"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৮ম বর্ষ : ৪র্থ খন্ড

শুক্রবার, ২৪ মাঘ, ১৩৭৫—শুক্রবার, ১৯ বৈশাখ, ১৩৭৬

FRIDAY, 14th MARCH, 1969 — FRIDAY, 2nd MAY 1969

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড — দেশ — ৪০শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 13th February, 1970 শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

চিঠিপত্র

'প্রথম ভারতীয় আই. এম. এস'

গত ২রা মাঘ 'অমৃতে' সংখ্যায় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের "প্রথম ভারতীয় আই এম এস" লেখাটি পড়লাম, এমন একটি মহান্ বাঙালীর জীবনী পড়ে সত্যই লেখককে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমি আরও ২।১টি কথা বলতে চাই। লেখক জানিয়েছেন কুমিল্লা জেলাস্কুলের শতবার্ষিকী (১৮৩৭-১৯৩৭) উপলক্ষে এই বিদ্যায়তনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে বিখ্যাত ছাত্রদের প্রদত্ত বিবরণাংশ থেকে জানা যায় যে, সূর্যকুমার এই বিদ্যালয়ে ১৮৩৯ সালে ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভর্তি হন, তারপর কুমিল্লা স্কুল থেকে কলকাতায় আসেন এবং কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন বলে জানা যায়। এই প্রবন্ধে বারবার ডাঃ গুডিভের নাম করা হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ডাঃ মৌ এট' এর নাম করা হয়নি। 'ডাঃ মৌ এট' মেডিকাল কলেজের কাউন্সিলর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনিই প্রথম সংবাদ দেন যে, শীঘ্রই মেডিকাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে উন্নত ধরনের চিকিৎসা বিদ্যা শেখানোর জন্য বিলেতে পাঠান হবে, এবং তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টাতেই বিলাত যাবার রাস্তা সুপ্রশস্ত হয়। প্রবন্ধে আরও দেখলাম, দ্বারকানাথের সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তী একই জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। (লেখকের মতে ১৮ই মার্চ আবার কারও মতে ৮ই মার্চ)। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরও একটি কথা বলতে চাই। দ্বারকানাথ ১৮৪২ সালে প্রথমবার যখন বিলাত যান তখন চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নার্থ মেডিকেল কলেজ থেকে একজন ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বিলাত নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলাতে যেতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু অভিভাবকগণের প্রতিবন্ধকতায় তাকে নিরস্ত হতে হয়।

একটি কথা আরও জানাতে চাই যে, সূর্যকুমার উপদংশ রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে যে সকল গবেষণা করেন তা সমসাময়িক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে পরে এ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবার সুবিধা ঘটেছে। ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণাল, মেডিকেল টাইমস্ এন্ড গেজেট, ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ইন্ডিয়ান এনাল্‌স্ অব্ মেডিকেল এন্ড সায়েন্স প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকাদিতে সূর্যকুমারের বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং কিছুকাল তার সভাপতিও ছিলেন।

বিদায় নেওয়ার আগে "১৮৭৪ সালের ১৫ই অক্টোবর" অমৃত বাজার পত্রিকা সূর্যকুমার সম্পর্কে যা লেখেন তা থেকে সামান্য কয়েকটি কথা লিখলাম।

"বঙ্গদেশ আরও একটি রত্নচ্যুত হইয়াছে। ডাঃ চক্রবর্তী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় ৪ মাস হইল ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ডাঃ চক্রবর্তী একজন অসাধারণ লেখক ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীর প্রকৃত নাম সূর্যকুমার চক্রবর্তী। তিনি একজন বিলাতী মেমকে বিবাহ করেন। সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তাহার সহিত তিনি তত সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। ডঃ চক্রবর্তীর অমায়িক ব্যবহার ছিল এবং যাহাতে দেশের উপকার হয় তৎপক্ষে তিনি যত্নশীল ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীর ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।"

সুনীলকুমার নিয়োগী

আসানসোল, বর্ধমান।

বিজ্ঞপ্তি

মানুষ গড়ার ইতিকথা

'অমৃতে' গত ন মাস ধরে মানুষ গড়ার ইতিকথা' নামে একটি বিভাগ চলেছে। এই বিভাগে কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার প্রায় ৪০টি প্রাচীন ও নবীন উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ের ইতিকথা প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগটি যে জনপ্রিয় হয়েছে এবং অগণিত পাঠক-পাঠিকা চিঠি দিয়ে এ বিভাগটির উপযোগিতার বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন এতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করেছি। কিন্তু বাংলাদেশের সবগুলি উল্লেখযোগ্য এবং খ্যাতনামা বিদ্যালয়ের 'ইতিকথা' প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের সাধনার বিষয়, কারণ এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা কয়েক শ' হওয়াই সম্ভব। সেজন্যে ন' মাস চালানোর পরই বিভাগটি বন্ধ করে দিতে হল। কিন্তু আমাদের অনুরোধ, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ক্ষুন্ন হবেন না, এবং সংক্ষেপে তাঁদের বিদ্যালয়ের বিষয়ে তথ্যাদি আমাদের জানাবেন।—আমরা তার মধ্যে নির্বাচন করে অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ইতিকথাই যথাসাধ্য 'অমৃতে' প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

—অঃ সঃ

মানুষগড়ার ইতিকথা

আপনাদের বহুল প্রচারিত 'অমৃতে'র আমি নিয়মিত পাঠক। বহু বিদ্যালয়ের বিষয়ে "মানুষগড়ার ইতিকথা" আপনি লিখে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয় চল্লিশ বছর আগে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তার ইতিবৃত্ত 'অমৃতে' এখনো স্থান পায়নি। সত্যিকারের মানুষ গড়ার ইতিকথা জানতে হলে আমাদের স্কুলকে জানতে হবে। আমাদের স্কুলের নাম মডার্ন স্কুল, নর্থ রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। পার্কসার্কাসে এটি অবস্থিত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় এই স্কুলটি পার্ক সার্কাস অঞ্চলে স্থাপন করেন। এ অঞ্চলের একমাত্র আদর্শ স্কুল বলতে মডার্ন স্কুলকেই বোঝায়। শুধু পার্কসার্কাস নয়, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ ও ১৯৬৬ দু দু'বার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। তাছাড়াও প্রতি বছর এখান থেকে ভারত সরকারের জাতীয় বৃত্তি ছাত্ররা পেয়ে আসছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে হায়ার সেকেন্ডারী পর্যায় উন্নীত হয়েছে।

মডার্ন স্কুল তার নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজে সচেষ্ট হয়েছে। এক বিঘা জমির ওপর তিনটি ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা গত ১৮ই জানুয়ারী রবীন্দ্র সদনে "ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের" ফোক সংস্, মাস সংস, ড্যান্সেস অফ্ ইণ্ডিয়ার আয়োজন করেন। সরকারী কোনোরকম সাহায্য না পাওয়াতে বিদ্যালয়ের প্রক্তন ছাত্ররা, বিদ্যালয়ের কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দ অর্থ সংগ্রহের কাজে নিজেরাই উঠে পড়ে লেগেছেন।

আমাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটু উল্লেখ করি মডার্ন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরীই প্রথম বাংলা দেশে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়
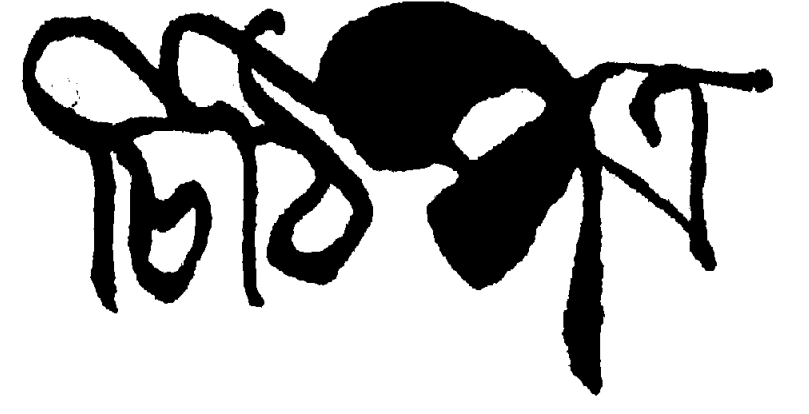
চিঠিপত্র

ছাত্রদের নিয়ে বয়েজ স্কাউট গ্রুপ গঠন করেন।

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক,
মডার্ন স্কুল ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন

মূক-বধির প্রসঙ্গে

গত ২৪শে পৌষের (৩৫শ সংখ্যা) অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে 'কুইজ : মূক-বধির প্রসঙ্গে'—এই বিষয়ে পুলক মুখার্জির লিখিত পত্র পড়ে অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়েছি। প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি যে, তাঁর চিঠির বিবরণের সঙ্গে আমি একমত নই। যেহেতু আমিও মূক-বধির ও শৈশবকালে কঠিন ব্যাধির কবলিত হয়ে শ্রবণশক্তি হারিয়েছি, তাই আমি বাল্যকাল থেকে "অনেক মূক-বধির যুবক যুবতী, নবীন নবীনা, প্রবীণ প্রবীণা"র সঙ্গে মিশেছি ও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা জানার সৌভাগ্যলাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের মানসিক ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত পরিণত। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। পুলকবাবু তাঁর পত্রে 'স্বয়ং মূক-বধির হয়েও' 'মানসিক ব্যক্তিত্ব অনেক পরিণত" লিখেছেন। একে অত্যন্ত গর্হিত মনে করি। আমার জিজ্ঞাসা কোন তথ্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে তাঁর এই অভিমত পেশ করেছেন?

তিনি কি তাঁর পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ মূক-বধির পরিষদের মূক-বধির সদস্য ও সদস্যাদের মানসিক ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করে উপরলিখিত সিদ্ধান্ত করেছেন? যদি তা হয়, তাহলে তাঁর ভুল হয়ে যাচ্ছে। কারণ তাঁর পশ্চিমবঙ্গ মূকবধির পরিষদ ছাড়া, অন্যান্য "মূকবধিরদের" সংঘ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সেই সংঘের মূকবধির সদস্য ও সদস্যাগণের সঙ্গে তাঁর সংঘের সদস্য ও সদস্যাদের তুলনা করা চলে না, তা নিশ্চয়ই জোর করে বলা যায়। সুতরাং তাঁর লিখিত পত্রকে অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে করি।

তাছাড়া যাঁরা "মূকবধির" হয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের সঙ্গে "হঠাৎ মূকবধির হয়ে যাওয়া" ব্যক্তিদের তুলনা করা চলে না। কারণ "হঠাৎ মূকবধির হয়ে যাওয়া" ব্যক্তিদের সৌভাগ্য এই যে শৈশবকাল বা যৌবনকালে কিছুকালের জন্য শ্রবণশক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার কবলিত হয়ে চিরকাল শ্রবণশক্তি হারান।

তাঁদের যদি স্মৃতিশক্তি থাকে, তাহলে তাঁদের মানসিক গঠন অর্থাৎ আচরণ "স্বাভাবিক মানুষদের" মত হয়। জন্ম মূকবধিররা সে সৌভাগ্য বঞ্চিত। তবে কয়েক ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও আছে। আমার মনে হয় ঠিকমত শিক্ষা পেলে আসল মূকবধিররা "মানসিক ব্যক্তিত্বে" পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন। সেজন্য পুলকবাবুর নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, তিনি যেন তাঁর পরিষদ ছাড়া অন্যান্য "মূকবধির" সংঘগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট ১৩ দফা স্মারকলিপি পেশ করার জন্য তাঁকে আন্তরিকভাবেই অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুমন দত্ত
(সোসাইটি ফর দি ডেফএর সভ্য)
কলি-১৯।

সোভিয়েত ঘোড়া

হালের বছরগুলিতে সোভিয়েট ঘোড়-সওয়াররা পৃথিবীর বহু দেশে ৫১৭টি কম্পিটিসানে যোগদান করেছেন। ৩৬৪টি প্রথম, ২৬৩টি দ্বিতীয়, ২০৪টি তৃতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। সোভিয়েত দেশের জকিরা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন আর ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং জিতেছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় খুব উচ্চমানের ঘোড়া আছে যাদের দ্বারা প্রজনন করানো হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোভিয়েত রাশিয়ার সরেস জাতের ঘোড়া আর দৌড়বাজ ঘোড়া উঁচু দামে বিক্রী হয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রসনোদর এলাকার বিখ্যাত ভোসখদ অশ্ব-প্রজনন খামারের "আর্নিলিন" নামে একটি সরেস জাতের অল্প বয়সী ঘোড়ার জন্যে ৩ লক্ষ ডলার দাম উঠেছে। এই ঘোড়াটি তিনবার ইউরোপীয় 'গ্র্যান্ড প্রাইজ' বা সর্বোচ্চ পুরস্কার জয় করেছে। আড়াই লক্ষ ডলার দাম উঠেছে তাম্বোভ অঞ্চলের দৌড়বাজ ঘোড়া 'লাজুৎ-চিক' এর জন্য। দুটি ঘোড়া ওলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কাজাকস্তানের সেই 'আবসেন্ত' আর উক্রাইনের 'ইখোর' ঘোড়া দুটির প্রত্যেকের জন্যে ১ লক্ষ ডলার দাম দিতে চাওয়া হয়েছে।

হালের বছরগুলিতে কতগুলি প্রতিযোগিতায় ভারতের ঘোড় সওয়াররা যোগদান করেছেন জানতে ইচ্ছা হয়। কলকাতা, বোম্বে, পাতিয়ালা, দিল্লী ভারতের এইসব জায়গার বিখ্যাত ভারতীয় জকিদের কাছে অনুরোধ করছি 'অমৃত' সাপ্তাহিকের মাধ্যমে আমাদের একটি ধারণা দিবেন, যাতে নিজের দেশ সম্বন্ধে একটা সত্য পরিচয় বিদেশী বন্ধুদের সামনে পেশ করতে পারি।

নারায়ণচন্দ্র অধিকারী
হিরাকুদ, ওড়িশা।

বেতারশ্রুতি

গত ২০-১-৭০ তারিখে সকালের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের কবিগুরুর "কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ" গানখানি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। গানখানি রবীন্দ্রনাথের নিজের রেকর্ড করা আছে। অধুনা শ্রীমতী ঋতু গুহও রেকর্ড করেছেন। তার ওপর আছে প্রকাশ্য স্বরলিপি। কিন্তু কোনটার সঙ্গে তিনি যে ঢংএ গাইলেন তার মিল নেই। এবং শুনে মনে হচ্ছিলো এ যেন অতুলপ্রসাদের সুর দেওয়া। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন খ্যাতনামা শিল্পীর কাছে বহু অখ্যাতনামা শিল্পী প্রত্যাশা রাখে। আশা করি এ সম্বন্ধে তিনি খুব সজাগ থাকবেন।

সুধীর চক্রবর্তী
কলিকাতা—৯।

"সাহিত্যিকের চোখে" আজকের সমাজ

যে কারণেই হউক ধারাবাহিক ভাবে 'অমৃত' পত্রিকার সংযোগ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম। ১৯৭০ সনের জানুয়ারী মাস থেকে নিয়মিত 'অমৃত' নিচ্ছি এবং পড়ছি। সত্যি কথা বলতে কি, 'অমৃত' পাঠ করে যে কোন সাহিত্যপিপাসু, সাহিত্যের রস পান করতে পারিবেন। "সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ" বিভাগটি নিঃসন্দেহে উৎকর্ষের দাবী রাখে। আমার, এই বিভাগটি খুবই ভালো লাগছে। 'অমৃত'তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "রামকৃষ্ণদেব ও কল্পতরু উৎসব" আলোচনাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি।

অরুণেশ্বর দাস,
রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।

শাদা চোখে

পরিষদীয় গণতন্ত্রে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে বিরোধী দলের। তাঁরা সরকারের দোষ-ত্রুটির শুধু সমালোচনা করেন না, কি কর্ম-পন্থা অনুসরণ করলে গণকল্যাণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার পথও নির্দেশ করে থাকেন। বিচিত্র এই পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী কংগ্রেস দলকে তার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় নি। সরকার পক্ষেরই কিছু শরিক সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নতুন নজীর স্থাপন করলেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী বলেছিলাম 'আজ নয়, ৫ই ফেব্রুয়ারীর' মধ্যে একটি অঘটন ঘটবেই। ইঙ্গিতটা ছিল অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের আশংকাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই অঘটন না ঘটলেও বিধান-সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন— 'একদিনও চলতে পারে না—যত তাড়াতাড়ি যায় ততই মঙ্গল'—সেই ঘোষণাই প্রমাণিত করছে, যুক্তফ্রন্ট আর নেই আছে শুধু তার মৃতদেহ।

এবার আর সাংবাদিকদের 'বিকৃত' করা প্রতিবেদন নয়। বিধানসভায় টেপরেকর্ড-করা ভাষণ সাক্ষ্য বহন করছে, এ সরকার অসভ্য, বর্বর। মুখ্যমন্ত্রীর অকুণ্ঠচিত্ত এই খেদোক্তি নিয়ে আর জল্পনা-কল্পনার কোন সুযোগ নেই। সোজা ও সরল ভাষায় বলতে গেলে সরকারের পতনই ঘটেছে। রাজ্যপালের ভাষণ আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অনেকেরই যে আন্তরিক সমর্থন নেই একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই গণতন্ত্রের যাঁরা পূজারী বলে নিজেদের দাবী করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই প্রহসন বন্ধ করার দাবী তুলতে পারেন। না হলে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে ফ্যাসিজমের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে কিনা কে বলতে পারে। কিন্তু সেই ভয়াবহ দিনটা এলো না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলব সমস্ত প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। তবু মাহেন্দ্র-ক্ষণের অপেক্ষায় প্রহর গণনা চলছে মাত্র। একের পর এক প্রহর শেষ হয়ে যখন সেই চরম মুহূর্ত আসবে তার আগেই যজ্ঞের পুরোহিতদের অন্য সমস্ত অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। সেই অন্তিম লগ্ন নির্ধারণেই শুধু মতভেদ এখন। নয়তো মানসিক দিক থেকে উদ্যোগপর্ব শেষ হয়ে এসেছে।

ফ্রন্টের অন্তরালে এতদিন যে বিরোধী শিবির সংহত হচ্ছিল বিধানসভার ফ্লোরে তা ভালো করে ফুটে উঠেছে। যেটুকু বোঝা-বুঝির অভাব ছিল তাও দূর হয়েছে। চৌদ্দ শরিকের মধ্যে দ্বাদশ অংশীদারের বিধান-সভায় প্রতিনিধি রয়েছেন। তাদের মধ্যে নিদেনপক্ষে সাতটি শরিকের কণ্ঠে রাজ্য-পালের ভাষণকে কেন্দ্র করে সমালোচনার একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাংলা কংগ্রেস অবশ্য সুর সপ্তমে চড়িয়ে বিক্ষোভে, ঘৃণায় নিজেদেরই অঙ্গে যথেচ্ছ আঘাত করেছেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত। গর্জনও করেছেন। ভ্রূকুটি কুটিল চোখে আক্রমণের পূর্বাভাষও প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু সরকারী-খাঁচা ভেঙে এখনও মুক্তাঙ্গনে লাফিয়ে পড়ার মত তেজ দেখান নি। তফাৎ এটুকু মাত্র। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, পি এস পি, এস ইউ সি, এস এস পি, গুর্খা লীগ প্রভৃতি দলের সদস্যরাও নির্মম সমালোচনা করেছেন রাজ্য-পালের ভাষণের। বিরোধী দুই কংগ্রেস দলের যে অভিযোগ, সেটা প্রমাণ করবার তাঁদের আর প্রয়োজন হয় নি। সরকারের সহযোগী দলগুলিই কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিয়েছেন। তাই বিরোধী নেতা ভোটও দাবী করেন নি। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বিরোধী নেতা হিসাবে শেষ মুহূর্তে অবশ্য একটি 'মাস্টার স্ট্রোক' দিয়েছেন। তিনি বলে-ছেন, রাজ্যপালের ভাষণের জন্য 'ডিভিসান' দাবী করে বিযুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে আর নাজেহাল করতে চান না। এতে বাংলা কংগ্রেসের মুখরক্ষাও করা হয়েছে।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর তিন দিবস-ব্যাপী যে বিতর্ক হয়েছে তা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে একটা বক্তব্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে, অধিকাংশ দলের পক্ষ থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাঁদের উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো। বামপন্থী কম্যুনিস্টরা তাত্ত্বিক যুক্তি ও সরকারের কল্যাণমূলক কাজকে সামনে রেখে অবশ্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সফল হতে পারেন নি। কারণ যাঁরা তাঁদের সমর্থক বলে আজ পর্যন্ত পরিচিত তাঁরা কো[illegible] বামপন্থী কম্যুনিস্টদের সপ্তরথীর চক্রব্যূ[illegible] থেকে উদ্ধারের জন্য তেমন আগ্রহ দেখা[illegible] নি। এমন কি সপ্তরথীর দিকে একটি শ[illegible] নিক্ষেপ করতেও এগিয়ে যান নি। নিজের শক্তির উপর আস্থা রেখে, আর গণ-দেবতার দরবারে আরজি পেশ করে, বাম-পন্থী কম্যুনিস্টরা নিজেদের রথচক্রে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন শুধু। তাই বিধান-সভার ভাষণ যদি কোন ইঙ্গিত বহন করে থাকে তো সেটা এই যে, আখেরে কোনো ভয়াবহ দিন দেখা দিলে আজকে যাঁরা পরোক্ষে 'লিপ সার্ভিস' দিলেন তাঁরা বামপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গেই পাল তুলে দিয়ে চলবেন কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

গোটা বিতর্কেই শুধু বিসর্জনের বাজনা বেজেছে। আবাহনের সুর বলতে গেলে শোনাই যায় নি। আর সমস্ত সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তর। প্রায় সকলে মিলেই চার্জশীট দিয়েছেন জ্যোতিবাবু আর আজীবন শিক্ষক অধুনা মন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়কে। এক কথায় বলতে গেলে সকলেই শুধু ভাঙ্গনের জয়গান গেয়েছেন। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ থেকে কদাচিৎ রচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

দেখে-শুনে মনে হয় 'যুক্তফ্রন্ট' যেন শরৎচন্দ্র বর্ণিত টগর বোষ্টমীর সংসার। প্রতিনিয়ত কোঁদল, লাঠালাঠি। তবুও টগর নন্দ মিস্ত্রিকে ছেড়ে দিতে চায় না। তেমনি নন্দও টগরের মায়া কাটাতে পারছে না। কিন্তু এভাবে যুক্তফ্রন্ট টিঁকিয়ে রেখে কি গণকল্যাণের কাজ কিছু করা যাবে? গদীতেই শুধু থাকা যাবে।

অবশ্য এহেন দুর্যোগেও একজন সদস্য আশার বাণী শোনাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি হচ্ছেন এস এস পি সদস্য শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র। দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, 'সময় আছে বন্ধু! এখনও ফিরে এসো।' সত্যিই শ্রীমৈত্র বেশীর ভাগ বাঙালীরই মনোভাবকে প্রতিফলিত করেছেন। শ্রীমৈত্র অন্য দিকে বামপন্থী কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে

গ্রামের যে তাত্ত্বিক ডিফেন্স দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তাকেও ধূলিসাৎ করেছেন তাঁদেরই তাত্ত্বিক রুবিনস্টন সাহেবের তত্ত্বকথা উল্লেখ করে। রুবিনস্টন থিসিসের উপর আলোকপাত করে শ্রীমৈত্র বলেছেন যে, ঐ দেশে তাত্ত্বিক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন পুলিশকে হাতে নিয়ে গরীবের স্বার্থে আইনকে কাজে লাগানোর কথা। রুবিনস্টন সাহেবের এই থিসিস স্বীকৃত হয়েছিল অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পালঘাট কংগ্রেসে। যদি এর স্বীকৃত ব্যাখ্যা এখনও বাম কম্যুনিস্টরা মেনে চলেন তবে বর্তমান অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের সুযোগ কোথায়? কাজেই যা সংঘটিত হচ্ছে তা হচ্ছে শরিকী সংঘর্ষই — শ্রেণীসংগ্রাম নয়। আর এই শরিকী সংঘর্ষই ফ্রন্টের অন্তিম দশা উপস্থিত করেছে। শ্রীমৈত্র জিজ্ঞাসা করেন, ক্রমাগত আইন পয়দা করে লাভ কি, যদি বিচার বিভাগের প্রতি আস্থাই না থাকে? রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্পর্কে জজ সাহেবের রায় নিয়ে সরকার বাহাদুরী নিচ্ছেন, অথচ বিচারের প্রতি আস্থা নেই একথাও বলা হচ্ছে। এসমস্ত সঙ্গতিহীন কথাবার্তা বলে লাভ কি? সর্বোপরি শ্রীমৈত্র বলেছেন, জনতা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে ছিল। আর সেই জনতাকে সঙ্গে নিয়ে অনায়াসে অনেক অসাধ্য সাধন করা যেত। কেন এই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো হচ্ছে? শ্রীমৈত্র জিজ্ঞাসা করেন, কেন দিল্লী গিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করা হচ্ছে সেই ইন্দিরাজী আর চাবনজীর সঙ্গে যাঁরা ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদীচ্যুত করেছিলেন?

সত্যিই ইন্দিরাজী স্বয়ংসিদ্ধা। এই চঞ্চল কলকাতাতে এসেও তিনি অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে যুক্তফ্রন্টের বারমাস্যা শুনলেন, আর হয়ত অলক্ষ্যে হেসেছেন। দেখা যাচ্ছে যাঁরা এতদিন শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে বজ্রমুষ্ঠি উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত না করে দিন যাপন করতেন না তাঁরাই এখন সুযোগ করে সময় ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে ইন্দিরাজীর সাক্ষাৎকারের আশায় বিমানযাত্রা করছেন। এমন কি কে বেশী সমর্থক তা প্রমাণ করার জন্য যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন কেউ কেউ। এটা নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কি?

এবার রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ককে কেন্দ্র করে যে অচিন্তানীয় ও

সত্যিই বিস্ময়কর। উপমুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন সরকার এভাবে ক'দিন চলবে তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী আমার আদেশ বাতিল করছেন, আর আমি তাঁর আদেশ বাতিল করে দিচ্ছি। সত্যিই কে কবে শুনেছে উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ বাতিল করে দিতে পারেন। ইন্দিরাজী বলেছেন, পশ্চিম বাংলার অবস্থা তাঁরা লক্ষ্য করছেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে। এই রাজ্য ভারতকে কি নতুন পথের নিশানা দেয় তার অপেক্ষায় তাঁরা আছেন। ইন্দিরাজী জ্যোতিবাবু বা অজয়বাবুর ভাষণ শোনেন নি। শুনলে কি বলতেন জানা নেই। মহামনা গোখেলের উক্তি আজ স্মরণ করে বাঙালী অজয়বাবু আর বাঙালী জ্যোতিবাবু আজ যা করছেন তা ভারতের অন্য জায়গায় যদি শুরু হয় তবে ভারতবর্ষে এক ভয়াবহ দিন সমাগত। সেই দিন ইতিহাসে বিলম্বিত হোক 'সমদর্শী' সেই আশাই করবে।

যুক্তফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গদীতে আসীন হয়েছিল তার ফলশ্রুতি যদি এই হয়, কি ভয়াবহ অবস্থার দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তা ভাববার দিন এসে গেছে। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাঁদের ঝগড়া করবার বা হানাহানি করবার অবাধ অধিকার আছে। কিন্তু তা গদী আঁকড়ে থেকে নয়। হয় তাঁরা বিরোধ মিটিয়ে নতুন উদ্যমে গণকল্যাণে ব্রতী হন, নয়তো জনতাকে তাঁদের তথা-

দিন। এর আর অন্য রকম হওয়া উচিত নয়।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের শেষ দিনে যে ভয়াবহ চিত্র বিধানসভার ভিতরে উদ্ঘাটিত হল তার পূর্বাভাষ আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। তার আগের দিনই যুক্তফ্রন্টের নির্ধারিত বৈঠক বসতে পারে নি। সভা বর্জন করে বাংলা কংগ্রেস এক চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিল, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের নীতির পরিবর্তন না করলে বৈঠকে কোন কথা হবে না। তারও আগে বাংলা কংগ্রেস কেবল 'টপ সিক্রেট' প্রস্তাব পাশ করে যাচ্ছিল। সেই একান্ত গোপনীয় প্রস্তাবের সারমর্ম নাকি ছিল তাঁদের দলনেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এককভাবে কোনো সংকট সৃষ্টি করবেন না। ঝোপ বুঝেই নাকি কোপ মারবার জন্য তাঁকে দলীয় কর্মপরিষদ নির্দেশ দিয়েছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী অসহিষ্ণু হলেও অভীষ্ট পথে এগুতে পারেন নি। কারণ সহযোগী দলগুলি নির্ঘণ্ট সম্পর্কে সহমত হতে পারেন নি। কেউ নাকি বলেছেন, নির্বাচন শেষ হয়ে যাক। কেউ আবার নাকি কনফারেন্সের কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিছু করতে রাজী নন। আবার শ্রীমতী গান্ধীরও পশ্চিমবঙ্গ সফর খানিকটা অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যত খড়্গ নাকি রাজনৈতিক কারণেই উত্তোলিত হয়েই আছে, অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি।

অবশ্য ক.লক্ষেপণের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে, একদিকে যেমন শক্তি সংহত ও বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, অন্যদিকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও নিতে হয়। রাজনৈতিক মহলের ধারণা হচ্ছে, এবার বাংলা কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা একেবারে অসহায়ের মত তাঁদেরই গদী থেকে উৎসাদনের পালার নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবেন না। তাঁরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবার রাজনৈতিক তৎপরতা যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করবেন সে সম্পর্কে 'সমদর্শী'ও' নিঃসন্দেহ, এবং তা করাই যে তাঁদের পক্ষে উচিত একথাও 'সমদর্শী' স্বীকার করে। কারণ তাঁদের বাঁচতে হলে লড়তে নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদেরই সঙ্গে অদ্যাবধি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে সমস্ত শরিক চলছে সেই রকম একটি বড় শরিকের অন্ততপক্ষে নয়টি জেলা কমিটি নাকি ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাশ করে বাম-পন্থী কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে চলার বিরুদ্ধে শুধু উষ্মা প্রকাশ করেছেন এমন নয়, আর এক মুহূর্তও গাটছড়া বেঁধে থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। সেই দলকে নাকি ঠিকমত চালিয়ে যাতে ভাঙন না ধরে সেজন্য নেতৃবৃন্দকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসে ফাটল ধরছে বলে তাঁদেরই এক সহযোগী দল সুকৌশলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচারের রাজ-নৈতিক অর্থ নাকি এই যে, মুখ্যমন্ত্রীকে এখুনি কিছু করা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা।

আবার এস এস পি'র একটি অংশ, যাঁরা 'নালিকুলপন্থী' বলে পরিচিত, তাঁরা দলের কার্যক্রম সিণ্ডিকেটপন্থী হচ্ছে এই অভিযোগের উপর জোর দিয়ে 'নালিকুল কমিটি' বাতিল করে দেওয়ার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তার উপর প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক মহল বলছেন, তাঁদের এই কৌশল অবলম্বন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিটি বাতিল করে যে অপমান করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নেওয়া। সরাসরি বাতিলের কথা উল্লেখ করে বিরোধিতা করতে থাকলে তা ধোপে ঠেকানো সম্ভব নয়। কাজেই নীতিগত ও তত্ত্বগত প্রশ্নের উপর জোর দিলে ইজ্জত থাকে, আর সমঝোতার সম্মানজনক শর্তও পাওয়া যেতে পারে। দলের এই অবস্থায় যদি কিছু ঘটে তবে সদস্যরা ভাগাভাগি হয়ে গেলে কিছু অঘটন ঘটার রাজনৈতিক উপযোগিতার প্রশ্নটা আবার বড় করে দেখা দিতে পারে। অতএব, অনেকেই মনে করছেন, দুই যুধ্যমান শিবিরের শক্তি বৈষম্যের খ তারতম্য আজও ঘটে নি বলে [illegible] ঘটছে না।

এদিকে ফ্রন্টের আশু বৈঠক বসবে কিনা এই সম্পর্কে কেউ সঠিক কথা বলতে পারছেন না। কিছু কিছু হিতাকাঙ্ক্ষী অবশ্য এ'র-ও'র কাছে যাচ্ছেন, আবার কি করে বৈঠকে বসা যায় তা বার করার জন্যে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বৈঠকে বসে ত কোন লাভ হবে না। সেই ভোটাভুটি করে অধি-কাংশের মত যদি সংখ্যালঘিষ্টরা না মানেন তাতে সমস্যার জটিলতাই বাড়ে মাত্র, সমাধান হয় না। অবশ্য তাতে জনতার কাছে অপর পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার মাল-মশলা যে পাওয়া যায় সেটা ঠিক। ফ্রন্টের সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত সহমত হয়ে গ্রহণ করার পরও যখন রক্ষিত হয় নি, বরঞ্চ ইচ্ছামত পদদলিত করা হয়েছে, সে অবস্থায় নতুন করে এই কৌশল অবলম্বনের যৌক্তিকতা কতোদূর তা সন্দেহের বিষয়।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্কের জবাবিভাষণ উপলক্ষে গত সপ্তাহে বাংলাদেশের খবরের কাগজে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর শিরোনামা জুগিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু তাঁর সহকর্মীকে আবার অসভ্য বর্বর আখ্যায় ভূষিত করে বলেছেন যে, এ সরকার যতো তাড়াতাড়ি যায় ততোই মঙ্গল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আবার পাল্টা নির্বাচনের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তার আগের দিন ছিলো ফ্রন্টের মিটিং যাতে প্রত্যাশিত ঝড় ওঠে নি, কারণ, বাংলা কংগ্রেস সভায় আসে নি ও ফলে বৈঠকও হয় নি। রাজ্য রাজনীতির এই থমথমে অবস্থার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশ তিন দিনের জন্য সফর করে গেলেন যার শেষ দিন ছিলো বিশ্বভারতীর সমাবর্তন। কংগ্রেসী রাজনীতির গত সপ্তাহের একটা বড় খবর ছিলো এই যে বর্তমানে মেদিনীপুর (বিধানসভা) ও বসিরহাট (লোকসভা) কেন্দ্র থেকে যে দুটি উপ-নির্বাচন হচ্ছে তাতে কংগ্রেসী প্রার্থীরা তাঁদের জোড়া-বলদ প্রতীক পান নি, কারণ প্রতীক সম্পর্কে শাসক ও বিরোধী উভয় কংগ্রেসের দাবী ও পাল্টা দাবী নিয়ে দিল্লীতে এখনো মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সামনে শুনানী চলছে। এদিকে উত্তর-প্রদেশ বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসার সংগে উভয় কংগ্রেসের রাজনীতি অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বি কে ডি-নায়ক চরণ সিং-এর সিদ্ধান্তের উপরই গুপ্তমন্ত্রিসভার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গ

অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবুর মধ্যে যে পত্রবিতর্ক শুরু হয়েছিল গত মঙ্গলবার জ্যোতিবাবু তাঁর শেষ জবাব দেন যাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের উত্তরে বলেছেন যে, শর্করা শিল্পের কণ্ট্রোলার নিয়োগ সংক্রান্ত 'কেলেঙ্কারি'র কথা প্রকাশ করে তিনি সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা আইন ভঙ্গ করেন নি, কারণ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কখনো মন্ত্রিসভায় ওঠে নি এবং সরকারী কার্যসূত্রেও তিনি এই নিয়োগের সংবাদ অবগত হন নি। বিতর্কের এইখানেই শেষ, কারণ, অজয়বাবু আগেই বলেছেন যে, তিনি আর কোনো পত্রের জবাব দেবেন না। বিতর্ক শেষ হলেও তার জের মেটে নি, কারণ, পরদিন যুক্তফ্রণ্টের যে বৈঠক ছিলো তাতে বাংলা কংগ্রেস আসে নি এবং রাজনৈতিক মহলের অনুমান যে, জ্যোতিবাবুর শেষ পত্র বয়কট সিদ্ধান্তের প্ররোচনা জুগিয়েছে। ফলে ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যরা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে যান এবং পরবর্তী বৈঠক কবে হবে তারও কোনো তারিখ নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনে রাজ্যপাল যে ভাষণ দেন তার ওপর বিতর্ক শেষ হয়েছে এবং তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তাও পাশ হয়েছে। কিন্তু এই বিতর্কে মন্ত্রিসভার যে আভ্যন্তরীণ অবস্থা ফুটে উঠেছে তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার কোনো আভাস নেই। অজয়বাবুর যে 'অসভ্য বর্বর' মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এই দিনের বক্তৃতায় তিনি আবার জোর দিয়ে তার পুনরুক্তি করেন এবং এই সরকারের যে জনকল্যাণের কোনো ক্ষমতা নেই তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। এদিনকার অধিবেশনে পাঁচজন মন্ত্রী বক্তৃতা করেন যাঁদের কারুর কারুর বক্তৃতায় ছিল নিজেদের সরকারের তীব্র সমালোচনা। এই অবস্থায় ফ্রন্ট রক্ষার কোনো পন্থা জ্যোতিবাবু বাতলাতে পারেন নি, তিনি বাংলা কংগ্রেসের ভাবগতির পিছনে ফ্রন্ট ভাঙ্গার চেষ্টার আভাসই লক্ষ্য করেছেন এবং জনগণের কাছে আবার ফিরে গিয়ে নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এলেন, গেলেন

এই অবস্থার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তিন দিনের জন্য বাংলাদেশ সফর করে গেলেন যার মধ্যে ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়াসের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন ও বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে ভাষণই ছিলো সবচেয়ে উল্লেখনীয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে কলকাতায় কংগ্রেস কর্মীদেরও এক সভায় তিনি ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল ভবনে এই দিন সন্ধ্যার পর অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবুর পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ ও নিভৃত আলোচনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যদিও বিষয়বস্তু অপ্রকাশ। তবে রাজনৈতিক মহলের এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজ-নিজ অভিমত প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

বলদ নিয়ে বিরোধ

কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক জোড়া-বলদ কে পাবে তাই নিয়ে শাসক ও বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা [illegible] চিত্রে মাল্যদান করেন। রাধানগর রামমোহনের জন্মস্থান।

তা এখন দিল্লীতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের বিচারাধীন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুটি উপ-নির্বাচন হচ্ছে —একটি মেদিনীপুর থেকে বিধানসভায় এবং অপরটি বসিরহাট থেকে লোকসভায়। মেদিনীপুর উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুই কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি। বসিরহাট কেন্দ্রে আগে বাংলা কংগ্রেসের সদস্য (হুমায়ুন কবির) ছিলেন, কাজেই এবারও বাংলা-কংগ্রেসই প্রার্থী দেবে। দুই কংগ্রেসের প্রার্থী এখনো ঠিক হয় নি। ইতিমধ্যে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ মেদিনীপুরের কংগ্রেসী প্রার্থীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, জোড়া-বলদ নিয়ে মামলার শুনানী এখনো শেষ না হওয়ায়, কোনো প্রার্থীকেই কংগ্রেসের নির্দিষ্ট প্রতীক দেওয়া যাবে না, তার বদলে বর্তমানে নির্দল প্রার্থীদের প্রতীক যেমন 'জোড়া পাতা' ও 'সাইকেল' গ্রহণ করতে হবে। মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে উভয় প্রতিনিধিই যথারীতি প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রতীক বর্তমানের জন্য সম্মত হয়েছেন।

চরণ সিং কি করেন

উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এখন আসন্ন ক্লাইম্যাক্সের ছায়া পড়েছে, নায়ক ও উপনায়কদের আগম-নির্গম ও চঞ্চল গতিতে তার আভাস। এপক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ঘুরে গেছেন, ওপক্ষে এসেছেন রামসুভগ সিং ও মোরারজী দেশাই। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে ১১ই ফেব্রুয়ারী, যদিও গুপ্তমন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ সম্ভবতঃ নির্ধারিত হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী যেদিন রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্কের অবসানে ভোট নেওয়া হবে। যদিও সি বি গুপ্ত এখনো অবস্থা সম্পর্কে নৈরাশ্যের আমল দিচ্ছেন না তবু সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে তিনি যে হিসেব দিয়েছেন তাতে নিজ-লিঙ্গাপ্পা-দল খুব আশার আভাস দেখছেন না। সি বি গুপ্তের হিসাবে, এখনো তাঁর ডজনখানেক ভোটে সংখ্যাধিক্য আছে। কিন্তু মনে হয়, বি কে ডি'র শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে সম্ভাব্য ঐক্যের ক্ষেত্রে নেতা মনোনয়নের প্রশ্ন নিয়ে কমলাপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যে মতভেদ দেখা দিতে পারে, তার ওপরই সি বি গুপ্ত এখন বেশী নির্ভর করছেন। গুপ্তের ধারণা, যদি চরণ সিং সম্মিলিত দলের নেতা মনোনীত হন তাহলে শাসক কংগ্রেস দল থেকে আনুমানিক বারতের জন সদস্য তাঁর দিকে আসবে এবং অপর পক্ষে যদি কমলাপতিই শেষ পর্যন্ত নেতৃপদ লাভ করেন তাহলে বি কে ডি থেকেও অনুরূপ পরিমাণ সদস্য বেরিয়ে আসবে।

ফলতঃ দেখা যায় চরণ সিং-এর ভবিষ্যৎ মতিগতির ওপরই এখন উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ভর করছে। নিজের অবস্থার জটিলতা বুঝে সি বি গুপ্তও নাকি চরণ সিংকে দলে ভাগাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রিত্বের টোপ ফেলেছেন।

লিবিয়ার কাছে ফরাসী বিমান বিক্রীর পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে শীর্ষ শক্তিবর্গের মধ্যে আর এক হুমকী ও পাল্টা হুমকীর পালা শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করলে সুবিবেচনার আশ্বাস পান। এরই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সের কাছে পৃথক পৃথক নোটে ইস্রায়েল-আরব সংঘাত

কোসিগিন বনাম নিকসন

যে বিপজ্জনক রূপ নিতে চলেছে তার ব
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই নোটের ব্যাপ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাকি বিশেষ উদ্
দেখা না দিলেও ফরাসীরা এর পেছনে আ
জগতে সোভিয়েট অস্ত্র সাহায্য বৃদ্
আভাস দেখতে পেয়েছে। ফরাসীরা বল
যে, সোভিয়েট নাকি ফ্রান্সের প্রধানমন
পম্পিদুকে জানিয়েছে যে, এই রকম অব
চলতে থাকলে তারা হয়তো আরব
ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এবং শেষ
সোভিয়েটকেও সম্ভবত আরবদের
নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন অবশ্য সোভি
নোটে দমেন নি, তিনি কোসিগিনকে জানি
ছেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি ইস্রায়েলে অ
সাহায্য বৃদ্ধিতে বাধ্য হবেন। সাংবাদিক
কাছে তিনি বলেছেন যে, ইস্রায়েল
৫০ খানা ফ্যানটম ও স্কাইহক জেট বিমান
জন্য আবেদন জানিয়েছে, ৩০ দিনের ম
তিনি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিকে প্রেসিডেন্ট নাসের সোজাসু
বলেছেন যে, নিকসন যদি ইস্রায়েল
৫০ খানা বিমান বিক্রী করেন তাহ
তিনিও সোজাসুজি মস্কোয় গিয়ে অস্
সাহায্য চাইবেন। তিনি বলেছেন যে, যু
রাষ্ট্র ইস্রায়েলকে শুধু বিমান দিচ্ছে ন
পশ্চিম জার্মানীর মারফৎ প্যাটন ট্যাংক
বোমাও দিয়েছে এবং এই সব বোমা
সম্প্রতি কায়রোর কাছে ইস্রায়েলী বিমা
আক্রমণের কালে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কাজেই
পাল্টা আঘাত হানার জন্য মস্কোর দ্বারস্থ
হওয়া ছাড়া তাঁর অন্য উপায় নেই।

সম্পাদকীয়

শ্রীমতী গান্ধী ও বাংলাদেশ

পশ্চিমবাংলার শাসনকর্তৃত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁদের মধ্যে ঐক্যের অভাব এই রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরীক্ষা ও বিপুল জনজাগরণ সম্পর্কে আশার বাণীই শুনিয়ে গেছেন। তিনি দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার করেননি। বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জাগরণ ও তার প্রত্যাশা পূরণের দাবির পর্যালোচনা করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের বিষয়। কংগ্রেসের ভাঙনের পর এই প্রথম তিনি বাংলাদেশে এলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এ রাজ্যের নেতারা এক হয়ে কাজ করতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর সংগে চলছে তীব্র বাকযুদ্ধ। বিধানসভায় এবারে সরকার কার্যত বিভক্ত হয়ে দুই সুরে কথা বলেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় বলেছেন যে, তিনি যে সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে সরকার 'অসভ্য ও বর্বর'। এ সরকার কিছুতেই চলতে পারে না।

অন্যদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সরকার যে ভাল কাজ করেছেন তার দিকে নজর না দিয়ে ফ্রন্টকে ভাঙবার জন্য কোনো কোনো দল মরিয়া হয়ে উঠেছে। যদি ফ্রন্ট ভাঙতেই হয় তাহলে আবার জনসাধারণের কাছে গিয়ে নির্বাচনের জন্য দাঁড়াতে হবে। সরকারপক্ষের মধ্যে বিভেদ এত স্পষ্ট, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে, বিরোধী দলের নেতা রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আর ডিভিশন দাবি করে সরকারকে বিব্রত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং এই ফ্রন্ট কতদিন চলবে এবং কবে ভাঙবে তাই এখনকার আলোচ্য বিষয় লোকের মুখে মুখে।

প্রধানমন্ত্রী এবার কলকাতায় এসে যতগুলি ভাষণ দিয়েছেন তাতে কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করেননি। বাংলাদেশে এককালে মহামনীষীরা জন্মেছেন, তাঁরা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এবারেও বলে গেছেন যে বাংলাদেশে যে জনজাগরণ দেখা দিয়েছে তাকে গঠনমূলক শক্তিতে পরিণত করে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। সারা ভারত আজ পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে আছে এই জনজাগরণ ও উৎসাহ কীভাবে নতুন সংগঠন-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই উৎসাহবাক্য নিছক সৌজন্যমূলক নয়। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে বাংলাদেশের যে-অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার স্বীকৃতিতেই প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী বাস্তব দৃষ্টিতেই বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির এই পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নিজেকে ঘোষণা করেছেন মধ্যপন্থীরূপে। আজ সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানের জন্য যে-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তা আর পুরানো পন্থায় দেশ শাসন করে দমন করা সম্ভব নয়। এই বিক্ষোভ তো শুধু ভারতে নয়, কিংবা পশ্চিমবঙ্গে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের এই বিবর্তন ভারত উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে সাহসের সঙ্গে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই পরিবর্তনকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, আজ শুধু ধনীরাই এই পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত নয়, যারা বিত্তহীন তারাও নিজেদের অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী নয়।

এই পরিবর্তনের ধাক্কায় কংগ্রেস পার্টির মধ্যেই যে শুধু ভাঙন দেখা দিয়েছে তা নয়। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলেই আজ ভাঙনের সূচনা। মত ও পথের পার্থক্য থেকেই এই বিভেদ। রক্ষণশীল অংশ সমাজের পরিবর্তনে বিমুখ। তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। কিন্তু এ হল জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে বসে থাকার মতো। আজ তাই কংগ্রেস পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের পথে পা বাড়ানোর জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এ কারণেই কংগ্রেস ভাগ হয়েছে। যাঁরা স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী তাঁরা বেরিয়ে গেছেন। অথচ কংগ্রেস সমাজতন্ত্র স্থাপন করবে বলে অনেক আগেই প্রস্তাব নিয়েছিল। সে প্রস্তাব রক্ষণশীলদের জন্য কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রীমতী গান্ধী শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে কংগ্রেসকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। অতি বাম কিংবা অতি দক্ষিণ কোনো দিকেই তিনি কংগ্রেসকে সামিল করতে চান না। তিনি মধ্যপন্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থের সুসম বণ্টন ও সামাজিক সাম্যের পক্ষপাতী। এ হল যুগের দাবি। এখনও যাঁরা দেয়ালের লিখন পড়তে পারছেন না তাঁরা বৃথাই আক্ষেপ করছেন যে শ্রীমতী গান্ধী দেশকে কমিউনিজমের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে এবার শ্রীমতী গান্ধী ভারতের নবযুগের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর পরিদর্শন করে গেলেন। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে তিনি সমাবর্তন ভাষণ দিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সামনে। এ দুটোই এ যুগের তীর্থ। মহামনীষীদের আবির্ভাবধন্য বাংলাদেশের জনমানসের নবচেতনার অভ্যুত্থানে সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী আশান্বিত। এখন এই অভ্যুদয়কে আমরা বিনাশধর্মী কাজে লাগাব, কি নতুন সমাজ গঠনের কাজে, তা নির্ভর করছে দেশের মানুষের ওপর। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর দেশের মানুষ সে-দায়িত্ব দু দুবার অর্পণ করেছে। এবার যদি তাঁরা ব্যর্থ হন তাহলে জনসাধারণকে এগিয়ে এসে প্রতিরোধ করতে হবে সমস্ত ভাঙন ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে। কারণ জনকল্যাণের জন্যই এই সমবেত শক্তির অভ্যুত্থান আজ এত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী সেকথাই বাংলার মানুষকে তাঁর উদাত্ত ভাষণে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

'লিটারেচর ইজ এ গ্রেট স্টাফ বাট এ সরি ক্রাচ'। উক্তিটি ওয়ালটার স্কটের। সাত দশকের এই সমাজের সামনে আজকের সাহিত্যিক দাঁড়িয়ে কি সাহিত্যিকের মুখ চেয়ে আজকের সমাজ, এ-প্রশ্ন জাগতে ওই উক্তি মনে পড়ল। সাহিত্যকে আজ 'গ্রেট স্টাফ'-এর পর্যায় ফেলি কি 'সরি ক্রাচ'-এর?

আরো একটু বিশ্লেষণ দরকার বোধ-হয়। বলিষ্ঠ দণ্ড পঙ্গুর বহনের বস্তু নয়। দুর্বলের সম্বল করে তুলতে হলে কাট-ছাঁট করে ওটির ভোল বদলে দিতে হবে। ওটাকে তখন বলিষ্ঠ দূরের কথা, দণ্ডও বলা যাবে না। এখন কেউ যদি ঘোষণা করেন আজকের সাহিত্যের দণ্ডত্ব ঘুচে গেছে, আত্মাভিমানী তর্কের খাতিরে জবাব দেওয়া যেতে পারে তার জন্যে আজকের সমাজ দায়ী, জাতি দায়ী—সাহিত্যের অধোগতি চিরকাল জাতির—অধোগতির প্রতীক, নিম্নগামিতার প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পরের দোসর। আরো বলতে পারি, কোন এক যুগের সাহিত্য সে-যুগের সমাজ-প্রবৃত্তির প্রতিফলন মাত্র। সমাজের স্রোত যে-ধারায় বইছে, সাহিত্যিক কালির আঁচড়ে তার ছবি সাজাচ্ছে।

এই জন্যেই কি 'অমৃতের' প্রশ্ন, বর্তমানের সাহিত্যিক আজকের সমাজকে কোন্ চোখে দেখছে? 'অমৃত' এ প্রশ্ন তুলে ধরে সজাগ এবং শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসকের মতো সময়োপযোগী এক অপ্রিয় কর্তব্যসাধন করতে চেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আজকের সাহিত্যিক তাতে হয়তো বিলক্ষণ বিপন্ন হয়ে উঠেছেন। কারণ সাহিত্যিক নিজেও সমাজের বাইরের জীব নন, সত্যভাষণের দায়ে ঐ প্রশ্ন তাঁকে নিজের বিবেকের আয়নার সামনে ঠেলে দিয়েছেন। তর্কের খাতিরে যা-ই বলি, সমাজের স্রোত যে ধারায় বইছে, কালির আঁচড়ে তার ছবি সাজানোই সাহিত্যিকের শেষ কাজ নয়। সেই স্রোতের নৌকোয় উঠে বসলে সাহিত্যিককে তার হালটি ধরতে হবে, কাণ্ডারীর আসনটিতে বসতে হবে। আর, সেই স্রোত যদি আত্ম-ধ্বংসী হয়, সেই প্রতিকূলতার মধ্যে আত্ম-রক্ষার বাঁকগুলোও তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে। তাছাড়া ওই প্রশ্নের মধ্যে সং বিশ্লেষণের একটা বিপজ্জনক ফাঁকিও হয়তো রয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে। 'আজকের' শব্দটা জুড়ে দিয়ে। এ-প্রসঙ্গে শিগ্‌গিরই আসছি।

'সোসাইটি ইজ নাও ওয়ান পলিশড হোরড্ ফর্মড্ অফ টু মাইটি ট্রাইবস, দি বোর্‌স্ অ্যান্ড দি বোর্‌ড্'—কবি বায়রনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আজ বোধহয় কেউ ও-কথা বলবে না। সদ্যগত দশকে সমাজ আর সমাজের গণচেতনা সম্পর্কে এত বচন আমাদের মাথায় ঠেসে ভরাট করা হয়েছে যে, সমাজের যথার্থ সংজ্ঞা নিয়েও আমরা বহু বিভ্রান্তির সম্মুখীন। আমরা বলতে সমাজের মূর্খজনেরা। কোনো রসিক মনীষীর উক্তি, সমাজে চার শ্রেণীর মানুষের বাস, যথা প্রেমিক-প্রেমিকা, উচ্চকাঙ্ক্ষী, দ্রষ্টা আর মূর্খ—তার মধ্যে একমাত্র মূর্খরাই সুখী। আমি এই সুখী মূর্খ-জনদের কথাই বলছি।

যাই হোক, বায়রনের যুগ থেকে আজকের রণং-দেহি যুগ পর্যন্ত সমাজের সংজ্ঞা না হোক সমাজ-গঠনের একটি শর্ত সর্বজনস্বীকৃত। সে শর্তটা আজ বক্তৃতার অলংকার কিনা জানি না। তবু সকলেই বলে এসেছে এবং আজও বলে, সুস্থ সমাজ যদি পেতে চাও আর তার মানুষকে যদি কাছে টানতে চাও তাহলে একটি বস্তুর চাষ অনিবার্য প্রয়োজন। সে-বস্তুর নাম হৃদয়।

আমার ধারণা, এই শর্তটির ওপর যে লেখক যত বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে পেরেছেন সামাজিক লেখক হিসেবে তিনি ততো বেশি সার্থক। এটুকুই তাঁর জন-গণের অন্তঃপুরে প্রবেশের আসল ছাড়পত্র।

প্রশ্ন, জনগণের সাহিত্যের উৎস কোথায়? উৎস জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবোধের উৎস আত্ম-মর্যাদাবোধ। আর স্বাধীনতা বিহনে আত্মমর্যাদার পুষ্টি অলীক স্বপ্ন মাত্র।

সেই স্বাধীনতা এসেছে।

বাইশ বছর হয়ে গেল এসেছে।

তবু আজকের সাহিত্য সমাজের জন-মানসের মনে স্থায়ী আসন নিতে পারছে না কেন? কেন সেটা সবলের গ্রেট স্টাফের বদলে পঙ্গুর সরি ক্রাচের আকার নিচ্ছে? তার একটা সোজা কারণ আজকের এই অস্থির সমাজকে লেখক চেনে না, জানে না। আর কিছুটা চিনলে বা জানলেও তাকে সে ভয় করে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তাই হাল ধরার বদলে আত্মস্বার্থে উল্টে সে পিচ্ছিল যোগানদারীর বৃত্তিতে মগ্ন।

তাহলে জিজ্ঞাসা, আজকের সমাজখানা

প্রণিধানযোগ্য।

একদিন সকলে মিলিত হয়েছিল মাথার ওপর থেকে ইংরেজের বুট সরানোর তাগিদে। উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, জ্ঞানী-মূঢ়—সকলের সেই মিলিত ইচ্ছার বেগে বাইশ বছর আগে ইংরেজের বুট সরেছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেই মিলিত শক্তি শ্রেণীতে শ্রেণীতে শাখায়-প্রশাখায় স্বার্থের ভেদাভেদে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সেই সঙ্গে যুক্ত দেশ-বিভাগের চূড়ান্ত অভিশাপ। আজকের সমাজ এই দীর্ঘ বাইশ বছরের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য শাসনের সন্তান।

তার রূপ?

মনে হয় এরপর সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তবু দুটো ঘটনা বলি। শরিকী সংঘর্ষের ফলে এক পরিচিত ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলে প্রাণ খুইয়েছে। দেখা হতে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ব্যাপার কি জানেন, প্রাণ যে দিচ্ছে আর প্রাণ যে নিচ্ছে তাদের কারো মনেই থাকে না যে তাদের সঙ্গে বাপ-মা ভাই-বোন আত্মীয়-পরিজনের নাড়ির যোগ কেটে-ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল—এ কি হল বলুন তো?

দ্বিতীয় ঘটনার রঙ্গস্থল আমার ঘর। অল্প বয়সের রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর এঁদের লেখা পড়তাম আর ভাবতাম কবে এঁদের চোখের দেখা দেখতে পাব। এখন প্রৌঢ় বয়সে নিজের দশা শুনুন। দিন-দুপুরে দুটি অল্প-বয়সী চেনামুখ ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বলল, কাল আমরা [illegible] উপলক্ষে একটা উৎসব করব—আপনার এই জানলার প্যাশেই বাজী-টাজি পোড়াব, আপনি দেখতে পাবেন—কিছু সাহায্য করুন।

অর্থাৎ আমার সাহায্যের বিবেচনা ওদের অনুকূল না হলে দুই-একটা বাজী ছিটকে-ছটকে জানলার এদিকেও চলে আসতে পারে। এই ভাব-ব্যঞ্জনাটা কি চোখবুজে অস্বীকার করব?

আজকের সর্বস্তরের নেতারা তাই করছেন। ফ্যাঙ্কেনস্টাইনকে জাগালে কি হয় সে-দিক থেকে তাঁরা চোখ বুজে আছেন। আজকের হাস্যকর শাসনের ফাঁক দিয়ে তাই এখনো অবাধে মারামারি কাটাকাটি হান-হানির যজ্ঞ চলেছে।

এর পরেও বলতে হবে কি দেখছি আজকের এই সমাজের দিকে চেয়ে?

একটা মৃত্যু দেখছি।

সে-মৃত্যু মহৎ নয়। বৃহৎ।

তবু আমি আশাবাদী সাহিত্যিক। তাই তারপরেও কিছু দেখছি। দেখছি, মৃত্যুর ওই ভস্মস্তূপ থেকে নতুন দিন নতুন মানুষ নতুন সমাজ জেগে উঠেছে!

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চনমন করে একটা জমকালো কাহিনীর আশা করছেন তাঁকেও হতাশ হতে হবে বলে আমি দুঃখিত। কারণ যেখানে রমেনের যাবার কথা সেটা আর যাই হোক, কোনো রকম চটকদার জায়গা নয়। সেটা এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের ছাপাখানা। যেমন অপরিষ্কার আর এলোমেলো, তেমনি সেখানকার অব্যবস্থা। সেই ছাপাখানার একমাত্র গুণ—খুব শস্তায় ইংরিজি, বাংলা ও হিন্দি সেখানে ছাপা হয় এবং দাঁড়িয়ে থেকে কম্পোজিটার ও মেশিনম্যানদের তাগাদা দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করা যায়।

দুর্গন্ধময় খাল পেরিয়ে মিনিট দশেক হাটলে ইলেকট্রিক ফ্যানের যে-বিরাট কারখানা, তাদের হাউস জার্নালের সম্পাদক রমেন। সেই পত্রিকা বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে দু' মাসে একবার করে বেরোয়। ছাপা হয় চিৎপুরের সেই শস্তার প্রেসে। কোম্পানিই এই প্রেস পছন্দ করে দিয়েছে। রমেনের কাজ সম্পাদনা ছাড়াও পত্রিকা বেরুবার সময় প্রেসে হাজির থেকে টাটকা-টাটকা প্রুফ দেখে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাড়া দিয়ে পত্রিকা বার করে দেওয়া। পত্রিকা ছাপা হয়ে কোম্পানিতে ডেলিভারি না হওয়া পর্যন্ত

রমেন যখন এসপ্ল্যানেডে পৌঁছলো তখন কার্জন পার্কের ট্রাম কোম্পানির আপিসের মাথার চৌকো ঘড়িতে মাত্র সাড়ে তিনটে। অবশ্য সে-ঘড়ি ট্রামের মতোই নিজেদের খুশিমনে কখনো চলে, কখনো যে চলে না এবং সময়ের যে তোয়াক্কা করে না সে-কথা রমেন ভালো করেই জানে। তাই চোখ ঘুরিয়ে সে তাকালো ভূতপূর্ব হোয়াইটওয়ে লেডল' কোম্পানির গম্বুজের ঘড়িটার দিকে। সেটায় প্রায় পৌনে চারটে। এ-ঘড়িকেও বিশ্বাস নেই। তাই আড়চোখে পাশের ভদ্রলোকের মণিবন্ধে সে চোখ ঘোরালো। রোল্ডগোল্ডের সেই হাতঘড়িতে তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। তারপর সে মাথা পিছনে হেলিয়ে দেখলো আকাশ : মাঝ-ডিসেম্বরের কলকাতার শীতের আকাশ। গোটা আকাশেই পাতলা শাদাটে মেঘের আলোয়ান জড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিম কোণে সেই চাদরের ফাটল দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুম-পাওয়া ঘোলাটে সূর্যকে চোখে পড়ে। এতোগুলি নিশানা থেকে রমেনের মনে ধারণা জন্মালো সময়টা চারটের কাছাকাছি, অর্থাৎ চারটে পেরিয়ে যায়নি।

যে-পাঠক ভাবছেন কোনো বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছে বলে সময় নিয়ে রমেনের এই ব্যাকুলতা তিনি দুটো ভুল করবেন। প্রথমত, রমেনের মনে সময় নিয়ে কোনো ব্যাকুলতা নেই। দ্বিতীয়ত, তার এমন কোনো বান্ধবীও নেই যার সঙ্গে বিকেল চারটের সময় কার্জন পার্কে দেখা করার ডেট। কেউ হয়তো ভাবছেন নিজের হাতঘড়িটা সকাল ন'টার সাইরেনের সঙ্গে মিলিয়ে হাতে পরে রমেন কেন আসেনি। তার অবগতির জন্যে জানাই এতোদিন সেটাই সে করেনি। আজ করেনি, কারণ গতকালই সেটা বাঁধা দিয়ে চল্লিশ টাকা জোগাড় করে মেসের এবং মেসের মোড়ের পানের দোকানে সিগারেটের দেনা সে মিটিয়েছে।

রমেন শুধু চাইছিলো সময় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে। কারণ এখান থেকে ট্রাম ধরে চিৎপুরের যেখানে পৌঁছবার তার কথা সেখানে যেতে বড় জোর মিনিট কুড়ি লাগে। এবং সেখানে পাঁচটার আগে পৌঁছে কোনো লাভ নেই।

ছিলো। আজ পাঁচটায় নতুন প্রুফ আর সংশোধিত প্রুফ পাবার তার কথা। কথা পাঁচটায় বটে, তবে অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে এই কথার কোনো দাম নেই। পাঁচটাও হতে পারে, সাতটা হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই রমেনের মনে সময় নিয়ে কোনো ব্যাকুলতা নেই।

অতএব রমেন একটা সিগারেট ধরালো। পত্রিকার স্টলে নানা পত্রিকার পাতা ওটালো। যে-সব পাহাড়িয়া উলের সওদা নিয়ে রেলিঙ-ঘেরা জায়গায় ভীড় করেছে সে-সব জায়গায় খানিক দাঁড়ালো। সাপ আর বেজির খেলা দেখলো। অন্ধ ভিখিরির হার্মোনিয়াম সহযোগে গান শুনলো। কিন্তু সব সময়েই তার মনের ওপাশে চিৎপুরে সেই নোংরা এলোমেলো প্রেসের নানা আবছা-আবছা ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। কেন বলি।

দিন পনেরো আগে উল্টোডাঙার খালের ওপারের বিজয় সিলিঙ্ ফ্যানের আপিস থেকে পত্রিকার পাণ্ডুলিপি নিয়ে রমেন যখন এসপ্লানেডে পৌঁছয় তখন দুপুর বারটা। তখনো তার হাতঘড়ি ছিলো। তাই সময়টা স্পষ্ট মনে আছে। তারপর ধরে চিৎপুরের ৭নং ট্রাম। দারুন ভীড়। কোনো রকমে উপরের হ্যান্ডেল ধরে সে চলেছে। কোথায় চলেছে বোঝবার উপায় নেই। টিকিট কেনবার সময় কণ্ডাকটরকে সে বলেছিলো মহাত্মা গান্ধী রোডের চৌমাথায় তাকে নামিয়ে দিতে। সেই চৌমাথায় ভীড়ের ধাক্কায় কোনো রকমে পথে নেমে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সেই সঙ্গে কেমন যেন দিশেহারাও হয়ে গেলো। পথ মোটেই প্রশস্ত নয়। কিন্তু এতো ভীড় আর এতো ধরনের যানবাহন যে বিশ্বাস করাই যায় না। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, টেম্পো, ঠেলা, রিক্সা—কিছুই বাদ নেই। সব মানুষই এতো ব্যস্ত যে কোথাও দাঁড়িয়ে বাড়ির নম্বর যে দেখবে তার উপায় নেই। তাকে বলা হয়েছিলো এই চৌমাথার ডান দিকের ফুটপাথ ধরে উত্তর দিকে মিনিট দশেক হাঁটলে ডানহাতি ছোটো একটা ফাউন্টেন-পেনের দোকান সে পাবে। দোকানটা এক সর্দারজীর। সেই দোকানের লাগোয়া সরু একটা গলি। সেই গলি দিয়ে পৌঁছলেই 'সত্যম প্রেস'। তার গন্তব্যস্থল।

একবার ভেবেছিলো জীবনে বোধহয় কোনোদিন খুঁজে পাবে না। কারণ সর্দারজীদের ফাউন্টেন আর ডট পেনের দোকান অনেক, কোনো বাড়ির গায়ে নম্বরের বালাই নেই, কোথাও নেই সেই প্রেসের সাইনবোর্ড। কোনো লোককে থামিয়ে যে জিজ্ঞেস করবে, তারও সম্ভাবনা নেই। সবাই অদৃশ্য যেন কিসের তাড়ায় হন্তদন্ত হয়ে প্রায় ছুটছে। খানিক দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নের জবাব দেবার সময় কারুরই নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অন্ধকার মতো গলি-পথটা সে খুঁজে পেয়েছিলো এবং তার ভিতর দিয়ে কোনো মতে হাতড়ে-হাতড়ে ছোটো আবিষ্কার করে কলম্বাস যতটা ... হয়েছিলেন প্রায় ততটাই।

উঠোনের উত্তরে সারি-সারি কয়েকটা ঘর—কোনোটার দরজার কপাট নেই। সেই ঘরগুলোর ছাদ থেকে কয়েকটা করুগেটের টিন বাঁশের ঠেকোয় ভর দিয়ে খানিকটা আকাশ আড়াল করেছে। ঘরগুলোর মধ্যে কী আছে বোঝবার উপায় নেই। টিনের নীচে একটা দড়ির খাটিয়া। সেখানে বসে মেরুন রঙের ছেঁড়া গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে একটি লোক বসে। তার মাথার চুল কাঁচাপাকা। প্লাস্টার করা বাঁ পা-টা সামনের দিকে বাড়ানো। মুখে তার বিড়ি, মাথার উপর দাঁড়ে একটা পায়ে শিকলি-আঁটা পালক-ওঠা টিয়া। কোলে একটি বছর খানেকের শিশু। হাত-পা এতো সরু সরু যে রিকেট হয়েছে বলেই মনে হয়। চোখগুলো তার বড় বড়, তাতে ধ্যাবড়া করে কাজল পরানো।

প্রেস কোথায় প্রশ্ন করতে সেই আধ-বুড়ো লোকটা দক্ষিণ দিকের ঘরটা দেখিয়ে দিলো। দক্ষিণ দিকের ঘরটা ছোটো। চার কোণে পর্বত প্রমাণ ধুলোয় ভরা ময়লা কাগজের স্তূপ। মাঝখানে কোনো মতে ছোটো একটা টেবিল। দুদিকে দুটো চেয়ার। একটিতে প্যান্ট আর হাত-কাটা শার্টের উপর সবুজ সোয়েটার-পরা হৃষ্ট-পুষ্ট কালো কালো এক ভদ্রলোক টেবিলের উপর ঝুঁকে গেলি প্রুফ সংশোধন করছেন। মাথার উপর ঝুলে টিমটিম করে জ্বলছে ধুলো মাখা একটা বাল্ব। তিনিই নরসিংবাবু—অর্থাৎ প্রেসের মালিক। লোকে তাঁকে পণ্ডিতজী বলে ডাকে।

রমেনের পরিচয় পেয়ে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। আপ্যায়ন করে খালি-চেয়ারে বসালেন। ছটুয়া নামে হাফ-প্যান্ট ও ময়লা গেঞ্জিপরা এক ছোকরাকে আদ্রক সহযোগে গরম চা জলদি আনবার ফরমাশ দিলেন, প্রেসের হেড কম্পোজিটার এবং হেড মেশিনম্যানকে ডেকে এডিটার-সাব—অর্থাৎ রমেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ঢালাও আদেশ দিলেন রমেন যখন যা বলবে সব কাজ ফেলে তারা যেন তার হুকুম পালন করে।

প্রুফের আশায় প্রথম দিন রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত রমেন বসেছিলো। কারণ বিজয় সিলিঙ ফ্যানের সুপারিনটেনডেন্ট তাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন উঠে গেলেই পণ্ডিতজী তাঁদের কাজ ফেলে অন্য কাজ ধরাবেন। পত্রিকাটা তাড়াতাড়ি ছাপানো রমেনেরও স্বার্থ। কারণ ছাপা হয়ে ডেলিভারি না হওয়া পর্যন্ত মজুরি সে পাবে না। তাই সে বসেছিলো। ছটুয়া তাকে আরো বার কয়েক আধ পেয়ালা করে আদ্রক-চা খাইয়েছিলো। বাড়ির জন্যে নানা আনাজ কিনে এসে পণ্ডিতজী তাকে খেতে দিয়েছিলো আধ টুকরো আপেল।

অধিকাংশ সময়েই রমেনের করার কিছু ছিলো না। ঝোলা থেকে জেমস বণ্ডের গা-শিউরনো উপন্যাসেও তার মন ভালো করে বসেনি। বই থেকে মুখ তুলে বারবার দরজার জরাজীর্ণ ছেলেকে। আর সেই ধ্যানমগ্ন রোঁয়া-ওঠা দাঁড়ের টিয়াটাকে।

ভিতরের দিক বলে এখানে চিৎপুরের হৈ-হল্লা প্রায় পৌঁছয় না বললেই চলে। তাই বিকেল তিনটে নাগাদ হৈ-হৈ করে এক জবরদস্ত মাঝবয়সী দশাসই মহিলাকে সেই আধবুড়ো লোকটার কাছে এসে প্রায় ছোঁ মেরে তার কোল থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নিতে দেখে প্রথমে রমেন হকচকিয়ে ওঠে।

এই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকালে মহিলার হাতে একটা ঝাঁটা ছিলো, শাড়িটা কোমরে টান-টান করে আঁটা, পান চিবিয়ে ঠোঁট দুটো টকটকে বিশ্রী রকম লাল। এসেই এক কোণে ঝাঁটা-টা ছুঁড়ে ফেলে, আধবুড়োর কোল থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে, উত্তর দিকের এক দোরগোড়ায় বসে, কোমরের কাপড় ঢিলে এবং ছেঁড়া ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করে খুলে বিনা দ্বিধায় বাচ্চাটাকে সে দুধ খাওয়াতে শুরু করলো। আধবুড়ো দার্শনিকের মতো মুখ করে আর একটা বিড়ি ধরালো। রমেন চোখ ফেরালো। কিন্তু মহিলার অনর্গল বাজখাঁই সুর তার কানে আসতে লাগলো। দেহাতী ভাষা রমেনের সড়গড় না হলেও মর্মার্থ বুঝতে তার অসুবিধে হোলো না। সিদ্ধি খেয়ে নেশা করে রাস্তায় পড়ে তার স্বামী অর্থাৎ আধবুড়ো লোকটা পা ভেঙে পড়ে থাকায় সে তার চোদ্দপুরুষ সম্বন্ধে চোখা-চোখা বাক্যবাণ হানছে। খেটে-খেটে তার গা-গতর ভেঙে যাবার উপক্রম। এই আধ-বুড়োকে বসিয়ে বসিয়ে আর সে খাওয়াতে পারবে না। শ্রাদ্ধের শেষ পিণ্ড এবার সে তার মুখে গুঁজে দেবে, তার আগে তার মুখে নুড়ো জ্বালাতে সে ভুলবে না। তারই ফাঁকে ফাঁকে যতদূর সম্ভব গলায় মধু ঝরিয়ে বাচ্চাটাকে বেটা-বেটা এবং আরো নানা নামে আদর করে ডেকে সে তার গায়ে-মাথায় হা[illegible] বোলাতে লাগলো। তারপর হঠাৎ ঝট[illegible] উঠে বাচ্চাটাকে স্বামীর কোলে ফেলে অন্দর থেকে এক বাটি সরষের তেল এনে বাচ্চাটাকে আবার কোলে নিয়ে জামা ছাড়িয়ে খালি গা করে নিজে পা দুটো সটান সামনের দিকে করে তার উপর শুইয়ে খানিক সে তেল ডললো। এ-কাজ শেষ করে একটা ময়লা ন্যাকড়ায় বাচ্চাটার গা থেকে তেল মুছে আবার তাকে জামা পরিয়ে তার স্বামীর কোলে বসিয়ে অন্দর থেকে সে দুটো অ্যালোমিনিয়মের থালা এনে কি করে আধ-বুড়ো লোকটার খাটের পাশে একটা নামিয়ে, বাচ্চাটাকে আবার কোলে নিয়ে সেই দোর-গোড়ায় বসলো অন্য থালাটা নিয়ে। থালা দুটোয় মোটা মোটা খান কয়েক আটার রুটি, কাঁচা লঙ্কা আর ডাল জাতীয় কিছু একটা হবে। তার স্বামী সেই দার্শনিকের মতো মুখ করেই থালা তুলে রুটি চিবুতে লাগলো। মহিলাও খাওয়া শুরু করলো। মাঝে মাঝে রুটির ছোটো ছোটো টুকরো সেই তরল পদার্থে ভিজিয়ে বাচ্চাটার মুখে লাগলো প্রায় গুঁজে দিতে। আর বাচ্চাটাও

লাগলো সেই রুটির টুকরোগুলো। আর মাঝে মাঝে লাগলো খিলখিল করে হাসতে।

খুব খুশি হয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে মহিলা বললো, "দেখ, দেখ—ক্যায়সা চাখ-মুখ কে খাতা!" এই প্রথম তার প্রতি একটু যেন নরম সুরে সে কথা বললো। খাওয়া শেষ হলে বাচ্চাটাকে আবার তার স্বামীর কোলে বসিয়ে, থালা দুটো মেজে ঘরে তুলে, কোমরের আঁচল টান-টান করে এঁটে, খ্যাংরা ঝাঁটা তুলে স্বামীর উদ্দেশ্যে এমন সব মন্তব্য করতে করতে বেরিয়ে গেলো যেগুলো খুব মিষ্টি ধরনের বলে রমেনের মনে হলো না।

চোখ ফেরাতে রমেন দেখে পণ্ডিতজীকে। পণ্ডিতজী মৃদু মৃদু হাসছেন। বাংলা বেশ ভালোই বলেন। মাঝে মাঝে ইংরিজিও। রমেনকে জানালেন ওই মহিলা ঝাড়ুদারনী তার স্বামী ঝাড়ুদার। সাত টাকার ভাড়ায় শহরের দিকে তারা থাকে। তারপর আপেলে একটা কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে তিনি মন্তব্য করলেন, "শি ইজ এ রোগ্!" রমেন বুঝলো রোগ্ কথাটা ইংরিজি, অর্থাৎ পাজী, বদমাস, শয়তান।

হয়তো পৌনে পাঁচটা হবে। আকাশটা যেন কম্বল জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। পথের বিজলি বাতি জ্বলছে। নানা রঙের নিওন বাতিগুলো নিভছে জ্বলছে। ভীড়-ঠাসা ট্রামে রমেন চলেছে চিৎপুরের ট্রামে। আজ শেষ ফর্মার প্রুফ দেখে সে প্রিন্ট অর্ডার দেবে। কাল ছাপা বাঁধাই হয়ে পরশু বিজয় সিলিগু ফ্যানের আপিসে পত্রিকা ডেলিভারি হবার আশা।

মহাত্মা গান্ধী রোডের চৌমাথায় নেমে রাস্তা পেরিয়ে পূব দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রমেন টের পেলো এসপ্লানেডের চেয়ে এ-জায়গাটা অনেক গরম। ট্রামে ওঠার আগে তার বেশ শীত শীত করছিলো। এখন আর সেই শীত শীত ভাবটা নেই।

আলো-অন্ধকারে ভীড়ের মধ্যে গা বাঁচিয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে রমেনের হঠাৎ মনে হোলো সে যেন কলকাতায় নেই। হাটছে যেন কাশীর কোনো শেষ-হীন গলির মধ্যে। তারপর তিনটে ব্যাপার মনে হতে তিনবার সে অবাক হোলো। বড়বাজার-চিৎপুর ব্যবসার জন্যে বিখ্যাত। সব রকমের সওদা এখানে মেলে—খড়ম ডুগি-তবলা থেকে আচার আর মেয়েদের দেহ নিয়ে ব্যবসা। শেষোক্ত কারণেই এ-অঞ্চল বিখ্যাত কি কুখ্যাত। কিন্তু এ-পর্যন্ত এই পথে ট্রাম-বাস-রিক্স-পথচারিণী কোনো মেয়ের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে কোনো পুরুষকেই সে তাকিয়ে থাকতে দেখেনি—যেমন দেখেছে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট-বালিগঞ্জ অঞ্চলে। সব পুরুষই এখানে যেন মনে-মনে হিসেব কষতে-কষতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাঁটে—মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপব্যয় করার সময় কারুর নেই। এটাই তার প্রথম বিস্ময়ের কারণ। দ্বিতীয় অবাক সে হয়েছে এতো দেখোন—যেটা প্রতি মিনিটে ঘটবার কথা। অ্যাকসিডেন্ট হব-হব করেও কেন যে হয় না সেটা অবাক হবার কথা বই কি। আর তৃতীয়—এবং সেটাই তার কাছে প্রধান বিস্ময়—প্রেসটার কথা মনে হলেই সেই রিকেটি বাচ্চাটার কথাই সবচেয়ে আগে তার মনে পড়ে। গত দিন পনেরো ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক-অনেক ঘন্টা সে কাটিয়েছে প্রেসে। অধিকাংশ সময়েই সংশোধন করার গেলি প্রুফ সে পায়নি। বই-টই পড়তেও তার ইচ্ছে করেনি। সেই ময়লা কাগজের স্তূপে ভরা প্রেসের ছোটো আপিস ঘরের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দরজার ভিতর দিয়ে প্লাস্টার-পা আধবুড়ো জমাদার, কাঠির মতো সরু-সরু হাত-পা-ওলা ধ্যাবড়া করে কাজল-পরা বাচ্চা আর সেই জাঁদরেল জমাদারণীকে সে ক্রমাগত লক্ষ্য করেছে গত প্রায় পনেরো দিন ধরে। বাচ্চাটা খান না এমন জিনিস নেই: আটার রুটি, ডাল, খিচুড়ি, দুধ—যা মুখের সামনে ধরা হয় তাই পরম আগ্রহের সঙ্গে খায়। প্রথম প্রথম প্রেসে ঢোকবার আগে রমেনের ভয় করতো: গিয়ে হয়তোদেখবে বাচ্চাটা মরে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বাচ্চাটা মরেনি। দিন দিন শশিকলার মতো না বাড়লেও ক্রমশ তার চেহারার মধ্যে একটা চেকনাই যে আসছে সেটা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে রমেন। আর তার উপর কেমন যেন রমেনের একটা মায়া পড়ে গেছে। তাই প্রেসের কথা ভাবলে প্রথমেই তার চোখে ভেসে ওঠে বাচ্চাটার মুখ। এটাই তার তৃতীয় বিস্ময়।

কিন্তু সে-রাতে তার জন্যে যে চতুর্থ আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ভিড়ের মধ্যে সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে রমেন তার আভাস পায়নি।

প্রেসের সেই সরু গলিটায় আলো নেই। [illegible] সেই জাঁদরেল জমাদারণীর কণ্ঠস্বর। উঠোনে পোঁছে দেখে প্রেসের লোকজনের ভিড়, খাটিয়ায় প্ল্যাস্টারে-মোড়া ভাঙা পা-টা সামনের দিকে মেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আধবুড়ো জমাদার বসে। তার খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি-ভরা গাল দুটো দিয়ে অঝোরে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখে বিড়িও নেই, কথাও নেই। আর সেই জমাদারণী—তার কোমরের আঁচল টান করে জড়ানো, তার ঠোঁট দুটো রক্তের মতো টকটকে লাল, তার চোখ যেন হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলছে, তার কোলে সেই রিকেটি বাচ্চাটা। বাচ্চাটার পায়ে উলের মোজার উপর রুপোর ঘুঙুর, গায়ে পুরো-হাতা লাল উলের স্যোয়েটার, মাথায় লাল উলের টুপি, চোখে ধ্যাবড়া কাজল, মুখে চুষি।

অনর্গল অশ্লীল ভাষায় চীৎকার করতে করতে ছেলে ট্যাঁকে নিয়ে খাঁচায় বন্দী ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে কোণ থেকে খ্যাংরা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে জমাদারের দিকে ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এলো। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখ বুজে জমাদার একটা হাত তুলে মুখ আড়াল করলো। জমাদারণী কিন্তু মারলো না। স্বামীকে কুকুর এবং শূকরের সন্তান আখ্যা দিয়ে, এক কোণে ঝাঁটাটা ছুঁড়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যাবার সময় সে জানিয়ে গেল, সন্তানকে নিয়ে চিরকালের মতো সে চলে যাচ্ছে—এখন ক্ষিদে পেলে তার স্বামীর মুখে লোকে বিষ্ঠা ধরে দেবে, তিলে-তিলে সে মরবে; মরবার সময় চিঁ-চিঁ করলেও তার মুখে জল দেবার কেউ থাকবে না, ইত্যাদি ধরনের দেহাতী ভাষায় আরো অসংখ্য অভিসম্পাত।

রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়িকা প্রস্থান করার পর প্রেসের কর্মচারীরা যে-যার জায়গায়

পণ্ডিতজী বললেন, "আইয়ে এডিটারসাব। আসুন-আসুন......"

মেক-আপ প্রুফ তখনো যে রেডি হবে না এ ধরনের একটা আশঙ্কা রমেনের ছিলো। জানা গেল আরো ঘণ্টাখানেক দেরী হবে। ছটুয়া যে আদ্রক-চা নিয়ে এলো তাতে চুমুক দিয়ে রমেনের বেশ ভালোই লাগলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে রমেন প্রশ্ন করলো, "আজ আবার কী হোলো পণ্ডিতজী—এইসব হৈ-হল্লা—"

পণ্ডিতজী চোখ মটকে একটু হেসে বললেন, "ও-সব কুছ নেই। সি ইজ এ রোগ......"

তারপর প্রেসের মালিকের কাছে কাটা-কাটা যে কাহিনী সে শুনলো সংক্ষেপে সেটা এই :

এই সতাম প্রেসের প্রতিষ্ঠা প্রায় পনেরো বছর আগে। তখন থেকেই এই জমাদারকে তিনি দেখছেন। সবে তখন সে বিয়ে করেছে। তার বৌ তখন কিশোরী, দেখতে মিষ্টি, স্বভাবটাও মিষ্টি। সব সময়েই মুখে হাসি লেগে থাকে। কিন্তু সে-বউ এ বউ নয়। —জমাদারের চিরকালই ছেলের খুব শখ। কিন্তু বিয়ের সাত-আট বছর পরেও

[illegible] মুলুকে যায়। ফেরে নতুন আর এক বউ নিয়ে। অর্থাৎ বর্তমান জমাদারণীকে নিয়ে। তখন থেকে তাদের সংসারে অশান্তির সূত্রপাত। দুই বউয়ে কোনো দিনই বনিবনা হয়নি। চিল্লাচিল্লি তখন থেকেই প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বড়বউয়ের স্বভাব শান্ত। সে বড় একটা কথাই বলতো না। স্বামীকে সন্তান দিতে পারেনি বলে সব সময়েই অপরাধীর মতো মুখ করে সে থাকতো। কিন্তু সে প্রতিবাদ না করলেও ছোটো-বউ অর্থাৎ এই জমাদারণী একাই একশ' লোকের মতো আসর মাতিয়ে রাখতো। একদিন বাক-বিতণ্ডা। ছোটো-বৌ খাংরার বাড়ি মেরে বড়-বৌকে বাড়ি ছাড়া করলো। স্বামীটা একটা ভেড়ুয়া। কাঁদতে কাঁদতে বড়-বৌ যখন বেরিয়ে যায় তখন স্বামী সঙ্গে গিয়ে বড়-বৌকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসে নিজের স্বামীত্বের একমাত্র কর্তব্য সম্পাদন করে। তখন থেকেই সংসারে জেঁকে বসে ছোটো-বৌ। আর তখন থেকেই ক্রমশ জমাদারের ভাঙের মাত্রা থাকে বাড়তে।

কিন্তু জমাদারের এমনি কপাল—দ্বিতীয় বউও তাকে কোনো সন্তান দিতে পারলো না। প্রতি রাতে জমাদার নেশায় বুঁদ হয়ে বাড়ি ফেরে আর ছোটো-বৌ নেশা করার জন্যে করে গালি-গালাজ। উত্তরে জমাদারও বলে যে বাঁজা, সন্তান ধারণে যে অক্ষম তার এই চিল্লাচিল্লি শোভা পায় না।

বছর খানেক আগে এক রাতে ব্যাপারটা চরমে ওঠে। পণ্ডিতজী তখন প্রেসে তালা দিতে যাচ্ছেন। বাইরে জমাদার আর তার ছোটো-বৌ-এর সঙ্গে নিত্যকার হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেছে। সেদিন সম্ভবত জমাদারের নেশার মাত্রা একটু বেড়ে গিয়েছিলো। ছোটো-বৌকে বেধড়ক চড়-লাথি-কিল মারতে-মারতে সে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকে, "আভি নিকালজা, আভি নিকালো।" জানায় তার চেয়ে বড়-বৌ ছিলো অনেক ভালো। এমন জানলে এই শয়তানীকে কখনো সে বিয়ে করে ঘরে আনতো না। জমাদারণী তখন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর তার স্বামী হিংস্র জন্তুর মতো এলোপাতাড়ি লাথি মেরে চলেছে। বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখে প্রেসের লোকজন হৈ-হৈ করে এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়। জমাদার হাঁপাতে হাঁপাতে খাটে গিয়ে বসে। আর তার ছোটো-বৌ দাঁড়িয়ে উঠে কোমরের কাপড় টান-টান করে জড়িয়ে নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চোখে তার এক ফোটা জল ছিলো না। ছিলো শুধু আগুনের মতো চাউনি। অত যে চেঁচায়, তার গলা দিয়ে তখন একটি স্বরও বেরুচ্ছে না। সেই অগ্নি-দৃষ্টি স্বামীর দিকে হেনে আর কারুর দিকে না তাকিয়ে সেই রাতেই হন হন করে সে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে বাড়ি ফিরে নিজেই রুটি সেঁকে, রাতে নেশা করে ফেরে। বৌ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে নির্বিকার চিত্তে বলে, "চুলা মে গিয়া।" তার হাবভাব দেখে মনে হয় আপদটা বিদেয় হয়েছে বলে সে খুব নিশ্চিন্ত। প্রেসের কর্মচারীদের মুখে তারপর তিনি শোনেন কিছু দিনের মধ্যে বড়-বৌ'কে নিয়ে আনবার কথা সে ভাবছে।

এমন সময়, গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি—সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। খুব ঠাণ্ডা সেদিনটা। দুপুরের প্রেসের কাজ চলছে। জমাদার রোদে বসে হাতে করে রুটি গড়ছে। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ গলির মধ্যে ফ্লুট বাঁশি আর ঢোলকের শব্দ। অবাক হয়ে প্রেসের কর্মচারীরা বেরিয়ে এলো। পণ্ডিতজীও প্রুফ ছেড়ে মুখে এসে দাঁড়ালেন। দেখা গেলো খাণ্ডড়দের বিয়ে বা অন্যান্য উৎসবের সময় ছেঁড়া জরির পোশাক আর লাল পাগড়ি পরা যে-সব বাজনদারদে দেখা যায় সেই রকমই একদল বাজনদা উঠোনে এসে হাজির। পিছনে জমাদারে ছোটো-বৌ, কোলে ওই বাচ্চাটা, গায়ে তা সালুর জামা আর রমেন যে লাল উলে সোয়েটারটা দেখেছে, সেটা। ছোটো-বৌয়ে রুক্ষ চুলে জট, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। রুটি গড়া থামিয়ে পিঁড়ির উপর ঘুরে ঘ জমাদার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে। সবাইকে ঠেলে সোজা স্বামীর কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে তার কোলে এক রকম প্রায় ছুঁড়ে ফে মাতৃভাষায় ছোটো-বৌ যা বলেছিলো বাংলা তর্জমা করলে সেটা এই রকম দাঁড়ায় "ছেলে-ছেলে করে মরছিস—এই নে ছেলে।"

এমন সময় ছটুয়া আবার আমাদে জন্যে আধ-পেয়ালা করে সেই আদ্রক নিয়ে এলো। অবাক হয়ে বললুম, " ছেলে পেলো কোত্থেকে?"

পণ্ডিতজী জানালেন কোন এ মারোয়াড়ি হাসপাতাল থেকে। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক দিন পরে তার মরে যায়। আত্মীয়স্বজন ছেলে নিতে কে আসে না। কার কাছে খবরটা পে জমাদারণী সেখানে গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে ছেলেটাকে পুষ্যি নিয়ে আসে।

বললাম, "তা হলে তো গণ্ডগো মিটেই গেল। তা হলে আজ আবার এ ঝামেলা কেন?"

পণ্ডিতজী মুচকি হেসে জানালে মাঝে মাঝে এ ধরনের ঘটনা এখনো ঘটে। জমাদারণীও এখন ভাঙ ধরেছে। যে-দিন নেশা বেশী হয় সেদিনই সে ভাবে তার স্বামী বড়-বৌকে এখনো ভুলতে পারে নি এবং এখনো তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে বড়-বৌ'কে টাকা পাঠায়। তবে ভাববার কিছু নেই। কালকেই ছেলে কোলে আবার সে ফিরবে। কারণ, "শী ইজ এ রোগ—পাজী, বদমাস, শয়তান।"

বিতাক ও গোবিন্দরাম

নারায়ণ দত্ত

শীতের গঙ্গা। একটু আগেও ধোঁয়াটে কুয়াশার মত অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ছিল। সকালটাই ছিল বিবর্ণ। তার মধ্যে দিয়ে ওঠা সূর্যটাকে অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদা একটা ছেলের অপরিচ্ছন্ন মুখের মত দেখাচ্ছে। রোদ উঠেছে। কিন্তু তারও যেন তেজ নেই। তেজ নেই গঙ্গায়ও। নিস্তরঙ্গ, শীর্ণ ভাগীরথীর বুকে মোচার খোলার মত কয়েকটা ডিঙি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভাসছে। আর গায়ে তার পিতৃপুরুষের শতচ্ছিন্ন কাঁথাটা চাপিয়ে ডিঙির মাঝি প্রাণের সুখে হুঁকো টানছে চোখ বুজে। তারও যেন আজ যাবার তাগিদ নেই। ভাসতে হয় ভাসছে।

অনেকটা এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবেই অপেক্ষা করছিল ছয়-জাহাজের বিরাট এক ব্রিটিশ বহর। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য-হীনতার কারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থের কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটার নাম ফলতা। কিছুটা দূরে সদ্য জেগে ওঠা গ্রামে তখনো খড়কুটোর আগুন করে পোয়াচ্ছে। বাঁকের দুদিকে রসভরা কলসী চাপিয়ে কর্মব্যস্ত শিউলিরা একটা খেজুর গাছ থেকে আর একটা খেজুর গাছের দিকে চলেছে দ্রুত পায়ে। আর গঙ্গার বুকে সেই 'ম্যান অফ ওয়ারে' বসে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, ভবিষ্যৎ বাঙলা দেশের দুর্যোগ-কুটিল নাট্যমঞ্চের অপ্রতি-দ্বন্দ্বী নায়ক কর্ণেল ক্লাইভ।—সিলেকট কমিটির এঁরা দুজন সভ্য। আর প্রেসি-ডেন্টকেও না চেনবার কথা নয়। ইনি সেই বীরপুঙ্গব, যিনি নবাবী ফৌজের কলকাতা আক্রমণের সময়ে কাচ্চা-বাচ্চা, বৌ-ঝিদের নিরাপত্তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে চোরের মত ঘাটের দরজা দিয়ে পালিয়ে-ছিলেন ফোর্ট ছেড়ে। ইনি রোজার ড্রেক।

যাই হোক, সেই সাতসকালে সিলেক্‌ট কমিটির সভা বসেছিল। তিন মাথা এক করে রোজই চলে প্ল্যান—কাউন্টার প্ল্যান। তর্ক-বিতর্ক। উদ্দেশ্য—কলকাতা উদ্ধার। হৃত সম্মানের পুনরুদ্ধার। বাঙলার ব্যবসার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু কিভাবে? অন্য পাঁচটা জাহাজে হাজারখানেক গোরা আর তার দেড়গুণ কালা সিপাহী। কিন্তু নবাবী ফৌজ কত? মানিকচাঁদ কলকাতার নিরাপত্তা কেমনভাবে গড়ে তুলেছেন? ফলতায় বহর নোঙর করেছে। কলকাতা থেকে ভাঁটায় বেশ কয়েকঘন্টার পথ। মাঝে নবাবের বড় ঘাঁটি বজবজ। কলকাতার আরও কাছে মেটে-বুরুজ। কিন্তু কোথায় কত ফৌজ? এই খবর পাওয়া যাবে কোথেকে? কাজেই শুধু আলোচনা। কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ক্লাইভের হাত বোধহয় নিসপিস করে। কিন্তু একেবারে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সিলেকট কমিটি রাজি হয় না! অথচ মাদ্রাজ ছেড়েছেন তাঁরা মাস-দুই হ'ল।

সেদিনও এমনি আলোচনা সুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটা থেমে গেল। জাহাজের একজন মাল্লা এসে ঘরে ঢুকল। 'বাউ' করে খবর দিলে সিলেক্‌ট কমিটিকে একজন জেন্টু প্রেসিডেন্টের দর্শনপ্রার্থী। জরুরী দরকার আছে। হাটখোলা থেকে আসছে।' ক্লাইভ আর ওয়াটসন হাটখোলা চেনেন না। কিন্তু ড্রেক কলকাতার ঝানু মাল। বহুদিন এ দেশে কাটিয়ে গেছেন। তার চিনতে কষ্ট হ'ল না। ক্যালকাটা থেকে আসছে। সুতানুটি-হাটখোলা। কে জানে, নতুন কোন সংবাদ আছে না কি? তাঁর কপিশ চোখে কৌতূহলের আলো জ্বলে উঠল, প্রেসিডেন্ট বললেন, ডাক তাকে, "শো হিম ইন।'

এল। একটা খেঁকুরে মত লোক। আপাতত অত্যন্ত পরিচয়হীন, অপদার্থ বলে মনে হয়। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, ড্রেক সাহেবকে দেয়ার হুকুম আছে হুজুর। ড্রেক হাত বাড়িয়ে বলে, 'ইয়েস।' কাগজ-খানা এগিয়ে দিয়েই লোকটা তাড়া-খাওয়া ধূর্ত শেয়ালের মত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাহেবদের অবাক দৃষ্টি তাকে যতদূর দেখা গেল, ধাওয়া করে নিয়ে গেল।

—রোজার ড্রেক অবশ্য ততক্ষণে চিঠি-খানা খুলে ফেলেছেন। এবং সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, সেই সংক্ষিপ্ত চিরকুটে রয়েছে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ—আলিনগরের সমরসজ্জার বিবরণ। সেই গোপন তথ্যটা হচ্ছে—'কলকাতায় তখন ৩৩২জন অশ্বারোহী, ১১০০ বরকন্দাজ, ৫০০ পাইক ও পিয়ন; থানায় (শিবপুরে) থানা দিচ্ছে তিন শ' পাইক ও পিয়ন; থানার উল্টো দিকে ছয়টা কামান, থানায় নয়টা, হলওয়েলের বাগানে তিনটে, সুরমান সাহেবের বাগানে চারটে, গার্ডেনরীচে দুটো, গঙ্গার ধারে দুটা, গড়ের সামনে দুটো, ওয়াই সাহেবের বাড়িতে দুটো, শেঠেদের ঘাটে দুটো, 'সারগাম' ঘাটে দুটো, গঙ্গার ওপর জাহাজে চারটে কামান। এছাড়া শিবপুরের উল্টো দিকে রয়েছে তিনটে বন্ধ-জাহাজ। আর রয়েছে মাটি ভর্তি দুটো ছোট জাহাজ। এখানে বোমা ছোড়ার তালিম দেওয়া হচ্ছে।'

এই "ইনটেলিজেন্স' পেয়ে ক্লাইভ-ওয়াটসন-রোজার ড্রেক সম্ভবত নড়ে-চড়ে বসে থাকবেন। হয়ত বা হাতে স্বর্গ পেয়ে থাকবেন। বজবজের দুর্গ অরক্ষিত, এই খবরও তাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে থাকবে। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর। শতের শ ছাপ্পান্ন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হয় মানিকচাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের বজবজের লড়াই। কাজেই, ইংরেজদের এই আক্রমণের পিছনে এই গোপন তথ্যের ভূমিকাটা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নাও হতে পারে।

কিন্তু কে পাঠাল এই দারুণ জরুরী খবর ইংরেজ বাহিনীকে? ইংরেজদের এত হিতৈষী বন্ধুটাই বা কে? ইংরেজদের পুরনো নথিপত্রে রয়েছে : 'দি প্রেসিডেন্ট অ্যাকোয়েন্টস দি কমিটি দ্যাট ওয়ান অফ গোবিন্দরাম মিটারস পিপল হ্যাজ সেন্ট ডাউন অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি স্ট্রেংথ অফ ক্যালকাটা থানা'...কিন্তু এই ঘটনার মানে এই নয়, গোবিন্দরাম ইংরেজদেরই একজন খয়ের খাঁ। দালাল। কি দেশের শত্রু। লঙ সাহেবের সঙ্কলিত সেকালের রেকর্ডপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, সাপ ও বেদের মুখে 'চুমু খাবার' ক্ষুরধার রাজ-নীতিতে মিত্তির মশায় ছিলেন সমান পোক্ত। তাঁর কাছে ভালো-মন্দর কোন পাকা মানদণ্ড নেই। সবাই ভালো, সবাই খারাপ। সবই প্রয়োজনের বিচারে।

এই দেখুন না, কলকাতা অধিকার করতে নবাবের লেগেছিল তিন দিন। আক্রমণ সুরু হয় বোলই জুন। অধিকার করেন উনিশে। এবং দেখা গেল, অধিকারের অনতিকাল পরেই গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ি, তাঁর চুনের কারখানা—তার মালপত্র, সবকিছু রক্ষার জন্য পাহারা বসে গেছে। যাতে লুঠ-পাট না হয়ে যায়। লঙ অবশ্য স্পষ্ট করে বলেননি, কারা দিল এই পাহারা। ইংরেজ-দের ত তখন পাহারা দেবার কথাই উঠতে পারে না। তারা ত তখন ছেলে-বউ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে 'জলমা' বলে তরী ভাসিয়েছে। কাজেই কারা দিল এই প্রহরা? গোবিন্দরামের নিজের পাইক-বরকন্দাজ? সে ত সব জমিদারদেরই ছিল। তবে সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে জমি-দারদের নিজস্ব পাইক-প্যারদায় তখনও বহাল ছিল কিনা, সন্দেহের বিষয়। তাহলে কি পাহারা দিয়েছিল নবাবী ফৌজ? মনে হয় তাই। এই লুন্ঠনের সময়ে নবাবী ফৌজ উমিচাঁদের বাড়ী-ঘর রক্ষা করেছিল, তার প্রমাণ আছে। দোস্ত উমিচাঁদকে ধরেই কি মিত্তিরজা এই আয়োজন করেছিলেন? হয়ত বা তাই।

তবে গোবিন্দরামের বাহবা এইখানে, যে নবাবী ফৌজ উমিচাঁদের বাড়ি পাহারা দেবার অজুহাতেই তাঁকে কলকাতা লুন্ঠনের ক্ষতিপূরণের যে বিরাট টাকা ক্লাইভ আদায় করেছিলেন মীরজাফরের কাছ থেকে, তার কানাকড়িও ঠেকায়নি কোম্পানী অথচ মিত্তির মশায় ঠিকই কেটে বেরিয়ে এলেন, পকেটে টাকার গোছা গুনে। সে এক মজার গল্প!

সঙ্গে লম্বা গোপন চুক্তি হয় লর্ড ক্লাইভের। তাতে নানা ক্ষতিপূরণের অঙ্কের সঙ্গে কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণের কথাটাও ছিল। কথা ছিল, কলকাতার কালা আদমিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশ লক্ষ টাকা দেবার। যেমন করেই হোক, সে খবর আর গোপন থাকেনি। ইংরেজরা লড়াই ফতে করে নবাব মীরজাফর বাহাদুরকে গদিতে বসাতেই গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার প্রমুখ শহর কলকাতার তাবড় তাবড় বাসিন্দারা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, আমাদের ক্ষতিপূরণের টাকা কই? অনেক টালবাহানার পর ইংরেজরা ব্যাপারটা বিবেচনা করতে রাজী হ'ল। তেরজন নিয়ে হ'ল একটা 'রেস্টিটিউসন কমিশন'। এঁরা সবাই কলকাতার রইস ব্যক্তি। বড়বাজারের শোভারাম বসাক, নয়নচাঁদ মল্লিক, দর্জিপাড়ার নীলমণি মল্লিক, রতন সরকার হরেকৃষ্ণ ঠাকুর (?), দর্পনারাম দত্ত, রামসন্তোষ (পদবী জানা যায় না), দয়ারাম বসু আর শুকদেব মল্লিক। তিনজন ছিলেন সম্ভ্রান্ত মুসলমান—আলিজান ভাই, মহম্মদ সাদিক ও আইনুদ্দিন। এঁরা ছাড়া কুমারটুলির গোবিন্দরাম ত ছিলেনই। কোম্পানীর রেকর্ডে কিন্তু হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম নেই। তাঁর জায়গায় আছেন দয়াকৃষ্ণ সরকার।

কমিশনের তদন্ত কি হ'ল আর না হ'ল কে জানে, দেখা গেল, দাবীদাওয়া কাটাকুটি করে দশ লক্ষ টাকা বিতরণ করল জন কোম্পানী। রতন সরকার, শোভারাম আর গোবিন্দরাম—এঁরা শুধু নিজেরাই টাকাটার ভাগ নেননি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকেও বেশ কিছু পাইয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য টাকাটা আবার এইসব মহাপুরুষদের পকেটেই ঘুরে এসেছিল কিনা ভগবানই জানেন। অবশ্য এরকম একটা অভিযোগ মনে ভেসে ওঠা অন্ততঃ অন্যায় নয়। কেননা গোবিন্দরামের সূত্রে যাঁরা টাকা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার বছর এমনকি দশ বছর আগে এন্তেকাল হয়েছে, এমন সব লোকেরাও রয়েছেন। গোবিন্দরাম মিত্রের কুলি কুড়ে বিশ্বাস পান চার হাজার টাকা। মিত্রজার তিনটি রক্ষিতা রতন, ললিতা ও হরিতুন বিবি (কারও মতে মতি বেওয়া) বাদ যাননি। এঁরা যথাক্রমে পান—আড়াই, দুই ও তিন হাজার টাকা।

অথচ ইংরেজদের সাফ কথা বলতে কোনদিনই পিছিয়ে যাননি গোবিন্দরাম। পুরনো কলকাতার সেই 'গ্রেট ফেমিনের' কথাই ধরুন। সতের শ' বাহাত্তর। সরকারী নথিপত্রে অবশ্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির কথাই লেখা আছে। কিন্তু গোবিন্দরাম এই 'গ্রেট ফেমিনের' নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন— জন কোম্পানীর কলকাতায় বাস করে। তাদের খিদমদ করে। চাকরী করে। এবং তাদের রক্তচক্ষু মোটেই 'কেয়ার' না করে।

এটা অবশ্য কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবার কাহিনী। কেননা, কোম্পানী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অনারেবেল রোজার ড্রেক বুঝি কলেকটর গোবিন্দরামকে বললেন [illegible] কারণটা কি? একটা রিপোর্ট দিও ত বাপু। মওকামত গোবিন্দরাম ব্যাপারটা বেশ খোলসা করেই বললেন: গত বছর ধান-চালের দাম বেশি গেছে কাজেই ধেনো জমির দাম বাড়বে, বেশি কথা কি? নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির এত চড়া দাম গত ষাট বছরে কখনও হয়নি। এর ফলে—'মেনি অফ ইওর ইনহ্যাবিট্যান্টস হ্যাভ পেরিশড উইদিন দি টাউন উইথ হাঙ্গার'—শহরের বহু লোক ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে। এই রিপোর্টে গোবিন্দরাম আরও একটা কথা বলেন, যেটা বিংশ শতকের কোন নেতার মুখেও বেমানান হবে না। 'ইফ ক্লথ ইজ ডিআর, এ পুওর মান মে পুট অফ দি বাইং অফ এ নিউ কোট আনটিল দি প্রাইস ফলস; বাট ফর ভিকচুয়ালস, হো-এন হাঙ্গার প্রেসেস, এভরিওআন মাস্ট বাই, ইফ হি হ্যাজ মানি টু পরচেজ ইট।' অর্থাৎ কাপড়-চোপড় মাগ্গী হলে গরীব গুর্বোরা দাম কমা পর্যন্ত হয়ত অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে, যখন ক্ষুধার জ্বালা লাগে, তখন, যদি তার কেনবার টাকা থাকে, তখন মানুষ না কিনে পারে না। এই দুর্ভিক্ষের জন্যে ইংরেজ কোম্পানী কিভাবে দায়ী, জিনিসের দাম চড়ার জন্যে কোম্পানী যে টাকায় ছয় পাই করে "সেলস ট্যাক্স" পেত, সেটার আমানত কিভাবে বেড়েছিল, সেই সাফ কথা সোজা-সুজি লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন মিত্তিরজা। তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি।

এই যে অপ্রিয় সত্য বলার জোর—এটা মিত্তিরজা বরাবরই দেখিয়ে গেছেন। সেটা জন কোম্পানীর কর্তাদেরই হোক কিংবা জমিদার হলওয়েলকেই হোক। হলওয়েলের তাঁবে তাঁর চাকরী। কিন্তু তাকেও সত্য বলতে পিছপা নয় গোবিন্দরাম। তাই দেখা যাচ্ছে, মনিব রালফ শেলডনের মৃত্যুর পর নন্দরাম সেন পড়েছেন বিপাকে। আর হলওয়েলের কাছে গোবিন্দরামের মুখে মুখে উত্তর। হঠাৎ একদিন হলওয়েল অভিযোগ আনলেন মিত্তির মশায়ের বিরুদ্ধে—তুমি বাপু ঠগ, প্রতারক। কোম্পানীকে ডাহা ঠকিয়েছ। অতএব খাতাপত্তর দেখাও। হিসেব দাও। প্রেতচ্ছায়ার মত একরাশ অভিযোগ যেন গোবিন্দরামের চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল। কিন্তু গোবিন্দরাম দেখেও দেখেন না। শুনেও শোনেন না। মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবখানা এই কি বাবা, এতকাল কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি? হঠাৎ কুম্ভকর্ণের মত জেগে উঠে [illegible] এত ফাঁকি?

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায় যায়। গোবিন্দরামের কোন [illegible] নেই। অনেক পেড়াপেড়ি। অনেক চেঁচামেচি। অনেক আস্ফালন। [illegible] জবাব [illegible] বাপু হে, অত তড়পাচ্ছ কিন্তু তুমিও চাকর, আমিও চাকর। তুমি জনাব [illegible] মনিবের চাকর অর্থাৎ কলকাতার কাউন্সিলের চাকর, খাতা দেখাব। অবশ্য এইরকম [illegible] দেখানোর পেছনে কারণ ছিল। কাউন্সিলের [illegible] দার হলওয়েলকে অত তোয়াক্কা করার দরকারটা কি?

কিন্তু কথা আছে। ভেতরে-ভেতরে যাই থাক, বাইরে সাহেবরা খুবই কেতাদুরস্ত। তাদের কাছে নিয়মকানুনের একচুল [illegible] নেই। হলওয়েল গোবিন্দরামের ওজর কাউন্সিলের গোচরে আনল, [illegible] কালক্ষেপ না করে হুকুম দিলে, ঠিক হ্যায়। রেকর্ড দেখাও। [illegible] বিরুদ্ধে বাবু তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। দোষক্ষালন করে তোমার সততার [illegible] সাবুত আছে দেখাও।' দেখাও ত দেখা[illegible] গোবিন্দ-রাম মিত্রও কারও বাড়ির চা[illegible] যে বললেই অমনি হুকুম তামিল [illegible] বলবে, 'বান্দা হাজির?'

যথা পূর্বং। মাস যেতে যে[illegible] বছর ঘোরে। কাউন্সিল খোঁচা দিলে। এবং [illegible]-বার এ ধরনের ঘটনা হওয়ার পর [illegible]-রাম জাগ্রত হলেন। মুখখানা ব্যাজার [illegible] বললে, খাতা দেখাব কি, খাতা ত সব [illegible] গেছে। হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মত ভোঁকাট্টা। সেই যে হুজুররা, ঝড় হয়েছিল না, দি গ্রেট ক্যালকাটা সাইক্লোন—সতের শ' সাঁই-ত্রিশ—সারা কলকাতাই জলে ভেসে গেল, ঝড়ে ডুবে গেল, সারা শহর লন্ডভন্ড। কত লোকই না মারা গেল—হাজার তিন। তোমাদের গির্জের মাথা ভেঙে পড়ল, আমার ব্ল্যাক প্যাগোডা, অমন নবরত্নের মন্দির—তার চুড়োই মাটিতে গড়াগড়ি। [illegible] কয়েকটা অনিত্য কাগজপত্র, সেগুলো [illegible] এমন ঈশ্বরআশ্রিত বস্তু যে নষ্ট হয়ে [illegible] পারে না? বুঝুন একবার 'ডিফে[illegible]' বহর।

মনে মনে হাসলেও, মুখে কলকাতা[illegible]-ন্সিলকে বলতেই হল, 'পারে। [illegible] পারে।' কলকাতার সেই সর্বনাশা ঝড়ের সঙ্গে কাউন্সিলের অনেক সভ্যেরই ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সে এক দুঃস্বপ্নের রাত। কাজেই গোবিন্দরাম মিত্রের যুক্তি কাগজে-কলমে নাকচ করা শক্ত। অবশ্য কাউন্সিল একেবারে বেকসুর খালাস দিতে নারাজ। ভাবতে বসে গেল। একসময় বললে, আচ্ছা না হয় তারপর থেকেই খাতা দেখাও। অর্থাৎ সতেরশ' সাঁইত্রিশের পর থেকে কল-কাতা কাছারীর খাতা দেখতে চায় কর্তারা! কোম্পানী ভাবে। গোবিন্দনামও ভাবেন। একজন চাপান দেয় ত অপরে উতোর গায়। গোবিন্দরাম এইবার সখেদে বললেন, ছিল হুজুর ছিল। সবই ছিল। কিন্তু এমন আমার কপাল উই-এ সব পুরনো কাগজ-পত্র খেয়ে গেছে। 'উই-এর দেখ ব্যবহার [illegible] পায় তাই কেটে করে ছারখার।' না, হাসির কথা নয়। এখন আজগুবি শোনালেও, সেকালের খাস কোম্পানীর নথিপত্রেই উই-এর এমনি ব্যবহারের গল্প রয়েছে। গোবিন্দ-রাম সব আটঘাট বেঁধে তবে না বলে ছিলেন [illegible]। ভাবখানা এই? উই-এ কাগজ-পত্র কেন আসবাবপত্র পর্যন্ত খেয়ে ফেলেন কল-কাতায়? সতের শ' সাঁইত্রিশ সালে [illegible] গড়ের

কি উই-এ খেয়ে ফেলার নজির নেই কোম্পানীর খাতায়? কোম্পানীর গুদামে দামী দামী ব্রোকেড চলে গেল উই-এর গর্ভে। তবে আমার হিসেবের খাতাগুলো আর দোষ করল কি?

হলওয়েল কিন্তু নাছোড়বান্দা। একটা এসপার-ওসপার করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং অচিরে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল। হলওয়েলের ছকা গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি লিখিতভাবে দেওয়া হল মিত্রমশায়কে। জবাব দাও। অভিযোগ অবশ্য সেই একটাই—কোম্পানীর টাকা গায়েব করেছ। কোম্পানী অবশ্য এভাবে কখনও বলে না কথাগুলো। বলে, দিশি লোকেদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে অর্থ আত্মসাৎ করেছ। কি রকম ব্যাপারটা? না, দেখ, তোমাকে কালা জমিদার হিসাবে কালা লোকেদের কাছে বাজার বিলি করতে হয়। করার কানুন—'পাবলিক আউটক্রাই' বা নিলামে। পাবলিক প্লেসে বা সাধারণগম্য প্রকাশ্য স্থানে। কিন্তু গোবিন্দরাম নাকি তাঁর বাগবাজারের বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে কল্পতরু হয়ে, তাঁর আশ্রিতজনের কাছে এই প্রসাদ বিতরণ করেছেন। নামে-বেনামে কিছু কি আর নিজে আত্মসাৎ করেননি। বাইরের যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা কবুল করেছেন মোটা সেলামী।

এহ বাহ্য। আগে কহ আর। হলওয়েল আরও বলেছেন। কোম্পানীর টাকায় তার নিজের জন্য চাকর পুষেছেন। কলকাতা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ টাকা গেছে তাঁর গর্ভে। তাছাড়া সেকালের কর্মচারীদের যে দোষ সবচেয়ে অমার্জনীয় বলে মনে করা হত—অথচ যে কাজ রাইটার থেকে গভর্নর—সকলেই কমবেশি নির্বিধায় করে এসেছেন, সেই 'প্রাইভেট ট্রেড' বেশ ফলাও করে এসেছেন গোবিন্দরাম মিত্র।

গোবিন্দরাম খোলাখুলিই এর জবাব দিলেন। এমন জবাব যাকে লোকে বলে মুখের মত। বললেন, হ্যাঁ, তাঁর 'ফার্ম' আছে। এবং তার জন্য উপরআলাদের অনুমতি নেওয়া আছে। তাছাড়া, বুকে হাত দিয়ে বলত বাপু, কে করে না এই কাজ? রাজা মহারাজা দেওয়ান-জমিদার সবাই। সবাই। ঠগ বাছতে যে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে বাছা! তাছাড়া, এসব না করে আমার উপায় কি বল। আমার একটা ইজ্জত বলে কথা আছে ত। লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, জুড়ি-পাল্কী না রাখলে জমিদারকে কেউ মানবে নাকি? তোমরা আর ক' গন্ডা টাকা মাইনে দাও? উপরি আয় আমায় করতেই হয়।

যাকে বলে 'প্লেন স্পিকিং'। সাফ জবাব। কিন্তু গোবিন্দ মিত্তির এবার ছাড়া পেলেন না। কালা জমিদারের চাকরীটা এবার চলে গেল। হলওয়েল তড়িঘড়ি তাঁর চাকরি যাবার হুকুমে সই দিয়ে দিলেন। ক্যাস ভাঙার অপরাধে। কিন্তু সারা কাউন্সিল এমন হেনস্থা! কাউন্সিল আবার চাকরী দিলেন গোবিন্দরামকে। তবে চিল যখন পড়েছে, কুটো না নিয়ে উঠবে না। কিছু গুনোগার দিতে হল মিত্তিরকে। তিন হাজার তিনশ' সাতানব্বই টাকা জমা দিয়ে দিলেন ট্রেজারীতে।

কিন্তু এত প্রতিপত্তির কারণটা কি গোবিন্দরামের? কাউন্সিল এত সমীহ করতই বা কেন? এ কি তার টাকার খেলা? বাড়ির দোল-দুর্গোৎসবের সমারোহে সাহেব বন্ধুদের নিয়মিত নেমতন্ন? খানাপিনার এলাহী আয়োজন? ক্লারেট, স্যাক, মদিরার ছড়াছড়ি? বলা শক্ত। তবে মিত্তিরজা, পয়সা করেছিলেন এবং করেছিলেন খুবই কম সময়ে, এটা ধারণা করা শক্ত নয়। কেননা, অক্টারলোনী মনুমেন্টের চেয়েও যার উচ্চতা বেশি ছিল সেকালে, সেই ব্ল্যাক প্যাগোডা—নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কি গোবিন্দরাম নন? সেটা তৈরী হয় সতেরশ' ত্রিশ সালে। কাজেই তারই মধ্যে গোবিন্দরাম বেশ পয়সা করে ফেলেছিলেন। কথিত আছে, এক সন্ন্যাসী এই কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। 'পূর্বে এখানে নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে।' যতদূর জানা যায় ব্ল্যাক জমিদারের চাকরী তিনি সতেরশ' বাইশে শুরু করেন। তাহলে মাত্র আটটি বছরে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার মত বিপুল ধনাঢ্য হয়ে ওঠেন! বেশ একটু তাড়াতাড়ি অনেকটা রাতারাতি ঘটেনি কি এই ধন-সঞ্চয়?

স্বভাবতঃই অনেকেই সন্দেহ করতে পারেন, এই পয়সা খুব একটা সহজ পথে হয়নি। তাহলে সেই বাঁকা পথটা কি? মনে হয় ব্যবসা। সতের শ' একুশ সালের মে মাসে কোম্পানীর নীলামে কিছু দামী বিলিতি কাপড় কিনতে দেখা যাচ্ছে গোবিন্দ-রামকে। তিনি বেনারসী শেঠ, উমিচাঁদের সঙ্গে তিন গজ 'ব্রড ফাইন কাপড়ও কিনে-ছিলেন উনিশ টাকায়। তাহলে কি কাপড়ের ব্যবসা? হতে পারে। এখন সুতানুটির বাজারে এটা একটা ভালো কারবার। তবে পলাশীর যুদ্ধের আগে গোবিন্দরাম যে চুনের বড় কারবারী হয়ে পড়েছেন, কোম্পানীর নথিপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। সতের শ' একান্ন বাইশে মার্চ। গোবিন্দরাম মিত্তিরের কাছে এত্তেলা গেল। কোম্পানী ডেকে পাঠিয়েছে। কি ব্যাপার না, কাঠ চাই, ইঁট চাই, চুন চাই। কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার রবিনস সাহেব দুদ্দাড় বাড়ি করছেন। ফোর্ট উইলিয়ম মেরামত করছেন। কাজেই 'বিল্ডিং মেটিরিয়ালস' চাই। গোবিন্দরাম বললেন, না কাঠ, না ইঁট বাপু এখন পারব না। চুনটা দিতে পারি। একশ' মণ ঝিনুকের চুন আর একশ' মন শামুকের চুন যথাক্রমে সাতাশ ও তেত্রিশ টাকা মন দ'রে একটা 'কন্ট্রাক্ট' সই ক'রে ফেললেন মিত্তির মশায়। তাঁর কাজকর্ম বেশ পাকা। 'এ্যাড-ভান্স' অগ্রিম। বাকিটা জানে। সইসাবুদ ক'রে উঠে যাবার সময় মিত্তিরমশাই বললেন, কাড় মজুরা। এহ ধরনের ব্যবসা কোম্পানীর সঙ্গে হরবখতই করেছিলেন গোবিন্দরাম, এবং উঠতি শহর কলকাতার হাজার হাজার বাজার বাড়ি গড়ার কাহিনীর পিছনে, গোবিন্দরাম তাঁর দু' পয়সা প্রাপ্তিযোগ করে নিয়ে-ছিলেন। তাঁর অঢেল পয়সার অন্যতম উৎস বোধ করি তাই। এবং এ প্রমাণও আছে, য শেষ বয়সে বিরাট নিমকমহল ছিল মিত্তির-জার। তাতেও পয়সার হৈ-চৈ ছিল না। এবং তাতে তাঁর অংশীদাররা ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের দোস্তবাবুরা।

তবে এ'কথা নয়, কোম্পানীর কাছে গোবিন্দরাম কেবল 'দেহি দেহি' করে চেঁচিয়েছেন। দরকারে তিনও তাদের দিয়েছেন। তবে, ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর—। গোবিন্দরামের সেই এক সুর। কলকাতার সামনে বিপদ। লড়াই হতে পারে। মিত্তিরজাকে কোম্পানী হাতে ধরে বললে, পেরিনস গার্ডেনের সুরক্ষার জন্য সাত কাঠা জমি চাই। জমিটা গোবিন্দরামের। ওটা দিয়ে দাও। গোবিন্দরাম বললে, অবশ্যই। অবশ্যই। নামেমাত্র মূল্যে। পঁচিশ টাকা কাঠা। সবনিয়ে একশ' পঁচাত্তর টাকা। কাপ্তেন মিনকিন জায়গাটা জরিপ করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু গোবিন্দরাম কোম্পানীতে ঢুকলেন কবে? গোবিন্দরামের একটা জীবনী গ্রন্থ ছিল। এখন অনেক চেষ্টা করেও সেটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই জীবনীকার বলছেন শহর কলকাতার জন্মের সেই উষা-লগ্নের কথা। যখন হুগলীর নবাবের হুমকির ভয়ে গঙ্গাবাজার পুড়িয়ে একটা ব্রিটিশ জাহাজ বেশ কয়েকজন ইংরেজ লোকলস্কর নিয়ে নামল সুতানুটির হাটে। দিশি হাটুরেরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কাপ্তেন সাহেবটা বিচিত্র। ক'বে নাকি কোন রূপসী যৌবনবতীকে আগুনে সহমৃতা হতে দেখে, ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেছিল। এবং অবাক কথা, মুঘল শাসকের রক্তচক্ষুকে মোটেই গ্রাহ্য করেনি। বিয়ে করেছিল মেয়েটাকে। তার ছেলেমেয়েদের বিলেত পাঠিয়েছিল। বড় বড় সাহেবদের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। এমনি বেয়াড়া। এমনি বেপরোয়া।

সেই বিচিত্র নিষ্ঠুর কঠিন লোকটার হোগলা ছাওয়া মাটির কুঁড়ের সামনে সপ্তদশ শতকের সেই অন্তিম মুহূর্তে একটা দৃপ্ত তরুণ এসে দাঁড়াল। ফুটফুটে রঙ। চটপটে চলনবলন। ফার্সী জানে। ইংরিজীও কি জানে—ইয়েস নো? কে জানে? মেজাজী কুঠিয়ালের ভালো লেগে গেল গোঁফের সদ্য রেখা ওঠা তরুণটিকে। ঝপ করে চাকরি দিয়ে ফেললেন কোম্পানীর খাস দপ্তরে। ষোলশ ছিয়াশি-সাতাশি। কুঠিয়াল আর কেউ নয়, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা যাঁকে দেওয়া হয়—সেই জব চার্নক। আর তরুণটি আমাদের এই গল্পের নায়ক—গোবিন্দরাম মিত্র। ব্যারাকপুর-চানক তাঁদের আদি বাড়ি। তাঁরা এখনকার ফোর্ট উইলিয়ম যেখানে গড়ে উঠেছে, সেই গোবিন্দপুরে উঠে এসে বসত করেন। তবে তাঁর নামেই গোবিন্দপুর, এটা নিছক অনৈতিহাসিক তথ্য। বরঞ্চ গোবিন্দপুরে জন্মেছিলেন বলে নাম—গোবিন্দরাম, হলেও হতে পারে।

অবশ্য গোবিন্দরামকে চাকরি দিয়েছিলেন চার্নক—কোম্পানীর দপ্তরে, এটাও বোধকরি ঠিক নয়। কেননা, সতের শ' থেকে সতের শ' কুড়ি সালের কোম্পানীর যেসব নথিপত্র সি আর উইলসন সাহেবের কল্যাণে আমাদের হাতে এসেছে, তাতে ভুলেও কোথায় মিত্তিরজা'র নাম নেই। তাছাড়াও কথা আছে। স্টারনডেল সাহেব বলছেন, তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিকলস ওয়েলর সতেরশ' বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে মেদনমল্ল পরগণায় গোবিন্দরাম মিত্র, ভোলানাথ মিত্র, ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল (রাজা সত্যানন্দ ঘোষালের পূর্বপুরুষ) এবং রাধাকৃষ্ণ দত্ত যৌথভাবে লবণের ব্যবসা করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের মেহেরবাণীতে। এবং ঐ সালে গোবিন্দরামের সই করা চব্বিশ হাজার সাতশ' তেত্রিশ টাকা প্রাপ্তির এক রসিদ সাহেব কাছারীতে দেখেছেন। অথচ তাঁর জীবনীকার তাঁর মৃত্যুকালে দেখিয়েছেন সতেরশ' ছেষট্টি।

এই সমস্যার সমাধান কি? সতেরশ' বাহাত্তর তেয়াত্তর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে, ষোলশ' ছেয়াশিতে তাঁর চাকরিতে ঢোকা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আর সি স্টারনডেলের প্রমাণ কোনক্রমেই ফেলা যায় না। এই সমস্যায় অবশ্যই আলোকপাত করতে পারে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত কোম্পানীর সমসাময়িক সব নথিপত্র, যেগুলি এখনও এদেশে দুর্লভ। এছাড়া আর কিইবা পথ আছে?

তবে গোবিন্দরামের বাবার নাম রত্নেশ্বর। ঠাকুর্দা হংসেশ্বর। পুত্র রঘুনাথ। পৌত্র রামচরণ। এ'রই জালিয়াতির মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়। পরে অবশ্য কলকাতার রহিস ব্যক্তিদের 'গণ আদালতে' সেই হুকুম মকুব হয়ে যায়। রঘুনাথ জন কোম্পানীতে চাকরি করেন নি। তিনি মুর্শিদাবাদের দরবারে কাজ করতেন। রামচরণের মুক্তির জন্যে স্বয়ং নবাববাবাহাদুর জন কোম্পানীকে যে আবেদন করেন, তাতে রঘুনাথকে তিনি তাঁর আপন বিশ্বস্ত কর্মচারী বলে উল্লেখ করেন।

সেকালের এক তরজা গানে কলকাতার আটবাবুদের প্রসঙ্গে গোবিন্দরাম মিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কালো দেশের কালো মানুষ কালো জমিদার
গোবিন্দরাম মিত্র আনে জুড়ি গাড়ী বাহার।

পুরনো কলকতায় আরও একটা ছড়া কাটত—

বনমালী সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি
হুজরীমলের কড়ি।

এই ছড়াটার আবার রকমফেরও আছে—

নন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি
হুজুরিমলের কড়ি
আর গোবিন্দরামের গাড়ি।

শেষ ছড়াদুটো থেকে ছড়িটা কার—নন্দরামের না গোবিন্দরামের তাই নিয়ে লড়াই লেগেছে। আসল সত্যটা মনে হয় দুটোর মাঝামাঝি। জন কোম্পানীর রাজত্বের আদিকালে দিশি লোকজনের মাথায় ছড়ি ঘোরানর ট্রাডিশন মৌলিক কায়স্থ নন্দরাম সেন মশায় সুরু করেছিলেন। আর গোবিন্দরাম সেটা কালো দেশের কালো মানুষদের মধ্যেই সীমাবন্ধ রাখেননি। সেই সোনা-বাঁধান ছড়ি খাস গোরা সাহেবদের মাথার ওপরও ঘুরিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জবরদস্ত জমিদারী অনেকেই সমীহ করে স্বীকার করত। চোর-ডাকাতরা থেকে গোরা সাহেবরা। আসল উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি যে 'ডেসপারেট' 'ডিফায়েণ্ট' বাঙালীরা ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে অগ্নিবৃষ্টি করেছিল, গোবিন্দরাম বোধকরি তাদেরই আদিপুরুষ।

তবে জুড়ি-গাড়ির বাহারও যে গোবিন্দরামের অপ্রতুল ছিল না, তাও মিথ্যে কথা নয়। গোবিন্দরামের বাড়ি দুর্গাপুজোয় নাক জুবরে খায়নি, এমন সাহেব কটা ছিল কলকাতায়। কি তার সমারোহ। কি তার বোলবোলা। দোলদুর্গোৎসবের মধ্যে বাঙালী নিজে ভোগ করতে চাইছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে—বাঙালী জীবনের সেই সুরও গোবিন্দরাম সুরু করে দিয়েছিলেন। অনেক কিছু দিয়েই গোবিন্দরাম একজন পথিকৃৎ পুরুষ। সন্দেহ নেই।
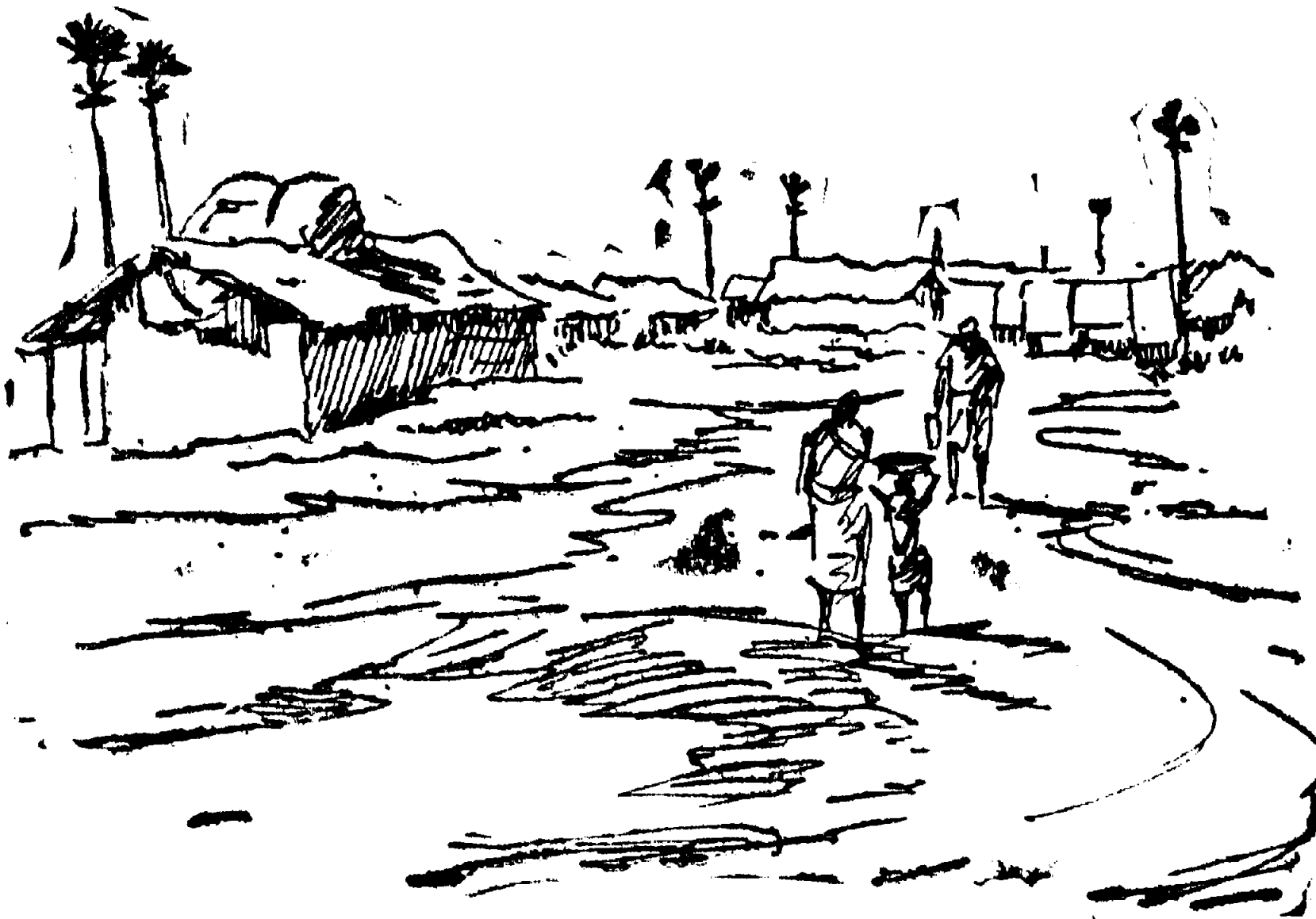
বারটার্ন্ড রাসেল

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

একবার চীন দেশে অবস্থানকালে বারটার্ন্ড রাসেলের মৃত্যু-সংবাদ একটি জাপানী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রাসেল সেই সময় গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। রাসেলের মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষতঃ ইংলন্ড আর আমেরিকায়। সুস্থ হয়ে নিজের শোক-সংবাদ পাঠ করে রাসেল কৌতুক বোধ করেছিলেন। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে রাসেল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"It provided me with the pleasure of reading my obituary notices, which had always desired without expecting my wishes to be fulfilled."

আর একটি মিশনারী পত্রিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এমন একজন নাস্তিক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে, একটা আপদ বিদায় হলে সবাই বাঁচে। রাসেল বলেছেন—

"Missionaries may be pardoned for heaving a high of relief at the news of Bertrand Russells death. I fear they must have heaved a sigh of different sort when they found that I was not dead after all".

এর পর অনেক দিন বারটার্ন্ড রাসেল বেঁচেছিলেন, এমনকি গত ডিসেম্বর মাসেও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনীদের অত্যাচার ও গণহত্যার তদন্তের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ কমিশনকে সমর্থনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে এক আবেদন পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ৯৭ বছরের বিদ্রোহী অভিজাত আর্ল রাসেলের এই অন্তিম আবেদন।

১৯৩৭-এ বি বি সি-র সঙ্গে রাসেল যখন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন বি বি সি-র মুখপত্র 'দি লিসনার' নামক পত্রিকায় একটি স্বরচিত শোক-সংবাদ তিনি প্রকাশ করেন—আজ শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত, এই মুহূর্তে তাঁর সেই স্বরচিত শোক-সংবাদটি বিশেষ অর্থময় হয়ে উঠেছে—

"By the death of the 3rd Earl of Russell (or Bartrand Russell as he preferred to call himself) at the age of ninety a link with a very distant past is severed".

বারটার্ন্ড রাসেল জানতেন, তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতি কিছু মানুষের প্রচণ্ড অস্বস্তি আছে, তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং মতাদর্শে অসঙ্গতি আছে। তাই তিনি এই শোক-সংবাদে আত্ম-বিশ্লেষণ করেছেন—

"His life, for all its waywardness, had a certain anachronistic consistency, reminiscent of that of the aristrocratic rebels of the early nineteenth century"

বারটার্ন্ড রাসেল কিন্তু এতদিনে পরলোকগমন করলেন, আর মাত্র কয়েকটি বছর কাটাতে পারলেই তিনি একটি শতাব্দী অতিক্রম করতেন। শেষপর্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ প্রতিরোধ করা আর সম্ভব হল না।

দার্শনিক, অঙ্কবিদ, অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী লর্ড রাসেল স্বদেশের এবং স্বদেশের বাইরের নৈতিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তনে এক অবিস্মরণীয় কার্যক্রম অনুসরণ করেছেন। পৃথিবীর বিচিত্র এই ভূমিতে যে বিরল সংখ্যক মানুষ বিচিত্র ও বিশিষ্ট হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠেন, বারটার্ন্ড রাসেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁরা যে কাজ করেন, যা চিন্তা করেন, তদ্দ্বারা যে-কালটিতে তাঁরা বিচরণ করেন, সেই কালটিকে এক নতুন রূপে, নতুন ধারায় রূপান্তরিত করেন। আমাদের এই দুরন্ত কালটিতে অনেক মহাজীবনের আবির্ভাব ঘটেছে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত ধারা তাঁরা প্রভাবিত করেছেন কিন্তু বারটার্ন্ড রাসেল দার্শনিক সমস্যা আর মানবিক সমস্যা উভয়বিধ ব্যাপারে সমান আন্তরিকতায় আত্ম-উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনে যে তিনটি ভাবাবেগ প্রবল হয়েছিল, তার কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, সেই তিনটি বস্তু হল—

"I was dangerously driven by the longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the suffering of mankind".

রাসেলের জীবনের এই ছিল মূল নীতি। দীর্ঘ ৯৭ বছর কাল এই ভাবাবেগে তিনি চালিত হয়েছেন এবং বিশ্ব-বিজয় করেছেন।

রাসেল গোষ্ঠীর যে-কোনও শাখার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই বিরাট বংশের নর-নারীদের কেউ না কেউ জনপ্রিয়তাহীন মতবাদে সারাজীবন মগ্ন হয়েছিলেন। অপরের সঙ্গে তাই রাসেলের

চরিত্রের বিচার করা সহজ নয়। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন যে, তিনটি বিশেষ প্রবণতাই তাঁকে আকুল করেছে।

রাসেল তাঁর সমকালীন মানুষকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছেন অনেক তরুণ বয়স থেকে এবং তিনি যে এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় অনেক কাল আগেই পাওয়া গেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে যে মনোভঙ্গী বা আইডিয়া তিনি প্রচার করেছেন, তা গৃহীত হয়েছে তাহলে হয়ত ঠিক বলা হবে না, তবে এ-কথা স্বীকৃত যে, তাঁর উক্তি ও কর্ম মেনে নেওয়া হয়েছে, সহ্য করা হয়েছে, তাঁর সমকালের মানুষ তা শুনেছে সুগভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

অতি অল্প বয়সেই রাসেল বুঝেছিলেন, সব কথাই স্পষ্ট গলায় বলা উচিত নয়. যা মনে আসে তা উচ্চারিত হওয়া ঠিক নয় আর কিছু কিছু উক্তি যাঁরা বয়সে বড়, তাঁদের হাস্যোদ্রেক করে। নিজের জীবনে পরিহাসের আঘাত সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করতে সময় লেগেছিল. এরপর তিনি আঘাত প্রতিরোধের এক পন্থা আবিষ্কার করলেন তার নাম রসিকতা। উত্তম রসিকতা এবং রসবোধ মানুষকে অনেক সংকট থেকে অনায়াসে বাঁচাতে পারে. তা অতি অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন রাসেল।

কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে গেলেন রাসেল আঠারো বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে. ম্যাথামেটিক্স ও ময়্যাল সায়েন্সে ফার্স্ট ক্লাস পেলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে তিনি সপ্তম র‍্যাংলার। এর পরবর্তী পনের বছর কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে রাসেলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—১৮৯৭-এ 'দি ফাউনডেসনস্ অব জিওমেট্রি', ১৯০০ 'দি ফিলজফি অব লাইবনিৎস' এবং সর্বোপরি হোয়াইটহেডের সঙ্গে যুক্তভাবে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি রাসেলকে খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে রূপান্তর ঘটে।

কেমব্রিজে রাসেলের যে জীবনধারা গড়ে উঠেছিল তা উত্তরকালে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"Cambridge was important in my life through the fact that it gave me friends and experience of intellectual discussions but it was not important through the academic instruction"

তবে এই কেমব্রিজে এক উপলব্ধি হয়েছিল রাসেলের, এইখানে তিনি শিখেছিলেন বিদগ্ধজনোচিত সততা. এবং রাসেল এই অভিজ্ঞতাকে মূল্যবান মনে করতেন। তিনি বলেছেন—

"The one habit of thought of real value that I acquired there was intellectual honesty This virtue certainly existed not only among my friends but among my teachers"

মহাযুদ্ধের কালে তাঁর এই স্বপ্ন ভেঙে গেল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, বিদগ্ধজনের সততার পরিধি সীমিত। এতদিন তিনি ভাবতেন, এ-জগতে কেমব্রিজই একমাত্র স্থান যা তাঁর আশ্রয়। মহাযুদ্ধের সময় এই ধারণাও পরিবর্তিত হয়। রুশোর কনফেসনস্ নামক গ্রন্থের সমগোত্রীয় তাঁর তিনখণ্ড আত্মজীবনী এক অপূর্ব গ্রন্থ।

এই আত্মজীবনীর প্রথম পর্বে রাসেল ১৮৭২—১৯১৪ পর্যন্ত কালের কথা লিখেছেন। এই কালের কথায় শৈশব, কেমব্রিজ, বন্ধুবর্গ, বিবাহ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে ক্রম্পটন লেওয়েইন ডেভিস, এলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড, এলিস ম্যাকটাগার্ট জর্জ মূর এবং মেনার্ড কীনেস প্রভৃতি সম্পর্কে যে সুন্দর রেখাচিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে শুধু বন্ধু-প্রীতি নয়, এক সুগভীর আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

বিবাহ সম্পর্কে তিনি খোলাখুলি লিখেছেন। প্রথমা স্ত্রী এলিস পিয়ারসন স্মিথের সঙ্গে বিবাহের সূচনায় পারিবারিক বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কাহিনী থেকে শুরু করে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন রাসেল। এই বিবাহ ১৮৯৪ খৃঃ অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ খৃঃ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল—শেষের দিকে নটি বছর রাসেলের কাছে অতিশয় পীড়াদায়ক। এই ১৯০১ খৃঃ রাসেলের জীবনে যুগান্তর এনেছে। এলিসের সঙ্গে বিচ্ছেদের সূত্রপাত ঘটেছে, সাম্রাজ্যবাদী রাসেল বুয়র সমর্থক এবং আরও পরে সম্পূর্ণ শান্তিবাদী প্যাসিফিস্ট হয়েছেন। মানব-সমাজের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তাই আর ছিল না।

১৯০৮ খৃঃ রাসেল রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন। তখন মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স। এই কালটি আবার রাজনৈতিক আন্দোলনের কাল। লন্ডনে অ্যান মরিস, ওয়েব, বার্নার্ড শ' প্রভৃতির নেতৃত্বে ফেবিয়ান সোসাইটির কাজ পুরোদমে চলেছে ওদিকে প্যাংকহার্স্টের সাফ্রাজিস্ট আন্দোলন, আবার অবাধ বাণিজ্য আন্দোলনও শুরু হয়েছে। রাসেল এসব আন্দোলনের মধ্যেই জড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু সংকট ঘনিয়ে এল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। ট্রিনিটির লেকচারার পদটি গেল। 'কনসেনসস্ অবজেকটর' রাসেলের একশ পাউন্ড জরিমানা এবং দু বছরের কারাদণ্ড হল। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীটা জরিমানা না দেওয়ার দায়ে নীলাম হল। অবশ্য তাঁর এক বন্ধু এই পাঠাগারটি সেই সময় কিনে রেখেছিলেন এবং পরে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব ব্যাপারে রাসেল একটা মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯১৪ খৃঃ থেকে ১৯৪৪ খৃঃ পর্যন্ত ঘটনাস্রোতের বিবরণ দিয়েছেন রাসেল। যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবের জন্য যে কি নিদারুণ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তার কথা লিখেছেন রাসেল। কর্মচ্যুতি, বন্ধুবিচ্ছেদ এবং চরিত্রহননের ঘৃণ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছেন রাসেল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এক মহান প্রত্যয়ের সুগভীর ভিত্তিতে। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা মাফিক সত্য কথনের সৎ সাহস তিনি পেয়েছেন এই কালে। সারাজীবনে যে-মানুষ অজস্র প্রশংসা আর প্রশস্তি পেয়েছেন, তাঁকেও যুক্তরা এক আইনজীবী নানাবিধ বিশেষণে ভূ করেছিলেন। অভিধান থেকে বাছা বাছা প্রয়োগ করে রাসেল যে কত বড় চরিত্র ব্যক্তি, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে ব ছিলেন যে এই লোকটি—

"narrow-minded, untruth bereft of moral fibre."

এমনকি আদালতও বললেন যে, রাসেল অধ্যাপনার কাজে বহাল করার অর্থ এ 'চেয়ার অব ইনডিসেনসী' সৃষ্টি করা। যারা রাসেলকে যুক্তরাষ্ট্রে যে অশ্রদ্ধা জানি ছিল, পরে তা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

।। দুই ।।

গাণিতিক রাসেল, কিন্তু তাঁর দার্শনি সত্তা গণিতের খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছে কিন্তু তাঁর সব পাণ্ডিত্য ছাড়িয়ে যে স গুণটি আজ তাঁকে অবিস্মরণীয় করে সেটি তাঁর মানবপ্রেম। শান্তিবাদী রাসে সারা বিশ্বের বিস্ময়। অনেক সময় ত উক্তিকে হয়ত বাতুলতা মনে হয়েছে, কি পরবর্তীকালে প্রমাণ করেছে তাঁর বক্তবে যৌক্তিকতা এবং সারবত্তা।

শুধু পাণ্ডিত্য নয়, তার চেয়ে অনে বেশী সদ্গুণের অধিকারী হয়েছিলে মহাপ্রাজ্ঞ রাসেল। প্রাচীন ভারতের ঋষিদে সঙ্গেই তাঁর কর্মজীবন তুলনীয়। তা জীবনে বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক প্রতিভা যে-সংযোগ ঘটেছিল, তা বিরল। ক মনীষী, স্বয়ম্ভু—এই মহামানব এ-যুগে এক মহাবিস্ময়। মানবিক চিন্তায় এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যা তাঁর অজ্ঞাত, এমন কোন বিদগ্ধ-জনোচিত অভিজ্ঞতা নাই য রাসেলের নাগালের বাইরে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে স্বদেশপ্রেমের প্লাবনে যখন সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে, আজ তিনি যুদ্ধ-বিরোধী প্যাসিফিস্ট 'বিবেকবান প্রতিবাদী', যখন তাঁর স্ব-শ্রেণীর সবাই যে-যার আধিপত্য এবং উচ্চকোটির আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে ব্যগ্র, তখন তিনি সোস্যালিজমের প্রবক্তা। রাশিয়ার দলে যখন ভিড়ে যাওয়াটাই ফ্যাশন, তখন তিনি কম্যুনিস্ট-বিরোধী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের এক কঠোর সমালোচক কে কি ভাবছে এ-কথা চিন্তা করার অবকাশ তাঁর ছিল না। একমাত্র মানব-সমাজের সেবায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দুই দশক তাঁর একটি মাত্র দায়-দায়িত্ব ছিল মানব-সমাজের প্রতি যথাযথ কর্তব্যপালন। বিশ্বশান্তির জন্য তাঁর যে আন্দোলন তার মধ্যে খাদ মিশ্রিত ছিল না। যে-যুগে সবাই চায় আরাম আর স্বস্তি সেই যুগে বৃদ্ধ রাসেল ট্রাফালগার স্কোয়ারে 'পিকেটিং'-এ যোগদান করেছেন আনবিক অস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশে। আর এই অপরাধে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

রাসেল স্বীকার করেছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তাঁর অন্তরেও জাতীয়তাবাদের অভিমান জেগেছিল। জার্মানীর সাফল্য তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে

...যে-কোনো অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের ... তিনিও জার্মানীর পরাজয় কামনা ...ছেন। তথাপি যুদ্ধ যখন ঘনিয়ে এল, ... মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য ... প্রয়োজন; তিনি লিখেছেন—

I have at times being paralysed by Secpticism at times I have been cynical, at other times indifferent but when the War came I felt as if I heard the voice of God I knew that it was my business to protest however futile protest might be. As a lover of civilization the return to barbarism appalled me'.

এই মনোভঙ্গী রাসেলের অন্তরে এক ...প্লাবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। রাসেল ...বলেন, শুচিবাগীশতা মানুষের জীবনে ...খ বা শান্তি আনে না। মৃত্যুর মধ্যে বাঁচার মত এক নতুন ধরনের প্রেম তিনি অন্তরে লাভ করলেন। রাসেল বুঝেছিলেন যে, মানুষের মনে যে অশান্তি, যে অশান্ত অস্বস্তির জ্বালা, সেই জ্বালাকে দূর করতে প্রয়োজন আনন্দের সঞ্চার করা আর তার ফলেই একটা মহৎ জগৎ একটা সুস্থ সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এই শান্তিবাদী মানুষটির অন্তরে আবার এক পরিবর্তন এল। নাৎসীদের অভিযান তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি লিখেছেন—

"I found the Nazis utterly revolting, cruel, bigoted and stupid. Morally and intellectually alike they were odious to me. Although I clung to my pacifist convictions I did so with increasing difficulty."

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই ভাবাবেগ তাঁর চিত্তকে উদ্বেল করে তোলেনি। সেবার ব্রিকসটন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করার সময় রাসেল লিখেছিলেন—'ইনট্রোডাকসন টু ম্যাথামেটিক্যাল ফিলজফি'। এইবার এল এক মহাপরীক্ষার কাল। ইংলণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। রাসেল স্থির করলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে যাতে নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায়, তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, তাই—

"at last consiously and definitely decided that I must support what was necessity for victory in second world war, however difficult victory might be to achieve and however painful its consequences."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য গিয়েছিলেন সেখান থেকে লস এঞ্জেলসে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪০ খৃঃ নিউইয়র্ক সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ নিলেন। কিন্তু সামাজিক সমস্যা বিষয়ে তাঁর উদার মনোভাব এবং ১৯২৯ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মরালস' তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। গোঁড়ারা ভীষণ আন্দোলন শুরু করলেন এবং নিউইয়র্কের সুপ্রীম কোর্ট তাঁর নিয়োগপত্র বাতিল করলেন।

১৯৪৪ খৃঃ স্বদেশে ফিরে প্রাক্তন কলেজে যোগ দিলেন রাসেল। ট্রিনিটিতে তখন জি ভি ট্রেভেলিয়ান প্রধান, তিনি রাসেলকে অনেক সুবিধাজনক সর্তে ফেলোশিপ দিলেন। কলেজ প্রাঙ্গনের বাইরে থাকার অনুমতি দিলেন আর জানালেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি বক্তৃতা দেবেন, ইচ্ছা না হলে দেবেন না। অনেক বছর পরে আবার ট্রিনিটিতে যোগ দিলেন রাসেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর লেবার পার্টির সদস্য হিসাবে রাশিয়া গিয়েছিলেন রাসেল একটি লেবার ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে। ফিরে এসে 'দি প্রাকটিস অ্যাণ্ড থিয়োরী অব বলশেভিজম' নামে একটি বই লিখলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর টিনিটি থেকে আবার ডাক এসেছিল, তিনি তখন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২০ খৃঃ চীনে গিয়েছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আচরণবাদ বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের জন্য। চীনা চিন্তাধারা এবং জীবনাদর্শ বিষয়ে এইখানে পড়াশোনা করেছিলেন এবং 'দি প্রবলেম অফ চায়না' বইটি লেখেন। এই সময় তিনি লিখেছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে চীন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তাঁর কিছু বক্তৃতা 'প্রিন্সিপলস অব সোস্যাল রিকানস্ট্রাকশন' নামে প্রকাশিত হয় এবং পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী ডোরা রাসেলের সহযোগিতায় ১৯২৩ খৃঃ 'দি প্রসপেকটস অব ইনডাসট্রিয়াল সিভিলাইজেসন' প্রকাশ করেন। ডোরা রাসেলের সঙ্গে হ্যামফ্ফিয়ারে পিটারসফিল্ড অঞ্চলে ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্নত ধরনের এক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে ছিল অবাধ স্বাধীনতা আর খেলাধুলোর সুযোগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাসেল বেতারবক্তা হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বি বি সি-র 'ব্রেনস টাসটে'র তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৭ খৃঃ বি বি সি-র আমন্ত্রণে 'রীফ বক্তৃতমালা' দান করলেন রাসেল। ৭৫ বছর বয়সে রাসেলের 'হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ণ ফিলজফি' প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের পূর্বেই সব বিক্রী হয়ে যায় এবং একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এই নতুন বইটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এর পর লিখলেন কিছু ছোটগল্প। ১৯৫৪ খৃঃ লিখলেন—'হিউম্যান সোসাইটি ইন এথিকস্ অ্যাণ্ড পলিটিকস' এবং 'পোর্টরেটস ফ্রম মেমোরি'। রাসেলের শেষ জীবনের রচনাবলীর মধ্যে 'আনআর্মড ভিকটরী' ও 'পলিটিক্যাল আইডিয়ালস' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এর পর প্রকাশিত হয়েছে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'আত্মজীবনী'। যাকে 'রুশোর কনফেসন' নামক গ্রন্থের সমতুল বলা হয়ে থাকে। এই বইকে 'কনফেসন' বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। তার ফলে বইটির গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে। রুশো তাঁর বইটির নাম 'কনফেসনস' রেখেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব যৌন-বুভুক্ষা ও যৌন অভিজ্ঞতা বিষয়ে খোলাখুলি লিখেছিলেন। রাসেলও অকপটে লিখেছেন নিজের যৌন আবেগ এবং যৌন-অভিজ্ঞতার কথা। এই বিষয়ে তাঁর মতবাদ স্পষ্ট—

"I have sought love, first, because it brings ecstasy, ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of Joy."

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি শুধু বস্ত্রহরণেই যে পটু ছিলেন তা নয়, গোবর্ধন ধারণ করে তাঁর বিরাটত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাসেল শুধু যৌন আবেগে চালিত হয়ে অসুস্থ মানুষের মত ঘুরেছেন, তা নয়। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে গঠিত বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৯৬৩ খৃঃ 'ন্যাশনাল কমিটি অব ১০০' থেকে তিনি যখন পদত্যাগ করেন। তখন বলেন—

"I am still a believer in mass civil disobedience"

এই প্রতিষ্ঠানটি আনবিক অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষার বিরোধী একটি বৃটিশ সংস্থা। রাশিয়ায় ইহুদীদের প্রতি আচরণের প্রতিবাদে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতি আক্রমণ করেন। নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্রকাশ্যে জানান যে, রুশ দেশে ইহুদী-বিরোধী মনোভাব নেই। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার, পশ্চিম জার্মানীর পরিস্থিতি, মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটিশ নীতি, দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক ধূর্তামি প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারে তাঁর বলিষ্ঠ ধিককার ধ্বনিত হয়েছে। দুই শতাব্দী আগের ভলতেয়ারের মত রাসেলের উচ্চকণ্ঠ সদা জাগ্রত ছিল মানবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন। গত দু' বছরের মধ্যে চেকোশ্লভাকিয়ায় রাশিয়ান অভিযানের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরোধী মতবাদের দমনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাসেল।

১৯৬৫-তে রাসেল লেবার পার্টি ত্যাগ করেন। কারণ, ভিয়েতনামের বর্বরতায় তিনি লেবার পার্টির প্রচ্ছন্ন সমর্থন লক্ষ্য করেছিলেন। এর পরের বছর জাঁ পল সার্ত্রের সহযোগিতায় ভিয়েতনামী যুদ্ধ অপরাধী'-দের বিচারের দাবী জানান। এই যুদ্ধ অপরাধীদের তালিকায় ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আতিশয্য পরবর্তী জীবনে তাঁর মাও-প্রীতি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছিল। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি চীনকে সমর্থন করেন। এর জবাবে নেহরু সেদিন ভারতীয় জনগণের তরফে ভারতের বক্তব্য জানিয়েছিলেন। নেহরু বলেছিলেন—

"This will give China a dominating position, specially in Ladakh, which they can utilise in future for a further attack on India."

বিংশ শতাব্দীর বিবেক ছিলেন বারটার্নড রাসেল। তিনি লিখেছেন যে, সুসংহত এবং সুসংবদ্ধ পৃথিবীতে—

"Life might be happy for all and intoxicatingly glorious for the best"

শেষজীবন পর্যন্ত এই স্বর্গরাজ্য গঠনের স্বপ্নই তিনি দেখেছেন। তাঁর স্বপ্ন সত্য না হলেও তা সার্থক করা চেষ্টা চিরকালের। কারণ এর বিপরীত হল নিশ্চিত ধ্বংসের পথ। শতাব্দীর সূর্য অস্তমান আকাশ কিন্তু গোধূলির আলোকে এখনও উজ্জ্বল।

সাহিত্যের খবর

পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য ও ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করবার উদ্দেশ্যে আগামী ১৪-১৫ মে পুরীতে পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম বৎসরে আলোচনা হবে প্রধানতঃ পূর্বাঞ্চলীয় কবিতাকে কেন্দ্র করে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কৈলাশ লেংকা। যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ব্রজনাথ রথ ও সদাশিব দাস। সদস্যদের মধ্যে আছেন আশিস সান্যাল, নীলমণি ফুকন, সত্য মহাপাত্র, পদ্মালয়া দাস, বিচিত্রনাথ কর, পি. এন, শাস্ত্রী প্রমুখ। পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্যের এই প্রথম সম্মেলনের আমরা সাফল্য কামনা করি।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭০—৭১ সালের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ডঃ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি।

জে, বি, এস হ্যালডেনের একটি নতুন জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবন নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বোধহয়, বিগত শত বৎসরে এমন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ইংলন্ডে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করেছেন। রোনাল্ড ডবলু ক্লার্ক সুন্দরভাবে তাঁর জীবনকাহিনীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জুলিয়ান হাকসলি— হ্যাল্ডেনকে অসাধারণ ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। পাঁচ বছর বয়সে হ্যালডেন জার্মান ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই জীবনীগ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানান হয়েছে। শিকাগো সান টাইমস বুক উইক-এ এই গ্রন্থটির সমালোচনা করতে বলা হয়েছে—"বইটি সুন্দরভাবে লেখা। হ্যালডেনের জীবন সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁতভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যি বলতে কি, হ্যালডেনের এমন সহানুভূতিসম্পন্ন জীবনী আর নেই।"

হার্বার্ট আর লটম্যানের সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের উপর একটি প্রবন্ধ 'নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধের এক জয়গায় তিনি লিখছেন, একজন তরুণ শিক্ষিত ফরাসী যুবককে তার প্রিয় তিনজন লেখকের নাম করতে বলি। সে প্রথমে কামু, তারপরে মাইকেল বুটার এবং সবশেষে বরিস ভিয়ানের নাম করে। সত্যি বলতে কি, কামু বেচে থাকলে এখন তাঁর বয়স হত ৫৬ এবং ভিয়ানের ৪৯। অথচ দুঃখের হল, ভিয়ানের নাম ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে তেমন উচ্চারিত হয় না। বুটারের নামের সংগে সংগে ক্লড সাইমন, রবার্ট পিন্দে প্রমুখের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্য ইতিহাস বোধ হয় একই রকমের। যথার্থ মূল্যায়নের সমস্যা প্রতি দেশে প্রতি কালেই রয়েছে।

স্টর্ম ইন চন্ডীগড় নামে নয়নতারা শাহ্‌গলের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে স্বাধীনতা লাভের পর বিভক্ত পাঞ্জাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক ছবি লেখক অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমেই তিনি দুজন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক নেতার ছবি দিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে, চন্ডীগড়ে ভিশল ডুবে এসেছেন এই দুজন বিবদমান রাজনৈতিক নেতার মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখিকা কিভাবে পাঞ্জাবী সমাজ এখন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তার চিত্র এঁকেছেন। লেখার গুণে বইটি অনবদ্য হয়েছে, যদিও বাস্তব জীবন থেকে তার অবস্থান অনেক দূরে।

জাঁ স্ট্যাফোর্ড আমেরিকান সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সম্প্রতি তাঁর নির্বাচিত 'গল্প সংকলন' প্রকাশিত হয়েছে। বিগত ২৫ বছর ধরে তিনি যে সব গল্প রচনা করেছেন, তার থেকে বেছে এই বইটি সংকলিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে অনেকেই আঞ্চলিকতার প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। শ্রীমতী জাঁ স্ট্যাফোর্ডের জন্ম হয়েছিল কলোরোডোতে। তার বাবা কয়েকটা গ্রামীন গল্প লিখেছিলেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয় মার্গারেট লীন লিখেছেন "এ স্টেপদটার অব প্রেইরী"। সেই প্রভাব যেন তাঁর গল্পেও প্রসারিত। প্রতিটি গল্পেই তিনি একটি কথাই বলতে চেয়েছেন। তা হল, মানুষ 'ডাবল প্রিজিনর'। এই সংকলনে যে গল্পগুলি, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনী গড়ে উঠেছে, হয় কোন বিদ্যায়তনে, কিংবা কোন হাসপাতালে অথবা কোন গরীবের ঘরে। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ তাঁর নিজের সত্তার কাছেই বন্দী। 'ইন দি জু' গল্পটিতে এই অনুভব খুবই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। 'এ সামার ডে', 'দি হেলদিয়েস্ট গার্ল ইন দি টাউন' প্রভৃতি গল্পও গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশের বহুদূরে থেকেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় ভারতের যে সব প্রান্ত আজ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর তাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহর অন্যতম। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে জব্বলপুরে আত্মপ্রকাশ করে একটি বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'সাতপুরা'। এ উপলক্ষ্যে সাতপুরার সম্পাদকীয় দপ্তরে একটি ছোট অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুরু হয় শ্রীনিত্যানন্দ সাহার সংগীতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি শ্রীমতী হেনা হালদার। তিনি বলেন এ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায় জব্বলপুরের সমস্ত বাঙালীকেই সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। প্রবাস বাংলার যে সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে 'সাতপুরা'র প্রকাশ সম্ভব হ'ল তা উল্লেখ করে পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায় আগামীদিনের জন্য উপস্থিত সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'সাতপুরা' জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত হ'লেও সমস্ত প্রবাসী বাঙালীর এ পত্রিকায় লিখবার অগ্রাধিকার থাকবে। পত্রিকা প্রকাশের দায়-দায়িত্ব এবং তার অর্থকরী অসুবিধের কথা জানিয়ে শ্রীমতী অশ্রু রায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। সভান্তে একটি সুন্দর হার্দ পরিবেশে চা-পানে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

মিনি হুজুগ —'মিনি পত্রিকা' 'মিনি বই' বিদেশেও বেরোয়, বেরোচ্ছে। কিন্তু তার ধরন-ধারণ বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক হুজুগের

সঙ্গে এক নয়। পকেট বুকের মতো ক্ষুদ্রাকার পত্র-পত্রিকা বের করার সংক্রামক প্রবণতা দেখা দিয়েছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে। কিন্তু আকারের ক্ষুদ্রতাই মিনির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, অক্ষরের খর্বতাও অবশ্য কাম্য। এসব পত্র-পত্রিকা আয়তনেই ক্ষুদ্র, অক্ষরে নয়।

ঘোষণায় বলা হয়েছে বাংলার ক্ষুদ্রতম সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'এখন'। কাল এবং লাল রঙে আঁকা প্রচ্ছদ। সম্পাদক নন্দদুলাল ভট্টাচার্য। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ঃ "বাংলার চলমান জীবনের সংগ্রামী বক্তব্যকে অজস্র স্ফুলিঙ্গের কণা চিন্তায় ভাবনায় ছড়িয়ে দেবার ক্ষুদ্রতম সাংস্কৃতিক হাতিয়ার।" ছাপা হয়েছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও আত্মকথা।

'অনুত্তম'-এর আকারও ক্ষুদ্র। তবে 'এখন'-এর মতো নয়। প্রচ্ছদে সত্যিকার রুচিসম্পন্ন ব্যবসায়ী পত্রিকার ছাপ আছে। বিজ্ঞাপনে ও বিভাগীয় রচনায় সাময়িকীর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সম্পাদক দাবী করেছেন ঃ "অনুত্তম একটি পূর্ণাঙ্গ মিনি সাহিত্য পত্রিকা"। অর্থাৎ 'মিনি' শব্দটি কেবল পত্রিকার নয়, সাহিত্যেরও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত। সাহিত্যের এই 'মিনি' উদ্যোগে ট্রাম-বাসের যাত্রীরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি ব্যস্তবাগীশ বড়বাবুরাও খুশি হবেন। মিনিটে মিনিটে গল্প-কবিতা পড়ার সুযোগ দিতে পারবে এই সব পত্র-পত্রিকা। 'অনুত্তম'-এর সম্পাদক শশধর রায়। ঠিকানা ঃ ৩৩।৪ দীনু লেন, হাওড়া—১। দাম ঃ তিরিশ পয়সা।

নতুন বই

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ (অনুবাদ সংকলন)—সম্পাদক স্বরাজ মজুমদার ও অমিতাভ চক্রবর্তী। আলফা পাব্লিশিং কনসার্ন, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম ঃ চার টাকা।

কবিতার ক্ষেত্রে কোনো একটি ভাষার বৈশিষ্ট্য, অনুষঙ্গ ও অভিব্যক্তিকে অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। বারবার একথা স্বীকৃত হয়েছে সমালোচক ও অনুবাদকের লেখায়। তবু এই অসম্ভবের প্রয়াসে উদ্যোগী হতে হয় আমাদের। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার 'কমিউনিকেশন' রক্ষার আভ্যন্তরীণ তাগিদেই বেরিয়েছে "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা"।

এই সংকলনে স্থান পেয়েছে ইউরোপ, আফ্রিক, আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা, এবং এশিয়ার কবিতা। অর্থাৎ পৃথিবীর চার চারটে মহাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। পাঠকের মনে, তাই নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে। প্রথমত, অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ভাষার কবিতাই এ সংকলনে স্থান পায়নি, দ্বিতীয়ত নির্বাচিত কবিতাগুলো সেই ভাষার কিংবা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিতাও নয়।

সংকলনের প্রথমেই স্থান পেয়েছে পৃথিবীর আঠারজন কবির লেখা একটি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদকদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের বহু নবীন-প্রবীণ কবি। যথাক্রমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে।

বইটির প্রথমদিকে ছাপা হয়েছে অনুবাদ সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা। তাতে সম্পাদকদ্বয় বলেছেন ঃ "কিন্তু এমন কয়েকটি সময় আসে যখন কোনো অনুবাদই শব্দগত অর্থে সার্থক ও চরমভাবে মূলানুগ হতে পারে না। পারে না আপন ক্ষমতার দৈন্যের জন্য নয়, ভাষার ধারণশক্তির অভাবেই।"

এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও অনুবাদগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শুধু একটা কথা স্বীকার করা যায় না, বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বোধহয়, ঠিক সময়ে সঠিক প্রতিশব্দ হাতের কাছে না পাওয়ার জন্যই কোনো কোনো কবিতার অনুবাদে দুর্বলতা থেকে গেছে।

আমরা সংকলনটির সম্পাদক ও প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই তাঁদের এই প্রয়াসের জন্য। বইটির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত। এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

পাখতুন থেকে দিল্লী ঃ জয়ন্ত দত্ত। প্রভাবতী প্রকাশনী। ১৮১।৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা—৪। দাম ঃ চার টাকা।

খান আবদুল গফফর খান আমাদের দেশে সীমান্ত গান্ধী এবং বাদশা খান নামে পরিচিত। এই দুর্দান্ত পাঠান নেতা গান্ধীজির অহিংস মন্ত্রে অনুরক্ত হয়ে পাঠান দেশবাসীকে অহিংসাতে অনুরাগী করে তুলেছিলেন। বাদশা খানের কর্মময় জীবন যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি আকর্ষণীয়। ব্রিটিশের নির্মম অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে পাখতুনিস্থান গঠনের জন্য লালকুর্তা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক গঠন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর যে সতের বছর তিনি পাকিস্থানে ছিলেন, তার চোদ্দ বছর কেটেছে জেলে। অবশেষে এই বৃদ্ধ সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতার যোদ্ধা কাবুলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গত বছর ২ অকটোবর গান্ধী জন্মশতবর্ষে সম্মানিত অতিথি হিসাবে ভারত সফরে আসেন। ভারতবাসী তাঁকে বিপুলভাবে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছে। বাদশা খানের কর্মময় জীবন এবং মানবপ্রেমের কথার আকর্ষণীয় বর্ণনা শ্রীজয়ন্ত দত্তের 'পাখতুন থেকে দিল্লী'। লেখকের ভাষা আরেকটু সুসংবদ্ধ ও সরস হলে ভালো হত।

গীতিমালঞ্চ ঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক ঃ সুনীতি ঘোষ। শহীদনগর, ভুবনেশ্বর।

ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষের 'গীতি-মালঞ্চ' পড়ে মনে পড়ে গেল এডওয়ার্ডের একটি উক্তি 'এ সার্জেন'স লাইফ ইজ এ প্রোসেস ফ্রম ওয়ান ড্রামাটিক ইভেন্ট টু অ্যানাদার নট ওনলি ইন ইমোশনাল বাট ইন অ্যান ইনটেলেকচুয়াল সেন্স'।

কর্মজীবনে তিনি চিকিৎসক। কিন্তু কবে একদিন হয়ত সঙ্গীতকে তিনি ভালবেসেছিলেন এবং সে ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই তাঁর অন্তরে প্রবাহিত থেকে এই পুস্তকরচনায় তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে বইটি সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় জ্ঞাতব্য তথ্য।

উত্তর ভারতীয় ভৈরব জয়জয়ন্তী মালকোষ, আড়ানা, রাগেশ্রী, বাহার মিঞা টোড়ী ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় বহু রাগ বিশ্লেষণ ও বাংলা ভাষায় গান রচনা শুধুমাত্র তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞানেরই পরিচায়ক নয়, দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সম্বন্ধে উৎসুক শিক্ষার্থীদের শিক্ষারও সহায়ক। ভারতের দুই প্রান্তের বিভিন্ন রুচির মানুষ এই রাগসঙ্গীতের মাধ্যমেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। সেদিক দিয়েও এই বইয়ের একটি বিশেষ দাম আছে।

[illegible] : [illegible] । ৮ [illegible] স্ট্রীট। কলকাতা—৬। দাম—[illegible] টাকা।

গীতার এই বাঙলা অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৮৯৩ সালে। বই-এর বাম পৃষ্ঠার সংস্কৃত মূল বাঙলা অক্ষরে এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠার বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। গীতার এই ধরনের সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ খুবই কম চোখে পড়ে। মূলের ভাষাগত সৌন্দর্য ও দীপ্তি অনুবাদেও রক্ষিত। সংস্কৃত লাইনের সঙ্গে বাঙলা লাইনের মিল রেখে এইভাবে অনুবাদ করা দুরূহ ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রাচীন বাঙলা পয়ার এবং আধুনিক ছন্দে অনূদিত গীতার এই সংকরণ অতুলনীয়। বইখানি একালের পাঠকেরও ভালো লাগবে।

●

বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী অ্যান্ড জেনারেল ইনফর্মেশন। বি ঝা দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশনা : লর্ড পাবলিকেশনস, ৩বি ম্যাডান স্ট্রীট, কলকাতা—১৩, ফোন : ২৩-৫৯৪৫। মূল্য—১৫ টাকা।

'বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী' নামটি যে অত্যন্ত বিনীত, তা' এই ডায়েরীর সূচীপত্রটির ওপর একবার চোখ বুলোলেই বুঝতে বাকী থাকে না। ভারতীয় ফিল্ম-জগৎ সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য এর ভিতরে পরিবেশিত; তার ওপর আনুষঙ্গিকভাবে এতে থাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রউৎসবের কথা, সারা জগতের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রপত্রিকার নাম, চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী প্রকাশকদের তালিকা, বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-বিদ্যালয়গুলির বিবরণ ও চলচ্চিত্র সংগ্রহশালার নাম। আরও আছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রবাজার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী, চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যবহৃত বিশেষার্থক শব্দগুলির ব্যাখ্যা, ১৯৬৭ ও ৬৮ সালে হলিউডের 'অ্যাকাডেমী' পুরস্কার বিজয়ীদের নাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৫৩ থেকে '৬৬ পর্যন্ত নির্মিত কাহিনীচিত্রের বাৎসরিক সংখ্যা ও চলচ্চিত্রগৃহগুলির মোট সংখ্যা, আসনসংখ্যা, জনসংখ্যা অনুযায়ী উপস্থিতি ও আসনের শতকরা হিসাব। ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক ও বিভিন্ন কলাকুশলীদের নাম-ঠিকানা, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রযোজক ও পরিবেশকদের নাম-ঠিকানা, ভারতের ফিল্ম-স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরীর নাম-ঠিকানা, কাঁচা ফিল্ম ও চলচ্চিত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীদের বিবরণ, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামো, ১৯৩১ থেকে ৬৯ পর্যন্ত ভারতে নির্মিত কাহিনীচিত্রের বাৎসরিক সংখ্যা, চলচ্চিত্র-শিল্প সংক্রান্ত সকল রকম আইনকানুন, পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ইতিবৃত্ত, সারা ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির নাম-ঠিকানা, সর্বভারতীয় প্রচারপ্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ, পূর্বভারতীয় পত্র-পত্রিকার বিবরণ প্রভৃতি ছাড়াও কলকাতার বৈদেশিক দূতাবাসগুলির ঠিকানা, বিমানসংস্থাগুলির বিবরণ, ডাক ও তার বিভাগ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়, ভারতীয় চিত্রের আন্তর্জাতিক পুরস্কারলাভের বিবরণ, ১৯৫৩ থেকে '৬৯ পর্যন্ত চলচ্চিত্রবিষয়ক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের বিবরণ প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যসংবলিত এই ডায়েরীর সঙ্গে আছে চলচ্চিত্র-প্রদর্শকদের জন্যে বিশেষভাবে মুদ্রিত 'ফিল্ম বুকিং চার্ট' ও 'বক্স-অফিস কলেকশান চার্ট' এবং প্রতি পৃষ্ঠায় চারদিক হিসেবে বাৎসরিক দিনপঞ্জী। ভারতের চলচ্চিত্রব্যবসায়ী, চলচ্চিত্রসেবী ও চলচ্চিত্রানুরাগীদের পক্ষে অপরিহার্য 'বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী'টি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করে সম্পাদক বাগীশ্বর ঝা চলচ্চিত্র-জগতের অশেষ উপকার সাধন করে থাকেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)—সম্পাদক বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : ৭৫ পয়সা।

পুরনো প্রচ্ছদের বদলে নতুন ছবি ছাপা হয়েছে কভারে। লেখার মান বদল হয়নি। এ সংখ্যায় একটি সুন্দর আলোচনা লিখেছেন চুনীলাল রায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সাহা, যজ্ঞেশ্বর রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, জরাসন্ধ এবং আরো দু' একজন। সম্পাদকীয় এবং বিভাগীয় রচনায় পত্রিকাটি সুখপাঠ্য। তবে রচনা নির্বাচনে আরেকটু সতর্ক হলে পাঠক উপকৃত হতেন। "বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে" প্রবন্ধকার খবর দিয়েছেন, তামিল ভাষায় নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" গল্পের অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত লেখক সুব্রাহ্মণ্য! বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা গবেষণা করুন, আমরা বিমূঢ় বোধ করছি।

নবজাতক (ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১ পাম অ্যাভিনিউ। কলকাতা—১৯। দাম : দেড়টাকা।

বর্তমান গান্ধীশতবার্ষিকী সংখ্যায় গান্ধী এবং লেনিন, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী, গান্ধীর রাজনৈতিক চিন্তা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে গান্ধী ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ এবং কয়েকটি স্মৃতিচিত্রণ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অনিকেত (প্রথম সংকলন)—সম্পাদক : শিবাজী রায়। মল্লিকপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

অনিকেত পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটিতে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। লিখেছেন : রত্নেশ্বর হাজরা, মজনু মোস্তাফা, দেবদাস আচার্য, হরিপদ দে, শ্যামল রায়, শিবাজী রায় এবং রথীন্দ্র ভৌমিক।

ধনধান্যে—(প্রথম বর্ষ ।। সপ্তদশ সংখ্যা)—সম্পাদক : শরদিন্দু সান্যাল। যোজনা ভবন। পার্লামেন্ট স্ট্রীট। নিউদিল্লী—১। দাম পঁচিশ পয়সা।

ধনধান্যের এটি সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজবিজ্ঞানী ও সাংবাদিক, পরিকল্পনার পথে দেশের উল্লেখ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা বিফলতার মূল্যায়ন করেছেন, পরিকল্পনা যন্ত্রের সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাসের সূত্র নির্ধারণ করেছেন এবং প্রাক-পরিকল্পনা যুগের পটভূমিকাতে পরিকল্পনোত্তর যুগের বিভিন্ন পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধরনের বিশেষ সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রকাশ করলে জনসাধারণ সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে অনেক খবরাখবর জানতে পারবে। এর প্রয়োজন আজ খুবই বেশি।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা—সম্পাদক : সুমিত মুখোপাধ্যায় এবং চিন্ময় দাশ। ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড। হাওড়া : ৪।

মামুলী ধরনের পত্রিকা। কোন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

পাইকপাড়া রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় পত্রিকা—সম্পাদক : শিবশম্ভু পাল। ২৪ রাজা মণীন্দ্র রোড। কলকাতা—৩৭।

স্কুল ম্যাগাজিন হলেও সম্পাদকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। রচনা নির্বাচনে এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে এঁদের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বিদ্যালয় অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন।

হাসির কবিতা (সংকলন)—গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম। বাণী মঞ্জিল। এ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম : এক টাকা দশ পয়সা।

প্রকাশকরা সবচাইতে হেলাফেলা করেন ছোটদের বই ছাপার ব্যাপারে। বাংলাদেশের এই তাজ্জব ব্যাপারটির প্রত্যক্ষদর্শী আবার ছোটরাই। 'হাসির কবিতা'র লেখক বেশ সহজ সরল ভঙ্গিতে ছোটদের মনের কথা বলেছেন ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসির সমন্বয়ে। যাদের বয়স এখনো [illegible] চৌদ্দর বেশী হয়নি, তারা প্রতিটি [illegible] তাকে উপভোগ করবে অনাবিল আনন্দে। কিন্তু বইটির ছাপা, অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ রীতিমতো বিরক্তিকর।

শিলঙের কবিতা (হৈমন্তী সংকলন)—সম্পাদক : রমানাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। আর ভট্টাচার্য। বিরাজ কুটীর। নিউ কলোনী (লোয়ার)। শিলং—৩।

শিলং থেকে প্রথম কবিতার পত্রিকা বেরিয়েছিল 'উৎস' নামে, ১৯৫৬ খৃঃ। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে পুরো পত্রিকাটিই সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত। কবিতার কাগজ হিসেবে এইটিই ছিল সম্ভবত আসামের প্রথম কবিতাপত্র, অবশ্য বাংলা ভাষায়। সেদিক থেকে 'শিলঙের কবিতা' শিলঙের দ্বিতীয় কবিতাপত্র। কয়েকজন খ্যাত এবং অখ্যাত কবির কবিতা আছে এই সংকলনে। বাঙলা কবিতা আন্দোলনে শিলঙের কবিতা স্বাক্ষর রাখতে পারবে আশা করি।

বৈকুণ্ঠের খাতা

একটি জীবন অনতি-অতীতের স্মৃতি

নাম শুনে সন্দেহ জেগেছিল, গল্পের বই না উপন্যাস?

'পরিচয়'-এর মতো উল্লেখ্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার। এককালে গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। বলেছেন আড্ডার গল্প। রাজনীতি করেছেন সক্রিয়ভাবে। সেজন্যেই বুঝতে পারছিলাম না, বইটি কী বিষয়ে লেখা। কিন্তু বইটি পেয়ে, পাতা উল্টেই জানা গেল, শ্রীগোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন : রূপনারাণের কূলে।

কিন্তু কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর অটোবায়োগ্রাফির নাম রেখেছেন 'জীবনস্মৃতি', নবীন সেন রেখেছেন 'আমার জীবন'। অর্থাৎ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সোজাসুজি নাম দেওয়াই রীতি। গোপালবাবু তাঁদের অনুসরণ করেন নি। রূপনারাণের কূলে তাঁর জন্ম নয়, বাস নয়, জীবনও কাটে নি। একটা সময় কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে, বাকি সময়টা কলকাতায়।

গোপালবাবু বলেন : "কোনো বিশেষ নদীর কথা আমার মনে ছিল না। নেই-ও। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে আছে : রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম; জানিলাম, এ জগৎ স্বপ্ন নয়।' এখানে কোনো বিশেষ নদীর কথা বলা হয়নি। আমিও বলিনি। বন্ধুরা বলেছিলেন, যা দেখেছ লিখছ না কেন? লিখলাম। কিন্তু আমার দেখা যে ফুরোয় না।"

'প্রস্তাব ও প্রস্তাবনা' অংশে লিখেছেন : "সেদিন (ইং ১৯৬৩) আমার ৬১ বছর পূর্ণ হয়েছিল। আর কারো তা জানবার কথা নয়। তবু প্রিয়জনরা দু-একজন দেখলাম দিনটা মনে রেখেছিলেন—স্বদেশেও বিদেশেও। আমার কিন্তু অন্যদিনের মতোই তা কেটেছে।...তারই মধ্যে কিছুটা সময় নিজের খুশি মতো কাটাবার অবসর পেয়েছিলাম।...দুপুরের ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে হাওড়া-ব্যান্ডেল যাতায়াত।

একষট্টি বছরের স্টেশনটা পেরিয়ে গেলাম, নামবার সময় হচ্ছে। কামরাভরা একরাশ মুখ নিয়ে—কথা নিয়ে, গুজব নিয়ে, তর্ক নিয়ে, আত্মীয়তা নিয়ে—ইলেকট্রিক ট্রেন তেমনি চলে যাবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগল—সেই একরাশ মুখ।"

সম্প্রতি গোপালবাবু আটষট্টিতে পড়েছেন। এখনো তেমনি সতেজ, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি নম্র। কথা বলেন ধীরে ধীরে। অথচ কোনো জড়তা নেই। মানুষ সম্পর্কে কেমন যেন একটা সস্নিগ্ধ মমতা ও আসক্তি। এক পরিশীলিত শিল্পী-মানসের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় প্রতিটি উচ্চারণে। বলেন : "এই আটষট্টি বছরে কিছুই দেখিনি বলতে পারব না। কিন্তু এমন কথা কি বলতে পারব যে সব দেখা হয়ে গেল? আমাদের সময়টা সুস্থির নয়। এজন্যে দুঃখ করছি না। এদেশে এ যুগে জন্মে তা এড়িয়ে গেলে দুঃখই পেতাম। এখন আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর হচ্ছে পৃথিবী। বিশ শতকের মানুষ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুচ্ছে—হয় সিদ্ধি, নয় পতন: মানুষে বিশ্বাস না হারানো এ যুগে দুঃসাহসের কথা। তবু আমার কাছে বিস্ময়ের মনে হয় মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা এ কালের মানুষের একটা বড় আবিষ্কার।'

এই গ্রন্থে অধ্যায় আছে অনেকগুলি। প্রতি অধ্যায়ের নাম আলাদা। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির মতো। কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। প্রায় ধারাবাহিক। যথাক্রমে (১) প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রস্তাব ও প্রস্তাবনা (২) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকৃতি ও স্মৃতি (৩) তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হালদার গোষ্ঠী (৪) চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গৃহচ্ছায়ার স্মৃতি (৫) পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রবাসীর ভদ্রাসন (৬) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একটি শিশিরবিন্দু (৭) সপ্তম পরিচ্ছেদ : অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গণ (৮) অষ্টম পরিচ্ছেদ : স্বদেশীর স্রোতাবর্ত (৯) নবম পরিচ্ছেদ : অগ্নি-স্পর্শ (১০) দশম পরিচ্ছেদ : পুঁটি মাছের কথা (১১) একাদশ পরিচ্ছেদ : আলোকের ঝর্ণাধারায় (১২) দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পাকামির পথ (১৩) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : উদ্বাস্তুর নামাবলী।

পরিশেষে ছাপা হয়েছে 'নাম-নির্ঘণ্ট'। তৃতীয় ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম দুটো

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার নেওয়া। বইয়ের নামটি তো বটেই।

গোপালবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : একে কি অটো-বায়োগ্রাফি বলা যায়?

গোপালদা বললেন : "আমি তো চুনোপুঁটি। আমার আবার অটোবায়োগ্রাফি কি? আমি বলতে চেয়েছি একটা সময়ের কথা, আমার দেখা মানুষের কথা। নিজের সম্পর্কে বলতে গেলে, পাঠক পারসপেকটিভ হারিয়ে ফেলবে। ইনসিডেন্টের পেছনে ছুটবে। আসল কথাটাই জানবে না। আমি যে তাই জানাতে চাই। আমার জীবন জেনে কি হবে? অটোবায়োগ্রাফি লেখা খুব শক্ত কাজ, বড় শিল্পীর কাজ। এর জন্যে দরকার যথেষ্ট শক্তি ও সংযম, শিল্পীর নিরাসক্তি, কিছুটা ডিটাচম্যান্ট, যা আমার নেই—অনেকের কাছেই দুরূহ।"

সম্ভবত এজন্যেই তিনি পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবেশের কথা বলেছেন—নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেন নি। সর্বত্রই তিনি দ্রষ্টা কিংবা শ্রোতা—প্রায় প্রতিটি ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থিত—তবু নিজের সম্পর্কে নীরব, মতামতে কুণ্ঠিত।

লিখেছেন : "'আমি' এই সর্বনাম শব্দটার রূপগুলো লেখকের ও পাঠকের পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে দুস্তর দেয়াল বেঁধে তোলে। ঐ সর্বনাম নিয়ে লেখক অসহায়। আত্মকথার মূলেই এই বাধা।"

তিনি নিজেই নিজের বিচারক। নির্মম রায় দিয়েছেন নিজের সম্পর্কে : "বড় শিল্পী, বড় লেখক হলে শিল্প-জীবনের প্রকাশধারা পরিস্ফুট হতো আমার আত্ম-স্মৃতিতে।... পুরাতন অভিজাত-গোষ্ঠীর প্রতিভূ সেকালের ধুলোয় ঢাকা জীবনের ঝাপসা ছবি দেখতে পেত কেউ কেউ কৌতূহলে, শ্রদ্ধায় ঝুঁকে পড়তেন আমার মুখের দিকে। একালের উদ্যোগী পুরুষ যদি হতাম বুদ্ধির উদ্যমের সুযোগের পথ দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কেমন করে নানা আয়োজনে বন্দী করতে হয় তা দেখিয়ে দিত আমার চরিতকথা। এসব কোনো বিশিষ্টতা আমার নেই। না পেয়েছি গদী, না নিয়েছি গদা।"

তিনি চান জীবনের অকপট, অকৃত্রিম প্রকাশ। মনে করেন, প্রত্যেক মানুষই বিশিষ্ট, এক অপূর্ব আবির্ভাব। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ মিশিয়ে জীবনটাকে আমরা গড়ে-পিটে তৈরী করেছি : "নিজের কথা বলতে বসলেই আমরা এই কথা ভুলে যাই। গিলটিতে মুড়ে প্রমাণ করতে চাই পিওর গোল্ড...। আত্মার এই অত্যাচারে আত্মজীবনী থেকে জীবন চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়, আমিই হয় সর্বস্ব।"

এখানেই রাবীন্দ্রিক ধারণা থেকে গোপালদা অনেক দূরবর্তী—অনেক আধুনিক, আমাদের কাছাকাছি মানুষ। ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য—সব কিছুর বিষয়ে নিজের কথা বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ করা কঠিন। তিনি তাই কনফেশনে ভীত নন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্বাচনের পক্ষপাতী—ভারতীয় রুচিবোধের ধারক। য়ুরোপীয় আত্মজীবনীকাররা এই গোপনতা স্বীকার করেন না। গোপালদাও স্বপ্রকাশে অকুণ্ঠ। তবু ওঁর অতি-বিনয় বিস্ময়কর মনে হয়। বাংলাদেশে ইদানীং গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা লেখা হচ্ছে সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে। বিদেশে ছাপা হচ্ছে বিপ্লবীর আত্মজীবনী কিংবা অচেনা, অজ্ঞাত সৈনিক ও শ্রমিকের জীবন-কাহিনী। এদেশের প্রকাশকরা যদি বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজকর্মী ও বিপ্লবীদের জীবনী এবং আত্মজীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হতেন, তা হলে সমগ্র দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস লিখতে বসে গবেষকদের বড় বেশী দলিল দস্তাবেজ ঘাটতে হতো না। একজনের স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে, অপরের স্মৃতি তার সংশোধনে সহায়ক হতে পারতো।

কিন্তু গোপালবাবু বিনয় করে যাই বলুন, তিনি তুচ্ছও নন, নগণ্যও নন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য ও রাজনীতিক আন্দোলনের তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁকে জানলে বাংলাদেশের একটা সময়ের কথা অনেকটাই জানা হয়ে যায়। জীবনের পরিবর্তিত মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মে। সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের ইতিহাস সম্ভবত তিনিই লিখেছেন প্রথম নতুনভাবে।

জিজ্ঞেস করলাম : এ বই লেখার পরিকল্পনা নেন কবে, কেন এবং কি উদ্দেশ্যে?

গোপালবাবু বললেন : "পরিচয়ের আসরে আমরা গল্পগুজব করতাম, আড্ডা দিতুম। কখনো শিল্পসাহিত্য নিয়ে, কখনো রাজনীতি নিয়ে। কমিউনিস্ট মুভমেন্ট আর স্বদেশী আন্দোলন নিয়েও গল্প হতো। আমি পুরনো দিনের কথা বলতাম। একাল-সেকালের নানা মানুষ নিয়েও আলোচনা হতো। বন্ধুবান্ধব আর অনুরাগীরা প্রায়ই বলতেন, সেসব কথা লেখার জন্যে। লেখা হয়ে উঠতো না। মাঝে মাঝে ভাবতাম, লিখলেও হয়। পরিকল্পনা বলুন, আর উদ্দেশ্যই বলুন—তা ঐ আড্ডা থেকেই।"

লিখতে শুরু করেন কবে? কোন্ সালে।

—১৯৬৩-তে বোধহয়। বছর সাতেক আগের কথা। কিস্তিতে কিস্তিতে শুরু করলাম 'পরিচয়'-এর পাতায় লিখতে। সব সংখ্যায় লিখতে পারতাম না। জায়গার অভাবে বাদ দিতাম। আমি তখন সম্পাদক। নিজের কথা বলার জন্যে অন্যের লেখা বাদ দিতে পারি না। কখনো কখনো লিখে উঠতে পারতাম না সময়ের অভাবে। দুটোই সত্য। ১৯৬৩-তে যখন লেনিনগ্রাদে যাই, তখন চার-পাঁচটা ইনস্টলমেন্ট লিখে ফেলেছিলাম অনেক দিনের। সবটাই অব[illegible] দেশে নিয়ে আসতে পারি নি। কিছুটা অংশে হারিয়ে গিয়েছিল অসাবধানে।

এ বইটি তো প্রথম খণ্ড। বাকি অংশও কি লেখা হয়ে গেছে?

—এ বই লেখার পেছনে নিজের তাগিদ বড় ছিল না। লিখেছি, অন্যের তাগিদে, পত্রিকার প্রয়োজনে। কাগজে য ছাপা হয়েছে, বইতে তার সবটাও দিতে পারিনি। প্রথম খণ্ডে আছে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ পর্যন্ত সময়ের কথা। কলেজ জীবন সম্পর্কে দুটো ইনস্টলমেন্ট লিখেছিলাম আমার সহপাঠী এবং অধ্যাপকদের কথা তাতে বলেছি। সে দুটো ছিল ভালো অংশ। এ বইতে তা ছাপা হয়নি। পরে খণ্ডে থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডের ম্যানাসক্রিপট তৈরী হয়নি। সময় পেলে, লিখব

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ছাপা বইয়ের কি কোনো গরমিল আছে?

—আছে। সামান্য পরিবর্তন। সুভাষকে (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) বলেছিলাম পরিচয়ের ছাপা ফাইলগুলো দেখে দিতে। উনি দেখে দিয়েছিলেন। পত্রিকায় বেরোবার সময় হয়তো ব্যক্তিগত পরিচয় ও আসক্তির জন্যে কোনো কোনো ব্যাপারে বেশী মূল্য দিয়ে ফেলেছিলাম। বই বেরোবার সময় তার কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। পরিচয়ে বেরিয়েছিল আমার হাতে লেখা ম্যানাসক্রিপট থেকে। বই ছাপা হলো, তাকে কাটছাঁট করে।

একে কি আপনার আত্মজীবনী বলা যায় না?

—আমি বলতে চাই না। নিজেকে আমি পেছনে ফেলে রাখতে চাই। যেসব লোকের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁদের কথা লেখাই আমার উদ্দেশ্য। যে-এনভায়রনমেন্ট থেকে তাঁরা উঠে এসেছিলেন, তার কথা লিখেছি, তাঁদেরই পুরোপুরি বুঝবার জন্য। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি কোনো মতামত দিইনি। সাহিত্যিকদের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বেশী বলেছি। এড়াতে পারলে ভালো হতো। আমার বাবা, দাদার কথা বলেছি সেজন্যই। এ জাতীয় বই লিখতে গেলে সকলেই সেলফ-কনসাস হয়ে যায়। আমিও কিছুটা হয়ে গেছি।

সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন কি?

—মোটামুটি ক্রনোলজিক্যাল। দু' একটা ব্যাপারে তা ব্যাহত হয়েছে। ঘটনাক্রমে মুজফ্ফর আহমদ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সম্পর্কে বলেছি। ওঁরা আমার পরবর্তী জীবনেই পরিচিত। এ রকম ক্রনোলজি ব্রেক করেছি মাঝে মাঝে। অতীতের কথা বলতে গিয়ে, খেই ধরার প্রয়োজনে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রধানতম উৎসাহী কে?

—চিত্রাঙ্কন : [illegible] ও দিলীপ দাস।

ছাপা হতে এত দেরী হলো কেন?

—আর্থিক দিকটা নিয়েছিল অনেক-দিন আগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উদ্যোগী। বিরামবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুভাষ বললো : গোপালদা, আর দেরী করতে চাই না। ওখান থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসা হলো। শেষ পর্যন্ত ছাপা হলো একটা প্রেস থেকে। এঁরাও ভুগিয়েছেন কম নয়। প্রচুর ছাপার ভুল। চেষ্টা করেও নির্ভুল করা গেল না। প্রুফে যা সংশোধন করে দিই, প্রেস তা অনুসরণ করে না। বইটার নাম দিয়েছি রূপনারাণের কূলে'। টাইটেল পেজের প্রুফ এলো : রূপনারায়ণের কূলে। যতবার সংশোধন করে দিয়েছি, ততবারই ওরা আমাকে অমান্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক ছাপা হয়েছে। প্রকাশক : মণীষা গ্রন্থালয়।

আপনার বাল্যকালের তুলনায় একালের ছেলেমেয়েদের আপনি বিচার করে দেখেছেন কি? আপনি যে-কালে জন্মেছেন, সেকালে ছেলেমেয়েরা কি রকম সুযোগ-সুবিধা পেতো?

—আমার বাল্য বয়সের তুলনায় একালের তরুণদের অনেক ভাগ্যবান বলে মনে হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য—মোটামুটি সব ব্যাপারেই তারা অনেক বেশী জানে। জানতে পারে। তাদের জানার সুযোগ বেশী। আমাদের সময়ে নানা ব্যাপারে এত উন্নতি হয় নি। অনেক কিছুই হাতের কাছে পাই নি আমরা। খুঁজে নিতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা দুর্বল রয়ে গেল। আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাদ পেয়েছিলাম, ওরা পায় নি। ভালো ছেলেদের এখন ভালো হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু খারাপ ছেলেরা হয়ে যাচ্ছে আরো খারাপ। সমাজ তাদের বাঁচাতে পারছে না। পাড়ার ছেলেদের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারবেন। রাজনীতির বোধ না নিয়েই অনেকে রাজনীতি করে। মূলত কেউ অসৎ নয়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা দেবে কে? জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের সচেতন করবে কে?......

সেদিনের মতো কথা শেষ করে তেত্রিশ নম্বর বাসে উঠলাম শ্যামবাজারে আসবো বলে। মানে, পনেরো বিশ মিনিটের অবকাশ। হাতে, রূপ-নারাণের কূলে। তিন রঙের ছাপা প্রচ্ছদ। ছোট বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কেবল : রূপ-নারাণের কূলে আর রূপ-নারাণের কূলে। মাঝখানে লাল সূর্যের একটা গোলাকার পিন্ড। আকৃষ্ট হওয়ার মতো প্রচ্ছদ।

আর বইয়ের ভাষা? অনবদ্য। এমন সুন্দর—সহজ অথচ সাহিত্য গুণসম্পন্ন আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। রচনা ভঙ্গিতে আকর্ষণীয়। দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, উদাসীন এবং অবজেকটিভ।

নিজের পিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : "ঘটনাবহুল নয় তাঁর জীবন। চমক লাগানো তো নয়ই। দেশের রাজনৈতিক বা বুদ্ধিজীবী সমাজে তিনি কোনো আলোড়ন তোলেন নি। তাঁর সে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না। যে ছোট শহরে তিনি জীবন-যাপন করেছেন সেখানে সবই শান্ত, মৃদুগতি, নিস্তরঙ্গ। তারই মধ্যে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। 'প্রধান' হতে চান নি, 'প্রথম'ও নয়। নিজের সহজ স্বচ্ছন্দ ধারায় দিন কাটিয়েছেন, সহজভাবেই হয়ে গিয়েছিলেন দশজনের একজন।"

মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে নয়, লেখার মধ্য দিয়ে। গোপালবাবু লিখেছেন : "বাড়িতে যে প্রবাসী আসে তাতে সেবার প্রকাশিত হয়েছে ছবিশুদ্ধ একটি লেখা—'সন্দীপের পুরোল বৃক্ষ', লেখক মুজফ্‌ফর আহমদ। বাবা পড়লেন, খুশি হলেন, বললেন, বাঃ বেশ সুন্দর পরিষ্কার লেখা।... বাবার কথাটাতে শুধু লেখাটা নয়, মানুষটির চরিত্রের একটি দিকও প্রকাশিত। হাতের লেখা দেখলে তা আরও বলা যেত। বাঙলা ইংরেজী এমন মুক্তার মতো বড় অক্ষর, পরিষ্কার, সুস্থির হাতের লেখা—আর দ্বিতীয়টি কারো নেই ভূভারতে। ভাষারও ঠিক এই গুণটি আছে—স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, নিশ্চয়তা। আর ওই প্রবন্ধটিতে ছিল মুজফ্‌ফর সাহেবের দৃষ্টিকোণেরও পরিচয়—অবজেকটিভিটি বা তথ্যনিষ্ঠা। লেখা মানেই ভাবের ফোয়ারা খুলে দেওয়া আর শব্দের আড়ম্বরে ফুলে ফেঁপে ওঠা,—বাঙলা ভাষার এই ঝোঁকটা এখনো কাটে নি।"

এ বইতে গোপাল হালদার অভিযোগ-হীন —কী বিষয়ের বর্ণনায়, কী বিষয়ীর আত্ম-উদ্ঘাটনে, কোথাও তাঁর কলমে ক্ষোভের তিক্ততা দেখা দেয় নি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন পরিণত জীবনে। চতুর্দিকে তাঁর অজস্র মানুষ—মানুষের মুখ। সকলের সঙ্গেই তিনি জড়িয়ে আছেন। এক প্রাজ্ঞ প্রবীণ মানবিক মমতায় তিনি সুস্নিগ্ধ। বইটি পড়ার পর তাই দ্বিতীয় খন্ডের জন্যে প্রত্যাশা জাগে।

—গ্রন্থদর্শী।

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(১৪)

রাংকার রামরিচ সিং-এর মাটির দেওয়াল, খাপরার-চালের ভান্ডার থেকে চতুর্দিকের উপত্যকা চোখে পড়ে। একটি নদী পাহাড়টাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘুঙুর পায়ে নেচে চলেছে। খেমটার সুর বাজছে যেন পায়ে পায়ে। "বল্ গোলাপ মোরে বল্, তুই ফুটিবি কবে সখী। বল্ গোলাপ মোরে বল্।"

আমরা যেদিন এসে পৌঁছলাম তার আগের দিনই বাঘে মড়ি করেছে পাহাড়ের নীচে নদীর পাশে। এক ওঁরাও চাষার ফুটফুটে দুধ-সাদা দুধেল গাই মেরে দিয়েছে বাঘে। আমরা পৌঁছেছিলাম সকাল ন'টা নাগাদ। পৌঁছনো মাত্র একবার মড়িটা দেখতে গেলাম। ভান্ডার থেকে প্রায় পনেরো মিনিটের পাকদন্ডী পথ। ঝর্ণাটার কাছেই কতগুলো পিটীস্ ঝোপের আড়ালে গরুটা পড়ে রয়েছে কাত হয়ে। দুধের বাঁট দুটো খেয়ে নিয়েছে আর পেছনের নরম অংশ। গলার কাছে দুটি পরিষ্কার ফুটো। মনে হল কেউ যেন ড্রিলিং মেসিন দিয়ে ড্রিল করেছে। গরুটাকে ধরেছিল এখান থেকে কম করে চারশ' গজ দূরে; বিকেলে যখন চরে বেড়াচ্ছিল। এতদূর টেনে এনেছে। কখনো ঘাড়ে ধরে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে, কখনো ঘাড়ে কামড়ে এক ঝটকায় পিঠের উপর তুলে।

যশোয়ন্ত চতুর্দিক নিরীক্ষণ করল ভাল করে। কুল্ কুল্ করে ঝর্ণাটাতে এক চিল্তে জল বয়ে চলেছে। এই রোদে-ভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়েও জায়গাটায় বেশ শীত শীত করছে। গরুটার কাছাকাছি বড় গাছ যা আছে, তাতে নীচের দিকে মোটেই মাচা বাঁধার উপযুক্ত ডাল নেই। যেখানে ডাল আছে, তা অনেক উঁচু। যশোয়ন্ত আমাকে বলল, তোমার অত উঁচু থেকে গুলি করতে অসুবিধা হবে। তার চেয়ে মাটিতে বসব। মাটিতে বসে জানোয়ার দেখতে অনেক সুবিধা, গুলি লাগাতেও সুবিধা।

আমি বললাম, তা ত সুবিধা, কিন্তু প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ারও খুব সুবিধা।

যশোয়ন্ত বলল, প্রাণ বেরুনো সোজা নাকি?

আমি বললাম, তোমার জগদীশ ভাইয়ের গুলির হাত থেকে বেঁচেছি বলে কি বাঘের হাতেও বাঁচব?

যশোয়ন্ত বলল, এখানে কথা বলো না—বাঘ ত বেশী দূরে যায় নি। ধারেকাছেই আছে। ঘুমুচ্ছে। বেশী চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হতে পারে।

গাছের নীচে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। আমারও হুইটলী সাহেবের বন্ধুর মত 'মাই গড হি' ইজ দ্যা ড্যাড অব অল গ্রান্ড ড্যাডিজ' বলতে ইচ্ছে করল। থাবার ছাপ দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

নিরীক্ষণ করে বোঝা গেল যে বাঘ নদী পেরোয় নি। নদীর যেদিকে গরু আছে সেই দিক দিয়েই গরুটা নিয়ে এসেছে, এবং খেয়ে সেই দিক দিয়েই ফিরে গেছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাঘ যে পথে গেছে সে পথেই ফিরে আসবে।

বেশ বুদ্ধি করে নদীর পাশে যশোয়ন্ত একটা গর্ত খুঁড়ল সেই ওঁরাও চাষা আর নিজে মিলে। আমাকে একটা ছুরি দিয়ে বলল, বেশ দূর থেকে কয়েকটা কেরাউঞ্জার ঝাঁকড়া ডাল কেটে আনতে। বলল, বন্দুক নিয়ে যাও। বাঘ কোথায় শুয়ে আছে কে জানে? ঝোপ কাটতে গিয়ে বাঘের নাকে কোপ বসিও না।

দশ-পনেরো মিনিট বাদে ঝোপ কেটে ফিরে এসে দেখি নদীর খাড়া পাড়ে যেখানে এক রাশ কেরাউঞ্জার ঝোপ আছে তার ঠিক পাশেই যশোয়ন্ত গর্তটা সম্পূর্ণ করেছে। গর্তের সামনে যেখানে কেরাউঞ্জার ঝোপ-গুলো ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে আমার কেটে-আনা ঝোপগুলো বসিয়ে দিল বালিতে। গরুটার কাছ থেকে এবং গরুটা যেদিকে আছে, সেদিক থেকে (কেরাউঞ্জার ঝোপের আড়ালে গর্ততে বসে থাকলে) বাঘ আমাদের মোটেই দেখতে পাবে না। অবশ্য যদি আমরা নড়া-চড়া বা শব্দ না করি। মাটিতে বসে থাকব, আর অতবড় রয়াল টাইগার এসে আমাদের থেকে দশ পনেরো হাত দূরে গরুর হাড় কড়মড়িয়ে খাবে—এ দৃশ্য কতখানি ভয়াবহ জানি না তবে এ দৃশ্যের কল্পনাও কম ভয়াবহ নয়। তাছাড়া আমাদের পেছনে ত উদোম টাঁড়। মাত্র কুড়ি হাত চওড়া বালিময় নদী—তাতে এক চিলতে জল চলছে মাত্র। বাঘ যে পেছন দিক থেকে আসবেই না এমন গ্যারান্টি যশোয়ন্ত দিচ্ছে কি করে জানি না। অবশ্য বাঘের পায়ের দাগ দেখে যশোয়ন্ত যা সব্যস্ত করেছে সেটাই সম্ভাব্য ও ঠিক বলে মনে হলো।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এনামেল-করা মগে এক কাপ করে গরম চা কৃপণের মত রয়ে সয়ে খেয়ে ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে এবং দুটো দেহাতী কম্বল এবং একটি ছোট নারকোলের দড়ির চারপাই নিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম মড়ির কাছে।

সূর্যের [illegible] নেমে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে। চৌপাইটা নদীর বালুরেখায় পাড়-ঘেঁষে পেতে, তার উপর কম্বল দুটো বিছিয়ে আমরা বসলাম। রামধনিচন্দনের চাকর এসেছিল সঙ্গে, তাকে বললাম, দেখতো বাবা ও-পাশ থেকে আমাদের মাথা দেখা যাচ্ছে কি-না? সে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করে বলল, কুচ্ছো না দিখতা হো বাবু, একদম ঠিক্কে হ্যায়।

তারপর সে এবং তার সঙ্গী দুজনে জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেল বস্তীর দিকে। বেশ শীত। রোদের তেজটা যত কমে আসছে তত মনে হচ্ছে কার অদৃশ্য হিমেল দু-খানা হাত কাঁধের দু-পাশে চেপে বসছে। তাছাড়া নদীতে বসেছি, ঠান্ডা যেন আরো বেশী বলে মনে হচ্ছে।

কাছেই জঙ্গলের মধ্যে কোনো ফাঁকা মাঠ আছে। তাতে যেন পাখীদের মেলা বসেছে। তিতির আর বটেরের ডাকে বন সরগরম। বন-মোরগ ডাকছে থেকে থেকে। ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া রব চতুর্দিকের গোধূলিবেলার নিস্তরঙ্গতাকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিচ্ছে। আমাদের সামনের গাছে একটা সুন্দর, বড় নীল আর খয়েরীতে মেশা কাঠঠোকরা এসে বসল। এসে কাঠ ঠুকতে লাগল ঠক্‌ঠক্ ঠকাঠক্ করে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এল। কোজাগরী একাদশীর চাঁদ উঠতে লাগল।

গরুটার পা শক্ত দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল যাতে বাঘ এসে টেনে এদিক ওদিক নিয়ে না যায়—তা না হলে আমাদের বসবার জায়গা থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। সাদা গরুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখনো পশ্চিমাকাশে বেগনেতে-গোলাপীতে মেশা একটা আভা আছে। তবে জঙ্গলে, পাহাড়ের নীচে, অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা উৎসুক হয়ে গরুর মড়ির দিকে চেয়ে বসে আছি। উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছি—এমন সময়, বড় জোর পনেরো মিনিট হল চাঁদ উঠেছে; হঠাৎ

আমাদের একেবারে সোজাসুজি পৌঁছলে একটা নুড়ি গড়িয়ে নদীতে পড়ার শব্দ হল। যশোয়ন্ত ছিলা-ভাঙ্গা ধনুকের মত মুহূর্তে রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে বসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে দুবার হাঁউ হাঁউ করে একটা চাপা গুরু গম্ভীর বিরক্তিসূচক আওয়াজ হল। যশোয়ন্ত আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে ব্যারেলের উপর আলো দেবে।

আমার বন্দুকটা কাঁধে ফেলে, তাড়াতাড়ি জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম যশোয়ন্তের সঙ্গে। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চের আলো জঙ্গলময় আলোর বন্যা বইয়ে দিল। সেই আলোর কেন্দ্রে দেখলাম একটা বিরাট ফিকে হলদে রঙা বাঘ আমাদের দিকে পেছন ফিরে হেলতে দুলতে চলেছে। পেটটা প্রায় মাটিতে ঠেকে গেছে। আলোটা গায়ে পড়তেই ভেবেছিলাম দৌড়ে পালিয়ে যাবে ভয়ে। কিন্তু মনে হল, কাউকে ভয় করা বাঘের কুষ্টিতে লেখা নেই। বড় জোর এড়িয়ে চলতে চায়—ভাবটা, leave and let alone.

চার কদম গিয়েই বাঘ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা নিরুদ্বেগের সঙ্গে ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। একটা প্রকান্ড মুখ—হলদে-শাদায় মেশানো। কপালের কাছটা শাদা—দুয়া বড় বড় খানদানী গোঁফ। একবার মুখ তুলে তাকালেই বুকের রক্ত হিম হবার জোগাড়। আমি টর্চটা ধরে রইলাম এবং যশোয়ন্ত মুহূর্তের মধ্যে আমার উত্তোলিত ডান হাতের নীচে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েই ওর ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল্ ব্যারেল দিয়ে গুলি করল। কি বলব, বাঘটা ঐখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সমস্ত শরীরটা কিছুক্ষণ থর্-থর করে কাঁপল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

যশোয়ন্ত বলল, ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে শিকার করাব। তা হল না। ব্যাটা আমাদের একদম বুদ্ধু বানিয়ে দিল। নদী টপ্‌কে একেবারে পেছন দিয়ে আসছিল। এ যদি মানুষ খেকো বাঘ হত তাহলে আর দেখতে হতো না।

আমি বললাম, বাঘ কোনো ঝুটঝামেলা না করে মরল কেন? তবে যে লোকে বাঘকে এত ভয় পায়? যশোয়ন্ত বলল, গুলি করার আগে পর্যন্ত বাঘের মতো 'ডোন্ট-কেয়ার', 'আয়না দেখি', 'কুছ পরোয়া নেহী' গোছের জানোয়ার দুটি নেই। মানুষকে বাঘ এড়িয়ে চলতে চায় এ পর্যন্ত। কিন্তু কখনো মানুষকে ভয় করে না। ফলে বুক-ফুলিয়ে রাজার মত আস্তে আস্তে হেলে-দুলে চলে, থেমে দাঁড়ায়—মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। তাই মাথা ঠান্ডা করে মারতে পারলে বাঘ মারা সব শিকারের চেয়ে সোজা। আর এ যদি চিতা হতো তু দেখতে, আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন লেজ তুলে দৌড়য়। বাঘ ভাবতেই পারে না, যে তার সঙ্গে ইয়ারকি-মারনেওয়ালা জীব আছে দুনিয়ায় এবং সে কারণে আলো ফেলতেই আমাদের ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

সফ্‌ট-নোজড্ গুলিটা কাঁধে ঢুকে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। চল কাছে, দেখাব। তা না হয়ে যদি গুলি কোনো বে-জায়গায় লাগত তাহলে দেখতে বাঘ কি জিনিস, আর মানুষ বাঘকে ভয় পায় কেন॰ ভয়-পাওয়ার মত জানোয়ার সে ত বটেই। আরো কিছুদিন জঙ্গলে থাকো, বাঘ যে কি জিনিস তা জানবার দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই হবে। প্রতিবারই কপিবুক শিকারের মত বাঘ পাকা আমের মত ধুপ্ করে পড়ে গিয়ে আমাদের যে কৃতার্থ করে না, তা জানতে পাবে।

কতকগুলো পাথর ছুঁড়ে আমরা বাঘটার কাছে গেলাম। গুলি করেছিল যশোয়ন্ত প্রায় তিরিশ গজ দূর থেকে। বাঘের মত বাঘ বটে। বনের রাজা যাকে বলে। বেচারির গরু খাওয়া হলো না।

পরে আমরা মেপেছিলাম। ন' ফিট এগারো ইঞ্চি Between the pegs. Between the pegs. মানে বাঘকে লম্বা করে লেজ সমেত একটি সমান্তরাল রেখায় শুইয়ে, নাকের কাছে এবং লেজের কাছে দুটি খোঁটা পুঁতে সেই খোঁটা দুটির দূরত্ব যত হয় তত।

গুলির শব্দ শুনেই রামরিচবাবু নিজে লোকজন নিয়ে এসেছিলেন। তা না করলেও পারতেন। কারণ গুলিটা ছোঁড়ার কথা ছিল আমার। এবং আমি গুলি ছুঁড়লে, গুলি ঘাড়ে না লেগে লেজেও লাগতে পারত। এবং সেই অবস্থায় অতজন নিরস্ত্র লোকজন নিয়ে সেই জঙ্গলে ঢোকাটা নিতান্ত নির্বুদ্ধির কাজ হত।

পরদিন দুপুরে ফলাও করে মুরগী-তিতিরের কাবাব-রোহনী-রোটি এবং হরিণের মাংসের আচার দিয়ে খাওয়া সেরে কষে দিবা নিদ্রা লাগালাম। রাতে ভাল ঘুম হয় নি। বাঘের চামড়া ছাড়াতে প্রায় রাত দেড়টা হয়ে গেছিল—তারপর সকালে অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে।

সারা দুপুর ঘুমিয়ে ক্লান্ত শরীরকে মেরামত করে বিকেলে রামরিচবাবুর ভান্ডারের সামনের উঠোনের আম গাছের নীচে বসে ভয়ষা দুধে-ফোটানো দারুচিনি-এলাচ দেওয়া চা খেলাম রসিয়ে রসিয়ে। বেলাও পড়ে এল। এবার আমরা রওয়ানা হব রুমান্ডির দিকে। বাঘের চামড়াটা জীপের পেছনে রাখা হয়েছে। ভাঁজ করা চামড়াটাতে সাঁটটা প্রায় ভরে গেছে। নুন লাগানো হয়েছে পুরো চামড়াতে। নুনের গন্ধ, রক্তের গন্ধ; বাঘের লোমের গন্ধ সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বদবু বেরুচ্ছে।

যাত্রাকাল সমুপস্থিত, এমন সময় জীপে মবিল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল মবিলের টিন শুদ্ধ গায়েব। এই অজগ্রামে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ও'রাও গঞ্জুরা কেরোসিন তেলই কিনতে পারে না। তাদের সে পয়সাও জোটে না। আর চকচকে টিন ভর্তি মবিল তেল কে চুরি করে নিয়েছে কে জানে? কাড়ুয়া তেল ভেবেও চুরি করতে পারে। অথচ মবিল গাড়িতে নেই-ই বলতে গেলে। চড়াই-এ উৎরাই-এ পাহাড়ী রাস্তা-সইদুপ্ ঘাট হয়ে রুমান্ডি পৌঁছতে হবে—এ রাস্তায় মবিল না থাকলে এঞ্জিন জ্বলে যাওয়া বিচিত্র নয়।

রামরিচবাবু ত খুবই লজ্জিত হলেন, বল্লেন, এখন কাকে ধরি বলুন ত? ছিঃ ছিঃ আপনারা সব মেহমান্ লোক আর আমার কাছে এসে আপনাদের এহেন হেনস্থা। রাগারাগি করতে আরম্ভ করলেন তিনি। সামনে যাকে পান তাকেই গালাগালি করেন।

এমন সময় যশোয়ন্ত তাঁকে আড়ালে ডেকে বলল, যে রাগারাগিতে কাজ হবে না। কি করলে যে কাজ হবে তা আর বলল না। রামরিচবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে কি সব ফিস্‌ফিস করতে লাগল ও। আমি ভান্ডারে বিছানো চৌপাইয়ে আলোয়ান মুড়ে বসে বসে চাঁদ ওঠা দেখতে লাগলাম। আর কিছুদিন বাদে লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। নিষ্কলঙ্ক শরৎকালে বন পাহাড়ে চাঁদের যে সে কি রূপ।

এমন সময় রামরিচবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লালটনগঞ্জী 'একরা-কেকরা' ভাষায় বলতে লাগলেন, যশোয়ন্তবাবু তন্ত্রমন্ত্র জানেন—তিনি ঐ বাইরের ঘরে পুজোয় বসেছেন। কে মবিলের টিন নিয়েছে তা উনি এক ঘন্টার মধ্যে জেনে ফেলবেন। এবং তার আর নিস্তার নেই। তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যে নিয়েছে, সে যদি টিনটি চুপি চুপি গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় রেখে আসে তবে যশোয়ন্তবাবু তার নাম বলবেন না এবং তাকে ক্ষমাও করে দেবেন।

যশোয়ন্ত কালীভক্ত জানতাম। কিন্তু সে যে তন্ত্রমন্ত্রও জানে, তা জানা ছিল না।

সেই চুরালিয়া বস্তীর লোকেদের, প্রথমে এই সাংঘাতিক খবরে বিশেষ প্রত্যয় হল না এবং আমারও হল না। কিন্তু দেখলাম, যে-ঘরে যশোয়ন্ত ধ্যানে বসেছে, সেই ঘরে দু'-একজন লোক উঁকি মারতে লাগল একে একে। এমনি করে ভীড় ক্রমশ বাড়তেই লাগল। ভান্ডারের চারপাশে গুজ-গুজ ফুস-ফুস শুরু হল। এত লোককে এমন করতে দেখে আমারো কিঞ্চিৎ সখ হল, যে যশোয়ন্ত কি প্রকার ধ্যান করছে গিয়ে একবার দেখে আসি।

ঘরের সামনে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই যা দেখলাম তাতে প্রায় আঁৎকে উঠলাম। সে ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই। সেটি অনেকগুলি খাপরার চালা ঘরের একটি। মেঝেতে একটি কেরোসিনের কুপী জ্বলছে। যশোয়ন্ত দরজার দিকে পেছন ফিরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে হাত দুটো মাথার উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং দরজা

বাংলায় সুর করে জলদ গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলছে—

'দুটো ঘুঘু পাখী দেখিয়ে আঁখি জাল
ফেলেছে পদ্মার জলে,
দুটো ছাগল এসে, হেসে হেসে খাচ্ছে চুমু
বাঘের গালে।'

এই লাইন ক'টিই বারংবার অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও পবিত্রতার সঙ্গে কেটে কেটে উচ্চারণ করছে। যশোয়ন্তের চকচকে ময়াল সাপের মত উলঙ্গ মসৃণ শরীরে কেরোসিনের কুপীর আলোটা ধেই-ধেই করে নাচছে। সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

বলা বাহুল্য, ঐখানে যে-সব লোক ঐ বীভৎস প্রক্রিয়ায় ধ্যান করা দেখছিল তারা কেউই বাংলার 'র'ও জানে না। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে যে এ কোনো সাংঘাতিক কাপালিকের মন্ত্র। রামরিচবাবু ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু সেই পরিবেশে উলঙ্গ যশোয়ন্তের মুখে ঘুঘু পাখীর গান যে কেমন শোনাচ্ছিল, তা বোধহয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার লোক আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। হাসব, না কাঁদব বুঝতে না পেরে পালিয়ে এসে আবার চৌপায়াতে বসলাম।

একটু পরেই রামরিচবাবুর খাস চাকর 'একরা টিনা মিললই হো—একরা টিনা মিললই হো' বলতে বলতে মবিলের টিনটা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। ওকে জেরা করতে ও বলল একটা লোক এইমাত্র টিনটা গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় রেখে দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পালাল।

একটু পরে সাধু যশোয়ন্ত ধ্যান ভেঙ্গে জামা-কাপড় পরে বাইরে এসে দাঁড়াল। সমবেত ভক্তমন্ডলী সমস্বরে বলল, 'বাপ্পারে বাপ্পা, তুহর গোড় লাগি বাপ্পা।'

(১৫)

শীতটা বেশ জোর পড়েছে। বনের পথে পথে আবার ট্রাকের একটানা গোঙানী শুরু হয়েছে। বাঁশ বোঝাই হয়ে কাঠ বোঝাই হয়ে দিনে রাতে ট্রাক চলেছে। দিনেই বেশী চলে। রাতে বড় বেশী চলে না। ফিকে লাল সিঁদুরের মত ধুলোর আস্তরণ পড়েছে পথের দু'-পাশের গাছগুলিতে।

ভোরবেলা শিশিরে ভিজে থাকে চারদিক। রোজ বন্দুক হাতে করে প্রাতঃভ্রমণে বেরোই। আজকাল জন্তু-জানোয়ারের ভয় আগের মতন করে না, তবে বন্দুক নিতে হয় যশোয়ন্তের সাবধান বাণী শুনে। যশোয়ন্তের জগদীশ বন্ধুরা যে কখন কোন্ সুযোগ নিয়ে বসেন তা কে জানে। অন্য লোক হলে হয়ত, এই ব্যাপারটা এত বড় করে দেখতো না, কিন্তু জগদীশ নিজে একজন জঙ্গলের ঠিকাদার। বন-বিভাগের সঙ্গে কেসে হেরে গেলে তার এমনি যা শাস্তি হবে, হবেই, কিন্তু বিড়িপাতা (কেঁদপাতা), লাক্ষা এবং কাঠের যে প্রকান্ড ব্যবসা তার আছে এ অঞ্চলে তা উঠে যাবে বল্লেই চলে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যে চলে না তা সে জানে এবং সে কারণেই যেন-তেন-প্রকারেন সে চেষ্টা করছে যাতে যশোয়ন্তকে শায়েস্তা করতে পারে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আর একবারও তারা রাতের সহলে আসে নি। এলে যশোয়ন্তের কাছে অন্তত খবরটা পেঁছিত।

সকালের পথের নরম পেলব পুরু ধুলোয় নানা জন্তু-জানোয়ারের রাতের পায়ের দাগ দেখি। আজ ভোরে বেরিয়ে দেখি শম্বরের দল রাস্তা পার হয়েছে। দুটি নীল গাই পথের উপরেই বসেছিল অনেকক্ষণ, তার দাগ। একটি চিতা রাস্তা ধরে প্রায় আধ মাইল সোজা আমার বাংলো থেকে যবটুলিয়া বস্তীর দিকে হেঁটে গেছে। আমার সামনেই একদল মোরগ-মুরগী রাস্তার উপর কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল, আমাকে আসতে দেখেই বাঁ-দিকের খাদে নেমে গেছে। তাদের পায়ের দাগ ধুলোর উপর টাটকা রয়েছে। কখনো সখনো বড় জাতের সাপ রাস্তা পার হয়েছে যে তার চিহ্ন দেখি। টাবড় একদিন বলেছিল ওগুলো শঙ্খচূড়।

যবটুলিয়াতে ওরা সেদিন একটা শঙ্খচূড় সাপ মেরেছিল। বিরাট লম্বা। সবজে সবজে দেখতে, পেটের দিকটা হলদে। এ অঞ্চলের লোক এই সাপকে বড় ভয় পায়। শঙ্খচূড় নাকি মানুষকে আধ মাইল তাড়া করে গিয়ে কামড়েছে এমন ঘটনাও ওদের জানা আছে। লেজে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠে, বুকে, মুখে, মাথায় ছোবল দেয়। যাকে কামড়ায় তার চোখে দিনের আলো প্রথমে হলদে হয়ে যায়, তারপর মিলিয়ে যায়, অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসে।

সুহাগী নদীর পাড়ে যে খাড়া পাহাড়টা উঠে গেছে—যার নাম বাগুং, সেখানে নাকি শঙ্খচূড়ের আড্ডা। ওদিকে বড় কেউ যায় না। এমনকি গরমের সময় যখন জঙ্গলের আনাচে কানাচে গরীব লোকেরা শেষ রাত থেকে মহুয়া কুড়িয়ে বেড়ায় তখনো ঐ পাহাড়কে ওরা এড়িয়ে চলে। আসলে আমার মনে হয়, সাপ সব পাহাড়েই আছে। কিন্তু ঐ পাহাড়ে নাকি দুর্গাগিয়া দেওতার মত কোনো বনদেওতা আছেন, তাই সাপেরা নাকি তার ঠাঁই সব সময় ঘিরে থাকে। কেউ বন-দেওতার থানের কাছাকাছি গেলেই তাকে তাড়া করে।

বেতলার চেকনাকার পেস্কীর ঘটনা টাবড়ের কাছ থেকে শোনার পর থেকে এদের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভূততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুধিয়েছিলাম। সে ভারী মজার।

ওরা বল্লে, 'দারুহা' বলে এক রকমের ভূত না-কি অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাস্তায় কেউ সন্ধ্যের পর একলা যাচ্ছে—হঠাৎ পাহাড়ের নীচে দেখতে পেল একটি ছোটখাট দুবলা-পাতলা লোক আসছে। সে হঠাৎ সামনা-সামনি আসতেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, যে তার সঙ্গে কুস্তী লড়তে হবে। কুস্তী যে লড়ল ত ভাল, না লড়লে সেই দারুহা ভূত হঠাৎ শাল গাছের মত লম্বা হয়ে যাবে আবার পরক্ষণেই লুমুরীর মত বেঁটে হয়ে যাবে। এমনি সার্কাস করতে থাকবে। এবং যার হৃদয় সবল নয় সে ত সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মরবে এবং যার হৃদয় সবল, সেও দরদর করে ঘামতে থাকবে। এই রকম করে দারুহা মিনিট পাঁচেক ভয় দেখিয়ে চাম্‌-চিকে কি থাপু পাখীর রূপ ধরে আকাশে উড়ে যাবে।

কতরকম গল্পই যে শুনি তার আর বলার নয়। আমার কাছে এ যেন এক আশ্চর্য, নতুন অনাবিল জগৎ। যবটুলিয়া বস্তীর গমভাঙা কলের পুপু-পুপানি, বিকেলের বিষণ্ণ রোদের সান্ত্বনার আঙুল, রাত্রের বনের অতর্কিত হায়নার হাসি এ-সব মিলিয়ে আমার মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। এ ক'মাসে শহুরে মনটাতে একটা অবিশ্বাস্য অদৃশ্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে।

আমার কাজ আবার জোর কদমে শুরু হয়েছে। কোনো বাঁশের ঝাড়ে আটটার কম বাঁশ থাকলে কাটা বারণ। তবুও কখনো সখনো কাটতে হয়, কিন্তু তাহলে আলকাতরা দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হয় সে সব ঝাড়ে। সেই সব ঝাড়ের জন্যে আলাদা রেজিস্টার রাখতে হয়। যদি কোনো ঝাড়ে আটটার কম অথচ শুকনো, অপুষ্ট এবং বিকলাঙ্গ বাঁশ থাকে তাহলে তাও কাটা যায়।

প্রতি ঝাড়েরই বাইরের দিকের বাঁশ কাটতে হয়। কখনো সখনো ঝাড়ও কাটা হয়। তখন বাঁশের কাঁচ গোড়া এবং তার সঙ্গে একটি করে বাঁশ ছেড়ে যেতে হয়।

এ অঞ্চলের বাঁশ সাধারণতঃ পরিধিতে আধ ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চির মধ্যেই হয়। উচ্চতায় কুড়ি থেকে ষাট, সত্তর ফিট অবধি হয়। যেখানে বাঁশ হয় সেখানে সাগুয়ান

গাছ বড় বেশী দেখা যায় না—অন্যান্য রুক্ষমারী গাছের জঙ্গল হয় সেখানে।

মাঝে মাঝেই জঙ্গলে যাই। পথে নানা ঠিকাদারদের সঙ্গে দেখা হয়। কাঠের কাজ করছেন যাঁরা। কোনো কুপে ক্লীয়ার ফেলিং হচ্ছে, কোনো কুপে কপিসিং ফেলিং হচ্ছে। কোথাও রকমারী জঙ্গল।

রমেনবাবু মাঝে মাঝেই বলেন, কি হবে চৌধুরী সাহেব পরের খিদমদগারী করে? চলুন আমি আর আপনি মিলে একটা বিজনেস করি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। আমি ত লেখাপড়া জানি না কিন্তু বাঁশ এবং এই জঙ্গলকে ভাল করেই জানি। আমি জঙ্গল সামলাব আর আপনি সাহেব সামলাবেন। দেখবেন কোয়েলের বানের মত হুড়হুড়িয়ে টাকা আসছে।

আইডিয়াটা মন্দ না। রমেনবাবু নানা-ভাবে উপার্জন করে হাজার পনেরো টাকা জমিয়েছেনও শুনতে পাই, কিন্তু আমার যে এক পয়সাও পুঁজি নেই।

এ-রকম নানা প্ল্যানের কথা উনি বলেন। বসে বসে শুনতে ভাল লাগে, কল্পনা করতেও ভাল লাগে, আমার ব্যবসা, আমার বাড়ী, আমার গাড়ী; ব্যস ঐ পর্যন্তই। এ জীবনে কল্পনা করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। মোটামুটি খেয়ে-পরে দিন কেটে গেলে এই কল্পনার জগতেই আমি সুখী—আর এমন রুমান্ডির মত জায়গায় যদি বাকি জীবনটা কল্পনায় বুঁদ হয়ে কাটাতে পারি তবে ত কথাই নেই।

দিনগুলি রাতগুলি কেটে যায়, কিন্তু মাঝে মাঝেই বড় একা একা লাগে। কত একা একা যে কি বলব। নিজের বুকের ভিতরে একটি অতল গহ্বর অনুভব করি। শীতের সন্ধ্যায় সূর্য যখন হেলে পড়ে, হরতেলের ঝাঁক যখন ফল খেয়ে বটগাছের আশ্রয় ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়, সুহাগী বস্তীর সব কটি গরু মোষ যখন গ্রামে ফিরে আসে, কুপ কাটা কুলিরা যখন দিন শেষে টাঙ্গী কাঁধে ফিরে এসে সঙ্গিনীর সঙ্গে পা ছড়িয়ে বাজরার রুটি খেতে বসে, তখন নিজের মধ্যে একটা তীব্র একাকীত্বের বেদনা অনুভব করি।

শীতের সন্ধ্যার একটি আশ্চর্য হৃদয়-স্পর্শী রূপ আছে। হলুদ আলোয় ক্রন্দনরতা শীতের বন থেকে, ঘাস থেকে, ফুল থেকে একটি করুণ শৈত্য উঠে আমার বুকে এসে বাসা বাঁধে। বুকের মধ্যে একটা অনামা তারের বাজনার বিচ্ছিন্ন আলাপ গুমরে গুমরে ওঠে।

কৃষ্ণচূড়ার নীচে, রামধানীয়া একটা চালাঘর বানিয়েছে চারটে শালের খুঁটি পুঁতে এবং উপরে বাঁশের উপর শালপাতা বিছিয়ে। রাত হয়ে গেলে তার নীচে বসি। রোজ সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই সেখানে আগুন করা হয়। আগুনের পাশে বসে বই পড়ি; নতুবা ওরা যা গল্প করে শুনি, তখন ঘরের মধ্যে বড় একটা থাকি না। আগুনের পাশে বসে বসে শরীর গরম করে নিয়ে, গরম গরম যা রান্না হয় খেয়ে শুয়ে পড়ি লেপের তলায়।

রামদেওবাবুদের পাঞ্জাবী ট্রাক ড্রাইভার গুরবচন সিং মাঝে মাঝে রাতে আমার বাংলো পেরুবার সময় ট্রাক থামিয়ে আগুন পুইয়ে যায়—আগুনগুলোকে টেনেটুনে ঠিক করে নেয়—কোনো কোনো দিন ওকে চা কিম্বা গরম কফি খাওয়াই—বেচারা কুটকু থেকে ডাল্টনগঞ্জে যায় প্রতি রাতে। বেচারার ট্রাকের জানালার কাঁচ মোটে ওঠে না—হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। পথে কোন দিন কি জানোয়ার দেখল, তার গল্প করে গুরবচন। ও আজকাল আর পাঞ্জাবী নেই, বিহারী হয়ে গেছে। যশোয়ন্তের মত। বহু বছর থেকে এখানে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফৌজে ছিল—বার্মায় যুদ্ধ করেছে। কোনো কোনোদিন তার গল্প করে। গুরবচন সিং এক জাঁদরেল ডাকসাইটে ব্রিগেডিয়ারের গল্প করে—তার মত সিপাহী কেউ নাকি দেখে নি। শত্রুর স্পাই এক সুন্দরী মেয়েকে ভালবেসে যে নিজে মরেছিল।

আগুনে গুরবচন সিং-এর চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করত। ও গল্প করতে করতে আমায় শুধোত, "বাহাদুর আদমী কা কমজোরী কিস সে হ্যায় জানতে হো বাবুজী?" আমি শুধোতাম, কিস সে? গুরবচন সিং কনভিকশানের সঙ্গে বলতো, "আওরৎ সে।"

নানান গল্প হতো। রামধানীয়া ওখানেই বসে রামায়ণ পড়ত গুন-গুনিয়ে—সেই শীতার্ত রাতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তারা-ভরা আকাশের নীচে বেশ লাগত সেই গুন-গুনানি।

ইতিমধ্যে রাংকা থেকে ঘুরে এসে শিরিণবুরুতে গেছিলাম এক শনিবার বিকেলে—রাতটা থেকে আবার রবিবার রাতে ফিরে এসেছিলাম। মারিয়ানা সত্যি সত্যিই খুশী হয়েছিল। মারিয়ানার স্বভাবে এমন একটা সহজীয়া স্বচ্ছতোয়া সুর আছে যা সহজে যে কোনো লোককে আপন করে নিতে পারে। অনর্গল হাসে—হাসি লেগেই আছে তার মুখে—চমৎকার কথা বলে—প্রতিটি পরিচিত, স্বল্প-পরিচিত এমন কি সদ্য-পরিচিত লোকের প্রতিও সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহার করে। ফলে অনেক বোকা লোক সেই ব্যবহারকে অন্য কিছু ভেবে মনে মনে দুঃখ পেয়ে মরতে পারে। ভারী ইচ্ছে হয় মারিয়ানার বন্ধু সুগতকে দেখতে।

বড় আদর যত্ন করেছিল মারিয়ানা। আমরা কোথাওই বেরুইনি—কোনো কাজ করি নি—যে কঘন্টা ছিলাম—কেবল রাতে শোবার সময় ছাড়া; মুখোমুখি বসে খালি গল্প করেছি। আমাদের যে এত কথা বলার ও শোনার ছিল, ওখানে যাবার আগে তা বুঝতে পারিনি।

ও আমার কোনো নিত্যপ্রয়োজনে আসে নি। আসবেও না কোনোদিন; তবু যে নীলকন্ঠ পাখিটি রোজ সন্ধ্যার আগে এসে রাধাচূড়োর ডালে বসে রুমান্ডিতে দোল খায়—আর আমি বসে বসে তাকে দেখি, কেন জানি তারই মত মনে হয় মারিয়ানাকে।

জাগতিক কারণে সেই পাখিটিকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই—সে এলে, এসে বসলে, সুন্দর ঠোঁটে নিক্বণ তুলে রেশমী ডানা পরিষ্কার করলে আমার ভালো লাগে—সে উড়ে গেলেই—রুমান্ডিতে রাত নেমে আসে।

টোড়ী-ডাল্টনগঞ্জের রাস্তায় জগলদহ কলিয়ারী বলে একটি কলিয়ারী আছে। সেই কলিয়ারীর কাছে থাকতেন মিহিরবাবু, যিনি পুজোর সময় টোড়ীতে ছিলেন এবং আমাদের অষ্টমীর দিন সাদর আপ্যায়ন করেছিলেন।

গেলেই ভারী আদর যত্ন করেন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। খাওয়ান - দাওয়ান। গল্প গুজব করেন। বলেন, সব ভাল। কেবল এই সঙ্গীর অভাব ছাড়া। ছেলে-মেয়ে দুটো ত একরা-কেকরা হিন্দী শিখেছে—আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে ঐ ভাষায় কথা বলতে আসে। ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করতে হয়।

ওখানে গেলেই ওঁরা ধরে পড়েন, তাস খেলুন। কবে কোন্ ছোটবেলায় একবার পুজোমন্ডপে বসে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রং-মিলানো শিখেছিলাম—সেও ভুলে গেছি।

মিহিরবাবুর ওখান থেকে চা খেয়ে রুমান্ডিতে ফিরে আসছি, এমন সময় দেখি সুহাগী বস্তীর কয়েকজন মুখ-চেনা লোক একটি ডুলি কাঁধে হনহনিয়ে পাক-দন্ডী রাস্তা বেয়ে লাতেহারের দিকে চলেছে। জীপ থামিয়ে কি ব্যাপার শুধোতেই শুনি, শেষ বিকেলে গরু চরাচ্ছিল একটি ছেলে—সুহাগী নদীর পাশের সবুজ ঢালে। থোকা থোকা জংলী কুল পেকে ছিল মাঠময়। ছেলেটির এক হাতে পাচন এক হাতে বাঁশী। পাচন আর লাঠি এক হাতে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে কুল ঝোপ থেকে কুল পেড়ে খাচ্ছিল আর গরু-গুলো তার চার-পাশে গলার কাঠের ঘন্টা দুলিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় ঝোপের অপর প্রান্ত থেকে, বলা নেই, কওয়া নেই, একটা বিরাট ভাল্লুক বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করে এবং বুক থেকে কোমর অবধি নখ দিয়ে সমস্ত মাংস নাড়ি-ভুঁড়ি শুদ্ধ চেঁচে ফেলার মত করে টেনে নামায়। জংলী পাতার রস লাগিয়ে কোনো-

ক্রমে ওরা নিয়ে চলেছে ওকে লাতেহারে। ছেলেটির কোনো জ্ঞান ছিল না তখন।

ছেলেটির বাবা দাদা এবং আরো একজন মুরুব্বি গোছের লোককে জীপে তুলে নিলাম। ওরা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসল। জুলিতে ছেলেটির কমপক্ষে চার ঘণ্টা লাগত লাতেহার পৌঁছতে। বাঁচবার আশা যদিও কিছু থেকে থাকে ত' তাও থাকবে না। বাকী লোকদের বললাম বস্তীতে ফিরে যেতে। তারপর যথাসম্ভব জোরে অথচ ওর গায়ে ঝাকুনি না লাগে এমনি করে জীপ চালিয়ে লাতেহারে পৌঁছলাম।

সেখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুও বাঙ্গালী—সৌরভ বসু আলাপ হল। অল্প বয়েসী ভদ্রলোক। ছেলেটির জন্যে খুব যত্ন করে যা যা করনীয় করলেন এবং বল্লেন, আজ রাত না কাটলে বলা যাচ্ছে না—তবে আমি যথাসাধ্য করছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

লাতেহার থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় আটটা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বল্লেন, কাল সকালে ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনদেরই পাঠিয়ে দিতে। ছেলেটির বাবা ও দাদা লাতেহারেই রয়ে গেল। আমি দশটা টাকা দিয়ে এলাম ওদের খাওয়া-দাওয়া খরচ বাবদ। ভারী কৃতজ্ঞ হল ওরা। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মনে হয় আমাদের মত আজন্ম শহুরে-পালিত লোকেরা কৃতজ্ঞতা কি তা ভুলে গেছি। অন্য লোক যদি কেউ কিছু আমাদের জন্যে করেও, তাকে আমরা পাবার অধিকারে পাচ্ছি—করবে না ত কি? এই মনোভাবে গ্রহণ করি। কৃতজ্ঞতার মত মহৎ অনুভূতি আমাদের অভিধান থেকে বোধহয় উধাও হয়ে গেছে।

জোরে জীপ চালিয়ে ফিরছিলাম। সঙ্গে সুহাগী গ্রামের অবশিষ্ট লোকটি। সে পেছনে বসে আছে। রুমান্ডির কাছা-কাছি চলে এসেছি—এমন সময় সুহাগী নদীর কিছু আগে পথটা যেখানে একটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে সেখানে গিয়ে জীপটা পৌঁছতেই জীপের আলোর পথের পাশে একজোড়া বড় বড় সবুজ চোখ জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিভে গেল—কারণ জীপের মুখটা আবার সোজা হয়ে গেল রাস্তা বরাবর।

পেছনের লোকটি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, মারিয়ে হুজোর ইয়ে ভালুকো। বহুত্ বড়া জান। ওর এ্যাহি জাগেমেই ত উ লেড়কাকা পাক্ড়াহিস্ থা—সায়েদ এহি জানভি হোমে শেকতা।

ছেলেটাকে আমি দেখেছিলাম। একটি সুন্দর ওঁরাও কিশোর। চোখ দুটো বোজা। সারা শরীর রক্তে ভেজা।

জীপটা থামালাম। বললাম, চলো দেখে উতরো। সামনের সীটে আমার পেছনে বন্দুকটাকে অন্ধ্যাজিম্ব করে নুইয়ে রেখেছিলাম। পকেট থেকে দুটি বুলেট বের করে পুরলাম। লোকটি বলল, জীপোয়া কো স্টার্ট মত বন্ধ কিজিয়ে হুজোর। কিন্তু জীপের স্টার্ট বন্ধ করেই দিলাম। তারপর টর্চটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, আও, বাত্তি দেখলাও গে ঠিকসে—ডান কাঁধের উপর দিয়ে কি করে আলো দেবে তা ওকে দেখালাম।

এত পরিভাষা কথা সত্ত্বেও, ভাল্লুকটা পালাল না। রাস্তা ছেড়ে আমরা জঙ্গলে নেমে গেলাম। জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকাই। এখানে সেখানে কুল ঝোপ, মাঝে মাঝে পিটিসের ঝোপ। তাছাড়া বড় বড় সেগুন গাছ।

একটু এগিয়ে আন্দাজ করে আলো ফেলতেই দেখি ভাল্লুকটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে একটু বাঁ-দিকে সরে গিয়েছে মাত্র। চোখ দুটো গাঢ় সবুজ—গায়ের কুচকুচে কালো লোম আলোয় একেবারে জেল্লা দিচ্ছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ গজ হবে।

কি করব ভাবতে না ভাবতেই অদ্ভুত ভঙ্গী করে একটি কালো অতিকায় ফুটবলের মত ভাল্লুকটি আমাদের দিকে বিষম জোরে দৌড়ে এল। সঙ্গীটি যদি টর্চ নিয়ে পালাত তবে অন্ধকারে আমার অবস্থা ওঁরাও ছেলেটির মতই হত। কিন্তু বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে এত তাড়াতাড়ি মরি। সঙ্গী নির্ভয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প হাতে আলো ধরে রইল আক্রমণকারী ভাল্লুকের উপরে। আমি লক্ষ্য স্থির করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে বুক লক্ষ্য করে গুলি করলাম।

কি হল বুঝলাম না, কেবল একটি বন-কাঁপানো উঁক্ উঁক্ আওয়াজ করতে করতে ভাল্লুকটা আরো বেগে আমাদের দিকে এগিয়ে এল; আমরা দুজনে প্রায় একসঙ্গে ডান-দিকে একটু ফাঁকা জায়গায় দৌড়ে গেলাম; ততক্ষণে আমাদের স্থান পরিবর্তন করতে দেখে ভাল্লুকটি আরো চটে গিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াবার আগে একমাত্র অবশিষ্ট গুলিটি মহার্ঘ্য নিবেদনের মত ভাল্লুকের বুক লক্ষ্য করে ঠুকে দিলাম। ভাল্লুকটি ঐখানেই পড়ে গেল। এবং অবিকল মানুষের চিৎকার করতে লাগল। সে চিৎকার শোনা যায় না।

একটা জিনিস অনুভব করে ভাল লাগল যে আমি একটুও ভয় পেলাম না। অবশ্য এর জন্য আমার নিজের কোনো বাহাদুরী নেই—সঙ্গী লোকটি ভয় পায় নি বলেই আমি ভয় পাই নি। পরিবেশে, ভীরু মানুষও সাহসী হয়ে ওঠে।

কাছে গিয়ে দেখি দুটো গুলিই লেগেছে। প্রথমটা বুকে লাগে নি, লেগেছে মাথার উপরের ঝাঁকরা চুলে; গুলিটা চুলে বিলিকেটে সোজাসুজি চলে গেছে। পরের গুলিটা একেবারে কানের নীচে ঘাড়ে লেগেছে। সেটিই মোক্ষম মার হয়েছে। পরে বন্দোবস্তের কাছে শুনেছিলাম, যে বাঘ বা ভাল্লুককে কখনো মাথায় লক্ষ্য করে মারতে নেই। ওদের খুলির আকার নাকি এমন এবং খুলি নাকি এমনই শক্ত, যে অনেক সময় তারা যেমন ফুটবলে হেড দেয় তেমনি হেড দিয়ে হটিয়ে দেয়। অর্থাৎ খুলিতে লাগলে গুলি পিছলে বেরিয়ে যায়।

দুজনে মিলে এতবড় ভাল্লুককে জীপে তোলা যায় না। তাই আমরা সুহাগীতেই গেলাম। ওরা সবাই খুব খুশী। কেউ কেউ বলতে লাগল যে এটাই সেই ভাল্লুক যেটা ছেলেটাকে আক্রমণ করেছিল।

কয়ের বানাতে যে মাল্লারা এসেছে গয়া জেলা থেকে, তারা একটি ভাল্লুকীর দুটি বাচ্চা ধরেছে দুদিন হল; কেউ কেউ বলল, এইটিই সেই ভাল্লুকী হতে পারে, বাচ্চা ধরতে, ক্ষেপে উঠে এমন করে বেড়াচ্ছে।

ওরা যখন সকলে মিলে গিয়ে ভাল্লুকটাকে নিয়ে এল তখন কিন্তু সত্যিই দেখা গেল যে সেটা একটা ভাল্লুকীই—ভাল্লুক নয় এবং এইটিই যে সন্তানহারা ভাল্লুকী তাও গাঁয়ের লোকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বলে দিল। মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম। ছেলেটির আক্রমণকারীর সঙ্গে যদি এই ভাল্লুকের কোনো যোগ থেকে থাকে—এই ভেবে।

আমার এই আনন্দ আর একটু বেশী স্থায়ী হলে ভাল হত। কিন্তু পরদিন বেলা আটটা-ন'টা নাগাদ ছেলেটির দাদা এসে খবর দিল সুহাগীতে, যে ছেলেটি মারা গেছে শেষ রাতে। জ্ঞানই নাকি আর ফেরে নি। ডাক্তারবাবু একটি ছোট চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন ওর হাতে। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। তবে প্রথম থেকেই অজ্ঞান হয়েছিল—কাজেই কষ্ট নতুন করে কিছু পায় নি।'

কয়ের বানাতে যে মাল্লারা এসেছিল এবং ভাল্লুকীর বাচ্চা দুটি ধরেছিল তাদের দেখা করে বলব ভাবলাম যে, তাদের অপরিণামদর্শিতার জন্যই এমন কাণ্ড হল। ছেলেটির মুখটা বার বার মনে পড়ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

একদিন কাজকর্ম সেরে মুত্ত ওঁরাও ছেলেটির দাদাকে নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে বানিয়ে মাল্লারা আছে। প্রায় মাইল তিনেক পায়ে হাঁটা পথ।

সেখানে গিয়ে ওদের সেই দুর্ঘটনার কথা বলতেই ওরা এত দুঃখ প্রকাশ করল ও অনুশোচনা জানাল যে আর কিছু বলতে পারলাম না। মনের রাগ মনেই রইল। এমন কি ছেলেটির দাদাও বলতে লাগল যে তোমরা আর কি করবে ভাই? ওর কপালে ছিল তাই অমনভাবে মরল সবই কপালের লিখন।

(ক্রমশ)

মনের কথা

(৩)

ঘটক-পত্নীর অনুরোধে ঘটক-বন্ধুর সঙ্গে রেসকোর্সে যেতে হল।

পর-পর দুটি রেসের দিনে বন্ধুটি আমার নির্দেশে একটা নাগাদ ঘটকের অফিসে যায়। প্রথমদিন ঘটক বন্ধুকে বসিয়ে রেখে কি একটা অজুহাতে সরে পড়ে, দ্বিতীয় দিন গিয়ে ওর দেখা মেলে না। সেদিন বন্ধুটি সরাসরি রেসের মাঠে চলে আসে এবং ঘটককে দেখতে পায়। ঘটকের মাথায় গান্ধী-টুপি, চোখে কালো চশমা। নিবিষ্ট মনে প্যাডকে দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখছিল। তার অদ্ভুত ব্যবহারে ঘটক-বন্ধু অপমানিত বোধ করে। বন্ধুকে না চেনার ভান করে ঘটক। নাম ধরে ডাকতে প্রথমে সাড়া দিল না, তারপর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিতে বিরক্ত হয়ে তাকাল। বন্ধু হেসে বলে যে ঐ টুপি-চশমার আড়ালে তার আত্মগোপন চেষ্টা বিফল হয়েছে। ঘটক মুখ ফিরিয়ে নিজের রেস-বই-এর পাতায় মনোনিবেশ করে। বন্ধু অবাক। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আমাকে ঘটনাটি জানালে আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। ঘটক-পত্নী আরো বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করেন এবং ব্যাপারটা সত্যিই ঘোরালো মনে হয়। বন্ধুটিকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর একবার আমার সঙ্গে রেসের মাঠে যেতে রাজি করানো হল। স্ত্রীর জেরার জবাবে এই দুই সন্ধ্যাতেও ঘটক নিশ্চুপ। কোনো কিছু বলতে পারেনি বা বলতে চায়নি।

দূরে থেকে ঘটকের গতিবিধি নজরে রাখলাম। দু'একবার ওর সঙ্গে মুখোমুখিও হলাম। পরিচিতির কোনো রেখা ওর মুখে ফুটতে দেখলাম না। চোখে কালো চশমা, ভাবান্তর দেখা গেল না। প্যাডক থেকে বাজি ধরবার জায়গায়, সেখান থেকে স্ট্যান্ডে। ওর একটু দূরে বসে দুটো বাজির দৌড় দেখলাম। আশে-পাশে সব লোক দৌড় শেষ হবার মুখে যখন উত্তেজনায় অধীর হয়ে ফেটে পড়ছে, হাত উঁচু করে নিজের নিজের বাজি-ধরা ঘোড়াকে গলার জোরে জিতিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করছে, ঘটক তখন নীরব। ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল। ও যেন শুধুই দর্শক, হার-জিতের সংগে ওর যেন কোনো সম্পর্ক নেই। দার্শনিকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে কালো চশমার আড়াল থেকে রেস দেখছে। ইংরিজিতে যাকে বলে স্পেকটেটর ফিলজফার; কোনো কিছুতেই অংশ গ্রহণ করছে না। কিন্তু দুবারই লক্ষ্য করলাম, দৌড়ের শেষে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলছে। বুঝলাম ওটা বাজি ধরার কার্ড। বাজি ধরেছিল, হেরে গেছে। তৃতীয় বাজির সময় ওর পাশে বসে সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকালাম। না, কোনো পরিবর্তন নেই। আমাকেও চিনতে পারেনি। ওর বন্ধু অন্য পাশে বসেছিল। তাকে যেন দেখেও দেখল না। ও'র দেশলাই আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, পকেটে হাত গলিয়ে দেশলাইয়ের বাক্স বের করে আমার হাতে তুলে দিল। পরিচিতির একটি রেখাও ওর মুখে ফুটল না। 'ঘটক' 'ঘটক' বলে দুবার ডাকলাম। ও ফিরে তাকালো না, সাড়াও দিল না। তখন ঘোড়াগুলো প্যাডক থেকে বেরিয়ে 'স্টার্টিংস্টল' (যেখান থেকে দৌড় সুরু হবে)-এর দিকে চলেছে। ওর চোখ সেই দিকে। 'ঘটক' নামের কোনো লোককে ও চেনে বলেই মনে হল না। দুজন অতি-পরিচিতের সঙ্গে এভাবে অভিনয় করে যাওয়া কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই প্রথম মনে হল ঘটক হয়তো স্বপ্ন-চারিতায় আবিষ্ট হয়ে রেসের মাঠে এসেছে। রেসকোর্সের বাইরের সব স্মৃতি এখন লোপ পেয়েছে। আমাদের ও সত্যিই চিনতে পারছে না।

গত সংখ্যায় যে কাহিনীগুলো বিবৃত করেছি সেগুলো নিশ্চয়ই পাঠকদের মনে আছে। তার মধ্যে স্টক-ব্রোকারটির সঙ্গে, (যে রাতে নিজের অজ্ঞান্তে কবিতা লিখত আর দিনের বেলায় স্টক-ব্রোকারি করত) ঘটকের অনেকখানি মিল আছে। ঘটক মনের জটিলতা এবং গূঢ়েষা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা সুরু করার আগে ঘটকের কাহিনীটি শেষ করা যাক।

সেদিন আমাদের কয়েক মিনিটের অসতর্কতার ফলে ঘটকের আর সাক্ষাৎ মিলল না। চায়ের স্টলে দাঁড়িয়ে গরম চা কোনোমতে গলায় ঢেলে চতুর্থ বাজির সময় নির্দিষ্ট স্থানে আর ঘটককে দেখলাম না। সাধারণত রোজই একই জায়গায় বসে রেস দেখে রেসের যাত্রীরা। অতি-বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও জুয়া খেলার সময় সংস্কার মেনে চলে। এমনিতেই বা কম কি? সকালবেলায় উঠে ব্যক্তিবিশেষের মুখ দেখলে বা স্থান-বিশেষের নাম শুনলে দিনটি ভাল যাবে না, —এ বিশ্বাস অনেকেই পোষণ করে। তারা সকলেই জুয়াড়ী নয়। যতবার পরীক্ষার আগে কালো বেড়ালটাকে দেখে গেছি, ততবারই অংকতে কম নম্বর পেয়েছি। একাধিক লোকের মুখে এই ধরনের উক্তি শুনতে পাবেন। কতবার কালো-বেড়াল না দেখেও কম নম্বর পেয়েছে, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে এরা সেটাকে হিসেবের মধ্যেই আনেনি। কেননা, 'দৈব', 'বরাত' ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ স্বভাবতই অবুঝ। এক বিশেষ জায়গায় বসে একবার একটা বা জ জিতেছে, সেই থেকে সেই জায়গাটার উপর বাধাকারী আকর্ষণ জন্মে গেছে। প্রথমবারে ঘটকের চিকিৎসার সময় রেস-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলাম। সেকথা সময়মত বলব। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ঘটককে না দেখে বিস্মিত বোধ করলাম। তবে কি ও আমাদের চিনতে পেরেছে? যতটা সম্ভব খোঁজাখুজি করেও দেখা মিলল না। হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

এর কয়েকদিনের মধ্যে ঘটক-পত্নী ঘটককে আমার চেম্বারে নিয়ে এলেন। ওর ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়ে নিজে থেকে বলল,—খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি ডাক্তারবাবু। আপনার কাছে হয়ত আবার চিকিৎসা করাতে হবে।

—কেন, কি ব্যাপার?

—কিছু মনে থাকছে না। বিশেষ করে টাকা-পয়সার হিসাব মেলাতে পারছি না। স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে রোজ খিটিমিটি বাধছে।

—খুলে বলুন, দেখি কিছু বুঝতে পারি কিনা?

—আমার মনে হয় স্ত্রী আমার পকেট থেকে টাকা পয়সা সরিয়ে রাখছে, অথচ আমার কাছে সেটা গোপন করছে। না হলে, এ মাসের মাইনের অতগুলো টাকা গেল কোথায়?

—হারিয়ে যেতে পারে, পিক-পকেট হতে পারে, কত কি হতে পারে? টাকার তো ডানাও থাকে, উড়ে যেতেই বা কতক্ষণ?

আমার রসিকতায় সাড়া দিলেন ঘটক। তার মুখে হাসি ফুটল। পরক্ষণেই চিন্তিত।

—সত্যি বলছি, খুবই ঘাবড়ে গেছি। এক-আধটা দিন কোথায় থাকি, কিভাবে কাটাই, কিছুতেই মনে করতে পারি না।

এরকম স্মৃতি-বিভ্রম ঘটতে থাকলে মহা বিপদ। এর কোনো কিনারা করতে পারেন যদি বড় উপকার হয়।

ঘটকের সম্মতিক্রমে তাকে সম্মোহিত করলাম। পুরনো রোগী সাধারণত অতি সহজেই হিপনটিক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কিন্তু অভিভাবনের ফলে রেসকোর্সের স্মৃতি তিনি মনে আনতে পারলেন না। অভিভাবন প্রসঙ্গে বললাম,

—গত শনিবারের বিকেল আপনি কোথায় কাটিয়েছেন, কি করেছেন, সেইসব এখুনি আপনার মনে আসবে। শনিবার একটার পর অফিস থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? মনে করুন। ঠিক মনে আসবে। বলুন—

কোনো উত্তর নেই। হাত তুলে চোখ খুলে দেখলাম, সম্মোহিত যে হয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিযুক্তি (dissociation) এত গভীর যে অভিভাবন কার্যকরী হচ্ছে না।

আরো দুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সম্মোহন থেকে জাগিয়ে দিলাম। তার আগে অবশ্য অভিভাবনের মাধ্যমে বললাম, —আগামী শনিবার আপনি একটার পর সোজা বাড়ী চলে আসবেন। ইতিমধ্যে আপনি গত শনিবারের ঘটনা মনে করতে পারবেন। মনে করার পরই যেখানেই থাকুন আমাকে ফোন করে জানাবেন।

কিছুক্ষণের জন্য কাহিনী বিস্তার ছেড়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই। এইবার সম্মোহন, অভিভাবন, স্বপ্নচারিতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে কিছুসংখ্যক পাঠকদের অন্তত রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটবে। সব ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হবে কিম্বা মনের কথা দুর্বোধ্য জারগণে পর্যবসিত হবে।

সম্মোহন, সংকোচন—দুটো কথাই আমরা ব্যবহার করব। 'হিপনটিজম' বা 'হিপনসিস্' কথা ইংরিজি বটে, কিন্তু বেশি চালু। পুরনো নাম মেস্‌মেরিজম।—ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রান্‌জ্‌ মেসমারের নাম আপনারা সবাই জানেন। তিনিই আধুনিক চিকিৎসায় এই পদ্ধতি প্রথম আমদানী করেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে সব দেশেই এই বিদ্যার প্রচার ও প্রয়োগ ছিল। সাধু-সন্তরা এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন। অশ্রদ্ধা না জানিয়েও বলা চলে, অনেক পীঠস্থান ও সাধু-মহারাজদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি সম্মোহনপ্রভাবেই গড়ে উঠত। সেকালের সামান (Shaman) থেকে একালের পাদ্রী-পুরুতের অনেকেই এ-বিদ্যায় পারদর্শী। ম্যাজিশিয়ানরা নাকি হাত-সাফাই-এর সংগে হিপনটিজমেও অভ্যস্ত। অনেক রহস্য-কাহিনী হিপনটিজমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তার বোধহয় অপ্রাসংগিক হবে না।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে (১৭৮৪) মেসমার প্যারির বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে তাঁর জৈব-চুম্বকতত্ত্ব পেশ করেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর ফলে তাঁকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে রোগীর গায়ে চুম্বক বসিয়ে, তারপর চুম্বকদণ্ড ছুঁইয়ে তিনি রোগীদের ঘুম-পাড়াতেন ও ব্যাধি দূর করতেন। তিনি মনে করেছিলেন যাঁরা গ্রহ-উপগ্রহের চৌম্বক-শক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে—বিশেষ আত্মিক-বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে তারাই জৈব-চুম্বকশক্তির প্রভাবে রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা লাভ করে। তাঁর এই জৈব-চুম্বকতত্ত্ব বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে গ্রাহ্য হয়নি। মেসমারের তত্ত্ব টিঁকলো না, কিন্তু মেস-মেরিজম্-এর রহস্য ও প্রভাব বেড়েই চলল।

এর অনেকদিন পরে ১৮৪৩ সালে স্কটল্যাণ্ডের ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড্ মেস্-মেরিজমকে আংশিকভাবে রহস্য-যবনিকার বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—মেস-মার-প্রভাবিত ঘুমের কারণ চোখের স্নায়ু-তন্তুর ক্লান্তি। একদৃষ্টে উজ্জ্বল কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসে এবং নিদ্রার সঞ্চার হয়। তিনি এই অবস্থার নতুন নামকরণ করলেন—হিপনসিস্। 'হিপনস' কথাটির মানেই ঘুম। ঘুমের ব্যাখ্যা দিলেন কিন্তু সংবেশক ও সংবেশিতের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আর এই সম্পর্ক নিয়েই ত যত কিছু রহস্যময় এবং অলৌকিক কাহিনীর প্রচার। সংবেশক, (যে হিপনটিজম করছে—চিকিৎসক) সংবেশিতকে (যাকে হিপনটিজম করা হয়েছে) কিভাবে প্রভাবিত করে? সংবেশিত সংবেশকের নির্দেশমত চলা-ফেরা কাজকর্ম করে কেন? সংবেশিতের দেহে নানারকমের পরিবর্তন ঘটে কেন? সংবেশকের অভিভাবনের ফলে তার বেদনা-বোধ চলে যায়, আরও অনেক ধরনের রোগ উপসর্গের উপশম ঘটে। এর কারণ কি? সংবেশক হাসালে সে হাসে, কাঁদালে কাঁদে; ভুলতে বললে ভোলে, মনে করতে বললে মনে করে। দুজনের মধ্যে এক নতুন ধরণের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মনে হয়। একে বলা হল rapport। ঘুম থেকে জেগে উঠবার পর সংবেশিত এসব কিছু ভুলে যায়। কি করে এসব ঘটে? র‍্যাপোরের ব্যাখ্যা বা সংবেশিতের রোগ উপসর্গ উপশমের কোনো হদিশ গত শতকে পাওয়া গেল না। ন্যান্সী স্কুলের, প্যারী স্কুলের প্রবক্তারা অনেক কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটালেন সম্মোহন প্রভাবে, সম্মোহনের জনপ্রিয়তা বাড়লো, মর্যাদাও কিন্তু, রহস্য কমলো না। বিজ্ঞান-গ্রাহ্য শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা ছাড়া রহস্যময়তা দূর হতে পারে না। রুশ-বিজ্ঞানী পাভলভ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এই শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে সম্মোহনবিদ্যাকে উচাটন-বশীকরণ জাদুকরণের সামিল হওয়া থেকে রক্ষা করলেন, 'অলৌকিকত্ব' খণ্ডন করলেন। মনের চিকিৎসায় আদিকাল থেকে সম্মোহন-অভিভাবন ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এখন আবার এর প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ বিস্তার উচিত মনে করছি। ঘটকের স্বপ্নচারিতার কারণ বিশ্লেষণের পক্ষেও এ আলোচনা অপরিহার্য।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর কৌশল অনেকেই জানেন। একটানা একঘেয়ে মৃদু-কন্ঠে গাওয়া ঘুমপাড়ানি গান সব দেশের শিশুদের ঘুম আনবার চিরন্তন পদ্ধতি। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো'—র সুর ও ছন্দ সব ভাষাতে একইরকম। বৈচিত্র্যহীন একটানা কন্ঠের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পেছনের সারির অনেক শ্রোতাই ঝিমুতে থাকে। সংবেশকের কন্ঠের একই লাইনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি রোগীর সংবেশন-নিদ্রা নিয়ে আসে। শিশুকে ঘুমপাড়ানো আর রোগীকে ঘুম পাড়ানোর প্রণালীর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। তাছাড়া চিকিৎক-সংবেশক বারবার রোগীকে অভ্যস্ত ঘুমের পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘুম আনতে সাহায্য করে। অভ্যস্ত পরিবেশে সহজেই ঘুম আসে, নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে চায় না।

স্বাভাবিক ঘুম আর হিপনটিক ঘুমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই ঘুম পুরোপুরি এক ধরনের নয়। স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা.—নিদ্রাতরঙ্গ, বিনা বাধায় সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিপনটিক ঘুমে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ, যে অংশ সংবেশকের কন্ঠস্বর ও নির্দেশে উদ্দীপিত হচ্ছে, জেগে থাকে। এই অংশ সম্মোহিত রোগীর বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগের একমাত্র পথ। পথরক্ষী মাত্র একজন—সংবেশক-

...ক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারুর ... কোনটির উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ... হিপনটিক ঘুম এক বিশেষ ধরনের ... নির্দিষ্ট কতকগুলো শর্তের উপর ...শীল। সর্তাধীন প্রতিক্রিয়ার এক ... দৃষ্টান্ত। পাভলভ আবিষ্কৃত ...ন প্রতিক্রিয়া কৌশলমতে বিশ্লেষণ। যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা এই ঘুমের ... সহজেই বুঝতে পারবেন।

... হল হিপনটিক ঘুম ও ...র শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা। ...কিৎসকের নির্দেশ যথাযথ প্রতি... করার বিরোধী কোনো ইচ্ছা বা ...গণীর থাকে না। অভিভাবনের ফলে ...চলে যায়, ঠাণ্ডা কোনো জিনিষ ... দেহে ছুঁইয়ে ফোস্কা পড়ানো যায় ... অতি-পরিচিত তথ্যের শারীরবৃত্তিক ... আজ আমরা জানি। সম্মোহিত ... মস্তিষ্কের স্বাভাবিক স্থিতি-...তা কমে যায়, কেননা, একটি জায়গা ...ার সব জায়গাই এ সময় নিস্তেজিত। ...বস্থায় মস্তিষ্কের উপর মৃদু ...ক জোরালো প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, ... পরীক্ষিত সত্য। মৃদু উদ্দীপক ...বিত নির্দেশ-বাক্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট ... উত্তেজিত করার সংগে সংগে কাছা-...অংশগুলো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। এই ...না-আরোহ (induced inhibition) ...কের অন্য একটি ধর্ম এবং পরীক্ষিত ... চিকিৎসকের অভিভাবিত নির্দেশ ...ঃ তখন মস্তিষ্কের একমাত্র পরি-...একচ্ছত্র সম্রাট। অন্য অংশ নিদ্রাচ্ছন্ন, ...নিষ্ক্রিয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা এখন এই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেদনাবাহী স্নায়ুপ্রবাহ পরিচালকের ইংগিতে থেমে পড়তে বাধ্য। একেবারেই গরম নয় এমন কোনো জিনিস গায়ে ছুঁইয়ে চিকিৎসক উষ্ণতার নির্দেশ দিলে ফোস্কাও পড়বে। ফোস্কাপড়ার মত জটিল স্নায়ুপ্রক্রিয়াও এখন পরিচালকের অধীনে।

অনেকে আবার নিজেকে সম্মোহিত করতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে স্ব-অভিভাবনও কার্যকরী হয়। ফরাসী দেশের এক মহাপুরুষের, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত, হাত-পা দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা গেছে। আমাদের দেশেও এক মহাপুরুষের পিঠে অন্য একজনের পৃষ্ঠদেশের আঘাতচিহ্ন অঙ্কিত হতে শোনা গেছে। এ-সবই স্বাভিভাবনের ফল, এর মধ্যে কোনো বিভূতি বা অলৌকিকত্বের মহিমা নেই।

মানসিক আঘাত পেয়ে রাতারাতি সব চুল পেকে গেল বা উঠে গেল,—এরকম ঘটনা খুব বিরল নয়। এই ঘটনাগুলো আর আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না।

আর একটি কথা বলে সম্মোহন প্রসঙ্গ শেষ করব। মনে রাখা দরকার, সম্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে সব রকমের কাজ করানো যায় না। দুর্নীতির প্রবণতা যার নেই, তাকে দিয়ে নৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব। চুরি-ডাকাতি ব্যাভিচার ইত্যাদি সম্মোহকের নির্দেশে যদি কেউ করে, বুঝতে হবে তার এই জাতীয় কাজের প্রতি বেশ খানিকটা আকর্ষণ ছিল। রাসপুটিনকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে, তার সবগুলো সত্য বলে মনে হয় না।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবন নির্দেশকে বাধা দিচ্ছে কে? বাধা দুদিক থেকে আসতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমরা প্রধানত পরিচিত। পরীক্ষাকালীন অভিভাবন-নির্দেশ হয়ত চিকিৎসক সংবেশকের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকে; অর্থাৎ তিনি হয়ত চান না সম্মোহিত ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কাজটি করুক। তাঁর কণ্ঠস্বরে হয়ত দৃঢ়তার অভাব থাকে, অথবা এমন কোনো সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে যা শুধু সম্মোহিত ব্যক্তির কানেই ধরা পড়ে। কাজেই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় না। অন্যদিক থেকে অর্থাৎ সম্মোহিত ব্যক্তির সত্তা সংরক্ষণের প্রশ্ন থেকেও বাধা আসতে পারে। কিছু কিছু সামাজিক বৃত্তি ও কোনো কোনো নীতি-বোধ আমাদের মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মে পরিণত হয়ে যায়, সহজাতপ্রবৃত্তির মত, —শর্তহীন প্রতিক্রিয়ার মত দৃঢ় ও অনড় হয়ে পড়ে। অভিভাবন-বাক্য এই ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভে অক্ষম। মানুষ মূলত সামাজিক প্রবৃত্তি পরিচালিত এবং সামাজিক ধর্ম অনেক সময় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকেও হার মানায়।

সব মানুষকে সম্মোহিত করা যায় না। সম্মোহনের গভীরতাও সকলের সমান হয় না।

পরের বার ঘটক-কাহিনীতে ফিরে যাব।

—মনোবিদ

নিজেরে হারায়ে খুঁজি
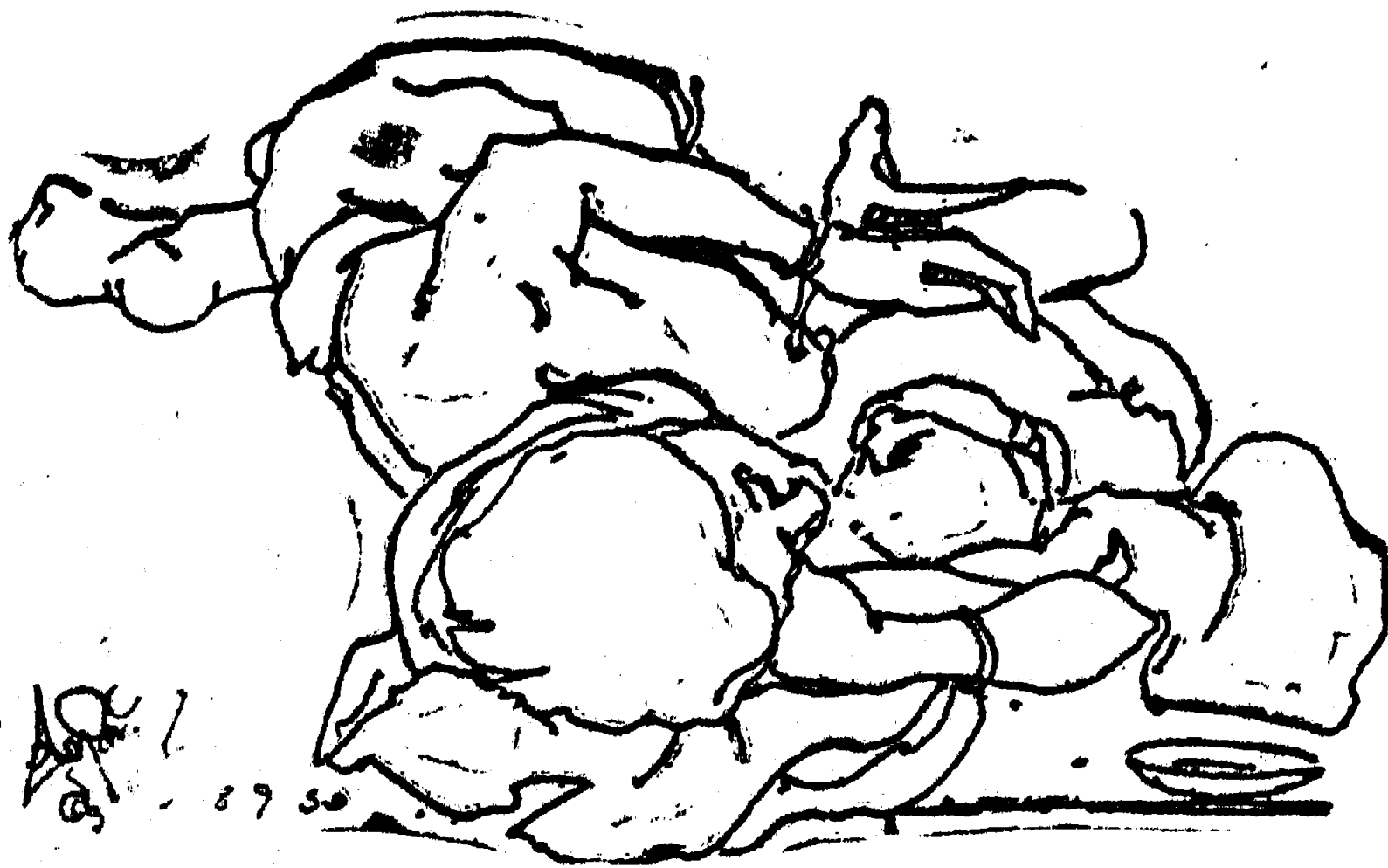
অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাই হোক, বাবুলালজী বৈজুবাবুকে স্টুডিওর চারিদিক আমাকে বেশ ভালো করে দেখিয়ে দিতে। সমস্ত বিভাগগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। পোষাক-আসাক অফুরন্ত তৈরী করে চলেছে দর্জিরা মাস্টারজীর তত্ত্বাবধানে। অন্যান্য বন্দোবস্ত সব চমৎকার, তবে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছেন স্টুডিও সাউন্ড-প্রুফ কিন্তু সাউন্ড-প্রুফ মোটেই নয়—ট্রেনের হুইসিল, কিংবা কুকুরের ডাক সবই শোনা যায় ফ্লোরের ভেতর থেকে। সেদিক থেকে কলকাতার কোনো স্টুডিওই সাউন্ড-প্রুফ নয়—যদিও এ-জিনিসটি অপরিহার্য টকী ফিল্মের ক্ষেত্রে। ল্যাবরেটরী দেখলুম—একতলা বাড়ীতে বাবুলালজীর অফিস, বৈজুবাবুর অফিস, ওপরে রিহার্সাল ঘর, নীচে ল্যাবরেটরী। পুকুরের ধারে খাওয়া-দাওয়ার ঘর, অর্থাৎ ক্যানটিন। মাছ-মাংস যাতে স্টুডিওর মধ্যে না যায়, তাই বাইরের দিকে খাবারঘর। কিন্তু বড় বড় শিল্পী বা টেকনিসিয়ান সবাই ভেতরে বসেই খেতো—শুধু ছোটখাট শিল্পীরা এবং কর্মীরা এই ক্যানটিনে এসে বসতো।

মোটামুটি ব্যবস্থা বেশ ভালো লাগল। আমি সব দেখছি—এমন সময় মন্মথবাবুও এসে হাজির হলেন। মন্মথবাবুরই লেখা 'চাঁদসদাগর'—যা স্টারে অভিনীত হয়েছিল, এখন তার চিত্ররূপ দেওয়া হবে।

বাবুলালজীর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়ে গেল।

এরপর রীতিমত রিহার্সাল শুরু হোল। 'লখিন্দর' চরিত্রের জন্য প্রথমে একটি নতুন ছেলেকে পরীক্ষা করা হোল। ছেলেটির নাম পুষ্কর বাগচী—বেনারসের ছেলে, ভাল লাঠিয়াল। সুন্দর চেহারা। বেশ কয়েকদিন ধরে রিহার্সাল দেওয়া সত্ত্বেও পুষ্কর আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারল না। ফলে ঐ চরিত্রটি তখন ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেওয়া হল।

এর ১৫।২০ দিন বাদে আমরা সব রিহার্সাল ঘরে রিহার্সাল দিচ্ছি, এমন সময় খবর এলো সাউন্ড-ট্রাক এসে গেছে—খিদিরপুর ডকে রয়েছে। বাবুলালজী গেছেন মাল ছাড়িয়ে আনতে। সন্ধ্যার দিকে দেখি তিনি নিজেই সেই ট্রাকটি চালিয়ে নিয়ে আসছেন।

এইবার একদিন শুভদিন দেখে 'চাঁদসদাগরে'র শ্যুটিং শুরু হোল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হোল 'রাম'রন' নামক একখানি হিন্দি ছবি। এ-ছবিখানি করছিলেন পণ্ডিত সুদর্শন এবং তাঁকে কলা-কৌশলের দিকে সাহায্য করছিলেন প্রফুল্ল রায়। যদিও বিজ্ঞাপনে নাম ছিল উভয়েরই যুগ্ম পরিচালকরূপে।

এর কিছুদিন পরেই ভারতলক্ষ্মীতে আর একখানি হিন্দি ছবির কাজ শুরু হোল—নাম 'ভক্ত-কি-ভগবান'। এ-ছবিখানির পরিচালক ছিলেন দাদা গুণজাল। এই ছবিতে পরিচালকমশাই আমাকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নির্বাচিত করলেন। এই আমার প্রথম হিন্দি ছবি।

এই সময় নিউ থিয়েটার্স থেকে ডাক এলো। প্রোডাকশান বিভাগের চানী দত্ত (ইনি একজন নামকরা অভিনেতা ছিলেন) এলেন প্রোডাকশান ম্যানেজার অমর মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা আমায় 'রূপলেখা' ছবিতে 'অশোকে'র ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। পরিচালনা করবেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তখন বড়ুয়া সাহেব গৌরীপুরের সুদর্শন রাজকুমার। তরুণ অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি—পরিচালক হিসেবে নয়। যাই হোক, আমার সঙ্গে চুক্তি হোল তিন মাসের—যদি তিন মাসে আমার কাজ শেষ না হয়, তাহলে Pro-rata দিতে হবে। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে এর আগে একখানি ছবি করেছিলাম—শিশিরবাবু তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে যে 'সীতা' ছবিখানি প্রযোজনা করেছিলেন, তাতে আমিই একমাত্র দলছুট লোক। আমি 'শম্বুক' করেছিলাম।

অমরগীতি চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী

এর মধ্যে কয়েকখানি তামিল ছবি পরিচালনা করেছিলাম এখানে। তখন মাদ্রাজে চিত্রনির্মাণের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। ভাষা তো বুঝি না—টেকনিক্যাল দিক এবং অভিনয়ের দিকটা দেখতাম আমি। 'সাক্কুবাই' এবং আরও কয়েকখানি ছবি আমি পরিচালনা করি।

এদিকে থিয়েটারে তখন 'মা' চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। তখন থিয়েটার আরম্ভ হত সাড়ে সাতটায় আর ভাঙতো বারটারও পরে। যেদিন দুটো করে শো থাকত, অর্থাৎ রবিবার বা ছুটির দিন, সেদিন আরম্ভ হতো বেলা দুটায় প্রথম শো এবং দ্বিতীয় রাত্রি আটটায়। দ্বিতীয় শো ভাঙতো সেই রাত্রি এ[illegible]। তখনকার দিনে দর্শকদের মনোবৃত্তি ছিল যে থিয়েটার দেখতে গেলে ঘণ্টা পাঁচেক না দেখলে আর কি হল। এর কমে হলে তাদের মনস্তুষ্টি হতো না।

নাট্যনিকেতনের হয়ে একবার গেলাম আসানসোল সফরে। সেখানে হলো 'মন্ত্রশক্তি'—আমি করলুম 'মৃগাঙ্ক'। কিন্তু তার পরদিনই ছিল আমার শ্যুটিং নিউ থিয়েটার্সে। আমি অভিনয়ের পর সেইরাত্রেই পাঞ্জাব মেল ধরে কলকাতা রওনা হলুম। হাওড়ায় পৌঁছালাম সাড়ে সাতটায়। বাড়ী পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গেই স্নানাহার করে একেবারে দশটার মধ্যে স্টুডিও। গিয়ে যথারীতি শ্যুটিং করলাম।

এই সময় আর একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা যা সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সেটি হল বিহার ভূমিকম্প। আমরা কলকাতায় তার ভয়াবহতা কিছুই

...য়ে পাইনি সি, কিন্তু মন্দেলায়, পাটনা, ...জনপদের প্রকৃতি আমাদের যে বাঁধনহারা ও ...জ সহজ লোকজন ও সম্পাতিরত ...ছিল, তা আজও বহু লোকের স্মৃতি-...টি অম্লান হয়ে আছে। কলকাতার শুধু ...মরা দেখেছিলাম সেন্ট পল গির্জার ...টি চূড়ায় ফাটল ধরেছিল এবং বিপদ-...ক মনে করে সেটাকে নামিয়ে ফেলা ...ছিল।

এই সময় 'চাঁদ সদাগর' মুক্তি পেল ...ন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা) মার্চ ...স। এই ছবিখানি জনগণের মনকে এমন-...বে জয় করেছিল যে সুদীর্ঘকাল ধরে ...দাছিল একই সিনেমায় সম্ভবত ৩১ ...তাহ ধরে চলেছিল। এরপর বাবুলালজী ...দিন আমায় বললেন মন্মথ রায়ের

...রাগার' ফিল্ম করলে কেমন হত। আমি ...লাম—খুবই ভালো হয় তবে এ প্রোডা-...ান খুব খরচসাপেক্ষ। এতে বাবু-...লজী বললেন : তা হোক। আমি ...ব—আপনি ডাইরেকশান দেবেন।

আমার তো আনন্দ হবারই কথা। ...ণ বর্মা এলেন আমার সহকারী হয়ে। ...ত্রনাট্য রচনায় তিনি আমায় সাহায্য করতে ...গলেন। শিল্পী অখিল নিয়োগী সেটিং-...র সব স্কেচ করতে লাগলেন।

স্কেচগুলি আমরা অনুমোদন করায় ...। সেট নির্মাতা দিনশ' ইরাণীকে (বিখ্যাত ...দযন্ত্রী জে ভি ইরাণীর পিতা) দেওয়া ...। সেট নির্মাণের জন্য। কিন্তু এত তোড়-...াড় করেও বইখানি আর চিত্ররূপ ...ল না।

কিন্তু কেন যে হল না, তার প্রধান ...রণ হল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে। ...ক্লান্ত পরিশ্রম করে এর চিত্রনাট্য রচনা ...রছিলুম আমি—প্রত্যেকটি চরিত্রের ...াষাক পরিচ্ছদের স্কেচ, সেটিংসের ...কচ দিয়ে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য যাঁরা যাঁরা ...খেছিলেন প্রত্যেকেই একবাক্যে প্রশংসা ...র বলেছিলেন এতো সিনারিও নয় এ যে ...কবারে ব্লু প্রিন্ট। একজন আনা-...ও যদি এই চিত্রনাট্য হুবহু অনুসরণ ...রে তাহলে তার হাত থেকে একখানি ...থম শ্রেণীর ছবি বেরিয়ে আসবে।

সে যাই হোক, আমারই অদৃষ্ট খারাপ, ...বটা হলো না—যদিও বেশ কিছুদিন ...হার্সাল দেওয়া হয়েছিল তদানীন্তন মঞ্চ ... চিত্রজগতের সব শিল্পীদের নিয়ে। শান্তি ...স্তাকে নেওয়া হয়েছিল ধরিত্রীর ...মিকায়। কাননকে নেবার চেষ্টা করে-...লুম, কিন্তু ও ছিল তখন রাধা ফিল্মের ...বন্ধ শিল্পী—পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ ...কে ছাড়ল না। কিন্তু সবটাই পণ্ডশ্রম ...লো। আমার এই পরিশ্রমের মূল্যবাবদ ...হু টাকার রফা করে বাবুলালজী আমার ...ত্তর আওতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রাধা ফিল্মের দক্ষযজ্ঞ মুক্তি-...ভ করল—কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে ৯ই ...ব্রুয়ারী—এতে আমি করেছিলুম মহারাজ দক্ষের ভূমিকা। সে সময় বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল এই ছবিখানি।

এই সময় যে মাসের তিন তারিখে আমার একটা সম্বর্ধনারজনী হয়। তাতে অভি-নয় হয়। পোষ্যপুত্র ও মন্ত্রশক্তি। এছাড়াও নির্বাচিত নৃত্যগীত। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে ভোর সাড়ে ছটা পর্যন্ত অভিনয় হয়েছিল।

এই বছরে যে মাসে নাট্যজগতের একটি বিরাট উল্কাপাত ঘটল—অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু।

আজকালকার দর্শক ও'কে জানে এক-জন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররূপে, কিন্তু উনি যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন সে যাঁরা তাঁর অভিনয় না দেখেছে তারা ধারণা করতে পারবেন না। সিংহল বিজয়-এ সিংহবাহু, চিরকুমার সভায় তাঁর 'রসিক' ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আহেরিয়ায়' 'মুলরাজ' যারা দেখে-ছেন তাঁরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না সে অভিনয়। তাঁর রসিককে অতিক্রম করতে শিশিরবাবুও পারেন নি এবং দানীবাবু অপেক্ষা তিনি ভাল করতেন 'মুলরাজ'। 'বঙ্গনারী'তে তারাসুন্দরীর সঙ্গেও অভি-নয় করেছিলেন। 'অযোধ্যার বেগম'-এ তিনি করেছিলেন 'ইমাম'—ঐ সময় তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে মঞ্চে নামার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অপূর্ব ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর, এবং তেমনি ভাবব্যঞ্জনার শক্তি।

গিরিশবাবুর সঙ্গে তাঁর একটা ঘটনার কথা এখানে বলছি—তাতে বোঝা যায় গিরিশবাবুকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধা কর-তেন। তিনি তখন মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার। গিরিশবাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হবে। তাঁকে প্রথমে নির্বাচন করে-ছিলেন 'সিরাজ'রূপে—কয়েকদিন রিহার্সাল দিলেন। কিন্তু পরে দানীবাবু গিয়ে তাঁকে ধরলেন এই ভূমিকাটির জন্য। পুত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেরে একদিন গিরিশ-বাবু তাকে একান্তে ডেকে এনে বললেন,— 'দেখ অপরেশ, সিরাজের ভূমিকাটা আমি ভেবে দেখলাম দানীকে দেব—তুমি অন্য কোন ভূমিকা নাও। তোমার পার্টটা আমাকে ফেরৎ দাও।'

'যে আজ্ঞে' বলে অপরেশবাবু তাঁকে, সমস্ত পার্টটা ফেরৎ দিয়ে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদত্যাগপত্রটাও দাখিল করলেন।

গিরিশবাবু বললেন : এটা কি রকম হল?

অপরেশবাবু বললেন : আমার ইজ্জৎ বাঁচাতে এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। আমি থিয়েটারের ম্যানেজার, আমি কয়েকদিন এই ভূমিকার রিহার্সাল দিয়েছি এখন যদি অন্য কেউ করে তাহলে নানালোকে নানা কথা বলতে পারে। তার-চেয়ে আমি যদি সাময়িকভাবে এখান থেকে চলে যাই তাহলে এসব কথা উঠবে না।

সত্যিই উনি সাময়িকভাবে মিনার্ভা ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরে অবশ্য আবার এসে-ছিলেন।

শেষের দিকে তিনি আর অভি-নয় করতেন না—শারীরিক অক্ষমতার জন্যে। ঘাড়টা তিনি সোজা করতে পার-তেন না। এরও একটা কারণ আছে। মাছ ধরার তাঁর দারুণ নেশা ছিল। দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি ছিপ হাতে করে পুকুরের ধারে বসে থাকতে কখনও ক্লান্তিবোধ করতেন না। এইভাবে থাকতে থাকতে তাঁর ঘাড়ে মাছ ধরার ভূত এমনভাবে চাপল যে তিনি কিছুতেই আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন না।

এর পরে নাটক রচনার দিকে অধিকতর মনসংযোগ করলেন এবং নাট্যরূপ দেওয়া এবং মৌলিক নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি যে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আপনাকে আমাকে নতুন করে বলার প্রয়োজন হবে না। তাঁর প্রায় ৬০।৬৫ খানি নাট্যরচনা আছে—সেই নাট্যকৃতিগুলিই এর সাক্ষ্য দেবে।

যাই হোক, অপরেশবাবুর তিরোধানে রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পূরণ আজও হয়নি একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

আমি তখনও কুমার মিত্রমশায়ের সঙ্গে আগেকার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলাম।

আমার বন্ধু হরিমোহন বসু প্রায় আমাকে বলত, 'তোমার সঙ্গে কুমারবাবুর এত অন্তরঙ্গতা ও'র কাছে কিছু সুবিধে করে কিছু জায়গা কিনে নাও না। ও'র প্রচুর জায়গা আছে গোপালনগরে। সেগুলো উনি বিক্রি করছেন এখন।'

প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগলেও পরের ব্যাপারটা মানে বাড়ী করবার নানা ঝামেলার কথা ভেবে পিছিয়ে এলাম। আর বাড়ী করার মত টাকা তো আমার হয় নি।

আমি বললাম : অত টাকা আমার কোথায়?

হরিমোহন বলল : এখন তো তুমি সিনেমা করছ, থিয়েটার করছ—তাছাড়া রেডিও গ্রামোফোনও আছে। বেশ তো দু-পয়সা আসছে। ভাড়াবাড়িতে আর কতদিন থাকবে?

একদিন আমাকে জোর করেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল কুমার মিত্র মশায়ের বাড়ী। যাবার সময় বললে—সঙ্গে একশো এক টাকা অন্তত নাও। নাহলে হবে না। যাই হোক গেলাম কুমারবাবুর কাছে। খানিকটা জায়গা গোপালনগর রোডের ওপর (আমার বাড়ী) কিনলাম—কুমারবাবু আমাকে বিশেষ খাতির করে তাঁর নির্ধারিত মূল্যের থেকে কাঠা পিছু একশো টাকা করে কম নিলেন। একশো এক টাকা বায়না দিয়ে এলাম এবং ঠিক হল আমার কন্ট্রাক্টের টাকা থেকে উনি মাসে মাসে কেটে নেবেন।

এইভাবে জমি কেনা হল এবং তা রেজিস্ট্রী হল ১৯৩৪ সালের জুন মাসে।

জমি রেজিস্ট্রি করার পরই আমার পেছনে লাগলেন ভেলুবাবু। ইনি হলেন প্রবোধ গুহমহাশয়ের এক দূর সম্পর্কীয় ভাই কন্ট্রাকটর বাসুদেব কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার —অর্থাৎ বাসুদেব কোম্পানীর ইনি হলেন বাসু, ইনি আমাকে খালি তাগাদা দিতে লাগলেন বাড়ী করবার। একদিন উনি প্ল্যান পর্যন্ত করে নিয়ে হাজির। প্রথমে দোতলা বাড়ী হবে তাতে চারখানা ফ্ল্যাট থাকবে। প্রথমে বললেন : আপনাকে আস্তে আস্তে অল্প স্বল্প করে খরচা দিলেই চলবে। আমি সেইজন্যেই রাজী হলাম, কিন্তু কাজ শুরু হবার পরই তিনি টাকার তাগাদা আরম্ভ করলেন। ক্রমশঃ তাঁর সেই তাগাদার মাত্রা বাড়তে লাগল। এবং তাঁর সেই তাগাদার ঠেলায় আমাকে পরিশ্রমের মাত্রা বেশ বাড়াতে হল।

'মা' বেশ সাড়ম্বরে চলছিল তখন। ৫০শ অভিনয় রজনী অতিক্রম করলেও দর্শকসংখ্যা একটুও কমেনি।

এরমধ্যে ৭ মার্চ তারিখে নাট্যনিকেতনে খোলা হল যোগেশ চৌধুরী মশায়ের সামাজিক নাটক 'পূর্ণিমা মিলন'। নাটকখানি খুবই কৌতুককর। এক বৃদ্ধের যুবতী নারীর প্রতি আসক্তির ফলে যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছিল। আমি ঐ নারী সঙ্গাভিলাষী বৃদ্ধের ভূমিকাটি করেছিলাম। সকলের অভিনয়গুণে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

অনেকদিন থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না—আমি কিছুদিনের ছুটি চাইলাম প্রবোধবাবুর কাছে যে একবার একটু হাওয়া বদলে আসি। কিন্তু প্রবোধবাবু বললেন : বেশ চল, তোমাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : কোথায়?

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন : ডায়মন্ডহারবার।

অবাক হয়ে বললাম—ডায়মন্ডহারবার?

—তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমার কথায় আস্থা রেখে একবার চলই না। দেখবে তার এফেকট।

এর ওপর আর কথা চলে না। গেলাম তাঁর সঙ্গে। রইলাম সেখানে সাতদিন ডাক-বাংলোয়। সঙ্গে রইলো নীহারবালা এবং সুবল। প্রবোধবাবুর ছেলে সুধীর রোজ যেত, খবরাখবর সব ওর মুখ থেকেই শুনতাম।

তখন জানুয়ারী মাস শীতকাল। রোজ খুব সকালে উঠে বেড়াতে যেতাম। একদিন নৌকো করে বেড়াতে গেলুম কুমড়োহাটি। প্রথমটা ডায়মন্ডহারবার শুনে যেমন নাক সিটকেছিলাম—এখন দেখা গেল শরীর বেশ ভালোই হল।

●

ডায়মন্ড হারবার থেকে ফিরে এসেই আবার নতুন উদ্যমে কাজে লেগে গেলুম। ডায়মন্ডহারবারে থাকাকালীনই প্রবোধবাবু বলছিলেন যে সামনে 'ইদ' আসছে—একটা বিশেষ আকর্ষণ কি করা যায়? কেউ বলল সাজাহান, কেউ বলল ইরাণের রাণী, কেউ বলল অযোধ্যার বেগম। শেষে প্রবোধবাবুই বললেন : আচ্ছা 'রিজিয়া' করলে কেমন হয়—মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া'?

মুসলমানদের পর্ব, সুতরাং মুসলমানী বিষয়বস্তু হলে এ সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করা যাবে।

কথাটা মনে লাগল সবাইয়ের। আমিও মত দিলুম। ঠিক হল যে আমি 'বক্তিয়ার', তারাসুন্দরী 'রিজিয়া' এবং চারুশীলা 'ইন্দিরা।'

পাঁচ তারিখে ফিরলুম ডায়মন্ডহারবার থেকে—আবার সাত তারিখে মঞ্চাবতরণ। ঐদিনই 'রিজিয়া' অভিনয়। বক্তিয়ারের ভূমিকায় আমি এই প্রথম। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় সেদিন খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

'রিজিয়া' অবশ্য একদিনই হয়েছিল। নিয়মিতভাবে তখন নাট্যনিকেতনে চলছে 'চক্রব্যূহ'। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা এই নাটকটি ১৯৩৪ সালের ২৩ মে উদ্বোধন হয়। আমি 'শকুনির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতাম। আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী সাজতো ভীম।

জানুয়ারী মাসে দুটি ছবিতে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলাম। একটি হলো ধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত 'বিদ্রোহী' অপরটি হলো 'প্রফুল্ল'। ছবি দুটির কাজও শুরু হলো। নাট্যনিকেতনে আমার সম্মানরজনী উপলক্ষ্যে দুটি নাটকের অভিনয় হলো। সাজাহান আর পথের শেষে। সেদিনের অভিনয়ে বহু বিশিষ্ট অভিনেতা অংশ নিয়েছিলেন।

এই সময়ে কলকাতা রেডিও-র স্টেশন ডিরেকটর মিঃ স্টেপলটন একটি ঘরোয়া বৈঠকে কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পীকে সম্মানিত করেন। সেই অনুষ্ঠানে আমিও আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। একটি রৌপ্যাধার আমি পেয়েছিলাম স্মারক হিসাবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে বোধহয় ২৭ তারিখে নাট্যমন্দির অর্থাৎ স্টারে শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে 'আলমগীর' অভিনীত হয়। সঙ্গে আরো একটি নাটক ছিল, সেটি হলো বৈকুণ্ঠের খাতা। শিশির ভাদুড়ী এবং নাট্যমন্দিরের শিল্পীদের সঙ্গে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

এপ্রিল মাসে নাট্যনিকেতনে নতুন নাটক খোলা হলো। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ব্রতচারিণী' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। 'ব্রতচারিণী' মোটামুটি ভালোই চলেছিল।

ব্রতচারিণী নাটকে একটি নতুন ছেলেকে নির্বাচন করা হয়েছিল কোন একটি চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে। একদিন আমি বসে রিহার্সাল পরিচালনা করছি। মনোরঞ্জনবাবু ছাড়া অন্যান্য শিল্পীরাও উপস্থিত আছেন। নতুন ছেলেটি রিহার্সাল দিচ্ছে। কিন্তু তার যেন সবজান্তা ভাব। হঠাৎ এক সময় সে প্রম্পটারকে বলে বসলো, এই জায়গাটা দরকার নেই, বাদ দিয়ে দিন। একথাগুলো নাটকে না রাখলেও চলে।

এছাড়া আরো কিছু বললো ছেলেটি।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুব বিসদৃশ লাগলো। মেজাজ গেল বিগড়ে। চটে উঠে বললাম, ওহে শোনো—এটা তোমার কি ধরনের ভদ্রতা, যেখানে আমি রিহার্সাল পরিচালনা করছি, নাট্যকার বসে আছেন—আর তুমি প্রম্পটারকে বলছো ও জায়গাটা বাদ দিয়ে দিন। এটা ভদ্রতার বাইরে। এ ধরনের ব্যবহার এ্যামেচার ক্লাবে চলে, এখানে নয়। পেশাদারী মঞ্চের কতকগুলো নিয়ম আছে, যেগুলো সকলকেই মেনে চলতে হয়। আর এসব যদি মানতে না পারবে, তাহলে এখানে অভিনয় করা চলবে না।

ছেলেটি সেদিনের পর আর আসেনি। তার নাম ছিল জ্যোতি।

এপ্রিল মাসে জয়পুর গিয়েছিলাম 'বিদ্রোহী' ছবির শ্যুটিং করতে। জয়পুরের কাছেই গলতা বলে একটা জায়গায় শ্যুটিং করতে যেতে হতো। কিন্তু আমরা থাকতাম জয়পুরেই।

প্রতিদিন সকাল আটটায় আমরা সদলবলে বেরিয়ে যেতাম 'লোকেশনে'। এখানকার মাছির উপদ্রবের কথা কোনদিন ভুলবো না। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে যে কী অবস্থা হতো, তা কি বলবো। এছাড়া আরো একটি ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন শ্যুটিংএ দারুণ দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়েছিল আমাকে। একটা 'শট' ছিল—প্রাসাদের ফটক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আমাকে অনুসরণ করছে আরো কয়েকজন অশ্বারোহী।

ক্যামেরা বসানো হয়েছে সামনে, একটু কোণ ঘেঁষে। কতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ ক্যামেরা ফিল্ড কতোখানি, তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দলের সুবল ঘোষ কলকাতার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। সেই আমাদের অশ্বারোহনের তালিম দিত। শ্যুটিং-এর সময় সুবল দাঁড়িয়ে ছিল ক্যামেরা ফিল্ডের বাইরে।

পরিচালক ডি, জি, শটটা রেডি করে বললেন, স্টার্ট ক্যামেরা।

ক্যামেরা চলতে লাগলো। আমাদের ঘোড়াও ছুটে চললো। আমি ওপর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে ক্যামেরার পাশ দিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম।

ক্যামেরা ফিল্ড অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সুবল আমার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। আমার ঘোড়াটা থামলো বটে, কিন্তু পিছনের ঘোড়াগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটে

সুবলকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে।
ঘোড়া তাকে মাড়িয়ে গেল।
ংঘাতিকভাবে জখম হলো সুবল।
হাসপাতালে পাঠানো হলো সঙ্গে

মি সেদিন সুবলকে বলেছিলাম,
একটি নির্বোধ—তোমার বোকামির
এমন কাণ্ড হলো।

বলকে বেশ কয়েকদিন ভুগতে
র এই দুর্ঘটনার দরুন।

পুরে শ্যুটিংয়ের কথা মনে পড়লে
র এই দুর্ঘটনার কথা মনে আসে।
তদানীন্তন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের
র রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত
ল মে মাসে। ঐ উপলক্ষ্যে চৌরঙ্গী-
আলোকসজ্জার কথা এখনো আমার
তে আছে।

মাসেই একদিনের সম্মিলিত
য়ের কথা বলা দরকার। প্রতাপাদিত্য
অভিনয় হয়েছিল। যাতে শিশির-
রডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।
ন ঐ একবারই তিনি রডার ভূমিকায়
য় করেন। অভিনয়ে তিনি কিছু
জি শব্দ ব্যবহার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন
চেয়েছিলেন।

এই সময়ের আমার পারিবারিক জীবনের
কথা না বলে পারছি না। গোপালপুর
বাড়ি তৈরি করেছিলাম, বেশ কিছুদিন
। এতোদিনে সে বাড়ির দরজা 'গৃহ-
শের' জন্যে উন্মুক্ত হলো। কিন্তু এ
করেছিলাম ভাড়া দেব বলে। কিন্তু
দেওয়া হলো না। কলকাতার ডালিম-
র বাড়ি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আমরা এই
তেই বাস করতে আরম্ভ করলাম।

গৃহপ্রবেশের দিনটি ছিল ১৮ই আষাঢ়,
র, ইংরাজী ৩ জুলাই অর্থাৎ রথযাত্রার
দিন। গৃহপ্রবেশের দিন থেকে তিনদি
নতুন বাড়িতে বাস করতে হয়, এই
বিধি। তাই হলো। এ কদিন
টারের পর চলে আসতাম গোপাল-
রের বাড়িতে। ভেবেছিলাম, তিনরাত্রি
র পর আবার ডালিমতলার বাড়িতে
বো। কিন্তু তা আর হলো না। মা
হুতেই এই নতুন বাড়ি ছেড়ে যেতে
লেন না। এমন সুন্দর বাড়ি, তাছাড়া
ড়ি থেকে কালীঘাটের মন্দিরের চূড়ো
খা যায়—মা কোন মতেই বাড়ি ছাড়লেন
। সেই থেকেই আমরা গোপালনগরের
ড়িতেই আছি।

রাধা ফিল্মস সে সময়ে পর পর ছবি
রছিল। এই কোম্পানীর ভক্তিমূলক ছবি
সুদামা'তে আমি সুদামের ভূমিকায়
ভিনয় করলাম। কৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন
রাজ আর রাধার চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন
নন দেবী। ছবিটির পরিচালক ছিলেন
শী বর্মা।

রাধা ফিল্মসের আর একখানি ছবি
ঠহার' রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করলো

২১ ডিসেম্বর। এই ছবিতে আমার ছিল রূপলালের ভূমিকা। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ধীরাজ, কানন, নির্মলেন্দু ও আরো অনেকে। পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বছরে আর একটি ছবিতে কাজ করেছিলাম। ছবিটি হলো সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'তরুবালা'।

এই বছরেই নাট্যনিকেতনের হয়ে আমরা গিয়েছিলাম চট্টগ্রামে অভিনয় করতে। কথা ছিল গৈরিক পতাকা অভিনয় হবে, কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের ঘোরতর আপত্তিতে শেষটা 'সাজাহান' করতে হলো।

সাজাহান অভিনয়ের পর কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক আলাপ করতে এলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতিতে তাঁরা পঞ্চমুখ, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। যেমন—ঔরঙ্গজীব যে মাঝে মাঝে বলেন, 'আমি তো মক্কার দিকে পা বাড়িয়ে আছি' বা যেখানে ঔরঙ্গজীব খোদার নাম উচ্চারণ করেন, সে সব জায়গা বিদ্রূপাত্মক মনে হয়। সেদিন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমি বললাম, দেখুন—এক-একজন অভিনেতা, এক-একভাবে অভিনয় করেন, ঠিক আছে আপনাদের আপত্তির কথা আমি রাধিকাবাবুকে জানাবো।

এবারে তাঁরা আমার ভূমিকা প্রসঙ্গে বললেন, আপনি বাঁ হাতে কোরাণ স্পর্শ করেন এটা বড় দৃষ্টিকটু, ডান হাতে স্পর্শ করতে পারেন তো?

বললাম, ডান দিকটা পক্ষাঘাতদুষ্ট, আমি তো এইভাবেই অভিনয় করি, সুতরাং ডান হাতে কোরাণ স্পর্শ করার কোন উপায় নেই।

আমি কিন্তু এর পরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে না ডান, না বাম, কোন হাতে না ছুঁয়ে কোরাণ স্পর্শ করার জায়গায় মাথা দিয়ে স্পর্শ করতাম।

এ ছাড়া ওখানে 'খনা' হল একরাত্রি নয়, বিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয়বার। খুবই জনাদর লাভ করেছিল 'খনা'।

প্রবোধবাবুর বহু বন্ধুবান্ধব নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন—চট্টগ্রামেও ও'র বহু বন্ধুবান্ধব ছিল। তাঁরা একদিন আমাদের সকলের জন্য স্টীমার পার্টির আয়োজন করলেন। আমরা একেবারে কর্ণফুলী নদীর মোহনা পর্যন্ত, যেখানে সাগরে গিয়ে মিশেছে নদী, সেখান পর্যন্ত মহানন্দে ঘুরে এলাম। খুবই উপভোগ্য হয়েছিল সে স্টীমার ভ্রমণটি।

তারপর আমার অন্য কাজ থাকায় আমি দলের সকলের আগেই কলকাতা চলে এলাম—আমার সঙ্গে এল সরযূবালা ও মনোরঞ্জনবাবু।

এই বছরের ১৪ ডিসেম্বর নাট্যনিকেতনে শচীন সেনগুপ্তের লেখা দেশাত্মবোধক নাটক 'নরদেবতা' খোলা হল। এই নাটকখানি বিখ্যাত বিলাতী লেখিকা মারী করেলি 'টেম্পোর্যাল পাওয়ার' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকখানির বিষয়-বস্তু দর্শকমহলে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এক সিংহলী রাজার ছেলের প্রণয় হল এক বিদ্রোহী দলের নেত্রীর সঙ্গে এবং একে কেন্দ্র করেই রাজার সঙ্গে বাধে বিরোধ। কয়েক রাত্রি অভিনয় হবার পর 'নরদেবতা' আমাদের তদানীন্তন শাসক-সম্প্রদায়ের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। বিংশ অভিনয় ছিল 'নরদেবতা'র শেষ অভিনয় ৪-১-৩৬। ভূমিকায় ছিলাম আমি, নীহারবালা ও অন্যান্য অনেকে।

এই সময় নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায়ের আর একখানি নাটক অভিনীত হল—তার নাম 'খনা'। 'খনা' নাটক থেকে লেখকের কথায় বলি—"'খনা' লিখিয়াছিলাম নিজের প্রেরণায় ১৯৩২ সালে পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গৃহীত হয়। দিনাজপুর নাট্য সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়। অধুনালুপ্ত 'নাট্যকুঞ্জ' (কলিকাতা) কর্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। 'বাঙলার বাণী' সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশেষে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪২ (১১ জুলাই, ১৯৩৫)।...... খনার কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা এবং চারি আনা কিম্বদন্তী।

এতে সঙ্গীত রচনা করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী, সুরসংযোজনা করেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যপরিকল্পনা করেন নীহারবালা।

ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ—বরাহ-আমি, মিহির-জীবন গাঙ্গুলী, খনা-সরযূবালা, ধরণী-চারুশীলা, কামন্দক-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মর্দনিকা-নিরুপমা, তরলিকা-তারকবালা (লাইট), বিক্রমাদিত্য-শিবকালী চট্টোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, এই বছরেই আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল সেটা বলতে ভুলে গেছি। সেটা হল নাট্যনিকেতনের মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্সের আবির্ভাব। থিয়েটারের ব্যবস্থাপনার ভার প্রবোধবাবুর হাত থেকে চলে গেল। ভার নিলেন যশোদাবাবু। নীহারবালাও প্রবোধবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে ক্যালকাটা থিয়েটার্সে এসে যোগদান করলেন। এ'রা প্রথম মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। আমি করলুম 'চন্দ্রবাবু' আর নীহারবালা করল 'নীরবালা'।

এই বছরের শেষ দিকে একটা মারাত্মক ব্যাধির কবলে সারা কলকাতা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রোগটা তখন 'ঝিনঝিনিয়া' বলে সকলের মুখে মুখে ফিরত। এটা আসলে ছিল একটা স্নায়বিক ব্যাপার। হঠাৎ

দেখা যেত কারু কারু সারা শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ অবশ হয়ে যেত। এই রকম অবস্থায় কাউকে দেখলে মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢালত। কিছুক্ষণ পরে অনেকে সুস্থ হত, আবার কারু কারু এর জের চলত ২।৩ দিন। ডাক্তাররা বললেন, —এ আর কিছুই নয়—ভিটামিনের অভাব এবং অবসাদই এর কারণ।

যাই হোক সারা কলকাতায় বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এই 'ঝিনঝিনিয়া'।

এল ১৯৩৬ সাল। ২০ জানুয়ারী ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মহাপ্রয়াণ ঘটল এবং অষ্টম এডওয়ার্ডকে ভারতের সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হল ২২ জানুয়ারী।

এর পর আমি পর পর দুটি বড় ছবির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। একটি হল ডি, এল, রায়ের 'পরপারে'। চন্দ্র ফিল্ম ছিলেন এর নির্মাতা এবং বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান যতীন দাস ছিলেন পরিচালক। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ভূমেন, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি। ২০ জানুয়ারী কন্ট্রাক্ট সই করলাম আর ছবি মুক্তিলাভ করল ৪ জুলাই চিত্রায়।

৩ ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইণ্ডিয়ার 'সোনার সংসার' ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলুম। দেবকী বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এই 'সোনার সংসার' এবং আমারও। স্যার শঙ্করনাথের চরিত্রটি আমার খুবই ভাল লেগেছিল, সেজন্যে যখন সেটে অভিনয় করতাম তখন আমি ও তুলসী লাহিড়ী (পণ্ডিত) দুজনে অনেক কথা বানিয়ে বলতুম, অবশ্য সিচুয়েশান বুঝে। ক্যামেরা চলছে, আমরা অভিনয় করে যাচ্ছি—script এ নেই এমন অনেক কথা আমিও বলছি, তুলসীও জবাব দিচ্ছে, কিন্তু দেবকীবাবু দেখছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। ও'র সহকারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, কিন্তু দেবকীবাবু 'কাট' বলছেন না! শেষে 'শট' শেষ হল। প্রায়ই দেবকীবাবু হাসতে হাসতে বলতেন—'ভেরি গুড'।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিল ধীরাজ, ছায়া দেবী, মেনকা, জীবন গাঙ্গুলী, আঙ্গুরী, রণজিৎ রায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, বিনয় গোস্বামী, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এতে সুর দেন।

যাই হোক, এই ছবিতে অভিনয় করে খুব আনন্দ পেয়েছিলুম।

ফেব্রুয়ারী মাসেই নাট্যনিকেতনের সঙ্গে গেলাম পাটনায়। ওখানে নাট্যনিকেতন বেশ কয়েক রাত্রি অভিনয় করলেও, আমি দু'রাতের বেশি অভিনয় করতে পারি নি। কারণ সে সময়ে কলকাতায় আমার অনেকগুলো ছবির শ্যুটিং চলছিল। সুতরাং আমাকে কলকাতায় ফিরতে হলো।

কলকাতায় ফেরার পরে সিনেমার কাজ নিয়ে মেতে উঠলাম। এর পর থিয়েটার তো আছেই। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে রঙমহলে চাঁদসদাগর অভিনীত হলো। আমি করলাম শিবপ্রসাদ। তারপর মহানিশাতে মুরলী ধরের ভূমিকাতেও অভিনয় করলাম। মার্চ মাসেই স্টারে অভিনীত রীতিমতো নাটকে আমি সুহৃদ ডাক্তারের চরিত্রে রূপদান করি।

এপ্রিল মাসের চার তারিখে নাট্যনিকেতনে কেদার রায় নাটকটির উদ্বোধন হলো। রমেশ গোস্বামীর এই দেশাত্মবোধক নাটকটি মঞ্চস্থ করতে ক্যালকাটা থিয়েটার্সের স্বত্বাধিকারী যশোদানারায়ণ ঘোষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। নাটকটির প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং অভিনেতাদের অভিনয়ের গুণে সে সময়ে নাট্যরসিক মহলে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটির ভূমিকালিপি ছিল এইরকম, কেদার রায়—আমি, চাঁদরায়—রবি রায়, শ্রীমন্ত—নরেশ মিত্র, কার্ভালো—ভূমেন রায়, ঈশা খাঁ—জহর গাঙ্গুলী, কাত্রু সর্দার—মণি ঘোষ, সোনা—নিরুপমা, রত্না—চারুবালা, মায়া—রেণুকা রায়।

কেদার রায়ের রিহার্সালে একটা ঘটনা ঘটলো। সেটা না উল্লেখ করে পারছি না। প্রথমে কেদার রায়ের চরিত্রটি দেওয়া হয়েছিল নির্মলেন্দুকে, আমার ছিল চাঁদরায়ের ভূমিকা। এইভাবেই রিহার্সাল শুরু হয়েছিল। একদিন রিহার্সাল চলছে, অথচ নির্মলেন্দু রিহার্সালে ঠিক মতো যোগ না দিয়ে টিপ্পনী কেটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। নরেশবাবু ব্যাপারটা যশোদাবাবুর কাছে বলতে, যশোদাবাবু নির্মলেন্দুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনি বিশিষ্ট অভিনেতা, অথচ এ ধরনের আচরণ করছেন কেন! আপনার আচরণ থেকে কি শিখবে, ছোট ছোট শিল্পীরা।

নির্মলেন্দু বরাবর একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। সে একটু চড়া সুরেই বললে, আমি আর কি করবো, ওরাই তো সব করছে। এ ভাবে রোজ রোজ আমি রিহার্সাল দিতে পারবো না।

শান্তপ্রকৃতির মানুষ যশোদাবাবু। ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমার এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির। বললেন, আমি থিয়েটারের শৃঙ্খলা কারো জন্যে ভাঙতে রাজী নই নির্মলেন্দুবাবু।

নির্মলেন্দু সেই কথাতেই থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। যাবার আগে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেলেন, অহীন—চললাম আমি।

মনে আছে আমি শুধু বলেছিলাম, আচ্ছা, এস।

এরপরেই কেদার রায়ের ভূমিকালিপি বদলে গেল। আমি হলাম নামভূমিকার শিল্পী।

ঠিক এই সময় খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী চারুশীলার মৃত্যু ঘটলো রহস্যজনকভাবে। আর সেই জন্যে তাঁর শেষকৃত্য চুপিসারে সারতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মৃত্যুরহস্য আজো রহস্যই রয়ে গেছে।

এই সময়ে মিনার্ভায় 'দস্যু' নামে নতুন নাটক খোলা হলো। এই নাটক তেমন না চললেও শরৎ খুব ভালো অভিনয় করেছিল। সন্তু সেনের সম্পাদনায় মিনার্ভাতে 'বাংলার মেয়ে' অভিনয় হলো এই সময়েই। আমি বাংলার মেয়েতে জিতেন ব্যানার্জির ভূমিকা করেছিলাম।

নাট্যনিকেতনে নতুন করে 'সরলা' হলো। আমি ছিলাম 'গদাধরচন্দ্রের' ভূমিকায়।

জুন মাসে দেবদত্ত ফিল্মের হয়ে 'অহল্যা' ছবির জন্য স্বাক্ষর করি। শ্যুটিংও বেশ কিছুদিন করেছিলাম, পরিচালনা করেছিলেন হরি ভঞ্জ। কিন্তু কেন জানি না ছবিখানি শেষ পর্যন্ত সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করেনি। এতে আমি 'গৌতম ঋষি'র ভূমিকা করি।

এই সময় ভাদুড়ীমশায়ের সম্প্রদায় অর্থাৎ স্টারে নবনাট্য মন্দিরের সঙ্গে কয়েকটি সম্মিলিত অভিনয়ে আমি যোগদান করি। প্রথমে হল ৫ জুন গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান', এতে ভাদুড়ীমশায় করেছিলেন 'করুণাময়', আমি করি 'রূপচাঁদ', আর রাধিকানন্দবাবু করেছিলেন 'দুলালচাঁদ'। তারপর ১১ জুন হল 'বিজয়া'। 'বিজয়া'য় শিশিরবাবু বরাবর করতেন 'রাসবিহারী' এবার আমি করলাম 'রাসবিহারী', শিশিরবাবু করলেন 'নরেন' আর ভূমেন করল 'বিলাস'।

এই মাসেই 'পরপারে'র শ্যুটিং শেষ করলাম।

ছোটবেলা থেকেই আমার খেলাধুলার দিকে ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। নিজেও এক সময় খেলেছি। এই সময় কলকাতায় এল চীন থেকে একটি ফুটবল টীম। এই বোধহয় ভারতে বৈদেশিক টীমের প্রথম আগমন হল। ভারতীয় একাদশের সঙ্গে খেলায় ১—১ ড্র হল। বিদেশী টীমের সঙ্গে ভারতীয় দল কিরকম খেলে তা দেখার লোভ সামলাতে পারলুম না।

শিশিরবাবু তখন তাঁর মঞ্চসফল নাটক 'রীতিমত নাটক' উঠাবার তোড়জোড় করছিলেন কালী ফিল্মের হয়ে। সুহৃদ ডাক্তারের ভূমিকা তাঁর সঙ্গে স্টেজেও করেছি, ফিল্মেও আমাকেই আহ্বান জানালেন ঐ ভূমিকাটির জন্যে। আমি ২১ জুলাই চুক্তিপত্রে সই করি।

৮ আগস্ট রূপবাণীতে দেবদত্তর 'রজনী'র উদ্বোধন হল। ছবিখানি তখনকার দিনে দর্শকদের চিত্ত জয় করতে পেরেছিল।

এই সময় একদিন শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী বাবুলাল চোখানি আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর স্টুডিওতে। আমি যেতে বাবুলালজী আমার সঙ্গে এক সুদর্শন সাহেবী পোশাক পরা ভদ্রলোকের আলাপ করে দিলেন। বললেন : ইনি হলেন মিঃ মধু বোস—এ'র 'আলিবাবা' দেখেছেন তো! ইনি এবার আমার এখানে একটা ছবি করছেন—সেটার বিষয় কথা বলবেন।

আমি বললাম : ও'র নাম আমরা খুব শুনেছি তবে চাক্ষুস আলাপ হয়নি। যাক, কি ছবি করছেন আপনি?

মিঃ বোস বললেন ঃ ছবিটার নাম হল ...নয়'—অবক্ষয়ের গল্প।

আমি বললাম ঃ আমার চরিত্রটা কি ...য় ?

মিঃ বোস গল্পটা মোটামুটি বলে ...র চরিত্রটা বুঝিয়ে দিলেন। ভালই ... আমার চরিত্রটি।

১৮ আগস্ট সই করলাম 'অভিনয়ে'র ...ক্ট্।

এই সময় আদর্শ ফিল্মের 'দলিত কুসুম' ...দিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু ...। আদর্শ ফিল্মের দুই পার্টনার ছিলেন ...লপুরের এম, পি শেঠ গোবিন্দদাস আর ...মিশ্র। এ'দের দুজনের মধ্যে কি একটা ...গোলের জন্যে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল ছবির ...। গোলমাল মিটতে আবার ছবির কাজ ...ম্ভ হলো। এই ছবির পরিচালক ছিলেন ...ট্যাণ্ডন, আর উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন ...ম রাশিয়ান ভদ্রলোক। ছবি তৈরির ...একদিন এক মজার ব্যাপার হলো।

ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল, অনাথ ...মের সম্পাদক মদ্যপান করে একটি ...র ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত। ...য়ান ভদ্রলোক বললেন, দৃশ্যটিকে ...বসম্মত করতে গেলে অভিনেতাকেও ...ু মদ্যপান করতে হবে।

আমি তখন বললাম, এটা মন্দ কথা নয়, ... যদি শটটা পাঁচবার এন, জি, হয় এবং ...ার নিতে হয়, তখন? পাঁচবারই তাকে ...ন করতে হবে তো?

রাশিয়ান ভদ্রলোক বললেন, দেখাই ... না, কি রকম দাঁড়ায়।

মনে মনে বললাম, এতো বেশ ভালো ...ক্টার। এরকম কথা তো কেউ ... না।

সেই মতোই শ্যুটিং আরম্ভ হলো। ...র আসল কথাটা বলি, অনাথ আশ্রমের ...দকের ভূমিকাটা ছিল আমার, আর ... নিতে হয়েছিল বার তিনেক।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে একটা ...ফিট নাইটে আমাকে অভিনয় করতে ...'গৈরিক পতাকায়' আমার ভূমিকা ছিল ...পুরে'। এ-ভূমিকায় এই প্রথম নামলাম।

এর পরের সপ্তাহে অভিনেতা মণি ... 'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ের ...জন করলেন নাট্যনিকেতনে। আমি ...লীচরণের ভূমিকায় নামলাম, আর ...র রায় করলো রমেশ। অভিনয়ে মাঝে ... চরিত্র বদল মন্দ লাগে না।

এই সময় প্রতিদিন রাত্রে 'সরলা'র শ্যুটিং ... ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর। ছবিটির ...জক অবশ্য ভারতলক্ষ্মী নয়—প্রযোজক ...ন যামিনী মিত্র। পুজোর সময় ছবিটি ...জ করতেই হবে, তাই প্রতিদিন শ্যুটিং ..., দিনে এবং রাতে। রাতের শ্যুটিং-এ ...পোকার উৎপাতে কতো যে ফিল্ম নষ্ট হয়েছে তার হিসেব নেই। সন্ধ্যে হতেই কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এই পোকা এসে ভিড় করতো কে জানে। ক্যামেরা চলাকালীন ক্যামেরার সামনেও এই পোকারা আসর জমাতো। এই পোকা মারার জন্যে যামিনী-বাবু একটি অভিনব পন্থা নিয়েছিলেন। বড়ো বড়ো কাগজের সীটে আঠা মাখিয়ে আলোর পাশে রাখা হতো—যাতে পোকারা এই আঠাতে জড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতেও কিছু হলোনা। আর ছবিটি যখন মুক্তি পেল, তখন পর্দার ওপর পোকার চিহ্নও ফুটে উঠলো।

'সরলা'র শ্যুটিং-এ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। পুরো এক রোল ফিল্ম ক্যামেরায় উল্টোভাবে লাগানো হয়েছিল। সেইভাবেই ছবি উঠেছে। ঘটনাটা ধরা পড়লো, ল্যাবরে-টরীতে পরিস্ফুটনের সময়। অগত্যা আবার শ্যুটিং করতে হলো। এই সময় আর এক বিপদ হলো।

পরিচালক চারু রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হঠাৎ মারা গেল। তাঁর স্ত্রী মায়া রায় বাড়ীতে থাকতে পারতেন না—তিনি চলে আসতেন স্টুডিওতে। ঐখানে ফ্লোরের এক ধারে শিল্পীদের বিশ্রামের জন্য একটি ফরাসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত রাত ধরে শ্যুটিং হত। যেসব শিল্পীরা শটের ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেতেন, তাঁরা একটু গড়িয়ে নিতেন এখানে। শ্রীমতী রায়ও এইখানে শুয়ে থাকতেন। এই শোকসন্তপ্ত দম্পতীকে দেখে সত্যিই আমার কষ্ট হত। চারুবাবুর মনের যেরকম অবস্থা তাতে কোন শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয়—তবু ছবির রিলিজের দিন ঠিক হয়ে গেছে, অতএব ছবি যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে।

যাই হোক, এইভাবেই ছবি শেষ হল এবং মুক্তিলাভও করল নির্দিষ্ট দিনে শ্রী সিনেমায় ২১ অক্টোবর।

সেই একই দিনে আরও দুখানি ছবি মুক্তিলাভ করল—একটি হল 'সোনার সংসার' উত্তরায়, অপরটি হল 'বিজয়া' রূপবাণীতে। এই দুখানি ছবির তুলনায় 'সরলা' খুবই নিরেস হয়েছিল।

আমার নট-জীবনের সবচেয়ে নৈরাশ্য-জনক ভূমিকায় নামতে হয়েছিল আমাকে একবার। নতুন নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে সব অভিনেতাই চায়। আমারও কি খেয়াল হল একবার যে 'প্রতাপাদিত্যে' রডার ভূমিকায় নামলে কেমন হয়! এই সময় এক সম্মিলিত অভিনয়ে আমি নামলুম 'রডা'র ভূমিকায় আর আমার 'ভবানন্দ' ভূমিকাটি করলেন নরেশ মিত্র। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি এরকম ফাঁকা হাউস আর তার ওপরে দর্শকদের বিরুদ্ধ সমালোচনা আমার জীবনে বিশেষ জোটেনি।

ওখানে 'কেদার রায়' তখন সগৌরবে ৬০ রজনীর গৌরব লাভ করেছে নাট্য-নিকেতনে। শিশিরবাবু স্টারে খুললেন 'অচলা' (শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-র নাট্যরূপ) ২২ অক্টোবর, ঠিক পুজোর মুখে একে-বারে। এ-নাটকখানি কিন্তু তেমন বেশীদিন চলেনি।

১ নভেম্বর রঙমহলে শেষ প্রদর্শনীর পর থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। ডিরেক্টারদের মধ্যে মতদ্বৈধতাই সম্ভবত এর কারণ।

আপনাদের আগে জানিয়েছি যে, এক জায়গায় বেশীদিন চুপচাপ বসে থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কয়েক মাস বাইরে কোথাও না যাওয়ায় মনটা কিরকম হাঁফিয়ে উঠে-ছিল। তাই ভাবছিলাম যে, কোনো দূরদেশ না হোক, কাছাকাছি কোথাও অন্তত একটা 'শর্ট ট্রিপ' দিয়ে আসতে পারলে মন্দ হয় না।

একদিন সে-সুযোগ জুটে গেল।

আমার এক তরুণ ভক্ত, নামটা তার আজ ঠিক মনে পড়ছে না। তাকে আমরা 'রয়' বলে ডাকতুম। বেশ বড়োলোকের ছেলে, থিয়েটার দেখার দারুণ নেশা। সে থিয়েটার ভাঙার পর প্রায়ই রাত্রে আমার বাড়ী পৌঁছে দিত। বিরাট গাড়ী হাঁকিয়ে সে আসত, নিজেই চালাত, আর বেশ ভালোই চালাত।

একদিন আমি রঙ্গচ্ছলে তাকে বলে-ছিলাম ঃ ছাহে রায়, তুমি তো বড় ভাল চালাও হে। চল না একদিন কাছাকাছি কোথাও একটু 'এক্সকারসান'-এ যাওয়া যাক।

রায় খুশী মনে বললে ঃ বেশ তো চলুন না—কোথায় যাবেন বলুন।

আমি বললুম ঃ বেশী দূরে যাওয়া তো যাবে না—কাছেপিঠে—ধর হাজারিবাগ। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গিয়ে হাজারিবাগ ঘুরে চলে আসা যাক।

রায় শুনেই রাজী হয়ে গেল।

তারপরদিনই আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর যাত্রা করলাম বেলা একটা নাগাদ। রায় নিজেই ড্রাইভ করছিল, আমি আর দুজন সঙ্গী ছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁরা থিয়েটার-বায়স্কোপের বাইরের লোক—আমার বন্ধু।

ধানবাদ পৌঁছলাম রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়। রাত্রিটা ওখানে ডাক-বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন স্নানটান সেরে চা-জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়া গেল বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ। ওখান থেকে বেরিয়ে বাগোড়া পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারটার সময়। ওখানে গিয়ে উঠলুম পি ডবলু ডি বাংলোয়। মধ্যাহ্নভোজন সারলুম ওখানেই—তারপরই বেরিয়ে পড়লুম হাজারিবাগের উদ্দেশ্যে।

ওখান থেকে হাজারিবাগ রোড হল ৩২ মাইল—ওখানে পৌঁছুতে বেজে গেল সাড়ে চারটা।

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সে বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! —চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে......হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে—অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

তাই বলে তুমি সাড়ে তিন টাকা গচ্চা দেবে? হতাশা, রাগ, বিস্ময় সব মিলিয়ে হিস হিস করে উঠল অমিয়। মাস ভোর ট্যুইশনি করে, স্কুলে পড়িয়ে যে কটা টাকা আনব, সব কি এই ভাবেই উড়িয়ে দেবে?

দেখ ঠিক করে কথা বল। একে কি উড়িয়ে দেওয়া বলে? আমি লাক-ট্রাই করেছি। তুমিও কর না? তুমি না এই মাসে সাতটা লটারীর টিকিট কেটেছ? ফি মাসে সাত আট টাকা এইভাবে তুমি ওড়াও না? বল, কোনবার একটা কনসোলেশন প্রাইজ পেয়েছ যে আমায় তুমি শাসাচ্ছ। থমথম করে সারা মুখ-চোখ পূর্ণিমার। হয়তো আরো কিছু বলতে পারলে ফর্সা মুখের উপর আলপনার মত ফুটে ওঠা গোলাপী ছাপগুলো ফিকে হয়ে আসত কিন্তু তার আগেই নটার সাইরেন বেজে উঠল। উনুনে ভাত চাপানো আছে। এইমাত্র বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখেছে অমিয়। পর পর এখন কাগজ পড়বে, দাড়ি কামাবে, কয়েক মগ জল ঢালবে মাথায়। সাড়ে দশটার মধ্যে নাকেমুখে দুটি গোঁজার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সময় নেই। পূর্ণিমা ছুটে গেল রান্নাঘরে।

বারান্দায় থামার ওপর ব্যাটনের মত কাগজটা পড়েছিল। দড়ির গিঁট খুলতেই সপাসপ খান কয়েক ঘা পড়ল পিঠে। আবার শরিকী সংঘর্ষ। চারটে খুন। পে-কমিশন আর ফিনান্স কমিশনারের লড়াই। বিরক্তি না সাইকোলজিতে, দেশগুলো যে কোথায় তাই এখন আর মনে করতে পারে না অমিয়, বিদ্রোহী সরকারের পতন। এক সময় হ হটা মহাদেশের সবকটা ইমপর্টান্ট টাউনের নাম, পপুলেশন সব মুখস্থ ছিল। আর দুয়েক অবলিক বি সি এস-এ বসেছে। এখন সব কেমন গুলিয়ে গেছে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে মধ্যমগ্রাম বা সুভাষগ্রাম কোন লাইনে, চট করে জবাব দিতে পারবে না। বিজ্ঞাপনে বেশ বড় বড় হরফে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। মাসের শেষাশেষি কুঁদঘাটার ট্যুইশনির টাকাটা পাওয়ার কথা আছে। একটা স্টোন নিলে কেমন হয়? এরা তো বলছে হাত দেখাতে ফি লাগবে না। ঠোঁটের কোণটা স্লাইট কুঁচকে গেল। হাসির রেখা বললে ভুল হবে না। এই অমিয় একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে ফুটপাথেশ্বর শিবের মাথায়......। আর আজকাল স্কুলে যাওয়ার পথে রথতলায় মোড়ে নবগ্রহ মন্দিরের সামনে কখন যে হাতদুটো কপালে উঠে আসে টেরই পায় না। কল্যাণ টেস্টে অ্যালাউ হয়েছে। মা গতকাল বিকেলে পূর্ণিমাকে বলে গেছেন। মানে সত্তরটা টাকা। উঃ এক একটা নিউজের দাম কত। কোথায় পাবে টাকা। তাছাড়া বড়দা চিঠি লিখেছেন 'আগামী মাসে আরো তিরিশটা টাকা পাঠাইতে পারিলে ভালো হয়। বড় টানা-টানির মধ্যে আছি।'

ওদিকে স্কুলে তো মাইনে ফিকসড। বি টি নেই তাই দুশো চল্লিশ আর ডি-এ নব্বই, থ্রি ফর্টি। সকাল বিকাল ট্যুইশনি আর কোচিং মিলিয়ে প্রায় দেড়শো আসে। অমিয় পূর্ণিমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বড়দা থাকেন সোনারপুরে। মা বাবা ছোট ছোট ভাই বোনগুলো আছে বড়দার কাছে। কানুনগো বড়দা একলা পারেন না। উপ-যুক্ত ভাই হিসেবে অমিয়রও দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব ইকুয়্যালটু দেড়শো টাকা। আগামী মাসে দেড়শো প্লাস সত্তর প্লাস তিরিশ। মোটমাট আড়াই শো। হে ভগবান। কোথায় পাবে অমিয়? কালীঘাটের এই কার্নিসে ঝোলানো দেড়কামরার ফ্ল্যাটটায় ভাড়াই পঁচাশী টাকা। তাও তিন মাস বাকী পড়েছে। এবার ডি-এর টাকাটা এলে শোধ দিয়ে দেবে। পূর্ণিমার ছোট বোনের বিয়ে সামনে। নিদেনপক্ষে একটা শাড়ি দিতেই হবে। ভাবনা, চিন্তা, ভাগ্য সব মাথায় উঠে গেল। এডভোকেট গোপাল গাড়ীতে উঠছে। অর্থাৎ সাড়ে নটা বেজে গেছে। আর দেরী করা যায় না। দাড়ি আজ না কামালেও চলবে। দু মগ জল মাথায় ঢেলে নিলেই হবে। যা শীত পড়েছে। ঠান্ডায় গাটা শিউরে উঠতেই মনে পড়ল র‍্যাপারটা ছিঁড়ে গেছে। শীতটা কেটে গেলে বুড়ো ইয়াসিনকে বলবে দেড়টা টাকা নিয়ে রিপু করে দিতে।

কি হল, তুমি স্নান করবে না আজ। রান্না রেডি। কলতলায় দাঁড়িয়ে কুলকুচো করতে করতে পূর্ণিমাকে বলতে শুনল অমিয়। ঝাঁঝ মরে নি গলায়। সঙ্গে ফোড়নের সানাই পোঁ ধরেছে। কাসছে পূর্ণিমা। কাশলে বা রাগলে পূর্ণিমার চাপা নাকের ফর্সা টুলটুলে মুখটা বেশ লালচে গোল হয়ে ফুলে ওঠে। তখন বেশ সুইট লাগে ওকে। কিন্তু তাই বলে পূর্ণিমা জুয়ো খেলবে। হাজরার মোড়ে দিনে-দুপুরে হাজার হাজার লোকের সামনে রাস্তায় উবু হয়ে বসে। প্রায়ই বসে খেলে। আজ পূর্ণিমা নিজেই স্বীকার করেছে। অমিয় জানত না। লোকনাথ দেখেছে। স্কুলে টিচার্স রুমে টিফিনের সময় তাই নিয়ে কাল কত টিপ্পুনী কাটল।

বেশ করে জুয়া খেলে, আমার খুশি খেলে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জোরে জোরে বুরুশটা চালাতে লাগল অমিয়। তোর কি? তোকে টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারী পোস্টে ভোট দিই নি বলেই তো যত রাগ। তুই কত বড় নীতিবাগীশ সে আমার জানা আছে। মুখে বড় বড় বুকনি। সংগ্রামী চেতনা, হ্যানা ত্যানা কত কথা। তুই নিজে

"ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং"

যে লটারীর টিকিট বেচিস? হুঃ, জুনিয়ার স্কুলের টিচার, ভালো টুইশনী জোটে না বলে পাঁচ টাকা করে ছাত্রপিছু কোচিংয়ে পড়াস। পড়াস না ঘেঁচু, তোলা আদায় করিস। কন্ট্রাক্ট নিয়ে ছাত্র পাস করাস। আমায় জপানোর কত চেষ্টা করেছিলি। ভেবেছিলি তোর ঐ গালভরা বুকনিতে গলে গিয়ে দলে নাম লেখাব। সে বান্দা অমিয় সেন নয়, জেনে রাখ। দলে ভেড়াতে পারিস নি বলে এখন পেছনে লেগেছিস। লাগ......লাগ, যত পারিস লাগ।

বোঁটা থেকে চুনটুকু দাঁতের ডগায় ছিঁড়ে নিতে নিতে অমিয় গম্ভীর মুখে বলল, ফিরতে রাত হবে। একটা কথাও না বলে পূর্ণিমা ঘরে চলে গেল। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে খবরের কাগজে মোড়া টিফিন কৌটোটা বগলদাবা করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল বিছানা তুলছে পূর্ণিমা। ঠিকে ঝি আজ আসে নি। তাই বাসন মাজতে হবে, ঘর ঝাঁট দিতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, অনেক কাজ বাকী পূর্ণিমার। রোগা শরীরটা একটুও রেস্ট পায় না। দু বেলাই রান্নাবান্না কাচক্যাচি করতে হয়। কতদিন যে ওরা সিনেমা দেখে না।

পূর্ণিমার দাদা ব্যাঙ্কে অফিসার। মাঝে মাঝে যেতে বলেন। থাকেন ভদ্রলোক লেক টাউনে। যেতে পারে নি অমিয়। ইচ্ছে হল বেরোনোর আগে বলে যায় সামনের রোববার আমরা যাব। থাক, এখন নরম হলে পূর্ণিমা পেয়ে বসবে। মান ভাঙানোর সময় নেই। তাছাড়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না অমিয়। একটু আধটু কড়কে দেওয়া ভাল। বৌমানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবার সামনে জুলো খেলবে এটাও বরদাস্ত করতে হবে নাকি? ভাবতে ভাবতে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে এসে আর একবার অভ্যেস মত পিছন ফিরে তাকাল যদি রোজকার মত পূর্ণিমা এসে দাঁড়ায়। না আজ আসে নি। বকাবকিটা তো আর কম হয় নি।

বাসে ঝুললে কোন রাগ বা প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে না অমিয়র। এক হাতে টিফিনের বাকস আর এক হাতে লাইফ। দুটোই সমান দরকার, প্রয়োজনীয়। দুটোই বাঁচানো দরকার। এই সময়টা সব কেমন গুলিয়ে যায়। তখন পাশের যে লোকটা একটা পা চাকার মাথায় রেখে হ্যান্ডেলে লেপটে থাকে সেটাকেও মনে হয় প্রচন্ড শত্রু। না, রাগ না। কেমন একটা আক্রোশ। ঠিক বলে বোঝানো যায় না। কতদিন ইচ্ছা হয়েছে স্টপে বাস ভিড়বার আগে প্রেশারের চাপটা হ্যাঁচকা দোলে পাশের লোকটার গায়ে জুড়ে দিয়ে ওকে ডিরেইল করে দিতে। অথচ বাদামতলার মোড়ে ভিড়ের রাশ একটু থিতুলে ভেতরে ঢুকে চিনতে পারে ভদ্র-লোক পাশের ফ্ল্যাটের বিজনদা, সঙ্গে আছে বিস্কুট কোম্পানীর ফোরম্যান বা পাড়ার গেজেট বুলু, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী। অথচ একটু আগেও লোকগুলোকে চেনা যায়নি। পূর্ণিমাকেই চিনতে পারল না অমিয়।

বন্ধুর বোন থেকে প্রাইভেট টুইশানির ছাত্রী হিসেবে দু বছর প্রবেশনের পর প্রেমিকার পদে প্রমোশন পেয়েছিল পূর্ণিমা। তারপর গত ফুড মুভমেন্টের গুতোগুতি ঠেলাঠেলি মারামারির ডামাডোলের বাজারে কোট প্যান্ট টাই পরা পুরুতের সামনে খাতায় সই দিয়ে বিয়ে পাকা করে তিন বছর সংসারী হয়েছে। পূর্ণিমার বাবা নেই। বড়দাই বাবার মত, পূর্ণিমা বলে। অথচ অমিয় দেখেছে বাবারা কেমন খোলস বদলান। পূর্ণিমার বড়দির স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। সম্বন্ধ করা সাদী। তাই খাতির অনেক বেশী। আর অমিয় যেন যেনো জলে ভেসে আসা কলার পেটকো। স্কুলমাস্টার বলে কিনা, কে জানে।

অথচ পূর্ণিমা কত আশা করেছিল। তখন অমিয় জানত না যে স্কুলে মাস্টারী ছাড়া গতি নেই তার। ডবলিউ-বি-এস-দিয়েছে। নানা ফার্মে ব্যাগ বওয়ার ইন্টারভিউ দিয়েছে একটার পর একটা। বাধবে নিশ্চয়ই একটা। তারপর? ছ সাত শো মাস মাইনে। সোস্যাল স্ট্যাটাস প্রেসটিজ। তিন বছরে সাজানো ফ্ল্যাটে বাহারী টবে ডালিয়া হয়ে উঠত পূর্ণিমা। শুদ্ধ নির্মল বাতাসের মত পরিচ্ছন্ন টুকটুকে ডালিয়ার চারপাশে আদরের পরশ বুলিয়ে যেত অমিয়। অথচ সবই কেমন অর্থহীন বিস্বাদ হয়ে গেল।

কথা ছিল পূর্ণিমা বি-এ, পড়বে। গান শিখবে। গলাটা ওর বেশ মিষ্টি লাগত অমিয়র। কতদিন গোয়ালিয়র মনুমেন্টের ঢাকনায় বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচবার জন্য আশ্রয় নিয়েছে। খালি গলায় শাদা বরফ কুচির মত লাখ লাখ বৃষ্টির দানায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত পূর্ণিমা।

সেই সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল। অমিয় বা পূর্ণিমা আর কোন দিনও ফিরে যাবে না সেই স্বপ্নের মত সুন্দর দুধের চৌচালায়। এখন শুধু চারদিকে কর্তব্য, দায়িত্ব আর প্রতিজ্ঞা পালনের দুঃস্বপ্ন। সবই পালন করতে হবে অমিয়কে। আর পারে না বলেই যেদিন লোকনাথ এসে বলল-- টিকিট কিনবে লটারীর? সেদিনই টিফিনের খরচা ওর হাতে তুলে দিয়ে এক টাকায় রাজা হওয়ার পাসপোর্টের দখল নিয়েছিল অমিয়। তারপর থেকেই লোভটা কেমন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

পরিশ্রম করে যে কর্তব্য-দায়িত্বের থাই মেটাতে পারবে না, অমিয় তা জেনে গেছে। তাই যেমন মাসের শুরুতে মাসকাবারী আনে, ঠিকে ঝির মাইনে দেয়, লন্ড্রীর বিল মেটায়, তেমনি খান সাত আটেক লটারীর টিকিটও কেনে। কোনদিন যদি সেই অঘটন ঘটে যায়— ঘটেও তো। এই তো সেদিন হরিয়ানা স্টেট লটারীর চার লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজ পেল একজন স্কুলমাস্টার। চার লাখ। ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকাতেই সব চলে যাবে হেসে খেলে।

ব্যাপারটা লাকপ্রাই মানে, ইয়ে—জুয়া! তাই হয়তো, হ্যাঁ, তাই। সবাই জানে অমিয়ও

জানে। কিন্তু বিধিবদ্ধভাবেই তো সব প্রদেশ থেকেই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এতে। কোটি কোটি দরিদ্র মানুষকে কাজের পুরস্কার দিতে না পেরে অদৃষ্টের পানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অমিয় কি করবে? সব জেনেও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়েও সে ফি মাসে টিকিট কেনে। কেনে অন্যান্য কলিগরাও। আর কমিশন পায় লোকনাথ। সেই লোকনাথই খবরটা এনেছে। গতকাল পূর্ণিমা জুয়া খেলছিল হাজরার মোড়ে।

রথতলায় নবগ্রহ মন্দিরের রেলিংয়ে ঢিপ করে মাথাটা ঠুকে একটা পাঁচ নয়া প্রণামীর থালায় ছুঁড়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এগারোটা বাজতে আর দেরী নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে অমিয়। শুনতে পাচ্ছে স্কুলের ঘণ্টা। ছুটতে ছুটতে র‍্যাপার, ধুতির কোঁচা, টিফিন বাক্স, পকেটের পেন, খুচরো সব সামলাতে সামলাতে ঠিক করল ফেরার সময় ব্যাপারটা কী, সে বিষয়ে একটু খোঁজ নিতে হবে।

ট্রাম চলছে, বাস চলছে। ট্যাক্সি, লরী, টেম্পো, ঠেলা, রিক্সা আর পদাতিক মিছিলে যেন মেলা বসে গেছে হাজরার মোড়ে। চার পাশে রেলিংয়ে, দেয়ালে টাঙানো স্টেট লটারীর স্টলের ওপাশেই বসেছে জুয়ার আসর। লাল, হলুদ, সবুজ বাতিটার তলায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ উদাসীনভাবে চেয়ে আছে জনস্রোতের দিকে। অমিয় ভীড়ের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল।

সাজিয়ে রাখা প্লাস্টিকের সোপ কেস, টিফিন বাক্স, ফাউনটেন পেন, পাউরুটি কাটা ছুরি, ছবি, আয়না, সেফটি রেজর, স্টোভ, ইলেকট্রিক ইস্ত্রী। চটের উপর থরে থরে সাজানো। প্যাকিং কেসের উপরেও উপচে পড়েছে। দুধারে দাঁড়িয়ে দুই দোকানী সার্কাসের খেলুড়ের মত প্রাণপণে চেচাচ্ছে— দু নয়া, দু নয়া, মাত্র দু নয়া। দু নয়াতেই ভাগ্য পরীক্ষা। কী না পেতে পারেন—সোপ কেস থেকে ফ্লাস্ক, আয়না থেকে স্টোভ বা ইস্ত্রী। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দ সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

পঞ্চাশটা ছোট ছোট তাসের মত টিকিট। প্রতি টিকিটের গায়ে নম্বর সাঁটা— এক, দুই, তিন, দশ, কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ। দাম টিকিট পিছু দু পয়সা। যত খুশী কেন। ইচ্ছা হয় পঞ্চাশটাই নাও একজনে। মাত্র এক টাকা লাগবে।

খেলা জমে গেছে। একটা সেলোফেন ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলো হোমওপ্যাথী পুরিয়ার মত ভাঁজ করা কাগজের টুকরো। টুকরোগুলো বেশ কয়েকবার নাড়া চাড়া করে দুই খেলুড়ের একজন ভিড়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছে যে কেউ ইচ্ছে এর ভেতরে হাত চালিয়ে একটা পুরিয়া তুলে নিন। একটা বাচ্চা ছেলে টানল। পুরিয়া খুলে সবাইকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— সতরা। কার নম্বর সতেরো, খোঁজ খোঁজ। সবাই যে যার টিকিট মেলাতে লাগল। দেখা গেল এক কাবুলী-ওয়ালার টিকিটের নম্বর সতেরো। নম্বর মিলে গেছে। পুরস্কারও নগদ নগদ দিয়ে দেওয়া হল— প্লাস্টিকের সোপ কেস।

প্রতিদানেই মুহূর্তে পঞ্চাশটা টিকিট বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। কেউ কিনছে পাঁচটা, কেউ দশটা কেউ কেউ বিশ ত্রিশটা। ফি বারই হয় আয়না বা সোপ কেস উঠছে। ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিকেল ধূসর হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল। জ্বলে উঠল কার্বাইডের নল। রাস্তা একটু ফাঁকা হয়েছে। ট্রামগুলো যেন হাঁটছে। হু হু করে রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে ফাঁকা সরকারী বাস। টুং টাং বাজছে রিক্সার ঘণ্টা। হঠাৎ হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই খেয়াল হল অমিয়র আজকে আর টুইশানিতে যাওয়া হল না। তিনটি ঘণ্টা যে কোথা থেকে কেটে গেছে টেরও পায়নি। তিন ঘণ্টায় প্রায় সত্তর বার নিজেই খেলেছে। গোটা পাঁচেক টাকা গচ্চা দিয়ে তিনটি সোপ কেস আর একটা আয়না জুটেছে। অথচ স্টোভ ইস্ত্রী বা ফ্লাস্ক কাউকেই পেতে দেখেনি। সত্তর বারে সত্তর টাকা হাতিয়ে নিয়েছে খেলুয়াড়েরা। বদলে বড় জোর কুড়ি বাইশ টাকার প্রাইজ দিয়েছে। লোভ—অভাবী মানুষের দুর্বলতম জায়গাটায় ঘা দিয়ে দিয়ে খেলুড়েরা সবটুকু রস নিংড়ে নিচ্ছে। শুষে নিচ্ছে দারিদ্র্যের শেষ সঞ্চয়টুকু।

সকাল সন্ধ্যে এই শহরের মোড়ে মোড়ে শয়ে শয়ে জুয়া পার্টি লক্ষ লোকের চলার পথ জুড়ে বসছে। এক টাকার লটারীর টিকিটে খেলা যাবে একবারেই। সেখানে জোর কম্পিটিশন—ত্রিশ চল্লিশ লাখ লোকের মধ্যে। সিকে ছিঁড়বে কজনার কপালে? আর এই দু পয়সার লটারীতে পঞ্চাশজনের মধ্যে এক জন হওয়া কি খুব কঠিন। আর স্টেট লটারীর একটা টিকেটের দামে কম করেও পঞ্চাশবার খেলা যাবে এখানে। পঞ্চাশবারে একটা স্টোভ বা ইস্ত্রী, নিদেনপক্ষে একটা সোপকেসও তো জুটে যেতে পারে।

এক সন্ধ্যার টুইশান কামাই করে অমিয় বুঝেছে, কেন পূর্ণিমা জুয়া খেলেছে। লাক-ট্রাই করার রসিকতাটুকু কখন উবে গিয়ে জেদ আর নেশার প্রেতদুটি ঘাড়ে ভর করে বসে তা তো নিজেই টের পায়নি। যদি সামান্য দুটো একটা ঘর সংসারের প্রয়োজন এই ভাবেই পূর্ণিমা মেটাতে চায় তাতে কি খুব দোষ দেওয়া যায়?

সারাটা দিনের ক্লান্তিতে, অবসাদে র‍্যাপারটা যেন চটের থলি হয়ে উঠেছে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল পূর্ণিমা কেন সারাটা দেশই আজ জুয়ায় মেতে উঠেছে। দেশ মানে তো অমিয়, পূর্ণিমা। এদের বাদ দিয়ে তো নয়। সবাই লটারীর টিকিট কিনছে—এক টাকার বা দু পয়সার। যে যার সাধ্য ও সাধ মত।

—সং বৎসু

বিজ্ঞানের কথা

পর্যায় সারণীর শতবার্ষিকী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্বের ইতিহাসে একদিকে যেমন বহু প্রতিভাধর মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছিল। একশো বছর পরে আজ আমরা সেইসব মনীষীর শতবার্ষিকী একে একে উদযাপন করছি। আমাদের দেশে আচার্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের জন্ম শতবার্ষিকী ইতিমধ্যে উদযাপন করেছি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি সাম্প্রতিককালে ডি এন এ (ডিঅক্সি রিবোনিউক্লিক এ্যাসিড) এবং পর্যায় সারণী (পিরিয়ডিক টেবল) আবিষ্কারের শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চিন্তা করে এসেছে, এই বিশ্ব-জগৎ কয়েকটি মৌলিক পদার্থ বা উপাদান দিয়ে গঠিত। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালের ভারতীয় পন্ডিতগণ মনে করতেন—বিশ্ব-জগৎ ক্ষিতি (মাটি) অপ (জল), তেজ (শক্তি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (মহাকাশ) এই পাঁচটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। গ্রীক পন্ডিতগণ বলতেন, মৌলিক পদার্থ হচ্ছে চারটি—মাটি বায়ু, জল ও আগুন।

মৌলিক পদার্থ বা মৌল সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হতে হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ রসায়নবিদ্ জন ডালটন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিলেন। তিনি বললেন— মৌল বলতে বোঝায় এমন এক পদার্থ যা ভেঙে আলাদা ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যাবে না। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, রুপো, তামা, লোহা ইত্যাদি (বর্তমান কালে অবশ্য আমরা জেনেছি, মৌলিক পদার্থ ভাঙা যায় না একথা বলা চলে না। কারণ, মৌল ভেঙেই পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি)।

একে একে বহু মৌল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে চেষ্টা চললো—বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট মৌলগুলিকে কি-ভাবে সাজিয়ে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যিনি প্রথম মৌলগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন তিনি হচ্ছেন জার্মান রসায়নবিজ্ঞানী ডোবে-রাইনের। তিনি দেখলেন—ক্যালসিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম, বেরিয়ামের মতো অনেকটা একই ধরণের তিনটি মৌলকে যদি পর পর সাজানো যায়, তাহলে মাঝখানের মৌলটির পারমাণবিক ভর হবে অপর দুটি মৌলের ভরের গড়ের প্রায় সমান। কিন্তু এভাবে মৌলগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা বহুক্ষেত্রেই সম্ভব হল না। এর পর ১৮৬৪ সালে বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ডস্ অন্য একভাবে মৌলগুলির শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করলেন। পারমাণবিক ভর অনুসারে তিনি মৌলগুলিকে একটি সারণীতে সাজালেন। তাতে দেখা গেল—যে কোন একটি মৌল থেকে শুরু করে গুণে গেলে অষ্টম মৌলটির ধর্ম হয় প্রথমটির অনু-রূপ। গানের সুরের ক্ষেত্রে যেমন অষ্টম সুরটি প্রথমটির অনুরূপ হয়, এটা প্রায় সেইরকম। এই নিয়মটিকে বলা হয় 'অষ্টক সূত্র'। এর দুবছর আগে ফরাসী ভূবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার চাঁকার্তো দেখেন—মৌল-গুলিকে তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজিয়ে একটি সারণী তৈরী করা যায়, যার একই উল্লম্ব স্তম্ভে পড়ে যেসব মৌল, তাদের ধর্ম প্রায় একরকম। কিন্তু দুজনেরই ভাগ্যে তখন শুধু অবজ্ঞা ও বিদ্রূপই জুটেছিল। তাঁরা কেউই তখন তাঁদের প্রস্তাব প্রকাশ করতে পারেননি। বহু বছর পরে যখন পর্যায় সারণীর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত হল, তখন তাঁদের গবেষণা-পত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এমন কি, নিউল্যান্ডস্ স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন।

এর পাঁচ বছর পরে (১৮৬৯-৭০) রুশ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ এবং জার্মান-বিজ্ঞানী লোথার মায়ার স্বতন্ত্রভাবে মৌল পদার্থের একটি সারণী প্রস্তুত করেন। তাঁরা যে রীতি অনুসরণ করেন তা চাঁকার্তো এবং নিউল্যান্ডস-এর অনুরূপ। কিন্তু মেন্ডেলিফই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করলেন, কারণ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি তাঁর মতামত ঘোষণা করেছিলেন।

মেন্ডেলিফ তাঁর সারণীর নাম দেন পর্যায় সারণী, কারণ এতে রাসায়নিক ধর্মের পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এই সারণীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, এটি নিউ-ল্যান্ডস্-এর সারণী থেকে জটিলতর এবং আজ যে পর্যায় সারণীকে আমরা যথাযথ মনে করি এটি সেই সারণীর প্রায় কাছা-কাছি। দ্বিতীয়ত মৌলগুলির পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজাতে গিয়ে যেসব জায়গায় তাদের ধর্মের (রাসায়নিক ও ভৌত) বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল সেখানে তিনি
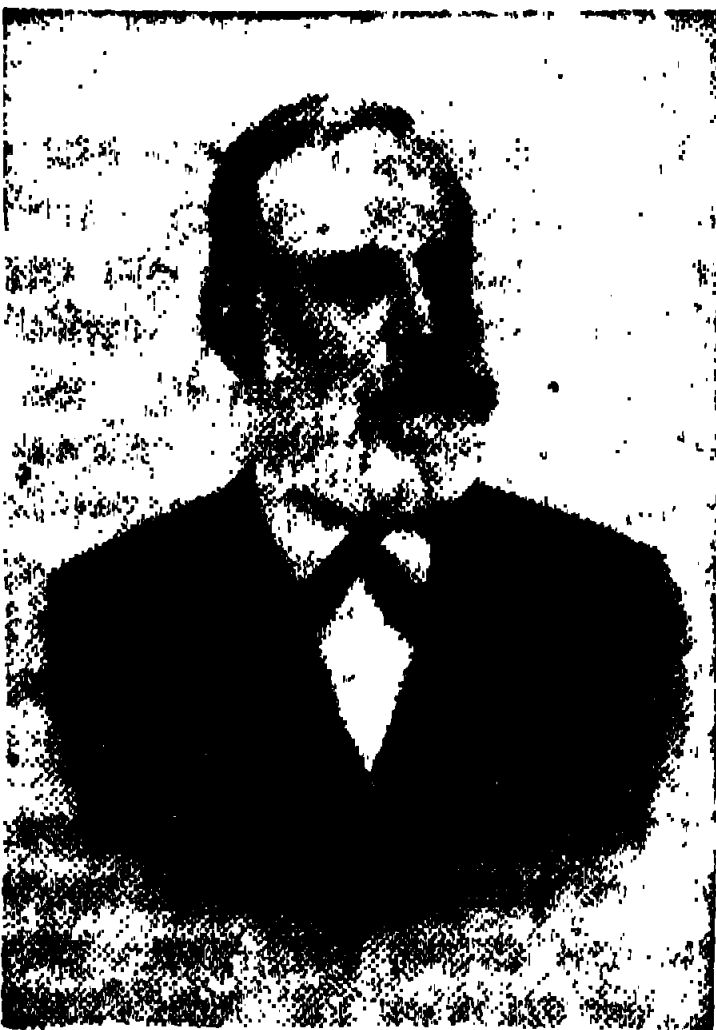
জার্মান বিজ্ঞানী লোথার মায়ার

রুশ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ

দক্ষতার সঙ্গে এই ক্রমবিন্যাসকেই স্বীকার করলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, পারমাণবিক ভরের চেয়েও বস্তু ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি। পরবর্তীকালে তাঁর এই অভিমত যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

মেন্ডেলিফ তাঁর পর্যায় সূত্র রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। আর লোথার মায়ার তাঁর পর্যায়-সারণী প্রকাশ করেন জার্মান ভাষায় ১৮৭০ সালে। লোথার মায়ারও মৌলের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী মৌলগুলিকে ক্রমিকভাবে তাঁর সারণীতে সাজিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞানী কানিজ্জারো প্রস্তাবিত মৌলগুলির পারমাণবিক ভর অনুসরণ করলে সারণীতে একটা পর্যায়ক্রম দেখা যায়।

মেন্ডেলিফ যখন তাঁর পর্যায় সারণী প্রস্তুত করেন তখন আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ছিল ৬৩। তিনি এই মৌলগুলিকে তাদের ভর অনুযায়ী তাঁর সারণীতে সাজালেন। তাঁর এই সারণীতে রয়েছে কতগুলি আনুভূমিক ঘর। এক-এক ঘরে বসানো হল এক একটি মৌল। সবচেয়ে লঘু বা হালকা মৌল হাইড্রোজেনকে বসানো হল সারণীর এক নম্বর ঘরে। আর সে সময়ে জানা সবচেয়ে ভারী মৌল ইউরেনিয়ামের স্থান হল একেবারে শেষ ঘরে। আনুভূমিক ঘরের কয়েকটি নিয়ে নামকরণ হল পিরিয়ড বা পর্যায়। এক, দুই, তিন করে গুণে সাত পর্যন্ত ঘরে এক একটি মৌল বসিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করা হয় এই সারণীতে। লক্ষ্য রাখা হয়, অনেকটা একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলগুলি যেন পর-পর উপর-নিচে স্থান পায়। একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলগুলিকে নিয়ে এক-একটি গ্রুপ বা শ্রেণীর সৃষ্টি হল। আবার যেসব মৌলের ধর্মে খুবই সাদৃশ্য, দেখা যায় তাদের পারমাণবিক ভর খুবই কাছাকাছি। তাই তাদের বসানো হল একসঙ্গে একই ঘরে। এরা হল অষ্টম শ্রেণীর মৌল। এরপর নিষ্ক্রিয় মৌল (হিলিয়াম, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন, নিয়ন ইত্যাদি) আবিষ্কৃত হলে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল নবম শ্রেণীতে। এই মৌলগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা নেই বলে আগে ভাবা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য এদের কিছু ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে) এজন্যে এই শ্রেণীর নামকরণ করা হয় শূন্য শ্রেণী। আধুনিক পর্যায় সারণীতে শ্রেণী আছে ৯টি এবং পর্যায় আছে ৭টি।

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, সারণীতে যেসব জায়গায় বিন্যাস করতে গিয়ে মেন্ডেলিফ অন্য কোন উপায় পেলেন না, সারণীর সেইসব জায়গায় ফাঁক রাখতে তিনি একটুও দ্বিধা করেননি। অসীম সাহসিকতা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন, ভবিষ্যতে এমন কোন মৌল আবিষ্কৃত হবে যেগুলি দিয়ে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করা যাবে। তিনি আরো এগোলেন। তিনটি শূন্য স্থানে কি কি মৌল থাকতে পারে তা ঐ স্থানের নিচের উপরের মৌলগুলির ধর্ম আলোচনা করে তিনি নির্দেশ করলেন।

মেন্ডেলিফের সৌভাগ্য—তাঁর জীবদ্দশায় নির্দেশিত মৌল তিনটির প্রত্যেকটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তাঁর বিন্যাস পদ্ধতির সাফল্য তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। ১৮৭৫ সালে ফরাসী রসায়নবিদ লেকক্ দ্য বয়বদ্র' এই তিনটি হারানো মৌলের প্রথমটি আবিষ্কার করেন এবং এর নাম দেন 'গ্যালিয়াম' (এই কথাটি ফরাসী দেশের লাতিন নাম)। ১৮৭৯ সালে সুইডিশ রসায়নবিজ্ঞানী লার্স ফ্রেডরিক নীলসন দ্বিতীয় মৌলটি আবিষ্কার করলেন এবং এর নাম দিলেন 'স্ক্যানডিয়াম' (স্ক্যানডিনেভিয়ার নামানুসারে)। আর ১৮৮৬ সালে জার্মান রসায়নবিদ ক্লেমেন্স আলেকজান্ডার ভিঙ্কলের তৃতীয় মৌলটি আবিষ্কার করে তার নাম দিলেন 'জার্মানিয়াম' (জার্মেনীর নামানুসারে)। মেন্ডেলিফ কথিত ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে এই তিনটি মৌলের ধর্ম হুবহু মিলে গেল। এরপর মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর দিকে সারা বিজ্ঞান-জগতের দৃষ্টি পড়লো।

এক্স রশ্মি আবিষ্কারের সঙ্গে পর্যায়-সারণীর ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হল। ১৯১১ সালে বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী চার্লস বার্কলা আবিষ্কার করলেন—কোন ধাতুখন্ড থেকে এক্স-রশ্মি বিক্ষিপ্ত হলে ঐ বিক্ষিপ্ত রশ্মির যে ভেদনশক্তি দেখা যায় তা অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং ঐ ধাতুখণ্ডের ওপর নির্ভর করে। তারপর ১৯১৪ সালে তরুণ বৃটিশ পদার্থবিদ হেনরী মোজলে বিভিন্ন ধাতু থেকে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করলেন। এথেকে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন তা হল এই যে, পর্যায় সারণীর বিভিন্ন মৌল ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করবার সময় দেখা যায় ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি একটি অতি সুনির্দিষ্ট নিয়মে হ্রাস পেয়ে থাকে।

এই সমস্ত থেকে পর্যায় সারণীতে মৌলগুলির অবস্থান একেবারে স্থির হয়ে গেল। যেমন, দুটি মৌলের অবস্থান পাশাপাশি হবে বলেই মনে হল। কিন্তু এগুলি যে এক্স-রশ্মি উৎপন্ন করে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যবধান ঈপ্সিত ব্যবধানের প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত হল, এই মৌল দুটির মধ্যে নিশ্চয় একটা ফাঁক থাকবে, যেটি কোন অ্যাবিষ্কৃত মৌলের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। যদি ঐ ব্যবধান ঈপ্সিত ব্যবধানের প্রায় তিন গুণ হয় তবে বুঝতে হবে সে মৌল দুটির মাঝখানে আরও দুটি মৌলের স্থান রয়েছে। আবার যে সব ক্ষেত্রে মৌল দুটির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক্স-রশ্মির মধ্যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঈপ্সিত পার্থক্যের সমান, সেখানে নিশ্চয় করে বলা যাবে মৌল দুটির মধ্যে কোন অজানা মৌল নেই।

এরপর মৌলগুলির প্রত্যেকটিকে একটি সংখ্যা দিয়ে সূচিত করা সম্ভব হল। এর আগে পর্যন্ত একটা সন্দেহ ছিল, কোন বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করে মৌলগুলি চিহ্নিত করলেও নতুন কোন মৌলের আবিষ্কারে হয়তো সেই পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। এখন কিন্তু আর সে অনিশ্চয়তা রইলো না।

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা মৌলগুলিকে ১ (হাইড্রোজেন) থেকে ৯২ (ইউরেনিয়াম) পর্যন্ত সংখ্যায় চিহ্নিত করতে শুরু করলেন। পরে দেখা গেল, এই পরমাণু ক্রমাঙ্কগুলি পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং পারমাণবিক ভরের চেয়েও এদের গুরুত্ব বেশি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, এক্স-রশ্মির উপস্থিতি থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, মেন্ডেলিফ টেলুরিয়ামকে (যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৫২) আয়োডিনের (পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৫৩) আগে বসিয়ে ঠিকই করেছিলেন (যদিও টেলুরিয়ামের পারমাণবিক ভর আয়োডিনের তুলনায় বেশি)।

মোজলের নতুন পদ্ধতির মূল্যায়ন হয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী জর্জেস উরব্যাঁ 'লুটেসিয়াম' মৌলটি আবিষ্কার করেন। পরে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'সেলটিয়াম' নামে আর একটি মৌল তিনি আবিষ্কার করেছেন। মোজলের নিয়ম অনুসারে লুটেসিয়াম ২৭ সংখ্যক মৌল এবং সেই অনুযায়ী 'সেলটিয়াম' হওয়া উচিত ৭২ সংখ্যক। কিন্তু 'সেলটিয়ামে'র বৈশিষ্টমন্ডিত এক্স-রশ্মি অনুসন্ধান করে মোজলে দেখলেন, মৌলটি আসলে লুটেসিয়ামই। ৭২ সংখ্যক মৌল প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কৃত হয় ১৯২৩ সালে। ওলন্দাজ পদার্থবিজ্ঞানী ডির্ক কোস্টার এবং হাঙ্গেরীয় রসায়ন বিজ্ঞানী ফন হেভেসি কোপেনহাগেন গবেষণাগারে এটির সন্ধান পান এবং নাম দেন 'হাফনিয়াম' (কোপেনহাগেনের লাতিন নাম)।

১৯২৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ভালটার নোডাক, ইডা টাকে এবং [illegible] বার্গ পর্যায় সারণীর আর একটি শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। যেসব আকরে তাঁদের ঈপ্সিত মৌলটি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল সেগুলি নিয়ে তিন বছর নিরলস গবেষণার পর তাঁরা ৭৫ সংখ্যক মৌল আবিষ্কার করেন এবং রাইন নদীর সম্মানে এর নাম দেন 'রেনিয়াম'।

আর বাকি রইলো চারটি শূন্য স্থান—৪৩, ৬১, ৮৫ এবং ৮৭। এই চারটি মৌল খুঁজে বার করতে আরও কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। রসায়ন বিজ্ঞানীরা অবশ্য তখন বুঝতেও পারেন নি, তাঁরা স্থায়ী মৌলের সবশেষেরটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বাকি চারটির প্রত্যেকটিই হচ্ছে অত্যন্ত অস্থায়ী মৌল। আজকের পৃথিবীতে তারা এমনই দুষ্প্রাপ্য যে একটি বাদে আর সবগুলিকেই গবেষণাগারে সৃষ্টি করে তবে পাওয়া গেছে।

চারটির মধ্যে প্রথম যেটিকে গবেষণাগারে সৃষ্টি করা হয় সেটি হচ্ছে ৪৩ সংখ্যক মৌল। এটি মানুষের তৈরী প্রথম মৌল বলে এর নাম দেওয়া হয় 'টেকনিসিয়াম' (গ্রীক শব্দের অর্থ কৃত্রিম)। এরপর ১৯৩৯

সালে ৮৭ সংখ্যক মৌলটি প্রকৃতি থেকেই আবিষ্কৃত হয়। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের ভাঙনে উপজাত অংশগুলির মধ্য থেকে এটিকে পৃথক করেন ফরাসী মহিলা রসায়নবিদ মার্গুরেরাইত পেরে এবং তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সের নামানুসারে এর নাম দেন 'ফ্রান্সিয়াম'। ১৯৪০ সালে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হয় ৮৫ সংখ্যক মৌল 'অ্যাস্টেটাইন' (গ্রীক শব্দের অর্থ অস্থায়ী)। চতুর্থ এবং সর্বশেষ অনাবিষ্কৃত ৬১ সংখ্যক মৌলটি সৃষ্ট হয় ১৯৪৫ সালে এবং এর নাম দেওয়া হয় 'প্রমিথিয়াম' (গ্রীক দেবতা প্রমিথিউসের নামানুসারে)।

এইভাবে শেষপর্যন্ত ১ থেকে ৯২ সংখ্যা পর্যন্ত সকল মৌলের তালিকাটি সম্পূর্ণ হল। আবার এক দিক থেকে দেখতে গেলে এই ব্যাপক অভিযানের বিচিত্রতম অধ্যায় শুরু হল এরপর। কারণ বিজ্ঞানীরা পর্যায় সারণীর সীমানা অতিক্রম করে অগ্রসর হলেন এবং দেখলেন ইউরেনিয়ামই পর্যায় সারণীর সর্বশেষ মৌলনয়। তখন বিজ্ঞানীরা ট্রান্স-ইউরেনিয়াম মৌল অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলগুলির অন্বেষণে গবেষণায় ব্যাপৃত হন এবং তার ফলে আবিষ্কৃত হয় একের পর এক মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম মৌল। আজ পর্যন্ত ১০৪ সংখ্যক মৌলের সন্ধান গবেষণাগারে পাওয়া গেছে। কিন্তু এটিই সর্বশেষ মৌল কিনা কে জানে!

—প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

।। পনের ।।
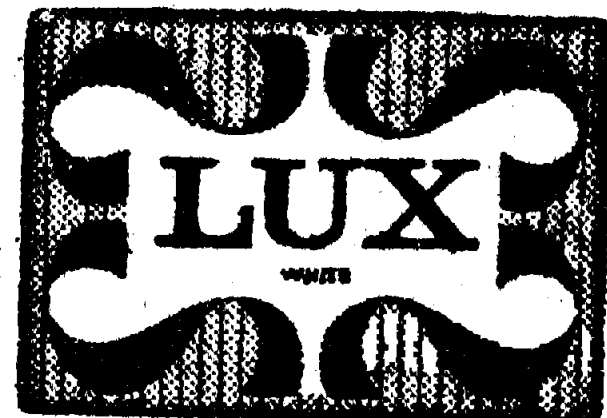
দরজা খুলে নীলাদ্রি অবাক হল।

অজানা, অচেনা কাউকে হঠাৎ দোর-গোড়ায় দেখলে লোকে যেমন বিস্মিত হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, নীলাদ্রিও ঠিক তাই করল। আগন্তুক সম্পূর্ণ অপরিচিত,—অজ্ঞাতকুলশীল। আগে কোনোদিন লোকটিকে দেখেছে বলে তার মনে হল না।

'—আপনি? কোথা থেকে আসছেন?' নীলাদ্রি সরাসরি প্রশ্ন করল।

আগন্তুক একটু হাসল। তার পরনে সাদা সার্ট, খাকী ফুলপ্যান্ট। পায়ে চকচকে সু-জুতো। চোখে সানগ্লাস। চশমার কাচের রঙ কাঁচ কিশলয়ের মত সবুজ।

লোকটি স্পষ্ট বলল—'আমি থানা থেকে আসছি।' মুহূর্তে নীলাদ্রির চোখে বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয় দেখা দিল। ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধোল,—'থানা থেকে আসছেন?'

—'হ্যাঁ', চোখের উপর থেকে চশমাটা নামিয়ে আগন্তুক বলল, 'আমি সি আই ডি ইন্সপেকটর রাজীব সান্যাল। একটু ভিতরে গিয়ে বসতে পারি?'

—'ও, হ্যাঁ। আসুন, আসুন।' নীলাদ্রি এবার অভ্যর্থনা করল।

দরজা পেরিয়ে দু পা এগোলেই বাঁ দিকে একখানা ঘর। সম্ভবত এটাই নীলাদ্রির ড্রইং রুম। বাইরের লোকজন এলে এখানেই বসে-টসে, ঘরের মধ্যে খান দুই-তিন বেতের চেয়ার। একটা টেবিলও রয়েছে। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে মাঝারি সাইজের কাঁচের আলমারি। তার মাথার উপরে একটা টাইমপীস। আলমারির তিনটে তাক, দুটো তাকে আলতোভাবে সাজানো অনেক বই, উপরের তাকটায় বই নেই। দু-চারটে পুতুল। একটা ওষুধের শিশি, টুকিটাকি আরো কটা জিনিস রয়েছে।

নীলাদ্রি সেন ব্যাচেলর। ছোট একখানা বাসা ভাড়া করে থাকে। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কলকাতায় তার বাবার একটা ছোট গাড়ি আছে। নীলাদ্রির মা বেঁচে নেই। বছর পাঁচেক আগে তিনি মারা যান। তারা তিন ভাই। বড় হিমাদ্রি ইনজিনিয়ারিং পাশ করে ইংলন্ডে গিয়েছিল। সেখান থেকে ক্যানাডায় চলে যায়। আজ দশ বারো বছর হল দেশছাড়া। আর কোনোদিন ঘরে ফিরে আসবে বলে কেউ মনে করে না। নীলাদ্রি মেজ, ছোট সোমাদ্রি এম-এ পড়ছে। সামনের বছর পরীক্ষা দেবে। আজ বছর চারেক হল নীলাদ্রি পলাশপুরে এসেছে। এর আগে অন্য একটা কলেজে ছিল। সেটা জেলাশহর নয়, মহকুমাও নয়। আরো মফস্বল। ট্রেন থেকে নেমে ফের বাসে যেতে হয়। প্রায় পঁচিশ মাইল রাস্তা। পলাশপুরে নীলাদ্রির ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনা করার ভার একজন গৃহভৃত্যের উপর। লোকটা বুড়ো এবং সে এখানকার নয়, খাস কলকাতা থেকে আমদানী। নাটক-থিয়েটারে মত্ত ছেলের সেবা-পরিচর্যা করার জন্য বাপই সঙ্গে দিয়েছে।

প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে এর বেশী খবর সংগ্রহ করা যায় নি। তবু কলেজ থেকে বেরোবার সময় রাজীবের মনটা খুশি-খুশি ছিল। আপাতত, এইটুকু যথেষ্ট। অধ্যক্ষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বাড়ির ঠিকানা বলেছেন। পথের নির্দেশ মাত্র দিয়েছেন। মাত্র নীলাদ্রির চেহারার

একটা ছোট্ট বর্ণনা পর্যন্ত। দরজা খুলতেই ওকে চিনতে রাজীবের কষ্ট হয়নি।

চেয়ারে বসে রাজীব বলল, 'নীলাদ্রিবাবু একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম। জানলাম কদিন হল আপনি কলেজে যাচ্ছেন না। মাঝে হঠাৎ কলকাতায় গিয়েছিলেন।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল,—'আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে নীলাদ্রিবাবু। এমন বিমর্ষ কেন?'

নীলাদ্রি মুখের ভোল বদলাবার দ্রুত চেণ্টা করে বলল, —'চিন্তিত হব কেন? ও কিছু নয়।' ভদ্রতাসূচক সে একটু হাসল। —'বলুন, আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

রাজীব মনে মনে হাসল। লোকটা অভিনেতা, তাতে সন্দেহ নেই। এক মুহূর্তেই কেমন হাসিমুখ করে ফেলল। কে বলবে একটু আগেই 'মেঘে ঢাকা সূর্যের মত ওর মুখটা কালো হয়েছিল?

—'দেখুন নীলাদ্রিবাবু। শুরুতেই একটা কথা আপনাকে বলে নিই।' রাজীব ভনিতা করল। 'খুব জটিল একটা কেস আমার হাতে এসেছে। এবং সেই কেসে আপনিও জড়িত। পুলিশের কাছে কিছু তথ্যও আছে। তবে আপনাকে বিপদে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।' ঈষৎ হেসে রাজীব বলল,—'আপনার কাছ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। আশা করি আপনি পরিষ্কার উত্তর দেবেন।'

লোকটার ভাষা কেমন চাঁচাছোলা। একটা জুজু দেখানোর হুমকি আছে। আহত অনুভব করলেও নীলাদ্রি তাই নিয়ে প্রতিবাদ জানাল না। 'কি বিষয়ে জানতে চান বলুন?' সে ঠান্ডা গলায় কথা কইল।

রাজীব বলল,—'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম নীলাদ্রিবাবু। আসলে আমার প্রশ্নগুলো খুব ব্যক্তিগত। হয়ত আপনার কানে একটু মন্দই শোনাবে। কিন্তু এর উত্তর জানা পুলিশের খুব প্রয়োজন।' একটু থেমে সে যোগ করল,—'যদি এড়িয়ে যান, কিংবা উল্টো-পাল্টা উত্তর দেন, তাহলে কিন্তু আপনারই ক্ষতি হবে।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করে রাজীব ধূমপান করতে উদ্যোগী হল। নীলাদ্রিকেও অফার করল। কিন্তু সে বলল,—'সরি, আমি খাই না।'

রাজীব একটু কাঁধ বাঁকিয়ে ফের চেয়ারে গা ঢেলে দিল। বলল, 'নীলাদ্রিবাবু, আপনি নীপা রায়কে নিশ্চয় চিনতেন?'

প্রশ্নটি ছোট। কিন্তু গভীর অর্থবহ। বেশ তীক্ষ্ন। নীলাদ্রি তা বুঝতে পারল। তবু অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে সে জবাব দিল, —'হ্যাঁ, নিশ্চয়। চিনতাম বৈকি।'

রাজীব হেসে বলল,—'শুধু চিনতেন?'

—'তার মানে?' নীলাদ্রি ভ্রু কুচকে তাকাল, 'কি বলতে চান আপনি?'

—'নীলাদ্রিবাবু,' রাজীব ফের হাসল। —'আমি যা বলতে চাই তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। মিসেস রায়ের সঙ্গে আপনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। একথা আমরা জেনেছি।'

তবু নীলাদ্রি তেজ দেখাল। 'আলাপ-পরিচয় থাকা মানেই ঘনিষ্ঠতা নয়। মিসেস রায় আমাদের কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ভালো অভিনয় করতেন, টাউন ক্লাবের নাটকে তাই আমরা ওকে হিরোইনের রোলে নামতে অনুরোধ করি।'

রাজীব মুচকি হাসল। 'ব্যস! এই পর্যন্তই? আর কিছু বলবেন না?'

নীলাদ্রি বিরক্ত সুরে তাকাল, 'আবার কি বলব? আর কি বলার আছে মশায়?'

—'আছে বৈকি।' রাজীব বাঁ-চোখটা ছোট করল। বলল,—'নীলাদ্রিবাবু, কোনো এক শনিবারের কথা বলব আপনাকে?'

—'শনিবারের কথা?'

—'হ্যাঁ, আপনি আর মিসেস রায় শিমুলপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠলেন। প্রথম-শ্রেণীর যাত্রী দুজনে। কামরায় একজন মাত্র লোক ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি কেউ ছিল না। সেই লোকটির সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে ট্রেনের কামরায় আপনি একটি কান্ড করলেন। বিবাহিতা ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানির পক্ষে তা যথেণ্ট।' কথা শেষ করে রাজীব ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসল। পরে নীলাদ্রির মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল,—'এর থেকেই বুঝতে পারবেন পুলিশ আপনার গতিবিধির উপর কতখানি নজর রেখেছে।'

নীলাদ্রির বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। গোপনীয় কোনো কাজে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে মুখের চেহারা যেমন শুকনো, কালিবর্ণ হয়ে ওঠে, নীলাদ্রিকে তেমনি দেখাল। আশ্চর্যের কথা ট্রেনের কামরার ব্যাপারটা পুলিশ জানল কেমন করে?

অনেকক্ষণ পরে নীলাদ্রি বলল,—'তাহলে আর মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছেন কেন? পুলিশ তো সবই জানে দেখছি।'

রাজীবের মুখে বিজয়ীর গর্ব ফুটে উঠল। 'জানলেও পুলিশ সেটা মিলিয়ে দেখতে চায় নীলাদ্রিবাবু। আর সে জন্যই আপনাকে প্রশ্ন করা। অবশ্য আপনি যদি সহযোগিতা করেন, তাহলেই প্রচেষ্টা ফল হতে পারে।'

নীলাদ্রিকে অবসন্ন দেখাল। মনটা এখন আর লঘু নয়, আগের মত হাওয়ায় ভাসছে না। একটা চুপসানো, বায়ুশূন্য খেলনা—বেলুনের মত ভারী। ক্লান্তভঙ্গীতে সে বলল,—'আমি স্বীকার করছি মিঃ সান্যাল। নীপার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওর বিয়ের আগেই আমাদের প্রথম পরিচয়, এবং তখনই আমি ওকে ভালবাসতাম। পলাশপুরে নীপাকে দেখে আমার ভালবাসা পুরাতন ব্যাধির মতই বেড়ে উঠল। আবার আমি গভীরভাবে ওর প্রেমে পড়লাম। কিন্তু ভালবাসলেও নীপা শেষ পর্যন্ত আমার প্রেমের মর্যাদা রাখে নি।'

রাজীব একটু চিন্তা করে বলল,—'সোমবার দিন আপনি কলেজে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। প্রথম ক্লাশটাও নেন নি। এবং সেদিনই কলকাতা চলে যান। তেমন কোনো কারণ ঘটেছিল নিশ্চয়?'

—'আমি সব কথা আপনাকে বলব মিঃ সান্যাল, কিছুই গোপন করব না।' নীলাদ্রি তার গালে, গলায় চোখের উপর বাঁ-হাতের করতল বুলিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে চাইল।

বলল,—'সোমবার দিন কলেজে গিয়েই আমি একটা টেলিফোন পেলাম।'

—'টেলিফোন?'

—'হ্যাঁ।' নীলাদ্রি চিন্তিত মুখে তাকাল। 'টেলিফোন ধরেই আমি খুব অবাক হলাম। কারণ নারীকণ্ঠ। মেয়েটিকে আমি চিনি না, জানি না। সেও তার পরিচয় ভাঙল না। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হল, আমাকে সে ভাল করে চেনে। এমন কি নীপার সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্কের কথাও সে জানে।'

—'তারপর?' রাজীব সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল।

—'মেয়েটি বলল, নীপা আমাকে স্মরণ করেছে। এখনই, এই মুহূর্তে আমার যাওয়া দরকার। না গেলে নীপা চটবে। হয়ত মেয়েটিকেও ভুল বুঝবে। তবু আমার মনে খটকা লেগেছিল মিঃ সান্যাল। কিন্তু প্রেম একটা অদ্ভুত, বিচিত্র জিনিস জানবেন। অন্ধমোহের কাছে যুক্তি-বিচার জড় পাথর হয়ে যায়। নীপার আহ্বান উপেক্ষা করার মত আমার শক্তি ছিল না। সেই মুহূর্তেই কলেজ থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম।'

কথা শেষ করে নীলাদ্রি চোখ বুজল। সম্ভবত সে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে ফের তাকাল। বলল,—'মিঃ সান্যাল, সেদিন দৌড়ে নীপার ওখানে না গেলেই বোধ হয় ভালো করতাম। গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তারপর আমার আর মাথার ঠিক রইল না।'

—'কি দেখলেন বলুন?' রাজীব সহাস্যে তাকাল।

—'আপনি দেবরাজ মিত্রকে চেনেন? টাউনক্লাবের নাটকের হিরো? সদর দরজা বন্ধ দেখে আমি রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে একবার উঁকি দিয়েছিলাম মিঃ সান্যাল। দেখলাম নীপা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে। আর দেবরাজ ওর খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। নীপার বাঁ হাতের আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে দেবরাজ ফিস ফিস করে কথা বলছে।' নীলাদ্রি হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে আবার বলল,—'এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পর আমি আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ালাম না। মাথাটা কেমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। একটা চলতি রিকশ পেয়ে উঠে বসলাম। বাড়িতে

এসে কোলিও ব্যাগে দু-একটা জিনিস ভরতে যা দেরি হল। যাবার সময় চাকরটাকে বললাম,—'কলকাতা যাচ্ছি। ফিরতে দু-চার দিন দেরি হবে। কেউ এলে বলিস।'

এবার রাজীবকে চিন্তিত দেখাল। হাতের কাছে অ্যাশ-ট্রে নেই। আলগোছে সিগারেটের মুখের ছাইটুকু সে টেবিলের এককোণে ঝেড়ে রাখল। বলল,—'আচ্ছা, তারপর সেই মেয়েটি আপনার সঙ্গে ফের যোগাযোগ করেছিল নাকি? আর কোনো টেলিফোন পেয়েছিলেন?'

—'না, আর টেলিফোন পাই নি। তবে একটা চিঠি পেয়েছিলাম।'

—'চিঠি?'

—'হ্যাঁ, বুধবার দিন বেলা তিনটে নাগাদ আমি একবার কলেজে যাই। তখন বেয়ারা আমাকে চিঠিটা দিল।'

—'চিঠিখানা আছে আপনার কাছে?'

—'হ্যাঁ।' নীলাদ্রি ঘাড় কাত করল। চট করে উঠে আলমারির মাথার উপর থেকে সে চিঠিখানা নিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে রাজীব সেটি নিল। খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে পত্রখানি সে পকেটে ভরল। বলল,—'এখানা আমার কাছে থাক। কিন্তু আমি আর একখানা চিঠি খুঁজছি নীলাদ্রিবাবু। আপনি আর কোনো চিঠি পান নি?'

—'না তো।' নীলাদ্রি সরলভাবে বলল।

—ঠিক বলছেন তো?' রাজীব সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। পরক্ষণেই স্বগতোক্তির মত সে বলল,—'বাট হোয়্যার ইজ দ্যাট মিসিং লেটার?'

চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগে রাজীব বলল,—'নীলাদ্রিবাবু মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ। আচ্ছা বুধবার দিন সন্ধ্যের পর আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'কেন বলুন তো? বাড়িতেই ছিলাম। মন-মর্জি আর দেহ দুটোই অচল হয়ে পড়ল, তাই রিহার্সালে যেতেও ইচ্ছে হয় নি।'

—'হুম্।' রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। একটু পরে সে বলল,—'আচ্ছা, অপানার বাবার নাম শ্রীঅমিয়মাধব সেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাঁর পেশা ডাক্তারি। পশার ভালো। —আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর চেম্বার। নিজের গাড়ি আছে।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' নীলাদ্রি একটু ভয় পেয়ে বলল। 'কিন্তু আমি ভাবছি—'

রাজীব হেসে বলল,—'কি ভাবছেন নীলাদ্রিবাবু?'

নীলাদ্রি ঢোক গিলে বলল,—'ভাবছিলাম আপনি এতসব কথা জানলেন কেমন করে? আর আমাকেই বা এতক্ষণ ধরে নানা প্রশ্ন করছেন কেন?'

—'কেন প্রশ্ন করলাম আপনি আন্দাজ করুন না—'

নীলাদ্রি মুখ নীচু করে বলল,—'নীপা সুইসাইড করেছে বলেই কি এত কথায় প্রয়োজন হল?'

—'ঠিক তা নয়।' রাজীব ফের সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'আচ্ছা মিসেস রায় কেন আত্মহত্যা করলেন বলতে পারেন? আপনার কি মনে হয়?'

—'কি জানি?' নীলাদ্রি হতাশভঙ্গি করল। 'নীপা ফিল্মস্টার হতে চেয়েছিল মিঃ সান্যাল। হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

—'ভাবলেও এর উত্তর মিলবে না। কারণ নীপা দেবী আত্মহত্যা করেন নি।' তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নীলাদ্রির মুখের উপর চোখ রেখে রাজীব বলল,—'মিসেস্ রায় খুন হয়েছেন এবং সেই খুনীকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

সংবাদটা বজ্রপাতের মত নিদারুণ। হতবাক নীলাদ্রিকে ফের কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে রাজীব ঘর থেকে বেরোল।

খুনের সংবাদ শুনে অবিনাশ সমাদ্দার রীতিমত হৈ-চৈ শুরু করল। রাজীব একা নয়, তার পিছনে সুব্রত দাঁড়িয়ে। ঘরে পুলিশ দেখেই অবিনাশের চক্ষু ছানাবড়া হবার জোগাড়। নীপা খুন হয়েছে শুনে সে কলরব শুরু করে দিল।

ধমক দিয়ে রাজীব বলল,—'ফালতু চেঁচামেচি করে একটা সীন ক্রিয়েট করবেন না। আমি যা জানতে চাই তার জবাব দিন।'

অবিনাশ কিন্তু থামল না। সে আগের মতই চেঁচিয়ে বলল,—'ওরে বাবা। কি সাংঘাতিক খবর। মিসেস রায় খুন হয়েছেন? শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ইন্সপেকটরবাবু। এই সেদিনও যে আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন। কে এই সর্বনাশটি করল স্যার?'

রাজীব ফের ধমকাল। 'এত ছটফট করছেন কেন বলুন তো? চুপ করে বসুন না। সর্বনাশটি কে করল তাই তো আমি জানতে চাই।'

ধমকে এবার কাজ হল। অবিনাশ শান্ত হয়ে বসল। দেবরাজ একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'দুজনে মিলে মেয়েটার পিছনে এমন ছিনেজোঁকের মত লেগেছিলেন কেন? কি মতলব ছিল আপনাদের?'

অবিনাশ দাঁত বের করে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—'কি যে বলেন স্যার। আমরা কেন ওনার পেছনে লাগতে যাব?'

—'বাজে কথা রাখুন।' রাজীব গম্ভীর-মুখে বলল। 'বুধবার রাত্তিরে নীপা রায়ের বাড়িতে কখন গিয়েছিলেন?'

অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'নীপাদেবীর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম? কেন স্যার?'

—'সেই কথাটাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।' রাজীব মুখ বিকৃত করল। একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে সে ফের বলল,—'বাড়ির চাকরটাকে যাত্রা শোনার লোভ দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেবার অন্য কি মানে হয় বলুন?'

সুব্রত তাকিয়ে দেখল অবিনাশের চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ছে। বেশ বোঝা যায়, সে বেজায় নার্ভাস হয়েছে। নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছে না।

টিপ্পনী কাটার মত সুব্রত বলল,—'এদের বরং থানায় নিয়ে চলুন রাজীবদা। তাহলেই সব কথা বের হবে।'

থানার নাম শুনেই অবিনাশ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। বলল,—'বিশ্বাস করুন স্যার। আমার কোনো দোষ নেই। ওই দেবরাজই যত নষ্টের গোড়া। কাল সন্ধ্যে-বেলায় ও আমাকে একটা পত্র দেখাল।'

—'পত্র?' রাজীব ভ্রূ কোঁচকাল।

—'পত্র মানে ইয়ে তেমন কিছু নয়। স্রেফ একটা চিঠি। মিসেস রায় ওকে রাত নটার সময় যেতে লিখেছিলেন।' অবিনাশ ফিক করে একটু হাসল।

—'দেখি চিঠিখানা।' রাজীব প্রায় আদেশ করল।

দেবরাজ দেরি করল না। চিঠিটা তার জামার পকেটেই ছিল। হাত ঢুকিয়ে বের করতে সময় লাগল না।

রাজীব এক রকম ছোঁ মেরেই সেটা ওর হাত থেকে তুলে নিল। প্রথমে সে খামটা দেখল। তারপর চিঠিখানা পড়ল। বিড়-বিড় করে নিজের মনে বলল,—'আই সী, দ্যাট মিসিং লেটার।'

চিঠিখানা বেমালুম পকেটস্থ করে সে দেবরাজের দিকে তাকাল।—'এটা নিশ্চয় কেউ আপনার হাতে দিয়ে যায় নি?'

—'আজ্ঞে না। নীচে ডাকবাকসে চিঠিখানা পড়েছিল। নিশ্চয় পিওন ফেলে দিয়ে গেছে।'

—'উঁহু।' রাজীব একটু হাসল। 'ভালো করে লক্ষ্য করেন নি। নইলে দেখতেন খামের উপর পোস্টঅফিসের শীলমোহর নেই। একটা পুরানো ডাকটিকিট কেবল সাঁটা রয়েছে।'

দেবরাজ ইতস্তত করে মুখ খুলল। 'একটা কথা বলব স্যার?'

—'নির্ভয়ে।' রাজীব অভয় দিল।

—'দোষ আমার মানছি। কিন্তু অবিনাশ আমাকে গাছের উপর তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নিতে চাইছে স্যার।'

—'এর মানে?' রাজীব তার বিরাট হাঁ-মুখটা একবার খুলেই ফের বন্ধ করল।

দেবরাজ বলল—'অবিনাশ আমাকে বরাবর বলেছে, নীপাদেবীকে একবার সিনেমা লাইনে নিয়ে ফেলতে পারলেই হল। ব্যাস্ আর দেখতে হবে না। পুরানো দিন-টিনগুলো ফুসমন্তরে ভুলে যাবেন। স্বামী-সংসার সব পূর্বজন্মের কথা বলে মনে হবে। মিসেস রায়কে দিতে হবে বলে ও আমার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়েছে স্যার!'

'আড়াই হাজার টাকা?' রাজীব চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'এত টাকা উনি আপনার কাছ থেকে চেয়েছিলেন নাকি?'

—'চেয়েছিলেন বৈকি। সত্যি বলছি স্যর,—ঈশ্বরের দিব্যি।' অবিনাশ মুখটা করুণ করল। —'তবে আড়াই হাজার নয়,—দু হাজার টাকা। ওর নাকি বিশেষ দরকার ছিল। ফিল্মের নায়িকা হতে উনি রাজি ছিলেন স্যর। দু হাজার টাকা আগাম দিতে বলেছিলেন।'

—'হুম।' রাজীবের মুখের উপর চিন্তার ছায়া ঘনাল। সে বলল,—'টাকাটা কি দিয়েছিলেন ওকে?'
অবিনাশ নিরুত্তর।

রাজীব হেসে বলল,—'থাক আর উত্তর চাইনে। টাকাটা দেন নি শুনলে আপনার বন্ধু আবার ফেরৎ চেয়ে বসবে।'

অবিনাশ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,—'দেবরাজ এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। কিন্তু আপনি বলুন। আমি কি কোনো বাজে কথা বলেছি? স্টুডিওর ফ্লোরে এক-আধবার তো গিয়েছেন স্যর? ঐ আলোর ছটা চোখে লাগলে ঘর-গেরস্থালির টিমটিমে বিজলিবাতির কথা কোন মেয়ের মনে থাকে?'

রাজীব কিন্তু হাসল না। বর্ষার মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার মতই তার মুখটা গোমড়া হয়ে রইল। বিরক্ত মুখে সে বলল,—'বাজে কথা রাখুন। এখন আসল কথার জবাব দিন দিকি।' চোখ ঘুরিয়ে রাজীব বলল,—'বুধবার দিন ওখানে কখন গেলেন? কত রাত্তির?'

দেবরাজ আর অবিনাশ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। —'কথা চেপে গেলেই বিপদ আছে অবিনাশবাবু।' রাজীব দুজনকেই সতর্ক করল।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি শুরু করে দিল। 'বলছি স্যর। নিশ্চয় সব কথা বলব। আপনার কাছে লুকোলে চলবে কেন? সাড়ে নটার আগেই আমরা দুজনে বেরোবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। কিন্তু নটার পরই কি রকম বৃষ্টি নামল জানেন তো? রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা জল। মাঝে মিনিট পাঁচেকের জন্য একটু কমেছিল। আমি বললাম,—দেবরাজ এত রাত্তিরে না যাওয়াই ভালো। বেকায়দায় পড়লে পাড়ার ছেলেদের হাতে ধোলাই খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা,—রাতদুপুর হলেও যাবে।'
—'তারপর?'

অবিনাশ ঠিক নাটকের সংলাপ বলছিল। 'আমরা যখন বাড়ির কাছে এলাম, তখন রাত্তির প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। জল থামল বটে, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে তেমনি মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। দু-চার পা এগোতেই রাস্তার উপর আমরা একটা সাদা রঙের বস্তুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বিদ্যুতের আলো পড়তেই সেটা স্পষ্ট হল। একটা লোক স্যর। সেও জলে প্রায় আধভেজা। গায়েমুখে চাদর মুড়ি দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুতের আলোয় সে আমাদের দেখল। আর পরমুহূর্তেই একরকম দৌড়ে পালাল।' অবিনাশ বার দুই কেশে গলা পরিষ্কার করল। বলল,—'লোকটা ছুটে পালাতেই আমার কেমন ভয় করল স্যর। চারপাশে গা ছম-ছম করা ঘন অন্ধকার। হঠাৎ আমার মনে হল এই মাত্তর যে একটু দৌড়ে অদৃশ্য হল, সে মানুষ তো? দেবরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, সেও ভয় পেয়েছে। আমরা আর এক মুহূর্তও দেরি করলাম না স্যর। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ফিরলাম।'

ঘটনাটা রাজীব ঠিক বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে বলল,—'অবিনাশবাবু, আপনার কলকাতার ঠিকানাটা বলুন তো?'

—'কলকাতার ঠিকানা?' অবিনাশ আমতা আমতা করল। 'কেন স্যর? ওটা আবার কেন জানতে চাইছেন?' রাজীব ব্যঙ্গ করল, 'কেন মশায়? ঠিকানা দিতে অমন ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ঘরের মধ্যে বোমা-টোমা আছে নাকি?'

অবিনাশ বোকার মত হাসল। 'কি যে বলেন।' এবং তারপরই সে সুড়সুড় করে তার ডেরার সন্ধান দিল।

থানায় ফিরে রাজীব দেখল, চৈতি চাকলাদার তার অপেক্ষায় বসে। সে একা আসে নি, সঙ্গে একজন যুবকও এসেছে।
সুব্রত ফিস-ফিস করে বলল,—'মেয়েটার সন্ধান কোথায় পেলেন রাজীবদা?'

কোথায় আবার?' রাজীব একটু হেসে বলল, 'চিত্রতারকার গোপন কথায় ওর নাম খুঁজে পেয়েছি।'

নিরিবিলি একটা ঘরে বসে রাজীব চৈতিকে ডেকে পাঠাল। একটু পরেই চৈতি ঘরে এল। সে একাই,—তার সঙ্গীটি বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

একনজরে রাজীব ওকে দেখল। রঙ কালো, কিন্তু দেখতে শুনতে মন্দ নয়। চেহারায় একটা চটক আছে। বেশ স্মার্ট বলেই মনে হল।

রাজীব সোজাসুজি বলল,—'সোমবার দিন নীলাদ্রিবাবুকে কলেজে টেলিফোন করেছিলেন কেন?'

সে ভেবেছিল অভিযোগ শুনেই চৈতি চমকে উঠবে। কিন্তু মেয়েটি তাকে অবাক করল। একটু হেসে সে বলল,—'ওমা, আপনি জানলেন কেমন করে?'

—'পুলিশের লোক অনেক খবর জানে।'

চৈতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—'নীপাদি আত্মহত্যা করে সকলকে দুঃখ দিয়েছেন। আমাকেও। আজ আমার কোন রাগ-রোষই নেই। কিন্তু তখন আমি নীপাদির নামে রেগে টঙ্। যেমন করে হোক, ওকে জব্দ করতে চেয়েছি।'

রাজীব হেসে বলল,—'নীলাদ্রিবাবুকে লেখা চিঠিখানা তাহলে আপনিই হাতিয়ে-ছিলেন? ফের সেটা বুধবার দিন বিকেলে দেবরাজের বাড়ির ডাকবাক্সে গলিয়ে দেন।'

চৈতি কোন উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে হাসল।

রাজীব বলল,—'আপনার সঙ্গে কে এসেছে?'

—'হরিপ্রকাশ,—ও ডাক্তার,— এখানেই হাউস-সার্জন আছে।'

—'ডাক্তার?' রাজীবের মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে উঠল। মুখখানা একটু বাড়িয়ে সে বলল, —'ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

চৈতি লজ্জা পেল। সে মুখ নামিয়ে হাসল। বলল,—'ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।'

—'বিয়ের ঠিক হয়েছে?' রাজীব এবার সোজা হয়ে বসল। 'কেন, দেবরাজ? তাকে নিয়েই তো নীপাদেবীর সঙ্গে আপনার খচাখচি হয়?'

চৈতি স্পষ্ট বলল,—'দেবরাজকে বিয়ে করা বোকামি। ও হল রাজপুত্তুর। আমার মত কালো মেয়েকে বিয়ে করলে ওর মন ভরবে কেন? সারা জীবন পস্তাবে।' ঠাট্টা করে সে ফের বলল,—'ওর জন্য রাজকন্যা আসবে। কুঁচবরণ রাজকন্যা।'

রাজীব কয়েক সেকেন্ড ভাবল। সে শুধোল,—'চৈতি দেবী, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব?'

চৈতি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

রাজীব হেসে প্রশ্ন করল,—'হরিপ্রকাশ আপনাকে খুব ভালবাসে, তাই না?'

এমন কথার জবাব দিতে কোনো মেয়ে পারে না। বিশেষ করে একজন পুরুষ-মানুষের কাছে। চৈতি আরক্তমুখে বসে রইল।

রাজীব ফের বলল,—'আচ্ছা, আপনার জন্য ও সব কিছু করতে পারে? সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে, তাই না?'

এবার চৈতি মুখ তুলে তাকাল। 'তা পারে। কিন্তু ওর বিপদ হবে জানলে তেমন কাজে ওকে কখনও পাঠাতে পারি না। এমন কি আমার জন্যেও না,—তেমন মেয়েই নই আমি।'

ওর উত্তর শুনেই রাজীব খুশি। একটা দিক থেকে সে নিশ্চিন্ত এখন। সে দিকটা পরিষ্কার, আলোময়।

(ক্রমশঃ)

হঠাৎ ॥

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আমি তো তোমার জন্যে আছি'
এই শব্দ শুনে আমি অনন্ত নির্ভর বাঁচি
বাঘের মতন জেদে হাত রাখি অরণ্যের বুকে।
পাহাড়ের শিখরে বিদ্যুৎ। কী দুর্মর সুখে
জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসে সমস্ত অতীত
বিকল শবের মতো। কুটিরের ভিৎ
মাটির দেওয়াল চেনামুখ শৈশবের কাল
সব শান্ত দিন নাচে উদ্দাম উত্তাল।

মৃত্যু ॥
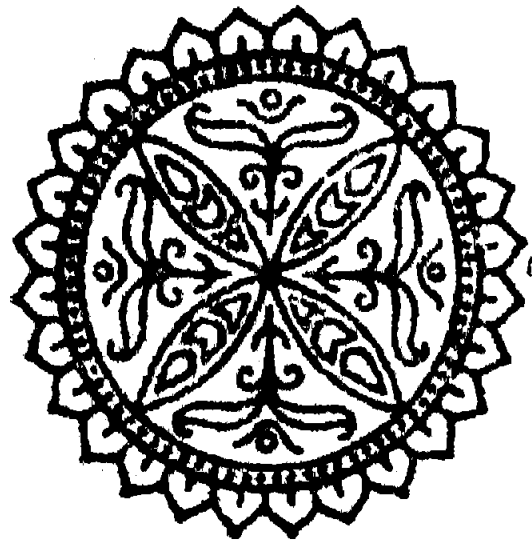
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ঘুমে গাঢ়তম ঘুমে অবলুপ্ত আছি শীত ঋতু
বর্ষা বা বসন্তে গ্রীষ্মে শীতের খোলস খুলে রেখে
লোকায়ত আনন্দের আমন্ত্রণে, বুকের গভীরে
কোনো ইচ্ছা তরঙ্গিত হলো না
একান্ত উৎসবের
কোনো প্রিয় ঋতু রক্তে মঞ্জরিত হলো না আমার
ঘুমে গাঢ়তম ঘুমে অচেতন পৃথিবীর বুকের উপরে
শংকিত শিথিল নগ্ন পা ফেলে পা ফেলে
আত্মগোপ[illegible] স্বাদ
বুকে টেনে নিতে [illegible]
মানুষের অফুরান প্রয়াসের পথে
স্খলন পতন ত্রুটি অগণন, তথাপি সা[illegible]না
সার্থকতা মানুষেরই ইতিহাস রচনা করেছে
জেনেও বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডের পিচ্ছিল বালিশে
তাঁর নিদ্রারত রূপ সমাসন্ন শীতঋতু গাঢ়তম ঘুম
সর্বাঙ্গে জড়ায় আমি চূর্ণ হবো জেনেও তাঁহার
আলিঙ্গনে সমর্পণ করেছি নিজেকে, জীবনের
স্বাদ পেতে এই আত্মসমর্পণ বড়ো প্রয়োজন
মরণের উদরস্থ প্রিয়তম দেহ—এই বোধ
আমাদের নিয়ে যেতে পারে শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে
শুদ্ধতম চেতনায় তাঁহার স্বরূপ যতো স্থির ফুটে ওঠে
ততো আত্মা শ্বেত পুণ্য পাখা মেলে অন্ধকার থেকে
অনন্ত সূর্যের দিকে উড়ে যায়
পৃথিবীর সংকীর্ণ পরিধি
ততো প্রসারিত হতে থাকে
ততো বড়ো হয় অক্ষির গোলক
আবিশ্ব পায়ের পাতা ছড়িয়ে সে প্রকৃতির মতন উদার
বিশাল গভীর হতে পারে
এই পৃথিবীর অনুপরমাণু
আত্মার জনক শেষ আশ্রয় জেনেই পৃথিবীকে
আপনার ক্ষুদ্র বুকে তুলে নিতে পারে
মৃত্যুই গোপন চাবি
খুলে দেয় অবরুদ্ধ বোধের দরোজা

সাগর জলের আগুন

বনবিহারী মোদক

অসময়ের বৃষ্টি-বাদল আর দুর্যোগের ঘনঘটায়, সন্ধ্যে হতে না হতেই সেদিন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঝোড়ো হিমেল হাওয়ার গুরুগর্জন আর বৃষ্টির ঝাপটা মাথায় নিয়েই বুড়ো লোকটি প্রায় পড়ি-কি মরি করে ছুটে চলেছে রেস্ট হাউসটার দিকে। হাতের বালতি-ভর্তি দুধ যে ছলকে পড়ছে—সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। নাবিক আর নৌ-সেনাদের এই সরাই-খানাটায় সে তো আজ প্রায় তিন বছর যাবৎ রোজই দুধ দিচ্ছে। সমুদ্রের ধারের পথটাও তো তার কাছে নতুন বা অচেনা নয়। কিন্তু, আজ এ কী ভয়ানক ব্যাপার! ওরে বাপ রে বাপ!

বারান্দা পেরিয়ে, দরজা ধাক্কানোর সময় আজ আর তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। রসুইঘরের হুকুম-খাটা ছোকরাটা দরজা খুলে দিতেই তার মুখ থেকে শুধু একটা কথাই উচ্চারিত হল—"আগুন! আগুন!"

—"এই বিষ্টির মধ্যে আগুন? ক' বোতল টেনেছ, বাবা রসরাজ? এই মদেই তুমি মরবে, বুঝেছ?"

ভয়ে, উত্তেজনায় দুধওয়ালা বুড়োটা তখন কাঁপছে। এমন অসম্ভব ভুতুড়ে কান্ড ও' বাপের জন্মেও দেখে নি। ছোকরাটার এই অবিশ্বাস আরও দিশেহারা করে তুলল ওকে।

"কই রে; কি হল? আর একটা বোতল বের করতে তোর এতক্ষণ লাগছে!" —বলতে বলতে নৌ-সেনাদের একজন রসুইঘরের দিকেই এগিয়ে এল। বুড়োর কথা তারও কিন্তু বিশ্বাস হল না। তারপর বুড়ো যখন হাউ-মাউ করে চিৎকার করে, দিব্যি কেটে বার বার বলতে লাগল: আয়েজী আড্ডা ছেড়ে আরও জনকয়েক রংরুট তখন কৌতূহলী হয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কোথায় আগুন গো খুড়ো?

—সমুন্দুরে গো বাবু, সমুন্দুরে! উঁরি বাব্বা।

—ওঃ, জলে আগুন? হো হো হো...

সমবেত অট্টহাসি আর ঠাট্টার দাপটে বেচারা বুড়োটা ততক্ষণে কেঁদেই ফেলেছে। ওদের বিশ্বাস করানোর আর কোনো উপায় না দেখে, বৃষ্টি-বাদলকে ভ্রূক্ষেপ না করেই সে একজনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে অন্যেরাও মজা দেখার লোভে তাদের পিছু নিল।

কিন্তু একি! নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সভয়ে দেখল—সমুদ্রের জল দাউদাউ করে জ্বলছে! খানিকটা জায়গায় একটুখানি আগুন নয়; যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, সমুদ্রের সর্বত্রই ভয়ঙ্কর আগুন! আগুনের আভায় আকাশটা পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

দেখতে দেখতেই সারা তল্লাটে তুমুল হুলুস্থুল পড়ে গেল। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ সবাই ছুটল জাহাজঘাটার দিকে। সাংঘাতিক একটা মহাপ্রলয় ঘটতে চলেছে মনে করে, আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ছুটোছুটি ও চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। কেউ বলল—নোঙর-করা জাহাজগুলোতে পিপে-ভর্তি যত পেট্রোল ছিল, সেগুলো নিশ্চয়ই জলে পড়ে আগুন ধরে গিয়েছে। অতি-বিজ্ঞ ধরনের কেউ কেউ আবার ঘোষণা করল—এ সবই শত্রু পক্ষের পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কাজ। সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র; পুড়িয়ে সব শেষ করে দেবার প্ল্যান! হুঁ হুঁ বাবা।

খুব বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র চব্বিশ বছর আগেকার ঘটনা। উত্তমাশা অন্তরীপের পশ্চিম উপকূলে সাইমন্স টাউন নামে যে ছোট্ট শহরটি আছে, সেটাই এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের ঘটনাস্থল। শুধু দু-চারজন লোকের দৃষ্টি-বিভ্রম বা মিথ্যা গুজব রটনা নয়: "দক্ষিণের জিব্রাল্টার" নামে আখ্যাত এবং বৃটিশ নৌ-ঘাঁটি প্রধান এই শহরটির অজ্ঞ-বিজ্ঞ তাবৎ মানুষই সেদিন সারারাত ধরেই জ্বলন্ত সমুদ্র প্রত্যক্ষ দেখেছিল! তখন এর কারণ সম্পর্কে সংবাদপত্রের পাতায় হরেক রকম আজগুবি ও অলৌকিক ব্যাখ্যারও ছড়াছড়ি দেখা গিয়েছিল।

আসল রহস্যটা ফাঁস হতেও অবশ্য দেরি হয় নি। হতবুদ্ধি ও ভীত মানুষদের অভয় দিয়ে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করে-ছিলেন—'নকটিলুকা' নামক অতি ক্ষুদ্র এক রকম জীবই এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের কারণ। এক কোষবিশিষ্ট ও গোলাকৃতি এই প্রাণীগুলোর শরীরে চাবুকের মতো ছোট একটা শুঁড় বা লেজ থাকে। ওটার সাহায্যেই ওরা জলের মধ্যে নড়াচড়া করতে পারে। কখনও কখনও কোটি কোটি পোকা দলবদ্ধ হয়ে সাগরজলে ভেসে বেড়ায়। এদের দেহের ফসফরাসের উজ্জ্বল 'আলোয় গোটা সাগরটাই তখন তরল আগুনের মতো দেখায়। এই জল, বালতি ভর্তি করে তুলে এনে ঘরের মধ্যে রাখলে, ঘরটা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠতে পারে! কখনও কখনও একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরেই সমুদ্রের জলে এ রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এটা মোটেই অলৌকিক বা ভুতুড়ে ব্যাপার নয়; এতে ভয় পাবারও কিছু নেই।

।।২।।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার শেষে লোকালয়ে ফিরে এসে, আগেকার দিনের নাবিকরা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতেন। আমাদের মঙ্গলকাব্যে শ্রীমন্ত সদাগরের দেখা 'কমলে কামিনী'র অলৌকিক দৃশ্য, অথবা কোলরিজের 'দ্য রাইম অব্ দ্য এনশ্যান্ট মেরিনার'-এ বর্ণিত ভয়াল বিভীষিকাময় ইতিবৃত্তের মতো, সে-সব গল্প গৃহবদ্ধ সাধারণ মানুষ সাগ্রহেই শুনত।

এখন অবশ্য দিনকাল পাল্টেছে। ও-রকম কাহিনীকে আমরা আজকাল আষাঢ়ে গালগল্প বলে হেসেই উড়িয়ে দিই। উপরে বর্ণিত সাগরজলের ভাসমান আগুনই হোক, অথবা সমুদ্রগর্ভের দীপ্তিমান বাড়বানলই হোক, এগুলো সবই আমাদের কাছে আজও নেহাৎ গাঁজাখুরী বলেই উপহসিত। কাব্যে, সাহিত্যে, বাড়-বাগ্নির উল্লেখ দেখলে, সেটাকে আমরা নিছক কবিকল্পনা বলেই ধরে নিই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের এই অহমিকা আসলে অজ্ঞতারই নামান্তর কিনা—তা কি আমরা তলিয়ে দেখি?

আপাতদৃষ্টিতে যত আজগুবি বলেই মনে হোক না কেন, সাগরজলে আগুনের অস্তিত্ব কিন্তু অবাস্তব কিছু নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এর সম্ভাব্যতা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করে না। আমাদের নিত্যপরিচিত ভূপৃষ্ঠের আগুনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল না থাকলেও বাড়বাগ্নি আসলে আগুন-ই। আগুনের অনেকগুলো ধর্মই এতেও নির্ভুলভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব পাকিস্থানে, চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথে, কুন্ডের জলমধ্যস্থিত পবিত্র অগ্নি যাত্রীদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। পরম পবিত্র এই কুন্ডের নাম 'বাড়বকুন্ড'। বাড়বকালী নামে আখ্যাত যে দেবীবিগ্রহটি এর অদূরস্থিত মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন, সেটিও নাকি ঐ কুন্ডের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। মূল মন্দিরের অনতিদূরে আরেকটি ছোট মন্দিরকেও পান্ডারা মহাকাল বাড়বেশ্বরের মন্দির বলেই দাবী করেন। অবিশ্বাসী লোকেরা ইচ্ছে করলে, জলের নীচের এই জ্বলন্ত আগুন আজও নিজের চোখেই দেখে এবং ছুঁয়েও আসতে পারেন।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বাড়বাগ্নির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে যেসব আখ্যায়িকা আছে, সেগুলো কিন্তু সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। মহাভারতের পরিশিষ্ট বলে আখ্যাত 'হরিবংশ' নামক পুরাণগ্রন্থের মতে—মহর্ষি ঔর্ব একবার অযোনিসম্ভব পুত্র কামনা করেছিলেন। প্রথমে, নিজের বুক থেকে তিনি ঐ অগ্নিময় পুরুষ সৃষ্টি করবেন বলে মনস্থ করলেন। অন্য সমস্ত জীব ধ্বংস করে, শুধু তাঁর ঐ জ্বালাময় পুত্রই এ-সংসারে বেঁচে থাকবে—এই-ই হল মহর্ষি ঔর্ব-র ভবিষ্যদ্বাণী। পরে তিনি তাঁর উরু থেকে সর্ববিধ্বংসী অগ্নিকে সৃষ্টি করলেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি চিৎকার কোরে উঠল—সে ক্ষুধার্ত, সসাগরা এই পৃথিবীকেই সে গ্রাস করতে চায়। অমনি দিগ্বিদিকে জ্বলে উঠল প্রচন্ড আগুনের লেলিহান শিখা! তাঁর সৃষ্ট এত সাধের পৃথিবী ধ্বংস হয় দেখে, ব্রহ্মা বিচলিত হলেন। তিনি ঔর্ব-

তনয়ের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্থির হল—মহাপ্রচণ্ড ঐ অগ্নি সমুদ্রের মুখে বাস করবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজেও সমুদ্র থেকেই জন্মেছেন; তাঁর বসবাসও সেইখানেই। কাজেই সাব্যস্ত হল যে—ব্রহ্মা এবং ঔর্বপুত্র এই অগ্নিময় পুরুষ দুজনে মিলে, অসুর ও রাক্ষসসহ প্রতি কল্পের শেষ দেবতা এবং সৃষ্টির অন্য সমস্ত জীব ও জড়বস্তু ধ্বংস করে ফেলবেন।

বড়বা অর্থাৎ সিন্ধুঘোটকীর মাথার উপর অগ্নিশিখার মতো আকৃতির জন্যেই সমুদ্রবাসী এই বিধ্বংসী বহ্নির নাম 'বাড়বানল'। লক্ষণীয় এই যে, পূর্বোক্ত বানানটির মতো, 'বড়বাগ্নি' বা 'বড়বানল' বানানও কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা যায়। সেখানে অভিধানকাররা যে-অর্থ করেছেন, তা হল—বড়বা-র মুখনিঃসৃত অগ্নি বলেই, নামটি 'বড়বাগ্নি'।

॥ ৩ ॥

ছেলেবেলার ইস্কুলপাঠ্য বইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি কবিতার দুটি পংক্তি আজও মনে পড়ে—

"সাগরে যে অগ্নি থাকে, কল্পনা সে নয়;
তোমায় দেখেই অবিশ্বাসীর
হয়েছে প্রত্যয়।"

বিদ্যাসাগর মশায়ের অগ্নিগর্ভ বীর্যবত্তাকে আমরা কতটুকু অনুভব ও অনুসরণ করতে পেরেছি, সে-কথা বলতে গেলে শুধু আত্মনিন্দাই সার হবে। অতএব সে-প্রসঙ্গ থাক। বাস্তব এই পৃথিবীটার সাগরজলে আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য নিরূপণের উপযুক্ত বিজ্ঞানদৃষ্টি আমরা অর্জন করতে পেরেছি কিনা আপাতত শুধু সেইটুকু ভাবলেই আমাদের চলবে।

অতলান্তিক মহাসাগরে দিগন্ত-ছোঁয়া জলরাশির বুকে অতি আশ্চর্যজনক ও রহস্যময় একটি অংশ আছে।

২০° থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৩০° থেকে ৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত, প্রায়-নিস্তরঙ্গ এই বিশাল জলরাশির ভৌগোলিক নাম 'সার্গাসো সাগর'। শুধু যে নিয়মিত চলাচলকারী ওশান-লাইনারগুলোই উত্তর অতলান্তিকের এই রহস্যঘেরা বিশাল জলরাশিকে চিরদিন সভয়ে এড়িয়ে চলছে, তাই নয়। দুনিয়ার জবরদস্ত নৌশক্তিগুলোর সামরিক জাহাজ, এমনকি দুঃসাহসী নৌ-অভিযাত্রীদের জলযানগুলোও আজ পর্যন্ত এদিকটা মাড়াতে সাহস করেনি। কিন্তু, কী আছে এখানে? আছে শুধু জলজ আগাছা আর জলবাহিত আবর্জনা ও জঞ্জাল! সারা বিশ্বের প্রায় সমস্ত নদ-নদী ও সমুদ্রের সমস্ত জলজ উদ্ভিদ ও ভাসমান আবর্জনা এই নিস্তরঙ্গ জায়গাটিতেই এসে জমা হয়। বহু যুগ যাবৎ এইভাবে জমতে জমতে, এর মাঝের অংশটাতে চড়ার মতো বিশাল একটা শক্ত ও ভারবহনক্ষম আবরণের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

অন্ধকার রাত্রিতে এখানে প্রায়ই একটা ভীতিজনক দৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়—শিলাবৃষ্টির মতো, হাজার হাজার পটকা একনাগাড়ে ফেটেই চলেছে! আওয়াজ শোনা না গেলেও, জলের তলা থেকে উপরের দিকে ক্রমাগত এই বিস্ফোরণ ও আলোর ঝলক, প্রতিটি নির্মেঘ, বৃষ্টিহীন ও অন্ধকার রাত্রিতেই সীমাহীন এই বিশাল জলরাশিকে অপার্থিব প্রেতলোকের মতো ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর করে তোলে।

দেখতে যতই ভীতিকর মনে হোক না কেন, এর কারণটা কিন্তু খুবই সাধারণ। ভূপৃষ্ঠের জলাভূমিগুলোতে যে আলেয়া দেখা যায়, জঞ্জালসাগরের এই আলোক-বিচ্ছুরণও আসলে তাই-ই। পচা আগাছার স্তরের ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের বুদ্বুদ সজোরে ফাটতে থাকার ফলেই, অন্ধকারে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নুদ্গীরণ দেখা যায়।

এ তো গেল সিন্ধুজলের ভাসমান আগুনের কথা। কিন্তু, সাগরের নীচের আগুন কি তাহলে অবাস্তব কবি-কল্পনা মাত্র? না; তা-ও নয়। সমুদ্রগর্ভেও আগুনের অস্তিত্ব বিজ্ঞানস্বীকৃত বাস্তব সত্য। শুধু পূর্বোক্ত ঐ একরকমের নয়, সাগরতলে বহ্নিশিখার মতো দীপ্তিবিকীরণ দেখা যায় আরও ৫ ধরনের :

১। সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গীরণ, ২। জৈব ও অজৈব ফসফরাসের অগ্নিসদৃশ ঔজ্জ্বল্য, ৩। লুসিফেরিনজনিত নীলাভ আলো, ৪। সামুদ্রিক সরীসৃপ ও প্রাণীর দেহের বৈদ্যুতিক আলো, এবং ৫। বেগবান অন্তর্বাহী সমুদ্র-স্রোতের প্রবল ঘর্ষণজনিত উজ্জ্বল বাষ্প-দীপ্তি।

এবার, এই পাঁচটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেলেই, সাগরজলের আগুন সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট হবে :

১। ভূপৃষ্ঠের মতো, সমুদ্রগর্ভেও আগ্নেয়গিরির অনেক জ্বালামুখ দেখতে পাওয়া যায়। অগ্নুদ্গীরণে সক্ষম, রীতিমত সক্রিয় ও সজীব আগ্নেয়গিরিও সাগরগর্ভে কম নেই। এগুলোর ফুটন্ত লাভা, উত্তপ্ত গ্যাস, বিশেষত ঊর্ধ্বমুখী আগুনের উজ্জ্বল আভা, সমুদ্রের তলার গভীর অন্ধকারে বহুদূরে থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। আগেকার দিনের মুক্তোসন্ধানী ডুবুরীদের মুখে এইসব আগুনের অনেক রোমহর্ষক (এবং প্রায়ই অর্ধসত্য) বিবরণ পাওয়া যেত।

২। মৃত সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষের হাড়, জলবাহিত আবর্জনা প্রভৃতির পচা তলানি—এসবও বহুদিন যাবৎ এক জায়গায় থিতিয়ে ফসফরাসের উজ্জ্বল অথচ অদাহ্য আলো বিকীরণ করতে পারে। সাগরগর্ভের মৃত্তিকাস্থিত খনিজ গন্ধকও এই দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করতে সাহায্য করে।

৩। জোনাকীর আলোর মৌল উপাদান যে লুসিফেরিন, সাগরতলের স্পঞ্জ প্রভৃতি কয়েক জাতের স্থাণু ও অর্ধস্থাণু জীবও তারই স্নিগ্ধোজ্জ্বল নীলাভ আলো ছড়ায়। গভীর সমুদ্রতলের নিস্তরঙ্গ অন্ধকার জলে, এগুলোকেও উজ্জ্বল আলোকবিন্দু বলেই মনে হয়।

৪। কয়েক শ্রেণীর সামুদ্রিক 'বাণ' মাছ এবং সরীসৃপের দেহেও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। আক্রান্ত বা উত্তেজিত হলে, এদের দেহ-নিঃসৃত এই আলো আরও বেশী দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। জলের নীচে, একটু দূর থেকেও এদের শরীরটা দেখা যায় না শুধু এই আলোকেই সঞ্চরমান ও জ্বলন্ত আগুন বলে মনে হয়।

৫। সিন্ধুগর্ভের অন্তর্বাহী জলস্রোতের পরস্পর ঘর্ষণেও, প্রচণ্ড তাপ ও দীপ্তিমান বাষ্প দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নয় বিখ্যাত সমুদ্রস্রোত 'গাল্ফ স্ট্রীমে'র বেগবান অংশগুলোতে এরকম উজ্জ্বল আভ অনেক সময়েই দেখতে পাওয়া যায়।

উপরের এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে—সমুদ্রের এইসব আগুন বুঝি শুধ সাগরের তলদেশে এবং জলের উপরিভাগে ভাসমান অবস্থাতেই দেখা যায়। আসলে কিন্তু তা নয়। সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে বিজলী-আলো বা লুসিফেরিনের আলো জলের মাঝখানে অথবা যে কোনো জায়গাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব। সব জায়গাতে এগুলোকে আগুনের জ্বলন্ত শিখা ব স্ফুলিঙ্গ বলেই মনে হয়, এবং স্রোতে জন্যে, দূর থেকে এগুলোকে কম্পমা দেখায়।

একটি কথা কিন্তু এখানে স্মরণ রা দরকার। ভূপৃষ্ঠে যে আগুন আমরা সচরাচ দেখি, তার দহনক্রিয়ার ব্যাপারটা হল—বায়ু অম্লজান পুড়ে উত্তাপ ও আলোক-বিকীর এবং কার্বন বা ছাইয়ের অবশেষ। সমুদ্র গর্ভের আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গীরণ ছাড় সাগরজলের অন্য সব দৃশ্যমান অগ্নিবিন্দুতে কিন্তু ওরকম দহনক্রিয়া পুরোপুরি খুঁ পাওয়া যাবে না। সাগরজলের প্রায় স আগুনই আসলে তাপবিহীন দীপ্ত বিকীরণমাত্র।

●

ধূলিমলিন এই মাটির পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এখন খু কম। মহাকাশের অজানা রহস্যের হাতছানি দিকেই মানবমনের সমস্ত অনুসন্ধিৎ আজ সদাজাগ্রত। কিন্তু সত্যিই কি এ পৃথিবীটার সবকিছুই আমাদের জানা হ গেছে? দুঃখের কথা এই যে, ভ্রান্ত এ আত্মতৃপ্তি আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া অ কিছুই নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সে অবিস্মরণীয় কবিতাটি উৎকলন করে প্র তোলা যায় :

"জীবন-মহাদেবের নৃত্য
দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে
মুগ্ন কবি মগ্ন মোহের গানে?
তাতা থিয়া, তাতা থিয়া—
ঠোকাঠুকি নীহারিকার মাল
তাতা থিয়া, সিন্ধু নাচে
বক্ষে জ্বালা বাড়বানল জ্বালায়.

আমাদের মোহ-মুগ্ধ কবি-হৃদয়, স্বল্প জ্ঞাত অথচ কাছের জিনিসগুলো সম্পর্কে আর কবে নিবদ্ধদৃষ্টি ও মনোযোগী হবে

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক

গোলাব সিং ওরফে সমশের আলি

গোলাব সিংকে আমি প্রথম দেখি ওয়ালটনে। লাহোর থেকে সাত-আট মাইল দূরে ছোট্ট এই গ্রামটির বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে স্থল ও বিমানবাহিনীর অফিসার ক্যাডেটদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র।

সামরিক প্রয়োজনে রিকুইজিশান করা, বিস্তৃত পরিধিওয়ালা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঞ্জাব বয়েজ স্কাউট অ্যাসোসিয়েশানের হেডকোয়ার্টার্স ভবনে ছিল বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র। স্টেশন-কমান্ডার স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট হগের কড়া আদেশে সীমানার বাইরে সমস্ত গ্রামটিই ছিল ক্যাডেটদের কাছে আউট অব বাউন্ডস।

উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে চলে গেছে কাসুর-গুরুদাসপুরের রাস্তা। ঐ রাস্তার অন্য পাশেই ছিল গোলাব সিংয়ের বাড়ী। সচ্ছল ছোট্ট চাষী পরিবার। বৃদ্ধ বাবা-মা আর যুবতী বোন সুরিন্দরকে নিয়েই ছিল তার সংসার। নিজের বয়স বাইশ-তেইশ। একদা খেলার সাথী, ঐ গ্রামেরই মেয়ে কুলদীপের সঙ্গে বিয়ে একরকম নিশ্চিত।

সত্যব্রত দে

ওয়ালটনে সামরিক কেন্দ্র শুরু হতেই বৃদ্ধ বাবা ঘরে বসে বসে অলসভাবে দিন কাটানোর চাইতে সরবত-লস্যির একটা দোকান করাটাই পছন্দ করলেন বেশী। নিজের বাড়ীতে তৈরী দৈ দিয়ে যে অপূর্ব লস্যি তিনি পরিবেশন শুরু করলেন, তার খ্যাতি রটতে বেশী দেরী হলো না। দিনের বেলায় ধরা পড়ার ভয়ে সাধারণত সন্ধ্যার পরেই চুপ চুপে পাঁচিল ডিঙিয়ে দোকানে হাজির হওয়াটাই ছিল চলতি উপায়। মাঠ থেকে দিনান্তে বাড়ী ফিরে বৃদ্ধ বাবাকে সাহায্য করা গোলাব সিং অবশ্য কাজ বলেই মনে করতো। সেই সূত্রেই গোলাব সিংয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা-কোর্স কিছুদিন চলার পর, হঠাৎ সামরিক কর্তৃপক্ষের এক জরুরী আদেশে বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র লাহোর থেকে পুণায় স্থানান্তরিত হল। তল্পীতল্পা বেঁধে লাহোর থেকে একদিন আমরা পুণা রওনা হয়ে গেলাম। লাহোর স্টেশনে আমার হাতদুটি ধরে ঐ সরল গ্রাম্য যুবক বিদায় জানিয়ে মিনতি করেছিল যেন তাদের ভুলে না যাই। ভাবাবেগে যদিও তখনকার মত আমিও বিচলিত হয়ে উঠে কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু মনে মনে জানতাম, জীবনের চলার পথে এর বিন্দুমাত্র মূল্যও নেই। এমনকি ভুলতে না চাইলেও ভুলে যেতে হয়।

কিন্তু আমার স্মরণের অপেক্ষায় গোলাব সিং রইলো না। ইতিহাসই একদিন তাকে সমস্ত মানবজাতির কাছে স্মরণীয় করে দিল। আজ সে বিশ্বের কাছে এ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক হিসেবে স্বীকৃত। তাকে স্মরণ করে আমি নিজেকেই আজ ধন্য মনে করি।

দিনান্তে কর্মক্লান্ত জীবনের একঘেয়ে আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার আশায় যখন মনটা আকাশে ডানা মেলে অলস অন্যমনে নিজেকে এলিয়ে দেয়, তখন নিজের অজান্তেই ফেলে-আসা জীবনের টুকরো টুকরো বিশৃঙ্খল স্মৃতিগুলো একে একে ভিড় করে এসে বিনিসুতোর মালা গেঁথে আমাকে সেদিনের মত মুক্তি দিয়ে যায়।

জীবনের শুরুতে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে লাহোর আমার প্রথম প্রেম। নানা কারণেই লাহোরকে ভালবেসেছিলাম।—সে-ভালবাসা আজও আমার অমলিন। লাহোর—আমার লাহোর! সেদিন যদি এমনটা থাকতো! যদি সবাই সম্মিলিত

কণ্ঠে বলতে পারতাম—এদেশ আমাদের সকলের—এটা গোটাই থাকবে, টুকরো টুকরো হবে না। তা হলে তো অমন হতো না—লাহোরের পথে পথে তো ঝরতো না হিন্দু-শিখ-মুসলমানের রক্ত—নারীর ইজ্জত যেতো না খোয়া—হারিয়ে যেতো না হাজার হাজার মানুষ।

বাইশ বছর আগে এক দুঃস্বপ্নময় দুর্যোগের দিনে দেশটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। দেশ ছেড়ে যাবার আগে ইংরেজ শুধু হিন্দুস্তান-পাকিস্তান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—তার সঙ্গে অতিরিক্ত দিয়ে গেল সর্বনাশা ঘৃণা-দ্বেষ আর অবিশ্বাস। ভাইয়ে ভাইয়ে মুলোকাৎ হলো খোলা তরবারি আর ছুরি নিয়ে। এই কাহিনীর শুরুও সেখান থেকেই।

বাড়ী থেকে মাইল-দুই দূরে চাষের ক্ষেত। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে গোলাব সিং তার লাঙ্গল আরভৈঁধনুটোকে নিয়ে। রোজকার মত সেদিনও সে বেরিয়েছিল। মাঠে চাষ করছে গোলাব আর আরো অনেক জোয়ান। গাঁয়ে রয়েছে শুধু বৌ, ঝি, বাচ্চা আর বুড়োরা। সবাই ব্যস্ত যে যার কাজে। নিশ্চিন্ততার একটা আস্তরণে যেন জড়ানো তাদের জীবন। এমন সময়ে দূর কোণে একটা চীৎকার—একটা অস্বাভাবিক হল্লা—একটা অপ্রত্যাশিত কোরাসের সুর।

বিস্মিত চমকিত ও হতবাক সবাই। একটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটেছে অনুমান করলেও তারা যেন ঠিক অনুমোদন করতে পারছিল না। ধীরে ধীরে কেমন যেন একটা অবশ-করা অবসন্নতা এসে ভর করছিল। হল্লাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে - আরো কাছে, তার তারপরেই মাঠ থেকে গোলাব সিংরা দেখলো দূরে আকাশটাকে কে যেন রাঙিয়েছে লালে-হলুদে। ভীত-শঙ্কিত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর হঠাৎ বুক চিরে ঠেলে বেরুলো একটা আর্ত চীৎকার। পরমুহূর্তেই শুরু হোল দৌড়ের প্রতিযোগিতা। মানুষগুলো ছুটছে—ভৈঁষগুলোও ছুটছে তাদের পেছন পেছন বুঝি কোন অজানা আশঙ্কার অশুভ ইঙ্গিতে। গাঁয়ের প্রান্তে এসে মন্ত্রমুগ্ধের মত হঠাৎই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল হাঁফধরা বুকগুলো। আগুন! মুহূর্তের বিচারে জীবন গেছে থেমে। শুরু হোল আর এক অধ্যায়।

একই রাস্তার এধার দিয়ে চলেছে ভারতের দিকে, আর ওধার দিয়ে পাকিস্তানের দিকে। যখনই দু' দল হচ্ছে কাছাকাছি মুখোমুখি অমনি ছুটছে হাতিয়ার, ঝরছে খুন। গোলাব সিংরাও চলেছে হিন্দুস্তানের দিকে। এমনিভাবে এক সময়ে তারা পৌঁছাল লাহোরের শহরতলী মোগলপুরায়। পথে একটি গ্রাম। মুহূর্তে জ্বললো আগুন—শুরু হলো নিধন যজ্ঞ। এগিয়ে যাবার পালা। এগুতে যায় গোলাব। হঠাৎ দেখে পাশে গোয়ালঘরের এক কোণে লুকিয়ে রয়েছে এক অনিন্দ্যরূপসী যুবতী।

থমকে দাঁড়াল গোলাব। এক লহমার চিন্তা—তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে মেয়েটির দিকে। অন্তিম মুহূর্তের কথা ভেবে ভয়ে পিছিয়ে যেতে যায় মেয়েটি কিন্তু সেটুকু জায়গাও নেই। ধীর পদক্ষেপে তরবারি হাতে সামনে এসে দাঁড়ায় গোলাব—চোখ বোজে তরুণী। এক ঝটকায় মেয়েটির চুলের গোছা ধরে টেনে আনে সামনে—অস্ত্র তোলে। তরুণীটি বুঝি তখন শেষ প্রার্থনা জানায় ঈশ্বরের কাছে। আঘাত হানার শেষ মুহূর্তে চমকে ওঠে গোলাব! একি! এ যে কুলদীপ! ভাল করে আবার দেখে—না, এ কুলদীপ নয়—বিধর্মী যুবতী। আবার অস্ত্র তোলে—চকিতে তাকায় ওর মুখের দিকে—ভেসে আসে কুলদীপের মুখ—তার জীবনের নির্বাপিত ধ্রুবতারা।

কিন্তু আজ আর সে নেই। প্রাণ দিয়েছে—ইজ্জত দেয়নি। চোখ খোলে তরুণী—বোধ করি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দেরী হবার কারণটা দেখবার জন্যে। স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে লোকটা—সেও অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে। দুজনে তাকিয়ে দেখে দুজনকে। চার চোখে নেমে আসে কেমন যেন একটা আকুতি—একটা দীপ্তি। কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। তারপরেই আছড়ে পড়ে মেয়েটি গোলাবের পায়ের উপর। বেড়িয়ে আসে একটা আর্ত প্রার্থনা—'মুঝে জিনে দো'।

দোটানার মাঝখানে তাকিয়ে আছে গোলাব। ওর কথায় যেন সে হঠাৎ ফিরে পায় চেতনা। পায়ের ওপরে পড়া তাজা গোলাপটিকে তুলে ধরে। গভীর কণ্ঠে ডাকে—'কুলদীপ'! মেয়েটির চোখে নেমে আসে বিস্ময়ের ছায়া। গোলাব আবার ডাকে। মেয়েটি কিছু বুঝতে না পেরে কেঁদে উঠে—'আমাকে বাঁচাও'।

গোলাব দুলছে ভাবনায়—কি করবে সে! 'যাও তোমাকে বাঁচতেই দিলাম'—ধীর গলায় কথাগুলো বলে ফিরে দাঁড়ায়। এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে। এমন সময়ে পেছনের জ্বলন্ত বাড়ীটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গোলাবের কাঁধেও পড়ে একটা বাঁশ। গোলাবের অস্ফুট শব্দ ঢাকা পড়ে যায় আর একটা তীব্র আর্ত চীৎকারে। ফিরে দেখে আগুনের গণ্ডীতে বন্দিনী সেই মেয়ে—চোখে তার মৃত্যুর ছায়া। উপেক্ষা করে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। তারপর লাফ দিয়ে পড়ে ঐ আগুনের বেড়াজালের ভেতর। পাঁজা কোলে করে নিয়ে আসে মেয়েটিকে বাইরে—সে আঁকড়ে ধরে আছে তাকে পরম নির্ভরতায়। এত বিপদের মধ্যেও কোথায় যেন একটা শিহরণ—কোথায় যেন একটা মিষ্টি মধুর চাপা উত্তেজনা অনুভব করে গোলাব। ক্ষণিকের সেই ঘোর লাগা থেকে জোর করে নিজেকে কাটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে নামিয়ে রেখে, সামনের দিকে পা চালায় গোলাব। কিন্তু পেছন থেকে ভীত কণ্ঠের আওয়াজ—'আমাকে বাঁচাও'।

—'আমি তো চলেই যাচ্ছি'।

—'অন্য কেউ তো আসতে পারে'।

—'তা আমি কি করবো'। নিজের কানেই যেন বিহ্বলতার সুর বাজে।

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। দূরে সঙ্গী-দের চীৎকার। তারা অনেক এগিয়ে গেছে। গোলাব তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—'তোমার নিজের ইচ্ছায় যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, তাহলে আসতে পার।' মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

—'কিন্তু তোমার পরিচয়—পরিচয় কি দোব?' ভয়ে-ভরা কণ্ঠে বলে গোলাব। কিন্তু কোন কথা না বলে নির্বিকার নির্ভরতায় তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। যেন এ-প্রশ্নের উত্তরের দায়টা গোলাবেরই। একটুখানি নীরবতার পর গোলাব বলে—

—'কেউ জিগ্যেস করলে তুমি বলবে—তুমি শিখ, তোমার নাম—'

—'কুলদীপ'। এত বড় বিপদের মুখেও তার মুখে হাসির রেখা।

—'হ্যাঁ—কুলদীপ!

এগিয়ে চলে ওরা ভারতের দিকে। যেতে যেতে রাত্রির আঁধার ঘনিয়ে আসে। মাঝে মাঝে ভীত-শঙ্কিত কুলদীপ আঁকড়ে ধরে গোলাবের হাত। সামনে তখনও দীর্ঘ পথ। বিশ্রামের সময় নেই। আলাপের সুর বিলম্বিত দ্বিধাগ্রস্ত। তবুও তারি মাঝে শোনা যায় জীবন বাঁচানোর দ্রুতলয়ের সঙ্গে জীবন জড়ানোর বিলম্বিত সুরের মূর্ছনা।

—'কুলদীপ! তোমার ভয় করছে না?'

—'কিসের?' নিষ্পাপ দুটি বিস্মিত চোখ তুলে ধরে কুলদীপ।

'তোমার ইজ্জতের—যদি [illegible] বেইজ্জত করি।'

—'সে তুমি পারবে না।'

—'পারব না? কেন?'

—'কারণ অসহায় নারীর দুরবস্থার সুযোগ যারা নেয়, তুমি তাদের দলের নও।'

—'তোমার ভুলও তো হতে পারে।'

—'অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে হয়নি। তা না হলে এভাবে তোমার সঙ্গে আসার চাইতে তোমার তরবারিকেই বেছে নিতাম।

আকাশের তারায় জীবনের ইশারা। হেঁটে চলেছে নীরব-মুখর দুটি প্রাণ। সংলাপে যতি—ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে আসছে দুটি হৃদয়।

এক সময়ে আবছা আঁধারের মধ্যে দেখা দিল নতুন দিনের আলো। দুর্গম পথও শেষ হলো। ওরা সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে আসে। তারপর এসে পৌঁছায় অমৃতসরে। সদ্য ঘর-বাড়ী ভিটেমাটি ছেড়ে-আসা অনেক মানুষের ভিড়ে ওরা আশ্রয় পায়। গোলাব আর কুলদীপ—একটি তরুণ ও তরুণী। তাদের দেবার মত পরিচয় তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সবাই তাকায় মাঝে মাঝে ওদের দিকে—দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা কে কার

কে? গোলাব যতটা সম্ভব সাবধানে আগলে রেখেছে কুলদীপকে। সবার অলক্ষ্যে শেখায় ওকে শিখের আচার-আচরণ। আর একই ঘরে অনেক নিরালা ক্ষণে ওর সঙ্গে থেকেও তুলে ধরেছে সংযমের অসহ্য ভারী পর্দাটা। অচেনা-অজানা দূরের মানুষ গোলাবকে বিশ্বাস করলো। কিন্তু কাছের মানুষ—তারই গ্রামের মানুষজন, যারা এসে জড়ো হয়েছে সেখানে, তারা কেন বিশ্বাস করবে গোলাবের কথা! গোলাবের সবকিছুই তো তাদের জানা।

দিন যায়। প্রত্যেকটি ছিন্নমূল মানুষই আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। গোলাবরাও। ওরাও এক কোণে বাঁধতে চায় ঘর—নব-জীবনের আশীর্বাদ নিয়ে। কিন্তু ধরা পড়ে যায় আচার-আচরণে যে, কুলদীপ শিখ নয়। আশেপাশের লোকের চোখে সন্দেহের গাঢ় কাজল। তারা তৈরী হয় দণ্ডহাতে।

—এবার কী হবে? ভয়ে আঁতকে কুলদীপ বোবাকান্না কাঁদে।

—কী আবার হবে। গোলাবের বে-পরোয়া কণ্ঠ।

—ওরা যদি জোর করে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়?

—আমার প্রাণ থাকতে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। অবশ্য যদি না......।

—কী বল! থামলে কেন?

—'যদি না তুমি নিজে চলে যাও।'

—'আমি তোমাকে ছেড়ে......বলতে পারলে এ-কথা?' উচ্ছ্বসিত কান্নার প্লাবন জাগে।

—কাঁদছ কেন? কাঁদবার কী আছে বোকা মেয়ে......ও তো আমি এমনিই বলেছি। আদরের সুরে বলে গোলাব।

কিন্তু কান্না আর থামে না। কাছে টেনে নিয়ে আদর করে গোলাব।—'শোন! এভাবে তো আর সত্যিই থাকা যায় না। যদি আমাদের নতুন করে বাঁচতে হয় তাহলে তোমাকে একটা জিনিস ছাড়তে হবে—পারবে?

—'তোমার জন্যে আমি সব পারবো—বল কী?'

—'ধর্ম!'

—'ধর্ম?' চমকে উঠেছিল কি কুলদীপ?

—'হ্যাঁ। সবাই যখন ধরে ফেলেছে, তখন ও ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। পারবে তুমি তা?'

—তোমার ভালবাসার চাইতে বড় আর কোন ধর্ম আমার জীবনে নেই।'

—'তবে কালই আমরা যাব গুরুদ্বারে। তুমি হবে শিখ। আর তারপরেই আমাদের বিয়ে।'

—'বিয়ে!' জড়িয়ে ধরে দুজনে দুজনকে বাঁধভাঙা হাসিতে।

পরদিন রৌশন পারভেজ ধর্মান্তরিত হলো কুলদীপ কাউরে। কুলদীপের বিয়ে হয়ে গেল গোলাব সিংয়ের সঙ্গে। আক্রোশে গর্জাতে থাকে লোভী বঞ্চিতের দল। তাদের বৌ-ঝিদের অনেককেই লুটে নিয়েছে। তাহলেও যেমন করেই হোক এই অনাচারকে ব্যর্থ করতেই হবে। নির্মম হয়ে ওঠে তারা। ঘর ছাড়ার দল বিধান দেয়—হয় ওকে ছাড়ো, আর না হয় আমাদের ছাড়ো। প্রায়শ্চিত্ত করো—না হলে আমরাই ছাড়বো তোমাকে। কুলদীপ সব শোনে।

—'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দাও—ছেড়ে দাও।'

—'এ-কথা কেন কুলদীপ?'

—'না হলে ওরা যে তোমাকে—'

—'একঘরে করবে'—একটু হাসে গোলাব।

'যাদের ঘর নেই তাদের আবার একঘরে হবার ভয়।'

—'তবু কেন তুমি বঞ্চিত হবে আমার জন্যে সমাজ থেকে—তার চেয়ে আমাকে—' কথাটা শেষ করতে পারে না কুলদীপ।

—'তোমার নিজের যদি কোন অসুবিধা থেকে যেতে চাও, তবে তুমি যেতে পার। কিন্তু ওদের ভয়ে আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না।'

ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে ভেসে যায় কুলদীপের চিবুক। গোলাব টেনে নেয় তাকে নিজের চিতোল বুকটার মাঝে। নিশ্চিন্ত-তায়, পরম বিশ্বাসের নির্ভরতায় আবেশে আমেজে গোলাবের বুকে জড়িয়ে থাকে কুলদীপ। মুখে ওসব কথা বললেও পরি-চিতদের ভ্রূকুটিকে কিন্তু অবহেলা উপেক্ষা করতে পারে না গোলাব। তাই একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে অন্ধকারের ভেতর কুলদীপের হাত ধরে আস্তানা থেকে বেরিয়ে শহরের অন্য এক প্রান্তে আশ্রয় নেয় গোলাব। উদ্বাস্তু হিসেবে চাষের আর থাকার জমি পেলো ওরা। গড়ে ওঠে একটা সুখী সংসার। প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত দুটি হৃদয় রচনা করে এক নিটোল কাব্য। দিন চলে যায়।

উনিশশো পঞ্চাশ সাল। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি—দেখা দিল গোলাবের জীবনের এক বিরাট অভিশাপরূপে। ঐ চুক্তিতে ছিল দু' রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে রক্তক্ষয়ী হানাহানির সময়ে উভয় দেশের যেসব নারী অপহৃতা হয়েছিল, তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা হবে। যেসব নারী ইতিমধ্যে বিয়ে-থা করে রীতিমত ঘর-সংসার করছে, তাদেরও প্রথমে ফিরে যেতে হবে নিজ নিজ দেশে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তারপর স্বেচ্ছায় ঘর বেঁধেছে এই রকমের একটা বিবৃতি দিয়ে ইচ্ছে করলে তারা ফিরে আসতে পারবে। ঐ চুক্তির পর থেকেই দুজনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কায় আপনা-আপনিই ভারাক্রান্ত হয়ে এলো দুজনের মন। কী জানি কপালে কি আছে!

ডাঃ সুশীলা নায়ার, সুচেতা কৃপালনী, মণিবেন কারা, মৃদুলা সারাভাই ইত্যাদির পরিচালনায় ভারতে গঠিত হয়েছে নারী-উদ্ধারণ সমিতি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্ধারকারীদের দল আর গাড়ী। সুযোগের সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে গোলাবের পরিচিতের দল।

সেদিন গোলাব মাঠে—ঘরে রয়েছে কুলদীপ। ওৎ পেতে থাকা শত্রুর দল খবর দেয় পুনরুদ্ধারকারীদের। দুয়ারে এসে দাঁড়ায় গাড়ী। নড়ে ওঠে দরজার কড়া। দরজা খুলতেই কুলদীপ আঁতকে ওঠে। মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে। তারি মাঝে প্রশ্ন ভেসে আসে—'আপনার বাড়ী কি লাহোর মোগল-পুরায়?'

ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে।

—'আপনাকে কি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে?'

—'না।'

—'আপনি মুসলমান?'

—'এ্যা...না...।'

—'না-না, এ মিথ্যে কথা বলছে',—বলে ওঠে একজন। 'আমি জানি ও মুসলমান। জোর করে ওকে ধর্মান্তরিত করে ঘরে আটকে রেখেছে গোলাব সিং।'

—'না-না, আমি আজ আর মুসলমান নই। আর কেউ আমাকে জোর করে ধরেও রাখেনি।' কান্না কান্না গলায় বলে কুলদীপ।

—'দেখুন, আমরা সব বুঝতে পারছি—তবু আপনাকে নিয়ম অনুযায়ী পাকি-স্তানে যেতেই হবে। তবে সেখানে একটা বিবৃতি দিয়ে আপনি অনায়াসে এখানে ফিরে আসতে পারবেন।'

—'কিন্তু আমার স্বামী—আমার সংসার?'

—"বললাম তো সেখানে গিয়েই আবার আপনি ফিরে আসতে পারবেন। নিন, দেরী করবেন না—তৈরী হোন। কুলদীপ চোখে অন্ধকার দেখে। মিনতি জানায় গোলাবের ফিরে আসার সময়টুকু চেয়ে। কিন্তু নারাজ উদ্ধারকারী আর নেকড়ের দল। ভীত শঙ্কিত কুলদীপ বাধ্য হয়েই কাঁদতে কাঁদতে উদ্ধারকারীদের ভ্যানে ওঠে।

কর্মক্লান্ত গোলাব দূরে থেকে দেখতে পায় দরজাটা আজ অস্বাভাবিকভাবেই খোলা। মনে হয় সব কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে। অজানা আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে ডাকে—কুলদীপ-কুলদীপ! শূন্য ঘরে ব্যর্থ হয়ে ঘুরে আসে ডাকটা। একে একে
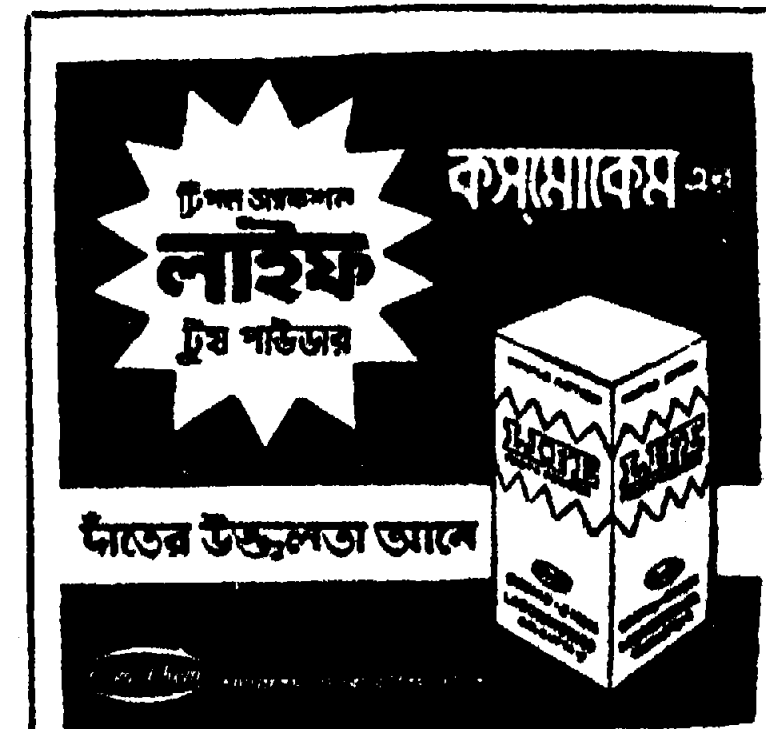
জড় হয় কিছু মানুষ, প্রতিবেশী। তাকে বলে সব, আর মুহূর্তের দেরী নয়। ছুটে চলে গোলাব ওয়াখা সীমান্তের দিকে—ভারত আর পাকিস্তানের সীমারেখা। প্রাণপণ দৌড়ে যখন ওয়াখা সীমান্তে পৌঁছাল গোলাব, তখন তার ঠোঁটের দু-দিকের কোণার ফেনায় রক্ত এসে জমেছে। তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি। ভ্যানটি তখন ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার মুখে। একটা হৃদয় ছেঁড়া ডাক বেরিয়ে আসে—"কুলদীপ-কুলদীপ! দাঁড়াও— আমি এসেছি। থরথর কম্পিত দেহমনে কুলদীপ চমকে ওঠে ডাক শুনে। এতো গোলাব! একটা অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে উঠছে সে। কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না—সব যেন আটকে যাচ্ছে। —"কুলদীপ—আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তুমি নিজে না গেলে কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু আমি পারলাম না সে কথা রাখতে। ওরা জোর করে নিয়ে গেল তোমাকে আমার কাছ থেকে।

বেশী কথা বলার সময় নেই। অনেক কষ্টে কান্নাটাকে সরিয়ে রেখে কুলদীপ বলে—"তুমি এতটুকু ভেবো না। আমি গিয়েই ফিরে আসবো সঙ্গে সঙ্গে।" গাড়ীটা ততক্ষণে পার হচ্ছে শেষ সীমারেখাটা।

—তুমি কথা দিলে কুলদীপ। তবে রইলাম আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় যতক্ষণ না তুমি ফিরে আস।" কথাগুলো শেষ হবার আগেই একটা বিরাট গতি নিয়ে ঢুকে গেল ভ্যানটা পাকিস্তান সীমানার ভেতরে। গোলাবের চোখে গাড়ীটা ঝাপসা—চোখের জলে না পথের ধুলোয় কে জানে?

গোলাব অপেক্ষা করতে থাকে। ফাঁকা মাঠে বেষ্ঠনীর ও-পাশে বসে থাকে অধীর প্রতীক্ষায়। রাতের কালো দিনের আলোয় যায় মিশে—দিনের আলো হারিয়ে যায় রাতের গভীরে। কিন্তু গোলাব থাকে নীরব-নিশ্চল। তার খাওয়া নেই—ঘুম নেই-ক্লান্তি নেই। বেশ কয়েকটি দিন কেটে গেল। গোলাব নড়ে না—পাছে কুলদীপ এসে তাকে দেখতে না পায় এই ভয়। কুলদীপের শেষ কথাটাই কেবল ঘুরে ফিরে বার বার মনে পড়ে—"আমি গিয়েই ফিরে আসবো—কিছু ভেবো না।"

বেষ্টনীর এপারে সৈন্যরা ওকে ভাবে পাগল—ওপারের সৈন্যরা ভাবে ও এক দিওয়ানা। কিন্তু গোলাবের দিক থেকে কোন সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত ওপারের সৈন্যরা আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। তারা জিগ্যেস করে গোলাবকে—কী হয়েছে, কেন সে অমন করে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে। তাদের কণ্ঠে মায়ালু সহানুভূতি। ভেঙে পড়ে গোলাব। ধীরে ধীরে বলে সব। সে কথা দিয়েছিল—কিন্তু কৈ আজও তো এলো না। মুগ্ধতার আবেশে ভেসে যায় প্রহরীদের হৃদয়। কথা দেয় তারা যেমন করেই হোক এনে দেবে তারা গোলাবের হৃদয় প্রতিমার খবর। এক সময়ে নিয়ে এলো খোঁজ। পাগলের মত ছুটে আসে গোলাব। কিন্তু করুণ নয়নে তারা জানায় মর্মান্তিক পরিণতির খবর। বিশ্বাস করতে চায় না গোলাব। তার কুলদীপ কখনও তাকে...।

হ্যাঁ—ওই সত্যি। বলে সীমান্ত প্রহরীরা। "তার আত্মীয়রা তাকে শুধু আটকে রেখেই ক্ষান্ত হয় নি—এমন কি তাকে আবার নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়েছে।" তাহলে-তাহলে আর কোনদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে না"—এর বেশী বলতে পারে না গোলাব—বোবা কান্নায় পরিপূর্ণ শোকের মূর্ত ছবি সে। প্রেমিক মনের শোকের ব্যথার ছোঁয়া লাগে প্রহরীদেরও মনে। অনেক ভেবে চিন্তে বলে—"এমনিতে তো কোন আশা দেখছি না। তবে একটা শেষ উপায় চেষ্টা করে দেখতে পার—যদি তোমার ইচ্ছা হয়।" লাফিয়ে উঠে জানতে চায় গোলাব কি সেই উপায়। সে যে কোন ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত।

—"যদি ধর্মান্তরিত হও।"

চমকে ওঠে গোলাব। নড়ে ওঠে তার সংস্কার আর বিশ্বাসের মূল। সে ধর্ম ত্যাগ করবে! না-না-তা সে পারবে না—কিছুতেই নয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ে—তার কুলদীপও তো তার জন্যে ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তবে সে কেন আজ তার জন্যে পারবে না—পারবে—নিশ্চয়ই পারবে। নতুন শক্তিতে নতুন উদ্দীপনায় নতুন হৃদয়ে সে আবার ছুটে চলে তার গ্রামের দিকে। সান্ত্বনা দিতে আসে পড়শীরা। অস্বস্তি বোধ করে গোলাব। ওদের সহানুভূতি ওকে আরো কঠিন করে তোলে। গাঁয়ের মহাজনদের কাছে জায়গা-জমি ঘর-বাড়ী সব বিক্রী করে দিল জলের দামে। তারপর সেই সামান্য পুঁজি নিয়ে সে আবার ছুটে চলে ওয়াখা সীমান্তের দিকে। পেছনের স্মৃতিকে পেছনে ফেলেই সে হাজির হোলো ওপারের সৈন্যদের কাছে।

—আমি এসেছি—আমাকে নিয়ে চল।

—বলেইছি যে তোমাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে।

—আমি তৈরী হয়েই এসেছি।

তখন ওরা নিয়ে গেল তাকে পাশের গাঁয়ে। সমশের আলি হোল গোলাব।

সমশের আলি আসে লাহোরে। মুখে শুধু এক কথা—রোশন। আমার রোশন কোথায়? পথে ঘাটে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই জিগ্যেস করে রোশনের কথা। শুনে কেউ হাসে—কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যায়—আবার কেউ বা চেষ্টা করে যতটা সম্ভব সাহায্য করার। কিন্তু ওই বিরাট শহরের কোনখানে রয়েছে রোশন—কে দেবে তার খোঁজ। সীমান্ত প্রহরীরাও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ যে ঠিকানা তারা পেয়েছিল সেখানে নেই রোশনরা। প্রহরীদের মুখ থেকেই অনেকে জানলো সমশের আলির ইতিহাস। ওই দিওয়ানার অন্তরের ব্যথা বিহ্বল করেছে অনেককে। ওকে নিয়ে শহরে বেশ একটা আলোড়ন। বিশেষ করে শহরের টাঙ্গাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ফেরীওয়ালা, খেটে খাওয়া সাধারণ দিন-মজুরদের ভেতর যাদের হৃদয়টা আজও সজীব হাজারো অভাব অনটনের মধ্যেও। দিনে দিনে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সমশেরের অবস্থা দেখে। আশ্রয়-সহায়-সম্বলহীন সমশেরকে তারা জোর করে আস্তানা করে দেয় থাকার—শাহীবাগের এক কোণে। রাতে থাকে সেখানে—দিনে খোঁজে রোশনকে শহরের প্রতিটি জায়গায়।

হতাশা আর ব্যর্থতার ভেতর দিন কাটে সমশেরের। শেষ সম্বলটুকুও যায় ফুরিয়ে। জামা-কাপড় হয়েছে শতছিন্ন—চুল হয়েছে রুক্ষ—দাড়ি-গোঁফ হয়েছে দীর্ঘ। শ্রান্ত ক্লান্ত সমশের শেষ পর্যন্ত দেহটাকেও আর বয়ে বেড়াতে পারে না। এখন শুধু বসে থাকে একই জায়গায়। কেউ দয়া করে কিছু দিলে খায় না হলে খায় না। মুখে শুধু রোশন—আমার রোশন!

রোশনের সেই আত্মীয় বাসা বদল করেও শান্তি পায় না। জোর করে ধরে রাখা রোশনের দিন কাটে শুধু চোখের জলে। তারও মনে শুধু একই চিন্তা—কথা দিয়েছে সে গোলাবকে—সে হয়ত এখনও তার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভাবনা-চিন্তায় দিনে দিনে শুকোতে থাকে সে। সমশেরকে নিয়ে শহরের আলোড়ন রোশনের আত্মীয়কে চিন্তান্বিত করে তুলেছে, তার ওপর রোশনের ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়—ভয় হয়। শেষে জোর করে রোশনের বিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই আত্মীয়। স্বামী তাকে নিয়ে চলে যায় লাহোরের—আর এক এলাকায়। কান্না ছাড়া আর কোন সাথীই রইলো না রোশনের। এমনি করেই কাটে আরও কিছু দিন।

উৎসবের সাজে সেজেছে সারা লাহোর। সকলেরই প্রাণে আজ একটা খুশীর আমেজ শুধু ঐ সমশেরের ছাড়া। সমস্ত অনুভূতি, সব সুখ-দুঃখের বাইরে চলে যাওয়া ঐ প্রেমিক পাগল কী জানি কী ভেবে হঠাৎই একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিছু পাওয়ার আশায় যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। শ্রান্ত অবসন্ন দেহটাকে খাড়া করে ধরে

কোন রকমে। তারপর যেন জীবনের শেষ আশাটুকু নিয়ে চলে লাহোর দরগার দিকে। যেখানে আজ জড় হয়েছে গোটা লাহোরের মানুষ—গরীব বড়লোক মেয়ে পুরুষ সবাই। নানা পসরা নিয়ে বসেছে পসারীরা। মেলার আনন্দ আজ লাহোর দরগায়। সমশেরও হাজির হলো সেখানে। গভীর আগ্রহে খুঁজতে থাকে রৌশনকে। প্রত্যেককে যেন তন্ন তন্ন করে দেখছে সমশের। হঠাৎ যেন পরশ পাথর পেয়েছে। তেমনি করে চমকে ওঠে দেখে ওই তো—ওই তো তার রৌশন। ছুটে চলে দিওয়ানা সমশের। ভীড় ঠেলে—চেপে ধরে ওর হাত—গভীর কম্পিত কন্ঠে ডাকে—রৌশন—আমার রৌশন!

চমকে ওঠে রৌশন। তাকিয়ে দেখে গোলাব। এক বুক আনন্দ আর দু চোখ ভরা শঙ্কায় বোকার মতন চেয়ে থাকে রৌশন। ও যেন পাথর হয়ে গেছে। রৌশন! আবার ডাকে সমশের। সম্বিত ফিরে পায় যেন সে। মুখে হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বারণ করে তারপর টেনে নিয়ে যায় তাকে এক পাশে। সমশেরের চোখে তখন অঝোর ধারায় বর্ষা নেমেছে। অভিমান ভরা কম্পিত কন্ঠে বলে—তোমাকে আমি কত খুঁজেছি রৌশন—কত খুঁজেছি। কাঁদে রৌশন। শঙ্কা জড়ানো গলায় প্রশ্ন করে—এখানে তুমি এলে কী করে?

—একদিন তুমি আমার জন্যে ধর্ম ছেড়েছিলে—আজ তোমার জন্যে আমি ধর্ম ছেড়েছি।

—এ তুমি কী করলে?

—তুমি কেন এত দেরী করলে? সমশেরের গলায় অভিমানের সুর।

—আমাকে যে ওরা জোর করে ধরে রেখেছিল।

—এখন তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে।

—আমার যে আর ফেরার পথ নেই। ওরা যে আমার বিয়ে দিয়েছে জোর করে।

সমশেরের হৃদয়ে যেন কে সজোরে চাবুক মারে। রৌশনের হাতটা চেপে ধরে সে। তুমি-তুমি—আর কিছু বলতে পারে না সে—সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছুই যেন আর বলার নেই।

ওদিকে রৌশনের স্বামী আর তার পরিবারের লোকজন রৌশনকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখে—নোংরা কাপড় জামা পরা কে একজন লোক রৌশনের হাতটা চেপে ধরেছে, নিশ্চয়ই কোন গুন্ডা-বদমাইস হবে। ব্যস্ বিনা প্রশ্নে শুরু হয়ে গেল ঘুসি আর লাথি। দুর্বল সমশের আঘাতের তীব্রতায় পাক খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সব যেন অন্ধকার হয়ে এলো।

রৌশন তখন কাঁপছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে—কাঁপছে সারা দেহটা। সে চীৎকার করে যেন বলতে চায়—না-না—ওকে মেরো না—ও আমার...। কিন্তু সব যেন গুলিয়ে যায়। কী যেন এক অসহ্য যন্ত্রণায় সে দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে—চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসে—টলে পড়ে একদিকে।

বাকরুদ্ধ সমশের মাটি থেকে বোকার মতন তখনও তাকিয়ে আছে। তার নাক মুখ চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসছে রক্ত—শুধু রক্ত। রক্তের ধারায় চোখ দুটো ঝাপসা—মুখটা ভরা লোনা স্বাদে। ওরা বলে ওঠে জেনানার যে ইজ্জৎ নিয়েছে তার এমনিই হয়। অসুস্থ দুর্বল শরীর আর সইতে পারে না। জ্ঞান হারায় সমশের। পড়ে থাকে তেমনি।

মেলা শেষ হয়ে এসেছে। অনেক রাত্রে অজ্ঞান অচেতন দেহটা নজরে পড়ে টাঙ্গাওয়ালাদের—লক্ষ্য করে দেখে এ তো সমশের। অসন্তোষ মোড় নেয় বিক্ষোভের দিকে। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে দেয়। ঠান্ডা জলের ঝাপটায় দোমড়ান মোচড়ান দেহটা কাঁপছে থেকে থেকে। এক সময়ে চোখ মেলে তাকায় কেমন যেন ঘোলাটে চাহুনি। চারিদিকে তাকিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে কী যেন খোঁজে! নিরাশ হয়ে আবার চোখ বোজে। ওরা জানে সব—বোঝে সব। ধরাধরি করে ওকে শাহীবাগে তার আস্তানায় পৌঁছে দেয়।

সারা রাত জেগে থাকে সমশের। কী যেন এক অনন্ত ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দেহটা থেকে থেকে কুঁকড়ে উঠলেও কোন বিকৃতি নেই। চোখে শুধু অঝোর ধারা। দুর্যোগের রাত সেও এক সময়ে যথারীতি কেটে যায়। দিনের আলোয় ঝলমল করে ওঠে সব কিছু। সমশেরও যেন নতুন জীবনের ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। প্রশান্ত মনে একটা নির্লিপ্ত শান্তিতে সে যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছে। কোথাও কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, দীন কান্না নেই, রাগ নেই, ঘৃণা নেই—আছে শুধু সব কিছু ভাল-লাগা আর ভালবাসার রূপ-বর্ণ-গন্ধ। ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে ওর মনটা যেন বলে ওঠে—কী সুন্দর দিনটা আজ। তারপর ওর যা কিছু যেটুকু জিনিষপত্র ছিল সব পরম অবহেলায় তার নিভৃত আস্তানায় ফেলে রেখে সে চলতে সুরু করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে লাহোর স্টেশনের দিকে।

স্টেশনের সবাই চেনে ওকে। তাই প্ল্যাটফরমে তার অবাধ গতি। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। প্রচন্ড গর্জনে দৈত্যের মত ছুটে আসছে লাহোর মেল। কেউ কিছু বোঝবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সমশের। সমস্ত স্টেশনটাকে দলিত-মথিত করে শুধু ভেসে আসে সমশেরের হৃদক-নিঙড়ানো শেষ আওয়াজ—কুলদীপ! কুলদীপ!

তারপর সারা লাহোর দেখলো সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য। সারা পৃথিবী জানলো সেই কাহিনী। টাঙ্গাওয়ালা, রিকসা-ওয়ালা, দিন-মজুরের লক্ষাধিক মানুষের সমশেরের দেহাবশেষ নিয়ে শোকমগ্ন মিছিল—পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাসে বোধ-করি দুর্লভ নিদর্শন। কান্নার অবরুদ্ধ আবেগকে ছাড়িয়ে এক দুরন্ত ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ঐ উন্মত্ত মানুষগুলোর মধ্যে। তাদের এক একটা হৃদয় বিদারক হুংকারে তারা রৌশন আর তার পরিবার আত্মীয়স্বজনদের যেন টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। সারা শহরটা ঘুরে শেষে ঐ শোভা যাত্রা এসে দাঁড়াল শাহীবাগে।

সমস্ত সংস্কার—সমস্ত ঐতিহ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে লাহোরের মানুষ সেদিন প্রেমিক-সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধির অদূরেই কবর দিল ঐ দীনতম লোকটিকে—এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহান দিওয়ানাকে। তার নাম গোলাবও নয়, সমশেরও নয়—ধর্মে সে শিখ, হিন্দু বা মুসলমানও নয়। জাতে নয় ভারতীয় বা পাকিস্তানী! তার একমাত্র পরিচয় দিওয়ানা—এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দিওয়ানা—প্রেমিক শ্রেষ্ঠ।

মাঝখানে কেটে গেল অনেক দিন। হঠাৎ শাহীবাগের এক প্রহরী এক গভীর রাতে দেখলো—ওই দিওয়ানার কবরে কালো বোরখায় ঢাকা এক নারী জেলে দিচ্ছে মোমবাতি। অশরীর আত্মার ভয়ে চীৎকার করে উঠলো সে। ওর চীৎকার শুনে ছুটে এলো অনেকে। এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। শুধু পড়ে রয়েছে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধাবৃন্ত আর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : শিপ্রা আদিত্য

কমল দাশগুপ্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া-শোনার ফাঁকে বছর তিনেক সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত শিল্প-শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে তিনি দার্জিলিং জেলার একটি পার্বত্য শহরে ইংরাজি শিক্ষকতা করছেন। গত ২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তিনি ২১ খানি তেল রং ও প্যাস্টেলের প্রদর্শনী করলেন। তাঁর কাজে নিসর্গ দৃশ্য, ফিগার ড্রইং এবং স্টিল লাইফের নিদর্শন দেখা গেল। অনেকখানি পরিণতির এখনো প্রয়োজন—বিশেষ করে তেল রঙের ক্ষেত্রে। প্যাস্টেলের একটি স্টিল লাইফ উল্লেখযোগ্য এবং কয়েকটি মহিলার ছোট স্কেচের মধ্যে একটা হাল্কা এবং নির্মল হাস্যরসের সঞ্চার প্রশংসনীয়।

●

ক্যানভাস শিল্পীগোষ্ঠী বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের পঞ্চম যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। চিত্র ও ভাস্কর্য নিয়ে ২৯টি কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। এবারকার কাজে শিল্পীদের রঙের ছবি আগেরবারের চেয়ে কিছু উন্নত হয়েছে এবং আরো বেশী অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে ঝুঁকতে দেখা গিয়েছে। ফিগারেটিভ ছবি যা আছে সবই প্রায় সেণ্টিমেণ্টাল। অবশ্য সব জায়গায় যেমন দেখা যায় এখনেও সেই রকম ডেরিভেটিভ কাজের সংখ্যাই বেশী। শান্তি চক্রবর্তীর "ডিল্যাপিডেটেড বিউটি" নামে দুখানি ছবির বিষয়বস্তু স্থাপত্যনির্ভর কাজ এবং ফ্রাঞ্জ ক্লাইন ঘেঁষা। সুখেন্দু রায়ের "টু সারভাইভ" ক্রন্দনরত একটি গ্রুপের ছবি—অতিশয় সেণ্টিমেণ্টাল এবং খুব একটা সুঅঙ্কিত নয়। স্বপনেশ চৌধুরীর নাগা যোদ্ধার ছবির রং এবং প্যাটার্ন মন্দ হয়নি। অশোক বিশ্বাসের দুখানি ষাঁড়ের ছবির একটি ত প্রায় ক্লীট থেকে আমদানী বলে মনে হয়। বেশ রঙচঙে কাজ। মানিক তালুকদারের 'ফিশ' এবং 'বার্ড' মূর্তি দুটি ইণ্টারেস্টিং। সুধীর ধরের ২০ নম্বরের মা ও ছেলের মূর্তিটিও মন্দ হয়নি।

●

১ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ৫৪বি মহানির্বাণ রোডে উত্তরঙ্গ চারুকারু শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। ৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা জল রঙ, ক্রেয়ন, পেন্সিল ও কালি কলমের ড্রইং-এর প্রায় ৭০ খানির ওপর নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা ল্যান্ডস্কেপ ও ফিগার এই উভয়েরই ছবিতে সমান ব্যবহার করেছে। মানুষের নানারকম কর্মলিপ্ত অবস্থার ছবি এঁকেছে, মিমি রায়, শীলা বাগচি, অরুন্ধতী রায়, কৃষ্ণাশ্রী বসু, দেবযানী বাগচি প্রভৃতি ছাত্রীরা জল রঙের ব্যবহারে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

●

৪১ নম্বর চৌরঙ্গীর কনক বিল্ডিং-এর একতলার একটি ঘরে "দর্শক" আয়োজিত একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন হল। পাঁচজন তরুণ ও প্রবীণ শিল্পীর ২৬ খানি জল রঙ ও গ্রাফিকের নিদর্শন নিয়ে ছোট এই প্রদর্শনীতে প্রধানত স্কেচের প্রাধান্যটাই লক্ষ্য করা গেল। দেবব্রত মুখার্জির স্বচ্ছন্দ জলরঙের কাজ 'সুন্দরবন' ছাড়া স্কেচগুলিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। চারু খাঁর আধা অ্যাবস্ট্রাকট ঘেঁষা "ইন্ডা-স্ট্রিয়াল এরিয়া" ও "স্বারকার ঘাট" বেশ বর্ণাঢ্য ছবি। এছাড়া সুবীর ব্যানার্জি, দীপালি পাল এবং বিশেষ করে শিপ্রা আদিত্যর স্কেচগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

●

গত ৩২ বছর ধরে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশের প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক চারুশিল্প ও বিশেষ করে লোকশিল্পের একটি অনন্য সংগ্রহ এখানে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংগ্রহশালাটি যে সময় খোলা থাকে সে সময় এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কারো তা দেখার সুযোগ হয় না। এমনকি এঁরা যখন বিশেষ প্রদর্শনীর অয়োজন করেন তখনো পর্যন্ত শহরের অন্যান্য গ্যালারির মত এটিকে খুলে রাখার ব্যবস্থা নেই তাই জন-সাধারণের অনেকেই এই সংগ্রহশালার প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ পান না।

●

তরুণ মূকবধির শিল্পী সুনির্মল ব্যানার্জি ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁর জল রঙ ও প্যাস্টেলের কতকগুলি ছবির প্রদর্শনী করলেন। অনেকগুলি স্বচ্ছন্দ জলরঙের ছবি দেখা গেল তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল একটি মূকবধির মুখের বিচিত্র অভিব্যক্তি আঁকা জোরালো ছবি। —চিত্ররসিক

অন্ধকার টানেলে

বিনতা রায়

'একি! তুই এখনও তৈরী হোস নি? সাতটায় পেঁাছবার কথা। আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকী।' মার্কেটিং করা প্যাকেটগুলো বিছানার ওপর নামায় চিত্রা।

"আমার তৈরী হ'তে পনেরো মিনিট লাগবে না।' আলসোমি ভেঙে উঠে দাঁড়াল রত্না। 'কিন্তু সত্যি বলছি, এই পার্টি ফার্টি আমার একদম ভাল লাগে না। ওর সঙ্গে এসব অনেক করেছি। কোনোদিনই ভাল লাগে নি।'

'ওর সঙ্গে যা কোনোদিন ভাল লাগেনি, একা একা তা আবার ভীষণ ভাল লেগে যেতে পারে।' কৌতুকে ঝলমলিয়ে উঠল চিত্রা। একটা ইজিচেয়ারে আরাম ক'রে বসে বলল, 'ছমাস ধ'রে চাকরির চেষ্টা তো করলি। এখানে এমন অনেকেই আসবেন, যাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ে একটা কিছু হয়ে যেতেও পারে। একবার দেখতে দোষ কি?'

'ওই দিকটা ভেবেই তো জোর ক'রে আপত্তি করতে পারছি না।' ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে রত্না। তারপর আধ-ঘণ্টার মধ্যে তারা এসে পেঁাছয় ক্লাবে। কারুর কারুর সঙ্গে রত্নার আগেই আলাপ ছিল। অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চিত্রা।

একজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নাম সুরঞ্জন মজুমদার। ব্যাচেলার মানুষ। সুদীর্ঘকাল বিদেশে থেকে নানারকম পড়াশোনা আর গবেষণা করে কাটিয়েছেন। নামের সঙ্গে অনেকগুলো ডিগ্রী। কিন্তু কি আশ্চর্য সহজ সরল মানুষটি। বহুকাল পরে দেশে ফিরে সবই তাঁর কাছে নতুন লাগছে। সব বিষয়ে শিশুসুলভ কৌতূহল। ক্লাবে এ'র সঙ্গে গল্প করেই বেশীর ভাগ সময় কেটে গেল রত্নার। চমৎকার লাগল মানুষটিকে।

বেশ রাতে দুই বান্ধবী বাড়ী ফিরে আসে। একই ঘরে দুটি বিছানায় শুয়ে পড়ে। মাথার কাছে দু'জনের বিছানার মাঝে একটা বেড-সাইড টেবিলের ওপর ছোট ল্যাম্পটা হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দেয় চিত্রা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চোখ খুলে একটু অপেক্ষা করে। রত্না সামান্যই ড্রিঙ্ক করেছে। চিত্রার যথেষ্ট অভ্যেস আছে। তবু, বস্তুটা যে কোনো আবেগকে একটু বাড়িয়ে দেয় বৈকি। কিন্তু চিত্রা নিজেকে সংযত রাখতে জানে। উঠে গিয়ে বসে রত্নার পাশে। ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দেয়। 'কাঁদছিস কেন?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রত্না। বলে, 'ইরার ব্যবহারটা দেখলি? বছর ঘুরতে

চলল, মার কথা তার একবার মনেও পড়ল না? আমার প্রতি কি ওর কোনো টান নেই?'

মাঝরাতে বিরক্তিকর লাগার কথা। কিন্তু চিত্রা বিরক্ত হয় না। ওর মনটা যে কতখানি কোমল, সেটা বাইরে থেকে তার হাবভাব চালচলনে মোটেই বোঝা যায় না। রত্মার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'দ্যাখ, রত্মা, আজকাল মা-বাপের প্রতি সন্তানের টানের থেকেও জীবনের সিকিওরিটিটা অনেক বেশী দামী। ইঞ্জিনীয়র অমর বোসের বাড়ী-গাড়ী, অমন রোজগার। মেয়েকে লরেটোতে পড়াচ্ছে, যেমন খুশি টাকা ওড়াতে দিচ্ছে। ইরা তার বাপকে ছেড়ে তোর কথা ভাবতে যাবে কেন? আজকাল ওরা মোটেও অমন সেন্টিমেন্টাল নয়। তুই মা, তোর তো এসব বোঝা উচিত।' তারপর হেসে বলে, 'আমার তো এসব ভাববার সুযোগই হল না এ জীবনে। যাক গে, কাঁদিস না। জীবনটাকে বাস্তব দিক থেকে দেখবার চেষ্টা কর্। রাত অনেক হল, ঘুমিয়ে পড়। হ্যাঁ, মজুমদারকে কেমন লাগল রে?'

চোখ মুছে রত্মা বলে, 'ভাল, খুব ভাল মানুষ। ঠিকানা নিলেন, এখানে আসতে চান।'

'বেশ তো, নিশ্চয়ই আসবেন। যাই শুয়ে পড়ি গে, মাথাটা ভারী লাগছে।' উঠে পড়ে চিত্রা।

●

রত্মা বলে, 'তুই এত বেশী ড্রিংক করিস কেন? লোকে বড় নিন্দে করে।'

'করুক। ওতে লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।' আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ে চিত্রা।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই সুরঞ্জন মজুমদার রত্মার কাছে মাঝে মাঝে আসতে শুরু করলে। চিত্রার চেষ্টায় একটা ভাল চাকরিতেও ঢুকলো রত্মা। অমর বোসের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পর চিত্রাই জোর করে ওকে ধরে আনে নিজের ফ্ল্যাটে। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'গল্পে যেমন পড়া যায়, বিধবাবাড়ী আছে, আমার ফ্ল্যাটও তেমনি হবে ডিভোর্সিজ লজ। নিশ্চিন্তে চলে আয়।' সেইখানেই ছিল রত্মা। তারপর চাকরিটা পাবার পর নিল আলাদা ফ্ল্যাট।

চিত্রা কিছুদিনের মধ্যে শুনতে পেল, মজুমদারের সঙ্গে রত্মার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। দুজনকে প্রায়ই সিনেমা কি গঙ্গার ধারে দেখা যাচ্ছে। বিয়ে করতে পারে এমনি কথাও শোনা যায়। চিত্রা এতে খুশিই হয়েছে। কারণ, চিত্রার মতে, সব ধাতের মেয়েরা একা থাকতে পারে না। মনের কাছে একজনকে না হলে তারা পাগল হয়, না হলে আত্মহত্যার মতো বোকামিও করে বসে।

চিত্রা প্রায়ই ক্লাবে যায়। সেদিন ওরা তিনজন একসঙ্গেই গেল। আনন্দ কোলাহলের মধ্যে চিত্রা হঠাৎ থমকে যায়। দেখে, হাসিমুখে এগিয়ে আসছে রত্মার ভূতপূর্ব স্বামী অমর বোস। এখানে তাকে খুব একটা দেখা যায় না। 'হ্যাল্লো।' হাত বাড়িয়ে দেয় বোস। চিত্রাও প্রত্যুত্তর করে, 'হ্যালো, তারপর?'

বোস চোখ দুটো ছোট করে কৌতুক করে, 'আচ্ছা, স্বামীদের কাছ থেকে ছাড়া পেলেই কি মেয়েরা খুব সুন্দর হয়ে ওঠে!' একটা বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিরা একই ধরনের বাঁধাগতের রসিকতাগুলো ছাড়া আর বোধ হয় কিছু জানেই না। গা জ্বলে যায়। কিন্তু অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই হেসে উঠে গলা নামিয়ে কৌতুকের সঙ্গেই প্রশ্ন করে চিত্রা, 'কথাটা কি আমাকে বলা হচ্ছে?' বোস হেসে ওর গালে একটা টোকা দিয়ে বলে, 'আরে সে তো বটেই। তবে আজ আর একজনকেও তো এখানে দেখছি।' চিত্রা স্বাভাবিকভাবেই বলে, 'আবার ওদিকে নজর কেন? ছেড়েছেন যখন, তখন একেবারেই রেহাই দিন না।'

কিন্তু রেহাই দেয় না অমর বোস। রত্মাকে সে যেন আজ নতুন চোখে দেখছে। দোলা লাগছে মনে। ওকে কাছে পেতে চায়।

সাধারণ মনের মেয়ে রত্মা। প্রথমটা খুবই গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভেতরে একটা দুর্বলতাও যেন বোধ না করে পারে না। ক্রমে নানা ছুতোয় অমর বোস রত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াও চলতে থাকে।

●

সেদিন সন্ধ্যায় শরীরটা মোটেই ভাল না থাকায় বাড়ী থেকে বেরোয় নি চিত্রা। ভৃত্য এসে জানায় মজুমদারসাহেব এসেছেন। চুলটা একটু ঠিক করে নিয়ে দ্রুত গিয়ে বোসবার ঘরে ঢোকে চিত্রা। বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। একি চেহারা হয়েছে ভদ্রলোকের? ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। 'বসুন বসুন মিস্টার মজুমদার। শরীর ভাল নেই?'

'শরীর ভালই আছে। ক'দিন ধরে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করব ভাবছিলাম। আজ কোনো খবর না দিয়েই চলে এলাম।' কৌচে বসে সুরঞ্জন।

'খুব ভাল করেছেন। দাঁড়ান চট্ করে দু' কাপ কফি করে আনি।' ভেতরে চলে যায় চিত্রা। বোধ হয় একটু সময় নিতেই ভদ্রলোকের সামনে থেকে সরে যায়। রত্মার কথা উঠলে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

কফি নিয়ে ফিরে এসে দেখে, সুরঞ্জন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। চিত্রার সাড়া পেয়ে আবার এসে বসে, 'আপনার জানলাটা দিয়ে লেকের দিকটা ভারী সুন্দর দেখায়।' কাপে চুমুক দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তারপর বলে, 'আপনার বন্ধুর খবর কি?'

চেষ্টা করে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেই চিত্রা প্রশ্ন করে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর যেন হঠাৎ সুরঞ্জন কথা বলে ওঠে, 'না, আমার সঙ্গে মাস তিনেক দেখা হয় নি। আজ একবার গিয়েছিলাম, শুনলাম বেরিয়ে গেছেন।' একটু থেকে আবার বলে, 'আপনি বোধ হয় জানেন না। আমাদের সবই সেট্‌লড্ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি যে হল!'

চিত্রা প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল, 'আপনি কি এদেশেই থাকবেন ঠিক করেছেন?'

'হ্যাঁ, রত্মার সেই রকমই ইচ্ছে যে। চাকরিটা ছাড়তে চান না। তা আমারই বা এতে আপত্তি করার কি আছে? থাকুন না একটা কাজ নিয়ে। আমার যেটুকু যা আছে, তাতে দুজনের জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু— জানেন, আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।'

এ রকম শাদা মনের একটি মানুষকে কিই বা বলতে পারে চিত্রা। এক-একবার ইচ্ছে করছে রূঢ়ভাবে বলে দেয়, ভদ্রলোক এ জগৎটাতে যেন একটু চোখ খুলে চলে। কিন্তু না, অসম্ভব। ব্যথায় মানুষটা নীল হয়ে যাবে, চিত্রা যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। সান্ত্বনার স্বরে তাই সে বলে, 'এত ভাববার কি আছে? দেখুন না কি হয়। কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে বোধ হয়।'

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুরঞ্জনের মুখ। বলে, 'ঠিক বলেছেন আপনি। নিশ্চয়ই কোনো কারণে খুব ব্যস্ত আছেন। যেটা হয়তো আমাকে জানাতে চান না। আপনি ঠিক বলেছেন। শুধুই আমি ভাবছিলাম। আচ্ছা, আজ চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

'কিছুমাত্র না। কিই বা রাজকাজ করছিলাম? আচ্ছা, আসবেন আবার।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসব। রত্নাকে নিয়েই আসব।' চলে যায় সুরঞ্জন।

ঘড়ি দেখে চিত্রা। সাড়ে এগারটা। তৈরী হয়ে নেয়। রত্নার ফ্ল্যাটে গিয়ে একটানা বেল দেয়।

রত্নাই এসে দরজা খোলে। নিয়ে গিয়ে বসায় শোবার ঘরে। 'ব্যাপার কি? এমন অসময়ে চিত্রাদেবী! ক্লাবে যাসনি?' হাসি-মুখে প্রশ্ন করে রত্না। তারপর ব্যস্তভাবে বলে, 'এক মিনিট বস ভাই, চোখেমুখে একটু জল দিয়ে আসি। এইমাত্র ফিরলাম।' গুন্-গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বাথ-রুমে গিয়ে ঢোকে রত্না।

ইজিচেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে চিত্রা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে নেয় রত্না। দু' কাপ কফি নিয়ে এসে মুখোমুখী বসে চিত্রার। 'তারপর? খবর কি বল্।'

কফিতে চুমুক দিয়ে চিত্রা বলে, 'খবর আমার নয়। তোর কথাই জানতে এসেছি। কি ঠিক করলি, আর একবার মালাবদল করে ঘরে ফিরে যাবি?'

একটু লাল হয়ে ওঠে রত্নার মুখ। বলে, 'তা ঠিক নয়, ও রকম কিছু করতে একটু অস্বস্তি লাগবে।'

হেসে ওঠে চিত্রা। কাপটা টি-পয়ে নামিয়ে রাখে। 'অ-সো-য়া-স্তি। একটু 'অস্বস্তি' লাগবে। থাক তবে। তার চেয়ে এই প্রেম-প্রেম খেলাটাই চলুক না!—বেশ মজা লাগছে না রে?'

'মজা কিনা জানি না। তবে একটা আনন্দ আছে বৈকি!' সহজভাবেই বলে রত্না।

'না রত্না, আনন্দ একে বলে না। একে বলে মজা। ফুর্তি।' খুব শান্তভাবে কথা বলে চিত্রা। 'সুরঞ্জন তো নাক-কান ডুবিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে-ও হাতে থাক, আবার এদিকে—আচ্ছা, সুরঞ্জনের মতো একটা মানুষকে এমন করে কাছে টানলি কেন? ও যে একেবারে অবোধ শিশু একটি!'

'বারে, আমি কি জানতাম, অমর আবার এভাবে পাগলামো শুরু করবে?' রত্না যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে চাইছে।

'সবাই আগে থেকে সবকিছু জানে না। কিন্তু জীবনের যে কয়েকটা রীতিনীতি আছে, সেটা মানতে হয়। যে কোনো জায়গায় নিজের মনকে স্থির করতে হয়। আমি অনেক ডিভোর্স স্বামী-স্ত্রী দেখেছি। স্বামী বা স্ত্রী দু' পক্ষের একজনকেই ধর্—সে যখন প্রশান্ত ধৈর্যের সঙ্গে নিজের একটা পথে চলে, তখন অপর পক্ষের যে অনুরাগ আসে, সেটা হয় সম্পূর্ণ একটা শ্রদ্ধার ব্যাপার। বড় চমৎকার। কিন্তু তোর আজকের এই ঘটনা, আরও অনেকের কথাই বলছি—তোদের মনের স্থিরতার অভাবে, এই খেলার শিকার হয় কয়েকটি বোকা, সরল ভালমানুষ। যারা শুধু জানে বিশ্বাস করতে, শুধু জানে সবকিছুকে গভীরভাবে দেখতে। বোকা—বোকা! তারা জানে না এ জগতে এগুলোর মূল্য কেউ দেবে না।' কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে চিত্রা। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নেয়। 'অফিসের বস-এর সঙ্গে তিন মাস স্টেটস্ এ ঘুরে এলাম। মাঝে মাঝে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরি ভোররাত্রে। আমি আবার এসব কি বলছি তাই না? মনে মনে হাসছিস বোধ হয়?'

'না, তা নয়—কিন্তু, মানে অবনীও কি তোর কাছে আসে না?' রত্না একটু হাঁপিয়ে উঠছে।

'একসঙ্গে তো অনেক দিন কাটালাম। দেখেছিস তাকে আসতে?'

'তা দেখিনি। কথাটা শুনেছিলাম আগে?—সেটা কি সত্যি নয়?'

'আসতে চেয়েছিল। গোড়াতেই বাধা দিয়েছি। আসল কথা হচ্ছে, ঘরছাড়া মেয়ে-দের বাইরের জগৎটা আয়ত্তে রাখতে চেহারায়, সাজপোশাকে একটা জৌলুস আনতেই হয়। ওরা সেটা দেখে নতুন করে ভোলে মাত্র—আর কিছু নয়। অবনীর বিয়ের খবর তোরাও শুনেছিস। মেয়েটি আমার থেকে বয়সে বেশ ছোটো। সুন্দর একটা বাচ্চাও হয়েছে ওদের। আমার সঙ্গে নিছক একটা রোমান্সের খেলায় অবনীকে কি করে আমি প্রশ্রয় দিতাম? তোর জন্যে সুরঞ্জন বিষ খাক কি সন্ন্যেস হোক, আমার কারণে একটা মেয়ের জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচে যাক, এ কি সম্ভব! অনেক সময় অনেক কথা মনে হয়, বলবার লোক পাই নে। আর আমার যে বন্ধুবান্ধব, তারা এসব শুনবেই বা কেন? সন্ধ্যায় সুরঞ্জনকে দেখ-লাম। ওরা আলাদা জাতের মানুষ। ছুটে এলাম তোর কাছে। ভাল লাগুক না লাগুক, আমাকে কথা বলতে বাধা অন্তত তুই দিবি না।'

'তা কেন দেব চিত্রা? তোর মতো এমন করে আমি কখনও কিছু ভাবিও নি। কিন্তু এখন আমিই বা কি করতে পারি?'

'তা আমি জানি না রত্না! যেমন ভাবে জীবনকে দেখেছি তাই তোকে বললাম। তোর বয়স হয়েছে। পরিণতিহীন ভেসে বেড়ানো কিম্বা স্থিত জীবন, ভেবে দ্যাখ, তুই কি চাস।'

উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দেয় চিত্রা। গিয়ে দাঁড়ায় জানালায় পিঠ দিয়ে। তারপর বলে, 'কিন্তু রত্না, এ তো শুধু তোর আমার কথা নয়। আরও তো অনেকে আছে। অনিবার্য কারণে আমরা পরস্পরকে মেনে নিতে পারি নি। দূরে সরে গেছি। কিন্তু তারপর?—এ সমাজে আমরা যেন চলেছি একটা অন্ধকার টানে-লের ভেতর দিয়ে। দমবন্ধ হয়ে মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছি এদিক ওদিক। যে কোনো একটা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছি, সেইটেইকেই জীবন বলে। জানি না কবে দাঁড়াবো খোলা আকাশের নীচে। বুক ভরে নিতে পারব মুক্ত বাতাস। যেখানে নেই কোনো গ্লানি—আছে আনন্দ, আছে শান্তি!'

অঙ্গনা
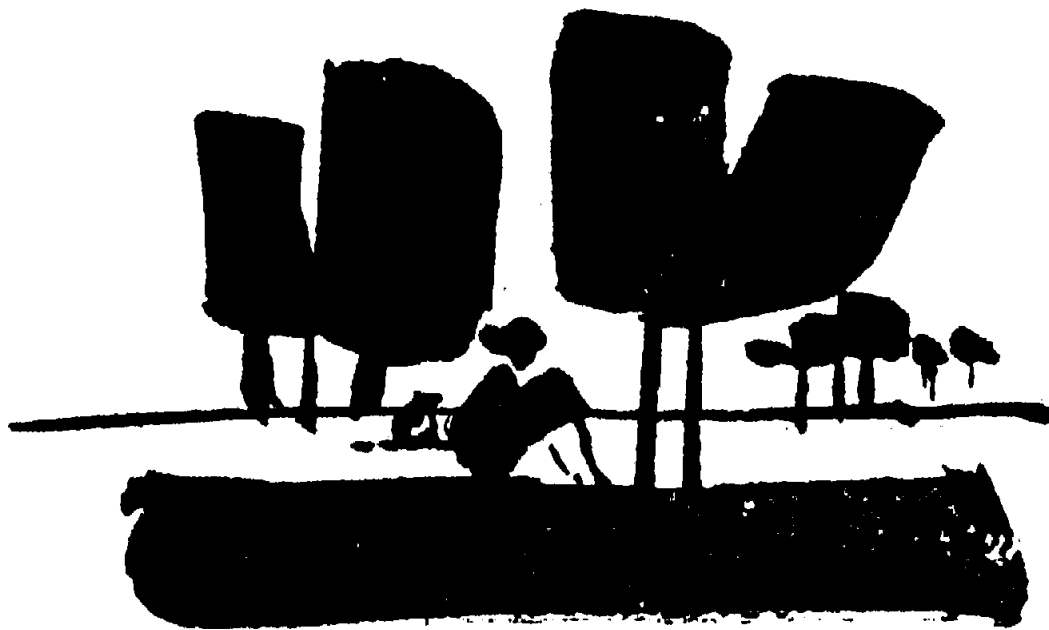
মা-বাবার ভাবনা

চারদিকে অতিমাত্রায় ছেলেরা বয়ে যাচ্ছে। মা-বাবাকে তাই খুব সতর্ক থাকতে হয়। সজাগ থাকতে হয়। ছেলেপুলেকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হয়। হাজারো নিষেধের বাঁধনে তাদের বেঁধে রাখতে হয়। আর প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিতে হয়, পৃথিবী বড়ো কঠিন ঠাঁই। একটু বেচাল হলেই সর্বনাশ। তারপর আরম্ভ হয় বিরাট ফিরিস্তি—বাবা কত কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন, তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বাবা এবং মা এত হিসেব করে চলেন বলেই তারা এই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছে। প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এই বাঁধাগতের সারগর্ভ বক্তৃতা মা অথবা বাবার কাছে কতোবার যে শুনতে হয় তার লেখাজোখা নেই।

ছেলেপুলেদের বুঝতে দিতে হবে কোনটা তাদের করা উচিত আর কোনটা উচিত নয়। এই অধিকার তাদের জন্মগত। একে খর্ব করা ভয়ানক অন্যায়। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই তা মেনে চলি না। সে কিছু অন্যায় করলেই মা বলে বসেন, তার বাবা তাদের জন্য কত কষ্ট করছেন। তিনি নিজে কত কষ্ট করছেন। দেরিতে বাড়ি ফিরলে তিনি কি ভীষণ চিন্তিত হন। এবং সর্বোপরি তিনি না থাকলে তাদের বাবার পক্ষে যেমন কিছু করা সম্ভব হোত না তেমনি সংসারও ভেসে যেত। একবারও তিনি ভেবে দেখেন না শিশুমনে তাঁর এই বক্তৃতার কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এই খোঁচা দেওয়া কথায় শিশুচিত্ত খুব আহত হয়। সে কারো কাছে মুখ খোলার ভরসা পায় না, পাছে আবার ধাতানি খায়। তাই একান্ত সংগোপনে নিজেই চিন্তা করে, বাড়ির কাছে সে বোঝাস্বরূপ। এবং কিছুটা অবাঞ্ছিতও। তার নিজেকে সব সময় অপরাধী মনে হয়। হয়তোনিজেকে সে সংশোধন করতেও পারবে না। ইচ্ছে থাকলেও বাড়ির অনিচ্ছার অভাবে তার এই সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে সে গোড়ায়ই পঙ্গু হয়ে যায়। এই ব্যাধি নিরাময়ের আর কোন পথই থাকে না।

সব মা-বাবাই চান, সন্তান তাঁদের সব কথা খুলে বলুক। অন্তত মা-বাবাকে সব কথা বলার মতো মনোভাব যেন তার তৈরি হয়। তার প্রবণতাও গোড়ায় এদিকেই থাকে। কিন্তু এক-আধবার ধাক্কা খাওয়ার পরই মা-বাবার উপর তার এই আস্থার ভাব ক্রমেই কমতে থাকে। তার মনে হয়, মা-বাবা বোধহয় তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তাই ফিরতে একটু দেরি হলেই নানা প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এর ফলে তার সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্কেও চিড় খায়। এটা মা-বাবার জানা উচিত, সে যদি কোন ভুলত্রুটি করে থাকে তবে তাকে সেটা বুঝতে দিতে হবে, যাতে সে নিজেকে নিজেই ভবিষ্যতে সংশোধন করে নেবে বা নিতে পারবে।

যেদিন সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের দল ছাত্রদের উপর বেত্রাঘাত এবং রূঢ় ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিনই সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার নতুন আচরণবিধিও প্রণীত হয়েছে। বেতের দিন ফুরিয়েছে সত্যি কিন্তু অনেক মা-বাবা সব সময় উপদেশমূলক কথাবার্তা বলেন। তাঁরা যথেষ্ট যুক্তিসহ হওয়া সত্ত্বেও এখানে প্রচন্ড ভুল করে বসেন। এর প্রতিক্রিয়া হয় বিরূপ। কারণ বাড়ি তো আর মনস্তত্ত্বের আখড়া নয়। ছেলের পক্ষে এটা বোঝা হয়ে হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যকার 'ন্যাচরালনেস'-এর অপমৃত্যু ঘটে। মা-বাবার সঙ্গে তার স্বাভাবিক এবং সহজ সম্পর্কও ক্ষুন্ন হয়। আবার যে বাড়িতে কথাবার্তা কম হয়, অঙ্গুলি হেলনে কোন কার্য সমাধা হয় অথবা যেখানে হৈ-চৈ এবং গোলমাল খুব বেশি হয়, এ রকম দুটো পরিবেশই শিশুমনের পরিপন্থী। এখানে শিশু পরিপূর্ণ হয় অর্ধপূর্ণ। তার বাকি অর্ধেকটা শূন্যই থেকে যায়। এসব পরিবারের ছেলেরা জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলে। জীবন তাদের কাছে মনে হয় খুব কঠিন। তারা লাজুক হয় এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর ভাগ্যের এমনি পরিহাস এই দুঃসহ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য অধিকাংশ সময়ই তাদের মা-বাবা আর বেঁচে থাকেন না। অথবা বেঁচে থেকেও কিছু করতে পারেন না। কারণ চরিত্র গঠনের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত।

সন্তানের ভালোর জন্য মা-বাবার চিন্তার অবধি নেই। তাঁরা চান কি করলে তাঁদের ছেলে অথবা মেয়ে 'সকলের সেরা' এই সার্টিফিকেট পাবে। অন্য সব মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এদের পথে চলতে বলবেন, এদের অনুসরণ এবং সর্বোপরি অনুকরণ করতে উপদেশ দেবেন। এটা মা-বাবার জীবনের এক মস্ত আকাঙ্ক্ষা। এর বশবর্তী হয়ে তাঁরা অন্ধভাবে ছুটে চলেন।

কোন সন্তানের প্রতি পক্ষপাত নয়, সবাইকে সমান নজরে দেখা। অনেক মা-বাবাই এই অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা কেন নিজেরা বিচার করে দেখেন বাস্তবিকই এই অপক্ষপাতী মনোভাব ঠিক ঠিক বজায় থাকে কি না। একটু আলোচনা করা যাক। উক্ত মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মা সব সন্তানকে সমান মনে করেন, সকলকে একই রকম ভালবাসেন, সকলের সঙ্গে একই নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হন। আজ যদি তিনি একজনের জন্য একটা বই কেনেন তো কাল আরেকজনের জন্য একটা নিয়ে আসেন। আজ যদি ছোটখুকীর জন্য একটা পছন্দসই জামা আনেন তো বড়খুকীর জন্য তার পরদিনই আরেকটা আনা চাই। এ ব্যাপারে তিনিও একটু ভাবনা-চিন্তা করেন না। সকলের দিকে সমান নজর দিতে হবে এই চিন্তায় তিনি বিভোর। বড়খুকীর সত্যি জামাটা দরকার আছে কি না সে ভাবনা যেন তাঁর নয়। মা-বাবারা এরপর ভেবে স্বস্তি পান, তাঁদের এই পক্ষপাতহীন আচরণ সন্তানদের যথার্থ মানুষ করে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু হয় ঠিক তার উল্টো। প্রতিযোগিতা এবং হিংসার মনোভাব এদের মধ্যে গড়ে ওঠে। যার ফল বিষময়। এইভাবে নীতিবাগীশ মা-বাবার দৌলতে সন্তানের বনিয়াদ একদম নড়বড়ে হয়ে গড়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সেখানে তারা স্বচ্ছন্দবিহার করতে চায়। শিশুমনের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী তারা অনেক কিছু গোপন করতে চায়। কিন্তু মা-বাবারা এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। সব ব্যাপারে তাঁরা শিশুর চেয়েও বেশি কৌতূহলী হয়ে নানা প্রশ্ন করেন। এর ফলাফল কখনই ভাল হয় না। মা-বাবাদের এটা বোঝা একান্ত দরকার। কারণ, তাঁদের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী ছেলেমেয়ের আর কে আছে?

মা-বাবারা আজকাল খুব নিয়ম নীতি মেনে চলেন। বেনিয়ম তাঁদের জমা-খরচের বাইরে। ছেলেমেয়েদের সামনে মা-বাবা ঝগড়া করবেন না। তাহলে ছেলেমেয়েদের মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই স্বামী স্ত্রী অর্থাৎ মা-বাবার মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। সুকৌশলী স্বামী স্ত্রীকে আলাদা ডেকে অথবা ছেলেমেয়েদের চোখের উপর দরজা বন্ধ করে বেশ ধমকালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি থমথমে মুখে অথবা চোখে জল নিয়ে ছেলেমেয়ের সামনে এলেন। বিচক্ষণ মা-বাবা বুঝলেন না এর প্রতিক্রিয়াও খুব শুভ হতে পারে না। আবার এমন অনেকও আছেন, যাঁরা মতানৈক্য এবং মনোমালিন্যের পালাটা বাইরে মিটিয়ে নেন। ছেলেমেয়ে যাতে বুঝতে না পারে তাঁরা জোড়াতালি দিয়ে চলছেন। ভবিষ্যৎ জীবনে ছেলেমেয়ে যাতে সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।

আবার এও দেখা গেছে, পুরোপুরি শান্ত, সুশৃংখল পরিবেশে মানুষ হয়েও ছেলেমেয়ের অপূর্ণতা থেকে যায়। রাগ-ক্রোধ এবং উদ্বিগ্ন মনোভাব তাদের অজ্ঞাতে রয়ে যায়। সর্বোপরি অভাব বস্তুটার সঙ্গে তাদের কোন পরিচয়ই থাকে না। অথচ মানুষের অবস্থা তো 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে'।

তাই সর্বদিক জানিয়ে, চিনিয়ে, শুনিয়ে ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর পথে চলতে দিতে হবে। নতুন জগতের সন্ধান যেমন দিতে হবে তেমনি তাদের নিজের জমৎ-ও থাকবে। তারা নিজে চলতে শিখবে, মা-বাবা তাদের চালিয়ে নেবেন। এমনিভাবে তারা হবে সম্পূর্ণ—যথার্থ মান-হুঁশ।

—প্রমীলা

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

যশোর রোড!
কোথায় যাবেন?
ট্যাক্সি গ্যারাজে যাচ্ছে!
তা হলে কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করলে কেন?

ট্যাক্সিওয়ালা জবাব না দিয়ে চলে গেল।

দেখলে মেজাজ! জবাব পর্যন্ত দিলে না!

পরমুহূর্তে পরাশর যা করে বসল তাতে কৃত্তিবাস হতভম্ব।

প্রেক্ষাগৃহ

তরুণ অভিনেতা শমিত ভঞ্জ। ফটো ঃ অমৃত
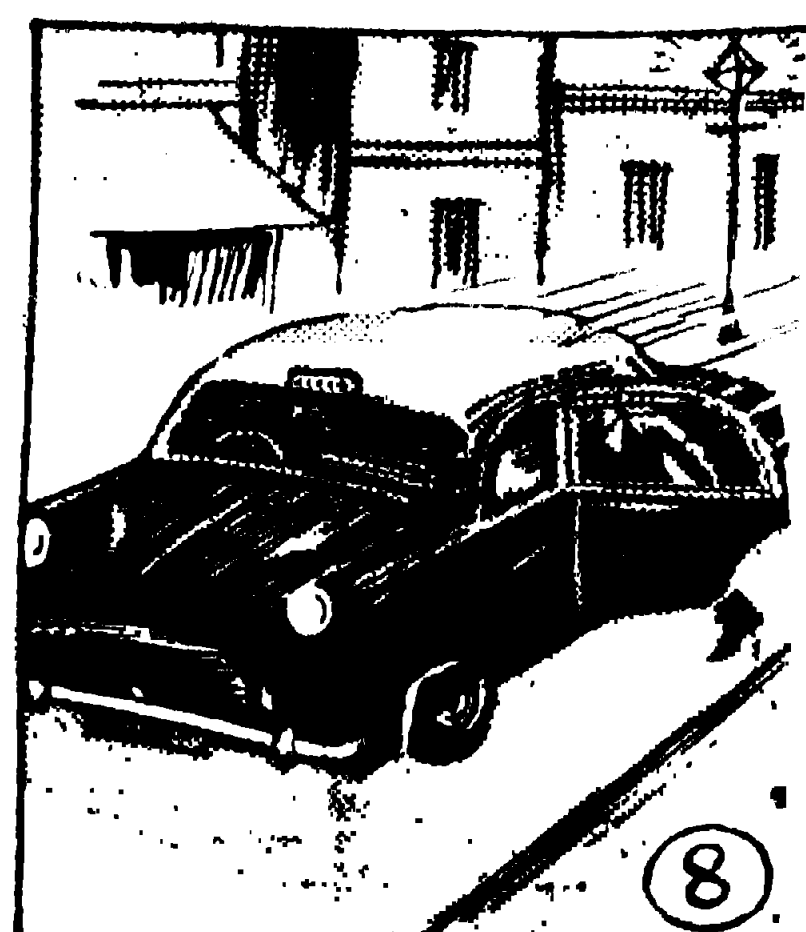
চিত্র সমালোচনা

রমণীপ্রেম ও দেশপ্রেমের পর্যায়িত তরঙ্গে

কোন্ সে রাজ্য বসন্তপুর, তা জানিনা, যেখানে পর্তুগীজরা যুদ্ধঘাটি স্থাপন করতে চায়। সে রাজ্যের এক রাজা আছেন; কিন্তু তিনি তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেওয়ানের বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদ মাত্র জানাতে পারেন, কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না। এমন কি, দর্শনার্থী প্রজাদের সামনে তাঁর বেরোবার হুকুম নেই। দেওয়ানের ইচ্ছা, একদিন সে এই বসন্তপুর রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে উঠবে এবং এই ইচ্ছা পূরণের জন্যে সে রাজার ইংলণ্ড-প্রবাসী উচ্চশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। অথচ রাজকুমারী ইংলণ্ডে থাকতেই প্রেমে পড়েছে ভারত নামে এক ভারতীয় যুবকের, যে নাকি একই রাজ্যের—ঐ বসন্তপুরের বাসিন্দা। রাজকুমারী প্রথমে আত্মপরিচয় গোপন রেখেই চলছিল; কিন্তু যেদিন চার্টার্ড এরোপ্লেন এল তাকে ভারতে নিয়ে যাবার জন্যে, সেই দিনই তার আসল পরিচয় প্রকাশ পেল ভারতের কাছে। ভারতও যখন তার সঙ্গী হয়ে বিমানে চড়ে ভারতাভিমুখে চলল, তখন যে বিমান নিয়ে এসেছিল, তার মুখ থেকে জানা গেল, দেওয়ান সাহেব বিবাহের উদ্দেশ্যেই রাজকুমারীর জন্যে বিমান পাঠিয়েছে। অমনি লেগে গেল তুমুল যুদ্ধ দেওয়ান-দূত ও ভারতের মধ্যে। প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের ফলে বিমানটি সাগরে পড়ে বিধ্বস্ত হল, কিন্তু নায়ক-নায়িকাকে বাঁচতেই হল গল্পের খাতিরে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পাবার পরে ওরা যখন নিজেদের রাজ্যাভিমুখে যেতে উদ্যত হল, তখন ওদের মধ্যে গোপন চুক্তি হল, নায়ক নিজের প্রত্যাবর্তন বার্তা ঘোষিত করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রটনা করবে নায়িকার মৃত্যুসংবাদ; কারণ নায়িকা ছদ্মবেশে থেকে দেওয়ানের ক্রিয়া-কলাপ দেখতে চায়। নায়ক যখন বসন্তপুর রাজ্যে ফিরে এল, তখন প্রজারা দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; নায়ককেই তারা তাদের নেতা নির্বাচিত করল। রাজ্যের পুলিশ-ইনস্পেক্টার-জেনারেলের ছেলে হয়েও নায়ক হল প্রজাদের দলপতি। লাগল লড়াই দেওয়ানের সঙ্গে—ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী হল তার প্রেরণা। একবার দেখা যায় সংঘর্ষের ছবি, আবার দেখা যায় প্রেমের ছবি; দুইই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে পাল্টে পাল্টে। শেষ পর্যন্ত এক উত্তেজনাপূর্ণ সাক্ষাৎ সংঘর্ষের দৃশ্যে রাজকুমারী নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়ানকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। দেওয়ান রাজকুমারীকে সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতে চায়। আবার শুরু হয় সংঘর্ষ তরবারির সাহায্যে এবং এতেই ঘটে দেওয়ানের মৃত্যু।

চিত্রালয় নিবেদিত, জগৎ এণ্টারপ্রাইজ পরিবেশিত, প্যারাডাইস-মুনলাইট-প্রিয়া-পূর্ণশ্রী-ভবানী প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত এবং মাদ্রাজের **শ্রীধর পরিচালিত রঙীন ছবি "ধরতী"র** কাহিনীর এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত-সার। কাহিনীটিতে নেই কি? প্রেমের দৃশ্যের পটভূমি হিসাবে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের নয়নবিমোহন দৃশ্যাবলী, জন্মভূমির জন্যে উৎসর্গিতপ্রাণ যুবকের মুখে তপ্ত বাণী, শক্তিমত্ত দেওয়ানের শক্তির স্বাক্ষরস্বরূপ পোষা বাঘ, বন্দুক-রিভলভার-তরবারির সংঘর্ষ, হেলিকপ্টার থেকে বোমা ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ, সম্মোহনী নৃত্যগীত, উত্তেজক ও রোমহর্ষক একক ও সংঘবদ্ধ বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পিতাপুত্রের মধ্যে আদর্শগত লড়াই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা-আন্দোলন ও গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি বিচিত্র, বহুমুখী আকর্ষণের সমাবেশ। কিন্তু সমস্তই এমন চড়া পর্দায়, এমন অবিশ্বাস্য-ভাবে বিন্যস্ত যে, কাহিনী ও চিত্রনাট্যকারের উদ্ভট কল্পনা যুক্তিবাদী মনে মাত্র হাস্যেরই উদ্রেক করে।

এই কাহিনী-চিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার (ভারত), ওয়াহীদা রেহমান

(রাজকুমারী), পাহাড়ী সান্যাল (রাজা), বলরাজ সাহনী (ইন্সপেকটার জেনারেল), অজিত (দেওয়ান), শিবাজী গণেশন (আনন্দ), প্রতিমা দেবী (আনন্দর মা), কামিনী কৌশল (ভারতের মা এবং ইন্সপেকটারের স্ত্রী)-এর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পিবৃন্দ। বলা বাহুল্য, এঁরা যেখানে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁদের নাটনৈপুণ্য প্রকাশে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করেন নি। নাটনৈপুণ্য ছাড়াও ওয়াহীদা রেহমানের নৃত্য ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

প্রচুরতম অর্থব্যয় করে ছবিটিকে সাজানো হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। শ্রীকাপাডিয়ার ফোটোগ্রাফী সর্বত্র এক স্তরের না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষতার পরিচায়ক। হসরৎ জয়পুরী ও রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত গানে সুরযোজনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ; ফলে গানগুলি সাধারণভাবে ভালো হয়েছে।

বৈচিত্র্য যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে শ্রীধর পরিচালিত "ধরতী" যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করবে।

মাল্যদান-এর সেটে পরিচালক অজয় কর, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

কর্তব্য ও প্রেমের মাঝে পিতৃভক্ত কন্যা

বাপের প্রতি মেয়ের টান থাকা একটি স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু তা হলেও কে, পি, এস, ফিল্মস্-এর ইস্টম্যান কালার ছবি "বেটী"তে যখন দেখতে বছর ছ'সাত বয়েসের মেয়ে সুধা তার বাবাকে বলে, "মা নেই তো কি হয়েছে? আমি তোমার দেখাশোনা করব" এবং যখন সত্যিই দেখতে পাওয়া যায়, উনুনে রুটি সেঁকতে গিয়ে তার পা তপ্ত রুটি দ্বারা দগ্ধ হয়, তখন মনে না করে পারা যায় না যে, হিন্দী ছবির নির্মাতাদের সব কিছুতেই কেমন যেন বাড়াবাড়ি করবার প্রবণতা রয়েছে। সুধার বাবা মিঃ বর্মাকে যে-বাড়ীতে বাস করতে দেখা যায়, তা দেখে কিছুতেই মনে হয় না যে, তিনি এমনই গরীব যে তাঁর চাকর-দাসী রাখবার ক্ষমতা নেই। ছোট্ট মেয়ে সুধা তার বাবাকে ভালোবাসে এবং বাপের জন্যে সে কষ্ট সইতেও রাজী—এই তথ্য দর্শকদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত করা যেতে পারত। ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাদের ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মিঃ বর্মার পুন[illegible] বিবাহ করার মধ্যেও কোনো র[illegible] অস্বাভাবিকতা দেখা দিত না। বর্মা[illegible] দ্বিতীয় স্ত্রী কমলার চরিত্রকেও অ[illegible] অস্বাভাবিকভাবে সুধার প্রতি অত্যাচা[illegible] দেখাবার প্রয়োজন ছিল না। মেয়ে এবং ব[illegible] একদিন কমলার ব্যবহারে অত্যন্ত বি[illegible] হয়ে একসঙ্গে গৃহত্যাগ করবে, [illegible] পরিণতির উদ্দেশ্যে ঢের বেশী প্রত্যয়[illegible] পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার সুযোগ ছি[illegible] কিন্তু যুক্তি ও স্বাভাবিকতার পথকে ছে[illegible] দিয়ে বিকট পরিস্থিতি সৃষ্টিতেই [illegible] হিন্দী কাহিনী ও চিত্রনাট্য[illegible] বে[illegible] আনন্দ পান? সুধা তার প্র[illegible]য় রাজে[illegible] মা-বাবাকে রাজেশের জীব[illegible] থেকে সে [illegible] দাঁড়াবে এই কথা দেবার পরে যে-চূড়[illegible] নাটকীয় পরিণতি[illegible]না ক্লাইম্যাক্স দৃশ[illegible] রচনা করা হয়েছে, যেখানে সুধার পক্ষাঘা[illegible]গ্রস্ত পিতা মিঃ বর্মাকে ডাঃ রাজেশ সু[illegible] সামনে হাজির করে সুধাকে জেরা করছে[illegible] তুমি বল যে তুমি সুধা নও, অস্বীকার [illegible] যে উনি তোমার বাবা, যেখানে মিঃ ব[illegible] তাঁর সকল শক্তি প্রয়োগ করে হুইল-চে[illegible] ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং মেয়ের দি[illegible] এগোতে এগোতে "বেটী" বলে কথা ব[illegible] ওঠেন, এই একটিমাত্র দৃশ্য "বেটী" ছবিটি[illegible] স্মরণীয় করে রাখবে। মেয়ে আর সবাই[illegible] অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্নেহশ[illegible] বাপকে পারে না—এই তথ্যকেই প্রতিষ্[illegible] করেছে "বেটী" ছবি।

অভিনয়ে পিতা মিঃ বর্মার (ভার্মা[illegible]) ভূমিকায় কিশোর সাহু স্মরণীয় অভি[illegible] করেছেন; অনেক সময়ে তাঁর অভি[illegible] অশোককুমারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ[illegible] নায়িকা সুধাবেশে নন্দার অভিনয় সাধ[illegible] পর্যায়ের। নায়ক সঞ্জয়রূপে রাজেশ খ[illegible] প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অভিনয় করেছেন। [illegible] সুধার ভূমিকায় বেবী সরিকা বাচনে[illegible] ভঙ্গীতে এক কথায় চমৎকার। বৈদ্যরা[illegible]

ছেলে দীপকবেশে রাজেন্দ্রনাথ ছবির হাল্কা অংশকে উপভোগ্য করেছেন সাধারণ দর্শকের কাছে। দীপকের প্রেমিকা জ্যোতি-রূপে শবনম দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। এ ছাড়া শ্যামা (কমলা), কামিনী কৌশল (বর্মার পরলোকগতা স্ত্রী), অসিত সেন (ডাক্তার) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। শকীল লিখিত গানগুলিতে সোনিক ওমির সুর-যোজনা সাধারণ স্তরের ঊর্ধে উঠতে পায়নি।

কে. পি. সিংহ ও এন. পি. সিংহ প্রযোজিত এবং হরমেশ মালহোত্রা পরি-চালিত কে. পি. এস. ফিল্মস-এর রঙগীন ছবি "বেটী" কাহিনীর গুণে দর্শক-সাধারণকে অনন্দ দেবে।

বটে। কিন্তু বিশ্বাস ও বক্তব্যের মধ্যে ফারাক আছে জনে জনে। এ দেশে, বিদেশে, দুজায়গাতেই। ফেলিনি বলেছেন যে কোন পরিচালক সারাজীবনে একখানা ছবিই মনের মতো করে করতে পারেন। ঋত্বিকবাবু এ ব্যাপারে ঐকামত। হয়ত কারো সব কটা ছবিই যথেষ্ট রসমাত্রা ছাপিয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু মনের মতো ছবি হতে বাধা কোথায়, বড়জোর ছোটখাট ত্রুটি থাকতে পারে।

এ সব ছোটখাট ত্রুটি নিয়েই তাঁর ভালো লাগে আনতোনিওনি, পোলানস্কি, ওয়াইদা, ফেলিনিকে। আর সবার চাইতে বেশী ভাল লাগে বুনুয়েলকে। বুনুয়েলের ছবির 'প্রতিটা ফ্রেমই যথেষ্ট অর্থপূর্ণ ও ইঙ্গিতময়।' তাই একমাত্র বুনুয়েলকেই খুব কাছের করে নিতে চান ঋত্বিকবাবু। নিজের মনের কিছু ছায়া তিনি একমাত্র ও'রই মধ্যে দেখতে পান।

আসল ব্যাপার ঋত্বিকবাবুর মধ্যে এত এত কথা, এত ব্যথা লুকিয়ে আছে যে তা বলার ভাষা যেন হারিয়ে গেছে। ছবির মধ্য দিয়ে, যন্ত্রিক ক্যামেরা দিয়ে কিছু দেখাতে চান, বলতে চান। সেই ক্যামেরার ভাষাকে তিনি খুঁজেছেন। ও'রই ভাষায় বলি :

'একটা ভাষা, যেটা কম বলবে, বেশী ফেনাবে না। কচ্‌কচ্‌ করবে না। যে স্বয়ং

স্টুডিও থেকে

ঋত্বিক ঘটক 'নতুন ছবি শুরু করছেন।' এ সংবাদেই কাঁপন। কারণ ঋত্বিকবাবুর প্রতিটা ছবিই আলোড়ন তোলে। অবশ্য এখন যে ছবিটা করছেন তা পুরোমাত্রায় ডকুমেণ্টারী ছবি। কিন্তু ছবির রাজ্যে ঋত্বিক ঘটক ফিরে এসেছেন এটাই সংবাদ।

গত সপ্তাহে সমুনা ফিল্মসের কর্ণধার শ্রীসুশীল করণ এ উপলক্ষ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। শ্রীঘটকের সঙ্গে এর আগে এমনতর পরিবেশে এত খোলাখুলিভাবে ছবি করা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। শান্তভাবে চিন্তা করে বেশ ঋজু ভাষায় ঋত্বিকবাবু তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। বিতর্কিত কিছু আলোচনাও সেখানে হয়েছিল। যেমন, যে বার্গম্যান আজকের দিনে অন্যতম সেরা পরিচালক হিসাবে স্বীকৃত, ঋত্বিকবাবু তাঁর মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় পান। ও'র কাছে বার্গম্যানের ছবি 'উদ্দেশ্যহীন'। আবার ফ্রান্সের গদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলেও সেই একই উত্তর দেন তিনি।

সারা ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে আর্ট ফিল্ম, পরীক্ষামূলক ছবি ইত্যাদি নাম করে যে সব কান্ডকারখানা চলছে সে সম্পর্কে ঋত্বিকবাবুর দ্বিধাহীন স্পষ্ট বক্তব্য—'ও সব আর কিছু নয়। এসকেপিজম। আর্টের নামে যৌনতারই ছড়াছড়ি শুধু। শিল্প তো মানুষের মনের কথা মানুষের মনের মত করেই বলবে। তা নয়। এ বৃথা জটিলতা কেন? এটা নেহাতই অজুহাত।' শিল্পের প্রধান কথা বক্তব্যনিষ্ঠ হওয়া। আদর্শনিষ্ঠ হওয়া পরের কথা। বক্তব্যনিষ্ঠ হতে গেলেই দৃঢ়বিশ্বাসের ওপর পা থাকা চাই। তা না হলে কিছুই সম্ভব নয়। নিরালম্ব শূন্যতার মধ্যে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না নিশ্চয়ই।' ঋত্বিকবাবু এই শেষ কথাটার ওপরই জোর দিয়েছেন বেশী। যাঁরা শিল্পী যাঁরা রসিক তাঁদের কাছে এ কথা নতুন নয়

বেতার শ্রুতি

ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যামের প্রথম প্রোগ্র্যাম ছিল সঙ্গীত। ১৯৫২ সালে ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যাম সিরিজে প্রথম প্রচার করা হয় সঙ্গীত। তার পর ১৯৫৩ সালের ২৯শে এপ্রিল শুরু হয় 'টক' অর্থাৎ কথিকা। ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যামে নাটক ও রূপক (ফীচার) প্রচার করা হবে কিনা তা স্থির করতে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। এবং শেষে ১৯৫৬ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রথম এই প্রোগ্র্যামে নাটক ও ফীচার প্রচারিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫৯ সালে ও ১৯৬০ সালে ক্ল্যাসিক্‌স ও সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬২ সালের অকটোবর মাসে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হবার পর এ দুটি বিষয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের বিভিন্ন অংশের সাহিত্যের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং দেশের উন্নতির একটা সামগ্রিক চিত্র তাঁদের কাছে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যামের বিরোধিতা করতে পারেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে এবং যেসব ভাষায় নাটক, ফীচার, কথিকা, ক্ল্যাসিক্‌স, সমকালীন সাহিত্য প্রভৃতি প্রচারিত হয় বা হয়েছে তাতে এই প্রোগ্র্যামকে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত বলা চলে? কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কখনও কোনো সমীক্ষা চালিয়েছেন বলে শোনা যায় নি—অথচ আকাশবাণীর দপ্তরে লিস্‌নার্স রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বলে একটা বিভাগের জন্য বছরের পর বছর ধরে বেশ মোটা টাকা অপচয় হচ্ছে।

অনুষ্ঠান-প্রযোজকদের সাধারণ অভিমত হচ্ছে, ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যাম তার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে নি, এই প্রোগ্র্যাম নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এবং শ্রোতারাও তা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন।

ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যাম অর্থাৎ অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের নাটক নিয়ে ইতিপূর্বে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। এবারের আলোচনা ফীচার বা রূপক নিয়ে।

পোর্টেব্‌ল্‌ টেপ রেকর্ডার আমদানি হবার পর থেকে রেডিও ফীচার বা ডকিউমেন্টারির অনেক সুবিধা হয়েছে এবং এগুলির প্রচারের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। আকাশবাণীর বক্তব্য হচ্ছে, আলোচনা-কথিকার প্রতি শ্রোতাদের আগ্রহ খুব কম এবং অনেকেই তা শোনেন না, তাই আলোচনা-কথিকার বদলে বেশি করে ফীচার প্রচার করা দরকার। তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে। নিছক নীরস জ্ঞানগর্ভ কতকগুলি কথার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ আকর্ষণ থাকে না, কিন্তু সেই কথাগুলিই যখন গল্পচ্ছলে বা নাটক-নকশার আকারে শোনানো হয় তখন আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়।

বি-বি-সি গান্ধীজী সম্পর্কে চারটি ফীচার প্রোগ্র্যামের জন্য ফ্রান্সিস ওয়াটসনকে স্ক্রিপ্ট-রাইটার হিসাবে দু বছরের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ প্রযোজককে দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সিস ওয়াটসন বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে 'বলার ভঙ্গি' গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'সত্যের ব্যাপারে রেডিওর নিজস্ব একটা পথ আছে। আত্মসচেতনতা ও দক্ষতা আবিষ্কারে মাইক্রোফোনের একটা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, এবং ভালো বেতার-বক্তা তাঁর কাছে যা সত্য বলে মনে হয় সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বড়ো ঘাবড়ান না, বিচলিতও হন না।'

ফ্রান্সিস ওয়াটসনের সঙ্গে বি-বি-সি'র যে অভিজ্ঞ প্রযোজক ছিলেন তাঁর নাম মরিস ব্রাউন। ফ্রান্সিস ওয়াটসন আর মরিস ব্রাউন গান্ধীজী সম্পর্কে ঐ চারটি ফীচার প্রোগ্র্যামের জন্য অনেক দিন ধরে ইংল্যাণ্ডে এবং তিন মাসের বেশি ভারতে বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কথা রেকর্ড করেছিলেন। ফ্রান্সিস ওয়াটসন ও মরিস ব্রাউন প্রণীত 'টকিং অভ্‌ গান্ধীজী' শীর্ষক গ্রন্থে (গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে কলকাতা থেকে ওরিয়েন্ট লংম্যান কর্তৃক প্রকাশিত) মরিস বলেছেন, তাঁরা এই চারটি ফীচার প্রোগ্র্যামের জন্য মোট সাতাশ ঘন্টার টেপ-রেকর্ড করেছেন এবং টেপের দৈর্ঘ্য সাড়ে পনের মাইলেরও বেশি, আর শব্দের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার।

মাঝে-মাঝে আমাদের প্রোগ্র্যাম এগ্‌জিকিউটিভরা আর অনুষ্ঠান প্রযোজকরা দিল্লীতে নানা রকম আলোচনায়-বক্তৃতা সভায় সমবেত হন। আকাশবাণীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এই আলোচনা-বক্তৃতা করেন। সভায় বি-বি-সি থেকে তাঁদের ট্রান্সক্রিপ্‌শন সার্ভিসে যেসব উৎকৃষ্ট ফীচার পাঠানো হয় সেগুলি বাজিয়ে শোনানো হয় এবং বি-বি-সি'র তুলনায় এখানকার সমস্যাগুলির চুল-চেরা বিচারও করা হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া সব সময়েই হতাশাপূর্ণ। থিওরি আর প্র্যাকটিস—কথা আর কাজ, এ দুটোকে তাঁরা কিছুতেই মেলাতে পারেন না। মেলানো তাঁদের সামর্থ্যের বাইরে। তাঁদের সে সময়, অর্থ, লোকজন, যন্ত্রপাতি কিছুই তেমন নেই।

সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে ভাষার বাধা। ভারত বহু ভাষা-ভাষীর দেশ। ফীচারের মূল জিনিস হচ্ছে, আসলের উপস্থাপনা। ফীচারের আকর্ষণ যে আসল লোকেরা তাঁরা ইন্টারভিউ দেন কিংবা তাঁদের কার্যকলাপ আর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই যে 'নিজস্বতা', এইখানেই ফীচারের বিশেষ মূল্য। এই সব ইন্টারভিউ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাষায় রেকর্ড করা হয়ে থাকে। মাদ্রাজের কোনো লোকের সঙ্গে ইন্টারভিউ করলে তামিলে রেকর্ড করা হয় এবং যখন ঐ ফীচারের মাস্টার-স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয় তখন ইন্টারভিউয়ের সমস্তটাই হিন্দীতে অনূদিত হয়। এই মাস্টার-স্ক্রিপ্ট যখন বিভিন্ন বেতার-কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছয় তখন আবার তা আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হয় এবং নাট্যশিল্পীরা তা রূপায়িত করেন। সুতরাং এতে আর তখন 'আসল' কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কখনও কখনও অবশ্য আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত ফীচারের মাঝে মাঝে কয়েক সেকেন্ড করে আসল লোকটির কথা শুনিয়ে তারপর আবার অনুবাদ শোনানো হয়। এতে মূল ভাষার কথাগুলি বুঝতে না পারলেও ফীচারের উৎকর্ষ যে কিছুটা বাড়ে ও প্রাণবন্ত হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একই প্রোগ্র্যামে এটা বার বার করা হলে সেটা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।

—শ্রবণক

জলসা

জন্মদিনের উৎসবে শিষ্য মনোজশঙ্করসহ বাহাদুর খাঁ সরোদ বাজাচ্ছেন।

শিল্পীর জন্মদিনে

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর শিষ্যবৃন্দ এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শিল্পীর পাম-এ্যাভিনুস্থ বাসভবনে। আড়ম্বরহীন এই আয়োজন আন্তরিকতার ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ। হয়ত সেই জন্যই এমন চিত্তস্পর্শী। ভারতীয় সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা এবং গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ যে কত নিকট কত মধুর হতে পারে সেদিনের অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। শিষ্যবৃন্দ পট্টবস্ত্র, মালাচন্দনে ওস্তাদকে সুসজ্জিত করে আসরে নিয়ে এসে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও এবং বাহাদুর খাঁসাহেবের স্বর্গত পিতা আয়তাবুদ্দিন খাঁর ছবির সামনে বসালেন। বাহাদুরের বহু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এবং এদেশের শিষ্যাশিষ্যাবৃন্দ তাঁকে প্রণাম ও অভিনন্দন জানান—শিল্পী সস্নেহে সকলকেই বুকে টেনে নিলেন। সকলের বিশেষ অনুরোধে বাহাদুর খাঁসাহেব দুই ঘন্টাব্যাপী সরোদ বাজিয়ে সকলের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের সকৃতজ্ঞ জবাব দেন।

আলাপ শুরু হয় পাহাড়ী ঝিনঝোটি রাগ দিয়ে। এ রাগ সিমলা পাহাড়ের লোক-সঙ্গীতজাত এবং সাধারণতঃ ধুণের পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু শিল্পীর পরিবেশনার গাম্ভীর্যে রাগবিস্তারের গতি-প্রকৃতিতে ভক্তিভাবের এমন এক আকুতি ফুটে উঠল যার আবেদন এই সংগীতসভাকে এক লহমায় যেন প্রার্থনাসভায় রূপান্তরিত করেছিলো।

গৎ বাজান 'কিরবাণী' রাগে। দাক্ষিণ ভারতীয় এই রাগে উত্তর ভারতের শ্রোতাদের প্রথম পরিচয় ঘটান পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তারপর আলি আকবর এবং আলাউদ্দিন ঘরানার প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনার দরুন এই রাগ আজ উত্তর ভারতেরও সম্পদ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিল্পীর প্রকাশভঙ্গির রূপ স্বতন্ত্র। বাহাদুরের বাজনায় রাগের রসমাধুর্য, কারুণ্য সংযত আবেগের শুচিতা এবং বিনীত মিনতির এমন এক উদ্বেল রূপ ফুটে উঠেছিল যা চিত্তকে অভিভূত না করে পারে না। -কোমল ধৈবত ও গান্ধার মৃদু বাজের অস্ফুট শ্রুতিতে কখনও বা দৃপ্ত বাজের দৃঢ়তায় বেগমপদার সঙ্গে মিলে যে বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে বিন্যাস চমক, বাহার কোনোটারই অভাব ছিল না কিন্তু গহনসঞ্চারী প্রাণশক্তির মত শিল্পীর গভীর বোধের ধ্যানের আলোয় উদ্ভাসিত বলেই সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের চিত্তে এমন স্থায়ী দাগ কাটতে পেরেছে।

সমান উল্লেখের দাবী রাখে অনিল ভট্টাচার্যের তবলাসঙ্গত; কখনও চুপি-চুপি কথা বলার মত না ধিন্ ধিন্-না ঠেকায়, কখনও সওয়াল জবাবের দৃপ্ত সাহসিকতায় কখনও সাথসঙ্গতের সখ্যতায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য করার শিল্পকর্মে তাঁর অবদান ভোলার নয়। আর একজন উদীয়মান তরুণ শিল্পীর উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইনি হলেন বাহাদুর খাঁর শিষ্য মনোজশঙ্কর। বাহাদুরের বাজনার সঙ্গে ইনি সেতার-সঙ্গতে ছিলেন। গুরুর সঙ্গে বাজনায় স্বাভাবিক প্রকাশের দ্বিধা এবং আপন কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ সঙ্কুচিত ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ওরই ফলে যেটুকু বাজনা শোনা গেল তাতে এই তরুণ শিল্পীর উপযুক্ত শিক্ষা, রেওয়াজ, রাগের শাস্ত্রসম্মত প্রকাশকুশলতার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলেছিলো।

নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রতি-যোগিতা বালিগঞ্জস্থিত 'অভয়াচরণ বিদ্যামন্দির'এ বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬০০ জনেরও অধিক প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বন্ধু মিলনী (রহড়া)—প্রতিবারের মতো এবারও তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় অরুণাচলের মাঠে। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র, নজরুল, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও বাউল গান এবং আবৃত্তি। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর সেন, বনানী ঘোষ অলোক সেন, দিলীপ চক্রবর্তী ও পূর্বা সিংহ। নজরুলের গান পরিবেশন করেন শ্রীমতী পূরবী দত্ত ও শ্রীশান্তিময় মুখোপাধ্যায়। দ্বিজেন্দ্র ও রজনীকান্তের গান শ্রীদিলীপ রায়। অতুলপ্রসাদী গান পরিবেশন করেন শ্রীমতী বনানী ঘোষ। বাউল গান শোনান শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বাউল। নজরুলের একটি গদ্য রচনা ও একটি আধুনিক কবিতা পাঠ করেন শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী বাসুদেব দেব, দুলাল দাশগুপ্ত ও পুলক গুহঠাকুরতা।

ওস্তাদ আলি আকবর ও বিলায়েৎ খাঁর যুগলবন্দী

আগামী ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী যন্ত্রসঙ্গীতের দুই বিভিন্ন ঘরানার শিল্পী ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ'র মিলিত যুগলবন্দীর আসর বসবে কলামন্দির মঞ্চে। সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত।

ত্রিসপ্তকের 'শ্যামা'

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ত্রিসপ্তক প্রযোজিত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ হচ্ছে। নৃত্যপরিকল্পনায় আছেন সমিত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনায় শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঋষিণ মিত্র, রমা দত্ত ও ত্রিসপ্তকের ছাত্রীবৃন্দ।

এছাড়া যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিদ্যুৎ বসু ও সম্প্রদায়। একক সঙ্গীতে আছেন প্রিয়াঙ্ক মিত্র।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

খেলাধূলায় সরকারের গঠনমূলক উদ্যোগ চা

কায়েমী স্বার্থ, পরিকল্পনার অভাব, কর্মক্ষেত্রে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ বা তার প্রয়োগবিধির অভাবেই ভারতের খেলার মান একটুও এগিয়ে যেতে পারে নি। থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীড়ামান অবনতির দিকে। খেলাধূলোর কল্যাণে নিখিল ভারত ক্রীড়া পর্ষৎ গড়ে ওঠায় মনে হয়েছিল পশ্চাত্য দেশের মত আমরাও বুঝিবা খেলাধূলোর ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাব। শুধু সর্বভারতীয় ক্রীড়া পর্ষৎ কেন, এর পর গঠিত হয়েছে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া পর্ষৎ। কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া গিয়েছে কিনা তা বিভিন্ন খেলাধূলোর বিষয় পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

আমাদের রাজ্যেও ছিল না অনেক কিছু। গড়ে উঠেছে ক্রীড়া পর্ষৎ। সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদও। এত করা সত্ত্বেও কি খেলার কোন উন্নতি হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলে সকলেই সোচ্চারে বলবেন, 'না'। এত করা সত্ত্বেও শুধু কি 'না' কথাটি শুনার জন্যেই সরকারী অর্থের অপচয় ঘটান হচ্ছে? ক্রীড়ামান অনুন্নত হওয়ার জন্যে সরকারই বিশেষভাবে দয়ী। কারণ, তাঁরা বাস্তু ঘুঘুদের তাড়াতে গিয়ে নিজেরাই ঐ ঘুঘুদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। বিনা পয়সায় খেলা দেখা এবং কিছু টিকেট সংগ্রহ করার ফিকির যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে দেশের খেলাধূলোর অপমৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক।

ফুটবল সংস্থার জঞ্জাল সাফ করতে গিয়ে যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি নিলে আমরা দেখতে পাব তদারকীর নাম করে কয়েক হাজার ব্যক্তিকে মাঠে ঢুকিয়ে দিয়ে চ্যারিটি ম্যাচে সাহায্যের তহবিল স্ফীত করার বদলে তার ক্ষতি করা হয়েছে। শুধু কি তাই, আই এফ এ'র টিকেটের কোটাতেও ভাগ বসান হয়েছে। চ্যারিটি ম্যাচে যেখানে হাজার হাজার টিকেটের চাহিদা সেই টিকেট নিয়ে দীর্ঘদিন বাদে তা ফেরত দেওয়ার নজীরও রয়েছে। এ ছাড়া এখনও সরকারী দপ্তরে আই এফ এ'র কিছু পাওনা টাকাও পড়ে রয়েছে। ঐ টাকা না পেলে আই এফ এ'র পক্ষে কেবল যে হিসাব মেলানই ভার হবে তা নয় অধিকন্তু ছোট ছোট ক্লাব যারা আই এফ এ'র সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল তারাও সাহায্যলাভে বঞ্চিত হবে।

একে ত মামলা ও অন্যান্য শরিকী ঝগড়ায় ছোট ছোট ক্লাবগুলি দু বছর সাহায্য লাভে বঞ্চিত ছিল। সরকার ইতিমধ্যে নানাপ্রকার ফরমাস করে বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে বিব্রত করবার চেষ্টা করছেন। একবারও কি অনুসন্ধান করে দেখেছেন ক্লাবগুলি চলবে কি করে? ক্রীড়ামন্ত্রী এক সময়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন টেস্ট ম্যাচের টিকেট প্রকাশ্যে বিক্রি করতে হবে। তাঁর ধারণা হচ্ছে প্রকাশ্যে টিকেট বিক্রয় করলেই কালোবাজারী বন্ধ হবে। প্রকাশ্যে টিকেট বিক্রয় করলে টিকেট কাদের হাতে গিয়ে পড়বে তা কি তাঁরা চিন্তা করে দেখেছেন?

শংকরবিজয় মিত্র

ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে সাত হাজার টিকেট প্রকাশ্যে বিক্রয় করতে গিয়ে যে অঘটন ঘটে গেল তা দেখে তাঁর শিক্ষা নেওয়া উচিত। এর আগে সি এ বি প্রকাশ্যে টিকেট বিক্রয় করতে গিয়ে যে অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বোধহয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

ক্রিকেট ক্লাবগুলি টিকেটের বিনিময়ে চাঁদা বাবদ যদি কিছু টাকাও নিয়ে থাকেন তাতে অন্যায় হয়েছে একথা বলা যায় না। ছোট ছোট ক্লাবগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বিভিন্ন দলের ঐ অর্থের প্রয়োজন। সরকার কোন সময়েই সেই ঘাটতি মেটাবার চেষ্টা করেন নি। বরং তাঁদের সাহায্য পাবার পথে বাদ সেধেছেন বা সাধছেন।

সরকারের উচিত লম্বা লম্বা কথা না বলে ক্লাবগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা। খেলাধূলো বাবদ ক'টা দলকেই বা তাঁরা মাঠ বরাদ্দ করেছেন তা বোধহয় খতিয়ে দেখার অবকাশ পান নি। পার্ক বা অন্যান্য সম্ভাব্য ক্রীড়াঙ্গনে খেলার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তার অবলুপ্তি ঘ দিকেই যেন লক্ষ্য বেশি। ১৯২৮ থেকে বিভিন্ন গুণী জ্ঞানী লোকের : ধ্বনি উঠেছে স্টেডিয়ামের। কিন্তু এতা বাকবিতণ্ডা বিফলেই গিয়েছে। অ পর্যন্ত একটা স্টেডিয়াম গড়ে তোলা স হয় নি। হবে কিনা তাতেও বিরাট সন্দে অবকাশ আছে। এর মধ্যে বিনা মাম থাবা মেরে সি এ বি ও ন্যাশন্যাল ক্রি ক্লাবের মাঠ দখল করে নেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে তাদের প্রাপ্য টাকা মি দেওয়া হবে। কবে এবং কি হিসাবে বরাদ্দ টাকা মেটান হবে তার কোন উ নেই। সম্প্রতি টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটের টি কিনতে গিয়ে যে ছ'জন ক্রিকেট অনুরা জীবন অবসান হয়েছে তাদের জন্যে দ পরিবারবর্গকে সাহায্যে করে সর সস্তা দরে কিছুটা বাহবা আদায় করেছে ট্রেন দুর্ঘটনায় লোক মারা গেলেও প দিন আবার ট্রেন চলে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি, মৃতদের নামে রা নামফলক বসেছে। কিন্তু যে সরক অব্যবস্থায় এই ভয়াবহ কান্ড ঘটেছে অনুসন্ধান করে কি দোষীর শাস্তি করা হয়েছে? যেখানে হাজার হা লোকের সমাবেশ হয়েছিল সে নিরপত্তার জন্যে রাত্রে পুলিশ মোত ছিল না কেন? দুর্ঘটনার সময় অ পুলিশের আবির্ভাব ঘটা সত্ত্বেও এই একটা ভয়াবহ অঘটন ঘটলো কেমন করে সকলের চিন্তার অতীত।

সরকারী বিবৃতিতে দুর্ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঐখানেই ঘ পরিসমাপ্তি ঘটে। এর ফাঁকে পদাধিকার জনৈক ব্যক্তি এক এক গেট দিয়ে বেশ বি সংখ্যক জনাশোনা লোককে খেলা দে সুযোগ দিয়েছেন। ঐ পদস্থ ব্যক্তি কমিশ রয়েরও ধারও ধারেন না। ওয়েস্ট ইন্ডি ভারত সফরকালে বিশ্রী পরিস্থিতি সম্প কমিশনের রায়ে বলা হয়েছিল দর্শকের অনুপ্রবেশই সেদিনকার অন মূল কারণ ছিল। সি এ বি যেখানে দ

সমাবেশ হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর সেখানে অবাঞ্ছিত লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি সংস্থাকে বে-কায়দায় ফেলার চেষ্টা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারের পদস্থ ব্যক্তি ভি আই পি গেট দিয়ে হাজার হাজার আপনজনকে অনুপ্রবেশ করিয়েই ক্ষান্ত হন নি অধিকন্তু সংস্থার খাদ্যও পরিবেশন করিয়ে পরিজনদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়ে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরিজনদের কাছে হিরো বনে গিয়েছেন।

এ ছাড়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি না রাখার জন্যে বাংলার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশান বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশান দুবার প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ায় এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কটকের জাতীয় গেমসে কোন প্রতিযোগী পাঠাবে না। শেষ মুহূর্তে সরকারী দপ্তরের চিঠি পেয়ে তারা সিদ্ধান্ত বদলায়। কর্জ করে টিম পাঠিয়ে বেশ কয়েকটি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ফিরে এসেছে। বেচারীদের ভাগ্যে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য মেলে নি। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এইভাবে টালবাহনা না করে সরকার যদি এ্যাথলেটিক ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থার জন্যে বিশেষ চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করেন তা হলে বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগের পক্ষে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় টিম পাঠাতে অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক অসচ্ছলতাও দূর হতে পারে।

পরলোকগত শিবদাস ভাদুড়ীর সমসাময়িক জনৈক খেলোয়াড় ক্রীড়া পর্ষতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। অদ্যাও পর্যন্ত ক্রীড়াবিদের ভাগ্যে কোন সাহায্য মেলে নি। অথচ ক্রীড়ামন্ত্রী সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন খেলোয়াড়দের যে কল্যাণ তহবিল আছে তা থেকে তাঁদের সাহায্য করা হবে। আমরা যে ক্রীড়াবিদের কথা বলছি ঐ ক্রীড়াবিদ শুধু ফুটবল বা ক্রিকেট বলে নয় হকিতেও তাঁর সময়ে একজন দিকপাল খেলোয়াড় ছিলেন। ঐ খেলোয়াড় শুধু বার্ধক্যেই জর্জরিত নন অনেক মাস অসুস্থতার জন্যে যথাযথভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে। এ ছাড়া তাঁর দৈনিক জীবনযাত্রার পথও বন্ধুর।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সরকারের আগ্রাসী মনোভাব। সি এ বি ও এন সি সি মাঠের দখল নিয়েছেন। তবে ক্রিকেট মাঠের দখল নিয়ে তাতে অন্যান্য খেলাধুলায় ব্যবস্থা করে ক্রিকেটের অপমৃত্যু ঘটান কোনমতেই সমীচীন হবে না। তার চেয়ে বলবো একই মাঠে ফুটবল ক্রিকেটের ব্যবস্থা না করে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের জমিতে দু লাখের মত স্টেডিয়াম গড়ে তাতে ফুটবল, হকি ও এ্যাথলেটিকস প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে ভলিবল, বাস্কেটবল, ও ব্যাডমিণ্টনের জন্যে আচ্ছাদিত কোর্ট। এ ছাড়া সাঁতারের জন্যে আধুনিক সুইমিং পুল তৈরীর আবশ্যকতা আছে।

খেলাধুলার উন্নতি করতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আধুনিক জিমন্যাসিয়াম গড়ে তাতে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করলে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ ঘাটতি থেকে যাবে। আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী কি এ সবের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন?

দাবার আসর

ক্যাপাব্ল্যাংকা মেমোরিয়াল টুর্ণামেণ্ট

যোসে রাওল ক্যাপাব্লাংকা দাবার আকাশে একটি অবিনশ্বর নক্ষত্র। দাবা খেলায় দিগ্বিজয় করে তিনি তাঁর মাতৃভূমি কিউবাকে অনন্যসাধারণ সম্মান এনে দিয়েছেন। বলা যায়, তাঁরই জন্যে কিউবায় দাবা আজ প্রায় জাতীয় খেলার সম্মান লাভ করেছে। ১৯৩৯ সালে তিনি মারা যান।

ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা তাঁর সম্মানার্থে প্রতি বছর বহু ঘটা করে হাভানায় একটি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। এর নাম ক্যাপাব্লাংকা মেমোরিয়াল টুর্নামেণ্ট। দেশবিদেশ থেকে বহু ডাকসাইটে খেলোয়াড় এই টুর্নামেণ্টে যোগদান করে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কয়েক বছর আগে এই টুর্নামেণ্টে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে চেয়েছিলেন আমেরিকার বিস্ময়কর প্রতিভা ববি ফিশার। কিন্তু কিউবার সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ থাকায় আমেরিকা ফিশারকে পাসপোর্ট দেয়নি। ফিশার তখন নিউইয়র্কে বসে বসেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন টেলিফোনে। ফিদেল কাস্ত্রো এই টেলিফোনে দাবা খেলার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন।

গত বছর শেষের দিকে ৭ম ক্যাপাব্লাংকা মেমোরিয়াল টুর্নামেণ্ট হয়ে গেল। যোগ দিয়েছিলেন ৯ জন গ্র্যাণ্ডমাস্টার ৫ জন ইণ্টারন্যাশনাল মাস্টার এবং আরো দুজন খেলোয়াড়। এই প্রতিযোগিতায় বরাবরই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। গতবারও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যুগ্ম বিজয়ী হন রাশিয়ার ভিক্টর কর্চনয় এবং এ্যালেক্সী সুয়েতিন। তৃতীয় স্থান দখল করেন যুগোশ্লাভিয়ার
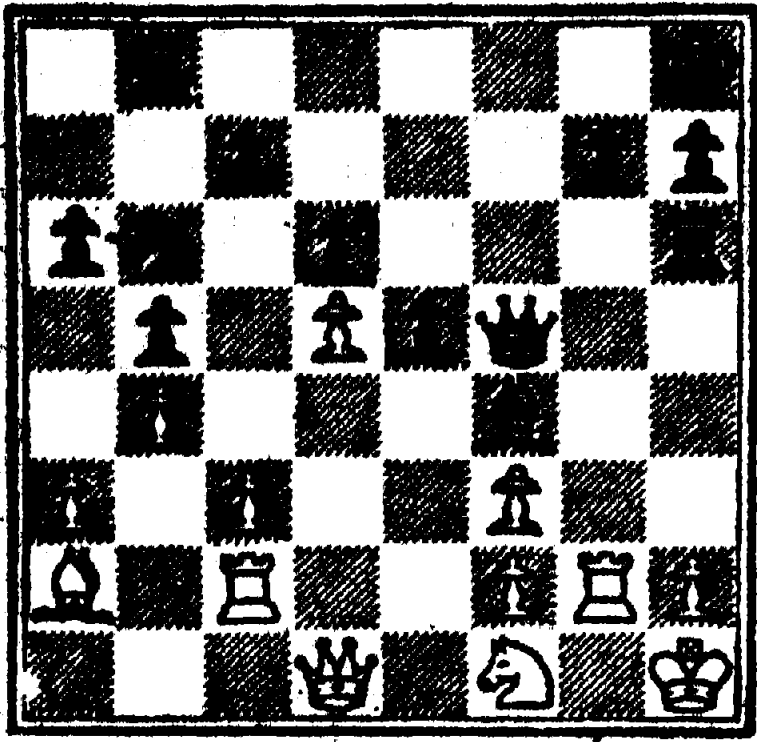
১নং চিত্র
কালোর ২৬ নং চালের পরের অবস্থা

এস, স্পিগোরিচ্। কিন্তু কর্চনয় এবং সুয়েতিন দুজনেই তাঁদের ব্যক্তিগত খেলায় স্পিগোরিচের কাছে পরাজিত হন।

সুয়েতিনের সঙ্গে স্পিগোরিচের খেলাটি দেখুন। সাদা—সুয়েতিন, কালো—স্পিগোরিচ। রাই লোপেজ। সাদার ৯নং চালটি রাই লোপেজের খেলায় সাধারণত দেখা যায় না। খেলাটায় ওপনিংয়ের দিক থেকে বিশেষত্ব আছে।

(১) ব—রা ৪ : ব—রা ৪ (২) ঘ—রা গ ৩ : ঘ—ম গ ৩ (৩) গ—ঘ ৫ : ব—ম ন ৩ (৪) গ—ন ৪ : ঘ—গ ৩ (৫) ০—০ : গ—রা ২ (৬) ন—রা ১ : ব—ঘ ৪ (৭) গ—ঘ ৩ : ব—ম ৩ (৮) ব—গ ৩ : ০—০ (৯) ব—ম ন ৩ : ঘ—ম ২ (১০) ব—ম ৪ : গ—গ ৩ (১১) গ—রা ৩ : ন—ঘ ১ (১২) ম ঘ—ম ২ : ঘ—ঘ ৩ (১৩) ন—গ ১ : গ—ঘ ৫! (১৪) ব—ম ৫

[অথবা, (১৪) ব—ন ৩ : গ×ঘ (১৫) ম×গ : ঘ—ন ৪ এবং কালোর খুব সুন্দর খেলা থাকে।]

(১৪)......ঘ—ন ৪ (১৫) গ—ন ২ : ঘ (ন ৪)—গ৫ (১৬) ব—ম ঘ ৩? : ঘ×গ (১৭) ন×ঘ? [সুয়েতিনের মতে, এখানে ব×ঘ করা উচিত ছিল।]

(১৭)...গ—ঘ ৪! (১৮) ন—রা ১ : গ×রা ঘ (১৯) ব×ঘ : গ—গ ৫ (২০) ন—গ ২ : ম—ঘ ৪+ (২১) রা—ন ১ : ব—রা গ ৪ (২২) ন—ঘ ১ : ম—ন ৪ (২৩) ন—রা ঘ ২ : রা—ন ১ (২৪) ব—ঘ ৪ : ন—গ ৩ (২৫) ব×ব : ন—ন ৩ (২৬) ঘ—গ ১ : ম×ব (গ ৪) (১নং চিত্র দেখুন।)

(২৭) ম—রা ২ [সুয়েতিনের মতে এখানে সাদার উচিত ছিল (২৭) ব—গ ৪ চালা।] (২৭) ব—গ ৩ (২৮) ব×ব : ব—ম ৪ (২৯) ঘ—ঘ ৩ : গ×ঘ (৩০) ব×ঘ : ন×ব (৩১) ন—ম ২ : ন×ব (৩২) গ×ব : ন×ন ব (৩৩) গ—রা ৪ : ম—গ ৩ (৩৪) ন—গ ১ : ঘ—গ ৫ (৩৫) ন—ম ৭ : ন—রা ৬ (৩৬) ম—ম ১ : ন—রা গ ১ (৩৭) ন—রা ১ : ন×ন+ (৩৮) ম×ন : ঘ—ম ৩ (৩৯) গ—ম ৫ : ব—ন ৩ (৪০) ম—ন ১ : ঘ—গ ৫ (৪১) ন—ন ৭? [এখানে সাদার উচিত গ—রা ৪ চালা] (৪১)...ম—ম ৩ (৪২) গ—রা ৪ : ম×ব (৪৩) ন×ন ব : ন—ম ১ (৪৪) ন—ন ৮ : ম—গ ১ (৪৫) ন×ন : ম×ন (৪৬) ম—ন ৭ : ঘ—ম ৭! (৪৭) ম—ঘ ৭ : ঘ×গ (৪৮) ব×ঘ? : ম—ম ৮+ (৪৯) রা—ঘ ২ : ম—রা ৭+ (৫০) রা—ন ৩ : রা—ন ২ সাদার হার স্বীকার।

এবারে দেখুন কর্চনয়ের সঙ্গে স্পিগোরিচের খেলাটি। কর্চনয় কয়েকবার রাশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তাঁর খেলার প্রধান বিশেষত্ব হোল প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ দেওয়া। বিপক্ষের আক্রমণ যখন তুঙ্গে উঠবে মনে হচ্ছে, ঠিক সেই সময় কর্চনয় তীব্র পাল্টা আক্রমণ হেনে প্রতিপক্ষকে বেসামাল করে দেন। বর্তমান কর্চনয় (১৮) ব—ম ন ৪ চাল দিয়েছেন যে প্ল্যান অনুসারে, সেই প্ল্যানে ত্রুটি রয়ে গেছে, কারণ তিনি একথা খেয়াল করেন নি যে কালো ইচ্ছে করলে সেণ্টারকে খানিকটা পরিষ্কার করে নিতে পারে এবং নিজের রা—৪ ঘরটির ওপর সাদার ততটা দখল নেই। যে অবস্থায় কর্চনয় (১৮) ব—ম ন ৪ চাললেন, সেই অবস্থায় খেলাটা দু' তরফেই সমান সমান ভেবে নিয়ে যদি (১৮) ম ন—ম ১ চালতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে নিঃসন্দেহে ভালো হোত। সাদা—কর্চনয়, কালো—স্পিগোরিচ। কিংস ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ব—ম ৪ : ঘ—রা গ ৩ (২) ব—ম গ ৪ : ব—রা ঘ ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ : গ—ঘ ২ (৪) ব—রা ৪ : ব—ম ৩ (৫) ঘ—গ ৩ : ০—০ (৬) গ—রা ২ : ব—রা ৪ (৭) ০—০ : ঘ—গ ৩ (৮) ব—ম ৫ : ঘ—রা ২ (৯) ঘ—ম ২ : ঘ—ম ২ (১০) ব—ম ঘ ৪ : ব—রা গ ৪ (১১) ঘ—ঘ ৩ : ব×ব! (১২) ঘ×ব : ঘ—রা গ ৩ (১৩) ঘ—ঘ ৩ : ঘ—গ ৪ (১৪) ঘ×ঘ : গ×ঘ (১৫) গ—রা ৩ : ব—রা ন ৪ (১৬) ব—গ ৩ : ম—ম ২ (১৭) ম—ম : ব—ঘ ৩ (১৮) ব—ম ন ৪ : ম ন—রা ১ (১৯) ব—ন ৫ :
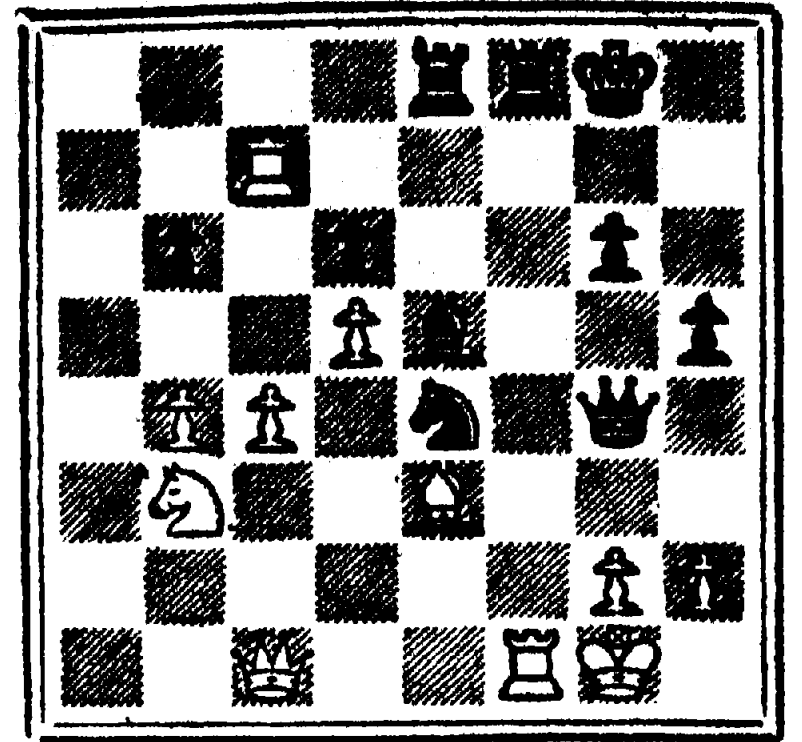
২নং চিত্র
কালোর ২৫ নং চালের পরের অবস্থা

ব—রা ৫! (২০) ব×ঘ ব : ব×গ ব (২১) গ×ব : ন ব×ব (২২) ন—ন ৭ : ঘ—রা ৫ (২৩) ম—গ ১ : গ—ঘ ৫ (২৪) গ×গ : ম×গ (২৫) ন×ব : গ-রা ৪

[সাদা মন্ত্রীর দিকে আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার করে নিতে পারল শেষ পর্যন্ত কিন্তু এইজন্যে সময় নিয়ে নিয়েছে অত্যন্ত বেশী। ইতিমধ্যে কালো রাজার দিকে আক্রমণের যে বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, তাতেই খেলাটার ফয়সালা হয়ে যাবে। ২নং চিত্র দেখুন।]

(২৬) গ—ম ৪ : ন×ন+ (২৭) ম×ন : ন—রা গ ১ (২৮) ম—ন ১ : ম—গ ৫ (২৯) ব—ঘ ৩ : ঘ×ব। সাদার পরাজয় স্বীকার।

* * *

১৯৬৯ সালের রাশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশীপে তিগ্রান পেত্রোসিয়ান একজন গ্র্যাণ্ডমাস্টার লেভ পোলুগায়েভ -এর সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করে প্রমাণ করেছেন যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব হারালেও তাঁর খেলা এখনো তেমন খারাপ হয়ে যায়নি। বোরিশ স্পাসকী বাদে রাশিয়ার আর সমস্ত নামী খেলোয়াড়ই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। লীগ প্রথায় মোট ২২টি গেম খেলে পেত্রোসিয়ানের অর্জিত পয়েন্ট হচ্ছে ১৪, এবং একটি খেলাতেও তিনি হারেন নি। এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে পেত্রোসিয়ান ছাড়া পোলুগায়েভস্কী, গেলার স্মিসলভ্ এবং তাইমানভ ১৯৭০ সালের ইণ্টারন্যাশনাল টুর্নামেণ্টে খেলায় অধিকার লাভ করেছেন।

—গজানন্দ বোড়ে

কলকাতায় ২৫তম আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের ফাইনালে রেলওয়ের রমেন ঘোষ এবং বাংলার পদ্মশান্তি দাসের সিংগলস খেলার একটি দৃশ্য। রেলওয়ে ৫—০ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে।
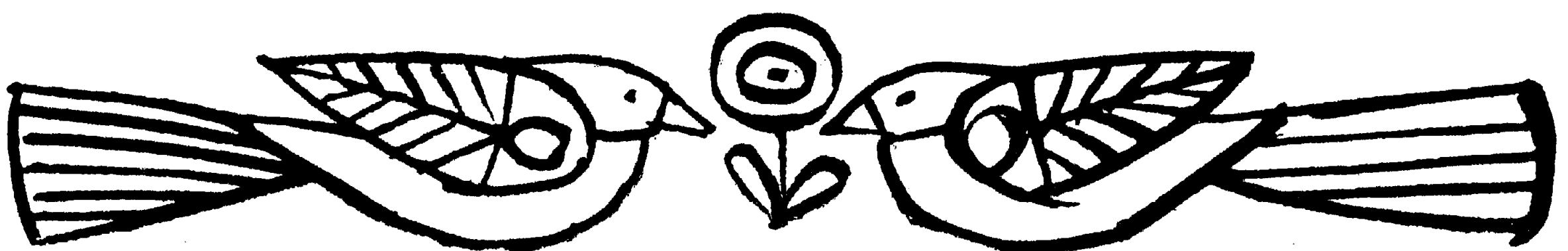
খেলাধুলা

দর্শক

স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

ভারতীয় বনাম সিংহল দল

সিংহল স্কুল দল : ১৫৯ রান (জয়বীর ৪৮ রান। ঠক্কর ২৯ রানে ৪, মাথুর ২৪ রানে ২ এবং কোলে ৩২ রানে ২ উইকেট)

ও ১৭১ রান (ফার্নাণ্ডো ৬০ রান। রবি ব্যানার্জি ৪৪ রানে ৫ এবং বোয়েন ২৮ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় স্কুল : ১৮৩ রান (মহম্মদ আলী ইকবাল ৮২ রান। আলয়াসিংগাম ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ৯৫ রান (রবি ব্যানার্জি ৬০ রান। জয়বীর ২১ রানে ৩ উইকেট)

মাদ্রাজের চিপক মাঠে আয়োজিত পঞ্চম টেস্টে সিংহল স্কুল দল ৫২ রানে ভারতীয় স্কুল দলকে পরাজিত করে টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় (ড্র ৩) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। বোম্বাইয়ের ১ম, দিল্লীর ৩য় এবং কলকাতার ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র যায়। আমেদাবাদের ২য় টেস্ট খেলায় সিংহল স্কুল দল এক ইনিংস ও ৯১ রানে জয়ী হয়।

প্রথম দিনের খেলায় সিংহল স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ১৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় স্কুল দল বাকি সময়ে ২ উইকেটের বিনিময়ে ২২ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের একঘণ্টা পর ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৪ রানে অগ্রগামী হয়। সিংহল স্কুল দল খেলার বাকি সময়ে ২য় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে ৯৪ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে জমা থাকে ৭টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ৩৫ মিনিট আগে সিংহল স্কুল দলের ২য় ইনিংস ১৭১ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি ২৩৫ মিনিট সময়ে ভারতীয় স্কুল দলের জয়লাভের জন্য ১৪৮ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মাত্র ৯৫ রানের মাথায় ভারতীয় স্কুল দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়। দলের ৯৫ রানের মধ্যে অধিনায়ক রবি ব্যানার্জি একাই ৬০ রান করেছিলেন। দলের অপর কোন খেলোয়াড় ১০ রানও তুলতে সক্ষম হয়নি। রবি ব্যানার্জি তৃতীয় দিনে সিংহল স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেটের মধ্যে ৫টা উইকেট (১৬ রানে) নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ভারত সফরে সিংহল স্কুল দল মোট ১০টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল (৫টি টেস্ট এবং ৫টি আঞ্চলিক খেলা)। এই দশটি খেলায় তাদের জয় ৬টি—৪টি আঞ্চলিক খেলা এবং ২টি টেস্ট খেলা। বাকি ৪টি খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

ভারতীয় স্কুল বনাম সিংহল স্কুল দলের ১৯৬৯-৭০ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় স্কুল দলের জে হংসরাজ (মোট রান ৪২০ এবং গড় ৪৪·৬৬)। সিংহল স্কুল দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট ৩৩৬ রান (গড় ৪২·০০) সংগ্রহ করেছেন আনন্দ জয়তিলক।

উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়ক রবি ব্যানার্জি (৪৪৬ রানে ২৩টি উইকেট)। অপরদিকে সিংহল দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (২৮৭ রানে ১৮টি) পেয়েছেন জয়বীর।

শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে 'জে আর ইরানী' পুরস্কার পেয়েছেন ভারতবর্ষের জে হংসরাজ এবং সিংহলের আনন্দ জয়তিলক।

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৫তম আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং জুনিয়র বিভাগে দিল্লী দলগত চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলা এবং মহারাষ্ট্র তিনটি বিভাগেরই সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছিল। শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র দুটি বিভাগের ফাইনালে খেলে মহিলা বিভাগের খেতাব জয়ী হয়েছে। অপরদিকে বাংলা পুরুষ বিভাগের ফাইনালে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে। বাংলা তিনটি বিভাগেরই সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলে কেবল পুরুষ বিভাগে জয়ী হয়। এখানে উল্লেখ্য, রেলওয়ে পুরুষ বিভাগের খেতাব জয়ের সূত্রে এই নিয়ে পাঁচবার রহিমতুল্লা কাপ জয়ী হল। মহিলা বিভাগে গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্র এবারও ছাদা কাপ জয়ী হয়েছে। জুনিয়ার বিভাগে খেতাব লাভের পুরস্কার নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়েছে এবার দিল্লী।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল
লেমি-ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ :

রেলওয়ে ৩—০ খেলায় কেরলকে পরাজিত করে। বাংলা ৩—১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ :

মহারাষ্ট্র ২—০ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে। কেরল ২—১ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে

জুনিয়র বিভাগ :

মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে। দিল্লী ৩—০ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত করে

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ (রহিমতুল্লা কাপ) :

খেলা : সিঙ্গলস ৩টি এবং ডাবলস ২টি

রেলওয়ে ৫—০ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে পাঁচবার রহিমতুল্লা কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগ (ছাদা কাপ) :

খেলা : সিঙ্গলস ২টি এবং ডাবলস ১টি

মহারাষ্ট্র ৩—০ খেলায় কেরলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার ছাদা কাপ জয়ী হয়েছে।

জুনিয়র বিভাগ (নারাঙ্গ কাপ) :

খেলা : বালকদের সিঙ্গলস ১, বালিকাদের সিঙ্গলস ১ এবং বালকদের ডাবলস ১।

দিল্লী ২—১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য প্রসঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের আসন্ন ইংল্যান্ড সফর উপলক্ষ করে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলে রীতিমত সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছে এবং তারা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় গোহার হেরেছে। বর্তমান সময়ে বে-সরকারীভাবে স্বীকৃত ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার এই হাঁড়ির হাল দেখে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলে খেলার অনুশীলনের কোন প্রস্তুতির কথা এখানে বলছি না। যে প্রস্তুতির কথা আলোচনা করছি তা সম্পূর্ণ অন্যধরনের এবং অন্য কারণে।

ইংল্যান্ডের জনমত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির অনুকূলে নয়। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরগামী এম সি সি দলে অশ্বেতকায় খেলোয়াড় বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর এই নির্বাচন দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মনঃপুত হয়নি। তাঁরা প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন এই কারণে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শ্বেতকায় খেলোয়াড়ের সঙ্গে কোন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়ের খেলার অধিকার নেই। এই অবস্থায় এম সি সি কর্তৃপক্ষের সামনে মাত্র এই দুটি পথ খোলা ছিল—ডি' ওলিভিয়েরাকে দল থেকে বাদ দেওয়া নতুবা সফরই বাতিল করা। এম সি সি কর্তৃপক্ষ মনেপ্রাণে সফর বাতিলের পক্ষপাতি ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভেবেছিলেন এই চালেই তাঁরা তাঁদের বর্ণবৈষম্য নীতির মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবেন। কিন্তু বৃটিশ সংবাদপত্র এবং জনমতের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত এম সি সি কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরই বাতিল করতে বাধ্য হন। এই প্রচন্ড চাপড় খেয়েও কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এই নীতির জন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা দু'বার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে) অলিম্পিক গেমসে যোগদান করতে পারেনি।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার অ্যাসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুপ্রবেশের ভিসা মঞ্জুর না করে নতুনভাবে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ইন্ধন জুগিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আর্থার অ্যাস আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় টেনিস খেলোয়াড় ক্লিফ ড্রিসডেল এই আমন্ত্রণের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জন্যেই আর্থার অ্যাসের নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সম্ভব হল না। আমেরিকার সরকারী মহল দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমেরিকার লন টেনিস এসোসিয়েশন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডেভিস কাপ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার অংশগ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। আগামী মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ কমিটির জরুরী সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বহু দেশই বর্তমান ঘটনার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ গ্রহণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। সেই বিক্ষুব্ধ দেশগুলি আজ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে দলে পেল। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অবস্থা খুবই সঙ্গীন। অলিম্পিক গেমসের প্রবেশদ্বার যেমন তাদের মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেছে তেমনি ডেভিস কাপের খেলাতেও হবে বলে অনেকের দৃঢ় ধারণা।

কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। হালফিল দক্ষিণ আফ্রিকার রাগবী দল ইংল্যান্ড সফরকালে বিক্ষোভকারীদের হাতে কম নাজেহাল হননি। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার জন্য খেলার মাঠে সে কি কড়া পুলিশ পাহারা। এক এ বিক্ষোভের প্রচন্ডতায় সফর বাতিল দাখিল হয়েছিল।

এই পটভূমিকায় আগামী গ্রীষ্মে আফ্রিকার ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড আসছে। আগে যে সাজ সাজ রবের বলেছি তা এই দক্ষিণ আফ্রিকার দলের নিরাপত্তার ব্যবস্থারই কথা। কি ব্যবস্থা শুনুন। ক্রিকেটের পুণ্যভূমি ইংলিস ক্রিকেটের হেডকোয়াটার্স মাঠের চারদিকে সুদৃঢ় কাঁটা তারের দেওয়া হয়েছে যাতে দক্ষিণ আফ্রিকার য়াড়দের গায়ে বিক্ষোভকারীদের এ নখের আঁচড় না পড়ে। নামকরা কাউন্টি গুলির মাঠেও যথেষ্ট বিক্ষোভ প্রতি ব্যবস্থা হয়েছে। কোন কোন মাঠে থেকেই রাত্রে কুকুর দিয়ে পাহারা হচ্ছে। গ্লামর্গ্যান কাউন্টি দলের ইন্ডিজ খেলোয়াড় ব্রায়ান ডেভিসের এ অনুযায়ী তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নির্দিষ্ট খেলা থেকে রেহাই দেওয়া হ

ইংলিস ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ এম সি সির এই প্রস্তুতি পর্ব লক্ষ 'লন্ডন সানডে টাইমস পত্রিকা' সম্প নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন 'আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের ই সফরকে কেন্দ্র করে এম সি সি যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তা প্রায় স প্রস্তুতির সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

সারা বৃটেনে দক্ষিণ আফ্রিকা সং বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরোধীরা আজ স ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। আফ্রিকা ক্রিকেট দলের আগামী ই সফর বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম হয়েছে তার কর্মকর্তারা দপত্রে এ চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, সি সি ক প্রকাশ্যে অস্বীকার করুন পুলিশী যাতে এম সি সি এবং কাউন্টি ক্লাবগ যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভার বহন হবে তা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছ সাহায্য হিসাবে আসছে না।'

'দিস ইজ নট ক্রিকেট'—এই ঐতি উক্তির প্রতি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি বৃটিশ জনসাধারণ যতখানি মূল্য দি তার কাণা কড়ি দেননি ইংলিশ খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এম সি সির কর্তারা।

ইন্টার রেলওয়ে হকি প্রতিযো

খড়্গপুরের সেরা রেলওয়ে স্টে আয়োজিত ইন্টার রেলওয়ে হকি যোগিতার ফাইনালে নর্দার্ন রেলও ৩—০ গোলে পেরাম্বুরের ইন্টিগ্র্যাল ফ্যাক্টরী দলকে পরাজিত করে এ ৬ বার চ্যাম্পিয়ান হল। বিজয়ী দলের পক্ষে তিনজন অলিম্পিক খে (রাজিন্দর, হরবিন্দার এবং ইন্দার অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 20th February 1970 শুক্রবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ 40 Paise

শূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।
৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রদ্ধেয় নট অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রথম পর্যায়ের 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা পড়ছি 'অমৃতে'। অনেক দিন থেকেই রচনার ধরন ভাল লাগছিল না, কিন্তু নটসূর্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তা প্রকাশে দ্বিধা ছিল। অধ্যাপক শ্রীসুমঙ্গল সেনের ৩৯ সংখ্যার চিঠিতে সে দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছি।

আশা ছিল শ্রদ্ধেয় শ্রীচৌধুরীর রচনায় তৎকালীন নাট্যালোকের একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস, বিশেষ করে তখনকার সাজঘরের দরজা আমাদের কাছে খুলে যাবে, এবং ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে উদ্ভাসিত হবে এক নবদিগন্তের। কিন্তু বর্তমান রচনায় যা প্রকাশ পাচ্ছে তা তৎকালীন অভিনেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনা। রচনাটি পড়লে মনে হয় স্বর্গীয় নাট্যাচার্য সম্পর্কে, শ্রদ্ধেয় নটসূর্যের আন্তরিকতায়, কোথায় যেন একটা ফাটল আছে। নিজের 'আলমগীরের' অভিনয়ের সমালোচনার উদ্ধৃতি দেওয়ার সময়, যেভাবে উনি লেখার সংযম হারিয়েছেন (৩য় বর্ষ ২৯ খণ্ড) তাতে ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে (যেমন 'শিশিরবন্ধু, হেমেন্দ্র রায়, শিশিরভক্ত নাচঘর' প্রভৃতি)। এমন কি শিশিরকুমারের 'নাদিরশাহে'র অভিনয়ে সচেতনতার অভাব, পরোক্ষভাবে একথাও উল্লেখ করেছেন (৩য় বর্ষ, ৩৩ খণ্ড)।

শুধু শিশিরকুমার নন, অন্যতম বিখ্যাত নট রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে শ্রীচৌধুরীর রচনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। স্টারে নটসূর্যের যোগদান রাধিকাবাবু সুস্থভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, (৩য় বর্ষ, ২৮ খণ্ড) এই উক্তি রাধিকাবাবুর প্রতি অসম্মানজনক? অধুনা গ্রে স্ট্রীট নিবাসী তাঁর পুত্রের কাছে জানলাম পিতা বহু বেনিফিট নাইটে অভিনয় করেছেন, কিন্তু শ্রীচৌধুরীর রচনায় রাধিকাবাবুর উক্তি 'আমি বেনিফিট নাইটে অভিনয় করি না' কথাটা পরস্পরবিরোধী।

বর্তমান রচনাটিতে তিনি নিজের জনপ্রিয়তার বহু ছবি আঁকছেন। কিন্তু সমসাময়িক অভিনেতাদের জনপ্রিয়তার কোনও উল্লেখ তিনি করছেন না। এমন কি তদানীন্তন জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর রচনায় প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। অথচ শোনা গেছে, দুর্গাদাসের জনপ্রিয়তা নাকি অনেক সময়, শিশির কুমারের প্রতিভাকেও ম্লান করে দিয়েছে। অথচ বর্তমান রচনার দ্বারা আজ থেকে বহু বছর পরের মানুষ ধারণা করবে, গিরিশ যুগের পর নটসূর্য ছাড়া আর কোনও প্রতিভা যেন ছিল না।

কিন্তু সমসাময়িক অভিনেতাদের সম্পর্কে শ্রীচৌধুরীর বন্ধুমনোভাব আশা করা অন্যায় নয়। অন্যায় নয়, তাঁর কাছে বাংলা নাট্যজগতের ফেলে-আসা দিনগুলির আরও সুস্থ রূপায়ণ। কারণ তিনি নটসূর্য হতে পারেন অস্তাচলের পথে, কিন্তু পশ্চিম দিগন্ত থেকে শেষ আলোর ছটায় আমরা ভরে উঠতে পারি।

প্রবীর মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা—২৬

ছোট পত্রিকার সমস্যা

কিছুকাল যাবৎ দেখছি 'অমৃতে' ছোট পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলছে। এর জন্য প্রথমেই 'অমৃতে'র কর্তৃপক্ষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। একটি অখ্যাত সাপ্তাহিকের কর্মী হিসাবে আপনাদের উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। এতখানি সহানুভূতি নিয়ে আমাদের কথা ভাবতে খুব কম পত্রিকাকেই দেখেছি। আশা করি, 'অমৃতে'র সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য আমি রাখতে চাই। আশা করি, আমার এই বক্তব্য প্রকাশ করে আমাদের মত শত-সমস্যা জর্জরিত ছোট পত্রিকা-সমাজকে উপকৃত করবেন।

বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশের বাইরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা অসংখ্য। তবু কেন যে মাঝে মাঝে ছোট পত্রিকার একান্ত অভাবের কথা শুনতে হয় জানি না। অবশ্য এটা ঠিক তাদের প্রকাশ যতই হোক না কেন, অকাল মৃত্যুই ঘটে অধিকাংশের। এবং তখন পাঠক এবং সমালোচক সমাজ থেকে অকাল মৃত্যুকবলিত পত্রিকা-সমাজকে শুনতে হয় অসংখ্য বিদ্রুপ এবং উপহাস। অনেক সময় এও বলতে শুনেছি : "যাদের মুরোদ নেই, তাদের এত সখ কেন?" কিন্তু সে কথা বলার আগে পাঠক এবং সমালোচকদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, তাঁরা যেন কারণটা একটু তলিয়ে দেখেন। কেন এই ছোট পত্রিকার জগতে এত মহামারি তা কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখেছেন?

আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত লেখকের তুলনায় নবীন লেখকের সংখ্যাই বেশী এবং উৎসাহও তাঁদের অদম্য। নবীন লেখকের নাম শুনে অনেকেই নাসাকুঞ্চিত করেন। কিন্তু তাঁদের লেখা যে অনেক সময় প্রতিষ্ঠিতদের চেয়ে ভাল হতে পারে, তার প্রমাণ অনেক ছোটো পত্রিকাতেই আছে। গতানুগতিকতার বাইরে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন আন্দোলন ইত্যাদির সৎ ও আন্তরিক পরিচয় এই সমস্ত লিটিল্ ম্যাগাজিনেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই লিটিল্ ম্যাগাজিন প্রকাশের পিছনে যে কত প্রতিকূলতা, বাধা, ব্যথা-বেদনা আর ত্যাগ স্বীকারের নির্মম ইতিহাস লুকনো আছে, তার খবর কে রাখেন? অথচ সত্যিকারের সাহায্যের অভাবে এসব কাগজ শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। সরকারের ঔদাসীন্য, বিশেষ করে ডাক-বিভাগের নির্মম উপেক্ষাসুলভ মনোভাব লিটিল্ ম্যাগাজিন প্রকাশের একটি অন্যতম অন্তরায়। সেই অন্তরায়কে অতি কষ্টে পার হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আদর্শবানদের পত্রিকা চালাতে হয়। কিন্তু সত্যিকারের শ্রম এবং আদর্শনিষ্ঠার দাম দিতে কজনই বা জানেন? বেশীর ভাগ ব্যক্তিই সামান্য দোষ ত্রুটি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ এবং কঠোর সমালোচনা করেই খুশী হন। অথচ তাঁদের এতটুকু সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পেলে যে আমাদের কতখানি উপকার হয় তা তাঁরা জানেন না। তাই আমি রুচিবান পাঠক এবং প্রতিষ্ঠিত ও নামী পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাব, তাঁরা যেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখ চেয়ে এবিষয়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

বিদ্যুৎ মল্লিক
কলিকাতা—৫৩

বহির্বঙ্গে বাংলা চর্চার সংকট

৯ই মাঘ প্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যা অমৃতে শ্রীকুসুমবিহারী চৌধুরীর 'বহির্বঙ্গে বাংলা চর্চার সংকট' রচনাটির জন্যে লেখককে ও সেইসঙ্গে সম্পাদক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি খুবই সময়োপযোগী। বাংলার বাইরে থাকি বলেই নয়, একজন বাঙালী হিসেবেই এখন এনিয়ে গভীরভাবে ভাববার যে সময় হয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারছি। শুধুমাত্র বাংলার বাইরের বাঙালীর জন্যেই নয়—বাংলা দেশের বাঙালীরও বেশী করে এ নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে।

চিঠিপত্র

কারণ বাইরের বাঙালীরা দূরে থাকার ফলে এবং নানা প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হবার জন্যে এ বিষয়ে অনেক বেশী রকম সচেতন। তাই তাঁরা প্রতিকারেও সচেষ্ট। অথচ বাংলা দেশেই বাংলা ভাষা এখন দুয়োরাণী। স্বীকার কেউ করেন না, একটা অদ্ভুত আত্মতুষ্টি নিয়ে প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে সব কিছুকে নস্যাৎ ক'রে অনেকেই বলতে ভালবাসেন যে যা হচ্ছে ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই হচ্ছে। অন্য প্রদেশের বাঙালীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে তাঁরা একটা উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে দেখেন। এদিকে কিন্তু তাঁদের চোখের সামনেই হিন্দী কিভাবে আস্তে আস্তে আগ্রাসী হয়ে সারা বাংলা দেশকে ছেয়ে ফেলছে তা দিব্য তাঁদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য যদিও বাংলা দেশের বাঙালীদের বিষয়ে বলা নয়, তবুও প্রসঙ্গক্রমে তা না লিখে পারলাম না। এ লেখা আমাদের, অর্থাৎ যাঁরা বাংলার বাইরে থাকেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। বাংলা দেশের বাইরে বাঙালীর সংখ্যা প্রচুর। একমাত্র বিহারেই বোধ হয় ১৮ লক্ষ। আজকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে এ বিপুল সংখ্যক বাঙালীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। বর্তমানে এখানে একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধেই আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষা আজ সংকটের মুখে—এই কথাটা ইদানীং সব সময়ই বলা হচ্ছে। সত্যি কথা। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বাংলার বাইরের বাঙালীদের চিন্তা করতে হবে গভীরভাবে যে, করণীয় কি? বা কোন্ রাস্তা গ্রহণ করা সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়? সমস্যাটা গভীর, তাই ভাবাবেগে আপ্লুত বা উত্তেজিত হয়ে কোন কিছু করা ঠিক হবে না। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যেন কোনভাবেই বিলীয়মানতার দিকে না ছোটে। এজন্যে প্রতিটি বাঙালীকে সচেতন হয়ে, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সেইসঙ্গে সবচেয়ে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে বর্তমানের 'হিন্দী চাপাও' নীতির দিকে। হিন্দীর এই সাম্রাজ্যবাদকে দক্ষিণীদের মতো রুখবার ক্ষমতা বর্তমানের বাঙালীর নেই। তাই বলে জবরদস্তি করার এই ধারাকে ব্যাহত করতে না পারলে সত্যিই আমাদের ভাষা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে। ইংরেজী যাবার পথে। সামনে পথ খোলা হিন্দীর। এর সঙ্গে রয়েছে মাতৃভাষা। কাজেই ঠিক করা উচিত, যতদিন না সমস্যার সমাধান হচ্ছে, বা আমরা সঠিক কি গ্রহণীয় তা ঠিক করতে পারছি ততদিন ইংরেজী সমান্তরালভাবে থাকবে। তার সঙ্গে থাকবে মাতৃভাষা। বর্তমানে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা মার খাচ্ছে। আমাদের এদিকে যেন তেমন গা নেই। সামান্য আলোচনা, দু একটা চিঠি-চাপাটি, সভা (তাও সবদিক বাঁচিয়ে) এতে করে কিছু করা যাবে না। বিহারে উর্দুভাষীরাও সঙ্কটের মুখে। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অনেক বেশী জোরদার। তাঁরা এ ব্যাপারে সক্রিয়ও বেশী।

বর্তমানে বিহারের মগধ বিশ্ববিদ্যালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল অ-হিন্দীভাষী পরীক্ষার্থীদের ওপর ফতোয়া জারী করেছে যে, এ বছর থেকে বাংলা বা উর্দুতে আর পরীক্ষা দেয়া চলবে না। এ কি জুলুম নয়! এতদিন যা চলে এসেছে, ছাত্ররা নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ে আসছে, এখন একেবারে এক কলমের খোঁচায় তা ছেড়ে হিন্দীতে লিখতে হবে? এ কোন দেশী বিচার? আপত্তি এখানে, এই জবরদস্তিতে। প্রতিবাদ করতে হবে এখানেই।

ভাষা এমন একটা জিনিস যাতে হাত পড়লে সহজেই তা মানুষকে উত্তেজিত করে, দিশেহারা করে। গোলমালও তাই হচ্ছে হামেশাই। বাঙালীদের সংঘবদ্ধ হয়ে এখন তাই এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে—নইলে পরবর্তী বংশধরেরা এজন্যে আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

জীবনময় দত্ত।
পাটনা—১

'নজরুলের সঙ্গে' কারাগারে

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় (৪র্থ খন্ড, ৩৯শ সংখ্যা) চিঠিপত্র বিভাগে "নজরুলের সঙ্গে কারাগারে" প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলাম তাতে আমার পদবীটি 'চট্টোপাধ্যায়ে'র পরিবর্তে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ছাপা হয়েছে, আমি খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি বন্দ্যোপাধ্যায় নই, চট্টোপাধ্যায়। যাইহোক, এই একটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়কে কিছু জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

করুণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
বেহালা, কলকাতা।

(২)

আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতের' সাহিত্যগত মূল্যের যথেষ্ট প্রশংসা করি। এতদিন ধরে আপনাদের ধারাবাহিক 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' নামক স্মৃতিচিত্রণটি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে প্রচুর আনন্দ এবং কবি-জীবনের অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য জানতে পেরেছি। সেগুলির মানবিক মূল্য ছাড়া সাহিত্যগত মূল্য যথেষ্ট আছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের জীবনের একটা দিক শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এর জন্য তাঁর কাছে এবং মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে সাহিত্যপ্রিয় প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা কৃতজ্ঞ থাকবে।

এর পর মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি যেন এই ধরনের আরো কিছু জীবনচরিত আমাদের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেন।

চিত্তরঞ্জন কাঁপ,
শিবরামপুর—নামখানা
দঃ ২৪ পরগণা

(৩)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'র নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকায় শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' ধারাবাহিক রচনাটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়লাম। রচনাটি আমার মত তরুণ পাঠকদের দারুণভাবে আলোড়িত করে।

যে নীরব যবনিকার অন্তরালে বিগত কয়েকটি বৎসর কবিপ্রতিভা গোধূলি-অন্ধকারে স্তব্ধ স্তিমিত আছে, সেই কবির জীবনের একটি বিরাট দিক সংকলিত হয়েছে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে'। স্বাধীনতা ও মানবব্যক্তিত্বের শৃঙ্খলমুক্তির পতাকাবাহী কবি নজরুল সম্বন্ধে আমার মত অনেক তরুণ এবং সাধারণ পাঠক কমই জানেন। শ্রীচক্রবর্তী ভাষাগত নৈপুণ্যে এবং বহু অজানা তথ্য সন্নিবেশিত করে যে ধারাবাহিক রচনাটি অমৃত পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তার জন্য আমার মত পাঠকদের কাছে নিশ্চয় শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগের—অভিযাত্রী সেনাদলের তূর্যবাদক নজরুলের কারাগার-জীবন সম্বন্ধে যে চিত্রগুলি লেখক 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' তুলে ধরেছেন তা কবি নজরুলের কারাগার-জীবনের উৎকৃষ্ট দলিলচিত্র হয়ে থাকবে। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। আর এই পল্লীগ্রাম থেকে আপনার 'অমৃত' পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিরা,—হুগলী।

শা[illegible]চোখে

অপসৃয়মাণ শীতের সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে **১২ই ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অধিবেশন বসেছিল।** পঞ্চাশ মিনিট সময়ের মধ্যে কেবিনেট ৪০টি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মেনু-অনুযায়ী জলখাবার খেয়ে মন্ত্রী মহোদয়েরা প্রায় সকলেই স্ব স্ব দলীয় কার্যে আবার আত্মনিয়োগ করেন, এবং অনেকেই শুক্রবার স্বাগত না জানানো পর্যন্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আহারাদি সম্পন্ন করে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা এলিয়ে দিতে পারেন নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি বিষয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেখে নিশ্চয় কেউ অনুমানই করতে পারবেন না যে যুক্তফ্রন্ট একটি অগ্নিগর্ভ সমস্যার সম্মুখীন। অথচ প্রত্যেক দলই তাঁদের নিজস্ব ছকবাঁধা পথে পরিকল্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ভাবাবেগের কোন স্থান নেই। আত্মজিজ্ঞাসা করে শৃঙ্খলাভের কোন আকাঙ্ক্ষাও এঁদের নেই। কেননা রাজ্যের মন্ত্রী হলে কি হবে, এঁরা ত আসলে দলের বন্দী। আর বার বার ত্রুটি স্বীকার করলেই গণদেবতাও যখন ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন, তখন ভয়েরই বা কারণ কি!

মন্ত্রীসভায় তর্ক-বিতর্ক নেই। যতদূর খবর পাওয়া যায়, কোন জ্যোতিষ্ক সেখানে বক্রী হন না। কেউ যদি তা হনও, অন্যান্য জ্যোতিষ্কের প্রভাবের ফলে সেই বক্রীভাব কেটে যায়। মন্ত্রীসভার নভোমণ্ডলীর সমস্ত জ্যোতিষ্কই নিজ নিজ কক্ষপথে অনায়াস বিচরণ করেন। অবশ্য বিপদ বা কক্ষচ্যুতি ঘটে তখনই যখন দলীয় দৃষ্টি পড়ে। শোনা যাচ্ছে, চোদ্দ গ্রহ খচিত ফ্রন্ট আকাশের উজ্জ্বলতম গ্রহটি পুরোপুরি বক্রী হয়ে গেছে। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী বক্রী হওয়ার কুফল ফলবে।

বাংলা কংগ্রেসের কথাই বলছিলাম। এ দল এখন সম্পূর্ণ বক্রী হয়ে গেছে। আর এঁদের কাছাকাছি যে সপ্তর্ষি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরাও ২৩শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই কক্ষপথে এসে যাবেন। সেই কক্ষপথে স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা কংগ্রেস তার তিনজন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ বোধকরি এর আগে যে এখন-তখন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে একটু ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। কাজেই বাজার সরগরম রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। এই মেয়াদী পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়ণের নির্ঘণ্টের মধ্যে অন্যান্য সহযোগীরাও তাঁদের কাজকর্ম সেরে নিতে পারবেন। আর যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

শুধু তাই নয়, বাংলা কংগ্রেস তাঁদের দলনেতা ও মুখ্যমন্ত্রীকে 'টপ সিক্রেট' সিদ্ধান্তর অংশবিশেষও অনতিবিলম্বে কার্যে পরিণত করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই 'টপ সিক্রেট' সিদ্ধান্তর যে অংশ রূপায়িত করা হবে তা আর কিছুই নয়—মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অনভিপ্রেত দপ্তরগুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ। আর নয়তো শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীদের গদীচ্যুতি। মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কর্মতালিকা নিয়ে এগিয়ে যাবেন তখন অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। আর অ্যাকশানের ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে।

অ্যাকশান বিলম্বিত হচ্ছে বলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও সত্যি কথা বলতে গেলে একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছেন। তবে শুধু নিশ্বাস নিয়ে শুধু জানে বাঁচারই চেষ্টা করছে এমন নয়। প্রত্যাক্রমণের জন্যও যে প্রস্তুতি চালাচ্ছে তাঁদের দলের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তর উক্তির মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, শ্রীঅজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলেই ফ্রন্ট ভেঙে যাবে না, বা মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে না। এই উক্তিটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বিকল্প সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে। আরও বিশ্লেষণ করলে এ উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মোটেই কঠিন নয় যে, বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীমুখার্জির একান্ত অনুগামী কয়েকজন বিধানসভার সদস্য ছাড়া একটি বিশেষ অংশ ফ্রন্টের বর্তমান রূপকে বিরূপ করবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, এবং অন্যান্য দলও (যাঁরা শ্রীমুখার্জিকে বর্তমানে এগিয়ে যাওয়ার সবুজ সংকেত দিয়েছেন তাঁরাও) আখেরে কেটে পড়বেন। নয়তো অন্য সম্ভাবনা এই হতে পারে যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহকর্মীদের সঙ্গে যদি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাঁদের একান্ত অনুরাগীদের মধ্যে একটি লাস্ট মিনিট সমঝোতা হয়ে যায় তবে বাংলার রাজনীতি উত্তরপ্রদেশের মতই নাটুকে হয়ে যাবে। এই দুই সম্ভাবনা ছাড়া আর একটি অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে। সেটা হচ্ছে, নির্ভেজাল মার্কসবাদী দলগুলির ঐক্য শ্লোগান। এইসব যে কোন একটা সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নিশ্চয়ই ঐ উক্তি করেছেন। কেননা নিতান্ত ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই যে এ সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন এমন না হওয়াই সম্ভব।

তবে একথা সত্য, মার্কসবাদীরা কার্যত যুক্তফ্রন্টে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলার জন্য যাঁরা কোমর বেঁধে এগিয়ে যান তাঁরা সকলেই শক্তিহীন।

কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা একেবারে অসহায় অবস্থায় মধ্যে পড়বার জন্য প্রস্তুত নন। এবং সেই কারণেই তাঁরা অশ্রুতপূর্ব প্লেনামে নিজেদের দলীয় অবস্থার পর্যালোচনা করে স্বীয় শিবির সংহত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর প্রতিবেদনে পার্টির কমরেডদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে'। তাকে প্রত্যাক্রমণ করে পর্যুদস্ত করতে হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করার জন্য।

শত্রু কে তাও চিহ্নিত করা হয়েছে। নাম না করেও প্রমোদবাবুরা যুক্তফ্রন্টের যে সমস্ত শরিকের একটুখানি শক্তি আছে তাঁদেরই বিরুদ্ধে কমরেডদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তবে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও বাংলা কংগ্রেসকে ঘৃণ্য চক্রান্ত করে যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর অজুহাতে বেশ একহাত নিয়ে ছেড়েছেন। বক্তব্য থেকে মনে হয়, ফ্রন্টকে মার্কসিস্ট পার্টির অভীপ্সিত পথে পরিচালিত করায় উদ্দেশ্যেই গড়া হয়েছে যেন। অবশ্য রাজনৈতিক দল হিসাবে তাঁদের এই পরিকল্পিত পথে এগোবার নৈতিক অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, পূর্বোক্ত দলেরা তাঁদের সঙ্গে সহমত না হয়ে বুর্জোয়া ধনী জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপাত করছে, তাঁদের তাই বিশ্বাস, সেই মুহূর্তেই কি মার্কসবাদী কম্যুনিস্টের নিজেদের আলাদা করে ফেলা উচিত ছিল না? কারণ নিজেদের কলুষিত করবার সুযোগ দেওয়া মোটেই উচিত নয়।

কিন্তু পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র মেনে নিয়ে মার্কসিস্টরা যখন শাসক শ্রেণীর অংশীদার হয়েছেন তখনই তা বোঝা উচিত ছিল যে, তাঁদের মত বিপ্লবী দলের [illegible] এ সমস্ত শোভা পায় না। কৌশলের নাম করে ক্ষমতা আস্বাদন শুরু করলে সে চক্র থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত। অন্ততঃ ইতিহাসে তার নজীর খুব নেই। অবশ্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যদি মনে করেন, কৌশল করে-করেই সকলকে কোণঠাসা করে ফেলবেন, তবে সে গুড়ে বালি। কারণ, তাঁরা যে কম্যুনিস্ট কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছেন মনে করছেন সেই স্কুলে পাঠ নেওয়া আরও অনেক সুছাত্র আছেন। তবু মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরাই সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন, কিম্বা তাঁদের অনুসৃত পন্থাই ঠিক, এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ কিছু নেই। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে সমস্ত কিছুরেই গুণগত পার্থক্য বদলে যাচ্ছে। কাজেই মানসিক অত্যুৎসাহিতা সর্বকিছুতে সাফল্য অর্জনে সবসময় সাহায্য করে না। প্রমোদবাবুরা তাঁদের সদস্য, সমর্থক ও সংগঠন বেড়েছে বলে দাবী করেছেন। অবশ্য আত্মসন্তুষ্টি লাভ না করে দলকে আরও জোরদার করার কথাও বলা হয়েছে। এত গুণীরা এতদিন কোথায় অবহেলায় দিন যাপন করছিলেন জানি না। কিন্তু ক্ষমতা একটুখানি দলের হাতে আসার

সঙ্গে-সঙ্গেই এত লোক কি করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন সেইটেই হল আসল প্রশ্নটা। প্রমোদবাবুরা হয়ত বলবেন, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু তাঁরা দল রাখতে পারলেন না কেন? উত্তর হচ্ছে, ক্ষমতা হারিয়েছে বলে। অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না, প্রমোদবাবুরা তাঁদের নয়া-কমরেডদের খাঁটি জিনিস করে তুলতে পারবেন না। তবে কেরালার অবস্থা দেখে শঙ্কিত বোধ করার কারণ আছে বৈকি! যে কেরালায় এতদিন এক ভীষণ ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেই কেরালায় ঝড় হওয়া ত দূরের কথা, একটু নিম্ন বায়ুচাপ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। আরও দুঃখের কথা এই যে, 'কার্জন পার্কের সার্কাসে'র তাঁবুটি শেষ পর্যন্ত তুলে নিয়ে গিয়ে ত্রিবান্দ্রম মহাকরণের সামনে খাটানো হয়েছে। গান্ধীবাদীরা অনশনকে দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মশুদ্ধি। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, গণমনে প্রভাব বিস্তার করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। ত্রিবান্দ্রমের তাঁবুটির মধ্যে কি যজ্ঞ সমাপন হচ্ছে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে প্রমোদবাবুরা যদি তার একটি ব্যাখ্যা দেন তবে গান্ধীবাদীরা কিছু আশান্বিত হবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন রাজত্ব করার পরও কেন শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করা গেল না? আর যে চক্রান্তের ফলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ হাতিয়ারটা হারালেন সেই চক্রান্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার জন্য সমস্ত শ্রেণীসৈন্যদের সমাবেশ করা গেল না কেন? প্রমোদবাবুরা নাকি বলেছেন, সেখানে গ্রামে গ্রামে তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। এবং গ্রামে ঘটছে বলেই বুর্জোয়া সংবাদপত্র চেপে যেতে পারছে। কিন্তু সেই বিপ্লবগর্ভ গ্রামগুলি থেকে কটা মিছিল ত্রিবান্দ্রমে এসেছে? পশ্চিমবঙ্গে কেরালার মতো কিছু হলে নাকি এখানে সব কাজ অচল হয়ে যাবে। কারণ শ্রমিক শ্রেণী গর্জে উঠবে। বিনম্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৬৯ সালে সমস্ত শরিকের এই ঐক্যবদ্ধ সরকারকে এক মুহূর্তের মধ্যে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের জন্যও লোক পাওয়া কঠিন হচ্ছিল। আর এখন এই এগার মাসের মধ্যেই এমন কি ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে গেল যে কলকাতা পেট্রোগ্রাড শহর বনে যাবে? কাজেই এ সমস্ত তত্ত্বিতম্বা বাদ দিয়ে অবস্থার বাস্তব মূল্যায়ন করে পদক্ষেপ করা উচিত। অতিরিক্ত কৌশল করতে গেলে ফ্রন্ট ত বাঁচবেই না, যাঁরা এখন মদৎ দিচ্ছেন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরাও উল্টো পুরাণ পড়তে শুরু করবেন।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা তাঁদের শক্তি সংহত করার উদ্দেশ্যেট বোধহয় শ্রেণী-সংগঠনগুলির মধ্যেও সংঘর্ষের বিস্তার ঘটাচ্ছেন। নয়তো এ আই টি ইউ সি দ্বিধা-বিভক্ত হবে কেন? কেনই বা অন্যান্য সংগঠন যথা মহিলা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হল। বড় দল ভেঙে একক দলের এ রকম সংহতিকরণের সময় এসেছে বলে যাঁরা মনে করছেন তাঁরা সত্যিই অবস্থার বাস্তব মূল্যায়ন করতে পারছেন বলে মনে হয় না।

যা হোক, বাংলা কংগ্রেস তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তে এসে বলেছেন, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণ আর সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করছে যে বাংলা কংগ্রেস অন্তত এ শক্তিজোটে আর থাকতে রাজী নয়। তাঁদের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি কর্মী-সভা ডেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। আবার ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টিও বলেছেন, মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে কোন সরকার গঠিত হলে তাতে তাঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। অতএব মার্ক-সিস্টদের উক্তি থেকে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে, কম্যুনিস্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেস যদি 'একঘরে'-ও হয়ে যান তবুও কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়াই যেন ফ্রন্ট সরকার চলতে পারে। কিন্তু তা তো একেবারেই অসম্ভব। কেননা, অন্যান্য সমস্ত দলগুলি মনে করে বাংলা দেশে শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বের প্রতি এখনও বেশীর ভাগ লোকের আস্থা আছে। আর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজ্যভিত্তিক নেতৃত্ব দিতে পারেন। শ্রীজ্যোতিবাবু মহাশয় সুপরিচিত হলেও, এবং তাঁর দলের সংগঠন থাকলেও, এখনও তিনি শ্রীমুখার্জির স্তরে উন্নীত হতে পারেন নি। সমদর্শীর মনে হয় এ বক্তব্য আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, শ্রীঅজয় মুখার্জিকে সামনে রেখে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করা যতখানি সুবিধাজনক হবে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে সেরকম লড়াই ত দূরের কথা, রাজনৈতিক অবলুপ্তি ঘটার আশঙ্কাও কম নয়। অতএব, শত দোষ-ত্রুটি থাকলেও বাংলা কংগ্রেসকে অন্তত সেই সমস্ত পার্টির পক্ষে পরিত্যাগ করা অসম্ভব, যাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রেখে সমৃদ্ধ হতে চান। এখনও হামলা হলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়ে একটা-কিছু সুরাহার আশায় থাকতে পারেন। কিন্তু যদি সেই অবলম্বন চলে যায়, তখন ত শুধু কৃষ্ণনামই ভরসা হবে মাত্র। অবশ্য, এটা কিছু দোষের নয়। কারণ, কৌশল করার অধিকার এঁদেরও আছে, আর নিজে-দের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা ও দলকে সমৃদ্ধ করবার নৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। তা না হলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — সমস্ত শ্লোগানের অর্থ একেবারে একাকার হয়ে যেতো। অতএব, এই এক-একটা স্তরের বিপ্লবকে সফল করতে হলে ভিন্ন-ভিন্ন কৌশলের ও বিভিন্ন শক্তির সাময়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় স্বীকার্য। এদিক থেকে বিচার করেই কৌশল মত মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ফলে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে বিশ্বাসী হয়েও পথ-বৈচিত্র্যের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে রুটমার্চ করা যাচ্ছে না। অনেকেই নিজের রুটে যাচ্ছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরাও এরকম একটি রুট ধরেছেন। এবং সেজন্যই হয়ত হাতিয়ারটা হারাবেন।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

বিহারে মন্ত্রিসভা গঠনের যে সম্ভাবনা গত সপ্তাহে কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল একটি ঘটনার প্রতিঘাতে তা শুধু ম্লান হয়ে যায় নি, পরন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে রাষ্ট্রপতির শাসন সেখানে দীর্ঘায়িত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই ঘটনাটি হচ্ছে পূর্বতন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত আয়ার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, যাতে ছজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সত্য বলে কমিশন মন্তব্য করেছেন। এই রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে বিরোধী কংগ্রেস, এস এস পি, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সমবায়ে সদ্য গঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা রামানন্দ তেওয়ারী (এস এস পি) পদত্যাগ করেছেন এবং এই পদত্যাগের প্রশ্নে রাজ্য এস এস পি'র মধ্যেও ভাঙনের আশংকা দেখা দিয়েছে।

বিহারের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপালের কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট প্রেরণের সময় আসন্ন, কারণ ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে পার্লামেন্ট বসছে, এবং ২৭শে তারিখে ঐ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে। রাজ্যপালের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কেন্দ্র বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বর্ধিত করা প্রয়োজন কিনা স্থির করবে।

কমিশনের রিপোর্ট

আয়ার কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তেওয়ারীর তীব্র প্রতিক্রিয়ার কারণ এই যে, যে ছজন পূর্বতন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কমিশন মন্তব্য করেছেন, তাঁদের পাঁচজনই বর্তমান বিরোধী কংগ্রেস দলভুক্ত। কাজেই, এই অবস্থায় বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলেই তেওয়ারী সিদ্ধান্ত করেছেন, যদিও রাজ্য কমিটি সংযুক্ত বিধায়ক দল ত্যাগের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করেছে এবং এস এস পি-র কেন্দ্রীয় সংস্থায়ও এই ব্যাপারে মতভেদ ঘটেছে যার পরিণতিতে এস এস পি-র চেয়ারম্যান কর্পূরী ঠাকুরও পদত্যাগ করেছেন।

কমিশনের রিপোর্টে যে ছজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সত্য বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন এককালীন মুখ্যমন্ত্রী কে বি সহায়, পূর্বতন সেচমন্ত্রী মহেশপ্রসাদ সিংহ, কৃষিমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পরিবহনমন্ত্রী রাঘবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, অর্থমন্ত্রী অম্বিকাশরণ সিংহ ও পূর্তমন্ত্রী রামলক্ষ্মণসিং যাদব। এঁদের মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তিই ইন্দিরাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, আর সকলেই সিণ্ডিকেট-সমর্থক। কমিশন প্রমাণ পেয়েছেন যে, কে বি সহায় তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে নিজের পুত্র, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। মহেশপ্রসাদ নিজ প্রভাবাধীন ব্যক্তিদের নিজ দপ্তরগুলোতে নিয়োগ করে নানাভাবে তাদের কাজে লাগাতেন বলে কমিশন সিদ্ধান্তে এসেছেন। আর এল সিংহ যাদবের বিরুদ্ধেও অনুরূপ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণগত বৈষম্য বোধের। রাঘবেন্দ্র নারায়ণ ছোটখাট লাভের ওপর বিশেষ নজর রাখতেন বলে কমিশন প্রমাণ পেয়েছেন। অম্বিকাশরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, কেউ ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগের ব্যাপার নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনি এমন উদারতা দেখাতেন যা সঙ্গত হয়নি।

বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্ব এইখানে যে, *ভারতে এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার পূর্ববর্তী একটি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী* ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ও অর্থসম্পদের হিসাব সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তদন্তের ফলে অন্ততপক্ষে ছজন মন্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যরূপে রামনন্দ তেওয়ারীই এই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতায় নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে সাত-আট দিন ধরে 'সমাজবিরোধী'রূপে আখ্যাপ্রাপ্ত দু' দলের মধ্যে ব্যাপক এলাকা জুড়ে যে অবাধ সংঘর্ষ চলছে, তাতে ঐ অঞ্চল রাজ্য প্রশাসনের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছে এরকম আশংকা করাও অন্যায় নয়। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার এই চূড়ান্ত নিদর্শনের মধ্যেই গত রবিবার রাত্রে আলিপুরের নিউ রোডে স্বীয় বাসগৃহে ফরাসী কনসাল আঁরি বেফেং ও তাঁর পুত্র অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে গুরুতর-

পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ওয়াল্টার স্টীল ১৪ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চিত্রে রাষ্ট্রপতিকে মিঃ স্টীলের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

ভাবে আহত হয়েছেন এবং বেফেতের পত্নী নিহত হয়েছেন। স্বভাবতঃই বৈদেশিক কূট-নীতিকের ওপর এই আক্রমণে কেন্দ্র গভীর-ভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে কূটনীতিকদের নিরাপত্তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রের উদ্বেগ অহেতুক নয়, কারণ, এর পূর্বেও কলকাতায় পশ্চিম জার্মান, বৃটিশ ও ফরাসী কূটনীতিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, যদিও বর্তমান ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই বলেই এখন পর্যন্ত অনুমান।

এদিকে ফ্রন্টের মধ্যে দ্বন্দ্বে রাজ্য প্রশাসন প্রায় অচল এবং এই অবস্থায়ই মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি দিল্লী গিয়েছেন বাহ্যতঃ পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য, যদিও যাত্রার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী নাকি ফ্রন্টের মধ্যে তাঁর সমর্থক দলগুলোকে ডেকে নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের যে বৈঠক হয়ে গেছে, তাতে স্থির হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায় কেরলের মতো মিনি ফ্রন্ট গঠন সম্ভব নয় এবং কম্যুনিস্ট পার্টি এই রাজ্যে শাসক বা বিরোধী কোনো কংগ্রেসের সঙ্গেই সহযোগিতা করবে না। ফ্রন্ট যে-কোনো সময়ে ভেঙে যেতে পারে—এই আশংকা প্রকাশ করেও তাঁরা মনে করছেন যে, সি পি এম-এর ওপর চাপ দিয়ে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে ফ্রন্ট এখনো রক্ষা করা যেতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে এবং সি পি এম-এর নেতৃত্বে যদি নতুন কোনো কোয়ালি-শন গঠিত হয়, তাহলে কম্যুনিস্ট পার্টি বিরোধী দলে আসন নেবে, কারণ, তাঁদের মতে, বিরোধী দলে থাকলেই তাঁরা সি পি এম-কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হবেন।

এদিকে জ্যোতি বসুও মনে করছেন যে, ফ্রন্টের সংকট এখন গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় সি পি এম পলিট ব্যুরোর বৈঠক থেকে সদ্য দিল্লীতে ফিরে গিয়ে গোপালন একটা সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্ট প্রায় ভেঙে যেতে বসেছে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য ছাড়া সেখানে মিনি ফ্রন্ট গঠনও সম্ভব নয়, কিন্তু মিনি ফ্রন্টের কোনো চেষ্টা হলেই রাজ্যব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কেরলে তাঁর দল তৈরী ছিল না, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা ভিন্নরূপ।

সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক সুন্দরায়াও কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন যে, ফ্রন্ট ভেঙে কোনো বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা হলে আমরা সেই সরকারকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। বর্তমান যুক্তফ্রন্টের একমাত্র বিকল্প হলো অন্তর্বর্তী নির্বাচন, ফ্রন্ট ভাঙলেই আমরা আবার জনগণের রায় চাইব। নিজেরাও আমরা বিকল্প কোনো মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করবো না।

আসামের রাজনীতিতে নতুন মোড়

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় ভগবতী তেজপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পরই রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় নেওয়ার সূচনা হয়েছে। ইতি-মধ্যে পরিষদীয় উপনেতা মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজ্যে ফিরে এসেছেন এবং আসাম মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত একটি সিদ্ধান্তে পরিষদীয় কংগ্রেস দলকে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী চালিহার স্থলবর্তী নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবতীর নির্বাচন এর মধ্যে সমাধা হবে না কাজেই সেক্ষেত্রে নেতা হিসেবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা খুব কম যদিও বাইরের কোনো ব্যক্তির নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয়। মহেন্দ্র চৌধুরীর আনুগত্য কংগ্রেসের কোন গোষ্ঠীর প্রতি, তা নিয়ে এ যাবত যে জল্পনা-কল্পনা চলছিল তারও এইসঙ্গে অবসান হয়েছে এক ঘোষণায় যাতে শ্রীচৌধুরী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে বিরোধী

দলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই এবং শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতিই তাঁর আনুগত্য।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন টিঁকল না

গত সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৪টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে প্রথমে অর্ডিন্যান্স জারী এবং পরে পার্লামেন্টে যে আইন পাশ করেছিলেন, সুপ্রীম কোর্টের ১১ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চ তা বাতিল করে দিয়েছেন। বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে বলেছেন যে, বিদেশী ও অন্যান্য দেশী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত না করে শুধু মাত্র ১৪টি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে এই ব্যবস্থার দ্বারা বৈষম্য করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিধিসম্মত রীতি পালিত হয়নি।

ম্যানিলায় অশান্তি

ফিলিপিনে দীর্ঘদিনের বাহ্য শান্তির অন্তরালে হঠাৎ ধূমায়িত বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাইরের চেহারাটাই সব সময়ে অন্তরের পরিচয় নয়। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে ফিলিপিনে হাক (কম্যুনিস্ট) বিদ্রোহীদের যে কার্যকলাপ রাজ্য প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, তা দমনের পর ফিলিপিনের রাজনীতিতে সরকার-বিরোধী কোনো উগ্রপন্থী আন্দোলনের আভাস ছিলো না। গত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে রাজধানী ম্যানিলায় যে প্রচন্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তা দমন করতে সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। এই সকল সংঘর্ষে পাঁচজনের মৃত্যু ঘটে, একশ'জন জখম হয়, দু'শ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর এক সপ্তাহের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিক্ষোভ, মিছিল প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়।

অবস্থা আপাতঃ শান্ত হলেও এর মূলে আরো গভীরে। গত নভেম্বর মাসে মার্কস আবার দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্টপদে নির্বাচিত হন। তারপর থেকে ফিলিপিনের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ট্যাক্স বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ফিলিপিনের অর্থনীতিকে সংকটময় করে তুলেছে। এর ওপর আছে প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা এবং সরকারী অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ। অথচ ফিলিপিনের জনসাধারণ এমন কোনো বিকল্প রাজনৈতিক দলও দেখতে পাচ্ছে না যা তাদের আস্থাভাজন। এই জন্য ছাত্র ও শ্রমিকরা কিছুদিন ধরে নির্দলীয়দের নিয়ে একটি মহাসম্মেলন আহ্বানের দাবী জানাচ্ছে যার কাজ হবে ফিলিপিনের সংবিধান সংশোধন করা। মার্কস অবশ্য আন্দোলনের পিছনে মাওপন্থীদের সক্রিয় কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছেন এবং বেতারভাষণে বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের অভিসন্ধি ছিল বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে ফিলিপিনে মাও-পন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আন্দোলনের পিছনে অবশ্য কম্যুনিস্টদের হাত থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষোভ যে অহেতুক নয়, ফিলিপিনের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটই তার প্রমাণ। বিক্ষোভের মূলে যে সকল অভাব-অভিযোগ রয়েছে, তা দূর না হলে শুধু কোনো দলের ওপর দোষারোপ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। ১০-২-৭০

সম্পাদকীয়

ফ্রন্টের ওপর নতুন চাপ

পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের এক বছর প্রায় পূর্ণ হতে চলল। এই এক বছরে তাঁরা কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে যে-ধারণা সৃষ্টি করেছেন তা মোটেই বাঞ্ছিত নয়। যুক্তফ্রন্ট একটি কোয়ালিশন সরকার। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে কোয়ালিশন সরকারের নজীর অনেক দেশেই আছে। ইংলণ্ডে গত যুদ্ধের সময় পুরো মেয়াদটাই কনসারভেটিভ-লেবারের কোয়ালিশন ছিল। সেই মন্ত্রিসভায় উইনস্টন চার্চিল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং লেবার পার্টির ক্লিমেণ্ট এটলী ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। চার্চিল ছিলেন যুদ্ধ-দফতরের ভারপ্রাপ্ত। এটলী ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বছর পশ্চিম জার্মানীতেও হিবলি ব্রাণ্ডট্ কোয়ালিশন সরকারের চ্যান্সেলর। অবশ্য সাধারণত দুই পার্টির কোয়ালিশনের রেওয়াজই ইয়োরোপে আছে। আমাদের এখানে চৌদ্দ পার্টির ফ্রন্ট যে-সরকার গঠন করেছেন তার নজীর অন্যত্র নেই।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক কারণেই ফ্রন্টের উদ্ভব। কংগ্রেস এতকাল এত শক্তিশালী ছিল যে কোনো এক পার্টির পক্ষে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে পর্যুদস্ত করে। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি কার্যসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, আদর্শগত ঐক্য তাদের কোনো সময় ছিল না, এখন তা আশা করা অযৌক্তিক। কিন্তু কার্যসূচীভিত্তিক ঐক্যও দেখা গেল এতগুলি পার্টির সরকারে রাখা সম্ভব হয় না। চৌদ্দ পার্টি ফ্রন্টের শরিক হিসাবে সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও রাজনৈতিক শক্তির দিক থেকে এঁরা সমান নন। নির্বাচনের আগে আসন বণ্টনের সময়েই দলগুলির শক্তির তারতম্য ফ্রন্টের নেতারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে দফতর বণ্টনের সময়েও বিধানসভায় দলগুলির আসন-সংখ্যা বিচার করা হয়। বৃহত্তম দল হিসেবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি স্বরাষ্ট্র দফতরসহ মুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করেছিল। দরকষাকষির পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাংলা কংগ্রেসের ভাগে যায় এবং শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

কিন্তু সেই কাঁটা প্রধান দুই শরিকদলের বুকে বিঁধে আছে। মার্কসবাদীরা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদ তাঁদের প্রাপ্য ছিল, অন্যরা তা দেননি। বাংলা কংগ্রেস মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদ তাঁদের দিলেও, মার্কসবাদীরা মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা স্বীকার করছেন না। দফতরগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করছে। প্রত্যেক দলই নিজের নিজের দফতরে নিজেদের অনুগতদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। এটা সকল দলের পক্ষেই প্রযোজ্য। তবে মার্কসবাদীরা প্রধান প্রধান দফতরগুলি করায়ত্ত করায় তাঁদের ওপরই আক্রমণটা বেশি। বিশেষত রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার অবনতিতে স্বভাবতই স্বরাষ্ট্র দফতর তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দিকে সকলে অভিযোগের অঙ্গুলি সংকেত করছে। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পত্রদ্বন্দ্ব। কার ক্ষমতা কতটুকু তা নিয়ে চলছে প্রকাশ্য বিতর্ক। বিধানসভায় এক এক মন্ত্রী এক এক সুরে কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সরকারকে 'অসভ্য ও বর্বর' আখ্যা দিলেন। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। এমন ঘটনার কথা কেউ কোনোদিন শুনেছেন বলে জানি না। সরকার পক্ষই বিরোধী পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদের কার্যকলাপকে চরম ভাষায় নিন্দাবাদ করল। অথচ এর পরও ফ্রন্টের চৌদ্দ দল মন্ত্রিসভায় টিঁকে আছেন। কেউ বেরিয়ে যাচ্ছেন না। এমনকি যে-মুখ্যমন্ত্রী নিজের সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলছেন তিনিও না।

সোজা কথায়, এই রাজনীতি পরিষ্কার নয়। অভিযুক্তেরা তো নয়ই, যাঁরা অভিযোগকারী তাঁরাও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করছেন না। তবে কি এমন সন্দেহ করা অযৌক্তিক নয় যে, সকলেরই মন্ত্রিত্বের লোভ আছে। মন্ত্রিত্ব চলে যাক এটা কেউ চান না। তাই যতদিন পারি মন্ত্রিত্ব করি—এই হল দলগুলির নীতি। সবচেয়ে প্রতিবাদকারী বাংলা কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের তিনজন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা আপাতত রেখে দিচ্ছেন। এই মন্ত্রীরা ২০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবেন। গ্রহণ করা না-করা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। যদি পদত্যাগ করতেই হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে ও'রা বাদ দিলেন কেন? তিনি পদত্যাগ করলে তো মার্কসবাদীশুদ্ধ সব আপদ চুকে যায়। মার্কসবাদীরা অবশ্য শাসিয়ে রেখেছেন যে, মন্ত্রিসভা ভাঙলে নতুন নির্বাচনের জন্য তাঁরা আন্দোলন করবেন। তাতেই কি ফ্রন্টের ভাঙন বিলম্বিত হচ্ছে? নতুবা বাংলা কংগ্রেসের এই 'মিনি পদত্যাগ' প্রস্তাবে অবস্থার কোনো উন্নতি হবে বলে তো মনে হয় না। যদি একে চাপ সৃষ্টির কৌশল বলা হয়, তাতেও কোনো কাজ হবে না। কারণ ফ্রন্ট এখন একটি ঘাতসহ চাপসহ সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আমি সাহিত্যিক নই, কারণ নানা কাজে জড়িয়ে থাকায় লিখতে পেরেছি আমি কম। তাই 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজে'র বিষয়ে কিছু বলতে দ্বিধা বোধ করি। মনে হয় যেন অনধিকার চর্চা করছি। কিন্তু বহু বৎসর যাবৎ আমি বহু বই পড়ে আসছি, এবং আজও পড়ে থাকি। তাই সেদিক থেকে সাহিত্যের বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে বলেই মনে করি। আর সাহিত্যও তো সমাজেরই জিনিস। তাই সাহিত্যের বিষয়ে কিছু বললেও তাতেও কি শেষপর্যন্ত সমাজের কথাই বলা হয়ে যায় না? আমার এ লেখাটিতে আমি তাই সেই দিক থেকেই দেখার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে রামায়ণ মহাভারতের কথা। অনেকে মনে করেন, বিশেষ করে আমাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা এবং গোঁড়া হিন্দুরা, যে, রামায়ণ মহাভারতের প্রত্যেক কথাই সত্যি। এবং এ দুটি কেবল ধর্মপুস্তক মাত্র। আবার অনেকে মনে করেন যে, যদিও এতে ধর্মের কথা অনেক আছে, যেমন অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, কিম্বা যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের উপদেশ, আসলে এ দুটি সামাজিক গ্রন্থ। অর্থাৎ এতে এমন কথা আছে যে এই বই পড়লে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হবে। আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ মাতা, কন্যা ও পুত্রবধূ, আদর্শ ভ্রাতা, বন্ধু, এবং সর্বোপরি আদর্শ ভগবানে বিশ্বাস এ দুটি বইয়ে ছড়ানো আছে। আর আছে দুর্জন ও দুষ্ট লোকের ইতিহাস। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই প্রকট হয়েছে যে, দুর্জন কখনো শেষপর্যন্ত কৃতকার্য হয় নি। অবিশ্যি আমি যখন রামায়ণ মহাভারতের কথা বলছি তখন আমি বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণ, কিম্বা ব্যাস-দেবের মহাভারতের কথাই শুধু বলছি না; তার সঙ্গে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং অন্যান্য অনেক পপুলার এডিশানের কথাও বলছি।

রামায়ণ মহাভারত পড়লে মন যে নরম হয়, তাতে আর সন্দেহ নেই। হয়তো ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া চলছে; তাঁরা যদি শোনেন রাম ও তাঁর ভাইদের কথা, কিম্বা যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইদের কথা, তাহলে অনেক সময় ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি লাঘব হতে পারে। মহাভারতের কোথাও দেখি নি যে, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন বৈমাত্রেয় ভাই বলে নকুল সহদেবকে ভিন্নচক্ষে দেখ-ছিলেন। এমন কি যখন তাঁরা পাঁচ ভাইয়ে দ্রৌপদীর স্বামী হয়েছিলেন তখনো দ্রৌপদীকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যবহারের কোনো তারতম্য দেখি নি। আবার যুধিষ্ঠির যখন জানলেন যে, কর্ণ তাঁর ভাই ছিলেন, অনুতাপে তখন তিনি এমন দগ্ধ হয়েছিলেন যে বহু কষ্টার্জিত রাজ্যও তিনি নিতে চান নি। অন্য দিকে মা কুন্তীও কখনো তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে কোনো তফাৎ করেন নি। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যাতে সমাজকে ভালো দিকে প্রভাবিত করেছে। রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে সকলেই জানেন। তাই আমি এ সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলব না।

তারপরে বঙ্কিমসাহিত্য থেকে আজকের সাহিত্য অবধি পাঠ করলে কিভাবে সাহিত্যের ধারা একটু একটু করে বদলেছে তার খানিকটা ধারণা করা যায়। এর বেশির ভাগটাই স্ত্রী-পুরুষের ভালো-বাসা নিয়ে লেখা। সবসময়েই যে তাদের বিয়ে হয়েছিল তাও নয়। কিন্তু তাতে তাদের নির্দোষ ভালোবাসা কম হয় নি। যেমন আয়েষা এবং জগৎ সিংহ। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে এবং আরো অনেক সাহিত্যিকের বইয়ে প্রেমের উচ্চাদর্শ পাওয়া যায়। তাতে সমাজের মঙ্গলই হয়েছে। ইদানীং কিছু কিছু বইয়ে আমি দেখেছি যে, শেষপর্যন্ত দুষ্টের দমন হয় নি। সেটা সমাজের দিক দিয়ে আমার কাছে খুব ভালো বলে মনে হয় না।

আরেক রকমের সাহিত্য আছে যাতে হয়তো অনেকে বিশ্বাস করেন না। আবার অনেকে মনে প্রচুর শান্তি পান। এই ধরনের সাহিত্যেরও সমাজের দিক দিয়ে যথেষ্ট মূল্য আছে। আমি ভৌতিক সাহিত্যের কথা বলছি। এই সম্বন্ধে বই পড়লে অনেক শোকার্ত লোক মনে যথেষ্ট সান্ত্বনা পান তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি অবিশ্যি ভূতের তিন চোখ, পা উল্টো দিকে, খোনা স্বর—এ ধরনের ভূতের গল্পের কথা বলছি না। যেসব ঘটনা জীবনে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে সেই সব ভৌতিক ঘটনার কথাই বলছি। হয়তো কেউ স্বামী হারিয়েছেন, কেউ বা পুত্র হারিয়ে-ছেন। তাঁদের মন শোকের নিবিড় অন্ধকারে ডুবে আছে। তাঁরা যদি কোনো লেখায় দেখেন যে, মানুষ মরে গেলেও তার অস্তিত্ব থাকতে পারে, তাতে তাঁরা মনে খুবই শান্তি পান। হয়তো সেই ভৌতিক ঘটনা সত্যি নয়। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বইয়ের ঘটনাও তো সত্যি নয়! সৌভ্রাত্রের গল্প, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের গল্প, মাতা-পুত্রের গল্প পড়ে যদি মনে সুখ হয় (যদিও এসব লেখকের রচনা মাত্র) তাহলে ভৌতিক ঘটনায় মনে শান্তি পাওয়াতে আপত্তি কী? আমার লেখা বইয়ে আমি দু-তিনটি পারলৌকিক ঘটনার কথা লিখেছি, যে ঘটনা আমার জানা এবং আমি সত্য বলে মানি। এইসব ঘটনা পড়ে বহু শোকার্ত নরনারী আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁদের একজন মহিলা লিখেছিলেন, 'আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, একদিন না একদিন আমার হারানো স্বামীকে ফিরে পাবই।'

যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে যতো কথা আমার মনে আসছে তা একটি ছোটো প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। তবে আজকের সাহিত্য সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে ঠিক হবে না। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি যে, আজকালকার উপন্যাস... বৃহদায়তন, এবং দামও অবিশ্যি সেই ...মাণ। এইসব বৃহৎ গ্রন্থের ... কোনোটিতে গল্পাংশ যথেষ্ট আছে। ...র কিছু বই ফেনিয়ে লেখা, এবং তাতে ...ক অবান্তর কথা থাকে। পড়লে মনে হয় যে, পাঠক কীভাবে লেখকের বই নেবে সেইটে মনে করেই যেন লেখা হয়েছে। লেখকের নিজের যা বলবার আছে তার চেয়ে পাঠকের কি ভালো লাগবে তার ওপরেই লেখক বেশি মূল্য দিয়েছেন। আর একরকমের সাহিত্য দেখেছি যেটা আমার মনে হয়, বড্ড বেশি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা। যেমন একটা সময়ে দেখতাম, র‍্যাশানের লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর কথা প্রায় সব গল্পেই থাকত। এসব বই সময়বিশেষে চললেও সর্বকালের জন্যে নয়। কিন্তু অনেক সময় সাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলেও তার আবেদন সর্বকালীন হতে পারে। যেমন দুর্বলের ওপর অত্যাচার। আজকের দিনে আমাদের দেশে যে হিংস্রতা নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে, আজকালকার সাহিত্যে সে সম্বন্ধে লেখা খুবই স্বাভাবিক। তবে যদি সেসব বই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিকে সমর্থন করে লেখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সৎসাহিত্য হবে। সকলেই নিশ্চয়ই চান, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়।

(সুধীর কান্তি ঘোষ)

দুষ্কৃতাম্। এর মোটামুটি মানে হচ্ছে যে, ভালো লোককে রক্ষা করতে হলে খারাপ লোককে দমন করতে হবে। এভাবে যদি সাহিত্য লেখা হয় সেটা সমাজের নিশ্চয়ই মঙ্গল করবে। এবং আজকের সাহিত্য মৃত না হয়ে চিরকালের জিনিস হবে।

আরেকটি কথা না বললে আমার সত্য বলা হবে না। আজকালকার দিনে সাহিত্য শুধু সখের নয়, বই লিখে সংসার প্রতি-পালন করা আজ আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমার মনে হয়, লেখক কিম্বা লেখিকা যতো সুন্দর বই লিখতে পারতেন ততোটা পারছেন না। হয়তো বই লেখার সময়ে লেখককে ভাবতে হয়, কাহিনীর সিনেমা-সম্ভাবনার কথা। এবং তা করতে গিয়ে গল্পে এমন কিছু লিখতে হয় যা হয়তো লেখকের নিজের মনের কথা নয়। আবার অনেক সময়, বছরের এক-একটা কালে, যেমন পুজোর মরশুমে, লেখক-লেখিকাকে একসঙ্গে অনেকগুলি লেখা লিখতে হয়। এটা হয়তো জীবিকার জন্যে দরকারও বটে। কিন্তু একসঙ্গে বেশি লিখলে যে লেখার মান খাটো হয়ে যায় তা অস্বীকার করা যায় না। এদিক থেকে পাঠকও খানিকটা বঞ্চিত হন। জানিনে, এ সব সমস্যার সমাধান কি!

যাই হোক একালের সাহিত্যের দিক দিয়ে আজকের সমাজকে যে রকম মনে হচ্ছে সংক্ষেপে বললাম। আশা করি কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না।

অন্ধকারের পাতা ঝরছে ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এখন আমি এক অস্তগামী সূর্যকে দেখছি,
অন্ধকারের সমুদ্রে আকাশটা ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে।
আধুনিক কবিতায় শব্দের শাবকদের খেলা বেশ
উপভোগ করতে পারলেও, ঠিক এমনি সময়ে
আমি হাসতে অপারগ। এমনকি সার্কাসের সেই
বেঁটে জোকারটাও আমায় সেদিন হাসাতে পারেনি।
এই মাগ্‌গি বাজারে হৃদয়ের মূল্যও বেড়েই চলেছে,
পদে পদে খেসারৎ দিয়ে যখন পথ চলতে হয়
তখন আমি হাসতে পারি না, শুধু অভিনয় দেখি।
এখন আমি এক অস্তগামী সূর্যকে দেখছি.
অন্ধকারের সমুদ্রে আকাশটা ক্রমেই যখন ডুবে যাচ্ছে
তখন আমার হাসবার কথাও নয়. ভাববার কথা।
আমি দেখছি. এ মুহূর্তে এ সমাজ বল্গাহীন ঘোড়া:
রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতার ভিড়ে দেখি ক্ষণে ক্ষণে
চেহারা বদল. শহরের শরীরের প্রতি রোমকূপে
বিষম বিষের জ্বালা প্রতিবাদে ইন্ধনই জোগায়।
এমনি পরিবেশে আমি মরুভূমি হয়ে যাই একেবারে.
হঠাৎ স্বপ্নের রাজ্যে রঙ-বেরঙের একরাশ রৌদ্রের বেলুন
যখন আবার উড়তে শুরু করবে. কেবলমাত্র তখনি
আমি আবার প্রাণখুলে হাসতে পারবো. তার আগে নয়।
এখন আমি কেবল অজানা অন্ধকারের পাতাগুলি
কিভাবে এক এক করে খসে পড়ছে সবিস্ময়ে তাই দেখছি।
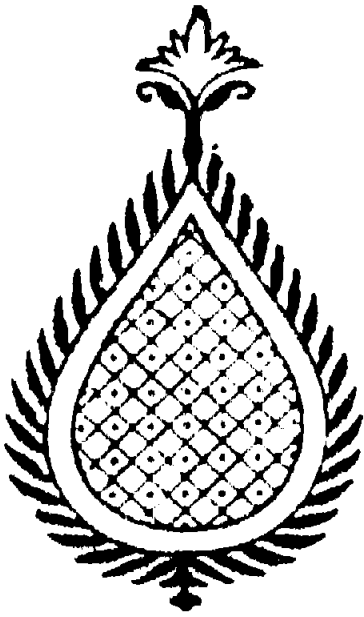
নাইনটিনাইন ॥

শান্তনু দাস

চৌপর দিন বসে আছি, বেমক্কা ব্যাটে বলে হ'ল না জীবন,
হায় ভাষ্যকার,
আজন্ম টুয়েলভথম্যান
প্যাড, গ্লাভস, টুপি ড্রেস সবশুদ্ধু নিয়ে বসে আছি।

সব ছিল ...
সবই ছিল. যখন যা প্রয়োজন,
ইনসুয়িং লেগব্রেক শক্ত কব্জি চোস্ত হাতে যার,
কিংবা বল ছুটে গেলে আমি একা দুরন্ত রাণার
দু' হাতে ছন্দ নিয়ে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলি বিস্তীর্ণ আকাশে।

কতকাল স্কোর গুনবো স্যার?
ক্রিজ থেকে ছুট্‌বল জ্বলন্ত গোলার মতো এসে
সরাসরি বুকে গিয়ে লাগে
রক্ত জমে চারপাশে ....
.........রক্ত জমে হৃদয়-গভীরে।

কে কাকে স্মরণ রাখে?

কে কাকে স্মরণ রাখে
যদি না দৃশ্যপটে ওঠে নামে উত্তপ্ত পারদ,
যদি না [illegible] মাইল কেঁপে ওঠে অথর্ব মেদিনী,
যদি না ব্যাটের ফলে সূর্য ওঠে সূর্য নামে রোজ।

চৌপর দিন বসে আছি দ্বাদশনম্বর আমি একা।
ক্যাপ্টেন. একবার ক্রিজে আসতে দিন
সেঞ্চুরী নাই বা হ'ল,
স্ট্যাম্পটা ওড়ার আগে নিলেও তো নিতে পারি মুঠোয় জীবন

অচলগড় রহস্য

অদ্রীশ বর্ধন

আরাবল্লী পর্বতমালা।

রুক্ষ, ধূসর, কর্কশ। অধিকাংশ কাঁটা-ঝোপ। সবুজ রং বড় একটা দেখা যায় না। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ-জ্বালা করে।

আরাবল্লীর এক প্রান্তে এলোমেলো কতকগুলো পাহাড়। ধুলোভরা পথ বেয়ে অনেক ওপরে উঠলে দেখা যায় একটা পুরোনো কেল্লা। আরও উঠলে পাথর ঘেরা জলাশয়। রাত্রে সেখানে জল খেতে আসে অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদ।

পাহাড় চূড়ায় উঠলে দেখা যায় যোজন-বিস্তৃত পর্বতমালা। দিগন্তে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাওয়া আরাবল্লী রেঞ্জ। ভয়ংকর। কিন্তু সুন্দর।।

আর একদিকে দেখা যায় মাউন্ট আবু।

মাঝে এই এলোমেলো পাহাড়। আর কেল্লা।

●

অচলগড়।

মাউন্ট আবু থেকে এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে। ফিরলাম অনেক হতাশা নিয়ে। অচলগড়ের কেল্লা মনে দাগ কাটে না।

তাই হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এলাম। আমি, শিপ্রী কবিতা আর [illegible]

আমরা এসেছি বেড়াতে। কোনো মামলা নিয়ে নয়। কিন্তু রেহাই পেলাম না। মামলা ওৎ পেতে ছিল রাস্তায়।

ট্যাক্সি ফিরছে মাউন্ট আবুতে। পাকদণ্ডীতে দুলতে দুলতে ঘুরতে ঘুরতে কখনো নামছি, কখনো উঠছি। আরাবল্লী দেখছি। আর ভাবছি চিতোরের রাণা প্রতাপ এই দুর্গম অঞ্চলেই বছরের পর বছর পালিয়ে বেড়িয়েছেন।

আচমকা একটা প্রাসাদ দেখলাম। প্রাসাদ তো নয়, যেন পাথরের বুকে একটা ফুটন্ত গোলাপ। ন্যাড়া পাথরে গোলাপী রং বড় মানিয়েছে।

ট্যাক্সি দাঁড় করালাম। রাস্তায় নামলাম। ক্যামেরায় চোখ রেখে ফোকাস করছি, এমন সময়ে পাকদণ্ডী যেখানে মোড় নিয়েছে, সেইখানে একটা ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাব ঘটল।

ভিউ ফাইন্ডারে স্পষ্ট দেখলাম একটা মিশমিশে ঘোড়া। হাওয়ায় কেশর উড়ছে। দৃপ্ত গ্রীবা বেঁকিয়ে টগবগিয়ে ছুটে আসছে। সওয়ার ঝুঁকে পড়েছে। ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

অবাক হলাম। ক্যামেরা নামিয়ে তাকালাম। রেসের ঘোড়ার মতই যেন উড়ে আসছে কালো ঘোড়া। লোহার নাল

অশ্বখুরধ্বনি মেশিনগানের শব্দের মতই এগিয়ে এল। নিমেষে পাশ দিয়ে উধাও হল। চোখের পলকে দেখলাম একটি মুখ। তরুণ। সুশ্রী। মাথায় কাউন্টি ক্যাপ। পাকানো গোঁফ। কিন্তু দুই চোখ উদভ্রান্ত।

দেখতে দেখতে ঘোড়া উধাও হল অচলগড়ের দিকে।

দেখলাম, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

●

ট্যাকসি আবার গড়ালো।

বউ বলল— 'ঠাকুরপো,, ছেলেটার ঘোড়া খেপে গেছে নাকি?'

ইন্দ্রনাথ বলল—'দেখেতো মনে হল না। পাকা সওয়ার। ও কী?'

একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। পাহাড়ের বুকে ধাক্কা খেয়ে যেন খানখান হয়ে গুঁড়িয়ে গেল হাহাকার ধ্বনি। কার চীৎকার? পাঁজর ভাঙা এ কান্না কার?

ইন্দ্রনাথ শক্ত চোখে তাকিয়েছিল গোলাপী প্রাসাদের দিকে।

মৃদুস্বরে শুধু বলল—'শব্দটা ঐ দিক থেকেই এল।'

'কি করতে চাও?' বউ জিজ্ঞেস করল।

'দেখতে চাও? গায়ে পড়ে যেতে পাড়ি। কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কি? আমার বাপু ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। ছেলেটা উর্ধ্বশ্বাসে পালালো ঘোড়া নিয়ে। তারপরেই এই চীৎকার। চলো যাই।'

'চলো।'

এখন বুঝছি, বউ জিদ ধরে ভালই করেছিল। নইলে অচলগড়ের মৃত্যুরহস্য রহস্যই থেকে যেত।

●

মূল রাস্তা থেকেই একটা পাথর বাঁধাই পথ উঠে গেছে। দুপাশে ল্যাম্পপোস্ট। বাহারি ফানুস। পথের শেষে মার্বেল তোরণ। ওপরে নহবৎখানা।

ট্যাকসি গিয়ে দাঁড়ালো তোরণের ভেতরে, ফোয়ারার পাশে। হন্তদন্ত হয়ে একজন পাগড়ি পরা বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। চোখে চশমা। পাকা গোঁফ।

বলল—'কাকে চাই?'

ইন্দ্রনাথ বলল—'কাউকে নয়। এইমাত্র কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তাই দেখতে এলাম। কারও বিপদ হয়েছে?'

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। থেমে থেমে বলল—'হয়েছে। আপনারা কারা?'

'টুরিস্ট। যদি কারও বিপদ-আপদ হয়ে থাকে—'

'আপনারা কোনো সুরাহা করতে পারবেন না! পুলিশে ফোন করেছি।'

'পুলিশ!' ইন্দ্রনাথ সচকিত হল। ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে। চলি তাহলে। [illegible]

কিন্তু আমাদের যাওয়া হল না: ট্যাকসিতে উঠতে না উঠতেই একটা পুলিশ জীপ প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল। তিড়িংমিড়িং করে লাফ দিয়ে নামল মাউন্ট আবু মার্কা কয়েকজন পুলিশ। সবশেষে ভারিক্কি চালে পুলিশ অফিসার।

নেমেই থমকে দাঁড়ালো। ভুরু কুঁচকে তাকালো। কটমটে চাহনি নিবদ্ধ রইল ইন্দ্রনাথের ওপর। দেখলাম, ইন্দ্রনাথের পাতলা গোঁফের আড়ালে খেলা করছে মৃদুহাসি। দুই চোখেও হাসি।

পরমুহূর্তেই যেন একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল। কামানের গোলার মত ধেয়ে এল পুলিশ অফিসার। ভীষণ কলরব করে সবলে জাপটে ধরল ইন্দ্রনাথকে।

খাঁটি বাংলায় শুধু দুটি উচ্ছ্বাস শুনলাম—'ব্যাটা ভুশুণ্ডির কাক! তুই এখানে?'

পাঁচ মিনিট পরে কুরু-পাণ্ডবের কলহ শেষ হল। ইন্দ্রনাথ আলাপ করিয়ে দিল। পুলিশ অফিসারের নাম দয়ারাম প্যাটেল। ইন্দ্রনাথের কলেজ ফ্রেন্ড।

●

দয়ারাম প্যাটেল বলল—'গুরুচরণ ব্যাপার। প্রিন্স অম্বর সিং খুন হয়েছেন।'

'সেকী!' বলল ইন্দ্রনাথ।

'টেলিফোনে তাই শুনলাম। চলোই না, দেখা যাক।'

'মৃগাঙ্কর সুবিধে হল', মুখ টিপে বলল ইন্দ্রনাথ। 'বড় তামাকের মসলা পাওয়া গেল।'

'বড় তামাক মানে?' দয়ারাম প্যাটেলের প্রশ্ন।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বউ বলল—'গাঁজা। আমার কর্তা গাঁজায় দম দেন গপপো লেখার সময়ে।'

'লেখক?'

মুখলাল করে বললাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

চোখ কপালে তুলল দয়ারাম—' সাবাস! আমি এ মামলায় তাহলে অমর হলাম।'

*

প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলাম সদলবলে। সব রাজপ্রাসাদের মতই বিলাসসম্ভার দেখলাম দেওয়ালে, মেঝেতে। ফরেন একসচেঞ্জের ঝামেলা যখন ছিল না, তখনকার আনা দেশ-বিদেশের সামগ্রী সুন্দর করে সাজানো রয়েছে প্রতিটি ঘরে।

যেতে যেতে সংক্ষেপে দয়ারাম প্যাটেল প্রিন্স অম্বর সিংয়ের ইতিবৃত্ত শোনালো। অচলগড়ের রাজা এখন দিল্লীতে থাকেন। রাজপুত্র ছেলেমানুষটি নন। প্রৌঢ় বয়সেও তিনি প্রিন্স। অচলগড়ের পুরোনো কেল্লা ভাল লাগেনি। তাই গোলাপী প্রাসাদ বানিয়েছেন। বাতিকের মধ্যে শিকার আর ফটোগ্রাফী।

প্রিন্স অম্বর সিং বিপত্নীক। একমাত্র পুত্র রাম সিং অপোগণ্ড। বয়স প্রায় উনিশ।

না। তাই অচলগড়ের পুরোনো কেল্লার পাশে জঙ্গলের বাংলোয় একা থাকে। বিষয়বুদ্ধিতে কাঁচা। কিন্তু বদ-বুদ্ধিতে পয়লা নম্বর ফক্কড়। অনেক বদভোসও আছে।

কথা বলতে বলতে একটা হলঘরে পৌঁছোলাম। চৌকাঠে পা দিয়েই দেখলাম আলমারী বোঝাই হাতিয়ার। দেওয়ালের গা ঘেঁসে সারি সারি আলমারী। ঘরের মাঝখানে কাচঢাকা বড় শোকেস। সেকেলে বন্দুক, পিস্তল, তরবারি, টাঙ্গি সাজানো থরে থরে। ছনলা পিস্তল সেই প্রথম দেখলাম। দেখলাম উটের পিঠে রেখে অগ্নিবর্ষণ করার উপযুক্ত দশ ফুট লম্বা বন্দুক। দেখলাম লোহার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। ভারি ভারি তরোয়াল, বল্লম, তীর, ধনুক। একটা ছোটখাট অস্ত্রাগারের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম সকলে। লাশটা চোখে পড়ল ঘরের ঠিক মাঝখানে।

লাল-কালো-নীল রং-এর প্রায় এক-বেগদা পুরু কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন এক প্রৌঢ়। কাঁচা-পাকা গালপাট্টা পাশ থেকেই দেখা যাচ্ছিল। অঙ্গে রাজপুত বেশ। মাথার শিরশোভা ঠিকরে পড়েছে আলমারীর দিকে। নিথর, নিস্পন্দ সে দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

প্রাসাদের বাইরে সাদা গোঁফঅলা যে বৃদ্ধর সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে ভূলুণ্ঠিত দেহর পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

থমথমে মুখে বলল—'প্রিন্স অম্বর সিংয়ের সঙ্গে রাম সিং কথা বলছিল কিছুক্ষণ আগে। রামসিং একটু আগেই চলে যায়। তারপর ঘরে আসতে দেখা যা... প্রিন্স এইভাবে শুয়ে আছেন। মাড়ি ...

দয়ারাম বলল—'ঘরে কে আগে এসেছিল?'

'রামসিং।'

'আঃ, তার কথা বলছি না। রামসিং যাবার পর কে এসেছিল '

বৃদ্ধ চুপ করে রইল।

'কে এসেছিল?' দয়ারামের স্বর তীক্ষ্ণ হল।

'ইন্দ্রাণী দেবী'

'অ!' কিছুক্ষণ চুপ। তারপর—'তিনি কি দেখলেন?'

'দেখলেন প্রিন্স মেঝেতে পড়ে। ডাকলেন, সাড়া পেলেন না। তখন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। আমি ছুটে এসে দেখলাম প্রিন্স মারা গেছেন।'

'আপনি ফোনে বললেন, প্রিন্স খুন হয়েছেন।'

'বলেছি।'

'কেন বললেন? কি করে জানলেন উনি খুন হয়েছেন?' 'দয়ারাম যেন পাল্টাপেত

'খুব সহজে। দাগটা দেখেছেন?' হেঁট হল বৃদ্ধ। তর্জনী ছোঁয়ালো মৃত অম্বর সিংয়ের ঘাড়ে। স্পষ্ট দেখলাম, ছাড়া-ছাড়া লাল দাগ। রক্ত জমে যাওয়ার চিহ্ন। চামড়ার নীচে রক্ত যেন সহসা স্থির হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ বলল—'গলা টিপে মারলে এই রকম দাগ দেখা যায়। তাই না?' ঈষৎ ব্যঙ্গ যেন শেষ প্রশ্নটা ছুঁয়ে গেল।

নির্নিমেষে তাকিয়েছিল দয়ারাম। বলল—'সেই রকমই তো দেখছি।'

বৃদ্ধ বলল—'আমি পুলিশ নই। কিন্তু আমার চুল পেকেছে—খুন-খারাপী অনেক দেখেছি। তাই আপনাকে ফোন করেছিলুম। দেখে যান, প্রিন্স অম্বর সিং খুন হয়েছেন। দেরি করতে চাই নি। কেননা, চেষ্টা করলে খুনীকে এখুনি ধরা যেতে পারে।'

দয়ারাম শুধু চেয়ে রইল।

বৃদ্ধর দুই চোখ যেন স্ফুলিঙ্গ ছড়ালো—'খুনীর নামটাও শুনতে চান?'

'জানি। রামসিং তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বৃদ্ধ। রমা সিং প্রিন্সের সঙ্গে চোটপাট করে যাওয়ার পরেই তার লাশ পাওয়া গিয়েছে। আর কোনো প্রমাণ চান?'

'চোটপাটটা কি নিয়ে?'

'ঘরোয়া কেলেঙ্কারী।'

'কিন্তু আমার শোনা দরকার।'

দয়ারামের চোখে চোখ রেখে বৃদ্ধ থেমে থেমে বলল—'শুধু আপনাকেই তা বলতে পারি। আর কাউকে নয়।'

'অ' ইন্দ্রনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো দয়ারাম। 'তোমরা পাঁচ মিনিট বসো। ব্যাপারটা শুনে আসি। ভূশুণ্ডির কাক, তোর ব্রেনটাকে শানিয়ে নে।'

●

পাশের ঘর থেকে দয়ারাম ফিরে এসে দেখল মৃত অম্বর সিংয়ের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

গম্ভীর স্বরে বলল দয়ারাম—'আর দেখার দরকার নেই। খুনই বটে। এখুনি গেলে রামসিংকে অ্যারেস্ট করা যাবে।'

ইন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিল না। একবার শুধু আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে নিল প্রিন্সের গলায়। তারপর পা বাড়ালো।

নীচে এসে বলল ইন্দ্রনাথ—'ভূশুণ্ডির কাকের ব্রেন তাহলে কাজে লাগল না?'

'না', মুখভঙ্গী করল দয়ারাম। 'প্লেন অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার। রামসিং মার্ডারার।'

'তাহলে তো গোল চুকেই গেল। কিন্তু ইন্দ্রাণী দেবী কে?'

এদিক-ওদিক দেখে খাটো গলায় বলল দয়ারাম—'রক্ষিতা।'

'হ্যাঁ। বাপ-বেটায় কলহ তাই নিয়েই। বাপের দেখাদেখি হারামজাদা ছেলেও বাংলোবাড়ীতে মেয়েছেলে রেখেছে। মাসোহারা নিয়ে বচসা। তারপর গলা টিপে ফেলে রেখে পালিয়েছে ঘোড়া ছুটিয়ে।'

'ঘোড়া ছুটিয়ে!' আমার আর কবিতার সঙ্গে চোখোচোখি হল ইন্দ্রনাথের। 'কালো ঘোড়া?'

সচকিত হল দয়ারাম—'তুই দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। সবাই দেখেছি আসবার সময়ে। যেন ভূতে তাড়া করেছে, এমনিভাবে একটা কালো ঘোড়া অচলগড়ের দিকে গেল। পিঠে সওয়ার। মাথায় কাউন্টি ক্যাপ। পাকানো গোঁফ।'

'ঐ তো রামসিং। আর দেরি নয়। চললাম। বিকেলে দেখা করব।'

●

বিকেলে দয়ারাম এল। হৃষ্টচিত্তে বলল—'রামসিং গারদে।'

'কবুল করেছে?' বলল ইন্দ্রনাথ।

'এত সহজে কেউ করে? খুন করেছে, কেউ দেখেই নি।'

'কি বলে?'

প্রিন্সের সঙ্গে বচসার কথা স্বীকার করেছে। বাপ হুমকি দ্যায়, এক পয়সাও দোব না বেশি বাঁদরামি করলে। কথা কাটাকাটির পর ছেলেকে বাবা ঘাড় ধরে বার করে দ্যায়। অপমানিত রামসিং ঘোড়া ছুটিয়ে বাংলো ফিরে যায়।'

'সত্যি বলছে বলে মনে হল?'

'বিলকুল ঝুট। হারামজাদার গলা টিপলে দুধ বেরোয়, এর মধ্যেই রক্ষিতা নিয়ে মাল খেতে শিখেছে। খুন ওর হাতের মোয়া।'

ইন্দ্রনাথ চুপ করে রইল। কবিতা বলল—'ইন্দ্রঠাকুরপো বলছিল, খুন তো অন্য সময়েও করা যেত। এত সাক্ষীসাবুদ রেখে ফাঁসি যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে কেউ খুন করে নাকি?'

দয়ারাম অট্টহাস্য করে বলল—ভূশুণ্ডির কাকের কারবারই আলাদা। অমনি একটা রহস্য বার করে ফেলেছে।'

ইন্দ্রনাথ গরম হয়ে বলল—'দাঁত বার করে বাঁদরের মত হাসিস নি। মানায় না তোকে।'

'তোকে মানায়', দাঁত বার করেই বলল দয়ারাম। 'কোল্ড ব্লাডে মার্ডার করুল খুনী প্ল্যান করে। রাগের মাথায় কেউ করে না। এটাও রাগের মাথায় খুন।'

'মানলাম। পোস্টমর্টেম কবে হবে'?]

'নিয়মরক্ষে করে একটা করব। যদিও না হলেও চলে।'

'দয়া করে শুধু নিয়মরক্ষে কোরো না। একটু মাথা খাটিও।' রাগের চোটে ইন্দ্রনাথ একটা 'কাঁচি' ধরিয়ে ফেলল।

'খুব চটেছিস দেখছি। কি ব্যাপার বলত?'

'মৃগাঙ্ক গাঁজায় দম দিয়ে গোয়েন্দা গল্প লিখলে কি হবে, একটা কথা ঠিকই লেখে। পুলিশের অধিকাংশ অফিসার হেঁড়ে মাথা।'

'খুবই আপত্তিকর', গম্ভীর হয়ে গেল দয়ারাম।

'পড়াশুনা করলেই তো জানা যায়।'

'কি জানা যায়?' ভুরু কুঁচকোলো দয়ারাম।

'গলায় রক্ত জমার দাগ থাকলেই যে সব সময়ে গলা টেপা হয়েছে—এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়।'

হাঁ হয়ে গেল দয়ারাম—'হযবরল পড়লে অবশ্য এমনি জিনিস জানা যায়।'

'আজ্ঞে না, ফোরেনসিক মেডিসিন পড়তে হয়।'

'আই সী। কোন কেতাবের কথা হচ্ছে?'

'অ্যাবস্ট্রাক্ট অভ ওয়ার্ল্ড মেডিসিন। আগস্ট, ১৯৬৯ সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৫।'

'কি লেখা আছে সেখানে?'

'লেখা আছে যে গলা টিপে মানুষ খুন করলে গলায় যে ছড়ে যাওয়া বা রক্ত জমার চিহ্ন দেখা যায় না—সেরকম চিহ্ন স্বাভাবিক মৃত্যুর পরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। জার্মানীর হাইডেলবার্গে ফরেনসিক মেডিসিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আছে জানা আছে কি?'

ঢোঁক গিলল দয়ারাম। কিছু বলল না।

'সেখানে একসপেরিমেন্ট করে এই আশ্চর্য তথ্য জানা গিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, মাসলকে প্যারাফিন মুক্ত করার পর ওয়ান পারসেন্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে মিশোনো ওয়ান পারসেন্ট এরিয়োক্রোম-সায়ানিন দিয়ে তিরিশ মিনিট রাঙিয়ে নিয়ে কলের জলে ধুয়ে অ্যালকোহলে শুকোলে তফাৎটা ধরা যায়।'

দয়ারামের চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে উঠল।

ইন্দ্রনাথ মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণের মত তখনও বাক্যবর্ষণ করে চলেছে—'মৃত্যুর আগে বা পরে যে মাংসপেশী টেপা হয়েছে, এই একসপেরিমেন্টের পর তা টকটকে লাল হয়ে যায়। কিন্তু যে মাংসপেশী টেপাটেপি হয়নি—তা হলদেটে গোলাপী থেকে যায়। কি বুঝলে?'

দয়ারামের মুখ দেখে করুণা হল আমার।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু নির্দয়—'হতভাগা, পোস্টমর্টেম যিনি করছেন, তাকে এই লাইনে টেস্ট করতে বল। গলার মাংসপেশী নিয়ে টেস্ট করতে বলবি। প্রিন্স অম্বর সিংকে রামসিং যদি গলা টিপে মেরে থাকে, তাহলে মাংসপেশীর রং হবে টকটকে লাল।

'নইলে হবে হলদেটে গোলাপী', এতক্ষণ পরে স্বর ফুটল দয়ারামের।'

'ইয়েস, মাই-ডিয়ার ইডিয়ট।'

'গালাগাল না দিয়ে তোর ঐ ইয়ে একসপেরিমেন্ট প্রসেসটা একটু লিখে দিবি? কি যে ছাই বললি সব গুলিয়ে গেল।'

•

পরের দিন সন্ধ্যায় মাউন্ট আবুর সানসেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখে ফিরলাম। টুরিস্ট বাংলোর চত্বরে দেখি পুলিশজীপ দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে দেখলাম, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দয়ারাম প্যাটেল। পাশে ছিপছিপে এক তরুণ। পাকানো গোঁফ আর তীব্র চাহনি দেখেই চিনলাম। কালো ঘোড়ার সেই সওয়ার। রাম সিং।

বারান্দায় উঠতেই দয়ারাম আলাপ করিয়ে দিল। ইন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল—"প্রিন্স অম্বর সিং হার্টফেল করেছেন। রাম সিং নিরপরাধ।"

মাথা নীচু করল রাম সিং। বলল—"পুরোপুরি নয়। আমি বাবাকে অত উত্তেজিত না করলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না। আমাকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার পরেই বাবা বোধ হয় আর সহ্য করতে পারেন নি।"

দয়ারাম বলল—'ইন্দ্রাণীদেবী ঘরে ঢুকে তাই ধরে নিয়েছেন রাম সিং হত্যাকারী। আসলে রাম সিং যাওয়ার পর দারুণ উত্তেজনায় প্রিন্সের হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। উনি পড়ে যান।"

সব চুপ। অকস্মাৎ ঘোড়ার চিঁহি রব শুনে চমক ভাঙলো। সবাই দেখল। দেখল চত্বরের এক কোণে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে একটা চতুষ্পদ। মিশমিশে তুরঙ্গ। পিঠে সওয়ার। সাদাপোশাক শুধু দেখা যাচ্ছে মুখ ঠাহর করা যাচ্ছে না।

চঞ্চল হল রাম সিং। তাড়াতাড়ি বলল—'আমি এসেছিলাম আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। আপনার জন্যেই আমার খুনী অপবাদ ঘুচলো। চললাম।' বলেই টুক করে নমস্কার করে তরতর করে নেমে গেল রাম সিং। লম্বা লম্বা পা ফেলে গেল মিশমিশে ঘোড়ার পাশে। রেকাবীতে পা রেখে অবলীলাক্রমে উঠে বসল ওপরে। সাদাপোশাক পরা সওয়ার রইল ওর সামনে। দুই বাহুর মাঝে।

ছিপটির সমসন শব্দ শুনলাম। অন্ধকারে আগুনের ফুলকি ছিটকে তড়বড়িয়ে ঘোড়া ছুটল ঢালু পথে। ফটকের কাছে আলোয় নিমেষে দেখলাম কালো ঘোড়ার সাদা সওয়ারকে। হাওয়ায় উড়ছে গোলাপী ওড়না। পলকের জন্য ঝিকমিক করে উঠল কানের হীরে, নাকের নক্ষত্র। পরমুহূর্তেই দুই সওয়ারকে নিয়ে উল্কার মত উধাও হয়ে গেল কৃষ্ণ অশ্ব। দূরে হতে দূরে মিলিয়ে গেল টগবগ টগবগ শব্দ।

মুখঝামটা দিল কবিতা—"মরণ আর কি! এখানেও সঙ্গে এনেছে!"

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

"শিবু সরকার পার্মানেন্ট হোল"

কালো কালো খুদে হরফে টাইপ করা চিঠিটা পেয়ে শিবু তো হতভম্ব; প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। এবার ও কি করবে? চাকরীটা গেলে খাবে কি? বাড়ীতে বা কি পাঠাবে? কলকাতায় ওর নিজেরই বা চলবে কি করে?

বড়বাবু চা আনতে পাঠিয়েছিলেন। মোড়ের মাথার দোকান থেকে চাটা এনে দিয়ে বারান্দায় বেঞ্চির হাতলে কনুই ফিট করে ঝিমুচ্ছিল। টিং টিং করে বড়বাবুর টেবিলের ঘন্টাটা বেজে উঠতে ধড়মড় করে ছুটে গেল—ডাকছেন স্যার? হ্যাঁ, এই নাও, চিঠিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফাইলে মুখ গুঁজলেন বড়বাবু। আর কালো কালো খুদে খুদে হরফে টাইপ করা চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শিবু। রোজই তো এরকম কত চিঠি বড়বাবু হাতে তুলে দিয়ে বলেন ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এস বা স্যারদের দিয়ে সই করিয়ে আন। আজ কিছুই বললেন না। চিঠিটা তুলে দিয়ে গোঁজ মেরে ফাইল ঘাটছেন।

শিবু লিখতে-পড়তে পারে না। ব্যানার্জিবাবুর দয়ায় বাড়ীর পরিচারক থেকে কলেজের সকলের পরিচারকের একটা লিফট পেয়েছে শিবু। চাষীর, যাকে বলে একেবারে প্রকৃত চাষীর ছেলে শিবু। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে। কবে কখন কিভাবে হারিয়েছে তাও আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় ওর বাবা যা দু-চার বিঘে জমি-জিরেত ছিল সব কুণ্ডুদের কাছে বাঁধা দিয়ে ওকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। মনে আছে মানে, পরে বড় হয়ে বাবার কাছে শুনেছে এসব শিবু।

যে বয়সে সব শিশু স্কুলে যায়, মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায়, সে বয়সে শিবু কসবার বাগচীবাবুর বাড়ীতে রন্টু মন্টুদের দেখভাল করত। বাবা ওকে বাগচীবাবুর কাছে জমা দিয়ে গিয়েছিল। তারপর কেটে গেছে কত কাল। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে যে বার কলকাতায় পেকাণ্ড দাঙ্গা বাধে সেবার বাবা এসে ওকে দেশে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর বাগচীবাড়ীতে যায় নি। বাগচীবাবু উকীল। খাটুনি অনেক। শিবুর মেয়েদের দেখা-শোনার জন্য মাস গেলে পাঁচটা করে টাকা দেবেন। বাপ হরিচরণ কুণ্ডুবাবুদের দিয়ে হিসেব করিয়ে দেখেছিল, সাত বছরে প্রায় সোয়া চারশো টাকা পাওনা হয়েছে ছেলের। কিন্তু উকীলবাবু সব কথা স্রেফ অস্বীকার করে প্রায় বেড়াল তাড়ানোর মত হরিচরণ আর শিবুকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সাত বছরে জ্ঞানগম্যি ততটা না বাড়লেও হাড়ে-মাসে বেশ লাউডগাটির মত তরতরিয়ে উঠল শিবু। দাঙ্গা মিটতে হরিচরণ ছেলেকে বলল, এখানে থেকে আর কি করবি? আমার নিজেরই চলে না। তুই বরং কলকাতায় গিয়ে কোন চায়ের দোকানে-টোকানে বয়-বেয়ারার কাজ কর। মাইনে পাস না পাস খেতে পাবি। বাপের হাত ধরে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিল, দ্বিতীয়বার একাই টাকী-সোদপুর থেকে বাসে চেপে শ্যামবাজারে এল। কাজও জোটাল নিজেই। পাঞ্জাবী হোটেলে জোগানদারের কাজ। দশ টাকা মাস মাইনে আর দোবেলা যিতনা খুসী রুটি অউর ডাল পেয়ে দিল খুস হয়ে গেল শিবুর। রাস্তার কলে বালতি পেতে সারা দিন ড্রাম বোঝাই করত জলে আর গন-গনে উনুনের আঁচে পুড়ে আলু মটর গোবী, মাছ মাংস ডিম রাঁধুনীর হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে চা বিস্কুট চপ থেকে সব রকম খানা টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া সবই করত শিবু। ভোর ছটায় সর্দারজীর তাড়া মেরে ঘুম ভাঙাত আর নাইট-শো ভাঙার ঘন্টাখানেক বাদে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের খানা মিটিয়ে যখন শুতে যেত তখন ভালভাবে কান পাতলে অস্পষ্ট কাক ডাকার আওয়াজ কানে পৌঁছোত।

তবু শিবু তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠল। উঠল মানে তলতা বাঁশের মত পাতলা ঋজু দেহটায় বয়সের আলগা লাবণ্য দিব্যি ফুটে উঠল। ভারী ভারী বালতি টানা হাত দুটো যেন ডেকরেটরের শাবল। একমাথা কালো চুলের তলায় করমচা লাল দুটি চোখ। আর রাঁধুনীর বিড়ি চুরি করে পাঁচ-টেনে হলুদে যেন অসুরের আত্মা। সেই অসুর শিবুকে আবিষ্কার করলেন ব্যানার্জি-

রাস্তার কলে জল নিচ্ছিল শিবু। বড়বৌদি বোধহয় পোস্ট অফিসে যাচ্ছিলেন। শিবু টেরও পায় নি যে একজন তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। বালতি ভর্তি হতে এক হ্যাঁচকায় শূন্যে দুলিয়ে দু হাতে দুটি আধমণি নিয়ে দোকানের দিকে পা বাড়াতেই বড়বৌদি সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—শোন। লুঙ্গিটা হাঁটুর পরে দো ভাঁজ করে পরা ছিল। ভদ্রমহিলাকে সামনে দেখে কেমন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বালতি নামিয়ে লুঙ্গির ভাঁজ খুলতে গিয়ে শুনতে পেল—কাজ করবি। আমাদের বাসায়। খেতে-পরতে পাবি। পুজোর সময় জামা-কাপড় দেব। আর কুড়ি টাকা মাইনে।

পরের মাসে নতুন মনিবের জোয়ালে নিজেকে জুতে দিল শিবু। ব্যানার্জীবাবুরা পাঁচ ভাই। বড় সংসার। ভাইরা সবাই স্যুট-বুট পরে সকাল দশটায় পান চিবুতে চিবুতে অফিসে ছোটেন। শুধু ছোটভাই নীহারবাবু বেলা বারোটার পর ধুতি পাঞ্জাবি পরে এক গাদা বই খাতা পত্র নিয়ে ফাঁকা ট্রামে চেপে চাকরী করতে যান। নীহারবাবু, শিবু শুনেছে, নাকি 'পফেসর'। ছেলেদের পড়ান। হুস-হুস করে গাঁজায় দম দেওয়ার মত শিবু যে সিগারেট খায় তাই টানেন আর দিন-রাত্ত বই খাতা নিয়েই আছেন।

নীহারবাবুর দয়ায় শিবুর চাকরী হয়েছে। বেয়ারার কাজ। 'পিনসিপাল' সাহেবকে ধরে নীহারবাবু কাজটা করে দিয়েছেন। মাইনে এক লাফে বেড়ে গেল তিন গুণ। গোড়ায় মানে চার বছর আগে, যখন ঢুকেছিল তখন মাইনে ছিল ষাট টাকা। তারপর শিবু দেখেছে স্যাররা আর অফিসের কেরানী বাবুরা কি বছর গরমকালে আর পুজোর ছুটির আগে মিছিল করে মনুমেন্টের দিকে যান আর ওর মাইনে বেড়ে যায় ধাক ধাক করে। এখন সব মিলিয়ে ও মাইনে পায় একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তবে সুশীলদা বলেছে ওর 'বেসিক' নাকি সেই ষাটই আছে, বেড়েছে শুধু 'ডিয়ার লাউন্স।'

শিবুকে চাকরী দেওয়ার সময় নীহারবাবু ভেবেছিলেন, যে যা বলবে মুখ বুজে জোট করে যাবি। তাহলে সবাই

সন্তুষ্ট হবে। আর সবাই সন্তুষ্ট হলেই ওর চাকরী পাকা হয়ে যাবে। চাকরী পাকা করার জন্য স্যারদের থেকে শুরু করে সুর্যিদা সবার সব আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে শিবু। চার বছরে অনেক শিখেছে। ওর সঙ্গে যারা কাজ করে তারা সবাই ওর কলিগ। কলিগ দুলাল সুনীল পর্যন্ত ওর মাথায় চাঁটা মেরে যায়। অফিসের যত কাজ, ফাইল বওয়া থেকে স্যারদের টিফিন এনে দেওয়া, কেয়ারটেকার বাবুর আদেশে ঘাড়ে মই নিয়ে উঁচু উঁচু দেয়ালের মাথায় উঠে বাল্ব লাগানো, ফুল বাগানের ইট-পাটকেল সরানো, 'প্রিন্সিপাল' সাহেবের গাড়ি ধুয়ে দেওয়া সব করেছে শিবু। যদি কেউ চটে গিয়ে ওর 'পার-নামিন্ট' হওয়া আটকে দেন। তাই কোনদিন কাউকে বলে নি যে, স্যার পারব না। অথচ দেখেছে দুলাল সুনীল কেমন কায়দা করে স্যারদের পর্যন্ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। টিফিনের সময় শিবু যখন পাগলের মত চা, সিগারেট আর খাবার আনতে আনতে হাঁপিয়ে ওঠে, ওরা তখন দিব্যি কলেজের বারান্দার কোণে বসে বিড়ি ফোঁকে আর আড্ডা দেয়। ওরা 'পারনামিন্ট'। একবার 'পারনামিন্ট' হতে পারলে শিবুও আর কারুর পরোয়া করবে না।

এই এতবড় কলেজে, যেখানে সবাই ওকে আদেশ করে, সুখিদাই ওর একমাত্র বন্ধু। সুখিদা ওকে প্রথম দিন আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে নাম-ধাম সব জেনে নিয়ে বলেছিল, যখন যা দরকার হবে বলবি। লজ্জা করবি না। ওই একটা মানুষের মত মানুষ। শিবুর কলিগ হলে হবে কি লোকটা ঠিক স্যারদের মত। কে বলবে সুর্য প্রামাণিক বেয়ারা। পোষাকে আশাকে চাল-চলনে সুখিদাকে স্যার বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

সুখিদার মত লোক হয় না। এই চাকরীটা হওয়ার পর বছর খানেক ব্যানার্জীবাবুদের বাড়ীতে থেকে কলেজে যাতায়াত করত শিবু। সারাদিনের কলেজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর স্যারের বাড়ীর দাদা বৌদিদের অজস্র ফরমাসে অসুরের মত খাটুনিতে দেহটা নুয়ে পিরেছিল। সেই সময় নীহারবাবুকে বলে [illegible]

ঘর ভাড়া করে উঠে এসেছে শিবু। বড় রাস্তার গা ঘেঁষে বেরোনো গলির মাথাটা যেখানে এসে মাটি আর টালির ঘরগুলোতে এসে মিশেছে সেখানে সুখিদার বাসা। চারটে ঘরের মালিক সুখিদা। একটা ছেড়ে দিয়েছে শিবুকে। মাস গেলে কুড়িটা টাকা শুধু দিতে হয়। তাহোক তবু তো হাতে একশো সাড়ে বারোটা টাকা থাকে। আর এই টাকা কটা তো সুখিদার দয়াতেই শিবু পাচ্ছে।

চাকরী তো নীহারবাবু জুটিয়ে দিলেন। কিন্তু চাকরী রাখার কায়দা যদি গোড়ার দিকে সুখিদা না শিখিয়ে দিত তবে কি শিবু সরকার চার বছর ধরে কলেজে পিওনের কাজটা টিঁকিয়ে রাখতে পারত। নিজের ছেলের স্লেট পেন্সিলে হাত ধরে শিবুকে ইংরেজীতে নামটা সই করাতে কে শিখিয়েছে?—ওই সুখিদা। শিবু বাংলা জানে না, ইংরেজী জানার প্রশ্নই ওঠে না। জানে শুধু ছবির মত এগারোটা শব্দ পাশাপাশি সাজাতে। একটা লাল স্ট্যাম্পের গায়ে মাস পয়লা প্রায় মিনিট খানেকের কসরতে নিজের নামটা লিখে দিলেই একশ সাড়ে বত্রিশ টাকা হাতে এসে যায়।

একশ সাড়ে বত্রিশ টাকার মধ্যে বাড়ীতে বাবাকে ফি মাসে মনি অডারে পাঠায় চল্লিশ টাকা। বাড়ী ভাড়া কুড়ি টাকা। আর নিজের খাই খরচের জন্য লাগে বাকী টাকা কটা। তবে যা থাকে তাতে চলে না। চলে না বলেই মাসের শেষে হাত পাততে হয় সুখিদার কাছে। হাত পাতলে 'না' বলে না কখনো সুর্য। সবাই চায়। দুলাল, সুনীল, দিলীপ, নির্মল, শীতলাপ্রসাদ, যজ্ঞেশ্বর—কেউ বাদ যায় না। ঐ রোগা বেঁটে খাটো লোকটা যেন ম্যাজিক জানে। টুপি থেকে ইচ্ছে মত ডিম বের করার মত পকেট থেকে করকরে ছোট বড় নোটের গোছা বার করে বলে, কত লাগবে?

আপদে বিপদে সবাই ছোটে সুখিদার কাছে। ছেলের অসুখ, কি বউয়ের বাচ্চা হবে, কি দেশে টাকা পাঠাত হবে, সুখিদার কাছে। চাইলেই টাকা মেলে। শিবু দেখেছে অফিসের অনেক বাবুই সুখিদার সঙ্গে মাঝে মাঝে বারান্দার কোণায় বা ক্লাসঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে মান বাঁচিয়ে টাকা ধার করে। সুখিদা এক কথার লোক চাও পাবে—তবে বাপু সময় মত শোধ দিও। এ বিষয়ে বড় হুঁসিয়ার। পয়লা তারিখ ছোট্ট ডায়রী-খানা পকেট থেকে বার করে ক্যাশ কাউ-ন্টারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। আর লাইন থেকে ওদের এক একজন ছিটকে বাইরে এলেই সুর্য চাপা গলায় হাঁকে—যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি খান কয়েক বড় নোট সুর্যের হাতে গুঁজে দিয়ে কাকুতি মিনতি করে। এই একটা দিনই শুধু সুর্যদা কেমন পেল্টে যায়।

শিবুও ধার নিয়েছে কতবার। গত পুজোতেই পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছিল। দেশে যাওয়ার আগে বাবার জন্য জামা-জুতো

বানিয়েছে। মাইনের টাকায় কুলোয় না বলেই তো হাত পাততে হয়েছে। সূর্যিদা বলেছে তোর কাছ থেকে বেশী নেব না। একবারে দিতে পারবি না; তাহলে খাবি কি সারা মাস। পঁচাত্তর টাকাই বেরিয়ে যাবে। তার-চেয়ে ছ মাস ধরে শুধে যা। ফি মাসে পনেরোটা করে টাকা দিলেই চলবে। শিবু তাই করে যাচ্ছে। আর দু মাস বাকী।

ঠিক এমনি সময় বড়বাবু চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন। এর আগেও একবার চিঠি ধরিয়ে-ছিলেন। 'ইনজিরিতে' লেখা। শিবু অতশত বুঝতে পারে নি। তখন ব্যানার্জীবাবুর বাড়ীতে থাকত। এক বছরও চাকরী হয় নি। সরস্বতী পুজোর সময় দুদিন কলেজ বন্ধ থাকে। বড়বৌদিকে বলে কয়ে রাজী করে দেশে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাবা খুব অসুখ। হাঁপানীর টানে বৃদ্ধ হরিচরণ ধনুকে হয়ে গেছে। রুগী মানুষটার চিকিচ্ছে করাতে গিয়ে দুদিনের জায়গায় ছদিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পায় নি শিবু। সাতদিনের দিন সকালে কলেজে আসতেই সুনীল বলল—যাও তোমার এবার হয়ে গেল। 'পিনসিপাল' সাহেব খুব রেগে গেছেন। হুকুম না নিয়ে তুমি কামাই করেছ। সেদিন দুপুরেই বড়বাবু একটা চিঠি দিয়ে বললেন কালই জবাব নিয়ে আসবি।

শিবু জবাব দেবে কি? ও কি লিখতে পড়তে জানে? বোবার মত খানিকটা সময় বড়বাবুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শেষ পযন্ত কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করে সার্টের পকেটে রেখে দিল। রাতেরবেলা পফেসরবাবুকে চিঠিটা দেখিয়ে বলল—বড়-বাবু জবাব নে যেতে বলেছেন। স্যার তো চিঠি পড়ে আগুন। কত গালাগাল দিলেন। বললেন, তুই করেছিল কি! নতুন চাকরী। পার্মানেন্ট হোস নি। আগেভাগে ছুটির দরখাস্ত না করেই কাজে কামাই করেছিস। 'পিনসিপাল' সাহেব খুব চটেছেন। এরকম বার কয়েক করলেই চাকরী চলে যাবে। এই কাগজটা চার্জশীট। সেবার ব্যানার্জীবাবুই শিবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এবার কে বাঁচাবে?

নীহারবাবু এ কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। বাসাও বদলেছেন। আর বার বার চার্জ শীট খেলে তিনি কি করে বাঁচাবেন শিবুকে। কাগজটা হাতে নিয়ে চুপ করে হাতে মাথা রেখে বসেছিল শিবু। বুঝতেই পারছে না ঠিক কি দোষে আবার এই কাগজ পেল। কোন তো দোষ করে নি। সেই সেবারের পর আর কোনদিন ছুটি পর্যন্ত নেয় নি শিবু। কতদিন সূর্যিদা বলেছে, ও শিবু তোর কেচোয়াল লীভ পাওনা আছে। নে দুটো-একটা। সব তো পচে গেল। সাহস হয় নি। মনে মনে এঁচে রেখেছিল পারমানেন্ট হলে একসঙ্গে সাত-দিন ছুটি নেবে। সূর্যিদার কাছ থেকে গোটা চল্লিশেক টাকা ধার নিয়ে দেশে গিয়ে কটা দিন ফুর্তি করবে। বাবা বলেছে এবার নাকি শিবুর বিয়ে করা উচিত। আর ঠিক এই সময়েই। মাথার ভেতরটা কেমন তাল-গোল পাকিয়ে ঝর ঝর করে জল হয়ে চোখ ফেটে ঝরে পড়ল।

কিরে কি হয়েছে শিবু? একটা আদরের আলতো ছোঁয়া কাঁধের ওপর পড়তেই শিবু বুঝতে পারল সূর্যিদা এসেছে। নোয়ানো মাথাটা উঁচু করে অনেক কষ্টে দম নিয়ে নিয়ে শিবু বলল, আমায় বাঁচাও সূর্যিদা। আকুল চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে রইল শিবু। চুপ কর চুপ কর, চারপাশে লোকজন, প্রফেসর, ছেলেরা ঘোরাঘুরি করছে। চল দিকিনি আমার সঙ্গে। চল ক্যানটিনের পেছনে। ওখানে গিয়ে শুনব কি হয়েছে।

চিঠিটা সূর্যর হাতে দিয়ে মাংসের দোকানের নিশ্চিত বধ্য বোবা প্রাণীটির মত দাঁড়িয়ে রইল শিবু। গম্ভীর মুখে চিঠিটা পড়ে সূর্য বলল—এতে কি লেখা আছে জানিস? ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে শিবু জানাল—না জানি না। এতে লিখেছে এবার তোকে পার্মানেন্ট করবে। তাই দুটো কাগজ চেয়েছে তোর কাছে। একটা ডাক্তারী সার্টি-ফিকেট আর একটা তোর বয়সের সার্টি-ফিকেট। বুঝলি হাঁদারাম এটা চার্জ শীট না এটা তোর সুখবর।

'পারনামিন্টে'র চিঠি? আনন্দে উল্লাসে শিবু যেন একটা হাউই হয়ে গেল। চার বছর ধরে যে ঘটনার জন্য অপেক্ষা করেছিল সেটাই ঘটতে চলেছে—আর বোকা বুদ্ধু ও কিনা কাঁদছে। খাকী ইউনিফর্মে সব কান্না ঘসে ফেলে হাসির ঢেউ ফুটিয়ে তুলল মুখে। আহ্লাদে আনন্দে হাসি যেন আর ধরে না। সূর্যিদার পায়ে শত কোটি পেন্নাম। লোকটা কালিগ হলে কি হবে, স্যারদের মত পন্ডিত। লিখতে পড়তে পারে, মানেও বোঝে সব কথার যা কিনা শিবুর নাগালের বাইরে। সাধে কি ওরা সবাই লোকটাকে মান্যি করে। মান্যবর সূর্য প্রামাণিকের হাতটা জড়িয়ে ধরে শিবু বলল, কাগজ দুটোর ব্যবস্থা তুমিই করে দাও সূর্যিদা। আস্তে আস্তে ভাবনা চিন্তার পর্দাটা সামান্য তুলে ধরে সূর্য বলল—হবে'খন। আর তোদের সবার পার্মানেন্টের ব্যবস্থা তো এই শর্মাই করেছে। যজ্ঞেশ্বর, সুনীল, দুলাল, শীতলা-প্রসাদ, দরোয়ান রামবাহাদুর, মালী গোবরী সবার ব্যবস্থাই করলাম। তোরটাও করব। তবে...।

তবে কি দাদা? আকুল হয়ে ওঠে শিবু। হঠাৎ কেন সূর্যিদা ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল সেটাই বুঝতে চায়। এখন না, পরে বলব। সন্ধ্যে বেলা আসিস তখন সব বুঝিয়ে বলব। ডিউটি দে গে যা। ক্লাশের ঘন্টা দিতে হবে, আমি চলি।

শিবুর তর সয় না। বস্তির নোংরা অন্ধকার উনুনের ধোঁয়ায় গাঢ় হয়ে ওঠার আগেই সূর্যর ফুলকাটা পর্দা, ছাপর খাট, রেডিও, দেয়াল ঘড়িতে সাজানো ঘরে ছুটে এল। সূর্য ডায়রীটা খুলে কি সব লিখ-ছিল। আড়চোখে একবার শিবুকে দেখে নিয়ে বিছানার পাশে টুলটা টেনে বসতে বলল। হিসাব-নিকাশ শেষ করে হঠাৎ দুম করে শিবুর মুখের উপর খেঁকুড়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল— একশটা টাকা দিতে পারবি? তাহলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

একশ টাকা! কোথায় পাবে শিবু? একশ সাড়ে বত্রিশ টাকা যার মাইনে, সে কি করে একশ টাকা দেবে? সূর্য তখন টাকার প্রয়োজনের পেঁয়াজটা পরতে পরতে খসাচ্ছে। আরে তোর ডাক্তারী সার্টিফিকেট তো টাকায় চার টাকায় মিলবে। কিন্তু বয়সের হবে কি? কোনদিন তো স্কুলে পড়িস নি যে স্কুল থেকে লিখিয়ে আনবি? আর হাসপাতালেও জন্মাস নি যে সেখানে লেখা থাকবে। আমার জানাশোনা লোক আছে, তাকে বলে কয়ে না হয় একটা স্কুলের সার্টিফিকেট এনে দেব। তার জন্য কিছু ছাড়তে হবে। নেহাৎ তুই আমার লোক তাই এ কটা টাকাতেই কোন রকমে রাজী করিয়ে নেব। কি হল চুপ করে আছিস যে? বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ জিজ্ঞেস করিস কাল গোবরী, যজ্ঞেশ্বর, রামবাহাদুরকে। ওদের এক এক-জনের বেলায় দেড়শো দুশো পর্যন্ত লেগে-ছিল। এর কমে হবে না সাফ বলে দিচ্ছি।

শিবুর কয়লার মত নিকষ কালো নির্বাক মুখটার দিকে তাকিয়ে বোধহয় মায়া হল সূর্যর—টাকাটা আমিই দিয়ে দেব। তুই কোথায় পাবি তা কি আর আমি জানি না। তুই বরং মাসে মাসে পঁচিশটা করে টাকা দিস। চার মাসে আসল শুধে যাবে। আর দু মাসের সুদ দিলেই চলবে। যা এখন ঘরে যা। কাগজপত্র সব রেডি করে দেব দুদিনে। কোন চিন্তা করিস না।

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে ফিরে শিবু মাটিতে পাতা ছেঁড়া কম্বলের বিছানায় গা হাত পা মেলে দিয়ে স্বস্তিতে চোখ দুটো বুজল। যাক এতদিনে সে 'পারনামিন্ট' হচ্ছে। এবার সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাবে। এবার থেকে যখন তখন হুট-হাট করে কেউ যদি বলে শিবু এটা কর ওটা কর তাহলে সুনীল, দুলালের মত শিবুও কায়দা করে পাশ কাটাতে পারবে। যখন চাকরীটা 'পারনামিন্ট' তখন আর ভয় কিসের।

সমস্ত ভয় থেকে শিবু মুক্ত। টাকী-সোদপুরের গাঁয়ের ছেলে হরিচরণের পুত্র শিবুর ভাতের ভাবনা আর থাকবে না। তার চাকরীও কেউ কাড়তে পারবে না। 'পার-নামিন্ট' হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা অজানা ভয় শীতল সরীসৃপের মত ওকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে— সূর্য প্রামাণিকের ডায়েরীর পাতায় ওর নামটাও সুনীল, দুলাল, যজ্ঞেশ্বর, রামবাহাদুরের মত পার্মা-নেন্টলি লেখা থাকবে: যতদিন চাকরী ততদিন নিত্য নতুন দেনার আসল আর সুদ গুনতে হবে। ব্যবস্থা পাকাপাকি হওয়ার আগেই শিবু ঘুমিয়ে পড়ল।

—[illegible]

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

(৪)

রোগ-কাহিনীর মাধ্যমে মনের বিচিত্র ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার কথা বলতে গেলে শুধু কাহিনীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকা চলে না। কি ভাবে রোগ-উপসর্গের সৃষ্টি হল, কি জন্যে মানুষটি আপনার আমার মত ব্যবহার করছে না, কি করে তার যন্ত্রণা লাঘব বা অস্বাভাবিক আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটল,—এসবও মাঝে মাঝে অনিবার্যভাবে এসে পড়বে। নিদান ও নিরাময়কাণ্ড অচিকিৎসক-পাঠকের কাছে স্বভাবত বিরস লাগবে। অতি সংক্ষেপে হলেও এসব কথাও কিছু কিছু বলতে হবে। উপায় নেই।

ঘটক প্রথম সংবেশনে শনিবার বিকেলের কোনো ঘটনাই মনে আনতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিনও ঐ একই ব্যাপার ঘটল। আমি হতাশ না হয়ে সংবেশনোত্তর অভিভাবণের Post hypnotic suggestion ফলাফলের প্রতীক্ষায় রইলাম।

এমনি সময় এক সন্ধ্যায় উত্তেজিত ঘটকপত্নীর আবির্ভাব। ঘটকের অফিস-ব্যাগ খুলে তিনি কালো টুপি আর কালো চশমার সন্ধান পেয়েছেন। ঘটক পত্নীকে ঘটকের ঘোড়দৌড়ের মাঠের বিশেষ পোশাকের কথা জানিয়েছিলাম। কালো টুপি কালো চশমা ঘটককে ব্যবহার করতে তিনি কোনোদিন দেখেন নি। ঘটনাচক্রে টুপি চশমার সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি শনিবার ঘটক আফিস থেকে একটা ব্যাগে করে অফিসের কিছু ফাইল বাড়ী নিয়ে আসতেন। রবিবার ঐ ফাইল নিয়ে কাজকর্ম করার পর সোমবার ব্যাগটা আবার আফিসে নিয়ে যেতেন। ব্যাগটা তাঁর বাইরের ঘরের ড্রয়ারে বন্ধ থাকত। এইদিন ঐ ব্যাগটা খুলে দেখবার কোনো কারণ বা সুযোগ তাঁর (মিসেস ঘটকের) ঘটেনি। মিঃ ঘটক শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজ অফিসে যেতে পারেন নি। অফিসের বেয়ারা আসে দুপুরের দিকে একটা জরুরী চিঠি নিয়ে। মিঃ ঘটকের নির্দেশে বাইরের ড্রয়ারের ব্যাগ থেকে ফাইলটা বের করে বেয়ারাকে দিতে গিয়ে চশমা ও টুপি তাঁর নজরে পড়ে।

—চশমা-টুপির কথা আপনি ঘটককে বলেছেন নাকি?

—না, কোনো উচ্চবাচ্য না করে ও দুটো অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলাম। আপনাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছি।

নিজের ঝোলা থেকে টুপি চশমা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জাম উল্টেপাল্টে দেখে সরিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলাম,—এ সম্বন্ধে কোনো কথা তুলবেন না। এগুলো আপাতত আমার কাছে থাক। এবার মনে হচ্ছে, আপনার স্বামীর শনিবারের স্মৃতি ফিরে আসবে। ঘটকপত্নী আশ্বস্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন।

দিন দুয়েক বাদে ঘটকের মুখ থেকে তাঁর নতুন অশ্ব-প্রীতির ইতিহাস শুনলাম। শনিবারের বিকেলের ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ল। সম্মোহন-উত্তর অভিভাবন কতটা কাজ করেছিল বলতে পারব না; তবে টুপি-চশমা যে তাঁর স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করতে অনেকটা সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার অনুরোধে তিনি চশমা টুপি শোভিত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে মোহিত হয়ে মুচকি হাসতে লাগলেন। একটু আগেই এই চশমা টুপি তিনি কোনোদিন দেখেছেন বা পরেছেন বলে মনে করতে পারেন নি। আমি তাঁর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সেই শনিবারের ঘটনা (যেদিন আমি তাঁকে রেসের মাঠে অনেকক্ষণ অবধি চোখে চোখে রেখেছিলাম), একটু নাটকীয় ঢঙে বলতে শুরু করলাম।

—মনে আসবে, ঠিক মনে আসবে। চেষ্টা করুন, মিঃ ঘটক। এই টুপি চশমা পরে আপনি প্যাডকের বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখলেন। তারপর বুকিদের (যাদের কাছে বাজি ধরা হয়) রিং এ এসে বাজি ধরলেন। সিঁড়ি ভেঙে স্ট্যান্ডে গিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন।... ঘোড়া ছুটছে, এগিয়ে আসছে, বাঁক ঘুরে সামনে এসে পড়েছে। জকিদের রংবেরঙের পোশাক চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। চারদিকে কোলাহল, উত্তেজনা। বাজি শেষ হল। দু নম্বরের বাজি, চার নম্বরের ঘোড়া জিতেছে। আপনি নিশ্চুপ নির্বিকার। পকেট থেকে বাজি ধরার কার্ডখানা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছেন। ...এক ভদ্রলোক দেশলাই চাইল আপনার কাছে। তার দিকে না তাকিয়েই আপনি দেশলাই দিলেন। ...মনে পড়ছে; সব মনে পড়ছে, আরো একটু ভাবুন, আরো একটু কনসেনট্রেট করুন। মনে পড়বেই—

ঘটকের ভাবান্তর ঘটল। ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলেন।

—আপনি দেশলাই চেয়েছিলেন, তাই না? উঃ, বুকের কাছটা কেমন যেন করছে। একটু জল দিতে পারেন? —টেবিলে মাথা রেখে ঘটক অবসাদে ভেঙে পড়লেন। তাঁকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘটকের রেস-প্রীতির মনস্তত্ত্ব না জানলে স্বপ্নচারিতার মনস্তত্ত্ব বোঝা যাবে না। দুবার ঘটকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তার মানসিকতার যে পরিচয় পেয়েছি, তার ফলে রেসযাত্রীদের সম্বন্ধে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মেছে। পাঠকদের অবগতির জন্য পেশ করলাম।

বাজি ধরা মানুষের বহু পুরনো অভ্যাস। বাজি জেতার মধ্যে অহমিকার তৃপ্তি ও সন্তোষ। অহংকে তুষ্ট রাখার একটা বিশেষ চেষ্টা এই বাজি ধরা। নিজের অনুমান বা বক্তব্য সঠিক হয়েছে জানলে সকলেরই একটা নিরাপত্তার ভাব আসে। বাজি জেতার সংগে অর্থপ্রাপ্তির সম্পর্ক না থাকলেও বাজির আকর্ষণ থাকে। যে সমাজ-সভ্যতায় প্রতিযোগিতা তীব্র, সেখানকার মানুষের বাজি ধরার প্রবৃত্তিও জোরালো। আর্থিক লাভলোকসানের সংগে যুক্ত হয়ে এই প্রবৃত্তি দুর্দমনীয় নেশায় পরিণত হয়। ধনের ধনের হাতছানি আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয় ডেকে আনে। সঠিক ভবিষ্যৎ-ভাষণের কৃতিত্বস্পৃহার সংগে যুক্ত হয় বিনাশ্রমে অর্থ-লাভের বাসনা।

যে সমাজে সম্মান প্রতিপত্তি থেকে জৈবিক নিরাপত্তা পর্যন্ত সব কিছুর অর্থ-নির্ভর— আবার অর্থপ্রাপ্তি থেকে সব রকমের সফলতাই দৈব বা ভাগ্যানির্ভর, সেখানে রেসের নেশার মাদকতা, তথা সব রকমের জুয়াড়ি মনোভাব বাড়তে বাধ্য। শেয়ার বাজার এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ নাগরিক সভ্যতার দুষ্ট ক্ষত। শেয়ার বাজার, ঘোড়দৌড়ের মাঠের আকর্ষণ ধনতান্ত্রিক দেশের বিশেষ একশ্রেণীর মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়, 'কম্পালসিভ নিউরোসিসে' দাঁড়ায়। শনিবার রাতের— 'আর নয়', প্রতিজ্ঞা বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শিথিল হতে থাকে। ঐদিন বিশুদ্ধ 'আকাডেমিক ইনটারেস্ট' থেকে রেসের কিতাব কেনা হয়। মনে মনে নানা জাগ্রত দেবস্থানে পূজো মানত করে, আশীর্বাদের ফুল বেলপাতা পকেটে পুরে, শেষবারের মত ভাগ্যপরীক্ষার সংগ্রাম করতে রেস-রণাঙ্গনে প্রবেশ করে। শেয়ার বাজারের ভাগ্য-পরীক্ষা-কেন্দ্র বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত। রেসের ময়দান এদিক দিয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। সর্বসাধারণের ভাগ্যপরিবর্তনের সুযোগ মেলে এখানে। প্রবেশ-মূল্যের উপরে আর দশটি টাকা খরচ করে বাজি ধরলে 'জ্যাকপট পুলের' লাখ টাকা পাওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই এখানে ফেরিওয়ালা, ছাত্র, কেরানীর মত বিত্তবাজারের চুনোপুঁটি থেকে রাজা-মহারাজা শিল্পসম্রাটদের মত রুইকাতলা রাঘববোয়ালদের অবাধ আনাগোনা। তবে ঘটকদের মত অল্-আউটের সংখ্যা হয়ত খুব বেশি নয়। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেন, জুয়াড়ি মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা রেসে যান না, নিছক খেলোয়াড়ী মনোভাব তাঁদের চালনা করে। তাঁদের কথা সত্যি হলে, তাঁরা নিঃসন্দেহে নমস্য।

ঘটক দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী। ব্যক্তি-মানুষের ভালমন্দ, সফলতা-বিফলতা, এককভাবে বিচার করলে, অথবা সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, দৈবশক্তি বা ভাগ্যচক্রে বিশ্বাসী না হয়ে উপায় নেই। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনার প্রাকৃতিক ঘটনার মত বিজ্ঞানের নিয়মে সঠিক ব্যাখ্যা চলে না। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, কিন্তু ঘটক চাকরী পাবেন কিনা, অথবা ছাঁটাই হবেন কিনা এ সম্বন্ধে কোনো পূর্বাভাস কেউ দিতে পারে না। আগামী দিনে তাঁর জীবনে কি ঘটবে, আমরা কি কেউ তার কোনো খবর রাখি? জীবনমৃত্যুর মতই ব্যবসায়ের তেজিমন্দা এবং মানুষের ভাগ্য অনিশ্চিত। এ অবস্থায় অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, সর্বস্ব পণ রেখে জুয়া খেলা এমন কি অস্বাভাবিক? যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলা নিয়ে কেউত সমালোচনা করেন না— ইত্যাদি।

এই রকম ধরনের অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা প্রথমবারের চিকিৎসার সময় ঘটকের মুখে শুনেছি। এই অনিশ্চয়তা অনেক রোগীই মনে মনে পোষণ করেন। তাঁরা সকলেই ঘটকের মত রেসের মাঠের যাত্রী হয়ত হন না, কিন্তু হতাশাবোধ পীড়িত হয়ে, ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হন। প্রথমবারের চিকিৎসার ফলে ঘটকের এই মতবাদ অনেকটা বদলেছিল, বাস্তবের সঙ্গে লেনদেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তিনি কেন আবার জুয়ার-নেশায় মেতে উঠলেন? স্বপ্নচারী হয়ে রেসের মাঠে যেতে শুরু করলেন?

ঘটক নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছিলেন। সঙ্গীসাথীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব রেসে যাওয়ার মত ব্যাপারের মূলে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনের সহযাত্রীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল বিয়ের পর থেকে। কাজেই রেসে যাবার চিন্তা মনে আসত না, এমন কি খবরের কাগজের রেসের পাতার দিকেও নজর যেত না। পারিবারিক ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে জীবন-রস আস্বাদন করে বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল। গোপন মনে নামকরা সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল। বিয়ের পর এদিক থেকেও সফলতার সম্ভাবনা দেখা গেল। এক পরিচিত বন্ধুর মাসিক পত্রিকার কয়েকটি গল্প ছাপা হওয়াতে সমালোচক-মহলে ঘটকের নাম উচ্চারিত হতে লাগল। দু' একজন ত তার মধ্যে বিরাট প্রতিভার সম্ভাবনা আবিষ্কারে পুলকিত হয়ে উঠলেন। যা রোজগার তা দিয়ে ভদ্রভাবে দিন কাটানো যাচ্ছে, অর্থশালী হবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাগাদা দিচ্ছে না, সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে স্বীকৃতিও মিলতে চলেছে। জুয়ার প্রলোভন দেখাবার বন্ধু-বান্ধবও বিরল। সবদিক দিয়েই ঘটক সুখী এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখন প্রকাশকদের কাছ থেকে তার লেখা প্রকাশের সনির্বন্ধ অনুরোধের প্রতীক্ষায় ঘটকের দিন কাটছে।

ঠিক এমনি সময় এক অঘটন ঘটল। একজন সাহিত্যিকের কাছে লেখা পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়েছিলেন। অনেকদিন অনেক তদ্বিরতদারকের পর ঘটকের লেখা পড়বার সময় হল সাহিত্যিকের। না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। তাঁর মন্তব্য বুকে

যেন শেলের মত বিঁধল। ভদ্রলোককে ঘটক বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন কাজেই আঘাতটার ধাক্কা সামলানো কঠিন হয়ে উঠল। প্রকাশকদের দু' একজনের কাছেও শোনা গেল অনুরূপ মন্তব্য। স্পর্শ-প্রবণ ঘটক মুষড়ে পড়লেন। লেখা ছেড়ে দেবার সংকল্প করে সাহিত্যিক সংসর্গ এড়িয়ে চলতে লাগলেন। আশৈশব লালিত হীনমন্যতাবোধ মাথা চাড়া দিল।

এর পর কর্মস্থানের নিরাপত্তাবোধে ও ঘেরাও-এর ফলে বেশ জোরালো এক ধাক্কা লাগল। ঘটক আরো মুষড়ে পড়লেন। স্ত্রীর কাছে কোনো ব্যাপারই ভাঙলেন না। ওকে বিব্রত না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। কোম্পানী যদি ব্যবসা গোটায় কি অবস্থা হবে? এই সময় যদি একটা বড় অংকের টাকা হাতে আসত, ঘটক মনে মনে ভাবলেন, চাকরী ছেড়ে এই হট্টগোলের বাঙলা দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতেন। জীবনের কোনো উন্নতির আর সম্ভাবনা নেই। কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই। সব যেন কটু আর বিস্বাদ। রেসের পাতায় আবার নজর দিলেন। রেস যাবার চিন্তা, একখানা দশ টাকার টিকিটে কুবেরের ভাণ্ডার জিতে নেবার স্বপ্ন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল। স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা, সন্তানের নামে শপথ, ডাক্তারের নির্দেশ অভিভাবন, মিলিতভাবে জুয়াড়ী মনোভাবকে দমিয়ে রাখল।

ঠিক এই সময়, উটের পিঠে শেষ বোঝাটি হয়ে, ঘটকের মনে বল ভেঙ্গে দিতেই যেন আবির্ভূত হলেন ডক্টর মনোহরলাল। আমেরিকা-প্রত্যাগত জ্যোতিষী ও গণৎকার। ঘটকের হস্তরেখা বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, দু' মাসের মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। হতে পারে লটারী, আবার রেস থেকেও আসতে পারে। মনোহরলালের এক মক্কেল কিছুদিন আগে জ্যাকপট পুলের টাকা জিতে কলকাতার দোকান বেচে নিজ বাসভূমি রাজস্থানে প্রস্থান করেছেন। শনি, মঙ্গলবার ছাড়া ঘটক যেন রেসে না যান। তাঁর গ্রহ-সংস্থান এই রকমই নির্দেশ দিচ্ছে। ঐ দুদিন মনোহরলাল বিশেষ অলোকদৃষ্টি লাভ করেন এবং কোনো কোনো ভাগ্যবান ভক্তকে কৃপা হলে 'উইনারও' বাতলে দিতে পারেন। শেষের কথাগুলো মনোহরলালের নয়, একজন সাহেব মক্কেলের। পেনিসিলভিনিয়া না কোথাকার ডক্টরেট, অনর্গল ইংরিজিতে কথা বলেন, সহকারীও বিলেত ফেরত। মক্কেলদের মধ্যে সাহেব-মেমও থাকে। শনিবার সকালে বসবার ঘরে লোক ধরে না। ঘটক অভিভূত হলেন। অফিসে ফিরে গিয়ে কাজে মন বসাতে পারলেন না। ডক্টর মনোহরলালের তাঁর প্রতি কৃপা হতে পারে কি না—এই চিন্তায় বিভোর হলেন। পরের শনিবার সকালে মনোহরলালের আস্তানায় গিয়ে নগদ একশত টাকা দিয়ে 'দৈবগুণসম্পন্ন সর্বসিদ্ধি' টুপি আর চশমা কিনে ফেললেন। এ-দুটো কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত অভেদ্য। ধারক অজেয়, অর্থাৎ ধারণ করলে রেস-সংগ্রামে পরাজয়ের শংকা থাকবে না। অধ্যবসায় সহকারে দুমাস প্রতি শনিবার ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ নিতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত জয় সুনিশ্চিত। প্রতি শনিবার প্রতিটি উইনারের জন্য পঞ্চাশ টাকা খরচের চেয়ে 'কবচকুণ্ডল'-এর জন্য একসঙ্গে একশ' টাকা খরচ অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। ঘটক তাই করলেন। শনিবার অফিস থেকে বেরোবার সময় টুপি আর চশমা পরে নিতেন। রেসকোর্স থেকে ফেরবার সময় ও দুটো অফিসের ব্যাগে পুরে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। শনিবারের এই সময়টার কোনো কিছুই সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়ে মনে করতে পারতেন না। আবার রেসে যতক্ষণ থাকতেন অন্য সব কিছু, এমন কি নিজের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যেতেন।

ঘটকের সঙ্গে সর্বসিদ্ধিদাতার আস্তানায় গিয়ে মনোহরলালের দেখা পাইনি। শুনলাম তিনি ডেরা পালটেছেন। তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে ওখানে ছিলেন তার প্রমাণ পেলাম ঘটকের মত আরো দুটি ভক্তের সঙ্গে কথা বলে। ঘটকের বোকামিতে অনেকেই মনে মনে হাসছেন। অথবা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠাউরেছেন। সর্বসিদ্ধিদাতা 'টুপি-চশমা'র বদলে ঘটক যদি 'সর্বসিদ্ধি কবচ' অথবা 'ম্যাগনেটাইজড্' আংটির জন্যে পাঁচশ' টাকাও খরচ করতেন, তাঁরা ঘটককে বোকা ভাবতেন না। ব্যাপারটাও অবিশ্বাস্য ঠেকতো না কেন না ঐ বোকামি-ব্যাধিতে পাঠকদের চেনাশোনা অনেক জ্ঞানী-গুণী লোক আক্রান্ত।

দ্বিতীয়বার ঘটক কি ভাবে রেস-রণাঙ্গণে ভগ্যযুদ্ধে নামলেন, তার একটা নাতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। ঘটক-মনের অবস্থা ও স্বপ্নচারিতার মনস্তত্ত্ব বোঝা এবার পাঠকদের পক্ষে অনেক সহজ হবে, আশা করি।

স্বপ্নচারিতা হিস্টিরিয়া রোগের এক বিশেষ অবস্থা। হিস্টিরিয়ার মনস্তত্ত্ব স্বপ্নচারিতা বোঝবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। হিস্টিরিয়া বলতে হিস্টিরিয়ার আক্ষেপ অবস্থার কথাই আগে মনে পড়ে। কিন্তু আক্ষেপ-পীড়িত অবস্থা ব ফিট হিস্টিরিয়া রোগের অজস্র উপসর্গের একটি মাত্র। এমন কোনো উপসর্গ নেই যা হিস্টিরিয়াতে হয় না। অন্যরোগের রোগলক্ষণ অনুকরণ হিস্টিরিয়া রোগীর বিশেষত্ব। ব্যথা বেদনা, স্নায়ুর অসাড়তা, হাত-পায়ের প্যারালিসিস, পেটের গোলমাল, অন্ধত্ব, বধিরত্ব, চেতনার-বিশৃংখলা, বোকার মত বা ছোট্ট শিশুর মত ব্যবহার, কথা বন্ধ, তোতলামী, আত্ম-বিস্মরণ, অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে তার মত আচরণ—ইত্যাদি হাজারো রকমের দেহ-মনের রোগলক্ষণ হিস্টিরিয়া রোগীর মধ্যে দেখা যেতে পারে। হিস্টিরিয়া রোগ নিয়ে অষ্টাদশপর্ব মহাভারত রচনা করা যায়। আমরা, অবশ্য তা করব না। খুব সংক্ষেপে হিস্টিরিয়ার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকজন অতি-বিখ্যাত চিকিৎসকের মতামত ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হব।

সংবেশনের আলোচনায় ফরাসী দেশে মেসমারের প্রভাব-প্রতিপত্তির উত্থান-পতন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। সরকারের কমিশন মেসমার-তত্ত্ব উদ্ভট বলে রায় দিলেন বটে কিন্তু মেসমারের চিকিৎসা-পদ্ধতিকে একেবারে বন্ধ করতে পারলেন না। মেসমারের অনেকদিন পরে ন্যান্সি এবং প্যারিসের কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক-এর উৎসাহে ঐ চিকিৎসা পুনরুজ্জীবিত হল। তখন আর নাম মেসমারিজ্‌ম্ নয়। ব্রেইডের দেওয়া নাম 'হিপনটিজ্‌ম্' কথাটাই চালু হয়ে গেছে, তবে তাঁর তত্ত্ব যদিও এ'রা কেউ মানেন নি। ন্যানসির Liebeault ও তাঁর ছাত্র Bernheim সংবেশন প্রভাবে—অন্ধত্ব, অসাড়ত্ব, বধিরত্ব ইত্যাদি হিস্টিরিয়ার উপসর্গ নিরাময় করাতে সাড়া পড়ে গেল এবং এ'রা হয়ে উঠলেন হিস্টিরিয়ার বিশেষজ্ঞ। তাঁরা মনে করলেন যে হিস্টিরিয়া উপসর্গ স্বাভিভাবনের (auto-suggestion) ফল; তাই চিকিৎসকের বিপরীত অভিভাবনে ভাল হচ্ছে। রেল-দুর্ঘটনার পর অল্প আহত যাত্রী নিজেকে চলৎ-শক্তি-রহিত মনে করার ফলেই তার হিস্টিরিক-অসাড়তা দেখা দিয়েছে। এই অসাড়তা স্বভিভাবনের ফল —'আমি হাঁটতে অক্ষম'—এই অভিভাবনের বিরুদ্ধে চিকিৎসক রোগীকে সম্মোহিত অবস্থায় দৃঢ়তার সঙ্গে অভিভাবন দিলেন—'তুমি অক্ষম নও, অসাড় নও, তুমি হাঁটতে পার'; রোগী চলার ক্ষমতা ফিরে পেল। এর কিছুকাল পরে প্যারীর Charcot হিস্টিরিয়ার আর একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন। ইনিও সম্মোহন-চিকিৎসায় হিস্টিরিয়া আরোগ্য করতেন। এ'র মতে হিস্টিরিয়া স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাধি—নার্ভ-এর অসুখ। ঠিক মনের অসুখ নয়। নিউরাইটিস্, নিউরালজিয়া ইত্যাদির সমগোত্র হিস্টিরিয়া। আরো বললেন, সম্মোহিত অবস্থা হিস্টিরিয়ারই এক বিশেষ অবস্থা। এই Charcot ছিলেন গ শতকের শেষের দিককার একজন দিক্‌পাল চিকিৎসক; প্যারির দু' দুটো মানসিক চিকিৎসালয়ের ডিরেক্টর—; নিউরোলজিতে বিশেষ পন্ডিত। কাজেই তাঁর প্রতাপে ন্যানসি স্কুলের অভিভাবন-তত্ত্ব কোনঠাসা হয়ে পড়ে রইল। হিস্টিরিয়া মনের অসুখ না হয়ে স্নায়ুরোগ বলে পরিগণিত হল। কিন্তু নানসীর পণ্ডিতরাও হাল ছাড়লেন না। মতবাদের লড়াই চলতে লাগল। হিস্টিরিয়া রোগীকে সম্মোহিত করে প্যারীর ডাক্তাররা সম্মোহনের, তথা হিস্টিরিয়ার তিনটি দশা আলাদা আলাদা পর্যবেক্ষন করলেন।

Charcot 'র দৌলতে হিস্টিরিয়ার জটিল রহস্য অনেকটা যেন বোঝা গেল। তিনি সংবেশনের তিন দশার মধ্যে হিস্টিরিয়ার বিভিন্ন উপসর্গের সন্ধান পেলেন। প্রথম দশায় ঘটে 'আচ্ছন্নতা', দ্বিতীয় দশায় চেতনারহিত শারীরিক কাঠিন্য, আর তৃতীয় দশায় স্বপ্নচারিতা। ইংরিজিতে যথাক্রমে Lethargy, Catalepsy & Somnambulism.

—মনোবিদ্

যে বই ওদেশে নিষিদ্ধ হল

পবিত্র সরকার

এ বছরের পয়লা জানুয়ারি থেকে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ-বিশেষ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অনেকে মুক্ত হয়েছেন, নানা দল সভা-সমিতির আয়োজন করছে সে-সবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর। কিন্তু পয়লা জানুয়ারি ঠিক আগের দিন, ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সামরিক শাসকের দপ্তর থেকে একটি ঘোষণায় পাঁচটি বাংলা বই নিষিদ্ধ করার কথা জানানো হয়। ঐ পাঁচটি বই হলঃ বদরুদ্দীন ওমরের 'সংস্কৃতির সংকট', এবং 'সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা' আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মতো বদমাশ', সত্যেন সেনের 'আলবেরুনী', এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (বা 'মহারাজ')-এর 'জেলে ত্রিশ বছর'। প্রথম দুটি বই প্রবন্ধের তৃতীয় বইটি গল্প-সংকলন, চতুর্থটি ঐতিহাসিক বা জীবনী-নির্ভর উপন্যাস, পঞ্চম বইটি নির্যাতিত দেশপ্রেমিকের আত্মজীবনী। 'মহারাজ'-এর বইটি আগে কলকাতাতেও ছাপা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। এটি প্রায় নতুন বই, পরিবর্ধিত আকারে ও আংশিক নতুন নাম নিয়ে ('জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম') ১৯৬৮ সালে ঢাকায় মুদ্রিত হয়েছে। লেখকেরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানের, বইগুলি সেখানেই ছাপা। ঔদার্য বিতরণের তারিখের ঠিক একদিন আগে এই নিষেধনামা জারি করার মধ্যে চক্ষুলজ্জা হয়তো আছে সুবিবেচনা নেই। প্রথমত, এই পাঁচটি বই কেন বাজেয়াপ্ত করা হল তা বলা দুষ্কর, কারণ একটি সর্বাঙ্গীণ কারণে এদের বিরুদ্ধে নালিশ তৈরি করা যায় না। আলাদা আলাদা কোনো কোনো কারণে এগুলিকে বিপজ্জনক বা বিস্ফোরক মনে করা হয়েছে তা আমরা দেখব। কিন্তু এই পরোয়ানার মধ্যে আর যাই থাক, আমলাদের দূরদর্শিতার পরিচয় নেই। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানসিক হালচাল যাঁরা সতর্কভাবে লক্ষ্য করছেন তাঁরা জানেন যে এই নিষেধাজ্ঞা বেশিদিন খাটবে না। তাছাড়া কোনো বইয়েই প্রত্যক্ষ বিপ্লবের জিগির নেই। সংগত সমালোচনা আছে, ধিক্কার বা অনুযোগ আছে—কিন্তু সত্যকার ধর্মবিরোধী বা রাষ্ট্রিকতা-বিধ্বংসী কিছু নেই। তবু যখন এগুলিকে নিষিদ্ধ করা হল তখন বোঝা যায়—যে-উদারনীতি একজন মানুষের হৃৎপরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, তাকে বিশ্বাস করা শক্ত।

বদরুদ্দীন ওমর রাজশাহীর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। এই নিষিদ্ধ বই দুটির লেখক হিসাবে গৌরবান্বিত হওয়ার আগে তিনি 'সাম্প্রদায়িকতা' নামে আরো একটি বই লিখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্যোগে কলকাতায় পূর্ব-পাকিস্তানের বই এবং সংবাদ ও সাময়িকপত্রের যে প্রদর্শনী হয়, তাতে ঐ বইটি ছিল। সেটি একটু উল্টেপাল্টে দেখে চমকে উঠেছিলাম। কে এই দুঃসাহসী গ্রন্থকার? ভারত-পাকিস্তানের সেই নিরর্থক যুদ্ধের পরমুহূর্তে দেশজোড়া যখন মনোবিকারের হাওয়া বইছে তখন অনাচ্ছন্ন সত্যকে সামনে রেখে এমন মোহমুক্ত বিশ্লেষণ কি সম্ভব? মনে ক্ষোভ জেগেছিল, পশ্চিমবঙ্গে, বাঙালী সংস্কৃতির সুচিহ্নিত পীঠভূমিতে কেন এরকম বই লেখা হয় না। কিউবা ও কঙ্গোর সংগ্রাম নিয়ে আমরা উত্তেজক নাট্যভাষা কিংবা উদ্দীপনাময় সংবাদ-উপন্যাস রচনা করি, কিন্তু যে-সমস্যা ঘরের কাছে, যা প্রত্যেক বছর কোথাও না কোথাও এই দেশে দংশন রাখে—মৌরাটে বা রাঁচিতে, নাগপুরে বা আমেদাবাদে বা ভিলাইয়ে—তাকে নিয়ে কেনো সুস্থির প্রতিবিধানের চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে নেই কেন? নাটকে-উপন্যাসে এ-সমস্যা বহুদিন হয় ফ্যাশানের বাইরে চলে গেছে, আন্তর্জাতিক মনস্কতা না থাকলে এখন জাতিচ্যুত হতে হয়। অথচ সামনে রয়েছে জীবন্ত সমস্যা—এই সাম্প্রদায়িকতা—এখনও অতিশয় দুর্ধর্ষ, এখনও অত্যন্ত সমসাময়িক। পশ্চিমবঙ্গে কি সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে? আমরা কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা কী করে যে নিশ্চিন্ত আছি—এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রায় দুর্লভ।

পূর্ব পাকিস্তানের লেখকেরা কিছু করবার চেষ্টা করেছেন। শুধু ভাষা-আন্দোলনে প্রাণ দেওয়ার মতো একটা আকস্মিক আবেগের উদ্‌গিরণ নয়, স্থায়ী কোনো প্রয়াস, সুদূরপ্রসারী একটি লক্ষ্য তাঁদের আছে। বদরুদ্দীন ওমর এ'দেরই একজন। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, পূর্বসংস্কারহীন, অপক্ষপাতী। নিছক সত্যসন্ধানীর নির্মমতা নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। সত্যের জন্য কাউকে আঘাত করতে ভয় পান নি, আবার তাঁর মধ্যে কাউকে খুশী করার দীনতাও নেই। তাঁর রচনাভঙ্গি প্রমথ চৌধুরীকে মনে পড়ায়, কিন্তু বাক-চাতুরির চেয়ে সরল ভাষণই তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর গদ্য ভারহীন, অথচ অতিরিক্ত তীক্ষ্ণও নয়, কাজের কথাগুলিকে businesslike করে বলার ইচ্ছা তাঁর। ফলে তাঁর লেখা প্রচ্ছন্ন এবং সংযত আবেগে প্রাণবান হলেও তাতে রম্যরচনার পীড়াদায়ক চটুলতা নেই। বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সম্বোধন করে গোষ্ঠীগত মন্ত্রগুপ্তির ভাষায় কথা বলছেন না, এটই বেশ আশ্চর্য লাগে। এদিকে হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে নয়, কেবল মানুষ হিসাবে সেই দাহ্যবস্তু সাম্প্রদায়িকতার বিচার—সেও কম বিস্ময়কর নয়। তার উপর একটি 'ধর্মীয়' রাষ্ট্রে বসে মার্কসবাদের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতাকে মেনে নিয়ে ঘটনাক্রমের অনুসন্ধান—এই রোমান্সমুগ্ধ দেশে তাকেও তো অভিনব বলেই মনে হয়।

১৯৬৬ সালে লেখা তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতা' বইটি (তাঁর 'আম্মা'কে উৎসর্গ করা) এ যাত্রা নিষিদ্ধ হয় নি, কিন্তু নিষিদ্ধ বই দুটির ভাবনার সূত্রগুলি ঐ বইয়েই আছে। 'সাম্প্রদায়িকতা' বইটিতে ইতিহাস-বিশ্লেষণ, 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'-তে বিশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তকে সমসাময়িক ঘটনার উপর আরোপ করার চেষ্টা। পরবর্তী বই দুটিকে বুঝতে হলে তাঁর ঐ প্রথম বইটির বক্তব্য অনুধাবন করার দরকার আছে। কারণ প্রথম বইয়ে যা প্রায় নিরাসক্ত তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা, পরবর্তী বই দুটিতে তা নিঃশঙ্ক প্রতিকার-স্পৃহার চেহারা নিয়েছে। সংগ্রামের অস্ত্র উদ্ধারের জন্যই যে তাঁর সত্যসন্ধান—তা এই তিনটি বই মিলিয়ে পড়লে গোপন থাকে না। এমন কি প্রথম বইয়ে, যেখানে তাঁর জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ চলছে, গবেষকের মতো নির্লিপ্ততা আছে, সেখানেও পাণ্ডিত্যের প্রবল বোঝা নেই। দুটি প্রবন্ধ আছে সে বইয়ে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সাম্প্রদায়িকতা' ও ধর্মীয় রাষ্ট্র, 'মুস্লিম জাতীয়তাবাদ ও মুস্লিম সাংস্কৃতি', 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' এবং 'সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি।' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ আছে আনিসুজ্জামানের 'মুস্লিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনায় তাঁর প্রাসঙ্গিক মতামতজ্ঞাপন। তাঁর আলোচনার ধরন থেকেই মনে হয়, সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীমাত্রকেই তিনি পাঠকরূপে পেতে ইচ্ছুক, তাই তাঁর গ্রন্থ পাদটীকা-বর্জিত, যদিও তার শেষে দরকারী তথ্যনির্দেশ আছে।

প্রথম প্রবন্ধে ওমর দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন মূলত মধ্যবিত্তের আন্দোলন ছিল। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাতে প্রাধান্য থাকার কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য-জীবিকায় তারা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল—ইংরেজি শিক্ষায় সুযোগ সর্বাগ্রে গ্রহণ করার দরুণ। মুসলমানরা

সাম্রাজ্য হারানোর। (মোগল সাম্রাজ্যের পতনে ভারতবাসী মুসলমানের ক্ষোভ যে কতটা অযৌক্তিক তা ওমর আলোচনা করেছেন) ক্ষোভে ও অভিমানে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিরূপতা কাটিয়ে উঠতে সময় নেয়, ফলে সর্বত্রই তারা বেশ পিছিয়ে পড়ে। পরে তাদের মধ্য থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর যখন উদ্ভব হল তখন তারা দেখল তাদের অধিকার ও সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, হিন্দুদের সঙ্গে সহজ প্রতিযোগিতারও উপায় নেই। তাই যা ছিল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, তা দুই সম্প্রদায়ের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে কালক্রমে সাম্প্রদায়িক চেহারা নিল। ওমরের কথায়, 'মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবি যে মূলত মুসলমান মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি, এ সত্যকে হিন্দু-মুসলমান কেউই যথার্থভাবে উপলব্ধি করল না। তার ফলে হিন্দুরা একে শুধু সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এবং মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে অস্বীকার করে আওয়াজ তুললেন ধর্মীয় রাষ্ট্রের।' পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও তিক্ততাকে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করার পক্ষপাতী। তাঁর সিদ্ধান্ত, ঐ প্রার্থিত ধর্মীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই।

পরের প্রবন্ধে এই সূত্র বিস্তার করে তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র জিনিষ। ...ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের আচরণ এবং ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশি। এছাড়া সত্যকার ধর্মনিষ্ঠা পরকালমুখী। ...সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা ইহলোকে। ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজন নেই। অন্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধনের চেষ্টার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি।' সুতরাং ধর্মনিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িকতা অবিচ্ছেদ্য এই ধারণা অসুস্থ ও বিকৃত সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার সুস্থ লেনদেন না হওয়ার ফলেই এই অসুস্থ মানসিকতা উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিরোধকে রূপ দিয়েছে। এর মূলে খানিকটা আছে ঐতিহাসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই বিদ্বেষকে ইংরেজ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেছে, তার সবচেয়ে সুচতুর নিদর্শন ১৯০৯ সালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের আর সুযোগ পেল না। লাখনৌ চুক্তি এবং খেলাফত আন্দোলনের সমঝোতা হল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।' নির্বাচনে সংগঠন-নিরপেক্ষভাবে হিন্দু হিন্দুর উপর এবং মুসলমান মুসলমানের উপর নির্ভরশীল হল। তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে অন্য সম্প্রদায়ের সমালোচনা ও বিরোধিতাকেই মনে করল অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এই নেতিবাচক মনোভাবকে সাধারণের মধ্যে প্রবলতর করে ভারতের হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত স্থগিত রাখল বৃহত্তর গণবিপ্লব।'

ধর্ম কীভাবে মধ্যবিত্ত স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছে, তৃতীয় প্রবন্ধে তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সংগঠন জাতীয় রাষ্ট্র—তার মধ্যে ধর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু স্বদেশকর্মীরা মূলত হিন্দু ভারতবর্ষের গৌরব করতেন, মূলত হিন্দু গৌরবের পুনরুত্থান চাইতেন—ওমরের এই কথা যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট নয়, তা তখনকার কাব্য-নাটক-রোমান্স পড়লেই বোঝা যায়। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে সংগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা 'অধিকতর উৎকটভাবে' আচ্ছন্ন হয়েছিল। ধর্মীয় প্রভাবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান একই ঐতিহ্যের একই গৌরবের অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হল। এর ফলেই মুসলমান উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে তার স্বদেশ-ভূমি মনে করতে পারল না। ওহাবী আন্দোলনের সময় তারা স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হল ধর্ম-প্রীতির প্রাবল্যে। ওমর বলেছেন, 'ভারতীয় ইতিহাসে তাই ওহাবী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীলতার তুলনা নেই।' তাঁর একটি সাহসী সিদ্ধান্ত: 'পাকিস্তানের স্বপ্ন সত্য অর্থে ধর্মপ্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী জীবনযাপনের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন মূলত মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠার।' পরের প্রবন্ধে তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি যে, কায়েদে আজম জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সম্প্রদায় ও জাতিকে এক করে দেখা হয়েছে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তাঁর ঘোষণায় দ্বিজাতিতত্ত্বের পুনরুল্লেখ জিন্না করেন নি, তিনি বলেছিলেনঃ

> ... "we should keep in front of us ..... our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual but in the political sense as citizens of the State".

বিঘোষিতভাবে ধর্মীয় রাষ্ট্র হলেও পাকিস্তানে 'ইসলামের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে বহুলাংশে।' তার কারণ আর কিছুই নয়, ওমর বলেন যে, শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধর্ম একসময় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সে স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার ব্যবহার্যতা কমে আসে। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো স্থায়ী শ্রেণীব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। তাই ওমর দেখিয়েছেন, অভিজাতমন্য মুসলমানদের সঙ্গে (যারা নিজেদের আরবী-ফারসী পূর্বপুরুষদের বংশধর বলে মনে করে) সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের শ্রেণীগত বিভেদ অনেক বেশি *মৌলিক। সংস্কৃতি প্রধানভাবে ধর্মনির্ভর* নয়। তাঁর সিদ্ধান্ত—'একজন গ্রাম্য পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমান এবং একজন পাঠান অথবা মাদ্রাজী মুসলমানের ধর্মীয় জীবনের মধ্যে ঐক্যের থেকে ঐক্যের অভাবই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অধিকতর প্রত্যক্ষ। এবং 'ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির গরমিল এবং ভারতীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা যে ঘোষণা করা হয়, সে ঘোষণা নিতান্ত মৌখিক এবং প্রাণহীন। এর দাবীর ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। ভারতীয় হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতীয় মুসলমানের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের ধারণাকে প্রমাণাভাবে অলীক কল্পনা বলেই মনে হয়।' কিন্তু এই সাংস্কৃতিক মিল থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ কী করে সাম্প্রদায়িক চেহারা নিল ওমর তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। দুই সম্প্রদায়েরই দায়িত্ব তিনি দেখিয়েছেন, যে সম্প্রদায়ের দায়িত্ব বেশি তাকে নির্দেশ করতে সংকুচিত হন নি। 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থের এই চতুর্থ প্রবন্ধটি সমগ্র গ্রন্থের মধ্যমণি, অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধির একটি চমৎকার নিদর্শন।

পরবর্তী প্রবন্ধটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে কাদের শ্রেণীস্বার্থের প্ররোচনা থাকে তা তাঁর বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। 'উচ্চমধ্যবিত্ত-স্বার্থরক্ষায় দাঙ্গার প্রয়োজন' এই মূলসূত্রকে তিনি তথ্য ও যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে প্রচার-মাধ্যমগুলির ভূমিকাও দেখিয়েছেন। তাঁর মতে 'স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবিত্ত লোকদের শ্রেণী-চেতনার কণ্ঠরোধ করার জন্য।' তাঁর আর একটি প্রস্তাব লক্ষণীয়—'পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের জীবনে সাম্প্রদায়িকতাকে উচ্ছেদ করতে হলে তার জন্য শুধু ভারত এবং পাকিস্তানের জনসাধারণের একক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। কারণ এ সমস্যাটি এক হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যানাল জলের সমস্যা অথবা পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যার সাথে তুলনীয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন দুই দেশের সরকার এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা এবং যৌথ প্রচেষ্টা।'

শেষ প্রবন্ধে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এবং শ্রেণীশত্রুকে বন্ধুর চেহারা দেয়। বাংলাদেশে দরিদ্র চাষী মুসলমান অত্যাচারী হিন্দু জমিদারকে জমিদার হিসাবে না দেখে মুখ্যত বিধর্মী হিসাবে দেখেছে, ফলে ভারত-পাকিস্তানের জাতীয় আন্দোলনই ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। এবং যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থের

---

* "১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান সংবিধান সভায় জিন্নার উদ্বোধনী বক্তৃতা। গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত।

সংঘর্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়েছিল সেই একই সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা এবার পাকিস্তানে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, * কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত দ্রুত উন্নতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদতা। সাম্প্রদায়িকতা এখনও পাকিস্তানে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বার্থের হাতিয়ার এবং '১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করার কাজে আংশিক অথবা পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে।'

বদরুদ্দীন ওমরের দ্বিতীয় বই 'সংস্কৃতির সংকট' সাম্প্রদায়িকতার একটি বিশেষ অংশে—যেখানে তা সংস্কৃতিকে বিকৃত করতে চায় সেখানে আলোকপাত করেছে। এ গ্রন্থে এসে (নভেম্বর, ১৯৬৭) চারপাশের মূঢ়তা দেখে তাঁর সামান্য ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে হয়, কারণ প্রথম বইয়ের তাত্ত্বিক নির্লিপ্ততা এতে তাঁকে ত্যাগ করতে দেখছি। বিদ্রূপ ও আক্রমণের আশ্রয় নিয়েছেন এখানে, কিন্তু তা কখনোই গণতান্ত্রিক অধিকারের এবং শালীনতার সীমানা অতিক্রম করে নি। সুস্থ একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্য থেকে সংস্কৃতি-বিকারের প্রচারকদের তিনি প্রশ্ন করেছেন, এর মধ্যে 'মৌলিক' গণতন্ত্রের বিরোধী কিছু আছে কিনা জানি না। তবে এ গ্রন্থে তাঁর ভাষা আরো স্পষ্ট, প্রখর, বাঙ্ময়। এ বইয়ে আছে সাতটি প্রবন্ধ। আগের মতোই পাদটীকাহীন ও গ্রন্থের শেষের তথ্য-নির্দেশ-যুক্ত। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে এই ঃ 'বাঙালী সংস্কৃতির সংকট' (১—১২), 'মুসলিম সংস্কৃতি' (১৩—৫৩), 'উনিশ শতকে মুসলিম শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা' (৫৪—৭৫), 'একুশে ফেব্রুয়ারী ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' (৭৬—৮১), 'শিক্ষার মাধ্যম' (৮২—৯১), 'ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' (৯৪—১০৫) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি' (১০৬—১০৯)। সবগুলি প্রবন্ধই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সব সময়ের ঘটনার উপর রেখে বিচার করার চেষ্টা। আমরা 'সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়েছি, সেগুলিকে বর্তমানের ওপর আরোপ করে বিচার করার সময় তাঁর বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি একটু বিচলিত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও যেহেতু রক্ত-মাংসের মানুষ সেহেতু প্রতিবাদের জন্য তাঁকেও এগিয়ে আসতে হয়। এই প্রতিবাদ নিছক আবেগজাত নয় বলেই বোধ হয় তাকে আরো বেশি ভয়। ভূমিকায় তিনি বলেছেন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গের আলোচনায় 'স্বার্থচিন্তা ও কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তি-বিবেচনা এবং সমাজ ও ইতিহাস চেতনার অবতারণা তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বর্তমান সাংস্কৃতিক চেতনার চরিত্র 'অসাম্প্রদায়িক'

* লেখকের আশংকা সত্য হয়েছে ১৯৬৯ অক্টোবরে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের দাঙ্গায়।

হলে তা 'শুধু যে এদেশের সাংস্কৃতিক আকাশকে দুর্যোগমুক্ত করবে তাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর সুফল অবশ্যম্ভাবী।' তাই তাঁর চেষ্টা 'সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত করার', 'সমগ্র পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার।'

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই সেই বিস্ফোরক ঘোষণা দেখি—'বাঙালীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের 'কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাসৃষ্ট'। আমরা বাঙালী, না মুসলমান না পাকিস্তানী—এ প্রশ্ন নিতান্তই একটা অর্থহীন প্রশ্ন। পরস্পর-বিরোধী জীবনদর্শন পোষণ করা সত্ত্বেও দুই জার্মানীর এক অংশ নিজেদের জার্মান এবং অন্য অংশ নিজেদের অজার্মান মনে করে কি? অন্যদিকে ধর্ম-সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনো মাথাব্যথা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে টলস্টয়ের আসন চিরস্থায়ী। তবে বাঙালী মুসলমান কেন বিদ্যাসাগর -বঙ্কিমচন্দ্র -শরৎচন্দ্র -মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ থেকে নিজেদের নির্বাসিত রাখবে? ওমরের মতে সংস্কৃতির সংকট সেখানেই যেখানে 'মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়ে চেষ্টা করে তাকে বর্জন করতে।' দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বিশদ করে দেখিয়েছেন যে, 'বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি' বলে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ কোনো সত্তা নেই। ধর্ম সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি নয়, গুরুত্বের বিচারে সংস্কৃতিতে ধর্মের চেয়ে ভাষার দাবি অগ্রগণ্য। আবার মুসলমান বর্গাদারের সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান জোতদারের বা উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলমানের সংস্কৃতিও ভিন্ন অর্থাৎ সংস্কৃতি মূলত শ্রেণী-নির্ভর। বঙ্কিমচন্দ্রের মীর মশাররফ হোসেন-প্রশস্তির উদ্ধার করে ওমর দেখিয়েছেন যে, বাঙালী সংস্কৃতিকে হিন্দু ও মুসলমান,—এই স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভাজন সম্ভব নয়। লোকসাহিত্যের উদাহরণে সংস্কৃতির ঐ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃতির ভাগ হয়েছে মধ্যবিত্তের দ্বারা, লোকজীবনে তা দ্বিধাবিভক্ত নয়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দু-সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু 'একমাত্র কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিদেশী মুসলমানদের থেকে বাঙালী হিন্দুর সাথে বাঙালী মুসলমানের ঐক্য অনেক গভীর ও বাস্তব।' ধর্ম সংস্কৃতির একটি উপাদান মাত্র। তা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও নয়, সে দুটি হল আর্থিক জীবন এবং ভাষা। তৃতীয় প্রবন্ধটি মূলত সিংহাবলোকন—উচ্চবিত্ত মুসলমান মধ্যবিত্তের বাংলাভাষা সম্বন্ধে উদাসীনতার কারণ ইতিহাসে সন্ধান। ওমর দেখিয়েছেন, মুসলমান সমাজের তৎকালীন নেতা নবাব আবদুল লতিফের চিন্তাভাবনা 'মোটামুটিভাবে এক ক্ষয়িষ্ণু এবং জীর্ণ কাঠামোর মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হত।' তিনি বাংলাভাষা সম্বন্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু 'নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, যারা জাতিগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তাদের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য হান্টার কমিশনকে অনুরোধ করেছিলেন। তবে সে বাংলাকে তিনি উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ দ্বারা পরিশুদ্ধ করে নেওয়া দরকার মনে করেছিলেন। উচ্চবিত্তদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তিনি সুপারিশ করেছিলেন উর্দুকে। অর্থাৎ তাঁর কাছে মুসলমানদেরও দুটি জাতি বা দুটি শ্রেণী ছিল—উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। একদল 'আরব ইরান এবং মধ্য এশিয়া থেকে আগত বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান বিজেতা, শাসনকর্তা, ধর্মনেতা, আলেম প্রভৃতিদের বংশধর।' অন্য দল জাত্যন্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ, ফলে মুসলমান সমাজেও তারা অন্ত্যজ। বাংলা যেহেতু এই নীচুতলার লোকদের ভাষা, তা দিয়ে উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতিবান মুসলমানদের শিক্ষা হতে পারে না। নবাবসাহেবের মতে সে-শিক্ষা কেবল আরবী-ফারসী-উর্দুর মাধ্যমেই সম্ভব। এই উর্দুর আধিপত্য বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকে পঙ্গু করে রেখেছে। ওমরের মতে 'মুসলমানী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' উদ্দেশ্যমূলক সংজ্ঞা—ও নামে যথার্থত কিছু নেই। যে-সমস্ত শব্দ তথাকথিত মুসলমানী শব্দ হিসাবে পরিজ্ঞাত, যেমন 'পানি', 'আণ্ডা', ইত্যাদি—এগুলি যে সংস্কৃত শব্দেরই রূপান্তর 'তমদ্দুনিক খাদেম'রা সে বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। * চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি ভাষানীতি সম্বন্ধেই প্রসঙ্গবিস্তার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, একুশে ফেব্রুয়ারির সাফল্য বাংলাভাষার রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতিতে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন বাঙালীদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের একটি অংশমাত্র। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণ উপলক্ষ্যে তিনি প্রশ্ন করেছেন 'সে আত্মনিয়ন্ত্রণ কি আজ বাঙালীদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে?' পরবর্তী 'শিক্ষার মাধ্যম' প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রভাষা হলেও বাংলাভাষা এখনও পাকিস্তানের কোথাও 'পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি।'

*'তমদ্দুন' কথাটিকে 'সংস্কৃতি' শব্দটির বদলে পূর্ব পাকিস্তানে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র আছে, ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতা আছে। বিলাতি পাবলিক স্কুলের ধরনে প্রচুর ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়েছে, সেখানে বিত্তবানদের সন্তানবর্গ ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে। ঢাকার নবোত্থিত অনেক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের বাপ-মায়েরা ইংরেজিতে সগর্ব কথাবার্তা চালান। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা এখনও যথার্থ সম্মান পায় নি। 'ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' প্রবন্ধে তাঁর সময়োচিত সতর্কবাণী আছে। ছাত্র-আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীচরিত্র না থাকায় তার লক্ষ্য বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, কখনো তা প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করে। তাতে সুবিধাবাদ, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা এই কারণেই দেখা দেয়, কারণ ছাত্র আন্দোলন মধ্যবিত্ততাকে সবসময় অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না। তাই ছাত্রদের দাবিতে 'রমজানের ছুটি হয়, শুক্রবার স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে 'জুম্মাবার' বলে। পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু রমজানের ছুটি নেই, রবিবারে স্কুল-কলেজের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তাঁর বিরক্তি ও ক্রোধ আর চাপা নেই—চতুর্দিকের নিদারুণ মূঢ়তায় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। 'ধর্মরক্ষার জন্য যারা রবীন্দ্রনাথের গান ও রচনা বর্জন করতে চায়—রবীন্দ্রনাথের অপরাধ তিনি 'হিন্দু' ও 'ভারতীয়'—তারা মহেঞ্জোদারো হরপ্পা তক্ষশীলা সম্বন্ধে সগৌরবে প্রচার করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে যায় কেন? আর 'ভারতীয়' বলে যদি তাঁকে বর্জন করতেই হয় তাহলে নজরুল অনেক বেশী ভারতীয়, কারণ তিনি এবং তাঁর পরিবার দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানকে আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন নি, ভারতেই থেকে গেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে 'তৌহিদবাদ-বিরোধী' মালমশলা আবিষ্কার করে মুমিনের দল যে সেগুলি 'বরদাস্ত করতে নারাজ' হয়ে 'ঊর্ধ্বে গগনে মাদল বাজিয়ে ধরণীতল উতলা' করছেন, তার কারণ আছে। হিন্দু এবং হিন্দু-ঘেঁষা মুসলমান লেখকদের খারিজ না করলে হাতিম তাইয়ের পুঁথি, কাওয়ালি আর মর্সিয়া সাহিত্যে রসিকজনের মন বসবে কেন?'

'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' বইটিতে এইসব বক্তব্যেরই পুনরুল্লেখ, কোথাও বা সম্প্রসারণ আছে। এটি বেরিয়েছে ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এ গ্রন্থে ওমর আরো তীব্র, কারণ বইটি মূলত নানা আক্রমণের প্রত্যুত্তর। বারোটি প্রবন্ধে সমসাময়িক নানা সাংস্কৃতিক তথ্যের এবং ঘটনার বিচার করেছেন তিনি, সেগুলি এই : 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', 'মুসলমানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন', 'বাংলাভাষায় বিদেশী শব্দ', 'পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাব', 'নজরুল ইসলাম অহিফেন', 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীগত ভূমিকা', 'ভাষা ও বানান-সংস্কারের রাজনীতি', 'একুশে ফেব্রুয়ারি', 'গোর্কী জন্মশতবার্ষিকীতে', 'অকটোবর বিপ্লব ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' এবং 'সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক পটভূমি।' শেষ তিনটি প্রবন্ধ বাদ দিলে বাকী প্রবন্ধগুলি পূর্ববর্তী গ্রন্থেরই অনুরণন বলা চলে। তাঁর আলোচনার মূল ভিত্তি এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে—সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় হল আর্থিক শ্রেণীবিন্যাস, তারপরেই ভাষা। ধর্মের স্থান সংস্কৃতিতে আছে, কিন্তু সে স্থান গৌণ। ধর্মকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষণের কাজে যে ব্যবহার করা হয়েছে এ তাঁর ধ্রুব বিচার। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রয়াসেও তার সেরকম ব্যবহার ছিল বা চলে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তাঁর বক্তব্য —সামন্তশ্রেণীর মুসলমানরা মোঘল-পাঠান শাসনকালে নিজেদের ভারতীয় মনে করেনি। তাদের দেখাদেখি এবং প্ররোচনায় নিছক বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তও (অর্থাৎ এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানও) নিজেদের আরব, ইরানী, তুর্কী, খুরসানী, সমরকন্দীদের বংশধর মনে করত। ১৯৪৭ থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির যে সংগ্রাম তারা শুরু করে, সে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত তাদের 'স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সংগ্রাম' হয়ে দাঁড়ায়। ওমরের মতে এখন মুসলমান বাঙালী মধ্যবিত্ত যথার্থ মাতৃভূমি খুঁজে পেয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে তাঁর প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ আনতে হলে উন্নততর ভাষা থেকে ব্যবহার্য ও আধুনিক জীবনযাত্রায় কার্যকর শব্দ আনা দরকার—'আরবী-ফারসী শব্দ নতুন করে আমাদের ভাষায় আমদানী এবং চালু করার প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং মূঢ়তাপ্রসূত'। চতুর্থ প্রবন্ধে তাঁর প্রশ্ন : 'কপালের টিপের থেকে লিপস্টিক, অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের থেকে ভ্যান গগ, পাল গগাঁ, বিশ্বভারতীর থেকে ফ্রাংকলিন*, রবীন্দ্র-নন্দলাল-ঠাকুর থেকে ওয়াল্ট ডিজনি কোন অর্থে 'ইসলাম', 'মুসলিম সংস্কৃতি' অথবা 'পাক-বাঙলা'র কালচারের নিকটতর আত্মীয়?' তাঁর মতে 'মুরুব্বীদের ব্যবসা-বুদ্ধি' অনস্বীকার্য, কারণ 'জোনাকির রাজত্ব কায়েম করতে হলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তাড়াতেই হবে।'

তৃতীয় প্রবন্ধটি অকুতোভয় সত্যভাষণের একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত—নাম 'নজরুল ইসলাম অহিফেন'। নজরুলের একটি সাম্যবিবেচনাপূর্ণ বিচার প্রথমে সেরে নিয়ে ওমর দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে নজরুলকে খাড়া করা কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বলে মনে হলেও আসলে তার মূলে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি প্রচুর আছে। এতে নজরুলের সম্মান তো বাড়েই না, মুসলিম সাহিত্যের মাহাত্ম্যও তৈরি হয় না। নজরুলকে কেবল ইসলামী সাহিত্যের রচয়িতা এবং 'মুসলিম রেনেসাঁসের' প্রতিভূ বললে তাঁর আংশিক এবং অনেকাংশে মিথ্যা পরিচয় উপস্থিত করা হয়। অথচ নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা চলছে ওদেশে। পরবর্তী প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত 'হিন্দু' ঐতিহ্যের অব্যাহত ধারাবাহী বর্তমান পূর্ব-বাংলার সাহিত্য। এ সত্য অস্বীকার করা 'পরিকল্পিত পাগলামি'। বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কীর্তনও মুসলমানদের কাছে বিজাতীয় নয়। ওমর দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতিকে পিতৃমাতৃপরিচয়হীন মনে করার কোন কারণ নেই। এ সংস্কৃতি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত হাজার বছরের যে বাঙালী সংস্কৃতি তারই ঐতিহ্যবাহী তার মধ্যেই আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির অনস্বীকার্য জন্ম-পরিচয়।' এর পরের প্রবন্ধটি খানিকটা পুনরুক্তিমূলক—পূর্ব-পাকিস্তানে ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতাকে আচ্ছন্ন করে কীভাবে সংস্কৃতিগত সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে তার ইতিহাস বর্ণন। এই চেষ্টা মূলত 'বৃহৎ বুর্জোয়াদের' —এরাই 'সাংস্কৃতিক মুৎসুদ্দী'। 'ভাষা ও বানান সংস্কারের রাজনীতি' প্রবন্ধে পূব পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলনের পশ্চাৎপট চিত্রিত করেছেন। ১৯৪৭ সালে বাংলা হরফের বদলে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের আরবী হরফ ব্যবহারের প্রস্তাব থেকে ঐ আন্দোলনের সূচনা। কেউ কেউ আবার বাংলা হরফের 'বৈজ্ঞানিক' সংস্কার চেয়েছিলেন। তারপর রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে জনবিদ্রোহ হল, বাংলাভাষা ও লিপি সংস্কারের প্রস্তাব ভয় পেয়ে লুকোল। কিন্তু আড়াল থেকে তা প্রায়ই মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করেছে। ওমরের প্রশ্ন : 'এমন কোন্ লেখক আমাদের দেশে আছেন যিনি দাবী করতে পারেন যে, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা বাংলা হরফের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে?' 'একুশে ফেব্রুয়ারি' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, বক্তব্য পূর্ববৎ। বাকী তিনটি প্রবন্ধে তাঁর মুখ্য আলোচ্য ঠিক সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা নয়, তবু এ বিষয়টি এত তীব্রভাবে তিনি অনুভব করেন যে অন্য প্রসঙ্গেও সে কথা নানা সূত্র ধরে চলে আসে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের সমুদ্রিত গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ' বাজেয়াপ্ত হয়েছে ভিন্ন কারণে। প্রথম গল্পটি ছাড়া বাকী সবগুলি গল্প সেই ধরনের—যাকে ইদানিংকার বাংলা সাহিত্যে আমরা 'নতুন রীতি' বলি। ভাষা ও বক্তব্যে তাঁর প্রাগ্রসরতা তাঁকে কলকাতার সদ্যতম লেখকদের সমকালীন হিসাবে স্বীকৃতি দেবে। 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' ঈডিপাস কমপ্লেক্স-এর পটভূমিকায় লেখা গল্প পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের বিধবা মার 'বিবাহের উপযুক্ত সন্তান' দেখছে, এতদিন সন্তানের জন্য যে-মা নিজেকে উৎসর্জিত রেখেছিল, হঠাৎ সেই-মা সদ্যজাগ্রত প্রেমের সম্মুখে কাতর, অসহায়। হিংস্র আতঙ্কিত সন্তান মাকে হত্যার জন্য স্পষ্ট কঠিন কারণ খুঁজতে তৎপর হয়ে উঠল, তারপর একদিন তার দ্বিতীয় সত্তা তাকে বলল, চারদিক থেকে

* একটি মার্কিনী প্রকাশনী, পূর্ব পাকিস্তানে এরা কিছু বাংলা বই প্রকাশ করেছে।

ম অনেকগুলো 'কারণ' পেয়ে গেছো।...... বরকে ধন্যবাদ এবার অন্তত একদিক কে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি হত্যাকাণ্ডে অগ্র- র হতে পারো।' 'ভয়' গল্পের নায়ক তার ছে একটি কুমারীর দুর্বল আত্মসমর্পণের র থেকে সব কিছুকে ভয় পায়, বাইরে রোয় না, কুঁকড়ে থাকে নিজের মধ্যে। যে আত্মহত্যার ইচ্ছার মধ্যে সে হঠাৎ জেকে শক্তিশালী বলে অনুভব করল, যে 'দেয়ালের কাছে সেই জটিল বিশাল ছটার দিকে যেতে লাগলো, মানুষের ভয়ে ক হাতে দড়ি আরেক হাতে সাপের ভয়ে াঁধারের ভয়ে হারিকেন নিয়ে, আত্মহত্যা রবার জন্যে।' প্রায় সমস্ত গল্পই অত্যন্ত স্পষ্ট মানুষের হঠাৎ নিজেকে দুর্মদরূপে নুভব করার চেষ্টা। ডাক্তারের কাছে আসন্ন ত্যুর নিদান জেনে লাজুক ভালোমানুষ শল্পের অধ্যাপক হঠাৎ রগরগে উর্দু চল- চ্চিত্র দেখল, শিস দেবার চেষ্টা করল দর্শক- দের সঙ্গে, পণ্য নারীর ঘরে গিয়ে প্রাণপণ দেহের স্বাদ নিল, অশ্লীল কথা বলে মদ খেয়ে বমি করে ভাসিয়ে দিল। বমির মধ্যে শুয়ে তার প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হল, 'যতদিন বাঁচি ততদিনের মধ্যে, এতকাল-সঞ্চিত সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সম্পদসকল হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করব।' (অধঃপতন)। 'চমৎ- কার অবচেতন' গল্পে একটি কিশোরের রহস্যময় বোঝাপড়ায় উত্তরণের বিবৃতি, 'সমীচীন মানব' 'অধঃপতনের' মৌলিক প্রেরণাই অন্য আধার পেয়েছে। 'মাংস' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ায়— বড়লোক অতিথির ঘরে কুমারী কন্যার অসহায় উপস্থিতি উপেক্ষা করে অতিথির খরচে আনা মাংস খেতে খেতে পিতা বলে 'মাংসটা খুব চমৎকার তো—'। 'সময়ের ঘর' গল্পের নিতান্ত মধ্যবিত্ত কাঠামো—মা ও বউয়ের ঝগড়ার পর ছেলে-বউয়ের অন্যত্র বাসা নেওয়া— কিন্তু তারই মধ্যে ছেলে যখন ভাবে 'আমার নিকটতম থেকে একজন আমাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে যাচ্ছে', এতদিন ছিলেন মা, এখন মিনা।' তখন লেখকের সামর্থ্য গোপন থাকে না। 'দণ্ডিত খেলো- য়াড়' নামে গল্পটি ক্রীড়াকুশল প্রাণবান একটি কিশোরের বন্ধুর মায়ের সঙ্গে অবৈধ অথচ নিরুপায় বিজড়িত হওয়ার গল্প। 'বান্দা' গল্পটি একটি অসাধারণ গ্রাম্য বৃদ্ধের চরিত্রকে একটি কিশোরের অপাপবিদ্ধ চোখ দিয়ে দেখা—যে বৃদ্ধ সত্তর বছর ধরে দুনিয়াকে 'ছেনে' ঐ কিশোরের কাছে তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব দেয়, আর মধ্য- রাত্রে নিজের বিছানায় নগ্ন দাঁড়িয়ে নিজেকে শাসন করে—' নফ্‌স্‌ দমন কর, এখনো দমন করতে শেখ, আল্লার নাম কর—তিনিই রক্ষা- কারী।' 'চাবি' একটি অসামান্য গল্প— ঘরের চাবি হারিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির নানা প্রান্তে সন্ধানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর যুবক অন্য ঘর ভাড়া নেয়। গল্পের শেষে তার কথা শুনি।

"আমি নিজের ঘরের বাইরে নির্বাসিত ও প্রবাসী থেকে এখনো দিনরাত সেই পুরনো ঘরের চাবি খুঁজছি; আমি আরেক- জনের বাড়িতে থেকে জীবনভোর আমার বন্ধ ঘরের আসল চাবি সন্ধান করে যাবো— এই আমার নিয়তি।'

শেষ গল্প 'সত্যের মতো বদমাশ' খানিকটা রূপকধর্মী— উৎসব-মেলায় নিষ্পাপ শিশুর মাকে হারানোর দুঃখ, মায়ের ধর্ষিতা হওয়ার সংবাদ পাওয়া, তারপর সেই শিশুকেও চারজন লোকের "কবরে-যাওয়ার 'খাটিয়া'র চারটি পায়ার মতো বয়ে নিয়ে" যাওয়া ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি। এ রূপক খুব অস্পষ্ট নয়, অন্তত রাজনৈতিক একটা সহজ ব্যাখ্যা করার ফলেই বোধ হয় এ বইয়ের উপর দণ্ড নেমে এসেছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ অত্যন্ত ক্ষমতাবান লেখক, মধ্যবিত্ত রুগ্নতার বাইরে গিয়ে যদি তিনি বদরুদ্দীন ওমরের সঙ্গী হন, তাহলে তাঁর লেখাকে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ভয় পাবার কারণ থাকবে।

সত্যেন সেনের বিস্তৃত পরিচয় আমি জানি না। যতদূর শুনেছি তিনি মৌলানা ভাসানীর শিষ্য, বহুদিন জেলে ছিলেন, সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছেন। একাধিক গ্রন্থের লেখক তিনি। উপন্যাস লিখেছেন এ পর্যন্ত সাতটি, চারটি প্রবন্ধের বই, শিশুদের জন্য একটি। 'আমাদের এই পৃথিবী' বলে তাঁর একটি বই শিশুদের জন্য সহজ বিজ্ঞান প্রসঙ্গের অবতারণা—বাংলা একাডেমি সেটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'মসলার যুদ্ধ', আর একটির নাম 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। 'আলবেরুনী' ১৩৭৬ সনের বৈশাখ মাসে বেরিয়েছে। জেলে বসে লেখা এই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কলকাতার লোকেদের এ উপন্যাস পড়ে একটু বিস্ময় জাগবে, কারণ প্রেম বা যৌনতার কোনো 'মোটিফ' না রেখেও কী করে লেখক শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেন তা ভাববার বিষয়। এই বই,—যাতে একটি মহৎ চরিত্রের মহত্ত্ব যোগ্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা পেয়েছে—তা কেন বাজেয়াপ্ত হল জানি না। খুঁজলে অজুহাত পাওয়া যায় না এমন নয়—কিন্তু এই নির্বোধ কারণগুলিই মূল কারণ তা বিশ্বাস করতে ভালো লাগে না। মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে খুব নীচু ধারণা জন্মায়। সত্যেন সেনের মূল অপরাধ সম্ভ- বত এই যে আবু রায়হান আলবেরুনীর মুখ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়েছেন, আরবের বিজ্ঞানচর্চার মূলে ভারতীয় গ্রন্থের দানের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আলবেরুনীকে একই সঙ্গে সক্রেটিস ও গ্যালিলিওর আদলে গড়ে তুলে তিনি কোনো কোনো অস্পষ্ট পক্ষের অস্বস্তি জাগিয়েছেন। এবং এক জায়গায় আলবেরুনীর বন্ধু আহমদ বলেছে, 'সৈন্যরা যেখানে প্রধান, সে রাজ্যের কি কখনো কল্যাণ হতে পারে?' আলবেরুনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবোধের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন, সাড়ম্বর বিদ্রূপহাস্য উপেক্ষা করে সুলতান মামুদকে বলেছিলেন, এঁদের (হিন্দুদের) কাছ থেকেই আমরা একদিন অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম।' এ উপন্যাসে আছে ভারতবর্ষে এসে আলবেরুনী ভার- তীয় ধর্মের নানা রীতিনীতি জানতে উৎসুক হন, অনুবাদের জন্য অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে যান। সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসে আলবেরুনীর বেদনার কথাও লেখক বলেছেন। যারা বদরুদ্দীন ওমরকে প্রচ্ছন্ন কাফের বলে গাল দেয়, তাদের কাছে সত্যেন সেন নিষ্কৃতি পাবেন না—তাতে আশ্চর্য কী।

আশ্চর্য ব্যাপার হল 'মহারাজ'-এর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করা। এতে পাকিস্তান- বিরোধী একটি কথাও আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। লেখকের বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে শুধু যে 'হিন্দু-ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল এমন কথা ইসলামী রাষ্ট্রের দখলদাররাও বোধ হয় স্বীকার করতে লজ্জিত হবে। এক জায়গায় শ্রীহট্টের নওগাঁর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক হিন্দুদেরই মূলত দায়ী করেছেন, কাজেই সরকারী উষ্মার কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনাও নয়। 'পাক-ভারতের স্বাধী- নতা সংগ্রামে' মুসলমান স্বদেশসেবকদের নেতৃত্ব ছিল না (যদিও নির্ভীক যোদ্ধা তাঁদের মধ্য থেকেও এসেছিলেন) এই ঐতি- হাসিক তথ্য যে-কোনো বিপ্লবীর জীবনীতে থাকতে বাধ্য। তাতে মুসলমান- দের হীনমন্যতা বোধ করার কোনো কারণ নেই, কারণ তাঁদের পশ্চাৎপদ হয়ে থাকার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁদের নয়। ১৯৬৫-র যুদ্ধের পর মহারাজকে যখন জেলে বন্দী করা হল তখন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী এই অশীতি-সন্নিহিত বৃদ্ধের মনে প্রশ্ন উঠেছিল, 'পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়াছে, আমি তো সে জন্য দায়ী নই, আমি কেন বন্দী হইলাম?' শুধু এই দুর্বল প্রশ্ন- টুকুই এত ভীতিজনক? নাকি এ বইকে পাকিস্তান সরকার চে গুয়েভেরার ডায়েরি জাতীয় সংক্রামক কিছু মনে করেছেন, যাতে রক্তবীজ ছড়াবে?

পূর্ব পাকিস্তানের খবর যা আসছে, তাতে মনে হয় এই পাঁচটি বইয়ের কণ্ঠরোধ করে খুব নিশ্চিন্ত হবে বলে যদি কেউ কেউ ভেবে থাকে, তাদের অনুশোচনার সময়ও খুব দূরে নয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নতুন যুগের কবি

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কবি এদেশে ইদানীং সুপরিচিত তাঁর নাম ইভতেসেংকো, সম্প্রতি অবশ্য সোভিয়েত রাষ্ট্রে তাঁর প্রতিকূল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেকজন শীর্ষস্থানীয় কবি হলেন আঁন্দ্রেই ভংসেনেসকী। মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই এই কবি সাম্প্রতিক সোভিয়েত কবিদের মধ্যে এক মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। মস্কোর লুঝনেবী ষ্ট্যাডিয়মে কবি একদিন তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন, সেদিন সেই আসরে চোদ্দ হাজার মানুষ ভীড় করে এসেছিল কবিকণ্ঠে আবৃত্তি শোনার আকর্ষণে। কবির একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বাহ্নে ত্রিশ হাজার পাঠক অগ্রিম মূল্য দিয়ে আঁন্দ্রেই-র কবিতা গ্রন্থ কেনার জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করেছেন। আঁন্দ্রেই যখন কবিতা পাঠ করেন তখন নাকি সেই আবৃত্তির মধ্যে এমন এক আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে যে, মনে হয় এ যেন কবিতা নয়, একটা আত্মিক সংযোগ, অন্তরের অন্তঃস্তলে কবির বাণী এসে আঘাত করে। রুদ্ধ যবনিকার ব্যবধান অন্তর্হিত, কবির সঙ্গে শ্রোতার সেখানে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

ভংসেনেসকীর জীবনেও অন্ধকার রাত্রি নেমে এসেছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের দুঃখের দিনে। ক্রুশচেভ সেই কালে উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সমকালীন শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ সুরু করেছেন, ফলে আঁন্দ্রেই সাময়িকভাবে রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং এই রাহুগ্রাসের কালে তিনি প্রায় অবলুপ্ত ছিলেন। ক্রুশচেভী-জেহাদের কালে প্রকাশ্য সভায় কবিতা আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ হল এবং এই কঠোরতার ফলেই সেই কালে রচিত কবিতার গতিও ব্যাহত হয়েছে।

সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি এই সরকারী জেহাদের তীব্রতা ১৯৬৩-র জুন মাস নাগাত কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে এল। পুনরায় নতুন রচনা প্রকাশিত হতে সুরু হল এবং প্রকাশ্য কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ শিথিল করা হল। আঁন্দ্রেই ভংসেনেসকীর কবিতা সংশয়বাদীর কবিতা। তবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উদ্দীপনার প্রাবল্য। মাঝে মাঝে পাওয়া যায় যন্ত্রণাকাতরতার বা পরিশীলিত ব্যঙ্গের পরিচয়। এছাড়া তার মধ্যে আছে গভীর গাম্ভীর্য। প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ও প্রাণোচ্ছলতা আঁন্দ্রেই ভংসেনেসকীর কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ।

বোরিস পাস্তেরনাকের প্রতি ভংসেনেসকীর সুগভীর শ্রদ্ধা। পাস্তেরনাক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য "He was my only master." পাস্তেরনাকই তাঁর গুরু আর এই দ্রোণগুরুর শিষ্য ভংসেনেস্কী।

সম্প্রতি অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের উদ্যোগে কয়েকজন প্রখ্যাত ইংরাজ কবি অনূদিত ভংসেনেস্কীর কয়েকটি কবিতা "অ্যান্টি ওয়ার্লড"—এই নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে কবির যে ৪৬টি কবিতা অনূদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে যেমন কবির বিভিন্নকালের মনোভংগীর পরিচয় আছে তেমনই পাওয়া যাবে তাঁর কবিমানসের ক্রমবিকাশের ধারা। অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে মূল কবিতার বক্তব্য অনেকখানি পরিশ্রুত কিংবা পরিশোধিত হয়ে রূপান্তরিত আকারে পাওয়া যায়, কবির কবিতা যেসব কবিবৃন্দ অনুবাদ করেছেন রুশ সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত নন যেমন আমরা যাঁরা এই গ্রন্থের পাঠক তাঁদেরও অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ তথাপি ভংসেনেসকীর কবিতার বিচিত্র স্বাদ এই কাব্যগ্রন্থের মারফৎ পাওয়া যায়। সমকাল, ঐতিহ্য ও পরিবেশে শিকড় অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। কবি যেসব সংকেত এবং প্রতীক ব্যবহার করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে রাশিয়ান। রুশদেশের অতীত দিনের সংগ্রামী নায়ক, দুষ্কৃতিকারী, রুশদেশীয় দৃশ্যপট বা নিসর্গলোক, রুশীয় ঋতু ও প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রভৃতি অতিশয় প্রাণবন্ত, মাঝে মাঝে তরল এবং অতিমাত্রায় গ্রাম্য বলে মনে হতে পারে। এর ফলে, কবিতার রসাস্বাদনে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি হয় এবং অনুবাদের অসমতল মাটিতে হোঁচট খেতে হয়। তথাপি স্মরণযোগ্য যে, এই কবিতাগুলির যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন ডবলু এচ অডেন।

কবিতার মধ্যে কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নি কবির ব্যক্তিসত্তা, তার ফলে, কবির মানবদরদী সত্তা স্পষ্ট হয়েছে এবং যে অশুভশক্তির প্রভাবে মানবিকতা মূর্ছিত তার প্রতি কবি ধিক্কার হেনেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে 'ফিজিসিষ্ট-লিরিসিষ্ট' নিয়ে বাদানুবাদ আছে, এই দ্বৈত সাংস্কৃতিক নীতির বাদী-প্রতিবাদীদের তিনিও একজন। কবি ভীষণ আতংকিত, তাঁর বিশ্বাস যে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অগ্রগতি মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে পারে, এই মানবিক মূল্যবোধই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অতি-প্রাকৃতিক বিশৃংখলা থেকেই এক দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি, ফলে, ভংসেনেসকীর কবিতার মধ্যে ছকবাঁধা রীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং এই ব্যতিক্রম তাঁর কবিতায় অতিমাত্রায় প্রতিফলিত।

এই কাব্য সংকলনের অন্তর্গত কবিতা 'ওৎসা'—বিশেষ উল্লেখ্য, কবিতাটি ডায়েরীর আঙ্গিকে পরিবেশিত, হোটেলের কামরায় ডায়েরীটি পাওয়া গিয়েছিল অথচ এই কাহিনী-ভিত্তিক কবিতায় না আছে কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র বা সুস্পষ্ট ঘটনাপ্রবাহ।

অংশত গদ্য, অংশত পদ্য এই চম্পু কাব্যটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য হল এক বিয়োগান্ত প্রেমকথা। প্রেম, বিরহ, কামনা প্রভৃতির অভিব্যক্তির মধ্যে একটা হাস্যকর উদ্বেগ প্রকাশিত। যে মেয়েটিকে ভালোবাসে তার নাম 'ওৎসা'—, (শব্দ বিপর্যয়ে 'জয়া' কথাটির রূপান্তরে 'ওৎসা' হয়েছে, জয়ার উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'জো' থেকে জোর অর্থ জীবন) এই ওৎসার সদাই শঙ্কা যে, সে হয়ত বিকৃত, রূপান্তরিত হয়ে যাবে, কোনো মানবিক বা অতিপ্রাকৃত অঘটনের ফলে নয়, বরং মানবকৃত সাইক্লোট্রোণের প্রয়োগফলে। যন্ত্রের শক্তি বীভৎস, ভীতিজনক এবং হাস্যকর। কবি এমন এক জগৎ দেখতে পাচ্ছেন যে জগতে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এই সব অশুভ অভিশাপকে। এই জগতে বৈজ্ঞানিকরা পরমানন্দে এবং মহাফূর্তিতে বিচরণশীল।

'বিট্‌নিকের স্বগতোক্তি'— কিন্তু আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এখানে যন্ত্র গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তারা বিদ্রোহ করেছে, ফলে একটি "রোবট" তার স্রষ্টাকে বলছে—

"give me your wife !
I have a weakness,
for brunettes;
I love them at 30 rpm."

ভবিষ্যকালের এই সব দানব সম্পর্কে কবি আতংকিত হয়ে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে

ফিরে দেখেছেন, অতীতের দুর্দান্ত অত্যাচারী-দের স্মরণ করে বলেছেন—

> "Machines as barbarous
> as Batukhan
> have enslaved us men."

মানবসমাজের বিকৃতি এবং বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে কবি বিভ্রান্ত। ব্যবহারিক ও সমকালীন দৃশ্যপটের প্রতিবাদী কবি সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের বিলুপ্তির আশংকায় বিহ্বল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি লারমনটভের কথা স্মরণ করে তাঁকে প্রশস্তি জানিয়েছেন। রাজনৈতিক এবং অন্যবিধ ত্রুটীর জন্য ককেসাস অঞ্চলে সৈন্যদলের সংগে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল লারমনটভকে। অত্যাচারী, টাকার কুমীর এবং জার প্রভৃতি সর্বকালের যারা বর্বর, যারা শিল্পীদের এবং লেখকদের যন্ত্রণা দিয়েছেন, সেই সব লেখক যাঁদের প্রতিভার মধ্যে এমন প্রবল শক্তি নিহিত ছিল— যে সেই প্রতিভা—

> "Could knock a crown off its
> head and shake the seats of
> power."

জনশ্রুতি যে আইভান দি টেরিবল অনেক স্থপতি—এমন কি প্রতিভাধর স্থপতি বারমারও চোখ উপড়ে নিয়ে রেড স্কোয়ারের সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে পুঁতে রেখেছিলেন যাতে তারা অনুরূপ কোনো সৌন্দর্য সৌধ আর না গড়তে পারেন।

বৈজ্ঞানিক দানবদের চেয়ে আদিমকালের বর্বরতা অপেক্ষাকৃত লঘু ধরনের। তারা বড় জোর অপমান করে ছেড়ে দিত, কিন্তু এ কালের বৈজ্ঞানিক দানব মানুষের সর্বাঙ্গীন অবলুপ্তির ব্যবস্থা করেছে। স্কল ব্যালাড সপ্তদশ শতাব্দীর পটভূমি প্রসারিত করেছে, পিটার দি গ্রেটের সময় একটি স্ত্রীলোককে প্রকাশ্য স্থানে মুণ্ডহীন করা হয়, এর নাম এনা মস্। সেই কাহিনীর ওপর আরোপ করা হয়েছে একালের বর্বরতাকে। জার, শয়তানের প্রতিমূর্তি, অতি কঠোর, দুর্দম ও দুর্দান্ত। সমগ্র দাসত্বের কালের প্রতীক এই জার। নারী কর্কশ এবং আবেগময়ী, তার অংগে সোনার রঙ যেন রক্তরঞ্জিত।

একালের নাট্যরূপ বিভিন্ন ধরনের। তেমনই নিদারুণ তেমনই নিষ্ঠুর কিন্তু সেই কার্য করা হয় গোপনে এবং নিরালা নির্জনে। তুষারাচ্ছন্ন টেলিফোন বুথে জনৈকা তরুণী কাঁদছে, তার অংগে যে কোট জড়ানো তা যথেষ্ট নয়, প্রতিরোধ শক্তি অনেক ক্ষীণ, তার আঙুল তুষারকণার সমতুল। তার ইয়ারিং আর চোখের জল দুই মিশে এক হয়ে গেছে। 'ফার্স্ট ফ্রস্ট' নামক এই কবিতাটি সুগভীর অনুভূতি ও ভাবাবেগের পরিচায়ক। শীতের প্রথম স্পর্শ তার জীবনের দুঃখের স্বাদও এই প্রথম।

কবি মানুষের অপরিসীম দুঃখের ইতিহাস লিখেছেন, তাদের শোক, তাদের যন্ত্রণা, আকুলতার কথা, কখনও তা নিদারুণ দুঃখের কখনও বা প্রহসন, কখনো আবার দুই-ই। একটা শিকারীর দল প্রচন্ড হট্টগোলে শিকার করতে বেরিয়ে খরগোসের পিছনে ছুটছে - সহসা তাদের মনোভংগী বদলায়, তারা ভাবে যদি অন্ধ হয়ে যাওয়া যায় কেমন মজা হয়, সে এক উদ্দেশ্যহীন অপরাধ। তারপর তারা প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করে অনেক অস্বস্তি মনে নিয়ে—

> "Or is it ourselves we're hounding ?".

কে কার শিকার ?

আঁন্দ্রেই ঘোষণা করেছেন দীপ্ত কণ্ঠে—

> "I am Andrei, not just any one."

আর যে সে নয়, স্বয়ং আঁন্দ্রেই। সেই আমি। আমি সেই কবি। যাঁর কণ্ঠে নব-জীবনের গান।

—অভয়ংকর

ANTIWORLDS: Poems by Andrei Voznesensky; translated by W. H. Auden, Jean Garrigue, Max Hayward, Stanley Kunitz, Stanley Moss, William, Jay Smith, Richard Wilbur; Published by OXFORD UNIVERSITY PRESS.
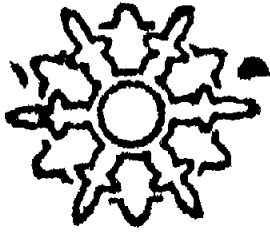
সাহিত্যের খবর

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ভবনে তামিল ভাষা শিক্ষার একটি ক্লাশ খোলা হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় এর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও। তিনি এই সমিতির কার্যাবলীর প্রশংসা করেন এবং বলেন, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চারটি কেন্দ্র খুলবেন। এই কেন্দ্রগুলি হবে ভুবনেশ্বর, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পুণা। কোনও এক ভাষার শিক্ষক অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিখে নিজ ভাষায় সেই ভাষা পড়াতে পারেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ বৃত্তি দেবেন।

কোরিয়ার সাহিত্যের সংগে আমাদের পরিচয় খুব সীমিত। কয়েক বছর আগে ইংরেজিতে কোরিয়ার কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি উপন্যাসও অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি কোরিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক কিম ইয়ং ইকের 'দি ডাইভিং গ্রাউন্ড' ইংরেজিতে বেরিয়েছে। বইটি নিয়ে এর মধ্যেই চারদিকে বেশ একটা আলোড়নও উঠেছে। মৎস্যজীবীদের জীবন নিয়ে লেখা হলেও এর মধ্যে মাঝে মাঝে লেখক একটা দার্শনিক আবেশ সৃষ্টি করেছেন। বর্ণনাভংগিও সুন্দর। এই কারণেই বোধ করি, এত সহজে পাঠকচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছে।

বিশ্বভারতীর এবারের সমাবর্তন উৎসবে প্রবীণ কবি কালিদাস রায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। এ সংবাদে সাহিত্য-রসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন। কবি, সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে শ্রীরায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। তাই বলা যায় উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি কবিচেতনা অর্জন করেছেন। তাঁর কবিতাতেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় পল্লী বাঙলার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কবিতার এই বৈশিষ্ট্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমালোচনা সাহিত্যকেও তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত জার্মানভাষী লেখক রবার্ট মুশিলের ১৯৪২ সালে মৃত্যু হয়। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কেনফুর্টে তাঁর সম্মানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মুশিলের অসংখ্য চিঠিপত্র, ছবি এবং তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের অজস্র সমালোচনা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

'সাহিত্য সেতু' পত্রিকা তার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নতুন লেখক লেখিকা সম্মেলন এবং পত্র পত্রিকা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দু টাকা প্রতিনিধি চাঁদা পাঠিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করবার অনুরোধ করা হয়েছে। প্রদর্শনীর জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সকল মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পত্র পত্রিকার দুটো করে কপি পাঠাবার জন্যেও অনুরোধ জানান হয়েছে। যোগদানের ঠিকানা—সাহিত্য সেতু, বাঁশবেড়িয়া কুন্ড-গলি, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

নতুন বই

মায়া মঞ্জিল ঃ (উপন্যাস)। ক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায়। পূরবী পাব্লিশার্স। ৮৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

ক্ষীরোদবাবুর মায়া মঞ্জিল একটি ইতিহাস মিশ্রিত রহস্যোপন্যাস। কাহিনী অংশের সূত্রপাত ঘটেছে রায়রায়ানের কুঠির মাঝরাতের ভৌতিক রহস্যকে কেন্দ্র করে। ভৌতিক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্র বাংলার স্বাধীন রাজা শোভা সিংহের বংশধরকে দিয়ে। অপরাধের ঘটনা ঐতিহাসিক হলেও পরিবেশ ঠিকমত তৈরি করতে পারেননি লেখক। নিছক ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যেই থেকে গেছে। যে রায়রায়ানের কুঠির রহস্যের ওপর গোটা উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা যেন কতকটা নিষ্প্রভ ও হালকা। মূল কাহিনী কোথাও জটিল আকার ধারণ করেনি। অমিতাভর বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা কোন গম্ভীর রহস্যোদ্ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। তবে তার তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। কাহিনী বিন্যাস মোটামুটি চলনসই।

যা চাই তা পাইনা ঃ (উপন্যাস) শ্রীআদিত্য। ডি লাইট বুক কোঃ। ১৭৩।৩ বিধান সরণি, কলকাতা—৬। তিন টাকা।

শ্রীআদিত্যের এটি সম্ভবত প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি কাহিনীনির্ভর। সুমন-সুজাতা, কুমারীশ-বিজিতা, বজ্রশংকর-সিলভিয়া চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী হলেও নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে মানসিক চিন্তার কোন অবকাশ দেখান হয়নি এদের মধ্যে। এরা প্রত্যেকেই সামাজিক কারণে জটিল মনস্তত্ত্বের পথে অবতির্ত হতে পারত। লেখক কাহিনীবিন্যাসের দিকে তেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন নি। আকস্মিক চরিত্রও এসে পড়েছে।

খাদি ও চরখার কথা ঃ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। গান্ধীজির শিক্ষা—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি। ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। কলকাতা—৭। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি মহাত্মাজীর ভাবধারা, চিন্তা ও জীবনদর্শন সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করছেন। গান্ধী-শতাব্দী পুস্তকমালায় এযাবৎ তেরখানি বই প্রকাশ করেছেন এঁরা। সম্প্রতি বেরিয়েছে 'খাদি ও চরখার কথা' এবং 'গান্ধীজির শিক্ষা'। গান্ধীজিকে জানবার পক্ষে বই দুটি বেশ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

আক্ষরিক আইন ঃ মদন চক্রবর্তী। নয়া প্রকাশ। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা—৬। দাম এক টাকা পঞ্চাশ, একটাকা পঁচিশ এবং দু টাকা।

শ্রীমদন চক্রবর্তী একজন শিক্ষক এবং আইনজ্ঞ। 'আক্ষরিক আইন' তিনটি খণ্ডে ছেলেমেয়েদের সাধারণ আইন সম্পর্কে জানাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। মানুষ হঠাৎ একদিনে শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীব হয়ে ওঠেনি। অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আসবার পথে তাকে অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়েছে। আলোর জগতে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচতে আজও প্রয়োজন হয় আইনের। অল্পবয়স থেকে আইনের জ্ঞান গড়ে উঠলে, স্বাভাবিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে মানুষ। তারই ইংগিত রয়েছে 'আক্ষরিক আইনে'। স্কুলের ছাত্রদের জন্য বইখানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আনন্দ ও পঁচিশতলা বাড়ী ঃ কল্লোল মজুমদার। কবিতা কলকাতা প্রকাশ-ভবন। ৭ নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা—২৯। দাম দু টাকা।

ছয়টি গল্প নিয়ে এই গল্পসংকলন। যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কালের গল্প বলে ভূমিকায় উল্লিখিত, গল্পকারের কোনো অকম্প জীবনদর্শন গল্পের মধ্যে মেলে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁর প্রবণতা জীবন-ধর্মী প্রগতিবাদের দিকেই, কিন্তু প্রচ্ছদের পিছনে যতটা উচ্চগ্রামে আছে ততটা নয়। বিষয় নির্মাণের চেয়ে আঙ্গিকগত কলা-কৌশলের দিকে নজর বেশী। দু-তিনটি গল্প শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। যেমন 'লেন্স' গল্পের জ্ঞানবীক্ষণ এবং ছই গল্পের বাস্তব ধারণা — সে তুলনায় 'তীর্থংকর' গল্পে ভাববাদ আধিক্যে বিমূর্তগুণ বেশী পরিলক্ষিত। বিষয়ের দিকে আরো সামঞ্জস্য-পূর্ণ ও সচেতন হলে, বাংলা গল্পের মূল প্রবাহের যথার্থ উত্তরাধিকার বহনে তিনি সক্ষম হতে পারেন। কেননা তিনি যে শক্তি-মান গল্পকার, একথা অস্বীকার করা কঠিন।

অনাদিন (পৌষ ১৩৭৬)—সম্পাদক আশিস সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য ও অমল ভৌমিক। ৫৩ বিধান পল্লী, কলকাতা—৩২। দাম ঃ এক টাকা।

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা 'ফরাসী কাব্যে আধুনিক ধারা'। লিখেছেন শিশির ভট্টাচার্য। সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি মন্দ নয়। কবিতা লিখেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকুমার ঘোষ, বনজ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, হিমাদ্রিশেখর বসু, গণেশ বসু, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, অমল ভৌমিক, আশিস সান্যাল, দীপক রায়চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। দুটো কাব্যগ্রন্থের আলোচনা ছাপা হয়েছে। চেহারা-চরিত্রে পত্রিকাটি সাম্প্রতিক পরিমণ্ডলকে ছুঁয়ে আছে।

মধ্যাহ্ন (চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৩৭৬) —সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৭২ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৬। দাম ঃ পঁচাত্তর পয়সা।

প্রচ্ছদ পূর্ববৎ। লেখায় কোন নতুন চমক নেই। প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যধর্মী। এ সংখ্যায় লিখেছেন নৃপেন্দ্র গোস্বামী, অমল চন্দ, তরুণকুমার বিশ্বাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কাল-পুরুষ শর্মা, চন্দন মজুমদার, পরেশ মণ্ডল, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, নীরদ রায়, বিষ্ণু ভৌমিক ও দিলীপ মিত্র। একটি হুঙ্গেরীয় গল্পের অনুবাদ করেছেন শিবপ্রসাদ বসু।

বৈকুণ্ঠের খাতা

বাংলা ছোটগল্পের পক্ষে এটা সুসময় নয়, রীতিমতো দুঃসময়।

কেউ বলেন, অবনতির যুগে বাস করছি আমরা। কেউ বলেন, পরিবর্তনের ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার। কিন্তু সুস্থির মন্তব্য করছেন না কেউ-ই। না পাঠক, না সমালোচক। বর্তমানের ব্যাপারে সকলেই সন্দিগ্ধ। জনৈক তরুণ গল্পকারের মতে, আমরা নষ্ট সময়ের মানুষ। কেউ বিষণ্ণ, কেউবা তাকিয়ে আছেন ভবিষ্যতের দিকে।

এই মন্তব্য নিয়ে অনেক জল ঘোলা হতে পারে, তুমুল তর্কবিতর্ক হতে পারে। সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা যাবে না বলেই মনে হয়। ছোট গল্পের পক্ষে এটা জয়ের নয়, বিপর্যয়ের যুগ।

তবু গল্পের বই বেরোয় মাঝে মাঝে। 'শত গল্প' 'গল্প পঞ্চাশৎ' 'শ্রেষ্ঠ গল্প' 'গল্প সমগ্র' ইত্যাদি নামে। কখনো কখনো কুচোকাচা দুটো চারটে গল্পের বইও বেরোয়। লক্ষণীয়, এসব সংকলনের লেখকরা কেউ তরুণ নন, বয়সে প্রৌঢ়, ঔপন্যাসিক হিসেবে অনেকে জনপ্রিয়। আজকের উড়নচণ্ডী ভাবটা নেই অনেকের গল্পে। পপুলারিটির ভারসাম্যে একালেও স্বচ্ছন্দবিহারী। অনেক প্রকাশকই যে সাগ্রহে তাঁদের বই ছাপেন, তাও হয়তো নয়। প্রকাশকরা চান লেখকের গুড-উইল এবং আসন্ন উপন্যাসের প্রাপ্তি সম্পর্কে একটা যোগাযোগ। 'গল্পের বই' ছাপার লোকসানটা এভাবেই হয়তো উপন্যাসের চাহিদায় মিটে যায়।

কিন্তু যাঁরা বয়সে তরুণ, কেবলই গল্প লেখেন, তাঁদের ভারি দুর্দশা। সাময়িকপত্রের চাহিদা মেটান তাঁরা রাতের পর রাত জেগে। পাঠকের সাময়িক বিশ্রাম ও অবকাশের মধ্যে তাঁরা মুক্ত, স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে উত্থান ও অবলুপ্ত। লিটল ম্যাগাজিনের চৌহদ্দীতে তাঁরা সর্বাধিক আলোড়িত। বইপত্র ছাপেন গাঁটের কড়ি সেলামী দিয়ে। বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন না অনেকেই। বন্ধু-বান্ধবদের বিলিয়ে দেন শেষ পর্যন্ত।

যথেষ্ট জনপ্রিয় না হলে ছোট কিংবা মাঝারি ঔপন্যাসিকদের অবস্থাটাও অনেকটা এরকম। প্রস্তাব উঠলে তাঁদের গল্পের বই ছাপতে দারুণ বিব্রত বোধ করেন যে কোনো প্রকাশক। আমি একজন তরুণ গল্পকারকে জানি, যিনি দেশ-অমৃতে অনেকগুলো গল্প লিখে বেশ খানিকটা জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁকেও নিজের পয়সায় বের করতে হয়েছে গল্পের সংকলন। এদিকে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো লেখক হিসেবে খুবই খ্যাতিমান। কিন্তু তাঁর কমপ্লিট গল্পসংকলন বেরিয়েছে? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদেরই বা কী অবস্থা?

কে তাঁদের গল্পের বই ছাপছেন?

প্রকাশক বলেন, বড় উপন্যাস লিখুন— বিশ, তিরিশ, চল্লিশ ফর্মার। কুচপরোয়া নেই। নিদেনপক্ষে লিখুন বড় গল্প, যাকে ছোট উপন্যাস বলে চালানো যায়। ছোট গল্প নৈব নৈব চ।

পুরনো সমস্যা, নতুন সমাধান

এই তাজ্জব পরিবেশ ও তাজ্জব পরিস্থিতিতে ততোধিক বিস্ময়কর ঘটনা মিহির আচার্যের 'আজ কাল পরশু'। কয়েকটি গল্পের সুনির্বাচিত সংকলন। মিহিরবাবু পপুলার স্টোরি-টেলার নন। দু-একটি উপন্যাস লিখলেও গল্পকার হিসেবেই পরিচিত। স্বভাবতই জনপ্রিয়তা বলতে যা বোঝায়, সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ (?) বস্তুটি এখনো বোধকরি তাঁর আয়ত্তের বাইরে। মনে হয়, এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা উদাসীন। প্রশ্ন করলে বলেন, 'সুতোয় রাজী যাং করতে চাই না।'

একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: গল্পের প্রকাশক জোগাড় করেন কি করে?

সপ্রতিভ উত্তর দিলেন মিহিরবাবু: পরিচয়সূত্রে। গল্পের বই ছাপবার জন্যে প্রকাশকরা নিশ্চয়ই হাঁসফাঁস করেন না। 'আজ কাল পরশু' বের করেছি নিজের পয়সায়। কারো দ্বারস্থ হইনি। নিজেই লেখক, নিজেই প্রকাশক এবং প্রুফ-রিডার।

কেন এই ঝুঁকি নিলেন? —পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

তিনি বললেন: প্রকাশকরা দোষ দেন গল্পের পাঠক নেই। কেউ কিনতে চায় না। আমার মনে হয়, তা ঠিক নয়। মানুষ গল্পের বইও কেনে, পড়ে। তুলনায় উপন্যাসের চেয়ে হয়তো কম বিক্রী হয়। কিন্তু উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দিলে এবং পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারলে লোকসান হয় না, বরং লাভই হয়। প্রকাশকরা চান কুইক রিটার্ণ। অল্প মূলধনে বেশী লাভ। সেটা গল্পের বই ছেপে পাওয়া যায় না।

আপনি কি মনে করেন, সব লেখকের পক্ষে নিজের গল্পের বই বের করা সম্ভব?

—না, সম্ভব নয়। প্রকাশক যখন জুটছেন না, তখন অপেক্ষা করে কি লাভ? একটি মাত্র বই ছেপে আসল টাকা তোলার

ধৈর্যও থাকে না। গল্পকাররা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রকাশকের ব্যানারে নিজেদের বই বের করার চেষ্টা করেন, তা হলে লোকসানটা এড়িয়ে যেতে পারবেন বলে মনে হয়। আমি আমার প্রকাশনীর নাম দিয়েছিঃ শুকসারী প্রকাশক। নিজের বই ছাড়াও অন্য দু-একটি বই বের করেছি। যেমন, 'পূর্ব বাংলার গল্প-সংগ্রহ' 'পূর্ব বাংলার কবিতা' ইত্যাদি। কোনো বইতেই এখনো লোকসান যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের পাঠক একচক্ষু নন। কমবেশী সব বই-ই তাঁরা পড়েন।

আপনি কি মনে করেন, প্রকাশকরা তাতে গল্পের বই ছাপতে আগ্রহী হবেন?

—পাঠক আরো না বাড়লে বলা যায় না কিছুই। পাঠকের রুচি বদল করানোর দিকে আমাদের দেশী প্রকাশকদের তেমন আগ্রহ নেই। তাঁরা পরিবেশন করেন পাঠকের রুচি অনুযায়ী গল্প উপন্যাস। আপাতত অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে নিজের বই নিজেই ছেপে যাবো। লোকসান না হলেই হলো। আমার বিশ্বাস, তরুণতম গল্পকারদের বইও বিক্রী হয়, হবে। ও'রা আমার মতো সাহস নিয়ে নেমে পড়তে পারেন।

আমি তাঁর নিভীক সত্যবাদিতায় বিস্মিত, মুগ্ধ।

বললাম ঃ আপনি তো পাঠক মহলে বিশেষ পরিচিত। তাহলে আর নিজের বই বের করছেন কেন গাঁটের পয়সা দিয়ে?

কিছুটা অভিমানের সঙ্গে বললেন, জনপ্রিয়তার জন্যে নয় নিশ্চয়ই। একটা সস্তা প্রেমের দৃশ্য, দুটো চুম্বন কিম্বা নায়িকার সমুদ্র-স্নানের ছবির জোরে পরিচালক একটা নাটককে সাধারণ দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। কিন্তু সত্যিকারের অভিনেতা মার খান অকারণে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যাঁরা জনপ্রিয়, তাঁরা ভালো লেখক নাও হতে পারেন ঐ একই কারণে। সত্যিকারের শিল্পসম্মত দায়িত্বশীল লেখা সমকালে না হোক, পরবর্তীকালে স্মরণীয়। লেখক আর যাই করুন আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেন না। লেখার মধ্যেই প্রকাশ পাবে তাঁর আভিজাত্য, তাঁর মর্যাদা। আমি একাল এবং আগামীকালের পাঠকের কাছে আমার লেখাগুলো পৌঁছে দিতে চাই।

'আজ কাল পরশু' প্রসঙ্গ

জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আজ কাল পরশু'র গল্পগুলো লিখেছেন কদ্দিন ধরে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি ঃ বছর ছয়েক।

সবচেয়ে পুরনো লেখা কোনটি? কোথায় বেরোয়?

—দ্বিতীয় গল্প 'তাহের আলি'। বেরোয় 'পরিচয়ে'। ১৯৬৪-৬৫ সালে হবে বোধ-হয়। ননী ভৌমিক সম্পাদক ছিলেন।

মিহিরবাবু ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথা বলছিলেন। শুনেছিলেন আমার কথা। আজকের বাংলা দেশ, মানুষ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন।

বললাম ঃ এ সংকলনের গল্পগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

আমার হাত থেকে চেয়ে নিলেন বইটা। পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললেন ঃ লিখে নিন। বিস্তৃত বলার সময় নেই। মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারি।

এ বইয়ের প্রথম গল্প ঃ 'সময়'। এই কাহিনী তিনজন মানুষের — সুরপতি, তীর্থনাথ এবং সুরপতির স্ত্রী সতীর। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। সে সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি-টাই ফুটে উঠেছে গল্পের কাঠামোতে।

দ্বিতীয় গল্প 'তাহের আলি'। সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা। তাহের আলি একটা ঐতিহাসিক চরিত্র। ছিলেন ডারবানের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। একজন য়ুরোপীয়ান মহিলাকে রেপ করার মিথ্যা অজুহাতে তার ফাঁসি হয়। গল্পটি বেরোয় 'পরিচয়ে'। শাদা-কালোর সমস্যাটি এ গল্পের পটভূমি।

তৃতীয় গল্প 'সিদ্ধার্থ'। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ডাক্তারদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে লেখা। একেকজন বড় ডাক্তার ৩২।৬৪ টাকা ফি নেন। অথচ তাঁরাও মানুষ। সকলের চিকিৎসার সুযোগ পান না কৃত্রিম আভিজাত্যের জন্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সেবার যোগ নেই। এরকম একজন ডাক্তার মানবতার তাগিদে নেমে এসেছিল সকলের মধ্যে কিন্তু অন্য ডাক্তাররা তা সহ্য করতে সম্মত নন। বিনা পয়সায় তিনি যদি চিকিৎসা করেন, তাহলে অনেকের ব্যবসা মাটি হয়ে যায়। অবশেষে সহযোগী ডাক্তারদের চক্রান্তে তাঁকে ধরা হয় একজন অ্যান্টি-সোস্যাল মানুষ হিসেবে।

চতুর্থ গল্প 'অপরাহ্ন'। ঐ একই স্পিরিটের গল্প। একজন সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে লেখা।

পঞ্চম গল্প 'অবসর'। মনে হয়, মিহির-বাবুর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। একজন রিটায়ার্ড লোকের ট্র্যাজেডি বলা হয়েছে গল্পচ্ছলে।

ষষ্ঠ গল্প 'অন্য আকাশ'। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের দাম্পত্যজীবনের কাহিনী। পেশাগত প্রয়োজনে তাঁকে নানা রকম অসৎ, জুয়াচোর, বদমাস লোকের সঙ্গে নির্মম আচরণ করতে হয়। অথচ দাম্পত্য জীবনে তিনি চান সুখী হতে। তাঁর স্ত্রী এসব পছন্দ করে না। পেশার সঙ্গে জীবনের এই বিরোধ বড় মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীকে বেঁধে রাখতে পারেন নি সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর। স্ত্রী পালিয়ে যায় একজন যুবকের সঙ্গে।

সপ্তম গল্প 'কাক, কুকুর আর লোকটা'। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে লেখা ছোট গল্প। পারস্পরিক সন্দেহ বড় মারাত্মক। ধর্মীয় উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত মানুষের বিবেককে লাঞ্ছিত করে। কোনো এক দাঙ্গায় একটি ভিখারী খুনের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গল্প। হিন্দু না মুসলমান এই ভিখারীটি তাই-বা কে জানে?

অষ্টম গল্প 'জন্তু-জানোয়ার বিষয়ক'। বেরিয়েছিল শুকসারী পত্রিকায়। কিছুকাল আগে রবীন্দ্র সরোবরে যে ঘটনা ঘটে যায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। সেই সময়েরই প্রতিফলন ঘটেছে গল্পের বর্ণনায়।

নবম এবং শেষ গল্প 'আজ কাল পরশু'। বেরোয় 'চতুষ্কোণে'। ১৯৬৬-র পুজোয়। পুরো রাজনীতির গল্প। সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লেখা।

আমি মিহিরবাবুর কথা শুনছিলাম প্রায় বিনা বিতর্কে। গল্পগুলোর বিষয় এবং বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করেছিল অনেক আগেই।

উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ 'সুখে দুঃখে প্রেমে-অপ্রেমে সমর্থনে-বিরোধে জীবনে-মৃত্যুতে অচ্ছেদ্য সঙ্গী, আমার সহ-কর্মীদের উদ্দেশ্যে।'

এর চাইতেও চমৎকার, স্টান্ট-মার্কা উৎসর্গপত্র হয়তো অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু লেখককে চিনে নেবার পক্ষে আন্তরিক উচ্চারণ লক্ষ, করি নি বেশী। মিহিরবাবুর মানসিকতা এবং অভিপ্রায়কে সহজেই উপলব্ধি করা যায় এসব শব্দের মধ্য দিয়ে। ভূমিকায় তা আরো স্পষ্ট।

মিহির আচার্য লিখেছেন ঃ 'সাধারণ মানুষের মতন সাহিত্যকর্মীকে দুটো জীবনের দায় বহন করতে হয়। একটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, যেখানে জীবনের আকাঙ্ক্ষা-গুলো ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমিত। আরেকটি জীবন, যেখানে তিনি সমাজের সমস্যাগুলির অন্তর্ভুক্ত। অনিবার্যতাই এই রচনার দৃষ্টিভঙ্গি তন্ময়। সচেতন লেখক তাঁর রচনায় এই দুটি জীবনের স্বন্দ্বে আকৃষ্ট হন, চিন্তিত হন, কিন্তু কদাপি

ব্যক্তির স্বার্থে সামাজিক অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেন না।'

ব্যক্তিজীবন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

মিহিরবাবুর জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় কাল ১৯৪২। কারণ হিসেবে তিনি বলেন : 'প্রথমত, তখন আমার বয়স ১৫। দ্বিতীয়ত, মালদা জেলা স্কুল থেকে সেবার আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। তৃতীয়ত, সে বৎসর আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিই। চতুর্থত, কলেজে পড়ার জন্য কলকাতায় আসি।'

মনে হয়, চতুর্থ কারণটিই বড়। মফস্বল শহর থেকে কলকাতায় চলে আসা একজন সাহিত্যিকের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। কেননা, কলকাতা আসার আট বছর পরে তাঁর প্রথম গল্পের বই 'নীল চোখ' বেরোয় ১৯৫০ সালে।

মিহিরবাবু বলেন : 'এ বইটি আমার জীবনে প্রথম সাফল্যের প্রতীক। এ গ্রন্থের দুটো গল্প—'নীলচোখ' এবং 'অক্টোপাস'—পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। যুদ্ধের পটভূমিকায় লিখেছিলাম 'নীল চোখ'। আমার এই লেখা পড়ে মেয়েরা সম্পাদককে চিঠির পর চিঠি দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ বইয়ের আটটি গল্প চেক ভাষায় অনূদিত হয় সে সময়ে।'

১৯৫০—৫২ সালের পর জীবিকার তাড়নায় তাঁকে সিভিল সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক্টরের চাকুরী নিতে হয়। মাঝখানে এক বছরের নির্বাসন। লেখা বন্ধ। তিনি বলেন : 'আরো দুটো ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ও ডি পি ও আর নামে বাঙালী গল্পকারদের একটা সংকলন বেরোয় চেক ভাষায়। তাতে আমার 'আকাল' গল্পটি সংকলিত হয়। ইংরেজী 'ক্রুসেডে' পত্রিকাতেও তার অনুবাদ ছাপা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের 'সোভিয়েট লিটারেচার' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার লেখার প্রশংসা করা হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান রাইটার' প্রবন্ধে।'

১৯৫৭ সালে বেরোয় তাঁর 'জোনাকির আলো' উপন্যাস। তখন তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু। এর পর থেকে ছেদ নেই। কেবলই দেখে যাওয়া। কেবলই লিখে যাওয়া। অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে গল্পে আর উপন্যাসে।

জিজ্ঞেস করলাম : ভারতীয় ভাষায় আপনার লেখা অনূদিত হয় নি?

—হয়েছে। হিন্দী, গুজরাতী, অসমীয়া, ওড়িয়াতে। হিন্দীতেই বেশী। বেরিয়েছে 'ধর্মযুগ' 'মায়া' 'মনোহর কহানিয়া' 'কহানী' প্রভৃতি পত্রিকায়। প্রায় পঞ্চাশ খাটটি তো হবেই। 'অমৃতে' প্রকাশিত 'একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস' শীঘ্রই হিন্দী গল্পপত্র 'সারিকা'য় বেরোবে। হিন্দী পাঠকদের অজস্র পত্রাঘাত আমাকে অভিভূত করে তোলে।

অমৃতের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কতদিনের?

—বোধহয় প্রথম বর্ষের শেষ কিম্বা দ্বিতীয় বর্ষের শুরু থেকে। 'অমৃত' আমাকে যতটা স্কোপ দিয়েছে, অন্য কোনো বড় পত্রিকা ততটা দেয় নি। বলা যায়, অমৃতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মনে আছে ওখানে ফোন করেছিলাম : 'গল্প লিখতে চাই।' উত্তর এল : 'আসুন'। গল্প দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ছাপা হলো। গল্পের নাম 'পোশাক'। তারপর থেকে নিয়মিত লিখে আসছি। অমৃতে প্রকাশিত 'শতাব্দীর শব' গল্পটি পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

আজ কাল পরশু এবং একালের ছোট গল্প

মিহিরবাবুর এই গল্প সংকলনটি পড়তে-পড়তে লক্ষ্য করছিলাম, একালের সঙ্গে সেকালের মেল-বন্ধন। অতিসাম্প্রতিক ঘটনাকে তিনি উপহার দিয়েছেন আধুনিকতর মোড়কে পুরে। অর্থাৎ একালের আঙ্গিক ও শব্দোচ্চারণে অভ্যস্থতার স্বাচ্ছন্দ অনুভব করা যায় তাঁর প্রায় প্রতিটি ছোট গল্পে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে তিনি তরুণতমদের থেকে আলাদা।

মিহিরবাবু বলেন : কোনো মানুষই শূন্যের বাসিন্দা নয়, সকলেই সামাজিক প্রাণী। সে জন্যেই দেখি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিছু সামাজিক প্রশ্ন। এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাকে ফিলজফিও বলতে পারেন। আমি সেই ফিলজফিকেই গল্পের মধ্যে সত্য করে তুলতে চাই। সেজন্যেই আমার প্রায় প্রতিটি গল্পই বক্তব্যপ্রধান। আমি আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলার জন্যই ছোট গল্পের আঙ্গিককে বেছে নিয়েছি।

তাহলে কি উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের কোনো বিরোধ কিম্বা পার্থক্য নেই?

—আছে নিশ্চয়ই। তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের। যেমন ছোট গল্প লেখার ক্ষেত্রে, তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে। অনেক সময় আমি উপন্যাসের বিষয়ও ছোট গল্পের মধ্যে বলার চেষ্টা করেছি। যেমন 'আজ কাল পরশু'র নাম-গল্পটা। তার ক্যানভাসটা উপন্যাসের। সংহত হয়েছে ছোট গল্পের আয়তনে।

ছোট গল্প বলতে আপনি কি বোঝেন?

—ছোট গল্পের কোনো বিশেষ ব্যাকরণ নেই। আধুনিক গল্প মুড-নির্ভর, অতিমাত্রায় সাবজেকটিভ। আমি তা মানি না। সাবজেকটিভ মানে সমাজের অঙ্গীকারগুলোকে অস্বীকার করা নয়।

আপনার এ সংকলনের গল্পগুলো কেমন যেন জানা-জানা মনে হয়। এর কারণ কি?

—আমার গল্পের প্রায় প্রতিটি অংশই প্রকাশ্য। গোপনতা আমি পছন্দ করি না। এ ব্যাপারে আমার গুরু টমাস হার্ডি। আমি আমার চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করতে করতে গল্প বলি। অর্থাৎ অ্যানালিটিক্যাল। ফলে পাঠকের কাছে আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। গল্প পড়ে কেউ বলেন না, তারপর? আমি নিজেই সব পাঠককে জানিয়ে দিই।

বিদেশী ছোট গল্প নিয়মিত পড়েন কি? কোথায় সব চাইতে ভালো ছোট গল্প লেখা হচ্ছে?

——ছোট গল্পের কাগজ ছাপি, ছোট গল্প লিখি, অথচ বিদেশী গল্প পড়ি না, তাই কি সম্ভব? আমি নিয়মিত বিদেশী গল্প পড়ি। আমার ধারণা, সব চাইতে ভালো ছোট গল্প হচ্ছে এখন পশ্চিম জার্মানীতে। আমার ভালো লাগে হাইনরিষ বোল, বরশার্ট প্রভৃতির লেখা। গর্কি, শেখভ, মোপাসাঁ, সার্ত্রে, কাম্যু, টমাস মান আমার প্রিয় লেখক।

ছোট গল্পের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিরকালই হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ইদানীং বংলা ছোট গল্পে একসপেরিমেন্ট একটা ফ্যাশানের বস্তু। যে তরুণ লেখক প্রথম গল্প লিখছেন, তাঁর সেই প্রথম গল্পকেই তিনি চালিয়ে দিচ্ছেন পরীক্ষামূলক গল্প হিসেবে। আমার বিশ্বাস, নানা রকম গল্প লিখে যাঁরা হাত পাকিয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরীক্ষামূলক ছোট গল্প লিখতে পারেন।

আপনার এই গল্পগুলোর মধ্যে শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির কোনো টানাপোড়েন আছে কি?

—আমি এখন শহর ও গ্রামের মনোভঙ্গিতে কোনো তফাৎ দেখতে পাই না। আজকাল শহর ও গ্রামের সম্পর্কটা অনেক ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে পুরোপুরি শহরও নেই, গ্রামও নেই। আমরা না শহুরে, না গ্রামীণ।

পথ-চলতি বিশেষ ঘটনা কি আপনাকে গল্প লেখায় উৎসাহিত করেছে?

—কোনো কোনো ঘটনা করেছে। তবে সব ঘটনা নয়। বিশেষ ঘটনাকে আমি আত্মসাৎ করে গল্প লিখি। সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভের ভাগাভাগিতে আমি বিশ্বাস করি না।

'আজ কাল পরশু'তে আপনার নিজের কথা কতখানি আছে?

—সবটাই। আমার সমগ্র সাহিত্যই আত্মজীবনীমূলক। আমি আমার প্রেম, বিরহ, সুখ, দুঃখ, সংগ্রাম, সাফল্য, উজ্জ্বলতা ও বিষাদ—সব কিছুকেই সাহিত্যে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই। দেখাতে ভালোবাসি।

—প্রজ্ঞাদর্শী

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা
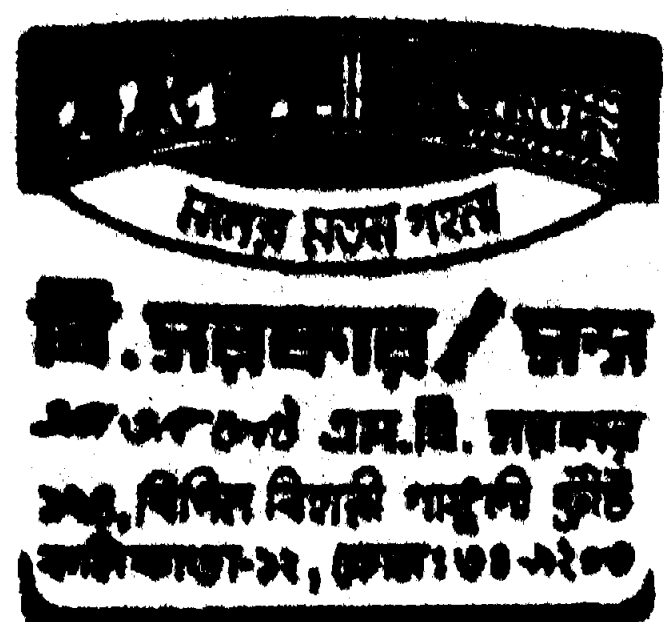
রাত আটটায় সময় দরজায় টোকা পড়ল।

প্রথমে খুব মৃদুভাবে, পরে সামান্য একটু জোরে। বেশ বোঝা গেল যে লোকটা দরজায় টোকা দিচ্ছে, সে অপরিচিত। এবং কপাটে জোরে ঘা দিতেও কুণ্ঠিত।

এদিকটা নির্জন। গাছপালা, ঝোপঝাপ বেশী, এবং সেই সঙ্গে অন্ধকারও। জানালার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত সীমাহীন আকাশটার একটি ছোট্ট অংশ চোখে পড়ে।

অনিমেষ দত্ত ভিতরের ঘরে ছিলেন। দরজায় টোকা পড়ার শব্দ প্রথমে তার কানে পৌঁছয়নি। তার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড লোকটি সন্ধ্যের পরেই চলে যায়। ফের সকালে আসে। অনিমেষ দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটিকে দেখলেন। তার পরনে একটা ছিটের ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে কমদামী সার্ট। পায়ে কাবুলি স্যাণ্ডেল। ব্যাকব্রাশ করা মাথার চুল। হাতে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত ফোলা একটা চামড়ার ব্যাগ। জিনিসপত্রে ঠাসা।

—'আপনি?' অনিমেষ লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন।

—'আমি ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানির লোক স্যার। কিস্তিতে দামী বই কিনবার একটা স্কিম আমাদের কোম্পানি চালু করেছে। আপনি যদি কাইণ্ডলি একটু দেখতেন।'

অনিমেষ বুঝতে পারলেন লোকটি ক্যানভাসার এবং ওকে এড়ানো কঠিন। বই কিনতে আগ্রহ নেই বললেও সে তাকে রেহাই দেবে না। অনিচ্ছুক লোককে বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ করে মাল গছানোই তো ক্যানভাসারের কৃতিত্ব। এবং এই লোকটিও নিশ্চয় ওর লাইনে গুণসম্পন্ন। একবার বই কিনবার ইচ্ছে নেই বললে লোকটি তার মন ফেরাতে এখনই লম্বা বক্তৃতা জুড়বে।

আর সত্যি সে তাই করল।

অনিমেষ চুপ করে আছে দেখে লোকটি বলল,—'আমাদের স্টকে স্যার বড় বড় সব অথরের বই আছে। সমস্ত ফরেন পাবলিকেশন। ইতিহাসের বই তো আছেই,—আরো নানা সাবজেক্ট। আপনার যেমন পছন্দ, যা রুচি হবে। আবার খরিদ্দারের সুবিধের জন্য কোম্পানি ইজি ইনস্টলমেণ্টের ব্যবস্থা করেছে। দুশো টাকার বই কিনলে একটা বুক কেস ফ্রি পাবেন। অথচ দশ-বিশ টাকার মত মাসে কিস্তি।'

তবু অনিমেষ বললেন,—'এত রাত্তিরে আপনি?'

—'রাত্তির একটু হয়ে গেল স্যার।' সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। 'চান খাওয়া সেরে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরেছি। তা গাড়ি লেট,—শিমুলপুরে এল বেলা আড়াইটের সময়। কলেজে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে চারটে বাজে। ওখানে কাজ সেরে আরো দু-তিনজনের

বাড়ি গেছি। সবশেষে আপনার দোরগোড়ায় হাজির হয়েছি।' কথা শেষ করে লোকটি সলজ্জভাবে হাসল।

সন্ধ্যেবেলাটা একা ঘরে বসে অনিমেষের ভারী ঠেকছিল। লোকটি কলকাতা থেকে আসছে। এখানকার কেউ নয়। বইয়ের ক্যানভাসার। ওর সঙ্গে কিছুটা সময় গল্পগুজব করলে মনটা হাল্কা হয়। আপাতত ব্যাগের মধ্যে রাখা বই-টই, কিংবা লিফলেট জাতীয় কিছু থাকলে তা নেড়েচেড়ে তিনি দেখতে পারেন। তারপর ওকে কলেজে দেখা করতে বললেই হবে। তখন নিজের জন্য না হোক, কলেজের জন্য কিছু বই তিনি অবশ্য কিনবেন।

অনিমেষ ওকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। ঢুকতেই ডান দিকে বেশ বড় সাইজের একটা টেবিল। তার উপর কিছু খাতাপত্র, লেখার প্যাড, বই-টই ছড়ানো। দুখানা ভালো চেয়ার টেবিলের দুই দিকে রয়েছে। এ ছাড়াও ঘরের মধ্যে আর একটি বসবার আসন আগন্তুকের চোখে পড়ল। সেটি ইজিচেয়ার,—ঘরের এক কোণে ঠাঁই পেয়েছে।

কাচের আলমারিতে রকমারি কেতাব। শুধু ইতিহাসের বই নয়, নাটক-নভেল থেকে শুরু করে সাধারণ জ্ঞানের বই পর্যন্ত রয়েছে। আগন্তুক ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আলমারির উপর চোখ বুলিয়ে নিল। পরে মৃদু হেসে বলল,—আপনার সংগ্রহ তো বেশ ভালই। বই কিনবার ঝোঁক আছে দেখছি। তাহলে আপনার কাছ থেকে আমিও একটা মোটা অর্ডার পাব স্যর।'

—'না মশায়, না।' অনিমেষ তাড়াতাড়ি বললেন। 'অত বই নিজের কেনা নয়। ওর বেশীর ভাগই আমার এক বন্ধুর।'

—'আপনার বন্ধুর?'

অনিমেষের মুখভাব বদলাল। ফস করে কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নইলে এ কথাটা ওকে না বললেই চলত। লোকটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—'হ্যাঁ, অবশ্য বন্ধুর হলেও বইগুলো সে আমাকেই দিয়ে গেছে। এখন ওগুলো আমারই সম্পত্তি।' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে অনিমেষ ফের বললেন,—'কই আপনার কাছে কি বই-টই আর কাগজপত্র আছে দেখি?'

লোকটা তার পেট-বোঝাই চামড়ার ব্যাগ থেকে খান তিন-চার বই আর কাগজপত্র বের করল। একখানা বই হাতে তুলে সে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে ধরল। অনিমেষ গায়ে একটা সুতির চাদর ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। বইটা নেবার জন্য বাঁ হাতটা বের করবার চেষ্টা করতেই, চাদরটা তার গা থেকে খসে পড়ল। লোকটা অনিমেষের দিকে একবার তাকিয়েই সবিস্ময়ে বলল,—'একি স্যর, আপনার হাত ভাঙল কেমন করে?'

—'আর বলেন কেন?' অনিমেষ একবার ভাঙা হাতের দিকে সস্নেহে তাকালেন। ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অবশ্য প্লাস্টার করতে হয়নি। কিন্তু শক্ত বোর্ড দিয়ে হাতটাকে বেশ কায়দা করে বাঁধা হয়েছে। গলায় এক টুকরো কাপড় বেঁধে ভাঙা হাতটা তারই উপর ভর করে আছে। বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো।

—'তেমন গণ্ডগোল তো কিছু হয় নি স্যর?' লোকটি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল। ফের বলল,—'এখন অল্পের উপর দিয়ে গেলেই রক্ষে।'

—'ঠিক অল্পের উপর দিয়ে নয়।' অনিমেষ আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালেন। 'এটা কোলস্ ফ্র্যাকচার বলেই সন্দেহ হচ্ছে। এক্স-রে করতে হল, দেখা যাক আর কদিন ভোগায়।'

—'আহা।' লোকটা জিভের সাহায্যে একটা শব্দ করে সহানুভূতি প্রকাশ করল। ফের বলল,—'তাহলে তো আপনার খুবই অসুবিধে। লেখা-টেখার কাজও বন্ধ। হ্যাঁ, কি ফ্র্যাকচার বললেন যেন? সে একটু লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করল। কথাটা একবার শুনেও ধরতে পারেনি। সেই অক্ষমতার জন্যই তার লজ্জা।'

—'কোলস্ ফ্র্যাকচার।' অনিমেষ স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন। হেসে বললেন,—'হাতের কব্জি ভেঙে গেলে তাই বলে।'

—'কি জানি স্যর। আমরা মুখ্যু মানুষ। অত ডাক্তার-বদ্যির ব্যাপার-স্যাপার বুঝিনে। শুধু এইটুকু বুঝি যে ডান হাত ভাঙলেই গরীবের কপাল ভাঙল। আসলে ডান হাতই তো আমাদের ভরসা। সেই তো অন্ন জোগাচ্ছে স্যর।' একটা ভালো কথা বলতে পেরে সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসল।

অনিমেষ বাঁ হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন। বইয়ের পাতায় চোখ দেবার আগে শুধু মন্তব্য করলেন, 'তা বটে।'

লোকটি আপনমনে কি চিন্তা করল। ফের অনিমেষের দিকে তাকাল।

—'এখানে আপনি কতদিন আছেন স্যর?' সে প্রশ্ন করল।

—'এখানে?' অনিমেষ বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বললেন।

—'তা বছর আস্টেক হবে।'

—'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অনিমেষ তাকালেন। দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, বিরক্ত ভঙ্গি। ভ্রূ কুঁচকে তিনি বললেন,

—'সে খোঁজে আপনার কি দরকার?'

মুহূর্তে লোকটা যেন মিইয়ে গেল। —'না, কোনো দরকার নেই। মানে এমনিই—'। এতক্ষণ সে বার বার ভাঙা হাতটার দিকে তাকাচ্ছিল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

বইগুলি দেখা শেষ করে অনিমেষ বললেন,—'এ তো খুব সাধারণ বই। কলেজ লাইব্রেরীতে সবগুলোই পাওয়া যাবে। যাই হোক কোম্পানির ক্যাটালগ আর লিফলেটগুলো আপনি রেখে যান। বরং দিন দশেক পরে একদিন কলেজে আসুন। দেখি যদি কিছু বইয়ের অর্ডার তখন আপনাকে দিতে পারি।'

লোকটি তবু বলল,—'দেখবেন স্যর, আমি অনেক আশা নিয়ে যাচ্ছি। অর্ডারপত্র না জোগাড় করতে পারলে আমার চাকরি থাকবে না। গরীব মানুষ,—চাকরি গেলে না খেয়ে মরব।'

অনিমেষ কোনো কথা বললেন না। শুধু একটু হাসলেন। লোকটি তার চামড়ার ব্যাগে বইগুলি ভরল। তারপর অনিমেষকে একটা নমস্কার ঠুকে ঘর থেকে বেরোল।

বাইরে ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার। শ্লেট রঙের আকাশের বুকে গ্রহ-তারার উজ্জ্বল আসর। দুধ শাদা বিস্তীর্ণ ছায়াপথ, প্রায় অন্তহীন। ......ঝোপে-ঝড়ে, গাছের চারপাশে জোনাকিদের মেলা।

অনিমেষ দত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে লোকটি কিন্তু তার গন্তব্যস্থলে গেল না। নির্জীবের মত পা ফেলে সে অল্প একটু পথ হাঁটল। তবে সেটা নেহাৎই ভান। কারণ কিছুদূর এগিয়ে সে আবার পিছন ফিরল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফের অনিমেষের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল, লোকটি মাথা নীচু করে সেদিকে এগোল। আত্মগোপনের ভঙ্গিতে ঘরের জানালার ঠিক নীচে এসে বসল। মিনিট দুই তিন পরে লোকটি আবার মাথা তুলল। গৃহস্বামী এখন কি করছে, তাই দেখবার জন্য সে চোরের মত সতর্কভাবে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাল। মিনিট পাঁচ-সাত একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে লোকটি নিজের মনে একটু হাসল। তারপর শত্রুসৈন্য যেমন করে বুকে হেঁটে এগোয়, অনেকটা তেমনি কৌশলে কিছুটা দূরে যাবার চেষ্টা করল। খানিকটা গিয়ে সে আবার মানুষের মত দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা লম্বা পা ফেলে জমাট কালো অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হল।

•

পরদিন সকাল নটার সময় রাজীবকে শিমুলপুর স্টেশনে দেখা গেল। তার বেশবাস সাদাসিধে, সামান্যই। কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু কৌশল আর কারিকুরি আছে।

যারা রাজীবকে ভালো করে জানে, তাদের পক্ষেও ওকে একনজরে চেনা কঠিন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধের উপর চাদর। পায়ে চটিজুতো। রাজীব গোঁফ কামায়। কিন্তু তার নাসিকার ঠিক নীচে ঘনকৃষ্ণ গোঁফটি আজ বিচিত্র এবং রীতিমত দর্শনীয়। যে কেউ দেখলে ভাববে দীর্ঘদিনের পরিচর্যার পর লোকটি এমন সুদৃশ্য গোঁফের অধিকারী হতে পেরেছে।

রাজীবকে খুব চিন্তিত মনে হল। একটা বুক সমান উঁচু ট্রি-গার্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে কাউকে লক্ষ্য করছিল। আসলে পলাশপুর থেকেই রাজীব লোকটার পিছু নিয়েছে। বাসে ও উঠল সামনের দরজা দিয়ে, —কাছাকাছি একটা সীটে বসল। আর রাজীব খানিকটা দূরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাসটা মেয়ে-পুরুষে সম্পূর্ণ বোঝাই হলে সে পিছনের দরজা দিয়ে উঠে এককোণে দাঁড়াল।

ট্রেন এসে ঢুকতেই লোকটি আর দেরি করল না। তার হাতে মাঝারি সাইজের একটা চামড়ার ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। সামনেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা দেখে সে উঠে পড়ল। ঠিক পাশেই আবার থার্ডক্লাস বগী। রাজীব প্রায় নিঃশব্দে সেই কামরাটিতে উঠল। দরজার ঠিক সামনেই একটি সীট ছিল। রাজীব সর্বাগ্রে খালি আসনটি দখল করে নিশ্চিন্তমনে সিগারেট ধরাল।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই রাজীব প্রমাদ গনল। প্ল্যাটফর্মে বেজায় ভিড়। এরপর লোকটিকে ফলো করা প্রায় অসম্ভব। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ও যদি একটা ট্যাক্সি নেয়, তাহলেই এত পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে। রাজীব কখন ট্যাক্সি পাবে তার ঠিক কি? আর পেলেও কোথায় রাস্তার ক্রশিং-এ রাজীবের গাড়িটা হয়ত সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর সেই ফাঁকে ওর ট্যাক্সিটা ডাইনে-বাঁয়ে কোন পথে যে ঢুকে পড়বে, তার অন্ধিসন্ধি বের করা দুরূহ এবং অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু রাজীবের কপাল ভালো। লোকটি ট্যাক্সি নিল না। বালীগঞ্জগামী একটা বাসে উঠল। রাজীবের সুবিধে হল। লোকটি একটু ভিতর দিকে যেতেই সেও বাসের হাতল ধরে পিছনের দরজার ফুটবোর্ডে পা দিল। এখানে দাঁড়িয়ে ওর গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজ। নইলে কখন ও বাস থেকে টুপ করে খসে পড়বে, রাজীব তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না।

শেয়ালদার মোড়ে এসে লোকটি বাস থেকে নামল। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার আগেই রাজীব ওর পিছু নিল। কিছুদূর গিয়ে লোকটি একবার পিছন ফিরে তাকাল। রাজীব সতর্কতার সঙ্গে একটি ফলের দোকানের উপর তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল। যাতে ওর মনে সন্দেহের ছায়াপাত না হয়। আড়চোখে লোকটির মুখের উপর চোখ বুলিয়ে সে আবার ফলের দর দাম শুরু করল। না, ওকে বেশ নিশ্চিন্তই মনে হল। রাজীবের উপস্থিতি বোধ হয় টের পায় নি।

আরো কিছুদূর হেঁটে ডানদিকে ডাকঘর। লোকটা কোনো দিকে না তাকিয়ে পোস্টঅফিসের মধ্যে ঢুকল। বড় ডাকঘর ভিতরে অনেক লোকজন। আসা-যাওয়া লেগেই আছে। লোকটি মনিঅর্ডার কাউন্টার থেকে একটি ফর্ম নিয়ে একপাশে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে কলম বের করে, তাতে নাম-ঠিকানা এবং টাকার অঙ্ক লিখে ফেলল।

এই ফাঁকে রাজীব পিছন দিকের দরজা দিয়ে পোস্ট-অফিসের ভিতরে ঢুকল। একেবারে কোণের দিকে গাল-তোবড়ানো এক বুড়োর কাছে গিয়ে সে ফিস-ফিস করে কিছু বলল। লোকটি কাজ করছিল। রাজীবের কথা শুনে সে কলম ফেলে ওর মুখের দিকে চাইল। তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে চোরাদৃষ্টিতে মনিঅর্ডার কাউন্টারের দিকেও তাকাল। রাজীব এবং বুড়ো দুজনেই লক্ষ্য করল, আগন্তুক পকেট থেকে টাকা বের করে ডাকঘরের কেরানীর হাতে দিচ্ছে। মনিঅর্ডার হলে পর লোকটি হাত বাড়িয়ে রসিদখানা নিল। চোখ বুলিয়ে একবার সেটি পরীক্ষা করল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে ফের ডাকঘর থেকে বেরোল।

রাজীব আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। গলা নামিয়ে বুড়ো লোকটির সঙ্গে দু-একটি কথা সেরেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। এখনই ওকে চোখের আড়াল হতে দিলে চলবে না। আরো কিছুক্ষণ লোকটিকে সে অনুসরণ করবে। ও কোথায় যায়, কি করে সমস্ত কিছু তার বিশদভাবে জানা দরকার।

লোকটি কিন্তু বেশী দূর গেল না। পাশেই সরু একটা গলির ভিতর সে ঢুকল। তিন চারটে নম্বরের পরেই একটা মান্ধাতার আমলের পুরাতন বাড়ি। তিনতলা গৃহ। রঙচটা নোনা ধরা দেওয়াল। ঢুকবার মুখেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহার অন্ধকার। লোকটি কয়লা-খনির শ্রমিকের মত সহজ স্বচ্ছন্দ পায়ে সেই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল।

পিছু পিছু রাজীবও বাড়ির মধ্যে ঢুকল। চেহারা দেখেই সে আন্দাজ করেছিল, এটা ভাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু বাইরেটা যতখানি হতাশাব্যঞ্জক, ভিতরটা ঠিক তা নয়। লোকজন আছে। সিঁড়ি বেয়ে মেয়েরা উপরে উঠছে। কেউ বা নামছে। ছোট ছেলেমেয়েরা একতলায় উঠোনে কলরব করে খেলা শুরু করেছে। একটা বাচ্চাছেলে পা পিছলে পড়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

লোকটি কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল। দোতলায় পাশাপাশি তিন-চারখানা ঘর। বাঁদিকের কোণের ঘরটার তালা খুলল। নীচে দাঁড়িয়ে রাজীব লক্ষ্য করল, লোকটি ঘরে ঢুকেই দরজাটা ফের বন্ধ করে দিল।

এখন ও দৃষ্টির আড়াল। অগত্যা রাজীব বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নামল। উল্টোদিকে কয়েক পা গেলেই একটা সিগারেটের দোকান। সময় কাটাতে সে ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে রাজীব সেটি ধরাল। তারপর আয়েস করে বার দুই-তিন সিগারেটে টান দিয়ে ব্যাপারটা আগাগোড়া চিন্তা করবার চেষ্টা করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটি দরজার মুখের ঘুপচি অন্ধকার অতিক্রম করে আলোয় এসে দাঁড়াল। রাজীব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল ওর হাতে পুরানো চামড়ার ব্যাগটি আর নেই। নিশ্চয় দোতলার ঘরে ওটি রেখে এসেছে। সে খানিকটা এগিয়ে যেতেই রাজীব পুনরায় ওর পিছু নিল। চালচলন দেখে মনে হল লোকটির এখন আর কাজের তাড়া নেই। সে বন-জঙ্গলের বৃহৎ প্রাণীর মত হেলতে-দুলতে, ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে। সময়টা দুপুর। বারোটা কখন বেজেছে। সূর্য মাথার উপর ছিল। এবার হেলতে শুরু করেছে। গলিপথ লোকজন কম। সুতরাং রাজীব খানিকটা দূরে থেকে ওকে অনুসরণ করে চলল। গলিটা বেশ বড়। একটা অতিকায় পাহাড়ী সাপের মত এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে। মিনিট পাঁচেক পরে গলিটা বড়

রাস্তায় এসে শেষ হল। লোকটি রাজপথে নেমে ডানদিক ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল। ফের অন্য একটা গলির মধ্যে ঢুকল। রাজীব টিমেতালে হাঁটছিল বলে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল। এখন জোরে পা চালিয়ে ওর সঙ্গ ধরবার চেষ্টা করল। নইলে কখন কোন বাড়ির দরজায় ও পা বাড়িয়ে বসবে, রাজীব হাজার কৌশলেও তা বের করতে পারবে না।

গলিতে ঢুকেই রাজীব একটু থমকে দাঁড়াল। নিতাইহরি কবিরাজ লেন। চেনা গলি। নামটা ক'দিন আগেই সে শুনেছে। রাজীব ইচ্ছে করেই আবার একটু পিছিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। এবার তার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। লোকটি হঠাৎ যদি পিছন ফিরে তাকায়, তাহলে রাজীবকে দেখেই তার সন্দেহ হবে। সে বুঝতে পারবে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সুতরাং ব্যবধান একটু বেশী হওয়াই ভালো।

মিনিট দুই-তিন পরে লোকটি একটা পুরাতন দোতলাবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। রাজীব যা ভেবেছিল তাই। ওকে এখন বেশ সতর্ক বলেই মনে হচ্ছে। প্রথমে সে সামনের দিকটা ভালো করে দেখল। তারপর উল্টোদিকে মুখ করে একবার পিছন দিকেও তাকাল। হয়ত রাজীবকে সে দেখতে পেত। কিন্তু গোয়েন্দার কপাল ভালো। রাজীব অনেকখানি তফাতে হাঁটছিল। তার সামনেই একজন লম্বা মতন ভদ্রলোক গলি-পথ ধরে যাচ্ছিলেন। নিজের মুখটি কৌশলে সে অগ্রবর্তী মানুষটির আড়ালে গোপন করল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই রাজীব বড় বড় পা ফেলে সেখানে এল। দরজা খোলাই ছিল। এবং সে হয়ত ভিতরে ঢুকত। কিন্তু হঠাৎ কি যেন লক্ষ্য করে রাজীব থমকে দাঁড়াল। দরজার মাথার উপরেই বাড়ির নম্বর সাঁটা—চৌদ্দ নম্বর। তার একটু নীচেই সবুজ রঙ দিয়ে লেখা—প্রবাসী মেস। নামটার দিকে নজর পড়তেই ওর মুখখানি আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল।

রাজীব আর দেরি করল না। লোকটির গতিবিধি তার জানা হয়েছে। মাথা চুলকে সে একটু ভাবল। তারপর আগের মতই লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগোল।

●

পোস্টঅফিসের সেই বুড়ো রাজীবকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল,—এই যে মশায়, আপনি এসে গেছেন। দেরি দেখে আমি সাত-পাঁচ ভাবছি। কোথায় আবার ফেঁসে গেলেন। আমাদের আবার সব প্যাক করে পাঠাবার আয়োজন করতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজীব লজ্জিত-ভাবে হাসল। সত্যি তার দেরি হয়েছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সে ফিরবে বলেছিল। কিন্তু এখন প্রায় এক ঘন্টা হতে চলল। আরো দেরি হলে পোস্টঅফিসের কাজ-কর্মের নিশ্চয় খুব অসুবিধে হত।

মনিঅর্ডার ফর্মটা হাতে নিয়ে রাজীব খুব অবাক হল। এর মধ্যেও একটা রহস্যের গন্ধ। মিনিট দুই-তিন চিন্তা করেও বিষয়-টির কোনো কূলকিনারা সে করতে পারল না। এটা কার লেখা? তবে কি পোস্ট-অফিসের লোকেই কোনো ভুল করল? কিন্তু সেই সবুজ কালি। হস্তাক্ষরও তার চেনা। রাজীব পকেট থেকে ছোট ডায়েরি বইটা বের করে, দরকারি অংশগুলি নোট করল। লেখা হলে মনিঅর্ডার ফর্মখানা সে বুড়োর হাতে ফেরৎ দিল। রাজীব যখন পোস্টঅফিস থেকে ফের বেরোল তখন তার মুখখানা যৎপরোনাস্তি গম্ভীর, কপালে চিন্তার ছোট-বড় রেখা। তাকে দেখেই মনে হবে, গভীরভাবে সে অন্য কিছু ভাবছে। অথচ চেষ্টা করেও জট ছাড়াতে পারছে না।

তিনতলা বাড়িটায় ঢুকবার সময় রাজীব কোনো দিকে তাকাল না। পায়রার খোপের মত প্রতি ঘরেই ভাড়াটের বাস। বড় বাড়ি। কত লোকে থাকে তার ঠিক নেই। চেনা-অচেনা মানুষজনের আনাগোনা লেগেই আছে। আসা-যাওয়া নিয়ে কেউ অত মাথা ঘামায় না। আসলে কে কার খোঁজ রাখছে?

দোতলায় উঠেই রাজীব বাঁদিকের কোণের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। পকেটে হাত চালিয়ে ছোট-বড় দুটি চাবির মত বস্তু সে সযত্নে বের করল। সাধারণ টেপা-তালা। দরজা খুলতে রাজীবের মিনিট-খানেকও সময় লাগল না। ছোট কাঠিটা দিয়ে ঠিক জায়গায় বার দুই চাপ দেবার চেষ্টা করতেই খুট করে তালা খুলল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাজীব দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। ছোট ঘর,— বেশ স্বল্প আয়তন। মেঝের উপর একটা চৌকি পাতবার পর আর সামান্য জায়গাই পড়ে আছে। ঘুরতে ফিরতে গেলে গা ঠেকবে। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। খাটের উপর খুব সাধারণ একটা বিছানা গোটানো রয়েছে। পাশেই তাকের উপর খান দুই-তিন বই। একটা গায়েমাখা সাবান, তেলের শিশি এবং টুকিটাকি আরো কটা জিনিস সে দেখতে পেল।

বিছানাটা একটু সরাতেই চামড়ার ব্যাগটার হদিস পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে পরীক্ষা করবার জন্য রাজীব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওর ব্যস্ততা দেখে মনে হয়, যেন ব্যাগের মধ্যে হীরে-জহরৎ লুকোনো আছে। এবং সত্যিই রাজীবের চোখদুটি হঠাৎ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাল। মুখখানা চাপাহাসিতে ভরে উঠল। মনে হল সোনাদানা, কিম্বা হীরে-জহরৎ নয়, ব্যাগের মধ্যে তার চেয়েও দামী কোনো বস্তু সে আবিষ্কার করেছে।

অন্য কেউ হলে ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠত। উত্তেজনায় এবং আনন্দে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াত। কিন্তু রাজীব অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। ব্যাগটি সযত্নে বন্ধ করে সে ওটি বগলদাবা করল। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে পা ফেলে ঘর থেকে বেরোল। দরজায় তালা লাগিয়ে আগের মতই কোনো দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

●

রাজীব যখন অ্যাটর্ণীর অফিস থেকে ছাড়া পেল, তখন বেলা আর বাকি নেই। বাড়ির আনাচেকানাচে, ইডেনের সবুজ মাঠে এবং পথের বুকে অপরাহ্নের ঘন ছায়া। গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাই-কোর্টের বাড়ির চূড়োয় এখনও একফালি মরা রোদ্দুর।........

সৌভাগ্য নিশ্চয়। রাস্তায় পা দিয়েই রাজীব একটা খালি ট্যাক্সি পেল। হাত বাড়াতেই সেটা থামল। গাড়িতে উঠে রাজীব শুধু বলল, —'হাওড়া স্টেশন।' তারপর গদিতে হেলান দিয়ে সমস্ত বিষয়টি সে মনের মধ্যে ফের নাড়াচাড়া শুরু করল। ব্যাপারটা এত গোলমেলে এবং জটপাকানো যে ঘটনার কার্যকারণ নিরূপণ করতে রাজীবও হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছে। রহস্যের কায়া তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে ফের পিছলে পালিয়ে যেতে চাইছে।

মুখ তুলে রাজীব তাকাল। স্টেশন আর দূরে নয়। আবছা অন্ধকারে হাওড়ার পোলটা ভ্রূকুটির মত বাঁকা বলে মনে হয়।

রাজীব যখন পলাশপুরে এল, তখন ঘড়িতে প্রায় দশটা। অত রাত্তিরে সুব্রত তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজীবের সাজ-গোজ দেখে সে সহাস্যে বলল—'কি ব্যাপার রাজীবদা? এমন নটবর বেশে কোথায় গিয়েছিলেন?'

নকল গোঁফটা আস্তে আস্তে টেনে তুলল রাজীব। বলল,—'গিয়েছিলাম অনেক দূর হে। সে কথা পরে বলব। কিন্তু তোমার খবর কি?'

—ভালো খবর নয়। মিসেস রায় আত্ম-হত্যা করেন নি, মরফিন ইনজেকশন দিয়ে তাকে কেউ খুন করেছে। এই সংবাদ এখন শহরে চাউর। সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছে। লোকে নীপাদেবীর স্বামীকেই সন্দেহ করে। পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না, তাই জানতে চায়।'

—'হুম!' রাজীব মাথার চুলে হাত বুলোতে শুরু করল। বলল,—'শিগগিরই আমরা খুনীকে গ্রেপ্তার করব সুব্রত। ও নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করো না।'

সুব্রত উৎসাহে কিছুটা এগিয়ে বসল। মুখ উজ্জ্বল করে সে বলল,—'খুনী কে তা আপনি জানতে পেরেছেন রাজীবদা?'

—'শুধু নামটাই জানতে পেরেছি।' চিন্তিত মুখ করে রাজীব বলল। 'তবে এখনও অনেক কিছু জানবার বাকি।'

—'লোকটা কে রাজীবদা?' সুব্রত তাড়া-তাড়ি বলল। 'নামটা আমাকে বলুন না।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। নাম বললেও তুমি তাকে চিনতে পারবে না সুব্রত। কারণ সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও তার মুখে আলো পড়ে নি।'

তবু সুব্রত অনুনয় করল—'সে কে রাজীবদা? কি নাম, আমাকে বলবেন না?'

রাজীব রহস্য করে হাসল। 'তার নাম সুরেশ্বর, সুরেশ্বর নন্দী।'

(চলবে)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী
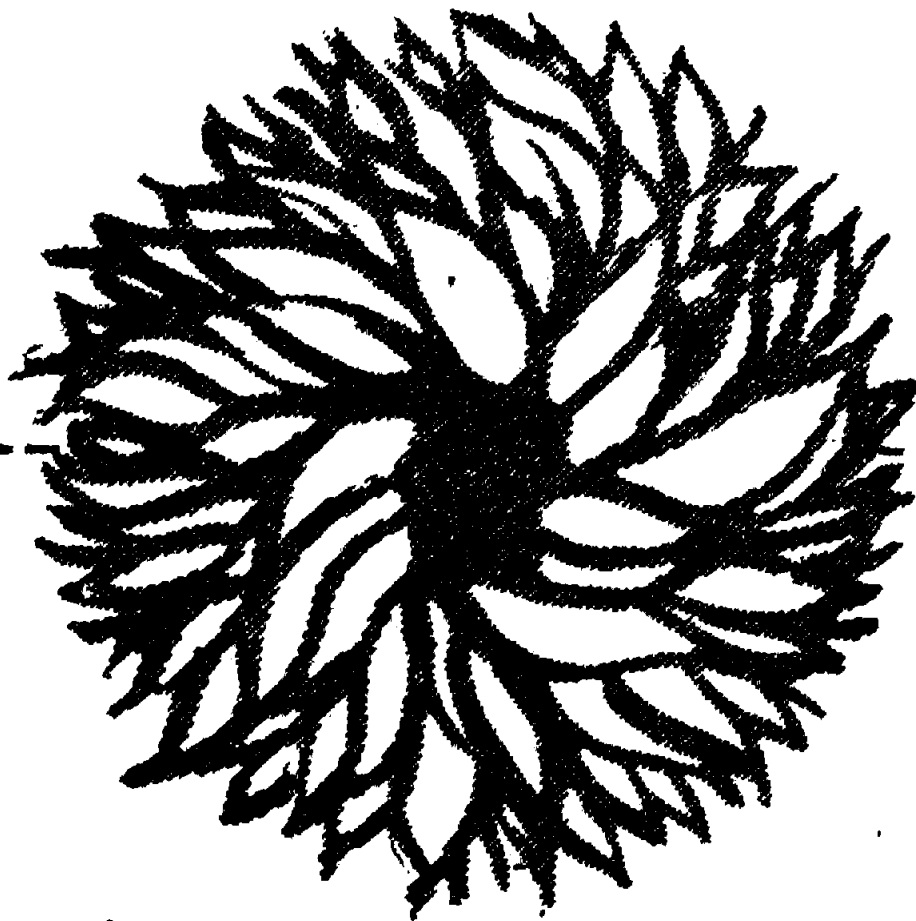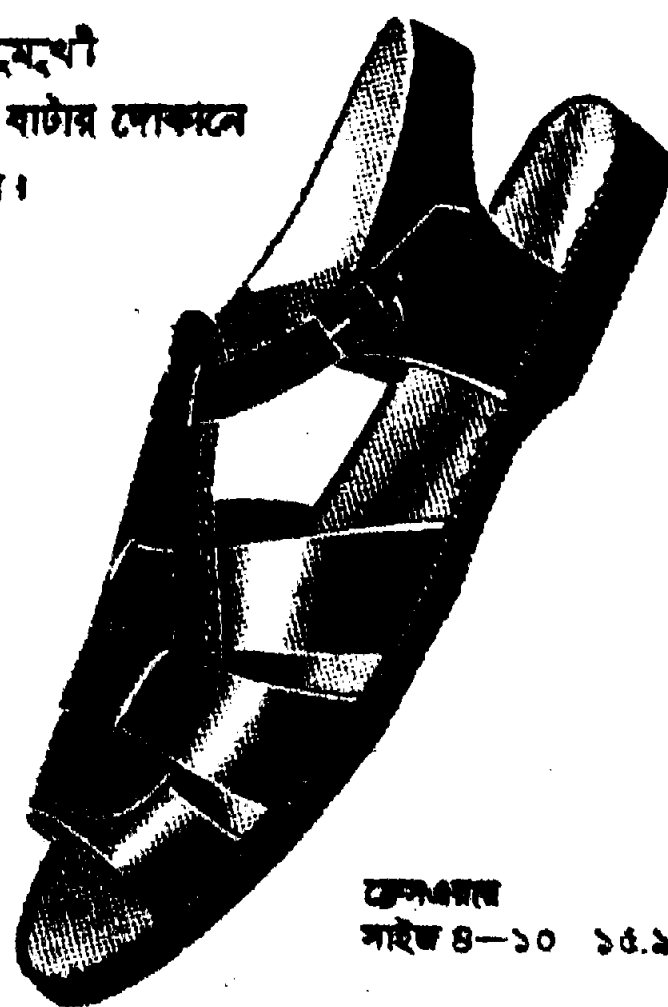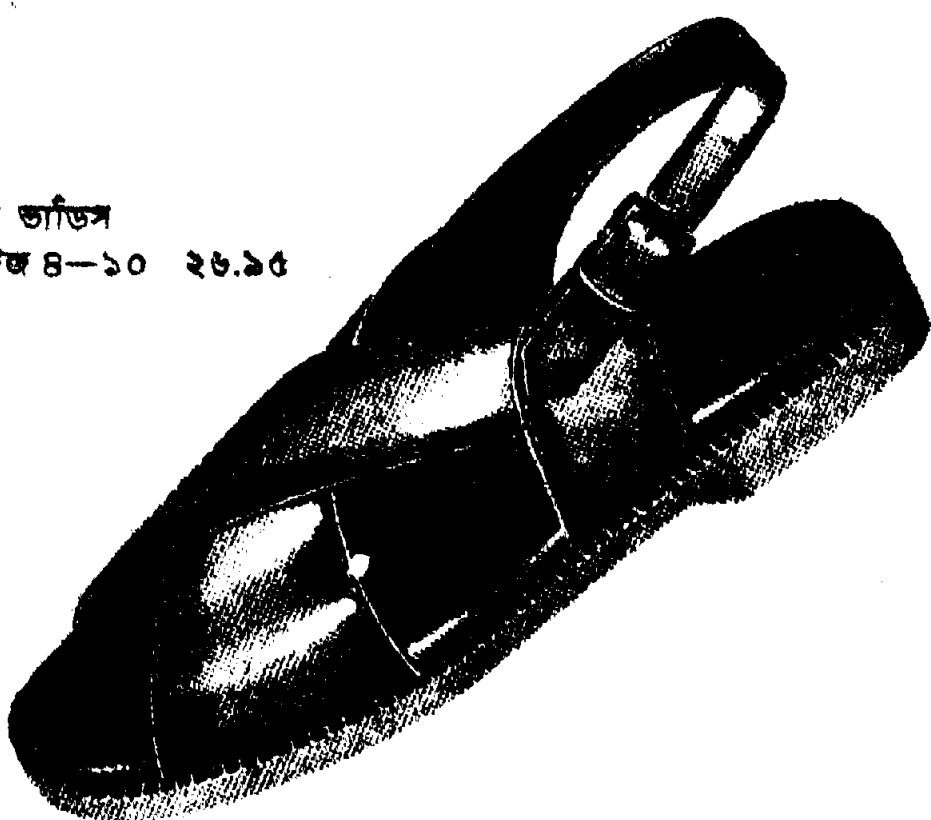
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওখানে থাকবার কোনো জায়গা না পেয়ে আমরা চলে এলাম তাঁচিঝোরায়—হাজারিবাগ থেকে ১৭ মাইল দূরে। এইখানে শিওয়ান নদীর সেতু বেশ দেখবার মতো। আমরা তাঁচিঝোরায় ডাকবাংলোতে এসে বিশ্রাম করলাম। সেই সন্ধ্যার সময় আমরা হাজারিবাগ টাউনের দিকে যাত্রা করলাম। কিন্তু হাজারিবাগ টাউনে না থেমে চলে গেলাম সোজা রাঁচির পথে—একটানা ৫৭ মাইল পথ। কিন্তু রাঁচিতেও কোন হোটেলে স্থান পাওয়া গেল না। শেষকালে স্টেশনের রেস্তোঁরায় নৈশাহার শেষ করলাম।

জায়গাই যখন পাওয়া গেল না, তখন আর থেকে কি হবে। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম—এবার ফেরার পথে। এলাম পুরুলিয়ায়—দূরত্ব ৭২ মাইল।

পুরুলিয়া পৌঁছুতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। রাস্তাঘাটেও লোক চলাচল নেই বললেই হয়। রাস্তাও তেমন ভাল নয়। দীর্ঘ পথ মোটর চালিয়ে রায়ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ রাস্তায় একজন লোকের দেখা পাওয়া গেল—তাকে জিজ্ঞেস করলুম : ডাকবাংলোটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটি মোটরের তীব্র হেড-লাইটে একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর বিড় বিড় করে সামনের দিকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল। আমরা সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম। কিছুদূরে যেতেই বজ্রগম্ভীর স্বরে একটি আওয়াজ ভেসে এল : হল্ট—হুকুমদার।

গাড়ীর হেড-লাইটে দেখা গেল দুজন সশস্ত্র প্রহরী বন্দুক উঁচিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রায় তো সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী থামাল। সেন্ট্রি দুজন এগিয়ে এসে বলল : ইধার কাঁহা যাতা?

আমি বললাম : কি ব্যাপার কি? আমরা যাব ডাকবাংলোয়।

'ডাকবাংলো ইধার নেহি—উধারসে যাইয়ে।' বলে দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা সেইদিকেই চললাম আবার।

ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম বটে কিন্তু সেখানে অনেক ডাকাডাকির পর চৌকিদারসায়েব উঠে দরজা খুলে দিল। আমরা ভিতরে তো ঢুকলুম, কিন্তু প্রচন্ড খিদে পাওয়া সত্ত্বেও একদানা খাবারও জুটল না আমাদের অদৃষ্টে। যাই হোক, খাওয়া না হোক শোওয়া তো হল।

দীর্ঘ মোটর-ভ্রমণের ক্লান্তিতে শোওয়া-মাত্রেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল যখন তখন সকাল আটটা।

তারপর স্নানটান সেরে বেশ ভালভাবে প্রাতরাশ সেরে দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়লুম ধানবাদের পথে। ধানবাদ পৌঁছলুম বেলা সাড়ে বারোটা নাগাত। ওখানে বাজারে এক হোটেলে গিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে শরীর ঠান্ডা হল।

একটু বিশ্রাম করেই আবার রওনা হলাম। এবার কলকাতার দিকে। ইচ্ছে ছিল যাবার পথে বরাকর ডাকবাংলোয় কিছু সময় থাকবো, কিন্তু হলো না। বাংলো বন্ধ। চৌকিদার গেছে পাশে গ্রামের বাড়িতে। লোকজন না থাকলে সে এমনি করে।

রায় বললে, চলুন, কার্মাটারে আমার বাড়ী আছে, সেখানেই রাতটা কাটাবো।

বললাম, বেশ, তাই চলো।

সন্ধ্যে হলো কার্মাটারে পৌঁছতে। কিন্তু রায়ের বাড়ী খালি নেই। মালী জানালো, আগে থেকে একজন ভাড়াটে এসেছে। সুতরাং সেখানে আর স্থান হলো না। শেষটা মালীই আর একটা বাড়ী ঠিক করে দিলে।

বাড়ীটা ছিল পোড়ো বাড়ী। তবুও সেই বাড়ীতেই উঠলাম।

রাঁচী থেকে কয়েকটা মুরগী এনেছিলাম। তারই দুটো কেটে রান্না করলো মালী। আর বাজার থেকে পাঁউরুটি কিনো আনানো হলো।

সে-রাত্রে মুরগী ভালোই রান্না করেছিল মালী।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতায় রওনা হলাম। আমার থাকার উপায় ছিল না, কারণ পরদিনই থিয়েটার আছে কেদার রায়।

কেদার রায় তখনো অপ্রতিহত গতিতে চলছে।

এই সময় নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায়ের কারাগার অভিনয় হলো। আমি কংসের ভূমিকায় অভিনয় করলাম।

কী জানি কেন, ছুটে বেড়াবার নেশা আমার। এই তো সেদিন খানিক বেড়িয়ে এলাম। আবার নভেম্বরের ১৫ তারিখে বেরিয়ে পড়লাম। মোটর ভ্রমণে। এবারে গেলাম বরাকরে 'কল্যাণেশ্বরী' মন্দির দর্শন করতে।

রাত্রে কারাগার অভিনয় শেষে বেরিয়ে শেষরাত্রে বরাকরের ডাকবাংলোতে আশ্রয় নিলাম। এই বরাকরের নদীই হলো বাংলা-বিহারের সীমারেখা। সকালে বরাকর নদীতে স্নান সেরে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে গেলাম দেবী দর্শন করতে।

এই কল্যাণেশ্বরীর ওপর আমার দারুণ বিশ্বাস এবং আকর্ষণ। এইখানেই আমার চিত্রজীবন শুরু। আমার প্রথম ছবি 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর শুটিং এইখানেই হয়েছিল। তারপর ম্যাডানের নির্বাক ছবি 'প্রেমাঞ্জলী' ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া থেকে নেওয়া ছবির শুটিং-ও হয় এখানে। আরো দু-তিনবার এখানে এসেছি। একবার আমার সঙ্গে ভূমেনও এসেছিল। কল্যাণেশ্বরী মূর্তির স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে। এ-পথে কোথাও গেলে দেবী দর্শন না করে যাইনি।

যাই হোক, কল্যাণেশ্বরী মন্দির-চত্বরে এসে যখন দেবী-মূর্তির সামনে দাঁড়ালাম, তখন মনটা ভরে গেল এক অ[illegible]চনীয় প্রশান্তিতে।

এরপর আমরা চলে এলাম নদী পেরিয়ে বিহারের একটি গ্রামে—চিরকুন্ডায়। মনোরম গ্রাম। এখানকার ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করে পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে সাড়ে বারোটার সময় কলকাতা রওনা হলুম। কলকাতা পৌঁছলুম সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করেই ছুটলুম রেডিও স্টেশনে। সেদিন আমার রেডিওতে 'মিশরকুমারী' অভিনয়।

তখন বয়স কম ছিল—পরিশ্রম করতে পারতুম। কাজ করতে কখনও আমি ক্লান্তি বোধ করিনি।

এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার তখন খুললেন 'পরশুরাম'।

ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে সম্মিলিত শিল্পীদের নিয়ে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হয়। এতে আমি নামলুম 'প্রতাপে'র ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, সরযূবালা, আঙুরবালা প্রভৃতি।

এইদিনই খবরের কাগজে যে-সংবাদটি সারা পৃথিবীর লোককে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল সেটি হল, রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা। ঘোষণাটি হল তিনি আমেরিকাবাসিনী মিসেস সিম্পসনকে বিবাহ করবেন। ডিভোর্স-করা কোন মহিলাকে বিবাহ করা ব্রিটিশ রাজপরিবারে নিষিদ্ধ, সুতরাং একে বিবাহ করলেই তাঁকে রাজ্যত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অষ্টম এডওয়ার্ড (যিনি ছিলেন ভূতপূর্ব প্রিন্স অফ ওয়েলস) প্রেমের দাবীকেই বৃহত্তর সম্মান দিয়ে এই ঘোষণার পর রাজ্যত্যাগ করলেন এবং 'Holf hound' নামক রণতরীতে চেপে ইংলন্ড ত্যাগ করলেন। হৃদয়ের দাবীর কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাবী ম্লান হয়ে গেল।

১৪ ডিসেম্বর ষষ্ঠ জর্জকে ঘোষণা করা হল ইংলণ্ডের রাজা বলে। ডিউক অফ উইণ্ডসর ভিয়েনার কাছে ব্যারণ রথসচাইল্ডের অতিথিরূপে বাস করতে লাগলেন।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, সপ্তাহখানেক আগে কালী ফিল্মস 'হারানিধি' নামক একটি ছবির জন্যে আমার সঙ্গে চুক্তি করে গেলেন। তিনকাড়িদা ছিলেন এর পরিচালক।

১৫ ডিসেম্বর ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা) রাধা ফিল্মের 'বিষবৃক্ষ' ছবির মুক্তিলাভ ঘটে। এতে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকাটি আমি করি। নির্বাক যুগেও আমিই ম্যাডানের হয়ে এই ভূমিকাটি অভিনয় করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গোরার নাট্যরূপ দিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯ ডিসেম্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাট্যনিকেতনে গোরার উদ্বোধন করলেন। প্রথম দিন অভিনয়ে নাটক শেষ হতে লেগেছিল ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে নাটক চলতে পারে না, সুতরাং নাটককে সংক্ষিপ্ত করার কাজ আরম্ভ হলো পরদিন থেকে।

গোরায় পরেশবাবুর ভূমিকায় ছিলাম আমি, নরেশ মিত্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন পানুবাবুর চরিত্রে, সুচরিতার ভূমিকাটি ছিল শান্তি গুপ্তার, আর নামভূমিকায় ছিলেন ভূমেন রায়।

এই স্টারেও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' আরম্ভ হোল। সেটিরও উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকে মধুসূদনের চরিত্রে ছিলেন শিশিরকুমার, আর কুমুদিনীর ভূমিকায় ছিলেন কঙ্কাবতী।

কলকাতার দুটি বিখ্যাত মঞ্চে তখন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৬-এর শেষ পর্যায়ে আর এমন কিছু ঘটনা নেই। ১৯৩৭-এর শুরুতেই এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না। তবে একটি ছবির কথা না বলে পারি না। ছবিটি হলো শিশিরকুমার পরিচালিত 'টকী অফ টকীজ'। শ্রীতে মুক্তিলাভ করেছিল। ছবিটিতে আমি করেছিলাম [illegible] ডাক্তার। ছবিটি ভালোই চলেছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমাকে প্রায়ই এখানে-ওখানে নাটক অভিনয় করতে

রাজনর্তকীতে কাশীশ্বর বেশে অহীন্দ্র চৌধুরী

যেতে হতো। নাট্যনিকেতনের হয়ে আমি ৩১ জানুয়ারী ফরিদপুরে রওনা হলাম। রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ওখানে অভিনয়-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ফরিদপুরের প্রসঙ্গে ওখানকার স্থানীয় নেতা মোয়াজ্জেম চৌধুরী, যিনি লাল মিঞা বলে পরিচিত,—মানুষটির কথা মনে পড়ে। মনে আছে, ফরিদপুরে পাঁচদিন আমাদের অভিনয় করতে হয়েছিল। প্রতিদিন নাটক দেখতে অজস্র দর্শকসমাগম হতো।

ফরিদপুর থেকে আবার কলকাতায়। আবার সেই 'গোরা' অভিনয়। কিন্তু সেই রাতে অভিনয় শেষে আবার অভিনেতা কালী গুহের দলের সঙ্গে ভূমেনের গাড়ীতে পুরুলিয়ায় যাওয়া। পথে ধানবাদ ডাকবাংলোয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম। এই বিশ্রামের অবসরে দেখা হলো ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে। ক্ষিতীশবাবু শুধু নাট্যরসিক নন, ভালো অভিনেতাও।

ধানবাদ থেকে রওনা হয়ে প্রায় ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করে এলাম পুরুলিয়ায়। এখানেই আজ রাত আটটায় শাজাহান অভিনয়।

রাতে অভিনয় শেষে আবার কলকাতার পথে রওনা হলাম ভূমেনের গাড়িতে।

কলকাতায় পৌঁছোবার ২ দিন পরেই শুরু হল কালী ফিল্মসে 'হারানিধি'র শ্যুটিং।

১৪ তারিখে হোল 'গোরা'র ২৩শ অভিনয়—এইদিন রবীন্দ্রনাথ আবার দেখলেন ম্যাটিনী শো'তে। সন্ধ্যার শো-তে দেখলে ভাঙতে দেরী হয় বলে তিনটের শো-তেই এসেছিলেন। অভিনয় দেখে তিনি খুশীই হয়েছিলেন।

সেইদিন রাতেই আবার ভূমেনের গাড়ীতেই আমরা রওনা হলুম ধানবাদ। এবারে ধানবাদে যে একজিবিশান হচ্ছিল তাতেই অভিনয়ের পালা। এবার খেয়াল হোল ধানবাদ এবং বরাকরের কাছে প্রচুর জলা আছে—সেখানে কিছু শিকার করলে মন্দ হয় না। এ বিষয়ে ভূমেনের উৎসাহ ছিল খুব বেশী। সেজন্যে সঙ্গে নিলাম আমার বন্দুকটা। আর তা ছাড়া রাত্রিবেলায় যাতায়াত করা—সেজন্যে সঙ্গে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র থাকাটাও মন্দ নয়। বলা তো যায় না—কখন কি হয়।

যাই হোক, ১৫ তারিখে ধানবাদের অভিনয় সেরে ১৬ তারিখেই সকালে বেরিয়ে পড়লুম কলকাতার দিকে। ভূমেন বলল : দাদা, বন্দুকটা এনেছ—চল না দেখা যাক, কিছু শিকার-টিকার মেলে কিনা! আমি বললাম : আগে থেকে শিকারের ধান্দায় ঘুরলে আর কল্যাণেশ্বরী যাওয়া যাবে না। এই ঝামেলাতেই দিন শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আগে কল্যাণেশ্বরী চল, দেবীদর্শনের পর যদি সময় থাকে তো তারপরে এদিকে নজর দেওয়া যাবে।

আগে বলেছি যে কল্যাণেশ্বরীর প্রতি আমার একটা দারুণ আকর্ষণ আছে। সুতরাং শিকার না হয় না হোক, কিন্তু দেবী দর্শন হবে না—এটা অসহ্য। কাজেই কল্যাণেশ্বরী পৌঁছে স্নানাদি সেরে পূজা দেওয়ার পর আহারাদি সারতে বেলা প্রায় গড়িয়ে এল। আর শিকারে বেরুনো হল না। সোজা কলকাতা চলে এলুম।

এর কয়েকদিন পরেই আবার ছুটলুম শিউড়ীতে। এবারে নাট্যনিকেতনের হয়ে। শিউড়ীতে এক বিরাট মেলা হচ্ছিল—সেই উপলক্ষ্যে এই অভিনয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী পৌঁছলুম শিউড়ীতে সকাল ৮-১৫ মিনিটে। ট্রেন থেকে নেমে দেখি সুলেখক, নাট্যকার এবং নাট্যরসিক রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা করছেন প্ল্যাটফর্মে। নির্মলশিব অত্যন্ত বন্ধুবৎসল অমায়িক ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে ও'র বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। তিনি আমার জন্যে আলাদা বাড়ীতে বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন। রাতে গিয়ে পৌঁছলেন নরেশবাবু, বনবিহারী ও সন্তোষ দাসকে সঙ্গে নিয়ে।

বিকেলবেলা নির্মলশিববাবু তাঁর ভাইপো তারাপদকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মেলা দেখবার জন্যে। ঘুরে ঘুরে মেলা দেখলুম, কিছু কিছু কেনাকাটাও করলুম। মেলাটি বেশ বড় আর জিনিসের সমাবেশও হয়েছে প্রচুর।

রাত্রি ৯টায় শো। প্রথম দিন হল 'কেদার রায়'।

দ্বিতীয় দিন—দুটো অভিনয়। প্রথম অভিনয় বেলা ৪টায়—'খনা', দ্বিতীয় অভিনয় হল 'সাজাহান' রাত্রি ৯টায়।

তৃতীয় দিন রাত্রি ৭টায় হলো 'গোরা'। অভিনয়ের পরে তাড়াতাড়ি নির্মলবাবু তাঁর গাড়ীতে করে 'সাঁইথিয়া' পৌঁছে দিলেন। পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম

গাড়ী এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে লাইনে পা লেগে পড়ে গেলুম। ভাগ্য ভাল যে আঘাতটা তেমন গুরুতর হয়নি।

কলকাতা পৌঁছলুম পরদিন সকাল ৮-৩০টায়। সেইদিনই আবার কালী ফিল্মে 'হারানিধি'র শ্যুটিং বেলা একটা থেকে। বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলুম স্টুডিও, তারপর সমস্ত দিন শ্যুটিং করে ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম নাট্য-নিকেতনে সাড়ে সাতটায় 'গোরা' অভিনয়।

এইরকম দৌড়ঝাঁপ করে অবিশ্রান্ত অভিনয় করে গেছি। এ একটা দারুণ নেশা —মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করেছি, কিন্তু ভালো লেগেছে।

এ শিউড়ী যাবার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায় প্রায় দশ মিনিট, কিন্তু স্টেশনে নেমে একটু পায়চারী করছি এমন সময় দেখি অদূরে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় শ্বেতশুভ্র দাড়ির প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল হল, কাছে এগিয়ে গেলাম—দেখলাম আমার অনুমান ঠিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চলেছেন বোলপুর। আমি গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই নমস্কার করতেই কবি স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন : অহীন যে—কোথায় চলেছ।

আমি বললাম : শিউড়ী—ওখানে যে একজিবিশান হচ্ছে সেইখানে একটা অভিনয়ের ব্যাপারে যাচ্ছি।

—ও, বড়বাগানের মেলা! বেশ, বেশ।

এইরকম টুকরো টুকরো দু একটা কথা বলার পর ট্রেন ছেড়ে দিল। উনি বললেন : উঠে এস।

আমি কবির কামরাতেই উঠে পড়লুম তাড়াতাড়ি। দেখলুম দীনু ঠাকুরও যাচ্ছেন সঙ্গে, আরও কারা কারা সব রয়েছেন। গল্প করতে করতে বোলপুর পর্যন্ত গেলুম। বোলপুরে কবি নেমে গেলেন, আমি আবার আমার কামরায় ফিরে এলুম।

পরদিন দেখি দীনেন্দ্রনাথ নিজেই এসেছেন গাড়ী নিয়ে আমাকে শান্তি-নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি জানতাম যে একবার দীনুবাবুর সঙ্গে গিয়ে পড়লে তার ওপরে তিনি যেমন গল্পপ্রিয় মজলিশি লোক তাতে আর সময়ে ফিরতে পারব না। আমি অনেক করে তাঁকে বুঝিয়ে বললুম এবং অনুরোধ রাখতে পারলুম না বলে ক্ষমাও চাইলুম।

১ মার্চ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে পার্লামেন্ট অফ রিলিজন-এর উদ্বোধন হল। সভাপতিত্ব করলেন ডঃ ব্রজেন শীল। এই উপলক্ষ্যে একটি বিরাট প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়।

৩ মার্চ সকালবেলায় প্রবোধবাবুর ছেলে সুধীর আমাকে টেলিফোনে জানাল যে আজকেই দুপুরের ট্রেনে বহরমপুর যেতে হবে। সেখানে 'খনা' ও 'আলাদীন' অভিনয় হবে, আমাকে যেতে হবে। আমার যেতে তেমন মন ছিল না কারণ টাকা পয়সা ঠিকমত পাওয়া যায় না ওদের কাছ থেকে। তাই আমি বললুম, অনাদিবাবুর স্টুডিওতে আমি তেলেগু ছবির পরিচালনার ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। যাই কি করে!

কিন্তু সুধীর নাছোড়বান্দা।

তখন আমি বললুম, অনাদিবাবু যদি অনুমতি দেন তাহলে যেতে পারি।

সুধীর তখন অনাদিবাবুকে ফোন করে। অনাদিবাবুকে অনেক কষ্টে রাজী করাল, কিন্তু এক সর্তে—পরদিনই অর্থাৎ চার তারিখে ছেড়ে দিতে হবে।

অগত্যা যেতেই হল। সেইদিন রাত্তেই অভিনয়-শেষে রাত ১-৭ মিনিটের ট্রেনে কলকাতা রওনা হলুম।

ভোরবেলায় কলকাতা পৌঁছুতেই জয়নারায়ণের টেলিফোন—সেইদিনই বেলা এগারোটা থেকে বেলগাছিয়া ভিলাতে 'হারানিধি'র শ্যুটিং—একটু বিশ্রাম করে স্নানাহার সারতেই স্টুডিওর গাড়ী এসে নিয়ে গেল। পৌনে চারটে পর্যন্ত শ্যুটিং হল। তারপর অরোরা স্টুডিওতে গিয়ে অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করে তেলেগু ছবি 'বিপ্রনারায়ণে'র চিত্রনাট্যটি নিয়ে এলুম একটু ভাল করে পড়ে দেখব বলে।

তারপরদিন আবার বহরমপুর যেতে হল। আসাম মেলে উঠে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করে বহরমপুরের ট্রেন ধরলাম। এদিন আবার 'কেদার রায়' অভিনয়। অসম্ভব জনসমাগম হয়েছিল সেদিন। বহুলোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল—এর ফলে খানিকটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু পরে পুলিশ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ায়নি।

অভিনয় খুব ভাল হয়েছিল। অভিনয়ের পরে রাঘববাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে প্রচুর খাওয়ালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার রাত্রি ১-৭ মিনিটের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে এলাম।

১০ মার্চ শুরু হল তেলেগু ছবি 'বিপ্রনারায়ণে'র শ্যুটিং অরোরা স্টুডিও-তে। আমি তেলেগু ভাষা জানি না—আমি টেকনিক্যাল দিক এবং অভিনয়ের দিক দেখতাম—সংলাপের জন্য ওদের তরফের লোক ছিল।

পরদিন অর্থাৎ ১১ মার্চ ছিল শিব-রাত্রি। সকাল দশটা থেকে চিত্রমন্দিরের 'শশিনাথ' শ্যুটিং। শ্যুটিং-এর পরই থিয়েটার। সেদিন আবার সারারাত্রি অভিনয় —গোরা, কেদার রায়, জয়দেব। সেদিন আবার নরেশবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'কেদার রায়ে' শ্রীমন্তর ভূমিকায় নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও নামতে পারলেন না। এই নিয়ে একশ্রেণীর দর্শক তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলেন। শেষে অনেক করে বুঝিয়ে তাঁদের ঠাণ্ডা করা হয়।

এর ২।১ দিন পরে নাট্যনিকেতন আবার আমাকে অনুরোধ করলেন মহিষাদল শো করতে যাবার জন্য, কিন্তু এবারে আর রাজী হলুম না। আমার হাতে এখন এত কাজ যে দিনে রাত্রে কোন সময়ই বিশ্রাম ছিল না। কোন কোন দিন দিনের বেলায় 'হারানিধি', রাত্রে 'শশিনাথ' বা 'বিপ্রনারায়ণ'। এ ছাড়া তো থিয়েটারের দিন থিয়েটার ছিলই।

এই যে মহিষাদল যেতে রাজী হলুম না—এতে যশোদাবাবু (ক্যালকাটা থিয়েটার্সের কর্ণধার) আমার ওপর বেশ রেগে গেলেন। এর কয়েকদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে পেলাম একখানা রেজিস্ট্রী চিঠি। তাতে আমায় জানানো হয়েছে যে নাট্য-নিকেতনে আমার চাকরি খতম।

চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি বললাম : আমাকে আপনার রেজিস্ট্রী চিঠি দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না—কারণ আপনার সঙ্গে তো আমার কোনো কন্ট্রাক্ট নেই। মুখে বললেই হোতো। বা পোস্টারে নাম না দেখলে আমি নিজে থেকেই আর আসতুম না।

এরপর শিশিরবাবুর আহ্বানে নবনাট্য মন্দিরের হয়ে একদিন নামলুম 'সীতা'র বাল্মীকির ভূমিকায় আর একদিন নামলুম 'আলমগীরে' রাজসিংহের ভূমিকায়। দুদিনই কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ।

এই সময় রাধা ফিল্মের সঙ্গে দুখানি ছবির চুক্তিপত্রে সই করলাম—প্রভাসমিলন ও হিমহার।

১ এপ্রিল হল হরতাল। উপলক্ষ্য—তদা-নীন্তন ভারত সরকারের নতুন শাসননীতি চালু হল—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। মুখ্য-মন্ত্রী হলেন জনাব এ কে ফজলুল হক, তার সঙ্গে রইলেন পাঁচজন হিন্দু ও পাঁচ-জন মুসলমান মন্ত্রী।

দেবদত্ত স্টুডিওতে 'ইন্দিরা'র শ্যুটিং আরম্ভ হল।

এই সময় (৮।৪।৩৭) নবনাট্যমন্দিরে 'চিরকুমার সভা'র একটি সম্মিলিত অভিনয় হল—আমি—চন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস —পূর্ণ, মনোরঞ্জনবাবু—রসিক ও নীহারবালা—নীর-বালা। খুব জমেছিল সে অভিনয়।

তখনকার দিনের চিত্রজগতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয় তদানীন্তন হিন্দি ছবির নায়ক গুল হামিদকে ভুলে যান নি। সত্যিকারের সুদর্শন চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। 'বাঙ্কী সিপাহী', 'খাইবার পাশ', 'সোনেরা সংসার', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি বহু হিন্দি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তিনি হঠাৎ মারা যান তাঁর দেশে পেশো-য়ারের এক গ্রামে ১৮ এপ্রিল ১৯৩৭।

প্রায়ই বাইরে যেতে হত এর-ওর দলের হয়ে। কখনও কালী গুহের ব্যবস্থাপনায়, কখনও মিনার্ভার দেলওয়ার হোসেন ও চন্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থা-পনায়, কখনও বিমল পালের ব্যবস্থাপনায়। মানে আমি তখন বাঁধন-ছেঁড়া ঘোড়ার মত—যে কেউ ডাকলেই এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলেই অভিনয় করে আসতাম। যাকে বলে 'খেপ' মারা—এ ঠিক তাই। বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, চুঁচুড়া, জামসেদপুরে, শ্রীরামপুরে যে কতবার গেছি তার ঠিক নেই।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে (২৮।৪।৩৭) নাট্যনিকেতনে ক্যালকাটা থিয়েটার্স খুললেন মন্মথ রায়ের 'সতী'। সেই সঙ্গে তাঁরা চার আনার টিকিট চালু করলেন। এটা পরীক্ষা-

মূলকভাবে চালু হল বটে কিন্তু সার্থক হল না।

ইতিমধ্যে কালী-ফিল্মের 'ছায়ানিধি'র শ্যুটিং শেষ হয়ে মুক্তি লাভ করল উত্তরা সিনেমায় ১লা মে ১৯৩৭।

এ বছরের মে মাস একটা দিক দিয়ে বিশেষ স্মরণীয়—সেটা হল ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জের অভিষেক উৎসব। এই উপলক্ষ্যে কলকাতায় যথেষ্ট আলোকসজ্জা ও বাজী পোড়ানো হয়েছিল।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে 'রঙমহল' আবার খুলল ১৫ মে 'অভিষেক' নাটক নিয়ে। দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি ছিলেন এই নাটকে।

এই মাসেরই ২২ তারিখে রূপবাণীতে মতিমহল থিয়েটার্সের ছবি 'রাঙা বৌ' মুক্তিলাভ করল। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর পরিচালক।

১৮ জুন দশহরার দিন মিনার্ভায় নতুন নাটক 'গয়াতীর্থ'র উদ্বোধন হল।

আদর্শ চিত্রের 'দলিত কুসুম'-এর কথা আপনাদের আগেই বলেছি। এতদিন ছবিখানি মুক্তিলাভ করল নিউসিনেমায় ১৭ জুলাই।

এই দিনই বাংলা চিত্রজগতে আর একটি ব্যাপার ঘটল। ঐ দিনই প্রমথেশ বড়ুয়া যে স্টুডিও করেছিলেন সেটি বিক্রি হয়ে যায়—আর তা কিনে নেন শ্রীঅনাদি বসু। বড়ুয়া-সাহেব থাকতেন মুলেন স্ট্রীটে, তারই পাশে ছিল এই স্টুডিও। ওখানকার যন্ত্রাদি ও জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অরোরা স্টুডিওয় নিয়ে গেলেন।

ম্যাডানের নামকরা ইটালিয়ান ক্যামেরা-ম্যান সিঃ মারকনি পরলোকগমন করেন। ভদ্রলোক বিদেশী হলে কি হবে—বেশ অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন।

চিত্রমন্দিরের 'শশিনাথ'-এর উদ্বোধন হল রূপবাণীতে ১৪ আগস্ট। আমি 'সোমনাথে'র ভূমিকায় অভিনয় করি। পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটিই প্রথম ছবি। ছবিখানি মোটামুটি ভালই হয়েছিল।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'অভিনয়' ছবিতে কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর হয় ১৮ আগস্ট—একথা আগেই জানিয়েছি।

১৮ আগস্ট রঙমহলে 'বন্ধু' নামক একখানি নাটক খোলা হয়।

এদিকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীমশায় ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ধর্মতলার করিন্থিয়ান থিয়েটার (বর্তমান অপেরা সিনেমা) লীজ নিলেন। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের যারা দর্শক ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল অবাঙালী। কারণ হিন্দি থিয়েটারে বাঙালী দর্শকের সমাগম তো এমনিতেই খুব কম। যোগেশবাবুর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা বোঝালেন যে, আপনার নাটক যেখানেই চলবে সেখানেই দারুণ চলবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি 'গৌরাঙ্গসুন্দর' নামক ধর্মমূলক নাটক খুললেন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। শিল্পীদের সংগ্রহ করলেন সব থিয়েটার থেকে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম যে ঐ মহল্লায় বাংলা নাটক চলা শক্ত, তার উপরে ধর্মমূলক। কারণ চাঁদনী ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে তো বেশীর ভাগই অ-হিন্দুর বাস। যাই হোক, আমাদের আশঙ্কাটাই ফলল। মাত্র কয়েক রাত্রি পরেই যোগেশবাবুকে ওখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল। এরপর যোগেশবাবু আবার স্টারে গিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন।

এর কয়েকদিন পর অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর রঙমহলে খোলা হল হিন্দি নাটক অভিষেক ও 'রাজতিলক'। বাঙালী ও অবাঙালী শিল্পীদের নিয়ে এই নাটক দুখানি খোলা হল। ঠিক যে কারণে যোগেশবাবুর 'গৌরাঙ্গসুন্দর' কোরিন্থিয়ানে চলল না, রঙমহলেও এ পরীক্ষা সফল হল না। কারণ রঙমহল হল পুরোপুরি বাঙালীপাড়ার মধ্যে।

তখনকার দিনে বাঙালী পাড়ায় হিন্দী বই চলত না। হিন্দীভাষী এলাকাতে আবার এর বিপরীত। সেখানে বাংলা বই আসর জমাতে পারত না।

রাধা 'ছিন্নহার' সে সময়ে খুবই নাম করেছিল। হরি ভঞ্জ পরিচালিত এই ছবিটি উত্তরায় মুক্তিলাভ করেছিল ২৫ সেপ্টেম্বর। এতে আমার ভূমিকা ছিল পুলিশ ইন্সপেকটরের।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে দুজনের নামের সঙ্গে আমার কেন, গোটা বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়। এঁরা হলেন মধু বসু আর সাধনা বসু। বসু দম্পতির পরিচালনায় সি এ পি তখন খুব নাম করেছে। কিন্তু এঁদের দলে কোন পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না। দলে ছিলেন অভিজাত বংশের ছেলে-মেয়ে। এঁরা ইতিপূর্বে 'আলিবাবা' করেছেন, সৌরীন মুখুজ্যের মন্দির এবং মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' করেছেন। লোকমুখে শুনেছি সি এ পি'র প্রশংসা, কিন্তু নিজে তখনও দেখি নি।

একদিন নাট্যকার মন্মথ রায় আমাকে বললেন, সি এ পি'র জন্যে নাটক লিখছি—বিদ্যুৎপর্ণা। আপনি যদি রাজী থাকেন অভিনয় করতে, তাহলে আপনার মত একটা চরিত্র সৃষ্টি করব নাটকে।

বললাম, অভিনয় না করার কোন কারণ নেই। স্টেজ ছেড়েছি সাময়িকভাবে। কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর। তবে আপনি সি এ পি পি'র কথা বলছেন, ওঁদের দলে তো পেশাদার শিল্পী কেউ নেই। ওঁরা কি আমাকে—

মন্মথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, সে ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

মন্মথবাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার কয়েক দিন বাদেই মধু বসু আমাকে নাটকের 'মোহন্ত' চরিত্রটি অভিনয়ের জন্যে বললেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সি এ পি সম্প্রদায় সাধারণ রঙ্গালয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের না হলেও, বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দলের ওপর মধু বসুর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দলের পরিবেশটিও আমার ভাল লাগত।

'বিদ্যুৎপর্ণা' তৈরী হল অভিনয়ের জন্যে। ফার্স্ট এম্পায়ার (বর্তমানে রক্সি সিনেমা)-এ নাটকটি উদ্বোধন হল ৯ অকটোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। নাটকটি ছিল ছোট, অভিনয়ে সময় লাগল দু ঘণ্টার মত। তাই এই সঙ্গে 'ওমর খৈয়াম' নামে একটি ছোট নাটকও অভিনীত হয়েছিল। এই নাটক দুটি সংবাদপত্রের প্রশংসা পেয়েছিল। প্রতিটি কাগজেই শ্রীমতী বসু এবং আমার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বদেশ পত্রিকা লিখেছিল, 'অহীন্দ্র-সাধনা সম্মিলন যে কিরূপ আকর্ষণীয় হয়েছিল তার প্রমাণ ওই হাউসে উপর্যুপরি কয়েক দিন অভিনয় হওয়াতেই পাওয়া গেছে'।

দীপালী লিখেছিল, 'শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি'।

এই সময়ের একটি ঘটনার কথা বলি। লণ্ডন থেকে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান ফুটবল দল ভারতে এল। ভারতের ছোট-বড় বিভিন্ন শহরে তারা প্রদর্শনী ফুটবল খেলল। দু-এক জায়গায় ড্র করে, নয়ত সর্বত্রই তারা জয়লাভ করেছিল। কলকাতায় থাকাকালীন একদিন এই দলের সদস্য-খেলোয়াড়রা বিদ্যুৎপর্ণা নাটক দেখতে এল। অভিনয়-শেষে তারা স্টেজের মধ্যে এল শিল্পীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে। প্রতিটি সদস্য এমনভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করল, যার মধ্যে সত্যকার আন্তরিকতা ছিল। মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় নি, ওরা সাগরপারের মানুষ, ওরা সেই দেশ থেকে এসেছে, যারা আমাদের শাসক।

কোরিন্থিয়ান দলের ছেলেরা আমাদের সকলের অটোগ্রাফ নিলে।

যে সময়ের কথা বলছি, এই সময় স্টারে আরম্ভ হয়েছিল 'বিদ্যাপতি' নাটক।

নানা ঘটনার মধ্যে এই সময়ের একটি দুঃসংবাদ শুধু আমাকে নয়, গোটা বাংলা দেশের মানুষকে মর্মাহত করল। সে সংবাদটি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু। ২৩ নভেম্বর তিনি গিরিডিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। গিরিডি থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতায়। আচার্য বসুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্নটি হারিয়ে গেল।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে আমি গিরিডি রওনা হলাম, 'দেবী ফুল্লরা' ছবির শ্যুটিং করতে। হাজরা পিকচার্সের এই ছবিটির পরিচালক আমাদের তিনকড়িদা। কলকাতা থেকে আমি যাচ্ছি মোটরে। সঙ্গে তিনকড়িদা আর শিশুবালা। গিরিডি যাবার পথে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। অন্য সময় দূরের পথে রাত-বিরেতে যেতে হলে আমি সঙ্গে বন্দুক নিতাম। তবে এবারে তিনকড়িদা রাইফেল নিয়েছেন বলে আমি শূন্য হাতেই বেরিয়েছি।

(চলবে)

বিজ্ঞানের কথা

গণিতবেত্তা ও দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল

বিশ্বখ্যাত গণিতবেত্তা, দার্শনিক শান্তিবাদী চিন্তানায়ক আর্ল বারট্রান্ড রাসেল গত ২ ফেব্রুয়ারী ৯৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যদিও পরিণত বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে, তবু বিশ্বের চিন্তারাজ্যে তাঁর তিরোধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা সহজে পূর্ণ হবে না।

রাসেল প্রধানত দার্শনিক হিসাবে সুপরিচিত হলেও বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অপ্রতুল নয়। ছোটবয়স থেকেই গণিতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। চার বছর বয়সে পদার্পণ করার আগেই তাঁর মা-বাবা মারা যান এবং তাঁর ঠাকুরমা তাঁকে লালন-পালন করেন। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। ১৮ বছর পর্যন্ত তিনি রাসেলকে বিদ্যালয়েই প্রেরণ করেন নি, গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে বাড়িতে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেন। এভাবে সমবয়সী সঙ্গীর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হলেও রাসেল কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানের আনন্দ খুঁজে পান গণিতের মাঝে। ১১ বছরের বালক রাসেল ইউক্লিডের সূত্রে রস অনুভব করলেন। কিন্তু ইউক্লিডের প্রমাণহীন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে নির্বিচারে মেনে নিতে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন চাইত না। তিনি একসময় বলেছিলেন, 'গভীর লজ্জার কথা যে ইংলণ্ডের ছেলেদের এখনও ইউক্লিড পড়ানো হয়।' সত্য হবে প্রমাণনির্ভর, স্বতঃসিদ্ধ বলে কিছু থাকবে না। দুটি সমান্তরাল রেখা মিলিত হতে পারে বা সমগ্র অংশের চেয়ে বড় নাও হতে পারে—এই সব কথা রাসেলকে আনন্দে উদ্দীপিত করে তুলত। প্রমাণবিহীন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নেওয়ার নৈরাশ্যই পরবর্তীকালে তাঁর মনকে দর্শনাভিমুখী করে তোলে। রাসেল নিজেই বলেছেন, গণিতের সেতু বেয়ে তাঁর জীবনে দর্শন এসেছে।

১৮ বছর বয়সে রাসেল যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন গণিত ও দর্শন উভয় শাস্ত্রেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ স্যার জর্জ ডারউইন, স্যার রবার্ট বেল এবং অধ্যাপক আলফ্রেড হোয়াইটহেড, বিখ্যাত গ্রীক মনীষী স্যার রিচার্ড জেব এবং বিশিষ্ট দার্শনিক হেনরী সিডউইক জেমস ওয়ার্ড প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন।

শিক্ষা-জীবন শেষ করার পর ১৮৯৮ সালে রাসেল ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিন্তু তার এক বছর আগেই জ্যামিতির ভিত্তি সম্পর্কে রচিত তাঁর 'অ্যান এসে অন দি ফাউডেশন অব জিওমেট্রি' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানিতে জ্যামিতির ভিত্তি বিষয়ে রাসেলের মৌলিক চিন্তাধারার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই চিন্তাধারা সার্থক পরিণতি লাভ করে ১৯০০ সালে। ঐ বছর তিনি অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সঙ্গে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ইতালীর প্রখ্যাত গণিতবিদ পিয়ানোর মুখে তাঁর উদ্ভাবিত 'সাঙ্কেতিক ন্যায়শাস্ত্র' (সিম্বলিক লজিক) সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে রাসেল বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। পিয়ানোর পথ অনুসরণ করে তিনি ১৯০৩ সালে গণিতের সূত্র সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ 'প্রিন্সিপিলস অব ম্যাথামেটিকস' প্রকাশ করেন। গণিতে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদানের জন্যে ১৯০৮ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে রাসেলকে রয়েল সোসাইটির ফেলো মনোনীত করা হয়।

অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সহযোগিতায় রাসেল গণিতের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণা আরও সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করে ১৯১৩ সালে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' প্রকাশ করেন। রাসেল-হোয়াইটহেডের এই যুক্ত প্রয়াস গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে স্বীকৃত হয়। শুধু গণিতের ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম নয়, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসেও এটি একটি দিক-নির্দেশক বলে আখ্যাত হয়।

প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পর থেকেই রাসেল দর্শনের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মন গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়। মানুষের সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর ধারণা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয় এবং সে আলোচনায় এখানে প্রবৃত্ত হব না। তবে এটুকু শুধু বলতে পারি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যকার সাধক যাঁরা, তাঁরা চিরদিনই শান্তি ও মানবকল্যাণের উপাসক। রাসেলও ছিলেন আজন্মকাল শান্তিবাদী। এজন্যে স্বদেশ ও বিদেশে তাঁকে নানা লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশপ্রেম ও জীবনাদর্শের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর মন কিছুকাল জর্জরিত হয়। বিবেকের নির্দেশে তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন। ফলে তাঁর কারাদণ্ড হল। কারাগারে বসে গণিত শাস্ত্র বিষয়ে একটি অনন্য গ্রন্থ তিনি লিখলেন। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-কীর্তি—'ইন্ট্রডাকশান টু ম্যাথেমেটিক্যাল ফিলোজফি।' এই সময় তিনি "অ্যানালিসিস অব মাইন্ড' নামে আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯২৩ সাল রাসেল তাঁর 'এ বি সি অব্ অ্যাটমস' গ্রন্থে লিখেছিলেন : পরমাণুর ভেতর লুপ্ত শক্তিকে মানুষ যেদিন আবিষ্কার করতে পারবে, সেদিন তার হাতে একটি প্রচণ্ড হাতিয়ার এসে পড়বে। সে হাতিয়ারের বিপুল শক্তি আজ কল্পনাও করা যায় না। পরমাণু শক্তিকে যিনি বহু আগেই অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছিলেন, সেই রাসেলই ২২ বছর পরে ১৯৪৫ সালে নাগাসাকি হিরোশিমার ওপর পরমাণু বোমার প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলায় গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। শান্তি ও মানবতার একনিষ্ঠ সাধক রাসেল সেদিন প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই সর্বনাশা পথ থেকে বিরত না হলে সমগ্র মানবজাতিই যে একদিন ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবে সে কথা শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রনায়কদের জানাতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নি।

মানুষের কল্যাণ ও জ্ঞান বিস্তারের জন্যে বারট্রান্ড রাসেল চিরন্তন সাধনা ও প্রয়াস করে গেছেন। সারা জীবনে গণিত দর্শন, সমাজসমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে ৫০টির বেশি গ্রন্থ তিনি লিখে গেছেন। তার মধ্যে 'এ বি সি অব রিলেটিভিটি,' 'ম্যারেজ অ্যান্ড মরালস', 'হ্যাজ ম্যান এ ফিউচার ?" গ্রন্থগুলি আমাদের সুপরিচিত। চিন্তারাজ্যে অনন্য অবদানের জন্যে রাসেলকে ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তাঁর অমূল্য অব-

দানের স্বীকৃতিতে ১৯৫৭ সালে তাঁকে আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাসেল তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় বলেছেন : 'আমি মানুষের হৃদয়ের রহস্য বুঝতে চেয়েছি। কেন আকাশ থেকে নক্ষত্রের আলো ঝরে। আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি পিথাগোরাসের সেই শক্তিকে যার বলে গাণিতিক সংখ্যাগুলি অবিরত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে। বেশি নয়, কিন্তু সামান্য কিছু আমি জেনেছি ও বুঝেছি।' জীবন-জিজ্ঞাসু সত্যসন্ধ মানবদরদী মহান চিন্তানায়ক বারট্রান্ড রাসেলের অমর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

লর্ড আলেকজেন্ডার টডের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে

গত জানুয়ারী মাসের গোড়ায় খড়্গপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এবার বিদেশ থেকে যেসব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী লর্ড আলেকজান্ডার টড। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। লর্ড টড যেমন অমায়িক তেমন সদালাপী।

প্রথমে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলুম কি বিষয়ে বর্তমানে তিনি কাজ করেছেন। তিনি বললেন : জীবন্ত বস্তুর রাসায়নিক প্রণালী বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমি বর্তমানে গবেষণা করছি। বলতে পারেন, জীবনক্রিয়া কিভাবে চলে তাই জানার আমি চেষ্টা করছি।

এরপর তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলুম বিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রের বাইরে অন্য বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা উচিত হবে কি না? (প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, লর্ড টড দীর্ঘ বার বছর বৃটিশ সরকারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন)।

এর উত্তরে লর্ড টড বললেন, আমি মনে করি, একজন বিজ্ঞানীর অভিমত সাধারণ মানুষের অভিমত থেকে ইতর-বিশেষ হবে না। তবে বিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে, মানুষের জন্যে পরীক্ষার সাহায্যে জিনিসের অনুসন্ধান করা।

যদি বিজ্ঞানীর আবিষ্কার বা উদ্ভাবনকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তার জন্যে বিজ্ঞানীর প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় বিজ্ঞানীরা পরমাণুশক্তির বিকাশ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান। মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে এই অমিত শক্তিকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রনায়কেরাই গ্রহণ করেন, বিজ্ঞানীরা নন। অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু একারণে বিজ্ঞানীরা তাঁদের অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকবেন এটা প্রত্যাশা করা উচিত নয়। যে সব লোক মারণাস্ত্র নির্মাণের কারখানায় কাজ করেন তাঁরা কি বিবেকের দ্বারা চালিত হন না? তাঁদের এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, যখন তাঁদের উভয়েরই কাজের ফল শেষপর্যন্ত মানুষের নিধন-যজ্ঞে প্রযুক্ত হবে?

জিন এবং বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মের সমস্যা সম্পর্কে লর্ড টড গবেষণা করছেন বলে তাঁকে সবশেষে প্রশ্ন করেছিলুম বৃটেনে বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি?

লর্ড টড বললেন : আমি মনে করি এই সমস্যা যতটা অর্থনৈতিগত ততটা বর্ণ-বিদ্বেষমূলক নয়। বৃটেনে সমাজের নিম্নস্তরের অর্থাৎ শ্রমজীবী লোকরাই বিদেশাগত কৃষ্ণকায়দের বসবাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। আমি মনে করি, তাদের এই বিদ্বেষের মূলে আছে এই ভয় যে, বিদেশাগতরা কম বেতনে কাজ করলে তারা চাকরি হারাবে ও ভবিষ্যতে চাকরি পাবে না। বর্ণ-বিদ্বেষ এখানে আসল হেতু নয়।

ছায়াপথে হীরার সন্ধান

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল, আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীতেই শুধু মহামূল্য হীরা পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ডঃ উইলিয়ম শাসল এবং জন গাউস্টাড বলেছেন, ছায়াপথ ও অন্যান্য নীহারিকামণ্ডলের ভান্তঃপ্রদেশে হীরার সন্ধান পাওয়া গেছে। সনাতনী ধারণায় ভান্তঃপ্রদেশে বিশুদ্ধ গ্রাফাইট অথবা বরফে আবৃত গ্রাফাইট কণার অস্তিত্ব ধরা হত। দূরপাল্লার অতিবেগুনী আলোর বর্ণালীতে দেখা যায়, বিশুদ্ধ গ্রাফাইটে শোষণ স্বরূপ এবং বরফে আবৃত গ্রাফাইটে অবলোহিত রশ্মির শোষণ হয় অত্যধিক। কিন্তু দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলোর ছায়াপথের ভান্তঃপ্রদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে যে ধরনের শোষণ বর্ণালীতে পর্যবেক্ষণ করা যায় তা উপরোক্ত সনাতনী বর্ণালী বৈশিষ্ট্যের বিপরীত।

ডঃ শাসল এবং গাউস্টাড বলেন : এ রকম অসুবিধা দূর হয়ে যায়, যদি ছায়াপথে হীরার অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। কারণ হীরা অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘের (অবলোহিত) আলোয় স্বচ্ছ, অথচ হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (অতি-বেগুনী) আলোকে শোষণ করে। তাছাড়া হীরার পরীক্ষালব্ধ অবলোহিত রশ্মির শোষণ বর্ণালী দ্বারা স্বাভাবিক লোহিত নক্ষত্রদের বর্ণালীতে বিশেষ বিশেষ পটির অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এছাড়া আরও দুটি প্রণিধানযোগ্য ঘটনা তাঁদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্থান পেয়েছে। প্রথমত উল্কাপিণ্ডে হীরাপ্রাপ্তির ঘটনা এটা সমর্থন করে, একদা উল্কাপিণ্ডগুলি কোন আদ্যগ্রহের অভ্যন্তরে সুউচ্চ চাপের অধীন ছিল। কিন্তু উপরোক্ত ভৌত অবস্থায় শুধু হীরাই নয় অন্যধরনের আকরিকের গঠনও বাঞ্ছনীয়। কাজেই উল্কাপিণ্ডে ঐ ধরনের কিছু আকরিকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তা পাওয়া যায় না।

ডাঃ শাসল এবং গাউস্টাড এই বৈসাদৃশ্য দূর করতে গিয়ে অনুমান করেন, সৌর-জগতের অন্যান্য পদার্থের মত উল্কাপিণ্ডও ভান্তঃপ্রদেশের ধূলিমেঘ থেকে গঠিত হয়। দ্বিতীয়ত এটা অনুধাবন করা গেছে, ধূলি-কণা ছায়াপথের অতি উত্তপ্ত অঞ্চলেও থাকে। হীরাই এমন একটি পদার্থ যা সে-রকম ভৌত অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

স্ট্রোকের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ অ্যালবার্ট হেস এবং ডাঃ টমাস প্রাইস এমন এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে কার স্ট্রোক হতে পারে তা আগাম বলা যায়। তার ফলে সতর্ক হওয়ার সুযোগও পূর্বাহ্নে পাওয়া যায়।

ডাঃ প্রাইস হিসাব করে দেখেছেন, শতকরা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে ক্যারোটিড ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার পর স্ট্রোক হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে হৃদযন্ত্র থেকে ক্যারো-টিড ধমনী দিয়ে রক্ত যাওয়ার সময়ের পরিমাপ করা হবে। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষের ওই পথে রক্ত যেতে কতটা সময় লাগে তা জানা আছে। যদি দেখা যায়, কোন ব্যক্তির ওই পথে রক্ত যেতে সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় বেশি সময় লাগছে, তাহলে বুঝতে হবে ক্যারোটিড ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহের গতি মন্থর করে দিচ্ছে। তখনই বুঝতে হবে, স্ট্রোক আসন্ন এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাঃ হেস তাঁদের এই পদ্ধতি বিড়াল ও বাঁদরের ওপর পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছেন। কিছু সংখ্যক মানুষের ওপরও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাতে সুফল পাওয়া গেছে। তবে তাঁদের মতে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

চোদ্দ

উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খাওয়াই মৌমাছির কাজ। মৌমাছির ধর্ম। শীত, বসন্তে, শরৎ, হেমন্তে কত বিচিত্র ফুলের মেলায় মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার মধু নেই, যার মধুর ভান্ডার শূন্য হয়েছে, সেখানে মৌমাছি নেই।

অনেক মানুষও উড়ে উড়ে মধু খায়। শীতের মরশুমী ফুলের মেলায় বসেও এদের নজর থাকে বসন্তের প্রতি। স্মৃতির ভান্ডারে এদের জমা হয় না কিছু। এদের হৃৎপিন্ড আছে কিন্তু হৃদয় নেই, মন আছে কিন্তু অন্তর নেই।

ভালবাসাই তো জীবনের ধর্ম। যৌবনে তার প্রথম পূর্ণ অনুভূতি। জীবন সন্ধিক্ষণের সেই অপূর্ব মুহূর্তে মানুষ ভালবাসবেই। তাইতো যৌবনে কতজনেই প্রেমে পড়ে কিন্তু ভালবাসা? সবাই কি ভালবাসতে পারে? দেহ-মনের প্রতিটি গ্রন্থিতে কি সবাই অনুভব করে অব্যক্ত বেদনা?

না। তাইতো প্রেমে পড়লেই ভালবাসা হয় না। প্রেম একটা রোগ। আসল না হলেও জল বসন্তে সবাই একবার ভুগবেই। সারা অঙ্গে কিছু ক্ষত রেখে যায়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব নেই। একদিন মুছে যায় সে ক্ষতের চিহ্ন। আর ভালবাসা? সে হচ্ছে অন্তরের ধর্ম, মনের বিশ্বাস। সে স্থায়ী, চিরস্থায়ী চিরন্তন। সে অনন্ত।

দুনিয়ার মানুষ বার্লিনে এসে ভুলে যায় তার সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা গোল্ডেন সিটি বার, এল প্যানোরমা বা বলহাউস রেসীতে ক্ষণস্থায়ী বসন্তে অনেকে আরো অনেক কিছু ভুলে যান। হান্সা কোয়ার্টারে থেকেও ভোলা যায় অনেক কিছু। কিন্তু তরুণ ভুলতে পারে না ইন্দ্রাণীর কথা।

অফিস থেকে ফিরে লিভিং রুমে চুপচাপ বসে বসে পরপর কতকগুলো সিগরেট খেতে খেতে তরুণ কি যেন ভাবছিল। বিভোর হয়ে ভাবছিল। অন্যদিন গাড়ী থেকে নেমেই প্রতিবেশী ডাঃ রিটারের ছোট ছেলেটিকে খোঁজে। তরুণকে দেখলে ছোট্ট রিটারও টলতে টলতে এগিয়ে আসে একটা মিল্ক চকোলেটের লোভে। প্রতিদিনের মত সেদিনও পকেটে চকোলেট ছিল কিন্তু গাড়ী থেকে অন্যমনস্কভাবে সোজা চলে এসেছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। অন্যদিনের মত সোজা প্যান্ট্রিতে গিয়ে চা তৈরী করতেও যায়নি। যাবে কেন? রোজ রোজ কি ভাল লাগে? শুধু নিজের জন্য এত ঝামেলা পোহাতে কার ইচ্ছে করে?

বিভোর হয়ে তাইতো ভাবছিল। যখন সবাই ছিল, সব কিছু ছিল, তখন সে কাছে ছিল। সুখে-দুঃখে অহরহ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেবার ঠিক পুজোর আগে আগে যখন তরুণের মার ডবল নিউমোনিয়া হলো তখন তরুণের বাবা গিয়েছিলেন কলকাতা। তরুণের সে কি ভয়। হাজার হোক একমাত্র ছেলে। সংসারের ঝুট-ঝামেলা বলতে যা বোঝায়, তা কোনদিনই সহ্য করতে হয়নি। তাইতো বাবার অনুপস্থিতিতে মার অসুখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। এপাড়া ওপাড়া থেকে অনেকেই এসেছিলেন। চিকিৎসা বা সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হয়নি ওদের সাহায্য সহযোগিতায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাঃ ঘোষালও বলেছিলেন, ভয় নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।

মার অসুখের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তরুণকে খুব বেশী ঝামেলা পোহাতে হচ্ছিল না। মুহুরী মদনবাবুই ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। ঔষধ-পত্র দেবার জন্য ও বাড়ীর জ্যেঠিমা সারাদিনই থাকতেন এ বাড়ী। এছাড়াও ঘোষাল বাড়ীর পিসিমা কতবার যে আসাযাওয়া করতেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ইন্দ্রাণী তো ছিলই। মাসীমার বিছানার একপাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত সারাদিন। সন্ধ্যার পর সংসারের কাজকর্ম সেরে ইন্দ্রাণীর মা আসতেন। রাত্রি নটা—সাড়ে নটা নাগাদ ইন্দ্রাণীর বাবাও আসতেন। তিনজনে মিলে ফিরে যেতেন রাত সাড়ে দশটা—এগারটার পরে।

তবু তরুণ ভয় পেয়েছিল। বাবাকে টেলিগ্রাম করেছিল, কাজ হলেই তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।

বাবার লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের পরে মাথা রেখে তরুণ আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ কে যেন এসে আস্তে মাথায় হাত দিল। অন্য সময় হলে চমকে উঠত, কিন্তু মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল। একটুও নড়া চড়া করল না। তবে বড় ভাল লাগল। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল আরেক জনের সমবেদনা। অনুভব করল ভালবাসার নির্ভরযোগ্য স্পর্শ।

'কি এত ভাবছ?' মৃদু গলায় ইন্দ্রাণী জানতে চাইল।

তরুণ কিছু উত্তর দিল না। আগের মতই টেবিলের পর মাথা রেখে ভাবছিল কত কি?

'বল না কি এত ভাবছ?'

'না তেমন কিছু না।' এবার তরুণ ছোট্ট উত্তর দেয়।

'তবে এমন করে একলা একলা বসে আছ কেন?

'এমনি'

'আমাকেও সত্যি কথা বলবে না?'

তরুণ টেবিলের পর থেকে মুখ তুলে একবার ইন্দ্রাণীকে দেখে। মুখে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বলে 'এমনি চুপচাপ বসেছিলাম।'।

এবার ইন্দ্রাণীও হাসে। 'তুমি কি [illegible] কর আজও তোমাকে আমি বুঝ[illegible]। র-লাম না?'

কথায় কথায় কত কথা [illegible]য়।

'আচ্ছা আমার যদি ভীষণ অসুখ করে?' ইন্দ্রাণী মজা করেই প্রশ্ন করে।

'ভাল ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হবে।'

'কিন্তু তুমি কি কিছু করবে? নাকি এমনি করে বসে বসে ভাববে?'

কয়েকদিনের মধ্যেই মা ভাল হলেন। বাবাও কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। মাঝখান থেকে তরুণের একটা নতুন উপলব্ধি হলো।

সে হলো ইন্দ্রাণীর ভালবাসা। দুঃখের দিনে, বিষাদের দিনে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়ের স্থির ইঙ্গিত।

অনেক দিন বাদে তরুণের মনে পড়েছিল সেদিনের স্মৃতি। ঘরবাড়ী থেকে অনেক দূরে মার মৃত্যু হলে তরুণ ইন্দ্রাণীর অনুপস্থিতি নিদারুণভাবে অনুভব করছিল। বহুদিন পর সেদিন হান্সা কোয়ার্টারে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে একলা বসে

থাকতে থাকতে ইন্দ্রাণীর অভাব নতুন করে বড় বেশী মনে পড়ল।

ডিপ্লোম্যাটের জীবনের নিজের কথা ভাবার অবকাশ বড় কম। ডিপ্লোম্যাট অনেক কিছু পায়, পায়না শুধু নিজের কাছে নিজেকে পাবার সুযোগ। কখনও কখনও প্রকাশ্যে, নিভৃতে, তাঁকে নিরন্তর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। দিনে অফিস রাতে পার্টি। সেখানেও ছুটি নেই। মদ খেতে হয় গেলাস গেলাস। কখনও নিজের ইচ্ছায়, কখনও অন্যের আগ্রহে। তবুও মাতাল হতে পারে না ওরা। ভুলতে পারে না নিজের দেশের স্বার্থ।

তাইতো মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই। কিন্তু যদি কদাচিৎ কখনও কর্তব্যের বেড়া জাল থেকে মুক্তি পায় ডিপ্লোম্যাট তখন তার বড় বেশী মনে পড়ে নিজের কথা। অধুনা বিশ্ব রাজনীতির প্রতিটি পাতায় বার্লিনের উল্লেখ হলেও লন্ডন-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-মস্কোর মত কূটনৈতিক চাঞ্চল্য নেই এখানে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসে অবশ্য, তবে সে মাঝে মাঝেই। তাইতো বার্লিনে এসে তরুণ একটু বেশী যেন নিজেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের বেদনা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার এমন 'কোরাস' শোনার অবকাশ যেন এই প্রথম এল তার জীবনে।

ঘরের চারপাশে দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিতেই রাইটিং ডেস্কের পাশে মিঃ মিশ্রের একটা ছবি নজরে পড়ল। তরুণ বড় ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এই মাতাল লোকটিকে। দেশে দেশে কত মানুষ দেখেছে তরুণ, কিন্তু গ্লানিহীন, কালিমামুক্ত এমন স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর কারুর দেখেনি। ঐ একই ডেস্কের আরেক পাশে ছিল ইন্দ্রাণীর একটি ছবি। ছবি দুটো অমন করে পাশা পাশি রাখার একটা কাহিনী ছিল।

ইউনাইটেড নেশনস-এ থাকার সময় রুণের ফ্ল্যাটে এসে মিশ্র যেদিন প্রথম ন্দ্রাণীর ফটোটা দেখলেন, সেদিন উনি জজ্ঞাসা করেছিলেন, ইজ দিস দি ইনোসন্ট গার্ল ইউ লাভ?

'ও যে ইনোসেন্ট তা আপনি জানলেন ক করে?'

মিশ্র সাহেবের কথা বলার ঢং-ই ছিল আলাদা।......'লুক হিয়ার ইডিয়ট ইয়ংমান। চোখ দুটো ভাল করে দেখ।'

একটু হাসতে হাসতেই তরুণ এক নক দেখে নেয় ইন্দ্রাণীর চোখ দুটো। ... 'কিন্তু কই ইনোসেন্স তো দেখতে চ্ছি না।'

'পাবে কোথা থেকে? মনটা বোধহয় রোপুরি বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

তরুণ আরো কি যেন বলতে গিয়েছিল ন্তু পারে নি। মিশ্র চিৎকার করে বললেন, 'আর বাজে বকালে পুরো এক তল স্কচ খাওয়ালেও আমাকে ঠান্ডা ত পারবে না।'

দু' এক রাউন্ড ড্রিংক্স আর কিছু গল্প গুজবের পর মিঃ মিশ্র বলেছিলেন, 'দেখ তরুণ, আই অ্যাম এ ফাদার, বাট আই হ্যাভ মাদার্স মাইন্ড। মাদার্স ফিলিংস!'

ঢক করে প্রায় আধ গেলাস হুইস্কীটা গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়েটা লুকিয়ে পড়বার পর আমি যেন ওদের মত মেয়েদের সব কিছু জানতে পারি, অনুভব করতে পারি। ঐ হোপলেস মেয়েটা আমাকে ঠকালেও আর কোন মেয়ে তা পারবে না।

তরুণ গেলাসটা হাতে নিয়ে চুপ করেই বসে থাকে।

অনেক দিন পর আজ হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে নিঃসঙ্গ তরুণের বড় বেশী মনে পড়ছে সে রাত্রির কথা।

......'চোখ দুটো দেখেই আমি বুঝতে পারছি এ মেয়ে কাউকে ফাঁকি দেবে না, দিতে পারে না। সী মাস্ট বী ওয়েটিং ফর ইউ।'......

নিজের একমাত্র মেয়েকে হারাবার স্মৃতিতে, ব্যথায়-বেদনায় সে রাত্রে বিভোর হয়েছিলেন মিঃ মিশ্র।......'আমার ঐ হোপলেস মেয়েটার মত এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা শুধু দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। তোমার এই ইন্দ্রাণী, আমার এই ইন্দ্রাণী মা সে জাতের নয়। ও বহুদিন ধরে বহু অন্ধকার মনে আলো ছড়াবে।'

রাইটিং ডেস্কের দুপাশে ঐ দুটো ছবি দেখে তরুণের মনে ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো স্বপ্নের মেঘ জমতে আরম্ভ করে। মেঘে মেঘে মেঘালয়ের প্রাসাদ গড়ে ওঠে মনের মধ্যে। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ে। তরুণ যেন হঠাৎ ইন্দ্রাণীকে দেখতে পায়। কটি মুহূর্তের জন্য অসহ্য নিঃসঙ্গতার যবনিকা পাত হয়।......

......'কি এত ভাবছ?'

চমকে উঠে তরুণ। 'কে? ইন্দ্রাণী?'

ইদ্রাণী মুখে কিছু বলে না। কোন কালেই তো ও বেশী কথা বলে না। কৃষ্ণচূড়ার মত মাথা উঁচু করে নিজের প্রচার সে চায় না, সূর্যমুখীর মত ঔদ্ধত্যও নেই তার। রজনীগন্ধার বিনম্র মাধুর্য দিয়েই তো সে তরুণকে মুগ্ধ করেছে। আজও সে ধীর পায় এগিয়ে এসে আলতো করে তরুণের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মুখে কোন জবাব দিল না, তবে যে চোখ দুটো হান্সা কোয়ার্টার ছাড়িয়ে, রেডিও টাওয়ার পেরিয়ে ঐ দূরের সীমাহীন আকাশের কোলে ঘোরাঘুরি করছিল, তাতে মিষ্টি তৃপ্তির ইঙ্গিত।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তরুণ কোন কথা বলতে পারে না। কৃষ্ণপক্ষের দীর্ঘ অমাবস্যার পর এক টুকরো চাঁদের আলোয় ঝলসে ওঠে মনপ্রাণ।

আবার একটা দমকা হাওয়া কোথা থেকে উড়ে আসে। ইন্দ্রাণী লুকিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিয়ে খেলা করার সুযোগও শেষ হয় ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের।

কতক্ষণ ধরে টেলিফোনটা বাজছিল তা সে জানে না। খেয়াল হতেই উঠে গেল।

......'ইয়েস মিত্রা স্পীকিং।'

অ্যাম্বাসেডর! বন থেকে? তবে কি ইন্দ্রাণীর কোন হদিশ পাওয়া গেল? না। মাস তিনেকের জন্য বন'এ থাকতে হবে জার্মান ইলেকশন আসছে বলে। চ্যান্সেলার কোনার্ড আদেনুরের জয়লাভ হবে কি? নাকি......। ইলেকশন সম্পর্কে স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হবে দিল্লীতে।

না বলবার কোন অবকাশ নেই। অ্যাম্বাসেডর নিজে টেলিফোন করেছেন। সি জি'ও তো রাজী। সুতরাং শুধু জানতে চাইল, 'হোয়েন শুড আই রিপোর্ট স্যার?'

'কাম বাই নেকস্ট উইক-এন্ড।'

ধন্যবাদ জানিয়ে তরুণ টেলিফোন নামিয়ে রাখল। কৌচে না বসে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে করতে ভাবল, ইন্দ্রাণীকে নির্বাসনে পাঠাতে। চিন্তায় ভাবনায় ভাবতে হবে ঐ বৃদ্ধ আদেনুরের কথা। বাহাত্তর বছর বয়সে যাঁর জীবন-সূর্য পৃথিবীর মহাকাশে উঁকি দিয়েছে, যিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে ঠান্ডা জলে পা দুটো ডুবিয়ে রেখে মাথায় তাজা রক্ত পাঠান আর ক্যাবিনেট মিটিং'এ সভাপতিত্ব করার সময় ঘন-ঘন চকোলেট খান, দিবারাত্রি ভাবতে হবে তাঁর কথা!

অতি দুঃখের মধ্যেও তরুণের হাসি পায় আদেনুরের কথা ভেবে। ঘুরতে হবে ঐ বিচিত্র বৃদ্ধের সভায় সভায়, যিনি তাঁর রোয়েনডর্ফের বাড়ীতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হলে এক বোতল রাইন ওয়াইন খেয়ে নিজেকে তাজা করে নেন?

(ক্রমশঃ)
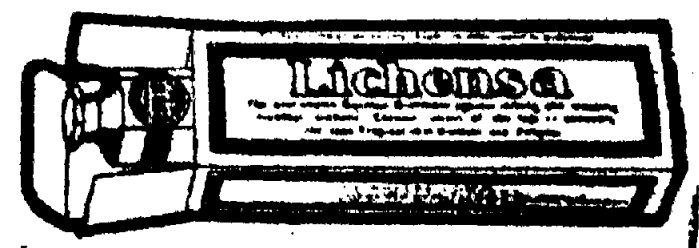
কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা আমাদের একটা শাল গাছের গুঁড়িতে বসতে দিল। গুঁড়িটা ওরা বসবার বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছিল। দেহাতী আঁখি গুড় দিয়ে বালি-খোঁড়া ঠান্ডা জল খেতে দিল। এইভাবে অতিথি আপ্যায়ন করল।

ওখানে বসে বসে ওরা কি করে খয়ের বানায় তা দেখলাম—শুনলাম। দেখলাম ওরা একটা চিতাবাঘ মেরেছে কাল—সেটার চামড়াটাকে একটা বাঁশের খোঁটার সঙ্গে গেঁথে মাটিতে বাঁশটিকে পুঁতে রেখেছে। বাঘের লেজটা মাটি অবধি ঝুলে আছে।

মাল্লারা বলল যে, ওরা প্রথমে খয়ের গাছের ছাল ছাড়িয়ে নেয়, তারপর বাইরের দিকে যে সাদাটে অংশ থাকে গাছের গায়ে, তাও তুলে নেয়—তখন দগদগে ক্ষতের মত গাছের লাল শরীর বেরিয়ে পড়ে। সেই দগদগে গায়ে আঠার মত আস্তরণ জমে। জমবার পর সেগুলো টুকরো টুকরো করে কাটে ওরা। কেটে এনে মাটিতে গর্ত করে বড় উনুন বানিয়ে সেই উনুনের গনগনে আঁচে বারো থেকে ষোল ঘন্টা জলে ফোটায়। তাতে যে আরকের মত পদার্থের সৃষ্টি হয় সেটিকে অন্য পাত্রে ঢেলে আবার উনুনে চড়ানো হয়। যতক্ষণ না সেই আরক বেশ ঘন হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত উনুনে চড়ানোই থাকে। ঘন হয়ে গেলে, একটি গোলাকার মৃৎপাত্রে ঢেলে থিতোতে দেওয়া হয়। সমস্ত রাত ধরে থিতানো হয়। তারপর দিন ভোরে বড় ঝুড়িতে ঢেলে ফেলা হয়। ছাঁকবার জন্যে। যেটুকু ঝুড়িতে জমা হয়, সেটুকু দিয়ে ভাল খয়ের হবে, ওরা সেই খয়েরকে বলে 'পাথড়া' আর যে জলীয় পদার্থ ঝুড়ি থেকে বাইরে এলো সেটিকে মাটিতে একটি গর্ত করে ঢেলে দেয়। তা দিয়েও এক রকমের নিকৃষ্ট খয়ের তৈরী করবে ওরা; তাকে ওরা বলে 'খয়রা'।

ঝুড়িতে যা থাকে তা প্রায় এক মাস ধরে ফেলে রাখা হয় শুকোবার ও শক্ত হবার জন্যে। তারপর প্রায় শুকনো হয়ে এলে সেগুলো মাটিতে ছাইয়ের উপর ঢেলে ফেলে। ওরকমভাবে আট-দশ দিন থাকবার পর সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। তখন সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে ব্যাপারীদের কাছে বিক্রী করে ওরা।

গরমকালে খয়ের বানানো যায় না কারণ গরমে খয়ের শক্ত হয় না মোটে—শুকনোও না। তাই শীতকালে কাজ আরম্ভ করে, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে ওরা চলে যায়। বন-বিভাগকে ওদের রয়্যালটি দিতে হয় এই খয়ের তৈরী করার জন্যে।

বেশ লাগে ওদের এই যাযাবর জীবনের কথা ভাবলে। ঝর্ণাতলায় রাঁধে-বাড়ে—সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে—শীতের রাতে যখন টুপ-টুপিয়ে শিশির ঝরে পাতা থেকে, তখন ওরা গোল হয়ে ওদের অনির্বাণ উনুনের সামনে বসে গল্প করে, গান করে, তারপর সেই আগুনের পাশেই কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। কেউ কেউ মাটির সরায় কাঠ-কয়লার আগুন নিয়ে ঝোড়ার মধ্যে দিয়েও শুয়ে থাকে।

রাতে বাঘ টহলে বেরিয়ে ওদের দেখে যায়—বাঘের চোখ ওদের ঝুপরির আশে-পাশে আগুনের গোলার মত জ্বলতে থাকে। কখনো সখনো হাতীর দল আসে। দূর দিয়ে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে চলে যায়। ওদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ক্যানেস্তারা পিটোয়, আগুনে নতুন করে কাঠ গুঁজে আগুন জোরালো করে।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো। প্রায়—তিন মাইল পথ যেতে হবে। উঠলাম আমরা। ওরা বার বার বললো, আবার আসবেন। আমরা গেছিলুম বলে আন্তরিক আনন্দিত হল। ছেলেটির মৃত্যুতে বার বার দুঃখ প্রকাশ করল। ভালুকীর বাচ্চা দুটিকে দশ টাকা করে এক ব্যাপারীর কাছে বিক্রী করে দিয়েছে ওরা। গরীব লোক। দশ টাকা ওদের কাছে অনেক টাকা।

পথ চলতে চলতে সুহাগীর ছেলেটি বলছিল, ভারী ভাল বাঁশি বাজাত নাকি ওর ভাই। ঐ বয়েসের ছেলেদের মধ্যে অত ভাল বাঁশি-বাজিয়ে চতুর্দিকে দশ পনেরোটা বস্তীতে কেউ ছিলো না।

আমরা প্রায় বড় রাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছি, এমন সময়, আমাদের একেবারে পথ জুড়ে একদল চিতল হরিণের দেখা পেলাম। ওরা এই সুঁড়ি পথের পাশে চরে বেড়াচ্ছিল। এদিকটাতে আমলকী গাছ অনেক। আমলকী খেতে এসেছিল কি জানি না।

একদলে যে এত হরিণ থাকে বা থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। ছোট বড়, মাদী শিঙ্গাল সব মিলিয়ে কমপক্ষে দুশো হরিণ হবে। আমাদের দেখা মাত্র তারা এমনভাবে বন-বাদাড় ভেঙে খুরে খুরে ঘটাঘট শব্দ তুলে ধুলো উড়িয়ে পালাল, সে কি বলব। এখনো মাঝে মাঝে সেই শেষ-বিকেলের সোনা-আলোয় হলদে সাদায় বুটি বুটি হরিণের ঝাঁকের পলায়মান ছবি চোখে ভাসে।

রাতে জীপে আসতে যেতে মাঝে মাঝে হরিণের ঝাঁকের সঙ্গে দেখা যে না হয় তা নয়, বড় বড় ঝাঁকের সঙ্গেও দেখা হয়। তখন গাড়ীর আলোয় জোনাকির মত ওদের চোখ জ্বলে। জ্বলে আর নেভে। কিন্তু দিনের আলোয় যেমন দেখায় তেমনটি রাতে দেখায় না। রাতে জঙ্গলের মধ্যে সব কিছুই কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয়। পথের পাশের বড় পাথর বা ঝোপের অপসৃয়মাণ ছায়ামাত্রকেই গুঁড়ি মেরে-বসা বাঘ বলে ভ্রম হয়। টিটি পাখীর ডাক—নাইটজারের সংক্ষিপ্ত অতর্কিত তীক্ষ্ম আওয়াজ—জীপের বনেট ফুঁড়ে ফরফরিয়ে ওড়া থাপু পাখীর ক্রমান্বয়ে থাপু-থাপু-থাপু-থাপু ডাক—এ সব মিলিয়ে রাতের বনে জঙ্গলে কেমন একটা অস্বাভাবিক [illegible] থাকে।

কে জানে অমন পরিবেশেই এখানের লোকেরা 'দারহা'র দর্শন পায় কি-না?

(১৬)

দেখতে-দেখতে বড়দিন এসে গেল। সুগতবাবু এসেছেন শিরিণবুরুতে। সেখান থেকে মারিয়ানা এবং উনি গিয়ে কুটকুতে থাকবেন দিন-কয়েক নিরিবিলি বিশ্রামের জন্যে। কুটকুতে ছুলোয়া শিকারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে পয়লা জানুয়ারী। আমরাও যাব।

ইদানীং আমার বাঙলোর সামনের রাস্তা দিয়ে অচেনা জীপের আনাগোনা বেড়ে গেছে। জবরদস্ত শিকারের পোশাক-পরা শহুরে শিকারীরা দামী-দামী রাইফেল-বন্দুক কাঁধে প্রায় প্রতিটি বাঙলো দখল করেছেন এসে। জঙ্গলে পাহাড়ে যেখানে-সেখানে হাটিয়া বসে; যেখানে-সেখানে হাটিয়ার দিনে 'ড্যাণ্ডি' বাবুরা নধর পাঁঠা থেকে শুরু করে পেত্তলের মল সব কিছু পাচ্য ও অপাচ্য জিনিস দর করে ও কিনে বেড়াচ্ছেন।

দুপুরবেলায় এবং কখনো গভীর রাতেও এ-বাঙলো সে-বাঙলো থেকে রেকর্ডপ্লেয়ারের ইংরিজী জাজ বা টুইস্টের রেকর্ড বাজছে।

রুমাণ্ডি থেকে শর্টকাটে কুটকু যাবার দুটি রাস্তা আছে। প্রথমটি বারোয়াড়ি ...টোর-মোড়োয়াই হয়ে কুটকু। অন্য রাস্তাটি ...ীপাদোহর হয়ে। রুমাণ্ডি থেকে একটি ...ানোয়ার-চলা সুঁড়িপথের মত পথ চলে গেছে। তাতে জীপ কষ্টে-সৃষ্টে যায়। লাতু থেকে সইদুপ্ ঘাট হয়ে ছীপাদোহর। ...াতে একটি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস আছে। ...ত থেকে কুজরুম হয়ে কুটকু। দুটি পথই ...তিদুর্গম। জীপ চালাতে রীতিমত কসরৎ ...রতে হয়—সারা রাস্তা গোঙাতে গোঙাতে ...ল জীপ। দুই পাশেই রুমাণ্ডি থেকে ...টক পেঁছিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল ...ড়ে।

অতখানি কষ্টকর পথ পার হয়ে ধুলোয় ...মাথ ভরে যখন আমরা মোড়োয়াই থেকে ...কুতে এসে পেঁছিলাম তখন সবে পূবের ...কাশ লাল হয়েছে। সূর্য ওঠে নি কিন্তু ...ন আভা কুয়াশার জাল ভেদ করে চারি-...ক ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শিশু সূর্যের ...ন্ত অন্তর ধরা পড়েছে কোয়েলের জলে। ...ীর ওপারে দেখা যাচ্ছে নদীর একেবারে ...ঘেঁষে, উঁচুতে ছোট্ট একটি বাঙলো।

এই কুটকু। দুদিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে ...। কোয়েল যে কি কলরোলা, কি সুন্দরী ...ভুলান নদী তা কুটকুতে না এলে বুঝি ...তাম না। চারিদিক পাহাড় ঘেরা, তার ... কোয়েল একটি অভিমানী বাঁক ...ছে। নদীতে জল খুব বেশী নেই। ...পর চাকায় জল ছিটোতে ছিটোতে নদী ...লাম আমরা। নদী পেরিয়ে ওপারে ...লাম। তারপর একটি বাঁক ঘুরে এসে ...লার হাতায় ঢুকে পড়লাম।

এতক্ষণ বুঝি বোঝা যাচ্ছিল না, বুঝি ...যাচ্ছিল না, জায়গাটা কতখানি সুন্দর। ...ার সামনে, হাতার সীমানা থেকে ...বত একটি কাঠের বারান্দা আছে ...একেবারে উপরে। তিন পাশে লোহার ...নর বেড়া। সেখানে দাঁড়িয়ে কোয়েলের ...ী মুখের সবটুকু চোখে পড়ে। মনে ...তে কষ্ট করে, ঐ ঠাণ্ডায় শেষ রাতে ...তদূর আসা সার্থক হল।

...রিয়ানা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে ...বারান্দায় বসুন; আসছি এক্ষুনি। ...দুজনে বারান্দায় না বসে বাঙলোর পায়চারী করতে লাগলাম। ঐ রাস্তায় ...ন জীপে এসে কোমর ধরে যাবার ... পায়চারী করতে-করতে দেখলাম ... একটি জীপ এবং জীপের পাশে ...অবস্থায় একটি ট্রেলার রাখা আছে।

...লোর বাঁপাশে যে আকাশ-ছোঁয়া ...ি আছে তার উপর থেকে এই সাত-... একটি কোটরা থেমে-থেমে ডাকছে ...যাক্ করে। আর সেই ডাক কোয়েল ...দূরে অবধি চলে যাচ্ছে তারপর আবার ঐ দূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।

নদীর ওপারে কেঁদ গাছের নীচে কি একটি জানোয়ার জল খাচ্ছিল মনে হল, হঠাৎ হুড়মুড় করে জঙ্গল ঠেলে পালাল। ময়ূর ডাকতে থাকল ওপার থেকে।

যশোয়ন্ত বলল, কপালে থাকলে সুগতবাবুর এবারে একটি বড় বাঘ হয়েও যেতে পারে। যা খবর আছে; তাতে ছুলোয়াতে বাঘ যে বেরোবেই তাতে আমি নিঃসন্দেহ। যদি সে একদিনে এই জঙ্গল ছেড়ে অন্য কোথাও সরে না পড়ে।

আমরা পায়চারী করছি। এমন সময় বাঙলোর বারান্দা থেকে ভদ্রলোক ডাকলেন আমাদের, আরে আসুন-আসুন, এদিকে আসুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

তাকিয়ে দেখলাম মারিয়ানার বন্ধু সুগতকে। লম্বা সুগঠিত চেহারা—বেশ সুপুরুষ বলা চলে। তবে সুন্দর বলতে যা বোঝায় তা নয়। পরণে পায়জামা ও ঘিয়ে ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবী; তার উপরে একটি শাল জড়িয়েছেন। চুলগুলো এলোমেলো। সব মিশিয়ে চেহারা এবং চশমাপরা চোখ দুটির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা মানুষকে প্রথম নজরেই আকৃষ্ট করে। খুব হাসি-খুশি ভদ্রলোক।

চৌকিদার অন্য দিকদিয়ে ঘুরে এসে চা দিয়ে গেছে। আমরা চেয়ার টেনে বসলাম। যশোয়ন্ত আলাপ করিয়ে দিল সুগত রায়ের সঙ্গে আমার। ফর্মালি। তাঁর চুরি-করে-পড়া চিঠির মাধ্যমে তাঁকে আমি আগেই চিনতাম।

ভদ্রলোক এমন প্রাণখোলা হাসতে পারেন, এমনভাবে চোখ তুলে তাকান যেন মনে হয় বুকের মধ্যেটা অবধি দেখতে পাচ্ছেন।

মারিয়ানাকে লেখা চিঠিটা পড়ে ফেলে-ছিলাম বলেই হয়ত, আমার বার-বার মনে হল—এই এলোমেলো চুলভরা মাথা ও কালো চশমার আড়ালের গভীর চোখের অতলতায় কোথায় যেন একটা বোবা কান্না আছে।

মারিয়ানা ওদিকের দরজা খুলে এল। একটি কালো সিল্কের শাড়ী পরেছে, মধ্যে লাল-লাল ফুল তোলা। গায়ে একটি সাদা শাল জড়িয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়েই যশোয়ন্তকে হেসে বলল, কি? এলেন ত জ্বালাতে? সুগতবাবু যশোয়ন্তের পক্ষ টেনে বললেন, জ্বলতে চাও যে সেটাও স্বীকার কর। নইলে ওকে নেমন্তন্নই বা করবে কেন? মারিয়ানা বলল, আমি মোটেই জ্বলতে চাই না।

মারিয়ানা সুগতের দিকে চেয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, এই যে, এঁর কথাই তোমাকে গল্প করেছিলাম।

সুগতবাবু চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামাতে-নামাতে বললেন, বুঝলেন মশাই, আপনার গল্প শুনে-শুনে প্রায় এ কদিনে আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। মারিয়ানা আপনার খুব বড় 'এ্যাডমায়রার'।

যশোয়ন্ত তড়াক করে সোজা হয়ে বসে বলল, আর আমার? আমার এ্যাডমায়রার নয় বুঝি?

মারিয়ানা দুস্টুমিভরা গলায় বলল, আজ্ঞে না মশাই।

কিছুক্ষণ সময় আমরা চুপচাপ বসে রইলাম, সুগতবাবু বললেন, শেষবারের মত একটা ময়ূর মারা যাক বুঝলেন যশোয়ন্ত-বাবু। যশোয়ন্ত বলল, যাই বলুন এমন মাংস আর খেলাম না।

মারিয়ানা বলল, রোদ উঠেছে, চলুন আমরা নদীর ওপারের ঐ বারান্দাতে গিয়ে বসি। এমন সুন্দর সকাল; কোথায় চুপ করে বসে থাকবেন, চোখ ভরে দেখবেন, — না, সকাল থেকে মাংস খাবার গল্প শুরু হল। আপনারা সত্যিই পরের জন্মে জল্লাদ হয়ে জন্মাবেন।

আমরা গিয়ে ঐ বারান্দায় বসলাম। একটা কনকনে হাওয়া আসছে নদীর উপর দিয়ে—মারিয়ানার অলকগুলো কানের পাশে কাঁপছে—সুগতবাবুর এলোমেলো চুলগুলো বিশ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে—সিগারেটটা ঠিক করে কিছুতেই ধরাতে পারছেন না—হাওয়া এসে বার-বার দেশলাই নিবিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হল ঐ মুহূর্তবাহী আগুনের সঙ্গে মারিয়ানার প্রতি সুগতবাবুর ভালোবাসারও একটা মিল আছে হয়ত। যতবারই পরিশ্রমের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে জ্বালাতে চান, ততবারই হাওয়ার ফুৎকারে নিবে যায়। যা থাকে; তা পোড়া বারুদের গন্ধ।

সুগতবাবু সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মারিয়ানা দেখছিল। অবশেষে একটা কাঠি নিবল না, সুপুরুষ হাতের মুঠোর মধ্যে আগুনটাকে বন্দী করে ফেলে সুগতবাবু সিগারেটটা ধরালেন।

যশোয়ন্ত শুধোলো, মিসেস রায়কে নিয়ে এলেন না কেন? সুগতবাবু যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন, আসতে বলেছিলাম অনেকবার কিন্তু ওঁর এক খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছবির এক্জিবিশান আছে এই সময়ে আর্টিস্ট্রি হাউসে—তাছাড়া উনি জঙ্গল-টঙ্গল, শিকার-টিকার বিশেষ পছন্দ করেন না, তবে অবশ্য আমার পথে

কোন বাধাও দেন না। নানা কারণে হল না আর কি একসঙ্গে আসা।
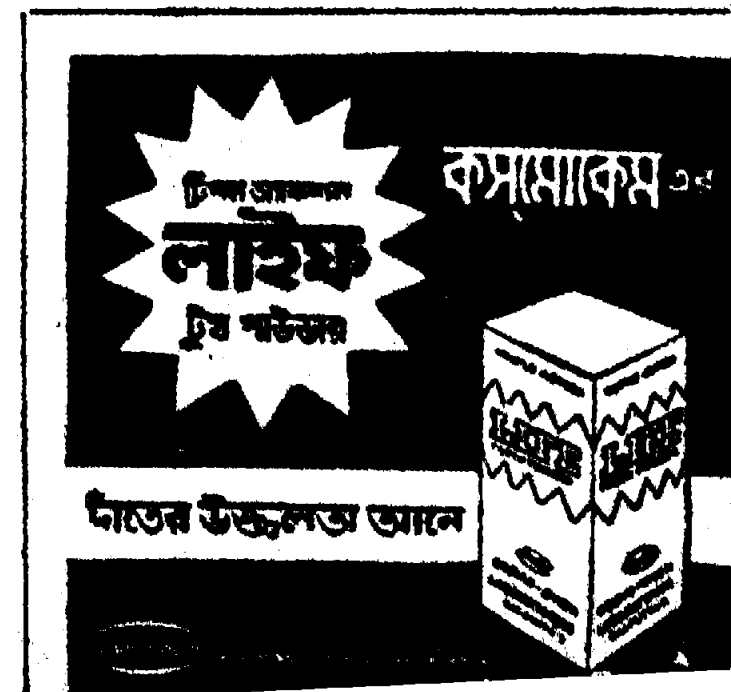
এইটুকু বলে, সুগতবাবু মারিয়ানার দিকে চাইলেন। মারিয়ানা চোখ নামিয়ে নিল।

কুজরুমের দিকে একটি বস্তিতে কুথী লাগানো রয়েছে—যেখানে রোজ রাতে শম্বর আসছে। এই শীতকালে পাহাড়ী বস্তি-গুলোর চারদিকে কাড়ুয়া আর সরগুজার চাল আর উপত্যকা সব একেবারে হলুদ হয়ে গেছে। এমন হলুদের সমারোহ বড় একটা দেখা যায় না। প্রতিটি পাহাড়ী গ্রাম দেহাতী মেয়ের ছুট্‌পরবের হলুদ শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে যেন। শান্ত সবুজের পটভূমিতে এই নরম হলুদ বড় চোখ কাড়ে।

সকলে মিলে ঠিক করা হল যে, বিকেলে হেঁটে-হেঁটে মুরগী-তিতির-বটের-আসকল-কালি-হরিয়াল, যা পাওয়া যায় তাই শিকার করা হবে। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া আটটা নাগাদ সেরে কুজরুমের রাস্তায় কুথী ক্ষেতে শম্বরের অপেক্ষায় ঝোড়ায় বসে থাকা হবে। রাত বেশী না হলে শম্বর সচরাচর পাহাড় থেকে নামে না; তবে বরাত ভাল থাকলে প্রথম রাতেও অনেক সময় পাওয়া যায়। যাই হোক আমি বললাম, পাহাড়ের উপত্যকায় শালপাতার ঝোড়ায় বসে এই ঠাণ্ডায় ত প্রাণ যাবার উপক্রম হবে—ওর মধ্যে আমি নেই। তোমরা যাও। যশোয়ন্ত বলল সেকথা মন্দ নয়, তাছাড়া মারিয়ানারও একা-একা লাগবে। কত রাতে আমরা ফিরব তার ত ঠিক নেই।

বিকেলে মারিয়ানা বাঙলোতেই ছিল। চুলটুল বেঁধে মুখ-হাত পরিষ্কার করে সেজে-গুজে সেই ঝুল বারান্দাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখনও বেশ বেলা ছিল। আমি যশোয়ন্ত এবং সুগতবাবু তিনজনে তিন দিকে বন্দুক হাতে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে নদীর উল্টো দিকে একটা কেঁদ গাছের নীচের একটা বড় কালো পাথরে আমি পা-ঝুলিয়ে বসে-ছিলাম। এদিকে-ওদিকে কিছু দূরে হাঁটা-হাঁটি করার পর।

এপার থেকে ওপারের কুট্‌কু বাঙলোটিকে দেখা যাচ্ছিল। সেই নদীর ওপারের কাঠের বারান্দায় মারিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল শাড়ি পরে। আমি দেখছিলাম। কোয়েলের গেরুয়া শরীর পেরিয়ে সবুজ পাহাড়ের পটভূমিতে মারিয়ানাকে মনে হচ্ছিল একটি একান্ত একলা ছোট্ট নীল পাখি, যে সুরগুজার হলুদ ক্ষেতে পথ-ভুলে ঢুকে পড়েছে তারপর হলুদে চোখ ধেঁধে গেছে, আর বেরিয়ে আসতে পারছে না।

শিকার করত বেরিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শিকার করতে ইচ্ছে করে না। প্রথম-প্রথম রুমাণ্ডিতে আসার পর যশোয়ন্ত বলেছিল, জঙ্গলকে ভালোবাসতে শেখো — তারপর দেখবে বন্দুক হাতে বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালে দিলখুশ হয়ে যাবে। এ কদিনে জঙ্গলের সম্বন্ধে যে অহেতুক ভয়টা ছিল সেটা সত্যিই কেটে গেছে। বন্দুক চালাতে শিখিয়েছে যশোয়ন্ত আমাকে — গুলি লাগাতে শিখেয়েছে। আমার নিজের উপর এখন আস্থা জন্মিয়েছে। তাই সত্যিই আজকাল বনে-পাহাড়ে চলাফেরা করি, কিন্তু শুধুই শিকার করতে আর ইচ্ছা করে না।

এই কুটকুর আসন্ন সন্ধ্যায় যে সুর, যে রঙ, যে ছবি; তার সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজের যেন কোন মিল নেই। যে বেহাগের সুর জলের কুলকুলানিতে এবং শুকনো পাতার মর্মরধ্বনিতে এখানে অনুরণিত হচ্ছে, তাতে বন্দুকের আওয়াজ হলে সেই মেজাজটি যেন ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

হঠাৎ আমার ডান দিকে ক'ক-ক'ক করে আওয়াজ হল, শুকনো পাতা সরানোর সড়-সড় খস্‌-খস্‌ আওয়াজ—তারপরই দেখলাম একটি প্রকাণ্ড মোরগ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নদীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়ানাকে দেখছে বোধহয়। আমাকে দেখতে পায় নি। বন্দুকটা আমার কোলে শোয়ানো আছে। মোরগটা গলা উঁচু করে আত্মবিশ্বাস ও কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গে ডাকল 'ক'কর-কু-কু-কু-কু--ক'=কর-কু।' এমন সময় একটা ছাই-রঙা আঁট-সাঁট গড়নের টাইট করে কোমরে-সেপটিপিন-আটকান শাড়ি পরা মুরগী এসে তাকে কুর্‌-কুর্‌ করে কি বলল—তক্ষুনি যৌবনমদে মত্ত মোরগটা আবার মুরগীর সঙ্গে আড়ালে চলে গেল। আমার গুলি করা হল না। গুলি করার কথা মনেই পড়ল না।

আমার পেছনে এবং নদীর ওপারে বাঙলোর দিক থেকে আগে-পরে দু-তিনটে বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল। জানি না যশোয়ন্ত বা সুগতবাবু কে মারলেন।

বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। একটু পরেই কোয়েলের জল থেকে রেফ্রিজারেটার খুললে যেমন ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করবে। সূর্য প্রায় হেলে পড়েছে। বাঙলোয় গিয়ে মারিয়ানার হাতে বানানো এক কাপ কফি খাবো।

কোয়েলের ধার ঘুরিয়ে বাঙলোয় ফিরতেই মারিয়ানা বলল, কি মারলেন? আমি বললাম, কিছুই মারলাম না—ঐ পারে গিয়ে চুপ করে একটা পাথরে বসেছিলাম। সেখান থেকে আপনাকে দেখা যাচ্ছিল। মারিয়ানা চোখ তুলে বলল সত্যি? আমি কি করছিলাম? আমি বললাম, আপনি কৃষ্ণ-চূড়ার ডালের নীল পাখির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই জঙ্গল-পাহাড়-নদী—এই অস্তগামী সূর্য সব মিলিয়ে যে ছবির সৃষ্টি হয়েছে সেই ছবির একটি আঙ্গিক আপনি।

মারিয়ানা খুশী হল। বলল, থাক, আমাকে নিয়ে কাব্য করতে হবে না। পারেনও আপনি। হাতে বন্দুক নিয়ে অত কাব্য আসে? বললাম, কাব্যের অনুপ্রেরণা থাকলে আসে—তবে ঠাণ্ডায় কাব্য হিম—জমে আইসক্রীম হয়ে যাচ্ছে—এক কাপ গরম, খুব গরম—কফি চাই।

সত্যি? একটু বসুন আমি এক্ষুনি চৌকিদারকে জল বসাতে বলে আসছি।

যশোয়ন্ত একটা খরগোশ মেরেছে। বলল, ব্যাটাকে বাঁশ-পোড়া করব কাল। সুগতবাবু একটি আসকল এবং একটি কালি-তিতির মেরেছেন।

ঠাণ্ডাও পড়েছে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। বড় নদীর পাশে বলে ঠাণ্ডা আরও বেশী। যশোয়ন্ত ঢক-ঢক করে অর্ধ বোতল রাম খেয়ে বোতলটি টাঁকস্থ করে লাপে উঠেছে। সুগতবাবু খাওয়ার আগে দু পেগ হুইস্কি খেয়েছিলেন যশোয়ন্তের অনুরোধে এবং মারিয়ানা বারণ করা সত্ত্বেও। খাওয়া-দাওয়ার পর সুগতবাবু কালো, ভারী ওভারকোটটা পরে নিয়েছিলেন। ভাল করে ফ্ল্যানেল দিয়ে রাইফেলটা মুছেছিলেন; তারপর যশোয়ন্তের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে-ছিলেন।

আমি আর মারিয়ানা জীপ অবধি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম ওঁদের। মারিয়ানা বলেছিল, সুগত বেশী রাত করবে না কিন্তু। ঠাণ্ডা লাগলেই তোমার ফ্যারাঞ্জাই-টিস বাড়ে।

পা'টা জীপে তুলতে-তুলতে সুগতবাবু বললেন, তুমি যখন বলছ তাই হবে। মারিয়ানা ঠোঁট উল্টে বলল, আমার কথা ত সব সময়েই শোনা হয়। যশোয়ন্ত জীপটা স্টার্ট দিল। হেডলাইটটা জ্বালল, তারপর ইঞ্জিনের গুনগুনানি জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কুজরুমের পথে হেড্‌লাইটের নৃত্যরত বৃত্তটি চোখের আড়ালে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

নেপথ্যের পথে

মধুপুরের পাগলী মেমসাহেব

মধুপুর স্টেশন থেকে প্রায় দু' মাইল ূরে বাহার-বিঘা পল্লীটি বনেদীয়ানায় লকাতার যে কোন অভিজাত পল্লীর সম- গোত্রীয়।

এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বিস্তৃত বেশ কটা চওড়া রাস্তা বাহার-বিঘার মাঝখান য়ে এসে পল্লীটির শেষপ্রান্তে একটি াহাড়ী নদীকে অতিক্রম করে দূরকার কে চলে গেছে। সাধারণ পাহাড়ী নদীর তই বর্ষাকাল ছাড়া আর প্রায় সব সময়েই ীর্ণস্রোতা। ঐ রাস্তাটির ধারেই পল্লীর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একটি বাড়ীর ম 'আসমান ভিলা'। কর্মক্লান্ত জীবনে ছুটো বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় ঐ বাড়ীতে স উঠলাম।

আমার আসল কাহিনীর সঙ্গে এসবের ান প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, তবুও শেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ রাস্তাটি ধানে পল্লীর শেষপ্রান্তে পাহাড়ী নদীর শা মিশেছে, তারই সংযোগস্থলে একান্ত ালায় শাল বনের ভেতর গড়ে ওঠা টা বাংলোবাড়ী আর তিনজন বাসিন্দাকে রই আমার এই কাহিনী।

আসমান ভিলার বারান্দায় আরাম- ারা নিয়ে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে রাস্তার ক তাকিয়ে থাকা ছাড়া সময় কাটাবার তখনও কোন আড্ডা বা পরিচিত কের সন্ধান পাইনি।

রোজ সকালে বেলা নটা নাগাদ পুরোন রে একটা সাইকেলে চেপে এক বৃদ্ধা াহেবকে মধুপুর বাজারে বাজার করতে ে দেখতাম। অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখতে াম, দূর থেকে ও'র সাইকেলের বেলের বা তাঁকে আসতে দেখলেই, খেলা- ায় মত্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল র খেলা ছেড়ে 'এই পাগলী মেমসাহেব' পাগলী মেমসাহেব' বলতে বলতে ণ তিনি বাহার-বিঘার সীমা রেখা ার হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর পেছন পেছন ় করতো। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্ন উঠলেও যতটা সম্ভব এসব অত্যাচার া করতেই চেষ্টা করতেন। মাঝে যখন ঐ ছেলেমেয়ের দল তাঁর লজ্ঝর- সাইকেলকে পেছন থেকে টেনে ধরে সহের সীমানায় আঘাত করতো, ় কেবল দেখেছি তাঁকে ছেলেদের করে দেখাতে। যাঁদের তিনি ভয়

দেখাবার চেষ্টা করছেন, তারা তাতে বিন্দু- মাত্র ভয় পাওয়া দূরে থাক, বরং মেমসাহেবকে ক্ষেপাতে পারার উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে, আনন্দ প্রকাশের মাত্রাটাও যেতো বেড়ে।

বাহার-বিঘার বয়স্ক কোন ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতি যদি সে সময়ে ঘটতো তাহলেই একমাত্র দেখতে পেতাম যে ছেলে-

সত্যব্রত দে

মেয়েদের অত্যাচার থেকে মেমসাহেবের নিষ্কৃতি ঘটেছে। তাছাড়া দু'পাশের বাড়ী থেকে কেউ বেরিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন এমন দৃশ্য তখনও আমার চোখে পড়েনি। তাই বাহার- বিঘার জীবনে এটা একটা অনুল্লেখযোগ্য দৈনন্দিন ঘটনা।

আসমান ভিলার সাঁওতাল পাহারাদার মংলুকে জিগ্যেস করেছিলাম গোবেচারী ঐ বৃদ্ধার প্রতি এই ধরনের অত্যাচার, বাহার- বিঘার মত পল্লীতে দিনের পর দিন কি ভাবে প্রশ্রয় পায়। আমার প্রশ্ন শুনে সে প্রথমটায় একটু বোধকরি অবাকই হয়ে গিয়েছিল। বাহার-বিঘার জীবনের সঙ্গে বৃদ্ধা মেমসাহেব ও তার চাইতেও জরাজীর্ণ তাঁর সাইকেলের পেছন পেছন ধাওয়া করাটা এত স্বতঃসিদ্ধ ও সহজগ্রাহ্য যে ঐ নিয়ে কোন প্রশ্ন তার মনে কোনদিন উদয় হয়নি। তাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জানালো যে এ সম্বন্ধে সে নিজেই কোন- দিন কিছু ভাবেনি। দীর্ঘকাল ধরে সে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে আসছে। তারতম্যের ভেতর শুধু এটুকুই ঘটেছে যে

মেমসাহেব সাইকেল চেপে বাজারে যেতেন তখন দূর থেকে ইচ্ছে করেই সাইকেলের বেলটা জোরে জোরে বাজাতেন; আর সেই শব্দে দু পাশের বাড়ী থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে তাঁর সাইকেলের গতিরোধ করে চীৎকার শুরু করতো—'মেমসাহেব চকোলেট দাও—না হলে তোমাকে ছাড়বো না।' মেমসাহেবও রাগের ভানে অক্ষমতা জানাতেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত রফা হতো। মেমসাহেবের ঝুড়ি থেকে বেরুতো চকোলেটের প্যাকেট আর সেখান থেকে একটা একটা করে সবাইকে দিয়ে হাসিমুখে আবার তিনি সাইকেলে চাপতেন।

অনেকদিন এমন ঘটনাও ঘটেছে যে কোন কারণে হয়ত ছেলেমেয়ের দল রাস্তায় অনুপস্থিত। সেদিন তাদের দেখতে না পেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার জুড়ে দিতেন—'দুষ্টু ছেলেমেয়েরা সব গেলি কোথায়? মরেছিস নাকি রে? বেরিয়ে আয় গর্ত থেকে নেংটি ইঁদুরের দল।' যদি না তাদের দেখা পেতেন, অপেক্ষা করতে করতে শেষকালে বিষণ্ণ মনে ফিরে যেতেন।

ধীরে ধীরে চকোলেট দেবার ক্ষমতা তাঁর এলো কমে। প্রায় বছর পনেরো আগে সেটা একরকম বন্ধই হয়ে গেল।

পুরোন ছেলেমেয়ের দল গিয়ে নতুন ছেলেমেয়ের দল আসে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরও রদবদল ঘটে। কিন্তু বাহান্ন-বিঘার জীবনে প্রতিদিনের ঐ একটি ঘটনা কেমন করে জানি না আজো সমানে চলে আসছে। মেমসাহেবের বয়স বেড়েছে আর তার সঙ্গে আরো অনেক বেড়েছে তাঁর দারিদ্র্য। তাই চকোলেট-না-দিতে-পারা মেমসাহেব ভবিষ্যতের নতুনদের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন ফসিল। জীর্ণ-দীর্ণ শত তালি দেওয়া পোষাক আর ততোধিক জীর্ণ ঐ সাইকেল চাপা মেমসাহেব আজ তাদের কাছে ভালবাসার চাইতে উপহাসের বস্তু। জীর্ণশীর্ণ চেহারা আর শতছিন্ন পোষাকের আবরণে কাউকে দেখলেই ছেলেবয়েসের কল্পনাপ্রবণ মন আপন মনেই পাগলের একটা সংজ্ঞা তৈরী করে নেয়। বোধকরি সেই কারণেই ধীরে ধীরে মেমসাহেবের রূপান্তর ঘটলো—পাগলী মেমসাহেবে। আর সেই থেকে ওভাবেই চলে আসছে। এ নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না।

মংলুর কথা শেষ হলে আমার নিজেরও মনে হলো সত্যিই তো—এটাই তো স্বাভাবিক। এটা না হলেই যেন কোথায় ছন্দপতন ঘটতো। যাহোক, মংলুর কাছ থেকে শোনার পর—মেমসাহেব সম্পর্কে ব্যক্তিগত-ভাবে যেটুকুও অনুসন্ধিৎসা আমার মনে ছিল—সেটুকুও আর রইলো না। কেননা চুনার, বিলাসপুর, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় এর আগে এমনিধারা অনেক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সাহেব-মেমদের দেখেছি, যাদের শেষ পরিণতির সঙ্গে বাহান্ন-বিঘার মেমসাহেবের কোন বিশেষ তফাত নেই। ইনিও হয়ত তেমনি কোন প্রিয়জন বা আত্মীয়স্বজনহীন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, জীবনের প্রান্তিকে এসে শেষপ্রহরের কাল গুনছেন।

কয়েকদিনের ভেতরই কয়েকটি চেনা-মুখের আবির্ভাবে বাহান্ন-বিঘায় একটি আড্ডা জমে উঠলো।

একদিন সকালে আড্ডাস্থলের দিকে চলেছি। রাস্তায় নেমে আসতেই দূর থেকে একটা সাইকেলের বেলের আওয়াজ কানে এসে পৌঁছাল। সেটা হয়ত লক্ষ্যই করতাম না যদি না খেলাধুলোয় মত্ত ছেলেমেয়ের দল হঠাৎ তাদের সবকিছু ফেলে রেখে দল বেঁধে চীৎকার করতে থাকতো 'ঐ পাগলী মেমসাহেব আসছে—ঐ পাগলী আসছে'। যথারীতি সেটা উপেক্ষাও করে-ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি একদল ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধা মেমসাহেবকে সাইকেল থেকে নামতেই শুধু বাধ্য করলো না এমন কি তাদের ভেতর কয়েকজন তাঁর তালি দেওয়া জীর্ণ পোষাক ধরে টানাটানি সুরু করে দিয়েছে। *ভীমরুলের দলের আক্রমণে মানুষ যেমন অসহায় হয়ে পড়ে, তেমনি অবস্থা হয়েছে বিব্রত অপ্রস্তুত মেমসাহেবের। দৃশ্যটা অসহ্য মনে হলো। ধমক দিয়ে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিয়ে মেমসাহেবকে উদ্ধার করলাম। আমার দিকে কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুটে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আবার সাইকেলে উঠে পড়লেন।*

আজ এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ছে না সেই আড্ডায় কিম্বা অন্য কোন স্থানে বা কারও কাছ থেকে মেমসাহেব সম্পর্কে কিছুটা জানার সুযোগ আমার হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে বাংলাদেশেরই কোন এক বিত্তশালী ব্রাহ্মণ পরিবারের ডাক্তারী পড়া একমাত্র সন্তান, কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম-বি পাশ করে, বাপ-মায়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চ-শিক্ষার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি সামরিক বাহিনীর মেডিকেল বিভাগে সরা-সরি কমিশন নিয়ে যোগদান করেন। ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে একজন সুন্দরী বিদুষী ইংরেজ যুবতীর প্রণয় ঘটে। ইউরোপ, আফ্রিকার বিভিন্ন সমরাঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি প্রশংসার ভাগী হন। তারপর একদিন যুদ্ধ থেমে গেল। বেসামরিক জীবনে ফিরে যাবার অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু সামরিক জীবনকেই তিনি শেষপর্যন্ত জীবিকা বলে গ্রহণ করলেন। সামরিক মেডিকেল বিভাগে পাকাপাকি যোগ দেবার আগে অপেক্ষামানা প্রণয়িনীকে বিয়ে করে ভারতে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা ছেলের বিলেত যাত্রাকে যদিও বা কিছুটা সহ্য করে নিয়েছিলেন—কিন্তু একেবারেই পারলেন না ছেলের এই বিবাহ। সংঘাত ঘটলো সংস্কারের সঙ্গে পুত্রস্নেহের। শেষ পর্যন্ত সংস্কারই জয়ী হল। বিনা দ্বিধায় একমাত্র উত্তরাধিকারীকে শুধু ত্যাজ্যপুত্র করেই ক্ষান্ত হলেন না, এমনকি তাঁর সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন।

এ নিয়ে ছেলের মনেও অভিমানের শেষ ছিল না। পিতা-মাতার সঙ্গে পুনর্মিলনের কোন সম্ভাবনার আশা তাঁর মনের গভীরে লুকিয়েছিল কিনা জানা যায়নি—তবে কোনদিনই কোন সূত্রে সে চেষ্টা যে তিনি করেন নি, সেকথা বেশ ভালভাবেই অনুমান করা যায়, তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনা থেকে।

যখন চাকুরী-জীবন শেষ হল তখন তিনি পদমর্যাদায় কর্ণেল ব্যানার্জী। শুধু নিজের বাপ-মায়ের উপরই নয়, এমন কি গোটা সমাজের উপরেও তাঁর দুঃখ অভিমান তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাই সামরিক জীবন থেকে অবসর নেবার পর আর বাংলাদেশে ফিরে না গিয়ে, সদা গড়ে ওঠা বাহান্ন-বিঘার শেষপ্রান্তে নির্জন নিভৃত স্থানে তৈরি করলেন শেষজীবনের বাসস্থান। *অপুত্রক স্বামী-স্ত্রী আর চাকুরী-জীবনের বিশ্বস্ত অনুগামী একাধারে ভৃত্য অনাধারে পাচক আবদুর রহমানকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল ঐ বাড়ীর জীবন-যাত্রা।*

স্বামী-স্ত্রী বাহান্ন-বিঘার অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে না মিশতেন যে তা নয়, তবে নিজেদের ঘিরে এমন একটা গুরু-গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে আলাপের মাত্রাটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সীমারেখা অতিক্রম করার সুযোগ পেত না, অথচ মেলামেশার ভেতর কোথাও এমন কোন সহৃদয়তার অভাবও ঘটত না যাতে বিরূপ সমালোচনার অবকাশ থাকতে পারে।

সাহেবী কায়দায় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর সন্ধ্যা আটটার ভেতর ডিনার শেষ হত। তারপর মিসেস ব্যানার্জী বসতেন পিয়ানোতে। স্বামীকে তাঁর প্রিয় ইংরেজী গান গেয়ে শোনাতেন রাত নটা পর্যন্ত এবং তারপর ঘুমোবার আয়োজন। এটাই ছিল প্রতিদিনের চলতি রুটিন।

কর্ণেল ব্যানার্জীর ছিল শিকারের নেশা। পাকা শিকারী হিসেবে তাঁর খ্যাতিও ছিল। সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, হরিণের অভাব নেই। প্রথম প্রথম শিকারে যাবার ইচ্ছেটা তাঁর প্রবলই ছিল। কিন্তু প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার দরুনই বোধকরি তাঁর সে নেশা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দূরে ঘন জঙ্গলঘেরা গ্রামান্তর থেকে যখন অসহায় সাঁওতালরা আসতো অত্যাচারী জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচাবার আবেদন নিয়ে, একমাত্র তখনই তিনি শিকারে বেরোতেন। কর্ণেলসাহেবের লক্ষ্য ব্যর্থ হতে তারা কোনদিন দেখেনি। তাদের কাছে কর্ণেলসাহেব ছোটখাট দেবতা বিশেষ। ভোরবেলায় বেড়িয়ে পড়তেন

কারে। বাগান আর নিজের কাজ নিয়ে রাদিন কাটাতে হত মিসেস ব্যানার্জীকে। রেপর বিকেল হলেই প্রসাধন সেরে ামীর প্রিয় পোষাকে সেজেগুজে তাঁর ত্যাবর্তনের পথ চেয়ে বারান্দায় বসে পেক্ষা করতেন। আর অবশ্যম্ভাবী প্রায় ন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসতেন র্ণেল সাহেব। নিয়মিতভাবেই দূরে ঙ্গলের ভেতর অনেক মশালের আলো ার আনন্দমুখরিত সাঁওতালদের বাঁশী-দলের আওয়াজ জানান দিত আরেকটি কার-সফল দিনের খবর। শিকার বা কারগুলিকে বন্য কাঠের ডালের সঙ্গে ধে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে আসতো ওতালরা। মেমসাহেবকে দেখাবার পর গুলো তাদের নিশ্চিত বরাদ্দ।

ব্যানার্জীসাহেবের ডিনারের জন্যে ি হবার অবকাশে ডিনারটেবিলকে ল আর মোমবাতি দিয়ে সুন্দর করে জের হাতে সাজিয়ে নিতেন মিসেস নার্জী। ডিনার খেতে খেতে সারাদিনের কারের ইতিহাস শোনাতেন কর্ণেল-হেব, আর গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ য় হাসিমুখে স্বামীর মুখের দিকে কিয়ে সে কাহিনী শুনতেন মিসেস নার্জী। ডিনার শেষ হলে সাহেব তাঁর খের চুরুট ধরিয়ে বসতেন কৌচে আর নোতে অতি মৃদুস্বরে গান গেয়ে নাতেন মিসেস ব্যানার্জী।

এমনি করেই চলছিল তাঁদের নিস্তরঙ্গ বন।

আজ মিঃ ব্যানার্জীর জন্মদিন। সকাল-য় বাড়ীর বারান্দায় বসে চা খেতে ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জন্ম-টা কেমন করে সার্থক করে তোলা যায় নয়ে মিসেস ব্যানার্জী আর রেহমান না-কল্পনায় ব্যস্ত। এমন সময়ে কাঁদতে ে হাজির হল একদল সাঁওতাল। মিঃ জীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে একটি ী কাঁদতে কাঁদতে জানালো যে ভোর-র দিকে তার স্বামী গোয়ালঘরে গরু-দের অস্বাভাবিক চীৎকার শুনে ছুটে ছিল দেখতে। কিন্তু উত্তেজনায় বোধ-সে কথা তার মনেও হয়নি যে ব অরক্ষিত অবস্থায় ছুটে যাওয়ার । কোন মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা ত পারে। গোয়ালঘরে পৌঁছাবার ই বাড়ীর উঠোনের মাঝখানেই হঠাৎ থেকে একটা মানুষখেকো বাঘ র ভেতর এক লাফে তাকে মুখে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না তার স্বামীর দেহ বা বাঘের কোন এখন সাহেব ছাড়া তাদের আর আশা ভরসা নেই।

ন্মদিনের প্রস্তুতি করছিলেন মেম-। কথা ছিল আজ আর কোথাও বন না সাহেব। কিন্তু আকস্মিক এই থাত মিঃ ব্যানার্জীকে এক কঠিন র সম্মুখীন করলো। সাঁওতাল মেয়ের কান্না শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন মেমসাহেব। স্বামী-হারা মেয়েটির বুক-ফাটা আর্তনাদের ভেতর বোধকরি তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই মিসেস ব্যানার্জীর চোখে সম্মতির লক্ষণ দেখতে পেতে সাহেবের কোন অসুবিধা হলো না। যত শীগগির সম্ভব ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে রাইফেল হাতে একরকম ছুটতে ছুটতেই সে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন।

জঙ্গলের ভেতরটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন বেলা চারটে। এরপর আর এখানে বসে থাকাটা সব দিক থেকেই বিপজ্জনক। ওদিকে আবার সাঁওতালরাও জঙ্গলের ভেতর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। আলো নিয়ে আসবার কথা তাড়াতাড়িতে কারো মনেই হয়নি। তাই ফিরে যাওয়াটাই প্রশস্ত মনে করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাঘটাও নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কেননা তার ফলেই বোধকরি হঠাৎ একটা ছায়া মিঃ ব্যানার্জীর পায়ের কাছে পড়লো। বিস্মিত হয়ে উপরে টিলার মাথার দিকে তাকাতে দেখতে পেলেন এক-জোড়া জ্বলন্ত আগুনের গোলা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। রাইফেলটাকে বাগিয়ে নিয়ে ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গুলিটা গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশে না লাগার দরুন আহত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ব্যানার্জীকে নিয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগলো। সেই অবস্থাতেই তিনি পর পর আরো তিনটি গুলি চালালেন। গুলির আওয়াজে সাঁওতাল দল উৎকর্ণ হয়ে জঙ্গলের সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সবাই যেন কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিশ্বাসই করতে পারছিল না বাঘ আর শিকারী দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে মরে পড়ে আছে।

সন্ধে পার হয়ে গেছে। মিঃ ব্যানার্জীর ফেরার সময় হয়ে এলো। স্বামীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যথারীতি প্রসাধন-পর্ব সমাপ্ত করে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আজ যেন একটু বেশী দেরী হচ্ছে। মনটাও কেন জানি অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠছে। জোর করে নিজেকে দুঃশ্চিন্তা থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে এলোমেলো কাজে মন দিলেন। আটটা বেজে গেল—অস্থির মনে আবার বারান্দায় এসে উদ্বিগ্ন হয়ে দূরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরেই মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। ঐ তো ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রতিবারের মত সাঁওতালদের জ্বলন্ত মশালের আলোর মিছিল এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অনেক কাছে এগিয়ে এলো আলোর মিছিল। কিন্তু কৈ—অন্যান্য দিনের মত সাঁওতালদের আনন্দ-মুখরিত কলকণ্ঠ বা মাদল-বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তো! তাহলে কি আজকের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে? শুধু হাতে ফিরে এলেন ব্যানার্জী-সাহেব?

মিছিলটা প্রায় বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। মশালের আলোয় সবাইকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শুধু মিঃ ব্যানার্জী ছাড়া। আরো দেখতে পেলেন ঠিক আগেকার মতই সাঁওতালদের কাঁধে লতাপাতা দিয়ে জড়ানো দুটি শিকার—ঠিক যেমনটি তারা

এর আগেও নিয়ে এসেছে। হয়ত মিঃ ব্যানার্জী পিছনে কোথাও আছেন। ধীরে ধীরে নীরবে নতমস্তকে সাঁওতালরা যখন লন পেরিয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে—তখন কেমন যেন একটা অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা তাঁর সমস্ত দেহ-মনকে অবশ করে ফেললো। যেন ভাল-মন্দ সব কিছুই বোঝার ক্ষমতা তার লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু ব্যর্থ প্রত্যাশায় চোখদুটো তার শূন্য দৃষ্টি মেলে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো। না—মিঃ ব্যানার্জীর চিহ্ন মাত্রও নেই কোথাও। এদিকে সাঁওতালরা লতায়পাতায় মোড়া মোড়ক দুটিকে খুলতে উদ্যত। প্রথমটি বাঘের দেহ। তা হলে তো শিকার ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়টি খুলতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ওদের চোখে জল কেন? তবে—তাহলে কি? হ্যাঁ—তাই-ই সত্যি হয়ে দাঁড়াল—ক্ষত-বিক্ষত মোচড়ানো দুমড়ানো মিঃ ব্যানার্জীর দেহটা সব চেনার অতীত। একটা তীব্র বুক-ফাটানো চীৎকার আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছিলেন স্বামীর মৃত-দেহের ওপর।

তারপর নিঃসঙ্গ জীবন আরো নিমর্মভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে উঠলো। অহরহ একটা চাপা বুকফাটা অব্যক্ত বেদনা ছাড়া আর কোন অনুভূতিই যেন তাঁর আর রইলো না। চরম এই বিপর্যয়ের দিনে নীরবে সব সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে রইলো শুধু একজন—প্রভুভক্ত ভৃত্য আবদুর রেহমান।

বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেল। মিঃ ব্যানার্জীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেন্সনও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু সঞ্চয় ছিল দিনে দিনে তাও নিঃশেষ হয়ে আসছে।

মাইনে না দিতে পারার গ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে অনেকবার রেহমানকে ছুটি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু রেহমান সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। জীবনের অনেক বছর প্রভুর সান্নিধ্যে কখন কেটে গেছে টের পায়নি। ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী থেকে নিজেকে শুধু বঞ্চিতই করেনি, এমন কি নিজের বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনের খবর রাখাও প্রয়োজন মনে করেনি। সাহেব আর মেমসাহেব ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির স্থান তার জীবনে ছিল না। আর আজ সেই হৃদয়বান প্রভুর অবর্তমানে, নিঃসঙ্গ মেম-সাহেবকে ভবিষ্যতের অন্ধকারে একলা ফেলে রেখে নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা তার কাছে বেইমানি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুটি মানুষ—একজন প্রভু আর একজন ভৃত্য—নিঃসঙ্গ জগতে পরস্পরকে আশ্রয় করে বোধকরি কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

বিশেষ সমস্যা দ্বিধা আর বিপদে পড়েছিল রেহমান সেদিন—যেদিন মেম-সাহেবের শেষ পুঁজিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। অনেক বোবাকান্নায় স্তব্ধ পাথর-প্রতিমা ধীরে ধীরে কথা কইলো—রেহমান এই বন্দুকদুটি বিক্রি করে দিতে পার? প্রভুর প্রিয় রাইফেলদুটির দিকে তাকিয়ে রেহমানের ইচ্ছে হয়েছিল প্রাণভরে একটু কাঁদে—কিন্তু পাছে তার এই ভাবাবেগ প্রভু-পত্নীকে বিব্রত করে, তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিল—পারবে নিশ্চয়ই পারবে। রাই-ফেলদুটো হাতে নিয়ে বাজারের পথে বেরিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু লুকিয়ে গোপন-পথে নিজের ঘরে ফিরে এসে পুরোন জিনিসপত্রের ভেতর সেগুলি লুকিয়ে রেখে-ছিল। তারপর নিজের টিনের বাক্স খুলে চাকুরীজীবনের সঞ্চয় থেকে উপযুক্ত মূল্যে পরিমাণ টাকা বার করে নিয়ে মেমসাহেবকে দিলে। মেমসাহেব টাকাটা নিজে না নিয়ে রেহমানকে বলেছিলেন, ও টাকাটা তুমি রাখো। ওখান থেকেই সংসারের খরচটা চালাও—যে কটা দিন চলে চলুক।

আকস্মিক এই প্রস্তাবের ভেতর রেহমান আল্লার মেহেরবাণীকে খুঁজে পেয়েছিল কারণ রাইফেল বিক্রির টাকাটাকে এখন অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। মেমসাহেবকে জানতেই দেবে না—সে টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে। তার নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে যতদিন চালান যায় চালাবে। চাকরের টাকায় জীবন নির্বাহ করতে হচ্ছে—এত বড় অপমান—এতবড় গ্লানি প্রভু-পত্নীর জীবনকে যেন দুর্বিষহ করে না তুলতে পারে—এটাই হবে তার সাধনা। ইনসান আল্লা। তাকে পারতেই হবে।

সে সাধনা—সে প্রার্থনা বিফল হলো না। মেমসাহেব জানতেই পারলেন না কেমন করে সংসার চলছে। খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে হলেও মেমসাহেব আজো জানেন না সংসারের টাকাটা কোথা থেকে আসছে। কারণ টাকা ফুরোলে রেহমান নিশ্চয়ই তাঁকে বলতো।

মিসেস ব্যানার্জীর সঙ্গে আলাপ কর-বার বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অলিগলিতে উঁকিঝুঁকি মারার এতটুকু ইচ্ছেও আমার ছিল না। তবুও কেমন যেন একটা অদৃশ্য শক্তি বিকেল হলেই আমাকে টেনে নিয়ে যেত নদীতীরে নির্জন সেই বাংলোটার পথে। নদীর বুকে বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে থেকে সন্ধেটা কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসতাম। নদীর চর থেকে বাড়ীটা পরিষ্কার দেখা যেতো। এতদিনের ভেতর এমন কিছু অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা উল্লেখযোগ্য ঘটনার আভাস পেলাম না যাতে আমার মনের কিছু খোরাক জোটে। যথারীতি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি প্রতিদিন। প্রায় একই সময়ে, বেলা ছটা নাগাদ দেখতাম মেমসাহেব প্রসাধন সেরে বারান্দায় চেয়ারে বসে দূরে জঙ্গলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নির্জন নদীতীরের অন্ধকার থেকে লক্ষ্য করতাম—আটটা নাগাদ রেহমান এসে হলঘরে ডিনার টেবিলে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, টেবিলটাকে সাজিয়ে দিয়ে, মেমসাহেবকে বোধকরি ডিনারের খবরটা জানিয়ে যেত। ধীরে ধীরে মেমসাহেব এসে টেবিলে বসে প্রার্থনা করতেন। একটু পরেই পুরোদস্তুর কেতাদুরস্ত তকমা আঁটা পোষাক পরে রেহমান সাহেবী কায়দায় ডিনার পরিবেশন করতো। এর ভেতর বৈচিত্র্য কিছুই নেই কিন্তু ডিনার খাবার সময়ে মিসেস ব্যানার্জীর রকম-সকম দেখে মনে হতো দ্বিতীয় একজন কেউ যেন তাঁর সঙ্গে বসে ডিনার খাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি টেবিলে আর কেউ নেই। হয়তো মস্তিষ্কবিকৃতির একটা অভিব্যক্তি। ডিনার শেষ হলে মেমসাহেব গিয়ে বসতেন পিয়ানোতে আর একটু পরেই শুনতে পেতাম পিয়ানোর টং-টাং-এর সঙ্গে চাপা গলার অস্ফুট মৃদু গুঞ্জন। কয়েক মিনিট পরে পিয়ানো থেকে উঠে দাঁড়াতেন তিনি তারপরই বাড়ীটা অন্ধকার হয়ে যেতো। বুঝতে পারতাম মেমসাহেব এবার শুতে গেছেন। আমিও ধীরে ধীরে তখন বাড়ীর দিকে পা বাড়াতাম।

একদিন আড্ডায় মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ছিলাম। কে একজন বলে উঠলেন—'আপনারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। মেমসাহেব কি আগেকার মত আছেন নাকি? পাগল—পুরোমাত্রায় পাগল আরে মশাই তিরিশ বছরের ওপর হবে মিঃ ব্যানার্জি বাঘের হাতে মারা গেছেন কিন্তু মেমসাহেব আজও সেকথা বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা মিঃ ব্যানার্জি শিকারে গেছেন। একটু বাদেই ফিরবেন মিঃ ব্যানার্জি বেঁচে থাকতে ঠিক যেভাবে তাঁদের জীবনযাত্রা চলত—আজও মেম সাহেব সেগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন—যেন সব ঠিক আছে। পাগল না হলে এসব কেউ করে!' এতক্ষণে আমার মেমসাহেবের প্রতি দিনকার একই রুটিনরহস্য কিছুটা উপলব্ধি হল। আলাপ করার তাগিদটা অনেক স্তিমিত হয়ে এলো।

আমার অবসরের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। কাল বাদে পরশু ফিরবো কলকাতায়। বাঘমুন্ডি-বিঘার প্রান্তিকে ও পাহাড়ী নদী আর তার নির্জনতা আমাকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাই শেষবারের মত তাকে বিদায় না জানিয়ে ফিরতে পারছিলুম না। একটু বেলা থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খানিকটা নদীর চরের উপর দিয়ে বেড়িয়ে সবে রাস্তার উপর উঠে এসে দাঁড়িয়েছি—এমন সময়ে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলো মেমসাহেবের সঙ্গে বাড়ীর দিকেই ফিরছিলেন তিনি। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। মুখে মৃদু বিষন্ন হাসির রেখা। বললেন—ইয়ং-ম্যান! তোমাকে প্রায়ই দেখি নদীর ধারে বেড়াতে। মধুপুরে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা এদিকটা একরকম এড়িয়েই চলেন। তাই তোমার প্রতি একটু কৌতূহল জেগে-ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম এ তো দেখছি আমার সেই পুরোন বন্ধু যে আমাকে দুষ্টু ছেলেগুলির হাত থেকে সেদিন বাঁচিয়েছিল। তারপর কতদিন ভেবেছি তোমার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু যোগা-যোগ আর কিছুতেই হয়ে উঠল না।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করার একটা বিশেষ বাসনা আমারও ছিল। কিন্তু পাছে আপনি সেটা পছন্দ না করেন সেই দ্বিধায় আর সাহস পাই নি।

একটু অবাক হয়েই যেন তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বিস্ময়ের সুরে জিগ্যেস করলেন—ঠিক বলছো তো?

—মিথ্যে বলার কোন কারণ তো নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষ আলাপ করবে—তাতে অন্যায়টা কোথায়?

—আমি তো মানুষ নই। মধুপুরের লোকেরা আমাকে আজ সেটুকু মর্যাদাও দেয় না। চিড়িয়াখানার জীবের মত আমি তাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু—নাম পাগলী মেমসাহেব। অবিশ্যি এ নিয়ে আজ আমার নিজেরও কোন সন্দেহ নেই—সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি—ওরা আমাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে।

এভাবে কথার মোড় ফিরবে ভাবতে পারি নি। ভীষণ একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছি। কি বলা যায় ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ মেমসাহেব চমকে উঠে বললেন—এইরে! বড্ড দেরী হয়ে গেল। আমার স্বামী শিকারে গিয়েছিলেন—ও'র ফেরবার সময় হয়ে গেছে। এখন আর তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারছি না। ও'র ফেরার আগে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হয়। ভীষণ পরিশ্রম আর ক্ষুধার্ত হয়ে ফেরে তো তাই দেরী সহ্য হয় না। আজ আমি চলি। হ্যাঁ—ভাল কথা মধুপুরে আর কদিন আছ?

—পরশু ফিরবো কলকাতায়।

—সে কি? এত শিগ্গির? আচ্ছা—তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে কাল সন্ধ্যায় আমার এখানে ডিনার খাও না! মিঃ ব্যানার্জির জন্মদিন। সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে আলাপও হবে। কি? কোন আপত্তি আছে?

একটু আগেই যাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হয়েছিল এখন দেখছি তিনি সত্যি-সত্যিই অসুস্থ। পাছে আমাকে ভুল বোঝেন তাই তাড়াতাড়ি হাসি-মুখে উত্তর দিলাম—

—মোটেই না। বরঞ্চ খুব খুশী হয়েছি। ডিনার এবং মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ—দুই-ই আমার কাছে সমান লোভনীয়।

—ধন্যবাদ। কাল ছটা নাগাদ এলে খুব খুশী হবো। আচ্ছা—গুড নাইট।

সারাটা দিন কেটে গেল জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে। সব গুছিয়ে নিতে একটু দেরীও হয়ে গেল। প্রায় সাতটা নাগাদ মেমসাহেবের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

বাড়ীটা যেন আজ বিশেষ সাজে সেজেছে। হলঘরের আলোগুলো যেন অনেক দিন বাদে তাদের উজ্জ্বলতা ফিরে পেয়েছে। লন পেরিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়েছি এমন সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ব্যানার্জি।

—এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। দেরী দেখে ভাবছিলাম—আর হয়ত এলেই না।

—আমাকে মাফ করবেন। কাল চলে যাব বলে জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে একটু দেরী করে ফেললাম। আমার ভয় হচ্ছে হয়ত আপনার কোন অসুবিধা ঘটিয়ে ফেললাম।

—না—তবে ঘটাতেও পারতে। কেননা আজকে আমার স্বামীর জন্মদিনে তুমিই একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি। না এলে ভীষণ দুঃখ হতো। ব্যানার্জি শিকারে গেছেন—ফেরার সময় হয়েছে। উনি ফিরে এলেই ডিনারে বসা যাবে—কি বল?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যাঁর জন্মদিন উপলক্ষ করে নিমন্ত্রণ পেলাম—তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে না এ কি করে হয়। উনি যতক্ষণ না ফিরছেন ততক্ষণ বরঞ্চ বারান্দায় বসে একটু গল্প করা যাক।

কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে এমনি দুটি চেয়ার দখল করে দুজনে বারান্দায় বসলাম।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবারে নজরে পড়লো মিসেস ব্যানার্জির প্রসাধন আর সাজসজ্জার উপর। বহুদিন আগেকার নিশ্চয়ই যৌবনের প্রাচুর্যের সময় দেহের মাপে তৈরী, একটা গাঢ় নীল রঙয়ের গাউন অতিবিষণ্ণভাবে মেমসাহেবের জীর্ণশীর্ণ দেহটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে আঁকড়ে ধরে আছে। গাউনটার সর্বত্রই সেলাই আর রিপুর চিহ্ন থাকলেও তার বনেদীয়ানা সহজেই অনুমান করা যায়। সাদা ফ্যাকাশে মুখের রংটাকে গোপালী করার চেষ্টায় গোলাপী পাউডার মেখেছেন প্রচুর কিন্তু সস্তার পাউডার তাঁকে নির্মমভাবে প্রতারিত করেই শুধু ক্ষান্ত হয় নি— যেন খানিকটা রোষভরেই তাঁকে আরো বীভৎস করে তুলেছে। যৌবনে একদিন যে সাজ—যে প্রসাধন তাঁকে ব্যানার্জির কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল—আজ হয়ত অভ্যাসবশে তারই রোমন্থন করেছিলেন। কিন্তু ভাবতেই হয়ত পারেন নি সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার মার্গারেটের সঙ্গে আজকের সত্তর বছরের মিসেস ব্যানার্জির কোন সম্পর্কই নেই।

অন্যমনস্কভাবে সেসব কথা ভাবতে-ভাবতে বোধকরি আমার দৃষ্টিটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে অকারণে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সেটি লক্ষ্য করেই হয়ত তিনি নিজের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন। প্রশ্ন করলেন—আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি এত ভাবছ বলত?

আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টিটা তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে দেখে লজ্জিত হয়ে উঠলেও নিজেকে সামলে উত্তর দিলাম—

—সত্যিই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম মার্গারেট ওয়াকার যে অতিসুন্দরী মহিলা ছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছে আজকের এই সন্ধ্যায়, এই মুহূর্তে, মিসেস ব্যানার্জির রূপের কাছে সে যেন ম্লান হয়ে গেছে।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই যা মুখে এসেছিল তাই বলেছিলাম। বিশেষ কিছু একটা ভেবে বলিনি বা কোন উদ্দেশ্যও তাতে ছিল না। তবুও সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারের ভেতরও আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, হঠাৎ ঐ তোবড়ানো গাল দুটো যেন অস্বাভাবিকভাবে লাল হয়ে উঠেছে। সে কি লজ্জায়? একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে আরেকটিকে ডেকে আনি নি তো? শঙ্কিতচিত্তে তারই একটা হিসেব-নিকেশ করছি। এমন সময়ে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত প্রচণ্ড এক হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ব্যানার্জি।

—মেয়েদের মনে সহজে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় ফন্দীটা তোমার বেশ রপ্ত করা আছে দেখছি। যে মেয়ে কুৎসিত-কদাকার—তাকেও যদি কেউ সুন্দরী বলে, সে খুশী[illegible] ভরে ওঠে—কিন্তু একথা সে ভাল[illegible]ই জানে ওকথা বলার ভঙ্গীটুকু ছাড়া আর কিছুই সত্যি নয়। এই সত্তর বছরের ফসিলকে সুন্দরী বলার ভেতর আমি রীতিমত একটা ফ্লার্টিংয়ের আভাস পাচ্ছি। বাট মাই ইয়ংম্যান—আই রিগ্রেট মাই সেভেন্টি।

ও'র কথা বলার ধরনে আমিও না হেসে থাকতে পারলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই মুহূর্তে যিনি স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে কথা বলছেন, পরের মুহূর্তেই তিনি কেন আবার অসংলগ্ন হয়ে পড়েন।

এমন সময়ে ঘরের ভেতরে একটা ঘড়ি অনেক কষ্টে টেনেটেনে আটটা বাজালো। নীরবতা পাছে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কিছু বলা দরকার ভাবছিলাম এমন সময়ে কে যেন বললো—মেমসাব—ডিনার রেডি। তাকিয়ে দেখি বহু জরাজীর্ণ, তালি-দেওয়া হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেয়ারা-বাবুর্চির তকমা

আঁটো পোশাকে সজ্জিত রেহমান সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

—তাই তো রেহমান। আমার মনে হচ্ছে সাহেবের আজ ফিরতে দেরী হতে পারে। আমাদের সম্মানিত অতিথিকে অনর্থক অপেক্ষা করিয়ে রেখে লাভ নেই। তুমি বরং ডিনার সার্ভ করার বন্দোবস্ত কর।

রেহমান চলে গেলে তিনি বললেন—ব্যানার্জির ঐ একটি দোষ। শিকারে একবার বেরুলে আর বাড়ী ফেরার কথা মনে থাকে না। অথচ আজ তাঁর জন্মদিন। অতিথিরা অপেক্ষা করে থাকবেন—আমি অপেক্ষা করে থাকবো—একথাটাও ভুলে যান। সত্যি বলছি—তোমার সামনেই আজ আমি তাঁকে জিগ্যেস করবো—তাঁর কাছে আমি বড় না তাঁর শিকার বড়। তুমি তো আমার ছেলের মত—সত্যিই বল তো আমার রাগ করাটা অন্যায়?

জোর করেই বেশ উচ্চগ্রামে হেসে বললাম—তাঁর জীবনে শিকার শুধু নয় এমন কি সমস্ত পৃথিবীর চাইতেও আপনি অনেক বড়—এ সত্যি কথাটা বহু বহুবার শুনেও বোধকরি আপনার আশ মেটে নি—তাই বারবার নতুন করে শুনতে ইচ্ছে হয় বিশেষ করে আজকের এই দিনটায়। আজকের দিনে অকারণে রাগ করার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে বৈকি।

-কি বলতে চাও তুমি?

—যাঁকে সমস্ত জীবন ভরে নিঃশেষে সব কিছু দিয়ে রিক্ত হয়েছেন—তাঁকে দেবার মত একটি মাত্র শেষ সম্বল আপনার হাতে আছে—সেটি হচ্ছে অনুরাগ। পঞ্চাশ বছর পরে আজও সেটুকু উপচে পড়ছে আপন মহিমায়। মিঃ ব্যানার্জি অতিভাগ্যবান পুরুষ। আজ এই মুহূর্তে তিনি আমার কাছে বিশেষ হিংসার পাত্র।

আনন্দে লজ্জায়, খুশীতে খিল-খিল করে উচ্ছল হয়ে উঠলেন মেমসাহেব।

ডিনার টেবিলে এসে বসলাম দুজনে। তিনটি আসনের সম্মুখে তিনপ্রস্থ ডিনার প্লেট, ছুরি-কাঁটা সাজানো। মোমবাতি আর ফুল দিয়ে সাজানো টেবিলটা মর্মান্তিকভাবে অন্য আরেকজনের অনুপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তিনটি আসনের সামনে তিনটি প্লেটে পাউরুটির দুটো করে টুকরো।

রেহমান ডিনার সার্ভ করছে এমন কেতাদুরস্তভাবে যেন টেবিলে তিনজন খেতে বসেছে। প্রথমে এলো ওনিয়ন সুপ। আমার নেওয়ার পর সেই সুপের খানিকটা খালি আসনের প্লেটে নীরবে তুলে দিলেন। সুপের প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাবার পর এলো বাঁধাকপি সেদ্ধ। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এর পরেই এলো অতিসাধারণ এক কাপ কফি। ডিনার শেষ। অবাক হয়ে ভাবছিলাম আজকের এই বিশেষ দিনেই যদি এমন ধারা খাবার বরাদ্দ হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য দিনে কি খান? কি খেয়ে বেঁচে আছে দুটি প্রাণী? তার দারিদ্র্যের খবর কিছুটা শুনেছিলাম কিন্তু সেটা যে এত মর্মান্তিক সেকথা কল্পনাও করতে পারি নি। ডিনারের জন্যে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখি, পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে এদিক-ওদিক টেবিল গুছাবার ছলে, অতিকষ্টে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে নিজেকে একটু সামলেও নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসো তোমাকে একটু গান শোনাই। জান ব্যানার্জির আবার ডিনারের পর গান না শুনলে ঘুম হয় না।

—আমি তাতে মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না। কেননা আমার নিজেরও এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আপনার গান না শুনলে আজ হয়ত আমারও ঘুম হবে না।

—থাক খুব হয়েছে—নাও স্টপ ফ্লাটারিং মি ইউ নটি—বলেই হাসতে-হাসতে পিয়ানোতে গিয়ে বসলেন।

জীর্ণ কম্পিত হাতের পিয়ানোর টুং-টাং আওয়াজের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠের অস্ফুট অদ্ভুত বাণী যেন কোন অতলান্তিকের তল থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ফিরছে। শুধু থেকে থেকে শুকনো ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো কেঁপে-কেঁপে উঠছে পুঞ্জীভূত অবরুদ্ধ কান্না আর বেদনায় মূর্ত হয়ে। গালের দু পাশ দিয়ে শ্রাবণের ধারা নেমেছে অঝোর ধারায়। টুকরো-টুকরো যে দু-একটা গানের কথা ভেসে এলো সেগুলো পার্থিব কোন মানুষের উদ্দেশ্যে, না কি স্বর্গপুরের অমরাবতীর কোন বাসিন্দার জন্যে, সেটুকু বুঝে উঠতে আমি পারি নি।

'ডার্লিং আই শ্যাল অলওয়েজ
প্রে ফর ইউ, নো মেটার
হোয়েরেভার ইউ মে বি'

কি ভাবছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার পেছনে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে দেখি মিনতি-ভরা চোখে রেহমান। বুঝলাম এবার আমার ওঠা প্রয়োজন। মিসেস ব্যানার্জি তখনও পিয়ানোয় বসে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়েছি এমন সময়ে হঠাৎ ঝনাৎ করে পিয়ানোটা আওয়াজ করে উঠলো। থমকে পেছনে ফিরে দেখি পিয়ানোর রীডের ওপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন মিসেস ব্যানার্জি। এ সময়ে আবার ফিরে যাওয়া তাঁকে বিব্রত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শীতের কুয়াশাভরা বাহাদুর-বিদায় রাস্তায় বারবার কানে বাজছিল—

'ডার্লিং আই শ্যাল অলওয়েজ
প্রে ফর ইউ, নো মেটার
হোয়েরেভার ইউ মে বি।'

পরাজিত

জয়শ্রী গুপ্ত
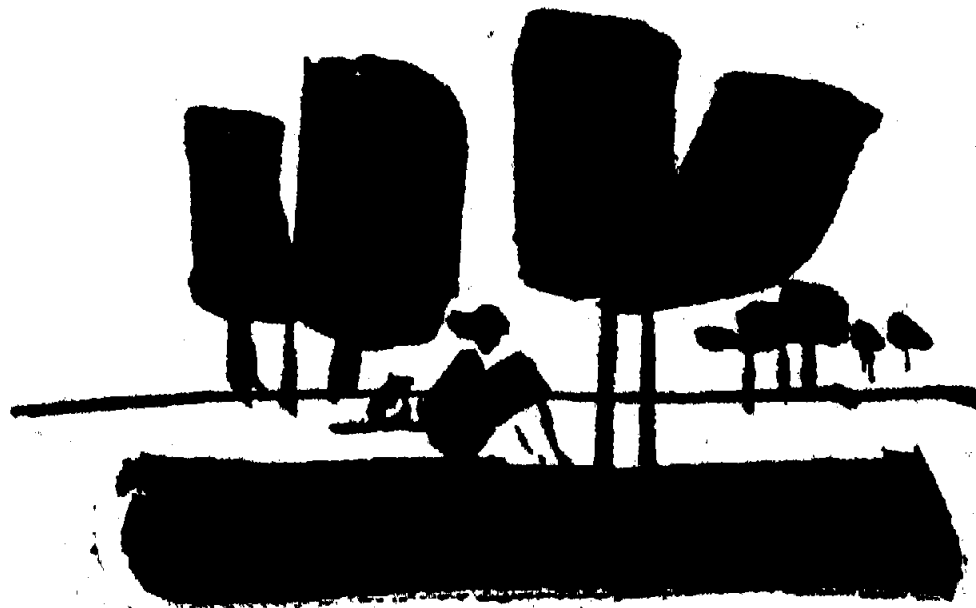
সকালে যখন অনুপম পুজোয় বসেছেন, প্রাত্যহিক রান্নায় ব্যস্ত সুরধুনী রান্নাঘরে, নিরুপম রোজকার মত দেরি করে স্নান সেরে তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরতে লাগলো। অনুপম একবার তাকালেন। পুজোর ঘর পার হয়ে একটু ছোট বারান্দা। সেখানে ছোট আয়নার সামনে দাঁড়ালো নিরুপম। পাশে তার ছোট শোবার ঘর। অনুপমের ঘরে দু'খানা খাট। স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর ছেলেমেয়ে এতদিন কাছে ছিল। ছেলে পাশ করে কলেজে পড়ছে হস্টেলে থাকে। মেয়ে মামার বাড়ীতে থাকে।

একটু পরে নিরুপমের পোশাক পরা হলে সে চীৎকার করল, 'ঠাকুর ভাত. কলেজের সময় হয়ে গেছে। শীগ্গির!' অনুপম আস্তে ডাকলেন 'নিরু—' অনুপম আস্তে কথা বলেন। এত আস্তে যে শোনা যায় না। তাঁর চলা বলা সবই আস্তে। তবুও একটি ব্যক্তিত্ব তাঁকে ঘিরে থাকে। নিরুপম হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘরে এল। 'বল' অনুপম গীতাটা বন্ধ করে বল্লেন, 'আজ একবার যা না, মেয়েটিকে দেখে আয়!'

'আমি আবার কেন—তুমি আর দিদি দেখলেই তো হ'ল?'

অনুপম একটু কাশলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে তারপর আবার নিরুপমের মুখে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'দেখ, নিজে দেখা একবার ভালো। অল্পবয়সে বিয়ে করছ না তো! আর তিনিও তো কলেজে পড়া—' এই অবধি বলে থেমে গেলেন।

দাদাকে নিরুপম ভালবাসে। ভয়ও করে খুব। প্রতিবাদ করতে পারল না। বলল, 'যাব, এখন যাই দশটায় ক্লাস।' সুরধুনীর গলা শোনা গেল 'নিরু খেতে আয়—' অনুপম আবার গীতায় মন দিলেন।

অনুপম আর নিরুপম সহোদর ভাই নন। কিন্তু অনুপম যে তার বৈমাত্রেয় ভাই বা সুরধুনী বৈমাত্রেয় বোন একথা সে কখনও বুঝতে পারেনি। নিরুপমের মা যখন নতুন কনেবউ এ বাড়ীতে পা দেন, তখনই অনমনীয় ব্যক্তিত্বে গড়া সেই মানুষটি, অনুপমের বাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'নতুনবউ, কখনও যেন কেউ জানতে না পারে অনু, সুরো তো নয়ই যে ওদের মা তুমি নও—আমিও যেন না দেখি।' নিরুপমের মা কলেজে পড়া মেয়ে ছিলেন না। কাজেই স্বামীর কথার জবাবে উত্তর না দিয়ে চুপ করে সায় দিয়ে ছিলেন মাথা নীচু করে। তারপর মাথা নত করে শ্বশুর-শাশুড়ীর ছবিকে প্রণাম করেছিলেন। সুরধুনী ছোটবেলায় বিধবা, কত ছোট-বেলায়, তা তাঁর মনে নেই। স্বামীর স্মৃতি ঝাপসা, অস্পষ্ট। দুইভাই আর অনুপমের দুটি ছেলেমেয়ে অমর ও শিবানী এদের নিয়ে তাঁর সুখ দুঃখে দিন কেটে যায়। অনুপমকে দ্বিতীয় বিবাহের কথা বলে-ছিলেন কিন্তু অনুপম অন্য নারীকে জীবনে আনবার কথা চিন্তাও করেন নি। সংসারের ভার পুরোপুরি পড়েছিল সুরধুনীর উপর। নিরুপম তখন ছোট, তাদের মা বাবা দুজনেই মারা গেলেন। অনুপম ভাইকে স্নেহ আর শাসন দিয়ে মানুষ করলেন। নিরুপম যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে তখন মা গেলেন তার কিছুদিন পর বাবা। অনুপম ভাইকে কোন কষ্ট বুঝতে দিলেন না। সুরধুনীকে কোন অভাব জানতে দিলেন না। নিঃশব্দে মাথায় তুলে নিলেন গুরুদায়িত্ব। একটি স্কুলে কাজ করতেন, বি-এ পাশ করে ঢুকেছিলেন, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে জ্ঞান ছিল, প্রধান শিক্ষকের ডানহাত হয়ে দাঁড়ালেন। স্কুলে তাঁর মত পরিশ্রমী, সৎ, ও নীরব কর্মী কেউ ছিল না। উন্নতি ধীরে ধীরে হল। রাত্রে দুটি' ছাত্র পড়াতেন। তখনও অমর ও শিবানী ছোট। অমর ও শিবানীর মা যখন মারা গেলেন তখন একজন কিশোর একজন বালিকা। অনুপম এ দায়িত্বও মাথা পেতে নিলেন। পিছনে ছিলেন সুরধুনী, তেমনি অক্লান্ত আর কষ্টসহিষ্ণু। নিরুপম তখন বি-এ পাশ করেছে। তার অধ্যাপক হবার ইচ্ছা দেখে অনুপম তাকে

এম-এ ক্লাসে ভর্তি করলেন। ভালভাবে নিরুপম পাশ করে সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ পেল। অনুপম দেখলেন এবার ওর বিয়ে দেওয়া দরকার। দাদা দিদি মাথার উপর থাকায় তার বন্ধুমণ্ডলী পরিবৃত দিনগুলি হাল্কা মেঘের মত ভেসে যায়। কলেজের খাতা, বন্ধু-বান্ধব ও ভাইপো ভাইঝি, এদের বাইরে কোন কিছুই তার চোখে পড়ে না। মেয়ে দেখায় রাজী হওয়ায় অনুপম নিশ্চিন্ত হলেন। সুরধুনী ঘরে এলেন। স্নান হয়ে গেছে। সুরধুনীর চুলে পাক ধরেছে। দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রতার চিহ্ন দেহে। মুখে ক্লান্তি, সংযম ও অভিজ্ঞতার মেশানো ছাপ। 'এস, চা খেয়ে নাও'—অনুপম উঠলেন চশমা খাপে ভরে রেখে বল্লেন, 'তোর কই,' 'হবে, হবে তুমি খাও তো সৃষ্টির রান্না পড়ে আছে'—অনুপম একটু হাসলেন। বোনের স্বভাব জানেন। তিনি না খেলে খাবে না। চিরদিন একভাবে কাটালো। নারীজগতের কত উন্নতি দেখলেন কত চাকচিক্য। বোনটি তার আড়ালে শুধু সেবা আর পরিশ্রম দিয়ে জীবন ক্ষয় করলো। চেতনা হল সুরধুনীর কথায়, 'যাক্ নিরু রাজী তাহলে। মেয়েটি ভালই জানো। কিন্তু বড্ড বেশি বয়স বাপু।' অনুপম বল্লেন, 'কেন তোর ভাই কি কম?' ওর বন্ধুরা তো সবাই সংসারী, ছেলেমেয়ের বাবা।'

'কি করবে বল? যা তৈরী করেছ? এখন বৌ কেমন হয় দেখ! বি-এ পাশ। এত লেখাপড়াজানা নিয়ে কি করবে শুনি? আমি কিন্তু এবার গুরুদেবের সঙ্গে কাশী যাব।'

অনুপম হাসলেন। 'বাবাঃ এখুনি? দাঁড়া শিবুর বিয়ে হোক, অমরের বউ আসুক—তবে তো!'

সুরধুনীর খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন, 'আমার বয়ে গেছে এতদিন থাকতে। তুমি থেকো এই বাড়ীতে। বৌদি গেছে, আমার ভাগ্য কি বৌ-এর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব? আচ্ছা আজ কি ইস্কুল নেই?'

'যাব এখুনিই। তুই যেন আর জল-খাবার দিস নে সুরধুনী' আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন। দুই ভাই চলে গেলে একা ঘরে অসহ্য লাগে। মহাভারত রামায়ণ অন্য সব বই অনুপম আনিয়ে দিয়েছেন। তবুও নিঃসঙ্গ লাগে। সর্বদুঃখহর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। অনুপম স্কুলে চলে গেলেন। আজ অমরের আসার দিন শনিবার। সুরধুনী খাবার রাখলেন। মিষ্টির পাত্র জলে বসিয়ে ঢাকা দিলেন। শিবানী মাঝে মাঝে আসে। যে কয়দিন থাকে সুরধুনীর মনে হয়, বাড়ীটার প্রাণ থাকে। কাকা আর ভাইঝি সব সময় হৈ-চৈ করে।......

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে নিরুপমের বিয়ে ভালভাবে হয়ে গেল। বৌভাত-এর আগে সবার পাতায় ভাত দেবার আগে নতুন বৌকে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন সুরধুনী। পাশাপাশি তিনখানা ছবি। অনুপমের স্ত্রী। নিরুপমের মা-বাবা। অন্যটি অনুপম ও সুরধুনীর মা। শর্বরী বুঝতে পারে নি। আন্দাজে বুঝল ইনিই প্রথমা। সুরধুনী বলতে প্রণাম করল শর্বরী। শর্বরী মানুষ হয়েছে প্রবাসে। তিন-চারজন ভাইবোনের মিলিত সংসার তার ভাল লাগছিল। এ যেন এক অনাস্বাদিত জগৎ তার অজ্ঞাত মধুরতা দিয়ে গড়া।

নিরুপমের নতুন জীবন আরম্ভ হল। জীবনে নিরুপম কখনও অনাত্মীয় মহিলার সংস্রবে আসে নি। শর্বরী কলেজে পুরুষ বন্ধুদের সংস্রবে এসেছে, কিন্তু পুরুষের ভালবাসার রূপ তার জানা ছিল না। প্রাক-ত্রিরিশে বিবাহ করলেও দুজনের মনের মাধুর্য দুজনকে নবীনভাবে আবিষ্কার করল। একে অপরকে ভাল-বাসলো। তবু...কোথায় যেন ছন্দপতন হয়। অনুপম বুঝতে পারেন কোথায় অসমছন্দে যতিপাত হচ্ছে। সুরধুনীর মুখে মেঘের ছায়া পড়ে। শিবানী আজকাল বাড়ীতেই থাকে। কাকীমাকে 'ছোটমা' বলে ডাকে। অমর গম্ভীর ও সংযত। শিবানী ও শর্বরীর মিলিত কলরব, ছুটোছুটি অনুপমের ভাল লাগে। বাড়ী যেন প্রাণহীন ছিল। এখন প্রাণ এসেছে। কিন্তু এই ছন্দ-পতন, কোথায় হয় তিনি ধরতে পারেন না। সুরধুনী চান শর্বরী ঘোমটা দিয়ে, আলতা পায়ে ঘোরাফেরা করবে, তাঁর কাছে কাছে থাকবে। শর্বরীর সেকথা মনে থাকে না। চেষ্টা করে আবার বহুদিনের অভ্যাসে বাঁ হাতে চুড়ি পরতে ভুলে গিয়ে বকুনি খায়। চাদরে আলতা লাগার ভয়ে আলতা পরে না, বুঝতে পারে সুরধুনী অপছন্দ করেন। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার এ বাড়ীতে বেশি। শর্বরী তাও মনে রাখতে পারে না। প্রায়দিন সুরধুনীর খাওয়া নষ্ট হয়।

কলেজ থেকে ফিরে একদিন নিরুপম দেখলো শর্বরী ঘরে বসে আছে। চুল বাঁধেনি মুখটা শুকনো। বইপত্র রেখে এসে বলল, 'কী হয়েছে?' শর্বরী কেঁদে ফেলল। সামান্য কারণে সুরধুনী তাকে তিরস্কার করেছেন। সাংসারিক সামান্য ব্যাপার। নিরুপমের কানে গেল না কী ব্যাপার। একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি কী বলেছ?' 'আমিও বলেছি আমি এখানে থাকব না।'

অধ্যাপকসুলভ গাম্ভীর্য নিরুপম বলল, 'বেশ তো চল তোমায় রেখে আসি?'

শর্বরী অবাক হয়ে বলল—'তা বলিনি। তুমিও থাকবে না এ বাড়ীতে।'

নিরুপম ঘুরে দাঁড়ালো। শিশুর বিস্ময় তার দুই চোখে। বলল, 'শর্বরী কী বলছ?' দাদা দিদিকে ছেড়ে কোথায় যাব? তুমি বুঝে দেখ।' শর্বরী চুপ করে থাকলো। তারপর উঠে গেল একসময়। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ পড়েছিল আগুন জ্বলে উঠল একদিন। প্রতিদিনের অসন্তোষ শর্বরী ও সুরধুনীর মধ্যে বিশ্রীভাবে আত্মপ্রকাশ
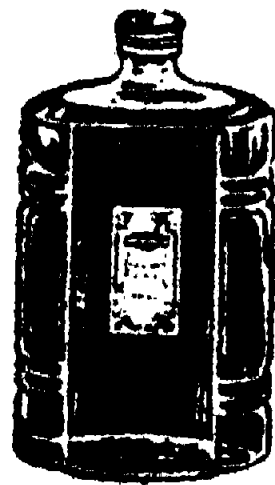
করল একদিন। শর্বরী মাতৃতুল্য ননদের মুখের উপর একটা কড়া জবাব দিয়েছিল। ভেবে দেখেনি পরিণাম। সহ্য করলে, হয়ত সব ঠিক হয়ে যেত। সুরধুনীই নত হতেন। শিবানী ও অমর যখন জানতে পারল তখন দুজনেই বলল, 'ছোটমা, তোমার অন্যায় হয়েছে।' অনুপম কোন কথা বললেন না। তাঁর মনে একটা ছবি ভেসে উঠছিল। খুব ছেলেবেলায় তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে নিরুপম বলত, 'দাদা, তুই সব বইগুলো আমাকে দিবি?' অনুপম বলতেন 'দেব।' 'স......ব?' 'হ্যাঁ সব।'

সমাধান খুব ভাল পথে এল না। নিরুপম একদিন কলেজ থেকে ফিরে বলল, 'দিদি আমি ভাবছি একটা বাড়ী নিয়ে—' কথাটা শেষ হল না। দ্রুত চলে গেল দিদির সামনে থেকে। সুরধুনীর মন সম্ভবত কঠিন পাথর। চোখে জলও এল না। সহজভাবে জলখাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী বলছিলে?' 'একটা ফ্ল্যাট নিলাম। এখানে অসুবিধে হচ্ছে।' 'ভাল জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।' 'কবে যাবে?' 'সামনের রবিবার?' সুরধুনী সরে গেলেন।......রাত্রে শর্বরী দেখলো নিরুপম খুব গম্ভীর। বলল, 'কী ভাবছ? কষ্ট হচ্ছে ছেড়ে যেতে?' 'নাঃ কষ্ট আর কী।' বলল নিরুপম। কিন্তু কথাটা বলতে তার বুক ভেঙে গেল। দাদার সঙ্গে সহস্র স্মৃতি আর দিদির খেতে দেবার দৃশ্যটা সে কিছুতে ভুলতে পারছিল না।

রবিবার সকালে অনুপম বাড়ী থেকে চলে গেলেন। শর্বরী সামনে গিয়ে প্রণাম করল। হাত তুলে বললেন—'থাক মা' তারপর আস্তে বেরিয়ে গেলেন। গাড়ী এসে দাঁড়াল, জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, শর্বরী সুরধুনীকে প্রণাম করবে, শিবানী ছুটে এল, 'ছোটমা বাবা আর পিসিমণির মনে কষ্ট দিয়ে তুমি সুখী হবে না। আবার আসতে হবে।' —সুরধুনী দু হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিলেন 'পোড়ারমুখী চুপ কর। যে যায় যেতে দে—' শিবানী কেঁদে উঠল। অমর এসে প্রণাম করল। নীরব, সংযত। শর্বরীর প্রণামের উত্তরে সুরধুনী কোন কথা বললেন না, কোন আশীর্বাদও না।

নিরুপমের ফিরতে আজকাল দেরি হয়। একা ফ্ল্যাটে শর্বরী হাঁফিয়ে ওঠে। এক একদিন জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরি কর কেন? কলেজ তো চারটে অবধি।' নিরুত্তাপ উত্তর আসে, 'কাজ থাকে।' কিম্বা 'দেরী হয়ে গেল।' নিরুপমের কথা ক্রমশ কমে আসছে। সবসময় তাকে শ্রান্ত মনে হয়। আর শর্বরীর মনে হয় সংসারে এত কাজও আছে। ওবাড়ী থাকতে তো জানতেও পারতাম না। বিকেলে সময় পাই না। ঝি না এলে কাজের সমুদ্র।' রাত্রে শুয়ে দুজনের কোন কথা হয় না। ঐ বাড়ীতে শিবানী আর অমর কেবলই গল্প করত। কখনও গান। কখনও আবৃত্তি। মাঝে মাঝে অনুপম ও সুরধুনী যোগ দিতেন। সেই মধুর সম্মিলন-এর জন্য মনটা তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। সংসারের সব খরচ চালিয়ে অকুলান হয়। নিরুপম টিউশানি নিল। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। সুরধুনী সবরকম সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, শিবানী ও অমর বলে যে কেউ আছে তাও মনে হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে একখানা পোস্টকার্ড নিরুপমের কলেজের ঠিকানায় আসে। সুন্দর হস্তাক্ষর সীমিত কথা। সাদর সম্বোধন। 'বৌমা ও তুমি কেমন আছ। কোন কষ্ট হয় কিনা। কষ্ট হলে জানাস। আর বেশি কষ্ট হলে চলে আসিস। টাকার দরকার হলে জানাস্।' বলা বাহুল্য লেখক অনুপম। শর্বরীর হাতে চিঠিটা এনে দেয় নিরুপম। কোন বাক্য বিনিময় হয় না। কী একটা অজ্ঞাত কারণে শর্বরীর বুকটা জ্বলতে থাকে। এমনি ভাবে দিন কেটে যায়। নিরুপম সকালেও একটা টিউশনি নিয়েছে। ফ্ল্যাট ভাড়া সব খরচ করে টাকায় কুলোয় না। সামনে পুজো। শর্বরী ভাবে মা বাবার কাছে যাবে কিনা। কিন্তু নিরুপমের শরীর ভাল যাচ্ছে না। ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। শহরে পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। বিকেলে কাজ সেরে ঝি যখন চলে যায় তখন খুব একা ও শ্রান্ত লাগে। নিরুপমের আসতে অনেক দেরি। মনে পড়ে সুরধুনী এ সময় চুল বেঁধে দিতেন। পরিচ্ছন্ন না হলে বকতেন। এখন কেউ নেই যে অনুযোগ করে। অনুপম স্কুল থেকে এসে 'বৌমা' বলে ডাকতেন। নতুন বই বা পত্রিকা পেলে তার হাতে দিতেন এসে। পাশাপাশি ফ্ল্যাট অনেকে আসে কিন্তু শর্বরীর বড় বাধো বাধো অন্য ফ্ল্যাটে যেতে। গেলেই কেমন করে যেন সেই প্রশ্নটা এসে পড়ে যেটা সে এড়াতে চায়।

পুজো এসে গেছে। ষষ্ঠী কাল। শর্বরী কোথাও যায়নি। সামনের মাঠে প্যাণ্ডেল বেঁধে পুজোর আয়োজন হচ্ছে। আলোয় আলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনও নিরুপম ফেরেনি। বাইরে কড়া নড়ে উঠল। শর্বরী ভাবল নিরুপম। দরজা খুলে তার বিশ্বাস হল না চোখকে। শিবানী ও অমর। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। অমরের হাতে দুটো বড় বাক্স। একটা প্যাকেট। ঘরে এনে বসাল শর্বরী। 'কী এসব? বাজার করতে বেরিয়েছিলি?'

'উঃ আগে জল খাওয়াও তো?' হাত দিয়ে চুল সরাল শিবানী। 'বাড়ী খুঁজতে হয়রান। কতক্ষণ খুঁজেছি জান? দুঘণ্টা। বাবাঃ।' শর্বরীর মনে যেন কাঁসের একটা হাওয়া বইল। এতদিনের ক্লান্তি ও অসন্তোষ কোথায় যেন উড়ে যাচ্ছে। জল ও মিষ্টি এনে হাতে দিয়ে বলল—'বাবা কেমন আছেন বল? পিসিমণি?' শিবানী বলল, 'পিসিমণির শরীর ভাল নয়। বাবার তো জান প্রেসার। আজকাল বড্ড অনিয়ম করেন। কে বলে বল?' অমর আস্তে বলল—'দিদ্‌ কাপড়গুলো—' 'ও হ্যাঁ ছোটমা, এই কাপড় শাড়ী তোমার ও কাকুর। শাড়ীটা পছন্দ? আমি পছন্দ করেছি।' হাতে নিয়ে দেখল শর্বরী দামী শাড়ী। জরিদের পাড়। ব্লাউজ। বাকিগুলো নিরুপমের জন্য। তার জন্য আলতা। সিঁদুর। শর্বরী কাপড়গুলো নাড়াচাড়া করছিল। তার চোখ ফেটে জল আসছিল। বুঝতে পারছিল কোথায় তার হার হয়েছে। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের মত ব্যক্তিত্বের অধিকারী শান্ত স্কুলশিক্ষকটির কাছে, আর গ্রাম্য সেই আলোকবর্জিতা মহিলাটির কাছে সে চিরদিনের মত হেরে গেছে।...... নিরুপম ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল 'কে? শিবুলাল? কী ব্যাপার? বাড়ী চিনলি কি করে?' দাদা কেমন আছেন, দিদি?'

শিবানী হেসে বলল, 'দাঁড়াও বাপু এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। আগে প্রণাম করি। পুজোর কাপড় নিয়ে এলাম।' নিরুপম দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে বসে পড়ল। 'তাড়াতাড়ি চা আন আর খাবার। এখনও ওদের খেতে দাওনি?' শর্বরী দেখছিল কী পরিবর্তন। এক বছরে এত উচ্ছল আর সহাস্য ও কোনদিন দেখেনি নিরুপমকে। ঘরে যেন দক্ষিণা বাতাস এসেছে। বদ্ধ বাতাস চলে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পরে ওরা চলে গেল। যাবার আগে বলল, 'ছোটমা, পুজোর কটা দিন ওখানে থাকবে। বাবা বলে দিয়েছেন বুঝেছ?'

দরজা বন্ধ করে এসে নিরুপম দেখলো বিছানায় বসে শর্বরী কাঁদছে। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে নতুন কাপড়ের ওপর। 'কী হল শর্বরী? বেশ তো ছিলে এতক্ষণ। এখন কি হল?' শর্বরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'হেরে গেছি, আমি হেরে গেছি তোমার দাদার কাছে জান? আজ বুঝলাম কোথায় হেরে গেছি।'

নিরুপমের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। সে কোন কথাই বলল না। যেন এক বছরের পর এই পরিণতি তার জানা ছিল। অঙ্কের জানা উত্তরের মত জানা ছিল যেন এই সমাধান। তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

অঙ্গনা

ইকেবানা প্রদর্শনী

সেই কবেকার কথা। জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছে। তথাগতকে আশ্রয় করে জাপানীরা নতুন চেতনায়। দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে কত না চৈত্য, মঠ, বিহার। স্থাপিত হয়েছে নিমীলীত আঁখি বুদ্ধমূর্তি। দলে দলে ভক্ত এসেছে। শ্রদ্ধা জানাতে, প্রাণের অর্ঘ্য-উপচার দিয়ে। বহিঃপ্রকাশ হস্তধৃত পুষ্প। স্থাপন করেছে বেদীমূলে। সুচারুরূপে। উভয় পার্শ্বে। অনন্ত বিশ্বাসের প্রতীক সেই ফুল শোভা পেত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে। স্বর্গলোকের নিভৃত কোণে বুদ্ধের দেহান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে। এমনিভাবেই জাপানের এক নিভৃত দার্শনিক চেতনাকে রূপ দিয়ে এসেছে এই পুষ্পার্ঘ্য। এর পেছনে অন্য কারণও ছিল। বৌদ্ধদের পবিত্র পর্বত, বিশ্বের প্রতীক সুমিসেনের অনুরূপ নিবেদন করা হোত এই পুষ্পার্ঘ্য। ভাবের গভীরতায় এই পুষ্প নিবেদন আত্ম নিবেদনের আবেদন বহন করতো। মুগ্ধ ভক্তেরা এর নামকরণ করেছিল 'ইকেবানা'। শ্রদ্ধা নিবেদনের এই অনমুকরণীয় ভঙ্গিই জাপানের বিশ্ববিখ্যাত পুষ্পসজ্জার উৎস। সে আজ প্রায় চৌদ্দশ বছর আগেকার কথা।

জাপানীদের পুষ্পসজ্জায় এই প্রবণতাকে নিয়মগত প্রণালীর মাধ্যমে সুষ্ঠু রূপায়ণের প্রথম উদ্যোগে দেখা গেল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে। কিউটোর রিক্কাকুডো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সেনকেই ইকেনোবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করলেন ইকোনোবো স্কুল অফ ইকেবানা। এ'রই প্রচেষ্টায় পুষ্পসজ্জা এবার অর্ঘ্যের সীমা ছাড়িয়ে আঙ্গিকগত এবং ব্যবহারিক উন্নতি লাভ করে। পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে রূপ নেয় ক্লাসিক ভাবধারা। ঘরবাড়ি সাজানোর উপকরণ হিসাবে ফুলের ব্যবহারে সবাই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুষ্পসজ্জার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সকলের মধ্যে আরো উৎসাহের সঞ্চার করেন।

পথ চলতে গিয়ে ইকেবানা অনেকবার মোড় নিয়ে নিয়েছে। আর যতবার মোড় নিয়েছে প্রতিবারই পুষ্পসজ্জার এক একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ইকেবানার প্রকরণ চিন্তায় 'রিক্কা' রূপ পায় সর্বপ্রথম। ভাবের গাম্ভীর্যে আর হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় বুদ্ধভক্তের অর্পিত পুষ্পার্ঘ্য থেকে রিক্কা আর্টের উৎপত্তি। কালক্রমে রিক্কা অবশ্য সুদিন হারিয়ে বসেছে। উৎসবে-আনন্দে একদিন রিক্কার সমাদর ছিল সবচেয়ে বেশি। এখন রিক্কার বার্ধক্যে জীর্ণ। সেকেলে আর পুরনো বলে সকলেই রিক্কার দিকে করুণার নয়নে তাকায়। কিন্তু জাপানী পুষ্পসজ্জার শুরুতেই তাই রিক্কাকে স্মরণ করতে হয়। ক্লাসিকাল পুষ্পসজ্জার গৌরবে রিক্কা অম্লান।

ষোড়শ শতকের শেষদিকে ইকেবানা নতুন মোড় নেয়। ক্লাসিকাল ছেড়ে সে এবার ন্যাচরালিস্টিক হবার দিকে মন দেয়। এসময় জাপানে চায়ের প্রচলন হয়। চায়ের উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সৃষ্টি হয় পুষ্পসজ্জায় নতুন প্রকরণ 'নাগেরিয়ে'। এই পুষ্পসজ্জায় ফুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হয়। উপকরণ যাই হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট আধারে তা সাজাতে হবে। ক্লাসিকাল ঢঙের মতো এতো নিয়মকানুনের খুব একটা কড়াকড়ি নেই। পুষ্পসজ্জার এই প্রকরণে সৌন্দর্যকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার সুযোগ আছে। এখানে কোন কৃত্রিমতা নেই। নাগেরিয়ের মূলকথা হলো, হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। সহজ এবং স্বাভাবিক এই পুষ্পসজ্জা মুখ্যত চা-উৎসবের জন্য আয়োজিত হলেও সকল জাপানীর মন জয় করেছিল। এর ব্যাপক চর্চা থেকেই একথা অনুমান করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এরই অন্য নাম 'চাবানা'।

নাগেরিয়ের পর নাগেরিয়েবানা আসে স্বতন্ত্র বক্তব্য নিয়ে। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই আলো-ছায়ার খেলা চলে, অস্ত্যর্থক এবং নঞর্থক দুটি দিক আছে। নাগেরিয়েবানা সেকথাই সোচ্চারে ঘোষণা করে নিজ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে। এটি একান্তভাবেই ইকেনোবো স্কুলের অবদান।

ফুল দিয়ে বাড়ি শুধু নয় ঘরও সাজাতে হবে। দেয়ালে যদি একটি পুষ্পসজ্জার প্রকরণ স্থান পায় তাতে সুরুচির পরিচয় মেলে। তাই ইকেনোবো স্কুল এদিকে মন দিয়ে সৃষ্টি করলো 'সেবকা' পুষ্পসজ্জা। এরও

বদল হয়েছে অনেক। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এর সৃষ্টি।

ফুলের দেশ জাপান। পুষ্পরসিক এদেশের জনসাধারণ। পুষ্পসজ্জায়ও এঁদের আগ্রহ অপরিসীম। সেই অসীম আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে তাঁরা আরো এগিয়ে যেতে চাইলেন। ইতিমধ্যে দিনকালের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট বিরাট বাড়ি অদৃশ্য হয়ে সবাই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। কিন্তু পুষ্পসজ্জাকে তো ভুললে চলবে না। এবার তাঁদের চিন্তার পুষ্পসজ্জার সর্বাধুনিক প্রকরণ হলো 'মরিবানা'। এর পেছনে পাশ্চাত্য জগতের প্রভাবও কিছুটা কার্যকরী ছিল। অনেক প্রকরণ সত্ত্বেও এতদিন উৎসবে রিক্কা এবং ট্র্যাডিশনাল জাপানী বাড়ি সাজাতে নাগেরিয়ের প্রচলনই ছিল সর্বাধিক। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার পর ওদের ঘরবাড়ির পক্ষে সেগুলো কোন বেমানান মনে হলো। চিন্তা নতুন মোড় নিলো। সৃষ্টি হলো নতুন প্রকরণ 'মরিবানা।'

মরিবানার নিয়মকানুনের খুব একটা বালাই নেই। ফুল এবং লতাপাতা এতে ইচ্ছামতো ব্যবহার চলে। পুরো একটি বাগানের দৃশ্য এই পুষ্পসজ্জায় ফুটে ওঠে। এর সুবিধা হলো যেকোন জায়গায় এই পুষ্পসজ্জার প্রয়োগ চলে। পড়ার ঘর অথবা বৈঠকখানা যাই হোক না কেন। তবে ঘরের সঙ্গে মানিয়ে চলা চাই। মরিবানার সার্বজনীন ব্যবহার পদ্ধতির জন্যই এটি জাপান এবং বিশ্বের একটি আদৃত পুষ্পসজ্জা।

ফুলের দেশ জাপান থেকে এই বার্তা আমাদের দেশে বয়ে নিয়ে এসেছেন মিসেস নোবুকো সফ্‌ট। ১৯৬৭ সালে কলকাতা শহরে তিনি সূচনা করেন ইকেবানা ফ্লোরাল আর্ট স্কুল অব ইণ্ডিয়ার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ৩০০ ছাত্র এখান থেকে পুষ্পসজ্জায় শিক্ষালাভ করেন। কেউ কেউ জাপান থেকেও স্বীকৃতিপত্র পেয়েছেন।

এবার অনুষ্ঠিত হলো সেই স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব।

ইকেবানার সামগ্রিক ইতিহাস এবং অগ্রগতির সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। তাই রিক্কা থেকে শুরু করে মরিবানায় উত্তরণের বিভিন্ন স্তরগুলি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবদ্ধ নয় এই প্রদর্শনী।

প্রথম পুষ্পসজ্জাটি দর্শককে অনেকক্ষণ ধরে রাখে। নমস্কার। সমাগত দর্শকদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। রিক্কা স্টাইলের এই পুষ্পসজ্জাটি অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয়টি এক লহমায় তুলে ধরে। নমস্কার-এর শিল্পী শ্রীমতী উমা বসু মিসেস সফ্‌ট-এর আন্তরিক অভ্যর্থনাকেই রূপদান করেছেন।

শীত আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। এরপর আসবে বসন্ত। পদধ্বনি খুব একটা দূরশ্রুত নয়। গাছে গাছে নতুন পাতা আর মুকুলে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে মিসেস ঋসকোনোজীর 'বাথ' অব ব্লুজ'-এর তাই দর্শকমনে নতুন আশার সংকেত বয়ে নিয়ে আসে।

সবুজের জন্মের মধ্যেই কিন্তু শিল্পীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়নি। বসন্ত দ্বারপ্রান্তে। তাই তার বৈভব একবার চিন্তা করে নেওয়া যাক। আর আমরা তো সমতলের লোক। পর্বত না হলে বসন্ত সেরকম খোলতাই হবে না। পূর্ববর্তী শিল্পীর যে সবুজের আভাস দিয়েছেন তাকে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীমতী নন্দিতা কেলা। তাঁর স্প্রিং ইন হিলস বর্ণ বৈভবে দর্শককে বসন্তের প্রাচুর্যপূর্ণ রূপটি উপভোগের সুযোগ এনে দেয়। এরই সঙ্গে রয়েছে শ্রীমতী প্রভা অরোরা 'স্প্রিং গ্লাস'—রঙের ঋতুর সুন্দর রূপ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী দে সরস্বতী বন্দনা করেছেন। মরিবানা স্টাইলে তাঁর বীণা যথার্থ বাগদেবীর উপযুক্ত হয়েছে। 'সুর-ভারতী'তে সুর সংযোজনা হলেই শ্রীমতী দে'র প্রয়াস সার্থক।

একটি শিশুও এই পুষ্পসজ্জায় অংশ নিয়েছে। মাস্টার মোসেস-এর সাইকাডেলিক ড্রিম শুধু শিশু নয় সকলেরই প্রশংসা কুড়োবে।

নমস্কার দিয়ে প্রদর্শনীর শেষ হয়েছে স্পেস এজ এ এসে। এই পুষ্পসজ্জাটি স্বয়ং মিসেস সফ্‌ট-এর। পরিকল্পনার অভিনবত্বে এবং পুষ্পসজ্জায় এর প্রয়োগ বাস্তবিক প্রশংসনীয়। আবার শ্রীমতী সফট-এরই ব্লু হেভেন আমাদের নীল আকাশের আস্বাদে পরিতৃপ্ত করেছে।

এছাড়া অনেককিছু আছে। শ্রীমতী সুমিতা দত্তের স্টার্ক বিউটি যথার্থ ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছে। স্মোকিং ডিলাইট-এ রসিকজনরা আনন্দ পাবেন।

শ্রীমতী সফট-এর স্কুল কলকাতায় সকাল-সন্ধ্যা বসে। কিন্তু তার কাজ শুধু কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্নস্থানে পুষ্পসজ্জার আয়োজন করেন তিনি। পাঞ্জাব এবং সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত এজন্য তাঁর যাতায়াত। তিনি আরো চেষ্টা করছেন, যাতে কৃতী ছাত্ররা জাপানে গিয়ে শেখার সুযোগ পায়। তিনি জাপান শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চালাচ্ছেন। হয়তো অচিরেই স্কলারশিপের ব্যবস্থা হবে এবং কেউ কেউ জাপানে ইকেবানা পুষ্পসজ্জায় অধিকতর দক্ষতালাভের সুযোগ পাবেন।

কথায় কথায় শ্রীমতী সফট জানালেন, উৎসবের দেশ ভারতবর্ষ। পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে উৎসবগুলিকে ধরে রাখা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। জাপানী পুষ্পসজ্জায় ভারতীয় উৎসব রূপ পাবে। এক সংস্কৃতি আরেক সংস্কৃতির পাশে এসে দাঁড়াবে। এমনিভাবে দুই দেশের ভাব সম্মিলন ঘটবে।

একদিন যা সম্ভব হয়েছিল বৌদ্ধধর্মে। আবার হয়তো তা সম্ভব হবে জাপ-দুহিতা আর ভারতীয় ঘরণী শ্রীমতী নোবুকো সফট এর আন্তরিক ভাবনা প্রয়োগে।

—প্রমীলা

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
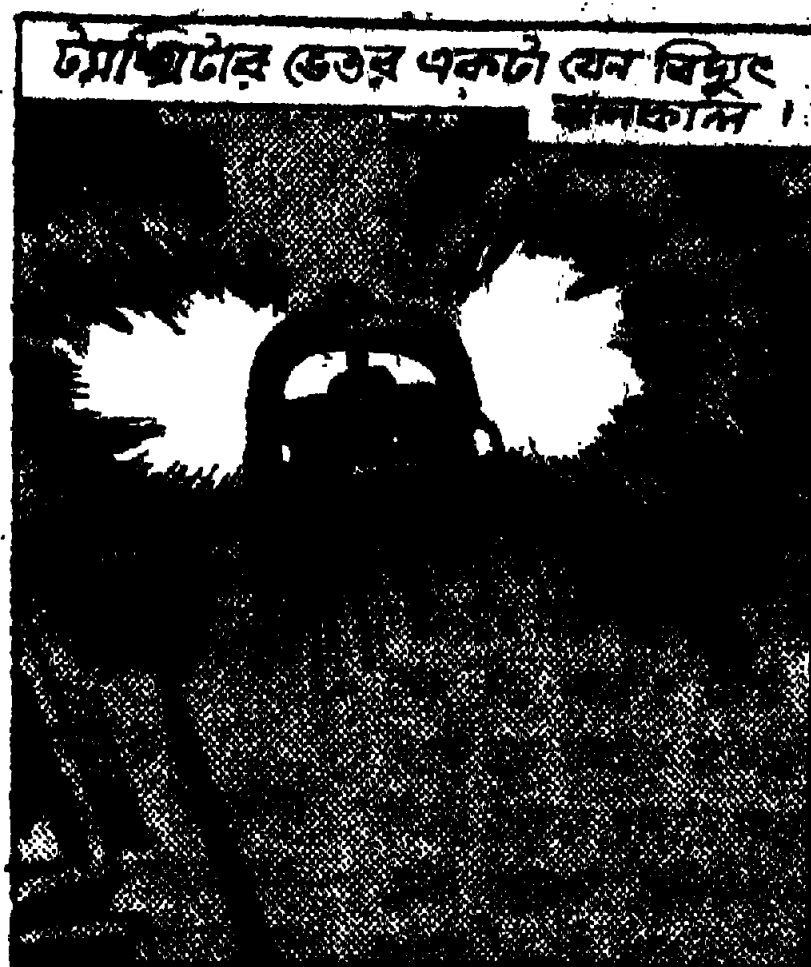
বেতার শ্রুতি

গতবারে ফীচার প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বেতারে ফীচার প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝায়? অথবা রেডিও ফীচার কী? নিশ্চয়ই কথিকা কিংবা আলোচনা, অথবা নাটক কিংবা কবিতা কিংবা ধারাবিবরণী নয়! এমনকি, সাধারণ রীতির বাইরে একটা স্পট্ রেকর্ডিংও' না!

বেতারে নাটকের কথা উঠলেই বলা হয় যে, নাটক কানের জন্য, চোখের জন্য নয়—কিন্তু নাটকের সংজ্ঞা কী তা বলা হয় না। আবার যখন বেতার কথিকার কথা ওঠে, তখন কথিকা কী তার ব্যাখ্যা মেলে না—শুধু কী হলে বেতার কথিকা ভালো হয় তা-ই বলা হয়। কিন্তু কেন? সহজ উত্তর: বেতারের জন্মের অনেক আগে থেকেই নাটক আছে—মঞ্চবিহীন নাটক, মঞ্চ-নাটক; নির্বাক ছবি, সবাক ছবি। আবার 'কথা বলা' বলতে কী বোঝায় তা-ও কারও অজানা নয়—বেতারে কথা বলা বাড়িতে, অফিসে ও মাঠে-ময়দানে কথা বলারই সম্প্রসারণ মাত্র। কিন্তু রেডিও ফীচার কী, রেডিওর জন্মের আগে তা কারও জানা ছিল না। সেই দিক দিয়ে রেডিওর সৃজনকর্মের মধ্যে রেডিও ফীচার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু রেডিও ফীচার আসলে কী তা এখনও অন্তরিতই রয়ে গেছে। রেডিওয় ফীচার প্রোগ্রাম অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এবং সমস্ত বেতার সম্প্রচার সংস্থা থেকে বর্ধমান হারে ফীচার প্রোগ্রাম প্রচার করা সত্ত্বেও এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, এখনও রেডিও ফীচারের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণীত হয়নি।

ভারতে বেতার সম্প্রচার শুরু হয় ১৯২৭ সালে, এবং ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতের বেতার সম্প্রচারের অগ্রগতি সম্পর্কে লায়োনেল ফিলডেনের রিপোর্টে ফীচার প্রোগ্রাম বিষয়ে মাত্র তিনটি পয়েন্ট আছে:

(১) পশ্চিমে ফীচার প্রোগ্রামের প্রভূত উন্নতি হয়েছে; (২) ভারতে প্রচুর পরিমাণে এইসব প্রোগ্রামের চেষ্টার সময় এখনও আসেনি; এবং (৩) এইসব প্রোগ্রামের জন্য যে যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা দরকার, তার প্রভূত অভাব রয়েছে।

সুতরাং ফিলডেন ফীচার প্রোগ্রামের জন্য পৃথক অধ্যায়ের আশ্রয় নেননি, ফীচারকে তিনি অন্য কতকগুলি প্রোগ্রামের সঙ্গে 'বিবিধ' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে ফীচারের একটা সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা তিনি করেছেন:

ফীচার প্রোগ্রামের বর্ণনা দেবার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, যদিও তা কোনোমতেই সহজ নয়। সমস্ত বেতার সম্প্রচার সংস্থাতেই প্রচুর ফীচার প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। ফীচার প্রোগ্রামকে উপাদেয়ভাবে তথ্য জ্ঞাপন অথবা মনোরঞ্জনের জন্য বেতার সম্প্রচারের প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের একটা উপায় বলা যেতে পারে। ফীচার প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে শব্দসহযোগে শিল্প উৎপাদনের প্রণালীর বিবরণ, কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে একটা চিন্তার উপস্থাপন ও প্রকাশের জন্য কবিতা ও গানের সঙ্কলন পর্যন্ত সবকিছুই হতে পারে।

ফিলডেনের এই সংজ্ঞা কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। এতে ফীচারকে একটা উপায় মাত্র বলা হয়েছে, যাতে বেতার সম্প্রচারের প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত পদ্ধতি আর কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞা বেতারের যে কোনো প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফিলডেনের দশ বছর পরে লরেন্স গিলিয়ম তাঁর 'বি-বি-সি ফীচার্স' বইয়ের ভূমিকায় রেডিও ফীচারের কতকগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই প্রোগ্রামকে কোনো ধরাবাঁধা ফরমুলোর মধ্যে ফেলা যায় না, আর সেই কারণে প্রচলিত প্রোগ্রামের ধারার বাইরে তার স্থান। এই প্রোগ্রাম মোটামুটিভাবে নানাবিধ প্রোগ্রামের বিষয় সূচিত করে, সাধারণত তথ্যমূলক ও ডকিউমেন্টারি—এবং বহুবিধ কৌশলে তা পেশ করা হয়, বেশির ভাগই নাটকের আকারে এবং বাস্তবের উপরে। ফীচার প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হচ্ছে, এই ধরনের বর্ণনা বেতার তার নিজেরই জন্য উদ্ভাবন করেছে এবং অন্যান্য ধরনের সঙ্গে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। এটা পুরোপুরি রেডিও,—সৃজনক্ষম লেখক ও প্রযোজকদের এক নূতন যন্ত্র।

কথিকা আর ফীচারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গি[illegible] গিলিয়ম বলেছেন যে, রেডিও ফীচারের উদ্দেশ্য সব [illegible] শ্রোতাদের অনুভব করানো ও সেই সঙ্গে চিন্তা করানো, মনোরঞ্জন করা ও সেই সঙ্গে তথ্য জ্ঞাপন করা। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কথিকার চেয়ে নাট্যায়িত বর্ণনা বেশি হৃদয়গ্রাহী ও বেশি কার্যকর হয়। আর এইখানেই ফীচার আর কথিকার মধ্যে প্রধান পার্থক্য। সহজতম আকারে ফীচার প্রোগ্রামের লক্ষ্য, নাটকের নাটকীয় শক্তির সঙ্গে কথিকার প্রামাণিকতা সংযুক্ত করা, কিন্তু নাটকে যেমন অলীকতা থাকে, ফীচারে তা থাকে না—ফীচারে শ্রোতাদের সত্য কথাই বলা হয়, যদিও নাটকের আকারে।

কিন্তু আমাদের বেতারের ফীচারের অধিকাংশই নিষ্প্রাণ, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় কেন? তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে ফীচারের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং প্রচারকালও বিবেচ্য। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের দরকার হয়, একই ট্রিটমেন্ট সকল বিষয়ে খাটে না, আবার সমস্ত ফীচারেরই এক উদ্দেশ্য থাকে না, একই সময়ের প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে প্রায় সব ফীচারকেই একই ছাঁচে ঢালা হয়। বন্য জন্তু সংরক্ষণ সপ্তাহ-বিষয়ক ফীচার যে ছাঁচে তৈরি হয়, গান্ধী শতবর্ষ অনুষ্ঠানের ফীচারও সেই ছাঁচে। এবং যাঁরা স্ক্রিপ্ট লেখেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরা সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেন না—বইপত্র আর প্রচার-পুস্তিকা দেখে, সরকারী আর বেসরকারী লোকদের সঙ্গে কিছুটা পরামর্শ করে স্ক্রিপ্ট লিখতে বসেন। মাঝে মাঝে কিছু স্পট্ রেকর্ডিংয়ের শব্দ যোগ করা হয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নিজে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে লেখা স্ক্রিপ্টের ফীচার আর বিভিন্ন সূত্র থেকে হাতের কাছে পাওয়া উপাদান থেকে লেখা স্ক্রিপ্টের ফীচারে অনেক পার্থক্য। প্রথমটাতে প্রাণ আসে, দ্বিতীয়টায় ঝিমিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এমনই ব্যবস্থা যে, লেখকদের পক্ষে সব সময় সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আবার লেখক নির্বাচনেও কর্তৃপক্ষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেন না সব সময়। ফীচার লেখার একটা অভ্যাস থাকা চাই, তার টেকনিক জানা চাই। কর্তৃপক্ষের উচিত ফীচার লেখকদের একটা গোষ্ঠী তৈরি করা এবং তাতে সাংবাদিক ও অধ্যাপকদের মতো লোকদেরও নেওয়া। এবং তাঁদের ন' মাসে ছ' মাসে লেখার ফরমায়েশ না দিয়ে ঘন ঘন দেওয়া। আর দক্ষিণার দিকটা একটু চিন্তা করা। একটা ভালো ফীচার লেখার জন্য যে চিন্তা, সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, কর্তৃপক্ষের উচিত তার যথোচিত মূল্য দেওয়া।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছিল সেগুলোর অংশবিশেষ নিয়ে একটি বিশেষ সংবাদ বিচিত্রা প্রচারিত হয়েছিল ঐদিন রাত সওয়া ১০টায়। ...অনুষ্ঠানটি সুসম্পাদিত, প্রশংসনীয়।

রাত সাড়ে ১০টায় 'জয়তু নেতাজী' শীর্ষক সঙ্গীতরূপকটিও ভালো লাগল। সঙ্গীতাংশ উল্লেখ্য। অনুষ্ঠানটি রচনার জন্য শ্রীসুকৃতি সেন প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় গল্পদাদুর আসরে শ্রীবিনয়ভূষণ গুপ্ত তাঁর বাপুজীকে দেখার কথা বললেন। বাপুজীকে তিনি বেশ কয়েকবার কাছে থেকে দেখেছেন—বরিশালে, ভবানীপুরে, সোদপুরে...। অল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছেন। দেশের বিশাল জনসমুদ্রে গান্ধীজী যে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিলেন তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—অল্প বয়েসে, বেশি বয়েসে...। এবং এই কথিকায় তিনি সেই স্মৃতি চারণ করেছেন। তার আগে, ভারতের বিশাল জনসমুদ্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগের পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন।...তাঁর এই স্মৃতিচারণ, এই বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। তাঁর বলার মধ্যে এতটুকু আড়ম্বর ছিল না, কাপট্য না। অত্যন্ত সরল ভাষায়, সহজ ভঙ্গিতে, গল্প বলার মেজাজে গল্পদাদুর শ্রোতাদের কাছে তিনি তাঁর বাপুজীকে দেখার কথা বলেছেন। আর সেই জন্যেই তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

২৬শে জানুয়ারী রাত সাড়ে ৭টার দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে বলা হল, 'উত্তরপ্রদেশের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে...।' ২৬শে জানুয়ারী উত্তরপ্রদেশ কি 'গণতন্ত্র দিবস' পালন করেছে? ভারতের অন্যান্য রাজ্য কিন্তু এই দিনটিতে 'সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করেছিল। উত্তর প্রদেশের 'গণতন্ত্র দিবস' পালনের খবর দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগ পেলেন কোথা থেকে? খবরের কাগজগুলো কিন্তু এ খবর দেয় নি। খবরের কাগজগুলোতে এই দিনটিতে উত্তরপ্রদেশে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' পালনের কথাই বলা হয়েছে। দিল্লীর ইংরেজী খবরেও বলা হয়েছে 'রিপাবলিক ডে।' 'রিপাবলিকের ডে'র বাংলা 'গণতন্ত্র দিবস' নয় নিশ্চয়?

এই দিন পরে ৭টা ৪৫ মিনিটে সমীক্ষায় স্বদেশসঙ্গীত বিষয়ে বললেন শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র বেশ স্বচ্ছ, প্রাঞ্জলভাবে স্বদেশসঙ্গীতের ধারা বিশ্লেষণ করলেন, কালে কালে স্বদেশসঙ্গীতের যে রূপ-পরিবর্তন হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলেন। সুন্দর লাগল।

...৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদ আরম্ভ হল ছিন্নমুণ্ড হয়ে। অর্থাৎ ঐ যে গোড়ায় বলা হয়, 'আকাশবাণী কলকাতা, এখন স্থানীয় সংবাদ, পড়ছি...' ইত্যাদি, তার কিছুই শোনা গেল না। হঠাৎ আরম্ভ হল এই বলে, 'আজ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিংশতি বার্ষিকী দিবস।'

বিংশতি অর্থ তো বিশ বা কুড়ি। তাহলে বিংশতি বার্ষিকী বিশ বা কুড়ি বার্ষিকী। এটা হয় তো? তাহলে আর আমরা মিছিমিছি বিংশ শতাব্দী বলি কেন? গালভরা বিংশতি শতাব্দী বলাই ভালো।

আর, এই সংবাদে যে 'আয়ত্তাধীন' কথাটা ব্যবহার করা হল এই কথাটা কোন্ অভিধানে আছে?

২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রাত সওয়া ১০টার 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত ও ভক্তিসঙ্গীত অবলম্বনে রচিত এই অনুষ্ঠানটি আকাশবাণীর ঐ দিনের অনুষ্ঠান-সূচীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিবেশনা এক কথায় সুন্দর। আরও সুন্দর এই কারণে যে, এই অনুষ্ঠানের গানে যিনি সুর আরোপ করেছেন তিনি বাঙালী নন, তাঁর নাম পি ডি কৃষ্ণমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণমূর্তির নিজেরই অনাত্র স্বীকারোক্তি : তিনি ভালো বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছে বাঙালীদের মধ্যে, শৈশব থেকেই বাঙালীর শিল্পসংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এই অনুষ্ঠানের গানে যে সুর আরোপ করেছেন তা মনোমুগ্ধকর শুধু নয়, অবাঙালীর পক্ষে বিস্ময়করও বটে।

পরে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে 'ছাব্বিশে জানুয়ারী' শীর্ষক অনুষ্ঠানটিও মন্দ লাগল না।

২৯শে জানুয়ারী সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। শ্রীমতী মিত্র তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

৩১শে জানুয়ারী সকাল সওয়া ৮টায় দুখানি আধুনিক গান গাইলেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় — 'এ পথে যখনি যাবে' ও 'জীবনে যারে তুমি'। পুরনো দিনের কোনো কোনো গান আজও যে শ্রোতাদের মন বিশেষ করে টানতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই গান দুটিতে। শিল্পীর কণ্ঠ দরদী, আবেগমণ্ডিত।

১লা ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন শ্রীমতী নীলিমা সেন। শ্রীমতী সেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী-দের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর এই অনুষ্ঠানের গান দুটিও সুন্দর। শুধু বক্তব্য, একই গানের পুনরাবৃত্তি একঘেয়ে লাগে, অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত গান গাইলেই ভালো হয়।

এই দিন রাত সওয়া ১০টার সংবাদ বিচিত্রাটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত। রেকর্ডিং ভালো, এডিটিংও। তবে কোনো কোনো বিষয়ে শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে—যেমন, গান্ধীজীর মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের ভাষণে।

এই সংবাদ বিচিত্রাটিতে অনেকগুলি বিষয় ছিল। তার মধ্যে ময়দানে নেতাজী প্রদর্শনীতে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সেই 'ঐতিহাসিক' ভাষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, নেতাজীকে কমিউনিস্টরা এতদিন ভুল বুঝেছেন, তাঁর আদর্শের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে স্বামী বিবেকানন্দর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর ভাষণটিও স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ — এবং সাগ্রহে শোনার মতো।

—শ্রব[illegible]

শিশিরকণা ধর চৌধুরী এবং মহাপুরুষ মিশ্র

জলসা

শ্যামল মিত্র নাইট। বেগবাগান ইয়ুথ্ কর্ণারের তরফ থেকে শ্রীমতী মঞ্জু পার নিবেদিত "শ্যামল মিত্র নাইট" কলামন্দিরে এক আনন্দমুখর সন্ধ্যা রচনা করে। উৎসব উদ্বোধনকালে শ্রীমতী কানন দেবী বলেন, "মৃত্যুর দ্বার থেকে নবজীবনের তোরণদ্বারে ফিরে আসাটা বিধাতার এক বিশেষ আশীর্বাদ। এ হোল শিল্পীর মহত্তর প্রকাশের ইঙ্গিত। আজ যা ইঙ্গিত তারই পরিপূর্ণ সার্থকতায় শ্যামলের জীবন ধন্য হয়ে উঠুক আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।" উদ্যোক্তাদের মহৎ প্রচেষ্টাকেও তিনি অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি শ্রীমতী সরযূদেবী বলেন, "শ্যামল আমায় "মা" বলে ডাকে। ওর দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়েছে আর ঠাকুরকে ডেকেছি। আমার প্রার্থনা বিফল হয়নি তারই প্রমাণ আজকের এই উৎসব। শ্যামল দীর্ঘজীবী হোক এই আশীর্বাদই তাকে করছি।" সেদিনের সংগৃহীত অর্থ দর্শকদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রামকৃষ্ণ সেবাসদনের সাধুজীদের হাতে তুলে দিলেন শ্রীমতী মঞ্জু পার। বিনা দক্ষিণায় শ্যামল মিত্র পরিচালিত অর্কেস্ট্রা সঙ্গতে এবং সুরে গান গেয়ে যেসব শিল্পীরা সেদিনের অনুষ্ঠান আনন্দময় করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, বাসবী নন্দী, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, আর শ্যামল মিত্র নিজে। আর এক আকর্ষণ ছিল পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, সলিল চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, স্বরূপ দত্ত এবং আরো কয়েকজন চিত্রতারকার উপস্থিতি।

নেপালে প্রজাতন্ত্র দিবস। কাঠমুন্ডুতে ৬ দিনব্যাপী প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসব উপলক্ষে সরকার প্রেরিত শিল্পী শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী ও মহাপুরুষ মিশ্র রাজা মহেন্দ্র, সাংস্কৃতিক দূত রাজবাহাদুর এবং উৎসবে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন ও প্রশংসা পেয়েছেন। ছয়দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ধরচৌধুরী যথাক্রমে মালকোষ, মারুবেহাগ, কিরবানী, যোগ, মোহনকোষ ও রাগেশ্রী পরিবেশন করেন। বীর, করুণ, মধুর, উদাস ও আনন্দ রসাশ্রিত বিভিন্ন রাগ শিশিরকণার পান্ডিত্য, রসবোধ ও ভাবগম্ভীর মেজাজের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দুর্লভ উপভোগ্য মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিল। শ্রীমতী ধরচৌধুরীকে ও দেশের পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

গ্রামোফোন কোম্পানীর বসন্ত বন্দনা। শীতের রিক্ততা আসন্ন বসন্ত-প্রাচুর্যের পূর্বাভাষ। সেই সত্যই স্মরণ করিয়ে দিলেন গ্রামোফোন কোম্পানী। এবারের "বসন্ত বন্দনা"-র ডালিও ভরে উঠেছে আকর্ষণীয় শিল্পীদের বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রচুর গান দিয়ে। এ বছরের বৈশিষ্ট্য বক্স অফিসের শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের প্রতিশ্রুতিদীপ্ত কয়েকটি ডিস্ক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, শ্যামল মিত্র ত রয়েইছেন। তরুণতর শিল্পী সুবীর সেন, অজিত বসুও শিল্পী তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এদের সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। স্ব-স্থানে এঁরা সবাই সু-গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু নতুন শিল্পীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবাক করে দিয়েছেন তাঁদের গানে উচ্চমানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষরের জৌলুষে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে দুজন শিল্পীর নাম মনে আসে তাঁরা হলেন সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতা ধরচৌধুরী। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে একটি গান গেয়েছেন। অপর একটি গান ঐ একই শিল্পীর সুরারোপিত কামাখ্যা ঘোষের রচনা। দ্বিজেনবাবুর রচনায় তাঁর কবিমনটিরও সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। গান ও কথার সমন্বয়ও লক্ষ্য করবার মত। গানদুটি সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিমার্জিত গম্ভীরকণ্ঠে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের গানের মতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কণ্ঠের মিলও উপভোগ্য। আর একটি জ্ঞাতব্য তথ্য হোল এই তরুণ শিল্পী সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তাই সহৃদয় শিল্পী ভি. বালসারা তার সহশিল্পীদের নিয়ে এই গানের উপযুক্ত সঙ্গত-সঙ্গীত রচনা করে সঙ্গীতরসিক মহলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ললিতা ধরচৌধুরী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গান নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছেন। কণ্ঠসম্পদ, গাইবার আনন্দ ও গীতিকাব্যের ভাবের প্রতি সুবিচার—এককথায় শ্রোতাদের চিত্ত জয় করবার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন তার কোনোটিরই এঁর গানে অভাব নেই। জনপ্রিয় শিল্পী তালিকায়

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন কবিতা অবলম্বনে ৪ ফেব্রুয়ারী স্বরলিপির উদ্যোগে মহাজাতি সদনে নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। ছবিতে নরেশকুমার এবং সুমিত্রা মিত্রকে দেখা যাচ্ছে।

সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন স্থান করে নিতে এ'র দেরী হবে না। সুধীন দাসগুপ্তের কথা ও সুরে মৃণাল চক্রবর্তীর দুটি গান পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বনশ্রী সেনগুপ্তের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি আরো বর্ধিত করবে এই সিরিজেরই প্রসিদ্ধ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া দুটি গান। গানদুটি লিখেছেন শ্যামল গুপ্ত। চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ইনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি গান গেয়েছেন। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখিত এবং অশোক রায় সুরারোপিত অরুণ দত্তর দুটি গান শ্রোতাদের আনন্দ দেবে। হেমন্ত-ভ্রাতা অমল মুখোপাধ্যায়ের হেমন্তবাবুর সুরে গাওয়া দুটি গান বেশ প্রাণবন্ত। রচয়িতা মিন্টু ঘোষ। মিন্টু ঘোষেরই লেখা দুটি গান সুন্দর গেয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ক হিসাবে তিনি সু-পরিচিত। আধুনিক গানও সেই খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। সুর দিয়েছেন অসীমা ভট্টাচার্য। শিপ্রা বসু—মার্গ সঙ্গীতের আসরের প্রশংসিত এক তরুণ প্রতিভা। নজরুলের গানও যোগ্যতার সঙ্গেই গেয়েছেন। শিল্পীর প্রকাশ-পরিধি আরও সম্প্রসারিত হোল এবারের দুটি সঙ্গীত আধুনিক গানে। কথা ভবেশ গুপ্ত, সুর রবীন্দ্র জৈন। ই, পি, রেকর্ডে ভাবসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতের চারজন অবিস্মরণীয় শিল্পীর ষোলটি গান সানন্দে এবং সাগ্রহে গৃহীত হবে। উমা বসু আজ নেই। কিন্তু তার অনবদ্য কণ্ঠের চারটি গান সঙ্কলন করে গ্রামোফোন কোম্পানী সত্যিকারের সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকের কাজ করেছেন। সুরকার (সুরসাগর হিমাংশু দত্ত) ও রচয়িতা (সুবোধ পুরকায়স্থ, সুনির্মল বসু, বিনয় মুখোপাধ্যায়) বিচারেও গানগুলির মূল্য যথেষ্ট। তবে শিল্পীর সার্থকতর অবদান। দিলীপ রায়ের গানের একটি রেকর্ড সংকলন বার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম যুগের দিক-চিহ্নিত শিল্পী কনক দাসের গাওয়া চারখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, দীপালি নাগের 'বেহাগ', রাগেশ্রী, রামসখ ও গৌরী রাগের চারখানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া "সাধক রামপ্রসাদ", "রাণী রাসমণি" ও "সাধক বামাক্ষ্যাপা" ইত্যাদি বিভিন্ন ছায়াচিত্রের শ্যামাসংগীত সযত্নে চয়িত হবার মতই সম্পদ। আরতি মুখোপাধ্যায়ের মহম্মদ সগীরুদ্দিনের পরিচালনা ও সুরে যোগ ও সরস্বতী রাগাশ্রিত টপ্পা ও তারাণা অঙ্গের দুটি উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রশংসা পাবার মত। অবশ্য তারাণার সার্থকতর প্রয়োগ হতে পারত কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে।

রূপকথা প্রযোজিত

'তাসের দেশ'

প্রতিষ্ঠানের নাম ও তার পরিবেশিতব্য বস্তুর এমন কাবামধুর মিল সচরাচর দেখা যায় না—সেদিন রবীন্দ্রসদনে বসে 'রূপকথা' আয়োজিত 'তাসের দেশ' দেখতে দেখতে এই কথাই মনে হয়েছে। একটি আষাঢ়ে গল্প অবলম্বনে লিখিত 'তাসের দেশ' ঠিক রূপকথা না হলেও রূপকথার আঙ্গিকেই লেখা। দৈনন্দিনের প্রথাবদ্ধ জীবনের জরাজীর্ণতার প্রতি কবির সহানুভূতির কারুণ্য রঙ্গে, কৌতুকে ব্যক্ত। হাসির ইন্দ্রধনুতেই বুঝি জীবনের ট্র্যাজেডি এমন করে ঘনিয়ে ওঠে।

মহারাজা কাশিমবাজার সাবিত্রী শিক্ষালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যম পরিবেশন করেন গায়ত্রী মিত্র।

ললিতা রায়চৌধুরী

তারুণ্যের, জয়দৃপ্ত রূপের প্রতীক রাজপুত্রের প্রাণোচ্ছল স্পর্শে তাসের দেশের প্রথাশৃঙ্খলিত জীবনের আবরণ ভেঙে গতিপ্রবাহে যুক্ত হওয়ার চাঞ্চল্য উপযুক্ত নৃত্য আঙ্গিকে ও সঙ্গীতশিল্পীদের কণ্ঠসম্পদের মাধ্যমে আমাদের মর্মগোচর করেছেন 'রূপকথা'র শিল্পীরা। শুরু হয় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, সোমেন দত্ত ও সুমিত্রা সেনের একক সঙ্গীত দিয়ে।

রং-বেরং-এর তাসের মুখোস-পরা 'তাসের দেশে'র অধিবাসীদের জীবনযন্ত্রণা ও মুখোশহীন নৃত্যে প্রাণবন্ত রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের মুক্তপ্রাণের উল্লাস চিত্তস্পর্শী। রাজপুত্রের ভূমিকায় সুদর্শন-সাধন গুপ্ত তাঁর নৃত্য ও অভিব্যঞ্জনায় চরিত্রের চাহিদা পূর্ণ করতে পেরেছেন। সদাগরপুত্রের রূপ দিয়েছেন উজ্জ্বল সেনগুপ্ত। হরতনীর ভূমিকায় অরুন্ধতী চাকলাদারকে মানিয়েছিল। অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন সুনীত বসু, অরূপ দত্ত, বটু পাল, শম্ভু ভট্টাচার্য, সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষা দত্ত, শ্রীরাধা দাস, শোভা ভট্টচার্য, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, ছায়া হালদার, ছন্দা মিত্র, শীলা চট্টোপাধ্যায়। সুষ্ঠু নৃত্য পরিচালনার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায়। জাভার মুখোশ-নৃত্যের সুবিস্তৃত সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবিগুরু অবহিত ছিলেন এবং সুমাত্রা, জাভা, শ্যামদ্বীপের নৃত্য আঙ্গিকের প্রাণবন্ততা যে কবিকে মুগ্ধ করেছিল একথা অসিতবাবু সম্ভবত মনে রেখেছেন। অন্তত তাঁর প্রতি চরিত্রের উপযোগী সুষ্ঠু, সুন্দর নৃত্যরচনা দেখে সেই কথাই মনে হয়। সোমেন দত্তর পরিচালনায় সঙ্গীতাংশের স্বচ্ছ প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন পবিত্র মিত্র, গৌর মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শান্তি মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, যুথিকা মিত্র, অতসী ঘোষাল, অর্চনা সেনগুপ্ত, কেয়া ঘোষ, শুভ্রা ঘোষ, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবেত

সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন দিনু চন্দ্র, গোপাল বসু, বিপ্লব মণ্ডল, অমর চন্দ্র ও রমেশ চন্দ্র। আলোকপাতে কনিষ্ক সেন, সজ্জায় কৃষ্ণকুমার ঘোষ, দৃশ্যপট রচনায় সৌরেন চক্রবর্তী। সম্মিলিত প্রয়াসেই এমন সুসামঞ্জস টিমওয়ার্ক সম্ভব হয়।

সুরবাহার সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক মিলনোৎসব

কসবা চিত্তরঞ্জন স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে সুরবাহারের তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুদিনব্যাপী নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় খ্যাতিমান শিল্পী বলরাম পাঠকের রাগেশ্রী রাগে সেতার বাজনা উপস্থিত শ্রোতাদের বিমোহিত করে। তবলায় অনিল রায়চৌধুরীও যোগ্য সঙ্গতীয়ার পরিচয় দেন। ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহশিল্পীদের যন্ত্রসঙ্গীত, বাণী সমাদ্দারের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীত, মঞ্জুলা মিত্রের সেতার, রূপালী ভট্টাচার্য ও নমিতা মল্লিকের রবীন্দ্র ও কথক নৃত্য, প্রশান্ত সমাদ্দারের তবলা লহরাও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। সুরবাহার সঙ্গীতগোষ্ঠী পরিবেশিত নজরুলের 'জাগো অনশন বন্দী' ও সলিল চৌধুরীর "নওজোয়ান' সার্থক রূপ লাভ করে। তবলা ও অন্যান্য তালযন্ত্রে সহযোগিতা করেন—চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন সিংহ। অন্যান্যদের মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—বিমল মিত্র, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, নন্দা মুখোপাধ্যায়, উর্মিলা দত্ত, সুগতা মৈত্র, মমতা সুর, রীতা সুর, জয়শ্রী ঘোষ, শ্রীলা রায়, আরতি রায়, ডলি ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা সাহা, প্রতিমা সরকার, শৈমন্তী বসু, নীলা দাশগুপ্তা, অঞ্জলি সেনগুপ্ত, স্বপন দত্ত, তাপস পাল, সুশীল রায়, দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পনা রায়চৌধুরী, ঝর্ণা ভৌমিক, সন্ধ্যা দাশগুপ্তা, অলকানন্দা মৌলিক, শাশ্বতী সাহা। দুদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণা সমাদ্দার ও সুনীল সাহা।

সুরবাহারের অনুষ্ঠানে বলরাম পাঠক

ডানকুনি "দশমহাবিদ্যা" আশ্রমে ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ১৪ জানুয়ারী, '৭০ ডানকুনি (হুগলী) দশমহাবিদ্যা আশ্রমে প্রতিবারের মত এবারেও বাক্‌সিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ দেবের মহাসিদ্ধি দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বাগচী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাংখ্যরত্ন। সেদিনের এই অনুষ্ঠানসূচীতে শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : সর্বশ্রী ফটিকচন্দ্র দাস, গিরিজা সাহা, জগন্নাথ দত্ত, যাদব চক্রবর্তী, সর্বানী সাহা, গীতা দেবী ও পূর্ব সিঁথি ধর্ম সংঘের শিল্পীরা। বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বাগচী রচিত সুমধুর মাতৃসংগীত পরিবেশনে শ্রীজগন্নাথ দত্ত তাঁর অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্যের পরিচয় দেন। আরো উল্লেখযোগ্য এই মাতৃসংগীত পরিবেশনে শিল্পী কোন যন্ত্রসংগীতের সাহায্য না নিয়েই একটির পর একটি গান গেয়ে যান। কণ্ঠশিল্পী শ্রীফটিকচন্দ্র দাস সাধক সর্বানন্দ বিষয়ে রচিত কণ্ঠসংগীতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। কুমারী সর্বানী সাহার কালীকা নৃত্য ও পূর্ব সিঁথি ধর্ম সংঘের সর্বানন্দ গীতি আলেখ্যটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। সবশেষে সাধক সর্বানন্দ বংশধর আশ্রমাচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র সর্ববিদ্যা উপস্থিত সকলকে সুরে চণ্ডী ও দশমহাবিদ্যা মায়ের রূপ বর্ণনা করেন মনোজ্ঞভাবে। নিয়মিত পূজান্তে সারারাত্রিব্যাপী মাতৃ আরাধনা সংগীতে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান পালন হয়। এরি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান সম্পাদক শ্রী[illegible] সর্ববিদ্যা উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ ও জলযোগে আপ্যায়ন করেন।

শ্যামল মিত্র নাইট/বনশ্রী সেনগুপ্ত, ইলা বসু, শ্যামল মিত্র, উৎপলা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুজীর হাতে চেক দিচ্ছেন মঞ্জু পাল।

প্রেক্ষাগৃহ

শান্তি/স বিত্রী চট্টো-পাধ্যায় দিলীপ রায়

চিত্র সমালোচনা

'আঁখি মেলি দেখ'

মানুষ শুনে শেখে, দেখে শেখে এবং ঠেকে শেখে। প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী বিধবা কাশীবাঈ ঠেকে শিখেছিলেন। আসল সুখ কোথায়, জীবনের পথে চলতে গেলে কোন্ জিনিসের বেশী প্রয়োজন, তা তিনি জানতেন না। তিনি জানতেন, যার অর্থ আছে, সেই পৃথিবীতে প্রধান সহায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন, তিনি ভুল জানতেন; তিনি দেখলেন ও জানলেন, হৃদয়বান সৎ ব্যক্তিই জীবনে চলার পথে সবচেয়ে বড়ো সহায়। ঠেকে শিখে তাঁর মনের চোখ খুলে গেল।

আমরা **শুম্প পিকচার্স নিবেদিত, আই এ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত এবং রঘুনাথ ঝালানি পরিচালিত ইস্টম্যান কালার রঞ্জিত হিন্দী ছবি 'মন কী আঁখে'র** অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কাশীবাঈ-এর কথা লিখছি। অর্থের লোভে তিনি কোটিপতির একমাত্র আধুনিকা কন্যা বন্দনার সঙ্গে তাঁর বড়ো ছেলে নরেশের বিবাহ দিয়েছিলেন। এবং ছোট ছেলে রাজেশ যখন একজন শিক্ষকের সুন্দরী সুশীলা কন্যা গীতাকে বিবাহ করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল, তখন যেই-মাত্র তিনি জেনেছিলেন, নববধূর পিতার কোনোরকম অর্থসম্পত্তি নেই, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি তার ওপর হয়ে উঠেছিলেন বিরূপ এবং তার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও তাকে দাসীর মত খাটাতে ও তার প্রতি অপরিমিত দুর্ব্যবহার করতে তাঁর বিবেকে একটুও বাধে নি। রাজেশ কতবার সীতাকে নিয়ে অন্যত্র থাকবার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু সীতা সম্মত হয় নি। তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সে তার শাশুড়ীর মন ফেরাবেই। শাশুড়ীর মন ফিরেছিল। কিন্তু সে গীতার সুব্যবহারে নয়, আধুনিকা বন্দনার দুর্ব্যবহারের দরুন পথে বেরিয়ে দুর্বৃত্তদের দ্বারা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার লুণ্ঠিত হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারাবার পরে।

লক্ষ্য করে দেখেছি, হিন্দী ছবির কাহিনীকারদের মাত্রাজ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। গীতাকে সৎ, সহনশীলা করতে হবে বলে তাকে এমনই করা হল যা বিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আবার বিধবা কাশীবাঈকে ঠিক বিপরীতভাবে এমন অর্থান্ধ করা হল যে, তিনি অনায়াসে ধনী পুত্রবধূর অশালীন, অসংযত নৃত্যলীলা বরদাস্ত করে তারই পক্ষ সমর্থনে নিজের ছেলের (যে তার স্বামী) সঙ্গে ঝগড়া করলেন। গেল সংখ্যায় যে-প্রশ্ন করেছি, সেই প্রশ্নই আবার করছি : যুক্তি ও স্বাভাবিকতার পথকে ছেড়ে দিয়ে বিকট পরিস্থিতি সৃষ্টিতেই কি হিন্দী কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারেরা বেশী আনন্দ পান? আরও একটি কথা। কিছুদিন আগে 'আরাধনা', 'পিঞ্জরে কে পঞ্ছী', 'দো রাস্তে' প্রভৃতি ছবি দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল, বোম্বাই চলচ্চিত্রজগৎ কাহিনী সম্পর্কে তার বহু ব্যবহৃত ফর্মুলাকে ত্যাগ করেছে এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদর্শনকে চিত্রায়িত করবার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু 'ধরতী' বা 'মন কী আঁখে' দেখবার পরে মনে করতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের সে-ধারণা রীতিমত ভ্রমাত্মক।

অভিনয়ে নায়িকা গীতার ভূমিকায় ওয়াহীদা রেহমান যথাসম্ভব চরিত্রোচিত স্বাভাবিকতা বজায় রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর নৃত্যকলাও উপভোগ্য। নায়ক রাজেশ বেশে ধর্মেন্দ্র তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীসহ কাহিনীর প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। বিধবা কাশীবাঈরূপে ললিতা পাওয়ার দর্শকের বিরাগভাজন হয়েছেন চরিত্রের দৌলতে। ধনীকন্যা এবং আধুনিকা বন্দনার ভূমিকায় ফরিয়ালের অভিনয় চারিত্রিক উগ্রতাকে পরিস্ফুট করেছে। গীতার বাবা ও মায়ের ভূমিকায় মনোমোহন কৃষ্ণ ও লীলা চিটনিস চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। বন্দনার অর্থশালী পিতার ভূমিকাটিও অত্যন্ত সুঅভিনীত।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশ মুখোপাধ্যায় পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা। ছবির কিছু কিছু সংলাপকে দর্শকরা সানন্দে উপভোগ করেছেন। ছবির শব্দানুলেখন কি ত্রুটিপূর্ণ? নইলে সর্বত্র সংলাপ সমানভাবে শ্রুতিগম্য হয় নি কেন? সহীর কৃত গান লক্ষ্মীকান্ত পারেলাল দ্বারা সুরসমৃদ্ধ হলেও বিশেষ শ্রুতিসুখকর হয়নি।

গীতার চরিত্রটিই 'মন কী আঁখে'কে দর্শনীয় করে তুলেছে।

স্টুডিও থেকে

বিয়ের জন্য কাজ পিছিয়ে যাওয়ার রেওয়াজটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কাজের জন্যও যে বিয়ের মত ব্যাপারটি পিছিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ রাখলেন শ্রীমতী তনুজা। গত ডিসেম্বরেই দিল্লীতে তাঁর বিয়ের পিঁড়িতে বসবার কথা ছিল। তিনি বসেননি। শ্যুটিং-এর চাপেই তাঁকে পিছিয়ে দিতে হয়েছে শুভক্ষণটিকে। আবার কবে সেই ক্ষণটিকে ডেকে আনবেন তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি। গত সপ্তাহে কলকাতায় 'চৈতালী' ও 'প্রথম কদম ফুল' ছবির বাকি কাজটুকু সারতে তিনি এসেছিলেন। 'চৈতালী'র কাজ মোটামুটি মিটলেও ইন্দোর সেনের ছবির কাজ পুরোপুরি তিনি শেষ করতে পারলেন না। কারণ শারীরিক অসুস্থতা। শনিবার গিয়েছিলাম ইন্দ্রপুরীতে 'প্রথম কদম ফুল'-এর ডাবিং শুনতে। স্টুডিওতে ঢোকার মুখেই দেখি তনুজা। ক্লান্ত পায়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসছেন রেকর্ডিং রুম থেকে। পাশে স্টুডিওর ম্যানেজার বাসুবাবু। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক ইন্দোর সেন। শ্রীসেনের কাছ থেকেই শুনলাম সেদিনের মত কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তনুজার জ্বর হয়েছে। গাড়ী ডেকে সৌমিত্রবাবু ও বাসুবাবু তনুজাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য।

বিলম্বিত লয়/উত্তম-সুপ্রিয়া

গল্প খোঁজার পালা এখন অনেকের। 'শান্তি' ছবি শেষ করে (এ ছবি সেন্সর সার্টিফিকেট পেল মাত্র ৩ ডিসেম্বর) স্বদেশ সরকার ভাবছেন কোন্ গল্প নেবেন। অবশ্য আগে শুনেছিলাম তীর্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটা গল্প নিয়ে ওঁর কাজ করার খুব ইচ্ছে। নতুন গল্পের সন্ধানে আছেন তপন সিংহও। এন্-টিতে ওঁর অফিসঘরে দেখা হতে জানালেন 'নতুন কিছু এখনও ঠিক করতে পারিনি।'

—সাগিনা মাহাতো একবারে কমপ্লিট?

ঃ না একবারে নয়, প্রায়।

—শুনছিলাম হিন্দী 'আপনজন' করার কথা।

ঃ এখনও ঠিক কিছুই হয় নি।

সুতরাং তাঁকেও ভাবতে হচ্ছে নতুন কি করবেন তা নিয়ে। সলিল দত্তের 'কলঙ্কিত নায়ক' মুক্তিপ্রতীক্ষায়। নতুন চিত্রনাট্য তৈরীর জন্য ভাবতে হচ্ছে তাঁকেও। মৃণাল সেনের 'ইচ্ছাপূরণ' (চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির ছবি) এখন শেষ পর্যায়ে। নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন আগামী মাসেই। কাজেই চিত্রনাট্যের খসড়া নিয়ে ব্যস্ত এখন তিনি।

●

লাইট অ্যান্ড শেড প্রযোজিত 'এই করেছো ভাল' ছবির চিত্র গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। পরিপূর্ণ হাস্যরসের এই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, নবাগত সমরজিৎ, অম্বুজ মৌলিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, শমিতা বিশ্বাস ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মধুসংলপী বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুর সংযোজনায় রয়েছেন অধীর বাগচী এবং নেপথ্য-কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও সুরকার স্বয়ং।

দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত, বড়ভাই উদার মানবিকতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি, কিন্তু ছোট ভাই অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অসদুপায়ে রহস্যজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং সুকৌশলে বড় ভাইয়ের বাড়ীটি ধীরে ধীরে হস্তগত করে। কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় ছেদ গেল! এরই মধ্যে একটা নয় দু' দুটো রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়! কেনই বা এই হত্যাকাণ্ড? এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে পুলিশের চোখে ছোট ভাই সন্দেহভাজন হয়ে পড়ে। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে এবং বারীন্দ্রনাথ দাস-এর চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক অজিত লাহিড়ী যে ছবিটি সদ্য সমাপ্ত করেছেন সেটি হল 'পদ্ম গোলাপ'। এই চিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সংগীত-পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র এবং নেপথ্য সংগীতে আছেন কিশোরকুমার, সন্ধ্যা মুখার্জি, আরতি মুখার্জি। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন যথাক্রমে—সৌমিত্র, অপর্ণা, অনুপ, অনুভা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ, শৈলেন মুখার্জি (অতিথি) প্রভৃতি। ছবিটি এই মাসেই এস এন ফিল্মসের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

—চিত্রলেখক

মঞ্চাভিনয়

সর্বধর্মসমন্বিত একটি মহৎ চরিত্র

মন বিশ্বাস করতে আনন্দ পায়, 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র মতো চরিত্র বুঝি সত্যিই এই পৃথিবীতে, আমাদের এই বাংলা দেশের মাটিতে বিচরণ করেছিল। কাহিনীকার বিমল মিত্র এবং নাট্যরূপদাতা রাসবিহারী সরকার ঐতিহাসিক চালচিত্রের সামনে এই প্রতিমাটিকে এমনই রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে প্রত্যয়সিদ্ধ ও বাস্তব ভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি ছিলে এবং তুমি থাকবে।

মুর্শিদাবাদের সন্নিকটবর্তী হাতিয়াগড়-এর জমিদারকর্মচারী শোভারামের কন্যা মরালী যে-পরিস্থিতিতে নিজের মরালিত্ব হারিয়ে জমিদারবাড়ীর ছোটবউ-বেশে সিরাজের সম্মুখীন হয়েছে, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়াপত্তনের যুগে আদৌ অসম্ভব ছিল না। মরালীর যে-মন সমব্যথী কান্ত সরকারে সমর্পিত, সে-মনে মানব-প্রেমের ফল্গুধারা বয়ে যাবে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রেমের বশবর্তী হয়েই সে সেজেছে মরিয়ম বেগম একই সঙ্গে সিরাজ, জমিদারবাড়ীর ছোটবউ এবং কান্ত সরকারের কল্যাণকামনায়। কল্যাণ-ব্রতী মেয়েটি পৃথিবীর কোনো কিছুকেই ভয় করে নি। এবং যখন সে দেখেছে, মরিয়ম বেগম সেজে থাকলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তখন পরাক্রান্ত ইংরেজের সহায়তা পাবার জন্যে সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে হয়েছে—বেগম মেরী বিশ্বাস। কিন্তু বেচারা মরালী! যে-দুটি মহৎ কাজের জন্যে তার খৃস্টধর্ম গ্রহণ, তার ত আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও তার কোনোটিতেই সে সাফল্যলাভ করল না: স না পারল সিরাজকে রক্ষা করতে, না পারল তার দয়িত কান্ত সরকারকে জীবিত অবস্থায় তার কাছে পেতে। তাই র্থতার জ্বালা জুড়োতে সে সহমৃতা ল সেই কান্ত সরকারের চিতায়, যার ঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল এবং যথাসময়ে বিবাহবাসরে উপস্থিত হ'তে পারায় সে অর্ধোন্মাদ ভিখারী উদ্ধব-সের গলায় মালা দিতে বাধ্য হয়েছিল কান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

বলা বাহুল্য, এই মরালী চরিত্রকে রেই 'বেগম মেরী বিশ্বাস" নাটক। লী থেকে মরিয়ম ও মরিয়ম থেকে ম মেরী বিশ্বাস। মানবতায় বিশ্বাসী লী বিশ্বাস চালে, চলনে ও ক্ষুতায় বেগম এবং মানবপ্রীতি ও জীবে সমদর্শিতায় যথার্থ খৃস্টান ী। নাট্যরূপদাতা রাসবিহারী সরকারের ক্ষ, তিনি বিমল মিত্রকৃত বড় বইটি "বেগম মেরী বিশ্বাস" নামক টিকে উদ্ধার করেছেন।

দুটি পর্বে এবং পনেরোটি দৃশ্যে নাটকটি সম্পূর্ণ। প্রথম দৃশ্য থেকেই নাটকটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। মাত্র তিনটি দৃশ্য চ'লে যাবার পরেই চতুর্থ দৃশ্যে মরালী বাঙলার নবাব সিরাজের সম্মুখস্থ হয় এবং কিছু পরেই সে রূপান্তরিত হয় মরিয়ম বেগমে। একেবারে শেষ দৃশ্যে যখন সে পাদ্রীর কাছে ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাম নিল বেগম মেরী বিশ্বাস, তার পরক্ষণেই জীবনের প্রতি তার বিশ্বাস গেল হারিয়ে এবং চিতায় শায়িত কান্ত সরকারের দিকে সে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হ'ল। মধ্যপথে সামান্য কিছু অংশ বর্জন করতে পারলে নাটকটি আরও চড়া তারে বাঁধা হয়ে অধিকতর উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে নাটকটিকে অনবদ্য বলা চলে। পুরুষদের মধ্যে সব-চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ক্লাইভের ভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায়। আচরণে ও ভঙ্গীতে, কথায় ও হাস্যে ভূমিকাটিকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। সিরাজের ভূমিকাটিকে গড়া হয়েছে নিয়তির ক্রীড়নকরূপে। নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে—সিরাজের দ্বিতীয় দৃশ্যে যেইমাত্র উদ্ধব-দাসের মুখ থেকে সিরাজ শুনল 'আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব নাই ঠিকানা', অমনই সে হয়ে পড়ল অদৃষ্টবাদী। এই নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশী নাট-নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ না পেলেও তিনি তাঁর আন্তরিকতা গুণে দর্শকমনে রেখাপাত করতে পেরেছেন। অনুপা উদ্ধবদাসের ভূমিকাটিকে মূর্ত করে তুলেছেন সবিতাব্রত দত্ত অভিনয়ে ও গানে। বিবাহের পরমুহূর্তেই সুন্দরী বধূকে হারানো তার জড় মনে চৈতন্যের সঞ্চার করেছিল, যার ফলে সে হয়ে উঠেছিল প্রেমিক বাউল—উদ্ধবের এই বিশেষ রূপটিকে শ্রীদত্ত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমিক কান্ত সরকারের ভূমিকাটিকে আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে
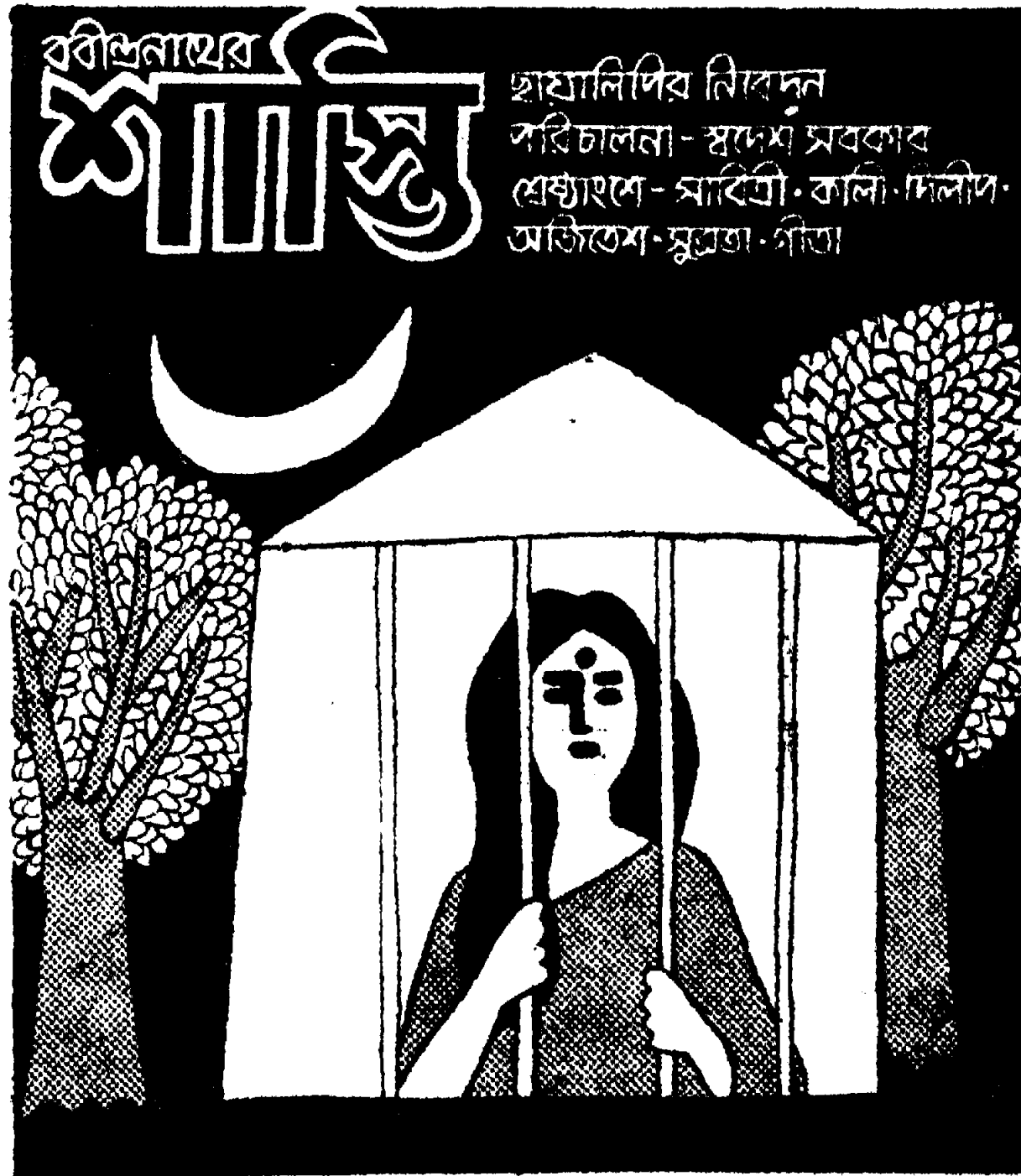
'বেগম মেরী বিশ্বাস' নাটকের দৃশ্যে জয়শ্রী সেন, গীতা নাগ, কণিকা মজুমদার, সবিতাব্রত দত্ত ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

রূপায়িত করেছেন তরুণকুমার। ক্লাইভের মুন্সীরূপে অনুপকুমার একটি বিশুদ্ধ চাটুকারকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন; তবে তাঁর সংযত হওয়ার আবশ্যকতা আছে। অপরাপর পুরুষ ভূমিকার মধ্যে শোভারাম ও মীরজাফর (গোবিন্দ গাঙ্গুলী), ছোট মশাই (অনুকূল দত্ত), কাজী (নির্মল ঘোষ), মহম্মদী বেগ (শান্তি ঘোষাল), মীরকাশিম (ইন্দ্রজিৎ সেন) এবং ওয়াটস্ (নিমু ভৌমিক) উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করব মরালী-মরিয়ম-বেগম মেরী বিশ্বাসের ভূমিকায় জয়শ্রী সেনের অভিনয়কুশলতার কথা। আন্তরিক অথচ সাবলীল অভিনয়-গুণে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করেছেন। ছোটবৌ রূপে কণিকা মজুমদারও অনবদ্য: তাঁর আবেগভরা সংলাপগুলি অন্তরস্পর্শী। গ্রাম্য বিধবা দুর্গার ভূমিকায় লীলাবতী (করালী)র জীবন্ত অভিনয় অবিস্মরণীয়। দর্শকরা এই ভূমিকাভিনয়কে অন্তর দিয়ে উপভোগ করেছেন। বড়-বৌ, লুৎফা ও নানী বেগম-রূপে যথাক্রমে গীতা নাগ, সংগীতা কর ও বেলা দেবীর অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সুরেশ দত্তের মঞ্চোপস্থাপনায় এবং তাপস সেনের আলোক-সম্পাত কৌশলে সমৃদ্ধ হয়ে নাটকটির অংগসজ্জা যুগ-রুচিকেই প্রতিভাত করছে। এক রাম-প্রসাদের গান ছাড়া বাকী সব গানই দাশরথী রায়ের রচনা থেকে সংগৃহীত হয়ে উদ্ধবদাসরূপী সবিতাব্রত দত্তের কণ্ঠে স্থাপিত। অনিল বাগচী দ্বারা সুরারোপিত হয়ে গানগুলি চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠেছে। তবে দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ে নাটকের বিশেষ বিশেষ ভাবোপযোগী আবহসংগীত রচনায় শ্রীবাগচী যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাকে অভিনব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশ্বরূপার বর্তমান নাট্যনৈবেদ্য "বেগম মেরী বিশ্বাস" বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-জগতের একটি দিকচিহ্নরূপে কীর্তিত হবে।

নিজেদের আন্তরিক চেষ্টায় উত্তর বঙ্গের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী 'ত্রিতীর্থে'র সভ্যরা সম্প্রতি একটি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে পর পর দুটি নাটকের অভিনয় করে এঁরা দর্শকদের আপ্লুত করেছেন। প্রথম দিন অভিনীত হোল শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' (ইবসেনের 'ডলস হাউসে'র বাংলা রূপান্তর)। এই নাটকে 'বুলু'র চরিত্রে বীথি সরকারের দক্ষ অভিনয় ভোলা যায় না। অন্য ককেকটি চরিত্রে ছিলেন হরিমাধব মুখার্জি, অমিতাভ সেনগুপ্ত, প্রভাস সমাজদার, নির্মলেন্দু তালুকদার, ছন্দা গুহ। দ্বিতীয় দিনের নাটক অসিত দে'র 'বৃষ্টি বৃষ্টি'ও নাট্যানুরাগীদের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

'চতুরঙ্গে'র শিল্পীরা সম্প্রতি এ, টি, এস (ইছাপুর) হলে 'ছায়ানায়িকা' নাটকটি সার্থকতার সংগে মঞ্চস্থ করেছেন। সম্মবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীদের আন্তরিকতার অভাব কোথাও ঘটেনি। নির্দেশক শীতল চক্রবর্তী ও বেলা সরকার 'অবিনাশ' ও 'সুতপা' চরিত্রে মর্মগ্রাহী অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়া আর যাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন তাঁরা হোলেন নরেন দাস (অমিতাভ), বাদল চক্রবর্তী (শ্রীধর), অরুণ ভট্টাচার্য (ফটিক), বিজন ভট্টাচার্য (সন্ধ্যা)।

দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা 'অনির্বাণে'র শিল্পীরা ইছাপুর নন্দ-শীলনীর বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁদের [illegible]সফল নাটক শচীন ভট্টাচার্যের 'এক্কা গাড়ীর ঘোড়া' পরিবেশন করলেন। কাহিনীর অভিনবত্ব, সুসংবদ্ধ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ও দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি প্রথম থেকেই দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। সুঅভিনীত এই নাটকের শিল্পীতালিকায় আছেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, সমা মিত্র, দীপেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, গৌর সোম, রথীন চক্রবর্তী, চঞ্চল ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ) রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' নাটকটি পরিবেশন করেছেন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র 'কালীনাথ' ও 'বিশ্বনাথ'র ভূমিকায় অনিল ভট্টাচার্য ও কেদারেশ্বর ব্যানার্জির অভিনয় সত্যি উপ-ভোগ্য হয়ে উঠেছিল। অন্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন নীরোদ ঘোষ, সরোজ মৌলিক, পংকজ ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম মুখার্জী ও সুনীল মৈত্র। অনিলকুমার ভট্টাচার্যের নাট্য-নির্দেশনা প্রশংসার দাবী রাখে।

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের রূপকধর্মী একটি নাটক নিয়ে গত তেইশে জানুয়ারী হালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ অবতীর্ণ হলেন সোদপুর পাত্রশিলায় 'একতা মঞ্চে'। ভাব-

ব্যান্তের কোন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরে লেখা এ নাটক শ্লেষাত্মক বাক্যজালে পরিপূর্ণ। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এতে অভিনয় করেন সরোজ ভট্টাচার্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল বসু এবং দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

একটি দেশের পটভূমিকায় সংঘটিত কাহিনীকে কেন্দ্র করে যে নাটকের সংঘাত গড়ে ওঠে, সেই নাটক চিরন্তনত্বে দাবী করতে পারে তখনই, যখন তার মধ্য দিকে এক চিরকালীন সত্তা এবং এক সর্বজনগ্রাহ্য অনুভব রূপ লাভ করে। 'উত্তর দরবারী' প্রযোজিত 'আগ্নেয়গিরি' নাটক যে অগ্ন্যুদ্গার তুলেছে তা শুধু একটি বিশেষ জায়গার কিছু লোকের এক আকস্মিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হয় নি, তা হয়েছে প্রতিটি যুগের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কলরোল। এ দিক দিয়ে 'আগ্নেয়গিরি'কে চিরকালের নাটক বলে অভিহিত করা ভালো, গভীরতর অর্থে একে প্রতীক নাটকের পর্যায়ভুক্তও বোধ হয় করা যায়। 'উত্তর দরবারী'র শিল্পীরা চিরকালের জনগণের নাটক অভিনয় করে প্রতিটি সংগ্রামী মানুষ ও নাট্যানুরাগীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পাবার দাবী রাখেন নিশ্চয়ই। 'আগ্নেয়গিরি' নাটকটি স্টাইনবেকের 'দি মুন ইজ ডাউন' অবলম্বনে লিখেছেন শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ হয়েছে সত্যিই প্রাঞ্জল।

বিজয়ী জার্মান বাহিনীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব একটি শহরের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত করলো। সেই দেশের স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নিলো ওরা। উদ্দেশ্য, সেখানকার কয়লাখনি থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ওরা সেখানকার মেয়রের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চাইলো। একদিকে সীমাহীন অধিকার বিস্তারের প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে শান্তির বাণী উচ্চারণ। এই দ্বিমুখী নীতির শিকার হোল সাধারণ মানুষ। কিন্তু বেশী দিন এ ভাবে চললো না। ঘরছাড়া বেনারিখের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বেনারিখকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো মেয়র, ডাঃ উইন্টার, মাদাম সারা, ফাদার নিকলসন এবং আরো অনেকে। বেনারিখের দল ক্রমশঃ শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্দীপনায় ব্যাপ্তি পেতে থাকলো এবং তা শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীর কর্ণধারদের আতঙ্কের কারণ হোল। সব শেষে সেই চরম মুহূর্ত এলো। দেশের মানুষ তাদের হারানো স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে এলো। জয় হোল তাদের। পতাকা উড়লো জনগণের।

নাটকের ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে সমবেত অভিনয়ের সুসংঘবদ্ধতার ওপর এই ধরণের নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতা নির্ভর করে। নির্দেশক জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রথম থেকে এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সর্বত্র এই সচেতনতা প্রত্যাশিত শৈল্পিক রসোত্তীর্ণতায় মিশে যেতে পারেনি ঠিক, কিন্তু তাতে নাট্যরস আস্বাদনে বাধা আসে নি। কর্ণেল ল্যাসার, ডাঃ লফটি, লেঃ টেন্ডার চরিত্রে কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, চন্দন গাঙ্গুলী, ও শঙ্কর ব্যানার্জীর অভিনয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হোতে পেরেছে। মাদাম সারা'র ব্যক্তিত্বকে যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাণু রায়। দেবী চ্যাটার্জী (কর্ণেল করেল)'র চরিত্রচিত্রণ মন্দ নয়, কিন্তু শিল্পীর 'স' উচ্চারণ অসহ্য মনে হয়েছে। অজিত দাসের 'মেয়র অর্ডেন' প্রশংসার দাবী রাখে। ফাদার নিকলসন'এর গভীরতা পরিমল রায়ের চরিত্রচিত্রণে ফুটে উঠতে পারে নি। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য পল্টু সাহা, বিমল মুখার্জী, দীপু চক্রবর্তী, রঞ্জন চক্রবর্তী, তাপস বোস, কল্যাণ মিত্র, সত্যব্রত ঘোষ, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী। নাটকের শেষ দৃশ্যের কম্পোসিশন সুন্দর হয়েছে। মঞ্চসজ্জায় পরিস্ফুট হয়েছে পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ, কিন্তু আলোকসম্পাত মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

শৈলেশ গুহ নিয়োগীর রঙ্গরসের নাটক 'ফাঁস' সম্প্রতি সাবলীলভাবে অভিনীত হ'ল মিনার্ভা [illegible] অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন [illegible] 'মিলন সংঘের' শিল্পীরা। [illegible] নিয়োগী নির্দেশিত এই নাটকের [illegible] ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন [illegible], [illegible] শ্রীমানী, আশিষ কুন্ডু, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাণী ভট্টাচার্য, [illegible], দিলীপ দে, মিন্টু দে, কাজল বোস, শঙ্কর ভট্টাচার্য, শম্ভু ভট্টাচার্য, [illegible] মুখোপাধ্যায়, অনিল রায়।

প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'দেবদারু'র পরিচালনায় একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী মার্চ মাসে উত্তরপাড়ার [illegible] মঞ্চে। প্রবেশমূল্য নির্ধারিত হয়েছে ২৫ টাকা। যোগদানের শেষ তারিখ ৫ই মার্চ। যোগাযোগের ঠিকানা : শ্রীঅমিত চ্যাটার্জি, সাধারণ সম্পাদক, দেবদারু, ৪৮, বিজয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, পোঃ উত্তরপাড়া, জেঃ হুগলী।

দেবী/সুলোচনা

বিবিধ সংবাদ

কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার ২২৬এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ রায় বিমানবিহারী মিত্র মহাশয়ের ভবনে গিরিশ স্মারক আলোচনার ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। শ্রদ্ধেয় নটসূর্য ডকটর অহীন্দ্র চৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন ও মহাকবির বিষয়ে আলোচনা করবেন। গিরিশ সঙ্গীত ও রচনা সভায় পঠিত হবে।

সুরঝংকারের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল নিউদিল্লীর আইফকাস হলে ২৮ জানুয়ারী। শিশু শিল্পীরা অনিল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'এক পয়সার ভেঁপু' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। প্রতিটি শিল্পীই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ফিরিওলার ভূমিকায় সঞ্চিতা বোস ও ছেলের ভূমিকায় কৃষ্ণা হালদার উল্লেখযোগ্য অভিনয় করে। শ্রীমতী শান্তা বোস মায়ের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন। তাঁর নৃত্যপরিচালনাও বিশেষ প্রশংসনীয়। শুধু সংগীতপরিচালনাতেই নয়, পরিচালক হিসাবেও শ্রীঅশোক ভট্টাচার্যের কাজ সুন্দর।

গত ১২ ফেব্রুয়ারী বাগবাজার তরুণ পাঠাগারের সরস্বতী পূজার সমাপ্তি উৎসব অতি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি ভাষণে সংস্থা সভাপতি এ্যাডভোকেট সুহৃদগোপাল দত্ত শ্রীঅরবিন্দ ও মানবপ্রেম সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরে নমিতা দত্তের সৌজন্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশ্রী ভোলানাথ দাস, কালু চক্রবর্তী, সুশীল দাস, শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, লিলি মিত্র, গীতা রায়চৌধুরী ও পারমিতা রায়। সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সেন, নিমাই চট্টোপাধ্যায় ও তারক সাহা। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সুশান্ত পাল ও সম্প্রদায় এবং হরবোলা পরিবেশনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান অভিজিৎ ব্যানার্জি, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর বন্দোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মঞ্জুলা রায়চৌধুরী।

গত ২৬ জানুয়ারী শুভবস্তু সভার দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব 'লোটাস' চিত্রগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। সম্পাদকের রিপোর্ট পাঠ করেন অরবিন্দ দাস। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডঃ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে শুভবস্তুর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত এবং কর্মোদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানশেষে অগ্রগামী প্রযোজিত 'নিশীথে' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। সভান্তে অসিত পাল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯৪৮ সালে স্থাপিত ভারতীয় **নাট্যসংঘ-এর অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন** হ'ল গেল ১৩ ফেব্রুয়ারী **ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেন্টারে।** এই **উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ প্রসঙ্গে** কলিকাতা হাইকোর্টের **প্রাক্তন প্রধান** বিচারপতি দীপনারায়ণ সিংহ বাঙলা রঙ্গালয়ের **একটি** সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা ক'রে রঙ্গজগতে বাঙলা দেশের অগ্রগামিতার কথা বিবৃত করেন। সভাপতিরূপে সংঘ-সভাপতি পালানপুরের নবাব সংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নাট্য-আন্দোলন বিস্তারে সংঘের একাধিক অকৃতকার্যতার কথা উল্লেখ করেন। পরে দিল্লীর লেখক-প্রযোজক সোম বেনেগল ও কলকাতার নাট্যকার - প্রযোজক-পরিচালক - অভিনেতা শম্ভু মিত্র তাঁদের বক্তব্য পেশ করবার পরে থিয়েটার সেন্টারের সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাওড়া থেকে প্রথম প্রকাশিত ও সম্প্রতি কলিকাতায় স্থানান্তরিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা "বিচার"-এর দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে। বিজ্ঞাপিত মনীষীর অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকরূপে যথাক্রমে দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরীকিশোর ঘোষ ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বরণ করা হয়। সভান্তে উপস্থিত সুধিবর্গকে নৃত্য-গীতাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সাধারণতন্ত্র দিবস ও নেতাজী জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্টির সভাবৃন্দ হাওড়া ও কলকাতার কয়েকটি অনুষ্ঠানে সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ সুনাম অর্জন করে। সঙ্গীতাংশে ছিলেন সর্বশ্রী গীতা ঘোষ, তিলোত্তমা মজুমদার, রেবা সরকার, শিখা ঘোষ, সমীর দত্ত, কাশীনাথ দত্ত, দীপেন দাস, নৃপেন মুখার্জি, অরবিন্দ সিংহ, তন্দ্রা দে, ছন্দা দে, মায়া দে, রুমা সিংহ, সোমা সিংহ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জ্যোৎস্না সিংহ।

খেলার কথা

টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট কিপিং

[illegible]নাথ রায়

ক্রিকেট খেলায় উইকেটকিপারের ভূমিকা দলের ব্যাটসম্যান, বোলার এবং ফিল্ডারদের থেকে কোন অংশে কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। 'লেগ-গ্ল্যান্স' মারের প্রবর্তক এবং ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গীয় রঞ্জিৎ সিংজী উইকেটকিপার নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন, শুধু দেখতে হবে খেলোয়াড়ের উইকেটকিপিং সম্পর্কে উপযুক্ত দক্ষতা আছে কিনা। এক্ষেত্রে তার রান করার প্রশ্ন গৌণ। তিনি তাঁর প্রখ্যাত 'জুবিলি বুক অব ক্রিকেট' পুস্তকে লিখেছেন 'একজন ভাল ব্যাটসম্যান যেমন অনেক রান করতে পারেন তেমনি একজন দক্ষ উইকেটকিপার বিপক্ষ দলের অনেক রান প্রতিরোধ করতে পারেন।'

বর্তমান নিবন্ধে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উইকেটকিপিংয়ের বিশ্বরেকর্ড এবং উইকেটকিপারদের অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য রেকর্ড দেওয়া হল।

ওয়ালী গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া)

জি আর ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া)

টেস্টে বিশ্ববিশ্রুত উইকেটকিপার

	খেলা	রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	গড়	সেঞ্চুরী	উইকেটকিপিং ক্যাচ	স্টাম্পিং	মোট
গডফ্রে ইভান্স (ইং)	৯১	২৪৩৯	১০৪	২০·৪৯	২	১৭৩	৪৬	২১৯
উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড (অ)	৫৪	১৪২৭	৬৫*	২২·৬৫	—	৭৮	৫২	১৩০
এ ডবলিউ গ্রাউট (অ)	৪৬	৮০৬	৭৪	১৫·৮০	—	১৫০	২৩	১৭৩
জে এইচ বি ওয়েট (দঃ আঃ)	৩৬	১৭৮৫	১৩৪	৩০·২৫	৩	৮৭	১৪	১০১
লেসলি এমস (ইং)	৪৭	২৪৩৪	১৪৯	৪০·৫৬	৮	৭৫	২৩	৯৮
ইমতিয়াজ আমেদ (পা)	৪১	২০৭৯	২০৯	২৯·২৮	৩	৭৭	১৬	৯৩
ক্লাইড ওয়ালকট (ও)	৪৪	৩৭৯৮	২২০	৫৬·৬৮	১৫	৫৪	১১	৬৫

দ্রষ্টব্য : সরকারী টেস্টে ১০০ বা তার বেশী 'ডিসমিস্যাল' তালিকায় উপরের ইভান্স (ইংল্যাণ্ড), গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া), ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া) এবং ওয়েট (দক্ষিণ আফ্রিকা) ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের জিম পার্কস ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করেছেন।

উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)

প্রবীর সেন (ভারতবর্ষ)

অন্যান্য বিষয়ে রেকর্ড

এক ইনিংসে ২০০ রান

২২০ রান—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, বার্বাডোজ, ১৯৫৩-৫৪

২০৯ রান—ইমতিয়াজ আমেদ (পাকিস্তান) বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, লাহোর ১৯৫৫-৫৬

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

১৫টি—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
৮টি—লেসলী এমস (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক রান

৩৭৯৮ রান—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

শ্রেষ্ঠ গড় রান

৫৬·৬৮ রান (প্রতি ইনিংসে)—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (ভারতবর্ষ)

সর্বাধিক টেস্ট খেলা

১১টি—গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যান্ড)

শ্বে কোন খেলোয়াড়ের প:ক্ষ বিশ্ব-রেকর্ড। ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কয়েকটি বে-সরকারী টেস্ট খেলার সূত্রে এই রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

মোট ২০০০ রান

এ পর্যন্ত মাত্র এই চারজন উইকেট-কিপার টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ বা তার বেশী রান করেছেন : ওয়েস্টইন্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকট (৩৭৯৮ রান), ইংল্যান্ডের গডফ্রে ইভান্স (২৪৩৯ রান), ইংল্যান্ডের লেসলী এম্‌স (২৪৩৪ রান) এবং পাকিস্তানের ইমতিয়াজ আমেদ (২০৭৯ রান)

উইকেটকিপিংয়ে বিশ্বরেকর্ড

সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

২১৯টি (কট ১৭৩ ও স্টাম্পড ৪৬)—গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক ক্যাচ

১৭৩টি—গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক স্টাম্পিং

৫২টি—উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)

এক ইনিংসে সর্বাধিক স্টাম্পিং

৫টি : উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫

: প্রবীর সেন (ভারতবর্ষ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

একটি খেলায় সর্বাধিক স্টাম্পিং

৫টি : প্রবীর সেন (ভারতবর্ষ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

এক ইনিংসে সর্বাধিক ক্যাচ

৬টি : ওয়ালী গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮

: জন টমাস মারে (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, লর্ডস, ১৯৬৭

ইমতিয়াজ আমেদ (পাকিস্তান)

একটি খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ

৮টি : জে জে কেলী (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, সিডনি ১৯০১-০২

: জি আর ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ওয়েস্টইন্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৫৪-৫৫

গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যান্ড)

জিম পার্কস (ইংল্যান্ড)

: জি আর ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লর্ডস, ১৯৫৬

: ওয়ালী গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লর্ডস ১৯৬১

: জে এম পার্কস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ক্রাইস্টচার্চ ১৯ [illegible]

এক ইনিংসে সর্বাধিক [illegible]স্যাল

৬টি (সবগুলিই ক্যাচ) : [illegible]লী গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে [illegible]ক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮

৬টি (সবগুলিই ক্যাচ) : জন টমাস মারে (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, লর্ডস ১৯৬৭

একটি খেলায় সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

৯টি (ক্যাচ ৮ ও স্ট্যাম্পিং ১) : গিল ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লর্ডস, ১৯৫৬

একটি সিরিজে সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

২৪টি (ক্যাচ ২২ ও স্টাম্পিং ২) : ডি এল মারে (ওয়েস্টইন্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬৩

একমাত্র নজির

১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট সিরিজে সিডনির দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে যে ৬৫৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) সংগ্রহ করেছিল তাতে ইংল্যান্ডের উইকেট-কিপার গডফ্রে ইভান্স একটিও 'বাই রান' দেন নি। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'বাইরান' শূন্য ৬০০ রানের ইনিংস আর নেই।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

২বার—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) : ১২৬ ও ১১০ রান (ত্রিনিদাদ) এবং ১৫৫ ও ১১০ রান (কিংস্টন), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

দ্রষ্টব্য : সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ক্লাইড ওয়ালকট ছাড়া অপর কোন

উইকেটকিপার এমন কি আর কোন খেলোয়াড়ই একটি সিরিজে দুবার একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করতে আজও সক্ষম হন নি। এখানে অবিশ্যি একটা কথা বলার আছে যে, ওয়ালকট যে সময় এই বিশ্ব-রেকর্ড করেন তখন তিনি একজন স্বীকৃত ব্যাটসম্যান হিসাবেই দলভুক্ত হয়েছিলেন এবং উক্ত টেস্ট সিরিজের কোন খেলাতেই উইকেটকিপিং করেন নি।

প্রথম নজির

নিয়মিত উইকেটকিপার হিসাবে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের একটি খেলার উভয় ইনিংসে সর্বপ্রথম অর্ধশত রান করেছিলেন ভারতবর্ষের উইকেট-কিপার দিলওয়ার হোসেন (৫৯ ও ৫৭ রান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৩৩-৩৪)

টেস্টে ভারতবর্ষের উইকেটকিপার

ভারতবর্ষের পক্ষে এ পর্যন্ত যে ১৫ জন নিয়মিত উইকেট-কিপার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন তাঁদের মধ্যে

ক্লাইড ওয়ালকট (ওঃ ইণ্ডিজ)

একমাত্র ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এক হাজার রান সংগ্রহের গৌরব লাভ করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বমোট তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে ঃ খেলা ৩০, মোট রান ১৬০৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মাদ্রাজ, ১৯৬৬-৬৭) সেঞ্চুরী ১, গড় ২৮-৬৯ এবং মোট ডিসমিস্যাল ৫৪টি (ক্যাচ ৪২ ও স্টাম্পিং ১২)।

ভারতীয় টেস্ট খেলায় উইকেটকিপিংয়ে ইঞ্জিনীয়ারের এই চারটি রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে ঃ সর্বাধিক টেস্ট খেলা (৩০টি), সর্বাধিক মোট রান (১৬০৭ রান), সর্বাধিক ডিসমিস্যাল (৫৪টি) এবং সর্বাধিক ক্যাচ (৪২টি)। টেস্টে ভারতীয় উইকেট-কিপারদের মধ্যে সর্বাধিক স্টাম্পিং করেছেন নরেন তামহানে (১৮টি) এবং এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান করেছেন বুধি কুন্দরন (১৯২ রান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৬৪)।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা

ফিলাডেলফিয়াতে আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল টেনিস প্লেয়ার্স ইনডোর ওপন টুর্ণামেন্টে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে ১০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, গত বছরের মত এ বছরের সিংগলস ফাইনালেও লেভার তাঁর স্বদেশবাসী টনি রোচকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস ঃ রড লেভার অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৭—৬ ও ৬—২ গেমে টনি রোচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩ এবং ৭—৬ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিংকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ নাস্তাসে এবং তিরিয়াক (রুমানিয়া) ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে আর্থার অ্যাস এবং ডেনিস রলস্টনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

াতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইনডোর ...ডিয়ামে আয়োজিত ৩৫তম জাতীয় ...ডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের ...পু ঘোষ পুরুষদের সিংগলস খেতাব ...য়েছেন। এই নিয়ে পাঁচবার ফাইনাল খেলে ... এই প্রথম সিংগলস খেতাব জয়। ...রের ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ...ওয়ে দলেরই সুরেশ গোয়েল, যাঁর কাছে ...গর তিনবারের ফাইনালে (১৯৬২, ৬৪ ও ১৯৬৭) তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। আর একবার ফাইনালে হেরেছিলেন নান্দু নাটেকারের কাছে ১৯৬৫ সালে।
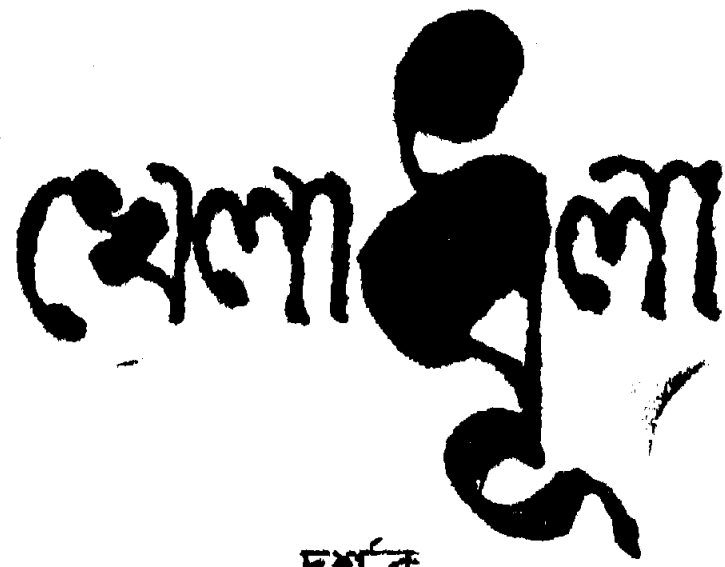
আলোচ্য প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলেছিলেন—মহিলাদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস। তিনি শেষ পর্যন্ত ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন।

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)

দুটি করে অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলেছিলেন রেলদলের দীপু ঘোষ (পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস), ইউ পি-র কুমারী দময়ন্তী সুবেদার (মহিলাদের সিংগলস ও ডাবলস), রেলদলের সুরেশ গোয়েল পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস), বালক বিভাগে দিল্লীর মলবিন্দর ধীলন (সিংগলস ও ডাবলস) এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্রের কুমারী মৌরীন ম্যাথিয়াজ (সিংগলস ও মহিলাদের ডাবলস)। এঁদের মধ্যে দুটি করে খেতাব পেয়েছেন দীপু ঘোষ, মলবিন্দর ধীলন এবং কুমারী মৌরীন ম্যাথিয়াজ। একটি খেতাব পেয়েছেন কুমারী দময়ন্তী সুবেদার। সুরেশ গোয়েল কোন খেতাব পান নি।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস ঃ দীপু ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫—৫ ও ১৫—৬ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েলকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ কুমারী দময়ন্তী সুবেদার (ইউ পি) ১১—৪ ও ১১—৮ পয়েন্টে কুমারী শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫—১২ ও ১৫—১১ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েল এবং সি ডি দেওরাসকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ কুমারী শোভা মূর্তি এবং মৌরিন ম্যাথিয়াজ (মহারাষ্ট্র) ১৫—৮, ১৬—১৭ ও ১৫—১১ পয়েন্টে কুমারী দময়ন্তী সুবেদার (ইউ পি) এবং জে সি ফিলিপসকে (কেরল) পরাজিত করেন।

মিকস্‌ড ডাবলস ঃ আসিফ পার্পিয়া এবং কুমারী রাফিয়া লতিফ (মহারাষ্ট্র) ১৫—৪ ও ১৫—৮ পয়েন্টে গৌতম ঠক্কর

এবং কুমারী শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

দ্বিতীয় বেসরকারী টেস্ট খেলা

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৬২২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রেমী পোলক ২৭৪, বেরী রিচার্ডস ১৪০ এবং টাইগার ল্যান্স ৬১ রান। গ্লিসন ৩টে উইকেট পান। ২টো করে উইকেট পান ফ্রিম্যান, কনোলী এবং স্ট্যাকপোল)

অস্ট্রেলিয়া : ১৫৭ রান (পল সিহান ৬২ রান। বার্লো ২৪ রানে ৩ এবং গডার্ড ১০ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৩৬ রান (ওয়ালটার্স ৭৪, রেডপাথ নটআউট ৭৪ এবং স্ট্যাকপোল ৭১ রান। বার্লো ৩ উইকেট পান)

ডারবানে আয়োজিত দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়ার বেসরকারী দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা এক ইনিংস এবং ১২৯ রানে জয়ী হয়ে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই দুই দেশের গত ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩—১ খেলায় (ড্র ১) অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রথম 'রাবার' জয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের পর বর্তমানে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজ খেলা হচ্ছে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজে রাবার পেলে তারা উপর্যুপরি দুবার 'রাবার' জয়ী হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক আলী বাচার টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৩৬৮ রান সংগ্রাম করে গ্রেমী পোলক ১৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় উইকেটের জুটি বেরী রিচার্ডস এবং গ্রেমী পোলক অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের পিটিয়ে বারম্বার বাউন্ডারীতে বল পাঠিয়ে ৬০ মিনিটের খেলায় ১০০ রান সংগ্রহ করেন। প্রতি ওভারে তাঁরা ৬ রান করেন। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় ১২৬ (২ উইকেটে)। এই সময় রিচার্ডস ৯৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। মাত্র ৬ রানের জন্যে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হন। রিচার্ডস শেষ পর্যন্ত ১৪০ রান করে আউট হন। টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁর এই রানে ছিল ২০টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী। খেলেছিলেন ১৮১ মিনিটে। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে রিচার্ডস এবং পোলক দলের অতি মূল্যবান ১০৩ রান সংগ্রহ করেন।
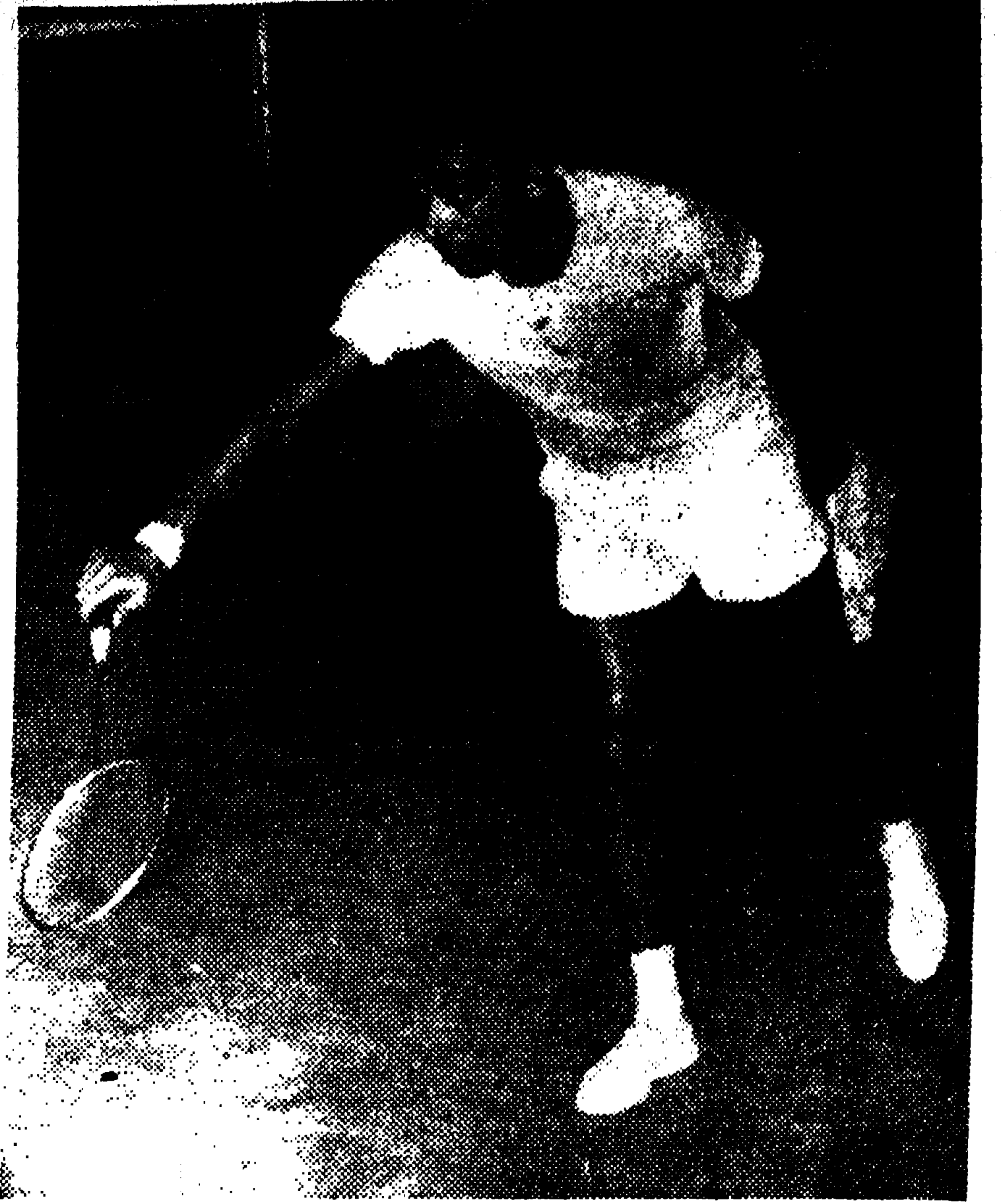
৩৫তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন দীপু ঘোষ (রেলওয়ে)

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ৬২২ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৬২২ রানই দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ৬২০ রান, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া জোহানেসবার্গ, ১৯৬৬-৬৭। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ৪৮৭ (৬ উইকেটে)। গ্রেমী পোলক ২৭৪ করে আউট হন। টেস্টে এক ইনিংসের খেলায় তাঁর এই সর্বোচ্চ রান। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে টেস্ট খেলায় গ্রেমী পোলক এবং ডাবলি নোর্স দুবার করে এক ইনিংসের খেলায় 'ডাবল সেঞ্চুরী' করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে কেপটাউনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে গ্রেমী পোলক ২০৯ রান করেছিলেন। আলোচ্য খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে গ্রেমী পোলক এবং টাইগার ল্যান্স ২০০ রান সংগ্রহ করেন— যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৮ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৪৬৫ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই সময় অস্ট্রেলিয়া ৩৬৫ রানের পিছনে পড়েছিল এবং হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে উপর্যুপরি পাঁচবার অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ২০০ রান পূর্ণ হল না। এই পাঁচটির প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার রান : ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ১৪৭, চতুর্থ টেস্টে ১৪৩, ৫ম টেস্টে ১৭৩, ১৯৭০ সালের প্রথম টেস্টে ১৬৪ এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১৫৭ রান। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে কি হাঁড়ির হাল আজ দাঁড়িয়েছে।

খেলার চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা এক ইনিংস ও ১২৯ রানে জয়ী হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 27th February 1970 শুক্রবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

আপনাদের পত্রিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পড়ছি। প্রতিটি কিস্তি পড়েই মনে হচ্ছে সত্যিকার ইতিহাসসন্ধানী পাঠকেরা এ শ্রেণীর রচনা পড়ে মর্মাহত না হয়ে পারেন না। অহীন্দ্রবাবুর লেখাটির সাহিত্যিক মানের বিষয় আমি অবশ্য কিছু বলছি না। কিন্তু অহীন্দ্রবাবু যে বাংলার একাধিক বরেণ্য পুরুষ সম্পর্কে কতকগুলি আপত্তিকর এবং অর্ধসত্য মন্তব্য করে যাচ্ছেন, সেখানেই আমার আপত্তি।

অন্য কথা বাদ দিয়ে মঞ্চের কথাই বলি। শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও তাঁর অবদান সম্পর্কে বহু অমূল্য তথ্য অহীন্দ্রবাবু পরিবেশন করতে পারতেন। কারণ বয়সের দিক থেকে তিনি আমাদের চেয়ে শিশিরকুমারের অনেক কাছের মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে সব না করে তিনি শিশিরকুমারের তথাকথিত দোষত্রুটিগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আমরা যারা এদেশে এবং য়ুরোপে মঞ্চাভিনয় দেখেছি, তারা বিনা দ্বিধায় শিশিরবাবুকে বিদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

শিশিরবাবুর আমেরিকা ভ্রমণ প্রসঙ্গ বহুজন বহুবার আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন, যে, সেযুগে 'কালো-আদমিদের' অপমান করাটাই ছিল পাশ্চাত্যের রীতি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমেরিকায় এক সময় যথেষ্ট অসম্মানজনক আচরণ করা হয়েছিল। স্বয়ং উদয়শঙ্করকেও য়ুরোপে কম অনাদর সইতে হয় নি। কিন্তু তার জন্য এঁরা কেউ ছোট হয়ে যাননি। ছোট হয়েছে তারা যারা অতিথিকে যোগ্য সমাদর করে নি। এসব কথা অহীন্দ্রবাবুরই বলা উচিত ছিল। কিন্তু তা না বলে তিনি শিশিরবাবুর একটুখানি প্রশংসা করে লিখলেন 'সংবাদপত্রে (আমেরিকার) শিশিরকুমার ও প্রভার কিছু কিছু সুখ্যাতি বেরিয়েছিল।' স্থানাভাবে অন্যান্য পত্রিকাগুলির সমালোচনার কথা উল্লেখ না করে কেবল নিউ ইয়র্ক সান-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। এঁদের নাট্যসমালোচক লিখেছিলেন—

> The Hindu players made a very good impression. Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe ....And the star, Mr. Bhaduri, who plays [illegible], is an emotional actor of considerable power.

এটা কি মামুলি প্রশংসার স্তরের সমালোচনা? অহীন্দ্রবাবু নিতান্ত যুবক নন। সুতরাং এসব কথা তাঁর অজানা নয় বলেই মনে হয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সেবা করতে গিয়ে এ বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করার সুযোগ আমার হয়েছে। তাই একটা প্রতিবাদ না করে পারলাম না। অনুগ্রহ করে এই পত্রটি প্রকাশ করে, অন্যত্র এ সম্পর্কে লেখালেখি করার অপ্রিয় কর্তব্যটি পালন করতে আমায় বাধ্য করবেন না।

দীপঙ্কর সেন
কলকাতা—২০

কারুশিল্প ও শিল্পীর ভবিষ্যৎ

হস্তশিল্প বিদেশে রপ্তানী করার ফলে আমাদের দেশ প্রতি বছর বেশ মোটা পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে। বিদেশী বিতাড়নের পর দেশে নানারকম উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। সে সময় হস্তশিল্পের বা কারুশিল্পের দিকে নজর দেওয়ার অবসর ছিল না। এ সব শিল্প উপেক্ষিত ছিল। পরে বিদেশীরা মুগ্ধ হয়ে এদেশ থেকে ঐ জাতীয় শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে থাকে। তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশীয় শিল্পরসিকদের চোখ খুলে দেয়। কিন্তু—এই হঠাৎ জেগে ওঠা শিল্পবোধ, শিল্প নিয়ে এমন ব্যবসা শুরু করে যা সত্যিই পরিতাপের। দরিদ্র শিল্পীদের কাছ থেকে কম দামে কিনে নিয়ে মধ্যবর্তী দালালেরা মোটা মুনাফা করতে থাকে। ফলে বিদেশে ভারতীয় কারুশিল্পের যে বাজার পাওয়া যাচ্ছিল, তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশেষে সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন।

সরকারী উদ্যোগে সর্বভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষদ গঠিত হয় ১৯৫২ খৃঃ। এই পর্ষদ হস্ত বা কারুশিল্পের উন্নয়নে এবং বাজার তৈরিতে একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে। ঐতিহ্যপূর্ণ মৃতপ্রায় কারুশিল্প একদিকে যেমন পুনর্জীবিত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি পেয়েছে উচ্চ প্রশংসা এবং বিরাট বাজার। বছরে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৬ কোটি টাকার মত জিনিস রপ্তানী হয়েছে বিদেশে ১৯৬৮—৬৯ খৃঃ মধ্যে। আশা করা হচ্ছে উৎপাদক, রপ্তানিকারক এবং রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় এই টাকার পরিমাণ একশ কোটির ওপর যাবে।

হস্তশিল্প পর্ষদের তিনটি কার্যক্রম সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্বাঞ্চলে কারুশিল্পের উন্নয়নের জন্য। ঐ তিনটি কার্যক্রম হোল :

মার্কেট মিট্ : স্কীমটি এ বছরই চালু হয়েছে। এর লক্ষ্য বিরাট। শিল্পী এবং উৎপাদকরা সুন্দর শিল্প নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হবেন ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের সামনে। এঁদের মধ্যে থাকবেন হস্তশিল্পের বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারকেরা। এঁরাই হলেন হস্তশিল্প প্রসারে প্রধান। এই ধরনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের মধ্যে বিক্রেতা এবং ক্রেতারা পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মুক্তভাবে আলোচনা করে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। এসব জায়গায় এসে রপ্তানিকারক এবং দোকানীরা নতুন নতুন ধরনের হস্তশিল্পের নিদর্শন দেখতে পান এবং পছন্দমত দেশের ভেতরে এবং বিদেশে রপ্তানি করতে পারেন।

মার্কেটিং ক্লিনিক : ক্লিনিক শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে একাফে (ECAFE)। ক্লিনিকের চিকিৎসাব্যবস্থার মত এর কাজ। কোন্ হস্তশিল্পটির কেন উন্নতি হচ্ছে না, অথবা প্রসার না ঘটবার কারণ কি, এসব অনুসন্ধানের দায়িত্ব মার্কেটিং ক্লিনিকের। বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রতিকারের উপায় দেখিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা উৎপাদন, ডিজাইন, দেশের ও বিদেশের বাজার এবং অর্থ প্রভৃতি সমস্যায় আলোকপাত করে। পূর্বাঞ্চলের শিল্পগুলির মধ্যে যেগুলির বিরাট বাজার রয়েছে, অথচ অবস্থা খুবই শোচনীয় পর্যায়ে, সেগুলি কলকাতার ক্লিনিকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে পড়েছে :

বিহার—মধুবানী পেইনটিঙ, কার্[illegible]
আসাম—বেলমেটাল
উড়িষ্যা—কাঠখোদাই শিল্প
ত্রিপুরা—বাঁশ শিল্প
মণিপুর—সূচীশিল্প
নেফা—কাঠখোদাই শিল্প, কার্পেট
পশ্চিমবঙ্গ—ব্লক মুদ্রণ, ঢোকরা ধাতুশিল্প, চামড়ার কাজ

আশা করা যায়, ক্লিনিকের আলোচনায় যারা অংশ নেবেন তাঁরা হস্তশিল্পের উন্নয়নে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

মার্কেটিং সেমিনার **:** ক্লিনিকে কয়েকটি বিশেষ শিল্পের নির্দিষ্ট অঞ্চলে উন্নয়নের অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়। ক্লিনিকের প্রস্তাব নিয়ে সেমিনারে আলোচনা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে শিল্পের প্রসার সম্পর্কে এঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন।

এই আলোচনায় পশ্চিমবংগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসাররা অংশ নেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং বিদেশে রপ্তানীকারকরাও অংশ নিয়েছিলেন।

এই যে বিরাট পরিকল্পনা, গবেষণা অনুসন্ধান, তার ফলে হস্তশিল্প বিকাশের

চিঠিপত্র

পথ কতখানি সুগম হবে? দেশের দরিদ্র শিল্পীরা দুবেলা দু মুঠো খাওয়ার চিন্তা ভুলে থেকে কি শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠবেন? সেটাই আগে চিন্তা করা দরকার। পর্ষদ সেদিকে নজর দিয়েছেন কিনা জানতে পারলে সুখী হবো। কারণ শিল্প নিয়ে কাজ করতে গেলে, শিল্পীকে ভুলে গেলে অন্যায় হবে।

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
বারাসাত। ২৪ পরগনা।

'ক্রন্দসী' কলকাতা

গত ২৫শে নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় আকাশবাণীর কলকাতা-ক কেন্দ্র থেকে প্রচারিত "কলকাতায় একদিন" শীর্ষক "বিচিত্রা"-য় কলকাতাকে ক্রন্দসী বলায় আমি ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের অমৃতের বেতার-শ্রুতি বিভাগে লিখেছিলাম : "... বাংলায় ক্রন্দসী শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত রোদসীর অনুসরণে—অর্থ, আকাশ। চলন্তিকায় ক্রন্দসী শব্দের অর্থ দেওয়া আছে—'আকাশ। আকাশ ও পৃথিবী'। ক্রন্দসী শব্দটি বেদেও আছে, কিন্তু সেখানে অর্থ—'চিৎকারকারী সেনাদ্বয়।' তাই কলকাতা ক্রন্দসী হবে কোন্ অর্থে?"

এর উত্তরে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অমৃতে "চিঠিপত্র" বিভাগে শ্রীসুশীলকুমার সেন (কলকাতা- ২৬) আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করে লিখেছেন : "...ক্রন্দসী শব্দের অর্থ 'চলন্তিকা' দেখেই তিনি ক্ষান্ত হয়ে সমালোচনা শুরু করেছেন। আশুতোষ দেবের 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' অথবা সুবল মিত্রের 'আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান' অথবা অনিলচন্দ্র ঘোষের 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' দেখলেই 'ক্রন্দসী'র অন্য অর্থ পাওয়া যেত। 'চলন্তিকা' বাংলার অতি ক্ষুদ্র অভিধান, তার উপর নির্ভর করে পরচ্ছিদ্রান্বেষণ সমর্থনযোগ্য নয়। নেতিমূলক সমালোচনা বেশী করলে বোধহয় ঐ রকম হয়। নজরুল ইসলামের কবিতায় 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে' ঐ রকম প্রয়োগ আছে। কাজেই 'ক্রন্দসী'র মানে খুঁজতে বেদের সাহায্য না নিয়ে বাংলা কবিতার অনুসন্ধান করলেই ভাল হত।"

চিঠিখানার জন্য শ্রীসেনকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তিনি হিসেবে একটু ভুল করেছেন—শুধু চলন্তিকা দেখেই আমি ক্ষান্ত হইনি। চলন্তিকার নাম করেছিলাম, কারণ এটি অনেকেরই হাতের কাছে থাকে, এবং যদি কারও ইচ্ছে হয় অর্থটা দেখে নিতে পারেন।

শ্রীসেন ক্রন্দসীর ভিন্ন অর্থের জন্য আশুতোষ দেব, সুবল মিত্র ও অনিলচন্দ্র ঘোষের অভিধান আর শব্দকোষের নাম করেছেন। কিন্তু তিনি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করতেন তাহলে দেখতেন সেখানে ক্রন্দসীর ভিন্ন অর্থ "রোরুদ্যমানা"-র পরে "কবিপ্র" লেখা আছে — অর্থাৎ "কবি প্রয়োগ"। এবং শ্রীসেনের নিশ্চয় জানা আছে, কবিদের একটু বেশী রকম স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে, এবং কবিপ্রয়োগ সর্বদা শুদ্ধ না হলেও তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধঘোষণা করি না। নজরুল ক্রন্দসীর যে অর্থ করেছেন তা যে অভ্রান্ত পণ্ডিতেরা এমন কথা বলেন না।

চলন্তিকার চেয়ে বড়ো যে অভিধান-গুলির নাম তিনি করেছেন সেগুলির চেয়েও বড়ো অভিধান আছে। এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধানে' ক্রন্দসীর রোরুদামানা অর্থ নেই, হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষে'-ও না। লিস্ট বাড়িয়ে লাভ নেই, শুধু এইটুকু বলি পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, ক্রন্দসীর রোরুদ্যমানা অর্থ মেনে নিতে তাঁরা রাজী নন।

ক্রন্দসীর 'ক্রন্দ' পর্যন্ত গিয়ে তাকে নারীর ক্রন্দনের সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়—যেমন জলপাইয়ের জল পর্যন্ত গিয়ে তাকে জলজ ফল বলা চলে না, অথবা আলুর সঙ্গে আলুবোখারার সম্পর্ক খোঁজা যায় না। বাংলায় কেউ কেউ তা গেছেন বলেই ক্রন্দসী রোরুদামানা হয়েছে। এবং কেউ কেউ সেই অর্থে প্রয়োগ করছেন। কাজী আব্দুল ওদুদও বাংলায় এই রকম প্রয়োগের কথা লিখেছেন।

—শ্রবণক

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আজ পর্যন্ত অমৃতে এ বিষয়ে যত-গুলি লেখা বেরিয়েছে তার মধ্যে আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে আশাপূর্ণা দেবী ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। এত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আজকের সমাজের আসল রূপটাকে আর কেউ তুলে ধরেছেন বলে আমার জানা নেই। দুজনেই আজকের সমাজকে যে বিশেষণে বিভূষিত করেছেন তার উপর আর কিছু বলার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষায় আজকের সমাজ হচ্ছে—'ধর্মহীন, মর্মহীন, নীতিহীন, প্রীতিহীন বিচারহীন, বিবেকহীন, সভ্যতাহীন, সততা-হীন,, লোভী স্বর্থপর আত্মকেন্দ্রিক উদ্ধত, অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী বেপরোয়া, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর।' আর আশুতোষ মুখো-পাধ্যায় এক কথায় বলেছেন—'...কি দেখছি আজকের এই সমাজের দিকে চেয়ে? একটা মৃত্যু দেখছি। সে মৃত্যু মহৎ নয়। বৃহৎ। এর পর আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর আসল বক্তব্য হচ্ছে—সমাজের এই বর্তমান রূপের জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা নিরপরাধ। কারণ এটাই সমাজের প্রকৃতি এবং মনুষ্য প্রকৃতির ধারা। তাই এই রূপটা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর অর্থটা ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার হল না। তার মানে কি—ধর্মহীন, সভ্যতা-হীন, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি হচ্ছে মনুষ্য সমাজের চিরন্তন রূপ? তাহলে 'আজকের সমাজে'র রূপ নয়? অর্থাৎ আজকের সমাজ বলতে কিছু নেই, আজ যা ঘটছে সবই প্রকৃতির নিয়মে ঘটছে। এরই নাম সমাজ। তাই কি? জানি না আমার বোঝার ভুল হল কি না।

কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে ঘটনাটির উল্লেখ করে যে প্রশ্ন তুলে মনকে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন, সেটাকেই বা কি করে অস্বীকার করব? সত্যই কি তবে আমরা সব অন্যায় অত্যাচারকে চোখ বুজে সহ্য করে যাব প্রকৃতির ধারার উপর দোহাই দিয়ে? তাঁর ভাষায়—'আজকের সর্বস্তরের নেতারা তাই করছেন। ফ্যাঙ্কেনস্টাইনকে জাগালে কি হয় সেদিক থেকে তাঁরা চোখ বুজে আছেন। আজকের হাস্যকর শাসনের ফাঁক দিয়ে তাই এখনো অবাধে মারামারি কাটাকাটি হানাহানির যজ্ঞ চলেছে।' তাই আশুতোষবাবু কোথাও বলেন নি যে এটা প্রকৃতির ধারা। তবে তিনি সাহিত্যিক, তাই স্বভাবতই আশাবাদী। তাই তিনি সমাজের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেও বিচলিত হননি। বরং মৃত্যুর ওই ভস্মস্তূপ থেকে তিনি নতুন প্রভাতের জন্মলগ্নের রঙিন ছবি দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা সাধারণ মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এসমাজকে গালি দিচ্ছি।

নজরুল হক্
মুলুক, বীরভূম।

'বিতর্কিত গোবিন্দরাম' প্রসঙ্গে

৪০ সংখ্যা অমৃত (১লা ফাল্গুন '৭৬) পত্রিকায় উক্ত আলোচনায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ দত্ত মহাশয় ইংরেজী VICTUALS শব্দের বাংলা উচ্চারণ 'ভিকচুয়ালস' লিখেছেন। নিশ্চিতই এটি মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়। উচ্চা-রণটি (৯৮ পৃষ্ঠা ১৮ ছত্রের ৪নং শব্দ) ভুল। ওটি হবে 'ভিট্‌ল্‌স্'।

চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলকাতা—৩২

শাদা চোখে

যতই দিন যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় ভারতের রাজনীতিও বিচিত্র আবর্তের মধ্যে পড়ে ঘুর-পাক খাচ্ছে। রাজনীতির পণ্ডিতরা যতই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, বিচার করলে দেখা যাবে আদর্শের প্রতি অনীহা আর সুবিধাবাদের প্রতি অবচেতন মনে যে প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে এই লেবেল-লাগানো রাজনীতির প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। যে কোন কুকর্মকে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক বলে ধরে নিয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে মদমত্ত হয়ে থাকার এক অভিনব কৌশল বর্তমানে সমস্ত দলগুলির মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। এই মন্তব্যে হয়ত অনেকে বিরক্ত হবেন। কিন্তু তাঁদের খুশি করবার জন্য সত্যকে গোপন করা উচিত হবে কি? কারণ রাজনীতিবিদরা; তথা তাঁদের পরিচালিত দলগুলিই তো জনতার ভাগ্যবিধাতা; কাজেই তাঁদের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয় বটে।

গুণী পাঠকরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, বর্তমানে ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার যে রাজনীতি চলেছে তা জনতাকে সঙ্গে নিয়ে আদর্শ-মাফিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ক্ষমতা-দখলের রাজনীতি নয়। সরকারী অনুগ্রহ বিতরণের মাধ্যমে গদীতে আঁকড়ে থাকার রাজনীতি। আর এই অনুগ্রহ বিতরণ করে দল ভাঙানো বা ডিফেকসানের রাজনীতি! আর এই অনুগ্রহ বিতরণ করে রাজনীতি! বর্তমানে এমন একটিও দল আছে কিনা বলা শক্ত, যার কর্মী ও নেতারা আদর্শের প্রতি নিগূঢ় আস্থা দেখিয়ে অভিষ্ট পথে চলার জন্য কোমরবেঁধে মৃত্যু-পণ করতে প্রস্তুত। একটি তথাকথিত প্রগতিশীল বিবৃতি দিয়ে যে কোন নেতা বা কর্মী এখন-তখন এদল-ওদল করতে পারেন। কে কখন কোন দলে যাবেন একথা এক মিনিট আগেও কারও বলা সম্ভব নয়। এমন কি যিনি এ খেলায় মাতেন তিনিও নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে হয়ত বলতে পারবেন না। যুগ-যুগ ধরে একই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে অসংখ্য কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে দুঃখ-কষ্টাবরণ করেও দেখবেন এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু নস্যাৎ করে দিয়ে অমনি বিবৃতি মারফৎ বেরিয়ে পড়লেন একজন দেশের কল্যাণে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামলব্ধ জ্ঞান মুহূর্তেই তিরোহিত হয়ে যায়, আর দল-ত্যাগী ব্যক্তি জনসমক্ষে হাজির হবার চেষ্টা করেন। অবশ্য শুধু দলত্যাগই ডিফেকশান নয়, আদর্শত্যাগও ডিফেকশান। তাই শুধু ব্যক্তিই ডিফেক্ট করছেন এমন নয়, দলও করছে। আর এর ফলেই রাজনীতিতে এসেছে অস্থিরতা। সন্দেহ ও সংশয় জমাট বেঁধে উঠেছে। একে অপরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন স্থিতিশীল সরকারের পতন ঘটা শক্ত হয়ে উঠছে।

এই অনিশ্চিত অবস্থাকে কেউ পুঁজিবাদের সংকট বলে অভিহিত করছেন। আবার কেউ বা বলছেন, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার ফলে এই অস্থিরতা এসেছে। আবার কেউ-কেউ শাসকগোষ্ঠী বা কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সার্বিক গণজাগরণ। অর্থাৎ বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে আগ্রহ আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে তার ফলেই শাসক দলের মধ্যে বিভাজন এসেছে। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল গোষ্ঠী তাই দেশের সমাজ-ব্যবস্থার নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন, শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি ইদানীং যাঁরা অকাতরে সমর্থন বিলিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ইন্দিরাজীকে নতুন সমাজতন্ত্রের দিশারী হিসাবে দেখলেও স্বয়ং ইন্দিরাজী বলছেন তিনি কংগ্রেসের পুরোনো কার্যক্রম ও প্রতিশ্রুতিই বাস্তবে রূপায়ণ করছেন মাত্র। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, কংগ্রেস জন্ম থেকেই সমাজবাদী। অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধীকে যাঁরা একজন নয়া-সমাজবাদী হিসাবে অখ্যাত করে তাঁকে কংগ্রেসের ট্রাডিশান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন এবং নয়া-আঁতাতের ক্ষেত্রকে মজবুত করে এক অভিনব রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করছেন, ইন্দিরাজী নিজেই তার ওপর যবনিকাপাত করতে আগ্রহী। ইন্দিরাজীর এ বক্তব্যে রুষ্ট হয়েই বোধ হয় তাঁর অন্যতম প্রধান সমর্থক শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন বলেছেন : ইন্দিরা কংগ্রেস নয়া আধারে পুরোনো মদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার পশ্চিম বংলার যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি বলেছেন, কংগ্রেস কংগ্রেসই আছে। শুধুমাত্র দু দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করছেন মাত্র। এ যুধ্যমান দলগুলি যাতে ফ্রন্টের বিষয়ে মাথা না গলান সেজন্য শ্রীমুখার্জি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। শ্রীমুখার্জির বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে-কোন কারণেই হোক তিনিও কংগ্রেসকে বা নব-কংগ্রেসকে কোন সার্টি-ফিকেট দিতে রাজী নন।

আর যাঁরা পুঁজিবাদের সংকট দেখা দিয়েছে বলে গভীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে ডিফেকশানের রাজনীতিকে কবুল করে নিচ্ছেন তাঁরাও ভুল করছেন। সত্যিই পুঁজিবাদ যদি সংকটে পড়েছে বলে তাঁরা মনে করেন, তবে সে অবস্থায় সংগ্রামকে তথা শ্রেণীসংগ্রামকে আরও তীব্রতর করার প্রশ্নই ওঠে। কিন্তু সেই কঠিন শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ কি কেউ দেখতে পাচ্ছেন? শ্রেণীসংগ্রামের নামে মজুর কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায় করলে সেটা কি বিপ্লবীদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম বলা যেতে পারে? আর সেই সংগ্রামের রূপরেখা দেখে কি মনে হয় না, ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অতন্দ্র প্রহরী পুলিশ ও বুরোক্র্যাট শাসনযন্ত্র এই আন্দোলনকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে? আসল কথা হচ্ছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য একটি তাত্ত্বিক ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে মাত্র। আরও যদি বিশ্লেষণ করা হয় দেখা যাবে, এঁদের বক্তব্য হচ্ছে কংগ্রেস ভাঙছে কারণ পুঁজিবাদের সঙ্কট; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই অপসৃয়মাণ পুঁজিবাদকে বাঁচাবার জন্যই কি এঁরা ইন্দিরাজীকে সমর্থন করছেন? আর ইন্দিরাজী যদি পুঁজিবাদের শেষ স্তম্ভ না হয়ে থাকেন তবে কি তিনি সমাজতন্ত্রী? কম্যুনিস্টরা দেখা যাচ্ছে তাঁকে সমাজতন্ত্রী ধরে নিয়েই কোয়ালিশন সরকার গঠনে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু ধোঁকা লাগে তখনই যখন বাম কম্যুনিস্টরাও চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখান। মনে হয় যেন কেরালার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কখনও তাঁরা রক্তচক্ষু ধারণ করেন, আবার পশ্চিমবঙ্গে গদীতে থাকার জন্য ভাবাবেশে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে ইন্দিরজী কখনও প্রগতিশীল আবার কখনও প্রতিক্রিয়াশীল। অর্থাৎ কেরালার ব্যাপারে ইন্দিরাজী প্রতি-ক্রিয়াশীল, এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে এখনও প্রগতিশীল। বিহারে ইন্দিরাজীর কি রূপ, অবশ্য সে সম্পর্কে বাম কম্যু-নিস্টরা কোন মন্তব্য এখনও করেন নি। পশ্চিম বাংলায় মিনিফ্রন্ট হলেই ইন্দিরাজী নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীল হবেন। এবং তখনই বাম কম্যুনিস্টরা নিশ্চয় তাঁকে [illegible] করবার কথাও বলবেন না। অব[illegible] [illegible]দের যুক্তি অনুসারে উচিতও নয়। কেননা যে বাম কম্যুনিস্টরা নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে বলে তাঁরা দাবী করছেন সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তম্ভকে যদি কেউ ধূলিসাৎ করে দেন তাতে কি তাঁকে আর প্রগতিশীল বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

ইদানীং আর একটি পুরোনো থিয়োরী নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে চালানো হয়েছে। সেটা হচ্ছে, ইন্দিরাজীকে যাঁরা সমর্থন করবেন না তাঁরা প্রতিক্রিয়া-শীল। আর এই প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছেন—স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও সিণ্ডিকেট। সিণ্ডিকেট নব-কংগ্রেসের মতই রাজনীতির নয়া-অংশীদার। কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহারে যখন জনসঙ্ঘ কোয়া-লিশান করেছিল, কিম্বা উত্তরপ্রদেশে, তখন তাঁরা প্রগতিবাদী ছিলেন। আর সেই সংযুক্ত বিধায়ক দলগুলির একটি কর্মসূচীও ছিল। এখন জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্র ইন্দিরাজীর সমর্থন করছেন না বলে তাঁরা প্রতিক্রিয়া-

শীল। মুসলিম লীগ প্রগ্রেসিভ, অকালীও প্রগ্রেসিভ। স্বতন্ত্র মুসলিম জেলা মালাপুরম সৃষ্টি করেছিলেন স্বয়ং শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ। কেননা তাঁদের প্রগতিশীলতার একটা স্বীকৃতি দিতে হবে ত! কিন্তু যে মুহূর্তে মুশলিম লীগ নাম্বুদ্রি সরকারের বিরুদ্ধে গেল, তখনই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল। বি কে ডি যখন ইন্দিরাজীর প্রতি সমর্থন জানাবেন, কি জানাবেন না, এমন এক দোদুলামান অবস্থায় ছিলেন তখন দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা তাঁদের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন। যে মুহূর্তে তাঁরা ইন্দিরাজীর ক্যাম্পে গেলেন তখনই প্রগতিবাদী হয়ে গেলেন। যে পি এস পি'কে সি আই এ'র এজেন্ট না বলে অনেকে জলগ্রহণ করতেন না সে পি এস পি এখন নিশ্চয়ই প্রগতিবাদী হয়ে গেছেন! অতএব, ভারতবর্ষে কে প্রগতিবাদী হবেন বা না হবেন তা নির্ভর করবে ইন্দিরজীর উপর সমর্থনের প্রশ্নে। আর তা ঠিক করবেন দুই কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু অচিরেই দেখবেন বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের বক্তব্য পাল্টিয়ে ইন্দিরাজীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রচার অভিযানে নেমে পড়বেন। এবং তাঁরা বলবেন, ইন্দিরাজীকে সমর্থন করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদকে শক্ত ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করানো।

সকলেই জানেন মিনিফ্রন্ট করা বর্তমান অবস্থায় আদৌ সম্ভব নয় যদি ইন্দিরজীর শুভেচ্ছা না থাকে। সে সম্ভব্য মুহূর্ত যখন দেখা দেবে তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি বিবৃতি দিয়ে তাঁর তেরজন সমর্থককে নিয়ে কলকাতার রাজপথে মিনিফ্রন্ট বিরোধী শ্লোগান দিতে-দিতে জঙ্গী মিছিল নিয়ে বের হন তখন বলুন ত শ্রীঘোষ প্রগতিশীল হবেন কি হবেন না? শ্রীঘোষকে অনেক বামপন্থী অভিনন্দিত করবেন কি করবেন না? অথচ অতুল্যবাবুরা যদি তা করেন তবে তাঁরা নিশ্চয়ই আদর্শগত ডিফেকশান করবেন। কিন্তু এই ডিফেকশানকে তখন সকলেই রজনৈতিক ভাষ্যে শ্রীমণ্ডিত করে 'কৌশল' নামে বিভূষিত করে ফেলবেন। আর এই কৌশলের জন্যই তখন চলবে ভিন্ন আদর্শ মতাবলম্বী সুবিধাবাদী কোয়ালিশান। এধরনের ভারতরঙ্গ বোধ করি কারোরই আর রোধ করবার ক্ষমতা নেই।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সমস্যা অপাতত মিটল। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা। কখনও মনে হচ্ছে রোগী বুঝি এই বেঁচে উঠল, আবার কখনও মনে হচ্ছে এই বুঝি গেল। আসলে সত্যিই সে ধুঁকছে। মাঝে-মাঝে শান্তি প্রচেষ্টা ও নেতাদের ভাষণ দেখলে মনে হয়, এবারকার মতো বুঝি মেঘ কেটে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নতুন সমস্যা আবার তার কালোছায়া বিস্তার করতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এখন যুক্তফ্রন্টের জয়গানে মুখরিত তাঁর নির্বাচনী সভাগুলিতে। কিন্তু মহাকরণে এসেই আবার তিনি বলবেন,—'আর পারছি না'। এ এমন এক অবস্থা যা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মন কি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করাও যায় না।

যখন একটা সমঝোতার ভাব দেখা যাচ্ছিল, অমনি রটে গেল মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন একাউন্টস্ বাজেট পাশ করাবেন। যাতে বাজেট নিয়ে আলোচনার অছিলায় যুক্তফ্রন্টকে দীর্ঘজীবন না রাখা যায়। চারিদিকে তখুনি সাজ-সাজ রব। মন্ত্রীরা সকলেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে হাজির। যদি ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ও হরি, মন্ত্রিসভায় সে প্রশ্ন আদৌ উঠলই না। এমন কি কোন মন্ত্রী সে খবরের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য প্রশ্নও তুললেন না। সমস্ত কিছুই বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। কিন্তু পরে অনেকে বলেছেন, না মশায়, এর নেপথ্য কাহিনী আছে। মুখ্যমন্ত্রী সব ঠিকই করে ফেলেছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক তীব্র বাধা দেওয়াতে আর সাহস করলেন না। কথাটা ঠিক বলেই মনে হবে। কারণ, ফরোয়ার্ড ব্লক সমমতাবলম্বী সহযোগীদের ছেড়ে ত আর বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতে পারে না। কারণ মার্কসবাদ আর সুভাষবাদে মিল আছে তো! অতএব, মার্কসবাদীদের ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা সমর্থন জানাতে পারেন না। বেচারী মুখ্যমন্ত্রী আর কি করেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণ ছাড়া উপায় ছিল না। আবার এস ইউ সি'ও নাকি প্রবল বাধা দিয়েছে। আর দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা ত রাজীই হতে পারেন নি। কারণ তাঁরা ফ্রন্ট ভাঙেন কি করে? ফ্রন্ট বাঁচাবার জন্য লাঠিসোটা নিয়ে তাঁরা নিত্তনৈমিত্তিক রাস্তায় মহড়া দিচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে বোকা বনে গেছেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা। তাঁদের মন্ত্রীরা সকলেই কোমর বেঁধে সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখেন, সব ভোঁ-ভাঁ। কোন কথাই নেই। কেউ যাতে ফ্রন্ট না ভাঙতে পারে তার জন্য যে তাঁরাও প্রস্তুত ছিলেন। দেখুন ত, ফ্রন্টের ১৪টি দলই কি সুন্দর চোর-চোর খেলায় মেতেছেন। আর খেলার পরই সধূম চায়ের কাপে মুখ দিয়ে একটু-আধটু খোস গল্প যে না করছেন এমনও নয়। নয়তো হাসিমুখে ক্যামেরায় ধরা পড়ছেন কি করে!

ভোট অন একাউন্টের বাজার গরম করা খবরের রেশ শেষ হতে না হতেই আবার জোর খবর। বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রীর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। পদত্যাগের পত্র দিয়েই সোজা তাঁরা সরকারী গাড়ী করে হাজির হলেন দলীয় সভায়। সিদ্ধান্ত হল, কাজটা ঠিকই হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। মন্ত্রীদের পদত্যাগের একমাত্র কারণ 'সি পি এমের সঙ্গে আর ঘর করা যায় না।' এতদিন বক্তৃতা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে। পদত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হোল। অবশ্য এর পরও প্রতিশ্রুতির পালা আছে। যদি প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তবে আবার প্রত্যাহারও হতে পারে।

কিন্তু পদত্যাগ ব্যাপারটা অত্যন্ত হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত কি? কেননা নৈতিক জ্ঞান থাকলে পদত্যাগের পরেই সব ইতি করে দেওয়া উচিত। সমদর্শীর তো মনে হয় শেষই হবে এবার। বাংলা কংগ্রেসের সহযোগীদের উপর প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টি করার জন্যই শুধু শ্রীসুশীল ধাড়া ও তাঁর সহকর্মীরা পদত্যাগ করলেন একথা ধরে নিলে ভুল হতে পারে। অবস্থা দেখে মনে হয়, বাংলা কংগ্রেস একাই দুর্গমের পথে পাড়ি জমাবে। মনে হচ্ছে যেন পশ্চিম বাংলার রাজনীতি আর একটি ঐতিহাসিক মোড় নিতে যাচ্ছে।

কিন্তু পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ-উপরোধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সে চেষ্টা ইন্দিরাজীকে নাজেহাল করার জন্য নয়, পশ্চিম বাংলার ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার জন্য। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর সোজা অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা রাজ্যের জন্য আদায় করা। প্রশ্ন এই যে, যদি ইন্দিরাজী তাতে রাজী না হন তবে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট কি তাঁকে গদীচ্যুত করবার জন্য অগ্রণী হবেন? ১৪টা শরিক দলের মধ্যে একমাত্র এস এস পি'ই বলছেন ইন্দিরা সরকার—কংগ্রেসেরই উত্তরসূরী মাত্র। অতএব, ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানোই হবে সমাজবাদের দিকে আর এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু আর অন্য শরিকরা ইতিমধ্যেই বলেছেন ইন্দিরাজীকে বিব্রত করা চলতেই পারে না। কারণ তাহলে প্রগতিবাদী শিবির মার খেয়ে যাবে, আর প্রতিক্রিয়াশীলরা গদীতে এসে যাবে। কি করে আসবে সেটা অবশ্য কেউ বলছেন না। সে কি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে না সশস্ত্র পন্থায় আসবে—একথাও বলতে কেউ রাজী নন। যদি নির্বাচনের মাধ্যমে আসার আশঙ্কা থাকে তবে ১৯৭২ সালে কি করে ঠেকাবেন? যদি ইন্দিরাজীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করে প্রতিক্রিয়াশীলদের দূরে রাখবেন বলে তাঁরা মনে করেন তবে ত ইন্দিরাজীই আবার ক্ষমতায় থেকে যাবেন। আর এঁরা বুঝি ঢাকের কাঠি হয়ে নিরালম্ব রাজনৈতিক জীবন যাপন করে যাবেন? আর যদি মনে করেন, মিতালি করতে করতে অনুপ্রবেশ করে সমস্ত কিছু বানচাল করে দেবেন তবে সে গুড়ে বালি। কারণ, ইন্দিরাজীর শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁরা এদের চেয়ে কম ধুরন্ধর নন। মন্ত্রী নির্বাচন, কমিটি গঠন ইত্যাদি লক্ষ্য করুন। সমদর্শীর বক্তব্যের উত্তর যথাযথ খুঁজে পাবেন, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। আর যদি মনে করেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা সশস্ত্র প্রতিবিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করতে পারে, তবে এখনও তো তা করতে পারে। তখনও পারবে। কারণ, পৃথিবীর দুরন্ত বলতে এখন আর কিছু নেই। কাজেই লেবেল লাগানো রাজনীতি করে গদীর লোভে বসে থাকলে কোনও লাভ হবে কি? তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়ে কৌশলের পথ অবলম্বন করা হয়েছে বলে জনতাকে ধোঁকা দেওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাস চোখ বুজে থাকে না।

সেইজন্য বলছি, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কথা বলে যুক্তফ্রন্টকে যুক্ত রাখা যাবে না। কাশীপুরে, দুর্গাপুরে

গুলি চালাবার পর কথাটা সোচ্চার হয়েছিল বটে কিন্তু তারপর পশ্চিমবঙ্গবাসী একথা ভুলে গেছে। কারণ, তাদের ভুলতে শরিকেরাই সাহায্য করেছেন। এখন আবার নতুন করে একথা বলে লাভ নেই। লড়াই তারা করতে পারেন না। একমুখে জয়গান আবার অন্যমুখে লড়তে হবে বলাটা বড়ই দৃষ্টিকটু এবং অত্যন্ত গোলমেলে কৌশল বলে মনে হবে। আজ জনতা তা অনায়াসেই ধরে ফেলবে।

সহৃদয় পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ইন্দিরাজীর পক্ষে লোকসভায় ২২২ জন সদস্য আছেন। তদুপরি পশ্চিম বাংলার দলগুলির সমর্থন ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশের সমর্থনে ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট সদস্যদের জোরে তিনি সরকার চালাতে পারেন। কিন্তু তবুও ভয়, যদি ইন্দিরাজী হেরে যান। ইন্দিরাজী হেরে গেলেই সব সদস্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাবে এ ধারণা করার কারণ কি? অতএব, ইন্দিরাজীকেও বাঁচাব আবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও লড়ব, এ কেমন রাজনীতি? বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা করা যায় কি?

তাই বলছিলাম ওসব কৌশল করে ফ্রন্ট বাঁচবে না। যুক্তফ্রন্ট ৩২ দফা কার্যকর করবে, আর কেন্দ্রীয় সরকার শুধু টাকা সরবরাহ করে যাবেন এরকম ঘটনাও অনির্দিষ্টকাল চলবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্টের রূপরেখা ঠিক হয়নি বলেই এখনও কত অর্থ পাওয়া যাবে তার হিসাব আসে নি। অথচ দেখুন, মাদ্রাজের ডি এম কে প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত অর্থ পাচ্ছে। কারণ হচ্ছে, তাদের কেন্দ্রের প্রতি অচলা ভক্তি।

কাজেই মনে হচ্ছে কোন বিশল্যকরণীই এই শক্তিশেলের আঘাত থেকে যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাতে পারবে না। শুধু বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেলেই যে ফ্রন্ট বাঁচবে এমন আশা ফ্রন্টের অতীব প্রিয় সুহৃদও করবে না। কেননা, যে ফরওয়ার্ড ব্লকের চাপের ফলে নাকি মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন একাউন্টসের প্রশ্নটি তুলতে পর্যন্ত সাহস পান নি সেই দলের নেতাই ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেছেন, যদি সি পি এম তার দুষ্কার্যের জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ক্ষমা না চান তবে বাংলা দেশে আগুন জ্বলবে। সি পি এম ক্ষমা চায় নি। আগুন জ্বলা না জ্বলা অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু এটাই যদি ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্তরের কথা হয় তবে সি পি এমকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে ঐ দল কোনক্রমেই মন্ত্রিত্ব করতে পাবে না। আর যদি গোপন আঁতাতকে বুঝতে না দেওয়ার জন্য একথা বলা হয় তবুও ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রিসভায় থাকতে পারবে না। কারণ নেতারাই ত দল নয়। কর্মীরাই আসল। মার্কসবাদের সূত্রে আত্মীয়তা হলেও রেজনেভবাদ ও মাওবাদের সূত্রে অনেক জেনারেশান পার্থক্য হয়ে গেছে। সেখানে সুভাষবাদ প্রবল হয়ে যাবে। অতএব, মিলন ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সি পি আই যতই লাঠিসোটা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে দেবে না বলে চীৎকার করুক না কেন কেরালায় নিজ নেতৃত্বে সি পি এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করেছেন। বিহারে তারা একজন হোক বা দুজন হোক, সি পি এম-এর সঙ্গে আলোচনা না করেই ইন্দিরাজীর কংগ্রেসকে গদীতে বসাবার জন্য আগেভাগেই বিবৃতি দিয়েছেন। এবং পরে সমর্থন করেছেন। শুধুমাত্র সরকারে যেতে বাকী। উত্তরপ্রদেশেও তারা একই পন্থা অনুসরণ করেছে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মেই উত্তরপ্রদেশের মতই যদি কোন সরকার গঠিত হয় তবে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা সমর্থন করবেন না একথা কি করে বলা যায়- অতএব বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পর পশ্চিম বাংলার পালা। সব যোগাযোগও সব মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

রাজ্য বিধানসভায় শুক্রবার ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে, ভোট অন অ্যাকাউন্ট নয়, পূর্ণাঙ্গ বাজেটই। এদিকে বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবু ছাড়া অপর তিনজন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সকাশে তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। আসামের কংগ্রেস পরিষদীয় দল মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও বিজয় ভগবতীর নেতৃপদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আসন্ন সংকট থেকে মুক্ত হয়েছে, কারণ চালিহাই শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থেকে যাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এযাবৎ মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল তার অবসান হয়েছে এবং উভয় রাজ্যেই শাসক কংগ্রেসের অনুবর্তী দল অন্যান্য দলের সমবায়ে মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হয়েছেন। এদিকে, গত শুক্রবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশনও শুরু হয়েছে যা ব্যাঙ্কিং অর্ডিন্যান্স, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নতুন মন্ত্রিসভা, চণ্ডীগড় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, রাজন্যভাতা বিলোপ বিল, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি বহু-বিতর্কিত বিষয়ের সম্ভাবিত উত্থাপনে বাদবিতণ্ডার প্রবল ঝড় তুলবে বলে আশঙ্কা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় বাজেট উত্থাপিত হবে মাসের শেষ দিনে—২৮শে ফেব্রুয়ারী।

রাজ্য বাজেট

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পুরো বছরের বাজেট না এনে পাঁচ মাসের ভোট অন অ্যাকাউন্ট উপস্থাপিত করবেন বলে যে একটা কথা রটেছিল, সেটা শেষপর্যন্ত সত্যি হয়নি, পুরো বাজেটই পেশ করা হয়েছে। বাজেটে নতুন কোন কর নেই, ঘাটতি অনুমান করা হয়েছে মোট ৪০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এর ভেতর রাজস্ব খাতের ঘাটতি ৬,১০,৭৩,০০০ টাকা ও রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে ৯,৩৯,৮৮,০০০ টাকা। এর সঙ্গে বৎসরান্তিক প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতি ২২,০৬,২৯,০০০ টাকা মিলিয়ে মোট ঘাটতি ওপরের অঙ্কে পেঁছোয়।

বাজেট ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবসায়গুলোর যে অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। চলতি বছরের সংশোধিত হিসেবে দেখনো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি শিল্পে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। আগামী বছরে এই লোকসান আরো বেড়ে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। এর ভেতর বৃহত্তর কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পেই লোকসান সর্বাধিক—১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এর পরই লোকসান দিয়েছে দুর্গাপুরের স্টেট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, যার পরিমাণ ৩২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। অন্য যেসব সংস্থা লোকসানের অঙ্ক বাড়িয়েছে, তা হচ্ছে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী, যন্ত্রচালিত ইঁট কারখানা, দারু-শিল্প কেন্দ্র, হাওড়ার কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য পরিবেশিত মৃত্তিকা সরবরাহ সংস্থা, বোনচায়না ও মৃৎপাত্র নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্প, শিলিগুড়ির সরকারী করাত কল, কল্যাণীর শিল্পসংস্থা, কলকাতার টুরিস্ট লজ, পঃ বঃ ইঁট ও টালি বোর্ড, সরকারী বিপণন কেন্দ্র, সিসাল চাষ প্রকল্প ও বারুইপুরের সরকারী শিল্পনগরী।

আগামী বাজেটে নতুন কোন কর প্রস্তাব না থাকলেও চলতি বছরের (১৯৬৯-৭০) জন্য যেসব অতিরিক্ত কর-ব্যবস্থা ধার্য হয়েছিল, সে বাবদ আগামী বছরে ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। সমগ্র চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে রাজ্য সরকার এইভাবে মোট ৮০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায়ের সংকল্প রাখেন, যদিও তিন-একর পর্যন্ত জমির খাজনা

ুবের ফলে মোট আয়-এর থেকে ১০ াটি টাকা কমে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পঞ্চম অর্থ িমশনের সুপারিশে অসন্তোষ প্রকাশ রেছেন এবং স্থায়ী অর্থ কমিশন য়োগের দাবী জানিয়েছেন। কেন্দ্রের কাছ কে যাতে আরো অধিক অর্থ রাজ্যের য়ন বাবদ আদায় হয়, তজ্জন্য তিনি ংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবও তুলেছেন।

িতন মন্ত্রীর পদত্যাগ

বাংলা কংগ্রেসের তিন মন্ত্রী—সুশীল ড়া, চারুমিহির সরকার ও ভবতোষ ারেন তাঁদের দলের কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত নুসরণে ১৯শে ফেব্রুয়ারী মুখ্য- ন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল রেছেন সি পি এম-এর জনস্বার্থবিরোধী ার্যকলাপের প্রতিবাদে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, পদত্যাগের অর্থ এই য় যে, বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে রিয়ে যাচ্ছে। পদত্যাগপত্রগুলো ফ্রন্ট বা ন্ত্রসভার বৈঠকেও উত্থাপিত হচ্ছে না, ুখ্যমন্ত্রী স্বয়ংই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত েবেন। পদত্যাগী মন্ত্রীরা তাঁদের পত্রে লছেন যে, সি পি এম-এর দলীয় ার্থান্বেষী ভাবগতি ও মাতব্বরীর ফলে ্রন্টের মধ্যে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি য়েছে এবং অন্যান্য দলের স্বার্থ ও ্ক্যার সঙ্গেও এর সংঘাত দেখা দিয়েছে। ্রণতিতে জনগণের স্বার্থও পদদলিত ্ছে। এমনকি ফ্রন্টের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা য় মুখার্জিও অবমাননা ও নিপীড়ন ্কে রেহাই পাননি। এই শোচনীয় ্কের অসহায় দর্শক হয়ে থাকতে তাঁরা র রাজী নন।

াালিহাই রয়ে গেলেন

চালিহার উত্তরাধিকারী সন্ধানের সমস্যা া জটিল হয়ে উঠেছিল যে, শেষপর্যন্ত ্ক কংগ্রেস দল চালিহাকেই মুখ্যমন্ত্রীর ্ থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানান ং তিনিও রাজী হয়েছেন। এখানে অবশ্য ্থ করা যেতে পারে যে, পূর্বের ্নায় চালিহার স্বাস্থ্যের বর্তমানে অনেক ্তি হয়েছে। অবশ্য তেজপুর উপ- ্াচনে ভগবতী যদি জয়ী হন, তাহলে -মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মহেন্দ্রমোহন ্ুরীর সঙ্গে কোনো সংঘাত দেখা দেবে া তা এখনই বলা যায় না। ভগবতীর ্াভের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল হলেও ্মান মন্ত্রিসভায় কোনোপ্রকার সম্ভাব্য ্দলে বাধাদানের জন্য তাঁর প্রতিপক্ষ ্ পরাজয়ের জন্য বিশেষ সক্রিয় রয়েছেন। ্ণ, ভগবতী নির্বাচিত হলেই তাঁর ্করা সম্ভবতঃ নূতন করে উপ- ্যমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য দাবী তুলবেন ্ সেই সঙ্গে মন্ত্রিসভায়ও কিছু রদ- ্লের দাবী উঠতে পারে।

বিহার উত্তরপ্রদেশ

বিহার ও উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে এযাবৎ যে টানাহ্যাঁচড়া চলছিল তাতে শেষপর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীই জয়ী হয়েছেন। বিহারে দীর্ঘ আটমাসব্যাপী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটেছে এবং রাজ্যের শাসক পারিষদীয় কংগ্রেস দলের নেতা দারোগাপ্রসাদ রাইয়ের নেতৃত্বে এক নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছেন। নতুন কোয়ালিশনে আছে ছ'টি দল—শাসক কংগ্রেস, পি এস পি, কম্যুনিস্ট পার্টি, বি কে ডি, ঝাড়খণ্ড ও শোষিত দল। বর্তমানে মোট তিনজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছেন, পরে অন্যান্য দল থেকেও সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়ানো হবে। পি এস পি ও কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে এখনও কেউ মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন না, তবে তাঁরা রাই-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

এর পরের দিনই—১৮ই ফেব্রুয়ারী বি কে ডি-র সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান চরণ সিং-এর নেতৃত্বে ও শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে উত্তরপ্রদেশে দশজন সদস্যের এক মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে যাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন, তাঁরা সকলেই বি কে ডি-র, কারণ শাসক কংগ্রেসের কেউ এখনই মন্ত্রীপদ নিচ্ছেন না। উভয় দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লে তাঁরা সম্ভবতঃ মন্ত্রীপদ নেবেন। বর্তমানে এই দলে শাসক কংগ্রেসের ১৩২ জন ও বি কে ডি-র ৯৬ জন সদস্য আছেন। উত্তরপ্রদেশে বি কে ডি-র সমবায়ে মন্ত্রি- সভা গঠন শাসক কংগ্রেসের একটা বিরাট জয়। সি বি গুপ্তের নাটকীয় পদত্যাগের পর বিরোধী কংগ্রেস, জনসংঘ, এস এস পি ও স্বতন্ত্র দল মন্ত্রিসভা গঠনে চরণ সিং-কে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা একপ্রকার বিলীন হয়ে গেছলো। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্য- মন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রই নাকি শেষ চালে বাজিমাৎ করে দেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শাসক কংগ্রেস ও বি কে ডি-র মধ্যে চুক্তি সম্ভব করে তোলেন।

দিল্লীতে এক সপ্তাহে

এদিকে দিল্লীতে গত এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় ব্যাপার ঘটে গেছে। সুপ্রীম কোর্ট ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করার পর ১৪ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকার ১৪টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণে নতুন এক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন, যাতে কোর্ট উল্লিখিত আইনের ত্রুটিগুলো দূর করা হয়েছে। নতুন আইনে ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষতিপূরণের হার বেড়েছে, তাদের মোট পাওনা হবে ৮৭ কোটি টাকা যা তারা নগদে বা সিকিউ- রিটিতে নিতে পারবে। শেয়ার-হোল্ডারদের ওপর পূর্বতন আইনে ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরি- চালনে যে বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল তা নতুন অর্ডিন্যান্সে বাদ পড়েছে।

এর তিনদিন পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রি- সভায় বিরোধী কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীদের শূন্য দুটি আসন পূর্ণ করা হয় গুলজারী- লাল নন্দ ও সঞ্জীবায়াকে নতুন মন্ত্রীপদে নিয়োগ করে। নন্দ রেলওয়ে ও সঞ্জীবায়া শ্রম-দপ্তরের ভার পেয়েছেন। ওয়াকেবহাল মহল বলছেন যে, উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস দলের নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠীকে এবং মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এক- জন করে সদস্য এর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রি- সভায় নেওয়া হবে।

পরদিন—১৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পে লাইসেন্স দানের পুরাতন নীতিও রদবদলের ঘোষণা করেন যার ফলে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধনের কারখানা- গুলোর আর লাইসেন্স লাগবে না। যেসব কারখানার মূলধন ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে, সেগুলোকেও কয়েকটি সর্তে লাইসেন্সমুক্ত করা হয়েছে, তবে এই মূল- ধনে নতুন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে তার লাইসেন্স নিতে হবে। এই সঙ্গে দত্ত কমিটির রিপোর্টে বিড়লা সংস্থা এবং অপর কয়েকটি বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ও নিয়ম- বহির্ভূত কাজের অভিযোগ করা হয়েছিল, তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্যও একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। এই কমিশনের এক- মাত্র সদস্য হবেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ কে সরকার।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য আলোচনা ব্যর্থ

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তি মিলে আরব ও ইস্রায়েল উভয় শক্তিকে অস্ত্রসংবরণের জন্য আহ্বান জানাক। কিন্তু রাশিয়া আরব, ইস্রায়েল উভয়কে এইভাবে শান্তিরক্ষার জন্য ডাক দিতে সম্মত নয়, তাদের নাকি দাবী যে, শুধু ইস্রায়েলকেই উদ্দেশ করে এই আহ্বান জানানো হোক এবং সেই সঙ্গে অধিকৃত আরব এলাকা ত্যাগের জন্যও তাদের কাছে আবেদন করা হোক। ফলে চতুঃশক্তির এই শান্তি-বৈঠকে আপাততঃ ছেদ পড়েছে। আগামী [illegible] বৈঠকের তারিখ পড়েছে ২৭শে ফেব্রুয়ারী [illegible]

ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত আইন কেন বাতিল হ'ল

গত বছর জুলাই মাসে ভারতের চৌদ্দটা ব্যাংক জাতীয়করণের পরে জনমানসে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল সুপ্রীম কোর্টে ব্যাংক জাতীয়করণ আইন কার্যকর নয় এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কিন্তু জনসাধারণ সে রকম হতভম্ব হয়ে যায় নি। কারণ হয়তো এই যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাংকগুলির কাজকর্মে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন জনমানসে রেখাপাত করে নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যবসায়ে ঋণদানের যে প্রচারকার্য চলেছে তা আদৌ নতুন কিছু নয়। জাতীয়করণের আগেই ঐ ধরনের ঋণ ঐসব শর্তে পাওয়া যেতো। বহু প্রার্থী তো একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন ঋণদানের শর্তের কড়াকড়িতে। ওদিকে ব্যাংকগুলির পরিচালকদের মধ্যেও খুব একটা বিচলিত ভাব দেখা যায় নি। এখনও তাঁরা তুষ্ণীভাব বজায় রেখেছেন। ব্যাংক কর্মচারীদের অধিকাংশই কিছুটা খুশী হলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা এ ক' মাসে এমন কিছু সুবিধা পান নি যাতে জাতীয়করণকে বাহবা দিতে পারেন। তবুও বলা যায়, ব্যাংক জাতীয়করণ ছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একদিকে ব্যাংক কর্মচারী-ঘেঁষা বামপন্থী রাজনৈতিক দাবী, অপর দিকে পুঁজিবাদ-ঘেঁষা চরম প্রতিকূলতা—এ দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখারই প্রয়াস ছিল এটা।

ভারতের সংবিধানপ্রণেতাগণ সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থের জন্যে রক্ষাকবচের ভাল ব্যবস্থাই করেছিলেন। তাই সমস্ত প্রগতিবাদী সংস্কারের পক্ষে বাধা আসছে। তবে একথাও ঠিক, সরকার তড়িঘড়ি করে ব্যাংক জাতীয়করণ করে কতগুলি মৌলিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নি। আর তার জন্যই খরচ হয়ে গেছে কয়েক লক্ষ টাকা—সুপ্রীম কোর্টে মামলা পরিচালনা করা এবং পরে এ সংক্রান্ত আইন পুনরায় তৈরী করার জন্য। এছাড়া ক্ষতিপূরণের মাত্রা ঠিক করে কয়েক কোটি অবাধে দেওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই।

যে সব কারণে ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বাতিল করা হল তার জটিল আইনের প্যাঁচ জনসাধারণ বুঝবেন না, বোঝবার দরকারও মনে করেন না। আইনের ব্যাখ্যাও সকল আইনবিদের কাছে সমার্থক নয়—তাও স্পষ্টই বোঝা যায়। আর আইনের ভাষার যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, ধারাগুলোর 'লেটার' ও 'স্পিরিট' দুটো দিকই বিবেচ্য। তবুও দেখা যাক সংবিধানের যে সব ধারার উল্লেখ করে সুপ্রীম কোর্টে ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বাতিল করা হয়েছিল সে সব ধারার আক্ষরিক অর্থ কি দাঁড়ায়।

সংবিধানের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে আইনের চোখে পক্ষপাতহীনতার কথা। এতে বলা হয়েছে—'ভারতের সীমানার মধ্যে ব্যাংক আইনের সমক্ষে এবং আইনের আশ্রয়ের ব্যাপারে কোনও ব্যক্তির প্রতি সমানাধিকার রদ করতেই পারবে না।' সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মতে মাত্র চৌদ্দটি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। আরও বহু ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাংককে আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন পক্ষপাতিত্ব জীবনবীমার ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালে করা হয় নি। তখন পুরোপুরি জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। আমাদের এটর্নী জেনারেল এ পক্ষপাতিত্বের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য পরিবেশন করতে হয়ত পারেন নি।

সংবিধানের ১৯ ধারার এফ (জি) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকেরই যে কোনও পেশা গ্রহণ, যে কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার থাকবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের মতে ব্যাংক জাতীয়করণ আইনে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির এই

সন্তোষ দত্ত

অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। কারণ তাঁদের ব্যাংক ব্যবসায় থেকে নিরস্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবনবীমার ক্ষেত্রে তবু বহু সংস্থার অন্যান্য বীমা ব্যবসায় চালু রেখে কোম্পানীর কাজকর্ম বজায় রাখার সুযোগ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া ৭৩টি ব্যাংক সংস্থার বাকী তথাকথিত ছোট ৫৯টি সংস্থা ব্যাংক ব্যবসায় চালু রাখার অধিকারী হলেও এই 'বড়' সংস্থাগুলি 'ছোট' সংস্থা হিসাবেও ব্যাংকের ব্যবসায় চালু রাখতে অধিকার পায় নি। এটাকেই নিদারুণ পক্ষপাতিত্ব বলা হয়েছে আইনের বিচারে।

এবার তৃতীয় কারণটি বিচার করে দেখা যাক। এটি ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত। 'জনস্বার্থে এবং আইন প্রণয়ন করে গৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, এবং এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, অথবা কিভাবে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কিভাবে তা প্রদান করা হবে, বা তার পদ্ধতি নির্দিষ্ট হবে, তা নির্দিষ্ট না করে নিয়ে কোনও সম্পত্তি গ্রহণ করা চলবে না।'

অবশ্য ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত কি অপর্যা[illegible] কোনও আদালত সে প্রশ্ন বিবেচনা কর[illegible] পারবে না। এক্ষেত্রে তা বিবেচনা কর[illegible] হয় নি।

বাতিল ব্যাংক জাতীয়করণ আ[illegible] প্রসঙ্গে বিচারকগণ বলেছেন যে, ক্ষতি[illegible] পূরণের পদ্ধতি যথাযথভাবে ঠিক করা [illegible] নি এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণও নির্ধারি[illegible] হয় নি। অতএব এই আইন কার্যকরও হ[illegible] পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা[illegible] কোম্পানীগুলি তো লিকুইডেট করা হয় নি[illegible] অথচ তাদের না ছিল কোনও সম্পত্তি, [illegible] কোনও মূলধন, যাতে নতুন কোনও ব্যবস[illegible] তারা শুরু করতে পারে। এটা একটা চর[illegible] গলদ। রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা কোম্পানীগু[illegible] কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বীমা ব্যবসায় চা[illegible] রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ব্যাংকের ক্ষে[illegible] ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি তাই সুপ্রীম কো[illegible] বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সংবিধানে[illegible] এই সংক্রান্ত বিধানটি সত্যিই প্রগতি[illegible] বিরোধী। আর বাতিল ব্যাংক আইনে ক্ষতি[illegible] পূরণের ব্যবস্থাটি মোটেই স্পষ্ট ছিল না[illegible] বিচারকদের মতে তা ছিল 'ইলিউসরি'।

ব্যাংক আইন বাতিল করার পরে কেন্দ্রী[illegible] সরকার ভাবতে বসলেন, কি করা যায়[illegible] ইতিমধ্যে ব্যাংক জাতীয়করণ-এর ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও কয়েকটি কার্যসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তাই নতুন অর্ডিন্যান্স পাশ করে নিতে হল লোকসভার বাজেট অধিবেশনের আগেই। ইতিমধ্যে ব্যাংক কর্মচারীদেরও দাবী সোচ্চার হয়েছিল সকল ব্যাংক জাতীয়করণের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করেন নি। তবে কয়েকটি শিক্ষা এ থেকে গ্রহণ করতে হল কেন্দ্রীয় সরকারকে। ১। তড়িঘড়ি করে জাতীয় গুরুত্বের কাজ করা ঠিক নয়। ২। সংবিধানের কয়েকটি ধারা প্রগতিবাদ[illegible] বিরোধী। ৩। আইনের ব্যাখ্যা তর্কাতীত নয়। ৪। জনসাধারণের একটা অংশ এখনও পুঁজিবাদী মতবাদের পরিপোষক। ৫। ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণে কর্মচারীদের দাবীই সবচেয়ে জোরালো। আর জোরালো প্রগতি-বাদী রাজনৈতিক দলগুলির দাবী। এই শেষে স্বপক্ষের যুক্তিও অনেক, কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে তা যে প্রয়োগ করার সুযোগ কম এতদিনে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অবশ্য কোন[illegible] অবস্থাই অনড়, অটল নয়—বিশেষ কর[illegible] ভারতের মতো দেশে।

সম্পাদকীয়

উচ্ছৃংখলার মাশুল

গত সপ্তাহে কলকাতাগামী নিত্যযাত্রীরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিলেন। শিয়ালদহ ডিভিশনের ট্রেনের চালক, গার্ড ও অন্যান্য কর্মীরা নিরাপত্তার দাবিতে ট্রেন চালানো বন্ধ করেছিলেন একশ্রেণীর যাত্রীর হামলাবাজির প্রতিবাদে। নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা সবারই জানা। ট্রেন কম, যাত্রী বেশি। অথচ ঠিক সময় যার যার গন্তব্যস্থলে যাওয়া চাই। কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা আজ ভাঙনের মুখে। যাত্রীদের অসীম ধৈর্যগুণেই এখন পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা চালু আছে। একমাত্র জাপানের টোকিও শহর ছাড়া পৃথিবীর কোথাও ট্রেনে এমন ভিড় দেখা যায় না। ট্রাম-বাসের তো কথাই নেই।

এ সবই সত্যি, কিন্তু তার জন্য ট্রেনের চালক বা রক্ষকদের কী কোনো দোষ আছে? পরিবহন ব্যবস্থার নিয়ামক ট্রেনের ক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষ। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন পৃথিবীর মধ্যে ব্যস্ততম স্টেশন। এখানে দিনে রাত্রে যত ট্রেন যাতায়াত করে পৃথিবীর কোথাও একটি স্টেশনে এত ট্রেনের ভিড় নেই বলে শুনেছি। যাত্রী-সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কলকাতার স্থানাভাব বলে নিত্যযাত্রীরা বহু দূর-দূরান্তর থেকে আসেন এই কর্মস্থলে, আবার কাজের শেষে বাড়ি ফিরে যান। সুতরাং ট্রেনের সংখ্যা কম হলে কিংবা ট্রেন চলাচল অনিয়মিত হলে যাত্রীরা যে ক্ষুব্ধ হবেন, ধৈর্যহারা হবেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু ধৈর্যহারা যাত্রীরা যদি এর জন্য ট্রেন-চালকদের ওপর হামলা করেন, গার্ড, চেকার, স্টেশনমাস্টারদের করেন লাঞ্ছিত, তাহলে তাঁদেরও তো সম্মিলিত প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। এই প্রতিবাদের ফলেই গত সপ্তাহে শিয়ালদহ স্টেশনে একদিন ট্রেন চলেনি। যাত্রীদের দুর্ভোগ হয়েছিল চূড়ান্ত। অবশেষে রাজ্য সরকার তাঁদের নিরাপত্তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আবার রেলের চাকা চলতে শুরু করেছে।

এই ঘটনা আকস্মিক নয়। বহুদিন ধরেই রেলে এই কাণ্ড চলছে। উচ্ছৃংখলা একবার যদি মানুষকে পেয়ে বসে তবে তা আর কোনো বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। জনতা যদি নিজের হাতে আইন এবং অন্যায়ের প্রতিকার করতে চায় তাহলে আইনও থাকে না, অন্যায়ের প্রতিকারও হয় না। একথা আজ বিশেষভাবে ভাববার সময় এসেছে। শুধু ট্রেনের যাত্রীদের একাংশই যে আজকাল যখন-তখন উন্মত্তের মতো আচরণ করছে তা নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রেই এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে। চরম শৃংখলাহীনতাই আজ সমাজের ব্যাধি। যার ফলে এই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে সত্যিকারের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

সর্বত্রই মানুষ আজ অসহিষ্ণু। বঞ্চিত মানুষ সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এটা ঠিক। কিন্তু যে-ক্রোধ শুধু অন্যায়কে বাড়িয়ে তোলে, তার প্রতিকারের পথ বার করতে পারে না তা সমাজের ক্ষতিকারক। স্কুলে, কলেজে, হাসপাতালে—সর্বত্রই এই দলবদ্ধ ক্রোধের বাড়াবাড়ি। ছাত্ররা তো যে কোনো অজুহাতে গণ্ডগোলে সিদ্ধহস্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল কোনো পরীক্ষাই নির্বিঘ্নে হয় না। শিক্ষক-অধ্যাপকদেরও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় ক্রুদ্ধ ছাত্রদের হাতে। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে সকলের পরীক্ষা ভণ্ডুল করা এক শ্রেণীর ছাত্রের বার্ষিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার হলে টোকাটুকি, ইনভিজিলেটরদের শাসানি দেওয়া তো আছেই। হাসপাতালের ডাক্তারদেরও রেহাই নেই। রোগীদের পক্ষ থেকে বলবার অনেক আছে। ডাক্তারদের মধ্যেও কর্তব্যকর্মে অবহেলার অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু এর প্রতিকারের পথ ডাক্তারদের ওপর শারীরিক আক্রমণ বা লাঞ্ছনা নয়।

পথেঘাটে সামান্যতম কারণে আজ দলবদ্ধ হামলাবাজির ঘটনা নিত্য চোখে পড়ে। বাস-কন্ডাক্টরদের ওপর আক্রমণের ফলে শহরতলীর বাসলাইনও কয়েকমাস আগে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ ছিল। এসব সমাজবিরোধী কাজে যারা উৎসাহ দেয় বা এগিয়ে আসে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু তাদের কাজে বাধা দেবার মতো সাহস সাধারণ নিরীহ মানুষের না থাকাতেই এরা দিনের পর দিন প্রশ্রয় পাচ্ছে। ছিনতাই, রাহাজানি এবং বোমা, পাইপগান নিয়ে মারামারিও এই সমাজবিরোধীদেরই কাজ। অথচ সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এদের ভয়ে সব সময় কম্পমান। সমাজের উচ্ছৃংখলার সুযোগ এই সমাজবিরোধীরা নিচ্ছে। তার ফলেই আজ সর্বত্র শৃংখলাবোধের এত অবনতি।

এদের দমন করবার জন্য পুলিশ আছে। কিন্তু শুধু পুলিশ দিয়ে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাহলে তো পথেঘাটে সর্বত্র সশস্ত্র সান্ত্রী বসিয়ে গণতন্ত্র চালাতে হয়। এ কাজের মূল দায়িত্ব সরকারের এবং নেতাদের। তাঁরা যদি সজাগ না হন, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে এই উচ্ছৃংখলার অবসান হবে না। পুলিশ-সান্ত্রী নিশ্চয়ই থাকবে এবং সমাজবিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে তাঁদের। কিন্তু সামাজিক স্থিতি, সাম্য এবং শৃংখলাবোধ ফিরিয়ে আনতে হলে দায়িত্বশীল নেতা ও সমাজকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা এই উচ্ছৃংখলা থেকেই উদ্ভূত হবে নৈরাজ্য।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদের চক্ষে সমাজের যে রূপ প্রতিভাত হয়, সমাজের পরিবর্তনের যে কারণ তাঁরা নির্ণয় করেন, যেসব উপাদান নিয়ে যেসব সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হন তা মান্য করেও সাহিত্যিক বলবেন—আপনারা যা বলছেন তা যথার্থ, কিন্তু সব কথাটা আপনারা বলছেন না। বলছেন না কারণ আপনাদের ফরম্যুলায় সেটা ধরা পড়ছে না। জীবনের বহুমুখী বহু-বিচিত্র প্রকাশকে কোনও বাঁধা-ধরা ছকে ধরা যায় না। জীবন-ধারা প্রমত্তা পদ্মার মতো কখন যে কোন কূল ভেঙে কোনদিকে ছুটবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত। কবি-সাহিত্যিকের চোখে জীবন তাই লীলা। সে লীলার ব্যাখ্যা করবার জন্যে তাঁরা খুব ব্যস্ত নন, কারণ তাঁরা জানেন তাকে সব সময়ে ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করা যায় না, তার চেয়ে সেটাকে উপভোগ করাই ভালো। এই নির্বিকার মনোভাব অবশ্য সব সাহিত্যিকের নেই, আমারও নেই। তাই বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে আমরা কেউ হৃষ্ট, কেউ ক্লিষ্ট হই।

আমার বয়স একাত্তর (৭১) বছর। আমি যে সমাজ দেখেছিলাম সে সমাজ লোপ পেয়েছে।

খুব ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে পুজোর সময় গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স সাত আট বছর। এর একটা স্মৃতি-চিত্র এঁকেছিলাম গদ্য কবিতায়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

চণ্ডীমণ্ডপে পুজো হচ্ছে
গ্রামের সবাই
সমবেত হয়েছে সেখানে
অসীম আগ্রহ ভরে।

ছেলেমেয়েদের হুড়োহুড়ি
হাসি কলরব;
গ্রামের ঢুলিরা বাজনা বাজাচ্ছে
ঢোলের পালক দুলিয়ে দুলিয়ে,
নেচে নেচে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে
একটা মেলা বসে গেছে যেন
মাটির পুতুলের কি সমারোহ
খাবারের দোকানি সারি সারি
নানা রঙের খাবার সাজানো।

আর এক পাশে
পল্লী শিল্পের নানা নিদর্শন,
ঝুড়ি, কুলো, মাদুর চাটাইয়ের
নানা নমুনা;
সবার মুখে হাসি।

প্রকাণ্ড সামিয়ানা বাঁধা হচ্ছে
যাত্রা হবে
দশখানা গাঁয়ের লোক দেখবে।

গ্রামের বউ গিন্নিরা
ভার নিয়েছেন ভোগের।

কোথাও ফল কুচোনো হচ্ছে,
তরকারি কোটা হচ্ছে কোথাও,
কোথাও রান্না চড়েছে।

লুচি-ভাজার গন্ধে
চতুর্দিক আমোদিত।
ফুল-বেলপাতা স্তূপাকার।
ভারে ভারে দুধ দই আসছে
মিষ্টান্নও নানা রকম।

গয়লা, ময়রা, দোকানী, কুমোর
সবাই শশব্যস্ত
মায়ের পুজো নির্বিঘ্নে হওয়া চাই,
সবারই মুখ উদ্ভাসিত।

পুজোর ক'দিন কারো বাড়িতে
রান্না হবে না
সবাই মায়ের প্রসাদ পাবে।

পট্টবস্ত্র-পরিহিত পুরোহিতরা
তারস্বরে পাঠ করছেন চণ্ডী
উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে।

ছোট ছোট মেয়েরা শুদ্ধ কাপড় পরে'
গাঁথতে বসেছে
শিউলি ফুলের মালা
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একধারে দাঁড়িয়ে
নাম শোনাচ্ছে খঞ্জনি বাজিয়ে।
মাইক নেই।

বর্তমানে কোনও গ্রামে ঠিক এই ধরনের পুজো অনুষ্ঠিত হয় কি না জানি না। বোধহয় হয় না। আজকাল পুজোর সময় কেউ বাড়িতে থাকেন না। নানা জায়গায় বেড়াতে বেরোয়। মুসৌরি, নৈনিতাল, দার্জিলিং বা দক্ষিণ ভারত। হোটেলে খায়। বড় বড় শহরে পুজোর চেহারা দেখে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম—

বৎসরান্তে একবার প্রতিমা সাজায়ে
উচ্চনাদে 'মাইক' বাজায়ে
কাঁপাইয়া চারিদিক ঢোলে আর ঢাকে
জগজীর্ণ দেহটাকে সাজাইয়া আজব পোষাকে
তোমার সম্মুখে নাচি কুঁদি
রামা, শামা, পটুলি, খেঁদি ভুঁদি।

রঙীন মাসিকপত্রে বাজে লেখা করিয়া বাহির
ফি বছর নিজেদের করিতেছি কেবল জাহির।
কিছু বল না তুমি; আস্পর্ধা বাড়িতেছে তাই।

এবারে দোহাই
অসুরকে ছেড়ে তুমি আমাদের ধর
ঠেঙাইয়া লাস কর।

চড় মেরে লাথি মেরে কান মলে' মলে'
বার বার দাও দেবি বলে'
তোমাদের এই রং চং
মনোরম নয় বাপ
ইহা শুধু পশুর প্রলাপ
তোমরা মানুষ নও, হাস্যকর সং।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বর্তমান সভ্য সমাজের 'লীলা' দেখে মুগ্ধ হ'তে পারিনি। কষ্ট হয়েছে, রাগ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে আপোষ করেছি যা হচ্ছে তা অনিবার্য। ঝড় এলে, বৃষ্টি এলে, ভূমিকম্প হলে তা যেমন সহ্য করি এসবও তেমনি সহ্য করছি। আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের যে দুটি জিনিস সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে তা হচ্ছে রাজনীতি এবং সিনেমা। বিবেকানন্দ বলে' গিয়েছিলেন—ধর্মই এ দেশের প্রধান প্রেরণা। রাজনীতি এবং সিনেমার প্রভাব বেশী স্পষ্ট ছিল শহরের সমাজেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। এখন তা পল্লীগ্রামেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। রাজনীতি এবং সিনেমা মানুষের ক্ষুধাকে উত্তেজিত করে, তার অভাববোধকে জাগ্রত করে, নিজেও অশান্ত হয় এবং নিজের চারিদিকে অশান্তির বীজ বপন করে। নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করবার শিক্ষা দেয় যে ধর্ম সেই ধর্মকেই বিপর্যস্ত করে এই দুটো জিনিস। এ দুটোর প্রভাব বেশী হয়েছে বর্তমান সমাজে তাই সমাজের চেহারা বদলে গেছে। কেউ সন্তুষ্ট নয়, সবারই মুখে বুলি কিম্বা মনে কামনা—আরও চাই, আরও চাই। সদা-সন্তুষ্ট থাকা উচিত, না জীবনযুদ্ধে সদা-উন্নতি-কামী হ'য়ে যুযুধান হওয়া উচিত এ প্রশ্নের নানা মুনির নানা মত চিরকালই শোনা গেছে। একদল যে মত প্রকাশ করেছেন, আর একদল তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। আমি এ মতবিরোধের মধ্যে না গিয়ে এইটুকু শুধু বলতে চাই অতিরিক্ত সন্তুষ্টি মানুষের চরিত্রে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, অর অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পশু করে তোলে। এই দুই 'অতি'র মধ্যবর্তী যে পথ তাই সভ্য মানুষের পথ। আপাতত আমাদের সমাজে সে পথ দেখা যাচ্ছে না। নানারকম অভাবের তাড়নায়, নানারকম উত্তেজনার বশে আমরা পশুই হয়ে গেছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি খুব হতাশ নই। কারণ বিবেকানন্দ যে কথা বলে' গেছেন তা মিথ্যে নয়। আমাদের

অন্তরের অন্তরতম লোকে ধর্মের শিক্ষা এখনও জবলছে। কি ভালো, কি করা উচিত তা এখনও আমরা বুঝি, কিন্তু যে অন্যায় অবিচার অত্যাচারের তোড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি অ এমন শ্বাসরোধকর যে আমরা মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস একদিন আমরা সুস্থ হতে পারব। আমরা অনেকবার এরকম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে আবার সামলে নিয়েছি ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। ধর্মবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত জাগ্রত হয়, বৃহৎ আদর্শ যে অমর তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের এই দুর্যোগের দিনেও অনেক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি যে তাঁরা আদর্শবাদী। গুণ্ডামি, নোংরামি, অশালীনতাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। তারা সেই সনাতন ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী যার কথা বিবেকানন্দ বলে' গেছেন। কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে দেখে আমরা মনে করি যে তারা সংখ্যাগুরু, কিন্তু সমস্ত দেশের জনসংখ্যার কথা ভাবলে আমাদের সে ভুল ভেঙে যায়। রাজনীতির সভায় বা সিনেমার টিকিট ঘরে অশালীন জনতার ভীড় হয়, কিন্তু কুম্ভ-মেলার ভীড় বা গঙ্গাসাগর স্নানের ভীড় বা তীর্থে তীর্থে প্রতিদিন পুণ্যার্থীদের ভীড়ের তুলনায় সে ভীড় কি খুব বেশী? তাছাড়া দেশের মানসিক ভিত্তির খবর কি রাখি আমরা? রাখলে দেখতে পেতাম বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলে গেছেন তার মর্মবাণীই সে ভিত্তিকে নির্মাণ করেছে। তাই মনে হয়, কেটে যাবে মেঘ—।

ঝ'রে যেতে দাও ধারা ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

মরা গন্ধরাজ, শুষ্ক সূর্যমুখী
ঝাঁকিয়ে গিয়েছ তুমি ঃ
উড়ে পড়ে স্মৃতি আজ—
রোদ্দুহীন দলগুলি ঢাকে দৃশ্যভূমি।

ব'রে যায় হাসি গাছের ভেতর দিয়ে প্যাপিয়ার মতো,
লতা-কস্তুরী মূর্ছিতা বুকে—জলস্থল নিমেষ-নিহত।
নভোচারী মস্ত সব পাখা হানে
অকালে মৌসুমী।

কেন মালার আঘাত লেগে
ঘুম নেমেছিল চোখে।
সারাটি যৌবন তাই কাটলো বিরহ-শোকে।
ভাঙা মধুমাস আসে ফ্যাক্টরির উঠোনে,
কাগজের ফুল তুমি ছোঁড়ো অনামনে।
ঝ'রে যেতে দাও ধারা তোমার নিকট থেকে দূরে
তাকে যেতে দাও বহু দূরে—
যার দিক্‌পট তুমি।

দুটি কবিতা ॥

প্রতিমা সেনগুপ্ত

আর এক জন্মে।।

এখন অনেক রাত;
আমি একজনের সুখের মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে
আর একজনের স্বপ্ন দেখি।
আমার সেই অন্যজন; অন্য মূর্তি—
যাকে শব্দ, মন্ত্র, স্পর্শের বাইরে রেখে এসেছি।
এখন যদি অনাদি রাতের কক্ষপথে তাকিয়ে যাই—
তবে; সে আসবে আমাকে তুলে নিতে প্রতি মুহূর্তে
একটি স্বপ্ন হ'য়ে ভেসে।

জাতক।।

বিভোর হ'য়ে তাকিয়ে ছিল
কোনদিকে জানি না;
বোধহয়; কোন অনুভূতিকে ধরবার জন্যে
দুহাত বাড়িয়ে আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না।
মনের মধ্যে এক আকাশ নিষ্ঠুর অদৃশ্য
ছটফট করে মরছে;
অনাদি, অনন্তকাল ধরে।

অধিকার রক্তের, কবিতার ॥

গণেশ বসু

তারপর কে যেন হাত রাখল। নাড়ীকাটা যন্ত্রণার অশ্রুপাত।
অন্ধকার। উদাত্ত নখের চূড়ায় চূড়ায় অন্ধকার। হা-ভাত অন্ধকার
অন্ধকারেই হারিয়ে যেতে চাইল সময়। সময়ের স্বরগ্রাম।
আমার পায়ে পায়ে দুঃখের পাঁচিল। বোধের বেদনা। বিষাদ
বিচ্ছেদের কুয়াশায় তাই আবৃত্ত। দু চোখ বেয়ে নোনা ঢল
অবহেলার ইতিহাস। ইতিহাস ঘৃণার। রক্তের। বর্শার।

ভাবনাগুলোর খড়ের ঝিকিমিকি। খরশাণ তলোয়ারের ডগায়
ডগায় অস্তিত্ব কল্পনা। দিন রাত্রি। ঋতুর মিছিল।

দেখলাম চোখের সামনেই ছিঁড়ে গেল আমাদের ভালোবাসা।
থেঁতলে গেল চেনা মুখ। স্বপ্নের উজ্জ্বলতা। দিকে দিকে
খসে গেল জীবন। সুতো-ছেঁড়া যৌবনঘুড়ি।

অন্ধকারে কাঁপছিল আমাদের ভালোবাসা। বাঙলা দেশ।
মানুষ, মানুষ!

দেখতে দেখতে ভেসে গেল মুখগুলো। বুনো জোয়ারের দাঁতে
সবুজ। বুকের রহস্য। আত্মহত্যার ধুঁকল অহঙ্কার।
অহঙ্কারী সময়।

চাইলাম নড়েচড়ে উঠতে। ভরে বন্দী। ভদ্রাসন গেল ভেসে।
আমিও। ভাসতে ভাসতে আরেক চর। হাঁ-মুখ খাঁড়ি। রক্তঝর
কাঁটার ঝোপঝাড়। মুখোশ। মুখোশের তর্জনী। দুঃসহ দুঃসহ!

তখন স্মৃতির মুখোমুখি।
নৌকোর গলুই ফাঁকা। খাঁ খাঁ বাড়ির শোঁ শোঁ
বাতাস। বাদুড়ের ছায়া।
পায়ে চলার পথে রক্ত। গাছের চূড়ায় চূড়ায় অন্ধকার।
পাতা-ঝরার গান। সেখানে কেউ নেই আবেগের। ভালোবাসার।

শূন্যতা......অনন্ত শূন্যতা

কোথায় দামাল ঘোড়ার খুরে অগ্নিকণা? সময়! কবিতা...

রবীন্দ্রনাথের 'প্যারাডাইস লস্ট'

দীপেন্দু চক্রবর্তী

'এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প কিসের অভিমুখে এ চলছে, সে কথা প্রতিবর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে'—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথামতই ১৯৭০ সালের সূচনাতেই পেছন ফিরে তাকিয়ে মনে হ'ল বেশ ছিল একদা অ্যাডাম-ইভের দল রবীন্দ্রনাথের স্বর্গকানন শান্তিনিকেতনে, সুলালিত ও সুরক্ষিত: হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল একদিন দূরে শয়তানের পদধ্বনি। শয়তানটি আর কেউ নয়, আধুনিক শিল্প সভ্যতা। ঈশ্বরের মত ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বোলপুরেই থামিয়ে দিলেন এই স্বর্গবিদ্বেষী দানবটিকে। ভুবনডাঙা কিছুদিন বাফার স্টেটের মত দুদিকের ভারসাম্য রক্ষা করতে থাকল। কিন্তু ঈশ্বর না হলেও ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয়, রবীন্দ্রনাথও একদিন বিদায় নিলেন সবাইকে চমকে দিয়ে। এবারে শয়তানটি বিনা বাধায় এগিয়ে এল শান্তিনিকেতনে, পীচের রাস্তা করে, মাটির ঘর ভেঙে দিয়ে দালান তুলে, ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের চুল-চশমা-চটির কায়দা বদলে দিয়ে।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? রবীন্দ্রনাথের অভাব? বর্তমান কর্তৃপক্ষের দুঃখকর ব্যর্থতা? এ রকম সমস্ত প্রশ্ন আমাকে অবশ্যই বিরক্ত করেছে, আর পাঁচজনকেও যা করে থাকতে পারে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করার সময় প্রায়ই দেখেছি ভ্রমণকারীরা দর্শকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—'বদলে গেছে, সব বদলে গেছে'! এবং তার জন্য দায়ী করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্তমান কর্তৃপক্ষকে। অভিযোগ যে অমূলক নয় তা সবারই জানা খবর। যে খবরটা আমরা জেনেও গোপন করে রাখতে চাই তা হল শান্তিনিকেতনের ওপর আধুনিক শিল্প-সভ্যতা প্রচন্ড আঘাত হেনেছে এবং তাকে আজ কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারি কেউ হলেন না। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলারা যখন তাঁদের সৃজনশীলতার নামে হামলা শুরু করলেন নানাভাবে তখনও এমন কেউ ছিলেন না যাঁর প্রভাবে বিশ্বভারতীর সনাতন কাঠামোটি অটুট থাকে। যাঁরা ছিলেন, সেইসব স্বনামধন্য ব্যক্তি ও প্রতিশক্তিশালী পরিবার রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে রূপায়িত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। ফলত, শান্তিনিকেতনের আজকে যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তাতে তাকে রবীন্দ্রনাথের সমাধিক্ষেত্র বলে অনেকে ভাবতে শুরু করেছে। একথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ, যিনি অচলায়তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, নিশ্চয়ই বর্তমান শিল্প সভ্যতার সঙ্গে এমন একটা আঁতাত করতেন যার ফলে অ্যাডাম-ইভের ইডেন উদ্যান না হোক, শ্রেণীহীন মনুষ্যত্বের একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেরণা দিত আজকের শান্তিনিকেতন। "বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই হবে তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কি হবে।......তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামীকালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়।" বিশ্বভারতী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাই বলে চুপ করেননি, তিনি আরো বলেছেন, "ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরী করে দিতে পারি, কিন্তু গম্যস্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে।" এই অকপট স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে একটি গতিশীল প্রাণচঞ্চল জীবন্ত প্রসেস্ বলে মান করতেন।

তাই যদি হয় তবে ধরে নেওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এখন বেঁচে থাকলেও রাস্তাঘাট পীচের হত, দালান উঠত, আশ্রমবাসীরা কলিংবেল বা ফ্রিজিডিয়র, খারত ঘরে, বিজ্ঞানের সমস্ত উপহারই গ্রহণ করত শান্তিনিকেতন; তবুও হয়তো তাঁর কোনো কোনো আদর্শ, বিশেষ করে যেগুলো মানুষের সামাজিক ভেদনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, বেঁচে থাকত। তবে প্রকৃতি ও মানুষের সংযোগসাধনের এই নতুন ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ কি করে দূর করতেন বলা শক্ত। অন্যদিকে, রবীন্দ্রোত্তর ঐতিহ্যবাদীরা এখনো শান্তিনিকেতনকে এই সাধারণ শহুরে সভ্যতার সুযোগটি দিতে নারাজ। এখনো তাঁরা আশা করেন, শান্তিনিকেতন চিরকালই থাকবে একটি তপোবন, সেখানে লতাগুল্মে আচ্ছাদিত কুটিরে বাস করবে গুরুশিষ্যেরা, মাঝে মাঝে হরিণশিশুর পেছনে ছুটতে দেখা যাবে কোনো শকুন্তলাকে, কিন্তু ব্যাধ সেখানে আসতে পারবে না, সে দুষ্মন্তই হোক আর জিম করবেটই হোক। ওঁরা ভুলে যান যে, যেখানেই হরিণ থাকে সেখানেই আসবে ব্যাধ, যেখানেই আছে অ্যাডাম-ইভ্ সেখানেই শয়তান। রবীন্দ্রনাথও হয়তো সবসময় এই সত্যটিকে মনে রাখতে পারেননি। তাই কালচেতনা থাকলেও তাঁর আদর্শবাদী মন চিরদিনই আশা পোষণ করে গিয়েছিল যে মানুষ ও প্রকৃতির মিলন সমাধানের পথ চিরকালই শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছবে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি, সমাজবিদ নয়। আর শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন মানবদরদী রম্যান্টিক কবি। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পরিকল্পনায় তিনি সেই পরিচয়ই রেখে গেছেন এবং নিজের কন্ঠেই তা স্বীকার করে গেছেন। "যে কাজের ভার নিয়েছিলাম," রবীন্দ্রনাথ জানান আমাদের, "তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সংযোগ ছিল অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল—(বিশ্বভারতী)।" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কন্স্টিটিউশন, নিয়মের কাঠামো--যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে।"

উনবিংশ শতাব্দীর রম্যান্টিক কবিরা প্রায় সবাই আইডিয়্যালিস্ট ছিলেন দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথও এই ইউরোপীয় রম্যান্টিক ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পারিবারিক আধ্যাত্মিক চেতনা। এর যোগফল

রবীন্দ্রনাথের মুক্ত মানবতাবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর রম্যান্টিক কবিদের প্রায় সবাই নতুন নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়াচ বাঁচানোর জন্য নানান দিকে ছুটেছিলেন। রম্যান্টিক চিন্তাধারার গুরু রুশো 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-এর মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করে অনেক শত্রু বাড়িয়েছিলেন। প্রকৃতিই যে আমাদের সবচাইতে বড়ো শিক্ষক একথা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন। তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ 'এমিল' প্রকৃতির কোলে মানুষের আশৈশব বড়ো হয়ে ওঠার কাহিনী। যদিও রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে, তবু রুশোর চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নজরে না পড়ে যায় না। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে আর একজন যদিও প্রকৃতির কোলে মানুষের শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করে যেতে পারেননি, তথাপি তিনি তাঁর কাব্য মারফৎ ছাত্রদের বইপত্র ফেলে প্রকৃতির কাছে যাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন—তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের সবার পার্থক্য হল ধর্মচেতনায়। রুশো ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিবাদে ঈশ্বরের স্থান থাকলেও তা কখনো এতটা স্পষ্ট, এতটা কেন্দ্রীয় নয় যেমন রবীন্দ্রনাথের দর্শনে। তবে গোড়াতে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে-থাকা নাগরিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণাটাই ছিল মুখ্য। তাই মুক্তির অন্বেষণে তাঁকে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয় যার বাস্তব রূপায়ণ 'বিশ্বভারতী' যার কাজ ছাত্রকে নম্বর দিয়ে বিচার করা নয়, তার সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা, তাকে বুঝতে দেওয়া, প্রকৃতির চোখে সবাই সমান, এবং অবশেষে তাকে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের একজন দোসর করে তোলা। আজকের বিশ্বভারতী যে এগুলোর কোনটাই টিঁকিয়ে রাখতে পারেনি সেটা এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য নয়। প্রধান বক্তব্য হল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তার অসংখ্য উপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও মূলত ভাববাদী, বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে ইউটোপিয়ান। বর্তমান সামাজিক স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আদর্শগুলোর কোনোটার এমন কি শান্তিনিকেতনের মত দ্বীপবৎ জায়গাতেও বেশীদিন জীবিত থাকতে পারে না। এ কথা বলা মানেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলোকে পরিত্যাগ করার পক্ষে ওকালতি নয়।

প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তহবার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, ভারতের সভ্যতা গ্রামীন, শহর নিতান্ত বিদেশী সভ্যতার প্রতিভূ। শিল্পসভ্যতা মানুষে মানুষের সম্পর্ককে ছিন্ন করে এক নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি করেছে। ভাবতে অবাক লাগে, আজকে যে ব্যাপারটা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটা নতুন আবিষ্কার, সেই অ্যালিয়েশনের কথা কত আগে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো চিন্তাবিদ বোধহয় এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে এত ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সবাইকে গ্রাস করবে শহুরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। একে হয়তো ঠেকানো যাবে না। 'তপোবন' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট-কাঠে তৈরী, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্য গগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।" অথচ এদিকে না ঠেকাতে পারলে মানবিক সম্পর্কের বিশ্লিষ্টতা চরমে পৌঁছে যাবে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা এই বিপজ্জনক অ্যালিয়েশনের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনে।

উনিশশতকের জার্মান আইডিয়ালিস্টদের মত রবীন্দ্রনাথও বিশ্ব প্রকৃতিকে একটি Absolute-এর বিচিত্র প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। এ ব্যাপারে, বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মধর্মের অবদান অপরিসীম। ব্রহ্ম চেতনার পক্ষে আধুনিক শিল্প সভ্যতা একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এগুলো দূর করতে পারা যায় যদি মানুষ আবার প্রেম ও মৈত্রীর আলোয় খুঁজে নিতে পারে তার আগেকার স্থানটিকে। আর ঐ আলোটি জ্বালানোর জন্য দরকার তপোবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'বিশ্বভারতী' এমনই একটি তপোবন।

'তপোবন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কিভাবে তপোবনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের আত্মা প্রস্ফুটিত হয়েছিল একাধারে মানুষ ও প্রকৃতির মিলন ক্ষেত্র, অন্যধারে মানুষের সাধনার নিরাপদ স্থল এই তপোবন। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই যে তপোবন অদৃশ্য হয়েছে তা তিনি মেনেছেন। 'কালিদাস যখন কবি, তখন দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে'। তাঁর কাছে বস্তুত তপোবন একটি আদর্শ হিসেবে যত মূল্যবান, ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে ততটা ছিল না। এইখানেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ভাববাদের আসল উৎস। 'বিশ্বভারতী'ও একটি আশ্রম, ঠিক যেমনটি রবীন্দ্রনাথ আর্যভারতের তপোবনের ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতির সংস্পর্শে এখানে মনুষ্যত্বের মুক্তি ও বিকাশ হবে, ভেদবুদ্ধি দূর হবে, বিচ্ছিন্নতাবোধ লুপ্ত হবে, এই তো ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা। "আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মত কোলে করে মানুষ করছে"—রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা ও আধুনিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, ঠিক একই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন, তাঁর কাব্যে 'অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে।'

সভ্যতার অর্থ সভার একজন হওয়া এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন জানাতে বাধ্য। কিন্তু সভ্যতার আর একটা দিক, যেখানে আছে বিজ্ঞান সেটার অর্থ তো প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বরং প্রকৃতিকে বশে আনা, কাজে লাগানো। আজকের শিল্পসভ্যতা তো ঐ নীতিই মেনে চলছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের তপোবন ও আজকের অবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বটির দিকে চোখ বন্ধ রাখা যায় না। প্রকৃতিকে সব রম্যান্টিকই সুন্দরতর করে দেখেন [illegible]দের কল্পনায়, রবীন্দ্রনাথও তাই ব[illegible]লেন। প্রকৃতির অনেক দিকই আছে যা এখনো ভয়ঙ্কর, বীভৎস। সব পশুপক্ষীই সুন্দর নয় এবং মানুষের প্রেমে সাড়া দেয় না। প্রাচীন ভারতের আশ্রমে মৃগশিশুর বদলে বাঘ-সিংহ দেখা দিলে প্রকৃতিকে মোটেই মাতৃরূপে কল্পনা করা যেত না। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর দিকটা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই দার্শনিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সাহায্য করে না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি প্রকৃতির ঠিক ততটুকু আমাদের গ্রহণযোগ্য যতটুকু আমাদের মঙ্গলের জন্য। অর্থাৎ মরুভূমিতে নিশ্চয়ই থাকবো না প্রকৃতির পরশের জন্য, থাকবো মরূদ্যানে। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে গ্রহণ করা হচ্ছে মানুষের নিজের সুবিধের জন্য। এই কারণেই মরুভূমিসদৃশ শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। প্রকৃতিবাদের মধ্যেই একটা ফাঁক আছে, [illegible]রণ প্রকৃতিকে যদি মানু[illegible] গ্রহণযোগ্য

করে তুলতে হয় তবে প্রকৃতিকে একটু সাজিয়েগুছিয়ে নিতে হয়, কিন্তু বিপদ হল অমনি চলে আসবে কৃত্রিমতা। এই কারণেই যা ছিল একটি স্বাভাবিক প্রান্তর তাই হয়ে উঠেছে আজ একটি কৃত্রিম বাগান, কারণ শান্তিনিকেতনে 'প্রকৃতি'কে বাঁচানোর জন্য মানুষকে 'বৃক্ষ রোপণ' করতে হয় প্রতি বছর। প্রকৃতিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের এত বড়ো উদাহরণ আর নেই। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মৈত্রীকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, দ্বন্দ্ব দেখতে পান নি।

শান্তিনিকেতনী শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে সামাজিক নিয়মশৃংখলার দাস না করে তাকে আপন খেয়ালে আর সবার সংগে বেড়ে উঠতে দেওয়া। সবাই মানবে, কিন্ডারগার্টেন ও মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির চাইতেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মহত্তর। 'তোতা পাখী'র লেখক খুব ভালো করেই জানতেন বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে খাপ খায় না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ আমাদের যে কারণে অশ্রদ্ধা জন্মেছে সে কারণটি বহু আগেই তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'বিদ্যার যাচাই', 'ছাত্র শাসনতন্ত্র', 'শিক্ষাবিধি', 'শিক্ষাসমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে যে শিক্ষাদর্শের দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন তারই বাস্তবরূপ হল তপোবন-মডেল। এই মডেলের সুফল অনেক, তবে এর প্রয়োগ, তা যতই সফল হোক, কখনই শিশুকে শ্রেণীভেদ ভুলিয়ে দিতে পারবে না। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাই। অনেক ব্যাপারে তৎকালীন রাজনীতিবিদদের চাইতেও তাঁর সমাজচেতনা প্রখর ছিল, কিন্তু তাঁর ব্রহ্মধ্যান সেই চেতনাকে মাঝে মাঝেই ব্যাহত করেছে। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—"সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর কিছু। ই'হাদের প্রত্যেকের ঘরের রকম-সকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ই'হাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।" এই ছাপটা দূর করা যায় কি করে? তিনি বলছেন, ধনীর শিশুকে যদি সংসার থেকে দূরে সরিয়ে অন্য শিশুদের সংগে মানুষ করা যায় একই অন্নে, একই বস্ত্রে, তবে সে আগে হয়ে উঠবে মানুষ তারপর হবে ধনীর ছেলে। বাস্তবে কিন্তু আমরা তা দেখি না। উকিল-জমিদার-বণিক-অধ্যাপকের সন্তান যতই দূরে দূরে মানুষ হোক, পিতামাতার সংগে আংশিক যোগাযোগেই সে বংশীয় ছাপ গ্রহণ করে। তারপর সংসারে এসে পড়লে তো কথাই নেই। শান্তিনিকেতনেও তাই ঘটেছে। ওখানে অধ্যাপনা করার সময় বারবার উপলব্ধি করেছি যে সামাজিক শ্রেণীভেদ শহর থেকে দূরে ব্রহ্ম-সাধনায় মগ্ন হলেই দূর হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাম্যবাদী আদর্শের কোনো বাস্তব ও সামাজিক ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা করেন নি। তাই তিনি বলেন, "অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন না—বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধনসঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে।" রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবতে পারেন নি যে ঐ বণিক ও ধনীরা, যারা সমাজকে বদলে দিচ্ছে, একদিন তার আদর্শের সমাধি রচনা করতে সাহায্য করবে। যে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'মানুষ আজ অপরের বিত্ত অপহরণ করে বড়ো হতে চায়', সেই রবীন্দ্রনাথ কি করে আশা পোষণ করতেন যে বণিক ও ধনীরা তাঁর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ভাবতে অবাক লাগে।

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন মাত্র, সারা ভারতে তা প্রযোজ্য কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি দেখে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"বিশ্বভারতীকে দুইভাগে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ সে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়তঃ শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সংগে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া (বিশ্বভারতী)।" এবারে প্রশ্ন, বাইরের সমাজে বিশ্বভারতী কতটুকু প্রভাব ফেলতে পেরেছে? বরং বাইরের সমাজটাই বিশ্বভারতীকে প্রভাবিত করছে। রাম নেই বলেই যে অযোধ্যার এই অবস্থা তা নয়, আসলে গোটা সমাজ যে দিকে যাবে অযোধ্যাকেও সেদিকে যেতে হবে, ইচ্ছা থাক বা না থাক। সমুদ্রই নদীর জল ফুলিয়ে দেয়, নদীর জল সমুদ্রে একেবারে হারিয়ে যায়। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সংগে মিশিয়ে আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।" বিশ্বভারতী কিন্তু আমাদের সমাজের মাটি থেকে রস টেনে বড়ো হয়নি, তার প্রাথমিক বৃদ্ধি সমসাময়িক সমাজের দিকে পিঠ দিয়েই হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন ভারতে তপোবন প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়, টোলও অদৃশ্য হতে থাকে আস্তে আস্তে, আজকে mass-education যুগে তপোবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধু একটি আদর্শ প্রয়াস হিসেবে প্রশংসা পেতে পারে, কিন্তু তা যে খানিকটা সময়-বিরোধী তা মানতে হবে। যে গাছ

সমাজের মাটি থেকে রস টানছেও না ও ফলও দিচ্ছে না, সমাজ তাকে মায়া করে না।

বস্তুতঃ আমরা ভুলে যাই যে 'বিশ্বভারতী' চিরকালই (এখন আরো বেশী) মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান, সর্বশ্রেণীর মানুষের নয়। এই মধ্যবিত্তের অধিকাংশই শহরের। শ্রীনিকেতন যদিও গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য, তবু কে অস্বীকার করবে যে শ্রীনিকেতন কোনোদিনও শান্তিনিকেতনের মতো সম্মান ও সুযোগ পায় নি? ইদানীং এই শ্রেণীভেদ আরো বেড়েছে। ওখানে অধ্যাপনা করার সময় এই অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করেছি। হয়ত রবীন্দ্রনাথ থাকলে এই পার্থক্য এত তাড়াতাড়ি আসত না, কিন্তু যখন আসত তখন তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যেত না। কারণ এই পরিবর্তনের শিকড় থাকে বৃহত্তর সমাজে, তা কোনো ব্যক্তির অনুভূতি বা ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। বৃহত্তর সমাজ বদলেছে, বদলেছে সেই সমাজের মধ্যবিত্তেরা; সেই মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বভারতী'ও বদলেছে; এই পরিবর্তনের মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পাওয়া যায় কি? শান্তিনিকেতনে যারা বাস করত তাদের অধিকাংশই ছিল শহরের কিম্বা অন্য জায়গার মধ্যবিত্ত। এখন তো তাদের সংখ্যা আরো বেশী। প্রায়ই দেখা গেছে, কোথায় শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে ছাত্ররা বাইরের সমাজকে নতুন দিক দেখাবে না তারাই বৃহত্তর সমাজে এসে আবার নতুন করে সেগুলো ভুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেন এমন হয়? এর কারণ এই যে আজকে তপোবনকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ নেই। শহরে প্রকৃতির সান্নিধ্য নেই, অতএব শহরের লোকেরা, যারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়, সবাই গ্রামে প্রকৃতির সংস্পর্শ পাবার জন্য আশ্রমে শিক্ষা নেবে এটা সার্থক হলে মন্দ হত না। কিন্তু বিপদ অন্যখানে। যে উদ্দেশ্যে এই প্রকৃতির শিক্ষা, সেটাই যে নষ্ট হয়ে যায় কিছুদিন পর। শহরের লোক কিছুদিন প্রকৃতির কোলে থাকলেই শহুরে মনোভাবকে একেবারে ঝেড়ে ফেলবে এমন ভাবা ভুল। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি প্রকৃতি নয়, তাকে ব্যবহার করা হয় রেস্ট হাউস হিসেবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কারণেই বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির স্নেহধন্য সন্তান হল গ্রামের কৃষকেরা, কেন-না তাদের কাজই তাদের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। গ্রামের কৃষক বা কারিগরেরা বংশপরম্পরায় পেশাগতভাবে প্রকৃতিকে যেভাবে জানে, শান্তিনিকেতনে দশ বছর অবস্থানও সে সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না।

"বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে"—এত মহৎ যার উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোকালে ছিল কিনা জানি না, আমাদের দেখতে হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অত বড়ো উদ্দেশ্যটা পড়লেই সমালোচনা আপনা আপনি নির্দয় হয়ে ওঠে। যদি উদ্দেশ্য সাধনার দিকে চোখ বন্ধ রাখি তবে 'বিশ্বভারতী'কে রম্যান্টিক অধ্যাত্মবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর কবিতা বলে মনে হয়, মনে হয় একটি মনোরম শিল্পকর্ম। এই কারণেই বোধহয় অনেকে এখনো 'বিশ্বভারতী'কে সাধারণ একটা বিশ্ববিদ্যালয় না করে, 'মিউজিয়ম পিস' হিসেবে সাজিয়ে রাখতে চান। কেউ কেউ রবীন্দ্র-অধ্যয়নের কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চান। যেভাবেই আজ বিশ্বভারতীকে আমরা কাজে লাগাই, রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শ অবহেলিত হতে বাধ্য। ঐতিহ্যবাদীরা অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে, বিশেষ করে কোলকাতা থেকে লোকেরা এসে শান্তিনিকেতনকে বদলে দিয়েছে। অভিযোগই প্রমান করে শান্তিনিকেতনের অন্তর্নিহিত শক্তি কত অল্প, বৃহত্তর সমাজের কাছে তাকে আজ আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাই। বিশ্বভারতী শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাঁচতে চায়নি, চেয়েছিল একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ আদর্শ জগৎ হয়ে থাকতে, বাইরের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজটার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। এ যেন রম্যান্টিক কবির সত্য-শিব-সুন্দরের অন্বেষণ এই ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল কাল প্রবাহের মধ্যে। এ যেন কীটসের গ্রিসিয়ান আর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর চেয়ে বহুলাংশে বাস্তবানুগ ও বিবেকানন্দের চেয়ে কোনো কোনো ব্যাপারে আরো উদার ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা যেভাবে সারা ভারতের সমস্ত মানুষের কাছে পৌছতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা হয় নি। এর কারণ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ধর্ম ও গান্ধীর ক্ষেত্রে রাজনীতি। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ঐকতানের কবির এ রকম কোনো সংযোগকারী সেতু ছিল না। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন তিনি পুরোপুরি নামেন নি তার কারণ হিসেবে বলেছেন যে সত্য সাধনার পথ অনেক, একটি নয়। নিভৃতবাসী প্রকৃতি-প্রেমিক কবি শাশ্বত সত্যের সন্ধান করেছেন, শুধু কাব্যেই নয়, কর্মেও, রাজনীতি করে নয়, সমাজ সংস্কার করে নয়, মনুষ্যত্বের একটি মন্দির রচনার মাধ্যমে। সেই মন্দিরটি ধুলামন্দির হল না, অনেক বেড়া ও লৌহ যবনিকা ঘিরে সে পবিত্র থাকতে চাইল। কিন্তু বাইরের আঘাতে তার প্রতিজ্ঞা টিঁকল না।

পুনর্বার উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা গেলেও এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে আমাদের দেশে এখনও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা ইউ জি সি যে কোনো সংস্থাই এখনো রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। যদি তাদের সেই সদিচ্ছা থাকে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর তুলনা করলে এইটুকু স্পষ্ট হয় যে কবি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চাইতে অনেক বেশী দূরদর্শী ও কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। 'শান্তিনিকেতনের হাওয়ায় কি যেন একটা আছে' এ রকম বহুব্যবহৃত ভাববাদী প্রশস্তি না করে বলতে পারি ওখানে এখনো ছাত্রদের জন্য খানিকটা দরদ ও দায়িত্ববোধ আছে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথের তপোবনকে আমরা পুরোপুরি গ্রহণ না করতে পারলেও, তাঁর শিক্ষানীতির একটা বড়ো অংশ আমাদের কাছে অপরিহার্য। 'শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহ চাই'—আক্ষরিক অর্থে এই বাণীর গুরুত্ব আজ নেই, কিন্তু যখন তিনি বলেন, বনের অর্থ 'সজীব বাসস্থান' এবং গুরু আমাদের 'সহৃদয় শিক্ষক' তখন তাকে অগ্রাহ্য করার পরিণাম হবে মর্মান্তিক। রবীন্দ্রনাথের স্বর্গকানন হারিয়ে গেছে, ঠিক, যে বিরাট আদর্শ নিয়ে তার সৃষ্টি হয়েছিল তা আর নেই বলে 'বিশ্বভারতী' আর পাঁচটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই এখন। এই স্বর্গকানন হারিয়েছি আমরা শুধু আমাদের ব্যর্থতার জন্যই নয়, ঐতিহাসিক নিয়মে এবং ঐতিহাসিক নিয়মেই যুগোপযোগী পদ্ধতিতে স্বর্গোদ্ধারের চেষ্টা থামতে পারে না এবং থামবেও না।

ঘর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ইয়াকুব খাঁর পায়ে-পায়ে কবর। ইয়াকুব খাঁর পায়ে পায়ে দোজখ। খোজারা কবরের ভিতর দোজখের আগুনে ঝলসাচ্ছে। সেই আগুনে পা বাঁচানো কঠিন। ইয়াকুব অনেক সাবধানে হেঁটে ফটকের কাছে পৌঁছেছিল। ফটকটা তখনও নড়ে উঠছে। কিন্তু ভারি দরজার একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে আর কাকেও সে দেখতে পায় নি।

ইয়াকুব মুণ্ডুটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজেছিল। ঠাসা অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সামনে ফাঁকা কিছু ঘাসের জমি। তার ওপাশে জাতীয় মহাসড়ক। সবকিছু অন্ধকারের মধ্যে একাকার। ছোট-বড় গাছ-পালার ঘন জঙ্গলে আবছা পোকা-মাকড়ের ডাক। আর আশ্চর্য, একটুও বাতাস নেই। সবকিছু শান্ত আর স্পন্দনহীন। সেই দুনিয়ার কোন চিহ্ন নেই আর—যে-দুনিয়াটা প্রতি সকাল থেকে সন্ধ্যা ইয়াকুব খাঁর মতো বুড়ো মানুষটিকেও কবর ছেড়ে পালাতে ফুসলায়। মহাসড়কের খানিক দূরে রেল-লাইন—সমান্তরাল। সেই সময় ট্রেনের শব্দ শোনা গেলে ইয়াকুব খাঁ ফটক বন্ধ করে ঘরে ফিরেছিল।

কানের ভুল হতে পারে। চোখের ভুল যেমন হয়। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অব্দি এই বিরাট ধ্বসে-পড়া নবাবী মসজিদ আর দালানবাড়ি—উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কবরখানায় তার জীবন কাটছে, তার বাপের কেটেছে, তার বাপের এবং তারও বাপের—ইয়াকুবকে কেউ ডাকে নি। সারাদিন ফটক খোলা থাকে। সবার দ্বার অবারিত। কত মানুষ আসে। মুখসুদাবাদ রিয়াসতের

একবার নয়, বেশ কয়েকবার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর স্পষ্ট নাম ধরে ডাকা-ডাকি করছিল। ইয়াকুব, ইয়াকুব! সেই সময় মাঝরাতে যেন বাতাসের তোলপাড় শুরু হয়েছে। যেন ছোট-বড় সবরকম গাছপালা দুলতে লেগেছে চারদিকে। ভাঙা দালানের কোণায়-কোণায় ইঁদুরগুলো দৌড়ে যাচ্ছে।... ইয়াকুব, ইয়াকুব! ইয়াকুবের বউ স্বপ্ন দেখে গোঙাচ্ছে। খরগোস কিম্বা শেয়াল একটা, লাফ দিয়ে ঘরের মেঝের পড়ল। পাটকাঠির বেড়ায় ঠাসা জানালাটা মড়-মড় করে উঠল।... ইয়াকুব, ইয়াকুব! ইয়াকুব সরকারী লণ্ঠনটা তাড়াতাড়ি জেবলে নিয়ে আগড় ঠেলে বেরিয়েছিল। বারান্দার নীচে সিঁড়ি বেয়ে নামলে যে সব পাথর বাঁধানো কবরগুলো পায়ের সামনে প্রতিরোধ, ইয়াকুব বিড়-বিড় করে গাল দিচ্ছিল তাদের ভূতগুলোকে।

খোজাদের কবরখানা দেখতে আসে। হরেক রকম মানুষ। পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষ। কত রকম গায়ের রঙ। জীবন্ত, ঝলমলে, তুখোড়, হল্লাবাজ। খোজা নবাব কী আমিরের সাদা টাটা পাথরে বাঁধানো কবরে বসে সিগ্রেট খায়। ফুল তুলে মেয়েরা খোঁপায় গোঁজে। বেলেল্লাপনা করে। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে দ্যাখে বুড়ো খিদমতগার ইয়াকুব খাঁ। রাগে গা জ্বালা করে। বেশরম আউরত! অসহ্য লাগলে সে গোমড়ামুখে বলেই ফেলে, বহুত্ খুব হয়েছে হুজুরেরা, আওর কী দেখবেন এখানে? ইয়ে তো মামুলী কবরখানা হ্যায়—খোজা লোগোঁকা। নবাবসাবকা বেগমসাবকী পেয়ারা লোগোঁকা গোর। ঔর কুছ নেহী। জী হাঁ।...

অসহ্য! তবু ভালো লাগে। ভালো লাগে রাতের দিকে—যখন নির্জনতা থমথম করে, ঝিঁঝিঁ ডাকে দিনের সেইসব দৃশ্যগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে। আঃ হা! ইয়ে তো হ্যায় জিন্দেগানী! এই তো হচ্ছে জীবন! সারাটি দিন জীবনই দেখেছে সে। এখন রাতে শুধু মৃত্যুর স্বাদ। মৃত্যুকে অনুভব করা। চারপাশে মৌতকা আন্ধেরা ঔর মৌতকা ঠান্ডে! মৃত্যুর অন্ধকার, মৃত্যুর শীতলতা শুধু। এবং তখনই দিনের রোদের প্রজাপতির মত সেই ফুটফুটে সুন্দর যুবক-যুবতীদের কথা তার মনে পড়ে যায়। আফসোসে ঘুম আসে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ইয়াকুব খাঁর...

বড়-বড় ঘরগুলো সব ধসে পড়েছে। দরজা-জানালা কোনটার খুলে নিয়ে গেছে চোরে—কোনটার বা অন্য কেউ। বারণ করতে মন চায় না ইয়াকুবের। নিচ্ছে নিক। যা কাজে লাগে, নিক্। তবে কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণান্ত বেচারার। জামিলা খাতুন—ওর বউ এখনও বুড়ো হয়নি। সে বলে, পাকাড়কে লে যায়ে গা তুমকো—হাঁ! কয়েদ হোগা!... ইয়াকুব ম্লান হাসে। কয়েদ হলে জামিলা আর তার ছেলে নশরত খাঁ ভিক্ষে করবে। তো তামাম মুর্শেদাবাদ জিলামে এহী মামুলী আদমীকা নসীব হ্যায়! ভিখ মাঙার নসীব।...অবশ্য সারা মুর্শিদাবাদ জিলা দ্যাখেনি ইয়াকুব। এমনকি লালবাগ শহরটাও ভালো করে দ্যাখে নি। সময় কোথায় তার? সারাদিন টুরিস্টবাবুরা আসে-যায়। তোতাপাখির বুলি বলতে-বলতে সামনে হাঁটে সে—ফির্, ইয়ে দেখিয়ে, খোজা নবাব-বাহাদুর হুসমত মীরজাকা কবর...ঔর ইয়ে খোজাসরদার মীরজা মুহম্মদ দানেশকা... ঔর......

দেয়াল-ঘেরা কবরখানা আর কেল্লার মত প্রকান্ড ভাঙা দালানের চারপাশে জঙ্গল। অজস্র ধ্বংসস্তূপ। ধারে-কাছে কোন বসতী নেই। অদূরে মুর্শিদকুলী খাঁর কবর—কাটরা মসজিদ। কবরখানার পিছনে উঁচু দেয়াল-ঘেরা পুকুর আছে। শ্যাওলা-ভরা সবুজ জলে ইয়াকুব খাঁর দুরন্ত ছেলে সাঁতার কাটে। ইয়াকুব তাড়া করে ছেলেকে। ...জলদী বে, জলদী নাহানা। ইস্কুলকা দের হো যায়ে গা!...ছেলে কিন্তু বাংলা বুলি বলে। কাটরা মসজিদের পাশে পাঠশালায় পড়তে যায়। আহা-হা, দুধের বাচ্চা—পাখির স্বরে পড়া বলে!...তো ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী কী রোশনি। জীবনের প্রোজ্জ্বল বাতি! ইয়াকুব খাঁ মধ্যরাতে ছেলের গায়ে হাত রেখে ভাবে, একদিন নশরত বড় হবে। বাবা-মাকে নিয়ে যাবে সুন্দর একটা ঘরে—যার চারপাশে কবরখানা নেই। সে চাকরী করবে—বাপের মত নচ্ছার চাকরী নয়, কবরখানায় নয়, জ্যান্ত মানুষেরা যেমন করে, ঠিক তেমনি। সে ভূতের প্রহরী হবে না। ভূতের ঘরে থাকবে না।

তবে, ডাকল কে? নির্জন বসতীহীন এ কবরখানায় এত রাতে কার দরকার হল ইয়াকুব খাঁকে। বিছানায় শুয়ে সে অনেকক্ষণ ভাবছিল। কানের ভুল ছাড়া কিছু নয়। সারা জীবন কবরখানায় যার বাস—সে ভূত আছে মেনেও ভূতের ভয় করে না। ইয়াকুব খাঁ অনেক রাতে ছোট্ট কবরখানাটার ওই প্রাঙ্গণে কাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে—হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছে, সঙ্গে-সঙ্গে তাড়া দিয়েছে, যাঃ, শো যা চুপসে নিঁদ্ যা। অশান্ত ব্যর্থ খোজাদের ভূতগুলো হয়ত সারা রাত সারা দিন ছটফট করে। এই তার ধারণা। কত জওয়ানী আসে—তাদের বুকের ওপর বসে ফুল ছেঁড়ে! গোরের ভিতর আফশোসে নড়ে খোজার আত্মা। দেহ দিয়ে দেহ ছুঁতে যায় হয়ত। ছোঁওয়া যায় না। কী দুঃখ, কী যন্ত্রণা বেচারাদের!......

ইয়াকুব খাঁ এই সব কথা ভাবছিল। খোজাদের কথা। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। আহা, খোদাতালা মানুষকে তো একবার মাত্র একটাই দেহ দেন! ইয়াকুব খাঁ মোনাজাত করছিল খোদার কাছে, ওরা যেন প্রত্যেকে একটা করে সুন্দরী হুরী (অপ্সরা) পায়। ওদের শান্তি হোক। ওদের জিন্দেগীর তৃষ্ণা তৃপ্ত হোক।......

হঠাৎ অস্পষ্ট ধুড়মুড় আওয়াজ হল কোথায়। ইঁট-চুন-বালি ঝরঝর করে খসে পড়ল। শেয়াল? তাই হবে। কিন্তু পরক্ষণে অস্পষ্ট কথাবার্তারও আওয়াজ শুনে চমকে উঠল ইয়াকুব। ওদিকে সারবন্ধ কয়েকখানা ঘর আছে। কোনটার ছাদ আছে, কোনটার নেই। ভিতরে ঘাস আর আগাছা—কোথাও যদি বা শূন্য, সারা মেঝেয় জীবজন্তুর নাদি ছড়ানো। ইয়াকুব ফের বিকৃত মুখে উঠল। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে বেরল সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান পাতল। হ্যাঁ, [illegible] চাপা স্বরে কথা বলছে। শরীর [illegible] উঠল তার। মানুষ, না ভূত ওরা? [illegible] গলায় চেঁচাল সে, কোন, কোন [illegible]

সঙ্গে-সঙ্গে চুপ। ইয়াকুব লণ্ঠনটা তুলে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামল। ওদিকের ঘরের সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক আলো ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু কথা বলার আওয়াজ সে স্পষ্ট শুনেছে। এটা কোনমতে ভুল হতে পারে না। ধ্বংসস্তূপের ওপর সাবধানে পা বাড়াল সে। শীতের মধ্যেও ঘাম দেখা গেল তার কপালে। তুলোর কম্বলটা গরম হয়ে উঠল যেন। শেষ প্রান্তের ঘুপটি ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা মানুষ। মানুষ—কারণ এখানের ভূত অমন পোশাক পরে না। প্যান্ট-কোট আর শাড়ি। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে। দরজার ভিতর লণ্ঠনটা উঁচিয়ে মুহূর্তে সে চিনতে পেরেছে ওদের। দিনের সেই বেলেল্লা লড়কা-লড়কী!

ইয়াকুবের মুখটা বিকৃত হাসিতে ভরে উঠল।...তো আপ হেঁয়া!...হিসহিস করে বলল সে, ইয়ে ঠিক নহী, ঠিক নহী! খান্দান আদমীকা গোরস্তানমে আপলোগ ক্যা মতলবসে আয়া? এত্তা রাতমে?

যুবকটি হাসছিল।...আরে এস, এস খাঁসাহেব। বিদেশি মানুষ, কোথায় আর যাব বলো তো! তখন তোমায় অমন করে বললাম, রাত্তিরটার মত জায়গা দাও—দিলে না। কী বেয়াড়া দেশ রে বাবা! কেউ জায়গা দিতে চায় না। অগত্যা কী আর করি, তুমিই বলো খাঁসাহেব?

যুবতীটিও নির্লজ্জার মত হাসছে!... একটা মাদুর দেবে? কিছু ভাড়া নেবে বরং। সক্কালে বাস ধরে আমরা লালগোলায় পদ্মা দেখতে যাব।

ইয়াকুব কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। এমন কাণ্ড তার জীবনে কখনো ঘটে নি। দিনের বেলায় যে ট্যুরিস্ট দলটি এসেছিল—একটু দেরী করেই এসেছিল—সন্ধ্যার সামান্য আগে, তাদের মধ্যে ছিল এরা। যেন ব্যাপারটাকে ফাঁকি দিয়ে এরা দুটিতে কেটে পড়বার মতলবে ছিল। কারণ ওরা সবাই বেরিয়ে গেলে কবরের পিছনের ফুলের ঝোপ থেকে আচমকা এদের আবির্ভাব। দরজায় দেউড়ি বন্ধ করে দিতে হবে। ইয়াকুব একথা বলতেই ওরা রাতের আশ্রয় চেয়েছিল। থাকবার মত জায়গা নেই—তাছাড়া... তাছাড়া ওদের কেমন বেলেল্লা মনে হচ্ছিল তার। দলের আড়ালে পরস্পর হাতধরাধরি, এমন কি ঝোপের ভিতর চুমু খেতেও দেখেছিল সতর্ক ইয়াকুব। মানুষ এমন বেহায়া হতে পারে! ওরা যে স্বামী-স্ত্রী নয়, তাও মালুম হয়েছে তার। বাঙালী হিন্দু জেনানা লোক সিঁথিতে সিঁদুর পরে। মেয়েটির সিঁথি লক্ষ্য করেছিল সে। সিঁদুর নেই। তাজ্জব!......

ইয়াকুব ঘড়-ঘড় করে বলল,...হামি গরীব আদমী বাবু। রাতমে এত্তা পেরেসানী দিতে এলেন কেন? শহরমে যান, হোটেল আছে বহুত। শহরমে বহুত ভদ্দর আদমি ভি আছে। সবায় জায়গা দেবে। ইয়ে গোরস্তানমে কাহে আপলোগ থাকবেন?

যুবকটি পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করল।...তোমার বখশিস, ইয়াকুব খাঁ। বড্ড বিপদে পড়েছি। তা না হলে কি এখানে আসি আমরা? তুমিই ভেবে দ্যাখ।

বিপদটা কী ভেবে পাচ্ছিল না ইয়াকুব। পাঁচ টাকা বখশিস! কবরখানার এই প্রহরী—যে ট্যুরিস্টদের কাছে গাইড হয়ে ওঠে, তাকে বড়জোর দু-চার আনা কেউ দিয়ে যায় দয়া করে। আর ওই পাঁচ টাকা দিলে লালবাগের যে কোন হোটেলওয়ালা ওদের থাকতে দিত। এই শীতে লেপ-কম্বলও দিত। তবে কেন এ কবরখানায় থাকবার জেদ ওদের? সে বলল, কুছ সমঝমে নেই আতা বাবুজী। আপলোগ হোটেলমে যাইয়ে।

যুবতীটি ম্লান হাসল।...এত রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ইয়াকুব। তুমিও তো মানুষ।

তর্ক করতে ভালো লাগছিল না ইয়াকুবের। সে বিরক্ত কণ্ঠে বলল, এ কি আপনাদের মতন আদমির জায়গা আছে হুজুর? জংলী গোরস্তান। সাপ আছে, বাঘ ভি আছে। তো কই খারাপ হয়ে গেলে যত পেরেসানী হামার হবে!

যুবকটি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু থাকছি। পারো তো জোর করে বের করে দাও!

কী নাছোড়বান্দা রে বাবা। ইয়াকুব গুজ-গুজ করতে-করতে ঘরে এল। গোলমাল থাক্ ওরা—তার কী? গায়ের জোরেও এঁটে ওঠা যাবে না। জওয়ান লোক। তাক্‌দ আছে গায়ে। ইয়াকুব বুড়ো হয়েছে। তাছাড়া চেঁচামেচি করে তো লাভ নেই। কে শুনতে পাবে? আশে-পাশে কোন বসতী নেই যে বিপদে-আপদে লোকের সাহায্য পাবে সে।

স্তূপগুলোর সাবধানে পা ফেলে নামবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, টাকাটা নিয়ে এলেই ভালো হত! পাঁচ-পাঁচটা টাকা! মাসে তিরিশ টাকা মাইনে পায় সে। এ বাজারে কী কষ্টে যে দিন কাটছে, বলার নয়। জামিলা খাতুন শুনলে তাকে বকবে। তার আক্কেলের নিন্দে করবে। ওই টাকায় কালকের দিন কী পরের দিনটিও হেসে-খেলে কেটে যেত! আফশোস লাগে।

নিজের ঘরের বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। টাকাটা চোখের সামনে অন্ধকারে উড়ছে তাজা প্রজাপতির মত। যেন গায়ে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তুলোর কম্বলটা গরম হয়ে উঠছে। ফের গিয়ে বেহায়ার মত চেয়ে বসবে নাকি?... বরং......

বুদ্ধি জেগে উঠল মগজে। বরং একটা কাজ করা যেতে পারে। বারান্দার এক কোণে পাটকাঠির বোঝা আছে একটা। জামিলা আশে-পাশের এলাকা ঘুরে দিনমান ওগুলো সংগ্রহ করে আনে। এ তল্লাটে প্রচুর পাটের চাষ হয়। নালায় বা খালে-ডোবায় চাষার পাট পচতে দেয়। কিনারায় প্রচুর ভাঙাচোরা পাটকাঠি পড়ে থাকে। চুপি-চুপি সেগুলো নিয়ে আসে গরীব-দুঃখী মানুষেরা। ইয়াকুব খাঁ খাঁটি মানুষ—চোর নয়, বদমাস নয়। তার বউ চুরি করবে, এটা সে অপছন্দ করে। কিন্তু উপায় কী? চোখে দেখেও তো সব মেনে নিতে হয়।

এও সেই রকম। মেনে নিতে হবে ইয়াকুবকে। ওই মানুষ দুটিকে সে এক বোঝা পাটকাঠি দিয়ে আসবে। বলবে, এর ওপর শুয়ে নিঁদ যান। একটা বাড়তি মাদুর বা তালাই থাকলে দিতাম। নেই। বউ যা-একটা বোনে, বেচে আসে বাজারে। বড় কষ্টে বাস করি হুজুর!

...হ্যাঁ, ওনাদের জাড় ভি লাগবে। তো কী করা যায়? হামার কম্বল ভি নেই একটা। কাঁথা আর চট আছে। দোঠো বালিশ আছে। ঠিক হ্যায়! এক বালিশ আপনাদের দিচ্ছি। ঔর পছন্দ হলে হামার চট লিন।

নিঃশব্দ হাসিতে ইয়াকুবের তোবড়ানো মুখটা ফুলে-ফুলে উঠতে থাকল।... গা জড়াজড়ি শুয়ে থাকবে দুই মর্দানা-ঔরৎ। তারপর ওরা...তারপর...হাসিটা আওয়াজে ভাঙল এবার—খিক্ খিক্ খিক্ খিক্!...বড়া তাজ্জব লাগে। এমনি করে বাচ্চা জন্মায় দুনিয়ায়। দুনিয়ায় বাচ্চা জন্মাবে বলে আদমিরা নিরালা ঘর ঢুঁড়ে বেড়ায়। আফশোস! কে ঘর পায়, কে পায় না। ওরা পায় নি। তাই ওরা চলে এসেছে খোজাদের কবরখানায়। জানোয়ারের নাদির ওপর শুয়ে পড়তে চাচ্ছে। বাচ্চার জন্ম দেবে বলে দুটি মানুষের খুন টগবগ করে ফুটবে যৌবনের উত্তাপে।

দেব, হামি ঘর দেব আপনাদের। হাঁ, মৌতের আন্ধার ঘরে জিন্দেগীর রোশনি জ্বালুন হুজুর-হুজুরাইন!......

তারপর পাটকাঠির বোঝা, নিজের বালিশ আর চটটা নিয়ে ইয়াকুব দরজার কাছে যেতেই হুড়মুড় করে উঠে বসেছে দুটি মানুষ। লণ্ঠনটা দম বাড়ানোর ফলে অফেজো হয়ে উঠছে ততক্ষণে। কাচে ঘন কালি জমেছে। স্পষ্ট কিছু নজরে পড়ে না। তবু ইয়াকুব দেখতে পেল দৃশ্যটা। পোশাক-আশাক বিছিয়ে ওরা শুয়ে ছিল দুটিতে। এত শীত! তবু ওদের নগ্ন দেহ দুটো যেন ঘামে চকচক করছিল। ইয়াকুব মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলল, থোড়া

বিস্তারা কা বন্দোবস্ত করেছি হুজুর! তকলিফ হলেও নাচার।

পুরুষটি গর্জে উঠেছে ততক্ষণে।... যাও, যাও বলছি এখান থেকে। ভূত কোথাকার!

শের হয়ে উঠেছে জওয়ান আদমি। সে তো ঠিকই। এখন ওনার মধ্যে জানোয়ার জেগে উঠেছে। বুড়া ইয়াকুবকে খাবায় পিষে ফেলবে। নখে বুকটা ফেড়ে দেবে একেবারে। ...তবু ইয়াকুব লুকিয়ে হাসছিল।...বিস্তারা হো'য়া থাকল হুজুর। হামি যাই। আরামসে 'নিদ যান।

নাঃ বখশিসটার কথা এখন তোলা যায় না। চিত নয়। জিনিসগুলো দরজায় সামনে দুম্দাড় নামিয়ে রেখে ব্যস্ত পায়ে চলে এল সে। লণ্ঠনটা সাফ না করলে আর কিছু দেখা যাবে না। বারান্দায় বসে ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে ফেলল সে। মুহূর্তে সারা কবরখানা ঘন অন্ধকারে গভীর হয়ে উঠল। কুলুঙ্গী হাতড়ে কিছু পাটের ন্যাতা আনল সে। কাচ ঠান্ডা হবার অপেক্ষায় বসে রইল। সামনে বারান্দার নীচে খোজাদের কবর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে হল, প্রতিটি কবরে ভূতগুলো দেহ পাবার জন্যে ছটফট করে উঠছে। আর এ কী তাজ্জব! সেই সব ভূতেরা এসে পড়েছে তার কাছে—খুবই কাছে। বড় ঠান্ডা তাদের অস্তিত্ব। পা বেয়ে, জানু উরু তলপেট পেরিয়ে, বুক থেকে গলা ঠোঁট মগজ অব্দি পোকার মত কিলবিল করে নড়ছে। সমস্ত দেহ হিম হয়ে উঠছে ক্রমাগত। হিমে আড়ষ্ট ইয়াকুব সাঁতার কাটছিল—অসহায় নড়াচড়া, কাকুতি, আগুনের জন্যে আর্তনাদ। অথচ গলা দিয়ে স্বর ফোটে না কেনামতে। দশ বছর আগেও ইয়াকুব তার মধ্যবয়সী বিবির গলা জড়িয়ে শুয়ে থেকেছে। নিভন্ত আগুনের সামান্য তাপে শেষ পুলক অনুভব করেছে। হায়, এখন শুধু ছাই আর ছাই। ছাই আর হিম। ওই কবরে শুয়ে-থাকা মানুষগুলোর দলে চলে গেছে ইয়াকুব। কে যেন ক্রমাগত ফিসফিস করে বলছে, ঔর ইয়ে হ্যায় খোজা ইয়াকুব খাঁকা গোর......

পাটের ন্যাতা রেখে উঠে দাঁড়াল সে। মনে হল চারপাশের গাছপালা বনজঙ্গল জুড়ে অদ্ভুত ঝড় শুরু হয়েছে। কবরখানা নড়ছে। ঘরগুলো দুলছে। পিছনের মসজিদের গম্বুজটা ভেঙে পড়ছে। দুনিয়া চৌচির হয়ে যাবার মত এক প্রচণ্ড আলোড়ন অন্ধকার রাতটাকে তছনছ করে ফেলছে। পায়ের নীচে মাটি দুলছে। বারান্দার থামটা আঁকড়ে ধরল সে। অস্ফুট বোবায়-ধরা স্বরে চিৎকার করে উঠল, বহু, জামিলা, জামিলা খাতুন!

পরক্ষণে ভয়ঙ্কর আওয়াজ হল খুব কাছেই। আড়াই শো বছরের কবরখানার অবশিষ্ট জীর্ণ দালানটা হঠাৎ মুছে গিয়ে দক্ষিণের ঢাকা আকাশটা খুলে দিল। ধুলোর ঝড়ে ভেসে চলেছে ছোট-বড় উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল অজস্র নক্ষত্র। হয়ত জামিলাই চেঁচিয়ে উঠেছিল, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও!

× × ×

গল্পটা শেষ করে মুরশিদাবাদ খোজা কবরখানার প্রহরী ইয়াকুব একটু হাসল। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।...হা সাহাব, ওই ঘরগুলো মেহমান আর মোল্লামৌলবীদের জন্যে বানিয়েছিলেন নবাব। সেই মাঝরাতের 'ভুঁইকম্পে' সব ধ্বসে যায়। আর মেরামত হয় নি। কী হবে বলুন? মুরশিদাবাদে তো শুধু কবর আর কবর। শুধু কবর দেখতেই লোক আসেন। আর তো কিছু নেই। যেটুকু আছে, জলদি সেটুকুও খতম হয়ে যাবে। তারপর......

বললাম, তোমার ছেলে কই? কোন ক্লাসে পড়ে?

ইয়াকুব বলল, ছেলে কলেজে পড়ছে হুজুর। খরচ কোনরকমে নিজেই চালাচ্ছে। থাকে বহরমপুরে। শনিবার বিকেলে বাড়ি চলে আসে। সোমবার চলে যায়। খুব 'হেটওয়ালা ছেলে' হুজুর। হাঁ—'কলারশিপ' পেয়েছিল একজামিনে। তবে সামনেবার আর এসে হামাকে দেখতে পাবেন না। ছেলের চাকরী হলেই নিয়ে পালাবে এ ভূতের ঘর থেকে। এখানে কি আদমি থাকে হুজুর?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা ইয়াকুব, ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছিল দেখছি। ওগুলো কেউ সরায়নি নিশ্চয়। সরালেই ওদের দেখতে পেত।

ইয়াকুব ঘাড় নাড়ল। নির্বিকার মুখে বলল, কী দরকার? আমি কাকেও বলি নি ওনাদের কথা। ওনাদের আত্মীয়কুটুম্ব শরমে পড়তেন। পড়তেন না হুজুর?

এত নিষ্ঠুর এই লোকটা! আমার খুব খারাপ লাগল এতক্ষণে। দুটি যুবক-যুবতী ওই ধ্বংসস্তূপে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে, কাকেও সেকথা জানায় নি সে! নাকি সবটাই বানানো গল্প? হয়ত আমার যেমন, আরো কতজনকে এই গল্প বলে চমক লাগিয়েছে ইয়াকুব।

সম্ভবত তাই। ইয়াকুব আমাকে একটা মজাদার গল্প শুনিয়েছে মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হল মনের ভিতর। হাসতে-হাসতে বললাম, তুমি লেখাপড়া জানলে জব্বর কিতাব লিখতে পারতে ইয়াকুব খাঁ। খুব চমৎকার গপ্‌পু শায়েরী করতে পারতে!

কাহে? ইয়াকুব বিস্মিত দৃষ্টে তাকাল আমার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ঠিক হ্যায়। আসুন। আপনি বহুত শরীফ আদমি। ঔর আপনাকে বলতে ভি হামার ইচ্ছা হল। কিসিকো এ বাত হামি বোলেনি হুজুর, খোদাকসম। আইয়ে-দেখিয়ে।

দক্ষিণ-পুর্বের ধ্বংসস্তূপের পাশে একটা মাত্র দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। সেখানে আঁকা-বাঁকা হরফে নাম লেখা আছে অনেকগুলো। একদা ট্যুরিস্টরা এসে লিখে গেছে। এখন এদিকে কেউ আসে না। এলে কবর দেখেই চলে যায়। ইয়াকুব আঙুলে তুলে দেখাল—দেখিয়ে!

মুহূর্তে আমার গা শিউরে উঠেছে। পা দুটো কাঁপতে লেগেছে। ইটের স্তূপের ফাঁকে আগাছার ঝোপ। তার শেকড়ে জড়ান একরাশ ধূসর চুল। তার পাশেই একটা মড়ার মাথা। কিছু হাড়। ইটগুলো কবে কে হয়ত সরানোর চেষ্টা করেছিল। সে চিহ্ন স্পষ্ট। ইয়াকুব হাঁটু দুমড়ে বসে কয়েকটা ইঁট আর চুনসুরকীর পিণ্ড সরাতে থাকল। মাকড়াসার জাল উঁইঢিবি ঝোপ। তার নীচে আরেকটা মড়ার মাথা। এক টুকরো ধূসর কাপড়। কাপড়ের টুকরোটা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, ক্যা দেখু রাহা?

গুঁড়ো হয়ে গেল কাপড়টুকু। কিছু পেলাম না। মুণ্ডু দুটোর দিকে তাকালাম। দেহের জন্যে রক্ত-মাংস বাসনা-কামনা আর প্রেম-ভালবাসার জন্যে একটা গভীর কাকুতি আমাকে অস্থির করে তুলছিল। দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। পারছি না।

সযত্নে ঢেকে দিল ইয়াকুব। তারপর হাত দুটো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। শাদা ভুরু। শাদা গোঁফ-দাড়ি, তোবড়ানো বিবর্ণ মুখ—আর চোখের কোণায় পিচুটি ছাপিয়ে জল ঝরছে। দাড়ি ভিজে যাচ্ছে বুড়ো প্রহরীর।...হাঁ ইয়ে আফশোস জিন্দেগীকা।...মাথা বারবার নড়ছে দুপাশে।...আদমি এই সাঁতারাহু (এমন করে) ঘর ঢুঁড়ে রাহা দুনিয়ামে। হা খোদা!

ঘর! মানুষেরা জন্ম দিকে চায় বলে মানুষেরা জন্মাবে বলে মানুষেরা ঘর ঢুঁড়ে ফিরছে। নিভৃত নির্জন ঘর। প্রকৃতির গভীরে যেখানে উঁইঢিবি জানোয়ারের নাদি ব্যাঙের ছাতা, ঐতিহাসিক পুরনো দালান। তবু কে পায়, কে পায় না। কে পেয়েও সব হারায়।

বললাম, চলি ইয়াকুব। তিনটের ট্রেন। সেমুহূর্তে ঘরের জন্যেই আমার মনে তাড়া লেগেছে।

আকাদেমিসিয়ান লেজনি এবং দুশান জবাভিটেল-এর অনূদিত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কিছু নিদর্শন।

চেক দেশে ভারতচর্চা এবং অন্যান্য

চিন্মোহন সেহানবীশ

বিদেশযাত্রার একটা সুযোগ জুটে গেল [illegible]চমকা। বাঙালী একান্ত ঘরমুখো বলেই [illegible]য়তো তার মনটা মাঝে মাঝে সুদূরের [illegible]য়াসী হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক এক-[illegible]য়েমির তাড়নায়। সুতরাং বেরিয়ে পড়-[illegible]াম দ্বিরুক্তি না করে।

ঠিক নিরুদ্দেশযাত্রা অবশ্য নয়, উত্তর-[illegible]রু বা সাহারা মরুতে দুর্গম যাত্রাও নয়। [illegible]মিকা পড়ে পাছে কেউ ভুল বোঝেন তাই [illegible]াড়াতাড়ি বলে রাখি, বিদেশ বলতে এখানে [illegible]নতান্তই চেকোস্লোভাকিয়া আর সোভিয়েত [illegible]উনিয়ন। তা'ও শুধু প্রাগ, মস্কো ও [illegible]লনিনগ্রাড, হেঁটে বা সাইকেলে নয়, [illegible]কালের একান্ত মামুলী বাহন, এরো-[illegible]প্লেনে চড়ে। তা'ও আবার এ দেশে দশদিন, [illegible]ও দেশে দশদিন, মোট মাত্র বিশদিনের [illegible]য়াদে। তার চেক্ বা রুশ বা অন্য কোন [illegible]সাভিয়েত ভাষাই জানি না। তাই ও দুই [illegible]দেশের ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান তাবৎ হাঁড়ির [illegible]খবর নিশ্চয়ই কেউ আশা করবেন না আমার [illegible]কাছ থেকে। আবার "প্রাগকে চেকোস্লো-ভাকিয়াবাসিগণ 'প্রাহা' বলিয়া থাকেন। প্রাগ হাওয়াই বন্দরে নামিয়া একটি ট্যাকসি [illegible]পিয়া বসিলাম। আহা, কি মনোরম দৃশ্য!" —ধরনের ভ্রমণকাহিনী ফাঁদারও তেমন সখ নেই। শুধু চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারত-চর্চা প্রসঙ্গে ওখানকার [illegible]তারজন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে যা জানলাম তারই কিছু বৃত্তান্ত এখানে লিখছি 'অমৃত' পাঠকদের জন্যে।

একটা কথা বলে রাখি এখানেই। গিয়েছিলাম অন্য কাজে, এটা তাই নিতান্তই রথ দেখতে গিয়ে কলাবেচার সামিল। নইলে হয়তো আরো কিছু খবর সংগ্রহ করা যেত অল্প আয়াসেই।

যে সংস্থাটির আমন্ত্রণে প্রাগে গিয়েছিলাম তার বিশাল দপ্তর মস্ত চওড়া এক রাস্তার উপরে। প্রথম দিনই সেখানে ঢোকার মুখেই চোখে পড়ল ফলকে লেখা সড়কের নাম—'ঠাকুরোভা'। দোভাষী বন্ধু জানালেন এ রাস্তা আমাদের কবির নামাঙ্কিত হয়েছে হাল আমলে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভালো লাগল এ প্রসঙ্গে—ইয়োরোপ, আমেরিকার অন্য সব দেশের মতো কবি এখানে 'টেগোর' নন। প্রায় আমাদের মতোই স্বচ্ছন্দে এঁরা বলেন ও লেখেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। চেকোস্লোভাকিয়ার বাংলাচর্চার হাতেখড়ি এ শতকের বিশের কোঠায়, অধ্যাপক লেজনির হাতে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক লেজনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের যোগাযোগের কথাও সকলেরই জানা। কাজেই এহেন গুরুর তত্ত্বাবধানে চেকোস্লোভাকিয়ার বাংলাচর্চা যে অন্য দেশের তুলনায় আরো বেশিদূর পৌঁছবে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এর আগে [illegible]তিনজন চেকোস্লোভাকিয়ার মান[illegible] আমার সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল : শ্রীমতী মিলাডা [illegible], শ্রীমতী বোজেনা হল-গিয়োভা ও [illegible] দুশান জবাভিটেল। এর

মধ্যে শ্রীমতী গাঙ্গুলী তাঁর স্বামী, সুপরিচিত লেখক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক মোহনলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের (দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুদিন হল তাঁকে আমরা হারিয়েছি অকালে) সহযোগিতায় কারেল চাপেকের কিছু ছোটগল্প ও আরো কিছু কিছু চেক্ লেখার অনুবাদ করেছেন বাংলায়—আবার এদেশ সম্পর্কেও কয়েকটি বই লিখেছেন চেক ভাষায়। মোহনলালের লেখা চেকোশ্লোভাকিয়ার সরস ভ্রমণবৃত্তান্ত—'পুনর্দর্শনায় চ' আমাদের সকলেরই ভালো লেগেছিল এ দেশে।

শ্রীমতী বোজেনা প্রাগের 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে' 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। এঁর বয়স ৩০ বছর মাত্র কিন্তু গবেষণার বিষয় মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা। এই গবেষণার সূত্রে কিছুদিন আগে যখন তিনি এখানে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তিনি বাংলা বলেন অল্প অল্প। মাস কয়েক হল তিনি দেশে ফিরে গেছেন এখানকার কাজকর্ম সেরে।

ডঃ দুশান জ্বাভিটেলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহু বছরের। বেশ কয়েকবার তিনি এ দেশে এসেছেন এবং বন্ধুত্ব অর্জনের আশ্চর্য প্রতিভার জোরে অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধুকে আকর্ষণ করেছেন তাঁর দিকে। তিনি অধ্যাপক লেজ্নির ছাত্র এবং বর্তমানে প্রাগের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের' 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' বিভাগের কর্ণধার। তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানের সামান্য একটি নমুনা ময়মনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা বিষয়ে গবেষণার জোরে তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট প্রাপ্তি। তাঁর গুরুর মতো তিনিও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার অনুবাদ ও রবীন্দ্রসাহিত্যবিষয়ক একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন চেক্-ভাষায়। বাংলা তিনি বলেনও চমৎকার। মনে পড়ে ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে যে রবীন্দ্রশান্তিমেলার আয়োজন হয়েছিল তাতে তিনি আমার মতো হাজার হাজার বাঙালীর চিত্তজয় করেছিলেন তাঁর একটি কথায়—'আমরা বাঙালী, আমরা আড্ডা ভালোবাসি।'

এবার কিন্তু আমার মুস্কিল হল এই যে আমি যখন দুশানের শহর প্রাগে পৌঁছলাম তখন তিনি আমার শহর কলকাতায়। আর শ্রীমতী বোজেনা প্রাগে থাকলেও তখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আটক ছিলেন। কাজেই এ সব ব্যাপারে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কিভাবে করা যাবে ভাবছি এমন সময়ে একটা সুযোগ মিলে গেল হঠাৎ করে। দেশ ছাড়ার আগে ভিসার জন্য দিল্লীর চেক্ এমব্যাসিতে গেলে সেখানে একটি চমৎকার বই হাতে এল—Looking towards India. । লেখকের নাম ডঃ মিলোশলাভ ক্রাসা। প্লেনে ঐ বইটিতে চোখ বুলিয়েই ঠিক করলাম এঁর সন্ধান পেতে হবে আমার কাজ হাসিলের জন্যে। বইয়ের পিছনকার লেখকপরিচিতি থেকে জেনেছিলাম তিনি প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের কর্মী ও চেকোশ্লোভাক-ভারত সমিতির সভাপতি। কাজেই একদিন সকালে ইনস্টিটিউটে গিয়ে তাঁকে ধরলাম। ডঃ ক্রাসা ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী। তাঁর বিশেষজ্ঞতা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস প্রসঙ্গে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশীয় দেশগুলির অবস্থান্তর বিষয়ে যে চেক্ গবেষকবৃন্দ তত্ত্বতল্লাসী করছেন তিনি তাঁদেরও একজন। বয়স ৫০ বছর অর্থাৎ ডঃ জ্বাভিটেলের চাইতে বছর পাঁচেক বড়। পরিষ্কার ইংরেজী বলেন, তাই বেশ আলাপ করা গেল দোভাষীর মধ্যস্থতা বিনাই। ডঃ ক্রাসা আমার আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর ঐ বিভাগের আর এক সহকর্মী, ডঃ জান মারেকের সঙ্গে। এঁর গবেষণার ক্ষেত্র ভারতের ইসলামী ইতিহাস। বয়স চল্লিশের মতো। উর্দু ও ফরাসী ভালো জানেন। বেশ কিছু তর্জমা করেছেন ইকবালের কবিতা।

ডঃ ক্রাসা ও ডঃ মারেকের সঙ্গে কথাবার্তায় ও তাঁদের যোগানো পুস্তিকাদি থেকে যা জানতে পারলাম তা মোটের উপর এই রকম :

যে দেশটি আজ ভূগোলে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে পরিচিত সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহ বহু দিনের। অনেক দিন অবধি তাঁরা যে কৌতূহল মেটাতেন যে তিনটি সূত্রে সেগুলি হল : প্রথমত, ভারতবর্ষ থেকে সুগন্ধি মশলার আমদানী, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের সঙ্গে এবং সর্বশেষে, ন'ম শতক থেকে চেক্ ভাষায় তর্জমা শুরু হওয়ার পর বাইবেলের সঙ্গে পরিচয়। কারণ যে বিদেশী ব্যবসায়ীরা মশলা যোগাতেন তাঁরা তারই সঙ্গে খবরও যোগাতেন ভারতবর্ষের। সে খবর বহুলাংশেই আজগুবী ও অলৌকিক—তার থেকে ধারণা জন্মাত আশ্চর্য সমৃদ্ধ এক সুদূর দেশের। আবার ভারতবর্ষের উল্লেখ চেক্‌ভাষীরা পেতেন একদিকে যেমন হেরোডোটাস, মেগাস্থিনিস, প্লিনি, টলেমির লেখায় তেমনি আবার বাইবেলেরও কোন কোন জায়গায়। বোহিমিয়ার মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সম্ভবত ঐ সূত্রেই পরে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ভারতে খৃষ্টীয় পাদ্রীদের কাল্পনিক ধর্মপ্রচার অভিযান সংক্রান্ত নানা কিংবদন্তীর। আবার আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনীও কিছু

অধ্যাপক পেট্টোলড

আকাদেমিসিয়ান ভিনামেন্স লেজনি

মরিস ভিন্টারনিৎস

পল্লবিত হয়ে পরিচিত হয়ে উঠেছিল চেক্-ভাষীদের ভিতরে। বলা বাহুল্য ভারত সম্পর্কিত ঐ সব কাহিনীতে অনেক সময়ে তাঁদের নিজস্ব কল্পনারও রঙ চড়ত বেশ জোরালো ভাবেই।

মধ্যযুগে মার্কো পোলোর মতো পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তেও চেক্‌ভাষীরা খবর পেলেন ভারতবর্ষের। আবার অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের জীবনকাহিনী গোড়ায় খোটানি ও প্রাচীন উইঘুর ভাষায় তর্জমা হয়ে পারস্যের ম্যানিকিয়ান সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তার মধ্যে আবার ঢোকে নানান খৃষ্টান ও জোরোয়াস্ট্রিয়ান উপাদান। তারপর ক্রমান্বয়ে পহ্লবী, আরবী, আর্মেনিয়ান ও গ্রীক ভাষায় তর্জমা হয়ে ঐ কাহিনী চেস্টোরিয়ান সিরীয়ান ও ল্যাটিনে রূপান্তরিত হয়। তার থেকে চোদ্দো শতকে অবশেষে সেটির অনুবাদ হয় চেক ভাষায়। তেমনি আবার ঐ শতকের শেষভাগে টমাস স্টিট্‌নির 'বরলাস ও জোশাফাট' কাহিনীতেও প্রতিফলিত দেখা যায় বৌদ্ধ কাহিনীর বিচিত্র রকমফের।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিও অনেক ঘুরপথে চেক্‌ভাষীদের কাছে পৌঁছয়। পারস্যের শাহের নির্দেশে প্রথমে পহ্লবী ভাষায় তর্জমা হয়ে তারই আবার প্রাচীন সিরীয় ও পরে গ্রীক অনুবাদ মারফৎ ওগুলি ইউরোপে পৌঁছয় এগারো শতকে—হয়তো আরবী তর্জমা মারফৎ তার কোন কোন গল্প এর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল সেখানে। চেক ভাষায় তার প্রথম তর্জমা ১৫২৮ সনে, আর দেখতে দেখতে সেগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তখন থেকে আজ অবধি তার বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বারবার, আর সেগুলি সম্পর্কে নানা লেখাও প্রকাশিত হতে থেকেছে চেক্ ভাষায়। অস্ট্রিয়ান হ্যাপস্‌বুর্গদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও যে গল্পগুলিকে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রমাণ একজন চেক্ লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে স্বৈরাচারী শাসনে অনেক সময়ে সত্য কথা বলা সম্ভব একমাত্র জন্তু-জানোয়ারের মুখ দিয়েই। কটাক্ষটা অবশ্যই হ্যাপস্‌বুর্গ শাসকগণের প্রতি। চেকদের ভিতরে পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তা আজো অম্লান। কয়েক বছর আগেও প্রকাশিত হয়েছে তার সাম্প্রতিকতম সংস্করণ।

১৩৪৮ সনে চতুর্থ চার্লস এক জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন প্রাগে। তাঁরই নামাঙ্কিত ঐ চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে মধ্য ইউরোপে ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম তাই নয়, ইউরোপের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও অন্যতম। ইটালির বোলোগ্না, বৃটেনের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, জার্মানীর হাইডেলবার্গ ও ফ্রান্সের সর্বনের সঙ্গেই এ দিক দিয়ে তার তুলনা। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, জন হুসের নেতৃত্বেই পনেরো শতকের গোড়ায় শুরু হয় এক ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন। আসলে ধর্মসংস্কারের পতাকাতলে সেটি ছিল এক বিশাল কৃষক-বিদ্রোহ। জন হুস্‌কে জীবন্ত চিতায় পুড়িয়েও সে আন্দোলনকে সহজে দমন করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত ঐ বিপুল আন্দোলন পর্যুদস্ত হয়ে গেলে ষোলো ও সতেরো দুই দশক জুড়ে চলতে থাকে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকার রাজত্ব। ইতিমধ্যে ১৫২৬ সনে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের অধীনে চেক্‌ভাষী বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া হাঙ্গেরি (তারই অংশ তখন ছিল শ্লোভাকিয়া) ও অস্ট্রিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোড়াপত্তন করে পরবর্তীকালের বহুজাতিক অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের। তারপর ১৬২০ সনে বোহিমিয়ার বিদ্রোহ প্রচেষ্টা শ্বেত পর্বতের যুদ্ধে পরাস্ত হলে তার যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অবশিষ্ট ছিল তা'ও ধুয়ে মুছে গেল এবং শুরু হল চেক্‌ভাষীদের দীর্ঘ তিনশ বছরের (১৬২০-১৯১৮) বিদেশী শাসন।—হুসের সময় থেকে যে প্রটেস্টান্ট ধর্মমত দানা বেঁধে উঠেছিল তাকে বেআইনী ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠা করা হল ক্যাথলিক একচ্ছত্রতা। সেই ধর্মসংস্কার-বিরোধিতার প্রধান পান্ডা হিসেবে জেশুইট পাদ্রীর দল আধিপত্য চালাতে থাকে শুধু ধর্ম নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও। তাদের ফর্মান অনুসারে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়া শুরু হল দেশের ভাষায় নয়, ল্যাটিনে। তারপর ১৭৮০ সনে সেখানে অস্ট্রিয়ান রাজবংশের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মান ভাষার আধিপত্য। তারো প্রায় ১০০ বছর পরে ১৮৮২ সনে প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাগ করা হয় জার্মান ও চেক্ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে দীর্ঘ ৩০০ বছর পরে অবশেষে যখন স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুদয় হয় তখন ১৯২০ সনে আইন পাশ হয় চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়কেই পুরনো চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে। প্রথম শ্লোভাক বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা ঐ সময়েই।

চেক্ ও শ্লোভাক্ জাতির জীবনে এইভাবে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে বারবার। এরই পৃষ্ঠপটে দেখা দরকার তার জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকের মতো ভারতচর্চার প্রয়াসকেও। হুস্ পরিচালিত আন্দোলন পর্যুদস্ত হওয়ার পর যখন সমাজে জেশুইট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো কিন্তু ঐ ধরণের প্রয়াস একেবারে বন্ধ হয়নি। এমন কি ধর্মমতের দিক থেকে চরম গোঁড়ামির পরিচয় দিলেও জেশুইট পাদ্রীরা অনেক সময়ে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন নানা বিষয়ে। এর প্রায় তিনশ বছর আগে ওডরিকাস বীমাস নামে এক বোহিমিয় ফ্রান্সিস্‌কান পাদ্রির ভারতভ্রমণের কাহিনী থেকে অনেক খবর পাওয়া গিয়েছিল। তবে আমরা জানি সতেরো আঠারো শতকে জেশুইট মিশনারীরা ভারতবর্ষে আসতে থাকেন দলে দলে। তাঁদের মধ্যে বোহিমিয়ার মিশনারীরাও ছিলেন অনেকে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সমযকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বহু খবরাখবর লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের চিঠিপত্রে ও স্মৃতিকথায়। এঁদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য সম্ভবত কারেল প্রিক্রুল (Karel Prikryl) ১৭১৮-১৭৮৫)। ১৭৪৮ সনে এ দেশে এসে তিনি খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন গোয়ার এক জেশুইট কলেজে। চিঠিপত্র ছাড়াও তিনি এখানে কয়েকটি ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনা ও পাঠ্যপুস্তক লেখেন। তার মধ্যে বিশেষ করেই নাম করতে হয় ল্যাটিন ভাষায় লেখা তাঁর কোংকনী ভাষার ব্যাকরণ। তামিল ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কেও তাঁর কিছু মূল্যবান মন্তব্য কিছুদিন আগে—১৯৫৫ সনে-আবিষ্কার করেছেন এক নবীন চেক্ ভারততাত্ত্বিক, কামিল যেভ্‌নেবিল।

প্রিক্রুলের কোংকনী ব্যাকরণের নিজস্ব মূল্য ছাড়াও সেটি প্রকাশের ফলে যে ব্যাপার ঘটে, নিঃসন্দেহে তার গুরুত্ব আরো অনেক বেশী। কারণ চেক্‌জগতের সমকালীন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত, জে দোব্রোভ্‌স্কির (১৭৫৩-১৮২৯) দৃষ্টি ওটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে শ্লাভোনিক গোষ্ঠিভুক্ত ভাষাগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন সঙ্গে সঙ্গে। অন্যান্য চেক্ ও শ্লোভাক পন্ডিতদেরও নজর তখন এদিকে যায় এবং ভারততত্ত্বের ধারাবাহিক চর্চা শেষ-অবধি পন্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বৈদগ্ধ্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে।

উনিশ শতক চেক্ ও শ্লোভাক্ জাতির নবজাগরণের কাল। এ সময়ে একদিকে যেমন তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ সন্ধানী চোখে তাকালেন তাঁদের আভ্যন্তরিক জাতীয় সমস্যাগুলির দিকে তেমনি আবার সে দৃষ্টি তাঁরা ফেরালেন ঘরের বাইরে, সারা দুনিয়ার প্রতিও। হ্যাপস্‌বুর্গ শাসকদের অবিশ্রাম বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও দমন করা যায়নি চেক্ ও শ্লোভাক জাতির সেই নবজাগরণ।

ভারতবর্ষের দিকে ঐ সময়ে নতুন করে যে দৃষ্টিপাত ঘটল তার চরিত্র বোঝা যায় এরই পৃষ্টপটে। আগের মতো এবার আর কল্পনাশ্রয়ী উদ্দাম উচ্ছ্বাস নয়, রীতিমত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন—ভারতবর্ষের ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ব, ধর্ম, দর্শন—সবকিছুর খুঁটিনাটি সন্ধানের ধারাবাহিক প্রয়াস। জোসেফ জুঙ্গ্‌মান (১৭৭৩-১৮৪৭) নামে একজন চেক্ ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখলেন সংস্কৃত অলঙ্কার-ছন্দ প্রসঙ্গে। তাঁর ভাই এন্টনিন জুঙ্গ্‌মান (১৭৭৫-১৮৫৪) সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রবন্ধে লিখলেন দেবনাগরী অক্ষরে লেখা এক তালিকা সমেত। জোশেফ স্টেফান টামাস্কো (১৮০১-১৮৮১) নামে একজন শ্লোভাক্ পন্ডিত সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে প্রথম বই প্রকাশ করলেন চেকোশ্লোভাক ভূখন্ড থেকে। ওদিকে ১৮৫১ সনে 'নলদময়ন্তী' ও ১৮৭৩ সনে 'শকুন্তলা'র অনুবাদ প্রকাশিত হয় চেক্ ভাষায় আর ১৮৭৩ সনে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু হয় 'মৃচ্ছকটিকের'।

আবার ভারতীয় দর্শন বিষয়ে চার খন্ড এক বই লিখলেন ফ্রান্টিসেক্ কুপর

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম চেক সংস্করণের একটি ছবি

(১৮২১-১৮৮২)। ভারতের ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ ও নৃতত্ত্বের পাশাপাশি ইতিহাস ও বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কেও প্রচুর লেখালিখি শুরু হল পত্র-পত্রিকায়। চেক্ পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত বিশ্ব-কোষেও বেশ ভালভাবেই স্থান পেল ভারত-প্রসঙ্গ। ফার্ডিনান্ড স্টোলিকা (১৮৩৮-১৮৭৪) এ দেশে এসে ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগ দিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পাদক নিযুক্ত হলেন এশিয়াটিক সোসাইটির। কলকাতার জাতীয় মিউজিয়ামে এখনো তাই রক্ষিত রয়েছে তাঁর আবক্ষমূর্তি। হিমালয়, কচ্ছদেশ ও আন্দামানেও তিনি বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন ও প্রকাশ করেছিলেন অনেকগুলি গবেষণামূলক নিবন্ধ। প্রচণ্ড কণ্টসাধ্য খাসগড় অভিযান থেকে ফেরার সময় দুর্গম কারাকোরাম গিরিবর্ত্মে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ সমাধিস্থ রয়েছে আমাদের লে-তে। তেমনি আবার দাক্ষিণাত্য, হিমালয় অঞ্চল ও সিকিমে ঘুরে ঘুরে বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন ওটাকার ফেস্টম্যান্টেল (১৮৪৮-১৮৯১)। তিনিও আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন এবং বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেন হিন্দী ও উর্দু।

এটা লক্ষণীয় যে প্রাচ্যবিদ্যার সব কটি বিভাগের মধ্যে চেক্‌দের ভিতরে ভারত-তত্ত্বের ঐতিহ্যই প্রাচীনতম। নিয়মিত ও ধারাবাহিক অনুশীলনের বিষয় হিসেবে যাঁরা এ বিদ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন অগাস্ট শ্লাইশের (১৮২১—১৮৬৮), এলফ্রেড লুড-ভিগ (১৮৩৭—১৯১২) ও জোশেফ জুবাটি (১৮৫৫—১৯৩১)। এর মধ্যে প্রথম দুজন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তৃতীয় জন চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। শ্লাইশের মহাভারত থেকে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান, লুডভিগ ঋগ্বেদের কিছু শ্লোক আর জুবাটি কালিদাসের কাব্য অনুবাদ করেন মূল সংস্কৃত থেকে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন দিকপাল। তবে প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়েই ভারততত্ত্বকে মোটের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যেই। তার বিচার্য বিষয়ের পরিধি আরো অনেক প্রসারিত হল, যে তিন দিক-পালের উদ্যোগে তাঁরা হলেন মরিস ভিণ্টার-নিৎস (১৮৬৩—১৯৩৭), ভিনসেন্স লেজ্‌নি (১৮৮২—১৯৫৩) ও ওটকার পের্টোল্ড (১৮৮৪—১৯৬৫)। শুধু বিষয়ের ব্যাপকতা-সাধনই নয়, যে বিদ্যা এতোদিন একান্তভাবেই শুধু বিশেষজ্ঞদের বিচার্য ছিল তাকে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত-সাধারণের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে ভারত-বর্ষের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার কাজেও তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী।

এ জন্য এঁরা তিনজনই এ দেশে এসে সরাসরি যোগাযোগ করেছিলেন এখানকার বিদ্বজ্জনের সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক পোর্টোল্ড ১৯০৯—১০ সনে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুদয়ের পর আর একবার নতুন চেক্ সরকারের বোম্বাইস্থ প্রথম কন্সাল হিসেবে। এঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ধর্ম—বিশেষ করে জৈন-ধর্ম আর ভারতীয় ও সিংহলী নৃতত্ত্ব। অন্যদিকে চেক্ ভাষায় হিন্দুস্থানী ভাষার প্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনা তাঁরই।

ভিণ্টারনিৎস ছিলেন প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিশাল পরিধি ব্যেপেই তাঁর জ্ঞান-সাধনা— শুধু কাব্য, নাট্য, অলঙ্কার শাস্ত্রাদি নয়, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাও বিচারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর সুবিখ্যাত তিন খণ্ড ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে। এমন কি প্রধান প্রধান আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলিরও সংক্ষিপ্ত বিচার রয়েছে তাঁর এই ইতিহাসে। জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর মূল রচনার বেশ কয়েকটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পত্রালাপ ছিল। কবির আমন্ত্রণে তিনি একবার বিশ্ব-ভারতীতে এসেছিলেন আগন্তুক হিসেবে। তাঁর তীক্ষ্ণধী ছাত্র, অটো স্টাইন (১৮৯৩-১৯৪২), মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য সম্পর্কে গবেষণা প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। দুঃখের বিষয় নাৎসীরা চরম নিপীড়নের পর তাঁকে হত্যা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে।

আর লেজ্‌নির গবেষণা সংস্কৃত, আভে-স্তার ভাষা, প্রাচীন ফরাসী থেকে পরবর্তী কালের প্রাকৃত ও পালি আর তারো পরে মারাঠি ও বাংলায় লেখা সমগ্র রচনা নিয়েই। এমন কি জিপসীদের সাহিত্যও বাদ পড়েনি তাঁর বিচারের থেকে। বৌদ্ধসাহিত্য বিষয়েও তাঁর রচনা প্রচুর। ১৯২২—'২৩ সনে তিনিও রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দুবার বিশ্বভারতীতে আসেন ও অধ্যাপনা করেন কিছুকালের জন্য।—রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যসংশ্লিষ্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি ১৯৩৭ সনে চেক্ ভাষায় ও দুবছর পরে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সেই ইংরেজী সংস্করণটি প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়কার নাৎসী বিমান-হানার দরুন।

সাংগঠনিক ব্যাপারেও অধ্যাপক লেজ্‌নির কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যেমন এক দিকে প্রাগের ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউটের কার্যনির্বাহক সম্পাদক ও পরে ...ন পরি-চালক ছিলেন তেমনি আবার চার্লস বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অলোমুকের প্যালাকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ডীনও হয়ে-ছিলেন। আবার ১৯৩৪ সনে ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগা-যোগ আরো ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত করে তোলার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন'। ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবসে সেদিন যে সব ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র (সুভাষচন্দ্র একাধিকবার চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে-ছিলেন ও বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯৩৮ সনে যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন তিনি বোম্বাই শহরে একটি ভারত-চেকোশ্লোভাক সমিতি গড়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ডঃ ক্রাসা জানালেন যে সুভাষ-চন্দ্রের চিঠিপত্র ও তাঁর সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্র তাঁরা কিছুদিন হল পাঠিয়ে দিয়েছেন নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দপ্তরে)। লেজ্‌নি ও ভিণ্টারনিৎস উভয়েই নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন গান্ধীজী প্রসঙ্গে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন কিন্তু দেহে ও মনে তাঁর নবীনের শক্তি। একদা তিনি 'পরিব্রাজকের ডায়েরী' নামক গ্রন্থটির জন্য বাংলার সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। যদিও তিনি সমাজতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে একজন শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত হিসাবে স্বীকৃত, তাঁর 'পরিব্রাজকের ডায়েরী' নামক গ্রন্থটি পাঠ করে সুকুমার সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে কি বিচিত্র শক্তির অধিকারী তার পরিচয় পাওয়া যায়। একালে হয়ত সেই 'পরিব্রাজকের ডায়েরী'র কথা অনেকের স্মরণে নেই। অধ্যাপক বসুর জীবনের বহু বিচিত্র কর্মকান্ডের মধ্যে 'পরিব্রাজকের ডায়েরী' এক অকিঞ্চিৎকর অবদান মনে হতে পারে কিন্তু অধ্যাপক বসুর রচনাশৈলীর বিচারে সেই গ্রন্থটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক বসু অতিশয় গুরুতর বিষয়ও যে এমন সরস ও সহজভাবে লিখতে পারেন তার পিছনে আছে তাঁর সেই সাহিত্যিক মনোভঙ্গী। গান্ধীজীর দর্শন বিষয়ে লিখিত 'স্টাডিজ ইন গান্ধীজম' কিংবা 'মাই ডেজ উইথ গান্ধী' গ্রন্থগুলি যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরাই অধ্যাপক বসুর এই অসামান্য লিপি-কুশলতার পরিচয় পেয়েছেন। 'কালচারাল এনথ্রপলজি' নামে অধ্যাপক বসুর একটি ছোট্ট গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থটি পাঠ করে মনে বিস্ময় জাগে যে, লেখক কেমন অবলীলাক্রমে সর্বসাধারণের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আজ তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তাই একদা একখানি উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য-মাসিক সম্পাদনা করলেও আজ তিনি বাংলায় আর লেখেন না, এটা নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষতি। সম্প্রতি অধ্যাপক বসুর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থটির নাম 'কালচার অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া'। এই গ্রন্থটি তাঁর সামগ্রিক সাধনার এক অপূর্ব নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং গান্ধী-দর্শনের বিশ্লেষণমূলক বহু প্রবন্ধ ও আলোচনা তিনি করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে, আলোচ্য গ্রন্থটি প্রায় চল্লিশবর্ষব্যাপী সময়ের মধ্যে লিখিত বহুবিধ নিবন্ধের এক সঞ্চয়ন। অনেকগুলি প্রবন্ধ আবার আলোচনার নির্দিষ্ট সীমারেখা পেরিয়ে গেছে—একথা লেখক স্বয়ং স্বীকার করেছেন গ্রন্থারম্ভে। সংস্কৃতি কথাটি এই কালে অতিশয় অত্যাচারিত, যথেচ্ছ ব্যবহারে তার মৌল রূপ যেন বিকৃত। মতলববাজ সমাজ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগায়, তাই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে, সংস্কৃতির নামে যা খুশি করা যায় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করা চলে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা কিন্তু অতিশয় প্রাচীন, এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক আঘাত সহ্য করেও আজো তার আকৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে, কারণ তার পিছনে ধর্মীয় ও সামাজিক রহস্য জড়ানো আছে। বহিরঙ্গের পারিপাট্য বা রঙীন আলখাল্লাটি খুলে সাংস্কৃতিক আদিম রূপটি প্রকাশ করা যে অতিশয় শ্রমসাধ্য, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক বসু খোসা বাদ দিয়ে শাঁসটুকু পরিবেশন করার প্রয়াস করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা সুপ্রাচীন। এখানে আর্যদের আগমনের আগেকার দ্রাবিড়-সভ্যতায় আর্যরা হাত দেননি, দ্রাবিড়রাও তেমনই তাঁদের আগেকার সভ্যতা বিলুপ্ত করেননি। বহু মানবের বহু সাধনার ধারার এক সম্মিলিত রূপ এই ভারতীয় সংস্কৃতি। পাশাপাশি এত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর বস্তু, আপাতদৃষ্টিতে যারা পরস্পরবিরোধী, তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভারতের ভূমিতে তা সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক বসু ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ কয়েকটি দিক নির্বাচন করে নিয়েছেন। সংস্কৃতি ও সমাজের ক্রম-বিবর্তন বিষয়ে বিচারকালে মানবিক দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই চিন্তা লেখকের মনে সদা-জাগ্রত। এই দিকটি উপেক্ষণীয় নয়। এক কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার আলো-আঁধারে লেখককে বিচরণ করতে হয়েছে এবং তার ভিতর থেকেই সারবস্তু আবিষ্কার করেছেন।

ভারতের সংস্কৃতির ভৌগোলিক পটভূমি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান দিক নির্ণয় করেছেন। এইসব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, আঞ্চলিক ভাষা, ধাতব-শিল্প, কৃষিগত পদ্ধতি, নানাবিধ লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রাচীন ভারতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আচার ও আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকখানি সাহায্য করেছে।

নাম বিবর্তন সম্পর্কে লেখক এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। কিভাবে জাতিগত নাম থেকে নদীর নাম, অরণ্যের নাম, পর্বতের নাম, সমুদ্রের নাম প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়েছে তার বিবরণ অতিশয় চমকপ্রদ। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংস্কৃতি কিভাবে একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে একটি মাত্র গোষ্ঠী বা পরিবারের মত সংহত করেছে তার বিবরণও লেখক দিয়েছেন। ভাবগত সংহতির সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতি কিভাবে জড়িত লেখক তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ধীরে ধীরে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে, আর সব সময়ে তার পিছনে কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনার বালাই ছিল না।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

লেখক প্রায় কিশোর বয়স থেকে উড়িষ্যার দেবদেউলগুলি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। উড়িষ্যার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের সম্পর্কে লেখকের সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় সর্বজনবিদিত। লেখক উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক ও সমাজিক জীবনের মধ্যে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার মূল্য অসীম।

ভারতের জাতিগত ও ভাষাগত অঞ্চলগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে লেখক পরিধেয়, পাদুকা ইত্যাদি দ্বারা এক মনোজ্ঞ ও মূল্যবান সিদ্ধান্ত করেছেন। লেখককৃত 'কালচারাল এনথ্রপলজী' নামক পূর্বউল্লিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে ভারতের বসন্ত উৎসব বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আছে, এই গ্রন্থে ভারতের বসন্ত উৎসব-বিষয়ক প্রবন্ধটি সেই প্রবন্ধেরই পরিবর্তিত রূপ। এই প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ, তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতি এবং অতীত দিনের সঙ্গে তার সংযোগ বিষয়ে লেখক হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন। মুখ্যতঃ কৃষিভিত্তিক ভারতের সংস্কৃতির ধারা যে কৃষিকর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, তার পালপার্বণ, আনন্দ-উৎসব সবকিছুরই পিছনে ছিল কৃষি-বিষয়ক অভিসন্ধি—একথা, লেখকের এই প্রবন্ধে সহজভাবে বিধৃত।

উড়িষ্যায় একদা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারার সম্মিলন ঘটেছে সেকথা লেখক বলেছেন, সেই ধারায় উত্তর ও দক্ষিণের সংস্কৃতি এসে মিলিত হয়েছে—এক হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রিবেণী-সংগম এই উড়িষ্যা। উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে মধ্যভারতের প্রায় সবটুকু এই অঞ্চলে এসে পড়েছে।

ভারতীয় মন্দির সম্পর্কে লেখকের বিশেষ জ্ঞানের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেই কারণে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শুধু যে তথ্যসমৃদ্ধ তা নয়, এই গ্রন্থের মধ্যে বোধ করি এই অংশটুকু তুলনাহীন। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীর অর্থনীতি কিভাবে উভয় প্রান্তকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছে লেখক তার সুবিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন।

অধ্যাপক বসু বিশেষ করে সমাজিক বিবর্তনের ধারা বিধৃত করেছেন, এবং এই সূত্রে জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন বিশদভাবে। এই বিভাগে বাংলাদেশের জাতিতত্ত্বের কয়েকটি দিকও আলোচিত হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে জাতি ও বর্ণগত ধারার সংযোগ তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এই সূত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সমস্যা ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারাও আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'ক্লাস অ্যান্ড কাস্ট', 'ডেমোক্রাসি অ্যান্ড সোস্যাল চেঞ্জেস ইন ইণ্ডিয়া' নামক প্রবন্ধদুটি উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল আগে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল লাইফ অব ক্যালকাটা' নামক প্রবন্ধটিও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধটিও 'এ সোস্যাল সার্ভে অব ক্যালকাটা' নামক প্রবন্ধটি বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হবে। মনে হয়, এই গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধ, যথা 'সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল লাইফ অব ক্যালকাটা', 'এ সোস্যাল সার্ভে অব ক্যালকাটা' ও 'সম অ্যাসপেক্টস অব কালচারাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল' একত্রে সংকলিত করে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে প্রকাশ করলে বাঙালী পাঠক উপকৃত হবেন, আর যদি বঙ্গানুবাদ হয় তাহলে ত কথাই নেই।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর এই গ্রন্থটি চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

—অভয়ংকর

CULTURE & SOCIETY IN INDIA by Professor Nirmal Kumar Bose; Published by Asia Publishing House, Bombay and Calcutta. Price Rupees Forty only.

সাহিত্যের খবর

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী জেরুজালেমে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইজারায়েলী সাহিত্যিক মিঃ এস ওয়াই অ্যাগনন পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮১ বৎসর। মিঃ অ্যাগনন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। একমাত্র হিব্রু ভাষাতেই তিনি পোলাণ্ডে অতিবাহিত তাঁর জীবন সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন।

এ সপ্তাহের আর একটি শোকাবহ ঘটনা হল ডবলিউ বি ক্লার্কের মৃত্যু। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি 'পথের পাঁচালীর যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, তা বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। অকসফোর্ড থেকে ইংরেজিতে এম-এ পাশ করে তিনি কার্শিয়াংয়ে আসেন শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। ১৯৪৭ সালে তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে অক্সফোর্ডে অ্যাংলো এশীয়ান স্টাডিস সেন্টারে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ সর্বজনবিদিত।

ডঃ উমাশংকর যোশি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আবার নির্বাচিত হয়েছেন। কবি এবং সমালোচক হিসেবে তিনি এখন বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। গুজরাটি ভাষায় 'সংস্কৃতি' নামে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। সম্প্রতি বিদেশে তাঁর গান্ধীজীর উপর ভাষণ দেবার জন্য যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য তিনি তা স্থগিত রাখেন। উপাচার্য হিসাবে তাঁর এই পুনর্নিয়োগে সাহিত্যরসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী কবি নজরুলের গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। কিছুদিন আগে রাজ্য সরকার ভি আই পি রোডে কবিকে যে দশ কাঠা জমি দিয়েছিলেন, সেই জমিতেই এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের কণ্ঠ আজ স্তব্ধ। কিন্তু সাহিত্যে ও সংগ্রামে তাঁকে যে আমরা ভুলিনি, একথাই যেন আজ নতুন করে প্রমাণিত হল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে পত্নীর প্রতিকৃতিসহ কবিকে এনে অনুষ্ঠানস্থলে বসানো হয়। কিন্তু সে সবের দিকে যেন তাঁর কোন দৃষ্টি ছিল না। [illegible] দৃষ্টি ছিল তেমনি উদাস, সবকিছু[illegible]পর কেমন যেন নির্লিপ্ত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন—'এদিনটি এক দিক থেকে যেমন আনন্দের অন্যদিক থেকে তেমন দুঃখের। আনন্দের এই জন্যে যে, দীর্ঘদিন পর কবির একটা ঘর মিলল, কিন্তু কবি আজ বোধশক্তিহীন।' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং মুকুর সর্বাধিকারীও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

গত ১৬—১৭ ফেব্রুয়ারী রাঁচীতে বিহার রাজ্য দ্বাদশ বঙ্গভাষী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনটি বিভিন্ন কারণেই গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন—বিহারবাসী বাঙালী স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে মিলে গেলেও, মাতৃভাষা ভুলে যাবে তা কল্পনা করা যায় না। বস্তুত কোনো মানুষের পক্ষেই মাতৃভাষা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—

বিহারের সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলির সুযোগ্য সম্মান দিতে হবে। ভাষা নিয়ে যেটুকু দ্বন্দ্ব তা রাজনীতির সৃষ্টি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়।' সার্চলাইট পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষ সরকার বলেন যে, ভাষাকে বাদ দিয়ে কোন জাতিই বড় হতে পারে না। ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি। ডঃ শরদিন্দু ঘোষাল, নির্মলকুমার বসুও সভায় ভাষণ দেন। এই সম্মেলন উপলক্ষ স্থানীয় ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরীতে পত্রে পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। রাঁচী বেঙ্গলি এসোসিয়েশনের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরিনাথ মিশ্র, ডাঃ শিশিরকুমার বসু, রাজেন্দ্রলাল সেন প্রমুখও ভাষণ দেন। সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে (ক) মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি এক প্রস্তাবে কেবল হিন্দিতে প্রশ্নোত্তর দিতে হবে বলে যা গৃহীত হয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। (খ) অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে দৈনিক কিছু সময়ের জন্য বাংলা প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত করতে হবে (গ) ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অনার্স কোর্স খুলতে হবে। (ঘ) রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পোষ্ট গ্রেজুয়েট কোর্স খুলতে হবে এবং পূর্ণিয়া, সিংভম প্রভৃতি অঞ্চলে আদালতে বাংলাকে স্বীকার করে নিতে হবে। প্রতিটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। বহুভাষী ভারতবর্ষের প্রগতির জন্যই প্রতিটি প্রদেশেই সংখ্যালঘুদের ভাষার মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের দপ্তর থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে। এর থেকে জানা যায়, আগামী ২৩, ২৪ এবং ২৫ এপ্রিল কলকাতায় এর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সম্মেলনে যাঁরা আসবেন বলে জানা গেছে, তাদের মধ্যে আছেন হিন্দির 'দিনকর', গুজরাটির উমাশঙ্কর যোশি, তামিলের-এ শ্রীনিবাসরাঘবন, তেলুগুর শ্রী শ্রী, ওড়িশার কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী ও শচী রাউত রায়, কাশ্মীরীর দীননাথ নাদিম ও আমিন কামিল, পাঞ্জাবীর অমৃত প্রীতম, মারাঠির প্রভাকর, মাচওয়ে, কানাড়ার গোপালকৃষ্ণ আদিগ, মালয়ালমের কৃষ্ণ ওয়ারিয়ার এবং আরও পঞ্চাশজন বিশিষ্ট তরুণ কবি। কবিতা পাঠ ছাড়াও চারটি আলোচনা সভা এবং কবিতাগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। এই বিবৃতিতে সম্মেলনের সদস্যভুক্ত হবার জন্যও আবেদন জানান হয়েছে। প্রতিনিধির জন্য দশ টাকা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের জন্য পঁচিশ টাকা চাঁদা ধার্য হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা— ১৪।৫ ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস কলকাতা—১৯।

জার্মান সাহিত্যে সম্প্রতি একটি উপন্যাস বেশ হৈ-চৈ তুলেছে? বইটির নাম ইংরেজি করলে দাঁড়ায় 'অ্যাপার্টমেন্টস'। লেখকের নাম জর্জ ফিসার। এটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থ। লেখক ১৯১০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত ভিয়েনায় মানুষের জীবনের বৈষম্যগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফিসারের বয়স এখন ৩৬। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভিয়েনায়, কিন্তু বসবাস করেন ইংলণ্ডে। বাস্তব জীবন বর্ণনায় না কি লেখক— অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার কারণও না কি এই।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে সরকারী, বেসরকারী সমস্ত রকম কাজে লাগানোর তাগিদেই শুধু নয়, সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করবার এবং সাইনবোর্ড, বিজ্ঞপ্তি যাবতীয় জনসংযোগের ক্ষেত্রেও বাংলাভাষাকে প্রাধান্য দেবার জন্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ।' 'বাংলাকে মুখের ভাষা, শিক্ষার ভাষা ও কাজের ভাষা করুন' এই ছিল প্রধান শ্লোগান। এই প্রসঙ্গেই 'বাংলা প্রবর্তন সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর আবেদনে জানান, 'আমরা ধরে নিয়েছি, বাংলায় কাব্য সাহিত্য চলতে পারে, মনের কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু কাজের কথা ও ভাষায় চলবে না। যে কাজ ভিন্ন ভাষায় করতে হয়, সে কাজে কখনো মন থাকতে পারে না। সেজন্য দুশ বছর ধরে ঐ ভাষাতে সব কাজ শিখেও তেমন কিছু গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের মনের ভাষা বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হলে, তার উপর কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই ভাষায় কাজের চিন্তা করতে হবে। তবেই এ ভাষা কাজের ভাষা হয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের বিদ্বান পণ্ডিত, ডাক্তার, উকীল, ইনজিনিয়র, বিজ্ঞানী, কারিগর, কারবারী, সরকারী আমলা যখন এই বাংলাভাষাকে তাঁদের মুখের, মনের ও কাজের ভাষা করে দাঁড় করাতে পারবেন, তখনই বাংলাদেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নাড়ীর যোগ ফিরে পাবেন, বাংলাভাষাকে ভালো বাসবেন। সাধারণ মানুষও উপরতলাকার জ্ঞানভাণ্ডারের শরিক হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

বাংলা প্রবর্তন সমিতি চাইছেন, আর আর দেশের লোকদের মত, আমরাও মাতৃভাষায় চিন্তা করি, মাতৃভাষা বলি, মাতৃভাষায় কাজ করি।'

নতুন বই

আধুনিক কবিতার উৎস— (প্রবন্ধ সংকলন) — কৃষ্ণ ধর ।। অনুভব প্রকাশনী, কলকাতা-৫। প্রাপ্তিস্থানঃ সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দামঃ তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস তৈরি হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এখনো লেখা হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে হবে। এতদিনে তার উপাদান সঞ্চয়ের কাজ শুরু হওয়া উচিত ছিল। মাঝে মাঝে দুটো চারটে প্রবন্ধ নিবন্ধ বেরোয় লিটল ম্যাগাজিনে। আবার পাঠক বিস্মৃত হয়ে সেসব হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন, সংরক্ষিত হচ্ছে না গ্রন্থাকারে। এদিক থেকে 'আধুনিক কবিতার উৎস' একই সঙ্গে সিদ্ধ করবে ইতিহাস এবং কবিতার প্রয়োজন। প্রবন্ধগুলোর ভেতরে অভিব্যক্ত হয়েছে একজন কবির অভিমত এবং পাঠকের তথ্যনিষ্ঠা।

এ বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতার প্রতীক ও চিত্রকল্প'। কৃষ্ণ ধর লিখেছেনঃ 'কবিকে আমরা বলতে পারি নির্মাণশিল্পী।' যদিও 'কবি বাস করেন দুই জগতে। দৃশ্যমান বস্তুজগতে তিনি উপস্থিত শারীরিক অর্থে। অন্য জগৎ তাঁর চিন্তার, তাঁর বাসনালোক। সেখানে নিয়ত চলছে বস্তুজগতের সমীকরণ। এই সমীকরণ থেকে কবিতার অবয়ব গঠন।'

অজস্র মৌলিক এবং চিরায়ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে। দেশী-বিদেশী কবিতার উদ্ধৃতি ও কবির অভিমতকে মান্য করেও নতুন কথা শুনিয়েছেন, কবিদৃষ্টির অনন্যতায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'তিন দশকের কবিতায় আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার আসল রূপ—উত্থান এবং প্রস্থানভূমি, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আজকের কবিতা, যে-মানসিকতাকে ক্রমাগত ব্যাপ্ত করে চলেছেন আজকের কবি এবং পাঠক। এই প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ 'কবিতার কোনো বিকল্প নেই।' আমরাও সমর্থন করি, কবিতার কোনো বিকল্প হতে পারে না। কেননা, নির্দিষ্ট কাঠামোতে কবির যে-রূপে শরীর লাভ করে, রূপান্তরে ঘটে তার অপমৃত্যু।

'কবিতার ছবি ও গান' 'কবিতার প্রত্যাশিত প্রত্যয়' 'কবিতার উৎস, উপকরণ ও প্রেরণা' 'কবিতার শিল্প ও প্রকরণ' 'কবিতা ও আধুনিক কাব্যনাটক' 'কবিতার জাদু'—এই ছয়টি প্রবন্ধে কৃষ্ণ ধর আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দব্যবহার, চিত্রনির্মিতি, নাটকীয়তা ও কবি-মানসিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন আত্মোপলব্ধির নির্যাস দিয়ে। তাঁর দৃষ্টি স্বতন্ত্র এবং বিশ্লেষণের ভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই নিজস্ব। এ গ্রন্থের দুটো প্রবন্ধ কিছুটা

আলাদা ধাঁচের। 'পাশ্চাত্য কবিতার ধারা' এবং 'কবিতাঃ ষাটের দশকের শেষে' নিঃসন্দেহে বস্তুমুখ আলোচনায় উপরি-তলের সংবাদ ঘোষণা করে।

বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার ওপরে মন্ময় আলোচনার বই বেশী নেই। বিশেষ করে কবিতার ওপরে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। কৃষ্ণ ধর এই গ্রন্থে সেই সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনের ওপরে আলোকপাত করেছেন। তাঁ ভাষায় : 'কবিতা কি এবং কেন এইপ্রশ্নের দ্বারা পাঠকের যদি এবং কেন এই প্রশ্নের দ্বারা পাঠকের যদি ঔৎসুক্য জাগে তাহলে কবিতার নিজস্ব জগতে প্রবেশ করলে তার উত্তর তিনি খুঁজে পাবেন। কবিতার জগতে যে শিল্পের খেলা তাকেই সহজ কথায় বলবার চেষ্টা হয়েছে এখানে। হয়তো সকলেই আমার মতের সঙ্গে একমত হবেন না। তবু আমার ভাবনাগুলোকে এখানে রূপ দিতে চেয়েছি আধুনিক কবিতার অনুরাগী পাঠককে তার স্বপ্নের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে।'

কবির এই বিনয় সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, 'আধুনিক কবিতার উৎস' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বই, যার ফলশ্রুতিতে বাংলা কবিতার পাঠক উপকৃত হবেন সর্বাধিক, কবিরা হবেন কৃতজ্ঞ। এ জন্যে আমরা কৃষ্ণ ধরকে অভিনন্দন জানাই।

মধ্যাহ্ন মাধবী [কাব্যগ্রন্থ] — হেনা হালদার ।। ৩৬১ নেপিয়ার টাউন, জব্বলপুর ।। দাম : তিন টাকা।

মহিলা কবিদের সহজাত কণ্ঠস্বর নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেননি হেনা হালদার। প্রচ্ছন্নভাবে একটি রোম্যান্টিক মন কাজ করলেও জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও অভিমানের যন্ত্রণাই তাঁর কবিতার মূল সুর। চাওয়া-পাওয়ার বৈষম্য তাঁকে বিষণ্ণ করেছে। নাম-কবিতায় লিখেছেন :

"আষাঢ়ান্ত বেলার মৌশুমী
নিরুদ্দেশ। কেন ফের কোমল গান্ধারে নড়ে-চড়ে
কেবলি আলাপ করছ? মাধবী সাজবে না
পল্লবিত প্রসাধনে। অবেলায় মীড়ের মোচড়ে
যতই যন্ত্রণা দাও রমকে-গমকে
ছোঁবে না তোমার সুর আমার সম-কে?"

গৃহস্থ-মানসিকতার আহবান ও আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে তিনি কখনো কখনো উত্তাল। বলেন :

"তীর নয় তরী নয় ভয়াল সমুদ্রে আমি যাব
দুর্মর দুরাশা নিয়ে সৌভাগ্যের রত্নদ্বীপে
তুমি যেতে পার।"

এ সঙ্কলনের বাহাত্তর পৃষ্ঠায় জায়গা পেয়েছে মোট তেষট্টিটি কবিতা, যার মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতি-প্রেম, জীবনতৃষ্ণা, অনুভবের গভীরতা ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে বারে বারে। বাংলা কবিতায় পাঠক সঙ্কলনটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন।

সংকলন পত্র ও পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ও শ্রীমা—পশুপতি ভট্টাচার্য। শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সংঘ: মাতৃমন্দির হাবড়া। ২৪ পরগণা।

শ্রীঅরবিন্দ এবং মায়ের সাধনার মধ্যে ছিল এক বিরাট লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের কথা আজকের ধর্মপিপাসুর কাছে হয়তো খুব একটা স্বচ্ছ নয়। গ্রন্থকার অত্যন্ত সহজ ভাষায় তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। বইটির শেষে আছে বাণী সংকলন।

মানব মন (জানুয়ারী ১৯৭০)—সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।। ১০২।১-এ বিধান সরণী, কলকাতা-৪ ।। দাম: ১-২৫ টাকা ।।

পুরো আট বছর ধরে নিয়মিত বেরিয়ে আসছে 'মানব মন'। মনস্তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছেপে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পেরেছে পাঠকমহলে। এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা অতুলচন্দ্র চন্দের 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও ভারত' এবং সর্বাণীসহায় গুহ সরকারের 'রোগ চিকিৎসায় বাক্যের উপযোগিতা'। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন কপিল শর্মা, এন জাবলোংস্কি, সুধীরচন্দ্র রায়, মনোবিদ ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

উদিতি (৩য় সংখ্যা ১৩৭৬)—সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ নন্দী। আগরতলা। ত্রিপুরা। দাম এক টাকা।

ত্রিপুরা থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটদের এবং বড়দের জন্য দুটি বিভাগে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা বিভিন্ন ধরণের রচনা আছে। আমেরিকার বঞ্চিত মানুষ আলোচনাটি তথ্যনির্ভর এবং সুখপাঠ্য।

Modern Bengali Literature (vol. 1. No. 1) Editor: R. Chattapadhyay. Indranath Prakasani. 14 Station Road, Calcutta-31. Price: 65 Paise.

মডার্ন বেঙ্গলী লিটারেচারের প্রথম সংখ্যার ম্যাক্সিম গোর্কী এবং লেনিনের ওপর বাঙালী কবিদের লেখা পনেরটা কবিতা ছাপা হয়েছে। বিমলচন্দ্র ঘোষ, চিত্ত ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, দুর্গাদাস সরকার, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শোভন সোম, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, শোভন মিত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতার অনুবাদক রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি ছোট হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেদিক থেকে প্রশংসনীয় বটে।

সমতট (প্রথম বর্ষ : ২) সম্পাদক—অর্ঘ্য-কুসুম দত্তগুপ্ত। ৫।১।বি দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট। কলকাতা-২৯। দাম দু টাকা।

সমতট একটি নতুন ধরনের পত্রিকা। প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক। দ্বিতীয় সংখ্যায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা হোল হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যে বিজ্ঞান', আশীষ বসুর 'পটার আর্ট অফ পাঁচমুড়া'। বিনয় সরকারের 'বঙ্গ সংস্কৃতির লেনদেন' আলোচনাটির পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা এবং আরো কয়েকটি রচনা আছে। এ সংখ্যাটি অনেক সুসম্পাদিত।

রাজধানী (জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭০)—সম্পাদক নিশানাথ সেন। ৩৪ ডাঃ নগেন ঘোষ লেন, কলকাতা — ৩১। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতার নতুন ত্রৈমাসিক। বিশেষ কোন নতুন সংবাদ বয়ে আনতে পারে নি। লেখকদের মধ্যে আছেন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নবীন-প্রাচীন কয়েকজন কবি। প্রচ্ছদের ঘোষণায় বলা হয়েছে 'বিশেষ কোন তিথির, বছরের, বা দশকের কবিতার উড়োচরিত্র নয়, বিংশ শতাব্দীর — বিশেষ করে শেষার্ধের বাংলা কবিতার পুরো চরিত্র ভাবীকালের কাছে সুপরিসরভাবে বিস্তৃত করতে ধীরে কৃতনিশ্চয়। রাজধানীর শরীরের অঙ্গাকোষে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকছে বিংশ শতাব্দীর কবিতার শীর্ষদেশী মহত্তা ও গহনতা অর দুই-ই আবিষ্কার করবে ভাবীকাল।'

আরো 'মিনি'

ভেবেছিলাম 'মিনি'র হুজুগ শেষ হয়েছে। একটি দুটি সংখ্যার পর আর বেরোবে না এসব পত্রিকা। সে ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আবার বেরিয়েছে 'অনুত্তম'—একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে। এ সংখ্যায় লিখেছেন দুই বাংলার কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা। লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, কমল চৌধুরী, সানাউল হক, সিকদার আবু জাফর, সৈয়দ মাসী আহসান, কাজ হাসান হাবিব প্রমুখ অনেকে। 'পূর্ববঙ্গে বাংলা ছবি' সম্পর্কে লিখেছেন সুলতানা জামান। তিনজন চিত্রাঙ্কনকার ছবি ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক শশধর রায়। ঠিকানা ৩৩।৪, দিনু লেন, হাওড়া—১ ।। দাম : তিরিশ পয়সা।

'তন্বী'র সম্পাদক খাজিমউদ্দীন আহমেদ ও কুমারেশ চক্রবর্তী। আকার বেশ ছোট। লেখাগুলো আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছোট আকারের। তবে চরিত্রের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যহীন। লেখকদের মধ্যে আছেন মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, গণেশ বসু, কুমারেশ চক্রবর্তী, কমল চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। 'শিল্পীর দায়িত্ব' সম্পর্কে কমল চৌধুরীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। ঠিকানা : ৫১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ।। মূল্য : কুড়ি পয়সা।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

বাঙলা নাটক গিরিশচন্দ্রের কাছে ঋণী অনেক কারণে। তাঁর আগে অভিনয় উপযোগী নাটক ছিল, ছিল না সুষ্ঠু প্রয়োজনা। পৌরাণিক, আখ্যাননির্ভর, গীত-বহুল রঙ্গরসভরা যাত্রারই ছিল কদর। দেশী জমিদারদের নিজস্ব রঙ্গশালায় তাঁদের রুচি অনুযায়ী নাটকের অভিনয় হোত। সাধারণ দর্শক তার শ্রোতা ছিল না। তাকেও আবার মঞ্চ না বলে যাত্রার আসর বলাই উপযুক্ত। নাটক দেখবার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল না জাতির। এর মধ্যে আবির্ভাব গিরিশচন্দ্রের। অবশ্য আগেই ক্ষমতাশালী নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ'দের নাটক যাত্রাউপযোগী করেই অভিনীত হোত। গিরিশচন্দ্রের সমকালে প্রতিভাধর নটের অভাব ছিল না। শরৎ ঘোষ, অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—এ'রা ছিলেন আসর জাঁকিয়ে। এ'দের মত গিরিশচন্দ্রও ছিলেন যাত্রার দলে। ন্যাশনাল থিয়েটার, বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার, হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার—কত দল অবিরত গড়ে উঠছিল আর ভাঙছিল। অনেক পরে এল স্টার, মিনার্ভা। গিরিশচন্দ্র কোন এক দলে বা মঞ্চে স্থির হয়ে ছিলেন না। তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতাই শুধু ছিলেন না, ছিলেন নাট্যশিক্ষক ও পরিচালকও। অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল তাঁর। অভিনয় আর পরিচালনা করতে গিয়ে এক সময় তিনি দেখেন অভিনয় উপযোগী নাটক নেই। বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হোল মঞ্চের প্রয়োজনে। তখন তিনি অন্তরের তাগিদে বিদেশী সাহিত্য পড়েন। তারপর নিজেই লিখছেন আর পরিচালনা করছেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক যে বিষয়ের নাটক হোক না কেন পড়াশুনা না করে তিনি লিখতেন না কখনো।

নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার দর্শকদের কথাও অবশ্য তাঁর মনে ছিল। লোকরঞ্জক নাটক রচনা ও উপস্থাপনা ছিল তাঁর অন্যতম চিন্তা। যেজন্য তাঁকে প্যান্টো-মাইম বা ফার্সও লিখতে হয়েছিল। আর তাই সঙ্গে করতেন তিনি কেরানীগিরি। কেননা বিরাট সংসারের জোয়াল ছিল কাঁধে। গিরিশচন্দ্র বলতেন, 'যাত্রাকথকতা ও ...ফ, আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে দেখে নাটক লিখতে হল। সেই দর্শকদের মনো-রঞ্জন করতে গেলে পৌরাণিক নাটক ছাড়া আর উপায় কি?'

শেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ ...ন গিরিশচন্দ্র। অভিনীত হয় ১৮৯৩ খৃঃ। শিক্ষিত সমাজ নিলেও, সাধারণ দর্শক এ-নাটক একেবারেই নেয়নি। ক্ষুব্ধ গিরিশ-চন্দ্র বললেন: 'নাটক দেখিবার যোগ্যতা লাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে। নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাংলায় তৈরী হয় নাই।' নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্রকে এই দর্শক তৈরীর দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। সেজন্য নাটক রচনায় তিনি পাশ্চাত্য রীতিকে প্রাধান্য দেননি। যাত্রার ঢঙটাই তাঁর মনে হয়েছিল ঠিক পথ। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন: 'আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালা যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকও তদ্রূপ হউক। আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান-সংখ্যা কমাইয়া ও গাহিবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।'

শিশির ভাদুড়ী বলেছেন, 'গিরিশচন্দ্রকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে।' গিরিশের নাটক বিচারের সময় মনে রাখতে হবে এ-কথা। তিনি নাটক লিখেছেন মঞ্চের প্রয়োজনে। তাঁকে ভাবতে হয়েছে দর্শক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথা। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন বলেই সেকালে গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয়তা হয়েছিল অসা-ধারণ। যদি তিনি মঞ্চের দিকে না তাকিয়ে নাটক লিখতেন, তবে হয়ত কয়েকখানি মাত্র উৎকৃষ্ট নাটক রেখে যেতেন ভবিষ্যৎ কালের জন্য। সকলেই জানেন, গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু তাঁর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের আজ আর তেমন জনপ্রিয়তা নেই। কারণ, দেশের পরিবর্তন ঘটেছে চিন্তায় এবং চৈতন্যে। মঞ্চ, দর্শক, নাট্যরুচি সবকিছুর রূপান্তর ঘটেছে। তাঁর নাটকের অতিনাটকীয়তা—আজকের মনস্তত্ত্ব-নির্ভর বাস্তবধর্মী নাটকের যুগে অচল। তবুও তাঁর সামাজিক নাটকের কিছু আবেদন একালের থেকে গেছে। কারণ, তিনি ছিলেন অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক। তাই তাঁর পক্ষে dramatic suspense সৃষ্টির আর্টটা জানা ছিল ভাল।

এসব নাটকের কোথাও কোথাও মধ্যবিত্ত সমাজের দুষ্ট ক্ষত উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়ে-ছেন। মানবচরিত্র দেখবার চোখ যে তাঁর কত সূক্ষ্ম ছিল এখানে তা স্পষ্ট। প্রফুল্ল আজও আলোড়ন তোলে। কেননা, এখানে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বলছেন, 'আমি চোখে না দেখে কিছু লিখিনি। 'প্রফুল্লে'র যোগেশ, 'হারানিধি'র অঘোর সব আমার চোখে দেখা।' তাছাড়া 'নাটক রচনা করবার আগে সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়...আমি নিজে ত্রিশ বছর বয়সের আগে মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিইনি।'

গিরিশচন্দ্রের সংলাপ রচনায় সাফল্য এসেছে প্রত্যক্ষ মঞ্চ-অভিজ্ঞতায়। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে গৈরিশ ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন দর্শক, অভিনেতা, অভিনেত্রীর কথা চিন্তা করে। চরিত্র উপযোগী সংলাপ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। তিনি মনে করতেন: Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমনভাবে গাঁথা থাকবে যে প্রত্যেক কথাই action indicate করবে। তাতে এক বা একাধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে।'

গিরিশচন্দ্রের নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার সংখ্যা কম নয়। সাহিত্য সংসদ তাঁর সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁর ভাই ছয় খণ্ডে 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। ছেলে দানীবাবু দশ খণ্ডে 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' ছাপিয়েছিলেন। পরে প্রকাশ করেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। কিন্তু এখন তাঁদের সম্পূর্ণ রচনাবলী পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে সাহিত্য সংসদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ'দের মুদ্রণ পারিপাট্য, অঙ্গ-সজ্জা বাংলা গ্রন্থ প্রকাশে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি গিরিশ রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। দাম কুড়ি টাকা। সম্পাদনা করেছেন দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং পরলোক-গত রথীন্দ্রনাথ রায়। এই রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য রথীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা অনেকেরই জানা। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য আশা করা যায় সে-কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-কথা ও জীবনী আলোচনা করেছেন দেবীপদ ভট্টাচার্য। দুটি আলোচনাই তথ্যপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য। প্রথম খণ্ডে যেসব নাটক স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে একুশখানি নাটক, প্রহসন এবং নাট্যধর্মী রচনা।

গদ্য-রচনার মধ্যে পৌরাণিক নাটক, নটের আবেদন, রঙ্গালয়, বর্তমান রঙ্গভূমি, নাট্যমন্দির, নাট্যকার, কাব্য ও দৃশ্য—এগুলির আবেদন যে এখনও রয়েছে, তা পড়লেই বোঝা যায়। পরের খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করলে, প্রকাশক বাঙালীর উপকার করবেন।

—সাংবাদিক

বৈকুণ্ঠের খাতা

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে অজিত দত্ত একটি বিশিষ্ট নাম। কবি হিসেবেই তাঁর খ্যাতি, তাঁর জনপ্রিয়তা। কেননা, কবিতার মধ্যে তিনি মুক্ত—স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। কখনো লিখেছেন বেশী, কখনো কম। পুরোপুরি বিশ্রাম নেননি কোনদিন, নিতে পারেননি। এটাই তাঁর প্রথম এবং প্রধান পরিচয়। শেষ কিম্বা একমাত্র পরিচয় নয় অবশ্যই। মাঝে-মাঝে লিখেছেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং সমালোচনার বই। তবু সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর কবিব্যক্তিত্ব। অন্তত ওভাবে তিনি ধরা দেন আমার কাছে। পাঠক হিসেবে মনে পড়ে তাঁর কবিতার লাইন — উজ্জ্বল এবং বিষন্ন উচ্চারণ। এখনো স্মরণে পড়ে 'নষ্ট চাঁদ' কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়গিরি মেঘের চূড়ায়
গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই : চাঁদের ভেল্কি
সবই জানা আছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে
আকাশ-ছড়ানো তারা।

স্বীকার করতে বাধা নেই, এই কবিতা আমাকে আবিষ্ট করেনি, চমকে দিয়েছিল। এখনো বিস্মিত হই বিরুদ্ধ-চিত্রের উপস্থিতিতে এবং কল্পনায়। 'চাঁদের ভেল্কি'টা যতই 'মেকি' হোক, তার মধ্যে জাদুকাঠির ছোঁয়া আছে নিঃসন্দেহে। আমি সেই জাদুমন্ত্র শুনেছি তাঁর কবিতায়। আমাকে আলোড়িত করেছে তাঁর উপলব্ধি।

শীঘ্রই বেরোচ্ছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। প্রকাশক 'ভারবি'। নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। দুজনেই কাজ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ছড়ার বই

অনেক দিন ধরেই একটি প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল : অজিতবাবু ছড়া লেখেন কেন? কিভাবে তিনি নির্ভর হয়ে যান ছোটদের লেখায়?

অজিতবাবু বলেন : 'ওসব নির্ভর করে 'মুড'-এর ওপর। যখন আমি সেরকম মুডে থাকি, তখনই লিখতে পারি ছোটদের ছড়া-কবিতা। সব সময় লিখতে পারি না নিশ্চয়ই।'

জিজ্ঞেস করলাম : ছোটদের মতো উল্লেখযোগ্য গদ্য আপনি কি কি লিখেছেন?

—'ছোটদের মতো গদ্য আমি বেশী লিখিনি। গল্প-উপন্যাস লিখতে পারি না। ওসব আমার ধাতে সয় না। আমি কবি। ছন্দের মিল ও ছবির জন্যই বোধহয় ছড়া লিখেছি। এককালে আমি বই বের করতাম। আমিই বের করেছিলাম সন্তোষকুমার ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বই। বেশ নাম-ডাক হয়েছিল দিগন্ত পাবলিশার্সের। নিজের একটা বই ছেপেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'ছড়ার বই'। কিন্তু বাজারে বের করিনি। ফর্মাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রী বাইণ্ডারকে দিয়ে কয়েক কপি বাঁধিয়ে রেখেছেন।'

আমি গিয়েছিলাম তাঁর কাছে সাধারণভাবে গল্প-গুজব করার জন্যই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকলেও, তা ছিল আমার মনেই। তিনি আমাকে একটা 'ছড়ার বই' উপহার দিলেন। প্রচ্ছদহীন কয়েকটা ফর্মা বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে নীল কাগজের মলাটে। ভেতরে লাল কালিতে ছাপা অজস্র ছবি। একটি ছবি বাই-কালার। আমি প্রথম ছড়াটির দিকে চোখ বুলোলাম :

মাথায় নিয়ে বাজে কথার ঝুড়ি
রাস্তা চলে আদ্যিকালের বুড়ি।

সেই সিরিয়াস কবি অজিত দত্তকে আর চেনা যায় না এসব লেখার মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ তিনি এখানে। যেন উপলব্ধির গভীরতা থেকে ভেসে উঠেছেন একেবারে উপরিতলে। হয়তো নিজের ছেলেবেলার দিনগুলোকে স্মরণ করেছেন ছড়ায়, কবিতায়। দর্শকের মতো দেখেছেন, চোখের সামনে শিশুর মেলা।

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

তবে সত্যিকারের 'বাজে কথা' বেশী বলতে পারেননি তিনি। সেসব সুকুমার রায়ের ব্যাপার। নন-সেন্স রাইমস বলতে যা বোঝায়, তা একমাত্র সুকুমার রায়ই লিখতে পেরেছেন একালে। অজি[illegible] ছোটদের হয়ে, তাঁদের চিন্তা-ভা[illegible]কে আত্মসাৎ করে, ছড়া লিখতে চেষ্টা করেছেন।

অজিতবাবু বলেন : 'ছড়ার বই'-এর লেখাগুলো আমার অবসর সময়ের রচনা। একবার আমি 'রঙমশাল' পত্রিকায় একটা কবিতা লিখেছিলাম কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে। এখন দেখছি সে কবিতাটি বিখ্যাত হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়ে। শুনেছি এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাবসম্প্রসারণ হয়। আমি এসব কথা ভেবে লিখিনি।

'ছড়ার বই'-এর লেখাগুলোতেও তাঁর এই মানসিকতাই কাজ করেছে। এ জন্যেই তিনি সার্থক এবং আন্তরিক। পেরেছেন ছোটদের উপযোগী ছবি উপহার দিতে।

দুর্গাপুজোর গল্প

জিজ্ঞেস করলাম : 'দুর্গা পুজোর গল্প' লিখেছেন কবে? ছোটদের জন্য গদ্য লেখা তো আপনি লেখেন নি, তাহলে এ বই লিখলেন কেন?

অজিতবাবু উত্তর দিলেন : এ বই লেখার পরিকল্পনা আমার অনেক দিনের। যখন বই বের করতম, তখনই ভেবেছিলাম

চণ্ডীর গল্প লিখবো। নানা কারণে, আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কেউ তাগাদা না দিলে আমি লিখতেও পারি না। গতবার কমলেশের তাগাদায় শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল।

আমি আমার পূর্বপ্রশ্নটাকেই বাঁকিয়ে-চুরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ বই লেখার অন্য কোন ইতিহাস আছে কি?

—হ্যাঁ রাজশেখর বসু রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করেছেন বাংলা ভাষায়। আমি বই দুটো পড়ে ছোটদের উপযোগী করে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প লেখার কথা ভাবি। ইচ্ছে ছিল, তাঁর অনুবাদ অনুসরণ করেই লিখবো। সেজন্যে অনুমতিও চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে লিখিতভাবে অনুমতিও দিয়েছিলেন। তাঁর অনুমতি-পত্রটি এখনো আমার কাছে আছে। কেবল আমি লিখে উঠতে পারিনি।

রামায়ণ-মহাভারতের গল্প লেখার ইচ্ছা কি এখনো আছে?

—ইচ্ছাটা আছে এখনো। সময় এবং প্রকাশকের তাগাদা থাকলে লিখবো। এ দুটো মহাকাব্যকে ছেলে-মেয়েদের জানা দরকার। পুরাণের কাহিনীগুলোও ছেলে-মেয়েদের জন্যে লেখা উচিত। লিখব বলে এককালে কয়েকটা পুরাণ সংগ্রহ করে-ছিলাম।

আমি চণ্ডীর কাহিনীটা ভাবছিলাম তখন। গত কয়েক বছর ধরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনে আসছি বেতারে। কয়েকটি মাত্র স্তোত্রকে সঙ্গীত ও সংলাপের মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছেন বীরেনবাবু। গদ্যানুবাদে কেমন হবে জানি না। তবে বড় বই লেখার মতো কাহিনী নেই চণ্ডীর স্তোত্রে।

অজিতবাবু বললেন ঃ 'চণ্ডী ছোট বই। গল্প লেখার উপাদানও কম। আমি চণ্ডীর তিনটি স্তোত্রকে সম্বল করে এ বই লিখেছি। স্তোত্রগুলোর অনুবাদ করেছি সরল ভাষায়। আমার মনে হয়, এর চেয়ে সহজ অনুবাদ অসম্ভব। ছোটদের দিকটা আমি বিশেষভাবে নজরে রেখেছি।

যাদের জন্যে এ বই লেখা, সেই ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকারা কি আপনাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে?

বললেন ঃ লেখার সময়ে আমার সন্দেহ ছিল। হয়তো তারা এ বই পছন্দ করবে না। বেরোবার পর সে ধারণা ভেঙে গেল। বাচ্চারা এখনো বাচ্চাই রয়ে গেছে। কি শহরবাসী, কি গ্রামের ছেলে-মেয়েরা—সকলেই একটা বয়সে প্রায় সমান। তাদের চাহিদা এক। প্রকাশককে বলেছিলাম, 'দুর্গা পূজার গল্প' কেউ পড়বে না। আজকের ছেলেরা আট-দশ বছরে বেশ বড় হয়ে যায়, বড় বড় কথা বলে, সায়েন্স ফিকশান পড়ে, রহস্য-রোমাঞ্চ-ডিটেকটিভ বই পড়তে চায়। কিন্তু এ বই বেরোবার পর দেখলুম অন্য রকম। বড়রা যতটা সফিস্টিকেটেড হয়, ছোটরা ততটা নয়। ওরা চিরকালই শিশু। আমার ধারণা, পনেরো ষোল বছরের আগে কেউ সফিস্টিকেটেড হয় না। 'দুর্গাপূজার গল্প' বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

দুর্গাপূজার গল্প

অজিত দত্ত

ছোটদের লেখা কি রকম হওয়া উচিত?

বাচ্চাদের বই বাচ্চাদের মতো হওয়া উচিত। ভাষার কচকচি ওরা বোঝে না। ভাষা সহজ, সরল হওয়া দরকার। কাহিনী হবে ওদের ধারণার অনুরূপ। কেননা, ছোটরা চিরকালই নিজেদের মতো করে ভাবে। তাদের চাহিদা যিনি পূর্ণ করতে পারবেন, তিনিই সার্থক। যিনি ছোটদের মানসিকতা জানেন না, তিনি অনেক সহজ কথা বললেও তারা তা গ্রহণ করবে না।

আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে 'দুর্গাপূজার গল্পে'র কি উপযোগিতা আছে?

—এখন আর দুর্গাপূজো সাম্প্রদায়িক নয়, এককালে ছিল। দুর্গোৎসব এখন বাঙালির জাতীয় উৎসব। সেকালে দুর্গা-পূজো হতো ধনী হিন্দুর বাড়ীতে। এখন হয় পাড়ায়-পাড়ায়। বারোয়ারী ব্যাপারে ধর্মের চেয়ে উৎসবটাই বড়। তাছাড়া ছোটদের কাছে আবার ধর্মটর্ম কি? ওরা ওসব বোঝে না। বাচ্চারা দেখে দুর্গার ঐ বিশাল মূর্তিটা। দশটা হাত। একেক হাতে একেক রকম অস্ত্র। পায়ের কাছে কাটা মোষ আর তার ছিন্ন মুণ্ড। মরণ-সংগ্রামে দুর্দান্ত অসুর—ভীত, সন্ত্রস্ত, ভয়ানক। তাকে অক্রামণ করেছে দুর্গার বাহন সিংহ। দু পাশে কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী। অথচ এই ভয়ংকর যুদ্ধের ইতিহাস জানে না কেউ। ছোটদের তা জানা দরকার। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলের কাছেই দুর্গাপূজার বিশেষ উৎসব-মূল্য আছে।

ছাপাখানার ভূত এ বইয়ের পাঠকদের কতটা বিরত করছে?

—ওটা না লেখাই ভাল। তাড়াহুড়োতে বের করলে কিছু ভুল থেকে যায়। এ বইতেও আছে। যেমন একটি স্তোত্র 'ধূম্রবরণা' শব্দটি ছাপা হয়েছে 'ধুম্রাবরণা'। সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে একটি কবিতায়। মূল পংক্তিটা ছিল ঃ 'তুমি বরাহরূপে রক্ষা করেছ পৃথিবীকে'। কিন্তু আমার বইতে ছাপা হয়েছে 'তুমি বরাহ আকারে রক্ষা করেছ পৃথিবীকে'। এরকম ভুল থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমি বিষণ্ণ বোধ করেছি কয়েক দিন। ছন্দের ভুল বড় মারাত্মক।

তবে আমি খুশী হয়েছি বইটার প্রোডাকশান দেখে। চমৎকার ছাপা, অজস্র ছবি, ইলাস্ট্রেশন গুলো চমৎকার। ছোটরা হয়তো এর ভুল আদৌ ধরতে পারবে না। এরা ঘটনা চায়। ঘটনাতে উজ্জ্বল করেছে ছবি ও প্রচ্ছদ।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম অজিতবাবুর কথায়। বাংলা বইতে ছাপার ভুল না থাকাটা বড় রকমের দুর্ঘটনা। সামান্য দু-একটা ভুলের জন্যে কেউ ভাবে না আদৌ। অজিতবাবু ভেবেছেন। এমন নিষ্ঠাবান আন্তরিকতা মানুষেও দুর্লভ।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

জিজ্ঞেস করলাম : সাম্প্রতিক কবি-গল্পকাররা তো ছোটদের লেখা লিখতেই চান না। অনেকের ধারণা, বড়দের কাঁচা লেখাগুলো ছোটদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়, কিম্বা উঠতি লেখকের বাজে লেখাগুলোই স্থান পায় শিশুসাহিত্যের পাতায়। এখনকার শিশুসাহিত্য পড়ে আপনার কি মনে হয়?

—অনেকেই ভালো লেখা লিখছেন। বড়দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী বেশ ভালো লেখা লিখেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের লেখাগুলো এখনো আমার পড়া হয় নি। শিবরাম চক্রবর্তী আমার বন্ধু। সবচেয়ে বেশী পড়েছি লীলা মজুমদারের লেখা। ও'র লেখায় সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'র প্রভাব আছে। উনি আমার আত্মীয় এবং বন্ধু। ছোটদের লেখায় ও'দের পরিবারটির জুড়ি নেই। সকলেই ভালো লেখেন এবং লিখেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' বইতে আমি তাঁর সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেছি। লীলা লিখেছে এই তো সেদিন।

লক্ষ্য করলাম, আমার প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বললাম : এখন কি লিখছেন?

—একটা অ্যাকাডেমিক বই লিখেছি, বাংলা সাহিত্যের ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি। ছাপার কথা ছিল লেখক সমবায়ের। কিন্তু ওদের এখন তেমন টাকা নেই। ছাপতে দেরী হবে। রবীন্দ্রনাথের ওপর কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রকাশক পেলে সেগুলি ঘষামাজা করে একটা বই বের করা যায়। অনেকগুলো কবিতা লিখেছি। বই বের করার ইচ্ছে আছে।

—গ্রন্থদর্শী

কবিতায় সশস্ত্র আধুনিকতা চাই

জনপ্রিয়তা চান না কোন্ কবি? সকলেই চান, কবিতার প্রচার বাড়ুক, কবিতার বই বিক্রী হোক। তবু জনসংখ্যার তুলনায় পাঠকের সংখ্যা বাংলাদেশে নেহাৎ-ই অল্প। তাই নিয়ে দুঃখের সীমা নেই প্রকাশক মহলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কবিরা। কেউ বলেন, কবিতা সকলের জন্য নয়। কেউ চেষ্টা করছেন পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছতে। এই উভয় আকাঙ্ক্ষার মিলিত ক্রিয়ায় আলোড়িত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

কয়েকদিন আগে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন : "আমাদের সশস্ত্র আধুনিকতা চাই। ব্যক্তির বৈঠকখানা থেকে কবিতাকে পৌঁছে দিতে হবে সমষ্টির দরবারে। ক্ষমায় দয়ায় অভিভূত হবার দিন নেই আর। কবিতা হয়ে উঠুক বাঁচার অন্যতম প্রধান শর্ত।'

একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : এ অভিপ্রায় কি তাঁর নিজের, না আরো অনেকের?

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন : 'আমার নয়, আমাদের। চোখের জলে ভেসে যাওয়া পদোর জন্য সোজা বঙ্গোপসাগর খোলা আছে। পাঠকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কবিদের। অপ্রয়োজনের ফুলঝুরি ছুঁড়ে ফেলে, হাতে নিতে হবে আত্মরক্ষার বল্লম। বিষণ্ণতায় চোখ বুঁজে থাকলে চলবে না কারো।'

সম্প্রতি 'অধুনা' বের করেছেন তাঁর সম্পাদিত একটি কবিতার সংকলন : 'কবিতার পুরুষ'। বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে চমকপ্রদ কয়েকটি ঘোষণা : (১) খবরে কাগজের মতোই কবিতা পড়া হোক (২) কবিতা থেকে জল আর ধোঁয়া একেবারে কেটে যাক (৩) শুচিবাই ও অস্পৃশ্যতা থেকে কবিতা মুক্ত হোক (৪) কবিতা খাওয়া পরার মতো ব্যবহারিক হয়ে উঠুক।

আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে বইটির প্রচ্ছদ দেখছিলাম। এমন সুন্দর কভার ইদানীংকালে দেখিনি কোনো কবিতার বইয়ের। চমৎকার ছাপা। বিদেশী বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় প্রকাশকের নিষ্ঠা। বাংলাদেশে সত্যিকারের 'পকেট বুক' বেরিয়েছে কটা জানিনে। এটি সেজাতেরই বই। দাম সস্তা, সওয়া দু'টাকা।

ভূমিকায় অমিতাভ দাশগুপ্ত লিখেছেন : 'ভুঁযমালের আড়ত নয়, টপ করে চুষে ফেলা আইসক্রিম কোন-ও নয় কবিতা, তাকে বুকে মাথায় অসংখ্য চোট নিয়ে এগোতে হয়, এই অতি অ-বিশেষ সত্য মেনে সংকলিত হল 'কবিতার পুরুষ।' এক জায়গায় বেশ কিছু ছিলে-টান কবিতাকে ধরে রাখা, যারা শিকড় খুঁজতে বেরিয়েছে শরীরের, লড়াই বা আন্দোলনের, বিষিয়ে-ওঠা ক্ষতের, মর্মময় মাটির, এক কথায় একক ও অসংখ্য মানুষের সঠিক অবস্থানের। একই সঙ্গে দেশে-ভিনদেশে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের সবুজ সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠছে রাইফেল, আর তারই পাশাপাশি চলছে আত্মহনন নয়, ব্যক্তিমানুষের অবিরাম আত্ম-খননের কাজ। কবিতাও এরকম অভিজ্ঞতায় সতর্ক, আবেগে যুবক।'

এ সংকলনে গৃহীত হয়েছে যাঁদের কবিতা, যাঁরা ১৯১৯ কিংবা তারপরে জন্মেছেন। কবিদের মধ্যে আছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নবীন-প্রবীণ প্রায় সব কবি-ই। এমনকি হাংরি জেনারেশনের কবিরাও বাদ যাননি। এ প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেন : 'আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত নই, কবিতার জন্য সকলের দুয়ার খোলা। এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছি।'

সাধারণত কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এতদিন যে অভিযোগটা ছিল, তা 'কবিতার পুরুষ' সম্পর্কে খাটে না। সম্পাদক সংখ্যা-বিচারে মোটামুটি সমতা রাখতে পেরেছেন। কারো কবিতা গৃহীত হয়েছে একটি কারো-বা দুটো। এতদিন যেসব কবি কোনো সংকলনে জায়গা পাননি, তাঁদেরও স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেন : - 'কবি নয়, কবিতাই প্রধান-বিচার্য।'

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

।। সতেরো ।।

সুব্রত চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বলল,—'সুরেশ্বর নন্দী? সে আবার কে রাজীবদা? মালটিকে কোথায় পেলেন?'

রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করল, 'কোথায় পাবো আবার? ওকে মালভূমিতে খুঁজে পেয়েছি সুব্রত। তবে মালই বটে। বর্ণচোরা আম, কিন্তু উঁহু'—ডানহাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর ঠেকিয়ে রাজীব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। বলল,—'আর একটি কথাও না। তুমি শুধু নামটি জানতে চেয়েছিলে। তার বেশী নয়। সময় হলে বাকিটুকু তোমায় বলা হবে।'

সুব্রত একবার রাজীবের মুখের দিকে তাকাল। মানুষটা এখন মৌনীবাবা। ওর মনের কথাগুলি ল্যাপল্যান্ডের জমাট বরফ হয়ে গেছে। কৌতূহল প্রকাশ করলে ছাই হবে। শত অনুনয়-বিনয়েও ও মানুষ গলবে না। ওকে মুখ খোলানো অসম্ভব।

অগত্যা সুব্রত বলল,—'তাহলে এখন কি কর্তব্য বলুন?'

রাজীব এবার হেসে ফেলল। 'কিছু কর্তব্য আছে বৈকি। প্রথমত, সুরেশ্বর নন্দীর নামটা কারোর কাছে ফাঁস করবে না। এমন কি তোমার গৃহিণীর কাছেও নয়। দ্বিতীয়ত, পরশুদিন সন্ধ্যেবেলায় তোমার বাড়িতে একটা চা-চক্রের আয়োজন করবে। এবং সেই আসরে সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রো। বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে ব'লো তাঁরা যেন অবশ্য আসেন।'

—'হঠাৎ চায়ের আসর কেন রাজীবদা?'

—'প্রয়োজন আছে সুব্রত। ঐ চায়ের আসরেই আমি সুরেশ্বর নন্দীকে নিয়ে আসব। কিন্তু একথাও তুমি কাউকে বলবে না। যাঁদের ডাকছ, তাঁদের কারো কাছে কথাটা ভাঙবে না।'

সুব্রত পরিহাস করে বলল,—'এমন কি আমার স্ত্রীর কাছেও নয়, এই তো?'

—'ঠিক তাই। আভাসে ইঙ্গিতেও যদি কেউ জানতে পারে, তাহলে কিন্তু সমস্ত প্ল্যান কেঁচে যাবে। সুরেশ্বর নন্দীকে আমি আর চায়ের আসরে হাজির করতে পারব না।'

সুব্রত একটু চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু চায়ের আসরে কাদের নেমন্তন্ন করব? আপনি একটা তালিকা করে দিন বরং।'

'লিস্টি করার প্রয়োজন হবে না। মোটামুটি নামগুলো তোমাকে বলে দিচ্ছি।' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল। 'মিসেস রায়ের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের সকলকে বলতে হবে। নীপা দেবীর স্বামী ডাক্তার রায় হবেন প্রধান অতিথি, তারপর খুড়োমশায়কে নিশ্চয় ধরতে হবে। এরপর নাটকের ডিরেক্টর আর হিরো এ'দের দুজনকেই চাই। মাস্টারমশায় অনিমেষ দত্ত এবং ফিল্মি দুনিয়ার মস্তান অবিনাশ সমাদ্দারকেও না বললে চলে না। এ ছাড়া

চৌধুরী দেবী ও তাঁর হবু বর হরিপ্রকাশকেও নেমন্তন্ন করবে। আর চাঁদবদনজীকেও বাদ দেওয়া যাবে না, এরপর তোমার ইচ্ছেমত ছুটকো-ছাটকা আরো কয়েকজনকে বলতে পার। তবে এক ভদ্রলোককে আমার নাম করে বলে এসো। তিনি পলাশপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সুনির্মল মুখার্জি। উনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।'

সুব্রত মাথার চুলে হাত রেখে বলল,—'দাঁড়ান রাজীবদা। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। আপনি তো এক কাঁড়ি লোকের নাম করে গেলেন। কিন্তু এ'দের অনেকেই যে এখন পলাশপুরে নেই।'

—'কে নেই আবার?' রাজীব হেসে প্রশ্ন করল।

—'নেই বৈকি, প্রথমে ধরুন চাঁদবদনজী। ভদ্রলোক গতকাল আপনার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই দুপুরের ট্রেনে কেটে পড়েছেন। তারপর খুড়োমশায়। শুনলাম আজ তিনিও কলকাতা পাড়ি দিয়েছেন। নীলাদ্রিবাবু আর অবিনাশ সমাদ্দারেরও যাবার কথা ছিল। তাঁরা আছেন কিনা কে জানে। অবিনাশের কলকাতার ঠিকানাটাও আমি জানি না।'

—'সে আমি দেব, তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে সুব্রত।' রাজীব অনুরোধ কিম্বা আদেশ করল ঠিক বোঝা গেল না। ফের বলল,—'যাঁরা কলকাতা চলে গেছেন, তাঁদের একবার ফিরিয়ে আনতে হবে যেভাবে পার, নইলে কিন্তু অসুবিধে আছে।'

সুব্রত মাথা চুলকে বলল,—'সে না হয় করা যাবে রাজীবদা, কিন্তু অনিমেষ দত্ত? শুনেছি নেমন্তন্ন করতে গেলে তেড়ে মারতে আসে, ভীষণ অসামাজিক আর ঘরকুনো, উনি পলাশপুরে কারো সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত করেন না। উনি কি আসবেন? আর এখন নেমন্তন্ন এড়াবার সুন্দর অজুহাত রয়েছে। গেলেই ভাঙাহাত দেখিয়ে দেবে।'

রাজীব ভ্রু কুঁচকে বলল,—'দ্যাখ না একবার ও'র বাড়িতে গিয়ে। হয়তো আসতেও পারেন।' একটু ভেবে সে ফের বলল,—'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আসবেন, এটা ও'কে শুনিয়ে দিও। তাহলে নিশ্চয় নরম হবেন, এবং আসতে রাজী হতেও পারেন।'

—'কি জানি,' সুব্রত হতাশ ভঙ্গি করল। বলল,—'একবার দেখি চেষ্টা করে। না আসতে চাইলে বরং একবার হাতজোড় করব। তার বেশী কিছু পারব না।'

বিরাট মুখ ব্যাদান করে রাজীব হাই তুলল। চোখ বন্ধ করে সে বলল,—'আজ খুব ঘুম পেয়েছে সুব্রত। যা বললাম, তাই ক'রো। কাল তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। পরশুও সারাদিন আমাকে পাচ্ছ না। আমি একেবারে তোমার চায়ের আসরে হাজির হব। ঠিক সাড়ে সাতটার সময়।'

—'আপনি নিশ্চয়ই একা আসছেন না? সুব্রতের চোখে রহস্য প্রকাশ পেল, 'সেই সুরেশ্বর নন্দীকেও চায়ের আসরে হাজির করবেন তো?'

—'অবশ্যই। সে কথা তোমাকে আর বলতে হবে না।'

কথা শেষ করে রাজীব চোখ দুটি ফের বুজল। কয়েক সেকেণ্ড পরে তেমনি চোখ বুজেই সে বলল,—'আচ্ছা, গুড-নাইট সুব্রত। শ্যাল মিট ইউ এগেন।'

●

পুলিশের নাম শুনেই বীরেন মোদক ভড়কে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,—'আসুন স্যার। ঘরের ভিতরে বসবেন চলুন। এতক্ষণ মিছিমিছি আমাকে ছলনা করলেন।'

রাজীব মুচকি হাসল, একটু আগেই লোকটার কি মেজাজ আর তেরিয়া ভঙ্গি। নীচের তলায় দাঁড়িয়ে রাজীব ওর নাম ধরে শুধু বার দুই-তিন ডেকেছিল। এবং পরে তাকে উপর থেকে নেমে আসতে বলল। আর তাই শুনেই বাবু রেগে টং। উপর থেকে ঠিক নেমে এল না। মারমুখী পল্টনের মত তড়বড় করে তেড়ে এল।

বেলা বারোটার মত। মেসবাড়িটা এখন ফাঁকা। যে যার রুজি-রোজগারের ধান্দায় বেরিয়েছে। দোতলায় প্রায় কেউ নেই। নীচের তলায় চাকর-বাকরেরা কাজ-কর্ম সারছে। মাঝে মাঝে হাঁড়ি-কড়া নাড়ার শব্দ কানে এলেই তা বোঝা যায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজীব একটা চেয়ারে বসল, বলল, 'বীরেনবাবু আমার হাতে সময় বেশী নেই। আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করব শুধু। দয়া করে রেখে ঢেকে বলবেন না। ছলনা করলে কিন্তু ভুগতে হবে।'

বীরেন হাতজোড় করে তাড়াতাড়ি বলল,—'অমন করে ভয় দেখাবেন না স্যার। আমি কোনো কথা গোপন করব না। একটা প্রশ্ন করে দেখুন,—আমি কেমন বাপের সুপুত্তুরের মত জবাব দিই।'

গম্ভীর গলায় রাজীব শুধোল,—'পলাশপুরের সরকারী ডাক্তার অম্বর রায়ের স্ত্রী নীপা রায়কে চেনেন?'

বীরেনের মুখটা শুকনো দেখাল। আমতা আমতা করে সে বলল,—'ইয়ে চিনতাম বৈকি স্যার। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। আমি শুনেছি নীপা আত্মহত্যা করেছে।'

'—ওর বিয়ের আগেই তো আপনাদের পরিচয় ছিল। এবং একবার উনি আপনার হাতছানিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাই না?'

বীরেন সলজ্জভাবে বলল,—'আপনি দেখছি সবই জানেন স্যার। কথাটা সত্যি। গোকুলনগরে থাকতে আমাদের ভালবাসা হয়, তখন দুজনেই ছেলেমানুষ। সংসারের তাপ-উত্তাপ টের পাইনি। ভাবতাম, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি প্রেমের মত রঙীন,—শুধু ছন্দে-গন্ধে ভরা। হঠাৎ একদিন কি দুর্মতি হয়েছিল। আমি ওকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বললাম। আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। আমার হাতছানিতেই ও ঘর ছাড়ল। তিন-দিন, তিন-রাত্তির আমরা একসঙ্গে কাটালাম। আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই। এই তিনদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিলাম। কিন্তু একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা এক জিনিস আর চব্বিশ ঘণ্টা তাকে নিয়ে কাটানো এবং তার বোঝা বওয়া ভিন্ন ব্যাপার। মিথ্যে বলব না, তে-রাত্তিরেই নীপা আমার কাছে একটা ভারী পাথর হয়ে উঠল। ওকে নিয়ে কি করি, কোথায় রাখি,—এই হল আমার দুশ্চিন্তা। শেষে ভাবলাম দুজনে কলকাতা চলে যাই। সেখানে মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই জুটবে। যা হোক কিছু ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমে নীপা ধরা পড়ল। আমি তখন দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম পুলিশ নীপাকে জেরা করছে। আমি এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি। তখনই ইস্টিশান থেকে কেটে পড়লাম। ওকে ফেলে পালিয়ে গেলাম। তিন মাস গোকুলনগরে যাইনি।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওকে দেখল। বলল,—'কালীনগরের ডাকবাঙলোতে দুজনে যে ফটো তুলিয়েছিলেন, সেটা কোথায়?'

আশ্চর্য। বীরেন কিন্তু একটুও দমল না। প্রশ্ন শুনে সে বরং হি-হি করে হাসল। বলল,—'আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব দেখছি আপনার জানা স্যার। কিন্তু সে ফটো এখন কোথায় পাব?' ম্লান হেসে বীরেন ফের কথা কইল। 'আসলে ফটোই ওঠেনি। ছবি তোলা হলে ফটোগ্রাফার বলেছিল দিন সাতেক পরে ওর দোকান থেকে ছবির ডেলিভারি নিতে হবে। তা সাত দিন পরে কেমন করে সেখানে যাব? পুরো তিন মাস আমি গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। বেশ কিছুদিন পরে একবার গিয়েছিলাম কালীনগরে। ছবিটা নেবো মনে করে। কিন্তু ফটোগ্রাফার বলল, নেগেটিভ ভালো হয়নি বলে সে আর ওটা ডেভেলপ করেনি। আমাকে টাকা ফিরিয়ে দিল।'

—'তাহলে বীরেনবাবু, আপনি মিছিমিছি মেয়েটাকে এতদিন ভয় দেখিয়েছেন?'

—'ঠিক মিছিমিছি নয় স্যার।' বীরেন স্পষ্ট বলল, 'ওছাড়া আমার উপায় ছিল না। এদিকে দুর্দশা স্বচক্ষে দেখছেন তো? একজন পার্মানেন্ট বেকার বলতে পারেন। এখনও মেসের দেনা সব শোধ করতে পারিনি। দুবেলা আহারের সময় এরা সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্ধুদের কাছে কতবার হাত পেতে টাকা নিয়েছি। তাও দেওয়া হয় নি। তার জন্যও দিন-রাত্তিরে অনেক বক্রোক্তি হজম করি। অবশেষে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। নীপার কাছ থেকে মোটা কিছু হাতিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম।'

—'নীপা রায়ের কাছ থেকে দু হাজার টাকা আপনি পেয়েছিলেন?'

বীরেন মাথা নাড়ল।—'আজ্ঞে না স্যার। পাবো কেমন করে? বুধবার দিন রাত্তিরে

অমন জল-বিবিণ্টি। অনেক অনুনয় করে-ছিলাম। এমন কি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েছি। কিন্তু কে সাড়া দেবে বলুন? তখন কি ছাই জানি ঘরের মধ্যে নীপা আত্মহত্যা করে মরে পড়ে আছে।' দুঃখ করে সে যেন বলল,—'বিশ্বাস করুন। ও আত্মহত্যা করবে, এ আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি ভয় দেখিয়েছিলাম বলেই কি নীপা লজ্জা ঢাকতে নীপা শেষে আত্মঘাতী হল?'

রাজীব শুধোল,—'কি ভয় দেখিয়ে-ছিলেন? দু হাজার টাকা না পেলে ওর স্বামীকে সব কথা জানিয়ে দেবেন, এই তো?'

বীরেন উত্তর দিল না। অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে বসে রইল।

অবস্থাটা রাজীব অনুমান করল। লোকটার অন্তরে এখন অনুশোচনার আগুন। যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত। এবং মনে মনে নিজেকেই দোষী ভেবে বসে আছে।

—'বীরেনবাবু, একটা কথা আপনাকে বলা দরকার।' রাজীব ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিসেস রায় কিন্তু আত্মহত্যা করেন নি। বুধবার রাত্তিরে তিনি খুন হন। হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে কেউ তাকে হত্যা করেছে।'

খবরটা শুনে বীরেন কিন্তু উত্তেজিত হল না। বরং বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল,—'নীপা আত্মহত্যা করেনি? সে খুন হয়েছে স্যার?'

'—হ্যাঁ, কিন্তু তাই নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই বীরেনবাবু। পুলিশের কর্তব্য দোষীর শাস্তি বিধান করা। খুনীকে শুধু খুঁজে পেলেই তো হবে না। সাক্ষ্যপ্রমাণ-সমেত তাকে ধরা চাই।'

বীরেন কোনো কথা বলল না। নিজের মনে সে কিছু ভাবতে শুরু করল।

রাজীব বলল,—'আচ্ছা, মিসেস রায় যে পলাশপুরে আছেন এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?'

—'ওর কাকা নরেশবাবুর কাছ থেকে—'

—'কত দিন আগে?'

একটু চিন্তা করে বীরেন বলল,—'প্রায় মাস চারেক আগে।'

—'এর মধ্যে নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার কবার দেখা হয়েছে?'

মনে মনে একটা আলগা হিসেব করে বীরেন বলল,—তিন-চার বার হবে। তার বেশী নয়।'

—'নরেশবাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়ে-ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি দু-তিনবার আমার মেসে এসেছেন।'

রাজীব খুব অবাক হয়ে বলল,—'মেসে এসেছেন? কেন? কোনো দরকার ছিল?'

বীরেন মাথা নাড়ল। 'দরকার কিছু ছিল না, উনি এমনি আসতেন। আমার খোঁজ-খবর নিতেন। বলতেন, নীপার স্বামী বেশ বড় চাকুরে। পলাশপুরে গিয়ে নীপাকে ধরলে আমার একটা হিল্লে হতে পারে।'

রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। শুধু মুচকি হাসল। কিছুক্ষণ পরে সে শুধোল,—'মিসেস রায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, একথা নরেশবাবু জানতেন?'

—'আজ্ঞে না, আমি কোনোদিন বলিনি।'

—'নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?'

বীরেন একটু ভেবে বলল,—'গত রবিবারে। সন্ধ্যেবেলায় নদীর ধারে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

—'হুম' রাজীব গম্ভীর হল, বলল,—'দেখা হবার পর মিসেস রায়ের কাছে আপনি দু হাজার টাকা দাবি করলেন, তাই না?'

বীরেন কোনো উত্তর দিল না। মাথা হেলিয়ে কথাটা সে স্বীকার করল।

—'তখন আর কোনো কথা হয়েছিল? মিসেস রায় কিছু জানতে চেয়েছিলেন?'

বীরেনকে এবার কেমন ভীতু-ভীতু মনে হল। শুকনো মুখে সে বলল,—'একটা কথা আপনাকে বলতে পারি স্যার। শুনলে আপনি কিন্তু চমকে যাবেন। তবে কথাটা গোপন রাখতে হবে।'

—'কি কথা?' রাজীব গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল। দু পা এগিয়ে বীরেন ওর কাছে এসে দাঁড়াল। রাজীবের কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে ফিস-ফিস করে অনেকক্ষণ কথা বলল।

সব শুনে রাজীব প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, বলেন কি বীরেনবাবু? এও সত্যি? আপনি ঠিক জানেন?'

—'সত্যি বৈকি স্যার। দিন-রাত্রির মত সত্যি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন,—এর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

ভ্রূ কুঁচকে রাজীব কয়েক সেকেন্ড ভাবল।

বীরেন বলল,—'আরো কথা আছে স্যার। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে ফিসফিস করে আবার কি বলল।'

কথা শোনার পরই রাজীবের মুখভাব বদলাল। এখন তাকে বেশ সজাগ, সতর্ক মনে হল।

—'কখন যেতে বলেছে আপনাকে?' রাজীব জানতে চাইল।

—'আগামীকাল। সন্ধ্যের পর টাকাটা দেবে।'

রাজীব একটু হেসে বলল,—'ভাগ্যিস কথাটা বললেন। নইলে এই যাওয়াই আপনার শেষযাত্রা হত। আর টাকা নিয়ে ফিরতে হত না। বরং অন্য জগতে নীপা দেবীর সঙ্গে ফের মিলিত হতে পারতেন।'

—'কি বলছেন স্যার?' বীরেন ভয় পেয়ে বলল, 'তাহলে কি যেতে নিষেধ করছেন?'

—'না, নিষেধ করছি না।' রাজীব গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি ঠিক সময়েই যাবেন। যাওয়ার প্রয়োজন আছে।' একটু থেমে সে যোগ করল,—'ভয় নেই। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

●

পরদিন সন্ধ্যের একটু আগেই রাজীব পলাশপুরে নামল। গতকাল দুপুরের মধ্য-কলকাতায় সে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে নীলাদ্রির বাবার চেম্বারে একবার যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে য়ুনিভার্সিটিতে। ফের ফরেনসিক ল্যাব-রেটরীর ডাক্তারের কাছে এবং সবশেষে একজন হ্যান্ড-রাইটিং এক্সপার্টের সঙ্গেও রাজীব দেখা করল, বিকেলের দিকে হাওড়া স্টেশনে এসে সে ফের ট্রেনে চাপল। তবে পলাশপুর যাবার জন্য নয়। রাত আটটা নাগাদ প্রায় এক'শ মাইল দূরের একটা স্টেশনে এসে রাজীব নামল। মাথার উপর পেন্সিলের সীসের মত রঙের রহস্যময় আকাশ। একরাশ ফোটা ফুলের মত দেদীপ্যমান নক্ষত্ররাজী। ইস্টিশান থেকে মাইলখানেক হাঁটলেই একটা ছোট গ্রাম,—নাম বল্লভপুর। অপরিচিত রাজীবকে গ্রামে ঢুকতে দেখে তিন-চারটে কুকুর সমস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

দূর থেকে রাজীবকে আসতে দেখেই সুব্রত চঞ্চল হল। রাজীব ঘরে ঢুকতেই সে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে বলল,—'কি ব্যাপার রাজীবদা? আপনি একা যে? সুরেশ্বর নন্দী কোথায়? তাকে অ্যারেস্ট করব বলে আমি যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।'

ঘরের মধ্যে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মুখের উপর রাজীব একবার দ্রুত চোখ বুলোল। সুব্রতের দিকে একটু হেলে সে গলা নামিয়ে বলল,—'আমিও তোমাকে সেই প্রশ্নটাই করব ভাবছিলাম। সুরেশ্বর নন্দী কোথায়? সে তো এখনও এসে পৌঁছয় নি।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল,—'তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সুরেশ্বর এখানে আসবে। আসতে তাকে হবেই।'

(চলবে)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

'চাওয়ালা আসরফি সাউ ও নীলটুপি বাঘমশাই'

গরম মুড়ি, চা, ঝুরিভাজা, বাদামভাজা মুহুর্মুহু হেঁকে চলেছে ফেরিওয়ালারা। সন্ধ্যের অপরিচ্ছন্ন আকাশে নোংরা চিমনীর ঝুলকালির ঠুলিটা ফালিটাক সরিয়ে কলেজ বিল্ডিংয়ের মাথার ওপরেই শ্রীপঞ্চমীর চাঁদ ঝুলে রয়েছে। বৃষ্টিভেজা সকালের শিরশিরানিটুকু অন্ধকার হতেই চাদরে, র‍্যাপারে, শাল, কোটে বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। শেষ শীতের এই কামড়ানি কাটানোর সবচেয়ে সস্তার নির্ভরযোগ্য দাওয়াই গরমা গরম চায়ে। দু হাতে ভাঁড় এগিয়ে দিয়েও খদ্দেরের ভিড় সামলাতে পারছে না গোবিন্দ। এ বেঞ্চির চাহিদা মেটাতে না মেটাতেই কানে আসছে, এই চা-ওয়ালা এদিকে এস। অন্ধকারে করপোরেশনের ফাটা বাল্বের তলায় জোনাকির দীর্ঘ আলোর রেখা অনুসরণ করেই শব্দভেদি বাণের মত নিমেষে হাজিরা দিচ্ছে গোবিন্দ। দুহাতে ঝোলানো ভাঁড়ের থলি আর গুঁড়ো কয়লার নিভু আঁচে চড়ানো গরম জলের পিতলা কলসী। ছাকনি দিয়ে ছেঁকে দেওয়ার তর সয় না। পার্কের কোণে কোণে দাদা দিদিরা হাসিগল্প, মজাক মজাক মস্করার ফাঁকে যেন শীতে শিউরে উঠছেন আর তখুনি মনে পড়ছে গোবিন্দর কথা।

কলসীটা উপুড় করে চা ঢালতে ঢালতে গোবিন্দ কানখাড়া করে বাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কোন বাবুর কাছে ওর প্রশ্নের জবাব মিলবে। পুছতে সাহসে কুলোয় না। কে যে কি মেজাজে আছেন, কে জানে। অথচ রেডিওর খবরটা নিজের কানে শুনেছে গোবিন্দ। শুনেছে গরমিণ্টে না কি খুব গন্ডগোল। টিঁকতে নাও পারে লোকে বলাবলি করছে। 'বিপারটা'র মানে ঠিক বুঝতে পারে না গোবিন্দ—বুঝতে চায়।

আসরফি সাউকে কেউ চেনে না এই পার্কে। ঐ নামে ডাকলে বসন্ত ঘোষ রোডের বস্তিতে কেউ কোন হদিশ দিতে পারবে না। বারৌণী জংশন থেকে ছোট লাইনে মাত্র পঁচানব্বই পয়সার টিকিটেই আসরফির গাঁয়ে পৌঁছোন যায়। চব্বিশ বছর আগে বাপ-দাদার সঙ্গে ঐ রেল লাইন ধরে আজব বিশাল শহর কলকাতায় এসেছিল আসরফি। কতই বা বয়স তখন ওর। বড়জোর বারো কি তেরো। বাপ মহীন্দরের চানার দোকান ছিল পার্ক-সার্কাসে লোহাপুলের গায়ে। দাদা বালমুকুন্দ যুদ্ধ বাধার সময় থেকেই দোকানের কাজে লেগেছিল। যুদ্ধ থামতে আসরফিকেও নিয়ে এল মহীন্দর।

সকালে করপোরেশনের স্কুলে পড়তে যায়, দুপুরে দোকানের কাজ করে। অস্পষ্ট মনে আছে, সেবারই বাবা ঠিক করেছিল দোকানটা বড় করবে—লাইট ফাইট আনবে। ঘরটার ঝাড়পোঁছের কাজ শুরু হয়ে গেল। এমনি সময় একদিন সকালে স্কুলে গিয়ে শুনল, মাষ্টারবাবুর হুকুম, কেউ বাইরে যেতে পারবে না। শহরে না কি দাঙ্গা বেধে গেছে। দুদিন মিলিটারী পাহারায় স্কুলে কাটিয়ে আসরফি যখন লোহাপুলের দোকানে ফিরে এল তখন মহীন্দর সাউর দোকানটা যে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

তারপর কেটে গেছে এক যুগ। বারোটা বছর রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে খেতে না পেয়ে, শুকিয়ে চামসি মেরে, তাগড়া হওয়ার কোন সুযোগই পেল না আসরফি। তাগড়া না হোক দুঃখ নেই, শহরের হরেক কিসিমের চিড়িয়াদের খুব কাছ থেকে দেখে ভাল করে চিনে নিতে পেরেই ও খুশী। চেতলার পালবাবুদের আড়তে দারোয়ানী করতে করতেই বিয়ে সাদি সারা। বসন্ত ঘোষ রোডের বস্তিতে উঠে এল আসরফি মতিয়াকে নিয়ে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটির আধপেটা খোরাকির কাজটা ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই চায়ের 'বেওসা' শুরু করল আসরফি।

বারৌণীর আসরফি সাউ এই চায়ের বেওসায় নেমেই বেমালুম গোবিন্দ বনে গেল। কখন, কি ভাবে, কেমন করে যে নামটা বাবুরা পাল্টে দিলেন তা ঠিক বলতে পারবে না আসরফি। শুধু বলতে পারে যে, পার্কে রাস্তায় চা ফিরি করতে করতে আসরফি নিজের অজান্তেই গোবিন্দ হয়ে গেছে। নিত্যি যারা খদ্দের, অর্থাৎ ঐ বাসগুমটির ড্রাইভার, কণ্ডক্টার, টাইমকিপার, 'নিসপেকটর', পথচলতি মানুষজন, কলেজের দাদাবাবু, দিদিমণিরা, সন্ধ্যের বাবু-বিবিরা সবাই ডাকে ওকে গোবিন্দ বলে। যে নামেই ডাক, ভরা কলসী খালি হলেই আসরফি খুশী। শুধু একটা ভয় বুনো বাঘের মত ভোর না হতেই ওকে তাড়া করে ফেরে। ঐ ভয়টা না থাকলে আসরফির চেয়ে সুখী কে আর এই শহরে?

অথচ 'লিকশনের' আগে বড় বড় বাবুরা কত চেঁচালেন এই পার্কে, বললেন ভোট দাও, সব জুলুমবাজী বন্ধ হয়ে যাবে। ভোট দিল আসরফি, দিল মতিয়া। ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট। ওদের ভোট থাকলে ওরাও ছাপ মেরে আসত। কিন্তু কি লাভ হল?

ভোর চারটেয় উঠে মতিয়া কয়লা ভেঙে তোলা উনুনে আঁচ দেয়। কলে তখনো জল আসেনি। রাস্তায় গঙ্গাজলে কলসীটা ছাই দিয়ে ঘষে ঘষে নতুন পয়সার মত চকচকে করে তোলে আসরফি। রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙে না সহজে। ন্যাকড়ার মত ছেলেটা কম্বলে দলা পাকিয়ে পড়ে থাকে। ফুলকুমারী তখন নিশ্চয়ই পরীদের দেশে ফুর ফুর করে পাখনা মেলে ঘুরে বেড়ায়। আসরফি চলে যাওয়ার অনেক পরে ওদের মা ডেকে তুলবে ছেলেমেয়ে দুটোকে। ততক্ষণে রাস্তার কলে জল এসে যায়। চাওয়ালার ছেলেমেয়ে দুটি এক ভাঁড় চাও মুখে না দিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া বইখানা নিয়ে স্কুলে ছোটে। মোড়ের মাথায় বাবাকে দেখে চা ফিরি করতে। তখন ওদের দিকে তাকানোর ফুরসৎ পর্যন্ত থাকে না আসরফির

সরকারী বাসগুলো একটার পর একটা কলেজের দোরে এসে থামছে। ভাঁড়, কলসী, গুঁড়ো দুধ, চা, চিনি সব নিয়ে ছুটোছুটি করছে আসরফি। এক কলসী চা বিক্রী [illegible] গোটা সাত আট টাকা আয় হয়। [illegible], চিনি, দুধ, ভাঁড়, কয়লার দাম বাদসাদ দিয়ে এগারোটার মধ্যে চার সাড়ে চার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে আসরফি। কিন্তু ফিরবে কি? দিদিমণিদের কলেজ ভাঙতে না ভাঙতে দাদাবাবুদের জটলা থিকিয়ে ওঠবার আগেই ফুটপাথের পাথরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গাঢ় নীল টুপি পরা বাঘটা এসে উল্টোদিকের পানওয়ালার কাছ থেকে চুনা চেয়ে নিয়ে খৈনী ডলতে থাকে। শাদা হাফপ্যাণ্ট সার্টের তলায় কালো বুট জোড়া দেখলেই চড়াক করে এক কলসী রক্ত তখন মাথায় উঠে আসে। কিন্তু গরম দেখিয়ে লাভ কি?

ঐ গরম দেখাতে গিয়ে বাদামওয়ালা কালুর কি হাল হয়েছে নিজের চোখে দেখেছে আসরফি। জোয়ান ছেলেটাকে মালপত্র সমেত ধরে নিয়ে যেত। ফাটকে পুরে দিত। বেওসা মাথায় উঠল। বারকয়েক ফাইন গুনতে গিয়ে সব ফেলে ঠেলে উধাও হল কালু। তবু মনে জোর ছিল ছোকরার। যাওয়ার আগে ইঁট ছুড়ে একটা কান্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। ভয়ে

তিনদিন কোন ফেরিওয়ালা বসেনি এই মোড়ে।

আসরফি তো আর কাল্লু নয়। তাকে পরিবারের কথা ভাবতে হয়। একলা পেট নয় যে কাল্লুর মত ইচ্ছে হল তো মনের ঝাল আচ্ছা করে মিটিয়ে পালাবে কোথাও। তাই সকালের কলসী যখন ভাঁড়ে ভাঁড়ে বাবুদের পেটে চালান গিয়ে একদম ঠন ঠন করে, তখন নিত্য বরাদ্দ দেড়টি টাকা বাঘমশায়ের পায়ে পুজো দিয়ে ঘরে ফেরে। শুধু আসরফি নয়, এই মোড়ে এমন কোন ফেরিওয়ালা নেই যে পুজো চড়ায় না রোজ। লটারী, জুতো পালিশ, শায়া-সেমিজ-বালিশের খোল, ক্যালেণ্ডার, ঝালমুড়ি, আলুর দম, বাদাম, চানা, ঘুগনি, ফুচকা, কেউ বাদ যায় না। এই মোড়ে বিক্রী বাটা বেশী। লাখো লোক রাত দিন ছুটছে ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে চারদিকে। বাবুদের পায়ে পায়ে মাছির মত লেপ্টে থেকে মাল গছাতে পারলে দু পয়সা ঘরে আসে—এ কথা আসরফিরা জানে। জানেন বাঘমশাইরাও। তাই গলির ভেতর বসলে প্রণামীর রেট অনেক কম, মোড়ের মাথায় ডবল দিয়েও নিস্তার নেই।

দু বেলা যারা বসে তাদের দু বেলাই প্রণামী দিতে হয়। আসরফিও দেয়। দু বেলায় তিন টাকা। এমন কি ভরা বর্ষায় সারাটা সন্ধ্যে কলেজের সামনের গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কাক হয়ে যায় যখন, তখনো দিতে হবে। নইলে যে সারা বছরের খোরাকি বন্ধ করে দেবে টুপিওয়ালা।

শীতের কটা মাস মাল কাটে ভাল। তখন সকাল সন্ধ্যে দু বেলায় আঠার উনিশ ঘন্টা রাস্তায় বসে পার্কে ফিরি করে প্রায় কুড়ি বাইশ টাকা রোজগার করে আসরফি। ও সময় কোন কোন দিন তিন কলসী চা বিক্রী হয়ে যায়। খরচ খরচা বাদ দিয়ে হাতে হাতে পনেরো ষোল টাকা থাকে। কিন্তু গরমে আর বর্ষার সময় রোজগার পড়ে যায়। লোকে লিমনেড, ডাব খায় চুক চুক করে, চা খায় কম। দু কলসী ছেড়ে এক কলসী মাল গছাতেই হিম সিম খেয়ে যায় আসরফি। তবু ছাড়ান নেই। দিনান্তে তিনটি টাকা দিতেই হবে। সবই যদি দিয়ে দেবে তবে আসরফির থাকে কি? মতিয়া, রাজেশ্বর, ফুলকুমারী আর নিজের, চারটি পেট চালাতে হয়। ঘর ভাড়া দিতে হবে। দেশে চাচাকে পাঠাতে হবে। নইলে কোনদিন অভাবের ঠেলায় সব জমি জমা বেহাত করে দেবে চাচা। এ ছাড়া অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। রাজেশ্বর ফুলকুমারীকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। একলা মানুষ আসরফি। বিমারে পড়লে এমন কেউ নেই যে ওর জরু বাল বাচ্চাকে একবেলা খেতে পরতে দেবে। অথচ ওরই গায়ে গতরে উপার্জনের অর্থ নিত্যি যারা নিয়ে যাচ্ছ তাদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই. এমনি মজা।

'গরম মুড়ি' লোকটা সাচ্চা আদমী। ঠিকঠাক কথা বলে। ওতো বলে কানুন মাফিক দোকান বানাও, রাস্তার পরে ঘর সাও কোন সাণ্ডাৎ তখন হাত পাতে এক-বার দেখি? টাকা নেই, তাই ঘর জোটে না। কিন্তু পেটে যে ভুখ লাগে, মতিয়ার যে কাপড় লাগে, রাজেশ্বর যে 'লিখাপড়া' করতে চায়, ফুলকুমারী যে দিন দিন বড় হয়ে ওঠে, তার কি হবে? আসরফি কি করবে? দেশে যা দুচার বিঘা জমি আছে তাতে এতগুলো লোকের মাস ভোর খোরাকি জুটবে কি না সন্দেহ। সেখানেও তো অনেকগুলো মুখ—চাচা, চাচী, চাচেরা ভাই বোন। তারা খাবে কি, আসরফিই বা খাবে কি? একথা কে বলবে?
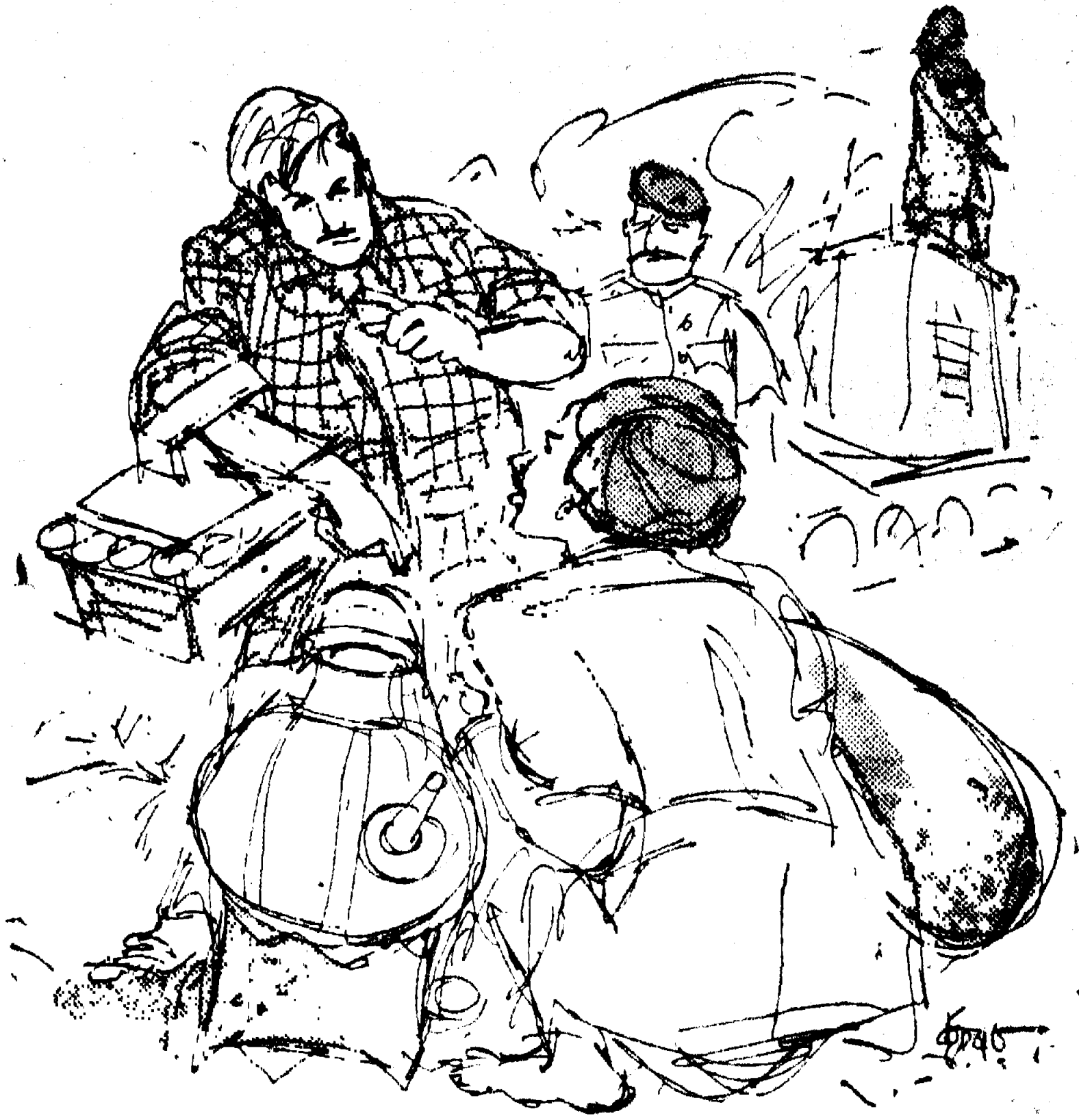
এদিকে সবাই বলছে গরমিন্টে গণ্ড-গোল লেগে গিয়েছে। রেডিওতে সেকথাই বলেছে। আসরফি নিজে শুনেছে। গণ্ড-গোল মানেই তো নয়া সরকার। নয়া সরকার বানাতে গেলে চাই আসরফি মতিয়ার ভোট। পাড়ার বাবুরা এসে বলবেন—গোবিন্দ কৈ রে? শোন আমাদের ভোট দিবি। তাহলেই সব মুস্কিল আসান হয়ে যাবে। কতবার তো বাবুদের কথা শুনে ভোট দিল, কৈ টুপিরা তো তবু ছাড়ে না। গদিতে যেই বসুক মোড়ের মাথার বাঁধা বরাদ্দের সিধে তো ঠিকই সদর দপ্তরে গোপন সুড়ঙ্গ পথে চালান যায়। তাই এবার আসরফি ভাল করে জেনে নিতে চায়, ভোট করে। বাবুরা যাই বলুন না কেন, আসরফি সাফ একটা বাত পুছবে—বলুন বাবু, ভোট দিলে আপনার সরকার আমাদের দেখবে তো। না কি আবার নীল টুপির ফেউ পিছনে লাগবে?

ঠিক কোন বাবুকে যে প্রশ্নটা করা যায়, সন্ধ্যে থেকে চা ফিরি করেও আসরফি তা এখনো ঠিক করতে পারল না। চা ঢালতে ঢালতে কান খাড়া করেই ছিল। হঠাৎ শুনতে পেল চাপা গলার ডাকটা—এই গোবিন্দ। ফিরে তাকিয়েই দেখে বড় বাঘমশায়ের আদরের পেয়াদা জুতো-পালিস ছোকরা ভুলু। এদিকে শোন। কলসী যেমন ছিল তেমনি রেখেই উঠে এল আসরফি। সকালের ওটা দিসনি। কেন রে? কারণ যাই হোক ভুলু আদায় করে ছাড়বেই। কথার ভেজাল বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। ট্যাঁক খুলে কড়ি গুনতে গুনতে আসরফি শুনতে পেল বুকের ভেতর থেকে তাজা গরম চায়ের মত ভলকে ভলকে রক্ত নাক মুখ চোখ ভাসিয়ে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। রাজেশ্বর ফুলকুমারীকে একদিন সার্কাস দেখাবে বলে যে টাকা কটা রেখে-ছিল ভুলুর হাতে তুলে দিয়ে নীরবে ফিরে এল আসরফি। কৌতূহলী খদ্দেরের একটা প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে চায়ের দাম বুঝে নিয়ে কলসী, ভাঁড়ের থলি হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু পরেই গোটা পার্ক ছাপিয়ে কেমন একটা চাপা কান্নার চীৎকার থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে উঠল—চায়ে গরম।

সন্ধ্যে থেকে যে প্রশ্নটা করবে বলে মনে মনে এঁচে রেখেছিল সেটা ওর অজান্তেই চায়ের তলানির মত কলসীর তলায় থিতিয়ে গেছে। এখন বাকী চাটুকু বেচে ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচে আসরফি। এই জমানা কবে বদলাবে কে জানে। লাল টুপিরা নীল হয়ে গেলেও অত্যাচারের দীর্ঘ হাত কবে ছোট হবে?

—[illegible]

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

হিস্টিরিয়া প্রসঙ্গে সার্কো-জেনেট-ফ্রয়েড-ইয়ুং

গত সপ্তাহে সংবেশনের ফলে হিস্টিরিয়ার তিন দশার উল্লেখ করেছি; তিন দশার বৈশিষ্ট্যগুলো বিবৃত করছি। প্রথম দশায় (লেথার্জি) রোগী আধাঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, দ্বিতীয় দশায় (ক্যাটলেপসি) তার জ্ঞান থাকে না, হাত-পা অসাড় আকেজো শক্ত হয়ে যায়; তৃতীয় দশায় (সমনামবোলিজম) রোগী জটিল কাজকর্ম করে যেতে পারে, কিন্তু পরে এ সম্বন্ধে তার কোন কিছু মনে থাকে না। হিস্টিরিয়া, বিশেষ করে স্বপ্নচারিতা নিয়ে সার্কোর ছাত্র পিয়েরে জেনেট অনেক কিছু লিখে গেছেন। ব্যক্তিত্ব সংগঠন ও ব্যক্তি-বিযোজন নিয়ে ফ্রান্সের মনস্তাত্ত্বিক মহলে এই সময় খুব হৈ-চৈ পড়ে যায়। স্বপ্নচারিতার অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা চিকিৎসকদের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে তোলে। আমেরিকায় মর্টন প্রিন্স ব্যক্তিত্ব-বিয়োজনের (স্প্লিট-পার্সোনালিটি) অনেক কেস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উইলিয়াম জেমস-এর লেখাতেও সার্কো-স্কুলের অভাব দেখা যায়। এঁদের মতে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে কতকগুলো ধারণা ও প্রবণতার সংগঠন। সুস্থ মানুষের মধ্যে এই সংগঠন বেশ সুদৃঢ়, সম্পূর্ণ, অখণ্ডিত। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণভাবে সংগঠিত; বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তি ভেঙে দুই বা আরো বেশি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একেবারে ভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে যেতে সক্ষম। এই ব্যক্তিত্ব বিয়োজন বা বিষঙ্গ (ডিসোসিয়েশান) শুধু হিস্টিরিয়ার উপসর্গ বা বিশেষ দশা ভাবলে ভুল হবে। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগেও সত্তার বিভাজন ঘটে থাকে। তবে তার রীতি-প্রকৃতি ভিন্ন। স্কিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার চেষ্টা এখানে করব না। সুইশ ডাক্তার Bleiiler এর একটি কথা শুধু বলে রাখা দরকার। তাঁর মতে স্কিজোফ্রেনিয়াতে সত্তা বা চৈতন্য ডাক্তাররা কনশাসনেস, পার্সোন্যালিটি, সীরিং এই তিনটে কথা একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও দার্শনিকদের কাছে কথা তিনটি ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক, তবুও আমরা মনোবিজ্ঞানী-চিকিৎসকদের অনুসরণ করে সত্তা, ব্যক্তিত্ব, চৈতন্য এখানে একই অর্থে ব্যবহার করছি] দু ভাগ নয়, টুকরো-টুকরো হয়ে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। স্বপ্নচারিতা বা ফিউগের বিষঙ্গ এবং স্কিজোফ্রেনিয়ার সত্তাবিভাজনের পার্থক্য চিকিৎসকদের নজরে সহজেই ধরা পড়ে। হাসপাতালের প্রবলপ্রতাপান্বিত নেপোলিয়ন অথবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ডাক্তারের কাছে বাড়ী যাবার জন্য আবেদন করছে, একটা সিগারেটের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে; আবার পরক্ষণেই নেলসনের উদ্দেশ্যে কামান সাজাতে বলছে কিম্বা অন্যকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শনে চমৎকৃত করছে। নেপোনিয়নের ভূমিকায় রোগী গৌরহরি সম্পূর্ণভাবে গৌরহরিকে ভুলতে পারে নি, গৌরহরির জগতের পাত্রপাত্রীকে পুরোপুরি বিস্মৃত হয় নি। স্বপ্নচারিতায়, বা ফিউগ-অবস্থায় আমরা দেখেছি, ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সম্পূর্ণ; পূর্ব-ব্যক্তিত্বের সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান ও স্মৃতি বিলুপ্ত।

হিস্টিরিয়া ও স্কিজোফ্রেনিয়ার সত্তা-বিভাজনের পার্থক্য, Bleuer অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন। সত্তা শুধু যে খণ্ড-খণ্ড হয়ে যায় তাই নয়; স্কিজোফ্রেনিয়ায় অনেকক্ষেত্রে ক্রমশ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে; খণ্ডব্যক্তিত্ব আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি পর্যন্ত হারাতে বসে। হিস্টিরিয়ায় এরকমটি ঘটে না। 'স্প্লিট পার্সোন্যালিটি' বলতে আজকাল সাধারণত স্কিজোফ্রেনিয়াকেই বোঝায়।

পিয়েরে জেনেট, মর্টন প্রিন্স প্রমুখ চিকিৎসক যখন হিস্টিরিয়া, ফিউগ, স্বপ্নচারিতার তথ্যানুশীলনে ব্যস্ত, তখন জনসাধারণের মধ্যে দ্বৈতব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশেষ কোন আগ্রহের সঞ্চার হয়নি। এই সময়কার (১৮৮৬) সাহিত্যজগতের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ডাক্তাররা যা পারেন নি, রবার্ট লুই স্টিভেনসন 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড'-এর গল্প লিখে তাই করলেন। পৃথিবীব্যাপী সাড়া পড়ে গেল। একই মানুষের মধ্যে জেকিল-হাইডরূপী দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণের কোন বিশেষ ঔৎসুক্য বা বিস্ময় ছিল না; প্রায় সব দেশের ধর্মপুস্তকে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ওষুধের সাহায্যে দেব-দানবকে আলাদা করা যায় এবং দানবদেবের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বীভৎস তাণ্ডব শুরু করে দিতে পারে,—এই সম্ভাবনার আতঙ্ক স্টিভেনসনের বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, জনসাধারণকে পেয়ে বসল। ধর্মভীরু সরল বিশ্বাসী ভিক্টোরিয়ানরা ডাক্তারদের কাছে আবেদন জানাল যেন এমন ওষুধ তাঁরা কখনও আবিষ্কার না করেন যার ফলে হাইডের আত্মা জেকিলের দেহ-মুক্ত হয়ে অনর্থ বাধতে পারে। মনে রাখা দরকার, যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেন, তাঁরাও খুব কম ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। স্বপ্নচারিতা, ফিউগ; বেশির ভাগ চিকিৎসকই আত্মার দেহান্তরণ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন এবং জন্মান্তরবাদের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি হিসাবে জাহির করতেন জেকিল-হাইডের গল্পে ওষুধ প্রয়োগে ব্যক্তিত্ব-বিয়োজন ব্যাপারটা খানিকটা বাস্তব-ঘেঁষা, অন্তত আধ্যাত্মিক ধূম্রজাল থেকে মুক্ত। তাই উল্লেখ করলাম।

সার্কো, জেনের পর হিস্টিরিয়া নিয়ে যিনি বিশেষভাবে মেতে ওঠেন এবং হিস্টিরিয়াকে কেন্দ্র করে যিনি একেবারে এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মনোবিকলন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, এবার তাঁর আলোচনায় আসা যাক। তিনি সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নাম শিক্ষিতমাত্রেরই জানা। ফ্রয়েড ভিয়েনার লোক। প্যারিতে সার্কোর অধীনে প্যাথলজিস্ট হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। এই সময় সংবেশন-প্রভাবে সার্কো রোগীর দেহে হিস্টিরিয়ার উপসর্গ সৃষ্টি করতেন। ফ্রয়েডের কাছে ব্যাপারটা খুবই নতুন। ফ্রান্সের বাইরের অধিকাংশ চিকিৎসক তখন হিস্টিরিয়াকে মানসিক ব্যাধি ভাবতেন না। শুধু তাই নয়, মেয়েদেরই শুধু হিস্টিরিয়া হয়, এই ছিল তাদের ধারণা। হিস্টিরিয়া শব্দটিই 'জরায়ু'বোধক শব্দ থেকে উৎপন্ন।

ভিয়েনায় ফিরে এসে অন্য একজন ডাক্তারের (জোসেফ ব্রয়ার) সঙ্গে তিনি সংবেশন সাহায্যে হিস্টিরিয়া আরোগ্য করতে লাগলেন। তাঁর আরোগ্য পদ্ধতির বিশিষ্টতা ছিল বিস্মৃত রোগ-কারণকে সংবেশনের সাহায্যে রোগীর স্মৃতি-পথে নিয়ে আসা। ফ্রয়েডের সাইকো অ্যানালিসিস তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত একটি একুশ বছরের মেয়ের জলাতঙ্কের কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। জলতঙ্ক বললে ঠিক হবে না, মেয়েটির গেলাস থেকে জল পান করার দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। কারণ কি সে তা জানত না বা বলতে পারত না। সংবেশন-অভিভাবনের সাহায্যে বিস্মৃত কারণটি তার মনে আসে এবং ফলে তার বিতৃষ্ণা দূর হয়। সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে মেয়েটির মনে পড়ল, সে একদিন এক ভদ্রলোকের পোষা কুকুরকে গেলাস থেকে জল পান করতে দেখেছিল, ফলে তার মনে জাগে ঘৃণা এবং ক্রোধ। প্রাণপণশক্তিতে সেই মনোভাব সে দমন করার চেষ্টা করে; কুকুরের মালিককে সে মনোভাব জানাতে চায় নি। মনোভাব অবদমনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ঘটনাটি তার স্মৃতি-পথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফ্রয়েডের ভাষায় সংজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হল তার অভিজ্ঞতা। সম্মোহন-অভিভাবন যতক্ষণ না নির্বাসিত অভিজ্ঞতাকে সংজ্ঞানরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করছে, ততক্ষণ হিস্টিরিয়ার উপসর্গ দূর হচ্ছে না। এ-থেকে ফ্রয়েড এই ধারণায় উপনীত হলেন যে, বিস্মৃতি-লোকে অবস্থিত অভিজ্ঞতা, আমাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। চেতনা স্তরের ওপারেও মনোজগত আছে। এর পর ন্যান্সি স্কুলের বার্ণহাইমের সংবেশনার অভিভাবনের ফলাফল দেখে ফ্রয়েড 'নির্জ্ঞান' (আনকনশাস) মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরো বেশি প্রত্যয়িত হলেন। সম্মোহিতকে বলা হল, যখন ঘড়িতে বারোটা বাজবে, সে তখুনি বার্ণহাইমের বসার ঘরের জানালাটা খুলে দেবে। এর পর তার ঘুম ভাঙান হল। বারোটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে সে জানালাটা খুলে দিল। বার্ণহাইম জিজ্ঞাসা করলেন, — জানলা খুললে কেন? ইতস্তত করে সে উত্তর দিল, —খুব গরম কিনা, তাই। সে বলল না যে আদিষ্ট হয়ে সে খুলেছে; অথবা এও বলল না যে না খুলে সে পারল না। বার্ণহাইম কিন্তু তার উত্তরে সন্তুষ্ট নন। উত্তর ঠিক হয় নি—বললেন তিনি। আরো দু-একটা বেঠিক উত্তরের পর শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে সঠিক উত্তরটি বেরিয়ে এল।—আপনি বলেছিলেন, তাই খুলেছি। হ্যাঁ, এইবার আমার মনে পড়েছে। বারোটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে জানালা খুলতে আপনিই আমাকে বলেছিলেন। বার্ণহাইম এতক্ষণে বিস্মৃত অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিপথে আনতে পেরেছেন। নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

ফ্রয়েড-এর কাছে এই অভিজ্ঞতার মূল্য অনেকখানি। তিনি বুঝলেন যে, রোগীদের উপসর্গ বা বিশেষ ব্যবহারের কারণ রোগীদের জ্ঞানের রাজ্যে না-ও থাকতে পারে। রোগের মূল কারণ নিহিত থাকে নির্জ্ঞানের গোপন গুহায়। নির্জ্ঞানে নির্বাসিত স্মৃতিকে সংজ্ঞানে আনার পদ্ধতিও তিনি এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলে, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলে, সব বাধা অতিক্রম করে অবদমিত ইচ্ছা বা ভুলে যাওয়া ঘটনাকে চেতনার কোঠায় নিয়ে আসা যায়। নির্জ্ঞানে নিবদ্ধ-প্রক্ষোভ বাইরে এল, ঘটল ক্যাথারসিস বা রেচন। প্রক্ষোভ-রেচনের অন্য নাম অ্যাবরিঅ্যাকশন। ভুলে-যাওয়া অতীতের পুনরুজ্জীবন—এই অ্যাবরিকেশনকে বাংলায় অবপ্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। অবদমন ও অবপ্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে হিস্টিরিয়ার তথা সবরকম নিউরসিসের নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন ফ্রয়েড।

এবার ফ্রয়েডের সর্বরতিবাদের (প্যানসেকস্যুয়ালিজম) মূল সূত্রটির সন্ধান করা যাক। এর আভাসও পেয়েছিলেন তিনি ফরাসীদেশের সম্মোহক-চিকিৎসকদের কাছ থেকেই। এক্ষেত্রে সার্কো জুগিয়েছিলেন অনুপ্রেরণা, জাগিয়েছিলেন ঔৎসুক্য। একজন ছাত্র সার্কোকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই হিস্টিরিয়া রোগীটির বিশেষ উপসর্গের কারণ কি? এর উত্তরে গুরু সার্কো উত্তেজনার সঙ্গে বললেন—এই ধরনের উপসর্গের মূলে রয়েছে কামেচ্ছা। একটু থেমে খুব জোরের সঙ্গে বললেন,—সব সময়ে, সব রোগীর মনেই এই ইচ্ছা প্রবল।

ফ্রয়েড-এর সর্বরতিবাদ নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। অনেকেই আধুনিক মনস্তত্ত্ব বলতে ফ্রয়েডীয় 'সাইকোঅ্যানলিটিক'তত্ত্বকেই শুধু বোঝেন অথবা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার নির্জ্ঞান-অবদমন-প্রতীক-এর সাহায্যে চরিত্রের অন্তরলোক উদ্ঘাটিত করেন। হিস্টিরিয়ার তত্ত্ব অনুসন্ধানে ফ্রয়েডীয় বিরাট অবদানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে কেবলমাত্র তাঁর প্রথম জীবনের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলাম, উদ্দেশ্য হিস্টিরিয়া সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ধারণা পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা।

হিস্টিরিয়ার উপসর্গ ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড একটি নতুন কথার আমদানি করলেন, যার ফলে জেনেট মর্টন প্রিন্স-এর বিষঙ্গ-তত্ত্ব থেকে তাঁর ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হল। তিনি বললেন, আনকনশাস মোটিভেশান অর্থাৎ নির্জ্ঞান-প্রেষণা থেকে উপসর্গের সৃষ্টি। জেনেট বলেছিলেন ব্যক্তিত্ব-বিযোজন-এর কথা; ব্যক্তিত্বের এক অংশ অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক-রহিত হয়ে নিজস্ব পরিমন্ডলের মধ্য স্বাধীনভাবে চলাফেরা আচার-ব্যবহার করতে থাকে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের বধিরত্ব, অন্ধত্ব, অসাড়ত্বের কারণ রোগীর চেতনার রাজ্যে অবস্থিত নয়; একথাটা তাঁরাও জানতেন; কিন্তু বিশেষ উপসর্গ যে বিশেষভাবে নির্জ্ঞানের কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এটা তাঁরা বলেননি। ফ্রয়েডই প্রথম উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন এবং নির্জ্ঞান-প্রেষণা নিয়ে গবেষণা চালালেন।

বিষঙ্গের গতিবিজ্ঞান ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার মূল কথা। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। গেলাশ থেকে জলপানের বিতৃষ্ণা ছিল যে-মেয়েটির, তার বিতৃষ্ণার কারণ যেটুকু জানা গিয়েছিল, জেনেট, মর্টন প্রিন্স তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু ফ্রয়েড আরো গভীরে যেতে চাইলেন। কেননা, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীর সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে উপসর্গ দূর করার অভিজ্ঞতা থেকে একটা ব্যাপার ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, যে এই উপায়ে উপসর্গ দূর হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে রোগী অন্য একটি উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে হাজির হয়। কারণ কি? প্রাথমিক পর্যায়ে সম্মোহনের সাহায্যে যে-বিস্মৃত ঘটনাটি মেয়েটির স্মৃতিপথে এসেছিল, সেই আশু কারণটি উপসর্গ ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। মনের আরো গভীরে নিহিত রয়েছে হয়ত অন্য কোনো কারণ যার আভাসমাত্র পাওয়া গেছে। আসল মূল কারণটির চেতনার রাজ্যে প্রবেশপথে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো বাধা বর্তমান। সেই বাধা কি ধরনের? কেনই বা মূল কারণটি নির্জ্ঞান রাজ্যে নির্বাসিত? অন্য পদ্ধতিতে ফ্রয়েড মূল কারণের অনুসন্ধান

শুরু করলেন। সেই পদ্ধতিই হল ফ্রি অ্যাসোসিয়েশান মেথড; অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি। এই অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে নির্জ্ঞান মনের রহস্য ও অবদমনতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন ফ্রয়েড। কুকুর গেলাশ থেকে জলপান করছে—এই ঘটনাটি মেয়েটির মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার কেন করল, আর কেনই বা ঘটনাটির স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে গেল, কেন? এই প্রশ্নদুটির সঙ্গে জড়িত আরো একটি প্রশ্ন—কুকুরের মালিকের সামনে বিতৃষ্ণা দেখানোতে মেয়েটির এত অনিচ্ছাই বা কেন? এই ধরনের 'কেন'র উত্তর ফ্রয়েড শিশু-মনের স্বন্দ্ববিরোধের মধ্যে খুঁজে পেলেন এবং অতিপরিচিত লিবিডো-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এইভাবে ঘটল। 'ঈদিপাস কম্‌প্লেক্‌স' ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আরো পরিচিত শব্দ। এই শব্দদুটির অপপ্রয়োগ আধুনিক সাহিত্যে প্রায়শই ঘটে থাকে বলে ফ্রয়েডীয় মনসমীক্ষা-তত্ত্বের বিশদ আলোচনার সুযোগ পাবার আগেই এ-দুটির সঠিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। এ্যাড্‌লার, ইয়ুং প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে ফ্রয়েডের মতপার্থক্য বুঝতে হলেও লিবিডো এবং ঈদিপাসকে বোঝা দরকার।

শৈশবের যৌন-প্রবৃত্তির অবদমন থেকে হিস্টিরিয়া ইত্যাদি সব রকমের নিউরোসিসের উদ্ভব, এই হচ্ছে ফ্রয়েডিয়ানদের অভিমত। মাতাপিতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক প্রধানত এবং মূলত যৌনকেন্দ্রিক। আগেই বলেছি, ফ্রয়েডীয় মতে রোগীর স্বন্দ্ব-অবদমনের ইতিহাস খুঁজতে হলে তার শৈশবে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 'শৈশব-যৌনতা' কথাটি অবশ্য ফ্রয়েড খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। নর-নারীর সঙ্গমের মধ্যে যে-যৌনতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, শৈশব-যৌনতা ঠিক সেরকমটি নয়। শিশুর যৌনতা বহু আকারে বহুভাবে তার দেহ-মনে সঞ্চারিত। তার আঙুল চোষা থেকে মাগ বিশেষের ভালবাসা; এ-সবের মধ্যেই যৌনতার অভিব্যক্তি। বলা যায় যৌনতা এখন 'polymorphous' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সর্বাত্মক যৌনতা বিশিষ্ট আকার ও রূপ পায়। মায়ের কাছ থেকে শিশু প্রধানত দেহ-মনের খোরাক সংগ্রহ করে, কাজেই তাকে কেন্দ্র করেই যৌনতা বিশেষ রূপ নিতে থাকে। ক্রমশ শিশু বুঝতে পারে, (সমাজ ও পিতা-মাতাই এ-বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন) পিতা মাতৃস্নেহের শুধু ভাগিদার নয়, আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির অন্তরায়ও বটে। মাতৃলিপ্সার অবদমন ও পিতৃবৈরিতার অপসরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। গ্রীক-আখ্যায়িকার ঈদিপাস পিতাকে হত্যা করে নিজের মাতাকে বিবাহ করেছিলেন; পিতা-মাতার পরিচয় না জেনে। শিশুমনের মাতৃলিপ্সা ও পিতৃবৈরিতাও অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞানে অন্তর্হিত হয়। নিজের অজ্ঞাতসারে তার চিন্তাভাবনা আচার-ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। মেয়েদের বেলায় এই জটিল মনোবৃত্তিকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রা-কম্‌প্লেক্‌স। ব্যাপারটা খুবই সহজভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। এই লিপ্সা ও বৈরিতার ফলে শিশুমনে অপরাধমনস্কতা, পাপবোধ ইত্যাদি জাগতে থাকে। একাত্মীকরণ (Identification) চেষ্টা চলে পাপবোধ দূর করার জন্য।

এর পর যৌনতা বিশেষভাবে নিজের দেহ-কেন্দ্রিক হয়ে আত্মরতি বা আত্মপ্রেমের জন্ম দিয়ে থাকে। এই অবস্থার নাম নার্সিসিস্টিক স্তর (Narcissistic)। এর পরে আসে সমকাম (হোমো সেক্‌সুয়ালিজম স্তর)। সমলিঙ্গের সহপাঠী, খেলার সাথীদের দিকে পরিচালিত হয় যৌনতা। ক্রমে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এই হেটারো-সেক্‌সুয়াল প্রেমই সাধারণের কাছে যৌন আকর্ষণ বলে পরিচিত। এই স্তর প্রধানত লিঙ্গ-কেন্দ্রিক ও প্রজননভিত্তিক। কাজেই প্রজাতি-সংরক্ষক।

যৌন-প্রবৃত্তির এই অধিরোহণ-পর্ব ফ্রয়েডের কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যব্যঞ্জক। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণে যদি বাধাবিপত্তি না ঘটে, তবে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই অধিরোহণপর্বে পূর্বস্তরের সবকিছুকে মুছে ফেলে সহজ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যাওয়া প্রায়শই ঘটে না। পূর্ণবয়স্কের মানসিক ব্যাধির মূলে, ফ্রয়েড বলেন, সব সময়েই থাকবে যৌনতার স্তর অতিক্রমণের সময়কার আঘাত (ট্রমা)। আদিম যৌন-প্রবৃত্তিকে ফ্রয়েড এইভাবে মানসতা সংগঠনের মূলশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এরই নাম লিবিডো। নব্য-ফ্রয়েডিয়ানরা 'লিবিডোতত্ত্ব'কে অনেকাংশে পরিবর্তিত করেছেন; 'এনার্জি' (এলাভিতাল) আর লিবিডোকে এক পর্যায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছেন: কিন্তু লিবিডোর আদি অর্থে ব্যবহারই ব্যাপক এবং অধিকাংশের সমর্থিত। অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে, ফ্রয়েড মনে করেন, নিশ্চয়ই জানা যেত যে, মেয়েটির জলপানের বিতৃষ্ণার কারণ অবদমিত শৈশবের কামেচ্ছা অথবা অবাঞ্ছিত যৌন-আক্রমণ।

এইবার ইয়ুং। জুরিখের সি জি ইয়ুং প্রথম জীবনে ফ্রয়েডের 'সাইকো-অ্যানালিটিক'তত্ত্বের ভক্ত ছিলেন। ফ্রয়েডের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা ইয়ুংকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, পরবর্তী জীবনে তিনি ফ্রয়েডের পন্থা পরিত্যাগ করে নিজের স্বতন্ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জ্ঞান মনের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানের জন্য 'শব্দ-অনুষঙ্গ' পদ্ধতির প্রচলন করেন।

তিনি কতকগুলো অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতেন, রোগীকে তাঁর সামনে বসে সেই শব্দগুলোর সঙ্গে অনুষঙ্গিত এবং সম্পর্কিত অন্য কতকগুলো শব্দ বলার নির্দেশ দেওয়া হত। এই শব্দের খেলায় ইয়ুং-এর কাছে রোগীর নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ধরা পড়ত। প্রতিটি শব্দের উত্তর দিতে কতটা সময় লাগছে সেটা স্টপ-ওয়াচ থেকে মাপা হত। রোগীর চোখ-মুখের অভিব্যক্তির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন ইয়ুং। তারপর উত্তরে বলা শব্দগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলে রোগী কি ইচ্ছা বা কথা অবদমিত করেছে, তার খানিকটা এবং অনেক সময় পুরোটা বোঝা যেত। ইয়ুং-এর একটা শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষার চার্ট তুলে ধরলে পদ্ধতিটা অনায়াসে বোঝা যাবে। যে-রোগীর মানসিকতা বিশ্লেষণে এই চার্টটি ব্যবহৃত হয়েছিল, সে ছিল মানসিক আরোগ্যশালার এক সেবিকা।

উদ্দীপক শব্দ	উত্তরে বলা	সময়
	আনুষঙ্গিক শব্দ	
বিবাহ	মেয়ে	৬·৮ সেকেণ্ড
চুমু	হাসি	৬·০ "
ভালবাসা	রাজি	৫·৬ "
পুরুষ নার্স	কাবোর্ড	৮·০ "
স্বপ্ন	ঝুড়ি	৬·৪ "
পাকা	ফল	৬·৬ "
আশীর্বাদ	গ্রহণ	৫·৮ "

উত্তরটা গোলমেলে প্রধানত দু' জায়গায়। পুরুষ নার্স-এর আনুষঙ্গিক কাবোর্ড এবং স্বপ্নের উত্তরে ঝুড়ি। ইয়ুং বলেছেন, এই দুই ক্ষেত্রেই সেবিকার মনে কামভাব জেগেছিল। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল কপোল। চোখের সামনে যা দেখেছিল, না ভেবেচিন্তে তাই উচ্চারণ করে উদ্দীপক শব্দের উত্তর দিয়েছিল।

—মনোবিদ

ভিড় প্রসঙ্গ : দ্বিতীয় মত

কলকাতার অসহ্য ভিড়, পথ চলতে গায়ে গায়ে গঁতো লাগে। মনটা যেন একটু একা থাকার জন্যে ছটফট করে। আর তাই তো পুজোর বন্ধে, কি আর কোনো সুযোগে, পালাবার সুযোগ পেলেই হাওড়া স্টেশনে ছুটি আমরা—দূরে কোথাও গিয়ে একটু হাঁফ ফেলবার জন্যে। কিন্তু দূরে গিয়েও কি আমরা একা থাকি, না, থাকতে চাই?

হ্যাঁ, একথা আমি একশবার স্বীকার করব, মাঝে মাঝে একা থাকতে আমরা সত্যিই চাই। কিন্তু সে কতোক্ষণের জন্যে? খুব বড়জাতের শিল্পী বা উচ্চমার্গের তপস্বী ছাড়া আর সকলেই কাতর হয়ে পড়েন দু-চারদিনের মধ্যেই। এর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে একটু আগে উল্লিখিত ঐ পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবার উদাহরণের ভেতরেই। লক্ষ্য করলে দেখবেন, কলকাতার ভিড় এড়াতে বেড়াতে যাই সেই সব জায়গাতেই, যেগুলো টুরিস্ট-কেন্দ্র হিসাবে নামকরা। ফলে ভিড়ের চাপ সেখানে কিছু কম হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জায়গাগুলো আমাদের ভালো লাগে। অন্যপক্ষে, আমরা যদি বেড়াতে যাই এমন কোনো জায়গায় যেখানে লোক-জন প্রায় আসেই না, মনটা পালাই পালাই করে। জানি, এক্ষুনি অনেকে তর্কের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সবিনয়ে নিবেদন করি, একা থাকতে যদি আমাদের খারাপই না লাগত তো নির্জন কারাবাস (তা দেরাদুন বা কাশ্মীর হলেও!) শাস্তি বলে গণ্য হত না। এবং সকলেই নির্জন কারাবাসে যাবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতাম!

আসলে আমরা যা চাই তা হল স্বাদ-বদল। সেজন্যে ভিড়াক্রান্ত শহরে মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পালিয়ে যাই আমরা মানুষের ভিড়েই —শুধু তার ধরণটা একটু আলাদা।

সকলেই জানেন, একালে ওদেশে টেলিভিশনের উঠতি যুগে সিনেমা-ওয়ালারা বিলক্ষণ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এবার বুঝি তারা ভাতে মারা পড়েন! বাস্তবিক ভয়টা মোটেই অমূলক ছিল না। সত্যিই তো, বাড়িতে বসে সিনেমার মতোই অন্য এক নাট্যরস আস্বাদনের সুযোগ যদি পাওয়া যায় তো কে আর তোড়জোড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিনেমা হলে এসে ভিড় জমাবে? কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তেমন মারাত্মক কিছু বিপদ ঘটল না। হয়তো একেবারে গোড়ার দিকে সিনেমা-যাত্রীর সংখ্যা কিছু কমেও থাকতে পারে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এবং অচিরেই সিনেমার দাপট চলতে লাগল আগের মতোই অপ্রতিহত গতিতে। কিন্তু এর কারণটা কী, অনুমান করতে পারেন? স্রেফ মানুষের গুঁতোসুখ পাওয়ার তাগিদ। ঘরে বসে টি-ভি দেখে সিনেমা দেখার সুখ হয় না—তার প্রধানতম কারণ হল ঐ মানুষের ভিড়ের অভাব। অর্থাৎ হলভর্তি মানুষের ভিড়ে বসে সিনেমা দেখলে একটা বাড়তি উপভোগ মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা একা-একা পাওয়া যায় না। মানুষের ভিড় যে আমাদের কতো কাম্য, এ থেকেই আশাকরি তা মালুম হবে।

অবিশ্যি তাই বলে আমি সবরকম ভিড়ের পক্ষেই নির্বিচারে সাফাই গাইছি তা নয়। বিশেষ করে কলকাতার মতো আক্রমণশীল ভিড় তো খারাপ দাঁতের মতোই বেদনাদায়ক। এবং খারাপ দাঁতের মতোই পরিহার্য। বিদেশে কলকাতার মতো বড় বড় শহরের মানুষেরা তাই নতুন এক কায়দা বার করেছে। বড় ছুটিতে বাকস-প্যাটরা বেঁধে লম্বা পাল্লার পাড়ি দেবার পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহের শেষের দিকেই রবিবারকে সামনে নিয়ে ওরা ছোটো ছোটো পাড়ি দেয়। হয়তো কাছাকাছি

দুর্লভ চক্রবর্তী

শহরে যায়, কিম্বা উদ্দেশ্যহীনভাবে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে একদিকে। রাস্তার পাশে কোনো সরাইখানা বা সরাবখানায় থামল দুদণ্ড, এদিক-ওদিক ঘুরে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিল। কিন্তু চারদিকেই তার আছে আরও দশ-বিশজন মুসাফিরের ভিড়। গায়ের উপর এসে পড়ছে না, কিন্তু উপভোগ করা যাচ্ছে। ব্যস, ওতেই হতে থাকল গুঁতোসুখ। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে দেখেশুনে।

মনে হয়েছে—কারণ আমার স্থির ধারণা, 'এক আমি বহু হব' উপনিষদে ঈশ্বরের মুখে এই যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, এটি আসলে আমাদেরও অন্তরের কামনা। অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এবং অনেকের সঙ্গে মেলবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মজ্জাগত। তাই তো সারা পৃথিবীতেই মানুষ কতোকাল আগে থেকে বসিয়ে আসছে মেলা। হয়তো জিনিসপত্র কেনা-বেচা ছিল তার একটা প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু সেইটেই নিশ্চয় সবটা নয়। কেননা আজকের এই সভাযুগে যখন টেলিফোন তুললেই যে কোনো জিনিস হাতের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, যখন হাজার-গণ্ডা শোরুম সর্বদা চোখের উপর বিরাজমান, আর দলে দলে এজেন্টরা এক-পায়ে খাড়া রয়েছে আপনার ইচ্ছা-মাত্র ভালোমন্দ সব জিনিসের তুলনামূলক দাম থেকে শুরু করে সবকিছু তথ্যের গোটা ইতিহাস শুনিয়ে দেবার জন্যে—তখন কেন 'ইন্ডাস্ট্রি ফেয়ার' বা 'এক্সপো' ইত্যাদি বসানো হয় পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় শহরে? আমি হলফ করে বলতে পারি, মানুষের গায়ের বাতাস গায়ে লাগানোই এসব মেলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বিশেষ করে আজকের জগতে, এলিয়েনেশান বা বিচ্ছিন্নতার দুঃখ যখন সর্বব্যাপী, তখন তো মানুষের সঙ্গ পাবার তৃষ্ণা আরও গভীর। অবিশ্যি ভিড়ের মধ্যে সঙ্গসুখ হয়তো পুরোটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু আজকের সময়টা যে ব্যস্ততার যুগ তাও তো স্বীকার করতে হবে! আগেকার দিনের মতো ড্রইংরুমে বসে আড্ডা দেবার সুযোগ আমাদের কজনের বরাতে জোটে? কিম্বা ড্রইংরুম নামক জায়গাটিই কজনের বাড়িতে আছে? অতএব বিকল্প ব্যবস্থা—এই ধরণের মেলা, কি নিবেদনপক্ষে গঙ্গার ধারে, লেকের পাড়ে কিম্বা চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ সময় কাটানো।

অবিশ্যি এতে যে মনের তৃপ্তি পুরোটা হয় তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু এটা মন্দের ভালো তা স্বীকার করতেই হবে। কেননা একালের জীবনযাত্রায় যন্ত্রের উপর নির্ভরতা এমনভাবে আবশ্যিক হয়ে উঠেছে যে, আমাদের মনের মধ্যেও এসে যাচ্ছে যান্ত্রিকতা। টেকনোলজির অভূতপূর্ব সাফল্যে মানুষ যেন নিজেই হয়ে উঠছে অকিঞ্চিৎকর। এই তুচ্ছতা এবং অসহায়তা-বোধ যে মানুষকে ভিতরে ভিতরে কতোটা পীড়িত করে, আজকের দিনের হাজার রকম স্নায়ুবিকার থেকেই তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, মানুষের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার অতিবিস্তৃত এবং অতিজটিল আয়োজনের চাপে মানুষের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে। এ দুর্বিপাকে মানুষের এক-মাত্র সহায় হল মানুষ। তাই ভিড়ের চাপে ক্লিষ্ট হয়েও খুঁজে নিতে হয় অন্য আরেক জাতের ভিড়ই। কেননা মানুষের সংসারে মানুষ ছাড়া আর কোনো গতি নেই মানুষের। মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও তাই ফিরে যেতে হয় মানুষের কাছেই—ঠিক যেমন মায়ের কাছে শাস্তি পেয়েও শিশু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তার মাকেই।

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

(পনের)

মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়ে গুরুত্ব বিচার করা যায় কল-কারখানায়, সওদাগরী অফিসে ও সাধারণ সরকারী দপ্তরে। হয়ত আরো কিছু কিছু জায়গায়। সর্বত্র নিশ্চয়ই নয়। বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ ও কূটনৈতিক দুনিয়ায় তো নয়ই। একবার পরীক্ষায় পাশ করে দু-চারটে প্রমোশন পেয়ে কিছুটা উপরে উঠলেই এই দুটি দপ্তরে গুরুত্ব বাড়ে না। পুলিশের এস-পি বা ডি-এস-পি'র চাইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টরদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশী। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনগুলিতেও ঠিক এমনি হয়।

বিগ পাওয়ারদের কথাই আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাম্বাসেডরের চাইতে প্রায় অজ্ঞাত এক থার্ড সেক্রেটারীর গুরুত্ব অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে এই থার্ড সেক্রেটারীর গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই অ্যাম্বাসেডরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ভারতবর্ষ বিগ পাওয়ার হয়নি বলেই হয়ত এখনও কন্ফিডেনশিয়াল রিপোর্টে অ্যাম্বাসেডরের দস্তখত প্রয়োজন হয়। তবে ভারতীয় মিশনগুলিতেও শুধু মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়েই ডিপ্লোম্যাটদের গুরুত্ব বিচার করতে গেলে অন্যায় ও ভুল হবে।

বন'এ ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর পলিটিক্যাল কাউন্সিলার হয়েও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিঃ আহুজার বিশেষ কোন গুরুত্ব বা প্রাধান্য নেই। যখন প্রায় রাতারাতি ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের জন্ম হয়, তখন মিঃ আহুজা ডি-এ-ভি কলেজের দর্শন-শাস্ত্র অধ্যাপনার কাজে হঠাৎ ইতি দিয়ে ডিপ্লোম্যাট হন। প্লুটো, সক্রেটিস বা ভগবান বুদ্ধের সংস্পর্শ ত্যাগ করেও আহুজা সাহেবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। বরং বছর বছর মাইনে বেড়েছে ও কয়েক বছর পর নিয়মিত প্রমোশনও পেয়েছেন। তবুও ও'র পর ঠিক নির্ভর করা যায় না এবং ক্ষেত্র বিশেষে নির্ভর করাও হয় না।

প্রত্যেক শুক্রবার আহুজা সাহেব তাঁর পলিটিক্যাল রিপোর্ট অ্যাম্বাসেডরকে দেন এবং অ্যাম্বাসেডর একটু চোখ বুলিয়েই তা বন্দী করে রাখেন নিজের ড্রয়ারে। সেকেণ্ড সেক্রেটারীর রিপোর্টটাই কেটে-কুটে পাঠিয়ে দেন দিল্লী।

এবার পশ্চিম জার্মাণীর নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশী। উনপঞ্চাশ থেকে প্রতি নির্বাচনে যা হয়েছে, এবার ঠিক তা হবে কিনা, কেউ জানে না। অনেকের মনেই অনেক রকম সন্দেহ। বার্লিন নিয়ে দুটি সুপার-পাওয়ারের ঠাণ্ডা লড়াই নেহাত হঠাৎই জমে উঠেছে বলে এই নির্বাচন আরো বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাইতো অ্যাম্বাসেডর তলব করেছেন তরুণকে।

তরুণকে টেলিফোন করার পরদিন সকালের কনফারেন্সে অ্যাম্বাসেডর নিজেই বললেন, আওয়ার ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ডেস্ক ওয়াণ্ট ডিফারেণ্ট স্ট্যাডিজ অ্যাবাউট ইলেকশন এবং সেজন্যই আমি বার্লিন থেকে তরুণকেও আসতে বলেছি।

এই নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু কোনার্দ আদেনুর। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের কাছে আদেনুর অপরিচিত নাম নয়। বরং সে জানে রসিক কূটনীতিবিদরা আদর করে এর নাম রেখেছেন জন ফস্টার আদেনুর!

অরণ্যেও দিন-রাত্রি হয় কিন্তু আদেনুরের কাছে নয়। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবার পরও এই মহাপুরুষ রাশিয়াকেও ঠিক স্বীকৃতি দিতে রাজী নন! ইন্দ্রাণীর সব স্মৃতি, সব কথা দূরে সরিয়ে রেখে তরুণ আদেনুরের চিন্তায় ডুবে গেল।

উনিশ শ' চোদ্দয় যখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আদেনুরের বয়স একত্রিশ। কোলোনের লর্ড মেয়র হন আরো দশ বছর পর। নাজীদের সময় এঁকে বনবাসে যেতে হয়। যুদ্ধের পর আমেরিকানরা আবার একে মেয়র করলেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান 'অকর্মণ্যতার' জন্য এঁকে পদচ্যুত করেন। চাকা ঘুরে গেল। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেন পশ্চিম জার্মাণীর সর্বেসর্বা—চ্যান্সেলার। তারপর এক যুগ ধরে চলেছে দাদুর রাজত্ব। একচ্ছত্র আধিপত্য! এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে?

তবুও জানে দাদুকে এককালে সবাই ভয়-ভক্তি করলেও আজ নিন্দায় মুখর বহুজনে। প্রকাশ্যে, মুক্তকণ্ঠে!

নির্বাচনের উত্তেজনায় কটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে কেটে গেল, তরুণ টের পেল না। পনের দিনে দশটি প্রদেশ ঘুরে ঘুরে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে! বড় বেশী ক্লান্তবোধ করছিল। অ্যাম্বাসেডর বড় খুশী হয়েছিলেন তরুণের রিপোর্টে। তাই তো সবকিছু মিটে যাবার পর অ্যাম্বাসেডর তরুণকে বললেন, বড্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে। টেক সাম রেস্ট বিফোর রিটার্ণিং টু বার্লিন।

তরুণ ধন্যবাদ জানাল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ স্যার!

প্রথম দু-তিন দিন তো কোলোনেই কেটে গেল। দিনে মিউজিয়ামে ও রাতে নাইট ক্লাব রোমান্টিকাতে। রোজ রোজ যেতে ভাল না লাগলেও চ্যাটার্জীর পাল্লায় পড়ে যেতেই হতো, আর ঐ দোতলার কোনার টেবিলে বসে রাইন ওয়াইন খেতে খেতে শুনতে হতো ওর ইন্দোনেশিয়ার কাহিনী।

তরুণের এসব কোনকালেই ভাল লাগে না। বিশেষ করে যারা নিজের অধঃপতনের কাহিনী বলতে গর্ব অনুভব করে, তাদের তরুণ মনে মনে দারুণ ঘৃণা করে। তবুও চ্যাটার্জীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। হাজার হোক এককালের সহকর্মী ও সমসাময়িক। দিল্লীতে রোজ একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে, সন্ধ্যায় কনট প্লেস ঘুরেছে, সাপ্রু হাউসে ওডিসী নাচ দেখেছে। আরো কত কি করেছে।

চ্যাটার্জীর প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ইন্দোনেশিয়ায়। নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, ধর্মভীরু সন্তোষ চ্যাটার্জী অত্যন্ত খুশী হয়েছিল এই ভেবে যে ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে গিয়েও অতীত দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শ অনুভব করবে প্রতি পদক্ষেপে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় সওদাগরের দল হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি এনেছিলেন এই দেশে, তার চিহ্ন আজও সযত্নে সসম্মানে দেখতে পাওয়া যাবে। কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড আর বাণ্ডিল বাণ্ডিল ধূপকাঠি নিয়ে যে সন্তোষ চ্যাটার্জী একদিন ভোরবেলায় বোম্বে থেকে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে চড়ে ইন্দোনেশিয়া রওনা হয়েছিল, সে সন্তোষ আর ফিরে আসেনি। হোটেল ইন্দোনেশিয়ার জাভা রুমে আর কেবাজোরান মডেল টাউনের ঐ ছোট্ট কটেজের বেডরুমে অসংখ্য ক্ষণিক বান্ধবীদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সে চ্যাটার্জীর মৃত্যু হয়েছে।

রাইন নদীর শোভা না দেখে রোমাণ্টিকাতে বসে বসে সেই সর্বনাশা নোংরা কাহিনী শুনতে শুনতে বিরক্তবোধ করে তরুণ। হাতে দিন তিনেক মাত্র সময় ছিল, কিন্তু তবুও সেকেণ্ড সেক্রেটারী হাবিবকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্ল্যাক ফরেস্টের দিকে।

নির্বাচনের পরিশ্রম আর চ্যাটার্জীর সান্নিধ্যে বড্ড ক্লান্তবোধ করছিল তরুণ। ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জন কটেজে বেশ লাগল দু'টি দিন। তাছাড়া অনেক দিন পর হাবিবের গান শুনতে আরো ভালো লাগল। নিজে গান শেখেনি, তবে বাড়ীতে গানের চর্চা ছিল। হাজার হোক রামপুরের খানদানী বংশের ছেলে তো! হাবিবের দরবারী কানাড়া শুনতে রাত জাগতে হতো না। সন্ধ্যার পর সাপার শেষ করে কটেজের বারান্দায় বসেই শোনা যেত। ঘড়ির কাঁটায় মাত্র আটটা বাজলেও মধ্যরাত্রির গাম্ভীর্য-ভরা ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে তরুণ যেন ফেলে আসা বাংলাদেশের স্মৃতি খুঁজে পেতো।

সঙ্গে সঙ্গে মনটা হাহাকার করে উঠত। দরবারী কানাড়ার মিষ্টি সুর কানে ভেসে এলেও বুকটা বড় বেশী জ্বালা করত।

হাবিবের গান থামত কিন্তু তরুণ যেন তখনও বিভোর হয়ে থাকতো। আত্মমগ্ন থাকত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হাবিব একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করত, কিয়া দাদা, কোন কষ্ট হচ্ছে?'

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়েই আসত। মুখে বলত, 'না, না, কষ্ট হবে কেন?'

ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জনতা আবার দু'জনকে ঘিরে ধরে। বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলে না।

হাবিব পকেট থেকে সিগরেটের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দেয়, 'দাদা, হ্যাভ এ সিগরেট'।

'সিগরেট?'

নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করে। মাথাটা হেঁট করে একবার নিজেকেই নিজে দেখে নেয়। আবার একটা চোরা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস! 'হাবিব! বেটার গিভ মী সাম ড্রিংকস্।'

তরুণ মিত্র ড্রিংকস্ চাইছে? হাবিব স্তম্ভিত হয়ে যায়। পার্টিতে, রিসেপশনে বা ককটেল দু'এক পেগ খেলেও ড্রিংকের প্রতি কোন আগ্রহ বা দুর্বলতা নেই ওর। এ কথা ফরেন সার্ভিসের সবাই জানেন। হাবিবও জানে।

'ইউ ওয়াণ্ট ড্রিংক?'

'কেন ফুরিয়ে গেছে নাকি?'

'না, না, ফুরোবে কেন বাট......!'

'তবে আবার দ্বিধা করছ কেন?'

হাবিব একটু হাসতে হাসতেই বলে, 'আপনাকে তো কোনদিন ড্রিংক চাইতে দেখিনি তাই......!'

ঐ আবছা অন্ধকারের মধ্যেই তরুণ একবার হাসে। 'আগে কোনদিন যা করিনি, ভবিষ্যতে কি তা করা যায় না?'

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে অ্যাম্বাসেডর যে মেসেজটা দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন তা হাবিবের হাত দিয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া কন্সাল জেনারেল বন'এ এলেও সব শুনেছিল। তাইতো অবথা শুরু করতে চায় না সে।

ঘর থেকে ওয়াইনের বোতলটা এনে দুটো গেলাসে ঢালে।

'চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স!'

আবার কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকার পর তরুণ জানতে চায়, 'আচ্ছা হাবিব, তোমার বাড়ীতে সবাই আছেন, তাই না!'

'হ্যা, বাবা-মা ভাই-বোন......!'

'তুমি বিয়ে করবে না?'

'হ্যা, করাচী যাবার আগেই বিয়ে করে যাব।' অনায়াসে জবাব দেয় হাবিব।

পাকিস্থানের নাম শুনেই তরুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'তুমি করাচী যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ দাদা!'

'কবে?'

'এইত তিন সপ্তাহের মধ্যেই আই উইল সেল ফর বম্বে। তারপর সিকস্ উইকস্ দেশে থেকেই করাচী যাব!'

ওয়াইন গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখল তরুণ। স্বগোক্তির মত চাপা গলায় বলল, 'তুমি করাচী যাচ্ছ?'

হাবিবও গেলাসটা নামিয়ে রাখে। একটা সিগরেট ধরিয়ে একটা টান দেয়। দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'দাদা, করাচীমে কই কাম হ্যায়?'

এবার একটু জোর করেই হাসে তরুণ, 'কাম? একটু জরুরী কাজ আছে ভাই।'

'টেল মী হোয়াট আই উইল হ্যাভ টু ডু।' মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করে বলে, 'যদি আমার দ্বারা না হয় তাহলে আই উইল আস্ক মাই আংকেল টু হেলপ মী।'

'হু ইজ ইওর আংকেল?'

'উনি পাকিস্থান ফরেন মিনিস্ট্রীর অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী!'

উল্লসিত হয় তরুণ, 'রিয়েলী?'

আর থাকতে পারে না তরুণ। হাবিবের হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'ইউ মাস্ট হেলপ মী, হাবিব।'

'নো কোশ্চেন অফ হেলপ দাদা, আপনার কাজ করা আমার কর্তব্য।'

ঐ রাত্রে দূর থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত পেলো ভগ্নমনা তরুণ মিত্র।

জলপ্রপাতের জলধারা যেমন দুরন্ত বেগে গড়িয়ে পড়ে, তরুণও প্রায় সেই রকম এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে ফেলল হাবিবকে।

'অত করে বলার কিছু নেই। কিন্তু কিছু আমিও জানি, বিকজ আই, সেণ্ট দ্য অ্যাম্বাসেডর্স মেসেজ টু ফরেন অফিস।'

এই পৃথিবীতে মানুষের কত কি সহ্য করতে হয়। জরা, দারিদ্র্য, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয়হীন নিঃসঙ্গ মানুষের মত অসহায় আর কেউ নয়। কাজের মধ্যে যখন ডুবে থাকে, যখন বৃদ্ধ আন্দোলনের রাজ-নৈতিক ইতিহাসের ব্যালান্স শীট মেলাতে হয়, তখন বেশ কেটে যায়। কিন্তু যখন কাজের চাপ নেই, যখন ব্ল্যাক ফরেস্টের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে নিজেকে বড় বেশী অনুভব করা যায়, যখন নিজের হৃৎপিণ্ডের মৃদু স্পন্দনও দৃষ্টি এড়ায় না, তখন হাবিবের মত কনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছেও আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা করে না।

হাবিবের দুটো হাত চেপে ধরে তরুণ বলে, 'ইউ মাস্ট ডু সামথিং হাবিব। আমি বড্ড লোন্‌লী।'

বন'এ ফিরেই অ্যাম্বাসেডরের কাছে আর একটা সুখবর পাওয়া গেল।

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস্ অফ নিউজ ফর ইউ।'

তরুণ মুখে কিছু বলে না, শুধু অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডরের দিকে।

'পাকিস্থান ফরেন অফিস হ্যাজ ইন-ফর্মড আওয়ার ফরেন অফিস যে প্লেনক্র্যাশ ভিকটিমসদের সমস্ত নাম চেক আপ করেও ইন্দ্রাণীর নাম পাওয়া যায়নি।'

'রিয়েলী স্যার?' তরুণের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অ্যাম্বাসেডর ডান হাত দিয়ে তরুণের কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলেন, 'তুমি ফাইল দেখতে চাও?'

অ্যাম্বাসেডর মনে আঘাত পেলেন নাকি? 'না, না স্যার! ফাইল দেখে কি করব? আপনার মুখের কথাই আমার যথেষ্ট।'

এ্যাম্বাসেডর আরো বললেন, তবে পাকিস্থান ফরেন অফিস জানিয়েছে, ইট উইল টেক টাইমস টু ট্রেস আউট ইন্দ্রাণী।'

টাইম? তাতো লাগবেই। পুলিশের ফাইল ঘেঁটে বর্ডার চেকপোস্টগুলোর রেকর্ড দেখতে হবে, ইন্দ্রাণী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে চলে গেছে কিনা। বর্ডার চেকপোস্টের রেকর্ডে হদিশ না পেলে আবার নতুন করে খোঁজ করতে হবে। সময় তো লাগবেই।

...'তাছাড়া হাবিব ইজ গোয়িং টু করাচী অ্যান্ড হিজ আংকেল ইজ দ্য রাইট পার্সন টু হেলপ আস।'

'হ্যাঁ স্যার তাইতো শুনলাম।'

'সুতরাং তোমার আর চিন্তা কি? বাই দ্য টাইম ইউ লিভ বার্লিন, ইন্দ্রাণী উইল রিজয়েন ইউ।'

তরুণ মনে মনে বলে, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক স্যার।

দুঃখে নয়, আক্ষেপে নয়, গোপন খবর সংগ্রহের জন্যও নয়, নিছক আনন্দে, খুশীতে সে রাত্রে হাবিবের সঙ্গে বোতল বোতল রাইন ওয়াইন ড্রিংক করল তরুণ।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণী দেবী

ভক্তি বিশ্বাস

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৈষ্ণীদেবী সম্বন্ধে আছে এক উপাখ্যান। সেই গল্পই মনে পড়ল। প্রাচীনকালে মহিষাসুর নামে এক দানব প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সে আপন শক্তিবলে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য জয় করে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। স্বর্গের দেবতারা একত্র হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে এক দিব্যশক্তি-সম্পন্না নারীর সৃষ্টি হল। দেবতারাই নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে তাঁকে সুসজ্জিতা করলেন। পর্বতরাজ হিমালয় সিংহকে দিলেন তাঁর বাহন করে। দেবতারা নিজ নিজ পৃথগসত্ত্বা ভুলে একত্র হয়ে দেবীর কাছে মহিষাসুর বধের প্রার্থনা করে স্তুতি আরম্ভ করলেন।

দেবতাদের স্তুতিতে বিচলিত হয়ে দেবী তুমুল নিনাদ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন। পৃথিবী দুলতে লাগল, পর্বত ফাটতে লাগল, দেবতাদের শত্রুদের হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মহিষাসুর জেগে উঠে এই শব্দ লক্ষ্য করে দেবীকে দেখতে পেলেন। দেবী তাকে যুদ্ধে আহবান করে প্রথমেই তাঁর চৌদ্দজন সেনাপতি সহ সব অসুরসৈন্য বধ করলেন। স্বয়ং মহিষাসুর তখন দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। শেষে সিংহ-মানব-গজ-আকৃতিধারী মহিষাসুরকে দেবী আপন পাশ দিয়ে বেঁধে তাঁর কণ্ঠের উপর পা রেখে বুকে ত্রিশূল স্থাপনা করে খড়্গ দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। এই প্রকারে দৈত্যনাশ হলে দেবতারা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হলেন। ত্রিকূট পর্বতের তিনটে চূড়া থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর পুষ্প বর্ষণ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

দেবতাদের স্তুতির উত্তরে দেবী ভগবতী বললেন, তিনি নানারূপে নানা নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। শক্তিরূপে পরাক্রম দেখান, গৌরী, রৌদ্রা, ব্রাহ্মী বারাহী, বৈষ্ণবী, শিবা, বারুণী, নারসিংহ, বাসবী, সবই তাঁরই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ।

এই সেই ত্রিকূট পর্বত। এরই তিনটি চূড়া থেকে দানববিজয়ী ভগবতীকে অভিনন্দন জানিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পুষ্প-বর্ষণ করেছিলেন। এই পর্বতেই ভগবতী বৈষ্ণী বা বৈষ্ণবীরূপে বিরাজ করছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আকাশের গায়ে মেঘখণ্ডের মত দাঁড়ানো সেই পর্বত, হিমালয়ের একাংশ।

ভগবতী বৈষ্ণীরূপে কি করে হিমালয়ের এই প্রদেশে অধিষ্ঠিতা হলেন, তার সম্বন্ধে আর একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

ত্রেতাযুগের শেষের দিকে রাবণ, খর-দূষণ, তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষসেরা অত্যাচারে পৃথিবীবাসীদের উত্যক্ত করছিলেন। সেই সময় পুরুষোত্তম রাম অযোধ্যাতে অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বত্র অত্যাচার ও আসুরিবৃত্তির প্রভাবে সমস্ত দেশের সাত্ত্বিকভাবাপন্ন লোকেরা কষ্ট পাচ্ছিল। ভারতের এই দশা দেখে দেবীশক্তির বিভিন্নরূপে প্রকাশিতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, বেদমাতা গায়ত্রী, সাবিত্রী প্রভৃতি একত্রিত হয়ে ভারতকে পুনরোদ্ধার করবার সংকল্প করলেন। তাঁদের সম্মিলিত তেজ থেকে এক দিব্য-বালিকা জন্মগ্রহণ করে সামনে উপস্থিত হলেন। সেই মহাশক্তির বালিকাকে দক্ষিণ-ভারতে সাগরের নিকট জন্ম নিয়ে সংসারের দুঃখ দূর করবার জন্য আদেশ প্রদান করলেন। ঐ কন্যাকে এও বোঝালেন যে সে ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামের শক্তি সীতার অংশে জন্ম নেবে।

কিছুদিন পর ঐ শক্তি রত্নাকর সাগরের নিকট জন্ম নিলেন, তাঁর নাম হল বৈষ্ণবী। তিনি স্বল্পায়ু হলেন। ঐ দিব্য-কন্যা আপনার অলৌকিক শক্তি দিয়ে মুনি ঋষি মানুষ এবং দেবতাদের আপন করে আকর্ষণ করে নিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য সর্বদাই ভিড় লেগে থাকত। কিছুদিন পর আপনার পিতার অনুমতি নিয়ে বৈষ্ণবী দেবী সমুদ্র-সৈকতের নিকট নির্জন কুটির তৈরী করে ভগবান রামের ধ্যানে সমাধি-প্রাপ্ত হয়ে রইলেন।

ওদিকে রামাবতারের কার্য শুরু হয়ে গেল। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় প্রস্থান করলেন। ভগবান রাম এবং লক্ষ্মণ আপনাদের বানরসেনার সঙ্গে রাবণ-সংহার করতে যাচ্ছিলেন। পথে নির্জনে ধ্যানরতা দিব্যকন্যাকে দেখতে পেয়ে তাঁর কুটিরে পদার্পণ করলেন। কন্যা ভগবান রামকে খুব আদরযত্ন করে সুন্দর আসনে বসালেন। ভগবান রামের প্রশ্নের উত্তরে কন্যা নিজের এবং নিজের পিতার পরিচয় জ্ঞাপন করে নিজের তপস্যার কারণ জানালেন। বললেন, আপনার দাসী হয়ে আপনার সঙ্গে চিরকাল থাকতে চাই।

ভগবান রাম তাঁকে নিজের বিপদের কথা বুঝালেন এবং নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে বললেন, 'রাবণবধের পর বেশ বদল করে তোমার কুটিরে আবার আসব। যদি তখন তুমি আমাকে চিনে নিতে পার, তবে তোমাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করে নেব।' এই বলে রাম চলে গেলেন।

রাবণকে সংহার করে অযোধ্যায় ফিরে এসে ভগবান রাম এক রাত্রে স্বপ্নে ঐ তপস্বিনী কন্যাকে দেখতে পেলেন। পর-দিনই সকালে তিনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে এক বৃদ্ধ সাধুর বেশ ধারণ করে কন্যার নিকট উপস্থিত হলেন। বৈষ্ণী দেবী কিন্তু ভগবানকে চিনতে পারলেন না। পরে জেনে খুব অনুতাপ করতে লাগলেন। ভগবান তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, কল্কি অবতারের সময় কলিযুগে তুমিই আমার শক্তি হবে। ততদিন পর্যন্ত তুমি উত্তর-ভারতের মণিক পর্বতের তিন শিখরযুক্ত পাহাড়ের বাঁদিকে যেখানে এক সুরম্য গুহার মধ্য দিয়ে শীতল জল প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তিন মহাশক্তি বিরাজিত আছেন, সেইখানে গিয়ে তপস্যায় লীন হয়ে থাক। সেখানে তুমি অমর হয়ে থাকবে। নল, নীল, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি তোমার প্রহরী হবে। ভক্তজনেরা তোমাকে দর্শন করতে আসবে, সমস্ত ভারতে তোমার মহিমা প্রচারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে অসুর রাজা ভৈরোঁকে সংহার করে সম্পদা দেবীর প্রসার করবে। তাতে উত্তরভারতে সুখশান্তি স্থাপিত হবে। ভগবান সূর্যনারায়ণ তোমাকে কমণ্ডুল দিয়েছিলেন, তারই দৌলতে তুমি বৈষ্ণবভোজন করাতে পারবে এবং কন্দ-মূল-ফল প্রভৃতি পেতে পারবে।'

ভগবান রাম এই বরদান করে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং বৈষ্ণী দেবীও উত্তরভারতে মণিক পর্বতের নিকট চলে এলেন।

ঐ সময় শতদ্রু থেকে ঝিলম পর্যন্ত ভৈরোঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তার অত্যাচারে প্রজারা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ওখানে এইপ্রকার ভীতিপ্রদ অবস্থা দেখতে পেয়ে ভগবতী বৈষ্ণবী সাত্ত্বিক লোকেদের একত্র করে নিয়ে ভক্তিভাবের এক আ[illegible]লন আরম্ভ করলেন। তাঁর সদ্ব্যবহারে [illegible]বাসীর মধ্যে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হল। ভগবতী একদিন সকলকে আপনার দিব্য কমণ্ডলু থেকে বৈষ্ণবভোজন দিয়ে তৃপ্ত করলেন এবং সকলের মন হরণ করলেন। এই ভাণ্ডারা দেবার সময় রাজা ভৈরোঁও লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছিলেন এবং ভগবতীর দিব্যরূপে মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি ভগবতীকে অপহরণ করবার জন্য চক্রান্ত করতে লাগলেন।

ওদিকে ভগবতীও দেবতাদের সহায়তায় ভক্তদের নিয়ে সংগঠন করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজা ভৈরোঁ দূতকে দিয়ে ভগবতী বৈষ্ণীর নিকট আপন বিবাহ-ইচ্ছা জানালেন, কিন্তু ভগবতী তাকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজা ভৈরোঁ তাতে না দমে তাঁকে জোর করে হরণ করবার চেষ্টা করলেন। ফলে ভৈরোঁর একদল সেনা বৈষ্ণী দেবীর হাতে নিহত হল এবং ঐসব সৈন্যের অস্ত্র-শস্ত্র ভগবতীর হস্তগত হল। ভৈরোঁর রাজ্যের কিছু কিছু জায়গাও ভগবতীর অধীন হয়ে গেল। আবার ভগবতীর সঙ্গে ভৈরোঁর সেনাদের যুদ্ধ বাধল। ভগবতী

আপনার শিবির 'চরণ-পাদুকা' নামক স্থানে নিয়ে গেলেন, পরে আরও এগিয়ে 'আধ-কুয়ারী'তে বাসা বাঁধলেন। এখানে ভগবতী এক গুহার ভিতর লুকিয়ে থেকে পরিখা খনন করে সবকিছু দেখতে লাগলেন। ঐ গুহা আজকাল 'গর্ভগুহা' নামে পরিচিত। আধকুয়ারীতে ভগবতী নিজ সৈন্যদের জন্য নিজ শক্তিবলে একটি সুন্দর পুকুর তৈরি করে সেটা জলে ভর্তি করে রাখলেন। এই পুকুর এখনো বিদ্যমান।

এই স্থানে খুব লড়াই হয় এবং ভৈরোঁর দুইজন সেনাপতি এবং অসংখ্য সৈন্য মারা যায়। এই পরাজয়ে ভৈরোঁ মরিয়া হয়ে জীবনপণ করে যুদ্ধ করতে লাগল। সে আধকুয়ারীর তিনদিক ঘিরে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র চালাতে শুরু করল। ভগবতী লুকিয়ে লুকিয়ে আপন শিবির গুহার মধ্যে স্থানান্তরিত করে নিলেন। ভৈরোঁর সেনারা আধকুয়ারী, সাঁঝেছাত এবং আরও উঁচুতে খুব বেশী রকম পরাজিত হল। এখন চারদিকে বৈষ্ণবী সম্প্রদায়ের রাজ্য বিস্তৃত হল। নিঃসহায় ভৈরোঁ পুনরায় সেনাদল একত্রিত করে নিলেন, কিন্তু এখন কেবল শতদ্রুর প্রান্তের রাজ্য তার অধীন রইল। ভৈরোঁ এবার ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। এগিয়ে এগিয়ে গুহা পর্যন্ত এসে গেল। ভগবতী ঐ সময় পবিত্র গুহাতে প্রবেশ করলেন। ভৈরোঁ না বুঝেশুনে ওই গুহার ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করলে ভগবতী মহাকালী চক্র দিয়ে তার মস্তক কেটে দিলেন। সেই মাথা দুই মাইল দূরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু জীবন্ত হয়ে রইল, ধড়টা ওইখানেই পড়ে রইল।

ভগবতী বৈষ্ণবী ভৈরোঁর মাথার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও?

ভৈরোঁ ভুল বুঝতে পেরে আপনার দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগল এবং ভগবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। 'কুপুত্র যদিচ হয়, কুমাতা কখনো নয়।'

জগদম্ব। হরপাপানি কামিনী মে দুরাত্মনঃ।
ক্ষমস্ব চাপরাধান্ মে সন্মার্গ মাং সমাদিশ।।

হে জগজ্জননী। আমি পাপী, দুরাচারী, পাপ করেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে সৎপথ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কর।

ভগবতী আর্দ্রহৃদয়ে বললেন, এখন তুমি শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত হয়ে গেছ। এতদিন তোমার মন নীচ ও মলিন ছিল, বুদ্ধি আসুরিভাবাপন্ন ছিল। এখন আমার কৃপাতে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হবে। যে আমাকে দর্শন করে তারপর তোমাকে দর্শন করবে, তার সব মনোরথ সিদ্ধ হবে।

ভগবতীর কৃপাতে ভৈরোঁর মুণ্ড ও ধড় যেখানে যেখানে ছিল, সেখানেই প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে রইল।

তখন থেকে ভগবতী বৈষ্ণবী পবিত্র গুহাতে ভগবান রামের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে বিরাজমান আছেন।

কাটরা ছেড়ে অল্পদূর এগোতেই একটি স্থান, নাম 'দর্শনী-দরবাজা'। আমরা বাজারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলাম, তাতে পথ অনেকটা সংক্ষিপ্ত হল। আমাদের পিট্টু অর্থাৎ মালবাহক ওম্‌প্রকাশের পিছু পিছু চলেছি। ওম্‌প্রকাশের পিঠে আমাদের মালের ছোট্ট একটা বোঝা। আমরা কম্বল বা কোনরকম বিছানা নিইনি, কেননা দাদা বললেন, তিনি খবর নিয়েছেন, বৈষ্ণী দেবীর মন্দিরসংলগ্ন ধর্মশালাতে কম্বল ভাড়া মেলে। তবে বহু-ব্যবহৃত কম্বল ব্যবহার করতে প্রবৃত্তি হবে না ভেবে আমরা জনপ্রতি একখানা করে বিছানার চাদর, একখানা করে গরম চাদর এবং রবারের বালিশ নিয়ে নিয়েছি। সঙ্গে হাতে রইল ছাতি ও লাঠি, যে যেমন প্রয়োজন বোধ করে, আর রইল জলের বোতল। পরবার জন্য যথেষ্ট গরম পোষাকও আছে। অক্‌টোবর মাস, হিমালয়ের বুকে ছয় হাজার ফুট মতন উঁচু, এখন ওখানে বেশ শীত।

হাজার হাজার যাত্রী চলেছেন, যেন মেলা হবে কোথাও। তার মধ্যে সবরকম বয়সের লোকই আছেন। অনেকে কোলে করে শিশুদের পর্যন্ত নিয়ে চলেছেন। সবাইর মনে প্রচণ্ড উৎসাহ। হেঁটে চলেছে আর বলছে—'প্রেমসে বোল—জয় মাতাদি! ফির্‌ভি বোল—জয় মাতাদি!!' আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিই, যাত্রী-স্রোতের গড্ডালিকা-প্রবাহে একাকার হয়ে যাই।

মাইল-দেড়েক নীচের দিকে নামা। সামনে একটা ঝরণা বয়ে চলেছে। নাম বাণগঙ্গা বা বালগঙ্গা। কথিত আছে, রাজা ভৈরোঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে এখানে ভগবতী খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানে বাণদ্বারা জল বের করে সেই জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। সেইজন্য এই ঝরণার নাম বাণগঙ্গা। ঐ সময় তিনি দূর থেকে ভৈরোঁর মস্তক দেখতে পান। ভগবতী এখানে তাঁর কেশদাম বা বাল ধৌত করেছিলেন, এইজন্য একে 'বাল-গঙ্গা'ও বলে। এখানে ঝরণার ধারে একটি ছোট মন্দির আছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য অনেকগুলি চা-মিষ্টির দোকান আছে, যেন ছোটখাট মেলা বসেছে।

বালগঙ্গার জলে সকল তীর্থযাত্রীর স্নান করা অবশ্যকর্তব্য। অনেকেই জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করতে জলে নেমে গেছে। ইতিমধ্যে ফেরৎ-পথের যাত্রী সমাগম শুরু হয়েছে। তারা সকলেই খোঁড়াচ্ছে যে! দেখে মনে হল, দূর বেশী না হলেও পথ খুব কঠিন, চড়াই তো আছেই।

বাণগঙ্গার উপর লোহার ঝোলান পুল পার হয়ে হিমালয়ের উপর চড়া শুরু করতে হবে। পাহাড়ের বুক চিরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। আমরা পোল পার হয়ে জলের ধারে নেমে মাথায়-মুখে জলস্পর্শ করে স্নানের পর্ব সমাধা করলাম। এবার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে চড়াই উঠবার পালা।

অশক্ত যাত্রী যারা তাঁরা ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছেন। শিশুদের নিয়ে কয়েকজনা মা ও বাবাও ঘোড়াতে চলেছেন। ঘোড়া চলবার পথ আলাদা, অনেকটা চওড়া। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক ঘুরে ঘুরে উঠেছে। কোথাও কোথাও পায়ে হাঁটা পথ সিঁড়ি-পথের সঙ্গে মিশেছে।

বছরের প্রায় সব সময়েই বৈষ্ণী দেবী দর্শন করা যায়। কিন্তু আশ্বিনের নবরাত্র থেকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্‌টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্য বা শেষ পর্যন্ত যাত্রীর ভিড় বেশী হয়। অক্‌টোবর-নভেম্বরই যাত্রার প্রকৃষ্ট সময়। দেওয়ালীর সময় বিশেষ উৎসব, তাই ভিড়ও তখন বেশী হয়।

পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছি। আধ মাইল উঠে 'চরণপাদুকা'-তে পৌঁছলাম। এখানকার উচ্চতা ৩৩৮৪ ফুট। কাটরার উচ্চতা ২,৯১৮—বাণগঙ্গাতে পৌঁছাতে অবশ্য বেশ খানিকটা নামতে হয়েছিল।

পথের দুধারে অগণ্য ভিক্ষুক বসে আছে। যাত্রীরা তাদের যথাসাধ্য ভিক্ষা দিচ্ছে। না দিয়ে কোন যাত্রী চলে গেলে সেজন্য তাদের নানারকম বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হচ্ছে। অথচ এই কষ্টকর চড়াই উঠতে উঠতে বা নামতে নামতে বারবার পয়সা বের করে ভিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন, সে ভুক্তভোগী মাত্রেই বোঝে। তাই ফেরবার পথে আমাদের লক্ষ্য করে এক বাঙালী ভিখারিণী মন্তব্য করল—'দ্যাখ্‌লো, অ্যায়রা খাবার সময়ও দিল না, এখনো দিল না।' অবাক কাণ্ড, এখানেও রিফ্যুজি!

লোকে বলে, বৈষ্ণীমাতা বাণগঙ্গা ছেড়ে উঠে আসতে আসতে এখানে পৌঁছে আপনার চরণ পাহাড়ের উপর রেখে-ছিলেন। দূরে থেকে ভৈরোঁকে আসতে দেখে তাড়াতাড়িতে তাঁর পাদুকা বা খড়ম ওখানে রেখেই উপরে উঠে যান। তাই এখানকার নাম হয় 'চরণ-পাদুকা'।

চরণ-পাদুকাতে একটি মন্দির আছে। তাতে ভগবতীর মূর্তি আছে। ফুল-বেলপাতা ঢাকা, সিন্দুর-চন্দনে চর্চিত মূর্তির বিশেষ কিছু বোঝাই যায় না। আশেপাশে কয়েকটি চায়ের দোকান আছে। কোন কোন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে মস্ত কলসীতে রাখা সুশীতল পানীয় জল বিতরণ করা হচ্ছে তৃষ্ণার্ত পথশ্রান্ত যাত্রী-দের। কোথাও কোথাও আমলকি, আচার ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। পথের ধারে, পাথরের উপর বিশ্রাম করতে অনেকে বসে পড়েছেন। আমরাও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ করে জলপান করে নিলাম। দেহ সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়। আবার পথ চলা শুরু। যাত্রীদল অবিশ্রান্ত চলেছে। দলে দলে নীচে নামছে, উপরে উঠছে। সকলের মুখে একই বুলি, 'জয়—মাতাদি। জয় মাতাদি! হাঁপাচ্ছে আর বলছে—'আবার বোল, জয় মাতাদি!' পরিশ্রান্ত কণ্ঠ দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না, তবু বলছে—'জয় মাতাদি!' যেন ধ্যান, জ্ঞান, জপতপ সবই ওই এক নামের মধ্যে পর্যবসিত। কিশোর কণ্ঠ শুনি, শুনি শিশুর কণ্ঠ মাতৃক্রোড় থেকে।

সারা বছর ধরে এখানে লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। পাথরের অসমতল সিঁড়ি তাদের পায়ের ঘষাতে মসৃণ হয়েছে, তাই খুব পিছল মনে হয়। কোথাও কোথাও ভেঙেও গেছে। অতি সাবধানে পথ চলা। নীচে নামবার যাত্রীদের দেখে দেখে

বুঝেছি, চড়াই উঠবার সময় যেমন দম পাওয়া যায় না, ধীরে ধীরে উঠতে হয়, নামবার সময় পিছল পথের জন্য অতি ধীরে, অতি সাবধানে নামতে হয়, নইলে হাত-পা ভাঙবার সম্ভাবনা।

পথে কোথাও কোন গাছপালা নেই—একেবারে রুক্ষরূপ হিমালয়ের। আজ মেঘলা দিন, তাই সূর্যের তাপ অতটা বোঝা যাচ্ছে না, নইলে এই রুক্ষ শুষ্ক পাহাড় বেয়ে ওঠা আরও কঠিন হত।

চরণ-পাদুকাতে ঘোড়াচলা চওড়া পথ আর পয়েহাঁটা সিঁড়ি একত্র মিশেছে। ঐ পথেরই একধারে একটা তেরপলের আচ্ছাদনের নিচে একদল লোক বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছে—বৈষ্ণীমায়ের জয়গান। এরাও পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রী। আমরা থামবার প্রয়োজন বোধ করি না, সামনে এখনো বাকি বহু পথ।

সিঁড়ি-সিঁড়ি—সিঁড়ি!

সেই সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উঠে মাইল-দুই পরে আমরা আদকুঁয়ারীতে পৌঁছলাম। এখানকার উচ্চতা ৪,৭৪৪ ফুট। পাহাড়ের উপর এখানে বেশ খানিকটা সমতল স্থান। সেখানেই আধকুঁয়ারীর মন্দির, পুকুর, ধর্মশালা, দোকানপাট তৈরি হয়েছে। স্থানটি মনোরম। এখানে পৌঁছাতে আমাদের বেলা আড়াইটে বেজে গেল। এপর্যন্ত আমরা একটানা প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঠে এসেছি। কষ্টকর পথ, এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে।

এ সেই আধকুঁয়ারী। এখানেই ভৈরোঁর সঙ্গে ভগবতীর শেষ যুদ্ধ হয়। এখানেই ভৈরোঁ নিহত হয়।

একটা ধর্মশালার প্রশস্ত বারান্দায় প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম। ওমপ্রকাশ দোকান থেকে চা এনে দিলে আমরা চা, বিস্কুট, চিজ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিই। প্রায় ঘণ্টাখানেক থামা ও মন্দির-দর্শন। মন্দিরের ভিতর আধকুঁয়ারীর সিন্দুরলিপ্ত মূর্তি আছে। মন্দিরের নিকট একটি গুহা আছে, তাকে বলে গর্ভগুফা। লোকে বলে, এই গুহাতে প্রবেশ করলে মাতৃ-গর্ভাবস্থানের ভাব অনুভূত হয়। খুব কষ্ট করে এই গুহাতে ঢুকতে হয়।

ঘণ্টাখানেকের পর আবার চড়াই ওঠা শুরু। আবার তেমনি পাহাড়ের গায়ে পাথরের সিঁড়ির অসংখ্য অসমতল ধাপ। তাই বেয়ে ওঠা। এ যে বুকফাটা চড়াই। দম থাকছে না। দাদা বারবার বলছেন, খু-উ-ব ধীরে ধীরে ওঠ।

তাই করছি, তবু কষ্ট হচ্ছে খুব। খানিকটা উঁচুতে আমার স্বামীকে দেখা যাচ্ছে। তিনি না থেমে এক পা এক পা করে একটানা উঠে চলেছেন। তবে খুব ধীরে ধীরে। যাত্রীদল সকলেই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, কিন্তু সমব্যথীর অভাব নেই। আমরা সকলে যেন একই পরিবারভুক্ত, মায়ের দর্শনে যাব, সাহস দিয়ে নিয়ে যেতে হবে সকলকেই।' তাই কয়েকজন যাত্রী সিঁড়ি ছেড়ে পাশের দিকের ঘোড়া চলার লাল মাটির রুক্ষ চওড়া পথে চলা শুরু করেছেন. তাঁরা আমাকে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত দেখে আহ্বান করেন—'এহি রাস্তাসে আইয়ে মাতাজী, ইধর দম্ ছুটেগা নেই। ওহো-হো-হো! ক্যায়সা কঠিন রাস্তা!'

ওমপ্রকাশও ওই পথ ধরেছে। দাদার অনুমতি নিয়ে আমিও তাদের অনুসরণ করে চলি। দাদা সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমি চললে তিনি চলছেন, থামলে তিনি থামছেন। এখনকার এই চওড়া পথ অনেক বেশী ঘুরে ঘুরে উঠেছে বটে, তাতে সিঁড়ি চড়বার কষ্ট নেই, তাই একটানা চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, সময় প্রায় একই লাগছে।

খানিক বাদে দেখি অনেকটা উঁচুতে উনি, সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন। আমাদের না দেখতে পেয়ে ভাবনায় পড়েছেন, কোথায় গেল ওরা? এখন আমাদের নতুন পথে দেখতে পেয়ে ইসারায় প্রশ্ন করেন—কি হোল?

দাদা তাঁকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমরা কিন্তু এখন অল্পায়াসেই হাঁটতে পারছি, তাই হাঁটতে ভালও লাগছে। বহু যাত্রী ইতিমধ্যে সিঁড়ি ছেড়ে আমাদের সঙ্গে জুটে গেছে।

নেড়া পাহাড়—কোথাও গাছপালার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কেবল মাটি-পাথর ও ঘাসে-ঢাকা পর্বতগাত্রে কোথাও ছোট ছোট ঝোপ মাত্র আছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচে তাকিয়ে দেখি, দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না। হাজার হাজার সিঁড়ি যেমন নীচে নদীর তীর অবধি নেমেছে, তেমনি পাহাড়ের চূড়া অবধি ঘুরে ঘুরে উঠেছে। সচল পিঁপড়ের সারি যেন চলেছে সেই সিঁড়ি বেয়ে, এক সার নামছে, একসার উঠছে। ঘোড়াচলা লাল পথ অজগরের মত পাকে পাকে পাহাড়টিকে বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

একজন পাঞ্জাবী মহিলা আমাদের উদাহরণ দেখিয়ে তাঁর স্বামীকে বলছেন, ওই ঘোড়াচলা পথে চল। ওই দেখ, ওঁরা যাচ্ছেন, ওই পথ সহজ হবে।

একটু হেসে বলি, চলে আসুন, চলে আসুন, সত্যি এ-পথ অনেক সহজ।

ঘোড়াতে চড়ে যাঁরা আসছেন, অতি সাবধানে তাঁরা চলেছেন। এ-পথে এখন অনেক যাত্রী, তাই যত্ন করে তাঁরা ঘোড়া সামলাচ্ছেন। পায়ে হাঁটা যাত্রীদের যেন অসুবিধা না হয়। ঘোড়ায় চড়তে হচ্ছে বলে যেন নিজেদের খানিকটা অপরাধী মনে করছেন। তাই কোথাও ঝগড়াঝাঁটি নেই, সকলেই মাতৃদর্শনের জন্য ব্যগ্র।

খানিক বাদে 'হাতীমাথায়' এসে পৌঁছলাম। পাহাড়টার আকৃতি এখানে হাতীর মাথার মতন, তাই এই নাম। হাতীমাথা থেকে নীচের উপত্যকার দৃশ্য সুন্দর লাগে দেখতে। বহু নীচে সমতলের উপর চেনাব নদী চলেছে, কিন্তু কে বলবে এ সেই গর্জনশীল নদী। বহুদূরে রূপালী ফিতে যেন সবুজ মাঠের বুকে পেতে রেখেছে কেউ। কোথাও কোথাও তার তীরে কিছু কিছু ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। দুটি-চারটি বড় বড় গাছ আছে, মনে হচ্ছে যেন কয়েকটা ঘাসের বন গুচ্ছ। এত উঁচু থেকে লোকজনের অস্তিত্ব বোঝা যায় না।

তখনো হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়নি।

মনে পড়ল, বহুদিন আগে ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছিলাম, যখন জম্মু থেকে বাণিহাল পাশ পার হয়ে কাশ্মীর উপত্যকাতে পা দিলাম। পাহাড়ের ভিতর কাটা সরু টানেল পার হতেই পুরো কাশ্মীর-উপত্যকা যেন ছবির মত দেখা গেল। সবুজ রঙের উপত্যকা, তার মধ্যে খুব ছোট ছোট বাড়ী, গ্রাম, পথঘাটের সরু রেখা, রূপালী ফিতের মত নদী ও ঝরণা, ক্ষুদে ক্ষুদে পর্বতমালার সারি। বাণিহাল পাশ খুব উঁচু, প্রায় সর্বদাই বরফ থাকে সেখানে। বছরের কয়েক মাস তো বরফের জন্য বন্ধই থাকতো। এখন কাশ্মীর যেতে হলে আর বাণিহাল পর্যন্ত অত উঁচুতে উঠতে হয় না। তার আগেই, অনেক নীচে নতুন মস্ত বাঁধানো টানেল তৈরি হয়েছে। দুটি টানেল, একটি যাবার, একটি আসবার। কাশ্মীর রাজ্য অধিকারে রাখবার তাগিদে বারমাস সৈন্য চলাচল অব্যাহত রাখতে হয়, তাই এই ব্যবস্থা। নতুন পথে আর অত সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় না।

আমরা এই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য বেশী সময় নষ্ট করতে পারছি না। এখনো অনেকটা পথ বাকি। তবে, এতক্ষণে আমরা চড়াই পথের অধিকাংশটাই উঠে এসেছি। হাতীমাথার উচ্চতা ৬২০০ ফুট, অর্থাৎ আমরা পৌনে চার হাজার ফুট উঠে এসেছি।

এ-পথের সবটাই কেবল চড়াই যে নয়, সাঁঝীছাত পৌঁছে আমরা সে-কথাটা বুঝতে পারলাম। যাত্রীদল কেবলই আনন্দ-প্রকাশ করছে—'আ গিয়া, আ গিয়া' ... মাতাদি'ধ্বনিতে আকাশবাতাস ...পূর্ণ হয়ে উঠেছে। লোকে বলে, সাঁঝীছাত এ-পথের উচ্চতম স্থান—উচ্চতা ৭,২১৮ ফুট। এখন মোটামুটি সমান রাস্তা। এখন আর দুটো ভিন্ন রাস্তা নেই, ঘোড়া চলবার পথেই পায়দল পথ মিশেছে।

ভৈরোঁর মন্দির সাঁঝীছাত থেকে দু' মাইল দূরে। সামান্য উঠতে হলেও পথ 'ময়দানমাফিক'। মন্দিরে পৌঁছে কিন্তু থামছে না কেউ। ফেরবার পথে ভৈরোঁ দর্শন করতে হবে। আমরা যথাসাধ্য দ্রুত এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

ভৈরোঁর মন্দির পার হয়ে পথ পাহাড়ের ওপিঠে নেমে গেছে। সামনে আর খোলা ধু-ধু-করা পর্বতগাত্র নেই। এদিকের পাহাড় মস্ত মস্ত পাইন ও ফার গাছের অরণ্যে ঢাকা, তারই মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। সূর্যদেব পিছনের পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেছেন। পাখীরা দলে দলে বাসায় ফিরে চলেছে। সামনে পর্বতমালার ঢেউ, তাতে কালচে রং ধরেছে। এদিকটা পূর্ব-দিক, তাই বনের মধ্যে অন্ধকার, যেন সন্ধ্যা

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। এতক্ষণকার রুক্ষতা ছেড়ে শ্যামল পথ ভালই লাগছে। ভিজে ভিজে হাওয়া, কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব, পাইন গাছের মর্মর ধ্বনি, অজানা পাখীর কাকলি। আধ-অন্ধকারে যেন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। এত পরিশ্রম সত্ত্বেও এখন একটু একটু শীত শীত করছে। পথ বেশ চওড়া। সেই পথে আমরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলেছি। এখনকার পথেও কোথাও কোথাও সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারলে হয়তো কিছুটা দ্রুত এগোনো যেত, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা আর সম্ভব নয়। আধ-অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে চলতে ভয় করছে। তাই সোজা বনে দ্রুত হেঁটে, প্রায় দৌড়েই চলেছি।

সামনের কালচে রং-ধরা সবুজ পাহাড়টা ক্রমে ক্রমে গাঢ় কাল হয়ে গেল যেন কখন। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের কালো ভেদ করে অগণ্য তারা ফুটে উঠলো। বৈষ্ণী দেবীর দরবার ঘিরে যে গ্রাম, তারই আলোয় যেন পাহাড়ে দেওয়ালীর আলো! তারাভরা আকাশের খানিকটা যেন পাহাড়ের গায়ে বসানো। আরও দূরে কালো, কালো পাহাড়ের ঢেউ আকাশের গায়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পায়ের কাছে কিন্তু নিশ্চিদ্র ঘন অন্ধকার। ঘন বনের মধ্য দিয়ে শুকনো পাইন-পাতা ছাওয়া পিছল পথে চলা। সঙ্গে টর্চ আনতে ভুল হয়নি, কিন্তু সে তো ক্ষুদ্রপ্রকাশের বোঝার মধ্যে বাঁধ। ক্ষুদ্রপ্রকাশ আগেই এগিয়ে গেছে। কাজেই এখন আর বের করবার কোন কথাই ওঠে না। আমাদের সঙ্গী আছেন আরও অনেক যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে 'জয় মাতাদি' বলে চেঁচিয়ে উঠি। মনে সাহস এনে দেয় ঐ নাম। যথাসম্ভব সাবধানে দ্রুত এগিয়ে চলা। দাদা সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার স্বামী কিন্তু এগিয়ে গেছেন।

গ্রামে পৌঁছানোর খানিক আগে থেকেই পথ ইলেকট্রিকের আলোয় আলোকিত। পথের পাশে ছোট ছোট গুহা বা কুঠুরী তৈরি করে ভস্মাচ্ছাদিত সাধু-সন্ন্যাসীর দল ধুনি জ্বালিয়ে বসে। স্বল্প বসনের অভাব মিটেছে আগুনের তাপে। কেউ কেউ ছোট ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে বসে আছেন। প্রায় সকলেই ভিক্ষাজীবী।

আমরা সোয়া ছয়টা নাগাদ মন্দিরের কাছে এক ধর্মশালাতে পৌঁছে গেলাম। অসম্ভব ক্লান্ত। উনি মিনিট-দশেক আগে এসে পৌঁছেছেন। মস্ত দোতলা এক ধর্মশালার বারান্দার এক কোণে আমাদের রাত কাটাবার জায়গা ঠিক হয়েছে। ইতিমধ্যে উনি অফিসে গিয়ে মন্দিরের কিউতে লাইন দেবার নম্বর নিয়ে এসেছেন, এখন কম্বলের খোঁজে গেলেন। আমরাও অফিসে গেলাম। টিকিট নিলে ওখানে সকলের হাতে স্ট্যাম্প মেরে দেব।

আমাদের নম্বর ৭৫০-৫১-৫২। অর্থাৎ আমাদের আগে আজ সকাল থেকে সাড়ে সাতশো নতুন যাত্রী এসেছে। তবু নাকি যাত্রীর ভিড় কম।

আমরা তাড়াতাড়ি করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দেখে আশ্বস্ত হলাম কত যাত্রী আমাদের মতই সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছল। কাশ্মীর, জম্মু, পাঞ্জাব ছাড়াও নানা দেশ থেকে নানা ভাষাভাষী যাত্রী এসেছেন। দেবী-দর্শন হয়ে যাবার পর একটি বাঙালী পরিবারকেও দেখেছিলাম আসতে। তাঁরা পূর্ববাংলার লোক। ভোরবেলা তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরাও আমাদের দেখে অবাক। তাঁরা জম্মুতে আছেন কর্মব্যপদেশে, তাই এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।

গাছপালা ঘেরা পাহাড়ের গায়ে ধাপে গ্রামের ঘরবাড়ী। গ্রামখানির মাঝখানে মস্ত মন্দির। খানিকটা নীচে মন্দিরের অন্যান্য অংশ। আমরা ১৫।২০টা উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে মোটা শিকল দেওয়া এক বেড়ার ধারে পৌঁছলাম। সেখানে দুজন পুলিশ পাহারাদার আছে, মন্দিরেরই পুলিশ। তাদের নির্দেশে জুতো খুলে যেখানে ঢুকতে পেলাম, যেটি একেবারে খোলা বাঁধানো চত্বর। যাত্রীদল এখানে কিউ দিয়েছে। আমরা তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এক পাঞ্জাবী দল এসে সেই চত্বর আগেই দখল করে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে ঢোল। করতাল, বাঁশী প্রভৃতি নানারকম বাদ্যযন্ত্র। পূজার উপাচার হিসাবে নানাপ্রকার সামগ্রী তাঁরা বহন করে এনেছেন। একটি মস্ত রুপার ত্রিশূল, তার সঙ্গে নানা রঙের নতুন কাপড় আটকানো, একটি রুপার ছত্র অনেকগুলি জরির কাজ-করা সিল্কের পতাকা। একটি কৃশকায়া সুদর্শনা যুবতী টুকটুকে লাল রঙের পোষাক পরে নানারকম গহনায় সেজেছে। বিশেষ করে তার নাকের নথটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। সে সেই দলের নেত্রী হয়ে গান গাইছে, আর দলের সকলে ধুয়ো ধরছে। গানের এক এক কলির পরেই তারা গানের সুরেই জয়ধ্বনি দিচ্ছে—'জয় মাতাদি'। মেয়েটি খুব সপ্রতিভ। মনে হয় খুব ধর্মপ্রাণা বলে দলের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী। সকলে তার ইঙ্গিত মত চলছে। ওই ঠান্ডার মধ্যে বাইরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সকলের একত্রে গান গেয়ে সজীবতা রক্ষা করার দায়িত্ব যেন তারই। অত ঠান্ডাতেও মেয়েটির কোনরকম পোষাক নেই। দলের সকলে তেমনি ধীরস্থির হয়ে সমানে গান গেয়ে চলেছে। তারাও তেমনি উৎসাহ-উদ্দীপনাময় ও ধৈর্যশীল।

আমরাও ঐ খোলা চত্বরেরই একপাশে বসে পড়ে তাদের ভক্তিভরা কণ্ঠের গান শুনছি। একটু একটু করে সামনের দল এগোচ্ছে—কিন্তু সে-এগোনোর গতি অতি ধীর। আমাদের কতক্ষণ যে এমন করে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। তবু বেশ লাগছে, যেন অধৈর্য হবার কোন প্রশ্ন নেই এখানে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সকলেই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষমান।

ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করা। শেষ পর্যন্ত উনি ধৈর্য হারান। 'চলুন দাদা আজ ফিরে যাই। কাল সকালে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

দাদা কিন্তু অত সহজে ভাঙবার পাত্র নন। বলেন, 'আর একটু অপেক্ষা করে দেখি। এখানকার মন্দির নাকি গুহার ভিতর, সে নাকি এক আশ্চর্য!' অর্থাৎ দাদা কৌতূহল সম্বরণ করতে পারছেন না।

পাহারারত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, বেশী দেরী হবে না, এখন মাতাজীর রাত্রের ভোগারতি হচ্ছে, তাই যা দেরী, নইলে যাত্রীর ভীড় আর কোথায়। একটু বাদেই মন্দির খুললেই দর্শন মিলবে।

বৈষ্ণীদেবীর মন্দির বা গুহা যাকে সকলে দরবার বলে, তার আবিষ্কারের একটি সুন্দর গল্প আছে।

হন্সালীতে শ্রীধর নামে এক ব্রাহ্মণ পরমাশক্তির ভক্ত ছিলেন। নিঃসন্তান হওয়াতে তার মনে দুঃখের অবধি ছিল না। নিত্যই তিনি ছোট ছোট মেয়েকে পুজো করে তাদের প্রসাদ পেতেন। এইসব কন্যাদের মধ্যে একজন দিব্যরূপধারী কন্যা প্রায়ই আসতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীধরজী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পূজা সমাপ্তির সময় শ্রীধরজী তাঁর সন্দেহ নিরসন করে জানলেন, তিনিই বৈষ্ণীমাতা, কন্যার বেশ ধরে তাঁর পূজা নিতে রোজ আসেন। কন্যা আরও বললেন—আমি ত্রিকূট পর্বতের গুহাতে থাকি। পথ দুর্গম বলে কেউ আমাকে দর্শন করতে যায় না। তুমি এবং তোমার উত্তরাধিকারিরা এখন থেকে আমার পূজা শুরু কর। শ্রীধর ঐ গুহা আবিষ্কার করে ভগবতী বৈষ্ণীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ভগবতীর বরে তাঁর চার পুত্র হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের ছেলেরাই ভগবতীর পূজার অধিকারী হন। এই প্রবাদ।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সামনের 'কিউ' যেন একটু নড়লো। আমরা একটা লম্বা টানা ঢাকা বারান্দায় ঢুকবার অধিকার পেয়ে শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঠান্ডা মেজেতে বসে পড়লাম। তাতে কিন্তু আমাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটলো না। কেবল খোলা আকাশের নীচে রাতের হিমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। দলবল নিয়ে পাঞ্জাবী মেয়েটি কিন্তু সেই বাইরেই রয়ে গেল। তারা সকলে একত্রে ঢুকবে।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা। আমাদের সামনের লাইন শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললাম। বারান্দার শেষপ্রান্তে আবার একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষে একটা লোহার ফটক। সেখানেও দুজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আমাদের শুদ্ধ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জনকে একেবারে ঢুকতে দিয়ে তারা সেই ফটকটা বন্ধ করে দিল।

এবার আবার খোলা আকাশের তলায় মস্ত আরেকটা চত্বরে প্রবেশ করা। শ' দেড়েকের মত লোকের বসবার জায়গা আছে। পাশাপাশি ৬টা লম্বা লম্বা সরু সতরঞ্চির আসন বিছানো আছে। এক এক লাইনে ২৫।৩০ জন বসতে পারে। সেখানে সকলে

বসে অপেক্ষা করছে। চত্বরের সামনে বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরের দরওয়াজা, শ্বেতপাথরের বাঁধানো মস্ত এক গুহার মুখ। দরওয়াজার সামনে একটি লোহার শিকলে মস্ত একটি পিতলের ঘন্টা ঝুলছে। যাত্রীরা গুহাতে ঢুকছেন বা বের হচ্ছেন, সকলেই ওই ঘন্টা বাজাচ্ছেন।

আমরা ওই আসনে সারি বেঁধে বসে পড়লাম। এবার আশা হচ্ছে, হয়তো দর্শনের আর বেশী দেরী নেই।

এখানে গুহার মুখেও দুজন পাহারাদার। এক একবার এক-এক দলে ২৫।৩০ জনা করে ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে এবং ঠিক ততজন ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পাচ্ছে। যেই কোন সারির আসন খালি হচ্ছে, তার পাশের সারি সেই সারির আসন দখল করে নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নীচের বারান্দা থেকে ততজন উপরের চত্বরে ঢুকবার অনুমতি পাচ্ছে।

এক-এক দল ভিতরে ঢুকছে, আর তাদের যেন বের হবার নাম নেই। ভাবি, কি করে ওদের দর্শন করতে এত সময় লাগে? এক-একটা দলের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসতে পনের থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগছে।

একটু লক্ষ্য করে দাদা বলেন, দেখেছ, ওরা প্যান্ট গুটিয়ে, শাড়ী উঁচু করে তুলে ঢুকছে, বেরুচ্ছে ভিজে পায়ে।

তাই দেখি। এত সাবধনতা সত্ত্বেও কারু পায়ের কাছের পোশাক জলে ভিজে গেছে। মনে কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে।

চত্বরের বাঁদিকে একটা মস্ত সাইনবোর্ড, অনেক কিছু লেখা আছে। পরে ফেরবার সময় দেখলাম, বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের পরিচালনা সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য লেখা। পাশে একটা মস্ত বাঘের মূর্তি, ভগবতীর বাহন।

মাথার উপর হিম পড়ছে, যত রাত বাড়ছে, শীতও জমাট বেঁধে আসছে। তবু ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়। আড়াই ঘন্টা হতে চলল। আমরা কিউতে অপেক্ষা করছি এখনো। পাঞ্জাবী মেয়েটি তার দলবল নিয়ে এতক্ষণে চত্বরে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে। এখানেও সকলকে নিয়ে গানে বাজনায় মাতিয়ে রেখেছে। মেয়েটির গলা ভেঙে গেছে, তবু তার থামবার নাম নেই। অত শীতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

অবশেষে আমাদের সুযোগ এল। দাদা আমাকে সর্বাগ্রে ঢুকবার সুযোগ দিলেন। আমার আগে একজন খুব মোটা ভদ্রলোক ঢুকলেন। পরে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে দাদা বলেছিলেন, ওই ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে আমি ভরসা পেলাম, তাই তোমাকে আগে ঢুকতে দিয়েছি। উনি যদি গুহার ভিতর ঢুকতে পারেন, তবে তোমার ঢুকতেও কোন অসুবিধাই হবে না।' আমার স্বাস্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত হল, স্মিতহাস্যে উপভোগ করলাম, যদিও আমি এমন কিছু মোটা নই! আমার স্বামী কিন্তু আমার দুর্দশাতে খুব খুশী!

ঘন্টা বাজিয়ে ঢুকে পড়লাম। কাপড়-জামা আগেই সামলে নিয়ে উঁচু করে আঁট-সাঁট করে নিয়েছি। ঢুকবার মুখেই প্রকাণ্ড একটা পাথর। গোটা গুহাটাকেই আড়াল করে রেখেছে। হামাগুড়ি দিয়ে সেটার উপর উঠে পার হওয়া। যেখানে নামলাম, সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, তেরছা হয়ে, কাত হয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হয়। বাঁদিকটায় মস্ত পাথর একটানা চলে গেছে। সরু পথ, কাঁকর ভরা, পায়ে সেই কাঁকর ফুটছে। গুহার পাথরের দেয়াল এত ঠাণ্ডা যে হাত ছোঁয়ানো যয় না, তবু তাই ধরে ধরে চলা।

কুড়ি-পঁচিশ হাত এগিয়ে দেখি, আগের দলের একজন যাত্রী ভিতরে থেকে গিয়েছিল, সে ফিরে আসছে। এখানটায় পথ আরও সংকীর্ণ। আমি দেয়ালে গা ঘেঁষে কাত হয়ে কোনক্রমে পথ দিলাম। সে গুহার বাঁদিকের উঁচু পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আমাকে অতিক্রম করল। সে চলে যাবার পর একটু এগিয়ে দেখি, পায়ের নীচের সংকীর্ণ পথটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। দেয়ালের ধারে উঁচুতে সেই মস্ত পাথরে একটা গর্ত মত ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে পাথর বেয়ে উঠে সেই গর্তের ভিতর ঢুকে ওপাশে নামা। পা দুটি আগে গলিয়ে পরে টুপ্ করে নামলাম, নামলাম একেবারে জলের মধ্যে! কনকনে ঠাণ্ডা জল, টলটলে পরিষ্কার, কুলুকুলু রবে বয়ে চলেছে গুহার নীচু অংশ দিয়ে। পাশের মস্ত পাথরটা এখনো পাশে পড়ে, তার গায়ে হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ধরে হেঁটে চলা। তবে জল কনকনে ঠাণ্ডা হলেও যেন ততটা কষ্ট বোধ হচ্ছে না। ধীর ধীরে সাবধানে এগোচ্ছি। পাশাপাশি হাঁটা, কাঁকর-বালির উপর জলের স্রোতের বিপরীত মুখে হাঁটা। গুহার ভিতরে কিন্তু আলোর ব্যবস্থা আছে, রীতিমতো ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। নীচু ছাদ, আমার মত বেঁটে মানুষও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আলো আছে তাই বাঁচোয়া। হিমালয়ের শত-সহস্র রূপের এ আরেকটি রূপ। বিস্ময় জেগে ওঠে মনে।

চলেছি তো চলেছিই। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি মেঝেতে পাথরের মধ্য থেকে কলকল করে জল উঠছে। এটা ওই ঝরণার উৎসমুখ। এই ঝরণাটিই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে খানিক নিচে মস্ত ধারাতে নামছে, সেখানে নল লাগানো হয়েছে, চারিপাশ বাঁধিয়ে যাত্রীদের নাইবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঝরণার উৎস পার হয়ে বাঁ-হাতে গেলে মন্দিরের সিঁড়ি, কালো পাথরের মসৃণ তিনটি ধাপ। মন্দিরের খোলা দরজা। এ যেন আরেকটা গুহার মুখ। ভিতরে তখনো তিনচার জন লোক আছে। তারা বের হয়ে আসতেই আমাদের প্রবেশ করবার সুযোগ এল।

বৈষ্ণোদেবীর দরবার—যেন মস্ত একখানি হলঘর। আসলে এও গুহারই একাংশ। তবে বেশ প্রশস্ত, ছাদও উঁচু। কুড়ি-পঁচিশজন লোক অনায়াসে দাঁড়াতে পারে। স্যাঁতসেঁতে কালো পাথরের ঘর; ইলেকট্রিক আলোয় আলোকিত। কোথা থেকে যেন ফুরফুরে করে বাতাস এসে ঘরখানির বদ্ধ-হাওয়া হালকা করে দিচ্ছে। ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত, ফুলে-ফুলে আচ্ছাদিত। কয়েকটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। জনাকয়েক পূজারী আছেন। তাঁরা তিনটি কালপাথরের পিণ্ড দেখালেন, সম্পূর্ণরূপে সিন্দুরলিপ্ত, লালসিল্কে ঢাকা—মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালীর পিণ্ডরূপ। লোকে বলে প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ অনেক আছে, কিন্তু এখানে এই তিন মহাশক্তির ভক্তদের প্রেরণা দেন, শক্তি, ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের প্রসাদ বিতরণ করেন।

আমাদের সঙ্গে পূজার কোন উপকরণ নেই। তাই আমাদের দর্শনও সংক্ষেপেই শেষ হয়ে গেল। নানাবিধ পূজার উপচার ওখানে ছড়ানো রয়েছে ফুল, পান, শুপারী, ধূপ, কেশর, নারকেল, রৌপ্যছত্র, রঙিন সুতোর মালা, ধ্বজার জন্য লাল, হলদে কাপড়ের টুকরো প্রভৃতি উপচার সকলেই কাটরা থেকে সংগ্রহ করে আনেন। আমরা কিছু কিছু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই আমাদের গলায় প্রসাদী সুতোর মালা পরিয়ে দিলেন পূজারীরা। এক মুঠো খুচরো পয়সা প্রসাদ পেলাম একটি সুগন্ধ ফুলের সঙ্গে। সকলের কপালে সিন্দুরের টিপ পরালেন পূজারীরা, ভক্ত শ্রীধরের বংশধর।

আবার সেই একই পথে ফেরা। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যাত্রীদের 'দর্শন' করতে দেরী হয় কেন! গুহার ভিতর অন্ততঃ একশ' ফুট না ঢুকলে দরবারে পৌঁছানো যায় না যে!

আমরা দর্শন ছেড়ে পরম পরিতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে বাইরে বের হয়ে এলাম। দুর্গম পথ, দুর্লভ দর্শন, তাই সকলের মুখে এমন এত তৃপ্তির প্রশান্তি। রাত সাড়ে ...টা। কিন্তু বাজার দোকানপাট জমজমাট, লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই, মনেই হয় না এত রাত হয়েছে। শুনলাম, সারারাত ধরে এমনি যাত্রীর আনাগোনা চলবে, চলবে দর্শন ও পূজা। বৈষ্ণোদেবীর দরবার দিবারাত্র সরগরম।

জাগ্রতা দেবী বৈষ্ণো। সকলেই নিজ নিজ কামনা বাসনা পূর্ণ করবার জন্য এখানে এসেছেন। কেউ চেয়েছেন ধন, কেউ বা রোগ-মুক্তি নিজের বা আত্মীয়পরিজনের। কিন্তু আমরা? আমাদের মনে কেবল দর্শন করবার আগ্রহ ছাড়া আর কি ছিল? মনের ভিতর খুঁজে দেখবার চেষ্টা করি।

সবাই প্রশ্ন করে, 'কেন গিয়েছিলে? কি চাইলে?'

উত্তর দিই, 'কই কিছু চাইনি তো।'

'সেকি, একেবারে কিছুই না?'

'কই না! চাইবার কথা তো কখনো মনেই হয়নি, দর্শনেই যে পরম তৃপ্তি আর কি চাইব?'

বিজ্ঞানের কথা

মানব কল্যাণে লেসার রশ্মি

লেসার রশ্মির সাহায্যে অস্ত্রোপচার
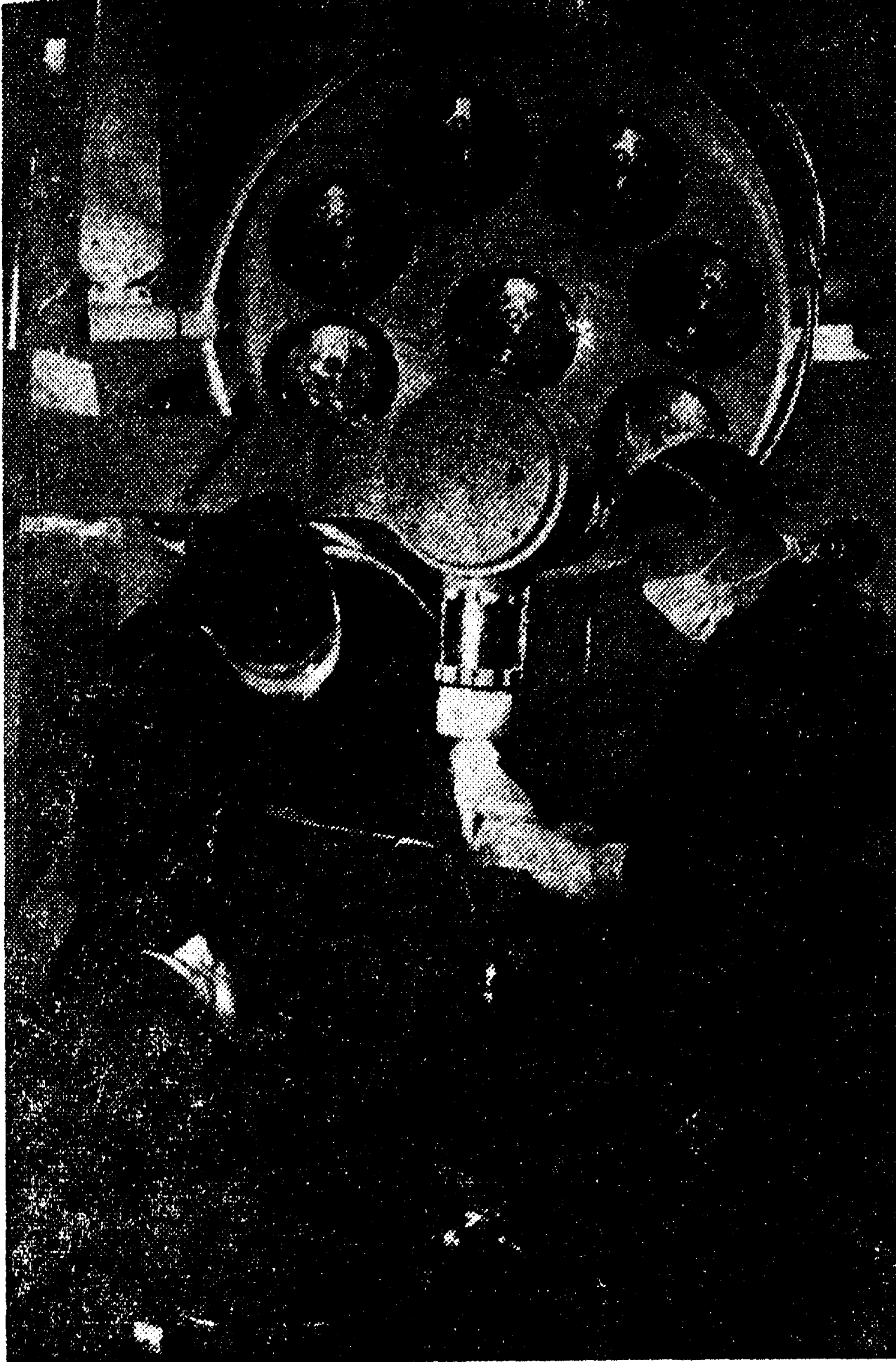
আজকাল 'লেসার' কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত। আমরা জানি, লেসার কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই সিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন' এই ইংরেজি কথাগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে। লেসারের কথা এখন প্রায়ই শোনা গেলেও দশ বছর আগে কিন্তু লেসার রশ্মি ছিল গবেষণার বস্তু ও বিজ্ঞানীদের বিস্ময়। বিজলী বাতির বালব থেকে সাধারণ যে বৈদ্যুতিক আলো বিকীর্ণ হয়, সেই আলোতে থাকে নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। সেই নানা দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ একটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লেসার রশ্মির বেলায় তা হয় না। এই রশ্মির সুতীক্ষ্ম ছটা অতি তীব্র এবং বহুদূরপ্রসারী। বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি আজ একটি মস্ত বড় হাতিয়ার। কিছুদিন আগে আমরা শুনেছি, অ্যাপোলো—১১ অভিযানে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে সঠিক দূরত্ব পরিমাপে লেসার রশ্মি প্রযুক্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে, তথ্য ও উপকরণ প্রণালীবদ্ধ করবার ব্যাপারে শিল্প-পণ্যের গুণাগুণ নিরূপণ, শল্য চিকিৎসা ও ভেষজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং হলোগ্রাফ বা ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব রচনায় এই রশ্মির প্রয়োগ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে লেসার রশ্মিকে সর্বপ্রথম বাস্তবে রূপদান করা হয়। তারপর থেকে সমগ্র বিশ্বে বিশেষত আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেনে এই রশ্মিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যে নানারকমের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে।

লেসার রশ্মির প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময় এনে দিয়েছে। অন্ধেরা এই রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি অতিক্ষুদ্র পাত অন্ধজনের মস্তিষ্কে স্থাপন করা হয়। এতে বাইরের যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সুস্থ মস্তিষ্কে প্রতিবিম্ব রচনা করে। অতি ক্ষুদ্র লেসার ক্যামেরাটির জন্যে অন্ধজনের মস্তিষ্কে প্রমাণ মাপের ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব পড়ে। অন্ধজনেরা তাতে দেখতে পায়।

রোগ চিকিৎসায় খুব ব্যাপক ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে। চোখের অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন অক্ষিপট বা রেটিনাকে পুনরায় লেসার রশ্মির সাহায্যে সংযোজন করা হচ্ছে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ত্বকের অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য রোগের রক্তপাত ও ব্যথা-বেদনাহীন অস্ত্রোপচার বর্তমানে এই রশ্মির সাহায্যে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি দন্তরোগ চিকিৎসাতেও লেসার রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে। জনৈক দন্তচিকিৎসক এই রশ্মি একজন রোগীর দাঁতে দুবার প্রয়োগ করে দেখেছেন, তাতে দাঁতের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই রশ্মি প্রয়োগের ফলে দাঁতের উপরিভাগের এনামেলের গঠনপ্রণালীতেও পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমানে নানাদেশে লেসার রশ্মি প্রয়োগের নানাবিধ যন্ত্র নির্মিত হচ্ছে। এই সকল উপকরণের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে স্মিথসেনিয়ান মিউজিয়ম অফ হিস্ট্রী অ্যান্ড টেকনোলজিতে। এই প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয়েছে লেসার ১০ : লেসার কারিগরী বিজ্ঞানের দশ বছর। গত জানুয়ারী মাসের শেষদিকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় এবং আগামী মে মাস পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে।

মানুষের কল্যাণ লেসার রশ্মি কতভাবে যে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। এই রশ্মির অন্যতম আবিষ্কারক শ্যাণ্ডলো এ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রকৃতির নানাবিধ শক্তিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের যে স্বপ্ন মানুষ এতদিন দেখে এসেছে, তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। স্যানফ্র্যান্সিসকো উপসাগরের তলায় সুড়ঙ্গ

তটিনীর বিচার-এ ডাঃ ভোস-এর চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী।

'খনা' যখন নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয় তখন এর চিত্রস্বত্ব কিনে রেখেছিলেন অরোরার অনাদি বসু। এখন শ্রীখেমকা এই চিত্রস্বত্ব কিনতে চাওয়ায় অনাদিবাবুকে তাঁর প্রদত্ত ৭০০্ টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়।

এই সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গগনে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল। শিগ্‌গীর যে বিরাট অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল খবরের কাগজ মারফৎ এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহের মাধ্যমে। এই মেঘ সঞ্চার পরে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক গগনের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের থিয়েটার জগতেও প্রচন্ড আলোড়নের ধাক্কা এসে লাগল।

৩০ মার্চ নাট্যনিকেতন মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্স শেষ অভিনয় করলেন 'বভ্রুবাহন' ও 'কর্ণার্জুন'।

মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী উপেন মিত্র মশায় পুরাতন মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে স্টার থিয়েটারে এসে আসর জমালেন। অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে ক্যালকাটা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার ও মিনার্ভা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য মিনার্ভার শিল্পী এবং কলাকুশলীরা সবাই স্টারে এসে জমলেন—এখানে তাঁদের প্রথম নাটক হলো 'ধর্মদ্বন্দ্ব' (কিংবা 'ধর্মদন্ড'—আমার ঠিক মনে নেই)।

একমাত্র চলছিল ভালো তখন রঙমহল। তাঁরা 'স্বামী-স্ত্রী'র পঞ্চাশৎ রজনীর উৎসব করলেন। দুর্গাদাস আর রাণীবালা এই নাটকে খুব সুনাম অর্জন করেছিল।

১৭ এপ্রিল ললিত মিত্রের মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। মঞ্চে ও পর্দায় দক্ষ চরিত্রাভিনেতা বলে তার সুনাম ছিল।

সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়ার হয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা ছেলেদের এ্যাডভেঞ্চারমূলক বই 'যখের ধন'-এ অভিনয় করছিলাম। পরিচালক ছিলেন হরি ভঞ্জ।

এই সময় একদিন ইস্ট ইন্ডিয়ার কর্ণধার খেমকাজীকে বললাম যে,—'দ্রৌপদী'র একটা মোটামুটি চিত্রনাট্য করা আছে—একদিন শুনুন না?

খেমকাজী রাজী হলে একদিন তাঁকে শোনালুম। তাঁর ভাল লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনার দায়িত্ব দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

১৯ মে ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মকোম্পানীর সঙ্গে 'দ্রৌপদী' ছবি করবার জন্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম। এটা কিন্তু অভিনয়ের জন্য নয়, পরিচালনার জন্যে।

ফুটবলের দিকে আমার ঝোঁক আশৈশব। বিদেশী কোন টীম এলেই তাঁদের খেলা দেখবার জন্যে আমি ছটফট করতাম। এই সময় এলো বর্মা ফুটবল টীম। খেলা হয় ২ দিন আই এফ-এ'র সঙ্গে। একদিন আই-এফ-এ জিতল, একদিন ড্র হল। দুদিনই চ্যারিটি। একদিন একখানা চ্যারিটির টিকেট যোগাড় করে দেখতে গেলাম।

আমাদের জীবনের একটা বিরাট ট্র্যাজিডি হল জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারি না নানাকারণে। স্টেজে যখন অভিনয় করি তখনও বেশ একটা দূরত্ব থাকে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। তাদের সঙ্গে মিশে যাই, তাদের সঙ্গে কথা বলি। আবার যখন ভাবি খ্যাতির খেসারত দিতে অনেক শিল্পীকেই নাজেহাল হতে হয়েছে জনতার ভালবাসার চাপে পড়ে শিল্পী [illegible] ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়েছে—তখনই পিছিয়ে পড়েছি।

যাই হোক, একদিন খোলা মাঠে সাধারণের একজন হয়ে খেলা দেখে খুব তৃপ্তি পেলাম।

৩ জুন স্টার মঞ্চে পুরাতন মিনার্ভার শিল্পীরাই মঞ্চস্থ করলেন 'চক্রধারী'।

এদিকে 'দ্রৌপদী' ছবির প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে আমাকে একখানা আলাদা ঘর দেওয়া হল। 'দ্রৌপদী'র চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনা করতে লাগলেন মণি বর্মা। ক্যামেরাম্যান ঠিক হলেন পল ব্রিকেট স্ক্রিপট এবং শ্যুটিং-এর বিষয় আলোচনা করতে তিনি প্রায়ই আসতেন। বটু সেন আমার সেটের ডিজাইন করতে লাগলেন।

'দ্রৌপদী'তে বহু চরিত্র, খুব সন্তর্পণে দেখে শুনে সব ঠিক করছি। ১৯ জুন 'দ্রৌপদী'র প্রথম শ্যুটিং হল। তখন 'দ্রৌপদী' ভূমিকাটির জন্য উপযুক্ত শিল্পী পাই নি।

ইতিমধ্যে 'ফুল্লরা'র কাজ শেষ হয়ে ২৫ জুন উত্তরায় মুক্তিলাভ করল। দর্শকেরা 'দেবী ফুল্লরা'কে বেশ ভালভাবেই অভিনন্দিত করল।

থিয়েটারগুলির মধ্যে একমাত্র রঙমহলই তখন একেবারে রম্ রম্ ক'রে চলেছে। ১৩ জুলাই বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'মেঘমুক্তি'র উদ্বোধন হল রঙমহলে। তারপর ৩১ তারিখে হল 'স্বামী-স্ত্রী'র শততম অভিনয় উৎসব।

এই সময় চিৎপুরে নতুন বাজারের কাছে রঙমহল নামে একটি থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে। নাট্যনিকেতনের হাউসই বন্ধ, কর্মীরা শিল্পীরা সব বেকার। তাদেরই মধ্যে থেকে কয়েকজন এই থিয়েটারের সংগঠক। তারা প্রথমে মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা' নাটক নিয়ে রঙমহলের দ্বার উদ্ঘাটন করল। তারপর এরা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে দিয়ে একখানি নাটক লেখাল—আবুল হাসান। তারা দুর্গাদাসকে গিয়ে ধরল এই নাটকের নাম ভূমিকায় নামবার জন্যে। দুর্গা এই নাটকে অভিনয় করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। আমিও মাঝে একবার গিয়ে 'ইরাণের রাণী' অভিনয় করি।

এই সময় বাংলা নাট্যজগতের এক বিরাট ক্ষতি হল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ভূপেন দা (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি মারা গেলেন ৫ আগস্ট কিন্তু ৮ আগস্টের খবরের কাগজে তা প্রকাশিত হল। তাঁর নাটক 'বাঙালী' এবং 'দেশের ডাকে' আমি অভিনয় করেছিলাম—একথা আগেই জানিয়েছি।

এই সময় আবার সি, এ, পি'র 'রাজনটী'র পুনরাভিনয় হল ফার্স্ট এম্পায়ারে তিন দিনের জন্যে—৭—৯ আগস্ট!

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুক্তিলাভ করল 'অভিনয়' রূপবাণীতে। ছবিখানি দেখে দর্শক ও সাংবাদিক সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত সিনেমা সাপ্তাহিক 'ফিল্মল্যান্ড' পত্রিকায় 'অভিনয়ে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল

"Ahin Chowdhury surpasses all his previous records in the screen. He is unique in his creation of "Pitambar".

কলকাতা রেডিওতে এই সময় একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতি শুক্রবার বেতার নাটুকে দল যে নিয়মিত নাটক অভিনয় করতেন তাতে সময় লাগত প্রায় ৩ ঘন্টা করে। এই বছরের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে সে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ালো এক ঘন্টায়। অর্থাৎ নাটকগুলিকে নির্মমভাবে কাটছাঁট করে রেডিওতে অভিনয়ের উপযোগী করে নেওয়া হোত।

কোনো দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে না থেকে মঞ্চে অভিনয় আমার চলতে লাগল পুরোদমেই। কখনও 'মা', কখনও 'কর্ণার্জুন', কখনও 'সাজাহান', কখনো 'পোষ্যপুত্র' একটা না একটা থিয়েটারে লেগেই থাকত—আর এই নাটকগুলিতে আমার 'পার্ট'ও' বাঁধা থাকত।

অক্টোবরের প্রথম দিকে আবার সি, এ, পি মঞ্চস্থ করলেন 'বিদ্যুৎপর্ণা'—ফার্স্ট এম্পায়ারে—দুদিনের জন্যে।

১১ অক্টোবর বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক ও সজ্জন ব্যক্তির মহাপ্রয়াণ ঘটল। তাঁর নাম হল নগেন্দ্রনাথ বসু—'বিশ্বকোষে'-র সম্পাদক। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বেশ ভালই, এঁর মৃত্যুতে খুবই বেদনাবোধ করেছিলাম।

চৌরঙ্গীপাড়ায় একটি অতি-আধুনিক চিত্রগৃহ 'লাইট হাউসে'র উদ্বোধন হল নিউ এম্পায়ারের পাশেই। এই দুটি চিত্রগৃহেরই কর্তৃপক্ষ এক—হুমায়ুন থিয়েটার্স লিঃ। দর্শকদের মনোরঞ্জন করার জন্য যতকিছু সুখ-সুবিধা প্রয়োজন তার কোনটিরই অভাব ছিল না, ফলে অচিরেই চিত্রগৃহটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে সি, এ, পি সম্প্রদায়ের হয়ে আমরা গেলাম ঢাকায় অভিনয় করতে। গিয়ে আমরা উঠলুম ডাক বাংলোয়। আমি আর তিমির একটা ঘরে, মিঃ ও মিসেস বোস একটা ঘরে দলের অন্যান্য মেয়েরা একটা ঘরে। অভিনয় হবে পিকচার হাউসে—নাটক 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমরের স্বপ্নকথা'। অভিনয়ের দিন সে কি ঝামেলা—ওখানকার রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একটি দল সুনীতি সঙ্ঘ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করলেন হাউসের সামনে। বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী সাধনা বসু পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবেন—এইটাই তাঁদের আপত্তি।

পরদিন অভিনয়। অভিনয়ের কিছু আগে আমি, মিসেস বোস ও তিমির এই তিনজনে হাউসের সামনে নামতেই বিক্ষোভকারীরা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি তখন বললাম : আমাদের আপনারা আটকাচ্ছেন কেন? আমরা শিল্পী মাত্র—আমরা তো হাউস বুক করিনি। আপনাদের যা কিছু বলবার আছে তা আমাদের প্রযোজক ও পরিচালক মধু বসুকে বলুন গিয়ে। তিনি আমাদের কন্ট্রাক্ট করে নিয়ে এসেছেন এইমাত্র—আমরা এসেছি, এতে আমাদের দোষ কি বলুন?

এই কথা বলায় তাঁরা একটু হকচকিয়ে গেলেন। আমরা ইত্যবসরে ভিতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই থামল না—গড়াল অনেকখানি। আগে ছিল "ওমরের স্বপ্নকথা"—সেটি যখন অভিনয় হয় তখনই হাউসের টিনের ছাদে ইট-পাটকেল পড়তে থাকে। মহামুস্কিল! এরকম ইষ্টকবৃষ্টি হতে থাকলে অভিনয় চলবে কি করে? আমরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়লুম। বিরতির সময় মধুবাবু স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে বেশ একটা ছোট-খাটো লেকচার দিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন যে আমরা সব তাঁদের অতিথি - অতিথির উপর আপনারা এইরকম ব্যবহার করবেন জানলে কখনই আসতাম না।

এই কথা বলায় সত্যিই ফল হলো। স্থানীয় অন্যান্য গণ্যমান্য লোকজনের চেষ্টায় এবং স্থানীয় তরুণ দলের আগ্রহে গন্ডগোল থেমে গেলো। এরপর তিনদিন অভিনয় হলো—আর কোনোদিন কোনো রকম গন্ডগোল হয়নি। শুধু তাই নয়, দর্শকসমাগম এতো বেশী হতে লাগলো যে একদিন অতিরিক্ত অভিনয় করতে হলো।

এখানে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ লেগেই থাকত।

ফেরবার পথে মেঘনা নদীর ওপর অদ্ভুত দৃশ্যাবলীর কথা আজও ভুলতে পারিনি।

অবশ্য ঢাকা আমি এর আগেও দুবার গেছি—১৯২৭ সালে এবং ১৯৩৩ সালে, কিন্তু এইবারের ঢাকা-সফর যতটা স্মরণীয় অন্যবারেরটা তত নয়।

ইতিমধ্যে মেট্রোপলিটান পিকচার্সের 'খনা'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল—মুক্তিলাভ করলো ১২ নভেম্বর। এতে আমি করেছিলাম 'বরাহ'—সে খবর আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছি। এর সঙ্গে ছিল ডি, জি, পরিচালিত একখানি দুরীলের হাসির ছবি—'অভিসারিকা'।

এরপর সি, এ, পি ধরলেন মন্মথ রায়ের 'রূপকথা'। মধুবাবু আমার কাছে একদিন প্রস্তাব করলেন এই নাটকে যক্ষরাজের ভূমিকাটির জন্য। ভূমিকাটি গুরুগম্ভীর নয়—হালকা হাস্যরস প্রধান, কিন্তু নতুনত্ব ছিল। আমি রাজী হয়ে গেলাম। 'রূপকথা'র রিহার্সাল সুরু হোল, আর

৪ ডিসেম্বর ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে এর উদ্বোধন হল। 'রূপকথা'য় অভিনয় করে আমিও আনন্দ পেয়েছিলাম, আর দর্শকরাও খুশি হয়েছিলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার' লিখেছিলেন : 'অভিশাপগ্রস্ত প্রেমের কাঙাল রুদ্ররূপী যক্ষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।"

এক সপ্তাহ এখানে অভিনয় হয়, পরে আবার 'শ্রী' চিত্রগৃহের মঞ্চে এর পুনরাভিনয় হয়।

১২ তারিখে নিউ এম্পায়ারে এক চ্যারিটি শো হয় এই 'রূপকথা'র। ঐদিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন লেডী ব্র্যাবোর্ন। এইদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিও আবার অভিনয়টিকে বেতারে প্রচার করেন।

ঠিক এর একদিন পরে রঙমহল থেকে আমার আহ্বান এল। আমি গিয়ে শুনলুম যে ও'রা শীগ্‌গির নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটকটি খুলবেন। সেই উদ্দেশ্যে ডাঃ ভোসের ভূমিকাটির জন্য আমাকে তাঁদের প্রয়োজন। আমি রাজী হয়ে গেলাম—এবং সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেল।

এদিকে সি, এ, পি সম্প্রদায় আবার জামশেদপুরে তিনদিন অভিনয়ের জন্য একটি বায়না নিয়ে বসেছে। মিলনী সিনেমার সঙ্গে। যেতেই হল ওখানে ১৮ তারিখে, ওখানে তিনদিন 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভিনয়ের পর ২২ তারিখে কলকাতা ফিরে এলাম।

ঐ সময় অর্থাৎ ১৯ তারিখে নাট্যনিকেতন খুললেন মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' এবং ষ্টার (অর্থাৎ পুরোতন মিনার্ভা) খুললেন 'বাসুদেব'।

কলকাতা ফিরেই 'তটিনীর বিচারে'র রিহার্সাল নিয়ে উঠে পড়ে লাগলুম। বড়দিনের আগের দিন উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়ে গেছে। যাই হোক, ২৪ ডিসেম্বর রঙমহলে রাত্রি ৮টার সময় এর উদ্বোধন হল। ২৫ ও ২৬ তারিখে দুটো করে শো হল। নাটকখানি কিন্তু প্রথমদিন থেকেই দারুণ জমে গিয়েছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন রাণীবালা, রতীন বন্দ্যো প্রভৃতি।

ছায়া সিনেমায় আবার কয়েকদিন সি, এ, পি'র 'শো' হল। ২৯।৩০ তারিখে হল 'রূপকথা'। দুদিনই আমাকে নামতে হোল। তারপর ও'রা করলেন 'আলিবাবা' —এতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না—আর তাছাড়া 'তটিনীর বিচার' চলছে তখন অপ্রতিহত গতিতে।

এরই মধ্যে ২।৩ দিনের জন্য একবার 'যখের ধনে'র আউটডোর শুটিং-এ যেতে হল। স্থান নির্বাচিত হয়েছিল রাঁচীর কাছাকাছি একটি পাহাড়ী জায়গায়। ১৯৩৯ সালের বর্ষারম্ভে এই প্রথম বাইরে যাওয়া। ১৩ তারিখ পর্যন্ত শুটিং করে ১৪ তারিখে সকালে কলকাতা পৌঁছই, সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার 'তটিনীর বিচার'।

১২ তারিখে ঐ রাঁচীরই আর এক জায়গায় গেলাম লোকেশান ঠিক করতে। সঙ্গে ছিলেন পরিচালক হরি ভঞ্জ, সুলাল (জহর গাঙ্গুলী) ও সুশীল রায়। কিন্তু লোকেশানটি আমার ঠিক মনোমত হল না। গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে দরজার ওপর হাত রেখে হরিবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় সুশীল বললে : তাহলে চল চল—এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে অন্য জায়গায় দেখা যাক। বলে গাড়ীতে উঠে বসে দরজাটা বন্ধ করতে গেল, আর সেই ফাঁকে আমার হাতের আঙুলটা দরজার ফাঁকে গেল চেপ্‌টে। ভাগ্যিস আমার হাতে গার্নেটের আংটিটা ছিল—তাই সমস্ত চাপটা আংটির ওপর পড়তেই আংটির পাথরটা ছিটকে পড়ে গেল আর আংটিটাও তেবড়ে গেল। আঙুলটায় সামান্য আঘাত লাগল মাত্র কিন্তু বেঁচে গেল। ওখানেই সামান্য বরফ দিতে যন্ত্রণাটা কমে গেল।

এর মধ্যে আবার অনুরোধ এল কালীগৃহের কাছ থেকে যে ধানবাদে একদিনের জন্যে যেতে হবে—সেখানে হবে 'ইরাণের রাণী'। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম না। ১৬ই তারিখে ধানবাদ পৌঁছে সেই রাত্রে অভিনয় করে আবার রাত্রিশেষের ট্রেন ধরে ১৭ তারিখে সকালে কলকাতা পৌঁছলুম। সেইদিন রাত্রেই আবার যাত্রা করলাম 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ বিশ্রাম বলে যে একটা জিনিস আছে এবং সেটা একান্ত প্রয়োজন শুধু জীবনধারণের জন্যে এটা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। এক যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছিলাম। অথচ এর জন্যে কোনরকম ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিনি কখনো। একটা দুর্দমনীয় স্রোতের টানে যেন ভেসে চলেছিলুম।

যাই হোক ১৮।১৯ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'সাজাহান' ও 'খনা' অভিনয় করে আমি ১৯ তারিখে রাত্রেই কলকাতা রওনা হই—২০ তারিখে কলকাতায় পৌঁছে আবার সন্ধ্যায় 'তটিনীর বিচার'।

এরপর কয়েকদিন বেশ বিশ্রাম করলাম কলকাতায় বসে। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে আবার গেলাম বিমল পালের ব্যবস্থাপনায় তার নাট্যসংস্থার সঙ্গে আবার 'শিউড়ী'। এখানে ২ দিন অভিনয় হোল—একদিন 'প্রতাপাদিত্য' আর একদিন 'পোষ্যপুত্র'।

এই ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড ব্র্যাবোর্ন সামান্য রোগভোগের পর লোকান্তর গমন করলেন।

মার্চ মাসে দোলযাত্রার দিন সি, এ, পি একদিনের জন্য 'শ্রী' নাট্যমন্দিরটি ভাড়া নিলেন। সেখানে হল 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমর খৈয়াম'। আমি যথারীতি নামলুম 'বিদ্যুৎপর্ণা'য়'।

এর পর ২০ তারিখে রঙমহল আবার বন্ধ হয়ে গেল। এইদিন 'তটিনীর বিচার'-এর ৩৭তম অভিনয় ছিল।

এর পর আবার সেই ভেসে বেড়ানোর পালা শুরু হল। চুপচাপ বসে থাকা তখনকার দিনে আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি—অবশ্য ভগবানের দয়ায় সুযোগও এসে গেছে একটার পর একটা। এই দেখুন না ভবানীপুরে রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে ময়মনসিংহের আঠারবাড়ীর জমিদারগৃহে এক বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁরা 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ের আয়োজন করলেন তাঁদের বাড়ীতে স্টেজ তৈরী করে। পুরোতন [illegible] বেশীর ভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রীই এতে অভিনয় করেন—আমিও 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় নামি।

নানাস্থানে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলাম। চুঁচুড়া রূপালী সিনেমায় একদিন হল 'মেঘমুক্তি', আমি নামলুম প্রোঃ ঘোষের ভূমিকায়। বসিরহাটে এই সময় একটি বিরাট মেলা হচ্ছিল—নাট্যনিকেতনের হয়ে সেখানে ২ দিন অভিনয় করলুম। একদিন হল 'কর্ণার্জুন' আর একদিন হল 'সাজাহান'। তারপর রঙমহলের শিল্পীরা বর্ধমানের 'বিচিত্রা' সিনেমার হাউস বুক করল। ওখানে ২ দিন অভিনয় হোল—একদিন 'কর্ণার্জুন' আর একদিন 'পোষ্যপুত্র'। আমি আমার অভিনীত চরিত্রগুলিই করে যেতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চাঁদ উঠেছে, কিন্তু শিশিরে চাঁদের আলো কেমন ঘোলাটে-ঘোলাটে লাগে। কোয়েলের উপর একজোড়া লাইট-জার ট্রিপ-ট্রিপ-ট্রিপ করে উড়ে-উড়ে পরিক্রম করছে।

এক অতীন্দ্রিয় শান্তি। এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নির্জনতা। কান পাতলে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দও শোনা যায়। কোনো কারণে যদি বুকের রক্ত ছলাৎ-ছলাৎ করে ওঠে, কাছে যে থাকে, সেও সে শব্দ শুনতে পায়।

মারিয়ানা শুধোল, এক্ষুনি শোবেন?

শুলে মন্দ হয় না। ঘুমটা বেশ জমিয়ে আসছে।

আমি ত দুপুরে আজকে অবাক কাণ্ড করেছি। আপনারা যখন রোদে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন খাওয়ার পর—আমি তখন বেশ একটু ঘুম...বলে চোখে-মুখে দুষ্টুমি মেখে হাসল। তারপর বলল, চলুন আমার ঘরে বসি। আপনি তো আবার যশোয়ন্তবাবুর মত ঢকঢকিয়ে গরম পানীয় খেতে পারেন না।

কফি বানিয়ে, কফির পেয়ালা হাতে তুলে দিল মারিয়ানা। পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে মারিয়ানা বলল, একটা কথা শুধোচ্ছি, কিছু মনে করবেন না আশা করি। কেননা, আমার ও আপনার সম্পর্কটা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে অনেক কথা অকপটে বলা চলে। তাই বলছি আচ্ছা গৌতমবাবু, আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেছেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। বললাম, দেখুন, ভালবাসার মানে যদি কাউকে স্তুতি করা, কাউকে চাওয়া হয়, তাহলে ভালবেসেছি। এমন মানুষ কোথায় যে কখনো না কখনো কাউকে না কাউকে চায় নি? তবে ভালবাসায় যে পাওয়ার দিকটা থাকে সে বাবদে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই ভালবেসেছিও বলতে পারেন আবার ভালবাসিওনি বলতে পারেন। যদি কাউকে ভালবেসে থাকি, তাকে জোর করে অধিকার করার সাহস হয় নি।

মারিয়ানা হাসল, বলল, আশ্চর্য। তারপর বলল, তাহলে আমার প্রশ্নটা আর একটু খুলেই বলি। আপনি কি মনে করেন, ভালবাসা মানসিক ব্যাপারের মত একটা জৈবিক ব্যাপারও—এ কি শুধুই মানসিক হতে পারে না? আমি এবং আমার মত অন্য অনেক অল্পবয়সী মেয়েই বিশ্বাস করে যে, ভালবাসাটা একটা সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থা বিশেষ। এর সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নেই।

আমি বললাম, দেখুন এ প্রসঙ্গটা এত পুরোনো ও ঘোরালো তাতে অন্য লোকের মতামত না নিয়ে নিজের-নিজের মত নিয়ে থাকাই ভাল—তবে আমার মনে হয় শরীরকে পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই বোধহয়। আমি যদি কাউকে কোনদিন ভালবেসে থাকি, তাহলে তার মনটার চেয়ে শরীরটাকেও কম বাসিনি। তাকে যখন পেতে চেয়েছি, তার বুদ্ধিমতি মানসিক সত্তার সঙ্গে তার সুগন্ধি শারীরিক সত্তাকেও সমান ভাবে চেয়েছি। জানি না, হয়ত এ আমার নিজের কথা।

মারিয়ানা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বলল, আপনারা মানে পুরুষরা কেমন অন্য-রকম। আপনাদের এবং আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে অনেক তফাৎ। আশ্চর্য! অথচ আমরা এক শিক্ষা পাই, এক বাবা-মার কাছে মানুষ হই—অথচ কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি হেসে বললাম, মাপ করবেন, বলতে পারব না।

মারিয়ানার ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে, চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, নিন্ শুয়ে পড়ুন দরজা বন্ধ করে। মারিয়ানা বলল, কম্বলের তলায় আরাম করে শোব বটে, কিন্তু ঘুম আসবে না। বই পড়ব। তারপর দরজা বন্ধ করতে-করতে বলল, দেখুন, রাতে ওরা ফিরলে আমাকে জাগাবেন কিন্তু প্লিজ। যদি কফি-টফি খেতে চায়। সুগতর গলার পেইস্টটা আমার ঘরে আছে, যদি দরকার হয়।

(১৭)

ছুলোয়া শিকারের সব আয়োজন প্রস্তুত। গত রাতে ওরা বৃথাই শীতে কষ্ট পেয়ে মরল। রাত আড়াইটে-তিনটে নাগাত ফিরে এসেছিল। শম্বর আসে নি কুম্ভী ক্ষেতে। তবে কোয়েলের দিক থেকে একটা বাঘের গোঙানীর আওয়াজ শুনেছে ওরা। শম্বরের ডাক শুনেছে তার অব্যবহিত পরেই— ডাকতে ডাকতে দৌড়ে গেছে শম্বরের দল নদীর দিক থেকে পাহাড়ে।

মাচা বাঁধা হয়েছে চারটে। প্রথমে যশোয়ন্ত, তারপর সুগতবাবু তারপরে আমি এবং সর্বশেষে টিগা বলে স্থানীয় একজন ওঁরাও শিকারি।

ছুলোয়া করবার ভার যে নিয়েছে তাকে দেখলেই বেশ অভিজ্ঞ যে, তা বোঝা যায়। কুজরুম বস্তীর লোক সে। ছুলোয়া করনেওয়ালারা বেশির ভাগই কুজরুমের লোক।

দুপুরের খাওয়া সেরে বেরোতে বেরোতে আমাদের বেশ দেরী হয়ে গিয়ে-ছিল—সকালে ছুলোয়া করলেই ভাল হত; কিন্তু রাত তিনটেয় ফিরে যশোয়ন্ত আর সুগতবাবু ঘুম থেকে উঠেছেন প্রায় এগারোটা বাজিয়ে। তরপর খুব তাড়াতাড়ি করা সত্ত্বেও বাঙলো থেকে বেরোতে বেরোতে প্রায় দুটো হয়ে গেল।

শীতের দুপুর। এর মধ্যেই একটা হিম-হিম ভাব। বনের গাছ-গাছালির ছায়া এখনি যেন কেমন দীর্ঘ ও শীতল বলে মনে হচ্ছে। বড় জোর দুটি ছুলোয়া হবে। তার বেশী হবে বলে আশা কম। সময় নেই।

প্রথম ছুলোয়া যখন আরম্ভ হল তখন প্রায় পোনে তিনটে বাজে। দেখতে দেখতে ছুলোয়া করনেওয়ালারা এগিয়ে এল। উত্তেজনা বাড়তে লাগল। হাতের তালু ঘামতে লাগল। বুকের মধ্যে টিপ্-টিপ্ করতে লাগল। একদল ময়ূর না উড়ে মাটিতে মাটিতে দৌড়ে গেল আমার মাচার তলা দিয়ে। তারপরই যশোয়ন্তের [illegible] দিক থেকে ও টিগার্‌র মাচার দিক থেকে পরপর দুটি রাইফেল ও বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। কি মারল জানি না।

এমন সময় আমার একেবারে সোজা-সুজি জঙ্গল ঠেলে একটি অতিকায় দাঁতাল শুয়োর বের হল। অতবড় যে শুয়োর হয় নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমার মাচা বোধ হয় নজরে পড়ে নি। আরো দু-পা এগিয়ে আসতেই আমি বন্দুক তুলে গুলি করলাম এবং গুলি লাগল গিয়ে ঘাড়ের পেছনে মেরুদণ্ডে। গুলিটা লাগামাত্র শুয়োরটা চার পায়ে মাটি ছিটকাতে ছিটকাতে ঘুরপাক খেতে লাগল ঐ জায়গা-তেই। চরকিবাজীর মত। প্রথম গুলিটা জব্বর হল কি হল না, বুঝতে না পেরে, বাঁ ব্যারেলে যে এল জি ছিল সেইটাও দুরগুম্ করে দেগে দিলাম। একটু দৌড়ে গিয়েই পড়ে গেল শুয়োরটা—পড়ে কিছু-ক্ষণ ছটফট করল, তারপর স্থির হয়ে গেল। শুয়োরের সঙ্গে গতজন্মে শত্রুতা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু, শুয়োরের বাচ্চারা ভালবেসে বারবার আমারই সামনে হাজির হবে।

ছুলোয়া শেষ হলে নেমে গিয়ে দেখি যশোয়ন্ত একটি চৌশিঙা হরিণ মেরেছে—। টিগা মেরেছে একটি শিঙাল চিতল। সুগতবাবু বললেন, আমার এত ঘুম পাচ্ছে ভাই, যে কি বলব—আমি ত মাচায় বসে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম—আপনাদের গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল। আজকাল মোটে রাত জাগতে পারি না। বড় কষ্ট হয় রাত জাগলে।

ঐ এক মাচায়ই উল্টোমুখে বসে আর একবার শিকার হবে। এই শেষ ছুলোয়া। এই ছুলোয়া শেষ হতেই রাত হয়ে যাবে প্রায়। তাড়াতাড়ি করে প্রথম ছুলোয়ার শিকারগুলি টেনে একটা দোলা-মত জায়গায় নামিয়ে রেখে ছুলোয়া-ওয়ালারা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে পাকদণ্ডী পথে ছুটে গেল। পনেরো কুড়ি মিনিট পরেই সুখিয়া একটি কেঁদ গাছে উঠে 'কু'—দিল। ওপাশের পাহাড় থেকে আওয়াজ হল—'কু'। শুরু হল ছুলোয়া।

যশোয়ন্ত বলছিল যে, এই ছুলোয়ায় বাঘের আশা বেশী। কারণ এখানের লোক-দের ধারণা, যে মধ্যবর্তী পাহাড়ের গুহা-তেই বাঘের আড্ডা। যতদূর শোনা গেছে, তাতে একজোড়া বাঘ আছে। গতকাল রাতের গোঙানির আওয়াজে যশোয়ন্তের সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। যদিও এটা ডিসেম্বরের শেষ, তবুও বাঘ ও বাঘিনীর একসঙ্গে থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই চলে। কাঁধে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। দূরের বিস্তীর্ণ টাঁড় থেকে তিতিরের কান্না ভেসে আসছে—টিঁউ-টিঁউ-টিঁউ-টিঁউ। একটা বড় কাচপোকা আমার মাচার কাছে ঘুরে-ঘুরে গুন-গুন করে উড়ছে। বিদায়ী সূর্যের সোনালি ফালি পাতার ফাঁকে ফাঁকে এসে সারা বনে এক মোহময় বিষণ্ণ আবেশের সৃষ্টি করেছে। কোয়েলের উপরে দক্ষিণের আকাশে একদল লালশির পোচার্ড উড়ে যাচ্ছে ডানা ঝট্‌পটিয়ে। সব মিলে এমন একটা নিস্তব্ধ নির্লিপ্ত, যে কি বলব।

ছুলোয়া শুরু হল। গাছের গায়ে টাঙ্গী দিয়ে হালকাভাবে মারার ঠকাঠক্ শব্দ, ছুলোয়াওয়ালাদের মুখ-নিঃসৃত নানারকম বিচিত্র শব্দ লহরী কানে এসে পৌঁছচ্ছে।

ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে আসছে। কাছে আসছে, আরো কাছে। মনে হল ছুলোয়া-ওয়ালারা দূর থেকে সোরগোল করে কি যেন বলল, 'উস্মে যাতা হ্যায় বড়কা বাঘোয়া বা।' অন্য একজন বলল, 'ডবল্ বাঘোয়া বা।' আরেকজন বলল, 'সামহাল্ হো। বড়া বাঘ।' এমন সময় সুগতবাবুর মাচার দিক থেকে একটি রাইফেলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল—এবং তার বোধহয় পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড বাদেই একটা অত্যন্ত তীব্র ও বুককাঁপানো আর্তচিৎকার কানে এলো। চিৎকার শুনে সেটা যে মানুষেরই চিৎকার প্রথমে তা মনে হলো না—বুকফাটা এমন একটা আঁক্—আঁ-আর্-র্-র্—আওয়াজ যে শুনে গলা শুকিয়ে গেল। কিন্তু আগে কি পরে আর কোনো আও-য়াজ হল না।

কি করব ঠিক করতে পারলাম না। যশোয়ন্তের কড়া নিষেধ ছিল যে, ছুলোয়া-চলাকালীন মাচা থেকে যেন না নামি। তাছাড়া ভয়ও করছিল। যদি সত্যিই বাঘ হয়। ঐ আওয়াজটা কিসের তা বুঝে উঠতে পারলাম না—বাঘের না মানুষের। কেন জানি মনে ডাক দিল যে সুগতবাবু নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছেন। মাচা থেকে নামব কি নামব না ভাবতে ভাবতে ঐ দিক থেকে আর একটি রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম ধরে অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় যশোয়ন্ত আমাকে ডাকছে শুনলাম।

এদিকে ছুলোয়াওয়ালারা প্রায় মাচার কাছ অবধি পৌঁছে গেছে। মাচা থেকে নামতে নামতে শুনলাম, যশোয়ন্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'ছুলোয়া বন্ধ করো—খাত্‌রা বন্ গীয়া—খাত্‌রা বন্ গীয়া।'

যশোয়ন্তের কথা শুনে ছুলোয়াওয়ালারা একে অন্যকে হাঁক দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—খাত্‌রা বন্ গীয়া—খাত্‌রা বন্ গীয়া।

ঘন বনের মধ্যে শীতের বিকেলে সেই থমথমে কুসংবাদটি গম্‌গম্ করে কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়াতে লাগল বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। খাত্‌রা বন্‌গীয়া—হো—খাত্‌রা বন্ গীয়া...।

মাচা থেকে নেমে দৌড়ে সুগতবাবুর মাচার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। মাচা থেকে সুগতবাবুর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বাইরে ঝুলছে। কপাল মাথা ও চুল গড়িয়ে দরদর করে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে মাটিতে পড়ছে এবং একটি মাঝারি আকারের টাই-গার মাচার পেছনে মুখথুবড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। মাচার লতার বাঁধন খুলে গেছে এবং মাচাটা এক পাশে কাৎ হয়ে গেছে। দু-তিনটি কাঠ খুলে নীচে পড়ে আছে।

আমাকে আসতে দেখে যশোয়ন্ত ওর রাইফেলটাকে ভূলুণ্ঠিত বাঘের গায়ে শুইয়ে তর্‌তর করে মাচায় উঠে আমাকে নীচে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়াতেই সুগতবাবুকে ধরে আল্‌তো করে আমার সাহায্যে মাটিতে নামাল।

ততক্ষণে ছুলোয়াওয়ালারা সবাই এসে গেছে। গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করছে। টিগা কোথা থেকে দৌড়ে কি কতগুলো পাতা ছিঁড়ে এনে সেই রস নিঙড়ে দিতে লাগল সুগতবাবুর গলায়। সুগতবাবুর ডান কাঁধ এবং গলার কিছু অংশ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে বাঘটা—। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গলার ফুটো দিয়ে রক্ত ও ফেনা বেরোচ্ছে। ফর্সা মুখটা এবং এলোমেলো চুলগুলো গাঢ় ঘন রক্তে থক্-থক্ করছে। চশমাটা মাচার নীচে পড়েছিল। একটা কাচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। অত রক্ত দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। গলা শুকিয়ে আসতে লাগল।

টিগা এবং তার অনুচরেরা বিনা বাক্য ব্যয়ে দু' মিনিটের মধ্যে শলাইগাছের ডাল কেটে লতা দিয়ে বেঁধে একটা স্ট্রেচারের মত বানিয়ে ফেলল। আমি এবং যশোয়ন্ত সুগতবাবুর অচৈতন্য শরীরটাকে ধরাধরি করে তাতে তুলে দিলাম। যশোয়ন্ত সুগত-বাবুর রাইফেলটাকে আনলোড করে নিজের কাঁধে নিল। তারপর আমরা হন্‌হনিয়ে জীপের দিকে চললাম। কিছু লোক রইল বাঘের তত্ত্বাবধানে।

এতসব কাণ্ড যে ঘটে গেল—সে সব বড় জোর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে। জীপে পৌঁছে আমি আর টিগা জীপের পেছনের সীটে সুগতবাবুকে যতখানি পারি সাবধানে কোলে শুইয়ে নিয়ে বসলাম। রক্তে আমাদের গা-হাত-পা মাখামাখি হয়ে গেল। যশোয়ন্ত জীপের স্টীয়ারিং-এ বসল। ওখান থেকে কুটুকু বাঙলো জীপে প্রায় পনেরো মিনিটের পথ।

যশোয়ন্ত বলল, বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না লালসাহেব। আমি যেন চমকে উঠলাম। জখম হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, সব বুঝছি; সব দেখছি—কিন্তু এই সুগতবাবু—মারিয়ানার এত আদরের সুগত—যিনি এখনো বেঁচে আছেন—আমার ও টিগার

কোলে শুয়ে আছেন—এখনো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণের বার্তাবাহী রক্ত ও ফেনা বেরোচ্ছে—তিনি যে সত্যি সত্যি মরে যাবেন ত ভাবা যায় না। মানুষ কি করে। চোখের সামনে কোলের মধ্যে মরে তা জানি না কখনো—জানতে চাইওনি—এই মুহূর্তেও জানতে চাই না।

মানুষের এবং সম্বংশজাত মানুষের রক্তেও ত কম দুর্গন্ধ নয়, চ্যাট্-চ্যাট্ করছে—এ রক্তে শম্বরের রক্তের মতই বদ্‌বু—ঈস্ যে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে জীপে পড়ছে—জমে যাচ্ছে সে রক্ত কোনো চিতল হরিণের নয়, শুয়োরের নয়; সে রক্ত যে সুগতবাবুর তা ভাবতে পাচ্ছি না।

যশোয়ন্ত বলল, বাঘটাকে সামনা-সামনি গুলি করেই ভুল করেছিলেন উনি। বাঘটা নিশ্চয়ই একেবারে মুখোমুখি আসছিল—কিন্তু ওর গুলি বাঘের বুকে লাগা সত্ত্বেও বাঘ সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে মাচায় উঠে ঐ মরণ-কামড় দিয়েছিল।

আমি চিৎকার শুনেই দৌড়ে গেছি এবং দূর থেকে দেখি বাঘ কাজ শেষ করে মাচা থেকে লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু মনে হল, পালাবার চেষ্টা করেও পারছে না। ঐ অবস্থাতেই আমি বেশ দূরে থাকা সত্ত্বেও একটি গুলি করলাম এবং তাতেই দেখলাম বাঘ শুয়ে পড়ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুগতবাবু হার্ড-নোজ্‌ড বুলেট ব্যবহার করেছিলেন, সফ্‌ট নোজ্‌ড বুলেট হলে বাঘ লাফিয়ে হয়ত মাচায় উঠতে পারত না। ডাবল ব্যারেল রাইফেল থাকলে হয়তো আর একটি গুলি করতে পারতেন, বাঘ মাচায় ওঠার আগে। যাক, এসব আলোচনা করে এখন আর কি হবে।

আমি বললাম, সব ত বুঝলাম, কেন মারিয়ানাকে গিয়ে কি বলব যশোয়ন্ত? মারিয়ানাকে গিয়ে কি বলব?

যশোয়ন্ত উত্তর দিল না। রাস্তায় চোখ রেখে গাড়ি চালাতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুট্‌কু বাঙলোয় পেঁাছে গেলাম আমরা। যশোয়ন্ত বলল একটা কম্বল, মারিয়ানার একটা শাড়ি এবং অ্যান্টিসেপ্টিক যদি কিছু বাঙলোয় থাকে, ত' এক্ষুনি নিয়ে এসো— মারিয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো—এক্ষুনি। নষ্ট করার মত সময় নেই।

টিগার কোলে সুগতবাবুর মাথাটা দিয়ে দৌড়ে গেলাম বাঙলোয়। যশোয়ন্ত জীপটা হাতার মধ্যে ঢোকালেও বাঙলো থেকে একটু দূরে রেখেছিলো।

মারিয়ানা ঘরে নেই। বাবুর্চিখানায় কি যেন করছে। বাবুর্চিখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আমার দিকে পেছন ফিরে বসে বসেই উঁচু উনুনের উপরের কড়াইয়ে কি একটা নাড়তে নাড়তে বলল, কি মশাই? ফিরছেন? এত তাড়াতাড়ি? অবশ্য আমুদেগোলায় বলব, আপনাদের জন্য চিঁড়ের পোলাও রান্না করলাম। সুগত খুব ভালবাসে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে যাবে।

উত্তর না দিয়ে আমি ডাকলাম 'মারিয়ানা—' মরিয়ানার মনে মনে সেই ডাক নিশ্চয়ই কোনো হিমেল ভয় পেঁাছে দিয়েছিল। এক মোচড়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েই ও আমার রক্তাক্ত চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল—চমকে উঠে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বললাম সংক্ষেপে; যা বলার। মনে হল, মারিয়নার সেই চমক কেটে গেল। ওর চোখ দুটি নিথর হয়ে গেল। দৌড়ে ঘরে গিয়ে একটি সাদা শাড়ি, একশিশি ডেটল এবং একটি কম্বল নিয়ে এল। আমি আর এক দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে ওর শালটি নিয়ে এলাম। তারপর আমরা দুজনে দৌড়ে এসে জীপে উঠলাম। টিগা ও চৌকিদার বন্দুক রাইফেলগুলো নিয়ে গেল ঘরে। ওরা বাঙলোর জিম্মাদারিতে রইল। সুগতবাবুর যে ড্রাইভার, সে খাস বেয়ারাও বটে। সে লোকটি ভীষণ কাঁদতে লাগল—কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল বাবু আমার দাদা-বাবুকে বাঁচান আপনারা যেমন করে পারেন, বাঁচান, নইলে আমি কোন্ মুখ নিয়ে বৌদির কাছে ফিরব।

ওকে যশোয়ন্তের পাশেই বসতে বললাম, জীপের সামনের সীটে।

যশোয়ন্ত জীপ স্টার্ট দিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে। হেডলাইটের আলোটা জঙলী পথে ছলো ছলো চোখে চলতে লাগল। পথও ত কম নয়। ছীপা-দোহরে ডাক্তার আছেন বটে কিন্তু এইরকম রুগীর চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম নেই। তাই উপায় নেই কোনো। ডাল্টনগঞ্জেই যেতে হবে। খোড়োয়াই হুটার বারোয়াড়ি হয়ে ডাল্টনগঞ্জ। কোয়েলের জল পেরিয়ে ওপারে পেঁাছল জীপ তারপর গোঙাতে গোঙাতে চলল।

মারিয়ানা কিন্তু কাঁদল না একটুও। ভেবেছিলাম কাঁদবে। একবার অস্ফুটে শুধু বলেছিল 'সুগত—উঃ।'

সাদা শাড়িটা সুগতবাবুর কাঁধে ও গলায় জড়িয়ে তার উপর জবজবে করে ডেটলের পুরো শিশি উপুড় করে দিলাম। যশোয়ন্ত জীপের ড্যাশবার্ডের ড্রয়ার থেকে রামের শিশিটা বের করে মুখ হাঁ করিয়ে ঢেলে দিতে বলল। দিলামও বটে, কিন্তু কিছুটা কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল এবং কিছুটা গলার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল। পাছে ঠান্ডা লাগে, তাই আধখানা কম্বল দিয়ে সুগতবাবুকে ঢেকে দিয়েছি। আর আধ-খানা নীচে দিয়েছি। আমার কোলের উপর কোমর ও পা রেখেছি, মারিয়ানার কোলে মাথা। পায়ের কিছুটা বেরিয়ে আছে পেছনে, পাঁজাকোলা করে শোয়ান সত্ত্বেও। অতবড় লম্বা-চওড়া মানুষটা।

যশোয়ন্ত যত সাবধানে পারে জীপ চালাচ্ছে, যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে। কিন্তু এদিকে তাড়াতাড়ি পেঁাছনোও দরকার। মারিয়ানা কোনো কথাই বলছে না। মাঝে মাঝে মুখটা নিয়ে সুগতবাবুর কম্বলে ঢাকা বুকটার কাছে রাখছে। বোধহয় হৃৎপিণ্ডের রায় শুনছে। একেবারে সোজা হয়ে দৃঢ় ঋজু শালগাছের মত বসে আছে মারিয়ানা।

উল্টো দিক দিয়ে একটা ট্রাক আসছিল। যশোয়ন্ত জীপটা বাঁ দিক করলো, ঐ ট্রাকের হেডলাইটের আলোয় জীপের ভেতরটা ভরে গেল। সেই আলোয় দেখলাম মারিয়ানা জীপের পর্দায় হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছে আর দু চোখ বেয়ে নিঃশব্দ ধারায় জল বইছে। চোখে চোখ পড়তেই দাঁতে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ও।

হুটারের কাছাকাছি গিয়ে যশোয়ন্ত এক সেকেণ্ডের জন্যে জীপটা থামালো একটা চুট্টা ধরাবে বলে। দেশলাই জ্বালতেই মারিয়ানা ঘৃণার সঙ্গে বলল, যশোয়ন্ত বাবু, একটা লোক মরতে বসেছে আর আপনার এখন চুট্টা না খেলেই হতো না? যশোয়ন্ত অপ্রতিভ হয়ে চুট্টাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার জীপে স্টার্ট দিল। এমন সময় সুগতবাবুর গলা থেকে একটা জোরে ঘড়্-ঘড়ানি আওয়াজ হতে লাগল—একটা মিনিটখানেক—তারপর থেমে গেল।

মারিয়ানা কেঁদে উঠে শুধোল, কি হল? এমন হল কেন? যশোয়ন্তবাবু কি হল?

যশোয়ন্ত দৃঢ় গলায় ধমকের সুরে বলল, কিছুই হয়নি। ভাল করে শোয়ান সুগতবাবুকে। ও'র নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। যশোয়ন্তের কথামত আমরা ও'কে একটু নাড়াচাড়া করে ভাল করে শোয়ালাম।

ডাল্টনগঞ্জের হাসপাতালে যখন পেঁাছলাম তখন রাত প্রায় ন'টা। যশোয়ন্ত দৌড়ে গেল হাসপাতালের ভিতরে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন ওয়ার্ড-বয় একটা স্ট্রেচার নিয়ে এল। আমরা দুজন সুগত-বাবুকে সাবধানে তাতে তুলে দিলাম। রক্ত জমে মারিয়ানার শাড়িতে একেবারে থকথক করছে। আমাদের সকলেরই গায়ে রক্ত। আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

অপারেশান থিয়েটারের টেবিলের উপর ও'কে রাখা হল। সাহেব ডাক্তার এসে স্টেথিস্কোপ লাগালেন বুকে। নার্সরা ডিসইনফেক্ট করার যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে লাগল ট্রেতে। কিন্তু সকলকে হতভম্ব করে ডাক্তার বললেন, "আই অ্যাম সরি জেণ্টেলমেন, হি মাস্ট হ্যাভ ডায়েড অ্যাট লিস্ট এন আওয়ার ব্যাক।"

সুগতবাবুকে একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে ওয়ার্ড-বয়রা বাইরে নিয়ে এল।

যশোয়ন্ত সুগতবাবুর হাত থেকে রিস্টওয়াচ ও হীরের আংটিটি খুলে নিল।

বুকপকেট থেকে পার্স এবং কতগুলো কাগজপত্র যা ছিল তা আমি নিয়ে আমার কাছে রাখলাম। মারিয়ানাকে আমরা নিয়ে সুমিতাবৌদির কাছে রেখে এলাম। কিছুতেই যেতে চাইছিল না ও সুগত-বাবুকে ছেড়ে। বিকেলবেলার হাসিখুশী সুপুরুষ--রাতেরবেলার রক্তাক্ত শব হয়ে গেল।

সুমিতাবৌদির বাড়ী থেকে ফেরবার সময় যশোয়ন্ত বলল, একটু চোখ রেখো চারদিকে। এখানে বাঘ নেই বটে, তবে জগদীশ পাণ্ডে আছে। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

যশোয়ন্ত বাইরে গেল আবার। কোলকাতায় মিসেস রায়ের কাছে ট্রাঙ্ককল বুক করে আমি বসে রইলাম।

চীফ কনসার্ভেটর ও যশোয়ন্তের প্রতিপত্তি ও জনাশুনো থাকাতে ডেথ-সার্টিফিকেটটা বের করতে আমাদের বেগ পেতে হল না। পুলিশের হাত থেকেও সহজেই নিস্তার পাওয়া গেল। পোস্ট-মর্টেম করল না। যশোয়ন্ত বলল, ভেবেছিলাম জগদীশ পাণ্ডের ডেথ-সার্টিফিকেট নিতে আসব—তা না; কি হল।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। গতকাল সকাল থেকে আজকের রাত এর মধ্যে কত কি ঘটে গেল। এই সামান্য সময়ের মধ্যে। রাংকায় যশোয়ন্ত বলেছিল আমাকে—লালসাহেব বাঘ যে কি জিনিস তা একদিন জানবে। তা যে এমন করে এবং এত তাড়াতাড়ি জানতে হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

পকেট থেকে সুগতবাবুর পার্সটা বের করলাম। ভিজিটিং কার্ড রাখবার জায়গায় একটি ফোটো। মারিয়ানা এবং অন্য এক ভদ্রমহিলার। খুব সম্ভব মিসেস রায়ের। আটটা একশ টাকার নোট। পনেরোটা এক টাকার নোট গোছ নো। ন'টা দশ টাকার নোট। কোলকাতার দুটি দোকানের ক্যাশ-মেমো। লাইসেন্স যে বন্দুকের দোকানে রিনিউ করতে দেওয়া হয়েছে তার রসিদ। আর কিছু নেই। অন্য কাগজ-পত্রগুলি রক্তে প্রায় মাখামাখি হয়ে গেছে। প্রথম কাগজটিই একটি চিঠি। এবং আশ্চর্যের কথা, মারিয়ানাকেই লেখা। হাসপাতালের দেওয়াল ঘড়িট টিক্‌টিক্ করতে লাগল একা একা। আমি চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

আমার মারিয়ানা, সোনা, কুটকু

৩০।১২

তুমি আমার পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছ কি জানি না। তুমি আমার পাশেই আছ, অথচ এত দূরে আছ যে, তোমাকে চিঠি লিখতে হচ্ছে।

আগামীকাল তোমার বন্ধুরা আসবেন শিকারে। তাঁদের সামনে বলবার ইচ্ছে থাকলেও হয়ত তোমায় কিছু বলতে পারব না। তাছাড়া তুমি যখন একলা থাকো তখনই বা বলতে পারি কই? অবশ্য নতুন করে তেমন কিছু বলায় নেইও। তবু তোমার সঙ্গে একা একা আরো দু' একটা দিন কাটাতে পারলে ভাল লাগত। তোমার বন্ধুদের যোগ্য সম্মান দিয়েই বলছি যে... (তারপর এত রক্ত লেগে আছে যে পড়া যাচ্ছে না।)

মারিয়ানা, বড় গাছ আমার খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে করে, আমি কোনো উষ্ণ গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় কুকুরের মত ক্লান্ত হয়ে আমার সর্বস্ব এলিয়ে সেই গাছের ছায়ায় বসে ক্লান্তি অপনোদন করি।

আমার ইচ্ছে করে তুমি কোনো গাছ হও। কোনো চেরী গাছ, কোনো কৃষ্ণচূড়া গাছ কিংবা কোনো ইউক্যালিপটাস্ গাছ যার সুগন্ধি ছায়ায় বসে আমি বাঁচবার তাগিদ পাই।

তুমি হতে পারবে সে গাছ? পারবে না, পারবে না, পারবে না। আমি জানি যে তুমি তা পারবে না। অথচ কোনোদিন পারবে না বলেই হয়ত মনে মনে সব সময় আশা করি যে তুমি পারবে, পারবে, পারবে। বলতে পারো? কেন এমন উইশফুল থিংকিং? যা কোনোদিন পারো না, তার জন্যে আর কতদিন এমন কাঙালপনা করব বলতে পারো?...... তোমার বন্ধু মহুয়া আজকাল আমাকে প্রায়ই প্রাঞ্জলভাবে বলে যে, তাকে ছাড়া আমার আর কাউকে (অর্থাৎ তোমাকে) ভালবাসা চলবে না। আমার সবটুকু ভালবাসা পাবার মনোপলি-রাইট যে তাকে সমাজ দিয়েছে সে সম্বন্ধে সে সচেতন। সে যে আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসে না তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সেটা সেও যেমন জানে, আমিও জানি। অথচ তুমি বল, মুখে না বললেও হাবেভাবে বল, যে আমারও একমাত্র ধর্ম-পত্নীকেই ভালবাসা উচিত। তোমাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে পাপ। তোমার পক্ষে আমাকে কোনো কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। শারীরিক ত নয়ই; মানসিকও নয়।

তুমি এবং তোমার বন্ধু দুজনে দুজনের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছ। তুমি বন্ধুর স্বার্থ দেখছো এবং বন্ধু তোমার স্বার্থ দেখছে। মধ্যে আমি বোকার মত দুজনকে সমানভাবে ভালোবেসে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও অপূর্ণতার গ্লানিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি।

তুমি লেখাপড়া শিখেছ, কিন্তু বৃথাই। বাইরে অনেক পুঁথি ওলটালে কি হয়, মনে মনে গোঁড়া মেয়েটিই আছ। সংস্কার-মুক্তি হয়নি। তোমার সংস্কার-মুক্তি হয়নি।

তোমার বন্ধুকে আমার যা ছিল সব দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারিনি—কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি যে, সে কথা সে জানে। তোমার কাছ থেকে কাঙালের মত চেয়ে তোমাকে শুধু বিরক্তই করেছি—তোমাকেও কণামাত্র আনন্দিত করতে পারিনি।

বরাবর জেনে এসেছি যে, অন্য কাউকে দুঃখী না করে নিজে সুখী হওয়া যায় না। কিন্তু আজ জানছি যে, নিজে পরম দুঃখী হয়েও অন্য কাউকেও কণামাত্র সুখী করা যায় না। আমার মত লোক দুঃখ পেতেই জন্মায়, দুঃখ হয়ত তাদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

জানো মারিয়ানা, আজকাল মাঝে মাঝে কেমন একটা আত্মহত্যার ইচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। অথচ আমার মত এমন তীব্রভাবে বাঁচতে বোধহয় কেউ চায়নি। তবু আজকাল আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমার মৃত্যুর পর অন্তত নিরুচ্চারে মনে মনে বোলো যে, তুমি আমাকে ভালোবাসতে কিন্তু তা দেখাতে পারিনি—তুমি আমাকে অনেক কিছু দিতে চাইতে—কিন্তু দিতে পারোনি। কারণ সমাজ তোমাকে সেই মুক্তি দেয়নি। এ যদি সত্যি নাও হয়, তবুও মিথ্যে করে, ভান করেও বোলো। আমি অশরীরী সত্তায় এসে কান পেতে সেই কথা শুনব। তুমি যখন ঘুমোবে, তখন এসে তোমার ঘুমন্ত চোখের পাতায় চুমু খেয়ে যাব। তাতে নিশ্চয়ই তোমার পবিত্র দেহ কলুষিত হবে না?

কেন জানি না। কেবলি মনে হয় যে, আমার দিন ফুরিয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা নদীর উপরের বারান্দায় বসে তোমার 'দিন ফুরালো হে সংসারী' গানটি শুনে বড় ভয় লাগল। একে কি বলব? premonition.

জানি না মারিয়ানা সোনা। আমার বড় ভয় করে। মরতে আমার বড় ভয় করে।

ইতি তোমার সুগত।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে পরাশরের নির্দেশে ট্যাক্সিটা অত্যন্ত নির্জন একটা জায়গায় অন্ধকারে এসে থামল।
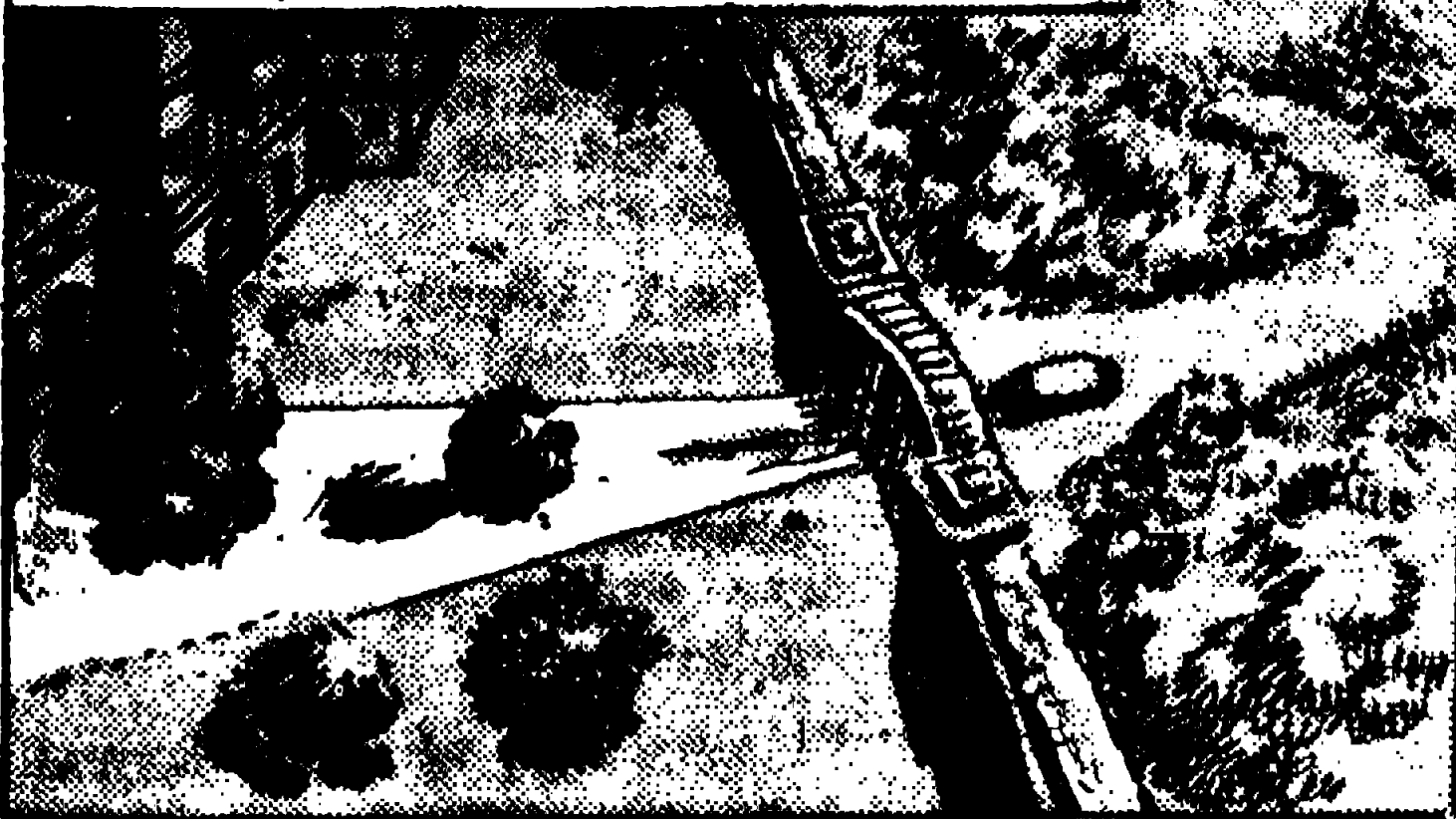
ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকোবার সময়—

অপরাধ নেবেন না স্যার। যদি বলেন ত অপেক্ষা করে থাকব। চার্জ লাগবে না।

বেশ, অপেক্ষা করো তা'হলে।

বাঘ হঠাৎ ভিজে বেড়াল হয়ে গেল যে! আর. এ কোথায় যাচ্ছ? যমপুরী মনে হচ্ছে যে!

প্রায় তাই!

বেশ কিছুক্ষণ হাঁকডাকের পর লন্ঠন হাতে দরোয়ান এসে গেটটা খুলল।

যমদূতের মতই চেহারা!

ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। শুধু বাইরে ট্যাক্সিটা ঘোরাবার সময় তার হেডলাইটের আলোয়—

বাড়ির সব ত ঘুটঘুটি অন্ধকার! মানুষ কেউ থাকে বলেও মনে হচ্ছে না!

সদানন্দর প্রথম ও শেষ প্রেমাভিসার

মিহির সেন

সদানন্দ সিকদার যৌবনে প্রেমে পড়েছেন কয়েক বারই, অবশ্য মনে মনে, কিন্তু প্রেমাভিসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন একবারই।

এ কালের মত প্রেম করাটা তখন জলবৎ তরলং ছিল না। শব্দটার উচ্চারণেই বহু জল ঘোলা হয়ে যেত। প্রেম-যাত্রা এবং যুদ্ধ-যাত্রায় বিশেষ তফাৎ ছিল না তখন। আহত বা নিহত হবার সমূহ সম্ভাবনা নিয়েই ওপথে পা বাড়াতে হত।

স্বভাবতই, স্বভাবে কিছুটা সলাজ সদানন্দও ছিলেন যুগোপযোগী প্রেমিক। যে কোন তরুণী-জড়িত যুগল-চিন্তাটা মনে-মনেই লালনপালন করতেন। কিন্তু মনের দিক দিয়ে বরাবরই কিছুটা কোমল থাকায়, যে কোন তরুণী দেখলেই দুর্বল বোধ করতেন তিনি। কেন যেন মনে হত, আহা! অবলা এই মেয়েটি গোপন প্রেমের অন্তর্দাহে বোধহয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমাব সামান্য একটু ভালবাসা পেলে ওর যন্ত্রণা হয়তো কিছুটা লাঘব হত।

কিন্তু সদানন্দ প্রেমের ক্ষেত্রে উদার হলেও মেয়েটির অভিভাবকরা কতটা ঔদার্যের অধিকারী তা অনুমান করতে না পারায়, তিনি নিজেকে কোন ক্ষেত্রেই প্রকাশিত করতেন না। এমন কি মেয়েটির কাছেও অপ্রকাশিত থেকে যেতেন।

কিন্তু নিভাননীর ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল নিভার জন্যই। একদিন সকালে রোজের নিয়মে বুকডন দিতে দিতে হঠাৎ নজরে পড়ল সদানন্দর, পাশের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে ওঁকে লক্ষ্য করছে একটি অপরিচিত মেয়ে। একটু একটু হাসছেও যেন মেয়েটি।

সংকোচে বাকী ডনগুলো মুলতুবি রেখেই ঘরে চলে এলেন সদানন্দ। কিন্তু বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল মেয়েটির মুখ। এবং, এতক্ষণে সন্দেহ হল, মেয়েটির মুখে যা দেখলেন তা বোধহয় হাসি নয়, অস্ফুট প্রেমের অন্তর্দাহের বেদনা! কিন্তু মেয়েটি কে?

পরিচয় পেতেও দেরী হল না মেয়েটি ব্রজদুলাল বাবুর ভগ্নী। ছেলেবেলা থেকেই বিহারে থাকে। সম্প্রতি এখানে আনানো হয়েছে সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখার জন্য।

বিহারিণী বলেই বোধহয় নিভাননী বাঙালী মেয়েদের মত সর্বাঙ্গে সংকোচ জড়িয়ে বেড়াত না। সপ্তাহ খানেকের ভেতরই ও পাড়া বিহারে বের হল। পাড়ার মেয়ে বৌদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। সামনে পড়লে সদানন্দর সঙ্গেও যে অসংকোচে দু'চারটা কথাবার্তা না বলত, তা নয়।

এবার কাছ থেকে দেখে নিশ্চিত হলেন সদানন্দ, মেয়েটি বাইরে হাসিখুশি হলেও এটাই ওর আসল পরিচয় নয়। এ ওর নিজেকে ভুলিয়ে রাখার অভিনয়। আসলে এই হাসির নিচে লুকিয়ে আছে ওর এক গভীর কান্না। অপূর্ণ, নিঃস্ব হৃদয়ের হাহাকার।

ভাবতেও বুকটা হুহু করে ওঠে সদানন্দর। কিন্তু উপায় কি? এ তো পথের ভিখিরি নয় যে, দেখে করুণা বোধ করলেই নিজেকে উজাড় করে দিয়ে দান করে তৃপ্ত হলাম। দাতা ও গ্রহীতার মাঝখানে এখানে হাজার বাধা, হাজার নিষেধ, গুরুজনদের শ্যেন দৃষ্টি!

নিজের মাকেও সদানন্দ যমের মত ভয় করতেন। নিভাননীকে মাঝে মাঝে বাড়ীর আওতায় পেলেও তাই নিজের সহানুভূতি জানানর সাহস পেতোনা। দু'চারটা যা সামাজিক কথাবার্তা হত, তা মা'র সাক্ষাতেই।

ব্রজদুলাল বাবুর বাড়ীও যে সদানন্দর কাছে নিষিদ্ধ এলাকা ছিল, তা নয়। কিন্তু ব্রজবাবু এখনও নিয়মিত দু'বেলা মুগুর ভাঁজেন, এই প্রত্যক্ষ বাস্তবটিকে কিছুতেই ভুলতে পারতেন না তিনি।

তবু শেষ পর্যন্ত, নিভাননীর অনুচ্চারিত গোপন মনোবেদনা সহ্য করতে না পেরেই বোধহয়, একদিন ওকে নিভৃতে পেয়ে সদানন্দ নিজেকে নিভার কাছে ব্যক্ত করে ফেলেন। নিভাননীর হাত ধরে বলেন, তোমার কাছে আমার একটা গোপন কথা আছে নিভা। না বলতে পারলে মরে যাব আমি।

নিভাননী ও'র কম্পিত মৃত-মুখ দর্শন করেই কিনা কে জানে, এই প্রথম হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে ভুরু কুঁচকে বলল, আপনি দিনভর এমন বয়তার

বলেন, আমার সরম লাগে। কোন আদমি দেখে ফেলবে তো—

কথাটা শেষ না করেই, সদানন্দর মাকে আসতে দেখে সরে যায় নিভা। কিন্তু একটা জটিল শব্দ-জব্দের সামনে ফেলে যায় যেন সদানন্দকে। এই অসমাপ্ত বাক্যে নিভাননী কি বলে গেল? কিসের গোপন ইঙ্গিত রেখে গেল এই রহস্যময়ী নারী?

সারাদিন পাগলের মত অর্থান্বেষণের পর, সন্ধ্যায় শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত বাক্যটির গূঢ়ার্থ প্রাঞ্জল হয় সদানন্দর কাছে। 'দিনভর এমন ব্যাভারে আমার সরম লাগে'—অর্থাৎ, দিনের আলোয় নয়, সদানন্দর সঙ্গে মিলিত হতে চায় ও আঁধার যামিনীতে। 'কোন আদমি দেখে ফেলবে তো—', অর্থাৎ আপত্তিটা আর কিছু নয়, শুধু আর দশ-জনের। সদানন্দকে চায় ও নিঃসঙ্গ এককভাবে।

নিভাননীর দুঃখে কাতর সদানন্দ সেই মুহূর্তে একটি দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে আসেন। আজ রাতেই বিরহিনী নিভাননীর সঙ্গে জীবনের চরম বোঝাপড়াটা করে ফেলতে হবে। বিরহ-কাতর মেয়েটিকে আর ঝুলিয়ে রাখাটা শুধু অন্যায়ই নয়, নিষ্ঠুরতাও।

পঞ্জিকা খুলে দেখলেন, আজ অমাবস্যার রাত। প্রেমাভিসারের আদর্শ তিথি। বৈষ্ণব পদাবলীতেও পড়েছেন সদানন্দ, কি পড়েছেন সঠিক মনে নেই, কিন্তু শ্রীরাধিকাও দুর্যোগের রাতকেই নাকি বেছে নিতেন অভিসারের জন্য

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারলেন না সদানন্দ। কল্পনায় দেখতে পেলেন, নিভাও আলুথালু বেশে, জানালার শিক ধরে আনমনে পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সদানন্দর। সত্যিই, বিচিত্র ঈশ্বরের লীলা। ভালবাসার ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন দেশ-কাল ভেদ নেই। দয়িতের জন্য সবারই সমান আকুলতা!

ঠিক রাত দুটোয় উঠে দাঁড়ালেন সদানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে একবার, না, নিভাননী নয়, ব্রজবাবুর মুগুর-হস্তে ঋজু চেহারাটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সামান্যক্ষণ কি যেন একটু ভাবেন তিনি। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে তাকের ওপর থেকে রুটিকাটা চাকুটা তুলে নেন। না, হত্যা করবেন না কাউকে। চাকু ব্যবহারের নিয়মকানুনও জানেন না। তবু, আত্মরক্ষার জন্য একটু তৈরী থাকা ভাল। সাপ-খোপের সামনেও তো পড়তে পারেন।

বাইরে এসে একবার চারদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করে নেন। কেউ নেই। গোটা পৃথিবীই বুঝি ঘুমাচ্ছে। পকেট থেকে এবার একটা রঙীন রুমাল বের করে নাকের ওপর বাঁধেন। তারপর নিঃশব্দে পথে নেমে আসেন।

নিভাননীদের বাড়ীর গেট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই বুকটা একবার কেঁপে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে স্বেদ,-কম্পন ইত্যাদির কথা পড়েছেন, একি সেই কম্পন, না, ব্রজবাবুর আতঙ্ক, ঠিক বুঝতে পারেন না। রুটি-কাটা চাকুটা শক্ত মুঠে ধরে সামনে পা বাড়ান।

নিভাননী কোন ঘরে শোয় সে সংবাদ নেওয়া ছিল। কিন্তু প্রথমেই সরাসরি সেদিকে না গিয়ে পা টিপে টিপে ব্রজবাবুর ঘরের দিকে যান সদানন্দ। ব্রজবাবু ঘুমুচ্ছেন। আহা ঘুমান! এ বয়সে দুবেলা মুগুর ভাজার ধকল তো কম নয়।

সেখান থেকে সরে এবার পাশের ঘরে উঁকি দিলেন। এ ঘরে ব্রজবাবুর দুই ছেলে ও শ্যালকটি শোয়। শ্যালকটি, প্রায় সদানন্দরই সমবয়সী। এই শালার প্রতি সদানন্দর মনোভাব খুব প্রসন্ন নয়। বিশেষ করে নিভাননী আসার পর থেকে। বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকলে কোন শালা জামাইবাবুর বাড়ী বেড়াতে এসে এতদিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকে?

এঘরেও সবাই ঘুমুচ্ছে। মনে মনে আশ্বস্ত হন সদানন্দ। কিন্তু পরবর্তী এবং অভিষ্ট ঘরটির কথা মনে পড়তেই বুকটা আবার কেঁপে ওঠে। গলা শুকিয়ে আসে।

—কে?

আচমকা একটা চাপা প্রশ্নে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন সদানন্দ। সামান্য দূরে একটি অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি। পরনে কালো প্যান্ট ও গেঞ্জি। সেই আবছা আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটির হাতে একটি খোলা ভোজালী।

সদানন্দর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ব্রজবাবু নয় তো?

সদ্যপ্রকাশিত লোকটি ভোজালীটা বাগিয়ে ধরে আরো দু'পা এগিয়ে আসে। সদানন্দ আতঙ্কে তখন, শুধু নিভাননী নয়, হাতের চাকুটার কথাও ভুলে গেছেন। আসন্ন অবধারিত মৃত্যুর সামনে অসহায়, চেতনাহীন একটা জড় পিণ্ডের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

—ও হরি, সেম সাইড্!

লোকটির চাপা ফ্যাসফেঁসে স্বস্তির স্বর শোনা যায়। হাতের অস্ত্রটা একটু নামিয়ে এবার সদানন্দের দিকে এগিয়ে আসে সে। সদানন্দর একেবারে বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, ভোজালীটা দিয়ে পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলে, কি বাওয়া, তুমি কোত্থেকে?

এবার মুহূর্তে নবাগতের পরিচয় অনুমান করতে পারেন সদানন্দ। দূরত্বটা আর একটু বেশী হ'ল দৌড়ে পালান যেত, বা চীৎকার করে লোক ডাকা যেত। কিন্ত এখন আর কিছু করার নেই। বাধা দিতে গেলে মৃত্যু অবধারিত। মানুষের জীবনের মূল্য এদের কাছে মশামাছির চেয়ে বেশী নয়।

ভোজালীর ডগাটা তখনও সদানন্দর পেট ছুঁয়ে। সদানন্দ হাতড়ে পান না, কি জবাব দেবেন। সত্যি পরিচয়টা দিলে মৃত্যু হয়তো আরো ত্বরান্বিত হবে।

—আরে, বোবা নাকি?—লোকটির স্বরে এবার বিরক্তি।—নাম কি?

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তে এসে গেছেন সদানন্দ। বাঁচতে হলে ওর ভুলটাকেই তোয়াজ করে যেতে হবে। তারপর, সুযোগ বুঝে কোন এক সময় কেটে পড়লেই হবে।

মুহূর্তে একবার বইয়ে-পড়া গুণ্ডা, মস্তানদের নামের তালিকাটা মনে মনে আওড়ে নেন তিনি। তারপর বলে ফেলেন, কাল্লু!

লোকটি মনে মনে একবার স্মৃতির পাতা উল্টে নেয় বোধহয়। তারপর সন্দেহের সঙ্গে বলে, খিল্টুর গ্যাঙ্?

কার গ্যাঙ্ জিজ্ঞেস করলেই আর এক বিপদে পড়তে হত। নামের যোগানটা ওপক্ষ থেকেই আসায় মনে মনে আশ্বস্ত হন সদানন্দ। সতৃপ্ত ঘাড় নেড়ে জানান, হ্যাঁ।

—কবে ছাড়া পেলি?

মনে মনে বলেন সদানন্দ, ছাড়া পেতেই তো চাচ্ছি! কিন্তু মুখে বলেন, দিন দশেক।

লোকটি এবার বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, তা, এ লাইনে যে?

সদানন্দ, সম্প্রতি কাল্লু, জানেন না, আগে কোন লাইনে ছিলেন। তাছাড়া, একটু আগেই তাঁর লাইন ছিল ভিন্ন। নিভাননীর লাইনেই এগোচ্ছিলেন তিনি। নেহাৎ কপালের ফেরে এ-লাইনে, এই বে-লাইনে এসে পড়তে হয়েছে। জবাব দিতে তাই সাবধান হতে হয়। অস্ফুট হেঁ-হেঁ হাসির সঙ্গে শুধু বলেন, এই এলাম!

লোকটি উত্তরে একটা স্বগত চাপা হুঙ্কার দেয়, হুঁ! ওয়াগনে খুব নজর রাখছে শালারা, না?

সদানন্দ এতক্ষণে নিজস্ব লাইনটা খুঁজে পান। নিজের নির্ভেজাল প্রমাণের উৎসাহে বলেন, ওয়াগন-লাইনে খুব ভীড়ও বেড়ে গেছে ওস্তাদ।

ওস্তাদ শুনে, খুশি হবার বদলে, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে লোকটার। চাপা ধমকের সুরে বলে, চুপ যা শালা; আর ওস্তাদ ওস্তাদ করিস না রে। কপাল মন্দা না হলে ভাল্টু পাল এই ছেঁচড়া লাইনে আসে?

এই খেদের সামনে নিশ্চুপ থাকাটা বাগ্মীর কিনা বুঝতে না পেরে, অধিক [illegible] দোষায়, গলায় শ্রদ্ধা ও বিস্ময় মিশিয়ে মন্তব্য করেন সদানন্দ, আমিও তো সে কথাই ভাবছিলাম ওস্তাদ।

যেন ভাল্টু পালের তাবৎ ইতিহাস নখদর্পণের ও'র। শুনে নিজের মনেই সখেদে বিড় বিড় করে ভল্টু, হুকের মাথায় শালা পুলিশ অফিসারটাকে খুন করেই ফেঁসে আছি। ওদিকে যমুনাটার টাকার তাগাদা—।

মনে মনে আবার আঁতকান সদানন্দ। লোকটা খোদ পুলিশ খুনের আসামী! আর তারই সাকরেদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি? হঠাৎ এ অবস্থায় ধরা পড়লে, ফাঁসি না হোক, যাবজ্জীবন তো অবধারিত!

একবার মনে হল, ভন্টুর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে, অকপটে সব স্বীকার করে, মুক্তি প্রার্থনা করলে কেমন হয়? যমুনার টানে যে এতবড় বিপদ অগ্রাহ্য করে পথে নেমেছে, নিভাননীর কথায় কি তার মন গলবে না?

কিন্তু তার আগেই ভন্টুর আশ্বস্ত স্বর ভেসে ওঠে, যাক, তবু তোকে পেলাম বলে! ঝুটমুট গুলতাপ্পি দিয়ে লাভ নেই, এ লাইনে আমার কোন এলেম নেই ভাই। দেখি তোর হাত যশে যদি হয় কিছু। তবে একটা কথা ইয়াদ রাখবি, কোন বেইমানির চেষ্টা করলে কিন্তু স্রেফ্ ফাঁসিয়ে দিয়ে যাব।

ভয়ে আঁতকে ওঠেন সদানন্দ। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, কি যে বল ওস্তাদ?

ভন্টু আদৌ গলে না এ বিনয়ে। বলে, ওসব ছেঁদো কথা রাখ। নেহাৎ ঠেকে পড়েছি বলে, না হলে হারামী ঘিন্টুর গ্যাঙকে বিশ্বাস করি আমি? কখন ফেঁসে যেতি!

মনে মনে এবার অনুতাপ হয় সদানন্দর। শুরুতেই যদি অমন বিনা প্রতিবাদে ঘিন্টুর গ্যাঙে নাম না লিখিয়ে ফেলতেন, তাহলে প্রাণটা অন্তত এমন হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছাত না। কিন্তু এখন আর গ্যাঙ্ পাল্টানর পথ নেই। এখন বাঁচার একমাত্র পথ নিজের আনুগত্য প্রমাণ [illegible] যাওয়া।

এতক্ষণ নিভাননীর ঘরের কোণে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। হঠাৎ নিভাননীর ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতে ভন্টু সদানন্দর কব্জি চেপে ধরে। ফিস ফিস করে বলল, কেটে পড়!

সদানন্দও বোঝেন, এখন কেটে পড়াটাই একমাত্র পথ। তবু কাটার আগে সতৃষ্ণ নয়নে একবার জানলার দিকে তাকান। কে জানে, হয়তো আমার জন্যই ঐ বিরহিণী এতক্ষণ বিনিদ্র প্রহর যাপন করছে। কিন্তু জানতেও পারল না অভাগিনী, তার সদুদা এখন তারই আঙিনায় দাঁড়িয়ে।

নিঃশব্দে ভন্টুর সঙ্গে রাস্তায় এসে ওঠেন সদানন্দ। দূরে, থানার পেটা ঘন্টিতে রাত তিনটে বাজল।

রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে দুপাশের বাড়ীগুলোর ওপর চোখ বোলাতে থাকে ভন্টু। তারপর একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, চ' শালা, এ বাড়ীটা দিয়েই বউনি করা যাক।

বিভ্রান্ত সদানন্দর মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রায়, এ বাড়ী মানে? এতো আমাদের বাড়ী!

কিন্তু সময়মত সামলে নিলেন। এ জল শেষ পর্যন্ত কোথায় কতদূর গড়াবে কে জানে? ভন্টুকে বাড়ীটা চিনিয়ে দেওয়া মানেই নিজের পরিচয়টা প্রকাশ করে ফেলা। নিঃশব্দে তাই ভন্টুর সঙ্গে নিজের বাড়ীর দিকেই পা বাড়ান সদানন্দ। নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান।

ভন্টু সতর্ক করে সদানন্দকে, ভাল করে দেখে নে, কেউ জেগে-টেগে নেই তো?

সদানন্দ মনে মনে বলেন, যার ঘর সে জেগেই আছে, আর তোমার সঙ্গেই আছে ওস্তাদ। কিন্তু ভন্টুকে খুশি করার জন্য জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলেন, না, সব ঠিক আছে।

—যন্তর সব সঙ্গে আছে?

মিন মিন করে বলেন সদানন্দ, ও বাড়ীতে ফেলে এলাম। ভন্টু বিরক্ত হয়ে খিঁচিয়ে করে বলে, তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছিস শালা। নে সর। তৈরী করে দিচ্ছি।

সদানন্দকে কনুইয়ের গোত্তা মেরে জানালার সামনে এগিয়ে যায় ভন্টু। পরবর্তী ব্যাপারটা আঁচ করে মনে মনে চমকান সদানন্দ। একবার মনে হল বলে ফেলেন, আমি দরজা খুলেই বেরিয়েছিলাম, সেই দরজা দিয়েই বরং ঢুকছি। দয়া করে জানলাটা নষ্ট কর না ওস্তাদ। কিন্তু ভয়ে উচ্চারণ করতে পারেন না কথাটা।

নিঃশব্দে ততক্ষণে পকেট থেকে কি সব যন্ত্রপাতি বের করে ফেলেছে যেন ভন্টু। তার একটা জানালার শিকের সঙ্গে লাগিয়ে চাড় দিল এবার। তাতে পরম বাধ্যতায় একটা শিক দুমড়ে বেঁকে একজনের উপযুক্ত একটা প্রবেশ পথ করে দিল।

বুকটা হু হু করে ওঠে সদানন্দর। মাস তিনেকও হয়নি, ধার করে এই জানলার শিকগুলো পাল্টান হয়েছিল।

ভন্টু পেছন ফিরে ইশারা করে এবার, যা, সিঁধিয়ে যা। তোর চেহারাটা ছোটখাট আছে। আমি নজর রাখছি।

ভন্টুর হাতের ভোজালীটা সজাগ হয়ে ওঠে। অগত্যা অনুগত ভঙ্গীতে জানলার দিকে এগিয়ে যায় সদানন্দ। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, কথাটা শোনা ছিল, এ যেন তারই এক মর্মান্তিক বিকৃতি!

অনভ্যস্ত সদানন্দ শিকের প্রবেশপথে গৃহ-প্রবেশে বার-কয়েক ঠোক্কর খান। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে আর কোন অসুবিধে বোধ করেন না। নিজের ঘর বলেই এ ঘরের সব কিছু মুখস্ত।

কিছুক্ষণ বাদে সেই শিক-পথেই আবার বেরিয়ে আসেন সদানন্দ। হাতে ঘড়ি, পেন, ফুলদানি ইত্যাদি। জিনিসগুলো মহামূল্য না হলেও, এই প্রথম বউনিতে বেশ খুশিই হয় ভন্টু। সদানন্দর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে জিনিসগুলো একটা থলিতে ভরে ফেলে। তারপর ফিসফিস করে বলে চ' কিছুটা গ্যাপ দিয়ে অন্য বাড়ী ধরি।

পথ নিঝুম। অটুট অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখেই বোধহয় শরৎচন্দ্র অন্ধকারের রূপ লিখেছিলেন। ভন্টুর সঙ্গে এগিয়ে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সদানন্দর। নিভাননীও হয়তো এখন জানলায় বসে এভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহরগুলো। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কি অনুমান করতে পারছে সেই বিরহিণী, তার সদুদা এখন কোথায়, কিসের বন্ধনে আবদ্ধ?

—ঘিন্টুর সেই মেয়েছেলেটা এখন কোথায় রে?

ভন্টুর প্রশ্নে আবার সম্বিৎ ফিরে পান সদানন্দ। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কোন মেয়েটা?

ভন্টু খেঁকিয়ে ওঠে, ন্যাকামি হচ্ছে শালা? আমরা কিছু জানি না?

সদানন্দর এবার জ্ঞানোদয় হয়। অন্য গ্যাঙের ভন্টু পর্যন্ত যে মেয়ের সংবাদ জানে, একই গ্যাঙের লোক সদানন্দর পক্ষে সেটা না জানাটা সন্দেহজনক ব্যাপারই বটে। তাই, হঠাৎ মনে পড়ার ভানে বলেন ও, সেই মেয়েটা? এখনও বেপাত্তা!

সংবাদটায় খুশি হয় ভন্টু। বলে, আগেই জানতাম! ও-সব চিড়িয়া কি অত সহজে পোষ মানে?

তারপর, একটু স্বর নামিয়ে রসালো সুরে জিজ্ঞেস করে, তা, তোরাও একটু ভাগ-টাগ পেয়েছিলি তো?

অন্ধকারেই লজ্জায় জিভ কাটেন সদানন্দ, যাঃ, কিযে বল?

ভন্টুর স্বর আবার খুশু হয়ে ওঠে, খুব যে রোয়াব রে! বলি তুইও একবার ফেঁসেছিলি না একটা মেয়ের জন্য? জানিনা শালা?

সদানন্দর আর প্রতিবাদের পথ থাকে না। সদানন্দ, ওরফে কালুর সব সংবাদই যে ভন্টুর নখদর্পণে, তা অনুমান করতে পারেন। সলজ্জ হেসে বলেন তাই, হেঁ হেঁ, ঐ একবারই।

একটা বাড়ীর ওপর চোখ রেখে হঠাৎ থেমে পড়ে ভন্টু। চাপা গলায় বলে, জানলাটা রাস্তার ওপরই দেখছি। বেশ ভাল পজিসনে। চল তো!

কিন্তু লজ্জায় সদানন্দর পা পড়ে না। জীবন মাস্টারের বাড়ী এটা। সদানন্দর যেটুকু পড়াশুনো এঁর দৌলতেই। নিজের বাড়ী চুরি করা এক কথা, কিন্তু গুরু-গৃহে—?

—কি রে, দাঁড়িয়ে গেলি যে?—সন্দেহের চোখে তাকায় ভন্টু।

আমতা আমতা করে বলেন সদানন্দ, না, মানে, জীবন-মাস্টারের খুব হাল্কা ঘুম কিনা, তাই—

একই সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে ভল্টু, কি করে জানলি?

নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন সদানন্দ, এর আগের রাতে টের পেয়েছিলাম।

এবার আশ্বস্ত হয় ভল্টু। বলে, সে দেখা যাবেখন। তুই চল তো?

অগত্যা এগোতে হয় সদানন্দর। যন্তর পর্যন্ত ফেলে এসেছেন বলে এবারও ভল্টুই শিক বাঁকিয়ে দেয়। সদানন্দ সেই প্রবেশ-পথে গুরুগৃহে প্রবেশ করেন।

খাটের ওপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন জীবন-মাস্টার। সদানন্দ সামান্যক্ষণ তাকিয়ে থাকেন গুরুর ঋষিসুলভ মুখের দিকে। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে পায়ের কাছে খাটটা স্পর্শ করে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, গুরুদেব, এই ক্ষণ অধঃপতিত শিষ্যের অপরাধ মার্জনা কর। পরদ্রব্য না বলিয়া লওয়া পাপ এই আদর্শ-শিক্ষা তোমার কাছেই লাভ করা সত্ত্বেও, তোমার কিছু দ্রব্য আজ আমার প্রাণের দায়েই 'না বলিয়া' নিতে হচ্ছে।

প্রণাম সেরে সবে এসে অন্ধকারে ঘর হাতড়াতে শুরু করেন সদানন্দ এবং কিছুক্ষণের ভেতরই ঘরের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করে, সেই একই পথে আবার বেরিয়ে আসেন।

এবারও জিনিসপত্র দেখে বেশ খুশি হয়

ভল্টু। হেসে বলে, নাঃ তোর হাত-যশ আছে দেখছি। হাত বেশ পাকিয়ে ফেলেছিস!

ভল্টুর এই তারিফে নয়, ওর ভোজালীর ভয়েই, এরপর সারা রাত ধরে, বাড়ীর পর বাড়ী, নিজের হাত-যশ দেখিয়ে বেড়াতে হয় সদানন্দর। ক্রমশঃই ভারী হতে থাকে ভল্টুর হাতের ব্যাগটা। আর, সদানন্দের বিবেক-দংশন। পাড়ায় আশৈশব নিরীহ ভালছেলে বলে সুনাম থাকাতে গ্লানিটা আরো বেশী বোধ করেন।

রাত চারটে নাগাদ ভল্টুর ব্যাগটা ভরে গেল। ঘড়ি পেন, রেডিও, মানিব্যাগ, ছোট-খাট কিছু গয়নাগাটিতে ব্যাগ একেবারে টাইটম্বুর।

তাছাড়া আকাশও পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভল্টু পরামর্শ দিল তাই, আজের মত থাক শালা; ঢের হয়েছে। চ' ফিরি।

ফিরতে ফিরতে জিজ্ঞেস করল একসময় ভল্টু, তুই থাকিস কোথায়?

সদানন্দ তখন নিজের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বলতে হল, সেই বেগমবাগান বস্তীতে।

ভল্টু ভুরু কুঁচকায়। বেগবাগান বস্তী? তা, কামাল সর্দারের গ্যাঙে না গিয়ে ঘিন্টুর ওখানে ভিড়লি কি করে?

এটা একটা সন্দেহের ব্যাপারই বটে। সদানন্দ দাঁত চেপে বলেন, ও শালার সঙ্গে বনল না, তাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সরাসরি প্রস্তাব করে বসে এবার ভল্টু, তা, চলে আয় না আমার গ্যাঙে?

এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি থাকতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজী হয়ে হয়ে যান সদানন্দ। বলেন তুমি নিলে আর আপত্তি কি ওস্তাদ?

ভল্টু এবার একটু বাজিয়ে নিতে চায় বোধহয় নতুন সাকরেদকে।—মেয়াদ কদ্দিন খেটেছিস?

তখন আর হিসেব করার সময় নেই। ঝটপট বলে দেন সদানন্দ বছর পাঁচেক।

—সাফ করেছিস ক'টা?

সাফ! সাফ কি রে বাবা? সদানন্দ একটু আটকে যান। তারপর আন্দাজেই ঢিল ছোড়েন, গোটা তিনেক।

ও'র পিঠ চাপড়ে তারিফ করে ভল্টু, সাবাস! তা, মেয়েবাজীর ঝোঁক-টোক আছে নাকি?

জীবনে এই একটি মেয়ের উদ্দেশ্যেই আজ কিছুটা ঝোঁক নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন সদানন্দ। কিন্তু ঠেলার নাম বাবাজী। সে ঝোঁক অনেক আগেই উবে গেছে। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ, বা না, কোনটায় খুশি হবে ওস্তাদ কে জানে? অথচ আজ রাতের অভিযান কোনক্রমে কপালগুণে শেষ করে এনেছেন। তাই, সাবধানে মধ্যপন্থী হন। বলেন, সে রকম কিছু না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভল্টু বলে, ঠিক আছে কাল আমার আস্তানায় চলে আয়। আলাপ করে দেখি।

কাল? তবু ভাগ্যি আজই সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়নি? আনন্দে ভল্টুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় সদানন্দর।

নিভাননীদের বাড়ীর সামনে এসে কি ভেবে যেন থামে ভল্টু। বলে, এটা দিয়েই বউনি করার চেষ্টা করেছিলাম, চল, এটা দিয়েই আজের মত খতম করি।

মনে মনে চমকান সদানন্দ। নিভার ঘরে? শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে নিভার ঘরে চুরি করতে হবে?

অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেকে বোঝান তিনি, কি আর করা যাবে? ভাগ্যের ফেরে কিনা করতে হয় মানুষের? ঠেকে পড়ে নিজের বাড়ীও তো চুরি করলাম।

ততক্ষণে নিভার ঘরের শিকে ভল্টুর কারুকার্য শুরু হয়েছে। অসহায় মুখে পেছনে গিয়ে দাঁড়ান সদানন্দ। মনে মনে অন্তর্দাহে ছিন্নভিন্ন হতে থাকেন। মনে মনে নিভার উদ্দেশ্যে বলেন, নিভু, আজ রাতে এ-ঘরই আমার অভিষ্ট ছিল। আজ এই ঘরেই ছিল আমার জীবনের প্রথম অভিসার। সেই ঘরেই এলাম শেষ পর্যন্ত। একটু বাদেই ঘরের ভেতর, তোমার স্পর্শের সীমায় পৌছাব। কিন্তু আমার এ আসা সে-আসা নয়। তুমি আমাকে ক্ষমা কর প্রিয়া!

—লে শালা, ঢোক।

ভল্টুর সাদর আহ্বানে জানলার সামনে এগিয়ে যান সদানন্দ। তারপর নিভুর কাছে আর একবার ক্ষমা প্রার্থনা করে, শিকের ফোঁকর দিয়ে নিজেকে ভেতরে গলিয়ে দেন।

বাঁকান শিকটায় পিঠের ছাল চলে যায় কিছুটা। কিন্তু ভয়ে ফিরতে পারেন না। বউনির ঘর থেকে বিফল হয়ে ফেরাটা এ-লাইনে অমঙ্গলসূচক কিনা, কে জানে? যদি তাই হয়, তাহলে বেরিয়ে এলেও ভল্টুর হাতে আরো কিছু ছাল চলে যাবে। কি দরকার তীরে এসে তরী ডোবানর।

পিঠে এবং অন্তরে তীব্র জ্বালা নিয়েই মেঝেতে আস্তে একটা পা নামাল সদানন্দ। তবু সান্ত্বনা, দু-হাত দূরেই তাঁর নিভু শুয়ে আছে। সারা রাত ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর হয়তো সবে ঘুমিয়েছে মেয়েটা। জেগে থাকলে জুলিয়েটের মত নিজেই হয়তো, প্রয়োজনে নিজের হাতে শিক বাঁকিয়ে, বিহারিণীতো, কর্বাজিতে সে জোর আছে নিশ্চয়ই, তাঁর রোমিও সদুদাকে এ ঘরে বরণ করে আনত নিভু।

—কে?

একটা চাপা প্রশ্নে চমকে সামনের দিকে তাকান সদানন্দ। আবছা একটা পুরুষমূর্তি নিভার ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে। সেই শালা না? ব্রজবাবুর শালা? কিন্তু নিভাননী দরজা না খুলে দিলে ও শালা এ ঘরে এল কি করে? মুহূর্তে হাজার প্রশ্ন খেলে যায় সদানন্দর মনে।

কিন্তু তখন আর এর সদুত্তর সন্ধানের সময় নেই। চোখের পলকে শিকের প্রবেশ-পথেই বাইরে প্রস্থান করেন সদানন্দ।

কিন্তু ওস্তাদ কোথায়? চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা ছায়া-মূর্তি। হাতে একটা ভারী ব্যাগ। ভল্টু-ওস্তাদ ওস্তাদ লোক। যঃ পলায়তি-পন্থা অনুসরণ করে সে তখন অপসারিত।

সদানন্দও মুহূর্তে সেই মহাজ্ঞানী মহাজনের পথ অবলম্বন করেন। পেছনের চোর-চোর আর্তনাদ পিছে রেখে নিমেষে অন্ধকারে অবলুপ্ত হন।

অনেক ঘুর-পথে অবশেষে যখন নিজের ঘরে এসে পৌঁছালেন সদানন্দ, তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু তার চেয়েও বড় যন্ত্রণা হৃদয়ে। এই তবে নারীর পরিচয়? এত বিশ্বাসঘাতিনী এই স্ত্রী জাতি? যার জন্য দাগী চোরের মত তিনি বাড়ী বাড়ী চুরি করে বেড়ালেন, সেই কিনা নিজহাতে খিল খুলে অন্য পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দিল? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সদানন্দর। এবং এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কেন নারীকে নরকের দ্বার বলে গেছেন।

পরদিন বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠেই সদানন্দ বৌদিকে বিয়ের মত দিয়েছিলেন। বৌদিদের মেয়ে দেখতে বলেছিলেন।

বোধহয়, অবিবাহিত থেকে, দ্বিতীয় কোন প্রেমাভিসারের প্রলোভনে পড়তে আর রাজী ছিলেন না বলেই সদানন্দর সেই সম্মতিদান।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

এ মাসের সবচেয়ে বড় খবর হল শিল্পমেলার দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন। গতবারের মত মার্কেট স্কোয়ারেই মেলা বসে। ৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার মেলার উদ্বোধন হল। মাঠের চারদিক ঘিরে ছবি আর মূর্তি সাজানো। কলকাতার ছোটবড় অনেক শিল্পীর অনেক রকমের কাজে ভর্তি। এক নজরে কলকাতায় কত রকমের শিল্পশৈলীর চর্চা হচ্ছে তার হদিস মেলে। যার যেমন পছন্দ সেইরকম ছবিই পাওয়া যায় এখানে। ভাল মন্দ মাঝারি সব রকম রুচির শিল্পকর্মের নিদর্শন চারদিকে ছড়িয়ে। তারই মধ্যে শিল্পীরা বসে গিয়েছেন ১৫ মিনিট কি আধঘণ্টার মধ্যে পেন্সিল বা তুলিতে প্রতিকৃতি আঁকতে। ছবিপিছু পাঁচ টাকা। ছবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে শিল্পীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। একমাত্র কলকাতার শিল্পীদেরই দেখলাম ছবিকে সকসের ঘরে পৌঁছে দেবার এই মহৎ প্রচেষ্টা—ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় এ ধরনের মেলা হয় বলে জানি না। ছবির দামও অসম্ভব সস্তা। যে কোন নামকরা গ্রাফিক শিল্পীর প্রিন্ট ১৫৲ টাকা। তেল রঙের ছবি হয়ত ১০০।১৫০৲ টাকা যা গ্যালারিতে কিনতে গেলে ৫ থেকে ১০ গুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়। এরই মাঝে মাঝে চলতে থাকে মাইকে ঘোষণা—আরো ছবি কিনুন, ছবির সঙ্গে বাস করুন। শুরু হয় স্বাক্ষর সংগ্রহ—মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারি চাই। কর্পোরেশনের কলেজ স্ট্রীটের মিউজিয়ামটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারি করবার জন্যে শিল্পীরা আবেদন জানাচ্ছেন। বাস্তবিক কলকাতার মত শহরে সমকালীন শিল্পীদের ছবি দেখানোর জন্যে একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারির বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে একটি শিল্প বিষয়ে লাইব্রেরীর। পৌর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুটা নাকি সহানুভূতিশীল। যদি তাঁরা উদ্যোক্তা হয়ে একটা ব্যবস্থা করেন তবে একটি ভাল গ্যালারিই তৈরী করা সম্ভব যেখানে সমস্ত শিল্পী মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং জনসাধারণ শিল্পরসের স্বাদ সহজে পাবেন। বছরে একবার মেলায় এই শিল্পীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ অবশ্য হয় কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। একটি গ্যালারি এবং সেই সঙ্গে শিল্পবিষয়ক একটি পত্রিকার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। [illegible] থেকে যদি এর কোন সুবন্দোবস্ত হয় তাহলে শিল্পানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হবেন। শিল্পমেলা ২২ তারিখ পর্যন্ত চলার কথা তবে যদি প্রয়োজন হয় ত অধিক দিন চলার সম্ভাবনাও রয়েছে।

গত ২ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংগ্রহশালায় বাঙলার ভাস্কর্যের একটি সুন্দর প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর সময় বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা দুটো পর্যন্ত মাত্র। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে তাঁদের সময়ে দেশের শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শন চোখের সামনে দেখবার এত সুযোগসুবিধা ছিল না। এই সংগ্রহশালা সেদিক দিয়ে যে অভাব পূরণ করেছে আশা করা যায় সকলে তার সুযোগ নেবেন।

বর্তমান প্রদর্শনীর ৩৬টি শিল্পবস্তুর মধ্যে অতি প্রাচীন যুগের দুটি ক্ষুদ্র মাটির শীলমোহর (হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত) সূক্ষ্ম মৃৎশিল্পের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত বৃহৎ ককুদযুক্ত একটি বৃষমূর্তি এবং চন্দ্রকেতুগড়ের সূর্যমূর্তির খেলনা বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্পের উৎকর্ষতার নিদর্শন। পঞ্চম শতাব্দীর একটি বৃহৎ মাটির মুখমণ্ডল (পান্না, মেদিনীপুর) তার বিচিত্র গ্লেজ ও গঠনের দিক থেকে লক্ষ্যণীয় মূর্তি। পশ্চিম দিনাজপুরের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত রমণীমুখটি গঠনভঙ্গিমায় অনুপম। ২৪ পরগণায় প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তরের চক্রের মধ্যে নৃত্যরত বিষ্ণুমূর্তিটি আরেকটি বিশিষ্ট সংগ্রহ। সাগরদীঘির ধাতুমূর্তি ও লোকেশ্বর শিবমূর্তি প্রাচীন শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। আধুনিক যুগের বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মৃৎশিল্প কিভাবে প্রাচীন শিল্পধারাকে অনুসরণ করে চলছে তার নিদর্শনও এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীর আলোক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। মিউজিয়ামটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলেও এর প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শোনা যায় নীচের তলায় প্রস্তরমূর্তির সংগ্রহটি স্থানাভাবে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। যে মিউজিয়াম সংরক্ষণ বিদ্যার ক্লাস এখানে নেওয়া হয় তারও নাকি স্থানাভাব।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পশ্চিম জার্মানীর শিল্পী মার্গারেট হেকলিথারের অনেকগুলি ছোট পেন্টিং ড্রইং এবং স্কেচের প্রদর্শনী ২০ থেকে ২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্যাস্টেল, গুয়াশ, ওয়াশ লিথোগ্রাফি ইত্যাদির মাধ্যমে অনেকগুলি স্টিল লাইফ, শিশুমূর্তি, ফুলের স্টাডি, বাংলা অক্ষরের সাহায্যে কম্পোজিশন ও ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে নিসর্গ-দৃশ্য তিনি রচনা করেছেন। শিল্পী যদিও পূর্ণ পরিণত স্টাইলে এখনো পৌঁছন নি তবু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সারা প্রদর্শনীতে একটা আনন্দের পরিবেশ আছে সেটা কম নয়। লিথোগ্রাফিতে করা আত্ম-প্রতিকৃতিটি একটি বলিষ্ঠ কাজ।

শানু লাহিড়ী দীর্ঘকাল পরে আকাদমি অব ফাইন আর্টসে ২৩ খানি চিত্রের প্রদর্শনী করেন (৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর)। শ্রীমতী লাহিড়ীর বর্তমান প্রদর্শনীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একটিমাত্র বিষয়বস্তু অবলম্বন করে তিনি ছবিগুলি তৈরী করেছেন। রামায়ণের একটি কাহিনী তার ভিত্তি সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যার রমণীরা রাবণের রূপ কিরকম তাই জানতে চাওয়ায় সীতা বলেন রাবণকে তিনি দেখেননি, জলে তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র দেখেছেন। সেইরূপ তিনি মেঝেয় আঁকতে চেষ্টা করেন, শেষে ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এই বিষয়ের ওপরেই শ্রীমতী লাহিড়ীর ছবিগুলি। রাবণ সীতার রূপের ভেরিয়েশন। দুটি ফিগার নিয়ে রঙ ও কম্পোজিশনের বিভিন্ন রকমের খেলায় কখনো কখনো তিনি ফ্যান্টাসীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছেন। চিত্ররীতিতে অনেকখানি নীরদ মজুমদারের কাজের ছাপ থাকা সত্ত্বেও কম্পোজিশনের অনেকখানি বাহাদুরী তাঁর নিজের প্রাপ্য। যে কয়টি কাজ রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেগুলির মধ্যে কতকটা গানের আলাপের ভাবটাই পরিস্ফুট হয়েছে। আরো দেখা গেল যে বর্তমানে সংযত বর্ণের প্রয়োগ এবং কাছাকাছি টোনের কাজেই শিল্পীর দক্ষতা অনেকখানি বেশী।

১৪ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ছাত্রদের আঁকা একটি স্কেচএর প্রদর্শনী হয়ে গেল। চল্লিশখানির ওপর স্কেচে জল ও তেল-রংএর ছবি এবং কালি-কলমে সাদা-কালোর আঁকা অনেকগুলি স্বচ্ছন্দ কাজ দেখা গেল। সিটি স্কেপ ও ল্যান্ডস্কেপই প্রধান। [illegible] দাশগুপ্ত, অনুপ মুখার্জি, কিরণপতি মাইতি, মলয় ভট্টাচার্য প্রমুখ [illegible] উল্লেখযোগ্য।

অঙ্গনা

মিস অ্যানে ফ্রেঞ্চ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শমিতা মুখোপাধ্যায় (২য়), শ্রাবণী চৌধুরী (প্রথম) এবং রত্না চক্রবর্তী (৩য়)। ফটো : অমৃত

তরুণী সুন্দরী

এক্সপো '৭০ সারা জাপানকে মাতিয়ে রেখেছে। এজন্য তোড়জোড়ের অন্ত নেই। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই এতে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু যৌবনের বন্দনা গান ছাড়া কোন কিছুই পূর্ণতা পায় না। তাই সব কিছুর সঙ্গে যৌবনমুখর যুবক-যুবতীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল। যুব উৎসবের আয়োজন যখন করাই হলো তখন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা থাকলেই বা মন্দ কি! একথা ভেবেই জাপানের বিউটি কংগ্রেস আয়োজন করেছে 'মিস ইয়ং ইণ্টারন্যাশনাল' প্রতিযোগিতার। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার এই আসরে ৫০টি দেশের তন্বীরা উপস্থিত হবেন সৌন্দর্যবতী সকল তরুণীর প্রতিনিধিরূপে।

এই আমন্ত্রণ এসে পৌঁছে গেছে আমাদের দেশের তরুণীদেরও কাছে। উদ্যোগ নিয়েছে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ইভস উইকলী' এবং প্রসাধনী উৎপাদক সংস্থা 'অ্যানে ফ্রেঞ্চ'। পাঁচটি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুন্দরী নির্বাচন সমাপ্ত করে 'মিস ইয়ং ইন্ডিয়া' নির্বাচিত হবে বোম্বাইয়ে। এই লেখা যখন আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে ততদিনে এই নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। 'মিস ইয়ং ইণ্ডিয়া' অপেক্ষা করবেন মূল প্রতিযোগিতার জন্য।

আঞ্চলিক সিরিজের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয় কলকাতায়। ৫০ জন নাম দেন। যোগদান করে ৪৫ জন। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাছাই শুরু হয়। ৩২ জনই বাদ পড়ে যান। ভাগ্যবতী ১৩ জন অপেক্ষা করেন শেষ রায়ের। দুরুদুরু বুকে সবাই একবার একান্ত সঙ্গোপনে পর পর ভেবে যান মিস অ্যানে ফ্রেঞ্চ, মিস ইয়ং ইণ্ডিয়া, মিস ইয়ং ইণ্টারন্যাশনাল। চোখ বন্ধ করে যা ভাবেন, চোখ খুললেই তা অন্যরকম। এমনি আশা-আশংকার দোলায় দুলতে দুলতে ১৩টি তরুণী হাজির হলো সমবেত সম্মানিত দর্শক এবং বিচারকদের সামনে।

প্রতিযোগিতা চলে দুটি পর্যায়ে। প্রথমবারের পর যাঁরা টিঁকে থাকেন তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়। তারপর আসরে মাত্র তিনজন। দর্শকরা প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে পড়লেন। প্রয়োজনীয় তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, বিজয়ীর মালা কার গলায় দোলে। বিরাট হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষিত হলো: সর্বসম্মত রায়ে 'মিস অ্যানে ফ্রেঞ্চ-ক্যালকাটা' নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী শ্রাবণী চৌধুরী। প্রথম এবং দ্বিতীয় রানার্স-আপ হলেন শমিতা মুখার্জী এবং রত্না চক্রবর্তী। দর্শক ঠাসা হলে তখনও বোম্বাইয়ের বিট সঙ্গীতশিল্পী সাজিদ খান ও তার স্যাভেজেস দলের 'ইস্ট গো ওয়েস্ট' গানের রেশ আর 'গো গো গার্লস' এর নাচের আমেজ।

আঠার বছরের তন্বী গৌরী শ্রাবণী অনেকখানি বিস্ময়। প্রসাধনের পলেস্তারা লাগানো সুন্দরীদের মধ্যে সে নিদারুণ ব্যতিক্রম। নিজের সৌন্দর্যেই সে বাজিমাৎ করেছে। ভ্রু-তে সামান্য কাজলের প্রলেপ ছাড়া প্রসাধনের কোনরকম আশ্রয় সে নেয়নি। শ্রীশিক্ষায়তনের ছাত্রী শ্রাবণী বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী। সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসে। ইতিপূর্বে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সে যোগদান করেনি। আমার প্রশ্নে সলজ্জ হেসে শ্রাবণী জানালো, প্রথমবারেই এতটা সাফল্য ভাবতে পারিনি। কথা বলতে বলতে আনন্দ ওর চোখ-মুখে উপচে পড়ছিল।

প্রথম রানার্স-আপ শমিতা ইতিপূর্বে অন্য একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সাফল্যের শীর্ষস্থানে ছিল। সে এবার প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। আর দ্বিতীয় রানার্স-আপ রত্না দ্বিতীয় বর্ষের বাণিজ্য শাখার পড়ুয়া।

তিন বিজয়ীই নগদ পুরস্কার পেলেন। মিস অ্যানে ফ্রেঞ্চ ক্যালকাটার ভাগ্যে অবশ্য আরো নানা পুরস্কার ছিল। রানার্স-আপরাও বাদ গেলেন না। এবার শ্রাবণী এবং শমিতা যাবে বোম্বাইয়ে। মিস ইয়ং ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সেখান থেকে এক্সপো'৭০। মিস ইয়ং ইণ্ডিয়া সেখানে বিনা খরচে ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবেন। সেই সঙ্গে প্রচুর পুরস্কার তো আছেই। এছাড়াও তিনি ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আট দিন থাকার সুযোগ পাবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নিরিখ কি? উত্তর এসেছিল, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ভারতীয় হতে হবে আর সেই সঙ্গে যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় তন্বী। —প্রমীলা

বেতার শ্রুতি

"The most important department, the most difficult to manage successfully, and the most difficult to describe simply is the Talks Department, which has to deal with immense variety of subjects in a variety of ways".

লর্ড সাইমন তাঁর 'দি বি-বি-সি ফ্রম উইদিন' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন, তাঁর এই মন্তব্য অনেক দিক দিয়ে আমাদের আকাশবাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রেডিওর 'টক' হচ্ছে ক্ষুদ্র ভাষণ। তাই বলে মাঠে-ময়দানের কিংবা লেকচার হলের ভাষণের মতো নয়। এই ভাষণ অনেকটা কথা বলার মতো। তাই একে কথনও বলা যেতে পারে। কিন্তু তা বলা হয় না। বলা হয় কথিকা।

বোবা না হলে সকলেই কথা বলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই বলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকের মধ্যে কথা আসে, এবং প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই কথা বলেন। সেটা শক্ত কিছু নয়, এবং আমরা যে বেঁচে আছি তার একটা কারণ এই কথা বলা। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে বললে তখনই বিপদ ঘটে। তখনই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ, তখন কোনো বিষয় সম্বন্ধে নয়, কোনো বিষয়ের উপর বলতে হয়। মানে, তখন যেভাবে যা মনে এল, যা-তা ভাবে বলা নয়, গুছিয়ে-গাছিয়ে সুন্দর করে সুষ্ঠুভাবে বলা। সেটা সহজ নয়।

রেডিও স্ক্রিপ্টের আসল জিনিস হল অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জন, সংক্ষিপ্ততা ও যথাযথতা। এখানে যতক্ষণ খুশি, যা খুশি, যেমন খুশি বলা যায় না। সময়ের বাইরে যাবার উপায় নেই এখানে। একজন 'টকার' বা কথককে যে সময় বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তার মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়। আর সেই বরাদ্দ সময় সাধারণত দশ মিনিট, ক্ষেত্রবিশেষে পনের মিনিট—আবার কথনও কথনও পাঁচ মিনিটও হয়। এবং তিনি যা বলতে চান, তার সবই তাঁকে এই সময়ের মধ্যেই বলতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলো-পাথাড়ি বলার সুযোগ নেই। তাঁকে একেবারে সরাসরি তাঁর বিষয়ে যেতে হবে; স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, মনোহর ভঙ্গিতে বিষয়টির অর্থ প্রকাশ করে শ্রোতাদের মন টানতে হবে।

রেডিও কথিকার স্ক্রিপ্ট লেখার সময় ভাষার প্রতি প্রখর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আজকের যুগের রসপণ্ডিতেরা আর সাধারণ লোকেরা সমানভাবে অতি অলংকৃত ভারী শব্দবহুল ও অকারণ সজ্জিত ভাষা পছন্দ করেন না, তাছাড়া ভালো রেডিও কথিকার পথে এসব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদপত্রের আর সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ আর রেডিওর কথিকার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। এ দুয়ের রূপ, রস, প্রকাশভঙ্গি সবকিছুই আলাদা। রেডিওর কথিকা কথক নিজেই পড়েন এবং শত সহস্র লোক তা শোনেন। ঊর্ধ্বলোকে বিচরণশীল ভাষা, দীর্ঘ বাক্য ও দুর্বোধ্য শব্দ এই শোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এবং কোনো শ্রোতাই রেডিওয় কষ্ট করে কিছু শুনতে চান না। প্রথমেই যদি তিনি আকৃষ্ট না হন এবং বিষয়টি যদি তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর না হতে থাকে তাহলে তিনি রেডিও বন্ধ করে দেন। সুতরাং ভালো 'টকার' হতে হলে সহজ ভাষা ও সহজ প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করা দরকার।

শুধু তা-ই নয়। স্ক্রিপ্টটা লেখার পর লেখককেই তা পড়তে হয়, আর সেইখানেই অসুবিধা। ভালো লেখক হলেই ভালো কথক হওয়া যায় না। খুব ভালো লেখককেও খুব খারাপ কথক হতে দেখা গেছে। রেডিও সকলের জন্য নয়, রেডিওয় সাফল্য লাভ করার জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারেঃ 'কী হলে ভালো রেডিও টকার হওয়া যায়?' —এর সহজ উত্তর হয় না, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না সুনির্দিষ্টভাবেও কিছু বলা চলে না। কারণ, যে কন্ঠস্বর একজনের কাছে ভালো শোনায়, আর একজনের কাছে তা খারাপ শোনাতে পারে, এমন কি আকর্ষণশূন্যও! অনেকে গভীর ব্যঞ্জনাময় কন্ঠস্বর পছন্দ করেন; আবার অনেকে হালকা, নরম কন্ঠ-স্বর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলকাতা কেন্দ্রের একজন সংবাদ পাঠকের কন্ঠস্বরের অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, আবার অনেকে অভিযোগ করেন, তাঁর কন্ঠস্বরের জন্যই তাঁর পড়া সংবাদ শুনতে ইচ্ছে করে না। সুতরাং ভালো টকার আর খারাপ টকারের কোনো 'ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড' থাকা শক্ত। কিন্তু তাই বলে হতাশার কারণ নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ভালো টকারের সম্বন্ধে দ্বিমত আছে, কিন্তু খারাপ টকারের সম্বন্ধে অপরিবর্তনীয়-ভাবে সকলে একমত।

জনসাধারণ্যে বলা আর রেডিওয় বলা এক নয়। দুটো ভিন্ন জিনিস। একটি রেডিও কথিকার লক্ষ লক্ষ শ্রোতা থাকতে পারেন, কিন্তু কথককে ভুললে চলবে না যে, এই লক্ষ লক্ষ শ্রোতা হাজার হাজার ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত এবং কোনো কোনো ভাগে একজন মাত্র শ্রোতাও থাকতে পারেন। সুতরাং রেডিওয় প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাদের উদ্দেশে কিছু বলা যায় না, বলতে হয় নিজেরই উদ্দেশে। অর্থাৎ রেডিওয় কথা বলা মানে আসলে নিজেরই কাছে বলা। একজন ভালো রেডিও টকার এমনভাবে বলেন যেন চায়ের টেবিলে বলছেন। তিনি মাঠে-ময়দানের বক্তাকে কিংবা ক্লাসঘরের অধ্যাপককে নকল করেন না।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৩০ জানুয়ারী রাত ৮টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত নাটক 'অপরিচিত',—মূল হিন্দী 'উসকা আজনবী'র বাংলা অনুবাদ। মূল হিন্দী রচনা 'মুদ্রারাক্ষস', বাংলা অনুবাদ শ্রীমতী রমা মৈত্র।

অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে সাধারণত যে-সব নাটক প্রচারিত হয়ে থাকে তার থেকে অনেক আলাদা এই নাটকটি। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের অধিকাংশ নাটকই নাটকপদবাচ্য ও শ্রাব্য নয়, কিন্তু এই নাটকটি সেদিক দিয়ে একটা ব্যতিক্রম।

উল্লেখযোগ্য এর বিষয়বস্তু। দিনটিও লক্ষণীয়—৩০ জানুয়ারী, মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস। অর্থাৎ একটি যুগের মৃত্যু। এই রকম এক মৃত্যুদিনেই জন্ম গ্রহণ [illegible] এই নাটকের নায়ক। সে গান্ধীজীকে [illegible] না, জানে না গান্ধীদর্শন [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে

বড়ো হয়ে উঠতে লাগল যেখানে গান্ধীজীকে নিন্দা করার প্রচেষ্টাই উদগ্র। এর ফলে সে হয়ে উঠল এমন একটা মানুষ, কোনো কিছুর উপর যার শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই। সবকিছুকে সে ভেঙে তছনছ করে যেন পৃথিবীর উপর একটা প্রচন্ড প্রতিশোধ নিতে চায়। সে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে হকি স্টিক দিয়ে আঘাত করে, সহপাঠী বন্ধুকে হত্যা করে, নারীর ভালোবাসাকে করে উপেক্ষা। কিন্তু কেন তার এই বিতৃষ্ণা, ক্রোধ, ব্যর্থতা, বেদনা তা সে নিজেই জানে না। এই উদ্দেশ্যহীন উগ্র মানসিকতাবোধ আর শূন্যতাবোধই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

'মুদ্রারাক্ষস'— বহুপরিচিত সংস্কৃত নাটকের নাম নেওয়া এই ছদ্মনামের আড়ালে যে নাট্যকার লুকিয়ে আছেন তাঁর চিন্তা আছে, দৃষ্টি আছে—বর্তমানকালের ব্যথ তা-বেদনাকে তিনি যে উপলব্ধি করেছেন তা সুস্পষ্ট।

নাটকটির বাংলা রূপান্তর সুন্দর। সামগ্রিক অভিনয়ও প্রশংসনীয়।

২ ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ও রাত সাড়ে ১০টায় শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত শুনে মন ভরেনি। তাঁর গানে যেন রসের অভাব থেকে যায়।

৪ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় এস্রাজ বাজিয়ে শোনালেন শ্রীমতী রাধারাণী কুন্ডু। ভালো লাগল। এস্রাজ একটি ক্রমাবলীয়-মান বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু এর সুরে এমন করুণ ও মিষ্টি যে, অন্য কোনো যন্ত্রেই বোধহয় এই রস সৃষ্টি করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এস্রাজ ভালো বাসতেন। রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে এস্রাজ একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল এই যন্ত্র কেউ বিশেষ শিখতে চান না। তার প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, এস্রাজ শিখতে বহু সময়ের দরকার হয়। কিন্তু সাধনার মধ্য দিয়েই তো সিদ্ধিলাভ করতে হয়। সুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই।

বেতার কর্তৃপক্ষ যদি এস্রাজের প্রোগ্রাম আরও কিছু বেশি করে দেন তবে এই মৃতপ্রায় যন্ত্রটির পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে।

৫ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে আধুনিক গান শোনালেন শ্রীমতী বাণী ঘোষ।...দরদ পাওয়া গেল না তেমন।

৬ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টার নাটক 'দৃষ্টি-প্রদীপ'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীজ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত।

'দৃষ্টিপ্রদীপ'কে যাঁরা বেতারে নাটকাকারে প্রচার করতে চান তাঁদের সাহস আছে বলতে হবে। কিন্তু সে সাহস কী রকম? জন ছাব্বিশেক অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে বেতার-নাটক করায় বাহাদুরি আছে ঠিক, কিন্তু বিচক্ষণতার পরিচয় আছে, বলা চলে না বোধহয়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বেতার-নাটক হতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে জোর তর্ক চলতে পারে, কিন্তু শ্রোতারা তৃপ্ত হতে পারেন নি। নাটকের কোনো চরিত্রই দানা বাঁধেনি। কোনো চরিত্রই মনে ছাপ ফেলতে পারে নি। অস্বাভাবিকতাও ছিল কিছু—যেমন, 'বাবা' মারা গেলে পরে ছেলেমেয়েদের অ্যাকশনে। বাবা মারা গেল, যেন কিছুই হয়নি। এতটুকু চাঞ্চল্য পর্যন্ত দেখা গেল না।

পরিষ্কার অনুমান করা যায়, এই কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করতে নাট্যকার তেমন আগ্রহ বোধ করেন নি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তেমন আরাম পান নি অভিনয় করে। তার জন্য ও'দের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া চলে না। কাহিনীকেও না। কারণ, বিভূতিবাবু বেতার-নাটকের জন্য তাঁর উপন্যাসখানা লেখেন নি। এটা যে কোনো দিন বেতারে নাটকাকারে প্রচারিত হবে তাও বোধহয় তিনি জানতেন না। তাহলে সেইভাবে লিখতেন। বেতার কর্তৃপক্ষ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-কে নাটকের জন্য নির্বাচন করে বিভূতিবাবুর একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রতি অবিচারই করেছেন।

৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। কন্ঠস্বর ভালো, দরদ আছে—কিন্তু উচ্চারণ আর একটু ভালো হওয়া দরকার।

সকাল ৮টায় শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহের লোকগীতি খুব সাধারণ। সওয়া ৮টায় শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের নজরুলগীতি ভালো। দুটো গানই।

১১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রচারিত নাটকের নাম 'জল' কিন্তু বেতার-জগতে ছাপা হয়েছে 'জাল'।

১২ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় ছিল 'বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার আসর', কিন্তু বেতার-জগতে ছাপা হয়েছে 'বাংলা কথিকা'।

১৩ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় নাটক ছিল 'সূর্যগ্রাস' কিন্তু বেতারজগতে ছাপা হয়েছে 'সূর্যসাক্ষী'।

শ্রীসুভাষ সমাজদার রচিত 'জল' নাটকটির মধ্যে খানিকটা নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল, একঘেয়েমি থেকে খানিকটা মুক্তি। নাটকটির মধ্যে একটা জীবনবোধ ছিল—এবং তা হৃদয় স্পর্শ করেছে।

'বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার আসরে' আলোচ্য বিষয় ছিল 'হৃদরোগ ও হৃদবদল'। আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার দুজন বিশিষ্ট হৃদবিশেষজ্ঞ ডঃ আর এন চ্যাটার্জি ও ডঃ গোদরেজ ক্যারাই। এই আলোচনা থেকে শ্রোতারা উপকৃত হয়েছেন বলেই আশা করা যায়। উপকৃত হবার মতোই আলোচনা ছিল এটা।

শ্রীসুশীল জানার কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'সূর্যগ্রাস' নাটকটি মোটেই জমে নি। কোনো চরিত্রই মনে রেখাপাত করতে পারেনি। সমগ্র কাহিনীটিও দুর্বল। অভিনয় মোটামুটি।

—শ্রবণক

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন অসীম দত্ত এবং সত্যজিৎ রায়

প্রেক্ষাগৃহ

প্রেমপূজারী / জাহিরা

শরৎচন্দ্র প্রভাবিত মাদ্রাজ নির্মিত হিন্দী ছবি

মাদ্রাজের জেনাস পিকচার্স নিবেদিত এবং অলিম্পিক পিকচার্স নির্মিত ইস্টম্যান কালারে তোলা হিন্দী ছবি "দেবী"র কাহিনীকারের নাম কোথাও বিজ্ঞাপিত হয়নি। কিন্তু কাহিনীর নায়িকা দেবী, তার মা যমুনাও গোপন-কথা-ফাঁস ক'রে টাকা আদায়কারী যোগেন্দ্রের সঙ্গে শরৎ-কাহিনী "চন্দ্রনাথ"-এর নায়িকা সরযূ তার মা সুলোচনা ও রাখাল ভট্টাচার্যের জীবনের ঘটনা ও চরিত্রগত সৌসাদৃশ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। চন্দ্রনাথ নিজে এখানে ডাক্তার শেখর, তার কাকা মণিশঙ্কর এখানে শেখরের দাদা পূর্ণচন্দ্র বা পূরণচাঁদ, তার মামী হরকালী পূর্ণচন্দ্রের বিধবা শাশুড়ী এবং হরকালীর বোনঝি পূর্ণচন্দ্রের শ্যালিকা শোভা।—এর পরে নিশ্চয়ই বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না যে, "চন্দ্রনাথ" কাহিনীর অনুযায়ী এখানেও কুলশীল সম্পর্কে অনুসন্ধান না ক'রেই ডাঃ শেখর দুঃখিনী বিধবা যমুনার কন্যা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করে বাড়ীতে নিয়ে এসে পূর্ণচন্দ্র ও তার বিধবা শাশুড়ীর বিরাগভাজন হয়েও সুখেই ঘর-সংসার করছিল। কিন্তু কুগ্রহের মতো যোগেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়ে যখন যমুনা দেবীর কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে, তখনই দেবীর জীবনে নেমে আসে বিষাদের কালো ছায়া। অবশ্য চন্দ্রনাথ নিজে সরযূকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এখানে ডাঃ শেখরের অসাক্ষাতে দেবীকে তাড়িয়ে দেয় পূর্ণচন্দ্র এবং পরে শেখর তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে যোগেনের যোগ-সাজশে যমুনাদেবীর কলঙ্কিত চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে অন্তঃসত্ত্বা দেবীকে কটু কথায় প্রত্যাখ্যান করে। এছাড়া চন্দ্রনাথে সুলোচনার চরিত্র যথার্থই কলঙ্কিত হলেও যমুনা দেবীর প্রতি আরোপিত কলঙ্ক শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সরযূর ছেলে বিশু ছবিতে হয়েছে দীপক; তবে দীপক ছেলে হলেও বিশুর মত 'আধো আধো' কথা কওয়া শিশু নয়, রীতিমত স্মার্ট। বর্তমান কালের অন্যান্য হিন্দী ছবির মতো নাচ-গান, খুন-জখম, পলায়ন-অনুসরণ ও 'মেহমুদ'-মার্কা লঘু হাস্যপরিহাসের দৃশ্যের ছড়াছড়ি থাকলেও শরৎ-কাহিনী 'চন্দ্রনাথ'-এর কাঠামোটুকুই "দেবী" ছবিটিকে সকল দর্শকের কাছেই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এবং এইখানেই ছবিটির সার্থকতা।

ছবিটির আরম্ভ দৃশ্য দর্শককে চমকিত ক'রে। 'একটি মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে'—এই সংবাদ বহন ক'রে ছুটে আসে দেবী ডাঃ শেখরের কাছে। শেখরও ছুটে গিয়ে তাকে বহু আয়াসে বিপদমুক্ত করে। একটি যুবক যখন শেখরকে 'ফি' দিতে চায়, তখন শেখর বুঝতে পারে, ঐ ছেলেটিই মেয়েটির আত্মহত্যা চেষ্টার জন্যে দায়ী এবং এই বুঝে সে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ভালোবাসার খেলা করবার জন্যে তিরস্কৃত করে। —এর পরে দেবী শেখরের ডাক্তারখানায় সাহায্যকারিণী হয় এবং ক্রমে প্রেম ও বিবাহ ইত্যাদির পরে 'চন্দ্রনাথ'-কাহিনীর ছায়াপাত হয়ে থাকে। শেষ দিকে নিজের ছেলে দীপকের সঙ্গে তার আলাপ হয় আকস্মিকভাবে এক কনভেন্ট স্কুলের পরিবেশে এবং দীপকও তার মায়েরই মতো ওর সাহায্যকারীর কাজ করতে থাকে। বহু ঘটনার পরে যখন সে জানতে পারে দীপক তার নিজেরই সন্তান এবং দেবী তখনও জীবিত, তার আগে দীপকের ওপর দিয়ে বহু উৎপীড়ন চলেছে যোগেন্দ্রনাথের তরফ থেকে। —সুবৃহৎ ছবিটিকে সব রকমে উপভোগ্য ক'রে তোলবার ত্রুটি করেননি চিত্রনাট্যকার ইন্দর রাজ আনন্দ ও পরিচালক ভি মধুসূদন রাও। ছবির সংলাপ অত্যন্ত সুন্দর।

নাম-ভূমিকায় নূতন অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন। নায়ক শেখরবেশে সঞ্জীবকুমার একটি বলিষ্ঠ অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। দেবীর মা যমুনাদেবী বেশে সুলোচনার অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। খল চরিত্র যোগেন্দ্রের ভূমিকায় মদন পুরীর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। রাজন বেশী মেহমুদ তাঁর হাস্যকৌতুকের একটি নূতন ভঙ্গী উপস্থাপিত করেছেন। রাজনের

স্ত্রী লছমী রূপে অরুণা ইরাণীও কম উপ-ভোগ্য নয়। পূর্ণচন্দ্রের স্বার্থান্বেষী শাশুড়ীর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। পূর্ণচন্দ্র বেশে রেহমান সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। অপরাপর ভূমিকায় জাগীরদার (মোটর ড্রাইভার), ফরিদা জালাল (শোভা), মনোমোহন কৃষ্ণ (উপকারী প্রতিবেশী), মুখরী (মেহমুদের বন্ধু ও গুরু) এবং বালক দীপকের অভিনয় প্রশংসনীয়।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ মানের। বিশেষ ক'রে রাজেন্দ্র ম্যালোনের ফোটোগ্রাফী, এস-কৃষ্ণ রাওয়ের শিল্পনির্দেশনা, এন-এম-শঙ্করের সম্পাদনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ছবির পাঁচখান গানই সুগীত হলেও আনন্দ বকসীর রচনা ও লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুর যোজনা সত্ত্বেও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি।

ভেনাস পিকচার্স নিবেদিত এবং অলিম্পিক পিকচার্স নির্মিত "দেবী" কাহিনী-গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে ব'লে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

নামেতেই বোঝা যায়, ছবিটি সংগীত-প্রধান। দশ-বারোটি নাটকীয়তা-পূর্ণ গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই চিত্রকাহিনীতে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ প্রযোজক সুনীল বসুমল্লিকের প্রযোজনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু হয়েছে 'জয়-জয়ন্তী'। প্রযোজক স্বয়ং পরিচালনা করছেন।

●

ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হতে পারে নায়ক-নায়িকার এত মাথামাখি এত চেনা-জানার পরেও কেন তাদের ঘর বাঁধা বিফল হয়ে গেল। নায়ক যেখানে চিত্রকর, নায়িকা যেখানে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী, সেখানে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া কেন অটুট রইল না। নায়কের জীবনে এল অ র এক নারী। —প্রিয়ারূপে এল না, এল বধূরূপে। চিত্রকরের মানস-সঙ্গিনী হতে পারেনি সে কিন্তু মমতায় মাখানো আত্মসমর্পণের কোমলতায় একটি শুভময়ী নারী।

এ যুগের সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন মানুষ ঠিক কী যে চায় তা নিজেরাই জানে না। এ শুধু শিল্পীদের মনের জিজ্ঞাসা নয়। বহুদিন ধরে বহু চিন্তা দিয়ে মানুষের এই উদভ্রান্ত অবস্থার কারণ নির্ণয় করা যায়নি। তবে কি আত্মবঞ্চনাই এর একমাত্র উৎস।

নরেন্দ্র মিত্র রচিত এই আধুনিক হৃদয়-দাহের কাহিনীটি চিত্রে রূপায়িত করেছেন অগ্রগামী। প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী ও নবাগতা দীপা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, অসিতবরণ, নির্মলকুমার, কণিকা, তরুণ, শ্যামল ঘোষ, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

নচিকেতা ঘোষের সুরে এ ছবির ছ'খানি গানই এ ছবির বিশিষ্ট আকর্ষণ। 'বিলম্বিত লয়' চিত্রের মুক্তির আর বেশী বিলম্ব নেই।

●

অভিনয়ের গ্ল্যামারে ব্যক্তিত্বে অজও বাঙলা চিত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী

স্টুডিও থেকে

বাঙলা ছবির নির্মাণের হার যখন অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে বলে সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে, তখন টালিগঞ্জের দুটি স্টুডিও বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল গত বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারী। দুখানি ছবির প্রযোজকই অভিজ্ঞ ও ছবি দুখানি শিল্পী-সমাবেশে ও অন্যান্য আয়োজনে বড় ছবির পর্যায়ে পড়ে।

প্রথমে যে ছবিটির কথা দিয়ে শুরু করছি তার নায়িকা হলেন অদ্বিতীয়া সুচিত্রা সেন, নায়ক একমেবাদ্বিতীয়ম্ উত্তমকুমার। এঁদের সঙ্গে আছেন বিকাশ রায়, বাসবী নন্দী, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। দশ বছরের এক কিশোর-শিল্পীর প্রতিভা-দীপ্ত অভিনয় এই চিত্রকাহিনীর বিশিষ্ট অংশ জুড়ে রয়েছে বলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'নতুন তুলির টান' অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্যের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'নবরাগ'। খ্যাতনামা পরিচালক বিজয় বসু চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক। এন-টি এক নম্বর স্টুডিও-এ 'নবরাগ' তোলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ছবিটির নাম 'জয়-জয়ন্তী'। প্রযোজন করছেন এম কে জি প্রোডাকসন্স। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে আজকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে দেখতে পাওয়া যাবে। এঁদের সঙ্গে থাকবেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ষোলো থেকে চার বছরের পাঁচটি বাচ্চা শিল্পী। 'জয়-জয়ন্তী'

অগ্রদূত পরিচালিত মঞ্জরী অপেরা চিত্রে মকুমার ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস। —ফটো : অমৃত
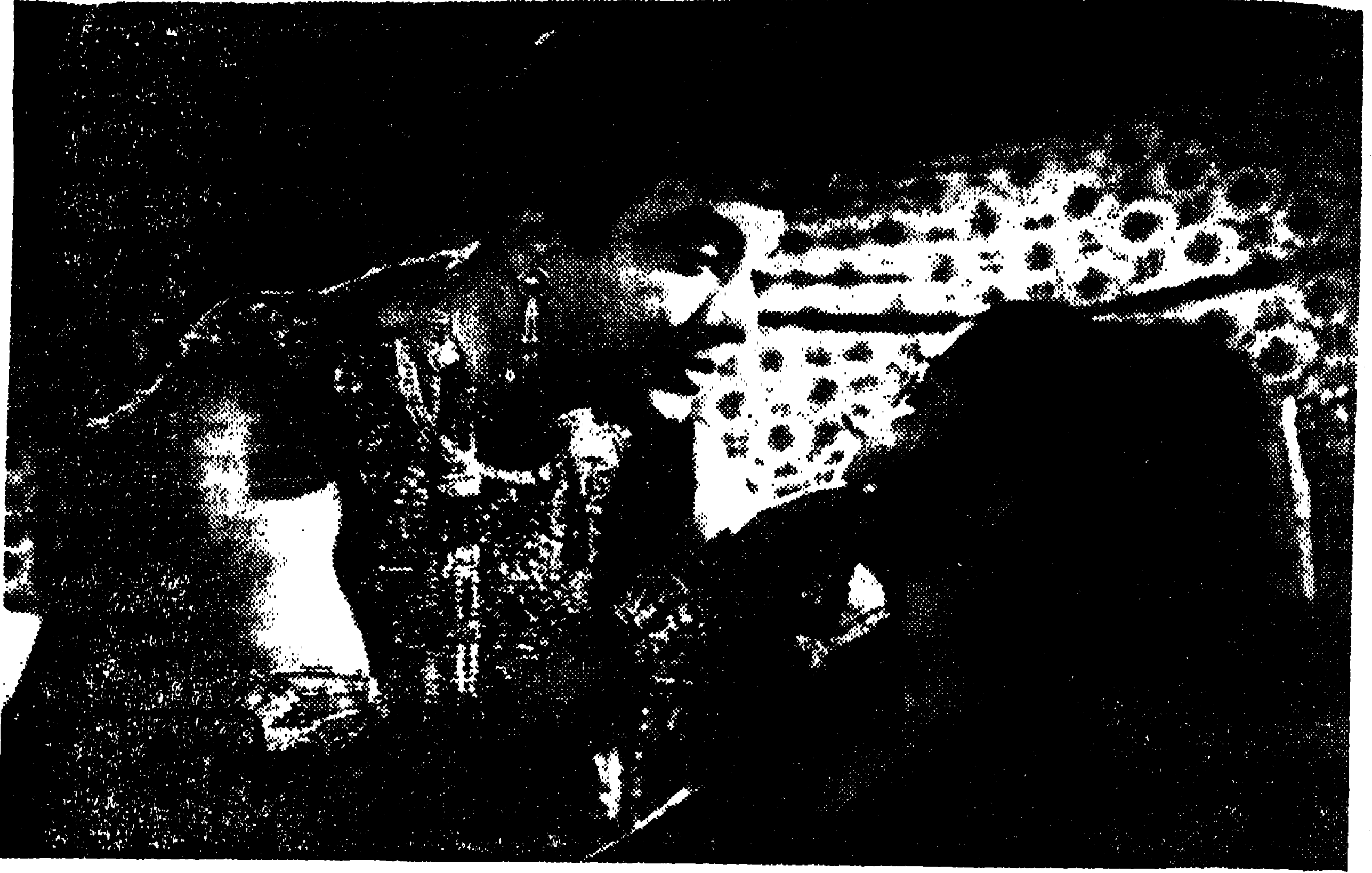
হলেন সুচিত্রা সেন। নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত হৃদয়াবেগ প্রবাহিত এই কাহিনীর নায়িকার জীবনে প্রেম এসেছিল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে—সব পাওয়ার পরম শুভক্ষণে এল চরম আঘাত। একটি দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে সংগোপনে রেখে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কর্মের জগতে ডুবে গেল সে।

সুরকার পবিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত 'মেঘ কালো' চিত্রে অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন—বসন্ত, বিকাশ, ছায়া দেবী, কনানী, সুব্রত, অসীম চক্রবর্তী, দীপিকা। পরিচালনা করেছেন সুশীল মুখোপাধ্যায়। সুরসংযোজনা করেছেন প্রযোজক স্বয়ং।

চিত্রমিত্র-এর সঙ্গীতবহুল চিত্র 'মহাকবি কালিদাস'-এর বারোখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে কাজ শুরু হয়ে গেল 'চিত্রদূত'-গোষ্ঠীর পরিচালনায়। সঙ্গীতপরিচালক বিজন পাল সুশীল মল্লিক, মঞ্জুশ্রী কুণ্ডু, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ও প্রণব ঘোষ প্রমুখ কয়েকটি 'নতুন সজীব কণ্ঠ' আমদানী করেছেন এই ছবিটিতে।

—চিত্রলেখক

মঞ্চাভিনয়

প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা একতা (পানশিলা, সোদপুর) পরিচালিত ৩য় বর্ষ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপঃ—

শ্রেষ্ঠ দল : জাগরণ সংঘ ('সমুদ্র সন্ধানে'), দ্বিতীয় দল : আদি মৈত্রী সংঘ ('মোচোর'), তৃতীয় দল : খেয়া ('শেষ বিচার'), শ্রেষ্ঠ পরিচালক : শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ('মোচোর'), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : শ্রীপিলু মজুমদার ('সমুদ্র সন্ধানে'), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : শ্রীমনীষ গুপ্ত ('মোচোর'), শিশু অভিনেতা : মাঃ অভিজিৎ ('আমায় ফিরিয়ে দাও')। গত ৭ ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটী পৌরপ্রধান শ্রীঅনিমেষ মজুমদার। পুরস্কার বিতরণ করেন কমিশনার শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংঘ-সভাপতি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বাগচী। গণনাট্য সংঘের প্রখ্যাত 'প্রতিচ্ছবি' শাখা (বারাসাত) এই অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেন।

পার্ক স্ট্রীট রিক্রিয়েশন ক্লাবের (মাহীন্দ্র এন্ড মহীন্দ্র লিমিটেড) প্রযোজনায় সম্প্রতি 'স্টার' থিয়েটারে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলি চাঁদ' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বাস্তবজীবন-নিষ্ঠ এই নাটকটির নির্দেশনায় কমল চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পীদের আন্তরিকতার অভাব কোথাও পরিস্ফুট হয়নি। 'বিশু' ও 'খুড়ো'র ভূমিকায় সুশান্তকুমার বসু ও চিত্র করের অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না। মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'সরযূ' একটি সংযত চরিত্রচিত্রণ। অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সপ্রতিভ অভিনয় করেন দেবব্রত করগুপ্ত, দেবু মুখোপাধ্যায়, নীলু রায়চৌধুরী, রঞ্জিত রায়, বিমলেন্দু রায়চৌধুরী, ও প্রতিমা পাল। আবহসংগীতে ছিলেন মুরারী ভড় ও সম্প্রদায়।

হলদিয়া ডক প্রোজেক্ট কণ্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের মঞ্চসফল নাটক 'ক্ষুধা' সার্থকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। সনৎ মুখার্জির নির্দেশনায় নাট্য-প্রযোজনাটি নানা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে ওঠে। মুখ্য ভূমিকায় যাঁরা অংশ নেন তাঁরা হলেন অনিল ঘোষ (জগৎবাবু), তপন ভট্টাচার্য (সদা), প্রশান্ত মিত্র (গজা), দিলীপ দে (রমা), জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী (অধ্যাপক গড়াই), দীনেশ নন্দী (শ্যামলাল),

গোরাচাঁদ ব্যানার্জি (মানস), যতীন দাস (মহেশ), শাশ্বতী রায় (প্রভা), হিমানী গাঙ্গুলী (মানবী), বেলা রায় (নিয়ালা), মাঃ মানস (বাবুয়া) অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হলদিয়া ডক প্রোজেক্টের অ্যাডিশনাল চীফ এঞ্জিনীয়ার কে এন সেন ও ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান এন, সি, সেনগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের এসটেট ম্যানেজমেণ্ট স্টাফ স্পোর্টস এ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে 'প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে' গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন সমর চ্যাটার্জি, সোমনাথ বসু, সুনীত ভট্টাচার্য, সলিল সিংহ, দীপক ঘোষ, ভোলানাথ ঘোষ, শ্রীবাস মণ্ডল, রামরবি ভট্টচার্য, অনন্ত চক্রবর্তী, সমর সরকার, সুনীল রায়চৌধুরী, দীনেন্দ্র ব্যানার্জি, ব্রজমোহন পালচৌধুরী, লক্ষ্মী হালদার ও মায়া দাস।

সম্প্রতি রবীন্দ্র ভারতীর দর্শন বিভাগের নবীন বরণোৎসব হয়ে গেলো। এই উপলক্ষে অভিনীত হোল 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' নাটক। শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত এই নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন দিলীপ দে। কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন দিলীপ দে, রতন পাল, কিরণশঙ্কর জানা, সুনির্মল বায়েন, শৈলেন সরখেল, হরেরাম চৌধুরী।

কাশীপুরের আর-বি-আর স্পোর্টিং ক্লাব সরস্বতী পুজো উপলক্ষে গত ন' তারিখ থেকে উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। গেল তিন দিনের (১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠানসূচী হল 'মানুষের জয়যাত্রা' প্রদর্শনী, পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'তিলোত্তমা' নাটকাভিনয় ইত্যাদি। সংস্থার পূজা প্রাঙ্গণ ছিল তাই সে ক'দিন উৎসব-মুখরিত।

ইটকো স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী সদস্যরা কিছুদিন আগে সংস্থার প্রথম বার্ষিক আনন্দানুষ্ঠানে বিমল রায়ের 'অভিনয়' ও গণেশ নন্দীর 'সূর্যতপস্যা' নাটক দুটি অভিনয় করলেন। নির্দেশক বিশ্বনাথ রায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে কয়েকটি অপূর্ব নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন অশোক দাস, সঞ্জীব চক্রবর্তী, পরাশর হালদার, রবীন পাত্র, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দীপক সেন, রণেন মুখোপাধ্যায়, বিভা ভট্টাচার্য, মমতা দে, করবী হালদার।

সম্প্রতি হিন্দী নাট্যগোষ্ঠী 'আদাকারে'র শিল্পীরা হিন্দী হাইস্কুলে 'দলদল' নাটকের সার্থক মঞ্চরূপ পরিবেশন করেছেন। আধুনিক হিন্দী নাট্যকারেরাও যে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিরত আছেন 'দলদল' নাটকই তার প্রমাণ। আর জি আনন্দ রচিত এই নাটক আধুনিক জীবনের উঁচু মহলের দাম্পত্য জীবনের কথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার অভিজাত পরিবারের 'গার্হস্থ্য' জীবনের ধারাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ সুস্পষ্ট। বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতে, ও প্রাণবন্ত সংলাপের মুখরতায় নাট্যপ্রযোজনাটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে ওঠে। এর জন্য পরিচালক কিষেণকুমারের শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। দুটি মুখ্য চরিত্রে কিষেণকুমার ও সুষমা সাইগলের অভিনয় ভোলা যায় না। রাজেন্দ্র পাতোদিয়ার আবহসংগীত ও মঞ্চ পরিকল্পনা নাটকের বক্তব্যকে আরো গভীরতর করে তোলে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের এসপ্ল্যানেড ম্যানসন বুকিং অফিস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা কিছুদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাহজাহান' নাটকটি 'মহাজাতি সদনে' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত সব মিলিয়ে সমগ্র নাটকটির প্রযোজনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এর জন্য অনেকটা কৃতিত্বের দাবী রাখেন নির্দেশক শম্ভু ব্যানার্জি। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্র রূপায়ণে দক্ষতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে ঔরংজীব', 'সাহজাহান' ও 'সুজা' চরিত্রে নির্মল ঘোষ, সুনীল সেনগুপ্ত ও জে এন চক্রবর্তীর অভিনয় হয়েছে অসাধারণ।

১০ ফেব্রুয়ারী স্পলডিং ইনস্টিটিউটের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার কর্তৃক তুলসী লাহিড়ীর 'পথনায়ক' ও 'মণিকাঞ্চন'' এবং সুনীল দত্তের একক অভিনয় 'মুক্তির স্বাদ' মঞ্চস্থ হয়। বহু-অভিনীত আর্ট থিয়েটারের পথনায়ক ও মণিকাঞ্চন প্রসঙ্গ নতুন করে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মুক্তির স্বাদ নাটকটি একক বাচনভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর নীচু পর্দায় হওয়ায় বহু জায়গায় নাটকের গতি শ্লথ হয়।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত রূপসী চিত্রে সন্ধ্যা রায় এবং শমিত ভঞ্জ। ফটো ঃ অমৃত

বিবিধ সংবাদ

৫ মার্চ সন্ধ্যায় ছটায় মহাজাতি সদনে স্মারক রজনীর অভিনয়। উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সোভিয়েত কনসাল জেনারেল মিঃ ঝারকভ।

কলকাতার চেকোস্লোভাক কনস্যুলেট, ইণ্ডো-চেকোস্লোভাক কালচারাল সোসাইটি এবং সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সম্মিলিত

দুটি মন চিত্রে সুপর্ণা সেন

উদ্যোগে ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী চেকোস্লোভাক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে কলকাতার নিউ সিনেমায়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী।

সরস্বতী মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টার-এর দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে। আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্য, গীত ও বাদ্য পরিবেশন করেন এবং 'দেবী চণ্ডিকা' নৃত্য পরিবেশন করেন সুস্মিতা ঘোষ। একক সঙ্গীতে অংশ নেন শিবানী ঘোষ, মমতা রায়, আইভি পাল, মণিদীপা দাস, দীপ্তি রায়, শিখা মালাকার, সুপ্রিয়া দে ও স্বপ্না ব্যানার্জি। এদিনের অন্য আকর্ষণ ছিল ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত 'বাকসিদ্ধ' নাটক। চরিত্র চিত্রণে ছিলেন আরতি পাল, সুচিত্রা ঘোষ, কল্পনা সাহা রায়, আরতি ভট্টাচার্য, আইভি পাল, স্বপ্না ব্যানার্জি, উমা ধর ও চৈতালী ভৌমিক। নাট্য-পরিচালনায় ছিলেন পুলিনবিহারী চক্রবর্তী।

গত ১০ ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে **বাণীনিকেতন ইনস্টিটিউট** আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানান সহ-কর্মসচিব বাসুদেব লাহিড়ী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী মল্লিকা চ্যাটার্জি, সুমিতা দত্ত, জগবন্ধু মৈত্র, কৃষ্ণা মৈত্র, খুকু মৈত্র, অপর্ণা লাহিড়ী, মিহির নন্দী ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। গীটারে লঘু-সঙ্গীতের সুর পরিবেশন করেন গোপীনাথ লাহিড়ী। তবলা সঙ্গত করেন তপন আদিত্য।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে আর্ট সেন্টার অফ ওরিয়েন্টের বৈদ্যবাটি, হাওড়া, কালীঘাট ও শিবপুর শাখার একবিংশতম সম্মিলিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন শ্রীরঞ্জিত গুহঠাকুরতা। এই অনুষ্ঠানে বিবিধ কর্মসূচীতে নৃত্য, গীত, সেতার, গীটার ও অর্কেস্ট্রায় প্রায় তিনশতাধিক ছাত্রী অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত করেন। প্রায় ২৫০ জন কৃতী ছাত্রীর মধ্যে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, কাপ-মেডেল, ট্রফি প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

বিগত শ্রীপঞ্চমীতে গীতালি সঙ্গীত শিক্ষায়তন আয়োজিত সারস্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্যামবাজারস্থ গীতালির প্রধান কার্যালয়ে। প্রারম্ভে গীতালির বিগত সমাবর্তন উৎসবে সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ও শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ প্রতিশ্রুত পুরস্কার দুটি মুর্শিদাবাদের ছয় বছরের শিশুশিল্পী মধুমিতা রায়কে প্রদত্ত হয় নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য। পরিশেষে পরিবেশিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রশংসার দাবী রাখেন কণ্ঠসঙ্গীতে কল্যাণ মজুমদার, শান্তা সাহা, অরুণা বসু, বীথিকা কুণ্ডু ও সত্যনারায়ণ হালদার এবং গীটারে শিবনাথ সাহা। এছাড়া বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওয়ালিউর রহমন কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলা সহযোগিতা করেন সুনীলকুমার দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গীতালির অধ্যক্ষ পংকজ সাহা। এবৎসরেও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হবে। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে শ্রীপংকজ সাহা, গীতালি সম্পাদকের কাছে, ৩বি, ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা-৪ এই ঠিকানায়।

মডার্ন সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত প্রথম বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্প্রতি স্কুল-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন পরেশ চ্যাটার্জি ও বাদল বিশ্বাস। অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী লক্ষ্মণ হাজরা, অনিল দত্ত, পরেশ চ্যাটার্জি, গোপাল মুখার্জি, মালা রায়, সুমিতা ঘোষ, সাগরিকা নাগ, রাধারাণী দে, শ্যামলী চক্রবর্তী, বেনু সেনগুপ্তা, রূপক চ্যাটার্জি, রামচন্দ্র দে ও মাঃ চুনু।

কলকাতায় **শিল্পমেলায় টেলিভিশন কেন্দ্রে** প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিনহার উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে হাওড়ার 'কৃষ্টি' পরিচালিত হরিদাস সঙ্গীত চক্রের শিশু ও কিশোর শিল্পীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, হাস্যকৌতুকে অংশগ্রহণ করেন। সর্বশ্রী জ্যোৎস্না সিংহ, মালা দাস, পল্টু দাস, আলো দাস, সুজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ সিংহ, সোমা সিংহ, রুমা সিংহ, অনীতা রায়, ঝর্ণা দাস। সঙ্গতে সর্বশ্রী রজত রায়, উমানাথ রায়, স্বপন ঘোষ ও গৌতম সিংহ। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন অরবিন্দ সিংহ ও পরিচালনায় শ্রীঅসিত রায় ও শিশির বসু।

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তিনদিনব্যাপী যে অনুষ্ঠানসূচী পালিত হয় তার মধ্যে দুটি নাটকাভিনয়ের আয়োজন ছিল। (১৬ ফেব্রুয়ারী) পরিষদের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' অভিনয় করেন। নাটকের পরিচালিকা ছিলেন রেণু দাশগুপ্ত। সুঅভিনীত চরিত্রগুলির রূপায়ণে ছিলেন, রীণা সেন, অভয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি বিশ্বাস, সান্ত্বনা দেব, শিপ্রা ভট্টাচার্য, তপতী বিশ্বাস, বনফুল চক্রবর্তী, অজন্তা রায়, জ্যোৎস্না চক্রবর্তী, গৌরী ঘোষ, ভারতী চক্রবর্তী ও ছবি মিত্র। অন্যদিন অভিযাত্রিক নাট্যসংস্থা অরুণ দাশগুপ্ত রচিত 'মাশুল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির গ্রন্থনে ও পরিচালনায় নৈপুণ্যের পরিচয় প্রতিভাত। অভিনয়ে অরুণ দাশগুপ্ত ও রেণু দাশগুপ্ত বিশেষ নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দলগত অভিনয়ও প্রাণবন্ত। হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতপরিচালনা প্রশংসনীয়।

সেকালের ক্রিকেট খেলা

এক মরশুমে দু' হাজার রাণ করা আর দুশো উইকেট নেওয়ার মধ্যে বাংলার আগেকার দিনের খেলোয়াড়দের বিশেষ কোন বাহাদুরী ছিল না। কথাটা মিথ্যে নয়। সময় বিশেষে কথাটা যখন সকলের কাছে গল্পের ছলে পাড়ি তখন আজকের ছেলেরা কেমন হকচাকিয়ে যায়। আড়ালে তাদের বলতে শুনেছি—'সব বুড়োগুলোর কি এক ধারা! এটা বলার মত কথা, না বিশ্বাস করার মত! খেলাটাও কি ছিল ঠিক সেকালের বাজার দরের মত—সস্তা গন্ডা ছিল, ভাল মন্দ পেট ভরে খেয়েছি।' বুঝলাম ছেলেরা কথায় সহজে ভিজবে না। পানের বাটায় চুন লাগিয়ে জিবে ঠেকাতে ঠেকাতে যতই বলি না কেন—এই মেরেছি, তাই মেরেছি, কথায় কথায় ইডেনের মাঠ পার করেছি, ছক্কার ছড়াছড়ি করেছি—সেকথা কেউ কান পেতে শুনবে না। হাত ঘোরালেই উইকেট পেতাম সেকথাও কেউ গ্রাহ্য করবে না। এখন ষাট বছরের ধারে এসে আর ত গতর হাঁকিয়ে ইডেনের মাঠ পার করতে পারব না। কাজেই ঢোক্ গিলে বলছি এ সব কথায় কান দেবেন না।

তবে হ্যাঁ, ছেলেরা আজ ক্রিকেট বুঝতে শিখেছে। আজকের ছেলেদের চালচলন দেখে আনন্দে বুক ভরে যায়। সেদিনের ক্রিকেটকে সবাই মনেপ্রাণে ঠাঁই দেয়নি। সাহেবদের খেলা বলে উপেক্ষা ত ছিলই। তারপর ক্রিকেট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, দুর্বোধ্যও বটে। জোর করে বাংলার দুলালদের মাঠে ধরে আনা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর সখ করে যাঁরা লর্ডস ক্রিকেট খেলবেন বলে মাঠে নামতেন আসলে তাঁরা লর্ডস বনলেও ক্রিকেটার হতে পারতেন না। তবু, আসরে নামতেন, সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ জোরে ব্যাট হাঁকাতেন। কাপড়ে মালকোঁচা বেঁধে খুব লম্বা ছুট দিয়ে বল করতেন। কিন্তু সাহেবরা তাতে খুশী হতেন না। বলতেন, ক্রিকেটের সাজ গায়ে না চড়ালে সে আবার ক্রিকেটার নাকি! এই কারণেই বাংলার বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও সাহেবরা কিছুতেই কাঁধে হাত দিয়ে দোস্তি করতেন না। নাক সিঁটকে পাশ কাটিয়ে যেতেন।

ধরা যাক, ছোনে মজুমদারের কথা। বলতে আজও দ্বিধা করি না—বাংলায় সন্তোষ মজুমদারের (ছোনে) মত চৌকস খেলোয়াড় আমাদের গড়ে নিতে বহুদিন লাগবে। এই ছোনেবাবু ফুটবল, ক্রিকেট হকি—সব খেলাই সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলতেন। ফুটবল এবং ক্রিকেটে সাহেবরাও তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। ছোনেবাবু চোস্ত ফুটবল খেলতেন, আট সাট পাকা সাহেবী কায়দায়। সেকালের নগ্নপদ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মাঝে ছোনেবাবুর পায়ে চড়ত ভারি ম্যানসফিলডের ছাপ মারা বুট। সেই বুট পায়ে যেমন ড্রিব্লিং, তেমনি দাপাদাপি।

ক্রিকেট খেলার সময় প্রথম প্রথম সেকালের বাঙালী ক্রিকেটারেরা বাঙালী ধাঁচেই কাপড় মালকোঁচা বেঁধে, শার্ট কাপড়ের ভেতর গুঁজে মাঠে নামতেন। ছোনেবাবুও তাই করতেন। সাহেবরা নাক বাঁকালেও তিনি মোটেই তা গ্রাহ্য করতেন না।

সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রিকেট না খেললে তাদের কাছে জায়গা মিলবে না এই মনোভাব নিয়েই ক্রিকেট খেলা শুরু করি। ফিটফাট সাজ-পোষাক চাই, আদব-কায়দা রপ্ত করা চাই এবং দাঁত চিবিয়ে সাহেবী বুলি না বললেও মান থাকে না। লাঞ্চ টেবিলে কাঁটা চামচে ধরা এবং মেপে মেপে কথা বলা। তাদের মত গেলাস গেলাস বিয়ার না খেলেও লজ্জার খাতিরে লিমন স্কোয়াসের বোতল নিয়ে গেলাসে ঢেলে সমান তালে তাদের সঙ্গে চুমুক দিতে শিখি। তবুও মন পেতাম না। বিশেষ করে আদবকায়দা মত আমাদের জনাবিস্তর কারুর ব্যাট থাকত না। তেল চিটচিটে তামা রংয়ের ব্যাট-এ সারি সারি তাঁত বাঁধান দেখে

কমল ভট্টাচার্য

তাঁরা যেন কেমন শিউরে উঠতেন। আর তারওপর ফাটা ব্যাট যদি খ্যানখ্যানে আওয়াজ তোলে তাহলে ত কথাই নেই। রাগে চোখ পাকাতেও তাঁরা কসুর করতেন না। প্রয়োজনে প্রকাশ্যে ব্যাট বদল করার জন্যে আম্পায়ারের কাছে আরজি জানাতেন। তবু আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখতাম না। বিশেষ করে ক্যালকাটা এবং বালীগঞ্জ ক্লাবের সঙ্গে খেলা থাকলে আমরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে যেতাম। লালচে বুটজোড়াকে বারকতক চুন বুলিয়ে সাদা ম্যাড়ম্যাড়ে করে তুলতাম: ব্লেড দিয়ে তেল চিটচিটে ব্যাটের তামা রং তুলে সাফ্ করতাম। প্যাড জোড়াকে যত-দূর সম্ভব খড়ি মাখিয়ে, মুচি ডাকিয়ে বকলসগুলোকে ঠিক করে নিতাম। আর পয়সা-কড়ির অভাবে জামা প্যান্টগুলোকে ঘরে কেচে বাটি উনুনে গরম করে ইস্ত্রি করতাম। গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে এবং ক্লাবেরও তেমন সচ্ছল অবস্থা ছিল না। তবু সাহেবরা আমাদের এরিয়ান ক্লাবকে সমীহ করতেন। তাঁরা জানতেন, সমান পাল্লা দিতে পারে একমাত্র এরিয়ান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। তবু তাঁরা তাচ্ছিল্য কম করতেন না। আভাসে ইঙ্গিতে বলতেন—সাজ পোশাক যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, খেলাতে ততই সুস্থ মনের অধিকারী হবে'।

একটা ঘটনার কথা বলি। ক্যালকাটা ক্লাবের সাহেবদের সঙ্গে খেলা এরিয়ান দলের। খেলাটা হয় ইডেনের মাঠে। এই খেলাই ১৯৩৬ সালের ক্রিকেট মরশুমে আমাদের প্রথম খেলা। কাজেই নভেম্বর মাসাশেষ ক্লাবের সমস্ত ক্রিকেট 'গিয়ারস' যোগাড় হয়ে ওঠেনি। তবু খেলা খেলাই—আর সে খেলা এরিয়ান বনাম ক্যালকাটার। হাড্ডাহাড্ডি খেলা। বেশ লোক জমা হয়েছিল ইডেনের মাঠে।

ক্যালকাটার যেমন এ্যালেক হোসি এবং টম লংফেল্ড, এরিয়ানেও তেমনি সুঁটে ব্যানার্জি এবং সুশীল বসু। কে হারে কে যেতে বলা শক্ত। এরিয়ান দলে তখন জনা চব্বিশ 'টপ্ প্লেয়ার'। কাকে রেখে কাকে বাদ দেবে—কম সমস্যা নয়। তবু এরিয়ানের দুই ওপনিং ব্যাটসম্যান বাঁটুল এবং নেপালকে কেউ বাদ দিতে সাহস করত না। এই জুটি খেলোয়াড়ের একজনকে বাদ দিলে ক্লাবে লাঠালাঠি লেগে যেত। কেউই সেঞ্চুরী করার মত ব্যাটসম্যান অবশ্য নন; তবু এঁরা পারতেন না এমন কোন কাজ ছিল না। সাহেবরাও এই জুটিকে আউট না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। নেপাল গাঙ্গুলীর গায়ের রং ছিল ফর্সা এবং চেহারা রোগা। বাঁটুল বিশ্বাসের মোটা থলথলে চেহারা। দুজনেই সোলার হ্যাট পরতেন, চিবুকে টুপির স্ট্র্যাপ লাগিয়ে। কোন কারণেই তাঁরা খালি মাথা দেখাতেন না, মাথায় টাকের লজ্জায়।

যাইহোক অধিনায়ক সুশীল বসু টসে জিতে যথারীতি বাঁটুল এবং নেপালকে ব্যাট করতে পাঠালেন। এমন কাণ্ড আর কখনও ঘটেনি—নেপাল প্রথম বলেই চোট খেয়ে মাঠে কাৎরে পড়লেন। সাহেবরা দেখলেন, নেপাল পেটে বলের ঘা খেয়েছেন। কিন্তু নেপাল এত কাহিল কেন? পরে বুঝলেন, বেচারা নেপাল 'এ্যাবডোমেন গার্ড' ছাড়াই মাঠে ব্যাটিং করতে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত ধরাধরি করে নেপালকে সাহেবরা প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিলেন। বাঁটুলকে সাহেবরা শাসালেন—'কি বাঁটুল তোমারও কি ঐ অবস্থা?' বাঁটুল একগাল হেসে বললেন—'না—না ঠিক আছে।' সাহেবরা সে কথা বিশ্বাস করলেন না। চুপিসাড়ে হাতের স্পর্শে দেখে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান সুশীল বসু। অধিনায়ক বলে কথা। সাহেবরা জানতেন সুশীল খুব টিপটাপ। খেলা চলছে। বাঁটুল দেখালেন তাঁর গ্রেট ইনিংস।, সেঞ্চুরী নয়, ধীরে সুস্থে খেলে বাঁটুল করলেন ৪৮ রান। দু' রান হলেই হাফ সেঞ্চুরী। হঠাৎ ঠক্ করে বাঁটুলের পেটে বল লাগল। বাঁটুল একেবারে ধরাশায়ী। সাহেবরা অস্থির হয়ে পড়লেন। বাঁটুলকে চারদিক থেকে ঘিরে সাহেবরা তাঁর প্যান্টের বোতাম খুলে চললেন, তাঁকে স্বস্তি দেবার জন্যে। চোখ যে তাঁর কপালে উঠছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহেবদেরও চোখ কপালে উঠল বাঁটুলের দেশী এ্যাবডোমেন গার্ড দেখে। বাঁটুলও ফিরলেন প্যাভিলিয়নে। সাহেবরা ফিরে এসে বাঁটুলের ভাঙা এ্যাবডোমেন গার্ডের কুচিগুলো একটি একটি করে সরিয়ে ফেললেন। নারকেল মালার কুচি-গুলো দেখে সাহেবরা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না সেটা কি দিয়ে তৈরী।

দাবার আসর

ক্রীড়ারত আওয়ে (বাঁ-দিকে) এবং ওপোসেন্স্কী (ডানদিকে)। দন্ডায়মান (বাঁ দি ক থেকে) —মিসেস রেটি, মুক্রেসার এবং সালো ফ্রোর

রিচার্ড রেটি

রিচার্ড রেটির নাম শোনেন নি, এমন দাবা খেলোয়াড় বোধহয় খুব কমই আছেন। সিগবার্ট তারাশ্ এবং তাঁর শিষ্যদের থিয়োরী যখন ফর্মালিজম্-য়ে পর্যবসিত হয়েছে, সেই সময় ঝড়ের দমকা হাওয়ার মত আবির্ভূত হলেন নিমজোভিচ, রেটি, টার্টাকোভার প্রমুখ ধুর: খেলোয়াড়। দাবা খেলার মধ্যে নূতন প্রাণ এবং উদ্যম সঞ্চারিত করলেন। সৃষ্টি হল বহু আলোচিত এফ 'হাইপার-মর্ডান স্কুল'।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সুসন্তান রিচার্ড রেটি (মে ২৮, ১৮৮৯—জুন ৬, ১৯২৯) দাবাজগতকে অনেক সুন্দর সুন্দর খেলা উপহার দিয়ে গেছেন, এবং দিয়ে গেছেন প্রচুর অনন্যসাধারণ এন্ড-গেমের প্রব্লেম এবং তাদের সমাধান। তাঁর দুটি অসাধারণ বই 'মাস্টারস্ অব দি চেস্-বোর্ড' এবং 'মডার্ণ আইডিয়াজ ইন চেস' প্রত্যেক দাবা-খেলোয়াড়ের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। হ্যারী গলম্বেকের মতে যে ৫।৬টি যুগান্তকারী বই দাবাখেলার মোড় ঘুরিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রেটির 'মডার্ণ আইডিয়াজ ইন চেস'। গলম্বেকেরই মতে, যারা দাবা খেলায় বেশ খানিকটা এগিয়েছেন কিন্তু পুরোপুরি 'মাস্টার-লেভেলে' পৌঁছাতে পারছেন না, তাদের কাছে রেটির 'মডার্ণ আইডিয়াজ' এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

রেটির নামেই হয়েছে বিখ্যাত 'রেটি ওপ্নিং', যা অনেক গ্র্যান্ড মাস্টারেরই প্রিয়।

রিচার্ড রেটির ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সম্মানার্থে হল্যান্ডের হ্যাদেল নামে এক ছোট গ্রামে একটি ছোট দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল গত বছর। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন হল্যান্ডের প্রাক্তন বিশ্বদাবা চ্যাম্পিয়ন ম্যাক্স আওয়ে (৬৮), চেকোশ্লোভাকিয়ার কারেল ওপোসেন্স্কী (৭৭), ভিয়েনার হ্যান্স মুয়েলার (৭২) এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে গ্র্যান্ড মাস্টার সালো ফ্লোর (৬০)। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে রেটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং টুর্ণামেন্টেও রেটির বিপক্ষে খেলেছেন। এছাড়া বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মস্কো থেকে এসেছিলেন মিসেস রেটি।

প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি গেম হয়। এর মধ্যে ৫টি গেমই ড্র। ১টি মাত্র গেমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। তাতে আওয়ে মুয়েলারকে হারিয়ে দেওয়ার সূত্রে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেন।

সালো ফ্লোরকে এখনো মাঝে মাঝে টুর্ণামেন্টে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বাকীরা সকলেই দাবা খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও এঁদের খেলায় কতখানি ধার রয়েছে, পাঠকগণ নীচের খেলাগুলি থেকে তা বিচার করতে পারবেন।

প্রথম গেমঃ— সাদা—আওয়ে, কালো—মুয়েলার। নিমজোইন্ডিয়ান ডিফেন্স। (১) ব—ম ৪ ঃ ঘ—রাগ ৩ (২) ব—মগ ৪ ঃ ব—রা ৩ (৩) ঘ—মগ ৩ ঃ গ—ঘ ৫ (৪) ম—গ ২ ঃ ব—ম ৩ (৫) গ—ম ২ ঃ মঘ—ম ২ (৬) ব—মন ৩ ঃ গ×ঘ (৭) গ×গ ঃ ০—০ (৮) ব—রা ৩ ঃ ন—রা ১ (৯) ঘ—রা ২ ঃ ব—মঘ ৩ (১০) ঘ—ঘ ৩ ঃ গ—ঘ ২ (১১) গ—রা ২ ঃ ঘ—গ ১ (১২) ০—০ ঃ ব—মন ৪ (১৩) মন—ম ১ ঃ ব—ম ৪ (১৪) ব—ঘ ৩ ঃ ঘ (গ১)—ম ২ (১৫) গ—ঘ ২ ঃ ন—ন ২ (১৬) ব×ব ঃ ব×ব (১৭) ন—গ ১ ঃ ব—গ ৩ (১৮) ব—ম ন ৪ ঃ ঘ—ঘ ১ (১৯) গ—ন ৩ ঃ গ—ন ৩ (২০) গ×গ ঃ ন×গ (২১) ম—ম ২ ঃ ন—ন ২ (২২) ব—গ ৩ ঃ ন—রা ৩ (২৩) ব—রা ৪ ঃ ঘ—রা ১ (২৪) ব—রা ৫ ঃ ব—ঘ ৩ (২৫) ঘ—রা ২ ঃ ঘ—ঘ ২ (২৬) ঘ—গ ৪ ঃ ন—রা ১ (২৭) গ—ম ৬ ঃ ম—ম ২ (২৮) ব—রা ঘ ৪ ঃ ঘ—ন ৩ (২৯) ম—গ ৩ ঃ ব—রা ঘ ৪ (৩০) ঘ—রা ২ ঃ ন—ম গ ১ (৩১) ঘ—ঘ ৩ ঃ ন (ন২)—ন ১ (৩২) ব—ন ৩ ঃ ব—মগ ৪ (৩৩) ম—রা ৩ ঃ ব—ন ৩ (৩৪) ব×ব ঃ ব×ব (৩৫) ব—গ ৪ কালোর হার স্বীকার।

দ্বিতীয় গেমঃ—সাদা—ফ্লোর, কালো—আওয়ে। ডাচ্ ডিফেন্স। (১) ব—ম ৪ ঃ ব—রা গ ৪ (২) ব—ম গ ৪ ঃ ব—রা ঘ ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ ঃ ঘ—রা ন ৩ (৪) ব—রা ৪ ঃ ব—ম ৩ (৫) ব—ম ঘ ৩ ঃ গ—ঘ ২ (৬) গ—ঘ ২ ঃ ০—০ (৭) ঘ—গ ৩ ঃ ঘ—গ ৩ (৮) গ—রা ২ ঃ ব—রা ৪ (৯) ম ব×ব ঃ ঘ×ব (১০) ব×ব ঃ ঘ×রা গ ব (১১) ০—০ ঃ গ—ম ২ (১২) ম—ম ২ পারস্পরিক সম্মতিতে ড্র।

তৃতীয় গেমঃ—সাদা—আওয়ে, কালো—ওপোসেন্স্কী। বেন-মনি ডিফেন্স।

(১) ব—ম ৪ ঃ ঘ—রা গ ৩ (২) ব—ম গ ৪ ঃ ব—গ ৪ (৩) ব—ম ৫ ঃ ব—রা ঘ ৩ (৪) ঘ—ম গ ৩ ঃ গ—ঘ ২ (৫) ব—রা ৪ ঃ ব—ম ৩ (৬) গ—ম ৩ ঃ ০—০ (৭) রা ঘ—রা ২ ঃ ব—রা ৩ (৮) ০—০ ঃ ব×ব (৯) রা ব×ব ঃ ম ঘ—ম ২ (১০) ব—গ ৪ ঃ ব—ম ন ৩ (১১) ব—ম ন ৪ ঃ ব—ঘ ৩ (১২) ঘ—ঘ ৩ ঃ ঘ—রা ১ (১৩) ম ঘ—রা ৪ ঃ ম ঘ—গ ৩ (১৪) ব—গ ৫ ঃ ঘ×ঘ (১৫) গ×ঘ ঃ গ—ম ২ (১৬) ম—গ ২ ঃ ব—ম ঘ ৪ (১৭) ন ব×ব (১৮) গ—ঘ ৫ ঃ ম×গ (১৯) ন×ন ঃ গ—ম ৫+ (২০) রা—ন ১ ঃ ঘ—গ ৩ (২১) ন×ন+ ঃ রা×ন (২২) রা গ ব×ব ঃ ন ব×ব (২৩) গ—গ ৩ ঃ গ—রা ৪ (২৪) ঘ—রা ৪ ঃ ম—ন ৩ (২৫) ব—রা ঘ ৩ ঃ ব×ব (২৬) ঘ×ঘ ঃ গ×ঘ (২৭) গ—ঘ ৪ ঃ গ×গ (২৮) ন×গ ঃ ম—ঘ ৪ (২৯) ন—গ ৪ পারস্পরিক সম্মতিতে ড্র।

কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরে পশ্চিম এশিয়া জোনল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল। ১৯৭২ সালে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন বোরিস স্পাসকির মুখোমুখি কে বসবেন, তা স্থির করার জন্যে বিশ্বব্যাপী যে বাছাই চলছে, এই প্রতিযোগিতা তারই অঙ্গ। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারত থেকে ম্যানুয়েল এ্যারন এবং নাসির আলী, ইরান থেকে এন, হেম্মাসি এবং এম, হেম্মাস্সিয়ান, ইজ্রয়েল থেকে এস, কাগান এবং এম, পেরেটস্, এবং মঙ্গোলিয়া থেকে টি, উজটুমেন এবং পি, টুমুরবেটর। খেলোয়াড়দের অর্জিত পয়েন্ট দেওয়া হোল: সর্বোচ্চ পয়েন্ট ১২।

যুগ্মভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছেন কাগান এবং উজটুমেন, প্রত্যেকেই পেয়েছেন ৮ পয়েন্ট। তৃতীয়—পেরেটেস্ ৭½; যুগ্মভাবে চতুর্থ এবং পঞ্চম হয়েছেন ম্যানুয়েল এ্যারন এবং টুমুরবেটর, প্রত্যেকেই ৫½; যুগ্মভাবে ষষ্ঠ এবং সপ্তম হয়েছেন নাসির আলি এবং হেম্মসি, প্রত্যেকেই ৫; অষ্টম হয়েছেন হেম্মাসিয়ান ৩½।

শীর্ষস্থান অধিকার করা নিয়ে কাগান এবং উজটুমেনের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা হবে। তাতে যিনি জিতবেন, তিনি এ বছর স্পেনে ইণ্টার-জোনাল টুর্নামেণ্টে অংশগ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে ইজরায়েলকেই সবচেয়ে শক্তিশালী ধরা হয়েছিল। ভারতের দুজন প্রতিযোগী মোটের ওপর খুব ভাল ফল দেখাতে না পারলেও নাসির আলী দু-দুবার ইজরায়েলের কাগানকে, এবং ম্যানুয়েল দু-দুবার ইজরায়েলের পেরেটসকে এই টুর্নামেণ্টে পরাস্ত করেন।

—গজানন্দ বোড়ে

খেলাধুলা

দর্শক

স্যার লিওনার্ড হাটন

ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার লিওনার্ড হাটন ভারতবর্ষে এসেছেন। এ খবরে ভারতবর্ষের ক্রিকেট অনুরাগী মহল খুবই খুশী। কিন্তু এম সি সির ১৯৫১-৫২ সালের ভারত সফরে তাঁর খেলা দেখার জন্যে যাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তাঁরা আজ পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে অভিমান করবেন। সেই সফরে তিনি আসতে পারেননি। তারপর এম সি সি ভারত সফরে আসে ১৯৬১-৬২ সালের ক্রিকেট মরশুমে। এর অনেক আগেই ১৯৫৫ সালে তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নেন। সুতরাং ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর খেলা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। আজ লেন হাটন প্রসঙ্গে পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ছে। সেই ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে ওভালের অবিস্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ— যার নামই দেওয়া হয়েছে 'হাটন'স ম্যাচ'। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালের এই শেষ চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলায় লেন হাটন ৩৬৪ রান করার সূত্রে এই রেকর্ড-গুলি করেছিলেন : (১) টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড, (২) পেশাদার খেলোয়াড়দের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রান, (৩) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দীর্ঘতম সময়ের খেলা (১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট) এবং (৪) ইংলিস ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে কম বয়সে ৩০০ রান সংগ্রহ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে লেন হাটন রাতারাতি স্বনামধন্য হলেন। সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষের ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁর খেলা দেখার বাসনায় দিন গুনে চলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার সূত্রে এ পর্যন্ত মাত্র যে সাতজন খেলোয়াড় ৬০০০ বা তার বেশী রান করার গৌরব লাভ করেছেন, লেন হাটন তাঁদের নামের তালিকায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত (১৯৬৮ সালের ৩রা এপ্রিল) তৃতীয় স্থানে ছিলেন— হ্যামণ্ড এবং ব্র্যাডম্যানের পরই ছিল তাঁর স্থান। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৭৯, ইনিংস ১৩৮, নটআউট ১৫ বার, মোট রান ৬৯৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৪, সেঞ্চুরী ১৯টি এবং গড় ৫৬·৬৭। সরকারী টেস্টের এক সিরিজের খেলায় তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যান : খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রান ৬৭৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৯৬·৭১— বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৫৩-৫৪। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর ৭টি টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান—ইনিংস ১১, নটআউট ২ বার, মোট রান ৫২২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫০ (লর্ডস, ১৯৫২) এবং সেঞ্চুরী ২। ১৯৫২ সালে তাঁরই নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড ৩—০ খেলায় (ড্র ১) ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল এবং তিনি উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন—খেলা ৪, ইনিংস ৬, নটআউট ১, মোট রান ৩৯৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫০ এবং গড় ৭৯·৮০। হাটন ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৫ সালের ২৮শে মার্চ। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে ১৯৫৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে রাজকীয় 'নাইট' খেতাবে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। লেন হাটনের দর্শনীয় মার ছিল কভার-ড্রাইভ।

স্যার লিওনার্ড হাটন

কলকাতায় সি এ বি আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় এবং সাংবাদিক বৈঠকে স্যার লিওনার্ড হাটন ক্রিকেট খেলার বিবিধ বিষয়ে তাঁর যে-সব ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের সঙ্গে ইডেন উদ্যানের তুলনা করা যায়। কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেও এর তুলনা তিনি খুঁজে পাননি। তিনি ভিনু মানকাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, তাঁর মত আরও কয়েকজন খেলোয়াড় দলে পেলে ভারতবর্ষ খুব শীঘ্রই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। তাঁর মতে ভারতবর্ষের বর্তমান স্পিন বোলিংয়ের মান জগৎশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের ফাস্ট বোলারের অভাবের কারণ হিসাবে তিনি এ দেশের মন্থর পিচকে দায়ী করেন।

মাদ্রাজে তিনি অমর সিংকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হিসাবে সম্মানিত করেছেন। তাঁর মতে, তখনকার দিনে অমর সিং এবং মহম্মদ নিসারের মত একজোড়া দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার কোন দেশেরই টেস্ট দলে ছিল না। লেন হাটনের মতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ৬ জন অল-রাউণ্ডার হলেন—ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারী সোবার্স, অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার এবং ইংল্যাণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, উইলফ্রেড রোডস এবং ফ্র্যাঙ্ক উলি।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোদীর একাদশ দল ৫ উইকেটে হায়দরাবাদ দলকে পরাজিত করেছে। এই খেলায় কয়েকজন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম দিনের খেলায় হায়দরাবাদ দলের প্রথম ইনিংস ২৭৫ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ে মোদীর দল ২ উইকেটের বিনিময়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করে। হায়দরাবাদ দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগ সেঞ্চুরী (১০৪ রান) করেন।

দ্বিতীয় দিনে মোদীর দলের প্রথম ইনিংস ২০৮ রানের মাথায় শেষ হলে হায়দরাবাদ দল ৬৭ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৬ উইকেট খুইয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে হায়দরাবাদ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং মোদীর দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় মোদীর দলের জয়লাভের জন্যে ৮৮ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের কিছু আগেই মোদীর একাদশ দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে জয়ী হয়। মোদীর একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৭৪ রানে ভারতবর্ষের

চেকোশ্লোভাকিয়ার ইন্টার ব্রাতিশ্লাভা বনাম আই এফ এ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য।—ভৌমিক বাধা পেয়েছেন। খেলায় ইন্টার ব্রাতিশ্লাভা ৩—১ গোলে জয়ী হয়।

প্রাক্তন অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টরের নট আউট ৮৩ এবং সকসেনার ৯৮ রান উল্লেখযোগ্য ছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

হায়দরাবাদ : ২৭৫ রান (আব্বাস আলি বেগ ১০৪ রান। আনন্দ শুক্লা ১১১ রানে ৪ এবং শিভালকার ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০৬ রান (আব্বাস আলি বেগ ৭৬ নটআউট। শিভালকার ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

অবশিষ্ট দল : ২০৮ রান (রবীন মুখার্জি ৪১, জে রাও ৪০ এবং আনন্দ শুক্লা নটআউট ৬৪ রান। মুমতাজ হোসেন ৫৯ রানে ৬ উইকেট)

ও ২৭৪ রান (নরি কন্ট্রাক্টর নটআউট ৮৩ এবং রমেশ সকসেনা ৯৮ রান। গোবিন্দরাজ ৭৮ রানে ৩ উইকেট) —৫ উইকেটে।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

ইউরোপীয় অঞ্চলের খেলা

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন টমাস কাপ প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় অঞ্চলের সেমি-ফাইনালে সুইডেন ৭—২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে ইউরোপীয় অঞ্চলের ফাইনালে ডেনমার্কের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। সুইডেন বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার এই খেলা উপলক্ষে বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরোধী দলের তরফ থেকে খেলার মাঠে প্রচন্ড হামলা হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা এককথায় বানচাল হয়ে যায়। খেলার উদ্যোক্তরা সন্ধ্যার সময় খেলা হওয়ার কথা ঘোষণা করে বিকেলেই খেলা শেষ করে দেন। ফলে সন্ধ্যার মুখে বিক্ষোভকারীরা খেলার আসরের সামনে বিক্ষোভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা করে খেলা ভন্ডুল করতে পারেন নি।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সী জেল গ্রাউন্ডে ডি ভি সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের (কলকাতা) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ক্লাবের অন্যতম সহ-সভাপতি এবং ডি ভি সি-র এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অব পার্সোনেল শ্রীযুক্ত সত্য-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি এন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

যোগদানকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েট বিভাগের শ্রীদিলীপকুমার আচার্য ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন।

পরলোকে হার্বার্ট স্ট্রাডউইক

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হার্বার্ট স্ট্রাডউইক গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বিশ্বের বিখ্যাত উইকেট-কিপারদের মধ্যে তিনি অন্যতম হিসাবে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। স্ট্রাডউইক ইংল্যান্ডের সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি তাঁর খেলোয়াড়জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯০৯ সালে। শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন ১৯২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং ১৯২৭ সালের ক্রিকেট মরসুমের শেষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

স্ট্রাডউইক তাঁর খেলোয়াড়জীবনে (১৯০২-২৭) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক ডিসমিসাল করার এবং সর্বাধিক ক্যাচ ধরার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও অপর কোন উইকেটকিপারের পক্ষে স্পর্শ করাও সম্ভব হয়নি—তাঁর মোট ডিসমিসাল ১,৪৬৮ (ক্যাচ ১,২১৫ এবং স্টাম্পিং ২৫৩)। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান এইরকম—খেলা ২৮, মোট ডিসমিসাল ৭২ (ক্যাচ ৬০ এবং স্টাম্পিং ১২)। শুধু এই পরিসংখ্যান দিয়ে স্ট্রাডউইকের খেলোয়াড়জীবনের প্রতিভাকে ধরা সম্ভব নয়।

হার্বার্ট স্ট্রাডউইক

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th March, 1970. শুক্রবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ 40 Paise

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারবিবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪
(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম — সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা — ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা — ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা— ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত), ১৭১এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৬; প্রাণতোষ ঘটক, ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, কলিকাতা-৬০; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি, রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা-৫; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ১৬, অভয় বিদ্যালংকার রোড, কলিকাতা-৩৪; তুলসীকান্তি দে-বিশ্বাস, ৬, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা-৪; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, কলিকাতা-৬০; প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ/ শ্রীসুপ্রিয় সরকার
তাং—২৫-২-৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপাচুগোপাল দে

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খ‍ুঁজি

গত ২৩শে মাঘ তারিখে প্রকাশিত শ্রীসুমঙ্গল সেন মহাশয়ের চিঠিখানি পড়ে ভাল লাগলো। আত্মস্মৃতিকথাকে যেভাবে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রূপায়িত করছেন তার সাহিত্যিক মূল্য বড় কম নয়। সেদিক থেকে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু গত ২৩শে জানুয়ারী তাঁর রচনায় তিনি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর প্রসংগ যেভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে নটসূর্য আমাদের চোখে একটু ম্লান হয়ে পড়েছেন। নাট্যাচার্য বা নটসূর্য কারোর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবু তাঁরা আপন আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের অন্তরে এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন। কারো লেখনীর মাধ্যমে যদি সেই স্থানে সামান্যতম ফাটল ধরে তবে সেটা খুবই দুঃখের।

'নিজেরে হারায়ে খ‍ুঁজি' অমৃতে প্রকাশিত অন্যান্য গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। সেদিক থেকে তাঁর রচনা সার্থক। শুধু অনুরোধ, তাঁর লেখনীতে এটা যেন আমাদের কখনও না মনে হয় যে বিশেষ কারো প্রতি তাঁর ঔদার্যের অভাব।

সীতা রায়চৌধুরী
কলকাতা—২০

(২)

'নিজেরে হারায়ে খ‍ুঁজি', ১৬ই মাঘ, ১৩৭৬ সংখ্যায় উল্লেখিত 'কড়িবাবু অর্থাৎ নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' আসলে সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। উনি ছিলেন গিরিশ-যুগের কৃতী নৃত্য-পরিচালক। ও'র কৃতিত্বের তালিকায় আছে গিরিশচন্দ্রের হর-গৌরী (১৩১১), সিরাজদ্দৌলা (১৩১২), বাসর (১৩১২), অশোক (১৩১৭), তপোবল (১৩১৮) প্রভৃতি অসংখ্য বিখ্যাত নাটক।

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া।

(৩)

শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনী 'নিজেরে হারায়ে খ‍ুঁজি' নিয়মিত পড়ছি। এই প্রসঙ্গে অনেকের পত্রাদিও পড়লাম। বাংলা মঞ্চ ও চিত্রজগতের অনেক অজ্ঞাত তথ্য নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর বক্তব্য ও পরিবেশন ভঙ্গিমার সঙ্গে অনেক সময় একমত না হলেও ইতিহাস হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ৪১ সংখ্যায় (৮ই ফাল্গুন) প্রকাশিত অংশে কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ল। (১) নটসূর্য বলেছেন ক্রাউন সিনেমায় রাধা ফিল্মসের "বিষবৃক্ষ" মুক্তিলাভ করে এবং তিনি নগেন্দ্রনাথ রূপে অবতীর্ণ হন। তথ্যটি ভুল। বিষবৃক্ষ ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করে এবং নগেন্দ্রনাথের ভূমিকায় ছিলেন লোকান্তরিত জহর গঙ্গোপাধ্যায়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, পরিচালনায় ছিলেন ফণী বর্মা। কুন্দ-কানন দেবী। দেবেন্দ্র—কুমার মিত্র। সূর্যমুখী—শান্তি গুপ্তা। ম্যাডানের নির্বাক বিষবৃক্ষে তিনি নগেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। (২) হার নিধি উত্তরা সিনেমায় মুক্তিলাভ করে নি। করেছিল শ্রী সিনেমায় ১লা মে, ১৯৩৭। (৩) শশিনাথ পরিচালনা করেছিলেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে এটি যুগ্ম পরিচালিত ছবি—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কর্মযোগী রায় একত্রে।

অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত
কলিকাতা—২৬।

পূর্ব বাংলার সাহিত্য

৯ম বর্ষের ৩৮ এবং ৪১ সংখ্যাতে 'অমৃত'তে আপনারা শ্রীসাংবাদিক লিখিত 'পূর্ব বংলায় রবীন্দ্রচর্চা' এবং শ্রীপবিত্র সরকার রচিত 'যে বই ওদেশে নিষিদ্ধ হল' এই দুটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কারণ, পূর্ববঙ্গের প্রায় কোন খবরই আমরা পাই না। এই অবস্থায় আপনারা উক্ত নিবন্ধ দুটির মাধ্যমে পূর্ব-বাঙলার যেটুকু সাহিত্যিক, সামাজিক এমন কি রাজনীতিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দজনক।

অনেক ছোটখাট সাহিত্য পত্রিকা বর্তমানে কিছু কিছু পূর্ববঙ্গের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি প্রকাশ করছে। তা হলেও আপনাদের মত প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে তথ্য ও প্রবন্ধাদি পরিবেশিত হলে অধিকসংখ্যক লোক তা পাঠের সুযোগ পায়। তাই সর্বশেষে এই দুটি লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য 'অমৃত' সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে এই পত্র শেষ করছি।

বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সম্পাদক,
চিকরণ্ডজলা বিদ্যালয়,
জনাই, হুগলী।

বহির্বঙ্গে বাংলা চর্চার সংকট

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতের বাইরেও বাঙালী প্রচুর। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা যদি তাঁরা—না করেন তাহলে তার প্রধান দায়িত্ব তাঁদেরই, আর কারুর নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই স্থির করা হয়েছিল যে প্রতি প্রদেশে জনতার শিক্ষা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই হবে এবং রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী। বাংলা বা অন্য কোনো প্রদেশের নেতারা সেদিন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেননি। স্বাধীনতার পর যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রতি প্রদেশের নতুন সীমানার রচনা হল তখন কেবল বাঙালীরা নন, যাঁরা নিজের প্রদেশ ছেড়ে অন্য প্রদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে রয়েছেন, সবাইকেই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সুদৃঢ়রূপে বলতে পারি যে বাংলাদেশ থেকে দূরে থেকেও ইচ্ছা থাকলে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করেও অবসর সময়ে মাতৃভাষার চর্চা করা যায়। আমি পুরুষানুক্রমে পাঞ্জাবের (লাহোর) প্রবাসী বাঙালী। তবু প্রধানুসারে বাংলায় হাতেখড়ি হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রচলিত শিশু সাহিত্য এবং 'মৌচাক', 'রামধনু', 'শিশুসাথী' 'খোকাখুকু' প্রভৃতি ও পরে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা' ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা শিখেছি। সুদূর লাহোর থেকে বাংলাদেশের পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছি এবং অনাদৃত হয়নি। ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী একসঙ্গেই শিখেছি; পরে এই অঞ্চলে এসে গুজরাতী ও মারাঠী শিখেছি। কেউ ঘাড়ে চাপায়নি, স্বেচ্ছায় শিখেছি। কারণ যে প্রদেশে থাকব তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত বলেই মনে করেছি।

গত বিশ বছর যাবৎ দেখছি যে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে বাংলা বা অন্যান্য যে কোনো ভাষায় লেখাপড়ার চর্চা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। আধুনিক বেশভূষা সিনেমা ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদে তাঁরা যত ব্যয় করেন তার অংশমাত্র ব্যয় করে তাঁরা যদি নিয়মিত বাংলা পত্রিকা ও বই কেনেন তাহলে বাঙালীর গৃহে বাংলা বিস্মৃত হবে না। মা বাপ যদি বিরাগী হন তাহলে

চিঠিপত্র

অন্যান্যরা অনুরাগী হবে কেমন করে? যাঁরাও বা কিছু কেনেন তাঁরা অধিকাংশই চটুল সিনেমা পত্রিকাই কেনেন, বা লাইব্রেরী থেকে হাল্কা সাহিত্যের বই পড়েন। নববর্ষ, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দায়সারা গোছের কয়েকটি নাটক অভিনয় করে ও কিছু অপটু নৃত্যগীতের দ্বারা বাঙালী সংস্কৃতি রক্ষা করেন। ফলে মননশীল প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা এখন মুষ্টিমেয়।

হিন্দীর প্রতি এত আক্রোশ যে একাধিক ভাষার চর্চা সম্বন্ধে আমাদের এত অনীহা কেন তাও বুঝি না। অর্ধমাগধী থেকেই তো বাংলার উৎপত্তি। তার উপর প্রথমে পড়েছে মোগল-পাঠান শাসন যুগের ফার্সী, আরবী, উর্দুর প্রভাব। দ্রাবিড়ের মত উত্তর ভারতের কোনো ভাষাই বাংলার অনাত্মীয় নয়। মোগল যুগে বাঙালী চোগা চাপকান পাগড়ী পরেছে, ফার্সী পড়েছে, এবং সেই সময়েই বাংলা ভাষা গড়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের গোড়া পত্তন ঘটেছে। ইংরাজের আমলে ইংরাজী পড়েছে, ওদিকে দেড়শো বছরের অনুশীলনে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিও উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছে। তা হলে এখন স্বগোত্রীয় ভাষা হিন্দীর প্রভাবে বাংলা বিলীয়মান হবে কেন?

আসল কথা, গত তিন দশকে আমাদের সাধারণ শিক্ষার মানের অবমূল্যায়ন হয়েছে। একাধিক ভাষার চর্চা করবার মত আগ্রহ নেই। হিন্দী, বাংলা এবং সব ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু মান কমেছে। বাজে কবিতা, গল্প, উপন্যাস বস্তাবন্দী হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু চিন্তার খোরাক যোগাবার মত রচনার লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের অভাব ঘটছে। সেজন্য ইংরাজীকে আমরা সরাতে পারব না, এবং বাহুল্যবিড়ম্বিত চাকরিকামী জীবনধারা এমন খাতে বইতে আরম্ভ করেছে যে একটিমাত্র ভাষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী হতেও আমরা অক্ষম হয়ে পড়ছি।

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়,
আমেদাবাদ—১।

মনের কথা

আপনার পত্রিকায় সম্প্রতি 'মনের কথা' শীর্ষক যে ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তা পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। মনোবিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান ও জটিল তথ্য এতে সংযোজিত হয়েছে অথচ পড়তে রসসিক্ত গল্পের মতই সুখপ্রদ। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর মানসিক যন্ত্রণা ও তার অবচেতন সত্তার কার্যকলাপ এতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। রোগীর মানসিক অবস্থা চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাখ্যা দেওয়ায় পাঠক সাধারণের রোগীর মনোবস্থা বুঝবার সুবিধা হয়েছে। রোগীদের অদ্ভুত আচরণ প্রকাশের সঙ্গে এর ব্যাখ্যা দেওয়ায় মনে হয়েছে এরা আমাদের কত কাছের মানুষ। তাদের মনের সঙ্গে আমরা অতি অন্তরিকভাবে পরিচিত হচ্ছি।

রজতকান্তি চক্রবর্তী,
সোনাই রোড, শিলচর-৫,
কাছাড়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা "অমৃতে"র আমি একজন ভক্ত পাঠিকা, এবং আমার বাবা পত্রিকাটির গ্রাহক। অন্যান্য নানা প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির মত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বিভাগটি আমার কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই বিভাগটির মাধ্যমে নতুন বই, পত্রপত্রিকা, প্রভৃতির পরিচয় পেয়ে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আমার একটি অনুরোধ আছে—আমি শিশুদের উপযোগী নাটক সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক আমি খুব বেশী সংগ্রহ করতে পারিনি, যদি আপনার এই পত্রিকার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা অথবা স্বয়ং অভয়ঙ্করের কলম থেকে কিছু জানতে পারি তাহলে উপকৃত হব। আমি জানতে চাই, শিশুদের উপযোগী যে সমস্ত নাটক বাংলা সাহিত্যে রয়েছে তার লেখক ও প্রকাশকসহ পুস্তকগুলির নাম কি?

আশা করি আপনি আমার চিঠিটি প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করবেন। নমস্কার রইল।

স্বপ্না দাস।
মেদিনীপুর।

অন্ধকারের মুখ

আমি আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা মারফত একটি বক্তব্য পেশ করতে চাই। আশা করি চিঠিপত্র বিভাগে আলোচ্য বক্তব্যটি প্রকাশিত করবেন।

অমৃতে ধারাবাহিকভাবে আমি দেবল দেববর্মা রচিত 'অন্ধকারের মুখ' নামক উপন্যাসটি পড়ে আসছি। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক গুপ্তরস আছে। লেখকের এই প্রচেষ্টার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অমৃতের কর্তৃপক্ষকেও এজন্যে ধন্যবাদ জানাই, এবং এইরকম উপন্যাস প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

উত্তম সরকার,
ধূপগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

ক্রন্দসী কলকাতা

২৭শে ফেব্রুয়ারীর অমৃতে শ্রবণকের চিঠি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। শ্রীসুশীলকুমার সেনের চিঠির বক্তব্যের খণ্ডনে তাঁর যুক্তিগুলি অসার ও অসংগত। তিনি সুশীলবাবুর চিঠির বক্তব্যকে 'কটাক্ষ' (কটাক্ষ—'তীব্র সমালোচনা'—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) বলেছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন তাঁর 'বেতার-শ্রুতি'র প্রায় সবটাই 'কটাক্ষ'। উচ্চারণ বিকৃতি, স্বরের শ্রুতিকটুতা, ঘোষকের অসতর্কতা ঐসবই তাঁর লেখার অর্ধেকাংশ জুড়ে থাকে।

সুশীলবাবুর 'কটাক্ষ' তাঁকে বিচলিত করেছে দেখে অবাক হলাম। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে শ্রবণক বলেছেন, 'চলন্তিকা' অনেকের হাতের কাছে থাকে। কিন্তু এ অনুমানের ভিত্তি কোথায়? আমি অনেককে জানি যাঁরা ঐ অভিধানটি যথেষ্ট মনে করেন না, এবং তাঁরা পণ্ডিত না হলেও মূর্খ নন। দ্বিতীয়ত শ্রবণক বলেছেন, 'ক্রন্দসী' কথার পরে 'কবিপ্র' লেখা আছে। ঠিক কথা, কিন্তু তা আছে আশুতোষ দেবের 'নূতন বাঙ্গালা অভিধানে'। কাজী আবদুল ওদুদ ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষের 'ব্যবহারিক শব্দকোষে' 'কবিপ্র' নাই। শ্রীশ্রবণক এই সত্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। আশুতোষ দেবের অভিধান ও ব্যবহারিক শব্দকোষের সময়ের ব্যবধানও আট বছরের। আট বছর আগে যা কেবল কবি-প্রয়োগ মাত্র ছিল, তা কালক্রমে বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। ভাষার সজীবতাই তার কারণ, তা ছাড়া আছে Usage-এর দাবী। জলপাই আলু বোঝবার কথা শ্রবণক বলেছেন। জানতে ইচ্ছে করে 'অমৃত ফল' ও 'শ্রীফলে'র সঙ্গে যথাক্রমে অমরত্ব বা শ্রীদেবীর কি যোগাযোগ? শ্রবণকের উপদেষ্টা পণ্ডিতগণ 'ক্রন্দসী'র 'রোরুদ্যমানা' অর্থ গ্রহণে অরাজী ভালকথা। পণ্ডিতদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আমরা 'সাধনাতীত' না লিখে 'সাধ্যাতীত' লিখি, 'অজ্ঞলোকের জ্ঞানার্থে' না লিখে 'জ্ঞাতার্থে' লিখি, 'আর্থনীতিক উন্নতির' পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক উন্নতির' চেষ্টা করি, 'অধীন কর্মচারীর' আর্জি খারিজ না করে 'অধীনস্থ কর্মচারীর আর্জি' খারিজ করি। 'লিস্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।

লোকেশরঞ্জন গুহ,
রাজপুর, ২৪ পরগণা।

শাদা চোখে

নতুন পরিবহনমন্ত্রী হারুণ-অল-রশীদের মত রাজ্য পরিবহনের কেন্দ্রীয় কর্মশালায় সেদিন হাজির হয়ে সকলকে শুধু হতচকিত করেন নি, একজন কর্মীর কৈফিয়তও তলব করেছেন। কারণ, একটি বাস নাকি নড়বড়ে চাকা নিয়ে দৈনন্দিন পরিক্রমায় রাস্তায় বেরুচ্ছিল। আর চললেই দুর্ঘটন—তাই এই কৈফিয়ৎ। পরিবহনমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে সবিনয়-নিবেদনমিতি,—বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় একটি স্টেট বাসে করে সমদর্শী শ্যামবাজারের দিকে আসছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল সামনের চাকার একটি রিঙ তীব্রবেগে প্রায় বিশ গজ দূরে ছিটকে গেল—আর চাকাটা বায়ুশূন্য হয়ে গেল। ফলে বাস চলল না। যাত্রীরা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বটে,—কিন্তু বাসের ভাড়াটা মার গেল। কারণ আর একটি সরকারী বাস কখন আসবে একথা কেউ বলতে পারলেন না। অতএব, চোরের উত্তম-মধ্যম হজম করার মত মানসিকতা নিয়ে যাত্রীরা সকলেই অন্য যান-বাহনের সন্ধানে চলে গেলেন।

আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে ঘটনাটা নিতান্তই মামুলী। কারণ, দুর্ঘটনা ঘটে যতক্ষণ না ১০।২০ জন যাত্রী হাসপাতালে শয্যা গ্রহণ করছেন বা দু-একজন এই সুন্দর ভুবন থেকে বিদায় নিচ্ছেন, ততক্ষণ, অন্তত আজকের সমাজব্যবস্থায়, এর কিছু মূল্য নেই। এবং তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি, বা নিদেনপক্ষে কোন গুণী ব্যক্তির কিছু অঘটন না ঘটলে কোনো বিধান-সভার মাননীয় সদস্যও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ দেখাবেন না। কত হারে-নারে-শঙ্করা ত অহর্নিশ প্রাণ হারাচ্ছে। তার জন্য কেউ মাথা ঘামিয়ে তাঁর অমূল্য সময়ই বা নষ্ট করবেন কেন?

তবুও ঘটনাটা উল্লেখ করলাম। কারণ এর সঙ্গে অর্থনীতির মৌল প্রশ্ন জড়িত। আর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার একটি নজীরও বটে। সকলেই জানেন, রাজ্য পরিবহনের প্রতিটি বাস-পিছু কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন। অর্থাৎ পাঁচজনকে নিয়ে যদি একটি পরিবার ধরা হয় তবে প্রায় শতাধিক লোকের মাসিক ভরণ-পোষণ এই একটি বাসের আমদানী থেকেই হয়। কিন্তু এ ও সকলের জানা আছে যে, সরকারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এবং সেই সরকারী টাকা নিশ্চয় আম-জনতার কাছ থেকেই আসে। এই ২২ ব্যক্তি সরকারী বাসের তদারক করে এই যানগুলির জান কোন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যাত্রী মাত্রই তা অবগত আছেন। বেশীর ভাগ বাসেরই তবু গালভরা নামগুলো অক্ষত অবস্থায় সামনে ঝুলছে। অভ্যন্তরের অবস্থা দেখলে বোবারও কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে। কাজেই বলছিলাম, এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে কেন? কৈফিয়ৎ তলব করেছেন, খুবই আশার কথা। কিন্তু দোষীকে সাজা দেওয়া সম্ভব হবে কি? উত্তর পাওয়া শক্ত। কারণ তা করলে বিলক্ষণ বিপদ। মেহনতী মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ সঙ্ঘবদ্ধ শোষিত জনতা সহ্য করতে প্রস্তুত হবে না। দীর্ঘদিন তাঁদের উপর অত্যাচার হয়েছে। কাজেই এখন আর তা চলবে না। ফ্রন্ট এখন তাঁদের হাতিয়ার। অতএব, হাতিয়ার কি করে বহনকারী রণদুর্মদ মালিকের উপর আঘাত হানবে! আশ্চর্যের কথা নয় কি?

জ্যোতিবাবুর 'জনগণ' ও অজয়বাবুর 'সুপ্রীম কোর্টের' বিচারকরা ইতিমধ্যেই শুনেছেন এই কর্মীবৃন্দের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতন বৃদ্ধির দাবীর কথা। আপনারা হয়ত এও অবগত আছেন, এঁদের বেতন বৃদ্ধিও হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে সমদর্শীর জিজ্ঞাসা, আপনারা কেউ কি শুনেছেন এই মেহনতী মানুষের নেতৃবৃন্দ একদিনও ঘুণাক্ষরে কর্মীদের উদ্দেশ্য করে সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাতে? আপনারা কেউ কি সংবাদপত্রে একটিও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি দেখেছেন, শ্রমিকদের কোমর বেঁধে উৎপাদন-এর কাজে মনোনিবেশ করার জন্য উপদেশ দিতে বা আহ্বান জানাতে। হয়ত যেখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের কারখানায় শ্রমিকরা কাজে নিযুক্ত সেখানে না হয় এই উপদেশ দিতে তাঁরা অপারগ। কিন্তু যে সমস্ত শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরি-চালনাধীন (কেন্দ্রেরও নয়), সেই সমস্ত শিল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম করবার জন্য নির্দেশ কোন নেতা আদ্যাবধি দিয়েছেন কি? শ্রমিক নেতারা প্রায়শই বলে থাকেন, অন্তত সরকারকে আদর্শ মালিক হতে হবে। চরিত্রগত বিচার-বিবেচনায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ত অন্তত কেউ একচেটিয়া পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক বলে চিত্রিত করার সাহস রাখবেন না। আর, এক বৎসর গদীতে থাকাকালে রাজ্য সরকারী কর্মচারী-দের বেতন খুব কম বেড়েছে একথাও নিশ্চয় কেউ বলবেন না। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজকর্ম চলছে কি? কেউ কেউ হয়ত সমদর্শীকে গালি-গালাজ করতে কসুর করবেন না। হয়ত বলবেন, মশায় আপনার এত বুকে জ্বালা কেন? আমি বলব আপনাদের জন্যই। কারণ, আপনারাই ত প্রলেতেরিয়ান রেভল্যুশানের ভ্যানগার্ড!

যে মার্কসবাদ নিয়ে সদাসর্বদা চর্চার কথ শোনা যায়—সেই মহামনীষী মার্কস থেকে শুরু মহান লেনিন, স্তালিন এবং মাও-সে-তুঙ পর্যন্ত সকলেই শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর আন্দোলনকে নির্ভেজাল 'ইকনমিজম'-এ রূপান্তরিত করা সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বেতন বৃদ্ধি যে আখেরে 'লেবার ব্যুরোক্রেসি' স্থাপনে সাহায্য করে এ সম্পর্কেও গুণীরা নিশ্চয়ই একমত হবেন। আপনাদের অবগতির জন্য পেশ করছি, সাংহাই ও ক্যান্টনের কয়েকটি ঘটনা। মহান মাও-এর চীন দেশে ঐ দুই শহরের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখিয়ে হোক বা আলো-চনার মাধ্যমেই হোক কিছু মজুরী বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল মজুরী বৃদ্ধির অনুপাতে সেখানে উৎপাদন বাড়ে নি। চীনা কর্তৃপক্ষ তখনি শ্রমিকদের এই সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, উৎপাদন যদি না বাড়ে মনে রাখবেন রাষ্ট্রের হাতে আজ ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ উৎপাদন যদি না বাড়াতে পারেন তবে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। শুনে হয়ত অনেকে আতঙ্কিত বোধ করবেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে কী অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তা ভেবে দেখুন। উৎপাদন যদি না বাড়ে তবে বাড়তি বেতন আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয় রাষ্ট্রকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে কর্মচারীদের প্রাপ্য মেটাতে হবে। আর সেই রাষ্ট্রের অর্থ কে জোগাবে? জনগণকেই করের বোঝা চাপিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতএব, একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য অন্যজনকে যদি করভারে জর্জরিত করে তার জীবন-মানকে বিপর্যস্ত করতে হয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? সমাজবাদের সংজ্ঞার মধ্যে এর কোন টীকা টিপ্পনি আছে কি? তাই চীন কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে অন্য ক্ষমতার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এ বক্তব্য স্মরণ করেই চাকা-খোলা স্টেট বাস প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলাম। সেই বাসটি যদি ভালভাবে পরীক্ষা করার পর রাস্তায় বের হত তবে কি দিনের অবশিষ্ট অংশের জন্য অকেজো হতে পারত। আর এই যে অলসভাবে সময় কাটিয়ে দিয়ে বেতনটা গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থটা কে যোগান দেয়? জনতা নয় কি? সরকারকে যখন আইডিয়াল এমপ্লয়ার হওয়ার [illegible] বলা হয় কর্মচারীরা আইডিয়াল [illegible]র কথাটা ভাবেন না কেন? সমদর্শীর বক্তব্যটা সেখানে। আসলে বাস্তবে যা হচ্ছে তা শ্রেণীসংগ্রামের প্রস্তুতি না গড়ে লেবার ব্যুরোক্রেসির ক্ষেত্র তৈয়ার করা হচ্ছে নাকি? যে কোন রাজ্য সরকারী কর্ম-সংস্থার কর্মীবন্ধুদের দায়িত্ব এখন অনেক বেশী। যদি তাঁরা মার্কসবাদ, লেনিনবাদের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন তবে তাঁদের পক্ষে গাফিলতি করা মোটেই উচিত নয়।

হালফিল আপনারা দেখছেন, কি সওদাগরী অফিসের কর্মচারী, কি রাজ্য সরকারের কর্মচারী, সকলেই এখন যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য যাঁরা চক্রান্ত করছেন বলে ধরে নিয়েছেন তাঁদের অর্থাৎ সেই চক্রান্তকারী-দের আতঙ্কিত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন। খুবই ভাল কথা। কারণ, কর্ম-চারীদের রাজনৈতিক অধিকারও আছে। শুধু বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে নিজেদের শক্তিকে সীমিত না রেখে তাঁরা ফ্রন্টকে বাঁচাবার কাজেও অগ্রণী হয়েছেন। আরও

লক্ষ্য করে থাকবেন, কৃষকের ধান রক্ষার জন্যও তাঁরা সরকারকে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। শহরের খেটে-খাওয়া মানুষ আর গ্রামের শোষিত মানুষের লড়াই যদি একাত্ম হয়ে যায়, তবে মুক্তি যে অত্যাসন্ন একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শহরের খেটে-খাওয়া মানুষগুলির মধ্যে, অর্থাৎ যাঁরা দপ্তরে-দপ্তরে কর্মরত তাঁদের মধ্যে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা গ্রামে জমির অধিকারী। কর্মচারী ছাড়া আছেন ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনীয়ার ও ব্যবসায়ী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছেন 'অনুপস্থিত জমি-মালিক'। এবং এও লক্ষ্য করে থাকবেন, আদর্শের লেকচার দিতে আমরা আঁতেলেকসুয়েলরা মোটেই কার্পণ্য করি না। কিন্তু আমরা কি কেউ একথা চিন্তা করেছি যে, আমরা তাঁরাই যাঁরা গাছেরও খাচ্ছি আর তলারও কুড়োচ্ছি। আমরা শহরে মাইনে বাড়িয়ে নিচ্ছি, আবার জমির ফসলও সংগ্রহ করে বারো মাসে তের পার্বণের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। 'শোষিত মানব সমাজের মুক্তিকামী যোদ্ধা আমি' এগিয়ে এসে ত এখনও একথা ঘোষণা করে বলিনি যে, 'আমি যখন কর্মের বিনিময়ে শহরে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছি, তখন আমার গ্রামের জমি তোমরা যারা ভূমিহীন তাদেরই মধ্যে বিতরণের জন্য রাজ্য সরকারের হাতে আমি অর্পণ করলাম?' পশ্চিম বাংলায় প্রগতিশীল আন্দোলনের অভাব নেই। প্রগতিবাদী নেতারও অভাব নেই। কিন্তু কেউ কি অদ্যাবধি শুনেছেন এমনি একজন নেতা এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ধরনের কথা ঘোষণা করেছেন? অনেকে হয়ত বলবেন, আমাদের নেতাদের কারও অবস্থা সে রকম নয়। কিন্তু সমদর্শী চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে, এরকম নেতা বেশ কিছু আছেন। কর্মী ত অঢেল। মুখে যতই বলা হোক না কেন, শ্রেণীচরিত্র বদলানো অত সহজ নয় বলেই অদ্যাবধি এরকম ত্যাগী কর্মী ও নেতার অভাব ঘটেছে। কাজেই কৃষকের ফসল রক্ষার আন্দোলনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্পত্তি রক্ষার পরোক্ষ কৌশল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর ২৫ একর জমি পর্যন্ত যখন আইনের আওতার বাইরে আছে তখন আর পায় কে? যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও আমার অনুরোধ আইন করুন, যাঁরা চাকরী করছে তাঁরা বাসস্থানের জন্য তিন কাঠা কি পাঁচ কাঠা জমি ছাড়া আর কোন ভূসম্পত্তি রাখতে পারবেন না। অন্তত আপনারা যাঁরা বামপন্থী বলে গর্ব অনুভব করেন আপনারা এই মহাযজ্ঞের হোতা হয়ে কাজ শুরু করুন। দেখবেন, সারা ভারতবর্ষে বিপ্লবের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মানুষের রথচক্র সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে পরাস্ত করে অভীপ্সিত পথে এগিয়ে যাবে।

তাই সরকারী কর্মচারীদের কাছে নিবেদন করছিলাম, আপনারা কৃষকের ধান রক্ষার আন্দোলন আগে না করে সরকারী লালফিতার বন্ধন থেকে জ্যোতিবাবুর 'জনগণ' ও অজয় মুখার্জির 'সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের' অভিযোগগুলির মুক্তিআন্দোলনে ব্রতী হন। তাহলেই যুক্তফ্রন্টকে সত্যিকারের সাহায্য করা হবে। একথা মনে করবেন না, আপনাদের উপদেশ দেওয়ার ঔদ্ধত্য সমদর্শীর আছে। আবার বলছি, আপনারা প্রোলেতেরিয়ান রেভল্যুশনের ভ্যানগার্ড বলেই আপনাদের কাছে নিবেদন করছি মাত্র।

আবার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের বিপ্লবী নেতৃত্ব দেবে কে? পশ্চিম বাংলায় এখন যুক্তফ্রন্ট চলছে। ফ্রন্টের আলোচনা যত কম করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ, ৩২-দফা নামে যে কর্মসূচী আছে তা উপরিবর্ণিত বক্তব্যের ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। তবুও যেটুকু জনকল্যাণমূলক আছে তা বাস্তবে রূপায়িত করবে কে? মন্ত্রীরা একে অপরের দাঁত ফেলে দিতে যেখানে কোমর বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে কিই-বা আশা করতে পারা যায় বলুন।

বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার নিজেরাই অহর্নিশ তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করে চলেছেন। অবশ্য, আমি আপনি যদি এই দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করি তাঁরা আমাকে আপনাকে চক্রান্তকারী বলতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। তাঁরা বলছেন, বেশীর ভাগ প্রশ্নেই তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। শুধু একটা বিষয়েই

এখন পর্যন্ত যা গরমিল। সেটা হচ্ছে পুলিশ বিভাগের উপর খবরদারী করার জন্য থানা-ভিত্তিক কমিটি গঠন। বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আই এই প্রশ্নের উপর সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু এই কমিটি গঠিত হলেই শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ হবার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারেন কি? যে কোনো আইনকে মানা বা কেন নীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সঠিক পথে চলা, সেটা সম্পূর্ণ মানসিকতার উপর নির্ভর করে। কাজেই কোনো বিষয় কেউ সাময়িকভাবে মেনে নিলেও সব সময়ে সেই নীতিই অনুসৃত হতে পারে না। হবেও না। কারণ, যদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখা যাবে, শ্রেণীসংঘর্ষ বলুন আর শরিকী লড়াই বলুন, কিম্বা গণকল্যাণের কাজই ধরুন, সমস্তই নির্বাচনমুখী প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ঝানু পার্লামেন্টেরিয়ানদের কায়দায় সমস্ত আন্দোলনকেই বিন্যাস করা হচ্ছে। কোনো সমস্যার মূলে আঘাত না করে আলতোভাবে সমস্ত কিছুকে সমাধানের পোঁচ লাগিয়ে আপাতজনপ্রিয়তা লাভ করবার কৌশলই অবলম্বিত হচ্ছে। কাজেই আদর্শগত মতপার্থক্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ক্যাডারদের মানসিকতা বজায় রেখে এসেম্বলি দখলের প্রচ্ছন্ন অভিযানের মধ্যেই বর্তমান যুক্তফ্রন্টের সংকট। এবং হয়ত শ্রমিকদের কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার কথা বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয় না।

—সমদর্শী

নেপাল যুবরাজের বিয়ে উপলক্ষে কাঠমণ্ডুতে আগত কমিউনিস্ট চীনের প্রতিনিধি মিঃ কুও-মো-জো ১লা মার্চ ভারতীয় দূতাবাসে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে করমর্দন করছেন। রেডিও ফটো।

দেশে বিদেশে

ভারত সরকারের নবনিযুক্ত রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ তাঁর দপ্তরের জন্য পার্লামেন্টে যে বাজেট পেশ করেছেন তা তাঁর নিজের দলকে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। সমস্ত বিরোধী দল যেখানে এই বাজেটের বিরোধিতা করার জন্য কৃতসংকল্প সেখানে এই বাজেট পাশ করানোর চেষ্টার অর্থ হচ্ছে সরকারের পতন ঘটানোর ঝুঁকি নেওয়া। শাসক দলের দিক থেকে একথা বুঝতে দেরী হয় নি। দলের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় ও সাধারণ সভায় রেলওয়ে মন্ত্রীর উপর চাপ দেওয়া হয়েছে বাজেটে বাড়তি ভাড়ার যেসব প্রস্তাব তোলা হয়েছে সেগুলি থেকে দরিদ্র জনসাধারণকে রেহাই দেওয়ার জন্য—এবং, সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে, শ্রীনন্দ হয়ত এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী ও ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব থেকে রেহাই করবেন।

পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখার জন্য শাসক কংগ্রেসকে কিভাবে মানিয়ে চলতে হচ্ছে তার একটি নমুনা পাওয়া গেল পার্লামেন্টের অধিবেশনে একটি বিলের আলোচনার সময়। সম্পত্তি হুকুম দখল করার অধিকার সংক্রান্ত এই বিলে স্বতন্ত্র দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বিলের মেয়াদ সম্পর্কে একটি ধারা শাসক দলের সমস্যরা নিজেরাই ভোট দিয়ে বাতিল করলেন।

শাসক দলের পক্ষে আর একটি দুঃসংবাদ এই যে, মধ্যপ্রদেশের শুক্ল মন্ত্রিসভা দলের ভিতরে অন্তর্বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই মন্ত্রিসভার আয়ু আর কত দিন সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে। সেখানে বিধানসভার জনকংগ্রেস দলের সাতজন সদস্য কোয়ালিশন সরকারের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকী দিয়েছেন। উত্তর-প্রদেশে নয়াকংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী জানিয়েছেন যে, তাঁ[illegible] যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শ্রীচরণ [illegible]ের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে আগ্রহী।

বিদেশের বড় খবর এসেছে লাওস থেকে। সেখানে প্যাথেট লাও বাহিনী 'প্লেন অব জারস' দখল করে নিয়েছেন এবং লাওসের উত্তরাংশে তাঁদের বিজয় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার কোন কোন সদস্য আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে লাওসে ভিয়েতনামের ধরনের দ্বিতীয় আর একটি যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চলেছেন।

রেলওয়ে বাজেট

২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে পার্লামেন্টে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ১৯৭০-৭১ সালের জন্য রেলওয়ে বাজেট উত্থাপন করার সঙ্গে-সঙ্গে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সদস্যদের মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দুই কম্যুনিস্ট পার্টি সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোষণা করে যে, তারা যাত্রী ভাড়া বাড়াবার চেষ্টার বিরোধিতা করবেই। কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী এস এ ডাঙ্গে বলেন যে, বাজেট প্রস্তাব সম্পূর্ণ

অযৌক্তিক। তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, শহরতলী থেকে যাঁরা ডেইলী প্যাসেঞ্জার হিসাবে ট্রেনে যাতায়াত করেন তাঁদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় করতে গেলে 'অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য'। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রী কে আনন্দন্ নাম্বিয়ার বলেন যে, তাঁর দল রেলওয়ে বাজেটের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। জনসংঘ দলের শ্রীবলরাজ মাধোক বলেন, এটা জনবিরোধী বাজেট। মুখে যে সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলেন তাঁদের আসল চরিত্র এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ফাঁস হয়ে গেছে এবং আগামী সাধারণ বাজেটে কি থাকবে তার একটা আগাম আভাষও এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। পুরানো কংগ্রেসের শ্রীমতী শারদা মুখার্জি বলেন যে, ভাড়া বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা আরও বাড়বে। নির্দলীয় নেতা আচার্য কৃপালনী বলেন, 'বিশেষ করে যে সরকার দিব্যি করে বলেন যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন তাঁদের ভাড়া ও মাশুল বাড়ানটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

এমন কি নয়া কংগ্রেসের কোন কোন সদস্যও এই সমালোচনার ঐকতানে যোগ দিতে ছাড়েন নি। শ্রীকে আর গণেশ বলেন যে, সাধারণ মানুষ যেখানে কিছুটা স্বস্তির আশা করছে সেখানে এই বাজেট তাদের আঘাত করবে। তাঁর মতে সমাজতন্ত্রের যে কথা বলা হয় তার সঙ্গেও এই বাজেট প্রস্তাবের মিল নেই।

শ্রীনন্দ যে বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বের দরুণ তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটের ভাড়া বাড়বে ৮০ পয়সা—৯·৬০ থেকে ১০·৪০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটের ভাড়া বাড়বে ১·৭০ টাকা—১৬·৮০ থেকে ১৮·৫০, প্রথম শ্রেণীর টিকেটের উপর বাড়বে ২·৪৫ টাকা —২৯·০৫ থেকে ৩১·৫০ এবং এয়ার-কন্ডিশন কামরার টিকেটের উপর বাড়বে ৯·৭৫ টাকা—৫৪·২৫ থেকে ৬৪ টাকা। অধিকতর দূরপাল্লার ভাড়া বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম হবে। মেইল ও এক্সপ্রেস ছাড়া অন্যান্য সাধারণ ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটের ভাড়া ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়বে ১০ পয়সা করে। শহরতলী থেকে যাঁরা ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে ট্রেনে যাতায়াত করেন তাঁদের জন্য মান্থলি টিকেটের ভাড়াও বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রায় সর্বপ্রকার মাল বহনের জন্য রেলওয়ে মাশুল ২ থেকে ৭ শতাংশ বাড়াবার প্রস্তাবও দিয়েছেন শ্রীনন্দ।

শ্রীনন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, রেলওয়ের ভাড়া ও মাশুলের বিভিন্ন হারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটা সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই তাঁর প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বাজেট বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, তাঁর প্রস্তাবগুলি কার্যকর হলে ১৯৭০-৭১ সালে লভ্যাংশ বাবদ ১৬৭·০৯ কোটি টাকা বাদ দিয়ে ২২·৩৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। তৃতীয় শ্রেণীর

সম্প্রতি লাওসে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিকসংকট। অন্তর্বিপ্লবে এবং উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের আক্রমণে বিস্তৃত অঞ্চল এখন মুক্ত। ছবিতে দেখা যাচ্ছে জনৈক সরকারী সৈন্যকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভাড়া বাড়িয়ে ৮·২৫ কোটি টাকা বেশী আয় করা যাবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। সে জায়গায় প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির দরুণ আনুমানিক বাড়তি আয় হবে ২ কোটি টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট বিক্রী থেকে এখন রেলওয়ের মোট যে আয় হয় তার অনুপাতে ৩·৭ শতাংশ আর প্রথম শ্রেণীর টিকেট বিক্রীর মোট আয়ের অনুপাতে ৭ শতাংশ আয় বাড়বে বলে অনুমান করা করা হয়েছে।

ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবের সমর্থনে রেলওয়ে মন্ত্রী বলেন যে, যাত্রী ও মালের পরিমাণ স্বাভাবিকহারে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান ভাড়া ও মাশুলের হারে ১৯৭০—৭১ সালে রেলওয়ের আয় হবে ৯৮৩ কোটি টাকা অর্থাৎ চলতি বছরের তুলনায় ৩২·৫০ কোটি টাকা বেশী। আর সেই জায়গায় রেলওয়ে চালাবার খরচ বাড়বে ১৭·৯৪ কোটি টাকা, অবচয় রিজার্ভ ও পেনসন তহবিলের দরুণ খরচ বাড়বে ৫ কোটি টাকা করে এবং দেয় লভ্যাংশ বাড়বে ৮·৬৬ কোটি টাকা। একুনে নীট আয় যা হবে তার পরিমাণ দেয় লভ্যাংশ থেকে ১৬·৬২ কোটি টাকা কম হবে। অথচ, রেলওয়ের জন্য চতুর্থ পরি-

অভি-সন্ধি ?
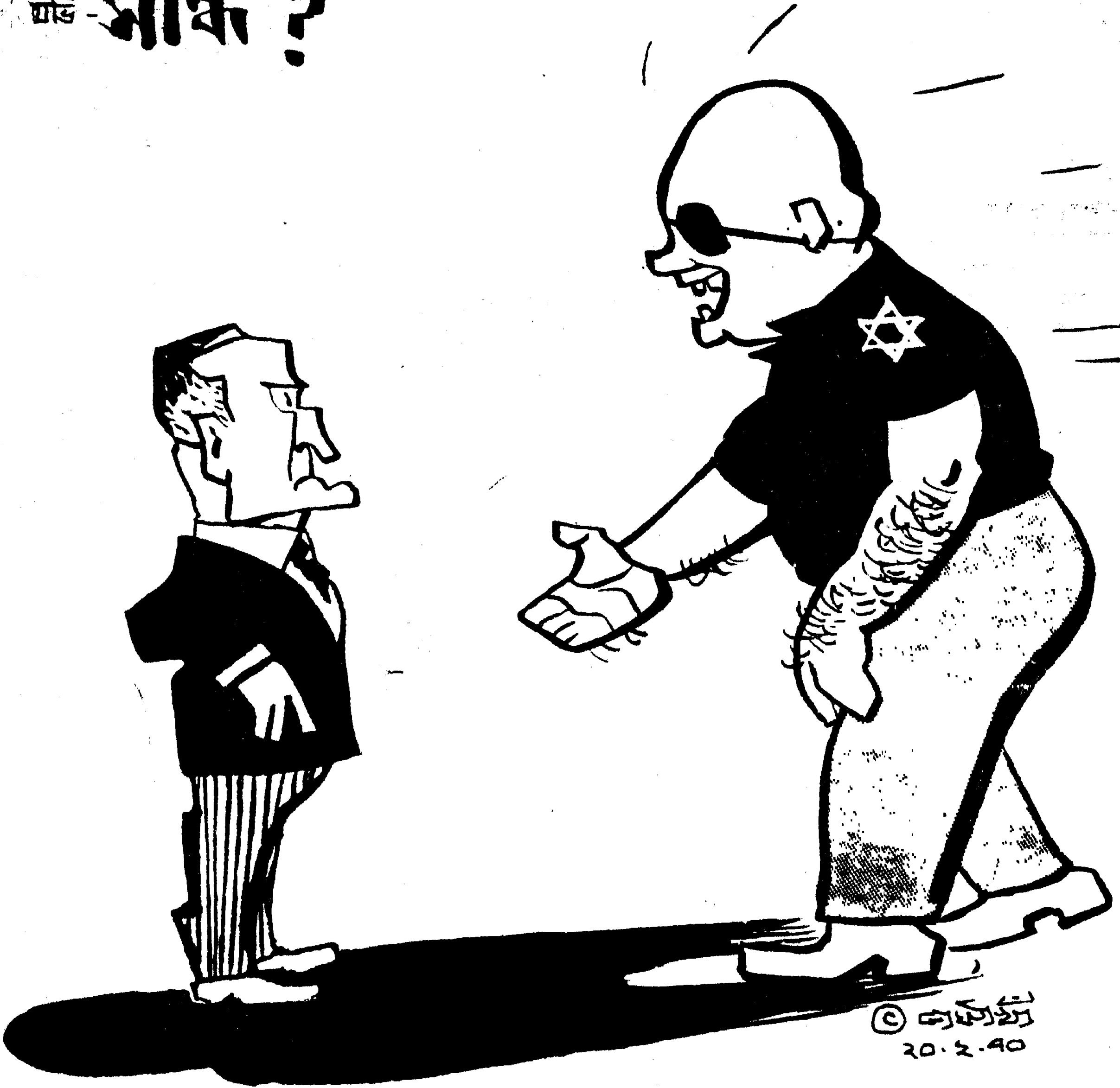
কল্পনা যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আগামী বছর রেল-ওয়ে বাজেটে ১৯·২৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে আর সেই টাকাটা উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে।

শ্রীনন্দ তাঁর এই বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর বিভিন্ন দলভুক্ত দুই ডজনের বেশী পার্লামেন্ট সদস্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একটি পত্র লিখে অনুরোধ করে জানালেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে এয়ার-কন্ডিশন কামরা ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করা হোক এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ে চালাবার খরচও কমান হোক। যে-সব পার্লামেন্ট সদস্য এই চিঠি লিখলেন তাঁদের মধ্যে শাসক কংগ্রেস দলের তিনজন সদস্যও আছেন। রেলওয়ে মন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন যে, কি কারণে তাঁকে ভাড়া ও মাশুল বাড়াতে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলো-চনায় বসতে ইচ্ছুক।

২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে শাসক দলের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক ও সাধারণ সভায়ও শ্রীনন্দের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা

বাজেটের প্রাক্কালে পার্লামেন্টে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষার যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির যে আবহাওয়া এখন দেশের মধ্যে রয়েছে ১৯৭০—৭১ সালেও সেই আবহাওয়া বজায় রাখতে হবে।

রিপোর্টে এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বাজারে যোগান ও চাহিদা দুইই বাড়বে এবং সরকারী ও বেসরকারী, উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে অনেক বেশী অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

সমীক্ষা রিপোর্টে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, চলতি বছরে অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে বার্ষিক শতকরা ৫ কি ৫·৫ হারে অগ্রগতি করা সম্ভব হবে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য-কেন্দ্র ভাবনা

গত সপ্তাহে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধি এক বক্তৃতায় এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর দল রাজ্যগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী। এই চিন্তাকে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে একটি শিথিল ফেডারেশনই হবে ভারতের সম্ভাব্য রাষ্ট্রকাঠামো। স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলোর সম্মতি ও সহযোগিতায় সেই ফেডারেশন কাজ করবে। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম দল এই রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য আন্দোলন করে যাবে বলে তিনি জানান।

ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা একটি যুক্তরাষ্ট্রের কথা বললেও কার্যত মজবুত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপনই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। রাজ্যগুলো সব দিক দিয়েই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রই হল পরিকল্পনার রচয়িতা এবং সাহায্যকারী। বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে। সেখানে রাজ্যসরকারের স্বার্থের প্রতি নজর রাখার ব্যবস্থা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও কর্তৃত্বেই পাবলিক সেকটরের প্রসার স্বীকৃত হয়ে আসছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও গত দুই দশকে কেন্দ্রই ভারতের রাষ্ট্রশক্তির মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। রাজ্যগুলোর সত্তা উপেক্ষিতই হয়েছে।

নবলব্ধ স্বাধীনতার পর এমন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু গত দশ-পনেরো বছরে রাজ্যগুলোতে সংহতিবোধের পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, জাতীয়তাবোধের স্থান নিয়েছে আঞ্চলিকতাবোধ, উদারতার পরিবর্তে সংকীর্ণতা। এই সত্য আজ অস্বীকার করে লাভ নেই। নেহরুর জীবনের শেষ দিকেই এই দুর্লক্ষণগুলো জাতির জীবনে দেখা দিতে শুরু করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির গতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা কতকগুলো রাজ্যসমষ্টিই দেখতে পাই। একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব প্রতি পদেই অনুভূত হয়। রাজনীতিজ্ঞরা বলবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতা অপরিসীম, কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাও তো অটুট। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেকটি সোভিয়েট স্বয়ংশাসিত কিন্তু মস্কোর ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। সত্য কথা। কিন্তু ভারতের মতো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় স্বাধীনতালাভের পর একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য অতীতে রাজনৈতিক কারণে সাধিত হয়নি। যা হয়েছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে। রাজনৈতিক সংজ্ঞায় ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হল বৃটিশ আমলে— পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতীয়রা নিজেদের রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি নেশন বা জাতি হিসাবে ভাবতে শিখল, অনেক ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করেন। এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে বৃটিশ আমলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় একতার সৃষ্টি। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল কিংবা ভগৎ সিং, আশফাকউল্লা শুধু বাংলাদেশ, পাঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেননি। তাঁরা ভারতবর্ষের জনাই ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের একতার প্রতীক। হিন্দু মুসলিম শিখ, খৃস্টান সকল ভারতীয়ই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের আত্মদানে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সুতরাং আজ ভারতকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে ভারতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে আমরা এক এক অঙ্গরাজ্যের সীমানার স্বয়ংশাসিত আঞ্চলিকতাকে বরণ করব কিনা তা ভাববার বিষয়।

অবশ্য শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা কোনো জাতির ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হতে পারে না। অর্থনৈতিক বিকাশে, সংস্কৃতি ভাবনায় সকলে সমপর্যায়ে উন্নীত হলেই জাতীয়তাবোধ প্রকৃতভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে তার অভাব থেকেই আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি। কোনো একটি ভাষা বা একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিলে বিরোধ বাধবেই। অর্থনৈতিক বিকাশেও কোনো অঞ্চল উপেক্ষিত থাকলে তার অধিবাসীদের মনে বিতৃষ্ণার ভাব জাগবে। ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ, বহু ধর্ম, বহু সম্প্রদায় নিয়ে আমরা একটি বৃহত্তর ভারতীয় জাতি। এই ঐক্যবোধ ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার জিনিস নয়। তলা থেকে প্রতিদিনের কর্মে, চিন্তায় এবং পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদানে সমপর্যায়ে এই ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সীমানা নিয়ে, শহর নিয়ে, নদীর জল বাঁটোয়ারা নিয়ে রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকবে। তাই তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগমের নেতা যে কথা বলছেন তা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসম্ভব না হলেও জাতীয় সমৃদ্ধি ও ঐক্যবোধের দৃষ্টিতে দেখলে ক্ষতিকারক।

রাজনৈতিক কারণেই আজ কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল। একদলীয় শাসনবাবস্থা অনেক রাজ্যেই আজ আর নেই। কেন্দ্রেও যে ভবিষ্যতে কোয়ালিশন হবে না একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু তাতে কেন্দ্রকে দুর্বল করার পরিবর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে অধিকতর সহযোগিতারই পথই উন্মুক্ত করবে বলে আমাদের ধারণা। কতকগুলো দুর্বল বিচ্ছিন্ন রাজ্য নিয়ে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন যেমন অসম্ভব, একটি পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক যোজনা ছাড়া তার রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কথাও বর্তমান জগতে চিন্তা করা যায় না।

পাহাড়ের দেয়ালে ॥

সমীর দাশগুপ্ত

আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে
একদিন সাঁওতাল পাহাড়ে বসে
ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা দেখছিলাম—
অবিশ্বাস্য ছোট ছোট হাত
আমার মেয়ের মতো তারা এলোমেলো খেলছিল
আমার চোখে মুখে চুলে।

সেদিন বীভৎস লেগেছিল
একটা বাচ্চা শুয়োরের
যন্ত্রণায় নীল চিৎকার
ছুরি দিয়ে আকাশের পেট চিরে-ফেলা
অসহ্য শব্দের ছবি
সাঁওতাল পাহাড়ের নিচে—
উপর থেকে দেখেছিলাম রক্তাক্ত উল্লাসে
এলোমেলো পাথর ছুঁড়ে মারছে কয়েকটা লোক।

তারপর আমার মেয়ের ফোঁটা ফোঁটা হাত আর দেখিনি
মানুষের হাত দেখছিলাম।
মনে পড়ে শুয়োরটা
পাহাড়ের দেয়ালে আটকা পড়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে
হঠাৎ লাফিয়ে পড়েছিল একটা লোকের গায়ে
তার কালো বুকে জবাসংকাশ রক্ত দেখেছিলাম—
মৃত্যুর নিরীহ হিংসা।

অথচ অস্থি গুঁড়ো হয়ে যাবে জানি
পাথরে হাতের নখ ভেঙে যাবে
পাহাড়ের দেয়ালে শেষবার ধরা পড়ে গিয়ে
ছুঁড়ে মারতে পারব না আমাকে সেদিন
মুখোমুখি লোকটার গায়ে, পারব না
হত্যার মন্ত্রকে করে তুলতে জবা—

আমার জটায়ু অঙ্গীকার।

তুমি ভাবছ ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

তুমি ভাবছ, আর কোনোদিন ফিরব না বলেই
আমি ঘর ছেড়ে একছুটে বাইরে এসেছি
তুমি ভাবছ, সব কিছু চুকিয়ে দিয়েই
আমি চলে যাবার জন্য চলে এসেছি
আসলে, সেরকম অসম্ভব জ্বলে ওঠা
আমার নিম্নবিত্ত রক্তে কুলিয়ে ওঠে না
তুমি তো জানই আমি ভিখিরীর অধম ভিখিরী
দু অঞ্জলি পেতে কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছি।

তুমি ভাবছ, আর কোনোদিন ফিরব না বলেই
সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে আমি বিদায় নিয়েছি
আসলে তোমার কাছ থেকে আমার ছবি ফেরৎ নেব
সেরকম পৌরুষ আমার কখনো সাজে না।
তুমি তো জানই আমি ভিখিরীর অধম ভিখিরী
অভিমানে ফোঁস করে উঠেছি কেবল
নেহাৎ কৌতুক করেও ডাকো যদি—
পোষা ময়নার মতোই তোমার কাছেই ফিরে যা

চিঠি ॥

কবিরুল ইসলাম

রৌদ্রে-নীলে আদিগন্ত আমার আশ্বিন
কালকেতু ধানের গুচ্ছে
শিশিরে-শিশিরে
সচ্ছল সংবাদ :
পথে ঘাটে মাঠে মাঠে, দ্যাখো, বিস্ফারিত
নীল রৌদ্র চিঠি :
ছুটির বাঁশিতে যেন সুনীলে-অনিলে
লুটোপুটি!

হে ডাকপিয়ন,
তুমি আশ্বিনে-আশ্বিনে
চিঠি এনো
আকাশে-বাতাসে,
চিঠি এনো
বাতাসে-বাতাসে :
নীল রৌদ্র চিঠি!

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

বয়স হলে ব্যক্তির মনে হতে পারে যে তার সত্তা বংশপরম্পরায় হারিয়ে যাচ্ছে, এমন কি সে একরকম হেরেও গেছে। হয়তো বিগত যুগের সত্যই তার চৈতন্যে প্রবল, সেই জীবন, সমাজ, আত্মীয়বন্ধুতেই কিঞ্চিৎ বেশি তৃপ্ত তার ভাবনাচিন্তা ঃ আর সে ভাবনা

তার অন্তহীন, পদ্মার স্রোতের মতো
চরে চরে, কিংবা দূর শিখরের ঢলে
সচল অথচ স্থির; দেখি অবিরত
চেনা মুখ, আধ-চেনা শরীর বা মনও,
শরীর ও মন, সচেতন নিঃসঙ্গের ঘরে
অদৃশ্য গলায় বলে ঃ যাব না, যাব না।

অথচ সে-দেশ নেই, এই কালান্তরে
কলকাতা অচেনা, অপহৃত, অপসৃত,
সে পৃথিবী চ'লে গেছে, রয়েছি আধৃত
আমরা কয়েকজনা শুভ্র শূন্যে চরে,
দুপাশে ফেনিল ঢেউ, রৌদ্রাক্ত আদরে।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি শিল্পী ও সাহিত্যিক হন এবং জীবন্ত হন তাহ'লে তো তাঁকে টানাপোড়েনের মধ্যেও সমসাময়িক বাধ্যতই থাকতে হয়। এবং সাহিত্যিকের চোখে সমসাময়িক সমাজ সবসময়েই বোধহয় জিজ্ঞাসায় পরিগ্রহণে উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্তিতে বিদ্রোহে কমবেশি চঞ্চল্যকর, অথচ সাহিত্যিক তো এই মিশ্র সমাজেরই ভবিষ্যতোন্মুখ অথবা অতীত-নির্ভর সরব সরিক।

অবশ্য সামাজিক গতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ জীবনযাত্রার বিন্যাসে ও মানসে জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীসাহিত্যিকের পক্ষে তার সমসাময়িক সমাজ যেমন উত্তেজনার মাত্রায় তেমনি নিত্যপরিবর্তনশীল জটিলতায় বিভ্রান্তিকর না হোক উদ্‌ভ্রান্তিকর বটে। কিন্তু বৃহৎ বিবেচনায় এ ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের জীবদ্দশায় বেশ আগে থেকেই, কয়েক শতাব্দী ধরেই। সম্প্রতি অর্থাৎ বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে এই জটিলতা আর তার দ্রুত পরিবর্তনীয়তার মাত্রা কমবেশি সব দেশেই, বিশেষত দুর্গত ও সেকেন্ডহ্যান্ড দেশে, আমাদের স্বদেশে চৈতন্যকে প্রায় সেকেন্ডহ্যান্ড স্নায়ু বিকারে তোলপাড় করছে। মানবিক সভ্যতা ভব্যতার ধ্যান-ধারণা, আদর্শ নিশ্চয়ই মানবিকভাবে অন্বিষ্টে জীবিত আছে, কিন্তু জীবনযাত্রার ভেদাভেদদীর্ণ স্তরে স্তরে, বাস্তব দৈনিকতার প্রত্যক্ষে তার চেহারায় নিশ্চয়ই রকমফের হয়েছে ও হচ্ছে, এমন কি তা হরেক ছদ্মবেশেও হচ্ছে।

বর্তমানকালে হয়তো এই পরিবর্তনশীলতা ও তার উজ্জ্বল বেগের মাত্রায় ও ধোঁয়ার ভয়ঙ্করতা বয়স্কদের, বিশেষত আমাদের সাবেক বাঙালী বাবুসমাজে খানিকটা ঠিক-বেঠিকভাবে বিচলিত করে, নওলযৌবনের চালচলনে বিমূঢ় করে— যদিচ আশা করি বিমূঢ় বিরক্তি লাগে অপারগ ঈর্ষাবশত নয়, মূল্যায়নের কারণ-বশতই। তবে নবযুবকেরা যদি জুলপি নেড়ে বলেন, ফূর্তি করার সাধ তো পিতা-মহদের কালেও ছিল, আলালের ঘরের দুলাল কি শুধু আমরাই, সধবার একাদশীটা না হয় একালে অচল কিন্তু মূল ব্যাপারটা কি ইঙ্গবঙ্গীয় রেনেসাসের তথা ইয়াঙ্কি-বঙ্গীয় রিফর্মেশনের সান্নিপাতিক নাড়িতেই স্পন্দিত নয়? তখন ভারিক্কি জবাব দেওয়া হয়তো দশ বিশ

বিষ্ণু দে

ত্রিশ দশকে জন্মওয়ালা বা লেখাপড়া-শেখাদের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়। রোয়াকে বা মোড়ে মোড়ে চোতাদার আড্ডা হয়তো ঠিক এ রূপ পায় নি, কিন্তু তেমনি পারিবারিক শাড়ি লুঙ্গি জড়িয়ে সেকালের যুবারা তেমনি বেশি রকিফেলার তো হত না, কারণ তখন তাদের স্কুল-কলেজের নির্দিষ্ট কিন্তু স্পষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল বেশি, যেমন ছিল পরীক্ষা ডিঙোলেই চাকরিবাকরির পছন্দসই নিশ্চিতি না হোক, অন্তত সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

সত্যিই তো উন্নয়নপরিকল্পনাসমূহের বীজ ও মহীরুহের ব্যঙ্গে আমাদের জীবন-চিত্র আরো উদ্‌ভ্রান্ত, গ্রাম ও শহরের সভ্যতার গন্তব্য ও পথ আর যোগাযোগ প্রায়ই পীড়াদায়ক ও শুভবুদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। সদ্যপ্রৌঢ় যুক্তরাষ্ট্রের এবং খানিকটা বৃদ্ধ ইংলন্ড—যা আজও আমাদের পিতৃভূমি, আর ফ্রান্স ও মার্কিনী জর্মানির ঠিক বিপরীত নিম্নমানে আমরা নানাবিধ বুদ্ধির নির্মূলে বিপ্লবসাধন করছি, টাকা আনা পয়সা—মাইলে ক্রোশে সেরে ছটাকে এইসব বিপ্লব কৃষি ও যান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক বিধিনিয়মে উৎপাদন বণ্টন বাদ দিয়েই হয় নি কি? তরুণদের জবাব দেওয়া শক্ত বৈকি। এমন কি বর্ট্রান্ড রসেলের মতো মহৎ মনীষায় পাগল আমাদের অবুঝিকওর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান মানসে দুর্লভ।

এইসব জিজ্ঞাসা কি শুধুমাত্র আমাদের দুর্ভাগা দেশে উঠছে? নকসালবাড়ির নামে ফুৎকার ছাড়িয়ে এসবের উত্তর দেওয়া যায় না। পশ্চিমের সৌভাগ্যবান হিসাবী দেশেও এইরকম প্রশ্ন তো চিন্তাবিশ্বে গুরুতরভাবে আলোড়িত হচ্ছে।

গেগরি বেটসনের মতো প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের কথাই ধরা যাক। একটি ছোট লেখায় তিনি আদি পিতামাতা আদম ও ঈভের গল্পের এক রূপক দিয়ে নিজের বক্তব্য মূর্তিময় করেছেন। ইডেন উদ্যান থেকে তাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হলেন এবং এই মর্ত্য স্বর্গোদ্যান—প্রকৃতি থেকে বন উপবন নদী সমুদ্র থেকে উপড়ে ফেলে দিলেন নিজেদের সিসটেমিক বা প্রকৃতিগত তথা মানবতান্ত্রিক স্বভাবটাই এবং পার্থিব বিশ্বেরও সামগ্রিক বৈশ্বিক স্বভাবটাও। বেটসনের মতে পশ্চিমা জগতের উন্নতিবাদী ও প্রত্যক্ষে উন্নয়নশীল সংকল্পপরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবে ঐ দুটি মৌল জৈবিক নীতি বর্জিত হচ্ছে এবং তার ফলে প্রকৃতি তথা মানুষ হচ্ছে ও হবে খণ্ডিত, অসুস্থ, হবে অসম্পূর্ণতর, হবে বিকল-স্বভাব। হর্বার্ট মার্কুসের অন্য চিন্তাবিশ্বে দুর্ভাবনার সঙ্গে এইখানে শুদ্ধতর বিজ্ঞান-চিন্তার মিল। এইরকম মনন ও মানসের অন্তস্তল থেকেই ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহ পেয়েছিল তার গভীরতা, মার্কিন প্রাচুর্যেও এবং সাহায্য ও হননীতিতেও এই দুশ্চিন্তার প্রভাব।

শিক্ষার জগতে যাতায়াত ছিল অনেক-খানি, তাই ছাত্রদের বিষয়ে ঐ কথাটা মনে আসছে আমাদের দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে বয়স্কদের চালু সমালোচনাটা।

বয়সের গুণে নাকি দোষে—অভিভাবকদের শিক্ষকদের সমালোচনার মধ্যের মর্মপীড়াটা বোঝা আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু জীবনে, দিনগত বাস্তবে বা মনো-লোকে সবই তো জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে থাকে সরুমোটা তারে তারে. তাই ছাত্রবয়সের মনোলোকে সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা মৌলিক ব্যাপার কিনা তাও হয়ে ওঠে জিজ্ঞাস্য। তার কতটা বৃহত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কতটা আর্থিক দুর্গতি বা অনিশ্চয়তা, কতটা অপ্রাকৃতিক ঘেঁষাঘেঁষি অথচ সম্বন্ধহীন

ভিড়, কতটা সফলকাম বা বিফলমনোরথ বয়স্ক জগতের মূল্যমানবশত ঘটে, তাও ভাবতে হয়। তার জন্যে বয়স্কদের সাংস্কৃতিক বিশৃংখলা, এমন কি নৈতিক অনিশ্চয়তাই বা কতটা দায়ী?

তাছাড়া আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কি বিশৃংখলার কিছু কমতি? এমন কি প্রতিবাদী বা ক্ষমতা-ইচ্ছুক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে? লেখক শিল্পীরা অবশ্য জাত-প্রতিবাদী, কিন্তু প্রতিবাদী স্বভাব সত্ত্বেও বোঝা শক্ত নয় যে লেখক-শিল্পী ঐ বিশৃংখলার, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, অংশীদার। এবং সে বিশৃংখলা যা আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও কারো কারো মনে হতে পারে শিল্পীদের নিজস্ব শিল্পকর্মের ধরণধারণে সঞ্জাত, তাও শুধু নন্দনতাত্ত্বিক নয়, সামাজিক গলদেরই অংশীদার।

বিশেষ করে বয়স্কের পক্ষে তাই সমসাময়িক সমাজ মনোকষ্ট দিতে, উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে বৈকি, কিন্তু সরাসরি বিচারের গদিতে বসাটাও শুভবুদ্ধির লক্ষণ নয়। বোর্জিস্ দেবুরের কথাটা বোধহয় বয়স্কের পক্ষে সর্বাধিক সত্য। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দেবুরের একটি বই আরম্ভ হয়েছে এই সহজ কথায়: আমরা কদাচ বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমসাময়িক হতে পারি। ইতিহাস এগিয়ে চলে ছদ্মবেশে, রঙ্গমঞ্চে সে আসে আগের দৃশ্যের সাজমুখোশে সেজে আর আমাদের কাছে তাই নাটকের অর্থটা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্দাটা যতবার ওঠে, প্রতিবারই বহমান ক্রমান্বয় আমাদেরই পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কথাটা সবার পক্ষেই সবদেশে এবং সর্বকালেই সত্য।

তাই এর্নেস্তো চে গুয়েভারার প্রাজ্ঞ মন্তব্যের মর্মগ্রহণেও কারো বাধা থাকে না। সত্যই নতুন সমাজকে—এবং শেষ অবধি প্রতি সমাজকেই, কম বা বেশি, এবং প্রতি যুগেই, স্বকীয় গঠনের তাগিদে অতীতের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় মাততে হয়, আর, ব্যাপকভাবে, গঠনের কাল স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্বকালেই। ঐ দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তিক চৈতন্যে অনুভূত হবেই, কারণ তা চালু শিক্ষাদীক্ষার ভুক্তাবশেষের পীঠে নতশীর হবেই,—যে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি নির্দিষ্টই হচ্ছে ব্যক্তিকে দুর্বল একক বা বিচ্ছিন্ন করার লোভে, আমদানি-রপ্তানির সভ্যতার কেনাবেচার পণ্যসম্বন্ধের মরিয়া জিদে পরিবর্তনশীল যুগমাত্রেরই স্বধর্মে যা অমোঘ।

হয়তো মনন-নির্ভর জগতে এই জিদ কমবেশি, অন্তত সোজাসুজিভাবে কমবেশি নগ্ন, যদিচ গুয়েভারার চিঠির মন্তব্য আমাদেরও শিল্পীলেখকের পক্ষে চিন্তাগ্রাহ্য। কারণ আমাদের ক্রিয়াকলাপ পণ্যোৎপাদনের ও বণ্টনের হিসাবে নৈতিবাচক, অন্তত গৌণ ব্যাপার। তাই ভাবের জগতে বস্তুগত ও মানসগত প্রয়োজনের মধ্যে ভেদাভেদ অনেকটা হয়তো স্বচ্ছ। দীর্ঘকাল ধরে আমরা চেষ্টা করে এসেছি বিচ্ছিন্নতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সৃষ্টিধর্মী সংস্কৃতির গলির মধ্যে দিয়ে, শিল্প-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনমন্যতার খিড়কিদোর দিয়ে। কিন্তু এই ওষুধেও সেই একই আধিব্যাধির জীবাণু: শিল্পী অসংলগ্ন নিঃসঙ্গ গৌণ জীব থেকে যায়, যার সাধ কিন্তু সমগ্র নিসর্গ ও জীবপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য। ফলে শিল্পীর লড়াই নির্দিষ্ট হয়ে যায় পারিপার্শ্বিকের অত্যাচারে বঞ্চনাজর্জর মানবিক ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্ন কূপমণ্ডুক আত্মরক্ষায়।

এই আত্মরক্ষার চেহারা কখনও কারো কারো হয়তো নিরীহ, সংকুচিত বা আত্মদানে উন্মুখ, কারো বা আত্মজাহিরে উদ্দাম। এই চেহারাই কি অনেকে দেখেন নি ব্যাপ্তভাবে, অস্পষ্টভাবে, কখনও রবীন্দ্রব্যবসায়ী জোলো ভাষায়-ভাবে কখনও বা প্রতিবাদী নেশাক্রান্ত রূপে অন্যত্রও? বয়স্ক অনেকের বয়সের স্বধর্মেই মনে হতে পারে, কীটস্-কথিত সেই হ্যাংলা বংশপরম্পরার চালচলনের দাবিদাওয়ার উদ্দামতার চেহারা শুধু বেশভূষায় নয়, তার স্বভাবটাই আলাদা। কিন্তু তাই কি একমাত্র সত্য? আমাদের কৈশোরে যৌবনে আমাদের অনেকের মানসিকতাও কি মাত্রায় না হলেও জাতে একই ছিল না? অবশ্য বাস্তব অবস্থা তখন ছিল অনেক কম সামুদ্রিক হলাহলে মন্থিত। লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ছিল তখন সংখ্যালঘুর, ফলে সোচ্চার কণ্ঠ ছিল কম, চাকরিবাকরির নিশ্চিতি আত্মপ্রকাশের ও আত্মচর্চার অবকাশ ছিল সেই মন্থর যুগে কিছু বেশি, টাকা যেমন কম ছিল, টাকার পুরুষার্থও ছিল কম, অস্থানে কুস্থানে ছড়াছড়িও কম। প্রতিযোগিতা এখন সর্বত্রই তীব্রতর। এমন কি এখনও যাঁরা হর্তাকর্তা সেই রাজনৈতিক ও সরকারী বেসরকারী নেতৃত্বও ছিল কম মরিয়া ও কম বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া ছিল বিদেশী একেবারে নিরেট নির্মম শোষণ ও শাসন, যার চোখে এ দেশের প্রায় সব মানুষই সমান অধম। এবং সেইখানে ছিল একটা আপাত-ঐক্য, তাই যাকে বলে সিনিসিজম্—নৈরাশ্যজ তিক্ত নৈতিবাদ তাও ছিল কম মুখর। এক হিসাবে আমরা খাস ইংরেজের দাসরা হয়তো তুলনায় ভাগ্যবানই ছিলুম।

তাই সমসাময়িক সমাজ যতই উদ্‌ভ্রান্তিকর, এলোমেলো, অশালীন, বিশৃংখলাহত লাগুক, মনে হয় আমরা সবাই তো কমবেশি এ ব্যাপারে দায়ী, এ দায়ভাগের ভার আমাদেরও। যতই বিমূঢ় ব্যথিত লাগুক, মনের গোচরে অগোচরে আমরা কি বুঝি না যে এরা ও ওরা এবং অনেকেই সবাই শেষ অবধি আমরাও বটে? অস্বস্তি লাগতে পারে খুবই, নিজেদের মনে হতে পারে রবাহূত অতিথি যেন, তবু আমরাও তো সরাইখানার পত্তনীদার। আপাতদৃষ্টিতে যাকে বা যাদের মনে হয় অপরিচিত জগতের বাসিন্দা, যেন বা আগন্তুকমাত্র, তারাও তো পালাবদলে আমাদেরই উত্তরাধিকারী, অচেনাবেশে অল্পবয়স্ক আমাদেরই তির্যক রূপ। তা সে যতই মাঝে মাঝে মনে হোক, বা মনে করিয়ে দিক যে আমরা বিগতপ্রায়। তবু ইয়েটসের মতো নাটকীয় ঢঙে মানব না: এ দেশ বৃদ্ধের দেশ নয়;

> সকলই বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রবিন্দু থেকে চ্যুত,
> শুধুমাত্র বিশৃংখলা সারা বিশ্বে
> রাশ ভেঙে মাতে,
> রক্তগন্ধ অজ্ঞান বান বাঁধ ছেঁড়ে
> এবং সর্বত্র
> অনঘ্রাত সারল্যের শুভ্র শুচি ব্রত
> ডুবে যায় এ-দেশে ও-দেশে;
> শ্রেষ্ঠরা হারায় আস্থা
> আর নিকৃষ্টেরা মাধ্যাকর্ষহীন
> যত্রতত্র আবেগে উড্ডীন লেলিহ
> আশঙ্কাতে।

উত্তরমেঘ

(ছোট উপন্যাস)

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

রুক্মিণীকুমার বললেন, 'যা কিছু দেখছেন, সবই আমার নিজের হাতে গড়া।'

তৃষিত, তৃপ্তচোখে তাকাল চন্দ্রচূড়। সপ্রতিভ হতে চেয়ে নড়ে-চড়ে বসল। সারা মুখে, সর্ব অবয়বে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল।

কাচের দেয়ালের ওপারে আদিগন্ত বনভূমি, অসমান উধাও প্রান্তর। কচিৎ পাখিদের শূন্যে বিচরণ চোখে পড়ে। এই আছে, এই নেই। দলছাড়া উপলখণ্ডের মত ছিটে-ফোঁটা মেঘ অনন্ত নীলের সমুদ্রে ইতস্তত অলস, মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ায়। রোদ্রে লীন হয়ে আছে ঘাস-পাতা-বৃক্ষ সব। নিঃশব্দ, শীতল এই ঘরে বসে থাকতে থাকতে রুক্মিণীকুমারকে মনে হল পরম রসিক। শিল্পীর মত পবিত্র, সুন্দর।

চতুর্দিকে এই অনির্বচনীয় শোভা। দেখে মুগ্ধ, বিহ্বল হতে হয়। অথচ ভেতরে কি নিষ্ঠুর ব্যস্ততা! কর্তব্যে অবহেলার চিহ্ন নেই কোথাও। ক্লান্তি নেই, ভ্রান্তি নেই। নিষ্ঠাই তো মানুষকে চরমে পৌঁছে দেয়। নিষ্ঠা আর একাগ্রতা। মোট কথা, ঐকান্তিক হতে হবে। অবশ্য পূর্বপুরুষকারকে পেছনে ফেলে রেখে নয়। রুক্মিণীকুমার সেই জাতের পুরুষ যার সব ছিল, সব আছে। তাই সিদ্ধির শিখরে দাঁড়িয়েও তৃপ্তি নেই। নিরভিমানকণ্ঠে এখনো অতৃপ্তির খেদ। চরমতমের পরে পরমতমের অন্বেষণা। বিশ্বকে জানা হলে ব্রহ্মাণ্ডকে পাবার এষণা। মানুষের অজেয়, অজ্ঞেয় কিছু নেই। চাই ধৈর্য, চাই নিষ্ঠা। চাই একাগ্র আন্তরিক সাধনা। অধ্যয়নে যাকে মেলে না, অধ্যবসায় হাত করবে তাকেই। উদ্যোগী পুরুষের কাছে, কোন বাধাই আর বাধা নয়। দেয়ার ইজ নো আল্পস্! এগিয়ে চল। সঙ্গী না জোটে, একলা চল! অন্ধকারের পরমায়ু কতটুকু!

'এসেছেন, কদিন থেকে যান। দেখে যান, কেমন করে কী হয়।'

'চলে যাবো বলেই এসেছি, তাই কি ধরে নিয়েছেন?'

'নিয়েছি।'

নিষ্ঠুর, সংক্ষিপ্ত জবাব। চোখ না তুললেই কাগজ-পত্র-ফাইলের ভেতরে ডুবে

যেতে চাইলেন রুক্মিণীকুমার। জরুরি কয়েকটা চিঠি টাইপ হয়ে ট্রের ভেতরে পড়ে ছিল। আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়ে বেল টিপলেন। স্যুইংডোর ঠেলে উর্দিপরা চাপরাশি এসে হাজির। সই করতে-করতে সুরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে, বললেন, 'কড়িরামবাবু!'

এক মিনিটও কাটে না। সশরীরে কড়িরাম রায়ের আবির্ভাব। ফর্সা, রোগা, ছিমছাম মানুষটি। চোখে নিকেলের চশমা। পরণে ধুতি, ধোপদুরস্ত ছিটের শার্টের ওপরে শাদা সুতির কোট। কণ্ঠটি বড় ক্ষীণ, বড় দুর্বল।

'আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ।' একটু-ও না চমকিয়ে কাগজ-পত্র থেকে চোখ সরিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুললেন রুক্মিণীকুমার। চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, 'ইনি চন্দ্রনাথ ত্রিবেদী...'

'চন্দ্রচূড়।'

ভুল শুধরে দিতে চাইলে চন্দ্রচূড়।

হেসে উঠলেন রুক্মিণীকুমার। স্থান কাল-পাত্রের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করেন, 'চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী...।'

থেমে প্রশ্ন করেন, 'জানেন, লাইনটা কার?'

'জানি।' স্থির চোখে চেয়ে থাকে চন্দ্রচূড়।

শুনে উজ্জ্বল হলেন রুক্মিণীকুমার। কণ্ঠে মুদুতার আভাস এনে, উদাস, বিষণ্ণ-সুরে বলেন, 'এক হতে চেয়ে অন্য রকম হয়ে যাই আমরা। ছাত্রজীবনে বড় আশা ছিল, শিশির ভাদুড়ীর মত মস্ত অভিনেতা হবো। এই 'মেঘনাদ বধ' শুনিয়েই ধীরেন ব্যাণ্ডারকে তাজ্জব বানিয়ে ছেড়ে ছিলাম। আসলে ধীরেনবাবুর পদবী ছিল চাটুজ্যে। দি গ্রেট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হেড ক্যাশিয়ার ছিলেন তিনি। ব্যাঙ্ক লিকুইডেট হয়ে যাবার পরে আমাদের ইস্কুলে এলেন শিক্ষক হয়ে। একেবারে প্রথম দিনেই ওই আবৃত্তি শুনে কাত। তারপর সময়ে-অসময়ে কাছে পেলেই হল। আবৃত্তি শোনাতে হত। তিনি বলতেন, রুক্মিণী ডোণ্ট গিভ আপ দিস্ হ্যাবিট। ইট উইল গিভ ইউ এ রেজাল্টাইন ফিউচার। ইউ উইল বি এ গ্রেটম্যান লাইক ভাদুড়ী। তিনিই নেশা ধরিয়ে দিলেন। সেই থেকে অভিনয় করেই চলেছি। অভিনেতা আর হলুম না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। যেন নিজের ভেতরে তলিয়ে যেতে চাইলেন, খতিয়ে দেখতে চাইলেন আরো কিছু যা কেউ দেখেনি, কাউকে দেখাতে পারবেন না রুক্মিণীকুমার। মাঝে-মাঝে তাই কেমন হয়ে যান। ঘুলিয়ে ওঠা জীবনটাই সাময়িকভাবে থিতিয়ে এলে কেমন আত্মস্থ, বিষণ্ণ, একা আর স্বতন্ত্র।

কড়িরাম তখনো দাঁড়িয়ে।

নির্বাক, নিস্পন্দ চন্দ্রচূড়।

গোটা রাত কেটে গেছে। তারপর সকাল ফুরিয়ে এখন দুপুরের কাছাকাছি। কথায়, আলাপে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা। তবু এত দীর্ঘ আলাপের পরেও এমন উচ্ছল, মুখর মনে হয়নি তাকে। বরং ভয়ংকর গম্ভীর, মেজাজী মনে হয়েছে। যেন কাজের কথা ছাড়া কিছুই মগজে ঢোকে না তাঁর। সবিস্ময়ে ভেবেছে চন্দ্রচূড় নিরেট পাথর দিয়ে গড়া ওই দেহের আড়ালে বুঝি প্রাণ নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই। কল্পনা করার, স্বপ্ন দেখার সময় নেই একটুও। আছে হিসেব। দিন-মাস-মুহূর্তের ছকে বাঁধা যান্ত্রিক জীবনে কবিত্বের অবকাশ মেলে না। হৃদয়ের চর্চা তো বাহুল্য। স্মৃতির জাবর কেটে লাভ?

বরং বিপরীতে মোহিনীকে মনে হয়েছে, উচ্ছল, জীবন্ত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। যেন চড়া রঙে আঁকা ছবির মত, কড়া সুরে বাঁধা গানের মত। স্বপ্নে, কল্পনায় চঞ্চল, প্রগলভে, মুখর। মেলাতে গেলে মেলে না। সাজাতে গেলে রুক্মিণীকুমারের পাশে যাকে ঠেকে একান্ত বেমানান। যা চক্ষুকে পীড়া দেয়, মনকে আহত করে।

'আপনি থাকুন। আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে চন্দ্রচূড়বাবু। সব সময়ের জন্যে প্রয়োজন। জানেন তো আমার কোন বন্ধু নেই?'

তিনি কি ভুলে গেছেন, কড়িরাম তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে? ভাবলেশহীন চোখ তার। সর্বাঙ্গে ভিখিরির ভঙ্গী ফুটিয়ে অম্লান। দেখে নিজেই মনে-মনে কুণ্ঠাবোধ করে চন্দ্রচূড়। কথা বলে স্থির, অনুচ্চ কণ্ঠে। পাছে কড়িরাম শুনে ফেলে সব।

'আপনি না তাড়ালে আমি কোথাও যাবো না।'

'ছি ছি! কী যে বলেন!'

তিনি নীরব হয়ে গেলেন। মুখে-চোখে চিন্তার, ক্লেশের ছায়া ঘনিয়ে এলে তাঁকে সুদূর, মলিন মনে হয়। যেন অজ্ঞাতে ঘুমের ঘোরে বলার মত ধীরে-ধীরে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন, 'সবাই চলে যায়। কাউকে তাড়াতে হয় না চন্দ্রচূড়বাবু। কথা দিচ্ছি, আপনাকে-ও তাড়াবো না। আপনিও কথা দিন।'

'দিলুম।'

'আজ থেকে আমরা বন্ধু!'

'বন্ধু।'

তাঁর প্রসারিত বলিষ্ঠ হাতের ওপরে যেন নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে নিজের হাতখানা তুলে দিলে চন্দ্রচূড়।

'অথচ বিশ্বাস করুন, বন্ধুতা ছাড়া সামাজিক আর কোন সম্পর্কের ওপরেই আমার বিশ্বাস নেই।' এযেন অন্য কোন গোপন কথার, গূঢ় কথার ভূমিকা যা কেবল তাকেই বলা চলে, যে আপন, যে অন্তরঙ্গ যে সকলের চেয়ে নিকট। যার কাছে জীবনের সমস্ত ধন গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্তে পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়া যায়। ঘুরে-ফিরে শতাব্দী পেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেও যে তাকে চিনে নেবে ঠিক, না চাইতে ফিরিয়ে দেবে সব।

কিন্তু মোহিনীও কি এই কথাটাই বোঝাতে চায় না, সে একা, সে নিঃসঙ্গ, সে বন্ধুহীন? অন্ততঃ আচরণে ফুটিয়ে তুলতে চায়। নিঃশব্দে শোনাতে চায়, তার কোথায় বিষাদ। তারা যেন একই নদীর এপাড়ে-ওপাড়ে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্ন, সুদূর হয়ে আছে। একজন অন্যজনকে মুখ দেখাতে নারাজ। মাঝখানে ঢেউ আর আবর্ত। কুটিল স্রোতের বুকে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘর-বাড়ি, [illegible] উপবন। বিপুল ধ্বংসের আশঙ্কায় অস্থির, নিঃশব্দ, সবাই। অথচ কত শ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে গড়া সব। এই বিত্ত, এই বৈভব কি একা, কৃপণের মত ভোগ করতে চেয়ে নিষ্ঠুর, তিনি ক্ষমাহীন?

মুখ দেখে বোঝা ভার। নইলে দিনের আলোয় কত উদার, কত অকপট মনে হয় রুক্মিণীকুমারকে। এখন কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মোহিনীকেও কি মনে হবে অন্য মানুষ? চিনতে কষ্ট হবে তার?

কয়েক মিনিটের আলাপেই মোহিনীকে মনে হয়েছে কত আপন, কত নিকট। যে-কারণ হৃদয় থেকে সেই উষ্ণ উপস্থিতি এখনো ধুয়ে মুছে নিভার, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না চন্দ্রচূড়। ঘর-দোর, আত্মীয়-বান্ধব ছেড়ে এত দূরে চলে আসার পরেও নিজেকে আর একলা, অসহায় ঠেকে না। বিচ্ছেদের, বেদনার সমস্ত গ্লানি ঘুচিয়ে দিয়েছে মোহিনী একা।

অথচ আলাপ কত সামান্য। কয়েকটি মুহূর্ত বই তো নয়। তা-ই যথেষ্ট। রসনায় যদি বিকৃতি না থাকে রসগ্রহণে অনর্থ ঘটে না কোথাও। বিন্দুতেই তো সিন্ধুকে মেলে। একটি বালুকণায় বিম্বিত বিশ্বের প্রতিকৃতি। চন্দ্রচূড় জেনে গেছে, রূপের আড়ালে আলগোছে ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা সেই ক্ষতের ঠিকানা। ভেতরে-ভেতরে পরম আদরে জীইয়ে রাখা মোহিনীর নিটোল অভিমান। দুঃখের জারকরসে মজ্জমান সুখের পসরা।

'আপনি সব দেখে নিন, বুঝে নিন সব।'

চমকে ওঠে চন্দ্রচূড়। কণ্ঠ শুনে সংবিৎ ফিরে পায়। এ সেই পুরনো, পরিচিত রুক্মিণীকুমার, যাকে চেনা যায়। সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়, মানুষটা কেমন। তাইত একটু আগের আলাপ তাকে বিস্মিত করে তুলেছিল। সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। একটু আগে বলা কথাগুলিই চরম ঠাট্টার মত মনে হয়। বরং এই গম্ভীর আদেশ তাকে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক করে তোলে। এই রুক্মিণীকুমারকেই বিশ্বাস করা যায়। ভালোবেসে, বন্ধু ভেবে যে নিকট হতে চায় তাকে না। সে যেন অপরিচয়ের ব্যবধানে সুদূর, দুস্তর, দুরধিগম্য। দুশাময়, তবু অস্পৃশ্য তাঁর উপস্থিতি, অবস্থান। যা মানুষকে হয়তো সাময়িকভাবে কাছে টানে, কিন্তু চিরকালের মত আপন, অন্তরঙ্গ করে তোলে না আদৌ।

'অবশ্য কড়িরাম আছে। আপনার অসুবিধে হবে না কিছুই।'

আশ্বাসের মত শোনায়। তিনি যেন ধরেই নিয়েছেন, ভেতরে-ভেতরে চন্দ্রচূড়

ঠাহর করতে পারছে না, কী তার করণীয়, কতটুকু দায়। আর কখনো তো আসেনি। দেখেনি এসব। মাটির ওপরে-নীচে চলেছে সমান গতিতে কাজ। এই গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে ক'জন? যে পারে সেই তো কৃতিপুরুষ। সাফল্যের সিংহদ্বার তার সামনে চিরদিনের মত খোলা। রুক্মিণীকুমার পেরেছেন।

'আমি অসুবিধের কথা আদৌ ভাবছিনে।'

'তাহলে?'

হাতের কাজ থামিয়ে রুক্মিণীকুমার মাথা তোলেন। জবাবের প্রত্যাশায় চোখে চোখ রাখেন।

'ভয় পাবেন না। একদিন সব চিনে নেবো।'

চন্দ্রচূড় আরো সহজ, আরো স্বাভাবিক হতে চায়। সারামুখে বিনীত হাসির ভঙ্গী ফুটিয়ে আবহাওয়া স্বচ্ছ, মধুর করে তোলে। মনে মনে রুক্মিণীকুমার খুশি হন। বুদ্ধির তারিফ করেন। না, অশ্বিনী তাঁকে ঠকায়নি। বরং তলিয়ে যাবার মুহূর্তে খড়-কুটোর বদলে একটা মস্ত কাঠের গুড়িই তাঁর সামনে ছুড়ে দিয়েছে। কূল খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না আর। আস্তে-আস্তে মনের জোর ফিরে আসছে যেন। আগের মতই ফিরে পাচ্ছেন সব।

'আমাকে ভীরু ভেবেছেন নাকি?'

তরল গলায় পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করেন রুক্মিণীকুমার। হাতের কাজ এক-পাশে সরিয়ে রেখে বলেন, 'কই, দেখি হাত।'

'তার মানে?' চন্দ্রচূড় ভড়কে যায়। অবাক হয়ে বলে, 'পাঞ্জা লড়তে হবে নাকি?'

'আলবত'।

'আমি পারবো না আপনার সঙ্গে।'

'তাহলে ভীরু কে?'

'আপাতত আমিই।'

শুনে হেসে ওঠার কথা। কিন্তু রুক্মিণীকুমারের মুখ ভার ভার ঠেকে। তিনি যেন অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর হয়ে যান। তাঁকে বিষণ্ণ, চিন্তিত মনে হয়, যা কল্পনাও করেনি চন্দ্রচূড়। ভেতরে-ভেতরে সে তাই মুষড়ে পড়ে। এমন খেয়ালি মানুষের পাল্লায় পড়তে হবে জানলে নিজেকে অন্যভাবে তৈরী করে নিত। জানার চেষ্টাও তো করেনি। সেইটেই হয়েছে কাল। যেকারণ নিজেকে বিপন্নবোধ করে এখন।

'ভয় পেলে কি চলে ভাই।' ধীরে ধীরে প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন রুক্মিণীকুমার। মৃদু অথচ স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি কিন্তু ভয় পাইনি। সহজে ভেঙে পড়িনি। হেরে গিয়েও আজ পর্যন্ত হার মানিনি কোথাও।'

এর চেয়ে সহজ করে আত্মপরিচয় দেয়া বোধ করি সম্ভব নয় রুক্মিণীকুমারের পক্ষে। লোকে যাই ভাবুক, অহংকারী তিনি নন। বরং বিশ্বাসে, উদ্যমে এখনো স্থির, নিশ্চল। মেশামেশি, ঘেঁষাঘেষির ব্যাতিকটা তাঁর অল্প। নিজেকে আলগোছে দূরে সরিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন। লোকে ভাবে দাম্ভিক, উন্নাসিক। ক'জন আর কাছে আসে? দূর থেকে কত কথাই তো ভাবা যায়। তার সবটুকুই কি সত্যি? হয়তো নয়। দূর থেকে যাকে জোনাকি ভাবা যায়, কাছে গেলে দেখা যাবে সে স্নিগ্ধদীপের শিখা।

ছাত্রজীবনে অশ্বিনী ছিল প্রাণের মানুষ। যৌবনে সে-ই চলে যায় সকলের চেয়ে দূরে। প্রায় ভুলে যাবার সময় এলে, দীর্ঘ দিন-মাস-বছরের ব্যবধানে আবার আচমকা দেখা হয়ে গেলে দু'জনেই দু'জনকে চিনে ফেলে সমান অবাক। বিধি কি এমন দেখাটাই কপালে লিখে রেখেছিল তবে! একজনের চাল নেই, চুলো নেই। অন্যজন রূপে-রসে জীবনকে পরিপূর্ণ-ভাবে ভোগ করবার একটা জটিলতাহীন সহজ, সরল পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে এরই মধ্যে। এটা কেমন করে সম্ভব ভেবে পায় না চন্দ্রচূড়। অশ্বিনী ভাবে, তাহলে অযথা বয়স বাড়িয়ে মেদের বদলে মেধা খাটিয়ে বেঁচে থাকার মানে হয়? নিষ্ফল জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার?

'এখনো সেই ছাত্র ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছিস?

কথা শুনে লজ্জা পাবে কোথায়, তা না। চন্দ্রচূড় হাসে। আমূল পাল্টে-ফেলা চেহারাটাই চেয়ে দেখে অশ্বিনীর। তা ধনে মানে সে আজ সমৃদ্ধ, পূর্ণ বলা চলে। শূন্য যেটুকু ছিল সেএকু-ও পূরণ হয়েছে বিদেশিনীর পানিগ্রহণে। এখন তো সে রীতিমত এলিট অব দা সোসাইটি! দেখে তাক লাগে বইকি। সম্ভ্রম না দেখিয়ে উপায় আছে কার?

'সংসারে সবাই কি সব কাজ পারে অশ্বিনী?'

'কথা বলার ঢঙটাও বদলায়নি দেখছি।' অশ্বিনী যেন আহত হয়েছে তার কথা শুনে।

'আমি তোকে গালাগালি করিনি। বরং বড় হতে না পারার মূলে যে আমার ছোট হতে না পারার অক্ষমতা সেই কথা-টাই অকপটে জানালুম। তুই দুঃখ পেলি?'

'নাঃ' অশ্বিনী বলতে শুরু করে। বন্ধুত্বে অরুচি ধরে গেছে তার। আলাপ করার ইচ্ছেটুকু অবধি নেই যেন।

'তা জানি।' খানিকটা আত্মপ্রসাদের ভঙ্গী এনে মুখ-চোখ সহসা উজ্জ্বল করে কথা বলে চন্দ্রচূড়। 'আমাদের সুখ-দুঃখ বোধ দিয়ে তোর বোধের জরিপ করা সহজ নয়। তবু যা মনে হয় বলি।'

'যত সব সেণ্টিমেণ্টাল ফুল।' নিঃশ্বাস ছেড়ে অশ্বিনী। যেন আপন মনে গজ-গজ করে। 'সুযোগ পাসনি বলে সুযোগের সন্ধানও করবিনে? মরতে যখন পারবিনে তখন মানুষের মতই বাঁচার চেষ্টা কর।'

'তোর বাঁচা আর আমার বাঁচা যদি এক জাতের না হয় তখন?'

অশ্বিনী আর কথা বলে না। অনেকক্ষণ চুপ-চাপ এগিয়ে যাবার পর একেবারে

গায়ের ওপর ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায়। অন্তত যাবার সময় তো কিছু বলা দরকার। আর যদি দেখা না হয়? সারাজীবনের মত মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায় যদি? প্রাণে বড় লাগে। বিদায়ের মুহূর্তে বুঝি চিরদিনই করুণ। হোটেলের ঠিকানা দিয়ে বলে, 'মাসখানেক আছি। দিন পনেরো বাদে পাঁজিটাঁজি দেখা করবি কিন্তু।'

আর দাঁড়ায় না। দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসে। যেতে যেতে বলে, 'তবু তো তোর সঙ্গে দেখা হল। এবার এসে দেখি কোথায় হারিয়ে গেছে সবাই। সাতদিন ধরে শুধু পুরনো ঠিকানা মিলিয়ে একে-একে খুঁজে বার করতে চেয়েছি। কিন্তু কাউকে মেলেনি। কী হল রে আমাদের? কোথায় গেল সেই সব দিন?'

কথা শুনে ঠিক আগের মত খারাপ লাগে না। বরং চতুর্দিকে যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা দেহ-মন ক্লান্ত, বিষণ্ন এবং পঙ্কিল করে তোলে, সেখানে অশ্বিনীকে মনে হয় পরমাত্মীয়ের মত একান্ত আপন। পুরনো সেই দিনগুলি মনে পড়ে। স্মৃতি যেন ছায়াছবির মত চোখের ওপরে ভাসে। আহা, অশ্বিনী এখনো তেমনি সজীব, ঠিক ততখানিই সংবেদনশীল।

দিন পনেরো বাদে যাবার কথা। কিন্তু দশদিনের মাথায় চিঠি এসে হাজির।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়। যাবে কি যাবে না সে কথা ভাবার অবকাশটুকু অবধি মেলে না।

'তোকে এক মাসের মধ্যে কলকাতা ছাড়তে হবে। কপাল ভালো তোর। শ'পাঁচেক পাবি এখন। কী, রাজি তো?'

'ভেবে দেখবার সময় দিবিনে?'

'বারো ঘন্টা। গোটা একটা রাত।'

রুক্মিণীকুমার কথাটা গর্বের সঙ্গে ফাঁক করেন।

'অশ্বিনী আমার পরম সুহৃদ। অত স্নেহ আমি কাউকে করিনে। তাকেই জানিয়েছিলুম, একা সামলাতে পারিনে আর। একটা বিশ্বাসী, তোমার মত লেখা-পড়া জানা লোক দাও।'

এখন টের পায় চন্দ্রচূড়, মনে-মনে রুক্মিণীকুমার খুশি হয়েছেন খুব। যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তাকে পাওয়া আর আকাশের চাঁদ পাওয়া যে সমান। ইচ্ছে হলেই ছুটে বেড়াবার সময় পাবেন এখন।

কড়িরাম ডাকে, 'আসুন।'

সিঁড়ি ভেঙে নিচে আসে চন্দ্রচূড়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরেকবার চেয়ে দেখে সব। ঠান্ডা ঘরের ভেতরে থেকে বোঝার উপায় নেই, বাইরে কি দুঃসহ তাপ। দুরন্ত দাবদাহে মাঠ-ঘাট পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তপ্ত নিঃশ্বাসের মত থেকে থেকে হাওয়া বয়। শিরীষ কাগজের মত এক-এক ঝলক হাওয়া এসে মুখ-চোখ সর্বাঙ্গ ঝলসে দিয়ে যায়।

পথে নেমে উত্তাপ অসহ্য ঠেকে আরো। দূরে পাথুরে পথ-ঘাট-প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে ধাঁধা লাগে, মাথা ঝিম-ঝিম করে। কাছে-দূরে ধুলোবালি পাথরের খাঁজে-খাঁজে জমাট অশ্রুর মত জ্বল-জ্বল করছে শুধু অভ্র আর অভ্র। দেখে ভ্রম হয়। অজান্তে সে যেন কোন রূপকথার দেশে এসে হাজির। রোদ্দুরের ছোঁয়া লেগে এখানে জেগে উঠতে চাইছে সবাই। যেন শত-সহস্র মানিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে কে। সিন্দবাদের সেই নাবিকের গল্প মনে পড়ে। রক পাখির পায়ে শরীর বেঁধে যে একদিন হীরক দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে কি সেই সব বিষাক্ত সাপ আর হিংস্র লোভী বণিকেরা নেই? অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে আসে যারা? আর পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে যারা প্রার্থনা করে ধন-মান-পরমায়ু? তবু সারা-রাত যখের ধনের মত সব কিছুই আগলে থাকে সাপ। দিনের আলোয় মুখ দেখাতে মানা। কিন্তু রুক্মিণীকুমারের কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

খাদের মুখে দাঁড়িয়ে কড়িরাম রূপকথা শুরু করে।

'ভাগ্য নিয়ে কী বিশ্রী রকমের ঠাট্টাই যে চলেছে! আজ যে ফকির সে কাল রাজা। আমরা কেবল দেখতেই এসেছি, বুঝলেন। দেখেই যাবো চিরকাল। তাছাড়া উপায়? পরের পাতে দুধ-ভাত দেখে নিজের গালে চড় মেরে তো লাভ নেই।'

একটু আগে ব্লাস্টিং হয়ে গেছে। খাদের মুখ ধোঁয়া আর ধুলোয় একাকার। চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ভাঙা, টুকরো পাথর, অভ্রের কুচি। এরই মধ্যে প্রাণপণে পাথর সরাচ্ছে কুলি-কামিনের দল। কিম্ভুত-কিমাকার এক-একটা মানুষ। গায়ে যেন মত্ত হাতীর বল। সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে টিকেন মুন্সী। অশ্লীল ভাষায় কাকে যে গালাগাল করছে বোঝা ভার। তাদের দেখে সে যেন আরেকটু মুখর হয়ে ওঠে। টিকেন মুন্সীকে দেখে পৌরাণিক দৈত্যের ছবি মনে পড়ে।

'এখন চলবে খোঁজাখুঁজির পালা। তেমন তেমন বস্তু পেলে তার দাম লাখ টাকারও বেশী। শ' কিংবা হাজারের হিসেব এখানে অচল। লাখ আর কোটির কারবার। আবার পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে হয়রাণ হয়ে গেছে কত কেউ। একেবারে ফতুর হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে। রাজার ছেলে ভিখিরি বনে গেছে। নইলে অমন যে সায়েব ফারকুয়ার তারও কিনা মাথাটা বিগড়ে যায়। টাকা টাকা! টাকা থাকলেও জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা! শেষ একে সব ছত্রখান করে দিয়ে গেল সায়েব। নেশার খোয়ারি ভাঙার পরে যা হয় ঠিক তেমনি হাল হয়েছিল। শেষ দিকে কাজে-কর্মে মন ছিল না একদম। দিনরাত মদ গিলে মাঝি পাড়াতেই পড়ে থাকতো। টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে যাকে যা খুশি বিলিয়ে দিত। বাধা দেবার তো ছিল না কেউ। বারণ করার মানুষ অনেক আগেই শিকলি কেটে পালিয়ে গেছে।'

'কে?' অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করে চন্দ্রচূড়। তার সারা মুখে আগ্রহ, বিস্ময় আর ব্যাকুলতা।

'রোজি ফ্রান্সিস। আদিবাসী মুন্ডাদের মেয়ে। রাঁচি থেকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল সায়েব। তা এক গাছের ছাল কি অন্য গাছে লাগে? খাঁটি বিলিতি রক্ত সায়েবের। আর রোজি হল গিয়ে আপনার আস্তাকুঁড় থেকে উঠে আসা নষ্ট মেয়েমানুষ। ভালোবাসায় রুচি থাকবে কেন তার?'

দম নিতে চেয়ে কড়িরাম থামে। পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরায়।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে তারা। কথায়-কথায় খেয়াল থাকে না। আস্তে আস্তে আকাশ থেকে রোদের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে এখন দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে থৈ-থৈ করছে মেঘ। আবছা আলোয় অন্য রকম দেখাচ্ছে সব। কেমন ঘোলাটে, বিষণ্ন ছায়া-ছায়া। পথের দুপাশে ধুলোয় ছড়ানো অভ্রের কুচিগুলো ম্লান, অনুজ্জ্বল ঠেকে। দূরে হর্তুকির গাছের আড়ালে পোড়ো কুঠি-বাড়িটা চোখে পড়ে। কদমের ছায়ায় গাত্র এলিয়ে দিয়ে আপন মনে জাবর কেটে চলেছে নিরীহ মোষ। দেখা হয়ে গেছে। কাল থেকে অফিসের কাজ দেখাশুনো করবে চন্দ্রচূড়। কড়িরাম পথ-ঘাট চিনিয়ে দিচ্ছে। নতুন মানুষ তো।

'ওই যে দেখছেন, ওইটেই হল গিয়ে আপনার ফারকুয়ার সায়েবের বাংলো। লোকে বলে ভূত বাংলো।'

'কেউ থাকে না বুঝি?'

'থাকার জন্যে থাকে না। মাঝে-মাঝে ছেলে-ছোকরারা এসে লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খায়। কুলি-কামিনগুলোকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করে।' বলে চোখ টিপে শুকনো মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে আবার মুছে পুরোনো কথার খেই ধরে কড়িরাম, 'শেষের কটা বছর ফারকুয়ার ওই বাড়িটাতেই একলা কাটিয়ে গেছে। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ অবধি করতে চায়নি। অন্ধকার ঘোর-ঘোর হলে দেহাতের দিকে যেতো খাঁটি মহুয়ার স্বাদ নিতে। খেয়ালের বশে, ঝোঁকের মাথায় একে-একে ধন-মান সব কিছুই হাতছাড়া হচ্ছিল। যেটুকু ছিল সেটুকুও দেখাশোনা করবার মানুষ ছিল না তেমন।'

মুখ-চোখ ক্রমশ পাণ্ডুর হচ্ছিল কড়ি-রামের। ভয়ঙ্কর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে। চন্দ্রচূড় টের পাচ্ছিল, সে এখন স্মৃতির গভীরে আরো অন্ধকার, অস্পষ্ট আলো-ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছিল। কথা বলে বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে দেবার ইচ্ছে অথবা রুচি ছিল না চন্দ্রচূড়ের। বরং সমান তালে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে কান পেতে শুনছিল সব। তাকে একাগ্র মনে হচ্ছিল। দেখে তৃপ্তির অন্ত ছিল না কড়ি-রামের। এমন একজন খাঁটি শ্রোতাই তো সে চায়। যে কারণ অসম্ভব ভালো লাগে চন্দ্রচূড়কে।

'এই রুক্মিণীকে ভালোবাসতো খুব। রাত্রে ফিরতে দেরি হলে সে-ই খুঁজতে বেরিয়েছে। অসুখ-বিসুখ হলে নিজের হাতে পরিচর্যা করেছে।' বলে সামনে তাকায়। যেতে-যেতে বারদুয়েক থেমে পড়ে কী ভাবে। তাকে ভীষণ অনামনা আর দুঃখী মনে হয়। এ যেন তার নিজেরই পরাজয় আর গ্লানির ইতিহাস। ধীরে ধীরে ধরা গলায় সে আবার শুরু করে। যেন গভীর ঘুমের ভেতরে ডুবে যেতে যেতে স্বপ্নের ঘোরে বলে যায়। যে কারণ আদ্যোপান্ত মুখস্ত স্বগতোক্তির মত শোনায়। শুনে তাকে একই সঙ্গে অশুচি, অপবিত্র, আবার শুদ্ধ, সৎ মনে হয়। সচরাচর যা একই মানুষের কাছে মেলে না। 'একা রুক্মিণী আর কত পারে? তবু সায়েবের বিশ্বাস
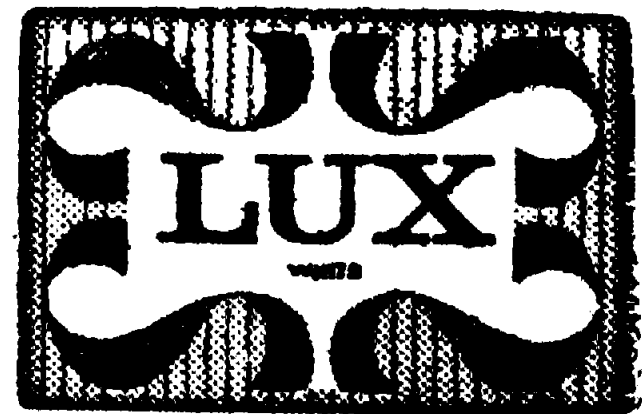
ছিল তার ওপরেই। কিন্তু রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান আর থাকেনি। হাতের কাছে যাকে পেয়েছে, যা দিয়ে পেরেছে মারধোর করেছে সায়েব। রুক্মিণী সরে থেকেছে তখন। মাথা ঠান্ডা হলে বুদ্ধির তারিফ করেছে সায়েব। কী চোখেই যে দেখেছিল জোকট্যাকে। নেশার ঝোঁকে এক-একদিন প্যাগলের মত চীৎকার করে কেঁদেছে সায়েব। কঁদতে-কাঁদতেই রুক্মিণীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। বলেছে, অল দ্যা নেটিভস্ আর আনগ্রেটফুল, স্বৈচারাস এক্সসেপ্ট যু। আই লাইক নান, রুকমিনি। আই আই কান্ট। ডু য়্যু নট লাইক মি?' সেই কান্না শুনে পাথর গলে যায়। রুক্মিণী তো কোন ছার। আমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সায়েবের কান্না তো আর সত্যি-সত্যি মাতালের প্রলাপ নয়। আমরা তাই মনে মনে অভিসম্পাত করেছি সেই সর্বনাশী রোজিকেই। মানুষ আবার এত নিষ্ঠুর হয়!'

সুন্দর করে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা সংসারে সকলের থাকে না। কড়িরামের আছে। শুনতে শুনতে স্থান-কালের ভেদাভেদ যেন ঘুচে যায়। চন্দ্রচূড় দেখেও দেখে না, কখন পায়ের তলা থেকে খর্বাকৃতি ছায়াটাই দীর্ঘ হতে-হতে এখন প্রকান্ড হয়ে গেল। মাথার ওপরে সূর্য খানিকক্ষণ ঝিম ধরে থাকার পর এখন পশ্চিমে রক্তচক্ষু মাতালের মত ঢলে পড়ছে ক্রমশ। মেঘ সরে গিয়ে আবার ছেঁড়া, টুকরো নীলের আভাস লাগে চোখে। প্রান্তরে, বৃক্ষশীর্ষে, সবুজ পাতার হাতে-হাতে ঝলমলিয়ে ওঠে রোদ। ঘাসের ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গোপন কথার মত হাওয়া বয়। হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ, বনের গন্ধ। যেন দূরদূরান্তের স্মৃতির ভারে মৃদু, মন্থর, ক্লান্ত হয়ে আছে সব।

মোহিনী বলেছিল, 'দুপুরে ফিরবেন তো?'

'কেন, দূরে অন্য কোথাও যেতে হবে নাকি আজ? কিছু বলে গেছেন রুক্মিণীবাবু?'

বাইরে এসে থমকে দাঁড়ায়। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে চন্দ্রচূড়। কিন্তু মোহিনীর মুখে বাঁকা হাসি দেখে পলকে নিবে যায়। যেন কোন মন্ত্রবলে তার কথা বলার সমস্ত শক্তি অপহরণ করেছে মোহিনী। চন্দ্রচূড় স্থির, নিশ্চল ছবির মত চেয়ে থাকে।

'না, আমাকে বলার কথা তো নয়।'

মোহিনী যেন কোন মতে কথা কটি উচ্চারণ করে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। সহসা কে যেন অপমান করে গাল দিয়েছে তাকে। অথবা ফর্সা দুই গালে আচমকা চড় কষিয়ে আরক্ত করে তুলেছে।

বাইরে জীপ দাঁড়িয়ে। কাল রাত্রেই কথা হয়ে আছে। জীপ এসে নিয়ে যাবে। সারাদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে সব। ভোর না হতেই চন্দ্রচূড় তাই তৈরী হয়ে আছে। এখানে এসে এই একটা পরিবর্তনই হয়েছে, সূর্য ওঠার আগেই চন্দ্রচূড় জেগে ওঠে।

মোহিনীর দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় চন্দ্রচূড়। কথাটা মনে গিয়ে লাগে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অমন আর্ত, করুণ মূর্তির গা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দূরে গাছ-পালা-দিগন্তের রেখা দেখে। সব কিছুই আবছা, রহস্যময় ঠেকে। মোহিনীর চোখে তো সেই প্রার্থিত কটাক্ষ নেই যা দেখে মুগ্ধ, বিহ্বল হতে পারে চন্দ্রচূড়। তবু ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল কোথায়। অহেতুক অভিমানে ভারি হয়ে ওঠে মন। মোহিনী কী বলতে চায়? কার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ তার? তবু বৃষ্টিভেজা সবুজ পাতার মত শান্ত, সিক্ত মুখশ্রী, সর্বাঙ্গের সরল [illegible] অনেকক্ষণ অবধি চন্দ্রচূড়ের [illegible] চেতনায় একটি স্থায়ী ছাপ এঁকে [illegible] যেতে যেতে, এমন কি আপিসে [illegible] কুমারের মুখোমুখী বসে থাকার পরেও সেই মুখ ভুলতে পারেনি।

এখন বেলার দিকে চেয়ে আবার মনে পড়ে।

মোহিনী কি পথ চেয়ে বসে আছে? ভাবতে ভালো লাগে। রক্ত যেন উত্তাল হয়ে ওঠে হঠাৎ। বড়লোকের বড় বড় খেয়ালের কথা নিয়ে গল্প লেখা হয়, উপন্যাস রচনা করা চলে। কিন্তু তাকেই এভাবে ঠিক এতখানি প্রত্যক্ষ করা যেন সংসারে এই প্রথম। চন্দ্রচূড়ের আগে কেউ দেখেনি। এমন কথাও শোনেনি কেউ। আর কী আশ্চর্য! বাড়ির জন্যে সেই মন-কেমন-করা ভাবটাই ধীরে ধীরে কোথা দিয়ে কেমন করে উবে যাচ্ছে! তার মনের ওপরেও কি মোহিনীর হাত পড়েছে কোথাও? কিন্তু তুমি আমার কে? এখানে না এলে দেখাই হত না জীবনে। তাহলে কার ক্ষতি হত? হয়তো কারো না। অথচ আজ যদি চলে যাই হঠাৎ চলে যেতে হয় যদি, তাহলে সেই বিচ্ছেদের ব্যথার আতুর হবো দুজনেই।

(ক্রমশঃ)

চেক দেশে ভারতচর্চা এবং অন্যান্য

চিন্মোহন সেহানবীশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাগে জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৯ই আগস্ট ১৯৩৮। সঙ্গে রয়েছেন ডি লজনী এবং এ সি এন নাম্বিয়ার।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিয়মিত চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রাগে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা ১৯২২ সনে। তবে তার সত্যকার কাজকর্ম শুরু হয় আরো প্রায় সাত বছর পরে। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটি কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে চলেছে এমন সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় জীবনে নেমে আসে ফ্যাসিবাদের কালো ছায়া। স্বভাবতই নাৎসী দখলের সময়ে ইনস্টিটিউটের অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়। তবে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা নাৎসীরা বন্ধ করে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগ না থাকায় এর কাজ একেবারে বন্ধ হয়নি যুদ্ধের ভয়ংকর বছরগুলিতেও। বরঞ্চ চারিদিকের দম-আটকানো আবহাওয়া থেকে বাঁচার বহু প্রবীণ ও নবীন গবেষক অনেক সময়ে জড়ো হতেন ইনস্টিটিউটের ঘরগুলিতে।

সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের কর্মীসংখ্যা এখন একশোর মতো। ভৌগলিক দিক থেকে আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর পূর্ব এশিয়া এই চারটি বিভাগে এখন কাজ চলে ইনস্টিটিউটের। এর গ্রন্থাগারে রয়েছে দেড় লক্ষ বই—তার অধিকাংশই চীনা ভাষায় লেখা বা চীন-সম্পর্কিত বই বা পুঁথি। প্রায় আশিটি দেশ থেকে ছ'শোর মতো প্রাচ্যবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট পত্রিকা এঁরা পেয়ে থাকেন নিয়মিত।

শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষ নয়, এ যুগের ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কেও চেকোশ্লোভাকিয়ায় দেখা গেছে সমান আগ্রহ। যেমন ১৮৫৪ সনে দীর্ঘ এক ধারাবাহিক রচনায় একজন লেখক তাঁর দেশবাসীকে অবহিত করেছেন রামমোহন ও দ্বারিকানাথের শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে। সিপাহী বিদ্রোহের খবর চেক পত্র-পত্রিকায় বহুবার আলোচিত হয়েছে আর সে-আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিরূপতা ও ভারতবাসীর প্রতি সুস্পষ্ট সহানুভূতি। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপি, বাহাদুর শাহের নাম বারবার প্রকাশিত হয়েছে কাগজপত্রে। ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে একজন চেক গ্রন্থকার এই দুর্গতির জন্য সব থেকে বেশি দায়ী করেছেন বৃটিশ শাসকদের। তারপর জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের পর ক্রমে বিপুল সহানুভূতি লক্ষ্য করা গেছে তার রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার প্রতি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেছে পরাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক মহলে। এমন কি চেক শিল্পপতিদের নিজস্ব বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রূপায়িত হয়েছে যে Svuj k svemu কথাটিতে (অর্থাৎ 'ঘর সামলাও') তার ব্যঞ্জনা হয়তো আইরিশদের Sinn Fein -এর (অর্থাৎ 'শুধু আমরাই') চাইতেও আমাদের 'স্বদেশী' মন্ত্রের কাছাকাছি। চেক সংবাদপত্রে ঐ সময়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির জন্য আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশী নির্যাতনের বিবরণ, ব্যাপক বৃটিশ পণ্য বয়কটের কথা, লাল-বাল-পালের রাজনৈতিক চরমপন্থার প্রসঙ্গ। আবার ১৯৮০ সনে তিলকের কারাদন্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা যখন সাধারণ ধর্মঘটে নেমেছে তখন তার তাৎপর্য যেমন লেনিনের চোখে ধরা পড়েছিল তাঁর সুপরিচিত 'বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য উপাদান' প্রবন্ধে, তেমনি আবার চেক সমাজতন্ত্রী তরুণদের পত্রিকা 'একাডেমি'তেও লেখা হল : "বৃটিশ সেনাদল কর্তৃক 'জন-কয়েক' শ্রমিককে গুলী করে হত্যা করার সংক্ষিপ্ত সংবাদবাহী গুটিকয়েক টেলিগ্রাম থেকে ভারতে বৃটিশ সরকারের নৃশংসতা ও হিংসার একটা ধারণা পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ে ১৪,০০০ নানান ধরনের শ্রমিক ধর্মঘট করে। পরে অন্য সব কারখানার শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রদর্শনের জন্য তাতে যোগ দেয়। এর ফলে ধর্মঘটীর সংখ্যা ওঠে ২০,০০০-এ। চেক পত্রপত্রিকায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সুপরিচিত Indian Sociologist পত্রিকার কথা বা বিনায়ক দামোদর সাভারকারের বন্দী অবস্থায় জাহাজ থেকে চমকপ্রদ পলায়নের কথাও প্রকাশিত হয়েছে থেকে থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ১৯১৫ সনে সমাজতন্ত্রী

ৎদেঙকা বুর্গ'সারোভা অংকিত উদয়শংকরের প্রতিকৃতি।

দলের পত্রিকা 'প্রাভো লিডু' তার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ করেছে ভারত-প্রসঙ্গে এই কথা বলে : 'পৃথিবীর বৃহত্তম এই উপনিবেশে শিল্পের অগ্রগতি সূচনা করবে বিচিত্র সব পরিবর্তনের। শেষ পর্যন্ত ঐ দেশ অর্থনৈতিক ও তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জন করবে। বর্তমান যুদ্ধ এক নব পর্যায় চিহ্নিত করবে ভারতের ইতিহাসে। এর ফলে ত্বরা-

ন্বিত হবে সেই সব প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভারতবর্ষ লাভ করবে তার স্বাধীনতা।' যুদ্ধপরবর্তী যুগে গান্ধীজী, তাঁর মতামত ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে বহু রচনাও প্রকাশিত হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও দেশে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছাড়াও 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টি-টিউটের খাতায় স্বাক্ষর রয়েছে জগদীশচন্দ্র, সুনীতিকুমার, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ বেণীপ্রসাদ, অধ্যা-পক বিনয় সরকার প্রমুখের নাম। উদয়-শংকর সে-দেশের মানুষকে অভিভূত করে-ছেন তাঁর নৃত্যকলায়।

তবে ঐ সময়ে যাঁরা তাদের দেশে গিয়েছিলেন তার মধ্যে যে দু'জন ভারতীয়ের নাম চেকোশ্লোভাকিয়াবাসীরা সবচেয়ে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আজো উচ্চারণ করে থাকেন তাঁরা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল। জওহর-লাল ১৯৩৩ সনের আগেই তাঁর বিশ্ব ইতিহাসে উল্লেখ করেছিলেন হুস্‌বিদ্রোহ, ১৮৪৮ সনের বিপ্লব, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন এক রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুদয় প্রভৃতি প্রসঙ্গের। ১৯৩৫ সনের শেষ দিকে তিনি কংগ্রেসের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য কৃপালনী মারফৎ তাঁর সেই বই আর কংগ্রেসের আন্দোলন সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন অধ্যাপক লেজ্‌নিকে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল যাতে কংগ্রেস ও প্রাগের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মারফৎ দুই দেশের মধ্যে ভাববিনিময় স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। অধ্যা-পক লেজ্‌নি তাঁকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় আমন্ত্রণ জানান ১৯৩৫ সন। তিনি রাজীও হন; কিন্তু কমলা নেহরুর মৃত্যুর দরুন সেবার আর তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি চেকোশ্লোভাকিয়ায়। ইতিমধ্যে নাৎসীদের দাপট শুরু হয়ে গেল ইয়োরোপে। নেহরু আবার বিদেশ যাচ্ছেন শুনে তারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় জার্মানীতে। কিন্তু এর আগে ১৯৩৬ সনে যেমন তিনি মুসো-লিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবারো তেমনি তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন নাৎসী আমন্ত্রণ। আর তার বদলে ১৯৩৮ সনে তিনি গেলেন ফ্যাসিস্ট অভি-যানের দুই শিকার—স্পেন ও চেকোশ্লোভা-কিয়ায়। স্বভাবতই এ ঘটনা বিশেষভাবেই অভিভূত করেছিল নাৎসী ছায়াচ্ছন্ন চেকো-শ্লোভাকিয়াকে। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর মতো নেতা যে পরবর্তী দিনে চেকোশ্লোভা-কিয়ার পক্ষে দাঁড়ান, তারো পিছনে ছিলেন নেহরু। এ সবের জন্য আজো [illegible] জওহর-লালকে স্মরণ করেন দুঃ[illegible] [illegible]র বন্ধু হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিন্টারনিৎস ও লেজ্‌নির ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা আগেই কিছুটা বলা হয়েছে। লেজ্‌নিকে লেখা কবির বেশ কয়েকটি চিঠি তাঁর শত-বর্ষপূর্তির বছরে প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ জবাভিটেলের উদ্যোগে। ডঃ ক্রাসা আমায় জানালেন যে, আর একখানি চিঠি তাঁরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন লেজ্‌নির কাগজপত্রের মধ্যে। চিঠিটি এখানে ছাপা হল 'অমৃত'' পত্রিকার পাঠকদের জন্যে। *

---

* ১৯৩৭ সনের ৩১শে জানুয়ারি ভিন্টোরনিৎসের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অধ্যাপকের বোনকে একটি চিঠিতে লেখেনঃ

During my long life and extensive travels, I never met a servant more worthy of respect than the learned doctor....In him! I have lost a faithful comrade. India has lost one of its truest Pandits and best friends, and humanity one of its sincere champions.

১৯২০ সনে কবি যখন আমেরিকা যাবার পথে দিনকয়েক লণ্ডনে কাটাচ্ছিলেন তখন লেজ্‌নি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে আমন্ত্রণ জানান চেকোশ্লোভাকিয়া সফরের জন্য। আমেরিকায় পেঁাছে তিনি ঐ রকম অনুরোধপত্র পান ভিণ্টার্‌নিৎসের কাছ থেকেও। উভয়কেই তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে দেশে ফেরার আগে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাবেন। সেই কথামতো ১৯২১ সনের জুন মাসে কবি চেকেশ্লোভাকিয়া পেঁাছন। তাঁর বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলাপ, সেখানকার মানুষের মধ্যে এত প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করে যে তাঁকে বাধ্য হতে হয় সফরের মেয়াদ বাড়াতে। কবি যে জালিয়ানওয়ালা বাগে অনুষ্ঠিত নৃশংসতার প্রতিবাদে রাজসম্মান প্রত্যাখ্যান করেছেন—বারবার সে ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় চেক্‌ সংবাদপত্রে।

পাঁচ বছর পর রবীন্দ্রনাথ আরো একবার চেকোশ্লোভাকিয়ায় যান সেখানকার লেখকদের আমন্ত্রণে। এবার সেখানে তিনি অভিনন্দিত হলেন শুধু কবি হিসাবে নয়, ফ্যাসিবাদের একজন মহৎ বিরোধী হিসেবে, বিভিন্ন জাতি ও রক্তের মানুষের মধ্যে মিলনের উদ্গাতা হিসাবে যুদ্ধোত্তর পর্বের সাংস্কৃতিক মূল্যবিপর্যয়ের দিনে যাঁর সৃষ্টি গভীর ছাপ ফেলেছে ইউরোপের আকাঙ্ক্ষিত জীবনের 'পরে।' এবার কবির সঙ্গী ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। এবারো বহু সভায় তিনি বক্তৃতা ও আবৃত্তি করেন, সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রপতি ম্যাসারিকের সঙ্গে আর জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেন তাঁরই 'ডাকঘরের' কবিতা ও গান এবার বিশেষ সাড়া জাগায় চেক্‌ কবি ও সুরকারদের ভিতরে। অনেকে তার প্রেরণায় সৃষ্টি করেন নতুন গান ও সুর।

কবি ও সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে বিপুল ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন তা আরো যেন বিস্তারলাভ করে ঘনায়মান ফ্যাসিস দুর্যোগের দিনে ঐ ছোট্ট 'সুন্দর' দেশের প্রতি তাঁর মহৎ ও অবিচল সমর্থন ঘোষণায়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার জানা ছিল না। ১৯৩৭ সনের বড়দিনের সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত লেখক কারেল্‌ চাপেক্‌ (লেজ্‌নির কাছে লেখা কবির যে চিঠিটি উপরে প্রকাশিত হয়েছে তা'তে দেখা যায় যে কবি এ'র লেখার সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন) প্রাগ রেডিও মারফৎ রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ ও এশিয়ার উদ্দেশে একটি বাণী পাঠান (এর আগে তিনি অনুরূপ এক বাণী পাঠিয়েছিলেন এলবার্ট আইনস্টাইনের উদ্দেশেও। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বাণীটি চাপেক পড়েন, চেক্‌ ভাষায় আর রবীন্দ্রনাথের জন্য সেটি তর্জমা করেন অধ্যাপক লেজ্‌নি)। চাপেক্‌ বলেছিলেন : 'মহামানব, প্রাচ্যদেশের সুসঙ্গত বাণীমূর্তি, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে আমরা আপনার শান্তিনিকেতনে অভিনন্দন জানাই; আপনাকে আমরা অভিনন্দিত করি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে যেখানে তুষারপাত চলেছে, সেই ইউরোপ থেকে যেখানে আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করছি, সেই পশ্চিম দুনিয়া থেকে যেখানে সব থেকে উন্নত জাতিগুলিও সৌভ্রাত্র সম্ভাষণে হাত ধরতে পারে না পরস্পরের। তবু আমাদের দুই দেশ ও সংস্কৃতির ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা সৌভ্রাত্রের হাত বাড়ালাম আপনার প্রতি, মধুর প্রাজ্ঞতার কবি আপনার প্রতি, শান্তির নীড় আপনার শান্তিনিকেতনের প্রতি, আপনার সুমহৎ ভারতবর্ষের প্রতি, আপনার সুবিশাল এশিয়ার প্রতি, সেই এশিয়ার প্রতিও পশ্চিমের আবিষ্কৃত অস্ত্রে যাকে পরিণত করা হচ্ছে শ্মশানে। আমাদের উভয়েরই সাধারণ ভূখণ্ডের সবথেকে পূর্ব ও সবথেকে পশ্চিম কোণার কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে, এমন এক মুহূর্তে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ক্ষীণ এক কণ্ঠ বছরের শেষে আপনাকে ডাক দিচ্ছে : পৃথিবী বাঁচুক, তবে সে পৃথিবী যেন হয় সমান ও স্বাধীন জাতিদের পৃথিবী।'

সুভাষচন্দ্র চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে গেলে লেজ্‌নির সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের কবির উত্তর পেঁাছতেও দেরী হল না :

"Friends in Czechoslovakia! In the terrible storm of hatred and violence raging over humanity accept the goodwill of an old idealist who clings to his faith in the common destiny of the East and West and all people on the earth. Rabindranath."

(চেক্‌ ভাষা থেকে পুনরনূদিত।)

তারপর কুখ্যাত মিউনিক বিশ্বাসঘাতকতায় যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার এক অংশকে বলি দেওয়া হল হিটলারের সাম্রাজ্যলোভের কাছে তখন রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রপতি বেনেশের কাছে এই তার পাঠালেন :

'I can only offer profound sorrow and indignation on behalf of India & of myself at the conspiracy of betrayal that has suddenly flung your country into a tragic depth of isolation, and I hope that this shock will kindle a new life into the heart of your nation leading her to a moral victory and to an unobstructed opportunity of a perfect self-attainment.'

এর কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু অধ্যাপক লেজ্‌নিকে লিখলেন :

'I feel so keenly about the suffering of your people as if I was one of them. For what has happened in your country is not a mere local misfortune which may at the best claim our sympathy: it is a tragic revealation that the destiny of all those principles of humanity for which the people of the West turned martyrs for three centuries rests in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when even the bullies stand by each other.

'I feel so humiliated and helpless when I contemplate all this,

HOTEL IMPERIAL
WIEN

Oct: 23. 1926

Dear Dr Lesny

I am confined to my bed, ill and tired. My doctor thinks ~~that~~ I shall have my release in the beginning of the next week when I shall try to visit Budapest where the people are so eagerly waiting for me. The memory of my welcome in Prague will always remain in my heart and my love for your people I shall carry with me to India.

I have just finished reading the Letters from England by your great author Capek, they are brilliantly suggestive and full of originality.

Kindly send me a list of the books that you have undertaken to send to our library in Santiniketan. For I have to send a notice beforehand to Prabhat Kumar Mukerji, our librarian informing him about the number and names of them.

With kindest regards to yourself and your wife

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

humiliated to see all the values which have given whatever worth modern civilization has, betrayed one by one, and helpless that we are powerless to prevent it. Our country is itself a victim of these wrongs. My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor even the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity. I can only remind those who are not yet wholly demented that when men live as beasts they sooner or later tear each other.

'As for your own country, I can only hope that though abandoned and robbed it will maintain its native integrity and falling back upon its own inalienable resources will recreate a richer national life than before.

১৯৩১ সনের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ লেজনিকে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি পাঠালেন যাতে ছিল 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতের পৃষ্ঠপটে কবির এক সমকালের মূল্যায়ন। সঙ্গের চিঠিতে তিনি লেজনিকে লিখলেন যে কয়েকদিন আগে জওহরলালের কাছ থেকে তিনি মধ্য ইউরোপের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত খবর পেয়েছেন। তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে রইলেন তাঁর সেই বিশ্বাস যে

'.... Your brave people will not lose heart and you will not fail to rebuild once again your own future.'

তারপর যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে কবি ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন : '...দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহা সাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দন্তপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খেয়া। অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সম্রাজ্যশক্তি নির্বাকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালীর হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল. মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাব্লিককে দেউলে করে দিতে, মুানিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ঈমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হল না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে।'

চেকোশ্লোভাকিয়ার মনুষের অন্তরের গভীরে তাই রবীন্দ্রনাথের স্থান।

লেজনিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

আকাদমি পুরস্কৃত কবি মণীন্দ্র রায়

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এবারের সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার বাংলা সাহিত্যের কবিতার বই 'মোহিনী আড়াল'কে দেওয়া হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের লেখক মণীন্দ্র রায়। স্বভাবতই এই সংবাদে আমরা পুলকিত। মণীন্দ্র রায় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আপনজন, তাঁর এই সম্মানে আমরাও সম্মানিত। 'অমৃত'-গোষ্ঠীর তিনি কেন্দ্রবিন্দু, অমৃতগোষ্ঠীর তরফ থেকে আমরা কবি মণীন্দ্র রায়কে অভিনন্দন জানাই। যে স্বীকৃতি তিনি লাভ করলেন তা দেশের মানুষ তাঁকে অনেক পূর্বেই দান করেছে, এখন পাওয়া গেল রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। 'মোহিনী আড়াল' ইতিমধ্যে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অনেক অবাঙালী পাঠকও 'মোহিনী আড়ালে'র প্রশংসা আমাদের কাছে করেছেন।

পাবনার শীতলাই গ্রামে মণীন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পরে। সেই শীতলাই গ্রামে কবির বাল্যজীবন কেটেছে। শীতলাইকে তিনি ভুলতে পারেন নি আজো—

'বারেবারেই দাঁড়াই গিয়ে
দিঘির ঘাটে, কোথায় জল, পৈঠা ছুঁয়ে
হেলঞ্চদোলে ঢেউয়েরা মৃদু শিউরে
ওঠায়
আধো-ডোবা কাঠির মাথায় ফড়িং কাঁপে
এমন সকাল কোথায়?'

বারেবারেই তাই সেই কিশোর মন দিঘির ঘাটে গিয়ে দাঁড়ায়, শহরের ইট-কাঠ কনক্রিটে মন যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন মনে হয়—

'সেকালে শীতলাইয়ে একটা বটগাছ ছিল
ছেলেবেলা সে গাছটাকে এ-মাঠে ও-মাঠে
যতোই ঘুরেছি, যেত দেখা
বিশাল ডালপালা নিয়ে, সাতপুরুষের
জীবন ও জীবিকার নানা আলপনার
গ্রামাকাহিনীর বুকে একা।'

এখন পঞ্চাশের প্রান্তে এসেও সেই শীতলায়ের বটগাছ মাথা তোলে। কবির অন্তরে জাগে সেই গ্রামখানি। শহর দেখেছেন অনেক, স্বদেশ ও বিদেশের অনেক রাজপথ অনেক চোরাগলি, কিন্তু গ্রামের সেই ছবি কবির মন থেকে মুছে যায়নি।

তিরিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে সেই কালেই তরুণ কবি মণীন্দ্র রায়ের কবিতা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে। নম্র, সলজ্জ ভঙ্গীর এই সুদর্শন কবিকে কলিকাতার বরেণ্য সাহিত্যিক-সমাজ সেদিন আন্তরিক আগ্রহে গ্রহণ করেছিল। সেদিনকার সাহিত্য-সমাজে চমক জাগানো সহজ ছিল না, বাংলার কাব্যজগত সেইকালেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অনেক প্রতিষ্ঠাবান কবির অরণ্যে এই নতুন কবির আবির্ভাব চোখ এড়িয়ে যায় নি। ছাত্র অবস্থায় মণীন্দ্র রায় কবিতা লিখেছেন আর সেই কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সেদিনের পরিচয়ে এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক সমসাময়িক পত্রে, তার মধ্যে অনেক পত্রিকা আজ অবলুপ্ত। তারপর ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ত্রিশঙ্কু, একচক্ষু, ইঙ্গিত, ছায়া সহচর, সেতুবন্ধের গান, অন্যপথ, কৃষ্ণচূড়া, অমিল থেকে মিলে, মুখের মেলা, অতিদূর আলোরেখা, কালের নিস্বন্ মোহিনী আড়াল, এই জন্ম, জন্মভূমি। এছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন শেকসপীয়রের সনেট পঞ্চাশৎ, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা, নতুন দিনের রুশ কবিতা ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছেন, বর্তমানে 'অমৃত' পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা সূত্রে প্রথম সংখ্যা থেকেই জড়িত।

মণীন্দ্র রায়ের অন্তরে আছে একটা স্বাভাবিক ঔদার্য, এই প্রকৃতিগত সদগুণ তাঁর কাব্যে এনেছে এক প্রশান্তির সুর। তিক্ততা নয়, ক্রোধ নয়, ক্ষোভ নয় অথচ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তাঁর কবিতায় ধ্বনিত। তিনি বিশ্বাস করেন—কোনো মানুষই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি প্রসারিত না হলে মহৎ সৃষ্টি অসম্ভব। জীবনের মতো কবিতারও বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন রূপ এবং রূপান্তর।

কবি তাই অনুভব করেছেন ঢেউ-এর ছোবল। যে ঢেউ তলার মাটি কাটছে—

'ঢেউয়ের চতুর শাবল মাটি
কাটছে, মাটি ফাটছে, তুমি
হাওয়ার ডাকে কান পাতোনি?'

ঢেউয়ের দাঁতে সময় চেঁচিয়ে উঠছে, তাকে কি বুকে পাওনি? এই প্রশ্ন এ কালের। কবি তাই নতুন দিনের স্বপ্নকে চিনতে পেরেছেন। বিস্ফোরিত অন্যমনের সংবাদ তিনি পেয়েছেন।

কবির অন্তরে এক উদাসীন মন আছে। সেই মন সদা জাগ্রত। কবি জানেন—

'নাম বড় মোহময়; তবু
নাগর দোলার টানে
বাজারের এই ওঠানামা
সতত চঞ্চল করে—'

নিজের অতীত বয়ে সদাই চঞ্চল হয়ে থাকা, সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়। নাম যে বড় ভয়ংকর। তাই সেই লেলিহ আগুনে অনেক অশ্রু আয়ুকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। দহন বেড়েছে। জ্বালা বেড়েছে।

১৯৬৮-তে প্রকাশিত 'নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়' কাব্য থেকে এই উদ্ধৃতি। এর আগে ১৯৩৬-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'কালের নিস্বন'। এই কাব্যগ্রন্থের সূচনায় কবির শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এর সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে জেগেছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্নন্যো
অভিচাকশীতি।।

দুটি পাখি বসে আছে, একটির ঠোঁটে আহারের স্বাদ, আর সংগী উদাসীন।
'দুই পাখি কাছাকাছি একই ডালে বসে।
একই আধারের বুকে উভয়ত সে পদচারণা।'
একই সুরে বাদী-বিসম্বাদীর অনন্যসাধনা।
কবি এই দুই পাখির মধ্যে পেয়েছেন প্রেমের প্রতিমার সন্ধান। যেন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, আর তার মাঝে শূন্য, কালের নিস্বন।

কবির এই 'কালের নিস্বন' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে এক বিচিত্র কবিমানসের পরিচয়। ১৯৩৬-তে কবি যেন আপনাকে খুঁজে পেয়েছেন, তাই তিনি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন—

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার
নিয়তির মতো—
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় বসে আছে
স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অংগারিত
বাসনার ক্ষত
বুঝিবা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু
শিখার ঝলকে।

তাই কিছু যে পাইনি তা নয়, কবি স্বীকার করেছেন—

'না, অনেক পেয়েছি জীবনে;
স্বপ্ন, ঘৃণা, অশ্রু আর হাসি
বহিঃস্থ ব্যক্তির শূন্য মনে
এ সংসারে থাকিনি প্রবাসী।'

চিত্তে অন্ধ আকুলতা জেগে থাকে, এবং সেই জেগে থাকাটাই তার সজীবত্বের লক্ষণ।

যে কাব্যগ্রন্থটি পুরস্কৃত হল, তার নাম 'মোহিনী আড়াল'। এই কাব্যগ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। সুদীর্ঘ কবিতায় এক বহু হতে চায়—আদিম সূর্যের ব্যাকুলতা—'মোহিনী আড়াল! হিরন্ময় পাত্র খুলে ফেল, /চোখে রাখো চোখ।'

দু হাজার বছরের অবচেতন মনের সম্ভাষণ কবির এই কাব্যে ধ্বনিত। এ ত মানুষেরই শ্রুতি। এক আমি বহু হব, এ যে ঈশ্বরের সাধ। তাই প্রশ্ন জাগে—

এই তো একান্ত বাণী বিস্মৃতির শেষে
কে খোঁজে এখন, বল, দেয়ালের
ওপারে হাতের
শব্দে সাড়া
'যেখানেই পালাও ইচ্ছার ভিতরে
ছায়া কাঁপে'—

'মোহিনী আড়াল' গতানুগতিকতার কাব্য নয়। বহু দূরের এক বাসনার সঙ্গে এ যুগের সাধককে মিশিয়ে এ এক আশ্চর্য কাব্যভাবনা। মাঝে মাঝে প্রতীকী মানুষ কানে কানে বলে—'গুহাচিত্রে প্রকৃতি জয়ের/ কোন প্রয়োজনে তারা/ মৃত্যুর ছায়ায়/ খুঁজেছিল অমরতা!...'

কবি তাই সদাজাগ্রত—

'আমি শহরের/ দূর প্রান্তে এ নিশীথে/ জেগে আছি, বড় বেশী জেগে একাকীর/ গভীরে মানুষ খুঁজি।'

পরিশেষে কবির কণ্ঠে সেই অনাদি কালের প্রশ্ন—

'ওগো অন্তরীণ প্রেম,
আর কবে মানবিক শ্রুতির ভাষায়
হবে উদযাপিত? এক
বহু হতে চায়, সে ত মমতারই
গূঢ় জাগরণে!
হৃদয়ে প্রবেশ কর, প্রীত হও,
হে প্রেম আমার,
সব কপাটের বাধা, ভাঙা কড়িকাঠ
হোক অরণির স্তূপে তোমারই শিখায়
আয়ু, জ্যোতি, ওজসের জনসমাগমে
উর্ধ্বশির স্বাহা ।।'

কবি মণীন্দ্র রায় আজ পঞ্চাশের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছেছেন। 'মোহিনী আড়াল'র পর তাঁর ৫৫৯ লাইনে সম্পূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা 'এই জন্ম, জন্মভূমি'। বিগত ১০ পৌষ তারিখের অমৃতে এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জীবন-যন্ত্রণায় অস্থির কবির বিচিত্র বেদনাবোধের অভিব্যক্তি এই সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। ছন্দ, প্রকরণ ও পদ্ধতিতে এক নতুন ভঙ্গীর পরিচয় 'এই জন্ম-জন্মভূমি'।

কবি মণীন্দ্র রায় আজ জীবনের মধ্য-পথে। তিনি আরো দীর্ঘকাল জীবিত থেকে বাংলার কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন এই আমাদের প্রার্থনা। বর্তমান আলোচনায় তাঁর কাব্যভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

মণীন্দ্র রায় আমাদের আপনজন একথা আগে বলেছি, সেই আপনজনকে আমরা অমৃতগোষ্ঠীর তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার

সাহিত্য আকাদেমির পরিচালক বোর্ড ১৯৬৯ সালের আকাদেমি পুরস্কারের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি নির্বাচন করেছেন। অসমীয়া ভাষা — আসামের থিয়েটার সম্পর্কে লেখা অধ্যাপক অতুলচন্দ্র হাজারিকার 'মঞ্চলেখা'; বাংলা ভাষা - শ্রীমণীন্দ্র রায়ের কবিতার বই 'মোহিনী আড়াল'; ইংরাজি—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-এর আলোচনাগ্রন্থ 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ; গুজরাটি— স্বামী আনন্দ লিখিত 'কুলকথাও'; কানাড়া—ডঃ ইউ টিপ্পেরুদ্রস্বামী লিখিত সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থ 'কর্ণাটক সংস্কৃতি সমীক্ষে'; কাশ্মিরী—আবদুল খালেক-এর 'তাকজেন-গিরিকা'; মৈথিলি—উপেন্দ্র ঝা-এর 'দু পত্র'; মালয়ম—এদাসিরি গোবিন্দন নায়ার-এর 'কবিলে পাগ'—, মারাঠি—এস এন বনহাট্টি লিখিত 'নাট্যাচার্য দেবল'; ওড়িয়া—সুরেন্দ্র মহান্তির 'নীল শৈল'; পাঞ্জাবী—ডঃ [illegible]ভজন সিং-এর 'নামুপেনা' উর্দু— পরলোকগত মখদুম মহীউদ্দীন [illegible] বিস[illegible] ই-রকস; হিন্দি—শ্রীল[illegible] [illegible]ক্লের—'রাম দরবারী'; তামিল—প[illegible] [illegible]ত ভারতী-দশন লিখিত 'ঘিচি [illegible]ার' (নাটক); তেলেগু—তুসুল্যা সী[illegible]ামমূর্তির 'মহাত্মা কথা' (কবিতা); সিন্ধি এস ইউ মালকানি লিখিত 'সিন্ধিনামারজি' (ইতিহাস)।

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ডাইরেক্টার ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের জন্ম ১৯০৪ সালের ১৪ জানুয়ারী। তিনি ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলকাতা ও

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

ইংলাণ্ডে শিক্ষালাভ করেন এবং এম-এ, ডি-লিট, ডি-ফিল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-ধারী, বৃটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো। নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বৎসরা-ধিককাল কারাবাস করেছেন। তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক, বিশ্বভারতীর পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য, বিবিধ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের লেখক। বিশেষ করে তিনি বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব লিখে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন (১৯৫০)। তিনি বার্মা গভর্ণ-মেন্টের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাক্তন উপদেষ্টা ছিলেন। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্ট্যাডিজের ডাইরেকটার।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতিবেশী সাহিত্য

১৯৫৭ খৃস্টাব্দে এই কলকাতায় সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক-লেখিকা যোগদান করেন। হিন্দি, উর্দু, মারাঠী, গুজরাতি, তামিল, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, গুরুমুখী প্রভৃতি সকল ভাষার প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। এক হিসাবে কলকাতা শহরে সর্বভারতীয় লেখকদের সেই প্রথম সমাবেশ। এর পরে, অন্য কয়েকটি সম্মেলনেও সর্বভারতীয় লেখক সমাবেশ ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যকর্মের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই সূত্রে প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, বর্তমানে মুন্সী প্রেমচন্দ, মহাদেবী বর্মা, শিবশঙ্কর পিল্লাই, উমাশঙ্কর যোশী, শঙ্কর কুরুপ, কালিন্দীচরণ, ইলাচন্দ্র যোশী, যশপাল, কিষণচন্দর, নিরালা, সুমিত্রানন্দন পন্থ প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত, আরো অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমরা মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম। জীবিত বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল মিত্র, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসকারদের প্রচুর গল্প-উপন্যাস হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধর্মযুগ, হিন্দুস্থান, সারিকা প্রভৃতি হিন্দি সাময়িকপত্রে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের গল্পের অনুবাদ থাকে, এমন কি সত্যজিৎ রায়ের একটি মাত্র বাংলা গল্পের প্রতিও এই সব হিন্দি অনুবাদকদের লক্ষ্য আছে, এবং সেই কাহিনীর সুন্দর হিন্দি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বিমল মিত্রের 'সরস্বতীয়া' নামক উপন্যাসিকার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থানে', সেই সঙ্গে আছে লেখকের কথা, জীবনী, চিত্র ইত্যাদি। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে আশাপূর্ণা দেবীর গল্প।

এই আলোচনার মধ্যে এই সব তথ্য উল্লেখের প্রয়োজন আছে। সাম্প্রতিক হিন্দি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরা বুঝেছেন যে সমকালীন বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দি ভাষাভাষীদের পরিচয় হলে তার ফল শুভ হবে। প্রতিবেশী সাহিত্যের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত থাকলে লাভটা উভয়ত।

দুঃখের বিষয় এই অনুপাতে বাংলায় হিন্দি বা অন্য প্রান্তীয় সাহিত্যের অনুবাদের প্রতি আমরা সমধিক আগ্রহান্বিত নই। 'অমৃত' পাঠকদের স্মরণ থাকা সম্ভব বোম্মানা বিশ্বনাথন কিছুকাল পূর্বে ধারাবাহিকভাবে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রতিবেশী সাহিত্যের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা অনুবাদ করেছিলেন।

সম্প্রতি হিন্দি সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে দেখা গেল, অতি অল্পকালের মধ্যে হিন্দি সাহিত্যের কি বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই সম্মেলনে দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দি সাহিত্যিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সব কবি ও উপন্যাসকারদের মধ্যে অনেকেই বয়সে নবীন এবং প্রগতিশীল মনোভঙ্গীর অধিকারী। উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং য়ুরোপ ভ্রমণের সুবিধা পেয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেক প্রসারিত হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজে উদারনীতিক সাহিত্যকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এঁরা সচেতন।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে 'পরিমল' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা আছে। আগের যুগের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ জাতীয় এই সংস্থাটির সঙ্গে অধিকাংশ আধুনিক হিন্দি লেখকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট। এই সংস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'পরিমল' এক চিরন্তন গতিশীল সংস্থা হায়', 'আউর হোতে না হোতে পরিমল আজ এক হোনে ন হোনে কে বীচ এক এইসা নাম হায় যো পিছলে পঁচিশ বর্ষো সে লাগাতর কিসি না কিসি রূপ মে সম্পূর্ণ হিন্দি সাহিত্য ক্ষেত্র মে নয়ে-পুরাণে ঔর অত্যধিক নয়ে, সব কো প্রতিক্রিয়া কো কেন্দ্র বিন্দু রহা হায়।'

এই সাহিত্য সংস্থার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৯, ১০, ১১ই ফেব্রুয়ারীতে যে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রকাশনের 'দিনমান' পত্রিকায় এবং অন্যান্য হিন্দি দৈনিক ও সাপ্তাহিকেও প্রকাশিত হয়েছে, সম্মেলনটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এত অধিক সংখ্যক প্রখ্যাতনামা হিন্দি লেখক সাম্প্রতিককালে আর কোন সমাবেশে যোগদান করেন নি। এই সম্মেলনে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন লেখককেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, অন্য কোন ভাষা গোষ্ঠীকে না ডাকলেও বাংলার সঙ্গে হিন্দির আত্মিক যোগ আছে এই স্বীকৃতি এই সমাবেশে মিলেছে।

রাজনৈতিক দলাদলির ক্ষুদ্রতা আর সৃজনশীল মনোভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাহিত্য-জগৎ স্বতন্ত্র, সেই জগতে নতুন-পুরাতন সব সাহিত্যকারের মর্যাদার আসন প্রসারিত। যিনি প্রবীণ তিনি তাঁর বুদ্ধি ও বিচার মাফিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের পথে এক-একটি পদক্ষেপ এক-এক রকমের। কিছুই উপেক্ষণীয় নয়। নতুনকে বরণ করতে হয় উদার বাহু মেলে আর পুরাতনকে মর্যাদা দান করতে কুণ্ঠার কারণ নেই। সৃজনশীলতার পথ মুক্ত, সেখানে সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। ব্যবসাদারের মতলববাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচল। রাজনীতি যে মুক্তির স্বাদ পায় নি, সেই মুক্তি লাভ করেছে সাহিত্য। সাহিত্য ও সাহিত্যকারের সামনে আজ অনেক জীবন্ত প্রশ্ন উপস্থিত। এই সব আলোচনাই এই সম্মেলনে হল।

এই অনুষ্ঠানটি উদ্ঘাটন করেন নেপাল-এর বি পি কৈরালা, স্বাগত ভাষণ দিলেন মহাদেবী বর্মা, সভাপতিত্ব করলেন ডঃ শিবপ্রসাদ সিংহ আর বিশেষ অতিথির ভাষণ দিলেন সুমিত্রানন্দন পন্থ।

প্রথম দিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সাহিত্য কেন? ডঃ বিজয়দেবনারায়ণ শাহী একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ পাঠ করে আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

তিনি বললেন—'আগর হমারে সামনে সাহিত্য কা ইতনা বিশাল চিত্রফলক হায় জিস মে বাল্মিকী, হোমর, কালিদাস, শেকসপীয়র, গেটে, টলস্টয়, ইত্যাদি সব বড়ে ভারী কাল বিস্তার মে প্রকাশমান হায় তো প্রশ্ন কা আকার বহুত ছোটা ইয়া লগভগ অনর্গল-সা হো জাতা হায়। মনুষ্যতা কা ইস সাহিত্যিক বিস্তার কে প্রতি ব্যবহার ইস কয়ো কা শমন কর দেনে কে লিয়ে কাফি হোনা চাহিয়ে। দূসরে তরফ যব ঐ 'আজ কে বিশিষ্ট দেশ-কাল মে যা আউর প্রত্যক্ষ শব্দ মে, ইস ১৯৭০ কে ভারতবর্ষ মে হিন্দি কি কিসো রচনারত লেখক কী ঔর য়া স্বয়ং আপনে ঔর দেখতে হায়, অউর সাথ হী সাথ আপনে সমুচ সমাজকে গিরাবট, কূল মিলা কর এক মানবব্যাপী অসমর্থতা, নপুংসকতা ঔর ইস সবকো ঢকনে কি লিয়ে আজকে কবচ পর-কবচ ধারী মনুষ্য কো দেখতে হায় তো ইস প্রশ্ন কা আকার বাড়তা জতা হায়—ঔর লগতা হায় কি প্রশ্ন সঠিক হায় ঔর শায়দ আবশ্যক ভী।'

ডঃ শাহীর প্রশ্ন বিশেষ অর্থপূর্ণ। যে সমস্যা আজ হিন্দি লেখকের সেই প্রশ্ন আজ ভারতের সকল ভাষাগোষ্ঠীর লেখকের মনে জেগেছে। তাঁর প্রবন্ধের আরো জোরদার অংশ উদ্ধৃত করলে তাঁর বক্তব্য হয়ত বোঝা ন সম্ভব হত কিন্তু আমাদের স্থান সীমিত।

সাহিত্যের সংকট এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠানগত চাপ সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত করেন। এই আলোচনাসভার দুটি অধিবেশনে প্রায় কুড়িজন বিশিষ্ট লেখক অংশ গ্রহণ করেন এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। পরদিন 'সমসাময়িক কবিতা—সার্থকতা ঔর সমস্যা' নামক আলোচনার বৈঠক বসে। অনেক কবি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় একটি কবি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হল। আধুনিক ও প্রাচীন হিন্দি কবিরা কবিতা পাঠ করলেন। এই অনুষ্ঠানের সংযোজক ডঃ জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তিনি হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক।

সভায় ইলচন্দ্র যোশী, মহাদেবী বর্মা, সুমিত্রানন্দন পন্থ, শিক্ষার্থী, বিপিনকুমার অগ্রবাল, দুধনাথ সিংহ, ডঃ অরুণ মিত্র, শ্রীকান্ত বর্মা, নির্মল বর্মা, ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ লাল, সর্বেশ্বরদয়াল সাকসেনা, লক্ষ্মীকান্ত বর্মা, কেশবচন্দ্র বর্মা, বালকৃষ্ণ রাও, নিত্যানন্দ তেওয়ারী, অশোক বাজপেয়ী প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন এবং সুদীর্ঘ আলোচনার কালেও সভার আয়তন হ্রাস পায় নি।

এই সভায় যোগদানকারী কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল তাঁরা যেমন সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখেন তেমনই বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটিও তাঁদের অজানা নয়। প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে সকলের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, হিন্দি সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল আমাদেরও সমকালীন হিন্দি সাহিত্য সম্পর্কে অনুরূপ আগ্রহ থাকা প্রয়োজন।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

সাতজন আধুনিক আমেরিকান ঔপন্যাসিকের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন উইলিয়াম ভ্যান ওকনার। যে সাতজনের উপর তিনি আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন এডিথ ওয়ার্টন, সিনক্লিয়ার লুই, এফ স্কট ফিজারাল্ড, উইলিয়াম ফকনার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, টমাস উলফ এবং নাথানিয়েল উলফ। আসলে মেনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই সাতজন ঔপন্যাসিকের উপর আলাদা আলাদাভাবে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থে একত্রে সেগুলি সংকলিত করা হয়েছে।

মেনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পুস্তিকাগুলিতে একদিকে যেমন লেখকের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে হয়েছে তার লেখার মূল্যায়ন। প্রথম যে আলোচনাটি আছে তা হলো এডিথ ওয়ার্টনের উপর। তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল 'দি ডেকোরেশন অব হাউসেস' গ্রন্থটি মাধ্যমে। এই গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন ওগডেন কডম্যানের সহযোগিতায়। এরপর তাঁর মৌলিক রচনা 'দি গ্রেটার ইনক্লাইডনেশন' নামক একটি ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরেই তিনি একধরনের ছোট উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু খ্যাতি অর্জন করেন 'দি হাউস অব মার্থ' নামক উপন্যাসটির মাধ্যমে। এতে নিউইয়র্কের নগরজীবনের বিভিন্ন দিক অতি নিপুণভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিউইয়র্ক শহরজীবনকে কেন্দ্র করে তিনি আরও দুটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'দি কাস্টম অব কি কান্ট্রি' উপন্যাসে তিনি মানুষের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান চিত্রিত করেন। তাঁর সমস্ত রচনাতেই একটি নীতিবোধকে ফুটিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা আছে। সিনক্লিয়ার লুই-এর উপর আলোচনাটির সূত্রপাত হয়েছে, তাঁর জীবনকাহিনী দিয়ে। তার থেকে জানা যায় যে, তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত কাব্যরচনা দিয়ে। ই এল লিটারারি ম্যাগাজিন পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু প্রকৃত খ্যাতি অর্জন করেন স্যাটায়ারধর্মী উপন্যাস 'ব্যাব্বিট' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এই উপন্যাস লেখার সময়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জীবনের কোন একটি দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। কিন্তু লিখতে বসে আমেরিকার মধ্যবিত্ত জীবনের একটি হাস্যকর ছবি এঁকে ফেললেন। সিনক্লিয়ার লুই হলেন প্রথম আমেরিকান লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এফ স্কট ফিজারাল্ডের উপর আলোচনাটিও তাঁর জীবনী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর জীবনী খুবই ট্র্যাজিক। অমিতব্যয় এবং অত্যধিক মদ্যপানের জন্য তাঁর বিব... বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯২৫ খৃঃ তাঁর ...ট গেটসবাই' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এতে আধুনিক অথচ অদ্ভুতরকমের প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী একজন প্রেমিকের চিত্র তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দি সাইড অব প্যারাডাইস' এবং 'টেন্ডার ইজ দি নাইট' তাঁর অন্য দুটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

ফকনারের উপর আলোচনাটিও বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। ফকনার যেন নিজেকে খুশী করবার জন্যই লিখেছিলেন। 'দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরি' তাঁর খুব একটা সচেতন প্রয়াস নয়। প্রকৃতপক্ষে এতে জয়েসের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। চল্লিশের দশকের আগে তাঁর একটা খুব খ্যাতিও ছিল না। নোবেল পুরস্কার লাভের পরেই যেন তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হেমিংওয়ে বোধকরি একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ইউরোপে হেমিংওয়ের উপন্যাস সম্বন্ধে মিশ্র ধারণা বর্তমান। আসলে তাঁদের অনেকেই ঠিকভাবে হেমিংওয়ের উপন্যাসে যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, তার স্বরূপ ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন

না বলে মনে হয়। তাঁর উপর যে আলোচনাটি সংকলিত হয়েছে, তার রচয়িতা ফিলিপ ইয়ং। তিনি দেখিয়েছেন, 'ইন আওয়ার টাইম' হল হেমিংওয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকধর্মী রচনা। 'দি সান অলসো রাইজেস', 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', 'ফর হুম দি বেল টোলস্', 'দি ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি' ইত্যাদি গ্রন্থের জন্য তিনি বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। নাথানিয়েল ওয়েস্টের উপর আলোচনাটিও সুচিন্তিত। পৃথিবীর প্রথম সারির কয়েকজন ঔপ-ন্যাসিক সম্বন্ধে জানতে হলে এই গ্রন্থটি পাঠককে অপরিসীম সাহায্য করবে বলে আশা করি।

অতীন্দ্র মজুমদার কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। তিনি বর্তমানে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। কবি ও সমালোচক হিসেবে তাঁর পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে অবিদিত নয়। তিনি ভারতে মাত্র একমাস থাকবেন। এর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন আদি-বাসীদের জীবন ও সাহিত্যের উপর তথ্য সংগ্রহ করবেন। এর মধ্যেই নাকি বস্তার, উড়িষ্যা এবং বাঙলার আদিবাসীদের উপর অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন। ভারত থেকে প্রথমেই যাবেন মিশরে। সেখানে আল্ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর মুসলমান প্রভাবের উপর একটি আলোচনা সভায় যোগ দেবেন আগামী ৩ মার্চ। সেখান থেকে যাবেন বুদাপেস্টে। বলবেন চর্যাপদ ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উপর। চর্যাপদের অনেক কটি কবিতা তিনি ইংরেজিতে এর মধ্যেই অনুবাদ করেছেন। বুদাপেস্ট থেকে যাবেন হাইদেনবার্গ এবং তারপর প্যারিসে। সেখানে গান্ধীজির উপর দুটি আলোচনা সভায় যোগ দেবেন। তারপর চিকাগো, কালি-ফোর্নিয়া এবং হাওয়াইয়ে কয়েকটি সভায় বাঙলা সাহিত্যের উপর বলবেন। জিজ্ঞেস করলাম—'আপনার নতুন কোন বই বেরুচ্ছে কি?' জানালেন, কিছুদিনের মধ্যেই 'হিস্টোরিক্যাল গ্রামার অব দি বেঙ্গলি লেংগুয়েজ' প্রকাশিত হচ্ছে। এখন তিনি 'দি ড্রাম এন্ড দি ফ্লুট' নামে একটি গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত আছেন। এর পরেই সমকালীন বাঙলা কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করার কথা ভাবছেন। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন—'অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় সাহিত্যের উপর, বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের উপর বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে অনেকে বাঙলা ভাষা শিখছেন। প্রসঙ্গতঃ আরো জানালেন, মিসেস এম ওয়েডেট নামক একজন তরুণ কবি জীবনানন্দের অনেক কটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকায় তার কয়েকটি প্রকাশিতও হয়েছে। এখন তিনি আরও কয়েক-জন কবির কবিতা অনুবাদ করছেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, পাপুয়া থেকে আধুনিক

পরলোকে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আগামী সপ্তাহে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

বাঙলা কবিতার একটি অনুবাদ সংকলন ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। উইলি বিয়ার ও পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী মিলে এই অনুবাদ করেছেন। যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, আশিস সান্যাল প্রমুখ।

রাশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের জল্পনা-কল্পনা চলছে। কিন্তু, রাশিয়ার অধিকাংশ লেখক নিজেদের সাহিত্য সম্বন্ধে কি ভাবেন, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি সীমিত। সম্প্রতি কানাডার টোরোন্টো থেকে প্রকাশিত 'কানাডিয়ান টেলিগ্রাম' পত্রিকায় প্রখ্যাত রুশ লেখক সার্গেই মিখাইলকভের একটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন রেখেছিলেন প্রখ্যাত কানাডিয়ান সাংবাদিক মার্ক দ্য ভিলিয়ার্স। পাঠকের সুবিধার্থে প্রশ্নোত্তর আকারেই তার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্নঃ আপনার দৃষ্টিতে রাশিয়ান শিল্প ও সাহিত্যের দায়িত্ব কি কি?

উত্তর ঃ সোভিয়েট সমাজ জীবনের সত্য বর্ণনা এবং তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন সাম্যবাদী সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। নতুন সমাজ গঠনে যেসব জটিলতা তার বাস্তব প্রকাশ শিল্পী ও সাহিত্যিকের দায়িত্ব, তাকে অস্বীকার করা নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন, সাহিত্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবে?

উত্তর ঃ বিশ্বসাহিত্যে কোথাও রাজ-নীতি নিরপেক্ষ সাহিত্য ছিল না বা নেই, কারণ শিল্প বা সাহিত্যে রাজনীতিকে অস্বীকার করা সাহিত্যিকের অন্য এক ধরনের রাজনীতি। সারা পৃথিবীতে এখন একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছে এবং সাহিত্য হচ্ছে তার দর্পণ স্বরূপ। যদি দর্পণটাকে এই সংগ্রামের দিকে উল্টো করে ধরা হয়, তাহলে তাতে যে প্রতিকৃতি ধরা পড়ে, তা হল লেখকের ব্যক্তিচিন্তার, যে লেখক কোন কিছুর সংগে নিজেকে জড়িত করেন না।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্য কি দেশাত্মবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবে?

উত্তর ঃ যদি সাহিত্য প্রকৃত অর্থে জন-গণের ধারণাকে প্রতিফলিত করে, তাহলে দেশাত্মবোধ দ্বারা তা প্রভাবিত হবেই।

প্রশ্ন ঃ প্রতীচ্য শিল্প সাহিত্যকে কি কি অর্থে অবক্ষয়ী ও বুর্জোয়া ভাবধারার মাধ্যম বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ প্রতীচ্যের সব শিল্প সাহিত্যকে আমি এবং আমরা অবক্ষয়ী বা বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতীক মনে করি না। বাস্তব এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনু-প্রাণিত সাহিত্য সেখানে সফলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবক্ষয়ী এবং বুর্জোয়া ভাবধারার সাহিত্য বলতে আমি মনে করি—হতাশা এবং নিজের সৃজনশীল ক্ষমতার উপর অবিশ্বাস —সংশয়বাদ, দুঃখবাদ এবং মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। এছাড়াও জাতিবিদ্বেষ এবং নিম্নমান পাঠকের তথাকথিত তৃপ্তির জন্য পর্নোগ্রাফির মত রচনা আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কেবল অর্থোপার্জনের জন্য যে সাহিত্য রচনা তাই আমার কাছে অবক্ষয়ী ও বুর্জোয়া সাহিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও শিল্পীর স্বাধীনতা এবং প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়ের উপর তিনি কয়েকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য রেখেছেন। যেমন—সাহিত্যিক মানেই স্রষ্টা এবং সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীনতা মানে শৃংখলাবদ্ধ জীবন। যা খুশী তাই করবো—যেভাবে খুশি চলবো—এ মনোভাব কোন স্বাধীন মানুষের হতে পারে না।

নতুন বই

শুভ বিবাহ ও অন্যান্য গল্প (সংকলন) **পরিমল গোস্বামী। নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা ৬। দাম : আট টাকা।**

বইটি আমাদের কাছে দ্বিবিধ কারণে আকর্ষণীয়। প্রথমত, এটি গল্প-সংকলন, দ্বিতীয়ত ব্যঙ্গরসাত্মক গল্পের বই। এ দুটো ব্যাপারই বাংলাদেশে ইদানীং দুর্লভ। স্যাটায়ার কিছু কিছু লেখা হয়েছে, ভালো হিউমার লেখা হয়নি তেমন। পরিমলবাবুর গল্পগুলি কেবল পাঠককে হাসাবার জন্যে নয়, ভাবাবার জন্যেও লেখা।

এ সংকলনের প্রথম গল্প 'শুভবিবাহ' বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালের অমৃতে। একজন দরিদ্র গণিত-শিক্ষক শেষপর্যন্ত কিভাবে জনৈক ছাত্রের চেষ্টায় অপাঠ্য উপন্যাসের লেখক হয়ে উঠলেন, তারই মর্মান্তিক অথচ হাস্যকর ছবি ফুটে উঠেছে হাল্কা তুলির টানে। সম্ভবত এই একটি-মাত্র গল্পে তিনি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাবলীল।

অন্যান্য গল্পে তাঁর মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে ঘটনার উপস্থাপনায়, চিত্র-নির্মিতিতে এবং সংলাপের ভারহীনতায়। অত্যন্ত চেনা-বিষয়কে অবলম্বন করে এমন সব কাহিনী তিনি লিখেছেন, যা প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েও অপরিচয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। বহু ঘটনাকে মনে হয় অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, এবং অবাস্তব।

তবু রচনার গুণে উপভোগ্য। জীবনের নানারকম বৈপরীত্যের সূত্র থেকে উৎসারিত হয়েছে হাসির উপাদান, কিন্তু সে হাসি হো-হো করে হাসা যায় না, আনন্দে-বেদনায় উপভোগ করতে হয়।

সূচীপত্রের পাতা ওল্টালেই নজরে পড়বে কয়েকটি গল্পের নাম। অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। যেমন : '৫ ফুট পৌনে পাঁচ ইঞ্চি পাত্রী চাই', 'সরষের তেল', 'প্রেম, বিবাহ' 'ডি-ভ্যালুয়েশন ও পঞ্জিকা' 'উর্বশীর বিচার' ত্রেতাযুগের পকেটে' বিয়ে পাসের আগে' 'মালতীর মন ও বিশ্বযুদ্ধ' ইত্যাদি। নানারকম সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার গভীর ও অগভীর—উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গল্পগুলি লেখা। উদ্দেশ্যের দিক থেকে সফল এবং সার্থক। গল্পগুলি পড়ার পরেও দীর্ঘকাল তার প্রতিক্রিয়া পাঠককে আলোড়িত করে। বইটি প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশক উভয়েই ধন্যবাদার্হ।

ভূমিকায় পরিমলবাবু তাঁর স্বভাব-সুলভ তীর্যকতার সঙ্গে বলেছেন : 'একটি মাত্র গল্পের নামে এ পুস্তকের নাম রাখা হল শুভবিবাহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর নাম হওয়া উচিত ছিল বহু বিবাহ। কারণ এতে বিবাহ সম্পর্কিত গল্প আছে অন্তত নয়টি। কিন্তু এ যুগে বহু বিবাহ আইনসঙ্গত নয়, এবং শুভবিবাহ প্রথা-সঙ্গত, তাই এ নাম।...তবে দু-একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও মোটের উপর গল্পগুলিকে অতিক্রম করে একটা হাল্কা ব্যঙ্গের সুর হয়তো ফুটেছে। তা না হলে গল্পগুলির অন্য কোনো সার্থকতা নেই।'

●

আকাশ স্বপ্ন দেখে (কাব্যগ্রন্থ)—**দীপ্তিময় সরকার পরিবেশক : বিদ্যাভারতী ৮সি, ট্যামার লেন, কলকাতা—৯। দাম : দু'টাকা।**

কলকাতার কোলাহলের বাইরে উত্তর বাংলার মফস্বল শহরে বসে শ্রীসরকার নির্জনে তাঁর কাব্য-সাধনা করে চলেছেন। যতদূর জানা যায়, এটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রচিত তেইশটি কবিতা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সঙ্গে গদ্য-কবিতা রয়েছে। সরকারের কবি-মেজাজে কোনো জটিলতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত সরল আবেগে কবিতাগুলি প্রাণবান। কিছু কিছু শব্দচয়ন এবং উপমা-নির্মাণে কবি প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রেমের কবিতাগুলি রোমান্টিক। 'রং বদলায়' কবিতায় কবির আশাবাদ শোনা যায় : 'প্রতিটি মানুষ দুঃখের কুঁড়ি ছিঁড়ে ভোরের আলোয় পবিত্র। দূর আকাশ থেকে সংকেত আসে বসন্তের পলাশ ফুল। জীবন জোয়ারে ভাসায় মাঙ্ক সংকল্পের উল্লাস।'

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রতীক্ষায় রইলুম।

●

স্বপ্নদ্বীপ [কাব্যগ্রন্থ] — **নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী—২। দাম : চার টাকা।।**

কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। কালে কালে তার চেহারা বদল হয়েছে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে। আবার কবি-মানসিকতার স্বভাব ও উপলব্ধিতে তা হয়ে ওঠে ভিন্ন রসাস্বাদী। এই কাব্যগ্রন্থের কবি একটি বিশেষ ভাব ও দার্শনিক পরিমণ্ডলের বাসিন্দা। তাঁর ব্যবহৃত শব্দের নমনীয়তা পাঠককে আবিষ্ট করে। প্রায় প্রতিটি কবিতায় তিনি মুগ্ধরূপে মগ্ন এবং তন্ময়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন : 'নীরদের কবিতা আসছে স্বপ্নচেতনা থেকে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি তাঁকে সুররিয়ালিস্ট ছাপ দিয়েছি...প্রকৃত স্বপ্ন কবিতায়...অর্থ ও সঙ্গতি আছে এবং নিশ্চয় থাকবে। স্বপ্ন কবিতা সাধারণত ছবি, ছায়াদৃষ্টি, প্রতীকে ঠাসাঠাসি, কেননা তাদের লক্ষ্য হল এমন এক গভীর সত্যকে প্রকাশ করা যা সাধারণ ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়। নীরদ ইচ্ছে করে তার কবিতাকে অস্পষ্ট করে না, যে উৎসের সন্ধান সে পেয়েছে, তার সাবলীল গতিকে রূপ দেয়।'

বাংলা কবিতার অভিদগ্ধ পাঠক [illegible]তা-গুলোর মধ্যে একালের তীব্র যন্ত্রণা না পেলেও ঐশী আলোর দীপ্তি ও আহ্বান অনুভব করবেন।

●

প্রেম-অপ্রেম (উপন্যাস)—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বসন্ত সাহিত্য মন্দির, শিবপুর, হাওড়া। দাম : পাঁচ টাকা।

এ উপন্যাসের নায়ক অনিক প্রেম-অ-প্রেমের দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত পুরুষ। অনেক মহৎ কথা শুনিয়েছেন লেখক তার মুখ দিয়ে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের খুশি মতো যা ইচ্ছে বলেছেন দ্বিধাহীন ভাবে। অবশ্য মাঝে মাঝে চমকপ্রদ ঘটনা ও ততোধিক উত্তেজক সংলাপ ব্যবহারে তিনি পাঠককে ধরে রাখতে পেরেছেন নিজের দিকে। এদিক থেকে তাঁর সাফল্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

বৈকুন্ঠের খাতা

জাদুকরের পালিত পুত্র

'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড সি সী'র মতো উপন্যাস লেখা হয় নি বাংলা সাহিত্যে। অদূরভবিষ্যতে লেখার সম্ভাবনাও কম। নদীর জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে 'পদ্মা নদীর মাঝি' 'গঙ্গা' 'তিতাস একটি নদীর নাম'। কিন্তু সমুদ্র প্রসঙ্গে সাহিত্যকরা প্রায় নীরব।

অথচ কলকাতা থেকে সমুদ্র বেশী দূরে নয়। ফ্রেজারগঞ্জ ষাট মাইলের মধ্যে। চট্টগ্রাম সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। দীঘার সৈকতাবাসে বসে দেখা যায় অনন্ত সুনীল জলরাশি। তবু যেন সমুদ্র এসে আমাদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। তার গর্জন এসে তেমন করে পৌঁছায় নি লেখকের চিন্তা ও চেতনায়। মৎস্য দপ্তরের চেষ্টায় আমরা সমুদ্রের মাছ খেয়েছি। জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করি নি।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন : 'আমার কবিতায় সমুদ্র, বন্দর, নোঙর ইত্যাদি শব্দ আছে বিস্তর পরিমাণে। এক সময়ে আমি নই, আমার সমকালীন অনেক কবিই এরকম শব্দ ব্যবহার করতেন বন্ধনমুক্তির অনুষঙ্গে। সমুদ্র আমার কবিতায় এসেছে প্রতীক হিসেবে।'

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস 'বিদেশিনী' পড়তে গিয়ে কথাটা নতুন করে মনে পড়ল। উপন্যাসটির প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে দুটো জাহাজ আর আকাশী রঙের জলরাশির ছবি। তাদের ছাপিয়ে উঠেছে গাউন-পরা একটি মেয়ের মুখ, হাসি-হাসি। এবং নীচের দিকে ইংরেজী অক্ষরে দুটো বাক্যের পুনরাবৃত্তি : 'নিগার কুইট কান্ট্রি' 'গো টু হেল'।

অর্থাৎ সমুদ্রকে ছাপিয়ে উঠছে হৃদয় এবং শাদা-কালোর ভেদ। সমুদ্রের গর্জন ও ব্যবধান উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করছে আলোড়ন। দেশ-কালের সীমা-লঙ্ঘনের আন্তরিক প্রয়াস বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে।
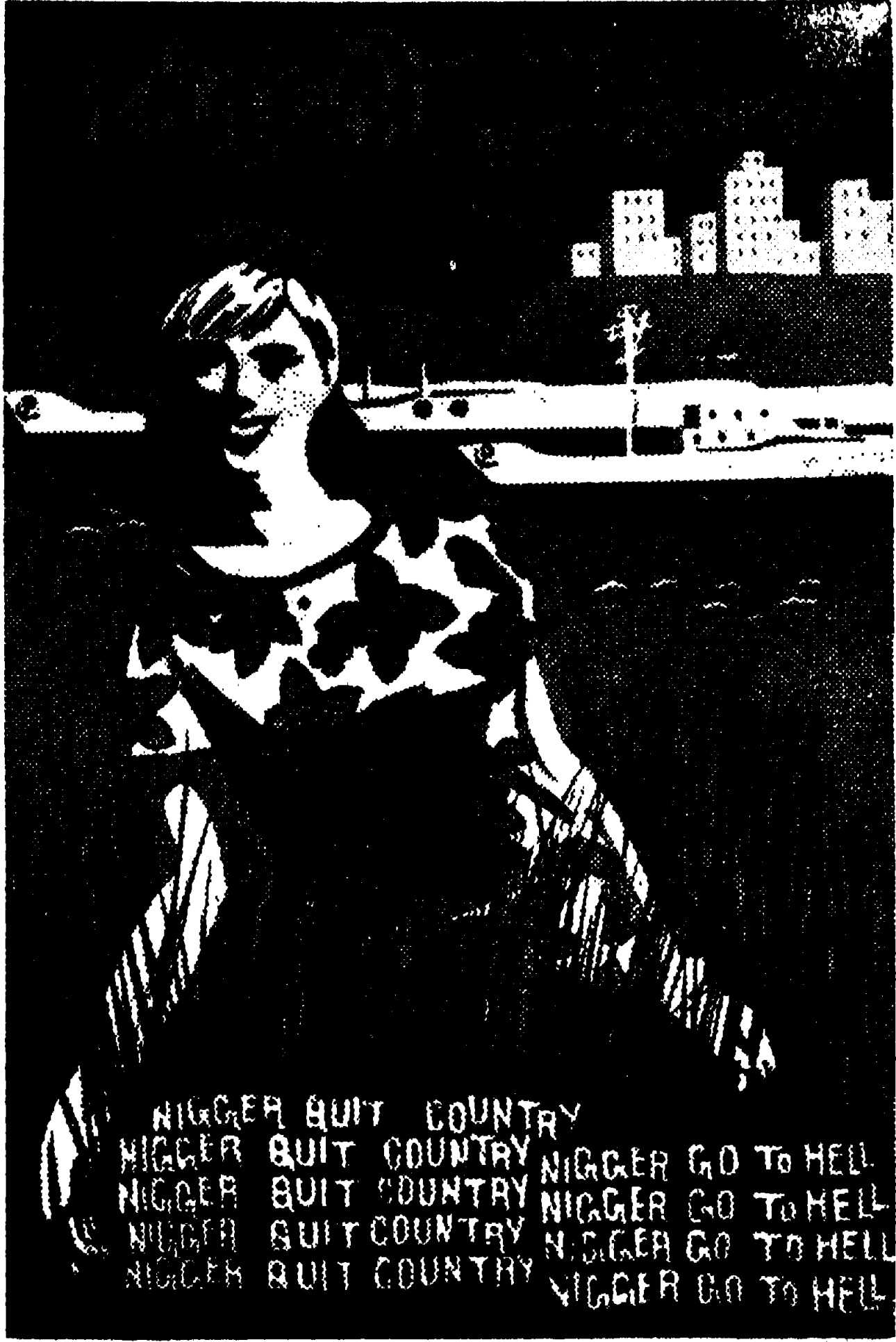
প্রেম ও জীবন

অতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। অতীনবাবু বললেন : 'জাহাজে চাকরী নিয়েছিলাম এককালে। ঘুরেছি প্রায় সারা পৃথিবী। দেখেছি উপকূলের মানুষ, বিস্তীর্ণ জলরাশি, নাবিকদের প্রেম ও ভালোবাসা, দুঃখ ও বিষাদ, শাদা-কালোর ঝগড়া। এ উপন্যাসে যা বলেছি, সবই আমার কথা। আমার চেনা মানুষের কথা।'

কোন্ জাহাজে চাকরী নিয়েছিলেন? কেন? কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?

—জাহাজটির নাম 'এস এস সিওল ব্যাংক'। ১৯৫৩-৫৪ সালের ঘটনা। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। জাহাজে ছিল পাট, সারস পাখি আর কাঠ। জীবিকার তাগিদেই চাকরী নিয়েছিলাম। প্রথম যৌবনের উন্মাদনাও ছিল হয়তো। নতুন দেশ আর মহাসমুদ্রের আহ্বান তো উপেক্ষা করা যায় না।

প্রসঙ্গ না থামিয়েই বললেন : কলকাতা থেকে আমরা কলম্বো হয়ে গিয়েছি লরেঞ্জো মার্কেস, ডারবান, কেপটাউন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল ঘুরে বুয়েনস এয়ারেস। সেখান থেকে ব্রাজিলের ভিকটোরিয়ান। ব্রাজিল থেকে লোহ-আকর নিয়ে ইংলণ্ডের কার্ডিস বন্দরে। আমার বয়স তখন আঠারো-উনিশ। বাণিজ্যের সূত্রে আমি মানুষ দেখেছি। বিভিন্ন মহাদেশের মানুষ। তাদের ভাষা আলাদা, চেহারা-চরিত্র আলাদা। হৃদয়ের দিক থেকে মিল আছে সারা পৃথিবীর।

এ উপন্যাসটিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়?

—বলতে পারেন অটোবায়োগ্রাফী-মূলক। প্রায় সব ঘটনারই যোগ রয়েছে আমার জীবনের সঙ্গে।

'বিদেশিনী'র নায়িকা মারিয়ার সঙ্গে আপনার প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি?

একটু অপ্রস্তুত, কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললেন : ছিল। তবে অন্য নামে। সে প্রসঙ্গ লিখবেন না। বিয়ে-থা করেছি, ঘর-সংসারী হয়েছি। সে কথা এখন ভুলে যাওয়াই উচিত।

আপনার স্ত্রীর কাছে কি এ খবর গোপন আছে?

—না, নেই। সে-ও জানে। তার চিঠি-পত্র দেখেছে। তবে একটা গোপন ব্যাপারকে প্রকাশ্যে এনে কি লাভ আছে বলুন?

বললাম : পাঠকের লাভ আছে। তাঁরা উপন্যাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিককেও বুঝতে চান, জানতে চান।

সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন : তা হলে শুনুন। বুয়েনস এয়ারেসে ছিলাম কয়েক দিন। ওখানে থাকার সময় এক ভদ্র-মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি ভালো-বাসতেন আমাকে। বোধহয়, এত কম বয়সে মা-বাবার স্নেহ ছেড়ে দূরে বিদেশে যাওয়ায় কিছুটা মমতা বোধ করতেন আমার জন্য। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। পড়তো বুয়েনস এয়ারেস বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি তার চোখে দেখেছিলাম, দ্বিতীয় জন্মের আর্তি, অন্য দিগন্তের আলো। সে বয়সের ভাষা রহস্যময়। সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না। রক্তের কল্লোলে শুনেছিলাম তার গান। আজও শুনি। দূর, অস্পষ্ট সঙ্গীতের মতো। বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম : 'ওকে বিয়ে করতে চাই।' অনুমতি পেলে হয়তো বিয়ে করতাম। ও আমাকে ভালবাসতো। বাবা লিখলেন : 'যদি তুমি আমার ছেলে হও, তা হলে মেম বিয়ে করো না। তোমার মুখ দেখবো না কোনোদিন।' বিয়ে করা হলো না। ওর প্রেম রয়ে গেল আমার জীবনে। "বিদেশিনী' আমার সেই প্রেমের স্মৃতি!

অভিজ্ঞতার রূপান্তর

তারপর?

বুয়েনস এয়ারেস থেকে পালিয়ে এলাম। ওকে আমার বলার কিছু ছিল না। আমি পলাতক। কয়েক দিন কাটালাম লুসিয়ানার একটি ছোট্ট বন্দর—পোর্ট অব সালফার-এ। আমি মানচিত্রে তার নিশানা পাই নি। ওয়ার্লড এটলাসে এত ছোট বন্দরের নাম থাকে না। ঐ রহস্যময়ী মেয়েটির মতোই সেও রয়ে গেছে একান্ত আড়ালে। পোর্ট অব সালফার-এ এসে শুনলাম শাদা-কালোয় দাঙ্গা লেগেছে। ওখানকার নিগ্রো আর য়ুরোপীয় সাহেবদের মধ্যে বর্ণভেদের দারুণ লড়াই। নিজের দেশকে ভাবতে চেষ্টা করলাম। দাঙ্গা হয়েছে আমাদের দেশেও। ভারতবর্ষে ধর্ম হলো দাঙ্গার উৎস, য়ুরোপ-আমেরিকায় বর্ণ। ঐ একই মানসিকতা কাজ করছে পৃথিবী জুড়ে। এই নৃশংসতার তুলনা নেই। ক্যাপটেনের আদেশ, কোন ভারতীয় যেন বন্দরে না নামে। আমি তখন মোটামুটি ফর্সা ছিলাম। আমাকে চালিয়ে দেওয়া হলো স্প্যানিশ বলে। নতুন নাম ও জানিও দ্য অতীন্দ্রো। এ উপন্যাসের সুমন সেই আমি।

অতীনবাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি স্মৃতির জগতে চলে যাচ্ছিলাম। সে স্মৃতি আমার নয়। তারই রহস্যময় সেই অলিখিত ইতিহাসের জগতে। কেউ জানতো না সেই কাহিনী। আমার সামনে আবরণ উন্মোচন করছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললেন : ওখানে একটা জার্মান পরি-বারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। এই পরিবারের বয়স্কা মহিলা ছিলেন ন্যাশনাল স্টেট রাইট পার্টির সদস্যা। ও'রা গুম খুন করতেন। জাহাজের থার্ড ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ওর ভাইয়ের পরিচয় ছিল। ওর ভাই এসেছিল, ক্যানারি পাখির খোঁজে। ভদ্রমহিলা ছিলেন নিঃসন্তান। আমি দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশে ভদ্র-মহিলার অন্য রূপ দেখেছি। আমার প্রথম প্রেমকে স্থাপন করেছি এই পটভূমিতে। কেননা, আমিও তো ভারতীয়। রঙ যতই ফর্সা হোক, সাহেবদের মতো নয় নিশ্চয়ই। প্রেম ও সাম্প্রদায়িকতার এই দুই দৃশ্যকে আমি এক করেছি 'বিদেশিনী' উপন্যাসে। নিজের দেশ ও ধর্মীয় হানাহানির আমিও যে প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরোক্ষ অংশীদার।

জ্যাঠামশাই

আর কোন ঘটনা কিম্বা চরিত্র কি এ উপন্যাসের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে?

হ্যাঁ করেছে' — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন, তাঁকে আমরা বলতাম পাগল জ্যাঠামশাই। এই চরিত্রটি আমাকে হন্ট করে। এককালে বড় চাকুরী করতেন। গায়ের রঙ ছিল মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো ধবধবে ফর্সা। এমন সুন্দর, সুপুরুষ আমি কমই দেখেছি। সেই জ্যাঠামশাই হঠাৎ একটি ইংরেজ মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। খবর পেয়ে ঠাকুরদা ছুটে এলেন কলকাতায়। দেশে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে ছিলেন একটি মেয়ের সঙ্গে। জ্যাঠাইমা যৌবনে দেখতে খারাপ ছিলেন না। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের চোখ ছিল না তাঁর দিকে। ধীরে-ধীরে তিনি পাগল হয়ে গেছেন ঐ প্রেমের জন্যে।

তারপর?—গল্প শোনার আশ মিট-ছিল না আমার কিছুতেই।

অতীনবাবু বললেন, আমরা তাঁকে দেখেছি পাগল অবস্থায়। তখনো বয়স বেশী হয়নি। প্রায়ই দেখতাম, মাঠ, ঘাট, নদী-নালায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন একা-একা। বড় বেশী কথা বলতেন না। সাধারণ পাগলের মতো চিৎকার হৈ-হল্লা করতেন না একেবারে। তাঁর প্রেম সঞ্চারিত হয়েছিল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর ওপর। তাঁর কথা ছিল স্বগতোক্তি। ছোট ছোট পোকা-মাকড়, লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, বুনো ফুল, নাম না জানা পাখির সঙ্গে তাঁর মমতাময় দৃষ্টি বিনিময় হতো। মাঝে মাঝে তিনি জ্যোৎস্না রাতে কোনো গাছের নীচে বসে শেলী কীটস আবৃত্তি করতেন। কখনো কখনো নৌকোয় করে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। ফিরে আসতেন পাঁচ সাত-দিন পরে। শেষপর্যন্ত একদিন তিনি হারিয়ে গেলেন। কেউ বলেন, সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন কেউ বা বলেন অন্য কথা। আমার মনে হয়, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। জ্যাঠাইমা এখনো সিঁদুর পরেন, মাছ-মাংস খান। তার ধারণা, জ্যাঠামশাই ফিরে আসবেন। এ উপন্যাসে তাঁকে এঁকেছি একটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রেমের জন্য তাঁর এই হাহাকার জীবনে ভুলতে পারবো না।

অন্য কোনো উপন্যাসে কি আপনার জ্যাঠামশাইয়ের প্রভাব আছে?

—'একটি জলের রেখা'য় আমি তাঁর কথা লিখেছি। ভাবছি একটা পুরো উপন্যাস লিখবো তাঁকে নিয়েই।

নানাকথা

'বিদেশিনী'র সঙ্গে অন্য উপন্যাসের মিল আছে কি?

—সাধারণ অর্থে কোনো মিল নেই। এ উপন্যাস আলাদা রকমের। আমার বক্তব্য একটাই, সকলেরই কিছু ভালো হে

আপনি কি সাহিত্যের ব্যাপারে কোনো আদর্শে বিশ্বাসী?

—আদর্শ তো প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই থাকে। মানুষের মঙ্গলবোধ থেকেই আমার যা কিছু লেখা। আমার ধারণা, মানুষের দুঃখ বেদনা হতাশা যন্ত্রণার ওপরেও আরো একটা বস্তু আছে, যার জন্যে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। তবে এটাও ঠিক, কোনো সঠিক আদর্শ দিয়ে সর্বকিছুকে বিচার করা যায় না। সর্বকিছুই ডাইনামিক। এই মুহূর্তে যে মানুষটি আত্মহত্যার সংকল্প গ্রহণ করছে, পরমুহূর্তেই তাকে দেখা যায় উজ্জ্বল এবং আশাবাদী। লেখক হিসেবে আমি এই সত্যকে প্রকাশ করতে চাই। আমার মনে হয়, লেখকের কোনো সিসটিমেটিক আদর্শ থাকতে পারে না।

দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে কাকে আপনার সবচাইতে ভালো লাগে? কার কার বই আপনি বেশী পড়েছেন?

—বিদেশী সাহিত্য আমি বেশী পড়িনি। হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস' আমার খুব ভালো লেগেছিল। কাম্যুর 'দি প্লেগ' পড়া শুরু করেছিলাম। শেষ করতে পারিনি। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' পড়েছি অনেক আগে। ওয়ার্লড ক্লাসিকগুলো প্রায় সবই পড়া। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি নষ্ট পাঠক। যখন বেশী লিখি, তখন কিছুই পড়তে পারি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব বই পড়া হয়নি। আমি বই পড়ি যখন আমার বন্ধ্যাদশা। হয়তো এজন্যে আমাকে দোষারোপ করবেন। কেউ বা আমার লেখায় আবিষ্কার করেন কাম্যু-কাফকার প্রভাব। আমি এসব কথা আদৌ আমল দিই না। কেননা, আমি আজো অনেকের লেখা পড়িনি।

'বিদেশিনী' প্রথম বেরোয় কোন পত্রিকায়?

—একটা সিনেমা পত্রিকায়। তাও সবটা নয়। একটা সংখ্যায় বেরোয় আদ্দেকটা। পরে বাকিটা লিখে দিয়েছি।

এ উপন্যাসের বাস্তব চরিত্র কোনগুলো?

—নায়ক তিনজন—সামাদ, সুমন আর সুচারু। বার্ট ও বাস্তব। এরা সকলেই নাবিক। আমার এককালের বন্ধু, সহকর্মী।

একে কি আপনার আত্মবিশ্বাস লেখা বলা যায়?

—না, এটা আমার আত্মবিশ্বাস লেখা নয়, ব্যক্তিগত প্রেমের আন্তরিক কাহিনী। আমার ভালো বই 'একটি জলের রেখা'। এবার লিখবো আত্মবিশ্বাস লেখা—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে।' অমৃতে বেরোবে ধারাবাহিক।

লেখকের নাম

কথায় কথায় অনেক কিছুই বলা হয়ে যায়। 'বিদেশিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গে দেশ-কালের কথাকে বড় প্রাধান্য দিচ্ছিলেন অতীনবাবু। আজকের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ বিপুল।

আমি ছোট্ট প্রশ্ন করলাম: আপনার ডাক-নাম কি?

আরো সংক্ষেপে উত্তর দিলেন তিনি: ভুলু।

তারপর, একটু থেমে বললেন, 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পুরো নাম নয়। পুরো নাম: অতীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবার উল্টোরথে মানিক-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলাম একটি উপন্যাস লিখে। তাতে একটা চরিত্র আছে। তার নাম শেখর। সেজন্যেই নিজের নাম থেকে আমি, 'শেখর' বাদ দিয়ে লিখলাম অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু উপন্যাসটি বই-আকারে বেরোবার সময় দেখি, আমি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে গেছি। প্রকাশক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করলাম: এটা কেমন করে হলো? তিনি বললেন, অতীন্দ্র আবার কি? ও নাম ভালো শোনায় না। তোমাকে অতীন বলে ডাকি। সেজন্যই ও নামে ছাপলাম। তখন থেকে আমি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত। পুরো নামের অনেকটাই খসে গেল।

জাদুকরের পালিত পুত্র

অতীনবাবু বললেন, পত্রিকায় বেরোবার সময় 'বিদেশিনী'র নাম ছিল 'জাদুকরীর পালিত পুত্র'। প্রকাশকের অনুরোধে নাম পাল্টাতে হলো।

জিজ্ঞেস করলাম: এই দ্বিতীয় নামে উপন্যাসটিকে বুঝতে কি অসুবিধা হয়?

—না। হয় না। এ উপন্যাসের নায়িকা 'মারিয়া' আমার কাছে এখন 'বিদেশিনী' ছাড়া আর কি? তাকে সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারলাম কই?

প্রথম নামকরণের তাৎপর্য কি?

—সে গল্প আপনারা অনেকেই জানেন। পুরনো দিনের একটা গল্পে আছে: কোনো এক জাদুকরের একটি ছোট্ট পালিত পুত্র ছিল। একদিন সেই ছেলেটি শুনতে পায় গ্রামের মানুষ—আপশোষ করছে: দেশের গাছপালা, নদী-নালা সব শুকিয়ে যাচ্ছে। গাছ থেকে ফুল ঝরে যাচ্ছে, পাতা ঝরে যাচ্ছে। ফল নেই। মাঠে ফসল নেই। জাদুকর ছেলেকে বললো: কালো বেড়ালটা নিয়ে যাও, অনেক—অনেক দূরে—দেখবে একটি চাঁপা গাছ থেকে ঝর্ণার জলে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়ছে। বিড়ালটি সঙ্গে থাকলে পথের ভয় থাকবে না। এ পর্যন্ত অনেকেই গেছে ঐ ফুল আনতে। কিন্তু কেউ পারেনি। ঝর্ণার জলে পড়ার আগেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হেঁটে সেই ছেলে চাঁপাগাছের কাছে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে গাছ থেকে ফুল পাড়ার চেষ্টা করছে। নিজের কথা ভুলে গেল ছেলেটি। জীবন বিপন্ন করে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে মেয়েটিকে নামিয়ে আনে। তার আশঙ্কা ছিল হয়তো ঝর্ণার জলে পড়ে গেলে মেয়েটি আর বাঁচতো না। মাটিতে নামিয়ে আনতেই মেয়েটি হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেল। ছেলেটিকে বললো, আমি এই বনের দেবী। এ পর্যন্ত অনেকে এই ফুল নিতে এসেছে। কিন্তু কেউ নিজের জীবন সংশয় করে পরোপকারে এগিয়ে আসেনি। তোমার ওপরে আমি খুশী হয়েছি। যাও, এ ফুল ছড়িয়ে দাও তোমার গ্রামের মাঠে মাঠে। আবার সব সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে।

নীতিবাক্যটি নির্দেশ করে বললেন, অর্থাৎ গল্পটির প্রধান বক্তব্য মানুষের ভালো করো, কল্যাণ করো স্বার্থত্যাগ করো, সকলের মঙ্গল করো। আমিও এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই মঙ্গলের কথই বলেছি। এটা আমার জীবনেরও আদর্শ। অধিকাংশ লেখার মধ্য দিয়েই আমি এই সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। জাদুকরীর পালিত পুত্রের মতো মানুষ চাই এখন আমাদের দেশে।

—গ্রন্থদর্শী
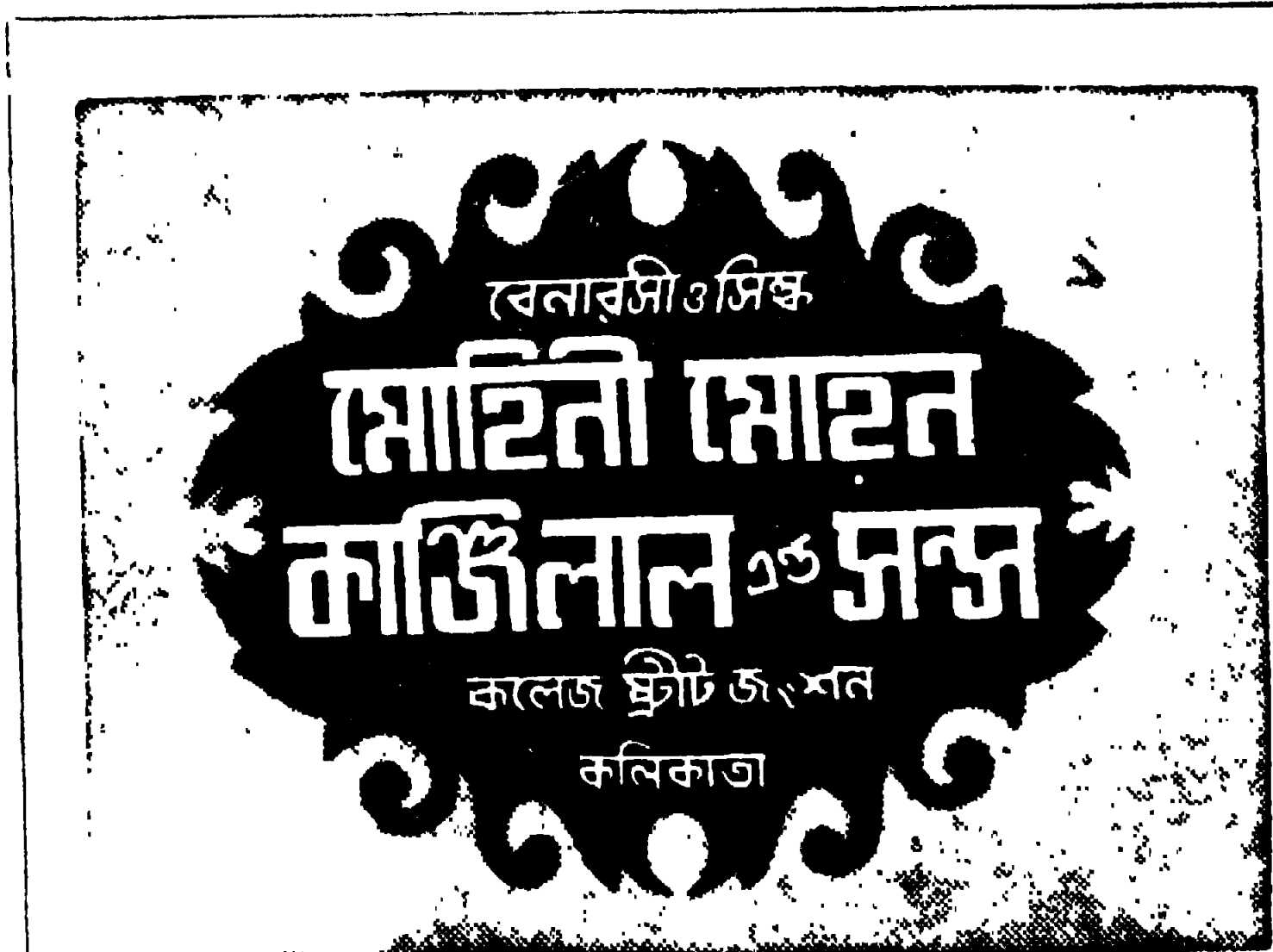
পুরুলিয়া মেলা—১৯৭০

বিশাল প্রেক্ষাগৃহে শূন্যতা আর মঞ্চকে ঘিরে স্বল্প গুটিকয়েক লোকের আলাপ-আলোচনা শোনবার ইচ্ছে নিয়ে বসে থাকলেও পরিবেশের শূন্যতা দুপুরের খরতার সঙ্গে মিলেমিশে প্রায় ভাতঘুমের আবেশ এনে দিয়েছিল। হঠাৎ শব্দ সম্প্রসারণ যন্ত্রের একটানা বক্তৃতার ঘুমপাড়ানী আবেশ ভেঙে দিয়ে কাব্যের ছন্দ নাড়া দিল নির্জীব মনকে। পুরুলিয়া মেলায় 'পুরুলিয়া পরিচিতি' আলোচনাচক্রে শ্রীপশু-পতিপ্রসাদ মাহাত তখন পুরুলিয়ার পরিচয় দিচ্ছেন লৌকিক ছন্দে—

> দামোদর কংসাবতী
> দ্বারকেশ্বর শিলাবতী
> অযোধ্যা আর পঞ্চকোট পাহাড
> হামেদের পুরুল্যাই ভাই
> পুরুল্যাই ঘর ভাই।

আষাঢ় শরাবণ মাসে
জল হ্যল নাই ভাদর মাসে
হালের গরু পালে চরে খাই
হামেদের পুরুল্যাই ঘর ভাই

> গালা তসর হামেদের আছে
> ছো ঝুমুর টুসু আগে পেছে
> ছ্যালা ছুলুর ইসকুল নাই
> হামেদের পুরুল্যাই ঘর ভাই

পেটেতে ভাত নাই
পরণেতে লুগা নাই
মুখে পান হাতে চুন ভাই
হামেদের পুরুল্যাই ঘর ভাই

সীমান্ত বাংলার এই জেলা অফুরন্ত বিস্ময় বক্ষে নিয়ে আজও অপেক্ষমাণ সংস্কৃতিগর্বী বাঙালী রসিকদের সহমর্মীতার কামনায়। পশুপতিবাবুর আবৃত্তি করা লোককাব্যটির পংক্তিতে পংক্তিতে পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাই ঘুমের আবেশকাটা মেজাজে বিস্মিত হয়ে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম এর প্রতিটি কথাকে। সেদিনের লোক কবির প্রত্যক্ষ জ্ঞানমতে এ কাব্যটির 'আছে' আর 'নেই'-এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত খুব স্বল্পই তফাৎ ঘটেছে। 'ছ্যালো ছ্যুলুর ইসকুল' আজকের পুরুলিয়ায় বেশ কয়েকটিই গজিয়েছে, কিন্তু বুভুক্ষু পড়ুয়াদের আজ পড়ার উৎসাহ

শিপ্রা আদিত্য

কোথায়? ঝালদার জগৎজয়ী গালার ব্যবসাও আজ সিকেয় উঠেছে। তবে মার্কিন মুল্লুকে বিড়ি রপ্তানির কারবার ভাল করে শুরু করতে পারলে তবেই এযাত্রা হয়তোবা রক্ষা পাবে ঝালদার শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

এ আলোচনা-সভায় পুরুলিয়া সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি মনে করেন পুরুলিয়ায় আজকের অবজ্ঞাত ছৌ নাচ বিগত দিনের জনপ্রিয় দরবারী নৃত্যশৈলীর অপভ্রংশ রূপ। হয়তো এমন একদিন শীঘ্রই আসছে যেদিন পুরুলিয়ার এই ছৌ নাচ ভারত জয়ে সমর্থ হবে। শ্রীমানিকলাল সিংহ মহাশয় আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—পুরুলিয়ার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও প্রতিমাগুলির সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করলে হয়তো বা একদিন এ অঞ্চল ভারতের মধ্যে প্রাচীনতম সভ্য জনপদের অবস্থিতিকে নির্দেশ করবে। শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলায় [illegible] অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন প্রতিমাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের মশানডিহি [illegible] বীরস্তম্ভের সঙ্গে বাঁকুড়ার [illegible] পাহাড়ের নিচে বা ছাতনা গ্রামে, মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থেকে কিছু দূরে কিয়েনচাঁদ গ্রামের অথবা হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলের এই স্মৃতিস্তম্ভ বা বীরস্তম্ভগুলির তুলনা করে এর বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয় আলোকপাত করেন। পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য ঝুমুর, টাঁড়ঝুমুর, টুসু, ভাদু, কীর্তন প্রভৃতি পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যের বিষয় যথাযথ নিদর্শনসহ আলোচনা করে এক বিশিষ্ট পরিবেশ রচনা করেছিলেন এই আলোচনায়। শূন্য প্রেক্ষাগৃহের নিরাশ পরিবেশ এমন আশাবাদী আলোচনায় যদি সত্যিই কোন বাঙালীর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে, তবেই এমন আশাবাদ সার্থক হবে।

এই মেলার আসরে আমদানী করা নকল পরিবেশ স্থানীয় জনসাধারণকে মেলাটির বিষয় যথেষ্টই নিষ্পৃহ করতে সফল হয়েছে। কলকাতার অনুকরণে নির্মিত গৃহদ্বাকার সাধারণ তোরণদ্বারটি পেরুবার

মত দুঃসাহস পুরুলিয়ার সহজ, সরল, দরিদ্র, গ্রামীণ মনের কাছে কামনা করাই দুষ্কর। সেই সঙ্গে ছিল নগদ ১০ পয়সার প্রবেশমূল্য যা জনসাধারণ বা অনেকের পক্ষেই ছিল দুঃসহ। বাংলা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কিছু কিছু প্রদর্শন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রচার দপ্তরের মণ্ডপও ছিল একটি এ প্রদর্শনীতে। যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনসমক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ প্রদর্শনীটিতে যে সব প্রাচীরচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সেগুলি গণ-সংগ্রামের কথা বলার চেয়েও গণবিমুখতা ভাব প্রকাশ করেছে আশ্চর্যরূপে। বিগত তিরিশের দশকে তৎকালীন সরকারের প্রচারিত বিকৃত প্রাচীর চিত্রগুলির কথাই মনে পড়ে এ প্রদর্শনী দেখে। সেদিনের সেই 'সাবধান ওলাউঠা হইতেছে' অথবা 'বসন্তের টীকা লউন'-মার্কা এ প্রচার পরিকল্পনা। জানি না এ ধরনের প্রচারবিদ বা প্রচার-শিল্পীদের হাত থেকে সরকারী প্রচার দপ্তরের মুক্তি পেতে আর কতদিন লাগবে? বিপ্লবমুখী জন-জীবনের ধাক্কা কি আজও সেখানে পৌঁছায়নি?

এছাড়া স্থানীয় হস্তশিল্পের দু'একটি বিপণি ছিল এ প্রদর্শনীতে। তসর, গরদের বস্ত্রাবলী, সুতীকাপড়ের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাবলী, ঝালদার ইস্পাত ও লোহের সামগ্রী, বাঘমুণ্ডীর চড়িদা গ্রামের ছৌ-নাচের মুখোশের একটি দোকানও এসেছিল এখানে। তবে মুখোশগুলির দুর্মূল্যতার জন্য তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের দোকানও এসেছিল এখানে, কিন্তু ডোকরার কাজ চোখে পড়েনি। কিন্তু স্থানীয় অ্যালুমিনিয়ম কারখানার তৈজসপত্রের দোকান ছিল একটি। এছাড়া চুড়ি, বিড়ি, খেলনা নাগরদোল্লা দিল্লীর চাট, পপ্‌কর্ন, লক্ষ্ণৌই পান, 'ফটাফট্' (তরকারী কাটা যন্ত্র), চাঁদমারীর কারবার, সরকারী কর্মচারী-পত্নীদের আয়োজিত অগ্নি-মূল্যের মজলিস কফিখানা প্রভৃতি। এরই সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গণের দুই কোণে আয়োজিত হয়েছিল দুটি শতবার্ষিকী মণ্ডপ লেলিন ও গান্ধী। এ দুটি মঞ্চর পরি-কল্পনা ও সংগঠন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আয়োজকদের নিষ্ঠা ও সাফল্যের সম্ভা-বনার হদিশ পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধী-নতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের অন্যতম গান্ধীবাদী দল লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র পুরুলিয়ার কি নিষ্ঠুরভাবেই না অবহেলিত হয়েছেন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে। 'এভাররেডী টর্চ' আর বীণা বিড়ির' প্রচারপত্রে আবৃত মণ্ডপের মাঝে আচার্য নন্দলালের বিখ্যাত লিনোকাট রচিত 'গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান' চিত্রটির এক বিকৃত ও ব্যর্থ অনুলিপি দণ্ডায়মান। সেই সঙ্গে গান্ধী স্মারকনিধি প্রচারিত গান্ধীবাণীর প্রাচীর-পত্রাবলী আচ্ছাদিত হয়ে এবং নিয়মরক্ষার ধরনে কয়েকটি বেড়ৈলৈভেল মণ্ডিত ফুল গাছের টব দ্বারা সজ্জিত গান্ধীমণ্ডপ রচনা করে জাতীয় পিতার জ ন্ম শ ত বা র্ষি কী পা ল নে র দায়িত্ব পালন করে চলেছে পুরুলিয়াবাসী জনগণ।

এই মণ্ডপটির কিছু দূরেই আয়োজিত হয়েছিল লেলিন মণ্ডপ। এটির সংগঠনে আর্থিক অনটন প্রকাশিত হলেও ত্রুটীহীন নিষ্ঠার প্রকাশ দেখা গেছে এখানে। শিবির আকৃতি, রক্তশীর্ষ মণ্ডপটির ভিতরের প্রদর্শনু-কক্ষটি ছিল ত্রিভুজাকৃতির। সামনের বিস্তৃত প্রবেশদ্বারযুগল থেকে পেছনের কৌণিক বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে প্রদর্শন মণ্ডপটি। দু'পাশের দেওয়ালে লেলিনের বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনী আলোকচিত্রের সাহায্যে বিধৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল লেলিনের বাণীসহ সুমুদ্রিত প্রাচীরপত্রাবলী এবং কিছু লেলিন মতবাদের সাফল্যজ্ঞাপক প্রাচীরপত্রাবলী। বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট কয়েকটি রুশ তৈলচিত্রের সুবৃহত মুদ্রিত অনুলিপির সঙ্গেই ছিল শ্রীদেবব্রত মুখো-পাধ্যায় রচিত দুটি রঙিন চিত্র বিদ্রোহী সংগ্রামী লেলিন। দ্বারযুগলের মধ্যস্থ দেওয়ালে শ্রীমুখোপাধ্যায় অঙ্কিত সাদা কালোয় দণ্ডায়মান লেলিনের (উচ্চতা ৯ ফুট) প্রতিকৃতিটি দেখে বহির্মুখী দর্শক মণ্ডপ পরিত্যাগের আগে লেলিনের চিন্তায় প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। এই মণ্ডপটির উল্টোদিকেই দেখা গেছে— স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয় সম্বন্ধে পরিসংখ্যাসহ বিভিন্ন আদর্শ ও প্রাচীরপত্র সহযোগে এক শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল এ মেলা প্রাঙ্গণে।

•

সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় আয়োজিত এ প্রদর্শনীটি চরম সাফল্য লাভ করেছিল এর লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান-গুলির মাধ্যমে। মেলা প্রাঙ্গণে, খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দৈনন্দিন —ছৌ, নাচনী, নাটুয়া, দাঁড়, সাঁওতালী নৃত্য। অথবা লোকগীতির আসরে— করম, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, টাড় ঝুমুর, দাড়শাল্ল, ভাদরিয়া, জাওয়া ঝুমুর, সাপুড়িয়া, বাউল, কীর্তন এবং সাঁওতালী গান। এই আসর-গুলির অনুষ্ঠানের সময় সমবেত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও বিচিত্র রস উপভোগের প্রকাশ দেশজ শিল্পীমহলে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন-দরবারী এবং লোকসংস্কৃতি পরিপুষ্ট পুরুলিয়ায় আয়োজিত এবারের এই মেলার মধ্য দিয়ে আর একটি দুরারোগ্য বিকৃতির নিঃশব্দ অনুপ্রবেশও লক্ষ্য করা গেল— বাউল সংগীতের আসরে মন্দিরা খঞ্জনীর বদলে 'ম্যারাকাস' ব্যবহার চালু হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাউলের আলখাল্লা ছোট হয়ে পাজামা-পাঞ্জাবিতে নেমেছে দেখা গেল। স্থানীয় লোকসংগীত গায়কের টুসু, ভাদু, ঝুমুর সমৃদ্ধ খাতায় চটুল হিন্দি ফিল্মিগানের সংগ্রহ স্থান করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে লোকায়ত সংগীতেও কিছু কিছু 'ইতরপ্রিয়' চটুল সুরের অনু-প্রবেশ লক্ষ্য করা গেল রসিকজনদের পাশ কাটিয়ে। এমন কি দুর্গম অযোধ্যা পাহাড় বা পঞ্চকোট থেকে নেমে আসা সাঁওতালি নৃত্যবিদরাও 'বাবুদের' সামনে নাচার জন্য আপন আপন বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে নির্বিবাদে সংগ্রহ করে চলেছে যাত্রা থিয়ে-টারে দেখা বাবুদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্রাবলী। এমন কি ছৌনাচের দলগুলিও ক্রমে ক্রমে যাত্রাদলের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের মোহে পড়েছে। ফলে ছৌ-নাচের অপরিহার্য সাবলিলতা এবং সুদীপ্ত—প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গীগুলিও ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে এইসব অবাঞ্ছিত অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহারের দাপটে।

মেলার এ আয়োজনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন স্থানীয় লোকসেবক সংঘের নেতারা, জেলা প্রশাসকমহাশয় এবং স্থানীয় বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতি-ষ্ঠানের কর্মীরা। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংবাদ ও গণসংযোগ মন্ত্রকের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন এ মেলায়। স্বভাবতই এই নিঃশব্দ-পদক্ষেপে অবশ্য-ম্ভাবী রূপে অগ্রসরী বিকৃতির প্রতি তাদের সমবেত দৃষ্টি আকর্ষণ করে সজাগ সাব-ধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করি।
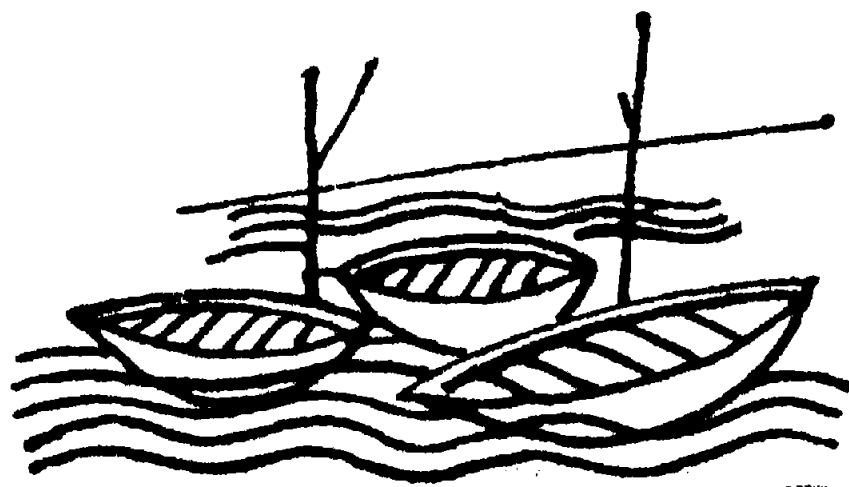
রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

"প্রাণের কড়ি"

কেওড়াতলায় গিয়ে কাজ নেই জামাইদা। ঝক্কি-ঝামেলা বেশী। হ্যানা-ত্যানা নানা কথা শুধোতে পারে। গণ্ডায়-গণ্ডায় মরা দিন-রাত আসছে। ইলেকট্রিকটা শুনেছি নাকি খারাপ। আর চিতা পাওয়া মুস্কিল। হয়তো লাইন লাগাতে হবে। বডি তুলতে-তুলতেই বেলা পড়ে যাবে, তার চেয়ে চলুন দয়াময়ীর ঘাটে যাই। একটু ঘুর পথ হবে। তা হোক ঝামেলা কম। কাজটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে।

উঠোনের মাঝে খাটিয়ায় বুড়ি শাশুড়ী ভিজে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে আছে। বুকের মাঝ বরাবর জম্পেস করে একটা দড়ির গিট এঁটেছে অনিলরা। চারটেফুলের তোড়া খাটিয়ার চার কোণায় বাঁধা। সাত সকালে টাটকা ফুলের বদলে গত দিনের বাসী ফুলের তোড়াই বোধহয় দোকানী চালিয়ে দিয়েছে। দামেও নিশ্চয়ই কম। অলরেডি ডাক্তার, খাট, গামছা, ফুল, দড়ি, রিক্সা ভাড়া মিলিয়ে বত্রিশটা টাকা বেরিয়ে গেছে। এখনো পড়ে আছে সারাটা দিন। কত লাগবে কে জানে? মাস পুরেতে নিট দু হপ্তা বাকী। অথচ ট্রাঙ্কে আছে আর বড়জোর শত-খানেক টাকা। যা ভাল বুঝিস কর অনিল, আমি আর কি বলব বল।

বলার আর আছেই বা কি? বুড়ি মরার আর টাইম পেল না। দেখছে এ মাসে কোন ওভার টাইম হয় নি। ওভার টাইম তো দূরের কথা, আগামী মাসে মাইনে হবে কি না সন্দেহ। মেলটিং শপে যা গণ্ডগোল চলছে, যে কোন মুহূর্তে স্ট্রাইক বেধে যেতে পারে। ব্যস তাহলেই হয়ে গেল। কোম্পানীও নিশ্চয়ই লক-আউট ডিক্লেয়ার করবে। তখন খাবে কি? খাবে কচু পোড়া। শালা বিয়ের ক্যাঁতায় আগুন।

চাকরী পাওয়ার লোভে ফ্যান কোম্পানীর খোঁড়া কালো মেয়েটকে বিয়ে করেই যত ফ্যাসাদে পড়ল সুকুমার। আই টি আই ট্রেণিং কমপ্লিট করে তিন বছর বেকার বসেছিল। বাপ-দাদারা উঠকে-বসতে গাল পাড়ত। তাই বলতে গেলে নিরুপায় হয়েই হবু শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। অজাতে বিয়ে করার জন্য বাবা ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দিল। বিয়ে ইস্তক ঘর-জামাই সুকুমার। ছেলে-বুড়ো সকলের জামাই বা জামাইদা। বেলঘরিয়ার পাট চুকিয়ে টালিগঞ্জের পি কে রায় লেনে শ্বশুরের ভাড়া বাড়ীতে সেই যে এসে ঢুকেছে আর বেরুতে পারে নি। বেরুবে কি? হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে শ্বশুর ব্যাটা ঘাড় গুজড়ে ফ্যাকটরীর ফ্লোরে মরে পড়ে রইল। তাও তো হয়ে গেল প্রায় ছ বচ্ছর। ছ বছরে চার-চারটে ছেলে-মেয়ে হয়েছে। সেই সঙ্গে বিধবা বুড়ি শাশুড়ীর বোঝাও চাপল ঘাড়ে। সাতটা পেট চালাতে গিয়ে শ্বশুরের সুপারিশে জোটানো চাকরীর মাইনেয় নাকের জলে চোখের জলে হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক সত্যিই ভাল। নইলে ছ মাস ভাড়া বাকী পড়লেও তাগাদা দেয় না এমন বাড়ী-ওয়ালা কি শহরে কোথাও আছে? বরং নিজেই যখন দু-একবার সময়মত দিতে না পারার জন্য ক্ষমা-টমা চাইতে গেছে তখন অনিলের বাবা হেসে-হেসেই বলেছেন—তুমি হলে বাবা পাড়ার জামাই। ইন্দুবাবু এ বাড়ীতে প্রায় পঁচিশ বছর কাটিয়ে গেছেন। সেই যুদ্ধের সময় যখন সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাল তখন পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া যদি মাস-মাস উনি না দিতেন তাহলে আমারই বা তখন চলত কি করে? থাক ও নিয়ে তুমি ভেবো না। বোনাস পেলে ইনস্টলমেন্টে শোধ করে দিও।

সত্যিই এ রকম লোক আর হয় না। সুধাংশুবাবুর ছেলেটাও হয়েছে ঠিক বাপের মত। আপদে-বিপদে অনিলের মত সহায় আর হয় না। এম-এ পাশ। স্কুলে মাস্টারী করে। বিয়ে-থা করে নি, নাটক করে বেড়ায়। কোন ঝনঝাটে নেই। বরং অন্যের ঝনঝাটে সাহায্য করে। ওর সাহায্য না পেলে যে আজ কি হত বলা মুস্কিল।

ভোর হওয়ার আগেই বুড়ি শাশুড়ী দোর খুলে করপোরেশনের মেথরকে দিয়ে রোজ উঠোনটা ধোওয়ায়, বাথরুম পরিষ্কার করায়। জল ঢালার সময় শাশুড়ীর বকাঝকা সব কানে আসে। একতলায় তিনটে ঘর সুকুমারের। দোতলায় থাকেন বাড়ীওয়ালা। আজই শুধু ঘুম ভাঙে নি সুকুমারের। কেন ভাঙে নি সেটা অবিশ্যি একটু পরেই টের পেয়েছে। দরজায় দম-দম করে আওয়াজ পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে, মশারী প্রায় ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে দেখে জানালায় অনিলের উত্তেজিত দুটো চোখ। তখুনি বুঝেছে নিশ্চয়ই কোথাও কোন ঝামেলা পাকিয়েছে। নইলে এত ভোরে অনিল কেন দরজায় দামামা বাজাবে।

দরজা খুলেই বুঝতে পারল দামামা বাজানোর কারণটা। মেথর ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে তখনো উঠোনে। বুড়ো মাইজি আজ দরজা খুলে দেয় নি। মেথরের হাঁকাহাঁকি শুনে দোতলা থেকে অনিল নেমে এসে সদর দরজার হুড়কো নামিয়ে মেথরকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে সুকুমারের পাশের ঘরের জানালায় উঁকি মেরে দেখে খুড়িমার বডিটা খাট থেকে অর্ধেকটা ঝুলছে। ভেতর থেকে দরজায় খিল আঁটা। কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে জামাইদার দরজায় ধাক্কা মেরে'

লুঙ্গির কশিটা ভাল করে এঁটে চোখ রগড়ে শাশুড়ীর ঘরে উঁকি দিল সুকুমার। অনিল যা বলেছে তাই। একবার ভেবেছিল দরজা ভেঙে ঢুকবে। তক্ষুনি মনে পড়ল ছ মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী। দরজা মেরামতির ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। অনিলই তখন ওপর থেকে সুপারী কাটা যাঁতি এনে পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক করে ভেতরে চালিয়ে দিয়ে খিলটা খুলে দিল। ততক্ষণে কেতকী আর বাচ্চারা উঠে এসেছে, দোতলা থেকে সুধাংশুবাবু আর তাঁর অন্য ছেলে-মেয়েরাও নেমে এসেছেন।

দেখার আর ছিল না কিছু। তবু সুকুমার, সুধাংশুবাবু কিরণবালার নাকে, গায়ে, পায়ে সব জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে ক্ষীণ শ্বাসের আশ্বাসটুকু খুঁজল। অনিল গিয়েছিল ডাক্তার ডাকতে। অত ভোরে কেউ আসতে চায় না। তাছাড়া মিস্ত্রী মানুষের তো আর বাঁধা ডাক্তার থাকে না। রোগ-ভোগ হলে আজকাল ই এস আই-র ডাক্তারই সব ব্যবস্থা করে দেয়। শেষ পর্যন্ত শিবু মণ্ডল

এল, ডবল ফীজের শর্তে। বললাম চিনি না, শুনি না, জানলামই না মরল কি সে? নেহাৎ তুমি বলছ তাই যাচ্ছি। একটা সার্টিফিকেটও না হয় দেব। তবে বাপু, কণ্ডিশন মনে রেখ।

ব্যাগের মধ্যেই প্যাড ছিল। ঘরে ঢুকে, একটু-আধটু নেড়ে-চেড়ে, খস-খস করে প্যাডের কাগজে সবচেয়ে সহজ একটা কারণ টানা অক্ষরে লিখে দিয়ে আটটা টাকা গস্ত করে বিদায় হল মণ্ডল ডাক্তার। অনিলের ছোট ভাই কমল ছুটল ভবানীপুরে খাটিয়া, ফুল, গামছা, দড়ি সব কিনতে।

বাঁধাছাদা শেষ হতে-হতে নটা বেজে গেল। কেতকী খাটিয়ার একটা পায়া ধরে মায়ের পায়ে মুখ গুঁজে বসেছিল। কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো কেমন একটা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে উঠোনের চার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। সুধাংশুবাবু একটু আগে দোতলায় উঠে গেলেন। আপিসের বেলা হয়ে গেছে। তাছাড়া অনিল, কমল আর পাড়ার অন্যান্য ছেলে-ছোকরারা আছে। কোন চিন্তা করতে হবে না সুকুমারকে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে-খন। তাছাড়া এই অনিত্য সংসারে সবই মায়া, ভেবে কোন লাভ নেই।

দিদি আপনি উঠুন, আমরা এবার বেরুব। কেতকীকে ধরে অনিল দাওয়ায় এনে বসাল। তারপর টুকরো গামছাগুলো কয়েকজনের হাতে তুলে দিয়ে বলল—আয়, হাত লাগা। বল হরি হরিবোল। বল হরি হরিবোল। ফ্যান কোম্পানীর ফোরম্যান ইন্দুভূষণ দাসের বিধবা, চার্জম্যান সুকুমার বোসের শাশুড়ী কিরণবালা গত পৌষে ছাপ্পান্নোয় পা দিয়ে ফাল্গুনের গোড়াতেই পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাঁধে চেপে দয়াময়ীর শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে চললেন।

সিমেন্টের ব্রীজের এপারটা করপোরেশন, ওপারটা মিউনিসিপ্যালিটির। কেওড়াতলা হলে সুবিধে হত, মাত্র মাইল-টাক পথ। অনিলের পরামর্শে পাড়ার জামাইদার শাশুড়ীর শবদেহ নিয়ে ছেলে-ছোকরারা খোয়া-ওঠা ধুলো-জড়ানো ভাটিখানার সড়ক ধরে সোজা ছুটল দক্ষিণে, আদি গঙ্গার বাঁকের দিকে। আড়াই মাইল পথ মিনিট পঁয়তাল্লিশে কাবার করে দিয়ে যখন খাটটা নামাল শ্মশান-ডাক্তারের ভাঙাচোরা পাকা একতলা আপিস ঘরের কাছে, তখন দর-দর করে ঘাম ছুটছে শববাহকদের মুখ-চোখ, ঘাড়-গলা বেয়ে। পুরোনো ঘুণধরা ঘোড়া নিমগাছের ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে রোদে তেতে-ওঠা কিরণবালা যেন একটু আরাম পেলেন। ছেলে-ছোকরারা বাঁধানো ঘাটলার পৈঠায় বসে গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে জামাইদার দিকে পিছন ফিরে কড়া সিগারেটে গাঁজার দম চড়াল। সুকুমারকে ঘাটের পাশে বসিয়ে রেখে অনিল গেল শ্মশান-ডাক্তারের কাছে।

অফিসে ডাক্তার নেই। কোথায় গেল? ডুমুরতলার আর একটা পার্টির কাছে খবর পেল, ডাক্তার ডোমদের নিয়ে ইঁটখোলার সাজানো ইঁটের পাঁজার পেছনে বসে এই ভর-দুপুরে শীত মারছেন মা-কালীর পেসাদ দিয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে পাঁজার পেছনে আবিষ্কার করল ডাক্তারকে। অচেনা একটা মানুষকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ভাঁড় বোতল ইঁটের পাঁজার খোদলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

মানুষ না যেন একটা ল্যাম্প পোস্ট। হাঁটুঝুলে নোংরা ধুলো-মাখা ধুতি ছাড়া সারা গায়ে কাপড়ের আর কোন চিহ্ন নেই। মোটা একগাছি পৈতা আড়াআড়িভাবে কাঁধ থেকে ডানদিকের হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। শেয়ালদা রুটের ট্রামগাড়ি-মার্কা বুকের খাঁচার ওপরে মুণ্ডুটা ঠিক কৃষ্ণনগরের স্প্রিংয়ের পুতুলের মত সদা-সর্বদা নড়-নড় করছে। কণ্ঠা আর চোয়ালের মাঝে নৌকোর কাছির মত জেগে রয়েছে দুগাছা নলি। ছ্যাতলা-পড়া চামসী মুখের পরে একটা চাঁদির চশমা পরিয়ে দিলে ঠিক মনে হবে যেন পাড়াগাঁর পুজোরী বামুন। প্রায় ফাঁকা মাথাটায় প্রথম শীতের টাকা-টাকা জোড়া খান-কয়েক ফুলকপি এধারে-ওধারে ছড়িয়ে আছে। অনিলকে কিছু বলতে না দিয়েই বেশ চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল ল্যাম্পপোস্ট—কি চাই? পার্টি বুঝি? কৈ সার্টিফিকেট দেখি?

মন দিয়ে মিনিট খানেক ধরে ছ লাইনের প্রায় অবোধ্য ইংরেজীতে লেখা সার্টিফিকেটখানা দেখে কি যেন ভাবল ডাক্তার। তারপর টেম্পো গাড়ির মতো গর্জন করে শুধোল—বডিটা কোথায়? চলুন দেখি।

বডি দেখল, বার-বার সার্টিফিকেটখানা পড়ল, তারপর নিজের খাস কামরায় ঢুকে ষষ্ঠ জর্জের ঠাকুমার আমলের একটা ঢাউস চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল—গাঁড়াকল আছে। হুঁ বাবা। গোড়াতেই সন্দ হয়েছিল। আমি পারমিশন দেব না।

সে কি? ডাক্তারের কথা শুনে অনিল সুকুমার দুজনেরই মাথা ঘুরে গেল। কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু? কি দোষ হল? কেন পারমিশন দেবেন না?

কিছুতেই আর মুখ খোলে না ডাক্তার। শুধু বলে—গাঁড়াকল আছে, গাঁড়াকল। দাঁড়ান থানায় খবর দি। পুলিশ আসুক। তারপর যা হয় হবে। কিন্তু গাঁড়াকলটা যে কোথায় অনিল সুকুমার বুঝে উঠতে পারল না। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও যখন ডাক্তারের মুখ খোলাতে পারল না, তখন অনিলের মুখ খুলল—সাবধানে কথা বলুন, গাঁড়াকল আছে বলেই যদি মনে হয় তো থানায় খবর দিন। পুলিশ আসুক। এতক্ষণে যেন একটু ধাতস্থ হোল ডাক্তার। সারা রাত ধরে বোতল উৎসব চালিয়ে সকালের ঝিমুনিটুকু কাটানোর জন্য তলানি চাখছিল সাঙ্গ-পাঙ্গোদের নিয়ে। সে ব্যাপারে সাত সকালেই একটা পার্টি এসে বাদ সেধেছে। তা সেধেছিস, সেধেছিস, আবার কেন নয়া হুজ্জুতি বাবা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটার ভেতরে গণ্ডগোল রয়েছে, আবার কিনা পার্টি চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে। কোন রকমে এলানো কাঁধটা সিধে করে দু আঙুলের ফাঁকে হলদে রংয়ের লাইন-টানা রুলারের মত ঢাউস কলমটা বাগিয়ে ধরে কাগজপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে খেঁকিয়ে উঠল ডাক্তার—দেবই তো খবর। পেয়েছেন কি? আইন-কানুন নেই না কি? ছেড়ে কথা বলব। যান দিকি এখন। আমার কাজ আমায় করতে দিন।

জিভে তখনো নেশার আড়ষ্টতাটুকু কাটে নি। ধরে-ধরে থেমে-থেমে বাক্যগুলো শেষ করল ডাক্তার। অনিল কান খাড়া করে শুনল ডাক্তার বিড়-বিড় করছে—এখানে কেন বাওয়া। করপোরেশনের মাল করপোরেশনের শ্মশানে না গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে আসা কেন? ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখল সাজানো চিতেয় মড়া তুলছে ডুমুরতলা পার্টি। কি যে করবে বুঝে উঠতে পারল না। এমনি সময় ডুমুরতলা পার্টির এক মস্তান হাতছানি দিয়ে ডাকল অনিলকে।

ঘোড়ানিমের তলায় শুয়ে কিরণবালা ঘুমুচ্ছে। সুকুমার শ্মশান-ডাক্তারের অফিসের বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। শববাহকরা ঘাটের ধারে আড্ডা মারছে। অনিল ধুতি-শার্টের ওপর গামছার গিটটা জোরে এঁটে নিয়ে এগিয়ে গেল ডুমুরতলার জটলার দিকে। হাওয়াই চপ্পল, টেরিলিন প্যাণ্ট, কলার-তোলা গেঞ্জির ওপর সিনেমার হীরোর স্টাইলে একগোছা চুল-ফেলা মস্তান ঘাড় নাচিয়ে বলল—শালা, গণ্ডগোল বাধিয়েছে না? হ্যাঁ, দেখুন তো কি ব্যাপার, রীতিমত বিব্রত অনিল, মুখটা প্লেন করে ফেলল—কোন কারণ দেখাচ্ছে না, শুধু বলছে গাঁড়াকল আছে। কি গাঁড়াকল বলবি তো? তা বলার নাম নেই, বলছে থানায় খবর দেবে। কি করি বলুন তো?

মস্তান সিগরেটের ছাইটুকু টুসকি মেরে উড়িয়ে একটা লম্বা টান মেরে ধীরে-সুস্থে জিজ্ঞাসা করল, আসছেন কোথা থেকে? গঙ্গার এপার না ওপার?—ওপার, জবাব দিল অনিল। একটা পাতলা হাসির রেখা ঠোঁট কাঁপিয়ে কপালে উল্টে-পড়া চুলের গোছায় এসে মিশল—বুঝেছি! ডাক্তার ঠিক মাল ক্যাচ করেছে। এখন শুধু ন্যাজে খেলাচ্ছে। কি দাদা, ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না? মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল অনিল—না, কিছু বুঝতে পারছি না।

অভিজ্ঞ মস্তান হাসি হাসি মুখে কারণটা বুঝিয়ে দিল অনিলকে—আপনারা আসছেন টালিগঞ্জ থেকে। ওখানকার মড়া যাবে কেওড়াতলায়। তা না গিয়ে এসেছেন মিউনিসিপালিটির শ্মশানে। ডাক্তার ঠাউরেছে, নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল আছে। অনিল মাঝপথে হামলে পড়ে বলতে গেল, দেখুন, নাথিং ফিসি, মিথ্যিমিছি ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলছে ডাক্তার। অনিলকে আর কিছু বলতে না দিয়ে, ভ্রুজোড়ার ফাঁকটুকু প্রায় বুজিয়ে এনে বলল মস্তান—সে আমায় বলে কি হবে দাদা? কেওড়াতলায় না গিয়ে দয়াময়ীর ঘাটে এসেছেন। ও-ডক্তার আপনাদের ছাড়বে ভেবেছেন? তারিখ দেওয়া হাতঘড়িটা এক ফাঁকে দেখে নিয়ে উপদেশের সুরে বলল—এখনই তো প্রায় এগারোটা। ডাক্তারের ফোন-টোন নেই। থানা দু' মাইলের পথ। ডোমগুলো এখন আমাদের মড়া পোড়াবে। শেষ হতে হতে

সোয়া দু'টো আড়াইটা তো হবেই। তারপর লোক যাবে থানায়। পুলিশ আসতে আসতেই দেখবেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তার চেয়ে ওর হাতে একটা বড় পাত্তি ধরিয়ে দিন, দেখবেন লাইন ক্লিয়ার।

জামাইদাকে সব খুলে বলল অনিল। মাস ভোর খাটুনি আর আধপেটা খাওয়া শরীরটা সর্বদাই এমনিতে ঝিমিয়ে থাকে, তার ওপর ভোর থেকে যা হুজ্জুতি শুরু হয়েছে, তাতে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। শ্মশান-ডাক্তারের আপিসের দেয়ালে হেলান দিয়ে হাবিজাবি সাংসারিক নানা প্রয়োজনের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন অনামনস্ক হয়ে গিয়েছিল সুকুমার। অনিলের সবক'টা কথা বোধহয় কানেও ঢোকেনি, ক্লান্তিতে বুজে-আসা চোখটা কোনরকমে আধখানা খুলে বলল—যা ভাল বুঝিস কর।

পারমিশন পেয়ে অনিল ছুটল ডাক্তারের কাছে। তখনো ডাক্তার ঠিক সেই রকমই কলম মুঠিয়ে ধরে টেবিলে কাগজ হাতড়াচ্ছে আর বিড় বিড় করে বকছে। গলার স্বরটা যতটা পারে নামিয়ে নরম করে জানলার ধারে মুখটা বাড়িয়ে অনিল বলল—ডাক্তারবাবু, একটু শুনবেন? ঠিক কলমটা টেবিলে রেখে শিরওঠা প্রেতের মত ফ্যাকাসে মুখখানা উঁচু করে খেঁকিয়ে উঠল ডাক্তার—বললাম যে থানায় খবর পাঠাচ্ছি। তর আর তর সয় না দেখছি। অনুনয়ের সুরে ভিজে গেল অনিলের গলা—না, বলছিলাম কি থানা-পুলিশের হুজ্জুত না করে, কিছু করা যায় না কি? এই শেষ কথাগুলো ডাক্তারের খেঁকুড়ে মুখে ঠান্ডা একটা মলম মাখিয়ে দিল। কোনরকমে তোবড়ানো গালে হাসির বুদ্বুদ কেটে ডাক্তার বলল—যাবে না কেন? গোড়ায় তা তো বলেননি। বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ল্যাম্পপোস্ট একটা কাঠির মত লম্বা হাত অনিলের কাঁধের ওপর রেখে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলল—ব্যবস্থা-ট্যাবস্থার জন্য ভাবনা কিসের। সব হবে, কিছু মালকড়ি ছাড়ুন। বোঝেনই তো, ওপারের মাল এপারে এনেছেন, গাড়াকল না থাকলে আনবেন কেন বলুন। আপনারা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক।

তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক দুঃখের কাহিনী গেয়ে গেল ডাক্তার। ফরটি-ফাইভে ডাক্তারী পাশ করে কি কুক্ষণেই যে মিউ-নিসিপ্যালিটির এই মড়া-পোড়ানোর চাকরীটা নিয়েছিল। বৌ, তিনটি মেয়ে সব নিয়ে এই দুর্দিনের বাজারে না খেতে পেয়ে মরতে হচ্ছে। মাইনের টাকায় চলতে হলে মুখুজ্যে ডাক্তারকে এতদিন চিতায় উঠতে হত। নেহাৎ অনিলদের মত খানকয়েক পার্টি আপদে-বিপদে এসে হামলে পড়ে বলে উদ্ধার করে দিন ডাক্তারবাবু, মুখুজ্যে ডাক্তার না বলতে পারে না। তারাই কাজ উদ্ধার হলে ভালবেসে যা দেয় তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে। বামুনের ছেলে হয়ে দিনরাত এই শ্মশানে পড়ে থাকা যে কি ঘেন্নার—সেনটেন্সটা আর কমপ্লিট না করে চোখমুখের ইসারাতেই বুঝিয়ে দিল ডাক্তার। অনিল ডিমে তা দেওয়ার মত সমানে তাল দিয়ে যাচ্ছিল। চিড়ে ভেজানোর জন্য অল্পস্বল্প সহানুভূতির জলও জোগাচ্ছিল সমানে। তারপর ফাঁক বুঝে কথাটা পাড়ল—দশটা টাকা দিচ্ছি, ব্যবস্থা করে দিন ডাক্তারবাবু।

মুহূর্তে ঝুলে-পড়া গালদুটো টান টান হয়ে উঠল। নাকের ফুটো দুটো হাঁ হয়ে গেল। যেন অনেক কষ্টে দম নিয়ে বার-কয়েক গালদুটোয় জিভটা সান দিয়ে মড়া পোড়ানোর কাঠের মত ফট্ করে ফেটে পড়ল—ধ্যাষ্টামো রাখুন। আমার তিনটে মেয়ে, পাঁচটা শ্মশানের লোক, বৌ আর নিজে। দশ টাকায় কি হবে? দু বোতল মালের দামই তো দশ টাকা' ঐ ওদেরই বা কি দেব, আর আমিই বা খব কি? যান, যান, বসে থাকুন, আমি খবর পাঠাচ্ছি থানায়।

শেষপর্যন্ত ত্রিশটা টাকা আর এক বোতল পাকী মালে কিরণবালার সদ্গতির ব্যবস্থা হল। অনিল নিজের পকেট থেকেই টাকাটা দিয়ে দিল। সুকুমারকে বলল, এখন থাক, পরে দেবেনখন। আর একটা ছেলেকে বাসভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল বোতল আনতে।

ডুমুরতলা চলে গেল তিনটে নাগাদ। সুকুমারের শাশুড়ীকে আধকাঁচা আমকাঠের চিতায় তুলে ওপরে আরো ভারী ভারী কয়েকটা টুকরো গুঁড়ি দিয়ে হেঁটেয় কাটা ওপরে কাটা করে দিল ডোমরা। একটু পরে যখন চিতার আগুন বেশ জ্বলে উঠল, তখন শ্মশান-ডাক্তার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সদ্য-কেনা পাকী মালের বোতলটা বগলদাবা করে ইঁটের পাঁজার আড়ালে চলে গেল। শাশুড়ীর চিতার পাশে বসে সুকুমার তখন ভাবছে, ট্রাংকে আছে বড়জোর আর শ'খানেক টাকা। বাড়ী ফিরে অনিলকে এখুনি পঁয়ত্রিশটা টাকা দিয়ে দিতে হবে। নইলে আর মান থাকবে না ছেলেটার কাছে—এত সাহায্য করল ও।

আর অনিল দয়াময়ীর ঘাটের এক কোনায় বসে ভাবছিল, এ তো দারুণ মজার কল। মরেও শান্তি নেই। মড়ার গায়ের শেষ রসটুকু নিংড়ে নেওয়ার মত যন্ত্র ফিট করা আছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অনিলের মত ছেলেকে যদি যন্ত্র অনায়াসে হাঙ্গামা-হুজ্জুতির ভয় দেখিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিতে পারে, তাহলে অশিক্ষিত গরীব মানুষদের অবস্থা কি? কত বোতল পাকী মাল আর ক্যাশ টাকার পারমিট যে দয়াময়ীর ঘাটে জমা পড়েছে, যা আরো পড়বে, তার খোঁজ কে রাখে? কিরণবালা তো চলে যাচ্ছেন। ঘাট থেকে পাড়ের দিকে চোখ ফেরাতে অনিল দেখল—চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সন্দীপন্দু

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

গুস্তাভ ইয়ুং এবং অ্যালফ্রেড অ্যাডলার

(৬)

ইয়ুং-এর শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা না বললে এর উপযোগিতা ঠিকভাবে বোঝানো যাবে না। সাইকো-অ্যানালিস্টরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যাপারে খুব উৎসাহিত বোধ না করলেও অপরাধ নির্ণয়ে এর প্রয়োগ এক সময়ে খুব চালু হয়েছিল। হাসপাতালে একটা চুরির ব্যাপারে শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে সহজেই অপরাধী ধরা পড়ে এবং স্বীকারোক্তি করে। যে-জিনিসগুলো চুরি হয়েছিল, সেগুলোর অর্থবোধক শব্দ এবং আরো কতকগুলো সাধারণ শব্দ (চোরাই জিনিস বা অপরাধের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই) মিলিয়ে-মিশিয়ে উদ্দীপক শব্দের একটা তালিকা তৈরী হয়। এই দু' ধরনের উদ্দীপক অপরাধীর মনে দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; অনেক ক্ষেত্রে সেরকমটি ঘটে না। সেই প্রতিক্রিয়া অপরাধীর হাবভাবে সহজেই ধরা পড়ে। অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দের উত্তর দিতে দেরী হয়। আর এই অপরাধ-সম্পর্কিত শব্দগুলোর উত্তরে বলা শব্দগুলো হয় অন্যদের থেকে আলাদা ধরনের, যা পরীক্ষকের কাছে বিশেষ অর্থ-বাহক হয়ে ওঠে। জল-পড়া, চাল-পড়া খাইয়ে চোর ধরবার পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। মন্ত্রপূত জল বা চাল খেয়ে অপরাধীর ভাবান্তর ঘটে অথবা দৈহিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মন্ত্রপূত দ্রব্যের অলৌকিক ক্ষমতার ফলে ঐ ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে, এ-বিশ্বাস অপরাধীর মনে থাকে বলেই এক্ষেত্রে জলপড়া চালপড়া অপরাধ নির্ণয়ে সহায়ক হয়। শব্দ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে কিন্তু অপরাধীর প্রতিক্রিয়া পূর্ব-বিশ্বাসজনিত নয়। এই পদ্ধতির আধুনিক উন্নত সংস্করণ এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে দেহের উপর উদ্দীপক-শব্দের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া মাপা হয়। উদ্দীপক শব্দের প্রভাবে রক্তচাপেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অপরাধীকে পরীক্ষকের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে। ইয়ুং এবং তাঁর সহকর্মীরা মনে করতেন যে, শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষায় নির্জ্ঞান মনের প্রবণতার আভাস মেলে।

ইয়ুং-এর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর মতভেদের ক্ষেত্র সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার। ডাক্তারদের কাছে যদিও ইয়ুং-তত্ত্ব বর্তমানে বিশেষ সমাদৃত নয়, তবুও শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে ইয়ুং-এর সমষ্টি-নির্জ্ঞান ও আদিরূপ (archetype) বিশেষভাবে পরিচিত। তাছাড়া মনস্তত্ত্বের অতি-প্রচলিত 'কমপ্লেক্স' 'ইনট্রোভার্ট' 'এক্সট্রোভার্ট' কথাগুলো আমরা পেয়েছি ইয়ুং-এর কাছ থেকে।

দুটি ক্ষেত্রে এই দুই দিকপালের মধ্যে প্রথম মতভেদ ঘটে এবং পরবর্তীকালে মৌলিক তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও দুজনের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

প্রথম মতভেদ লিবিডো-তত্ত্ব এবং মানসিক আঘাতের Trauma গুরুত্ব নিয়ে। ফ্রয়েডের সর্বরিতবাদ ইয়ুং মানতে পারলেন না, লিবিডোকে জীবনপ্রক্রিয়া বলে অভিহিত করলেন। শৈশবে পুষ্টিগ্রহণ, কৈশোরে খেলাধুলোর মাধ্যমে সমবয়সীদের সঙ্গে লেনদেন এবং যৌবনে কামজ আকর্ষণ; —এই জীবনপ্রক্রিয়া বা লিবিডোর বিভিন্ন সময়ের অভিব্যক্তি। ইয়ুং-এর মতে 'ট্রমার' নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। অন্যের ভালবাসা বা সহানুভূতি উদ্রেকের একটা উপায় হিসেবে রোগী 'ট্রমাকে' কাজে লাগায়। হিস্টিরিয়া রোগীর বেলায় তার ব্যবহার ও কার্যকলাপ বিশেষ উদ্দেশ্য পরিপূরণের উপায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একটি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ের উল্লেখ করেছেন। একপাল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে মেয়েটি রাস্তা ছেড়ে সরে না দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে করতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটতে থাকে। রাস্তার কাছাকাছি একটি বাড়ীতে তার প্রেমিক থাকতো। মেয়েটির এই হিস্টিরিয়ার উদ্দেশ্য আহত হয়ে ঐ বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া। তার প্রেমিকের সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা তাকে রোগাক্রান্ত করেছে।

ইয়ুং-এর ইনট্রোভার্ট, 'এক্সট্রোভার্ট' ইত্যাদি বিভিন্ন 'টাইপ'-এর আলোচনা এখন স্থগিত রাখছি। মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নৃশবিজ্ঞানী পাভলভও মানব-জাতিকে বিভিন্ন 'টাইপে' ভাগ করেছেন। পাভলভের কথা বলবার সময় ইয়ুং-এর মানসিক-বিশিষ্টতাধর্মী 'টাইপের' আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ফ্রয়েড ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর লিবিডোতত্ত্বকে মনে করতেন সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

শেষজীবনে ইয়ুং চিকিৎসাবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের থেকে দর্শনের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় বিভার সন্ধানে তিনি মেতে উঠলেন। আত্মা-পরমাত্মা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ফ্রয়েডের মতে ধর্মগুরু হবার চেষ্টা করলেন —'মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অফ এ সোল' গ্রন্থে ইয়ুং পুরোপুরি দার্শনিক, বলা চলে একজন প্রফেট। ফ্রয়েডের এই ব্যঙ্গোক্তির জবাবে ইয়ুং বললেন, মানুষ নিজের মনে যে প্রবণতা অনুভব করে, যাকে সত্য বলে মনে করে, সেটা জগতের কাছে উচ্চকণ্ঠে বলবার স্বাধীনতা তার আছে। ফ্রয়েড তাঁর মনে রিরংসা ও জিঘাংসার সন্ধান পেয়েছেন এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার যথাযথ বিবরণ দাখিল করেছেন, আর ইয়ুং তাঁর মনে স্বর্গীয় কামনা ও ঈশ্বরের করুণার জন্য দারুণ পিপাসা অনুভব করেছেন, এর বিবরণও তিনি জগৎসমক্ষে পেশ করতে বাধ্য। ঊনিশ শতকের স্বভাববাদে দীক্ষিত ফ্রয়েড ও ঐশীবাদ-ভাববাদে দীক্ষিত ইয়ুং-এর এই স্বন্দ্ব সে-যুগের পক্ষে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ নিঃসন্দেহ, কিন্তু বর্তমানে এ-স্বন্দ্বের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কেননা, আজ স্বভাববাদ ঐশীবাদের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। আর বস্তুত, ফ্রয়েডের জৈবপ্রবৃত্তিসার তত্ত্ব আদৌ বাস্তুবাদসম্মত নয়; শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে ভাববাদেরই সামিল। ফ্রয়েডোত্তর সাইকো-অ্যানালিসিস শেষপর্যন্ত ইয়ুং দর্শনের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।

কাহিনীর ভক্ত যাঁরা, তাঁরা ঘটকের কথা শোনবার জন্য নিশ্চয়ই অধীর হয়ে উঠেছেন। ফ্রয়েড ইয়ুং-এর মতপার্থক্য বিশ্লেষণ তাঁদের হয়ত আকৃষ্ট করছে না। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিকপালের সম্বন্ধে সামান্য কিছু তুলনামূলক জ্ঞান আধুনিক সব মানুষের পক্ষেই দরকার। হিস্টিরিয়া নিয়ে চর্চা

করতে গিয়ে এ'রা মনোরাজ্যের বিচিত্র ভাণ্ডার আবিষ্কার করে গেছেন, অন্তরে অগাধ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন। আধুনিক মানুষের মনের কথা বুঝতে হলে ঐসব ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরোজা খোলার চাবি আমাদের চাই-ই। নাহলে ঘটককে পুরো জানা যাবে না। ঘটকের পরে যাঁরা আসবেন তাঁরা হয়ত আরো জটিলতর চরিত্র। তাঁদের মনের গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হলে আধুনিক মনস্তত্ত্বের চাবিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই ফ্রয়েড ইয়ুং অ্যাড্‌লার পাতঞ্জলের অবতারণা আমাকে করতেই হচ্ছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পটভূমিকা যদি ঠিকমত তৈরী করতে পারি, তবেই পরবর্তী কাহিনীর চরিত্রগুলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।

ইয়ুং-এর সমষ্ঠিনির্জ্ঞান এবং আদি-প্রতিমার (archetype) কল্পনার মধ্যেই ইয়ুং-এর ভগবৎ বিশ্বাস ও ধর্মীয় সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিফলিত। তিনি পৌরাণিক অতিকথামূলক (মিথ্‌) কাহিনীর সন্ধানে দেশবিদেশের পুরাণ প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্র মন দিয়ে পড়েছেন। ফ্রয়েডের মত তিনি মনে করতেন না যে ঈশ্বর-বিশ্বাস কেবলমাত্র মানসিক অভিক্ষেপ (প্রোজেকশন)। মনের ব্যথাবেদনা সমস্যার ভার বাইরে অবস্থিত একজনকে তুলে দিতে চায় মানুষ। এই একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর! এইভাবে নির্জ্ঞানে অবস্থিত দ্বন্দ্ব, অবদমিত ইচ্ছা সংজ্ঞানগোচর হয় এবং ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে। ইয়ুং-এর ধারণা যে ঈশ্বর লিবিডোশক্তিরই চরম বিকাশের প্রতিনিধি ও প্রতিরূপ। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড থেকে ইয়ুং আরো দূরে অবস্থিত। নির্জ্ঞান চিন্তা আর আদিম মানুষের প্রাচীন চিন্তা ইয়ুং-এর কাছে সমধর্মী। ফ্রয়েডের লিবিডো দেশকাল পেরিয়ে পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে গুহাবাসী মানবজাতির শৈশবে গিয়ে হাজির হয়। এখানে সব চিন্তার উৎস এক, সব ক্রিয়াকলাপের চালিকাশক্তি এক। পুরাকথা ও প্রাচীন ধর্মীয় কর্মবিধির মধ্যে আধুনিক মানুষের অচেতন মানসের অবস্থান। ইয়ুং আবিষ্কার করলেন যে, সব প্রাচীন জাতির পৌরাণিক কাহিনী একই ধরনের। নায়ক নানা রকমের দুর্যোগ ও বীরোচিত কাজের মধ্য দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং পরে ঐশীকৃপায় পুনর্জীবন লাভ করে। পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক নিরাকার লিবিডো-শক্তির সাকার সংস্করণ। দুর্যোগ ও বীরোচিত কার্যকলাপ লিবিডোর সংক্রমণের প্রতীক। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার মাতৃপ্রাপ্তি। লিবিডোর মূল উৎস এই বিশ্বমাতৃকা। পাগলের প্রতিটি প্রলাপবাক্য, ইয়ুং-এর মতে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক এবং আমাদের পূর্বপুরুষের আদিম কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। ফ্রয়েডের ব্যক্তি-নির্জ্ঞান এইভাবে বিচিত্র সমষ্ঠিনির্জ্ঞানে রূপান্তরিত। সংক্ষেপে বলা চলে, ব্যক্তি-মানুষের মনের গোপন কোঠায় শুধু তার শৈশবের স্মৃতিভাণ্ডার নয়, গোটা মানবজাতির শৈশব-স্মৃতিও সেই গোপন কোঠায় অধিষ্ঠিত অথবা বলা চলে, নির্জ্ঞানের দুটি অংশ, এক অংশ ব্যক্তিগত, সেখানে আছে ব্যক্তি-লিবিডোর শৈশবসঞ্চারণের ইতিহাস; অন্য অংশ সমষ্ঠিগত, সেখানে সুপ্ত আছে সমষ্ঠিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত লিবিডো পরিক্রমার ইতিবৃত্ত। এই অংশ আদি-প্রতিমা আদিম ইচ্ছার রূপ ও প্রতীক-সমৃদ্ধ, এখানে নানারঙের ইন্দ্রধনুর সমারোহ।

আদি-প্রতিমা বা আর্কিটাইপের বিবরণ দিয়ে ইয়ুং-প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। আদ্যিকাল থেকে এই আদিপ্রতিমা নানাভাবে নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে রূপায়িত। ব্যক্তি-সম্পর্ক বিশেষভাবে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত। পিতা-মাতা আর সন্তান—প্রধানত এই তিন নিয়ে পরিবার। এই সম্পর্কের ভাবসত্তা চিরন্তন ও শাশ্বত। খৃষ্টধর্মের ত্রিনীতির মধ্যে এই পারিবারিক আর্কিটাইপের প্রতিচ্ছবি। ঈশ্বর পিতা, খৃষ্ট পুত্র এবং হোলি গোস্ট নিয়ে যে ত্রয়ী, সেই ত্রয়ী নানারূপে বিভিন্ন ধর্মে পারিবারিক সম্পর্কের প্রতীকরূপে আবির্ভূত।

ঈশ্বরকে পিতারূপে বা জনক হিসেবে কল্পনা ধর্মশাস্ত্রে নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে বারবার দেখা যায়। সব জাতির আদিম ধর্মক্রিয়ার মধ্যে নিহত প্রাণীর রক্তে পাপ ধুয়ে ফেলার কাহিনী বারবার শোনা যায়। কেউ পাপ ধুয়েছে ভেড়ার রক্তে, কেউ ষাঁড়ের কেউ বা ঘোড়ার রক্তে পাপ ধুয়েছে। এইভাবে মানুষ জন্মে জন্মে পাপ করার অধিকার অর্জন করেছে। এইসব অনুষ্ঠান ইয়ুং-এর মতে এক ধর্ম অন্য ধর্মের কাছ থেকে শিক্ষা করে না, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের আচার সংস্কার ধার করে না। এই একইভাবে চিন্তা করার বা একই অনুষ্ঠান একইভাবে যুগ যুগ ধরে পালন করা গোষ্ঠীগত সহজ প্রবৃত্তি। আদি প্রতিমার কল্পনা মানবপ্রজাতির সহজাত সংস্কার।

যতটা পারি সংক্ষেপে ইয়ুং-এর পৌরাণিক অতিকথার ব্যাখ্যা বিবৃত করলাম। সংক্ষেপে বলতে গিয়ে হয়ত অনেক জায়গায় অতি-সরলীকরণ ঘটে গেল। কিন্তু নিরুপায়। প্রসঙ্গান্তরে না গেলে রচনা একঘেয়ে হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।

ফ্রয়েড ইয়ুং-এর পরেই অ্যাড্‌লার-এর নাম মনে পড়া স্বাভাবিক। একসময় ফ্রয়েডের সহযোদ্ধা ছিলেন অ্যালফ্রেড্ অ্যাডলার। ভিয়েনার চিকিৎসা-জগতে সে সময় ফ্রয়েডের থেকে তিনি অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। কাজেই অ্যাডলারকে সহযোদ্ধারূপে পেয়ে প্রথম জীবনে ফ্রয়েডের খুব সুবিধা হয়েছিল; কেননা তখন ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব বা সর্বতবাদ চিকিৎসকসমাজে অপাঙক্তেয়। কিন্তু বেশিদিন এই আঁতাত টেঁকেনি। মতবিরোধ বাধল মনোরোগের কারণ বা লিবিডোতত্ত্ব নিয়ে। ইয়ুং-এর মত লিবিডোর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ নয়; এর কতটা কামেচ্ছা আর কতটা জীবনীশক্তি, এ নিয়েও লড়াই নয়। এবার লড়াই-এর পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। মেসমার থেকে জেনেটের মাধ্যমে পাওয়া যে দ্বৈতসত্তার সাধনার ফলে ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইয়ুং সেই সাধনায় আরও গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, অর্থাৎ বিজ্ঞান থেকে আরো দূরে সরে গিয়ে সমষ্ঠি নির্জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফ্রয়েড ইয়ুং-এর মতভেদ লিবিডোকে সমৃদ্ধশালী করেছিল, অ্যাড্‌লার কিন্তু লিবিডোর গতি-প্রকৃতি নয়, সরাসরি এর অস্তিত্বকেই অগ্রাহ্য করে বসলেন। দৈন্যবোধ থেকে হিস্টিরিয়া তথা সবরকমের নিউরোসিসের জন্ম।—এই তত্ত্ব অ্যাডলারের মৌলিক অবদান।

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্রতা, অসহায়তা ও নিষ্ফলতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। আশেপাশে বয়স্করা যা খুশী বলছে, যা খুশী করছে; তাদের অনেক শক্তি, প্রচুর সামর্থ্য। বাঁচতে হলে, নিজের অভাব মেটাতে হলে এই বয়স্কদের উপর নির্ভর ছাড়া উপায় নেই। শক্তি অর্জন, ক্ষমতা আয়ত্তে আনা তার প্রাথমিক প্রয়োজন। ক্ষমতালাভের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিশুজীবনের সূত্রপাত। কী ধরনের সংগ্রাম? অল্পবয়সেই শিশু বুঝতে শেখে কিসে মাতাপিতা বয়স্করা তুষ্ট আর কিসেই বা তাঁরা রুষ্ট। বড়দের হাতেই সব ক্ষমতা। একাগ্রচিত্তে ছোটরা বড়দের হাবভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করে, তাদের মন বোঝবার চেষ্টা করে। বড়দের থেকে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাদের কম নয়। এই জ্ঞানের সময়-সুবিধামত প্রয়োগ ছাড়া শক্তিলাভের আর কোনো উপায় নেই। যেমন করে হোক নিজের দৈন্যের ক্ষতিপূরণ করতে হবে;—এই হচ্ছে অ্যাডলারের মতে শিশুমাত্রেরই অভীষ্ট। সুদক্ষ সেনাপতির মত শিশু এই ক্ষমতালাভের যুদ্ধ পরিচালনা করে। পিতামাতার মতিগতি, সঙ্গতি-অসঙ্গতি, তাঁদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভাইবোন, ঠাকুমা-দিদিমার মনোভাব ও অবস্থিতি; সব কিছু বিচার করে নিজের দৈন্য পরিপূরণের বা ক্ষমতালাভের লড়াই চালায়। আর একটু বড় হলে পাড়া-প্রতিবেশী, জ্ঞাতি-আত্মীয়, পরিবারের বন্ধুবান্ধবকেও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বলে সে মনে করে। এই বহুমুখী লড়াই-এর ফলাফল সব সময়ে শিশুর অনুকূলেই যাবে এমন নয়। তবে এর ফলে শিশুর মানসিকতা ও চরিত্র বিশিষ্ট রূপ নিতে বাধ্য হয়। এই রূপ পুরোপুরিভাবে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পরে এই রূপে ব্যক্তির আকারে প্রতিভাসিত। শৈশবের ব্যর্থতা ও দীনতা পূরণের কৌশল শত্রুপক্ষের ক্ষমতা ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। আবার শিশুর নিজস্ব জন্মদত্ত শক্তিসামর্থ্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির উপরও খানিকটা নির্ভর করে। এইভাবে কেউ হয় বাধ্য, কেউ অবাধ্য; কেউ সৎ সুশীল, কেউ বা দুষ্কৃতিপরায়ণ; কেউ মায়ের আঁচলধরা খোকা, আবার কেউবা ডানপিটে বখা।

অ্যাডলারের মতে দৈন্য-পূরণের তাগিদে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং

স্থায়ী হয়। অ্যাড্‌লার একে বলেছেন 'স্টাইল অফ্ লাইফ'। কোনো কারণে কোনো সময় এই বিশেষ স্টাইলে যদি অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে একেবারে নতুন ধরে বাঁচবার স্টাইল আয়ত্ত করতে হয়। নতুন স্টাইল আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। এর ফলে ছোট বড় নানা ধরনের অসুবিধা এবং ত্রুটি দেখা দিয়ে থাকে। লজ্জায় লাল হওয়া ও তোতলামির মত সামান্য অসুবিধা থেকে পাগলামির মত বড়-দরের বিশৃংখলাও ঘটতে পারে। কোনসময়ে ঠিক কি অবস্থায় এসব ঘটে তারও একটা নির্দেশ পাওয়া যায় অ্যাডলারের কাছ থেকে। পিতামাতার আকস্মিক মৃত্যু অথবা পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পুরনো স্টাইলে বাঁচা যদি সম্ভব হয়, তবেই হিস্টিরিয়ার মত উপসর্গ প্রকাশ পায়। হিস্টিরিয়া তথা নিউরোসিসের কারণ প্রসঙ্গে অ্যাডলার ভাইবোনদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ-গুরুত্ব কিন্তু ফ্রয়েডীয় গুরুত্ব থেকে আলাদা। এখানে লিবিডোর কোনো স্থান নেই। এ্যাড্‌-লারের মতে জন্মগ্রহণের ক্রমপর্যায় অনু-যায়ী শিশু-মানসে বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ ঘটে ও চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়।

একমাত্র সন্তান শৈশবে মা-বাপের উপর কর্তৃত্ব করে, অনেক সময় গোটা পরিবার সন্তানটির খেয়ালমত নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে অকালে শিশু পরিপক্ক হয়ে ওঠে, বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ এদের তাড়াতাড়ি ঘটে। ছোটদের সঙ্গ ছেড়ে এরা বড়দের সঙ্গ খোঁজে। স্কুলে ও সমাজে প্রবেশ করার সময় এরা এই 'স্টাইল অফ্ লাইফ' ছাড়তে পারে না। যদি শিক্ষক ও সমাজের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছ থেকে এইভাবে দৈন্যপূরণের ক্ষমতা সংগ্রহ করতে না পারে, তবে এদের হিস্টিরিয়ার মত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অনেক সময় অবশ্য একমাত্র সন্তান বাপমায়ের 'খোকন' হয়ে থাকে, বাড়তে চায় না।

দ্বিতীয় সন্তানের প্রভাব আরো বেশি। জ্যেষ্ঠের মত শুধু বাবা-মাকে নিয়ন্ত্রণ নয়, ক্ষুদে দাদাটিকে তার সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার উপরও কর্তৃত্ব করে। তার জুলুমবাজি আরো বেশি। কনিষ্ঠের কর্তৃত্ব করার ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র আরো বেশি হলেও সে ছোট থাকার সুবিধাগুলো বেশি বুঝতে পারে। এবং সেইভাবেই তার 'স্টাইল অফ লাইফ' তৈরী হয়। শেষ সন্তানটিকে শৈশব পার হতে না দেওয়ার মধ্যে পিতা-মাতার অনেকখানি স্বার্থ থাকে। যতদিন নাতিনাতনির আবির্ভাব না ঘটছে, ততদিন আদরযত্ন করার একটি পাত্র চাই। আর 'ছোট'র ছেলেমি তাঁদের বুড়ো হয়ে যাওয়ার বিষণ্ণ অনুভূতি থেকে রক্ষা করে।

লিবিডো-তত্ত্ব এবং অন্তরদর্শন থেকে মুক্ত আড্‌লার-তত্ত্ব। এখানে চরিত্র ও মানসিকতা গঠনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকৃত। সমসাময়িক দুই মহারথী ফ্রয়েড এবং ইয়ুং থেকে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। নারী-জাগরণ আন্দোলনের এবং সমাজবাদ আন্দোলনের তিনি সমর্থক। ফ্রয়েডের পুরুষ-প্রাধান্য তত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, মনস্তত্ত্ব কখনও লিঙ্গাভাত্তক নয়। পিতৃ-প্রধান সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে সামাজিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত; জৈবিক পার্থক্যের সঙ্গে এ-প্রাধান্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ পার্থক্য বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থার ফল এবং পরিবর্তনীয়। সমাজবাদ সম্পর্কে অ্যাড্‌লারের আগ্রহ রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসেবে নয়। মনস্তাত্ত্বিক অ্যাড্‌লার মনে করেন যে, সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিউরো-সিসের মূলে নিহিত। এই সমাজের অধিকাংশ নরনারী অসাফল্য ও ব্যর্থতাপীড়িত; ফলে হিস্টিরিয়ার মত রোগে আক্রান্ত। যান্ত্রিক জগতে ব্যক্তি যন্ত্রের সামিল। নগরকেন্দ্রিক এই সভ্যতা ব্যক্তিকে নদনদী আকাশমাটি থেকে বঞ্চিত করেছে। যতক্ষণ না সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠছে, যতক্ষণ না উৎপাদন-যন্ত্র ও ধনসম্পদের উপর সমাজের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ দৈন্যবোধ থাকবে এবং চলবে দৈন্য-পূরণের এবং ক্ষমতাসংগ্রহের লড়াই। নিউরোসিস বেড়েই চলবে। সমানাধিকারভিত্তিক সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি জয় করবে সমাজবোধের তাগিদে। প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতার প্রবণতাই হবে ব্যক্তি-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সবরকমের মানসিক ব্যাধির প্রকোপ নিশ্চয়ই কমবে। অ্যাড্‌লারের মত মনস্তাত্ত্বিকের এই অভিমত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আসছে সংখ্যায় পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের ও মস্তিষ্কবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো তুলে ধরে, আবার ঘটক প্রসঙ্গে ফিরে যাবে।

—মনোবিদ

মনের কথা : আলোচনা

প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অমৃত (৯ম বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ৪০ সংখ্যায়) "মনোবিদ" মহাশয় লিখিত মনের কথা শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে তত্ত্ব তথ্য ও বিজ্ঞানগতভাবে বিভ্রান্তিকর ত্রুটি লক্ষ্য করে অমৃত-এর পাঠক-পাঠিকা যাতে ভুল ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণ না করেন সেজন্য নিম্নলিখিত আলোচনাটি পাঠালাম। অনুগ্রহ ক'রে লেখাটি প্রকাশ করে আনন্দিত ও বাধিত করবেন।

মনোবিদ মহাশয়কে সবিনয়ে নিবেদন যে, তিনি সম্মোহক ও সংবেশিতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ও সম্মোহন বিজ্ঞান সপর্কে যে সব তথ্য বর্ণনা করেছেন তা বহুযুগ পূর্বের। সে যুগে সম্মোহনের প্রকৃতি সিদ্ধান্তিকরণ হয়নি, সে যুগে চেতন মনকে আচ্ছন্ন করে অবচেতন মনকে একবার কব্জায় আনতে পারলেই সর্বকিছু করা সম্ভব বলে ধারণা করা হ'ত। তারপর গত ৩৫।৪০ বছরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা হয়েছে এবং অনেক নতুন আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সকল সংবাদ তাঁর জানা নেই দেখে বিস্মিত। নেচার অব হিপ্নোসিস সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধতার অবকাশ ছিলই। কিন্তু ইলেকট্রো এনসেফা-লোগ্রাফ (আমেরিকা) এবং ইলেকট্রো এন-সেফালোস্কোপ (রাশিয়া) ও সাইকো গ্যাল-ভানিক রিফ্লেক্সন এপারেটাস আবিষ্কৃত হবার পর যন্ত্র সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কের কম্পন, চিন্তাধারার ছাপ গ্রহণ, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অংশগুলির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এবং শারীরবৃত্তিক সহ্য শক্তির সীমা পরিসীমা নির্ধারণ নিশ্চিত হবার পর এটা দিবা-লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট সত্যরূপে প্রতিভাত। বিজ্ঞান-জগৎ কর্তৃক প্রমাণিত সত্যরূপেও স্বীকৃত গত ১৯৫৩ সাল থেকে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর অভিমত এবং সিদ্ধান্ত এই যে, সম্মোহন মোটেই কোন প্রকারের নিদ্রা নয়, অজ্ঞান অচৈতন্যাবস্থা নয়, আচ্ছন্নাবস্থা নয়, হিস্টিরিয়া নয়, কন্ডি-শান্ড রিফ্লেক্স (সর্তাধীন প্রতিক্রিয়া) নয়, অলৌকিক নয়, বিযুক্তাবস্থা (dissociation) নয়, মস্তিষ্ক অবসাদকারক নয়, বরং উন্নত অভিভাবিত অবস্থা (increased suggestibility) —গভীরতম একাগ্রতাপূর্ণ অবস্থা (super concentrated state) (অথবা ধ্যানময় বা তন্ময়াবস্থা)।

বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, আমে-রিকান মেডিক্যাল কাউন্সিল, বৃটিশ সোসাইটি অব মেডিক্যাল হিপ্নোটিস্টস, সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল এন্ড এক্স-পেরিমেন্ট্যাল হিপ্নোসিস (নিউইয়র্ক—ইউ, এস, এ),

The British Journal of Medical Hypnotism, World Medical Periodicals, World Health Organisation,

টোকিও মেডিক্যাল কাউন্সিল (টোকিও) কর্তৃক উক্ত মত এবং নিম্ন বর্ণিত সকল মত ও সিদ্ধান্ত সমর্থিত। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের উক্ত মত ও সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে।

সম্মোহনবিদ সম্মোহীত ব্যক্তির সাময়িক পরিচালক মাত্র (guide), পক্ষান্তরে সম্মোহনবিদ কোন অবস্থাতেই সম্মোহিতের দ্বারা যথেচ্ছ কাজ করিয়ে নিতে পারেন না। ক্রীড়নকে পরিণত ক'রতে পারেন না। সংবেদনশীলতার পরীক্ষামূলক কতকগুলি টেস্ট ক্রীড়া হিসাবে প্রদর্শন সম্ভব হ'য়ে ওঠে। সম্মোহক যা কিছু করেন বা বলেন, তাতে সংবেশিতের বা সম্মোহিতের আন্তরিক স্বীকৃতি ও দ্বন্দ্বহীন সমর্থন থাকেই। এজন্যই চারিত্রিক পবিত্রতা, সংস্কার, ধর্ম, আজন্ম বিশ্বাস এর বিরোধী অন্যায়, অমানুষিক কোন অভিভাবনের প্রচেষ্টা সম্মোহিত অবস্থা ভেঙ্গে দিতে পারে, অভিভাবন অগ্রাহ্য ক'রতে পারে, সম্মোহিতাবস্থা নিদ্রায় রূপান্তরিত হতে পারে। সংবেশিত ব্যক্তির যে কোন গভীরতম মোহিতাবস্থাতেও উক্তরূপে যে কোন সাজেসান অগ্রাহ্য ও পরিত্যাগ করার ক্ষমতা থাকেই। এবং সর্বাবস্থাতেই সংবেশিত ব্যক্তি পূর্ণ বা আংশিক চৈতন্যবান থাকেনই। সুতরাং কি করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, কোন পরিবেশে করা হ'চ্ছে, কি কি সাজেসান দেওয়া হ'চ্ছে, কেন দেওয়া হ'চ্ছে, এ সম্পর্কে সাধারণভাবে চেতনবান ও অবহিত তিনি থাকবেনই। কেবলমাত্র criminal হিপ্নোটিজমের পর্যায়ভুক্ত সম্মোহিতের মনে হ্যালিউসিয়েশান (ভ্রম) সৃষ্টি ক'রে মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার উপর বিশ্বাস জন্মিয়ে কতকগুলি স্বেচ্ছাচারমূলক মত সাময়িকভাবে খাটানো সম্ভব, যা কোন বিজ্ঞানী বা সম্মোহন চিকিৎসক করেন না। কারণ তা সম্মোহিতের মনে ও দেহে প্রচণ্ডতম বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তী 'নিউরোসিস' রোগের সূচনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

মনোবিদ মহাশয়ের লেখা En repport (আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন) সম্মোহন ও সংবেশিতের মধ্যে—একান্ত ভ্রমাত্মক এবং তা বিজ্ঞানগত ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে বহু পূর্বে। তিনি বলেছেন—'ঘুম থেকে উঠবার পর সংবেশিত সব ভুলে যায়', কিন্তু আসলে কখনো কিছুই তিনি ভোলেন না, যদি সম্মোহক ভুলবার সাজেসান বিশেষরূপে আরোপ না ক'রে রাখেন। আর এতৎসত্ত্বেও সম্মোহিত ব্যক্তি ইচ্ছা ক'রলে এবং পৌনঃপুনিক স্মরণ চেষ্টা দ্বারা সম্মোহিত অবস্থা ভঙ্গ হবার পর উক্ত অবস্থায় কি কি ঘটেছে প্রায় সবই স্মরণে সক্ষম হ'তে পারেন।

সম্মোহিত অবস্থা মোটেই কোনপ্রকারের ঘুম নয়, বরং জাগ্রত অপেক্ষা আরও গভীরতম একাগ্রতাপূর্ণ অবস্থা, (super concentrated state) যে অবস্থায় মনের সমস্ত ইউনিটগুলির একত্র সমাবেশ সংঘটিত হয়। আর সেজন্য ঐ একত্র সমাবিষ্ট ইউনিটগুলি নির্দিষ্ট অভিভাবনে অভিভাবিত হওয়ার কারণে সোজি সমস্ত সজেশান পূর্ণরূপে গ্রহণ (absorb) ক'রতে সক্ষম হয়। এই ক্রিয়াটি সাধারণ জাগ্রতাবস্থায় মোটেই হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, জাগ্রতাবস্থায় মানুষের মন একসঙ্গে হাজারো রকম চিন্তা ক'রতে সক্ষম (diluted thoughts)। আর সেইজন্যই অভিভাবন বাক্য আদেশ বা নির্দেশ এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে অপর কান দিয়ে বিনির্গত হ'য়ে যায়—উপরোক্ত মনের ইউনিটগুলিকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। ফলে অভিভাবন কার্যকরী হয় না। কিন্তু সম্মোহিতাবস্থায় অপরাপর সমস্ত চিন্তা বিদূরিত হ'য়ে কেবলমাত্র সম্মোহকের নির্দেশানুযায়ী একটি মাত্র চিন্তায় মন আকৃষ্ট হয়ে সংলগ্ন থাকে। সেইজন্যই সেই ঐকাগ্রতাপূর্ণ অবস্থায় একটি মাত্র চিন্তার অবশ্যম্ভাবী অসীম শক্তির বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং ঐ একাগ্রতারই গভীরতার তারতম্যানুসারে শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন, বেদনার অপনোদন, রোগ নির্ধারিতকরণ, নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি বিধান, শরীর লৌহবৎ শক্তকরণ অসীম সহাশক্তির প্রবর্তন (যাতে শল্য চিকিৎসা সম্ভবপর হয়ে ওঠে) এমনকি বেদনাবিহীন সন্তান প্রসব সম্ভবপর হয়ে থাকে। কারণ মনের সমস্ত ইউনিট যখন একটি মাত্র নির্দিষ্ট চিন্তায় নিবদ্ধ তখন অন্য কোনদিকে সেগুলিকে আকৃষ্ট করার আর কোন উপায় বা অবকাশ থাকা সম্ভব নয়। আর তাই-ই সম্মোহনবিদের নির্দেশে হাসি-কান্না, চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম সংঘটিত হয়। ঐ অবস্থাতে অটোমেটিক রাইটিং, অটোমেটিক মুভমেন্ট, স্বপ্নদর্শন, ভারোত্তোলন, Age regression, ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে। উপরিউক্ত অবস্থা গভীরতার তারতম্যানুসারে 'লাইট' —'মিডিয়াম' ও 'ডিপ' এই তিনটি স্তরভেদ করে। অবশ্য সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'লাইট ষ্টেজ'ই যথেষ্ট কার্যকরী।

একটি অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কথা এখানে বলা উচিত। মানুষের মন একই সময়ে দুই বিপরীতমুখী চিন্তা ক'রতে অক্ষম। যখন 'হ্যাঁ হবেই' এই চিন্তা থাকে 'না হবে না' তন্মুহূর্তে চিন্তা করা সম্ভব নয়।

সম্মোহন বিজ্ঞানে সম্মোহনবিদের বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যথার্থ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে সম্মোহনবিদের 'প্রভাব' খাটানোর প্রশ্ন একান্ত অবাঞ্ছনীয় ও অবান্তর। কারণ এটা সর্বজনস্বীকৃত বিজ্ঞানসম্মত সত্যরূপে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত যে, সম্মোহিতাবস্থায় যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই সম্মোহিতের নিজস্ব কল্পনা-শক্তি জনিত, এবং তাঁরই অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের সহায়ক। সুতরাং তথাকথিত 'প্রভাব খাটানো'র প্রশ্নের অবকাশই নেই।

মহামতি আই, পি, প্যাভলভের অবদান অসীম ও অমূল্য। বিশেষ ক'রে তাঁর আবিষ্কৃত 'কণ্ডিশানড রিফ্লেক্স' (সর্তাধীন প্রতিক্রিয়া) চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বৃহত্তর অংশ পূর্ণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু তাই ব'লে হিপ্নসিস (সম্মোহন) কখনই কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স নয়। যদিও সর্তাধীন প্রতিক্রিয়া দ্বারা সম্মোহিত অবস্থা উৎপাদিত করা যেতে পারে। বহু মানুষকে শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া দ্বারাই প্রথম দিনে প্রথম অধিবেশনেই গভীরতর (deep degree) সম্মোহিতাবস্থায় উপনীত করানো যায়। এটা আমার ২৩ বছরের বাস্তব ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকেও বলতে পারি। উপরন্তু অনেক বড় বড় ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরণের ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন সম্মোহনের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে, পূর্বকথিত যান্ত্রিক পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তকরণের আগে।

'সীগমন্ড ফয়েড্' যাঁর অবদান মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাহীন, তিনি শতকরা ৪০ জনকে সম্মোহিত ক'রতে সক্ষম হ'য়ে নিজের অক্ষমতা ভেবে 'মনঃসমীক্ষণ' (সাইকোএনালিসিস) নিয়ে গবেষণা ক'রে নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার ক'রে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত ক'রেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সম্মোহন দ্বৈত ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সমন্বয়ে সম্ভবপর'। পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ ক'রলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা ছাড়া 'আত্ম-সম্মোহন' (Self Hypniosis) সম্ভবপর। শেষ জীবনে তিনি স্বীকার ক'রেছিলেন, মনঃসমীক্ষণ ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বজনীন ব্যবহারযোগ্য করতে হ'লে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে সম্মোহন বিজ্ঞানেই ফিরে যেতে হবে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক Charcot বলেছিলেন— 'কেবলমাত্র মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণই সম্মোহিত হবার যোগ্য।' কিন্তু এটি প্রমাণিত সত্যরূপে স্বীকৃত হ'ল যে সুস্থ সবল বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণই সম্মোহনের সংবেদনশীলতার সর্বাধিক অধিকারী। শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী লোককে সম্মোহিত করা যায় অন্ততঃ চিকিৎসা সম্পর্কে।

'আত্ম-সম্মোহনে' অনভ্যস্ত অনভিজ্ঞ সম্মোহনবিদ খুব কমই আছেন ব'লে অনুমিত হয়। তাছাড়া যাঁর চলা বলা করা ও ভাবা আত্ম-সম্মোহন অভ্যাসে নির্ণীত নয়, তাঁর অন্যের চলা, বলা, করা [illegible] নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধান করা প্রচেষ্টা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা পণ্ডিতগণের বিচার্য।

মনোবিদ মহাশয় মহাপুরুষের ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ন্যায় রক্ত পড়া এবং অন্য একজনের পৃষ্ঠদেশের আঘাত চিহ্ন মহাপুরুষের পৃষ্ঠে অংকিত অবস্থাকে স্ব-অভিভাবন ক্রিয়া বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সবিনয় নিবেদন এই যে এগুলি exceptional case হিসাবে স্ব-অভিভাবনের যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রলেও এটি কিন্তু এই সকল বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের বাইরের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও জটিলতম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথা। তিনি একটি উচ্চতম বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যা দিয়ে জটিলতার সৃষ্টি ক'রেছেন।

আর পি ব্যানার্জি, হাওড়া

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

।। আঠার ।।

হঠাৎ রাজীবের মনে হল, সে এসে পৌঁছবার পরই একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই দু-একজন মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল বটে। এখন অনেকেই তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করছে। ফের মুখ নামিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বেশ বোঝা যায়, ওরা এমন একটা বিষয়ের আলোচনা করছে, যার সঙ্গে রাজীবও জড়িত। সকলেই বেশ চঞ্চল এবং কৌতূহলী। হঠাৎ পুলিশের বড় দারোগার বাড়িতে এই চায়ের আসরের হেতু কি? নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। আগন্তুকদের মুখে এই প্রশ্নই আঁকা। উত্তর জানবার জন্য সকলেই আগ্রহী।

ইতিমধ্যে অতিথি-অভ্যাগতদের কাছে চায়ের কাপ এসে হাজির। জল-খাবারের ছোট ডিস প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হল। অনেকেই চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। কেউ বা ডিস থেকে একটা সিংগাড়া তুলে নিয়ে তাতে ছোট্ট কামড় বসাল।

ঘরের দরজায় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। কেউ আসছে বুঝতে পেরেও রাজীব চায়ের কাপ থেকে মুখ সরাল না। লোকটি ঘরে পা দিতেই সুব্রত কনুয়ের কাছে একটা মৃদু চিমটি কেটে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। তবু রাজীব খুব চঞ্চল হল না। আগন্তুককে চোরাদৃষ্টিতে সে আগেই দেখে-ছিল। এখন মুখ তুলে চাইল। সহাস্যে বলল,—'আসুন নরেশবাবু। দেরি দেখে ভাবলাম আপনি বুঝি আর এলেনই না।'

কিন্তু নরেশবাবু একা নন। তার সঙ্গে চাঁদবদনও হাজির। কিউয়ের পাশে ইউয়ের মত লোকটি নরেশবাবুর গায়ে প্রায় সেঁটে রয়েছে।

চাঁদবদনই কথা বলল,—'নরেশবাবু আসতে দিককত করছিল হুজুর। বলে কি,

ভাতিজি মরে গেল, ফিন পলাশপুরে কার পাশে যাব? কি ফায়দা হোবে? হামি বললাম কি ইন্সপেকটরবাবু যখন বলিয়েছেন, উর একদফা চলুন। ব্যস এই শেষবার। জরুর কোই আচ্ছা খবর মিলবে। নেহি তো ফালতু ফালতু ইন্সপেকটরবাবু কাঁভি ডাকতেন না।'

রাজীব চায়ের কাপে আর একবার চুমুক দিয়ে বলল,—'চাঁদবদনজী ঠিকই ধরেছেন। মিছিমিছি আপনাদের হয়রানি করবার জন্য এতদূরে টেনে আনিনি। আমার কাছে খবর আছে। খুব চাঞ্চল্যকর সংবাদ। এই খবর দেবো বলেই আপনাদের সকলকে এখানে সমবেত করেছি। চায়ের আসরের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এখানে যাঁরা উপস্থিত, তাঁরা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন। এবং সেজন্যই আজকের আসরে কেবল তাঁরাই নিমন্ত্রিত।'

ইতিমধ্যে সুব্রত সুইচ অফ করে একটা আলো নিভিয়ে দিয়েছে। এখন ঘরের মধ্যে কম পাওয়ারের বাতিটা জ্বলছে। ফলে কোণের দিকে বেশ অন্ধকার। অন্যত্র আবছা আলো। কেমন রহস্যময় পরিবেশ। অতিথিদের চোখ মুখ ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায় না,—অথচ চেনা যায়।

রাজীব তাকিয়ে দেখল, সমস্ত ঘরটা মন্ত্রবশ ভুজঙ্গের মত শান্ত। একটা ছুঁচ পড়লেও টের পাওয়া যায়। ফিসফাস, গুঞ্জন আর নেই। সকলেই কিছু একটা শুনবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কেউ কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। চোখের পাতাও স্থির। ঠিক পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল।

চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে রাজীব বলল,—'শহরসুদ্ধ সব লোকেই এখন জানে শ্রীমতী রায় আত্মহত্যা করেন নি। বুধবার রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন। এবং যে লোকটি তাকে হত্যা করে, সে রীতিমত চতুর এবং বুদ্ধিমান। কারণ খুনের কৌশলটি অভিনব তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও নিখুঁত এবং চমকপ্রদ হল এই হত্যাকান্ডকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। সমস্ত ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, যে খুনী নিঃসংকোচে আমাদের চার পাশেই ঘোরাফেরা করল, অথচ তাকে সন্দেহ করবার মত কোনো কার্যকারণ জনসাধারণ বা পুলিশ খুঁজে পায় নি।'

পিছন থেকে কে একজন শুধোল,—'শ্রীমতী রায়ের হত্যাকারীকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন ইন্সপেকটরবাবু?'

রাজীব একটু হেসে বলল,—'নিশ্চয়। অবশ্য হত্যাকারীকে খুঁজে পেলেও খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা সহজে জানা যায়নি। আজ সকালে তাও পরিষ্কার হল। সুতরাং খুনীকে এখন সর্বসমক্ষে হাজির করতে বাধা নেই।'

সকলেই একদৃষ্টে রাজীবের দিকে তাকিয়ে আছে। কে এই জঘন্য অপরাধের নায়ক, তার পরিচয় জানবার জন্য প্রত্যেকেই উদগ্রীব। পিছনের সারিতে একজন উসখুস করল। বোধহয় তার কৌতূহলই বেশী। হত্যাকারীর নাম জানবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে রাজীব ফের শুরু করল,—'সমস্ত ব্যাপারটা একবার কেঁচেগণ্ডূষ করা যাক। বুধবার রাত্রে নীপা দেবী বাড়িতে একা ছিলেন। এবং সেই রাতে ডাক্তার রায়ের হাসপাতালে নাইট-ডিউটি ছিল। রাত আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। চাকর দুঃখহরণও রাত নটার সময় যাত্রা শোনার জন্য চলে গিয়েছিল। সুতরাং বুধবার রাত্রে নীপা দেবী ছাড়া আর কেউ বাড়িতে ছিল না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন রাত্রে ভীষণ জলঝড় হয়েছিল। হত্যাকারী রাত নটার পর কোনো একসময় বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এবং হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীমতী রায়ের দেহে হেভি ডোজের মরফিন ইনজেকশন পুশ করে। নীপা দেবী নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে, সে তাকে বিছানার উপর ঠিক ঘুমোবার ভঙ্গিতে শুইয়ে দেয়। পরে একটি প্রায় শূন্য স্লিপিং পিলের শিশি বালিশের পাশে রেখে সরে পড়ে। যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মিসেস রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।' একটু থেমে রাজীব আবার কথা বলল,—'এর থেকেই অনুমান করা যায় যে হত্যাকান্ডটি সুপরিকল্পিত। খুনী ঠিক সাধারণ লোক নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারটা সে মোটামুটি বোঝে। ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিতে জানে। এবং অন্ততঃ আট-দশটি মরফিনের অ্যামপিউল সে পূর্বেই সংগ্রহ করেছিল। তারপর সুযোগ বুঝে ইনজেকশন দেবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢোকে। শুধু তাই নয়, মিসেস রায়কে জোর করে ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকলে, লোকটি নিশ্চয় ক্লোরোফর্ম কিংবা ঐ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে তাকে বাগে আনবার চেষ্টা করেছিল। এবং নীপা দেবী বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলার পর সহজেই তার পায়ের গোড়ালীর কাছে স্যাফেনাস ভেনে মরফিন ইনজেকশন পুশ করে দেয়। ফলে শেষ রাতের দিকে শ্রীমতী রায়ের মৃত্যু ঘটে।'

কেউ কোনো প্রশ্ন করল না দেখে রাজীব নিজেই বলল,—'অবশ্য এমনও ভাবা চলে যে, মিসেস রায় স্বেচ্ছায় ইনজেকশন নিতে রাজী হয়েছিলেন। দেহের প্রয়োজন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে কত ইনজেকশনই তো আমরা নিয়ে থাকি। এবং এমনি কোনো অছিলায় তাকে প্রতারণা করে মরফিন দেওয়া হয়েছিল। পরে ব্যাপারটা নিছক একটা সুইসাইডের ঘটনা বলে চালানোর অপচেষ্টা হয়েছে।'

প্রিন্সিপ্যাল সুনির্মলবাবু মন্তব্য করলেন, 'শহরের লোকের মনে কিন্তু সেই ধারণাই বদ্ধমূল ইন্সপেকটরবাবু।'

রাজীব পরিষ্কার বলল,—'তাদের অনুমান অবশ্যই ভ্রান্ত। তবে ব্যাপারটা আমি খোলসা করে বলছি। এই রকম ভাবনা-চিন্তার অর্থই হল, নীপা দেবীর স্বামী ডাক্তার অম্বর রায়কে খুনী মনে করা। অম্বর রায় চিকিৎসক এবং মরফিনের অ্যামপিউল সংগ্রহ করে ইনট্রাভেনাশ ইনজেকশন দেবার কৌশলও তার জানা। এ ছাড়া শহরের কেউ কেউ জানে যে রায়-দম্পতির মধ্যে বনিবনা ছিল না। নারী হলেও নীপা দেবীর মন ছিল বহির্মুখী। স্বামী আর ঘরকন্নার মধ্যে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেন নি। শহরের নানা অনুষ্ঠানে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কলেজের নানা ফাংশনে মিসেস রায়ই সব। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে তিনি হিরোইন। তলে তলে মস্ত একটা কান্ড করতে মিসেস রায় এগোচ্ছিলেন। খবরটা নিশ্চয় সকলে জানেন না। এবং সকলের পক্ষে এ খবর জানাও সম্ভব নয়। নীপা দেবী সিনেমায় নামতে রাজি হয়েছিলেন। অবিনাশবাবুর প্রস্তাব তিনি প্রায় দু হাতে লুফে নেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত ব্যাপারেই ডাক্তার রায়ের সায় ছিল না। তিনি আপত্তি করেছেন, সাধ্যমত বাধা দিয়েছেন। কিন্তু বউকে রুখতে পারেন নি। ফলে দুজনের সম্পর্কের গভীর অবনতি ঘটেছিল। এ ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। প্রফেসর নীলাদ্রি সেনের সঙ্গে নীপা দেবীর পূর্ব-পরিচয় ছিল। বিয়ের আগের ভাব-ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, দুজনের মধ্যে ঠিক তা ঘটেছিল। পলাশপুরে দেখা হলে পু[illegible] প্রেমে ফের বসন্তের হাওয়া [illegible] লাগল। এ সমস্তই আমাকে তদন্ত [illegible] জানতে হয়েছে। যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকেই টুকরো টুকরোভাবে নানা তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। তবে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি মিসেস রায়ের লেখা একটা ডায়েরি বই থেকে। এটা না পেলে আমার খড়-গাদায় ছুঁচ খোঁজার অবস্থা হত। এবং খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্য টেনে বের করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত।'

রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে রাজীব পুনরায় শুরু করল,—'আমি জানি ডাক্তার রায় বউকে বিশ্বাস করতেন না। স্বামীর সন্দেহের কথা স্ত্রীও জানতেন। নীপা দেবী তাই ঠিক করেছিলেন, তিনি ঘর ছাড়বেন। তবে কারো সঙ্গে নয়। স্বেচ্ছায় এবং একাই। নীলাদ্রি সেনকে তিনি বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিরস্ত করবেন। তার সামনে হাজার বাতির উজ্জ্বল ইশারা। ফিল্মস্টারের ঝলমলে জীবনের ধারেকাছেও, মফঃস্বল কলেজের একজন অধ্যাপক রীতিমত বেমানান এবং অকিঞ্চিৎকর।'

অম্বর একপাশে চুপ করে বসেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা সি আই ডি ইন্সপেকটর এমন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করবে, সে তা ভাবেনি। লোকটা আরো কি বলে শোনার জন্য অম্বর সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইল।

দুঃখ করে রাজীব বলল,—'কিন্তু মিসেস রায়ের একটি ইচ্ছেও পূর্ণ হয়নি। নিয়তি তখন ঝড়ের বেগে তাকে গ্রাস করবার জন্য এগোচ্ছে। সিনেমার হাতছানি, রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ মেঘের প্রাসাদের মত সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। এমন কি নীলাদ্রি সেনের সঙ্গে শেষ কথাও তার বলা হল না। বৃহস্পতিবার দিন কাকার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরোলে ডাক্তার-স্বামীর ঘরে আর কোনো দিন হয়ত ফিরতেন না। কিন্তু নিয়তি তার মনের ইচ্ছা-বাসনার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বুধবার রাত্তিরেই নীপা-দেবী আততায়ীর হাতে খুন হলেন।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে রাজীব বলল—'আমি জানি এমন একটা কেসে ডাক্তার রায়কে খুনী বলে সন্দেহ করা খুব স্বাভাবিক। প্রথম দিকে আমার মনও সেদিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতেই আমার সন্দেহ কাটল। একটা কথা অপানারা মনে রাখবেন। অম্বর রায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক,—মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তিনি যদি ঠান্ডামাথায় তাকে খুন করতে চাইতেন, তাহলে কখনও চিকিৎসা-বিদ্যার আশ্রয় নিতেন না। একজন ভদ্রমহিলাকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করে তার বালিশের পাশে ঘুমের বড়ির শিশি রেখে গেলেই পুলিশ সেটা সুইসাইড বলে গণ্য করে না। আনন্যাচারল ডেথ কেসে পোস্টমর্টেম অবশ্যম্ভাবী। এবং ঘুমের ওষুধই যে মৃত্যুর কারণ, সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া দরকার। তারজন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে ভিসেরা পাঠানো হবে। কেমিক্যাল এগজামিনেশনে মরফিন পাওয়া গেলে, পুলিশ ভদ্রমহিলার ডাক্তার স্বামীকেই সন্দেহ করবে। এবং ডাক্তার রায় কি এতই মূর্খ যে এইভাবে স্ত্রীকে খুন করে তিনি প্রায় স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে বসবেন? আমার তা মনে হয় না। ডাক্তার রায়ের খুনের মতলব থাকলে তিনি স্ত্রীকে অন্য উপায়ে পৃথিবী থেকে সরাতেন। খুব সাধারণ মানুষে যা করে। মাথায় মোক্ষম আঘাত, কিংবা গলা টিপে হত্যা। পরে পুলিশ এসে দেখত, মৃতার অলংকার-টলংকার সব নিখোঁজ। লোকে ভাবত,—'ইট ওয়াজ এ মার্ডার ফর গেইনস।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে খুনী কে?' রাজীব ঘরের কোনের দিকে একবার তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—'তবে কি অধ্যাপক নীলাদ্রি সেনই অপরাধী? তিনি নীপা দেবীর পূর্ব-প্রণয়ী। পলাশপুরে এসে ফের তাদের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেম হয়। ডায়েরিতে নীপা দেবী লিখেছেন, নীলাদ্রিবাবু তাকে বহুদূরে কোথাও নিয়ে যেতে চান। এবং আমি জানি দেবরাজের সঙ্গে মিসেস রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হন। নীপা দেবীর ফিল্মে নামার ইচ্ছাও সম্ভবত তাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তবে কি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নীলাদ্রি সেনই হাতে তুলে নেন? তদন্তে জানা গেছে নীলাদ্রির বাবা ডাক্তার। বাপের নাম ভাঙিয়ে আট-দশটা মরফিনের অ্যাম্পিউল জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল, নীলাদ্রিবাবু কি ইনজেকশন দিতে জানেন? আমি এ বিষয়ে তদন্ত করেছি। নীলাদ্রি সেন তার বাবার মেজ ছেলে। বাপের ইচ্ছে ছিল, এই ছেলেটিকে ডাক্তারি পড়ান। কিন্তু ডাক্তারি পড়া দূরে থাক, স্কুলের গন্ডী পেরোবার পর ছেলে সায়েন্স পড়তেই রাজি হল না। বাপের সঙ্গে একরকম ঝগড়া-বিবাদ করেই সে আর্টসে গিয়ে ভর্তি হল। ডাক্তার সেন আমার কাছে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলেছেন। অন্য ছেলেরা মাঝে-মধ্যে তার চেম্বারে এসেছে। দেহের নানা রোগ-অসুখ নিয়ে বাপের সঙ্গে কথা বলেছে। চিকিৎসা-পদ্ধতি লক্ষ্য করেছে। কিন্তু নীলাদ্রি ব্যতিক্রম। ছোটবেলায় এক ফোঁটা রক্ত পড়তে দেখলে সে তিড়বিড় করে লাফাত। কলেরার ইনজেকশন নিতে হবে শুনলে বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাত। বাপের চেম্বারে বসে অসুস্থ মানুষের দেহে ইনজেকশনের ছুঁচ ফোটানো সে কি স্বচক্ষে দেখতে পারে?' একটু হেসে রাজীব বলল, —'এমন একটা ইতিহাস শোনার পর, নীলাদ্রিবাবুকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে আমি ঠিক ভাবতে পারলাম না।'

সামনের সারিতে চৈতি বসেছিল। সাজে-গোজে আজও সে পটের বিবি। মাজা ঘষা মুখ, মাথার পিছনে প্রায় মৌচাকের মত সুদৃশ্য এক খোঁপা। ম্যাচ করা শাড়ি আর ব্লাউজ। রাজীব লক্ষ্য করল, খানিকটা দূরে বসে অবিনাশ কেবলি ওর মুখের উপর চোখ বুলোচ্ছে। চৈতির ঠিক পিছনেই তার হবু-বর হরিপ্রকাশ বসে। সে মাথা ঘোরালেই অবিনাশ মুখ নামিয়ে নিচ্ছে।

রাজীব ওকে লক্ষ্য করে বলল,—'চৈতি দেবী, সন্দেহ কিন্তু আমি আপনাকেও করেছিলাম। দেবরাজের সঙ্গে মিসেস রায়ের ঘনিষ্ঠতায় আপনিও কম ঈর্ষান্বিত হন নি। এবং নানাভাবে মিসেস রায়কে জব্দ করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। নীলাদ্রিবাবুকে অযথা টেলিফোন। বেনামীতে তাকে চিঠি দিয়ে উত্তেজিত করবার চেষ্টা। তারপর দেবরাজের ডাকবক্সে মিসেস রায়ের লেখা চিঠিখানা রেখে এসে সবচেয়ে অন্যায় করেছেন। মেয়েদের ঈর্ষা এমনিই হয়। কিন্তু তবু আমি বলব, আপনি বুদ্ধিমতী চৈতি দেবী। কারণ দেবরাজ আর অবিনাশ কেউই বুঝতে পারেনি যে চিঠিখানার মধ্যে আপনার একটা মস্ত প্যাঁচ রয়েছে। বুধবার রাত্তিরে ওরা দুজনেই তাই বোকার মত দৌড়েছিল। জল-ঝড় না হলে নিশ্চয় একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হত। আমি বিশ্বাস করি প্রেমের টানে দৌড়বার সময় কেউ থলিতে করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর মরফিনের অ্যাম্পিউল নিয়ে যায় না। কাজেই ওরাও সন্দেহমুক্ত। খুনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই।'

সুব্রত লক্ষ্য করল চৈতি মাথা হেঁট করে বসে। আর অবিনাশ দাঁত বের করে হাসছে। দেবরাজের মুখখানা খুব চকচকে দেখাচ্ছে,—ঠিক ট্যাঁকশাল থেকে সদ্য বেরোনো সিকি-আধুলির মত উজ্জ্বল।

সুনির্মলবাবু বেশ চিন্তিত মুখে বললেন,—'তাহলে মিঃ সান্যাল? নীপা দেবীর হত্যাকারী কে? আমরা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি তো প্রায় সকলের কথাই বলে গেলেন। শুধু নরেশবাবু আর চাঁদবদনজী বাকি।'

চাঁদবদন তখনই প্রতিবাদ করে বলল,—'আরে সিয়ারাম, সিয়ারাম। হামার নাম কেনো উঠবে, আমি কি সুঁই দিতে পারি?'

রাজীব কথা বলল না। শুধু অপাঙ্গে দেখল। খুড়োর মুখখানা প্রায় ছাইবর্ণ। তার প্রসঙ্গ উঠতেই ভদ্রলোক শুধু ঘাবড়ে যান নি। বেশ ভয় পেয়েছেন বলেই মনে হল।

কৌতুক করে রাজীব বলল,—'কিন্তু নরেশবাবু, আপনি কি বলবেন? আপনি তো ইনজেকশন দিতে শিখেছেন শুনলাম।'

—'হ্যাঁ, তা শিখেছি।' খুড়ো চটে উঠে বললেন। 'তাই বলে ভাইঝিকে আমি ইনজেকশন দিয়ে মারব? এ সব কি আজে বাজে কথা বলছেন?'

রাজীব হেসে বলল,—'খুন করতে না চাইলেও ভাইঝির সর্বনাশ ঘটাতে আপনি চেয়েছেন নরেশবাবু। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে? বুধবার দিন সন্ধ্যের পর চাঁদবদনজীকে আপনি বলেছিলেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই ওরা বাড়ি বেচতে রাজি। কিন্তু রাত দশটার পর জল-ঝড়ের মধ্যে হোটেলে ফিরে আপনি উল্টো কথা বললেন। বাড়ি বিক্রি করতে আপনার ভাইঝি রাজি নয়। অথচ আপনি আমাকে বলেছেন যে, সেদিন সন্ধ্যের পর নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় নি।'

নরেশবাবু কোনো জবাব দিলেন না।

চাঁদবদন বলল,—'হাঁ, হাঁ। আপনি ঠিক ধরিয়েছেন হুজুর। এ কথার কুচ্ছ মতলব তো হামি সমঝাতে পারিনি।'

—'পারবেন কেমন করে?' রাজীব গম্ভীর মুখ করে বলল, 'এর উত্তর জানতে হলে নীপা দেবীর বাবার উইলের সর্তগুলি আগে জানতে হবে।'

—'উইলের সর্ত?' অম্বর এতক্ষণ পরে কথা বলল।

—'হ্যাঁ, উইলের কথা আপনি কিছুটা জানেন ডাক্তার রায়। কিন্তু সবটা নয়। উইলে লেখা আছে যে, আপনার শ্বশুরমশায়ের অবর্তমানে তার বিবাহিতা কন্যাই কলকাতার গৃহ-সম্পত্তির মালিক হবেন। কিন্তু শ্রীমতী রায় যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তবে তাঁর স্বামী এই সম্পত্তির অধিকারী হবেন না। সে ক্ষেত্রে এই গৃহের উপর নরেশবাবুর স্বত্ব সাব্যস্ত হবে।'

অম্বর বলল,—'ঠিক তাই। সে কথা তো আমিও আপনাকে বলেছি ইনস্পেকটরবাবু।'

—'বলেছেন ঠিকই, কিন্তু উইলে আরো একটা কথা লেখা আছে ডাক্তার রায়। [illegible] সাংঘাতিক। উইলে বলা হয়েছে দু

নীপা দেবী স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে যান, এবং স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের ইতি হয়, তাহলেও তিনি এই গৃহ-সম্পত্তির অধিকার হারাবেন। এবং তেমন ঘটলে তাঁর গর্ভজাত পুত্র-কন্যাই এই সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করবেন। এবং সন্তান জাত না হয়ে থাকলে এই সম্পত্তি নিঃশর্তভাবে নরেশবাবুর ভোগদখলের অধিকারভুক্ত হবে।'

অম্বর খুব অবাক হল। 'আশ্চর্য! উইলের এই কথাটা তো আমি জানতাম না।'

রাজীব হেসে বলল,—'আপনি জানতেন না সত্যি, কিন্তু নরেশবাবু জানতেন। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ভাইঝির ঠিক বনিবনা হয়নি, এ কথাটাও বোধহয় তাঁর জানা ছিল। মাস চারেক আগে বীরেন মোদকের সঙ্গে দেখা হতেই নরেশবাবু তাই একটা সুবর্ণ-সুযোগ পেয়ে গেলেন।'

অম্বর ফের বলল,—'বীরেন মোদক? সে আবার কে?

'ওকেও আপনি চিনবেন না ডাক্তার রায়। বিয়ের আগে নীপা দেবী একটি কান্ড করে-ছিলেন। নর্থ বেঙ্গলে গোকুলনগরে তখন ওরা থাকতেন। বীরেন মোদকের সেখানেই বাড়ি। মিসেস রায়ের তখন বয়স কম। বীরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছিল। এবং দুজনে একবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। পুরো তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর এক ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমে নীপা দেবী ধরা পড়লেন। এবং সেদিনই রাত্রে মেয়েকে নিয়ে তার বাবা কলকাতায় চলে আসেন। তার-পরই আপনার সঙ্গে নীপা দেবীর বিয়ে হয়েছিল।'

—'কি আশ্চর্য!' অম্বর শুকনো মুখে বলল,—'এসব কিছুই তো আমি জানতে পারিনি।'

রাজীব হেসে বলল,—'নরেশবাবু বীরেন মোদককে তার ভাইঝির ঠিকানা দিয়ে-ছিলেন। তার মনে একটা গভীর দুরভি-সন্ধি ছিল। ভালবাসার লোককে এতদিন পরে দেখলে নীপার মন ফের টলতে পারে। আর জামাই যদি বীরেনের পরিচয় জেনে ফেলে, তাহলে একটা কেলেংকারী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বীরেন মোদক ঘুঘু-লোক। ও পথেই সে হাঁটল না। মিসেস রায়কে সে ব্ল্যাক-মেইল করা শুরু করল। প্রেম-ভালবাসা বীরেন কি ধুয়ে খাবে? তার টাকা চাই।—তিন-চার মাসে মিসেস রায়ের কাছ থেকে সে অনেক টাকা আদায় করেছিল। শেষকালে তার দাবি উঠেছিল,—দু-হাজার টাকা। না পেলে সমস্ত কথা সে ফাঁস করে দেবে। তিন-চার মাস ধরে বীরেনই বাড়িতে ঢিল ফেলত। এই ছিল তার সংকেত। ঢিল পড়লেই পরদিন নদীর ধারে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে হত। নচেৎ সেদিনও ঢিল পড়বে। একদিন, দু-দিন...তিনদিন; যত দিন না সে টাকা পাচ্ছে।'

অবিনাশকে অধৈর্য মনে হল। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'কিন্তু স্যর হত্যাকারী তাহলে কে? এই বীরেন মোদকই কি মিসেস রায়কে খুন করেছিল? কিন্তু কেন?'

রাজীব ওর দিকে তাকিয়ে বলল,—'একটু ধৈর্য ধরুন অবিনাশবাবু। খুনীর নাম এখনই জানবেন। শুধু নাম নয়, তাকে সশরীরে এই আসরেই দেখতে পাবেন।'

কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব বলল,—'বীরেন মোদক কেন খুন করতে যাবে? ব্ল্যাক-মেইলর কি খুন করে? সে কেবল ভয় দেখায়। নীপা দেবীর হত্যাকারী অন্য লোক। তার নাম সুরেশ্বর,—সুরেশ্বর নন্দী।'

—'সুরেশ্বর নন্দী? সে আবার কে?' দু-তিনজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—'একটু পরেই তো তাকে স্বচক্ষে দেখবেন। এই ফাঁকে বরং তার পরিচয়টা দিয়ে রাখি।' রাজীব অনেকটা বক্তৃতা দেবার মত ভঙ্গিতে শুরু করল,—'সুরেশ্বরের বাড়ি বল্লভপুর গ্রামে। এখান থেকে বেশ দূরে। রেলপথে প্রায় দু'শ মাইল হবে। প্রথম জীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিল সুরেশ্বর। ইংরেজীতে ভালো দখল ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বাংলাতে প্রবন্ধ লিখে সে একশ' টাকা প্রাইজ পেয়েছিল। ফাইন্যাল পরীক্ষায় দুটো লেটার পেয়ে সুরেশ্বর পাশ করল। সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য স্কলার-শিপটা হাতছাড়া হয়ে গেল। রেজাল্ট দেখে হেডমাস্টার বললেন,—সুরেশ্বর, তুমি আর্টসে ভাল করবে। অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ো, কিন্তু সুরেশ্বরের বাবা বাদ সাধলেন। বি-এ পড়ে ছাই হবে। ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। বড় ডাক্তার হতে পারলে সংসারের দুঃখকষ্ট ঘুচবে। বাপের ইচ্ছা-মত সুরেশ্বর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল। প্রি-মেডিক্যাল পরীক্ষায় আটকাল না। কিন্তু ফার্স্ট এম, বি, বি, এস পরীক্ষাতেই সুরে-শ্বর হোঁচট খেল। কয়েকটা বিষয়ে সে ফেল করেছে। আর ফেল করাই তো স্বাভাবিক। দু বছর ধরে সুরেশ্বর শুধু নাটক-নভেল আর ইতিহাসের বই ঘেঁটেছে। প্রবন্ধ লিখে কাগজে পাঠিয়েছে। দু-একটা লেখা ছাপাও হয়েছিল। সুতরাং ডাক্তারির বই খুলে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে তার সময় কোথায়? ফেল করার পর সুরেশ্বর কলেজে যাওয়া ছাড়ল। ইতিমধ্যে তার বাবা গত হয়েছেন। সংসারে তখন তার গার্জেন বলতে সে নিজেই। মেসের রুম-মেট ছোকরা তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সে রিসার্চ করছিল। সুরেশ্বরকে সে বি-এ পড়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো পড়া যায় না। খরচ-খরচা, নানা সমস্যা আছে। বাবা বেঁচে নেই। মেসের খরচ কে জোগায়? কলেজে ফের ভর্তি হওয়া অসম্ভব। সুরেশ্বর ভাবল সে প্রাইভেটে বি-এ পরীক্ষা দেবে। বছর দুই সে মেসে ছিল। তারপর হঠাৎ এক অ্যাকসিডেন্টে ওর সেই রুম-মেট মারা গেল। তার দিন সাতেক পরেই সুরেশ্বর মেস থেকে নিখোঁজ হল। এখন সে কি করে তার গ্রামের লোকেও সঠিক জানে না। কিছুদিন ধরে মাসের প্রথমে বিধবা মাকে কেবল টাকা পাঠাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। সকলে তাকিয়ে দেখল চার-পাঁচজন সেপাই একটি লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছে। সবার পিছু পিছু আর একজন লোকও ঘরের মধ্যে ঢুকে ভীরু শশকের মত এককোণে চুপ করে দাঁড়াল।

প্রথমে নীলাদ্রিই চেঁচিয়ে উঠল, 'একি! প্রফেসর অনিমেষ দত্তকে এমনি করে বেঁধে আনবার অর্থ কি?'

হেড-কনস্টেবল রাজীবকে একটা লোহার ডান্ডা দেখিয়ে বলল,—'এটা ওর হাতে ছিল স্যর।' পরে অন্য লোকটির দিকে তাকিয়ে সে ফের বলল—'ঠিক সময়ে না গিয়ে পৌঁছলে ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলত।'

লোহার ডান্ডাটা হাতে নিয়ে রাজীব বলল,—'কি সুরেশ্বরবাবু? বীরেন মোদককে কোথায় আঘাত করবেন ভেবে-ছিলেন? অন দি নেপ অফ দি নেক?' পরে ব্যঙ্গ করে সে বলল,—'ডাক্তারি তো ভালই শিখেছেন মনে হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল মুখার্জী এগিয়ে এলেন। 'এসব কি বলছেন ইনস্পেক্টরবাবু? ইনি প্রফেসর দত্ত—ইতিহাসের ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। আমি স্বচক্ষে ওর সার্টিফিকেট দেখেছি।'

—'ঠিক দেখেছেন।' রাজীব স্বীকার করল। তবে অনিমেষ দত্ত বহুদিন আগে স্ট্রীট-অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। ভদ্রলোক ওর রুম-মেট ছিল। বন্ধুর মৃত্যুর পর সুরেশ্বর তার সার্টিফিকেটগুলি এবং কিছু বই হাতিয়ে নেয়। কি[illegible]দিন পরে [illegible] নাম ভাঁড়িয়ে নর্থ বেঙ্গলে [illegible]য়। গোকুল-নগরে নতুন কলেজ [illegible] সুরেশ্বর সেখানে চাকরি পেল। [illegible]ন সে এমন ঘরকুনো, আমিশুকে [illegible] ছিল না। কিন্তু ওর কপাল ম[illegible] গোকুলনগরে বছরখানেক কাটাবার [illegible] সুরেশ্বর ধরা পড়ে গেল। নতুন এক[illegible]নর এসে তাকে দেখে অবাক। অনিমে[illegible]কে সে একবার কলকাতায় দেখেছিল। এ মানুষ কখনও সে নয়। লোকটা জান[illegible] ব্যাপারটা কানা-ঘুষো হতেই সুরেশ্বর গোকুলনগর ছেড়ে পালাল। আর কোনোদিন সেখানে যায় নি।

দেববাজ বলল,—'কিন্তু মিসেস রায়কে সুরেশ্বর নন্দী খুন করল কেন?'

—'হ্যাঁ, খুনের মোটিভের কথা এবার বলছি। এর আগের রবিবার সন্ধ্যার পর নীপা দেবী আর বীরেন নদীর ধার থেকে ফিরছিল। তখন অতর্কিতে সুরেশ্বরের সঙ্গে তাদের দেখা হল। এরপর তার আসল পরিচয় যে ফাঁস হয়ে পড়বে তা ভেবেই সুরেশ্বর কলকাতা পালিয়েছিল। বীরেন মোদকের মেসটা সে চিনত। কলকাতায় তার সঙ্গে এক-আধবার দেখাও হয়েছে। ফের সে অধ্যাপনা করছে, একথা অবশ্য বীরেনকে বলেনি। যাই হোক বীরেন মোদকের সঙ্গে সে সোমবার দেখা করেছিল। বীরেন বলল, নীপাকে সবকথা সে বলেছে ঠিকই। কিন্তু তার কথা [illegible] সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। ব্যাপারটা হয়ত এখনও জানাজানি হয় নি। দুদিন ধরে কলকাতায় বসে সুরেশ্বর তখন [illegible] প্ল্যানটা এঁটেছিল। ব্যাপারটা যদি এখন

ফাঁস না হয়ে থাকে, তাহলে সে এই উপায় বেছে নেবে। প্রথমে নীপাকে হেভি ডোজে মরফিন দিয়ে খুন করবে। এবং কেসটা এমনভাবে সাজাবে যাতে ওর ডাক্তার-স্বামীকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয়। এবং তারপর বীরেনও তার শিকার হবে।'

সুব্রতের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'বিলম্বে কাজ নেই, তুমি ওকে অ্যারেস্ট কর। তবে ভয় নেই, হাতের কব্জী ওর ঠিকই আছে। কোলস ফ্র্যাকচার মিথ্যে,—সব ভড়কি। কনস্টেবলকে হাতকড়ি লাগাতে বল।'

সুরেশ্বরের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রাজীব। বলল,—'আমাকে চিনতে পারছেন তো মিঃ নন্দী? আমিই সেই বইয়ের ক্যানভাসার। আপনার ডান-হাতের কব্জী ভেঙেছে বললেন। অথচ বুড়ো আঙুলের ডগায় সবুজ কালির দাগ। অর্থাৎ একটু আগেই একলা ঘরে আপনি লেখার কাজ করছিলেন। তখনই আমার সন্দেহ হল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফের আপনার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, আমার সন্দেহই সত্যি। কোলস ফ্র্যাকচার হলে কেউ কি আঙুলে কলম ধরতে পারে? তারপর পোস্ট অফিসে ফের আপনাকে লিখতে দেখলাম। এবং তখনই আপনার আসল পরিচয়টাও আমার জানা হল।'

হঠাৎ সুব্রত বলল,—'কিন্তু রাজীবদা, উনি যে মরফিনের অ্যামপিউল সিরিঞ্জে ভরে ইনজেকশন দিয়েছেন, তার প্রমাণ কোথায়?'

—প্রমাণ আছে বৈকি। কলকাতার সাত নম্বর পরান সাহা লেনে সুরেশ্বরের একখানা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে। সেখানেই একটা চামড়ার ব্যাগে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, মরফিনের ভাঙা অ্যামপিউল সব খুঁজে পেয়েছি। ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরোতে।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল—'ব্যাগের মধ্যে একটা প্রেসক্রিপশনও পাওয়া গেছে। কোন এক ডাক্তারের লেটার প্যাডের উপর সুরেশ্বর লিখেছে। মরফিনের প্রেসক্রিপশন, তিন-চারটে দোকানের ক্যাশ-মেমোও ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। আমার মনে হয় এতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।'

অম্বর প্রশ্ন করল—'কিন্তু মিঃ সান্যাল, বুধবার দিন রাত্তিরে ঘরের একটা দরজায় তালা ছিল। অন্য দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ, খুনী তাহলে ঢুকল কেমন করে?'

'সে কথাও আমি ভেবেছি ডাক্তার রায়।' রাজীব চিন্তা করে বলল, 'আপনার নিশ্চয় মনে আছে শোবার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। আমার ধারণা বাড়ির পিছন দিকের নীচু পাঁচিল টপকে সুরেশ্বর ঘরে ঢুকেছিল, এবং অতর্কিত আক্রমণে ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু ব্যবহার করে মিসেস রায়কে আয়ত্তে আনে। সারারাত দরজা জানালা খোলা ছিল বলে, ক্লোরোফর্মের গন্ধ আমরা পরদিন টের পাইনি।'

*　　　*　　　*

একটু আগেই আসামীকে নিয়ে সুব্রত থানায় গেছে। অতিথিরাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।। ঘর থেকে রাজীব একাই বেরোল, অনেকক্ষণ ধূমপান করা হয় নি। মাঠে নেমেই সে একটা সিগারেট ধরাল। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে তার মনে হল খানিকটা দূরে নরেশবাবু একাই হেঁটে চলেছেন। ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গি। সঙ্গে চাঁদ-বদনও নেই। ওর সঙ্গ ধরবার জন্য রাজীব বড় বড় পা ফেলে এগোল। কাছে গিয়ে বলল,—'নরেশবাবু, আপনি আমার উপর খুব রাগ করেছেন, তাই না'

—'রাগ করব কেন?' নরেশবাবু যেন কষ্ট করে বললেন।

—'রাগ করাই স্বাভাবিক। আপনার সম্বন্ধে এতগুলো কথা বললাম।' রাজীব ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে জানাল।

অন্ধকারে নরেশবাবুর মুখটা ঠিক দেখা গেল না। তিনি বললেন,—'আপনার কথা তো সত্যি ইনস্পেক্টরবাবু। সম্পত্তির লোভ বড় সাংঘাতিক বস্তু। তার জন্যই আমি চেয়েছিলাম নীপার সঙ্গে অম্বরের বিবাহ-বিচ্ছেদ হোক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মেয়েটা খুন হয়, এ আমি চাইনি। কোনোদিন প্রার্থনা করিনি।'

—'আমি তা জানি।' রাজীব সান্ত্বনার সুরে বলল,—'আপনি মিছিমিছি নিজেকে এত অপরাধী মনে করছেন নরেশবাবু। এই আলোর মুখটাই তো আমাদের সব পরিচয় নয়। মনের ভিতরে গাঢ় অন্ধকারে আর একটা মুখও লুকিয়ে আছে। সেটি অন্ধকারের মুখ। ভাগ্য ভালো, সেই মুখটা আমরা দেখতে পাইনে। নইলে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কি আমরাই কথা বলতে পারতাম? অন্ধকারের মুখটাকে টেনে বের করেছি বলেই সুরেশ্বর আজ অপরাধী। আর আপনার এই বিষম লজ্জা। যারা সেই মুখটাকে লুকিয়ে রেখেছে, সমাজে তারাই বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কতদিন আর তা চেপে রাখবে? অন্ধকারের সেই মুখ একদিন আলোতে প্রকাশ পাবে।'

রাস্তায় পেঁৗছে রাজীব থমকে দাঁড়াল। নরেশবাবু বললেন,—আমি তাহলে চলি ইনস্পেক্টরবাবু।'

হাত তুলে নমস্কার করল রাজীব। বলল,—'হ্যাঁ, গুড বাই। পরে আবার দেখা হবে,'।

অন্ধকারে দীর্ঘাকৃতি মানুষটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখের কাছে সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি শুধু জ্বলতে লাগল।

(সমাপ্ত)

হোলোগ্রাফের সাহায্যে গৃহীত অবিরাম টানরেখার চিত্র
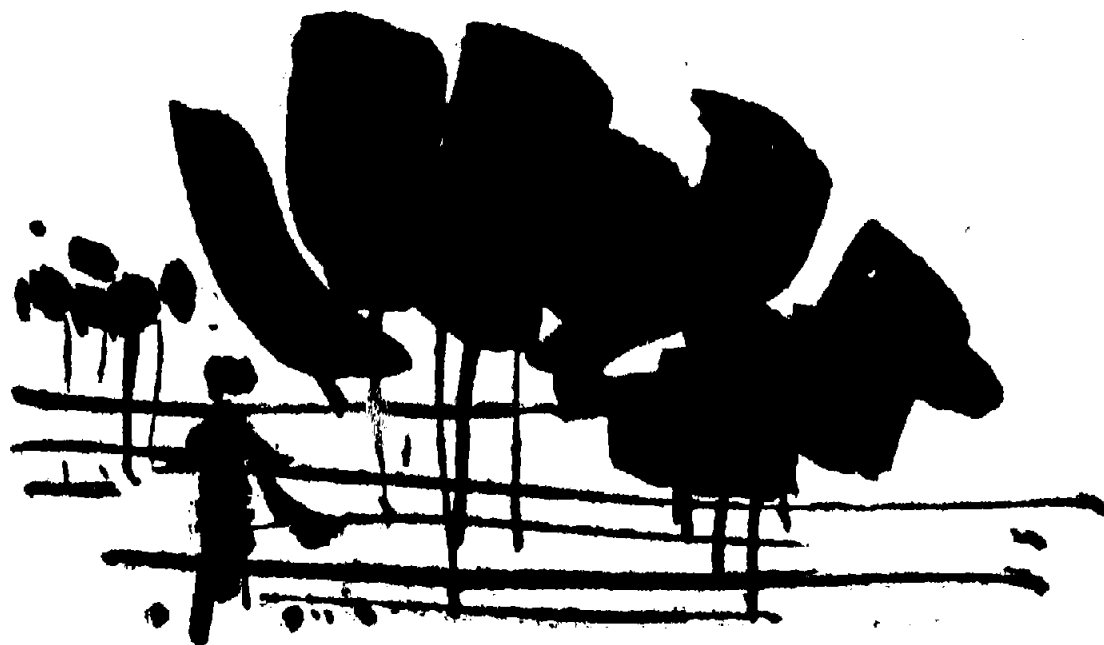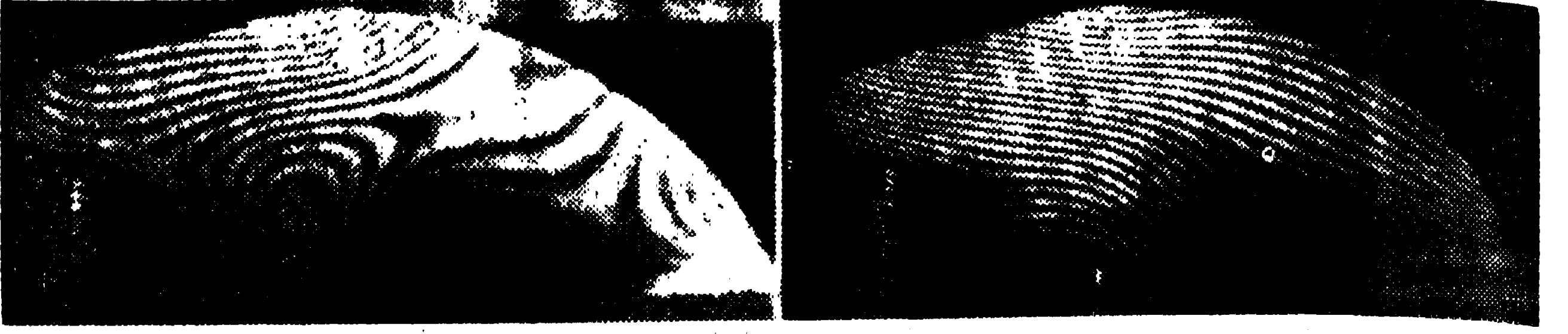
বিজ্ঞানের কথা

অভিনব আলোকচিত্র হোলোগ্রাফ

আজকাল 'হোলোগ্রাফ' কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু হোলোগ্রাফ বলতে কি বোঝায় তা আমাদের অনেকের জানা নেই। গ্রীকভাষায় 'হোলো' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমগ্র। সুতরাং 'হোলোগ্রাফ' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সামগ্রিক অনুলিখন। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে হোলোগ্রাফ হচ্ছে এক অভিনব আলোকচিত্র পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় কোন বস্তু বা দৃশ্যের মৌলিক আকৃতিকে আলোক তরঙ্গের এক সাংকেতিক চিত্রে বন্দী করে রাখা হয় এবং পরে যে কোন সময়ে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সেই অবরুদ্ধ আলোকতরঙ্গগুলিকে যথাযথ পারম্পর্যে মুক্ত করে সাংকেতিক চিত্র থেকে মূল বস্তু বা দৃশ্যের অবিকল প্রতিকৃতি আবার সংগঠিত করা হয়। চোখে আসল বস্তুটির যেমন চেহারা দেখা যায়, এক্ষেত্রে প্রতিকৃতিও হয় হুবহু একই রকমের। এই প্রতিকৃতি শূন্যে নিরালম্বভাবে ভাসমান থাকে।

আমরা যখন কোন ঘন বস্তু দেখি, তখন তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিন মাত্রাই আমাদের নজরে আসে। কিন্তু সাধারণ আলোকচিত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুটি মাত্রাই শুধু প্রকাশ পায়। আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বে অবশ্য তিনটি মাত্রাই দেখা যায়। সে জন্যে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বে যে গভীরতার বোধ হয়, আলোকচিত্রে তা পাওয়া যায় না। আমরা চোখে কোন বস্তু দেখবার সময় মাথা ও চোখ ঘুরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে লক্ষ্যবস্তুর পাশ বা পেছনের অংশও কিছুটা দেখতে পাই। আলোকচিত্র ত্রৈমাত্রিক চলচ্চিত্র বা স্টিরিও স্লাইড প্রক্ষেপণ ইত্যাদি কোন পদ্ধতিতেই এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না। কিন্তু হোলোগ্রাফে চোখে-দেখার এই সমস্ত সুবিধাই পাওয়া যায়।

২১ বছর আগে ১৯৪৮ সালে হোলোগ্রাফ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ব্রিটেনের টমসন হাউস্টন কোম্পানীর বিজ্ঞানী ডঃ ডেনিস গ্যাবর। কিন্তু জোরালো ও সুসংগত আলোর অভাবে গ্যাবর উদ্ভাবিত পদ্ধতি ১ বছর বাস্তবে রূপ পায় নি। ১৯৬০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী থিয়োডোর মেইম্যান প্রথম লেসার টর্চ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তখন থেকেই হোলোগ্রাফির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং এ সম্পর্কে নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেট লেইথ ও তাঁর সহকর্মীরা ওয়াশিংটনে অপ্‌টিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা-র এক সভায় তাঁদের তৈরী হোলোগ্রাফ থেকে প্রতিকৃতি প্রদর্শন করে সমবেত সকলকে বিস্মিত ও অভিভূত করেন। তখন হোলোগ্রাফ সম্পর্কে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়।

হোলোগ্রাফি ব্যবস্থা বেশ জটিল। তাই সহজভাবে হোলোগ্রাফি ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তবে এটুকু বলা যায়, হোলোগ্রাফির মূলকথা নিহিত আছে আলোকতরঙ্গের ব্যতিকরণ ও অপবর্তন তত্ত্বের মধ্যে। যেসব জিনিস নিয়ে হোলোগ্রাফি গঠিত হয় তা হচ্ছে : (১) রশ্মি-বিভাজনী আয়না, (২) লেসার বাতি, (৩) লেন্স এবং (৪) প্রতিফলক। এই ব্যবস্থায় রশ্মি-বিভাজনী আধা-আয়নার সাহায্যে প্রথমে লেসার-তরঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। এই দ্বিধাবিভক্ত লেসার-তরঙ্গের একাংশ ত্রৈমাত্রিক লক্ষ্যবস্তুর গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে অপবর্তিত তরঙ্গরূপে আপতিত হয় ফটোপ্লেটে। অপর অংশটি প্রতিফলকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে ভূমি-তরঙ্গরূপে ঐ একই ফটোপ্লেটে পড়ে।

এইভাবে দুদিক থেকে আগত তরঙ্গশ্রেণী ফটোপ্লেটের ওপর এক আর একটার ওপর পড়ে এক জটিল ব্যতিকরণ নকশা গড়ে তোলে। পরে ফটোপ্লেটটি পাকা অর্থাৎ ডেভালপ ও ফিকস করে নেওয়া হয়। এইভাবে তৈরী ফটোপ্লেটকে বলা হয় হোলোগ্রাম।

এই হোলোগ্রাম থেকে মূল লক্ষ্যবস্তুর প্রতিকৃতি পুনরায় সংগঠিত করা হয় লেসার বাতি ও লেন্সের সাহায্যে। লেসার-রশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে হোলোগ্রামের ওপর পড়লে পুনসংগঠিত প্রতিকৃতির আভাসী প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায় শূন্যে নিরালম্ব ভাসমান অবস্থায়। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে কোন বস্তু দেখতে যেমন দেখায়, এই প্রতিবিম্বটি হয় ঠিক সেইরকম। হোলোগ্রামের অপর পাশে তৈরী হয় বাস্তব প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব চোখে দেখা যায়, আবার ক্যামেরাতেও ধরা যায়।

রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইউ এন ডেনিস্যুক এবং পোলারয়েড করপোরেশনের গবেষক ডঃ হীরডেন স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেছেন, একটি হোলোগ্রাম প্লেটে একাধিক

[হ]লোগ্রাম নেওয়া যায়। বিশেষ পদ্ধতিতে হোলোগ্রাম রেকর্ডটি লেজ-ব্যাক করলে থেকে ঐসব ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন [ভি]ন্নভাবে (অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্য- [কে] না মিশিয়ে) বার বার প্রতিকৃতিতে [পু]নরুৎপাদন করা যায়।

এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে অধ্যাপক [..]থ এবং তাঁর সহকর্মীরা হোলো-[গ্রাফ]ের চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করছেন। [..] মধ্যেই তাঁরা সচল হোলোগ্রাফিক চিত্র [..]ন করেছেন। এদিকে রুশ বিজ্ঞানী [..]সাক এবং মার্কিন গবেষক ডাঃ কেইথ [..]ংটন স্বতন্ত্রভাবে রঙীন হোলোগ্রাফ [..]তের কৃতিত্বলাভ করেছেন।

[হো]লোগ্রাফি পদ্ধতির বিবিধ প্রয়োগের [..] দিনের দিন জানা যাচ্ছে। জীববিদ্যা [..]চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ [..] হোলোগ্রাফির প্রয়োগ বিশেষ ফল- [..] হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি [..]জনীয় পরীক্ষায় হোলোগ্রাফি পদ্ধতির [..]গ সফল হয়েছে। হোলোগ্রাফি [..]তির যে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে আমরা [..] করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে আমরা [..]ঙ্গ হোলোগ্রাফি চলচ্চিত্রও দেখতে [..] এই চলচ্চিত্রে চিরাচরিত রুপোলী [..] বলে কিছু থাকবে না, অথচ শূন্যে [..]লম্ব ভাসমান হোলোগ্রাফির মাধ্যমে [..]রা দেখতে পাব, অভিনেতা-অভি-[নেত্রী]র সচল অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত [..]র অভিনয়ে যেমনটি দেখা যায়, অবি-[কল] সেই রকম নাটকের কুশীলবদের [..]ত্রিক ঘন প্রতিকৃতি দেখা যাবে হোলো-[গ্রাফি]র চলচ্চিত্রে।

[..]ড়া ও স্কোয়াশ সম্পর্কে গবেষণা

ভারতে প্রধান প্রধান সব্জির মধ্যে [..]ড়া ও স্কোয়াশ অন্যতম। রাজস্থানে [..] দুই সব্জির প্রচুর চাষ হয়, কিন্তু কোন [..] ভাইরাস ও ছত্রাকের আক্রমণে প্রতি-[বছর]ই তার প্রচুর ক্ষতি হয়।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে রাজ-[স্থা]নের উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি [গবে]ষণা প্রকল্প শুরু হয়েছে। বিশ্ব-[বিদ্যা]লয়ের উদ্ভিদ চিকিৎসা বিভাগের [..]গী প্রধান ডঃ বি পি চক্রবর্তী এবং [..]ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সুধীর [..]রের নেতৃত্বে এই গবেষণা পরিচালিত [..] তাঁদের গবেষণার বিষয় হবে, অন্যান্য [..]র শাকসব্জির ব্যাধি এইসব তরি-[তর]কারির ওপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে [..] নিরূপণ করা। তাঁরা ব্যাধিরোধক [..]ড়া ও স্কোয়াশ উদ্ভাবনের চেষ্টাও [..]বন।

স্বয়ংক্রিয় শিশুদের দোলনা
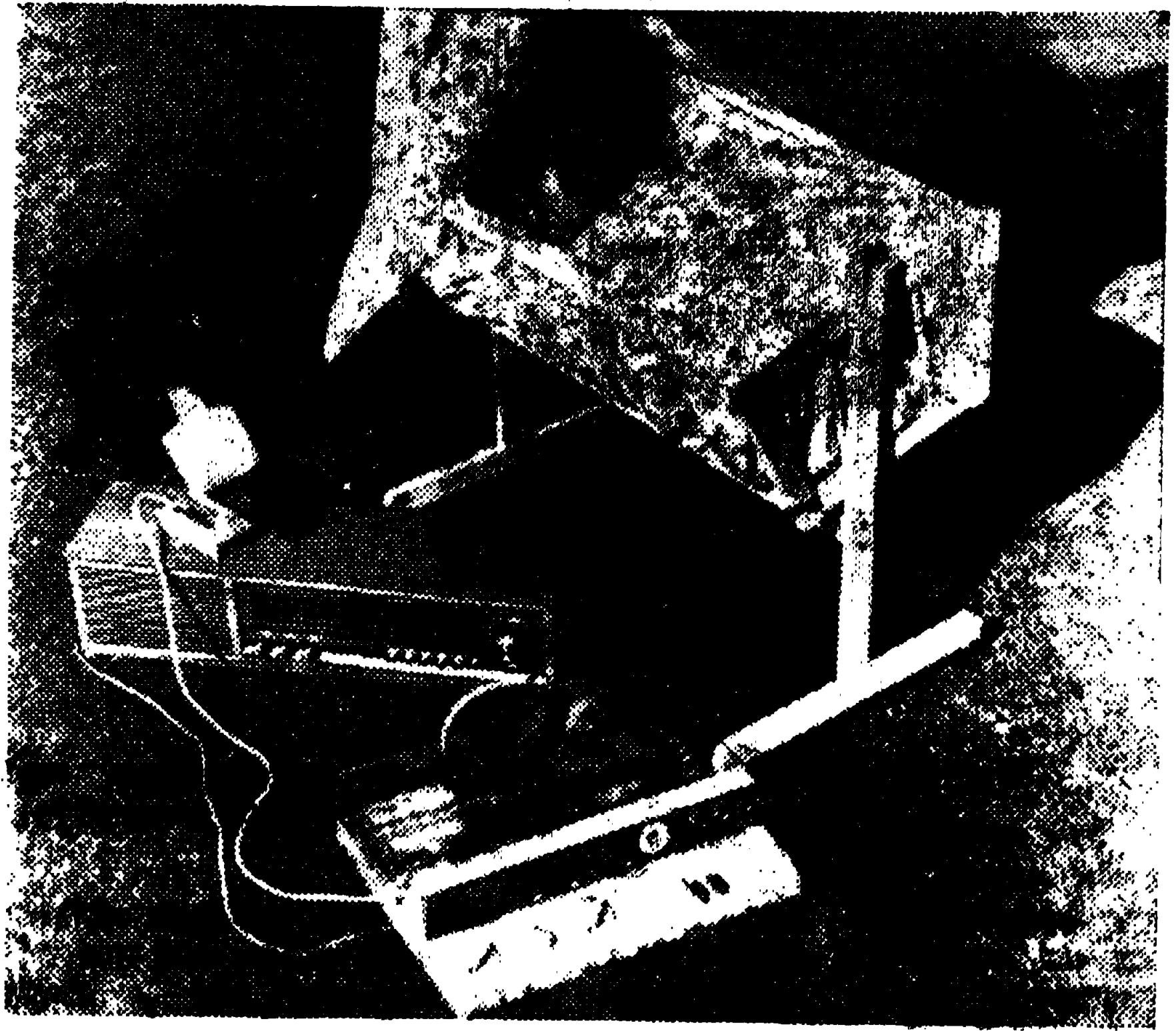
ছোট শিশুদের শোয়ানো ও ঘুম [পাড়া]নোর জন্যে দোলনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দোলনা সাধারণত হাত দিয়ে দোলাতে হয়। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে 'আপনি ও আপনার শিশু' সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীতে এক অভিনব স্বয়ংক্রিয় দোলনা প্রদর্শিত হয়েছে। শিশু কাঁদবার সঙ্গে সঙ্গে দোলনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। ইলেকট্রনিক সতর্ক পদ্ধতি রিলের মাধ্যমে একটি ছোট মোটরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং সেই মোটরটি দোলনা দোলাতে থাকে। সেই সঙ্গে একটি রেডিও চালু হয়ে যায়। রেডিওর ঘুমপাড়ানি গান শিশুকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তিন মিনিট পরে যন্ত্রটি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও যদি শিশু কাঁদতে থাকে, তাহলে যন্ত্রটি আবার নতুন করে চালু হয়ে যায়। এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় দোলনা যে মায়েদের পরম সমাদর লাভ করবে তা বলাই বাহুল্য।

স্বয়ংক্রিয় শিশুদের দোলনা

ওরিয়েন্টার

আমরা জানি, বাদুড়েরা সুপারসনিক ওয়েভ বা শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে বাধা অতিক্রম করে উড়ে বেড়ায়। বাদুড়দের এই বিশেষ ধর্মটিকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব যন্ত্র তৈরী করেছেন। তার নাম 'ওরিয়েন্টার'। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অন্ধ মানুষদের নতুন নতুন সুযোগ ও সুবিধা দেবার জন্যে নানা চেষ্টা চলছে। রুশ বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন—কেমন করে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে নির্মিত যন্ত্র-টিকে অন্ধদের পথ চলবার কাজে লাগানো যায়। হালকা এই যন্ত্রটিকে গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া যায়। এর ওজন ২৩০ গ্রাম।

এই ওরিয়েন্টার একাধারে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র। যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চ কম্পনাঙ্কে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। এর গতিপথের চারধারে কোন রকম বাধা থাকলে প্রতিফলিত শব্দতরঙ্গ যন্ত্রটিতে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ। ফিরে-আসা শব্দ-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তা থেকে বিভিন্ন সংকেতের সৃষ্টি হয়। কানের সঙ্গে তার দিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রের যোগাযোগ থাকে।

শব্দের সংকেত অনুযায়ী অন্ধলোকেরা বাধার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝতে পারেন। এক এক ধরনের বাধার জন্যে এক এক রকম সংকেত যন্ত্রটি জানিয়ে দেয়। সামনে গাড়ী আসছে, না বাড়ি আছে, রাস্তায় গর্ত আছে কিনা তা ওরিয়েন্টার জানিয়ে দেয়। এমন কি ঐ বাধা অন্ধ লোকটির থেকে কোন্ দিকে, কতটা দূরে আছে ইত্যাদি বিষয়ও যন্ত্রটি জানিয়ে দেয়। এক কথায় ওরিয়েন্টার থাকলে অন্ধরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। শুধুমাত্র সংকেত-গুলিকে তাঁদের মনে রাখতে হবে।

জীবজগতে বাদুড়রা যেমন খুব সহজে বাধা অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যায়, তেমনি যাঁরা চোখে কম দেখেন, বা একেবারেই দেখতে পান না, তাঁরাও রাস্তাঘাটে একান্ত নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে ওরিয়েন্টারের সাহায্যে পথ চলতে পারেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফিল্ম কর্পোরেশান অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে সুশীল মজুমদার তখন 'রিক্তা' ছবিখানি শুরু করেছিলেন—তিনি একদিন আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন ফিল্ম কর্পোরেশনের অফিসে। ওখানে আমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই হোল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্যুটিংও আরম্ভ হোল।

এই সময় নাট্যনিকেতনের হয়ে গেলাম বাঁকুড়া — প্রথম দিন হল 'কর্ণার্জুন', পরদিন হল 'সাজাহান'। কথা ছিল এই অভিনয়ের পরেই ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব। কারণ তার পরদিনই ছিল দেবদত্তের 'রুক্মিণী' ছবির শ্যুটিং। আমার 'কল কার্ড' সই করা আছে। আমি যদি কোনো কারণে না যেতে পারি তাহলে কর্তৃপক্ষের খুব ক্ষতি হবে।

কিন্তু অভিনয় যে-কোনো কারণেই হোক ভাঙতে একটু দেরী হয়ে গেল—ইতিমধ্যে কলকাতা যাবার ট্রেন তখন চলে গেছে। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম একেবারে। কারণ আমি আজ পর্যন্ত কথা দিয়ে বা 'কল কার্ড' সই করে কথার খেলাপ করি নি।

কেউ-কেউ বললেন, একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি সিরিয়াসলি ইল বলে। অসুস্থ হয়েছে অতএব যাবার উপায় নেই। একজন বললেন : কাল খুব ভোরে উঠে মোটরে করে আপনাকে পৌঁছে দেব—একটু দেরী হবে কিন্তু উপায় কি।

আমি কিন্তু ওসব কথায় কান না দিয়ে বসলুম টাইম-টেবলখানা নিয়ে। দেখলুম যে একটা ট্রেন আছে আগ্রা হয়ে আসানসোল পর্যন্ত। আমি ভেবে দেখলুম এই ট্রেনে করেই আসানসোল পর্যন্ত যাওয়া যাক, তারপর আসানসোল থেকে অনেক ট্রেন পাওয়া যাবে। সেই রাত্রেই ট্রেন ধরলুম, এবং আসানসোল থেকে হাওড়াগামী একটা ট্রেন ধরে বেলা ১০টা নাগাত হাওড়া পৌঁছলাম। এবং বাড়ী পৌঁছে তাড়াতাড়ি স্নানাহার করে স্টুডিওয় গিয়ে উপস্থিত।

একদিন ফিল্ম কর্পোরেশান স্টুডিওতে 'রিক্তা'র শ্যুটিং করছি, এমন সময় দেখি সুধীর গুহ, সতু সেন ও দীপচাঁদ কাংকারিয়া গিয়ে হাজির। কি ব্যাপার? শুনলুম ওঁরা শরৎবাবুর 'পথের দাবী' খুলবেন তাই আমাকে ওঁদের প্রয়োজন 'সব্যসাচী'রূপে। আমি রাজী হতেই দীপচাঁদজী আমার হাতে ৯০০্ টাকা গুঁজে দিতে এলেন।

আমি বললাম : টাকা আমি এখন নেব না—এখন শ্যুটিং করছি, রাখব কোথায়?

অভিযোগে অহীন্দ্র চৌধুরী

তোমাদের কেউ একজন টাকা নিয়ে থাক। আমি শ্যুটিং শেষ করে মেক-আপ খুলে জামা-কাপড় বদলাই—তারপর নেব।

সুধীর আর সতু রয়ে গেল, দীপচাঁদবাবু চলে গেলেন। তারপর শ্যুটিং শেষে যখন আমি টাকাটা নিতে গেলাম তখন সুধীর আমার হাতে সব টাকাটাই দিয়ে বললে : কাকাবাবু ঐ টাকা থেকে আমাকে ৩০০্ টাকা না দিলেই চলবে না। পুতুলকে (শেফালিকা) দিতে হবে—ওই তো 'পথের দাবী'তে ভারতী করেছে। সে অসুস্থ—আমি তাকে আজ টাকা দেব বলে কথা দিয়ে এসেছি।

আমি বললাম : দীপচাঁদ যে আমাকে ৯০০্ টাকা দিয়ে গেল—তাহলে আমি ৯০০্ টাকার রসিদ দেব না—রসিদ দেব ৬০০্ টাকার।

সুধীর বলল : ঠিক আছে, আপনার নামে ৬০০্ টাকাই লেখা হবে।

আমি তখন ৩০০্ টাকা সুধীরের হাতে দিয়ে দিলাম।

এদিকে নাট্যনিকেতনে তখন 'কর্ণার্জুন', 'প্রতাপাদিত্য', 'শাজাহান', 'আলমগীর'—এই সব পুরনো বইয়ের অভিনয় চলছিল এবং আমি প্রতি নাটকেই আমার ভূমিকাগুলি করে যাচ্ছি। একবার হলো কি—রঙমহলের শিল্পীরা চুঁচুড়ায় রূপালী সিনেমায় বায়না নিয়েছে — আমাকে ধরে বসল দুদিন ওখানে অভিনয় করতে হবে।

আমি বললুম : তা কি করে হয়, আমি যে নাট্যনিকেতনে অভিনয় করছি একই দিনে দু জায়গায় কি করে অভিনয় হবে।

রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী বললেন : দাদা, আপনি একটু কষ্ট করলে দু কূলই রক্ষা হয়।

আমি বললুম : কি রকম

আপনি এখানে ... করে চুঁচুড়া চলে যাবেন—গাড়ি ... ওখানে আরম্ভ হতে তো একটু রাত্তির হবেই। ওখানে আমরা আরম্ভ করব সাড়ে দশটা নাগাত। তাহলে সব দিক ম্যানেজ হবে।

আমি দেখলুম যে, এটা সম্ভব হতে পারে, তবে শরীরের ওপর ধকলটা পড়বে খুব বেশী। তা পড়ুক, স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভাল ছিল, তাই এ সমস্ত কষ্ট আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমি রাজী হয়ে গেলুম।

সেই রকমই ব্যবস্থা হোল। কলকাতা ও চুঁচুড়া দু জায়গাতেই অভিনয় ম্যানেজ হয়ে গেল।

১৭ এপ্রিল একদিনের জন্য খুলে করোনেশন হলে 'খনা' অভিনয় হোল।

১৮ তারিখ থেকে শুরু হোল কালী ফিল্মসে 'শর্মিষ্ঠা'র শ্যুটিং। নরেশ মিত্র পরিচালক। আমি নামলুম শুক্রাচার্যের ভূমিকায়।

এর পর শুরু হোল 'পথের দাবী'র রিহার্সাল ২২ এপ্রিল থেকে। খুব কঠিন ভূমিকা এই সব্যসাচী ...

[...] পরিবর্তন আছে পাঁচবার। 'পথের [...]র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শচীন সেন-[...]। যে 'পথের দাবী' বইকে বৃটিশ [...]র রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত [...]ছিলেন সেই 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ অভিনয় হবে — এজন্য দর্শকের [...]হলের অন্ত ছিল না। উদ্বোধনের [...]ধার্য হয়েছে ১৩ মে সুতরাং হাতে বেশী নেই। আমরা সবাই উঠে-পড়ে [...]লুম।

অবশ্য এই সঙ্গে রঙমহল শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ও চলতে লাগল এখানে-ওখানে। কখনো পোষ্যপুত্র, কখনো মন্ত্র-শক্তি, আবার কখনো 'প্রফুল্ল', কখনো 'চির-কুমার সভা' 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি।

'পথের দাবী'র রিহার্সাল পরিচালনা আমাকেই করতে হোত। সতু সেন যদিও নামে পরিচালক তবু বেচারী সময় করে উঠতে পারত না। কারণ প্রবোধবাবু ইদনীং আর বিশেষ কিছু দেখতেন-শুনতেন না সেই জন্যে সতু আর সুধীর দুজনকেই সমস্ত জিনিসপত্র কেনাকাটা অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হোত।

রিহার্সাল সুষ্ঠুভাবেই চলছিল, কিন্তু উদ্বোধনের আগের দিন অর্থাৎ ১২ তারিখে আমার হোল প্রচণ্ড উদরাময়। কাল 'পথের দাবী'র উদ্বোধন, আর অজ শরীরের এই অবস্থা। ওষুধ-পত্তর খাওয়া হোল।

আর শরীরেই বা দোষ কি! প্রায় রোজ
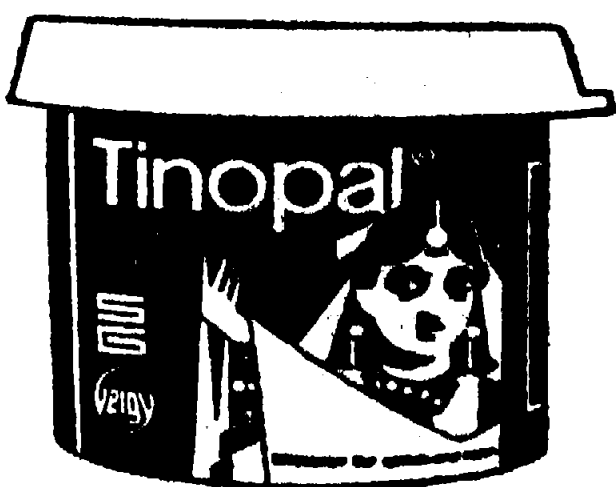
অভিনয়—কোন কোন দিন দু জায়গায়। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ সব মিলে দেহযন্ত্রের এই অবনতি ঘটল।

যাই হোক, শনিবার দিন কিন্তু খানিকটা সুস্থ বোধ করলুম — তবে দুর্বলতা রইল। তবু এমার্জেন্সীবোধে একজন ডাক্তারকে মোতায়েন রাখা হল স্টেজের ভিতরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে রকম প্রয়োজন আর হয় নি।

এদিকে হাউস একেবারে দর্শকের ভিড়ে উপচে পড়ছে। ন স্থানং তিল ধারণম্।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সুমিত্রা—প্রভা, অপূর্ব — ভূপেন চক্রবর্তী, ভারতী—শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতি। কয়েক রাত্রি পর থেকে প্রভার জায়গায় অপর্ণা করত 'সুমিত্রা'।

দর্শকরা তো প্রথম রাত্রি থেকেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সবই ঠিক হোল, কিন্তু আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত যেদিন 'পথের দাবী'র ডবল শো থাকত। পাঁচবার পাঁচবার দশবার মেক-আপ পরিবর্তন করা কি সহজ ব্যাপার! এইভাবেই 'পথের দাবী' চলতে লাগল।

এদিকে রঙ্গালয়মঞ্চে আর একটি নক্ষত্র পতন ঘটল। বাংলা দেশের একমাত্র গ্রাজুয়েট মঞ্চাভিনেত্রী কঙ্কাবতী সাহু পরলোকগমন করলেন। যদিও কঙ্কাবতী শিশিরবাবুর দল ছাড়া অন্য কোথাও অভিনয় করেন নি, তবু তিনি যে একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন তার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন।

এর পর জুন মাসের ২৯ তারিখে আমার বর্তমান গোপালনগর বসত বাটীর গৃহপ্রবেশ। যদিও তখন বাড়ীটি সম্পূর্ণ হয় নি, ঘরের মেঝেগুলি তখনও বাকী ছিল—তবু অসমাপ্ত অবস্থাতেই গৃহপ্রবেশ হোল।

'পথের দাবী'র ২৬ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রভা নাট্যনিকেতন ছেড়ে দিল হঠাৎ। তখন একটা সমস্যা দেখা দিল—এখন হঠাৎ 'সুমিত্রা' পাওয়া যায় কোথায়? নবাগতা অপর্ণাকে এই ভূমিকায় 'ট্রায়াল' দেওয়া হোল। দেখলুম মেয়েটির মধ্যে ক্ষমতা আছে — শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে চলবে। অতএব সেই দিন থেকে সেই করতে লাগল এবং ভালই করতে লাগল।

এর পর 'রুক্মিণী'র শ্যুটিং সমাপ্ত হয়ে শুরু হোল 'তটিনীর বিচার' সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। আমি ডঃ ভোসের ভূমিকাতেই নামলুম। তটিনীর ভূমিকায় রাণীবালা এবং নায়ক বসন্তের ভূমিকায় ছিল সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় বলে একটি নতুন ছেলে। তখনকার দিনের লাস্যময়ী অবাঙালী চিত্রাভিনেত্রী রমলা (মিস র‍্যাচেল) একটি বিশেষ ভূমিকায় নেমেছিল।

এতদিন রঙমহলের শিল্পীরা নানা দিকে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছিলেন—এতদিনে তাঁরা আবার থিতু হলেন। বিধায়কের লেখা 'মাটির ঘর' দিয়ে রঙমহল আবার নতুন করে দ্বার উদ্ঘাটন করল। দলপতি হয়ে এলেন দুর্গাদাস, নাটকখানি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের মনোরঞ্জন করেছিল।

তারপর 'রিক্তা'র উদ্বোধন হল রূপবাণীতে ১৯ সেপ্টেম্বর। তখনকার দিনে 'রিক্তা' একটি স্মরণীয় চিত্র হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছিল।

হ্যাঁ একটা সব থেকে বড় খবর বলতে ভুলে গেছি—যাতে সমগ্র পৃথিবী নড়ে উঠল। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা। এইটিই পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়। পৃথিবীর কোন দেশই এর বীভৎসতা থেকে রেহাই পায় নি।

এই সময় রঙমহল থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে গদাই মল্লিক বেরিয়ে গিয়ে অ্যালফ্রেড মঞ্চটি দখল করলেন 'নাট্যভারতী' নাম দিয়ে। শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' দিয়ে নাট্যভারতীর দ্বারোদ্ঘাটন হল।

১৬ সেপ্টেম্বর আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও চিত্র-জীবনের প্রথম দিককার সহকর্মী পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ হঠাৎ লোকান্তরগমন করলেন। প্রথম জীবনে আমি ও প্রফুল্ল কি দারুণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 'সোল অফ এ স্লেভ' করেছিলাম, সে সব কথা এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে বলেছি। হঠাৎ প্রফুল্লর মৃত্যুতে আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।

কিছুদিন যাবৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কাছাকাছি কোথাও একটু ঘুরে আসবার জন্যে মনটা খুব উসখুস করছিল। একদিন সুযোগও এসে গেল।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের এক ভগ্নিপতি থাকেন কালিংপঙে। নাম ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত। মন্মথ এক চিঠি লিখে দিল তাকে—আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ৩ সেপ্টেম্বর সেখানে পাঠিয়ে দিলাম—আমি সঙ্গে যেতে পারলাম না তার কারণ শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় হবে ৩ অক্টোবর।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এমনি দুর্ভাগ্য যে স্টার মঞ্চ এই সম্মিলিত অভিনয় হবার শেষ মুহূর্তে সে অভিনয় হলো না এবং এক বাড়ী দর্শকদের টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতে হল।

৫ তারিখে আমি দার্জিলিং মেলে চলে গেলুম কালিম্পং।

ওখানে আমি ৫।৬ দিন ছিলাম, প্রত্যেকটি দিনই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে কাটল। ওখানে বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস তখন ছিলেন—আমাদের বাসার কাছেই তিনি থাকতেন—তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল কলকাতা থেকেই। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। আমাকে ওখানে দেখতে তাঁর বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

একদিন রিকশা করে যাচ্ছি। সামনে দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সামনে ভদ্রমহিলাকে দেখে আমি স্বভাবতই মুখটা নীচু করে আছি। এদিকে সেই ভদ্রলোকটি একেবারে রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন : আরে কে অহীন নাকি?

আমি তাকিয়ে দেখি : ভদ্রলোক আর কেউ নন, প্রাক্তন ভারতের প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস। সুধীরঞ্জন আমার বিশেষ বন্ধু। আমি সবিস্ময়ে বললাম : আরে তুমি!

বলে রিকশা থেকে নামলুম। সুধীরঞ্জন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি যে রকম নতনেত্র হয়ে চলেছিলে তাতে মনে হচ্ছিল যে তুমি কালিম্পং-এর পাহাড়ে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ।

আমি বললাম : একজন ভদ্রমহিলার দিকে সামনা-সামনি চেয়ে থাকলে তিনিও অস্বস্তি বোধ করবেন, আর সেই সঙ্গে আমিও সেই জন্যেই......

এই রকম আরও কিছু কিছু জানাশোনা লোক বেরিয়ে পড়ল। আর দাশগুপ্ত তো আমাদের আদর আপ্যায়নের কোনরকম ত্রুটি করেন নি। অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন ডাঃ দাশগুপ্ত।

একদিন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম গ্যাংটকে বেড়াতে, রওনা হলুম সকাল আটটায়। ওখান থেকে অইরালি হোল ন মাইল। এখান থেকে রংপো অর্থাৎ সিকি সীমান্ত হল ১৪½ মাইল। এখানেই ছি ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমান্ত। এখানে একটা চেক পোস্ট ছিল, সেখানে পরিচয় পত্র দেখাতে হবে সিকিম যেতে হলে। কালিম্পং থেকে সমস্ত রাস্তাটাই বেশ সুন্দর, পাঁচ চাল মাঝে মাঝে বহু দূর বিস্তৃত চেরী ফু গাছ বড় এলাচের গাছ, রাস্তার দুধারে ঝ রয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য।

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম যে দু এ জায়গায় 'ধস' নেমেছিল সেগুলি আব সারানো হচ্ছে। রংপো থেকে গ্যাংটক ২ মাইল। গ্যাংটক পৌঁছে আ ... চল ওখানকার ফরেস্ট অফিসার শ্রীভ ... দের প্রধানের সঙ্গে। চমৎকার অমায়িক ... লোক।

তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন বৌদ্ধ বিহারে। ভারতবর্ষে এর থেকে ভাল বৌদ্ধ বিহার আর নেই। অজস্র ধর্মগ্রন্থে ঠাসা লাইব্রেরী—সত্যিই দেখবার জিনিস। ঘরে মেঝেগুলি কাঠের এবং এমন সুন্দর পালিশ করা যে, 'ডান্স-ফ্লোর' বলে মনে হয়। সিকিমের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীপ্রধান। প্রাসাদ দেখবার অনুমতি মিলল। এখন যিনি মহারাজা হয়েছেন তখন তাঁর বয়স ছিল খুব কম এবং তখন তিনি ছিলেন যুবরাজ। প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের নিমন্ত্রণ করেন ডিসেম্বর মাসে। সেই সময় ওখানে বিরাট এক মেলা হবে আর সে সময় সারা ভারত থেকে বৌদ্ধরা এসে সমবেত হবে। ওখানে আর একটা জিনিস দেখে খুব অবাক লাগল। প্রাসাদ ও বৌদ্ধ বিহারের সামনে সুন্দর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ময়দান।

একটু দূরেই ডাক বাংলো। মিলিটারী অফিসারদের কোয়ার্টার। মোটের উপর অপূর্ব সুন্দর জায়গাটি। ডাক-বাংলোতেই আমরা খাওয়া-দাওয়া করলুম—তারপর সন্ধ্যার সময় আবার কালিম্পং-এর দিকে যাত্রা করলাম। বাড়ী ফিরতে বেশ একটু রাত্রি হয়েছিল—ছেলেমেয়েরা রাস্তা

ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার কিন্তু মনটা একটা অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে তাদের কাছে এই সব স্থানের সৌন্দর্য এক অক্ষয় ছাপ রেখে যায়।

এর পরদিন কালিমপং ত্যাগ করে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

আরও কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে নাট্যভারতী কর্তৃপক্ষ, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন, শেষে টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারে টাকা পর্যন্ত পাঠালেন। বাধ্য হয়েই আমাকে চলে আসতে হলো।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেজে নামতে হল। ইতিমধ্যে শিশিরবাবুর দল আমার নাম জুড়ে দিয়ে 'রঘুবীর ষোড়শী, সধবার একাদশী ও চিরকুমার সভা ঘোষণা করে বসে আছেন। ১১ অক্টোবর কলকাতা পৌঁছলাম—সেইদিনই 'রঘুবীর'। তাতে ছিলেন শিশিরবাবু, তিনকড়িদা, নরেশবাবু, বিশ্বনাথ, শৈলেন, নীহারবালা ও আমি।

তার পর 'ষোড়শী' এবং তার পরদিন সধবার একাদশী ও চিরকুমার সভা।

আবার তারপরদিন নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' এইদিন অভিনয় শেষে দেখি আমার 'গারনেট' পাথরের আংটিটা আঙ্গুল থেকে কখন খুলে পড়ে গেছে। একদম বুঝতে পারিনি। এই আংটিটার জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল—দাম অবশ্য খুব বিরাট কিছু একটা নয়—কিন্তু এটা আমার খুব প্রিয় আংটি ছিল।

এই সময় অভিনয় যে প্রত্যেকদিন হত তা নয় এই সময় প্রায় প্রত্যহই দুটো করে অভিনয় হতো এবং তা দু-জায়গায়। যেমন ধরুন তটিনীর বিচার চলছিল নাট্যভারতীতে—ওদিকে নাট্যনিকেতনে চলছে 'পথের দাবী', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি।

পূজোর সময় চরদিনই নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতনে দুটো জায়গাতেই অভিনয় করেছি। কোনদিন আগে নাট্যভারতী, পরে নাট্য নিকেতন, আবার কোন দিন তার উল্টো। অর্থাৎ দুই থিয়েটারেই আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলেছিল।

অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে ছবির শ্যুটিংও চলছে। এই সময় শুরু হল প্রফুল্ল পিকচার্সের 'কমলে কামিনী'।

এইভাবে সপ্তাহের সব ক'টা দিনই প্রায় নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' ছাড়াও কখনও কখনও 'মন্ত্রশক্তি' তিনকড়িদাকে নিয়ে কখনও 'আবুল হাসান', কখনও 'চিরকুমার সভা' কখন 'প্রফুল্ল' কখনও 'পোষ্যপুত্র' হতে থাকল, আর ওদিকে নাট্যনিকেতনে 'পথের দাবী' ছাড়াও পুরাতন নাটক 'সাজাহান', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতিতে নামতে হয়েছে। কারণ নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতন দু'দলেরই এই নাটক দুটিতে অর্থাৎ 'তটিনীর বিচার'-এ ডাঃ ভোস এবং 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর ভূমিকায় আমাকে যেমন দর্শকেরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল অন্য কোন শিল্পীকে যদি এই ভূমিকায় নামানো যায় তবে চূড়ান্ত অনর্থের সৃষ্টি হবে, আর হয়ত থিয়েটারও মার খেয়ে যাবে। তাই আমাকে নিয়ে এত টানাটানি।

অবশ্য এমনও অনেক দিন গেছে যেদিন ঠিক ৫টায় নাট্যভারতীতে করলুম 'তটিনীর বিচার', তারপর নাট্য নিকেতনে গিয়ে 'পথের দাবী' করলুম, ওটা শেষ করে আবার নাট্যভারতীতে ফিরে এসে 'মন্ত্রশক্তি' করলুম।

আর একবার মনে আছে শিশিরবাবুর সঙ্গে 'রঘুবীর' অভিনয় শেষ করে, চলে গেলুম মিডলটন ষ্ট্রীটে, এ পি গুপ্তর বাড়ীতে। এখানে সেদিন কি একটা বিবাহ উপলক্ষে 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। সে অভিনয় শেষ করে আবার ফিরে গেলুম নাট্যনিকেতনে 'বঙ্গেবর্গী'তে নামবার জন্যে।

অবশ্য এরকমভাবে অভিনয় করে অর্থাগম ভালই হতে লাগল। কিন্তু মানুষ তো যন্ত্র নয়—রক্তমাংসে গড়া। তার শরীরে ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে আর সব থেকে বড় কথা হলো মন এবং মেজাজ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই বলতে পারি যে, শরীরে হাজার ক্লান্তি আসুক, মন-মেজাজ যতই খারাপ হোক মঞ্চে পা দিলেই মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতো। এই যে পরিবেশ, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সাজ-পোশাক, মঞ্চকর্মীদের ব্যস্তভাবে আনা-গোনা, দর্শকদের হৈ-হুল্লোড়, যন্ত্রীদের সুর বাঁধা, টুন্ টাং আওয়াজ—এ সব একটা আলাদা মেজাজ এনে দেয়। এর ওপর মেকাপ চড়ালে তো আর কথাই নেই—মানুষটাকেই বদলে যেতে হয়। তখন আর আমার মধ্যে আমি থাকি না—তখন আমি নাটকের চরিত্রের একজন—তখন আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নই—তখন আমি কখনও ডাঃ ভোস, কখনও বৃদ্ধ শাজাহান, কখনও বহুরূপী সব্যসাচী আবার কখনও আপনভোলা চন্দ্রবাবু।

এই হল নটের জীবন। মঞ্চের ভিতর ঢুকলেই সে মানুষটা পালটে যায়—। আমারও ঠিক তাই হত। সুতরাং ক্রমাগত এত অভিনয় সত্ত্বেও কখনও ক্লান্তি আসত না।

নাট্যভারতীতে ১৯ অক্টোবর তারিখে খোলা হল কাজী নজরুল ইসলামের নৃত্য-গীতবহুল নাটক 'মধুমতী'। এ নাটকে অবশ্য আমি কোন অংশ নিইনি—তবে প্রায়ই রিহার্সাল দেখতে হোত। মাঝে মধ্যে অনেক উপদেশ নির্দেশও দিতে হত। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সাল কিন্তু চলতেই থাকল। অবশ্য এত চেষ্টা সত্ত্বেও নাটকখানি বেশীদিন চলেনি

এরপর নভেম্বরের শেষাশেষি আর একবার কালিম্পং গেলাম। আমার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা মীরা ও ভানু তখন ওখানেই ছিল। ভারী সুন্দর আবহাওয়া তখন ওখানে। শীত সামান্য পড়েছে তবে অসহ্য নয় বরং গরম জামা কাপড় পরা থাকলে বেশ আরামদায়ক মনে হয়।

এখানে কয়েকদিন থাকার পর ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে কালিম্পং থেকে ৯ মাইল দূরে আলগোড়া নামক একটি জায়গায় গেলুম। এ পাহাড়টি সমুদ্রগর্ভ থেকে ৫৮০০ ফুট উঁচু—এখানে যে ডাক বাংলোটি সেটি ভারী সুন্দর, মনে রাখার মত। ডাক বাংলোটি যেন একটি রেলের কামরা। এখান থেকে তিব্বত সীমান্ত পেডং খুব কাছে, মাত্র তিন মাইল। ডাক বাংলোয় বসে দেখা যেত তিব্বতী নারী-পুরুষেরা অশ্বতরে চড়ে বিরাট বোঁচকায় ভর্তি উল এবং উলের তৈরী সোয়েটার নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসত দলে দলে। অনেকে পায়ে হেঁটেও আসত। এখানে আছে রোপওয়ে স্টেশন। শূন্যে দড়ির লাইন পাতা আছে, তারই সঙ্গে লাগানো আছে ছোট বাক্সর মত বসবার জায়গা। এ দিয়ে নীচ থেকে ওপরে ওঠা বা ওপর থেকে নীচে নামা যায়।

অপূর্ব দৃশ্য। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেখলেও যেন মন ভরে না।

এর পরদিন আমরা সকাল ৮-৩০টায় মোটরে করে গেলাম দার্জিলিং। সঙ্গে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম। আসল উদ্দেশ্যে হল টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা।

যাবার সময় পড়ল তিস্তানদীর ওপরে অ্যান্ডারসন ব্রিজ। এই সেতু নির্মাণে অদ্ভুত ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ রকম উঁচু জায়গায় একটা span -এ তৈরী সেতু সত্যিই বিস্ময়কর। সেইজন্যে আরও অবাক হলাম যে, ঐ রকম শক্ত সেতু কি করে সম্প্রতি বন্যার তাণ্ডবে ভেঙ্গে পড়ল।

আমরা গিয়ে পৌঁছলুম দুপুর বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অর্থাৎ ১১-৩০-টায়। গিয়ে উঠলুম কালীবাবুর সেন্ট্রাল বোর্ডিং হাউসে। তখন শীতের সময় বোর্ডিং-এ লোকজন খুবই কম—সবাই প্রায় চলে গেছে—দু'চারজন ছাড়া বোর্ডিং প্রায় খালি। সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হোল না।

খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে সকলে মিলে বেরুলাম শহরটা একটু দেখবার জন্যে।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। কারণ রাত ৩-৩০টার সময় তো উঠতে হবে টাইগার হিলে যাবার জন্যে। একজন লোককে বলে রাখলাম ঠিক সময়ে তুলে দেবার জন্যে। সে ঠিক সময় তুলে দিল—আমরা তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। এই লোকটিই আমাদের নিয়ে চলল পথ দেখিয়ে।

টাইগার হিলে যে জায়গা থেকে সূর্যোদয় দেখব, দেখি সেখানে ইতিমধ্যে বেশ ভীড় হয়ে গেছে। সামনের সিটগুলি ভর্তি হয়ে গেছে। স্থানীয় পাহাড়ী লোকদের ভীড়ই বেশী। ওদের পোশাকের দুর্গন্ধে গা-টা কি রকম যেন গুলিয়ে উঠল। তখনও সূর্যোদয়ের দেরী ছিল—আমি বললুম: এখানে তো বসা যাবে না দেখছি, চল ছাদের ওপর যাওয়া যাক।

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

—বোস—

অ্যাম্বাসেডরের টেলিফোন পেয়ে কাউকে খবর না দিয়েই বার্লিন ত্যাগ করেছিল। বন'এ থাকবার সময়ও অবসর পায়নি কাউকে চিঠিপত্র দেবার। বন্দনাকেও নয়। ফিরে এসে দেখল অনেক চিঠিপত্র এসেছে। একটা খামে পাকিস্থানী স্ট্যাম্প দেখে চমকে উঠল। ঢাকা থেকে মণিলাল দেশাই ?

সবার আগে ঐ চিঠিটাই খুলল। চিঠিটি দীর্ঘ নয়। চটপট পড়ে ফেলল। তারপর আবার পড়ল......পাকিস্থান গভর্ণমেন্ট বেশ সিরিয়াসলী কেসটা টেক-আপ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। শুনেছি পার্টিশানের সময় যেসব সরকারী কর্মচারী ঢাকায় ছিলেন তাদের কাছে একটা সার্কুলার পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর খবর জানবার চেষ্টা করা হবে। মাইনরিটি কমিশন এই-ভাবে বহু লোকের খবর জেনেছেন এবং মনে হয় এক্ষেত্রেও কিছু খবর পাওয়া যাবে। তবে এসব ব্যাপারে সময় লাগবেই।

দেশাই যে ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনে আছে, একথা তরুণ জানত না। মণিলাল গুজরাটী হলেও জন্মেছে কলকাতায়! ভবানীপুরে। লেখাপড়াও শিখেছে কলকাতায়। মণিলালের বাবা সৌরাষ্ট্রে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে যৌবনে চলে আসেন কলকাতা। নগণ্য পুঁজি, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু পরিশ্রম ও সততার জন্য কয়েক বছরেই নিজের অদৃষ্ট ঘুরিয়ে ফেলেন।

মণিলালের বাবা ছেলেকে ব্যবসায় ঢুকতে দেননি। 'তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। আমার মত দোকানদারী করো না।'

মণিলাল ব্যর্থ করেনি তাঁর বাবার আশা। কলকাতার রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রামে অবাঙালীদের প্রতি বাঙালীদের বিতৃষ্ণার প্রকাশ দেখেছে বহুদিন কিন্তু বিরক্ত বোধ করেনি। সে তো বোম্বে, আমেদাবাদ, সুরাট বা বরোদার গুজরাটী নয়। সুরাটের আত্মীয়-বন্ধুরা তো ওদের বাঙালী বলে। মণিলাল তার জন্য গর্ব অনুভব করে। দেশে গেলে ওদের সঙ্গে তর্ক করে, ঝগড়া করে বাঙালীর হয়ে।

মণিলালের সঙ্গে তরুণ বছর খানেক মাত্র কাজ করেছিল দিল্লীতে। তারপর আর দেখা হয়নি কোনদিন। সেই মণিলাল দেশাই চিঠি লিখেছে ?

মুগ্ধ বিস্মিত তরুণ রাইটিং ডেস্কের ওপর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা একবার দেখে নেয়। তারপর আপন মনে প্রশ্ন করে, এত-লোকের প্রচেষ্টাও কি তুমি ব্যর্থ করে দেবে?

দেশাই'এর চিঠিটার 'পর দিয়ে আরেকবার চোখ বুলিয়ে উঠে যায় রাইটিং ডেস্কের কাছে। হাতে তুলে নেয় ইন্দ্রাণীর ফটোটা।

......'অনেক দিন পর আমাকে দেখলে ? তাই না ?'

নিজের প্রশ্নের কৈফিয়ত নিজেই দেয়, কি করব বল ? তুমি তো জান ডিপ্লোম্যাটের জীবন !

একটু থামে। একটু হাসে। 'আমার মত ঘরকুনো কুঁড়ে ছেলে কি এমনি এমনি বেরুতে চায় ? একলা একলা থাকতে কি ভাল লাগে ? এই এত বড় অ্যাপার্টমেন্টে একলা একলা থাকতে বুকটা বড় জ্বালা করে, বড় বেশী তোমাকে মনে পড়ে......

চোখের দৃষ্টিটা যেন একটু ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি ফটোটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসে কৌচে। চিঠিপত্রের বাণ্ডিল হাতে তুলে নেয়।

বন্দনা দুটো চিঠি লিখেছে :...... কি আশ্চর্য লোক বলো তো তুমি! কতদিন তোমার খবর পাই না। দুটো-তিনটে চিঠি লিখেও কোন জবাব পেলাম না। তোমার জন্য যে আমার কত ভাবনা-চিন্তা হয়, তা হয়ত বিশ্বাস কর না বা জান না। জানলে কখনও তুমি আমাকে এমন কষ্ট দিতে না।......

এতক্ষণ পর্যন্ত তবু সহ্য করেছিল তরুণ কিন্তু তারপর ও কি লিখেছে ?

...'আমি না হয় তোমার মা'র পেটের বোন নই কিন্তু তাই বলে আমাকে এমন দুঃখ দেবে কেন ? আমার ভালবাসার এমন অমর্যাদা করবে কেন ?......

পাগলী মেয়েটা দ্বিতীয় চিঠিটায় শুধু দুটো লাইন লিখেছে, দয়া করে শুধু জানাও তুমি সুস্থ আছ, ভাল আছ। সম্ভব হলে বার্লিন গিয়ে তোমার খোঁজ করে আসতাম কিন্তু তুমি জান, সে সামর্থ্য আমার নেই।

বড় অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বন'এ যাবার পর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছে, ঘুরতে হয়েছে কয়েক হাজার মাইল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লিখতে হয়েছে লম্বা লম্বা রিপোর্ট, কিন্তু তবুও বন্দনাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল। বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

আরো একটা অন্যায় হয়ে গেছে। বন্দনা সামান্য চাকরি করে। তাছাড়া প্রতি মাসেই দেশে বেশ কিছু পাঠাতে হয়। বিকাশেরও একই অবস্থা। সুতরাং কদিনের জন্য বার্লিন বেড়াতে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তরুণেরই উচিত ছিল একবার ওদের নিয়ে আসা। ওরা ছাড়া তরুণের আর কে আছে ?

বেশ ক্লান্তবোধ করছিল। কোনমতে জামা কাপড় চেঞ্জ করে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেয়ে নিল। তারপর একটা দীর্ঘ চিঠি লিখল বন্দনাকে।

শেষে লিখল, কিছু দিনের জন্য তোমরা দুজনে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। বিকাশকে বলো ডেপুটি হাই কমিশনারকে আমার কথা বলতে। তাহলে ওর ছুটির কোন অসুবিধে হবে না। আর তোমার ছুটি নেবার তো কোন ঝামেলাই নেই! অ্যাপ্লিকেশন দেবে না বলেই তো ছুটি পাও না। প্যান অ্যামেরিকান অফিসে খোঁজ করে তোমাদের 'ওপন' টিকিট দুটো নিয়ে নিও।

চিঠি শেষ করার আগে আরো দুটি লাইন জুড়ে দিল, যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করতে না পার তবে এ চিঠির জবাব দিও না। আর আমাকে দাদা বলেও কোনদিন ডেকো না।

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়েই প্যান অ্যামেরিকান অফিসে ওদের দুজনের ভাড়া পাঠিয়ে দিল।

চিঠির জবাব এলো না; চারদিন পর এলো টেলিগ্রাম, রিচিং ফ্রাইডে প্যান অ্যাম ফ্লাইট ফাইভ-সেভেন-সিকস-বন্দনা বিকাশ।

তরুণ জানত এমনি একটা কিছু হবে। বন্দনা যতই রাগ করুক, ওর চিঠি পাবার পর আর রাগ করে থাকতে সাহস করবে না। কেবলটা পাবার পর তরুণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কেবলটা হাতে নিয়ে চলে গেল কন্সাল জেনারেল ট্যাণ্ডনের ঘরে। কোন ভূমিকা না করেই বলল, হ্যাভ আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট বন্দনা ?

ট্যাণ্ডন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'কতবার বলেছ তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে ?'

'বন্দনা আর বিকাশ আমার এখানে আসছে।'

'দ্যাট ইজ হোয়াই ইউ লুক লাইক এ ম্যাড চ্যাপ।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।

'ওরা কবে আসছে ?'

'এই শুক্রবার।'

'তাহলে তো সময় নেই। বাড়ী ঘরদোর তো একটু ঠিকঠাক করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিছুতো করতেই হবে।'

'তাহলে তুমি বরং বাড়ী যাও। আমি অফিসে আছি।'

'না, না, তা কি হয় ?' কৃতজ্ঞ তরুণ বলে।

আই সে গো হোম। এরপর তর্ক করলে না খাবে।'

আর একটি কথাও না বলে তরুণ চলে নিজের ঘরে। টুকটাক কাগজপত্র সামনে অফিস থেকে বিদায় নিল।

অ্যাপার্টমেণ্টে একবার সব ঘরদোর ঘুরে দেখতে দেখতে ভাবছিল র জন্য স্পেশ্যাল কি করা । আর এক চক্কর ঘুরতে গিয়ে রাইটিং কের পর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা বড় চোখে লাগল। আলতো করে ফটোটা নিল নিজের হাতে। একটু অন্যমনস্ক কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ মুখ দিয়ে য়ে পড়ল, শুনেছ, বন্দনারা আসছে। আসবে না?

মনে হলো ইন্দ্রাণী জবাব দিল, আসব ক। তোমাকে ছেড়ে আর কতকাল থাকব ...

টেলিফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ণী কোথায় লুকিয়ে পড়ল। ফটোটা য়ে রেখে তরুণ টেলিফোনের রিসিভারটা নিল, টরুণ হিয়ার...কি ভাবীজি? কি বর?

হঠাৎ এমন সময় মিসেস ট্যাণ্ডনের টেলি- ন?

'বন্দনা আসছে ?'

'এর মধ্যে সে খবর আপনার কাছে ছে গেছে?

'উনি এক্ষুনি অফিস থেকে টেলিফোন জানালেন।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'শুক্রবার মানে পরশু আসছে?'

'হাঁ ভাবীজি।'

এবার ভূমিকা ত্যাগ করে কাজের কথায় ন ভাবীজি, 'তোমার অ্যাপার্টমেণ্ট ছোট ও ওদের তো আমার কাছে থাকতে দেবে তা যাই হোক সারা দিন তো তোমরা ঘুরে কাটেই এবং রোজ সন্ধ্যার পর কোন হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকবে...।'

'না, না, ভাবীজি বন্দনা আবার ওসব ন করে না।'

'ও না করুক। মোটকথা রোজ সন্ধ্যার [illegible] র এখানে সবে। লাঞ্চ-ডিন খাওয়া দাওয়া কর যাবে, বুঝলে?'

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তরুণ বলল জ রোজ কি সম্ভব হবে?

'তবে কি একদিন ডিনার খাইয়ে ভদ্রতা তে বলছ?'

আর কি বলবে তরুণ? 'আচ্ছা বীজি, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সাহস আমার হবে না।'

বিকেল বেলার দিকে মিঃ দিবাকর নি।

কি ব্যাপার? কোন জরুরী খবর আছে কি? তরুণ জানতে চায়।

সিসজি পাঠিয়ে দিলেন। আপনার বোন- নিপতি আসছেন, তাই যদি কোন দরকার কে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

'সিসজি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনার কি ইভার লাগবে? যদি লাগে তাহলে।'

'না, না, আমি তো নিজেই ড্রাইভ করি। ড্রাইভার লাগবে কেন?'

বন্দনারা আসছে শুনে মিঃ ও মিসেস ট্যাণ্ডন অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আপনজন বলতে তরুণের কেউ নেই। মা-বাবা ভাই-বোন কেউ না। যারা সহজ পথে প্রথম প্রেম ভুলতে পারে, তরুণ তাদের মধ্যেও পড়ল না। জীবনে আর কোন মেয়েকে সে আপন ভাবতে পা না। বন্দনারা এলে অন্তত কদিনের জন্য ও নিঃসঙ্গতা ঘুচবে ভেবেই মিঃ ও মিসেস ট্যাণ্ডন অত্যন্ত খুশি।

দুটো দিন কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, তা টের পেলে না তরুণ। শুক্র- বার সকালে অফিস করে লাঞ্চ টাইমেই বেরিয়ে পড়ল। আনন্দে, উত্তেজনায় লাঞ্চই খেল না। প্লেন ল্যাণ্ড করবে সওয়া তিনটেয়। প্লেনেই বন্দনাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে যাবে। তবুও তরুণ ভাবল, ওরা এলেই খাব।

প্লেন ল্যাণ্ড করার বেশ খানিকটা আগেই পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে। দেখেশুনে বেশ একটা ভাল জায়গায় গাড়ীটা পার্ক করল যাতে বেরুতে না দেরী হয়। একটি মুহূর্তেও যেন অপব্যয় না হয়।

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে পায়চারী করতে করতে আর একবার মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিল ওরা এলে কি করবে। ইতিমধ্যে কখন যে ফ্রাংকফুর্ট থেকে প্যান অ্যামেরিকানের প্লেন এসে গেছে, সে হুঁস নেই। অতগুলো সাহেবসুবার ভীড়ের মধ্যে ঢিপ করে বন্দনা প্রণাম করতেই হুঁস ফিরে এলো তরুণের।

বন্দনার হাত দুটো ধরে তুলে নিতে নিতে বলল, আরে থাক থাক, এখানে নয়।

কে কার বাধা মানে? কথা শেষ করতে না করতেই বিকাশও একটা প্রণাম করল।

মালপত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে তরুণ বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল,'কোন কষ্ট হয়নি তো?'

বন্দনা বলল, ওর আবার কি কষ্ট হবে? বিনা পয়সায় বার্লিন ঘুরিয়ে দিচ্ছি, তাতে আবার কষ্ট কিসের?'

'আঃ বন্দনা! কি যা তা।'

এত সহজে কি বিকাশ হার মানে?, 'তোমার টি বোর্ডের পয়সায় বার্লিন দেখছি?'

তরুণ থামিয়ে দেয়, 'বাড়ীতে গিয়ে সারারাত ঝগড়া করা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি চলো তো।'

অ্যাপার্টমেণ্টে পেঁৗছতে পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। সামনের লিভিং রুমে মালপত্র নামিয়ে রেখেই তরুণ বলল, 'নাও, নাও, চটপট হাত-মুখ ধুয়ে নাও; ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

বিকাশ অবাক হয়ে বলল, 'সে কি দাদা, আমরা তো আজ দুবার করে লাঞ্চ খেয়েছি।'

কন্টিনেন্টাল ফ্লাইট যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকেই-- একথা তরুণ জানে। তবুও ওদের নিয়ে এক- সঙ্গে লাঞ্চ খাবার লোভে বেশ কিছু ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই বন্দনা বলল, তুমি কি, চলো তো দাদা! সারাদিন না খেয়ে বসে আছ?

'আ! কি বকবক করছ। হাতমুখ ধুয়ে নাও, সবাই মিলে একটু কিছু মুখে দেওয়া যাক।'

বন্দনা আর তর্ক করে না। 'কোথায় কি আছে, একটু দেখিয়ে দাও তো দাদা।' বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটু তাড়া- তাড়ি নাও। দেখছ না, দাদা না খেয়ে আছেন।'

সংসারধর্ম বুঝে নিতে মেয়েদের সময় লাগে না বন্দনারও লাগল না। লিভিং রুমে কৌচে বসে সেন্টার টেবিল টেনে নিয়ে মহা- নন্দে খাওয়া-দাওয়া মিটল। বন্দনাকে পেয়ে তরুণ হঠাৎ মহা কুঁড়ে হয়ে গেল, হাত ধুতেও উঠে গেল না।

'বন্দনা, একটু হাত ধোবার জল...।'

এমন করুণ সুরে কথাটা বলল, যে বন্দনার বড় মায়া লাগল। 'তোমাকে কে উঠতে বলেছে?'

ঐ কৌচে বসেই শুরু হলো আড্ডা। 'সব চাইতে আগে বল, তোমাদের ছুটি কদিন?'

তরুণের এই প্রশ্ন শুনেই বন্দনা আর বিকাশ একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। ওরা ভেবেছিল, এয়ারপোর্টেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার আগেই তাই শলা-পরামর্শ করে উত্তরদাতাও উত্তর ঠিক করে রেখেছিল।

বিকাশ চিবুতে চিবুতে বলল, 'নেকসট উইক থেকে আমাদের অডিট!

চিমটি কেটে তরুণ জানতে চাইল, 'তিন-চারদিন আছ তো?'

'না-না, দাদা তিন-চারদিনের জন্য কি এত খরচা করে এতদূর আসে?'

বন্দনা চুপটি করে বসে মিট মিট করে করে হাসছিল। এবার তরুণ ওকে জিজ্ঞাসা করল, বন্দনা, তোমার অডিট কি এই উইকেই শুরু হচ্ছে?'

'আচ্ছা দাদা, অমন করে কথা বলছ কেন? আমি কি বলেছি—?'

আর এগুতে হলো না। —'তোমার হয়ে আমিই না হয় বলেদিলাম।'

হাসি-খুশিতে ডগমগ হয়ে বন্দনা বলল, 'ও চলে যাবে যাক। আমি অত সহজে যাচ্ছি না।'

ফরেন সার্ভিসের কর্মচারীরা ফরেন সেক্রেটারীর চাইতে অডিট পার্টির নিম্নতম কর্মচারীকে যে বেশী ভয় করে, তা তরুণ জানে। তাছাড়া বিকাশের সেকশনের উপরেই যে অডিট করাবার ভার, সে খবরও তরুণ রাখে। 'তাহলে ছুটি পেলে কেমন করে?'

'ডেপুটি হাই-কমিশনারকে আপনার কথা বলাতেই এক উইকের ছুটি পেয়েছি। আদারওয়াইজ--!'

তরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। কি করা যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বলল, 'আমি কিন্তু দাদা, মাসখানেক থাকব।'

'বিকাশের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

(ক্রমশঃ)

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবার আমার পুরনো রুমান্ডিতে ফিরে এলাম। বড় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম। কুটকুতে যখন যাই তখন আমাদের সামনে অতবড় একটা শোকাবহ ঘটনা অপেক্ষা করে আছে বলে জানতাম না। মারিয়ানার কথা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়।

কোলকাতা থেকে সুগতবাবু ও মিসেস রায়ের আত্মীয়স্বজন ট্রাঙ্ককল পেয়েই গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। মৃতদেহ কোলকাতায় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। মারিয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওঁরা। হয়ত না গেলেই ও পারত। কারণ মারিয়ানার বন্ধু মহুয়া, পরোক্ষে তার এতবড় সর্বনাশের মূলে যে মারিয়ানাই, এমন কথা হয়ত সেই শোকতপ্ত মুহূর্তে মুখ ফসকে বলেও ফেলবেন। যদি তাই বলেন সেটা মারিয়ানার কাছে দুর্বিষহ বলেই ঠেকবে। উনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে, সুগতবাবুর সমস্ত পাগলামি, ছেলেমানুষের মত কাঙালপনা সত্ত্বেও, আন্তরিক ও সর্বাঙ্গীণ চাওয়া থাকা সত্ত্বেও, এক কণাও না দিয়ে মারিয়ানা তাকে নির্মমভাবে বারে বারে ফিরিয়েই দিয়েছে—নিজেকে বড় বড় কথার বুলি দিয়ে ভুলিয়েছে—বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হবে না ভেবেছে।

তবু এও সত্যি যে, সুগতবাবুর মৃত্যুতে মারিয়ানার মত করে বোধহয় আর কেউ বোঝেনি; যে সে সুগতকে তার সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসত।

সুগতবাবুর পার্স এবং অন্যান্য সবকিছু কাগজপত্র তাঁর বড় দাদার হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কেবল সেই রক্তমাখা চিঠিখানা দিতে পারিনি। সেটি এখনো আমার কাছেই আছে। মারিয়ানা যখন শিরিণবুরুতে ফিরবে, তাকে গিয়ে দিয়ে আসব। যদি সে আর না ফেরে, তাহলে ভেবেছিলাম সে চিঠি কোয়েলের জলে ভাসিয়ে দেব। আবেগভরা পাহাড়ী নদীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুগতবাবুর অসামাজিক প্রেম বাহিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ক্যালেন্ডারে একদিন হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম সময়টা একটা ঘাসফড়িং-এর মত লাফাতে লাফাতে কখন জানুয়ারির মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

প্রথম এখানে এসে দেখেছিলাম মহুয়াডাঁরের মেলায় লোক যাচ্ছে দলে দলে। তারপর কত যে মেলা হল! পালামৌ যেন মেলারই জায়গা। প্রতি মাসে কিছু না কিছু কোথাও না কোথাও লেগেই আছে। অনেক রকম জিনিস মেলে এই মেলাগুলিতে। ওঁরাওদের হাতে-বোনা সবুজ ও লাল কাজ করা চাদর। খুব একটা সুরুচির ছাপ আছে। মেয়েদের গলায় হাতে এবং পায়ে পরার পেতলের গয়না। কাঠের কাঁকই—আরো কত কি দেখার জিনিস, কেনার জিনিস।

বছরের প্রথম মেলা হয় জানুয়ারির প্রথম দিকে হির-হিঞ্জে, বালুমঠ থানায়। তার পর ডাল্টনগঞ্জীয়া মেলা— ফেব্রুয়ারির প্রথমে। চাঁদোয়া থানায় চাকুটার মেলাও ছোট নয়—ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি বসে। মার্চের প্রথমে নাসাত্ থানার সরিকদলে, এবং মাসের শেষে নগর—উন্টারীতে, উন্টারী থানায়। এপ্রিলেও মে'তে একটি করে মেলা। ভণ্ডনাথপুরের কিতাবে এবং মহুয়াডারে। তারপর বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধার জনাই বোধহয় মেলা টেলা বিশেষ নেই। সেই নভেম্বর মাসে আবার বসে। সবশেষের মেলা ডিসেম্বর মাসে—কে'র থানায় বালুমঠে—নওয়াডিতে।

জানুয়ারিতেই শীতের প্রকোপটা সবচেয়ে বেশি। এখন পাহাড়ে বনে টাটকা তরিতরকারির অভাব হয় না। সবকিছুরই যেন স্বাদ আলাদা। প্রতি বৃহস্পতিবারে যবটুলিয়াতে যে হাটিয়া বসে সেই হাটিয়ার মুরগীগুলো যেন অনেক বেশী স্বাদু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাটে বগারী ভাজা পাওয়া যায়। বগারী পাখির ঝাঁকে একসঙ্গে হাজার হাজার পাখি থাকে—দেখতে চড়ুইয়ের মত, কিন্তু চড়ুইয়ের চেয়েও বোধহয় ছোট। এখানকার লোকেরা ক্ষেতে জাল পেতে ধরে। ঝুড়িতে জ্যান্ত পাখি নিয়ে বসে থাকে উনুন সামনে করে। অর্ডার হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে ভেজে দেয়। নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে খেলেই হল। ওঁরাও, খাঁরওয়ার, ভোগতা, মুন্ডা, কাহার সকলে যা উপাদেয় জ্ঞানে খায় কি বলব। খেতে সত্যিই ভাল।

শিকার করতে শেখার পর থেকে মুরগী বড় একটা কিনি না। আর এখন বুনো মুরগীরও যা স্বাদ। ধান খেয়ে খেয়ে গায়ে পুরু চর্বির আস্তরণ পড়েছে। শেষ বিকেলে ধান ক্ষেতে যখন মুরগীর ঝাঁক চরতে নামে সোনালি পাখনায় দ্যুতি ছড়িয়ে, তখন দেখতে ভারী ভাল লাগে। মুরগী নিধন ত দৈনন্দিন কর্মে দাঁড়িয়েছে এখন। তাছাড়া খাবার জন্যে হরিয়াল, তিতির, কালিতিতির এবং আসকলও মারি। কালি-তিতিরের মাংস নয় ত, মনে হয় মাছ খাচ্ছি।

আজকাল নিজে নিজে মাঝে মাঝে মুরগী রাঁধি। যশোয়ন্ত কি ঘোষদা কি রমেনবাবু এলে, একটা মন-গড়া বিরাট নাম দিয়েছি—রাশ্যান—আমেরিকান—নাম একটা হলেই হল। নাম যাই দিই না কেন, খেয়ে কেউ খারাপ বলে না। যশোয়ন্ত বলে, দ্যাখো লালসাহেব, তোমার মধ্যে যে এত গুণ সুপ্ত ছিল তা কি এই রুমান্ডিতে না এলে জানতে পেতে? হাসতে হাসতে বলি, যা বলেছো।

সেদিন ঘোষদা এসেছিলেন—একটা খুব সুখবর নিয়ে। ওঁদের বিয়ের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে—কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি এ পর্যন্ত। সেদিন ঘোষদা জীপ থেকে নেমেই এক গাল হেসে বললেন, গিন্নির ছেলের বাবা হচ্ছি হে, এই ছ'-সাত মাস বাদে—সন্দেশ খাওয়াও, সন্দেশ খাওয়াও। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কনগ্রাচুলেশানস। বললাম, এ ত সন্দেশের খবর নয়—আপনাকে শান্তিপুরী লাড্ডু খাওয়াব।

খবরটা আনন্দের বটে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার আনন্দ হল না। পুরানো সুমিতা বৌদিকে আমার দেখা অভ্যস্ত, হৈ হৈ করা, ফুর্তিবাজ [illegible] পর রাত আড্ডা মেরে কাটানো, [illegible] বৌদির ছেলে হলে সেই বৌদিকে ত আর পাবো না। তাছাড়া, কোলের কাছে কেউ ছিল না বলে প্রবাসী ছেলেগুলোকে এমন বড়দিদির মত যত্নআত্তি করতেন। ছেলে না শত্তুর। আমার ভাল লাগল না। শুনলাম সুমিতাবৌদির এই পাহাড়ী পথে জীপে করে আমার এখানে আসা একেবারে বারণ। দশ বছর ছেলে ছাড়া চলল ত এক্ষুনি ছেলের কি দরকার ছিল জানি না। ঘোষদাটার লজ্জা-ফজ্জাও নেই। কবে ছেলে হবে তার ঠিক নেই—এখন থেকে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ভাল করে মুরগী রেঁধে টেকো বুড়োকে অগ্রিম সাধের নেমন্তন্ন খাইয়ে দিলাম। খিট্ক্যাল কি খিট্ক্যাল। ঘোষদা হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

সেদিন রবিবার, বাগানে বসে আছি আলোয়ান মুড়ে সকালবেলার রোদ্দুরে, এমন সময় একটি বছর পনেরো বয়েসের ওঁরাও ছেলে দৌড়তে দৌড়তে আমার বাংলোয় ঢুকলো। আমার সামনে এসে নমস্কার করে যা বলল তার সারাংশ হচ্ছে তাদের বাথান ভেঙে কাল রাতে একটা বড় চিতা তাদের আদরের বাছুরটিকে মেরে

টেনে নিয়ে গেছে জঙ্গলে—তার একটা বিহিত করা দরকার।

গ্রামে টাবড় শিকারি থাকতে আমার তলব পড়ল কেন বুঝলাম না। পরে জানলাম ওদের গাদা বন্দুকের চেয়ে টোপীওয়ালা বন্দুকের উপর শ্রদ্ধা বেশী। তাছাড়া জেনে ভাল লাগল যে, শিকারি হিসেবে আমার বেশ সুখ্যাতি হয়েছে। অবশ্য সেটা আমার কোনোরকম চেষ্টা বা গুণ ব্যাতিরেকেই। যশোয়ন্তবাবুর সাকরেদ সুতরাং ভাল শিকারিই হবেন এমনি একটা ধারণাই এর মূলে।

জামাকপাড় পরে, গেলাম ছেলেটির সঙ্গে। সুহাগী বস্তির একেবারে শেষ বাড়ি তাদের—সুহাগী নদী থেকে বেশী দূরে নয়। ওঁরাওদের বাড়ি যেমন হয়—অদ্ভুত ধাঁচের, চৌকো নয়। বাড়ির লাগোয়া বাথান। কাঠ পোঁতা উপরে শলাই কাঠের ছাউনি। তার উপরে শালপাতা চাপা দেওয়া। চিতাটা সামনে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে বাছুরটাকে মেরে অবার সামনে দিয়েই বাছুরটাকে মুখে করে নিয়ে জঙ্গলে নদীর দিকে চলে গেছে। বাথানে যখন ঢোকে তখন গরুটা দড়ি ছিঁড়ে এসে চিতাটাকে শিং দিয়ে গুঁতোবার চেষ্টা করেছে। পা দিয়ে চাঁট মারারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু দড়ি ছিঁড়তে না পারায় কিছুই করতে পারেনি। অবশ্য দড়ি ছিঁড়লে তার অবধারিত ফল হত যে, গরুটাও চিতার হাতে মরত। গরুটাকে মারা চিতাটার পক্ষে মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু অত ভারী জানোয়ারকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না বলে অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক গরুটাকে মারেনি।

থাবার দাগ দেখে বুঝলাম বেশ বড় চিতা এবং বিলকুল মস্ত্। ঘষটানোর দাগ দেখে দেখে আমরা প্রায় তিনশ গজ গিয়ে বাছুরটার হদিস পেলাম। পেছনের দিক থেকে খেয়েছে সামান্যই। পেটটা ফুলে ঢোল। যেখানে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে সেখানটায় অনেকগুলো পিটিস ও কেরাউঞ্জার ঝোপ। তার পাশে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। বড় গাছ নেই। ঘাসে ভরা বিস্তীর্ণ টাঁড়।

সময়টা শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলোয় বন্দুক দিয়ে গুলি করতে মোটে অসুবিধে হয় না, রাইফেল থাকলেই বরং অসুবিধা হয়। তাই ঠিক করলাম একটা অর্জুন গাছে বসব। গাছটা সেই ফাঁকা জায়গায় একেবারে গা ঘেঁষা। ফাঁকা জায়গাটায় অর্জুন গাছটি থেকে বড় জোর পনেরো হাত দূরে একটি ক্ষয়ের গাছ।

আমার সঙ্গে সেই ছেলেটি এবং সুহাগী গ্রামের আরো দুটি লোক এসেছিল। তাদের বললাম অর্জুন গাছে একটা ছোট চার-পাই উঁচো করে বেঁধে মাচা বানাতে।

সুগতবাবুর মাচায়-শায়ীন রক্তাক্ত শরীরটির স্মৃতি এখনো মন থেকে মোছেনি। চিতাবাঘ অবশ্য গাছ বেয়েই উঠতে পারে। তাই উঁচু বা নীচু করে মাচা বাঁধা অবান্তর। তবে মাচা বেশী উঁচুতে বাঁধলে গুলি করতে খুব অসুবিধা হয়। তাই মাঝামাঝি উচ্চতায় বাঁধতে বললাম। গরুটাকে টেনে এনে সেই ক্ষয়ের গাছের গুঁড়িতে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। নইলে চিতা দড়ি ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে।

ওরা চুপচাপ আমার কথামত কাজ করল।

এখানেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলাম। ঘাসের উপর পায়ের দাগ ভাল বোঝা যায় না। তবু যতদূর বুঝলাম চিতাটা নদী পেরিয়ে নয়াতালাওর দিকে চলে গেছে। গরুটাকে ঠিক করে বাঁধা হলে উপরে পাতাসুদ্ধ ডাল চাপা দিয়ে রাখা হল যাতে শকুনের নজর না পড়ে। তারপর ফিরে এলাম।

বিকেলবেলা, বেলা থাকতে থাকতে গিয়ে মাচায় বসলাম। সঙ্গে ছেলেটি ও তার বাবা এসেছিল। গরুর গা থেকে ডাল-পালা সব কিছু সাবধানে সরিয়ে নিয়ে তারা কথা বলতে বলতে গ্রামের দিকে ফিরে গেল।

সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। একটি বিষণ্ণ সোনালি আভায় সমস্ত বনস্থলি ভরে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে মোরগ, ময়ূর ও তিতিরের ডাক ভেসে আসছে। সুহাগী গ্রামের মোরগগুলো দিনশেষের ডাক ডাকছে গলা ফুলিয়ে। গলায় কাঠের ঘন্টা ডুং ডুং করে বাজিয়ে গাঁয়ের কাড়া বয়েল ফিরে গেছে। যবটুলিয়া বস্তির গমভাঙ্গা কলের পুপ-পুপানি থেমে গেছে। গাছে গাছে পাখিরা আসন্ন রাতের জন্য তৈরি হচ্ছে।

সুহাদী নদীর দিক থেকে একটা লক্ষ্মীপেঁচা দুরুম্ দুরুম্ দুরুম্ করে তিনবার ডেকে উঠলো। তার এখন সকাল হল। রোদে বেরুবে। কোথায় ইঁদুর কোথায় ব্যাঙ্ সেই ধান্দায়। দুটি টিটি পাখি টিটির টি—টিটির টি করতে করতে মাঠটা পেরিয়ে কোনাকুনি উড়ে গেল। মাচার পেছনে মাটিতে একদল ছাতারে এতক্ষণ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে তাবৎ জাগতিক ব্যাপারের উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল। অন্ধকার নেমে আসতে আসতে তারাও নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু পিটিসের ঝোপের ভিতরে তাদের উসখুসানী, নড়ে-চড়ে বসার আওয়াজ—কুরকুর—খুরখুর, অনেকক্ষণ অবধি শোনা গেল।

তারপর হঠাৎ দেখলাম, একটি উষ্ণ ভরন্ত সুরেলা দিন একটি সিক্ত রুপোলি হিমেল রাতে গড়িয়ে গেল।

দিনের আলো থাকতে থাকতে চিতাটা আসবে আশা করেছিলাম। এখন কপালে ভোগান্তি আছে। যা শীত—তা বলার নয়। একটু পরই পাতা বেয়ে হয়ত শিশির পড়বে টুপটুপিয়ে।

দেখতে দেখতে চরাচর উদ্ভাসিত করে একটি মোমের থালার মত হলুদ চাঁদ পাহাড় বনের রেখা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠলো। প্রতি আনাচে কানাচে হলুদ আলো ছড়িয়ে গেল। যা অদৃশ্য ছিল তা দৃশ্যমান হল। যা আশ্চর্য ছিল তা স্পষ্ট হল। ধারালো ঘাসের চিকন শরীরে আলো পিছলে পড়তে লাগল।

কোথা থেকে এলো জানি না; দুটি বড় বড় কামওয়াসা খরগোশ লাফাতে লাফাতে মাঠটি পার হয়ে চলে গেল। আধঘন্টা পরে একটি লুমরী এলো। হাওয়ায় রক্তের গন্ধ পেয়ে নাক তুলে নিঃশ্বাস নিল। তারপর বাছুরটার কাছে এসে, যোষদা যেমন করে আমার রান্না-করা মুরগীর দিকে চেয়ে থাকেন তেমনি করে চেয়ে রইল। ঘুরে ফিরে দেখল। কাছে গেল; ফিরে এল।

এমন সময় হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত এক লাফ মেরে লুমরীটা আমার মাচার নীচ দিয়ে পড়ি কি মরি করে পালাল। চোখ তুলে দেখলাম একটি প্রকান্ড চিতা ঘাস ঠেলে এগিয়ে আসছে। সমস্ত শরীরটাকে যেন চারটি পায়ের খোঁটার মধ্যে ঝুলিয়ে নীচু করে বয়ে বেড়াচ্ছে। চকচকে চামড়ায় চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে।

একবার থেমে দাঁড়ালো। চারদিকে সাবধানে চাইল। তারপর বাছুরটা পূর্বস্থানে নেই দেখে খুব অবাক হল। ভেবেছিলাম খাওয়া আরম্ভ করলে দেখেশুনে গুলী করব, কিন্তু আমার সন্দেহ হল আদৌ না খেয়েও ত পালাতে পারে? চিতাটা আমার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটি নদীর, উল্টো দিকে। নদীর দিক থেকেই এসেছে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। চোখের পলকও পড়ছে না। যেন কার সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ও হয়ত জানে না, হয়ত মৃত্যুর সঙ্গেই আছে।

খুব আস্তে আস্তে, বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চিতাটার কাঁধে নিশানা নিলাম। বন্দুকের মাছিতে এবং ব্যারেলে চাঁদের আলো চকচক করছিল। ট্রিগার টানলাম। ডানদিকের ব্যারেলে একটি পৌনে তিন ইঞ্চি লেথাল বুলেট ছিলো। কি হল বুঝলাম না। চিতাটা যেদিকে মুখ করে ছিলো সেদিকে মুখ করেই একটি প্রকান্ড লাফ দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সেই চন্দ্রালোকিত পটভূমিকায় তার লম্ফমান মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মনে হল যে গুলীটা লেগেছে। কিন্তু এতকাছ থেকে কাঁধে গুলী খেয়ে লাফ দেওয়াটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হল। অবশ্য আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতায়।

চারিদিকে নজর রেখে বসে থাকলাম। একঘন্টা কেটে গেল। ওঁরাওরা মোষের শিঙ দিয়ে একরকমের শিঙে তৈরি করে। সেই রকম একটি শিঙে নিয়ে এসেছিলাম। কথা ছিল, আমার কোনো সাহায্যের দরকার হলে আমি শিঙে বাজাব। কি করব, বুঝতে পারলাম না। বাঘ যদি গুলী খেয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। তাহলে শিঙে বাজিয়ে যাদের এই রাতের জঙ্গলে ডেকে আনব তাদের বিপদ অবধারিত।

আরো একঘন্টা কেটে গেল। শীত একেবারে অসহ্য। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। বন্দুক শুইয়ে রেখে কম্বলে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে বসে আছি, তবুও মনে হচ্ছে জমে যাব।

(ক্রমশঃ)

চড়ুইএর বাসা

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

ঘরের চালের নীচ দিয়ে একটা ভারী মোটা গরাণের কড়িকাঠ লম্বালম্বি চলে গেছে। তারই ওপর ক'দিন হল দুটো চড়ুই বাসা বেঁধেছে। তাদের কিচির-মিচির আওয়াজের চোটে সুন্দরীর চুপচাপ ঘর-খানাতে হঠাৎ যেন হাটের হট্টগোল শুরু হয়েছে। এতটুকু পুচকে-পুচকে দুটো পাখি, কিন্তু তাদের বিক্রমের চোটে সুন্দরী অস্থির। ভোরের আলো ফুটেছে কি ফোটে নি শুরু হল কিচকিচিনি। সারাদিন ধরে ঐ কড়িকাঠটার ওপর বসে দুটোতে তার-স্বরে গলা ফুলিয়ে অনর্গল বকে যায়। মাঝে-মাঝে কোথায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। কখনও একটা, কখনও দুটোতে একসঙ্গে। আবার এসে বসে ঐ কড়িকাঠের বাসাটার তলায়। আর তৃতীয় চড়ুই ঘরে ঢুকেছে কি বাঁধল রাম-রাবণের লড়াই। ঝুঁটোঝুঁটি ঝগড়া। ঠোকরা-ঠুকরি, পাখসাট আঁচড়া-আঁচড়ি। বাইরেরটা বাইরে না যাওয়া অবধি স্বস্তি নেই। তাকে বার করে দিয়ে আবার মুখোমুখি বসে দুটোতে সমানে কিচকিচ করতে থাকবে। আবার যখন-তখন ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ।

সুন্দরী বলে— আজকাজজো। খোড়ায় তোদের জিন দেওয়া আছে নয়? এই যাচ্ছিস, এই আসতিছিস। বলি ব্যাপারটা কি?

একলা ঘরে সুন্দরী ওদের সঙ্গে কথা বলে চলে।

সন্নিসীর এসব ঝামেলা সহ্য হয় না। সে নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসে। রবিবার ছুটির দিনে সে বসে-বসে গাল পাড়ে— শালার চড়ুই-এর নিকুচি করেছে। কোত্থেকে ঝামেলা উড়ে এসে জুড়ে বসল। শালাদের কাঁচ-কাঁচানির চোটে এটুকু জিরোবার জো নেই।

এদিকে দুটো চড়ুই মিলে সন্নিসীর সখের ফ্রেম দেওয়া আয়নাটার ওপর বসে সমানে ঠুকরে যাচ্ছে আর কাঁচর-কাঁচর করছে। মনে হয় আয়নার ভিতরকার পাখিদের সঙ্গে ঝগড়া করে যাচ্ছে। আয়নাটা অকথ্য রকমে নোংরা হয়ে উঠেছে। সন্নিসী তাড়া লাগায়—হ্যাঃ, হুঃ। হাতে তালি বাজায়। হাড় বজ্জাত চড়ুই দুটো একবার উড়ে যায়। আবার তখুনি ফড়-ফড় করে উড়ে এসে বসে আয়নাটার ওপরে।

সন্নিসীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়।—চড়ুই শালা চড়ুই, তোদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকে তবে আমার—

[illegible] চোটে সন্নিসী বাইরের থেকে [illegible] লগি বাঁশ নিয়ে ঘরে ঢোকে। [illegible] থেকে ত. দেখতে পেয়েই ছুটে [illegible] সুন্দরী। — হেই সন্নিসী, পাকির [illegible] দিসনি।

[illegible] দেবে না। শালাদের বজ্জাতির [illegible] হয়ে উটিচ। যেন ঠিক দা' [illegible] হয়ে উটেচে।

—[illegible] জীব। ফগ্গামনে চড়ুই —

—[illegible] অবোলা—

ভেংচে ওঠে সন্নিসী। — দ্যাকনা আয়না-লা কি করেচে।

এক গাল হেসে সুন্দরী বলে—ওরা [illegible] ওদের কি বোধভাষ্যি আচে? [illegible] করেচে ওদের শত্তুর নুইকে আচে [illegible]নাটার ভিৎরি।

শত্তুর ভিৎরি কি বাইরে দেকাচ্চি [illegible]।

[illegible] ওঁচায় সন্নিসী।

— [illegible] ভাল হবে না বলতিচি। তুই [illegible] পাকির বাসায় লগিটা ছুঁইয়ে [illegible]।

[illegible]রীর গলার আওয়াজে সন্নিসীর [illegible] উবে যায়। শামুকের মতো [illegible] বলে—হারামজাদারা [illegible] করে মাল্লে। যাবশালা [illegible] সন্নিসী হয়ে—।

সুন্দরী [illegible] আর মিট-মিট হাসে। [illegible]। মনে-মনে বলে— [illegible] লোক। আমার মতো মেয়েমানুষ [illegible] জোটে। আর মেয়েমানুষ না হলি [illegible] কি করে তাই আমি দেকতে চাই। [illegible] একবার যা, গিয়ে অগড়টা দ্যাক।

[illegible] বড়াইটা হল সুন্দরীর [illegible] সোমত্ত মেয়েমানুষের শরীর। [illegible] টোল খায় নি কোথাও। গাঙের [illegible] জোয়ার যেন থমে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। [illegible] যখন বাড়ী থাকে না বড় আয়নাটার [illegible] সুন্দরী আদুড় গায়ে একবার করে [illegible] দাঁড়ায়। নিজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে [illegible] বাঁকা ঠোঁটে মনে-মনে নিজেকেই [illegible] কাটে। — আঁটকুঁড়ির শরীলের [illegible] দ্যাকোনা। এত খোয়ারেও জলুষ এট্টুকু টস্কোয় না। মরণ, মরণ তোমার—

খোয়ার? তা হয়েচে বৈকি। আজই না হয় তুমি ওজগেরে পুরুষের বৌ। আচ [illegible] ভাতে। সঙ্গী সেজে অঙ্গ বঙক চ্চ। [illegible] তোমার মুকি পোনা মাচের মুড়ো [illegible] কাঁকড়ার মাঁস ছাড়া ওচে না। দুদ, [illegible] না খেলে পেটটা খালি খালি ঠেকে। সিদিনের বিভ্রান্তটাও মনে [illegible] সুন্দরি! সিদিন কপালে আর [illegible] হাত চপড়াতিস। আর নিজেকে [illegible] হতভাগীর বিটী অষ্টপ্রহর। হতভাগীর বিটি ছাড়া আর কি? যার [illegible] মা দয়ামায়া বিসজ্জন দে পেটের সন্তানকে বেচে দেয়, তারে কি কয়? মা নয় তো আক্কুসি। জেমন্ত আক্কুসি। নৈলে পেটের সন্তানের সঙ্গে এমন অকোচ কেউ দেকেচে? পশু-পাকিরাও তাদের বাচ্চা ছাড়তে চায় না। তাদের শরীলেও দয়া-মায়া আচে। গরু-ছাগলের বাচ্চারাও এটু চোকির আড়াল হলি তাদের মারা হামলায়। আর তুই মানুষের মা হয়ে—

সুন্দরী শুধিয়েছিল—আমায় বেচিবি কিসের নেগে?

—আমার গুদোমভাড়া। হারামজাদা নরকে মিনসে আমার সব্বোনাশ করে দে' সরে পড়ল। তা' পর এই তেরোটা বচর তোরে মানুষ কত্তি যথা সব্বস্ব দিচি। তার উপুরে দেনা। দেনা শুধতি হবে নি?

সাফ সাফ জবাব দিয়েছিল সুন্দরীর মা। আসল কথাটা কিন্তু সুন্দরী জানত। মার আবার...বাচ্চা হবে। পাঁচু ঘরামী যওয়া-আসা করছে। মেয়ে সোমত্ত হয়ে উঠছে, কাছে থাকলেই হাঙ্গামা। কাজেই দাও বিদেয় করে। সুন্দরীর মা তার হাতটা তোরকে গাজীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল— এই নে' যাও।

মাকে ছেড়ে যেতে বুকটা ছিঁড়ে পড়ছিল। বার-বার জলভরা চোখে ফিরে-ফিরে দেখছিল সুন্দরী। বুক চিরে মাঝে-মাঝে কান্না ঠেলে উঠছিল—মারে, তোরে আর জন্মে দেকতে পাবুনি রে মা।

বার-বার নজরে পড়ছিল তার মা এক বাণ্ডিল নোট গুনছে একমনে। মুখটা তুলে একবার তাকায়ও নি। সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকটা জমে পাথর হয়ে যাচ্ছিল।—মা তো নয়, একানড়ের মা। গরু-ছাগলের বাচ্চাদের ওপর এট্টা নাড়ীর টান থাকে। এবার মরে যেন তাই হই। মানুষ জন্মে ধিৎকার।

বুক উথলে নিশ্বাস পড়ে সুন্দরীর।

—মুকপোড়া ভগমান। পেটে এট্টা দিলি না। দিলে একবার দুনিয়াকে দেইকে দিতুম মা কারে কয়। বাচ্চা কি করে পালতি হয়। বলে কুসন্তান যদি বা হয় তো কুমাতা ককনো নয়।—আবার একটা বড় নিশ্বাস পড়ে সুন্দরীর।—জেবনটা বেরথা গেল, ফল ফলল না এট্টা।

পাশের উনুনে ভাত পুড়তে থাকে। খেয়াল থাকে না। সন্নিসী পাশের ঘর থেকে চেঁচায়—সুন্দরী কমনে গেলি র‍্যা? ভাত পুড়ে যে খাক্ হয়ে গেল।

এমনি প্রায়ই হয়।

আর যদিন সুন্দরী একা থাকে, সেদিন তার খোয়ারের কথাগুলো খুব বেশী করে মনে পড়ে।

রেলে কাজ করে সন্নিসী। ভোরবেলা সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে কলকাতায় যায়। ফিরতে সেই সন্ধ্যে পার। হপ্তার মধ্যে ছ' দিনই ঐ হাল। রবিবারটা ছুটি। সুন্দরী ঠাট্টা করে বলে 'অ্যালের বাবু'। সন্নিসীর রোজগারপাতি ভাল। ছিটে বেড়ার ঘর ভেঙে সে কোঠা বানিয়েছে। টিনের চাল। কিন্তু লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাঙের ধারে। তার কারণ আছে। পাঁচজনে সন্নিসীর নামে মুখ বাঁকায়। বলে—সন্নিসী বাজারের বেশ্যে নিয়ে ঘর করে।

—হাঁরে সুন্দরী তুই আজও বাজারের বেশ্যে নটী? এই পাঁচটা বছর একনাগাড়ে একটা মদ্দর ঘর করেও তুই বাজারের?

প্রতিবেশীরা বলে—কয়লার ময়লা যায় না ধূলে, বেশ্যে মাগীর ইজ্জত যায় না মলে।

—হতভাগীর ব্যাটা-বিটীরা তা বলুক গে। কতো সব সতী নকখী নে' ঘর কুত্তেচে তা তো আমার জানতি বাকি নেই। ঘোমটার মদ্দি খেমটার নাচ নাচে। চোকির মাতা খেয়ে বসে আচে চোকখাগীর ব্যাটারা। নজরে পড়ে না। মরুকগে—। লোকোলয়ে আর যাবুনি। ঘেন্না ধরে গেল।

নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে সুন্দরী।

—কিন্তু বাজারের মেয়েমানুষ তো তুই একদিন ছিলি সুন্দরী। জয়নগরের গা[illegible]র বাজারে খালধারে খোড়ো ঘরের ভিৎরি ব্যাওসা ফেঁদেছিলি। মেটে সিঁদুরের সিঁতি, গুলে পোকার টিপ, দু চোকি চওড়া করে ন্যাপা কাজল। চপচপে করে তেলে ভিজিয়ে পাটী-পাটী করে চুল বাঁদতিস। সেঁজের বেলায় কুপী হাতে দরোজায় দাঁড়াতিস। গঞ্জের হেটুরে মিনসেগুলোর ভীড় নেগে যেত। বুকটা এট্টু টিপ-টিপ কোত্তো না কি? কোত্তো। পুতখাগীর বেটা তোরপের সঙ্গে যদি হট্ করে দ্যাকা হয়ে যায়। ঘুটিয়ারীশরিফের মেলা থেকে সরে পড়েছিলুম। আমি না সরে পড়ে আমার রূপায় ছেলে? একদিন না একদিন তোরপেই দিত চালান করে আর কোতাও। কোতায় ঢোঁসা, আর কোতায় ঘুটিয়ারীশারিফ। তোরপে ভেবেছেল বাদাবনের কাঁচা বাচ্চা মেয়ে কিছু বুজবে নি। জানতো না তো ঐ মার খপ্পরে পড়ে সুন্দরীর পিঁপুল পেকেছেল অনেকদিন। দুটো মাস যেতে না যেতে হাড়ে-হাড়ে টের পেইছিলুম তোরপের ব্যাপার-স্যাপার। মেয়ে বেচার ব্যাওসা, কত তোরপে। ভিন্ ভিন্ মুলুকে কোতায়-কোতায় সব চালান করে দিত। তার আগে মেয়েগুলোকে সে নিজে খেত। দিগ্ ধেড়ে মিনসে, বাপের বইস। ভীমের মতন গতর-খান। মুকে প্যাঁজির গন্ধে ওক উঠতি আসে। এতের বেলা তার মূর্তি দেকলি গলা দে' বলিদানের প্যাটার মতন আওয়াজ বেরুত। তোরপে চাপা গলায় শাসাত—চুপ কর ছুঁড়ি। গলায় গামচা গুঁজে দোবো। নয়তো গলা টিপে জন্মের মতন থতম করে দোবো। — বাইরের উটোন থেকে তোরপের কানা বাপটা হাঁকত—ও গুয়োটা কচি মেয়েটাকে জানে মরবি? ওরে বাড়তে দে'।

—বুড়োকে তামাক সেজে খাইয়ে, গা-হাত-পা টিপে দে' বশ করিছিলুম, বুড়োটা আমাকে নেক নজরে দেকত। টিপি-টিপি বলত— একেনে থাকিস নি। তোরপেটা বোকোশ। তোরে ঘানি গাচে তুলে নেঙড়াবে। হাড়-

মাস শুষে খেয়ে ছিবড়ে করে বাইরে চালান করে দেবে।

—তক্কে তক্কে থাকি। পেরায় বচর ঘুরতি যায়। ঐ বুড়োকেই তাতিয়ে-পুতিয়ে একদিন মেলা দেকবার ছুতো করে হলুম পগার পার। তোরপে বাড়ী ছেল না। ঘুটিয়ারীশরিপ থেকে এ্যালে চেপে সেনার-পুরে।—টিকিস কই গা মেয়ে?—টিকিসবাবু শুদোয়।—নিঃ। সোনরপুরে আসতেই টিকিসবাবু নেইবে দিলে। যাও গো মেয়ে উলে যাও। টিকিসের পয়সা না দিলে এ্যালে চড়তে দোবু নি।

রিস্টিশেনে উলে তো ছিষ্টি রন্দকার। যাই কমনে? হাতে এট্টা তাঁবার পয়সা বলতে নি। এককোণে বসে বসে কাঁদতিচি। এক মেয়েমানুষ ঘুন ঘুন করে এসে কাচে বসল। পেল্লায় লাস, বিপুজয় চ্যায়র। যেন তাড়কা আক্কুসি। এক গা উপোর গয়না, নাকে ফাঁদি নত। সন্নিমাসী। এক টাপিরা পান পুরে, মুটো হানেক দোক্তা মুকি ঢেলে দে ফিস ফিস করে শুদোয়—কাঁদিস ক্যান লা ছুঁড়ি? তোর ঘর কমনে?

—ঘরবাড়ি নিঃ।

—সে কিরে? বাপমা-সোয়ামী?

ঝেঁইজে উটে বললুম—বাপ-মা হত-ভাগার বেটা-বিটী যমের বাড়ী। সোয়ামী আবাগের বেটা কোন চুলোয় ঝাঁংলা মুড়ি দে বসে আচে, কে জানে ?

ওমা তোর একনো বে' হয় নি? এই উট্‌তি যৈবন নে' আস্তায় আস্তায় ঘুত্তি-চিস। ভয়-ডর নি?

—কি করব? দুনিয়ায় আমার যাবার ঠাঁই নি।

—আমার সাতে যাবি?

—কোতায়?

—চ' না। আমি যেতায় নে' যাব সেকেনে। তোর শরীল আচে, তোর চিন্তে কি? কতো ব্যাওসাদার মহাজন তোর পায়ে আচাড়ি-বিচাড়ি খাবে ডাঙায় তোলা উই কাৎলা মাচের মতন। আজী আচিস?

—হ্যাঁ আজী।

সন্নিমাসী এনে তুললে জয়নগরের গঞ্জের বাজারে।

তা পায়ের কাচে আচাড়ি-বিচাড়ি খায় নি যে এমন নয়। কিন্তু সহদেব। সন্নিমাসীর বোনপো সহদেব। অলপ্পেয়ে, ছিষ্টিখেগো সহদেব। কোতা থেকে এসে চিলির মতন ছোঁ মাল্লে। আমার সব্বোনাশ কল্লে। আমার ব্যাওসা পত্তর সিকেয় তুলল।

সহদেবের কথা মনে পড়তেই সুন্দরীর বুকের ভিতরটায় রক্ত ছলছলিয়ে ওঠে। সে যেন ঢোলের বাদ্যি শোনে আপন বুকের ভিতরে। —

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাগড় ঝাঁ।
ঝাঁ তাকপুর গুরুদাসপুর
গুপীনাথপুর গুরুদাসপুর।

ঝড়ের মতন বাদ্যি বাজাত সহদেব। মাতালের মতন বাজিয়ে যেত ঘন্টার পর ঘন্টা। — মাতলার গাঙের জোয়ারের মতন মাতলামী লাগত, নেশা লাগত সে বাদ্যি শুনলি। বুকের মদ্দি গুর গুরুলি উটত পেরথমটায়, তা' পর ঝড়। সহদেব ঢোলটা এক সময় ধাঁ করে কাঁদ থে' নেইবে একে দু হাতে আমার শরীলটা আচমকা শোলার পুতুলের মতন টপ করে তুলে ধরত মাতার উপুরে। দু'বার লোপালুপি করে ঝট করে চেপে ধরত ধান অ চড়ানো পাটার মতন চ্যাটাল বুকটার উপরি। তা'পর মুকে বুকে—

লজ্জায় নিজের মনে রাঙা হয়ে ওঠে সুন্দরী। সমস্ত শরীরের ভিতর তিরতির করে একটা আমেজের স্রোত বয়ে যায়। গাটা শিউরে শিউরে ওঠে।

ওঃ পীরিত কত্তে জানত বটে মন্দটা। থেকে থেকে হাতের থাবার মদ্দি কোমরটা চেপে ধরে আদর করে বলত—ঠিক যেন ফুলবাতাসী। বাতাসী ফুলবাতাসী দেকুলে মজে মন। বুকেতে ধরব কতক্ষণ। তুই ডোবাই-এর নটী-ই সুন্দরী। অনেক সমুদ্-দির পো ভিরমী খাবে তোর নাচ দেকলি। আমি তোর নাচের সাতে ঢোল বাজাব। বাস, তোতে আমাতে ডোবাই-এর দল।

—মাজে মদ্দি বলত—ওসবে কাজ নি। ওগ-গোগ আচে। তা'পর আচে শরীলের খোয়ার। চ' আমার সাতে।

—মাসীকে বলি।

—মাসীকে বলতে যাবি কিসের লেগে? তুই কি দুদখেকো কচি খুকী নাকি?

—মাসীর আশচয়ে আচি, মাসীকে বলবুনি? মাসীর তরেই তো বেঁচে আচি। নৈলে এদ্দিনে কোতায় ভেসে যেতুম বানের জলে কুটোর মতন।

—মাসী তোরে ছাড়বেনি।

দিন কতক চুপ করে থাকত সহদেব, আবার ফুসলুনি দিত। — সুন্দরী এসব ছাড়। হ্যাঁবা তোর ঘর কত্তে ইচ্ছে করে না, সোয়ামী পত্তুর নে'?

সুন্দরী বলত—আমরা হলুম বাজারের বেশ্যে। ঘর-গেরস্তি কি আমাদের জন্যি? আমাদের আবার সোয়ামী কি? যে যখন ঘরে আসে সেই সোয়ামী। আর পুত্তুর? ম্যাগোঃ—

সুন্দরী নাক সেঁটকাতো—ঐ সব গেরস্তের ঝি বৌদের মতন। এক পাল এণ্ডি-গেণ্ডি। গা ঘিন ঘিন করে।

—যদি না চাস তো ডোবাই-এর নটী হ'। অঙীন জেবন। নাচবি, গাইবি ফুর্ত্তি করবি। বড় বড় বাবুদের পেরানে ফুর্ত্তি দিবি। তোর পয়সা খায় কে? আমি তোর খেদমত করব।

সুন্দরীর মন ভারি হয়ে আসে।

—না চাইলেই তো আর রেহাই নি। খোয়ারের নেগেই তো বিদেতা মেয়ে জন্ম দেচে।

—মাসীকে গে' ধর। মাসী অনেক জড়ি-বুটী, গুন-গ্যান, মন্তর-তন্তর জানে।

সহদেবের কথা শুনে মাসীকে গিয়ে ধরে পড়ে সুন্দরী।

—মাসী ঘরে নিত্যি নোক বাড়াচ্চে। কিসে কি হয়—

মাসী প্রথমে রাজী হয় না। — বাঁজা হয়ে থাকবি সেটা কি ভাল?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর জিদে পড়ে মাসী রাজী হয়ে যায়।

—উঃ মাগো।

বুকটার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে। মনে হয় ছাতি বুঝি ফেটে যাবে চৌচির হয়ে। যন্ত্রণা উঠে আসে সুন্দরীর বুকের অনেক ভিতর থেকে।

—যে পাপ করিচি, তার পেরাচিত্তির—কিচ্ কিচ্ কিচ। কিচির কিচির কিচ্।

চড়ুইটা জানালার ওপর বসে যেন ধমকাতে থাকে সুন্দরীকে। সুন্দরী বুকটা দু-হাতে চেপে ধরে জোরে তাকায়। দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসে। মাতলার গাঙের ওপর থেকে হঠাৎ এক ঝলক শীতল বাতাস ঘরে ঢুকতে সে যেন দম নিয়ে বাঁচে। চড়ুইটাকে ভাল করে দেখে নেয়। ওটা মাদীটা। সুন্দরী ওর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলে।

—তোর আমার এক হাল বুঝলি? পোড়ারমুখী? তা তোর ভাতার গেছে কোন অজ-কাজজোতে? ডিম পাড়বি বলে ন্যা আটকুড়ি? তোর মিনসেটা করে কি? আমি যেন আমার গন্দ খেয়ে বসে আচি—

বলতে বলতে সুন্দরীর বুকটা ভার ওঠে। গলার কাছটা নিংড়ে আসে। চোখ দিয়ে আপনা থেকেই টস টস [illegible] জল গড়ায়।

চড়াইটা সামনে বসে বসে সমানে কিচির কিচির ডেকে চলে। আর সুন্দরী বিড় বিড় ক'রে আপন মনে।

—সাতজন্মের শত্তুর সহদেবটা এ আমার কি সব্বোনাশ করে গ্যাল?

—ডোবাই-এর নটী! ডোবাই-এর নটী হয়েই তো সব্বোনাশটা আরও ঘটল। মাসীর কাচ থে' নোপাট কল্লে দ্যাসটা। তা'পর আজ হেতায় কাল সেতায়। কোতায় মরিপুরীর চৌধুরীবাবুদের বাড়ীতে আসের মেলা। কোতায় বড়বাড়ি মোড়োলবাবুদের বাড়ীতে মোচ্ছোব, কোতায় হল্লুবির ঘোষবাবুদের বাড়ীতে পাব্বন। সেঁজেরবেলায় সেজেগুজে বড় পুকুরের ওপর বালি ফেলে বানানো এ্যালবেলে মৌরপংকীর উপুর নাচ। হ্যাজাকের ল্যান্ঠন জ্বলত। মাতোব্বরবাবুরা পাড়ের ওপর মুকিয়ে ঘিরে বসত খেউড় শোনবার নেগে। বাবুরা বলত জলেশ্বরী সহদেবের হাতের ঢোল বোল তুলত—তাকুড় তাকুড় তাক্ কুড় কুড়।

মাতলার গাঙের ওপর থেকে ঝলকে ঝলকে হাওয়া বয়। মাদী চড়ুইটা এক সময় ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় বাইরে।

বুকের ব্যথাটা সুন্দরীর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে। সেই দম আটকানো ভাবটাও আর থাকে না। সে তখন মনে মনে নেচে চলে ঢোলের বোলের সঙ্গে সঙ্গে। পাটী পেতে চুল বাঁধা। নাকে টানা নথের দোলে নাকছবি। খোঁপায় জড়ান ফুলের মালা। ঠোঁটে নুটি আলতার ছোপ। কপালে গুলপোকার টিপ। যতটা পারে আঁটোসাঁটো করে পরা কাপড়। গাছকোমর জড়িয়ে বাঁধা টান টান করে। সামনে পিছনে মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ। সঙ্গে সঙ্গে দামাল বুকের বেসামাল ওঠাপড়া। আর চোখমুখে চাপা ইসারার ভঙ্গী। রসের বান ডাকত। খিস্তি-খেউড়ের বৃষ্টি হয়ে যেত। যেন ঠিক সাপের মুখে ব্যাঙ নাচুনি। শুকনো বারুদে যেন আগুনের ফুলকি উড়ে পড়ত। পাল্টি দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত লড়ুয়ে মদ্দগুলো। একটু কম বয়সী ছোঁড়াদের তো কথাই নেই। কোমর নাচাতে নাচাতে, সামনে পিছনে রঙ্গের ওপর ধাক্কা মারতে মারতে তারা এগিয়ে আসত। চোখেমুখে ফুটে উঠত বুনো মাতলামো। সুন্দরী ক্ষেপে উঠত ক্ষেপে যেত। আধ বোতল পাকি ধেনো গলায় গলগল করে ঢেলে দিয়ে টাকটুকে পাকা করমচার মতো ঢুলু ঢুলু দুচোখ টানটান করে চাইতে চাইতে ওর ঠোঁটের ওপর দিগ্বিজয়ী হাসি হাসতে হাসতে সে এগিয়ে যেত প্রতিপক্ষের সামনে। ভুট্টার দানার মতো সাদা সাদা দাঁতের সার থেকে বিষাক্ত হাসি ছড়াতে ছড়াতে সে শ্লেষ ছুঁড়ে মারত প্রতিপক্ষের দিকে— কইমাছ পড়েচে ফাঁদে টোপ গিলে।

টোপ কথাটার ওপর এমনভাবে জোরটা দিত যে তার সঙ্গে সহদেবের হাতের ঢোলের বাড়িটা ঠিক ঠিক মিলে গিয়ে একটা অদ্ভুত চাপা ধমকানির মতো আওয়াজ তুলত। পরক্ষণেই হেসে ঢলে ঢলে নাচত সুন্দরী পরের পদটা ধরে—

দুধারে দুই ব্যাঁকা বঁড়শী এঁটেকে
গেচে চোয়ালে।
কইমাচ পড়েচে ফাঁদে টোপ গিলে।

সহদেবের হাতের সোমটা ঠিকমতো ঢোলের ওপর এসে মিলে যেত পদের শেষের সঙ্গে সঙ্গে।

বাহারে বাহারে —দুচোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠত সহদেব। মাতব্বরবাবুরা নড়েচড়ে গলা বাড়িয়ে বসতেন। তারিফ করতেন সুন্দরীর গানের আর সুরাসিক্ত আদিরসাত্মক ভাবভঙ্গীর। তারপর চলত এদিক থেকে চাপান আর ওদিক থেকে উতোর। ওদিক থেকে চাপান আর এদিক থেকে উতোর। শেষে মাঝরাতে যখন হ্যাজাকের তেল কমে আসত, বাবুদেরও ঝিমুনি লাগত তখন ছোঁড়াটারে গোহারাণ হারিয়ে দিয়ে গান ধরত সুন্দরী—

ছোঁড়া বাইতে পারে তেলো ডোঙা
ওছোঁড়া গাধাবোট চালাতি যায়।
বেহদ্দ বেহায়া ছোঁড়া নজ্জা
নেইকো গায়।

তারপর রুকে উঠে দুরন্ত নাচ সুরু করত জয়ের উল্লাসে। সহদেবের ঢোলে ঝড় উঠত তখন। তাকুড় তাকুড় ঢিমে বোল ছেড়ে ঢোল কালবোশেখীর ঝড়ের মতো জগঝম্পের বোল ধরত—

ঝিঝ্‌ঝিনাকিটি ঝিঝ্‌ঝিনাকিটি
ঝিঝ্‌ঝিনাকিটি ঝিঝ্‌ঝিনাকিটি।

বাবুদের ঝিমুনি কেটে যেত।

বাবুরা বার বার বাহবা দিতেন ঘূর্ণিঝড়ের মতো অনর্গল নেচে যেত সুন্দরী। যেন তখুনি উড়ে যাবে। নোট, টাকা, এমনকি সোনাদানাও ঝরত তখন বাবুদের হাত দিয়ে। রাতে ডাক পড়ত বাবুদের শোবার ঘরে। সেখানে দুধের মতো ধোওয়া সেজ, পরীওড়ন পালং, আতর গোলাপের সুবাস আর বিলিতী মদের ছড়াছড়ি। সুন্দরী বলত—অঙের নেশা। সেই নেশার ঘোরে সে মা হবার কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

গড়ের গঞ্জের বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে সৌখীন করে সাজিয়েছিল। যৌবনের ঐ কড়া নেশায়, রঙের নেশায়, সহদেবের পীরিতের নেশায় সে বারোটা বছর বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দিল।

সেই নেশা ছুটল সেদিন যেদিন সহদেব তাকে ছেড়ে পালাল। ঝগড়া নয়, মনান্তর নয়। সহদেব পালাল সুন্দরীর কিছু গয়নাপত্তর হাতিয়ে নিয়ে, খালের ওপারের নতুন মেয়ের সঙ্গে। নেশায় ভোম হয়ে থাকা সুন্দরী টেরই পায়নি কবে দুজনের ভিতর পীরিত গজিয়ে ছিল। গয়নার শোক ছাপিয়ে তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল মনিষ্যিটার শোক। তিনচার দিন ওঠেনি দাঁতে কুটো কাটেনি। খালি পড়ে পড়ে মড়াকান্না কেঁদেছে নীচু সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে। চারদিন পরে তাকে হাত ধরে তুলল পাশের ঘরের পরী।

—দিদি ওঠ্। শরীলটা যে পাত হয়ে গেল। আমাদের বলে শরীলই ভরসা। নে ওঠ্।

পরী প্রায় জোর করেই টেনে তুলেছিল সুন্দরীকে। চারপাঁচ দিন রেঁধে খাইয়েছিল দুবেলা। বুকটা বড় খালি খালি লাগত সুন্দরীর।—পুতেখাগীর ব্যাটা নেমকহারাম সহদেব। মন-পেরান যথাসব্বস্ব তোরে দিলুম। আর তুই তার মর্য্যেদা দিলিনি। আমায় এমনি দাগা দিয়ে গেলি। শেষ পজ্জন্ত ওই উচকপালী চেরনদাঁতী গুয়েপেত্নীটার সঙ্গে তুই ভিড়লি? অলপ্পেয়ে দাগাবাজ, মর মর। ওলউঠো হোক তোর। তোর নতুন পিরীতের ঢেমনিকে মা শেতলা টেনে নিক।

গায়ের জ্বালায় মটমট করে আঙুল মটকায় সুন্দরী।

—দিদি আমার বাচ্চাটারে এটু ধর না লা। ঘরে নোক এয়েচে। আদঘন্টার মদ্দি নে যাব।

সুন্দরী না করতে পারে না। অসময়ে পরী করেছে অনেক। নিমরাজী সুন্দরীর সামনে বছর খানেকের বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিয়ে পরী চলে যায়। গাটা ঘিন-ঘিন করতে থাকে সুন্দরীর। ঐ অতটুকু বাচ্চাদের দেখলেই সুন্দরীর গা ঘেলায়। গায়ে কিরকম দুধ তোলা দুধ তোলা গন্ধ। মাগোঃ। সুন্দরী সহ্য করতে পারে না। অনেকদিন থেকে ওর পরিষ্কার থাকার বাতিক। সৌখীন সুন্দরী। এতটুকু দুর্গন্ধ, এতটুকু নোংরা, ময়লা ওর বরদাস্ত হয় না।

—অ্যাই, অ্যাই, অ্যাই খোকা কোতায় যাচ্চিস র‍্যা?

বাচ্চাটা টলে টলে হেঁটে চলেছে জলের কলসীটার দিকে দু হাত বাড়িয়ে। পাথরে

কোঁদা এতটুকু একটা চেহারা। মোটা সোটা নাদুস-নুদুস, নাদা পেট। কোমরে একছড়া রুপোর গোট। ফোলা ফোলা গাল আর ড্যাবা ড্যাবা নিষ্পাপ সরল দুটো চোখ। এক মাথা কোঁকড়া চুল ঝেঁপে এসে পড়েছে চোখে মুখে। পরী আদর করে চোখে কাজল পরিয়ে একটা কাজলের টিপ দিয়ে দিয়েছে কপালে।

সুন্দরীর ডাকে বাচ্চাটা চুলের ফাঁক দিয়ে চায়। দুটো চোখে এবার তার দুষ্টুমী ভরে আসে। হাত দিয়ে কলসীটা দেখিয়ে বলে—হুই!

সুন্দরী তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়। ছেলেটা ধাঁ করে বসে পড়ে তড়বড়িয়ে হামা দিয়ে ছোটে আর একদিকে। সুন্দরী এবারে কৌতুক বোধ না করে পারে না।

ওরে শয়তান। তোর পেটে পেটে এত বজ্জাতি? দাঁড়া—

খুব অবাক হয় সুন্দরী অতটুকু ছেলের অতটা দুষ্টবুদ্ধি দেখে। দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে সুন্দরী। নরম ঠান্ডা যেন একতাল কাদা।

অদ্ভুত ভাবান্তর হয় সুন্দরীর মুহূর্তের মধ্যে। কচি ছেলে দেখলেই যার নাক সিঁটকে শিকেয় ওঠে, ঠোঁট যায় উল্টে, সেই সুন্দরীর হঠাৎ যেন মনে হয় এই ঠান্ডা কাদার তালটাকে বুকে চেপে ধরলে হয়তো তার বুকের ভিতরকার আগুনের জ্বলুনীটা কিছু কমে। আদড় বুকের ওপর সে চেপে ধরে ছেলেটাকে।

—ওমা এটুকু ছেলে, কি দুষ্টু রে বাবা!

সুন্দরী ভাবতে থাকে। ছেলেটা দু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে তাকে। আর কথা নেই বার্তা নেই চকচক শব্দ করে খেতে সুরু করেছে।

একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত অনুভূতি যেন বিদ্যুতের মতো পা থেকে মাথা অবধি হিল-হিলিয়ে উঠে যায় সুন্দরীর। ভিতরে যেন সব কিছু গলে গলে পড়ছে এমনি মনে হয়। হাত-পা ঢিলে হয়ে আসে। ছেলেটা বার কতক টান দিয়ে দুধ না পেয়ে চটে উঠে দুধে দাঁতের কামড় বসিয়ে দেয়। সুন্দরীর সারা দেহ নতুন বর্ষায় ফোটা কদম ফুলের মতো শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে।—উরে বাবারে! কি আক্রোস ছেলে রে বাবা! রক্ত বের করে দিলে।

রাগ করে বুক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—মাটিতে বসিয়ে দেয় দুম করে। ছেলেটা কিন্তু কাঁদে না। ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত দাপাদাপি করে বেড়ায় হামা টেনে। আর হাতের কাছে যা পায় দু' হাতে টেনে দুদ্দাড় করে ফেলতে থাকে। মাঝে মাঝে থামে আর সুন্দরীর দিকে ফিরে ওপর নীচে ওঠা নতুন চারটে দাঁত বার করে—হি-হি করে হাসে।

পরী এসে ছেলে নিয়ে যেতে যেতে সুন্দরীর ঘরে প্রায় দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যায়। কলসী উল্টে ঘরের মেঝে জলে ভেসে যায়। ওদিকে জলচৌকীর ওপর থেকে মাজা কাঁসার বাসনকোসনগুলো মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়। সুন্দরী পাগলের মতো সেগুলো একধার থেকে কুড়িয়ে যেতে থাকে। ছেলেটা মহা আনন্দে আর একধার থেকে সেগুলো টেনে টেনে ফেলে আর হাসে।

—উঃ, কি দস্যি রে বাবা! একে বেঁদে আকতি হয়। জ্যান্ত ডাকাত এটা।

সুন্দরী রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যায়। কোমরে কাপড় জড়িয়ে একধারে দাঁড়িয়ে হাঁপায়।

পরী লজ্জা লজ্জা মুখ করে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়।—দিদি তোর ঘরটা নৈনেত্য করে দেচে দস্যিটা। আমি সব তুলে আকতিচি। তুই সর।

ছেলেটাকে তুলে নিয়ে দু'চার ঘা চড়-চাপড় কসিয়ে দেয় পরী। ছেলেটা এবার ককিয়ে ওঠে। সুন্দরী বলে— আহা, ওরে মাত্তিচিস ক্যান লা পরী? ও শিশু। ওর কি বোধ ভাষ্যি আচে?

সুন্দরী হাত বাড়ায়। আর আশ্চর্য, ছেলেটা কান্না থামিয়ে মার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরীর কোলে।

পরী হাসে আর বলে—সেই কতায় বলে না, মার চেয়ে মাসীর টান বেশী। সেই বিত্তান্ত। সুন্দরীর খালি বুকটা ভরে গেল। সহদেবের শোক ভুলল সুন্দরী। যখন তখন সে পরীর ঘর থেকে ছেলেটাকে টপ করে তুলে নিয়ে আসত নিজের ঘরে। ছেলেটা যে এদিকে ছাঁদা ভাঁড় সে খেয়ালই থাকত না। সৌখীন সুন্দরীর পরিষ্কার থাকার বাতিক শিকেয় উঠল।

সুন্দরী ছেলেটাকে দু'হাতে নাচাত আর বলত—আমার সাতজন্মের সোয়ামী। বলত আর ছেলেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে নাল-ঝোল মাখা মুখের ভিতর মুখ গুঁজে শুষে শুষে চুমু খেত। যেন ফোটা ফুলের মৌ শুষে খাচ্ছে এমনি মনে হত তার। ছেলেটার নরম কালো শরীরের সর্বত্র মুখ বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করত। কখন কখন ফোলা ফোলা কচি ঠোঁটের ওপর ছোট ছোট কামড় দিত আর বলত—বল দেকি খোকা, আমি তোর কে?

পরী শিখিয়েছিল—মাসী। ছেলেটা বলত—মাতি।

সুন্দরী বলত—না। বল বৌ।

ছেলেটা বলত—বৌ।

বলেই খিল খিল করে হেসে উঠত মজা পেয়ে। একলা ঘরে সুন্দরীর সময় কেটে যেত হু-হু করে।

এমন সময় একদিন গঞ্জের বাজারে সুন্দরীর সন্নিসীর সঙ্গে দেখা।

—কিগো মান্যিবতী! এদ্দিন ছেলে কোতায়? ক্যানিঙের মোড়লদের বাড়ী ডোবাই-এর নাচ দেকা থেকে তোমার নেগে যে পাগল হয়ে ঘুত্তিচি। কেউ বলে জয়-নগরে। কেউ বলে হাজিপুরে। তিন তল্লাট ঢুঁড়ে ফেলাতি বাকি রাকিনি, মাইরী। হাঁটতি হাঁটতি হেঁটুর মালা ধরে গেল। জুতোর চামড়া খয়ে গেল।

—কে তোমাকে জুতোর চামড়া খোয়াতি বলেচে—?

শক্ত মুখে ভুরু কুঁচকে জবাব দেয় সুন্দরী। মুখ তুলে একবার সন্নিসীর দিকে চাইলও না। হঠাৎ সুন্দরীর মনে পড়ে এই লোকটাই ক্যানিং-এর মোড়লদের বাড়ী নাচের সময় পায়ের কাছে একটা চামড়ার ব্যাগ ছুড়ে দিয়েছিল। ঘরে বসে সেটা খুলতেই তার থেকে পাঁচটা করকরে দশ টাকার নোট বার হয়েছিল। তাই দেখে সহদেব মন্তব্য করেছিল—তোকে দেকে সুমুন্দির পোর ভাব নেগেচে সুন্দরী। এবার আমায় দেকচি নাটি হাতে পাহারা দিতি হবে।

সন্নিসী সঙ্গ ছাড়ে না সুন্দরীর। ঘরের দরজায় এসে বলে—সেই সুমুন্দির পো ঢলীটা ঘরে আচে নাকি?

ঝাঁজিয়ে ওঠে সুন্দরী। ঝামটা দিয়ে বলে—আচে না আচে তোমার দরকারটা কি? যাও সরে পড়। অত পীরিতে কাজ নি।

সুন্দরীর রকম সকম দেখে সন্নিসী সুড়-সুড় করে সরে পড়ে তখনকার মতো। যাবার সময় পরীর ঘরে খানিকটা বসে কি সব গুজ-গুজ ফুস-ফুস করে যায়। দুপুরে পরী আসে। বলে—দিদি হাতের নক্ষ্মি পায়ে ঠেলতিচিস। ঘরে নোক এসে নি তো খাবি কি?

কথাটা তখন মনে পড়ে সুন্দরীর। ডোবাই-এর বায়না আজ ক'হপ্তা বন্ধ। বায়না ধরত সহদেব। দরজায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার অভ্যাস সুন্দরী অনেককাল হারিয়েছে। দরজায় দাঁড়াতে ভাল লাগে না, মানে লাগে। এদিকে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। খাব কি?

সন্ধ্যাবেলায় আবার সন্নিসী এসে হাজির। হাতে প্রথম বর্ষার এই পেরায় এক ইলিশ মাছ। মাছটা দাবার একপাশে ধড়াস করে ফেলে সে কেঁচার খুঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খায়। ইলিশ দেখে সুন্দরী একেবারে মেনী [illegible]। তবু ভিতরের কথা বাইরে প্রকাশ [illegible] যায় না। একনজরে সে মাছটাকে দেখে নিয়ে তেতো গলায় বলে— মাছটা এখেনে ফেললে যে।

—ফেলব কমনে। আমার কি বারো গণ্ডা শোর বাড়ী আচে?

—আচে কি না আচে তুমিই জান।

—আমার তিনকুলে কেউ নি। তুমিই আদি। ঝল, ভাজা টক—

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সুন্দরী সন্নিসীকে। সহদেবের কাছে লাগে না। এটা তো একটা মন্দ নয়। যেন মেনীমুখো মানকে। রোগাটে শরীরটা। মাঝারি গড়ন। চেহারায় একটা গরুচোর গরুচোর ভাব। দূর!

তবু মনের ভিতরটাতে একটা কথা গিয়ে বেশ জোরেই ঘা মারে।—আমার তিন কুলে কেউ নিঃ। —অবস্থাটা সুন্দরীরই মতন। কিন্তু মনের কথা মনের মধ্যেই থাকে। বাইরে সে ফোঁস করে ফুঁসে ওঠে—ও আমার সাতজন্মের সোয়ামী রে। এলেন হুকুম কত্তি। বলি আমার পেচনে নেগেচ ক্যানে? বাজারে কি আর কেউ নিঃ?

—থাকবে না ক্যানে? তোমার মতন আর দেকলুম কৈ গো! দেকেই তো দয়ে মজলুম।

দাবার ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে জবাব দেয় সন্ন্যাসী। তারপর গায়ের থেকে মাটা খুলতে খুলতে বলে—সাতজন্মের হাঁতি পারি, এ জন্মের তো হাঁতি পারি, মি ইচ্ছে করলি। তাও যে সে নয় দস্তুর তন ওজগোরে ভাতর। এল কেম্পানীতে জ করি। এক আঁজলা ট্যাকা মাইনে াই।

জাঁক করতে থাকে সন্ন্যাসী। চট করে লার সুর বদলে অত্যন্ত করুণ করে বলে—বাড়ীতে খাবার লোক নিঃ। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

গরগর করতে করতে সুন্দরী মাছটা নিয়ে বঁটি পেতে বসে। গায়ের জ্বালার আপসানি দিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে মাছ কোটে। মনের ঝাল ঝাড়ে মাছের ঝালে, ঝাড়া বেশ কয়েক গণ্ডা ধানি লঙ্কা ঠুসে দিয়ে।

জানলা দিয়ে মন্দা চড়াইটা ফড়-ফড় করে ঘরে ঢোকে। ঠোঁটে তার কুটো। মাদীটাও সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে কিঁচির-মিঁচির করতে করতে। হেসে ফেলে সুন্দরী। সন্ন্যাসীর সেদিনকার দশা ঐ মন্দা চড়ুইটার মতন ছিল। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা এসে হাজির হত। হাতে হয় একটা ইলিশ মাছ, না হয় তো কলকাতার মণ্ডা, না হয় তো শাড়ী, টুকিটাকি যা হয় একটা কিছু। কুটো বইত সন্ন্যাসী। ঘর বাঁধার জন্য কুটো বইত।

কিন্তু সুন্দরীর মন পাওয়া সহজ ছিল

না। সন্নিসী এলেই সে পাশের বাসা থেকে পরীর ছেলেটাকে টপ করে তুলে নিয়ে এসে সন্নিসীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আদর করত। চটকাতো, চুমু খেত, তারই সঙ্গে বকে যেত। সন্নিসীর দিকে ফিরেও তাকাত না। সন্নিসী তা দেখে হাসত আর বলত—

পরের সোনা দিউনি কানে
কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে।—
ত্যাকন বড় নাগবে গো সুন্দরী।

ঝামটা দিত সুন্দরী। —পর হতি যাবে ক্যানে? পরী আমার মার পেটের বোনের বাড়া। তার সন্তান আমার পুত্র?

—নিজের এট্টা হলেই তো হয়।

লোভ দেখাত সন্নিসী।

হঠাৎ আবার বুকের ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দম আটকে আসে। হাঁস-ফাঁস করে সুন্দরী। বুক যেন ফেটে যেতে থাকে। —উঃ হ্যাচকা কি বিপুজ্জয় টানরে বাবা! কলজে পজ্জন্ত উপড়ে নে' ফেললে। আর ফেললে কিনা পরী! পরীর মনে শেষ পজ্জন্ত এই ছ্যাল?

পরীর ছেলেটার বাতাস লেগেছিল। দুদিন সমানে বমি আর পাইখানা। বন্ধ হয় না কিছুতেই। ঝাড়তে এসে বাগদীবুড়ি বললে—আটকুড়ি মেয়েছেলের নিশ্বেস লেগেচে।

ব্যস। শোনামাত্র সেই পরীর কি রণচন্ডী মুর্তি! যে দিদি ছাড়া কথা বলত না, তার মুখে কেবল আঁটকুড়ি হাপুতি ডাক। ঘর থেকে সুন্দরীকে যাচ্ছে তাই করে দূর করে দিলে। বলে কিনা—মার চেয়ে দরদ বেশী তারে কয় ডান। তারপর থেকেই দেখলে কেবল—দূর দূর, বেরো বেরো। ধর ঝাঁটা মার ঝাঁটা। মনের ঘেন্নায় সন্নিসীর হাত ধরে সুন্দরী বললে—আমায় একান থে যেতায় খুশী নে চ সন্নিসী। একেনে আমি আর থাকবুনি।

—কিন্তু আমি তো জন্মের আঁটকুড়ি। ইচ্ছে করেই নিজের সব্বোনাশ নিজে করিচি। ওরে কি পাপ করিচি রে!

বুকের ওপর দুম-দুম করে কিল চড় মারে সুন্দরী। মাথার চুলগুলো চড়চড় করে ছেঁড়ে। তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

—কেউ আমায় জেবনে মা বলি ডাকবেনি। নোকোলায় মুক দেকবে নি আঁটকুড়ির। অফলা, অজম্মা গাচের মতন হয়ে অইলি সুন্দরী। তোর মরণ ভাল।

সন্নিসী সুন্দরীকে তার পৈত্রিক ভিটেতে এনে তুলেছিল ক্যানিং-এর বাজারের কাছে। তারপর সেখান থেকে ওই নতুন বাড়ীতে গাঙ ধারে।

সন্নিসী একের পর এক ডাক্তার বদ্যি ডাকে। ওষুধ ইঞ্জেকশন চলে বেশ কিছু দিন। সুন্দরীকে সান্ত্বনা দেয়।—ভাবনা করিস কিসের নেগে? চিকিচ্ছেতে ওসব ব্যায়রাম ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে-পিলে হবে।

চিকিৎসা চলে বছর খানেক। কিন্তু কিছুই কিছু না। শেষে হাসপাতালের এক ডাক্তার বলে—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাও অপারেশন করাও। বাচ্চা হবে। সন্নিসী তাতেও পেছপা নয়। সুন্দরী কিন্তু হতাশ হয়। বলে—আমার আর কিছু হবে নি রে সন্নিসী। তুই আমায় তেয়াগ দে' আর এট্টা ভাল মেয়ে বে' কর।

সন্নিসী তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে। বলে—অনেক খুঁজে তোরে বার করিচি সুন্দরী। তুই আমার সব্বস্ব। তোরে তেয়াগ দে' আমার জেবনে ধিক! ব্যাটা-বিটী কি আমার ছেরাদ্দের পিন্ডি চটকাবে?

তারপর সুন্দরীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়— তুই দেকিস কল-কেতার বড় ডাক্তারের চিকিচ্ছেতে ছেলে হয় কিনা।

কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ করে সন্নিসী। এ ডাক্তার থেকে সে ডাক্তার। বড় বড় নাম, বড় বড় তকমা। সুন্দরী বলে—বড় বড় দালান কোটায় বসে। সায়েব-সুবো সেজে হোক্কামী করে। আসলে সব গো-বদ্দি। চিকিচ্ছে জানে না ছাই। কেবল শরীলের একেনে টেপে সেকেনে টেপে। হেতায়-হোতায় হাত গোঁজে। ম্যাগোঃ। নাজে মরি। আর কতায় কতায় ফেল কড়ি। তাই কি এক-আধটা টাকা। আঁচলা আঁচলা।

শেষে অপারেশন হল সুন্দরীর হাস-পাতালে। হাসপাতালের ডাক্তার ভরসা দিলে এবার ছেলেপিলে হবে।

—জোচ্চোর মিনসে, জোচ্চোর তার সাতপুরুষ। হাড় মিথ্যেবাদী না হলি কেউ অমন কতা বলে? দু বচর হতি চলল ছেলে-পিলের কোতায় কি!

আসলে ডাক্তার যে সন্নিসীকে বলে দিয়েচে সুন্দরীর জীবনে ছেলেপুলে হবে না, ওর গর্ভ ধারণের ক্ষমতাই গেছে নষ্ট হয়ে, সে কথা সন্নিসী প্রাণধরে সুন্দরীকে বলতে পারেনি।

সুন্দরীর ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করার বাতিক বেড়েছে ভীষণভাবে। কোথায় দক্ষিণে কেশবেশ্বর সুন্দরী ছোটে সেখানে। হত্যে দেয়। বুক চিরে রক্ত দেয়। কোথায় পাঁচুঠাকুর, কোথায় ধম্মঠাকুর। তিন তল্লাটের কোন ঠাকুর দেবতা বাদ যায় না। তাছাড়া উপোষ তিরেশ তো লেগেই আছে।

জীবন বড় নিঃসঙ্গ বড় নিরর্থক মনে হয় সুন্দরীর। লোকালয় ছাড়িয়ে বাঁধের ওপর নিরালা এই বাড়ীটাতে তার এই নিঃসঙ্গতা আরও বেশী করে তার বুকে চেপে বসে। ভয়াবহভাবে দুঃসহ মনে হয়। কাছে পিঠে জনমনিষ্যির বাস নেই। মাতলার গাঙের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকে চুপ করে। ঘরের মধ্যে গাঙ থেকে ছুটে আসা হাওয়া বইতে থাকে ঝলকে ঝলকে। গায়ে মাথায় লুটোপুটি খায়। দেওয়ালে টাঙান হরেক রকমের ক্যালেন্ডারে রাজ্যের শিশুদের ছবি। কোনটায় ননীচোরা বালগোপাল। কোনটায় কোন রেডিও কোম্পানীর বিজ্ঞেপনের হাসি-ভরা এক ফুলের মতো ফোটা শিশু মুখ। কোনটায় বেবি-ফুডের বিজ্ঞাপনে স্তন্যপানরত শিশু। ক্যালেন্ডারগুলো ফট-ফট করে হাওয়ায় ওড়ে। সুন্দরীর কিন্তু সেদিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করে না। ও ঘোলে আর কতদিন দুধের সাধ মেটাবে সুন্দরী। মাতলার গাঙের উল্টো দিকটায় অনেকখানি চড়া পড়ে গেছে। সুন্দরীর মনে হয়, তার জীবনটাও অমনি শুকনো, চড়াপড়া।

সেদিন ছুটি। ঘরেতে সন্নিসীকে রেখে সুন্দরী গিয়েছিল স্টেশনের কাছে পদা বাগদীর বাড়ী। পদার আঁটকুড়ী বৌ সৈরুবির সঙ্গে তার ভাব। তার ঘরে এক পাল বেড়াল।

সৈরুবি বলেছিল—[illegible] পোষ গো দিদি। বেড়াল হল মা ষষ্ঠির বাহন। বেড়াল পুষলি মা ষষ্ঠি খুশী হবে। কোল ভরে দেবে।

সৈরুবির বাড়ী থেকে দুটো মখমলে বেড়ালবাচ্চা আঁচল চাপা দিয়ে নিয়ে আসছিল সুন্দরী। [illegible] মনে মনে গাল পাড়ছিল।—মর [illegible] একপাল বেড়াল পুষিচিস, এদিকে [illegible] দেবার খেমতা নেই। আহা কেষ্টের [illegible]। কি দশা। এতে মা ষষ্টি খুশী [illegible] না ছাই? মুয়ে আগুন তোর।

ঘরে পা দিতেই [illegible] চোখে মহামারী কান্ড। একটা বড় লাঠি হাতে সন্নিসী সারা ঘর তোলপাড় করে চড়ুই [illegible] তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর চড়ুইগুলো [illegible] পেয়ে প্রাণ-ব্যাগা-ত্যায় চেঁচাচ্ছে আর ঘরের এক দিক থেকে অন্যদিকে পাগলের মতো [illegible] হুড়োউড়ি করচে।

সুন্দরীকে দেখে সন্নিসী লাঠি হাতেই এগিয়ে আসে। —অ্যা[illegible]ই তোর জন্যে। নৈলে শালার চড়ুই [illegible] গুষ্টির দপ নিকেশ কত্তুম অ[illegible]ক আগেই। দ্যাখ গুয়োটার জাত কি ক[illegible]রেচে?

সুন্দরী দেখে সন্নিসীর অনেক সখের দুধ খাবার ফুল তোলা কাঁচের বাটি তাকের ওপর থেকে মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই চড়ুইগুলোর কান্ড।

সুন্দরী সন্নিসীর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। বলে—হেই সন্নিসী, তে ব্যাগেত্তা করিচি। এট্টু ঠান্ডা হ। চড়ুইদের দুষব কি, দোষটা তো আমার। বাটি মনের ভুলে তাকের এক ধারে একে গিছি।

—ওসব আমি জানি না। ও হারামজাদা চড়ুইগুলোকে আজ আমি হয় বিদেয় করব নৈলে মেরে নৈনেত্য করব। তোর কে কতা আমি শুনতিচি না। হুঙ্কার ছাড়ে সন্নিসী। কিন্তু সুন্দরী আজ অ[illegible] ঝাঁঝিয়ে ওঠে না। বলে—ও কতা বলা নেই রে, অমঙ্গল হবে। শোন—

সন্নিসীর কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মাথা তার বুকের কাছে এনে নীচু সুরে বলে তোরে আগে বলি নি! গেল মাসের [illegible] আমার চান বন্দ।

সুন্দরীর কথা শুনে সন্নিসীর মুখ হাঁ হয়ে যায়। হাতের থেকে লাঠিটা খসে পড়ে যায় মেঝের ওপরে।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ওপরে উঠতে উঠতে বাড়িটা সত্যিই ভুতুড়ে বলেই মনে হল।
এত বড় বাড়ির এই সিঁড়ি!
আসল বড় সিঁড়ি আছে — তবে সেদিক এখন বন্ধ!
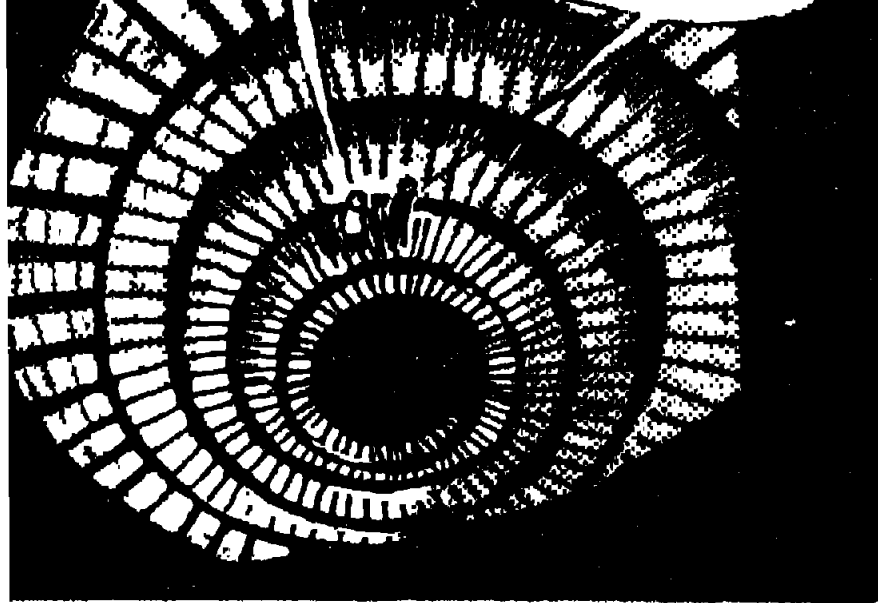
আর একটু উঠতেই আলোটা দপ দপ করে নিভে গেল।

আলোটা নিভে গেল যে!

—একটু পা ফসকালে এ অন্ধ কূপেতে পড়ে মরতে হবে। একটা দেশলাই ও সঙ্গে নেই।

পরাশরের ভেলকিটা আবার দেখা গেল। হঠাৎ একটা আলোর ঝলক।
দরকার নেই দেশলাইএর!

তবু ধাপগুলো দেখে নিলাম। কিন্তু এ ভেলকিতে ট্যাক্সিওয়ালা জব্দ হল কি করে?

ফটো নিয়ে পুলিশে দেবে এই ভয়ে। এটা যে শুধুই ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ তাও জানে না!

সেই আলোর ঝলকেই ওপর পর্যন্ত উঠে এসে —

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ললিতকলা আকাদেমি ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে গত ৯ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের উত্তরের গ্যালারিতে পূর্ব জার্মানীর শিল্পী কে, ই, মুলারের ভারত ভ্রমণ শীর্ষক একটি চিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনকালে পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি নতুন তথ্য শোনান। একটি হল শিল্প সমালোচকেরা না দেখে শিল্প সমালোচনা করেন ও দ্বিতীয়টি হল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী এখনো নাকি যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণের জন্যে নয়। গত ৯।১০ বছরের অভিজ্ঞতায় এটুকু বলতে পারি, না দেখে শিল্প সমালোচনা করেছেন এমন কোন সমালোচকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত পরিচয় হয়নি এবং দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে এটুকু জানি যে কলকাতা শহরে দর্শনী নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী বছরে কটা হয় তা বোধ হয় এক আঙুলেই গুণে বলা যায়। অ্যাকাডেমির রবীন্দ্র গ্যালারি, বার্ষিক প্রদর্শনী এবং অন্যান্য দু-একটি প্রদর্শনী ছাড়া কোথাও দর্শনী নেওয়া হয় না, হলে শিল্পীদেরও কিছুটা উপকার হতে পারত। জনসাধারণের সব অংশই এখানে এসে শিল্প প্রদর্শনী দেখে যেতে পারে এবং অনেক সময় যায়ও। যারা ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা, 'ভিকটোরিয়া-মেমোরিয়াল', 'মরা সোসাইটি' দেখে বেড়ায় তারাও আজকাল মাঝে মাঝে অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হয়। বারণ করবার কেউ নেই এবং করার কোন কারণও নেই। আরো বেশী লোক যদি আনতে হয় তবে এক গেটের সামনে মেগাফোন লাগিয়ে ডাকাডাকি করা ছাড়া ত কোন পথ দেখছিনে। তবে একটা কথা জানি যে মন্ত্রীমশায় বা অতি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী বা বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপতিরা এই ভবনে কদাচিৎ পদার্পণ করেন—হয়ত উদ্বোধনী ভাষণ দিতে আমন্ত্রিত না হলে তাঁরা পদার্পণ করবার সময়ই পান না। বরং এঁরা যদি কখনো কখনো আসেন ত শিল্প ও শিল্পীদের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিনে একটু ওয়াকিবহাল হয়ে যেতে পারেন—তাতে উভয়েরই লাভ হবে।

এখন চিত্রের বিষয়ে আসা যাক। যা দেখেছি তাই লিখছি। প্রদর্শনীর সুমুদ্রিত বৃহৎ ক্যাটালগে ৭২ খানি ছবির উল্লেখ আছে। শিল্পী ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে ভারত ভ্রমণ করে যে ছবিগুলি এঁকেছেন তার একটি নির্বাচিত অংশ এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীমুলারের শিল্পকর্মকে পূর্ব জার্মানীর সোসাল রিয়্যালিস্টিক আর্টএ বিশিষ্ট অবদান বলে ধরা হয়। এবং ক্যাটালগের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতীয়েরা কি তাঁর শিল্পের মুকুরে নিজেদের চিনতে পারবেন? হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন। এবং বিশিষ্টভাবে চিনতে পারবেন। টাইমস্ অব ইন্ডিয়া অ্যানুয়াল-গুলির সঙ্গে যাঁদেরই পরিচয় আছে তাঁরা খুব সহজেই চিনতে পারবেন। শ্রীমুলার প্রধানতঃ গ্রাফিক শিল্পী। তাঁর কলমের সূক্ষ্ম রেখাপাতে এচিংএর আমেজ পরিষ্কার। ভারতীয় বলতে ময়লা রং, সরু গলা, বড় মাথা বেগুনচেরা চোখ, মস্তবড় পাগড়ি প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁট ইত্যাদি প্রায় প্রতিমা লক্ষণের মতই ব্যবহৃত হয়েছে। আগাগোড়া সূক্ষ্ম রেখার ভাল ইলাস্ট্রেশন। পথপ্রান্তে পতিত ভিক্ষুক মূর্তিটি বেশ সেন্টিমেন্টাল। বাঙলা ও মাদ্রাজের দু-একজন তরুণ শিল্পীর গ্রাফাইট পেন্সিলে আঁকা প্রতিকৃতি প্রায় একইরকম। আমাদের নিখিল বিশ্বাসকে গ্রাফাইটে সোস্যালি রিয়্যালাইজ করার পর আর চেনা যায় না। তিনখানি ছবি বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ লাগল—মাদ্রাজের এক বৃদ্ধা মহিলা, পথের কুকুর ও একটি ময়ূর। এখানে শিল্পী একটা বিশেষ অনুভূতি দর্শকের মনে সঞ্চারিত করতে সাফল্য লাভ করেছেন। কালি-কলমের সূক্ষ্ম রেখা ও একটু সিপিয়া ওয়াশের ছোঁয়া ছবি-গুলিকে মাধুর্যমন্ডিত করেছে।

জলরঙ ও তেলরঙের কাজগুলিতে কিন্তু এই দক্ষতার একান্ত অভাব দেখা গেল। কোথাও কোথাও অগুস্ট ম্যাকে কি ক্রিশ্চিয়ান রোলফ্‌স্ বা একটুখানি সেজানের ছোঁয়া দেখা যায় কিন্তু বিশেষ একটা দ্যোতনা নিয়ে ফুটে ওঠে নি। হারমোনিয়াম হাতে ছেলে, ফলওয়ালা, প্রাচীন শিল্পদ্রব্য বিক্রেতা, সেকেন্দ্রা, ফুল-ওয়ালা ইত্যাদি ছবিতে আধুনিক রীতির গা ঘেঁষে বা গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টায় খুব একটা জোরালো কাজ দেখা গেল না যদিও রঙের প্রয়োগনৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে। তেলরঙের কাজগুলি বড় কাঠ কাঠ এবং রঙও কাঁচা কাঁচা, বোম্বায়ের বাড়ি-তৈরীর কাজে মজুরনী, আগ্রার মুটে, মাদ্রাজের পুলিশ খুব ছোট কাজ। বড়-মাপের মাদার ইন্ডিয়া ইলাস্ট্রেশন ঘেঁসা ছবি। এক বৃহদায়তন মহিলা তিনটি বড় বড় চোখের ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় পরিবার পরিকল্পনার পোস্টার। কালি-কলমের কাজে মাধ্যমের ওপর শিল্পীর যে ক্ষমতা দেখা গেল এখানে তার চিহ্ন বিশেষ পাওয়া গেল না। সম্ভবত গ্রাফিক শিল্পেই তিনি নিজেকে কিছুটা আবিষ্কার করেছেন।

শিল্পচর্চায় নতুন এক যন্ত্রের আবির্ভাব হচ্ছে। জিনিসটি হল কম্পিউটার। ইতিপূর্বে কম্পিউটার দিয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়েছিল। গতবছর লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব কন্টেম্পরারি আর্টস কম্পিউটারে আঁকা ড্রইং-এর প্রদর্শনী করে দেখান যে, এতে মানুষের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশী নিখুঁতভাবে কাজ করা যায়। এবারে হ্যানোভারে দুশর ওপর কম্পিউটারে আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেল।

কম্পিউটারে করা আধুনিক ড্রয়িং-এর নমুনা দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত এবং হতভম্ব হয়েছেন। অনেক ছবিই প্রথম দর্শনে একটু ফাঁকা ফাঁকা ডেকরেশন বলে মনে হয়েছে। অনেক ছবিতে পেঁচালো ফর্ম, থাড়াই ফর্ম এবং শঙ্খের চিত্র, জাফরি কাটা নকশা বা গোলাকার রেখার নমুনা দেখা [illegible]। এদের কোন রকম শিল্পগোষ্ঠী[illegible] করা সম্ভব হয় নি। তবে এটুকু বোঝা গেল যে, আপাততঃ ভবিষ্যতে কম্পিউটারে তৈরী রঙগীন নকশা যন্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা চলবে। কম্পিউটারে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবি করাও সম্ভব হয়েছে। জার্মানী, জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ক্যানাডা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। যন্ত্রশিল্প যে ভাবে কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে তাতে ভবিষ্যতে শিল্প কি রূপ নেবে তা বলবার সময় যদিও এখন আসে নি তবু দুটি কথা স্বভাবতঃই মনে পড়বে। একদা প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণের চেষ্টায় ক্লাসি-কাল নিসর্গ দৃশ্য ও প্রতিকৃতি চিত্রণ উদ্ভব হয়েছিল। ক্যামেরার আবিষ্কারের ফলে তার অনেকখানিই যন্ত্রশিল্পের হাতে চলে গিয়েছে। শিল্পীরা পরের যুগে বিমূর্ত শিল্পের সৃজন করতে থাকে তাহলে শিল্পীরা কোথায় দাঁড়াবেন। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সীমা এখনো পরিমাপ করা যায় নি। তাই ভবিষ্যতে সে যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে না একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

অঙ্গনা

শিল্পশ্রীর প্রদর্শনী/মীরা চৌধুরী, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী ঠাকুর। নীচে প্রদর্শনীর একাংশ। ফটো : অমৃত

ফিতা কাটতেই ধীরে ধীরে পর্দাটি সরে গেল। প্রদর্শনী স্পষ্ট হলো। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান দেশী-বিদেশী দর্শককে মুহূর্তে হলঘরটি ভরে গেল। শিল্পশ্রীর শিল্পের খ্যাতি আছে জানা ছিল, কিন্তু এই উপচে-পড়া অনুরাগীর সংখ্যা জানা ছিল না। রজত-জয়ন্তী বর্ষে শিল্পশ্রীর প্রদর্শনীতে এসে এটা একটা মস্ত লাভ।

পঁচিশ বছরে উপনীত শিল্পশ্রী আনন্দে ডগমগ হয়ে তার সামগ্রিক সাধনা দর্শকের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে অসংখ্য জিনিস। তার মধ্যে মিরর ওয়ার্ক-ই' সবচেয়ে বেশি। জামা থেকে জুতো এই কাজ। কোথাও দৃষ্টিকটু নয়। সর্বত্রই নয়নাভিরাম। নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত অনেকগুলি ডিজাইনের উপর রং-এর প্রয়োগ এসম্পর্কে সুগভীর ভাবনা-চিন্তার পরিচায়ক। এসবের উৎস আমাদের প্রাচীন শিল্প। যেখান থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি, শিল্পশ্রী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আবার আমাদের সেখানেই নিয়ে গেছে। এজন্য আমরা রীতিমত গর্বিত।

তোরণের দৃশ্যসজ্জাটি খুবই চমৎকার। এ-ধরণের কাজ মাত্র একটি। জুটের কাজের দু-একটি নিদর্শনও যথেষ্ট প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। টেবিলক্লথ, বিভিন্ন ধরণের টি-কোজী, কাজ করা লেডিজ ব্যাগ, অ্যালবাম সবই আছে। সেই পরিচয়েও শিল্পশ্রী অনন্য।

শিল্পশ্রীর রজত-জয়ন্তী সমবেশে সবই স্বতন্ত্র উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। একটি পর্দায় কাজ এবং রঙের বিন্যাস প্রতিটি দর্শককে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখে। শিল্পশ্রীর সর্বাধুনিক অবদান কাচের কাজ করা জুতো। এ জুতো তৈরি করে বাটা। তার পরের কাজ এখানকার। সে কাজে এই জুতো বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

১৯৩৪ সাল থেকে প্রতিষ্ঠার পর শিল্পশ্রী যেসব কীর্তিতে উজ্জ্বল তার প্রায় সবই এই প্রদর্শনীতে আছে। কোনটাই বাদ যায়নি। তবে ইদানিংকালে বাটিকের চর্চা আর এই শিল্পকেন্দ্রে হয় না। তাই বাটিক অনুপস্থিত। যদিও বাটিকের পথিকৃৎ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। সর্বত্র বাটিকের ভীড়ে অন্য সবকিছু হারিয়ে যায়। এই বাটিক বর্জনে দর্শক যেমন অনেকখানি রিলিভড তেমনি অন্যান্য শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপও প্রশংসনীয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় বললেন, শিল্পের যে প্রতিশ্রুতিকে শিল্পশ্রী পূর্ণ করেছে তা আজও শেষ হয়নি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে শিল্পশ্রী নিজ প্রচেষ্টায় অনলস থাকবে এটাই হলো আজকের দিনের কামনা।

প্রদর্শনীর সর্বত্র একটি মুখ। সকলের সঙ্গে মিশছেন, কথা বলছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পঁচিশ বছর আগে যেমন আজো তেমনি। বিরামবিহীন। ক্লান্তি তাঁর কাছে হার মেনেছে। তিনি শিল্পশ্রীর কর্ণধার শ্রীমতী মীরা চৌধুরী।

১৯৪৪ সালে মাত্র ২৫০ টাকা সম্বল করে শিল্পশ্রীর সূচনা করেন শ্রীমতী চৌধুরী। নিজের বাড়ীতেই শিল্পকেন্দ্র। মাত্র দশজন কর্মী নিয়ে শুরু। এঁরা সকলেই এসেছিলেন অভাব-পীড়িত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। দেখতে দেখতে কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেল। এই বছরেরই ডিসেম্বরে তিনি আয়োজন করলেন প্রথম প্রদর্শনীর। আর সে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাংলার গভর্ণরের পত্নী লেডি কেসী। উদ্বোধন করতে গিয়ে বিমুগ্ধ লেডি কেসী বলেছিলেন, 'আই থট ইট উড বি গুড, বাট আই নেভার রিয়েলাইজড ইট উড বি সো গুড।' যাত্রার শুরুতেই এত-

খানি সাফল্য আশাতীত। কিন্তু শিল্পশ্রী এবং যাঁরা চৌধুরীর জীবনে তা সত্য।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীরাজগোপালাচারী বলেন, দিস ইজ এ পোয়েট্রি, দিস ইজ মিউজিক।

শিল্পশ্রীর শিল্পসৃষ্টি সত্যি কবিতা-সঙ্গীত। দেশ নয়, বিদেশেও এই শিল্পের খুব কদর। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে এখনও কিছু কিছু জিনিস নিয়মিত যায়।

আগে কর্মী মেয়েরা শ্রীমতী চৌধুরীর বাড়িতে বসেই কাজ করতেন। দশটায় এসে পাঁচটায় যেতেন। কর্মী মায়েদের সঙ্গে আসতো তাঁদের ছেলেমেয়েরা। মায়েদের কাজ দিয়ে শ্রীমতী চৌধুরী ও'দের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসতেন। এমনিভাবে চললো অনেকদিন। তারপর বয়স-এর ভার চেপেছে শ্রীমতী চৌধুরীর উপর। আজ আর তাই বাড়িতে বসে কাজ করানো সম্ভব হয় না। তিনি ওদের কাজ দিয়ে দেন। ডিজাইন বুঝিয়ে দেন। সপ্তাহে একবার এসে ও'রা কাজ দিয়ে আবার নিয়ে যায়। ২৫টি কর্মী মেয়ে এখন শিল্পশ্রীর সঙ্গে যুক্ত।

বয়স বেড়েছে সত্য। কিন্তু শ্রীমতী চৌধুরী তা মানতে চান না। নিত্য নতুন ভাবনা তাঁর মাথায়। যা ভাবেন সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইন করেন। তারপর প্রয়োগ। রঙের বিন্যাস। একটি মুহূর্ত তাঁর জিরোবার সময় নেই। সিলভার জুবিলীর আনন্দ-মেলায় তাই তিনি চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সকলকে আপ্যায়ন করেছেন, মিষ্টি হেসে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। আর সবাইকে বলছেন, পাড়ায় পাড়ায় এমনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। এতে শিল্পভাবনা রূপ পাবে আর দুঃস্থেরও সেবা হবে।

—প্রমীলা

বেতারশ্রুতি ‖ অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত ১০টা ৫ মিনিটে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবরে বলা হল, ভারত সরকারের শিল্প-নীতির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পরের দিন সংবাদপত্রে দেখা গেল, পরিবর্তনটা শিল্পনীতির নয়, শিল্প লাইসেন্স নীতির। দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ভারত সরকারের ১৯৪৮ সালে গৃহীত শিল্পনীতি ১৯৫৬ সালে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারপর আর তার পরিবর্তন হয়নি। হয়েছে শিল্প-লাইসেন্স নীতির।

২০শে ফেব্রুয়ারী বেলা আড়াইটের 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার' কথা শোনালেন শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কী উপযোগিতা, কেমন হবে এই গ্রন্থাগার, চলবে কীভাবে—সবই বেশ বিশদভাবে আলোচনা করলেন তিনি। ভালো লাগল। কিন্তু আলোচনার শেষটা যেন হঠাৎ এসে গেল।

এই অনুষ্ঠানে এর পরের আলোচনা 'ডলটনের পরমণুবাদ' নিয়ে। কিন্তু ঘোষণায় শোনা গেল ডালটনের পরমাণুবাদ। বক্তা শ্রী ভানু নায়ক ডালটন আর ড্যালটন দুই-ই বলেছেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডলটন আমাদের এখানে অনেকের কাছে ডালটন হয়েছেন, আবার অনেকের কাছে ড্যালটন (যেমন আমাদের সার সি ভি রামন্ আমাদেরই হাতে হয়েছেন রমণ), কিন্তু ডলটন শ্রীনায়কের কাছে একসঙ্গে ডালটন আর ড্যালটন দুই-ই হলেন কী করে? যা-ই হোক, তাঁর আলোচনাটা কিন্তু ভালোই লেগেছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে 'বাংলার নাট্যকার'—এই পর্যায়ে মধুসূদন সম্পর্কে বললেন শ্রীদিলীপ মৌলিক। শ্রীমৌলিকের কথিকাটি ছিল প্রধানত আজকের নাট্যনিরীক্ষার সঙ্গে মধুসূদনের যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর সৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন নিয়ে। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে মধুসূদনের সামগ্রিক নাট্য-সাধনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু তবু শ্রীমৌলিক এই স্বল্প পরিসরে মধুসূদনের নাট্যকর্মের একটা স্পষ্ট চিত্র দিতে পেরেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর বেতারের উপযোগী এবং বাচনভঙ্গি সুন্দর।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় লোক-গীতি শোনালেন শ্রীমন্মথলাল দাস। লোক-গীতির স্বরূপটি পাওয়া গেল তাঁর গানে। ...সওয়া ৮টায় আধুনিক গান গাইলেন শ্রীমতী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়। কান্না ছিল না মোটে—বেশ স্বচ্ছ, স্পষ্ট। আধুনিকের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল।

এইদিন বেলা ১টায় রূপ ও রঙ্গের আসরে কৌতুক নকশা 'অথ প্রণয় কথা'। রচনা শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিতৃতুল্য মামা। মামার অফিসেই ভাগ্নে কাজ করে। মামার এক সুন্দরী পি-এ আছে। তার প্রতি মামা-ভাগ্নে দুজনেই আসক্ত। দুজনেই তাকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিও দুজনের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলে এবং দুজনকেই বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি করে।

একই দিনে একই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে একই মেয়ের সঙ্গে মামা-ভাগ্নের বিয়ে। দুজন [illegible] ঘরে বসে জয়ন্তীর [illegible] অপেক্ষা করছে [illegible] সময় গড়িয়ে যায়, অপেক্ষা আর শেষ হয় [illegible] জয়ন্তী আর আসে না।

শেষে ঘটনা[illegible] মামা-ভাগ্নের [illegible] হয়ে গেল। [illegible] হতেই সন্দ-উপসন্দের লড়াই বাধে আ[illegible]ক! কিন্তু বাধল না [illegible] রহস্য উদ্ঘাটিত [illegible]। জয়ন্তী বিবাহিতা [illegible] বিকৃতমস্তিষ্কা। [illegible]

কৌতুক ন[illegible] নামে সাধারণ যেসব ছ্যাবলামি [illegible] ন্যাকামি পরিবেশন করা হয়ে থাকে, [illegible] প্রণয় কথা' তার [illegible] কিছুটা ব্যতিক্রম। [illegible]নীতে অভিনব[illegible] থাকলেও এবং ত[illegible]রাল না হলেও [illegible] মধ্যে একটা গতি [illegible] ছিল। সেটা ভা[illegible] লেগেছে। কিন্তু [illegible]ীকে বিবাহিতা [illegible] বিকৃতমস্তিষ্ক ক[illegible] রসের ভাণ্ডারে [illegible] ঘাটতি পড়েছে। শেষটা রসমণ্ডিত [illegible] পারেনি। অভিনয় ভালোই। কৌ[illegible] জমেছিল মন্দ না।

২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় [illegible] জগতের অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী প্র[illegible] হবার কথা ছিল 'পশ্চিমবঙ্গে উ[illegible] পরিকল্পনা' বিষয়ে একটি কথিকা। [illegible] প্রচারিত হয়েছে গ্র্যামোফোন [illegible] শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভক্তিমূলক গান। ঘোষণায় এই পরিবর্তনের কারণ দূরে থাকুক, পরিবর্তনের কথাটা [illegible] স্বীকার করা হয়নি। তাহলে কি [illegible] ধরে নেবেন, বেতার কর্তৃপক্ষের ভক্তিমূলক গানই উন্নয়ন পরিক[illegible] বিষয়ক কথিকা?

২৫শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা [illegible] মিনিটে রাগপ্রধান গান শোনালেন [illegible] নির্মলা মিশ্র। আধুনিক গানের [illegible] হিসাবে শ্রীমতী মিশ্রের কিছুটা নাম [illegible] সেই কারণে কিনা জানি না, ত[illegible] রাগপ্রধান গানকে আধুনিক গানেরই সারণ বলে মনে হল।

এইদিন বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে [illegible] থেকে প্রচারিত খবরে বলা হল...'ত[illegible] মৃদু ভূকম্প অনুভূত হয়েছে।' অ[illegible] অমৃত-য়ের পাঠকরা কী বলেন?
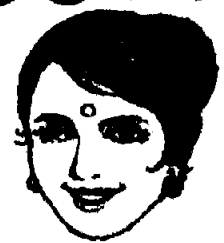
জলসা

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র …পাধ্যায় আয়োজিত বাসভবনে একটি …জ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখের … রাখে। …সংগীত-নায়ক শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। …ুকরণীয় ভঙ্গি ও মেজাজে তিনি পরি-…ন করলেন কামোদ, কাফি ও ভৈরবী। …র বিদ্যুৎগতি ও আপন স্বকীয়তা …দের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য শিল্পীদের … ছিলেন ভি জি যোগ ও মীরা বন্দ্যো-…য়। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়জয়ন্তী— …দিয়ে শোনবার মত। আসর শেষ হয় …নু ভ্রাতৃদ্বয়ের 'মালকোষ' দিয়ে। শ্রোতা-… ওস্তাদ আমীর খাঁর উপস্থিতি …রের মর্যাদা বাড়িয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যো-…য়, সংগীতপরিচালক শ্রীঅমল চট্টো-…য়, শ্রীশঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমান ঘোষ …রিমল চৌধুরী, শ্রীগোলাম কুদ্দুস এই …ষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

…ত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান

সম্প্রতি সংগীত পরিষদের দ্বিতীয় …ক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট তরুণ শিল্পী …ণলাল নাগ সেতার বাজিয়ে শোনান। …ন তিনি শ্যামকল্যাণ রাগে আলাপ জোড় …ঝালা বাজান, পরে পিলু রাগে গৎ …য়ে শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দান …। তবলায় সহযোগিতা করেন প্রখ্যাত …শী শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য। বিশেষ করে … ও সাথসংগতের সময় সমস্ত আসরটি … জমে ওঠে। শ্রোতাদের বিশেষ অনু-… শিল্পী পরে বাহার ও একটি ঠুংরী …ন।

সংগীত পরিষদের এই অনুষ্ঠানে প্রথমে …শিল্পীরা ও ডিপ্লোমা বিভাগের মেয়েরা …নি সমবেত রবীন্দ্রসংগীত শোনান। পরে …তী মঞ্জু দাস ও শ্রীমতী মধুমাধবী …ার্য 'মন্দিরে মম আসিল কে' ধ্রুপদাঙ্গ …ট পরিবেশন করেন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল …পাধ্যায় শিল্পীদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে …দের কর্মপন্থার বিবরণ দেন। সিঁথি. …নগর ও দমদম অঞ্চলে এই জাতীয় …প্রতিষ্ঠান খুব অল্পই আছে বলে … মন্তব্য করেন।

…নিকের রবীন্দ্র নাট্যোৎসব

…ত সপ্তাহে (১৬—১৯ ফেব্রুয়ারি) …সদনে বৈতানিক গোষ্ঠি রবীন্দ্র …ৎসব অনুষ্ঠান করলেন। তার মধ্যে …ীকি প্রতিভা' প্রকৃত রবীন্দ্র-নাটক। … তিনটি—শকুন্তলা, ক্ষুধিত পাষাণ ও …ন্য ক্ষতি রবীন্দ্রনাথের গল্প, কথা ও …ত অবলম্বনে তৈরী নাটক। প্রাচীন …তা রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার যে অনবদ্য …চনা করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে বৈতানিকের শ্রীমতী নন্দরাণী চৌধুরী শকুন্তলা নৃত্যনাটক তৈরী করেছেন। কথা ও গানে এবং নৃত্যপরিকল্পনায় শকুন্তলাতে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষিত শকুন্তলা নৃত্যনাট্যের পরিবেষণ এই প্রথম। নাটকটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। শকুন্তলার ভূমিকায় অলকনন্দা চাকলাদার ও দুষ্মন্তের ভূমিকায় সাধন গুহ যথাযথ। বাল্মীকি প্রতিভা বহু অভিনীত হলেও বৈতানিকের শিল্পীরা এই অপেরা-আশ্রিত নাটকটি নিপুণভাবেই অভিনয় করেছিলেন। বাল্মীকি ও প্রথম দস্যুর ভূমিকায় অভিনয় প্রশংসনীয়, নাট্যনির্দেশনায় অমল ভট্টাচার্য ও সংগীত-পরিচালনায় খোকন মজুমদার কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। 'ক্ষুদিত পাষাণ' সে তুলনায় নিষ্প্রভ। এর নাটকীয়তা পরিস্ফুটনে আরও

বৈতানিকের নাট্যোৎসবে শকুন্তলা নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্যে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। সংগীত ও আলোর ব্যবহার প্রশংসা করবার মতো। সামান্য ক্ষতির নাট্যরূপ দিয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্যনির্দেশনায় ছিলেন শ্রীমতী ঠাকুর। কবিতাটির বক্তব্য সংগীতে, নৃত্যে ও সংলাপে যথাযথভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। নৃত্য পরিকল্পনাও ছিল হৃদয়-গ্রাহী। রাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী মধুচ্ছন্দা পালিত চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে-ছিলেন। সংগীতের ব্যবহারও হয়েছিল সুনিপুণ। চার দিনের অনুষ্ঠানে বৈতানিক তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

মহত্বতী শিশুশিল্পীত্রয়। মুক্ত নীল আকাশে তারার ঝিকিমিকি তারই নীচে অসংখ্য শিশু-দর্শক বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছে তাদেরই বয়সী তিনটি শিশুশিল্পীর নৃত্য ও সংগীত। মিষ্টি নামের মালহোত্রা ভগ্নীত্রয় সোনু, গীতা ও মীরা প্রতিবছরের মত এবারও শহরের বিভিন্ন অনাথাশ্রম থেকে আমন্ত্রিত প্রায় সহস্র দরিদ্র অনাথ শিশুদের নৃত্য-গীত, খেলনা ও খাদ্য দিয়ে মুহূর্তের জন্যও যেন তাদের নিঃস্ব জীবনের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই মহৎ উদ্যম যে ব্যর্থ হয়নি প্রাঙ্গণভরা শিশুর 'আনন্দকাকলীই তার প্রমাণ। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রী ও শ্রীমতী প্রকাশ মালহোত্রা অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে অন্তরের সংবেদনশীল প্রসারতার শিক্ষা দেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত সুধীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। মানবিক আবেদনই সেদিনের অনুষ্ঠানকে এমন স্মরণীয় করেছে। অনু-ষ্ঠান সুরু হোল গীতা ও মীরা মালহোত্রার কণ্ঠসংগীত দিয়ে। গুরু এ, কাননের পরি-চালনায় এঁরা গাইলেন বেহাগ, যোগ, হৈমবতী, দরবারী-কানাড়া ও ভজন। প্রতি রাগে পরিবেশনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা, অনুশীলনের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। অবাক করে দিয়েছেন শ্রীমতী সোনু মালহোত্রা। ভারতনাট্যমের বিভিন্ন অঙ্গ, আলারিপু, জাতিস্বরম, বর্ণম, তিল্লানা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশ ছিল তার পরি-বেশিতব্য বস্তু। গত বছরেও তাঁর নৃত্য দেখেছি। এবারের অনুষ্ঠানে দ্রুত উন্নতির সুস্পষ্ট চিহ্ন শুধু বিদ্যমান নয়, শিল্পীর নিজস্ব শিল্পবোধ, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও অভিব্যক্তি আর মধ্যের ক্রমাগ্রসারী শিল্পীকে দর্শকবৃন্দের মর্মগোচর করেছে।

উত্তর কলিকাতার মডার্ণ সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত প্রথম বার্ষিক সংগীত অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো কালী-প্রসন্ন চক্রবর্তী স্ট্রীটস্থ স্কুল প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী পরেশ চ্যাটার্জি, লক্ষ্মণ হাজরা, অনিল দত্ত, গোপাল মুখার্জি, মালা রায়, রাণীবালা দে, সুমিত্রা ঘোষ সাগরিকা নাগ, রূপক চ্যাটার্জি সগঃ মুখার্জি, বিশ্বনাথ মল্লিক ও মাঃ চুনু। অনুষ্ঠান পরিচালনায় পরেশ চ্যাটার্জি এবং বাদল বিশ্বাস।

উদয় শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেন্টার তাদের চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এক নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্র সদন মঞ্চে মার্চের এগারো থেকে ষোল তারিখ পর্যন্ত। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান সেণ্টারের নতুন অর্ঘ্য 'চিদাম্বরা'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সুমিত্রানন্দন পন্থের লেখা অবলম্বনে 'চিদাম্বরা' ছাড়াও ঐ কদিন মঞ্চস্থ হবে 'বাসবদত্তা' ও 'পরিচয়'।

—চিত্রাঙ্গদা

সাচ্চাই/শাম্মী কাপুর

প্রেক্ষাগৃহ

কড়ি দিয়ে কিনলাম একটি বিপুলায়তন উপন্যাসের নাট্যরূপ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত মঞ্চসাফল্য অর্জন করতে পারে না। কিন্তু একটি বিশেষ অনুভূতির আলোয় উপন্যাসটির গভীরতম সত্যকে সংলাপ ও সংঘাতের সেতুবন্ধনে নাটকে মুখর করে তোলা যায়। এই ধারণাটিই বোধহয় দৃঢ়তর ভাষা পেলো ইসকো রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' নাট্যপ্রযোজনায়। বিমল মিত্রের এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন রতন ঘোষ। মূল উপন্যাসটির মধ্যে জীবন ও চরিত্র যে ব্যাপ্তি আছে, তাকে আশ্চর্য সংযম সংক্ষেপ সংহত আকারে নাটকে মূর্ত কর তুলতে পেরেছেন শ্রীঘোষ।

দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'স্টা থিয়েটারে পরিবেশিত এই নাটকের সামগ্রি অভিনয়ে 'ইসকো রিক্রিয়েশন ক্লাবে শিল্পীরা আন্তরিকতা ও শিল্পবোধে পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যনির্দেশনায় শ্রীরত ঘোষ মোটামুটি সফল হয়েছেন বলা চল তবে নাটকের শুরুতে দুটি ট্রেন এ্যাক্সি ডেন্টের সংঘর্ষ যেমন সার্থক হয়ে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসে পরিচিত নেপথ্য কণ্ঠে তে সংযম, সুন্দর হোতে পারে নি অভিনয়ের দিক থেকে নৈপুণ্যের স্ব রাখেন প্রভাত ভট্টাচার্য (মিঃ ঘোষাল) মমতা চট্টোপাধ্যায় (সতী)। এই দু শিল্পীর চরিত্রচিত্রণ সমগ্র নাট্যপ্রযোজন একটি বিশিষ্ট সম্পদ। 'দীপঙ্কর' চা রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আন্তরিকতার স অভিনয় করলেও, চরিত্রের অতলে সব স শিল্পী প্রবেশ করতে পারেননি। 'দাত্ত বাবু'র ভূমিকায় আশুতোষ গোস্বামী প্র বন্ত অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন, শ্রীম ছন্দা দেবীর 'লক্ষ্মী' একটি উল্লেখযো চরিত্রচিত্রণ। 'সনাতন' চরিত্রে বিশ্বম্ভর ব মোটেই স্বাভাবিকতার সীমা স্পর্শ কর পারেননি। যে শান্ত-সমাহিত চরি আমাদের প্রত্যাশায় ছিল, শিল্পীর অভি তা মোটেই ফুটে উঠতে পারেনি। শ্রী গোস্বামীর 'ফোঁটা' একটি প্রাণোচ্ছল চ চিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সচ্চি ঘোষাল, হিমাংশু গোস্বামী, অশোক ব পাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীল চার্য, বিশ্বনাথ লাহা ন সর ভারতী মুখোপাধ্যা কল্যাণ ঘো ইন্দুভূষণ, ব্রজবাসী, রবি দে, শি ভট্টাচার্য।

অজিত মিত্রের আলোকসম্পাত না বক্তব্যকে যে নতুন এক অর্থময়তায় সমৃ করেছে, সে-বিষয়ে বোধহয় কোন নেই। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যের আ ব্যবহার যে ব্যঞ্জনা এনেছে, তা যায় না। তবে সঙ্গীত পরিচালনার ব্য সুনীলবরণের কাছে আমাদের আরো আশা ছিল।

'চেনামহলে'র দুটি নাটক বাংলা অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মহল' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। যে- বোধ আজকের নাট্যচর্চাকে উদ্ব করছে, এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা আন ভাবে তারই অংশীদার। সম্প্রতি থিয়েটারে দুলাল মিত্রের 'পুতুলের ও মুরারীমোহন সেনের 'পলাতক' না নয়ের মধ্য দিয়ে 'চেনামহলের মোটামুটি অক্ষুন্নই থেকেছে। নাটকের প্রয়োগ-পরিকল্পনায় নিষ্ঠ শৈল্পিক চিন্তার পরিচয় রেখেছেন র

সোনাবৌদি/সুখেন দাস

...। তাঁর পরিকল্পনাকে একটি সুষম ছন্দে ...র্ণ করে তুলেছে শিল্পীদের বিচিত্র রূপচিত্রণ। সামগ্রিক সার্থকতার সীমা না ...র্শ করলেও, দুটি নাটকের প্রযোজনা ...কদের বোধহয় আকৃষ্ট করেছে। শিল্পী-...র মধ্যে ছিলেন জীবন চট্টোপাধ্যায়, তপেন ..., উপেন ...ফদার, সঞ্জীব রায়, ...জিৎ দত্ত, দুলাল মিত্র, সঞ্জিত ..., রণজিৎ বসুমল্লিক, অজয় ...চার্য, মনীষ লাহিড়ী, কার্তিক ঘোষ, ...ক বিশ্বাস, মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ...চেতা রায়। নাটকদুটির ঘটনা ও মূলে ...বোর সঙ্গে আবহসংগীত বেশ কিছুটা ...ল রাখতে পেরেছে। এর জন্য দেবব্রত দাশগুপ্ত নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখেন।

'আনন্দলোক' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা ...প্রতি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় করলেন ...শীশ ভট্টাচার্যের নাটক 'কাল পরশু'। ...জকের সমাজ যে অশ্রান্ত জটিলতার মধ্য ...য়ে এগিয়ে চলেছে, তার ফলে আগামী-...ল বা পরশু আমাদের সভ্যতার স্বরূপ ... হোতে পারে, তারই আভাস দিয়েছেন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে। সমগ্র নাটকটিকে ...সাত্তীর্ণ করে তুলতে নির্দেশক অসিত ...খোপাধ্যায় যে শিল্পবোধের পরিচয় ...খেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ...রিত্রে সুঅভিনয় করেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, ...য়া ঘোষ, দেবকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, ...নীল গুহ, ভবরূপ ভট্টাচার্য, তরুণ ...খোপাধ্যায়, অমর বসু, কুমারেশ চট্টো-পাধ্যায়, শৈলেন মৈত্র, গোপাল দাস, ...মারী সান্তু চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা ...রেন ভাস্কর মিত্র ও পিণ্টু বসু।

জানা গেছে নাটকটি পুনরাভিনয়ের আয়োজন করছেন আনন্দলোকের শিল্পীরা।

'রঙ্গরস' সংস্থা সম্প্রতি ডাঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'কেয়াকুঞ্জ' ও পরিমল সেনের 'জীবনকাহিনী' নাটিকাদুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপ দেন, তাঁরা হলেন অশোক ঘোষ, চন্দন দাস, শ্রীনাথ রায়, কালী ব্যানার্জি, বীণা দাস, অমলেন্দু চক্রবর্তী, রঞ্জন রায়, চিত্ত ব্যানার্জি, গোরা রায় ও নমিতা মণ্ডল।

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার চতুর্দশ নাট্যানুষ্ঠান কিছুদিন আগে রঙমহলে পরিবেশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের নাটক ছিল সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'বাঁধ'। নিখুঁত নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন রবীন সিনহা। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন শিপ্রা সাহা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেনগুপ্ত, কল্যাণ রায়, অরিন্দম রায়, সুখেন্দু সাহা, বিলীন দাস, রবীন দত্ত, যোগেন দত্ত, সবিতা মুখোপাধ্যায়, অরুণ দাসের আবহ-সঙ্গীত নাটকটির গতিবেগকে গভীরতা দিতে পেরেছে।

চলন্তিকা মধ্যমগ্রামের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চলন্তিকা'র শিশু-শিল্পীরা সম্প্রতি বঙ্কিমপল্লীতে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'শুনে পুণ্যবান' ও ডাঃ অরুণ দের 'দুই কন্যা' মঞ্চস্থ করেছে। তপন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় নাটকদুটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেয় অঞ্জনা, উর্মিলা, বনানী, সুব্রত, শিল্পী, অনুভা, মনু, মণিদীপা, উমা, মনু শোভন, স্বর্ণকমল, মৃণাল, জয়ন্ত শঙ্কর, উৎপল, সলিল।

বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের পরিচালনায় এবারের একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এ-মাসের শেষের দিকে। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, ইউনাইটেড ক্লাব, বেলগাছিয়া (টালা পার্ক)।

নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে সপ্তম বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা শুরু হবে এ-মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। প্রতি-যোগিতায় যোগদানের ব্যাপারে ইনস্টি-

নে 'পিঞ্জর'-এর সেটে অপর্ণা সেন, যাত্রিক-এর অন্যতম পরিচালক শচীন মুখোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।
—ফটো : অমৃত

র সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

খার্জি এন্টারপ্রাইজের সভ্যবৃন্দ রঙ- ১১ ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ করলেন রঞ্জন গুপ্তের বিখ্যাত নাটক 'ময়ূর-। নাটকটির চরিত্রগুলিতে অভিনেতা ভিনেত্রীরা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রাখতে হয়েছেন। অভিনয়ে যাঁরা সবচেয়ে প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা হলেন ঘোষ (পান্না), শ্যামল ভট্টাচার্য), শম্ভু চ্যাটার্জি (উদয়), দিলীপ দে), অশু বোস (হীরা)। এছাড়া মুখার্জি (শ্রীলতা), তরুণ মুখার্জি), অরুণ দাস (রাঘব), ননী দেব প) চরিত্রানুগ—নাটকটির নির্দেশনায় অজিত দে। অনুষ্ঠানের সাফল্যের ছিলেন শ্রীদিলীপ বোস।

ভুদয়ের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'অন্য ইতিমধ্যে নাট্যরসিকদের দৃষ্টি ণ করেছে। শ্রীকিরণ মৈত্র রচিত ও লিত এই নাটকটির ৫ম অভিনয় শিত হবে আগামী ৬ মার্চ সন্ধ্যা মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে।

শাখীর নতুন নাটক 'অলকানন্দা' মার্চ মাসে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে ত হবে। শ্রীনারায়ণ সান্যালের ঐ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন কান্তি, নির্দেশনায় আছেন কমল চট্টো-।

াগামী ৭ মার্চ বেলা আড়াইটেয় সম্প্রদায় বিশ্বরূপা মঞ্চে রবীন্দ্র র্ষের তিনটি একাঙ্ক নাট্য 'জীবনান্ত' মাটির কান্না' এবং 'বিরাশী সিক্কা' শন করবেন। নাট্য-নির্দেশনা নিখিল র্ষের।

গত ২৭ জানুয়ারী লোকতীর্থের শিল্পিবৃন্দ মুক্ত অঙ্গনে রতন ঘোষের 'শেষ বিচার' এবং সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চমিত্র' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। টিম-ওয়ার্ক সুন্দর। প্রধান চরিত্রটিতে রূপদান করেছিলেন ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন বিমল দে, অর্ধেন্দু রায়, বিনয় চক্রবর্তী, অঞ্জন গাঙ্গুলী, সমীর গাঙ্গুলী, রতন ভট্টাচার্য। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বিমল দে। 'পঞ্চমিত্রের' সংগীত পরিচালনায় ছিলেন প্রভাতভূষণ এবং নির্দেশনায় ছিলেন বিমল দে। অভিনয়াংশে বিকাশ ঘোষদস্তিদার, বিমল দে, প্রভাতভূষণ, সনৎ চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু রায়, অঞ্জন গাঙ্গুলী, বিনয় চক্রবর্তী, ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু রায়, তৃপ্তি ব্যানার্জি ও অনুরাধা মুখোপাধ্যায়।

গত ১৩ জানুয়ারী সেন্ট্রালাইজড ক্যাশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিশ্বরূপাতে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজা বদল" নাটকটি খুব সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করলেন। এঁদের দলগত অভিনয় নাটকটির একটি বিরাট সম্পদ। নাট্যপরিচালক জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিশ্রমের পুরস্কার নিশ্চয় পেয়েছেন শিল্পীদের কাছ থেকে। ছোট-খাটো ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই আছে। বিভিন্ন চরিত্রে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মেনকা দেবী, ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময় ভট্টাচার্য অসিত গুপ্ত, প্রদীপেন দত্ত, সুকুমার কর, মনিজয়, ননী ঘোষাল, সুনীল ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ নিয়োগী, রাখাল ভট্টাচার্য, মদন দত্ত, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অংশ নেন। সুনীলবরণের আবহসংগীতও মোটামুটি।

দমদমের এক সুপরিচিত নাট্যসংস্থা **'সব্যসাচী'** সম্প্রতি দমদম-মতিঝিল অন্তর্গত দেবীনিবাস কলোনীতে তাঁদের নতুন "আলোর পথে" মঞ্চস্থ করলেন। এটি নাট্যকার শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'স্বাক্ষিক' নাটকের নতুন পরীক্ষা। শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত বক্তব্যধর্মী নাটক 'আলোর পথে' সুপ্রযোজিত। দলগত অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ এ নাটকের নির্দেশক শ্রীদিলীপ মজুমদার। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুকুমার পালুই, শৈলেন ঘোষ ও নির্দেশক দিলীপ মজুমদার উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র সরকারের সহযোগিতায় আসছে তেরোই মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী এক চিত্রোৎসবের আয়োজন করছেন কলকাতার ম্যাজেস্টিক প্রেক্ষাগৃহে। অতি সাম্প্রতিক সাতখানা জার্মান ছবি এ উৎসবে দেখানো হবে।

কলকাতার নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ গত ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গিরিশ স্মারক আলোচনার ষষ্ঠ অধিবেশন শুরু করেন। নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সংসদসচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সভায় জানান যে, গিরিশ নাট্য সংসদ বহুদিন ধরে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের রচনার প্রচার ও প্রসারে এবং তাঁর নাটকাভিনয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। জনমানসে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি যাতে চিরজাগ্রত ও ভাস্বর থাকে, তার জন্য নিয়মিত গিরিশ স্মারক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। সংসদ-এর উদ্যোগে গিরিশ আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন। সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা সংসদ একান্তভাবে কামনা করে। শ্রীচৌধুরী গিরিশচন্দ্রের বিষয় বিশ্লেষণ করে বলেন যে, নট, নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক মহাকবি গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যকে এবং মঞ্চকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তা চিরকাল সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবেন। গিরিশচন্দ্রের প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাঁকে সর্বদিক দিয়ে বিরাট করে তুলেছে। ঠাকুরের সহচর্যে গিরিশচন্দ্র নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। শ্রীসুনীলকুমার মিত্র সংসদ-এর পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানান। গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগৌরব নাটক থেকে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কুমারী সুজাতা পাঠক একটি দৃশ্য পাঠ করেন।

বাটানগরে ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ইয়োথ হোস্টেল এসোসিয়েশনের বাটানগর আঞ্চলিক শাখার ব্যবস্থাপনায় নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'নৃত্যকলা' প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পূর্ণিমা হালদারের ভারতনাট্যম, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অরুণা দে, অনিত ঘোষ, রুণু সেনের নাগানৃত্য, নীরেন্দ্রনাথ, পানুকুমার, ঝর্ণা বাগচীর জেলে-জেলেনীর নৃত্য, পূর্ণিমা হালদার ও কৃষ্ণা হালদারের রাজস্থানী লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। অজয়কুমার গাঙ্গুলীর 'হরবোলা' আকর্ষণীয়। যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, নন্দদুলাল হালদার।

রাউরকেল্লার ভারতী মণিমালার দ্বিতীয় বার্ষিকী উৎসব পালন করল গেল ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল তিনটি নাটকের মঞ্চায়ন। সেগুলি হল শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'অনশন ভঙ্গ' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পরের উপকার করিও না' ও রবীন ভট্টাচার্যের 'জীবনান্ত'। উক্ত নাটক তিনটিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, বিশ্বতোষ রক্ষ, ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সরস্বতী সাহা, অঞ্জলি সাহা, রত্না রক্ষ, শিখা দত্ত, নিবেদিতা ঘোষ, শীলা দে, বন্দনা সিমলাই, মৃদুলা কুণ্ডু, অশোক মুখোপাধ্যায়, কার্তিক দাস, অঞ্জিত চক্রবর্তী, মানসী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সুন্দরবন মিউজিক্যাল কনফারেন্সের উদ্যোগে বৈদ্যনাথ রায়ের পরিচালনায় কাকদ্বীপ অমর টকীজের পার্শ্ববর্তী মাঠে সারারাত্রব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল। ঐ অনুষ্ঠানে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন, এছাড়া সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, দিলীপ চক্রঃ, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, হাস্য কৌতুকে সুশীল চক্রবর্তী কৌতুক গানে দুই বেচারা এবং মূকাভিনয়ে তপন দত্ত, যন্ত্রসঙ্গীতে ভি, বালসারা অংশ নেন।

গোরক্ষপুরের রমানাথ লাহিড়ী দুর্গাবাড়ীতে ৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন উৎসব ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় বাঙালীরা। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষদিনে বাঙালী সমিতির প্রযোজনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চসফল এ নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, জগৎবিকাশ মুখোপাধ্যায়, অনিল দত্ত হরেন্দ্রনাথ আচার্য, অশোক বোস, সুবীর দত্ত, অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রাম ঘোষ, শ্রীতোষ চক্রবর্তী, মিহির দাস, মুকুট বিশ্বাস, দীপক দে, ধীরেন পাল প্রমুখ।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

গত বৃহস্পতিবার থেকে সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র ইনডোর সুটিং-এর কাজ শুরু করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য শ্রীরায়েরই রচনা। কদিন আগে তিনি কলকাতার নিউমার্কেট ও বিভিন্ন জায়গায় বহু দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। এ ছবিতে তিনি সবই নতুন মুখ নিয়ে কাজ করছেন। নতুনদের মধ্যে কুমারী জয়শ্রী দাশগুপ্তা একজন। ইনি কয়েক বছর আগে এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

এই করেছ ভাল/সমরজিৎ, নিরঞ্জন রায়, শমিতা বিশ্বাস

অতঃপর কি ?

অজয় বসু

তদন্ত শেষ। রিপোর্টও দাখিল করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, রাজ্য সরকার কি করবেন?

গত ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের সময় যে অলক্ষণে কান্ড ঘটে গিয়েছিল, যার পরিণামে ছ-ছজন তাজা তরুণকে ইডেনের দোরগোড়ায় আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল, তদন্ত সেই ভয়াবহ ঘটনা ঘিরেই। কেন এমনটি ঘটলো তার কারণ অনুসন্ধানে এক সদস্যের একটি কমিশন বসিয়েছিলেন রাজ্য সরকার। এমন শোচনীয় কান্ডের পুনরাবৃত্তি পথ রোধায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখার ভারও পেয়েছিলেন এক সদস্যের কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীকরুণাকেতন সেন।

শ্রীসেন তাঁর দায়িত্ব পালন করে ভবিষ্যতে অনুসরণীয় কিছু কার্যপদ্ধতির সুপারিশও জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার সেই সুপারিশের নির্দেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি কি অবলম্বন করবেন? এবং কালবিলম্ব না করেই?

এই প্রশ্ন তোলার হেতু আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। টেস্ট ম্যাচ উপলক্ষে ১৯৬৭ সালের পয়লা জানুয়ারীতেও ইডেন উদ্যান নরককুন্ডে পর্যবসিত হয়েছিল। সেবারও এক তদন্ত কমিশন বসানো হয় এবং সেই কমিশনও করণীয় কাজের এক বিস্তারিত সুপারিশ রেখেছিলেন রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু সরকার পূর্বতন কমিশনের সুপারিশ না মেনে অব্যবস্থা ও অলক্ষণে কান্ডের নায়ক যারা তাদের হাতেই অবস্থাটি ছেড়ে রেখে আত্মতুষ্টিত ভোগাই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। ফলে আর একটি, আগের চেয়ে আরও সাংঘাতিক ও শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল। পূর্বতন কমিশন (বিচারপতি শ্রীকমলেশ সেন কমিশন) সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের যে ঔদাসীন্য প্রশ্রয় পেয়েছে, শ্রীকরুণাকেতন সেন কমিশন সম্পর্কেও সেই মনোভাব আঁকড়ে ধরা হবে কিনা, আমার প্রশ্ন তাই। আরও প্রশ্ন, কমিশনের বক্তব্য ও সুপারিশকে যদি শিরোধার্য মানায় আন্তরিকতা দেখানো না হয়, তাহলে ঘটা করে কমিশন বসানো হয়ই বা কেন? ব্যাপারটি কি সেক্ষেত্রে শুধু লোকদেখানো অকাজেই পর্যবসিত হয় না?

দ্বিতীয় সেন কমিশন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীতি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। বোধহয় এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নি। অতএব আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারি। তবে সেই ফাঁকে সেন কমিশনের রিপোর্টের পাতা উলটে আর একবার জেনে নেওয়া যেতে পারে যে সেদিন ইডেনের সামনে অমন সাংঘাতিক কান্ড কেন ঘটেছিল, এর জন্যে দায়ী কে বা কারা। এবং এই জাতীয় ঘটনা প্রতিরোধে সেন কমিশনের সুপারিশই বা কি।

ঘটনার কারণ নির্ণয়ে শ্রীকরুণাকেতন সেন বলেছেন যে, টেস্ট ম্যাচের ব্যবস্থাপক সংস্থা রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশনের টিকিট বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন ছিল না, দৈনিক টিকিটের কাউন্টারে তদারকী করায় তাঁদের কোনো প্রতিনিধির সন্ধান পাওয়া যায় নি, আহতদের শুশ্রূষার অথবা জনসংযোগের কোনো আয়োজনই করেন নি রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ঘটনার সময় পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেও ভীড় জমার মুখে আগের রাত্রে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটি অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি, এই অনবধানতা মারাত্মক। টেস্ট ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে অপরিমিত উৎসাহ, উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, টিকিট বণ্টন বিক্রীর বৈষম্যমূলক নীতি এই উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাহিদা মেটাতে পারে নি। এইসব এবং আরও কটি কারণ মিলে অবস্থাটিকে আয়ত্তের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। এক কথায় শ্রীসেনের অভিমত, ছ' ছজন তরুণকে (এবং আরও কজন আহতকে) এক চূড়ান্ত অব্যবস্থার জের মিটোতে গিয়েই তাঁদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ঘোড়ার পায়ে কেউ পিষ্ট হয়েছে অথবা লাঠি বা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্রের ঘায়ে নিহত ব্যক্তিরা আঘাত পেয়েছিলেন, এমন প্রমাণ নেই। তবে টিকিট পাওয়ার আশায় যাঁরা কিউয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের অনেকের বেপরোয়া আচরণে ঘটনাস্থলে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল, একথা সত্যি। ছজনের মৃত্যুর কারণ দম বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাঁরা ভীড়ের চাপে পড়ে যাওয়ার পর ধেয়ে আসা জনতা তাঁদের পায়ে মাড়িয়ে ফেলে।

ভবিষ্যতে এমন শোচনীয় কান্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে সেন কমিশনের সুপারিশ হলো:—

কলকাতায় অবিলম্বে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা হোক। ইডেনের গ্যালারি বাড়ানো হবে না নতুন স্টেডিয়াম বানানো হবে তা সরকারের বিচার্য। তবে স্টেডিয়ামে জায়গা বাড়ানো বা নতুন স্টেডিয়াম গড়ার বিষয়ে আর একদিনও দেরী করা চলে না।

স্টেডিয়াম না হওয়া পর্যন্ত ইডেনে আর টেস্ট ক্রিকেটের ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে না, এই বক্তব্য নাকচ করে শ্রীসেন বলেছেন যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে সুষ্ঠু পরিবেশে টেস্ট ক্রিকেট চলায় কোনো অসুবিধে ঘটবে বলে তাঁর মনে হয় না।

এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলতে শ্রীসেন টিকিট বিলি বিক্রীর, জনতা নিয়ন্ত্রণের এবং পুলিশের কর্মপদ্ধতির কথাই বুঝিয়েছেন। শ্রীসেনের অভিমত, দৈনিক এবং সিজন, দু ধরনের টিকিটই খোলা কাউন্টারে বিক্রী করতে হবে এবং কাউন্টারগুলিকে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে রাখলে এক জায়গায় চাপাচাপি ভীড়ও জমবে না। গত ডিসেম্বরে জনসাধারণের জন্যে মাত্র সাড়ে সাত হাজার দৈনিক টিকিট বিক্রী করা হয়েছিল। ফলে ৫৪,৪০২ খানি টিকিটের বেশির ভাগই চলে যায় সুবিধেভোগীদের হাতে। এই ব্যবস্থা বদলে শ্রীসেন খোলা কাউন্টারে ৮৭০০ সিজন ও সাড়ে সাত হাজার দৈনিক টিকিট রাখার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর ধারণা, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বেশি টিকিট ছাড়া হলে টিকিটের কৃত্রিম চাহিদা যেমন কমবে তেমনি কাউন্টারের ভীড়ও পাতলা হয়ে যাবে।

এযাবৎকাল সিজন টিকিট রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্ণধার স্থানীয় কোনো ব্যক্তির মর্জিমাফিক বিলি বণ্টন করা হচ্ছিল। শ্রীসেন এই রীতি পরিবর্তনে পক্ষপাতী। বিলি বণ্টনের দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কোনো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হলেই সুফল পাওয়া যাবে বলে তাঁর ধারণা। বিনি পয়সার কার্ড বা আমন্ত্রণলিপির সংখ্যা নির্দয় হাতে কমিয়ে দিতে এবং টিকিট সংগ্রহে সরকারী কর্মচারীরা, আইন পরিষদের সদস্যারা এবং ক্রীড়াজগত বহির্ভূত অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যেন কোনো সুবিধা না পান তার দিকে দৃষ্টি দিতে শ্রীসেন জোরালো বক্তব্যও রেখেছেন।

যে সব অঞ্চলে টিকিট বিক্রীর জন্যে কাউন্টার খোলা হবে সেই সব অঞ্চলকে সুরক্ষিত করা দরকার। কিউ আগলাতে খোঁটাখুঁটি পোঁতা যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন অবস্থা বোঝাতে জনতার সামনে লাউডস্পীকার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি রাখার। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত করে রাখতে সি এ বি ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। অধস্তন পুলিশ অফিসারের ওপর সমস্ত দায়িত্ব না ছেড়ে রেখে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সমস্ত কাজে তদারকী ভার নেওয়া উচিত বলে শ্রীসেন মনে করেন।

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কি করা উচিত তা বলা শ্রীসেনের এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু সে এক্তিয়ার জনসাধারণের আছে বলে তাঁদের পক্ষ থেকেই আমি প্রশ্ন তুলছি, এই রিপোর্ট হাতে নিয়ে রাজ্য সরকার অতঃপর কি করবেন? ওই রিপোর্টের হালও কি পূর্বতন সেন কমিশনের রিপোর্টের মতো হবে? না, এবার অন্তত ব্যবস্থা বদলে সরকারী হাত দুটিকে কাজের দিকে প্রসারিত করা হবে? বেলতলায় বারবার যাওয়া আসা করা কি ন্যাড়ার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে?

জোহানেসবার্গে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বে-সরকারী তৃতীয় টেস্ট খেলার একটি দৃশ্য : দক্ষিণ আফ্রিকার সহ-অধিনায়ক এডি বার্লো অস্ট্রেলিয়ার বোলার জন গ্লিসনের (ডানদিকে) বল বাউন্ডারীতে পাঠিয়েছেন। বার্লো শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১১০ রাণ করে আউট হন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই খেলায় ৩০৭ রাণে জয়ী হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২৭৯ রান (আরভিন ৭৯, রিচার্ডস ৬৫ এবং গ্রেমী পোলক ৫২ রান। গ্লিসন ৬১ রানে ৩, ওয়াল্টার্স ১৬ রানে ২ এবং কনোলী ৪৯ রানে ২ উইকেট)

ও ৪০৮ রান (এডি বার্লো ১১০, গ্রেমী পোলক ৮৭ এবং লী আরভিন ৭০ রান। গ্লিসন ১২৫ রাণে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২০২ রান (ডগ ওয়াল্টার্স ৬৪ রান। পিটার পোলক ৩৯ রানে ৫ **এবং** মাইক প্রোক্টার ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭৮ রান (রেডপাথ ৬৬ রান। প্রোক্টার ২৪ রানে ৩, গডার্ড ২৭ রানে ৩ এবং বার্লো ১৭ রানে ২ উইকেট)

জোহানেসবার্গে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০৭ রানে জয়ী হয়েছে। ফলে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৩-০ খেলায় পরাজিত করার সূত্রে তারা 'রাবার' জয়ের সম্মান লাভও করেছে। বর্তমান টেস্ট সিরিজের শেষ চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল ড্র হলে অথবা অস্ট্রেলিয়া জয়ী হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার এই 'রাবার' জয়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক আলি বাচার টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। প্রথম দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৯১ রান ওঠে। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ১০৫ এবং চা-পানের সময় ১৩২—২ উইকেট পড়ে। রিচার্ডস ৮৭ মিনিটের খেলায় তাঁর রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু আগে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা তাদের শেষ ৫টা উইকেটে মাত্র ৮৮ রান সংগ্রহ করেছিল খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১২২ রান তুলেছিল। অস্ট্রেলিয়ার ১২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ উইকেটের জুটি ওয়ালটার্স এবং চ্যাপেল দলের ৯৭ রান তুলে সাময়িকভাবে পতন রোধ করেন—একসময়ে ৯০ মিনিটের খেলায় তাঁরা ৫০ রান তুলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ করে অস্ট্রেলিয়া খেলায় যে সুযোগ পেয়েছিল তা শেষপর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেনি।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু পরেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২০২ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৭ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে ২৩৯ রানে এগিয়ে যায়। হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট জমা থাকে।

চতুর্থ দিনে চা-পানের বিরতির কিছু পরে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় অস্ট্রে-লিয়ার জয়লাভ করতে ৪৮৬ রানের প্রয়োজন হয়। হিসাব নিয়ে দেখা গেল অস্ট্রে-লিয়াকে খেলায় জয়লাভ করতে হলে প্রতি মিনিটে এক রান করে তুলতে হবে। লাঞ্চের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রান ছিল ২৮৪ (৫ উইকেট)। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এডি বার্লো সেঞ্চুরী (১১০ রান) করেন। বর্তমান টেস্ট সিরিজে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। কেপটাউনের প্রথম টেস্টে তিনি ১২৭ রান করেছিলেন। তৃতীয় টেস্টে তাঁর এই ১১০ রানে ছিল ১৬টা বাউণ্ডারী এবং একটা ছক্কা। লেগেছিলেন ৩২৪ মিনিট। চতুর্থ দিনে শতরান পূর্ণ করা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় উপর্যুপরি বলে লরী এবং চ্যাপেলকে আউট করে অস্ট্রেলিয়াকে আর মাথা তুলতে দেননি। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় মাত্র ৮৮, পাঁচটা উইকেট পড়ে। খেলার এই অবস্থায় জয়-লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩৯৮ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল পাঁচটা উইকেট।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের কিছু পরেই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৮ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০৭ রানে জয়ী হয় এবং সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে উপর্যুপরি দুটি সরকারী টেস্ট সিরিজে (১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৭০) রাবার জয়ের গৌরব লাভ করে।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার এশিয়া অঞ্চলের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৫-৪ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোনের সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। প্রথম দিনে ইন্দোনেশিয়া ৩-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। সুতরাং জাপানের এ পরাজয় মোটেই অগৌরবের হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় রুডি হার্টানো একাই চারটি খেলায় জয়ী হন—দুটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলস। এখানে উল্লেখ্য, হার্টানো উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৮-৬৯) অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে ব্যক্তিগত বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। জাপানের নোরিকো তোনমা টমাস কাপের খেলায় এই প্রথম যোগদান করে অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাড-মিন্টন প্রতিযোগিতার রাণার-আপ ধর্মাদিকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ম্যারাথন দৌড়

দিল্লীর স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রথম 'অল-ইণ্ডিয়া ইনভিটেশন ম্যারাথন' দৌড়ে সার্ভিসেস দলের জগবীর সিং প্রথম স্থান লাভ করেছেন। নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে তাঁর ২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ৩৬.৮ সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। জাতীয় রেকর্ডের থেকে তিনি ১০ মিনিট বেশী সময় নিয়ে-ছিলেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৭ জন অ্যাথলীটের মধ্যে শেষপর্যন্ত ১৮ জন নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেছিলেন। ম্যারাথন দৌড়ের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হরমেক সিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি।

ফলাফল : ১ম জগবীর সিং (সার্ভি-সেস), ২য় ডি বীরেদার (পুলিশ) এবং ৩য় জোরা সিং (সার্ভিসেস)।

লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

যুবসঙ্ঘের পরিচালনায় রঞ্জি স্টেডিয়ামে লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান্স, মহ-মেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি ক্লাবের প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে ইস্টবেঙ্গল (৩২ পয়েণ্ট), মহিলা বিভাগে সিটি এ সি (৩১ পয়েণ্ট), বালক বিভাগে বেহালা (৩১ পয়েণ্ট) এবং বালিকা বিভাগে হাওড়ার শরৎ সঙ্ঘ (১৬ পয়েণ্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : তপন দাশগুপ্ত (ইস্টবেঙ্গল); **মহিলা বিভাগ :** এডুইনা স্যামুয়েল (সিটি এ সি); **বালক বিভাগ :** সমর মাঝি (বেহালা); **বালিকা বিভাগ :** জাহ্নবী চক্রবর্তী (শরৎ সঙ্ঘ)।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

১৯৬৯-৭০ সালের জাতীয় রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পাঁচটি অঞ্চলেরই লীগ খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। পূর্বা-ঞ্চলে বাংলা, পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই, উত্তরা-ঞ্চলে রেলওয়ে, দক্ষিণাঞ্চলে মহীশূর এবং মধ্যাঞ্চলে রাজস্থান লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতার নক-আউট পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। মূল প্রতিযোগিতার নকআউট পর্যায়ের খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছে :

কোয়ার্টার ফাইনাল : রেলওয়ে বনাম রাজস্থান

সেমিফাইনাল : (১) বোম্বাই বনাম মহীশূর (২) বাংলা বনাম রেলওয়ে অথবা রাজস্থান

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

জলন্ধরে গত ১লা মার্চ থেকে পুরুষ-দের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৭টি দল প্রথমে চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলবে। প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দল নকআউট পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। বাংলার খেলা পড়েছে 'সি গ্রুপে'।

গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাবের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে এবং রানার্স-আপ রেলওয়ের 'ডি' গ্রুপে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়েছে ১৯২৮ সালে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত পাঞ্জাব ১৪ বার ফাইনালে খেলে ১০ বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। তাদের পরই রেলওয়ে দলের সাফল্য উল্লেখযোগ্য—১০ বার ফাইনালে খেলে তারা ১০ বারই চ্যাম্পিয়ান হয়েছে (এর মধ্যে দুবার যুগ্ম-বিজয়ী—১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস এবং ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজের সঙ্গে)।

বিভিন্ন গ্রুপে যোগদানকারী দল

'এ' গ্রুপ : পাঞ্জাব, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, এম পি, মাদ্রাজ, বিহার এবং আসাম

'বি' গ্রুপ : বোম্বাই, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, অন্ধ্র, মহীশূর, সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং রাজস্থান

'সি' গ্রুপ : বাংলা, গুজরাট, **ভূপাল, সার্ভিসেস, বিদর্ভ এবং কেরল**

'ডি' গ্রুপ : রেলওয়ে, **জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাতিয়ালা, হায়দরাবাদ এবং গোয়া**

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ

নিউইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো ফ্রেজিয়ার চতুর্থ রাউণ্ডে জিমি এলিসকে ভূতলশায়ী করে শেষ পর্যন্ত হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব জয়ী হয়েছেন। এলিস চতুর্থ রাউণ্ডে ভূতলশায়ী হন এবং পঞ্চম রাউণ্ডের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। ফলে ফ্রেজিয়ারকে বিশ্ব বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। লড়াইটি ১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। প্রায় ১৮০০০ দর্শক ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই লড়াই দেখতে এসেছিলেন।

আন্তর্জাতিক বক্সিং মহল ফ্রেজিয়ারকে হেভিওয়েট বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে মেনে নিলেও আমেরিকার বিখ্যাত 'রিং ম্যাগাজিন' এবং কয়েকটি মুসলীম রাষ্ট্রের মতে ক্যাসিয়াস ক্লে আজও হেভী-ওয়েট বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এখানে উল্লেখ্য, আইন অমান্যের কারণে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাসিয়াস ক্লের বিশ্ব খেতাব বাতিল করা হয়।

"টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং পরিক্রমা"

'অমৃত' পত্রিকার গত ৩৭ সংখ্যায় (১০০৪—১০০৬ পৃষ্ঠে) প্রকাশিত 'টেস্ট ক্রিকেট বোলিং পরিক্রমা' নিবন্ধে ২০০ উইকেট পাওয়ার তালিকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবসের নামটি যোগ হবে। এবং 'হ্যাটট্রিক' করার তালিকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ২ বার 'হ্যাটট্রিক' হবে (১ বার নয়)।

উপরের দুটি তথ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আগেই অমৃত পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সুতরাং তথ্যের এই হেরফের ধরতে অমৃতের পাঠকদের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। যাইহোক অমৃতের গুণমুগ্ধ পাঠক শ্রীসুধাংশুশেখর সিংহ (হাইলাকান্দি, কাছাড়) ওপরের দুটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্তব্যবোধ এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

দাবার আসর

হাল আমলে ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ডঃ যোনাথন পেন-রজের নাম আন্তর্জাতিক মহলে সুপরিচিত। এপর্যন্ত মোট ১০ বার তিনি ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাছাড়া, তিনিই আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় বৃটিশ খেলোয়াড় যিনি দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে অন্তত একবার হারাতে সক্ষম হয়েছেন।

সম্প্রতি আরেকজন বৃটিশ খেলোয়াড় শ্রীআর. ডি. কীন আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। এই দুজনকে এখন বৃটিশ দাবার ওপর মহল ধরা হচ্ছে। তবে, বর্তভিন্নিকের মতে, শ্রীকীন খেলতে বসে শুধু চালের নানারকম ভ্যারিয়েশনই হিসাব করেন, সত্যিকারের মৌলিকত্ব (অরিজিন্যালিটি) রয়েছে ইংল্যান্ডের আরেকজন উঠতি খেলোয়াড় শ্রী এম. জে. ব্যাশমানের মধ্যে: তরুণদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জানেন দাবার ছকে কী করে "অরিজিন্যাল" পজিশন আনতে হয়।

ব্যাশমানের দুটি খেলা দেখুন। একটি হার এবং একটি জিত। হার খেলাটিতে বর্তভিন্নিকের কথার সত্যতা যেন আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে। দুটি খেলাই হয়েছিল আর্মেনিয়াতে, আর্মেনিয়ার দুজন উঠতি খেলোয়াড়ের সঙ্গে। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শ্রীপেত্রোসিয়ান আর্মেনিয়ারই সন্তান। তাঁকে বাদ দিলে আর্মেনিয়াতে সেরকম নামী খেলোয়াড় আর কেউ নেই, যদিও আর্মেনিয়াতে দাবা খেলার প্রচার আছে যথেষ্ট। তবে পেত্রোসিয়ানের যোগ্য উত্তরাধিকারী খুঁজে বার করতে আর্মেনিয়া আজ খুবই সচেষ্ট। এই চেষ্টার ফল কি রকম দাঁড়াচ্ছে, নীচের খেলা দুটি থেকে আমরা তা খানিকটা আন্দাজ করতে পারব।

সাদা—হ্যাগোপিয়ান, কালো—ব্যাশমান। ক্যারোকান ডিফেন্স। (১) ব—রা ৪ ঃ ব—মগ ৩ (২) ব—ম৪ ঃ ব—রাঘ৩ (৩) ঘ—মগ ৩ ঃ গ—ঘ ২ (৪) ঘ—গ ৩ ঃ ব—ম ৪ (৫) ব—রা ৫ ঃ ঘ—ম ২ (৬) ব—রান ৪ ঃ ঘ—গ ১ (৭) ব—ন ৫ ঃ ঘ—ন ৩ (৮) গ—ম ২ ঃ ঘ—রা ৩ (৯) ম—গ ১ ঃ ঘ—রাগ ৪ (১০) ব—ন ৬ ঃ গ—গ ১ (১১) ঘ—রা ২ ঃ ব—রাঘ৪ (১২) গ×ব ঃ ন—রাঘ১ (১৩) গ—ম২ ঃ ব—গ৪ (১৪) ব—গ৩ ঃ ব×ব (১৫) ব—রাঘ ৪! ? ঃ ন×ব (১৬) গ—ন৩ ঃ ঘ—গ৪ (১৭) ম—ঘ ১ঃব×ব (১৮) গ×ন ঃ ব×ব [এই চালটার পর দর্শকের হাততালিতে ফেটে পড়েছিল হলঘর। ১নং চিত্র দেখুন।] (১৯) গ—গ৩ ঃ ব×ন=ম (২০) গ×ম ঃ ঘ—রা৫ (২১) ম—ঘ৫+ ঃ ম—ম২ (২২) ম—ম৩ ঃ ম—গ ৩ (২৩) ব—রা ৬ ঃ গ×রাব (২৪) ঘ—রা ৫ ঃ ম—ঘ৩ (২৫) ০—০ ঃ গ×ব (২৬) গ×ঘ ঃ গ×গ (২৭) ম×মব ঃ গ—ঘ ৩ (২৮) ম—ম ৭+ঃ রা—গ ১ (২৯) ম—ন৩ ঃ রা—রা১ (৩০) ম×গ ঃ ম—রাগ ৩ (৩১) ঘ—রাগ ৪ ঃ ন—গ ১ (৩২) ঘ(রা৫)×গ ঃ ম—ঘ৪+(৩৩) ম×ম ঃ ঘ×ম (৩৪) ঘ—রা৫ এবং সাদার জয়লাভ।
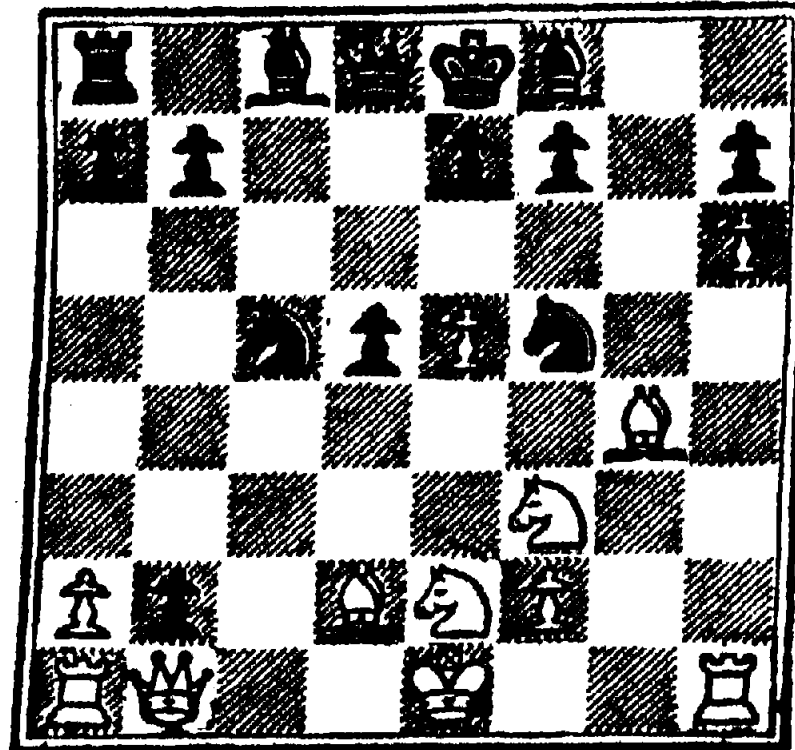
১নং চিত্র
কালোর ১৮নং চাল ব×ব।
এর পরের অবস্থা

এবারে দ্বিতীয় খেলাটি দেখুন। সাদা— ডেমিরখানিয়ান, কালো— ব্যাশমান। কিংস ইন্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ঘ—রাগ৩ ঃ ব—রাঘ ৩ (২) ব—গ৪ ঃ গ—ঘ ২ (৩) ঘ—গ৩ ঃ ব—ম ৩ (৪) ব—ম৪ ঃ ব—মগ৩ (৫) ব—রা৪ ঃ ম—ঘ ৩(৬)ব—রান ৩ঃ ঘ—গ৩ (৭) গ—রা২ ঃ ০—০ (৮) ০—০ ঃঘ—রা১ (৯) ব—ন ৩ ঃ ব—রাগ ৪ (১০) গ—ঘ ৫ ঃ ম—গ২ (১১) ব×ব ঃ গ×গব (১২) ম—ম২ ঃ ঘ—গ৩ (১৩) গ—ম৩ ঃ গ×গ (১৪) ম×গ ঃ ঘ—ন৩ (১৫) মন—রা১ ঃ মন—রা ১ (১৬) ন—রা৬ ঃ ম—ম২ (১৭) রান—রা১ ঃ ঘ—গ২ (১৮) ন (রা৬)—রা২ ঃ ব—রা৩ (১৯) গ×ঘ ঃ ন×গ (২০) ঘ—রা৪ ঃ ন—গ৪ (২১) ঘ—ঘ ৩ ঃ ন—গ৫ (২২) ব—রান ৪! ? ঃ ন(রা ১)—রাগ ১ (২৩) ব—ন৫ ঃ ব—রাঘ ৪ (২৪) ঘ×ব ঃ গ×ব (২৫) ঘ—গ ৩ ঃ ম—ঘ ২ (২৬) ঘ×গ ঃ ম×ঘ (ম৫) (২৭) ম×ম ঃ ন×ম [এপর্যন্ত সমান সমান খেলা। ২নং চিত্র দেখুন। এরপর ব্যাশমান কিভাবে জিতলেন তা লক্ষ্যণীয়।] (২৮) ন—রা৪ ঃ ন—ম ৭ (২৯) ন—ম৪+ ঃ রা—ন১ (৩০) ঘ—রা ৪ ঃ ন—ম ৫ (৩১) ন [illegible] ঃ ব—রা ৪ (৩২) ব—গ ৫ ঃ ন—[illegible] (৩৩) ঘ—ম ৬ ঃ ন—[illegible] ৫ (৩৪) ব—গ ৩ঃ ন—ম৬! (৩৫) রা—ন২ ঃ ব—রা৬ (৩৬) ঘ×ব ঃ ব—ম৫ (৩৭) ঘ—ন৬ ঃ ন—গ৪ (৩৮) ঘ×ব ঃ ন—ন৫ (৩৯) রা—ঘ ১ ঃ ব—রান ৩! (৪০) ঘ—ঘ৪ ঃন—ম৭ (৪১) ন—ঘ ৬ ঃন—মন (৪২) ব—গ ৪ ঃ রা—ন২ (৪৩) [illegible]—মগ ৬ ঃ ন×ন (৪৪) ঘ×ন ঃ [illegible]—ম৪ (৪৫) ব—রাঘ ৩ ঃ রা—ঘ ৩ (৪৬) ঘ—রা ৫+ ঃ রা—গ ৪ (৪৭) ঘ—গ ৩ ঃ ন—ন ৬ (৪৮) রা—ঘ ২ ঃ রা—রা ৫ (৪৯) ব—ন ৪ ঃ ব—মন ৪ (৫০) ব—ঘ ৩ ঃ ন—গ ৬ (৫১) ঘ—ম ২+ ঃ রা—গ ৪ (৫২) ঘ—গ ৪ ঃ ন—গ ৭+ (৫৩) রা—ন ৩ ঃ রা—রা ৫ (৫৪) ঘ—গ৬+ ঃ রা—গ ৬(৫৫) ঘ—গ ৫ ঃন—ম ৭(৫৬) ন—রাগ ১+ঃ রা—রা ৫ (৫৭) ঘ—গ ৬+ ঃ রা—ম ৬ (৫৮) ঘ—গ৪ ঃ ব—রা ৭ (৫৯) ঘ—রা ৫+ ঃ রা—রা ৫ (৬০) ন—রা ১ ঃঘ—রা ৬ সাদার হার স্বীকার।

২নং চিত্র
কালোর ২৭নং চাল ন×ম।
এর পরের অবস্থা

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 13th March, 1970 শুক্রবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীমনোজ বিশ্বাস

চিঠিপত্র

অমৃতকে নিয়ে

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। 'অমৃত' যে আমাদের কত আনন্দ দেয় সেটা নিশ্চয়ই অনুমেয়। আমরা মফঃস্বলে থাকি, তাই আমাদের পত্রিকাটি পেতে দু'-একদিন প্রায়ই দেরী হয়। মনে হয় যেন দু'-এক যুগ দেরী হচ্ছে। এটা যে অমৃতের প্রতি একটা দারুণ আকর্ষণ তা বলাই বাহুল্য। এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। প্রতি সংখ্যাতেই 'অমৃত' যেন একটা নতুনত্ব নিয়ে আসে। বিশেষ করে এর ছোট গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি। উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব গুহ-র 'কোয়েলের কাছে' সত্যিই অভিনব। এর স্বাদই যেন আলাদা। এমন অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখনীতে মূল কথার চাইতে অন্যান্য বিষয়গুলি বেশী করে থাকে। আর সেজন্য অনেক সময় বিরক্তি আসে পড়তে পড়তে। কিন্তু 'কোয়েলের কাছে' পড়ে একবারও বিরক্তি আসে না। অজানা পরিবেশের পটভূমিকায় লেখা 'কোয়েলের কাছে' সত্যিই অভিনব। লেখককে আমার ধন্যবাদ। তারপর সন্দিৎসুর লেখা 'নিকটেই আছে'ও একটি আশ্চর্য লেখনী। এত সুন্দর এর ঘটনাবিন্যাস যে, পড়তে পড়তে 'নিকটেই আছে'দের চোখের সামনে দেখতে পাই। এছাড়া অমৃতের ছোট গল্পগুলি ও অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' প্রতিবারই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আনে।

'খেলাধুলা' বিভাগে শ্রীগজানন্দ বোড়ে যেমন 'দাবা' খেলা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছেন, ঠিক সেরকম যদি ক্রিকেট ফুটবল ও ব্যাডমিণ্টন খেলার আইনকানুন সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেন, তাহলে আমাদের, মানে আজকের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের অনেক উপকার হয়।

'অমৃত' যে অভিনব, অতুলনীয় এবং একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক, তা বলাই বাহুল্য। 'অমৃত'কে এইভাবে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

শুভেন্দু চক্রবর্তী,
হাইলাকান্দি, আসাম।

(২)

আমি আজ তিন বৎসর যাবৎ আপনাদের সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর নিয়মিত পাঠক। এ-অমৃত পান করা যায় না এবং সেইজন্যই অমরত্ব প্রাপ্তিরও আশা নেই; কিন্তু তবু আমি প্রতিটি সংখ্যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি। অবশেষে যখন আমার অভীষ্ট বস্তুটি আমার হাতে এসে পেঁছয়, তখন আমি স্বস্তিবোধ করি।

অমৃতের প্রতিটি গল্প, উপন্যাস এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ আমার খুব ভাল লাগে। 'শাদা চোখে' বিভাগ পড়ে অবাক হই শ্রীসমদর্শী কিভাবে আজকের দিনে, এই দলাদলির দিনে, স্থিরমস্তিষ্কে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের সমালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে মন্তব্য করেন। শ্রীসমদর্শী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই বোধহয় এমন সম্ভব নয়। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পড়তে পড়তে মনে হয় আমি যেন সেই যুগে চলে গেছি। শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য-এর 'ডিপ্লোম্যাট' আমাকে নিয়ে যায় দেশবিদেশে। বার্লিন, ওয়াশিংটন, লন্ডন, নিউইয়র্কে। তরুণ, মিঃ মিশ্র এবং অন্যান্যদের মতো আমিও আশা করছি প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর প্রবেশের। আর শ্রীবুদ্ধদেব গুহ-এর 'কোয়েলের কাছে' পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে গভীর অরণ্যের ছবি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমিও যেন চলে গেছি যশোয়ন্তদের সঙ্গে শিকারে। বাঘ, ভাল্লুক বা হরিণ কিংবা অন্য কোন হিংস্র কিংবা অহিংস্র প্রাণীর আনাগোনার মধ্য দিয়ে চলেছি। শিকার হচ্ছে। ঘরে বসেও মাঝে মাঝে চমকে উঠি সেইসব ভীষণাকৃতি পশুপাখী বা জন্তুজানোয়ারদের কার্যকলাপে। আবার কখনো চোখে পড়ে নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। মারিয়ানা বা সুমিতা বৌদিকেও ভোলা যায় না।

অমৃতের প্রতিটি রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে। প্রশংসা পাবার যোগ্য প্রতিটি রচনা বহনকারী 'অমৃত' তাই আমার মতে অপূর্ব। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সর্বশেষে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি সম্পাদক মহাশয়ের কাছে। প্রস্তাবটি হলো 'দাবার আসরের' মতো 'তাসের রাজা ব্রিজ'-এর একটি আসর। আশা করি এমন একটি আসরের ব্যবস্থা হলে অনেক পাঠক উপকৃত হবেন এবং পত্রিকার কদরও বাড়বে।

ননীগোপাল রায়,
শিলং-১

মানুষ গড়ার ইতিকথা

আপনাদের সাপ্তাহিক অমৃতের ২রা জানুয়ারীর 'মানুষগড়ার ইতিকথা' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিবরণ আদ্যোপান্ত অভিনিবেশসহকারে পড়লাম। আপনারা যে সুদূর গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিকথা আপনাদের সাপ্তাহিক মারফত জনচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, সেজন্য আপনারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই বিবরণের ভিতরে কিছু ভুল তথ্য এবং তথ্যের অনুল্লেখ লক্ষ্য করলাম। সম্ভবত যে-সূত্র হতে আপনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেই সূত্র হতেই আপনাকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তারি প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই চিঠি। আমার বক্তব্যবিষয়গুলি এই :

(১) '......উত্তরপাড়ার মুখুজ্জেদের গোমস্তা বরদাকান্ত সামন্ত কাঁসাই নদীর বাঁধের গায়ে সাড়ে দশ কাঠা জমি দান করলেন। দানের একটি মাত্র শর্ত ছিল, বরদাবাবুর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা চিরকাল বিনাপয়সায় পড়ার সুযোগ পাবে এ স্কুলে।'—এই বিবরণ সম্পূর্ণ ভুল ও আপত্তিকর। বরদাকান্তের বড় দানকে কেন ছোট করে দেখান হল তার রহস্য ঠিক বোঝা গেল না। ১৬ কাঠা (১০॥ কাঠা নহে) জমি স্বেচ্ছায় দান করে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার জন্য পূর্বোক্ত কোন শর্তই তিনি আরোপ করেননি। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত দলিলই এ-কথার প্রমাণ দেবে। তাছাড়া আজও পরিবারের ছেলেমেয়ে মাইনে দিয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে এবং কোনদিনই ঐ পরিবারের সব ছেলেমেয়ে বিনা বেতনে পড়াশোনা করেনি।

তাছাড়া ১৬ কাঠা জমির সংলগ্ন বিরাট পুষ্করিণীসহ প্রায় ১২ বিঘা জায়গার সবই তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের। বিদ্যালয়ের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসমূহ, বাগান সবই তাঁর পরিবারের জায়গায় অবস্থিত। দুঃখের বিষয়, আপনার এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কোথাও সে-কথার উল্লেখ করা হয়নি।

(২) 'বাড়ী উঠতে মহেশচন্দ্র মাইল-খানেক-খোল দূরের ধুলিয়াপুর গ্রামের

চিঠিপত্র

এফ-এ পাশ রাখালচন্দ্র ডোগরাকে স্কুলের হেডমাস্টার করে নিয়ে এলেন।'

—রাখালবাবুকে মহেশচন্দ্র আনেননি—এনেছিলেন 'প্রসন্নকুমার সামন্ত। এই প্রসন্নকুমারের সঙ্গে পরিচয় ছিল রাখালচন্দ্রের। প্রসন্নকুমার ছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। বিদ্যালয়গৃহ যখন আগুনে পুড়ে গেল, তখন তার গৃহ নির্মাণের জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে খুঁটি-চাল সংগ্রহ করেছেন এই প্রসন্নকুমার।

(৩) '......প্রায় এক বছর ধরে মাস মাস কুড়ি টাকা করে সাহায্য পাঠিয়েছেন স্কুলের নামে। তারপর আর পারেন নি।'—কথাটি ঠিক নয়। তিনি তাঁর আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও মাসে ২০।২৫্ টাকা করে দীর্ঘ পনের-কুড়ি বৎসরকাল সাহায্য দান করে এসেছেন।

(৪) লেখা হয়েছে, 'টিনের চালায় স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে গেল।...সরকারী রেট অনুযায়ী মাইনে ছিল ক্লাশপিছু বার আনা থেকে আড়াই টাকা। কিন্তু আদায় কিছু হতো না বললেই চলে। গড়ে প্রতি মাসেই মহেশচন্দ্র সত্তর-আশী টাকা করে স্কুলকে সাহায্য দিতেন। শুধু যে নিজে সাহায্য দিয়েছেন তাই নয়, বড় ছেলে সত্যেশ্বরকেও সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন।'—এই বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইতিমধ্যে দেশবাসী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু সচেতন হওয়ায় ছাত্রদের মাইনে পূর্বাপেক্ষা বেশী আদায় হতে থাকে। জেলা বোর্ড থেকে এর মধ্যে মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। তদুপরি জাফরলাধা সাহেবের মাসিক সাহায্য ত' ছিলই। আর শিক্ষকমহাশয়গণও স্বার্থ ত্যাগ করে অল্প বেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন।

(৫) 'ব্যবসায়ে লাভ হতেই সত্যেশ্বরের মাথায় ঢুকল এবার এম-ই স্কুলকে হাই স্কুল করে তুলতে হবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজও শুরু হয়ে গেল।...নিজে অনেক টাকা যোগ করে দোতলা বাড়ীর ফাউণ্ডেশন সমেত পাঁচ কামরার একটি একতলা পাকা বড়ী বানালেন সত্যেশ্বর।'

—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার মধ্যে সত্যেশ্বরবাবু একা ছিলেন না। গ্রামের অন্যান্য উদ্যোগী মানুষও ছিলেন। যে একতলা পাকা বাড়ী তৈরি হয়েছিল, তা কিন্ত সত্যেশ্বরবাবুর টাকায় তৈরি হয়নি। তবে সত্যেশ্বরবাবু অনেকের সঙ্গে নিজেও কিছু টাকা দিয়েছিলেন।

(৬) পরিশেষে যাঁদের কথা উল্লেখ না করলে বৈষ্ণবচক উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাঁদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

প্রথমত, মহাপ্রাণ জননায়ক ও শিক্ষাব্রতী রজনীকান্ত প্রামাণিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিক অকৃতদার রজনীকান্ত তাঁর সৃজনী প্রতিভাযুক্ত অপূর্ব নেতৃত্ব দিয়ে এই বিদ্যালয়কে গড়ে তুলেছিলেন—সে-কথা আজ কারও অজানা নেই। উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৬ হতেই রজনীকান্ত ছিলেন বিদ্যালয়ের বরাবর সভাপতি। বিদ্যালয়ের কর্মিগণ তাঁরই নিকট থেকে পেয়েছিলেন সেবাব্রতে দীক্ষা। প্রতি পদে তিনি সবাইকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, আদায় করলেন সরকারী অনুদান ও অনুমোদন। আট-দশ বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয় জনসাধারণ ও সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুন নতুন কর্মধারা অনুসরণ করে এটি এক বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

তারপর ১৯৫৭ সাল। শ্রদ্ধেয় রজনীকান্তের চেষ্টায় ও যত্নে অনেক নাম-করা পুরাতন বিদ্যালয়কে পিছনে ফেলে মেদিনীপুর জেলার প্রথম চারটি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের অন্যতম বিদ্যালয় হিসাবে মঞ্জুরী পাওয়ার সুযোগ লাভ করল। এই সঙ্গে প্রয়োজনীয় গৃহ, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেল অনেক টাকা। সর্বোপরি ছাত্র ও শিক্ষকদের নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যাপারে জননায়ক রজনীকান্তের নাম বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরঅক্ষয় হয়ে থাকবে। উক্ত প্রবন্ধে তাঁর নামের উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত নাম করা যেতে পারে বিলেতফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীহরলাল শীল মহাশয়ের। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগেই ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞে যোগ দিলেন এই দরদী সেবক। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য হরলাল প্রাণ দিয়ে কাজে লাগলেন। অল্প দিনেই তিনি বিদ্যালয়টিকে আপনকরে নিলেন। পারিশ্রমিক হিসাবে বিশেষ কিছুই নিলেন না। তিনি বিদ্যালয়কে দিলেন অনেক কিছু। দিলেন শ্রম, যত্ন ও সেবা। অকৃতদার হরলাল তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের কয়েক হাজার টাকার বই দিলেন বিদ্যালয় পাঠাগারে। নিজের বাড়ীর জন্য তৈরি চল্লিশ হাজার ইঁট দিলেন বিদ্যালয়কে, অতিথিশালার চেয়ার-টেবিল আসবাবপত্র দান করলেন, বিদ্যালয়-পুকুরের ঘাট তৈরি করার জন্য দিলেন নগদ আড়াই হাজার টাকা। এঁর কথাও ঐ ইতিকথায় উল্লেখ করা হলো না কেন?

কেশবচন্দ্র সামন্ত
প্রাক্তন সহ-সভপতি, বৈষ্ণবচক বিদ্যালয়,
বৈষ্ণবচক।

অচলগড় রহস্য

গত ৮ই ফাল্গুনে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ৪১ সংখ্যা) শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের 'অচলগড় রহস্য' রহস্য-কাহিনীটির জন্যে লেখককে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে 'অমৃতে'র সাহিত্যগত মূল্যের যথেষ্ট প্রশংসা করি।

অদ্রীশবাবু গতানুগতিক রহস্যকাহিনী ছেড়ে নতুন এক্সপেরিমেণ্টের উপর বর্তমান রচনাটি লিখে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মাস্লের এক্সপেরিমেণ্টের কথা যা লিখেছেন, তার শেষের দিকে আরও কয়েকটা কথা লেখা হলে ভাল হত। উনি লিখেছেন, '...মাস্লকে প্যারাফিন মুক্ত করার পর ওয়ান পারসেণ্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে মিশোনো ওয়ান পারসেণ্ট এরিয়োক্রোমসায়ানিন দিয়ে তিরিশ মিনিট রাঙিয়ে নিয়ে কলের জলে ধুয়ে অ্যালকোহলে শুকোলে তফাৎটা ধরা যায়......'।

এখানে কলের জলেধোয়ার সময়টা দেয়া উচিত ছিল। কারণ, কলের জলে বেশী ধুলে সব রং উঠে যাবে। আবার শুধু এক নিমেষ মাত্র ধুলে এক্সপেরিমেণ্টের গুণাগুণ বোঝা যাবে না। তাই 'জারনালে' জলে ধোয়ার সময়টা উল্লেখ করে দিয়েছে—এক থেকে তিন মিনিট।

আর একটা কথা। অ্যালকোহল দিয়ে মাস্লকে শুকোলে চলবে না। ডি হাইড্রেড মানে এখানে শুকনো নয়। ডি হাইড্রেড মানে এখানে জলমুক্ত করা। অ্যালকোহল দিয়ে জলমুক্ত করে এই কিট্ দিয়ে মাইক্রোস্কোপ কভার গ্লাস-এ ঢাকতে হবে। তবেই মাস্লের তফাৎটা ধরা যাবে।

তুষারকান্তি দে ও শ্রাবণী দে
হাওড়া-৪।

শাদাচোখে

অমিত বিক্রমে রাজ্যের শাসনদণ্ড হস্তগত করবার পর যুক্তফ্রন্টকে চারটি উপ-নির্বাচনে আবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। টালিগঞ্জ, রায়না ও মেদিনী-পুর এ তিনটি বিধানসভার নির্বাচন এবং সর্বশেষ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট (হয়ত শেষবারের মত) একই ট্রেডমার্ক নিয়ে বাজার মাত করলেন ট্রেডমার্ক একই থাকলে কি হবে—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের মধ্যে ঝগড়া এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে যে-কোন মুহূর্তে কোম্পানী লাল বাতি জ্বালিয়ে দিতে পারে। কোম্পানীর অন্তিমদশার সমস্ত লক্ষণ এখন পরিস্ফুট।

সংকটের তীব্রতা বর্তমানে এত প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, মুমূর্ষু ফ্রন্টের প্রায় এখন-তখন অবস্থা। যতই জোড়াতালি দিয়ে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, ফ্রন্ট আর একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারবে না। যাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করছেন তাঁরাও একথা বিলক্ষণ জানেন। তবুও যতক্ষণ 'শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ অন্তিমদশা শুরু হওয়ার আগে অনেকগুলি লক্ষণই ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এই নির্বাচন-গুলিতেও সেই দুরারোগ্য ব্যাধির উপসর্গ-গুলি তার ভয়ংকর রূপ নিয়ে বর্তমান। বিধানসভায়, জনসভায় এবং ফ্রন্ট বৈঠকে ফ্রন্টের অনৈক্যের প্রতিক্রিয়ার সুর পরিষ্কার-ভাবে ধ্বনিত হলেও জনতার ওপর তা পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু নির্বাচনে যখন জনতার কাছে তাঁদের ইতিকর্তব্য পেশ করে পক্ষ অবলম্বনের জন্য আবেদন জানান হয় তখন সমস্ত আদর্শ, বিচারধারা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ নির্বাচনই একমাত্র কষ্টিপাথর যার নিকষে গণমতের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

এ চারটি উপনির্বাচনের রাজনৈতিক পটভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়োজন সর্বাধিক। বিশ্লেষণের রঞ্জনরশ্মি ফেললেই দেখা যাবে ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক চেহারা কি রূপ-পরিগ্রহ করবে। ট্রেডমার্ক এক থাকলে কি হবে এই নির্বাচনী লড়াই-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি শুধু শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করে নি, আখেরে যখন একলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে সে সময় দল কতটুকু মহড়া নিতে পারবে সেই শক্তিও যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। আর কোন্ দল কোন্ দলের মিত্র-শক্তি হিসাবে থাকবে তারও ইঙ্গিত এই নির্বাচনগুলির মাধ্যমে পাওয়া গেছে।

প্রথমে আগে টালিগঞ্জ ও রায়নার উপনির্বাচন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এ দুই উপনির্বাচনে ফ্রন্টের ট্রেডমার্ক ব্যবহার করলেও এককভাবে এই লড়াইগুলো লড়েছেন এবং জিতেছেন। অন্য তেরো শরিকের সাহায্যের তোয়াক্কা করেন নি। এবং তাঁরা বলেছিলেন অন্য শরিকদের তাঁরা প্রচার-প্রস্তুতির সাহায্যের জন্যে আমন্ত্রণ জানাবেন না এবং জানানও নি। অবশ্য টালিগঞ্জ আসনটি মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা দীর্ঘদিন ধরে দখল করে আসছিলেন। কিন্তু রায়না আসনটি তাঁরা দখল করেছিলেন কেবলমাত্র মধ্যবর্তী নির্বাচনে। তাও সংগঠনের জোরে নয়—ফ্রন্টের পক্ষে যে জন-মতের তুফান উঠেছিল সেই তুফানে কংগ্রেস (অবিভক্ত কংগ্রেস) খড়কুটোর মত উড়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও শেষোক্ত আসনে লড়াইয়ের জন্যে ফ্রন্টের শুভেচ্ছাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করলেও মার্কসবাদী কম্যু-নিস্টরা দেখতে চেয়েছেন সরকারে আসীন হওয়ার পর তাঁরা কতটুকু শক্তি অর্জন করেছেন এবং এককভাবে লড়াইয়ে এই অধুনা-অর্জিত শক্তির ব্যবহারিক উপ-যোগিতা কতখানি বর্তমান রয়েছে। সকল পাঠকই অবগত আছেন, ফ্রন্টের শরিকরা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনেছেন যে তারা দল হিসাবে কংগ্রেস রাজনীতির মানচিত্র থেকে খানিকটা সরে যাওয়ার ফলে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, তা পূরণ করে বিকল্প ও একমাত্র রাজ-নৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবার অভিপ্রায়ে বলপূর্বক অন্যান্য শরিকদের সংগঠন দখল করে নিয়ে এককভাবে এগিয়ে যেতে চাইছেন। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যও হচ্ছে তাই। সেদিক থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। আর কতদিনই বা যুক্তফ্রন্ট বজায় রেখে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে চলা যাবে? একে-বারে নিজের করে নিয়ে ভোগ করবার বাসনা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। তবে কথা হচ্ছে, মার্কসবাদীদের ব্যবহার থেকে অন্য শরিকদের অভিযোগ ভিত্তিহীন একথাও বলা যায় না। অবশ্য তাঁদের রাজ-নীতিক চালচলনের দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে তাঁরা সর্থক হয়েছেন। এবং এই বছর মধ্যে থেকেও একলা চলার যে অব্যক্ত শ্লোগান নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন এর একটি প্রতিক্রিয়া জনমানসে নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই এ চিত্র পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। পূর্বোক্ত দুটি নির্বাচনের ফলাফল দেখলে বোঝা যায়, বাম কম্যুনিস্ট-দের আশ্বস্ত হওয়ার অনেকখানি কারণ আছে। তাঁদের শক্তিই শুধু বাড়ে নি, সংগঠনের ব্যবহারিক শক্তি অর্থাৎ মোবি-লিটিও অনেক বেড়ে গেছে।

এবার মেদিনীপুরের উপনির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীবিশ্ব-নাথ মুখার্জিকে বিধানসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত করে আনার জন্য। শ্রীমুখার্জি অধুনা বিলুপ্ত বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ফলে, তাঁকে মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। শ্রীমুখার্জি একজন বাঘা দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার ফ্রন্ট [illegible]নীতিতে তাঁর একটি প্রচণ্ড নেপথ্য [illegible] রয়েছে। কাজেই দলের অনুশাসনকে মান্য করে মেদিনীপুরের শ্রীকামাখ্যা ঘোষ সদস্য-পদে ইস্তফা দিয়ে শ্রীমুখার্জির জন্য স্থান করে দেন। এই নির্বাচনে বাম কম্যুনিস্টরা শ্রীমুখার্জির পক্ষে প্রচারে নামেন নি। অবশ্য, একটি হ্যাণ্ডবিল বিলি করে তাঁদের সঙ্গে অন্যান্যদের মতপার্থক্যের কথা জনতাকে জানিয়ে দিয়ে শ্রীমুখার্জিকে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। অবশ্য, দক্ষিণ-পন্থীরা অভিযোগ করেছেন যে তলে-তলে বাম কম্যুনিস্টরা ইন্দিরা-কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন এবং সাধারণভাবে ভোটারদের মধ্যে নিরুৎসাহ ভাব সৃষ্টি করবার অপ-প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। স্বয়ং বিশ্বনাথবাবুও অভিযোগ করে বলেছেন, দক্ষিণপন্থীদের জন্য উচিত ছিল আসনটি মেদিনীপুরে, অন্য কোথাও নয়। সত্যি বলতে গেলে, মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয় একত্র থাকলে অন্যদের

পক্ষে মেদিনীপুরে নাক গলান একটু শক্ত বইকি। এ নির্বাচনও ফ্রন্টের জনতাকে বিভক্ত করেছে।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের মৃত্যুতে আসনটি খালি হয়েছিল। কবীর সাহেব প্রথমে বাংলা কংগ্রেস নেতা ছিলেন, পরে লোকদল সৃষ্টি করে বাংলার প্রথম ফ্রন্ট সরকারকে কবরস্থ করেছিলেন। যেহেতু কবীর সাহেব একদা বাংলা কংগ্রেস নেতা ছিলেন। সেই সুবাদে উপনির্বাচনে আসনটা ফ্রন্ট সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা কংগ্রেসকে লড়তে দিলেন। হালফিল বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীআমজাদ আলী মাত্র ১২ হাজার ভোটের ব্যবধানে প্রগ্রেসিভ মুশিলম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। মনে রাখা দরকার, কবীর সাহেব বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সংযুক্ত মোর্চা — যা PULF নামে পরিচিত, তার প্রার্থী হিসাবে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে যুক্ত কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন দশা হল। এই আসনটির ভোটারদের আনুপাতিক হিসাবে দেখা যায়, শতকরা ৩৮ জন মুসলমান ভোটার এ কেন্দ্রে আছেন। যুক্তফ্রন্টের ট্রেডমার্ক নিয়ে বাংলা কংগ্রেস মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল ছাড়া অন্য শরিকদের সক্রিয় সাহায্য নিয়ে নির্বাচনে লড়েছেন। মার্কসবাদীরা পরিষ্কার ভাষায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীর জন্য প্রচারে নামবেন না। মেদিনীপুরের মত এখানেও নির্বাচনের দু দিন আগে একটি ইস্তাহার বিলি করে বাংলা কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেও জনগণকে ফ্রন্টের প্রার্থীকেই ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন। কাজেই কেউ বলতে পারবেন না যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা একেবারে সোজাসুজি অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল। তদুপরি আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, এই কেন্দ্রে যে সাতটি বিধানসভার আসন আছে তার মধ্যে স্বরূপনগর, বসিরহাট ও হাসনাবাদ দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের দখলে, বাদুড়িয়া ও রাজারহাট বামপন্থী কম্যুনিস্টদের হাতে। আর হাড়োয়া বাংলা কংগ্রেসের অধিকারে এবং ভাঙ্গড় অধুনা ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের নেতা এ কে এম ইশহাক সাহেবের দখলে। আর এই ইশহাক সাহেবই এই উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়েছেন। '৬৭র নির্বাচনেও এই আসনটির জন্য তিনিই যুক্ত কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রন্ট এবং দুই কংগ্রেস সকলেই এখানে মুসলমান প্রার্থী দিয়েছিলেন। মুশিলম লীগ ত দেবেই। কারণ, তাঁদের দলের নামই অন্যদের ঢোকবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত হয়ত তাঁরা ভবিষ্যতে ঔদার্যও দেখাতে পারেন। যা হোক প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত তর্ক-বিতর্ক বাদ দিলেও একটি ছবি কি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না যে, ফ্রন্টের শক্ত আস্ফালন সত্ত্বেও তাঁরা মানুষএর মধ্যে এতটুকু শ্রেণীসচেতনতা জাগাতে তখনও সক্ষম হন নি? এই প্রশ্নও কি জাগে না যে অবচেতন মনে এখনও ধর্মীয় শক্তির ভয় রয়ে গেছে? এত আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও মুশিলম লীগের প্রার্থী, যাঁর এই রাজ্যে পরিচিতি পর্যন্ত নেই বা যাঁর দলের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এখনও লোকে ওয়াকিবহাল নয়, তিনি কি করে এত ভোট পেলেন। তাহলে কি ধরে নেব, জ্যোতিবাবুর 'জনগণ' আর অজয়বাবুর 'সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা' তাঁদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন? আর যদি তাই হয় তবে এই রাজনীতি এবং শ্রেণীসংগ্রামের জারক রসে সম্পৃক্ত হয়ে নিদেনপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থীকেও ত ভোট দিলেন না? ব্যাপারটা কি ঘটেছে তার কোন বিশ্লেষণ ত অদ্যাবধি পাওয়া গেল না। এত প্রগতিশীল আন্দোলনের মুকুটমণি পশ্চিমবঙ্গে এই হাল কেন হল, প্রমোদবাবু কি অন্য কোন শ্রেণীযোদ্ধার সেনাপতিও তার কোনো ব্যাখ্যা রাখছেন না।

নির্বাচনী ফলাফল বেরুবার পর জ্যোতিবাবু উল্লাস প্রকাশ করে বলেছেন, ভোটের ব্যবধান আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করছেন সেজন্যই এ হাল হয়েছে। প্রমোদবাবু তাঁর দল যুক্তফ্রণ্ট-বিরোধী কাজ করেছে এই অভিযোগকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, সি পি এম সমর্থন করেছে বলেই বাংলা কংগ্রেস জিততে পেরেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কি জ্যোতিবাবু কি প্রমোদবাবু কেউই অল্পপরিচিত এই মুশিলম লীগের প্রতি তাঁদেরই শোষিত মানুষের এই ভয়াবহ সমর্থনের প্রতি একবারও ধিক্কারধ্বনি উচ্চারণ করেন নি, কিম্বা সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেন নি। তাঁদের এই নীরবতাকে কেউ যদি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মুশিলম লীগের ভোটের সংখ্যার মাধ্যমে বাম কম্যুনিস্টরা নিজের সংগঠনশক্তি ও মোবিলিটির প্রমাণ পেয়েছেন বলেই অন্য বিষয়ের উপর জোর দিয়ে চিন্তাশীল মানুষের মনকে অন্যত্র নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করছেন, তবে কি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু রাজনীতির রাজকীয় ভাষা প্রয়োগ করে হেনস্তা করা যাবে!

বাংলা কংগ্রেস নেতা সুশীল ধাড়া সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে মার্কসবাদীরা মুশিলম লীগ প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন। তাঁর এই অভিযোগকে অন্যান্য কয়েকটি দল পরোক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এর জন্য তদন্ত কমিটি গঠন হওয়া উচিত। শ্রীধাড়া বলেছেন, তাঁর হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে, কাজেই তাঁর দল আর আদৌ সি পি এমের সঙ্গে বসে কোন আলোচনা চালাবেন কিনা সেই সম্পর্কে দলের মতামত গ্রহণ করতে হবে। আর এই অজুহাতে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে বাংলা কংগ্রেস যোগদান পর্যন্ত করে নি।

বিধানসভার আসনের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজারহাট কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস বা ফ্রন্ট প্রার্থী মুশিলম লীগের প্রার্থী অপেক্ষা প্রায় দু হাজার ভোট কম পেয়েছেন। আগেই বলেছি এই আসনটি বর্তমানে সি পি এমের দখলে। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে রাজারহাট কেন্দ্র কলকাতারই বিস্তৃতি মাত্র। কলকাতায় হাঁচলে রাজারহাটে শোনা যায়। কলকাতার মিছিলের আওয়াজে রাজারহাট কাঁপে। আর সেই রাজারহাটে মুসলমান ভোটারের সংখ্যাও বেশী নয়। কাজেই মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতার মোহে আকৃষ্ট হয়ে মুশিলম লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন একথা বলা যায় না। কাজেই মুশিলম লীগ প্রার্থীকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁরা কারা? সাধারণভাবেই এই বক্তব্য সর্বত্র প্রযোজ্য। কারণ ভোটের অনুপাত ছিল খুবই কম। নিতান্ত ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনা করে সন্তর্পণে কেউ-কেউ যে ভেতরে-ভেতরে মুশিলম লীগকে ভোট দিয়েছেন একথা সত্যি বলে অনুমান করা কিছুই কঠিন নয়।

আর একটি কথা না বললে চিত্রটি একটু অপরিষ্কার থেকে যাবে। যে তিনটি আসন দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের দখলে সেখানে যদি ফ্রন্ট প্রার্থীর পক্ষে ভাল ভোট না থাকত তবে ফ্রন্ট প্রার্থী হেরে যেত একথা অবধারিত। কিন্তু ঐ তিনটি কেন্দ্রও মুসলমান-অধ্যুষিত নয় এমন নয়। বরঞ্চ রাজারহাটের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। কাজেই মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে ভোট দিয়েছেন একথা বলা যায় না। আবার দেখুন ভাঙ্গড় কেন্দ্রেও মুশিলম লীগ প্রার্থী পেয়েছেন প্রচুর ভোট। এমন কি ইশহাক সাহেব যিনি এই কেন্দ্র থেকে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনিই এই কেন্দ্রে সামান্য তিন হাজার ভোট পেয়েছেন! সেখানে মুশিলম লীগ পেয়েছেন ১৭ হাজারের উপর, আর ফ্রন্ট প্রার্থী বার হাজারের কিছু কম। সকলেই অবগত আছেন, এই অঞ্চলে কিষাণরা কি দারুণ জমির লড়াই লড়েছে ফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে। আমরা কি ধরে নেব যে এই জাগ্রত কিষাণরা রাতারাতি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছেন, তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ ও ঐক্যের কথা জলাঞ্জলি দিয়ে? কোনটা সত্য গুণীরাই বলুন। তারপর আসুন হাড়োয়ার কথায়। বাংলা কংগ্রেসের দখলে এ আসন থাকা সত্ত্বেও তাঁদের প্রার্থী এই এলাকায় কম ভোট পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের ভাগে এই আসনটি পড়েছিল, কারণ '৬৭র নির্বাচনে তাঁদেরই দলের প্রার্থী আসনটি জিতেছিল PULF এর প্রার্থী হিসাবে। তবে দলের সংগঠন জোরে তখন জেতে নি বাংলা কংগ্রেস। জিতেছিল অধ্যাপক কবীরের টানে। সংগঠন বলতে

সূর্য্যগ্রহণ!
৭.৩.৭০

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো স্থানে
পূর্ণগ্রাসও দেখা যেতে পারে
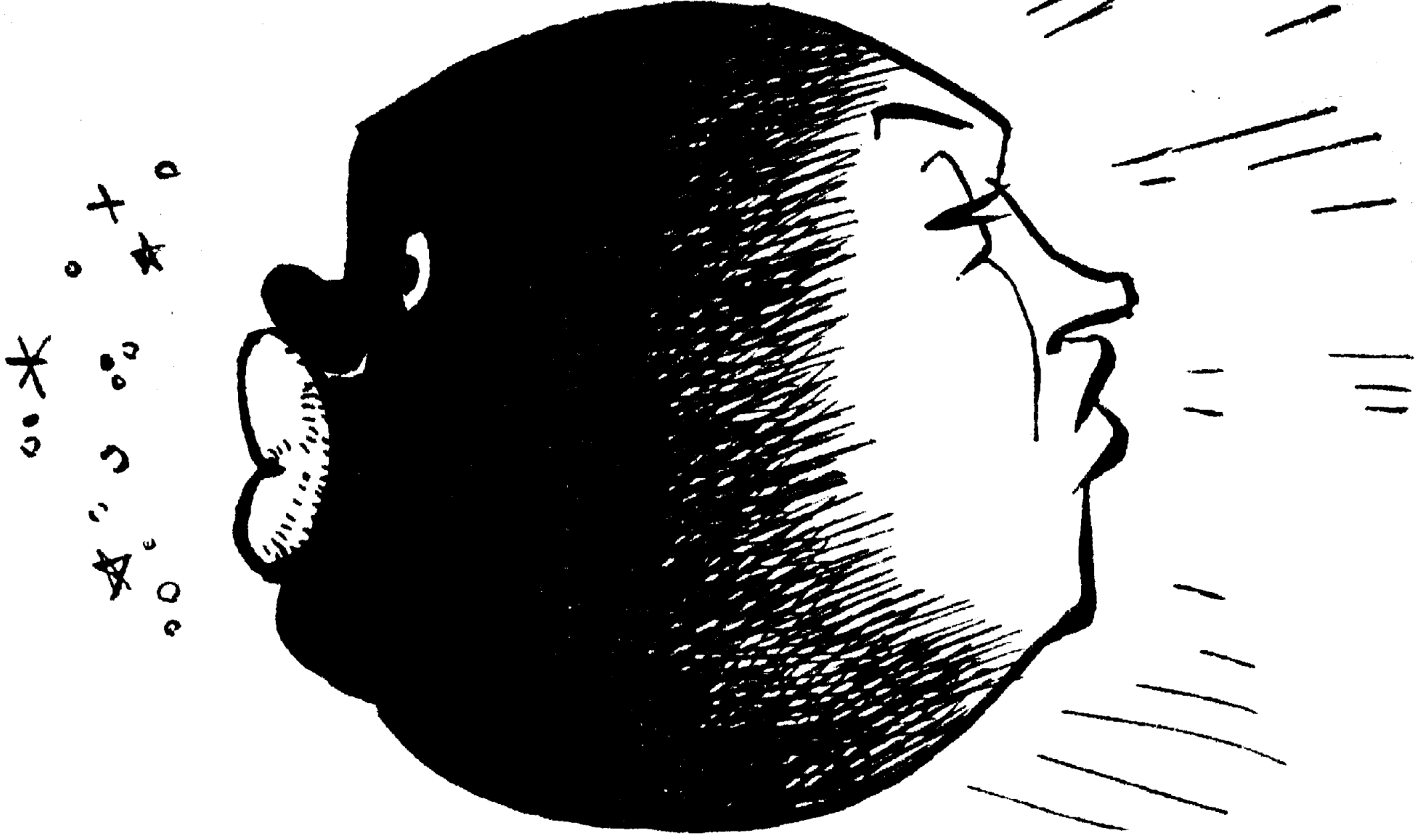
© কাফী খাঁ ৭.৩.৭০

যা বোঝায় তা মার্কসবাদীদেরই আছে। শ্রীসুশীল ধাড়া তবুও দেখিয়েছেন, যেসব কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস মধ্যবর্তী নির্বাচনে বেশী ভোট পেয়েছিল তা তাদের অটুট আছে। শুধু মার্কসবাদীদের এলাকা থেকেই তাঁরা ভোট পান নি। পেয়েছেন মুশ্লিম লীগ প্রার্থী। এ বক্তব্য তথ্য-ভিত্তিক। কোন আন্দাজে ঢিল মারার চেষ্টা নয়। এই বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে গেলে কেন জ্যোতিবাবু বা প্রমোদ-বাবু আতঙ্কিত বোধ করেন নি তার হদিশ পাওয়া যায়। এতটুকু ভুল করবার অবকাশ সেখানে নেই। তাঁদের দলের কর্মীরা সুশৃঙ্খল এবং রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কাজেই রাজনীতির বাজারে যেভাবেই তাঁরা পণ্য বিক্রী করুন না কেন, তাঁদের লোক-সানের ভয় কম। কারণ মার্কেট যে তাঁরা কন্ট্রোল করতে পারবেন সেই সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত।

আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। মেদিনীপুর ও বসিরহাট কেন্দ্র নির্বাচন থেকে আরও একটা সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে, বামপন্থীদের আখেরে মোকা-বিলা করবে ইন্দিরা কংগ্রেস। শ্রীঅতুল্য ঘোষের আদি কংগ্রেস নয়।

যা হোক, রায়না ও টালিগঞ্জে মার্কস-বাদী কম্যুনিস্টরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে একবার তাঁদের শক্তি যাচাই করে নিলেন, আর বসিরহাট ও মেদিনীপুরে পরোক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে দলীয় শক্তি যাচাই করে দেখলেন। এবং এই শক্তি পরীক্ষা তাঁরা শুধু নির্বাচনী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। শ্রমিক ও ছাত্র ফ্রন্টেও সরাসরি সেই মহড়া দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বাম ছাত্র ফেডারেশান এককভাবে ছাত্র ধর্মঘট ডেকে সাফল্য লাভ করেছেন। আর রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ১২ই জুলাই কমিটির মাধ্যমে খন্ড-খন্ড হরতাল করেও শক্তি বুঝে নিয়েছেন। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়, প্রথমে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির মাধ্যমে এগিয়ে গেলেও বর্তমানে তাঁরা একেবারে নিজেদের নেতৃত্বের মধ্যে আন্দো-লনকে সীমাবদ্ধ করে রাখছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, অন্যান্য শরিকদের সর্বক্ষেত্রে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা নিজেদের দুর্গ গড়ে তুলছেন। আর এই কার্যক্রমের র-প্রেক্ষিতে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সৌ প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য মিলা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, সি পি এম এককভাবে আর একটি নির্বাচনে সকলের সঙ্গে মোকা-বিলার জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেছেন, 'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। যেমন, আন্দোলনে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে দিই নি। আর শ্রমিক ও কিষাণ ও মধ্যবিত্তের রুটি রুজি সংস্থানের জন্য অন্তত কিছুটা আমরা করেছি। সেই প্রসঙ্গে শ্রমিকরা কত টাকা আর কিষাণরা কত জমি পেয়েছেন, শ্রীদাশগুপ্ত তারও হিসাব দিয়েছেন। কৃতিত্ব তাঁদেরই, কারণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা তাঁদের দলেরই প্রতিনিধি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনী প্রচার তাঁরা শুরু করেছেন, এখন ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্বটা বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই নিলে ষোলকলা পূর্ণ হবে। কাজেই যুক্ত-ফ্রন্ট এখন-তখন (কিম্বা প্রমোদবাবুর মতে ১৫ই মার্চের মধ্যে যে ভেঙে যেতে পারে) সে আশঙ্কা খুব অমূলক বলে মনে হয় না।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

অর্থমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় তাঁর প্রথম বাজেটে বাজীমাৎ করেছেন। তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন যাতে লোকসভার সকল পক্ষই তাঁর বাজেটে সন্তুষ্ট না হলেও অন্ততপক্ষে অসন্তুষ্ট হন নি। যাঁদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁদের কাছ থেকে আয়কর, সম্পত্তি কর, শহর অঞ্চলের ভূসম্পত্তি কর ও দানকর বাবদ আরও টাকা আদায়ের প্রস্তাব করে, সেই সঙ্গে সঞ্চয়কারীদের জন্য নূতন সুবিধা দিয়ে ও কোম্পানীর উপর নতুন কোন করের বোঝা না চাপিয়ে এবং নিম্ন আয়ের লোকদের কিছু সুবিধা দিয়ে ও কতকগুলি নতুন সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার ঘোষণা করে তিনি তাঁর বাজেটের জাদু-বলেতে সকলকেই খুশি করার মত কিছু না কিছু রেখেছেন। এই খুশির মধ্যে একথাও প্রায় চাপা পড়ে গেছে যে, পরোক্ষ কর হিসাবে তিনি ১৩৪ কোটি টাকার ও প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আরও ৩৬ কোটি টাকার বোঝা চাপাচ্ছেন এবং তা সত্ত্বেও তাঁর বাজেটে ২২৫ কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে—**যে ঘাটতি নতুন নোট ছাপিয়ে মেটাতে হবে।**

শ্রীমতী গান্ধী ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন যে, লোকসভায় তাঁর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তাঁর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তাঁর দলের প্রথম বৃহৎ শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেল রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কের শেষে। ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে কয়েক শত সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটিও তাঁরা পাশ করাতে পারলেন না এবং মূল প্রস্তাবটি ১৭০-৬০ ভোটে গৃহীত হল। যাঁরা বর্তমান বাজেট অধিবেশনেই শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের পতনের আশা করছিলেন তাঁদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

হরিয়ানায় দলত্যাগের ফলে শ্রীবংশীলালের মন্ত্রিসভার সামনে যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেটা তিনি বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী করিয়ে দিয়ে কাটিয়ে উঠেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বলেছেন, "বিরোধী পক্ষ যেন ভুলে না যান যে, তাঁরা যে খেলা খেলছেন সেটা আমিও ভাল জানি। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগে অন্তত আমি নড়ছি না।" এদিকে পাঞ্জাব-হরিয়ানা আঞ্চলিক বিরোধের প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরুনাম সিং এমন একটি মন্তব্য করেছেন যাতে ঐ রাজ্যের হিন্দুদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, "পাঞ্জাবের হিন্দুরা যদি চলে যেতে চায় তাহলে আমি তাদের আটকাতে পারি না।" আর একটি মন্তব্যে তিনি প্রকারান্তরে স্বতন্ত্র শিখ রাজ্যের পুরানো ধুয়া তুলে বলেছেন, "হিন্দীভাষী বলে ফাজিলকা অঞ্চলটিকে কেন্দ্রীয় সরকার যদি হরিয়ানার সঙ্গে যুক্ত করতে চান তাহলে তাঁরা শিখ রাজ্য গঠনেরই উস্কানি দেবেন।" মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ ইতিমধ্যে ভারত সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু গোপন রাখা হলেও এটা জানা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যই ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দুই রাজ্যই নিজের নিজের দাবীতে অটল। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা দল একদিন "বোম্বাই বন্ধ" করে এবং মহীশূরে ছাত্ররা ট্রেন, ডাকঘর ইত্যাদি আক্রমণ করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব আন্দোলন সম্পর্কে তিন দিনে তিনবার—একবার মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় আর দুবার মহীশূরের বেলগাঁও জেলায়—পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে।

লোকসভায় ও রাজ্যসভায় পর পর দুটি বিবৃতি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে "জাতীয় উদ্বেগ" প্রকাশ করেছেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করার চেয়ে বরং এর প্রতিকারের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপরই ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ডেপুটি স্পীকার সভাকক্ষের ভিতরেই একজন এস এস পি সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ঐ বিধানসভার গোলযোগ চরমে উঠেছে। এর আগে গত কয়েকদিনের মধ্যে ঐ বিধানসভায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, স্পীকারকে ঘেরাও করা হয়েছে এবং একজন কংগ্রেস সদস্যকে লক্ষ্য **করে জুতো ছোঁড়া হয়েছে।**

শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম বাজেট

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য যে ৫৩৪০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন তার মুখবন্ধে তিনি সেই সব নীতির উপর জোর দিয়েছেন যেগুলিতে 'একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যাবে।' তাঁর বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বিষয়গুলি হলঃ—(১) সম্পত্তি কর, ৫ লক্ষ টাকার বেশী মূল্যের নাগরিক সম্পত্তির উপর কর, দানকর এবং বছরে ৪০ হাজার টাকার বেশী আয়ের উপর ব্যক্তিগত কর বাড়বে। (২) তাছাড়া উৎপাদন শুল্ক বাড়বে চিনির উপর, ভাল জাতের চায়ের উপর পেট্রলের উপর, সাদা কেরো-সিনের উপর, বিস্কুট, বোতলে-ভরা সোডা-ওয়াটার জাতীয় পানীয়ের উপর এবং মাখনের উপর। (৩) অবিবাহিত, নিঃসন্তান ও একটি সন্তানের পিতাদের উপর থেকে বাড়তি করের বোঝা তুলে নেওয়া হবে এবং যাদের আয় বছরে ৫ হাজার টাকা বা তার কম তাদের আদৌ আয়কর দিতে হবে না। ইউনিট ট্রাস্ট ও শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ এবং ব্যাঙ্কে আমানতের সুদ বাবদ মোট তিন হাজার টাকা বা তার কম আয় হলে তার দরুন আয়কর দিতে হবে না। সব রকম ট্যাকস তুলে নেওয়া হবে 'বেবি ফুড'-এর উপর থেকেও। (৪) তাছাড়া, চা-এর উপর থেকে রপ্তানী শুল্ক তুলে নেওয়া হবে এবং কতকগুলি পাটজাত জিনিসের উপর রপ্তানী শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হবে। (৫) 'লগ্নীর আবহাওয়া অনু-কূল রাখার জন্য কোম্পানীর উপর করের হার অপরিবর্তিত রাখা হবে।

তাছাড়া, এই বাজেটে কতকগুলি নতুন জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস হল, তিন বছর বয়স পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য যোগাবার পরিকল্পনা। আর একটি হল, যেসব শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আওতার মধ্যে আছেন তাঁদের জন্য মালিক, শ্রমিক ও সরকারের চাঁদায় একটি পারিবারিক পেনসন ও বীমার ব্যবস্থা করা। শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ, জল সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য একটি নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেসব অঞ্চলে জলসেচের সুবিধা নেই সেসব এলাকায় চাষের উন্নতির জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রথম বাজেট সম্পর্কে অল্প যে কয়টি তীক্ষ্ণ মন্তব্য শোনা গেছে সেগুলির মধ্যে একটি এসেছে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীজর্জ ফার্ণাণ্ডেজের কাছ থেকে। তিনি এই বাজেটকে 'জাতীয়বিরোধী, সমাজতন্ত্র বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পক্ষপাতী' বলে অভিহিত করেছেন এবং

কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সমস্ত করের বোঝা তুলে নিতে এবং রেলের ভাড়া ও মাশুল কমাতে বাধ্য হন তার জন্য আগামী মে মাসে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ভয় দেখিয়েছেন।

(শ্রীফার্ণাণ্ডেজের এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ঘোষণা করেছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের ও ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের টিকেটের ভাড়ার হার বাড়াবার প্রস্তাব রহিত করা হবে এবং খাদ্যশস্য বহন করার মাশুলও অপরিবর্তিত থাকবে। এদিকে, শ্রীফার্ণাণ্ডেজের দলের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে। লোকসভার ১৭ জন এস এস পি সদস্যের মধ্যে শ্রীএস এম যোশী প্রমুখ ৯ জন 'দলের নেতৃত্বের মধ্যে ডিক্টেটরি মনোভাব'-এর নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন। শ্রীযোশী প্রমুখ সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন নতুন কংগ্রেসের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল। অন্য শিবিরে যাঁরা প্রয়োজন হলে পুরানো কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পতন ঘটাতে উৎসুক তাঁদের মধ্যে শ্রীফার্ণাণ্ডেজ অন্যতম)।

কোন কোন মহল থেকে এই আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা তীব্রতর হবে এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞরা এই আশংকা দূর করার চেষ্টায় বলেছেন যে, ২২৫ কোটি টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়লে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বাড়বে এমন মনে করার কারণ নেই। চলতি আর্থিক বছরে এর চেয়েও বেশী পরিমাণ নতুন টাকা ছাড়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একথাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, নতুন করের ফলে বিলাসদ্রব্যের দাম বাড়তে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে না। খোলা বাজারে চিনির দাম যদিও কিলো পিছু ২০ পয়সা করে বাড়বে তাহলেও চিনিকলগুলির উৎপাদনের যে ৭০ শতাংশ সরকার লেভি করে নিয়ে নেন তার দাম সামান্যই বাড়বে। দেশের ভিতরকার চাহিদা কমিয়ে বিদেশের বাজারে রপ্তানী বাড়াবার উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সরেস জাতের চায়ের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ান হয়েছে। দেশের বাজারে যে চা বিক্রী হয় তার অর্ধেকই এই বর্ধিত উৎপাদন শুল্কের আওতার বাইরে থাকবে। অর্থ দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা অবশ্য স্বীকার করেন যে, পেট্রলের উপর কর বৃদ্ধির ফলে শহরের বাসযাত্রীদের বেশী ভাড়া দিতে হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের এই প্রবোধবাক্যে অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর নিজের দলেরও সকলে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। 'নতুন কংগ্রেস'-এর পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় দলের নেত্রীর কাছে আবেদন জানান হয়েছে যে, চা চিনি ও কেরোসিনের উপর করবৃদ্ধির প্রস্তাব রহিত করে সাধারণ মানুষের ক্লেশ লাঘব করেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির ঐ সভায় আর একটি অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, কর বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই অভিযোগ সমর্থন করে বলেন যে, তাঁর ছেলেকেই বেশী দাম দিয়ে পেট্রল কিনতে হয়েছে।

এবারকার বাজেট সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক-দিক দিয়ে সংবাদের সৃষ্টি করেছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করার পর ও স্পীকার লোকসভার অধিবেশন সেইদিনকার মত মুলতুবী ঘোষণা করার পর ধরা পড়ে যে, নতুন কর প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য নিয়মানুযায়ী অর্থ বিল পেশ করার কথা তা করা হয়নি। এই ভুল সংশোধন করার জন্য স্পীকার শ্রীধীলন ঐদিন রাত্রি দশটার সময় লোকসভার একটি অধিবেশন ডাকলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন ঐ রাত্রিতে বোম্বাইয়ে যাবেন বলে পালাম বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। জরুরী তলব দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে লোকসভার বৈঠকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। এমন ঘটনা লোকসভার ইতিহাসে এর আগে আর কখনও ঘটে নি।

শ্রীমতী গান্ধীর বৃহৎ জয়

পর্যবেক্ষকরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তর দিতে উঠে এবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গভীর আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিরোধী দলগুলিকে বিশেষ করে জনসংঘকে কোণঠাসা করেছেন। তাঁর এই আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তি যে বেশ শক্ত তা ভোটের ফলেই প্রকাশ পেল। রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নয়া কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল সেটি ১৭০-৬০ ভোটে গৃহীত হল। তার আগে বিরোধীপক্ষ থেকে আনীত সংশোধন প্রস্তাবগুলিও অগ্রাহ্য হয়ে যায়। পার্লামেন্টে এই প্রথম বড় রকমের শক্তি পরীক্ষায় শ্রীমতী গান্ধীর এই নজরে পড়ার মত সাফল্যের কারণ হচ্ছে, কোন প্রশ্নের উপর একজোট হয়ে বিরোধী সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নি। মূল প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হয় তখন দুই কম্যুনিস্ট পার্টি, ভারতীয় ক্রান্তি দল ও পি এস পি-র একাংশ ভোটদানে বিরত ছিলেন। আবার বিরোধী পক্ষ থেকে উত্থাপিত চার শতাধিক সংশোধন প্রস্তাবের মধ্যে যে কয়টিতে ডিভিসন ডাকা হয়েছিল সেগুলির এক-একটিতে এক এক ধরনের ভোট হয়। যে প্রস্তাবে বিরোধী পক্ষে সবচেয়ে বেশী মতৈক্য দেখা দিয়েছিল সেটি এনেছিলেন জনসংঘের শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের অন্তর্বর্তী ভাতা দেওয়ার দাবীটি এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবেও বিরোধী পক্ষ থেকে ১২৭টির বেশী ভোট সংগ্রহ করা যায় নি, ফলে বিপক্ষে ১৭২টি ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করে দিতে 'নয়া' কংগ্রেস'-এর অসুবিধা হয় নি। অপরপক্ষে, ডি এম কে-র পক্ষ থেকে হিন্দী ভাষার প্রাধান্য রহিত করার উদ্দেশ্যে যে সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছিল তা বলতে গেলে অন্য কোন বিরোধী দলের সমর্থন না পাওয়ায় ২০-১৭৮ ভোটে নাকচ হয়ে গিয়েছিল।

কাঠমাণ্ডু থেকে

নেপালের রাজপুত্রের বিয়ে উপলক্ষে রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে যে উৎসব হয়ে গেল তেমন একটি স্মরণীয় ঘটনা এই অঞ্চলে ইদানীংকালের মধ্যে আর কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই উপলক্ষে শুধু যে একটা আড়ম্বরের ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রদর্শনী হল তাই নয়, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের যে সমাবেশ এই উপলক্ষে হয়ে গেল তাও একটি দুর্লভ ঘটনা। নেপালের প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে এই উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি। এই যাত্রায় শ্রীগিরি নেপালে চীনের সাহায্যে নির্মিত রাজপথটি দেখে এসেছেন, একপাশে কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধি কুও-মো-জো ও অন্য পাশে পাকিস্থানের প্রতিনিধি ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে নিয়ে ছবি তুলেছেন, কাঠমাণ্ডুস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীরাজবাহাদুরের স্ত্রীর পাশে বসে কুও মো-জো সদালাপ করেছেন, এইসব সংবাদ কতকটা ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এইসব সংবাদের তলায় এই বিষয় সত্যটাও চাপা পড়ে নি যে, ভারতীয় রাষ্ট্রপতি এই আনন্দানুষ্ঠান থেকে কিঞ্চিৎ নিরানন্দ হয়ে ফিরে এসেছেন। কেননা, নেপালের রাজা কিঞ্চিৎ রেখে-ঢেকে হলেও একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক ভাল নয়। প্রসঙ্গটা তুলবার জন্য রাজা মহেন্দ্র যে সুযোগ বেছে নিয়েছিলেন সেটাও লক্ষ্য করার মত। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে যেসব বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য রাজা একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন সেখানেই তিনি প্রসঙ্গটি তোলেন। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী বাণিজ্য ও অন্য দেশের ভিতর দিয়ে মাল চলাচলের যেসব অধিকার স্বীকৃত আছে সেগুলির বেশী আর কিছুই নেপাল চায় না।' যদিও তিনি ভারতের নাম করেন নি, তাহলেও বুঝতে বাকী থাকল না, তাঁর মন্তব্যের লক্ষ্যটি কোন দেশ। ঐ সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত পাকিস্থানী ও চীনা প্রতিনিধিরা যে এই মন্তব্য উপভোগ করেছেন তাতেও কোনই সন্দেহ নেই।

সম্পাদকীয়

সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে

সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার সবচেয়ে বেশি সুযোগ গ্রহণ করছে গুণ্ডা, মাস্তান এবং অন্যান্য সমাজ-বিরোধীরা। শুধু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য এই কথা বলা হচ্ছে মনে করলে ভুল করা হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সকল দলের ব্যক্তিই আজ এর ভুক্তভোগী। কংগ্রেস-বিরোধিতার নামে এক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আন্দোলনের আড়ালে সমাজ-বিরোধীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। তাই দেখা গেল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর যুক্তফ্রন্ট গদীতে বসলেও সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তি আসেনি। কলকাতায় চিরকালই নানান রাজ্যের অবাঞ্ছিত লোকদের ঘাঁটি। এদের শায়েস্তা করার জন্য পুলিশের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আটক আইন পাশ করা হয়েছিল এদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই।

কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতা অনেক সময় এমন অন্ধ হয় যে, সরকারের কোনো প্রচেষ্টাতেই তখন খোলা মন নিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই আটক আইনের মেয়াদ শেষ হলে তা নতুন করে পাশ করাতে কেউ রাজী হল না। তার ফলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আর আটক করে রাখা সম্ভব নয়। গুণ্ডা-বদমায়েসরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতা শহরে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ছিনতাই তো যখন-তখন হচ্ছে। ডাকাতি রাহাজানির সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় বিধানসভায় তথ্য পেশ করে জানিয়েছেন যে, ১৯৬৯ সালে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভের পর থেকে এ বৎসর ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ৬৩৬টি খুন হয়েছে। এর মধ্যে ৯৮টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ তো গেল খুনের খতিয়ান। গত এক বৎসরে এই রাজ্যে ৯০০ ডাকাতি হয়েছে। এর কোনোটাই রাজনৈতিক ডাকাতি নয় বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন। খুন ও ডাকাতি সব সময়েই সরকারের দোষে হয় একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, উন্নততর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, খুন ডাকাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু খুনের কিনারা করা, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এই দায়িত্ব পালনে পুলিশ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া কলকাতা শহরে দিনে-দুপুরে যতগুলো ডাকাতি হয়েছে তা লণ্ডন-শিকাগোর দুঃসাহসিক ডাকাতির রেকর্ডকেও ম্লান করে দেয়। এগুলো ঘটছে কেন? পুলিশ আগের মতো ডাকাতদের ধরতে পারছে না। এবং তাদের এমন শাস্তি দিতে পারছে না যাতে অপরাধীদের মনে ভয় জন্মায়।

খুনের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে, এর মধ্যে রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা কম। কিন্তু শ্রেণীসংঘাতের নামে যে সমস্ত ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপ হয়েছে তার গোত্র কি রাজনৈতিক? গ্রামাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য এই সমস্ত সংঘর্ষকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে হিংসাকে সমর্থন করছে। তার ফলে যে কোনো অপরাধই রাজনৈতিক নামের আড়ালে চাপা দেবার চেষ্টা চলছে। অথচ বিধিসম্মতভাবে গঠিত সরকার শান্তিপূর্ণভাবে সমাজকল্যাণের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসানসোলের খনি অঞ্চলেও চলছে বেপরোয়া গুণ্ডামি। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েই এই অপকর্মের সাফাই গাওয়া অপরাধ।

ছাত্রমহলেও আজ মারামারি ও সংঘর্ষ নিত্যকার ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে এ সমস্ত বিরোধ হচ্ছে না। ছাত্রসমাজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তার ফল কী দেখা যাচ্ছে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা প্রায় বন্ধ। পরীক্ষা নেওয়া এক দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। উপাচার্য ঘেরাও হচ্ছেন। ছাত্ররা নিজেদের রক্ত ঝরাচ্ছে রাজপথে। এই যুক্তিহীন রাজনীতি বাংলাদেশকে ক্রমশ আত্মঘাতী বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার সুযোগ নিয়ে সমাজ-বিরোধীরাও যথেচ্ছ অপকর্ম করার সাহস পাচ্ছে। সকল রাজনৈতিক দলকেই এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এভাবে কোনো দেশ এগোতে পারে না। কোনো সরকারও এমনভাবে খুন, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের বেপরোয়া সংখ্যাবৃদ্ধির পর পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে শক্তিক্ষয় করতে পারে না।

তোমাদেরই জন্য কিছু ভালবাসা ।।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আমার বিশ্বাস আমি বহুকাল এই একভাবে রয়ে গেছি;
কখনো উপাধিময় প্লেটখানি কুকুরের বকলশ থেকেও উজ্জ্বল,
মেঘলা দিনের চেয়ে ঢের বড়ো—লম্বা ও কৃপণ
একজনই রয়েছে, তবু নানা ছলে এই তর্ক,
আপনি কি ভালোবাসেন এদেশের জল-বায়ু এবং যুবতী,
অথবা রবিবারের মতো কিছু ঢিলেঢালা সহজ পাঁচজন,
যারা ঠিক স্বভাবের মধ্যে পোষে প্রথম বিড়াল—
অথচ কাউকেই তারা বিড়ালের মতো কি কখনো
রৌদ্র ও বিছানা বুঝে দিতে জানে?

বিতর্ক যেমনই হোক, তবু এইভাবে ধীরে জমে ওঠে
শিশির ভিতরে জল, জলেরও ভিতরে
একরাশ পাতা ও ফুল, মনেমনে অসম্ভব দোয়াতদানির
মলিনতা, খুব জোরে জেগে উঠলে স্বচ্ছ দেওয়াল
যে-রকম খরগোশের মতো এক দৌড়ে ছুঁয়ে আসে বনভূমি,
এই ফুটে ওঠে, ফের মিশে যায়, বহতা এমনি।
তবু কি বিনষ্টি নেই যারা চলে অভিন্ন শরতে,
যাদের এখনি কোনো গন্তব্য ধার্য নয় ব'লে
প'ড়ে থাকে গাছতলায়, সম্ভবত একান্তে গাছেরই কাছে
করে স্বীকরণ :
গতি নিরুপায়, কিন্তু বিরুদ্ধতা পূর্ণতার শস্যপ্রতিম!

আমি টের পেয়ে যাই, কোথাও শস্যও আজ
সংক্রামক ব্যাধির কবলে,
কেন উজ্জ্বলতা শুধু, জানি তাও;
হাড়েরও ভিতরে বহু নষ্ট হয়; তবু
একজন যখনই বলে, আজ আমার ভীষণ অসুখ,
আমার বুকের মধ্যে ভালোবাসা জন্ম নেয়।
পরস্পর প্রত্যাভিবাদন ক'রে তারা যেই পরস্পরের
রক্ত নিয়ে নিষ্ঠুরতা করে আমি বুঝি,
সারা পৃথিবীর মাটি এখনো শুকোনোই আছে,
বারুদের ধোঁয়া আর রুদ্ধশ্বাস গন্ধের ভিতরে,
সব কিছু গিয়েও কিছু রয়ে যায়, আমি তার স্বত্ব বুঝে নিতে
এখনো রয়েছি সেই এক ভাবে,
আমাকে ব'লোনা বৃথা পাঁচজনের মতো হতে আজ
জীবনের বহুতর ভাঙচুর সত্ত্বেও এই ভেবে রাখি,
আমাকে আগামী কালও তোমাদেরই জন্য
কিছু ভালোবাসা দিতে হবে।

তাই ত জটলা হচ্ছে ।।

তরুণ সেন

পট পট হাততালি উড়ছে।
পড়োশীর মুখ দেখে শিখে নেয়া বর্ণপরিচয়
মানুষের একান্ত স্বভাব,
তাই গাঢ় শীত এসে আগুনের মুখ দেখে যায়,
মাঝখানে ছোট এক ঘোলাটে আকাশ
চারদিকে পাখির জটলা—
তাই ত এখানে ভীড়,
কেমন সোরগোল হচ্ছে।

অথচ সবারই
নিজের আস্তানা আছে—
অর্থাৎ যেমন কীট ঠিক ক'রে রাখে তার নিজস্ব কবর,
অথচ সবারই আছে মাপসই নিজস্ব শরীর
অর্থাৎ একটা ঘর,
যেখানে সমস্ত দিন ছিটে রোদ নিয়ে কাটে
তিন ফুট উঠোনের বেলা
এভাবে মানুষ তার জটিল অঙ্কের ছক ফাঁদে,
তারপর
সবারই নিজস্ব কোনও ছোটখাট দ্বীপ
যেখানে লণ্ঠন জ্বালে মাঝরাতে,
দাঁড়ের শব্দ থেমে গেলে
হাওয়া এসে হাতে তুলে নেয় একতারা—
নোঙগর ফেলতে যায় মাঝে-মাঝে আনাড়ী নাবিক।

মানুষ তা ভুলে থাকে, কখনো ভুলতে হয় তাকে,
কেননা যোজন দূরে কোনখানে অবিরাম ফুলের মরশুম
প্রায়শই ভুলে যায় রাতকানা হলুদ মৌমাছি—
তাই ত এখন
সোরগোল, ছুটির ঘণ্টার মত অতিদ্রুত বাজে হাততালি
ভীষণ জটলা হচ্ছে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

ট্রেন ড্রাইভারদের ঝটিকা ধর্মঘট। ফলে অসংখ্য মানুষের দুর্গতি। এ দুর্গতি আমন্ত্রিত, আহূত। সাধারণ মানুষই ডেকে নিয়ে এসেছে এ দুর্গতি।

নিরাপত্তা তো চাইবেনই ট্রেন ড্রাইভাররা। সবাই যেমন চেয়ে থাকেন তাঁরাও চাইবেন। সভ্য জগতে নিরাপত্তা মানুষের সর্বনিম্ন দাবী।

সেই নিরাপত্তার দাবীতে ট্রেন ড্রাইভাররা যদি ধর্মঘট করেন তাকে অন্যায় বলা চলে না। এই সমাজেরই মানুষ তাঁরা, এই সমাজেরই সেবক। কিন্তু সমাজের এক অংশের হাতে তাঁদের কেউ যদি নিগৃহীত হন, অকারণে তাঁদের যদি বারে-বারে বিপন্ন হতে হয়, সে অবস্থায় হঠাৎ তাঁরা হাত গুটিয়ে বসলে কি করে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে?

ট্রেনযাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া ড্রাইভারদের দায়িত্ব ঠিকই। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগ তো বটেই আজকাল নানা কারণেই মাঝে মাঝে ট্রেনের গতি ব্যাহত হয়ে থাকে। তার মধ্যে ট্রেনের তার চুরি আছে, চালের চোরাকারবার আছে, ওয়াগন থেকে মাল পাচারের ব্যাপার আছে আবার রাজনৈতিক খেয়ালেও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ট্রেন আটক করা হয়ে থাকে।

এ সবই অনৈতিকতার ফল, যাকে বলা চলে বিবেকের সংকট। রবীন্দ্রনাথ এককালে সভ্যতার সঙ্কটের কথা তুলে বিপর্যয়ের আশংকা করেছিলেন। সাংস্কৃতিক চেতনার অভাবেই সভ্যতার সংকট দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই আশংকা আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তারও চেয়ে আরও বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। সংস্কৃতিবোধের অভাব যখন অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় অর্থাৎ সংস্কৃতিবোধ যখন প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আর সমাজে নৈতিকতার বালাই থাকে না। এমনি নীতিহীন সমাজে মানুষ তার বিবেকসম্পদ হারিয়ে ফেলে।

মানুষের সংস্কৃতিবোধই তার বিবেককে ঠিক পথে চালিত করে। কিন্তু সে বোধ যখন লুপ্ত হয়ে আসে তখন মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, ধৈর্যহারা হয়ে মত্ত মাতঙ্গের মত যা ইচ্ছে তাই করে চলে।

ট্রেন ড্রাইভারকে মারধোরের নিশ্চয়ই বিচার হতে পারত। বিচারে অন্যায়কারীর শাস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু বিচার প্রার্থনার ধৈর্য আমাদের কোথায় এবং বিচার চাওয়াই বা হবে কার কাছে? তাই এক বা একাধিকের অন্যায়ের খেসারৎ দিতে হয় অসংখ্য মানুষকে।

আজকের সমাজের এই যে চেহারা, নিরপেক্ষ দৃষ্টির সাহিত্যিক বিশ্লেষণে তার অনেক কারণই চোখে পড়ার কথা। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় কারণ অভাবনীয় জন্মবিস্ফোরণ। প্রধানত এই জনসমস্যারই চাপে তরুণদের মধ্যে দেখা দিয়েছে গভীর হতাশা এবং চারদিকের গুরু সমস্যার ভারে সমাজ আজ একরূপ বিদীর্ণ চৌচির।

শুধু যে আমাদের দেশেই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই এই একই রূপ। বিশ্বরাজনীতি যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই যুদ্ধ-মনোবৃত্তির ফলে সর্বকালেই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময়েই সমস্ত ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে দলীয় স্বার্থে তরুণ সমাজকে কাজে লাগায়।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তরুণদের মধ্যে এমনিভাবেই অন্যায় আচরণ-এর প্রবণতা বেড়ে চলে এবং অনেক সময় আইন-শৃংখলার যাঁরা রক্ষক এবং দেশের যাঁরা শাসক তাঁদের নীতিহীনতার নানা দৃষ্টান্তও ছোটদের সংক্রামিত করে থাকে।

আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছৃংখলতার পেছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে। দারিদ্র্য ও বেকারী তার মধ্যে অন্যতম বড় কারণ। এর ফলে বস্তীবাস ও অনেকের পক্ষে গাছতলায় বা ফুটপাতে আশ্রয় গ্রহণ, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ ও স্বাস্থ্যহীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমন দৃশ্য আমাদের হামেসাই চোখে পড়ে থাকে যাকে স্বাভাবিক মানুষের জীবনই বলা চলে না, নিছক পশু-জীবনধারারই তা সামিল। তাদের জীবনে সুস্থ আমোদ-প্রমোদের তেমন কোন অবকাশও নেই। এই অবস্থায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি যদি বেড়েই চলে, সমস্ত দুঃখ ভুলে সাময়িক আনন্দের জন্যে তাড়ির দোকানে যদি বেজায় ভিড় দেখা যায় বা যৌন-লালসার তৃপ্তির জন্যে যত্রতত্র যদি অঘটন ঘটে তা' হলে কাকে দোষ দেবো? চুরি-ডাকাতি-লাম্পট্য সবই অনৈতিকতার ফল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের ওপরতলার যে মানুষদের উপেক্ষায় অনাদরে আরেক দল মানুষকে নীতিহীনতার পথ নিতে হয় তাঁদের জীবন-নীতির ও মনোবৃত্তির কি প্রশংসা করা চলে?

দেশের শহর ও গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে। পার্লামেন্ট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা ও পৌরসভা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, এবং খেলার মাঠে ও আমোদ-প্রমোদের আসরে পর্যন্ত আমরা কি দেখছি, কি পাচ্ছি? সে সব স্থানের দৈনন্দিন কলহ-কোঁদল ও অশালীন কদর্য ইত্যাদি দেখে এবং সংবাদপত্রে তার বিবরণ পড়ে আমাদের যুবকদের একাংশ যদি উচ্ছন্নে যাবার পথকেই বেছে নেয় তা' হলে আপশোষের কারণ ঘটলেও নিশ্চয়ই তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এর পরে রয়েছে ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপের প্রশ্ন। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের দীর্ঘকালের বিদেশী শাসনের পাপচক্র ধর্মীয় রাজনীতিকে এমনিভাবে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে যার ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষ স্বদেশভূমিকে পর্যন্ত খণ্ড-খণ্ড করতে আমাদের প্ররোচিত করেছে। দেশের রাজনৈতিক নেতারা আজও যে সেই দুর্বুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি সেটা দুর্ভাগ্যের কথা। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অসহায় উদ্বাস্তুর কান্নায় ভারত ও পাকিস্তানের আবহাওয়া আজও ভারী হয়ে আছে। পেটের জ্বালায় প্রাণের দায়ে গৃহহারা আশ্রয়হীন এই সব নিঃস্ব মানুষ যখন অন্ধকার পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয় তার জন্যে কি তারা দায়ী, না আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি এবং নেতৃবর্গ যারা তাঁদের রাজনৈতিক দাবা খেলার খেয়ালে অসংখ্য নরনারীকে বাস্তুচ্যুত ও সহায়-সম্বলহীন করে ছেড়েছেন? সমাজের ওপর তার যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে সে তো জানা কথাই এবং সে সব চিত্র কাব্যে, কথা-সাহিত্যে ও নাটকে প্রতিফলিত না হয়ে পারে কখনো?

আজকের সমাজে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও রুচিহীনতার প্রাবল্য চলেছে বলেই সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটছে। কাজেই এজন্যে সাহিত্যের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ এর জন্যে দায়ী সাহিত্য বা সাহিত্যিক নয় দায়ী সমাজ। একথা মানতেই হবে, কোনকালেই মানুষের জীবনের সবটুকু সুন্দর নয়। জীবনে আলোও যেমন আছে, তেমনি আছে অন্ধকার। আর অন্ধকার আছে বলেই আলো আমরা প্রাণভরে উপভোগ করি। জীবনকে প্রকাশ করাই যদি সাহিত্যের লক্ষ্য, তাহলে সাহিত্যে আলোও যেমন আসবে, অন্ধকারেরও তেমনি ছায়াপাত ঘটবে। হুইটম্যান নিজের কবি-সত্তা সম্বন্ধেও তেমনি কথাই বলেছেন—

'I am not the poet of goodness only, I do not decline to be the poet of wickedness also'.

এটাই তো প্রকৃত সাহিত্যিকের যথার্থ মনোভাব। কিন্তু একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রসপ্রধান। রস মানে যদি আর্ট হয়, তা'হলে মেনে নিতে হবে 'art lies in concealment' অর্থাৎ অপ্রকাশ আভাসের মধ্যেই প্রকৃত শিল্প-রস নিহিত। বীভৎসতাও একটা রস বটে কিন্তু তা এতই নিম্নমানের যে কোন উচ্চগ্রামের শিল্পীই বোধহয় তাকে সহজ মনে আর্টের পর্যায়ে ফেলতে রাজী হবেন না।

আর্টের কথা থাক। আজকের যে সমাজকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার এ-রূপ একদিনে বা হঠাৎ আমাদের সামনে এসে হাজির হয় নি। তার একটা অতীত আছে—দীর্ঘ অতীত। তেমনি আছে তার একটা ভবিষ্যৎ — অবারিত ভবিষ্যৎ। কাল পাল্টে-পাল্টে মানুষ একালে এসে পৌঁছেছে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। সেই সব পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য রয়েছে সমকালীন সাহিত্যের পাতায়-পাতায়। কোথাও সমাজ আগে এগিয়ে গেছে, সাহিত্যে তার ছাপ পড়েছে; আবার কখনো-কখনো সাহিত্যিক আগে চিন্তা করেছেন, সমাজ সেই চিন্তাকে অনুসরণ বা গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশের কথাই বলি। হাজার-হাজার বছর ধরে ভারতীয় জনসমাজ বেদ-বিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের আদি গ্রন্থ উপনিষদের নির্দেশ 'চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চলো'। এই এগিয়ে চলার পথেই বেদসিদ্ধ আস্তিক ষড়দর্শনের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে বেদবিরোধী নাস্তিক দর্শন। পশু-হিংসা সমন্বিত যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রাচীন কালেও যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে উপনিষদেই তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সে প্রতিবাদ এতই স্পষ্ট যে, যাগযজ্ঞ বিষয়ে উপনিষদে কোন আলোচনাই স্থান পায় নি। এথেকেই বুঝতে পারা যায় পশুবলি ও যাগযজ্ঞাদি বিষয়ে উপনিষদ-ঋষিদের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা ছিল কতো গভীর, তাঁরা শুধু [illegible]র বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তা'হলেও বেদেরই অন্তভাগ উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত। কিন্তু কেবলমাত্র পশুবধ ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান নয় পুরোপুরি বেদ-বিরোধিতার ওপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম। এই দুই মতবাদে ঈশ্বরের কোন স্বীকৃতি নেই, তবে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে জৈন ও বৌদ্ধদের বিশ্বাস হিন্দু আস্তিকদের মতোই। তা' সত্ত্বেও এই উভয় দর্শন নাস্তিক দর্শন বলেই পরিচিত, কারণ এই দুই মতবাদই বেদবিরোধী এবং ঈশ্বর-বিরোধী।

কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই ভারতে সার্বিক নাস্তিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় চার্বাক দর্শনে। আজকের পৃথিবীতে সে সবেরই [illegible] দেখতে পাই সর্বত্র। ভারতে [illegible] এই নাস্তিক মতবাদ [illegible] প্রবল হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

যা প্রত্যক্ষ নয়, তা' প্রমাণিত নয়। কাজেই ঈশ্বর বা পরলোকতত্ত্ব বলে কিছু থাকতে পারে না এবং দেহ-আত্মা অভিন্ন। অতএব এই দেহের সুখের জন্যে সর্বতো প্রয়াসই মানুষের করণীয়। দু' কথায় এই হলো চার্বাক দর্শন যাকে আজকের পরিভাষায় বস্তুবাদী দর্শন বলে অভিহিত করা চলে।

এই বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তা ক্রমশই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে প্রসারিত হয়ে চলেছে। একালের মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে চার্বাক দর্শনের মিল লক্ষণীয়। মানুষের সর্বতোমুখী সুখের সন্ধান, সে তো মানবহিতৈষণারই কথা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের দুঃখী মানুষ, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষের কাছে এই মতবাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ তো থাকবেই। এবং এই নাস্তিক দর্শনের যুক্তি খণ্ডন খুব সহজ নয় বলেই এমন কি কোন কোন বিখ্যাত খৃস্টান ধর্মযাজকও সামাজিক সমস্যা সমাধানে মার্কসবাদের গঠনমূলক ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারেন নি। এ অবস্থায় মার্কসবাদের বা অনুরূপ কোন মতবাদের ঢেউ যে ক্রমে-ক্রমে দেশে-দেশে উত্তাল হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটের ওপর মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়ন ও বঞ্চনা আর চলবে না, সেই পরিবর্তনেরই পদধ্বনি চলেছে আজ পৃথিবীর সর্বত্র। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই। কারণ তিনিই প্রকৃত কবি বা সাহিত্যিক যিনি নিজের মধ্যে আপন কালকে অনুভব করেন এবং সকল মানুষের দর্পণে নিজেকে দেখে তা প্রকাশ করেন। মানুষের কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের ভাষায় প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই সেই একই কথা—

> In all people I see myself, none more
> and not one a barley less,
> And the good or bad I say of myself
> I say of them:

কিন্তু আজকের যুগে আমরা যখন দেখছি দেশ-বিদেশে সংসার-সমাজ সব ভেঙে চুরমার হয়ে চলেছে, একটা নতুন ঝড়ো হাওয়া যখন বয়ে চলেছে গোটা দুনিয়ার ওপর দিয়ে তখন কি আমরা শুধু ভাঙনের গানই গাইবো, ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর ছবি কি আমরা আঁকবো না?

সুপণ্ডিত নীরদ চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

> 'I have long since come to hold that we modern Indians have no social life'

নিজের দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রীচৌধুরী তাঁর এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই ধারণার মধ্যে সত্যতা আছে নিশ্চয়ই, তবে সেখানে কিছুটা অতিশয়োক্তিরও আশঙ্কা করছি। আমাদের সামাজিক জীবনে বা সামাজিকতায় অনেক গলদ ঢুকেছে ঠিকই, তবুও আতিথেয়তা এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি, কিম্বা অভদ্রতা বা পরনিন্দা-পরচর্চাই অথবা নানা রকমের অপরাধই আজকের এই ক্ষীয়মান সমাজেরও শেষ পরিচয় নয়। চোখ মেলে তাকালে এবং আন্তরিকভাবে দেখতে চাইলে এ সমাজে এখনো অনেক ভালো কাজের ও ভালো দিকের সাক্ষাৎ মিলবে।

সর্বদেশে সর্বকালেই কিছু কিছু অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এদেশের ছয়-সাত হাজার বছরের ইতিহাসেও অনেক বড়-বড় অন্যায় ও অপরাধের দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেজন্যে হতাশ হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। ভারতীয় জনসমাজে ইদানীং উচ্ছৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা কিছু বেশী পরিমাণেই দেখা দিয়েছে। তার বিভিন্ন কারণের কথা আগেই বলেছি। আরেকটা কারণ বেদ-নিযুক্ত আমাদের অদৃশ্য সমাজ-পাহারাদার ঈশ্বরকে আমরা' বরখাস্ত করতে চলেছি। সে কারণে সমাজে সাময়িকভাবে অন্যায়-বোধ ও পাপবোধ অত্যন্ত শিথিল হয়ে এসেছে। এককালের ঈশ্বর—ভয়ের [illegible] শাসন-ভয়ের যখন মুখোমুখি হতে [illegible] মানুষকে তখন আবার ভয়ে-ভয়ে [illegible] পথে ও সত্য পথে চলতে আরম্ভ [illegible] অপরাধের পরিমাণও তখন কমে [illegible] অথবা সেই ভয় যখন নিজেরই মধ্যে [illegible]-গত সংস্কারে দাঁড়াবে, সমাজ কল্যাণের [illegible] দৃষ্টিতে ব্যষ্টি মানুষ নিজেই তখন [illegible] পাহারাদার হবে, সমাজ-সচেতন [illegible] মানুষই অবতীর্ণ হবে ভগবানের [illegible]। 'আত্মানং বিদ্ধি'র হিত কথা তখন [illegible] পূর্ণতা লাভ করবে। তখন তাকে [illegible] করার জন্য বলার দরকার হবে না: [illegible]! এজন্য নিশ্চয়ই একটা অনুকূল [illegible] বুনিয়াদ বাঞ্ছিত।

কবি বা সাহিত্যিককে দ্রষ্টা [illegible] আজও ধরে নেওয়া চলে তা'হলে [illegible] সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই কল্যাণের দৃষ্টি। কাজেই তাঁর রচিত সাহিত্য শুধুমাত্র সমকালীন সমাজের ফটোগ্রাফ বা প্রতিচ্ছবিই হবে না, পাঠক সেখানে তার চেয়েও বেশী কিছু হয়ত প্রত্যাশা করবে। যা অধঃপতন থেকে উত্তরণের পথ দেখায় সেই সাংস্কৃতিক-বোধের পরিচয়টুকু সে পেতে চাইবে সাহিত্যের পাতায়।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটবে, সে তো স্বাভাবিক। গাছ বড় হয়, তার যেমন একটা মূল থাকে তেমনি প্রত্যেক সমাজেরই মূলে তার সংস্কৃতি। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারায় আমরা সেই সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী হয়ে বসি। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে প্রত্যেকেই যেমন তার উত্তরাধিকার রক্ষা করতে পারে না, তেমনি জাতিও বিভ্রান্তি-বশে বা কোন বিপর্যয়ে পড়ে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে হারিয়ে ফেলে। তখনি দেখা দেয় বিবেকের সংকট। তেমনি এক সংকটকালের ভেতর দিয়ে আমরা যখন চলেছি তখনকার সাহিত্যে বেশী করে অন্ধকারের ছায়াপাত ঘটবেই।

কিন্তু বিবেকের এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠবোই। তখন আমাদের সাহিত্যে আবার আলো, আরো আলোর উৎসবে আমরা শরিক হবো।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। এক ।।

আড়াইশো বছরের ঠান্ডা কামানটার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে কল্পনা গাইডবুকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। সামনে শীতের শান্ত নীল গঙ্গা। বালির চরে কয়েকটা লেজনাচানো পাখি। ওপারে রোশনীবাগের কবরখানায় যেখানে সুবে বাংলা-বেহার-উড়িষ্যার এক পরাক্রান্ত নবাব সুজাউদ্দীন অবাধ ঘুমে মগ্ন, সেখানে দীর্ঘ উদ্ধত শিমুলের শীর্ষ লাল ফুলে ভরা। ওদিকেই কোথায় যেন ছিল ভাগ্যহত সিরাজদ্দৌলার সাধের হীরাঝিল। অজস্র গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে সবুজের দুর্ভেদ্য দুর্গ ওপারে। বড় রহস্যময় লাগে। সামনে কয়েক পা হাঁটলে মিয়ানো কাতর ঘাসে ঢাকা প্যালেসচত্বরের শেষপ্রান্তে সাদা পাথরে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপর মন্ডপাকৃতি ছাউনি। সেখানে একটা থামে হেলান দিয়ে বসে আছে নীরেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে কী আওড়ে চলেছে শুভ। অবাধ উত্তরহাওয়ার বেগে তার রুক্ষ চুল উড়ছে। পাঞ্জাবি উড়ছে। ধুতিও ওড়াউড়ি করছে। অত রোগা ঢ্যাঙা শুভ! হাওয়ার তাড়ায় এক্ষুনি সোজা গঙ্গার ঠান্ডা জলে গিয়ে না পড়ে! কবিতা শোনাচ্ছে নির্ঘাৎ। কল্পনা মাঝে মাঝে মুখ তুলে দৃশ্যটা দেখছিল আর মুখ টিপে হাসছিল। কিন্তু নীরেনের আজ হল কী? দিব্যি সুবোধ বালকটি বনে শুভর কবিতা গিলছে নিঃশব্দে,—এমন তো হবার কথা নয়!

স্বাতীকে এতক্ষণে ইমামবাড়ির ফটক পেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পাশে যথারীতি দিব্যেন্দু। দুজনেরই চোখে গগলস। রোদে অবশ্য তত বেশি উজ্জ্বলতা নেই। একটু ভিজে ভাব থাকায় উষ্ণতাটুকু যে ওম যোগাচ্ছে, তা চোখের পক্ষে স্নিগ্ধ। আকাশের এখানে ওখানে ছিটে-ফোঁটা মেঘ রয়েছে। ঘুম ভাঙবার পরই স্বাতীর মুখে খবর জানা গিয়েছিল, আবহাওয়া প্রতিকূল। দারুণ কুয়াশা। সারা আকাশ হাল্কা মেঘে ঢাকা। স্বাতীর খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। উঠে বাইরে

কিছুক্ষণ ঘুরে এসেছিল। ও পাক্কা অ্যাথলেট মেয়ে। ওর পক্ষে এটা সম্ভব। বিদেশে-বিভুঁয়ে বেড়াতে এসেও অভ্যাস বা বিধি বদলায় না। তাতে নাকি হঠাৎ স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এবং একা রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষণ সঙ্গে। ওই দিব্যেন্দু। সেও জাত অ্যাথলেট। দুটিতে যা সব কথাবার্তা বা তর্কবিতর্ক চলে, সবই খেলাধুলোর রাজ্যের। কল্পনার তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। সে মনে মনে বিরক্ত হয়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও যে ধান ভানে, তার জলজ্যান্ত নমুনা ওরা দুটিতে। অবশ্য এবার মুরশিদাবাদ বেড়াতে এসে দিব্যেন্দু সম্ভবত একটু অন্যরকম হতে চাচ্ছিল, হতে পারছে না স্বাতীর জন্যে। দিব্যেন্দু যদি বা ইতিহাসের প্রসঙ্গ তোলে, স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে তার মোড় ফিরিয়ে দেয়। সে কি স্বাতীর বাজী জিতে নেওয়ার চেষ্টা? দিব্যেন্দু অবশ্য স্বাতীর দূরসম্পর্কের মাসতুতো না পিসতুতো ভাই। সে থাকে বেহালায়, স্বাতীরা টালায়। কল্পনা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। দিব্যেন্দুকে সব সময়—অন্তত বাইরে কোথাও গেলে, স্বাতী যেন এমনি করে আটকে রাখতে চায়। বাহুবন্ধনে? হয়ত তাই। কল্পনা মুখ টিপে হাসে, কিন্তু খারাপও লাগে। কত কী আছে জীবনে, কত ছোট-বড় সূক্ষ্ম বা গভীর লক্ষ্য করার বস্তু। ওই সব গাছপালায়, বাতাসে, রোদে, জলে, আকাশে। কল্পনা কবিতা লিখতে পারে না। শুভ পারে। এখানে আসা অব্দি শুভর প্রতি সে মনোযোগী হয়ে পড়েছে। কিন্তু সংকোচ—সংকোচ সে ওই স্বাতীর জন্যে। বাইরে-বাইরে যা দেখার মত ব্যাপার, তা হচ্ছে আপাতত স্বাতীর গারজেন দিব্যেন্দু আর কল্পনার গারজেন স্বাতী।

পোষাকে স্বাতী সবসময় বিদেশিনী অর্থাৎ পশ্চিমী। খুব সফিসটিকেটেড ধরনের মেয়ে। স্বাতীর মত খেলোয়াড় মেয়ের পক্ষে এটা বেমানান লাগে। সচরাচর খেলোয়াড়েরা—কল্পনার যা ধারণা, একটু বোকাসোকা, সরল, আন-সফিসটিকেটেড হবে। স্বাতী তার উল্টো। গত রাতে নীরেন একটা তর্ক তুলেছিল—যা কিছু ওয়েস্টার্নাইজেশন, তাই মডার্নিজম কি না। কল্পনা টের পাচ্ছিল এ আক্রমণের লক্ষ্য স্বাতী। হোটেলের ডাইনিং হলে কাল রাতে স্বাতীর অমন আঁটো প্যান্ট আর ক্ষুদে কোট সবার চোখেই হয়ত বিসদৃশ ঠেকছিল। তর্ক জমতে দেরী হয় নি। সেই প্রৌঢ় অধ্যাপকও যোগ দিলেন টেবিলে। কী নাম যেন—দেবতোষ ব্যানারজি। খুব চেনা লাগে নামটা। কবে যেন শুনেছিল নামটা, মনে পড়ে না। তর্ক রাত বারোটা অব্দি গড়াচ্ছিল। হঠাৎ ওপর থেকে নেমে এলেন অধ্যাপকের 'জাঁদরেল জেনারেল' গিন্নিটি। অধ্যাপক নতমস্তকে ত্রাহি ত্রাহি গোপন আর্তনাদ তুলে বিদায় নিলেন।...

বেলা বাড়লে কল্পনারা যখন বেরিয়েছে, অধ্যাপক দম্পতিকে দেখা গেছে নহবতখানার ওদিকে। রিকশো চেপে কোথায় চলেছেন দুটিতে। স্বাতী হাসতে হাসতে বলেছিল, শূর্পনখা ব্যানারজি! অদ্ভুত নাম দিয়েছেন নীরেনবাবু। কী নাম যেন ভদ্রমহিলার—এই শুভ, বলো না নামটা? তুমি তো কাল বিকেলে ওঁর সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছিল!

শুভ বলেছিল, সুদেষ্ণা। তা তোমরা যাই ভাবো ওঁকে, ওঁর হৃদয় আছে।

নীরেন চাঁটি তুলে বলেছিল, থাম ব্যাটা কবি। হৃদয় আবিষ্কার করে বেড়াচ্ছে সেই থেকে। এখন হৃদয়ের বাসস্থান মগজে। তার খবর রাখিস?

প্রকারান্তরে নীরেনের কথাটা যথার্থ হতে পারে। কল্পনার ধারণা—কেন এ ধারণা হল সে জানে না, ভদ্রমহিলা সম্ভবত বুদ্ধিমতী। সব দিকে লক্ষ্য তীক্ষ্ন। তা না হলে কল্পনার টুথব্রাশ হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে সবাই যখন হাসাহাসি করছে, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, বিদেশে এসেছ মেয়েরা, সাবধানে থাকো না কেন? এর পর আস্ত মুখের দাঁত চুরি যাবে, দেখে নিও। ছ্যা ছ্যা, কী জায়গায় না আসা গেছে!

কে জানে কেন, কথাটা শুনে গা শিউরে উঠেছিল কল্পনার। তবে মজার কথা দাঁত যাবার আগেই স্বাতীর এক পাটি কেডস জুতো গেছে। কুকুর-টুকুর নয় তো? প্যালেস হোটেলের মধ্যে কুকুর নেওয়া নিষেধ। তাছাড়া বাইরের লোকেরা কেউ কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসেন না এখানে। এক সম্ভাবনা, স্থানীয় নেড়ি কুত্তা। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজারটি ভীষণ দুঁদে। ভদ্রলোকের চোখ এড়িয়ে নীচের লনটুকু পার হওয়া কুকুর কেন ছুঁচোর পক্ষেও অসম্ভব। সুতরাং সবায় ধরে নিয়েছে নির্ঘাৎ দলের কারো তামাসা।...

অন্যমনস্কভাবে কল্পনা গাইডবুকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পড়ছিল না কিছু। স্বাতী আর দিব্যেন্দুকে এদিকে আসতে দেখে তাদের দিকেই তাকিয়ে রইল এবার। বিভাসের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। ওদের সঙ্গে ইমামবাড়ির ভিতর ঢুকেছিলেন ভদ্রলোক। এখনও বেরোলেন না যে!

গলায় ঝুলন্ত ভিউফাইন্ডারটা তুলে চোখে রাখল কল্পনা। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে দূরে নহবতখানার ওপরতলায় দৃষ্টি পৌঁছল। আরে! থামে হেলান দিয়ে বুকে দুটো হাত বেঁধে বিভাসবাবু তাকিয়ে আছেন ভাঙা কেল্লাবাড়িটার দিকে। শুভর মত ভাব লেগেছে বুঝি মনে! কল্পনা মুখ টিপে একটু হাসল। ওঁর গানের কলিটা মনে পড়ছে।

আমরা সবাই এসেছিলাম হারিয়ে যাবার
খেলায়

অন্ধকারের ভেলায়

নিশীথ রাতে পাতাঝরা বনে...

বেশ গায় বিভাস। কাটরা মসজিদের মিনারের ওপরতলায় উঠে জমিয়ে তুলেছিলেন ভদ্রলোক। কেবল বেরসিক নীরেনটা আচমকা ডি এল রায়ের বুড়ো বাদশা শাহজাহান সেজে চেঁচিয়ে উঠেছিল, দিই লাফ, দেবো লাফ... এবং গানটা আকাশের শূন্যে অকালে মারা প[illegible]। কাল বিকেলে।

ভিউফাইন্ডারে বিভাসকে তন্ময় হয়ে দেখছিল কল্পনা। ফরসা রঙ টানা চোখ নায়কোচিত মুখশ্রী। বড় বড় চুল বাতাসে উড়ছে। একটুখানি অন্যমনস্ক সৌখিনতার ছাপ আছে বেশভূষায়। পালিসিল্কের পাঞ্জাবি, বাদামী স্ট্রাইপড জহর কোট, চওড়া পাড় তাঁতের ধুতি, বিচিত্র কোলাপুরী চপ্পল। সব মিলিয়ে কিছুটা সেকেলে জমিদারী ছাঁদ। নিজেকে ভবঘুরে বলা অভ্যাস আছে বিভাসবাবুর। এখানে এসে আলাপ হয়েছে, কিন্তু মনে হয় কতকালের চেনা। খুব সহজেই কল্পনাদের দলের সঙ্গে মিশে গেছেন।

স্বাতী এসে গেল। অদ্ভুত মেয়ে যা হোক! চুপচাপ ওই ঠাণ্ডা কামানটায় বসে কী করছ? উঠে এস।

কল্পনা হাসল।...তোমাদের দেখছিলাম স্বাতীদি। কাছের মানুষগুলো দূরে গেলে কী অদ্ভুত দেখায়, ভাবা যায় না।

দিব্যেন্দুর মুখটা গম্ভীর। সে বলল, আজকের বারোটা অব্দি প্রোগ্রাম মোতিঝিল আর কাঠগোলার বাগান। চলো, ওঠা যাক।

কল্পনা কামান থেকে উঠেছে। আড়ামোড়া খেল। তারপর হাল্কা পায়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। বলল, কালকের মত হাঁটতে পারব না বলে দিচ্ছি। রিকশো করতে হবে।

স্বাতী বলল, সেটা কর্তার ইচ্ছে।

দিব্যেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আজ কর্তাটর্তা যা কিছু, সব ওই নীরেন। বাপ্সে! মেয়েদের ম্যানেজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কল্পনা ফুট কাটল।... পা ব্যথা করলে কাঁধে চাপতে চায় বুঝি?

পেলে ছাড়ে না কেউ। দিব্যেন্দু মন্তব্য করল। পরক্ষণে স্বাতীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে কল্পনার দিকে চোখ টিপল।

স্বাতী ফোঁস করে উঠল। থামো! তোমারও কোনদিন না কোনদিন প[illegible] মচকাবে। তখন কার কাঁধে চাপ[illegible] দেখবো'খন।

আগের রাতে নীচের ডাইনিং হলে খেতে আসবার সময় আচমকা সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল স্বাতী। হাঁটুতে লেগেছিল। এখনও পট্টি বেঁধে রেখেছে। কাল পথ হাঁটতে বেচারার খুবই কষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই। রিকশো নিচ্ছি-নিচ্ছি করে এক মাইল হাঁটিয়েছিল দিব্যেন্দু। বোঝা যাচ্ছে, রাগটা এখনও পড়ে নি। দিব্যেন্দু বলল, আচ্ছা, বিভাসবাবু কোথায় গেলেন? ইমামবাড়ির ভিতর গিয়ে আর খুঁজে পেলাম না ভদ্রলোককে। কী খামখেয়ালী লোক রে বাবা?

স্বাতী বলল, হারিয়ে গেছেন। হারিয়ে যাবার গান গেয়ে বেড়ান কিনা।

কল্পনা বলল, ওই দ্যাখো, নহবতখানায় নহবত বাজাচ্ছেন।

কল্পনার গলা থেকে ভিউফাইন্ডারটা নিল দিব্যেন্দু। চোখে রেখে বলল, স্ট্রেঞ্জ! একেবারে ধ্যানী মূর্তি। ব্যাপার কী?

কল্পনা বলল, কাল ওঁর গানের সময় তোমরা বাধা দিলে। ভদ্রলোক নিশ্চয় রেগে

গেছেন। সেণ্টিমেন্টে লেগেছে নির্ঘাৎ। সকাল থেকে কেমন বিরস মুখ দেখছিলাম। এড়িয়ে যাচ্ছেন যেন।

স্বাতী বলল, তোর কল্পনার দৌড় অসামান্য। যা না, রাগ মানিয়ে নিয়ে আয়!

দায় পড়েছে। বলে কল্পনা হন হন করে এগিয়ে ঘাটের মন্ডপটার কাছে পৌঁছল। শুভ আর নীরেন মুখ ফেরাল। কল্পনা গিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল এক পাশে।

ততক্ষণে ইতস্তত কিছু কিছু মানুষের ভিড় শুরু হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় অবশ্য কমই। সেদিন অন্তত ছ'-সাত হাজার মানুষ এসেছিল এ ভূতের শহর দেখতে। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার সুরঞ্জনবাবুর হিসেব বা মন্তব্য এটা। বছরে-বছরে ট্যুরিস্টের সংখ্যা বাড়ছে মুর্শিদাবাদে। হরেক দেশের হরেকরকম মানুষ। হাজারদুয়ারীর বিরাট প্রাঙ্গণটা গিজগিজ করে। কত সব রঙ-বেরঙের পোষাক-আসাক হল্লা-হুল্লোড়। থাকবার জায়গা অপ্রচুর। দশ-বারোটি ঘণ্টা কাটিয়েই চলে যেতে হয়। তবে আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখলে কয়েকটা দিন কাটানো যায়। গঙ্গার ধারে পুরনো একটা প্রকাণ্ড দালানবাড়িতে সদ্য এ বছর নতুন হোটেল খোলা হয়েছে—ওই প্যালেস হোটেল। কোন শিল্পী নবাবের বসতবাটি ছিল নাকি। ইটালিয়ান স্থাপত্যের ধাঁচে তৈরী দোতলা বাড়ি। ওপরে নীচে সর্বসাকুল্যে দশটা ঘর। তাছাড়া প্রকাণ্ড ডাইনিং হল আর কিচেন রয়েছে। টানা বারান্দা আর বড় বড় থাম আছে। পিছনের দিকে লন আর একটা সুন্দর বাগিচা আছে। সুইমিং পুলটার সংস্কার করা হয়েছে। ওদিকে পূর্বে মস্তো উঁচু পাঁচিল। তার ওধারে প্রাইভেট রোড। নিজামত কেল্লা। বর্তমান নবাবপরিবারের লোকেরা থাকেন। উত্তরে—জানালার বাইরে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা একটা পুরনো বাগান। বাগানে দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ যেমন আছে, তেমনি বুনো গাছের সংখ্যাও অগুনতি। দিনের বেলা হাটতেও গা ছমছম করে। ঘন ছায়া ঝোপ-ঝাড় বেঁজি-খাটাস-শেয়াল-সাপখোপের বাসা। ঠিক মাঝখানে গভীর একটা ডোবা আছে। ডোবার পাড়ে একটা ভাঙা মসজিদ। এ তিন দিনে শহরের অনেকখানি জায়গা চষে বেড়িয়েছে ওরা।

হোটেলের পশ্চিমটা পুরো ফাঁকা। গঙ্গা। তার ওপারে সবুজ গাছে ঢাকা শান্ত গ্রাম। রোশনীবাগ হীরাঝিল—আরও কত ঐতিহাসিক জায়গা। সিরাজদ্দৌলার আমলে নাকি ওপারেই রাজধানীর দফতর-খানা ছিল। শুভ দিব্যেন্দু আর নীরেন পশ্চিমের ঘরখানা পেয়েছে। বড় ঘর। ডাবল সীটেড যাকে বলে। তার এ পাশেরটাও তাই। স্বাতী আর কল্পনা থাকে। তার ওপাশে বিভাসবাবু একা।

উত্তরপ্রান্তের ঘরের সামনে টানা বারান্দা। তারপর সামনাসামনি দুটো ঘরের একটায় সেই অধ্যাপক দম্পতি। অন্যটায় কাল দুপুরে আরেক দম্পতি এসে ঢুকেছে। শুভ ভীষণ আলাপী। রাতারাতি ভাব জমিয়ে নিয়েছে। দীপেন বোস আর তাঁর স্ত্রী ইরা বোস। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ব্যবসা আছে। স্ত্রীর বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ। দুটিতেই কিঞ্চিৎ অমিশুক প্রকৃতির। কিন্তু শুভটা বেহায়া। গায়ে পড়ে বউদি ডাকতে শুরু করলে কল্পনার যা রাগ হয়েছিল শুভর ওপর!

বারান্দার শেষপ্রান্তে খাপছাড়া ছোট্ট একটা ঘর আছে। সম্ভবত সারভ্যান্টস রুম। ওটাও ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ক'দিন আগে থেকে এক ভদ্রমহিলা নিয়েছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাকি। নাম চীনা মিত্র। খুবই আলাপী আর হুল্লোড়বাজ মেয়ে। ছবি আঁকা হবি। ভোরে তুলি ইজেল ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়েছে আজ। কোথায় ছবি আঁকছে নিরিবিলি কে জানে। কল্পনার বেশ ভালো লাগে মেয়েটিকে। বয়সে কল্পনার অনেক বড়। তাহলেও সখী-সখী হাবভাব হুল্লোড়বাজী মিলিয়ে সমবয়সীই দেখায়। ছিমছাম পোযাক, হাল্কা গড়ন, মুখশ্রী আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যা আছে, তা সাহস। একা চলে এসেছে বিভুঁয়ে!

কল্পনা হাঁটু ঘিরে দু-হাত জড়িয়ে বসেছে। শুভ বলল, একা বসেছিলে দেখছিলাম।

কল্পনা হাসল।... কবিতা পড়ছিলেন নাকি?

নীরেন উঠে দাঁড়াল। রক্ষে করো বাবা। আর কবিতা নয়। দিব্যেন্দু, আজকের প্রোগ্রাম কী রে?

দিব্যেন্দু এসে বলল, মোতিঝিল। কিন্তু মাইন্ড দ্যাট, আমি আজ দলনেতার পার্ট করছি নে। সব ভোট তোকেই দিচ্ছি আমরা। কী বলো স্বাতী?

স্বাতী আনমনে বলল, হ্যাঁ।

কল্পনা বলল, বরং কবিবর নিন না আজ। সোজা কবিতার রাজ্যে নিয়ে চলুন।

নীরেন চোখ পাকিয়ে বলল, অসম্ভব। রাস্কেলটা আমার কান ব্যথা করিয়ে দিয়েছে।

শুভ বেজার মুখে বলল, এই! মেয়ে-দের সামনে অপমান করিস নে তো। ভাল্লাগে না।

সবাই হেসে উঠল এবার। নীরেন বলল, ঠিক আছে। আই এ্যাম দি লীডার। কিন্তু আগেভাগে বলে দিচ্ছি, প্রোগ্রাম যাই থাক্—ইচ্ছে হলেই বদলাব। তখন কোনরূপ আপত্তি চলিবে না। রাজী?

কল্পনা চোখ বুজে ঢোক গিলে বলল, রাজী হইলাম।

শুভ নতমস্তকে বলল, যথা ইচ্ছা তব যাইতে প্রস্তুত, অনুগামী দোসর, লক্ষ্মণসম, বনে কিংবা শমনভবনে...

কথা কাড়ল দিব্যেন্দু।... স্বাতীর কিন্তু পায়ে ব্যথা!

নীরেন তেড়ে এল। সেটা স্বাতীর বলার কথা। তুই কে রে ছোকরা? মনে রাখিস, এখন থেকে আমিই স্বাতীর গারজেন। স্বাতী, কী বলো?

স্বাতী আজ কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। থতমত খেয়ে বলল, রাজী।

হুররে! নীরেন আর শুভ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল।

দিব্যেন্দু হার মানার ভঙ্গীতে বলল, অল রাইট। চলো, জাহান্নামের দিকেই যাত্রা করা যাক্। বলে সে একবার দ্রুত আকাশটা দেখে নিল। মেঘ ছিটেফোঁটা আছে ইতস্তত। কিন্তু আপাতত সূর্যের চারপাশটা বেশ ফাঁকা। রোদ একটু খর হয়েছে। গাছপালার মাথায় কুয়াসার ধূসরতা মুছে গেছে সবার অলক্ষ্যে। ফের সে পায়ের কাছাকাছি ও খানিক তফাতে মাটির ওপর কী যেন খুঁজল। তারপর ...এক মিনিট—যে যেখানে আছো নড়ো না, বলে দৌড়ে সিঁড়ির ধাপে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্ত থ বনে গিয়েছিল সবাই। তারপর বুঝেছে। ক্যামেরা খুলছে দিব্যেন্দু। কিন্তু শাটার টেপার মুহূর্তে কল্পনা দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। দিব্যেন্দু হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। কল্পনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, ধুৎ! আমার ফোটো ভালো হয় না। একেবারে পেত্নীর মত লাগে।

দিব্যেন্দুর খেয়াল হল এতক্ষণে, কল্পনার ক্যামেরা-ভীতি আছে। এখানে আসবার পর যতবারই ছবি তুলেছে কল্পনা হয় সরে গেছে চরম মুহূর্তে, নয়তো মুখে হাত ঢেকেছে। পরে স্বাতীর কাছে সে জেনেছে, কল্পনা ছেলেবেলা থেকে ওইরকম নার্ভাস হয়ে পড়ে ক্যামেরার সামনে। ওর ছবি নেওয়া এক সমস্যা। অন্যমনস্ক থাকলে তবেই ওর ছবি তোলার সুযোগ মেলে। কিন্তু কারই বা এত গরজ আছে ওর ছবি তোলার! বাড়িতে দুটোমাত্র মেয়ে—কল্পনা আর স্বাতী। দিব্যেন্দু যেমন দূর-সম্পর্কের ভাই, কল্পনাও নাকি স্বাতীর সেইরকম বোন। ছেলেবেলায় বাবা-মা মারা গিয়েছিল। স্বাতীর বড়লোক বাবা আত্মীয়কন্যা কল্পনাকে মেয়ের মত মানুষ করেছেন। ওরা দুটিতে সোদর দিদি-বোনের মত বেড়ে উঠেছে। স্কুলে কলেজে গেছে। স্বাতীর বাবা বেঁচে নেই এখন। মা আছেন। তিনিও রুগ্না। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। এদিকে স্বাতীর স্বাধীনতা অবাধ স্বভাবত। তবে খেলাধুলোয়, তার যত গভীর আকর্ষণ, অন্য কিছুতে নয়। ক্যামেরায় শখ স্বাতীর নেই।

দিব্যেন্দুর অপ্রস্তুত চেহারা দেখে স্বাতী একটু হাসল মাত্র। কোন মন্তব্য করল না। ছবি অবশ্য উঠবেই একটা। তাতে দেখা যাবে কল্পনার মুখটা দু-হাতে ঢাকা।

যেতে যেতে শুভ বলল, বুঝেছি। আমাহেন সব বাঁদরবর্গের মধ্যে কল্পনা-সুন্দরী ছবি তুলবে কোন্ দুঃখে?

ফের সবাই একচোট হেসে নিল। শুভ তারপর যথারীতি কবিতা আওড়ানো শুরু করেছে :

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!...

নীরেন হাত তুলে গর্জাল। ...স্টপ ইট, আই সে। শুধু ঝরা আর মরা ছাড়া কথা নেই! ওই এক হিরো জুটেছেন কোত্থেকে কাল গম্বুজের ওপর উঠে শুনি, তিনিও ঝরাঝরির গান জুড়েছেন। গজানোর চিন্তা নাই কিচ্ছু, শুধু মরা আর ঝরা।

দিব্যেন্দু বুঝতে না পেরে বলল, সংসারটাই ঝরার। লাইফ ইজ এ বিগ ট্রাজেডী।

শুভ সোৎসাহে ওর হাত ধরল পিছিয়ে এসে। ...ইয়েস! বিশ্বজুড়ে ওই ঝরার গান বাজছে। অ্যান ইন্টারন্যাল উইনটার। ঝরছে, ঝরছে, আর ঝরছে। বুঝলে স্বাতী?

আনমনা স্বাতী চমকে উঠে বলল, কী?

পাতা। বলে নীরেন হা-হা করে হেসে উঠল। আহাম্মক যত সব। দিব্যেন্দু একজন স্পোর্টসম্যান হয়েও জীবনকে ট্রাজেডী বলে ফেলল। আসলে এইসব বুঝভুড়ুল-গুলো জানে না, ইট ইজ নাথিং বাট এ কমেডী। জামপিং ফ্রম সিচুয়েশান টু সিচুয়েশান...

স্বাতী মৃদু হাসছিল। জামপিং রেস! কাল রাতে পায়ের স্টেপিং আর একটু গোলমাল হলে সে প্রাচীন নবাবী দালানের এত উঁচু থেকে নীচে গিয়ে পড়ত যে আপাতত কয়েক মাস সর্বাঙ্গে প্লাস্টার এঁটে শুয়ে থাকতে হত। সে অবশ্য স্বাতীর ক্ষেত্রে। কল্পনা কি অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙে মারা পড়ত। সত্যি, জীবন মানেই লাফ দিয়ে-দিয়ে অক্ষত এগোনো—লোকহাসানো তামাসা ছাড়া আর কী? মনে মনে সে বলল, নীরেনদা ইজ কারেকট। কিন্তু অমন করে কলার খোসা সিঁড়ির মাথায় কে ফেলল? ম্যানেজার খুব বকাবকি করেছে চাকর-বাকরদের। বোর্ডাররাও এক-বাক্যে বলেছে, কাল থেকে আজ এখন অব্দি কেউ কলা খায় নি।...

নীরেন কিন্তু বিভাসবাবুর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে সবার। শুভ দিব্যেন্দুর গলা থেকে ভিউফাইন্ডারটা নিয়ে চোখে রাখল। প্রাঙ্গণের দিকটা দেখতে দেখতে বলল, সেই মস্তানগুলো আজও যায় নি দেখছি। বেলেল্লাপনার আর জায়গা পায় নি—এসেছে পোড়ো শহরে বদমাইসি করতে। আরে! বিভাসবাবু ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন? ওটার নাম কী যেন নীরেন, ওই যে রাস্তার ওপর ফটকটা?

নীরেন বলল, নহবতখানা। আগের দিনের লোকেরা বেশ ছিল রে। কেমন রোমান্টিক, ভাবগদগদ জীবন। ভোরবেলা শহরের লোকের ঘুম ভাঙত নহবতের সুরে। আসা।

শুভ বলল, বিভাসবাবু সানাই বাজাচ্ছে নাকি রে? চল, ওদিকেই যাই। ওঁকে না নিলে জমবে না।

স্বাতী বাদে সবাই সোল্লাসে বলল, ঠিক, ঠিক।

দলের গতি বাঁক নিল এবার। স্বাতী বলল, কোথায় যাওয়া হবে আজ?

নীরেন গম্ভীর হয়ে বলল মোতিঝিল। ঘসেটিবেগমের প্রাসাদে।

কেল্লাবাড়ির কাছে আসতেই দীপেন বোস সস্ত্রীক আবির্ভূত হলেন। শুভ চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাল্লো ইরাবউদি, হ্যাল্লো দীপেনদা! নমস্কার, নমস্কার। আসুন, দলে ভিড়ে যান।

দীপেন বোস সুটেড-বুটেড জেন্টল-ম্যানের গাম্ভীর্যে বললেন, কোথায় চলেছেন সব?

মোতিঝিল। শুভ জানাল।

ইরা বোস এগিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে কল্পনার হাত ধরল। ...কাল অত রাত্রে বেরিয়ে গান গাইছিলেন। ভাবলুম, পা টিপে এগিয়ে চমকে দিই। দিলুম না। ভারি সুন্দর গাইতে পারেন তো!

স্বাতী চমকে উঠে বলল, কল্পনা! তাই নাকি?

কল্পনা অপরাধীর মত হাসল মাত্র।

দীপেন বোস নীরেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন। দিব্যেন্দু আর শুভ পাশাপাশি। পিছনে কল্পনা স্বাতী আর ইরা। ইরা বলল, সেই ভদ্রমহিলা কই? আপনাদের সঙ্গে দেখছিলুম কাল—সেই যে...

বুঝতে পেরে কল্পনা বলল, চৈনাদি? কোথায় যেন ছবি আঁকছেন।

ও! উনি বুঝি আরটিসট? ইরার ঠোঁটে একটু কুঞ্চন দেখা গেল।

শুভ প্রচন্ড হাত নাড়ছে নহবতখানা লক্ষ্য করে। বিভাসকে না নামিয়ে ছাড়বে না। কাছাকাছি যেতেই বিভাসের দেখা পাওয়া গেল নীচের ফটকে। হাত তুলে নমস্কার করল সে।

কল্পনা কয়েক পা এগিয়ে বলল, ওখানে কী করছিলেন এতক্ষণ?

বিভাস সলজ্জ হাসল। ...এমনি। বেশ ভালো লাগছিল চারপাশটা।

শুভ চাপা গলায় বলল, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই ইরাবউদির সঙ্গে। ভীষণ গানের ভক্ত কিন্তু। এমন বিশুদ্ধচরিত্রের নারী সংসারে দুর্লভ। আসুন।

যেতে যেতে বিভাস বলল, কাল এক মজার কান্ড হয়ে গেছে। রাত্রে বাথরুমের চৌবাচ্চায় আচ্ছাসে হাত-মুখ তো ধুয়ে নিচ্ছি। হঠাৎ দেখি জলের ভিতর এক পাটি কেডস জুতো...

কথাটা স্বাতী শুনতে পেয়েছিল। দৌড়ে এসে বলল, আমার, আমার।

আমার মানে? বিভাস অবাক।

শুভ বলল, আরে জানেন না বুঝি! স্বাতীর এক পাটি কেডস হারিয়ে গেছে যে। কী কান্ড দেখুন। নির্ঘাৎ নীরেনের রসিকতা।

বিভাস বলল, এ রসিকতার কিন্তু কোন অর্থ হয় না। চৌবাচ্চার জলে...অবশ্য স্বাতী দেবীর জুতো... কাচুমাচু হয়েছিল বিভাস, অন্য কারো নয়। তাহলেও জুতো তো। যাক গে, আমি সেজন্যে কিছু মনে করি নি স্বাতী। জুতোটা শুকোতে দিয়েছি জানালার ধারে।

কল্পনা খিলখিল করে হেসে উঠল। স্বাতীদি! ভদ্রলোককে তাহলে জুতো ধোওয়া জল খাইয়ে ছেড়েছ!

ইরা বলল, হাউ ফানি!

স্বাতী ধমকাল। ...কী অসভ্যতা করছিস!

হাসাহাসিতে কান গেছে নীরেন আর দীপেন বোসের। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। নীরেন বলল, এ স্পীডে হাঁটলে মোতিঝিল পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। মনে রেখো, ফিরে এসে লাঞ্চ খাবো।

বাঁকের মুখে দেখা গেল অধ্যাপক দম্পতিকে। রিকশোর দরাদরি করছেন। নীরেনদের দেখেই অধ্যাপক দেবতোষ ব্যানারজি সোল্লাসে চেঁচালেন, আসুন আসুন নীরেনবাবু। জহলাদের খড়্গ থেকে ত্রাণ করুন। সামান্য একটুখানি ঘুরিয়েই ভাড়া চায় তিন টাকা! বেশি দূর নয়—ওখানে রাধামাধবের মন্দিরটা দেখে থানার পাশের ঘাটে গেছি। সুদেষ্ণার স্নান করতে যা একটুখানি দেরী হয়েছে। তার জন্যে বলে এক টাকা বেশি দিতে হবে।

নীরেন একবাক্যে বলে দিল, দিয়ে দিন।

কয়েক মুহূর্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে ব্যাগ খুললেন অধ্যাপক। সুদেষ্ণা ভাবগম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। সদ্য-স্নাতা। এখনও পিঠে ভিজে চুলের ছাপ রয়েছে। টাকা বের করতে দেখে বললেন সত্যি দিচ্ছ নাকি?

সত্যি বইকি। দেবতোষ হাসবার চেষ্টা করছিলেন। ...এঁরা যখন বলছেন।

এবার রণচন্ডীর আবির্ভাব ঘটল। দু টাকার এক পয়সা বেশি নয়। এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছে? চলো, চলো আভি থানা মে।

এরা চাপা হেসে এগোল। পিছনে বচসা সমানে চলেছে। স্বাতীর কানে কানে কল্পনা বলল, শূর্পনখা ব্যানারজির চেহারাটা কিন্তু ভারি সুন্দর।

হাতিশালার কাছে পৌঁছতেই দলশুদ্ধ অবাক। পাশ দিয়ে অধ্যাপক দম্পতি সেই একই রিকশোয় বোঁও করে চলে গেলেন। যাবার পথে অধ্যাপক পিছন ফিরে, স্ত্রীর অগোচরে সম্ভবত, হাত নেড়ে কী বোঝাতে চাইলেন, সেটা বোঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু শুভ চেঁচাল, ব্র্যাভো! মোতিঝিলেই দেখা হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমারবাবু

ভবানী মুখোপাধ্যায়

একদা বাংলাদেশের ভদ্রমানুষদের নামের পিছনে বাবু শব্দটি যোগ করে সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গীতে তাঁদের নাম উল্লিখিত হত, যথা, বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, শরৎবাবু, সুভাষবাবু প্রভৃতি। সেকালে এই ট্র্যাডিশ্যান ছিল, এখন অবশ্য ধারা পাল্টিয়েছে; আমরা বলি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র। পুরাতন ধারা অনুসারে সদ্য পরলোকগত সাহিত্য-সাধক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীকুমার-বাবু' এইভাবে উল্লিখিত হতেন। দীর্ঘকাল ধরে শ্রীকুমারবাবু এই নামটি বাঙালীর মুখে মুখে ফিরেছে।

ভালো ছাত্র হিসাবে শ্রীকুমারবাবু হেতমপুর কলেজ থেকে এম-এ পাশ করে কলকাতায় আসেন। ১৯১০-এ ঈশান স্কলারশিপ নিয়ে বি-এ পাশ করলেন, আর এম-এ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই রিপন কলেজের অধ্যাপক হয়ে যোগ দিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯৭০ এই ষাট বছর কাল ধরে শ্রীকুমারবাবু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গেলেন। এমন দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মেলে। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীকুমারবাবুকে একটা বই পড়তে দেখা গেল। প্রশ্ন করা হল—এখন আর পড়ছেন কেন, কষ্ট হয় না? শ্রীকুমারবাবু বললেন—ঐ কষ্টটাকে ভোলার জন্যই বই পড়ছি। যতক্ষণ পড়ি ততখন ব্যথা-বেদনার চাপটা কম থাকে।

ইংরাজী ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে এম-এ পাশ করার পরই শ্রীকুমারবাবু প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক হয়ে এলেন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। এর পর তাঁর থিসিস ঃ 'রোমান্টিক থিওরী ওয়ার্ডসার্থ অ্যাণ্ড কোলরীজ' উচ্চ প্রশংসিত হল—শ্রীকুমারবাবু পি. এইচ. ডিতে সম্মানিত হলেন। তারপর সেই ১৯১২ থেকে কত ছাত্রই না তাঁর হাতে এসেছে, তাঁরা অনেকই উত্তরকালে অনেক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীকুমারবাবুর নাম 'লিজেনডে' পরিণত হয়েছে। শ্রীকুমার-বাবুর ইংরাজী পড়ানোর রীতি সেকালে মুখে মুখে আলোচিত হত। তাঁর পড়ানোর সময় অন্য কলেজের ছাত্রও গিয়ে হাজির হত। ইংরাজী সাহিত্যের একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত হিসাবেই মুখ্যতঃ শ্রীকুমারবাবুর খ্যাতি।

কিন্তু ১৯৪৬-এ সম্ভবতঃ খগেন মিত্র অবসর গ্রহণ করার পর শ্রীকুমারবাবুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনার জন্য 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হিসাবে ব্রতী করলেন। সেই সময় একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, শ্রীকুমারবাবু ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাই বলে তাঁকে বাংলার চেয়ার দেওয়া কি উচিত হল? এটা শ্যামাপ্রসাদের একটা হঠকারিতা। কিন্তু সেই ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বংগ ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে কি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা প্রমাণ করে গেছেন। মহাপণ্ডিত শ্রীকুমারবাবুর পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। সকলের জন্য ছিল তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও অপরকে সাহায্য করা তাঁর স্বভাব ছিল। শ্রীকুমারবাবুর মধ্যে অনন্য-সাধারণ নিষ্ঠা ছাড়া আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। যে গুণ ইদানীং বিরল হয়ে উঠেছে সেই প্রচারবিমুখতাই ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই ঠাণ্ডা মানুষটির অজস্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল, কোথাও সদস্য, কোথাও বা সভাপতি। সেনেট, সিণ্ডিকেট, কলা ফ্যাকল্টির ডিন, কলা বিভাগে স্নাতকোত্তর অধ্যাপনা পরিষদের সভাপতি, বোর্ড অব ষ্টাডিজের সদস্য, আবার রাজ্য বিধানসভার সদস্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের পরিষদীয় দলের নেতা, প্যাসেঞ্জার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, আবার ফুটবল খেলারও অনুরাগী। শেষ জীবনে ক্লাবে গিয়ে একটু তাস খেলতেন বা গল্প করতেন। রবিবাসর নামক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীকুমারবাবু সুস্থ থাকলে সর্বত্র গিয়েছেন যথাসময়ে, সমগ্র আলোচনায় ধৈর্যসহকারে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সভার শেষে সভাপতি হিসাবে যে সামগ্রিক আলোচনা করতেন তা অতিশয় মূল্যবান মনে হত।

শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন অজস্র। তাঁর কাছে যাঁরা বই পাঠাতেন তিনি তা সম্পূর্ণ পড়ে তার এক বিস্তারিত আলোচনা পত্রাকারে লিখে পাঠাতেন, অনেক কবি ও ঔপন্যাসিকের কাছে শ্রীকুমারবাবুর এই জাতীয় পত্র হয়ত এখনও অপ্রকাশিত আছে। এ ছাড়া তাঁর এক বিরাট অবদান—'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—এই সুবৃহৎ গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে। প্রতিটি সংস্করণে অনেক নূতন তথ্য ও নূতন গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হত। ইদানীং বলতেন আমি আর বেশী দিন নেই, এই গ্রন্থে অনেক ফাঁক আছে, অনেক উল্লেখযোগ্য নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, যাবার আগে সেগুলির প্রতি যথাযোগ্য বিচার করে যেতে চাই। দুঃখের বিষয় তাঁর এই মনোবাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল।

'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটির মত 'বাংলা ছোটগল্পের ধারা' সম্পর্কে অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনার বাসনা তাঁর ছিল, এই উদ্দেশ্যে একখণ্ড সংকলন গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করে গেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তার অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়নি।

সাহিত্য স্রষ্টা অনেকে আছেন, তাঁদের উপযুক্ত পরিচয় দান করার কাজটি সমালোচকের। উত্তম সাহিত্য স্রষ্টা প্রচুর কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উত্তম সমালোচকের অভাব আছে। ইদানীং এই অবহেলিত শাখায় বহু অযোগ্য ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শ্রীকুমারবাবু ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলে বাংলা সাহিত্যের

সমালোচনা রীতিতে এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনা করেছেন। সমালোচনার অর্থ যে নিয়ন্ত্রণহীন উচ্ছ্বাস কিংবা উন্মাদের মতো বিষোদ্গার করা নয় শ্রীকুমারবাবু তা জানতেন। এক আশ্চর্য প্রসন্ন মনোভংগীর ফলে তিনি যে সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারাশংকরের সাহিত্য-জগৎ সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীকুমারবাবু অতি-সংক্ষেপে লিখেছিলেন—

"A small Bengali village in-the Rarh area is, as it were, the epitome of all Indian hamlets, with its petty local factions, caste feuds, frustration and disillusionment, and its fumbling quest of a new and juster pattern of life. This is the world of which Tarasankar writes".

(Times of India—Dec.: 10.1967)

এই কথা বলে তিনি তারাশংকরের গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামের এক সুন্দর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন তারাশংকরের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির মুহূর্তে। তিনি এই দুটি উপন্যাস সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পর লিখেছিলেন—

The two novels are a land mark in the history of Bengali fiction Their main claim to distinction lies in their having broken fresh ground and imparted momentum and passion to the traditionally quiet and monotonous rhythm of rural life. The novels present a striking and memorable picture of village society in transition'

(T. of I.—10.12 67)

এত অল্প কথায় এত সুন্দরভাবে তারাশংকরের দুখানি স্মরণীয় গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করা শ্রীকুমারবাবুর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

গত বছর শ্রাবণ মাসে 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় বহু সাহিত্যিকের রচনাবলীর মধ্যে শ্রীকুমারবাবুর একটি প্রবন্ধ আছে 'অচিন্ত্যকুমারের ছোট-গল্প'। এই প্রবন্ধটিকে একটি আদর্শ সমালোচনা প্রবন্ধ বলা যায়। সতেরটি মুদ্রিত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটির মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের সামগ্রিক সাহিত্য সাধনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কিছুটা দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করছি—

'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্য সৃষ্টি বিচিত্ররূপিণী, নানা শাখা প্রবাহিনী। কাব্য, উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধক জীবনী, সমালোচনা ও ছোটগল্প তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বহুমুখী নিদর্শন। প্রতিটি প্রকরণেই মনীষা ও শিল্প সৃষ্টির ছাপটি সুস্পষ্ট ও স্বাধীনতায় উজ্জ্বল। তার রচনা-বৃত্ত পরিধি বিস্তারে বিশাল ও দিগন্ত স্পর্শী। তার কাব্য রবীন্দ্র-প্রভাবিত ও ঐতিহ্যানুগত। এতে আধুনিক কবিতার বৈপ্লবিকতা অতি প্রকট নয়। উপন্যাসে তার জীবন সমীক্ষা এক মেরু থেকে বিপরীত মেরু পর্যন্ত প্রসারিত। 'বেদে' ও 'টুটাফুটার' ছন্নছাড়া গলা-পচা জীবনের গ্লানিময় বীভৎসতা থেকে 'রূপসী রাত্রি' ও 'চলে নীল শাড়ি'র কল্পনাসৌন্দর্যমুগ্ধতা-মানব জীবনের এক সীমান্ত থেকে অপর সীমান্ত পর্যন্ত এর ভ্রমণ-স্বচ্ছন্দতা তাঁর কল্পনার ক্ষিপ্রগামিতার এক আদর্শ নিদর্শন। এ যেন চিরপথিক মানবআত্মার অসীম তীর্থাভিসারের স্বপ্নকাহিনী, সাহিত্যবাসনের ত্রিজগৎগ্রাসী পদবিন্যাস। তার ধর্মসাধনার মর্ম-আলেখ্যগুলি তত্ত্বের কাব্যময় ও জীবন চঞ্চল রূপান্তর, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির চিত্র ও আবেগময় অনুলিখন। তার 'কল্লোল যুগ' শুধু সাহিত্য রসস্বাদ নয়, সমাজ ও ব্যক্তি চেতনার আশ্চর্য উদ্ঘাটনের ছবি, সাহিত্যের অন্তগূঢ় প্রেরণা-উৎসের দিশারী সন্ধান।' (কথা-সাহিত্য —শ্রাবণ ১৩৭৫)।

এইভাবে অচিন্ত্যকুমারের প্রায় সামগ্রিক সাহিত্য সাধনার পরিচয় বিচিত্র কাব্যধর্মী ভাষায় শ্রীকুমারবাবু দিয়ে তারপর বলেছেন —'তথাপি মনে হয় অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য পরিচয়ের অনন্যতা তাঁর ছোটগল্পেই প্রধানতঃ নিহিত।' এই যে সামগ্রিক পরিচয় দানের প্রয়াস এবং তারপর মুখ্য প্রসঙ্গের উত্থাপন, এই ছিল শ্রীকুমারবাবুর আলোচনার বৈশিষ্ট্য। এমন হৃদয়গ্রাহী কাব্যধর্মী ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই।

প্রবীণ সাহিত্যিক সম্পর্কে যেমন শ্রদ্ধা, অপেক্ষাকৃত নবীনতম সাহিত্যকারের প্রতিও সেই উষ্ণ আগ্রহ। 'বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা' এই নামে একটি সুদীর্ঘ রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধটির প্রথমাংশটুকুই তিনি লিখে গেছেন। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করতে পারলে একটা মূল্যবান সম্পদ হত। এই প্রবন্ধে শৈলজানন্দ, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির আলোচনা করে প্রফুল্ল রায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'পূর্বপার্বতী' সম্পর্কে এক বিস্তারিত আলোচনা করেন, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' প্রমুখ কয়েকখানি সদ্যোলিখিত উপন্যাস আসাম পার্বত্য অঞ্চলের নাগা জাতির খুব কৌতূহল-উদ্দীপক ও জীবন রসোজ্জ্বল সমাজ কাহিনী উপভোগ্য বর্ণনাকুশলতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। এগুলি প্রায় পুরোপুরিই আঞ্চলিক সাহিত্য।......এই জীবনচিত্রে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞান ও জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন অবসর নাই; ইহাদের জীবন কয়েকটি প্রাথমিক মনোবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের অন্ধ ঘূর্ণাবর্তের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলোড়ন। সুতরাং যাঁহারা ইহার মধ্যে জীবনবোধের গভীরতা ও জীবন দর্শনের দূর-বিসর্পিত তাৎপর্য প্রত্যাশা করেন তাঁহারা যে হতাশ হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি এই চিত্রের মধ্যে যে একটা স্বভাব-সংগতি, ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে একটা ছন্দ-সুষমা ও চরিত্র নৃ-ষঙ্গতা দেখা যায় তাহাই উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রমাণ।'

(সাহিত্যের খবর—বৈশাখ—১৩৬৭)

এমন সহজ অথচ গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ শক্তিই ছিল শ্রীকুমারবাবুর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্যে যে আঞ্চলিকতা আছে এই প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে তারও পরিচয় দিয়েছেন।

সেকসপীয়র জয়ন্তীর সময় তিনি সেকসপীয়র প্রসঙ্গে একটি ছোট প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'কি লেখক, কি পাঠক সকলের জীবনই যান্ত্রিকতা-কবলিত। শেকসপীয়র যে মুক্ত, প্রসন্ন, অন্তর্ভেদী জীবনকে দেখিতেন তাহা যেন আধুনিক যুগের নেত্র হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার যেমন যন্ত্র সাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করে, সাহিত্যও তেমনই ব্যাধি-বীজাণুবহুল জীবনকে পরীক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে সুস্থ দৃষ্টি, সহজ ও প্রসন্নতা, জীবনের বিস্ময়-মহিমার স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস উপলব্ধি ও দিব্য প্রতিভার রঞ্জন-রশ্মিতে উহার রহস্য-গভীরতায় চকিত অনুপ্রবেশ—[illegible]গুলিই শেকসপীয়রের কবিতার শাশ্বত[illegible]। এগুলি যদি জীবনে ফিরিয়া না আসে, তবে শেকস-পীয়র-পূজা নিছক অতীতচারণায় পর্যবসিত হইবে।'

(বৈতানিক—বৈশাখ-শ্রাবণ-১৩৭১)

বাংলা সাহিত্যে সমালোচকের অভাব আছে, উপযুক্ত সমালোচক না থাকলে সাহিত্যের বিকাশলাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। শ্রীকুমারবাবুর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি যে অপূরণীয় এই উক্তিকে অতি-শয়োক্তি বলা যাবে না।

নতুন বই
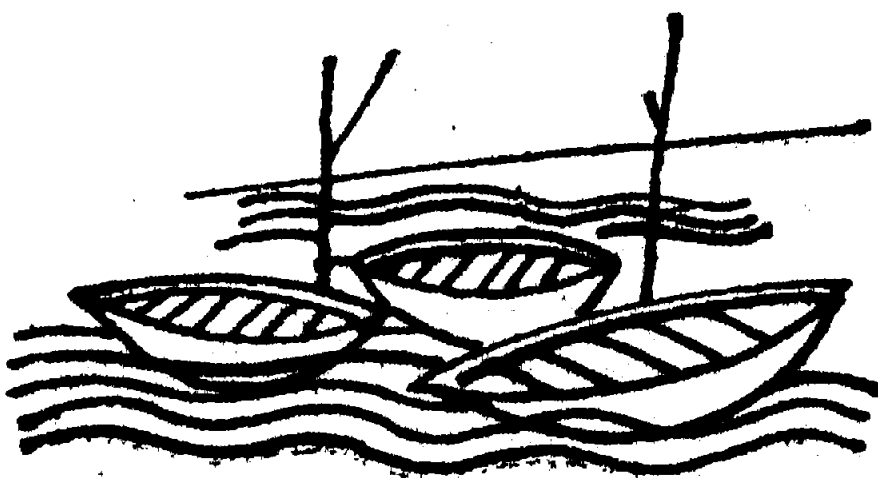
ব্যাপার বহুতর [ব্যঙ্গ গল্প]—ওঙ্কার গুপ্ত।। বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড. ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৯।। দাম : পাঁচ টাকা।।

হিউমার বলুন, আর স্যাটায়ারই বলুন—উভয়ের মূল উৎস চলমান জীবনের অসংগতি। প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চারদিকে। যদি কেউ সেই ঘটনার ছবি আঁকাতেন নিয়মিত, তাহলে আমরা অনেকেই চমকে উঠতাম : এই তো আমাদের মুখ, মুখের ভঙ্গি, কথাবার্তা। তাকে অস্বীকার করতে পারলেই ভালো হতো। আরশিতে কে আর নিজের কালিমাথা মুখের ছবি দেখতে চায়?

ওঙ্কার গুপ্ত আমাদের সেই চলমান জীবনের ছবি এঁকেছেন এ বইয়ের পাতায়-পাতায়। ভাষা ব্যবহারে মনে হয় উদাসীন, কেমন যেন হালকা হালকা। ফালতু কথা নয়, সোজা কথাই বলেছেন তিনি। তাঁর এই নির্বিকার ভাবটাই মর্মান্তিক হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কেন না, এ বইয়ের প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত, সজীব এবং প্রত্যেকের চেনা। লেখক ছদ্মনামের আড়ালে থেকে সকলের আঁতের খবর ফাঁস করে দিয়েছেন। কেউ টাকাওয়ালা, কেউ বিত্তহীন। ওঙ্কার গুপ্ত কাউকেই রেহাই দেন নি। বোধহয় নিজেকেও না। ভণ্ডামির মুখোস খুলে আসল মানুষটাকে চিনিয়ে দিয়েছেন পাঠকের কাছে।

এ বইয়ের প্রথম লেখা 'পুণ্যতীর্থে'। দ্বিতীয় লেখা 'ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য'। ঘাট-বাঙালের ভাষাকে আয়ত্ত করেছেন তিনি অনায়াসে। এমন কি সেই ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করেছেন, যিনি বলেন : 'আমি বিধবা-মানুষ, অতো খাবার-দাবার দিকে দিকে নজর নেই।'

উদাহরণ দিলে পাঠক হেসে হেসে লুটোপুটি খাবেন। হাসতো হাসতে যন্ত্রণায় ছটফট করবেন। ঘরে, বাইরে, অফিসে, রেস্তোরাঁয়, যেসব মানুষকে আমরা প্রতিদিন দেখি তাদেরই নিখুঁত ছবি এঁকেছেন ওঙ্কার গুপ্ত। তাঁর সেন্স অব হিউমার আছে। আছে ছবি দেখার চোখ। কিছুটা ক্যামেরা-ধর্মী বলা যায়। বেশ পাওয়ারফুল লেন্সের ক্যামেরাতেই ছবিগুলি ধরা পড়েছে।

আমরা লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এমিনেস্কুর কবিতা (মূল রুমানিয়ান থেকে অনুবাদ)—অনুবাদ : অমিতা রায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা—১৩। দাম : তিন টাকা।

বিদেশী কবিতার অনুবাদে সাধারণত চেনা মুখ আর আলোড়িত নামের পুনঃ পরিচয় ঘটে। অমিতা রায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুন ভাষা গ্রহণ করেছেন, যে ভাষার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। এবং তিনি এমন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন, যিনি শতবর্ষ আগেকার মানুষ। অথচ আধুনিক মানুষের মতই তাঁর যন্ত্রণা এবং বিপর্যয়। অমিতা রায় এমিনেস্কুর অনুবাদে মূল ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌছে দিয়েছেন। আমরা মূল ভাষা জানি না। লেখিকার শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে ছত্রিশটি কবিতা। ভূমিকায় এমিনেস্কুর জীবনী, মনসিকতা ও স্বদেশে তাঁর জনপ্রিয়তার কথা আলোচিত হয়েছে। ছাপা, বাঁধাই মন্দ নয়। অনুবাদটি প্রকাশের জন্য আমরা অমিতা রায়কে ধন্যবাদ জানাই।

মনের মধ্যে বুকের মধ্যে অধীর সরকার। এশিয়া পাবলিশিং কোং। দাম দু'টাকা।

৩৭টি কবিতা নিয়ে সংকলনটি পড়লে প্রধানত তিনটি কথা মনে আসে : রোমান্টিক ভাবধারা (যদিও কিছুটা গতানুগতিক), অন্তর্লীন গীতিধর্মিতা ও আশাবাদী মানসিকতা। কবির নতুন কিছু করার প্রবণতা নেই, কিন্তু শান্ত পরিমণ্ডল গড়ার শৃঙ্খলায় তিনি মনোযোগী। 'কিছু কথা কিছু ছবি বারবার ফিরে ফিরে অভিনব হয়ে ওঠে আমাদের মানুষের মনে (কিছু কথা কিছু ছবি) অথবা 'আকাশে অনেক আলো, অনেক আশ্বাস, হৃদয়েতে প্রাণের স্পন্দন (কাল বৃষ্টি, আজ সূর্য) বা 'মানুষের ভালোবাসা শান্ত শুভ্র রম্য গীতিকায়'। উচ্চারণে এমন সিদ্ধান্তেই আসা যায়। কোনো কোনো জায়গায় পরিচিত পঙক্তি অপ্রযুক্ত। প্রায় সব কবিতাই অক্ষরবৃত্তে লেখা, মাত্রাবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে তাঁর কবিতা হয়ত আরো ভালো হত, যেমন 'সোনার শিখা মলিন হল সাঁঝের উপকূলে' (একজন।) ছন্দবৈচিত্র্য তাঁকে উন্নত অবস্থানও দিতে পারে।

বেদ গ্রন্থমালা (প্রথম খণ্ড)—প্রাপ্তি-স্থান : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম : তিন টাকা।

বাংলায় বেদের সূক্তগুলির ভালো তর্জমা দুর্লভ। এ বইয়ের প্রথম অংশে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের আটটি মন্ত্রের টীকাসহ অনুবাদ ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয়

অংশে বিভিন্ন বৈদিক শব্দের অর্থ, উৎপত্তি ও ব্যবহার আলোচিত। সিরিয়াস পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে। এ বইয়ের লেখক একজন নন, দুজন— পরিতোষ ঠাকুর ও অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। দুই অংশের দুটো নাম। যথাক্রমে 'বেদার্থ মঞ্জুষা' এবং 'বৈদিক শব্দকোষ'।

প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা (আলোচনা) — রমণীমোহন রায়। নবভারত ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দাম : তিন টাকা।

ভক্ত সাধকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ প্রগাঢ় অনুধ্যানের বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণচরিত্রের কোনো কোনো দিক সমস্যা ও সংশয় সৃষ্টি করে। যাঁদের মনে কৃষ্ণভক্তির অপার্থিব আলো আছে, তাঁরাই কেবল এ ব্যাপারে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় এই গ্রন্থে রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে ও অনুচ্ছেদে। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ও বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করে শ্রীযুক্ত রায় একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

মিনি বুক দুই নম্বর—চমক চান তো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ইয়ার্কি নয়, সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ভাবছেন তিনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল রজনীগন্ধা' বের করেছেন দুই নম্বর মিনিবুক হিসেবে। সম্পাদনাও করেছেন তিনি নিজেই। পরিবেশনের মূল দায়িত্বটা তাঁর নিজেরই।

'লাল রজনীগন্ধা' গদ্যের বই নয়, কবিতার। ইদানীংকালে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি ভালো কবিতা এতে জায়গা পেয়েছে। 'চে গয়েভারার প্রতি' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি।
আমার অনবরত দেরী হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে
আলোছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে
অপরাধী করে দেয়।

আমাদের আশঙ্কা এই ক্ষুদে বইটা মার খাবে বিজ্ঞাপনগুলোর জন্যে। কবিতার চেয়ে চমকপ্রদ, মুখরোচক বিজ্ঞাপন আছে কয়েক ডজন। পাঠক-পাঠিকা সামনের ও পেছনের বিজ্ঞাপনগুলো পড়বেন আর মুচকি হাসি হাসবেন। হয়তো মাঝের শাদা পাতাগুলোর দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পাবেন না আদৌ। যোগাযোগের ঠিকানা : ৭১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলকাতা ৩৬ ।। দাম : তিরিশ পয়সা।

অভিনয় (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত ।। মৌজনা প্রেস, ১০১ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ২৬ ।। দাম : এক টাকা।

নাটক সম্পর্কে চিরকালই দর্শকদের আগ্রহ। ভালো আলোচনার জন্য পত্রিকা ছিল না কয়েক বছর আগেও। এই পত্রিকাটি অন্য নামে বেরিয়েছিল এতদিন। নতুন নামেও পুরনো ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রয়েছে লেখায় ও সম্পাদকীয় রুচিতে। নাটকের ক্ষেত্রে আপোষহীন সংগ্রাম করাই পত্রিকাটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরী, সুরেশ দত্ত, রতনকুমার ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রলয় শূর, শিশির বসু, সুরজিৎ বসু, সুভদ্রা অধিকারী, সোমেন ঘোষ, দিলীপ চৌধুরী ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সংখ্যার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনাটি লিখেছেন সুরজিৎ বসু। জাপানী নো নাটকের কাহিনী অনুসরণে তিনি লিখেছেন 'কামরূপা' নামে একটা ছোট্ট নাটক।

লেখা ও রেখা (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬)—সম্পাদক ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ।। ১২।১সি পাইকপাড়া রো, কলকাতা—৩৭ ।। দাম : এক টাকা।

সম্পাদকের কথা ভালো। চিন্তার খোরাক আছে। রচনা নির্বাচনে এ সংখ্যাটা পূর্বের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে বেরোয়নি। গ্রন্থবীক্ষণে বই সমালোচনার পরিবর্তে লেখকের মতামত ছাপা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন সুকুমার মিত্র ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়। গল্প কবিতা লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম মাহাত, রবীন সুর, রথীন ভৌমিক, কাজী আমিনউদ্দীন আহমদ এবং আরো কয়েকজন।

ভাটপাড়ার একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র (দ্বিতীয় সঙ্কলন)—**সম্পাদক : উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।। ২৬ বাবুপাড়া রোড, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।। দাম : তিরিশ পয়সা ।।**

প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির কোনো নাম নেই। প্রচ্ছদ অনুপস্থিত। অনেকটা বুলেটিনের মতো। লিখেছেন দুর্গাদাস সরকার, কবিরুল ইসলাম, তপন দাস, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন।

শ্লোক (শীত সংকলন ১৩৭৬) —সম্পাদক শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ।। ২৮ রয়েড পার্ক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, বেহালা, কলকাতা ৩৪ ।। দাম : এক টাকা ।।

কবিতা ও অন্যান্য রচনার নির্বাচনে সম্পাদকের নিষ্ঠা পরিস্ফুট। একটি কাব্য-নাট্য লিখেছেন শিপ্রা ঘোষ, প্রবন্ধ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টো[পাধ্যায়], কৃষ্ণ ধর, গোরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তি[কুমার] ঘোষ, অমিতভূষণ আচার্য এবং আরো [অনেকে]। অনুবাদ করেছেন গোবিন্দ [...]পাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও [...] ভরদ্বাজ।

কৃষ্ণচূড়া (প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক [...] সোম ।। ১৯ নাজির বাগান, হালতু, ২৪ পরগণা ।। [দাম :] এক টাকা।

প্রবন্ধ নাটক কবিতা সবই ছাপা হয়েছে। রচনা নির্বাচন মন্দ নয়। লিখেছেন [...] ধ্যানানন্দ, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত সোম, দিলীপ মুখোপাধ্যায় [ও] আরো কয়েকজন। প্রচ্ছদ ভালো।

মৃণাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্র[...] পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। নব[ীন] প্রবীণ কবিদের যৌথ-সহযোগিতায় প[ত্রি]কাটি আকর্ষণীয়। লিখেছেন জগন্[নাথ] ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, কৃষ্ণ ধর, সুশীল রায়, জহরলাল সিনহা, গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। ঠিকানা : ৩৯ বি ডেন্টামিশন রোড, কলকাতা ২২ ।। দাম এক টাকা।

অনেক বয়স হয়েছে **জাগরী** পত্রিকার। পরিণত হয়নি সাহিত্যের দৃষ্টিতে। সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা ।। ঠিকানা ৭৪।৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৩ ।। দাম পঞ্চাশ পয়সা ।।

চারুবাক টৌটা ইন্ড্রাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাবের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মুখপত্র। রচনা নির্বাচন মন্দ নয়। সম্পাদক : রণজিৎ দাস ।। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬ ।।

বেরিয়েছে **এখন**। প্রচ্ছদে বলা হয়েছে : বাংলার ক্ষুদ্রতম প্রগতিশীল পত্রিকা! সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নাম : বার্ট্রান্ড রাসেল স্মরণে। লিখেছেন পূর্বপ[...]এর কবি-সাহিত্যিকরা। লেনিন শতবর্ষ সম্পর্কে আলবার্ট রিস উইলিয়মস-এর বক্তব্যের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। সবশেষে আছে সংস্কৃতি সমাচার। পত্রিকাটির সম্পাদক : নন্দদুলাল ভট্টাচার্য। ঠিকানা : ৫৪ পিয়ারীমোহন সুর গার্ডেন লেন, কলকাতা ১০ ।। দাম : ২০ পয়সা ।।

বাঙালী পাঠকের কাছে বিস্ময়কর নতুন সংবাদ নতুন সংবাদ হলো : 'বিশ্বের প্রথম দৈনিক মিনি পত্রিকা'র প্রকাশ। রোজ সাহিত্যপত্রিকার নতুন সংখ্যা বেরোনো এমনিতেই চমকপ্রদ। তার ওপরে এটা আবার মিনি পত্রিকা। পত্রিকাটির নাম স্রোতস্বিনী। ইদানীং দেখা যাচ্ছে বিশ্বের প্রথম হবার দিকে বাঙালী সাহিত্যিকদের দারুণ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের জয় হোক। পত্রিকাটির পান্ডা সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিকানা ১৩ এ পি সি রোড, কলকাতা ৯ ।। দাম : প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

স্বাঙ্গীকরণের শিক্ষা

অপরের ধনে পোদ্দারি করার প্রবাদটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। আমরা প্রায়শই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এবম্বিধ কাণ্ড ঘটিয়ে থাকি। এই কর্মেরই গুরুশ্রেণীয়রা নেপো নামে খ্যাত,—দইটুকু তারাই মেরে নেয়। সম্প্রতি বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচনা বাটপাড়ি করে ইন্দুকান্ত শুক্ল কী পরিমাণ মৌলিক যশ অর্জন করেছেন, সে-কাহিনী আপনাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অসমীয়া বা ওড়িয়া প্রভৃতি সাহিত্যে এবম্প্রকার ক্রিয়া-কলাপ কে বা কাহারা কী পরিমাণ করেছেন তার তালিকা আপনাদের দেবেন জীবন চৌধুরী ও সম্প্রদায়। বাংলা সাহিত্যের খবরই বা কে রাখে। তবে এসব ব্যাপারে ফিরিস্তি দিয়ে ফল কিছু নেই। কেননা, এ-বাবদে অনুবাদ, অনুসরণ, অনুরণন, ছায়া বা ভাব অবলম্বন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন পর্যায় যেমন বর্তমান তেমনি আবার সূক্ষ্মভাবে বর্তমান প্রতিভার ক্ষেত্রে চিন্তাসাযুজ্য,— great men think alike বয়েৎ অনুযায়ী। এমন কাণ্ড অবিশ্যি অনেক দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে একই সময়ে একই চিন্তাধারা অনুসৃত হচ্ছে। যেমন ধরুন, মার্কনি এবং জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একবার কিছু আবিষ্কার হয়ে গেলে তার প্রণালী বা 'ফর্মুলা' সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়ে যায়। তারপরে কেউ 'পেটেণ্ট' নিয়ে রাখলে পর অপরে থাবা বসাতে পারে না। যদিচ ডাক্তার ব্রহ্মচারির ওষুধের মতো হাঙ্গামা কখনো-সখনো ঘটে থাকে।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রতিভার বা চিন্তাধারার সাযুজ্য বড় গোলমেলে ব্যাপার। এর তো কোনো 'ট্রেড মার্ক' নেই, মানকসংস্থারও এলাকাভুক্ত নয়। এক আছে কপিরাইট, তাও মুদ্রণের বা অনুবাদের জন্য। পৃথিবীতে নাকি সবসুদ্ধ ২৭৯৬টি ভাষা আছে। তার মধ্যে অধিকাংশগুলিতেই সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে। বিশ্বের সমস্যা-গুলিরও মোটামুটি একটা ধারাসাম্য আছে, প্রেমের ব্যাপারে তো আছেই। সুতরাং একই ধরনের পুস্তক হয়ত পৃথিবীর এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে চালু আছে, আমরা টের পাচ্ছি না। হঠাৎ হয়ত কোনো ভাষাতাত্ত্বিক এক-দিন আবিষ্কার করে বলবেন, অমুক ভাষার বই থেকে অমুক লেখক নকল করে চালিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বের তাবৎ ভাষার কথাই বা কেন, ভারতবর্ষেই যেসব ভাষা চালু আছে, তার ক'টির খোঁজই বা আমরা রাখি? রাখলেও তাবৎ সাহিত্য পড়ে মিলিয়ে দেখিই বা ক'জনা? তাই এমন সব প্রচ্ছন্ন আত্মসাতের কাহিনী অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়ে। লেখকরা অবিশ্যি অনেক সময়ে বলেন, অভিযুক্ত বইটি রচিত হবার আগে সাদৃশ্যযুক্ত কথিত পুস্তকটি তিনি পড়েননি। আপনি অবশ্যই বলতে পারেন, যুক্তিটা বেশ মজাদার বটে, কিন্তু এই উক্তি সর্বৈব অসত্য না হতেও পারে। সব লেখকের সব বই পড়া সম্ভব হয় না। তবে এজাতীয় সাদৃশ্য হয়ত অনিবার্য নয়। যদিচ যুগজীবনের মজা এই যে তার আনন্দ বা যন্ত্রণা সব সচেতন মনের কাছেই ধরা পড়ে থাকে। তবু আমাদের বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে নানা-বিধ আলোচনা সমালোচনায় মন্তব্যে বিতর্কে প্রবন্ধে বক্তৃতায় বিবিধ বিচিন্তার ছিটেফোঁটা সকলেরই কাজে আসে, চোখে পড়ে— এড়ানো যায় না। সুতরাং কোনো বই না পড়েও সে-বইয়ের ছায়া সচেতন বা অচেতন-ভাবে লেখকের মধ্যে এসে পড়া তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য জেনেশুনেও যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

এদিকে দেখুন, শুধু অন্য লেখকের বই চুরিই নয়, পুরোপুরি বইটাই প্রকাশকরা আত্মসাৎ করছেন। 'সঞ্চিতা' প্রভৃতি বিখ্যাত বই গোপনে ছাপানোর ব্যাপার একরকম,— আমি শুধু তাই বলছি না। এবং লেখকদের প্রাপ্য মর্যাদার কলা কে কতটা দেখাচ্ছেন সে-কথাও বলছি না। বলছি আপনাদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতনামা লেখক তাঁদের বই নির্বিবাদে অন্য দেশে ছাপিয়ে ব্যবসা করবার কথা। যেমন চলেছে পাকিস্তানে, —আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব আইন সত্ত্বেও। বাংলা লেখকের লেখা হিন্দি লেখক বেপরোয়া আত্মসাৎ করে লাভবান হচ্ছেন, আর এদিকে লাভবান হচ্ছেন যিনি তিনি লেখকও নন, মূল প্রকাশকও নন। এ সেই অবাঙালীর মুনাফা চিন্তারই অপর দিক যেন। 'গীতাঞ্জলি' খুব কাটতি হবে ভেবে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে 'দো হুন্দর' মজুত করে রাখা। লেখকদের তো 'ক্যাপিটাল' কিছু লাগে না, 'দো পইসাকা কলি ঔর এক দিস্তা কাগজ'—ব্যস্। তার ফলে 'এক লাখ বিশ হাজার রুপইয়া মুনাফা' (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ)—'বাপ্ রে বাপ!'

আমরাও মশাই তা বলে এমন কিছু নির্দোষ নই। লেখক বলুন, বক্তা বলুন, দেশপ্রেমিক বলুন,—তাঁকে বিদেশী ধাঁচে ঢালাই না করলে, বিদেশী যশস্বীদের সঙ্গে তুলনা না করতে পারলে,—শুধু তুলনাই নয়, সেই নামেই অভিহিত করতে না পারলে তৃপ্তি পাই না। তাই রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্কট, সুভাষচন্দ্রকে বাংলার গ্যারিবল্ডি বা ডিসরেলি ইত্যাদি নামে অভিহিত করে গর্ব বোধ করে থাকি। বিদেশের যাঁরা এঁদের চেনেন না, তাঁদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করি, চিনলে আহ্লাদে গলে যাই। অথচ নিজের দেশেই বা এঁদের মান-মর্যাদা কতখানি, তার পরিমাপ করে দেখি না। যে সকল রথীমহারথী সভা-সমিতিতে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিদের পদ 'অলংকৃত' করেন— এবং এসব ক্ষেত্রে বাস্তব স্বার্থনাকুল দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পৃষ্ঠপোষক নির্বাচন করা হয়, অর্থাৎ কিনা 'অব্যাপারেষু ব্যাপারম্'—তাঁরা সাহিত্যিকদের সম্পর্কে যে-ধরনের বিজ্ঞতাপ্রসূত বিবৃতি দিয়ে থাকেন, সেইসব অবিস্মরণীয় বিস্ময় স্মরণ করুন। খোদ কলকাতা বেতারকেন্দ্রেই শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে নাকি কত কেচ্ছা ঘটে গিয়েছে, বেতারে নাকি জীবিত ব্যক্তি-দের স্মৃতিচারণ করা হয় না। 'কবিকণ্ঠ' ইংরেজির 'Kabikantha' সূত্রে 'কবিকান্ত' ছাপানো হয়েছিল, তা-ও আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। আমাকে একবার ট্রেনযাত্রায় কস্মিংচিৎ অবাঙালী সাহিত্যানুরাগী অর্থাৎ 'ডিলেট্রাণ্ট' পড়ুয়ার পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। তিনি বললেন, 'হামি রোবিনদোরোনাথ পড়িয়েসে, নাজিরুলেস্লাম ভি পড়িয়েসে। রোবিনদ্রোনাথ তো বোলিয়েছেন —আমার মাথা নোতো কোরে দাও হে তোমার চোরোন ধুলার পোরে। আর নাজিরুলেস্লাম বোলিয়েছেন—বোলো বীর বোলো উন্নীয়ত মোমো সির। একজন বোলেন পয়েরমে সির লোটাবে, ঔরেকজন বোলেন সির কভি না নিচ কোরবে!' বুঝুন ব্যাপারখানা! যার যেমন গড়ন তার তেমন স্বাঙ্গীকরণের ধরন। এই তো সেদিন দিল্লীর দিল্লাগিটা দেখলেন,—'রামায়ণ কী এক বিলায়তী আলোচনা' শীর্ষক হিন্দিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে হিন্দু সংস্কৃতি-বিরোধী বিচারে মামলা-টামলা করে বসলেন ধ্বজাধারীরা।

তবু আমরা নিজেদের বিদেশী আলোকেই দেখে থাকি, সেই আলোকেই বিচার করি। তাঁরা প্রশংসা করলে গলে যাই, নিন্দে করলে কুঁকড়ে যাই। নিজেরা তথ্য উদ্ধার করি না, আপত্তিও জানাই না। স্বদেশে সম্মান দিতে নারাজ, বিদেশ থেকে সম্মান জুটলে তখন নাচানাচি করি। অবিশ্যি এ-কথাও বলব মশাই, এরও একটা বিপদ আছে। সকলেই মনে করে বসেন, তাঁর এমন প্রতিভার মর্যাদা দেশে হচ্ছে না। তাই লীলাময় দে-রা সুইডিশ একাডেমিতে কাব্যাদি পুস্তক প্রেরণ করেন, নীরদ চৌধুরীরা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বা ভাগ্যের নজির রাখেন। নিজের জোর কি মশাই তুলনার অপেক্ষা রাখে? 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' এই সূত্রে একটি কাহিনী নিবেদন করি। কথিত আছে (পশ্য—International Cyclopedia of Music & Musicians গ্রন্থের Beethoven প্রসঙ্গ) মহাকবি গ্যয়ঠে এবং সংগীতনায়ক বীঠোফেন যখন একসঙ্গে পথ চলছিলেন, তখন অপর দিক থেকে সপারিষদ মহারানী আসছিলেন। গ্যয়ঠের গর্ব ছিল যে সকলে তাঁকে বিদ্বান বলে সম্মান দেখায়। বীঠোফেনেরও শির ছিল উন্নত। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে মহারানী অথবা দুই প্রতিভাধর—কারা পাশ কাটাবার রাস্তা করে দেবেন। বীঠোফেন গ্যয়ঠেকে বললেন, দেখ, আমরা রাস্তা ছাড়ব না। ওতো ফ্রান্সের রানী, আমরা সারা বিশ্বের রাজা। কিন্তু যখন সপারিষদ রানীর দল এগিয়ে এলেন, গ্যয়ঠে টুপি হাতে নিয়ে অভিবাদন করে পাশ ফিরে তাঁদের যাবার রাস্তা করে দিলেন। কিন্তু বীঠোফেন টুপিসহ উন্নত মস্তকে এগিয়ে চললেন, *পারিষদবর্গ দুভাগ হয়ে সসম্মানে তাঁকে রাস্তা করে দিলেন। কে কাকে সম্মান দেখাবে তার চেয়েও বড় হল সম্মানের মূলে কোথায় সেই স্বীকৃতির প্রশ্ন। ভেবে দেখুন রবীন্দ্রনাথের কথা, পরাধীন দেশের লোক হয়েও কখনো মাথা নীচু করলেন না,—জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে শুরু করে শেষ বয়সে শ্রীমতী রথবোনকে চিঠি লেখা পর্যন্ত।*

তাহলে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী পন্ডিতদের কাছে কিভাবে স্বীকৃত বা বিকৃত তার কিছু নমুনা দেখুন। তাবৎ বিশ্বের যাবতীয় সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদির খোঁজখবর অস্মদ্দেশে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলেই রাখেন। কিন্তু ও-দেশের পন্ডিতগণও এ-দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে কী পরিমাণ জ্ঞান রাখেন দেখলেই বুঝবেন কেন বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণের বিলাতি আলোচনা লিখেছিলেন। অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষ্য থেকে দু-চারটি মাত্র উল্লেখ করছি, এতেই আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। তাঁর বয়স, মতবাদ, পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে আপনি যে কী পরিমাণ অজ্ঞ তা বুঝতে পারবেন। কোথাও দেখবেন তিনি সপ্তসন্তানের জ্যেষ্ঠ, বিবাহ করেছিলেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, কোথাও দেখবেন 'মানসী' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'করুণা' (?) প্রথম উপন্যাস, 'শকুন্তলা' তাঁর রচনা এবং আসলে নাকি তিনি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেননি।

পশ্য—

(1) Chambers's Biographical Dictionary, new edition, 1961, p. 1244:—

Tagore, Sir Rabindranath (1861-1941). Indian poet and philosopher, born in Calcutta. He studied law in England and, for 17 years, managed his family estates at Shileadah, **where he collected the legends and tales he afterwards used in his work. His first book was a novel, Karuna,** followed by a drama, the tragedy of Rudrachanda. He .... was knighted in 1915 — an honour of which he **unsuccessfully tried to rid himself** in 1919 as a protest **against British policy** in Punjab. .... His work includes Gitanjali (1913), Chitra (1914) his first play, **Sakuntala (1920)** ....

(2) Twentieth Century authors, 3rd print, 1950, 1381-82.

Tagore, Sir Rabindranath .... was born in Calcutta, the eldest of seven sons of Maharshi Debendranath Tagore, a wealthy Brahmin ....In 1883 he married Mrinalinidebi, they had **one son and a daughter** who is married to **a** *well-known agricultural enconomist of Calcutta University ...... In 1915 he was knighted; four years later he surrendered the* title in protest against **British suppression of Punjab riots, but in later years permitted to be used again**.... Tagore translated much **of his own work and that of others** *into English, and occasionally wrote directly in English himself ...... he has been called 'the Bengal Shelley'....*

(3) Everyman's ***Encyclopedia,*** *vol. 12. ed. 3, p 180-81.*

After his (Tagore's) ***marriage in 1923.*** *He spent seventeen years managing the family* ***estate, at*** Shilaidah". .. ..

(4) Cassell's Encyclopedia, of Literature, 1953, vol. 2, p.2037:-

".....**in 1890** he (Tagore) published his first volume of poetry, **Manasi** ('The Mind's Embodiment')

এই সকল উল্লেখ থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ক্রিয়াপর্ব ইত্যাদি বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে যাবে আপনার। ১৯২৩ ইংরাব্দে বিবাহের পর সতেরো বছর শিলাইদহে কাটিয়ে কি প্রকারে তিনি কাব্য রচনা করলেন, বিশ্বভারতী গড়লেন এবং ১৯৪১ ইংরাব্দে মারা গেলেন, সে এক পরম বিস্ময়। একবার কল্পনা করুন, সুদূর ভবিষ্যতের গবেষকরা কী মুশকিলেই পড়বেন,—অথবা কতই না উত্তম গবেষণা গ্রন্থ প্রস্তুত করবেন। চণ্ডীদাসের মতোই দুই-তিন বা চার রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন। সূক্ষ্মবিচারে নীরদবাবু তো ইতোমধ্যেই দুই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এবং বই-এর বাজারে আমরা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ, জনগণের রবীন্দ্রনাথ, কেরানি রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রবীন্দ্রনাথের মালা গেঁথেই ফেলেছি। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' বহু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠের সৌভাগ্য হবে মনুষ্যকুলের। ছেলেবেলায় আমরা মশাই গবেষণা-গবেষণা খেলা খেলে বলতুম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, আসলে 'ইয় সাগা' নামে এক জাপানী 'চন্দ্রবিদ'—অর্থাৎ চান্দ্র পন্ডিত ছিলেন এবং তিনি মারা যাবার পর তাঁর নামের পূর্বে হিন্দু প্রথায় আমরা 'ঈশ্বর' বসিয়ে নিয়েছি।

এই ঐশ্বরিক চর্চা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণের শিষ্য কালী-উপাসক রবীন্দ্রনাথের কথা কি আপনি জানতেন? জানতেন না।—আমরা স্বদেশের প্রতিভাশীল সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ। সকল কোষ-কারদের উপরে টেক্কা দিয়েছেন খ্যাতিমান মার্কিন পন্ডিত জন ক্লার্ক আর্চার—ইয়েল য়ুনিভার্সিটির তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ভূতপূর্ব অধ্যাপক তিনি। এডোয়ার্ড জুর্জি সম্পাদিত 'The Great Religions of the Modern World' (1946) গ্রন্থে আর্চার লিখিত অধ্যায়ের ৮৩ পৃষ্ঠার ১৭—২৫ পংক্তিতে মুদ্রিত দেখবেন নিম্নোক্ত তথ্যাবিষ্কার:—

'Right-hand Shaktism exhibits clean, unselfish, material mercy of an unstrained quality for which certain devotees, e.g. the notable Bengali Saint Ramakrishna, and *his faithful* **disciple** *Rabindranath* **Tagore,** *professed* **to** *draw their* **satisfaction, even to the** *realization of perfect union with divinity.* **Tagore and many** *an other found* **'Kali's** *grace' rewarding and her 'name' a channel of salvation, with life at this 'Mother's feet' in worshipful humility of* greater worth than formed acts, austerities **and** pilgrimage".

রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ কৃতিত্বের 'বিলায়তি' ব্যাখ্যানের পর আর অন্য কিছু বা অন্য কারো সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর কী বলুন?

—**বীরবাহু**

ত্রুটি স্বীকার

অমৃতের ৪৩ সংখ্যায় ৩৮০ পৃষ্ঠায় একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সব গল্পের মতো এ গল্পেরও ঘটনা এবং চরিত্র কাল্পনিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি পরিবারের উল্লেখ থেকে গেছে, যা আমাদের একেবারেই অনভিপ্রেত। এই ত্রুটি ঘটে যাওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।

বৈকুণ্ঠের খাতা

ওমর খৈয়াম

সত্যাসত্য জানি না, শুনেছি, স্যার আশুতোষ মুখুজ্জে নাকি ওমর খৈয়ামের একজন নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন।

ঘটনাটা অনেকের কাছে একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। বাংলার বাঘ হিসেবে যিনি খ্যাতিমান, লোকশ্রুতির নায়ক—নিজের হৃদয়ের কাছে তিনিই আত্ম-সমর্পিত। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে জেনেছে অন্যভাবে।

তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল রুবাইয়াৎ-এর ইংরেজী অনুবাদ। বঙ্গানুবাদ তখনো হয় নি। সম্ভবত প্রথম অনুবাদ করেন কান্তি ঘোষ, পরে নরেন্দ্র দেব ও নজরুল ইসলাম। তিনটি বই-ই আমি পড়েছি। কান্তি ঘোষকে মনে হয়েছে বিশ্বস্ত, নরেন্দ্র দেব জনপ্রিয়। নজরুল চড়াসুরের কবি। স্বভাবতই ফারসিকবির মোলায়েম বিষণ্ণতা ধরা পড়ে নি তাঁর অনুবাদে। যদিও তিন-কবিরই প্রধান অবলম্বন ছিলেন এডওয়ার্ড ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড। অর্থাৎ ইংরেজীর মধ্যস্থতা।

কেন ফারসি থেকে বাংলায় নয়

আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল : কেন ফারসি থেকে বাংলায় নয়? ওমর খৈয়ামের অনুবাদে কি ইংরেজ-দোভাষীর প্রয়োজন ছিল?

তার উত্তর আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

ইংরেজ শাসনের আগে আমাদের রাজ-ভাষা ছিল ফারসি। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা। তাহলে কেন মূলভাষা থেকে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলি অনুবাদ হলো না বাংলাভাষায়?

জনৈক তরুণ অধ্যাপকের মতে, ইংরেজ আসার পর ভারতীয় সমাজে দেখা দিয়েছিল মূল্যবোধের পরিবর্তন। সত্যিকারের আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, তার আস্বাদ অনুভব করেছি ইংরেজী সাহিত্যে। মুঘলরা আমাদের ঘরছাড়া করলেও গ্রাম-ছাড়া করেনি, ইংরেজ আমাদের কাউকে শহরবাসী, কাউকে বা নগরমুখী করেছে। ফলে দেশী সাহিত্যের ঘরানা ছেড়ে কেউ

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা একটি ছবি

মুঘল আমলে বিদেশীভাষার দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

তিনি বলেন : যে-যুগের শিক্ষিত-বাঙালি ফারসি জানতেন সবচেয়ে বেশী, সে যুগে বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গীতময় মিস্টিক আবেদনে আবিষ্ট ছিলেন প্রায় সকলেই। বিশেষ করে, বাংলাদেশের আউল-বাউল ভাটিয়ালি গানের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে যে-রহস্যলোকের সন্ধান ছিল, তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারেন নি ওমর খৈয়াম। বাঙালির চিন্তার সঙ্গে তার সহমর্মিতা ছিল, স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

অন্য একজন তরুণ কবির মতে : কোনো বিদেশীভাষা জনজীবনের প্রাত্যহিকতায় নেমে এলে, তার অনুবাদে কারো ঔৎসুক্য থাকে না। মুসলমান আমলে ফারসি জানতেন অনেকেই, তবু অনুবাদ হয় নি ফারসি কবিতার। ইংরেজ আমলে শেলী, কীট্‌স, বায়রন, ব্রাউনিং, টেনিসন আটকে গিয়েছিলেন স্কুল-কলেজ আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌহদ্দীতে। না হলে, ইংরেজীর অনুবাদে বাংলাদেশ ছেয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

অবশ্য এসবই অদূরদর্শী অনুমান। অনুসন্ধান করে প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করতে পারেন তাত্ত্বিক ও গবেষকরা। আমি জানতাম অন্য কারণ।

পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ায় গুজব আছে : এডওয়ার্ড ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের আগে নাকি রুবাইয়াৎ-এর কোনো খোঁজখবর জানতেন না কেউ। সারা পৃথিবীর কাছে তার অস্তিত্ব ছিল অন্ধকারে। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড তাকে আলোয় নিয়ে আসেন। সাহায্য করেন ই বি কাওয়েল। তাঁর অনুবাদ প্রথম বেরোয় ১৮৫৯ সালে, রুবাইয়াৎ-সংখ্যা পঁচাত্তর। পরে তিনটি সংস্করণ হয় ১৮৬৪, ১৮৭২ ও ১৮৭৯ সালে।

কিন্তু গুজব গুজব-ই। বাস্তবভিত্তি থাকে না তার সব সময়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় যদি কোনো সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই রুবাইয়াৎ-এর অস্তিত্ব ছিল না কোনো দিন। প্রাচ্যের পাঠক দীর্ঘকাল পড়ে এসেছেন মূলভাষা থেকেই।

বারবার মনে পড়ে ই বি কাওয়েলের নাম। কে এই ই বি কাওয়েল?

কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের পরে। কিছুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছেন কেমব্রিজে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতিও কম নয়। অনুমান করা যায়, ওমর খৈয়ামের পাণ্ডুলিপির খোঁজে তিনি পারস্যে যান নি, কলকাতা থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

অর্থাৎ বাংলাদেশে ওমর খৈয়াম অপরিচিত ছিলেন না। ইংরেজ-আমলে ফারসি-জানা লোক বিরল হবার পর রুবাইয়াৎ-এর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারের অন্ধকার কোণে আশ্রয় পেয়েছিল। ইংরেজী অনুবাদ বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই যে তা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাও নয়। তাকে জনপ্রিয় করেছিলেন দুজন কবি—রসেটি ও সুইনবার্ণ। তাঁদের উৎসাহ এবং প্রচারে বিখ্যাত হয়ে গেলেন ওমর খৈয়াম এবং ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড। বইটির অনতম আকর্ষণ ছিল এডমাণ্ড ডুলাক-এর অসাধারণ ছবিগুলি।

ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালি-কবিরা পশ্চিমী গুজবকেই সত্য বলে মনে করেছিলেন। ফলে, ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড-আশ্রিত হয়ে পড়েন অনেকেই। এছাড়া বোধহয় উপায়ও ছিল না। ফারসি-জানা বাঙালি কবি তখন আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না।

অশোক ভট্টাচার্যের অনুবাদ

সম্প্রতি রুবাইয়াৎ-এর আরেকটি অনুবাদ বেরিয়েছে। অনুবাদক কবি অশোক ভট্টাচার্য। লক্ষ্য করলাম তাঁরও আশ্রয় এডওয়ার্ড ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড। আবার সেই বহুশ্রুত বিখ্যাত গ্রন্থের ভাষান্তর।

অশোকবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : কেন এই নতুন অনুবাদ?

খুব সহজ এবং অন্তরঙ্গ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন তিনি : আমার মনে হয়, একেকটা জেনারেশন পার হয়েই পুরনো ক্লাসিকস্ সম্পর্কে ভাবা দরকার। আগের কালের ভাষা পরের কালে অচল। সেজন্যেই প্রয়োজন অনুবাদ, নতুন ল্যাংগুয়েজ। কেননা সেকালের রচনাভঙ্গিতে একালের পাঠক ক্লান্ত বোধ করেন। ওমর খৈয়ামের অধিকাংশ বাংলা অনুবাদই এক পুরুষ আগেকার কাব্যরীতি-আশ্রয়ী। সমকালীন পাঠকের মানসিকতা ও রুচি অনুযায়ী অনুবাদের প্রয়োজন সর্ববাদিসম্মত।

চটিয়ে দেবার জন্য বললাম : এ তো আপনার ধারণার কথা। ওমর খৈয়ামের সঙ্গে মানসিকার মিল কোথায়? ধ্রুপদী-চিন্তনের সেই ব্যাপ্তি একালের কবি পাবেন কি করে?

—আমি মনে করি, যে-কোন কবি যে-কোনো কবিতা অনুবাদ করতে পারেন না। মানসিকতার মিল অবশ্যই চাই। ওমর খৈয়াম মডার্ন ওয়ারল্ডের কাছে এখনো যথেষ্ট সজীব, যথেষ্ট এলাইভ। কেউ তাঁকে ভাবতে পারেন কবি হিসেবে, কেউবা দার্শনিক হিসেবে। কিন্তু তিনি আছেন, সকলের কাছেই আধুনিক হিসেবে বেঁচে আছেন।

বললাম, বলুন, আমি বিস্তৃতভাবেই বিষয়টি জানতে চাই।

অশোকবাবু বললেন : 'ওমর খৈয়ামের কাছে লাইফের প্যাথোজের দিকটা বড় হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিহৃদয়ের নিঃসঙ্গতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসার আর্তনাদ। জীবনের আপাত কোলাহলকে ছাড়িয়ে বিশ্ব তথা সৃষ্টির কার্যপ্রণালীর দিকে তাকালে সচেতন হয়ে উঠতে হয় এক অমোঘ শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে। যিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে মেনে চলেন, তিনি একেই চূড়ান্ত বলে নিশ্চিত হয়ে নীরব থাকেন। কিন্তু যিনি তাকে বুদ্ধির আলোয় বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁর কাছে বিষয়টি জটিলতর এবং গভীরতর অর্থ বহন করে। ওমর খৈয়াম ছিলেন গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি সেই অদৃশ্য শক্তিকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু যুক্তিবাদী মন নিয়ে তাকে গ্রহণ করেছেন।'

তাঁর লেখায় তো দেখি বিষাদের সুরটাই স্পষ্ট—তাই না?

—জীবনের অনিত্যতাই ওমর খৈয়ামকে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, বিষণ্ণ ও পীড়িত করেছে। সেজন্যেই তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস না করে, জীবনটাকে নিঃশেষে উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যে-সময়টা চলে যাচ্ছে, শত অনুরোধেও তা আর ফিরে আসবে না। তাই, আনন্দ করো, ফূর্তি করো—এই তার শেষ কথা। এদিক থেকে তাঁকে চরম নাস্তিক বলা যায়। মনে হয়, তাঁর ঝোঁক ভারতের চার্বাকপন্থী ও গ্রীসের এপিকিউরিয়ানদের জীবনদর্শনের প্রতি।

কি কারণে তাকে আধুনিক বলা যায়?

—তাঁর কবিতা পড়লেই উপলব্ধি করবেন সুগভীর বেদনার সুর, যেন তাঁর যন্ত্রণা সমস্ত হৃদয় ও শরীরকে আলোড়িত করছে প্রতিক্ষণ। ঠিক এই সুরটির জন্যই তাঁর চতুষ্পদীগুলি আধুনিক। সমস্ত রকম অমোঘ, অদৃশ্য বিধানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। আমি মনে করি, এই প্রতিবাদ ওমরের একার নয়, সকল যুগের সকল আধুনিক কবির বিদ্রোহ। এ জন্যেই ওমর খৈয়াম কালজয়ী, যে-কোনো তরুণ কবির সমসাময়িক। আমাকে আকর্ষণ করেছিল তাঁর মেটেরিয়েলিস্টিক আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং অব দি ওয়ার্লড। তাঁর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি পৃথিবীর প্রতি মমতা—লাভ ফর দি ওয়ার্লড।

আমি একবার কিংবা দুবার নয়, বহুবার পড়েছি তাঁর অনুবাদটি। তাঁর বক্তব্য এবং বিশ্বাসকে যথাসম্ভব আন্তরিকতায় বাস্তবায়িত করেছেন তিনি। শব্দব্যবহার, চিত্রানুষঙ্গে প্রায় প্রতিটি অনুবাদ অপূর্ব। অবশ্য যাঁরা অন্যান্য জনপ্রিয় অনুবাদগুলি পড়েছেন, তাঁরা পড়বেন সংশয়ে।

আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ১২ নম্বর রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদটি। অশোক ভট্টাচার্যের ভাষান্তর :

> 'কী মধুর পৃথিবীতে
> মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার!'
> কেউ ভাবে, কেউ বলে,
> 'কবে পাবো স্বর্গের দুয়ার!'
> যা-কিছু নগদ মেলে
> সব ফেলে সেইটুকু নাও—
> ওই শোনো বাজে দূরে
> নিদারুণ শব্দ দামামার!

ছন্দের লোভ নয়, মূলের আনুগত্যই অশোক ভট্টাচার্যের অনুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য মূল বলতে এডওয়ার্ড ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের অনুবাদ। অশোকবাবু ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে মনে করেন। ভূমিকায় লিখেছেন : 'ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদীগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড যে একজন সমমর্মী কবিকে খুঁজে পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, তিনি যেন নিজের অগোচরেই এগুলি অনুবাদ করতে শুরু করে দেন।'

বইটির প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি এঁকেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি ইলাস্ট্রেশন অসাধারণ। এডমন্ড ডুলাক-এর ছবি যেমন ইংরেজী-অনুবাদকে বিখ্যাত করেছে, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছবি তেমনি করবে অশোক ভট্টাচার্যের অনুবাদকে মর্যাদাবান।

অশোকবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই অনুবাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

—আমি ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের প্রথম সংস্করণের পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছি। পরবর্তী সংস্করণকে মান্য করিনি। কারণ ওটাই আমার কাছে প্রামাণ্য মনে হয়। বইটির আকারও ছিল ছোট। আমি আমার অনুবাদটিকেও ছোট আকারের কাগজেই ছেপেছি। বাজারী রুচির কথা ভাবি নি।

কতদিন আগে এই অনুবাদগুলি করেছেন?

—আই এ পড়ার সময়, ১৯৫৪ সালে। পরে রিভাইজ করেছি বোধহয় এম এ পাশ করার সময় কিংবা সামান্য পরে। কয়েকটা রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদ ছাপা হয়েছিল এক পত্রিকায়। ছবি এঁকেছিলেন দেবুদা। স্বভাবতই তাঁর একটা নীরব প্রতিশ্রুতি ছিল, বই বেরোলে তিনি ছবি আঁকতেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন। আমার এ বইয়ের সম্পূর্ণ স্কীমটাই দেবুদা দিয়েছেন।

নানা-কথা

আপনি আর কার কার কবিতা অনুবাদ করেছেন? এবং কেন?

—করেছি পারভেজ শাহেদী, আর কার্ল হ্যানসবর্গের। আমি ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতায় আস্থাশীল নই। যেমন ধরুন, কার্ল হ্যানসবার্গের কথা। মডার্ন পোয়েট্রির সঙ্গে তাঁর মানসিকতার যে মিল, তা নিতান্তই অবভিয়াস। তাঁর উপলব্ধি কেবল একার নয়, সকলের। আমার সংগে অন্যেরও যা ভালো লাগে, আমি তাই অনুবাদ করি।

আপনি রুবাইয়াৎ-এর পূর্ববর্তী অনুবাদগুলি পড়েছেন?

—খুব ছোট বয়সে, যখন আমার ইংরেজীতে দখল ছিল না, তখনই বাংলা অনুবাদ পড়েছি। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড পড়ার পর আমার ধারণা পাল্টে যায়। সেসব অনুবাদ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

ছাপার আগে কি কাউকে পাণ্ডুলিপি পড়িয়েছেন?

—মৃগাঙ্ক রায়কে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি যত্ন নিয়ে পড়েছিলেন। কোনো কোনো অংশ রিভাইজ করতে বলেছিলেন। বেরোবার পর পড়েছেন অনেকেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চেয়ে পাঠিয়েছেন। বিমলচন্দ্র ঘোষ পড়েছেন।

অনুবাদের পর কি কোনো ফারসি-জানা লোকের সাহায্য নিয়েছিলেন? মূল বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে হয়তো নির্ভুল অনুবাদ হতে পারতো।

কিছুটা প্রতিবাদের সুরে বললেন ঃ আমি ফারসি জানি না। ভালো ফারসি-জানা লোক এখন কই? একজন রিচার্স স্কলার পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, ফিট্‌জ্‌-জেরাল্ড ওমরের স্পিরিটটা ধরতে পেরে-ছিলেন। যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ইংরেজীতে তাঁর অথেনটিসিটি সম্পর্কে আমি নিঃসন্দিগ্ধ।

সবকটি রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদ কি সমান আগ্রহ নিয়ে করতে পেরেছেন?

—তা পারি নি। অনেকগুলো রুবাইয়াৎ-এ আমি স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগের কাছাকাছি, সেজন্যে স্বচ্ছন্দ। কয়েকটার ক্ষেত্রে অসতর্ক। কেননা, আমি উপলব্ধির সাযুজ্য বোধ করিনি সেসব রুবাইয়াৎ-এ।

ওমর খৈয়ামের পুনরুদ্ধার

অশোক ভট্টাচার্যের আন্তরিকতা ও অসংকোচ স্বীকৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে হয় নি, কখনো তিনি সাফাই গেয়েছেন। যদি কোথাও কিছু ভ্রান্তি থেকে থাকে, তবে তা তাঁর অজ্ঞাতসারে।

সংবাদে প্রকাশ ঃ এশিয়াটিক সোসা-ইটির মহাফেজখানায় নাকি রুবাইয়াৎ-এর একটা সচিত্র পাণ্ডুলিপি আছে। শোনা যাচ্ছে, লালবাজারে সাতশো বইয়ের পাণ্ডু-লিপি অন্তরীণ। ইংলণ্ড-আমেরিকায় এখন ওমর খৈয়ামের পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। শুনেছি, নতুন একটা হাতে-লেখা পুঁথিও পেয়েছেন ওঁরা। ফ্রান্সের জনৈক সমালোচক নাকি ওমরখৈয়াম সম্পর্কে ভাবছেন নতুনভাবে। অনেকের ধারণা, এডওয়ার্ড ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের ইংরেজী-অনুবাদটি নাকি মূলানুগ হয় নি।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চ্যালেঞ্জ করার মতো লোক কই?

মূল পুঁথি হাতের কাছে পেয়েও যথার্থ অনুবাদ বের করতে না-পারা খুবই দুঃখের। এতদিন আমরা দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছি। মূলভাষার রহস্যটা জানতে পারলে বড় ভালো হতো।

অশোক ভট্টাচার্য ভূমিকায় লিখেছেন ঃ 'বাঙালিদের কেউ কেউ মূল ফারসি রুবাইয়াৎ-এর রসাস্বাদন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।...এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটি সচিত্র পুঁথি কলকাতারই একটি বইয়ের দোকান থেকে এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে আবিষ্কৃত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য ঃ ওমর খৈয়ামের একটি প্রাচীন পুঁথি ঃ শ্রীহরিহর শেঠ। প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৮)। এটি ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত। খৈয়ামের সব থেকে প্রাচীন যে পুঁথিটি বডলিয়েন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, সেটির লিখন-কাল হল ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং প্রাচীনত্বের দিক থেকে এটিও অবহেলার নয়। পারস্যের বিখ্যাত লিপিকার সুলতান আলির কলম-জাত এই পুঁথিটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার পাসরুর গ্রামের হিন্দু বিদ্যার্থী দেবীদাস। পাঁচটি সুন্দর চিত্র সমন্বিত এই পুঁথিটি কোন্ সূত্রে কলকাতায় এসেছিল তা অবশ্য স্পষ্ট জানা যায় না।'

—গ্রন্থদর্শী
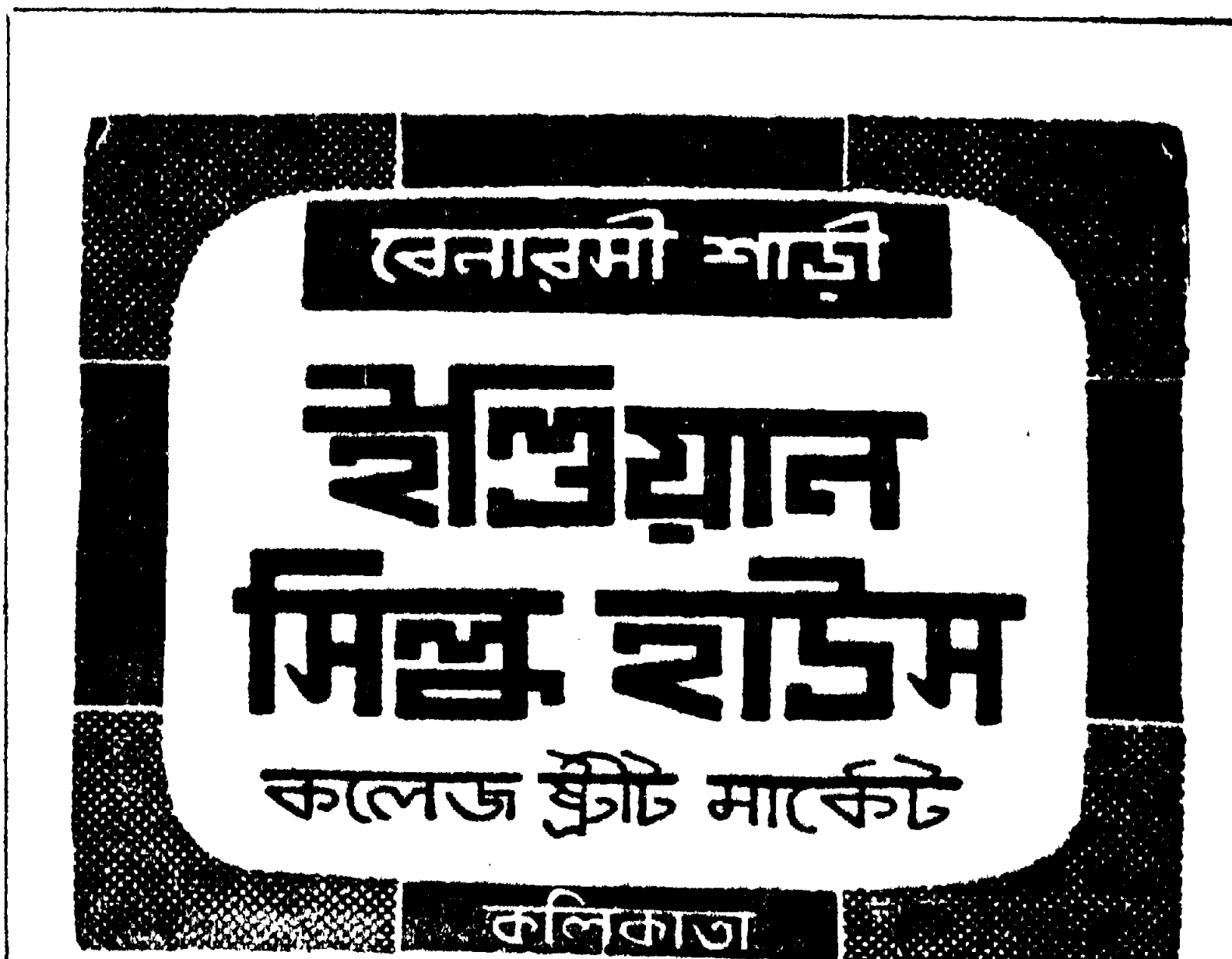
বিজ্ঞানের কথা

টেস্ট-টিউব মানব সন্তান

সম্প্রতি বিজ্ঞানজগতে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটেনের অন্যতম খ্যাতনামা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটো গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পৃথিবীর প্রথম টেস্ট-টিউব মানব সন্তান হয়তো এক বছরের মধ্যেই আসছেন। নিঃসন্তান ও বন্ধ্যা শ্রীমতী অ্যালেন যিনি মাতৃগর্ভের বাইরে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব-ভ্রূণটি নিজের গর্ভে ধারণ করেছেন তাঁকে এই সাক্ষাৎকারে দর্শকসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটি আজ আমাদের কাছে চাঞ্চল্যকর মনে হলেও একেবারে আকস্মিক নয়। কারণ বেশ কিছুকাল আগে থেকে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা হিসাবেই তাঁরা এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে গবেষণাগারে টেস্ট-টিউবে ব্যাঙ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। সেদিন টেস্ট-টিউবে সৃষ্ট ব্যাঙ গবেষণাগারে স্বাভাবিক ব্যাঙের মতই লাফিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু ব্যাঙের কাহিনী আর মানুষের কাহিনী এক নয়। মানুষের ডিম্বকোষের গঠন সম্পূর্ণ আলাদা এবং বেশ জটিল। টেস্ট-টিউবে মানব-ডিম্বে গর্ভাধান অনেক বেশি জটিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব-বিজ্ঞানীরা থেমে থাকেন নি। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানী গোষ্ঠী ঘোষণা করেছিলেন, ৯ বছর নিরলস চেষ্টার পর তাঁরা গবেষণাগারে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু সে ভ্রূণকে তাঁরা বাড়তে দেন নি, চার দিন পরে বিনষ্ট করে ফেলেন।

টেস্ট-টিউবে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি বলতে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে মানুষ সৃষ্টি বোঝায় না। আসল ব্যাপার হচ্ছে এক নারী-দেহ থেকে ডিম্ব বার করে নিয়ে সেটিকে টেস্ট-টিউবে পুরুষের সংগৃহীত শুক্রকীটের সঙ্গে মিশিয়ে মানুষের জীবন সূত্রপাত করা। তারপর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে সেই ভ্রূণটিকে অপর এক নারীর (যিনি কোনো কারণে বন্ধ্যা) গর্ভে স্থাপন করা। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলেছেন নারীগর্ভ থেকে ডিম্ব বার করে নেওয়া অতি সামান্য ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট নারী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

গত জুলাই মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সামনে 'জীন' বা বংশাণু প্রথম ধরা পড়ে। এই জীনই ক্রমোসোমের মধ্যে বসে থেকে মানুষের সন্তানকে মানুষ হবার নির্দেশ দেয় কুকুরের সন্তানকে কুকুরই করে—বিড়াল করে না। অথচ মানুষের ক্ষেত্রে যা কুকুর বা বিড়ালের ক্ষেত্রেও তাই একই ডি এন এ অর্থাৎ ডি-অক্সিনিউক্লিক অ্যাসিড। এই জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব প্রাণীর 'জেনেটিক কোড' বা প্রজনন-সংহিতা। পরম রহস্যময় এই সংহিতার পাঠোদ্ধার করেছেন খোরানা, নীরেন বার্গ, হোলি, নেফাক, এডওয়ার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটি ব্যাঙের জীন বা বংশাণু তুলে নিয়ে আর একটি ব্যাঙের তন্তুকোষ যদি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে নবজাতক ব্যাঙটি শেষোক্ত ব্যাঙের আকৃতি-প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। জীব-বিজ্ঞানীরা বলছেন : একটিমাত্র কোষ থেকে যদি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি হতে পারে, তবে অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে প্রজননের জন্যে যৌন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের ডিম্বকোষের চাইতে ব্যাঙের ডিম্বকোষ প্রায় একশত গুণ বড় বলে ব্যাঙের ক্ষেত্রে কাজটা যত সহজে হয়েছে মানুষ বা অন্য উন্নত জীবের ক্ষেত্রে ততটা সহজ হবে না।

কিন্তু টেস্ট-টিউবে মানবসন্তান সৃষ্টি আজ আর বিজ্ঞানীর স্বপ্নবিলাস নয়, তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। এই সম্ভাবনা নানা দিক থেকে বিতর্ক ও ঝড় উঠেছে—বিজ্ঞানীরা কি করতে চাইছেন? তাঁরা কি মানুষের চিরাচরিত ধ্যানধারণা নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেমপ্রীতি সবকিছুকে
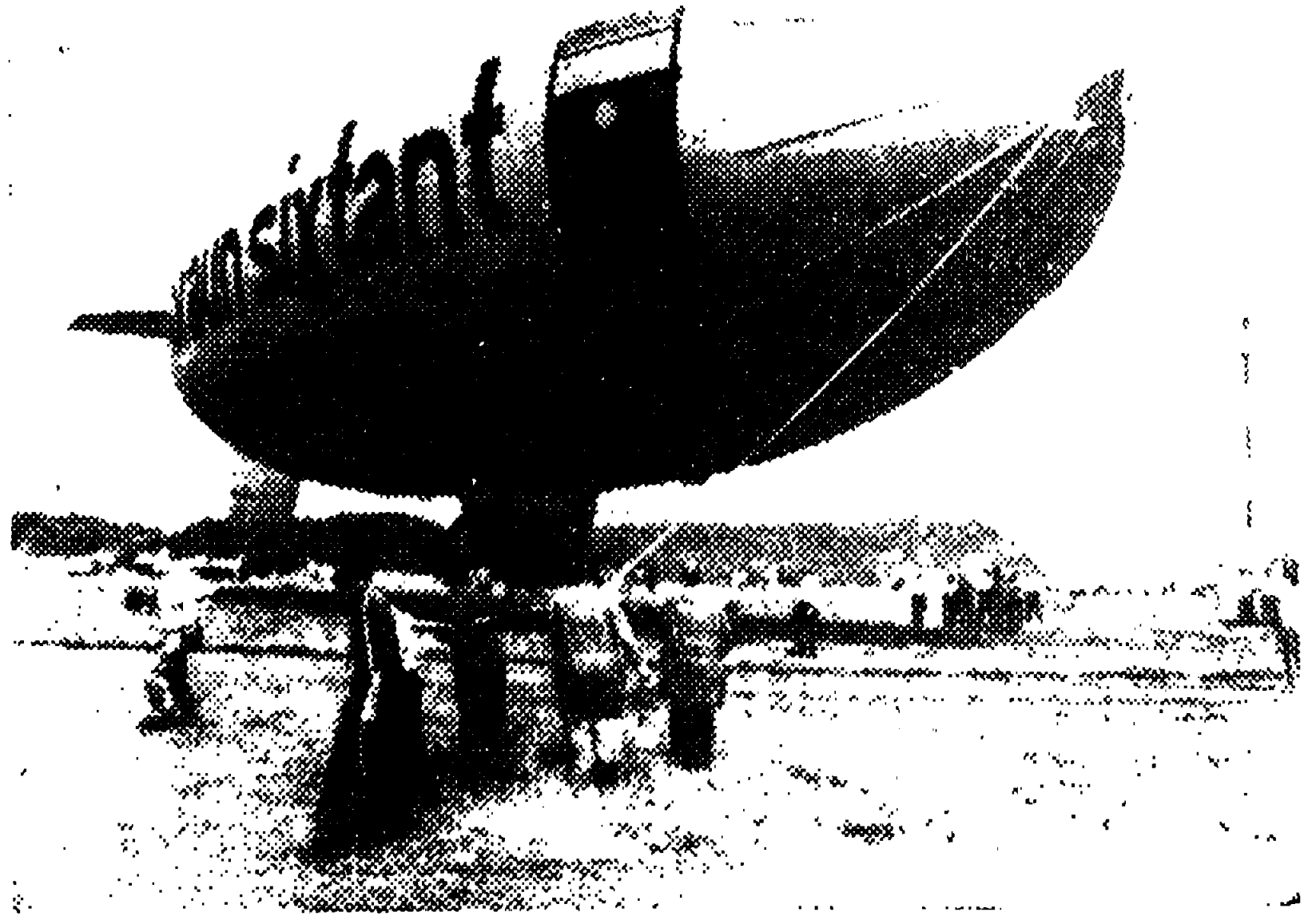
হিলিয়াম গ্যাসপূর্ণ ইউরোপের প্রথম বিমানপোত। এই ধরনের আর একটি বিমানপোত আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মেনীতে হাইড্রোজেনপূর্ণ জেপলিন 'হিন্ডেনবার্গ' আকাশে উড়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭ খৃঃ নিউইয়র্কের কাছে বিস্ফোরণের ফলে বিনষ্ট হয়। হিলিয়াম কিন্তু হাইড্রোজেনের মতো দাহ্য নয়। এই গুণের দরুণ বিশেষজ্ঞরা [illegible] জেপলিন তৈরী করতে পারবেন আশা করছেন।

ধ্বংস করতে চাইছেন? তাঁরা ফ্রাঙেকনস্টাইন সৃষ্টি করতে চলেছেন? এর উত্তরে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলেছেন: আমরা অতিমানব বা ফ্রাঙেকনস্টাইন সৃষ্টি করতে চাইছি না। চাইছি বন্ধ্যা নারীর সন্তানকামনা পূর্ণ করতে এবং বংশানুক্রমিক রোগব্যাধিকে প্রথম জীব-কোষটির মধ্যেই খুঁজে নিয়ে সেটাকে নির্মূল করে ফেলতে।

সারা পৃথিবী জুড়ে জীববিজ্ঞান আজ যে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তাতে আমরা আশা করতে পারি, বিজ্ঞানীরা একদিন ইচ্ছামতো আকৃতিপ্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। এ-কথা আজ অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে আমরা বলতে পারি, প্রতিভাবান পুরুষের তন্তু-কোষ যদি কোন বংশাণুর ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তবে যে সন্তান জন্ম নেবে তার চেহারা, তার প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঐ প্রথম পুরুষেরই অনুরূপ হবে! বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় একই চেহারা, একই মেধা, একই মস্তিষ্কের বহু মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বায়োলজিক্যাল ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর এই সম্ভাবনার কথা কোন জীব-বিজ্ঞানীই আজ অস্বীকার করছেন না।

বিশিষ্ট রুশ জীব-বিজ্ঞানী ডঃ নেফাক আঁত সম্প্রতি বলেছেন: জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে সকল আবিষ্কার ঘটেছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম মনীষার প্রতিভূ হিসাবে প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, কবি, লেখক, শিল্পী ও সুরকার জন্মানো সম্ভবপর হতে চলেছে। আজ শুধু প্রশ্ন—কবে তা হবে? কেউ বলছেন ২৫ বছর, কেউ বলছেন ৫০ বছর। কিন্তু সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসছে যেদিন নেফাকের উক্তি সত্যিই বাস্তবে পরিণত হবে।

খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা এখন ৩৪২ কোটি। বছরে গড়ে এই জনসংখ্যা বাড়ছে ৫০ হাজার করে। ২০০০ খৃস্টাব্দে মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি।

বর্তমানে সমগ্র ভূমণ্ডলকে ভূমি থেকে উৎপন্ন ৫ হাজার ৩ শত কোটি এবং সমুদ্র থেকে উৎপন্ন ৩ হাজার কোটি টন খাদ্যসহ মোট ৮ হাজার ৩ শত কোটি টন জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে সারা পৃথিবীতে গম উৎপাদিত হয় ২৭ কোটি ৩২ লক্ষ টন, ভুট্টা ২২ কোটি ৭০ লক্ষ টন, আলু ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন, গোমাংস ৩ কোটি ২১ লক্ষ টন শূকর মাংস ২ কোটি ৯২ লক্ষ টন এবং ভেড়ার মাংস ৬০ লক্ষ টন।

এইসব পরিসংখ্যানের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, পৃথিবীর মোট ১৩৫৭ কোটি হেক্‌টর (১ হেক্‌টর=প্রায় আড়াই একর) জমির ১১ শতাংশেরও কম জমিতে খাদ্যশস্যাদির চাষাবাদ হয়। ২০ শতাংশের কম জমি গোচারণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়। বেশির ভাগ জমিতেও সেচের ব্যবস্থা নেই। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর মোট জমির এক-তৃতীয়াংশেরও কম জমি চাষাবাদ ও গবাদি-পশুর চারণভূমির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

রুশ বিজ্ঞানী আই সিনায়াগিনের মতে উল্লেখিত পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি থেকে দুটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রথমত আজ পৃথিবীতে খাদ্যসমস্যা একটি বাস্তব সমস্যা। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় ৫০ কোটি নরনারী ও শিশু অর্ধাশনে দিন যাপন করে এবং প্রায় ১৫০ কোটি নরনারী ও শিশু অপুষ্ট। দ্বিতীয়ত ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ এখনও তার হাতে যে সম্পদ রয়েছে তার এক-দশমাংশও ব্যবহার করে নি।

তবে উপায় কি? উপায় হিসাবে পৃথিবীর অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সেই-সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সমুদ্র থেকে খাদ্য আহরণ, কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে যেসব গবেষণা চলছে সেসব বাদ দিয়ে শুধু জমির দিকে, বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন দেখা যাক, কৃষির উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। রুশ গবেষক কনস্তান-তিন মালিন বলেছেন, উৎপাদনের সাধারণ স্তর যদি অগ্রগামী দেশগুলির গড়ে পৌঁছয় তাহলেই পৃথিবী সহজেই প্রায় সাড়ে ৯ শত কোটি মানুষের খাদ্য যোগাতে পারবে। অর্থাৎ ২০০০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা যত দাঁড়াবে বলে জনতত্ত্ববিদেরা মনে করছেন তার চাইতে আড়াই শত কোটি বেশি মানুষের খাদ্য যোগানো সম্ভব হবে। এশিয়ার কথা ধরা যাক। চালই এই মহা-দেশের প্রধান খাদ্য। এশিয়ায় হেকটর প্রতি চালের উৎপাদন গড়ে ১·৬ থেকে ১·৯ টন। অথচ অনুকূল আবহাওয়া না থাকা সত্ত্বেও ইউরোপে হেকটর প্রতি চাল হয় প্রায় ৪·৫ টন।

এক্ষেত্রে কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারত বা ইন্দোনেশিয়ায় যে চাষীরা হেকটর প্রতি সার ব্যবহার করে মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম, সেখানে ইউরোপে চাষীরা হেকটর প্রতি আড়াই টন নাইট্রোজেনের সার ব্যবহার করে। আধুনিক সার ব্যবহার করে শুধু এশিয়া নয়, অন্যান্য মহাদেশেও চালের উৎপাদন অন্তত পক্ষে তিন গুণ বাড়ানো সম্ভব।

উন্নত ধরনের বীজ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে গম ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায়। বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

পোকামাকড়, উদ্ভিদাদির রোগ ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কম করে ধরলেও এইসব উৎপাতের ফলে পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট হয় তাতে কুড়ি থেকে ত্রিশ কোটি মানুষের ক্ষুধা মেটানো যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন ক্ষতিকর পোকামাকড় নির্মূল করা এবং উদ্ভিদাদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে এখনও যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলি দ্রুত দূর করা হচ্ছে। কৃষিবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ (উপযুক্ত আলো, আদ্রর্তা, পুষ্টির ব্যবস্থা ইত্যাদি) সৃষ্টি করতে পারলে উৎপাদন বহু গুণ বাড়তে পারে।

গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের দান নগণ্য নয়। প্রজননবিদ্যা আরও পুষ্ট পশু সৃষ্টিতে সহায়তা করছে, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং দ্রুত পশুসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব করেছে।

খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিল্পও বড়-রকমের ভূমিকা গ্রহণ করছে। কৃষি-যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক সার সরবরাহের ওপরই প্রধানত কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। কাজেই চাষাবাদের ব্যাপারে শিল্পের অগ্রগতির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজাত জিনিসের ক্ষেত্রে কৃত্রিম জিনিসের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। উদ্ভিদজাত রঙের পরিবর্তে রাসায়নিক রঙই এখন ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রবার ও কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে যেসব বাগিচায় পাট, শণ, রবার ইত্যাদির চাষ হয় সেসব জায়গায় চাল, গম, তরি-তরকারীর চাষ হবে। অনেক বাগিচা ফলের বাগানে পরিণত হবে। ধানভানা প্রভৃতির আধুনিক উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও অপচয় বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে।

আধুনিক বিজ্ঞান এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে যে অল্পসময়ের মধ্যেই তার সাহায্যে খাদ্যের উৎপাদন দু-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। উল্লিখিত তথ্যাদি লক্ষ্য করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে খুব বেশি সময় লাগারও কথা নয়। কাজেই হাতপা গুটিয়ে বসে না থেকে 'অনিবার্য পরিণামে'র আশঙ্কায় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস না ফেলে দুর্ভিক্ষের বিপদ এড়ানোর জন্যে মানুষের আজ একান্তভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন—এই হলো খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লেনিন লাইব্রেরী/মস্কো

রুশদেশে সংস্কৃতি চর্চা ও অন্যান্য

চিন্মোহন সেহানবীশ
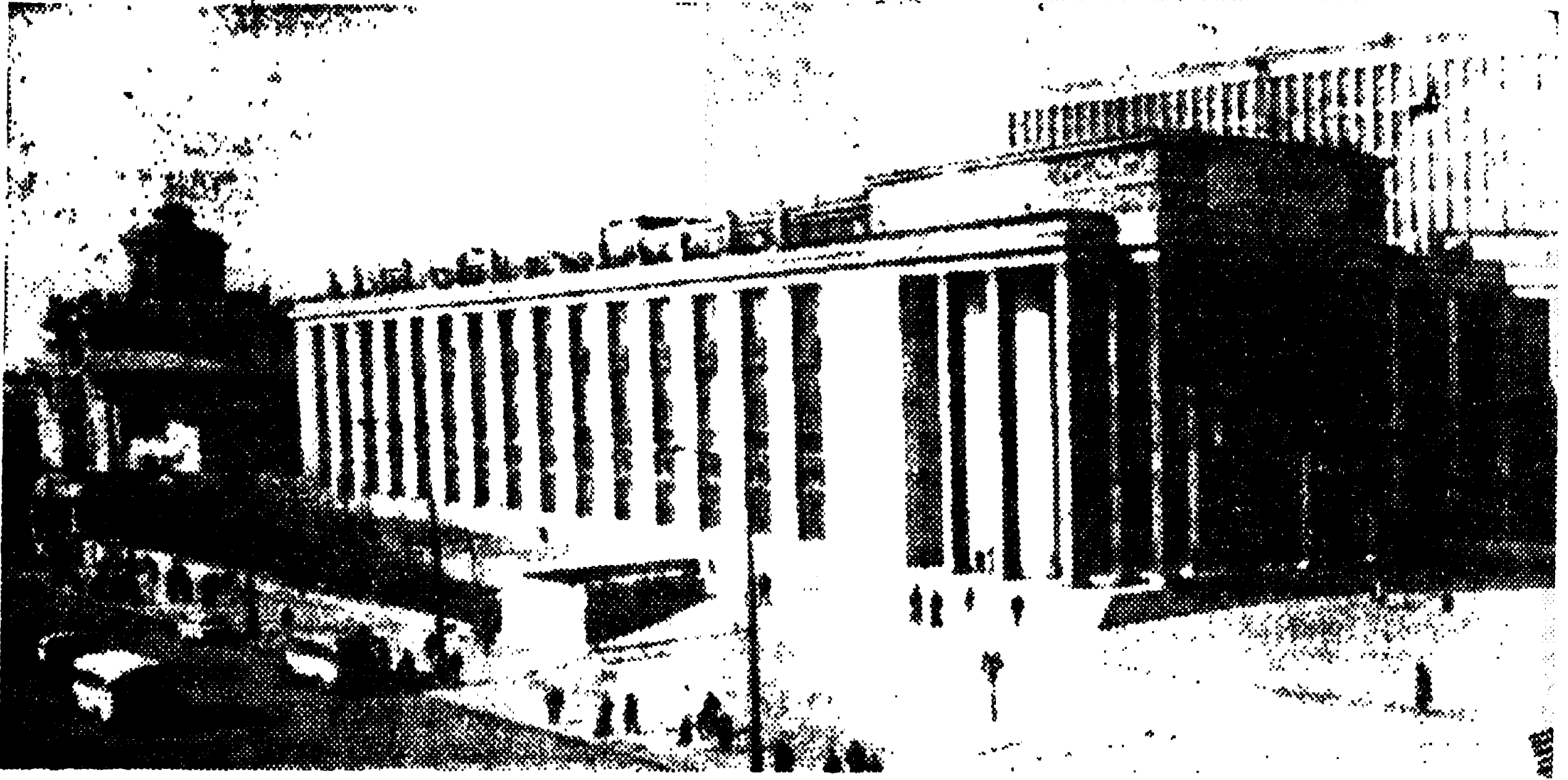
চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে অবশেষে মস্কো পেঁাছলাম ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়। বিমানঘাঁটিতে নেমেই টের পেলাম একটু আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—তারই কনকনে জের বাতাসে। সাত বছর আগে একবার এখানে এসেছিলাম, তারো সাত বছর আগে আর একবার। তবে সে দুবারই এসেছিলাম জুন জুলাই মাসে অর্থাৎ ওদের গ্রীষ্মকালে। মস্কোয় তখন পেয়েছিলাম কলকাতার ডিসেম্বর মাসের আবহাওয়া, খুবই চমৎকার আরামপ্রদ। এবার কিন্তু বুক ঠুকে এসেছি নভেম্বরের শেষে, থাকব ডিসেম্বরের পয়লা হপ্তা অবধি। মনে মনে তাই বেশ একটু অ্যাড-ভেঞ্চারের ভাব ছিল—এবার বেশ খাঁটি একটা াশিয়ান উইণ্টার দেখব যা নাকি নপোলিয়ন থেকে হিটলার অবধি বড় বড় ালোয়ানদেরও নাজেহাল করে ছেড়েছিল বশ কিছুটা। প্রথম দফা সোভিয়েত ভ্রমণের ার ইতিমধ্যে বয়সটাও চোদ্দ বছর বেড়ে াওয়ায় এমন একটা দুঃসাহসে নিজেই নজের পিঠ চাপড়াচ্ছি আর মতলব আঁটছি কানগাতিকে ১০টা দিন টিঁকে থাকতে ারলে দেশে ফিরে কি রকম ভয়ংকর শীতের ল্প করব প্রিয়জনদের কাছে—তা বাদ াধলেন দর্পহারী মধুসূদন। বিষণ্নমুখে সাভিয়েত বন্ধুরা জানালেন, ওঁদের াবহাওয়াবিদদের মতে এবার নাকি ওঁদের ষ্ণতম শীতকাল (ওয়ার্মেস্ট উইণ্টার) গত একশই বছরের মধ্যে। অথচ আশ্চর্য এই ! মাত্র হপ্তা আড়াই তিন আগে নাকি রফে শাদা হয়ে গিয়েছিল মস্কোর পথঘাট াছপালা।

কিন্তু এখন কোথায় বরফ? সোভিয়েত ধুরা বেজারমুখ করে ক্রমাগত পারার মাপ ড়াছেন—শূন্যের ৫ ডিগ্রি উপরে! এমন কি ৫ ডিসেম্বর যেদিন আমি দেশে ফিরলাম সেদিনও শীত শূন্যের মাত্র ৫ ডিগ্রি নিচে! সোভিয়েত বন্ধুরা মাথা নাড়েন আর ক্ষুণ্নমনে বলেন, ঘোর কলি, নইলে কেউ কখনো দেখেছে এমন অলক্ষুণে ব্যাপার—মস্কোয় ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তায় পারা শূন্যের নিচে ২০য়ে, ১৫ নয়, এমন কি ১০-ও নয়—মোটে ৫ ডিগ্রি! বোধ হল লজ্জায় ওঁরা আর মুখ দেখাতে পারছেন না দুনিয়ার ভদ্রসমাজে!

অথচ আমি তো ব্যাপারটা টের পাচ্ছি হাড়ে হাড়ে! তবু একদিন যখন ওঁদের একজন জানতে চাইলেন, 'ডু ইও ফাইণ্ড ইট কোল্ড?' তখন 'এ আর এমন কি' ধরনের একটা চালিয়াতি সুরে আর কিছুটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থদের মনমরা হালকে চাঙ্গা করার জন্য প্রাণপণে জবাব দিতাম, 'রাদার!' তরুণ রুশ বন্ধু কিন্তু আমার জটিল মনক্রিয়ার কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে ঠোঁট উল্টে প্রশ্নাকারে ব্যঙ্গবাণ হানলেন 'ইউ কল দিস কোল্ড'? তাঁর মনের জ্বালাটা বুঝে সেদিন আর কিছু বললাম না তাঁকে। জবাব দিলাম পরের দিন সকালে। ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি দেখে বন্ধুটি যেই-না বলেছেন, 'ইট ইজ রেইনিং' অমনি অবিকল তাঁর নকলে ঠোঁট উল্টে আমি জানতে চাইলাম 'ইউ কল দিস রেইন?' তারপর দুজনেই হেসে উঠে হাত মেলালাম সেয়ানায় সেয়ানায় এই বোঝাপড়ায়।

এবার মস্কোয় যে-সব জায়গায় ঘুরলাম তার মধ্যে গোড়াতেই মনে পড়ছে লেনিন লাইব্রেরির কথা। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তম আর পৃথিবীর সব থেকে বিশাল লাইব্রেরিগুলির অন্যতম। এর সূত্রপাত গত শতকের ষাটের কোঠায়। রুশ রাজনীতিজ্ঞ রুমিয়ানৎসেভের ব্যক্তিগত বই, পুঁথি, নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহগুলি নিয়ে তাঁরই নামাঙ্কিত যে মিউজিয়ামটি গড়ে ওঠে বহুদিন অবধি এই লাইব্রেরি ছিল তারই অংগ। মাত্র বিশজন মানুষের বসার উপযোগী একটি ঘরে এর সসংকোচ সূচনা। কয়েক দশক চারজন মাত্র কর্মচারী এর কাজ চালাতেন। যদিও বইয়ের সংখ্যা তখনই এক লক্ষের মতো! দেশের জ্ঞানীগুণীরা কিন্তু তখন থেকেই এখানে আসতেন পড়তে। বিপ্লবের আগে এখানকার নিয়মিত পাঠকদের মধ্যে দেখা যায় তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, চেখভ, মেণ্ডেলিয়েভ, টিমিরিয়াজেভ, সিয়ালকোভস্কি, কোরোলেংকো প্রভৃতির নাম। ১৮৯০

সনের ২৬ আগস্ট তারিখের তালিকায় দেখা যায় লেনিনের স্বাক্ষর।

এই বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত লাইব্রেরি লেনিনের নামাঙ্কিত হয় তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে। মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অমন বই পড়ার বাতিক এমন আর কোন দেশে নেই। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, এলিভেটরে উঠতে নামতে, পার্কের বেঞ্চে এখানে বই পড়ার ধুম। সারা দেশের ৩৭০,০০০ লাইব্রেরিতে এখানে সংগৃহীত রয়েছে ২৫০ কোটির মতো বই সাড়ে এগারো কোটি পাঠকের নিত্য ব্যবহারের জন্য। মস্কো শহরেই আছে প্রায় ৪০০০ বিনা চাঁদার পাবলিক লাইব্রেরি। তাতে রয়েছে প্রায় ১৮ কোটি বই। অর্থাৎ বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইটালির মোট যত পাবলিক লাইব্রেরি আছে তার যোগানের সমান। তার উপরে চমৎকার ব্যক্তিগত সংগ্রহও রয়েছে অসংখ্য।

তবু সারা দেশে এত আয়োজন সত্ত্বেও লেনিন লাইব্রেরির পাঠক-সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। একদিনের কথা মনে পড়ে। মাঝখানের ঢোকার গলিটিতে (যার একপাশে রয়েছে টুপি ওভারকোট রাখার ব্যবস্থা) ঢুকে দেখি অন্তত পাঁচশ লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সারি বেঁধে। কি ব্যাপার জানতে চাইলে দোভাষী বন্ধু জানালেন, ২৫০০ মানুষ বসার জন্য যে ২২টি হলঘর আছে সবই এখন ভর্তি। তাই এঁরা অপেক্ষা করছেন যেমন যেমন এক একজন বেরোবেন এঁরা তাঁদের জায়গা নেবেন একে একে। ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এঁরা বই পড়ছেন নিবিষ্টমনে—তাঁদের পালা আসার জন্য হয়তো এভাবে নিঃশব্দে অপেক্ষা করবেন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা। শুনলাম পাশেই নাকি জোর ব্যবস্থা চলেছে আরো পরিসর বাড়ানোর। ইতিমধ্যে এঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন।

পালা করে এইভাবে এখানে রোজ গড়ে ১০,০০০ লোক পড়তে আসেন। তাঁদের মধ্যে একাডেমির পণ্ডিত ও গবেষণায় মগ্ন বৈজ্ঞানিকদের জন্য আছে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ-করাদের জন্যও তেমনি জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী রয়েছে বিশেষ আয়োজন। তা ছাড়া আছে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য ৫০০ লোকের উপযোগী একটি মস্ত হল।

লেনিন লাইব্রেরিতে তাই নানা মানুষের সমাবেশ—একদিকে প্রচণ্ড পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ গবেষক—আবার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ—তরুণতরুণী আবার প্রবীণ প্রবীণাও। অদ্ভুত ভালো লাগল দেখতে বুড়ীদের চশমা কপালে তুলে পারোনো কাগজ ঘাঁটতে তার থেকে দরকারী খবর টুকে রাখতে নোটবইয়ে। শুধু দেশের মানুষ নয় লেনিন লাইব্রেরিতে ইদানীং আমার মতো যথেষ্ট বিদেশী অনুসন্ধিৎসুরও ভীড়। ১৯৬৮ সনে মোট ৪০০০-এরও বেশি বিদেশী এখানে এসেছিলেন ১১০টি দেশ থেকে।

লেনিন লাইব্রেরিতে বই, পুস্তিকা, পত্রিকাদির সংখ্যা এখন আড়াই কোটির মতো। তার সঙ্গে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ নতুন বই ও পত্রিকা যুক্ত হচ্ছে বছর বছর। এ-সব বই ও পত্রিকা শুধু সোভিয়েতের ৮৯টি ভাষায় নয়, ১০৯টি বিদেশী ভাষাতেও।

সাধারণভাবে গ্রন্থপ্রকাশনা সম্পর্কে একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন প্রতি বছর বই প্রকাশিত হয় ১৩০ কোটি কপি। ১৯১৯ থেকে ১৯৬৫ সনের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষটি বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে, মোট ৩০০০ কোটি মতো সংখ্যার। আমাদের কাছে এ-সব রাশিগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংখ্যার মতো।

মস্কোয় এবার দ্বিতীয় যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল তার নাম 'ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম'। এর সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি। সোভেৎস্কায়া স্কোয়ারে এর বিশাল দপ্তরটিতে মার্কস, এঙ্গেলস ও বিশেষ করে লেনিনের বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে এবং তার অনুশীলন ও গবেষণা চলছে ধারাবাহিক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মহাফেজখানাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। তার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, শ্রীযুক্ত ল্যাভরভের কাছে শোনা গেল ইনস্টিটিউটের ক্রমবিকাশের কাহিনী। ১৯২০ সন থেকে 'মার্কস এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট' হিসাবে এর সূচনা। ইতিমধ্যে লেনিনের নির্দেশে গঠিত হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনার এক কমিশন। ১৯২৩ সনে স্বতন্ত্র এক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা হয় লেনিন ইনস্টিটিউটের। ১৯২৮ সনের পর ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হয় এখনকার এই 'ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম'-এ।

শ্রীযুক্ত ল্যাভ্রভ জানালেন যে ইনস্টিটিউটের কাজ বর্তমানে চলে নানা বিভাগে। যেমন মার্কস, এঙ্গেলস ও উনিশ শতকের আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ('প্রথম আন্তর্জাতিক' সমেত) সংক্রান্ত গবেষণার বিভাগ। মার্কস ও এঙ্গেলসের মূল রচনাগুলির দুটি সংস্করণ ইতিমধ্যে এঁরা প্রকাশ করেছেন। মার্কসের রচনার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ অবশ্য ৮০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র জার্মান ভাষায়—১৯৬৮ সনে মার্কসের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উদ্যোগে। এখন চেষ্টা চলেছে ইংরেজী ও অন্যান্য মূল ভাষাগুলিতেও সেই সংস্করণ প্রকাশের।

ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বিভাগ হল লেনিন সংক্রান্ত। ইতিমধ্যে এঁরা লেনিনের পূর্ণাঙ্গ রচনার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধুনিক অর্থাৎ পঞ্চম সংস্করণে আছে ৫৫টি খণ্ড। এই সংস্করণের ২ লক্ষ কপি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হওয়ায় এখন ব্যবস্থা হচ্ছে তার পুনর্মুদ্রণের। এ দেশে আমরা ইংরেজীতে ঐ রচনার যে ৪০টি খণ্ড দেখেছি সেগুলি চতুর্থ রুশ সংস্করণের অনুবাদ—তবে পঞ্চম সংস্করণের থেকেও তাতে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেনিনের বই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে এতবং মোট ৪০ কোটিরও বেশি।

ইনস্টিটিউট অফ লেনিনিজমে'র তৃতীয় বিভাগের বিচার্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস। বহু খণ্ডে এখানে এক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে চারটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাপ্তি কালের দিক থেকে ১৮৯৮ সনে পার্টির প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯২১ সন অবধি।

ইনস্টিটিউটের আর এক কাজ হল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্বতল্লাসী। এ বিভাগটি অন্যান্যের তুলনায় নতুন। এখানে এখন চলছে 'তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিকে'র একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনার কাজ। ১৯১৯ সনে লেনিনের নায়কত্বায় এর প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৪৩ সনে এই সংস্থাকে তুলে দেওয়া পর্যন্ত এর প্রায়

পঁচিশ বছরের বিচিত্র তৎপরতার কথা থাকবে সেই ইতিহাসে। শুনলাম 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের যে সব নেতারা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনো জীবিত (যেমন, ইংলণ্ডের রজনী পাম, কানাডার টিম বাক প্রমুখ) তাঁদের সকলেরই পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে এ প্রসঙ্গে। স্বভাবতই এই বইটি প্রকাশিত হবে বিভিন্ন ভাষায়। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র বিভিন্ন সমস্যার প্রস্তাব, ইস্তেহার ও অন্যান্য দলিলপত্রও প্রকাশিত হবে এই বিভাগ থেকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত ঐ সংস্থার নির্বাচিত দলিলের তিন খণ্ড সংকলনই এখনো পর্যন্ত ইংরেজী পাঠকদের একমাত্র অবলম্বন।

ইনস্টিটিউটের আর এক ধরনের কাজকর্ম সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রীয় মহাফেজখানা-সংক্রান্ত। ১৯২২ সন অবধি এই কাজ চলত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'রই এই বিভাগ হিসেবে। এখন এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে শুধু সোভিয়েত পার্টির দলিলপত্রই থাকে না, মস্কো বা সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-সব বিদেশী কমিউনিস্ট 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'তরুণ কমিউনিস্ট লীগে'র কাজকর্ম করতেন তাঁদের কাগজপত্রও রয়েছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটিও ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে সব বই বা পুস্তিকা রচিত হয়েছে বা আজো হচ্ছে, তার এক বিপুল সংগ্রহ। এই সব বই পড়বার জন্য ইনস্টিটিউটের অসংখ্য ছোট বড় কক্ষে পড়তে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্য থেকেই শুধু নয়, আমার মতো বিভিন্ন দেশেরও মানুষ।

আর সবশেষে বিশেষ করেই উল্লেখ্য হচ্ছে ইনস্টিটিউটের পুরনো ও জীর্ণ দলিলপত্র পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের কথা। লেনিন কারাগার, নির্বাসন, আত্মগোপনের বিচিত্র ও কঠিন অবস্থার মধ্যে হাতের কাছে যে কাগজের টুকরো পেয়েছেন তাতেই হয়তো লিখে গেছেন অনেক লেখা। সে-সবই সযত্নে সংগ্রহ করে এখানে তার পাঠোদ্ধার করা হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। অতি জীর্ণ কাগজের টুকরোগুলিকেও তেমনি এখানে জোড়া লাগানো হয় নিখুঁতভাবে।

তারপর মূল দলিলগুলিকে সংরক্ষিত রাখা হয় বায়ুতাপনিয়ন্ত্রিত বিশেষ সব সংরক্ষণ-কক্ষে। শুধু ক্রমিক কর্মনিবারণের ব্যবস্থার জন্য সেগুলি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া হয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। ইতিমধ্যে গবেষকরা কাজ করেন মূল দলিলের ফোটো স্ট্যাটিক প্রতিলিপি বা মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে। আজকাল এই ল্যাবরেটরিতে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রতিলিপিগ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মূল দলিলের মতো কাগজ যোগাড় করতে পারলে তার প্রতিলিপি এত নিখুঁত করা সম্ভব যে একমাত্র বিশেষজ্ঞেরা ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না কোনটি আসল আর কোনটি নকল।

মস্কোয় এবার তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানটি দেখে চোখ ও মন জুড়ল সেটি হল তার বিখ্যাত 'ত্রেতিয়াকভ' চিত্রশালা। এর আগের দু'বারই তিন চার ঘন্টা ধরে দেখেছি লেনিনগ্রাডের জগদ্বিখ্যাত 'হার্মিতাজ' মিউজিয়াম, যদিও তিন চার ঘণ্টায় প্রায় কিছুই দেখা সম্ভব নয় 'হার্মিতাজে'র মত সুবিশাল চিত্রশালায়। দ্বিতীয়বারে তরুণ বন্ধু শুভময় ঘোষের সঙ্গে (দুঃখের বিষয় তাঁকে আমরা হারিয়েছি অকালে) একদিন দেখতে গিয়েছিলাম মস্কোর 'পুস্কিন আর্ট মিউজিয়াম'। কিন্তু কেন জানি কোনবারই দেখা হয়নি এই 'ত্রেতিয়াকভ'।

পাভেল মিখায়েলোভিচ ত্রেতিয়াকভ (১৮৩২-১৮৯৮) ছিলেন মস্কোর এক মস্ত ব্যবসায়ী। তাঁর বাতিক ছিল রুশীয় চিত্র ও শিল্প নিদর্শন সংগ্রহের। ১৮৫৬ সন থেকে শুরু হয় তাঁর এই পুরনো আইকন ও বিভিন্ন পর্বের ছবি সংগ্রহের ধারাবাহিক কাজ। ১৯৫৬ সনে তাই সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় এই সংগ্রহশালার শতবর্ষ পূর্তির উপলক্ষটি। ত্রেতিয়াকভের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল সে-যুগের বহু প্রগতিপন্থী ও গণতান্ত্রিক-ভাবাপন্ন রুশ শিল্পীদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন তাঁদের শিল্পের আন্তরিক সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক। কাজেই দেখতে দেখতে তাঁর সংগ্রহ এত সুবিপুল হয়ে ওঠে যে ১৮৭২ সনে তাঁকে একটি বাড়ি তুলতে হয় তাঁর ছবিগুলিকে রাখার জন্যে।

ত্রেতিয়াকভ ১৮৯২ সনে তাঁর সারা-জীবনের শিল্পসংগ্রহ সমস্তই তুলে দেন তাঁর প্রিয় মস্কোবাসীদের হাতে। দানপত্রে ছিল তাঁর এই মহৎ কথা ক'টি :

'আমার প্রিয় মস্কো শহরে রুশীয় শিল্পবিকাশে পোষকতা করার উপযোগী একটি একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা-কল্পে এবং উত্তরপুরুষপরম্পরার হাতে আমার সংগ্রহ তুলে দেবার জন্য আমি এতদ্বারা আমার সমগ্র চিত্রশালাটি ও সেখানে সংগৃহীত যাবতীয় শিল্পনিদর্শন এবং এই বাড়ির যে অর্ধাংশ আমার সেটি আমি চিরতরে অর্পণ করছি মস্কো পৌর সংস্থার হাতে।'

১৯১৮ সনের ৩রা জুন লেনিন-স্বাক্ষরিত এক নির্দেশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করেন যে ত্রেতিয়াকভ মিউজিয়াম দেশের মহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম আর রুশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রেতিয়াকভের মহৎ অবদানের স্মৃতিতে তাই তাঁরই নামাঙ্কিত থাকবে এই সংগ্রহশালা।

বিপ্লবের পর ত্রেতিয়াকভের সংগ্রহ বিপুল আকার ধারণ করেছে দিনে দিনে। ১৮৯৩ সনে সেখানে ছিল ১৮০৫টি ছবি ও শিল্পনিদর্শন আর শতবর্ষপূর্তির বছর, ১৯৫৬ সনে সে সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫,২৭৬-এ। একদিকে যেমন প্রাচীন রুশ শিল্পের বিভাগটি বহুগুণ বেড়ে গেল তেমনই আবার সংগ্রহশালায় সংযোজিত হল নতুন এক সোভিয়েত শিল্পের বিভাগ। ব্যাপকতর পরিসরের জন্য বাধ্য হয়ে পুরনো বাড়িটির বারবার সংস্কার ও তার সঙ্গে নানা সংযোজন করতে হয়েছে অবশ্য মূল স্থাপত্যের চরিত্র যথাসম্ভব ক্ষুন্ন না করেই।

একটা কথা ত্রেতিয়াকভে ঢুকেই চোখে পড়ল। এ কথা ঠিক যে তার অমন চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্য নেই 'হার্মিতাজে'র মতো। কিন্তু 'হার্মিতাজ' বা 'পুস্কিন' রয়েছে সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের অসংখ্য ছবি, ভাস্কর্য ও অন্যান্য সব শিল্পনিদর্শন—বিশেষ করে 'হার্মিতাজে'। ত্রেতিয়াকভ কিন্তু একান্ত-ভাবেই রুশীয়। তার দেওয়ালে রং-এ রেখায় প্রতিফলিত কিয়েভ রুশের অস্ফুট জাতীয় উন্মেষ থেকে আজকের দিনের প্রচণ্ড শক্তিধর সোভিয়েত সমাজের মহাজাতীয় আত্মার বিবর্তনবৃত্তান্ত। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নে গেলে শুধু 'হার্মিতাজ' দেখেই ক্ষান্ত হওয়া চলে না—সে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতাকেও পূরণ করতে হয় 'ত্রেতিয়াকভে'র ঘরোয়া রূপ দেখে।

কালের দিক থেকেও ত্রেতিয়াকভের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। প্রাক-খৃস্টান যুগের কোন শিল্পনিদর্শন এখানে নেই রাশিয়া খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে দশম শতকে। কিন্তু তারপরেও প্রায় গোটা এগারো শতক জুড়ে সমস্ত শিল্পপ্রয়াস চলেছিল বাইজানস্টাইন ওস্তাদদের তত্ত্বাবধানে। সত্যকার রুশীয় শিল্পের উদ্ভব এগারো শতকের শেষভাগে—কিয়েভ রুশ সংস্কৃতির উন্মেষের সঙ্গে। স্বভাবতই সে শিল্পের প্রেরণা ধর্মীয় আর বিষয় খৃস্ট, মেরী মা, জন দি ব্যাপ্টিস্ট ও খৃষ্ট শিষ্যদের অলৌকিক সব কাহিনী। তবু তারই মধ্যে ছাপ পড়ত শিল্পীর ব্যক্তিগত মনের, তাঁর অলৌকিক বিশ্বাস শুধু নয়, একান্ত মানবিক বৃত্তিরও। ঐ সব প্রাচীন রুশীয় 'আইকন'গুলির উজ্জ্বল রঙ বহুদিন ঢাকা পড়েছিল গাঢ় প্রলেপের আড়ালে। উনিশ শতকের শেষদিকে সেগুলিকে যখন পরবর্তীকালের প্রলেপ থেকে উদ্ধার করা হতে থাকে তখন তারা যেন পুনরুজ্জীবন লাভ করে। তারপর থেকে মধ্যযুগের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে রুশীয় 'আইকন' স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের দরবারে।

আঠারো শতকে পিটার দি গ্রেটের প্রবল পৌরুষ বিপুল পরিবর্তন ঘটান শুধু

সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতেই নয়—শিল্পের ক্ষেত্রেও। ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে দেবতা ছেড়ে শিল্প ঝুঁকল মানুষের দিকে। শুরু হল আঁকা রাজারাজড়া, রাজদরবার আলো-করা সুন্দরী ও বড় বড় বীরদের ছবি। তার পাশে স্থান পেল নিসর্গচিত্রও।

উনিশ শতকের গোড়ায় নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনীকে পরাস্ত করার পর রুশ জনসাধারণের মনে স্বভাবতই প্রবল হয়ে উঠল জাতীয় আত্মপ্রত্যয়। আবার তারই সুর প্রতিধ্বনিত হল এমন কি অভিজাত-বংশীয়দের একাংশের মধ্যেও। জাতীয় কবি পুস্কিন ও ডিমোস্ত্রিস্ট সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবেরা জারের মধ্যযুগীয় একচ্ছত্র শাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন যেন অপমানিত ও নিপীড়িত রুশ জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবেই। এই সময়কার ছবিতেও দেখা গেল এ সবের ছাপ। ছবির বিষয় এবার আর শুধু পুস্কিনের মতো কবি বা সুভরভোর মতো জাতীয় বীরেরাই নয়, কিছুটা পরিমাণে সাধারণ মানুষও সেখানে প্রবেশাধিকার পেতে লাগল ক্রমে ক্রমে। এমন কি শুধু আয়তনের বিশালতার জোরেই যে ছবি গোড়ায় আমার চোখ টেনেছিল ইভোনভের (১৮০৬-১৮৫৮) সেই বিখ্যাত 'জনতার সামনে খৃস্টের আবির্ভাব' ছবিটির বিষয় ধর্মীয় হলেও ছবির পুরোভাগে জন দি ব্যাপটিস্টের কেন্দ্রীয় মূর্তিটি নয়, একেবারে ক্রীতদাস সমেত সাধারণ মানুষেরাই যে সে ছবির নায়ক তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ সমাজে ক্রমে সূচনা দেখ যায় ধনতন্ত্র প্রসারের। ১৮৬১ সনে ভূমিদাসত্বের উচ্ছেদ ঘটে। এই শতকের প্রথমার্ধে যে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছিল এর দরুন সেই বিকাশধারাই আরো প্রবল হয়ে ওঠে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একে একে আবির্ভাব হয় তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কির মতো সাহিত্যিক, চাইকো-ভস্কি ও মুসর্গস্কির মতো সুরকার আর রেপিন ও সুরিকভের মতো চিত্রশিল্পীর। শেষোক্তদের বিশালায়তন ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই দেখা যায় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন। তাতে তাঁদের প্রবল শক্তির পরিচয় নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যায়। তবে আমার কাছে ভালো লাগল এই সময়ের কিছু পোর্ট্রেট—যেমন রেপিনের আঁকা তাঁর মেয়ের সুন্দর ঘরোয়া ছবি, পেরভের 'দস্তয়োভস্কি' বা ক্র্যামস্কোইয়ের 'ত্রেতিয়াকভ' বা 'তলস্তয়'।

সবশেষে সোভিয়েত পর্বের ছবি। দেখতে দেখতে তারো বয়স এখন পঞ্চাশের উপর হয়ে গেল। স্বভাবতই এ পর্বে বিষয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা কারখানার মজুর বা যৌথ খামারের চাষীর, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ আর অবশ্যই লেনিনের মতো জন-নেতার। তবে নিসর্গচিত্র, ব্যক্তিমানুষ, সুষম নারীদেহও মোটেই অবহেলিত নয়—বিশেষ করে ইদানীং। বাইরের দিক থেকেও এ পর্ব একটা একটানা নিরেট ব্যাপার নয়। তার ভিতরেও লক্ষ্য করা গেল ইতিহাসের বিচিত্র গতিপথের সাক্ষ্য - গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ, দেশগঠনের প্রচণ্ড প্রয়াস বিশেষ করে যৌথ কৃষির পত্তন, পরি-কল্পনার যুগের সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, নাৎসী হামলা প্রতিরোধ সংগ্রামে সাধারণ মানুষের অসাধারণ বীরত্ব, যুদ্ধান্তের বিশাল পুন-র্গঠন প্রচেষ্টা, সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মৈত্রী ও শান্তির ঐকান্তিক কামনা। আঙ্গিকের দিক থেকেও পরিবর্তন চোখে পড়ে। ঠিক বিপ্লবোত্তর পর্বের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস নানা বিচিত্র রূপে একদা আত্ম-প্রকাশ করেছিল আর্টের ক্ষেত্রেও। তারপর বহু দশক ধরে সেখানে মোটের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল একাডেমিক ধাঁচের প্রাধান্য, প্রায় একচ্ছত্রতা। সে একচ্ছত্রতার জায়গায় আবার যেন দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহসী মেজাজ। এমন কি প্রকট হয়ে না উঠলেও বিমূর্তায়নের ছোঁয়াচও যেন কিছুটা লাগছে অত্যাধুনিক ছবিগুলিতে।

ত্রেতিয়াকভ আর্ট গ্যালারী

'ত্রেতিয়াকভ' দেখতে গিয়ে দুটো জিনিস বড় ভালো লাগল। প্রতি ঘরে মিউজিয়ামের তরুণ কর্মীরা ছবি দেখতে সাহায্য করছেন বিভিন্ন ধরনের ছবির বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাঁদের ভাষা বুঝলাম না কিন্তু মনে পড়ে গেল ৪০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এই ত্রেতিয়াকভ মিউজিয়ামের উল্লেখ করেই লিখেছিলেন :

'...ছবিতে যে-বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই। চিত্রবস্তুর সংস্থান, তার বর্ণকল্পনা, তার অঙ্কন, তার অবকাশ, তার উজ্জ্বলতা, যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক, এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এই জন্যে পরি-চায়কের বেশ দস্তুরমতো শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তারপরেই লিখেছেন, 'অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম।'

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

"অজয় সরকার এলেন"

শেষ লেখাটা জমা দেওয়া ইস্তক মাথা খুঁড়ছিলাম—লিখি কি নিয়ে? অনেকগুলো বাঁকা-চোরা রেখা-কুটিল মুখ উঁকি দিয়ে যাচ্ছে চারপাশে। কিন্তু কোনটাই ঠিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। ভাবতে ভাবতে টেবিলে ফাইলটাইল ফেলে রেখে টাইয়ের নটটা আলগা করে হাত-পা ছড়িয়ে দিলাম। দু'পাশে খটাখট টাইপের জলতরঙ্গ বাজছে—কিউবিকেলের পাতলা প্লিপিস-পর্দা ফুঁড়ে শব্দরাজ্য হাওয়ার মত জলের মত অনায়াসে বয়ে চলেছে। সব কেমন গোলানো, আলাদা করে এক-আধটা যে তুলে নেব তার উপায় নেই। উপায় নেই, অথচ সপ্তাহ বড় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু করি কি?

ঠিক তক্ষুনি বেমক্কা সাইরেনের মত কঁকিয়ে উঠল ফোনটা। হ্যালো,—স্পিকিং। কে সন্ধিৎসু? প্রশ্নকারীর গলাটা খুবই পরিচিত। ভাবলাম রিসিভারটা নামিয়ে রাখি। নামাব কি পরিচয় তো আগেই দিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া দেবেশ সহজে ছাড়বে না। লাস্ট কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম জমা দিই নি। দুশো উনিশ টাকা বাহান্ন পয়সা। দেবেশের মামা এজেন্ট। আমার প্রিমিয়াম জমা না পড়লে এজেন্টের কমিশন পড়ে থাকবে, এল আই সি পেমেন্ট দেবে না। আর এল আই সি পেমেন্ট না দিলে মামাবাবু ভাগ্নের কাছে দৌড়বেন। ভাগনে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। তার সুবাদেই কেসটা হয়েছে। তাই এবার তাকে দিয়েই গুঁতো মারছেন। যতটা সম্ভব করুণ করে বললাম—হাতে এখন টাকা নেই রে। তাছাড়া গ্রেস পিরিয়ড পেরোতে তো এখনো ছ'দিন বাকী। একটা চেক পাওয়ার কথা আছে। পেলেই...

ধুত্তোরি কে তোকে প্রিমিয়ামের কথা বলছে। তোর পলিসি তুই বুঝবি। চালাস না চালাস সে তোর ব্যাপার—তোড়ে ধুইয়ে দিল দেবেশ আমার সব অজুহাত—শোন একটা জরুরী ব্যাপারে তোকে ফোন করছি। বিকেলের দিকে একবার আসতে পারবি? প্রিমিয়াম-ট্রিমিয়ামের ব্যাপার না রে।

দেবেশ যেন মধু ঢেলে দিল কানে। আলগোছে টেবিলে পড়েথাকা প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বার করে ম্যাজিসিয়ানের মত এক হাতেই দেশলাই জেবলে ধরলাম—কি ব্যাপার বল তো? যেন আমার কথাটা শুনতেই পেল না, স্পষ্ট শুনলাম কাকে বলছে কাল ফাইলটা ডি এম এর কাছে পুট আপ করব। আপনি ক্লায়েন্টের ব্যাগটা, হ্যাঁ হ্যাঁ মিঃ রাউথের ব্যাগটা আনিয়ে নিন। তারপর আমার দিকে মনোযোগ দিল—শোন তুই তো 'নিকটেই আছে' লিখছিস। আমার নিকটে আয়, একেবারে তরতাজা টাটকা মাল দেব। বলেই আর কোন কথা না বলে ফোনটা কট করে কেটে দিল। অতএব ......

তিনটা বাজতে না বাজতে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোটটা টেনে নিয়ে ফাইল বগলদাবা করে রওনা দিলাম। চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, ম্যাডান স্ট্রীট, সামনেই এল আই সি'র পোলার অফিস। তেতলা। বিরাট হলঘর। শত শত টেবিলে হাজার হাজার ফাইল। এক কোণে দেবেশ চেয়ার, টেবিল, ফাইল, পেন স্ট্যান্ড, ফোন-টোন সব সাজিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই হৈ-হৈ করে উঠল—জানতাম আসবি। বোস। কি খাবি? চা না কফি? ভ্যাপসা গরমে কাহিল গা থেকে কোটের বোঝাটা চেয়ারের মাথায় খালি করে স্ট্রেট বললাম—যা তোর ইচ্ছে। আগে বল কেন ডেকেছিস?

পেটে কথা থাকে না দেবেশের। সেই কলেজ লাইফ থেকে তো দেখছি। বিশেষ করে গোপনীয় বা জরুরী মনে হলে তো কোন কথাই নেই। যতক্ষণ না কথাটা পাঁচকান হচ্ছে ততক্ষণ যেন বেচারা হাঁসফাঁস করে। আমি বসতেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল—এখুনি মিসেস রাউথের আসার কথা। ঠিক সময়েই এসেছিস্। একটু অপেক্ষা কর।

রীতিমত চমকে উঠলাম। এ আবার কি নতুন নাটক দেখাচ্ছে দেবেশ! আমাকে টেনে আনল। এদিকে আবার কোন মহিলাকে আসতে বলেছে। কিন্তু আমার লেখার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি? বোধহয় আমার অবস্থাটা একটু ফিল করল দেবেশ। সহানুভূতির সঙ্গেই বলল—একটু অপেক্ষা কর। এখুনি এসে যাবেন। নিজের কানেই সব শুনতে পাবি। তুই শুধু আমি যা করতে বলব তাই করবি। তথাস্তু বলা ছাড়া তখন আমার আর কিই বা বলার আছে।

কফি এল, গোটাকয়েক সিগারেট পুড়ল, এল আই সি'র ভেতরের ব্যাপার সম্পর্কে দেবেশ একটা ছোটখাট লেকচার দিল। তারপর হঠাৎ দেখি লেকচার থামিয়ে ট্রেতে সাজানো ফাইলের গাদা থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে গম্ভীরভাবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ডটপেনের উল্টোদিকটা টেবিলে ঠুকতে লাগল দেবেশ। কি হল? হঠাৎ কেন এই চেঞ্জ? সামনে তাকালাম, পেছনে তাকালাম। দেবেশকে জিজ্ঞাসা করলাম। সবই আগের মত আছে, বন্ধু নিরুত্তর। তখন চোখ গেল হলঘরের একদম এক্সট্রিম এন্ডে, দরজার দিকে। প্রথমেই নজরে পড়ল অ্যাসট্রেনটদের ব্যবহারের মত বিশাল একটা গগলস। আড়ালে কুঁদে কাটা ফর্সা একটি মুখ। ঠোঁট গোলাপী, কালো চুলের ঝালরে ঢাকা ছোট্ট কপালে মস্ত একটা গোলাপী টিপ। এক ঝাঁকা বাঁধা কাঁপ মাথায় বয়ে নীল রেশমে মোড়া যে বস্তুটি এগিয়ে আসছেন বুঝলাম তিনিই দেবেশের ফাইলে ডুবে যাওয়ার আসল কারণ। সোজাসুজি তাকিয়ে থাকা যায় না, সিলি দেখায়। অগত্যা আমিও ফাইল খুললাম।

গুড আফটার নুন মিঃ দাস। একটা হালকা সুগন্ধে টেবিলটা ভরে গেল। দেবেশের ফাইলটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে সামান্য ঝুঁকে অভ্যর্থনা জানাল দেবেশ—বসুন মিসেস রাউথ। তারপর মিঃ রাউথ কেমন আছেন? ভদ্রমহিলা বসলেন। মাথার ঝাঁকাটা দুলে উঠল। হাতের থলেটা, ভুল হল বিরাট কিলো বটুয়াটা টেবিলের ওপর রাখলেন। বিন্দু-বিন্দু গোলাপী ঘাম গাল, গলা, ঘাড় বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসছে। কানে এল ভদ্রমহিলা বলছেন—উনি এখনো শুয়েই আছেন। ডাক্তার বলছেন, আরো মাসখানেক লাগবে। বলতে বলতে, বোধহয়

খেয়াল হল আমি অপরিচিত, আমার সামনে ব্যক্তিগত কথা বলা ঠিক না, তাই থেমে গেলেন। দেবেশ তাড়াতাড়ি আলাপ করিয়ে দিল। নামগোত্র ডিটেলসে বলে শুধু চেপে গেল আমার লেখার ব্যাপারটা—আমার বিশেষ বন্ধু। ওর পরামর্শ নেব বলেই ডেকে এনেছি। স্বচ্ছন্দে আপনি সব বলতে পারেন।

আপনি বলেছেন সব?—মিসেস রাউথ এবার গগলসটা চোখ থেকে নামালেন।

না বলিনি এখনো। বলব, তা আপনি ফর্মটা ফিল-আপ করে এনেছেন?

হ্যাঁ। বলতে বলতে সেই বিশাল বটুয়ার ওপরের টিপকল আলতো চাপে খুলে ফেলে ভেতরে হাতটা নামিয়ে দিলেন মিসেস রাউথ। এই নিন—দেখুন সব ঠিক আছে কিনা? একটু তাড়াতাড়ি হলে আমাদের খুব উপকার হয় মিঃ দাস।

ফিল-আপ করা ফর্মটা খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে দেবেশ একবার চোখ তুলল—অজয় সরকার আর এসেছিল?

আর আসে?—রীতিমত ঝংকার দিয়ে উঠলেন মিসেস রাউথ—দেখতে পেলে পুলিশে খবর দেব না।

সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ বলে উঠল—না না খবরদার, এখুনি ও কাজ করতে যাবেন না। ওর নামে আরো কয়েকটি কমপ্লেন এসেছে। আমরা এনকোয়ারী করব। এখুনি ধরা পড়লে সব মাটি হয়ে যাবে। তারপর একটু থেমে আবার বলল—আচ্ছা মিসেস রাউথ, আপনাকে যে একটা অভিযোগ লিখে জানাতে বলেছিলম, তা করেছেন কি?

ও বাবা! আমার দ্বারা ওসব লেখাটেখা হবে না। বরং লিখতে চান, লিখে নিন, না হয় গোটা ইনসিডেন্টটা আর একবার ন্যারেট করব।

হতাশ দেবেশ এবার আমার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বলল—তোর তো হাত তাড়াতাড়ি চলে। কাইন্ডলি যদি একটু নোট করে দিস। সে আর বলতে, কাগজ-কলম গুছিয়ে মুহূর্তে রেডি হয়ে গেলাম।

আপনাকে তো আগেই বলেছি মিঃ দাস গত বছর ঠিক পুজোর আগেই আমার স্বামী এ্যাকসিডেন্টে পড়েন। মিঃ রাউথ, আপনি জানেন, এম এস কাপুরের সঙ্গে পার্টনারসিপে ফার্ণিচারের ব্যবসা করেন।

মাঝপথে মিসেস রাউথকে থামিয়ে দিয়ে দেবেশ খানিকটা ডিকটেশন দিল আমাকে—বৌবাজারে ওদের ফার্ম। জয়েন্ট ওনারসিপ। গত বছর সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি অফিস থেকে বাড়ী ফিরছিলেন মিঃ রাউথ। থাকেন যোধপুর পার্কে। গড়িয়াহাটের মোড় স্কুটার ঘোরাতে গিয়ে একটা দোতলার সঙ্গে একেবারে মুখো মুখি ধাক্কা। প্রাণে জোর বেঁচে গেছেন তবে বাঁ পটা এখনো সারে নি।

তিনমাস নার্সিংহোমে রেখেছিলাম খেই ধরলেন মিসেস রাউথ।—জলের মত একগোছা টাকা বেরিয়ে গেল। রোজ কেবিন ভাড়া লাগত চল্লিশ টাকা। দু'বেলা দু'জন নার্স। গোড়ার দিকে কণ্ডিশন যখন সিরিয়াস তখন সিনিয়র নার্স রেখেছি। এক-একজনের চার্জই একুশ টাকা। এছাড়া সকালের নার্সের মিল বাবদ সাত টাকা আর রাতের বেলা তিন টাকা দিতে হত। তার ওপর ওষুধ-পথ্য, অপারেশনের ফি হ্যানাত্যানা মিলিয়ে তিন মাসেই প্রায় সাত-আট হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। আমার কি তখন মাথার ঠিক আছে। বুঝতেই পারছেন তখন কি সাংঘাতিক অবস্থা। মিস্টার কাপুর যদি তখন হেল্প না করতেন তাহলে যে কি হত? শিউরে উঠলেন মিসেস রাউথ—খোলাখুলি সব বলছি আপনাকে মিঃ দাস। কাইন্ডলি যেগুলো একান্ত ব্যক্তিগত বাদ দেবেন। কলম চালাতে চালাতে দেবেশের হয়েই আমি জবাব দিলাম—রিপোর্টে এসব ডিটেলস নিশ্চয়ই বাদ যাবে কি বল দেবেশ—তাই না? দেবেশ ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। থ্যাঙ্ক য়ু—আমার দিকে তাকালেন মিসেস রাউথ—হ্যাঁ যা বলছিলাম।

মিঃ কাপুর আর মিঃ রাউথের ফার্মটি নেহাতই নাবালক। মিঃ রাউথ আগে কলকাতার একটা বড় ফার্ণিচার কোম্পানীর সেলসম্যান ছিলেন। সেলিংয়ের সূত্রেই কাপুরের সঙ্গে আলাপ। পঁয়ষট্টি সালে দু'বন্ধুতে মিলে এই ব্যবসা শুরু করেছেন। করেই পড়েছেন বিপদে। দেশজোড়া মন্দার ঠেলায় প্রায় জেরবার হয়ে যাওয়ার যোগাড়। লাভ দূরে থাক প্রথম দুটি বছর শুধু ঘরের টাকা ঢালতে হয়েছে বিজনেস টিকিয়ে রাখার জন্য। রিসেন্টলি কয়েকটা সরকারী অফিসের টেন্ডার ধরে অবস্থাটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, এমনি সময় রাউথ পড়লেন অ্যাকসিডেন্টে। অবস্থা গোছানো মানে সমস্ত পেমেন্টটেমেন্ট করার পর মাস গেলে মিঃ রাউথ অফিস ম্যানেজার হিসাবে সাড়ে আটশো টাকা পেতেন। স্ত্রী একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ান। ছেলেপুলে হয়নি এখনো। স্বামী-স্ত্রীর জোড়া আয়ে যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট মেনটেন করতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টটাই সব আপসেট করে দিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে ওর অ্যাকসিডেন্ট হল, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নার্সিংহোম থেকে রাউথকে ঘরে নিয়ে এলাম। তখন টাকার খুব টানাটানি চলছে। এ ক'মাস মিস্টার কাপুর যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তিন মাসে প্রায় চার হাজার টাকা দিয়েছেন। দিতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু আমাদের মুখ চেয়ে সব কষ্ট সহ্য করেছেন। ব্যাঙ্কে যা কিছু ছিল সব ফুরিয়ে গেল। অথচ ডাক্তার বলেছেন একজন ভাল ম্যাসারকে দিয়ে ওকে বেগুলোর ম্যাসাজ করানো দরকার। তার জন্য কি মাসে এক-সট্টা অন্তত শ'তিনেক টাকা লাগবে। কি বলব মিঃ দাস চোখে তখন সব অন্ধকার দেখছি। ঠিক এমনি সময় জানুয়ারীর তিন কি চার তারিখ, এক-জ্যাক্ট ডেটটা মনে নেই, সকালবেলা অজয় সরকার এলেন।

আপনি চিনতেন আগে থেকে?—দেবেশ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল মিসেস রাউথকে।

বারে সে কথা তো আগেই আপনাকে

বলেছি। আগে জানলে ঐ লোকটাকে কেউ কখনো বাসায় ঢুকতে দেয়?

সরকার কি বলে পরিচয় দিল?—আবার জিজ্ঞাসা করল দেবেশ।

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে আমি দরজা খুলে দেখি, মিসেস রাউথ বলে চলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সুন্দর চেহারা। কথাবার্তায় রীতিমত ইমপ্রেসিভ। একটা সিটল গ্রে সার্জের স্যুট বোধহয় প্রথম দিন পরে এসেছিলেন। আমায় দরজা খুলতে দেখেই বললেন—আপনিই বোধহয় মিসেস রাউথ? আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। চিনি না, জানি না অথচ ভদ্রলোক আমায় চেনেন। পরে বুঝেছি নেমপ্লেটের সংগে আমায় মিলিয়ে দুয়ে দুয়ে চার করেছেন। যাই হোক বেশ ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন— মিঃ রাউথ এখন কেমন আছেন? প্রশ্ন শুনে আমি ভাবলাম বোধহয় ও'র কোন বন্ধু বা পরিচিত। তাই বাইরে দাঁড় করিয়ে না রেখে বললাম—ভেতরে আসুন।

হঠাৎ বেডরুমে আমার সংগে মিস্টার সরকারকে ঢুকতে দেখে আমার স্বামী উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সংগে সংগে মিস্টার সরকার বলে উঠলেন—না না মিস্টার রাউথ এখন উঠবেন না। আপনি শুয়ে থাকুন। নিজে থেকেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার স্বামীর বিছানার পাশে বসলেন সরকার।

প্রথম দু-তিন মিনিট তো বুঝতেই পারি নি যে ওকে আমার স্বামী আদৌ চেনেন না। তারপর যখন বুঝতে পারলাম তখন দেখলাম ভদ্রলোক দারুণ মিশতে জানেন। পরে নাম-ধাম জানলাম। আসছেন এল আই সি অফিস থেকে। এই আপনার ডিপার্টমেন্টের নাম বলেছিলেন মিঃ দাস।

মিসেস রাউথের কথায় মুচকি হাসল দেবেশ—অর্থাৎ পলিসি হোল্ডার সার্ভিসিং ডিপার্টমেন্ট?

হ্যাঁ। বললেন ঐ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। উনি একজন আউটডোর সার্ভিসিং অফিসার। নেচার অব ওয়ার্ক হল, প্রত্যেক অফিসারের আণ্ডারে এক-একটা এরিয়া বলে ভাগ করা থাকে। সেই এরিয়ার সব পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়াম, লোন ইত্যাদি ব্যাপারে টাইম টু টাইম খবরাখবর নেওয়া। সেই নতুন পলিসি করবার জন্য গ্রাউণ্ড প্রিপেয়ার করা। অর্থাৎ অনেকটা মার্কেট রিসার্চ কাম সার্ভিসিং।

এবার দেবেশ বেশ জোরেই হেসে উঠল—জানেন মিসেস রাউথ, ও রকম কোন পোস্ট এল আই সি'তে নেই। হ্যাঁ তবে আমাদের এজেন্টরা মাঝে মাঝে কোল্ড ক্যানভাসিং করেন, বাড়ী বাড়ী ঘুরে নতুন পলিসি গছানোর চেষ্টা আর কি।

সেসব তো এখন শুনছি মিঃ দাস। তখন কি এতশত জানতাম। আর জানার ইচ্ছাই কোনদিন হয় নি। কি করে হবে বলুন, আপনাদের ঐ পলিসির ফর্মটা দেখলেই কেমন মাথা ঘুরে যায়। দেড়গজী লম্বা ভাঁজকরা কাগজটায় কুটি কুটি করে কমপক্ষে দশ হাজার শব্দ ভরে রেখেছেন। অন্তত একশটা ক্লজ বাই ক্লজ হবে। যাক গে, যে কথা বলছিলাম। এদিকে ও'র বা আমার মাথায় আসে নি যে সরকার আমাদের চিনলেন কি করে, আমার স্বামীর যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তাই বা জানলেন কি করে? উল্টো উনি আমাদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—বলি, কোন পলিসি-টলিসি আছে না নেই? কি বলব মিস্টার দাস আধ ঘন্টার মধ্যে এমন আপনার লোক হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক যে এসব প্রশ্ন তখন একটুও বিরক্তিকর লাগে নি। আমার বা আমার স্বামী কারুরই খেয়াল ছিল না যে একটা পেড আপ পলিসি মিস্টার রাউথের নামে আছে। একষট্টি সালে মিঃ রাউথ যখন সেলসম্যান ছিলেন তখন বিশ হাজার টাকার একটা পলিসি নিয়েছিলেন। চার-পাঁচ বছর চালানোর পর পঁয়ষট্টি সাল নাগাদ প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ সেবারই চাকরীটা ছেড়ে নতুন ব্যবসা ধরেছেন। টাকার খুব টানাটানি চলছিল।

খুঁজে-পেতে লোহার আলমারীর এক কোণায় পেলাম পলিসিটা, কাপড়চোপড়ের তলায়। সরকার বললেন টাকার যখন এত টানাটানি চলছে তখন এল আই সি'র কাছ থেকে লোন নিচ্ছেন না কেন? আপনিই বলুন মিস্টার দাস যে পলিসির কথা আমাদের কারুর মনে নেই, সেটা জমা দিয়ে লোন নেওয়ার কথা কি করে মাথায় আসবে? তাছাড়া পলিসি বন্ধক রেখে যে লোন পাওয়া যায় এ রকম শোনা ছিল, কিন্তু কিভাবে যে পাওয়া যায় তা তো কিছুই জানতাম না।

এ ব্যাপারে সরকার একেবারে ঝানু-লোক, ইণ্টারাপ্ট করল দেবেশ। বেশ কিছু-দিন এল আই সি'তে কাজ করেছে সরকার।

দেবেশের কথায় চমকে গেলাম—তার মানে? ডু য়ু নো হিম?

না। সরাসরি আলাপ নেই। তবে মিসেস রাউথের কেসটা হাতে আসার পর ডিপার্ট-মেন্টে খবরাখবর নিয়ে ভদ্রলোকের ব্যাক-গ্রাউণ্ড খানিকটা জেনেছি।

কি রকম?—আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

ন্যাশনালাইজেশনের আগে সরকার ছিল একজন ফিল্ড অফিসার। খুব চটপটে কাজিয়ে লোক। কোম্পানী সরকার নিয়ে নেওয়ার বছর কয়েকের মধ্যেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে ধানবাদে বদলি হয়ে যায়। কিন্তু বছর ঘুরল না, পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়ামের টাকা তছরুপের দায়ে চাকরীটি খোয়াল। এল আই সি সরকারকে ছাড়ালেও, সরকার এল আই সি'কে আজো ছাড়ে নি। হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে রেগুলার যাওয়া আসা করে। শুনেছি পুরোনো পরিচিত অফিসারদের ধরে-পড়ে নিজের আত্মীয়স্বজনের বেনামে এজেন্সী নিয়ে কমিশন আদায় করে যাচ্ছে এল আই সি'র কাছ থেকে। সেখানে হাতে-নাতে প্রমাণ করা কণ্টকর। তবে মিসেস রাউথের কেসটা একটু অন্যধরনের।

যাই বলুন মিস্টার দাস, ভদ্রলোকের আর যে দোষই থাকুক চালচলন আদব-কায়দায় একেবারে নিখুঁত। আর খুব সহজেই মানুষের দুর্বলতাটুকু ধরতে পারেন। আমাদের টাকার দরকার। কাপুর আর আগের মত দিতে পারছেন না। বুঝি তো তাঁর অবস্থা। আমার একলার আয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে কোনরকমে সংসার চলে। টাকার অভাবে আমার স্বামীর পংগু পাটা ম্যাসাজ করানো যাচ্ছে না। হেজি-পেজি কাউকে দিয়ে ম্যাসাজ করাতে ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, ওতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। আমাদের মুস্কিল আসানের জন্যই যেন সরকার এলেন। কাগজপত্র দেখেশুনে নিজের ডায়েরীতে নোট করে নিলেন। বললেন, দু-একদিন বাদে এসে জানিয়ে যাবেন ঠিক কত টাকা লোন আমার স্বামী পেতে পারেন।

এক কথার মানুষ মিস্টার সরকার। ঠিক দু'দিন বাদেই এলেন। এ[illegible] শুধু না, একটা বিরাট ফুলের তোড়া আমার হাতে দিয়ে বললেন, এল আই সি'র তরফ থেকে মিঃ রাউথের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। ঘন্টাখানেক সেদিন ছিলেন আমা-দের সংগে। গল্প-টল্প করে একদম মাতিয়ে তুললেন। আমার স্বামী তো একদম চার্মড। সেদিন মিঃ সরকার চলে যাওয়ার পর বললেন, এ রকম লোক হয় না। আগে লাইফ ইন্সিওরেন্সের নামেই গায়ে জ্বর আসত, কিন্তু মিস্টার সরকার আমার সমস্ত ধারণাটাই বদলে দিলেন।

কিন্তু লোনের ব্যাপারে সরকার সেদিন কিছু বলেন নি আপনাদের?—দেবেশের চোখমুখ রীতিমত উৎসুক হয়ে উঠল।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছেন। দেখুন দেখি আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। বললেন, যে পরিমাণ প্রিমিয়াম জমা পড়েছে তাতে এগারো শ টাকার মতো লোন পাওয়া যেতে পারে। তবে সেজন্য প্রায় সোয়াশ টাকার লোন বণ্ড কিনতে হবে। এল আই সি'র নিয়ম নাকি ধার নিতে গেলে প্রতি একশ

টাকায় টেন পারসেন্ট লোন বণ্ড সাবমিট করতে হবে পলিসি হোল্ডারকে।

ক্লিয়ার কেস অব চিটিং—প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দেবেশ—স্রেফ ধাপ্পা। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। আগে নিয়ম ছিল লোন নিতে গেলে পলিসি হোল্ডারকে লোন বণ্ড জমা দিতে হবে। তবে শতকরা দশ ভাগ নয়, একশ টাকায় মাত্র এক টাকা কুড়ি পয়সা। ব্যাপারটা অনেকটা কোর্ট-ফি'র মত। কালেকটরে জমা পড়ে। তাহলেও এগারোশ টাকায় লাগত তেরো টাকা কুড়ি পয়সা। কিন্তু বছর দুয়েক হোল পলিসি হোল্ডারদের রিলিফ দেওয়ার জন্য এল বি জমা দেওয়ার নিয়ম উঠিয়ে দিয়েছে এল আই সি। অর্থাৎ আজ আর লোনের জন্য মিস্টার রাউথকে কানাকড়িরও লোন বণ্ড সাবমিট করতে হবে না।

সেসব তো পরে আপনার কাছে শুনেছি মিস্টার দাস। তাকিয়ে দেখি মিসেস রাউথের মুখে ছোট একটুকরো বিষন্ন মেঘের ছায়া। ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বললেন—তখন কি ছাই এসব জানতাম। সরকার যা বলেছেন অন্ধ বিশ্বাসে তাই মেনে নিয়েছি। শুধু মেনে নিয়েছি তাই না, যখন বললেন এ জন্য মিঃ রাউথের একবার এল আই সি অফিসে যাওয়া দরকার, গোটা কয়েক ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে তখন নিরুপায় হয়েই আমরা বললাম,—দয়া করে আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন মিঃ সরকার। টাকাকড়ি যা লাগে দিচ্ছি।

শুনলে অবাক হবেন মিস্টার দাস, গোড়ায় কিন্তু কিছুতেই রাজী হন নি সরকার। বললেন, এল আই সি'র অফিসার হিসাবে মক্কেলের সুখ-সুবিধা দেখা তাঁর কাজ বটে, প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনও যোগাবেন, তবে কাগজপত্রের ব্যাপারে ক্লায়েন্টের ইনিসিয়েটিভ থাকা উচিত। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আমাদের কোন উপায় নেই। মিস্টার রাউথ তো বিছানা ছেড়ে নড়তেই পারেন না। আর এদিকে আমার স্কুল। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন মিস্টার সরকার।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় দুটো ফর্ম নিয়ে এলেন। তার মধ্যে একটা ঠিক এই ফর্মটার মতই ছিল মিস্টার দাস, বলে মিসেস রাউথ দেবেশের টেবিলের পড়ে-থাকা লোন অ্যাপ্লিকেশনটা তুলে ধরলেন। আমার স্বামীকে দিয়ে সই-টই করিয়ে একশো বারোটা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। বলেছিলেন সাত দিনের মধ্যেই এল আই সি থেকে চেক এসে যাবে।

তারপর? তারপর কি হল মিসেস রাউথ?—লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বটুয়া থেকে একটা রুমাল বের করে গলায় ছোট ছোট ঘামের কয়েকটি মুক্তা মুছতে মুছতে মিসেস রাউথ বললেন—তারপর আমাদের কপাল পুড়ল। সাত দিনের জায়-[illegible] পার হয়ে গেল। চেকও এল না, সরকারও আর এলেন না। তখন কোন উপায় নেই দেখে ফোন করলাম এই অফিসে। ফোন নম্বরটা সরকারই আমাদের দিয়েছিলেন। এই নম্বরে ফোন করে অজয় সরকার বললেই নাকি হবে।—তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রেস ফর্মে লোন অ্যাপ্লিকেশন করেছি।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলেন মিসেস রাউথ। একটু থামলেন। তারপর সেই সোনালী সুন্দর মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বিষন্নতা ঝরে পড়ল—আমি ফোন করেছিলাম। সব শুনে মিস্টার দাস একবার অফিসে এসে দেখা করতে বলেন। অফিসে ও'র সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। আর তখুনি বুঝলাম আমরা অপরিচিত একজনকে বিশ্বাস করে ডাহা ঠকেছি।

প্রতারিত ক্লান্ত মানুষটি এবার দেবেশের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন—মিস্টার দাস আমাদের জন্য যা করেছেন তার তুলনা নেই। আমরা ও'র কাছে কৃতজ্ঞ।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি কালোকালো আমার বন্ধুটি সুন্দরী মহিলার প্রশংসায় প্রায় পোড়া বেগুন হয়ে উঠেছে। বিব্রত ভাবটুকু কাটানোর জন্য তাড়াতাড়ি দেবেশ বলে উঠল—এখনো তো লোন পান নি। আগে পান, তারপর না হয় প্রেইজ করবেন।

কবে নাগাদ পাব মিস্টার দাস?—যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মনে হল মিসেস রাউথকে।

লোন অ্যাপ্লিকেশনটা নাড়া-চাড়া করতে করতে দেবেশ বলল—মিস্টার রাওথের ব্যাগটা আমি আনিয়ে রেখেছি। আশা করি উইদিন এ ফোর্টনাইট পেয়ে যাবেন। এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয় বুঝতেই পারছেন।

বটুয়াটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস রাউথ। চোখের তারা দুটি আবার হারিয়ে গেল ঘন দু'টুকরো মেঘের আড়ালে। গোলাপী দুটি ঠোঁট ভদ্রতায় ফুলকুসুমের সুবাস ছড়িয়ে বলল—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার দাস। উত্তরে দেবেশ কিছু বলার আগেই দশটি ছোট ছোট আঙুলে পুষ্প-কোরকের ভঙ্গিমায় একবার মিলিত হল, তারপরেই খুট-খুট করে হাই হিলের আওয়াজ উঠল প্রকাণ্ড হলঘরে। আস্তে আস্তে টেবিল চেয়ারের আকাবাঁকা গলিপথ ছাড়িয়ে, দরজা পেরিয়ে, করিডোর-রাজপথে মিলিয়ে গেলেন মিসেস রাউথ।

আসি রে দেবেশ—কোটের খোলে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে ফাইলটা হাতে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

যাচ্ছিস?

হ্যাঁ। আজ চলি তাড়া আছে।

—সন্ধিৎসু

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

ইভান পেত্রভিচ পাভলভ : শর্তাধীন রিফ্লেক্স ও পরীক্ষামূলক নিউরোসিস্

(৬)

এ পর্যন্ত যে সব মনরোগবিশারদের মতামত পেশ করেছি, তাঁরা অসুস্থ মনের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুস্থ মনের-তত্ত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফ্রয়েড, ইয়ুং, আডলার প্রথমে মনের রোগ পরে মানসিকতা নিয়ে চর্চা করে মনের অনেক রহস্য ভেদ করেছেন বলে দাবী করেন। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের আওতার বাইরে মনস্তত্ত্বকে এঁরা নিয়ে এলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের মর্যাদা পেল না মনস্তত্ত্ব। মস্তিষ্ক মননক্রিয়ার ভিত্তি অনেকে স্বীকার করলেন বটে, কিন্তু এই ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে দাঁড় করাতে পারলেন না।

মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে, মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কারের পদ্ধতিই বা কি? এই সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য মনোবিদ্যার বিজ্ঞান-অনুমোদিত অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছিল না। দার্শনিকদের মত নানা রকম কল্পনা ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে মনস্তাত্ত্বিকরা চলতে চাইছিলেন। পদে-পদে বাধা পাওয়া সত্ত্বেও। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জার্মানী ও আমেরিকাতে ফ্রয়েড ইয়ং-এর আগে থেকেই কিন্তু একদল বিজ্ঞানী প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মন নিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন ওয়েবার, মুলার, হেলমহোল্জ-এর শ্রবণ ও দর্শনইন্দ্রিয় নিয়ে গবেষণা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। জার্মনীর ডকনার ও উন্দের ল্যাবরেটরী থেকে উনিশ শতকের শেষ দিকে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে আমেরিকার জন হপকিনস ইউনিভার্সিটিতে মনস্তত্ত্বের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হয়। এর আগে মস্তিষ্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থান নির্ণয়পর্ব শেষ হয়েছে। এই সব গবেষণা ও আবিষ্কার খুবই মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও মনের জটিলতা এবং রহস্যময়তাকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারল না। কেননা এগুলো ছিল খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন; মস্তিষ্কের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের হদিশ অথবা মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রের সন্ধান এর থেকে মিলল না। নতুন গবেষণা পদ্ধতির অভাবে মস্তিষ্ক অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত রাজ্যই হয়ে রইল। মনোবিদ্যাও নির্জ্ঞানভিত্তিক অনুমানপ্রধান পথে অনেক ঘুরে-ফিরে আবার অজ্ঞেয় রহস্যময়তার দিকেই ফিরে চলল। এই সময় নতুন পদ্ধতির সন্ধান দিলেন একজন রুশীয় ফিজিওলজিস্ট। তাঁর নাম ইভান পেত্রভিচ পাভলভ।

অন্যান্য অনেক যুগান্তকরী আবিষ্কারের মত, এই পদ্ধতি-আবিষ্কারের সময় পাভলভ এর গুরুত্ব কতখানি তা ঠিক বুঝতে পারেন নি। মস্তিষ্কের-ক্রিয়াকলাপের আভাস পাবার জন্যও তিনি এই পদ্ধতির আশ্রয় নেন নি। হজমক্রিয়ার গবেষণার সঙ্গে জড়িত পাভলভের এই গবেষণা পদ্ধতি। হজমক্রিয়ার ওপর নতুন আলোকপাতের জন্য ১৯০৪ সালে পাভলভ নোবেল প্রাইজ পান। এই হজম নিয়ে গবেষণার সময় কুকুরের লালা এবং পাকাশয়ের হজমী রসের পরিমাণ নির্ণয় দরকার হয়ে পড়ে। লালা ও হজমী রস দেহের বাইরে সংগ্রহ না করতে পারলে সঠিকভাবে মাপা যায় না। একটা ছোট্ট অস্ত্রোপচার করে লালাগ্রন্থিনালীর **(Salivary duct)** এক প্রান্ত বাইরে এনে চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে দিলেন। সেখানে একটা টেস্ট টিউব বসিয়ে লালা বাইরে সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত হল।

অস্ত্রোপচারের পর কুকুরটি সুস্থ হয়ে উঠলে পরীক্ষা চালালেন। সুস্থ জীবন্ত প্রাণীর ওপর এর আগে ফিজিওলজিস্টরা বড়-একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ করে উঠতে পারতেন না। দেহের যন্ত্রবিশেষ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হলে যন্ত্রটিকে দেহ থেকে আলাদা করে নিয়ে এসে বিভিন্ন অবস্থায় তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা হত। বলাবাহুল্য, সুস্থ প্রাণীর দেহের মধ্যে যন্ত্রটি অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে বা বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে কাজ করতে পারে, এভাবে সেটা বোঝা যেত না। এদিক দিয়ে পাভলভ পদ্ধতির উন্নত ধরন অনস্বীকার্য। অতি সহজে এবং বলা চলে প্রায় নিঃশব্দে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। লালা ঝরা এবং লালা মাপা থেকে পাভলভ মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি আবিষ্কার করলেন। মস্তিষ্কের ক্রিয়াগত অবস্থার অর্থাৎ মানসিকতার গবেষণার পথ খুলে গেল।

আগেই বলেছি, ১৯০৪ খৃঃ হজমক্রিয়ার গবেষণার জন্য পাভলভ নোবেল প্রাইজ পান। এই নিয়ে পরীক্ষা চালাবার সময় লালা ঝরার দিকে তাঁর নজর পড়ে। তিনি দেখলেন যে, অনেক সময় খাবার মুখে তোলবার আগে থেকেই কুকুরের লালা পড়ছে। যে লোকটি কুকুরের খাবার দিতে আসত তার পায়ের শব্দ শুনলেই কুকুরের লালা ঝরত। থালা-বাসনের শব্দ শুনলেও লালা পড়ত। কেন? কেন [illegible] মাটিতে পড়ে? অনেকটা এই ধরনের প্রশ্ন। উত্তরটা অনেকের কাছে খুবই সোজা। কুকুর বুঝতে পারছে খাবার আসছে, তাই লালা পড়ছে। পাভলভের এ উত্তর মনঃপূত হল না। তিনি প্রশ্ন তুললেন, কুকুর যে মানুষের মত বুঝতে পারে বা চিন্তা করতে পারে তার প্রমাণ কোথায়? আরো বুঝতে চাইলেন, মস্তিকের কোন ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই লালা ঝরার সঙ্গে সম্পর্কিত? খাবার মুখে বা জিবে লাগলে কুকুরের লালা পড়ে এই স্বাভাবিক ফিজিওলজিক্যাল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে, থালা-বাসনের শব্দ বা খাবার-পরিবেশকের পায়ের শব্দ শুনে লালা পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কি? এই লালা নিঃসরণ (খাবার মুখে লাগার আগে) কি মানুষের মননক্রিয়ার সামিল কোন কিছু? উপাদেয় খাদ্যের কথা চিন্তা করলে মানুষেরও মুখে লালা আসে। এই লালা-পড়া নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গবেষণা করলে নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সূত্র তথা মননক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কৃত হতে পারে। শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফ্রয়েড

স্বপ্নের গলিপথ দিয়ে নির্জ্ঞানে প্রবেশ করেছিলেন, পাভলভ লালাগ্রন্থির গলিপথ দিয়ে মস্তিষ্করাজ্যে প্রবেশ করলেন। এই-ভাবে কঠিন করোটির আবরণকে তুচ্ছ করলেন। প্রকৃতিকে পরাভূত করলেন। নিয়ন্ত্রিত ও পূর্বনির্ধারিত অবস্থার মধ্যে ল্যাবরেটরীতে মস্তিষ্কের, বিশেষ করে গুরু-মস্তিষ্কের কার্যকলাপ নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত হল।

ঘন্টা বাজানো হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে খাবার দেওয়া হচ্ছে কুকুরকে। কয়েকবার এই রকম করার পর দেখা গেল যে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের লালা ঝরছে এবং কুকুরটি খাবারের পাত্রটির দিকে যাবার চেষ্টা করছে। এইটি হচ্ছে পাভলভের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট। এই লালা-ঝরা, খাদ্যের সাক্ষাৎ মেলার আগেই শুধু ঘন্টাধ্বনির শব্দে লালা-ঝরা প্রতিক্রিয়ার নাম শর্তাধীন রিফ্লেক্স বা কন্ডিশনড রিফ্লেক্স। এই শর্তাধীন রিফ্লেক্স মনোজগতের ক্রিয়াকলাপ ব্যখ্যার প্রথম সোপান। খাদ্যের সঙ্গে মুখের সংস্পর্শে স্বাভাবিক লালাঝরা জীব-জগতের সহজ ঘটনা, সহজাত আদিম জৈবক্রিয়া (ইনস্টিংটুয়াল এ্যাকটিভিটি)। পাভলভের ভাষায় শর্তহীন বা আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্স। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার দরকার নেই, কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। এক-এক জাতীয় প্রাণী এই ধরনের কতকগুলো শর্তহীন রিফ্লেক্স নিয়ে জন্মায়। এগুলোকে বলা চলে প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিম্নমস্তিষ্ক: (সাবকর্টেক্স) সোজা ভাষায় পুরনো মগজ। গুরুমস্তিষ্ক বা কর্টেক্স পরবর্তীকালের অভিব্যক্তি (evolution) আধুনিক হলেও এর বয়স কোটি বছরের কম নয়। মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখির বাসা বাঁধার মত জটিল প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো সহজাত আদিম ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত; শর্তহীন রিফ্লেক্স-সমষ্টি।

শর্তাধীন রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। এই রিফ্লেক্স বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে গড়ে ওঠে। পাভ-লভের এক্সপেরিমেন্টের ঘন্টাধ্বনিকে বলা হয় শর্ত বা শর্তহীন উদ্দীপক; এই উদ্দীপকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে গড়ে উঠেছে শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া, লালাঝরা। কুকুর একটি নতুন শিক্ষা লাভ করেছে; বিজ্ঞানের ভাষায় তার একটি শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরী হয়েছে অথবা বলা যায় তার লালাঝরা ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে শর্তায়িত বা কন্ডিশনড হয়েছে। ঘন্টাধ্বনি শ্রবণ-কেন্দ্রে যে উদ্দীপনা জাগায়, সেই উদ্দীপনার সঙ্গে খাবার সময়কার লালা-ঝরার মত শর্তহীন রিফ্লেক্স, নিম্ন-মস্তিষ্কের উদ্দীপনার যোগাযোগ ঘটেছে। শুধু ঘন্টাধ্বনিই এখন লাল ঝরাবার পক্ষে যথেষ্ট। এইভাবে জন্মের পর থেকেই জীবশিশু বহির্বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগের নতুন গুণ আয়ত্ত করে বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। এই-ভাবেই শিক্ষালাভ হয়। এই ক্রিয়াকলাপ (কন্ডিশনড রিফ্লেক্স) একান্তভাবে গুরু-মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। শর্তহীন রিফ্লেক্স, আগেই বলেছি, প্রজাতিগত সহজাত বৈশিষ্ট্য আর এই শর্তাধীন রিফ্লেক্স শিক্ষাসাপেক্ষ অর্জিত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। তার মানে এই যে, কুকুরকে কন্ডিশনড করা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার কাছেই শুধু ঐ ঘণ্টা বাজানোর দাম আছে। অন্য কুকুরের লালা ঐ ঘন্টাধ্বনিতে ঝরবে না।

শুধু ঘণ্টধ্বনি নয়, যে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপকের সঙ্গেই কুকুরকে কন্ডিশন্ড করা যেতে পারে। ঘন্টা বাজানোর বদলে যদি কুকুরকে একটা আলো দেখানো হয়, একটা গন্ধ শোঁকানো হয়, কিম্বা পিঠে থাবড়ানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেওয়া হয়; তাহলে আলো, গন্ধ, পিঠ-থাবড়ানোর সঙ্গে লালা ঝরা শর্তায়িত হবে। আরো মনে রাখা দরকার, লালাঝরা সহজাত খাদ্য রিফ্লেক্স; এই সকল অন্য যে কোনো সহজাত শর্তহীন রিফ্লেক্সকে শর্তাধীন রিফ্লেক্সে পরিণত করা যায়। হঠাৎ জোরে চীৎকার করলে শিশুমাত্রেই চমকে উঠবে, আত্মরক্ষার সঙ্গে জড়িত এই চমকে ওঠা; এটা একটা শর্তহীন রিফ্লেক্স। এই চমকে ওঠাকেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোনো উদ্দীপকের সঙ্গে কন্ডিশনড করা চলে। যে কোনো আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্সের উত্তেজনা বহির্জগতের যে কোনো ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উদ্দীপকে সংযুক্ত হয়ে নতুন শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। একটি শর্তাধীন রিফ্লেক্সকে ভিত্তি করে ও নতুন শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরী হতে পারে। মস্তিষ্কের নতুন ধর্ম বা গুণলাভের পথ অজস্র।

শর্তহীন রিফ্লেক্স চিরস্থায়ী। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পথ তৈরী রয়েছে ও থাকবে। শর্তাধীন রিফ্লেক্স কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, পুরোপুরি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ। শর্তগুলি যথাযথ সঠিক না হলে রিফ্লেক্স তৈরী হবে না। একবার ঘণ্টা বাজিয়ে লালা ঝরানো রিফ্লেক্স তৈরী হয়েছে বলেই চিরকাল ঘণ্টা বাজালেই লালা ঝরবে, এমন নয়। ঘণ্টা বাজানোর পর যদি কয়েকবার কুকুরকে খাবার দেওয়া না হয়,—অর্থাৎ শর্তহীন উদ্দীপনা যদি বন্ধ থাকে, তবে ঘণ্টা বাজানোর পর লালাঝরা ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কি, এর পরেও ঘণ্টা বাজালে কুকুর হয়ত খাবারের পাত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

আরো নানাভাবে শর্তাধীন রিফ্লেক্স ভেঙে পড়তে পারে। বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। হিস্টিরিয়া প্রসঙ্গে যেটুকু না বললেই নয়, সেইটুকুই শুধু বলব।

শর্তাধীন রিফ্লেক্স পরীক্ষার এই আদি এক্সপেরিমেণ্ট থেকে পাভলভ বুঝলেন যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পরিমাপ সম্ভব। মননক্রিয়ার পরিমাণগত বিশ্লেষণ করতে পারা যায়। বিজ্ঞানীর কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সবিশেষ। লালার পরিমাপ লালাগ্রন্থির উত্তেজনাক্রিয়ার ফল। আবার লালাগ্রন্থির উত্তেজনা ঘণ্টাধ্বনির দরুন শ্রুতিকেন্দ্রের উত্তেজনার ফলে ঘটানো সম্ভব। শ্রুতিকেন্দ্রের সাড়া উচ্চমস্তিষ্কের সাড়া। এই সাড়ার পরিমাপ ও লালাঝরার পরিমাণ থেকে নির্ণয় করা চলে।

এই অতি সহজ ও আদি পরীক্ষাটি ক্রমশ পাভলভ ও তাঁর সহকর্মীদের ল্যাবরে-টরীতে নতুন ও জটিলতর পরিবেশে প্রযোজিত হতে লাগল। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পাভলভ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রথমে কুকুর, পরে শিম্পাঞ্জী নিয়ে গবেষণা চলে। আরো পরে মানসিক রোগগ্রস্তদের নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। ল্যাবরেটরীতে প্রথম নিউরোসিস তৈরী করেন। এর ফলে মনরোগবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এই পরীক্ষামূলক নিউরোসিস এবং শর্তাধীন রিফ্লেক্সের ভাঙাগড়ার নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের এবং মনোবিজ্ঞানের অনেক নতুন মৌলিক সূত্র আবিষ্কৃত হল। লক্ষণীয়, যে পাভলভ সুস্থ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ থেকে অসুস্থ মনের আচার ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করে-ছিলেন, আর ফ্রয়েড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অসুস্থ মননক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে সুস্থ মানসিকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। হিস্টিরিয়া এবং অন্যান্য নিউরোসিসের মস্তিষ্কভিত্তিক কারণ আবিষ্কারের মূলে ছিল শর্তধীন রিফ্লেক্স নিয়ে পাভলভের আগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সমন্বয়।

পাভলভের মতে—সব রকমের আত্মিক অথবা মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিস্তেজনার দরুণ ঘটছে। মননক্রিয়া পরিবেশপ্রভাবিত মস্তিষ্কের কন্ডিশনড্

রিফ্লেক্স। মস্তিষ্ক বস্তুর জটিলতম বিন্যাস ও সংগঠনের অভিব্যক্তি। পরিবেশও পুরোপুরি বাস্তব। দেহের মধ্যেকার পরিবেশই হোক আর বাইরের জগতই হোক—দুইই বস্তুর বিশেষ সমন্বয়ে গঠিত। মানসিকতার ভিত্তিভূমি বস্তুনির্ভর; তা বলে মন একটা বস্তু নয়। এবার মস্তিষ্কের উত্তেজনা-নিস্তেজনার গতিপ্রকৃতি ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের পাভলভ আবিষ্কৃত সূত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে হিস্টিরিয়ার কারণ নির্দেশের চেষ্টা করা যাক।

উত্তেজনা আর নিস্তেজনা (এক্‌সাইটেশন অ্যান্ড ইনহিবিশন) মস্তিষ্ক কোষের মৌলিক গুণ বা স্বধর্ম। উত্তেজনা নিস্তেজনা একই প্রক্রিয়ার দুই বিপরীত ব্যঞ্জনা। এরা দুয়ে মিলে স্নায়ু প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপের অভিব্যক্তি। উত্তেজনা মস্তিষ্কের প্রভবাধীন আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী, আর নিস্তেজনা এই ক্রিয়াকলাপকে মন্দীভূত করে ও দরকারমত এর অবসান ঘটায়। দেহের বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য যন্ত্রপাতির বিরামহীন সুষম কার্যপ্রবাহের জন্য এই দুই ধরনের ক্রিয়াই একান্ত প্রয়োজনীয়। উত্তেজনা কেন্দ্র থেকে সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে চায়, নিস্তেজনা উত্তেজনাকে সংযত সংহত করতে চায়। এ-দুয়ের বিরোধ ও সমন্বয় মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সক্ষম রাখে। বিরোধ দ্বন্দ্ব ঠিকমত না মিটলে; সমন্বয় না ঘটলে মননক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলে না। নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি মাত্র নয়। উত্তেজনার মতই নিস্তেজনার উদ্দীপক ও শর্তাধীন শর্তহীন দুরকমের হতে পারে। কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স এর আদি এক্‌সপেরিমেণ্টে উল্লিখিত খাদ্য ছিল শর্তহীন উত্তেজনা-উদ্দীপক; আর ঘণ্টাধ্বনি শর্তাধীন উদ্দীপক।

পরীক্ষানিরীক্ষার সময় পরিবেশে আকস্মিক কোনো নতুন উদ্দীপক যদি সাড়া তোলে, তবে কুকুরের লালাঝরা থেমে যায়। কোনো শব্দ শুনলে, জোরালো কোনো আলো দেখলে কুকুরের লালা ঝরা বন্ধ হয়। অন্য কোনো লোক ঘরে ঢুকলেও এইরকমটি হতে পারে। কুকুর খাবার পাত্র থেকে মুখ তুলে তাকায়। লালাগ্রন্থি কেন্দ্র নিস্তেজিত হওয়ার দরুন এরকম ঘটে। এই নিস্তেজনার নাম শর্তহীন বা বহিরাগত নিস্তেজনা। এই প্রক্রিয়া প্রজাতির জন্মগত ও স্বভাবত বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি খাদ্য না দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে চললে লালার পরিমাণ ক্রমশ কমে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। এখানেও সেই নিস্তেজনা। এর নাম শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনা। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ পরিবেশে এই নিস্তেজনা ঘটছে, তাই শর্তাধীন। জীবের পক্ষে এ নিস্তেজনা অত্যাবশ্যক। এই নিস্তেজনা অনর্থক লালার অপচয় বা শক্তিক্ষয়নিবারক। নিস্তেজনার সাহায্যে জীব পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে ও নতুন প্রয়োজনীয় রিফ্লেক্স গড়ে তোলে। উত্তেজনার মতই নিস্তেজনা জীবের পক্ষে বিশেষ দরকারী। পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ ভাবে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এই নিস্তেজনাক্রিয়ার দৌলতেই সম্ভব। জীবনধারণ, আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণ,—এই প্রধান তিন ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি বা শর্তহীন রিফ্লেক্সকে ভিত্তি করে উত্তেজনা-নিস্তেজনার সাহায্যে প্রাণীমস্তিষ্কে হাজার হাজার শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে উঠছে, ভেঙে পড়ছে। এই ভাঙাগড়ার কাজে ছেদ বা বাধা পড়লে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটলে, প্রাণী অস্থির চঞ্চল অথবা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চিন্তাভাবনা আচারব্যবহারে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই বিশৃঙ্খলা কিছুদিন ধরে চললে মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি হয়।

পাভলভ প্রধানত কুকুর নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন। তাই অনেকের ধারণা পাভলভের আবিষ্কৃত মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সূত্রগুলি শুধু প্রাণীর বেলায় প্রযোজ্য। অনেকে এও মনে করেন যে, পশুমন আর মানবমনকে এক করে দেখেছেন পাভলভ। ওয়াটসন প্রমুখ আমেরিকান ব্যবহারবাদীদের (behaviourists) সমগোত্র পাভলভ, এই ধারণাও অনেকে পোষণ করেন। পশুমন মানবমনের গুণগত পার্থক্য মনরোগের ক্লিনিকে কাজ করার সময় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেন। কথা বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করার ফলে পশুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বাঙময় জগতের বাসিন্দা মানুষ। বাচনক্ষমতা উদ্দীপককে সামানীকরণ ও বিয়োজনের ক্ষমতা দিয়েছে। মনোবিকার নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পাভলভ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে,—পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ (পশুদের একমাত্র জগৎ) ছাড়াও মানুষের ভাষাগ্রাহ্য আর একটি জগৎ আছে। পশুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবার প্রথম ধাপটি হল—হাতিয়ার ব্যবহার করতে ও দলবেঁধে কাজ করতে (প্রধানত খাদ্য আহরণ) শেখা। প্রয়োজন হল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও ভাববিনিময়ের। উৎপত্তি হল শব্দের। সেই সব শব্দমালা থেকে তৈরী হল বর্বর যুগের প্রথম ভাষা। আভ্যন্তরীণ কতকগুলো যন্ত্রপাতিতে, যথা ভোকাল কর্ড, ল্যারিংস ইত্যাদিতে ঘটল বিশেষ পরিবর্তন, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কেরও। মানবমস্তিষ্কে নতুন গুণ ও ধর্ম আরোপিত হল। মস্তিষ্কের এই বিশেষ মানবীয় পরিবর্তন পশুদের অলভ্য অসংখ্য গুণের অধিকারী করে তুলল মানুষকে। বহির্বাস্তবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংকেতকে বিয়োজিত ও সামান্যীকৃত করে প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী হয়ে উঠল। পশুর সম্বল শুধু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা আর মানুষের কাজে লাগছে হাজার-হাজার বছর ধরে সঞ্চিত লক্ষ-লক্ষ মানুষের কোটি-কোটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। দর্শন কাব্য বিজ্ঞান,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংকেতের বিয়োজন ও সামান্যীকরণেরই ফল। বস্তুজগৎ ভাষার মাধ্যমে মানব মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। পাভলভ এই নতুন সংযোজিত স্তরটির নাম দিয়েছেন দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র (সেকেন্ড সিগনালিং সিস্টেম)। প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির স্তর; পশু ও মানুষ উভয়েই সে তন্ত্রের অধিকারী। মনে রাখা দরকার যে এই তন্ত্র দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একে অন্যকে প্রভাবিত করে। প্রথমটির বিশেষ বিবর্তনের ফলে দ্বিতীয়টির উদ্ভব। ব্যবহারবাদীরা মানব মস্তিষ্কের এই গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নীরব। পাভলভ মনে করতেন না যে, কেবলমাত্র ব্যবহার দিয়ে জটিল মননক্রিয়ার হদিশ মিলবে।

ল্যাবরেটরীতে শর্তাধীন রিফ্লেক্সের এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পাভলভকে নানা সময়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারই সমাধান করতে গিয়ে মস্তিষ্কের অনেক নতুন ধর্মের সন্ধান মেলে। মনোবিকার বা নিউরসিস সম্পর্কে আগ্রহ সমস্যা মেটাতে গিয়ে ধীরে-ধীরে তাঁর মনে আসে। শর্তাধীন উত্তেজনা থেকে শর্তাধীন নিস্তেজনা সৃষ্টি না করতে পারলে পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে নিয়ে নতুন পরীক্ষা সম্ভব নয়। দেখা গেল, কতকগুলো কুকুরকে নিস্তেজিত করা অসম্ভব না হলেও বেশ সময়সাপেক্ষ; আবার কতকগুলো

কুকুরের নিস্তেজনা-অবস্থা অন্যদের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। এই পর্যবেক্ষণ থেকে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা-উত্তেজনার আধিক্য অনুপাতে মস্তিষ্কের টাইপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হলেন। মোটামুটি সারমেয়কুলকে এবং পরে মানব প্রজাতিকেও চার টাইপের মধ্যে নিয়ে এলেন। মস্তিষ্কের 'টাইপ' ঠিক করলেন মৌলিক নার্ভ-প্রক্রিয়া; (উত্তেজনা-নিস্তেজনা) বিচার করে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনার তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী মস্তিষ্ককে প্রথমে সবল ও দুর্বল, এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। যাদের মধ্যে উত্তেজনা-নিস্তেজনা দুয়েরই তীব্রতার অভাব তারা দুর্বল বা ইনহিবিটরী টাইপ। এদের সহ্য-ক্ষমতা কম। উদ্দীপনার মাত্রা সামান্য বাড়লেই এরা সইতে পারে না। উচ্চ-মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিশৃঙ্খলা সহজেই প্রকাশ পায়। বিষাদরোগের প্রাদুর্ভাব এদের মধ্যে বেশী বলে, এদের আর এক নাম 'মেলানকলিক' বা বিষণ্ণ টাইপ। এরা অল্পতেই হাঁপিয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস এদের কম, উৎসাহেরও অভাব। সব সময়েই উৎকণ্ঠিত। অল্প আঘাতে মুষড়ে পড়ে, পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এরা বেশ অসুবিধ বোধ করে। আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগেরই মস্তিষ্ক এই টাইপের।

সবল মস্তিষ্কের প্রধানত তিন টাইপ। দুটি টাইপের মধ্যে আছে উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতা আর একটি টাইপে এই সাম্যের অভাব। অসমঞ্জস এই টাইপের বিশেষত্ব এদের অতিউত্তেজনাপ্রবণতা। নিস্তেজনাক্রিয়া দুর্বল। পাভলভের ভাষায় এরা অসংযত বা আনরেস্টরেনড টাইপ। এরাও মনরোগে আক্রান্ত হয় বেশী সংখ্যায়। এরা হঠকারী, অতিউৎসাহী, আত্মম্ভরী। অসহিষ্ণু, অসংযমী, কিন্তু প্রাণশক্তি এদের প্রচুর। আত্মশক্তি সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস ও সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের জীবনে প্রায়শই অসাফল্য নিয়ে আসে; যদিও এদেরই মধ্যে পাওয়া যায় আলেক-জান্ডার ড্রেক ও কলম্বাসের সন্ধান।

সুসমঞ্জস সবল টাইপ দুটিকে পাভলভ নাম দিয়েছেন স্যাংগুইন ও ফ্লেগম্যাটিক। উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতার দরুন মন-রোগের সম্ভাবনা এদের অনেক কম। মস্তিষ্কের মধ্যেকার উদ্দীপনাপ্রবাহের বেগের কম-বেশী দিয়ে এদের পার্থক্য স্থির করা হয়েছে। যাদের গতিময়তা কম, যাদের উত্তেজনা-নিস্তেজনার রূপান্তরণ অপেক্ষা-কৃত শক্ত ও সময়সাপেক্ষ, তাদের বলা হয় সুস্থির বা ফ্লেগম্যাটিক। এরা সংযমী, অধ্যবসায়ী, অচঞ্চল, ধীর, স্থির ও ঘাতসহ। এরা বিফলতায় ভেঙে পড়ে না, এদের উদ্যমের অভাব ঘটে না। দীর্ঘকাল ধরে একই বিষয়ে কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু এরা চটপটে নয়। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সহজে মনোনিবেশ করতে পারে না। দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণামূলক কাজ করতে পেলে এই টাইপের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। আপাতদৃষ্টিতে এদের মনে হয় অনড় নিরুৎসাহী। অন্য সবল সুষম টাইপটির বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার ক্ষমতা অনেক বেশী। নার্ভের গতিময়তা বেশী থাকার দরুন এরা সব কিছু বোঝে তাড়াতাড়ি; অনেক সময়ে গভীরে না গিয়েও কাজ চালিয়ে যেতে পারে। সব কিছুতে উৎসাহ দেখায় বেশী, সাড়া দিয়ে থাকে অল্পেতেই। আপাতদৃষ্টিতে হঠকারী টাইপের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য বেশী। কিন্তু নিস্তেজনার ক্ষমতা থাকার দরুণ এরা আত্ম-সংযমে সমর্থ। বড় ব্যবসায়ের সফল কর্ম-কর্তা ও রাষ্ট্রনেতাদের মস্তিষ্ক এই টাইপের। এদের নাম দেওয়া হয়েছে, স্যাংগুইন বা আশাবাদী।

এই চার টাইপের কোন একটির শক্ত কাঠামোর মধ্যে কোন মানুষকেই হয়ত ফেলা যাবে না। আর টাইপে ফেলার চেষ্টার বাড়াবাড়িও ঠিক নয়। মস্তিষ্ককোষের নমনীয়তা ও পরিবর্তনধর্মিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন পাভলভ। বার-বার এই কথাই বলেছেন,—যে পরিবেশের অনুকূল সাহায্য মস্তিষ্কের ক্রমোন্নয়ন, টাইপের রূপান্তরণ সম্ভব। মস্তিষ্কের plasticity ও immense potentialities এর উল্লেখ তাঁর লেখার অনেক জায়গায় আছে। 'টাইপ'-এর আলোচনা মনরোগের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়েছে। কিন্তু অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বেড়ে চললেও সুস্থ মানুষের তুলনায় তারা নগণ্য। এই নগণ্য সংখ্যাই মাত্র পরিবেশের সঙ্গে নিস্তেজনা-উত্তেজনার সমতা সাধনে অক্ষম।

'টাইপে'র বিচার করতে গেলে, মানুষের বেলায়, প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের কথাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়বে। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক তন্ত্র আর বাক্‌ভিত্তিক তন্ত্র যদি সমশক্তিমান না হয় তাহলেও মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। অবেগপ্রবণ কবিস্বভাবের মানুষের মধ্যে থাকে ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য। পাভলভের ভাষায় এরা 'আর্টিস্টিক টাইপ'। আর বিচারপ্রবণ দার্শনিক বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে থাকে দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য। এদের বলা হয় 'ফিলজফার টাইপ' কোনটিরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অতি-আবেগপ্রবণ টাইপের দৃষ্টান্ত হিসেবে শেলী, ভ্যানগগের নাম করা যেতে পারে। অতি-বিচারপ্রবণের দৃষ্টান্ত হ্যামলেট। আগের চার এবং শেষের দুই টাইপের permutation, combination করলে অনেক রকমের 'টাইপ' পাওয়া যাবে। মনস্তাত্ত্বিকের কাছে টাইপের মূল্য যাই থাক, আমাদের কাছে এর মূল্য শুধু মন-রোগপ্রবণতার দিক থেকে। পাভলভের মতে 'আর্টিস্ট ইনহিবিটরী' টাইপের মধ্যেই হিস্টিরিয়ার আধিক্য দেখা যায়। ঘটককে কি এই টাইপে ফেলা যায়?

—মনোবিদ্

মনের কথা ঃ আলোচনা

১৩ ফেব্রুয়ারীর ৪০ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত মনোবিদের লেখা 'মনের কথা' প্রবন্ধে একটা অগভীরতা ও ভ্রমাত্মক ধারণার ছাপ সুস্পষ্ট। হিপ্নোটিজম যে ঘুম আনয়ন করা নয় এবং হিপ্নোসিস যে ঘুমন্ত অবস্থা নয় তা বৃটিশ মেডিক্যাল হিপ্নোটিস্ট সোসাইটি ও আমেরিকার সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল এন্ড এক্সপেরিমেন্টাল হিপ্নোসিস দুটি প্রতিষ্ঠানের মতেই প্রমাণিত সত্য। বাংলা দেশে অবস্থিত সম্মোহন গবেষণার প্রতিষ্ঠান সাইকিক রিসার্চ সেন্টারের মতেও হিপ্নোসিসের সঙ্গে ঘুমের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া হিপ্নোসিস যে কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স, মানে শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া নয়, এও তাঁদের দৃঢ় অভিমত। শিক্ষার জন্য বেশ কিছুদিন ব্যয় করার পরই শর্তাধীন প্রতিক্রিয়ার কথা আসে। প্যাভলভীয় মতানুসারে লেখক যেটা বলতে চেয়েছেন যে, হিপ্নোটিস্টের সাজেসান বা নির্দেশ (প্রসংগত বাক্-প্রয়োগ কথটা যুক্তিযুক্ত কারণ হিপ্নোটিস্ট ও সাবজেক্ট-এর সম্পর্ক আমেরিকান মতে ফেথ্ প্রেসটিজ রিলেশনশিপ ও বৃটিশ মতে টিচার পিউপিল রিলেসনশিপ) পাত্রের (লেখক যাকে সংবেশিত বলেছেন) তার মনেও নাকি বেল বাজানোর ফলে সম্মোহনের অবস্থা এসে পড়ে। হিপ্নোটিজম নিয়ে যাঁরা কিছুমাত্র চর্চা করেছেন, তাঁরই জানেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনরূপ ট্রেণিং বা কনডিশানিং ছাড়াই অতি দ্রুতভাবে প্রথম চেষ্টাতেই বেশ কয়েকজনকে সম্মোহিত করা যায়। তাই হিপ্নোসিসকে কনডিশন্ড রিফ্লেক্স বলা ভুল।

লেখক হিপ্নোসিসকে ঘুমের নামেই চালিয়েছেন এবং হিপ্নোসিসকে ঘুম হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। হিপ্নোটিজমের আবিষ্কর্তা ব্রেড জীবনের শেষ দশায় ঘুমের থিওরি পরিত্যাগ করেছেন এবং ঘুমের থিওরী বিজ্ঞানী মহলে প্রায় ১০০ বৎসর পরিত্যক্ত। কিন্তু কোনো-কোনো হিপ্নোটিস্টের এখনও এই ধারণা বর্তমান জেনে দুঃখ অনুভব করছি। কোনো সাবজেক্ট যদি লেখককে প্রশ্ন করে—আমাকে ঘুমোতে বলছেন না হয় ঘুমবো। কিন্তু ঘুমবো আবার আপনার কথাও শুনতে হবে, এই দুটো একসঙ্গে কি করে করবো, তখন লেখক কি জবাব দেবেন জানবার প্রচন্ড কৌতূহল রইল। ঘুম নয় বলেই হিপ্নোটিজম শব্দটা ভ্রমাত্মক, তাই ব্রেড-পরবর্তী যুগে বহু বিজ্ঞানী শব্দটাকে বদলে অনেইরসিস (Oneiros—গ্রীক শব্দ, মানে স্বপ্ন) বা Medism কথটা Meditation থেকে উদ্ভূত) কথাটা চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিপ্নোটিজম শব্দটা এত চালু হয়ে গেছে যে, এই শব্দটাকে পরিবর্তন করা গেল না।

হিপ্নোসিস মানে একটা Trance like stage, Meditative Condition, বা একটা ভাবমগ্ন অবস্থা, বা একটা সংবেদনশীল তন্ময় অবস্থা, বা একটা একাগ্রচিত্ত অবস্থা। হিপ্নোটিজম শব্দটার অর্থ হলো—এটা একটা উচ্চস্তরের আত্মিক অবস্থা, বা চিত্ত-সংযোগের অবস্থা, যে অবস্থায় হিপ্নোটিস্টের বাক্‌প্রয়োগ সাবজেক্টের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে ও সেই মতো মনের কাজ করার শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। হিপ্নোটিজমকে মানসিক একাগ্রতার শিক্ষা, উন্নয়ন ও তার ব্যবহার আখ্যা দেওয়া হয়। Hypnotism is Theory of Concen--tration এই মতটাই বর্তমানে পরীক্ষিত সত্য, বিজ্ঞানীমহলে এই ধারণাটাই গৃহীত। বৈজ্ঞানিকভাবে এই মতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউই কোনো প্রতিবাদ করেন নি।

এবার হিপ্নোসিস যে ঘুম নয় তার আলোচনা করা যাক। ঘুম কথাটা উচ্চারণ না করেও যে সম্মোহিত করা যায় তা সব হিপ্নোটিস্টের জানা। দ্বিতীয়ত ঘুমন্ত ব্যক্তির সামনে কেউ কথা বললে সে সেটা খেয়াল করে না, কিন্তু হিপ্নোসিসে অতি মৃদু শব্দ বা হুইসপারিং পাত্র শুনতে পায়। তৃতীয়ত জাগ্রত চেতনা বা কনসাসনেস ঘুমে স্তব্ধ থাকে, কিন্তু হিপ্নোসিসে পাত্র মনের দিক থেকে এলার্ট। চতুর্থত Knee—Jerk ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থার মতনই এটা হিপ্নোটিক অবস্থায় বর্তমান থাকে। পঞ্চমত Electro Encephalograph যন্ত্রে ব্রেন-ওয়েভ মেজার করে দেখা গেছে যে ঘুমের সঙ্গে কোনো মিল পাওয়া যায় নি, বরং জাগ্রত অবস্থার সঙ্গেই মিল বেশী। ষষ্ঠত Body Resistance যা Emotional Strain বা আবেগের চাপে যে পরিবর্তন আসে, তা সাইকোগ্যালভানিক রিফ্লেকস্ (Psycho Galvanic Reflex Apparatus) যন্ত্রে দেখা গেছে। জানা গেছে, ঘুমন্ত অবস্থার বদলে জাগ্রত অবস্থার সঙ্গেই হিপ্নোটিক অবস্থার মিল বেশী। দু' জায়গাতেই এটা প্রায় 5000 ohms এর কাছাকাছি।

যেহেতু ঘুমের সাজেসান দিয়ে পাত্রকে সম্মোহিত করা হচ্ছে এবং যেহেতু পাত্রের চোখ বন্ধ থাকে বলে আপাতদৃষ্টিতে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে, সে হেতুই হিপ্নোসিসকে ঘুম বলে চালানোর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। ঘুমন্ত ব্যক্তি কোথায় কিভাবে আছে জানে না, কিন্তু সম্মোহিত ব্যক্তি কোথায় কি অবস্থায় আছে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে সবটাই জানে এবং বোঝে। হিপ্নোটিস্টের সব কথাই সে শুনতে পাচ্ছে, এবং জিজ্ঞাসিত হলে সম্মোহিত অবস্থাতে থেকেও উত্তর দিতে পারে। সাবজেক্ট্ কোনো সময়েই সম্মোহকের হাতের পুতুলে পরিণত হয় না, বা তাকে দিয়ে দুর্নীতিমূলক কাজ করানো ইচ্ছামত সম্ভব নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, এ ক্ষেত্রে নাকি সংবেশকের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকে, বা তিনি হয়তো চান না সম্মোহিত ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কাজটা করুক, বা তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব থাকে। এ ধারণটাও লেখকের ভুল। কারণ নীতিবিরুদ্ধ বা বিবেকবিরুদ্ধ কোনো সাজেসান দিলে বিরোধ বাধে পাত্রের মনে, আবেগের সংঘর্ষ হয়, দীর্ঘদিনের অর্জিত সংস্কার ও নীতিবোধের ধারণা তথা বদ্ধমূল সাজেসান নূতন অপরাধমূলক সাজেসানকে মনের মধ্যে জায়গা দিতে চায় না। ফলে মানসিক আলোড়নের ফলে শান্ত একাগ্রচিত্ত অবস্থা, অর্থাৎ হিপ্নোসিস কেটে যায় এবং পাত্র সম্পূর্ণভাবে জেগে ওঠে। অপরপক্ষে কোনো গণিকা বা স্ট্রিপটিজ আর্টিস্টকে বস্ত্র উন্মোচনের সাজেসান দিলে পাত্রের মনে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না ফলে পাত্র সেটা পালন করতে পারে।

সব মানুষকে সম্মোহিত করা যায় না, লেখকের এ মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। তবে অভিজ্ঞ হিপ্নোটিস্টরা আমার মতে প্রায় ৯৫ (পঁচানব্বই শতাংশ) লোককেই চিকিৎসার ব্যাপারে সম্মোহিত করতে পারে। বদ্ধ উন্মাদ, জড় ব্যক্তি, কল্পনা[illegible] ব্যক্তি ও Morons বা খালি হিপ্নো[illegible]র আওতার বাইরে থাকেন। হিপ্নোসিস যে একাগ্রতার থিওরি তা আরো বোঝা যায় সুস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং কল্পনাশক্তিসম্পন্ন বা একাগ্রতা-সম্পন্ন লোকেদের খুব সহজেই সম্মোহিত করা যায়। হিপ্নোসিসের স্তরভেদ আছে চার রকম। যথা হিপ্নোয়িডাল, লাইট, মিডিয়াম ও ডিপ বা সমনামবুলিস্টিক স্টেজ। এই গভীর অবস্থাতেই হান্ড্রেড পারসেণ্ট কনসেনট্রেসান হয়, ফলে ট্রান্সের মধ্যে থেকেও পাত্র চোখ খুলে চলা ফেলা হেঁটে বেড়ানো সবই করতে পারে। তখন সমস্ত Units of Mind Power হিপ্নোটিস্টের সাজেসানে এমনভাবে আচ্ছন্ন যে একটা পা কেটে বাদ দিলেও সাবজেক্টের মন কোনো যন্ত্রণা অনুভব করে না। Major Surgical Operation, Age Regression ও Automatic Writing-এর পরীক্ষানিরীক্ষা এই অবস্থাতেই হয়। চিকিৎসা ব্যাপারে লাইট হিপ্নোসিসই যথেষ্ট।

অজয় চট্টোপাধ্যায়
সাইকিক রিসার্চ সেন্টার,
চন্দনগর, হুগলী।

উত্তরমেঘ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু যেতে তো হবেই। আজ হোক, কাল হোক, বিচ্ছেদ আমাদের অবধারিত তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো। নইলে আচমকা আঘাত এসে গুঁড়িয়ে দিতে পারে আমাদের। তুমি সইতে পারলেও সে আঘাত আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে মোহিনী। এমন কি আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো, আত্মহত্যা করবো সেদিন। শুধু তোমাকে হারিয়ে, তোমার জন্যে, মোহিনী।

কিন্তু কড়িরামের গল্প তখনো শেষ হয়নি।

কথায়-কথায় তারা আরো এগিয়ে যায়। ফারকুয়ার সায়েবের ভাঙা বাংলোর বারান্দায় উঠে আসে। টিলার ওপরে বাড়ি। এখানে দাঁড়িয়ে আরো স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ করা যায় সব। সামনে মাঠ-প্রান্তর, বহুদূরে বিস্তৃত আকাশ আরো সুন্দর মনে হয়। বড় শখের বাংলো ছিল সায়েবের। পাথরের দেয়াল-ছাদ এখনো অটুট। চারদিকে অসংখ্য গাছ বাড়িটাকে ছায়ার ভেতরে ডুবিয়ে রেখেছে। অর্জুন-হর্তুকি-নিম-করম—আরো কত গাছ! সব গাছের নাম জানে না চন্দ্রচূড়। এখানে এলেই যেন কিছু মনে পড়ে যায়। অন্তত ভাবতে ইচ্ছে করে। স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ার আড়ালে নির্জন এই বাড়ি-ঘর-দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে বুকের ভেতরে ভার-ভার ঠেকে। কেমন শূন্য, রিক্ত, বিষণ্ন মনে হয় সব। জীবনের যা কিছু আয়োজন, যত কিছু সম্ভাবনা সব ভুল, সবই মিথ্যে। মহাকালের একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে মুহূর্তে মলিন হয়ে যায় সব।

দরজা-জানলার চিহ্ন নেই। ভেতরে ইঁদুর আর চামচিকের আস্তানা। ইটপাতা আলগা উনুন রয়েছে একটা। পোড়া কাঠ, ছাই, হলুদের ছোপ লাগা ছেঁড়া কাগজ, মাটির ভাঙা হাঁড়ি, শালের পাতা এমনি অসংখ্য আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঘরময়। কে কবে রান্না করে খেয়েছে তারই চিহ্ন। খানিকটা গোবর শুকিয়ে আছে মেঝেয়। বিশ্রামের লোভে গরু-ছাগলও উঠে আসে। অথচ একদিন কত প্রিয় ছিল, পবিত্র আশ্রয় ছিল ফারকুয়ার সায়েবের। আজ মেঝের ওপরে বিষধর সাপের খোলস উড়ে বেড়ায়। গা শির-শির করে দেখে। ঘুরে-ফিরে চন্দ্রচূড় আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে পুরনো, পরিত্যক্ত ফুলের বাগান দেখে। হয়তো এই বাগান খুব শখের ছিল সাহেবের। আজ আর ফুল নেই। নয়ন-লোভন সবুজের চিহ্ন নেই। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে সব। এক পাশে বিলিতি পামের গা জড়িয়ে সাপের মত মোটা ম্যানিপ্ল্যান্টের লতা অনেক ওপরে উঠে গেছে। যেন পুরাণো বাগানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ওই একমাত্র গাছ আর লতা। বনতুলসী, বোকা ভ্যাটরার ফাঁকে-ফাঁকে ভাঙা টব, ইটের কেয়ারি চোখে পড়ে।

'একদিন সবকিছুই সায়েবের হাতছাড়া হয়ে গেল।'

আনমনে কথা বলতে-বলতে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে কড়িরাম। যেন আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাটা সে নিজেকেই শোনায়।

বাইরে এসে চন্দ্রচূড় যেন সম্বিত ফিরে পায়। প্রশ্নাতুর চোখে কড়িরামের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, 'এই বাড়ি, বাগান সব?'

তার আগ্রহ দেখে উৎসাহে চঞ্চল হয়ে ওঠে কড়িরাম। বলে, 'বৈজুপ্রসাদ একে-একে হাত করে নিচ্ছিল সব। অথচ এক-দিন এই বৈজুকেই ঠাঁই দিয়েছিল সাহেব। নিজের পয়সায় গোলদারির দোকান

বানিয়ে দিয়েছিল। চোখের পর্দা নেই মানুষের, বুঝলেন? নিমকের মান রাখতে জানে না সবাই। ভগবানের দুনিয়ায় পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার কি হবে না কোনো-দিন? নিশ্চয়ই হবে। এই বৈজুপ্রসাদেরও হবে দেখবেন।'

খানিক থেমে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে কড়িরাম। মনে-মনে অতীতের সঙ্গে আজকের অবস্থাটাই হিসেব করে মিলিয়ে নিতে চায়। কিন্তু মেলে না যে! কিছুই মেলে না। সব কিছুই অস্পষ্ট, অচেনা ঠেকে। এ যেন বাড়ি নয়। শুধু ইট, কাঠ আর পাথরের স্তূপ। সেই সাধের সাজানো বাগান আজ কোথায়? এ যে শ্মশান! স্বার্থে, স্বন্দে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এখানে দাঁড়ালে কান্না পায় কড়িরামের। নিজের দুঃখ, শোক, সান্ত্বনার স্মৃতি মনে পড়ে।

কালে-কালে সেই বৈজুই হয়ে গেল এখানকার সর্বেসর্বা। সায়েবের নামটা অবধি ভুলে গেল সবাই। একদিন দেনার দায়ে বাংলোটাও ক্রোক হয়ে গেল। নির্বি-বাদে সব ছেড়ে দিলে সায়েব। বাজারের পাশে বাহাদুর মিস্ত্রির ঘর ছিল খালি, তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেইখানেই উঠে গেল। রুক্মিণী থাকলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু এমনি বরাত, সে তখন সায়েবকে না জানিয়ে রোজিকে খুঁজতে বেরিয়েছে। মাস চারেক বাদে যখন ফিরে এল তখন এখানকার হাল বিলকুল বদলে গেছে। সায়েবেরও সায়েবিআনার গন্ধ নেই কোথাও। দেখেশুনে হাত-পা কামড়ানো ছাড়া করার কিছু নেই। চুপি চুপি খবরটা তবু সায়েবকে শুনিয়ে দিলে রুক্মিণী। গিরিডি শহরে খোঁজ পাওয়া গেছে রোজির। কিন্তু সেই রোজি আর নেই। তখন তার কঠিন অসুখ। সর্বাঙ্গে কুৎসিৎ ব্যাধি নিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। খবর তো নয়, যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র। শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সায়েব। আনন্দে কেঁদে ফেলে বললে, আফটার অল সী ইজ মাই ওয়াইফ। তুমি অ্যাটওয়ান্স চলে যাও। তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো রুকমিনি। রোজিকে আমি সুস্থ, নিরাময় করে তুলবো। তারপর আর এখানে নয়। এবার ভাবছি হোমে চলে যাবো।'

কড়িরাম আবার ঘুরে দাঁড়ায়। পুরনো বাড়িটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। যেন কোনো প্রাচীন মন্দির গাত্রে স্থাপত্যের চরম নিদর্শনগুলিই প্রত্যক্ষ করছে। যেন নয়নাভিরাম সেই সব দৃশ্যই দেখছে যা দেহের সমস্ত ক্লান্তি ঘুচিয়ে মনকে মুহূর্তে মুক্ত, পবিত্র করে তোলে। কড়িরাম যে জানে সব। চেয়ে থাকতে গেলেই চোখ জলে ভরে আসে। আর এক একটা দিন-মাস-মুহূর্তের স্মৃতিই পলকে উদ্‌ভ্রান্ত, অবশ করে তাকে, তার চেতনাকে। বিহ্বল, বেদনাতুর চোখে সে তাই কতক্ষণ এমনি চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে হিসেব করে সে কথা বলা যায়। কারণ সে জানে, অসংখ্য দায় আর দায়িত্বের সঙ্গে ফারকুয়ার সায়েবের পবিত্র স্মৃতি বহন করাও তার অন্যতম কর্তব্যের সামিল। যে ভোলে ভুলুক, তাই বলে সে ভুলবে কেন? কেমন করে ভুলবে? সায়েব যে একদিন ঈশ্বরের মত তাকেও আশ্রয় আর অন্নের সংস্থান করে দিয়েছিল। নইলে একদিনের সেই প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাকে কোথায়, কোন অকুলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো কে জানে। তার গোপন পাপ, গা থেকে ক্লেদ আর গ্লানির সেই কুৎসিত চিহ্নগুলি নিজের হাতে ধুয়ে-মুছে টেনে নেবার মত আপনজন আর কে-ই বা ছিল দুনিয়ায়? সায়েব এসে অমন করে না দাঁড়ালে লালসার পঙ্কিল আবর্তে সে হয়তো তলিয়ে যেতো কবে। ঘর বাঁধার ইচ্ছেই কি ছিল তার? সায়েবই যেন নতুন করে লোভ দেখালে তাকে। বুকের ভেতরে জ্বালিয়ে দিলে পবিত্র আগুন। নইলে কোথায় যেতো মোহিনী! রুক্মিণীকুমারের ঘর আলো করতে অন্য কেউ ছুটে আসতো কি আজ? সঠিক বলা ভার। অন্তত মোহিনী যে নামহীন, গোত্রহীন মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে সংসারে দুঃখের বোঝা আরেকটু ভারি করে তুলতো কড়িরাম তা নির্ভুলভাবে জানে। আর জানে বলেই তার সর্বাঙ্গে ভয় আর আনন্দ আর আহত অভিমানের মিশ্রিত শিহরণ। এবং অবসরের বিরল মুহূর্তগুলি সে তাই প্রার্থনা ও অনুশোচনার জন্যে সঙ্গোপন করে রাখে। কারণ এখনো মনে-মনে নিজের কাছে বিশুদ্ধ হবার বাসনা পোষণ করে কড়িরাম। ফারকুয়ার বলেছিল, তুমি নিজের কাছে খাঁটি থেকো, পবিত্র থেকো কড়িরাম। দেখবে কোনো পাপই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাছাড়া ভালোবাসায় পাপ নেই মনে রেখো। সমাজ তোমাকে জল্লাদের মত শাস্তি দিতে পারে। বিচার করার শক্তি তো তার নেই। স্বর্গের আইন-কানুন কি এত শস্তা? মানুষ তার খবর পাবে কোত্থেকে? তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করনে। ভালোবাসাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের নাম ভালো-বাসা। বাস্তবিক, অতি সাধারণ এই কথাগুলিই আজ অর্থে, ব্যঞ্জনায় নতুন করে বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কারণ, চতুর্দিকে চোখ রেখে, কান পেতে সে যেন পুরোপুরি হতাশ, বিরক্ত হতে পারছে না। মনে হচ্ছে, আছে আছে, এই অন্ধকারের ওপারেই আলো আছে কোথাও।

'রোজি কি ফিরে এসেছিল আবার?'

কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে কড়িরাম। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে জট পাকিয়ে যায় ফের। খানিকক্ষণ বিহ্বলের মত চুপ-চাপ চেয়ে থাকতে-থাকতে সে যেন স্থান-কাল সম্পর্কে সহসা সচেতন হয়ে ওঠে। ব্যথা আর লজ্জায় সংমিশ্রণে সেই মনমরা ভাবটাই মুখ থেকে, চোখ থেকে মুছে ফেলতে-ফেলতে আস্তে করে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস চেপে প্রাণপণে শক্ত হতে চেষ্টা করে। প্রায় মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। দূরে গাছ-গাছালির মাথায় রোদ দেখে। দীর্ঘ, অসমান, উধাও প্রান্তরে লুটিয়ে পড়া ছায়া। বড় ক্লান্ত লাগে। যেন দিগন্তবিসারী এই মাঠ, এই কঠিন, উত্তাল তরঙ্গভঙ্গিম প্রান্তর পেরিয়ে এসেছে সে একা। আজ তার সঙ্গী নেই। আপন বলতে কেউ নেই। পৃথিবীতে এত একা, এত দুঃখী কেউ হয়! অথচ আরো দীর্ঘ পথ যেতে হবে। কঙ্কর আকীর্ণ কত পথ, প্রান্তর, মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হবে তাকে। কে জানে এই তৃষ্ণারও শেষ আছে কিনা। পথের উপান্তে কোনো স্নিগ্ধ সায়র। পানে, অবগাহনে যার জল কখনো উষ্ণ, অপবিত্র হয় না।

ঘুম-ভাঙা, স্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মত ধীরে ধীরে চন্দ্রচূড়ের কাছে সরে এসে, অনেকটা আপনমনে অস্ফুট গলায় কথা বলে কড়িরাম। কণ্ঠ শুনে তাকে সরল, অকপট কিন্তু আতুর মনে হয় চন্দ্রচূড়ের। কড়িরামকে দেখে সে মায়া বোধ করে।

'ফিরে এসেছিল বৈকি। সারা গায়ে দগ-দগে ঘা নিয়ে ফিরে এসেছিল রোজি। দেখে চেনা যায় না। দুর্গন্ধে দশ হাত দূরের মানুষ অবধি তিষ্ঠোতে পারে না। সায়েব কিন্তু নিজের হাতে পরিচর্যা শুরু করে দিলে।'

'ভালো যখন বাসে মানুষ তা এমনি করেই বাসে। ফারকুয়ারের ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। আচরণে তাই মিথ্যা, ছলনা ছিল না কোথাও।'

মুগ্ধ কণ্ঠে কথা ক'টি উচ্চারণ করে চন্দ্রচূড়। আড়চোখে কড়িরামের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। মনে-মনে যেন তার সমর্থন প্রার্থনা করে। কারণ ফারকুয়ারের জন্যে তার বুকে যে শ্রদ্ধার, ভালোবাসার আসন পাতা সেখানে জোর করে আর কাউকে বসাবার সাধ্য যে নেই চন্দ্রচূড় তা জানে, বিশ্বাস করে। এবং করে বলেই আপাতত এই প্রসঙ্গে সে ইতি টেনে দিতে তৎপর। কারণ এ দিকে বেলা যায়। মাঠে-ঘাটে ছায়া ঘনিয়ে আসে ক্রমে। এবং অদূরে বনভূমি গাঢ় সবুজ হয়ে এলে আকাশ শা[illegible] শীতল সরোবর মনে হয়। কাটা [illegible]ড়ের মত কয়েকটা চিল লাট খেতে খেতে শূন্য থেকে প্রায় মাটির কাছে নেমে এলে দৃশ্যের আড়াল থেকে নিবিড় নীলের বুকে মাছরাঙা চকিতে গা ভাসায়। আর এইসব দৃশ্য, কাটা-কাটা ছবি তার বিবাগী হৃদয় নিয়ে খেলা করে। তার ঘরের কথা মনে পড়ে। এবং লজ্জাকরভাবে হলেও মোহিনী অস্পষ্ট মুখচ্ছবি, তার ক্ষীণ অথচ একান্ত গোপন ও অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণ যা আপাত তার পক্ষে দুর্নিবার। কিন্তু কতটুকু আলাপ তাদের? ক'দিনেরই বা পরিচয়?

বাধা দিলে কড়িরাম। প্রায় গায়ে জোরে অফুরন্ত আবেগে বিরতিহীন ব[illegible] যায়, মহাশয় ব্যক্তি ছিল ফারকুয়ার। আ[illegible] মানুষ গোটা জীবনে একটা কি দু[illegible] মেলে। সকলের ভাগ্যে আবার তাও জো[illegible] না। আসল কথা পুণ্যি চাই। [illegible] চেয়ে খাঁটি মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া আরো কঠিন।' এই পর্যন্ত কথা বলেই কড়িরাম যেন হাঁপিয়ে ওঠে। পুলকে, বিস্ময়ে এবং খানিক উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে ওঠে এবং নিঃশ্বাস দ্রুত ও ঘন। তার পরবর্তী কথাগুলি শোনার আশায় উদ্‌গ্রীব

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে চন্দ্রচূড় নিপুণভাবে লক্ষ্য করে যে চশমার পুরু কাচের আড়ালে তার বড় বড় চোখের তারা সহায়হীন মত ভ্রমরের মত জলে ভাসা। যেকারণ ব্যক্তিগত সমস্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও সে আপাতত বিরক্ত হওয়া স্থগিত রেখে ভেতরে-ভেতরে তার জন্যে মমতা ও সহানুভূতি সঞ্চয়ে বরং নিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে। আর কড়িরাম পরিপূর্ণ উৎসাহে ধীর, মন্থর স্বরে বলে যায়, 'সায়েব কী বলত জানেন? বলত, আমি খ্রীস্টান। আর্তের সেবা আমার ধর্ম। আমি পাপকে ঘৃণা করি, পাপীকে নয়। আর রোজি তো কোনো পাপ করেনি। সজ্ঞানে পাপ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। স্টিল শী লাভস্ মি। আই নো, শী লাভস্ টু। ভালোবাসা কি কখনো পাপ হয়?'

এই অবধি বলে কড়িরাম ক্লান্ত, নিথর হয়ে যায়। আর বিনা বাক্যব্যয়ে পুরোনো, পরিচিত পথে পা ফেলে চন্দ্রচূড়। তাকে নিরুপায় অনুসরণ করে কড়িরাম। কারণ আপাতত চন্দ্রচূড়ের আকর্ষণ দুর্নিবার। বুকের ভেতরে পুষে রাখা ক্ষোভ, দুঃখ, লালসা ও পরাজয়ের পাশাপাশি এমন কিছু প্রিয় এবং পবিত্র নাম, ভালোবাসা ও আংশিক সফলতার স্মৃতি জীর্ণ, ভগ্ন দেবালয়ে জ্বলন্ত দীপশিখার মত অনির্বাণ যে সে নিজেকে মাঝে মাঝে অতিশয় সৎ ও শুদ্ধ মনে করে এবং এখনো প্রত্যহের অসংখ্য পাপ ও অনাচারের ভেতরে সকলের ঘৃণা ও হিংসার অযোগ্য সে। কারণ তার জীবনে সেই লোকাতীত চরিত্রের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেইদিনের সেই সব কথাই চন্দ্রচূড়কে শোনাতে চেয়ে কড়িরাম তার শীতল হয়ে আসা রক্তের ভেতরে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য অনুভব করে। এবং হঠাৎ হাওয়ায় হতে চমকে ওঠা বৃষ্টি-ভেজা বৃক্ষ-পত্র-পল্লবের ন্যায় তার সর্বাঙ্গে এক লোকোত্তর অনায়ত্ত শিহরণ। যেতে-যেতে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করে তার। এবং মনের মধ্যে অগণিত ঘটনার ভিড়। আর সমস্ত ঘটনাই সেই সরল, উদার, প্রাণবান বিদেশীকে ঘিরে আবর্তিত।

'পাপ-পুণ্যের খবর আমি রাখিনে, চন্দ্রচূড়বাবু। জানিনে, কিসে পাপ হয় আর কিসে পুণ্য। জীবনভোর দেখে আসছি, টাকা আর মেয়েমানুষের জন্যে না করতে পারে হেন কাজ নেই মানুষের। জাল-জোচ্চোর-বদমায়েশেরই দেখি শেষ পর্যন্ত জয় হয়। তবু সব দেখা-শোনার পরেও মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায়, এখানেই কি শেষ? হয়তো নয়। হলে ফারকুয়ার সায়েবের মত জ্বালা-যন্ত্রণা-ত্যাগের যে কিছুই অর্থ হয় না। এক কথায় মিথ্যে হয়ে যায় সব। [illegible] যে সহ্য করা কঠিন।'

কথায় কথায় আবার খাদের পাশেই ফিরে এসেছে তারা। খেয়াল ছিল না, কড়িরাম থেমে যেতেই সজাগ হয়ে ওঠে চন্দ্রচূড়। থমকে দাঁড়িয়ে একবার চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলে। সামনে আপিসঘর। ভেতর থেকে দরজা-জানলা ঠিক আগের মতই বন্ধ। এখনো চুপ-চাপ কাজ করে চলেছেন রুক্মিণীকুমার। বাইরে প্রচণ্ড রোদ্রে আপ্রাণ পাথর খুঁড়ে চলেছে ধনুকের মত বাঁকা কিছু মানুষ। হয়তো অভ্র খুঁজে পাবে। এমনি করেই পায়। কেউ সারাটা জীবন শুধু পাথর কেটে হয়রান।

কিন্তু কড়িরাম নিথর হয়ে গেছে। এই বাড়ি, এই ঘর, ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভার অন্তত সাময়িকভাবে মিথ্যে, মায়া মনে হয়। পেছনে আঁকা-বাঁকা অসমতল দীর্ঘ পথের দিকে উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে চেয়ে থাকতে-থাকতে কেমন হয়ে যায়। সে যেন ইহলোকে আর নেই। ঘামে-ভেজা চক-চকে মুখখানা ভাবনায়, বিষাদে থম-থম করে। দেখে অবাক মানে চন্দ্রচূড়। কড়িরামের চোখে আবার জল দেখা দিতেই তাকে শিশুর মত সরল অথচ অনুতপ্ত মনে হয়। কিসের অনুতাপ? আনমনা কথাটা ভাবতে চেষ্টা করে চন্দ্রচূড়। দুঃসময়ে ফারকুয়ারের জন্যে কিছুই করতে না পারার অনুশোচনাই কি দগ্ধ করে তাকে?

চশমা খুলে চোখ মুছতে-মুছতে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে কড়িরাম। সলজ্জ হাসি হেসে প্রায় ধরা গলায় বলে, 'মনটা কেমন হয়ে গেল। এমনি হয় জেনেই পারতপক্ষে এসব কথা আর ভাবিনে। সায়েব কিনা আমাকেও ভালোবেসেছিল।'

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। সে জানে, সমস্ত ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখার আশা বৃথা। কারণ ফারকুয়ার সায়েব আর কোনোদিন এখানে ফিরে আসবে না। রোজি ফান্সিসও গল্পে শোনা কাল্পনিক চরিত্রের সামিল। এ জীবনে চোখের সামনে সশরীরে হাজির হবে না তারা কেউ। কিন্তু বেঁচে থাকবে কড়িরাম রায়। একা তার মুখেই শোনা যাবে, শুনতে পাবে সবাই, একদিন এখানে মানুষ এসেছিল, একজন মানুষ! ফারকুয়ারের নাম কি সহজে ভোলা যায়? মনে মনে অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করে চন্দ্রচূড়। এতক্ষণে তার বুকের ভেতরে টন-টন করে। আস্তে অতি আপনজনের মতই কড়িরামের হাত ধরে সে টানে।

॥ দুই ॥

মোহিনী এসেছিল। ঘরে ফিরে ফোনে খবর নিয়েছে কয়েকবার। চন্দ্রচূড় তখনো ফেরেনি। কাজের চাপে খেয়াল ছিল না আদৌ। গল্পে-গল্পে আবার যখন মনে পড়ল, ফোনটা বেজে উঠল ঠিক তখন। অন্য কেউ হলে তাকে বিরক্ত হয়ে উঠতে দেখা যেতো। কিন্তু যেহেতু ওপারে মোহিনী আর এপারে ঠিক তার মুখোমুখি বসে চন্দ্রচূড় তাই সহাস্যে ভদ্রতা রক্ষা করে বলতে হয়, 'ধরুন।'

রিসিভার এগিয়ে দিলে রুক্মিণীকুমার। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে আগের মতই পিঠ টান করে বসে থাকে। অন্তত চন্দ্রচূড়ের কাছে তো প্রমাণ হয়ে গেল, স্ত্রী সম্পর্কে শতকরা নিরানব্বুইজনের মত স্পর্শকাতর সে নয়। বরং আরো উদার, আরো মুক্ত হৃদয় নিয়ে ঘোরাফেরা তার। সে জানে, যুগটা আঠারো শতকের নয়, বিশ শতকেরও শেষার্ধ। তাছাড়া জানার ইচ্ছেও সেই ওপারে দাঁড়িয়ে এমন অসময়ে এই বিদেশী, নিরালা পুরুষটির কানে-কানে কী কথা বলতে পারে, কী কথা বলার সাহস হবে মোহিনীর।

ফোন রেখে চন্দ্রচূড় উঠে দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ, প্রসন্ন মুখে বলে, 'আমি এবার চলি।'

'তাই যান। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করুন গিয়ে।' অকপট মুখভঙ্গী। সহাস্য সহজ সুরে সম্মতি জানায় রুক্মিণীকুমার। যেন কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। নিজের কাজ ছাড়া সংসারে আর কিছু জানতে হবে না, বুঝতে হবে না। এমনকি ঘরের ভেতরে মোহিনীর হালচাল নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথাও তার নয়। জীবনে বাজে, ফালতু সময় খরচ করার দিন যে ফতুর হয়ে গেছে কবে! যে-কারণ কাজের অছিলায় চন্দ্রচূড়কেই রাখা। আসলে মোহিনীর জন্যেই তো সব। সমাজে-সংসারে মোহিনীকেও যে আর পাঁচটা শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ের মতই চলনসই করে তুলতে চায় রুক্মিণীকুমার। মনে-মনে নিজের সঙ্গেই আজ মোহিনীকে নিয়ে আরো অনেক উঁচুতে ওঠার সাধ। কে তা বোঝে? কে-ই বা বুঝতে চায়?

হাত তুলে ঘড়ি দেখল চন্দ্রচূড়। দুটো বাজে। গ্রীষ্মের দুপুর গড়িয়ে বিকেল শুরু হতে বাকি নেই আর। তবু রুক্মিণীকুমার চুপচাপ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও কি মনে পড়ে না? ঘরে ফেরার নাম নেই। নাকি ঘরের প্রতি টান নেই, মায়া নেই আর? বড্ড বেমানান, বেখাপ্পা ঠেকে সব। অসময়ে

তাকেই বা কেন ভাবা? রুক্মিণীকুমার কি কিছুই ভাবছে না? দেবতা তো নয়, নিছক মানুষ। তাছাড়া লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ দেবতাকেও দগ্ধ করে, দীর্ণ করে। তবে কি চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও বধির হয়ে থাকতেই চায় সে? কিন্তু কেন? তলে-তলে কোন স্বার্থসিদ্ধির আশা তার? ভেতরে-ভেতরে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রচূড়। সবকিছুই তার কাছে অর্থহীন অথচ গভীর চক্রান্ত মনে হয়।

'আম, মোহিনী হয়তো না খেয়েই বসে আছে।'

বুঝতে পারে না চন্দ্রচূড়, খুঁচিয়ে তাকে সজাগ হতে বলে কিনা রুক্মিণী-কুমার। অন্তত তেমন কোনো বাঁকা পরিহাস তো তার আচরণে ধরা পড়ে না, যা দিয়ে একজন অন্যজনকে অসাড়, নিস্তেজ করে দিতে পারে। এমনকি সারা মুখে ঈর্ষা অথবা অভিমানের চিহ্ন নেই কোথাও। যত-দূর সম্ভব নিজেকে সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক করেই রাখে সে। তবে কি তার মনেই যত পাপ? চন্দ্রচূড় নিজেই অকারণ ভুগে মরছে ভাবনায়, বিলাসে? ভাবনার বিলাস? হয়তো তাই। আজন্ম পরিচিত শহরের অতি-পরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে মানুষকে একটি মাত্র ছকে ফেলে দেখাতেই তো অভ্যস্ত সে। সেই ছক যে হিংসার, সন্দেহের কালো রঙে আঁকা। মানুষ যে পরিপূর্ণ সৎ হয়, সহজ হয়; সব পাপ আর সমস্ত তাপের ঊর্ধ্বে তার স্বাভাবিক সত্তা এখনো বোল আনা টিকে আছে—কোথাও এমন কথা চন্দ্রচূড়ের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

বাইরে এলে চিন্তায়, বিষাদে আগের চেয়ে আরো ক্লিষ্ট মনে হয় তাকে। এখন থেকে-থেকে মোহিনীকেই মনে পড়ছে কেবল। অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারেনি চন্দ্রচূড়। শুয়ে-শুয়ে শুনতে পেয়েছে সেই হাসি, তার সংলাপের প্রতিটি ধ্বনি বুঝি বুকের গভীর থেকে উঠে এসে রাতের ভেতরে গুঞ্জন তুলেছে বারবার। যেন আবাল্যের যাবতীয় প্রস্তুতির লক্ষ্য ছিল এই দেশ। এই দূর পরপ্রবাসিনী। অনেক-ক্ষণ অবধি এক অস্পষ্ট দুঃখবোধ পীড়ন করেছে তাকে। জীবনের যাবতীয় শিক্ষা, সংস্কার, সংযমের কথা ভুলে সে যেন মোহিনীকেই প্রত্যক্ষ করেছে সারারাত, সমস্ত সকাল।

কেন এমন হয়? নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে চন্দ্রচূড়। প্রশ্ন-প্রশ্নে জর্জর, কণ্টকিত করেছে। হৃদয় মেলেনি, উত্তর মেলেনি তবু। তবে অকারণ হৃদয় রক্তাক্ত করা কেন? চেতনা বিবশ করা শুধু?

পাশের ঘরে দেয়ালঘড়ির কালো-কালো দুই হাত সবল মুদ্রার মত সময়কে বাজিয়ে পরখ করে গেছে ঠিক-ঠিক। ঘুম আর জাগরণের ভেতরে নিশ্চল শুয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয়েছে সে যেন অতল জলের নীচে কোমল, শীতল স্নিগ্ধ শৈবালে শয়ান। মমতার মত অসহ্য পরম অন্ধকার মলিনতায় একা। দেহে-মনে প্রস্ফুটনের উদগ্র বাসনা তার। কিন্তু ঘুমহীন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নহীন ঘুমের ভেতরেই যে নিরন্তর আনাগোনা। কে তাকে নিয়ে যাবে সেই মুক্ত, বিশুদ্ধ, অন্তহীন আকাশের আঙিনায়? আলোক দর্পনে কবে তাকেও দেখাবে সেই হিরন্ময় আত্মার স্বরূপ? বুকের ভেতরে অসহ্য, অস্থির ঠেকে সব। মস্তিষ্কের ভেতরে অনুভব করে মনোরম চঞ্চলতা।

ভোর রাতে বাথরুমে ঢুকে মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে আবার বিছানায় এসে বসেছে। টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়েছে। বেলা হলে চাকর এসে কড়া নেড়েছে দরজায়। হাতে ট্রে, ডিশ-ভর্তি খাবার, চায়ের সরঞ্জাম। দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল চন্দ্রচূড়। লজ্জায়, দ্বিধায় কিছুটা ম্রিয়মান।

'ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে!'

সরবে নিজেকেই ধিক্কার দিতে চেয়েছে চন্দ্রচূড়। এটা অনুচিত। সবাইকে সাক্ষী রেখে যেন নিজেকেই শোনাতে চেয়েছে, এত ঘুম ভালো নয়। সে কি ঘুমোতে এসেছে এখানে? হাওয়া বদলাতে?

'সারারাত ট্রেনের ভেতরে কেটেছে কাল। ট্রেনজার্নির ধকল কি কম? তার ওপর এসে অবধি ছুটোছুটি তো করছেন। দেহের কি দোষ বলুন? ও বেচারা তো অন্তত রাতের বিশ্রামটুকু চায়।'

চাকরের পিছু-পিছু মোহিনী এসে হাজির। লক্ষ্য করেনি চন্দ্রচূড়। দেখে পুলকে, বিস্ময়ে একাকার হবার বদলে কুণ্ঠিত, কৃতার্থ বোধ করে বরং। কী যে করণীয় বুঝতে পারে না। আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। দেহে-মনে এখনো সেই অদ্ভুত জড়তা যা তাকে গোটা রাত অন্ধকার একলা বিছানায় শুইয়ে রেখেছে, ঘুমোতে দেয়নি আদৌ। এখন হেসে উঠে স্বাগত জানাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ অপরাধী মনে হয় নিজেকে। মোহিনী কি জেনে গেছে সব? সারারাত ঘুমোতে পারেনি চন্দ্রচূড়। তাকে ভেবে তার কথা মনে রেখে অন্ধকার একলা ঘরে ছটফট করেছে কেবল। শূন্য শয্যা কণ্টক মনে হয়েছে। যেন এমনি সংকটময় মুহূর্তে হৃদয়ের কাছাকাছি তাকে পেলে ভালো হয় যাকে পেলে জীবন সহজ সার্থক হয়ে ওঠে। সব আর্ট ফ্রন্ট সাইট কি তবে এই? বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় প্রেমের পূর্বাভাস? ভেবে অবাক হয়ে ওঠে চন্দ্রচূড়। মুখে কথা আর সরে না।

নিজের হাতে চা তৈরী করতে বসে গেছে মোহিনী। চাকর মধ ফিরে গেছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। শুধু ঘরে মা যেন বিশ্ব-সংসারে এখন তারা দুজন এক-মাত্র সুখী জীবিত এবং নিঃসঙ্গ। যেন এই ঘর ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় নেই বক্ষ নেই ছায়া নেই। মানুষ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সব সমস্ত কিছুই মৃত নিষ্প্রাণ এবং শব্দহীন। চন্দ্রচূড়ের বড় ভালো লাগে এই নৈঃশব্দ, মোহিনীর ব্যস্ততা নিষ্ঠা; ভেতরে-ভেতরে অন্তত এই মুহূর্তটুকুর জন্যে তার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা অথবা নিছক টান যা জগতের অর্থাৎ তার আকৈশোর ক্ষুদ্র জীবনে অভাবনীয় সত্য। চন্দ্রচূড় তাই চোখ ফেরাতে পারে না। হয়তো চোখ ফিরিয়ে নিতে গেলেই মোহিনী টের পাবে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। কারণ ভয় হয়। কারণ লজ্জা। কারণ মোহিনী জেনে যাবে সব। তার মন মনের ইচ্ছে যা অন্ধকারের মত গোপন ও রহস্যময় এবং দুঃসাহসে পূর্ণ।

ধীরে-ধীরে নিজেকে ফিরে পেতে চেয়ে মনে-মনে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে চন্দ্রচূড়। নিষ্পাপ, নিস্পৃহের মতই সে মোহিনীকে দেখে, তার হাতের নিটোল গড়ন। ব্যস্ত, চঞ্চল প্রতিটি আঙুল। আঙুলের নিপুণ নিষ্ঠা ও ব্যস্ততা। কানের পাশ থেকে নেমে-আসা চিবুকের ললিত ভঙ্গিমা। এই সকালবেলা স্নান সেরে নিয়েছে। সে-কারণ তাকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল মূর্তির মত শান্ত ও প্রসন্ন মনে হয়। পাটভাঙা তাঁতের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে মোহিনীকে। সে কি টের পায়, তাকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছে আরেকজন?

'নিন।'

চায়ের কাপ তুলে ধরে মোহিনী।

'ভাবছি নেবো কি নেবো না।'

চোখে রহস্যের ঝিলিক তোলে চন্দ্রচূড়। চাপা ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। যেন এমনি করেই চিরকাল ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে থাকার বাসনা।

'নেবেন না মানে?'

স্বরে কৃত্রিম ঝাঁঝ, ... র অস্পষ্ট আভাস এনে বাঁকা, তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে মোহিনী। যেন বুঝতে পারছে না। সরল গ্রাম্য বালিকার মতই তার চোখে স্বচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক সব, সমস্ত কিছুই। চন্দ্র-চূড়ের কথা, কণ্ঠ, হাসির ভঙ্গিমা কিছুই স্পষ্ট মনে হচ্ছে না তার। তবু ভালো লাগে। মনে-মনে ভয় আর তীব্র অনির্বচনীয় সুখ আর শিহরণ অনুভব করে মোহিনী এবং বিপুল আশা নিয়ে অপেক্ষা করে কার, কিসের তা জানে না।

'জানেন তো, নুতাস্তি ভোজনে বিপ্রাঃ? খালি চায়ে মন উঠছে না তাই।'

শুনে হেসে ফেলে মোহিনী। তপ্ত-কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলে, 'খান না সবই তো আপনার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে।'

খাবার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মোহিনী। এদিকে যে চা জুড়িয়ে জল। সে-খেয়াল আর থাকে না।

চন্দ্রচূড় আলনার কাছে এগিয়ে যায়। তোয়ালে পাজামা, গেঞ্জি কাঁধে নিয়ে বলে, 'আমি আসছি।'

মোহিনী বাধা দেয়। বলে, 'বাঃ রে! চা জুড়িয়ে যাবে যে।'

এগিয়ে আসে চন্দ্রচূড়। নিবিড় করে বলে, 'চাটুকুই নিচ্ছি তাহলে। আর সব থাক।'

'খাবেন না?' মোহিনী অবাক।

'অভ্যেস নেই এত সকালে খাবার।'

'জানেন আপনার জন্যে আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি সব।'

(ক্রমশঃ)

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবশেষে থাকতে না পেরে ঠিক করলাম, যে মাচা থেকে নেমে হেঁটে যাব গ্রামে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, হে ভগবান, যেন গুলী না লেগে থাকে—চিতা যেন বাড়ি চলে গিয়ে থাকে। গুলী খেয়ে আমার জন্যে যেন ওঁৎ পেতে বসে না থাকে নীচে।

অবশ্য এখন ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। চতুর্দিক, পায়ে চলা জঙ্গলি পথ, সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভগবানের নাম করে নামলাম গাঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে বন্দুক হাতে। নির্বিঘ্নেই নামলাম। মাচার উপরে থাকতেই ডান ব্যারেলে একটি এল জি পুরে নিয়েছিলাম। বাঁ ব্যারেলও এল-জিই আছে। কাছাকাছি হঠাৎ করে আত্মরক্ষার জন্যে ছুঁড়তে হলে বন্দুকে এল-জিই সবচেয়ে ভাল।

সিঁড়ি-টিঁড়ি এখানেই থাকুক। সকালে লোক পাঠিয়ে আনানো যাবে। কম্বলটাকে বাঁ কাঁধে ফেলে ডানকাঁধে বন্দুকএটাকে শুটিং পজিশনে তুলে আস্তে আস্তে এগোলাম। আঁকাবাঁকা পথে বোধহয় পনেরো কুড়ি পাও যাইনি, বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল চিতাটা একটা গাছের নীচে ওঁৎ পেতে আমার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। আমি জানি না আমি কি করলাম—একসঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত দুটি ট্রিগার একই সঙ্গে টিপে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য। চিতাটি নড়া চড়া কিছু করল না। যেমন ছিল তেমনি রইল। অমনি আমার সন্দেহ হল চিতাটা লাফিয়ে এসে ঐখানে মরে পড়ে নেই ত? সন্দেহ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়লাম নিথর হয়ে। তবুও যখন চিতার কোনো ভাবান্তর হল না। তখন আমি ঐখানেই শিশুর ফুঁ দিয়ে কম্বল মুড়ে বসে পড়লাম। শীতটিত কোথায় উবে গেল। খুব আনন্দ হল। আমার প্রথম চিতা—প্রথম বাঘ। শিকারির খাতায় নাম উঠল। যশোয়ন্ত নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। কোলকাতার [illegible]বাবুর পক্ষে একবছরের মধ্যে এতবড় উন্নতি সত্যিই অভাবনীয়।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা শলাই কাঠ জ্বালানো মশাল জেলে এসে হাজির। চিতাটা দেখে ওরা ভারী খুশী—'বড়কা শোনচিতোয়া—বড়কা শোনচিতোয়া' বলে খুব খানিক চেঁচামেচি হল।

চিতাটির কাছে গিয়ে আলো দিয়ে দেখলাম, প্রথম গুলীটা ঠিক যে জায়গায় নিশানা করেছিলাম তার চেয়ে একটু পিছনে লেগেছে এবং মাটিতেও চিতার গায়ের রক্ত জমে আছে। তার মানে, পরের গুলী দুটির একটিও লাগেনি চিতার গায়ে, যে কেঁদ গাছের গায়ে বাঘটি পড়েছিল তার গুঁড়িতে গিয়ে গুলী লেগেছে। অর্থাৎ সত্যিই যদি চিতা আহত হয়ে ওঁৎ পেতে থাকত, তাহলে এ শিকার অন্য রকম হত। সুগতবাবুর রক্তমাখা মুখটার কথা নতুন করে মনে পড়ল।

পরদিন সকালে বাংলোর হাতায় সাড়ম্বরে চিতাটির চামড়া ছাড়াচ্ছিলাম। চতুর্দিকে পৃষ্ঠপোষক ও স্তুতিকার ভিড় করে আছে। এমন সময় ঘোড়া টগ্‌বগিয়ে যশোয়ন্ত এসে হাজির হল।

সুগতবাবুর মৃত্যুর পর বহুদিন ওর কোনো খোঁজ খবর ছিল না। আমারও একটু একা থাকতে ইচ্ছা করত। মারিয়ানার জলেভেজা চোখ দুটো কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারিনি এ কদিন। সুগতবাবুর মুখটিও বারবার মনে পড়ছে। ঘুমের মধ্যেও মনে পড়ছে। কিন্তু তবুও চুপ করে শুয়ে শুয়ে ওদের কথা ভাবতে ভালো লেগেছে: জানি না সত্যি সত্যি সুগতবাবু এসে মারিয়ানার ঘুমন্ত চোখের পাতায় চুমু খেয়ে গেছেন কিনা। আজকাল এরকম করে কেউ কাউকে ভালোবাসে দেখিনি। যে যুগে ভালবাসা বিনা আয়াসেই কেনা যায়, সে যুগে এহেন দুঃখী ভালবাসার কথা চিন্তা করাও আশ্চর্য।

যশোয়ন্ত ঘোড়াটা গাছে বেঁধে এসে, সব শুনে, আমার পিঠে দু চড় মেরে বলল, সাবাস দোস্ত—গুরু গুড়, চেলা চি[illegible] রাতে ওভাবে মাচা থেকে নামাটা তোমার অত্যন্ত মুখামি হয়েছে। ভবিষ্যতে এরকমভাবে আত্মহত্যা করতে যেও না। এর চেয়ে অনেক সোজা পথ আছে আত্মহত্যার। বাৎলে দেব।

যশোয়ন্ত আসাতে অপ্রয়োজনীয় লোকের ভীড় অনেক কমে গেল। ধীরে ধীরে ভীড় পাৎলা হল। যশোয়ন্ত সব লোকজন চলে যাওয়া অবধি আমার কাছে বসে থাকল, তারপর হঠাৎ বলল, একটা জরুরি কাজে এসেছি। ভালকরে শোনো। তোমাকে বলিনি এতদিন; সুগতবাবুর মৃত্যুর পর একটা চাল চেলেছিলাম ডাল্টনগঞ্জে। শহরের যে সব লোকের সর্বত্র গতি, তাদের কাছে বলেছিলাম, যে, আমি সুগতবাবুর শব নিয়ে কোলকাতা যাচ্ছি সেখান থেকে দেরাদুনে যাব অফিসের কাজে দেড় দুমাসের জন্যে। তার আগে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। কথাটি রটিয়েছিলাম, যাতে জগদীশ পাণ্ডের কানে কথাটা যায় তার জন্যেই। দেখছি ফল ফলেছে। এ নিশ্চয়ই ডি এফ ও'র অফিসে খোঁজ করেছিল; কিন্তু সেখানেও ব্যাপারটা আন-অফিসিয়ালি ক্যামোফ্লেজ করা আছে। ডি এফ ও'র সই জাল করা চিঠি আছে। কেউ জানে না। ডি এফ ও নয়। ব্যাটা ধরতে পারেনি যে ওটা আমার চাল।

গম্ভীর মুখে যশোয়ন্ত বলল, শোনো লালসাহেব ওরা আগামীকাল রাতে আবার আসছে শিকারে। ও কেসফেসে কিছু হবে না। জগদীশ পাণ্ডে যেন-তেন-প্রকারেণ উপর মহল ধরা-পাকড়া করে ও কেস চেপে দেবে। তখন আমাদের মান ইজ্জত সব যাবেই—বদুপরি সেও আমাদের ছেড়ে দেবে না। ভোগান্তির শাস্তি চোরাই পথে ঠিকই দেবে। তাই ঠিক করলাম এ সুযোগ ছাড়ব না। জগদীশ পাণ্ডেকে শিখলাব এ বেলা।

সইদুল ঘাট হয়ে ওরা এদিকে আসবে। অনেক ঘোরা পথে। খবর পেলাম যে ওরা বলেছে, স্পট লাইটে যে জানোয়ারের চোখ দেখা যাবে সেই সব জানোয়ারই মারবে, কি জানোয়ার তা বিচার করবে না, নর-মাদীও বিচার করবে না, শাস্তি দেবার জন্যে একেবারে ম্যাসাকার করবে। জানোয়ার মেরে মেরে ওখানেই ফেলে রেখে যাবে। এবার ওরা শিকারে আসছে না, গতবারের অসম্মানের বদলা নিতে আসছে! আমাকে শিক্ষা দিতে আসছে। তা আসুক আমার প্ল্যানও কিন্তু রেডি। শিগ্‌গির একবার তোমার জীপটা নিয়ে চল—জায়গাটা দেখে আসি।

যশোয়ন্তের প্ল্যান কিছুই বুঝলাম না। তবে আমার মনে ডাক দিল যে, কমনেই জানি একটি নিশ্চিত বিপদ বা বিপদের আশঙ্কা আছে। জীপের উইন্ডস্ক্রীনে যখন সেখানে গুলী লেগেছিল তখন কেমন মনে হয়েছিল এখনো তা ভুলিনি। রাগ যে আমার হয়নি তা নয়। তবে আমার মতো লোকের রাগ ইজিচেয়ারে শুয়ে, মনে মনে শত্রু নিপাত করেই ফুরিয়ে যায়। যতখানি রাগ আমি বইতে পারি, তার চেয়ে বেশী রাগ হলে সে রাগ উপচে পড়ে যায়—ধরে রাখতে পারি না।

যশোয়ন্ত বলল, চল আজ একটু স্কাউটিং করে আসি।

কুজরুম বস্তি পেরিয়ে [illegible] ঘাট অবধি পৌঁছলাম আমরা [illegible] [illegible]। [illegible] রেঞ্জার সাহেব ডাল্টনগঞ্জে গেছেন। পরশু

ফিরবেন। বুঝলাম জগদীশ পাণ্ডে সবরকম খবরাখবর নিয়েই আসছে। অবশ্য রেঞ্জার সাহেব থাকলেই বা কী? শীতের রাতে জগদীশ পাণ্ডের মত লোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই এবং বাধা দিলে জঙ্গলে যে সে তাকে গুলী করে মেরে রেখে যেতে পর্যন্ত পারে, এই সাধারণ বুদ্ধি সমস্ত সুস্থ মস্তিষ্ক লোকেরই আছে। সে বুদ্ধি নেই কেবল যশোয়ন্তের। ও একটা দাঁতাল একরা শুয়োর। গোঁ একবার চাপলে হয়। তখন লড়াই সে করবেই। যত বড় বাঘই হোক্‌না কেন, তার সঙ্গে লড়াই না করে পালাবে না।

সইদুপ্‌ ঘাটের ঠিক নীচে একটি কাঠের সাঁকো আছে, পাহাড়ী ঝর্ণার উপরে—পাহাড় থেকে রাস্তাটা বাঁকে বাঁকে নেমে এসেছে—চক্রাকারে। একটি বাঁক ঘুরেই এই সাঁকোটি। ঐখানে খুব সাবধানে না গাড়ি চালালে সাঁকোতে ধাক্‌কা খাবার সম্ভাবনা, অথবা গাড়ি পথ থেকে নীচের খাদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

সইদুপ ঘাটের রাস্তা অতি খারাপ। রাত হয়ে গেলে মাল-বোঝাই ট্রাক এই ঘাট দিয়ে মোটেই যাতায়াত করে না। খালি ট্রাকও সম্ভব হলে এড়িয়ে যায় এই ঘাটকে। একদিকে পাহাড় এবং অন্যদিকে খাদ—বাঁকগুলো এত ঘন ঘন ও রাস্তা এত সরু যে, ট্রাকের পক্ষে মোড় ঘোরার নিদারুণ অসুবিধা।

সেই সাঁকোর সামনে যশোয়ন্ত নামল। আমাকে বলল, স্টার্ট বন্ধ করো গাড়ীর। সাঁকোর উপরে চওড়া চওড়া সেগুনের তক্তা পাতা আছে। বড় বড় বোল্টের সঙ্গে লাগান। বোল্ট খোলার একটা বড় রেঞ্চ নিয়ে এসেছে যশোয়ন্ত। সেই রেঞ্চ দিয়ে প্রায় আধঘণ্টা কসরৎ করেও একটি বোল্টও খুলতে পারল না। তারপর বলল, হুঃ, এতে হবে না। অন্য বুদ্ধি করেছি।

তারপর, যশোয়ন্ত পথের পাশে, গাছের ছায়ায় একটি পাথরের উপর বসে আমাকে ওর সেই অন্যবুদ্ধি বোঝাল।

জগদীশ পাণ্ডেরা ছীপাদোহর আসার আগে যে চেক্‌নাকা পড়ে, তা পেরিয়ে আসবে। তখন বন্দুক রাইফেল সব নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখবে গাড়ীতে এবং ফরেস্ট গেটে বলবে যে, জঙ্গলে কাজ দেখতে যাচ্ছে। সেই সময় ফরেস্ট গার্ড যশোয়ন্তের ইনফরমেশান অনুযায়ী বলবে যে, আজ ডি, এফ, ও সাহাব আনেওয়ালা হ্যয় রাত মে।

অন্যদিন হলে জগদীশ পাণ্ডে হয়ত ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে যেত। কিন্তু ডি, এফ, ও সাহেব আসার আগে আগেই ও হংখশাই সেদিন কাজ সেরে পালাবে। ডি, এফ, ও সাহেব সজ্জন লোক—ওঁকে ভয় নেই—ভয় হচ্ছে, বদতমিজ যশোয়ন্তকে। সেই-ই যখন নেই—তখন এই সুযোগ জগদীশ হাতছাড়া করবে না।

যশোয়ন্ত বলল যে, আমাকে জীপটি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে, সইদুপ ঘাটের অনেক আগে। ওদের জীপ ঐ জায়গাও পেরিয়ে যাবার বেশ পরে আমি গাড়ী স্টার্ট করে জোরে ওদের পেছনে পেছনে আসব, যাতে ওরা আমার জীপের হেড লাইটের আলো দেখতে পায় অথচ আমি বেশ দূরে থাকি। সইদুপে ঘাটের মত পাহাড়ি পথে অন্য গাড়ীকে পাশ দেবার জায়গা কম। হুড খোলা জীপে বন্দুক, রাইফেল সমেত অবস্থায় ওরা আমাকে পাশ দিতে চাইবেও না। ডি, এফ, ও সাহেবের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে।

যশোয়ন্ত বলল, ডি, এফ, ও'র পোশাক পরে, ডি, এফ, ও'র জীপের নাম্বার প্লেট লাগানো জীপ চালিয়ে আমাকে আসতে দেখলে ওদের প্রথম কাজ হবে যত জোর পারে জীপ ছুটিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কুটকু পৌঁছে কোয়েল পেরিয়ে মোড়োয়াই হয়ে পালামৌ ধরবার জোটি নেই। সইদুপ ঘাটে জীপ যত জোরে ছুটবে আমাকেও তত জোরে জীপ ছোটাতে হবে এবং মাঝে মাঝে হর্ণ বাজাতে হবে জোরে জোরে। তাতে ওরা আরো ঘাবড়ে যাবে—ভাববে, ডি, এফ, ও যে বটেই, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সেই সময় ভয় আছে, ওদের কাছ থেকে গুলি খাবার। কিন্তু সে সম্ভাবনাও এই ঘাটে অপেক্ষাকৃত কম, কেননা রাস্তাটা ক্রমান্বয়ে পাহাড়ে পাক খেয়েছে। অনেকখানি জায়গা সোজা বড় জোর পঁচিশ-তিরিশ হাতের বেশী আর দেখাই যায় না। তার চেয়ে বেশী পেছনে থাকলে, আমার জীপের আওয়াজ ও হেডলাইটের আলোই কেবল ওরা শুনতে ও দেখতে পাবে। আমাকে দেখতে পাবে না। তাই ওদের জীপে বসে বসেই আমার জীপের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়তে পারবে না। এইরকম ভাবে তীব্র বেগে নামতে নামতে যখন ওরা ঘাটের শেষ সীমায় নেমে আসবে, তখন, ন্যাচারালি, ওদের জীপের গতি আরো বেড়ে যাবে। শেষ বাঁক নিয়েই সামনে দেখবে সাঁকোটি।

ইতিমধ্যে আমার জীপের অফুরন্ত হর্ণ শুনে যশোয়ন্ত সাঁকোর উপরে আড়াআড়ি করে একটি শালের খুঁটি ফেলে দেবে। তার গায়ে লাল শালু আগে থেকেই বাঁধা থাকবে এবং সামনের দিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রকাণ্ড টিনের নোটিশ ঝুলবে। সাদার উপরে লালে লেখা থাকবে 'ডেঞ্জার'। সাঁকোর মুখে ওদের জীপ মোড় নেবার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁ দিকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসেথাকা যশোয়ন্ত ওর ফোর-ফিফ্‌টি-ফোর-হাণ্ড্রেড রাইফেল দিয়ে সামনের টায়ারে গুলি করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ডান দিকে খাদের দিকে ঝোঁক নেবে এবং ঐ গতিতে, ঐ আকস্মিকতায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে যতবড় গ্রাঁ-প্রি ড্রাইভারই হোক না কেন জগদীশ পাণ্ডে, পুরো জীপ শুদ্ধ গিয়ে তাকে পড়তেই হবে ডানদিকের খাদে, নদীর পাথরে ভরা কোলে, এবং ভগবান আমাদের সহায় হলে ওদের একজনও বাঁচবে না।

সব শুনলাম চুপ করে। যশোয়ন্ত একটা চুট্টা ধরালো। আমি বললাম, কিন্তু এ যে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার যশোয়ন্ত। যশোয়ন্ত বলল, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

বললাম, তোমার রাগ ত জগদীশ পাণ্ডের উপর, দলের লোকদের মারবে কেন? যশোয়ন্ত চোখ লাল করে আমার দিকে চেয়ে বলল, জগদীশের রাগও তো আমার উপরে, তোমার উপর গুলি চালাল কেন?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

হঠাৎ মনে হতেই ওকে বললাম, টায়ারে গুলি করার পর যদি যশোয়ন্ত যা ভাবছে তা না হয়? কোনোরকমে যদি গাড়ি ওরা থামিয়ে ফেলে, তাহলে কি হবে?

যশোয়ন্ত বলল, তাহলে আর কি হবে? আমাদের দু'জনের লাশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কোয়েলের বালিতে পুঁতে দেবে। ওদের প্রায় সকলের হাতেই ম্যাগাজিন রাইফেল—আমরা দু'জনে পারব না কোনোমতে।

আমি বললাম, কি দরকার যশোয়ন্ত খামোকা এরকম করে—যদি সত্যিই ওরা জীপটা থামিয়ে ফেলে?

যশোয়ন্ত হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে চুট্টাটা ফেলে দিল। বলল, আরে ইয়ার মরেগা ত একরোজ জরুর। মগর, মরনাহি হ্যায়ত আইসৌহি তামাশা করতে করতে। কুকুরের বাচ্চাটাকে শিখলাতে না পারা পর্যন্ত খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি নেই।

পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা জিরিয়ে নিলাম। শীতের বেলা দেখতে দেখতে মনে হলো এই সন্ধ্যে হলো বুঝি। এক কাপ করে চা খেয়ে আমি আর যশোয়ন্ত বেরিয়ে পড়লাম।

সইদুপে ঘাটের কাছাকাছি যখন এলাম তখন সন্ধ্যে হবো হবো। পথে কুজরুম পেরিয়ে এসেই আমরা একটি জায়গায় পথের পাশে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার পোশাক বদলে যশোয়ন্তের সরকারী পোশাক পরে ডি, এফ, ও সাজলাম। তখনকার ডি, এফ, ও সাহেব মাথায় সবসময় কি শীত কি গ্রীষ্ম একটি শোলার টুপি পরে থাকেন। যশোয়ন্ত সেরকম একটি টুপি আমাকে বের করে দিল ওর ঝোলা থেকে।

যশোয়ন্ত জীপের নাম্বার প্লেটে একটা বটলের জলের সঙ্গে মাটি গুলে কাদা করে লেপে দিল। বলল, তাড়াতাড়িতে অন্য নাম্বার প্লেট করানো গেল না।

সাঁকোটার কাছে এসে যশোয়ন্ত নেমে গেল। ওর ঝোলা থেকে দু টুকরো লাল শালু কাপড় বের করে পথের পাশ থেকে একটি শুকনো শালবল্লী তুলে এনে আড়-আড়ি করে সাঁকোর উপর বসিয়ে দিল এবং 'ডেঞ্জার' লেখা টিনের বড় চাকতিটা একটুখানি বেঁধে সেই শালবল্লীর গায়ে ঝুলিয়ে দিল।

হঠাৎ মোড় ঘুরেই এই রকম অবস্থায় সাঁকোটি দেখলে যে কোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের লোকই গাড়ি নিয়ে এ সাঁকো পেরোবার চেষ্টা করবে না। যশোয়ন্তের বুদ্ধির তারিফ করছি। ঠিক এমনি সময় একটা ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল আমাদের পেছন থেকে। তাড়াতাড়ি আমরা দৌড়ে গিয়ে একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কারণ আমাকেও এখন এ অঞ্চলের প্রায় সব ড্রাইভারই চেনে। ঐ অকুস্থলে অমন অদ্ভুত

পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই তাদের সন্দেহ হবে। যশোয়ন্ত তাড়াতাড়ি করে তার সাজসরঞ্জাম লুকিয়ে ফেলল।

ট্রাকটি চলে গেল।

যশোয়ন্ত আমাকে বলল, যাও আর দেরী করো না, এগিয়ে যাও—ঘাট থেকে মাইল দুয়েক আগে বাঁ দিকে কতকগুলো ঘন সেগুনের প্ল্যানটেশান আছে—তার সামনেটায় পিটিশ্ ঝোপে ভরা। সেইখানে জীপটা ঢুকিয়ে স্টীয়ারিং-এই বসে থেকো। রাস্তা ছেড়ে জীপটা যেখানে জঙ্গলে ঢোকাবে, সেখানে জীপ থেকে নেমে পথের ধুলোর উপর চাকার দাগটা পা দিয়ে ভাল করে মুছে দিও। মনে থাকে যেন। যাও ইয়ার। গুড লাক্। গুড হান্টিং।

এই বলে আমাকে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে ঝোলা থেকে রামের বোতল বের করে যশোয়ন্ত ঢক্‌ঢকিয়ে খেতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে জীপ চালিয়ে চলে গেলাম।

অন্ধকার হয়ে গেল। বনের পাতায় পাতায় ঝিঁঝিঁর ঝিন্‌ঝিনি সুরু হল। সেগুন গাছের তলায় পিটিশের আড়ালে বসে বসে কোনো গাড়ির এঞ্জিনের শব্দই শুনতে পেলাম না এ পর্যন্ত। সাতটা বেজে গেল। খুব শীত করছে। মশাও বেশ আছে। জীপের পেছনে শুকনো পাতায় পা ফেলে ফেলে সাবধানে কি একটা জানোয়ার যেন আমায় নজর করছে। সঙ্গে আমার বন্দুক আছে। কিন্তু কোনো আলো নেই। আজ থেকে দেড় বছর আগে এই ঘাটে একটি নরখাদক বাঘ এসে আস্তানা গেড়েছিল এবং বহু মানুষ খেয়েছিল। তারপর এই ঘাটেই একজন স্থানীয় শিকারীর হাতে সেই বাঘ মারা পড়ে। ইতিমধ্যে জগদীশ পাণ্ডের মত জীপারূঢ় শিকারীর গুলিতে যে অন্য কোনো বাঘও আহত হয়ে তারপর নরখাদকে রূপান্তরিত হয়নি এমন গ্যারান্টি কোথায়? বেশ অস্বস্তি লাগল।

রাত প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ দূরাগত একটি জীপের এঞ্জিনের গুন্‌গুনানি শোনা গেল। এ জায়গাটায় রাস্তাটা বেশ সোজা এবং প্রায় সমতলের উপর দিয়ে। টপ্-গীয়ারে জীপটা আসছে—বেশ জোরে চালিয়ে আসছে বোঝা গেল। দেখতে দেখতে আওয়াজটা নিকটবর্তী হল—কাছে এলো, এবং আমার সামনে দিয়ে আলোর বন্যা বইয়ে [illegible] জীপটা চলে গেল।

জীপটা আমাকে অতিক্রম করে যাবার [illegible] পরই আমি এঞ্জিন স্টার্ট করে মাথার টুপিটা চেপে বসিয়ে দুর্গানাম জপ করে ওদের পিছু নিলাম। আমিও টপ গীয়ারে রীতিমত জোরে চালিয়ে চললাম।

একটু যেতে না যেতেই দূরত্ব কমে আসতে লাগল। আমার হেড লাইটের আলোয় দেখলাম পাঁচ-ছজন আরোহী। হেডলাইটের আলোয় তাদের বন্দুক রাইফেল চকচক করছে। দুটি জীপের দূরত্ব কমে আসছে—এদিকে ওরাও সইদুপ ঘাটে উঠতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় সামনের জীপ থেকে তীব্র এক ঝলক স্পট লাইটের আলো আমার জীপের উইণ্ডস্ক্রীনে পড়ল। কিন্তু তাতে ওরা বড়জোর আমার পোশাকই দেখতে পেল। ঐ গতিমান জীপ থেকে ঐ দূরে অন্য গতিমান জীপের চালককে চেনা সোজা কথা নয়।

ওরা ঘাটে উঠছে। জীপটা পাক দিয়ে দিয়ে রীতিমত জোরের সঙ্গে পাহাড়ে চড়ছে। অত্যন্ত পাকা ড্রাইভার—সন্দেহ নেই। নইলে ঐ রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালানো সোজা নয়।

ঘাটে উঠেই, যশোয়ন্তের নির্দেশমত আমি হর্ণ বাজাতে বাজাতে ওদের ধাওয়া করলাম। ঐ নির্জন পাহাড়ে বনে আমার জীপের ডাবল হর্ণের আওয়াজ যশোয়ন্ত যে শুনতে পাচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যশোয়ন্ত এখন কি করছে? আমার কেবল সেই কথাই মনে হতে লাগল। আমার জীপের গতিও ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। উত্তেজনাও বাড়তে লাগল। এবং আমরা ঘাটে ঘাটে প্রায় সাঁকোর কাছাকাছি এসেছি বলে মনে হল। কুকুর তাড়ানোর মত করে জগদীশ পাণ্ডের দলকে তাড়াচ্ছি—এইটা জেনেই মন আত্মতৃপ্তিতে ভরে গেল।

ঘাটের শেষ বাঁক নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের গাড়ীর ব্রেক কষার জোর কিচকিচ শব্দ শুনলাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে যশোয়ন্তের হেভী রাইফেলের গুলীর আওয়াজ। তার-পর কি হল বোঝার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝন-ঝন আওয়াজ হল — পাথরের গায়ে লোহা আছড়ালে যেমন আওয়াজ হয় এবং সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ এবং চীৎকার। এই সময় আমার জীপও অকুস্থলে পৌঁছে গেল—হেডলাইটের আলোয় দেখলাম পথের ডানদিকের পাথরে ধাক্কা মেরে একটা শালের চারা গাছ ভেঙে ওদের জীপ গিয়ে নীচের নদীতে পড়েছে।

আমি পৌঁছান মাত্র যশোয়ন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে শালবল্লা থেকে লাল শালুর টুকরো দুটো ও ডেঞ্জার লেখা টিনের চাকতিটা খুলে নিল তারপর শালবল্লাটা যখন সরিয়ে পথের পাশে ফেলছে ঠিক তক্ষুনি নদীর বুক থেকে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল এবং আমাদের বেশ কাছে, আমাদের পাশ কেটে গিয়ে একটা গুলি পাহাড়ে লাগল।

হেডলাইটটা সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ে দিলাম। জীপ এগিয়ে যশোয়ন্তের কাছে পৌঁছতেই যশোয়ন্ত এক লাফে ওর সম্পত্তি-সমূহ সমেত ডান দিকের সীটে উঠে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আরো দু-তিনটি গুলির আওয়াজ হল। একটি গুলি এসে জীপের পেছনের পর্দা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। যশোয়ন্ত জীপের সাইড লাইটটাও হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল এবং আমাকে কানে-কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, জোরে চল। যত জোরে পার।

প্রাণপণ জোরে অ্যাক্‌সিলারেটরে চাপ দিলাম—জীপটা উল্কার মতো সাঁকো পেরিয়ে বেরিয়ে এলো—তারপর আবার আলো জ্বালিয়ে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কুজরুমের দিকে। পেছনে কি হল, ওরা বাঁচল কি মরল, কজন মরল, কজনের হাত-পা ভাঙল কিছুই বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম যে একেবারে অক্ষত দেহে না হলেও বেশ বহাল তবিয়েতেই দু-তিনজন আছে—নইলে অত তাড়াতাড়ি আমাদের উপর দমাদ্দম্ গুলি চলতো না।

কুজরুমের আগে গিয়ে জীপ থামালাম। যেখানে জামা-কাপড় ছেড়েছিলাম। যশোয়ন্ত বলল, তাড়াতাড়ি জামা বদলে নাও। আমি চালাচ্ছি এবারে।

যশোয়ন্ত একেবারে টাঁকিয়া-উড়ান করে জীপ চালান। কুটকুর কাছে এসে কোয়েল পেরিয়ে এলাম। এই মাত্র ক'দিন আগেই সুগতবাবুকে নিয়ে রাতে আমরা এই পথেই ফিরেছি। তারপর ইটার হয়ে, মোড়োয়াই।

রুমাণ্ডির রাস্তায় বেঁকে গেলাম আমরা। পথে অন্য কাগজ কোম্পানীর একটি ট্রাকের সঙ্গে দেখা হল। জীপ দেখে পাশ করে দাঁড়াল—আমরা বেরিয়ে গেলাম। ড্রাইভার আমাদের জীপের নম্বরও পড়তে পারল না।

রুমাণ্ডি পৌঁছেই যশোয়ন্ত হুইস্কির বোতল খুলে বসল।

আমার কেমন যেন নিজেকে খুনী খুনী মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে খুব ভয়ও করছিল। এই বুঝি পুলিশের লোক এল অ্যারেস্ট করতে—অথবা ওরাই বুঝি দল বেঁধে রাইফেল বন্দুক বাগিয়ে এসে হাজির হল এক্ষুনি। যশোয়ন্ত কিন্তু নির্বিকার। ও বলল, মোড়োয়াই-এর আগে যে ট্রাকটির সঙ্গে দেখা হল সেই ট্রাকটি যদি থামে অথবা উল্টো দিক দিয়ে যদি অন্য কোনো ট্রাক আসে তবেই ওদের উদ্ধার করবে—নইলে সব সারা রাত ওখানেই পড়ে থাকবে।

(ক্রমশঃ)

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ কি একটা প্রশ্ন? অত্যন্ত সহজ হয়ে বন্দনা উত্তর দেয়, 'কেন? দিনে ইন্ডিয়া হাউসের বিখ্যাত ক্যান্টিন, আর রাত্রে স্বহস্তে সাত্ত্বিক আহার, অথবা ইতালীয়ান কাফে?'

'এতকাল ঐ হোটেল-রেস্তোরায় খেয়ে কাটাবে?'

বিকাশ বলে, 'না, না, তাতে কি হয়েছে?'

মফঃস্বলের ফৌজদারী কোর্টের উকিলের মত বন্দনার কাছে অফুরন্ত আর্গুমেন্টের রসদ! 'এতকাল কিভাবে কাটিয়েছ?'

তরুণ একটু শাসন করে, 'আঃ! বন্দনা, বিয়ের পর যেন একটু মুখরা হয়েছ!'

ছুটি-ছাটা নিয়ে বেশ তর্কটা জমে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ছেদ পড়ল।

'দ্যাখ তো বন্দনা, কে? হয়ত ভাবীজি।'

'কে ভাবীজি?'

'আমার কন্সাল জেনারেলের স্ত্রী।'

ঠিক যা সন্দেহ করেছিল, তাই। সবাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রওনা দিল মিঃ ট্যান্ডনের বাড়ীর দিকে।

—সতের—

এককথায় যাকে বলে ভূরিভোজ তাই হলো। সবাই দল বেঁধে ড্রইংরুমে এলেন পোস্ট-ডিনার আড্ডার জন্য।

'আচ্ছা ভাবীজি, আমার জন্য তো এমন ভূরিভোজের আয়োজন কোনদিন হয় নি।'

ভাবীজি তরুণের কথার জবাব না দিয়ে বন্দনাকে বললেন, 'দেখছ তোমার দাদার কি হীন মনোবৃত্তি? কোথায় বোম-ভগ্নি-পতিকে খাইয়েছি বলে খুশি হবে, তার বদলে কিনা হিংসা করছে?'

বন্দনা হাসে, বিকাশ হাসে। মিঃ ট্যান্ডনও হাসেন। কেউ কোন কথা বলেন না।

মিসেস ট্যান্ডনই আবার শুরু করলেন, বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের ইজ্জতই আলাদা। বিয়ের পর তুমিও এমনি ইজ্জত আদর-আপ্যায়ন পাবে।

বন্দনা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। শুধু একবার চুরি করে বিকাশের দিকে তাকাল, একটু হাসল।

'বিয়ে না করলে ভাল-মন্দ খেতেও পাব না?' অবাক হয়ে তরুণ প্রশ্ন করে।

ভাবীজির স্পষ্ট জবাব, 'না।'

'শুড আই ম্যারী টু-মরো?'

এবার ভাবীজি হঠাৎ সিরিয়াস হলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আই উইশ ইউ কুড, তরুণ!'

ভাবীজির ভাবান্তরে, ঐ ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাই পাল্টে গেল। অটামের বার্লিনের আকাশ হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল।

'জানো বন্দনা, আমার আর ভাল লাগে না। সত্যি ভাল লাগে না। নিজের ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন কতদূরে পড়ে রয়েছে। এদের নিয়েই তো আমার সংসার।'

মিঃ ট্যান্ডন, তরুণ, বিকাশ চুপটি করে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। বন্দনা বলল, 'তা তো বটেই।'

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। 'আর এদেরই মুখে যদি হাসি না দেখি, তাহলে কেমন লাগে বলো তো?'

আর এগুতে পারলেন না ভাবীজি। গলার স্বর আটকে এল। ঠিক তাকিয়ে না দেখলেও সবাই বুঝল, মিসেস ট্যান্ডনের চোখের কোণায় জল এসে গেছে।

সিচুয়েশনটা সেভ করবার চেষ্টা করলেন স্বয়ং মিঃ ট্যান্ডন। 'আঃ! এখন আর দুঃখ করছ কেন? ইন্দ্রাণী উইল বী উইথ আস ভেরী সুন।'

মিসেস ট্যান্ডন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। 'বাজে বকো না তো! ভেরী সুন, ভেরী সুন করতে করতে তো তুমি রিটায়ার করতে চলেছ।'

প্রথম দিনের পরিচয়, ব্যবহারেই ভাবীজিকে দেখে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় বন্দনা, বিকাশ। দাদাকে ওঁরা এত ভাল-বাসেন?

হ্যাঁ।

ফেয়ারলি প্লেসে বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ সারা জীবন কাটাতে হয় অনেককেই। পাশা-পাশি বসে সারা জীবন কাজ করতে করতে তিক্ততা আসে বৈকি! কিন্তু যাদের জীবনে সে স্থায়িত্ব কোন দিনই আসবে না, আসতে পারে না, তাদের সবার মন ঠিক বিষাক্ত হতে পারে না। হবার অবকাশ নেই। বিষ একটু এগুতে না এগুতেই ট্রান্সফার! কানাডা থেকে আলজিরিয়া, লন্ডন থেকে কলম্বো, পিকিং থেকে প্যারিশ। আট-দশ-বারো বছর পর যখন আবার দেখা হয়, তখন সে বিষের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতীত দিনের এই তিক্ততা যদি কেউ মনে করে রাখত তবে কি ওবেরয় আজো ফরেন-সার্ভিসে থাকতে পারে?

রাত্রে ফিরে এসে এইসব গল্পই হচ্ছিল তিনজনে মিলে। বড় কৌচটায় দাদার পাশে ওবেরয়ের কথা শুনছিল বন্দনা। বিকাশ সামনের কৌচে বসেছিল।

ওবেরয় তখন আফ্রিকার সীমান্ত রাজ্য মরোক্কোতে পোস্টেড। চুয়াল্লিশ বছর ফরাসী শাসনে থাকার পর মরোক্কো স্বাধীন হয়েছে। সারা দেশের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। [illegible] স্কোয়ারে সারা দিনরাত্রি হৈ-হুল্লোড় চলত। ওবেরয় ঘুরে ঘুরে সেসব দেখত।

রাবাতে ইন্ডিয়ান মিশন খোলা হলেও ফুল টাইম অ্যাম্বাসেডর তখনো আসেন নি। ওবেরয় ও আর দু-তিনজনে মিলেই সব কাজ করত। ভারত মরোক্কো থেকে কিছু ফসফেট কিনলেও আর বিশেষ কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেন ছিল না দু' দেশের মধ্যে। কমার্শিয়াল কাউন্সিলারের পদও মঞ্জুর করা হয় নি। ওবেরয়কেই এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের টুকটাক খোঁজখবর ঘুরে-ফিরে জোগাড় করতে হতো। ঘুরত ক্যাসাব্লাঙ্কা, মারাকেশ, ফেজ, তাঞ্জিয়ার।

তরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ঐ ঘোরাঘুরিই হলো ওর কাল।'

বড় বড় হোটেলে যাতায়াত শুরু হলো ঘন-ঘন। 'গ্রানাদা'য়, 'হোটেল টুর হাসান' কখনও 'কন্সুলাত'এ। শুরু হলো নাচ-গান খানা-পিনা।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তরুণ বলল, 'মরোক্কোর নাইট ক্লাবগুলো সস্তা হয়ে আরো সর্বনাশ হলো।'

[illegible] ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে, 'সস্তা [illegible]

[illegible] দেয় বন্দনা, 'কেন তুমি যাবে [illegible]'

[illegible] শাসন করে, 'আঃ বন্দনা!' তার- [illegible] বলে, 'রিয়েলি দে আর ভেরী [illegible] দু' ডলার দিলেই বড় বড় নাইট যাওয়া যায়।'

[illegible] বছর পর সেই ওবেরয় যখন [illegible] ট্রান্সফার হলো, তখন সর্বনাশের [illegible] আর দেরী হলো না। মৌড়- [illegible] মাতাল হাওয়া ওকে উড়িয়ে [illegible] বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে ওর [illegible] ইন্ডস্ অ্যাম্বাসেডর।

[illegible] রাজনৈতিক গুরুত্বের চাইতে [illegible] নাইট ক্লাবের প্রাধান্য বেশী। কিন্তু [illegible] আমাদের একটা বিরাট [illegible] ফরেন সার্ভিসের ক্লাশ- [illegible] পাঠান হয় এই মধ্য- [illegible] ডজন ডজন ডিপ্লোম্যাট [illegible] কর্মচারী আছেন এই [illegible] এছাড়া পূর্ব-পশ্চিম যাতা- [illegible] রাত কাটান না, এমন [illegible] ডিপ্লোম্যাট নেইই।

[illegible] সবাইকে ঠকিয়েছে ওবেরয়। [illegible] পাউন্ড, কাউকে আবার [illegible]-একশ' পাউন্ড!

[illegible] বছর পরের কথা। ওবেরয় [illegible] থেকে খবর এলো মার [illegible] দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের [illegible] পেত না বেচারী। [illegible] সাহস ছিল না। [illegible] থাকা সত্ত্বেও লোকের যাবার [illegible] পারল না।

[illegible] টান দিয়ে তরুণ বলল, [illegible] ডিপ্লোম্যাসী উইথ [illegible] কলিগ। ওবেরয় কিছু [illegible] কিন্তু খবরটা ছড়িয়ে পড়ল [illegible]

[illegible] দিয়ে হঠাং বেরিয়ে [illegible]

[illegible] ছড়িয়েই পড়ল না টপ [illegible] হলো ইউরোপের পাঁচ- [illegible] মিশনের পনের-বিশ জন [illegible]। ঠিক হলো ওবেরয়কে [illegible] জেনেভায় আনান [illegible]। ডিসিসনের সঙ্গে [illegible] এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডন [illegible] চেক পৌঁছে গেল! [illegible] খবর পৌঁছে গেল [illegible] ও ভগ্নিপতির [illegible] এয়ার ইন্ডিয়া ইনি- [illegible] জার্নি টু [illegible] ট্রিটমেন্ট!

[illegible] কথা বলতে গিয়ে হেসে [illegible] এয়ার ইন্ডিয়ার কাছ থেকে [illegible] পেয়ে চমকে গিয়েছিল।'

বিকাশ জানতে চাইল, 'ভদ্রমহিলা সেরে গেলেন কি?'

'না।'

অতীত দিনের তিক্ততার কথা ফরেন সার্ভিসের কেউ মনে রাখেন না। রাখতে পারেন না। ওটা ওদের ধর্ম নয়, কর্ম নয়। অতীত দিনের কথা মনে রাখলে কি ডিপ্লো- ম্যাসী করা যায়? অসম্ভব।

ওবেরয়কে যাঁরা এমন করে ভাল- বাসতে পারে, তাঁরা তরুণের জন্য ভাববে না?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরুণ বলে, 'এদের মত কিছু মানুষ না থাকলে হয়ত আমি পাগল হয়ে যেতাম। এই পৃথিবীতে একলা থাকার মত অভিশাপ আর নেই।'

ঘরের পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল। বিকাশ একবার বন্দনার দিকে তাকাল, বন্দনা বিকাশকে দেখে নিল।

'তুমি একলা কোথায়? আমরা কি তোমার কেউ নই দাদা?' বন্দনা যেন একটু আহত মন নিয়ে কথাটা বলল।

ডানহাত দিয়ে বন্দনার মাথাটা টেনে কাঁধের পর রেখে আদর করতে করতে তরুণ বলল, 'আমি কি তাই বলেছি? তোমাদের চাইতে আপন আমার আর কে আছে?'

বিকাশ তরুণকে ভয় না করলেও বেশ সমীহ করে চলে। আজ যেন একটু সাহস পেল। 'ওকে এত বেশী আদর করবেন না দাদা।'

বন্দনা মাথাটা তুলে ভ্রু কুঁচকে বিকাশের দিকে তাকাল।

তরুণ জানতে চাইল, 'কেন?'

একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বিকাশ জবাব দেয়, 'আপনি ওকে ভাল- বাসেন বলে ওর বড় বেশী অহংকার আর আমাকে ভীষণ কথা শোনায়।'

'সে কি বন্দনা? আমার জন্য ওকে কথা শোনাও?'

'না দাদা, ও সব মিথ্যে কথা বলছে।'

'ইভন্ ইফ দে আর মিথ্যে, আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার সাচ্ সিরিয়াস অ্যান্ড ডামেজিং অ্যালিগেশনস্।'

স্বামীকে আর বেশী অপদস্থ করতে চায় না বন্দনা। 'দাদা, কফি খাবে?'

কফি খেতে ভীষণ ভালবাসে তরুণ। ওর বহুকালের নেশা ডিনারের পর এক কাপ ঘন ব্ল্যাক কফি নিয়ে গল্প করবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, বন্দনা-বিকাশের সঙ্গে।

'কফি? হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া?'

বন্দনা বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে?'

হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বিকাশ বলল, 'না, না, একটা বেজে গেছে, আমি আর খাব না।'

তরুণ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'সত্যিই তো অনেক রাত হয়ে গেছে। থাক থাক বন্দনা আর কফি করতে হবে না। তোমরা বরং শুতে যাও।'

বন্দনা বলে, 'আমি এখন শুচ্ছি না।'

'যাও বিকাশ তুমি শুয়ে পড়।'

বিকাশ একটু আপত্তি করছিল, কিন্তু বন্দনার কথায় আর দেরী করল না। 'বিয়ের পর এই তো প্রথম ভাইয়ের কাছে এলুম। তুমি যাও তো, আমাদের একটু প্রাইভেট কথাবার্তা বলতে দাও।'

তরুণ আবার শাসন করে, 'আঃ বন্দনা!'

বন্দনা প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে-ঠুলেই বিকাশকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

দু'কাপ ব্ল্যাক কফি শেষ হবার পরও কত কথা হলো দু'ভাইবোনের।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রেগুলার চিঠিপত্র দাও না কেন বলতো?'

'চিঠিপত্র লিখতে ভাল লাগে না। তাছাড়া চিঠিপত্র লিখে কি মন ভরে?' তরুণ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'তোমাদের কাছে পেতেই ভাল লাগে।'

ডানহাতের পর মুখটা রেখে বন্দনা মুগ্ধ হয়ে দাদার কথা শোনে।

'আচ্ছা বন্দনা, আমি যদি লন্ডনে ট্রান্সফার হই, তাহলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে—তাই না?'

লন্ডন যাবার কথা শুনেই বন্দনা চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'তুমি লন্ডনে আসছ?'

'না। তবে গেলে মজা হতো।'

'এসো না দাদা। আমরা একটা বড় ফ্ল্যাট নেব।'

ঘড়ি দেখে তরুণ চমকে উঠল, 'মাই গড! সওয়া তিনটে বাজে!'

'তাই নাকি?' বন্দনার কাছে যেন তেমন রাত হয় নি।'

'যাও, যাও, শিগগীর শুতে যাও।'

বন্দনা তরুণের বিছানার বেডকভার তুলে ব্র্যাকেটগুলো ঠিক করে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল।

ছোট্ট নাইট ল্যাম্পটা জেলে বিকাশের স্যুটটা ঠিক করে ওয়াড্রবে তুলে রাখল। নিজে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাইটি পরে সুইচ অফ করে লেপের তলায় ঢুকে পড়ল।

একটু এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে শুতে গিয়েই বিকাশ জেগে গেল।

'তুমি ঘুমোও নি?' বন্দনা জানতে চাইল।

'ঘুমোব না কেন? তুমিই তো ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।'

'উঃ কি মিথ্যেকথা তুমি বলতে পার!'

'মিথ্যে কথা? তুমি রোজ আমার ঘুম ভাঙাও না?'

'কখনো না। তুমিই জেগে জেগে ভন্ডামী করো।'

'ভন্ডামী নয়, বলো কর্তব্য। মাই সেকরেড ডিউটি টু মাই বিলাভেড অ্যান্ড একসাইটিং ওয়াইফ!'

অন্ধকারের মধ্যেও যেন দুজনে দুজনকে দেখতে পেল, দেখতে পেল হাসি হাসি মুখ।

বন্দনা যেন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই হুঁশিয়ার করে 'রোজই ফ্যাটারী করো, আজ আর সুবিধে হচ্ছে না।'

'আই অ্যাম নট কনসার্নড উইথ মাই সুবিধে বাট ইওর অসুবিধে।'

'আজ দেখছি তোমার মাথায় ভূত চেপেছে বাট মাইন্ড ইট, সেক ডোন্ট ডিস্টার্ব মী।'

বন্দনা একটু পরেই আবার বলে 'ক'টা বাজে?'

'ক'টা?'

'চারটে বেজে গেছে!'

'সো হোয়াট?'

'কাল সকালে দেরী করে উঠলে দাদার কাছে মুখ দেখান যাবে না। ভাববে...!'

'কিচ্ছু ভাববেন না, বরং জানবেন বোন বেশ সুখেই আছে!'...

সত্যি সত্যি পরদিন সকালে উঠতে অনেক দেরী হয়ে গেল। তরুণ অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। পরিতৃপ্ত চা-ব্রেকফাস্টের উদ্যোগ আয়োজন করে লিভিং রুমে বসে বসে কয়েকটা পিরিওডিক্যাল উল্টেপাল্টে দেখছে।

ওদিকে ওরা দুজনে উঠে কেউই আগে বেরুতে চাইছিল না। অনেক ঠেলাঠেলির পর দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলো।

'কি ঘুম হলো?' তরুণ জানতে চাইল।

মুহূর্তের জন্য বন্দনা-বিকাশের সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময় হলো। তারপর বন্দনা বলল, 'এখনও জানতে চাইছ ঘুম হলো কিনা?'

'কাল তোমরা বেশ টায়ার্ড ছিলে। অত রাত করে শুতে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

বিকাশ কোনমতে বলল, 'অফিস যাবার চাপ না থাকলে ঘুম যেন ভাঙতে চায় না।'

'নিশ্চয়ই ঘুমুবে। খাবে-দাবে ঘুমুবে বৈকি! ক'দিন রিল্যাক্স করে নাও।'

'দাদা তুমি চা খেয়েছ?'

'রোজই তো একলা একলা খাই। তোমরা আসার পরও একলা একলা খাব?'

বন্দনা চটপট চা-টা নিয়ে এলো। চা-টা খেয়ে উঠবার সময় তরুণ বলল 'বুঝলে বিকাশ, বন্দনা যতদিন আছে ততদিন আমি আর কিচ্ছু কাজকর্ম করব না।'

বিকাশ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই করবেন না।'

'মাছ-মাংস সব কেনা আছে। দেখেছ তো?'

বন্দনা বলে 'কালকেই দেখেছি।'

'বেশ ভাল করে খাবার-দাবার বানাও। আমি কিন্তু রোজ লাঞ্চ খেতে আসব।' হাসতে হাসতে তরুণ বলে।

বন্দনা হাসতে হাসতে বলে, 'না আসবার কি কথা আছে দাদা?'

তরুণ একবার হাতের ঘড়িটা দেখে বল্লো, 'ও! বড্ড দেরী হয়ে গেল।'

বেরুবার আগে তরুণ একবার [illegible] কন্সাল জেনারেলকে টেলিফোন করে 'স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ট্যান্ডন সাহেব জবাব দিলেন [illegible] তোমাকে আসতে বলেছে? বি হ্যাপি [illegible] ইওর সিস্টার অ্যান্ড বিকাশ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ স্যার! [illegible] অ্যাম কামিং উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার'

ট্যান্ডন সাহেব আর তরুণের সঙ্গে কথা বলতে চান না। 'একবার বন্দনাকে দাও তো।'

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। কেমন আছ বন্দনা?'

'খুব ভাল।'

'কাল রাত্তিরে খুব জমেছিল [illegible]'

'হ্যাঁ, তা বেশ জমেছিল।'

'তোমার দাদাকে অফিসে আসতে দিচ্ছ কেন?'

'অফিসে না গেলেও চলবে?'

'একশ'বার।'

বন্দনা টেলিফোন নামিয়ে [illegible] দাদা হাসছে।

'তোমাকে অফিস যেতে হবে না।'

'তাই কি হয়? ট্যান্ডন সাহেব [illegible] বলেন।'

কিছুক্ষণ ধরে [illegible] উপরে ধের পালা চলল। [illegible] সমাধান করল বিকাশ।

'ঠিক আছে; চল আমরা [illegible] অফিস যাই। কিছুক্ষণ থেকে [illegible] একসঙ্গে চলে আসব।'

বন্দনা দুটো হাতে [illegible] বলল, 'দি আইডিয়া!'

(ক্রমশ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible] বললু : ছাদের ওপর সাংঘাতিক [illegible] ভেতরে বসুন।

[illegible] আমি জোর করেই ছাদের ওপর [illegible] দেখলাম গাইডের কথা [illegible] ছিল। শীতের চোটে ভানু [illegible] ঠকঠক করে কাঁপছে [illegible] লেগে যাচ্ছে। এ অবস্থায় [illegible] থাকা যায় না—বাধ্য হয়ে [illegible] সেই ঘরেই ফিরে এলাম।

[illegible] আমাদের ভাগ্য ভাল—সামনে যে [illegible] বসেছিল তারা আমাদের [illegible] সামনের সীটেই [illegible] করে দিল। আমরা বেশ [illegible] আমাদের ভাগ্যটা [illegible] ছিল কারণ সেদিন আকাশে [illegible] ছিল না—এরকম পরি-[illegible] এখানে খুব কমই দেখা

[illegible] হোক, এদিকে সাড়ে চারটে নাগাদ [illegible] একটু একটু করে ফিকে হতে শুরু [illegible] কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শীর্ষে [illegible] বিচিত্র বর্ণ সমারোহ। সূর্যদেব [illegible] তলা থেকে একটু একটু [illegible] হচ্ছেন, আর বিভিন্ন রং-এর রশ্মি-[illegible] ওপর ভর করে কাঁপতে [illegible] কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে এসে ঠিকরে [illegible] লাল, নীল, বেগুনী, [illegible] সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে কাঞ্চন-[illegible] রূপ চোখের সামনে প্রতিভাত [illegible] তুলনা নেই। দু'চোখে বিস্ময় [illegible] সেই অপরূপ রূপ-[illegible] দিকে।

[illegible] এই সৌন্দর্য-মুহূর্তটি [illegible] ভেবেছিলাম। হলো না ছবি [illegible] এসেছি কালিম্পং-এ। [illegible] সেই দুচোখ দিয়ে

এরপর আবার ফিরে এসেছি কালিম্পং-এ। এর মধ্যে একদিন স্থানীয় ফরেষ্ট অফিসার নলিনী দাশগুপ্ত আমাকে ও আমার স্ত্রীকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন।

দাশগুপ্তের বাড়িতে চায়ের আসরে সেদিন আরো অনেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হলো।

আমি তো বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলাম। কিন্তু নাট্যভারতীর একটার পর একটি টেলিগ্রাম আমাকে আর নিশ্চিন্তে থাকতে দিলে না। নাট্য ভারতীর নতুন নাটক 'সংগ্রাম ও শান্তি'র উদ্বোধন তারিখ আসন্ন। সুতরাং আর নয়, এবারে কলকাতায় ফিরবো ঠিক করলাম।

ফিরেও এলাম। আরম্ভ হলো 'সংগ্রাম ও শান্তি'র রিহার্সাল।

নাটকটির উদ্বোধন হলো পূর্ব ঘোষিত দিনে ২৩ ডিসেম্বর। প্রথম দিন থেকেই নাটক জমলো। বড়দিনের সপ্তাহে মহা-সমারোহে চললো নাটক। আমি ছাড়া এ নাটকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম বলছি। জহর গাঙ্গুলী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা, সুহাসিনী, বড় রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী (পেঁচি), সন্তোষ সিংহ ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন এই নাটকে।

চলতি অভিনয়ের কথা বলতে গেলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে যে সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলাম, সে কথা না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত থাকে। একদিন হলো চন্দ্রগুপ্ত, আর একদিন রঘুবীর। চন্দ্রগুপ্তে শিশিরবাবু ছিলেন চাণক্যের ভূমিকায়, আর আমি অভিনয় করেছিলাম সেলুকাসের চরিত্রে।

অভিনয়ের মধ্যেই ১৯৩৯ সাল শেষ হয়ে গেল। এই বছরটা আমার জীবনের কর্মমুখর অধ্যায়। শুধু অভিনয় আর অভিনয় —এছাড়া যেন আর কিছু ছিল না। আর শুধু কি মঞ্চ? ফিল্ম, রেডিও, গ্রামোফোন —কিছুই বাদ যায়নি।

১৯৩৯-এর ধারাটাই অব্যাহত রইলো ১৯৪০-এর শুরুতে। নাট্য ভারতীতে যথারীতি চলছে 'সংগ্রাম ও শান্তি'। মাঝে মাঝে অভিনীত হচ্ছে 'তটিনীর বিচার'।

এদিকে ফিল্ম কর্পোরেশনের নতুন ছবি, হীরেন বসু পরিচালিত 'অমরগীতি'তে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলাম।

এই সময় আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকের যাত্রী হলেন। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে থিয়েটারের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না—কিন্তু থিয়েটারে প্রায় আসতেন এবং তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। সুধাংশুবাবুর মৃত্যুকালে মাত্র ৪৪ বছর বয়েস হয়েছিল। এরকম একজন ভাল লোকের মৃত্যুতে মনটা বেশ কাতর হয়ে পড়ল।

নাট্য ভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। মাঝে মাঝে 'তটিনীর বিচার' হয়। আর নাট্য নিকেতনেও মাঝে মাঝে নামতে হয়, কখনও 'পথের দাবী', কখনও 'মা', কখনও 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতিতে।

একদিন নাট্যভারতীর হয়ে ময়মনসিং গেলাম সেখানকার এক মেলায় অভিনয় করতে। এখানে ২দিন অভিনয় হয়েছিল। প্রথম দিন 'কর্ণার্জুন' (তিনকড়ি দা কর্ণ—আমি : শকুনি), পরদিন 'মন্ত্রশক্তি' (তিনকড়ি দা মথুরো, আমি মৃগাঙ্ক)। এখানে অভিনয় ভালোই হল, স্থানীয় জনগণের প্রশংসাও পেলাম প্রচুর—কিন্তু যে জিনিসটা আজও ভুলতে পারিনি সেটা হোল বিপুল ভীড়। ষ্টেশনে ট্রেন থামতে দেখি সে কি সাংঘাতিক ভীড় ষ্টেশনে। কাতারে কাতারে লোক—কয়েক সহস্র হবে। বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলে এবং গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়। ভিড়ের চাপে আমরা ট্রেন থেকেই নামতে পারি না—শেষে পুলিশ এসে আমাদের নামতে সাহায্য করে।

ডাক বাংলোয় এসে তবে খানিকটা শান্তি। কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি পেলাম না। যদিও কয়েকজন পুলিশ ছিল ডাকবাংলোয় আমাদের পাহারা দেবার জন্যে, তবুও আনাচে কানাচে সমস্ত দিন কৌতূহলী ছেলের দল আমাদের খুঁজেই বেড়িয়েছিল।

৩১ জানুয়ারী অভিনয় শেষ করে পরদিনই কলকাতা রওনা হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১ ফেব্রুয়ারী শেয়ালদহ পৌঁছেই দেখি প্রবোধ গুহ মশায়ের তৃতীয় পুত্র নিরু ষ্টেশনে আমারই অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই বলল : কাকাবাবু আপনার জিনিসপত্রগুলো দিন। আমরা গাড়ীতে তুলে দিই। আপনাকে এখুনিই হাওড়া ষ্টেশন যেতে হবে।

—কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি।

—আজ রাত্রে দুমকায় প্লে আছে, আর সবাই চলে গ্যাছেন—আপনার টিকিট কেটে রেখেছি। বললে নিবু।

—আজই প্লে? বাড়ী গিয়ে স্নান খাওয়া করে যাওয়া যাবে না?

নিবু বললে : তাহলে আর এই ট্রেনটা ধরা যাবে না। এ ট্রেনটা ফেল করলে আর তো ট্রেন নেই। এই টাকাটা বাবা আপনার জন্যে আমার কাছে রেখে দিয়েছেন।

বলে আমার প্রাপ্য টাকাটা আমার হাতে দিল। টাকাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কি প্লে হবে?

—বোধহয় সাজাহান।

আমি চলে গেলুম হাওড়ার দিকে, নিবু আমাকে পৌঁছে দিল হাওড়া ষ্টেশান। ষ্টেশানেই রিফ্রেসমেণ্ট রুমে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। নিবু অবশ্য আমাকে বলে গেল যে বাড়ীতে বুঝিয়ে বলে দেবে।

রামপুরহাট ষ্টেশানে গাড়ী থাকবে, ওখান থেকে দুমকা যাওয়া হবে—এই রকম কথা আমাকে বলে গিয়েছিল নিবু। কিন্তু রামপুরহাট ষ্টেশানে নেমে দেখি কাকস্য পরিবেদনা। না গাড়ী, না লোকজন। মহা মুস্কিল, এখন পৌঁছব কি করে?

আসল ব্যাপার হোল প্রবোধবাবু ভেবেছিলেন যে আমি হয়ত শিয়ালদহতে ট্রেন থেকে নেমেই সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়ায় এসে আবার ট্রেনে উঠতে চাইব না সেইজন্যে তাঁরা এক রকম ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি আসছি না। সেইজন্যেই কোন লোক বা গাড়ী পাঠান নি।

আমি যখন রামপুরহাট ষ্টেশানে নামলুম তখন অপরাহ্ণ। আমি এদিক ওদিক খোরাঘুরি করতে লাগলুম—দেখলুম যে কোনো গাড়ী নেই। বাস অবশ্য ছিল, কিন্তু অসম্ভব ভীড় দেখে আর সমস্ত রাস্তা দাঁড়িয়ে যেতে হবে মনে করে আর উঠলুম না।

কুলির মাথায় আমার ছোট সুটকেশ আর বিছানাটি চাপিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন তো অবস্থা দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম।

আমি কুলিকে জিজ্ঞেস করলুম : হিঁয়া কোই গাড়ী-উড়ি নেহি মিলেগা—দুমকা যানেকো লিয়ে?

কুলি বলল : বস্ মে যাইয়ে না। আউর তো কোই গাড়ী হ্যায় নেহি।

—নেহি বাবা—বাসমে নেহি যায় গা।... আচ্ছা, তুম এক কাম করো। ওয়েটিং রুমমে সামান সব রাখ দো।...কলকাত্তা যানে কো ট্রেন কয় বাজে আতি হ্যায়?

আমার তখন ভারী বিরক্ত লাগছিল—। একটা লোক রাখেনি, কিসে যাব তার বন্দোবস্ত নেই—এমন কি একখানা গাড়ী পর্য্যন্ত নেই। এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরতে যাব—এমন সময় দেখি দূরে বটগাছটার নীচে একখানা খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাসটার কাছে গিয়ে দেখি একজন মাত্র লোক বাসের ভিতরে বসে কিসব হিসেব করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : হাঁ ভাই, এ গাড়ী কি দুমকা যাবে।

সে হিসেবের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলল : না।

আমি বললুম : যা ভাড়া চাও, তাই দেব।

এতক্ষণে সে চোখ তুলল আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে : স্যর আপনি?

—হ্যাঁ—কেন আমাকে চেন নাকি? আমি কৌতুক করলুম।

সে সলজ্জ হেসে বললে : আপনাকে কে না চেনে স্যর?... তা স্যর আপনি আজ নামবেন তো 'সাজাহানে'! 'সাজাহান' বলতে তো আপনাকে বাদ দিয়ে কাউকে ভাবাই যায় না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : তুমি আমার 'সাজাহান' দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যর—শুধু আপনার কেন, ভাদুড়ী মশায়েরও দেখেছি, তবে আমার আপনারটাই ভাল লেগেছে।

এখন ভাই, আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবে? এর জন্যে তোমার যা ভাড়া হবে তাই পাবে। তবে এ বাসে কিন্তু আর কোনো লোক নিতে পারবে না।

—ছেলেটি সোৎসাহে বলল : ঠিক আছে স্যর।

বলে কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাসের ভিতরে রাখল আর আমাকে বলল : আপনি ড্রাইভারের পাশের সীটে বসুন স্যর, আরামে যাবেন।

আপনি দু মিনিট বসুন স্যর—আমি ত্রৈলোক্যকে ডেকে আনি।

'ত্রৈলোক্য কে?'

কণ্ডাকটার স্যর। ওর থিয়েটার দেখার খুব সখ স্যর। ওকে একটা পাশ দেবেন স্যর।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : বেশ তো, তোমরা দুজনেই দেখবে। ...তা প্লের আগে পৌঁছুতে পারব তো?

—সে জন্যে ভাববেন না স্যর। আমার একটা দায়িত্ব নেই? এই ৪০ মাইল যেতে বড় জোর ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

যেতে যেতে ছেলেটি অনেক কথাই বলল। ছেলেটির নাম শ্যামকান্ত। নিজেই ড্রাইভার। ভীষণ থিয়েটার-পাগল। ফাঁক পেলেই কলকাতা যায়—গিয়ে থিয়েটার দেখে। আমার বহু নাটক ও দেখেছে। গাড়ী চালাতে চালাতে সেই সব কথাই বলছিল।

সন্ধ্যার একটু পরেই আমি পৌঁছে গেলুম দুমকা। গিয়ে দেখি যে ক্যাম্পে আমাদের আস্তানা হয়েছিল সে স্থান শূন্য—সবাই চলে গেছে প্যাণ্ডেলে অর্থাৎ যেখানে অভিনয় হবে সেখানে। [illegible] আমি গিয়ে পৌঁছতেই সকলেই [illegible] আশ্চর্য এবং আনন্দিত হল। [illegible] বললেন : যাক, তুমি যে আসরে [illegible] ভাবতেই পারিনি—নীহারকে [illegible] ছিলাম এই পর্য্যন্ত। যাক, [illegible] হাত ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও—[illegible] মেক-আপে বস।

তাই করলুম—শ্যামকান্তর গাড়ী [illegible] রেখে দিলাম—ঠিক হল যে অভিনয় [illegible] হলেই সে আমাকে আবার রামপুরহাট ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে। [illegible] দুদিন থাকবে—অন্য অভিনয় [illegible]

এদিন ঔরঙ্গজেব হয়ে [illegible] রায় আর অপর্ণা হল জাহানারা।

আমি অভিনয় শেষ করেই সেই [illegible] করে রওনা হলুম রামপুরহাটের দিকে [illegible] ভোরবেলার ট্রেন ধরে কলকাতা চলে এলুম।

৩।৪ তারিখে নাট্য ভারতীতে [illegible] ও শান্তি' করলাম। 'অমর [illegible] একদিন স্থগিত রাখতে হোল [illegible] বিচারের ব্যাক প্রোজেকশনের জন্য।

৫ তারিখে আবার বরিশাল [illegible] খুলনা হয়ে গেলাম মাদারিপুর। [illegible] যাওয়া বড় কষ্টকর। [illegible] ও বাস—এতগুলি [illegible] যখন মাদারিপুরে পৌঁছিলাম [illegible] ৬টা। মাদারিপুরে [illegible] রাত নটায় [illegible] সদাগর'—রাত্রি নটায়। [illegible] দুনিয়ার লোক ভিড় করে এল [illegible] দেখতে এবং কেউ কেউ [illegible] করল।

ঐদিনই এক টি. এম. [illegible] প্রবোধবাবুর কাছ থেকে [illegible] যে এখানকার অভিনয় [illegible] রওনা হতে হবে ফরিদপুর।

অভিনয় শেষ করে আর [illegible] পাওয়া গেল না—মেক-আপ তুলে [illegible] কিছু খেয়ে নিয়ে সোজা একজন [illegible] সিফটারকে দিয়ে ডাকবাংলো থেকে [illegible] জিনিসপত্র আনিয়ে নিয়ে চলে [illegible] ষ্টিমারঘাট। গিয়ে দেখি লঞ্চ [illegible] আছে—আমি লঞ্চের সামনের [illegible] আরাম করে বসলাম। লঞ্চ ছাড়ল [illegible] সওয়া ৫টায়। ভোরের হাওয়ায় এবং [illegible] দিনের পরিশ্রমে ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়লুম। বেলা ৯টার সময় ঘুম ভাঙল [illegible] স্থলে পৌঁছে গেছি। [illegible] করে বেশ কিছুদূর [illegible]

সমস্ত দিন আর আমার কিছু [illegible] হল না। আমার জন্য ওরা যা খাবার [illegible] তার ঢাকা খুলে দেখি খাবারের ওপর [illegible] হয়ে একপুরু ধুলো জমে আছে। [illegible] আর তা খেলুম না—এমন কি [illegible] না। তারপর বেলা তিনটের সময় [illegible] পৌঁছলাম। তারপর আবার [illegible] ২৫ মাইল বাসে ভ্রমণ, [illegible] পৌঁছলুম ৫টার সময়। গিয়ে [illegible]

জীবনসঙ্গিনী চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী

বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ও বেগুন ভাজা করালেন। আমি স্নান করে এসে খেলুম। তারপর রাত্রি ৯টা থেকে অভিনয়—কর্ণার্জুন। শেষ হল রাত্রি আড়াইটায়।

তারপর দিন হল 'পথের দাবী'। এবং পথের দাবী শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার রওনা হলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে।

কলকাতা পেঁৗছেই নাট্যভারতীতে সংগ্রাম ও শান্তি। এদিকে নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তারে'র শ্যূটিং শুরু হল ফণী মজুমদারের পরিচালনায়। গায়ক ও সুরকার পঙ্কজ মল্লিক এই ছবিতে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন. সেই সঙ্গে সুদর্শন নায়ক জ্যোতিপ্রকাশ ও নায়িকা ভারতীরও অভিনয় জগতে প্রবেশ. পরবর্তীকালের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেন।

আমাদের থিয়েটারের হাবুলের কথা আগে বলেছি আপনাদের। ১১ তারিখে তার একমাত্র পুত্র এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেল। হাবুল আমাদের সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তার এ রকম একটা দুর্ঘটনায় আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

১২ ফেব্রুয়ারী নিরঞ্জন পালের পরিচালনায় তাঁরই লেখা গল্প 'শুকতারা'র শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হল ব্যারাকপুরের ফিল্ম প্রোডিউসার্স ষ্টুডিওতে। আমার বিপরীতে ছিল চন্দ্রাবতী।

নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' এবং সংগ্রাম ও শান্তি' যথারীতি চলছিল। এদিকে নাট্যনিকেতন তখন কোলকাতায় এবং বাইরের 'শো' করার দিকেই নজর দিয়েছিল বেশী।

১৪ ফেব্রুয়ারী আসানসোলে গেলাম—সেখানে হোল 'কর্ণার্জুন' নিউ এম্পায়ার সিনেমায়। ১৬ তারিখে হোল 'পথের দাবী'। পথের দাবী' আমরা কলকাতায় করতাম ঘূর্ণমান (Revolving) মঞ্চে, কিন্তু মফস্বলে, যেখানে ষ্টেজই নেই—সিনেমাকে ষ্টেজে রূপান্তরিত করে অভিনয় করতে হয়, সেখানে অসুবিধা হয়ই। তবু তারই মধ্যে সমস্ত মানিয়ে নিতে হল।

অভিনয় শেষ করেই শেষ রাত্রে ট্রেন ধরে হাওড়া চলে এলাম। আমাকে আসতেই হবে কারণ পরদিন আমার নাট্যভারতীতে শো আছে—'সংগ্রাম ও শান্তি'।

সকাল বেলায় হাওড়া ষ্টেশন এসে দেখি সে এক বিপদ। হাওড়া ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। তরুণ পাঠক পাঠিকারা হয়ত অবাক হচ্ছেন শুনে যে ব্রিজ খুলে দেওয়াটা কি ব্যাপার। তাহলে ব্যাপারটা বুঝিয়েই বলছি, শুনুন।

আজকাল যে ব্রিজটি দেখছেন সেটি তৈরী হয়েছে ১৯৪১ সালে। তার আগে কাঠের সেতু ছিল, জাহাজ যাবার সময় প্রতিদিনই একবার করে খোলা হত। অর্থাৎ ব্রিজটি এমনভাবে তৈরী ছিল যে মাঝের অংশটি সরিয়ে নেওয়া যেত। তারপর প্রয়োজন মিটে গেলে আবার যুক্ত করা হোত। ব্রিজ খোলার সময় প্রতিদিন কাগজে বিজ্ঞাপিত হত। প্রায় ঘণ্টা ২।৩ কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এই সময় ফেরী ষ্টিমার ছিল, যাদের প্রয়োজন খুব বেশী এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা যাদের পক্ষে সম্ভব হোত না, তারা এই ফেরী ষ্টীমার কিংবা নৌকায় পারাপার করত।

আমিও তাই করলুম. অতক্ষণ অপেক্ষা করার চেয়ে ষ্টিমারে কোন মতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা পার হয়ে কলকাতার মাটিতে এসে নামলাম।

কয়েকদিন পরে আবার নাট্যনিকেতনের হয়ে গেলাম বহরমপুর। সেখানেও একটি সিনেমা হাউসের ষ্টেজ নিয়েই আমাদের কাজ করতে হোল। উমা ভাদুড়ী আমাদের আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নি। ডাক বাংলোয় আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হল। দলের অন্যান্য লোকজন আগেই চলে গিয়েছিল, আমি ২৭ তারিখে বেলা বারোটার ট্রেনে রওনা হলুম--কিন্তু পথে হল দেরী। মাঝপথে ট্রেন লেট করায় যখন বহরমপুর পেঁৗছলুম তখন ৮টা বেজে গেছে, সুতরাং ধুলো পায়েই একেবারে ষ্টেজের ভিতরে মেক-আপ রুমে। প্রথম দিনই 'পথের দাবী' রাত্রি প্রায় ২টার সময় অভিনয় ভাঙ্গল, তারপর ডাকবাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম আর হল না—সামান্য কিছু মুখে দিয়ে একেবারে ঘুম।

পরদিন হবে 'সাজাহান' অভিনয়—।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবলুম অভিনয় তো সেই রাত্রে দিনের বেলাটা কাটাই কি করে? ২।১ জন শিল্পী এসে আমায় ধরল: দাদা, সিরাজদ্দৌলা অভিনয় করি, আর সিরাজের দেশে এসে তার প্রাসাদ, কবর এই সব স্মৃতিগুলো দেখে আসি চলুন।

কথাটা আমারও খুব মনে ধরল, আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম : ঠিক আছে চল ঘুরে আসি—তোমরা প্রবোধবাবুকে বলে একখানা গাড়ী যোগাড় কর দেখি।

গাড়ী যোগাড় হয়ে গেল। আমি এবং আরও দলের তিনজন এই চারজনে বেরিয়ে পড়লাম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আসতে। দেখলাম মতিঝিল, মুর্শিদকুলি খাঁর কবর, ইমামবাড়া, লালবাগ যেখানে সিরাজ, লুৎফা ও আলিবর্দীর কবর সযত্নে রক্ষিত আছে। এই সব জায়গায় এলে আর কিছু হোক বা না হোক, মনটা খুবই উদাস হয়ে যায়। সিরাজের সংগে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ নেই, কিন্তু আছে আত্মিক সম্বন্ধ। সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল, বণিকের

মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল যাদের তাড়াতে আমাদের ২০০ বছর সময় লাগল।

বাকি সব দ্রষ্টব্য দেখে সন্ধ্যার মধ্যেই ডাকবাংলোয় ফিরে এসে যথাসময়ে আসরে নামলুম এবং 'সাজাহান' অভিনয় হোল।

অভিনয় শেষে সেই রাত্রেই আবার কলকাতা রওনা হলুম।

২ ও ৩ মার্চ নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' করে আবার ৪ তারিখে খড়্গপুরে নাট্যনিকেতনের হয়ে 'পথের দাবী' করলুম। অভিনয়ান্তে সেই রাত্রেই আবার কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

একদিন শ্রীভারতলক্ষ্মীর মালিক বাবুলালজী সন্ধ্যার সময় আমায় ডেকে পাঠালেন। গেলাম। যেতেই বাবুলালজী বললেন, আসুন দাদা আসুন। আপনার একটা পার্ট আছে—

আমি বললাম: কি পার্ট—কি ছবি—কে ডাইরেক্টার?

বাবুলালজী বললেন: বুড়োদার ছবি—'অবতার'।

বুড়োদা মানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আমার পার্টটি বুঝিয়ে দিলেন।

যাক, আমার 'অবতারে'র কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল।

এরপর পড়ল শিবরাত্রি। আর শিবরাত্রি মানেই তো জানেন থিয়েটারওলাদের পোয়াবারো। অর্থাৎ ৪।৫ খানা নাটক একসংগে প্রোগ্রামে ফেলে টিকিটের দাম বাড়িয়ে সারা রাত্রি অভিনয়ের আয়োজন করে দর্শক টানা। এই বছর আমি একটা রেকর্ড করলাম। নাট্যভারতী নাট্যনিকেতন ও মিনার্ভা তিন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই এমন সব নাটক নির্বাচন করলেন যে সেসব নাটকে আমার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আমি তিন জায়গাতেই রাজী হয়ে গেলাম। সেই মত নাটক সাজানো হল।

প্রথমে নামলাম নাট্যভারতীতে সন্ধ্যা ৬-৩০টায়—এখানে হলো 'তটিনীর বিচার' তারপর নাট্যনিকেতনে হল 'কর্ণার্জুন' রাত্রি ১২-৩০টা থেকে এবং শেষ কিস্তি হলো 'চাঁদসদাগর' মিনার্ভাতে।

এখানে একটু বলবার আছে। 'তটিনীর বিচার' শেষ করে যখন নাট্যভারতী থেকে বেরুতে যাব এমন সময় এল প্রবল বৃষ্টি। আর আপনারা তো জানেন ঠনঠনিয়া কালীতলার অবস্থা। কিন্তু আমাকে যেতে তো হবেই। কথা দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হইনি, এমন ঘটনা আমার অভিনয় জীবনে বিরল। অথচ এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে না পাই ট্যাকসী না পাই কোন কিছু। এদিকে নাট্যনিকেতন থেকে ক্রমাগত ফোন আসছে। তাদের প্রথম নাটক শেষ হয়ে গেছে, এখন কর্ণার্জুনের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

শেষ পর্যন্ত একটা রিকসা পেলাম। রিকসা চেপে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে চলেছে, এমন সময় একটা ট্যাকসী পেলাম। ট্যাকসীতে উঠতে যাবো, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবোধবাবুকে দেখলাম গাড়ী নিয়ে আসছেন। আমাকেই আনতে যাচ্ছিলেন প্রবোধবাবু।

ট্যাকসী ছেড়ে দিয়ে প্রবোধবাবুর গাড়ীতেই চলে এলাম নাট্যনিকেতনে।

নাট্যনিকেতনে 'কর্ণার্জুন' শেষ হলো রাত চারটেয়। কিন্তু এখানে শেষ নয়। এখনো বাকি আছে মিনার্ভায় 'চাঁদসদাগর।' সেখানে আমি নামভূমিকার অভিনেতা।

মিনার্ভায় 'চাঁদসদাগর' শেষ হলো বেলা দশটায়।

এতোতেও ক্লান্তি নেই। ঐ দিনই বেলা ৫টায় নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবির শ্যুটিং ছিল। যথারীতি আমাকেও যেতে হলো।

ক্লান্তি কি, জানতাম না সে সময়। রেসের ঘোড়াও বিশ্রাম পায়, কিন্তু বিশ্রাম-সুখ আমার জন্যে নয়।

দিন কয়েক পরে নাট্যনিকেতনের হয়ে বাঁকুড়ায় গেলাম অভিনয় করতে। সেখানে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অভিনীত হলো 'সাজাহান', 'কর্ণার্জুন' আর 'পথের দাবী'।

অভিনয় উপলক্ষে গিয়েছি, তবু বিষ্ণুপুরটা বেড়িয়ে এলাম। বাঙলা সংস্কৃতির পীঠভূমি বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। দেখলাম, এখানকার বিখ্যাত মন্দিরগুলি। মন্দিরগুলি টেরা-কাটা স্টাইলের। বীর হাম্বীরের দল-মাদল কামান দেখে বাঙালীর শৌর্যের কথা মনে পড়লো।

বিষ্ণুপুর ভালোই লাগলো সব মিলিয়ে। এখানেই আলাপ হয়েছিল স্থানীয় মহকুমা হাকিম সাহিত্য রসিক এবং সাহিত্যিক সুধাংশুকুমার হালদারের সঙ্গে। শ্রীযুক্ত হালদার একজন আই-সি-এস।

বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরে কয়েকটি দিনের জন্যে 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে অভিনয়। তারপর আবার কলকাতার বাইরে যাবার পালা।

এবারে দিলোয়ার হোসেনের সঙ্গে গেলাম পূর্ব বাংলার বগুড়ায়। স্থানীয় এডওয়ার্ড হল সিনেমার মঞ্চে 'শাজাহান' অভিনয় হলো।

বগুড়ায় প্রথমে ডাক বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বাংলোয় থাকা আর হলো না। সেখানে আগে থেকে ভিড় জমে গেছে শিল্পীদের জন্যে। ভিড় বলতে রীতিমতো জনতা। শেষটা থিয়েটারের উদ্যোক্তারা আমাদেরকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছেই একটা নতুন বাড়িতে। আপাতত জনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

অভিনয় করতে যেখানেই যাই না কেন কাছাকাছি দর্শনীয় কিছু থাকলে না দেখে ফিরি না। এখানে দেখলাম মহাস্থান গড়। পূর্বে এখানে পরশুরাম নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। তার ধ্বংসাবশেষও বর্তমান। অনেকের কাছে শুনলাম, এই পরশুরাম নাকি মহাভারতে বর্ণিত পরশুরাম। সত্যি মিথ্যে জানি না। এসব যাচাই করার স্পৃহাও আমার নেই।

বগুড়ায় আর একটি দর্শনীয় নীলা-দেবীর ঘাট। অতীত দিনের কোন এক সতী নারীর আত্মত্যাগের মহিমা এই ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে। অনেকটা 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে বর্ণিত ঘাটের মত আর কি!

যদিও কলকাতায় ফিরলাম কিন্তু ফিরেই খবর পেলাম, সেইদিনই আমাদের যেতে হবে বসিরহাট হয়ে ধলতিথার কাছে ইছামতী পেরিয়ে ইটিন্ডায়। সেখানে 'মিশরকুমারী' অভিনয় হবে। তখন জানতাম না, পরে শুনেছি ধলতিথাই নাকি দেবেন্দ্র অমৃতলালের পৈতৃক বাসভূমি।

ইটিন্ডার পথে যখন রওনা হলাম তখন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমেছে। ঝড়-বৃষ্টি হবে বলেই মনে হলো।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো মোটরে ইটিন্ডার খেয়াঘাটে পৌঁছাতে। ইছামতী পেরিয়ে যখন ইটিন্ডায় পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গিয়ে দেখলাম একটা স্কুল বাড়ির প্রাঙ্গণে মঞ্চ তৈরী হয়েছে। স্কুল বাড়ির মধ্যে টিকিট বিক্রী ... সাজঘর করা হয়েছে একটা ... ঘিরে নিয়ে।

মেক-আপ সেরে যখন মঞ্চে পৌঁছলাম তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। তবু অভিনয় শুরু হলো রাত নটার সময়। কোনমতে একটা অঙ্ক হলো কিন্তু তারপর আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি। স্টেজ, প্যাণ্ডেল সব ভেসে গেল বৃষ্টিতে। সেই যে নাটক বন্ধ হলো, আর আরম্ভ করা গেল না।

সেদিন সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। ভোরে ইটিন্ডা থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলাম বেলা দশটায়।

'সংগ্রাম ও শান্তি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২২ তারিখে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন ব্যারিস্টার এস এন ব্যানার্জী। সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মারক অভিনয়ে সেদিনে নাটকের শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

—ক্রমশ

শিল্পী : অখিল ভৌমিক

শ্রীমতী পলিন ডাভ আমেরিকান শিল্পী। ওয়াশিংটন ও ফ্রান্সে চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছেন। বোম্বাই ও নেপালে প্রদর্শনীর পরে ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁর ছবি, ড্রয়িং ও গ্রাফিক প্রিন্টের একটি নাতি-বৃহৎ প্রদর্শনী করলেন।

শ্রীমতী ডাভ-এর ৪৪ খানি ছবির মধ্যে তাঁর বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল যদিও তার সাফল্যমণ্ডিত কাজগুলি বিমূর্ত রীতির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে এবং এখানেই বোধহয় তাঁর স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। অ্যাক্রাইলিকে আঁকা এই ১৪।১৫খানি ছবিতে বিভিন্ন স্বচ্ছ রঙ স্তরে স্তরে ব্যবহার করে ক্যানভাসের ওপর একটা আলোর খেলা ফোটানো হয়েছে। এই আলো কখনো উজ্জ্বল কখনো স্তিমিত, কখনো বা হাসির মত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কয়েকটি ছবির নামও দিয়েছেন হাসি। এক একটি ক্যানভাসে এক একটি রং প্রধান—অন্যান্য বর্ণগুলি তাকে সাহায্য করেছে। নেপালে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে তিনি কতগুলি দেব-দেবীমূর্তি নিয়ে যে এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়েছেন সেগুলি সার্থকতা লাভ করে নি। লাল জমি ও কালো রেখায় যে বরাহ অবতার, তারা বা চা-পানরত লামার ডেকরেটিভ ছবি এঁকেছেন তার রং রেখা গঠন ইত্যাদি এতই কাঁচা যে এক হাতের কাজ বলে বিশ্বাস করা শক্ত। অথচ দুখানি ঘি-ন্যার স্টাডিতে পাকা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

সেরিগ্রাফগুলির মধ্যে এই ভারতীয় মোটিফ কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও আশানুরূপ বলা যায় না। বরং তাঁর "রেড অ্যাপল" নামে বাদামী ও কমলা রঙের সরলীকৃত অ্যাবস্ট্র্যাকশনে একটা সঙ্গীতের ঝংকার পাওয়া যায়। হাতী, গণ্ডার, মহিষ ইত্যাদি কয়েকটি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ছোট প্রিন্টগুলির রঙের বাহার থাকলেও ফর্মের দিক থেকে বিশেষ জোরালো নয়। বরং মাত্র একরঙে করা "প্রেয়িং ক্যাট" ছবিতে তাঁর ডিজাইনের বাহাদুরী অনেক পরিস্ফুট।

২এ দুর্গাচরণ চ্যাটার্জি লেনের 'চিত্র-নিকেতন' শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিশু-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর ষাটখানির ওপর ছবির মধ্যে চিত্রনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরের শিশু-শিল্পী এবং দেশ-বিদেশের কয়েকটি শিশুর ছবি দেখানো হয়েছিল। হল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, রুমানিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবিগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের শিশুদের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে যেটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে তা হল সব শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা। প্রত্যেকেই তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি প্রায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। ৫ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য, শহরের ছবি পাখি পশু উৎসবের ছবি, ফেরিওয়ালা, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা মায় চাঁদে যাত্রা পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি। শিল্পীদের মধ্যে অর্পিতা দাশগুপ্ত, বারবারা বার্কে, জ্যাকলিন পেটার, প্রসূন চক্রবর্তী, প্রিসিলা মেয়ার, রাহুল মুখার্জি, রিচার্ড ওটেমা এবং আমাদের পাপুর দুখানি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তার "হেড" কম্পোজিশনটি অসাধারণ রকমের পরিণত কাজ।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে "আর্ট এরাউণ্ড" সংস্থার উদ্যোগে ৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি মুক্তাঙ্গন চিত্র প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। কলকাতার অনেকগুলি বড় বড় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। খোলা মাঠে বসে বসে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা দেখতে সকলেরই ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে যদি ঘুরে ঘুরে দেখা যায় এক একজনের রং ও রেখার স্বতস্ফূর্ত ব্যবহার, যে ব্যবহার বোধহয় একমাত্র ছোট ছেলেমেয়েরাই করতে পারে।

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের বার্ষিক ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। এবারে শাদা-কালো ফটোগ্রাফি বিভাগে ৫৮ খানি এবং রঙ্গীন স্লাইড বিভাগে ৩৫ খানি ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছে।

অন্যান্য শিল্পের মত ফটোগ্রাফিও শিল্পের প্রধান উপকরণগুলির অভাবে অসুবিধায় ভুগছে। ফলে উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফের সংখ্যা কমে আসছে কারণ এর জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তা ফিল্ম, কাগজ, কেমিক্যাল ইত্যাদির অভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রদর্শনীতে মোটামুটি উচ্চমানের কাজ দেখা গেলেও খুব অসাধারণ কাজ এবারে প্রায় অনুপস্থিত। কয়েকটি শিশু প্রতিকৃতি, শীতের দৃশ্য, ভীড়ের মধ্যে ধরা মুখ, এবং ছেলেমেয়েদের খেলার ছবিতে জীবনের স্পন্দন সাফল্যের সঙ্গে ফোটানো হয়েছে। টি রাজগোপাল, যোগীন্দর চওলা, ও... শর্মা, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমীরকুমার বসুর শাদা-কালো ছবিগুলি চমৎকার। রঙীন ছবির মধ্যে অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অজয় ঘোষ, গোপীলাল দে, পি, কে, ... সমীরকুমার বসু প্রভৃতির ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

যুগোশ্লাভিয়ার কবি, শিল্পী ও ভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ কস্তিক-এর ছবির একটি বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ অবধি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্রদর্শিত হয়ে গেল।

১৭ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অ্যাকাডেমিতে অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, রামমোহন সরকার এবং শিউলি ঘোষের তিনটি একক প্রদর্শনী হল। শ্রীমতী রায়চৌধুরী অপরিচিত নন। এবারকার ১৫ খানি ছবিতে তাঁর পুরনো রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর ছবিতে রহস্যময় লোকের প্রকাশটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অদৃশ্য এক নিঃশব্দ জগতের হাতছানি অনেক জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই পরীক্ষার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। তাঁর মুরালধর্মী ছবিগুলির গঠনপারিপাট্য প্রশংসনীয়। অন্য ছবির মধ্যে 'আওয়েকনিং' ও 'ম্যাডোনা'র ফর্মের সরলীকরণ সুন্দর।

পাওয়া

গৌর বিশ্বাস

'এই শোন্, আমার না কেমন যেন—'

বারবার, অন্তত সাতবার চেষ্টা করলাম কথাটা বলতে। কিছুতেই অঞ্জলিকে বলতে পারলাম না। কুণ্ঠা, লজ্জা। সত্যের কাছে ধরা-পড়ার ভয়। আমি কিছুতেই অঞ্জুকে বলতে পারছি না।

অঞ্জু, তুই তো আপন মনে চুল বেঁধে চলেছিস। তুই তো অবিরত কলকল করে কথা বলে চলেছিস। তুই তো জানিস না। আমার না কেমন যেন মনে হচ্ছে—জানিস, সন্দেহ হচ্ছে—। তাই যদি হয়, —নাঃ, আমার ভাবতেই ভয় করে—এত ভয় যে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অঞ্জলি, তুই আমার দিকে অমন করে তাকালি কেন। তোর ওই তাকানোটা ভালো নয়। তোর চোখে অবাক প্রশ্ন দানা বাঁধছে। এ তো ভালো নয়। এ তো আমার কাছে বিপজ্জনক। আমি তোকে সে কথা বলতে পারব না। কক্খনো না।

ঃ 'কী রে, তোর কী হয়েছে। অত ছটফট করছিস।'

ঃ 'জানিস অঞ্জু—আমার বড্ড—'

ঃ 'কী। বল।'

ঃ 'জল তেষ্টা পেয়েছে।'

না বলা যাবে না। তোকে বলা যাবে না। তুই একরত্তি মেয়ে। তোকে বলে কিছুর সুরাহা হবে না। তোর মা ডাকছেন, তুই যা। তোর ঘরে বরং নির্জনতা নিরেট হয়ে নামুক। আমি একা একা একটু ভাবি। জানিস, বড্ড ভয় হয়েছে আমার। ভয় পেলে

পৃথিবীটাকে হঠাৎ অন্যরকম মনে হয়। যেন চারপাশটাই ফাঁদ। মাথার ঠিক থাকে না। অথচ পৃথিবী একই পুরনো চালে চলছে। অত ভয় পেলে চলে না। তা কি আমি বুঝি না! তবু—

আয়নায় একটিবার মুখ-দেখা দরকার। অন্য দিনকার চাইতে আজ মুখটা অন্য-রকম দেখাচ্ছে। : একটু ভয় এই মুখে দানা বেঁধেছে। একটু দিশেহারা ভাব। মুখটা নাকি মনের আয়না। তা হলে আমার মনে ভয় এটা সবাই বুঝতে পারছে। এখন যদি কেউ আমার পিঠটায় থনথন চাপড়াতে থাকত, ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাঁকাতে থাকত তবে আমার ভয়টা কাটত। বুক টানটান করে লোকের সামনে মুখোশ পরে থাকতে পারতাম। এই প্রক্রিয়াটার প্রবর্তক শংখদা—হ্যাঁ শংখদা—মানে আমার শংখদা।

এই চোখের দিকে তাকিয়ে শংখদা আকাশ দেখতে পেত। চোখে শিহরন আর অনুভূতির ঢেউগুলো অতিক্রম করতে থাকলে দেখতে পেত আরো অনেক কিছু। তারপর ও আরো কাছে এসে দেখত। খনি-ইঞ্জিনীয়ারের মতো খুঁজে খুঁজে দেখত। বলত : 'মণি, আমি কূল পাচ্ছি না—কূল পাচ্ছি না এত গভীর তুমি!' তখনই তো সে আমাকে জড়িয়ে ধরত। চুমু খেত—ওর দুই ঠোঁট দিয়ে সেইসব 'অলৌকিকছু' বোধ হয় শংখদা এমনি করেই খুঁজে বের করত। আমি তো কিছুই দেখতে পাইনি কোনো-কালে, অথচ শংখদা যখন দেখতে পাচ্ছে দেখুক—

ওই দ্যাখো, অঞ্জু আবার এসেছে। বলছে : 'কীরে, তোর যে আজ কথাই নেই। জানিস, মা আজ—হী হী'—ওর আর হাসি থামে না।

থাম্ তুই, থাম। হাসি দেখলে আমার লোভ হয়। অপাঙক্তেয়র মতো তোকে শুধু হাসতেই দেখি। আমি হাসতে পারি না। আমার শংখদা যখন হাসত, তার আশে-পাশের সবাই হাসত। জানিস, তার হাসিতে অন্যদের ভাগ ছিল। তোর মতো ওই রকম স্বার্থপরের মতো হাসতো না। আমি একটুও হাসতে পারছি না। অথচ তুই—

: 'হী-হী—অ্যাই মণি, তোর হাসি নেই কেন? জানিস, মা এক মজার কথা—, তুই কী ভাবছিস রে?'

: 'অঞ্জু, জানিস, আমার বন্ধু—'

: 'কী। কী রে?'

: 'তুই শংখদাকে চিনিস? শংখদা—?'

: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই তো রাতদিন তার কথা এখানে বলতিস। চিঠি দিত। দুমাস আগে বেড়াতে এসেছিল। তুই তো বললি পাঁচ বৎসর পর দেখা হল। আর পরশু এসেছিল—ওঃ না, কাল। এবার কিন্তু কেমন গম্ভীর এবং ব্যস্ত ছিল। এল আর গেল।'

নে নে। তুই দেখছি বেশ চোখ রাখ-ছিস। শংখদাকে নিয়ে আগে খুব গল্প করেছি। জানিস, শংখদার নামটা আর তার কথা আলোবাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতাম। যাকে তাকে বলতাম। কিন্তু শংখদাকে এবার লুকোতে হবে। এখন শংখদার কথা বলতে গেলে আমার ভয় লাগছে।

: 'সত্যি, তোর শংখদা কী মজার লোক। বোঝাই যায় না যে অত বড়ো লোক। সত্যি, আমার সংগেও কেমন মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলেছিল সেবার। এবার তো ছুটে গেলাম। কথা না-বলেই চলে গেল।'

এ তো আচ্ছা মেয়ে হে! অত শংখদা শংখদা করছিস কেন। আমার ভয় করছে। ওকে যে লুকোতে হবে।...না না অঞ্জু শংখদার নাম তুই কর। শংখদার কত কথা তুই শুনেছিস। আমাকে লেখা তার কত চিঠি তোকে দেখিয়েছি। তুই আমার আপন। তোকে আমার বিপদের কথাটা বলব। জানিস, আজ সকাল থেকে সবকিছু অন্য রকম হয়ে গেছে। আজ সকাল থেকে আমি আবিষ্কার করেছি—না না সে কথা তোকে বলতে পারব না।

: 'এই মণি, জানিস, শংখদা তোকে ভালবাসে! হি হি, অত ছটফট করে উঠলি কেন! জানিস, দুষ্টু-ছেলেদের চোখ চিক-চিক করা দেখলেই বোঝা যায় ওরা ভালো-বেসেছে। গম্ভীরসম্ভীর দেখলে মনে হয় ওদের ঘাড়ে বোঝা চেপেছে—'

একরত্তি মেয়ে বলে কি! এত জানল কী করে! কোথা থেকে মুখস্থ করেছে নাকি! কিন্তু না না, তুই থাম! শংখদাকে ছাড়!

: 'মণি, তোর শংখদাকে নিয়ে এত চুপচাপ কেন আজ।'

চুপ, চুপ! শংখদাকে নিয়ে অত টানাটানি কেন তোর। চুপ!...'ওঃ। বিশ্বাস কর, আমার মাথা ঠিক নেই, তাই তোর গলা চেপে ধরেছি ভাই। অন্যায় হয়েছে। জানিস, আজ সকাল থেকে আমি অন্য রকম হয়ে গেছি। আমার শুধু ভয় করছে। আমি হঠাৎ টের পেলাম—'

: 'কী রে? বল্-না বাপু! আমি কাউকে বলব না। কী হয়েছে তোর—' অঞ্জু এগিয়ে এল। আর আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ও কাউকে বলবে না, তার মানে ও সব বুঝে গেছে। আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

: 'নারে কিছু না। ...মানে একটা স্বপ্ন—'

: 'কী স্বপ্ন বল না!'

আমি বললাম, 'না, স্বপ্নও না। এমনি-ই কিছু না। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? হোঃ হোঃ, তুই একটা বোকা। অভিনয় করছি, বুঝলি—'

আমি পালালাম। এমনি ধরা পড়ে গেছলাম আর কি। খুব কাজ [illegible] বুঝলি, এখন যাই।'

এত রোদ, এত আলো। লোকজন [illegible] দুটো-একটা। বড্ড বাজে লাগে। [illegible] জানা লোকগুলো যদি হঠাৎ [illegible] বেশ হত। বুক ফুলিয়ে চলতে পারতে[illegible]

দেখেছ! ওই লোকটা চট করে [illegible] চশমাটা চোখে চড়াল। কী উদ্দেশ্য [illegible] থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। [illegible] ও আবার আকাশ খুঁজতে চাইছে। [illegible] পুরুষরা এই কেমন। শংখদার [illegible] স্বভাবের লোকটোক তো দুনিয়ায় দু[illegible] থাকতে পারে! আসলে লোকটা [illegible] দেখছে। ওর চোখদুটো কি এক্ষুনে [illegible] ছাড়বে। লোকটা বেহায়া [illegible] নাকি! না না, অমন করে তাকালে [illegible] না-এসে বরং ভয় লাগছে। জানেন, [illegible] আগের মণি নেই, আমি এখন অন্য [illegible] দানের। ...তা মশাই, ওই রাস্তা [illegible] বেশ বাঁচা গেল। একটু দাঁড়াই।

গাছের ছায়ায় এরা [illegible] একে অন্যের ভেতর ডুবে যাচ্ছে—[illegible] খুঁজে চলছে। আমি যে [illegible] এসে দাঁড়িয়েছি তা [illegible] দেখবে না। ওই কালোচশমা [illegible] লোকটা [illegible] আস্ত গাড়ল। এরা পর[illegible] দেখছে না। বাঁচা গেল। [illegible] পৃথিবী এই রকম মগ্ন [illegible] আমি তাহলে বাঁচি।

ঘন ছায়া। মি[illegible] থাকলে মজার মজার [illegible] বলত [illegible] মানুষের মতো [illegible] চালাত। ওর তো এ সময় [illegible] না। আসলে কঠিন [illegible] জলের মতো হয়ে যায়। আমাকে [illegible] করে ও কূল-কূল বয়ে যায়। [illegible] শুধু জল নয়, মিষ্টি হাওয়া।

এরা জোড়ায় জোড়ায় মগ্ন [illegible] কিন্তু ওরা কখনো শংখদা বা [illegible] পারে না। পাঁচবছর আমি কেমন-যেন [illegible] হয়ে গিয়েছিলাম, কেমন বোবা [illegible] গিয়েছিলাম। শংখদা এল। আমি [illegible] হয়ে গেলাম। শংখদার সংগে [illegible] এসেছিলাম। আমি যেন ফুরফুরে [illegible] এদের মতো আমরাও বসেছিলাম। [illegible] খুশীর রঙ নিয়ে বসেছিলাম। আমার [illegible] চৈতন্যে তখন শংখদা, শংখদা, আর [illegible] শংখদা— আমি আমার নার্ভগুলো [illegible] করে দিয়ে, লোমকূপগুলো [illegible] তুলে ধরে আবিষ্টের মতো [illegible] ছিলাম : দাও দাও আরো আনন্দপুল[illegible] দাও।

ওই যে সেই আধা-জঙ্গল [illegible] ওখানে একটা ভাঙাবাড়ী আছে। [illegible] একটা স্রোত ওখানে আমাকে [illegible] নিয়েছিল—

চুপ! এই চুপ! ওই জঙ্গলটার [illegible] আর তাকিও না। এখানে অনেক [illegible]

এই রকম তাকিও না। এরা আমাকে চিনে ফেলবে। ধরে ফেলবে।

কিন্তু কী বোকা লোকগুলো! এদিকে কেউ তাকায় না। ওরা কি আকাশ খুঁজছে। খনি খুঁজছে।

তখন ট্রেনটা এল।

ও একটা প্রকাণ্ড ব্যাগ নিয়ে হুড়-মুড় করে নামল। আমাকে দেখে একেবারে বোঝাটা ঘাড়ে চাপিয়ে জড়িয়ে ধরে আর কি। কিন্তু শঙ্খদা, তুমি কী। আমি তেরো প্লাস পাঁচ আঠারো হয়েছি। এইরকম করে না।

: 'তুই আগের মতো লাজুক আছিস। মুখখানা আহা গোলাপ ফুল। ইস্, তুই তো আচ্ছা বড়ো হয়ে গিয়েছিস।'—দেহটা জরিপ করলে তুমি।

এই তোমার মস্ত দোষ শঙ্খদা। পাঁচ বছর পরে যেই দেখা হল, অমনি তুমি আমার দেহ নিয়ে পড়লে।

: 'তুই একটা আগুন! আগের মতো আর গায়ে হাত দেয়া যাবে না নাকি?'— উচ্ছ্বাস তোমার ফেনিল হয়ে উঠল। শঙ্খদা, তুমি তো জানো না, পাঁচ বছর ধরে আমি সব মুহূর্ত তোমার জন্যে সাজিয়ে রেখেছি। সেটা তুমি দেখবে না। শুধু দেহ।

তুমি কেমন শঙ্খদা। ঘরের মধ্যে যেমনি একা পেলে অমনি জড়িয়ে ধরলে। চুমু খেলে। মধ্যে পড়ে পাঁচটা বৎসর একেবারে আচমকা গুঁড়িয়ে দিলে। তুমি সব পার। এক লাফে পাঁচ বছর হনুমানের মতো ডিঙিয়ে গেলে।

: 'পড়াশোনার সংবাদ কী তোর।'

এই শঙ্খদা! ওই সংবাদটা তুমি আর নিও না। ওটা আমার হবে না। ফি ক্লাসে দুইবার তিনবার থাকার অভ্যেস আমার। তাতে বাবার বই-কেনার পয়সা একটু কম লাগে। এর নাইনে উঠেছি। কিন্তু বই নেই।— ভালোই হয়েছে পড়তে হয় না।'

: 'সেকি! চিঠিতে তুই এ-সব জানাস নে কেন। বই না হলে পাশ করবি শিখবি কী। তোকে পাশ করতেই হবে। নে ভাবিস নে— এখন ধরে তোর মা নেই, চট করে এই টাকাগুলো তোর বাকসে লুকিয়ে রাখ— একটা শাড়ীও হয়ে যাবে।'

: 'সত্যি শঙ্খদা, তোমার তুলনা নেই। জানো শঙ্খদা, আমার বাবার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এখানে চাকরি পেয়ে বাবা আরো অনেকগুলো মুখ বাড়িয়েছেন।'

: 'সত্যি, সেকেলে লোকগুলো যে কী।'

আমি লাফাতে লাফাতে অঞ্জুর কাছে হাজির। : 'এই অঞ্জু, অঞ্জু, আমার সেই দাদাটা— সেই শঙ্খদা এসেছে। তুই আয়। জলদি আয়।'

আমার পরিবেশ এই গণ্ডী আর ঘরবাড়ী আমাকে ছোটো করে রেখেছে। আমাকে লুকিয়ে রেখেছে ম্লান করে রেখেছে। তোমাকে পরিচিত সকলের সামনে তুলে ধরে আমার স্বপক্ষে বিজ্ঞাপন দেয়ার ফন্দি এঁটেছি। দেখুক সবাই আমার একটা শঙ্খদা আছে।

ভোম্বলের খুড়ী শুধিয়েছিল : 'এই মণি, ও কে রে?'

আমি বলেছিলাম: 'শঙ্খদা। আমার দাদা হয়। কলকাতায় থাকে। এইবার ডাক্তারি পাশ করেছে।'

খুড়ী বুড়ী অত শুনতে চায়নি বটে। কিন্তু ক্রমশ এ-সব জিজ্ঞেস করতই। তাই আমি আগেভাগেই বলে দিলাম। বিজ্ঞাপন আর কি। সেই সঙ্গে আমারও একটু আপে ওঠার ইচ্ছে।

মা বললেন : 'মণি কেমন জলি চটপটে হয়ে উঠেছে। বাবা, তুমি মেয়েটাকে চেন বটে। কেমন জবু-থবু চাল-চলন ছিল ওর। এখানে এসে অব্দি ও এই রকম হয়ে গেছে। আজ ও খুব খুশী। ...তা বেশ তো, ওকে নিয়ে তুমি ঘোরো। আনন্দই তো জীবন। ও খুব আনন্দ পাবে।'

সেই ক'দিন। তুমি যেখানে যাও আমিও সেখানে। তুমি বললে : 'তুই না-হলে কি চলে আমার! নে-নে, এই গগল্‌সটা চোখে দে। ফাইন দেখাচ্ছে। টাইট করে শাড়ী পরলি না কেন। লোকজনের ভেতর দিয়ে যখন যাব, তুই গ্যাট-গ্যাট করে হাঁটবি।'

শঙ্খদা, ও শঙ্খদা, আমাকে আর হাঁটা শেখাতে হবে না। আমার বুকের ভেতর উদ্দীপক বাজনা চলছে, আমি তার তাল বুঝি যে।

: 'তোদের ঘরটা বড্ড ঠাসাঠাসি। তোকে মোটেই একা পাবার জো নেই। লোক নেই এমন জায়গায় চল। তোকে কতক্ষণ চুমু খাইনি বল তো। ঠোঁট শুকিয়ে গেল যে।'

শঙ্খদা তুমি একটুও বদলাও নি। একই রকম আছ। এত শিখেটিকেও তুমি বদলাও নি। ছেলেমানুষই আছ। সত্যি, তুমি অবাক। তুমি একটুও বদলাও নি। তোমারও মনে আছে হয়তো।

শঙ্খদা, তোমার একটা কথা আজো মনে লেগে আছে। আমাকে খুব ভাগ্যবান মনে হত কিনা! তাই আজো মনে আছে। তুমি বলতে: 'তুই সত্যিই মণি। তোদের বাড়ী তো মেয়ের অভাব নেই—কিন্তু তুই মণিই। তোকেই ভালো লাগে। তোর দিদি তোর থেকে ফর্সা। কিন্তু তোর তুলনা নেই। আমি কবিতা লিখতে পারিনে, পারলে তোকে নিয়ে কেবলই লিখতাম। তোর চলায় একটা নৃত্য-ভঙ্গিমা আছে। তোর তাকানোর ভেতর একটা স্বপ্নের ঢল আছে। তুই যখন হাসিস ১০০ পাওয়ারের বালবটাকে ম্লান দেখায়। তোর কথাবার্তায় বন্যার মৃদু প্লাবন থাকে—তাতে পলি-ঝরার মিষ্টি-মিহি সুর। বল্, কবিতা লিখতে পারলে কেমন ফেমাস হয়ে যেতাম না?' তুমি এমনি দুষ্টু ছিলে। পাকা ছিলে। দুষ্টু, পাকা! না, এ-কথাগুলো বলা যায় তখন, যখন নিজেকে তোমার সমান বলে মনে হতে থাকে—সেই সময় এই কথাগুলো আপনাআপনিই বেরোয়। কিন্তু তুমি তো অনেক উঁচুতে ছিলে শঙ্খদা, এখন তো আরো উঁচুতে। তবু তুমি কেমন সহজভাবে আমার সঙ্গে একাকার হতে চাও। তোমার মহত্ত্বের লীলা।

: 'মণি, ঝাঁপ দে। উঁহু। ঝাঁপ দে। আমি তোকে ধরব। হাত-পা ভাঙবে না। ঝাঁপ দে।' তুমি একহাত ধরে থাকলে, আমি ঝাঁপ দিয়ে তোমার ঘাড়েই পড়লাম।

: 'উঁচুনীচু পথ। মধ্যে-মাঝে এই রকম ঝাঁপ দিবি। তোকে ঠিক নিয়ে যাব।—এমন নিরালা ভূখণ্ড দুনিয়ায় নেই। এখানে কোনো লজ্জাও নেই।'

: 'হ্যাঁ শঙ্খদা। আমার মোটেই লজ্জা করছে না। দোহাই শঙ্খদা, এমন করলে হাঁটব কী করে।'

: 'হাঁটার দরকার কী। এখানে ভিড় নেই, লোক নেই, কাজ নেই, চিন্তা নেই। চারপাশে মাটির গন্ধ। ঘাসপাতার তাজা-জীবন। আয়, শুই। আজ সারা রাত এখানে কাটাব। চাঁদ ডুবলে তবে ফিরব।'

: 'না শঙ্খদা। বাড়ীর লোক কী ভাববে।'

: 'বলবি অনেক দূরে বেড়াতে গেছলাম। সে আমি শিখিয়ে দেব।'

: 'শঙ্খদা, মনে আছে, সেই যে একদিন—'

: 'এখন আর অতীত নয়, ভবিষ্যতও নয়। এখন বর্তমান। সব ভুলে খুব কাছে টেনে আন মনটা।'

যেন দুটো তীক্ষ্ম বাদ্যযন্ত্র। যেন কোনো এক বিশাল সঙ্গীত-ইচ্ছায় সমন্বিত সুরে বেজে-বেজে চলল।

এক সময় শুধু ঝিঁঝিঁদের ডাক শুনেছিলাম।

: 'এই মণি! ওঠো, যাবে।'

শঙ্খদা আমার দেহে মন নেই। প্রতি কোষে-কোষে গুলে গেছে। আমার বাড়ী কোথায়। আমি কোথায় যাব।

: 'চাঁদ ডুবেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। তোর কি আঁধার লেগেছে?'

তুমি আমাকে বয়ে বয়ে আনলে। কিছু একটা ঘটে গেছে। যেন কড়া একটা স্বপ্নের ঘোরে কিছু একটা ঘটে গেছে।

ওই যে জঙ্গল জায়গাটা।

চুপ! এই চুপ! ওদিকে অত নজর কেন। সাবধানে থাক।

এখন এই রাস্তার ধারে বসে আমি খুব অসহায় বোধ করছি। মন সহসা ঝড়ঝঞ্ঝায় দিকহারা। নড়তে-চড়তে ভুলে

যাচ্ছি এখন। পৃথিবীর কেন্দ্রের বড় ভীষণ টান। পাতালেও ঢুকতে পারছি না। আসলে এই এক অদ্ভুত অবস্থা আমার এখন। সামনে পিছনে বাধা। ধীরেন কেরানীর দ্বিতীয় কন্যা অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে। ধীরেন কেরানী এককালে জমিদার ছিলেন—আজ যেমন সে কেরানী এবং মাথায় আবার নবরত্নের বোঝা—তাঁর মেয়ে এখন খুব অসহায় বোধ করছে।

শংখদা, জবু-থবু মণির মাথায় তখন জমাট অন্ধকার। সময়টাই যেন পাহাড় হয়ে চেপে বসেছিল। এমনি সময় তুমি এসেছিলে। আমার বোঝা উবে গিয়েছিল। আমি পাখা ঝটপট করে উড়ছিলাম। কিন্তু ধীরেন কেরানীর মেয়ে যে আমি। সব পাখিদের মতো আমি তাই আবার নেমে এলাম মাটিতে।

তবে তুমি আমাকে সুন্দর সুন্দরতম একটা স্মৃতি উপহার দিয়েছ। ওই স্মৃতিই আমাকে মধ্যেমাঝে স্বাস্থ্যকর অবহাওয়ায় ফিরিয়ে আনে।

...খটাখট খটাখট খট! 'ওম্মা তুমি! হ্যাঁ শংখদা, বিনানোটিশে হঠাৎ?' তুমি তোমার চোখ দুটো দিয়ে আমাকে স্নান করিয়ে দিলে। যেন ফোয়ারার জল অঝোরে ঝরে পড়ছে। ওই দ্যাখো! আমার আবার লজ্জা করল।

ঃ 'কেমন আছিস রে!' এমনভাবে শুধোলে, যেন আমি এতক্ষণ সংকটাপন্ন ছিলাম।

ঃ 'ওম্মা ভালোই—আবার কী!' তুমি গালে টোকা মারলে। অনুভব করলাম সারা কায়মন জুড়ে তোমার জন্যে আমার তৃপ্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ঃ 'কোনো অসুবিধেয় পড়েছিস? কোনো বিপদ, কোনো অভাব—'

ঃ 'শংখদা, তুমি কি স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছ?'

ঃ 'তোর কিছু দরকার নেই? তুই কিছু চা।'

তুমি কী শংখদা। আমি কী চাইব। 'ওকি, টাকা বের করছ কেন?'

ঃ 'নে নে মণি। কাছে রাখ। নে না লক্ষ্মী। শোন না লক্ষ্মী, আমি অন্তত ভাবতে পারব তোর কাছে একটা প্রহরী আছে।'

ঃ 'তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'তুই খুব ভালো। নিষ্পাপ।' স্বগতোক্তির মতো বললে।

ঃ 'শংখদা, না শংখদা। টাকা আমি কী করব।'

ঃ 'আমার টাকায় তোর ভাগ আছে। পাঁচ বছর দেখা হয়নি বলেই আমি ডাক্তার হতে পেরেছি। তুই নিবি—চেয়ে চেয়ে নিবি।'

ঃ 'ওমা! কোথায় চললে?'

ঃ 'চলে যাচ্ছি। তাড়া আছে।'

ঃ 'সে কি! মাকে ডাকি। তুমি থাকো। এ কী ধরনের আসা-যাওয়া!'

ঃ 'হঠাৎ মনে হল তুই খুব বিপদে পড়েছিস।'

ঃ 'মানে?'

ঃ 'আমি স্বপ্ন দেখলাম তুই দুর্ঘটনায় পড়েছিস।......মণি, সব কথা কি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?'

ঃ 'বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'আমার ওপর তোর রাগ হল না, ঘেন্না হল না—তাই ভেবে ভেবে আমার আশ্চর্য লাগে। আমার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। ...কিন্তু জানিস, আমি বোধ হয়, আমি বোধ হয়—'

ঃ 'কী।'

ঃ 'তুই তাহলে ভালো আছিস। দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ভালো ঘুম হবে। ...চল্, ইস্টিশান অব্দি যাবি। ওই তোর বন্ধু অঞ্জু না?'

ঃ 'ডাকব?'

ঃ 'না না, থাক। আমি যাই বুঝলি?'

ওর হঠাৎ আসার মধ্যে একটা মানে পাচ্ছি যেন।

শংখদা কী বলেছিল? আমি বিপদে পড়েছি। শংখদা এমন হুড়মুড় করে এসেছিল এমনভাবে কথাগুলো বলেছিল মানে খুঁজে পাই নি তখন। ওর ওই গাম্ভীর্য আর ব্যস্ততা। —এমন তো ওর বদলানোর কথা নয়। আমি এই দুদিন শুধু ভাবছি। ওকে বিশ্লেষণ করছি—প্রত্যেকটি মেয়েকেই জীবনে একদিন-না-একদিন করতে হয়। হঠাৎ আজ সকাল থেকে আবিষ্কার করলাম—আমার খুব বিপদ—আমি মুখ দেখাব কী করে। বাঁচব কী করে।

মাথাটা ভারী হয়ে ওঠে। ঘাড় থেকে ধড় থেকে ওটা ঝুলে পড়তে চায়। 'শংখদার টম্ভীর দেখলে মনে হয় ওদের ঘাড়ে বেক চেপেছে।' —কে বলেছিল? ওঃ, অঞ্জু।

ঃ 'হিহি, শংখদা তোকে ভালোবাসে।'

মণি, মণি, তুই কি কোনো বিপদে পড়েছিস? কোনো অভাব, কোনো দুর্ঘটনা?

হাড়পাঁজর ভাঙতে ভাঙতে ট্রেনটা আসছে। সিটি মারছে।

এই এই রিকশা! দেবদূত! হাঁকো, হাঁকো—এইদিকে, এইদিকে। এখানে দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি। ট্রেনটা ক'মিনিট দাঁড়াবে? দশ মিনিট? এত?

বাক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া নোট নিলাম। হাতের কাছে যা পেলাম। কাপড়চোপড়? কী হবে! শুধু টাকাগুলোই দরকার।

হাঁকাও স্টেশন, রিকশা!

ঃ 'কোথায় চললি, মণি?'

মা। মাগো! আমি আবার ফিরে আসব। এক্ষুনি আসব। নুনু না। হয় তো আসব না—কোনোদিন না। মাগো! কান্না এল। ফুঁপিয়ে কান্না এল। ...এই রিকশা হতচ্ছাড়া, আমার কান্না দেখছ! হাঁকাও ট্রেন ধরিয়ে দিলে বকশিস দেব।

আমি যাচ্ছি। যেন ট্রেন যাচ্ছে না, আমিই যাচ্ছি। এমন একটা প্রচণ্ড [illegible] হয়েছে আমার। কয়েক গণ্ডা [illegible] ফাটিয়ে যেন কে আমাকে গ্রহান্তরে [illegible] মেরেছে। আমি ফিরব কিনা জানি না।

পৌঁছতে পৌঁছতে হয় তো [illegible] আমি চিনতে পারব না। তবু [illegible] করতে হবে। যত কষ্ট হোক [illegible] খুঁজে বের করতে হবে। ডাক্তার শংখশুভ্র রায়। ডাক্তার। ওই যে বাচ্চা মতো—[illegible] আর বয়স—এরই মধ্যে ডাক্তার হয়েছে। 'বাচ্চা ডাক্তার'—এ কথা এখন বলা যায় না। বাচ্চা বলা যাবে না, সে যে এখন মানিগণ্য লোক। শংখবাবু। ডাক্তার রায়। [illegible] ডাক্তার। ওকে আর আপনারা কতটুকু জানেন। আমি জানি। শংখ ডাক্তার মানে শংখদা। ও এখনো ছেলেমানুষ। ও কী করে ডাক্তারি করে! আপনারা তো জানেন না—ও খুব ছেলে-মানুষ। ও বড়-বয়সের লোকের অভিনয় করে।

ও সীমিত রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা নয়। ওর রঙ্গমঞ্চ মানুষের এই বিশাল জগৎ। ছেলেমানুষির পোশাক বদলে ও সিরিয়াস হয়ে ওঠে ঃ ও তখন শংখ ডাক্তার, শংখশুভ্র রায়। জানেন, ও তখন ব্যক্তিত্বময়। অপরের ওপর ওর ব্যক্তিত্ব প্রভাব ফেলে, কর্তৃত্ব করে। আমি এই বড়-ছেলেমানুষটার ছত্র ছায়ায় অনেক বেলা পর্যন্ত কাটালাম।

অনেক দিন অনেক রাত। আমার মনের ওপর দুর অন্ধকারের আবরণ বিছানো।

ট্রেনটা এক সময় থামল। আর সামনে হঠাৎ আলো। মনে-চৈতন্যে সহসা নিটোল স্বচ্ছন্দতা নামল। আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু। যাত্রীরা যে যার মতো চলে যাচ্ছে। আমি একটু দেরী করে নামলাম। নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালাম। শক্ত-শক্ত ঠেকে। চারপাশে বাধা বাধা সীমিত সব কিছু। কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন মণি! ও মণি, তোমার যে এখনো অনেক কাজ বাকী। তুমি ধীরেন কেরানীর মেয়ে মণি! তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। মনে কর তুমি ধীরেন কেরানীর মেয়ে। মনে কর।

সাত নম্বর খালপার রোড। হ্যাঁ, ওই তো বাড়ি। যদি ভুল হয়। তবে লোক-জনকে শুধোব। ঃ শঙ্খধবল রায়। আমি ওর আত্মীয় হই। আমি মণি।

ট্যাক্সিটা সারাপথ দিয়ে হুহু করে এল। কখনো সখনো ভিড়ের জন্যে থেমে যাচ্ছিল। আমিও দমে যাচ্ছিলাম তখন। কিন্তু এখন যখন সাত নম্বরের কাছে এসে গেছে হল জনমানবশূন্য। অজানা অচেনা ভূখণ্ডের মধ্যে কিনারা থেকে কে যেন নিয়েছে আমাকে। আমি যেন টলছি। হঠাৎ আমি যেন এক বিরাট পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় উঠে উঁচিয়ে নিয়ে পাদদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

কোনো অসুবিধেয় পড়েছিস? কোনো বিপদ, কোনো অভাব— মণি, তুই কিছু চা। চেয়ে দেখ না।

ঃ আপনি মনে হয় কাউকে খুঁজছেন।

...শঙ্খবাবু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো ওই ঘর। যান। আছেন।'

অতঃপর আমি সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে শুধু একটিমাত্র জায়গায় এসে হাজির হলাম। ...'হ্যাঁ, আসুন!' ঃ এই তো শঙ্খদার গলা! কিন্তু তবু ঢুকতে যেন বাধা। আমি হালকা নই, অনেক বোঝা নিয়ে এত উপরে উঠতে পারছি না। অনেক অনেক কষ্ট করে ধীরে খুব ধীরে ঘরে ঢুকলাম। যেন এভারেস্টের মাথায় উঠলাম।

ঃ 'আরে, তুউউই! মণি! তুমি!'

ছেলেমানুষি ছলাৎ করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই গাম্ভীর্য নামল।

ঃ 'এস। বস।'

উৎকণ্ঠিত চোখকান পেতে রেখেছ, শঙ্খদা। ছুটে এসে তুমি তো আমাকে দুমড়ে ধরছ না। —যেমন তুমি তোমার ঘরে গেলে আগে করতে। চাপ দিয়ে দিয়ে বেতের মতো আমাকে বাঁকে বানাতে চাইতে। তুমি বলতে 'তুই একটা বেতের ডগা। তোকে বাঁকিয়ে ফেলব। মেয়েদের মেরুদণ্ড থাকতে নেই।'

শঙ্খদা, ঘন গাম্ভীর্য মুখে চাপা রাগ আড়াল করে বললে ঃ 'মণি, কী হয়েছে। ভাবতেও পারি নি এমন আচমকা তুমি আসবে।'

আমি কথা বলার ভাষা পাচ্ছি নে। যেন কান্না পায়। মনের সব ভয় বিপদ সমস্যা একত্রিত করে বললাম ঃ 'তুমি তো ডাক্তার। আমাকে সারিয়ে দাও।' বলতে বলতে কান্না এল জোরে।

শঙ্খদা! তুমি বারকয় এদিক ওদিক এলোমেলো ঘুরে খেলে। তুমি টাল সামলাচ্ছ! তুমি ধপাস করে বসে পড়লে।

না না শঙ্খদা! এমন করে না! ঃ 'আমি তোমার ওপর রাগ করি নি। মন্দ ভাবি নি। সত্যি, সত্যি।'

তুমি আমার ওপর একবার মাত্র বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। অতঃপর তুমি ছটফট করতে থাকলে। ঃ

'মণি, মণি। তুই কিছু চা। আমার কাছে তোর কিছু চাওয়া উচিত। চেয়ে চেয়ে নে।'

এই সময় আমার রেকর্ড প্লেয়ারটা হঠাৎ থেমে গেল। আমার স্নায়ুময় চৈতন্যময় যে ভয়াল সঙ্গীতটা এতক্ষণ ধরে বাজছিল, হঠাৎ তা থেমে গেল।

তুমি চরকির মতো ঘুরে দিয়ে ছুটে গেলে—এক তোড়া কার্ড। সেগুলোর তুমি আগুন ধরালে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল শঙ্খদা? চেপে যাচ্ছিলে? গলা ধরে আসে। চোখমুখ লাজিয়ে আসে।

অনেক অনেকদিন পর এতদিনকার কুয়াশাটা হঠাৎ উবে গেল। যেন সূর্য উঠল। পায়ের তলায় মাটি। আমার শঙ্খদা।

কিম্বা সেইসব কুয়াশারা এতদিন পর মূর্তিমান হয়ে উঠল। আমার শঙ্খদা।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

হলঘরটা দিয়ে যেতে যেতে কৃত্তিবাস অবাক।
এযে পাখির হাট দেখছি! ওঁর পাখির ব্যবসা নাকি?
না, এটা শিউপ্রসাদজির সখের চিড়িয়া-মহল।

চিড়িয়ামহল থেকে বসবার ঘরে ঢোকবার পর —
আসুন মিঃ ভর্মা! সঙ্গে কাকে এনেছেন মনে হচ্ছে?
আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার বন্ধু মিঃ ভদ্র। আশা করি আপনার আপত্তি নেই!
জল জ্যান্ত হাজির তবু বলছেন মনে হচ্ছে! চোখে আবার ওটা?

সত্যিই শিউপ্রসাদজির চোখে এই আধা-অন্ধকার ঘরেও কালো চশমা।
না, না — কিছুতে আর আমার আপত্তি নেই। আসুন। বসুন।

কাছে গিয়ে বসবার পর —
আপনাকে ডাকার কারণ ফোনেই একটু জানিয়েছি।
হ্যাঁ, কিন্তু শুনে আমি কিছু বুঝতে পারিনি শিউপ্রসাদজি!
ভদ্রলোক কি অন্ধ? মাথাও ত খারাপ মনে হচ্ছে!

পরের কথায় সেই সন্দেহ বাড়ল।
না বোঝার কিছু নেই। সত্যিই আমি কাল লক্ষ্মীকে খুন করেছি!

কি বলছেন শিউপ্রসাদজি? রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও মেয়ের মত স্নেহে যাকে মানুষ করেছেন, যে আপনার চোখের তারা সেই লক্ষ্মী-দেবীকে আপনি খুন করেছেন? আপনি স্বপ্ন দেখছেন!

হ্যাঁ, স্বপ্নও বলা যায় — চরম দুঃস্বপ্ন! সত্যিই আমার অত আদরের লক্ষ্মীকে আমি নিজের হাতে খুন করেছি —

ওই শিলামূর্তির মত সমাহিত মানুষটি হঠাৎ অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে উঠল।
কোথায় কেমন করে — চলুন, দেখাচ্ছি —

অঙ্গনা

শিক্ষার ...তেতে

...শী বিশ্বনাথ মণ্ড, সীমানা ...সারিত। এত কাছে এসেও ...জানতে পারে না। তারা ...আসে, নাটক দেখেই চলে ...গায়ে গায়েই স্কুল, কলেজ ...প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ...পরিপুষ্ট আর শ্রীমতী ...দেবী সেই আনন্দেই ...জীবন ধরে যে সাধনা করে ...সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাঁর লক্ষ্য, ...তাই একান্ত প্রচারবিমুখ। ...তাঁর ৮২ বছর জন্মোৎসব ...জন্মোৎসবও নিজের প্রশস্তির ...তারচেয়েও বেশি যোগ্য ...তিনি তাঁর সাধনাকে আরো ...তুললেন।

...দেবী উত্তর-সাধক ...আমাদের অনেকেরই খুব ...আছেন। আমরা তাঁর খোঁজ ...ভেবেছেন তাই জানলাম। ...অসামান্য সংগঠন ...অবাক মানতে হয়। ...শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে ...প্রসাদে তাঁর জীবন আজ প্রায় ...পূর্ণ।

...করনজা গ্রামে শ্যাম-...জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ...ছিলেন জমিদার এবং ...শিক্ষার ব্যাপারে তিনিও ...ছিলেন। সেকালের স্বল্প ...সম্ভব শিক্ষার সুযোগ ...হিনীকে দেন। মেয়েও এই ...সদ্ব্যবহার করেন। ...থেকে প্রথম হয়ে তিনি ...করেন। স্কুলের পড়াশোনার ...। এবার চললো সঙ্গোপন ...বাড়িতে পড়ার সুষ্ঠু ...। তাই স্কুলের পড়া সাঙ্গ ...পড়া থেমে রইলো না।

...মেয়ের বিয়ের জন্য বাবা ...সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে ...বিয়ে হলো। সুরেন্দ্রনাথ ...সম্পন্ন বধূ শ্যামমোহিনী ...এলেন। এক মুহূর্তে সবাইকে ...করে নিলেন। এ বাড়িতেও ...প্রীতি খুব অনুরাগ। শাশুড়ী ...গ্রামের নিরক্ষর বৌ-ঝিদের অক্ষরজ্ঞান এবং পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন। শ্যামমোহিনী মনের মতো কাজ পেয়ে গেলেন। দারুণ উৎসাহে তিনি নতুন পাঠ-শালা খুললেন। গ্রামের বৌ-ঝিরাও এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিল। সব সময় স্কুল চলতো। শুধু শ্যামমোহিনী যখন বাপের বাড়ী যেতেন তখন পাঠশালা সাময়িক বন্ধ থাকতো। শ্যামমোহিনী বাপের বাড়িতে দিন গুনতেন নতুন পড়ুয়াদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু এ সুখ তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন সহ্য হয়নি। বিবাহিত জীবনের চার বছর পূর্ণ হতে না হতেই তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হলো। মৃত্যুশয্যায় স্বামী তাঁকে দিয়ে গেলেন এক গুরুতর দায়িত্ব। তিনি বলে গেলেন, আমাদের দেশের মেয়েদের লেখা-পড়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করো।

ভারাক্রান্ত চিত্তে বাপের বাড়ি ফিরে এলেন শ্যামমোহিনী। শুরুতেই জীবন ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এখনও তাঁকে অনেক পথ ভাঙতে হবে। এতো বড় কষ্টেও স্বামীর দেওয়া দায়িত্বভারই তাঁকে দেবে নতুন জীবনের আনন্দ। কিছুদিন যেতেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার কাজে নেমে পড়লেন। যা ছিল এতদিন গৃহকোণে এবার তাই নিল প্রকাশ্য রূপ। মাত্র ২০ বছর বয়সে শ্যামমোহিনী প্রতিষ্ঠা করলেন স্বগ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয়। এখানেই স্ত্রী-শিক্ষায় অগ্রণী শ্যামমোহিনীর প্রাথমিক বিকাশ। মায়ের নামে স্কুলের নামকরণ হলো গোবিন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়। তিনি নিজেই হেড-মিস্ট্রেস। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। উন্নয়নের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম শুরু করলেন। প্রাইমারী স্কুল উন্নীত হলো এম-ই স্কুলে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে শ্যামমোহিনীর এই ভূমিকা সারা পাবনা জেলায় তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। দিকে দিকে তখন তাঁর ডাক। সবাই বলছে, পাবনায় শুধু করনজা নয়, আরো অনেক গ্রাম আছে। তোমার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করো। শ্যাম-মোহিনী এই ডাকে সাড়া দিয়ে একটি একটি করে ছয়টি স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এমনিভাবে পাবনা জেলায় স্ত্রীশিক্ষার ধুম পড়ে যায়।

কিন্তু শ্যামমোহিনীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুলে শিক্ষকতা করার ব্যাপারে সরকারী নিয়মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা তাঁর পক্ষে

অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদিও এমনিতে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। পড়া এবং পড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তবুও ছাপ না হলে চলে না। তাই তিনি চলে আসেন কলকাতা। ভর্তি হন ব্রাহ্ম ট্রেণিং স্কুলে। সিনিয়র ট্রেণিং কোর্সে। পরীক্ষায় দেখা গেল তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার তাঁর শিক্ষকতার প্রতিবন্ধ অপসারিত হলো।

এসময় লেডি অবলা বসুর নজরে পড়েন শ্যামমোহিনী। রতনে রতন চেনে। লেডি বসুর পক্ষে শ্যামমোহিনীকে বুঝে ওঠা অসুবিধা হয় নি। তিনি শ্যামমোহিনীকে বিদ্যাসাগর বাণী ভবন পরিচালিত স্কুলসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।

কিন্তু পরিদর্শকের কাজের পরও তাঁর হাতে প্রচুর সময় থেকে যায়। সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি তাই একইসংগে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করেন। তারপর যে স্কুল থেকে তিনি সিনিয়র ট্রেণিং নেন, সেই স্কুল থেকেও ঋণ পরিশোধের ডাক আসে। ব্রাহ্ম ট্রেণিং স্কুলে তিনি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদ গ্রহণ করেন।

এই সময় শ্যামমোহিনী দেবী যে কি ভীষণ পরিশ্রম করেন তা কল্পনা করাও যায় না। ভবিষ্যতের মহীরুহের সম্ভাবনা তার মধ্যে। তাই প্রকাশ-মুহূর্তেই নিজের বিশালতার তিনি পরিচয় রাখতে চান।

তাই দেখা গেল, এতগুলি কাজের মধ্যে থেকেও তিনি আরো সময় হাতে রেখেছেন। সেই সময়ে কর্পোরেশনের একটি স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দেশ জুড়ে এসময় স্বদেশপ্রেমের তরংগ। সেখান থেকে শ্যামমোহিনীও নিজেকে দূরে রাখতে পারলেন না। শিক্ষার সংগে সংগে মেয়েরা যাতে সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী হয় সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। তাই তিনি ব্রাহ্ম ট্রেণিং স্কুলের মাঠে মেয়েদের লাঠি-ছুরি খেলার ব্যবস্থা করেন। মেয়েদের সংগে সংগে তিনি নিজেও খেলা শিখতেন। শিক্ষা দিতেন পুলিন দাস।

চরকা, খদ্দর, মহিলা সমিতির মাধ্যমে তিনি দেশের স্বাধীনতাআন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। অসহযোগ আন্দোলনে ... চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে ... আসেন। কিন্তু যেখানেই তিনি ... সেখানেই শিক্ষা এবং বিশেষভাবে ... শিক্ষার সংগে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এখানকার একটি প্রাইমারী স্কুলে এম-ইতে উত্তীর্ণ হয়।

১৯৩১ লেডি অবলা বসু ... মোহিনী দেবীকে কলকাতা ... অনুরোধ করেন। সে ডাকে সাড়া ... কলকাতা আসেন তিনি। এবার তাঁর ... অপেক্ষা করছিল আরো বৃহৎ দায়িত্ব। ... বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। এই সুযোগে তিনি ... সমাজ, ঠাকুরবাড়ি এবং অন্যান্যের ... পরিচিত হন। বাণী ভবন-এর ... শ্যামমোহিনী দেবীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মুক্তির পথ পায়। এখান থেকেই বাণী পীঠ'এর পরিকল্পনা তাঁর মনে দৃঢ় ... দৃঢ়তর হয়।

১৯৩৪ সালে মাত্র দুজন ... শ্যামমোহিনী দেবী বাণী পীঠ-এর ... করেন নারকেলবাগান লেনে। ... অবলা বসু খুবই আনন্দিত হন। ... তিনি যখন জানতে পারেন বিদ্যাসাগর ... ভবনের মতই শিক্ষা এবং ... সবকিছুর সুযোগই বাণী পীঠে ... ১৯৩৫ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন ... নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ ... করেন নিজের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করে ... জন্যে।

বাণী পীঠ ... রূপ পায় ... মহীরুহের রূপ নিতে ... ইতিমধ্যে কলকাতায় ঘনিয়ে আসে বিশ্ব ... বোমার আশংকায় কলকাতায় স্কুল ... তখন অসম্ভব। শ্যামমোহিনী দেবী ... সবকিছু গুটিয়ে চলে যান ... করনজায়।

১৯৪৩ সালে তি... আবার ... আসেন। এরই মধ্যে একবার ... স্থানান্তরিত হয় কৃষ্ণনগরে। এমনি ... স্থানান্তর বাণী পীঠ-এর জীবনে ... উল্লেখযোগ্য দিক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ... স্থানান্তরের মধ্যেও বাণী পীঠ-এর ... মৌল পরিবর্তন হয়নি।

অনেক ঘোরাঘুরির পর ১৯৪৬ ... ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে এই ... পীঠ স্থায়ী রূপ পায়। ... সেকেণ্ডারী স্কুল বা কলেজেই ... দেবীর সাধনা শেষ হয়নি। ... তিনি গড়ে তুলেছেন শিল্প ... ছাত্রী নিবাস। এছাড়া প্রাইমারী স্কুল আছেই।

আরো উল্লেখযোগ্য, বাণী পীঠ ... রূপ পাবার পর শ্যামমোহিনী ... সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন ... ভারত নারী শিক্ষা পরিষদকে। ... সম্পাদকরূপেই এখন তিনি কাজ ... আর সেইসংগে চলছে তাঁর উত্তর ... সন্ধান।

—প্র

তার প্রকৃতি

…বাণীর সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে …র আলোচনার শ্রোতাই সম্ভবত কম। আর সেই কারণেই বোধহয় …র আলোচনার সংখ্যাও অনেক …লেকভাবে। ১৯৬১ সালে একটা …ওয়া হয়েছিল তাতে দেখা গেছে, …র সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে …র আলোচনার ভাগ মাত্র ৫·৫১

… বেতারে সম্প্রচার চালু হবার … দীর্ঘ ২৫ বছর কথিকার জন্য … ছিল সাধারণভাবে ১৫ মিনিট। … গেল এই সময়টা অনেক বেশি। … দেওয়া হল। এখন অধিকাংশ সাধারণত ১০ মিনিটের মধ্যে …কে। একটা কথিকার পক্ষে …ই মনে হয় ঠিক সময়।

… কথিকা আর আলোচনা যে … অর্জন করতে পারেনি তার কারণ … সময়ের কম-বেশি নয়। তার … অভাব : বিষয় নির্বাচনে, বক্তা … পরিবেশনে…।

…বাণীর জুনিয়র প্রোগ্রাম … রচিত 'হ্যান্ডবুকে' বলা … লোকের ধারণা, বিষয় যা-ই … প্রত্যেকটি কথিকাকেই এক-… হতে হবে। তাই … কথক তাঁদের কথিকাকে … দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন— … কথিকা আলু বোনা সম্পর্কেই … ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্পর্কে, … চলা সম্পর্কে। এই সব … উদ্দেশ্য কিন্তু স্পষ্টভাবে ও … কিছু জ্ঞাপন করা।' … অভিমত। আর একটা … সম্প্রচার যদি আনন্দদান … সম্প্রচারককে কেবল আনন্দ … না, তাঁকে প্রত্যয় জন্মাতেও

… প্রত্যয় জন্মানোর জন্য ভাষাকে … করার দরকার … সত্য যে, বেতার কথিকার … কিছু জানানো, অর্থাৎ …—কিন্তু তাই বলে সব সময় … জোর দিলে চলে না। … জোর দিতে হবে, … উপরও। ভঙ্গি … দিকটি উপেক্ষা করলে

… অধিকাংশ কথিকায় … স্টাইলকে অবহেলা করে বিষয়ের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা বলা হয় তার উপরই বেশি জোর পড়ে, যেভাবে বলা হয়, তার উপর নয়। যে-দেশের বেতার প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত এবং শ্রোতাদের শিক্ষা দেওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য সে-দেশে এটা অনেকটা অবশ্যম্ভাবী। যে বক্তা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই বড়ো বলে মনে করেন, তাঁর চেয়ে যে বিশেষজ্ঞ তাঁর কথিকাকে তথ্যভারাক্রান্ত করে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, আকাশবাণীতে তাঁরই কদর বেশি।

কিন্তু একটা কথিকা কী রকম হওয়া উচিত? প্রথমত, অবশ্যই, শ্রোতারা আনন্দের সঙ্গে কথিকাটি শুনবেন; দ্বিতীয়ত, কথিকাটি বিষয়টি সম্পর্কে শ্রোতাদের আগ্রহ সৃষ্টি করবে। রসাল কথোপকথন যেমন হয়, কথিকাকেও তেমনি হতে হবে—তাই বলে তার ভাষা সাধারণ কথোপকথনের মতো স্ল্যাং হবে না মোটেই, তাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি থাকবে না, এবং শেষটা সিদ্ধান্তহীন রয়ে যাবে না। সাধারণ কথোপকথনের মধ্যে যে সজীবতা থাকে, ঘনিষ্ঠতা থাকে, সহজতা থাকে—তার সবই থাকে। লেখায় প্রকাশভঙ্গির মতো বলায় প্রকাশভঙ্গিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ছন্দ ও স্বরভঙ্গি বেতারের কথিকার একটা বড়ো জিনিস। কথককে সেটা আয়ত্ত করতে হয়। 'লেখা কথা' আর 'বলা কথা'র মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কী সেই পার্থক্য তা তাঁকে বুঝতে হবে।

বেতারের কথিকা আর আলোচনার মধ্যে পার্থক্য শুধু বহিরঙ্গের: কথিকা কেবল একজনের, আর আলোচনা একাধিক লোকের। কথিকায় একজন লোক যে কথা-গুলো বলেন, আলোচনায় তা-ই একাধিক লোক বলে থাকেন। অন্তরঙ্গে কথিকা আর আলোচনা এক। তাই বেতারের আলোচনাকে অনেক দিক দিয়ে কথিকারই সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে।

এই কথিকা আর আলোচনা যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক, সজীব ও প্রাণোচ্ছল হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাতে যেন অপ্রাসঙ্গিক জিনিস না এসে পড়ে, জোর করে কোনো কিছুকে টেনে বড়ো করা না হয়, ছোটোখাটো অবান্তর কথারও জাল বুনে না ওঠে—ড্রয়িংরুমের আলোচনায় যেমনটি হয়ে থাকে সাধারণত বেতারের আলোচনায় ড্রয়িং-রুমের সতেজতা, আন্তরিকতা আর সরলতা থাকবে, কিন্তু তার শিথিলতা নয়। একটা সুপ্রযোজিত আলোচনা শুনে মনটা ভরে ওঠে। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মনে কোনোরকম টান থাকে না। আলোচনা শুনে মনে হয়, তাঁরা যেন তাঁদের পছন্দ-মতো বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন, তাঁদের আলোচনা যে অন্যরাও শুনছেন সে-খেয়াল তাঁদের থাকে না। এটা একদিনে হয় না, হঠাৎ হয় না। এর জন্য অনেক দিনের চেষ্টা চাই, চিন্তা চাই। আর, আগে থেকে মহড়াও দিয়ে নিতে হয়। যে কোনো বেতার প্রতিষ্ঠানে এই মহড়া একটা 'অবশ্য' জিনিস। কিন্তু আমাদের আকাশ-বাণীতে নয়। আকাশবাণীর কর্তারা এই মহড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তার সুবিধাও হয় না তাঁদের। কিন্তু এটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে : তাঁদের গরজ নেই মহড়ার, আর তেমন তেমন লোকদের প্রচারের বা রেকর্ডিংয়ের আগে মহড়া দিতে বলার সাহসও হয় না।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে দিল্লীতে একটা লিস্‌নার রিসার্চ সার্ভে করা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে শ্রোতাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ কথিকা শুনে থাকেন। এত কম শ্রোতৃসংখ্যা আকাশবাণীর আর কোনো অনুষ্ঠানেরই বোধহয় নেই। অথচ দেশের, বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশের লোককে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে কথিকা আর আলোচনার ভূমিকা অনেকখানি। এই বিশাল ভারত-বর্ষের কোটি কোটি লোক এখনও নিরক্ষর—খবরের কাগজ, বইপত্র এসব তাঁদের নাগালের বাইরে। তাড়াতাড়ি তাঁদের শিক্ষিত করে তোলায় রেডিও একটা মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এবং তা করতেই হবে। এই ট্রানজিস্টরের যুগে দূরে পল্লী-গ্রামেও রেডিও-সেট পৌঁছে গেছে—কমিউনিটি সেন্টারে অথবা বিত্তশালী চাষী পরিবারে। বিত্তশালী যে পরিবারে একখানা খবরের কাগজ ঢোকে না, সেই পরিবারে রেডিও অবাধে, সাড়ম্বরে প্রবেশ করেছে; অনুরোধের আসর, [illegible] গান, আর বিবিধ ভারতীর [illegible] চটুল উন্মাদনা-ভরা হিন্দী গানে সকলে পাগল হচ্ছে। বেতার কর্তৃপক্ষের উচিত, এই পাগলামিটাকে [illegible] গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা; [illegible] কথিকা আর আলোচনার দিকে [illegible] দৃষ্টি দেওয়া।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২২ ফেব্রুয়ারী গল্পদাদুর আসরে বা ও বাপুজী সম্পর্কে বললেন শ্রীমতী স্বর্ণলিকা সেন। স্বল্প পরিসরে এঁদের মোটামুটি স্পষ্ট একটা পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীমতী সেনের বলার ভঙ্গিটিও সহজ, কিন্তু স্ক্রিপ্ট পড়ার ভাবটা পরিহার করতে পারলে ভালো হ'ত।

এই আসরের পরে সমবেত কণ্ঠে শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় রচিত দেশাত্মবোধক গানও ভালো লাগল।

২৪ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠান 'কল্লোলিনী কলকাতা', পরিচালনা করেন শ্রীপংকজ সাহা।

কলকাতা কতখানি কল্লোলিনী তা কলকাতায় না এলে বোঝা যায় না। কিন্তু তা বুঝতে কলকাতায় এলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। কলকাতার মানুষ এই অসীম জনসমুদ্রে, তার কর্ণ-ভেদী কল্লোলে কেমন করে দিন যাপন করছে তার খণ্ড-খণ্ড কতকগুলো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। চিত্রগুলি খণ্ডিত হলেও স্পষ্ট, প্রাণবন্ত। কলকাতা-বাসীরা এই চিত্রগুলির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়ে জীবনটাকেও নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন মনে হয়।

এই দিন বেলা আড়াইটের বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে ভারতের মহাপুরুষদের প্রসঙ্গে রামানন্দ সম্পর্কে শ্রীবিপুল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কথিকাটি উল্লেখযোগ্য।

২৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিচিত্রানুষ্ঠানে প্রচারিত হ'ল বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান : বীরভূমের কবিগান। বেশ লাগল, সুন্দর লাগল।

কবিগান গাইলেন শ্রীবটকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীআনন্দ-গোপাল মণ্ডল ও শ্রীশরদিন্দু মণ্ডল। এঁদের টিম-ওয়ার্কটা সুন্দর।

গানের আগে যে ভূমিকাটা ছিল বিশ্ব-ভারতীর কর্মিবৃন্দের সেটাও বেশ সরস ও সজীব হয়েছিল। একেবারে ঘরোয়া।

২৬ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে শ্রীপ্রদীপ দাসগুপ্তের আধুনিক গান ভালোই লাগল। কিন্তু কান্নার ভাবটা কি কিছুতেই ছাড়া যায় না? আধুনিক গান গাইতে গেলেই কি কাঁদতে হবে?

২৭ ফেব্রুয়ারী সকাল পৌনে ৮টায় তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। তিনখানি গানই সুন্দর, বিশেষ করে শেষের দুখানি—'দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন' ও 'একমনে তোর একতারাতে'।...৮টায় লোকগীতি গাইলেন শ্রীমতী মিনু দে। খুশি হওয়া গেল না। লোকগীতির গায়কীই পাওয়া গেল না।... সওয়া ৮টায় আধুনিক গান গাইলেন শ্রীবলরাম দাস। সেই কান্নার সুর। অসহ্য।

২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১২টায় বেতারজগতের অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিন্তু প্রচারিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের পরে ঘোষক জানালেন, এবার ক্ল্যারিনেট (ঘোষ-কের উচ্চারণে অবশ্য ক্ল্যারিওনেট) শোনা যাবে। গেল, কিন্তু তার আগে কিছুক্ষণ 'ফিলার' হিসাবে মিশ্রবাদ্য শোনা গেল, তার আগে কিছুক্ষণ কিছুই শোনা গেল না। এবং ক্ল্যারিনেটের শেষে ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'এই অনুষ্ঠানের প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।'

কিন্তু দুঃখ এইখানেই শেষ হয় নি, আরও দুঃখ পড়ে ছিল পরের জন্য। দুঃখের ঘোষণার পর ঘোষক জানালেন, 'এখন দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।' কিন্তু না, বাংলায় নয়, যতদূর বোঝা গেল, অহমীয়ায় এক ভদ্রলোক সংবাদ পড়তে শুরু করলেন। একটু পরে তিনি থেমে গেলেন এবং বাংলা সংবাদ শুরু হ'ল। মা পাঠক, এখনও দুঃখ শেষ হয় নি, আসল দুঃখ এর পরে—যখন বাংলা সংবাদ-ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'যুবরাজ বীরেন্দ্রর সঙ্গে যুবরাণী আই-শরিয়ার বিবাহ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।' আইশরিয়া? প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল কানে। আই-শরিয়া ঐশ্বর্য কেমন করে আইশরিয়া হলেন? বেশি চিন্তার দরকার হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হ'ল আকাশবাণীর দপ্তরে খবরটা এসেছিল ইংরেজীতে, তাতে ঐশ্বর্য ইংরেজী বানান ছিল Aishwarya.—অনুবাদক Aishwarya-কে আই-শরিয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না, পেরেছিলেন। এইদিন রাত ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত [illegible] সংবাদে অন্য একজন ঘোষক ঐশ্বর্য বলেছিলেন।

মা পাঠক, দুঃখ এখনও শেষ হয় নি, আরও আছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন তা বোধ হয় দিল্লীর [illegible] বিভাগ জানেন না। জানলে কি তাঁর মৃত্যুসংবাদটা একেবারে শেষ দিকে [illegible] করতেন! অথবা জানতেন এবং [illegible] তাঁর মৃত্যুসংবাদকে [illegible] কারণ তিনি তো সামান্য [illegible] মাত্র ছিলেন, রাজনৈতিক নেতা [illegible] তো ছিলেন না। এবং [illegible] দাম নেই, অথবা [illegible]

কলকাতা [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকখানি [illegible] ছেন। অবশ্য সংবাদে নয়, [illegible] রাত সওয়া ৮টায় নির্ধারিত [illegible] বাতিল করে সেখানে তাঁরা [illegible] বিশীর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রচার করেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি মর্মস্পর্শী। চার মিনিটের মধ্যে গভীর [illegible] ভরা শ্রীকুমারের যে পরিচয় তিনি [illegible] তা সুন্দর।

১ মার্চ সকালে শিশুমহলে [illegible] ভালুকের গল্প শোনালেন শ্রীমতী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ লাগল। গোড়ায় কিছুটা কৃত্রিমতা ছিল, কিন্তু [illegible] তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

এই গল্পের পরে শ্যামাসঙ্গীত শিশুশিল্পী সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য। [illegible] লাগল।...এর পরে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি করল কল্পনা চট্টোপাধ্যায় গুহরায়। তা-ও সুন্দর লাগল।

—শ্রী

জলসা

যুগলবন্দী অনুষ্ঠানে আলি আকবর এবং বিলায়েৎ খাঁ। —ফটো : অমৃত

শিল্পী সংসদের তরফ থেকে ও শ্রীমতী চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য ...ত ওস্তাদ আলি আকবর ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর দ্বি-সান্ধিক ... বন্দী অনুষ্ঠান—সংগীত রসিক ও ...মহলে—এক রোমাঞ্চকর কৌতূহল ও ... সৃষ্টি করেছিল। এ অনুষ্ঠানের ... নতুনত্বের কারণে। বিভিন্ন ঘরানার বিভিন্ন শিল্পীর দ্বৈতবাদন, কয়েক মাস ... দিল্লীতে এবং সম্ভবত ১৯৫৭ অব্দে ...তে হলেও কলকাতায় শিল্পীর যুগল-...র আসর এই প্রথম।

দুদিনের অনুষ্ঠানে এঁরা যথাক্রমে ... রাগ বাজিয়েছেন পূরবী-কল্যাণ, বেহাগ —এবং উপসংহারীয় ধুন বা ঠুংরী ... পরিবেশিত রাগ ছিল মিশ্র পিলু ...রবী।

যুগল-বন্দী—বলতে বোঝায় দুই ...র মিলনজাত আনন্দমুখর সংগীত-... বন্ধনের ভিত্তি পরস্পরের সংগীত-... নিবিড় ঐক্য, একই ভাবের ভাবুক ...সংগীতসাধকের ধ্যান ও চিন্তার বিচিত্র ... সমৃদ্ধ এক শিল্পসুন্দর প্রকাশ। ... বোঝাপড়ার দরুন একে অন্যের ... আবার যুগ্ম-সৃজনে একে যাতে ... ছাপিয়ে উঠতে না পারে তারই ... প্রয়াস।

দুই ঘরানার—শিল্পীর পক্ষে এতগুলি ... পূর্ণ করা অসম্ভব—কারণ উভয়ের ... বাদন-পদ্ধতি এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর ...পার্থক্য ত ছিলই তাছাড়াও ওস্তাদ ... আকবর ও ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ... সাংগীতিক ধর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণ ... ধরনের।

কিন্তু এগুলি বাধা সত্ত্বেও এঁদের ... ও সেতারের যুগলবন্দী জমে উঠে-... এবং শ্রোতারা—তা উপভোগও ...ছেন—তার কারণ উভয়শিল্পীর মধ্যের ... সৌহার্দ। বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের ... আকবরের প্রতি একটা নিবিড় ... শ্রদ্ধাবোধ—এবং মিলনোৎসুক এই ...শিল্পীর প্রতি আলি আকবর খাঁ সাহেবের ...তুল্য স্নেহ-মধুর দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ের ...কে চাকচিক্যে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে। ... চাওয়ার আন্তরিকতায় উভয় তরফই ... এবং অনুষ্ঠানের উপভোগ্য অংশ ...খানেই নিহিত। সম্পূর্ণ ধ্রুপদী ঢঙে আলি আকবর রাগের রূপাভাষ ও আলাপ সৃষ্টি ... চেয়েছিলেন—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ...। বর্ণপিয়াসী বিলায়েৎ তাঁর রঙিন মনের অদম্য চাঞ্চল্যে জোড়-অঙ্গের ছন্দ-বৈচিত্র্যে বাজনার গতিকে নিয়ে আসবার জন্য চঞ্চল। আলি আকবর বাধা দেননি—বরং বিরাট শিল্পীর সীমাহীন ঔদার্যে বিলায়েৎকে প্রশস্ত অবকাশ দিলেন—সেতারের ওপর তাঁর কিম্বদন্তীতুল্য দখল—দক্ষিণ ও বাম-হস্তের বিস্ময়কর কারিগরী দেখাবার।

বিলম্বিত অঙ্গে কিছু পর্দা টপকে গিয়ে বিলায়েৎ বিজলীর চকিত আলো ঝলকানো ঘষেটি তানের চমক, দীর্ঘস্থায়ী মীড় ও আশের রংবাহারী ঝিকিমিকিতে শ্রোতৃচিত্ত ভুলিয়ে দিলেন। এ যেন শ্রোতৃ-চিত্তে তাঁর যথাযথ পদ্ধতিতে এগিয়ে না যাওয়াজনিত ক্ষুন্নতার ক্ষতিপূরণ।

আলি আকবরের নিমেষের বিস্তারে—নির্নিমেষে মুগ্ধ করার গভীর সম্পদ (যা একান্তভাবেই তাঁর ধ্রুপদী মনের সৃষ্টি)—তাঁর সমুদ্রতুল্য সাংগীতিক জ্ঞান স্থিতধী ও প্রশান্ত সম্বন্ধে শ্রোতাদের নতুন করে অবহিত করল:

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বোধহয় কোনদিনই ভুলতে পারবেন না 'বেহাগ'—রাগ বাজানোর সময় আত্মভোলা আলি আকবরের ধৈবত স্পর্শের রোমাঞ্চিত উন্মাদনা। ধৈবত-স্বর বেহাগে দুর্বল কিন্তু এই দুর্বল স্বরেরও যে নিজস্ব একটা বক্তব্য আছে—এবং সে লাজুক ভাষা সবার কাছে মুখ খোলে না। চুপিচুপি তার প্রাণের কথা বলে সেই মহাশিল্পীর কাছেই যিনি এ ভাষার বেদনাকে অনুভবের মর্যাদা দিতে পারেন।

শিল্পীজনোচিত সংযমে পণ্ডিত শান্তা-প্রসাদ সংগত করেছেন উভয় শিল্পীর মেজাজের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখে। ঠুংরি অঙ্গে পিলুই সমধিক চিত্ত-গ্রাহী হয়েছিলো পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরি-বেশনার জন্য। 'ভৈরবী'-তে উভয় শিল্পীর মুন্সীয়ানা ও আঙ্গিক-শৈলীর প্রাচুর্য থাকলেও ঝালার গতিবেগের দ্রুততায় সুরের চেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসই যেন প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। এককভাবে দুই শিল্পীর বাজনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ—উপভোগ্য—উভয়ের মিলনজাত কোনো সামগ্রিক সামঞ্জস্যের স্বস্তি এতে মেলেনি এ সত্যও অনস্বীকার্য। কিন্তু —দুই

অঞ্জনা নিবেদিত কথানে গালিব নৃত্যনাট্যের কয়েকজন শিল্পী। —ফটো : অমৃত

জাতের দুটি মন—একসঙ্গে মিলতে চেয়েছে। **এই চাওয়ার ঔদার্য ও প্রসারতাই এখানে বড় কথা এবং উল্লেখযোগ্য সংবাদ।**

পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স। তিনদিনের স্বল্প-পরিসরে পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স সুনির্বাচিত কয়েকজন শিল্পীকে উপস্থিত করেছেন এক পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিবেশে। 'আমরা শিল্পী-সংখ্যাধিক্যে বিশ্বাস করি না, উপভোগ্য পরিবেশন মানই আমাদের লক্ষ্য'—উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন সংঘ-সচিব শ্রীসতীন সেন। সঙ্গীত-সভার উদ্বোধন হয় শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের 'বন্দেমাতরম' দিয়ে। কণ্ঠ-সঙ্গীতের আসরের আকর্ষণ ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ ও সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক। ওস্তাদ আমীর খাঁর গান শুরু হোলো 'কৌশিকী কানাড়া' দিয়ে। ওস্তাদের শান্ত মেজাজের অনুকূলে 'বাগেশ্রী' অঙ্গেই এই ভাবগম্ভীর রাগ পরিবেশিত হয়। সীমার মাঝে অসীম-কে প্রত্যক্ষকরণের মতই, পরিমিত বিস্তার ও স্বল্পকাটি তানের মধ্যে শিল্পীর অন্তর্মুখীন ধ্যানকল্প রূপটি যেন শ্রোতৃচিত্তে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সুগম্ভীর এই রাগের পর শ্রোতৃচিত্তের স্বচ্ছ মুক্তি ঘটল বসন্ত-বাহারের কোমল মাধুর্যে। তবে পঞ্চমের উল্লাসের চেয়ে মধ্যম-এর স্নিগ্ধ-সজল মোড় ফেরাই এখানে রসসৃষ্টির উৎস। কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণে বাধা হয়ত ছিল, কোনো পর্দায় হয়তবা সুর কম বলেছে কিন্তু সব ত্রুটি ভুলিয়ে দিয়েছে শিল্পীর অসাধারণ শিল্পবোধ।

সুনন্দা পট্টনায়ক গাইলেন 'মালকোষ'। অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ তাঁর মূলধন। এর সঙ্গে মিশেছে রেওয়াজী তানের সমারোহ। উচ্চগ্রামী যে-কোনো পর্দায় কণ্ঠের 'ভলিয়ুম' পরিবর্তিত না করেও অনায়াস-দক্ষতায় সঞ্চারণ, সুরের ওপর স্থিতি। এর আগে তারসপ্তকের পর্দাতেই তাঁর দক্ষতা শ্রোতাদের বিস্মিত করেছে। কিন্তু এই প্রথম মন্দ্রসপ্তকে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বিস্তার এবং তানাচাঞ্চল্যের সংযম শিল্পীচিত্তের পরিণতত্বের বিকাশে সূচিত। এ টি কাননের গজুটিটোড়ি তাঁর স্বভাবানুগ দক্ষতায় পরিবেশিত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'গাওতি' ও ঠুংরি সঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতে ভি জি যোগ বাজিয়েছেন স্ব-নামের ছন্দে মেলানো রাগ 'যোগ'। পরে ঠুংরী। 'যোগ'-এ চাঞ্চল্য থাকলেও শিল্পীর পাণ্ডিত্য ও আনন্দময় মেজাজ অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তুলেছে। মণিলাল নাগ তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সু-পরিচিত। ইনি যে একই জায়গায় থেমে নেই এবং প্রাপ্ত প্রশংসাকে প্রাপ্তির শেষ সীমা বলে মনে করেন না, সেদিনের বাজনাই তার প্রমাণ। 'জয়জয়ন্তী' আলাপে প্রতিটি অঙ্গ যেমন সু-বিশ্লেষিত, তেমনই সরস মাধুর্য ছিল 'গাঢ়া' রাগের গতে। তান, মীড়, ঝালা—সকল অঙ্গেই পরিশীলিত অঙ্গুলি বাজ ও সন্ধানী মনের পরিচয় সুমুদ্রিত। আমজেদ আলি খাঁর 'দরবারী কানাড়া' উচ্চমানের। পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন 'কোমল রেখভ আশাবরী'। ধীর পদক্ষেপে রাগ-বিস্তারের ক্রমপ্রসারে পুঞ্জোর আকৃতি ও অনুভাব। সারা প্রেক্ষাগৃহে এক ভাবগাঢ় তন্ময়তার সৃষ্টি করে। মুগ্ধকারী মীড়ের অস্ফুট শ্রুতিতে দূরাগত বাঞ্জনার রেশ মনের মধ্যে এক অনপনেয় রেখাপাত ... মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে ... ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ... নাথের এবং ডোভার লেনে ওস্তাদ ... খাঁর গাওয়া 'কোমল আশাবরী'।

সুরেশ সঙ্গীত সংসদ আয়োজিত ... রবীন্দ্রসদন মঞ্চে নিবেদিত সঙ্গীত ... সম্মেলন পরিকল্পনার অভিনবত্ব ... অভিনন্দনীয়। নয়াদিল্লী ... এই ... সর্বভারতীয় প্রা... ভিত্তিতে ... নামী শিল্পীদের ... স্থাপন এবং ... রসিক মহলকে তাদের কৃতিত্ব ... অবহিত করার রসমূল্য ত আছেই ... তথ্যমূল্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যও ... ভবানী দাসের 'বন্দেমাতরম' গানে ... শুরু, মঙ্গলাচারণ পাঠ করেন ... হরিনারায়ণ বেদশাস্ত্রী। সানাই-এ ... অনুষ্ঠানের প্রথম অধ্যায় ... আলি আহমেদ হোসেন। এর পর ... দিনে ত্রিপুরা-দিবস, বিহার-দি... ইণ্ডিয়া-ডে, রবীন্দ্র-দিবস, পশ্চিম ... দিবস, আসাম ও মণিপুর-দিবস ... ভারতীয় দিবস, উড়িষ্যা-দিবস ... দিবস এবং সর্বভারতীয় দিবস ... অনুষ্ঠান) দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ...

প্রশংসনীয় বিষয় ঘড়ির কাঁটা ... উঠলো। অনুষ্ঠান-সময় নির্ধারণ ... সময়ে পরিসমাপ্তি। এর জন্য ... মঞ্চ-ব্যবস্থাপক বিজয় চক্রবর্তী ... মানের শিল্পীর অনুষ্ঠান সু... তোলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ... লক্ষ্যণীয়। সকল অনুষ্ঠানে আসর ... থাকতে পারিনি। শোনা গেছে, ... দিনই হল প্রায় ফাঁকা ছিল। একদিন ...

মণিলাল নাগ

...দের বাজনার দিন সারা প্রেক্ষাগৃহে ...লোক যেন আর ধরে না। টিকিট ...র্থীরা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে ...সমাগমের পরিপ্রেক্ষিতে রবি... ...ই শ্রীমতী এম এস শুভলক্ষ্মীর ...র বিরজু মহারাজ এবং সুনন্দা ... এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আমরা ... দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ... সুযোগ্য পুত্রদ্বয় বিজয় ... নির্মল চক্রবর্তীকে শিল্পীরূপে ...শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত ... সুরেশবাবুর সৃষ্ট বহু ... হবি পুত্রদের মাধ্যমে শ্রোতাদের দরবারে পৌঁছত, তাঁরাও খুশি হতেন, 'সুরেশ-সংসদ' নামের সার্থকতাও বাড়ত। দ্বিতীয়তঃ, অনুষ্ঠান-পুস্তকে যোগদানকারী সর্বভারতীয় সকল শিল্পীরই ছবি আছে, শুধু সুনন্দা পট্টনায়কই বাদ। এতবড় সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের এ-ত্রুটি থাকা উচিত নয়।

সকল শিল্পীই আপনাপন মান অনুযায়ী যথাসাধ্য 'সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন, সে ত আগেই বলেছি। মজা হয়েছিল শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর দিন। নামের রূপকথাতুল্য স্বপনচারিতা অথবা গ্ল্যামার, যে- কোনো কারণেই হোক, সকলে এবং সপরিবারে আগেভাগেই এসে হাজির। চোখের দেখাটাও ত কম নয়। কিন্তু গান শুরু হওয়ার পর দাক্ষিণী সঙ্গীতে অনভ্যস্ত কান বা যে-কোনো কারণেই হোক, দু-চার মিনিট শুনেই অধিকাংশ শ্রোতা উধাও।

তবে যথার্থ সঙ্গীত-রসিক যাঁরা, তাঁরা প্রথম থেকে শেষ অবধি মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আকণ্ঠ ভরে পান করেছেন—এই সাধিকা শিল্পী পরিবেশিত সঙ্গীত-প্রবাহের অমৃতধারা। দীর্ঘ তিনঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে ইনি গাইলেন যথাক্রমে পান্থুবড়ালী, মুখারী, মায়ামালবগোলী, শঙ্করাভরণম্। হিন্দুস্থানী রাগ, জয়জয়ন্তী রাগ পরিবেশনা স্থায়িত্বে অল্প কিন্তু গভীরতায় অতলস্পর্শী। এরপর ভজন, ডি এল রায়ের গান রবীন্দ্রসংগীত।

সঙ্গে সুযোগ্য মৃদঙ্গসঙ্গতে ছিলেন ভি ভি সুব্রহ্মণম (বেহালা), টি কে মূর্তি (মৃদঙ্গম), ভি নাগরাজন (খঞ্জিরা), টি এইচ বিনায়করাম (ঘটম)। পণ্ডিত রবিশঙ্করের ঝিঁঝিট রাগের আলাপ পাণ্ডিত্যে, বৈদগ্ধ্যে, উপাদান-সম্ভারের বৈচিত্র্যে, সর্বোপরি শাস্ত্রীয় শুদ্ধতায় বিরুদ্ধ সমালোচনার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে। সিংহেন্দ্র মাধ্যমের গাম্ভীর্য ও ছন্দ-বৈভব চিত্ত দুলিয়ে দিয়েছে। আল্লারাখার তবলাও এর জন্য অনেকখানি দায়ী। সুনন্দা পট্টনায়কের 'মধুবন্তী'তে শিল্পীর এক নূতন দিক উদ্ভাসিত।

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে চিন্ময় লাহিড়ীর গান্ধারিকা এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। শিল্পীর সুর লাগানোর যাদুকরী ক্ষমতা মুহূর্তেই যেন আসর জমিয়ে দেয়। বিস্তার তান ভাবের অনুগামী হয়ে রাগের যথার্থ মূর্তিটির সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচিত করে। এর ওপর চিন্ময়বাবুর উদাত্ত কণ্ঠ-মাধুর্য, আনন্দভরা মেজাজ ও সৃজনশৈলী ত আছেই। এঁর গান শুনে শুনে যেন আশ মেটে না। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইমন' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার শুধুমাত্র রাগ-শুদ্ধিতার কারণেই নয়। শিল্পীর সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা যথার্থ। শিক্ষা ও অনুধাবন মিলে অনুষ্ঠানটি শিক্ষণীয় দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছে।

আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। উত্তরভারতে দাক্ষিণভারতীয় রাগ জনপ্রিয় করার প্রসঙ্গে শুভলক্ষ্মী-পতি সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও 'কল্কি' পত্রিকা সম্পাদক শ্রী টি এস সদাশিবম পণ্ডিত রবিশঙ্করের নামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

সুরঙ্গমার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংগে নাচে শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত।

...শিল্পীত্রয় মালহোত্রা ভগিনী সেংধে, সীতা ও মীরা মালহোত্রা।

নাগেশ্বর রাও

একটি আদর্শ মহৎ প্রাণ

অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি—মানুষের ... কিছু কাম্য, সমস্ত পেয়ে সাফল্যের ... বসেও ভদ্রলোক বললেন—'আই ... গাটার বয়। (অত্যন্ত দারিদ্র পরিবারে ... জন্ম); তাই লেখাপড়া বলতে গেলে ... কিছুই শিখিনি। কোনক্রমে ক্লাশ ... সিক্স পর্যন্ত এগুতে পেরেছিলুম। ... ন' বছর বয়সেই আমি মেয়ে সেজে ... নামি এবং উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ... গত রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করি। ... সময়ে মিঃ স্বামী নামে একজন ... প্রযোজকের নজরে পড়ি; তিনি ... একটি ছবির নায়কের ভূমিকায় মনো... করেন। সেটা হচ্ছে ১৯৪৪ সাল ... থেকে একটানা পঁচিশ বছর ধরে ... নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে ... ১৯৬৩ থেকে আমার ... স্থল হয়েছে হায়দ্রাবাদ। আজ আমি ... প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান, একটি ... প্রতিষ্ঠান, কয়েকটি চিত্রগৃহ, ... খানা, প্রকাণ্ড বাড়ো খামার এবং ... ফলবাগিচার মালিক। প্রচুর আমার ... কিন্তু জেনে রাখুন, আমার আয়ের ... তৃতীয়াংশ নিয়মিতভাবে ... দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্যে ... একটি কলেজও আছে। আর একটি ... আমি করেছি প্রযোজক-পরিচালক ... রাওয়ের সহযোগিতায়। ... প্রত্যেকে এক লাখ টাকা করে ... করব, এই অঙ্গীকার ... 'চক্রবর্তী চিত্র' নাম ... কেশনাল অ্যাণ্ড এ... কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ... করে আদর্শ চিত্র নির্মাণ করব ... আমাদের প্রথম ছবি ... বড়) চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ ... —কথাগুলি বলেছেন তেলেগু ... বিশিষ্ট অভিনেতা অক্কিনেনি ... রাও গ্র্যাণ্ড হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিকদের কাছে।

প্রেক্ষাগৃহ

একের অপরাধে অন্যের স্বেচ্ছায় দণ্ডগ্রহণ

আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরস্থ একটি গ্রামের এক কৃষিপরিবারকে অবলম্বন করে মাত্র ন'পৃষ্ঠায় ও তিনটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ 'শাস্তি' নামে রস-কাহিনীটি রচনা করেছিলেন, তাতে এমন কিছু ঘটনার সমাবেশ নেই, যাকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে একটি ঠাসবুনোন পূর্ণ-দৈর্ঘ্য চিত্র গড়ে উঠতে পারে। এতে আসলে ঘটনা হচ্ছে একটিই।

সারা দিন ধরে জমিদার-বাড়ীর চাল ছাইবার কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করে আসার পরে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে বড়োভাই দুখিরাম যখন বড়ো-বৌয়ের কাছে ভাত চাইল, তখন বড়োবৌ রাধা জ্বলে উঠে জবাব দিল, 'ভাত কোথায়, যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।' গৃহিণীর শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের অসহ্য হয়ে উঠল এবং কোনো কিছু না ভেবে স্ত্রীর মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাধা মারা যাওয়াতে দুই ভাই এবং ছোট-বৌ চন্দরা যখন একেবারে হতভম্ব, তখনই এসে হাজির হল চক্রবর্তীমশাই। তাঁর কাছে ছোটভাই ছিদাম নেহাৎই না ভেবে-চিন্তে বলে বসল, 'ঝগড়া করিয়া ছোটবৌ বড়োবৌয়ের মাথায় এক ... কোপ বসাইয়া দিয়াছে।' এবং ... তাঁর পা জড়িয়ে ধরে যখন ... বৌকে বাঁচাবার কি উপায় ... চক্রবর্তীমশাই বুদ্ধি খাটিয়ে ... থানায় ছুটিয়া যা—বলগে, ... ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ... চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল ... স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া ... সত্যিই তাই। অথচ চক্রবর্তীর ... কাজ করলে বৌ হয়তো বাঁচতে ... দাদা খুনের দায়ে জড়িয়ে ... চিন্তায় অস্থির হয়ে ছিদাম ...

...পরে বৌ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ...গেলে আর তো ভাই পাইবনা।'

...কথাটি তীরের মতো গিয়ে ...বুকে বিঁধল। সে মনে মনে ভাবল, ...স্বামী! এই স্বামীকেই আমি ...তবে কাজ কি আমার বেঁচে ...ছিলাম যদিও তাকে বলতে ...বড়োজা আমাকে বঁটি লইয়া ...আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা ...ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া ...লাগিয়াছে।' কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না ...নিজেকে বাঁচাবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা ...না এবং কবুল করল যে, যেহেতু সে ...তাকে দেখতে পারত না, সেই জন্যে ...প্ররোচনায় সে তাকে খুন করেছে। ...পেলে আবার বৌ হবে', স্বামীর মুখে ...নির্মম উক্তি তাকে জীবন সম্বন্ধে ...করে তুলেছিল এবং সে তাই যত-সম্ভব, এই জীবন থেকে মুক্তিলাভের পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

রবীন্দ্ররচনা 'শাস্তি' অবলম্বনে একটি ...তিন বা চার রীলের ছবি তৈরী ...কলে ছায়ালিপি প্রতিষ্ঠান একটি ...রীলের পূর্ণদৈর্ঘ চিত্র দর্শকদের ...দিতে গিয়েছেন বলেই ছবিটির ...হয়েছে আলগা, বহু দৃশ্যই হয়েছে ...দীর্ঘায়িত ও পৌনঃপুনিকতাদোষ-...বিশেষ করে বড়োবৌ ও ছোটবৌয়ের ...দৃশ্যগুলি বারংবার এসে বিরক্ত ...এছাড়া ওদের পারস্পরিক আচ-...সামঞ্জস্যেরও যথেষ্ট অভাব প্রত্যক্ষ ...দৃশ্য রচনারও ত্রুটি আছে। বড়ো-...কোপ বসাতে দুখির পরনের ...ছিটেয় ভরে উঠল, দেখানো ...অথচ ছোট-বৌয়ের হাতে রক্ত ও ...না পড়ে থাকতে দেখে চক্রবর্তী ...সাব্যস্ত করল, দুখির ফতুয়ার ...নজর গেল না, এ কেমন কথা? ...অভিনয়গুণে শাস্তি'র কয়েকটি ...চিত্তাকর্ষী হয়েছে। এক, ...দরুণ ছোটো-বৌয়ের কাছে ...টাকা খরচ করে সোনার ...হয়েছে শুনে দুখি ক্ষেপে ...এবং পরে ঐ মাদুলি বিক্রি করে টাকা ...ছোটো-বৌয়ের মুখের অনু-...আত্মস্থ করে দেয়। দুই, ...রোজগার করে আনব', ...এই কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে দুখি ...করে এবং জোর করে ...দরজা ঠেলে ঢুকে শেষ পর্যন্ত ...করে। বড়োভাই দুখি-বেশে ...বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের ভূমিকায় ...অদ্বিতীয়, তার আর একটি ...রেখেছেন। ছোটভাই ছিদামের ভূমি-...রায়ও চরিত্রটির সঙ্গে প্রায় ...উঠে তাঁর নাটনৈপুণ্যের স্বাক্ষর ...রেখেছেন।

...চন্দরার চরিত্রে সাবিত্রী চট্টো-...ভাবভঙ্গীর প্রকাশে অসামান্য; কিন্তু ...চরিত্রোচিত গ্রাম্যতার অভাব। ...ছবির প্রথম দিকে গ্রামপথে তাঁর ...ভাবে চলনভঙ্গী কিছুটা দৃষ্টি-কটু। বড়বৌ রাধারূপে গীতা দে'র গতি ও ভাবভঙ্গী চরিত্রোচিত, কিন্তু তিনি এত দ্রুত সংলাপ বলেছেন, যে অধিকাংশই শ্রুতি-গ্রাহ্য হয়নি। অপরাপর ভূমিকায় পরলোকগত প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (গোমস্তা চক্রবর্তী), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (নর্তকী), কমল মজুমদার (উকীল) এবং দোষারোপকারী উকীলের ভূমিকায় অভিনয়কারী উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় হচ্ছে মণীশ দাশ-গুপ্তের চিত্রগ্রহণের কাজ। বহির্প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির এক-একটি ফ্রেম বাঁধিয়ে রাখ-বার মতো। ছবির শিল্পনির্দেশনা ও সম্পা-দনাও কৃতিত্বের পরিচায়ক। ছবির গান-গুলির সুরসৃষ্টি ও তাদের সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মেলার ঢপ-গাইয়েরা কীর্তন-প্রধান গান করে না এবং কীর্তনীয়ারা অলকা-তিলকা কাটে। ছোটবৌয়ের মুখের গান সাদামাঠা ও যন্ত্রসঙ্গীতবর্জিত হওয়া উচিত ছিল। কাহিনীর আবহ অনুযায়ী যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবহার হওয়া উচিত।

ছায়ালিপির নিবেদন ও স্বদেশ সরকার পরিচালিত 'শাস্তি' ছবিটি সামগ্রিক অভি-নয়গুণে ও চিত্রগ্রহণ পারিপাট্যের জন্যে দর্শনীয়।

আদর্শচ্যুতির ট্র্যাজিডি

মানুষ সৎপথে চলে সুখী হয় কিংবা অসৎপথে চলে?—এ প্রশ্ন আজ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের মনকে উৎপীড়িত করছে এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, চার দিকেই দেখতে পাচ্ছি আজকের দিনের মানুষ বস্তুসবস্ব মন নিয়ে সৎ ছেড়ে অসতের পথেই ছুটে চলেছে বেশী।

তাই দেখি, এম সি আর ফিল্মস্ (মাদ্রাজ)-এর ইস্টম্যান কলার ছবি সাচ্চাই-এর অন্যতম চরিত্র কিশোর সৎপথে থেকে জীবনে উন্নতি করবেই করবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে এককভাবে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অপারগ হল এবং পকেটমারা, ছিনতাই থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি প্রভৃতির সেরা নায়ক হয়ে 'বাগী সিতারা' নামে খ্যাতিলাভ করল। আর তারই বন্ধু, কলেজ-জীবনে বেপরোয়া অশোক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার পথে চলতে চলতে একটি বিশেষ দুর্ঘটনার মোকাবিলা করতে গিয়ে তার বিবেকের সম্মুখীন হল এবং তারই কর্মের ফলে চির-অন্ধ এক নারীর ক্ষমাসুন্দর মনের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে 'মেহনতী ঔর মজদুরী ভগবানকা পুজা হ্যায়', এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন করে পথ চলা শুরু করল। দুই বন্ধুর কথা ছিল, তিন বছর পরে মহাত্মা গান্ধীর মর্মরমূর্তির নীচে তারা মিলিত হয়ে সৎ এবং অসৎ পথে চলে কে কোথায় পৌঁছুল, তার হিসাব দাখিল করবে। কথামত তারা মিলিত হলও বটে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে যার সৎপথে চলবার কথা, সে হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ 'বাগী সিতারা' আর যার অন্য পথে চলার অভ্যাস ছিল, সে ন্যায়পরায়ণ ইন্সপেকটার অশোক। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কিশোর অর্থের প্রতি অন্যায় মোহের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পেল এবং স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিল।

মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, নৃত্য-গীত, সাসপেন্স প্রভৃতি জনমনোরঞ্জনের প্রভূত উপাদান থাকা সত্ত্বেও 'সাচ্চাই' ছবিটিকে একটি শিক্ষামূলক আদর্শপ্রধান চলচ্চিত্ররূপে আমরা অভিনন্দিত করছি। প্রযোজক এম সি রামমূর্তি এবং পরিচালক শঙ্করকে অশেষ প্রশংসা করব, এমন একটি সত্যাদর্শ প্রচারকে ছবির অঙ্গীভূত করবার জন্যে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে ছবিটির মধ্যে যেসব

তরুণ মজুমদার পরিচালিত কুহেলী চিত্রে সন্ধ্যা মজুমদার এবং বিশ্বজিৎ।

—ফটো : অমৃত

উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কেও খুব বেশী আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু কিশোরকে আদর্শচ্যুত করবার যেসব পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই রয়েছে অবাস্তবতা। যে-কিশোর আদর্শের জন্যে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনকারী পিতার সংস্রব ঘৃণাভরে ত্যাগ করল, সে কিসের মোহে প্রকাশকে তার জীবনের গুরু বলে মেনে নিল, এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কিশোর তো পার্থিব সুখদুঃখের দিকে তাকিয়ে তার বিপথগামী বন্ধু অশোকের সামনে গান্ধীজীর বাণীকে তুলে ধরেনি। তবে সে পার্থিব সুখের দিকেইধাবিত হল কেন, এর কোনো সদুত্তর আছে কি?

অভিনয়ের ক্ষেত্রে শাম্মী কাপুর (অশোক), সঞ্জীবকুমার (কিশোর) এবং নায়িকা সাধনা (শোভা) তাঁদের নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে সঞ্জীবকুমারের অভিনয় আগের থেকে ঢের বেশী উন্নত। মীনা বেশে মেহমুদও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন। জিনতাই দলপতি প্রকাশবেশে প্রাণ যে বিচিত্র অভিনয়কলা প্রদর্শন করেছেন, তাকে অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য ভূমিকায় রাজমেহেরা (দীনদয়াল), জগদেব (শেখর), জনিওয়াকার (সীতারাম), সুলোচনা (কিশোর ও শোভার মা), ধুমল (হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট) প্রভৃতির অভিনয় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে রঙ্গীন ফোটোগ্রাফী ও শিল্পনির্দেশনাকে অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'শ বরষকে জিন্দগীসে অচ্ছে হ্যয় প্যার কে দো চার দিন' গানের দৃশ্যটি ফটোগ্রাফী এবং উপস্থাপনার দিক দিয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছবির সংলাপ ও গান, দুই-ই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ছখানি গানের প্রতিটির সুর চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে 'এ দোস্ত মেরে মৈনে দুনিয়া দেখী হ্যয়', 'বীত চলী হ্যয় রাত হিয়ে বাহার কী', 'মেরে গুনাহ মাফ কর মোর জমীর সাফ কর', 'শো বরষ কী জিন্দগীসে অচ্ছে হৈ প্যারকে দো চার দিন'—এই চারখানি গানই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এম সি আর ফিলমস (মাদ্রাজ)-এর রঙ্গীন ছবি 'সাচ্চাই' আদর্শ, অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা এবং গানের জন্যে সকল শ্রেণীর দর্শকের কাছে আদরণীয় বলে গৃহীত হবে।

মঞ্চাভিনয়

বহুরূপীর নতুন নাটক

একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, ইচ্ছার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে ভেবেছিল ওর ভালোবাসার মানুষ (লোকে যাকে দস্যু বলে জানতো) পৌরুষের যথার্থ দীপ্তিতে বলিয়ান হয়ে শুকনোমাটির বুকে সোনার ফসলের লাবণ্য আনবে, ফুল ফোটাবে তার 'ঠাঙাড়ে' লাঠিতে। একদিন একটি অন্ধকার অতিক্রম করা আলোর উচ্ছ্বাসে সফলতার আভাস এলো। ... হোল উদ্বেল। নিগূঢ় অনুভূতির ... হোল একটি শাশ্বত কবিতা। ... কবিতাই সত্য, জীবনের ... পাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ। সম্প্রতি ... 'বহুরূপী'র নবতম প্রযোজনা কুমার ... 'কিম্বদন্তী' দেখতে দেখতে ... এই সত্যই মনকে আবিষ্ট ও অভিভূত ... ছিল। এঁদের 'বর্বর বাঁশী' ... মনে মোহ ছিন্ন করে বাস্তব ... মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জীবনের ... জের আসল চেহারা তুলে ধরেছে, ... শতাব্দীতে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা ... জটিল এক প্রশ্নের সামনে, আর ... ভাষা দিলো কর্মী মানুষের ... ফুলের মতো জীবনের প্রত্যাশা ... আমরা বাঁচি, বেঁচে থাকার এক ... বাসনায় আমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

কুমার রায়ের 'কিম্বদন্তী'র পটভূমিতে রয়েছে নবাবী আমলের পূর্ববাংলার কিম্বদন্তী কাহিনী। এ কাহিনীর যেমন আছে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার দোলা, তেমনি আছে ... দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, অরাজকতার কথা। এক দস্যুদলের নিষ্ঠুর অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি দিয়েই নাটকের যাত্রা শুরু। হনন, লুণ্ঠন আর ব্যভিচার করাই দলের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিবেকের কিছুটা ক্লান্ত দস্যুসর্দার ... থেকে একদিন উদ্ধার করলো এক ...

...বতী মেয়ে 'সুলভা'কে। নিশ্চিত ...ভূত অপমান থেকে এদের ...'রঙ্গন' সুলভার কোমল ও মনটাকে যেন একটু ছুঁয়ে গেল। ...ভাবলো রঙ্গনকে নিয়ে। রঙ্গনও ...জীবনের স্বাদ পেতে উন্মুখ ...। কিন্তু সুলভা ভাবলো— ...দস্যু হিসেবে রঙ্গনকে সে কোন ...বন্ধনে জীবনে জড়িয়ে ...না। রঙ্গনকে আসতে হবে ...শক্তিমান পুরুষ হয়ে যে শুধু ...লুণ্ঠনের বদলে খোলা ...ফলাতে হবে ফসল, সোনার ফসল। ...করলো রঙ্গনকে। দস্যু-...প্রাণের আবেগে দ্বিগুণ ...কাজে। সবশেষে ফসলের ...স্বপ্ন সফল হওয়ার ...'রঙ্গন' 'সুলভা' হিল্লোলিত ...অনেক দিন রাত পেরিয়ে ...বাজলো। সুলভার স্বপ্ন আর ...জড়িয়ে মঞ্চে যে কাব্যের ...পড়েছে, তাকে কি আমরা এক ...বলে দূরে সরিয়ে রেখে দিতে ...পারি না, তার কারণ এই ...তা তো জীবন বিচ্ছিন্ন

...একদিকে চলেছে অত্যা-...আর লুণ্ঠনের বন্যা, অন্য-...প্রহরে সুলভার স্বপ্ন ও ...একটি প্রাণময় আলোকে ...। ওরা কিন্তু ...ভালোবাসাই যে বাঁচে, ভালো-...সৃষ্টির প্রাণছন্দ, এ সত্যই ...মূল কথা। অতল ...কবিতা, ঠিক হৃদয়েরই ...বোধহয় আজ নাটকে ...না, এদিক দিয়ে 'কিম্বদন্তী' ...হোতে পেরেছে বলে মনে ...নাট্যকার কুমার রায়ের ...প্রশংসার দাবী রাখে।

...প্রযোজনাটিও 'বহু-...গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে। নাট্য-...বহন করেছেন শ্রীমতী ...প্রায় তেরো বছর আগে প্রযো-...পর শ্রীমতী মিত্রের এটাই ...নির্দেশনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রয়াস। ...প্রযোজনাকে সার্থক শিল্পসুষমায় ...উঠতে গেলে যে সব দিকের ...আলোকসম্পাত করতে হয়, সেসব ...নির্দেশিকা শ্রীমতী মিত্র প্রথম ...ছিলেন। কাহিনীর বিস্তারে ...চিরন্তন সত্যের আভাস ...পেরেছেন, কয়েকটি আবেগের ...তাঁর শিল্পবোধের গভী-...করেছে। মানবিক ...কাব্যসুষমার সেতুবন্ধন যে ...শিল্পরূপ পরিস্ফুট করে ...প্রমাণ করেছেন শ্রীমতী ...আশ্চর্য সুন্দরভাবে ব্যবহার ...নাটকে, হৃদয়ের ভাষাই হয়েছে ...সোচ্চার।

আলেয়ার আলো। সন্ধ্যারাণী ও মঞ্জু দে

অভিনয়ের দিক থেকে প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'সুলভা' চরিত্রে শাঁওলী মিত্রের অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না, প্রতিটি মুহূর্তকে নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তুলতে তিনি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার নজীর রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আবেগ আর যন্ত্রণার আর সংসারের ক্ষণগুলোকে যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা হয়েছে স্পষ্ট। সুলভার সঙ্গিনী বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীর ভূমিকায় আরতি মৈত্রের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও প্রাণোচ্ছল। কথা বলতে বলতে অনায়াসে তিনি গান গেয়েছেন আবার ফিরে এসেছেন সংলাপে। বিশেষ করে সুলভা আর কৃষ্ণদাসীর মুহূর্তগুলো মঞ্চে হয়েছে সজীব। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'রঙ্গন'ও একটি বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত চরিত্র চিত্রণ। তাঁর 'রঙ্গন' কখনো শক্তিমান, কখনো বেপরোয়া কখনো আবার নিদারুণভাবে অসহায়। শান্ত ঔদার্যভরা একটি চরিত্রের রূপ দিয়েছেন যশস্বী অভিনেতা গঙ্গাপদ বসু (শিরোমণি)। 'ধনপতি'র ভূমিকায় কালীপ্রসাদ ঘোষ আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়েছেন, বলাই গুপ্তের 'অধিকারী' আমাদের ভালো লেগেছে। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন উদয় সিংহ, উৎপল ভট্টাচার্য, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, রাণা রায়, শোভেন মজুমদার।

খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা ও হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত 'কিম্বদন্তী' এর শৈল্পিক গভীরতা বাড়িয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ-সংগীত নাটকটির যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

তরুণ অপেরার নতুন যাত্রানাটক, শম্ভু বাগ রচিত এবং অমর ঘোষ পরিচালিত 'লেনিন' যে বাংলার দর্শকসমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তালাভ করেছে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই পালাগানটির দেড়শোতম অভিনয়ের অনুষ্ঠান।

লেনিন শতবার্ষিকী উৎসবে এই পালাটিকে আসরস্থ করবার জন্যে প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তরুণ অপেরার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করেন। বিশেষ অতিথিরূপে সোভিয়েট কনসাল জেনারেল ঝার্কভ এবং সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী সময়োচিত ভাষণ দেবার পরে তরুণ অপেরার ও যাত্রাশিল্পিসংঘের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মানপত্র দেওয়া হয়। সভাশেষে যথারীতি 'লেনিন' পালাটি আগ্রহী দর্শকদের সামনে অভিনীত হয়।

[illegible]/ অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং ললিতা চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

গেল ২ মার্চ সন্ধ্যায় জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক-এর কলিকাতাস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধির গৃহে জি ডি আর-এর এক চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল স্থানীয় চিত্র-সাংবাদিক, শিল্পী, কলাকুশলী এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সঙ্গে মিলিত হন। রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য এই প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। এই দলে ছিলেন : জি ডি আর-এর সংস্কৃতিমন্ত্রকের মিসেস রুথ ল্যাংগার, চিত্র পরিচালক হর্স্ট সীম্যান, অভিনেত্রী টাওডেল কুলিকাওস্কি (মিসেস সীম্যান) এবং ওখানকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টার লুটজ কোহলার্ট। এই অনুষ্ঠানে 'ফ্রোজন লাইটনিং' নামে ফ্যাসিজম-বিরোধী ছবিখানি দেখানো হয়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে, সোদপুর, দক্ষিণায়ন অঞ্চলে 'শুভেচ্ছা' নব পেয়োনীর আসরের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে, সূচীর বৈচিত্র্যই সকলের প্রশংসার দাবী রাখে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক শ্রীবিমল বসু। এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে, বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করে সত্যসেবী মায়া রায়-চৌধুরী। আবৃত্তি, সঙ্গীত, অপ্রস্তুত ভাষণ প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার লাভ করে সর্বশ্রী সঞ্জীবন ঘোষ, মহুয়া গুহ, লিপি গোস্বামী, অচিন চৌধুরী, রূপা মজুমদার, সুরভি ঘোষ, বাসুদেব জমাদার, অণিমা বর্ধন, মায়া রায়চৌধুরী, রাহুল গুহ ও সন্দীপ মৈত্র। সভাপতি পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। এরপর একে একে একক-সঙ্গীত, গীটার, হরবোলা (বাবুল কুন্ডু) প্রভৃতির পর অনুষ্ঠানের শেষ [illegible] গীতিআলেখ্য— 'গন্ধবিধুর [illegible]' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার [illegible] ছিলেন যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলু বসু। গ্রন্থনা ও ভাষ্যে শ্রীসঞ্জয় ঘোষ, সঙ্গীত ও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে —সর্বশ্রী বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সুরঞ্জন রায়, মায়া রায়চৌধুরী, [illegible] রেখা ঘোষ [illegible] বর্ধন, মহুয়া [illegible] শকুন্তলা সাহা, [illegible] জমাদার, [illegible] জমাদার, পুতুল দে, পূর্ণিমা [illegible] গোস্বামী, কাজলী ঘোষ [illegible] দে, লিপি গোস্বামী, দীপু [illegible] মজুমদার, শিল্পী ভৌমিক ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে শ্রীদুলাল বসুর পরিচালনায় শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের [illegible] নাটক 'ভীম বধ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অংশ গ্রহণ করে—সর্বশ্রী [illegible] ঘোষদস্তিদার, সঞ্জীবন ঘোষ, অসীম [illegible] সুব্রত মজুমদার, অচিন চৌধুরী, [illegible] রায় তুহিন চৌধুরী, বরিষণ ঘোষ, [illegible] মজুমদার ও গৌতম রায়। অনুষ্ঠানের [illegible] দিকে সহায়তা করেন—সর্বশ্রী [illegible] মিহির চৌধুরী, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] গোপাল বসু ও সুকুমার রায়।

সেরা ছবি ভুবন সোম

বঙ্গীয় চিত্র-সাংবাদিক সংঘ গত বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম'কে নির্বাচিত করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী-বাবা' দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এবং শ্রীসেন ও শ্রীরায় গত বছরের সেরা পরিচালক (যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলা ছবির পরিচালনায়) হিসাবেও নির্বাচিত। শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকার পুরস্কার পেয়েছেন তপেন চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন (বাংলা) ও অশোক-কুমার ও সুহাসিনী মুলে (হিন্দী)। বিস্তারিত বিবরণ পরের সংখ্যায়।

জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক-চলচ্চিত্রোৎসব আসছে ১৩ থেকে ১৯ [illegible] পর্যন্ত ম্যাজেস্টিক সিনেমায় অনুষ্ঠিত হবে।

গেল ৮ মার্চ রবিবার সকাল [illegible] প্রাচী সিনেমায় 'ওয়ার অভ দি [illegible]' প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটিতে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী [illegible] গেছে।

খেলার কথা

স্যর লেওনার্ড হাটন প্রসঙ্গ

...ক সময় অনেক খ্যাতিমান লোককে ...কটা উদগ্র বাসনা জাগে। কখনও ...ণ হয়, কখনও তা অপূর্ণই থেকে ...নি অনেককালের এমনি একটা ...পূর্ণ হল—দেখতে পেলাম সর্ব- ...একজন সেরা ব্যাটসম্যান স্যর ...হাটনকে। তবে যখন তিনি ...ও হিসেবে মানুষের মনে একটা ...পেতেছিলেন, তখন তাঁকে ...পূর্ণ বলে একটু ক্ষোভও রয়ে ...ন তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর ...গত কাজে কলকাতায় এসে- ...ন্তু ক্রিকেটের প্রতি তাঁর সহজাত ...ক্রিকেটের উন্নতি ও প্রসারে আগ্রহ ... বিশেষ করে তাঁকে ভাল ...দেশের ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ...উন্নতির জন্য প্রয়োজন হলে তাঁর ...র উল্লেখ।

...লেন হাটনের ক্রিকেট জীবনের ... ইতিহাস বিরাট। তার একটু ...রেই তাঁর কথা আলোচনা করছি। ...তে স্যর লেওনার্ডহাটনের ভূমিকা ...য়। তাঁকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন ...সংখ্যানের। তাই পরিসংখ্যান দিয়ে ...র সূচনা।

... ১৯১৬ সালের ২৩শে জুন। ...এই খেলোয়াড় ক্রিকেটে যে ...রেকর্ড করেছেন তা মনে রাখার ... ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল ...নিয়মিতভাবে ক্রিকেট খেলে ৮১৪টি ...খেলে ৪০,১৪০ রান করেছেন। তার ...বার অপরাজিত থেকে গিয়েছেন। ...সেঞ্চুরীর সংখ্যা ১২৯। ব্যাটিং-এ তাঁর ...হচ্ছে ৫৫'৫১। ৭৯টি টেস্ট ...তিনি ১৩৮টি ইনিংসে সংগ্রহ ... ৬৯৭১ রান। সর্বোচ্চ রানের ...৩৬৪। ...বার অপরাজিত থেকে ... এছাড়া করেছেন কমবেশি ...সেঞ্চুরী। টেস্ট গড় রানের হিসাব ...৫৬'৬৭।

...১৯৪৯ সালে এক মরশুমে ছাপ্পান্নটি ... অর্জন করেছিলেন ৩৪২৯ ...বার অপরাজিত থেকে গিয়েছিলেন। ... সেঞ্চুরীর সংখ্যা হচ্ছে চারটি। ... ২৬৯ রান ছিল বলার মত। ঐ ...রানের গড় হিসাব ছিল ৬৮'৫৮। ...স্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৯টি ইনিংসে ... অপরাজিত থেকে গিয়েছেন। ...রানের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের ... ৩৬৪। গড় হিসাব ছিল ... এছাড়া ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ...৪ রান করে ওয়ালি হ্যামণ্ডের ১২৮১ রানের রেকর্ড টপকিয়ে গিয়েছেন। হ্যামণ্ড ১৯৩৬ সালের আগস্টে এক মাসে উপরোক্ত রান করার রেকর্ড করেন। এর পর হাটন আবার ঐ বছরে আগস্টেই ১৫৫০ রান করে সি বি ফ্রাই, কে এস দলীপ সিংজী ও হার্বার্ট সাটক্লিফের এক বছরে হাজার রান করার রেকর্ড ধরে ফেলেন।

লেন হাটন সতেরবার হাজার রান এবং একবার তিন হাজার রান করেছেন। ১৯৫১ সালে সর্বমোট ১২৯টির মধ্যে বিদেশে তাঁর সেঞ্চুরীর সংখ্যা ছিল চব্বিশটি। ১৯৫৪-৫৫ সালে লেন হাটনের অধিনায়কতায় ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্বদেশে টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনটিতে বিজয়ী হয়, ইংলণ্ড হারে একটি টেস্ট খেলায় এবং অপর খেলাটি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। ঐ একই বছরে ইংলণ্ড স্বদেশে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে খেলে ২টি খেলাতে বিজয়ী হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় উভয় পক্ষই দুটি করে খেলায় বিজয়ী হয় এবং একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৮ সালে টেস্ট ম্যাচে নটিংহ্যামে

শঙ্করবিজয় মিত্র

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০০, ওভালে ৩৬৪ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে সিডনিতে ১২২, ১৯৫০-৫১ সালে এ্যাডিলেডে ১৫৬ এবং ১৯৫৩ সালে লর্ডসে ১৪৫ রান করেছেন। এছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেও যে ৫টি সেঞ্চুরী করেছেন তা হচ্ছে : ১৯৩৯ সালে লর্ডসে ১৯৬ এবং ওভালে ১৬৫*। ১৯৫০ সালে ওভালে ২০২*, ১৯৫৪ সালে জর্জটাউনে ১৬৯ এবং ১৯৫৪ সালে কিংস্টনে ২০৫।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে চারটি সেঞ্চুরী করেছেন, তা হল : ১৯৪৭ সালে লিডসে ১০০, ১৯৪৮-৪৯ সালে জোহানিসবার্গে ১৫৮ ও ১২৩, ১৯৫১ সালে লর্ডসে ১০০ রান। তিনটি সেঞ্চুরী করেছেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তা হচ্ছে ১৯৩৭ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ১০০, ১৯৪৯ সালে লিডসে ১০১ এবং ওভালে ২০৬। ভারতের বিরুদ্ধে ১৯ ২ সালে লর্ডসে ১৫০ এবং ম্যাঞ্চেস্টারে ১০৪ রান করেছেন।

তিন-তিনবার তিনি একটি খেলায় দুটি পৃথক সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভালে যে ৩৬৪ রান করেন, তা এখনও কারুর মন থেকে মুছে যায়নি। কৃতিত্বের স্বাক্ষরে আজ তিনি এম সি সি-র অবৈতনিক সদস্য। ১৯৫০ সালে তিনি মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে খেলাকালীন সাহায্য তহবিলে পেয়েছিলেন ৯,৭১৩ পাউন্ড। খেলার গুণেই তিনি স্যর উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন।

স্যর লেওনার্ড হাটনের খেলা দেখার সৌভাগ্য না হলেও ব্যবসা সংক্রান্তে কলকাতায় আসার জন্যে তাঁকে চাক্ষুস করার সৌভাগ্য হয়েছে। হাটনের আগে সাক্ষাৎ হয়েছে মরিস টেট, জ্যাক রাইডার, হার্বার্ট সাটক্লিফ, সি জি ম্যাকার্টনি, লিণ্ডসে হ্যাসেট, দলীপ সিংজী, ডন ব্র্যাডম্যান, জর্জ হিড্লে, কিথ মিলার, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গারফিল্ড সোবার্স, রে লিণ্ডওয়াল, মহম্মদ নিসার, নিল হার্ভে, হানিফ মহম্মদ, ওয়েস্লে হল, ডেনিস কম্পটন প্রভৃতি খ্যাতনামা দিকপাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে। বিশ্বাস করুন বা না করুন জ্যাক হবস ও অমর সিং-এর পর স্যর লিওনার্ড হাটনের সঙ্গে যেরকম একাত্ম হয়ে কথাবার্তা কওয়ার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে এমন সুযোগ এর আগে আর কখনও আসেনি। আলাপ-আলোচনার পর মনে হল দেখা পেলুম খেলা থেকে অবসর নেবার পর। আগে যদি খেলার ঝিলিক কিছুটা দেখার সৌভাগ্য হত।

কলকাতায় পৌঁছিয়ে তিনি বিশ্বের ঐতিহ্যসম্পন্ন মাঠে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। মাঠে ভারতের দাদু ফাদকারকে দেখে চিনতে তাঁর একটুও অসুবিধা হয়নি। পঙ্কজ রায় নাম বলতে তাঁকেও চিনে ফেললেন। সহজে চিনে ফেলেছিলেন বোর্ড সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ম্যানেজার শ্রীপঙ্কজ গুপ্তকে। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক হাটনকে বিশ্বের সেরা গোড়াপত্তনকারী বলে উল্লেখ করেন। আর পঙ্কজ গুপ্ত মাঠের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম মাঠের অন্যতম। এই মাঠে যে এক সময় সারা মাঠ জুড়ে টেনিস খেলা হত, এখন আর তা হয় না।

হাটন যে একজন মাঠ-বিশেষজ্ঞ, তা মাঠে ঢোকার পরই সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। মাঠে ঢুকেই পিচ দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন যে, ইংলণ্ডের পিচের মত। মাঠের মনলোভা দৃশ্য দেখে বললেন, এই উইকেট একটু 'শেলো'। বলে ফেললেন এই মাঠে যদি একটু খেলতে পেতুম, তাহলে রান কেমন করে করতে হয় দেখিয়ে দিতুম। লিণ্ডওয়াল ও মিলারের মত

বোলার ভারতে না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন। খেলায় অনেক বিবর্তন এসেছে বা আসছে। আপনারা কেমনভাবে তা নেবেন তা আপনাদের ওপর নির্ভর করছে। আপনাদের দেশে অনেক বড় বড় খেলোয়াড় রয়েছেন। ঠিকভাবে সমন্বয় হলে ভারতের সেরা দল বলে পরিগণিত হবে।

ক্রিকেটের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বর্তমান খেলায় হারজিতের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বলেন সুস্থ মনে খেলতে হবে। তাঁর মতে খেলার মেয়াদ বাড়ালে খেলার গতি হবে আরও মন্থর এবং ক্রিকেটের আকর্ষণও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। খেলার আকর্ষণ যে হ্রাস পাচ্ছে তার জন্যে তিনি বলেছেন ব্যাটসম্যানরাই কি দোষী? বোলাররা নেতিমূলক আচরণ করলে অর্থাৎ নাগাড়ে স্টাম্পের বাইরে বল ফেললে দ্রুত হারে রান উঠবে কেমন করে? বোম্বাই ও মাদ্রাজের উইকেট সম্পর্কে হাটনের অভিমত হচ্ছে উইকেট 'স্লো' অর্থাৎ এতে বল দ্রুতগতিতে যায় না। পিচ ফাস্ট হলেই ভারতের ভবিষ্যৎ হবে ... চাকুরীর পর খেলায় ... ভালভাবে মন বসে না। ভারতকে ... সমাধান করতে হবে।

তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার ... ও মিলার জুটি জোরে বল করতেন ... বল ছিল ইংলণ্ডের কেনেথ ফার্ন... স্ট্যাথাম ও টাইফুন টাইসনের। ... ইংলণ্ডের উইলফ্রেড রোডস ... শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়।

দাবার আসর

এবারে রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে কিছু খেলা দেওয়া হোল। রাশিয়ান দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগিতা, অনেক আন্তর্জাতিক দাবা টুর্ণামেন্ট থেকেই রাশিয়ান প্রতিযোগিতার খেলার মান অনেক উঁচু, এতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের বেশিরভাগই হচ্ছেন প্রখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টার। পেত্রোসিয়ান যে যুগ্মভাবে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন, সে কথা আমরা ইতিপূর্বে 'অমৃত'য় লিখেছি। তাছাড়া, রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ হচ্ছে রাশিয়ার খেলোয়াড়দের পক্ষে বিশ্ব বাছাই প্রতিযোগিতার প্রথম ধারা—অর্থাৎ একটি জোনাল টুর্ণামেন্ট। সেইজন্যে, এই রাশিয়ান প্রতিযোগিতায় বরাবরই খুব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় এবং খেলাগুলোও হয় উপভোগ্য।

সাদা—ই, প্ল্যাটোনোভ; কালো—ভি, কুপরিচিক। এ্যালেখাইনস ডিফেন্স।

(১) ব-রা ৪ : ঘ-রাগ ৩ (২) ব-রা ৫ : ঘ-ম ৪ (৩) ব-ম ৪ : ব-ম ৩ (৪) ব-মগ ৪ : ঘ-ঘ ৩ (৫) ব-গ ৪ : গ-গ ৪ (৬) ঘ-রাগ ৩ : ব×ব (৭) গব×ব : ব রা ৩ (৮) ঘ-গ ৩ : ঘ-গ ৩ (৯) গ-রা ৩ : ম-ম ২ (১০) গ-রা ২ : গ-ঘ ৫ (১১) 0-0 : 0-0-0 (১২) ব-গ ৫ : ঘ-ম ৪ (১৩) ঘ×ঘ : ম×ঘ (১৪) ব-ঘ ৪!?

[সাদা স্বেচ্ছায় একটি বড়ে বিসর্জন দিয়ে কিছু জায়গা পরিস্কার করে নিতে চাইছে। কালো যদি ঘোড়া দিয়ে ঘোড়াবড়েটিকে মারে, তারপর খেলা কিভাবে এগুবে তা খুব পরিস্কার নয়। যাই হোক, কালো বড়েটি না মারাই শ্রেয় মনে করল।]

(১৪)...ম-রা ৫ (১৫) ম-ঘ ৩ : ঘ×মব (১৬) ঘ×ঘ : গ×গ (১৭) ন-গ ৪! : ম×রাব (১৮) ন-রা ১ : ন-রাঘ ৪ (১৯) ন-গ ২ : গ-ন ৫ (২০) ন-ম ২ : গ-ঘ ২ (২১) ম-ন ৭ : রা-ঘ ১ ?

[একটি ভুল চাল যার ফলে খুব দ্রুত কালোর খেলাটি হাতছাড়া হয়ে গেল। ...অনেক ভালো হোত (২১)... ন×ঘ (২২) ন×ন : ম×গ+ (২৩) ন×ম : ...×ন (২৪) ম-ঘ ৩ এবং কালো কিছুটা লড়তে পারে।]

(২২) ব-ঘ ৫ : ন-ম ৪ (২৩) ব-গ ৬ : ন(ন১)-ম ১ (২৪) ঘ×ব : ম×গ+ [কালোর মন্ত্রী দিয়ে সাদা গজটিকে না মেরে উপায় নেই কেন, তা পাঠককে ভালোভাবে অনুধাবন করে দেখতে অনুরোধ করি।] (২৫) ন×ম : ব×ঘ (২৬) ন-মন ৩ : ব-মন ৩ (২৭) ন×ন : ন×ন (২৮) ব×নব। কালোর হার স্বীকার।

সাদা—ভি, কর্চনয়; কালো—ভি, এ্যান্টোশিন। নিমজোইণ্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ব-ম ৪ : ঘ-রাগ ৩ (২) ব-মগ ৪ : ব-রাত (৩) ঘ-মগ ৩ : গ-ঘ ৫ (৪) ব-রা ৩ : 0-0 (৫) গ-ম ৩ : ব-গ ৪ (৬) ঘ-গ ৩ : ব-ম ৪ (৭) 0-0 : মব×ব (৮) গ×ব : ব-মন ৩ (৯)
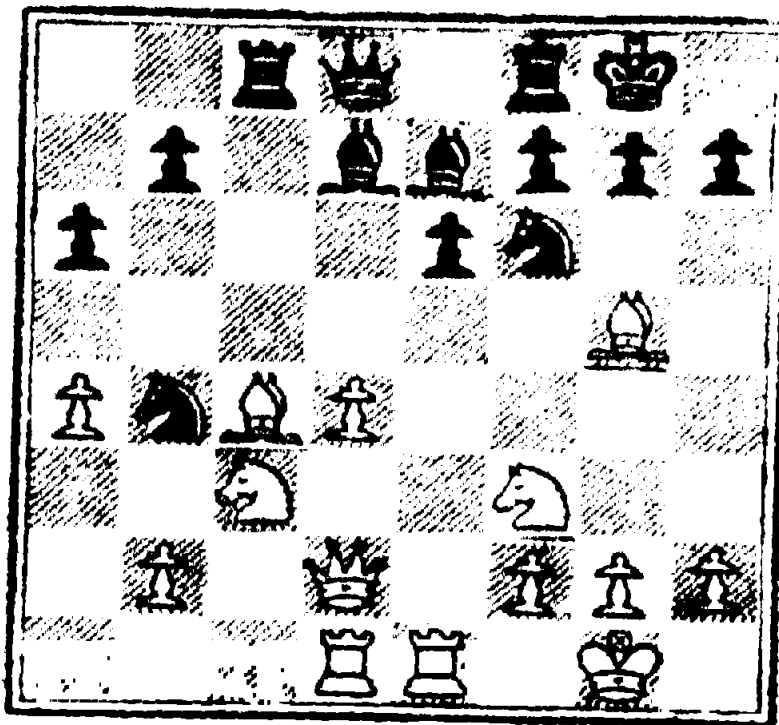
১নং চিত্র
কালোর ১৪নং চাল ঘ—মঘ ৫-য়ের পরের অবস্থা

ব-মন ৪ : ব×ব (১০) ব×ব : ঘ-গ ৩ (১১) গ-রাঘ ৫ : গ-রা ২ (১২) ন-রা ১ : গ-ম ২ (১৩) ম-ম ২ : ন-গ ১ (১৪) মন-ম ১ : ঘ-মঘ ৫ [১ নং চিত্র দেখুন।] (১৫) ব-ম ৫ : ব×ব (১৬) গ×মব : গ-গ ৩ (১৭) গ×গ : ম×ম (১৮) ন×ম : ঘ×গ (১৯) গ×ঘ : গ×গ (২০) ঘ-ম ৫ : গ-ম ১ (২১) ব-মঘ ৪ : ব-মন ৪ (২২) ব-ঘ ৫ : ঘ-ঘ ৫ (২৩) ব-ঘ ৪!? : ঘ×ঘ (২৪) ন×ঘ : ন-গ ৪ (২৫) ঘ-রা ৫ : ন×নব (২৬) ঘ-ম ৭ : ন×ব+ (২৭) রা-গ ১ : গ-গ ৩? [এইখানে কালোর নৌকা-ঘ ৪

২নং চিত্র
সাদার ১৬নং চাল গ-ঘ-... ...

চালটি খুবই ভাল ... (২...) রা×ঘ (২৯) ন-ম ৭ : ... ন×ঘব : ব-ন ৫ (৩...) ... ব-ন ৬ (৩২) ন-ন ৭ : ... ব-ঘ ৬ : ন-মঘ ৫ (৩৪) ... (৩৫) ন×ব। কালোর হার স্বীকার। যদি (৩৫) ...ন ... অথবা (৩৫) ...গ ... (৩৬) ... (৩৭) ব-ঘ ৮=মন্ত্রী।

সাদা—এল, স্টাই... ; ... তাইমানভ। সিসিলিয়ান ডিফেন্স।

(১) ব-রা ৪ ... ব-রাগ ৪ : ব-রা ... (৩) ঘ... ঘ-মগ ৩ (৪) গ-ঘ ৫ : ... 0-0 : ব-মন ৩ (৬) ... ব-ম ৩ : ঘ-রা ২ (৮) ব-ম... (৯) ঘ-গ ৩ : ব-ম ৩ (১০) ... ব-মঘ ৪ (১১) ম-ম ২ : ... ব×ব : গ-ঘ ২ (১৩) মন-ম ১ : (১৪) ম-রাগ ২ : ব-রাগ ৪! ব-রা ৫ : মব×ব (১৬) গ... [২ ... দেখুন।] (১৬) ...ঘ-ম ৫ (১৭) ব×গ (১৮) ঘ×ব : ম×... (১... ৩ : ম-গ ২ (২০) ন-ম ৩ : মন-ম... ন (গ ১)-ম ১ : ন×ন (২২) গ-ম ৩ (২৩) ঘ-রা ২ : গ-... ম-ম ৪ : ম-গ ৭ (২৫) রা-গ ২ ... (২৬) ন-মগ ৩ : ন×ন (২৭) ম-রা ৫ (২৮) ব-ঘ ৩ : ব-... ব-রান ৪ : গ-ঘ ৫ (৩০) ম-গ ... (৩১) ম×নব ?? : ম-গ ৬+ (৩২) ... ১ : ম-গ ৭ + +।

—গজানন

পদব্রজে দিল্লী : বাংলার এই চারজন মহিলা- স্নিগ্ধ গোল, মীনা গুহ, স্বপ্না অধিকারী এবং মীরা সরকার কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লী যাওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সেখান থেকে তাঁরা বিমানযোগে দমদম বিমানঘাঁটিতে ফিরেছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

কমনওয়েলথ গেমস্

আগামী ১৬ই জ‌ুলাই এডিনবরায় ...ল্যান্ড) নবম কমনওয়েলথ গেমসের ...র বসছে। খেলার এই আসর ভাঙবে ...শে জুলাই। খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই ...টি দেশ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের ...প্রকাশ করেছে। যদি শেষপর্যন্ত ...টির বেশী দেশ অংশগ্রহণ করে, তাহলে ...ওয়েলথ গেমসে সর্বাধিক দেশের যোগ-...র রেকর্ড হবে। এ-বিষয়ে পূর্বের ...র্ড ৩৫টি দেশ (কার্ডিফ, ১৯৫৮)।

...ত্ব এবং গুরুত্বের দিক থেকে ...লিম্পিক গেমসের পরই এই কমনওয়েলথ ...নের স্থান। প্রভেদ এই যে, কমন-...লথ গেমস একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠান - একমাত্র কমনওয়েলথ গোষ্ঠী-ভুক্ত দেশগুলিই যোগদানের অধিকারী।

এই কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধন ১৯৩০ সালে। সে সময় নাম ছিল বৃটিশ এম্পায়ার গেমস। প্রতি চতুর্থ বছরে আসর বসার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে কয়েক বছর প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। শেষ কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসেছিল জামাইকার কিংস্টনে, ১৯৬৬ সালে। এই অষ্টম ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ৪টি বিভাগে (অ্যাথলেটিক্স, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন এবং কুস্তি) অংশগ্রহণ করে মোট ১০টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৩) জয়ী হয়েছিল। ভারতবর্ষ তার দশটি পদক এইভাবে সংগ্রহ করেছিল : কুস্তিতে ৭টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ২), ভারোত্তোলনে রৌপ্য ১, হাতুড়ি নিক্ষেপে রৌপ্য ১ এবং ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ ১।

ভারতবর্ষ আগামী নবম কমনওয়েলথ গেমসে যোগদান করবে। অ্যাথলেটিক্স দল গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের অ্যামেচার এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতার সর্বনিম্ন মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। গত কমনওয়েলথ গেমসে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারীদের সাফল্যকে ভারতীয় অ্যাথলীটদের যোগ্যতার সর্বনিম্ন মান ধার্য করা হয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে ইউরোপের ক্রীড়ামান ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স দল গঠনের উদ্দেশ্যে যোগ্যতার যে সর্বনিম্ন মান ধার্য করা হয়েছে, তা স্পর্শ বা অতিক্রম করার মত ক্ষমতা মাত্র কয়েকজন ভারতীয় পুরুষ অ্যাথলীটের আছে। মেয়েদের সর্বনিম্ন মান স্পর্শ করার মত দক্ষতা কোন ভারতীয় মহিলার নেই।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অ্যাথলেটিক দল তৈরির উদ্দেশ্যে পাতিয়ালার প্রশিক্ষণ শিবিরে যে ৪৫ জন অ্যাথলীটকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন সার্ভিসেস দলের ২৬ জন, রেলওয়ের ৭ জন, পুলিশের ৫ জন, স্টিল প্ল্যান্টের ৩ জন এবং একজন করে পশ্চিমবাংলা, দিল্লী, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের প্রতিনিধি। পশ্চিমবাংলা থেকে যাচ্ছেন এম পোড়েল। পাতিয়ালার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ২০শে থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত আমন্ত্রিত অ্যাথলীটদের তালিম দেওয়া হবে। তারপর দু'দিনব্যাপী ট্রায়ালে (১৩ই ও ১৪ই জুন) চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে। ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলটি ৫ই জুলাই লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করবে।

যোগ্যতার সর্বনিম্ন মান
পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার : ১০'৪ সেঃ, ২০০ মিটার : ২১'৩ সেঃ, ৪০০ মিটার : ৪৬'৮

শ্রীডি এন চৌধুরীর হাত থেকে ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব নির্বাচিত বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় পাইকপাড়ার কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র কল্যাণ মুখার্জি (মাঝে) একটি ট্রানজিস্টার সেট গ্রহণ করছেন। ছবির ডানদিকে প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল।

সেঃ, ৮০০ মিটার : ১ মিঃ ৪৭'৭ সেঃ, ১৫০০ মিটার : ৩ মিঃ ৪২'৮ সেঃ, ৫০০০ মিটার : ১৩ মিঃ ৪২'৪ সেঃ, ১০,০০০ মিটার : ২৯ মিঃ ৫৫'৪ সেঃ, ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ : ৮ মিঃ ৪১'৬ সেঃ, ১১০ মিটার হার্ডলস : ১৪'৫ সেঃ, ৪০০ মিটার হার্ডলস : ৫২'০ সেঃ, হাইজাম্প : ১'৯৩ মিটার, পোলভল্ট : ৪'১১ মিটার, লংজাম্প : ৭'৫০ মিটার, ট্রিপল জাম্প : ১৫'৪৭ মিটার, সটপুট : ১৬'৩৯ মিটার, ডিসকাস : ৫০'৩২ মিটার, হ্যামার : ৫৭'৪৮ মিটার, জ্যাভেলিন : ৬৫'৬৩ মিটার, ডেকাথলন : ৬,৫১৩ পয়েন্ট, ৪×১০০ মিটার রীলে : ৪০'১ সেঃ, ৪×৪০০ মিটার রীলে : ৩ মিঃ ১১'৩ সেঃ, ম্যারাথন : ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ ১৩ সেঃ, ২০ কিলো ভ্রমণ : ২ ঘঃ ৫২ মিঃ ২১'২ সেঃ।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার : ১২'০ সেঃ, ২০০ মিটার : ২৪'২ সেঃ, ৪০০ মিটার : ৫৪'৭ সেঃ, ৮০০ মিটার : ২ মিঃ ০৫'১ সেঃ, ১০০ মিটার হার্ডল : ১৪ সেঃ, হাইজাম্প : ১'৬৫ মিটার, লংজাম্প : ৫'৮৫ মিটার, সটপুট : ১৩'৯৪ মিটার, ডিসকাস : ৪৪'৮৩ মিটার, জ্যাভেলিন : ৪২'২৭ মিটার, ৪×১০০ মিটার রীলে : ৪৭'১ সেঃ, পেন্টাথলন : ৪,০০০ পয়েন্ট।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ

পানামার ইসমাইল লাগুনা ৯ম রাউন্ডে বিশ্ব খেতাবধারী ম্যান্ডো রোমসকে পরাজিত করে পুনরায় লাইটওয়েট বিভাগে বিশ্ব-খেতাব জয়ী হয়েছেন।

কলকাতার হকি মরসুম

কলকাতার হকি মরশুমের প্রধান আকর্ষণ প্রথম বিভাগের হকি লীগ এবং বেটন কাপ প্রতিযোগিতা। গত ৪ঠা মার্চ থেকে প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। তবে খেলা এখনও পুরো জমেনি। কারণ প্রধান দলগুলি—মোহনবাগান (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান), ইস্টবেঙ্গল (গত বছরের রানার্স-আপ), এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ের এ এ দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা বাংলা দলের পক্ষে বর্তমানে জলন্ধরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা কলকাতায় না ফিরলে খেলার জৌলুষ বাড়বে না।

এ-বছর প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ২০টি দলের পরিবর্তে ১৯টি দল অংশগ্রহণ করেছে। জাভেরিয়ান্স খেলছে না। তাদের শূন্য স্থান অপর কোন দল দিয়ে পূরণ করা হয়নি। বাংলাদেশের হকি খেলায় জাভেরিয়ান্স দলের অবদান কম নয়। তারা ১৯২৪ এবং ১৯... প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্র... লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯১১ ... কাপ জয়ী হয়েছিল। গত বছর... বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতা... তালিকায় শেষ দুটি স্থান ... আর্মেনিয়ান্স এবং খালসা স্পোর্টিং... তারা এ-বছর দ্বিতীয় বিভাগে... তাদের শূন্য স্থান পূরণ ... বছরের দ্বিতীয় বিভাগের হকি... চ্যাম্পিয়ান বেঙ্গল ইউনাইটেড ... আপ উয়াড়ী দল।

দ্বিতীয় বিভাগের হকি লী... যোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ... দ্বিতীয় বিভাগে প্রমোশন ... বছরের তৃতীয় বিভাগের লীগ ... টাউন ক্লাব এবং রানার্স-আপ ... দ্বিতীয় বিভাগ থেকে ... নেমেছে ন্যাশনাল স্পোর্টস ... পুলিশ দল।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ ... শিপের লড়াইটা শেষপর্যন্ত ... এবং ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে ... থাকবে। গত বছর মোহনবাগান ... অবস্থায় এবং ... চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। ... কাপ প্রতিযোগিতায় ... সঙ্গে যুগ্ম ... ইস্টবেঙ্গল ২ পয়েন্টের ... প্রথম বিভাগের হকি লীগ ... রানার্স-আপ হয়েছিল। ... খ্যাতনামা খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল ... দান করায় গত বছরের ... বেশী শক্তিশালী ...

১১২ মাইল সাইকেল

বারবালা স্পোর্টিং ক্লাব ... নিখিল ভারত ১১২ মাইল ... রেসে বুড়কেল্লা স্টিল প্ল্যান্টের ... সিং প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ... রায় ট্রফি জয়ী হয়েছেন। ... শান্তিপুর এবং প্রত্যাবর্তন—... এই নির্দিষ্ট ১১২ মাইল দূরত্ব ... করতে তাঁর ৬ ঘণ্টা ১০ ... সেকেন্ড সময় লাগে। প্রতিযোগিতায় ... গ্রহণকারী ১৪ জনের মধ্যে ... জন গন্তব্যস্থলে ফিরেছিলেন।

ফলাফল : ১ম এস আর ... কেল্লা), ২য় মলয় ... হুইলার্স), ৩য় সুকুমার ... এ, বাংলা)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ... হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 20th March, 1970. শুক্রবার, ৬ই চৈত্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীতৃপ্তি নন্দী

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

আপনার অমৃত সাপ্তাহিকের ২২শে ফাল্গুন ১৩৭৬ তারিখের ৪৩শ সংখ্যার 'চিঠিপত্র' পৃষ্ঠায় শ্রীশিশির বসু লিখিত পত্রে সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে, আমি কড়িবাবুর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম ও একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি। তাঁর পদবী যে গঙ্গোপাধ্যায় ছিল তা আমি জানতাম। এই ভুল দর্শানোর ঐ সংখ্যাতেই অহীন্দ্রবাবু যা বলেছেন বিষবৃক্ষ উদ্বোধন সম্বন্ধে তাও ঠিক। কেননা আমার ডায়েরীতে শুধুমাত্র লেখা আছে ১৩ই ডিসেম্বর 'রাধা ফিল্মসের বিষবৃক্ষ রূপবাণীতে উদ্বোধন'। কোন ভূমিকালিপি আমার ডায়েরীতে লেখা নাই। সুতরাং কি বা কোন সূত্রে এটা লেখা হল তার সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারছি না। তবে যখন আমার স্বাক্ষরিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তখন এই ত্রুটি স্বীকার করতেই হবে। এই ভুল-ত্রুটি দর্শানোর জন্য আমি দুজনাকেই ধন্যবাদ জানাই।

অহীন্দ্র চৌধুরী
কলকাতা—২৭।

(২)

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আমেরিকা-অভিযানের গৌরবকে নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী স্মৃতিচারণের মাধ্যমে নস্যাৎ করার প্রয়াস পেয়েছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, আমার মতে তা অমূলক। কেননা শ্রীচৌধুরীর বহুপূর্বে সফরকারী দলের দুই বিশিষ্ট সদস্য (দুজনেই শিশির-অনুরাগী এবং প্রত্যক্ষদর্শী) যোগেশ চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্বার্থহীন ভাষায় সেই ঐতিহাসিক সফরের লজ্জা-জনক ব্যর্থতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নটসূর্যের মন্তব্য তো সে তুলনায় অনেক সহনীয়।

বিশদ বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই, তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং প্রামাণিক তথ্যের জন্য একালের উৎসাহী নাট্যামোদী-দের যোগেশ চৌধুরীর 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থ, 'শ্যামলী' (১৩৫৭।৫৮)-তে প্রকাশিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'নিউইয়র্কে বাংলা থিয়েটার' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'নাচঘর' পত্রিকায় (?) মুদ্রিত শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর 'অচল টাকা' ও 'উপসংহার' রচনা এবং নিদেনপক্ষে হাল আমলের 'সাজঘর' (ইন্দ্রমিত্র) পড়ার জন্যে, এবং অন্তরালবর্তী কাহিনী জানার জন্য সে সময় আমেরিকায় অবস্থানকারী ভারতীয় দলের প্রাণকর্তা প্রখ্যাত মঞ্চবিদ শ্রীসতু সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানাই।

নাট্যাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কারোর চেয়ে কম নয়, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারণে তাঁর ব্যর্থতা, ভ্রান্তি এবং অব্যবস্থিত-চিত্ততার প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ হতে আমার ঘোরতর আপত্তি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে শিশিরকুমার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল, এর জন্য মার্কিনী সফরের দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই—ওটা জাতির জীবনে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য, স্বখাত সলিলেই সেদিন শিশিরকুমারের ভরাডুবি ঘটেছিল—বর্ণবৈষম্যের অজুহাত নিরর্থক। অন্ধ উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে সত্যকে অস্বীকার করলে ইতিহাসেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা।

(৩)

'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ সংখ্যায় একটি ভুল চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল ভুলটি মুদ্রাকর প্রমাদবশত ঘটে থাকবে। কিন্তু ঐ ভুল একই অনুচ্ছেদে দুবার দেখে ভাবলাম ভুলটির দিকে লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য।

২৯৫ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অনুচ্ছেদের গোড়াতে আছে: 'এই সময় চিৎপুরে নতুন বাজারের কাছে রঙমহল নামে একটি থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে।' কয়েক লাইন পরেই আবার আছে: 'তারা প্রথমে মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা' নাটক নিয়ে রঙমহলের দ্বার উদ্ঘাটন করল।' এই প্রসঙ্গে জানাই চিৎপুরের থিয়েটারটির নাম 'রঙমহল' ছিল না, ছিল 'রূপমহল', বোধ হয় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের রঙমহল থিয়েটারের নামের সঙ্গে পার্থক্য রাখতেই এর নাম 'রূপমহল' করা হয়েছিল। ইংরাজীতেও 'রঙমহল'কে লেখা হত 'Rangmahal' এবং 'রূপমহল'কে 'Rangamahal' রূপে।

পরিশেষে জানাই, 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'র প্রতিটি কিস্তিই অসীম আগ্রহ এবং কৌতূহলের সঙ্গে পড়ছি। সে যুগের বাংলাদেশের নাট্যশালার ইতিহাস অত্যন্ত মনোগ্রাহীরূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। লেখককে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর, হুগলী।

(৪)

অহীন্দ্রবাবুর লেখা আত্মচরিত বেশ আগ্রহ সহকারেই পড়ে আসছি। কোথায় কাকে ঠিক বলা হল না বা আরও ভাল বলা উচিত ছিল এর বিচার করতে বসলে অনেক কথা এসে পড়বে। কেন না অমুকে সম্বন্ধে কেন লিখলেন বা অমুককে কেন এত ভাল বললেন, অমুক সম্বন্ধে নীরব রইলেন কেন, একথাও ত উঠতে পারে। তার চেয়ে মনে হয় যা পাচ্ছি তাই আকণ্ঠ ভরে পান করা ভাল। সকলের মনের মতন গুছিয়ে ঠিক ঠিক লিখবেন লেখক এরকম ভাবাও বেশী আশা করার সামিল। যেমন ধরুন, ১৪ ফাল্গুনে সংখ্যায় মেঘনা নদীর কথা তুললেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা একেবারে চেপে গেলেন। পাঠকের মনে শুধু একটা ইচ্ছাই জেগে রইল। তাই বলে কি কৈফিয়ত চাইতে যাব, না বলব কে বলেছে আপনাকে কথাটা তুলতে? যাই হোক, উনি লিখে যান, আমরা আনন্দ করে পড়তে থাকি, এইটেই কি ভাল নয়?

কৃষ্ণ চক্রবর্তী
হাওড়া—১।

রবীন্দ্রনাথের 'প্যারাডাইস লস্ট'

রবীন্দ্রনাথের 'প্যারাডাইস লস্ট' প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কেন সেই নীতি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফল হতে পারল না তার কারণ নির্দেশ করেছেন। লেখক নিজেই শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন শিক্ষক। সুতরাং তাঁর মতামতের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর স্বপ্নের রাজ্য

চিঠিপত্র

শান্তিনিকেতন গড়তে চেয়েছিলেন। এই শতাব্দীর নানা কঠিন ও কর্কশ পরিবেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতের মধ্যে একেবারে তপোবনের শান্ত মধুর ও গম্ভীর রূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে কিম্বা ব্যর্থ হতে চলেছে। লেখক হয়তো কিছুটা খাঁটি কথাই বলেছেন। তবে একথাও সত্যি যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন কিছু করতে হলেই একটা আদর্শের কথা এসে যায়—সংস্কারকের মনে একটা স্বপ্নের ভাব জাগরিত হয়। শিক্ষা নিয়ে যা কিছু নতুন পরীক্ষা ও পরিকল্পনা হয়েছে তার থেকে আদর্শ বা স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দেওয়া কোনদিনই সম্ভব হয় নি। একেবারে যা বাস্তব তাকে নিয়ে শিক্ষা বা অন্য যে কিছু বিষয়ে সংস্কার করতে গেলে যা সমস্যা তাই চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায়। লেখক রবীন্দ্রনাথের দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গিয়ে কিভাবে তাঁর আদর্শের প্রকৃত গ্রহণীয় ও উপাদেয় অংশটুকুর সার্থক প্রয়োগ হতে পারে তার কোন সূচনাই দিলেন না। প্রবন্ধের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের যে মহনীয় কথাটি উল্লেখ করেছেন তাও একেবারে আবছায়া হয়েই রয়ে গেছে। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিসরে কেমন করে সেই আদর্শ প্রবর্তন করা যেতে পারে তার কোন সংকেতই দিলেন না। শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন শিক্ষকের কাছে আমরা যা আশা করেছিলাম এই প্রবন্ধে তা পেলাম না—এই আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ।

সুধাংশুশেখর রায়
ভদ্রক কলেজ, ভদ্রক।

'অমৃত'কে নিয়ে

আমি আপনাদের প্রকাশিত অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। বর্তমানে আমি অমৃত ছাড়াও আরও কতকগুলি পত্রিকা পড়ছি। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি অমৃত ছাড়া আর কোনও পত্রিকাই (আমি যে সমস্ত পত্রিকা পড়ি) পাঠকের দিকে দৃষ্টি রাখে না। তবে কিছু সংখ্যক পাঠকের রুচিবোধের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

অমৃত পত্রিকা কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পত্রিকা সাধারণ মানুষের পক্ষেও বোধগম্য। এই পত্রিকায় একদিকে যেমন আছে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা অপরদিকে আছে খেলাধূলোর কথা। আবার কিছু ফিচার সহ (রুচি-মার্জিত) সিনেমা ভিত্তিক আলোচনা। উপন্যাসগুলিও ভারী সুন্দর। বুদ্ধদেব গুহ রচিত 'কোয়েলের কাছে' পড়ে আমরা এক নতুন জগতকে জানতে পারছি। আবার 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' সম্বন্ধে বিভিন্ন কবি ও লেখকদের এই মন্তব্যগুলি পড়ে আজকের সমাজ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে এই পত্রিকা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করে পাঠক-মনের অনেক বন্ধ দরজা খুলে দিচ্ছে। পত্রিকাটি পড়ে সকল শ্রেণীর মানুষে উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য
পাণ্ডুয়া, হুগলী।

নিকটেই আছে

'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আমি মাস তিনেক ধরে নিয়মিতভাবে পড়ে আসছি। আমার কাছে সব থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে 'নিকটেই আছে' নামে নিয়মিত বিভাগটি। বর্তমান যুগে নানা ছদ্মবেশে, লোকচক্ষুর আড়ালে কত কাণ্ডই না ঘটছে। তা হয়তো সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু লোক-চক্ষুর সামনে যে জুয়াচোর পকেটমাররা বিভিন্ন কায়দায় মনুষ্যসমাজকে ফাঁকি দিচ্ছে তার চিত্র আপনাদের পত্রিকা অমৃত প্রতি সংখ্যাতেই তুলে ধরছে। এটা সত্যিই তারিফ করবার মতো। আশা করি 'নিকটেই আছে' বিভাগে আরো অনেকের স্বরূপ উদঘাটিত হবে—যা আমাদের বিস্মিত করে তুলবে।

মদন সরকার, দুর্গাপুর—৮।

সাহিত্যে ডবল নকল

কিছুদিন আগে 'ডুপ্লিকেট' বা নকল লেখক এই নামে কিছু আলোচনা পড়ে-ছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে অমৃতে অন্তরঙ্গকরের লেখাতেও এসম্পর্কে আলো-চনা দেখেছি। আর তাতেই জানতে পারি, 'বিমল মিত্র' নকল বেরিয়েছেন। অর্থাৎ উপরিউক্ত সাহিত্যিকের নাম কোনও অসাধু ব্যক্তি কাজে লাগাচ্ছেন। যাই হোক আমার বর্তমান পত্রের বিষয় ওই নকল বিমল মিত্রকে কেন্দ্র করেই।

কয়েকদিন আগে একটি বই হাতে এসেছিল লেখক বিমল মিত্র, বইয়ের নাম—'সংসার'। সাহিত্যিক বিমল মিত্রের 'এর নাম সংসার' নামক বইটিরই বোধহয় কার-চুপি সংস্করণ, এই ভেবেই তাড়াতাড়ির সঙ্গে 'সংসার' বইটি দেখছিলাম। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়তেই আমার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। মনে হ'ল বাংলা-সাহিত্যে এ এক অতি ঘৃণিত উপায়ে শ্রদ্ধেয় কথা-সাহিত্যিকদের ঠকানো হচ্ছে। সংসার বইটি আসলে একটি খোলস। সাহিত্যিক বিমল মিত্রের নামকে মিডিয়াম করে যে নকল বিমল মিত্র এই বইটি লিখেছেন, তাতে আবার অপর একজন লেখকের একটি উপন্যাসের হুবহু মিল রয়েছে।

গত ভাদ্র সংখ্যায় একটি পত্রিকায় শ্রীবুদ্ধদেব গুহের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস বেরিয়েছিল। নাম—'মহড়া' নকল বিমল মিত্রের সংসার বইটির প্রতিটি লাইন শ্রীবুদ্ধদেব গুহের সেই মহড়া উপন্যাস থেকে নেওয়া। বুদ্ধদেববাবুর একটি উপন্যাস ও কিছু ছোট গল্প আমি পড়েছি। বর্তমানে 'অমৃত' পত্রিকায় ধারা-বাহিক ভাবে প্রকাশিত ওঁর 'কোয়েলের কাছে' আমাকে মুগ্ধ করেছে। কারণ আমি নিজেও দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্য-পরিবেশে কাটিয়েছি। তাই এই জঘন্যতম কারচুপির আবরণ উন্মোচন করা প্রয়ো-জনীয় মনে করেই এই চিঠি লিখতে বাধ্য হলাম।

মহড়ার শুরু:—রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়ে, ওরা অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছিল।

সংসারের শুরু:—কবিগুরুর চিত্রা-ঙ্গদার নাট্যরূপ দিয়ে, ওরা অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছিল।

নায়ক অর্জুন রায়ের জায়গায় রমেন রায়। নায়িকা উজ্জয়িনীর জায়গায় বিভা। এইভাবে শুধু নায়ক-নায়িকার নাম পরি-বর্তন করে সম্পূর্ণ সংসার বইটি ৮০ পৃষ্ঠায় নকল বিমল মিত্র মহাশয় শেষ করেছেন। দাম দুই টাকা মাত্র। বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে চিঠির কলেবর বৃদ্ধি পাবে। প্রমাণ-স্বরূপ দুখানি বই-ই আমার কাছে রক্ষিত আছে।

আশা করি এই চিঠি আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশ করে শ্রদ্ধেয় কথা-সাহিত্যিক ও সমাজের কাছে এইসব অসাধু লেখক ও ব্যবসায়ীদের আসল মুখোশ খুলে দিতে সহায়তা করবেন।

কমল লাহিড়ী,
সোদপুর, ২৪-পরগণা।

শাদা চোখে

একটি বসন্ত অতিবাহিত হতে না হতেই যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক মুকুল অকালেই ঝরে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যুক্তফ্রন্টকে ঘিরে যে সুখের নীড় রচনা করেছিল, যে রঙীন স্বপ্নে জীবনকে রাঙিয়ে তুলেছিল —সে নীড় ভাঙছে, সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। শুধু গ্লানি আর হতাশা ক্রমেই জীবনকে করছে আচ্ছাদিত। প্রাণভরা ভালবাসা দিয়ে ফ্রন্টের যে ভাবমূর্তির গলায় তারা বরমালা অর্পণ করেছিল, সে মালা শুকিয়ে গেল। একটি সূত্র থেকে ঝরে পড়ার মাত্র আর দুদিন বাকী। অর্থাৎ আজ ১৪ই মার্চ শনিবার, আগামী ১৬ই মার্চ সোমবার রাত্রেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলেই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে দুঃখের গভীরতর কালো ছায়া। একমাত্র দৈববাণীই ফ্রন্ট রক্ষা করতে সমর্থ। নতুবা সব শেষ। শুধু ইতিহাসের পাতায় একটি অধ্যায় হিসাবে সংযোজিত হয়ে থাকবে একটি বৎসর। যুক্তফ্রন্টের অভ্যুত্থান ও পতনের কাহিনী। রাজনীতির ছাত্ররা গবেষণার বিষয়বস্তু পাবেন। শুধু পাবেন না ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মনের পরিচয়। আর পাবেন না যে মানুষগুলি অকাতরে এই সংস্থাটিকে ভালোবেসেছিল, তাঁদের প্রতি এই হৃদয়হীন রাজনীতিবিদদের দরদের এতটুকু স্বাক্ষর। কারণ, তত্ত্বকথার আড়ালে নিজেদের সযত্নে লুকিয়ে রেখে প্রত্যেকেই আবার সেবা ও ভালবাসার নতুন শপথ নিয়ে গণমনে অধিকার বিস্তারের আশায় দোরে দোরে ঘুরবেন। অভাগা বাঙালী সেই আবেদনে সাড়া না দিয়েও পারবে না। ক্ষমা-সুন্দর চোখে শত অপরাধ হেলায় ভুলে গিয়ে আবার হয়ত কম্পমান হাতে মালা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। শুধু অনুরোধ এইটুকু, বিচার-বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে সন্তর্পণে যেন এগিয়ে যান। এবং বিমূঢ় না হন। অবশ্য আঘাত-প্রত্যাঘাত জীবনে এসে থাকে। তাকে উপেক্ষা করে চলতে পারলেই জীবন-প্রবাহ ছন্দায়িত হয়ে উঠে। নব-বসন্তের আবার আবির্ভাব হয়। পল্লবিত হয় জীবন-তরু। এই ভরসা নিয়ে বাঙালীকে বাঁচতে হবে। অপরের হাতে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে অলস জীবন যাপনের দিন আর নেই। যদি তা করেন আঘাত পাবেন। হতাশা আসবে। জীবন-নদীর গতিবেগ স্তিমিত হয়ে যাবে। পরাজিত হয়ে প্রতিক্রিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

যাক্ বিলাপে বিলম্ব না করে ১৪ই মার্চ ও ১৬ই মার্চের মধ্যে ফ্রন্ট রাজনীতির নেপথ্য লিপিবদ্ধ করে যাই। কারণ, তা না হলে ইতিহাসের অনেক মালমশলা চাপা থেকে যাবে। ১৬ই মার্চ রাত্রিতে হয়ত অভাবনীয় ভাবে রাজনীতির পট পরিবর্তনও হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা নাও দিতে পারেন। একথা বলছি ১৪ই মার্চের শনিবার সকালবেলায়, ১৩ই মার্চের রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নির্ভর করে।

মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লী থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই তাঁকে ইস্তফা দেওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্য নেপথ্যে জোর চেষ্টা শুরু হয়। সূত্রটি শুরু হয় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাব থেকে। যদি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে স্বরাষ্ট্র-দপ্তর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বাংলা কংগ্রেসকে রাজী করিয়ে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এই প্রস্তাব বাম-কম্যুনিস্টরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেও স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের মালিক স্বয়ং জ্যোতিবাবু একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সমস্ত দলের প্রতিনিধিসহ এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন। উদ্দেশ্য, ফ্রন্ট সরকারের অনিবার্য পতন রোধ। এই বিকল্প প্রস্তাব আর দিল্লীর নিমরাজী ভাব মুখ্যমন্ত্রীর মনে নাকি একটি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বাম-কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের দৃঢ় উক্তি 'বিকল্প সরকার গঠিত হবেই' সংশ্লিষ্ট দলগুলির চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দেয়। তাঁদের অনেকেরই ধারণা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পর বাম-কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, রাজনীতিতে কখন কিভাবে মোড় ঘুরে যায় অন্ততঃপক্ষে বর্তমানের অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। এবং এসম্পর্কে তাঁরা বিহার ও উত্তর প্রদেশের ঘটনা উল্লেখও করেছেন। কাজেই সরকার যদি কেউ একবার গঠন করে ফেলে তখন শুরু হবে দলত্যাগের পালা। সুযোগ-সন্ধানীরা ত তত্ত্বকথার বর্মে নিজেদের আচ্ছাদিত করে নিকটেই আছে।

এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির দোটানায় পড়ে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস-ইউ-সি ও ফ্রন্টপন্থী পি-এস-পি ১৩ই মার্চের গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করে সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বাংলা কংগ্রেসসহ এই দলগুলির বিরুদ্ধে বাম-কম্যুনিস্টরা মিনিফ্রন্ট গঠন করার অভিযোগ করে আসছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, এই রাতের বৈঠকে এঁদেরই শপথ নিতে হয় মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে মিনিফ্রন্ট সরকার গঠিত হতে দেবো না। ভাবুন, কেন এই প্রতিজ্ঞা। নিশ্চয়ই তাঁরা এমন এক জায়গা থেকে ভয় পাচ্ছেন, যেখানে তাঁদের বিশেষ হাত নেই। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, পর্যায়ক্রমে গভর্ণরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেই চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্ন যদি এতই সোজা হত তবে তাঁর গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করার এত প্রয়োজন কি? আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী যদি সহজেই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র হতেন তবে তিনিও এতবার দেখা করতেন? [illegible] পর্যায় আর ঘটনার ক্রম-বিকাশ, এই সূত্রে এক করে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, রাজ্যপাল মহাশয় যেন একটা মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং মধ্যস্থতা [illegible] হলে তিনি কি করবেন সেটা [illegible] নিশ্চিত হতে না পেরেই এই [illegible] বৈঠক অবিশ্রান্ত চলছে। সূত্র [illegible] কথা মাথায় আসছে। আর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় বলতে গেলে, বাংলা কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদের বৈঠকে রাজ্যের সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করে স্থির হবে নীতি। এই সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা হচ্ছে আজকের এই ১৪ই মার্চের সকালবেলায়—(১) বাম-কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব— স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কার্য পরিচালনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বদলীয় তদারকী কমিটি। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দুই দলের মান রক্ষা করে ফ্রন্ট রক্ষা করা।

(২) এরকম অসহনীয় অবস্থার মধ্যেও প্রত্যেক দল বলেছেন ফ্রন্টের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়নি। একথা বলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে যে কোন অবস্থায় আবার হাতে হাত মিলিয়ে নেওয়ার জন্য পথ খোলা রাখা।

এখন দেখা যাক্ মার্কসবাদীরাই বা কেন হঠাৎ এরকম একটি বিকল্প প্রস্তাব

দিলেন। যাঁরা থানা-কমিটি গঠন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন তাঁরা এরকম উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগের ব্যাপারেই বা রাজী হচ্ছেন কেন?

একথা কারো অজানা নয়, যুক্তফ্রন্ট শরিকী সংঘর্ষ নিবারণের জন্য অতীতে অনেক কমিটি নিয়োগ করেছেন অকুস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করবার জন্য। কিন্তু একটি কমিটিও কাজ করেনি। ঘুরে এসে রিপোর্ট দিতে পারেনি। কারণ ভিন্ন মত। অথবা রিপোর্ট তৈরী করবার জন্য সময়ের অভাব। কাজেই উপরে যদি একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিতও হয়, তবে তা স্বাভাবিক কারণেই অচল হয়ে যাবে। কেউ একমত হওয়া সম্ভব হবে না। আর দূর-দূর থানায় কবে কি ঘটল, তার রিপোর্ট আসতে আসতেই ঘটনার গুরুত্ব কমে যাবে অথচ থানা-কমিটি গঠিত হলে কাজ হোক বা না হোক তাজা খবর জোগাড় করা খুবই সম্ভব, আর বাম-কম্যুনিষ্টদের কার্য-কলাপের উপর নজর রাখার সুবিধাও অনেক বেশি।

কাজেই মনে হচ্ছে বাংলা-কংগ্রেস ও তার সহযাত্রী দলগুলি হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছে। যদি জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে সংখ্যা লঘু সরকার গঠিত হয়ে যায়, তবে তাঁরা বিশ-বাঁও জলে গিয়ে পড়বেন, আর মুখ্য-মন্ত্রীর এঁদের নেতৃত্বে যে সরকার গঠনের কথা এরা মনে মনে পুষে আসছিলেন, তা যে ক্রমেই নিরাকার হয়ে যাচ্ছে দিল্লী থেকে ফেরার পর মনে হয় তিনি সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছেন। কাজেই মীমাংসার একটা শেষ চেষ্টা চলছে।

যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন ফ্রন্টের মধ্যে শরিকদের সংহত হলো গেছে। একমাত্র আর-এস-পি যদিও বা নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার পরেও হয়তো বলবেন, আমরা অন্য তেরটি দল একযোগে মন্ত্রিসভা করতে পারব না কেন। শোনা যায়, এই মর্মে চিঠিও প্রস্তুত। কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পত্র প্রেরিত হবে বলে ধারণা। কাজেই ১৬ তারিখের মধ্যে আর একটা অঘটন ঘটলে কেউ আশ্চর্য হবেন না। এই অঘটন হচ্ছে ফ্রন্টের জোড়া-লাগার অঘটন মন্ত্রীসভা একত্রে কাজ করবার পুনঃ প্রতিশ্রুতি দেবার অঘটন।

আর তা না হয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটে তাহলে কি হতে পারে সেই সম্পর্কেও খানিকটা চিত্র ভেবে রাখা দরকার। ফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাম-কম্যুনিষ্টরা কি আন্দোলন করতে পারবেন জানি না। কিম্বা আন্দোলন তাঁদের কতটুকু সাফল্য লাভ করবে তাও জানি না। তবে একটা কথা বলা যায়, পশ্চিম-বাংলাও বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি সরু হয়ে যাবে। এক গ্রুপের দলপতি বলবেন, আমার সংখ্যাধিক্য আছে, অন্যরা

বলবেন আমাকেই মন্ত্রীত্বের জন্য ডাকা হোক। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা থাকছে কি? আদি ও নব দুই কংগ্রেসকে বাদ দিলে বর্তমানের যুক্তফ্রন্টের দ্বিধা-বিভক্ত রূপে কি হবে। নিশ্চয়ই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বা অন্য দলগুলো কেউই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কারণ, ফ্রন্টের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২১৮। ডিফেকশান না ঘটাতে পারলে বর্তমানের সংহতি অনুযায়ী দুই শিবিরের শক্তি সংখ্যা মোটামুটি দু-চারজনের এদিক ওদিক হয় মাত্র। কাজেই কংগ্রেসের সমর্থন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কংগ্রেসের সাহায্য চাইতে কে কুন্ঠা বোধ করবে। বাম-কম্যুনিস্ট বা ডান কম্যুনিস্ট কেউই এর জন্য দ্বিধা বোধ করবেন না করতেও পারেন না। কারণ, ডান কম্যুনিস্টরা সামগ্রিক দেশের রাজনীতিক ভিত্তিতে ইন্দিরা-কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেই আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে এখন তাঁরা যে অবস্থায় আছেন, তাতে যে কেন মুহূর্তে কোয়ালিশন সরকার করতেও গররাজী হওয়ার কথা নয়। বাংলা কংগ্রেসে এসম্পর্কে কোন ভিন্ন চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়াও সম্ভব নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি ইন্দিরার কর্মপন্থাকে আধা-প্রগতিশীল মনে করলেও কেন্দ্রে তাঁদের সঙ্গেই চলছেন। আর ফ্রন্টপন্থী পি-এস-পি ইতিমধ্যেই তাঁদের ভাগ্যের নৌকার হাল বাংলা কংগ্রেসের হাতেই তুলে দিয়েছেন। শুধু মুসকিল হবে এস-এস-পিকে নিয়ে। তাঁদের মত হচ্ছে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ইন্দিরা কংগ্রেস আদৌ প্রগতিবাদী নয়। অতএব, ওঁর দলের সঙ্গে সমঝোতার কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং পশ্চিম বাংলায় ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের প্রশ্নে তাঁরা যে বিপরীত দিকে ঘুরে দাঁড়াবেন না, অর্থাৎ মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যাবেন না, একথা বলা যায় না। তাঁদের দল ভাঙনের মুখে গিয়ে পড়বে এমন সন্দেহ নেই। তবে যে কোন অবস্থাতেই তাঁদের ২।১ জন সদস্য যে এদিক ওদিক করবেন সেটা নিঃসন্দেহ। যদি কাশীকান্ত মৈত্র সহ একদল অজয়বাবুর দিকে যান তবে শ্রীনরেন দাস মহাশয় তাঁর দু একজন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে জ্যোতিবাবুর দিকে যাবেন। আর যদি কাশীবাবুরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলান তবে নরেনবাবুরা ইন্দিরাজীর সমাজবাদী কর্ম-পন্থায় আস্থা স্থাপন করে অজয়বাবুর নৌকায় উঠে পড়বেন। এর অন্যথা হবে না।

কেরালার রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আর এস পি'র ভূমিকা কি হবে বলা কঠিন। এখনও তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে নিরপেক্ষ হয়েও বাম কম্যুনিস্ট ঘেঁসা কথাবার্তা বলছেন বটে। তবে সত্যিই যদি অজয়বাবু বিকল্প সরকার গঠনে সমর্থ হন, তবে প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সমর্থন জানাবেন না, এমন কথা বলা যায় না। ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি বেশী কায়দা করতে গিয়ে অজয়বাবুর নেতৃত্বকে প্রায় অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেই বসে আছেন। আর মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই তিক্ত হয়ে উঠেছে যে এক সঙ্গে ঘর করতে যাওয়া একটু অসুবিধা হবে বই কি?

আর যদি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করে তবে ত কথাই নেই। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর ভাষায় বলা যায়, এখানে মুখে কংগ্রেসের বিরোধিতা করলে কি হবে দিল্লীতে ত স্বয়ং রামমূর্তি সাহেব দু বেলা ইন্দিরাজীর কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন? কথাটা নিতান্ত অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ইন্দিরাজীর সকলকে দিল্লী ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিনি কি জেনে শুনেই একটি বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে (যাঁরা দিনের মধ্যে একবার অন্তত কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই-এর কথা না বলে জলস্পর্শ করেন না, সেই রকম) একটা ফ্রন্টকে তার শত্রুতা করবার জন্য গদীতে রাখবার মানসে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছেন। নাকি তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এই ঝগড়া তাঁর আদৌ পছন্দ নয় বলে এই মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রায় সব দলই যে তার সমর্থক এটাই কি তার প্রমাণ নয়? কবে, কখন, কোথায় কে দেখেছেন বিরোধী দলকেও শাসকদলকে গদীতে রাখবার জন্য এমন প্রাণপাত চেষ্টা করছে? নিশ্চয়ই কোথাও একটা মিলনের সূত্র আছে। নতুবা এই সাহস তাঁরা দেখান কি করে? উত্তরপ্রদেশে চরণ সিং গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে হাত মেলাবার একদিনের মধ্যেই চরণ সিংকেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব দান করে নব-কংগ্রেস পরোক্ষে ক্ষমতায় থেকে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নব-কংগ্রেসের যাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রু বলে নিজেদের চিহ্নিত ও মুহুর্মুহু ঘোষণা করে আসছেন, তাঁদের গদীতে আসীন রাখবার জন্য ইন্দিরাজীর এত আগ্রহ কেন? নিশ্চয় যুক্তফ্রন্ট তাঁর কাছে দায়াবদ্ধ। এ ছাড়া এই ঘটনার আর কোন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হতে পারে কি? যদি আখেরে ঐক্যবদ্ধ না থেকে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়, তাহলেও বুঝতে হবে যে নিতান্ত ঘটনার পরিবেশই তাঁদের একত্রে থাকতে দিল না।

কিন্তু এই নিবন্ধ সহৃদয় পাঠকরা যখন পাঠ করবেন, তখন ১৬ই মার্চ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এবং তখন হয়ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থাকবে, না-হয় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়ে আবার মন্ত্রিসভা গঠনের তৎপরতা শুরু হয়ে যাবে। তবে, পাঠকগণ একটা কথা স্মরণ রাখবেন, যদি জোড়াতালি দিয়ে ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা টিঁকে যায়, তবুও জনগণের কল্যাণের আশা অতীব কম। কারণ মন্ত্রীত্বের গদীতে এক থাকলেও মনের মিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই আগেরে জনগণকেই তার মাশুল দিতে হবে। ফ্রন্ট যদি টিঁকে থাকে তবে কিছুদিন বাদেই আবার সেই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। আর যদি ক্ষমতা থেকে ফ্রন্ট বিচ্যুত হয়ে যায়, কোনো দল হয়ে যাবে বিপ্লবী, আর কেউ বা প্রতিক্রিয়াশীল। কেউ আন্দোলনের ডাক দিয়ে কিম্বা আন্দোলন করে পাপ অপনোদনের চেষ্টায় ব্রতী হবেন। আবার কেউ প্রগতিশীল কর্মসূচী রূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনছেন। এই অজুহাতে [illegible] সাহায্যে "সমাজবাদের রথচক্র" এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, মহৎ [illegible] সম্পাদন করতে লাগে অসম্ভব [illegible] কৃচ্ছসাধন এবং দীর্ঘদিনের প্রচে[illegible] [illegible] কাজ করতে মুহূর্তেও দেরী [illegible] তেমনি সমাজবাদেরও কোন শর্টকাট নেই। অদ্যাবধি যা হয়েছে তা ধাপ্পা [illegible] ক্ষমতা বাজীমাৎ করার চেষ্টা মাত্র। এই রাজনীতি আদর্শের প্রতি অনীহার কথাই ব্যক্ত করে মাত্র। আমার এই বক্তব্য তাঁদেরই জন্য যাঁরা নিজেদের প্রতিনিয়ত সমাজবাদের অগ্রণী সৈনিক বলে দাবী করেন।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট থেকে বাংলা কংগ্রেসের বেরিয়ে যাওয়ার এবং ফ্রন্ট সরকার থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভবিষ্যৎ সুক্ষ্মসূত্রে ঝুলতে আরম্ভ করল তখন রাজধানী দিল্লী বিব্রত হচ্ছিল পানীয় জল দূষিত হওয়ার সমস্যা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগ করার আগেই বিধান-সভা অচল হয়ে পড়ায় বাজেট পাশ করার সমস্যা দেখা দিল এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আলোচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন।

যদিও শ্রীমতী গান্ধীর সরকার রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্কের শেষে লোকসভায় প্রচুর ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছেন তাহলেও তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ দূর হয় নি। বিশেষ করে, পুরানো কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি বিরোধী দল যে তাঁর সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সবরকম চেষ্টা করে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ভোট গ্রহণের সময় পুরানো কংগ্রেস দলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। ভবিষ্যতে যাতে সবাই হাজির থাকেন সেজন্য দলের সদস্যদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীমতী গান্ধীর দলকে আবার লোকসভায় শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার যাই করুন না কেন, লোকসভার ভোটাভুটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেকথা তাঁদের ভালভাবে বিবেচনা করতে হচ্ছে। স্বভাবতই শ্রীমতী গান্ধীকে এ ব্যাপারে খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের প্রথম চেষ্টা হল, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ব্যাপারে তাঁদের কোন ভূমিকাই যে নেই সেকথাটা বুঝিয়ে দেওয়া। এই কারণেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ও পশ্চিমবঙ্গে যে আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে সেকথা নিজে স্বীকার করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অনিচ্ছুক হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'নূতন কংগ্রেস' দলের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, এই রাজ্যে ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটলে অন্য যে কোন সরকারই তৈরী হোক না কেন তার মধ্যে তাঁর দল থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আর একটি ঘোষণা গত সপ্তাহে শোনা গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনের মুখ থেকে। তিনি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীদের তালিম দেওয়ার জন্য যে কয়েকটি কেন্দ্র চালু রয়েছে সে খবর কেন্দ্রীয় সরকার রাখেন—যদিও রাজ্য সরকার এবিষয়ে কোন খবর তাঁদের দেন নি। স্পষ্টতই, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে 'জাতীয় উদ্বেগ' প্রকাশ করা হয়েছে তার মূলে নকশালপন্থী তৎপরতার এই সংবাদও একটা কারণ। আর একটি খবরে প্রকাশ যে, নকশালপন্থীদের দমন করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ব্যাপক প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে পত্র দিয়েছেন।

'শিকাগোর সাতজন'

'শিকাগোর সাতজনকে' নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তোলপাড় চলছে। বোস্টন শহরে ২৫০০০ মানুষ বিক্ষোভ জানিয়েছে, ম্যানহাটানে ১৫০০ জন রাস্তায় বেরিয়েছে বার্কলি ও পলো অল্টোর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দোকানপাটে ইট ছোঁড়া হয়েছে। এই সব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে ঐ সাতজনের উপর আদালতের যে দণ্ডাদেশ হয়েছে তার বিরুদ্ধে। প্রকারান্তরে বলতে গেলে আমেরিকার তরুণদের এই বিক্ষোভ সেদেশের সমগ্র বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

এরকম যে হবে সেকথা ঐ সাতজন দণ্ডিত আসামীর মধ্যে একজন আদালতেই বলেছিলেন। যিনি একথা বলেছিলেন তাঁর নাম রেনার্ড ('রেনি') সি ডেভিস। আমেরিকান ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের ফেডারেল বিচারপতি জুলিয়াস হফম্যান জুরির রায়ের ভিত্তিতে দণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পর রেনি ডেভিস বলেছিলেন, 'আমার জুরিদের দেখা যাবে আগামীকাল সারা দেশের রাস্তায়।'

'শিকাগোর সাতজনে'র বিরুদ্ধে এই মামলার উদ্ভব ১৯৬৮ সালে ডেমোক্র্যাটিক দলের জাতীয় সম্মেলনের সময়কার ঘটনা থেকে। ঐ সম্মেলনের সময় শিকাগো শহরে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধীরা ও সরকার-বিরোধীরা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল, সেটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আকার ধারণ করে-ছিল। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের গুরুতর সংঘর্ষ হয়েছিল। শিকাগো শহরের মেয়র হচ্ছেন রিচার্ড ডেলি। তিনি ডেমো-ক্র্যাটিক দলের লোক এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল ও কড়া মেজাজের মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর অধীনস্থ পুলিশবাহিনী শিকাগোর বিক্ষোভকারীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছিল আর বিক্ষোভকারীরাও ছেড়ে কথা কয়নি। ঐ ঘটনার ভিত্তিতে আমেরিকান ঔপন্যাসিক নর্মান মেইলার 'আর্মিজ অব দি নাইট' নামে একটি বই লিখেছেন।

শিকাগোর ঐ ঘটনার পর আট মাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে গত বছর মার্চ মাসে এই সম্পর্কে আটজনকে বিচারপতি জুলিয়াস হফম্যানের আদালতে সোপর্দ করা হয়। আসামীরা সকলেই প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, আদালতে তাঁরা ন্যায়-বিচার পাবেন না। আদালতে বসে বিচার-পতিকে 'ফ্যাসিস্ট', 'শুয়ের' প্রভৃতি ভাষায় গালিগালাজ করতে, অশালীন শব্দ প্রয়োগ করতে, আমেরিকার বিচার-ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের অনাস্থা ঘোষণা করতে তাঁরা একটুও কসুর করেননি। অপরপক্ষে, বিচারপতি হফম্যানও আসামীদের প্রতি তাঁর বিরূপতা গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। আদালতের ভিতরে গোড়া থেকেই একটা গমাকাবেলার রাজনীতি'র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার মধ্যে আইনের বিশ্লেষণে কেউ বড় বেশী মনোযোগ দিতে পারেননি। একদিকে বিচারপতি ও সরকার পক্ষের উকিল এবং অন্যদিকে আসামীরা ও আসামীপক্ষের উকিল পরস্পরের উদ্দেশে চীৎকার করে আদালতকক্ষকে গরম করে তুলেছেন। আসামীদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এজলাসের মধ্যেই মার্শালদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছেন।

বিচারের মধ্যপথেই একজন আসামীকে আদালত অবমাননার দায়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হলেন ববি সীল। চরমপন্থী নিগ্রোদের 'ব্ল্যাক প্যান-থার্স' নামে যে দল আছে, সেই দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ববি সীল আদালতে সবচেয়ে বেশী গোলযোগ বাধিয়েছেন। শেষ-পর্যন্ত তাঁকে হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে রেখে আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত রাখা হয়েছিল বিচারপতির আদেশে।

অন্য যে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল, তাঁরাই 'শিকাগোর সাতজন' নামে খ্যাতিলাভ করেছেন।

এঁদের বিরুদ্ধে দুই দফা অভিযোগ আনা হয়েছিল। এক দফা অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ১৯৬৮ সালে শিকাগোতে ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনের সময়ে দাঙ্গা বাধাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজ্যের সীমানা পার হয়ে অন্য রাজ্যে আসার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে

দ্বিতীয় দফার অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁরা নিজেরা আলাদা-আলাদাভাবে দাঙ্গা বাধাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তঃ রাজ্য চলাচলের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৮ সালের নাগরিক অধিকার আইনের মধ্যে দাঙ্গা দমন সংক্রান্ত যেসব ধারা যোগ করা হয়েছে, সেইসব ধারার বিধান অনুযায়ীই এইসব অভিযোগ আনা হয়েছিল। ঐ ধারাগুলির দ্বারা দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের একাংশকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনা হয়েছে; কিন্তু আইনটি কতদূর সংবিধানসম্মত, সে-বিষয়ে প্রশ্ন আছে এবং বিচারপতি হফম্যানের এজলাসে সেই প্রশ্নেরও যাচাই হবে বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু যেভাবে এই মামলা চলেছে, সেভাবে এটাকে সমগ্র আমেরিকান বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা চলবে। তাতে এই মামলার আইনের দিকের চেয়ে রাজনীতির দিকটা অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

এই বিচারে সাহায্য করার জন্য যে জুরি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। জুরিতে ছিলেন দশজন নারী ও দু'জন পুরুষ। মামলার শুনানীর পর যখন জুরারেরা কি রায় দেবেন তা বিচার করতে বসলেন, তখন দেখা গেল, নারীদের মধ্যে ছ'জন এবং পুরুষদের মধ্যে দু'জনই সাতজন আসামীর সকলকেই দুই দফা অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে চান। বাকি চারজন নারীর মধ্যে তিনজন সকলকেই অব্যাহতি দিতে চান আর একজন মনস্থির করতে পারলেন না। দুটি দলের মধ্যে এমন তীব্র মতবিরোধ হল যে, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে হোটেলের আলাদা আলাদা ঘরে বৈঠক করতে লাগলেন। চারদিনেও কোন মীমাংসা হল না, শেষপর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠা জুরর মিস কে রিচার্ডসের চেষ্টায় একটা আপোষ হল। (একজন সদস্য বলেছেন, 'আমরা বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম'।) শেষপর্যন্ত জুরির যে-রায় বেরোল, তাতে দলবদ্ধ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে সাতজনকেই অব্যাহতি দেওয়া হল, পাঁচজনকে ব্যক্তিগতভাবে দাঙ্গা করার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করা হল এবং দুজনকে (একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর একজন গবেষক) দুই দফা অভিযোগ থেকেই অব্যাহতি দেওয়া হল।

জুরি এই রায় ঘোষণা করার পর বিচারপতি হফম্যান তাঁর দণ্ডাদেশ দিলেন—প্রত্যেক আসামীর জন্য পাঁচ বছরের কারাবাস ও পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা।

কিন্তু এই দণ্ডই সব নয়। জুরিরা তাঁদের রায় বিবেচনা করতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারপতি হফম্যান "শিকাগোর সাতজন"-এর বিরুদ্ধে এবং তাঁদের অ্যাটর্নিদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনলেন। বিভিন্ন অভিযোগে বলা হল, তাঁরা বিচারপতিকে "ফ্যাসিস্ট", "শুয়োর," "স্বেচ্ছাচারী" প্রভৃতি বলে গালাগালি দিয়েছেন, উঠতে বললে উঠে দাঁড়ান নি, হেসেছেন, শ্লেষাত্মক কথা বলেছেন ইত্যাদি। সাতজন আসামীকে আদালত অবমাননার দায়ে দু মাস থেকে ২৯ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

আর সবচেয়ে অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটল আসামী পক্ষের দু'জন অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে। বিচারপতি হফম্যান অ্যাটর্নি উইলিয়াম এম কুনৎসলারকে আদালত অবমাননার দায়ে চার বছর ১৩ দিনের জন্য এবং অ্যাটর্নি লিওনার্ড আই ভাইনগ্লাসকে ২০ মাসের জন্য কারাবাসের আদেশ দিলেন। জুরির সঙ্গে পরামর্শ না করে কাউকে আদালত অবমাননার অপরাধে ছ' মাসের বেশী কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না, সুপ্রীম কোর্টের এই রায় এড়াবার জন্য বিচারপতি হফম্যান একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার পৃথক পৃথক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন এবং প্রত্যেকটির দরুণ অনধিক ছ' মাস কয়েদ খাটার আদেশ দিলেন। এই পৃথক পৃথক কারাবাসের আদেশগুলি যোগ করে ঐ দীর্ঘমেয়াদের দণ্ডাদেশ দাঁড়াল। আমেরিকার বিচার-ব্যবস্থার ইতিহাসে কোন ব্যবহারজীবীকে সরাসরি বিচারের দ্বারা (যেখানে একই ব্যক্তি একাধারে অভিযোগকারী ফরিয়াদী পক্ষের উকিল, জুরি ও বিচারপতি) এমন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা অভূতপূর্ব।

যদিও ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগ্নুর মত রক্ষণশীল মার্কিন নেতারা শিকাগোর আদালতের এই বিচারকে অভিনন্দিত করেছেন, তাহলেও আমেরিকার উদারনৈতিক জনমত যে এই বিচার ও দণ্ডাদেশে বিচলিত হয়ে পড়েছেন ও আমেরিকান বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন তাতে সন্দেহ নেই। নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট মেয়র জন লিন্ডসে বলেছেন 'বিচার-ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে' এই মামলা। তিনি এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'সাদামাটা কঠোর সত্য কথাটা হল এই যে, আমাদের দেশ একটা নতুন দমনপীড়নের যুগের সম্মুখীন হতে চলেছে—যে-দমনপীড়ন গত কয়েক বছরের মধ্যে আর কখনও এমন বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি।'

অর্থাৎ, প্রকারান্তরে, শিকাগোর সাতজন আমেরিকার বিচার-ব্যবস্থাকেই বিচারের সম্মুখীন করেছেন। তাঁরা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলির জের চলবে বলে মনে হচ্ছে।

●

এদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তিনটি রাজ্যের মধ্যে এমন একটা অবাঞ্ছিত সম্পর্কের ত্রিভুজ তৈরী হচ্ছে যেটা উদ্বেগজনক। এই তিনটি রাজ্য হচ্ছে মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ু। বেলগাঁও ও অন্যান্য কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের মধ্যে যে বিরোধ চলছে তার কোন মীমাংসা হয় নি। যদিও এই বিরোধ সম্পর্কে সীমান্তের দুই পারে কিছুদিন আগে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল সেগুলি এখন বন্ধ হয়েছে তাহলেও উভয়পক্ষই এই ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করে রয়েছেন। ভারত সরকারও স্থির করে উঠতে পারছেন না, তাঁরা কি করবেন। মহারাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা ইন্দিরা-সমর্থক কংগ্রেস দলের হাতে রয়েছে আর মহীশূরে শাসনক্ষমতা রয়েছে ইন্দিরা-বিরোধী কংগ্রেস দলের হাতে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভি পি নায়েকের সরকারও সন্তুষ্ট হবেন আবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠবে না, সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার এমন একটি সূত্র খুঁজে বার করা স্পষ্টতই নয়াদিল্লীর পক্ষে সহজ হচ্ছে না।

মহীশূরের সঙ্গে তামিলনাড়ুর বিরোধ রয়েছে কাবেরী নদীর জলের ভাগ নিয়ে। এই দুই রাজ্যের মধ্যে কাবেরী নদীর জল কিভাবে ভাগ হবে সেবিষয়ে ১৯২৪ সালে থেকে একটি চুক্তি হয়ে আছে। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তামিলনাড়ুর বক্তব্য হচ্ছে, হেমবতী ও কাবিনি নামে কাবেরীর দুটি উপনদীতে মহীশূর সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই দুটি কার্যকরী হলে ঐ চুক্তি অনুযায়ী তামিলনাড়ুর যতটুকু জল পাওনা আছে ততটুকু আর তার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না। অপরপক্ষে, মহীশূর সরকার বলছেন, মেট্টুর ও অন্য একটি পরিকল্পনায় তামিলনাড়ু এর আগে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী জল নিয়েছে এখন মহীশূর শুধু তার সেই লোকসানটা পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করছে মাত্র।

তামিলনাড়ুর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিয়েছে যে বিষয়টি নিয়ে সেটি হল এই যে, বোম্বাই সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তামিলদের উপর জুলুমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধানত শিবসেনাদের উদ্যোগে এই জুলুম চলছে, এই কথা বলে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। এরকম একটা খবরও বেরোল যে, এই বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান করার জন্য তামিলনাড়ু থেকে একদল প্রতিনিধি পাঠান হল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়ক এই বলে আপত্তি জানালেন যে, এটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের ভিতরকার ঘটনায় অন্য একটি রাজ্যের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। পরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রী করুণানিধি বলেছেন যে, মহারাষ্ট্রে প্রতিনিধিদল পাঠাবার কথা তিনি বলেন নি। তবে মহারাষ্ট্রে তামিলদের উপর অত্যাচার ও শিবসেনাদের হাতে তাদের নির্যাতনের অভিযোগও তিনি ফিরিয়ে নেন নি।

১৩,৩,৭০।

সম্পাদকীয়

অনিশ্চয়তার আবর্তে

পশ্চিম বাংলার রাজনীতি আবার এক জটিল আবর্তের মধ্যে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত এই জটিলতাকে ত্বরান্বিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, চৌদ্দ পার্টির যুক্তফ্রন্টের জন্মলগ্ন থেকেই এদের মধ্যে বিরোধের বীজ লুকোনো ছিল। গত এক বছরে তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পরস্পরের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর পদটি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ দেখা দেয়। মার্কসবাদীরা প্রকৃতপক্ষে সেই সময়েই অজয় মুখার্জীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই সপ্তাহখানেক ধরে দপ্তর নিয়ে জোর টানা-পোড়েন চলে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য পার্টিগুলোর মধ্যে সত্যিকারের সদ্ভাব ছিল না। আশা করা গিয়েছিল যে কাজের মধ্য দিয়ে এই পার্টিগুলো পরস্পরের কাছাকাছি আসবে। কারণ কার্যসূচীর ভিত্তিতেই যখন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তখন নিম্নতম সাধারণ কার্যসূচীই এদের ঐক্যবদ্ধ করবে।

সেই আশা পূর্ণ হয় নি। বাংলা কংগ্রেস পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছে যে মার্কসবাদীদের সঙ্গে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলা কংগ্রেসের প্রতি 'বন্ধুভাবাপন্ন' দলগুলো কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। অর্থাৎ সকলে ঝগড়া করতে রাজী, কিন্তু কেউ কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিলে তার পিছনে কেউ দাঁড়াতে রাজী নয়। ফ্রন্টের শরিকদের এই সুবিধাবাদী রাজনীতিই ফ্রন্টের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। যদি তাঁরা আন্তরিকভাবে নির্দিষ্ট কার্যসূচীর ভিত্তিতে কাজ করতে রাজী হতেন তাহলে পশ্চিম বাংলার রাজনীতির অবস্থা এমন ঘোরালো হত না।

অবস্থা এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময় মন্ত্রিসভা থাকবে কি যাবে তা বলা যাচ্ছে না। বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যও জোর চেষ্টা চলছিল। অঙ্কের হিসাবে বাংলা কংগ্রেসের ৩৩ জন সদস্য ফ্রন্টে না থাকলেও যুক্তফ্রন্টের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে এবং তার দ্বারা মন্ত্রিসভা পরিচালনা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু অঙ্কের হিসাবে রাজনীতি সব সময় চলে না। তাই নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল রাজ্যের বাজেট পাশ করানো। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের বাজেট পাশ করবার জন্য কয়েকদিন সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা তাতে রাজী হন নি। ফলে এই বাজেট ৩১ মার্চের মধ্যে পাশ করাবার দায়িত্ব পড়ল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর।

প্রধানমন্ত্রী এই সংকট এড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। এটা স্পষ্ট যে, নতুন কংগ্রেস চান না যে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে যাক। বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনেও তাঁদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। রাষ্ট্রপতির শাসন যদি হয় তবে তার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টেরই। কারণ তাঁরাই মিলে মিশে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথা উঠেছে। নির্বাচন হলেই যে অবস্থার উন্নতি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত এককভাবে কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা খুব কম। তাহলেই আবার কোয়ালিশনের প্রশ্ন আসবে। কেরলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা চালাচ্ছে। বাংলাদেশে সে রকম কোনো অবস্থা দেখা দেয় কিনা তা নিয়ে জল্পনা চলবে।

আসল কথা, ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এক কঠিন সময় এখন। কোনো একটি দলের পক্ষে রাজ্য শাসন করা দুষ্কর। অথচ নীতিভিত্তিক কোয়ালিশনও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা যাচ্ছে না। এদিকে বাংলা দেশে বিশেষত আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন সকলের মুখে মুখে। সমাজবিরোধীরা সরকারের ভিতরকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে চরম দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। এ অবস্থায় কোনো রাজ্যে স্বাভাবিক জীবন চলতে পারে না। ১৯৬৭ সাল থেকে যে অনিশ্চয়তা চলছে বাংলা দেশে ১৯৭০ সালে এসেও তা স্থির হল না। সত্তরের দশককে সম্ভাবনার দশকরূপে চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিম বাংলায় তার সম্ভাবনা কী একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে।

যাই ॥

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

রক্তে বেজে উঠেছে ডাক—আমি যাই
বোধে ফুটেছে কাঁটা, তাহলে যুদ্ধ
বুকের ভেতর টুপটাপ খসে পড়ছে বীজ,
যেন পাথর? শুধু যেন পাথর?

যতটা দূরে যাই ততটাই ফিরে ফিরে আসি
সিঁড়ি বলতে ওঠা নামা দুটোই
ডান হাত অন্ধকারে বাঁ-হাতে জেলেছি লন্ঠন
যুদ্ধেও আমি শান্তিতেও সেই।

তবু বোধে ফুটেছে কাঁটা, তাহলে যুদ্ধ
রক্তে বেজে উঠেছে ডাক—আমি যাই।

ঋতুবদলের পালা ॥

শিশির ভট্টাচার্য

যদিও এখনি ঋতুবদলের পালা
আকাশে বাতাসে ঊর্ধ্বশ্বাসের তাড়া
এখনি রুপোলি দুপুরের স্মৃতিটুকু
শ্রাবণের ঘন ঘোলাজলে পিচ্ছিল।

কেঁপে কেঁপে বাজে স্টীমার ছাড়ার বাঁশি
পাটাতনে ঢেউ ছলাং ছলাং ডাকে
স্পন্দিত জেটি কলরবে উচ্ছল
হাঁসের ডানায় বাসাবদলের গান।

তবু ছুঁয়ে থাকো তৃষ্ণার সীমারেখা
রক্তে বাজাও সবুজে ধানের রঙ
বুকের কঠিন কান্নায় পাড়ে ভেঙে
মনে হয় তুমি এসে বুঝি ফিরে গেলে।

খিল খুলতেই ॥

সুধীর মুখোপাধ্যায়

সে এসে আমার দরজায় টোকা দিয়ে বললে
খোল দরজা,
আমি তখন ঘরের মধ্যে
আমার রাজপথে মিছিলের মাথা গুনছিলুম
চির অনাগত ফসলের রূপ দেখছিলুম—
খুলি নি।

তারপর একদিন নির্বাসিত আমি
ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে যখন
নিসর্গের শোভা দেখছিলুম
প্রজাপতির পাখায় ঝুলতে ঝুলতে অনেক উঁচুতে
দুর্লভ কোন ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে
আকাশের নীলটাকে দু হাত দিয়ে কুড়িয়ে
বুকের মধ্যে পুরে রাখছিলুম
তখন
দরজায় আবার টোকা
তখন অপার্থিব আমি
দু হাতে যত জোর তারচেয়ে আরো অনেক জোরে
দরজার সঙ্গে সঙ্গে থাকা খিলটাকে খুলে দিলুম—
হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল যে
সে আমার পার্থিব বধ্যভূমির অজগর অন্ধকার।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যেমন কাল তেমনি হাল। কিংবা, যেমন কলি তেমনি চলি।

আমাদেরও তেমনি। যেমন দেখা তেমনি লেখা। ঘটনা দেখে রটনা করা। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ে মমত্ববোধ আর প্রকাশে দুঃসাহস।

'রাখুন।' আমার তরুণ বন্ধুটি পাশ থেকে গর্জে উঠল ; 'কিউ—একটা কিউতে দাঁড়িয়েছেন কোনোদিন? সকাল থেকে দুপুর—দুপুর গড়িয়ে বিকেল—দেখেছেন সে ক্লান্তি আর নৈরাশ্যের চেহারা? সেই এক সুড়ঙ্গ অন্ধকার?'

'যে যেমন দেখেছে।' বললাম সবিনয়ে, 'তুমি লাইন দেখছ, আমি হয়তো দোকানিকে দেখছি। রসদ কম গ্রাহক বেশি। কী করে ঠেকাবে চাহিদাকে? কী করে ঝাঁপ ফেলে পালাবে এক ফাঁকে? তুমি নৈরাশ্য দেখছ আমি ভয় দেখছি। দুই-ই বাস্তব। দুই-ই বর্তমান। দুই-ই সমাজের মধ্যে।'

'কিন্তু লাইন যদি ক্ষেপে যায়,' তরুণ বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'জনতা যদি দোকানের উপর চড়াও হয়, তছনছ লুটপাট শুরু হয়ে যায়—'

'তোমার চোখে তাই বড় হয়ে পড়ে তুমি তাই লেখ। আমি দেখছি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পুলিশসাহেব উদাসীনের মত কেমন রোদ পোহাচ্ছে।'

'পুলিশের কথা বলবেন না।'

'কেন বলব না? পুলিশও তো মানুষ। মানবতা যেমন ক্ষুধার্তের মধ্যে আছে তেমনি ভয়ার্তের মধ্যেও আছে। আবার কাজ রাখি না প্রাণ রাখি পুলিশসাহেবের এই দ্বিধাগ্রস্ততা—এই পীড়ার্ততার মধ্যেও তো বর্তমান।'

তরুণ বন্ধু শান্ত হতে চায় না। বললে, 'চোরের মধ্যে দেখুন, পুলিশের মধ্যে দেখবার কী আছে?'

'চোখের সামনে মারপিট হচ্ছে অথচ পুলিশ লাঠি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কিছু করতে পারছে না, তার এই যন্ত্রণাটা অনুভব করবার মত নয়? চোরের কথা যদি বলো, গৃহস্থের কথাটাও ভুলো না। চোরকে হাতেনাতে ধরতে পেরে গৃহস্থ তাকে খুঁটিতে বেঁধে বেদম পিটছে—পিটুনি খেতে-খেতে চোর ক্লান্ত হয়ে বলছে, একটু জল খেতে দিন, আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, সেই গৃহস্থই তাকে গ্লাস করে জল এনে দিল।'

যেমন জঘন্যতা আছে তেমনি মহানতাও আছে। যেমন নিষ্ঠুরতা আছে তেমনি মায়া-মমতাও আছে। লোলুপতার পাশেই রয়েছে নিস্পৃহতা। কপটতার পাশেই আন্তরিকতা। আর, মানবতা সবখানে। সব নিয়ে মানুষ, আবার সবরকম মানুষ নিয়েই সমাজ।

'শুধু বানানে-ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য এসেছে—এই যা।' বললাম সরল করে।

'আপনার সবতাতে কেবল ওসব ভুল খোঁজা—'

'বানান-ব্যাকরণই জীবনে প্রথম জোর করে বশ্যতা আদায় করে। ওখানেই প্রথম ডিসিপ্লিনের পাঠ। যুক্তির ধার ধারে না, মাথা পেতে মেনে নিতে হয় স্বীকার করার।'

সেদিন কটি ছেলে এসেছিল সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সরস্বতী বানান কী?

অগ্রণী ছেলেটি বিরাট সাহস দেখিয়ে বললে, 'দন্ত্য স, র, দন্ত্য স—সরস—বাকিটা সোজা, দন্ত্য স আর ত-এ দীর্ঘ ঈ। সরসতী।'

'ব-ফলাটা কোথায় গেল?'

'আজকাল রেফ আর ব-ফলা চলে না। এখন শুধু ঢেলে সাজার দিন—'

'কী বলছিস যা-তা?' দলের আরেকটি ছেলে আপত্তি করে উঠল : 'তোর নাম যে অর্ণব, রেফ দিস না? অরণব লিখিস?'

পরিকে-পরিকে মারামারি শুরু হল। চাঁদা দিয়ে আমিই শেষে দু'পক্ষকে ঠাণ্ডা করলাম।

দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিলেন বয়স্করা।

'একটা কথা বলব?'

'কী, বানান জিজ্ঞেস করবেন?' দলপতি রুখে উঠলেন : 'আপনাদেরই দৈনিক পত্রিকা হৃষীকেশের বানান করেছে ঋষিকেশ—প্রথম ভুল। অন্যতম বানান করতে গিয়ে মাঝখানে একটা বিকল্প বসিয়েছে। যেন বলতে চায় নিজেও ঐ বস্তু আছে।'

'না, বানান জিজ্ঞেস করব না।' অভয় দিলাম : 'শুধু জানতে চাইছি জ্ঞান হয়ে কত বছর দুর্গা-ঠাকুর দেখছেন?'

'অন্তত ত্রিশ-বত্রিশ বছর।' দলপতি গর্বের সঙ্গে বললেন, 'দেখছি কী, চালাচ্ছি।'

'এই ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছেন গণেশের পায়ের নিচে একটি নেংটি ইঁদুর। ইঁদুর কেন তা বলতে পারেন?'

'এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?' বিস্ময়ের মত তাকালেন ভদ্রলোক।

'আপনার মনে কোনোদিন প্রশ্ন জেগেছে এত বড় একটা জাঁদরেল দেবতা ছোট্ট একটা ইঁদুরকে বাহন করেছেন কেন?'

'আমার তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—'

'কিন্তু আপনি যে পুজো করছেন। কার পুজো করছেন তার খোঁজ নেবেন না?'

'ওসব পুরোহিতরা খুঁজবে।'

'বেশ, জানবার জন্যে আমাকেও তো জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'ওসব জানবার আমার কৌতূহল নেই।'

মনে-মনে বললাম, 'শ্রদ্ধাও নেই। শাস্ত্র বলেছে আগে শ্রদ্ধা, এখন আগে শ্রাদ্ধ।'

'চল হে, এখানে কিছু হবে না।'

দল চলে যেতে দেখি একজন পিছনে পড়ে রয়েছে। সে আরো এগিয়ে এসে বললে, 'আমাকে ব্যাখ্যাটি বলে দিন না ইঁদুরের তাৎপর্য কী। আর লক্ষ্মীর ঐ পেঁচার কী মানে?'

এই দেখ! শুধু উদ্ধত নয়, সশ্রদ্ধও আছে। শুধু পরাঙ্মুখ নয়, জিজ্ঞাসুও আছে। এই শেষের লোকটিও তো সমাজেরই মধ্যে।

'কিন্তু কালীপুজোর বেলায় কী হল?' বললে তরুণ বন্ধু, 'আমাদের যুবসেন্টারের প্যান্ডেলে এক বিদেশী পর্যটক এসে হাজির—'

'যুব-সেন্টার!' একটা ধাক্কা খেলাম : 'ইংরিজি-বাঙলায় খিচুড়ি কেন?'

তরুণ বন্ধু হাসল : 'ওটা যুবকল্যাণের মত। শুধু খিচুড়ি নয়, জগা-খিচুড়ি।'

'বিদেশী পর্যটক কী বললে?' আগের কথাটা ধরিয়ে দিলাম।

'উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞেস করলে, তোমরা নগ্ন প্রতিমা পুজো করছ কেন? ভাবতে পারেন একটা ছেলেও উত্তর দিতে পারল না। শুধু বললে, এটাই রেওয়াজ।'

'আমি বিশ্বাস করি না। একজন না একজন নিশ্চয়ই কোথাও ছিল যে অন্তত কমনসেন্সের থেকে উত্তর দিতে পারত।'

'একজন দিয়েছিল। বললে, আগে "মিনি" ছিল, পরে "মিনি" হল, এখন "মিনি" হয়েছে। মিনি মানে None এর চেয়েও কম। শুনে সাহেব হাসল, সাহেবকে হাসতে দেখে মেয়েরাও হাসল।'

'বিশ্বাস করি না।' বললাম দৃঢ়স্বরে, 'ওখানে নিশ্চয়ই একজন ছিল যে সিস্টার নিবেদিতা পড়েছে।'

'রাখুন। নিজের সিস্টারের নাম জানে না, তার সিস্টার নিবেদিতা!' তরুণ বন্ধু গম্ভীর হল : 'সেজন্যেই আমি এসব বারোয়ারি পুজোর বিরুদ্ধে। ঠাকুর-দেবতা মানি না। অথচ পুজো নিয়ে মাতা-মাতি করা কেন? উচিত এ সব bona করে দেওয়া।'

সেই পুরোনো অভিযোগ এখনো যথাযথ :

'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স।'

আগের চেয়ে সমাজ কি খুব বেশি বদলেছে?

আগেও ডাকাতি করত এখনো ডাকাতি করছে। আগেও উচ্ছৃংখল ছিল এখনো উচ্ছৃংখল আছে। আগেও মানত না এখনো মানে না।

'না-মানা যুগের মোরা মানুষ
বেসাতি মোদের কালি-কলুষ
চোখে জ্বলিতেছে তাজা-জলুস
কিছু না পাওয়ার নেশা।'
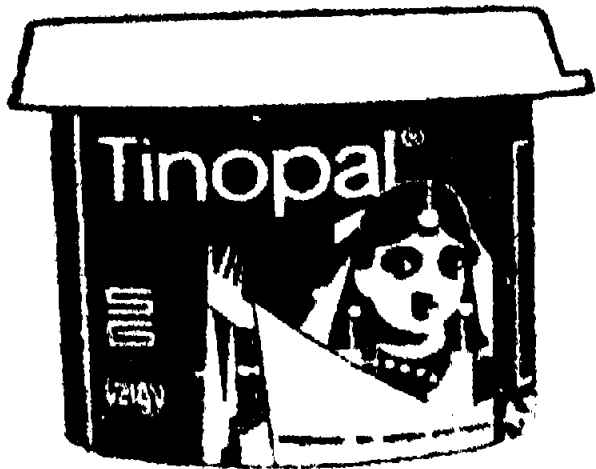
সময় বদলায়, শাসন বদলায়, আইন বদলায়, অভিধান বদলায়, কিন্তু মানুষকে বদলায় কে? সে বুঝি সে একই থাকে। শুধু ভোল পালটায়, বোল পালটায়, বস্তু সেই একই।

আগে ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচত, এখন খেমটার ভেতর ঘোমটা নাচে!

ধাঁ করে একটা বল এসে পড়ল বাড়ির মধ্যে। হুড়মুড় করে কতগুলি ছেলেও ঢুকে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। বলা-কওয়া নেই, উপরে-নিচে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজাখুঁজি করে বলটা বার করে নিয়ে ছুট দিল রাস্তায়।

রাস্তায় মানে ওদের ক্রিকেট-মাঠে।

তবু তো ওরা নিরীহ। টেনিস-বল দিয়ে খেলছিল। পরের দল দুর্ধর্ষ, সত্যি-কার 'ডিউস' বল দিয়ে খেলছে। বাম্পার দিলে হুক করা ছাড়া উপায় নেই, তাই ছক্কাসাবী উঁচু বল পড়ল এক পথচারী ভদ্রলোকের মাথার উপর। আর গাড়ি-চাপা দিয়ে ড্রাইভার যেমন পালায় তেমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল ব্যাটসম্যান। জনতা তেড়ে গিয়েও ধরতে পারল না। গাড়ির বেলায় গাড়িটা অন্তত পোড়ানো যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে কী পোড়াবে? এক-জোড়া ইটের স্টাম্প ছাড়া সেখানে আর কী আছে?

না, পাড়ার মধ্যে আরো সব উৎসাহী ছেলে আছে, তারা আহতের শুশ্রূষায় এগিয়ে এল, ধরাধরি করে নিয়ে চলল ডাক্তারখানায়।

'এখন আবার এ এক নতুন অ্যাকসি-ডেন্ট জুটেছে।' রাস্তার ভিড়ের মধ্যথেকে একজন মন্তব্য করল : 'এই দুর্দান্ত খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

'তা হলে অ্যাকসিডেন্টের জন্যে ট্রেন চালানোও বন্ধ করে দিতে হয়।' আরেকজন টিপ্পনী ঝাড়ল।

শুধু অ্যাকসিডেন্ট দেখছেন কেন, শুশ্রূষা দেখুন।

'কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো
কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, এক হাঁটু জল
কেউ বলে সাঁতার।।'

আর দেখুন পক্বকেশী বৃদ্ধা ঠাকুমা ইডেনে কেমন টেস্ট দেখতে এসেছেন। জামাইয়ের ঘরে কী করে একটা বাড়তি টিকিট জুটেছে, তাই সখ করে ঢুকে পড়েছেন। এত খেলা-খেলা শুনি, সেটা কী জিনিস তাই স্বচক্ষে দেখতে আসা। তোমরা খেলা দেখ, আমি মজা দেখি।

পাশের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন 'আমাদের জামাই কোনজন?'

সেই থেকে শুরু হল নানা কণ্ঠের গুঞ্জন।

'ঠাকুমা জামাইকে বলুন খেলা ছেড়ে দিয়ে সিনেমায় নামতে। সেখানেই মানাবে ভালো।'

'জামাই কেমন খেলছে ঠাকুমা? বলছে কিনা পিচ খারাপ। নাচতে জানে না, উঠানের দোষ।'

ঠাকুমা টিকিটের গরমে শুধু হাসছেন।
আগের যুগেও নেপোরাই দই মেরেছে,
এখনো সেই নেপোরাই দই মারছে।

নেপোর থেকেই নেপোটিজম। আর সব 'ইজম'-এর দম ফুরোয় কিন্তু নেপোটিজম সনাতন ও শাশ্বত।

কোথায় বিক্ষোভ কোথায় অশান্তি! মাঠময় দেখ কাকে বলে নিটুট শৃঙ্খলা-বোধ! কোথাও এতটুকু একটা দীর্ঘশ্বাস নেই। কাতরোক্তি নেই। কাউকে জানতে দেওয়া নেই। কিন্তু কত লোক তো জেনেছে, দেখেছে, তাজা প্রাণের মৃতদেহগুলি পায়ে মাড়িয়ে মাঠে ঢুকেছে—তারাও সারাদিন স্থির হয়ে বসে খেলা দেখল! কে বলে সমাজ থেকে নিয়মনিষ্ঠা উঠে গিয়েছে? কে বলে ক্রিকেটের দার্শনিক তাৎপর্য আমরা বুঝিনি!

একটু এদিক-ওদিক করে সব তেমনি আছে। সেই সড়ক আছে ফলক আছে পদক আছে পদবী আছে। আগের দিনের রায়বাহাদুর রায়সাহেবরাও এসে গিয়েছেন।

যা শুধু একটু আঙ্গিকের হেরফের। একটু বা স্থান-পরিবর্তন। আগে চোখে চশমা ও হাতে চটি বই-খাতা নিয়ে শিকার খুঁজত, আজকাল খোঁজে হাতে গিটার নিয়ে। অলকদা আর ঝিলিকদি-রা আজকাল সন্ধ্যায় বিশেষ বেরোয় না, বেরোয় ভর-দুপুরে, জ্যোৎস্নার চেয়ে খররৌদ্রই বেশি নিরাপদ। লেক বা ময়দান ছেড়ে বসছে গিয়ে কবরখানায়, কখনো বা শ্মশানঘাটের নির্জনে। শরীরে আর পরিবারে অশান্তি না হলেই হল। অশান্তি-নিরোধের ব্যবস্থাও হাতের কাছে। আগে যা নিষিদ্ধ ছিল এখন তাই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। যদি নিজে না বোঝো, না পারো, হেলথ-ইনস্পেকট্রেসকে ডাকো, শিখিয়ে-পরিয়ে দেবে।

আইনের উস্কানিতে দাম্পত্য কলহ আদালতে গিয়ে শাখা বিস্তার করছে, সম্পত্তির অংশ পাওয়া বোনের হাতে ভাই-ফোঁটা ভাইকাটা হয়ে উঠছে, তাই বলে আইনকে কি অভ্যর্থনা করব না? জন-মঙ্গল আইন কি মন্দ? তেমনি স্বাধীনতার বিপাকে বহুতর জঞ্জাল আর ঝঞ্ঝাটের আমদানি হয়েছে, তাই বলে কি স্বাধীনতার জয় দেব না? স্বাধীনতা কি অন্যায়?

'তাহলে আজকের এই উচ্ছৃঙ্খলতাকেও অন্যায় বলতে পারেন না।' তরুণ বন্ধু টেবল চাপড়াল : 'হাজার-হাজার দরিদ্র ও বেকারের দল কোথায় যাবে, কী করবে? তাদের মধ্যে আবার হাজার-হাজার উদ্বাস্তু, হাজার-হাজার ছন্নছাড়া। বাড়ি-ঘর হারিয়ে খেত খামার খুইয়ে এখানে এসে তারা কী পেল? কী হল? এখনো কিনা আপনারা আইন দেখবেন?'

'আমরা সবাই শুধু সুবিধে দেখছি।'

'সুবিধে?'

'হ্যাঁ, সুবিধাই এখন একমাত্র সুবিধি।'

'কিন্তু এ দিন থাকবে না নতুন সূর্যোদয় হবে।' আবার বললুম, উঠে পড়লুম।

নিশ্চয় হবে। এখনো লজ্জাবতী মেয়ে আছে, সাধু গৃহস্থ আছে, বিনীত ছাত্র আছে, পরোপকারী বন্ধু আছে। শুধু দাবির কথাই বলে না, দায়ের কথাও ভাবে এমন কর্মী আছে। কাকে ফাঁকি দেয় না, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে রাত করে অফিসে বসে ফাইল দোরস্ত করছে এমন কেরানিও দুর্লভ নয়। চিত্তবিত্তে তৃপ্ত এমনও কিছু নিচু মাইনের লোক আছে যারা ঘুষ খায় না, সামনে চোখ রেখে পথ চলে। ট্যাক্সিতে মাল ফেলে গেলে ড্রাইভার ঠিকানা খুঁজে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এমন কি পকেটমারও প্রয়োজনমত টাকা রেখে বাকিটা মনি-অর্ডারে ফেরত পাঠায়।

সূর্যোদয় একবার নয়, আবার হবে। বারে-বারে হবে। এক সংগ্রামের জয়ের পর আরেক সংগ্রাম শুরু হবে। সংগ্রামের শেষ নেই, বিকাশের ইতি নেই, আর এমন কোনো সংজ্ঞা নেই যার মধ্যে মানুষকে চিরদিনের মত সীমাবদ্ধ করা চলে। যা কিছু মাননীয় তাই মাননীয়। তাই মহনীয়।

'চলো, বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে। তুমিও তো যাবে।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

বিয়ের আসর আলোর মালায় ঝলমল করছে। কত গাড়ি কত লোকজন কত হই-চই। কত উলু কত শাঁখের আওয়াজ।

মাইকে গান দিয়েছে। শোনো একবার গানখানা। প্রাণ ভরে শোনো।

'বিদায় দে গো শচীরানী
আমি সন্ন্যাসেতে যাই,
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
তারে বোলো বুঝাইয়া
মা, তোমার চরণে জানাই।
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখো গো
মা গো, তোমার নিমাই নাই।।'

বললাম, 'বিয়ের লগ্নে সন্ন্যাসের গান। একেই বলে খানাপিনা-ব্যাকরণে শৈথিল্য।'

তরুণ বন্ধু ম্লান মুখে বললে, 'এ একেবারে হতাশ করে ছাড়ল।'

প্রাণের হুতাশন হতাশ হতে জানে না। 'জাহাজ যদিও ডুবো, তারা আছে ঠিক ধ্রুব।' আশ্চর্য, তরুণ বন্ধুটিই আবৃত্তি করল :

'শুষ্ক মাথায় কিশলয়-উল্লাস
হতাশায়ও বুকে রেখো দৃঢ় বিশ্বাস—
জাহাজ যদিও ফুটো

তীর তবু প্রস্ফুট
উত্তর দিকে ঠিক আছে কম্পাস।'

যতই ঘোরাও, যতই এলোমেলো করে দাও, কাঁটা ঠিক উত্তর দিকেই মুখ করে থাকে। কে জানে হয়তো মানুষের সেখানেই শেষ উত্তরণ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও হোলি উৎসব

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর।।
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাব ভরে গলতহি লোচনে নীর।।
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে।।

শচীনন্দন গৌরাঙ্গ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় ফাল্গুনী নক্ষত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে পবিত্র এই দিনটি। পাঁচশত বছর আগে যে মহাপুরুষ পৃথিবীর বুকে অনাচার ও কদাচার দূর করতে চেয়েছিলেন তাঁর লীলাময় অমৃতোপম জীবন স্মরণ করেই হোলি উৎসব। মানুষের বেদনা, হতাশ্বাস, দূর করতে, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর মানবমূর্তি স্মরণ করেই সেকালের পদকর্তারা রচনা করেছিলেন অনুপম সঙ্গীতালেখ্য।

বাঙলাদেশে চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে হোলি উৎসবের প্রচলন ছিল না। সমকালীন বিভিন্ন পদকর্তার রচনায় আছে এর বর্ণনা।

ভদ্রালম্বিত শৈব্যোদীরিত
রক্ত-বক্সোভরধারী।
পশ্য সনাতন মূর্তিরিয়ং ঘন
বৃন্দাবন-রুচিকারী।।
(সনাতন গোস্বামী)

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত-সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরা রায়।।
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে।।
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা রায়।
কুঙ্কুম পিচকা লেই পিছে পিছে ধায়।।
(বাসুদেব ঘোষ)

আজুরে কনকাচল নীলাচলে গোরা।
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা।।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণেরই রূপ বিগ্রহ। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলার একাঙ্গ আলেখ্য তাঁর লীলাময় জীবনে স্পষ্ট।

বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দাবিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নব ঋতুপতি বাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান
নবীন নবীন ধরই মান
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবিন নবিন ভাতিয়া।
সভে মিলি ফাগু তিমির করি-বেঢব
সেখই না পারই কোই।।
ঐছনে কানু লেই সভে আওব
ভুরিতহিঁ নিধুবন পাশ।
গোবর্ধন কহ আনন্দে খেলহ
পন্মা পাউ নৈরাশ।।
ফাগুরাজে সকল করল আঁধিয়ার।
নারি-পুরুষ কোই লখই না পায়।।
ঐছনে কানুকমাঞ্জহি ষেরি।
আনন্দ নিধুবনে সো নাহি হেরি।।
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবনের তরুলতা রাতুল বরণে।।
রাঙ্গা ময়ূর নাচেগাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।

সখী এসে বললেন শ্রীরাধাকে—

আজু কোই কুলবতী নাহি বাহিরাব।
যমুনা সিনানে কোই নাহি যাব।।
বিপরীত পড়ল আজু যুবতী সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে মেলই যুবরাজ।।
পন্থহি পন্থ ঘেরল চৌওর।
সব ব্রজবালক তাহে আগোর।।
বটু সুবল দুঁহু ভেল এক ঠাল।
যূথহি যূথ করল নিরমাল।।
ভরি পিচকারি লেই সভে হাও।
ঘন বরিষণ জনু পড়তহি মাস।।
আবিরে না হেরিয়ে দিগবিদিগ্।
রঙ্গে বসন বহি যাওত ভিগ্।।
কহ গোবর্ধন রহ গৃহে মাহ।
কোই জনি মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ।।

এদিনে ঘরে থাকা যায় না। প্রকৃতির অনিন্দ্য আনন্দময়তার আকুল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে কে? ব্রজ যুবরাজের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান—

ঋতু রাজার্পিত তোয্য এরঙ্গম।
রাধে ভজ বৃন্দাবন রঙ্গম।।
মলয়ানিল গুরু শিক্ষিত লাস্যা।
লটতি লতাবলিরুজ্জ্বল হাস্যা।।
পিক ততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গম।
পশ্যতি ভেয়ুকুলমঙ্কুর দঙ্গম।।
গায়তি ভৃঙ্গ ঘাটান্ভুত শীলা।
মম বংশীব সনাতনলীলা।।

বৃন্দাবন-রঙ্গের আনন্দলহরী থেকে শ্রীমতী রাধা কি অন্তরালে অবস্থান করবেন? কখনই নয়। সখী পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। শ্যামসুন্দরের সঙ্গে রঙ্গস্থলে সাক্ষাৎ হতেই গগনপবন হয়ে উঠল রাঙা বরণ।

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধু মধুরে বৃন্দাবন রোধসি
হরিরিহ হর্ষ তরঙ্গী।।
বিকিরতি যন্ত্রেরিত মঘবৈরিণী
রাধা কুঙ্কুম পঙ্কম।
দয়িতামর মানি সিঞ্চতি মৃগমদ
রস রাশিভিরবি শঙ্কম।।
ক্ষিপতি মিথো যুব মিথুনমিদং নব
দরুণ তরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভি জল্পতি
কল্পযুয় তনু বিলাসম্।।
সুবলো রণয়তি ঘন করতালী:
জিতবাণিতি বনমালী।
ললিতাবদতি সনাতন বল্লভ
অজয়ত পশ্য মজালী।।

দোলের কথা

সুকুমার সেন

বাংলা দেশের দুটি 'পরব' (সংস্কৃতে 'পর্বণ', বাংলায় 'পাল-পার্বণ') সর্বজনীন বলা যায়—দুর্গাপুজো আর দোল। 'দোল-দুর্গোৎসব' কথাটির মধ্যে এই তথ্যটি নিহিত আছে। (পরব এসেছে 'পর্ব' থেকে, শব্দটি মূলে 'পর্বণ' তদ্ধিত প্রত্যয় হলে 'পার্বণ'।) পর্বন মানে গাঁট, গাছপালার বা জীবজন্তুর অথবা নির্জীব বস্তুর। চাঁদের গাঁট হল কয়েকটি বিশিষ্ট তিথি—যেমন অষ্টমী, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা। বেদের সময় প্রধান উৎসব অর্থাৎ সোমযজ্ঞগুলি বৈদিক চন্দ্রপর্ব—বিশেষ করে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। সেই সূত্রে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত সামাজিক উৎসব 'পর্ব', 'পার্বণ' নাম পেয়ে এসেছে। 'পাল-পার্বণ' মানে যে উৎসব প্রধানত ক্রম-অনুসারে পালিত হয়।

শীতের অন্তে বসন্ত আসে। তখন মানুষের চারিদিকে আকীর্ণ উদ্ভিদ-জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত নূতন যৌবন আবির্ভূত হয়। গৃহীর ঘরে সংবৎসরের সম্বল সঞ্চিত হয়েছে গ্রামের দিগ্‌বিদিকে সবুজ-লাল-হলদে শাদায় জেলুস ফুটেছে। সেকালের মানুষদের কাছে তাই বসন্তের উৎসব ছিল নব-জীবন, নব-যৌবনের হুল্লোড়। এখন পর্যন্ত তাই এই উৎসবের উৎস-মূলে জৈব-জীবনের হুল্লোড়ই চলে এসেছে। হুড়োহুড়ি (পুরোনো 'হুড়াহুড়ি', 'হুড়, হোলাহোল') হুলোহুলি (পুরোনো 'হুলাহুলি') দোলের হিন্দী সমার্থক 'হোলি' বা 'হুলি'র সমগোত্রীয়। বসন্ত-উৎসবের এই নামটি অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানেও গৃহীত হয়েছে চতুর্বিধরূপে—হোলী, হোলা, হোলাকা, হোলিকা।

বসন্ত-উৎসবের একটা অঙ্গ ছিল—এখনও বোধকরি কোথাও কোথাও আছে—খড়কুটো দিয়ে ঘরের বা মন্দিরের মতো করে পুড়িয়ে দেওয়া। হয়ত এই সূত্র ধরেই অর্বাচীন কোন কোন স্মৃতিকার 'হোলী' শব্দটির মূলে এক রাক্ষসী হোলিকার কল্পনা করেছেন। এই রাক্ষসীকে পুড়িয়ে মারার স্মরণেই এই উৎসবের এমন নাম হয়েছে। ভারতবর্ষের চিন্তারীতির একটা বড় বিশেষত্ব হল ভাব-কল্পনাকে বস্তু-কল্পনায় নিয়ে আসা এবং সে কল্পনাকে আবার দেব বা দানব (অর্থাৎ ভালো বা মন্দ) ছাপ দিয়ে কাহিনী রচনা। এখানে তেমনি ঘটে থাকতে পারে। অথবা আরও এক ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়। বেদে যজ্ঞ-বিঘ্নকারিণী দীর্ঘজিহ্বীর কাহিনী আছে। তাকে ইন্দ্রিয়ভোগের দ্বারা পরাভূত করে ইন্দ্র ঋষিদের যজ্ঞরক্ষা করেছিলেন। এই কাহিনীর আধারে পুরাণে অহল্যা কাহিনী গড়ে উঠেছে। হোলিকাকল্পনার দীর্ঘ-জিহ্বী কাহিনীর সূত্র থাকতে পারে। অথবা তাড়কার মতো আর এক বিঘ্ন-কারিণী রাক্ষসীর কল্পনা থাকতে পারে।
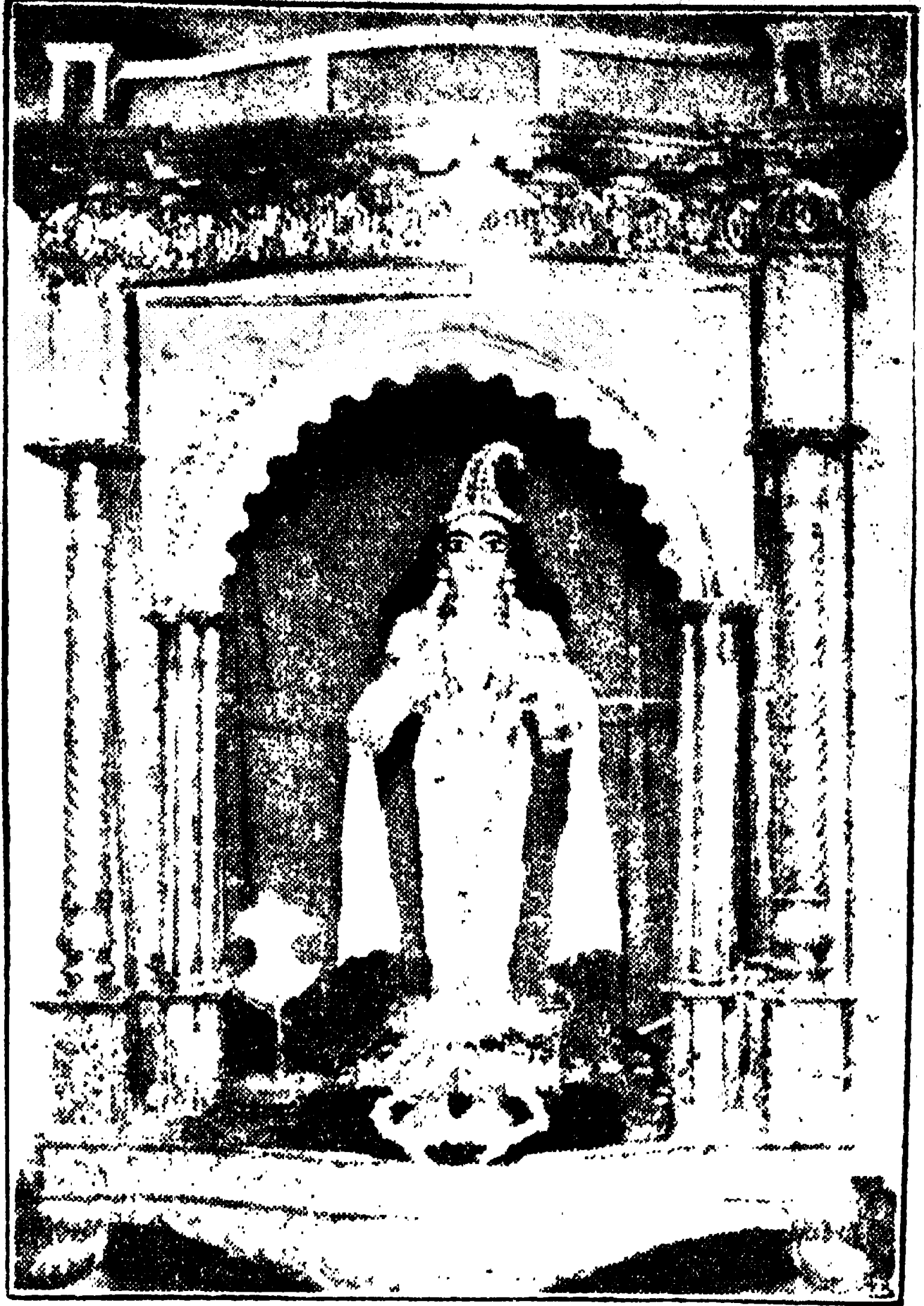
শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বলে কোন ধর্ম-অনুষ্ঠান ছিল না। যেদিন তাঁর জন্ম হয় সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। যে ক্ষণে জন্ম হয় সে ক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিল। সেজন্য নবদ্বীপময় হরিধ্বনি ও শঙ্খ-ঘণ্টার রোল উঠেছিল। লোকে দলে দলে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। সেই থেকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের শুরু। চৈতন্যের জন্মদিন বৎসরের মধ্যে সর্বশুভ দিন—সকল বৈষ্ণব ভক্তের কাছে কি বাংলা দেশে কি ব্রজধামে। চৈতন্যের তিরোভাবের পরে সনাতন-রূপ গোপাল ভট্ট-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামীরা যখন বৈষ্ণবের আচরণীয় বিধিসকল সংস্কৃতে গ্রন্থবদ্ধ করলেন তখন স্বভাবতই পশ্চিমাঞ্চলের লোক-উৎসব—যাতে লৌকিক গান ও ছড়ার সূত্রে কৃষ্ণের প্রেমকথার সংযোগ ছিল—তাকে গ্রহণ করে দোলযাত্রার ব্যবস্থা করা হল। সেই দোল-লীলা বাংলা দেশেও এল, এখানে দোল-

যাত্রা হল। পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু হোলি স্বতন্ত্র উৎসব রূপে রয়ে গেল।

দোল-যাত্রা, আসলে দোলা-যাত্রা, দোলায় অর্থাৎ শিবিকায় চড়ে স্ফূর্তি করতে করতে শোভাযাত্রা। যাত্রা কথাটির মানেই হল অনায়াস গমন—জলে অথবা স্থলে। যে উৎসবে দেব-বিগ্রহ অথবা দেব-পূজকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গমন করেন তাই-ই ছিল 'যাত্রা'। যেমন রথযাত্রা, দোলাযাত্রা, স্নানযাত্রা। অশোক তাঁর এক অনুশাসনে বলেছেন যে, তিনি অনেক আয়োজন আড়ম্বর করে 'বিহারযাত্রা' করেছিলেন। আমার মনে হয় সে 'বিহার'-যাত্রা দোলা-লীলার মতো বসন্ত-বিহার—যদি স্থলপথে হয়—শোভা-যাত্রা। কিংবা—যদি জলপথে হয় তবে স্নানযাত্রার মতো শোভাযাত্রা। জঙ্গম দোলা স্থাবরে পরিণত হয়ে আমাদের দোলযাত্রায় রূপ পেয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচারে ও পদাবলীতে বসন্ত-উৎসবের তিনবার অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাই। প্রথম বসন্ত-পঞ্চমী, যা এখন সাধারণ সমাজে শ্রীপঞ্চমী নামে এবং সরস্বতী পূজারূপে অনুষ্ঠিত। বাসন্তী রঙে ছোপানো বস্ত্র পরিধানেই এই বসন্ত উৎসবটি পারমিশিত। দ্বিতীয়—ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা। তৃতীয়—ফুলদোল। এ উৎসব কোন কোন স্থানীয় বিগ্রহের নৈষ্ঠিক পূজার বাইরে অজ্ঞাত।

বসন্ত উৎসবের ও দোলের উল্লেখ রূপগোস্বামীর আছে। এক বসন্ত উৎসবে দোলা বা দোলনার কথা নেই, রং খেলার কথা আছে। যেমন—

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধুমধুরে বৃন্দাবন রোধিস
হরিরিহ হর্ষতরঙ্গী ।। ধ্রু

বিকিরতি যন্ত্রেরিতম্ অঘবৈরিণি
রাধা কুঙ্কুম-পঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদ-
রসরাশিভিরবিশঙ্কম ।।

সুবলো রণয়তি ঘন করতালীং
জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতনবল্লভম্
অজয়া পশ্য মমালী ।।

'রঙ্গময় হরি এখন পরম মধুর বৃন্দাবনের তীরভূমিতে হর্ষে তরঙ্গিত হয়ে রাধিকার সহিত ক্রীড়া করছেন ।। অঘনাশনের প্রতি রাধিকা যন্ত্রযোগে কুঙ্কুম-কর্দম নিক্ষেপ করেছেন। তিনিও নিসঙ্কোচে প্রিয়াকে মৃগমদরসরাশিতে সিক্ত করেছেন। সুবল ঘন ঘন করতালি দিয়ে বলছে, বনমালী জিতেছে! ললিতা বলছে, দেখ আমার সই সনাতন-বল্লভকে ১ হারিয়ে দিয়েছে ।।'

আর এক বসন্ত-উৎসবে দোলায় চড়ার উল্লেখ করেছেন রূপগোস্বামী।

নিপততি পরিতো বন্দন পালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী ।।
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরল-সরোরুহশিরসি যথালী ।।
জনয়তি গোপীজন-করতালী।
ক্বাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী ।।
অরমারণ্যকমণ্ডনশালী।
জয়তি সনাতনরসপরিপালী ।।

'চারদিকে পরে পরে বন্দনা[...] চলেছে। আনন্দে দোলা দিচ্ছে তাঁর [...] প্রিয়বর্গ। দোলার উপর বনমালী বিলাস করছে[ন], যেন চঞ্চল পদ্মের উপর মধুকর। গোপী[রা] করতালি দিচ্ছে। কোন কোন গো[প] সম্মুখে নাচ জুড়েছে ।। আরণ্যক শো[ভায়] মণ্ডিত হয়ে সনাতনরস ২ পোষণ করে [...] শোভা পাচ্ছেন ।।'

বাংলায় বসন্ত-উৎসবের তথা দো[ল] লীলার পদাবলী সর্বপ্রথম শ্রীচৈত[ন্য] বিষয়েই লেখা হয়েছিল। বাসুদেব ঘো[ষের] এই পদটি সর্বাগ্রে লেখা দোললীলা-প[দের] অন্যতম বলে মনে করি।

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে ফিরয়ে গোরা রায় ।। ধ্রু
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে
ইত্যাদি।

ফুলদোলের পদ লেখেন নয়না[নন্দ] মিশ্র।

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌরকিশোর ।।
সহচর ফাগু পেলই গোরা গায় । ইত্যাদি

রাধাকৃষ্ণের বসন্ত-উৎসবের পদ [যাঁরা] লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিবানন্দ চক্র[বর্তী] প্রবীণতম এবং প্রধান। তাহার পরে [জ্ঞান]দাস ও গোবিন্দ দাস।

পুরীতে চৈতন্যের ফল্গু-উৎসব [...] ভালো পদ লিখেছিলেন 'দীন' কৃষ্ণ[দাস] ('খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ' ইত্যা[দি]) এবং গোবিন্দদাস ('নীল[...] [...] গোরা। গোবিন্দ ফাগুর[...] ভেল ভোর' ইত্যাদি)

বসন্ত-উৎসবের পদাবলী রচনায় [...] কবিরা খুব উৎসাহ বোধ করেননি, [...] না, পদাবলীর ভাব-গভীরতা এ উৎস[বের] হুল্লোড়ে আনা যায় না। তাই জ্ঞানদাস [...] গোবিন্দদাসের পরে দোল-লীলার পদ [...] পাই একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর ম[ধ্য] দিকে। এ পদগুলি লিখেছিলেন পদক[ল্প]তরুর সঙ্কলয়িতা 'বৈষ্ণবদাস' গো[কুলা]নন্দের বন্ধু উদ্ধব দাস।

আগেই বলেছি, আবার পুন[রুক্তি] করছি, 'হোলি' শব্দটি হিন্দী [...] এসেছে। বাংলায় এর সমগোত্রীয় এবং অ[...] সমার্থক শব্দ হল 'হুড়াহুড়ি' (বাং[...]

---

* ১ দুটি অর্থ। (১) চিরন্তন [...] (২) পদকর্তার গুরু সনাতনের [...]
২ দুটি অর্থ। (১) চিরন্তন [...] (২) পদকর্তার গুরু সনাতনের প্রেম।

শব্দ), পুরানো বাংলার 'হোড়' (প্রতি-শব্দ। স্বন্দ্ব, ঠেলাঠেলি), হুড়োহুড়ি, হুলোহুলি'। অর্থাৎ মাতামাতি হুড়োহুড় (—হুলো-লোট)। একদা বসন্ত উৎসবের অঙ্গ ছিল খড়কুটো ইত্যাদি নিয়ে আগুন জ্বালানো (এবং সেই আগুনে ফল-মূল, শস্য, অথবা জীব-জন্তু পুড়িয়ে খাওয়া—সেকালের ভাষায় 'অভ্যূষখাদিকা')। খড়কুটো নিয়ে আগুন জ্বালানোর থেকে হয় ঘরের আকারে দাহ্যস্তূপ দাহন, তারপর তা হয়েছিল রাক্ষসী মূর্তি। সে মূর্তির জন্য দায়ী শাস্ত্রকার। তাঁরা চলিত ভাষার 'হোলি' শব্দকে কল্পিত সংস্কৃত (স্ত্রীলিঙ্গ) রূপ দিলেন 'হোলিকা'। স্ত্রীলোক পুড়িয়ে মারতে গেলে তাকে রাক্ষসী হতেই হবে। তাই অর্বাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে হোলির ব্যাখ্যা হয়েছে হোলিকা-দাহন কাণ্ড। সাহিত্যে বসন্ত-উৎসবকে শেষ পরিণতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'ফাল্গুনী' নাট্য-কাব্যটি শীতের অন্তে বসন্তের প্রাদুর্ভাবকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নব-জীবন লাভের সিম্বল ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোনরকম তাণ্ডব বা অগ্নিকাণ্ডের দিক দিয়ে যান নি। শীতের জড়তার—প্রাণের ও বুদ্ধির জড়তার—দিকেই ঝোঁক দিয়ে তিনি বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির তাল মেলাতে চেয়েছেন।

কণ্ঠচাঁপার গন্ধ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

NITAI GHOSH

মৃদুলা আজকাল বড় বেশি কথা বলে। মৃদুলার নিজের অন্তত তাই মনে হয়। অবিশ্যি সে জানে, সে নিজের সঙ্গেই কথা বলে। এবং তাইতেই তার সংশয়, সে অন্যের চোখে কীভাবে ধরা পড়ে। নিজের সঙ্গে মানুষ গলা খুলে কথা বলে না। তা হলে তা সাধারণ চক্ষে অপ্রকৃতিস্থতা। নিঃশব্দে নিজের সঙ্গে যে-কথালাপ তাইতে মৃদুলা নিজের মনকে যেভাবে স্পর্শ করে তেমনভাবে সে নিজের চেহারাও দেখতে পায় না, স্বরূপকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও। অতএব এ অবস্থায় তার চেহারাটা কি রকম দাঁড়াতে পারে তা অনুমান করতে গেলে, মৃদুলার ভাল করে লক্ষ্য করা উচিত তার ছোটবোনের মুখ। সেই অতি কোমল মুখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মৃদুলার অস্বাভাবিক আত্মকথন। বিশেষ করে ইদানীং যেন এটা ছোটবোনের চোখে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট। তাই সম্ভবত ছোট-বোন তাকে আজকাল এ প্রশ্ন প্রায়ই ক... থাকে: কী ভাবিস বল তো দিদি?

বয়সের বিচারে মৃদুলার ছোটবো... নাবালিকা নয়, সে কারণে দিদিকে এ... প্রশ্ন করা তার পক্ষে কখন কখন সমীচী...

ছোটবোন মঞ্জুলার দিকে অস্বাভাবি... অন্যমনস্ক তাকিয়ে থেকেছে এমনভাবে, য... মৃদুলার কাছে প্রশ্নটা অসম্ভব কিছু।

পরে মঞ্জুলার ঠেলা খেয়ে কষ্ট ক... হেসেছে। বুঝেছে কিছু একটা বলতেই হ... বলেছে, ঠিক তোর বয়সে ফিরে যা... যায় কী করে তাই ভাবছি।

মঞ্জুলা বলেছে, তা হলে আর বি... করতে হবে না, না রে?

মৃদুলা ছোটবোনের গালে আল... চাপ দিয়ে বলেছে, কী করে জান... পারলি তুই?

—কেন আমার বয়সে কেউ বিয়ে ক... বুঝি?

—তা-ই নাকি?

মৃদুলা ছোটবোনের কথায় ম... পেয়েছে। মাথার দীর্ঘ চুলের প্রান্ত স্প...

করে কেন বলেছে, ইস্কুলে পড়ার মত মজা আর নেই, না রে?

হাসতে হাসতে বললেও মঞ্জুলা জানে কথা কটা বলতে দিদির রীতিমত কষ্ট হয়। কারণ বহুদিন হল, স্কুল ছাড়ার পর থেকে দিদি মৃদুলা এই কথাটা সুযোগ-সুবিধে পেলে বলে থাকে। মৃদুলার স্কুল-ছাড়া তাদের পরিবারে বিশেষ একটি ঘটনা হয়ে আছে। মঞ্জুলা তখন নিতান্ত বালিকা। তার মনে থাকার কথাও নয়। তবে সেই বিশেষ ঘটনাটির একাধিক উল্লেখ ও আলোচনায় মঞ্জুলারও এখন মনে হয়, সে-ও ঘটনাটির একজন বিশিষ্ট সাক্ষী। বাবা বা মা-র মত সে-ও বুঝি দায়ী। স্কুল ছাড়ার জন্যে দিদির মনে যে দুঃখ, সেই দুঃখের কারণ এ পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের মত মঞ্জুলাও।

স্কুল ছাড়ার পর দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে আজ মৃদুলার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবার পরও যাকে বোঝাস্বরূপ মনে করে এসেছে বাবা-মা, আজ বিয়ের বন্দোবস্ত করে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হতে চাইছে। মঞ্জুলা ঠিক এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পেরেছে বলেই, সে নিজেকে দিদির দুঃখের কারণ মনে করতে পারে আরও সহজে। দিদির লেখাপড়ার ইতিহাস তার যতটুকু শোনা আছে তা থেকে মঞ্জুলা জানে, দিদিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্কুল থেকে বাবা ছাড়িয়ে নিয়েছে। মা-র অনিচ্ছা থাকলেও বাধা দেয়ার যুক্তি খুঁজে পায়নি। পড়াশুনোটা বড়লোকি শখ ছাড়া কিছুই না, মৃদুলাদের মত চির অনটনের সংসারে। মঞ্জুলা শুনেছে, স্কুলের হেডমিসট্রেস মিস আর্থার বাবাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি নিতে গেলে বাবাকে ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিতে হয়। আর মৃদুলার বাবা প্রিয়রঞ্জন-বাবু মরে গেলেও হাত পাতবেন! স্ত্রী [illegible] সকলের কাছেই সমভাবে অবিশ্বাস্য। মিস আর্থার দিদির জন্যে বাড়ি এসে মা-র হাত দুখানা জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর আকণ্ঠ বাংলার সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন: মিডলা বড় রাইট মেয়ে আছে মিসেস ঘোষ, উহাকে কেনো শুডু শুডু— মিস আর্থারের হাতের ওপর মৃদুলার মা-র চোখের জলের দুটি ফোঁটা পড়েছিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। মিস আর্থারও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে আর কী বললে উঁকে রাজী করান যাবে তা তিনি ভেবে উঠতে পারেননি। তাঁর স্নেহ ভালবাসা ছাড়াও আছে স্কুলের স্বার্থ। একটা নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মুখে একটি অসামান্য কৃতী মেয়ে বা ছেলের ওপর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম যে কত বেশি নির্ভর করে তা মিস আর্থার কেমন করে বোঝাতে পারেন মৃদুলা-মঞ্জুলার মাকে।

শুধু ফ্রি বা হাফ-ফ্রি করে দিলেই যদি সব কিছুর সুরাহা হতো তা হলে তো মৃদুলার মা-র ভাবনা-চিন্তা বলতে কিছুই থাকত না। স্বামীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিমত হলেও, শেষাবধি মৃদুলার মা অন্য পথ বাছাই করতে পারলেন না। মৃদুলার লেখাপড়ার শেষ ওইখানেই।

মঞ্জুলা স্মরণ করতে পারে যতটুকু তার সঙ্গে জড়িয়েছে যথাসম্ভব এর ওর তার মুখ থেকে শোনা কথাগুলো। দিদির লেখাপড়া ছাড়ার বেদনাময় কাহিনী তাই তাদের দুঃখের সংসারে সর্বাপেক্ষা করুণ ঘটনা, অন্তত মঞ্জুলার কাছে।

মঞ্জুলা যে তার দিদির কথা নিজের সাধ্যমত গভীরভাবে চিন্তা করে, একথা মৃদুলার অজানা নেই। হয়তো, সম্ভব হলে, মৃদুলার চেয়েও বেশি করে ভাবে। মৃদুলার দৃষ্টিতে ছোটবোন মঞ্জুলা তাই স্বচ্ছ একখানা দর্পণ।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিস আর্থারের মৃত্যুর শোক সংবাদের বিস্তৃত বিবরণ তাই মঞ্জুলাই দিদির নজরে এনেছে প্রথমে। সংবাদের সঙ্গে প্রকাশিত মিস আর্থারের ছবির ওপর আঙুল রেখে সে-ই মৃদুলাকে বলেছে: এ ছবিটা মিস আর্থারের অনেকদিনকার আগেকার ছবি, না রে দিদি?

মিস আর্থারের বিভিন্ন বয়সের ছবির সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এইভাবে ছবির ওপর সমনোযোগ দৃষ্টি রেখে মৃদুলা বলেছে, কী সুন্দর দেখতে ছিল মিস আর্থারকে তখন।

দিদির কথায় ছবির প্রতি দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হওয়ার কথা, তাই মঞ্জুলা মিস আর্থারের চশমাপরা আয়ত চক্ষু দুটির দিকে, গলাবন্ধ নকশাকাটা ওভার গাউনের ওপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে।

মিস আর্থার সম্পর্কে ছাপা সংবাদ অধিকতর মনোযোগসহ মৃদুলা পড়ে গেছে: সুদূর স্কটল্যান্ড নিবাসী মিস রোসালিনড আর্থার বহুদিন স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতভূমিকেই আপনার ঘর-বাড়ি মনে করেছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অবিচ্ছিন্ন সেবার পর এই বিরল শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান ঘটল আমাদের এই বাংলা দেশেই। আমাদের শিক্ষাজগতে তাঁর দুর্লভ অবদান সত্যই অবিস্মরণীয়।

মিস্ আর্থারের ঘটনাবহুল জীবনের নানা গৌরবময় অধ্যায়ের উল্লেখসহ আরও অনেক কথা, প্রায় সম্পূর্ণ এক কলমব্যাপী।

পড়তে পড়তে মৃদুলার মনে পড়ে যায় আসলে অন্য সব কথা। তার সঙ্গে যত কথা বলেছিলেন মিস্ আর্থার—সেই সব কথাই। মিস্ আর্থার বিশ্বাস করতেন মৃদুলার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বিদেশের মেয়েদের মত বাংলা দেশের মেয়েরাও খুবই শীঘ্র দলে দলে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। মৃদুলাকে এখন সব চেয়ে বেশি করে যা ভাবায়, মিস্ আর্থারের মৃত্যুর পরও যদি তার বাবা তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন। মৃদুলার ধারণা, সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত মৃদুলার স্কুলছাড়ার বেদনাবহ ঘটনা মিস্ আর্থারের বুকে বিঁধে ছিল। প্রত্যেকেই এ সংসারে কিছু না কিছু দুঃখ নিয়ে মরে। মিস্ আর্থার যে-সব দুঃখ নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে গেলেন মৃদুলার জীবনের দুঃখময় ঘটনা নিশ্চয় তার অন্যতম।

এলোমেলো সব চিন্তায় মৃদুলা কেমন তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মিস আর্থারের ছবির ওপর।

দিদিকে একটানা লক্ষ্য করে এমন সব মুহূর্তে মঞ্জুলা জিজ্ঞাসা করেছে, কী ভাবছিস বল তো দিদি?

নিরুত্তর থেকে মৃদুলা যখন ছোট-বোনের মুখের দিকে তাকায় তখন সে অবশ্যই অনুমান করতে পারে, মঞ্জুলা তার মনের ইচ্ছার সবটুকু না-জানুক, অনেকখানি জানে।

মঞ্জুলা বাস্তবিক জানে, দিদির মনোবাসনার অনেকখানি। দিদির ভাবনা মঞ্জুলা

কিছুটা এভাবে যাচাই করেছে ঃ মিস্ আর্থার তাঁর 'গার্ল'স ওন্ হোম' থেকে একদিন ছুটি নেবেন। অবসর গ্রহণের সময় তাঁর বর্ষীয়সী প্রসন্নমুখে সেবার সার্থকতা ও অনলস কর্মের সফলতা লক্ষ্য করে, মৃদুলা তাঁর গলায় মস্ত বৃত্তাকার ফুলের মালাটা পরিয়ে দেবে। মাথাটা একটু নিচু করে, চশমার ফাঁক দিয়ে সহাস দৃষ্টি মেলে, মিস রোসালিন্ড আর্থার তাঁর যোগ্য উত্তর-সাধিকা মৃদুলা ঘোষের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষের বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর স্কটল্যাণ্ড-এ ফিরে যাবার প্রাগ্-মুহূর্তে মৃদুলাকে দিয়ে যাবেন তাঁর সারা জীবনের কর্মপ্রেরণার মূল মন্ত্রটি।

মঞ্জুলার এহেন চিন্তায় যখনই 'গার্ল'স ওন্ হোমে'র বর্তমান হেড মিস্ট্রেস্ মিসেস্ শাশ্বতী দাস এসে দাঁড়ান, তখনই সব ওলোটপালট হয়ে যায়। মঞ্জুলার ভাবনায় একমাত্র বাস্তব হয়ে থাকে যা—তার দিদি স্কুলের গাণ্ডীই পার হতে পারেনি তো অন্য কথা।

সবকিছু চিন্তাভাবনা মন থেকে দূরে গিয়ে, চোখের সামনে প্রকাণ্ড পোস্টারের মত বড় হতে থাকে, শাশ্বতী দাস আর স্কুলের আনকোরা নতুন বিল্ডিং—যার কোন দেয়ালের কোন অজ্ঞাত অংশেও মিস্ রোসালিন্ড আর্থারের মুখের কোন অস্পষ্ট চিহ্নমাত্রও নেই।

আর ঠিক এমন সময় দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলা অনুমান করার চেষ্টা করেছে, মিস্ রোসালিন্ড আর্থার না মিসেস্ শাশ্বতী দাস—কে এখন দিদির ভাবনায় অধিকতর বাস্তবগ্রাহ্য।

মঞ্জুলার অনুমান মিথ্যে নয়। মৃদুলা মিসেস্ শাশ্বতী দাসের প্রতাপ প্রতিপত্তির কথাই ভেবেছে। স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সে কারণে মিসেস দাসের দাপট সমাজের উঁচু মহলেও সুবিদিত। মিস্ আর্থারের আত্মত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করাটা তিনি অন্যায় মনে করেন। মিস্ আর্থার জাতধর্মে বিদেশিনী হয়েও কর্মে ও চিন্তায় তেমন দ্রুতগতি

নন। সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে গেলে তাঁকে যথেষ্ট প্রাগ্রসর হতে হবে। নিন্দুকের সমালোচনায় যদি তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়—তিনি জাঁকজমকবিলাসী বা উঁচু মহলের পক্ষপাতী, তবে চলতি কথাটার সপক্ষে গলা মিলিয়ে মিসেস্ দাসকে বলতেই হবে, দ্য লাক্সারিজ অফ টু-ডে আর দ্য নেসেসিটিজ অফ টু-মরো।

মিসেস্ শাশ্বতী দাস মিস্ আর্থারের মত মৃদুলার মার কাছে তাঁর মেয়ের জন্যে ভিক্ষাথীর আবেদন জানাতেন কি? কোনদিনই না, সম্ভবত। মৃদুলার পরিবর্তে যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের সুখী কোন মেয়েকে স্কুলে পেলে খুশী হতেন। মিসেস্ দাস সম্পর্কে পরিচিত অনেকের মুখ থেকে সম্প্রতি মৃদুলা যা শুনেছে তাইতে তার বিশ্বাস, সামাজিক প্রতিপত্তিই তাঁর কাছে সর্বাগ্রগণ্য। স্কুলের বাইরের চেহারায় তাই তিনি অতিরিক্ত মনোযোগী। মৃদুলা বা তার মত মেধাবী মেয়ের পরিবর্তে, তিনি চান সামাজিক প্রতিপত্তি আছে এমন সব পরিবারের মেয়েদের। স্কুল ফাণ্ডের জন্যে হাত পাতলে যে-কোন সময় মোটা টাকার কন্‌ট্রিবিউশন দিতে রাজী হবেন এইসব পরিবারের গার্জেনরা। শুধুমাত্র 'গার্ল'স ওন হোমে'র প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়-দায়িত্ব পালন করেই তো তাঁর কর্মজীবন শেষ হতে পারে না। বহু বড় বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। সমাজের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে ওঠ-বস করতে হয়। যথার্থ কিশোরীর আক্ষেপে এসব ভেবে মৃদুলা মিস্ দাসকে অভিযুক্ত করেছে।

মিসেস্ শাশ্বতী দাস সম্পর্কে মৃদুলার এ হেন কৌতূহলের মূলে আছে আসলে মঞ্জুলা। মৃদুলার বিয়ের যখন তোড়জোড় চলেছে, সেই সময় একদিন বাড়িমুখো পথ-চলতি মঞ্জুলা 'গার্ল'স ওন হোমে'র নতুন বিল্ডিং-এর দিকে আঙুল উঁচিয়ে দিদির কানে চাপা-গলায় বলেছিল, তোদের স্কুলের নতুন বাড়ির ওই পাশটা বাবা ভাড়া নেবে, তোর বিয়েতে।

মৃদুলার মতো, তার বিয়েতে, মঞ্জুলারও যে বিশেষ উৎসাহ নেই, সে-কথা মৃদুলার ভাল জানা। তবু তার বিয়ে সম্পর্কে বিশেষ দরকারী দু-চারটি সংবাদ ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায়, মঞ্জুলাই অনুচ্চ কণ্ঠে পরিবেশন করে থাকে।

অধুনা 'গার্ল'স ওন হোম' সম্পর্কে মৃদুলার আগ্রহ এইভাবে বিস্তার লাভ করে। স্কুলের নতুন বিল্ডিং-এর চিন্তায় তার মনে পড়ে যায় স্কুলের পুরোনো দিনের ভাঙা পাঁচিলটার কথা। তার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু ক্লাশের মেয়েরা টিফিনের সময় হাত বাড়িয়ে এটা-ওটা কিনে খেত। মিস আর্থার সারাবেন সারাবেন করেও কিছু করে উঠতে পারেননি। স্কুল ফাণ্ডের অবস্থা আশাপ্রদ ছিল না। কোন পরিচিত দৃশ্য স্মরণ করলে তা চোখের সামনে উপস্থিত হতে যতটুকু সময় লাগে, তার আগেই কোন চেনা স্বর বা চেনা গন্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ে বা

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভূত হয়। প্রায় ... কারণবশত স্কুলের পুরোনো বিল্ডিং... কথা স্মরণের মুহূর্তে মৃদুলার ম... ভেসে আসে কাঠচাঁপার গন্ধ।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য মিস আর্থারে... সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়... ছুটির দিনের সকাল। স্কুলের গেট ... হাতে ঠেলে বাবা প্রিয়রঞ্জন ঘোষ মৃদুলাকে... নিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন। কিছুদূ... গিয়েই মিস আর্থারের দেখা পাওয়া গেল... ফুলে-ছাওয়া কাঠচাঁপা গাছটার নিচে এক... খানা ইজিচেয়ারে বসে মিস আর্থা... স্ক্রিপ্চার পড়ছিলেন।

কারও পায়ের শব্দ না পেলে তি... সম্ভবত চোখ তুলতেন না। দু জো... জুতোর শব্দে যখন তিনি বইয়ের ফাঁ... আঙুল রেখে, মাথা তুলে, স্নিগ্ধ তাকি... ছিলেন, তখনই মৃদুলা তাঁকে দেখে মু... হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে মাথার ও... তাকিয়ে দেখেছিল কাঠচাঁপা গাছটাকে... সমস্ত বাতাস ভরেছিল ফুলের গন্ধে... মৃদুলার নাকে সেই কাঠচাঁপার গন্ধ এখ... লেগে আছে। ছাত্রী-জীবনের দু... বিশেষ সুখস্মৃতির সঙ্গে এই কাঠচাঁ... গন্ধও স্মর্তব্য।

মৃদুলা জানে, 'গার্ল'স ওন হো... বর্তমান বিল্ডিং-এর ঔজ্জ্বল্য মঞ্জুলা... অনেক সময় বিমূঢ় করে রাখে। ... মৃদুলার মনে পুরোনো ভাঙাচোরা স্কু... বাড়িটার ঝাপসা স্মৃতি মন্থর বিচরণ ক... সময়ের দিক থেকে, মৃদুলা তখনই ... অনুভব করে, মঞ্জুলা তাকে অনেক পিছ... রেখে এসেছে। মঞ্জুলা তার শরীরকে ... ভাবে যতটুকু প্রয়োজন আচ্ছাদিত ক... আজ থেকে পনের বছর আগে তের বা... বয়সে, মৃদুলা বাস্তবিক পোশাক-পরি... সম্পর্কে এমন সচেতন ছিল না ... মৃদুলা ম... করে, ছোটবোন শরীর স... তার থে... অনেক বেশী সচেতন। আধুনিক বাড়ি... দোরের মতো আধুনিক পোশাকও মঞ্জু... মতো এ-সময়ের মেয়েদের বিশিষ্ট রু... আধুনিক বাড়ির বাসিন্দা যেমন কা... কায়দায় আধুনিক, অতি-আধুনিক মে... তেমনি হালফ্যাসানের পোশাকের অন্ত... শরীরকে কীভাবে আদর-যত্নে রাখতে ... জানে। 'গার্ল'স ওন হোমে'র বর্তমান বিল... এর মতো মিসেস্ শাশ্বতী দাসও ... মঞ্জুলার মনের নিভৃতে আছেন নাকি। মি... রোসালিন্ড আর্থারের সপক্ষে এক সময় ক... বলতে গিয়ে মৃদুলা একদিন মঞ্জুলার ... থেকেই বাধা পাবে না তো? মঞ্জু... কথাগুলোয় মৃদুলা সহসা চিন্তিত হয়... জানিস দিদি, ওই বাড়িটার একপাশটা ... ভাড়া নেবে, তোর বিয়ের জন্যে। ... মঞ্জুলা কি চায়, মিস্ রোসালিন্ডের ... স্মৃতি আর ওই স্কুল-বাড়ির কোথাও ... কথিত মমতা বা স্নেহের স্পর্শকাতরতা... প্রশ্রয় না-দেয়—বাস্তবিক মঞ্জুলা কি চা... ওই রকম ঝকঝকে স্কুল-বাড়ির ... সুসজ্জিত কোণে তার নিজের বিবাহবা...

রচিত হবে, যখন প্রিয়রঞ্জন ঘোষের সংসারে অন্তত খানিকটা স্বাচ্ছল্য দেখা দেবে।

এই এতক্ষণে নিজের চিন্তায় নিজেই ছেদ টানতে পেরেছে। বাবা প্রিয়রঞ্জন ঘোষের কথায় যখন সাংসারিক স্বাচ্ছল্যের কথাটা ভাবে, তখন হাসি ছাড়া মৃদুলার গত্যন্তর নেই। তার বাবাকে কথাটা কে যেন বলেছিল। চেষ্টা করে মনে করতে পারল মৃদুলা : দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় চিনুমামা। চিনুমামা বাবাকে বলেছিলেন, জামাইবাবু, সুসময় আমাদের জীবনে কোনদিনই আসবে না। বড় মেয়েকে মানুষ করুন, ও মানুষ হলেই দেখবেন সময় ফিরবে।

সেই চিনুমামার কোন সংবাদ বহুদিন নেই। মাঝে মাঝে চিনুমামার কথাগুলো ইদানীং মৃদুলাকে কেমন উদাস করে তোলে। হয়তো চিনুমামার মতো এমন একজনও আর কেউ নেই যে তার সম্পর্কে এ রকম কথা বাবাকে বলতে পারত।

মৃদুলার বিয়ের তোড়জোড় শেষ হয়ে এল, যেদিন প্রিয়রঞ্জন ঘোষ তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মৃদুলার মাকে বললেন, যাক, দেনা-পাওনার ব্যাপার সব মিটে গেল— শুধু বাকি রইল নগদ আড়াই হাজারের এক হাজার, আর গয়নার কি যেন এক খানা—

প্রশ্নটা স্ত্রীর সামনা-সামনি রেখে উত্তরের প্রত্যাশায় থাকলেও, মৃদুলার মা ভর্ৎসনা ও উপহাসের দৃষ্টিতে স্বামীর হাস্যকর পরিস্থিতিটাকে সমস্ত পরিবারের সামনেই খুব বেশি স্পষ্ট করে তুললেন। মঞ্জুলা মৃদুলার দিকে যেভাবে তাকাল তাইতে মৃদুলা বুঝতে পারল, প্রিয়রঞ্জন ঘোষ এখন পরিবারের যে-কাউকেই যে-কথা বলবেন তার অর্থ একটিই : তুমি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ সেই অবস্থাটার নামই কি ভরাডুবি? মৃদুলার মনে হল তার মনের এই অবস্থায় সে চিনুমামাকে একখানা চিঠি লিখতে পারলে খুশী হয়। কিন্তু চিনুমামার ঠিকানা? খোঁজ করলে কি পাওয়া যায় না? আর্মিতে জয়েন করে চিনুমামা মেস-পটামিয়া বা এমন কোন একটা জায়গায় গিয়ে থাকবেন। মৃদুলা এও ভেবেছে যদি কোন ক্রমে তার চিঠি চিনুমামার ঠিকানায় পৌঁছয় তাও ভালো। উত্তর না-পেলেও চিনুমামা যে তার চিঠি পেয়েছেন, এ-সংবাদও মৃদুলার কাছে পরম স্বস্তির কিছু হবে।

মনে মনে যেভাবে দাঁড় করাবে তাই যে তার চিঠির আক্ষরিক ভাষা হবে এমনই বিশ্বাসে মৃদুলা চিঠির কথাগুলো এইভাবে সাজানোর চেষ্টা করল : তুমিই তো বলেছিলে চিনুমামা, মৃদুলাকে মানুষ করুন জামাইবাবু, দেখবেন সময় ফিরবে। বাবা নিশ্চয় আমায় মানুষ করেছে। না হলে আজ আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কী করে এমন নির্বিঘ্নে। বাবা কি বিশ্বাস করে জান চিনুমামা? বাবার বিশ্বাস পাত্রপক্ষ খুবই দরাজ। আর পাত্র নিজে? তার মতো দরাজ ছেলের দেখা মেলা ভার। নেহাতই বাবা-মার মনে কষ্ট দিতে মন চায় না। না-হলে সামান্য দাবি-দাওয়ার ব্যাপারও সে সমর্থন করত না। বাবা এক হাজার টাকা নগদ আর এক আধখানা গয়না বিয়ের পর পাত্রপক্ষকে দেবে। আর এতক্ষণ না পারছে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ চিনুমামা?

বিয়ের ব্যাপারটাই আগাগোড়া অনিশ্চিত। টাকা জোগাড়ের ইতিহাস আমি কেন ছোটবোন মঞ্জুলাও কিছু কিছু জেনেছে। আর বিয়ের পরের ব্যাপারটাও কি খুব সুনিশ্চিত মনে কর। আমার তো মনে হয় এত বেশি অনিশ্চিত যে সমাধানের পথ আমাকেই না শেষ পর্যন্ত খুঁজতে হয়।

একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি শুধু, বাবা কি এর চেয়ে অনেক কম কাঠ-খড় পুড়িয়ে আমার লেখাপড়াটা যাতে বন্ধ না-হয় তার চেষ্টা করতে পারত না? বিয়ের পর অনেক সুখশান্তি আমার জন্যে জমা আছে, বাবার অন্তত বিশ্বাস তাই। আর আমার বিশ্বাস কি জান, লেখাপড়া শিখে স্কুলের মেয়েদের পরিবর্তে যদি জীবনটা কাটাতে পারতাম, সুখ না হোক অনেক স্বস্তিতে বাঁচা যেত।

এ-ছাড়া তার মনের নিভৃতে যে ক্ষুদ্র ইচ্ছেটা ছিল তার কথা লজ্জার খাতিরে চিনুমামাকে চিঠিতে জানাতে পারবে না। তাই সেই একান্ত আপন ইচ্ছার কথা চিঠিতে অকথিত থাকবে।

আর প্রায় আশ্চর্য, মরীয়া হয়ে মৃদুলা চিনুমামার ঠিকানা জোগাড়ে উঠে পড়ে লেগে গেল। মঞ্জুলার কাছে ব্যাপারটা বিশেষ অবাক লাগার মতো, কিসের এমন প্রয়োজন চিনুমামার ঠিকানা? কোথায় চিনুমামা তার ঠিক নেই তো তাঁর ঠিকানা।

আয়োজনের যেটুকু বাকি ছিল প্রিয়রঞ্জনবাবু সেটুকুও শেষ করলেন একদিন নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপিয়ে।

ঝকঝকে ছাপায় মৃদুলার নামের সঙ্গে বুঝি চেহারাও ধরা পড়ে। বাঁধা গদে ঢালা চিঠির ভাষা। আইনের বইতে ছাপা বাঁধা নিয়মকানুনের ভাষার মতো বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রের ভাষা। মেয়ের বাপ যেন সকলের সমনে দাঁড়িয়ে অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছেন নানা ত্রুটিবিচ্যুতির। সর্বসমক্ষে ঘোষণার মতো জানাচ্ছেন, অমুকে জেলা-নিবাসী অমুক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র, পাত্র হিসাবে যিনি অদ্বিতীয়, তাঁরই হাতে মেয়েকে সমর্পণ করে কৃতকৃতার্থ হচ্ছেন।

নিমন্ত্রণপত্র পাত্রপক্ষের রুচিসম্মত হতে পারে কিনা সেটাও একবার যাচিয়ে নিলেন প্রিয়রঞ্জনবাবু পরিবারের সবাইকে দিয়ে।

চিঠির ওপর চোখ রেখে মৃদুলা 'গার্লস্ ওন্ হোম'র নতুন বিল্ডিং-এ তার বিবাহবাসরের দৃশ্যটা অনুমান করার চেষ্টায় ছিল।

আলোকোজ্জ্বল বিয়ে বাড়ির বাইরের আলোয় বিয়ের কনের ভেতরের অন্ধকার অনায়াসে চাপা পড়ে থাকবে। চিরকালের বিয়েটা সামান্য একটা রাতের অস্থায়ী আলোকসজ্জায় কয়েকটি ক্ষণ অমরাবতীর মহিমায় দীপ্তি পাবে। বিয়ের আসর থেকে কি আলোকোজ্জ্বল কাঠচাঁপা গাছটার মাথা দেখতে পাওয়া যাবে? আর সেই গাছটার নীচে? নিশ্চয় মিস্ রোসালিন্ড্ অর্থার ইজিচেয়ারে বসে স্ক্রিপচার পড়বেন না। বরের বাবা, মৃদুলার ভাবী শ্বশুর, তাঁরই জন্যে সংরক্ষিত একখানা চেয়ারে বসে মুখে পান পুরবেন কিম্বা মোলায়েম করে সিগারেট ধরাবেন। কাঠচাঁপা গাছটার তল্লাট জুড়ে পাত্রের পিতার অস্তিত্ব জমজমাট হয়ে থাকবে।

ভাবনার পরিশেষে মৃদুলা শুধু ভেবেছে, আচ্ছা কাঠচাঁপার গন্ধটাও কি অসম্ভব? বুক ভরে নিশ্বাস নিলে কাঠ চাঁপার একটা গন্ধও কি তার নাকে আসবে না।

ইতিমধ্যে কখন যে মঞ্জুলা দিদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা মৃদুলার নজরে আসে নি আদৌ। ভাগ্যে তার চোখের দু ফোঁটা জল মঞ্জুলা আসবার আগেই চিঠির ওপর পড়েছিল।

মৃদুলা যখন চোখে আঁচল চাপতে যাবে সেই সময় মঞ্জুলার পরিচিত প্রশ্নটা আরেক বার শুনেছে, এত কি ভাবিস বল তো দিদি?

মৃদুলা বাস্তবিক ভেবেছে : সব আলোর ঔজ্জ্বল্য ও সমস্ত কণ্ঠের কোলাহল স্তব্ধ করে মিস্ রোসালিন্ড্ আর্থারের অস্তিত্ব সত্যি হতে পারে না, কাঠচাঁপার গন্ধটা যদি নাকে আসে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমেরিকা ও স্বরাজ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের সহানুভূতি মিলেছে এবং ভারতের বিপ্লব যেমন নিরস্ত্র বিপ্লব, সহায়তাও মিলেছে সেই রকম নিরস্ত্র ভঙ্গীতে। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলণ্ডেও কিছু মনীষী অনেকভাবে সাহায্য করেছেন, আয়ার্লাণ্ডের ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ-যোগ। জার্মাণীও নিজের স্বার্থে কিছু কিছু সাহায্য করেছে, অনেক বিপ্লবী একদা জার্মাণীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত-রাষ্ট্রের সহায়তাও নগণ্য নয়। অধ্যাপক গ্যয় হোপ ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্ট-মেন্টের সঙ্গে ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন, তিনি বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে ভারতের সংগ্রামে যুক্ত-রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন 'আমেরিকা ও স্বরাজ: ভারতের স্বাধীনতায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা' এই নামে। এই গ্রন্থে আলোচিত বহু বিষয় এদেশে এখনও অজ্ঞাত আছে। প্রথম মহাযুদ্ধ কালের প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলসন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালের প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট পরাধীন জাতিসমূহের যে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকা প্রয়োজন তা বুঝেছিলেন এবং নানাভাবে তা সমর্থন করেছেন।

মিঃ উইলসনের বিখ্যাত চোদ্দ দফা-নীতি আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করেছিল, এবং তাঁর এই নীতি তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করেছিল। আমেরিকা তার আইসোলেশন নীতি বা নিরালা থাকার নীতির আড়ালে থাকলেও প্রথম দিকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অভিযান আমেরিকার জনগণের মনে ভারতবর্ষের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সজাগ রেখেছিল।

এই দেশের নানাবিধ পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রতি আমেরিকার মানুষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। আমেরিকার যেসব মিশনারী কর্মীরা ভারতে কর্মরত ছিলেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ এবং অহিংস নীতি তাঁদের অন্তরে রেখাপাত করেছিল। ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর মনে গান্ধীবাদ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন চার্চ সংগঠনে পেশ করেছেন এবং এইভাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা আন্দোলনে আমেরিকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে অনুকূল ভঙ্গী রচনায় সহায়ক হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জে জে সিং-এর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়া লীগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রায় দুই দশক ধরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা সম্পর্কে অবহিত রেখেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে জে জে সিং-এর প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব আজো বর্তমান। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> "An extremely sincere and convincing protagonist of the cause of India's freedom".

আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনও ভারতের পক্ষে অনুকূলে হয়েছে, নিগ্রো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারতের গণ-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। ওয়ালটার হোয়াইট ইণ্ডিয়া লীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে অনুরোধ করলেন যে, তিনজন বিশিষ্ট আমেরিকান নাগরিক নিয়ে গঠিত একটি কমিশনকে ভারতে পাঠানো হোক, তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে ভারতবাসীদের আশা ও আকাঙ্খার প্রতি যে আমেরিকার সরকার সহানুভূতি-শীল এই বিশ্বাস সৃষ্টি করুন।

এরপর তিনি যে প্রস্তাব পেশ করলেন তা অধিকতর সাহসিক এবং বলিষ্ঠ। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, প্রশান্তসাগরের কোথাও মৌলানা আজাদ, নেহরু, গান্ধীজী, চিয়াং কাইশেক এবং রাজাজীকে নিয়ে একটা প্যাসিফিক কনফারেন্স ডাকা হোক, সেই কনফারেন্সে রুজভেল্ট এবং চার্চিলও উপস্থিত হয়ে মুখোমুখি আলোচনা করুন। লেখক ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নিগ্রো সহানুভূতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "An interesting illustration of how pervasive was the Indian problem in many sectors of society and among groups of widely varying aims"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে মার্কিন সর্বাধিনায়কের পদে রুজভেল্ট আসীন ছিলেন এ এক শুভ লক্ষণ। পার্ল হারবারের ঘটনা আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী মহাসমরে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার অনেক আগেই কি উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য তিনি দাবী করেন যে, একটা নীতি নির্ধারণ করা অবিলম্বে কর্তব্য।

অতলান্তিক সনদ বা এ্যাটল্যান্টিক চার্টারে চতুর্বর্গ স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দান করা হল তার মধ্যে অন্যতম হল যুদ্ধান্তে কোন জাতি কি ধরণের শাসন ব্যবস্থায় থাকতে চায় তা তারা নিজেরাই স্থির করে নেবে, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার এই নীতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা নতুন আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। মিঃ চার্চিল কিন্তু সেদিন সদম্ভে বলেছিলেন যে মহামান্য সম্রাটের সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় লালবাতি জ্বালার সভায় পৌরোহিত্য করতে তিনি রাজী নন। চার্চিলের এই অবাধ্যতা মিত্রপক্ষের কাছে যুদ্ধকালে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই এক-গুঁয়েমিজনিত অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক দেখা গেছে। বৃটেনের কোয়া-লিসন সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ এ্যাটলি ও মিঃ বেভিনের অতলান্তিক সনদ বিষয়ে যে নিজস্ব মত ছিল তা তাঁরা গোপন রাখেন নি। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ১৯৩৯-এ প্রথমবার ভারত সফর শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় অধিবাসীদের কি ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত সেই বিষয়ে বলেন—

> "The most promising course to improve British reception to India's independence claim was to persuade a few influential Americans to bring pressure to bear upon the British Government with respect to India".

জাপান যুদ্ধে নামার পর সমরজনিত সংকট ভারতের গা ঘেঁষে এল এবং তারই ফলে চার্চিল, রুজভেল্ট এতদিন যা বার বার বলে এসেছেন, তা কানে তুলতে বাধ্য হলেন। এই গ্রন্থের লেখক বলছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ নামক রত্নহার অটুট রাখতে পেরেছিল বৃটিশ সরকার কিন্তু ১৯৩৯-৪৫-এর মহাযুদ্ধের পর রাজনৈতিক পরিবর্তন আরও বিলম্বিত করা সম্ভব হল না।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে ক্রিপস্ মিশন পাঠানো হয়েছিল তার পিছনে মার্কিন চাপ ছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ক্রিপসের নেতৃত্বে বৃটিশ ক্যাবিনেটের

একটি অংশের সমর্থন। প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করে রুজভেল্ট প্রত্যক্ষভাবে এবং তাঁর দূতবর্গের সহায়তায় এই কথাটি বার বার করে বলেছেন যে, ভারতকে যদি স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি দান করা হয় তা হলেই যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যাবে।

১৯৪২-এ ক্রিপস মিশনের মাঝখানে কর্ণেল জনসন এসে যে বাধা সৃষ্টি করলেন সেই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"If blunder characterizes Johnson's effort to bring together the Indians and the British, history owes it to his memory to record it as of the kind which may lose a battle but sometimes win a war".

জনসনের সঙ্গে নেহরুর গোপন সাক্ষাৎকারের কথা ফাঁস হয়ে যায়। এরপর উইলিয়াম ফিলিপস এলেন তাঁর উত্তরসাধক হয়ে। ইনি জনসনের চেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন। ভারতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন ফিলিপস বিশেষতঃ মহাত্মাজীর অনশনের কালে। ভারতীয় সমস্যার সমাধানে ফিলিপস প্রচন্ড উৎসাহ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ওয়াশিংটনে ফিরে ফিলিপস জানালেন যে নেহরু ও গান্ধীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার করতে ভারতবর্ষে গিয়ে তিনি সফল হননি, এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন চার্চিল এবং ফিলিপসের সঙ্গে যখন চার্চিলের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন—

"The Prime Minister paced the floor exclaiming 'my answer to you is take India if that is what you want! Take it by all means! But I warn you that if I open the door, a crack there will be, the greatest bloodbath in all history".

চার্চিলের কথাটি হয়ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশবিভাগের ফলে যে রক্তস্নানে অখন্ড ভারত কলংকিত হয়েছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একদিন স্পষ্ট করে লিখিত হবে।

লেখক বলেছেন যে, ইতিহাস হয়ত প্রশ্ন করবে ভারতের স্বাধীনতায় উৎসাহী মার্কিনদের সহিষ্ণুতা বিষয়ে—

"But it should not discount the fervour of their sentiment in behalf of India's aspirations for self-rule".

১৯৩৯-১৯৪৭ পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসে—

"There was a single-minded attitude towards Indian aspirations".

গ্রন্থটি সুবৃহৎ, অনেক অজ্ঞাত তথ্যে পরিপূর্ণ। সমকালীন ইতিহাসে আগ্রহী পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

—অভয়ংকর

AMERICA AND SWARAJ: THE U S ROLE IN INDIAN INDEPENDENCE: BY A GOY Hope (Public Affairs Press: WASHINGTON Price $4.50.

সাহিত্যের খবর

আবু সৈয়দ আয়ুব রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন

শ্রীআবু সৈয়দ আয়ুব তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৯-৭০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কার বাবদ তিনি ৫০০০ টাকা পাবেন।

●

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী আমেরিকান গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। উদ্যোক্তা ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি। সুন্দর সাজানো গোছানো এই প্রদর্শনীটি সাহিত্য রসিকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। স্বল্প মূল্যের পাঠ্য-বইয়ের ভারতীয় সংস্করণের অংশটি ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও গবেষকদের সাহায্য করবে। আমেরিকান গ্রন্থের অনুবাদ এবং পত্র-পত্রিকার অংশটিও বিশেষ উল্লেখ্য। আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

পাপুয়া ও নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম হন কিভিন আউরে। তাঁর কবিতার নাম 'আই কাইমারে'। কবিতাটির কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"আমি তাকে এই সব খাদ্য দিলাম,
দিলাম তাকে সাগুদানা,
আমাদের সাগুদানা তিনি আহার
করবেন,
আর আমাদের প্রভাত সংগীত
আবৃত্তি করে শোনাবেন তিনি।
এভাবেই তাঁর মুখ ক্রমশ নমনীয় হয়ে
উঠবে।"

কবিতা হিসেবে হয়ত তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু নিউগিনির কবিতা হিসেবে এই অংশটি উল্লেখ করা হল।

সুরেশ দালালের সম্পাদনায় 'কবিতা' নামে একটি গুজরাটি দ্বি-মাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ এবং অলংকরণের দিক থেকে পত্রিকাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। সুন্দরম, উমাশংকর যোশি, সুরেশ দালাল, রমেশ পারেখ, ভোলাভাই প্যাটেল প্রমুখের কবিতা এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ। পত্রিকাটিতে ভারতীয় কবিতার একটি অনুবাদের অংশও আছে। বিভিন্ন ভারতীয় কবিতা এখানে প্রকাশ করা হয়। বর্তমান সংখ্যায় যাদের কবিতা অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন মারাঠির দিলীপ চিত্রে, হিন্দির অশোক বাজপেয়ী এবং বাংলার আশিস সান্যাল। ইদানিং প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেই একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যায়, এভাবেই ভারতীয় সাহিত্যের একটা সংহত রূপ ফুটে উঠবে।

২৮ বছর ধরে কাব্য ত্রৈমাসিক 'একক' নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে, এ গৌরব এককের পক্ষে অনন্য। বোধহয় এশিয়ার অন্য কোনো কাব্য পত্রিকার ভাগ্যে এই দীর্ঘজীবনলাভ সম্ভব হয়নি। আগামী এপ্রিল মাসের গোড়াতেই এর শততম সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে। 'একক'-এর শত সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে ৫।৪।৭০ তারিখে কবি ও সাহিত্যিকদের এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আর 'এককে' প্রকাশিত নবীন ও প্রবীণ দুশো কবিদের কবিতা নিয়ে দুটি সংকলন গ্রন্থ 'শতেক

কবিতা এবং 'কবিতা শতক' নামে বের হচ্ছে। 'একক' নির্দলীয় কাব্য পত্রিকা। এখানে কাব্যামোদী সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার। 'একক' আয়োজিত এই কবি-সভার সাফল্য নির্ভর করছে জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর, আর এই ব্যাপারে প্রেসের কাছে আমাদের আবেদন তাঁরা যেন 'এককে'র প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে কবি-সভার আয়োজন যাতে সার্থক হয়—সে জন্যে সহৃদয় সহযোগিতা করেন।

জন ব্যারিম্যান ইংরেজি সাহিত্যের একালের একজন বিশিষ্ট কবি। সম্প্রতি ত'ার একটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'হিজ টয়, হিজ ড্রিম, হিজ রেস্ট'। প্রকাশ করেছেন ফেবার এ্যান্ড ফেবার। ১৯৬৪ সালেও এই সংস্থা তাঁর একটি গ্রন্থ 'সেভেন্টি সেভেন ড্রিমসংসস' প্রকাশ করেছিলেন। এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, এতে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ দিকটি ফুটে উঠেছে। প্রখ্যাত আমেরিকান কবি রবার্ট লাওয়েল ও তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ব্যারিম্যান তাঁর কবিতায় সমসাময়িক জীবনকে ধরতে চেয়েছেন কখনও তীর্যক ভঙ্গিতে, কখনও বিদ্রূপে তিনি যেন এই হৃদয়হীন সময়কে আঘাত করেছেন। মৃত্যুচিন্তাও মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় এসেছে। অবশ্য এ মৃত্যুচিন্তা টেনিসনের মৃত্যুচিন্তার মত নয়। জেমস টিউলিপ এই গ্রন্থ দুটির সমালোচনা করতে গিয়ে পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়ায় লিখেছেন, 'এই গ্রন্থটি পাঠ করার পর আমার শেক্সপীয়রের কথা মনে পড়ছে, বিশেষ করে তাঁর শেষ নাটকটির কথা।' যদিও প্রসপেরোর অনুভূত জগতের সঙ্গে ব্যারম্যানের দেখা জগতের একটা মৌল পার্থক্য আছে, তবু যেন সে কথাই এই গ্রন্থ দুটি মনে করিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক কবিতার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকের কাছে, বই দুটির মূল্য অপরিসীম।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর নেই। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ৯ মার্চ, সোমবার তাঁর দক্ষিণ কলিকাতাস্থ বাস-ভবনে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। ডঃ ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ সমালোচক ও গবেষক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর তিনি যে-বইটি লেখেন, তা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'বাঙলার বাউল' বইটির জন্য ১৯৫৮ খৃঃ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

নতুন বই

মরু ও মঞ্জরী—ননী ভৌমিক। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

প্রথম গল্প-গ্রন্থ ধানকানা প্রকাশ করেই ননী ভৌমিক বাংলা গল্প-সাহিত্যে এক ক্রান্তিলগ্নের সূচনা করেছিলেন। মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা গল্প-সাহিত্যের যে সীমিত প্রাঙ্গণকে অনেকদিন ধরে ঘষা-মাজা করা হয়েছে, সেই প্রাঙ্গণের বাইরে ক্ষুধা, ক্রন্দন, অত্যাচার এবং অবিচারের নির্মম কষাঘাতে লুণ্ঠিত এক অন্ধকার জীবনের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে শ্রীভৌমিক প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃতের সম্মান অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য সাহিত্য-সাধনার তুঙ্গ-মুহূর্তেই তাঁকে দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। যতদূর জানা আছে, এই দশ বছর ননী ভৌমিক মস্কোতে রুশ ভাষার বাংলা অনুবাদ কার্যে ব্যস্ত আছেন। তাই এতদিন পরে তাঁর মূল বাংলা রচনা মরু ও মঞ্জরী গ্রন্থটি বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হবে। আশা করব, বর্তমান গ্রন্থটি যেন সাহিত্যে ননী ভৌমিকের পুনরাবির্ভাবকে সূচীত করে।

লেখক ১৯৬৭ সালের শরতে উজবেকিস্তানে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কিছু কিছু অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। আকারগত সাদৃশ্যে এটি যদিও এক সরস ভ্রমণ-কাহিনী, কিন্তু এর পাতায় পাতায় অনুভব করা যায় এক আশ্চর্য প্রাণস্পন্দন, যা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর উজবেকিস্তানের গন-জাগরণ এবং বহু শতাব্দীর দাসত্ব এবং অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্তির বলিষ্ঠ প্রয়াসের যন্ত্রণা এবং আনন্দকে আমাদের বুকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। উজবেকিস্তানের সেই বিশাল উষর, মরু-অঞ্চল—মহাভারতে যার উল্লেখ আছে, আলেকজান্ডারের সহচর ঐতিহাসিকের বিবরণে যার ভয়ংকর ভৌগোলিক বর্ণনা, বিশ্বের যত দিগ্বিজয়ী, চেঙ্গিস, খোঁড়া তৈমুরের ঘোড়ার খুরে যে মরু-প্রদেশের বাতাসে বার বার বালি উড়েছে, পদে পদে ভাঙা কেল্লা আর প্রাকার মিনা-করা মিনার-গম্বুজের যে দেশটায় পা দিতে গিয়ে লোককে প্রথমেই পদার্পণ করতে হয় ইতিহাসে, সেই দেশ শেষপর্যন্ত যখন 'জারের কারাগার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন তার জাতিগত চেহারা কিছুই ছিল না। তাজিক, উজবেক, তুর্কমেন, কিরগিজ প্রভৃতি তালগোল পাকানো এক বিশাল জন-সমষ্টিকে চেনা যেত শুধু এক নামে—তুর্কিস্থান। অথচ সেই তথাকথিত তুর্কিস্থান আজ নিখুঁত ভাষাভিত্তিক কতকগুলি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়ে উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উজবেকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমঃবৃদ্ধির একটি উজ্জ্বল ছবি চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক। তাই আধুনিক উজবেকিস্থানকে জানতে হলে বর্তমান গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য।

ননী ভৌমিকের যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা হল, তাঁর ভাষায় কোন জড়তা থাকে না, খুব, স্বচ্ছ, সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলে তাঁর ভাষা। বর্তমান গ্রন্থেও সে বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয়নি। ফলে উজবেকিস্থানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জটিল কাহিনীও তাঁর রচনার প্রসাদে সরল এবং সরস হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন পরে এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য তিনি নিশ্চয়ই বাংলা দেশের পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ হবেন।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশনও এই মূল্যবান গ্রন্থটির প্রকাশনে অগ্রণী হয়ে আমাদের সামনে এক নূতন প্রত্যাশার দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

তকতকে ছাপা, বাঁধাই, পাতায় পাতায় আর্ট পেপারে ছাপা রঙীন ছবিতে ভরা এই বইখানি হাতে নিয়ে যেকোন পাঠক খুশি হবেন।

ব্যোমকেশ মুস্তাফী-দেবজ্যোতি দাস।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবজ্যোতি দাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা-৬। দাম দেড়টাকা এবং দুটাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় দুটি নতুন সংযোজন ব্যোমকেশ মুস্তাফী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী। মুস্তাফী প্রথম শ্রেণীর সৃজনধর্মী লেখক ছিলেন না। মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যের ব্যাখ্যাকার এবং সাহিত্য-কর্মী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের এই নিরলসকর্মীর জীবনকথা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। আর ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত গবেষক। বাঙলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নব-জাগরণ এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। বাঙলা ইতিহাস ও সাহিত্যের বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্যের তিনি সন্ধান দিয়ে গেছেন যা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক কাজ হচ্ছে। এই জ্ঞান-তপস্বীর জীবন-কথা প্রকাশ করে সাহিত্য পরিষদ একটি বড় দায়িত্ব পালন করলেন।

বজ্রবিষাণ (উপন্যাস)। জ্যোৎস্না গুহ। **প্রকাশ ভবন। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।**

বরিশালের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি ভারতবর্ষে বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এই বিষয়কে অবলম্বন করে অসাধারণ গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। বর্তমান উপন্যাসের তরুণ নায়ক প্রভাত মিত্র একজন উদীয়মান উকীল। তার দিন-রাত্রির স্বপ্ন কিভাবে দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়ানো যায়। দেশের কাজের জন্যে সে একরকম ঠিকই করেছিল আজীবন অবিবাহিত থাকবে। কিন্তু রোগশয্যায় শায়িত দাদুর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত বিবাহে সম্মতি না জানিয়ে পারে না। প্রভাত ক্রমশ সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের চেয়ে সুভাষ বসুর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। সে গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়। প্রথম দিকে গোপন থাকলেও, শেষে সকলে, বিশেষ করে তার স্ত্রী দীপ্তি, মা মহামায়া, দাদু সত্যপ্রসন্ন এবং আবাল্য সুহৃদ তরুণ ডাক্তার সুব্রত জানতে পারে প্রভাতের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা। সংসারের প্রতি উদাসীন প্রভাত গুপ্ত সমিতির নির্দেশে ইংরেজ পুলিশ সুপারকে গুলিবিদ্ধ করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল। অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে প্রভাতও মুক্তি পেল। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতা হিংস্ররূপ ধারণ করল। চোখের সামনে মেয়েকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল গুন্ডারা। জেলে থাকাকালীন পুলিশের নির্মম অত্যাচারে প্রভাত দু' চোখ হারিয়েছিল। তাই মানুষের পৈশাচিক রূপ চোখে না দেখলেও কানে ভেসে এসেছে কন্যার তীব্র অসহায় আর্তনাদ। প্রভাত স্তব্ধ হয়ে ভাবে এই পৈশাচিক রূপ দেখার জন্যেই কী তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল?

এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেরা লেখকের রচনাগুণে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বীণা। ভাই এবং স্বামীর মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিবারণ দারোগার লালসার কাছে বাধ্য হয়ে সঁপে দিয়েছে। দাদু সত্যপ্রসন্নকেও ভোলা যায় না। তিনি বিদেশী শাসনের অবসান চাইলেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এদেশে ইংরেজ শাসনের সার্থক দিকটাও মাঝে মাঝে প্রভাতকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। সুব্রত ডাক্তার বিনা পয়সায় গরীব লোকদের চিকিৎসা করে। সেও চায় দেশের স্বাধীনতা। তবে প্রভাতের মত অসহিষ্ণু সে নয়। স্বাধীনতার মূল্যবোধ সকলের মধ্যে জাগিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া তার কাম্য। মা মহামায়া পুত্রকে হারাতে চান না। বিধবা এই মহিলার কাছে পুত্রের মঙ্গল কামনাই একমাত্র ধ্যানধারণা।

লেখকের পরিহাসবোধের প্রশংসা করতে হয়। সত্যপ্রসন্ন এবং তাঁর ভৃত্য উমাচরণের মধ্যে কথোপকথন, চাটুজ্জের কলকাতা যাত্রা, ট্রেন ও রেলগাড়ির মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ অবতারণার মাধ্যমে লেখক পাঠকের মনে অনাবিল হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল উপন্যাসটির অঙ্গসজ্জা ছাপা বাঁধাই সন্তোষজনক।

মাও সে-তুং (জীবনী)—সুধাংশুরঞ্জন ...ঘোষ। **বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : আট টাকা।**

এ শতকের একটি বিস্ময়জনক নাম মাও সে-তুং। দীর্ঘকাল পরাধীন এবং শোষিত একটি জাতির মুক্তিদাতাই শুধু নন তিনি, চীনা জাতির পুনর্জাগরণ এবং এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানই সম্ভবত সব থেকে বেশী। সাধারণ কৃষি পরিবারের সন্তান এই লৌহকঠিন মানুষটিকে জীবনের প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত প্রবল প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাঁর তত্ত্ব এবং রাজনীতিক কৌশল, রাশিয়ার সঙ্গে তত্ত্বগত বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি লেখক শ্রীঘোষ জীবনকথায় মধ্যে পরিস্কার বিশ্লেষণ করেছেন। চীনা ভাষায় মাও সে-তুং-এর কোন জীবনী আজও প্রকাশিত হয়নি। বাঙলায় প্রকাশ করে, প্রকাশক বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হবেন। ভাষা সম্পর্কে লেখকের আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। তিনি শব্দ প্রয়োগ ব্যাপারে অনেক সময় অসতর্ক থেকেছেন। অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ বইটির অন্যতম ত্রুটি। কয়েকটি ছবি আছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সমীক্ষা (রজত জয়ন্তী সংখ্যা)—সম্পাদক রমেন আচার্য ।। জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাব, কলকাতা—১৩ ।।

প্রচ্ছদে বাংলা-ইংরেজী-হিন্দীতে লেখা একটি শব্দ 'সমীক্ষা'। জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত। রুচিসম্মত প্রচ্ছদ ও মুদ্রনে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো। তিনটি ভাষায় লেখা ছাপা হলেও, প্রধান্য পেয়েছেন বাঙালি লেখক-লেখিকারা। কবিতা-গল্প-নাটক-প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন অনিরুদ্ধ কর, শিশির চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, সংকর্ষণ রায়, চিন্ময় সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, তুষার মজুমদার, চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, হারু দত্ত এবং আরো অনেকে। নামকরা কবি-সাহিত্যিকদের কাছে হাত না পেতে নিজেদের রচনাসম্ভারে পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে সম্পাদকদের নিষ্ঠা অনুভব করা যায়।

কালি ও কলম (পৌষ-মাস ১৩৭৬)—সম্পাদক বিমল মিত্র ।। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ ।। দাম : পচাত্তর পয়সা।

এ সংখ্যার দুটো লেখা 'সাহিত্যের অন্তরালে শরৎচন্দ্র' এবং 'দপ্তরেফস্কি' ধারাবাহিকভাবে লিখছেন ছবি মুখোপাধ্যায় ও যজ্ঞেশ্বর রায়। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন হেনা চৌধুরী রঞ্জিতকুমার সরকার, আরতি বসু, রসিক রায়, সবিতা সেনগুপ্ত, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জরাসন্ধ ও বিমল মিত্র সম্পাদকীয় এবং 'সাহিত্যের খবর' ফিচারটি ভালো।

অন্বয় (অষ্টম সংকলন)—সম্পাদক : শ্যামসুন্দর দত্ত ও শুভঙ্কর ঘোষ। ৬৭।২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৯। দাম এক টাকা।

কবিতার কাগজ অন্বয়। কবিতা থেকে প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশী। লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, তরুণ সান্যাল, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, অলোক রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, এবং আরো অনেকে।

বৈকুণ্ঠের খাতা

দশক ভাগের বিড়ম্বনা ও ষাটের দশক

বিশ শতকের আরেকটা দশক শেষ হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটায়। শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের পয়লা জানুয়ারী। ইংরেজী 'সিক্সটিজ'-এর অনুসরণে আমরা এ সময়টার নাম দিয়েছি ষাটের দশক। এখন আমরা সত্তরের দশকের বাসিন্দা।

এবার পেছন ফিরে তাকাতে হবে। নিতে হবে সাহিত্যের অডিট-রিপোর্ট। হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, কি পেলাম। কেউ বলবেন: বিদ্রোহের ও প্রতিবাদের যুগ। কেউ বলবেন: সংশয়ের ও সন্দেহের। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসবেন অনেকেই। তৃতীয় পক্ষে দাঁড়াবার লোকও কম নয়। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন: মূল্যায়ন করে দেখতে হবে কোন্ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হবে ষাটের দশক?

কিন্তু বিচারের ভারটা মহাকালের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না কেউ। যেমন তেমন একজন বিচারক হলেও আপত্তি নেই। তড়িঘড়ি করে একটা রায় ঘোষণা দরকার: কি হলো, আর কি হলো না। এবং বিচারটা দেওয়ানী আদালতে নয়, ফৌজদারী ব্যবস্থায় হলেই ভালো।

মুশকিল হয়েছে এখানেই। আমি 'মূল্যায়ন' বলতে যা বুঝি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাও যে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। না হলে, জাতীয় আয়-ব্যয়ের মতো সাহিত্যের সালতামামি করা যেতো অনায়াসেই। বলা যেতো, এই মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এবং কি ব্যালান্স রইলো এই দশকের শেষে।

বছরখানেক আগে জনৈক বন্ধুকে বলেছিলাম: ষাটের দশকের ওপর একটা প্রবন্ধ লিখুন। দেখা যাক কে কি লিখেছেন?

ভদ্রলোক সোজা উত্তর দিলেন: সাহিত্যের আবার দশকওয়ারী হিসেব কি? নতুন ধরনের কোনো আন্দোলন হলে, তার ওপরে তর্ক-বিতর্ক করা যায়, কিংবা একটা পরিবর্তন থেকে আরেকটা পরিবর্তন পর্যন্ত সাধারণ আলোচনা করা চলে। আমি এভাবে সময় মেপে আলোচনার পক্ষপাতী নই। কেন না, সাহিত্য ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে চলে না।

বললাম: সময়ের চৌহদ্দীটাকে অস্বীকার করি কি করে? সাহিত্য সময়ের মুখাপেক্ষী নয়?

চমকপ্রদ শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর। বললেন: সময়কে অস্বীকার করতে কে বলছে? সাহিত্যের ওপরে যদি তার ছায়া পড়ে, তা হলে নিশ্চয়ই আলোচনা দরকার। আমি বলেছি, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেলেই সাহিত্যের কাঁটা ঘোরে না। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যা লেখা হলো, ১৯৬০ সালের সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান আমি স্বীকার করি না। অথচ দশকের হিসেব মানলে ব্যবধানটা স্বীকার করে নিতে হয়।

জলে-ডোবা মানুষের মতো আমি বললাম: তবুও এটাই রীতি। সাহিত্যের বিচারটা এখন এভাবেই চলে আসছে। যুক্তি তর্কে পারবো না জানি। আপনি না লিখলে অনেকে আলোচিত হতে থেকে যাবেন।

ঠাট্টা করে বললেন: পাঁচসালা দশসালা পরিকল্পনার মতো সাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে নিলে কেমন হয়? এজন্যে দরকার হবে, উচ্চ পর্যায়ের একটা কমিটি গঠন। এই কমিটির সদস্যরা ঠিক করে দেবেন, পরের দশকে কি [illegible] গল্প, কবিতা, উপন্যাস, রম্য [illegible] লেখা হবে এবং কারা কারা লিখবেন। লেখার বিষয়, লেখকের নাম, শব্দ, পংক্তি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা—সবই পূর্বাহ্নে ঠিক করে দিতে হবে। সুপারভাইজার হিসেবে থাকবেন আমাদের মতো দু-চারজন সমালোচক। তাঁরা মাঝে মাঝে সাহিত্যের বাজারটা ঘুরে ঘুরে দেখবেন, পত্র-পত্রিকা ঘাঁটবেন, আর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাবেন, কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, কোনো কবি সাহিত্যিক আশানুরূপ লিখে উঠতে পারছেন কি পারছেন না ইত্যাদি। তা হলে, দশকের শেষে চট করে এমন একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলা যায়, যা সর্ববাদিসম্মত বলে গৃহীত হতে পারে।

হেসে বললাম: এমন একটা প্রস্তাব কার্যকরী হলে মন্দ হয় না। আপনার উদ্ভাবনী শক্তিকে অন্তত তারিফ করার জন্য একটা সভা ডাকা দরকার। সিরিয়াসলি বলছি, আমারও বিশ্বাস এযুগে সাহিত্যের

বিচার চলে না, মোটামুটি আলোচনা করা যায়।

দশকের বিড়ম্বনা

কিন্তু আলোচনাটা করবো কাদের নিয়ে? আগে ঠিক করা দরকার কে কোন্ দশকের কবি কিংবা সাহিত্যিক। যেহেতু রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের মতো কবি-সাহিত্যিকদের কোনো আইনানুমোদিত তালিকা নেই, সেইহেতু সমালোচকের অসুবিধাটা আরো দুস্তর। সকলের ক্ষেত্রে না হলেও কাউকে কাউকে নিয়ে পড়তে হয় দারুণ বিপদে। প্রত্যেক দশকের মতোই ষাটের দশকেও এমন কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা স্বেচ্ছায় চিহ্নিত হতে না চাইলে দশকের অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা জাগে। যেমন, ধরা যাক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নাম। কলকাতার পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সিরাজের ঘনিষ্ঠতা ষাটের গোড়ার দিক থেকে। তার আগে তিনি কলকাতার পাঠকমহলে অপরিচিত। অথচ লিখছেন তো কম দিন নয়! তাঁর 'কিংবদন্তীর নায়ক' এই সেদিন বেরোলেও রচনাকাল এক দশক আগেকার। যখন সিরাজের বয়স, বন্ধু-বান্ধব ও সতীর্থদের কথা ভাবি, তখন কিছুতেই তাঁকে ষাটের অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছে হয় না। প্রচার, প্রতিষ্ঠার দিকে তাকালে অবশ্যই ষাটের। রচনা বৈশিষ্ট্যে প্রবীণের দলভুক্ত।

এজন্যেই প্রশ্ন জাগে: ষাটের কবি-সাহিত্যিক কারা? কোন্ মানদণ্ডে বিচার করতে হবে, কে ষাটের অন্তর্ভুক্ত, কে বহির্ভূত? কোনো সংকলন সম্পাদনার সময় এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে, নিরিখটা বয়সের হবে, না প্রতিষ্ঠার? প্রথম প্রকাশিত রচনার ভিত্তিতেও তা করা যায়। কিন্তু সে লেখক যদি কোনো দশকের শেষের দিকে লেখা শুরু করেন, এবং সেই দশকে যথেষ্ট পরিচিতি না পান, তা হলে তো তাঁর দুর্দশার অন্ত থাকে না। পরের দশক তাঁকে ফেলেন প্রবীণের দলে, আগের দশক মনে করেন নেহাৎ-ই নবীন। সোজা কথায় ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলে থাকেন তিনি।

ষাটের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে একজন কবির নাম মনে পড়ে। ভদ্রলোক লেখা সুরু করেছিলেন মধ্য পঞ্চাশে। প্রায় সব পত্র-পত্রিকাতেই লিখেছেন তিনি। থাকেন কলকাতার বাইরে। বছরখানেক আগে তিনি দুঃখ করে বলেন: আমাকে কেউ পাত্তা দেয় না এখন। পঞ্চাশের সংকলনে আমার জায়গা হয়নি। ষাটের সংকলনেও নেই। যদিও আমি নিজেকে বারবার ষাটের কবি বলে স্বীকার করছি।

জনপ্রিয় কবি সাহিত্যিকদের এরকম সংকটে পড়তে হয় না। উভয় দশকের সংকলন-কর্তারা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে বর্তে যান। প্রকাশিত সংকলনের চাহিদা বাড়ে। কেউ বয়সের নিরিখে, কেউ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের জায়গা ছেড়ে দেন উভয় সংকলনে। এমন ঘটনা অবশ্য ঘটে কালে-ভদ্রে। কিন্তু উপেক্ষার অভিযোগটা সর্বজনীন।

সাহিত্যে জনপ্রিয়তা একটা দুর্লভ বস্তু! সমকালে ভীড় হয় মিডিওকার কবি সাহিত্যিকদের। তাঁরা নিজের খেয়ালে লেখেন। সংখ্যাতেও হয়তো কম নয়। কিন্তু নজরে পড়েন না কারো। তাঁরা প্রায়শ দশক-উপেক্ষিত, দশক-বিড়ম্বিত এবং অনালোচিত। কে তাঁদের নাম মনে রাখছে? কি তাঁদের অতীত? কি তাঁদের ভবিষ্যৎ? বিষয়টা সকলেই একবার ভেবে দেখতে পারেন।

অমনোযোগী পাঠক

এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে সবার আগে মনে পড়ে, লেখক নয়, পাঠকের কথা। কেননা, পাঠকের আগ্রহ-ই লেখককে উৎসাহিত করে সবচেয়ে বেশী। তাঁদের উপেক্ষা বড় মর্মান্তিক। একজন কবি সাধারণত অপর কবির কবিতা পড়েন না। কেউ বলেন, কি হবে পড়ে? কবিতা লিখতে জানে আর কজন? অনেকে মনে করেন, নিজের কবিতা ছাড়া বাকি সবই বাজে।

মূল ব্যাপারটা হলো, অশ্রদ্ধা। কবিতাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসার অভাব। আবেগে, উত্তেজনায়, রাগে, বিরাগে, অভিমানে ও ক্রুদ্ধতায়—সকলেই স্বয়ংধৃত। স্বভাবতই অন্যের প্রতি অনীহা একটি সাধারণ লক্ষণ।

ষাটের জনৈক কবিকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম: কার কার কবিতা আপনার ভালো লাগে?

কবি উত্তর দিলেন: পত্র-পত্রিকার সূচীপত্র পড়ি, কবিতা পড়ি না। বন্ধু-বান্ধবরা লেখেন, আমি আড্ডায় বসে মাঝে মাঝে শুনি। বই উপহার পেলে আল-মারীতে সাজিয়ে রাখি, ভালো না লাগলে ওজন করে বেচে দিই।

এই সহজ নিরাভরণ উত্তরে দুঃখ করা যায়, রাগ করা যায় না। কবিতা এখনো পাঠকের কাছাকাছি হতে পারেনি। বড় বড় কাগজে কবিতা বেরোয়, কিন্তু অনেক পাঠক তাকে অঙ্গসজ্জার বিষয় বলে গণ্য করেন। সাধারণ পাঠক পড়েন গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, ফিচার প্রভৃতি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক

কবিতার অন্তর্মুখী বেদনাকে উপলব্ধি করার সহজ পদ্ধতি বোধহয় এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

গল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা। গল্পের চেয়ে প্রবন্ধের পাঠক সংখ্যা বেশী। নতুন ধারা বা নতুন রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক গল্প এখনো পাঠক সমাজে অচল। বোধহয়, কাঠামোর বৈচিত্র্য, লেখকের নিঃসঙ্গতা ও প্রতীকের ব্যবহার পাঠকের বোধগম্যতাকে যথেষ্ট আলোড়িত করতে পারছে না। লিটল ম্যাগাজিনের এলাকা ছাড়িয়ে বড় কাগজের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা কিংবা পপুলারিটির জন্যে প্রাণান্ত-কর প্রয়াস করেন না অনেকেই। পাঠক তাঁদের ব্যাপারে অকৌতূহলী, সমালোচক সন্দিগ্ধ। ফলে, অবস্থাটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা হলো কফি হাউস ও কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা লেখেন, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবরাই শেষ পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম লেখার বাধ্যতামূলক পাঠক। কেউ পড়েন হুজুগে পড়ে। মনোযোগটা তাঁদের দিকে নয়, সহজবোধ্য গল্প ও আবেগধর্মী কাহিনীর দিকে।

সেজন্যেই সমস্যা দাঁড়িয়েছে, পাঠককে কিভাবে নিজের দিকে টানা যায়? এ সময়ের মধ্যে বেরিয়েছে গল্পের নানারকম পত্রিকা, কবিতার দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, ঘটিকী ইত্যাদি। বোধহয় টেলিগ্রামও বেরিয়েছিল একটা। পাঠক তাতে খবরে আনন্দ পেয়েছিল, কবিতা পাঠে উৎসুক হয়নি। গল্পের বই বিক্রী হয় না বন্ধুবান্ধবদের বাইরে।

পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি

এই দশকের সাহিত্যিকরা মোটামুটি সকলেই সেলফ আইডেনটিফায়েড হওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখার ভেতরে। জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতাকে প্রকাশের যেহেতু কোনো সরল ভাষা নেই, সেহেতু লেখার মধ্যেও ঘটেছে তার অনিবার্য প্রতিফলন। প্রায় সকলেই ক্ষত-বিক্ষত, আত্মকেন্দ্রিক এবং কখনো কখনো গোষ্ঠীবদ্ধ। অতীত এবং অন্যকে অস্বীকার করার একটা প্রচণ্ড অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায় অনেকের মধ্যেই।

পঞ্চাশের জনপ্রিয় একজন লেখক আমাকে বলেছিলেন, ষাটের লেখকরা দুর্বিনীত, ক্ষমতাহীন এবং রাগী মেজাজের। কোনো রকম শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে লেখা শুরু করেনি। আমাদের তো উড়িয়েই দিতে চায়।

আমি বিরোধিতা করে বলেছিলাম: আপনারাও তো উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন চল্লিশের উত্তরাধিকারকে। এটা তো যে-কোনো কালের তরুণদের ধর্ম। গতকালের বিদ্রোহী যুবক, একালের প্রবীণ প্রৌঢ়ে পরিণত হয়েছে। আপনি এখন সেই পুরনো স্বভাবকে অস্বীকার করতে চাইলে চলবে কেন?

ভদ্রলোক বিষণ্ণ হয়ে বলেন: তা হলেও ওঁদের সম্পর্কে আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। ওরা গত এক দশকে কিছুই লেখেনি, লিখতে জানে না।

এই বিরোধ চিরকালের। ভয় পাবার কিছু নেই। আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ষাটের উল্লেখযোগ্য কবি ও গল্পকারের সংখ্যা তেমন কিছু বেশী নয়। অনেকে অপরিণত। আত্মপ্রচারের জন্য তাঁরা কখনো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন। পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং বনিবনার অভাবে গোষ্ঠী ছেড়েছেন। নিজেদের মধ্যে সাময়িক আলাপ-আলোচনা, গল্প কবিতা পাঠ ছাড়া তেমন কিছু বড় কাজ হয়েছে বলে চট করে বলা যায় না। কেউ কেউ নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়ে পত্রিকায় ছাপিয়েছেন। তাতেও কারো তেমন গৌরব বৃদ্ধি হয়নি।

তার মূল কারণটা, এমনো হতে পারে যে, লেখক নিজে এবং তাঁর সমালোচকের বাইরে সেই সব মতামতকে পাঠক বেশী আমল দেননি। গোষ্ঠীভুক্ত একজন লেখকের লেখা যতখানি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে, গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্যজনের লেখা ততখানি উপেক্ষিত হয়েছে। এমন কি একই লেখক গোষ্ঠীভুক্ত থাকার সময় যে মতামত পোষণ করেছেন, ভিন্ন গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে তিনিই হয়তো সেই মতামতকে প্রত্যাহার করে বিরূপ মন্তব্য করতে কসুর করেননি।

অর্থাৎ সমালোচনার চেয়ে আত্মপ্রচারই হয়েছে বেশী। প্রায়ই দেখা গেছে, একই বই চূড়ান্তভাবে নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত হয়েছে। কেউ লিখেছেন: অপূর্ব, অসাধারণ। কেউবা লিখেছেন: কিছুই হয়নি। এই বিপরীত সিদ্ধান্তের কারণ লেখা নয়, লেখকের সঙ্গে পত্রিকা এবং সমালোচকের সম্পর্কের স্বাভাবিকতা কিংবা তিক্ততা।

ষাটের দশকে কবি-সম্মেলন হয়েছে অনেকগুলি। কিন্তু প্রায়শ দেখা গেছে, সকলেই নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ উপস্থিত হয়েছেন, কেউ হননি। শ্রোতার সংখ্যার চেয়ে কবির সংখ্যা প্রায় সব-ক্ষেত্রেই বেশী। নিজের কবিতা পড়ার পর সভাগৃহে উপস্থিত থাকার মতো ধৈর্য দেখা গেছে খুব কম জনেরই।

এই অসহিষ্ণুতা চিরকালই বিপজ্জনক। ষাটের দশক তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

অথচ গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রবণতাটা কেবল ষাটের দশকের নয়, পঞ্চাশেরও। তিরিশ-চল্লিশেও অনুরূপ প্রবণতা ছিল। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে হোক, গল্প সম্পর্কে হোক, একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল অনেকের। কেউ ভালো গল্প কিংবা কবিতা লিখলে, তাকে অভিনন্দন জানাবার মতো সমবয়সীর অভাব হতো না। ষাটে নাকি এ ব্যাপারটা একেবারেই নেই। নিন্দুকের প্রচার কিনা জানি না। সত্য হলে, দুর্ভাবনার কারণ আছে। কেননা, মতান্তর হওয়া সম্ভব ও মনান্তর মারাত্মক। শিল্পের বিরোধের চেয়ে ব্যক্তির বিবাদটাই তার প্রধান উৎস।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে খোলা মন নিয়ে এগোনোই তো উচিত। তাই না?

—গ্রন্থদর্শী

রুশদেশে সংস্কৃতিচর্চা ও অন্যান্য

চিন্মোহন সেহানবীশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলাম দ্বিতীয় ফ্লোরটি থেকে। প্রতি ঘরে ঐ তরুণ পরিদর্শয়িত্রীদের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিদর্শয়িত্রী') ঘিরে দেখলাম ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ সৈনিকদের ভীড়। তারা ছবি দেখছে, খাতায় 'নোট' করছে আর অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জর করছে ঐ পরিদর্শয়িত্রীদের। বোধ হল সব কিছু এখনই জেনে বুঝে নেবে এই ওদের পণ। কেউ কেউ আবার একা বসে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রয়েছে একটি ছবির দিকে। আবার মনে পড়ে গেল কবির কথা :

'১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এই-রকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা ছুতোরমিস্ত্রী, লোহার, মুদি, দরজি ইত্যাদি। তার আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী-সম্প্রদায়।' আবার আর এক ক্ষেত্রের কথাও :

'আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রিসারেক্শন। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনেছিল। অ্যাংলো স্যাকসন চাষী-মজুরশ্রেণীর লোকে এ-জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ করছে এ-কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।'

লেনিন বলেছিলেন আর্টের ক্ষেত্রে নতুন নতুন যে সব মতও গজিয়ে উঠছে তার মর্ম আমি বুঝি না। কিন্তু একটা সোজা কথা বুঝি : Art must go to the People তারই সাধনা প্রত্যক্ষ করে কবির মতো আমিও মুগ্ধ হলাম এবার 'ত্রেতিয়াকভ' দেখতে গিয়ে।

মস্কো থেকে ওদের বিখ্যাত রেড অ্যারো ট্রেনে ১ ডিসেম্বর সকালে পৌঁছলাম লেনিনগ্রাডে। লেনিনগ্রাড আমার চোখে বরাবরই অপরূপ। তবে এ দফায় এখানে আমার মেয়াদ চল্লিশ ঘণ্টার কম। তাই স্থির করেছিলাম এবার আর তার রূপে ভুলে পথে পথে ঘুরে বেড়াব না অন্যবারের মতো, নইলে যে কাজে এখানে আসা সে-কাজ না সেরেই ফিরে যাব মস্কোয়। তবে চোখকান তো আর বন্ধ রাখা যায় না একেবারে, তাই এরই মধ্যে গাড়ি চড়ে যেতে যেতেও মাঝে মাঝে ধরা দিয়েছি লেনিনগ্রাডের মায়াজালে। উইন্টার প্যালেসে'র সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার গেলেও ঢুকিনি বটে 'হার্মিতাজে' তবু গাড়ি থামিয়ে ব্রিজের উপর থেকে দেখেছি নেভার দু' পারের দৃশ্য আর ঝিরঝিরে তুষারপাতের মধ্যে পায়ে হেঁটে কিছুটা ঘুরেছি নেভস্কি প্রসপেক্টের জাঁকজমক আর দোকানপাটের জৌলুষ দেখতে দেখতে।
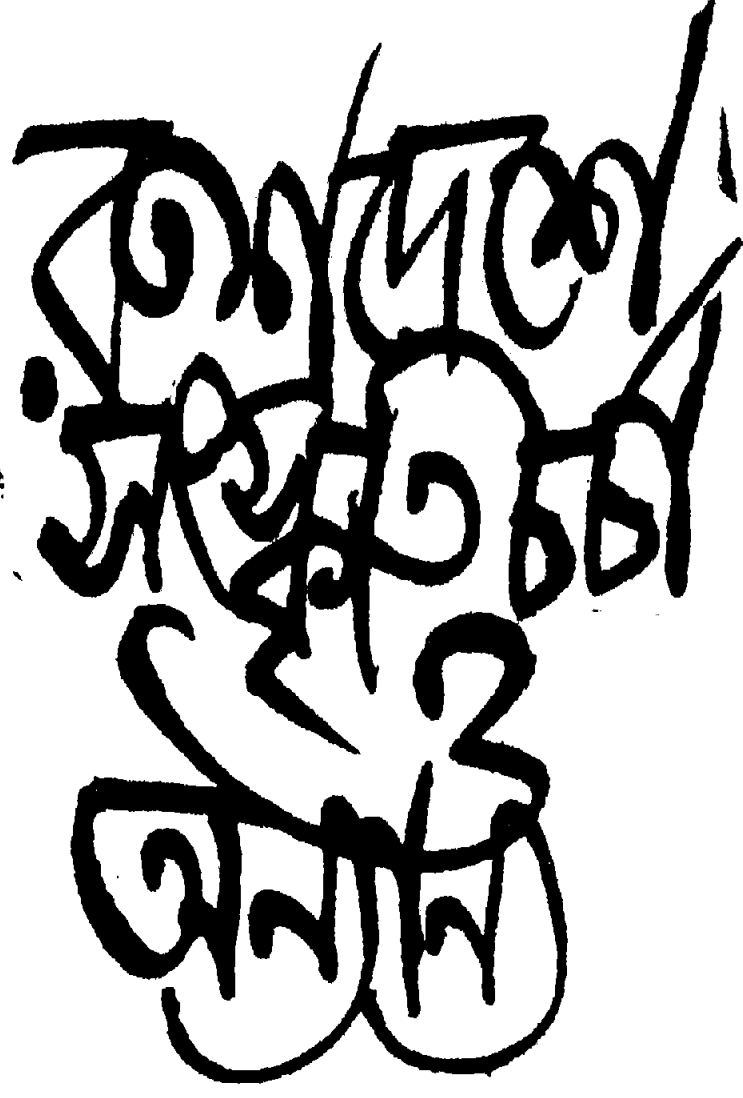
যাই হোক যে কারণে এখানে আসা তারই জন্য প্রথমেই যেতে হল সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির পরিচালনাধীন 'ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এর লেনিনগ্রাড শাখার দপ্তরে। সেখানে ঢুকে যখন কালিয়ানভের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম তখন ইনস্টিটিউটের যে দুজন কর্মকর্তা আমার তত্ত্বাবধান করছিলেন (ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক, শ্রীযুক্ত এভগেনি কিচানভ ও ইনস্টিটিউটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের বৈজ্ঞানিক সম্পাদিকা, শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা ত্রেভিয়াকোভা) তাঁরা বা আমার দোভাষী সঙ্গীরা কেউই অবাক হননি। কারণ কালিয়ানভ যে মহাভারতের রুশ তর্জমা করছেন মূল সংস্কৃত থেকে তা অনেকেই জানেন আর ভারতীয় হিসেবে আমার পক্ষে সে খবর রাখা তো মোটেই বিচিত্র নয়। 'কিন্তু কালিয়ানভের জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন আমি বেশ অসংশয়ে ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি থেকে গেরাসিম লেবেদেভের বাংলা পাটীগণিতের পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলাম তখন তাঁরা একটু চমকেই গেলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন ঐ পাণ্ডুলিপি যে এখানে আছে তা আমি জানলাম কি করে। ইতিমধ্যে কালিয়ানভ এসে উপস্থিত। আমি তখন কিঞ্চিৎ নাটকীয়ভাবেই তাঁদের জানালাম যে আগে সে পাণ্ডুলিপি আমি এখানে দেখে গেছি আর সেদিনও আসরে হাজির ছিলেন কালিয়ানভ। আর ছিলেন শচীন সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো দু'চারজন। কালিয়ানভকে মনে পড়িয়ে দিলাম যে শচীনদা সেদিন ঐ পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি বাঙালী নাট্যকার সেদিন তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এখানে ব্যক্ত করেছিলেন দু'চার কথায় যা টেপ রেকর্ড করে পরে ছড়ানো হয়েছিল মস্কো বেতারকেন্দ্র মারফৎ। কালিয়ানভকে জানালাম, যে শচীনদাকে আমরা হারিয়েছি বেশ কয়েক বছর হল।

এর পর আলাপ জমে উঠতে যে আর দেরী হয়নি তা বলাই বাহুল্য। কালিয়ানভ কথা বলতে ভালোবাসেন খুব। প্রবল উৎসাহভরে তিনি বলে চললেন তাঁর মহাভারতের অনুবাদের কাহিনী। আদি পর্ব শেষ হয় (স্মির্নভের সহযোগিতায়) ১৯৫০ সনে, সভা ও বিরাট পর্ব যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সনে আর উদ্যোগ পর্বের তর্জমা তিনি এখন মাজাঘষা করছেন, আশা করছেন সেটি প্রকাশ করা যাবে ১৯৭২ নাগাদ। ইতিমধ্যে তাঁর ছাত্রী, সভেৎলানা নোভিকোভা বন পর্বের এক অংশ অনুবাদ শেষ করেছেন ও সেটিকে পাঠানো হয়েছে ছাপাখানায়। আর তাঁর ছাত্রের ছাত্র (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যাদের বলতেন—Grand-pupil) ভ্যাসিলকেভ কাজ করছেন অন্য অংশটি নিয়ে। কালিয়ানভ জানালেন জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণণ ও ইন্দিরা সকলেই সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন তাঁর কাজের।

ইতিমধ্যে গেরাসিম লেবেদেভের (১৭৪৬-১৮১৭) পাণ্ডুলিপি এসে হাজির। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮০৫ সনে রুশ ভাষায় প্রকাশিত তাঁর 'পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কয়েকটি নিরপেক্ষ মন্তব্য' গ্রন্থের ভূমিকায় লেবেদেভ তাঁর জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছেন তাতে তিনি তাঁর বাংলা শেখার প্রসঙ্গে বলেছেন :

'আমি একটি ছোট্ট অথচ কাজে লাগে এমন অভিধান তর্জমা করি আর রচনা করি বেশ কিছু সংলাপ ও পঞ্জিকার একটি অংশ (তিন মাসের) যার থেকে পাটিগণিতের প্রাথমিক চারটি প্রক্রিয়া সমেত অনেক কিছু জানা যায়। হিন্দুস্তানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভারতচন্দ্রের...কবিতার কিছু কিছু অংশও আমি বই থেকে তর্জমা করি...।

'বাস্তব অবস্থার সমালোচনার প্রয়োজন-বোধে আমি দুটি ইংরেজী কমেডী—একটি 'Disguise' ও অন্যটি Love is the best doctor' বাংলায় তর্জমা করতে অগ্রসর হই...। বাংলা শব্দগুলির নিচে আমি রুশ ভাষায় তার অর্থ ও উচ্চারণ লিখে রাখি।'

ঐ ভূমিকারই আর এক জায়গায় লেবেদেভ বলেছেন যে তিনি নামকরা পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে এখানকার বর্ণমালা, অভিধান, ব্যাকরণ, পাটিগণিত, পঞ্জিকা প্রভৃতির পাঠ নিয়েছিলেন। বোধ হয় তাঁর এই পাটীগণিতের (এখানে তার একটি পৃষ্ঠা ছাপা হল) পাণ্ডুলিপি (তাঁর বাংলা ব্যাকরণেরও একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে) তারই ফল। এখানেও লক্ষণীয় বাংলা শব্দগুলির নিচে রুশ ভাষায় তার উচ্চারণ ও অর্থ লিখে রাখার ব্যবস্থা।

লেবেদেভ এ দেশে প্রথম বাংলা থিয়েটারের পত্তন করেন ১৭৯৫ সনে। কলকাতার ২৫নং ডুমতলায় (এখন এজরা

লেবেডেভের হাতে লেখা পাটিগণিতের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

তিন আটে চব্বিশ ২৪। চারি আটে বত্রিশ ৩২। পাঁচ আটে চাল্লিশ ৪০।
ছয় আটে আটচল্লিশ ৪৮। সাত আটে ছেপ্পান্ন ৫৬। আট আটে চৌষট্টি ৬৪।
আট নয় বাহাত্তর ৭২। আট দশে আশী ৮০॥ — একুনে নয় ৯।
নয় দুগুণে আঠারো ১৮। তিন নয় ২৭। চারি নয় ছত্রিশ ৩৬।
পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ ৪৫। ছয় নয় চৌয়ান্ন ৫৪। সাত নয় তেষট্টি ৬৩।
আট নয় বাহাত্তর ৭২। নয় নয় একাশী ৮১। নয় দশে নব্বই ৯০॥
দুগুণে দশ ১০। দশ দুগুণে কুড়ি ২০। তিন দশে ত্রিশ ৩০।
চারি দশে চল্লিশ ৪০। পাঁচ দশে পঞ্চাশ ৫০। ছয় দশে ষাইট ৬০।
সাত দশে সত্তর ৭০। আট দশে আশী ৮০। নয় দশে নব্বই ৯০। দশ দশে শত ১০০।
এগারকে এগারো ১১। এগার দুগুণে বাইশ ২২। তিন এগার তেত্রিশ ৩৩
চারি এগার চোয়াল্লিশ ৪৪। পাঁচ এগার পঞ্চান্ন ৫৫। ছয় এগার ছেষট্টি ৬৬।
সাত এগার সাতাত্তর ৭৭। আট এগার অষ্টআশী ৮৮। নয় এগার
নিরানব্বই ৯৯। এগার দশে একশত দশ ১১০॥ — বারকে বারো ১২।
বার দুগুণে চব্বিশ ২৪। তিন বারো ছত্রিশ ৩৬। চারি বার আটচল্লিশ ৪৮।
পাঁচ বার ষাইট ৬০। ছয় বার বাহাত্তর ৭২। সাত বার চৌরাশী ৮৪।

স্ত্রীট) নিজের খরচে ও পরিশ্রমে তিনি খাড়া করেন এক রঙ্গমঞ্চ আর তারপর বাঙালী পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তায় উপরে উল্লিখিত ইংরেজী প্রহসন দুটিকে তর্জমা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন সেই মঞ্চে। এও উল্লেখযোগ্য যে এ দেশে এই প্রথম তিনি স্ত্রী ভূমিকায় নামালেন এ দেশের মেয়েদের। কিন্তু তাঁর ভাষায় :

'আমি যখন অত কাণ্ড করছিলাম তখন একথা চিন্তা বা কল্পনাও করিনি যে ব্যবসায়ীদের রাজত্বে, পয়সার কাঙাল থিয়েটারী লোকদের উপরে সোনার চাকচিক্য, এমন কি রক্তের ছোপ-লাগা রুপোর চাকচিক্যের প্রভাবের আবহাওয়ায় এ-সবের দরুন জ্বলে উঠবে বিদ্বেষের আগুন, কিছু লোককে তা উদ্দীপন ও প্ররোচিত করবে আমার কুৎসা রটনায়, আমার স্বার্থহানি ঘটাতে আর তার ফলে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ হবে বিদেশীর এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার।'

সর্বস্বান্ত হয়ে মনের দুঃখে লেবেডেভ ইংলণ্ড হয়ে দেশে ফেরেন ১৮০১ সনে। লণ্ডন থেকেই ঐ বছর প্রকাশিত হয় তাঁর 'A Grammar of the Pure and mixed Indian Dialects' । মনে হয় তাঁর ঐ বাংলা পাটীগণিতের (ও বাংলা ব্যাকরণেরও) রচনা এর আগে—সম্ভবত তাঁর ভারত ত্যাগেরও আগে।

গেরাসিম লেবেদেভ ছিলেন মুখ্যত কাজের মানুষ। তবে এ দেশে আসার আগে তাঁর সখ ছিল সঙ্গীতের। মনে হয় তারই সূত্রে পরে উদ্ভব হয় তাঁর অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ সংশ্লিষ্ট আগ্রহের। তবু এই সব আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনকথায় লিখেছিলেন :

'বাংলা, হিন্দুস্থানের সাধারণ মিশ্র ভাষাগুলি ও যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম যাতে এ-কথা মানুষকে বোঝানো ও জোর করে বলা যায় যে হিন্দুস্থানের মতো দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আমার মতো যাঁরা পর্যটন করেন তাঁরা যদি এ-সব না জানেন শোনেন তা হলে খুব বেশি দূর এগোনো যাবে না আর বিভিন্ন সময়ে যে-সব বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বসবাস করেছেন তাঁদের সঠিক খবরও জানা যাবে না (সভাপতি স্যর উইলিয়াম জোনসের প্রত্যাশা অনুযায়ী। জোনস নি[illegible] কি [illegible] গেছেন তা জানা যাবে দিনে [illegible]।'

'সভাপতি' অর্থাৎ [illegible]৪ সনে প্রতিষ্ঠিত এখানকার 'এ[illegible]ক সোসাইটি'র সভাপতি। উইলিয়[illegible] জোনসের এই উল্লেখ ও ঐ উদ্ধৃত [illegible] বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে লে[illegible] শেষ পর্যন্ত নিছক 'কাজের মানুষই' থেকে যাননি। এ দেশের ভাষা, ব্যাকরণ, পাটীগণিত, পঞ্জিকা, সাহিত্য ও রীতিনীতি বিষয়ে রুশ ভাষায় কিছুটা অনুশীলনের সূত্রপাত করেন তিনিই। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ সঙ্গতভাবেই তাঁর পরিচয় রাশিয়ায় ভারত-বিদ্যার আদিপুরুষ হিসেবে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা আগের প্রবন্ধে লিখেছি। চেকোশ্লোভাকিয়ার মতোই রাশিয়ারও ভারত সম্পর্কে আগ্রহ বহু-কালের। তবে শুধু রাশিয়া না ধরে যদি গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ধরা যায় তা হলে সে আগ্রহ মেটাবার মতো দু দেশের সরাসরি যোগাযোগের ইতিহাস চেক-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসের চাইতে অনেক প্রাচীন। কারণ আজকের সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয় খৃস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণদের সময়ে। সারা মধ্য এশিয়া জুড়ে দেখতে দেখতে ঘটে তার আশ্চর্য বিস্তার। পরে ৭ থেকে ৯ম শতকে ইসলামের চাপে বহুলাংশে নিষ্প্রভ হলেও আবার মধ্য এশিয়ার কোন কোন জায়গায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানও দেখা যায় অল্পবিস্তর। এমন কি আজো সোভিয়েত ইউনিয়নে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব কম নয়। মধ্য এশিয়া ও কুষাণ-

দের নিয়ে এখন জোর গবেষণা চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে।

এর আগে চেকোস্লোভাকিয়ার মতোই রাশিয়ায়ও পেশছেছিল আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনী কিঞ্চিৎ পল্লবিত আকারেই। তার সংগে যুক্ত হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের সংগে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সাক্ষাতের এক কাল্পনিক বৃত্তান্ত। বুদ্ধ-চরিতও পেশছেছিল খৃস্টানীবেশে। রাশিয়াতেও পনেরো শতকে তর্জমা হয়েছিল পঞ্চতন্ত্রের কোন কোন গল্পের। আর নভ্গোরদের ব্যবসাকেন্দ্র থেকে হয়তো এর কিছু আগেই উদ্ভব হয়েছিল 'সাদকো' নামে এক 'বীলিনী' বা বীরগাথার যার বিষয়বস্তু হল তরুণ এক রুশ 'বয়ার' বা ব্যবসায়ীর আশ্চর্য দেশ, ভারতবর্ষে পাড়ি দেবার তীব্র কামনা ও ভারতযাত্রার এক কাল্পনিক কাহিনী। মনে পড়ে ১৯৫৫ সনে লেনিনগ্রাডের রঙ্গমঞ্চে দেখেছিলাম 'সাদকো'র এক সার্থক অপেরা-রূপায়ন।

পনেরো শতকে তাই ৎভের শহরের এক বণিক, আফানাসি নিকিতিন যখন সমরকন্দ বাকু দিয়ে স্থলপথে পারস্য হয়ে ভারতবর্ষে পেশছলেন তখন তিনি যেন এলেন সেই কল্পকথারই বাস্তব নায়ক হিসেবে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত—'তিন সাগরের পারে'তে তিনি রুশদের শোনালেন ভারতবর্ষের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার কাহিনী। অন্যদিকে ভারতবর্ষ থেকেও যে ব্যবসায়ী বা তীর্থযাত্রী সাধু-সন্যাসী নভ্গোরদ বা ঐ সব অঞ্চলে যাতায়াত করতেন ব্যবসা অথবা ধর্মের টানে, তারও কিছু-কিছু খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের কেউ-কেউ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। এমন কথাও শোনা যায়।

উনিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকেই রাশিয়ার সব থেকে প্রভাবশালী চিন্তানায়কেরা সকলেই ভরতবর্ষের মতো সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশের উপরে বৃটিশ শাসন-শোষণের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। এ'দের মধ্যে ছিলেন নভিকভ, র্যাডিশেভ, হার্জেন, চার্নিশেভস্কি, ডুব্রোলিউবভ, বেলিনস্কির মতো প্রথিতযশা ব্যক্তি। এ'দের মধ্যে কারও-কারও আবার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল গোড়ার যুগের রুশ সংস্কৃতজ্ঞদের সংগে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের যুক্তিকে আরও অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন মানুষের মনে।

তবে বিদ্যার এক বিশিষ্ট অঙ্গ ও পরম্পরাবাহিক অনুশীলনের বিষয় হিসেবে ভারততত্ত্বের চর্চা রাশিয়ায় সত্যই শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। গোড়ায় শুরু হল সংস্কৃত ভাষায় চর্চা। তবে অনতিবিলম্বে ভারত-তত্ত্বের যে দিকটির দিকে পণ্ডিতদের নজর গেল সেটি হল বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শন। এর কারণ অনুমান করা চলে। রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতির দরুণ সম্ভবত প্রথম থেকেই তাঁদের কৌতূহল এদিকে যায়।

সে যাই হোক সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে এই সূত্রে পরের পর আবির্ভাব হল চারজন বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের : ভ্যাসিলি পাভলোভিচ ভাসিলিয়েভ (১৮১৮—১৯০০), তাঁর কৃতী ছাত্র, আইভান পাভলোভিচ মিনায়েভ (১৮৪০—১৮৯০), ঐ দুজনারই ছাত্র, সেগেই ফিওদোরোভিচ ওল্ডেনবুর্গ (১৮৬৩—১৯৩৪) এবং মিনায়েভ ও ওল্ডেনবুর্গের ছাত্র, ফিওদর ইপ্পোলিতোভিচ্। শ্চের্বাৎস্কই (১৮৬৬—১৯৪২)। ইউরি রোরেরিখের নামও করা চলে এ প্রসংগে।

এ'রা প্রত্যেকেই এক-একজন দিকপাল। এ'দের মধ্যে মিনায়েভ ও শ্চের্বাৎস্কই ভারতে এসেছিলেন। মিনায়েভ এসেছিলেন তিনবার। তৃতীয়বার ১৮৮৫-৮৬ সন তিনি কলকাতায় তিন সপ্তাহ কাটান আর যাঁদের সংগে দেখা করেন তার মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ সি ব্যানার্জি) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র নাম স্বাক্ষর করে তাঁর যে বইগুলি মিনায়েভকে উপহার দিয়েছিলেন সেগুলি এখন রয়েছে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের হেফাজতে। বোম্বাইতে ভাণ্ডারকার এবং কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙের সংগে এঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

শ্চের্বাৎস্কই ভারতে এসে পাঠ নিয়েছিলেন বারাণসী ও পুনায় পণ্ডিতদের কাছে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিশালতার সম্পর্কে একবার স্বয়ং মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে বলতে শুনেছি যে শ্চের্বাৎস্কই-য়ের শিষ্য হিসাবে তিনি গৌরবান্বিত এবং তাঁর মতে শ্চের্বাৎস্কই হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের পণ্ডিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাশিয়ায় রাহুলজী যে মহিলাকে বিবাহ করেন তিনি ছিলেন শ্চের্বাৎস্কই-য়ের সেক্রেটারী।

ভাসিলিয়েভ, মিনায়েভ, ওল্ডেনবুর্গ ও শ্চেরবাৎস্কই—সকলেরই মুখ্য চর্চা বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন নিয়ে। তবে ভারততত্ত্বের অন্য বিভাগেও এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কাজ করেছেন কিছু কিছু। যেমন মিনায়েভের আগ্রহ ছিল ভারতের ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান ও লোকগাথা সম্পর্কে। আবার তাঁর তিনবার ভারত ভ্রমণ সংক্রান্ত 'ভারতীয় ডায়েরী'তে দেখা যায় ভারতে ইংরাজ শাসন-শোষণের তীব্র সমালোচনা, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ, বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মারাঠী বিদ্রোহী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যাঁকে এডেনে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানেই যাঁর মৃত্যু হয়) দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন এবং বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার উচ্চ প্রশংসা।

ওল্ডেনবুর্গেরও তেমনি অতুল কীর্তি তাঁর 'বিব্লিওথেকে বুদ্ধিকা' গ্রন্থমালার সম্পাদনা হলেও ভাষা-বিজ্ঞান, ভারতীয় লোকগাথা ও লোককাব্য বিষয়েও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া দক্ষ পরিচালক হিসাবেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ১৯০৬-'০৭ সনে তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে যে রুশ-অভিযান প্রেরিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার নায়ক। আবার জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি ছিলেন লেনিনগ্রাডের ওরিয়েন্টাল ইন-স্টিটিউট সংগঠনের প্রধান পরিচালক।

শ্চেরবাৎস্কইও তেমনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হলেও ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাজ করেছেন যথেষ্ট। একদিকে নিজে 'দশকুমার চরিত' ও 'পঞ্চতন্ত্রের' অনুবাদ করেছেন, অন্য দিকে তাঁর শিষ্যবর্গ যখন 'অর্থশাস্ত্র' তর্জমা করছিলেন তখন তাঁদেরও পরিচালনা করেছেন পাঁচ বছর ধরে। আবার ১৯২৪ সনে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও ১৯২৭ সনে ভারতে বস্তুবাদের ইতিহাস বিষয়ে তিনি যে দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন তার গুরুত্বও অপরিসীম। পরম আনন্দের কথা আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মী, শ্রীহরিশচন্দ্র গুপ্ত অশেষ পরিশ্রম করে ঐ দুটি ও শ্চেরবাৎস্কই-য়ের আরো কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ মূল রুশ থেকে ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন এবং সেগুলি সম্প্রতি প্রকাশিতও হয়েছে 'ইন্ডিয়ান স্টাডিজ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে (তাঁরা আর এক তরুণ গবেষক, এন পি এনিকেয়েভের লেখা 'ভারতের প্রাচীন দার্শনিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমান মতাদর্শগত সংগ্রাম' বিষয়ে একটি বইও সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন ইংরেজী ভাষায়)।

শ্চেরবাৎস্কই-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একবার পত্র বিনিময় হয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির ফোটোস্ট্যাটিক প্রতিলিপি কবির জন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত 'সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল।

ওল্ডেনবুর্গ ও শ্চেরবাৎস্কই উভয়েই তাঁদের গবেষক জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি সম্ভবত করে গেছেন সোভিয়েত বিপ্লবের পর। বিপ্লবের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ১৯১৮ সনেই লেনিনের সঙ্গে ওল্ডেনবুর্গের সাক্ষাৎকার। লেনিন তাঁকে বলেন, 'এখন এই ধরুন আপনার সব বিষয়... মনে হতে পারে এ-সব বুঝি খুব দূরের জিনিস; কিন্তু এটা আবার খুব কাছের ব্যাপারও বটে।... জনসাধারণের কাছে যান, শ্রমিকদের কাছে যান, তাদের বলুন ভারত ইতিহাসের কথা, ইংরেজদের দ্বারা নির্যাতিত ও ক্রীতদাসে পরিণত কোটি কোটি হতভাগ্য মানুষের যুগযুগান্তব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। আর তাহলেই দেখবেন তারা কিভাবে সাড়া দেয়। আর আপনিও... তার থেকে পাবেন বিপুল বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ নতুন গবেষণার, কাজকর্ম ও চর্চা চালানোর প্রেরণা' ('সোভিয়েত দেশ' পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৬৯, ২৫ পৃষ্ঠা)।

লেনিনের আহ্বানে যে ওল্ডেনবুর্গ সাড়া দিয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি নিজে এর পর পুরাণো আমলের রুশ বুদ্ধিজীবিদের কাছে বার বার আবেদন জানান সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য। এমন কি শ্চেরবাৎস্কই অভিজাত বংশীয় ও শোনা যায় বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শেষ অবধি বিরূপ হননি সোভিয়েট সরকারের প্রতি। বরং ১৯২২ সনে তিনি লেখেন : '...কোন কিছু প্রকাশ করাই যখন অত কঠিন ছিল আজ প্রায় ছয় বছর পরে যদি একটা সুযোগ এসে থাকে আগের সব পরিকল্পনার অন্তত সামান্য অংশও পূরণের, তাহলে তার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী সেই সব কর্মীরা যাঁরা বহু অসুবিধা ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও দেশত্যাগের চিন্তা করেন নি, সর্বদা বিশ্বাস রেখেছেন দেশের অবশ্যম্ভাবী ও ত্বরান্বিত পুনরুত্থানে আর প্রাণপাত করেছেন ধ্বংস ও সর্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে' (N. P. Anikeev — Modern Ideological Struggle for the ancient Philosophical Heritage of India ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)।

বিপ্লবের পর লেনিনের পরামর্শে সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারততত্ত্বের পরিধি বহু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। প্রথাসিদ্ধ পথে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা আর তার বাহন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত নিয়ে গবেষণা চলতে থাকল—তবে তার পোষকতা চলল আরো দরাজ হাতে—আর তারই পাশাপাশি নতুন করে নজর পড়ল মধ্য, আধুনিক এমন কি সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রতিও এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির দিকেও। দ্বিতীয়ত শুধু বিষয়ের প্রসারই নয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানাবিধ সমস্যা আলোচনায় স্পষ্ট এখন প্রাধান্য লাভ করতে লাগল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি।

এমন নয় যে এ পদ্ধতির খাতিরে ভারতবর্ষের আধুনিক বা সমসাময়িক ইতিহাস নিয়েই শুধু সোভিয়েত পণ্ডিতেরা অতঃপর মাথা ঘামাতে থাকলেন। আদৌ না। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও সমসাময়িক—সব পর্বের সমস্যাকেই দেখা হতে লাগল নতুন ও সামগ্রিক এক অখণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে। অবশ্য এই দৃষ্টি বস্তুবাদী হওয়ার ফলে সমস্যা বিচারে অর্থনৈতিক বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বৈষয়িক উপাদানগুলি প্রাধান্য পেতে লাগল বিশেষ করে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ-কাজ কেমন চলছে তা খানিকটা পরখ করা যেতে পারে। ভারতে প্রাচীন ইতিহাসের যে মূল সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত গবেষকরা মাথা ঘামানো শুরু করলেন সেটি হল ঐ সময়কার সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—সেটি কি অন্য সব দেশে ইতিহাসের ঐ স্তরে যে দাস-সমাজ দেখা গিয়েছিল সেই সমাজ, না অন্য কোন ধরনের সমাজ? মার্কস যাকে 'উৎপাদনের এশীয় পদ্ধতি' বলেছেন তারই উপরে নির্ভরশীল সমাজ, না সরাসরি দাস-শ্রম-নির্ভর সমাজ? এই নিয়ে বহুদিন ধরে প্রচণ্ড তর্ক বিতর্ক চলে সোভিয়েট পণ্ডিতদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত পাল্লা ঝুঁকেছে দাস-সমাজের দিকে—যদিও একথা মানা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের দাস-সমাজ আর গ্রীক-রোমান দাস-সমাজ এক নয়। [illegible] মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন জি এম [illegible]।

ওদিকে জি এম বঙার্ড-লেভিন মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন, আবার নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করছেন ভারতে আর্য অভিযান প্রক্রিয়ার। তাঁর মতে হরাপ্পা-সভ্যতার পতনের প্রধান কারণ ঐ অভিযান নয়, আভ্যন্তরিক বিবাদ-বিসংবাদ। বঙার্ড-লেভিন আবার মেগাস্থিনিস প্রভৃতি গ্রীক পর্যটকের সাক্ষ্যকে অশোকের যুগের শিলালিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঐ সাক্ষ্য মোটেই উপর নির্ভুল।

ভারতবর্ষে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চলছে তার ফলাফলের প্রতিও সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিকরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। সোভিয়েট ভূখণ্ডে, যেমন মধ্য এশিয়ার জাংগা-তেপে জেলায় তাঁরা নিজেরাও প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালাচ্ছেন (এলবাউম ও স্তাভিস্কির নেতৃত্বে) তাতে ভারত ও মধ্য এশিয়ার প্রাচীন সম্পর্ক বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া গেছে। আর এখন তো কুষান-সভ্যতা নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছেন সোভিয়েত পণ্ডিতেরা। সোভিয়েতের এশীয় ইন-স্টিটিউটের পরিচালক বাবাজান গফুরফ এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী।

প্রাচীন [illegible] সাহিত্যের আলোচনা, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা করছেন বিশিষ্ট কালিয়ানভ, ইলিনের মত পণ্ডিতবর্গ।

(ক্রমশঃ)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। দুই ।।

শুভ যা বলেছিল, ঠিক তাই। অধ্যাপক সস্ত্রীক মোতিঝিলে অনেক আগেই হাজির। দরজা-জানালাবিহীন নিরেট একটা কক্ষসদৃশ পুরনো ইঁটের স্তূপ। তার সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক স্ত্রীকে কী সব বোঝাচ্ছেন। সুলেখার মুখ দেখে কিছু অনুমান করা কঠিন। নির্বিকার তাকিয়ে আছেন মাত্র। আজ ভিড় সামান্যই। সেই রিকশোওলাটা দিব্যি আয়েশে বসে আছে রিকশোর ওপর। এদের দেখে মুখ টিপে হাসল একটুখানি। শুভ নিঃশব্দে ওকে দুহাতের সবগুলো আঙুল দেখাল। অর্থাৎ দশ টাকার কমে ছাড়বে না বলে দিচ্ছি। রিকশোওলা হাসল ফের। ঘাড় নাড়ল। দীপেন বোসকে অমিশুক ভেবেছিল। দেখা যাচ্ছে, সেটা ভুল। অন্তত নীরেনের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন। কথার উপলক্ষ্য রাজনীতি। গেটের পাশে একটা কবর। ফলকে লেখা আছে একটা নাম। সিরাজদ্দৌলার ভাই একরামুদ্দৌলার চীনদেশীয় গৃহশিক্ষকের কবর। দিব্যেন্দু কবরের পাশ কাটিয়ে ঝিলের দিকে এগোচ্ছে। শুভ দেখল, বটগাছের ঝুরির নীচে একা চলে গেছে কল্পনা। ইরা সামনের মসজিদের ভিতর ঢুকেছে; ইরাকে আজ উগ্র আধুনিকা দেখাচ্ছে। ডাইকরা চুড়োখোঁপা, ফিকে হলদে রঙের ঝিকমিক ঠোঁট, নাভির নীচে শাড়ির সুরু পেটকাটা ব্লাউস।

শুভ এগিয়ে গেল। পাশে গিয়ে বলল, কবর দেখছেন? ভাবতে কেমন লাগে, তাই

না? এমন মরা হয়ত খুব সুখের—কবরে ফুল ঝরছে পাতা ঝরছে...গ্র্যান্ড!

ইরা হাসল। ...এ বয়সে মরার কথা ভাবতে নেই। অবশ্যি, আপনি কবিতা লেখেন!...

শুভ বলল, কবিরা তো চিরদিনই ঠাট্টার পাত্র।

ইরা একটু সিরিয়াস হল হঠাৎ।...বাট আই লাইক পোয়েটস। পরক্ষণে আঙুল তুলে পাঁচিলের দিকে এগোল সে।...আসুন, আসুন। কী সুন্দর অর্কিড ঝুলছে গাছটায়!...

নীরেন এবার ক্লান্তি বোধ করছিল।...এনাফ অফ ইট। মিস্টার বোস, আপনি ঘুরুন। আমি ওদের দেখি।

অধ্যাপক চেঁচিয়ে উঠেছেন এদিকে।...এই যে নীরেনবাবু। আসুন, আসুন। ব্যাটা ইংরেজদের কীর্তি দেখে যান। এই ইটের ঢিবিতে ঘসেটিবেগমের সোনাদানা লুকিয়ে আছে ভেবে এনতার গোলা চালিয়েছিল। ওই দেখুন সব গর্তমর্ত ইস! কল্পনা করতে পারেন, একদিন কী ছিল জায়গাটা। অশ্বক্ষুরাকৃতি ঝিল, সুন্দর প্রাসাদ, আঃ, আঃ!

সুদেষ্ণা কড়ামুখে বললেন, কী হল? ক'কাচ্ছ কেন?

অধ্যাপকের চোখে মৃদু ভর্ৎসনা দেখা গেল। তারপর ক'পা এগোলেন। জানেন, ইতিহাস আর পুরাতত্ত্ব আমার সাবজেক্ট। যেখানে-যেখানে এমনি সব পোড়ো জায়গায় গেছি, কিছু না কিছু নতুন ব্যাপার আমার চোখ এড়ায়নি। সেবারে গেলাম পাণ্ডু রাজার ঢিবি...

সুদেষ্ণা হনহন করে কবরখানার দিকে চলে গেলেন। নীরেন বিনয়ী ছাত্রের মত বলল, এখানে নতুন কী আবিষ্কার করলেন স্যার?

স্যার শুনে যেন পুলকিত হলেন দেবতোষ।...লক্ষ্য করেছেন? মুরশিদাবাদে ওরা সিরাজের কোন চিহ্নই রাখতে চায়নি—এক কবর বাদে? কী প্রমাণ হয় এতে? ওর নাম মুছে দিতে চেয়েছিল ওরা। বাট হোয়াই? কেন? নিশ্চয়ই ভীষণ জনপ্রিয় ছিল সিরাজ। নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়েছিল—যার ফলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ছিল, এবং...

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীরেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, স্বাতী, এই স্বাতী!

স্বাতী ঝিলের পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে। কী করছে ওখানে? সাপটাপ থাকতে পারে। নীরেন লম্বা পায়ে এগোল স্বাতীর দিকে।

দেবতোষ দীপেন বোসকে নিয়ে পড়েছেন!...আসুন মিস্টার বোস। রাত্রে ভালো করে আলাপের সুযোগই পাইনি। আসুন, রোদে গিয়ে দাঁড়াই। ওরা সব তরুণ ছেলেমেয়ে, ছোটাছুটি করুক কিছুক্ষণ। অবশ্যি...ভুল বুঝতে পেরে কাঁচুমাচু হাসলেন তিনি।...অবশ্যি আপনিও তরুণ। কেবল আমিই যা পৌঁটাছাড়ার দলে। ওই যে কী গাইছিলেন ভদ্রলোক—পাতাঝরার বনে!...

দীপেন বোস হাসছিল না। বলল, আপনি তো অধ্যাপনা করেন। কোথায়?

দেবতোষ বললেন, কলকাতার দিকেই। আপনি?

আমি...মানে আমার একটা ট্রেডিং কনসার্ন আছে চৌরঙ্গীতে।

বাঃ! বাণিজ্যে বাঙালী মশাই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। আপনাদের মত নবীনেরাই যা ভরসা। কিসের ট্রেড?

দীপেন বোস যেন বিরক্ত হল।...তেমন কিছু নয়। নিতান্ত ডিস্ট্রিবিউটার। কসমেটিকসের।...

ওদিকে কয়েক পা গিয়েই নীরেন থমকে দাঁড়িয়েছে। দিব্যেন্দু আর কল্পনার এমন ঘনিষ্ঠতা সে ভাবতে পারে নি। গায়ে গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড শেকড়ের ওপর ওরা বসে আছে ঝুরির আড়ালে। স্বাতী কি তাই লক্ষ্য করছে এতক্ষণ?

নীরেন ওদের চোখ এড়িয়ে স্বাতীর কাছে গেল। এখানে যে একসময় দালান-কোঠা ছিল, তার প্রমাণ এইসব ইট আর ধ্বংসস্তূপ। তার ওপর ঘন ঘাস, আগাছার জঙ্গল আর নানারকম গাছপালা গজিয়েছে। নীরেন হাতের পাশের ঝোপ থেকে একটা বুনো ফুল তুলে নিল। তারপর বাঘের মত চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে স্বাতীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। এত তন্ময় হয়ে আছে স্বাতী, টের পেল না কিছু। পরক্ষণে ফুলটা ওর বিশৃংখল পাখির বাসার মত চুলে গুঁজে দিতে গেলে স্বাতী চমকে উঠল।

নীরেন চাপা হেসে ওর হাতটা ধরে বলল, বনকন্যার মত দাঁড়িয়ে আছ। ব্যাপার কী?

স্বাতী একটু ঝুঁকে ওর হাতটা লক্ষ্য করে বলল, কী যেন ছিল তোমার হাতে। কই? দেখি।

ফুল। পরবে নাকি?

এত পুলক কেন আজ? স্বাতী মিটিমিটি হাসছে।...মেয়েদের একা দেখলে খুব বীরত্ব দেখাতে সাধ জাগে—তাই না?

ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে নীরেন বলল, নাঃ। এমনি। একটু চপল হতে চাচ্ছিলাম—ধুৎ আমার পোষায় না। ওসব দিব্যেন্দুটা বেশ পারে। ওই দ্যাখো না! দেখতে পাচ্ছ?

স্বাতীর ঠোঁটের কোণে একটু কুঞ্চন ফুটে রইল কয়েক মুহূর্ত। একবার চোখ তুলে ঝিলের পাশে বিরাট ঝুরিওয়ালা বটগাছটার দিকে তাকাল সে। যেন শুধু গাছটাকেই দেখে নিল। তারপর বলল, কল্পনাটা মরবে।

এমন সুরে কথাটা বলল স্বাতী যে নীরেনকে চমকে উঠতে হল। সে বলল, বাগড়া দিচ্ছ কেন? ওরা যদি প্রেম করে তো করতে দাও। নাকি তোমার কিছু আশাটাশা ছিল ওর প্রতি!

নীরেনের কথায় এমন গোঁয়ার্তুমি বা স্পষ্টতা স্বাতীর গা সওয়া। সে একটু হাসল।...কে? ওই দিব্যেন্দু? রক্ষে করো বাবা। শৃঙ্গধারী জীবকে শতহস্ত দূর থেকে প্রণাম।

নীরেন স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, সবাই শৃঙ্গধারী। আমিও।

হয়েছে। তোমার প্রতি কে আশা নেই আমার। যাও, গেট আউট।

নীরেন হাসল।...ভাগিয়ে দিচ্ছ একেবারে।

ওখানে কবরখানার ভাঙা পাঁচিলে পা তুলে ইরা হাসছে। ওপাশে মাত্র দুফুট নীচে দাঁড়িয়ে আছে শুভ। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মেথেস্ট, মেথেস্ট! চলে আসুন। হাতটা নিন, পড়বেন না।

ইরা বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, থাকগে। ও খুঁজবে আবার।

কী মুস্কিল! আরে আমি তো আছি, পড়ে যাবেন না...নাছোড়বান্দা শুভ ক্রমাগত হাতটা সাপের ফণার মত দোলাতে থাকল।

ইরা এদিক-ওদিক চঞ্চল চোখে তাকিয়ে বলল, কিন্তু যাব কোথায় শুনি? কী আছে ওদিকে?

শুভ বিরক্তমুখে বলল, ওই জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ। আসুন না, দেখে আসি! ধেৎ! তখন যদি 'না' বলতেন, আমি ঝাঁপ দিতাম না। এখন আমার ওঠার সমস্যা।

ইরা হাত বাড়াল।...হাত দিচ্ছি। ধরে উঠুন।

বাঃ! চমৎকার! শুভ হেসে উঠল।... কিন্তু আমার ভার সইতে পারবেন না। পড়ে যাবেন। তখন মিস্টার বোস আমার নামে কেস ঠুকে দিক। ওপথে আমি নেই।

কিন্তু হাতটা ধরল সে। ধরামাত্র ইরা সামনে ঝুঁকেছে। তারপর কী যেন হল, শুভ প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে সামলে নিতে বাধ্য হয়েছে। ওপাশে নীচেই নেমে গেছে ইরা।...পর্বত অভিযান করা হল যেন। যান, ভীষণ জেদী আপনি।

দুজনে আমবাগানের নীচে পিটুলি আর কালকাসুন্দে ঝোপ ঠেলে গম্বুজটা লক্ষ্য করে এগোতে থাকল।

দীপেন বোস কেটেছে এক ফাঁকে। রাস্তা পেরিয়ে ওদিকের মসজিদের চত্বরে পৌঁচেছে। আসবার সময় লক্ষ্য করেছিল সে। উঁচু বারান্দায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে ইজেল। রাত্রে হোস্টেলে অল্প একটুখানি কথাবার্তা। চীনা মিত্র। নামটা বেশ লাগছে।

এলাকায় ইতস্তত জঙ্গলের ভিতর এমন মসজিদ খুব কম নেই। সবগুলোই পোড়ো। মুসেপড়ার মুখে পৌঁছেছে। গম্বুজে ফাটল, দেয়ালে ফাটল। অশত্থ-বট গজিয়েছে। বেশ নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছেন ভদ্র-মহিলা। কী আঁকছেন কে জানে!

দীপেন ফটকটা ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করল। ভেঙে পড়বে না তো? তারপর প্রায় লাফ দিয়ে সেটা পেরিয়ে গেল। একটু কাসল।

চীনা চমকে উঠে মুখ ফেরাল এদিকে। হাতে তুলি। ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল দীপেনের দিকে। সম্ভবত চিনতে চেষ্টা করছে। দীপেন বলল, নমস্কার। কাল রাত্রে হোটেলে আলাপ হয়েছিল। আমার স্ত্রী ইরা আপনাদের পাড়ার মেয়ে—আপনারা বেশ পরিচিত দেখলাম।...

ও। হ্যাঁ। চীনা স্মিত হাসল।...... বেড়াতে বেরিয়েছেন? ইরা কোথায়?

দীপেন বলল, ওদিকে ঘুরছে। আমি এসেই আপনাকে লক্ষ্য করেছিলাম। কৌতূহল হল, কী ছবি আঁকছেন দেখে আসি। কিছু মনে করছেন না তো?

না, না। কী যে বলেন! চীনা জিভ কাটল সবিনয়ে। ...তার ওপর পাড়ার জামাই।

হা-হা করে হেসে উঠল দীপেন।... অবশ্যই। ...মাই গুডনেস! এ কি আঁকছেন?

তুলির গোড়া দাঁতে কামড়ে চীনা তাকিয়ে আছে ছবির দিকে। দীপেনের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, কেন? বুঝতে পারছেন না? অবশ্যি এখনও সামান্য কাজ বাকি। কয়েকটা পোঁচ।

দীপেন ছবির সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে যেন বোঝবার চেষ্টা করছে। ...বড্ড জটিল। আমি আবার আর্টফার্ট একেবারে বুঝি নে—তার ওপর এই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট।

শান্ত চোখে তাকাল চীনা মিত্র। ......ছবিটা দেখে কি কিছু মনে হচ্ছে না আপনার? এ্যানি ইমপ্রেসন?

দীপেন তীক্ষ্ন দৃষ্টে ছবিটা লক্ষ্য করে বলল, একটা রিঅ্যাকশন ঘটছে আমার—টু স্পীক দ্য ট্রুথ।

বলুন।

কেমন যেন ভীষণ—ভীষণ কিছু ঘটতে চলেছে... তার সামনে আমি অসহায়, একেবারে অন্ধের মত। এ লিভিং স্টোন ইন দ্য এক্সপ্লোসান... ওই সব খণ্ড, ব্লাডের মত টানা কালো রেখা...

চীনা হাসল।... বানিয়ে বলছেন না তো?

না, না। বিলিভ মি।

তাহলে আমার আঁকার ত্রুটি হয় নি।

এখানে কী প্রেরণা পেলেন এমন ছবি আঁকবার? ডোন্ট মাইন্ড মিস মিত্র, এটা নিতান্ত একটা প্রশ্ন।

চীনা কয়েক মুহূর্ত মসজিদের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। নাসারন্ধ্র কাঁপছিল একটু একটু। তারপর বলল, দেখুন। জীবন যার মধ্যে আশ্রয় নেয়, তার নাম সময়। সময়ের একটা চেহারাই মোটা-মুটি আমরা দেখি, সেটা জনপদে বা মানুষের ভিড়ে কিম্বা সমাজে। সেটা আপাতদৃষ্টে যত উজ্জ্বল চঞ্চল মনে হোক, তার মোটামুটি রকমটা একই। সে সেখানে কাম্য, সুন্দর, ভদ্র—আইনের অধীন। কিন্তু এখানে এসে—এই পোড়ো ভুতের শহরে পা দিলেই সময়ের অন্য এক চেহারা দেখতে পাচ্ছি। অথচ এখানেও জীবন আজও আছে। আধার যেহেতু অন্য, তার রূপও অন্যরকম। ডু ইউ ফিল ইট? ওই দেয়ালের ওপর গাছপালার শিকড়গুলো লক্ষ্য করুন। এবং......

দীপেন মাথা দোলাচ্ছিল। এবার বাধা দিয়ে বলল, এনাফ! আই ফিল ইট।

চীনা পেটের কাছ থেকে রুমালটা টেনে নিয়ে মুখ মুছল। একটু হাসল।... খুব বকছিলাম। ছবিটা আজ শেষ করব ভাবছি। কিন্তু বড্ড ক্লান্তি! আর একলা লাগছিল খুব। ভাল হল—আপনি এসেছেন। চা খাবেন? সঙ্গে আছে। আমি বড় একটা খাই নে। খুব ক্লান্ত হলে—তবেই একটু-আধটু।

ফ্লাস্ক খুলতে থাকল সে। চত্বরে কিটব্যাগ পড়ে রয়েছে। অনেকগুলো রঙের কৌটো। তুলি। ছুরি। আরও সব টুকিটাকি।

দীপেন বলল, কাপ তো একটাই। সরি, জল আছে দেখছি। ধুয়ে নেবেন। আমার ভীষণ চা-পানের অভ্যাস আছে। কী অপূর্ব যোগাযোগ!

চা খেতে খেতে ছবিটার দিকে তাকাচ্ছিল দীপেন। চীনা সামনে ফের পায়চারি সুরু করেছে। মাঝে মাঝে তাকেও লক্ষ্য করছিল সে। খুব চেনা লাগে। কোথায় দেখেছিল এর আগে?......

অধ্যাপক পাঁচিলে ভর দিয়ে ঝিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুদেষ্ণার বাজখাই ডাক শুনে মুখ ফেরালেন। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে সুদেষ্ণা। লোকের সামনে অকারণ চেঁচামেচি—কোন মানে হয় না! ওকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে। আগামীকাল মাইল আষ্টেক দূরে রাঙামাটি চাঁদপাড়ায় রাজা শশাঙ্কের রাজধানী দেখতে যাবার ইচ্ছে আছে। কোন অছিলায় ওকে রেখে যেতে হবে।

সরে এসে বললেন, কী ব্যাপার? ডাকছ কেন? চলে যাব?

সুদেষ্ণা বললেন, ধিঙ্গি ছোঁড়াছুড়ি-গুলো বনজঙ্গলে যা খুশি করে বেড়াক্! তোমার এত উঁকি মারা কেন বলো তো? ছিঃ! বয়স যত বাড়ছে, তত খোকাপনা বাড়ছে।

জিভ কাটলেন দেবতোষ।...ছ্যা ছ্যা! কী সব যা-তা বলছ, দ্যাখ তো! আমি ওদের দেখব কেন? ওই ঝিলটা দেখছিলাম। জানো? ইতিহাসে আছে—ওটার আকার ছিল ঘোড়ার ক্ষুরের মত। ওতে নৌকো বেয়ে বেড়াত নবাব-নন্দিনীরা...

সুদেষ্ণা বিকৃত মুখে বললেন, তাই বুঝি দেখা হচ্ছিল এতক্ষণ।

কাঁচুমাচু হাসলেন দেবতোষ। ...তা বলতে পারো। পুরাতাত্ত্বিকরা কল্পনার চোখেও কিছু দ্যাখেন বই কি। সত্যি সুদেষ্ণা, তুমি এত ভাল তো ছিলে না কোনকালে।

সুদেষ্ণা বললেন, রাখো ওসব আদিখ্যেতা। বটতলায় কুঞ্জ বসিয়ে মানভঞ্জন পালা গাইছে—আর দিব্যি হাঁ করে গিলছ। এস, আর ভাল্লাগে না। কই, তোমার সেই হাজার বছরের পুরনো গোপীবল্লভের মন্দির কোথায়? খুব যে চালাকি করে আনলে। সে কি এই কবর দেখাতে?

চলো। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বয়স ক্রমশ গুরুভার হয়ে আসছে। মন হচ্ছে কোণঠাসা। চারপাশে এইসব সজীবতা, তারুণ্যের ছবি, এত প্রাণচঞ্চলতা, আর দেবতোষের সেখানে কোন ভূমিকাই নেই। বড় অসহ্য লাগে জীবনটাকে। রাগ হয়। ক্ষোভে বুকের ভিতরটা ছটফট করে। কিছু পেয়েও পাওয়া গেল না। কিছু স্পষ্ট জানা গেল না। তাই পিছন ফিরে শুধু যা কিছু স্মৃতি—যা অতীত, তার মধ্যে উটের মত নাক ডুবিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা। এত অসহায় দেবতোষ!

পাশে চলতে চলতে ফিসফিস করে দেবতোষ বললেন, দেখো, রিক্সোওলার সঙ্গে ফের দরদস্তুর বাধিও না। বেশ দেরী করিয়ে দিলাম বেচারার।

সুদেষ্ণা উচ্চকণ্ঠে বললেন, সে হবে। কিন্তু গোপীবল্লভের মন্দির না দেখালে তোমার ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। রিকশো থেকে নামব না।

সভয়ে দেবতোষ বললেন, সর্বনাশ! সারাদিন রিকশো করে ঘুরবে নাকি?......

বিভাস একা দাঁড়িয়েছিল। পাশের ভাঙা দালানবাড়িটার ভিতর দেখার মত অবশ্য কিছু নেই। দেয়ালে অজস্র নাম আর ঠিকানা লেখা। একদল যুবক-যুবতী ওখানে ঢুকে ছবি তুলছিল এতক্ষণ। বিভাস তাদের শেষ ছবিটার জন্যে শাটার টিপে দিয়েছে। ওরা কলকণ্ঠে, ধন্যবাদ দাদা, নমস্কার—বলে চলে গেলে চত্বরটা ভীষণ নির্জন হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ সে আনমনে গুন গুন করছিল। তারপর দেখল, স্বাতী এসে তাকে ডাকছে।... বিভাসবাবু, এই যে!

লাফ মেরে অত উঁচু স্তূপটা ডিঙিয়ে আসতে দেখে বিভাস অবাক। খেলোয়াড় মেয়ে। ওর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। বিভাস বলল, ওরা সব কোথায়?

কে জানে! বলে স্বাতী পাঁচিলে পিঠ রেখে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর।

বিভাস সামান্য সরে এল কাছে। মুখের দিকে স্থির তাকাল কয়েক মুহূর্ত। কিছুটা জোকারের ভাবভঙ্গী। তার ধারণা, যে কোন কারণেই হোক স্বাতীর মন খারাপ। তাকে চাঙ্গা করার অনির্দিষ্ট দায়িত্বভার যেন সে গ্রহণ করে নিয়েছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি, কপালে ভাঁজ, ভ্রূ কুঞ্চিত।

স্বাতী কটাক্ষ হানল।... কী দেখছেন?

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বিভাস বলল, আপনার অসুখ।

আপনি কি ডাক্তার নাকি?

হতে সাধ যাচ্ছে খুব।

স্বাতী মুহূর্তে বিরসতার মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলল। হাল্কা হেসে বলল, যান্! আমার কিস্যু হয় নি। আসুন, ওই পাথরটার ওপর বসা যাক্। পায়ের ব্যথাটা ফের টের পাচ্ছি।

চত্বরের মাঝখানে বিজাতীয় ভাষায় খোদাই করা লিপিসমেত চৌকো একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর। সেটার ওপর বসে পড়ল দুজনে। মধ্যে এক হাতের ব্যবধান। বিভাস টের পাচ্ছিল, স্বাতীর শ্বাসপ্রশ্বাস চাপা-উত্তেজনা সামলানোর প্রয়াস চলেছে। কিসের উত্তেজনা?

স্বাতী কিছু বলার আগেই বিভাস গুনগুনিয়ে উঠেছে।

আমরা যারা এসেছিলাম হারিয়ে যাবার খেলায়

অন্ধকারের ভেলায়

নিশীথ রাতে পাতাঝরা বনে......

হঠাৎ গান থামাল সে। বলল, স্বাতী, আপনি গান গাইতে পারেন না?

স্বাতী সামনে একটু ঝুঁকে আছে। নীচের দিকে দৃষ্টি। ওই ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে অস্ফুট বলল, না।

বিভাসের দুঃসাহসী হাতটা ওর পিঠে নামতে দেরী করল না।...স্বাতী, শুনছেন?

উঁ?

আমরা—আমরা যেন হঠাৎ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তাই না?... বিভাস বলতে থাকল।... মাত্র তিনটি দিন। এই তিনটি দিনেই কী সব ঘটে যাচ্ছে বা ঘটতে চলেছে—হ্যাঁ, আই স্মেল ইট। কাল বিকেলে কাটরা মসজিদের মিনারে ওঠবার সময় অন্ধকার সিঁড়িতে হঠাৎ আপনি আমার...

স্বাতী সোজা হয়ে বসল। আস্তে আস্তে বলল, ও কিছু না। হঠাৎ ভয় পেয়েছিলাম।...

কে, কে?... বটতলার মোটা শেকড়টা থেকে দিব্যেন্দু ধুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কল্পনাও।

ঘেঁটুবনটা ভীষণ নড়ছে তখনও।

দিব্যেন্দু হাত দুটো মুঠো করে দু-পা এগোল। কল্পনা সরে এল। সে হন হন করে ঘাসের জঙ্গলটা পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। উত্তরের আমবাগানে শুভ আর ইরা বোস পাখি তাড়াতে ব্যস্ত। একটু পরেই কল্পনাকে দেখতে পেল ওরা। ভাঙা পাঁচিলের কাছে এসে এক লাফে শুভ উঁচু চত্বরে উঠল। তারপর হাত বাড়াল। ইরা বোস তার হাতটা ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে। দেখে ভীষণ হাসি পেল কল্পনার।

কাছে এসে শুভ বলল, এ গ্র্যান্ড্ ডিসকভারি! কী হারালে তা জানো না কল্পনা। ওই গম্বুজওয়ালা ঘরের দেয়ালে একটা মজার লেখা পড়লাম। চমৎকার কবিতা দু' লাইন। অনবদ্য। এই দ্যাখো টুকে এনেছি। 'মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠল চাঁদ। ডোবার ধারে পাতবো [illegible] ধরার ফাঁদ'। নীচে একটা তারিখও লেখা আছে। ৭-২-৭০!... মাথা চুলকে শুভ ফের আওড়াল, সাত-দুই-সত্তর [illegible] মিসেস বোস থুড়ি ইরা বউদি, আজ তারিখ কত?

ইরা ঠোঁট উল্টে বলল, অত খবর রাখি নে।

কল্পনা বলল, আজই ফেব্রুয়ারী সাত।

শুভ হো হো করে হেসে বলল, ব্যাটা নির্ঘাৎ মাতাল।

এবং কবিও।... পিছন থেকে নীরেন বলল। নীরেনের হাতে এক গোছা ঘেঁটু-পাতা। পাশে দিব্যেন্দু।

ইরা ইতিউতি তাকাচ্ছিল। দীপেন বোসকে খুঁজছে। টের পেয়ে শুভ বলল, আরে, ওরা সব কই? স্বাতী বিভাসবাবু দীপেনদা?

কল্পনা বলল, আর এখানে ভাল্লাগে না। নীরেনদা, নেক্সট প্রোগ্রাম কী?

নীরেন ঘড়ি দেখে নিয়ে জবাব দিল, আপাতত হাঁটতে হাঁটতে পথচলা।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। শুভ হাতে চোঙ বানিয়ে ডাকতে সুরু করেছে। স্বাতী! বিভাসবাবু! দীপেনদা!

স্বাতী আর বিভাস এসে গেল দক্ষিণের ভাঙা দালানবাড়ি থেকে। রাস্তার ওপারের পোড়ো মসজিদের ফটক পেরিয়ে দীপেন বোসকে আসতে দেখা গেল। তার পিছনে চীনা মিত্রকে দেখে শুভ চেঁচাল, হ্যাল্লো চীনাদি!

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়। — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'

বুঝলেন নিসপেকটরবাবু এ দুকান-উকান সব তুলে দিতে হবে। কি লাভ ঝুটমুট লোকসান দিয়ে। আর নেই, খরচাতে-ডবল হয়ে গেল। ট্রাম-বাস ট্যাক্সির শব্দস্রোত ভেদ করে লালাজীর খেদোক্তি এল কানে। বড় রাস্তার ওপরে হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী কুণ্ডুদের তেতলা ফ্ল্যাটবাড়ীর থালি-পড়ে থাকা গ্যারেজে লালা বনসীরামের রেশন শপ। চাল গম চিনি সুজির টাল দেওয়া বস্তার ছোটখাট পাহাড়, এক মানুষ উঁচু দাঁড়িপাল্লা, দুজন কুলি আর গদির ওপরে গণেশ আসনে বসা লালাজীকে বাদ দিলে যেটুকু সামান্য জায়গা পড়ে থাকে, সেখানে একজোড়া টুল টেবিল সাজিয়ে বসেন লালাজীর ক্লার্ক কাম অ্যাকাউন্টেন্ট রমেন সরকার। সন্ধ্যে থেকেই সরকারবাবু ইনসেপকটর অবনী বোসকে ডেইলি জমা খরচের হিসাবটা গল্পচ্ছলে বোঝাচ্ছিলেন। নন-জুয়াল রেজিস্ট্রারটায় চোখ ঘুরছিল অবনীর, তাই কথা কটা কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। আর কানে ঢুকলেই বিপদ। অবনী জানে এরপর লালাজী কি বলবেন— এ হপ্তাটা ছেড়ে দিন বাবু। আর চালাতে পারছি না। চালাতে কি ছাই অবনী নিজেই পারছে। পৌনে দুশো-সোয়া তিনশো স্কেলের রেশন সপ ইনসপেকটরীর চাকরীতে বিধবা পিসি টু সদ্য জন্মেছে এমন একটি আড়াই মাসের পুঁটলি সমেত আটটি প্রাণীর পেট চালানো যে কি দায় তা লালাজী বুঝবে কি করে? মাস গেলে এই চার হাজার ইউনিটের দোকানটা থেকে কম করেও হাজার টাকা নিট আয় লালাজীর। তাছাড়া উপরি প্রায় সাত-আটশোর কম হবে না। শালা দু হাতে ব্ল্যাক করে সরকারী গুদাম সাবাড় করে দিচ্ছে, যত কঞ্জুষী শুধু আমার বেলা। দাঁড়াও ব্যাটা টাইট কাকে বলে দেখাচ্ছি।

কৈ সরকারবাবু ক্যাশমেমো দেখান দেখি এবার—নন-জুয়াল রেজিস্ট্রারটা পাশে জড় করা খালি বস্তার গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অবনী একটা ছোটখাট হুংকার দিল। ইঙ্গিতটা বুঝতে মুহূর্তও দেরী হল না লালাজীর। নিসপেকটরবাবু কথাটা পাশ কাটানোর চেষ্টা করছেন। হাবে-ভাবে দেখাবেন যেন চটে গেছেন। খাতাপত্র সব না দেখে আজ ছাড়বেন না। প্রত্যেকটা ক্যাশমেমো মিলিয়ে মালের ওজন বুঝে একটা না একটা খুঁত বার করবেন। পয়লা নম্বরের বদমাস। খুচ করে একটা জট পাকাতে ওর কতক্ষণ। আর সেই জট সিধে পথে ছাড়ানো মানে দোকানের লাইসেন্সটি খোয়ানো। আর বাঁকা পথে কম করে দুশোটি টাকার ধাক্কা। তার থেকে বরাদ্দ প্রণামীর টাকা কটা হাতে গুঁজে দিয়ে মাপ চেয়ে নেওয়াই ভাল।

কিন্তু দেবতা কি একটি যে একবার ভেট চড়ালেই উদ্ধার পাবে বনসীরাম? ছোট, সেজ, মেজ, বড়—চার, চারটি দেবতা। প্রত্যেক সপ্তাহে চারজনকে সন্তুষ্ট করতে হবে। সবচেয়ে ছোটটি প্রতি মঙ্গলবার দুপুরে এসে দাঁড়াবেন দোকানের দরজায়। তার খাঁই সামান্য, পাঁচটি টাকা। সেজবাবু আসেন বেস্পতিবার। দশটি টাকা তাঁর চাই। দিতেই হবে, নইলে খাতাপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করবেন। মেজ কর্তার রেট সেজ কর্তার ডবল। উনি দু সপ্তাহ অন্তর একদিন এসে চল্লিশটি টাকা নিয়ে যাবেন। আর বড় কর্তা অর্থাৎ গোটা এলাকার চল্লিশ পঞ্চাশটা দোকান যার আণ্ডারে, এমনিতে তাঁর আসার সময় হয় না। এতগুলো দোকান দেখতে হয়। মাসে বড় জোর একবার হয়তো পায়ের ধুলো দিয়ে বনসীরামকে উদ্ধার করবেন। চা, পান, সিগারেটের আপ্যায়নে খুশি হয়ে বিদায় বেলায় শরিফ মেজাজে বনসীরামের দোকান চালানোর তারিফ করে বলে যাবেন পরের দিন সকালে যেন লালাজীর কর্মচারী বাসায় গিয়ে দেখা করে। অর্থাৎ চার সপ্তাহের পাওনা গণ্ডা সমেত একশো বিশটি টাকা যেন যথারীতি বড়দেবতার গৃহ-মন্দিরে পাঠানো হয়।

তা পাঠায় বনসীরাম। কারণ জানে যে তীর্থস্থানে বাস করে পাণ্ডাদের চটিয়ে লাভ নেই। তাতে তারই ক্ষতি। কখন কোন বাবুর একটা ছোট্ট রিপোর্টে তার লাইসেন্সটি বাতিল হয়ে যাবে কে বলতে পারে? মেজবাবুকে তেরাঞ্জ করার ঢংয়ে বনসীরাম বললেন—এ বোসবাবু, ক্যাশমেমো দেখে কি করবেন? চা খান, পান সিগারেট নিন। কাম-কারবার ছোড়িয়ে। অবনীর মনে হল লালা ওকে ঠাট্টা করছে।

ভাবতে ভাবতেই কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল অবনীর। কদিন ধরেই মেজাজটা গরম। একেই এটা লীন সিজন, রেশন দোকানে অফ-টেক কম। লোকে চাল চিনি ছাড়া গম বলতে গেলে নেয়ই না। নেবে কি? পাঞ্জাব না হরিয়ানায় বলে সবুজ বিপ্লব চলছে গত দু বছর ধরে। মাল গাড়িগুলো দিন-রাত সেই বিপ্লবের ফসল এনে ঢেলে দিচ্ছে পশ্চিম বাংলার গোডাউনে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পদ্মা, আই-আর-এইট আর তাইচুংয়ের তেফলা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে নিজের দেশেই। শহরের ভেতরেই রেশন প্রাইসে চাল পাওয়া যাচ্ছে। শুধু ভবিষ্যতের আশংকায় লোকে এখনো লাইন লাগিয়ে রেশন তোলে। তাই দোকানগুলো টিঁকে আছে। আর দু-একটা বছর এরকম চললে হয়তো গভর্ণমেন্ট রেশনই তুলে দেবে। তাহলে অবনী খাবে কি?

ঐতো কটা টাকা মাইনে আর সামান্য শত খানেক টাকার ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স। এতে কি চলে? সামান্য যা বিশ-পঁচিশ ট্রাভেলিং অ্যালাওয়েন্স পায়, সে কটা টাকা বাঁচানোর জন্য এতবড় মহল্লার দোকানগুলো দিন ভোর হেঁটে হেঁটে চেক করে বেড়ায় অবনী। হাঁটিতে হাঁটতে হাঁটু টনটনিয়ে ওঠে, পায়ের নলি ছিঁড়ে পড়ার জোগাড় হয়, তবু সাহস করে ট্রামে-বাসে সহজে চাপে না। পান সিগারেটের খরচটা দোকানগুলো থেকেই উঠে আসে। শুধু উঠে আসে তাই না, দোকানপিছু এক

প্যাকেট সিগারেট ওর বরাদ্দ। দিনে পাঁচটা দোকান ঘুরলেই পাঁচ প্যাকেট। একটা প্যাকেটেও হাত দেয় না অবনী। গলির মোড়ে পান-সিগারেটের দোকানে সস্তায় বেচে দেয়।

লীন সিজনে লালাজী সহজে উপুড় হস্ত হন না। এসময় অবনীর সাপ্তাহিক আদায় অর্ধেকেরও কম। আগে যেখানে মাস গেলে তিন-চারশো টাকা উপরি আসত এখন সেখানে দেড়শো টাকা আসে কিনা সন্দেহ। নেহাৎ অবনী বুঝে চলে তাই এই মাগ্গী গণ্ডার বাজারে কোনরকমে টি'কে আছে। কিন্তু বড়বাবু বোধহয় আর টি'কতে দেবেন না। কদিন ধরে অফিসে কানাঘুষা শুনছে বদলির অর্ডার না কি রেডি, দিন দুয়েকের মধ্যেই এসে যাবে। চার বছর এই এরিয়ায় কাজ করে যেটুকু পসার জমিয়েছে অবনী তা তো যাবেই, আর নতুন এরিয়ায় কবে কতদিনে যে প্র্যাকটিশ জমবে বা আদৌ জমবে কি না কে জানে? ঘুঘু লালাজী নিশ্চয়ই খবরটা জেনেছে। ব্যাটা তাই ন্যাজে খেলাচ্ছে। অবনীও ছাড়বে না।

কি হল, ক্যাশ মেমো কৈ? পান, সিগারেট এনেছেন কেন? সরান এসব।—রাগে থম-থম করছে অবনীর মুখ-চোখ। লালা বনসীরাম, সরকারবাবু, কুলি দুটি কোনদিন নিসপেকটরবাবুর এই চেহারা দেখে নি। বাবুরা আসেন। গল্পটল্প করেন। চা, পান, সিগারেট খেয়ে ট্যাঁকে রেস্ত গু'জে চলে যান। আজ হল কি বাবুর?

কি হল এখুনি বুঝবে বাছাধন। অবনী বোস এমনিতে ভাল মানুষ। কিন্তু চটালে চণ্ডাল। বাঁধা আয়, খরচ তে-ডবল হয়ে গেছে না, কথা শোনাচ্ছ। ক্যাশমেমো দেখব কি না দেখব ব্যাটা তুমি দেবে উপদেশ? খুব যে টাকার গরমাই। ভেবেছ বাবু বদলি হয়ে যাবেন আর করবেন কি? যাওয়ার আগে তোমার দোকানে ঘুঘু চরিয়ে যাব। এত বছর ধরে হ্যান্ডলিং লসের মাল বেচেছ ব্ল্যাকে। তোমার কুলিরা ওজনে মারে, সেই মাল যায় কালোবাজারে। চার হাজার কার্ডের মধ্যে কম করে সাড়ে তিনশ ফলস কার্ড যে লালা তোমার সে কি আমি জানি না? আর পাড়ার মস্তান নেণ্টু দাসের সঙ্গে যোগ সাজসে আরো প্রায় পঞ্চাশটা ফলস কার্ডের মাল ঘরে তুলে বাজারে ঝেড়ে দিচ্ছ সে খবর কি আমার জানা নেই? তোমার আয় কমে গেছে? গত পাঁচ বছরে কম করে কি মাসে তুমি শুধু ব্ল্যাকে হাজার-বারোশ টাকা কামিয়েছ। কি করে লালাজী? কামিয়েছ এই অবনী বোস আর নেণ্টু দাসের জন্য। নেণ্টুর কমিশন ঐ পঞ্চাশটা কার্ডের উপর আয়ের ফিফটি পারসেণ্ট। আর আমায় দিয়েছ কত? আগে মাস গেলে ষাট-সত্তর পেতাম। এখন বিশটি টাকাও ছোঁয়াতে চাও না।

এখন না হয় বছর খানেক ফসল ফলছে দেশে, চালের দাম পড়ে গেছে। অবাঙালীরা ছাড়া গম নিতে চায় না কেউ। কিন্তু তার আগে? হ্যান্ডলিং লসের মালটা কোথায় যেত লালাজী? বৃটিশ আমলে রেশনের সেই আদি যুগে প্রতি মণে তিন সের ছাড় মিলত দোকানীর। গো-ডাউন থেকে রেশন শপে লরীতে মাল আনা-নেওয়ায় ঐ পরিমাণ লস হয় বলে ধরা হত। স্বাধীনতার পর গভর্ণমেণ্ট হ্যান্ডলিং লসের অ্যামাউণ্টটা তিন থেকে এক সেরে নামিয়ে দিল। এখন একশ কে-জি-তে দুশো চব্বিশ গ্রাম পায় দোকানী। লালাজী হপ্তা পিছু পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ কুইন্টাল শুধু চাল আসে তোমার দোকানে। বলো তো বাছা, কত কিলো চাল তুমি হ্যান্ডলিং লস হিসাবে প্রতি মাসে পাচ্ছ? সেই চাল কোথায় যায়? ক্রাইসিস পিরিয়ডে আড়াই টাকা তিন টাকা দরে কালোবাজারে বেচে মোটা নাফা তোলনি ঘরে?

নাফা করনি সাধারণ মানুষ দু মুঠো অন্নের শেষ সংগ্রহে থাল[illegible]সিয়ে? তোমার নির্দেশে পাল্লার ও[illegible] হেরফের করে নি তোমার কর্মচারীরা [illegible]ই চোরাই মাল কোথায় গেছে?

কি বোসবাবু কেমন আছেন? —দরজায় একটা অশুভ ছায়া রাস্তার আলো আড়াল দিয়ে দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াল। নেণ্টু দাস পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চবর চবর করে পান চিবুচ্ছে। এক নিমেষে হাজার প্রশ্নের জট সিধে-সরল হয়ে গেল। ক্যাশ-মেমো, রেজিস্টার, হিসেবের কারচুপি সব ভুলে গিয়ে বোকা বোকা মুখে মস্তানের ঝিলিকমারা চোখের দিকে তাকিয়েই অবনী বুঝল, ট্যাণ্ডাই-মেণ্ডাই করে লাভ হবে না। লালাজী সরকারবাবুকে দিয়ে ত্রাণকর্তাকে ডাকিয়ে এনেছেন।

ক্যাশমেমো দেখবেন বাবু? —লালাজীর তাবলা মুখটা দেখে কেউ কোনদিন সন্দেহও করতে পারবে না যে প্রশ্নটায় কোন প্যাঁড়া-কল আছে? অবনী দোকানের ম্লান আলোয় একবার নেণ্টুর দিকে একবার লালাজীর দিকে চেয়ে হেসে উঠল—মাথা খারাপ হয়েছে না কি লালাজী? ক্যাশমেমো দেখে কি হবে।

নেণ্টু এবার ভেতরে ঢুকে সরকারবাবুর টুলটা টেনে নিয়ে অবনীর পাশে বসল। কুলিরা বাইরে চলে গেছে। সরকারবাবু দরজার গোড়ায় উবু হয়ে বসে। লালজী পরম নিশ্চিন্তে গদি থেকে নেমে কোমরের কশিটা আঁটতে আঁটতে বললেন,—সে কথাই

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে থাকবে তার জবাব।

মনের কথা

পরীক্ষাধীন নিউরোসিস ও সম্মোহন পর্ব

(সাত)

হিস্টিরিয়া সম্পর্কে পাভলভের দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত গড়ে উঠেছে কুকুরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে। কিন্তু মানবমস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের কথা তিনি সব সময় মনে রেখেছেন, মানুষের রোগের গুণগত পার্থক্য বিচারে কখনও অবহেলা করেন নি। ঘটকের রোগ উপসর্গ ব্যাখ্যার আগে পাভলভের পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা চলতে পারে।

১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে পেত্রভা ও রিকম্যান পাভলভের পরিচালনাধীনে প্রথম পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি করেন।

পেত্রভার পরীক্ষাধীনে ছিল দুটি বিপরীত টাইপের কুকুর। একটির মস্তিষ্ক অতি-উত্তেজনাপ্রবণ, অন্যটির মস্তিষ্কে ছিল অতি-নিস্তেজনা-প্রবণতা। দুটিকেই ছয়টি শর্তাধীন রিফ্লেক্স শেখানো হল। তারপর এদের আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হল। বেশ জোরালো বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক খাদ্য-রিফ্লেক্সের উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করলেন পেত্রভা। সাধারণত এই ধরনের উদ্দীপক শর্তহীন প্রতিরক্ষা-রিফ্লেক্স দেখা দিয়ে থাকে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে প্রাণীমাত্রেই এই ধরনের বেদনাদায়ক উদ্দীপক এড়িয়ে চলে। কিন্তু শিক্ষা দেবার ফলে কুকুর দুটি এই উদ্দীপকে প্রথম দিকে ঠিকমত সাড়া দিল: তাদের খাদ্য-রিফ্লেক্স গড়ে উঠল। পরীক্ষক বারবার ওদের এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে লাগলেন: বৈদ্যুতিক শক-এর মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। কুকুর দুটির স্নায়ুমণ্ডলী এই চাপ সহ্য করতে পারল না: তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। আগেকার তৈরী রিফ্লেক্সগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। অতি-উত্তেজনাপ্রবণটির নিস্তেজনা ক্ষমতা আরো কমে গেল, অতি মাত্রায় চীৎকার ও লাফঝাঁপ আরম্ভ করে দিল; অতিনিস্তেজনাপ্রবণটির ইতিবাচক রিফ্লেক্স ভেঙে পড়ল, দিন-রাত ঝিমুতে লাগল। এইভাবে ল্যাবরেটরীতে প্রথম নিউরোসিস সৃষ্টি করলেন পেত্রভা। এই অবস্থা বেশ কয়েক মাস স্থায়ী হল। নিস্তেজনাধর্মী কুকুরটি কয়েক মাসের বিশ্রামেই সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তেজনাধর্মীটির বেলায় শুধু বিশ্রামে কাজ হল না। ব্রোমাইড্ জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে।

তাদের অসুস্থতার কারণ কি? উপসর্গের এই বৈপরীত্যই বা কেন?

উত্তেজনা ও নিস্তেজনাক্রিয়ার তীব্র সংঘাত থেকে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে,—পাভলভের এই অভিমত। বেদনাদায়ক উদ্দীপকের দরুণ সহজাত প্রতিরক্ষা রিফ্লেক্স নিস্তেজিত করতে হচ্ছে, আবার সেই উদ্দীপকভিত্তিক শর্তাধীন খাদ্য-রিফ্লেক্স গড়ে তুলতে হচ্ছে। এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার পরস্পর বিরোধিতার ফলে মস্তিষ্ককোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতি-উত্তেজনাপ্রবণ কুকুরটির নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া ক্রমশ হ্রাস পেয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর অন্যটির বেলায় উত্তেজনা-ক্ষমতা আরো কমে যাওয়ায় কুকুরটি দুর্বল নিস্তেজ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

রিকম্যানের পরীক্ষাধীন কুকুরটিও ছিল অতি-নিস্তেজনাধর্মী। রিকম্যান কুকুরটির উপর অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি অস্বাভাবিক জোরালো উদ্দীপকের প্রভাব পরীক্ষা করতে চাইলেন। দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে উত্তেজিত করল এইসব উদ্দীপক। প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। কুকুরটি প্রথমটায় বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠল। তারপর স্থির ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের পা দুটো প্রসারিত, মাথা পিছন দিকে হেলানো, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে: অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করল কুকুরটি। সব রিফ্লেক্স ভেঙে পড়ল। দু সপ্তাহ ধরে এই অবস্থা রইল। তারপর ব্যবহার স্বাভাবিক হয়ে এল। কিন্তু এরপরও ঐসব অস্বাভাবিক উদ্দীপকের যে কোনো একটা প্রয়োগ করলেই কুকুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ত।

এবার উত্তেজনা-নিস্তেজনার সংঘাত নয়; নিউরোসিস্ সৃষ্ট হয়েছে মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুণ। নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া উচ্চ মস্তিষ্ক থেকে মধ্যমস্তিষ্ক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাত্রাধিক উত্তেজনা প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ঘটিয়েছে। ল্যাবরেটরীতে রিকম্যান 'নার্ভাস্ ব্রেকডাউন' সৃষ্টি করেছেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বন্যার সময় এই কুকুরটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবার আরো স্থায়ী হয়েছিল 'নার্ভাস্ ব্রেক-ডাউন'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুণ নিউরোসিস ঘটাতে পারে।

প্রথম দিককার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মনে হয়েছিল যে সুষম টাইপ বুঝি নিউরোসিসে আক্রান্ত হয় না। আরো মনে হয়েছিল যে উপসর্গগুলো সব সময়েই [illegible] নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী [illegible] থাকে। পরবর্তী গবেষণার ফলে এই ধারণার পরিবর্জন পরিবর্ধন ঘটে। আরো অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হবার ফলে পাভলভের তত্ত্ব আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়।

মস্তিষ্কের টাইপ সব সময়ে অসুস্থতা-সুস্থতার নির্ধারক নয়। যে কোনো সবল সুষম টাইপেরও নিউরোসিস হতে পারে বা নার্ভাস ব্রেকডাউন' ঘটতে পারে। নির্ভর করছে পরিবেশের জটিলতা ও চাপের উপর। অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত যোগাযোগ থেকে মানসিক রোগ দেখা দেয়। ঘটনার বিশেষ ধরণ, এবং প্রাণীর পূর্ব অভিজ্ঞতা মানসিকতা ও মানসত্তার বিপর্যয়কে প্রভাবিত করে। পরপর অনেক আঘাত বা কঠিন কাজের সম্মুখীন হলে সবল সুষম প্রাণীও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। পেত্রভা ও রিকম্যানের পর ল্যাবরেটরিতে নিউরোসিসের অন্য এক ধরণের কারণ নির্ণয় করা হল। দেখা গেল, উদ্দীপকের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃংখলার হেরফের করেও কুকুরকে বিভ্রান্ত ও অসুস্থ করা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দীপক-

ভিত্তিক শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে তোলবার পর যদি উদ্দীপকের সময় এদিক ওদিক করা হয় তাহলে অনেক সময় কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়ছে দেখা যায়। বাঁধাধরা অভ্যাসের ব্যতিক্রম এখানে অসুস্থতার কারণ। পেত্রভের পরীক্ষাধীন কুকুরদের নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছিল, রিকম্যানের পরীক্ষায় উত্তেজনা-প্রক্রিয়া মাত্রাধিক পীড়ন ঘটেছিল আর এই ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের গতিময়তার উপর বেশি চাপ পড়ছে। উত্তেজনা, নিস্তেজনা আর গতিময়তা—এই তিন প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত পীড়নের ফলে নিউরোসিস্ সৃষ্টির মডেল তৈরী হল। ল্যাবরেটরির বাইরে নিউরোসিসের কারণ বিশ্লেষণ করে পাভলভ নিজের যুক্তির সমর্থন পেলেন। আকস্মিক মানসিক আঘাত বা বিপর্যয়, বিপরীতধর্মী কার্যকলাপ বা চিন্তাভাবনার সংঘর্ষ এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন—এই তিন কারণেই মানুষের নিউরোসিস্ হয়ে থাকে। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে পাওয়া আরো একটি তথ্য ঃ সিকায়েট্রি ক্লিনিকে সমর্থিত হল। রোগ-উপসর্গের প্যাটার্ন সম্পর্কিত ধারণাও বদলে গেল। জানা গেল যে মস্তিষ্কের টাইপ আর রোগের টাইপের পূর্ববর্ণিত সম্পর্ক সব সময় সব অবস্থায় সঠিক নয়।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিসের উপসর্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাভলভ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে মস্তিষ্কের বহু জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও অস্বাভাবিক ব্যবহারের হদিশ পাওয়া গেল। সম্মোহনের বিভিন্ন পর্ব সংশ্লিষ্ট এই আবিষ্কার পাভলভীয় মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

পরীক্ষাধীন কুকুর ক্ষীণ একঘেয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ত। বলা চলে, তারা সম্মোহিত হয়েছে। এই সময় জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় উপনীত হবার মধ্যে তিনটি পর্ব বা দশার সন্ধান পেলেন পাভলভ। সম্মোহনের এই তিন পর্ব নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার বিস্তার সাপেক্ষ। এই তিন পর্বে মস্তিষ্কের ধর্ম তিন রকমের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। প্রথম পর্বের নাম সমতাপর্ব বা phase of equalisation এই পর্বে জোরালো এবং ক্ষীণ উদ্দীপক একই মাত্রার সাড়া জাগায়। জাগ্রত অবস্থায় উদ্দীপক শক্তির তারতম্যের সঙ্গে সাড়ার মাত্রা বেশি কম হয়। দশ মাত্রার উদ্দীপকে যদি দশ ফোঁটা লালা ঝরে, তবে কুড়িমাত্রার উদ্দীপকে ঝরবে কুড়ি ফোঁটা, তিরিশমাত্রায় তিরিশ ফোঁটা—ইত্যাদি। সমতাপর্বে এই স্বাভাবিক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। নিস্তেজনা এই পর্বে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের নাম আপাতস্ববিরোধী পর্ব। এই পর্বে জোরালো উদ্দীপকে নামমাত্র সাড়া জাগে অথবা একেবারেই জাগে না; অথচ ক্ষীণ উদ্দীপক সাড়া জাগায়, বেশ জোরালো সাড়া জোগায়। নিস্তেজনার আরো বিস্তার ঘটেছে। তিরিশমাত্রার উদ্দীপকে লালা ঝরছে না, কুড়িমাত্রার উদ্দীপকে হয়ত বা পাঁচ ফোঁটা পড়ল, কিন্তু দশমাত্রার উদ্দীপকে লালার মাত্রা অনেক বেড়ে গেল। সম্মোহিত অবস্থায় সংবেশকের মৃদু নির্দেশ জোরালো উদ্দীপকের কাজ করে, আমরা জানি। পাভলভের মতে এই অবস্থা পরীক্ষাধীন paradoxical phase -এর সঙ্গে তুলনীয়। সম্মোহন, পাভলভ মনে করেন, মস্তিষ্কের আংশিক নিস্তেজনার ফল, আর ঘুমে নিস্তেজনাপ্রবাহ প্রায় গোটা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে।

তৃতীয় পর্বকে বলা হয় অতিস্ববিরোধী পর্ব। এই সময় নেতিধর্মী উদ্দীপক ইতিবাচক হয়ে ওঠে।

সুস্থ মস্তিষ্কে এই পর্ব তিনটি ক্ষণস্থায়ী এবং তৃতীয় পর্বের পরই প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু যে কোনো একটি পর্ব কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

সম্মোহন পর্বের আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল যে নিউরোসিসের উপসর্গ হয় উত্তেজনাভিত্তিক, না হয় নিস্তেজনাভিত্তিক (পেত্রভের প্রথম পরীক্ষা)—এ ধারণা ঠিক নয়। উত্তেজনাভিত্তিক উপসর্গের সঙ্গে যে কোনো সম্মোহন পর্বের উপসর্গও দেখা দিতে পারে; আবার নিস্তেজনাধর্মী প্রাণীর উপসর্গেও উত্তেজনার প্রকাশ থাকতে পারে।

শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা মস্তিষ্কের এই তিনটি প্রধান ধর্মের যে কোনো একটির অতিমাত্রায় পীড়নের ফলে, সবল দুর্বল সব রকমের প্রাণীরই নিউরোসিস্ দেখা দিতে পারে। ল্যাবরেটরীর প্রথমদিককার পরীক্ষামূলক নিউরোসিস্ থেকে এইটুকু জানা গেল। এর পরও অবশ্য আরো অনেক জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান পাভলভ। মস্তিষ্কের অংশবিশেষের অনড় অবস্থা বুঝতে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। অবশেসন বা আচ্ছন্ন অবস্থার আলোচনার সময় সেই সব পরীক্ষার ফলাফল উত্থাপন করা হবে। পাভলভের পথে ঘটকের অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান এখন করা যেতে পারে। অবশ্য তার আগে ল্যাবরেটরিতে প্রাণীর উপর পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞান কিভাবে ক্লিনিকে প্রযুক্ত হল, আমাদের জানা দরকার।

মানুষের হিস্টিরিয়া প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য সূচিত করে এবং প্রধানত দুর্বল মস্তিষ্কের রোগ। কিন্তু সব হিস্টিরিয়া রোগী যে দুর্বল হবে এবং তাদের মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে মনরোগের প্রাথমিক সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হল, কিন্তু শেষ অভিমত প্রকাশের মত জ্ঞান অর্জন করা হল না। কুকুরের উপর পরীক্ষিত তথ্য যান্ত্রিক ভাবে মানুষের উপর প্রয়োগ করা চলে না। কুকুরের স্নায়ুতন্ত্র ও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্যের কথা পাভলভ সব সময় মনে রেখেছেন। কথা বলার ক্ষমতা মানুষকে প্রাণী-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ এবং পৃথক শক্তির অধিকারী করেছে। বাক্‌তন্ত্র বা এই দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের অবস্থিতির কথা বিচার না করে মানুষের রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। এই দ্বিতীয়তন্ত্র বিবর্তনের শেষ ধাপে গঠিত হয়েছে এবং এই তন্ত্র সুস্থ জাগ্রত মানুষের চিন্তা-ভাবনা আচার ব্যবহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক। এখানে ফ্রয়েডের সঙ্গে পাভলভের মতভেদ লক্ষণীয়। সহজাত প্রবৃত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু মানসতার নিয়ামক নয়,—এই হচ্ছে পাভলভের বক্তব্য। ফ্রয়েড গুরুত্ব দিয়েছেন নির্জ্ঞান এর উপর, পাভলভ দিয়েছেন চৈতন্যের উপর। মনরোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য জীবনের শেষ কয়েক বছর পাভলভ মানসিক রোগের ক্লিনিকে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। নিউরোটিক ব্যবহারের মূলে নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো অনেক কিছু বিচার্য বলে তিনি বিবেচনা করলেন। রোগীর সমাজ-জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি জীবনের সব কিছু না জানলে কারণ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বা তাঁর ছাত্ররা কখনও নির্জ্ঞান-প্রেরণা বা অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা মনে করেন নিউরোটিক ব্যবহারের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য বা বিশৃঙ্খলা দায়ী। তাঁদের প্রধান বিচার্য কিভাবে এবং কেন এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

"— how and why do there arise in the given case changes in the normal processes of the nervous system" —

মানসিক আঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনের বিশেষ পরিবর্তন-এর ইতিহাস থেকে এর উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে অন্য স্কুলের চিকিৎসকদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনো পার্থক্য আছে মনে হয় না। কিন্তু আঘাত ও দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা ও তা থেকে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে পাভলভীয়নরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন। বারান্তরে এ-প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব। মোট কথা, কুকুরের উপর পরীক্ষালব্ধ তথ্য প্রাথমিক জ্ঞানের সূচনা মাত্র; ক্লিনিকে সেই জ্ঞান প্রয়োগের ফলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হল। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস পাভলভ-তত্ত্বের প্রধান অবলম্বন এবং মনরোগের সহজ সাধারণ মডেল। মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞান পাভলভের এই গবেষণার ফলে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

এক কথায় বলতে গেলে, নিউরোসিস চলমান ভারসাম্যের বিপর্যয়। জীবনপথে চলতে গিয়ে মানুষকে অনেক আঘাত, অনেক দ্বন্দ্ববিরোধ সমস্যা, অনেক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। আঘাত দ্বন্দ্ব সহ্য করে, দ্বন্দ্ববিরোধের সঙ্গে লড়াই করে সমস্যার সমাধান করে, বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ঃ এইভাবে চলমান ভারসাম্য বজায় থাকে। যখন বহির্বাস্তবের চাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ঘটে নার্ভ-প্রক্রিয়ার বিশৃংখলা।

অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে কিভাবে ফ্রয়েডিয়ানরা সাইকো এ্যানালিসিস করে থাকেন, অনেকেরই জানা থাকার সম্ভাবনা। কেননা অনেক দিন ধরেই এ-বিষয়ে পুঁথি-পুস্তক পত্র-পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায়। পাভলভের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণের ধারা তত বেশি পরিচিত নয়। তাই এ-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা উচিত মনে করছি। পাভলভ ও ফ্রয়েডের তত্ত্বগত পার্থক্যও এর ফলে পাঠকদের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হবে।

কুড়ি বছর ধরে হাসপাতালের বেডে নিশ্চল নির্বাক হয়ে শয্যাগত থাকার পর একজন রোগী অল্প অল্প নড়াচড়া কথা-বলা আরম্ভ করলেন যখন, তখন তাঁর বয়স ষাট। এতদিন তাঁকে টিউব দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এই খাদ্য হজম করা ছাড়া কোনো সক্রিয় জীবনের লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল না। অবশ্য অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও দুর্বল নাড়ীর স্পন্দন থেকেও বোঝা যেত যে, তিনি জীবিত আছেন। তাঁকে দেখে চট্ করে বোঝা যেত না যে তিনি জীবিত, না মৃত। এই জীবন্মৃত অবস্থা ক্রমশ কেটে যেতে লাগল। নিজের চেষ্টায় বসতে পারলেন, কথাও বলতে লাগলেন। নিজের অবস্থা প্রসঙ্গে বললেন যে, তিনি সবকিছু শুনতে পেতেন, বুঝতে পারতেন, কিন্তু কথা বলার বা নড়াচড়া করার শক্তি ছিল না। হাত-পা জিভ সবই পাথরের মত ভারী মনে হত। কথা বলা ত' দূরের কথা, নিঃশ্বাস নেওয়া ছিল এক প্রাণান্তকর কঠিন ব্যাপার।

পাভলভের আগে বহু চিকিৎসকই এই রোগীকে দেখেছিলেন এবং এ নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছিলেন। এই অসাড় নিশ্চল অবস্থা, অনেকে মনে করেছিলেন, তীব্র প্রক্ষেভের ফল। এঁরা কেউই মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিতে প্রথম এগিয়ে এলেন পাভলভ। এই অনড় অচল অবস্থার জন্য উচ্চমস্তিষ্কের কি ধরনের বিকলতা দায়ী সেই বিচারে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পাভলভের রোগনির্ণয় পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সব সময়েই রোগীর নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের বৈকল্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন। কেন অসুস্থতা? সমাজ ও পরিবেশের কোন আঘাত কোন দ্বন্দ্ব অসুস্থতার কারণ? নিঃসন্দেহে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পাভলভ এ-প্রশ্নের জবাব ত খুঁজতেনই, উপরন্তু নার্ভতন্ত্রের বিকার-বৈকল্য সঠিক-ভাবে অনুধাবন করে রোগী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন। 'সাব-জেক্টিভ ডিটেইলস'-এর থেকে বিকার-তন্ত্রের দিকে বেশি মনোনিবেশ করতেন। উপসর্গ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করতেন স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা নিস্তেজনা গতিময়-তার পরিপ্রেক্ষিতে। ফ্রয়েড রোগ উপসর্গের কারণ বিশ্লেষণ করতেন নির্জ্ঞানরাজ্যে, পাভলভ অনুসন্ধান করতেন কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রে, বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে। কেননা পাভলভের মতে, মনের বিকার মস্তিষ্কক্রিয়ার বিকার ছাড়া ঘটে না।

পাভলভের কাছে এই রোগীর উপসর্গ-গুলির বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রতিভাত হল? উচ্চমস্তিষ্কের কোন্ ধরনের বিশৃংখলা এই অনড় অশক্ত অবস্থার জন্য দায়ী? প্রধানত তার পেশীগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব হারিয়েছে। ইচ্ছামত দেহের কোনো অঙ্গই নাড়াতে পারছে না। দেখাশোনা বোঝার ক্ষমতা অব্যাহত। সুতরাং উচ্চমস্তিষ্কের শুধু একটি বিশেষ অংশ, যা অঙ্গ-সঞ্চালনের জন্য দায়ী, যাকে বলা হয় চেষ্টিয় অংশ; এক্ষেত্রে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়; অন্য অংশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় নয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, এর বেলায় যা ঘটেছে তাকে বলা চলে—

"the exclusion of the activity of only the motor region of the cerebral hemispheres"

এ-ধরনের বিশেষ নিস্তজনা কুকুরের মস্তিষ্কে ল্যাবরেটরীতে পাভলভ দেখেছেন; মানুষের এ-অবস্থার কথাও তিনি জানেন। এ-অবস্থা এক ধরনের সম্মোহিত অবস্থা। সম্মোহনের নানা পর্ব নিয়ে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমরা জানি। সম্মোহনের এক পর্বে মানুষের ঠিক এই অবস্থা হয়। সব বুঝতে পারে, শুনতে পারে কিন্তু পেশীগুলো স্বেচ্ছাচালিত অবস্থায় থাকে না। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়ত আছে। শেষপর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে—

"the patient would present an example of chronic partial sleep or hypnosis"

এখন প্রশ্ন আসবে মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষের এই নিস্তেজনার কারণ কি? কিভাবে এবং কেন এই নিস্তেজনা ঘটেছে?

উত্তরে পাভলভ প্রধানত দুটি কারণের নির্দেশ দিলেন। হয়ত মস্তিষ্কের চেষ্টিয় পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে কোনো বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজের ফলে; কিম্বা অন্য কোনো স্থানের ক্ষয়ক্ষতের দরুণ সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মস্তিষ্ক। ফলে ঘটেছে চেষ্টিয় অংশের এই নিস্তেজন। ষাট বছর বয়সে আপনা থেকে রোগী আরোগ্যলাভ করছে—এ থেকে পাভলভ মনে করলেন, তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বার্ধক্যে নিস্তেজনা স্বভাবত হ্রাস পায়। অনেকে ষাট-পঁয়ষট্টির কোঠা পেরিয়ে প্রগলভ, চপলমতি হয়ে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলে থাকেন। চলতি কথায়, এই অবস্থাকে বলা হয় 'বাহাত্তুরে পাওয়া'। শারীরবৃত্তির পরিভাষায় বার্ধক্যে নিস্তেজনা কমতে থাকে, ফলে কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে অসংযমী হয়ে ওঠেন অনেক বৃদ্ধ।

এইবার [illegible] নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

ঘাতকের মস্তিষ্ক কোন্ টাইপের? এই দিয়েই শুরু করা যাক। পাভলভীয় টাইপের বৈশিষ্ট্য আমরা জানি। ইয়ুং-এর মানসিক টাইপ'-এর উল্লেখ মাত্র করে গেছি; বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়নি। 'টাইপোলজি'র উপর ইয়ুং বেশ জোর দিয়েছেন। ইয়ুং বর্ণিত প্রধান টাইপ দুটি। বহির্মুখীন ও অন্ত-র্মুখীন। তাঁর মতে টাইপ বৈশিষ্ট্য জন্ম থেকে পাওয়া, অর্জিত ধর্ম নয়। বহি-র্মুখীন টাইপ বাইরের জগতের মানুষ, তার কার্যকলাপ চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে সমাজের অন্য মানুষকে নিয়ে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে লিবিডোর প্রয়োজন মেটায়। আর অন্তর্মুখীন টাইপ আত্মগত ধ্যান-ধারণায় বিভোর থাকে। কাল্পনিক জগতে তার বিচরণ। অন্য মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্ষীণ। এক টাইপ অন্য টাইপের ভাবনাচিন্তা বুঝতে পারে না। তারা যেন ভিন্নভাষাভাষী মানুষ; পরস্পরকে আংশিকভাবে বুঝতে পারলেও, পুরোপুরি সংযোগ স্থাপনে অক্ষম। কাজেই এক টাইপ অন্য টাইপকে ঘৃণা করে। বহির্মুখীনের কাছে অন্তর্মুখীন স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা, অকেজো অসামাজিক। অন্তর্মুখীনের বিচারে বহির্মুখীন অমার্জিত অভদ্র, সূক্ষ্মবিচারে অক্ষম, শুধু হৈ-হৈ নিয়েই থাকে। কিন্তু এখানেই ইয়ুং থামেননি। এটা হল টাইপদুটির বাহ্যিক পরিচয়। এদের অবচেতন মনে আবার ঠিক বিপরীত ধর্মের সমাবেশ। বহির্মুখীনের অবচেতন মনে আছে অন্তর্মুখীনতা আর অন্তর্মুখীনের অবচেতনায় বহির্মুখীনতা। টাইপের অনেক 'গ্রুপ-সাবগ্রুপ'-এর বিবরণ ইয়ুং-এর লেখায় পাওয়া যায়। সেসব নিয়ে আমরা আলো-চনার প্রয়োজন দেখছি না। ইয়ুং এবং পাভ-লভের অনেক আগে হিপোক্রেটিস টাইপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বস্তুত, পাভ-লভের টাইপের নাম ও বৈশিষ্ট্য হিপোক্রেটিসের কাছ থেকেই নেওয়া; যদিও শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা একান্ত-ভাবে পাভলভের নিজস্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরভিত্তিক টাইপের কথাও হিপোক্রেটিস উল্লেখ করেননি। আরো অনেকে টাইপের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ইয়ুং বা পাভলভের মত বিস্তার করেননি। রোগের কথা প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখ বাহুল্য।

—মনোবিদ

উত্তরমেঘ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষুণ্ণ মনে হল, আহত মনে হল মোহিনীকে।

বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। এমন সুন্দর, এমন কথা ছিল তার জ্ঞানের অতীত। না জেনে সে কি আঘাত করেছে তাকে? তার কথায়, কণ্ঠে কি মৃদুতম অবহেলার রেশও লেগেছিল কোথাও? কিন্তু চন্দ্রচূড় যে তা চায় না। মোহিনীকে আঘাত করা, খেলার ছলে কাছে আসা, আবার অবহেলা দেখিয়ে হাসতে-হাসতে দূরে সরে যাওয়া, এ যে তার অভিপ্রেত নয়। কথাটা গলা ছেড়ে বলা যাবে না, স্পষ্ট করে, প্রাণ খুলে বোঝানো যাবে না বলেই কি মোহিনী ধরে নেবে তা সত্য নয়? চন্দ্রচূড় ভাবতে পারে না, কোনমতেই নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারে না, যে মোহিনী তার নয়। সে মোহিনীর কেউ নয়। কেবল অন্ধকারে অগোচরে কাছে আসা তার। যেন দূরে আরো দূরে সরে যাবার জন্যেই কাছে আসা। কথাটা মোহিনীর এখনো বোঝা দরকার। কেন সে ভুল বোঝে মোহিনী কেন যে স্বপ্ন দেখে এখনো! একটা সুন্দর, স্বরচিত এবং সহনীয় মিথ্যাকেই গোপনে রক্তের ভেতরে বহন করে বেঁচে থাকতে চাওয়া কেন যে! অথচ একদিন স্বপ্নের বিলাসকুঞ্জে ঝড় উঠবে। প্রচণ্ড দৈত্যের মত হাওয়া এসে লুণ্ঠন করে নেবে সব। ছিন্ন-শাখা পত্র-পল্লবের মত পড়ে থাকবে, ভেঙে পড়বে সমস্ত নির্মাণ। অথচ বাস্তবতা নিষ্ঠুর জেনেই মোহিনী তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কল্পনার শব্দহীন, সংজ্ঞাহীন হিমেল সংসারেই নিরন্তর সুখ আর শান্তি আর ভালোবাসা কুড়িয়ে তৃপ্ত হতে চেয়ে, পূর্ণ হতে চেয়ে তৎপর। কিন্তু সে যে

অসম্ভব। নিষ্কাম প্রেম, নিষ্কলুষ ভালোবাসা যে কোন্ স্বর্গের ধন চন্দ্রচূড় তা জানে না। আর জানে না বলেই মোহিনীর জন্যে মায়া হয় তার। চন্দ্রচূড় টের পায়, মোহিনীর ভিতর ভেতরে অভিমান জেগে আছে, হয়তো আর কারো বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ। সে কে? তবে কি রুক্মিণীকুমার? কথাটা চকিতে বিদ্যুতের মত তার স্মৃতি এবং চিন্তার ভেতরে খেলা করে। ভাবনাটা মুহূর্তে ব্যাকুল, বিষণ্ণ করে তাকে।

জুড়িয়ে-আসা চায়ের কাপে চুমো খেতে-খেতে মনে পড়ে, মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুমোতে ভুলে যান রুক্মিণীকুমার। তখন একলা ঘরে *অসহায়, মতিচ্ছন্নের মত পায়চারি করা অথবা উপায়হীন অলসের মত চোখ মেলে চুপচাপ বসে থাকার বদলে ঘরের সবগুলি আলো জেলে দিয়ে তাদের সামনে অনর্গল কথা বলে যান। যতিহীন সেই কথার যেন শেষ নেই, শুরু নেই, এমনকি অনেক সময় চন্দ্রচূড়ের মনে হয়েছে তার মানে-ও নেই। তবু একসঙ্গে চুপচাপ বসে থেকেছে তারা. সে আর মোহিনী। নিষ্পলক রুক্মিণীকুমারের মুখোমুখি বসে তার অর্থহীন প্রলাপ শুনে গেছে। নির্বাক চেয়ে থাকতে-থাকতে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে, তার হাসি-*কান্নায় করুণ হয়ে-ওঠা মুখ, আবার সহসা অধীর, গম্ভীর, নীল হয়ে-আসা অবয়ব। কিন্তু ভুল করে অন্তত একটিবারও ভাবার অবকাশ থাকে না, এই বাড়ি-ঘর, বিপুল বৈভবের একমাত্র অধীশ্বর সে একা। এমনকি রানীর মত এই যে মোহিনী, তার ওপরেও যেন রুক্মিণীকুমারের কোনো দাবী নেই। মোহিনী যেন তার স্ত্রী নয়। তারা দুজনেই যেন আজ সন্ধ্যায় দুই বিপরীত-মুখী ট্রেনের কামরা থেকে নিতান্ত খেয়ালের বশে এখানকার মাটিতে পা রেখেছে। দুজনেই বেড়াতে এসেছে এখানে। হয়তো পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকেও নয়, মহাশূন্যে ভাসমান, বিচ্ছিন্ন দুই গ্রহ থেকে হঠাৎ এখানে এসে হাজির। আবার একদিন আচমকা ফিরে যাবে তারা। কেউ জানবে না, কাউকে জানাবে না সে-কথা। কাকেই বা জানাবে? ত্রিসংসারে আপনার বলতে কে-ই বা আছে আর? পরস্পরের কাছে-ও দূরে, দুস্তর হয়ে আছে তারা। হয়তো থাকবে চিরকাল। তাছাড়া উপায়?

'রুক্মিণীবাবু কোথায়?'

'জানিনে।'

'বেরিয়েছেন কখন?'

'কী জানি।'

মোহিনীকে বিরক্ত মনে হল। মুখে-চোখে বেদনার, তিক্ততার নিরন্ত আভা দেখে লজ্জা পেল চন্দ্রচূড়। হয়তো মোহিনীর কাছে এমন করে রুক্মিণীকুমারের প্রসঙ্গ বারবার টেনে না আনাই ভালো। কিন্তু সে যে রুক্মিণীকুমারের কাছেই এসেছে, অশ্বিনী তাকে রুক্মিণীকুমারের কাছেই পাঠিয়েছে, মোহিনীর কাছে নয়, কথাটা *কেমন করে শুনিয়ে দেবে তাকে? অন্তত না শোনালেও নয়। চিরদিন তাকে ভুল বুঝে কাছে টেনে আপন করে নিতে চেয়ে অকারণ আঘাত পাবে মোহিনী। সে কি ভালো? আর যেই পারুক, নিছক মিথ্যার প্রলেপে তাকে ভুলিয়ে রাখার কামনা অন্তত চন্দ্রচূড় ভাবতে পারে না। নিজেকে ঠিক অতখানি নিচে টেনে নামাতে গা ঘিন-ঘিন করে। চাকরি নিয়ে আসা* তার। মোহিনীকে নিয়ে মোহিনীর সঙ্গে খেলা খেলতে তো নয়। বাস্তবিক অন্যায় হয়ে গেছে। নিজেকে এখন অপরাধী মনে হচ্ছে তার। এমনি আরামে-আয়াসে চলার কথা তো নয়। চিরদিন সম্ভব হবে না তা। তাছাড়া সঙ্গতও নয়। রুক্মিণীকুমার নিজেই কি সহ্য করবেন, মেনে নেবেন অতখানি আবদার? পুরুষ হয়ে পুরুষের মন বুঝবে না, তার ঈর্ষা, স্পন্দন, লালসার খবর রাখবে না চন্দ্রচূড় কি ততখানিই বোকা? মনে-মনে অনুশোচনার অন্ত থাকে না যেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে আরো। আটটা বেজে গেছে কখন। জানলার বাইরে দূরে য়ুক্যালিপ্টাসের সারির পেছনে চোখ রাখে চন্দ্রচূড়। ঝা-ঝা রোদ্দুরে এরই মধ্যে জ্বলতে শুরু করেছে মাঠ-ঘাট, নৈবেদ্যের মত ছোট-ছোট টিলা। হাঁপাতে-হাঁপাতে রাস্তার পাশে একটা বাস এসে থামল। আদিবাসী দুটি মেয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল। গলা ঝেড়ে একরাশ ধোঁয়া আর ধুলো উড়িয়ে বাসটা ফের আগুনের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো ফিতের মতো ঝুলে-পড়া রাস্তা বেয়ে নিচে নামতে-নামতে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ কান পেতে দিগন্তে বিলীন হয়ে আস বাসের গোঙানি শুনল চন্দ্রচূড়। তারপর মাঠ দেখল, ক্লান্তিহীন মাঠের রাখাল, ইতস্ততঃ ছড়ানো-ছিটানো মহিষের পাল।

'আমাকে যদি আরো আগে জাগিয়ে দিতেন!'

আনমনা অনুচ্চকণ্ঠে আফশোস জানাল চন্দ্রচূড়। মলিন মুখে, অর্থহীন চোখ মেলে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। যেন স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে স্থির, নিশ্চল জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আর্ত, চিন্তিত এবং গম্ভীর নাবিকের মত সে এখন তীর খুঁজে পেতে চেয়ে তৎপর।

'সারারাত ঘুম হয়নি ভেবেছিলুম। কাল থেকে ঠিক সময়েই মধু এসে ডেকে তুলে দেবে।'

নিস্তেজ, নিরুত্তাপ কণ্ঠ মোহিনীর। তাকে বিবর্ণ, মলিন মনে হল। সঙ্গোপনে সে যেন কোন নিগূঢ় বেদনা লুকিয়ে রাখতে চায়। এঁটো কাপ-ডিশ পড়ে থাকে। ভুল করে চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকেও চেয়ে *দেখে না একবার। ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায় মোহিনী। যেতে-যেতে যেন আর কাউকে উদ্দেশ করে বলে, 'বেলা হয়ে গেছে বেশ। স্নানটা সেরে নিন।'*

অনেকক্ষণ তন্দ্রাহতের মত একা বিষণ্ন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। বুকের ভেতরে ভার-ভার ঠেকে তার। ধীরে-ধীরে শ্বাসকষ্টের অস্পষ্ট বোধ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে। হৃদপিণ্ড থেকে কী এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা সমস্ত শরীরে শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্কের কোষে-কোষে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। ভুলে যায়, এখানে, এই বাড়িতে কবে, কতদিন আগে সে এসেছে। এখনো তাদের পরিচয় ততখানি দীর্ঘ নয়। দিন-মাস-বছরের ব্যবধানে তারা পুরোতন হয়ে যায়নি কারো কাছে। তবু মোহি[illegible]কে মনে হয় কত ঘনিষ্ঠ, নিকট[illegible] অথচ অবর্ণনীয় দুঃসহ তার অবস্থান, উপস্থিতি। আগাগোড়া যার কোনো অর্থ খুঁজে বার করা কঠিন। সে কি চিরকাল থেকে যাবে এইখানে? মাঝে-মাঝে তাই মনে হয়। ইচ্ছে হয় পেছনের পথঘাট, নদ-নদী, বাড়ি-ঘর, বন আর বাগানের নাম-ধাম ভুলে গিয়ে, স্মৃতি থেকে শ্লেটের লেখার মত একদিন মুছে দেবে সব। কারণ, মাছির মত এইখানে মধুর সাগরে ডুবে মরতেই যে আসা তার। এমনি করেই আমৃত্যু সুখে-দুঃখে, প্রেমে-বিরহে দগ্ধ হবে সে। কখনো আগুনের মত রাঙা হবে, কখনো ছাই। এবং তাই তো পরিণাম।

বাথরুমে ঢুকে ট্যাপ খুলে দিয়ে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। চট করে মাথার ভেতরে একটা ভাবনার উদয় হয়। বিস্মিত হয়ে সে এখন ভাবে, মোহিনীর চোখেও কি ঘুম ছিল না তবে? নইলে কেমন করে টের পায়, সারারাত ঘুম হয়নি তার? চন্দ্রচূড় জেগে ছিল সারাক্ষণ? কিন্তু

কার জন্যে জাগরণ? কার কথা ভেবে? মোহিনী, তুমি কি জানো সব? সমস্ত খবরই রাখো? জানো, আজ আমার ভেতরে-বাইরে কারো নিত্য, নিত্যের আনাগোনা? আমি কী চাই? দিনে-দিনে আমাকে এমন করে অসহায়, অস্থির করে তুলেছে কে? এখন আমার ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না। কাজ আর অকাজ এক হয়ে গেছে আমার কাছে। ঘরে-বাইরে যেখানে যাই, যেখানেই থাকি, মনে হয়, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সমস্ত সুখ যেন চলে গেছে। কেন এমন হল মোহিনী, কেন এমন হল? আমাকে এমন করে কাঙাল বানিয়ে তোমার কী লাভ বলো? ভেতর কাপ-ডিশের শব্দ হল। মধু এসে এঁটো বাসন সরিয়ে সাফ করে রাখছে সব। ঘরে ঢুকে সবকিছুই ছিমছাম দেখতে পাবে চূড়। মোহিনীর নজর আছে সবদিকেই। ভীত, সন্ত্রস্ত মনে হল তাকে। রুক্মিণীকুমারের কথা মনে পড়ল। মোহিনী তাঁরই স্ত্রী। সব কথা জানাজানি হয়ে গেলে কী অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাই যে সইতে হবে! ভাগ্যিস মানুষের মন মানুষ দেখে না। নইলে মোহিনীই কি রেহাই পেতো আজ? পালিয়ে গেলেই কি মুক্তি পাবে সে? বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? এ যে পাপ! এ যে ঘোরতর অন্যায়, অপরাধ! ভাবতে-ভাবতে সে কেমন কাহিল হয়ে পড়ে। বড় ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, সহায়-হীন মনে হচ্ছে নিজেকে। এমন করে রাতারাতি পাল্টে যেতে পারে মানুষ। নিজের দিকে চেয়ে নিজেরই সংশয়। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রচূড়। সেই মানুষ আর নেই। এখন নিজের কাছেই অচেনা, সুদূর, দুরধিগম্য। এখন ঘরে ফিরে গেলে যদি আত্মবন্ধু-পরিজন কেউ আর না চেনে, চিনতে না পারে তাকে? বিস্মিত হবে না চন্দ্রচূড়। সে ছোট হয়ে যাচ্ছে। নীচ, অপদার্থ, হীন। আর এমনি করেই একদিন বিশ্বাসঘাতকের, অবশেষে আত্মহননের ভূমিকা বেছে নেবে সে। কেউ জানবে না, মোহিনীই তাকে খেলো।

সেদিন রুক্মিণীকুমার বলেছিলেন, 'ফিউচার প্রসপেক্টের আশা নিয়ে যদি এসে থাকেন, তাহলে হয়তো তেমন জোরের সঙ্গে গ্যারান্টি দিতে পারবো না। আমার এই চেহারাটা দেখেও যেন ভুলবেন না।'

বলে হেসেছিলেন। হাসতে-হাসতেই কেমন উন্মনা, গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছিল তাঁর। জীবনে কত শত দুর্লঙ্ঘ্য দুঃখময় পথ একে-একে পার হতে হয়েছে তাঁকে। এবং একাই পার হয়েছেন তিনি। হয়তো সঙ্গী ছিল না। আজকের মত সহায় ছিল না কেউ। বড় অন্ধকার, জটিল, বন্ধুর সেই পথ। সুযোগ পেলে সেই দুঃসহ স্মৃতিই কি তোলপাড় করে তাঁকে? যে-কথা কাউকে শোনানো চলে না, সে-কথা মনকে শোনাতে হয়। না শুনিয়ে যে নিস্তার নেই। মন ছাড়া অমন অকপট, উদার সঙ্গী আর কে আছে, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়? হৃদয়ের ভার লাঘব করার ঠাঁই আর কোথাও নেই। এত বড় বিশ্বে মানুষ বড় অশান্ত, বড় একা। কারো সঙ্গেই কারো মিল নেই এখানে। না বৃত্তির, না প্রবৃত্তির। কেউ চিত্ত নিয়ে মহাজন, কেউ বিত্ত পেয়ে ধনী। একসঙ্গে চিত্তের আর বিত্তের অধিকারী ক'জন? নেই। আর নেই বলেই তো দ্বন্দ্ব আছে, ধন্ধ আছে। আলো আছে। আছে আঁধার। আছে এক পেয়ে অন্যকে খোঁজার অদম্য পিপাসা। এর নাম জীবন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

'চেহারাটাই তো মস্তবড় বিজ্ঞাপন মানুষের। চেহারা দেখেই অনুমান করে নেয়া চলে, কে ধনী, কে গরীব। মানুষটা সাধু, না চোর। রাগী, না শান্ত।'

রুক্মিণীকুমার তার চোখে চোখ রাখেন। চেয়ে থাকতে-থাকতে বুঝি আপনমনে বিড়-বিড় করেন।

'অনুমানে ভুলও তো হতে পারে।'

'তাই তো বলছি।' রুক্মিণীকুমার লুফে নিলেন কথাটা। বললেন, 'সব সময় কথাটা সত্য নাও হতে পারে। অনুমানে গলদ থেকে যেতে পারে কোথাও। এই যেমন এখন আমি কিছু বুঝতে পারছিনে, আপাততঃ আমার পক্ষে ধারণা করে নেয়া দুষ্কর, আপনি মানুষটি কেমন। ভালো, না মন্দ। সৎ, না অসৎ।'

'পরীক্ষা করে নিন।'

সারামুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরে-ভেতরে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে চন্দ্রচূড়। অথচ তেমন লাজুক কিংবা ভীরু সে নয়। তবু কেন যে রুক্মিণীকুমারের এত কাছাকাছি বসেও প্রাণ খুলে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না, উৎসাহ পাচ্ছে না চন্দ্রচূড়। বরং সে যেন তাঁর কথার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। যে-কারণ ম্লান হাসি হেসে নম্র আবেদনে সে আজ নিজেকে লুটিয়ে দিতে চায়। তাছাড়া বাঁচার পথ, আত্মরক্ষার আর কোনো মন্ত্রই যে জানা নেই।

'বললেন পরিচায়তে।' বয়স্কের, বিজ্ঞের হাসি হেসে রুক্মিণীকুমার যেন চিরাগনের মতই নির্বিরোধ দিতে চান তাকে। আয়েস করে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে, আধ-খানা চোখের পাতা বুজিয়ে, ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা, কথার প্রতিটি শব্দ ওজন করে, আস্বাদ নিতে-নিতে বলেন, 'ফলটা তো আর একদিনে হয় না। বীজ থেকে ফল। আজকে যাকে বপন করা হল, একদিন সে ফল দেবে বৈকি। অবশ্য সে যদি অবশেষে নিষ্ফলাই থেকে যায়, ওই অবস্থাতেই জীবন নিঃশেষ করে যদি, মেনে নেবো ওইটেই তার ফল। আসলে তার নিষ্ফলা থাকার কারণ পরীক্ষার কারণে নিহিত। গলদ যা-কিছু ওই পরীক্ষার ভেতরেই থেকে গেছে। বপনের আগেই

শুধু পরখ করা নয়। বপনের পরেও পরিচর্যার প্রয়োজন। নতুবা রোদ লেগে পুড়ে যেতে পারে, জল লেগে পচে যেতে পারে। নজর না দিলে কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীর আহার হতে পারে। আগাছার শোষণে-নিষ্পেষণে তার দৈহিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হতে পারে। পুষ্টির অভাবে সে যদি মরে যায় তাকে দোষারোপ করা চলবে না।'

'তাহলে তো অদৃষ্টবাদীর মত সেই অনাগত ভবিষ্যতের পথ চেয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই?'

কথা পেয়ে চন্দ্রচূড় যেন উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে মত্ত হয়ে ওঠে। সহজ সুরে কথা বলতে চেয়ে সে বরং অস্বাভাবিক সুরে চেঁচিয়ে ওঠে খানিক। যা শুনে সন্দেহে, বিস্ময়ে রুক্মিণীকুমারের পক্ষে চমকে না ওঠাই শোভন, সঙ্গত, রুচিকর। মনে-মনে তিনি *তা জানেন বলেই কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে থাকেন। তারপর স্পষ্ট অথচ মন্থর গলায় ব্যক্তিত্বের সেই নিপুণ, গম্ভীর ধ্বনি শোনা যায়।*

'নেই ঠিকই। তবে তাকে সার্থক, ত্বরান্বিত করার মূলে থাকবে মানুষের সদিচ্ছা, নিরলস কর্মের শুভ প্রেরণা। তা না হলে সেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎও সাফল্যের ডালি নিয়ে বিরস বদনে ফিরে যাবে। আমরা তাকে স্পর্শের অধিকারটুকু অবধি পাব না।'

রুক্মিণীকুমার চুপ করলেন। উদাস, নিষ্পলক চোখে যেন বহুদূরে কোনো দৃশ্যের ভেতরে কাকে খোঁজেন। তাঁকে বিষণ্ণ, গম্ভীর মনে হয়। আশায়-স্বপ্নে দোদুল্যমান অতীতের সেই ক্লান্তিহীন দিন-রাত্রির স্মৃতিই বুঝি আবিল, আরক্ত করে তাঁকে।

'আমাকে কী মনে হয়, ভীরু, অলস, অকর্মণ্য, দুর্বল?'

'বলেছিতো, ধারণাটা সব সময় সত্য না-ও হতে পারে। তাই না দেখে, না বুঝে মন্তব্য করা অশোভন, অসঙ্গত।'

কথা শুনে দমে যায়। সব কথা হারিয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় চন্দ্রচূড়ের। রুক্মিণীকুমার কি সেই নির্দেশ, ভয়াবহ পরিণতির দিকেই আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে চাইছেন? বোঝাতে চাইছেন, সহজ-সরল সত্যের চেয়ে কঠিন, নির্মম আরেক ভবিতব্যের কথা যা তার প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় এবং স্মৃতিতে বিদ্যমান? ইদানীং তাকে যেন কুঁড়ে খাচ্ছে, শূন্য করে দিতে চাইছে সেই দুঃসহ ভাবনা।

বয়স যথেষ্ট হয়েছে। কত তা অনুমান করা কঠিন। কথা শুনে, চোখে দেখে আচমকা আঁচ করে নেবার উপায় অবধি *নেই। দেহের বাঁধুনি এমনি অটুট। ক্লান্তির ছাপ লাগেনি কোথাও। শৈথিল্যের চিহ্ন ফোটেনি। এখনো মোটর সাইকেলে চেপে গোটা তল্লাট তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ান।* উদয়াস্ত আগের মতোই যে খাটতে হয় তাঁকে। কোয়ারির কোথায় কতটুকু পাথর কাটা হয়েছে, কোথায় নতুন গ্রেড দেখা দিয়েছে, আর কতদূর এগিয়ে গেলে আসল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে তিনি তা জানেন, সব তাঁর নখদর্পণে। নিজের হাতে মাল ঝাড়াই-বাছাই না করে যেন তৃপ্তি নেই। পকেটেই শীলমোহর আছে। গালা, মোম সব কিছুই সঙ্গে থাকে। ব্লাস্টিং হয়ে গেলে সুদের মুখে এসে দাঁড়ান। হয়তো তখনো ধুলো-ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারদিক। অতশত ভাবলে কি চলে? উল্লাসে, উদ্দীপনায় তিনি তখন মরিয়া। মাঝে-মাঝে পাগলের মত অন্ধকার খাদের ভেতরে ছুটে যান। গোফের কাছে দাঁড়িয়ে মাল কাটা, কুলি-কামিনের কাজের তদারকি করেন। আবেগে, উত্তেজনায় সমস্ত শরীর যেন থর-থরিয়ে কাঁপে। রক্ত যেন টগবগিয়ে ফুটতে থাকে তখন। এমন গম্ভীর রাশভারি মানুষ। অথচ ভুলে যান তাঁর মান-সম্মান-মর্যাদার কথা। কুলি-কামিনের হাতে হাত লাগিয়ে রুক্মিণীকুমার তখন পাথর সরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিছু যেন গুঁড়িয়ে না যায়, ভেঙ্গে না যায়। গুঁড়িয়ে গেলেও ফেলে রাখা যাবে না। সব কিছুই গাড়ি বোঝাই হবে। গুদামে চলে যাবে। ফেলা কি যায়! এ যে অভ্র। টাকায় টাকা এনে দেবে! যার সঙ্গে তাঁর সুখ, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁর জীবন জড়িয়ে আছে। সমস্ত হৃদয় দিয়েই নয়, গোটা জীবনের বিনিময়ে তিনি আজ এই পাথর-মাটির গহ্বরে আটকা পড়ে গেছেন। এই অন্ধকার থেকে মুক্তি নেই তাঁর। তিনি তা চান না। পেলে মরে যাবেন। বরং এই কুলি-কামিনের পেছনে ঘুরে বেড়ানো ঢের সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক মনে হয় এখন। তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে তিনি কেবল খুঁজে বেড়ান, কোথায় নতুন থেডের দেখা মেলে। তাহলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মৃত্তিকার জঠর খোঁড়া শুরু হবে আবার। আবার উন্মত্তের মত চীৎকার, ছোটাছুটি। শিশুর মত আনন্দে-আবেগে নেচে ওঠা। তখন আর চেনা যাবে না তাঁকে। বেশে-বাসে, আচারে আচরণে একেবারে অন্য মানুষ রুক্মিণীকুমার।

আর ঘরে কিংবা আপিসে ফিরে গেলে চেনাই যাবে না। চোখে দেখে, কথা শুনে বলাও যাবে না, কোয়ারিতে কি দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। ফাঁকি দিয়ে তাঁকে এড়িয়ে কিছুই ঘটে [illegible] কোথাও। ঘরে-বাইরে তাঁর [illegible] সমান সজাগ। চোখের [illegible] রাখলেও তিনি বুঝি দেখতে পান। যেন তাঁর শ্রুতির অগোচরে কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই যা দিয়ে ভুল করে হলেও অন্তত মুহূর্তের জন্যে তাঁকে প্রতারণা করা যায়। লোকে তাই একই সঙ্গে ভয় করে, শ্রদ্ধা *করে, আবার ঘৃণাও করে তাঁকে। তিনি তো ইট-কাঠ পাথরের মত নিরেট, নিষ্প্রাণ নন। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী সচল, শক্তিমান, সক্ষম এবং জীবন্ত।* কিন্তু সংসারে আর দশটা মানুষের মত অকারণ মুখর, প্রগলভ নন বলেই কি তাঁকে সমস্ত হিসেবের বাইরে রাখা যায়, স্নেহ-প্রেম ভালোবাসার তালিকা থেকে খারিজ করে দেয়া সম্ভব তাঁর নাম, তাঁর পরিচয়? হয়তো না। মানুষ তাঁকে আজ অবধি জানা কিংবা বোঝার অবকাশ পায়নি বলেই কি বলা চলে, তিনি নিষ্ঠুর অমানুষ, হৃদয়হীন? অথচ তিনিই জানেন কী দিয়ে, কেমন করে মানুষের মত বেয়াড়া বেয়াদপ, সামাজিক জীবগুলিকেই পো মানিয়ে আসল কাজ হাসিল করে নিতে হয় অমন যে কাঁড়রাম, বচনে-বাচনে [illegible] মেলা ভার, রুক্মিণীকুমারের কাছে এ তাকেও মুখ বুজে কথায় আগলে কুলুপ এঁটে থাকতে হয়। এ ভারি বিচিত্র ব্যাপার সহজ কথার স্বচ্ছন্দ জবাব দিতে গিয়ে মাথা চুলকে নিতে হয় পাঁচবার। লা মাহাতোর মত ডাক সাইটে দাঙ্গাবাজ ত কাছে এসে কেঁচো হয়ে যায়! সোনার মাঝি বলে, দেওতা, ধোঙা ঠাকুর! বাঘ অ গোরুকে একই ঘাটে জল খাওয়াবার চিরন্তন মন্ত্রই কি তাহলে শি নিয়েছেন তিনি? তবে মোহিনীর কাছে এ কিংবা মোহিনীই কাছে এলে নিজে নিরুত্তাপ হয়ে যান? নাকি সব ক্লেদ স দেহের সমস্ত ক্লান্তিই মুছিয়ে নিতে অ তাঁর? মোহিনীর ছায়ায় শীতল, নি হতে আসা? আবার পুরোপুরি জু যাবার আগেই কেমন উন্মত্তের মত ছু বেরিয়ে যান, পালিয়ে যান কোথায়! যা উষ্ণ, উত্তপ্ত কর্মের প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়া বিশ্রামে কি শান্তি আছে আর?

(ক্রমশ

বিজ্ঞানের কথা

টেরো-সয়ার ঃ বিশ্বের প্রথম উষ্ণশোণিত নভশ্চর

টেরোসয়ার নখরের সাহায্যে গাছে উঠছে।

পৃথিবীতে প্রাণীর প্রথম আবির্ভাবকাল থেকে যুগে যুগে নানা বিচিত্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং কালক্রমে তাদের অনেকগুলি আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সব অতিকায় প্রাণী পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত, বা মহাকাশে উড়ে বেড়াত তাদের কারো কারো কঙ্কাল মিউজিয়ামে দেখা যায়, অথবা ফসিল বা জীবাশ্মরূপে তাদের কারো কারো নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই রকম একটি প্রাণী হচ্ছে টেরো সয়ার বা টেরো-ডাকটাইল। এটি হচ্ছে বিশ্বের প্রথম উষ্ণশোণিত নভশ্চর। দশ কোটি বছর আগে এই বিচিত্র প্রাণীটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এবং সাত কোটি বছর আগে ক্রেটাসিয়াস যুগে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়। পর্বত গাত্রে এদের ফসিল বা জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই বিচিত্র প্রাণীটির জীবনযাত্রার মধ্যে এমন কয়েকটি রহস্য আছে যার সমাধান আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি।

ডানাবিশিষ্ট এই নভশ্চর প্রজাতির মধ্যে চড়ুই পাখির মতো ক্ষুদ্রাকৃতি 'টেনোড্র্যাকন' থেকে আরম্ভ করে ২৭ ফিট দীর্ঘ ডানাবিশিষ্ট 'টেরানোডন' পর্যন্ত ছিল। এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘকায় পাখি হচ্ছে অ্যালব্যাট্রস। এর ডানার দৈর্ঘ্য ১২ ফিট অর্থাৎ টেরানোডনের ডানার তুলনায় প্রায় অর্ধেক। বিবর্তনের ফলে সকল প্রাণীরই আকৃতি আজ পরিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তনকালে বিভিন্ন আবাসস্থলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে টেরো-সয়ার শ্রেণীর নভশ্চরদেরও আকৃতি পরিবর্তিত হয়—বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের উড্ডয়নের উপযোগী তারা হয়ে ওঠে।

আমরা জানি, পাখির ক্ষেত্রে মূলত কেবল দু ধরনের উড্ডয়ন দেখা যায়। প্রথম রকম হলো ডানা নাড়িয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া। অপরটি হল ডানা স্থির রেখে শুধু বাতাসে ভেসে থাকা। এক্ষেত্রে ওড়ার শক্তি আসে বাতাস থেকে।

বাস্তবক্ষেত্রে পাখিরা সম্পূর্ণ ডানা নাড়িয়ে অথবা সম্পূর্ণ ডানা স্থির রেখে বাতাসে উড়তে পারে না। চড়ুই পাখি প্রধানত ডানা নাড়িয়ে ওড়ে। তবু সময় সময় তাদের ডানা স্থির রেখে ভেসে বেড়াতেও দেখা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালব্যাট্রস প্রধানত বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তবু কখনও কখন তাদের ওড়ার জন্যে ডানা নাড়তে হয়। পাখির ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটেছে হয় ডানা নাড়ার দিকে, অথবা ডানা স্থির রেখে ভেসে বেড়ানোর দিকে।

টেরো-সয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আদিযুগে তারা ডানা নাড়ার উপযোগী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী যুগে তারা ভেসে বেড়ানোর উপযোগী হয়ে ওঠে। অতিকায় টেরানোডন প্রজাতি ছিল সুনিপুণ গ্লাইডার অর্থাৎ তারা অবলীলাক্রমে ডানা স্থির রেখে দীর্ঘ সময় আকাশে ভেসে বেড়াতে পারত। পরবর্তীকালে মানুষ যে কৃত্রিম গ্লাইডার উদ্ভাবন করেছিল তার মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল টেরানোডন প্রজাতির নভশ্চরের মধ্যেও সে সব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে টেরানোডন পরিপূর্ণ গ্লাইডারের খুব কাছাকাছি এসেছিল।

নিপুণ গ্লাইডারের দেহভার হবে লঘু এবং তার সঙ্গে থাকবে বিপুল পক্ষ বা ডানা। দেহের লঘু ভারের ফলে নিমজ্জন বা নিচে নেমে আসার গতি হ্রাস পায় এবং দীর্ঘকাল বাতাসে ভেসে থাকা সম্ভব হয়। টেরানোডন তার বিবর্তনকালে সম্ভাব্য সকল উপায়ে দেহভার একেবারে কমিয়ে এনেছিল। তাদের কঙ্কালের অস্থি ছিল অতি ক্ষীণ এবং নভশ্চরদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু ও ফাঁপা অস্থি ছিল তাদের। তাদের লম্বা ডানার অস্থি ব্লটিং কাগজের চেয়ে পুরু ছিল না। টেরো-সয়ারের ডানার ফাঁপা অস্থির তুলনায় পাখিদের বায়ুপূর্ণ অস্থি অনেক বেশী ভারী। অস্থি হ্রাসের ফলে টেরানোডন সমস্ত দাঁত হারিয়ে ফেলে এবং তার পরিবর্তে পাখিদের মতো ছুঁচলো হালকা ঠোঁট ছিল। আদিম টেরো-সয়ারদের ল্যাজ পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয় এবং পশ্চাৎ ভাগের লম্বা অঙ্গ হ্রাস পেয়ে ধরবার হুকে পর্যবসিত হয়।

ডানা নেড়ে উড়ে বেড়াতে মাংসপেশীতে যতটা শ্রম হয় আকাশে ভেসে বেড়াতে

তার চেয়ে অনেক কম শ্রম হয়। টেরো-সয়ার তাদের কতকগুলি উড্ডয়ন-পেশীর ভার কমিয়ে দেহকে আরও লঘু করে তোলে।

বাতাসে ভেসে বেড়ানোর জন্যে দেহের ভার লঘু হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি দেহের কোন কোন অঞ্চলে শক্তি বজায় রাখাও প্রয়োজন। বক্ষাস্থি, গলদেহের অস্থি এবং মেরুদণ্ডের অস্থি জুড়ে একটি শক্ত কাঠামো টেরানোডনের বিরাটাকার ডানায় শক্তি জোগায়। বস্তুত, টেরানোডনের সমস্ত দেহ একটি শক্ত কোঠরের মতো কাঠামো হয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে লম্বা ডানা, মাথা ও পশ্চাৎ ভাগের ক্ষুদ্র পা সংযুক্ত হয়েছে।

এই বিরাটাকার টেরো-সয়াররা কিভাবে মাটি থেকে আকশে উঠত সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে একটা সমস্যাস্বরূপ। কারণ তাঁরা মনে করেন, মাটি থেকে ওঠার আগে এই প্রাণীদের যথেষ্ট গতি অর্জন করতে হত। আকাশ থেকে কিভাবে তারা মাটিতে নামত, সেটাও একটা সমস্যা। দ্রুতগতিতে নামলে মাটিতে পড়ে তাদের হাড়গোড় একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে যা সমস্যা বলে মনে হয়, টেরানোডনের কাছে তা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি।

টেরানোডনের পক্ষে বোধ হয় মাটি থেকে ওপরে ওঠা ও ওপর থেকে মাটিতে নামা সহজসাধ্যই ছিল। মাটি থেকে ওঠার জন্যে টেরানোডন শূন্যে ওড়ার ওপর প্রধানত নির্ভর করত। নিমজ্জনের ক্ষীণ গতির দরুণ অল্প বাতাসেও তাদের ওপরে ওড়ার সুবিধা হত। পাহাড়-পর্বতের *চূড়ায় উড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী ছিল, তবে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের ওপরও তারা ভেসে বেড়াত। বস্তুত, সুনিপুণ গ্লাইডারের মতো টেরানোডন* মাছের সন্ধানে *ক্রেটাসিয়াশ সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়াত। পর্বতচূড়ায় তাদের বাসায়* যখন তারা ফিরে আসত তখন তারা এত আস্তে আস্তে নামত যে দেহে কোন আঘাত লাগত না।

বাতাসে ভেসে ও উড়ে বেড়ানোর পাখিদের দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণী হল যারা স্থলভাগের ওপর উড়ে বেড়ায়, যেমন শকুন। আর এক শ্রেণী হল যারা সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়ায়, যেমন অ্যালব্যাট্রস। যারা সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়ায়, তাদের ডানা লম্বা ও সরু আকৃতির। টেরানোডনে এই রকম ডানা দেখা যায়। তাদের ডানা প্রসারিত করলে তার কাঠামো দাঁড়ায় অনেকটা অ্যালব্যাট্রস বা সামুদ্রিক চিলের মতো। সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়ানো থেকে স্থলভাগের ওপর উড়ে বেড়ানোর তফাৎ হচ্ছে এই যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে উষ্ণ বাতাস ঊর্ধ্বে উঠে পাখিকে বাতাসে উড়ে বেড়াতে সাহায্য করে। ঊর্ধ্বগামী এই উষ্ণ বাতাসকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'থার্মাল'। এই থার্মালের সাহায্যে বাতাসে উড়ে বেড়াতে হলে নিমজ্জনের গতি খুব কম হওয়া দরকার এবং সেই সঙ্গে নভশ্চরের সহজে বাঁক নেবার ক্ষমতাও থাকা দরকার। টেরানোডনের নিমজ্জনের গতি কম। কিন্তু তাদের ডানা পেশীবহুল কাঠামো। এজন্যে তারা ডানার আকার এমনভাবে সংকুচিত করতে পারত যা পালকবিশিষ্ট পাখির পক্ষে সম্ভব নয়। স্থলভাগের ওপর বা সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়াবার সময় প্রয়োজন মতো ডানার আকৃতি পরিবর্তিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা টেরানোডনের ছিল বলে মনে হয়।

টেরানোডনের মণিবন্ধে 'টেরয়েড' নামে বন্ধফলকের (অস্থি ভেঙে গেলে যে কাঠের টুকরো ব্যবহার করা হয়) মতো একটি অস্থি দেখা যায়। এই অস্থির উপযোগিতা কি তা এখনও পর্যন্ত ঠিক-ভাবে জানা যায় নি। এই অস্থি দেহের নিচের দিকে গলা বরাবর একটি ঝিল্লীর অংশকে ধরে রাখে। মনে হয় এই অতিরিক্ত ঝিল্লী অংশ কয়েকটি কাজের জন্যে ব্যবহৃত হত। মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার সময় এই টেরয়েড ঝিল্লী এমন কোণে ধরা থাকত যে ডানার নিচে বহমান বাতাস থেকে ভেসে বেড়ানোর সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া যেত। টেরানোডন যখন বাতাসে ভেসে বেড়াত, তখন টেরয়েড ঝিল্লী বাতাসে 'ব্রেক'-এর মতো কাজ করত এবং তার সাহায্যে তারা পাশ ফিরতে পারত। মাটিতে নামবার সময়ও টেরয়েড ঝিল্লী ব্যবহৃত হত। টেরানোডন যখন মাটিতে নেমে আসত, তখন তারা বোধ হয় ঝিল্লীর পিছনের অংশ-সমেত পা দুটিকে এগিয়ে আনত এবং তারপর সমগ্র ডানাকে বাঁকিয়ে ফেলত। যখন টেরয়েড সামনের দিকে এবং সামান্য নিচের দিকে ধরা থাকত, তখন ডানার *প্রান্তভাগ বেঁকে যেত। এর ফলে ডানার ওপর দিকে বাতাস শান্তভাবে বয়ে যেত এবং অসুবিধাজনক বাতাসের ঢেউ সৃষ্টি হত না। এ জন্যে অতি ধীরে ধীরে টেরানো-ডন মাটিতে নামতে পারত।*

কিন্তু অঙ্গ সংস্থানের দিক থেকে কোনো প্রাণী উড্ডয়নের যতই উপযোগী হয়ে ওঠে, তার সংজ্ঞাতন্ত্র বিকাশের ক্ষমতা সীমিত হয়। উড্ডয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে চোখ ও ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। টেরো-সয়ারে এই অঙ্গগুলি এবং মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি বিশেষ উন্নত ধরনের। বর্ণ নির্ণয়ের দৃষ্টিশক্তিও হয়তো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই দৃষ্টিশক্তির দরুণ নভশ্চররা দূরে থেকে বস্তু দেখে তা তুলে নিতে পারে। পাখিদের বর্ণ নির্ণয়ের দৃষ্টিশক্তি প্রখর। টেরানোডনের লঘু মস্তিষ্কের অবস্থা বিচার করে বলা যায়, তাদের ভারসাম্য রক্ষার সংজ্ঞা বেশ উন্নত ছিল। লঘু মস্তিষ্কই প্রাণীর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। টেরানোডনের লঘুমস্তিষ্কের আকৃতি ও সংস্থানের দিক থেকে পাখিদের মতো। বস্তুত টেরো-সয়ারের সুনিপুণ উড্ডয়ন শারীরস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ গড়ে উঠেছে। তাদের গুরুমস্তিষ্কও পাখিদের মতো। মস্তিষ্কের করোটি উঁচু ও গোলাকার। এর ফলে টেরো-সয়ারে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছিল।

টেরো-সয়ারকে সাধারণত সরীসৃপ বলে ভাবা হয়। কিন্তু পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো তারা সক্রিয় উষ্ণ শোণিত প্রাণী। উড্ডয়ন হচ্ছে প্রাণীর একটি শ্রম-সাধ্য ব্যাপার। টেরো-সয়ারের উচ্চ বিপাক-ক্রিয়া থেকে যে তাপ উৎপন্ন হত তা তাদের পুরু লোম বা পশমের আচ্ছাদনে সংরক্ষিত থাকত। টেরো-সয়ারের দেহে যে লোমপূর্ণ আচ্ছাদন ছিল তার সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গেছে একটি সাম্প্রতিক প্রত্ন-তাত্ত্বিক আবিষ্কারে। এই আবিষ্কারে এমন একটি ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যাতে পশমপূর্ণ আচ্ছাদনের চিহ্ন সুস্পষ্ট-ভাবে বর্তমান।

টেরানোডনের অঙ্গুলিতে যে নখ দেখা যায় তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নখ বিশেষ কাজের জন্যে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। এই নখের সাহায্যে তারা গাছে বা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করত। গত শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করতেন, এই নখের সাহায্যে পুরুষ টেরানোডন মিথুনের সময় স্ত্রীকে ধরে রাখত। কিন্তু অজকাল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই নখের সাহায্যে টেরানোডন আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ করত। এই নখ দিয়ে তারা সম্ভবত গায়ের পশমপূর্ণ আচ্ছাদন পরিষ্কার করত, আমরা যেমন ঝাঁটা দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে থাকি।

কিন্তু একটি প্রশ্ন আজও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে—এত দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বসবাস করা সত্ত্বেও টেরো-সয়ার *ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও তাঁরা খুঁজে পাননি। তাঁদের একটি অনুমান হচ্ছে: এই* অতিকায় গ্লাইডার নভশ্চরের জীবনযাত্রা এমন বিশেষ পরিবেশে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট বাস্তু সংস্থানের পরিবেশেই তারা বেঁচে থাকতে পারত এবং পরিবেশে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত না। আর একটি অনুমান হচ্ছে, পাখিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টেরো-সয়ার পেরে ওঠে নি। সম্ভবত কোনো সমুদ্রগামী পাখী প্রজাতি এসে টেরানোডনের পরিবেশ অধিকার করে বসে। এই পাখিরা টেরানো-ডনের মতো একই ধরনের মাছ হয়তো খেত, অথবা পর্বতচূড়ার বাস থেকে টেরো-সয়ারদের হাটিয়ে দেয়।

কিন্তু এ সবই হচ্ছে অনুমান মাত্র। আমরা বোধ হয় কোনোদিনই টেরোসয়ারের অবলুপ্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারব না। তবে বিমান বিজ্ঞানের পক্ষে এটা পরম আক্ষেপের বিষয় যে, এই সুনিপুণ গ্লাই-ডার নভশ্চর আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে একে-বারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যশোয়ন্ত এক এক চুমুকে এক-এক
। শেষ করতে লাগল। অন্ধকারে ওর
। দুটো চিতাবাঘের মত জ্বল-জ্বল
তে লাগল। মাঝে মাঝে বাঁ-হাতের
লা দিয়ে গোঁফটা মুছে নিতে লাগল।
শীতটা কমে এসেছে, তবে এখনো
ড়ে আছে। কলকাতার ডিসেম্বরের
ও বেশী শীত।

আজ রবিবার। সকালে বারান্দাতে
ছিলাম কাগজ নিয়ে। মাঝে-মাঝে
রের কাগজ আনিয়ে পড়ি ডাল্টনগঞ্জ
ক। রোজকার কাগজ প্রায়ই পড়া হয়
কাগজ পড়া ভুলেই গেছি। রবিবারের
গজ আনাই মালদেও বাবুদের ট্রাক
ভারে মারফৎ। একদিনের কাগজেই গত
দিনের খবর আস্বাদন করি।

যশোয়ন্ত বলত, পৃথিবীর কোন কোণায়
শ হচ্ছে, কোথায় লোক না খেতে পেয়ে
ছে, কোথায় লোক বেশী খেতে পেয়ে
য় এত সব খবরে তোমার কি দরকার
র? খাও-দাও, কান পেতে মৌচুসী
খির শিস শোনো, নয়ত চল বন্দুক কাঁধে
র বনে-পাহাড়ে এক চক্কর ঘুরে আসি—
বে দিল খুশ হয়ে যাবে। আমরা
করছি রাজনীতি, না বসাচ্ছি পাবলিক
র্ভিস কমিশানের ইন্টারভিউতে—কি হবে
ছোট মাথায় অত সব অবান্তর প্রসঙ্গ
পিয়ে?

প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে কত তর্ক করেছি
তারপর নিজের অজান্তে কখন দেখেছি—
গজের জন্যে আর তেমন অভাবই বোধ
রি না। যেমন কোলকাতায় করতাম—ভোর-
লার চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না পড়লে
ন হতো কি একটা কর্তব্য কর্মই করা
লা না।

তাছাড়া, এখানে খবরের কি অভাব
য়? কার গরু মরেছে সাপের কামড়ে,
ন, কূপে কর্পাসিং ফেলিং শুরু হয়েছে,
থায় বাঘের অত্যাচারে বাঁশ কাটা কাজ
পুরির বন্ধ আছে; কোথায় কোন বুড়ো
ও হাঁড়িয়া খেয়ে কার মাথায় টাঙ্গি
রেছে, কোথায় কোন মেয়েকে ভেজ্জা-
র পর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এমনি
কত শত খবর। কেবল কাগজই ছাপা হয়
না—কিন্তু খবরের অভাব কোথায়?

গেটে একটি ট্রাক থামল। ড্রাইভার নেমে
এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে গেল।
শিরিনবুরু থেকে মারিয়ানা লিখেছে।
ছোট্ট চিঠি।

গোতমবাবু,

আগামী কাল কি কোনো জরুরী কাজ
আছে? একবার আসেন যদি, ত খুব ভাল
হয়। বড় একা একা লাগে। রাতটা থেকে
পরদিন বিকেলেই আবার রওনা হয়ে
চলে যাবেন। কোনো খবর পাঠানোর দরকার
নেই। চলে আসবেন। আসতে পারলে খুব
খুশী হব।—আপনার মারিয়ানা।

কিছুই ভাল লাগছিল না। চুপচাপ
বসে ভাবছিলাম যে এক মুহূর্তবাহী হঠ-
কারিতায় ভর করে এই রুমান্ডিতে এসে
উঠেছিলাম—আর এক মুহূর্তবাহী হঠকারি-
তার পরিণাম হিসাবে হয়ত রুমান্ডি ছেড়ে
চলেও যেতে হবে। কেন জানি, আস্তে
আস্তে অবচেতন মনে কেমন একটা বিশ্বাস
জন্মেছে, যে ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দেবেই।
রাখবে না। বিশেষ করে আমার ইমি-
ডিয়েট বস ঘোষদা যখন আমাকে
তাড়াতে চান। অন্তত যশোয়ন্ত ত
এ ব্যাপারে ঘোষদার উপর একে-
বারে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। জানি না,
হয়ত এর পেছনে আরো বড় কোনো হাত
আছে, যে হাত কোলকাতায় হুইটলী সাহেব
পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আর একসটেনশান
পাব বলে ভরসা নেই।

কোলকাতাতেই যদি এই চাকরী করতাম
তবে হয়ত এই বিষাদ আসতো না। সেখানে
বেশীর ভাগ বেসরকারী অফিসের চাকরী ত
ছাড়ার জন্যেই। কিন্তু তবু, সেখানে আমার
আজন্ম পরিবেশ, আমার আশৈশব অভিজ্ঞ-
তারই পুনরাবৃত্তি হত। কিন্তু এই রুমান্ডিতে
যে নির্জনতা, যে প্রাকৃতিক ঔদার্য, যে
সবুজ শালীনতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি--
যে উৎসারিত আনন্দের আমি অংশীদার
হয়েছি—যে আত্মমগ্নতায় আমি নিমগ্ন হয়েছি
তা থেকে রাতারাতি আমাকে কোলকাতায়
কেউ উপড়ে নিয়ে ফেললে আমার কষ্ট হবে
—আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে ডিজেলের
ধোঁয়ায়। মেকি ভদ্রতায় দম বন্ধ হয়ে যাবে।

ঝোক্কোজাই থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায়
চারটে বেজে গেল। শেষ শীতের বিকেল—
চারটে অনেক বেলা।

সোনালি রোদের বালাপোষ মুড়ে বন-
পাহাড় শেষবারের মত গা-ভাতিয়ে নিচ্ছে।
ক্ষেতে ক্ষেতে কিতারী, বাজরা ধান, গেঁহু
সব কিছুই প্রায় কেটে নেওয়া হয়েছে।
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে আশাবাদী চড়ুইগুলো
তবু শূন্য ক্ষেতে দল বেঁধে স্বপ্ন দুপুরে
চঞ্চল ভাবনার মতো মুঠো মুঠো উড়ে
বেড়ায়। বুলবুলি পাখিরা কেয়াউজা ঝোপের
ডালে বসে শিস দেয়—ছোট ছোট মৌসুমী
পাখি সুন্দরী মেয়ের চোখের তারার মত
স্পন্দিত হয় ফুলে ফুলে। টুনটুনি পাখির
বড় দেমাক। গান গায়, কি গায় না।

জীপ বেশ জোরে চালিয়ে চলেছি।
শিরিনবুরুতে এখন মারিয়ানার বাংলো
অবধি জীপ যায়। আমরা প্রথমবার গিয়ে-
ছিলাম বর্ষাকালে—তখন পথ অতি দুর্গম
ছিল এবং পথের একটি নদী পেরুনো যেত
না। পুজোর পর থেকে সে নদীর উপর দিয়ে
জীপ চালিয়ে চলে যাওয়া যায়।

সাড়ে সাতটা বাজে। মারিয়ানার বাংলোর
দোতলায় আলো জ্বলছিল। একতলায় সব
বাতি নিবোনো। গেটের কাছে জীপটি
থামতেই কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে উঠল।
মারিয়ানা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল।
চৌকিদার গেট খুলল।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মারিয়ানা নেমে এল।
একতলার বারান্দার বাতি জ্বালল। একটি
ফলসা পেড়ে সাদা শাড়িতে মারিয়ানাকে
রোগা, করুণ ও অনেক বেশী সুন্দরী বলে
মনে হল।

ও বলল, সত্যিই এলেন। ভেবেছিলাম,
আসবেন না। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে
শুধোলাম, এরকম ভাবনার কারণ?—কোনো
কারণ নেই। এমনই ভেবেছিলাম। এক্ষুনি
খাবেন? না এখন কফি-টফি কিছু খেয়ে
রাতের খাবার পরে খাবেন। রোজ কখন
খান রাতে?

রোজ ত ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে শয়নে
পদ্মলাভ। আজকে এখন কফি খেয়ে পরেও
খাওয়া চলতে পারে। মারিয়ানা, যে ঘরে
ঘোষদা-বৌদি প্রথমবার এসেছিলেন, সে ঘরে
আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছে। ওর ঘরের
পাশেই। বলল জামা-কাপড় বদলে হাত
মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি।

মারিয়ানা নিজে হাতে ওমলেট ও কফি
বানিয়ে দিল খাবার ঘরে স্টোভ ধরিয়ে।
আমরা দোতলায় খাবার ঘরেই বসে বসে
গল্প করতে লাগলাম। বাইরে এখনো বেশ
ঠান্ডা।

শুধোলাম, হঠাৎ তলব করলেন যে? খুব
একা একা লাগে, না?

একা একা ত বেশ অনেকদিন থেকেই
আছি—সেটাতে ত অভ্যস্তই হয়ে গেছি।
কিন্তু এবারে কোলকাতা থেকে ফিরে এসে
একেবারে অসহ্য লাগছে, একেবারে অসহ্য।
সুগতকে পুড়িয়ে এলাম।

আমি একটু আশ্চর্যরকম কঠিন হয়েই বললাম, ভদ্রলোক যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন আপনি কিন্তু রাণীর মত মাথা উঁচু করে বেড়াতেন—আজ উনি যখন নেই—আপনাকে কাঙালিনীর মত মনে হচ্ছে কেন?

আমার কথাতে মারিয়ানা খুব অবাক ও বিব্রত হয়ে আমার চোখে তাকাল। কিন্তু উত্তরে কিছু বলবার আগেই, আমি কোটের পকেট থেকে সুগতবাবুর রক্তমাখা চিঠিখানি বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম নিন, এই সুগতবাবুর শেষ চিঠি। আপনাকে লেখা।

মারিয়ানা ভীষণ আশ্চর্য ও কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে আমার দিকে তাকাল—তারপর কম্পমান হাতে চিঠিটা খুলল। কালো কালো দাগ দেখে শুধোল, এগুলো কিসের দাগ?

আমি নিষ্ঠুর গলায় বললাম, সুগতবাবুর রক্তের।

আমি কেন এবং কি করে এমন নিষ্ঠুর হলাম আমি আজও জানি না।

ঝরঝরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মারিয়ানা *চিঠিটা পড়তে লাগল। মারিয়ানা যখন সুগতবাবুর মাথা কোলে নিয়ে জীপে বসেছিল কুটকু থেকে ডাল্টনগঞ্জ যাবার সময়—তখনো এমনিভাবে কাঁদেনি।*

তারপর ও চিঠিটা পড়া শেষ করে, ভাঁজ করে নিজের সামনে রাখল। জলভরা চোখে আমাকে শুধোল, আপনি তাহলে সব জানেন?

আমি বললাম, সব জানি কিনা জানি না, তবে এর আগে আমাকে পাঠানো বইয়ের মধ্যে অসাবধানে রাখা যে চিঠি ছিল, সেটি পড়েছিলাম এবং এইটি দেখলাম। তাতে যতটুকু জানা যায় জেনেছি। তবে আমার ধারণা এর চেয়ে বেশী কিছু জানার নেই। সেই চিঠিটা পড়ে খুব অন্যায় করেছিলাম সত্যি, কিন্তু পড়েছিলাম বলেই আজকে আপনার দুঃখের গভীরতা বোঝার জন্য অন্তত একজন লোকও এখানে পেলেন। সেইটে নিশ্চয়ই কম কথা নয়। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। একথা অন্য কেউ জানবে না।

মারিয়ানার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল—ইউক্যালিপটাস গাছের মত সোজা হয়ে বসে বলল, আমি কাউকে কেয়ার করি না।

তখন ওকে দেখে আমার হাসি পেল, আমি বললাম, তাই বুঝি? এত সাহস সুগতবাবু বেঁচে থাকতে কোথায় ছিল? তখন এ সাহসের ছিটে-ফোঁটা থাকলে উনি হয়ত মরতেন না।

মারিয়ানা কথা বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সুগতবাবুর চিঠিটা আরেকবার খুলল, আবার বন্ধ করে রাখল।

মারিয়ানা তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, আপনারা পুরুষমানুষেরা, বড় অবুঝ। আমাদের দিকটা কোনোদিন আপনারা বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না।

কোনো উত্তর দিলাম না। ঘড়িটার টিক-টিক টিক শুনতে লাগলাম।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে মারিয়ানা জানে না যে নিজের [illegible] নিজের ঠুনকো বিবেকের সঙ্গে, [illegible] আজন্ম সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ও এক-সময় হেরে গেছে। কিন্তু সেই পরাজয়টা বড় দেরীতে এল।

শুলাম যখন, তখন প্রায় বারোটা। বাইরে নিশুতি রাত। গ্রামের কুকুরগুলো সমস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে—শম্বর-টম্বর দেখে থাকবে। অনেকখানি গাড়ি চালিয়ে এসেছি, তাছাড়া এত রাত করা অভ্যাস নেই। বেশ ভাল ঘুম এল।

রাত কত জানি না—হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়ানার গলা। দরজায় বেশ জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে আর আমার নাম ধরে ডাকছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুললাম—দেখলাম মারিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে—মুখটা ফ্যাকাশে। আমি শুধোলাম কি হল?

মারিয়ানা চারদিকে তাকিয়ে বলল, সুগত এসেছিল।

আমি ধমকের সুরে বললাম, চলুন ত ঘরে চলুন। বলে ওকে প্রায় জোর করে খোলা বারান্দা থেকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকে ওকে দৃঢ় গলায় বললাম, বসুন। খাটে বসুন। বলুন আমাকে, কি হয়েছিল। মারিয়ানা কথা বলতে পারছিল না। আমি ঘরের ইজিচেয়ারে বসলাম।

একটু সামলে নিয়ে মারিয়ানা বলল, এই ঘরে সুগত এসেছিল একটু আগে।

আমি বললাম, আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কি যাতা বলছেন? লেখা-পড়া শেখা মেয়ে, অমন বোকার মত কথা বললে আমার রাগ হয়ে যাবে কিন্তু।

মারিয়ানা বলল, না না প্লিজ শুনুন, আমার কথা, শুনুন। সুগতকে একটু আগে দেখলাম।

আমি বললাম কি হল কি?

মারিয়ানার মুখটা আতঙ্কে কুঁচকে উঠল—বলল ভাবতে পারি না। সুগত পায়-জামা-পাঞ্জাবী পরে এসেছিল। শাল জড়িয়ে। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছিল দেখলাম।

ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার কেমন গা ছমছম করতে লাগল—মনে হল চোখ খুললেই ভয় পাব। আপনি যে ইজিচেয়ারে বসে আছেন—মনে হল, কে যেন সেখানে বসে আছে, চোখ মেলতেই দেখি সুগত। উঠে বসলাম। ঘরের নীল আলোটা জ্বলছিল। ঐ আলোয় ওসে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি চোখ মেলতেই হেসে বলল, খুব অবাক হলে ত? তোমাকে দেখতে এলাম। আমি ভুলে গেলাম যে ও মরে গেছে—ওকে আমরা পুড়িয়ে এসেছি।

আমি কথা বললাম, আমি ওর নাম ধরে বললাম, সুগত, আমি তোমাকে ভাল-বাসি, ভালবাসি ভালবাসি।

সুগত একটু হাসল। বলল, একথাটা তখন বললে না? এ কথাটা শোনার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করে থাকলাম। তখন বললে না?

আমি বলতে গেলাম—আমি বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারিনি যে, তুমি এমন ছেলেমানুষ। আমার যা আছে সব দিতে পারি তোমাকে তুমি যেমন করে চাও।

সুগত বলল, সত্যি সত্যি?

আমি বললাম, সত্যি, সত্যি।

সুগত আমার কাছে এগিয়ে এলো। মনে হল আমাকে আদর করবে বলে। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। তখনো ভয় পাই-নি। তখনো একটুও ভয় পাইনি—খুব ভাল লাগছিল, সুগতকে খুব সুন্দর লাগছিল। ভাবছিলাম, এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। এমন সময় যেই সুগত কাছে এলো, দেখি—সেই রক্তমাখা মুখটা—সেই গলার কাছের ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফেনা বেরোচ্ছে। আমি, আমি আঁতকে উঠলাম ওকে দেখে ঘেন্না হল, কেঁদে ফেললাম। মনে হল সুগত বীভৎসভাবে হেসে উঠলো—তারপর কি হল জানি না, দেখলাম সুগ[ত] নেই—আমি একা ঘরের মেঝেয় দাঁড়[িয়ে] আছি। সেই দেখলাম সুগত নেই—অম[নি] ভয় পেলাম—ভীষণ ভয় পেলাম—ভাবল[াম] মরেই যাব ভয়ে—তারপর কোনোরক[মে] আপনার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলা[ম]। *তারপর, তারপর... জানি না। এই যে এ[খন] আপনার সামনে বসে আছি।*

আমি বললাম আপনি একটু বসু[ন]। আমার ঘরে ব্রান্ডি আছে ব্যাগে, যশোয়ন্ত রাখতে দিয়েছিল সঙ্গে। নিয়ে আসি। গর[ম] জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটু খান, সুস্থ বোধ করবেন।

উঠতে যেতেই মারিয়ানা বলল, না আ[মি] একা ঘরে থাকব না।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার ঘ[রে] এল। বাইরে বড় শীত। ব্র্যান্ডিটা বে[র] করলাম। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপ[র] আমার পিছু পিছু (যেন এটা আমার বাড়ি; ওই আমার অতিথি) এমনিভাবে সা[থে] সঙ্গে খাবার ঘরে এল। এসে একটা চেয়া[র] টেনে বসে চুপ করে আমায় [illegible] লাগল।

খুঁজে খুঁজে স্টোভ [illegible] করে, স্টো[ভ] ধরিয়ে একটু জল গরম করলাম। গ্লাসে ক[রে] জল এবং ব্র্যান্ডি মিশিয়ে মারিয়ানার কা[ছে] এসে গ্লাসটি ধরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ আমাকে রাতজাগা জল-ভেজা চোখ নি[য়ে] ফ্যাল ফ্যাল করে অপ্রকৃ[তিস্থ] ভাবে দেখছিল—আমি কাছে যে[তেই] আমার হাত থেকে গেলাসটি টে[বিলে] নামিয়ে রেখে আমার হাতটি ওর দুহা[তে] জড়িয়ে ধরল।

ঘটনার আকস্মিকতায় এত অভিভূত [illegible] গেলাম যে, বলতে পারি না। আমার [illegible] দিয়ে সযত্নে ওকে সরিয়ে ওকে চেয়ারে ব[সা]লাম।

বললাম, পাগলী মেয়ে। নিন, ব্রা[ন্ডি] খেয়ে নিন।

মারিয়ানা ঝরঝর করে কাঁদতে ক[াঁদতে] আস্তে আস্তে ব্র্যান্ডিটা খেল—তা[রপর] গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ধরা গলায় বলল, [illegible] জনের কাছের অকৃতজ্ঞতার গ্লানি জীব[নভর] বয়ে বেড়াব—এ ভুল যাতে আর না [illegible] তারই পাঠ নিলাম। চুমু খেলেই, বা অ[illegible] প্রকাশ করলেই যে নিজেকে এক্সপ্রেস ক[রা]

মানুষ যে ছোট হয়ে যায় না, সেটা আমি যে আজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তাই আপনাকে দেখালাম।

আমি বললাম, ওসব পরে হবে, এখন চলুন লক্ষ্মী মেয়ের মত এবারে শুয়ে পড়ুবেন। ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে ওর গায়ে কম্বল টেনে দিলাম। আশ্চর্য! শোকে মানুষ কি রকম শিশু হয়ে যায়। ভাবা যায় না।

তবু ও কিছুতেই একা শুতে রাজী হল না। অগত্যা আমার ঘরের খাট থেকে বিছানা এনে ওর ঘরে পাতলাম। ও কিছুতেই আমাকে মাটিতে শুতে দিল না। ও মাটিতে শুল। আমি ওর খাটে শুলাম।

সারা রাত মারিয়ানার মিষ্টি শরীরের গন্ধভরা বিছানায় শুয়ে আমার ভাল করে ঘুম হল না। ঘরের আধো-অন্ধকারে মারিয়ানাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের জন্যেও বোধহয়। খুব ইচ্ছে করছিল খাট থেকে নেমে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুই। কিন্তু কেন জানি না পারলাম না।

পরদিন সকালে মারিয়ানা একেবারে স্বাভাবিক। সলজ্জ হাসি হেসে বলল, আপনাকে বেড়াতে আসতে বলে কাল খুব জ্বালাতন করেছি না?

আমি বললাম, ভীষণ। কিন্তু এরকম একা একা ত আপনার থাকা চলবে না। হয় আপনি কোলকাতায় যান, নয়ত আপনি এখানে কোনো আত্মীয়টাত্মীয়কে আনান। নইলে একটা বিয়ে করুন! এরকম একা একা জঙ্গলে মানুষ থাকতে পারে?

মারিয়ানা দুঃখিত গলায় আমাকে বলল, এতদিনে আমাকে আপনি এই বুঝলেন? বিয়ে আমি করব না। বিয়ে করলে সুগতর কাছে কি জবাবদিহি করব? তাছাড়া মহুয়ার কাছেও যে বড় ছোট হয়ে যাব।

আমি বললাম, অন্য লোকে কি বলবে না বলবে, ভেবে ভেবেই ত এই অবস্থা আজকে—আপনারা সেই ভুল করবেন না। সুগতবাবুর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করবেন নিশ্চয়ই—কিন্তু তাহলে এখন থেকে অমন ধনুক ভাঙ্গা পণ করে বসবেন না।

মারিয়ানা মাথা নেড়ে বলল না না এসব বলবেন না গোতমবাবু—আপনি আমাকে যেমন করে জানেন এক সুগত ছাড়া আর কেউ বোধহয় এত কাছ থেকে জানেনি; জানে না। আপনি অমন কথা বলবেন না। একজনকে বড় মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছি। আমার এসব ভাল লাগে না। এখন আমি মুক্ত। সুগত সংস্কারমুক্তির কথা বলতো। তা যে এমনভাবে ঘটবে কখনো ভাবিনি। আমাদের সমাজের বিয়েটা সত্যিই একটা বাঁধন; মুক্তি নয়। যে যাই বলুক।

গেট অবধি পেঁাছে দিতে এল মারিয়ানা। বলল, চাকরী যদি সত্যি যায়ই তবে এখানে এসে আমার কাছেই থাকবেন।

আমি হেসে বললাম—আজীবন?

মারিয়ানা সিরিয়াসলি বলল, আজীবন। খুশী হয়ে থাকতে দেব।

আর খেতে পরতে?

হ্যাঁ তাও দেব।

আর কিছু ত দেবেন না?

ও হেসে বলল, না।

জীপটা স্টার্ট করলাম। মারিয়ানা চুলটা হাত দিয়ে কপাল থেকে সরাতে সরাতে বলল, সত্যি! আপনার মত বন্ধু আমার আর একজনও নেই—আপনার জন্যে কি প্রার্থনা করা যায় বলুন ত?

আমি বললাম, পরের জন্মে যেন আপনার সুগত হয়ে জন্মাই।

মারিয়ানার চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—পরক্ষণে চোখ নামিয়ে বলল, ভারী খারাপ আপনি।

॥২১॥

এই বন পাহাড়ের সব কিছুই কেমন অদ্ভুত। লোকগুলোও যেন থাকতে থাকতে অদ্ভুত হয়ে যায়। এই যে এতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, জগদীশ পাণ্ডের দলবলকে যে নদীতে ফেলে দিল যশোয়ন্ত তার জন্যে ওরা পুলিশে ডাইরী পর্যন্ত করল না। শুনেছি, জগদীশ পাণ্ডের একটা পা ভেঙ্গে গেছে। ওর বন্ধুর পাঁজরে চোট লেগেছে। অন্যজনের কলার বোন্ ভেঙ্গে গেছে। অথচ তবু যেন কিছুই হয়নি; এমনি ভাব করে নেহাতই জীপগাড়ি ব্রেক ফেল করে নদীতে পড়ে গেছে; এই বলে ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়েছে।

ওরা পুলিশে ডাইরী না করায় যশোয়ন্ত বেশ চিন্তিত আছে। সত্যি কথা বলতে কি ওকে আগে কখনো এত চিন্তিত দেখিনি। আজকাল যখনি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোয় ও পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। কোমরে গোঁজা থাকে ওর হাফহাতা খাকী বুশ শার্টের নীচে। আমিও যখনি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোই তখনি বন্দুকটা নিয়ে বেরোই। অবশ্য বন্দুক দিয়ে শিকার করা চলে, ডাকাতি করা চলে, মানে আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসেবে বন্দুক ভাল কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুক অচল। বনের রাস্তার মোড়ে অথবা জঙ্গলের সুঁড়ি পথে কোথায় যে জগদীশের দলবল লুকিয়ে থাকবে তা পূর্বমুহূর্তেও সময়ও পাওয়া যাবে না। পিস্তলে এই সুবিধা। এই সব সময়ে মুহূর্তের মধ্যে পিস্তল থেকে কাছাকাছি গুলি ছোঁড়া যায়।

জানি না কেন, যশোয়ন্ত প্রায়ই বলছে আজকাল, যে জগদীশ পাণ্ডের কাছ থেকে আমার বোধহয় কোন ভয় নেই। প্রথম কারণ এই যে যশোয়ন্ত নিশ্চিত ভাবে জেনেছে যে আমার চাকরী শিগগিরই যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ ঝগড়াটা এখন নাকি যশোয়ন্ত আর জগদীশ পাণ্ডে এই দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। *এ ব্যাপারে বোধহয় দু'পক্ষেরই মতামত এই যে, অন্য কাউকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। কবে কখন এই দুই শত্রু এমন বোঝাপড়ায় এল তা অবশ্য জানি না।*

তাই যদি হয়ে থাকে তবে এর পরিণাম খারাপ। খুবই খারাপ। জগদীশ পাণ্ডে যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে সে করতে পারে না এমন কাজ সত্যিই নেই। যশোয়ন্তের বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অতএব এরা দুজনে যদি এ ব্যাপারে একা একা ফয়সাল্লা করতে চায় তবে যে কি ঘটনা ঘটবে ঠিক ভাবা যায় না।

জগদীশ পাণ্ডের সঙ্গে ওর ঝগড়া যে শুধু শিকার নিয়েই নয় তার একটু আভাস পেয়েছিলাম গতকাল।

আমি আর যশোয়ন্ত নইহার থেকে জীপে ফিরছিলাম। লালুতির সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। এক ঝুড়ি মহুয়া মাথায় নিয়ে লালুতি শাল বনের পথে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। যশোয়ন্ত জীপটা প্রায় ওর গায়ের কাছে ভিড়িয়ে ওকে ঝাপটে ধরে কোলে তুলে চুমু খেয়েছিল—ঝুড়িভর্তি লালতির সব মহুয়া রাস্তায় পড়ে গেছিল। লালুতি কপট ক্রোধে হাত-পা ছুঁড়েছিল। তারপর তাকে জীপের বনেটের উপর বসিয়ে দিয়ে যশোয়ন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—বলেছিল ঈ-হ্যায় মেরী দিল—জান্ দোস্ত—লালসাব ওর ই হ্যায় লালুতি—মের্ মুন্নী। যশোয়ন্ত লালুতির দিকে চেয়ে বলল, এক রোজ দুলহীন বনেগী লালসা কি?

নহী নহী। বলে লালীত মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

যশোয়ন্ত চুট্টায় আগুন দিয়ে বলেছিল কিঁউ? মেরী দোস্ত খুবসুরৎ নহী?

নহী, নহী, উস্ লিয়ে নহী।

ত কিস্ লিয়ে?

উত্তরে লালুতি চুপ করে রইল।

অমনি যশোয়ন্ত আবার ওকে জড়িয়ে ধরে সারাগায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

লালুতি কিত্‌ কিত্‌ করে হাসতে হাসতে বলল, ছোড়ো ছোড়ো সুড়সুড়ি লাগতা হ্যায়। যশোয়ন্ত ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুম জানতে হো মেরী ... অভিতক কিসীসে মুহব্বত নেহি ...

লালুতি আবার হাসল। বলল, ঝুট্। ঝুট্ বাত হ্যায়।

সেই প্রথম আমি লালতির দিকে ভাল করে তাকালাম। কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে। গায়ের রং তামাটে। খুব টানা-টানা চোখ। ঠোঁট দুটো দারুণ। কটা কটা একমাথা চুল। অত্যন্ত নোংরা। গায়ে গন্ধ।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। লালতির পক্ষে বিশ্বাস করাই সম্ভব নয় যে আমার বয়সের আমার মত একজন যুবক এখনও কাউকে বুকে নিয়ে ঘুমোয়নি। হাসি পেল। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে অনিচ্ছে হয়।

তারপর আমি আর যশোয়ন্ত দুজনে লালতির ঝুড়ি থেকে পড়ে যাওয়া মহুয়া গুলি সব আবার কুড়িয়ে দিলাম। লালুতি হাসতে হাসতে ঝুড়ি মাথায় চলে গেল।

জীপ চালাতে চালাতে যশোয়ন্তকে শুধিয়েছিলাম, ওর মধ্যে তুমি কি এমন দেখেছ যশোয়ন্ত?

যশোয়ন্ত হাসল। বলল, ইস্ লিয়ে ত ম্যায় শহরবালোসে ডরতা। তারপর বলল ওর মধ্যে গম্ভীরে দেখার ত কিছু নেই ওর মধ্যে শুধু একটি পিমাকিন লাজোর

শরীর দেখেছি। শরীর ছাড়িয়ে ওর মধ্যে ত আমি আর কিছু দেখতে যাইনি লালসাহেব। তোমরা পড়ে-লিখে আদমীরা সবসময় দিগন্তের ওপারে কি আছে তার খোঁজ করো। সবসময় তোমরা সামান্যকে ছাড়িয়ে অসামান্য কিছু খুঁজতে যাও। তাই বোধহয় পাও না। আমি আমার সামান্য দিগন্তরেখার মধ্যে বন্দী আছি; বন্দী থাকতে চাই। এই বেতলা, বাগেচম্পা —ছীপদোহর, রুদ-চাহাল—চুংরুর জঙ্গলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাই—লালতির নাঙ্গা শরীরে বন্দ হয়ে থাকতে চাই—এই আমার দিগন্ত। মধুর দিগন্ত। এর বাইরে কি আছে আমি কখনো দেখতে যাইনি লালসাহেব। যদি কিছু থেকে থাকেও তা জানার লোভ বা আগ্রহও আমার নেই। আমি নিজেকে নিয়ে খুব সুখে আছি। তোমরা দূরের শহরের লোকরা, বাইরের পৃথিবীর লোকরা এলোমেলো কথা বলে আমার এই মনোযোগ নষ্ট করে দিও না।

জীপটা একটা কজওয়ে পেরুল—গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে। আওয়াজ কমলে আমি শুধোলাম, তুমি কি বলতে চাও লালতিকে তুমি ভালবাস?

যশোবন্ত আবার হাসল। মাঝে মাঝে গোঁফের ফাঁকে ও কেমন দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসে। বলল, নিশ্চয়ই—ভালবাসি। শরীরের ভালবাসা।

আর মনের ভালবাসা?

যশোয়ন্ত হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, মনের ভালবাসা ত সবাইকে বাসা যায় না লালসাহেব। সে একজনকেই বাসি। তবে কি জান লালসাহেব, সে ভালবাসার ত গা বদল হয় না। সে ভালবাসা এক গায়েই থাকে। জীবনে একজনকেই তেমন করে ভালবাসা যায়। অন্য ভালবাসাগুলো সব সেই একই ভালবাসার ভেঙে যাওয়া আয়নার টুকরো-টুকরো। টুকরোগুলো এক জীবনে দু'হাতে কুড়িয়ে জড়ো করেও আর সে আয়না জোড়া লাগে না। সে আয়না ভাঙে; তা ভাঙেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমার জঙ্গলী দোস্ত যশোয়ন্ত মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে ফেলে, যে উত্তরে কথা না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে।

একটু পরে যশোয়ন্ত নিজেই বলল, আর সবচে মজার কথা কি জানো দোস্ত—এই মনের ভালবাসা আর শরীরের ভালোবাসা কখনো একজনের কাছ থেকে তুমি পাবে না। যদি তা কখনো ঘটে সে এক দুর্ঘটনা বটে। তা না হওয়াই ভাল। আমাকে একশ একটা গুলি করলেও আমি বিশ্বাস করি না যে, কেউ একই সঙ্গে শরীর আর মনের ভালবাসার চাহিদা মেটাতে পারে।

আমি বললাম, তাহলে আর ভালবাসা ভালবাসা বলছ কেন? বল শরীরের চাহিদা।

যশোয়ন্ত খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো—বলল, বিলকুল নহী। চাহিদা বড় নোংরা কথা। জিনিসটাও নোংরা। তোমাকে কি করে বোঝাব—যে শরীরেরও ভালবাসা আছে—শরীরও বুলবুলি পাখির মত কথা বলে। তারপর রেগে গিয়ে বলল তোমার মত গাধা সতী ব্যাচেলারকে এসব কথা বোঝানো আমার কর্ম নয়।

এই লালতি যখন ষোলো বছরের ছিল তখন থেকে আমি ওর শরীরকে ভালবাসি। দিন কয় আগে এক রাতে লালতি আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এল। দেখলাম ওর গালে কে যেন দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। ওর বাঁদিকের গালে একটা ছোট্ট লাল তিল আছে। তাই আমি ওর নাম দিয়েছিলেন লাল্তি। ওর আসল নাম অন্য। কি করে এমন হল জিজ্ঞেস করতে, লাল্তি আমাকে সব বলল। কি বলব লালসাহেব। সে রাতে আমার বড় কষ্ট ও রাগ হয়েছিল। যে শরীরকে আমি ভালবাসি সেই শরীরে কেউ হায়নার মত দাঁত বসাবে এ আমি ভাবতে পারি না। তাছাড়া যে সব কমবকত পুরুষ মেয়েদের কি করে আদর করতে হয় তাই শেখেনি সেগুলোর কোনো অধিকারই নেই কোনো সুন্দর শরীরে হাত ছোঁয়াবার। তবু একটা খাটাশ, একটা বদ বু হায়না আমার লালতির গালের লাল তিলের উপর দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। সেদিন থেকে ঘাটাশটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। আমার শরীরের ভালবাসার শরিকের গালে ও দাঁত ছুঁইয়েছে। ওর আমি একদিন জান নিয়ে নেব লালসাহেব। তুমি দেখো। ওকে একদিন আমি জানে খতম করব।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কে সে লোক?

যশোয়ন্ত এক অদ্ভুত শান্ত হাসি হাসল তারপর জীপের গীয়ার বদলাতে বদলাতে হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, হাম্‌লোগোঁকা দোস্ত। জগদীশ পান্ডে।

নয়তালার কাছে সেই আম বাগানে নাকি ভাল্লুকের মরশুম শুরু হয়েছে। সেই বুড়ো ট্রাকড্রাইভার ইতিমধ্যে আমাকে আরো কয়েকবার মনে করিয়ে দিয়ে গেছে তার প্রয়োজনের কথা লজ্জায় সঙ্গে, কুণ্ঠার সঙ্গে ভয়ের সঙ্গে এসে।

রামধানীয়া এসে বলেছিল, সন্ধ্যের পর আমবাগানে আমের লোভে ভাল্লুকগুলো রোজই আসছে। এখন শুক্লপক্ষ। সন্ধ্যের পর চতুর্দিকে জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করে। জঙ্গলের নীচে বহুদূর অবধি নজর চলে। মাঝে মাঝে রাতে এখন পথে বেরোলেই হাতীর দলকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ওরা দল বেঁধে নয়াতালাওর দিকে যায় জল খেতে। কোনোদিন বা দেখা যায় না—জঙ্গলে শুধু শব্দ শোনা যায় ডালপালা ভাঙার। হাতীর দল কোনোদিন কাউকে কিছু বলে না। গুণ্ডা পাগলা হাতী থাকলে ভয়ের ব্যাপার। হাতীর উপদ্রব বেতালার দিকেই বেশী। আমাদের এদিকে উপদ্রবকারী হাতী বড়-একটা আসে না।

ভাবলাম। চলে যাবার আগে একটা পুণ্য-কর্ম যদি করে যেতে পারি মন্দ কি? ট্রাক্-ড্রাইভারের তৃতীয় পক্ষের বউ যদি আশীর্বাদ করে আমায় তা না জানি কেন না কোন্ উপকারে লেগে যাবে ভবিষ্যতে।

সেদিন আটটা নাগাদ বেরিয়েই পড়লাম বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে। আজকাল সন্ধ্যেই হয় প্রায় সাতটা নাগাদ। সূর্য আর পৃথিবীর শরীর ছেড়ে উঠতে চায় না। যাই যাই করতে করতেও বেলা যায় না। সূর্য উঠলেও তার শরীরের তাপ সারা পৃথিবীর শরীরে ছড়িয়ে থাকে। হাওয়ার নিঃশ্বাসে মহুয়া আর করৌঞ্জার বাস ভাসে। রাত চরা পাখিরা খুশীর ফোয়ারা ছড়ায় ছোট ছোট ঠোঁটে। জঙ্গলে পাহাড়ে এ সময় হেঁটে বেড়ানোর মত মনোরম অভিজ্ঞতা আর নেই।

বড় রাস্তা ছেড়ে নয়াতালাওর রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। এখান থেকে আমবাগান আরো মাইলখানেক। নানা কথা ভাবতে ভাবতে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে চলেছি। আধ মাইলটাক গেছি বড় জোর। এমন সময় পথের ডান দিকের একটি পাহাড়ী নালার বুকে শুকনো পাতা মড়ানোর মচমচ আওয়াজ পেলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম একটু পর তার পাশেই আবার ওরকম মচ্‌-মচ্ আওয়াজ শুনলাম।

খুব কৌতূহল হল, কি জানোয়ার অমন করছে তা দেখার। বন্দুকটায় দুটো এল-জি পুরে নিয়ে পা টিপে টিপে ওদিকে সাবধানে এগোতে লাগলাম।

(আগামী সপ্তাহে সমাপ্য)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই দিন এত আনন্দের মধ্যেও একটি দুঃসংবাদ আমার মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ্ করছিল। তা হলো রসরাজ অমৃতলাল বসুর পুত্র ক্ষেত্রমোহন বসুর পরলোকগমন। আমি যখন ডালিমতলা লেনে ছিলাম, তখন এঁরাই ছিলেন আমার পাশের বাড়ীতে। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁর পরিবারের বন্ধুবাৎসল্য ও সহৃদয়তা কোনদিন ভুলবার নয়। ক্ষেত্রবাবুর আকস্মিক পরলোকগমন আমাকে খুবই আঘাত দিয়েছিল।

২৬ তারিখে গেলাম গাইবান্ধা প্রবোধবাবুর দলের হয়ে। এখানে হোল 'সাজাহান'। এ দিন এডমন্ড টকীজ হলে অভিনয় হলো। প্রচন্ড ভীড়—বহু লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেল বলে পরদিন 'পথের দাবী' অভিনয় হলো ঐ হলের সংলগ্ন প্যান্ডেল বেঁধে। অভিনয় খুব ভালো হলো বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই আমাকে কলকাতা চলে আসতে হলো, কারণ নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' তখন সমানে চলছে। এই দিন ছিল ৯৮তম রজনী।

অভিনয় শেষ করেই আবার সেই রাত্রেই গাইবান্ধা রওনা—পরদিন ২৯ তারিখে পৌঁছলুম এবং 'কর্ণার্জুন' অভিনয় হল। অভিনয় শেষ করে আবার সেই রাত্রেই কলকাতা রওনা হলুম। পরদিন কলকাতায় পৌঁছেই আবার 'সংগ্রাম ও শান্তি' অভিনয় নাট্যভারতীতে।

অর্থাৎ আমি এইটাই বলতে চাচ্ছি যে কলকাতার অভিনয় আসরগুলিকে ঠিক চালু রেখে এবং একদিনও অনুপস্থিত না হয়ে *বাইরের খেপ'গুলিতে যতদূর সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হোত। আজ বলতে বাধা নেই এত যে* দৌড়ঝাঁপ করতাম তার জন্য কখনও ক্লান্তি বোধ করিনি। অবসাদ এসে কোনদিনও মনকে গ্রাস করেনি।

১লা এপ্রিল তারিখে ভারতলক্ষ্মীতে 'অবতার'এর শুটিং সেরে রাত্রের ট্রেনে রওনা হলুম লালমণিরহাট। এটাও প্রবোধ গুহ মশায়ের দলবর্তী হয়ে যেতে হয়েছিল। ওখানে দুদিনে (২রা ও ৩রা) তিনটি নাটক অভিনীত হল—প্রথম দিন হল সাজাহান। পরের দিন সাজাহান ও কর্ণার্জুন। এখানে স্টেশনের পাশেই ডাকবাংলো, রেলওয়ে ইনস্টিট্যুটও একেবারে গায়ে গায়ে বললেই হয়। সব থেকে আমার ভাল লেগেছিল লালমণিরহাট স্টেশনের বিরাট ইয়ার্ডটি। কত ট্রেণ আসছে, যাচ্ছে, মালগাড়ী, প্যাসেঞ্জার, মেলট্রেন—কত যাত্রী উঠছে নামছে—ট্রেনের হুইসিল, ইঞ্জিনের হুইসিল, লোকজনের চিৎকার, কুলীদের চিৎকার সব মিলেমিশে একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব বাংলায় বোধ হয় এইটাই সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ইয়ার্ড। রাত্রে অভিনয় শেষে স্টেজের একটা উইংসের দিকে দরজা জানালা খুলে দিয়ে চুপচাপ একা বসে থেকেছি—কি রকম একটা অদ্ভুত স্বপ্নময় মনে হোত সমস্ত পরিবেশটাকে। ডাকবাংলোয় ফিরে এসেও—পেছনের জানালার ধারে বসে এ দৃশ্য দীর্ঘ সময় ধরে দেখেছি এবং উপভোগ করেছি।

৪ তারিখে ফিরে নাট্যভারতীতে যথারীতি 'তটিনীর বিচার' এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' চলতে লাগল। ১০ তারিখে রঙমহলে রংমহলের শিল্পিবৃন্দ আমাকে নিয়ে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করলেন। এতে কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভূমেন রায়, রবি রায়, মনোরঞ্জন, প্রভাত সিংহ, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতি ছিলেন।

১১ তারিখে 'তটিনীর বিচার'এর শততম অভিনয়-উৎসব উদ্‌যাপিত হল। প্রচুর ফুল উপহার দিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং গুণগ্রাহী দর্শকরা শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন।

১৩ তারিখে নাট্যভারতীতে প্রথম হল 'চিরকুমার সভা' বেলা ৩টায়। আমি চন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস-পূর্ণ, তিনকড়িদা-অক্ষয়, যোগেশবাবু—রসিক। খুব জমেছিল অভিনয়। তারপর হল রাত্রি ৮-৩০টার সময় 'সংগ্রাম ও শান্তি'।

যদিও 'সংগ্রাম ও শান্তি' ভালই চলছিল তবু কর্তৃপক্ষ নতুন নাটক তৈরী করতে লাগলেন। শচীনবাবু ইতিমধ্যে আর একখানি নাটক লিখেছেন এবং কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদনও করেছেন—এই নাটকখানির নাম হল 'আর্লিং হোম'। বাজারে পোস্টার ছাড়া হোল আমার ও দুর্গাদাসের নাম দিয়ে।

১৭ তারিখে রংমহলে হোল 'চন্দ্রগুপ্ত'। নরেশবাবু চাণক্য, আমি সেলুকাস। রবি, ভূমেন এরাও ছিল।

এর পর কয়েক রাত্রি শিল্পীদের সম্মান-রজনী উপলক্ষে কতকগুলি পুরোনো বইএর সম্মিলিতভাবে পুনরাভিনয় হল। প্রথমে হল ১৯শে এপ্রিল ভূমেনের সম্মান-রজনী রংমহলে। কেদার রায় ও চরিত্রহীন। দুটি নাটকেই আমি ছিলাম।

তারপর হল ২৩শে এপ্রিল স্টারে সরযূবালার সম্মান-রজনী। এখানে হল চন্দ্রশেখর ও সাজাহান। 'চন্দ্রশেখর' আমি বিশ্বাস এবং সাজাহানের নামভূমিকায়।

তারপর ৬ মে হল রংমহলে যোগেশ চৌধুরী মশায়ের সম্মান-রজনী—এদিনে হল 'প্রতাপাদিত্য' ও 'মহানিশা'। তারপর দিন অর্থাৎ ৭ তারিখে মিনার্ভায় সন্তু মুখোপাধ্যায়ের সম্মান-রজনী। এখানে হল সাজাহান ও কিন্নরী। এক 'কিন্নরী' ছাড়া সব নাটকেই আমি ছিলাম।

২৫ তারিখে প্রবোধবাবুর দলের হয়ে গেলাম রংপুরের [illegible] নামক একটা জায়গায়। এখানকার [illegible]মিদারবাড়ীর বিরাট নাটমন্ডপে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হল 'সাজাহান'।

২৯ তারিখে গেলাম কলকাতার কাছাকাছি একটি গ্রামে—নাম সীতাপুর, মার্টিনের ট্রেনে যেতে হয়। সেখানে হল মন্ত্রশক্তি। অভিনয় শেষে ফিরে আসবার কোন উপায় ছিল না—তাই বাধ্য হয়ে সেখা[illegible] রাত্রিবাস করতে হলো।

জীবনে এত জায়গায় [illegible]ছি, কিন্তু এমন মশার উৎপাত কোথা[illegible] দেখিনি।

তটিনীর বিচার একটি খুবসফল নাটক। এর চিত্ররূপও সমান সুখ্যাতি অর্জন করলো। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ৪ মে রূপবাণী চিত্রগৃহে।

আরো একটি 'কমলে কামিনী'—এ ছবিটির পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ মারা গিয়েছিলেন ছবির কাজ অসমাপ্ত রেখে, সেই ছবিটি এতোদিনে সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তি পেল ১১ মে তারিখে। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা না জানিয়ে পারছি না। প্রফুল্ল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের 'চিত্র'-জীবন শুরু একই সঙ্গে। প্রথম জীবনে দুজনে কতো কষ্ট স্বীকার করেছিলাম 'সোল অফ এ স্লেভ' ছবির জন্যে।

আজো যখন পুরোনো কথার মধ্যে প্রফুল্লকে মনে পড়ে, তখনই মনটা শূন্য হয়ে *যায়। ভাবি, প্রফুল্ল থাকলে সে আজ কতো বড়ো হতো। তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা* লুকিয়ে ছিল।

শুধু কি এক প্রফুল্ল, কতোজন এমনি করে অকালে হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু সেদিনের সাক্ষী হয়ে আজো আমি আছি।

যাইহোক, ভালো-মন্দ মিশিয়ে দিন এক রকম চলছিল। এর মধ্যে খবর পেলাম শ্রীমধু বসুর কাছ থেকে। মন্মথ রায়ের রাজনটী নিয়ে ছবি করছেন মধুবাবু। আমার কাছে অনুরোধ এলো রাজগুরুর ভূমিকাটি করার জন্যে। রাজনটী নাটকে আমি মধুবাবুর পরিচালনায় সি-এ-পি-র হয়ে অভিনয় করেছি। এবারের অনুরোধও অভিনয় করার—রাজনটীর হিন্দী এবং বাংলা দুটি সংস্করণেই। শুধু হিন্দী, বাংলা নয়, ইংরেজীতেও মধুবাবু ছবিটি করেছিলেন। নাম 'কোর্ট ড্যান্সার'। বাংলা ও হিন্দী ছবির নামকরণ হয়েছিল রাজনর্তকী।

মধু বসু এবং সাধনা বসু তখন বোম্বাইতে আছেন ছবির কাজে। সেই সঙ্গে মন্মথবাবুও। এই ছবির ব্যাপারে মন্মথবাবুর কাছ থেকেও চিঠি পেলাম। সে দীর্ঘ চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

'You know how anxious we are to get you as a pillar of strength for our pictures. We missed you so greatly in 'Kumkum'. Let us not miss you in Rajnatee, which is going to be quite an ambitious venture.

Here are some of the strong points why you should not turn down Mr. Bose's proposal,

Firstly the period of your stay in Bombay should not exceed three month. Mr. Bose will see to that. And it is not impossible for you to manage all absence from Calcutta for three months provided it means no loss for you, rather a gain.

Secondly, it may be arranged to pay you more than your ordinary and usual minimum monthly income of Rs. 2000/-............

এ ছাড়া চিঠিতে আরো অনেক কথা লিখেছিলেন মন্মথবাবু। বোম্বাই গেলে কাজের মধ্যে কিছুটা বিশ্রাম যেমন পাবো, তেমনি বোম্বাই বেড়ানো হবে। তাছাড়া এখান থেকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কাজটাও সেরে নিতে পারবো।

শুধু আমাকে নয়, মন্মথবাবু আমার স্ত্রীকেও একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। চিঠি লেখার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মন্মথবাবু বেশ ভালো করেই জানেন, আমার স্ত্রীর দেশভ্রমণের নেশা প্রবল। বিশেষ করে তীর্থের পথ হলে তো কথাই নেই।

লাভ-ক্ষতির কথা হিসেব করলে, বোম্বে গেলে আমার আর্থিক দিক থেকে লোকসানই হয়। তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। তার প্রধান কারণ, বোম্বে গেলে কিছুটা বিশ্রাম পাবো, যেটি আমার একান্ত দরকার। আর খানিকটা দেশ-ভ্রমণ তো হবে।

তবে মধুবাবুকে একটা কথা জানিয়ে দিলাম। কলকাতায় অনেক কাজ বাকি আছে, বিশেষ করে কয়েকটা ছবির কাজ হাতে রয়েছে, সেগুলো শেষ না করে যেতে পারবো না।

আমার কথায় রাজী হলেন মধুবাবু।

গ্রান্ড হোটেলে মধুবাবুর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। সেখানে ছিলেন ওয়াদিয়া মুভিটোনের মালিক হেমরাজ হরিদাসের একজন প্রতিনিধি।

প্রভাস—মিলন-এ অহীন্দ্র চৌধুরী

মধুবাবু বললেন, আপনার 'সেট' পড়তে এখনো দেরি আছে। সুতরাং আপনার হাতের কাজ শেষ করে নিন এর মধ্যে। আর সেট পড়ার আগে আপনাকে আমি জানিয়ে দেব।

যাক, সেদিন এই রকমই একটা ব্যবস্থা হয়েছিল।

মধুবাবুর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হলো ৯ আগস্ট। তার পর দিনই পেলাম মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক হিমাংশু রায়ের মৃত্যুতে ভারতের চিত্রজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। হিমাংশু রায় চিত্রজগতের ধ্রুবতারা। তাঁর 'লাইট অফ এশিয়া' 'সিরাজ' 'থ্রো অফ এ ডাইস' 'কর্ম' প্রভৃতি ছবি সারা পৃথিবীতে যে সমাদর লাভ করেছিল তা তখনকার দিনে অভূতপূর্ব। সে সময় বোম্বাই এ বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠা করে হিন্দি ছবিকে অ-হিন্দিভাষীদের কাছে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব বহুলপরিমাণে তাঁরই প্রাপ্য।

পরদিন রংমহলে হল 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মাটির ঘর' অভিনয়। এই দুটি নাটকেই অভিনয় করে চলে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশন—রাত্রি ১২টার পর সেখানে হল 'ডাক্তার'-এর শুটিং। রাত্রি ১২টার পর আর কোন যাত্রীবাহী ট্রেন স্টেশনে আসে না—লোকজনের ভিড়ও বিশেষ থাকে না—সেই সময়ে রেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্লাটফর্মের ভেতর ট্রেন থেকে নামা-ওঠা এবং কতকগুলি দৃশ্য তোলা হল। শুটিং শেষ করে বাড়ী পৌঁছলাম যখন তখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজছে।

এর আগে ১৫ মে তারিখে রংমহল কর্তৃপক্ষ নাট্যকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'আগামী কাল' নামক একখানি নাটক খুললেন। 'উমাপ্রসন্ন'র চরিত্রটির জন্য প্রভাত সিংহ আমায় খুব ধরলো। আমি রাজী হলাম এক সর্তে—'নাট্যভারতী'তে 'তটিনীর বিচার' ও 'সংগ্রাম ও শান্তি'তে আমি যে রকম অভিনয় করছিলাম—তা করে যাব। ঠিক হলো যে শনি ও রবিবার-এর নাট্যভারতীর প্রোগ্রাম ঠিক রেখে শুধু বুধবার দিন রংমহলে অভিনয় করব। সেই রকমই করতে লাগলাম।

এরপর ২৬ তারিখে নাট্যভারতীতে হল 'প্রফুল্ল'র সম্মিলিত অভিনয়—তারপর 'সংগ্রাম ও শান্তি'।

এর দুদিন পরে ২৮ তারিখে গেলুম পাবনায়। স্থানীয় টাউন হলে অভিনয় হল 'সাজাহান'। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার স্টিমার ধরে কলকাতা। আসবার সময় সুলাল (জহর গাঙ্গুলী) এক কাণ্ড করে বসল। স্টিমারে দারুণ ভিড়। একটি অল্প-বয়সী মুসলমান মেয়ে সম্ভবত কলেজের ছাত্রী একা-একাই কলকাতায় আসছিল। হঠাৎ সুলাল একটু বেশী মাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠল। শিল্পী সম্প্রদায়ের ওপর সাধারণ ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণ একটু বেশীই হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে আমাদের কামরায় এসে বসতে বলায় সে ভিড়ের হাত থেকে তো রক্ষা পেলই— তাছাড়া বাংলা দেশের নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে ভ্রমণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা? কলকাতার কাছাকাছি ট্রেন এসে পৌঁছবার সময় সুলালকে একটু কাছে ডেকে চুপি-চুপি বললাম : আর কেন? বেচারীকে এবার রেহাই দাও।...ও কোন সম্প্রদায়ের লোক জান তো? বোরখা ছেড়ে তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে এই না কত! এর ওপর একটু বেচাল দেখলে মজাটা টের পাইয়ে দেবে।

সুলাল তাচ্ছিল্যভরে কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল : কি যে বলেন দাদা। শেয়ালদা পৌঁছলে হয় একবার। তারপর কে কার, কে তোমার। সমস্ত রাস্তাটা কি রকম কাটল বলুন তো।

যেদিন ফিরলাম সেই দিনই অর্থাৎ ২৯ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় 'আগামী কাল' অভিনয়।

এর আবার কয়েক দিন পরে নাট্য-নিকেতনের তরফ থেকে গেলাম পাকশী রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে, হল 'সাজাহান' অভিনয়। এসব নাটক তো রংয়ের তুরুপ— অভিনয় হলেই জমতে বাধ্য।

পাকশী থেকে ফিরেই সেই দিন (৪ জুন রঙমহলে দুখানি বড় বড় নাটকেই আমি নামলাম—মন্ত্রশক্তি ও চরিত্রহীন। আমার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রে নেমেছিল নির্মলেন্দু, সরযু, নরেশদা, যোগেশবাবু, ভূমেন, রবি, নিভাননী প্রভৃতি। অভিনয়-শেষ করে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত্রি দুটো।

এর পর নাট্যভারতীকে ১৩ জুন খুলল শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের 'নার্সিং হোম'। আমি 'নার্সিং হোমে' কোন ভূমিকা নিতে প্রথম অস্বীকার করি, কারণ আমার বম্বে যাওয়ার কথা—শুধু কয়েক রাত্রি নেমে, তারপর ছেড়ে দেওয়ার ফলে হয়ত নাটকখানি 'মার' খেয়ে যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা—আমাকে 'বিক্রমা-দিত্যে'র ভূমিকা নিতেই হল। নায়িকা কুন্তলার ভূমিকা করেছিল রাণীবালা।

নাটকখানি জমেছিল খুবই। দর্শক ও সমালোচক সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে-ছিলেন। দীর্ঘদিন পরে আবার শিশির-বাবুর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করলাম 'আলমগীরে'—এটা একটা বিশেষ অভিনয়-রজনী ছিল। এতে শিশিরবাবু, আমি এবং দুর্গাদাসও ছিল।

৬ জুলাই রূপবাণীতে নিরঞ্জন পালের ছবি 'শুকতারা' মুক্তিলাভ করল। গল্প-লেখক হিসাবে মিঃ পালের খ্যাতি শুধু এদেশেই নয়, সাগরপারেও বিস্তৃত। দীর্ঘ-দিন ধরে তিনি চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, এর আগেও কয়েকখানি ছবির পরিচালনা করেছিলেন, তবে 'শুকতারা'ই আমার মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি।

এরপর কয়েক রাত্রি শিশিরবাবুর দলের সঙ্গে সম্মিলিত অভিনয় হল। এক দিন হল 'ষোড়শী' (৯-৭-৪০) আর এক দিন হল 'সীতা' (১২-৭-৪০) এই দুটি অভিনয় রজনীতেই শিল্পীরা ছিলেন শিশিরবাবু, আমি, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ, ছবি বিশ্বাস, প্রভা, রবি, পুতুল, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি।

এই সময় আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু সুরদেব গাঙ্গুলী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন তাঁর সাধনোচিত ধামে। ইনি ছিলেন তদানীন্তন কালের এমারেল্ড প্রেসের মালিক। এঁর দাদা গণদেব ছিলেন নাট্যরসিক ও নাট্য-উৎসাহী। এঁরা দুজনেই প্রেস চালাতেন। ডি এল রায় স্ট্রীটে ছিল এই এমারেল্ড প্রেস এবং তাঁরা থাকতেনও ঐ বাড়ীতে। সুরদেবের মৃত্যুতে আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।

১৬ জুলাই তারিখে আবার একবার সম্মিলিত অভিনয় হল মিনার্ভায়—নাটক ছিল 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সাজাহান'।

তখনও নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' যথারীতি চলছে একদিন হঠাৎ রাণীবালা অসুস্থ হয়ে পড়ল কিন্তু শেষ-মুহূর্তে (প্রতিমার) চরিত্র কে করবে? কেউ সাহস করে না—খুবই মুস্কিলে পড়ে গেলুম। দুপুরবেলায় ডেকে পাঠান হল সুহাসিনীকে (বর্তমানে নামকরা শিল্পী নীলিমা দাসের মা)। মাত্র কয়েক ঘণ্টার রিহার্সাল দিয়ে সুহাসিনী সাহস করে নেমে গেল। আর বলতে বাধা নেই, বেশ ভালই অভিনয় করল। নতুন বলে কোন রকম জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। দর্শক-বৃন্দকে একেবারে বুঝতে দিলে না যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তাকে এই পার্ট তৈরী করতে হয়েছে।

এর পরদিন ছিল 'নার্সিং হোম'। সেদিনও রাণী নামতে পারল না। সেদিনও তার ভূমিকাটি (মহামায়া) অন্য একজনকে দিতে হল। রাজলক্ষ্মী (বড়) তখন অবশ্য ইদানীং কালের মত বিরাটদেহী ছিল না— সেই কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিল। কিন্তু তার পরদিন রাণীবালার ভক্ত অনেক দর্শক রাজলক্ষ্মী মঞ্চাবতরণ করবে শুনে টিকিটের দাম ফেরৎ নিয়ে চলে গেল। প্রায় একশো টাকার টিকিটের দাম ফেরৎ দিতে হয়েছিল।

এদিকে বম্বে থেকে মন্মথ রায় ও মধু-বাবুর ঘন-ঘন চিঠি আসতে লাগল বম্বে যাবার জন্যে। এতদিন তাঁরা আমাকে বাদ দিয়ে যে সব দৃশ্য ছিল সেগুলির শুটিং করছিলেন—এবার আমাকে না হলে আর চলবে না। সুতরাং আমিও এখানকার কাজকর্ম সব শেষ করে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলুম।

২৩ জুলাই মিনার্ভায় আমাকে এক বিদায় সম্ভাষণ জানান হল। নবাব স্যার কে জি এম ফারুকী সভাপতিত্ব করলেন। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে করে আমাকে একটি মানপত্র দিলেন মিনার্ভার শিল্পীরা ও কর্তৃপক্ষ। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এই বিদায় অভিনন্দনের পরে 'মিশরকুমারী' ও 'আত্মদর্শন' অভিনীত হল। আমি যথারীতি 'আবন' এবং নির্মলেন্দু লাহিড়ী 'সামন্দেশ'। 'আত্ম-দর্শনে' আমি 'মন' রাজা।

২৬ তারিখে আবার একবার শিশির-বাবুর সঙ্গে 'সীতা' অভিনয় করলুম। আমি করলুম 'শম্বুক'। এ অভিনয়ের আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ভারত-লক্ষ্মীতে 'অবতার'-এর শুটিং করেছি। তারপর স্টুডিও থেকে সটান একেবারে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে।

অবশেষে বম্বে যাবার দিনস্থির হয়ে গেল। ৯ আগস্ট। কিন্তু যাত্রার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যহ অভিনয় চলতে থাকল কোন-না-কোন থিয়েটারে। আমি যে কলকাতায় তিন মাসের মত থাকব না— তার জন্যে সব থিয়েটারই যেন আমাকে দিয়ে যতদূর সম্ভব কাজ করিয়ে নিতে চায়। আমিও কাউকে নিরাশ করি নি—সাধ্যমত সকলের অনুরোধই রাখতে চেষ্টা করেছি।

মঞ্চ ও চিত্র-জগতের বাইরের ব্যাপার হলেও একটি দিনের করুণ স্মৃতি বহুদিন আমার মনে কাঁটার মত খচ-খচ করেছিল। সেটি হল আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা এরিয়ান্স বনাম মোহনবাগান। সেই স্মরণীয় খেলায় মোহনবাগান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল ৪—১ গোলে। যদিও এরিয়ান্স পুরোপুরি বাঙালী টিম, বাংলা দেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এরিয়ান্স তথা দুঃখীরামবাবুর অবদান অবিস্মরণীয়, তবু মোহনবাগানের এ দুর্ভাগ্যে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। হাজার হলেও আমাদের জাতীয় টিম বলতে মোহনবাগানকেই বুঝি।

সেদিন আর এক দুঃসংবাদের খবর পাওয়া গেল। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আগুন লেগে বহু টাকার ক্ষতি হয়। অনেক নামকরা ছবির 'নেগেটিভ' পুড়ে যায়। এটাও একটা জাতীয় ক্ষতি—কারণ তখন সারা ভারতে বাংলার মুখ উজ্জ্বলকারী চিত্র প্রতিষ্ঠান ছিল নিউ থিয়েটার্স।

কিন্তু মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে আমাকে যেতে হল নাট্যভারতীতে এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি'র ৮৩তম অভিনয় আসরে নামতেও হল রাত্রি সাড়ে ৭টায়।

এর পরদিন ছিল ৮ আগস্ট এবং সেই দিনই আমার কলকাতায় শেষ-রজনী। ভারতলক্ষ্মীর 'অবতারে'র কিছু শুটিং বাকী ছিল, সেদিন তা শেষ করলাম। তার-পর নাট্যভারতীতে এসে দেখি সেখানেও বিদায় সম্ভাষণের বিরাট আয়োজন। বম্বে যাত্রার প্রাক্কালে এ আমার 'শেষ অভিনয় রজনী'—এই মর্মে প্রচুর প্রাচীরপত্র পড়ে-

ছিল। সেদিনকার [illegible] ছিলেন কাশিমবাজারের [illegible] চন্দ্র নন্দী মহাশয়।

পরদিন ৯ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ই আই আর বম্বে মেলযোগে বম্বে যাত্রা করলুম। এই উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শিল্পীদের ভিড়ে প্ল্যাটফর্ম ভর্তি। এদের মধ্যে যাদের কথা বেশী করে মনে পড়ছে তারা হল—অমর মল্লিক, ফণী মজুমদার, রতীন, সন্তোষ ঘোষাল, বিমল ঘোষ, সুলাল, বিধু মল্লিক, দিলওয়ার হোসেন, বিজয় রায় ও আরো অনেকে। ফুলের মালায় ও অভিনন্দনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিদায়বেলার এই ক্ষণগুলি মনের মধ্যে এমন দাগ কেটে যায় যে সহজে ভোলা যায় না। এ দিনটিও আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

ট্রেন ছাড়বার আর অল্পক্ষণ বাকী। এমন সময় দেখি হন্তদন্ত হয়ে আসছে প্রবোধ গুহ মহাশয়ের ছেলে সুধীর। তার হাতে একটি ক্ষুদ্র হাঁড়ি। সুধীর আমাকে একখানি চিঠি দিল। প্রবোধবাবু লিখেছেন।

তোমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে আজ অনেকেই স্টেশনে গেছে—আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মন খুব কাতর হয়ে পড়ায় যেতে পারলুম না। তুমি যেটি খেতে খুব ভালবাস—তাই পাঠালুম। গ্রহণ করলে খুশী হব। তোমার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

হাঁড়ি দেখে অনেকেই মনে করল যে, উঠল : দাদা আপনি তো মিষ্টি খেতেন বুঝি রসগোল্লা আছে। দুই একজন বলেও না— আবার ধরলেন কবে?

আমি বললাম : এখনও খাই না—ওতে মিষ্টি নেই—আছে বোধ হয় ফাউল রোস্ট—তাই না সুধীর?

সুধীর হেসে বলল : ঠিক ধরেছেন।

প্রবোধবাবু জানতেন ফাউল রোস্ট আমার খুব প্রিয়—এই ফাউল রোস্ট খাইয়ে উনি আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আমি সুধীরকে বললাম : এইটে আমার সত্যিকারের লাভ হল। অন্য অন্য বার ফাউল রোস্টের বিনিময়ে আমাকে কিছু না কিছু কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু এইবার কিন্তু কোন কাজ না করেই এটা পাওয়া গেল।

সকলেই খুব হেসে উঠল। তারপর আমি বললাম : দেখ তোমার বাবার সঙ্গে আমার টাকা-পয়সা নিয়ে কোন কথাবার্তা কখনও হয় না—মানে দেনা-পাওনার কোন প্রশ্নই নেই তাঁর সঙ্গে—সেটা হয় তোমাদের সঙ্গে।

যাই হোক, এই রকম হাসি-খুশী ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল।

[illegible] কামরাটার মধ্যে আমি একা।

আর এই একা থাকার মানেই হল দুনিয়ার চিন্তা এসে মনের মধ্যে ভিড় করা। মনে পড়তে লাগল বাড়ীর কথা—স্ত্রীর কথা, ছেলে-মেয়ের কথা, বৃদ্ধা জননীর কথা—আরও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা। অভিনয়জগতের বাইরেও যে আর একটা জগৎ আছে এবং আমরা যে আসলে সেই জগতেরই মানুষ একথাটা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

সংসার-তরণীতে ভেসে চলেছি, কিন্তু হাল ধরি নি কোনদিন—সেদিক দিয়ে আমার স্ত্রী সুধীরা সুদক্ষ মাঝিকের মত সংসার-তরণী চালিয়ে নিয়ে যেতেন—কোনদিন আমাকে জানতে দেননি কিছু।

এদিকে মন্মথ রায় বম্বে থেকে আমাকে প্রায়ই চিঠি দিতেন। সত্যি কথা বলতে কি অনেকটা তাঁর আগ্রহের জন্যেই কলকাতার সব কিছু ছেড়ে এই কন্ট্রাক্ট সই করতে রাজী হয়েছিলাম। তিনি আমার জন্যে যে হোটেলটি ঠিক করেছিলেন, সেটির নাম হল হোটেল 'মেরিনা'—একেবারে সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভের ওপর। ভারী সুন্দর জায়গা। একটি সম্পূর্ণ 'সুইট' মাত্র ২৫০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠিক হয়েছিল। যদিও আমি হোটেলে থাকার চেয়ে একটা ফ্ল্যাট নেবারই পক্ষপাতী ছিলাম কিন্তু মনোমত ফ্ল্যাট না পাওয়ায় মন্মথ আমার জন্যে হোটেলই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। থাকা ও খাওয়ার খরচ বাবদ মাসিক ২৫০৲ টাকা এখন অবিশ্বাস্য শোনালেও তখন সেইটাকেই একটা মোটা অঙ্ক বলে ধরা হত।

মধুবাবুরাও থাকতেন আমার হোটেলের কাছাকাছি মাত্র কয়েকখানি বাড়ী পরে 'শ্যাটো মেরিন'-এ। এই জায়গাটি বোম্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত পল্লী—অনেক নামকরা শিল্পী এবং অভিজাত পরিবার থাকতেন এই মেরিন ড্রাইভের ওপর।

যাক, আমি তো ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১০টার সময় বোম্বাই পৌঁছলাম। স্টেশনে মন্মথ রায় উপস্থিত ছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন হোটেল মেরিনায় এবং ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে তাঁর বাড়ী চলে গেলেন। মন্মথবাবু ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন 'প্যারেলে'।

পরদিন গেলাম মধুবাবুর সঙ্গে ওয়াদিয়া মুভিটোন স্টুডিও দেখতে। স্টুডিওর মালিক এবং 'রাজনর্তকী'র প্রযোজক মিঃ জে বি এচ ওয়াদিয়ার সঙ্গে আলাপ হল। চমৎকার মানুষ মিঃ ওয়াদিয়া। পুরোপুরি ব্যবসাদার, অসাধারণ সৌজন্য-

[illegible] হয়ে [illegible] রয়েস [illegible] বিরাটভাবে সামাজিক ছবি [illegible] আয়োজন...একেবারে তিন ভার্সান।

ওখানে অনেক পরিচিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের দেখতে পেলাম। দেখা হল সাগর মুভিটোনের মতিলাল, বুলবুলে দেশাই, প্রতিমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। প্রতিমা তো বাংলা দেশেই ছিল, ওর সঙ্গে কয়েকটা ছবিও করেছি একসঙ্গে। এখন পুরোপুরি বম্বের বাসিন্দা। এ ছাড়া তো মধুবাবু বাংলাদেশ থেকে শিল্পীরা ছাড়া সমস্ত কলাকুশলীদেরও নিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন ক্যামেরায় ছিল যতীন দাস, প্রবোধ দাস, সম্পাদনায় শ্যাম দাস, শিল্পনির্দেশে সুধাংশু চৌধুরী, সঙ্গীতে তিমিরবরণ প্রভৃতি। এই সব শিল্পীরা ছিলেন রাজনর্তকীতে—আমি, সাধনা বসু, জ্যোতিপ্রকাশ, বেচু সিংহ, প্রভাত সিংহ, প্রীতি মজুমদার (টুকলু), মণালকান্তি ঘোষ প্রভৃতি। মন্মথবাবুও একটা ভূমিকায়—চিত্রাবতরণ করেছিলেন।

এদের অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। ফেরার সময় মতিলালের গাড়ীতেই ফিরলাম। মতিলাল অবশ্য নেমে গেল তার বাড়ীতে মালাবার হিলে। তারপর তার গাড়ী এসে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল।

পরদিন সমস্ত দিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। আগের রাত্তির থেকে শুরু হয়েছে, সমস্ত দিনের মধ্যে বিরাম নেই। চুপচাপ বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল। বেরিয়ে পড়লাম এক সময় বর্ষাতিটা নিয়ে। কিন্তু কোথায় যাব? রাস্তাঘাট ভাল চেনা নেই। তারপর চারিদিকে জল—জল, আর জল। আমি দমবার ছেলে নই, বর্ষাতির সঙ্গে ছাতা নিয়ে গেলাম হর্নবী রোডের দিকে—হর্নবী রোড ধরে গেলাম মিউজিয়ামএ। মিউজিয়াম ঘুরে আবার চলে এলাম মেরিন-ড্রাইভ। মেরিন-ড্রাইভের ওপরে বাঁধানো রেলিংটার ধারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ওপর বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলুম। ভারী ভালো লাগে আমার বৃষ্টি পড়া দেখতে।

(ক্রমশঃ)

মন আর মানুষ

ছবি বসু

NITAI GHOSH

আধ ঘন্টার আড়াআড়ি—ছ'টা বাজতে পনেরয় মানসী বাড়ী ফিরল লেডিজ-ট্রামে চেপে, আর মণিময় ফেরে ছ'টা বেজে পনেরয়।

বাড়ী ফিরেই কলে ঢুকল মানসী, বেশ আরাম করে গা-ধুয়ে কাপড় শুকোতে দেবার সময় চোখে পড়ল গলির মুখে পড়ন্ত বেলায় মণিময় তার বকের মত সরু সরু পা ঝপাঝপ চালিয়ে আসছে।

কিন্তু কোথায় গেল পদ্মর মা। বারে বেশ মজা ত! সদর দরজা হাট করে খোলা। কোথায় কেটে পড়েছে এর মধ্যে। খাবার-দাবার নিশ্চয়ই কিছু তৈরী নেই। সব পড়ে আছে বৌদির অপেক্ষায়। মণিময় এসেই ত' হাঁকডাক সুরু করবে। এটুকু যদি তার সয়। কিন্তু কেনই বা সে রোজ রোজ এইসব ঝাক্কি পোয়াবে? সারাদিন আপিসের পর তার বুঝি খিদে-তেষ্টার বালাই থাকতে নেই?

রাগটা তখন পদ্মর মাকে ছেড়ে পড়ে মণিময়ের ওপর। ওর আসকারা না থাকলেও সমর্থন আছে নিশ্চয়ই, নইলে রোজই সেই এক কথা বলা সত্ত্বেও পদ্মর মার এত সাহস হয় কোথা থেকে?

আসল কথা সংসারে মণিবকে লোক-জনরাই ঠিক করে নেয়। নইলে প্রভুদের সিংহাসনটায় স্বামীদের এমন মৌরসী-পাট্টা হল কি করে।

মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে থাকে আর সেই আগুন চেপে শান্ত ঘরণী গৃহিণীর মত ময়দা মাখতে বসে গেল মানসী।

একসঙ্গেই প্রায় দুজনে ঢুকল। মণিময় আর পদ্মর মা।

—তুমি কতক্ষণ?

মণিময়ের সেই এক অভ্যাসসূচক প্রশ্নের জবাবে ও বলে—

—এই কিছুক্ষণ হবে।

তারপর তাকেও পাল্টা মামুলি কথা [...]লতে হয়।

—প্রচণ্ড ভিড় ত।

—সে আর বলতে। জামাটা আমসত্ত্ব [...]নে গেছে।

—তবু ত রয়েছে। মানসী নির্বিকার-ভাবে বলে চলে—সকালবেলা ট্রাম থেকে নামতে যেয়ে দেখি, আমার খোঁপাটা আর এক ভদ্রলোকের বোতামের সঙ্গে আটকে গেছে।

—কি থ্রিলিং। মণিময়ের টিপ্পনি গায়ে না মেখেই সে বলে—আস্ত একগোছা [...]টকা চুল ছিঁড়ল। মাগো কি ব্যথা করছিল।

মানসী মুখটা কোঁচকাল।

—আহা ভদ্রলোক বেচারী যে ব্যথা পেলেন...মণিময় ফুট কাটে।

—দেখ ছোট-লোকামি কোর না। আমি সব ছুঁড়ে ফেলে দেব। বলেই চোখ পড়ে পদ্মর দিকে। বদমাইশ ঝিটা চোখ মটকে নিঃশব্দে হাসছে।

—তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে শুনি! [...]ভার মজা পেয়েছ না।

—হ্যাঁগো চিনি আনতে হবেনি? তুমি [...] বেশ লোক গো! মানসী চুপ করে। আড়চোখে দেখল মণিময় জুতো ছেড়ে সেটা সজোরে আলনার দিকে ছুঁড়ল। ভাবল বাবু রাগ দেখাচ্ছেন। ঝিকে বকছি [...] কি অপরাধ হয়েছে তাতে?

তবে হ্যাঁ, রাগলে তার হৈ-হল্লাটা একটু উঁচু পর্দায় উঠে যায় এই-যা।

কিন্তু মেজাজের দোষ কি। আর মেজাজ ভাল হওয়া কি মন্দ হওয়া সে-কি মানসীর হাতের মধ্যে?

এই যে ট্রাম-বাসে রোজ এই ধস্তাধস্তি [...]তে শুধু শরীরের ধকলই নয়? কাপড়-চোপড়গুলো কি দ্বিতীয় দিন পরবার উপযোগী থাকে?

চা খেতে খেতে মণিময় নির্বিকারভাবে বলে—অনেকদিন ত হ'ল, এবার চাকরিটা কি আর না করলেই নয়? কি বল?

—তার মানে? আমার পার্মানেন্ট চাকরি, শুধু শুধু ছাড়ব কেন? তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে শুনি?

—অসুবিধে মানে তোমার শরীর আর আমার মানসিক শান্তি—সব নষ্ট হচ্ছে।

মানসীর গলা ধরে যায়। আর মুশকিল হচ্ছে কি জবাব দিতে গেলেই ওর গলা ধরে যায়।

মণিময়ের কাট-কাট কথা আর নির্বিকার ভাব সে সহ্য করতে পারে না। কেন! ভাল-মন্দ বিচার করবার শক্তি কি মণিময়ের একারই রয়েছে?

কথার পিঠে কথা বলতে না পেরে ও আড়ষ্ট হয়ে যায়, আর তখনই কান্না পায়। আর এই বয়সে রোজ রোজ সেন্টিমেন্টাল হওয়া কি সাজে! তার চেয়ে কোন কথা না বলাই ভাল, তবু মানসী জবাব দেবার চেষ্টা করে—

—আমি চাকরি ছাড়লে তোমার লাভ!

—মানসিক শান্তি।

—সেটা কিসে?

—ভাল খেয়ে।

—কেন পদ্মর মা'র রান্না মুখে রুচছে না?

—উপায় কী?

এবার মানসী হেসে ফেলে। বোঝে মণিময় আমড়াগাছি করছে। ইতিমধ্যে ওর রাগটা পড়ে গেছে। মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সত্যি কিরকম যেন শুকনো মনে হচ্ছে মানুষটাকে। তখন বলল—চলনা একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসি। বেশ হাওয়া দিচ্ছে আজকে।

—তাই চল।

দুজনে ঘুরল লেকের ধারে গাছপালা-গুলোর আড়ালে আবডালে। নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর এসে সেই বিকেলের প্রসঙ্গটা আবার তুলল মণিময়।

—সত্যি বল না একটু টেনেটুনে চালালে কি একার রোজগারে চলে না।

প্রসঙ্গটা এড়াতে চায় মানসী। বলে—চাকরি ছেড়ে দিয়ে সারাদিন করব কি বল? তুমি ত আর আমার আঁচল ধরে বসে থাকবে না।

—থাকলেই হ'ল আর কি। দুদিনে চুলোচুলি সুরু হয়ে যাবে।

দুজনেই সশব্দে হেসে ওঠে। ওদের হাসির আওয়াজে মাথার ওপরে গাছের ডাল থেকে দুটো পাখি ঝটপট উড়ে গেল।

বউয়ের আঁচল-ধরা ঘরকুনো স্বামী মানসীর দু-চক্ষের বিষ। তাই বলে স্বামী বাড়ী ফিরলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে এমন কথাও সে মানে না।

মণিময় অবশ্য তা নয়।

রাতে খাবার পর মন ঠিক করে ফেলে মানসী।

—ভাবছি সামনের মাসে ছুটির দিন-কটা কাটিয়ে তারপর কাজটা ছেড়ে দেব।

তার এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে যেন চাবুক খেল মণিময়। ওর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে সে যেন হতভম্ব হয়ে থাকে। কত কথা হয়, তারপর কাজ। এ যেন কথার গোড়াতেই কাজের সুরু।

—কি-গো ভাল করিনি?

—ভাল খুব ভাল। মণিময় ওর উৎ-সাহটা কেমন ভাবে প্রকাশ করবে ভাবতে হিম-সিম খেয়ে যায়।

কিন্তু মানুষ মুখে বলে এক কথা আর তার অবচেতন মন যে মনের রহস্য তার পাশের মানুষটির নেহাতই অজানা সে মন বলে অন্য কথা। মণিময় যখন আকুতি-ভরা গলায় মানসীকে চাকরি ছাড়তে বলে, তখন তার মন বলে—তবে করবে কি সারা-দিন? আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করবে ত! মুখে যখন আড়ম্বর করে মনের শান্তির কথা বলে তখন তার মন বলে—তোমাকে নিয়ে ত' সারাদিন মন ভরবে না। দুজনে মুখোমুখি খোগাস্।

—আর তাছাড়া এই সাজান গোছান ঝকঝকে তকতকে সংসারে জৌলুস এক-জনের রোজগারে বজায় থাকবে? না থাকবে না কোনমতে।

মুখে বলে—ভেব না লক্ষ্মীটি, যেমন করে হোক আমি চালিয়ে নেব।

আর মন বলে—চালিয়ে নেব বললেই হ'ল? বাড়তি আয়টা হবে কোথা থেকে? টিউশনি? তা সে ত অমার লাইন নয়।

মানসী বলে—পদ্মর মাকে না-হয় ছাড়িয়ে দেব। দুটো ত লোক। একটা ঠিকে লোক রাখলেই চলবে।

মন বলে—তোমার শাড়ি কেনা আর সিনেমার রেটটা কি দুম করে কমে যাবে?

মন আর মানুষ ঠিক এক কথা বলে না। মানুষ মণিময় পুরোপুরি যখন অভিনয় করে, তখন মন বলে—'কালী-বাড়িতে পুজো দেব। মাগো চাকরিতে যেন ওর মতি হয়।'

মণিময় ক'রাত্রি না ঘুমিয়ে ছটফট করে। বিয়ে হয়েছে ওদের পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে দু'জনের রোজগারে অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা আর অব্যাহত থাকছে না ভাবতে ওর দম বন্ধ হয়ে যায় অথচ কথাটা যদি মানসীকে সোজা করে বলা যেত। যদি একটুও বোঝদার হত তার বউটা। আশ্চর্য এতদিন চাকরি করেও নিজের রোজগারের জোরটা বরবাদ করতে ওর দ্বিধা হচ্ছেনা! কত সহজে মেয়েরা পুরুষের বশ্যতা মানতে রাজি হয় ভেবে অনুকম্পা হয় মণিময়ের।

পর পর কয়েকদিন ওরা রুটিনমত চলাফেরা করল। বাইরে থেকে নিরুদ্বিগ্ন শান্ত পরিবেশ কিন্তু মানসীর মনে যে প্রচন্ড ঝড় চলেছে এ-ক'দিন ধরে তার আভাস মাত্র কি মণিময় পেয়েছে?

চাকরি ছাড়ার দরখাস্তটা রোজ লিখব লিখব করে আর লেখা হয়নি মানসীর। ভেবেছে লিখলেই ত এস্পার-ওস্পার যা হোক একটা ঘটেই যাবে। তার চারপাশের সহকর্মীদের আতংক-ভরা চোখে,—ছাঁটাই, বেকারী আর অনশনের সুস্পষ্ট ছাপ। এদের মাঝে দিশেহারা হয়ে সে ভাবে বাস্তবিক একটু বিশ্রামে থাকবার জন্যে চাকরিটা সে সত্যি ছাড়বে কিনা। ও জানে মণিময় বারবার তাকে অনুরোধ করবে না। বেশী কথার লোক সে নয়, ওরা পুরুষ, ওদের আমিত্ব আর ভ্যানিটি অপার, একটা স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারবে না এমন পুরুষের জন্মই বৃথা, মণিময় কি আর তার স্বজাতির ব্যতিক্রম? ও চাইবে মানসী দুবেলা ভালমন্দ রাঁধবে। ওর জন্য সারাক্ষণ ভাববে। বিকেলবেলা চুল বাঁধবে, ভাল করে সাজবে, তারপর ওর প্রতীক্ষায় থাকবে।

কিন্তু ধরে ফেলেছে মানসীর। মোটেই সে চাকরি ছাড়বে না—তাতে মণিময় যত ক্ষুন্ন হয় হোক। ও যা তাই, কারও ফরমাইস-মত ও সৃষ্টি হয়নি।

তাছাড়া তার নিজস্ব কোন রোজগার নেই, সেই অভাব, অনটন।......'

ওরা দুজনের রোজগারে রাজার হালে থাকে না, তবে সংসারে যে সাশ্রয় হয়েছে অনেক সেটা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে?

মণিময়ের স্পর্শকাতর মন। মানসী কি করে তাকে বুঝিয়ে বলবে!

ওরা এখন ভাবতে পারে বৎসরান্তে কলকাতার কাছেপিঠে কোথাও দিন-কয়েকের জন্য বেড়িয়ে আসবার কথা, নয়ত মাসে এক-আধবার বাইরে যাওয়া, সিনেমা দেখা, কখনওবা মণিময়ের জন্য একটা সৌখিন শার্ট, নয়ত মানসীর একটা নতুন ডিজাইনের শাড়ি।

দূরে দূরে সবকিছু আশা-ভরসা বিসর্জন দিতে হবে মণিময়ের মনোমত লক্ষ্মী বউ হয়ে থাকলে।

কিন্তু মণিময় আর মানসী—

দুজনে কথা বলে অনেক তবু মনের কথা পরস্পরের অজানা। মানসী ভাবে, মণিময় কই তাকে ত আর প্রশ্ন করছে না চাকরি ছাড়ার দরখাস্ত দিয়েছে কিনা। আসল কথা ওর ভ্যানিটিতে বাধছে দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানাতে।

কিন্তু দু-চারদিন পর ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম।

মণিময় অফিস থেকে ফিরেছে ছ'টা পনেরয়। মানসী তখনও বাড়ী ফেরেনি। সাতটা পনের গড়িয়ে আটটায় ঘড়ির কাঁটা ঠেকে।

মণিময় চঞ্চল হয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করে। এবার কি করবে? টেলিফোন। আচ্ছা আর একটু দেখা যাক না।

আসল কথা কাজের গরজ নেই, আপিস ছাড়বার আগে ওর বন্ধুদের নিয়ে আবার সিনেমায় না যায়, কিন্তু একটা খবর ত দিতে পারত। মণিময় মনে মনে এবার সত্যি উত্তপ্ত হতে থাকে।

পদ্মর মা দু-চারবার তাড়া দিয়ে যায় —যাও না বাপু আপিসে খোঁজ নাও দিকি। মানুষটার ভালমন্দ কিছু হতেও ত পারে।

পদ্মর মার বিচারবুদ্ধি আছে দেখা গেল। বলতে বলতেই মানসী আসে। সঙ্গে তার দুজন সহকর্মিণী।

ওরা বলে, মানসীর নাকি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে করতে একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও দু' হপ্তার ছুটি আদায় করে তারা মানসীকে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাবার সময় চতুরাটি চোখ মটকে বলে—সুখবরের জন্য মিষ্টি পাওনা রইল। পরে আদায় করে নেব কিন্তু।

তখন ওরা দুজনে মুখোমুখি বসল।

মানসীর দু'চোখে জল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সে পদত্যাগপত্রটি বার করল। বলে—ক'দিন শুধু ভেবেছি আজ চিঠিটা দেব-দিচ্ছি করে তারপরেই এই কান্ড!

মণিময় ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

—ওকি করলে ওটা পড়ে দেখলে না?

—দরকার নেই আর।

—খবরটা ডাক্তারের মারফৎ জানতে হবে? মণিময় প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে স্ত্রীর হাতটিতে আলতো করে চাপ দেয়।

—ক'দিন এই চাকরি নিয়ে যা ভাবনা গেছে!

—এবার কি ঠিক করলে? আর ত চাকরি করা যাবে না। অবসন্নভাবে মণিময় বলে।

—দূরে পাগল, দুজন রোজগার না করলে ছেলেমেয়ে মানুষ করব কি করে?

গভীর স্নেহে কেমন আবিষ্ট গলায় মণিময় বলে—আমিও ঠিক তোমার মতই ভাবছিলাম মানসী।

অঙ্গনা

ভারত-ভ্রমণ অন্তে জুডিথ হার্ট

ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন বৃটিশ মহিলা মন্ত্রী শ্রীমতী জুডিথ হার্ট। সফর সমাপ্ত করে তিনি দেশে ফিরে গেছেন। বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত তিনি। দপ্তর থেকেই তাঁর সফরের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। ভারতবাসীর জীবন-ধারণের মান উন্নয়নে বৃটিশ অর্থ কতটা সাহায্য করছে, এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেজন্যই তাঁদের দেওয়া সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বৃটিশ পুঁজি কিভাবে কাজ করছে এতদসম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানসঞ্চয় ছিল তাঁর এই সফরের অঙ্গ। বলাবাহুল্য, তিনি তাঁর এই দায়িত্ব সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি ঘুরে দেখেছেন। এজন্য সারা দেশটাই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ সাহায্যপ্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

এই ঘোরাঘুরির ফাঁকে তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে উন্নয়ন এবং সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। উচ্চপদস্থ আমলারাও এই আলাপ-আলোচনা থেকে বাদ যাননি। তারপরই দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতে বৃটিশ সাহায্য চালিয়ে যেতে এবং সম্ভব হলে আরো বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন।

শ্রীমতী জুডিথ হার্ট ভারত ভ্রমণের এক মনোজ্ঞ বিবরণও দিয়েছেন। উন্নয়নের দুটি ধারা তিনি এদেশে প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষি এবং গ্রাম, শিল্প এবং শহর।

কৃষিতে ভারতের অগ্রগতিকে উল্লেখ-যোগ্য অভিধায় ভূষিত করে তিনি সপ্রশংস হয়েছেন। আশা প্রকাশ করেছেন, অগ্রগতির এই ধারা বজায় রেখে এদেশ কৃষিক্ষেত্রে আরো উন্নতি লাভ করবে। তবে এক্ষেত্রে এখনও অনেক করণীয় আছে। তামিলনাড়ু, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কৃষি পরিকল্পনাধীন অনেকগুলি জায়গা তিনি পরিদর্শন করেন। অসংখ্য কৃষক, সরকারী কর্মচারী এবং গবেষকের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন। 'সবুজ বিপ্লব' সংক্রান্ত কথাবার্তাই এতে প্রাধান্য পায়। এসম্পর্কে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে শুষ্ক অঞ্চলের কৃষকদের ফসল ফলানোর সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলার একটি কৃষিক্ষেত্রের প্রচুর ফলন দেখে তিনি অবাক হন। পুরনো পথ ছেড়ে কৃষকেরা এখানে আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছে। সার এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ—দুয়েরই তারা সদ্ব্যবহার করেছে। অবশ্য এই অঞ্চলে সেচের সুবিধা আছে। তাই ফলনও খুব উল্লেখযোগ্য। চাষের এই সাফল্য চাষীর জীবনে প্রভাব ফেলছে। জীবনধারণের মান উন্নয়নে সে যেমন সচেষ্ট তেমনি আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতিও কিনছে।

আর্থিক উন্নতির আরেকটি দিক হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। এদেশের মহিলারা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বেশি সন্তান মানেই তাদের স্বচ্ছলতা হ্রাস।

পাঞ্জাবের গম বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার কৃষিক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা বর্তমান। চাষের সুযোগ এখানে ক্রম-বর্ধমান। কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠায় চাষীদেরও খুব সুবিধা হচ্ছে। এর সঙ্গে শুষ্ক অঞ্চলের ফারাক বিস্তর। এক জায়গায় যেমন প্রচুর চাষের জল অন্য জায়গায় তেমনি প্রচন্ড জলাভাব। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে এই অবস্থা অত্যন্ত প্রকট। এই অঞ্চলের জন-সাধারণকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির উপর। অন্য কোন প্রকার জলের সুযোগ এখানে নেই। অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা খুবই কষ্টকর। তাই সমস্যা দেখা দিয়েছে এখানে জল নিয়ে আসার। এতে খরচ খুব বেশি। কাজটাও খুব সহজসাধ্য নয়। তবে এ সম্পর্কে ভারত সরকার চুপচাপ বসে নেই। কিভাবে এই অঞ্চলের উন্নতি করা যায় সে নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তা এবং গবেষণা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী হার্টের ধারণা, ভারত সরকার এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

এদেশে আর দুটি পরস্পরবিরোধী চিত্রের সহাবস্থান খুবই আশ্চর্যজনক। উন্নত শিল্প ও শিল্পের চর্চা এবং দারিদ্র্য এদেশে হাত ধরাধরি করে চলেছে। অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্র তিনি পরিদর্শন করেন। তামিলনাড়ু, দুর্গাপুর, কানপুর এবং পাটনায় শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তাঁর মতে খুবই প্রশংসনীয় উদ্যম। দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে। ইস্পাত উৎপাদনের পুরো ক্ষমতা এই উৎপাদন কেন্দ্রে সক্রিয় বলে তাঁর ধারণা। সারা দেশ জুড়ে বিরাট শিল্পো-দ্যোগ চলছে। সে তুলনায় কিন্তু গ্রামের উন্নতি তেমন নয়। শুধু মাত্র কৃষি নয়, কৃষির সহায়ক শিল্পের উন্নতিও একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় উন্নয়নের এই পরস্পর-বিরোধী দিক দেশের অর্থনীতির পক্ষে খুব একটা সহায়ক হবে না।

সারা দেশ ঘুরে এবার তিনি এলেন কলকাতায়। ভ্রমণের এই অংশকে তিনি সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করে-ছেন। কলকাতার নগর প্রকল্প সংস্থা তাঁকে নিয়ে যান বস্তিতে। হয়তো উদ্দেশ্য ছিল বস্তির উন্নয়ন কার্য দেখানো। বেছে বেছে সবচেয়ে দুটো নোংরা বস্তি তাঁকে দেখানো হয়। এ দুটি বস্তির উন্নয়ন প্রচেষ্টার তিনি প্রশংসা করেন। পরে সান্ত্বনার স্বরে তিনি বলেছেন, কলকাতার মতো বড়ো শহরের হাজারো সমস্যা। তাই চট করে সমাধানের স্বপ্ন খুবই অবাস্তব।

কলকাতা সম্পর্কে শ্রীমতী হার্টের মন্তব্য অনেকটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো। এমনিতেই এই শহরের প্রতি সকলের বিরূপ মনোভাব। কলকাতা সম্পর্কে কটূক্তির অন্ত নেই—স্বদেশে এবং বিদেশে। তাতেই মোট ট্যুরিস্টের মাত্র শতকরা ১২ জন এসেছে কলকাতা, বোম্বাইয়ে শতকরা ৩১ জন আর দিল্লীতে শতকরা ৩০ জন। অন্যান্য শহর নিয়ে বিদেশে কত প্রচার কিন্তু কলকাতা নিয়ে অত মাথাব্যথা কারো নেই। কিছু কিছু পরিকল্পনার কথা শোনা যায় খবরের কাগজের সীমাবদ্ধতায়। সেই শহরে এসেই শ্রীমতী হার্ট পরিদর্শন করলেন বস্তি, যাকে তিনি ভ্রমণের সবচেয়ে হতাশা-ব্যঞ্জক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ বস্তি ভারতের রাজধানী খোদ দিল্লী শহরেই আছে। অধিবাসীদের অবস্থাও অবর্ণনীয়। অথচ সেখানকার নগরকর্তাদের জ্ঞানের নাড়ি টনটনে, বিদেশী মন্ত্রীকে বস্তি দেখানোর যত গরজ আমাদের।

পরিশেষে শ্রীমতী হার্ট মন্তব্য করে-ছেন, ভারত ভ্রমণের সুযোগে তিনি একটি উন্নতিকামী দেশের নানা সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছেন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন। বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে এই অভিজ্ঞতা তাঁর খুবই কাজে লাগবে। ভাবনা-চিন্তা করে তিনি সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন, ভারতের উন্নতিতে আরো কেমনভাবে বৃটিশ সাহায্য করা সম্ভব যাতে এই মহান দেশ নিজস্ব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং ভারতবাসীদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন হয়।

—প্রমীলা

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

উত্তেজিত শিউপ্রসাদজিকে শান্ত করার চেষ্টা করল পরাশর।

শান্ত হন শিউপ্রসাদজি আগে এখানে বসেই ব্যাপারটা শুনি।

এখানে বসেই বলব? কিন্তু তাহলে যে ভালো করে সব বোঝাতে পারব না। লছমীকেত আপনি দেখেছেন, মিঃ ভার্মা!

হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি!

কিন্তু আপনার বন্ধু ত দেখেননি। টেবিলের ওপর একটা অ্যালবাম আছে বোধহয়-

হ্যাঁ, আছে। আপনি এবার একটু বসুন!

আচ্ছা বসছি- অনুগ্রহ করে, আলোটা একটু বাড়িয়ে অ্যালবামটা আপনার বন্ধুকে দেখান!

শিউপ্রসাদজির নির্দেশই মানা হল।

ছোট বেলা থেকে লছমীর অনেক ছবি ওতে আছে।

সত্যিই অত্যন্ত স্নিগ্ধ চেহারার একটি মেয়ের কৈশোর থেকে যৌবনের ছবি অ্যালবামে পাওয়া গেল।
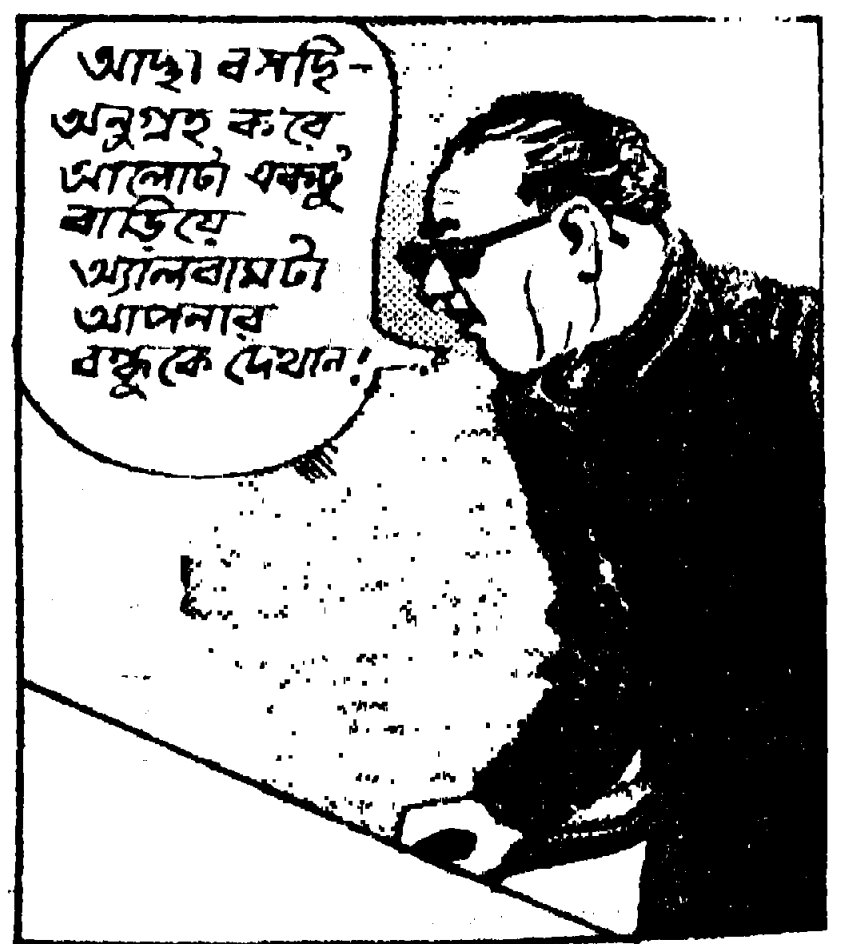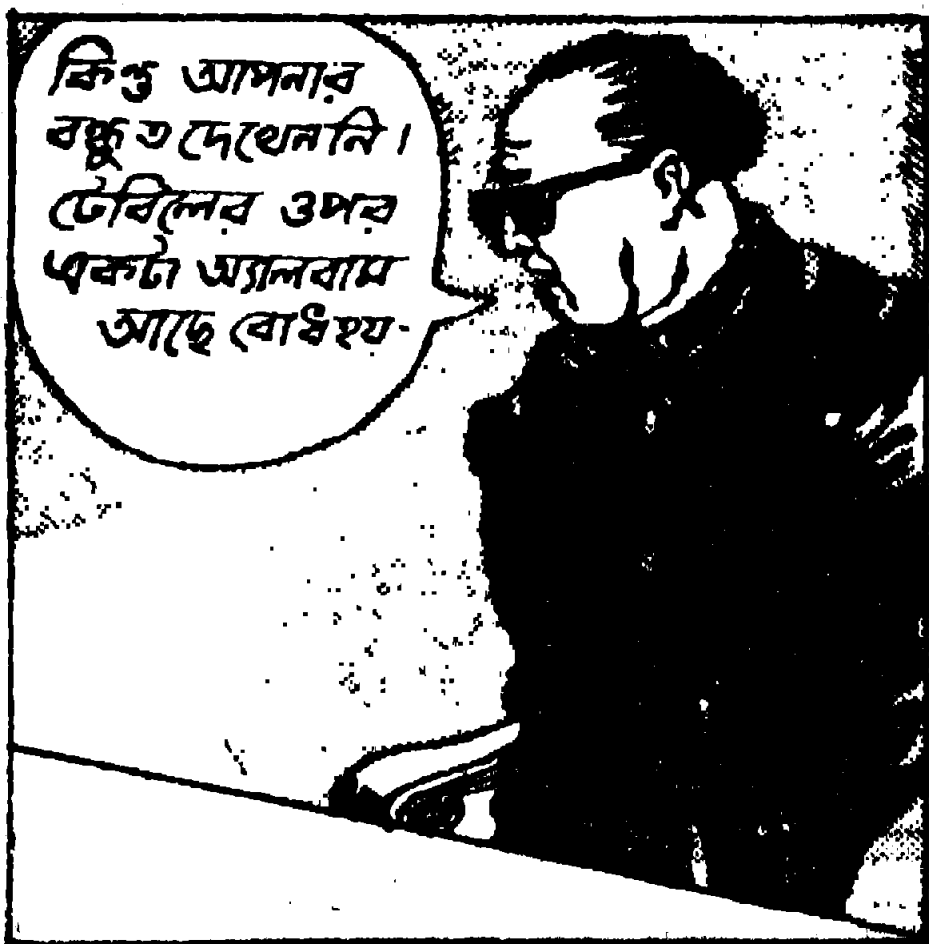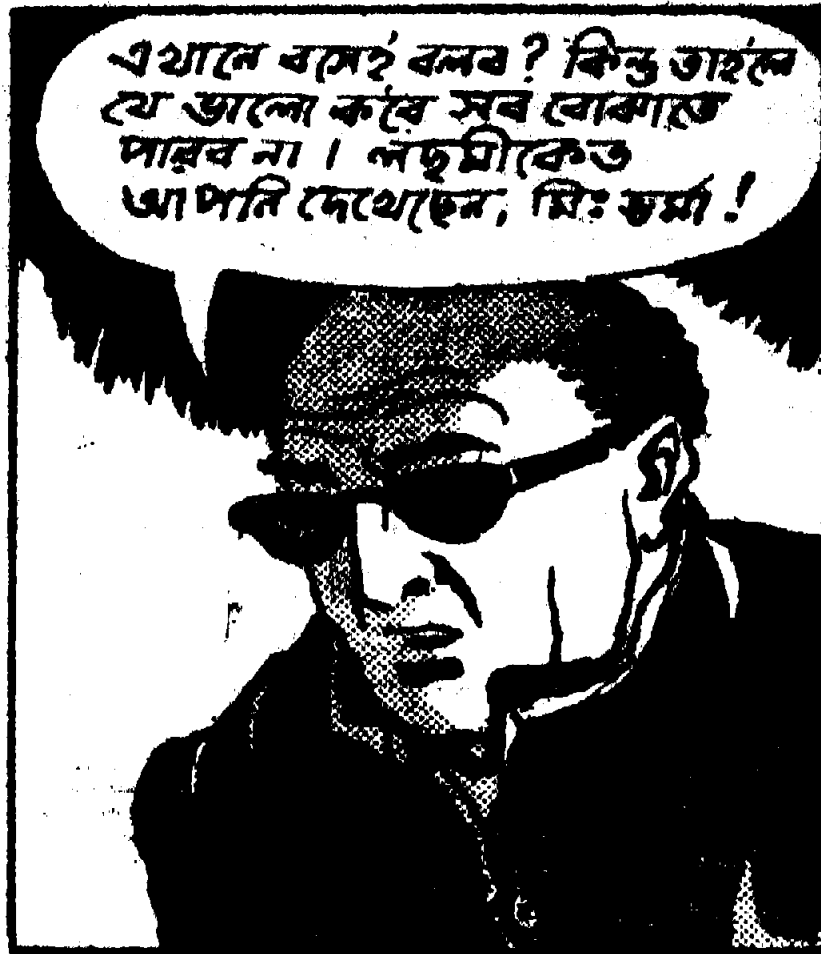
বেতার শ্রুতি

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে দিল্লীতে একটা লিসনার র্চ সার্ভে করা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে আলোচনা আর কার শ্রোতৃ-সংখ্যা বেতার অনুষ্ঠানের সমগ্র শ্রোতৃ-সংখ্যার প্রায় শতাংশ মাত্র। আকাশবাণীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানের শ্রোতৃ-খ্যা এত কম নয়।

আকাশবাণীর আলোচনা আর কথিকার শ্রোতৃ-সংখ্যা যে চেয়ে কম তার অন্যতম প্রধান কারণ বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব বা তূহলের অভাব। জনচিত্তে প্রবল কৌতূহল আর প্রচণ্ড আলোড়ন ষ্টি করেছে এমন অসংখ্য ক্ষেত্রে আকাশবাণী একেবারে নীরব কেছে। এখনও দেশের ও বিশ্বের এই সামগ্রিক অস্থিরতার কালে ব বিষয়ে মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহ, কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা— কাশবাণী সেসব বিষয়ের অধিকাংশেরই প্রতি উদাসীন। কখনও খনও বড়োজোর সরকারী ধারায় কোনো মন্ত্রীর কিংবা উচ্চপদস্থ কারী কর্মচারীর বিবৃতি অথবা ক্ষুদ্র ভাষণ হয়তো প্রচারিত কিন্তু শ্রোতাদের তাতে বিশেষ আগ্রহ থাকে না, কারণ কারী বক্তব্য কী হবে না-হবে তাঁদের অনেকেরই তা জানা আছে।

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কখনই কোনো বিতর্কমূলক বিষয়ে লোচনা প্রচার করেন না—অথচ বিতর্কের মধ্যেই থাকে প্রাণ, র শ্রোতাদেরও তাতে বেশি আগ্রহ। এই আগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে: পশ্চিম বঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট ন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভা স্বীকার রে নিলে বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিধান-ভার অভ্যন্তরে যে 'ঐতিহাসিক বিনির্দেশ' দিয়েছিলেন এবং সেই ময় গোলমালের মধ্যে ডঃ ঘোষ যে আহত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে নচিত্তে প্রচণ্ড সাড়া জেগেছিল এবং জনসাধারণ উভয় পক্ষের ক্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের দানীন্তন অধিকর্তা প্রভূত পরিশ্রমে দিল্লীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ম্মতি আদায় করে কলকাতা কেন্দ্র থেকে উভয় পক্ষের বক্তব্য চার করেছিলেন। প্রথম দিন প্রচারিত হয়েছিল ডঃ ঘোষের বক্তব্য, রের দিন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের। তদানীন্তন কেন্দ্রাধিকর্তা তখন যে হস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার জন্য জনসাধারণ তাঁর কণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। সংবাদপত্রেও তাঁর এই সৎ প্রচেষ্টার বিতর্কিত বিষয়ে বক্তব্য প্রচারের শুভ সূচনার জন্য প্রশস্তি করা য়েছিল।

কিন্তু বিতর্কমূলক বিষয় প্রচার সে-ই সম্ভবত শেষ। র পরে অনেক বিতর্কমূলক বিষয় এসেছে, জনচিত্ত অধিকার রেছে, আবার চলেও গেছে—কিন্তু আকাশবাণী অনড় হয়েই আছেন।

আসলে বিতর্কে আকাশবাণীর একটা অমূলক ভয় আছে। অথবা তাঁরা ঝামেলা এড়াতে চান। তাঁদের এই ভয় শুধু রাজ-নৈতিক আর অর্থনৈতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নেই, চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের এই ভয়—তা সে সামাজিক বিষয়েই হোক, কি দেশের বিষয়ে অথবা ধর্মের।

তারা জিঙ্কিন 'কাস্ট্ ইন ইণ্ডিয়া' নামে একখানি বই লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, বোম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর একটি কথিকায় তাঁকে জাতি কথাটা বলতে দেওয়া হয়নি, কারণ ভারত সরকার জাতিভেদপ্রথা বিলোপ করে দিয়েছেন।

এই ধরনের জিনিস আকাশবাণীতে নিত্য ঘটে, অহরহ ঘটে। কিন্তু বাইরের লোকেরা তা জানতে পারেন না, কথকরা এ নিয়ে বলাবলি করেন না। কারণ, তাঁরা জানেন, বেশি হৈ-চৈ করলে তাঁদের হয়তো আর ডাকাই হবে না।

শুধু বিষয় নিয়েই আকাশবাণীর ভয় নয়, ব্যক্তি নিয়েও। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার কাদের পছন্দ করেন না, আকাশবাণীর প্রোগ্র্যামের কর্তাদের তা বিলক্ষণ জানা আছে, এবং তাঁরা সেইসব ব্যক্তিকে কখনই কোনো বিষয়ে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানান না। তাঁদের ভয়, এইসব ব্যক্তি সরকারের পক্ষে অপ্রীতিকর কিছু যদি বলে ফেলেন তাহলে অনেক টানাহেঁচড়া হবে। তার চেয়ে নিরাপদ ব্যক্তিদের ডাকাই ভালো।

সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আকাশবাণীতে কতকগুলো 'ডুজ' আর 'ডোণ্টস্' ('করণীয়' আর 'অকরণীয়') আছে—অর্থাৎ কোনগুলো প্রচারিত হতে পারে আর কোনগুলো পারে না। এবং সেগুলো আজও প্রায় অব্যাহত ধারায় চলে আসছে। আকাশবাণীর এই 'ডোণ্টস্'-য়ের তালিকায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে কোনো জীবিত ব্যক্তির, রাজনৈতিক দলের এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটিও আছে। বৃহত্তর চিন্তায় এইসব 'ডোণ্টস্'-য়ে আপত্তির কিছু হয়তো নেই। কিন্তু সরকারী অফিসে সবকিছুই উপরসাভাবে দেখা হয় এবং তার ফলে অনেক সময় চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আকাশবাণী থেকে চলচ্চিত্রের সমালোচনা প্রচারে বাধানিষেধের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, এতে করে সেই চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে। বহু বছর আকাশবাণী থেকে গ্রন্থসমালোচনায় গ্রন্থের মূল্য বলা হত না এবং প্রকাশকের নামঠিকানা থাকত উহ্য, কারণ তাতে গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন করা হবে। সৌভাগ্যবশতঃ পরে আকাশবাণীর কর্তাদের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং এখন গ্রন্থসমালোচনার উপর 'ডোণ্ট্'-য়ের সেই খড়্গ উদ্যত নেই। আকাশবাণীর 'ডোণ্ট্'-য়ের নীতি মানতে হলে তো গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম ছাড়াই সমালোচনা করা উচিত।

আকাশবাণীর আলোচনা আর কথিকার বড়ো অসুবিধা হচ্ছে সেগুলি সুপ্রযোজিত হয় না, শুধু প্রচারিত হয়। প্রোগ্র্যামের ভারপ্রাপ্ত যাঁরা, তাঁরা বিষয় ঠিক করেন, বক্তা মনোনীত করেন, বক্তার কাছ থেকে স্ক্রিপ্টটা এলে তার মধ্যে 'ডোণ্ট' কিছু আছে কিনা দেখেন, থাকলে বাদ দিতে বলেন। তারপর বক্তা টেপ রেকর্ডিংয়ের সময় মাইক্রোফোনের সামনে আপন মনে স্ক্রিপ্টটা পড়ে যান, এবং রেকর্ডিং হয়ে গেলে চেক নিয়ে চলে যান। তাঁর দায় চুকে গেল, প্রোগ্র্যামের ভারপ্রাপ্ত যিনি, তিনিও অব্যাহতি পেলেন।

প্রোগ্র্যামের ভারপ্রাপ্ত যিনি, তিনি ঐ 'ডোণ্ট্স্' ছাড়া আর কিছু দেখলেন না। স্ক্রিপ্টটা কেমন হল, কি হলে আরও বেতারোপযোগী হত, কেমন করে বললে শ্রোতাদের বেশি করে আকর্ষণ করতে পারত—সেসব দিকে মন দিলেন না। এমনকি, একবার মহলা দিয়ে নিতেও বললেন না। অথচ যে-কোনো বেতার প্রতিষ্ঠানে এই মহলা একটা 'মাস্ট' ('অবশ্য')। এবং বি-বি-সি এই মহলার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় দিয়ে থাকে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক বলে সাধারণত যে সব বস্তু কর্ণাধঃকরণ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা গেল ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক পরগাছা। 'পরগাছা মূলে ছিল 'কাঠপুতলা', সৈয়দ আব্দুল মালিক কর্তৃক অসমীয়া ভাষায় রচিত। অসমীয়া বেতার-রূপ শ্রীমহেন্দ্র বরঠাকুর। বাংলা রূপান্তর শ্রীঅনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

'পরগাছা'র মধ্যে নাটকীয়তা বিশেষ না থাকলেও একটা স্বচ্ছতা ছিল। স্পষ্টতা।...এবং সাবলীলতা।

স্বজন-পরিজনহীন মমতাজের ঘর, কোথা থেকে কে জানে, বিধাতার আশীর্বাদের মতো একদিন বেদানা নামে একটি মেয়ে এসে উঠল। সরল-মন মমতাজ প্রশ্ন করল না কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে। শুধু জানল, বিপদে পড়ে এসেছে। তাকে আশ্রয় দিতে হবে, নিরাপত্তা দিতে হবে, বাঁধতে হবে স্নেহের বাঁধনে।

বেদানাকে পাবার পর মমতাজের জীবনধারা গেল বদলে। তার ছন্নছাড়া জীবনে এল স্থিরতা। বেদানাও পরম আদরে গ্রহণ করল মমতাজকে। তাই মমতাজ অসুখে পড়লে তাকে সারিয়ে তোলার জন্য তার আকুলতার শেষ ছিল না। ডাক্তার ডেকে, ওষুধ এনে, পথ্য করে, সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে বেদানা সারিয়ে তুলল মমতাজকে।

কিন্তু মমতাজের এই অসুখই তার জীবনে আবার দুঃখ ডেকে নিয়ে এল। তার অসুখের সময় ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বেদানার। ডাক্তার বেদানার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। বেদানা সে প্রেম সভয়ে, সঙ্কুচিত মনে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু মমতাজের আরোগ্য লাভের পরে দেখা গেল ডাক্তার আর বেদানার মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। কী করে, তার কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। ডাক্তার বেদানার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলে বেদানা তা সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। কেন, তা জানা যায়নি।

বেদানা ডাক্তারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মমতাজকে জানাল, এবং তাদের বিবাহে অনুমতি চাইল। মমতাজ দীর্ণ হৃদয়ে, রুদ্ধ স্বরে দিল সে অনুমতি। ...বেদানা চলে গেল। মমতাজের জীবন আবার ভরে গেল পরম শূন্যতায়, শতধা হ'ল তার হৃদয়মন।

বেদানার চরিত্রটি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই মূর্ত করে তুলেছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য, কিন্তু তাঁর পাশে শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারকে মোটেই ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। ডাক্তারকে খুব একঘেয়ে ও অ-প্রেমিক লেগেছিল। শ্রীবিজয় সরকারের মমতাজ ভালো। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ চালিয়ে গেছেন।

১লা মার্চ রাত সওয়া ১০টায় ছিল সংবাদ বিচিত্রা (বেতারজগতের ভাষায় 'বেতার সংবাদ বিচিত্রা', কারণ ইংরেজীতে 'রেডিও নিউজ রীল' লেখা থাকে)। এই সংবাদ বিচিত্রার বিষয় ছিল : কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া, রাণী রাসমণির জন্মোৎসব ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া সংবাদপত্রে জানা গেছে, কিন্তু রেডিওর তাঁদের নিজেদের মুখের কথায় জানার মধ্যে আলাদা একটা মূল্য আছে, সেই মূল্যটা পাওয়া গিয়েছিল এই সংবাদ বিচিত্রায়।

রাণী রাসমণি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারীদের মনে একটা বিশেষ আসন অধিকার করে আছেন। তাই তাঁর জন্মোৎসব পালন খুবই স্বাভাবিক—এবং প্রয়োজনও। সাড়ম্বরে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। তারই কিছু অংশ প্রচারিত হয়েছে এই অনুষ্ঠানে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর বিয়োগে বাংলা সাহিত্যানুরাগীরা স্বাভাবিক ভাবেই কাতর হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা, সহকর্মীরা ও ছাত্ররা কাতর হয়েছেন বেশি। তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে এইদিনের এই সংবাদ বিচিত্রায়। প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ধীর শান্ত সংযত শোকার্ত স্বরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা চিত্তস্পর্শী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেল তার উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় শ্রীকুমারের অসামান্য দানের কথা তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিও মনে গভীর রেখাপাত করার মতো। বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র ও বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর শ্রদ্ধানিবেদনও স্মরণীয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পাদিত, সুগ্রথিত।

২রা মার্চ রাত সাড়ে ৯টায় শ্রীমতী কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতা বেশ দরদ দিয়েই গেয়েছেন।

এইদিন রাত সওয়া ১০টায় ছিল গ্র্যামোফোন রেকর্ডে গৃহীত কীর্তনাঙ্গ গীতিনাট্য : 'শ্রীরাধার মানভঞ্জন'। রচনা শ্রীপ্রণব রায়, প্রযোজনা শ্রীঅধীর সেন, পরিচালনা শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়।

এই গীতিনাট্যের সঙ্গীতাংশে ও অভিনয়াংশে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা ছিলেন। বেশ মনোরম হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। শিল্পীরা প্রায় সকলেই আন্তরিকতার গেয়েছেন, অভিনয় করেছেন। তাঁদের গান আর অভিনয়ে বেশ একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ মনোরমতায় ব্যাঘাতও ঘটেছিল কিছু অভিনয় আর গানের কখনও আগে, কখন পরে ধীরে সেগুলির আবৃত্তি শো যাচ্ছিল। ধীরে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ক যেন কেউ প্রমট করে দিচ্ছেন অথ 'একো' (প্রতিধ্বনি) হচ্ছে। কিন্তু পরে আবৃত্তি প্রমট হতে পারে না, আব আবৃত্তি 'একো' হতে পারে না—ও কিছুটা চিন্তায় পড়তে হয়েছিল। দোষ গ্র্যামোফোন কোম্পানির না বেতারকেন্দ্র গ্র্যামোফোন কোম্পানির রেকর্ডিং কিন্তু ব প্রশংসনীয় নয়।

দিল্লী কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ বিভা বাংলা বাক্যগঠনের একটা সু নমুনা "পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছেন, রাজ্যে শিল্প পরিস্থিতি যতদূর সম্ভব খার বলা যায়।"

এই সুন্দর বাক্যটি ৩রা মার্চ ১২টা ৫০ মিনিটের খবরের গোড়ায় শেষে দুবার বলা হয়েছে।

ভাষা ও উচ্চারণজ্ঞানও এ অপরিসীম। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পা গেছে ৯ই মার্চ সকাল সাড়ে ৭টার খব এই খবরে বলা হয়েছে : 'যুক্তফ্রন্ট যুগ্ম (আনডারলাইন বাংলা উচ্চারণ যুগ আহ্বায়কের অন্যতম (মার্ক যুগ্ম অনাতম) শ্রীসুধীনকুমার...।'—'সুলফা ভাং ওষুধ' (সালফা ড্রাগ?)। 'একটি স সরকারী জাপানী প্রতিনিধিস্বর' (ম একটি প্রতিনিধিস্বর)।

আমি অনেক দিন থেকে বলেছি, এঁ একটা কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। কেউ কান দিচ্ছেন না। এই সম্প্রতি দিল্ল সাহিত্য আকাডেমি অনেককে আ পুরস্কার দিয়েছেন, এঁদের কেন দি না ভেবে বিস্মিত হচ্ছি।

—শ্রব

জলসা

রবীন্দ্র ভারতীতে রবিশঙ্কর

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজে তরুণ শিল্পী কুমকুম ভট্টাচার্য

'কৌশিকী' নিবেদিত রবীন্দ্রসংগীতের একক অনুষ্ঠান—যথাযোগ্য পরিবেশক এবং উপস্থাপনার পটভূমিকার অ-দেখা আলোতে সংগীতের মর্মমূর্তিটি যেন আপন তাগিদেই সহৃদয় রসিকের কাছে ধরা দেয়—আর সেই অধরা আলোর চকিত দীপ্তি ক্ষণকালের হলেও অন্তরের অতলে এক অনপণেয় ভালো লাগার ছাপ রেখে যায়। এ-সত্য নতুন করে অনুভব করলাম সম্প্রতি পরিবেশিত আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস হলে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক গানের এক চিত্তগ্রাহী রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান শুনে। অশোকতরুবাবুর গান আগেও শুনেছি কখনও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের সংগত-দানের গায়করূপে, কখনও বা কোনো অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে একজন অংশ-গ্রহণকারীরূপে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সে-সব অনুষ্ঠান মনে কোনোই রেখাপাত করতে পারেনি।

অশোকতরু বন্দোপাধ্যায় একজন শিল্পী, তাঁর নিজস্ব ধারণা এবং স্বপ্ন নিয়ে বিশেষ এক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ-সত্য সম্বন্ধেও সেইদিনই অবহিত হলাম, এবং শিল্পী মনটির সঙ্গে সেদিনের অনুষ্ঠানে পরিচয়ের ঘটনা সত্যিই আনন্দের।

রবীন্দ্রসঙ্গীত মানসলোকের বিভিন্ন দর্শনের ধারা অনুসরণ করে বিচিত্র ভাব ও কল্পনাভিত্তিক সঙ্গীতগুচ্ছের নির্বাচনে অশোকবাবুর সংস্কৃতিমান বিদগ্ধ মনেরই স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে মোটের ওপর পাঁচটি যুগের ছায়া পড়েছে। প্রথম যুগে তানসেন, বৈজু বাওড়া প্রভাবিত ধ্রুপদ গান, দ্বিতীয় যুগে কথাই মুখ্যস্থান অধিকার করে এবং কথার মেজাজ ও ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রাগ ও তালের অবতারণা। তেলেনা, টপ্পা, রাগগীতি এর টমার মুরের আইরিশ ও ইউরোপীয় সুর, তৃতীয় যুগ সম্পূর্ণ বাংলা-দেশের মৃত্তিকাজাত এক আবেগবিহ্বলতা। বহু ভক্তিপ্রধান গানের জন্ম এই যুগেই। এরপর কাব্যধর্মী গীতির যুগ—বাউল, ভাটিয়ালী, জারী, কীর্তন এবং জাতীয়-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে শান্ত রসের উপাসক, কবি মরমী ভাবের গভীরে ডুব দিয়ে একাধারে মুক্তপ্রাণ ঔদাস্যে আনমনা অন্যদিকে জীবন ও জগতের অন্তরালের গভীর রহস্যের সন্ধানে ব্যাকুল।

সেদিনের সঙ্গীত-চয়ন ও পরিবেশনায় উপরোক্ত সবকটি ধারার পথচিহ্ন সু-পরিলক্ষিত। আত্মনিবেদনের বিনিত প্রার্থনার আর্তি, কালোয়াতী গানের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য, টপ্পা ঠুংরীর শৃঙ্গার যাতনা কৌতুক এবং সন্ধানী মনের স-কাতর কারুণ্য ও বুকফাটা আবেগ অশোকবাবুর পরিশীলিত কণ্ঠ, সুচিন্তিত গায়নশৈলী এবং শিল্পীজনোচিত আত্মমগ্ন আবেগে এক অপূর্ব রসমূর্তি গ্রহণ করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যেন আস্বাদ করেছি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য "পুষ্পবনে পুষ্প নাহি" গানটিতে ভৈ'রোর প্রশান্ত কারুণ্য, শুদ্ধ গান্ধার ও কোমল রেখাবের মধুর-ব্যঞ্জনা।

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" গানটিতে আবেগের আতিশয্য মাঝে মাঝে কৃত্রিম মনে হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে এই সন্ধ্যা যেন কয়েকটি দুর্লভ এবং সরস মুহূর্তের এক সুন্দর মালাগাঁথা—যে মালা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গেঁথে সঙ্গীত-রসিকমহলকে উপহার দিয়েছেন শিল্পী ও কৌশিকীর সভ্যরা।

সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ—এবারের সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজের অধিবেশনে অন্যান্যবারের তুলনায় ব্যবস্থাপনার সুসংবদ্ধতা লক্ষ্য করবার মত। জনপ্রিয় শিল্পীসংখ্যা রীতিমত লোভনীয়। কিন্তু সময়ের সীমারেখায় সকলের অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করায় বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। তবে আকর্ষণীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠানের অবকাশ সঙ্কুচিত হওয়ার দরুন প্রাণভরে তাঁদের প্রকাশ-বৈভব উপভোগ করা যায়নি। এটুকু ত্রুটি না থাকলে সঙ্গীতের এই বিস্তৃত আসর নিঃসন্দেহে উপভোগ্যতর হোত। প্রসঙ্গত বলা যায় চিন্ময় লাহিড়ীর কথা। ইনি গাইলেন 'হেমন্তিকা'—এ রাগ আগে

শোনা যায়নি। শিল্পীর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল আলাউদ্দিন ঘরাণার "হেমন্ত" রাগের সঙ্গে যুগল নিষাদ প্রয়োগ করে এই আশ্চর্য সুন্দর রূপে সৃষ্টি এক স্রষ্টাই তাঁর নিজের। কণ্ঠস্বরের মাদকতা চিন্ময়বাবুর প্রধান সম্পদ, এর সঙ্গে মিলেছে তাঁর প্রসন্ন মেজাজ ও সুপরিকল্পিত শিল্পবোধ। এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর সঙ্গীতের প্রতিটি মুহূর্ত রোমাঞ্চকর। তবে আগেই বলেছি পরিবেশনের সময় বড় অল্প তাই মন ভরেনি।

নাসির হোসেন খাঁর "যোগকোষ" সুকণ্ঠ শিল্পীর পরিচ্ছন্ন বিস্তারে উপভোগ্য, তবে তুলনামূলক বিচারে অধিকতর উপভোগ্য তাঁর গজল ও ঠুংরী। সুনন্দা পট্টনায়কের প্রথম দিনের গান 'কৌশিকী কানড়া' রেডিওর মারফত প্রচারিত হয়। 'মালকোষ' অঙ্গের দৃপ্ততার সঙ্গে শিল্পীর ভক্তিভাব মিলে বিশেষ এক পরিবেশ সৃষ্টি করলেও শিল্পীর যে বিশিষ্ট তানশৈলীর সঙ্গে শ্রোতারা পরিচিত সেদিন তার অভাব আমাদের ক্ষুণ্ণ করেছে। অবশ্য তারাণার অতুলনীয় ছন্দসৌকর্য ভোলার নয়। এই তানের অভাব কিন্তু তিনি অকৃপণ ধারায় পূর্ণ করেছেন দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে যেদিন গাইলেন 'রায়সী কানাড়া'। দুদিনের ভজনের প্রথমদিন "অজ সুদিন" তুলসী-*দাসের বৈরাগ্য, দ্বিতীয় দিন 'যোগী মত্ যা'র বাংলাদেশের মন্দিরে পূজারিণীর বিনতি এক ভাবঘন পরিবেশ রচনা করে।*

পণ্ডিত যশরাজের গানে তানের কিছু অংশ সুন্দর। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। শিপ্রা বসুর গানে উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচয় মুদ্রিত। অন্যান্য তরুণ শিল্পীদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি সম্ভাবনা দেখেছি যাদের মধ্যে তাঁরা হলেন সুভাষ চাকলাদার, অমীতা মজুমদার, মীলা মজুমদার।

প্রভাতী রাগের ধ্যানকল্প পরিবেশে কণ্ঠসঙ্গীতের আসর সমাপ্ত করেন ওস্তাদ আমীর খাঁ।

যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রীমতী শিশিরকণা ধর-চৌধুরীর 'কলাবতী' শুনে বিস্মিত হতে হয় বয়স অনুপাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গভীরতা প্রত্যক্ষ করে।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নটভৈরব ও ভৈরবী তাঁর স্বভাবানুগ উদ্যমে পরি-বেশিত। কল্যাণী রায়ের 'মালকোষে' শিল্পীর আঙ্গিক নৈপুণ্য ছাড়াও চিন্তার ছাপ লক্ষণীয়।

ভি. জি. যোগের বেহালার চটক ও বলরাম পাঠকের সূক্ষ্ম কারুকার্যের আকর্ষণ যথেষ্ট। সেতারে সুব্রত রায়চৌধুরী পরি-বেশিত বহুকোষ সত্যিই মধুর।

ঊর্মিলা নাগরের কথক নৃত্য মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত। এই প্রতিভাময়ী শিল্পীকে উপস্থাপনার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। *মায়া চট্টোপাধ্যায় যে বাংলার অদ্বিতীয় কথক-নৃত্যশিল্পী সে সত্য নতুন করে অনুভব করা গেল। লিপিকা গুপ্তর* "ভারতনাটাম" প্রশংসনীয় হলেও আগের তুলনায় অনেক ম্লান। কেন? রূপা গুপ্ত শিশুশিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতিতে অক্ষুণ্ণ।

"রবীন্দ্রভারতী" পরিদর্শনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর—সম্প্রতি কলকাতায় থাকাকালী পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর নানান কাজের ফাঁ 'রবীন্দ্রভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনায় উপস্থিত হন জোড়াসাঁকোয়। প্রতিটি ক্লা গিয়ে শিক্ষার্থীদের ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী টপ্পা, কীর্তন, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গী শুনে এবং কথাকলি, ভারতনাট্যম, মণিপুরী কথক ইত্যাদি বিবিধ নৃত্যদর্শনে প্রীত এবং গুরুদেব শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করে

'আজব শহর'-এর মিউজিক টেক—এ

গত সপ্তাহে রবীন বসু প্রোডাকস প্রথম প্রয়াস 'আজব শহর'-এর সঙ্গীতগ্র হয়ে গেল টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। ক পক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে স্টুডিও পেঁছে দেখি খাতা হাতে মাইকের সা দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য পরিচালনা রবীন বসুর। কিন্তু সংগী পরিচালনায় আছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী স্বরচিত সুর ও কথায় আধুনিক গা কৃতিত্বের সঙ্গেই গেয়েছেন গ্রামোফো 'বসন্ত-বন্দনা সিরিজে। ফিল্ম-সং পরিচালকরূপে এই প্রথম এঁর স পরিচয় ঘটল। নেপথ্য সঙ্গীতের শিল্পী রূপে আছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ব সেনগুপ্ত এবং পরিচালক স্বয়ং। দ্বিজে *বাবুর সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গাইছি* 'এ মধুঝরা সুন্দর লগনে'।—কোনো বি রাগের ওপর জোর দিয়ে এ-গানের রচিত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ-আলোর ঝ কানির মত কখনও পিলু, কখনও খা ও বিলাবলের স্পর্শে কথাগুলি সুরের দোলায় দুলে উঠছি । গ সুরের কারিগরী শিল্প -প্রাণ ক আধারে বেশ কয়েকটি উপভোগ্য মুহূ সৃষ্টি করেছে। শুনলাম এই গানটিই একটি সিচুয়েশনে দ্বিজেনবাবুও গাইছে

দ্বিতীয় গানটি 'এই হাওয়া এই মা মাটির সজল মেদুরতা হাওয়ার অনায়াস ছন্দে কথা বলে ওঠে ব সুন্দর কণ্ঠে।

আর একটি পরিবেশনযোগ্য হোলো এই যে, দ্বিজেনবাবু এই ছ সম্পূর্ণ অচেনা এক গীতিকারকে সঙ্গ রসিকের গোচরে আনছেন—নাম বীরে ভট্টাচার্য। তথাকথিত আধুনিক রুচিহীন বিকারের স্রোতে ভেসে না সহজ, সরল আবেদনের রূপটি রাখার চেষ্টা করেছেন এটা নিশ্চয়ই আ কথা। সুরকার ও গীতিকারের এই প্রয়াস আমাদের ভাল লেগেছে।

—চিত্রা

আজব শহর/সঙ্গীত পরিচালক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং নেপথ্য গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণী সেনগুপ্ত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

ন্রাগ কি প্রেমের পূর্বগামিনী?

তিলকুচি গ্রামের সংসারানভিজ্ঞ গ্রন্থ-
ীরী শশিভূষণ সদ্যবিকশিত এম-এ,
-এল-এর প্রতি প্রতিবেশীকন্যা দশ
সর বয়স্কা অশিক্ষিতা গিরিবালার যে
কর্ষণবোধ, তার নাম বোধকরি অনুরাগ।
রণ এম-এ, বি-এল পাশকরা একুশ-
ুশ বছরের যুবকের প্রতি দশ বছরের
িকা প্রেম ও প্রণয়ে ডগমগ হয়ে
েছে, এ-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে
ভব নয়। গিরিবালার মধ্যে যেদিন লেখা-
ড়া শেখবার ইচ্ছা জেগেছিল, সেদিন সে
জের ভাইয়েদের কাছ থেকে উৎসাহের
লে তাচ্ছিল্য লাভ ক'রে তার ভাইদের
কে অনেক বেশী বিদ্বান শশিভূষণের
রর সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার
হায় পাবার আশায়। শশিভূষণ তাকে
ই দেখতে ডাকা সত্ত্বেও সে প্রথমটা
বড় বিদ্বান লোকের সান্নিধ্যে যেতে
ারেনি; কিন্তু ক্রমেই বালিকাসুলভ
কোচ কেটে যেতে সে শশিভূষণের কাছে
লেখাপড়া শুরু করল এবং শিগগিরই
ংলা এবং ইংরেজি বর্ণমালা আরত্ত
রে নিয়ে সহজ বই প'ড়ে ফেলতে
াগল। পড়া উপলক্ষ্যেই গিরিবালার সঙ্গে
শিভূষণের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এবং এর
ধ্যে এই অসমবয়স্ক পুরুষ ও নারীর
কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। পুস্তক-
ীর্দশন, ক্ষীণদৃষ্টি, সঙ্গীবিহীন শশীর
াছে গিরিবালা ছিল একমাত্র কথা-কওয়ার
লোক এবং বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও শশীই
ছিল গিরির বালিকা-জীবনের একমাত্র
বন্ধু ও গুরু। কিন্তু সেই বন্ধু ও গুরু
যেদিন আইন-পুস্তকের মধ্যে নিজেকে
আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়ে একমাত্র শিষ্যার
সান্নিধ্য সম্পর্কেও চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ
করল, সেদিন বালিকাহৃদয়ে অভিমান
পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল এবং গুরুর মনো-
যোগ আকর্ষণে অসমর্থ হয়ে সে নীরবে
ও সংগোপনে অশ্রু বিসর্জন করল।
স-গুরুর জন্যে শিষ্যা প্রায় প্রতিদিন
সুপক্ক কালোজাম, আচার, আমসত্ব,
কেয়াখয়ের, বকুল ফুল প্রভৃতি নিয়ে
আসত, সেই গুরু যে কি ক'রে কয়েকটি
নির্জীব বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে
রেখে তার সজীব স্নেহধন্যা শিষ্যাকে
পরম উপেক্ষাভরে দূরে সরিয়ে রাখতে
পারে, তা' একান্তভাবেই তার বুদ্ধির
অগম্য। ক্ষণস্থায়ী অভিমান কেটে
যেতে গিরিবালা আবার যখন গুরু-
গৃহে যাবার জন্যে আকুল আগ্রহে পা
বাড়াল তখন পড়ল চরম বাধা। জয়েন্ট
ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা
তুলে নিয়ে গিরিবালার বাবা হরকুমার
শশিভূষণের আইন সম্পর্কীয় গবেষণার
প্রতি অবিচার করেছিলেন। সেই শশীর
বাড়ীতে যাচ্ছে শুনে হরকুমার মেয়েকে
ধমক দিলেন এবং দু'দিন বাদে তাকে যে
শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে, সে-খবরও জানাতে
ভুললেন না। গিরির বিয়ের কথা শশীর
কানে গেল, কিন্তু নিমন্ত্রণ না পাওয়ায় সে
তার বিবাহে যোগ দিতে পারল না। নৌকা-
যোগে শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে রওনা হবার
সময়ে নববধূবেশে সজ্জিতা গিরিবালা তীরে
দণ্ডায়মান শশিভূষণকে দেখে কেঁদে
আকুল হয়ে উঠল (রবীন্দ্রনাথ কিন্তু
বলেছেন, তীরে দাঁড়িয়ে থাকা গুরুকে
ঘোমটা-টানা নববধূ গিরি মুখ তুলে
দেখেনি, 'কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার
দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া
পড়িতে লাগিল।')

পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে
জেলেদের হয়ে লড়তে গিয়ে শশিভূষণের
যে পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, এ-খবর
নিশ্চয়ই শ্বশুরগৃহে থেকেও গিরিবালার
কানে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তার একান্ত
প্রিয় গুরুর এই বিপদপাতে তার নয়ন যে
অশ্রুসিক্ত হয়েছিল, এ-কথা অনুমান করা
কঠিন নয়। কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বাস
করবার সময়েই শশীর যে পিতৃবিয়োগ
হয়েছিল তাও নিশ্চয় গিরির অজানা ছিল
না। এই কারণেই শশীর কারামুক্তির দিনে
গিরিবালা তার জুড়ি-গাড়ী পাঠিয়ে তাকে
নিজের বাড়ীতে আনিয়ে নিয়েছিল এবং
তারও আগে তার অন্তর্লোকের আনন্দ-
বিধানের জন্যে তার বাড়ীর একখানি ঘরকে
পূর্ণ ক'রে তুলেছিল 'বড়ো বড়ো কাচের
আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের
সারি সারি বই' দিয়ে। ঘরের মধ্যে আরও
কিছু ছিল; সে হচ্ছে টেবিলে রাখা স্লেট
ও ছোটদের বই, যার প্রতিটিতে লেখা ছিল
গিরিবালা দেবী। অমনই শশিভূষণের
স্মৃতিতে উদিত হ'ল পাঁচ বছর আগে
ফেলে-আসা মধুর জীবনের টুকরো
টুকরো দৃশ্য। কিন্তু এই স্বপ্নরাজ্য থেকে
থেকে শশিভূষণ যখন বাস্তবে ফিরে এল,
তখন সে বাষ্পাকুল নেত্রে তাকিয়ে দেখল
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে 'নিরাভরণা

গিরি/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মৌসুমী সেন/সৌমিত্র এবং শিবানী বোস

শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা'—বালিকা নয়, যুবতী।

প'চাত্তর বছর আগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই ছোটগল্প অবলম্বনে ছবি করতে গিয়ে চিত্রনাট্যরচয়িত্রী ও পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী কাহিনীর নায়িকা গিরিবালাকে বালিকা না ক'রে করেছেন কিশোরী। কাহিনীর সারাংশে বলা হয়েছে ঃ দুটি নবীন প্রাণের বিরহ-মিলনে গাঁথা এই অপূর্ব কাহিনী।—কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এ-গল্প কিশোর-কিশোরীর প্রেমের গল্প নয়, যাকে ইংরাজীতে বলে কাফ-লাভ, এ-গল্প সে-জিনিস নয়। দুই অসমবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও রকম অকথিত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি; গুরু-শিষ্যার মধ্যে ছিল একটি নিবিড় স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক, যার মধ্যে অবচেতন মনের যৌন-প্রেমের বাষ্পমাত্রও নেই। এ বিশ্বজগতে দুজনে ছিল দুজনের একমাত্র কথা কইবার লোক, মনকে প্রসারিত ক'রে আনন্দলোকে পৌঁছে দেবার শরিক; মনের অর্গল খোলবার এদের কোনও দ্বিতীয় লোক ছিল না। হরকুমারের মামলা উপলক্ষ্যে শশিভূষণ যখন তার অন্তরকে প্রসারিত করবার দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠতর চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছিল এবং পেয়েছিল বলেই গিরিকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল, গিরিবালা তখন কিন্তু তার মনের দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল অপর কোনো পথ না পেয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ তার কোনো সংগীসাথীও জুটিয়ে দেননি—স্বর্ণ নামে কোনও খেলুনীকেও নয়।

অবশ্য পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবীর মনে যাই থাক, চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্র-ভাবনাকেই শ্রদ্ধার সংগে অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁর নির্বাচিতা নায়িকা হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে কিশোরী হয়েও কাহিনীর নায়িকা বালিকা গিরিবালাকেই সর্বাংশে রূপায়িত করেছে তার চলনে, বলনে, ভাবে, ভংগীতে। তার বালিকাসুলভ অভিব্যক্তি—বিশেষ করে তার চাউনি ও কথা বলার ধরণ—রবীন্দ্রনাথের বালিকা গিরিবালাকেই মূর্ত ক'রে তুলেছে। কাহিনীর কাব্যধর্মিতার দিকে বেশী ক'রে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তিনি চিত্রনাট্যের প্রথমার্ধকে ক'রে ফেলেছেন অত্যন্ত শ্লথ গতিবিশিষ্ট এবং শেষাংশে দর্শককে বিধবা গিরিবালার চমক দেবার জন্যে শশীর জেল হওয়া বা তার পিতৃবিয়োগ সম্পর্কে গিরির প্রতিক্রিয়া বিষয়ক দৃশ্য চিত্রনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। রবীন্দ্রনাথের আর একটি চমৎকার চিত্রকে চিত্রিত করবার সুযোগও তিনি ত্যাগ করেছেন ঃ কালোমোটা বইখানার উপর (গিরিবালা) মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধপাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করি[য়া] লাগিল।......সেই বইখানার বিনাশের জ[ন্য] সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সক[ল] অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছি[ল] ইত্যাদি।

নায়েব হরকুমারের সংগে গ্রাম্য বৃ[দ্ধ]দের দৃশ্য, পাঠশালার দৃশ্য, বিচারের দৃ[শ্য] প্রভৃতি এমন বহু দৃশ্যের কথা বলা যা[য়] যেগুলিকে পরিমার্জিত করবার যথে[ষ্ট] অবকাশ ছিল।

অভিনয়ে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক[থা] আগেই বলা হয়েছে। ক্ষীণদৃষ্টি, গ্র[ন্থ]বিহারী শশিভূষণ আকার ও রূপসজ্জা[র] দিক দিয়ে স্বরূপ দত্ত দ্বারা সুন্দরভা[বে] চিত্রায়িত হয়েছে; কিন্তু বাচনে এবং অ[ভি]ব্যক্তিতে চরিত্রটি আরও সুন্দরভা[বে] প্রকাশিত হবার অবসর ছিল। নায়েব হ[র]কুমারকে মূর্ত করে তুলেছেন (পরলোকগ[ত]) প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শশিভূষণের পি[তার] ভূমিকায় দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট অজি[ত] বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় শ[িবানী] রায় (স্বর্ণ বা সোনা) ও মঞ্জু ভট্টা[চার্য] (গিরিবালার মা) উল্লেখ্য অভিনয় করে[ছেন।] সাহেবদের ভূমিকাগুলি অতিমাত্রায় সা[হেবী] —একজন ছাড়া কেউই শ্রুতিগ্রাহ্য বা[ংলা] বলতে পারেন নি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভা[গের] মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজে দক্ষতার প[রিচয়] পাওয়া যায়; বিশেষ ক'রে প্রাক[ৃতিক] বহির্দৃশ্যগুলি নয়নাভিরাম। দৃশ্য রচ[নায়] শিল্পনির্দেশক বাস্তবধর্মী রুচিজ্ঞা[নের] নিদর্শন রেখেছেন। ছবিটিতে রব[ীন্দ্র]সংগীতের ব্যবহার প্রশংসনীয়—কি [কণ্ঠ]সংগীতে, কি আবহনির্দেশক যন্ত্রসংগী[তে।]

কে এল, কাপুর প্রোডাক[শন্স] প্রযোজিত এবং অরু[ন্ধতী] দেবী প[রি]চালিত 'মেঘ ও রৌদ্র' ...
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়সমৃদ্ধ হয়ে ...দের প্রীতি অর্জন করবে।

ঘটনার ঘনঘটা

ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইন্ডি[য়ার] প্রথম নিবেদন, মংগল চক্রবর্তী পরিচা[লিত] বাঙলা ছবি 'আলেয়ার আলো' ঘট[নার] ঘনঘটায় ভরা। এত ঘটনার জাল সচর[াচর] বাঙলা ছবির মধ্যে ক্বচিৎ মেলে। ...
সম্পত্তির লোভে ছোট ভাই অনুগ্রহনার[ায়ণ] বড়ভাই দীপনারায়ণের জন্যে মৃত্যুর ... পাতল ব্যাঘ্র-শিকার অভিযানে ... মৃত্যুকালে দীপনারায়ণ এস্টেটের বিশ[্বস্ত] ম্যানেজার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর কাছে ... ভাইয়ের চক্রান্তের কথা জানিয়ে ... তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ভবিষ্যৎ সন্তা[নকে] রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।

ম্যানেজার চন্দ্রকান্তের সজাগ ... বধানে দীপনারায়ণের বিধবা যথা[সময়ে] একটি কন্যারত্নের জননী হলেন। ... উইলের শর্তানুযায়ী অনুগ্রহনারায়[ণ] সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা পাবার ক...

...শঠ অনুগ্রহনারায়ণকে প্রৌঢ় চন্দ্র-
...বঞ্চিত করলেন আর এক বঞ্চনা
... তিনি সদ্যজাত কন্যাটিকে রক্ষণা-
...র ভার লেডী ডাক্তার মিসেস সেনের
... অর্পণ ক'রে তার শূন্যস্থান পূর্ণ
...ন ক্যাশিয়ার শ্রীনাথের নবজাত
... দিয়ে, যে জন্মক্ষণেই তার মাকে
...রাছিল।

...রপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে।
...নারায়ণের স্ত্রী শ্রীমতী দ্বারা নিজ-
...নজ্ঞানে পালিত প্রদীপ জার্মানী
... মাইনিং সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের
...দেশে ফিরে এসে নিজেদের কয়লা-
... ও ব্যবসায়ের তদারকি করছে।
...হনারায়ণ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়েও
...দগার করছে জ্যেষ্ঠের বংশধরের
...ধ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রদীপকে করেন
...চিত স্নেহ এবং তাঁর পুত্র অনুপ-
...ণ প্রদীপকে শুধু ভাই ব'লেই নয়,
...ত বন্ধু জ্ঞানে ভালোবাসে। প্রদীপ
...বন্ধ হয়েছিল শিখা নামে এক
...রীর সঙ্গে। যখন তারা পরস্পরকে
...হ ক'রে সুখী হবার স্বপ্ন দেখছে,
... অতর্কিতে তারা দুজনেই জানতে
..., যাঁদের তারা এতদিন ধ'রে মা
... জেনেছে, তাঁরা তাদের মা নয়—
...র দ্বারা সন্তানজ্ঞানে পালিত হয়েছে
... দুজনের কাছেই পৃথিবীটা গেল
...। ওরা কিভাবে নিজেদের প্রকৃত
...য় জানল, তাই নিয়েই ছবির শেষ
...শালি রচিত হয়েছে।

...যে-সব ঘটনার সাহায্যে কাহিনীর
...র ঘটানো হয়েছে, তাদের সম্ভাব্যতা
...ধে বিশেষ চিন্তা করা হয়েছে ব'লে
...হয় না। ক্যাশিয়ার শ্রীনাথের স্ত্রী
... পুত্র-সন্তানের জন্মের পরে পর-
...র পথে যাত্রা করল, তখন তার কাছে
...থ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল
...এটা কল্পনা করা খুব কঠিন নয় কি?
... ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ কেন মারা
...ন, এ প্রশ্ন কি কারুর মনে জাগেনি?
...ন যে সন্তানসম্ভবা ছিলেন, এও কি
...থ ছাড়া আর কেউ জানত না? আর
...দিকে কোনো ঝানু শিকারী শিকার-
... নিজের ব্যবহৃত ও পরিচিত বন্দুক
... ক'রে অন্যের (সে ভাই বা অন্য
...কেউই হোক না কেন) দেওয়া রাইফেল
...হার ক'রে, এ-ঘটনা চিন্তাও করা যায়
... তাই দীপনারায়ণ যখন অকুস্থলে
...গ্রহনারায়ণের কথায় তার দেওয়া নতুন
...ফেলটি গ্রহণ করলেন, তখনই দর্শকের
...তে বাকী থাকে না, তিনি স্বেচ্ছায়
...ত্র মৃত্যুর ফাঁদে পা বাড়ালেন। এমন
... অসম্ভাব্যতার কথা কাহিনীর প্রতিটি
... সম্পর্কে তোলা যায়। এবং এই
...ণেই কাহিনীটি এবং তাকে ভিত্তি
...র নির্মিত ছবিটির সঙ্গে কোনো
...হেই আমরা একাত্ম হয়ে উঠতে
...রিনি। সবটাই যেন বড্ড বেশী সাজানো
...কৃত্রিমতায় ভরা। এছাড়া শিকার ও
...র দৃশ্যগুলি (বিশেষ ক'রে বিস্ফো-
রণের দৃশ্যগুলি) যথেষ্ট আয়োজন ও
সতর্কতার অভাবে এমনভাবে গৃহীত হতে
পারনি, যাকে আমরা বাস্তব মনে করতে
পারি।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই দৃষ্টি
আকর্ষণ করেন এস্টেট ম্যানেজার চন্দ্র-
কান্তের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য।
প্রদীপ যখন নিজের মিথ্যা পরিচয়ের জন্যে
উত্তেজিত অবস্থায় চন্দ্রকান্তের ওপর দোষা-
রোপ করে, তখন রাধামোহনের মুখনিঃসৃত
'এতে আমার নিজের কোনো স্বার্থ
ছিল না' কথা কয়টি অবিস্মরণীয়। এর
পরেই উল্লেখ করতে হয়, দীপনারায়ণের
স্ত্রী শ্রীমতীর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর চরিত্র-
চিত্রণের কথা। অভিয়ের মাধ্যমে আবেগ
সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্যের তুলনা নেই।
নায়ক প্রদীপ ও নায়িকা শিখারূপে
সৌমিত্র ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের
গুণপণা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ ত্যাগ
করেননি। মদ্যপ ও কিছুটা ছন্নছাড়া
শ্রীধর চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপ-
সজ্জাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দুই ভাই দীপ-
নারায়ণ এবং অনুগ্রহনারায়ণরূপে যথাক্রমে
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর চট্টো-
পাধ্যায় বলিষ্ঠ অভিনয়ের পরিচয়
দিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় অনুপকুমার
(অনুপনারায়ণ), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
(রাহুল খাসনবীস), জ্যোৎস্না বিশ্বাস
(সুনন্দা), বনানী চৌধুরী (ছোট বৌ),
মঞ্জু দে (জানকী), সাধনা (লেডী ডাক্তার
মিসেস সেন) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন
বিভাগের কাজ মধ্য মানের। ফোটোগ্রাফী
সর্বত্র সমান দক্ষতার পরিচায়ক নয়। সেট
সম্পর্কেও সমান কথাই বলা যায়। ছবির
একখানি মাত্র গান "ওগো বৃষ্টি" কাহিনীর
সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত এবং রচনা ও সুরের
দিক দিয়ে সাধারণের উচ্চ পর্যায়ভুক্ত নয়।

"আলেয়ার আলো" দর্শকসাধারণকে
খুশী করলে আনন্দিত হব।

বছরের সেরা ছবি ভুবন সোম

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের বিচারে ... বছরের সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে ...ণাল সেনের প্রথম হিন্দী ছবি ভুবন সোম। ...জিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ...ছবি হিসাবে চিহ্নিত। এ ছাড়াও অন্যান্য ...ভাগে ভুবন সোম পাঁচটি ও গুপী গাইন বাঘা বাইন ...টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। ...ঘোষিত ফলাফল নিম্নরূপ :—

শ্রেষ্ঠ ছবি : (মানের ক্রমানুসারে) ভুবন ...সোম, গুগাবাবা, আশীর্বাদ, সরস্বতীচন্দ্র, ...আনোখী রাত, আরোগ্য নিকেতন, নতুন ...পাতা, রাহগীর, নান্হা ফরিস্তা, পরিণীতা।

শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি : ২০০১ স্পেস ...অডিসি, রোজ মেরিজ বেবি, বনি এন্ড ...ক্লাইড।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : বাংলা—সত্যজিৎ রায় ...(গুগাবাবা), হিন্দী—মৃণাল সেন (ভুবন ...সোম), বিদেশী—স্ট্যানলী কুব্রিক (২০০১ ...স্পেস অডিসি)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : বাংলা—তপেন ...চট্টোপাধ্যায় (গুগাবাবা), হিন্দী—অশোক-...কুমার (আশীর্বাদ), বিদেশী—সিডনী ...পয়টিয়ের (টু সার উইথ লভ)।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : বাংলা—অপর্ণা সেন ...(অপরিচিত), হিন্দী—সুহাসিনী মুলে ...(ভুবন সোম), বিদেশী—অড্রে হেপবার্ন ...(ওয়েট আনটিল ডার্ক)।

পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা : বাংলা—নির্মল-...কুমার (কমললতা), হিন্দী—অজয় সাহানী ...(আনোখী রাত)।

পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী : বাংলা—রোমি চৌধুরী (মন নিয়ে), শশীকলা (রাহগীর)।

সংগীত-পরিচালক : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (গুগাবাবা), হিন্দী—কল্যানজী-আনন্দজী (সরস্বতীচন্দ্র)।

চিত্রনাট্যকার : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (গুগাবাবা), হিন্দী—মৃণাল সেন (ভুবন সোম)।

সংলাপ লেখক : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (গুগাবাবা), হিন্দী—পণ্ডিত আনন্দকুমার (আনোখী রাত)।

সাদাকালো ফটোগ্রাফী : বাংলা—সৌমেন্দু রায় (গুগাবাবা), হিন্দী—কে, কে, মহাজন (ভুবন সোম)।

রঙীন ফটোগ্রাফী : হিন্দী—কানাই দে (রাহগীর)।

শিল্পনির্দেশনা : বাংলা—বংশী চন্দ্রগুপ্ত (গুগাবাবা), হিন্দী—রবি চ্যাটার্জি (রাহগীর)।

শব্দসংযোজনা : বাংলা—নৃপেন পাল, সুজিত সরকার ও অতুল চট্টোপাধ্যায় (গুগাবাবা), হিন্দী—শ্রীমেনন (নান্হা ফরিস্তা)।

সম্পাদনা : বাংলা—দুলাল দত্ত (গুগাবাবা), গঙ্গাধর নস্কর (ভুবন সোম)।

(বাংলা) শ্রেষ্ঠ গায়ক—মান্না দে (চিরদিনের), **শ্রেষ্ঠ গায়িকা**—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিণীতা)।

(হিন্দী) শ্রেষ্ঠ গায়ক—মুকেশ (সরস্বতী চন্দ্র), লতা মুঙ্গেশকর (সরস্বতীচন্দ্র)।

বিশেষ পুরস্কার : বেবী রাণী (নান্হা ফরিস্তা)।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি আগামী মাসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

মেঘ ও রৌদ্র/হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিস্নান/ললিতা চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও থেকে

কানন দেবী একদিন অতীতের পাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলে ছিলেন ঢাকায় একবার অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর ও দলবলের দুর্গতির কথা। ছদ্মবেশে রাতের আঁধারে পালিয়ে স্টীমারে উঠেও রক্ষে ছিল না। গুণমুগ্ধরা তখন জলে ঝাঁপ দেয় আর কি! তারপর কোনমতে পালিয়ে প্রাণ

বাঁচান দায়। যাই হোক, সে যাত্রা রক্ষে পেয়েছিলেন তিনি।

অবশ্য বহু বা অহীন্দ্রবাবুর জীবনেরও পাতায় পাতায় এরকম বহু গল্প আছে। ক্যামেরার সেসব কীর্তি-কলাপের যবনিকা পড়েনি এখনও। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চরিত্রে গুণমুগ্ধদের গুঞ্জন এখনও আমরা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে নামকরা শিল্পীরা এলে তার প্রমাণ পাই হাতে-নাতে। সুতরাং গুণগ্রাহীদের জনোলাভন থেকেছে বই কমেনি।

তবে অতীতের আর বর্তমানের মধ্যে ফারাক হলো এদের আচার আচরণে। আগে শিল্পীদের যে কারণেই হোক না কেন সবাই-ই কিছুটা সমীহ করে চলতেন। সিনেমার জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে নিঃসন্দেহে। আর তার সঙ্গে বদল হয়েছে ক্যামেরার ব্যবহারের। এখন জনপ্রিয় শিল্পীদের রাস্তায় বেরোনই দায়। কলকাতার রাস্তায় স্যুটিং করা যে কি ঝকি তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। গুণমুগ্ধদের ভীড় ও তাদের কৌতুহলের আতিশয্য সাথে সাথে এতই মাত্রাহীন হয়ে পড়ে যার জন্য কাজ চালানোই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

যেমনটি হয়েছিল ক'দিন আগে হাজারীবাগে। সুনীল বসুমল্লিক, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, অপর্ণা সেন, ললিতা চ্যাটার্জি ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন 'জয়জয়ন্তী' ছবির স্যুটিং করতে। কৌতুহলীদের ভীড় যতটা নয় তার দশগুণ মন্তব্য আর কটূক্তির ফলে কাজ বন্ধ হবার জো। কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য আর আচরণে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন ইউনিটের সবাইকে। তাদের মন্তব্য শুধুমাত্র শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েই ক্ষান্ত হয় নি, শিশু অভিনেতাদের মায়েদের ওপরও সমান তালে চলেছে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে কেউ প্রতিবাদ করতে গেছেন, কিন্তু ফল হয় নি কিছুই।

একজন শিল্পী বললেন, 'হাজারীবাগে এই আমার প্রথম নয়, বহুবার এর আগে কাজ করেছি। কিন্তু এরকমটি আর কখনও দেখি নি। ক'দিন আগে জামসেদপুরে গিয়েছিলাম অভিনয় করতে, সেখানেও ভালো ব্যবহার পেয়েছি সবার কাছ থেকে। আরও দুঃখের ব্যাপার কি জানেন, তারা [illegible] কলেজ স্টুডেন্ট, শিক্ষিত বলে [illegible]। কিন্তু তাদের ব্যবহারে শিক্ষার এতটুকু প্রমাণ পেলুম না।' শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে কাজ শেষ না করেই তাঁদের চলে আসতে হয়েছে। সবচাইতে এক সঙ্গে দুঃখের ও লজ্জার ব্যাপার এই যে, ঐ সব গুণমুগ্ধদের প্রায় সবাই ছিলেন বাঙালী, পরিস্কার বাংলায় তারা অশ্লীল মন্তব্য করেছেন। অথচ অবাঙালীদের কাছ থেকে আন্তরিক সৌজন্যতার পরিচয় পেয়েছেন।

মঞ্চাভিনয়

রাম শ্যাম যদু। নানাদিক দিয়ে বাদল সরকারের 'রাম শ্যাম যদু' একটি বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত নাটক। ইতিপূর্বে এ নাটক অনেকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি 'পাদপ্রদীপ' নাট্য-গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই নাটকটির পরিবেশনে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেননি। অনুশীলনের অভাব ও শিল্পীদের কৃত্রিম অভিনয় প্রযোজনাটিকে আহত করেছে বারবার। নির্দেশক দিলীপ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করতে পারেননি বলে মনে হয়, তাই শিল্পীদের অভিনয়ের মধ্যে কখনো একটি সুষম ঐক্য গড়ে ওঠেনি। নাটকের তিন প্রধান চরিত্র রাম, শ্যাম ও যদুর ভূমিকায় সন্তোষ ধরগুপ্ত, দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ ঘাটার অভিনয় খুব অল্প সময়েই স্বচ্ছন্দ হোতে পেরেছে। লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাসের 'শুকদেব' একটি অতিরঞ্জিত চরিত্রচিত্রণ, তমাল চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবানী' মোটামুটি সার্থক হোতে পেরেছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন : অমিতাভ সাহারায়, শেফালী চাটার্জি, আলো মজুমদার, বিশ্বনাথ দাস, জয়ন্ত ভট্টশালী। আলোকসম্পাতে ও মঞ্চপরিকল্পনার বিশেষ কোন শিল্পবোধের পরিচয় ছিল না। চায়ের দোকান ও ভবানীবাবুর ড্রয়িংরুমের পরিকল্পনার বাস্তবতার অভাব পরিস্ফুট হয়।

উত্তরা। একথা ঠিক যে আ[illegible] বহুমুখী পরীক্ষানিরীক্ষার যুগে গোষ্ঠ[illegible] নাটকের আবেদন যথেষ্ট পরিমাণে [illegible] কিন্তু মাঝে মাঝে অভিনয় আর পরিবে[illegible] স্বাতন্ত্র্যে এই ধরনের নাট্যপ্রযোজনা আম[illegible] মনকে স্পর্শ করে। সম্প্রতি স্টার থি[illegible] 'জাঠিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র 'উত্তরা' [illegible] ভিনয় দেখার পর এই সত্যটি [illegible] হয়েছে। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁর [illegible] চরিত্র সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন [illegible] নাটকের অগ্রগতির পথে কোন [illegible] আসেনি। টিমওয়ার্কে একটি ঐক্যের [illegible] স্পষ্ট ছিল। অভিনয়ে যাঁরা সবচেয়ে [illegible] কৃতিত্বের অধিকারী তাঁরা হোলেন [illegible] নাথ মুখার্জি (অভিমন্যু), দুলাল [illegible] (অর্জুন), খগেন দাস (ঘটোৎকচ), [illegible] দেবী (দ্রৌপদী), প্রতিমা পাল ([illegible] অন্যান্য চরিত্রে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর [illegible] তারাদাস ব্যানার্জি (দুর্যোধন), মুরা[illegible] (কপিল) বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি (কৃষ্ণ), [illegible] দত্ত (শকুনি), বাসন্তী চ্যাটার্জি (সু[illegible]

সূর্যসাধ। হাওড়া ডিস্ট্রি[illegible] অপারেটিভ স্টাফ রিক্রিয়েশন [illegible] শিল্পীরা সম্প্রতি 'রঙমহল' মঞ্চে প[illegible] মুখার্জির 'সূর্যসাধ' নাটকটি [illegible] সঙ্গে পরিবেশন করেন। সলি[illegible] নির্দেশনায় নাট্যপ্রযোজনাটি নানা [illegible] চিহ্নিত হয়। কয়েকটি ভূমিকায় স[illegible] করেন মুরারী রায়, গোপাল সেন [illegible] সাহা, প্রদ্যোৎ দাস, [illegible] কালী ব্যানার্জি, প্রফ[illegible] সরকার [illegible] ব্যানার্জি, মিনতি [illegible] ও রী[illegible]

কানাগলি। হ[illegible] এবং সাংস্ক[illegible] রিক্রিয়েশন ক্লাব [illegible] ক'দিন আগে [illegible] থিয়েটারের ম[illegible] ভানু চট্ট[illegible] 'কানাগলি' না[illegible]টি পরিবেশন [illegible] নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু [illegible] কয়েকটি চরিত্রে স্বাভাবিক ও [illegible] অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ [illegible] স্বদেশভূষণ গুপ্ত, সুনীল দে, [illegible] সুনীল দাস, প্রতিমা পাল। [illegible] নির্দেশনায় কিশোর ভড়ের [illegible] প্রশংসার দাবী রাখে।

বিন্দুর ছেলে। ব্রাদার্স অ্যান্ড [illegible] ইউনিটের প্রযোজনায় সম্প্রতি [illegible] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 'বিন[illegible] নাট্যাভিনয় হয়ে গেলো বাগবাজা[illegible] লাইব্রেরীতে। মালতী মুখো[illegible] প্রয়োগ-পরিকল্পনায় 'বিন্দুর ছেলে' [illegible] সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে[illegible] জ্যোৎস্না দত্তের 'বিন্দু', অন্নপূর্ণা [illegible] 'বিন্দুর মা', স্বপন পালের 'মাধব', [illegible] মুখোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা' কয়েকটি [illegible] যোগ্য চরিত্রচিত্রণ। হেনা দাস ও [illegible] লাহিড়ীও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় [illegible] করতে পেরেছেন। ব্যবস্থাপনায় [illegible] শ্রাবণী মুখোপাধ্যায় ও বুলবুল লা[illegible]

গোলাপ কাঁটা। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অফ ...ন্ডিয়া কর্মীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মঞ্চ-...তীর্থ' উদ্যোগে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে ...শ গুহ নিয়োগীর 'গোলাপ কাঁটা' ...টি পরিবেশিত হয়। পিকলু নিয়োগীর ...র্দেশনায় নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ ... প্রদীপ পাল, তপন মিত্র, নিতীশ ...র্জি, বদ্রীনারায়ণ চ্যাটার্জি, বিমলেন্দু ... আশীষ সান্যাল, নিরাপদ পাঠক, ...গেন দত্ত, হিমানী গাঙ্গুলী, প্রতিমা ..., তৃপ্তি দাস।

তিনটি একাংকিকা। নাট্যকল্পের ...শিল্পীরা কিছুদিন আগে অন্ধ্র হলে তিনটি ...ংকিকার অভিনয় করলেন। নাটক ...টি হোল প্রদোষ দত্তর 'খরস্রোতে' ...হিত চ্যাটার্জির 'রাক্ষস', ও সেনোরা ...র'। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন ...লী গোস্বামী, দেবাশীষ রায়, বিপ্লব ...গুপ্ত, অভিজিৎশংকর দত্ত রায়, নৃপেন্দ্র ... দেবদত্ত চৌধুরী, কমল সাহা, রত্না ...কিশোর ব্যানার্জি, সুপ্রকাশ মুখার্জি, ...নন্দ ব্যানার্জি, নলিনী চৌধুরী। ...টির নির্দেশনায় ছিলেন সঞ্জয় দাশগুপ্ত।

জামসেদপুর বেঙ্গলী ক্লাবের আয়ো-... কলকাতার নতুন নাট্যসংস্থা 'অমৃত-...' গত ১১ মার্চ গিয়েছিলেন সেখানে ...ঁদের 'বিদ্যাসুন্দর' মঞ্চস্থ করতে। ...র আধুনিক নাট্য আন্দোলনের পাশা-... নাট্যের গুরুত্বভিক থিয়েটারের মত ...পুরোনো দিনের জনপ্রিয় নাটকগুলোকে ...ন্দায়ন করতে প্রয়াসী। অনুবাদ ...সম্পর্কে এদের আগ্রহ কম। আর ...ক নাটকের অভাব তো বহু দিনের। ... এরা অতীতের পথ বেছে নেওয়া। ...র প্রধান তরুণকুমার কথা কটি ...লেন অনুষ্ঠানের শুরুতে। বিদ্যা-...র লেখা হয়েছিল প্রায় সাতশ বছর ... অমৃতমহল তাকে আধুনিক আঙ্গিকে ...সজ্জায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ...রা শুধুমাত্র দৃশ্য পরিকল্পনা নয়, ...টি শিল্পীও বিশেষ মনযোগী ছিলেন। ... সম্পাদনার পর যেভাবে নাটকটির ...না করেছেন এই গোষ্ঠি তা তাদের ...শৈলীর গভীরতার পরিচয় দেয়। ...র ধর্মী এ নাটক জনপ্রিয়তা পাবে ... করা যায়। তরুণকুমারের মনোরথ, ...সেনের হীরামালিনী ও অঞ্জলি চট্টো-...রের অঙ্গনা অতি সুন্দর সৃষ্টি। ... বিশ্বাসের বিদ্যা, রূপক মজুমদারের ... ও ভানু চট্টোপাধ্যায়ের বীরসিংহ ...। নাটকটি পরিচালনা করেন তরুণ-...। এদের পরবর্তী প্রদর্শনী আগামী ... এবং বাংলা নতুন বছরে এ'রা প্রযো-... করবেন অমৃতলালের 'খাসদখল।'

এইচ. জি. আই এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ... এঁদের প্রথম নাটক, ডাঃ নীহাররঞ্জন ...গুপ্তর 'উল্কা' মঞ্চস্থ করলেন—২২ ...য়ারী সন্ধ্যায় হিন্দু হাইস্কুলে। প্রধান

ইউথ প্যাথেট থিয়েটারের পুতুল নাচের দৃশ্য

অতিথির ভাষণে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সংবাদ সম্পাদক সতব্রত চট্টোপাধ্যায় এ'দের প্রথম প্রয়াস এই বিরাট নাটক মঞ্চস্থ করার সাহসিকতায় প্রশংসা করেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য মহাশয় নাটকের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন ও সময়োপ-যোগী আরও সুন্দর নাটক ভবিষ্যতে উপস্থাপিত করার নির্দেশ দেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীচাঁদ জৈন বলেন, ফ্যাক্টরীর কর্মিবৃন্দের কাজকর্মের অবকাশে এই আনন্দ বিতরণের যে প্রচেষ্টা, তা শুধু নিছক আনন্দদানই নয়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একে অপরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাবে, যা গড়ে তুলবে একটা সুন্দর আবহাওয়া।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যেকটি চরিত্রের রূপায়ণে দর্শকরা অভিভূত হয়ে পড়েন। ঘটনা বহুল এই নাটকের আবেগ-ময় মুহূর্তগুলি অসাধারণ প্রতিভায় ফুটিয়ে তোলেন অরুণাংশুর ভূমিকায় বিনয় চক্রবর্তী, রাজীবরূপী শিবেন চক্রবর্তী, কমলা ও মিলির ভূমিকায় যথাক্রমে—স্বপ্না মিত্র ও ইন্দিরা দে। নাটকের বেশীর ভাগ কলাকুশলী এই প্রথম মঞ্চে পদার্পণ করলেন। তৎসত্ত্বেও এর সাফল্য অনস্বীকার্য এবং তার সকল কৃতিত্বই নির্দেশক বিমল দে'র প্রাপ্য।

আগামী প্রযোজনা

* প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার ওয়ার্ক-শপের শিল্পীরা এখন দুটি নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত। নাটক দুটি হোল বিভাস চক্রবর্তীর 'বিচিত্রনাট্য' ও সত্যেন মিত্রের 'চাই, হৃদয় চাই'। 'বিচিত্রনাট্যে'র নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী ও চিন্ময় রায়। অন্য নাটকটির পরিচালনায় তাদের নাট্যকার স্বয়ং।

* শহরের বস্তি অঞ্চলের কিছু লোক যাদের ঘরে মধ্যাহ্নের আলো উঁকি মারে না, কিন্তু মন যাদের অন্ধকার নয়, তাদের জীবন নিয়ে লেখা জ্যোছন দস্তিদারের 'মধ্যাহ্নের দিন'। দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি শীঘ্রই পরিবেশন করবেন। শ্রীদস্তিদার স্বয়ং নির্দেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। *

* খ্যাতনামা নাট্যগোষ্ঠী 'রূপকারে'র পরবর্তী নাটক হোল 'লালন ফকির'। বহুশ্রুত লোকসঙ্গীতকার লালন ফকিরের অন্তরঙ্গ জীবন কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেছেন মন্মথ রায়। নামভূমিকায় ও নির্দেশনায় রয়েছেন সবিতাব্রত দত্ত। আলোকসম্পাত ও সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন তাপস সেন ও অনিল বাগচী। *

বিবিধ সংবাদ

গেল ১৩ই মার্চ থেকে স্থানীয় ম্যাজেস্টিক সিনেমায় জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক-এর সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পরিচালকের সৃষ্টি সাতখানি বিভিন্ন যুগোপযোগী ছবি সম্পর্কে আমাদের অভিমত আসছে বারে প্রকাশিত হবে।

কোলড়া, হাওড়া ৭ই মার্চ, কোলড়া বীণাপাণি ক্লাবের প্রচেষ্টায় তাঁদের গ্রামের প্রধান রাস্তাটির সংস্কারের জন্য ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ মার্চ ৪ রাত্রি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার দুটি প্রখ্যাত যাত্রা পার্টি 'তরুণ অপেরা' হিটলার ও লেনিন এবং 'সত্যম্বর অপেরা' জালিয়ানা-ওয়ালাবাগ ও দিগ্বিজয় যাত্রা-পালার অভিনয় করবেন। যাত্রা আরম্ভ রাত্রি ১১টায়।

এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত শনিবার (২৮।২।৭০) থিয়েটার সেন্টার হলে তরঙ্গ ও মঞ্চরথ গোষ্ঠী ছয়জন তরুণ প্রতিভার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

যাঁদের সম্বর্ধিত করা হয় তাঁরা হলেন সর্বশ্রী দীপালী সিনহা (পর্বতারোহণ-কারিণী), রণেন মোদক (সাংবাদিক কালান্তর), রাজকুমার (জাদুকর), অমলেশ ঘোষ (চিত্রশিল্পী), সুপ্রিয় বাগচী (কবি) ও সজল ঘটক (নাট্য নির্দেশক)।

কেন অনামী ও তরুণদের সম্বর্ধনা? এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্যোক্তারা জানালেন—সাহিত্য, শিল্প ও কৃষ্টির দিকে যাঁরা আগামীর সাধক সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের বরণ করছি এই উদ্দেশ্যেই—তরুণদের জয়যাত্রা যাতে সফল হতে পারে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরি-বেশন করেন—সর্বশ্রী হরেন কয়াল ও চঞ্চল-কুমার।

একক সঙ্গীতে শ্রীমতী অঞ্জলি সিনহা, জাদুতে রাজকুমার, সকলের সঙ্গে তবলায়

আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিনীত সিনড্রেলার একটি দৃশ্য।

সহযোগিতা করেন গৌরাঙ্গ বোস। স্বরচিত কবিতা পাঠে সর্বশ্রী চন্দন সেন ও গৌরী বসু উপস্থিত সুধী মন্ডলীকে আনন্দ দেন।

ওয়ার্নার ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল-এর কার্যকরী ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও প্রধান কর্ম-কর্তা মিঃ নর্মান বি কাট্জ-এর ঘোষণা অনুসারে ২১ থেকে ২৭ মার্চ নয়াদিল্লীর হোটেল ওবেরয় ইন্টারন্যাশনাল-এ 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স নিউ হরাইজন ইন্টারন্যাশানাল সেমিনার' অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে ছ'টি মহাদেশের চল্লিশটি রাজ্যে ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হবেন। এই সম্মেলনে ১৯৭০-৭১ সালে প্রতিষ্ঠানটি কোন্ কোন্ ছবি তৈরি করবে এবং কোন্ কোন্ রাজ্যে কি কি ধরনের ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করবে, সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা হবে। এছাড়া এই সম্মেলনে প্রতি-ষ্ঠানের মুক্তি-প্রতীক্ষিত বহু ছবি প্রদর্শন করা হবে প্রতিনিধিদের সামনে। সম্মেলনটি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরিচালক অজিত লাহিড়ী পরিচালিত এস বি পি প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্র 'পদ্মগোলাপ' বর্তমানে সেন্সারমুক্ত এবং শুভমুক্তির প্রতীক্ষায়। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বারীন্দ্রনাথ দাস। সঙ্গীত-পরিচালনা করে-ছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য সংগীতে রয়েছেন যথাক্রমে কিশোরকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আরতি মুখো-পাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করেছেন বিজয় দে এবং সম্পাদনা করেছেন গোবিন্দ চট্টো-পাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন যথাক্রমে সৌমিত্র, অপর্ণা, অজিতেশ, অনুপ, সত্য বন্দ্যো, অনুভা, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্রটির বিশ্ব পরিবেশনা করছেন মঞ্জুষা ফিল্মস।

গত ১ মার্চ আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিভাগের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কুলসমূহের প্রধানা পরি-দর্শিকা শ্রীমতী অনুপমা বসু এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে বিদ্যালয় ভবনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পাশ্চাত্য রূপকথা সিনড্রেলা এবং কবিগুরুর তাসের দেশ অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দের অভিনয় সুন্দর।

তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রার ১৫০-তম রজনীর অভিনয় সম্পর্কে সংবাদ বেরিয়ে গেছে গত সংখ্যায়। ঐ অনুষ্ঠানে যাত্রা-শিল্পীসংঘের পক্ষ থেকে লেনিন চরিত্রা-ভিনেতা শান্তি গোপাল, পরিচালক অমর ঘোষ এবং নাট্যকার শম্ভু বাগকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই যাত্রাভিনয়টির প্রমোদ-কর মুক্ত অভিনয় এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরো তিন মাসের জন্য এই যাত্রাভিনয়কে প্রমোদ করমুক্ত করেছেন।

ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় শ্রীম আরতি ভট্টাচার্য এবং জি এ মেনন-প্রযোজনায় আরম্ভ হয়েছে আরতি প্রোড সনের 'গৌরী' ছবির স্যুটিং। শ্রীঅ চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত এ ছ আলোছায়া গড়ে উঠছে এক ভাগ্যবিড়ম্ব নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে। এ ছবির দিয়ে সোচ্চার হবে সমাজের লো ব্যাভিচারী রূপটি, আর একটি জ প্রশ্ন : আজকের পৃথিবীতে আত্মস বজায় রেখে কি মেয়েদের বাঁচার কোন উ নেই? বাস্তবনিষ্ঠ এ ছবির বিভিন্ন চরি রূপারোপ করছেন জীবন ঘোষ, শে বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগতা শিখা সরকার (গৌরীর চরিত্রে), মাস্টার মলয়, সে ব্যানার্জি, রাধা দেবী। শ্রেষ্ঠাংশের রূপা যাঁদের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেন : অনিল চ্যাটার্জি, অভি ব্যানার্জি, শমিত ভঞ্জ, অজয় গাঙ্গু নামভূমিকায় রূপারোপ করবেন হয় কা বসু না হয় মাধবী মুখোপাধ্যায়। দত্ত-এর সুরারোপিত এ ছবির চিত্র এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথ ভবতোষ ভট্টাচার্য এবং নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য

ক্যাথলিক কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শৈলেশ নিয়োগী রচিত 'গোলাপ কাঁটা' না সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। আধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে না সংঘাতটি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ের ম বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র দক্ষযজ্ঞের সঙ্গীত গ্রহণ করছেন সঙ্গীত পরিচালক রমেশ নাইডু। এ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলার অন্যতম কণ্ঠশিল্পী নির্মলা মিশ্র ও প্রদীপ দাশগুপ্ত।

খেলার কথা

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

অলিম্পিক গেমস নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ...ত্তম খেলাধুলোর আসর। আবার এই ...লিম্পিক গেমসের প্রধান এবং সব থেকে ...র্ষণীয় অনুষ্ঠান হল অ্যাথলেটিক ...র্টস। অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার ...গদানের আগে—১৮৯৬ থেকে ১৯৪৮ ... পর্যন্ত অলিম্পিক গেমসের ১১টি ...রে আমেরিকা বেসরকারী পয়েন্ট ...লিকায় ১০ বার শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ...লিম্পিক গেমসে রাশিয়া প্রথম যোগদান ... ১৯৫২ সালে। এবং সেই সময় থেকেই ...মেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ...ড়িয়েছে রাশিয়া। ১৯৫২ সালের ...লিম্পিক গেমসের বেসরকারী পয়েন্ট ...লিকায় রাশিয়া তার প্রথম যোগদানের ...রেই আমেরিকার সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম ...ন অধিকার করেছিল। পরবর্তী চারটি ...সরে (১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) প্রতিটির বেসরকারী পয়েন্ট তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে রাশিয়া এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা। রাশিয়ার পক্ষে নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্যের পরিচয়। নানা রকমের খেলা নিয়ে এই অলিম্পিক গেমস। প্রধান অনুষ্ঠান অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে কিন্তু রাশিয়া আজও আমেরিকার অনেক পিছনে পড়ে আছে। আমেরিকার

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিরাট সাফল্যের কাছে রাশিয়া ম্লান হয়ে আছে। তবে ১৯৫৮ সাল থেকে এই দুই দেশকে নিয়ে যে ৮টি অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আসর বসেছে সেখানে কিন্তু রাশিয়া এবং আমেরিকা সমান-সমান—আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়ার প্রাধান্য মহিলা বিভাগে। কিন্তু পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সংগৃহীত মোট পয়েন্টের হিসাবে রাশিয়া ৬ বার এবং আমেরিকা ২ বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

বিগত আটটি অনুষ্ঠানে পয়েন্টের হিসাবে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে আমেরিকা ৭ বার এবং রাশিয়া ১ বার। অপর দিকে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাশিয়া ৭ বার এবং আমেরিকা ১ বার। একই বছরে দুই বিভাগেই (পুরুষ ও মহিলা) চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাশিয়া এক-বার (১৯৬৫) এবং আমেরিকা একবার (১৯৬৯ সালে)।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকসের আন্দোলনে রাশিয়ার ইয়ানিস ...সিস উপর্যুপরি ৫টি আসরে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে এক অসাধারণ রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

রেকর্ডের খতিয়ান

পুরুষ বিভাগের ২২টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১২টি বিষয়ে আমেরিকার এবং ১০টি বিষয়ে রাশিয়ার রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। রেকর্ডের দিক থেকে আমেরিকা দৌড় অনুষ্ঠানে এবং রাশিয়া ফিল্ড অনুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করেছে। মহিলাদের অনুষ্ঠান সংখ্যা ১৩টি। এখানেও আমেরিকা অগ্রগামী — ৭টি বিষয়ে আমেরিকা এবং ৬টি বিষয়ে রাশিয়ার রেকর্ড। মহিলাদের দৌড় অনুষ্ঠানে আমেরিকা এবং ফিল্ড ইভেন্টে রাশিয়ার জয়জয়কার। মহিলাদের ফিল্ড ইভেন্টে রাশিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য—আমেরিকার একটিও রেকর্ড নেই।

১৯৬৯ সালে পুরুষ বিভাগের ৯টি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাকী ১৩টি অনুষ্ঠানে আগের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ আছে—১৯৫৯ সালের একটি, ১৯৬৫ সালের চারটি এবং দুটি করে ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালের।

১৯৬৯ সালে মহিলা বিভাগে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে ৬টি অনুষ্ঠানে। বাকী ৭টি অনুষ্ঠানে পূর্বের রেকর্ড বহাল আছে—১৯৬৫ সালের ৪টি এবং ১টি করে ১৯৫৯, ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালের।

আমেরিকা বনাম রাশিয়ার বিগত ৮টি অ্যাথলেটিক স্পোর্টস আসরে ১৫টি বিশ্ব-রেকর্ড, ৯টি ইউরোপীয়ান রেকর্ড ১৭টি আমেরিকান রেকর্ড এবং ২২টি রাশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। এই থেকেই এই দ্বৈত ক্রীড়ানুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

রাশিয়া এবং আমেরিকার আলোচ্য দ্বৈত অ্যাথলেটিকসের গত আটটি আসরের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। যেমন প্রতি আসরেই আমেরিকার পুরুষ অ্যাথলীটরা স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার দৌড়ে (১০০, ২০০,

রাশিয়া-আমেরিকার দ্বৈত ক্রীড়ানুষ্ঠানে রেকর্ড

সময়

পুরুষ বিভাগ

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
১০০	১০·১	ডারেল নিউম্যান	আমেরিকা	১৯৬৫
২০০	২০·৩	জন কার্লেজ	আমেরিকা	১৯৬৯
৪০০	৪৫·৩	লী ইভান্স	আমেরিকা	১৯৬৯
৮০০	১ ৪৬·৪	জেরী সিবার্ট	আমেরিকা	১৯৬২
১,৫০০	৩ ৩৯·২	জিম গ্রেলী	আমেরিকা	১৯৬৫
৫,০০০	১৩ ৫০·০	ইউরি তিউরিন	রাশিয়া	১৯৬৩
১০,০০০	২৮ ২২·০	নিকোলাই দুতোভ	রাশিয়া	১৯৬৫

হার্ডলস

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
১১০	১৩·৪	জেরোম টার	আমেরিকা	১৯৬২
৪০০	৪৯·৫	ওয়ারেন কলে	আমেরিকা	১৯৬৪

স্টিপলচেজ

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
৩,০০০	৮ ২৬·০	আলেকজান্দর মোরোজোভ	রাশিয়া	১৯৬৯

রিলে

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
৪×১০০	৩৯·১		আমেরিকা	১৯৬১
৪×৪০০	৩ ০৩·১		আমেরিকা	১৯৬৯

ভ্রমণ

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
২০ কিলো	১ ৩১ ১১·০	ভ্লাদিমির গলুবিচনি	রাশিয়া	১৯৬৯

ডেকাথলন

		রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
৮,৩৫০ পয়েন্ট		ভাসিলি কুজনেৎসোভ	রাশিয়া	১৯৫৯

	মিটার	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
হাইজাম্প	২·২৮	ভ্যালেরি ব্রুমেল	রাশিয়া	১৯৬৩
লংজাম্প	৮·২৮	রালফ বোস্টন	আমেরিকা	১৯৬১
ট্রিপল জাম্প	১৬·৯১	ভিক্তর সানেয়েভ	রাশিয়া	১৯৬৯
পোল ভল্ট	৫·৩৫	রবার্ট সিগ্রেন	আমেরিকা	১৯৬৯
ডিসকাস	৬১·৬০	ভিক্তর লিয়াখোভ	রাশিয়া	১৯৬৯
জ্যাভেলিন	৮৫·৬৮	ইয়ানিস লুসিস	রাশিয়া	১৯৬৫
সটপুট	২০·৬৭	ডালাস লং	আমেরিকা	১৯৬৪
হ্যামার	৭২·৩৬	আনাতোলি বন্দারচুক রমুয়াল্ড ক্লিম	রাশিয়া	১৯৬৯

মহিলা বিভাগ

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ড স্রষ্টা	দেশ	বছর
১০০	১১·১	উইয়োমিয়া টিয়োস	আমেরিকা	১৯৬৫
২০০	২৩·১	এডিথ ম্যাকগুইরে	আমেরিকা	১৯৬৫
৪০০	৫৩·০	ক্যারী হ্যামন্ড	আমেরিকা	১৯৬৯
৮০০	২ ০৩·৮	মেরী ম্যানিং	আমেরিকা	১৯৬৯
১,৫০০	৪ ১৬·০	লুদমিলা ব্রাগিনা	রাশিয়া	১৯৬৯

হার্ডলস

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ড স্রষ্টা	দেশ	বছর
১০০	১৩·৬	ম্যামিয়াই র্যালিন্স	আমেরিকা	১৯৬৯

রিলে

মিটার	ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ড স্রষ্টা	দেশ	বছর
৪×১০০	৪৪·৩		আমেরিকা	১৯৬১
৪×৪০০	৩ ৩৩·৪		আমেরিকা	১৯৬৯

	মিটার	রেকর্ড স্রষ্টা	দেশ	বছর
হাইজাম্প	১·৭৫	তাইসিয়া চেনচিক	রাশিয়া	১৯৫৯
লং জাম্প	৬·৭১	তাতিয়ানা সর্চেকানোভা	রাশিয়া	১৯৬৫
ডিসকাস	৫৭·৭৪	তামারা প্রেস	রাশিয়া	১৯৬২
জ্যাভেলিন	৫৬·৩২	ভালেন্তিনা পপোভা	রাশিয়া	১৯৬৫
সটপুট	১৮·৯৪	নাদেজদা চিজোভা	রাশিয়া	১৯৬৯

৪০০, ৮০০ ও ১,৫০০ মিটার) প্র হয়েছেন। আমেরিকার এই নিরঙ্ প্রাধান্যের মূলে আছে নিগ্রো অ্যাথলীট অবদান। অপর দিকে দূরপাল্লার দৌ প্রাধান্যের নজির গড়েছেন রাশিয়ার আ লীটরা। ১১০ মিটার এবং ৪০০ মি হার্ডলসেও আমেরিকার প্রাধান্য—মাত্র এ বার (১৯৬৩ সালে) ১১০ মিটার হার্ড তারা স্বর্ণপদক পায় নি। এছাড়া আ রিকার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে ৪×১ মিটার ও ৪×৪০০ মিটার রীলে, ডিস এবং সটপুটে। অপর দিকে রাশিয়ার প্রা জ্যাভেলিন, ডেকাথলন এবং স্টিপলচে

রাশিয়ার ইয়ানিস লুসিস উপর্যু ৫টি আসরে জ্যাভেলিনে স্বর্ণপদক জ সূত্রে এক অতুলনীয় রেকর্ড সৃষ্টি ক ছেন। তিনি ছাড়া আর কোন অ্যাথলীট দ্বৈত ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপর্যুপরি ৫ এমন কি মোট ৫ বার কোন একটি বি স্বর্ণপদক জয়ী হন নি।

লী ইভান্স (আমেরিকা)

আমেরিকার উইয়োমিয়া টিয়ো

পোর্ট এলিজাবেথে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলার একটি দৃশ্য : দক্ষিণ আফ্রিকার ডেনিস লিণ্ডসে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকেঞ্জির বলে ওভার বাউণ্ডারি করেছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

চতুর্থ টেস্ট খেলা

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩১১ রান (বেরী রিচার্ডস ৮১ এবং এডি বার্লো ৭৩ রান। অ্যালান কনোলী ৪৭ রানে ৬ উইকেটে)

৪৭০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ রিচার্ডস ১২৬, আলী বাচার ৭৩, লী আরভিন ১০২ এবং ডেনিস লিণ্ডসে ৬০ রান। মেইন ৮৩ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২১২ রান (সিহান ৬৭ এবং রেডপাথ ৫৫ রান। পিটার পোলক ৪৬ রানে ৩ এবং প্রোক্টার ৩০ রানে ৩ উইকেট)

২৪৬ রান (সিহান ৪৬ রান। প্রোক্টার ৭৩ রানে ৬ উইকেট)

পোর্ট এলিজাবেথের শেষ চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৩২৩ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ১৯৭০ সালের বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের চারটি খেলাতেই জয়লাভের সূত্রে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা এই নিয়ে উপর্যুপরি দু'বার 'রাবার' জয়ী হল। ইতিপূর্বে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে দঃ আফ্রিকা ৩—১ খেলায় (ড্র ১) অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল। একটি সিরিজের সমস্ত খেলায় জয়লাভ দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে যেমন এই প্রথম, তেমনি সরকারী অথবা বে-সরকারী টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় এই প্রথম। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার হাতেখড়ি হয়েছে মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথে ১৮৮৯ সালের ১২ই মার্চ। উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যাণ্ড।

১৯৭০ সালের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় পরাজয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে অস্ট্রেলিয়ার আসন খুবই টলে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বরাত ভাল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজটা বে-সরকারী ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে পোর্ট এলিজাবেথে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজের শেষ চতুর্থ টেস্ট খেলাতে নামে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। খেলার সূচনা খুবই শক্ত হয়েছিল—কোন উইকেট না পড়ে ১৫৭ রান। কিন্তু মাত্র ১৩ মিনিটের খেলায় মাত্র ২ রানের বিনিময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি মূল্যবান উইকেট পড়ে যায়—১ম উইকেট ১৫৭ রান, ২য় উইকেট ১৫৮ রান এবং ৩য় উইকেট ১৫৯ রানের মাথায়। ১ম উইকেটের জুটিতে বেরী রিচার্ডস এবং এডি বার্লো দলের ১৫৭ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংস ৩১১ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার পেশ বোলার কনোলী দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাত্র ৫ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট পেয়েছিলেন। এবং এই সূত্রেই তিনি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে (সরকারী এবং বে-সরকারী) ১০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৮৯ রান সংগ্রহ করে।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের

বিদ্যাসাগর

"এই গ্রন্থখানির প্রকাশ বাঙালী পাঠকের কাছে এক সুসংবাদ সন্দেহ ... সবত্র মনীষী ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী তথা ... নিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়

দ্বিতীয় ইনিংসের ২৩৫ রান সংগ্রহ করে ৩৩৪ যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ... ব্যেরী রিচার্ডস সেঞ্চুরী (১২৬ রান) করেন। তাঁর ১২৬ রানে ছিল ১৩টা বাউণ্ডারী এবং ৬টা ছক্কা। খেলেছিলেন ২৩৯ মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের কিছু পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৭০ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটা খেলোয়াড় লী অরভিন মেডেন সেঞ্চুরী (১০২ রান) করার গৌরব লাভ করেন। খেলার এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার বাকি ৫২৮ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৭০ রান সংগ্রহ অসম্ভব ছিল। চতুর্থ দিনের খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট পড়ে ১৩৪ রন দাঁড়ায়।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের কিছু পরেই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৬ রানের মথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩২৩ রানের ব্যবধানে জয়লাভ করে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

জলন্ধরে ৩৫তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব এবং রেলওয়ে যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছে। লীগের খেলায় যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-অপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল—'এ' গ্রুপ থেকে পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু, 'বি' গ্রুপ থেকে বোম্বাই ও মহীশূর, 'সি' গ্রুপ থেকে সার্ভিসেস ও বাংলা এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে রেলওয়ে ও উত্তরপ্রদেশ। কোয়ার্টার ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব ৩—০ গোলে মহীশূরকে, বোম্বাই ১—০ গোলে তামিলনাড়ুকে, রেলওয়ে ১—০ গোলে বাংলাকে এবং উত্তরপ্রদেশ অপ্রত্যাশিতভাবে ২—১ গোলে শক্তিশালী সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল একমাত্র সার্ভিসেস দল এবং তারা কেরলকে ১৩—০ গোলে পরাজিত করে একটি খেলায় সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড করে। সুতরাং কোয়ার্টার ফাইনালে 'ডি' গ্রুপের রানার্স-আপ উত্তরপ্রদেশ দলের কাছে তাদের পরাজয় রীতিমত অঘটন।

সেমি-ফাইনালের এক দিকে গতবারের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব ২—০ গোলে বোম্বাইকে এবং অপর দিকে গত বারেরই রানার্স-আপ রেলওয়ে ২—০ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। পাঞ্জাব বনাম রেলওয়ে দলের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থেকে গেছে।

টেনিসে বিশ্ব খেতাব

কেম্ব্রিজে (ম্যাসাচুসেটস) আয়োজিত বিশ্ব টেনিস সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৫—২ খেলায় গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করে বে-সরকারী-ভাবে বিশ্ব-খেতাব জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি মাত্র এই দুটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন জন নিউকম্ব এবং ফ্রেড স্টোলে। অপরদিকে আমেরিকার পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—স্টান স্মিথ, আর্থার অ্যাস, ক্লার্ক গ্র্যাবনার এবং ক্লিফ রিচে। ... বিশ্ব খেতাব ... অস্ট্রেলিয়ার নিউকম্ব এবং ... ১১,০০০ ডলারের নগদ পুরস্কার ... করেছেন। প্রতিযোগিতায় মোট ... ছিল—৫টি সিঙ্গলস এবং ২টি ... প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সম... দাঁড়ায়।—উভয় দেশই একটি ক... খেলায় জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়... দিনের সিঙ্গলস এবং ডাবলসে ... জয়ী হয়ে ৩—১ খেলায় অগ্রগ... তৃতীয় দিনের তিনটি খেলার মধ্যে ... জয়ী হয় ২টি খেলায় (... ডাবলস) এবং আমেরিকা একটি খেলায়। অালোচ্য প্রতিযোগিতা... লিয়ার জন নিউকম্ব শ্রেষ্ঠ ... নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার ... দুটি সিঙ্গলস খেলায় অংশগ্রহণ ... প্রতিযোগিতায় একমাত্র তিনিই ... থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ

পাটনার প্রখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ ... ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ... মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২—১ ... বছরের বিজয়ী গোর্খা ব্রিগে... পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ... ইউনাইটেড দলের বিপক্ষে সে... খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ... গোলে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় প... গোলে হেরে যায়। শেষপর্যন্ত ... জয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০·০০	টাকা	২২·০০
ষাম্মাষিক	টাকা	১০·০০	টাকা	১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫·০০	টাকা	৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 27th March, 1970 শুক্রবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৭৬ 40 Paisa

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

গত ২৩শে মাঘ অমৃতের চিঠি-পত্র বিভাগে শ্রীসমঙ্গল সেন মশায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়ের ধারাবাহিক আত্মস্মৃতি 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' রচনার মধ্যে অংশবিশেষের উপর আলোচনা করেছেন; সেটা স্বর্গত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়ের দলবল নিয়ে আমেরিকা সফরে চৌধুরী মশায়ের মতামত নিয়ে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সুরু থেকে বাংলা নাট্যজগতের তদানীন্তন দুই দিকপালের অভিনয় দেখার দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল আমাদের মধ্যে। অর্থাৎ তখনকার কলেজে পড়া যুবকদের মধ্যে। এর ফলে সে যুগের রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অনেক ঘটনা আজও মনে আছে। তা ছাড়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিনয় সম্বন্ধে যে কোন রকম আলোচনা আগ্রহ সহকারে তখনও পড়তাম, এখনও পড়ি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেন মশায়ের বক্তব্যটি যদি অন্য দৃষ্টি-কোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই তাহ'লে বোধ হয় সেন মশায় ক্ষুব্ধ হবেন না।

সে সময়ে ভাদুড়ী মশায়ের আমেরিকা যাওয়া-আসার খবর ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়েছি—যাত্রার আয়োজনের শুরু থেকে আমেরিকা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। তাঁর আমেরিকা সফর সত্যই সফল হয়নি। অবশ্য শিশির-শিল্প-প্রতিভার কোন রকম বিচ্যুতি এর জন্যে তিলমাত্র দায়ী ছিল না, ছিল তাঁর দল গঠনের দুর্বলতা বা জিদ নিয়ে। চৌধুরী-মশায় বোধ হয় সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। বিদেশ সফরে একান্তভাবে 'নাট্য-মন্দির' দলকে মনোনীত না করে যদি তখনকার প্রতিনিধিমূলক বাছাই দলকে নিয়ে যাওয়া হতো তা হ'লে হয়তো সম্মিলিত দল আমেরিকায় দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারতো, এবং মাত্র তিন রাত্রির অভিনয়ে সফরের পরিসমাপ্তি ঘটতো না। হঠাৎ পরিসমাপ্তির মূল সন্ধান করতে গিয়ে কে গেল না গেল, কে ট্রেনে গেল, কেই বা জাহাজে গেল এ সব কথা উঠবে বৈকি। বিদেশ দেখার প্রলোভনে, বিশেষ করে ধনীর স্বর্গ আমেরিকা যাওয়ার আগ্রহে ধরাধরি, তদ্বির, মুখ তাকাতাকি এ সবের তোড়জোড় একান্ত স্বাভাবিক। সফরে বঞ্চিত হওয়ার ব্যর্থতায় আক্রোশ জন্মানও বিচিত্র নয়। আক্রোশবশে একজন অভিনেত্রী (বোধ হয় চারুশীলা) আমেরিকা সফর বন্ধ করার জন্য ভাদুড়ী মশায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দিয়েছিলেন। অবশ্য শেষ অবধি সে মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা হাস্যোদ্দীপক ঘটনার কথাও কোন একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম। ঘটনাটি এই রকম। আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় রজনীতে যবনিকা তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল এবং বিচিত্র অডিটোরিয়াম দেখে দুর্মুখ হতবাক হয়ে কাঁপতে থাকে, অথচ তার কথা বলার পালা সর্বপ্রথম—প্রভু, বার্তা আনিয়াছি। রামরূপী ভাদুড়ী মশায় দুর্মুখের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করে পরিস্থিতি রক্ষার জন্য সুরু করেন—

রে দুর্মুখ!
শ্বেতাঙ্গ যবনের দেশে
বুঝিবে না আমাদের ভাষা
আমার নিকটে আসিয়া
কর নিবেদন।

সত্য মিথ্যা জানি না, তবে যদি এটা সত্য হয় তাহ'লে এই রকম দুর্বল স্নায়ু শিল্পী নিয়ে দল গঠন নিশ্চয়ই খ্যাতির পরিপন্থী। চৌধুরী মশায় যদি তাঁর আত্মস্মৃতিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ধরনের ইঙ্গিত করে থাকেন তা হ'লে ভাদুড়ী মশায়ের শিল্প-প্রতিভাকে অবমাননা করেছেন বলে আমার মনে হয় না।

পরিশেষে আর একটা কথা। সমকালীন প্রতিভাধর দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রাধান্যের দাবী অল্প বিস্তর থাকেই। বৈদিক যুগে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের দ্বন্দ্ব সর্বজনবিদিত। দেবতার মধ্যে যদি এই ভাব থাকে মানুষ কোন ছার। সত্যি কথা বলতে কি, সে যুগে ভাদুড়ী মশায় আর চৌধুরী মশায়কে কেন্দ্র করে এই রকম একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার রটনা লোকের মুখে মুখে ফিরতো। আমারও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' যখন প্রথম খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল তখন এক জায়গা পড়ে আমার ধারণা সমূলে বিনষ্ট হয়। 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সময় চৌধুরী মশায় লবের সঙ্গে রামের প্রথম মিলনের দৃশ্যটির বর্ণনায় শিশির প্রতিভায় যে অর্ঘ্য ঢেলে দিয়েছেন এমন অকুণ্ঠ সুখ্যাতি চৌধুরী মশায়ের শিল্পী মনেরই পরিচয়। সেন মশায় যেটা দাবী করছেন 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'র প্রথম খণ্ড পড়লেই সেটা পাবেন।

ত্রিদিবেশ ঘোষ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি—১।

দুই আদি-কবি প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষার প্রথম কবি সঞ্জয় এবং বাংলা দেশের আদি কবি বলে খ্যাত কৃত্তিবাস ওঝার আসল পরিচয় হয়ত অনেকেরই জানা নেই। অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন যে উভয় কবিই শ্রীহট্টের সন্তান এবং একই পরিবারভুক্ত। কবি সঞ্জয়ের জন্মস্থান শ্রীহট্টের লাউড় (নবগ্রাম) এবং কৃত্তিবাসের জন্মস্থান নদীয়ার ফুলিয়া। কিন্তু কৃত্তিবাসের পিতামহ লাউড়েরই সন্তান ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতামহ পণ্ডিত নরসিংহ (নৃসিংহ) ১৩৬৮ খৃঃ বঙ্গের রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নরসিংহ তদানীন্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং যশস্বী বাগ্মী ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল চাণক্যের মত প্রখর। তাই নরসিংকে 'বাংলার চাণক্য' বা 'দ্বিতীয় চাণক্য' বলা হত। এই নরসিংহই কাশীর শ্রীবেদের নৃসিংহাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কুবের তর্কপঞ্চানন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পিতৃদেব ছিলেন। নরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র লাউড় থেকে ফুলিয়ায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই পুত্র হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। কবি সঞ্জয় ছিলেন নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও কৃত্তিবাসের খুল্লপিতামহ। কবি সঞ্জয় লাউড়ে বসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই লাউড়েরই সন্তান ছিলেন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, সুপ্রসিদ্ধ তপন মিশ্র। তাঁরই পুত্র ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম), পদকর্তা গোবিন্দ দাস, গোপাল দাস, বৈকু[illegible] মিশ্র (তাঁরই পুত্র হলেন 'চৈতন্য-ভা[illegible]' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস)।

—**সুরেশচন্দ্র দেবনাথ**, এলাহাবাদ।

সাহিত্যে বিজ্ঞাপন

আজকের দিনে বিজ্ঞাপনের প্রভাব প্রায়ই সব কিছুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এবং নানাভাবে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এর ফলে জনমানসে এর প্রয়োজনীয়তাও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বিজ্ঞাপনদাতা এবং পাঠক উভয়েই লাভবান হচ্ছেন। যতই প্রচার হচ্ছে ততই প্রচারের নতুন নতুন পন্থাও উদ্ভব হচ্ছে। অতএব এই আর্থিক অনটনের দিনে যদি সাহিত্যিকরাও উদ্যোগী হয়ে এ বিষয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে তাঁরাও নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন আশা করি। অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। সাহিত্যিকরা সাধারণত তাঁদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতা রচনার মাধ্যমে উপযুক্ত সময় বুঝে কোন দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করতে পারেন। সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এ বিষয়ে আগ্রহী হলে বিজ্ঞাপনের এই নতুন পদ্ধতিটিও নিশ্চয়ই জনপ্রিয়তা অর্জ

চিঠিপত্র

করতে সক্ষম হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিজ্ঞাপনদাতাদের উদার মনোভাব এবং এই সম্বন্ধীয় পরামর্শ। সমাজ জীবনের নানান ক্ষেত্রে যখন বিজ্ঞাপনের প্রভাব আলোড়ন তুলেছে তখন সাহিত্যও যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হয় তাহলে নিশ্চয়ই দোষনীয় হবে না।

আমার এই পত্রটি যদি সাপ্তাহিক অমৃতে প্রকাশ করেন তাহলে বাধিত হব।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
কলিকাতা—২০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র একজন নিয়মিত পাঠিকা। 'অমৃতে'র ৯ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৩শ সংখ্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে শ্রীঅভয়ংকর লিখিত অমৃতলোকের বার্তা পড়েছি। লেখক বারান্তরে বার্ণার্ড শর আবির্ভাবের বিবরণ দিবেন বলেছেন। সেই বিবরণের জন্য সাগ্রহ প্রত্যাশা...লেখক নিশ্চয়ই পূরণ করবেন, অপেক্ষায় রইলাম।

গত 'শারদীয়া অমৃতে' ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখিত 'অন্য ভুবন-অন্য জীবন' নামক নিবন্ধটিও আগ্রহ বর্ধন করে। বিষয়টি আরও আলোচিত হলে ভালো হয়।

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা—২৬

যে বই ওদেশে নিষিদ্ধ হল

৪১ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীপবিত্র সরকারের 'যে বই ওদেশে নিষিদ্ধ হল' নিবন্ধটি পড়লাম। অনেক দিনের আশা তিনি মিটিয়েছেন। এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা নেই। অবশ্য আমাদের সে সুযোগও নেই। রাজনৈতিক দাবা খেলায় আজ পূর্ব বাংলার সব কিছু আমাদের কাছে রুদ্ধ। এই নিবন্ধটি পড়বার কয়েক দিনের মধ্যেই নিষিদ্ধ বইগুলোর একটি পড়বার সৌভাগ্য হয়। সেটি হল বদরুদ্দিন উমরের 'সংস্কৃতির সঙ্কট'। পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের অজান্তে পূর্ব বাংলার চিন্তাধারার কত পরিবর্তন ঘটেছে তা কল্পনার বাইরে ছিল। সে চিন্তাধারা কত প্রগতিশীল তা এই বইটি পড়লে বোঝা যায়। বর্তমান পূর্ব বাংলার সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত। উমর সাহেব পূর্ব বাংলার একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তাঁর এই নির্ভীক প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

পরিশেষে আপনার কাছে অনুরোধ, 'অমৃতে' পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি নিয়মিত বিভাগ চালু করলে আনন্দিত হব।

তমালকুমার ভট্টাচার্য
রিলবং, শিলং—৪

নিকটেই আছে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। এই পত্রিকার প্রতিটি ফিচার আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। বলতে বাধা নেই, প্রায় সমস্ত রচনাই মনোগ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। অধুনা 'নিকটেই আছে' নামক যে ফিচারটি (লেখক—সন্ধিৎসু) প্রকাশিত হচ্ছে, তার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ। রচনাগুলি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। আর যেভাবে সন্ধিৎসু বর্তমান সমাজের প্রতারকদের ও তাদের প্রতারণার কলাকৌশলকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।— আর যাতে ঐ ধরনের প্রতারণার সম্মুখীন হ'লে প্রতারিত না হই, তার জন্যেও সচেষ্ট হ'তে পারব। অবশ্য কতখানি সফল হ'তে পারব, জানি না।

অশোক বিশ্বাস, কলকাতা—৪।

শ্রীকুমারবাবু

গত ২৯শ ফাল্গুনে অমৃতে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গত শ্রীকুমারবাবুর সম্বন্ধে লেখা পড়লাম। এই প্রসঙ্গে আমি সামান্য একটি কথা জানাতে চাই। শ্রীকুমারবাবু বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত, গণ্ড পল্লী গোপালনগরের 'রোল সি, এম, টায়েব ইনস্টিটিউশন' থেকে ১৯০৬ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম-এ। উনি শ্রীকুমারবাবুর মামা। উপরোক্ত তথ্যটি আমি আমার পূজনীয় পিতার নিকট থেকে শুনেছি। উনি তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

সুনীলকুমার নিয়োগী, জি টি রোড, আসানসোল।

অমৃত প্রসঙ্গে ও খেলাধুলো

আমি গত চারি মাস থেকে অমৃত নিয়মিতভাবে পড়ে আসছি। সত্যিই অমৃতের সব বিভাগই আমার কাছে অমৃত সমান হচ্ছে। বুদ্ধদেব গুহের কোয়েলের কাছে পড়তে পড়তে যে মনটাও সেই আরণ্যক জগতে গিয়ে পৌঁছায় তা খেয়াল হয় যখন তার শেষ প্রান্তের 'ক্রমশঃ' দৃশ্যমান হয়। কেবলই উৎসুক হয়ে থাকি কখন পরের সংখ্যা আসবে। তা ছাড়া 'নিকটেই আছে' নিয়মিত বিভাগটির সত্যকে প্রকাশ করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সত্যিই রেল গাড়ীর সেই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কাছে প্রকট হয়ে উঠে যখন নানা কু-মতলববাজের ছদ্মবেশ খসে পড়ে।

গত ৪১শ সংখ্যার (৪র্থ খণ্ড) ২৩৭ পৃষ্ঠায় 'টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট কিপিং' শীর্ষক তথ্যমূলক আলোচনাটি খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু একটা বিষয়ে মনে খুঁত রয়ে গেল। 'একটি খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ' ও 'এক ইনিংসে সর্বাধিক ক্যাচ' শীর্ষক তথ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট উইকেটরক্ষক ডেনিস লিণ্ডসের নাম না দেখে একটু বিস্মিত হলাম। কেননা তিনি ১৯৬৬—৬৭ টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলায় (ঠিক কোন টেস্টটি তা লিখতে না পারায় দুঃখিত) সর্বাধিক ৮টি ক্যাচ ও এক ইনিংসে সর্বাধিক ৬টি ক্যাচ লুফে গ্রাউট, মারে, ডিমেপার্কসের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া তিনি সেই সিরিজে উইকেট-রক্ষকের পক্ষে সর্বাধিক মোট ৬০৬ রান করে বুধিকুন্দরনের পূর্বতন বিশ্ব রেকর্ড (৫২৫) ভেঙে দিয়েছেন তারও উল্লেখ নেই। আপনি যদি এই চিঠিখানি চিঠিপত্র বিভাগ মারফত প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তো ভাল হয়।

অভিজিত সরকার, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪।

(লেখকের উত্তর)

অমৃতের ৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'টেস্ট ক্রিকেটে উইকেটকিপিং' নিবন্ধটি শুধু সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ে রচিত এবং তার উল্লেখও প্রবন্ধের মধ্যে এইভাবে করা হয়েছে 'বর্তমান নিবন্ধে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উইকেটকিপিংয়ের বিশ্ব-রেকর্ড এবং উইকেট-কিপারদের অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড দেওয়া হল' (পৃষ্ঠা ২৩৭, প্রথম কলমের ২য় অনুচ্ছেদ)।

যেহেতু ১৯৬১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা যে-সব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে তা সবই বে-সরকারী সেইহেতু ১৯৬৬-৬৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট-কিপার ডেনিস লিন্ডসে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডগুলি 'টেস্ট ক্রিকেটে উইকেটকিপিং' প্রবন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নি।

শাদা চোখে

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হল। তবে এবার বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়নি। ফলে, জনগণের প্রতিনিধিরা যথারীতি মাসহারা পেয়ে যাবেন। তবু জনতার মঙ্গলকর্ম সাধনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বিতর্ক করার জন্য যে পারিশ্রমিকটা পেতেন তা বন্ধ হয়ে গেল। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধাটুকুও টিকে আছে। আর টিকে আছে আইনসভা সদস্যদের এদল-ওদল করবার সুবিধাটুকু। সেই খেলা ঠিকমত খেলতে পারলে নতুন একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনাও একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়নি। অতএব, পুনরায় নির্বাচনের কথাটা পাকাপোক্ত হওয়ার আগে আর একবার মন্ত্রী হওয়ার আশাটাও অবচেতন মনে দানা বেঁধে থাকবে। কাজেই নেপথ্যে রাজনীতির ঘাড়ে যে বেশ নড়াচড়া করবে এ সুস্পষ্ট। তবে নির্বাচনের শ্লোগানই হবে মুখ্য আওয়াজ।

এবারের রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে চারটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া গেছে। প্রথমত, বাংলা কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসাজসে মিনিফ্রণ্ট করে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করেননি, রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে যে আটটি দল সহযোগিতা করেছেন এবং বারবার বলেছেন, ১৪টি শরিকের কাউকে বাদ দিয়ে সরকার তাঁরা গঠন করতে চান না, তাঁদের সেই আন্তরিকতাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা ডিফেকসানের রাজনীতির মাধ্যমে শ্রীমুখার্জির পদত্যাগের পর নতুন করে যে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা চলাচ্ছিলেন তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ এই নয় যে, রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়াতেই শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন না। কারণ হচ্ছে শ্রীবসুর সমর্থকরা অন্য শরিকদলের মধ্যে আছেন এ-বক্তব্যটা সত্য বলে প্রমাণ করা গেল না। অর্থাৎ তাঁদের দল ভাঙাবার প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে গেল। শ্রীবসুর কাছে রাজ্যপালের অনুরোধ ছিল: আপনি আপনার সমর্থকদের একটি তালিকা পেশ করুন, নতুবা আপনার সমর্থকদের হাজির করুন। বিধানসভায় ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের এবং তাঁদের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ আছেন ৮৩ জন। কাজেই রাজ্যপাল বিধানসভায় শ্রীবসুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এ-কথা বোঝার মত কোন যুক্তি নেই। রাজ্যপালের অনুরোধের উত্তরে শ্রীবসু দাবী করেছেন তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দিয়ে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি নীতিগতভাবে নাকি রাজ্যপালের কাছে তাঁর সমর্থকদের তালিকা বা তাঁদের হাজির করত পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দলের সেক্রেটারিয়েটও এক জরুরী বৈঠক করে বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

অন্যদিকে চৌদ্দ শরিকের আটটি শরিক দল রাজ্যপালকে সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা সি পি এম নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সমর্থন করবেন না। এবং শুধু তাই নয়, বাধা দেবেন। শাসক কংগ্রেস দলও ঐ এক কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্যপালের হিসাব মত এই দলগুলির সদস্য-সংখ্যা হচ্ছে ১৬৫। অন্যদিকে আদি কংগ্রেস রাজ্যপালকে না জানালেও বিবৃতি মারফৎ বলেছেন, তাঁরা বিরোধী দলেই থাকবেন। তিনজন সদস্যবিশিষ্ট প্রগ্রেসিভ মুশলিম লীগ কোনো কথাই বলেনি।

তা সত্ত্বেও বাম কম্যুনিস্টরা আর এস পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ও শ্রীসুধীন কুমারের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এ-দলগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত শ্রীসুকুমার রায়। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের ভাষায় এই বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নাকি কিছু সংখ্যক বিধানসভার সদস্য আছেন। শ্রীকোঙার অবশ্য তাদের সংখ্যা কত তা বলেননি। যাহোক তাঁদের আলোচনার ফলাফল যা আলোকে এসেছে, তা থেকে জানা গেছে, সকল দলই বাম কম্যুনিস্টদের মন্ত্রিসভা গঠনে সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন। শুধু আর এস পি ও লোকসেবক সংঘ আগে থেকে বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন থাকলে কোন শক্তিগোষ্ঠীর মন্ত্রিসভাকেই তাঁরা সমর্থন করবেন না। তবে তাঁরা নাকি মার্কসবাদীদের সূত্রের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। সেই সূত্র হচ্ছে, আগে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ, তারপর পরীক্ষা। এখন বিবেচ্য বিষয় হল, এই দলগুলির সম্মিলিত সদস্য-সংখ্যা কত? বাম কম্যুনিস্টদের ৮৩, আর এস পির ১২, এল এস এস-এর ৪, ওয়ার্কার্স পার্টির ২ ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের ১,—এই নিয়ে সর্বমোট শক্তি হচ্ছে ১০৩। শ্রীসুধীন কুমারের দলের কোন সদস্য নেই। কাজেই শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসের ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীসুশীল ধাড়া বাদে আর ৩১ জন সদস্য যদি চলে আসেন, তবুও অঙ্কের হিসাবে মার্কসবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজ্যোতি বসুর পক্ষে আগে সরকার গঠনের সুযোগ ও পরে আস্থা অর্জনের কথা বলা ছাড়া অন্য কোন পথ হয়ত ছিল না। অবশ্য শ্রীবসু এ-কথা বলতে পারেন, আরও অন্য দল থেকেও সদস্যরা আসতেন। কিন্তু যেসব সদস্যরা আসতে পারেন, বাংলাদেশের এই চরম সংকটের দিনে কেন তাঁরা আগেই এগিয়ে এসে শ্রীবসুর পাশে দাঁড়ালেন না সেটা একমাত্র জনগণই জিজ্ঞাসা করবার অধিকার রাখেন, 'সমদর্শী' নয়। কিম্বা জনগণ একথাও শ্রীবসুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তিনিই বা কেন এই সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য এগিয়ে গেলেন না?

সহৃদয় পাঠকরা নিশ্চয় অবগত আছেন, কেরালার শ্রীঅচ্যুত মেনন সরকার আবার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কা[illegible]কারী দলের পাঁচজন সদস্য বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা ঘো[illegible] করেছেন। সাড়ে চার মাস রাজত্বকা[illegible]ুত মেনন সরকার দুবার তাঁদের নি[illegible]ঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রশ্ন বিধানসভায় মীমাংসা করে দিয়েছেন। এই পাঁচ ব্যক্তি সরকার পক্ষ ত্যাগ করার পরেই শ্রীমেনন আস্থাসূচক ভোট চেয়েছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ এটাকে একটি কৌশল বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ পশ্চিমবাংলায় সরাসরি সংখ্যালঘু সরকার গঠনের জন্য শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যপালের সম্মতি চেয়েছিলেন। এবং পরে বিধানসভায় আস্থাসূচক ভোট গ্রহণ করবেন বলেছেন। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ জ্যোতিবাবুর এই প্রচেষ্টাকে কি বলবেন? কংগ্রেসকে গাল দিয়ে আবার তাঁদেরই অনুসৃত পথকে বরণ করে নেওয়া সুষ্ঠু রাজনীতি কি?

আরও একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসনের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই। সেটা হচ্ছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা মে মাসের মধ্যেই আবার নির্বাচন চান। বিপ্লবের কথা বলে ক্যাডারদের যতই খুশি করা হোক না কেন, আসলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কিছু কিছু সুবিধা বিতরণের দ্বারা ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা যায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন। অনেকে হয়ত এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু আসলে এটাই হচ্ছে ঘটনা। কৌশলের নাম করে তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলে এই সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু তা ধোপে টিকবে না।

আরও একটি কাজ এই রাষ্ট্রপতি শাসনের ঘোষণার মধ্যে থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে। সেটা হচ্ছে, সকল শরিকই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও কেন্দ্রের শাসনে খুবই খুশি হয়েছেন। এবং সেই অব্যক্ত আনন্দের কারণ হচ্ছে, আপাতত কেউ গদিতে বসতে পারল না। এবং তাই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে কোনো দল হরতালের ডাক দিলেন না। কিম্বা দু'-একটা বিক্ষোভ মিছিলও সংগঠিত করলেন না। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, তাঁরা নিজেরা দোষী। অতএব, এই দোষী মন নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভের জন্য নামলে তাঁদেরই সমর্থকদের বিরূপতার যথেষ্ট আশংকা ছিল, কাজেই বিক্ষোভ যদি হয়ও তবে কিছুদিন বাদে তা সংগঠিত হবে। জনতার স্মৃতিশক্তি যে খুবই দুর্বল, রাজনৈতিক নেতারা তা বিলক্ষণ জানেন।

এখন আলোচনা করা যাক, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা খুব তাড়াতাড়ি আবার নির্বাচন চাইছেন কেন? কারণ নিশ্চয় এটা নয় যে, নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হবে বিপ্লবও ত্বরান্বিত হবে। কারণ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি নির্বাচন হলে যুক্তফ্রণ্টের বার মাসের রাজত্বকালে নানারকম সুবিধা বিতরণের মাধ্যমে এবং দলীয় শক্তিকে তাঁরা যতটুকু বৃদ্ধি করতে পেরেছেন সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাবে। এ-কথা বলছি না, অন্য দলগুলি একেবারেই নির্দোষ। তবে তাঁদের হাতে যে সমস্ত দপ্তর ছিল, সংগঠন বাড়াবার পক্ষে তা খুব কার্যকর নয়। উপরন্তু মার্কসবাদীরা ফ্রণ্টের মধ্যে থেকেই এককভাবে গোটা এই একটি বছর নিজেদের ছকবাধা পথে এগিয়ে গেছেন। এবং শুধু তাই নয়, বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠনকেও সেই-ভাবে গড়ে তুলে সকলের সংগে মোকাবিলার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি শেষ করেছেন। কাজেই রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকাকালে অত্যল্প সময়ের মধ্যে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন এই ভরসা তাঁরা রাখেন। কারণ, রাজ্যপালের শাসন ও অন্য একটা বিকল্প মন্ত্রিসভার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। রাজ্যপাল কিছু মঙ্গলকর্ম সমাধা করে নিজের জনপ্রিয়তা বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করবেন। এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাছ থেকে যে সমস্ত সুপারিশ-সমূহ আসবে তা একটু আলতোভাবে দেখেই নির্দেশ দিয়ে যাবেন মাত্র। শাসন-যন্ত্রের গভীরে ঢুকে তিনি ত আর রাজনৈতিক বিলি-ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটাতে পারবেন না। কিম্বা বাম কম্যুনিস্টদের প্রভাব খর্ব করার জন্য অফিসারদের এধার-ওধার করতে পারবেন না, বা সেই অনুযায়ী পরিকল্পনাও নিতে পারবেন না। অতএব, রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে যদি নির্বাচন হয়, তবে বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের কৌশলের পুরো সুফল সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু যদি আর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, এবং সে-মন্ত্রিসভা যদি বিশেষ করে ঐ আট-দলীয় সরকার হয়, তাহলে বিপদ দেখা দিতে পারে। কারণ, এঁরা জানতে পারবেন বাম কম্যুনিস্টরা কোথায় কীরকম ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। সেইসব ব্যবস্থা রদবদল করে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে এঁদের মোটেই অসুবিধা হবে না। তাছাড়া রাজ্যপালের শাসনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণত কঠিন হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার পক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শাসন-যন্ত্রকে চালিত করার সুযোগ আছে। এবং তা ঘটেও।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদীদের কৌশল হবে মিনিফ্রণ্টের চক্রান্ত করে সরকার গঠনের চেষ্টা হচ্ছে বলে আওয়াজ তোলা, আর অন্যদিকে অবিলম্বে নির্বাচন চাই বলে জনমত সৃষ্টি করা। তাহলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অবিলম্বে নির্বাচনের কথা বলার অর্থ হচ্ছে বিধানসভা বাতিল করা। বিধানসভা বাতিল হলেই অন্য কোন মন্ত্রিসভা এসে আর তাঁদের পথের কাঁটা হতে পারবেন না। সংগে সংগে তাঁরা একটা নির্বাচনী মিনিফ্রণ্ট বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করবেন। যাতে জনতাকে বোঝানো কঠিন না হয় যে, তাঁদের শ্রেণীসংগ্রাম ও প্রগতিশীল কর্মপন্থাকে আরও অনেক দলই সমর্থন করছে। এবং যাঁরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' তাঁরাই শুধু বিরোধিতা করছেন মাত্র। কিন্তু অন্যদের কথা বাদ দিলাম, দুঃখ হয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্য। খাঁটি সমাজবাদের জন্মভূমির আশীর্বাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আজ প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হবার পথে! আরও দেখুন, এঁদের প্রায় সকলেই ইন্দিরাজীর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছেন।

যাহোক, যাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে বলে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলেন, তাঁদের কাছে নিবেদন করি—খেলা আবার নতুন করে শুরু হবে। হাফ টাইম হয়েছে মাত্র। তবে মনে রাখবেন এটা সেমি-ফাইন্যাল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রিসভার পতন অথবা পতনের আশংকা—এক সপ্তাহের সংবাদ-পত্রে প্রধান প্রধান শিরোনামগুলির এই হচ্ছে সারসংক্ষেপ। কোথাও দলত্যাগ, কোথাও **দলের ভিতর বিদ্রোহ। ফল সর্বত্রই প্রায় এক**—পুরাণো জোট ভাঙছে, নতুন জোট গড়ে **তোলার চেষ্টা হচ্ছে, আর যেখানে একদলীয় সরকার সেখানেও ঝোঁক নেতা বদলের। কাশ্মীর থেকে কেরল, গুজরাট থেকে উড়িষ্যা রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের রাত্রির নিদ্রা নেই, দিনের স্বস্তিও গত। একদিকে চলছেভাঙনের প্রয়াস, আর একদিকে ভাঙন রুখবার চেষ্টা। সবচেয়ে ব্যস্ত কংগ্রেসের দুই তরফের নেতারা। নয়া কংগ্রেসের সভাপতি** শ্রীজগজীবন রাম ভুবনেশ্বর ছাড়লেন ত পুরাণো কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅশোক মেহতা **সেখানে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কোচিনে গেলেন ত শ্রীরামকে দেখা গেল আমেদাবাদে।**

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অবশেষে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ৩৮৪ দিনের মন্ত্রিসভার অবসান ঘটিয়েছে। কেরলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন, উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও উড়িষ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিং দেওয়ের সামনে রয়েছে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ। কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ সাদিক রাজ্যপালকে দিয়ে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করিয়ে দিয়ে দলের ভিতরকার ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছেন, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই আত্মরক্ষার জন্য **স্বতন্ত্র দলের সংগে বোঝাপড়া করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আদালতের নির্দেশে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লের নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সেখানকার বিধানসভায় কংগ্রেস দলের ভিতরে শ্রীশুক্লকে নেতৃত্ব থেকে সরাবার দাবী তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে।**

বিদেশ থেকে পাওয়া চমকপ্রদ সপ্তাহান্তিক সংবাদ হল কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে প্রিন্স নরোদম সিহানুকের অপসারণ।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড সৃষ্টি করল। খুব সুস্থির না হলেও, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর এক বা একাধিক সরকার গঠিত হয়েছে এবং চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার চালাবার পরীক্ষা আর একবার ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা বলতে গেলে ভাগ্যের পরিহাস যে, অন্যান্য রাজ্যের আগে পশ্চিমবঙ্গেই রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হল। কেননা, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য অন্তত বাহ্যত অধিকতর সচেষ্ট ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে তফাতে সরে থেকে এই ধারণাই দৃঢ়মূল করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সংকট ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির নিজেদের সৃষ্টি, বাইরের কোন হস্তক্ষেপ সেজন্য দায়ী নয়। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই পার্লামেন্টে কিছু কিছু সদস্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছেন। রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানও এটা প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সকল তরফকে একটা বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দিতে চান।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভাকে জীইয়ে রেখে অদূর ভবিষ্যতে একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এই সুযোগ গ্রহণ করা হবে কিনা এবং হলে বিকল্প মন্ত্রিসভার গঠন কিরকম হবে সেটা কতক অংশে নির্ভর করছে কেরলে শ্রীঅচ্যুত মেননের সরকারের ভাগ্যের উপর। সেখানে সি-পি-আই-এর একজন সদস্যসহ (এই সদস্যটি মাস কয়েক আগে সি-পি-এম ছেড়ে সি-পি-আই-য়ে যোগ দিয়েছিলেন) মোট পাঁচজন সি-পি-আই-য়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিধানসভায় সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ, দুইদিকেই সদস্যসংখ্যা ৬৫তে (স্পীকারকে হিসাবে ধরে) এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন নিজেই বিধানসভায় একটি আস্থাসূচক প্রস্তাব এনে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতি বিধানসভার আস্থা আছে কিনা সেটা যাচাই করতে চেয়েছেন। ঐ প্রস্তাবকে সামনে রেখে দুই পক্ষই নিজের নিজের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছেন।

কেরল মন্ত্রিসভার এই সংকট দেখা দেওয়ার কয়েকদিন আগেই কোচিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার ও কেরলে শ্রীঅচ্যুত মেননের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী পুরাতন কংগ্রেস সি-পি-এম-এর হাতের পুতুল হয়ে খেলছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, কেরলে যে পুরাতন কংগ্রেস সম্প্রতি সি-পি-আই-প্রভাবিত মন্ত্রিসভাকে হটাবার জন্য উৎসুক হয়েছে সে কথা তারা গোপন করে নি। শ্রীমেননের মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দিতে পারলে তারা সি-পি-এম-কে পাল্টা মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সাহায্য করবে কিনা তা আগ্রহের সংগে লক্ষ্য করার বিষয়।

সাদিক-কাশিম বিরোধ

জম্মু ও কাশ্মীরে সাদিক মন্ত্রিসভার সামনে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সেখানকার কংগ্রেসের ভিতরে একদিকে সংগঠনের নেতা মির কাশিম ও একদিকে সরকারের প্রধান গোলাম মহম্মদ সাদিকের ভিতরে দীর্ঘকালের মতান্তর ও মনান্তরের পরিণাম। কাশ্মীর বিধানসভার ৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬১ জন কংগ্রেসের এবং তাঁদের সকলেই নয়া কংগ্রেসের অনুগামী। জম্মুতে কাশ্মীর বিধানসভার অধিবেশন চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সরকার পক্ষের চীফ হুইপ গোলাম মহম্মদ মির ঘোষণা করলেন যে, তাঁকে নিয়ে বিধানসভার ৩৫ কংগ্রেস সদস্য সাদিকের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং তাঁরা দলের নতুন নেতা নির্বাচন করতে চান। অবশ্য পরে জানান হল যে, চীফ হুইপ তাঁর মত বদল করেছেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সংগেই থাকবেন। সংগে সংগে সাদিক ও কাশিম দুই নেতার দুই পক্ষের লোকরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা দল ভাঙাবার নালিশ আনতে লাগলেন। কিন্তু সাদিক স্পষ্টতই তাঁর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং বাজেটের আলোচনা মধ্যপথে বন্ধ করেই বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্ত করে দেওয়ার জন্য রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায়কে পরামর্শ দিলেন। রাজ্যপাল তাঁর সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করায় এখন কাশ্মীরের বাজেটের পরিণাম কি হবে সেই প্রশ্নটি শিকায় ঝুলেছে। (পরে জানান হয়েছে যে, কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী সেখানকার রাজ্যপাল এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য)।

যেসব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাদিক ও কাশ্মীর কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ কাশিমের ভিতর মতভেদ রয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের সস্তা দরে চাল খাওয়াবার জন্য সরকারী কোষাগার থেকে ভর্তুকী দেওয়ার প্রশ্ন।

এই ভর্তুকী বাবদ ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে রাজকোষ থেকে কাশ্মীর উপত্যকার জন্য ২৩ কোটি টাকা, জম্মু অঞ্চলের জন্য ১১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং লডাকের জন্য ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই বছর এই বাবদ সারা রাজ্যের জন্য খরচ হবে প্রায় ১১ কোটি টাকা—অর্থাৎ রাজ্যের মোট রাজস্বের এক ষষ্ঠাংশের বেশী। কাশ্মীর উপত্যকায় যেখানে স্থানীয় চালের পড়তা খরচ দাঁড়ায় প্রতি কুইন্টলে ৯৪ টাকা আর রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানী করা চালের পড়তা খরচ দাঁড়ায় প্রতি কুইন্টলে ১৩০ টাকা সেখানে শ্রীনগরের অধিবাসীদের প্রত্যেককে ৪০ টাকা কুইন্টল দরে মাসে ১১ কিলো করে এবং কাশ্মীর উপত্যকার গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি অধিবাসীকে ৬০ টাকা কুইন্টল দরে মাসে ৬ কিলো করে চাল যোগান হয়। জম্মু শহরের অধিবাসীদের প্রত্যেককে মাসে সাড়ে তিন কিলো করে ও সেখানকার গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে মাসে ছয় কিলো করে যোগাবার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রতি কুইন্টলে ভর্তুকী দিতে হয় ২৬ টাকা থেকে ৬৩ টাকা পর্যন্ত। অনুরূপভাবে আটার দরুন প্রচুর পরিমাণ ভর্তুকী দিতে হয়।

জম্মু অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশী রেশন দেওয়া হয়, তাঁদের দরুন সরকার অধিকতর ভর্তুকী দেন এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শহরবাসীদের তুলনায় বেশী দাম দিয়ে রেশন কিনে খেতে হয়, এই সব অভিযোগ এনে জনসঙ্ঘ কিছুকাল যাবৎ 'খাদ্য ভর্তুকীর ব্যাপারে সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসানের জন্য' আন্দোলন চালাচ্ছে। যদিও জনসঙ্ঘের সঙ্গে কাশ্মীরের কংগ্রেসের মতৈক্য হওয়ায় বিশেষ কোন কারণ নেই তাহলেও কতকটা বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে এই যে, কাশ্মীরে জনসঙ্ঘের এই আন্দোলন কাশ্মীর কংগ্রেসের ভিতর মির কাসিমের অনুবর্তী গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী সাদিক রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কতকগুলি রাজনৈতিক দল যে আন্দোলন চালাচ্ছে তাতে একটি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন চালান সম্ভব ছিল না। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে চলছিল কংগ্রেস দলের সদস্যদের দলত্যাগে প্রবৃত্ত করার জন্য কিছু-কিছু বিধানসভা সদস্যের চেষ্টা। এর ফলেই আমি রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করার পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়েছি।'

সিং দেওয়ের বিপদ

কেরলে যেমন সেখানকার মন্ত্রিসভাকে ফেলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে সংগঠন কংগ্রেস তেমনি উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারকে গদীচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়েছে শাসক কংগ্রেস, আর ঐ চেষ্টায় শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল হয়েছে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। উড়িষ্যা বিধানসভার আটজন সদস্য শ্রীসিং দেওয়ের মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন তুলে নিয়ে প্রগতি দল নামে একটি পৃথক দল গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মন্ত্রিসভাকে ঘিরে একটি সঙ্কটের আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। কেননা, উড়িষ্যা বিধানসভায় বিভিন্ন পার্টির বর্তমান অবস্থান যে রকম তাতে ঐ আটজনের সমর্থন হারালে ১৪০ জন সদস্যের ঐ সভায় স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশনের পিছনে মাত্র ৬৪ জনের সমর্থন থাকে।

যে আটজন প্রগতি দল গঠন করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছয়জন জন-কংগ্রেস দলের আর বাকী দুইজন স্বতন্ত্র দলের। জন-কংগ্রেস থেকে দলত্যাগী একজন—প্রাক্তন শ্রী সোনারাম সোরেন—মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার মত বদল করেছেন।

এখন শ্রীসিং দেওয়ের গদী রক্ষার একমাত্র ভরসা হচ্ছে যদি সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলান যায়। সংগঠন কংগ্রেসের নেতারাও যে সেজন্য তৈরী তা শ্রীঅশোক মেহতার সাম্প্রতিক উড়িষ্যা সফরেই বোঝা গেছে। উড়িষ্যার বিধানসভার কংগ্রেস দলের মধ্যে দুই তরফই এক সঙ্গে মিশে আছেন, কোন্ তরফে যে কতজন তাও পরিষ্কার নয়। এবার দুই তরফ ভাগ হবে এবং শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার তরফ স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশনে যোগ দেবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিং দেওয়ের এই ব্যাপারে আশান্বিত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে। উড়িষ্যায় শাসক কংগ্রেস দল রাজ্যসভার আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে শ্রীবিজু পট্টনায়ককে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল কিন্তু দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে উড়িষ্যা বিধানসভায় কংগ্রেস দলের ভিতরে শ্রীপট্টনায়কের সমর্থকরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিং দেও ও তাঁর সমর্থকরা আশা করতে পারেন যে, বিধানসভায় কংগ্রেস দল ভাঙলে এই অসন্তুষ্ট সদস্যদের অনেকে সংগঠন কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

ইতিমধ্যে খাস দিল্লীতে কল-কারখানার নোংরা জল যমুনা নদীকে দূষিত করায় দক্ষিণ দিল্লীর লক্ষ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সংবাদে

প্রকাশ পেয়েছে যে, ওখলা থেকে সরবরাহ করা জল যে দূষিত হয়ে গেছে সেকথা পৌর কর্তৃপক্ষ সময়মত দিল্লীবাসীদের জানান নি। কয়েক লক্ষ লোক কয়েকদিন ধরে এই জল যে বিষাক্ত হয়ে গেছে তা না জেনেই পান করেছেন। তারপর যখন জলে ক্লোরাইডের মাত্রা ভয়ংকর বেড়ে গেল এবং যমুনা নদীর জলে মরা মাছ ভেসে উঠতে লাগল তখন আর ব্যাপারটা চেপে রাখা গেল না। এখন প্রকাশ পেয়েছে যে, কয়েক বছর আগেই বিশেষজ্ঞরা ওখলা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশ কেন কার্যকর করা হয় নি এবং জল দূষিত হওয়ার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিকদের কেন জানিয়ে দেওয়া হয় নি সেবিষয়ে তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজধানীর কর্তৃপক্ষ মহামারী আকারে যকৃতের রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা করছেন এবং সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

আমাদের দেশে কল-কারখানার প্রসারের সঙ্গে নদীনালার জল দূষিত হওয়ার সমস্যাটি দিল্লীর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনুরূপ সমস্যার প্রতি যথেষ্ট নজর দিয়েছে। অথচ আমরা যে এখনও এই সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেসব জাতের অপরিশোধিত খনিজ তেলে সালফারের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী জাপান সেসব তেলের আমদানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। জ্বালানী তেলের ধোঁয়ায় সেদেশের বাতাস যেভাবে মলিন হয়ে যাচ্ছে সেটা আয়ত্তে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই জাপান ঐ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। আর তার ফলে ঐ ধরনের অপরিশোধিত তেলের বিশ্ব বাজার দর পড়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার আমাদের দেশের তৈল শোধনাগারের জন্য ঐ সস্তা দরের তেলই কিনে আনার চেষ্টা করছেন, আমাদের আবহাওয়া দূষিত হওয়ার কথা না ভেবেই।

প্রিন্স সিহানুকের পদচ্যুতি

কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুক প্রতি বছরই ফ্রান্সে যান। এবারও গিয়েছিলেন। মাস দুয়েক যাবৎ তিনি নিজের দেশের বাইরে আছেন। দেশে ফেরার পথে মস্কো ও পিকিং হয়ে তাঁর যাওয়ার কথা। মস্কোতেই তাঁর কাছে খবর এল, কাম্বোডিয়ার রাজকীয় পরিষদ ও জাতীয় সংসদ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন এবং জাতীয় সংসদের সভাপতি চেন হেং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ পেল যে, আসল কর্তৃত্ব রয়েছে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লন নল ও উপপ্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিসোওয়াথ সিরিক মাতাকের হাতে।

প্রিন্স সিহানুক সম্ভবত এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কেননা, কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন-এ উত্তর ভিয়েতনাম ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) দূতাবাসের হামলার খবর যখন প্যারিসে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিল তখনই তিনি বলেছিলেন যে, 'কোন কোন লোক' কাম্বোডিয়াকে 'একটি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির কোলে ঠেলে দেওয়ার' চেষ্টা করছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে, দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানের দ্বারা তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

ভিয়েতনাম ও লাওস যেমন প্রাক্তন ফরাসী ইন্দোচীনের অংশ কাম্বোডিয়াও তেমনি। লাওস ভিয়েতনাম যুদ্ধের আগুনের বাইরে থাকতে পারছে না। কাম্বোডিয়াকে সেই আগুনের বাইরে রাখার জন্য প্রিন্স সিহানুক বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজের দেশকে আমেরিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেন নি। আমেরিকার সঙ্গে কাম্বোডিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করে দিয়েছেন। ইদানীং প্রিন্স সিহানুক অল্পে-অল্পে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও বেশী জড়িয়ে না পড়ার চেষ্টা করছিলেন। গত জুন মাসে তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কাছ থেকে এই মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হন যে, আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কিছু ভিয়েতকং সৈন্য কাম্বোডিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এই প্রতিশ্রুতিও তাঁকে দিল যে, ফ্রন্টের সৈন্য বলতে কাম্বোডিয়ায় যা কিছু আছে তা তারা সরিয়ে নিয়ে যাবে। আরও সম্প্রতি প্রিন্স সিহানুক আর একটি অভূতপূর্ব আদেশ দিয়ে কম্যুনিস্টদের অসন্তোষের কারণ ঘটিয়েছেন। কূটনৈতিক সুবিধার সুযোগ নিয়ে জাল কাম্বোডিয়ান মুদ্রা আনিয়ে চীনা, উত্তর ভিয়েতনামী ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সৈন্যরা কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ঐ মুদ্রা ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করছে, এই রকম সন্দেহ করে কাম্বোডিয়ার সরকার আদেশ দিয়েছেন যে, ঐ দেশ থেকে যেসব 'ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ' বাইরে যায় বা বাইরে থেকে সেদেশে আসে সেগুলি সবই তল্লাসী করা হবে।

এই সব ব্যাপার সম্প্রতি চরমে উঠল যখন স্পষ্ট সরকারী প্রশ্রয়ে কাম্বোডিয়ার ছাত্ররা রাজধানী নম পেন শহরের রাস্তায় উত্তর ভিয়েতনামের দূতাবাস এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দূতাবাসে চড়াও হল। তাদের দাবী, কাম্বোডিয়ার মাটি থেকে তাদের সৈন্য অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে।

ছাত্রদের এই দাবীর সঙ্গে অবশ্য প্রিন্স সিহানুক কোন দ্বিমত প্রকাশ করেন নি। বরং প্যারিসে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, কাম্বোডিয়া থেকে উত্তর ভিয়েতনামের ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী যাতে সরিয়ে নেওয়া হয় সেজন্য তিনি রাশিয়া ও চীনকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করবেন।

কিন্তু তাহলে প্রিন্সকে পদচ্যুত হতে হল কেন? সম্ভবত তাঁর দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী যতটা কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি গ্রহন করতে চান প্রিন্স সিহানুক তত দূর যেতে রাজী ছিলেন না। অথবা সম্ভবত এর মধ্যে গভীরতর কোন রহস্য আছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার জন্য হয়ত আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

সম্পাদকীয়

এবার শান্তি ফিরে আসুক

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন প্রায় অনিবার্যই ছিল পশ্চিমবঙ্গে। কারণ অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের অংশীদার দলগুলোর কেউই মন্ত্রিসভা টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে দুইবার রাষ্ট্রপতির শাসন হল এবং তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। পশ্চিম বাংলার পক্ষে এটি রেকর্ড। কারণ ১৯৬৭ সালের আগে কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়নি। কোনো মন্ত্রিসভারও পতন ঘটেনি। বহুদলীয় শাসনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাষ্ট্রপতির শাসন তারই পরিণতি।

তবে রাজ্যপালের সুপারিশে বিধানসভা বাতিল করা হয়নি। তাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় জীইয়ে রাখা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রপতির শাসন অবসান। যদি কিছু সময় অতিবাহিত হলে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের হিস্যাদারদের মতিগতির পরিবর্তন হয় তাহলে আবার একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা আশ্চর্য নয়। কারণ, বিধানসভায় প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরাট। তাঁরা ইচ্ছা করে নিজেদের পায়ে কুড়োল না দিলে পাঁচ বৎসর অনায়াসে এই মন্ত্রিসভা টিঁকে থাকতে পারত। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জগজীবনপন্থী কংগ্রেসের এমন শক্তি নেই যে কোনো বিকল্প সরকার তাঁরা গঠন করেন।

কিন্তু যে তীব্র মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্ট দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তাতে আবার তাদের এক সঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বিকল্প সম্ভাবনা হল মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য শরিক দলগুলোর মন্ত্রিসভা গঠন অথবা বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য শরিক দলের মন্ত্রিসভা গঠন। প্রাক্তন ফ্রন্টের গোটা পুনরুজ্জীবনের কথা কেউ ভাবছেন না যদিও রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোনো বস্তু নেই। কিন্তু সেই পুনরুজ্জীবন কখনোই সুখকর হতে পারে না। কারণ, বাংলা কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলোর সঙ্গে মার্কসবাদীদের ভাঙন এত ব্যাপক আকারে হয়েছে যে তাকে জোড়া লাগানোর সাধ্য প্রাক্তন ফ্রন্টের কোনো দলের বা নেতার নেই বলেই মনে হয়।

গত এক বছরে ফ্রন্টের শাসনে কোনো সুসংহত ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক রূপ জনসাধারণ দেখতে পায়নি। জনকল্যাণমূলক কিছু কিছু কাজ নিশ্চয়ই এই সরকার করতে চেয়েছেন এবং সমাজের কোনো কোনো শ্রেণী তার দ্বারা উপকৃতও হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মানুষকে প্রভূত মূল্য দিতে হয়েছে। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আকারে হয়েছে দলীয় সংঘর্ষ। প্রাণহানি হয়েছে প্রচুর। অথচ তার জন্য কোনো নিন্দাবাদ ঐক্যবদ্ধভাবে ধ্বনিত হয়নি ক্ষমতাসীন দলগুলোর নেতাদের মুখ থেকে। প্রত্যেক দলই অপর দলকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে যে দলমত-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হয় তা এই দলের নেতারা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার ফলে সর্বত্র হিংসার একটা আবহাওয়া ছিল বিরাজমান। এটাই হল প্রাক্তন সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এবং মূলত এই কারণেই সরকারের পতন ঘটল।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় সর্বত্র একটা স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেছে। সকলেরই আশা, এবার সমাজজীবনে ফিরে আসবে শান্তি। কিন্তু শুধুমাত্র পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে স্থায়ী শান্তি রক্ষা সম্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমাজের পরিবর্তনের পথ হল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। রাস্তায় খুনোখুনি করে এভাবে সমাজের পরিবর্তন আনার চেষ্টা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী। যাঁরা গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাস করে না তাদের এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতি গ্রহণ করা অযৌক্তিক। পশ্চিম বাংলা সবচেয়ে দুঃখী রাজ্য। তার সমস্যার অন্ত নেই। বাংলার মানুষ বহু আশা করে যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী করে পাঠিয়েছিল ক্ষমতার আসনে। সেই আশা তাঁরা পূর্ণ করতে পারেন নি। রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী হওয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিরোধী। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত মনে হয় এই শাসন চলবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই হবে রাজ্যপালের কাজ। কারণ এই দায়িত্ব শুধু আমলা আর পুলিশের সহায়তায় পালন করাও রাজ্যপালের পক্ষে দীর্ঘদিন সম্ভব হবে না।

তবু পথ ফুরোবে না ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তবু পথ ফুরোবে না। যদিও পথের
দিশা হারাতেও পারে, হয়তো বা না।
পথ খুঁজে হয়তো আবার
ফিরে যেতে হবে, অথবা হবে না,
যাওয়া অনুচিত বলে। দুঃসাহস কার
অবশিষ্ট আছে তা দেখতেই
যাওয়া কিংবা ফেরা নয়। যদিচ চিন্তায়
অন্য কোনো পদক্ষেপ স্বাভাবিক: সমীচীনতায়
সম্ভাব্য সকল হাওয়া যমুনাপুলিনে
কান পাতে; তথাপি উজানে
রৌদ্রকরোজ্জ্বল গ্লেসিয়ারে
যেতে চায় অন্য মন—আরেক হৃদয়
উড়াল পাখায়।
এবং অপ্রতিরোধ্য বাসনায়
কুয়াশার ঘোমটা ভয় দেখায়।

জীবন, জীবিকা, প্রেম
পিছুটানে, সমুদ্রসৈকতে আনে;
জন্ম-মৃত্যু-তরঙ্গদোলায়
নাচায় সাগর;
তবু পথ ফুরোয় না: মনে পড়ে
গৃহ, ভূমি, পরিবেশ
পরিচিত বিক্ষুব্ধ শহর;
এবং সামনে, পিছে, চারিদিকে
অগণিত চেনামুখ
অম্লান অজস্র স্বাক্ষর।

কখন কবিতা ॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ নয় শুধু শব্দের আঁকিবুকি
শরতের ছেঁড়া মেঘে লেখা বিস্ময়ের পাণ্ডুলিপি
ইতস্তত ছড়ান ছবি
খেয়াল খুশির হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া
সপ্তডিঙা মধুকরী ময়ূরপঙ্খী না

এ নয় শুধু কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান
না বলা কথার অনেকখানি অবকাশ
যোজন পথের দূরে
বলার অধিক কিছু বলতে পারা যেন

কিন্তু তুমি তো জান না
বাঁধের ফাটল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল
মনের নাবাল ভূমিতে কখন নামে ঢল
শব্দ জোয়ারের জল
কখন প্লাবন সৃষ্টির উৎসব
ফুলের মরশুম কাল
রক্তের ভিতরে নাচে দ্রিমদ্রিম মাদলের তাল

কখন ভ্রূণের বুকে জাগে প্রাণ
সূর্যবীজ উদ্গত অঙ্কুর
মমতায় চোখ মেলে পাখির শাবক
তুমি তো জান না
হৃদয় কখন রজস্বলা করুণায় আর্দ্র হয়
অলক্ষ্যে কখন বুকের ভিতরে রেখে হাত
তুলে আনতে হয় গোপন কথার মালা
ব্যথার রক্তিম গোলাপ

নিজেকে একান্তে ভেঙে ভেঙে
ভেঙে ভেঙে কখন কবিতা।

কথা ছিল ॥

জয়ন্তী রায়

কথা ছিল—অফুরান গান হবে তুমি,
নদীর মতন সুখ ছড়াবে দু'হাতে—
সম্পদে সহায়ে।
অনেক ধানের বীজ বোনা হবে—
এবং অনেক মাঠ ভরে দেবে শস্যে ও শ্যামলে।
ফেনিল বাতাসে গলাগলি
কচি চারাগুলি
শোনাবে স্বর্গের গান।
কথা ছিল—স্বর্গ তুমি এনে দেবে
এই মাঠে এবং মাটিতে।
সেই সুরে, স্বপ্নে আমি মগ্ন শুধু :

চেয়েও দেখিনি—
এতদিনে সেই মাটি একই আছে কিনা;
চেয়েও দেখিনি—
সেই মাঠে অনায়াসে বীজ বোনা
আজ আর সম্ভব কিনা।
এখনও স্বপ্নের ঢেউ
আমার শরীরে লাগে :
এখনও আমার কাছে
নদীর ঢেউ-এর গান অফুরান।
এখনও আমার কাছে মাঠের সম্পদ
মায়ের মতন স্নেহে অবিকল আছে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

চোঙা পেন্টেলুন পরাটাকে কিছু খারাপ কাজ বলা চলে না। বড়জোর এটুকু বলতে পারি যে দৈবাৎ যদি চোঙা পেন্টেলুনে আগুন ধরে যায়, তা হলে চট্ করে ছেড়ে ফেলা যাবে না। তার ফলে পেন্টেলুনধারী তরুণ বিস্তর ঝলসে যেতে পারে। তাতে তাকেই বেশ কিছুটা দুঃখ কষ্ট সইতে হতে পারে, কিন্তু সমাজের কোনো ক্ষতি হবে না। সরু মুখ জুতোর বেলাতেও আমার ঐ একই বক্তব্য। জুতোধারীর আঙুলে চিপ-কোলে সমাজের কি এসে যায়? তাছাড়া রং-চঙে মজাদার নকসাওয়ালা কামিজ পরতে দোষ কি? সমস্ত প্রাণী জগত জুড়ে সব পুরুষেরাই রং-চঙে বেশ ধরে, পেখম তুলে নাচে। মানুষের বেলাই বা সেটা অস্বাভাবিক হবে কেন? উদ্দেশ্যও হয়তো এক-ই। যথা, মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সাজ-পোশাক দিয়ে এ বেচারারা সমাজের কোনো ক্ষতি করে না। আর মেয়েদের কথাই যদি ধরা যায়, আবহমান কাল থেকেই আমাদের দেশের মেয়েরা নেই-জামা কিম্বা হ্রস্ব জামা গায়ে দিয়েছে। এতদিন পরে তাই নিয়ে আপত্তি করাটা হাস্যকর।

আসল কথা হল এতাবৎকাল একটা আড়ষ্ট ভিকটোরীয় নীতিবোধ আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এখন তাতে চিড় ধরেছে। যে-সব ভিকটোরীয় নিয়ম-কানুনকে তাদের জন্মস্থান অনেক দিন আগেই বাতিল করে দিয়ে ছিল, আমরা এতদিন সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে রেখে-ছিলাম। এখন আমাদের মুঠোর মধ্যেই তারা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়েছে বলে, আমাদের আক্ষেপের আর অন্ত নেই। বাইরের এই খুঁটিনাটিগুলোকে আমরা যতটা মূল্যবান মনে করে এসেছি, আসলে তারা ততটা নয়।

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সমাজ দুর্নীতিতে ভরে গেল বলে যাঁদের এত দুঃখ, তাঁরা যদি শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" বইটি মন দিয়ে পড়ে দেখেন, তা হলেই বুঝবেন সামাজিক দুর্নীতি কিছু আজকের ছেলে নয়। একটা বলিষ্ঠ জীবন লাভ করতে হলে যে-ভাবে গড়ে ওঠা দরকার, আমাদের সমাজ সে ভাবে গড়ে ওঠে নি। কোনো দিনই গড়ে ওঠে নি সেই আদিকালের হিন্দু সভ্যতার সময় ছাড়া। তার একটুখানি উন্মেষ হয়েছিল।

যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের জোরে উনবিংশ শতাব্দীতে দেশী সমাজের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া তাঁদের মধ্যে আর সকলেই একটা নব্য প্রতীচ্য আদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। সে আদর্শ আমাদের সমাজে সহজে অঙ্গীভূত হয়ও নি, হতে পারেও না, কারণ আমাদের এই না খাওয়া, নেংটি পরা মুখ্যু দেশ-বাসীদের জন্য সে সব নিয়ম তৈরী হয় নি। এমন কি উজ্জ্বল অনন্য পুরুষ রামমোহন রায়ের বাণীও শতকরা পঁচাশীজন ভারত-বাসীর কানের কাছেও পৌঁছয় নি। আজ পর্যন্ত পৌঁছয় নি, এবং কোনো কালেও পৌঁছবে না।

সমাজের এই খসে-পড়া, ধ্বসে-পড়া তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে এতকাল সেটা ধরা পড়ে নি, কারণ ঐ না পাওয়াদের এতকাল মুখ খুলবার সাহস হয় নি। এখন অর্থনীতিক ও রাজনীতিক কারণে সেই সাহস হয়েছে। তার ধরণটা আমি আদৌ সমর্থন করছি না, কারণ অনুসন্ধান করছি, এইমাত্র।

সামাজিক জীবনের ওঠা-পড়া কার্য-কারণ সূত্রে অবদ্ধ। আজকের দুর্দশার বীজ গত কালের সামাজিক সৌষ্ঠবের কোলেই লুকনো ছিল, এইরকম আমার মনে হয়। ভেড়ারা এতদিন বাদে যদি বা মানুষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু, খ্যাপা মানুষ দিয়ে কি হবে?

যা কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য, মলিন হাতে তার গায়ে কাদা মাখালে লাভ কিছুই হয় না, বরং ক্ষতি হয় অনেক। শুনি আজকের ছেলেমেয়েরা কোনো রকম নিয়ম বা সংযম মনে চলতে চায় না। জোরজার করে নিজেদের ইচ্ছা বজায় রাখার চেষ্টা করে। যার যত দল, তার তত প্রতিপত্তি। ভালো মন্দর বিচার নেই। কাউকে সম্মান দিতে হলে এরা নিজে-দের ছোট করা হল বলে মনে করে ইত্যাদি। কিন্তু যখন নিজেদের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাই, বন্ধুবান্ধবদের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাই, কই তাদের তো সে রকম মনে হয় না। আলাদা আলাদা ভাবে যারা ভদ্র দলবদ্ধ হলেই তারা অভদ্র হবে কেন? এর মধ্যে আমাদের মতো প্রৌঢ়দেরও কোনো দায়িত্ব নেই কি?

রোগটা হয়তো এক তরফের নয়। এদের হয়তো ধারণা হয়েছে যে ভালোভাবে চাইলে কিছু পাওয়া যায় না। এবং সত্যিই যায় না হয়তো অনেক সময়। আমাদের একটি নাম-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি নিজে কয়েক বছর আগে যে রকম অভদ্র ব্যবহার পেয়ে ছিলাম, তাতে এদের এই যুক্তিকে একেবারে অচল বলে ফেলে দেওয়াও চলে না। এ সব-ও কারণ, এর-ও প্রতিকার দরকার।

যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তার ওষুধও পাওয়া যায়। তাই আমি আজকের সমাজ সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হতে পারি না। হতাশার কারণ অন্য জায়গায়। কোথায় সেই সব বলিষ্ঠ নির্ভীক নেতারা যারা ভালোকে ভালো বলতে, মন্দকে মন্দ বলতে দ্বিধা করবে না? তারা দেখা না দিলে এই উদ্দাম উন্মাদ অসহিষ্ণু উচ্ছৃঙ্খল দুঃশীল যুব-শক্তিকে কে সংযত সংহত করে দেশের দুর্দশা ঘুচোবে? বিদেশের সব চাইতে দুর্বৃত্ত শক্তির মোহ কে দূর করবে? তার বদলে একটা সুস্থ বলিষ্ঠ প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয় কে এনে দেবে? একজনও নিঃস্বার্থ, সদাশয়, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ নেতা দেখতে পাচ্ছি না বলে হতাশ হচ্ছি। তেইশ বছরের স্বাধীনতার পরেও যদি দেশের শতকরা পঁচাশীজন লোক খেতে পায় না, পরতে পায় না, অসুখের চিকিৎসা পায় না, বুড়ো বয়সের আশ্রয় পায় না, শিক্ষা পায় না, তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারানো খুব আশ্চর্য নয়। আরো দুঃখের কথা আছে, যারা শিক্ষা পাবার সুযোগ পেয়েছে, তারা যদি সেই বিদ্যা প্রয়োগ করবার সুযোগ না পায়, এই যদি পুরনো নিয়মের পরিণাম হয়, সে নিয়মকে কেনই বা তারা মেনে চলবে? আজকের সমাজের উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খলতার আর ধ্বংস-পরায়ণ নির্মমতার পিছনে বোধ হয় এই ধরণের একটা কথা আছে। তবে সব চেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হল যে যাদের নিজেদের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তারা দেশীই হক, বা বিদেশীই হক, এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিতে ছাড়ছে না। উন্মাদ ছেলেমেয়েগুলো তো আর তাদের নয়, তারা আমাদের ছেলেমেয়ে, আমাদের নাতি-নাতনি। এদের জীবন নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের জীবনেরও কোনো অর্থ থাকবে না। উদার বলিষ্ঠ নেতারা, তোমাদের প্রচণ্ডতা নিয়ে এসো! যাবার আগে একবার দেখে যাই।

লীলা মজুমদার

পাঠক সজ্জন ও সম্পাদক সমীপেষু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যে মধ্যে পাঠকজনের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে। যাঁরা নবীন কবি যশোপ্রার্থী তাঁরা জানতে চান কি রীতি আমার লেখার? আগে থেকেই একটি গল্প কল্পনা করে নিয়ে বা বাস্তবজীবন থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে তবে শুরু করি অথবা একটা ঘটনা ধরে শুরু করে দি, তার জাল বোনার মত বুনেই যাই ছাঁদে ছাঁদে গিঁঠ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলি? এসব প্রশ্ন তাঁরা সরাসরি করেন আবার তাঁদের মুখপাত্র হয়ে করে থাকেন। ঘটনাগুলো সত্য অথবা কল্পনা? মানুষগুলি দেখা মানুষ বা আপনার মনে মনে তৈরী করা? আপনার সাহিত্যে অনেকে ইজ্‌মের গন্ধ পান। সুতরাং তত্ত্বকে আগে মনের মধ্যে নিয়ে তারপর ঘটনাকে তার অনুরূপ করে নেন অথবা গল্প বলতে গিয়ে তত্ত্বতে পরিণত করেন?

এমনি হাজারো প্রশ্ন। এর মধ্যে আরও ছেলেমানুষি প্রশ্ন থাকে। কখন লেখেন? কতক্ষণ লেখেন? এমন কি কতগুলো সিগারেট খান, কি নস্য নেন, কতটা এ প্রশ্নও করেন। শুধু পাঠকেরাই পত্রযোগে প্রশ্ন পাঠান না, সাময়িক পত্রিকার প্রতিনিধিরা এসেও প্রশ্নগুলি সামনে ধরে তার উত্তর চেয়ে থাকেন।

সংসারে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে যারা উপরের দিকে তাকান, যাঁরা উপরে উঠবেন, তাঁরা যখন দেখেন পাহাড়ের উপরে কেউ কেউ উঠেছেন আরও উঠবেন, তাঁদের ডেকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন—কোন পথে উঠলেন? একটু বলে দেবেন?

ছেলেবেলায় যারা প্রতিমা গড়ে তাদের প্রতিমাগড়া দেখতাম বসে বসে। কাঁচা মাটি নিয়ে নিজেরা গড়তে যেতাম কিন্তু পারতাম না গড়তে। যদি বা হঠাৎ এক সময়ে নাকমুখ চোখওয়ালা একটা কিছু গড়ে উঠত কোন রকমে তা হলে দেখতাম সেটা শিব হয় নি বা ঠাকুর হয় নি—সেটা হয়েছে ভূত বা প্রেত বা অলৌকিক কিছু। যা এমন অলৌকিক যে এর আগের কোন অলৌকিক কল্পনার সংগে তার কোন মিল নেই। সুতরাং পাঠক-মনে প্রশ্ন জাগে এই কি, যে রচনার জগতের কোন একটি অজ্ঞাত লোক আছে, সে লোকে পৌঁছুনোর হয়তো বা কোন মন্ত্র আছে অথবা কোন একটি চাবীকাঠি আছে যার জোরে ওই দেশে একদা লেখক প্রবেশ করেন এবং তীর্থফলের মত পুণ্যফলে মাটির পুতুলকে জীবন্ত করে তোলেন বা মাটির ঠাকুরকে সত্যকারের দেবী প্রতিমায় পরিণত করতে পারেন! অন্ধকার রাত্রি—যে রাত্রির বাসা মানুষের মনের মধ্যে, সে অন্ধকার রাত্রে যে জন তুলি দিয়ে সকালে সূর্যোদয়ের ছবি এঁকে সত্যিকারের দিন এনে দেয়—তাকে জিজ্ঞাসা তো নিশ্চয় করবে মানুষ, কোন রংয়ে তুমি ছবি আঁকো যে রংয়ের মধ্য থেকে শুধু রং নয় রংয়ের আলোও ফুটে বের হয়।

এ প্রশ্ন পাঠকের, এ প্রশ্ন সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের। এ প্রশ্ন সমালোচক এবং বিশ্লেষণ করেন যাঁরা তাঁদের, অনেক জনের।

মহাকবির জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত সেই এক আশ্চর্য প্রভাবের কথা মনে পড়ে—যেদিন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে একটি যবনিকা আশ্চর্যভাবে উঠে গিয়েছিল এবং যবনিকার ওপারে যে একটি দিব্যালোকের প্রকাশ পড়েছিল সমগ্র বিশ্বসংসার এমনকি নিজের চিত্তলোকের উপর—তাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল—মর্ত্যলোকের মধ্যেই অমর্ত্যলোক বা অমৃতলোক। কিন্তু সে তো সবার ভাগ্যে হয় না। কবে কখন যে কয়েক ঝলক আলো এসে আমাদের জীবনকে একটুখানি আভাস দিয়ে যায়—তার হিসেব তো আমাদের থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন তো থামে না।

উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে ছেলে-বেলায় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের অনুবাদ করা একটি জাপানী গল্প পড়েছিলাম।

গল্পটি এক নবীন চিত্রকরের বিচিত্র জীবনসাধনা নিয়ে লেখা। জাপানের চিত্র-জগতে আলোড়ন পড়ে গেল। নতুন ছবি এসেছে। নবীন আগন্তুকের নতুন ছবি। যার দীপ্তির কাছে প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত চিত্রকরদের ছবিগুলি যেন নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে গেল। মানুষের মনোহরণ করে নিলে এই নতুন ছবির রংয়ের বিন্যাস ও দীপ্তি। মানুষেরা এই নবীন আগন্তুককে নিয়ে তাদের উল্লাস ও আনন্দ দিয়ে সমারোহ করাতে মেতে উঠল।

ছবিগুলি নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। তার সে স্বকীয়তা সব থেকে বেশী প্রকাশ পেয়েছে বর্ণসমাবেশ ও ওই বর্ণের দীপ্তির মধ্যে। ওই যে আগে বলেছি—রংয়ের মধ্যে যখন আলো জ্বলে তখন রং হয় সূর্যের সপ্তরশ্মির মত রশ্মি। এই চিত্রকরের ছবির মধ্যে লালরংয়েরই বিন্যাস বেশী ও এই রংটিই থাকে কেন্দ্রস্থলে এবং এই লাল রং যেন আগুনের দীপ্তিতে জ্বলে। আরও বিশেষত্ব হল এই যে, দিনে দিনে যত দিন গত হয় তত এই লাল রং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। এমন দীপ্তিতে লাল রং ফলাতে আর কেউ কখনও পারে নি।

দেশের চিত্রকরেরা মুগ্ধ হলেন—তাঁকে স্বীকার করলেন, একবাক্যে প্রশংসাও করলেন এবং একদিন সকলে এসে তাকে সমাদর করে প্রশ্ন করলেন—নবীন শিল্পী, বলতো এই লাল রং তুমি কোথায় পেলে? কি থেকে সৃষ্টি কর এই দীপ্তির?

নবীন শিল্পীরও বিনয়ের অভাব ছিল না, সকলের কাছে বিনতচিত্তে সাধুবাদ গ্রহণ করলে কিন্তু কোন উত্তর দিল না; অর্থাৎ রং সম্পর্কে। শুধু একটু হাসল। সে নীরব হাসির মধ্যে অবজ্ঞা থাক বা না-থাক কিছুটা অবিনয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই কারণ সকলেই তার সে নীরব হাসিতে সূচাগ্র স্পর্শের অনুভূতি অনুভব করলেন। তাঁরা গম্ভীরভাবেই ফিরে গেলেন। দেশে সমাজে নবীন চিত্রকরের খ্যাতি যাই বা যেমনই হোক—তার সংগে দাম্ভিক বলেও রটনা রটল। তাতেও নবীন চিত্রকর কোন প্রতিবাদ করলে না—শুধু আবার একবার নীরবে হাসলে। তার ঠোঁট দুটি যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল—সেই ফ্যাকাসে ঠোঁটের রেখায় ধরে রাখা হাসির টুকরোটি বিষণ্ণ এবং ম্লান দেখালো।

এরপর একদা অকস্মাৎ এই তরুণ চিত্রকর অকালে নিতান্ত নবীন বয়সেই মারা গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তের দল ছুটে এল; কিন্তু সর্বাগ্রে ছুটে এলেন দেশের চিত্রকর সমাজ। তাঁরা এসেছেন সেই লাল রংয়ের সন্ধানে—সেই আশ্চর্য লাল রং। যা দিনে দিনে মলিন হয় না উজ্জ্বলতর হয়। যা শুধুই রক্তসার লাল রং নয়—যার মধ্যে আলো আছে।

তাঁরা তার রংয়ের সাজ-সরঞ্জাম, ভাণ্ডার খুঁজলেন। কোথায় সেই আশ্চর্য লাল রং? কোথাও তাঁরা পেলেন না। অবশেষে সন্ধান মিলল—চিত্রকরের বুকের উপর মিলল কতক-গুলি ক্ষতচিহ্ন।

রূপকের মধ্যে এ এক আশ্চর্য উত্তর। বুক চিরে রক্ত নিয়ে সেই রক্ত থেকে সে লাল রং তৈরী করত। বুকের রক্ত দিয়ে ছবি আঁকত।

এটা কোন রীতি নয় কারণ কোন নিয়ম বা পদ্ধতিতে বুকের রক্ত দিয়ে ছবি আঁকাও যায় না—লেখাও যায় না।

উক্তিটার প্রতিকথার অর্থ করে যদি কেউ সত্যই বুকের রক্ত দিয়ে ছবি আঁকে তবে

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই লাল আভা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এক কালো কুশ্রীতায় শিল্পীর সমস্ত প্রচেষ্টাই বাস্তবতার নিয়মধর্মে কালো হয়ে যাবে। রক্তের রং মানুষের দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে যতই গাঢ় উজ্জ্বল লাল হোক, এবং উত্তপ্ত হোক, রক্ত যখন দেহ থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বাতাস এবং আলোর উত্তাপের সংস্পর্শে আসে তখন সে কালো হয়ে আসে। জমে গিয়ে বিকৃত গন্ধের কথা থাক বাদ দিলাম। তার বিষাক্ত হবার সম্ভাবনার কথাও থাক।

তবুও মূল ভাব-সত্যকে এই বাস্তব-সত্য স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে ভাব-সত্য চিরন্তন গৌরবে অধিষ্ঠিত। বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা ছবি, তৈরী রক্ত সে এক আশ্চর্য বস্তু এবং এই ছবি আঁকাও, শিল্প-বিজ্ঞানের সকল নিয়ম এবং সকল প্রকার শিল্প, রীতি ও পদ্ধতির ব্যাকরণের ও প্রকরণের এলাকার নাগালের বাইরের কথা বা বাইরের এক আশ্চর্য সত্য। এ যে পারে সেই পারে; আরও আছে—যে পারে সেও বলতে পারে না কেমন করে পারে এবং নিজে পারে বলে সে এ কলা বা কৌশল বা এই পারা অপর কাউকে শেখাতেও পারে না।

তথাপি প্রশ্নের অন্ত নেই। এ উত্তরেও মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। শুধু কি অপর মানুষেরা? নিজে লেখক? লেখকও কি এই প্রশ্ন প্রকারান্তরে নিজেকে করেন না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিপালন বা রীতিপদ্ধতি পালনের মধ্যে কি এই প্রশ্ন করার প্রমাণ নেই?

যেমন ধরা যাক কলমের কথা।

যে কলমটিতে অত্যন্ত সার্থক একটি লেখা লেখেন লেখক—সেই কলমটিকেই তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতে চান না? লেখার কলম- ফাইল—টেবিল চেয়ার নানান জিনিস নিয়ে এ প্রশ্নের পরিচয় মেলে বলেই আমার বিশ্বাস।

কোন একটি কলম হারিয়ে গেলে লেখক নতুন কলম কিনেও মনে মনে জোর পান না।

এ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মনুষ্য-জন্মে সার্থকতার দিব্যলোকের বন্ধ দ্বারের চাবী খোঁজাই জীবনের নিয়ম। সোনার-কাঠিতে তার বিশ্বাস বিচিত্রভাবে আজও তার মনে বাসা বেঁধে আছে।

তবুও নিয়মের এবং রীতিপদ্ধতির একটা দাম আছে। এবং একটি মানুষ কি কি ভাবে ও কোন পথে সাধনা করে সার্থক হলেন এ জেনে একটা পরম তৃপ্তি আছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সুরের খাত বেয়ে ভাবের স্রোতের মত। বা সুরের শঙ্খধ্বনির পিছন পিছন গঙ্গার ধারার মত। সর্বপ্রথম সুর মনে এবং কণ্ঠে গুঞ্জন করে উঠত; একটি স্বরলিপির বারি-বাহিনী পথ তৈরী হয়ে যেত—সেই বারি-বাহিনী পথে ব্রহ্মার মত তাঁর কবিচিত্ত কমণ্ডলু থেকে ভাবের সুরধুনিকে মুক্ত করে দিতেন। শোনা যায়, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে শান্তিনিকেতনের লাল-মাটির জনহীন প্রান্তরে উতলা উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে একেবারে একলা হন হন করে চলেছেন তাঁর সকল গানের কাণ্ডারী ও সকল সুরের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথের বাড়ীর দিকে।

স্মৃতির ভাণ্ডারে মজুত রেখে এসে নিশ্চিন্ত হবেন। রবীন্দ্রনাথ শিবের মত কবি স্রষ্টা। সুরের পথ ধরে তাঁর গানের তরঙ্গিনী-প্রবাহিনী হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত কাজী নজরুল এঁদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম ঠিক একই নিয়ম কিনা জানি না। তবে গান আগে সুর পরে এমন হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপন্যাস বা গল্পের ক্ষেত্রে কোন একটি তত্ত্ব বা বিশেষ বক্তব্য আগে মনে আসে এবং তারই মত করে নিয়ে ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করে লিখে থাকেন অনেকে, আবার অনেকে লেখেন কোন একটি ঘটনাকে ধরে বা কোন একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে।

ইয়োরোপের অনেক লেখকের অথরস নোটবুক থাকে শুনেছি। সারা পৃথিবী এঁরা লেখার উপাদান খুঁজে বেড়ান—প্রতিটি মুহূর্ত তাঁদের এই সাধনায় নিয়োজিত। এঁদের অথরস নোটবুক এক আশ্চর্য সম্পদ। আমাদের দেশে এর রেওয়াজ এতদিনে হয়েছে। এর পর প্রশ্ন করেন এবং এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কবিতা গান গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ পড়াশুনার প্রয়োজন আছে কি না এবং করেন কি না?

নায়ক চিকিৎসক। তার জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়বার প্রয়োজন আছে বা নেই? কারণ অচিকিৎসক লেখক তো চিকিৎসকের জীবন নিয়ে অনেক বই লিখেছেন।

ড্রাইভারের জীবন নিয়ে লিখবেন—তার জন্য ড্রাইভিং শিখতে হবে?

প্রশ্ন এ ছাড়াও অনেক অনেক আছে।

মহাকবি কালিদাসের জীবনের গল্প স্মরণ করলেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর ওই বিস্ময়কর সৃষ্টি রসসাগরের রসধারা পান করতে করতে কত বিস্ময় মানুষ অনুভব করেছে এবং তার কোন নিরাকরণ করতে না-পেরে কি একটি বিচিত্র গল্প সৃষ্টি করেছিল এবং বিচিত্রভাবে সেই গল্প আজও মানুষেরা বিশ্বাস না-করে উপভোগ করে তৃপ্তি পায়।

গাছে চড়ে, একটি ডালে বসে, সেই ডালটিকে পরমানন্দে তন্ময় হয়ে কাটছিল যে মহামূর্খ, সেই মহামূর্খকেই মানুষেরা এই সাহিত্য-রসসাগরের স্রষ্টা হিসেবে খাড়া করেছে। এই মহামূর্খ আত্মহত্যার জন্য বিষ-কুণ্ড বলে কথিত কোন কুণ্ডের জল পান করলেন কিন্তু তাঁর এতে মৃত্যু হল না, তার পরিবর্তে হলেন মহাকবি; কারণ এই বিষ-কুণ্ড বলে কথিত কুণ্ডটি আসলে বিষকুণ্ড ছিল না, ওটি ছিল দেবী সরস্বতীর—বীণাপাণির করুণা-কুণ্ড।

অর্থাৎ 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিং'—আর কি।

স্কুলভীত রবীন্দ্রনাথ এবং পলাতক ছেলে কেরাণী-জীবনে নিয়োজিত শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও এমনি গল্প রচিত হত যদি এ-কালটা না-হয়ে সে-কাল হত। এ-কালের বাস্তবতা নিষ্ঠা ও অলৌকিকে বিশ্বাসভঙ্গই এমন গল্প তৈরী হতে দেয় নি। তবুও প্রশ্নের অতি সূক্ষ্ম অবশেষটুকু থেকেই গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম ছাত্র তো ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে কম হন নি, তাঁরা থাকতে এমন কালজয়ী রচনার স্রষ্টা এঁরা হলেন কি করে?

রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের তপস্যার কথা সুবিদিত। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান-জাহ্নবীর উৎস-স্থল অলকানন্দা থেকে সমতলভূমে গঙ্গাধারায় সাগরসঙ্গম মহাতীর্থ পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন, এই বারিই তিনি পান করেছেন—অবগাহন করেছেন, এই তরঙ্গশীকর স্নিগ্ধ বাতাসেই তিনি নিশ্বাস নিয়েছেন, তাঁর জীবনের সকল সবুজ খাদ্য এই জলেই পরিপক্ব হয়েছে। তবে এ জ্ঞানার্জনের পথে তিনি নিজেই নিজের গুরু।

প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র।

*　　*　　*

জীবনে তবুও প্রশ্ন আসে। আমাদের জীবনেও আসে। চিঠিতে আসে সম্পাদকের মারফতে আসে। সেই সূত্র ধরেই, এবার

আমার ক্ষুদ্র লেখকজীবনের কয়েকটি কথা বলব। গল্পের মত করেই বলি। এর মধ্য থেকেই সন্ধানী যাঁরা তাঁরা প্রশ্নের উত্তর বের করে নেবেন।

নিতান্ত বাল্যকালেই দেশকে ভালবেসেছিলাম। একালে দেশকে ভালবাসা সাধারণ ঘটনা। সাতষট্টি বছর আগে কিন্তু সাধারণ ঘটনা ছিল না। দেশ আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যে যে ভালবাসা আছে সে ভালবাসা নয়—রাজনৈতিক পথে ভালবাসা। সে কালে বন্দেমাতরম বলার মধ্যে সে ভালবাসা প্রকাশ পেত। আমার মা আমাকে দেশকে চিনিয়েছিলেন এবং ভালবাসতেও বলেছিলেন। লিখতেও তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। সকল জনের মায়েরাই ছেলেকে কবিতার সুর ছন্দ ছড়ার মধ্য দিয়ে শেখান। সেই শিখেই সকল ছেলেই বোধ করি ছেলেবয়সে কথায় কথায় মিলিয়ে ছড়া বাঁধে। ছড়া কবিতা হয়। যার গলায় সুর আছে মনের মধ্যে গান আছে, সে তার গানের তরী সুরের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। মা তাকে শেখান—খোকন আমার সোনা, সেঁকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা। খোকন—বোবা খোকন কান পেতে শুনে ছন্দ শেখে মিল শেখে সুর শেখে।

বড় হয়ে এই খোকনই কথার সঙ্গে কথা মেলায়; কোন ভাবকে প্রকাশ করে; তারপর গলায় সুর থাকলে তাকে গান করে তোলে। ছেলেবেলায় এ থেকেই কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। পুজোর সময়ের কবিতা। প্রথম কবিতা—"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল, তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।" প্রতি বৎসরই লিখেছি—ছাপানো হয়েছে—তারপর বড় হয়ে লিখেছি—"মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ জননী ধরি পায় ধরো না-ধরো না।" এর মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ ছিল বলে ছাপানো হয় নি। একটা লাইন ছিল—"দেবতা অসুরে বেধেছে রণ মাগো, এখনও ঘুমঘোরে ঘুমায়ে থেকো না।" এ সবের মধ্যে লেখার চেষ্টা ছিল, কিন্তু সে-চেষ্টাকে এই লেখক-জীবনের সঙ্গে যুক্ত না-করাই ভালো বলে মনে করি।

মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন 'মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম'। সেটা তাঁর পক্ষে বিনয়। আমার সে কালকে স্মরণ করে মনে করতে পারি যে, তখন লেখক হবার বাসনা ছিল, কিন্তু বিনয় ছিল না। সুতরাং সে কালের কথাও বাদ দেব।

এর পর নাটক লিখেছি। সেও লিখেছি আমাদের গ্রামে ভাল এ্যামেচার থিয়েটার ছিল এবং আমার পূর্ববর্তী দু তিনজন নাট্যকার ছিলেন। একজন ছিলেন—নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁদের দৃষ্টান্তে লিখেছি। নাটক ভাল হয়েছিল। কিন্তু সে লেখার সময়ের কথাও বাদ দেব। কারণ তখন জীবনের উদ্যম বা সাধনা নানা খাতে বইছে। বিষয়কর্ম করি, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধ্বজা তুলে ঘুরে বেড়াই, থিয়েটারের পালা এলে নাটকের মহলা নিয়ে মেতে থাকি, কলেরা বসন্ত হলে সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাজ করি অর্থাৎ বেগার খাটি। প্রশংসা কুড়ুই। এরই মধ্যে কোন বিয়ের প্রীতি উপহার লিখি, পুজোর কবিতা লিখি। নতুন নাটক ধরি কিছুদূর লিখতে লিখতে কাজের ডাক আসে, সে লেখা পড়ে থাকে, সেই ডাকে চলে যাই। সুতরাং লেখা সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তরই সে জীবনে খুঁজে মেলে না।

এর পরই এল গল্প লেখার যুগ। তার ভূমিকাটি হল এইরকম—আমাদের গ্রাম থেকে পূর্ণিমা বলে একখানি মাসিকপত্র বের করেছিলেন স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি হয়েছিলাম অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক; তারই দায়ে গল্প লেখায় হাত দিলাম। গল্প লিখলাম—ছাপা হল কিন্তু ঠিক যেন হল না। মাটি দিয়ে গড়লাম, পুতুল হল কিন্তু সে পুতুল কথা কইল না। এরই মধ্যে অকস্মাৎ এক বৈষ্ণবের আখড়া এবং একটি বৈষ্ণবীকে দেখলাম। গ্রামখানি আমাদের মহাল ছিল, বৈষ্ণবীকেও চিনতাম, নাম ছিল কমলিনী বৈষ্ণবী। কিন্তু সেবার যেন তাকে দেখলাম নতুন করে। আমি গিয়ে সেবার সদ্য পৌঁচেছি—হাত পা মুখ ধুচ্ছি এমন সময় কমলিনী এল; কপালে তিলক, নাকে রসকলি, গলায় তুলসী কাঠের মালা, পরনে ক্ষারে কাচা মোটা কাপড়, মাথায় অল্প ঘোমটা, এসে প্রণাম করে বললে—রাজবাড়ীর কুশল প্রভু? রাণীমা ভাল আছেন? ছেলেরা ভাল আছে? বড় মা (অর্থাৎ আমার মা) ভাল আছেন? প্রণাম করে সে একখানি ঝকঝকে মাজা ছোট্ট রেকাবীতে কয়েকটি বড় এলাচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি এবং দুটি পান নামিয়ে দিলে। এর পর আমি কাছারী বাড়ীর ভিতরের ঘরে গেছি—তখন শুনলাম গমস্তা রসিকতা করে বলছে—'বোষ্টুমীর পানের চেয়ে কথা মিষ্টি হাসি মিষ্টি।' শুনলাম বষ্টুমী বললে—'বোষ্টুমীর ওই তো সম্বল প্রভু।' মনে চমক লেগে গেল। যেন জীবনের সেই আলিবাবার গুহা খুলে গেল, আমি প্রবেশ করলাম আশ্চর্য ঐশ্বর্যপূর্ণ গুহার অভ্যন্তরে। কমলিনী বৈষ্ণবীকে জানতে চেষ্টা করলাম। বললাম—বোষ্টুমী তোমাদের আখড়া দেখব—তোমাদের গান শুনব। আর পান দিয়ে যেয়ো। পান ভারী ভাল লাগল। হৃদ্যতার মধ্যে কমলিনীর জীবন জানলাম। দেখলাম একই যমুনা নদী যখন হিমালয় থেকে বেরিয়েছে তখন তার এক রূপ, আবার যখন ব্রজপুরের তটবাহিনী সে তখন তার আর এক রূপ—কিন্তু তবু সে সেই একই যমুনা নদী। দিল্লীর তটপ্রান্তে যমুনার আর এক রূপ, কিন্তু সেও সেই এক যমুনা—সে পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগর মুখে চলার পথে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। কমলিনীকে নিয়ে দুটি গল্প লিখলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজেই, যে, এর মধ্যে যেন মাটির পুতুল জেগে উঠেছে। কথা কয়েছে। চোখ মেলেছে। এর আগে দুটি গল্প পড়েছিলাম, একটি শৈলজানন্দের একটি প্রেমেন্দ্রের। আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। মনে হল তার থেকে খারাপ হয় নি। আমার দুটি গল্পের প্রথম গল্প রসকলি। দ্বিতীয় গল্প—রাইকমল।

রসকলি প্রকাশিত হতেই খ্যাতি পেলাম। লেখা আমাকে টানলে। আমি লেখার জন্য সময় করতে বাধ্য হলাম। এর পরই ১৯৩০ এর আন্দোলনে জেল গেলাম। জেল যাবার পথে দেখলাম একজন পিঙ্গল গৌরবর্ণ রুক্ষ রূঢ় মানুষকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলেছে সিউড়ি। তার সর্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন, কালো দাঁড়ার দাগের মত ফুটে উঠেছে; কপালে [illegible] একটা ক্ষতচিহ্ন। আবোল তাবোল [illegible] বকছে পাগলের মত। নাম শুনলাম কা[illegible] কামার। শুনলাম বাসিনী বলে একটি মেয়ের প্রণয় নিয়ে সারা গ্রামের সঙ্গে ঝগড়া করে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মাথায় খুলিটা ডাণ্ডা মেরে চুরমার করে দিয়েছে, এবং রাত্রির মধ্যে পাগল হয়ে গেছে। অথবা পাগলামীর ভান করছে। মানুষটি বিচিত্রভাবে আমার সঙ্গেই গেল জেলখানায়। এবং এই জেলখানাতে লিখতে শুরু করলাম। 'পাষাণপুরী'। তার নায়ক কালী কামার।

এতক্ষণ যা বললাম—তার মধ্যেই পাবেন—বাস্তবতাই আমাকে লেখার জীবন্ত উপাদান যুগিয়েছে। তা থেকেই আমি প্রেরণা পেয়েছি। কোন তত্ত্ব আমার চিত্তকে খুব বেশী প্রবুদ্ধ করে না, তবে এই বাস্তব জীবনই গল্প উপন্যাসের মধ্যে একটি কোন তত্ত্বকে সৃষ্টি করে বা সত্য বলে যেন নিজেকেই প্রকাশিত করে। এখনও পর্যন্ত লেখার সময় নির্দিষ্ট হয় নি; যখন লেখা মনের মধ্যে বেশ ঘনিয়ে ওঠে; বলা যায় সুপক্ক ব্যঞ্জনের মত একটি গন্ধ ছড়ায়, তখনই কোনরকমে সময় করে নিয়ে লিখতে চেষ্টা করি—এইরকম চলছিল। এর পর জেল

থেকে বের হবার পর জেলখানার মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের অন্তর্কলহ দেখে বলে এলাম, এরপর দেশ-সেবা করব আমি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

কাজেও তাই করলাম। মধ্যে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হল এই যে, এই সময় দেশে সেটেলমেণ্ট হল এবং জমিদারীতে জমিদারেরা আইন অনুযায়ী বন্দিধ করলেন। আমিও করলাম। এই করতে গিয়ে মনে হল এত বড় অন্যায় আর হয় না। জমিদারীর মত অন্যায়। সুতরাং রাজনীতি ছাড়লাম বিষয়কর্ম ছাড়লাম। ভাইদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে, নিজে কলকাতায় এসে লিখে উপার্জন করে, অন্নসংস্থান করব সংকল্প করে, প্রথম এক বছর বালীগঞ্জে আমাদের আত্মীয়গৃহে কারুর বাড়ী দশ দিন, কারুর বাড়ী বিশ দিন অন্নঋণই হোক অর অন্নদানই হোক, গ্রহণ করে একটি বাসা করলাম। বাসা মানে একখানি পাকা-দেওয়াল টিনের-চাল ঘর। জলের কল রাস্তায়। ভাড়া পাঁচ টাকা। এ সময় লেখার দিনরাত্রি ছিল না। কিছু খাই নি, দিনরাত্রি লিখেছি, এমন দু দশদিনও গেছে। মনে পড়ছে 'জলসাঘর' লেখার কথা। বঙ্গশ্রীর আমল, দেশ থেকে কলকাতা এলাম চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। এসে পৌঁছুলাম বেলা ২টায়। হাওড়া থেকে এলাম বঙ্গশ্রী আপিসে। শুনলাম গল্পের জন্য কাগজ আটকে আছে। সজনীকান্ত এবং কিরণ রায় বললেন—গল্প দিতে পারেন? কালই।

বললাম—পারি। এবং ফিরে এসে লিখতে বসলাম সন্ধ্যের সময়, রাত্রে খেলাম না, সারারাত্রি পার হয়ে গেল, সকাল নটা নাগাদ 'জলসাঘর' গল্পটি শেষ করে বঙ্গশ্রী আপিসে এসে পড়ে শুনিয়ে বাসায় গেলাম এবং রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কিরণ রায়ের সঙ্গে পথে পথে বেড়িয়ে শুলাম। ঘুমোলাম, পরের দিনের গোটা দিনরাত্রি, তাই বা কেন, তারও বেশী সময়। মনে পড়ছে প্রথম যখন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বাসা করেছি, তখন আমার স্ত্রী কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বাত রোগে ভুগছেন, প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, উঠে দাঁড়াতে পারেন না এমনই অবস্থা। মনে মনে ভয় হচ্ছে, হয় তো বা জীবনের বাকি দিন কটা উত্থানশক্তিহীন হয়েই কাটাবেন। সময়টা পুজোর, পুজোর লেখার তাগিদ রয়েছে নানান কাগজ থেকে। আমি স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে একখানা শতরঞ্জির আসন পেতে কোলের উপর ফাইবারের সুটকেস রেখে পাতার পর পাতা গল্প লিখে যাচ্ছি। গল্পের পর গল্প। জীবনের দেখা মানুষ বা চরিত্র ধরেই গল্প বেশী এসেছে এবং সেই চরিত্রের নিজের পরিণামের মধ্যে গল্পটি সুন্দর পরিণতি পেয়ে সত্য হয়ে উঠেছে। এই সত্যই দিয়েছে জীবনে তত্ত্বের সন্ধান।

কি লিখেছি জানি না, তার মূল্য নির্ণয়েও আমার অধিকার নেই, তবে যেভাবে লিখেছি তা এই। এরই মধ্যে রয়েছে, প্রাচুর্যের সময় যেসব লেখা লিখেছি তা পাহাড়ের বা উঁচু টিলার গা বেয়ে বেরিয়ে আসা স্রোতের মত বেরিয়েছে।

কোন ভগীরথ সেখানে শাঁখ বাজান নি, আমিও ব্রহ্মার মত কমণ্ডলু উজাড় করে ঢেলে দিই নি। এবং কোন ক্ষণ লগ্ন দেখে সে বেরিয়ে আসে নি। তবে এক ধারাতেই জীবন চলে না। অনেক বাঁকে তাকে মোড় নিতে হয়, পাহাড় কেটে যখন আসে তখন তার এক চেহারা, সমতলের বুকে তার আর এক রূপ। আমার জীবনের তাই সব রচনাই যে আমার অভিজ্ঞতা বা দেখা বাস্তবজীবন থেকে নেওয়া ঘটনা ও চরিত্র থেকে আমি সৃষ্টি করেছি তাও আবার সত্য নয়।

যেমন 'কালিন্দী'। কালিন্দীর কল্পনা এল আমার মনে আর একজন লেখকের একটি নূতন উপন্যাসের পরিকল্পনার কথা শুনে। তিনি বললেন—তাঁর উপন্যাসে মানুষ থাকবে না। জমি সৃষ্টি হবে, জন্তু-জানোয়ার আসবে, তার পর একদা দেখা যাবে বালুচরে মানুষের পায়ের ছাপ। সেই ছাপ দেখে বাঘ ভালুক সিংহ ভয়ে পালাবে অন্য অরণ্যে; অজগর সাপ ঢুকবে গর্তের মধ্যে, নদীর দহের কুমীরেরা চলে যাবে নিচের দিকে।

আমার ভাল লাগল। আমি ঠিক করলাম—ঠিক এরপর থেকে আমি আরম্ভ করব অর্থাৎ কুমারী মৃত্তিকায় বনজঙ্গল জাগলো, সেখানে এল আদিম মানুষেরা। তারা জমি তৈরী করলে, বসতি বসালে। তারপর এল সভ্য চাষীরা। তার সঙ্গে লাগল জমিদারের কলহ। তারপর এল মিল-মালিক। চিমনীতে ধোঁয়া বের হল। উপরে আকাশ কালো হল। নিচে মাটি নিয়ে ঝগড়ায় বন্দুকের গুলিতে মানুষের রক্ত ঝরল মাটির বুকের উপর। তবে চরিত্রগুলি দেখা চরিত্র।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় সব সত্য। প্রত্যেক মানুষটি বাস্তব জগতে ছিল। ছিল না শুধু পাগল কাহার। পাগল বোধ হয় আমি নিজে। হাঁসুলীবাঁকের সৃষ্টির ইতিহাস বিচিত্র। কোন পরিকল্পনা নেই—কোন চিন্তা ভাবনা নেই, এমনই অবস্থায় স্বর্গীয় সুরেশবাবুর এবং স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকার মশায়ের তাগিদে ১৯৪৬ সালের পুজোয় দাঙ্গা মাথায় করে লিখেছি। কেমন করে লিখেছি তা বলতে পারব না। তবে একদিকে কেঁদেছি, অন্যদিকে দু পাতা চার পাতা লিখেছি, আনন্দবাজারের পিওন নিয়ে গেছে। কেঁদেছি দাঙ্গায় নিকিরী-পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া দেখে রাস্তার আশেপাশে পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' কিন্তু সম্পূর্ণটা কল্পনা। গঙ্গার তীরভূমি সত্য। বেদেনীদের বেদেদের দেখেছি কিন্তু শবলা পিঙ্গলা এবং বেদেরা যাদের নাম আছে তারা সত্য নয়। পাগুঠাকুরও সত্য নয়। কি করে যে লিখেছি তা বলতে পারি না। কিছু কিছু বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। তাতে অন্য কিছু পাই নি—পেয়েছি সাপেদের নাম। তাদের চরিত্র—এই পর্যন্ত।

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন অনেকে বইয়ের সাহায্য নেন কিনা? নিই নে? না নিয়ে কেউ পারে? 'আরোগ্যনিকেতন' লিখবার সময় আয়ুর্বেদের বই থেকে কত যে সাহায্য নিয়েছি তার কি হিসেব দিতে পারব? পারব না।

'বিচারক' লিখবার সময় আইনের বই পড়েছিলাম। ভূমি সংক্রান্ত আইন নয়—ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড। খুলে বসে লিখেছি।

এ পর্যন্ত আমার লেখকজীবনের বয়স—রসকলির কাল ১৩৩৫ সাল ফাল্গুনে থেকে আজ এই ১৩৭৬ ফাল্গুন পর্যন্ত গণনা করলে দাঁড়াবে পূর্ণ একচাল্লিশ বছর। এর মধ্যে সেই প্রস্তরসঙ্কুল উৎপত্তি-স্থল থেকে নেমে সমতল ভূমিতে অগ্রসর হয়—আজ নিঃসংশয়ে শেষের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি সাগরসঙ্গম সৃষ্টি করে একটি সুদীর্ঘ সজল সরস ধারা বহমান রাখার মত কোন কর্ম আমি নিশ্চয়ই করি নি। হয়তো একটা দুটো মজা খাল-বিলের মত জলাশয় থাকবে কিছুকাল, তারপর তাও সর্বগ্রাসিনী জননী বসুন্ধরা এবং সূর্যের মত মহাকাল গ্রাস করে নেবেন। এর মধ্যে কিন্তু আমার লেখক-জীবন কোন একটি বিশেষ নিয়ম, কোন একটি বিশেষ পথ অবলম্বন করে চলে নি। যেসব বহুবিধ প্রশ্ন আসে এবং বেড়িয়ে সাহিত্যসৃষ্টির রীতির মধ্যে যেসব প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন আছে তার উত্তরে এই ঘটনাগুলিই নিবেদন করলাম। সব শেষে আজকের রীতির কথা বলি। প্রথম সময়ের কথা। ছাত্রজীবনের ছাত্রের মত লেখার আসনে বসে লিখতে চেষ্টা করি। প্রতিটি লেখাই প্রায় দুবার লিখি। কোনটি বা তিনবার। 'হাঁসুলীবাঁক', 'আরোগ্যনিকেতন' তিনবার মার্জনা করেছি। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' প্রথম যা লিখেছিলাম তার প্রথম ৮০ পৃষ্ঠার পর প্রায় ৮০০।৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিটি অক্ষর নূতন করে লেখা। এই সেদিন মঞ্জরী অপেরা লিখেছি। মঞ্জরী অপেরাও দুবার লিখেছি। আরও একবার মার্জনা করবার কল্পনা আছে। অনেকে প্রশ্ন করেছেন—কোন কালে যাত্রাদলের সামিল হয়েও ঘুরেছি কি না? সামিল হয়ে ঘুরি নি, ওদের পিছন পিছন ঘুরেছি। ছেলেবেলা যাত্রাদলের যোগীন্দ্র মূল গায়েনকে কাকা বলতাম। তাঁর দলের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। পশুপতি ভটচাজ শিবানী উমা সাজত। বিভূতি কর্মকার, দ্বিজপদ পূজারী রাধা সাজত। এদের সিগারেট পান [illegible] জুগিয়েছি। মঞ্জরী অপেরার বা যাত্রা দলের মধ্যে মানুষের জীবনের যে কথাটি রূপ পায়—সেটি একটি নয় দুটি। একটি হল—হেসে নাও, দুদিন বইতে নয়। অন্যটি হল—এ [illegible] প্রপঞ্চমায়া জীবন রঙ্গমঞ্চ [illegible] রসের নটবর হরি যারে যা সাজান [illegible] তা সাজে। এটাই হতাশার পরমাশ্রয়। এদের জীবনে এইটেই সত্য হয়। ইচ্ছে আছে যাত্রার এই নবযুগের সূচনা করে নতুন সংস্করণ শেষ করব।

অর্থাৎ আবারও একবার কাটব মাজব না করব। তবে তত্ত্বের দিক থেকে পাল্টাবে না নিশ্চয়।

তত্ত্ব বা তথ্যের দিক থেকে রচনা আমার কখনও পাল্টায় নি।

আমার জীবন-জিজ্ঞাসা এবং জগৎ-জিজ্ঞাসা—যা আমাদের মানব-জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করি—অর্থাৎ কিনা যাকে বলি জ্ঞাতুম ইচ্ছা ও তার উত্তর, আমি অধিকাংশই পেয়েছি ব্যবহারিক জীবনে, মানুষের আচরণ থেকে, জীবন থেকে জগতেরই কাছ থেকে—জন্মের কাছ থেকে, মৃত্যুর কাছ থেকে। তাই আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এরই মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তরও নিহিত আছে।

পাগলের চেহারা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

NITAI GHOSH

মুখখানা ভার করে বিণু বলল—আজ
ার একটু হলে পুড়ে মরছিলাম। তোমার
দিন ধরে বলছি সাঁড়াশিটা একটু
রামত করিয়ে দাও, তা কানেই
গেলো না।

অভিরাম বিরক্ত হ'ল—কই কবে আমায়
লেছ?

বিণু ক্ষুব্ধকণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে
লে—বেশ, বলি নি ত বলি নি। যেদিন
নিতা পুড়েধুরে—

আর পারা যায় না। অভিরাম ভাবে।
ভাবে আর বিরক্ত হয়। জুতো-সেলাই থেকে
চণ্ডীপাঠ সবই তার একার ঘাড়ের ওপর।
পাঁচটার সংসারে এতো ঝামেলা পোয়াতে
হ'ত না। মাসে মাসে হিসেব মতো টাকাটা
বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেই ছুটি। আর এই
আলাদা বাসা ক'রে বাজারহাট কী না
তাকে করতে হয়। বিণুরও দু-বেলা রান্না-
বাড়ি, ঘরকন্নার কাজ—ফলে দু'জনেরই
অবকাশ ঘুচে গেছে। খরচও বেড়েছে।
চিন্তা আরও বেড়েছে। কী লাভ হয়েছে?
কার কী সুবিধে হয়েছে। বিণু বলবে,
অশান্তি নেই। তা অবিশ্যি নেই। ওর
আর কী, হাঁড়ি-হে'সেল, চাই-নেই, এই
নিয়েই দিব্যি থাকতে পারে। জীবনে যেন
আর কিছুই করার নেই! অভিরাম বাজার
যাবার সময়েই মনে মনে ভেবে রেখেছিল,
ছুটীর দিনের সকালটা একটু রেওয়াজ
করা যাবে। সামনের মাসে রেডিও
প্রোগ্রামে যে-যে গান গাইতে হবে সে-
গুলো একটু ঝালানো দরকার। বিণুর
সাঁড়াশি আক্রমণে তার দফা রফা হল।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে হাত বাড়িয়ে বলল—
কই দাও, সাঁড়াশীখানা দেবে ত! নাকের
ডগায় কামারশালা রয়েছে, নিজেও ত
দু-পা গিয়ে ওটা সারিয়ে আনতে পারত।

বিণু ঝংকার দিয়ে উঠল—ওই নোংরা
নর্দমা পেরিয়ে, বস্তীতে গিয়ে—
ম্যাগোঃ!

অভিরাম এতে আরও উত্যক্ত বোধ
করে—থাক আর নাক-শি'টকে ঢঙ করতে
হবে না। দাও—

—এখুনি! ওটা যে এ'টোর মধ্যে
রয়েছে। ওবেলা বরং যেয়ো—

—হয়েছে। দেবে? না আমাকেই খ‍্ুজে নিতে হবে!

স্বামীর মেজাজ দেখে বিণ্‌ু গজ-গজ করে—কোনো কাজ বললেই বাবুর মাথা গরম হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাঁড়াশিখানার কপালে হাতুড়ির ঘা আর জুটল না। অভিরাম বেজার হয়েই বড়-নর্দমার বুকের ওপর বাঁশের নড়বড়ে সেতুটি পেরিয়ে কামারের বিষণ্ণ ঘরখানায় পেঁৗছে দেখল লোকটা একাই আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বকছে—আমি পারব না! সে আমি পারব না। কিন্তু ওরা যে বোমা মেরে আমার দোকান উড়িয়ে দেবে বলে গেল!

প্রথমে কিছু মনে হয়নি অভিরামের। এপাড়ায় আজকাল বোমা মারামারির হিড়িক পড়েছে। এই ত দিন কয়েক আগে রাত দুপুরে কী কাণ্ডই হয়ে গেল। হয়ত সেই ব্যাপার নিয়েই লোকটা কিছু ভাবছে! মিনিট দুই দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনলো অভিরাম। কেন না, সেদিনের বোমার হাঙ্গামার সঙ্গে এই বস্তী বাড়িটার একটা সম্পর্ক রয়েছে—মানে, বোমার এক-পক্ষ এই বাড়িরই পিছন দিকে থাকে, অভিরাম শুনেছে।

একটু পরে সে বলল—ও ভাই শুনছো! আমার এই সাঁড়াশিখানা একটু পিটিয়ে দাও!

লোকটা তার কথা কানেই তুলল না। আপন মনে বকেই চলল—ওরে বাবা, ছোরাছুরি বানিয়ে শেষে মরতে যাবো নাকি। বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর করি! ওপর থেকে তিনি দেখতে পাবেন না! ছোরা দিয়ে তোরা মানুষ খুন করবি, লুট-পাট-ছেনতাই করবি আর রাজু-কামার তোদের হাতিয়ার বানিয়ে দেবে! তারপর? যাদের সর্বনাশ হবে তাদের মা-বোন শাপ-বৌ-এর শাপমন্যির পাপ কা'কে লাগবে! বলি রাজু-কামারের লাগবে কিনা তাই বল! সেটা আমাকে ব'লে দে!

চিৎকার ক'রে লোকটা এমনভাবে মুখ তুলে চাইল, মনে হ'ল যেন অভিরামের কাছেই সে কৈফিয়ৎ তলব করছে।

এ অবস্থায় কী করবে অভিরাম ভেবে পায় না। তবু বিণুর অসুবিধের কথা চিন্তা ক'রে সে আর একবার বলল—এই সাঁড়াশির খিলটা একটি পিটিয়ে দেবে?

কে কার কথা শোনে! লোকটা ডুকরে কে'দে উঠল—কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হে'চকি তোলার মতো থেমে সে বলতে লাগল। —না, না, আমি পারব না! তোমার পায়ে ধরছি অশোকদা' ক্ষ্যামা দাও! হ্যাঁ, তাই তোকে বলতে হবে রাজু! পস্টা-পাল্টি বলে দিবি আগে যা করিচি-করিচি! তখন ত বিয়ে-থাও করিনি, পাঁচুর মায়ের পেটে পাঁচুও হয়নি! একা ছিলাম, শাপ-মন্যি লাগলে আমাকেই লাগতো! কিন্তু—নঃ, ওরে বাপরে—দুধের বাছা যদি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে! হ্যাঁ গো, তাই হয়েছিল যে—সেই পীরপুরের হরিপদর বড় ব্যাটা ইয়া তাগড়া মোষের মতো ব্যাটা ভীম মরল না রক্ত উঠে! ও-হো-হো-হো—

অভিরাম অসহায় ভাবে সাঁড়াশিখানা নিজের সামনে তুলে দেখল। ইচ্ছে হ'ল লোকটার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ওর এই ভাব-লাগা দশাটা ঘুচিয়ে দেয়। কিন্তু ভরসা হ'ল না। কামারশালার উনুনে আঁচ কেমন ঝিমিয়ে গেছে, ছাই-এর তলায় হয়ত তখনও কিছু রয়েছে. চুপসে পড়ে থাকা হাপরটার দিকেও চোখ পড়ল, আর উপু হয়ে বসে থাকা লোকটার আশ-পাশে লোহা-লক্কড় আরও কী-কী যে দেখল অভিরাম পর মুহূর্তে ভুলে গেল। ওই সবের ওপরে বিণুর অপ্রসন্ন মুখখানা যেন ছায়া ফেলে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। অভিরাম হঠাৎ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল—কী হে, গাঁজাগুলী খেয়ে কি সব বকছ! কাজ করবে না! দাও-দাও সাঁড়াশির খিলটা একটু পিটিয়ে দাও—

লোকটা চমকে উঠল। একবার সরাসরি অভিরামের মুখের দিকে চাইলও। কিন্তু তার বেশি কিছু লাভ হ'ল না। মাথা নেড়ে সে আবার বিড়-বিড় করে' বকতে শুরু করল। অভিরাম তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল বিণুর ওপর। যার কর্তৃত্ব করার এত শখ তার যোগ্যতা থাকা উচিত! এর নাম খুশি প্রেম! একটা মানুষের ওপর নাগাড়ে হুকুম চালায়, তার যা কিছু সূক্ষ্ম, সুন্দর অনুভূতি সব দুরমুশ ক'রে সংসারের সবার মতো ছাঁচে ফেলে দেওয়ার নামই কি সুখ!

বড় নর্দমার কালো ঘোলা জলের ওপর থুতু ফেলে সে মন্থর গতিতে পথে নামল। আবার কি মনে ক'রে নর্দমার সেতু দিয়ে পানবিড়ির দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট দিতে বলে ভুলে গেল। গোপাল যখন বলল—বাবু সিগ্রেট নেবেন না?

—ও হ্যাঁ! দাও। আচ্ছা এই কামারের কি হয়েছে বল তো?

গোপাল মুরুব্বিআনার সুরে বলে—নেই ত দোকানে! শালা ভুখমারী সকাল থেকে সতের বার খে'কী কুত্তার বাচ্ছাটাকে দেখবার জন্যে ঘরে দৌড়বে তো খদ্দের জুটবে কোথেকে!

অভিরামের কথা শেষ করার ফুরসৎ না দিয়ে বকতে বকতে দোকান থেকে নেমে পড়ল—আপনি এক সেকেণ্ড দাঁড়ান বাবু। শালার ছেলে আদর করা দেখাচ্ছি।

অভিরাম বিব্রত হয়ে পড়ল—আরে না, দোকানেই আছে সে কিন্তু কাজ করছে না।

আকাশ থেকে পড়ল গোপাল—দোকানে রয়েছে! কিন্তু? মানে আপনার কাজ করবে না! এতবড় আস্পদ্দা! চলুন তো দেখি। শালা ভেবেছে কী! ছেনতাই পার্টির কাজ করিস বলে তোর এত তেল হয়েছে যে, রেডিও আর্টিসের কাজ ছু'বি না!

গোপালকে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। অভিরামের হাত থেকে সাঁড়াশিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই সে কামারের দোকানের দিকে মারমুখো হয়ে চলল। গোটা ব্যাপারটা অভিরামের কাছে কেমন অস্বস্তিকর লাগে—বছর দেড়েক আগে তার বন্ধু মৃণাল যেন ঠিক এমনি করেই তাকে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। হাসি পেল, এরকম মনে হওয়ার কোনো মানে হয় না, তবু মনে হল! আশ্চর্য, নিজের এই উদ্ভট ধরণের মনে হওয়ার জন্যে কতোবার আপন মনে হেসেছে। এরকমটা তার হামেশাই হয়। এই জন্যে কতোদিন বিণু তার ওপর...ভাবছিল আর বিড়ি-ওয়ালা গোপালের পিছু পিছু চলছিল 'রেডিও আর্টিস' অভিরাম রক্ষিত।

রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই গোপাল হুঙ্কার দিল—নেমে আয় শালা! আগে নেমে আয়, বাবুর পায়ে ধরে' ক্ষমা চেয়ে নে রাজুদা'!

রাজু কামার যে গোপালের কথা কানে তুলেছে তা মনেই হ'ল না। অভিরাম ভয় পেয়ে গেছে। শেষে গোপাল হয় ত লোকটাকে মেরেই বসবে। এ পাড়ায় কথায় কথায় সোডার বোতল আর 'পেটো' চলে। তা চলুক। ঠেকাবার সাধ্য কারুর নেই। কিন্তু অভিরামকে ঘিরে—ছি-ছি-ছি সে গোপালের হাত ধরে' টানে—আরে ছেড়ে দাও ভাই! ও-বেলা শ্যামবাজার থেকে কিনেই আনবো। একখানা সাঁড়াশির ভারি ত দাম! চলো—

গোপাল ততক্ষণে কামারের দোকানে ঢুকে পড়েছে—শালা এখনো রং-সে বসে আছো!

এবং পরমুহূর্তে তার একটা ধাক্কায় রাজু কাৎ হয়ে পড়ে গেল। অভিরাম দৌড়ে গিয়ে গোপালকে চেপে ধরল—এই এই এসব কি হচ্ছে!

গোপাল তখন ফু'সছে—শালা ভুখমারী, আমার সঙ্গে পে'য়াজী! ওঠ, সিধে হয়ে কাজ কর বলছি!

লোকটা কিন্তু ওই লোহালক্কড়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। ওর জ্ঞান-বুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়েছে। গড়াতে গড়াতে শেষে উনুনের ওপর গিয়ে পড়তে অভিরাম 'হাঁ হাঁ' করে ঝুঁকে পড়ে তাকে আটকাতে চেষ্টা করে। লোকটা আর্তনাদ করছে—আমার পাঁচুর মুখ চেয়ে মাপ করো অশোকদা' আমি ওসব খুনে-যন্তুর বানাতে পারবো না। মেরে ফেললেও তা রাজু পারবে না। ও 'অশোকদা' এসব বে-আনোয়ে কাজ আমাকে দিয়ে করিলে না!

অভিরামের কাছে বাধা পেয়ে লোকটা তার পা-জড়িয়ে ধরেছে—ছাড়বো না! তোমার ছিচরণে মাথা কুটে মরবো! 'অশোকদা' তোমার বাবা কতবড় মানী লোক, আর তুমি গরীবের দুঃখু বুঝবে না!

অভিরাম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে কাতরভাবে ডাকে—অ গোপাল, এ কী হল!

গোপাল বিজ্ঞভাবে বলে—আপনি সরে আসুন, বুঝিচি! শালা সকাল বেলায় নিশা-বিড়ি টেনে বুঁদ হয়ে আছে! বাড়ি যান, ওর ঘোর কাটুক—সাঁড়াশি সারিয়েও শালাই আপনাকে দিয়ে আসবে। খবরদার শালাকে এক পয়সা দেবেন না।

—কিন্তু সরবো কি পা—

—লাথি মারুন।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে অভিরাম গোপালের দিকে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নাড়ে—কী ফ্যাসাদেই পড়িচি! ওহে পা ছাড়ো—

অনেক কসরৎ ক'রে পা দু'খানা খালাস ক'রে নিয়ে অভিরাম সিগারেট টানতে টানতে মুহূর্তের মধ্যে নর্দমার বুকের ওপর সেতুতে এসে দাঁড়াল। গোপাল বলল—এ বস্তীর দস্তুরই এই। বৌটা ঝি-গিরি করবে পরের বাড়ি আর জানোয়ারগুলো গাঁজা-গুলী খাবে, বছর-বছর বাচ্চা হবে। রাজুদা কিন্তু এমন ছিল না—

শেষ কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনার সুর শোনে অভিরাম।

।। দুই ।।

একখানা ভাঙা সাঁড়াশি যে এত ঝামেলা পাকাতে পারে অভিরাম তা কল্পনাই করতে পারে নি। বস্তুতঃ ওটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। বিণুও আর উচ্চবাচ্য করে নি দিন-দুইএর মধ্যে। কিন্তু অফিস যাবার পথে সেদিন গোপালের দোকানে পান কিনতে গিয়েই ফ্যাসাদ হ'ল। কতকটা তিরস্কারের ভঙ্গীতেই গোপাল বলল—আচ্ছা ভুলো মানুষ ত আপনি! সাঁড়াশিটার কি হ'ল খোঁজও করলেন না?

জিভ্ কেটে অভিরাম বলল—দাও-দাও হাতে খানিকটা সময় আছে, বাড়ি দিয়ে আসি!

—আরে সারানো হ'লে কি আর পড়ে থাকতো?

—আপদ গিয়েছে। ফিরতি পথে মনে ক'রে আজই একটা কিনে আনতে হবে।

গোপালের যেন পান সাজতে মনেই নেই এমনিভাবে সে উদাস হয়ে বসে রইল। তার দীর্ঘশ্বাসে অভিরাম আশ্বস্ত বোধ করে। সেই সঙ্গে আশা করে এবার গোপাল কাজে হাত দেবে! কিন্তু তার উৎসুক দৃষ্টিকে উচ্চকিত ক'রে গোপাল বলল—জানেন, রাজু কামার সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। আমি তখনই আন্‌জাদ ক'রেছিলুম এর মধ্যে একটা বিকজ্ রয়েছে। নইলে, রাজুদার মতো সাচ্চা লোক, সে কেনই বা নিশার বিড়ি খেতে যাবে আর যদি খেয়েই থাকে ত তাতে অমনটাই বা হবে কেন! আরে আপনি ত চলে গেলেন সাঁড়াশি গছিয়ে দিয়ে। (অভিরামের মনে ছিল, গোপালই জোর ক'রে ওটা রেখেছিল। কিন্তু গোপাল যে-ভাবে কথা বলছে তাতে বাধা দিতে ইচ্ছে করল না।) তারপর ওর ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দিলাম চান্ করিয়ে. যাঃ শালা তোর শখের ক্যাতায় আগুন পড়ুক। কিন্তু দাদা, সেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাঁপ—একেবারে কাল্-সাঁপ!

গোপাল যাত্রা দলে অভিনয় করে। তার কথার মধ্যে অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গী অভিরামের আপিসের তাড়া ভুলিয়েই দিয়েছিল। মাঝখানে বাধা পড়ল, একটি দেড়-হাত সাইজের বাচ্চা অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় (যেন অভিরামের পকেটের তলা থেকে ফুঁড়ে আওয়াজটা আসছে) বলল—এ গোপালদা' বাবাকে লালসুতোর বিড়ি দশ নয়ার দাও—!

তাকে ধমকে থামিয়ে দিল গোপাল—থাম্! ব্যাটা, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে! হুঃ, বাবুকে আগে পান দেবো, তারপর ত—(সেই টানেই) বুঝলেন দাদা, শালা তুই ভুখমোরী, তোর অতো ধম্ম-বিচার করতে গেলে চলে?

এবার অভিরাম ঘড়িটা একটু বেশি উঁচু করে হাত তুলে দেখল। ইঙ্গিতটা গোপালের বুঝতে দেরি হল না। সে পানের বোঁটা ছাঁটতে ছাঁটতে বলল—ওই আপনাদের অলকবাবুর মস্তান ব্যাটা অশোকই হল যত সব্বনাশের গোড়া! ওদের কাণ্ড-কারখনা জানতে ত কারুর বাকী নেই। অলকবাবু লীডার বলে তার ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজত থেকে ছাড়া পায়—এই ত অবস্থা—দেশে ধম্ম, বিচার বলে কিছু আছে—(পান সাজা হয়ে গেল। কিন্তু গোপাল সেটা দিল না।) বলুন দাদা, আপনিই বলুন—বলে কি না ছোরা তৈরী করে দাও—কালই চাই! তা রাজু বলেছে, 'পারব না।' এই তার অপরাধ। অশোক গুণ্ডা তড়পেছে, টাইমে মাল রেডী না পেলে বোমা মেরে রাজুর দোকান উড়িয়ে দেবে। বলুন দেখি কত বড় বেআক্কেলে আবদার! বেচারা রাজু কারু সাতে-পাঁচে থাকে না, ভালোমানুষ লোক ও পড়ে গেল রাম ফাঁপরে—আজ ক'দিন ধন্দ মেরে বসে থাকে আর থেকে থেকে চিৎকুরে ওঠে, ওরে বাবা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, আমাকে মেরে ফেলবে! আমার পাঁচুর কি হবে! আবার কখনো বিড়-বিড় করে পারব না, সে আমি পারব না খুনে যন্তর তৈরী করলে পাঁচু আমার মরে যাবে! বুঝুন ব্যাপার! লোকটা একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েচে! বলতে বলতে গোপালের চোখ ছলছলিয়ে এল।

এদিকে আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাসে ঝুলে যাবারও ঠাঁই জুটবে না। কোথায় হাতে একটু সময় নিয়ে বেরিয়েছিল অভিরাম, পান চিবোতে চিবোতে আরাম করে বসে যাবে। মনে মনে ছটফট করলেও মুখে কিছু বলতে পারে নি। বিবেকের ছিটেফোঁটা এখনো বোধহয় টিঁকে রয়েছে, তাই ধৈর্য ধরে পরের দুর্দশার কথাটা না শুনে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে, গোপাল যখন তার হাতে পানের খিলিটা ধরিয়ে দিল তখন অভিরাম আরও মুস্কিলে পড়ে গেল। এতক্ষণ সে শুধু মুখ বুজে শুনেই গেছে এখন কিছু বলা উচিত—কিন্তু কী বলবে! কথা খুঁজে পাচ্ছে না—তার চেয়েও বড় কথা, সেদিনের সেই কামারশালার দৃশ্যগুলো ছবি হয়ে তার মানসপটে ভেসে বেড়াচ্ছে। অভিরামের কেবলই মনে হচ্ছে লোকটার পাগল হয়ে যাওয়ার জন্যে সে-ও দায়ী!

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে গোপালই তাকে উদ্ধার করল—ভেবে আর কি করবেন বলুন দাদা! যান আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অব্যাহতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অভিরাম পানটা গালে গুঁজে বলল—তা বটে! ভেবে কিছুই করার নেই। কিন্তু এই দুর্দিনে একটা লোক পাগল হয়ে গেল চোখের সামনে—ভাবতেই কিরকম লাগে!

দেড়-হাত লম্বা ব্যক্তিটি অকস্মা আলোচনায় যোগ দিয়ে মুরুব্বির মতে বলল—পেঁচোর বাবা না আখুন উটুনে না করছে জানো গোপালদা'!

গোপাল ধমকে উঠল—নাচ্ কচ্চে কে কচ্চে, তোর বাপের কি রে—! এই নে বিঁ নিয়ে দূর হ!

ছেলেটা এমন মজাদার খবর দি বাহবার বদলে খিঁচুনি খেয়ে দমে গেল তার হাতে বিড়ি দিতে দিতে গোপাল আ এক পশলা গাল পাড়ল—খবরদার তোমা যদি ফের ওর পেছনে লেগেছ ত জ্যান্ পুঁতে ফেলব—হাঁ! শালা তামাশা পেয়ে সব!

অভিরাম বিমর্ষভাবে পঁচকে ছেলেটা দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই অবস্থায় ত কানে গেল—লেকটা পাগল হয়েছে ে ভারি মজা হয়েছে। কী সব জানোয়া বুড়ো-বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত রং করে!

অকারণেই অভিরাম আপিসে পাগল লোকটার কথা ভাবল পেলো বে করে পাঁচুর কথা, যাকে চোখেও দ্য নি। কোনো কাজে মন দিতে পারল ন তার পাশে যে বুড়ো গাঙ্গুলী বসেন তি খোঁচাখুঁচি করলেন—বৌ এর সঙ্গে ঝগ হয়েছে?... পকেট-মার গিয়েছে?... বা অসুখ?... ইত্যাদি যতো রকমের দুশ্চিন্ত কারণ থাকতে পারে একে-একে টো মতো ছুঁড়তে লাগলেন। শেষে বললেন 'তাহলে এ্যামিবায়োসিস!' অভিরাম হ ছেড়ে দিয়ে শেষের কারণটাই মেনে নি কেন না একটা পাগলের জন্যে মন খা করা এ আপিসে বেমানান! বেমানান কারণ, এখানে সুস্থ-মগজের লোক বেশি নেই। বছরে গড়ে দুটো লোক পা হয়ে যায়। এইসব শিক্ষিত পাগলের এ কাব্যিক নাম আছে 'ফ্রাস্ট্রেশন'। কেউ অনেক উন্নতির আশা নিয়ে আসে ঘষটে ঘষটে দু-এক ধাপ উঠেই আট যায়! কেউ বা কালিগ্ কোনো মেয়ের প্রে পড়ে ধাক্কা খায়। কেউ হয়ত আ সমস্যা নিরাকরণে অক্ষম হয়। মোট ব পাগল হবেই দু-একজন। তারপর মেডিক লীভ নিয়ে, শক্ খেয়ে খানিকটা মেরা হয়ে আপিসে ফিরে আসবে। কাজ ক

কিম্বা করবে না। সরকারী চাকরীর এই একটা সুবিধে—সহজে যায় না। বাড়াবাড়ি হলে আবার ছুটি নাও। কাজেই অভিরাম ভরসা করে বলতে পারে না রাজু কামারের কথা। তা ছাড়া তার নিজেরই ব্যাপারটা খারাপ লাগছে। অনেক কষ্টে মন থেকে ওই ছেঁদো ভাবনার ছেঁড়া কাঁথাটা টান মেরে ফেলে দিল। দিতে পারল অঞ্জনার সঙ্গে গল্প করে। অঞ্জনা বিল সেকশনের মেয়ে। এসেছিল ইউনিয়নের বিষয়ে পরামর্শ করতে। তা থেকে উঠে পড়ল ওদের ড্রামা গ্রুপের কথা। অভিরাম কেন আসছে না ওদের দলে। তার মতো একটা ভার্সেটাইল গুণের যুবক শুধু কেরানীগিরিতে পার্টস নষ্ট করছে দেখে অঞ্জনার খারাপ লাগে।... মোট কথা বিকেলের দিকে অভিরামকে চাঙ্গা দেখে গাঙ্গুলীমশাই চোখ কুঁচকে স্বগতভাবে বললেন—আরে ও দুটোই এক।

অভিরাম তখন জরুরী কাজটুকু সারতে ব্যস্ত ছিল। একবার চোখ তুলে জিগ্যেস করল—আমাকে কিছু বলছেন?

না!

পিঁপড়ের সারির মতো অঙ্কের দিকে তাকিয়ে অভিরাম আবার কাজে মন দিল। কিন্তু তার কানে ঠিকই গেল—বুঝলে দত্ত, এ্যামিবায়োসিস আর ফেমিনায়োসিস দুটোই এক।

দত্ত উচ্চকণ্ঠে তারিফের বটুয়া খুলে বলল—কী, পান চাই বুঝি! কার অবার ফেমিনায়োসিস হল দাদা?

—ও ভাই কখন কার হয় বলা কি যায়! আর এ রোগের মজাই হল, পাগলের মতো রোগী নিজে টের পায় না।

অভিরাম ঘাড় গুঁজে নিজের কাজ করে গেল। না, কাজ ঠিক করে নি সে, কেন না কান খাড়া রেখে সব কথাই শুনছিল—কিন্তু বুড়োদের ওই পানসে রসিকতা তার পছন্দ নয়, তা ছাড়া কাজে মন দেবার চেষ্টাটাও তার ষোল আনাই ছিল। ঘাড় গুঁজে কাজের চেষ্টায় একটা সুফল হল—আজ ফিরে গিয়ে গোপালকে শক্‌-ট্রিটমেণ্টের পরামর্শ দেবে। সেরে যাবে মনে হয়। কিন্তু গোপাল যদি এগিয়ে না আসে! সে যদি বলে, রাজু তার কে? অভিরামের যদি অতোই মাথাব্যথা তবে সে-ই ঝুঁকিটা নিক্‌গে যাক! নাঃ, তা বলবে না। গোপাল তা কিছুতেই পারবে না। কেন পারবে না তা অভিরাম জানে না—তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস গোপাল সে প্রকৃতির নয়। তা ছাড়া, গোপাল যে রাজুর এক বস্তীর ভাড়াটে। আচ্ছা, অঞ্জনা যে তার ভার্সেটাইল গুণের কথা বলল, সেটা মন থেকে বলল—না, মন-রাখার জন্যে বলল! যাক, বলেছে ত! আর মিছে কিছু বলে নি। কিন্তু বিশু ত কই বলে না! আগে বলতো আজকাল যেন—!

।। তিন ।।

কোনো লাভ হয় নি। না, রাজুর কামারশালা বোমা মেরে উড়িয়েও কেউ দেয় নি। দোকানটা নতুন মাটির পোঁচড়া দিয়ে অন্য ভাড়াটে নিয়ে খুঁটি আর লাটু সাজিয়ে বসেছে। আর রাজু কামার এখন পাকাপোক্ত পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নিয়ে রং-তামাশা করে বস্তীর ছেলেমেয়ের পাল। অভিরামের পরামর্শ এবং পত্র নিয়ে গোপাল একদিন হাসপাতালে রাজুকে সঙ্গে করে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। কি করে হবে? যে চেয়ারে বসিয়ে শক্‌ দেওয়া হয়, সেটাতে একবার শক্‌ খেয়ে সেই যে লাফ দিয়ে 'বাপ্‌' বলে মাটিতে পড়ল রাজু, তারপর আর তাকে দ্বিতীয়বার চেয়ারে বসানো গেল না। ভূতের চেয়ারে সে বসবে না! অনেক কায়দাকানুন করেও কিছু সুবিধে হয় নি। তারপর কামেশ্বরপুরের সিদ্ধ-বাবার কাছ থেকে পাগলের-বালা এনে পরিয়েও কোনো ফল হয় নি। এত খবর অভিরামের জানবার কথা নয় কিন্তু গোপাল তাকে না শুনিয়ে ছাড়ে না। আজকাল পরতপক্ষে গোপালের দোকানে ওইজন্যেই যায় না অভিরাম। রোজ রোজ অন্যের দুঃখের একঘেয়ে কাহিনী শুনতে কারই বা ভালো লাগে! সে যখন কিছু করতেই পারবে না তখন শুধু শুধু বিড়ম্বনা বাড়িয়ে কীই বা লাভ। কদিন আগে ইলেকট্রিকের তার কেটে নেবার ফলে সন্ধ্যার পর রাস্তাটা অন্ধকারই থাকে, কাজেই ফেরার সময়ে চক্ষুলজ্জার হাঙ্গামা পোহাতে হয় না।

সেদিনও আঁধারেই ফিরছিল অভিরাম। একটা জায়গায় হৈ-হল্লা আর লোকের ভিড় দেখে একটু থমকে দাঁড়াতে হল। দিনকাল যা পড়েছে তাতে হুঁশিয়ার হয়ে পা বাড়াতে হয়—তা সে পাড়াই হোক বেপাড়াই হোক। একটু লক্ষ্য করে বোঝা গেল, তেমন কিছু নয় রাজু পাগলার পিছনে চ্যাংড়ার দল লেগেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে একেবারে গোপালের মুখোমুখি পড়তে হল। আঁধারের মধ্যে গোপাল তখন ফেউ তাড়ানোর মতো এলোপাতাড়ি গামছার বাড়ি মারছিল আর গাল পাড়ছিল। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন হয় বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তেমনিভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পথে আর চলার উপায় রাখছে না। আর দূরে থেকে চেঁচাচ্ছে 'এই পাগল কোথা যাবি—ছেরা যাবি এই পাগল!' অভিরাম চেষ্টা করে না এগোবার। কার ঘাড়ে পা দিয়ে ফ্যাসাদ বাধাবে। রাজু পাগলা বিড়-বিড় করে কিছু নিশ্চয় বলছে কিন্তু তা ওই হট্টগোলে শোনা যাচ্ছে না!

গোপালের গালাগাল আর গামছা-আস্ফালন হঠাৎ থেমে গেল। ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেয়ে আবার পাগলের কাছে আসতে লাগল। একটু ফাঁক পেয়ে অভিরাম এগুলো। নজরটা অবাধ্য ওই পঙ্গপালের মতোই তারও গোপালের ওপর পড়ল। আর সব জায়গাই ত বস্তীর চ্যাংড়াদের ঘেরা ঘেরাও, শুধু গোপালের আশ-পাশ ফাঁকা। অগত্যা অভিরাম মনকে তৈরী করে নিয়েই এগোয়। কী করবে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নয়-হয় দুটো কথাই শুনবে। নিজে থেকেই কথা বলবে সে।

প্রস্তুত থাকলেও সে এতখানি বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—কী গোপাল! তোমার এক কাজ হয়েছে ভালো—এ্যাঁ!

অভিরাম কথা না বললে হয়ত গোপাল লক্ষ্যই করত না। তার কথা থেকেই বোঝা গেল—কে?

একটা পুঁচকে ছেলের কান ধরে গোপাল ওপর দিকে চাইল—ও দাদাবাবু! আর বলেন ক্যানো, কাণ্ড দেখুন এই বাচ্চাটাও বাপের পেছনে লেগেছে!

অভিরামকে কিছু বলতে হল না গোপালই ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—এ্যাই এই দেখুন রাজুদার ছেলে পঁচু! আরে হতভাগা বাবাকে পাগল বলতে নাই।

ছেলেটা গোপালের গালে চড় কষিয়ে দিল—না, না, ও বাবা না—ও পাগল! আঃ, লাগে, ছাড়ো, ছাড়ো বলছি, এঃ—এঃ—এঃ ছাড়ো!

গোপাল ছেলেটাকে ছাড়তে নারাজ, অভিরামকেও ছাড়তে চায় না সে! পরাজিত সেনাপতির মতো হতাশ সুরে সে বলে—এর কী বিহিত করি বলুন তো দাদাবাবু!

উল্টোদিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে একখানা গাড়ি আসছে। সেই আলোতে অভিরামের মনে হল গোপাল যেন কাঁদছে। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে সে গোপালের হাত ধরে বলল—'সরে' এস। বাচ্চাটা তখনো গজরাচ্ছে—ছাড়ো—পাগল আমার বাবা না!... গোপালের কোলে থেকে ওই অবস্থাতেই সে অন্যের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে... 'এই পাগল ছোলা কাঁদব......ছোলা!'

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ঐক্য ও অনৈক্য

'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' কথাটি কে সৃষ্টি করেছিলেন তা জানা নেই, তবে তিনি যে অতিশয় চতুরব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই, 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি'—জননেতা এবং সমাজসেবকদের হাতে একটা সুবিধাজনক হাতিয়ার. তাঁরা এই কথাটির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন. সংঘর্ষ, মন কষাকষি, ভুল বোঝাবুঝি, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যেসব ব্যাধি ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন করছে সেদিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করেন নি, বরং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। এই কথাটির দ্বারা বিভিন্নতাবাদীদের প্রকৃত শক্তিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা আছে। বহুর মধ্যে ঐক্য, বিভেদের মধ্যে ঐক্য, এইসব উক্তি নেহাৎ মন ভোলানো কথামাত্র।

আসলে এই কথার মধ্যে এমন এক ভয়ংকর সমস্যা চাপা দেওয়া হয়েছে যার ফলে এক সময়ে সকলকেই ভুগতে হবে। ডাইরেক্টার অব ইনস্টিটিউট অব রেস রিলেসনস্, মিঃ ফিলিপস ম্যাসন এই সমস্যা প্রসঙ্গে কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদের মতামতের এক সঞ্চয়ন সম্পাদনা করেছেন। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ কিভাবে ঐক্যসাধন সম্ভব, কোন কোন শক্তি বিভেদের সৃষ্টি করে এবং কিভাবে তারা পরস্পর কাজ করে তা বিশেষভাবে অনুধাবন করা। এই প্রবন্ধ সমষ্টির লেখকবৃন্দ বিপরীতমুখী ধারাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সেখানেই তাঁদের কৃতিত্ব। প্রশ্নের দুটি দিকই তাঁরা বিচার করেছেন এবং এই বিশ্লেষণ সেই কারণে সমৃদ্ধ।

ভারতীয় সমাজ ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, ভাষা, শিক্ষা, অর্থ প্রভৃতি বহুস্তর বিভাগে ছিন্ন-ভিন্ন, এ সব কথা অতি পুরাতন। তবে একটা নতুন কথাও আছে, আর সেই কথাটি চমকপ্রদ। বিগত কুড়ি-বাইশ বছরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে এই সব বিভাগের রূপ পালটিয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী কি তাহলে আরো সরে যাচ্ছে? কিংবা তারা আগেকার চেয়ে পরস্পরের প্রতি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে? দেশ বিভাগের ফলে মুসলিম সমাজের চিত্তে যে আঘাত লেগেছিল তা কি এতদিনে সরে গেছে? জাতিগত বিভেদের চাপ কি আরো দৃঢ় হয়েছে না ক্ষীণ হয়ে এসেছে? ভাষাগত কলহ কি শেষ পর্যন্ত একটা অনাক্রমণ চুক্তিতেই শেষ হবে না প্রকাশ্য সংগ্রাম আসন্ন? নয়া-শ্রেণীর সভা সমাজ কি ঐক্য না অনৈক্য বৃদ্ধি করবে? এই প্রবন্ধাবলীর লেখকবৃন্দ এই জাতীয় এবং অন্যবিধ অজস্র প্রশ্ন তুলে ধরেছেন।

তাঁরা সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়েছেন এইভেবে যে কোথায় এর পরিণতি? যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল তার বিভিন্ন স্তর-বিশ্লেষণ করেছেন লেখকবৃন্দ। কোন্ ধারাটাই যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে একথা বলতে গিয়ে যে যার নিজস্ব ধারণানুসারে মন্তব্য করেছেন। তবে সকলেরই আশা যে পরিণতি মধুর হবে। যেসব কারণে বিভেদ বৃদ্ধি পায় তার শক্তি বিষয়ে এঁরা সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বিশ্বাস করেন যেসব কারণে ঐক্য বৃদ্ধি পায় সেই সব কারণ অনেক বেশী প্রবল আকারে উপস্থিত।

শুধুমাত্র যদি বিশ্বাস হত তাহলে তাঁদের এই সব সিদ্ধান্ত জননায়কদের গালগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, তার চেয়ে বেশী মূল্য হত না। কিন্তু এইসব সমাজতাত্ত্বিক লেখকদের কোনো অভিসন্ধি নেই। তাঁদের প্রতিটি অনুমানের পিছনে সমসাময়িক ধারার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ডাঃ পার্সিভাল স্পীয়ার ধর্মীয় বিভেদের কথা আলোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে মুস্লিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কিংবা শেষ পর্যন্ত হিন্দু জনতার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে হবে এই ধারণা ভ্রান্ত। তাঁর বিশ্বাসের পিছনে তিনটি যুক্তি আছে- ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মানুষে ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠবে এবং বর্তমান কালের ভারতীয় মুসলমান দিন দিন ভারতবর্ষকে আপনদেশ বলে গ্রহণ করতে শিখবেন, এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনেক হ্রাস পাবে। অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে তার ওপর এই অবস্থা অনেকখানি নির্ভরশীল। ডাঃ স্পীয়ার বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতের মুসলমানরা এদেশের সঙ্গে অনেকখানি মিশে গেছেন, এবং এই মিশ্রণ এক শুভ লক্ষণ।

ভাষা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মরিস-জোনস অনুরূপ আশা প্রকাশ করেছেন। যেসব রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রের সীমায় আবদ্ধ তাঁদের ক্রিয়াকলাপ আঞ্চলিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু দলগত নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে উন্নীত হলে তাঁকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণে চিন্তা করতে হবে। তবে সর্বদা এইভাবে চলে না। রাজাগোপালাচারী ও কামরাজ নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তাঁদের মতবাদ ডি এম কের চেয়ে এককাঠি সরেস। তাছাড়া যেসব মানুষ আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তাঁরা সহজে আঞ্চলিক সংকীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন না। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও নয়। দশটির মধ্যে নটি ক্ষেত্রে এঁরা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ গন্ডীর ভেতরই কাজ করে থাকেন। লক্ষ্যটাও তেমনই সঙ্কীর্ণ।

অধ্যাপক মরিস-জোনস নিজেই বুঝেছেন যে তাঁর বিশ্লেষণ অতি সরল। তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন স্বয়ং নেহরু বা গান্ধীজীও সর্বদা ভাষার প্রশ্নে

মাথা ঠিক রাখতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—

"Gandhi preached Hindusthani as the national language, operated a machine which worked mainly in English and reorganised the units of the party on the basis of regional languages".

এর সঙ্গে তার নিজের উপদেশ যেন পরিহাস বিজল্পিত—

"that the capacity for sustaining the incompatibles is a truth worth bearing in mind?"

অধ্যাপক মরিস জোনস্ আশাবাদী তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন। সর্বভারতীয় মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী তার স্থান থেকে নেমে আসবে, তবে হিন্দি তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না, কারণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দির চেয়ে উন্নত ভাষা বর্তমান। তাছাড়া হিন্দি একটি অঞ্চলের ভাষা মাত্র, হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দান করার অর্থ অঞ্চল বিশেষকে প্রাধান্যদান। জনসঙ্ঘের সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কাঠিন্য কেটে যাচ্ছে এমন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেসীদের মধ্যেও যে হিন্দি বিরোধী মনোভাব বর্তমান তিনি তার উল্লেখ করেছেন।

সংস্কৃতধর্মী করে ভাষাকে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"the process by which a 'low' caste or tribe or other group takes over the customs, ritual, beliefs, ideology and style of life of a high and, in particular a twice born caste."

সংস্কৃতভাষার পুনরুজ্জীবনের মধ্যে পুনরভ্যুত্থানের গন্ধও পাওয়া যায়। সংস্কৃত হয়ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় করেছে কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের আকৃতি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুঘেঁষা। এর ফলে বহু অ-হিন্দু গোষ্ঠীকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস বলেছেন—

"One of the most important tasks which confronts independent India is to draw all sections of India's heterogeneous population into the mainstream of national life while at the same time retaining what is valuable in Sanskrit thought and culture"

এর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ এই বহু ধর্মমতের মানুষের দ্বারা রচিত ঐতিহ্যকে সমগ্র হিন্দু সমাজের উদার হৃদয়ে গ্রহণ করা। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য সামগ্রিকভাবে কি করে সবাই গ্রহণ করবে, এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চল যেখানে বিরোধের মনোভংগী নিয়ে মুখ অন্ধকার করে আছে, সেখানে এই উদার আবহাওয়া সৃষ্টি হবে কিভাবে?

ডাঃ বিটল অনুন্নত সমাজের কথা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"There are on the one hand, certain factor which tend to blur the outlines of the traditional structure and to bridge the gap between the backward classes and the advanced sections of society".

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এর অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনে জাতি বা বর্ণের ব্যাপারটি যেভাবে কাজে লাগানো হয় তার ফলে এর ঐতিহ্যাশ্রয়ী কাঠামো চলে পড়েছে। আধুনিকতার প্রভাব অনুন্নত সমাজের সামান্যতম অংশ স্পর্শ করেছে মাত্র।

এই জাতীয় বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে শিক্ষিত ভদ্র সমাজের ভূমিকা অধিকতর সংকটময় হয়ে উঠেছে। মিঃ ফিলিপস ম্যাসনের ভূমিকাংশে যে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করা হয়েছে তার ভিতর যেমন ঐক্যের সূত্র আছে তেমনই আছে চিন্তার খোরাক।

—অভয়ংকর

INDIA AND CEYLON: UNITY AND DIVERSITY: ...
A symposium. Editor—Phillip Mason. Published by OXFORD UNIVERSITY PRESS: Price Rs. 42.50 only.
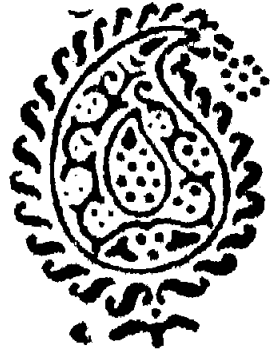
সাহিত্যের খবর

মধ্যকালীন গুজরাটী সাহিত্যমন তত্ত্ববিচার নামে গুজরাটী ভাষায় একটি বই বেরিয়েছে। রচয়িতা ডঃ নিপুণে আই পাণ্ড্যা। মধ্যযুগের গুজরাটী কবিতার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব ছিল, লেখক নিপুণভাবে তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখক অঙ্কন করেছেন সে-সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের নিখুঁত পরিচয়। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে বইটির অবদান অপরিসীম।

সম্প্রতি কানাডার সমকালীন কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন এ. জে. এম স্মিথ। কানাডাবাসী কবিদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজিতে কাব্য রচনা করেন এ-সংকলনে তাঁদের কবিতাই কেবল স্থান পেয়েছে। সম্পাদক দাবী করেছেন, যদিও এই কবিদের মাতৃভাষা ইংরেজি, তবু মূল ভূমিখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা তাঁদের কবিতায় একটা স্বতন্ত্র সুর এনেছে। এই সংকলনে বর্ষীয়ান কবিদের সঙ্গে তরুণ কবিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় র‍্যালফ গুটাফসনের কথা। ১৯৪২ সালে তিনি নিজেও কানাডিয়ান কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে কিন্তু যে স্বতন্ত্র সুরের কথা বলা হয়েছে, তার প্রভাব কম। বরং তিনি ভয়ানক মাত্রায় আমেরিকান কবিতার দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর 'অ্যারিওবারজেন্স' কবিতাটি পাঠ করলে উইলিয়ম কার্লো উইলিয়মের কথা মনে পড়ে। বর্ষীয়ান কবিদের আর একজন হলেন রবার্ট ফিঞ্চ। তিনি কানাডার একালের অন্যতম বিশিষ্ট প্রবীণ কবি। 'সিলভারথর্ণ ফিস' তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিত্রকল্প রচনা। চল্লিশ দশকের কবিদের মধ্যে জর্জ জনস্টন, মাইকেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারের কবিতা পড়লে যেন ডিলান টমাসের কথা মনে পড়ে যায়। তরুণ কবিদের মধ্যে আছেন মেরিয়াম ওয়াডিংটন, রনাল্ড যেটস, ডেভিড ওয়েভিল প্রমুখ। এই কবিদের মধ্যে মেরিয়াম ওয়াডিংটন বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই তরুণী কবির উপর আমেরিকান সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তিনি একটা নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করেছেন। তাঁর কবিতায় সমকালীন রাজনীতি, সমাজজীবন প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংরেজি বা আমেরিকান সাহিত্যের বাইরেও যে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠছে, কানাডার কবিতা তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের লেখা 'সুরসতিয়া' উপন্যাসটির হিন্দি অনুবাদ মধ্যপ্রদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লা মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় গত ১০ মার্চ একথা ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, এই উপন্যাসে মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিকৃত চিত্র এতে অংকন করা হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, লেখক শ্রীবিমল মিত্র এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন, বই আকারে প্রকাশের সময় এইসব আপত্তিকর অংশ বাদ দেওয়া হবে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

সংস্কৃত ভাষায় একটি পত্রিকা দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে, এ নিশ্চয়ই ভারতীয় সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শ্রীবসন্ত গ্যাডগিল 'সারদা' নামে এই পত্রিকাটি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনা করে আসছেন। একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি 'মহাত্মা গান্ধী' বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি নিবাস থেকে।

নতুন বই

রবীন্দ্র মনন (প্রবন্ধ)—শ্রীমন্তকুমার জানা। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দাম : আট টাকা।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রভাব আমরা ছাড়িয়ে এসেছি তিন দশক আগে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করতে পারিনি কিছুতেই। যদিও পালাবদলের ইঙ্গিত আসছে নানাদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ আয়ত পরিবেশ থেকে চিরায়তে ব্যাপ্ত হচ্ছেন। স্বভাবতই পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সমালোচকের মনে। প্রবন্ধকার শ্রীমন্তকুমার জানা এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুনভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিকোণ পুরোপুরি অবজেকটিভ। তত্ত্বের দিকে না গিয়ে তথ্যের ওপরেই নির্ভর করেছেন বহুলাংশে। প্রথম প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি'। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বাউল-সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা বার। সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সম্পর্ক নির্ধারণ করাই বোধহয় লেখকের উদ্দেশ্য। সবচাইতে বিতর্কিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা'। পাঠক কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবেন বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে ও বিচারের ভাষায়। কেননা, ছাত্রপাঠ্য অ্যাকাডেমিক আলোচনার গতানুগতিক রীতিকে অস্বীকার করে তিনি কোনো নতুন কথা শোনাতে পারেন নি। মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য আকস্মিক ও অতর্কিত চমক বলে মনে হয়: 'আশীর্বাণী' লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন।

Learn To Write Bengali (1) by B. Raichaudhuri, Orient Longmans Limited., 17 Chittaranjan Avenue, Cal-13. Price Rs. 1.50.

অবাঙালীদের জন্য বাংলা শেখার বই। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে হাতের লেখাটা যাতে রপ্ত করা যায়, তারই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। প্রথম পড়ুয়াদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলায় এ জাতীয় বই বেশী নেই বললেই চলে।

নারী আন্দোলন আজ আর কোন বিশেষ আলাদা কিছু নয়। এ হচ্ছে

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গোটা দুনিয়ারই প্রগতি-আন্দোলনের একটি অংশ। অর্থাৎ এই আন্দোলনও পরিচালিত হয় সুস্থ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যে, শ্রমের মুক্তি আর প্রাচুর্যের স্বাধীনতার জন্যে। সেই আন্দোলনেরই মুখপত্র **'চলার পথে'**।

সম্পাদিকা লিখেছেন, 'বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাবার হাতিয়ার হিসেবে এ-পত্রিকার জন্ম এবং আগামীকালের আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে এ-পত্রিকা তার যোগ্য ভূমিকা পালন করবে—এই আমাদের আশা।' এ-সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন রানী লাহিড়ী (নারী মুক্তি আন্দোলন ও লেনিনের শিক্ষা), উমা সেহানবীশ (ক্লারা জেটকিন), অরুণা হালদার, জাহানারা বেগম (পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েরা), মুক্তি মিত্র (পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ও আদিবাসী মেয়েরা), ভক্তি বিশ্বাস, অঞ্জলি রায়, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুলা সেন (মাদাম কামা)। বেলা দত্তগুপ্ত করেছেন মাদাম কুরীর 'একটি অপ্রকাশিত ডায়েরী'র অনুবাদ। তাছাড়া আছে গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনা। পত্রিকাটি নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হয়ে উঠবে বলে আমাদের ধারণা। সম্পাদিকা কমলা মুখোপাধ্যায়। ১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩।। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।।

'অনুক্ত'র বর্তমান সংখ্যাটির সম্পাদনায় বেশ দায়িত্বশীলতার ছাপ রয়েছে। ধারাবাহিক প্রকাশিত পুরবীর বিজয়া—ভিক্টোরিয়া—ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথা পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। কবি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে সুনীলকুমার নন্দীর প্রবন্ধটি উল্লেখ্য সংযোগ। শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ কবিতা, সুনীলকুমার নন্দী, লোকনাথ ভট্টাচার্য ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এবং কয়েকজনের গল্প এবং আলোচনা আছে বর্তমান সংখ্যায়। সম্পাদক : সুনীলকুমার নন্দী। ২২, বর্নফিল্ড লেন, কলিকাতা-১।

কবিতার সৃজন-মুহূর্ত আগে থেকে বলা যায় না—এরকম জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। তবু বেরিয়েছে 'মুহূর্ত-কাব্য'। সাব-টাইটেলে বলা হয়েছে : পৃথিবীর প্রথম মিনি পাক্ষিক কবিতাপত্র। আমরা প্রথম সংখ্যাটি দেখিনি। এ-সংখ্যায় লিখেছেন শঙ্কর দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল রায়, চণ্ডী পাল এবং আরো অনেকে। সম্পাদক : চণ্ডী পাল ও সুব্রত চক্রবর্তী। ঠিকানা : ৫২, মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ), কলকাতা ৩৬।। দাম : ২০ পয়সা।

পৃথিবীর অন্যতম অনুসাহিত্য পত্রিকা 'মুহূর্ত'কে নাকি মিনি প্রিন্স বলা হয়। লাইনোয় ছাপা এই পত্রিকাটি মুদ্রণ ও লেখার নির্বাচনে অনেকটা সিরিয়াস। লেখকদের মধ্যে আছেন দীনেশ দাশ, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, সত্য গুহ, সুনীল বসু, দীপঙ্কর সেন, মানব পাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর দত্ত। সম্পাদক : মানব পাল। ঠিকানা : ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯।। দাম : ২৫ পয়সা।

অন্য একটি মিনি পত্রিকা **'কৃষ্টি'**। দাম দশ পয়সা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ঘোষিত হয়েছে : কৃষ্টি তরুণ স্বপ্নের রূপকার। সম্পাদক : শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সুন্দর বসু।। ৫-ই, কাঁকুলিয়া [illegible], কলকাতা ১৯।।

উত্তর বাঙলার প্রথম মিনি পত্রিকা **'প্রান্তরেখা'**। সম্পাদক বলেছেন : 'আমাদের এ অনুপত্রিকায় সবই মিনি। লেখকরা মিনি। পরিসর মিনি, বলা বাহুল্য দামও 'মিনি' নয়। সময় যেহেতু আজ ঘোড়দৌড়ের মাঠে নেমে দুরন্তভাবে ছুটছে—অনুসাহিত্য অতএব, সেক্ষেত্রে অপরিচিত আগন্তুক নয়! তাই পরিসর স্মরণে রেখেই লেখাগুলিকে বিচার করবেন আশা করব।' তপন চক্রবর্তী, হিমাংশু রায়, সিন্ধন ভঞ্জ, নারায়ণ চন্দ, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত ঘোষাল, বিশ্বনাথ বসু, ধ্রুব চক্রবর্তী, সৌজেন সরকার রতন বিশ্বাস—এঁরা লিখেছেন কবিতা গল্প এবং আলোচনা। সম্পাদক : রতন বিশ্বাস এবং তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিকানা : তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দপাড়া (কদমতলা) জলপাইগুড়ি। দাম কুড়ি পয়সা।

মারাঠী সাহিত্যে রামগণেশ

সরোজিনী কমতনুরকর

রামগণেশ গড়করী লিখেছেন, "জীবনে বাঁচবার মতো কিছু থাকাতেই মৃত্যু হওয়ার একটা বিশেষ আনন্দ আছে।" ওঁর এই উক্তির পেছনে একটা মহান সত্য আছে। গড়করী মহাশয়ের জীবনে হয়েছিলও তাই। মারাঠী সাহিত্যে তাঁর অসীম প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঘটে তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যু। সে পঞ্চাশ বছর আগের কথা। রামগণেশের তিরোধান সাহিত্যক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি। সে ক্ষতিপূরণ অসম্ভব।

রামগণেশের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ বছর ধরে মহারাষ্ট্রের সাহিত্যিকমণ্ডলী এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যানুরাগী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এ-সৌভাগ্য মহারাষ্ট্রে একমাত্র গড়করীই লাভ করেছেন। বর্তমান বছর তাঁর মৃত্যুর অর্ধশত বার্ষিকীর বছর। সে উপলক্ষ ২৩ জানুয়ারী ১৯৬৯ থেকে ২৩ জানুয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে রামগণেশকে শ্রদ্ধা জানান হয়। সাহিত্য-সভা, বক্তৃতা, সাহিত্যের আলোচনা ও চর্চা, তাঁর লেখা নাটক মঞ্চস্থ করা, বেতারবাণীতে তাঁর জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা রামগণেশের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও মূল্যবান ভাষণ দিয়েছেন।

গুজরাটের নবসারী গ্রামে গড়করী বংশে রামগণেশের জন্ম ১৮৮৫ খৃঃ। গড়করী মানে কেল্লাদার, কেল্লার অভিভাবক। রামগণেশের পূর্বপুরুষ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যসীমানায় অবস্থিত মাণ্ডবগড় নামক দুর্গের কেল্লাদার ছিলেন। দক্ষিণ দেশ থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মহারাষ্ট্রীয় বীরমণ্ডলী ঐ মাণ্ডবগড়ের তটদেশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মাতৃভূমির দিকে ঘুরে দেখতেও পারতেন এবং দিল্লীর সম্রাট ও ভারতের অন্যান্য রাজাদের উপর চোখ রাঙাতেও পারতেন। রামগণেশের পূর্বপুরুষ যদিও সেকালে তেমন উল্লেখযোগ্য বীরত্বের অথবা কৃতিত্বের কোনো পরিচয় রেখে যাননি, তবুও রামগণেশের সাহিত্যিক কৃতিত্বে গড়করী বংশ উজ্জ্বল এবং মহারাষ্ট্রে চিরস্মরণীয় হয়েছে। রামগণেশের মা মারাঠী ইতিহাসে সুবিখ্যাত মাউলী প্রদেশের বারথ গ্রামের দেশপাণ্ডে বংশের মেয়ে।

জন্ম গুজরাটে, বাড়ির আশেপাশে গুজরাটীদের বসবাস, পরিবেশ ও আবহাওয়া গুজরাটী। এই সবের ফলে মহারাষ্ট্রের এই মহাকবির 'মুখ ফুটে তাঁর মনের কথা' গুজরাটী ভাষায় বেরিয়েছিল। তিনি ছেলেবেলায় গুজরাটী ভাষায় কথা বলতেন। স্বাভাবিকই গুজরাট ও গুজরাটী ভাষার দিকে তাঁর মনের বিশেষ টান ছিল। রামগণেশরূপী মহারাষ্ট্র - কাব্যকোকিলের কণ্ঠে যেমন গুজরাটী সুর প্রথম ফুটেছিল, তেমনি তিনি পাঁচ-ছয় বছর বয়সে 'সুর-সুন্দরী' (কিংবা এই অর্থের একটি) নাটক লিখেছিলেন। গড়করীদের বাসার কাছে একটি নাট্যসংস্থা ছিল। গড়করী বলতেন, "অভিনয়ের মহড়ার সময় ওদের যা হৈ-চৈ, হট্টগোল, চেঁচামেচি চলত, তা' শুনে শুনে আমি ঐ নাটক লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম।" মাত্র তিনদিনে পাঁচ-ছয় বছরের শিশুর সে-নাটক শেষ হয়ে উল্লিখিত নাট্যমণ্ডলীর ওখানে পেঁৗচেছিল। পাঁচ-ছ' বছরের শিশুর লেখা নাটকের কি গতি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

রামগণেশের ছোটবেলাকার ডাক-নাম ছিল 'লালজী'।

মেধাবী রামগণেশের মেজাজ বেশ একটু কড়া ও স্বভাব একরকম জেদী ছিল। তাঁর মনের বিরুদ্ধ কেউ কোনো আচরণ করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আবার তাঁর যা ভাল লাগত না, তাঁকে দিয়ে তা করানো কারও সাধ্য ছিল না। যা' করতে তিনি ভালবাসতেন, তা না করে ছাড়তেন না। রামগণেশের জেদী স্বভাবের উদাহরণ-স্বরূপ একটি মজার গল্প বলি। ছেলেবেলায় রামগণেশ নদীর বুকে সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু বাড়ির কর্তৃপক্ষ বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে নদীর ধারে যেতে দিতেন না। কিন্তু অল্প একটু অবসর পেলেই তিনি লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে নদীতে সাঁতার দিয়ে আসতেন এবং সেজন্য বকুনিও খেতেন। একবার ঐরকম লুকিয়ে তিনি সাঁতার দিতে গিয়েছিলেন। বাড়ির একজন বৃদ্ধ চাকর সে-কথা রামগণেশের বাবাকে বলেছিল। বাবার কাছে ঐ বৃদ্ধ চাকর তাঁর নামে নালিশ করেছিল ভেবে রামগণেশের এত ভয়ানক রাগ হয়েছিল যে, তিনি ঠিক করেছিলেন, রাত্রে ঐ বৃদ্ধ যখন তার খড়ের বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, তখন তার বিছানায় আগুন ধরিয়ে দেবেন। রামগণেশ পরবর্তীকালে সে-কথা নিজে কৌতুকচ্ছলে বলতেন, "বুড়োর ছোটো ছেলে আমার তখনকার বন্ধু ছিল। তার বাবাকে ওরকম পুড়িয়ে মেরে ফেললে তার মনে খুব কষ্ট হবে মনে করে আমি সেদিন বুড়োটার বিছানায় আগুন ধরিয়ে দিইনি। নইলে আমার নামে লাগিয়ে দেবার জন্যে তাকে আমি নিশ্চয়ই জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলতাম।"

তাঁদের পাশের বাড়ির গুজরাটীদের একটি ছোট মেয়ে—রোজ ইস্কুলে যাবার সময় রামগণেশকে ডাকতে আসত। মেয়েটির নাম ছিল দুরামন। "লালজী, চলো ভাই ইস্কুলে", বলে দুরামন যেই ডাকত অমনি লালজী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মতো 'ইস্কুল-পালানো' ছেলে। ইস্কুলে যেতে তাঁর ভাল লাগত না। দুরামনকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি কি কি উপায় ও যুক্তি খুঁজে বের করতেন এবং শেষে নিরুপায় হয়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে কি করে ইস্কুলে যেতে হত ইত্যাদি কথাও রামগণেশ পরে খুব রসিয়ে রসিয়ে বলতেন।

রামগণেশের জেদী স্বভাব পরবর্তী-কালে তাঁর বন্ধুবান্ধব ভাল করেই অনুভব করেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর শেষ-অসুখের সময়। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাঁকে পোষ মানিয়ে ওষুধপত্র খাওয়াতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর যে অনেক কারণ ছিল তার একটি ছিল তাঁর জেদী স্বভাব।

পিতৃবিয়োগের পর রামগণেশ বোম্বাইর নিকটবর্তী কর্জত গ্রামে তাঁর কাকার আশ্রয়ে যান। সেখানে কর্জতের ইস্কুলে ভর্তি হন। কর্জতের ইস্কুলের নানাবিধ স্মৃতি শেষপর্যন্ত রামগণেশের মন পুলকিত করত। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির ভবিষ্যৎকালীন কৃতিত্ব যিনি জেনেছিলেন এমন একজন শিক্ষক কর্জতের স্কুলে ছিলেন। তাঁর নাম কৃষ্ণাজী ভিকাজী জোগলেকর। জোগলেকর মহাশয় তখন কর্জতের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রামগণেশ ভবিষ্যতে একজন নামকরা লেখক হবেন—এ-কথা জোগলেকর বোধহয় বুঝে-ছিলেন। তাই তিনি রামগণেশের পড়াশুনো

ও অন্যান্য ব্যবহারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাঁকে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। জোগলেকর রামগণেশকে ইংরাজি ভাষার হাতেখড়ি দিয়ে তাঁকে এ বি সি ডি শিখিয়েছিলেন। ইংরাজি ফার্স্ট প্রাইমারের একটি পাতা ছেড়ে সমস্ত বইখানি পড়িয়ে জোগলেকর বলেছিলেন, "আমি যতদূর ইংরেজি জানি, তার চেয়ে একপাতা তোমাকে কম পড়ালাম। ঐ একপাতা না শিখলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি ভবিষ্যতে মস্ত বড় পন্ডিত হবে তা আমি নিশ্চয়ই জানি।" এই বলে তিনি রামগণেশের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁকে সস্নেহ আশীর্বাদ করেছিলেন। রামগণেশ জোগলেকরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন।

ম্যাট্রিকুলেশনের সময় রামগণেশ পুণায় যান। সেখানে মহারাষ্ট্রের অসামান্য মহানুভব ব্যক্তি তিলক, আগরকর ও চিপলুণকর দ্বারা যে শিক্ষাসংস্থার ভিত্তিপত্তন হয়েছিল, সেই ডেকান এডুকেশন সোসাইটির নিউ ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন। বোম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সময় তিনি তাঁদের সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। ঐ ছাত্রবৃত্তির জন্য তিনি পুণার ফর্গুসন কলেজে পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর কলেজ শিক্ষার দুই পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনি ১৯০৬ খৃঃ জানুয়ারি থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত কলেজে ছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯১২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। ছেলেবেলার অন্যান্য স্মৃতি যেমন তাঁর মনে চিরকাল অঙ্কিত হয়েছিল, তেমনি নিউ ইংলিশ স্কুল এবং ফর্গুসন কলেজের স্মৃতি তাঁর মনের আকাশে আজীবন উজ্জ্বল ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রামগণেশ দু-দুবার কলেজে গিয়েও কলেজ-শিক্ষা শেষ করতে পারেননি। ছোটবেলায় যদিও তিনি ইস্কুলে যেতে ভালবাসতেন না, তবু ফর্গুসন কলেজে শিক্ষালাভ করে বোম্বাই ইউনিভার্সিটির বি-এ পদবী লাভ করবার জন্য তাঁর মন উদ্বিগ্ন ও আকুল হয়েছিল। কিন্তু রামগণেশের জীবনে তাঁর ঐ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত তিনি সুবিখ্যাত কির্লোস্কর নাটক মন্ডলীতে এবং তারপর নিউ ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকের কাজ করেন।

রামগণেশ ফর্গুসন কলেজকে এত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, এমন শ্রদ্ধা করতেন যে, তিনি বারবার তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের বলতেন, "আমি মরলে আমার হাড়গুলো ফর্গুসন কলেজের প্রবেশদ্বারের মাঝখানে, শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের যাওয়া-আসার পথে পুঁতে রেখো। ঐ পথে যাতায়াতের সময় তাদের পদধূলি অনায়াসে আমার মাথায় পড়বে।" কিন্তু তা কি হয়! তাঁর অনুরাগী ছাত্রেরা ফর্গুসন কলেজের হোস্টেলে যে-ঘরে রামগণেশ বাস করতেন, সেই ঘরের প্রবেশদ্বারের উপরে তাঁর নামের একটি সুন্দর প্ল্যাব বসিয়ে তাঁর নাম সেখানে চিরজীবী করে রেখেছেন। আর পুণার সম্ভাজী পার্কে, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কণ্ঠের কলকলী কল্লোলিত হয়, যুবক-যুবতীরা বেড়াতে যান, প্রীতি-সংলাপে আবহাওয়া মধুর হয়ে ওঠে, সেখানে তাঁর একটা ব্রোঞ্জের আবক্ষমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাঁরা প্রতিদিন সম্ভাজী পার্কে যান, তাঁরা স্বাভাবিকই ভক্তিপূর্ণ নয়নে রামগণেশের ঐ মূর্তি দেখেন এবং আপন ভক্তিঅর্ঘ্য প্রদান করেন।

রামগণেশের ভাল ভাল বই পড়ার একটা নেশা ছিল। ইস্কুল কলেজে এবং পরে কির্লোস্কর মন্ডলীর বাসায় থাকাকালে তিনি সময় পেলেই মারাঠি, ইংরাজি এবং সংস্কৃত বই পড়তেন। কলেজে রোজ রাতে অন্তত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা না পড়ে তিনি ঘুমোতেন না। তিনি কত আর কি কি পড়েছিলেন তার শেষ নেই। তাঁর ঐ রকম প্রচুর পড়ার অভ্যাসই তাঁকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করেছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করে।

কির্লোস্কর নাটকমন্ডলীতে এবং নিউ ইংলিশ স্কুলে শিক্ষ দানের কাজ করতেন বলে গড়করী তাঁর সমকালীন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ও তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে 'গড়করী মাস্টার' নামে পরিচিত।

রামগণেশ যখন কির্লোস্কর নাটকমন্ডলীর আশ্রয়ে ছিলেন তখনই তাঁর নাটক লেখার সূত্রপাত। কির্লোস্কর নাটকমন্ডলী তখন শ্রীপাদকৃষ্ণ কোল্হটকর মহাশয়ের নাটক অভিনয় করতেন। সেই উপলক্ষে রামগণেশের শ্রীপাদকৃষ্ণের সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। তাঁর নাটকের সৌন্দর্য, রস, লালিত্য, বুদ্ধির ঝলক ইত্যাদি প্রতিদিন মহড়ার সময় দেখে ও অনুভব করে শ্রীপাদকৃষ্ণের সাহিত্যিক কৃতিত্ব রামগণেশের মন আকৃষ্ট করেছিল। তাঁকে নাটক লিখতে প্রেরণা দেয়। সেই জন্য তিনি শ্রীপাদকৃষ্ণ কোল্হটকর মহাশয়কে তাঁর নাটক লেখার গুরু মেনেছিলেন। রামগণেশ কখনও কখনও তাঁর গুরুকে অনুকরণও করেছেন, কিন্তু কচিৎ তাঁর লেখা শ্রীপাদকৃষ্ণের লেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সমুজ্জ্বল হয়েছে।

শ্রীপাদকৃষ্ণ কোল্হটকর আধুনিক মারাঠী নাট্যকারদের মধ্যে চতুর্থ দিকপাল। **আন্নাসাহেব কির্লোস্কর, গোবিন্দবল্লাল দেবল, কৃষ্ণাজী প্রভাকর খাড়িলকর, শ্রীপাদকৃষ্ণ** কোল্হটকর এবং রামগণেশ গড়করী মারাঠী নাট্যসাহিত্যের অনুক্রমে পঞ্চ দিকপাল। * ও'রা মারাঠী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, মারাঠী রঙ্গমঞ্চের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

মারাঠী নাট্যকাররা বাঙালী নাট্যকারদের মতো বেশী নাটক লেখেননি। তাঁরা প্রত্যেকে যে কয়েকটি করে নাটক রচনা করেছেন, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর নাটক। ঐসব নাটকের কতশত অভিনয় হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মারাঠী নাটকের বিষয়, প্রসঙ্গের সুগঠন, কালের সামঞ্জস্য, চরিত্রের পরিমিত সংখ্যা ইত্যাদির দিক দিয়ে মারাঠী নাটক অনুকরণীয়।

রামগণেশ মোট ছয়খানি নাটক রচনা করেন। দুটি অসম্পূর্ণ এবং চারটি সম্পূর্ণ। ১) বেড্যাণ্ডা বাজার (পাগলাহাট), ২) প্রেমসন্যাস, ৩) পুণ্যপ্রভাব, ৪) একচপ্যালা (মাত্র এক পেয়ালা), ৫) ভাববন্ধন, এবং ৬) রাজসন্যাস। নাটকগুলি এখনও সোৎসাহে ও সমারোহে অভিনয় করা হয়।

বেড্যাণ্ড বাজারের প্রথম তিন অঙ্ক রামগণেশের নিজের লেখা। * নাটকের কাহিনী উচ্চশ্রেণীয় কৌতুকরসে ভরপুর। একটি নাটকের প্রত্যেক ব্যক্তি যে-কোন একটি বিশেষ কল্পনায় মেতে প্রায় পাগল। ওদের ঐরকম পাগলামির ফলে এমন সব গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং এমন কৌতুকময় আবহাওয় বাড়িটাকে ছেয়ে রাখে যে তাদের সংলাপে প্রতি মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় প্রেক্ষাগৃহ ভেসে যায়। দর্শক সেই মনভরা হাসির ভাব সঙ্গে নিয়েই বাড়ি যান।

'প্রেমসন্যাস' (১৯১২) নাটকখানির বিষয় তৎকালীন বালবিধবাদের দুর্গতি ও তাদের পুনর্বিবাহের সমস্যা। রামগণেশ ঐ নাটকের দ্বারা নির্ভীকচিত্তে, স্পষ্টরূপে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচার করেছেন। অথচ তিনি প্রেমসন্যাস নাটকে পুনর্বিবাহ দেন নি। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে দোষ দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি সমাজের নিন্দার ভয়ে নিজের নাটকে পুনর্বিবাহ দেননি।

রামগণেশ তাঁর প্রেমসন্যাস নাটকখানি তাঁর নাট্যসাহিত্যের গুরু শ্রীপাদকৃষ্ণ কোল্হটকরকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গে তিনি লিখেছেন, "এর যা ভাল তা আপনাকে

---

* প্রথম মারাঠী নাটক লেখা হয় ১৮৪৩ খৃঃ। বিষ্ণুদাস ভাবে 'সীতা স্বয়ংবর' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। নাটকখানি তৎকালীন **সাঙলী** রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা **'প্রথম চিন্তামনরাও আন্নাসাহেব পটবর্ধন** এ'র পৃষ্ঠপোষকতায় সাঙলীতে কৃষ্ণা নদীর ঘাটে অভিনীত হয়। সেই জন্য 'সীতা স্বয়ংবর' মারাঠী প্রথম নাটক এবং বিষ্ণুদাস ভাবে মারাঠী আদি নাটককার বলে খ্যাত। কিন্তু ঐ নাটকের গঠন ও রচনা নাটক বলতে যা বোঝায় সেরূপ ছিল না। কিছুটা বাংলাদেশের 'যাত্রা' কিংবা 'পালা'র মতো ছিল 'সীতা স্বয়ংবর'। বাংলা প্রথম নাটক 'ভদ্রার্জুন' ১৮৫২ খৃঃ মঞ্চে প্রকাশ পায়। সেই হিসাবে মারাঠী নাটক বাংলা নাটকের চেয়ে নয় বছরের বড়। তারপর যে সকল অন্যান্য ইংরাজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ কিংবা রূপান্তরিত নাটক মারাঠী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল সেগুলি ক্ষণকাল বাদ দিলে, আন্নাসাহেব কির্লোস্কর মহাশয়ের 'সৌভদ্র' নাটকই মহারাষ্ট্রের প্রথম সুগঠিত, সুরচিত পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত প্রধান নাটক এবং আন্নাসাহেবই আধুনিক নাট্যসাহিত্যের প্রথম দিকপাল।

* রামগণেশের মৃত্যুর পর চিন্তামন গণেশ কোল্হটকর নামে এক অভিনেতা ঐ নাটকের অবশিষ্ট ভাগ লিখে নাটক সম্পূর্ণ করেন। বলাবাহুল্য যে রামগণেশের নিজের লেখা প্রথম তিন অঙ্ক এবং পরবর্তীকালে লেখা অবশিষ্ট অঙ্ক—এই দুইএ বৃহৎ তফাৎ সুস্পষ্ট।

উৎসর্গ করলম—দোষ ত্রুটি আমার নিজের রইল।" ঐ উৎসর্গ যখন আমি প্রথম পড়েছিলাম তখন আমার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়েছিল। তিনি কণিকায় লিখেছেন,—

'চন্দ্র কহে বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর
গায়ে।"

উক্ত উৎসর্গ এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য পংক্তি এই দুইএ কবি মনোভাবের যে চমৎকার সাদৃশ্য, তাতে মন উদ্বেলিত হয়।

'পুণ্যপ্রভাব' (১৯১৭) নাটকে ভারতীয় নারীর পতিব্রতা ধর্মের উচ্চতা ও শক্তি এবং মাতৃভাবের মহান গরিমা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকটি উচ্চশ্রেণীর। পুণ্যপ্রভাব একটি সুন্দর কমেডী।

'ভাববন্ধন' নাটকের চেহারা আবার একটু আলাদা। কিন্তু এই নাটকখানিও একটি ভারী সুন্দর কমেডী। ঘটনা প্রসঙ্গের সংঘাতে নাটকের কাহিনী এমন সুশ্রীভাবে বিকাশ পায় যে নাট্যতত্ত্বের দিক দিয়ে কয়েকটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, নাটকটি অত্যন্ত লোকপ্রিয়। মানুষের মন ভাবের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে কিরূপে সুবদ্ধ এবং ভাবই মানুষকে প্রিয়জনের জন্য কত বড় স্বার্থত্যাগ করতে সক্ষম করে, তার একটি কলাকৌশলপূর্ণ শব্দচিত্র ঐ ভাববন্ধন নাটক। গড়করী ভাববন্ধনের বেশীর ভাগ ১৯১৮ খৃঃ লিখেছিলেন। শেষের ভাগ ২৩ জানুয়ারী, ১৯১৯ খৃঃ, তাঁর মৃত্যুর দিন, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েই মুখে
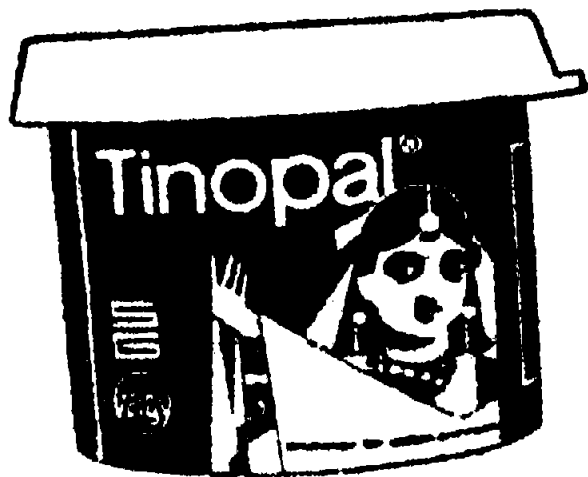
মুখে বলেছিলেন। তাঁর পুত্রবৎ প্রিয় পান্ডুরঙ্গ বাপট লিখে নিয়েছিলেন। পান্ডুরঙ্গ বাপট রামগণেশের শেষ পর্যন্ত সেবা করেছিলেন। সেদিন রামগণেশ এত জোরে বলছিলেন যে তাঁর মা ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, "লালজী, কত জোরে বলছ, তুমি যে খুব দুর্বল হয়েছ......।" লালজী বললেন, "মা, ঐ বাক্যগুলি যে ফৌজদারের মুখের, উঁচু গলায়ই বলতে হবে।"

'একচপ্যালা' (১৯১৭ খৃঃ) নাটকে মদ খাওয়ার কুফল ব্যক্ত হয়েছে। এটা একটা ট্র্যাজিডি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন সুবিদ্য, সুশীল উকিল দৈবাৎ মদ খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ মদ্যপ হয়ে ওঠেন। শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজের পতিপরায়ণা স্নেহরূপিণী স্ত্রী ও শিশুকে হত্যা করে নিজের জীবনও কেমন করে শেষ করেন সেই দুর্ভাগ্যের কাহিনী একচপ্যালায় হৃদয়স্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে।

'রাজসন্ন্যাস' অসম্পূর্ণ হলেও নাটকখানি রামগণেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। আগেকার উল্লিখিত নাটকসমূহ রামগণেশের কাঁচা হাতের লেখা। তথাপি তাদের নিজস্ব সৌন্দর্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অস্বীকার করা যায় না। 'রাজসন্ন্যাস' রামগণেশের কপালে নাট্যসাহিত্যিকের রাজটিকা পরিয়ে দিয়েছে। রামগণেশকে মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার বলে চিহ্নিত করেছে। রাজসন্ন্যাসের এক একটি বাক্য নাট্যভান্ডারের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার পুত্র ছত্রপতি সম্ভাজীর জীবনচিত্র এই নাটকের বিষয়। রামগণেশ দেখিয়ে দিয়েছেন যে বীরের সন্তান কখনও কাপুরুষ হয় না। বীর শিবাজীর পুত্র বীর সম্ভাজী আওরঙ্গজেবের কারাগারে বীরের ন্যায় মরণকে বরণ করে নিলেন, কিন্তু জাতি-ধর্ম-দেশকে লাঞ্ছিত হতে দিলেন না।

রাজসন্ন্যাসে ছত্রপতি সম্ভাজীর মুখের বাণী, "রাজা হা জগাচা উপভোগশূন্য স্বামী। রাজ্য উপভোগ, হ্মণজে রাজসন্ন্যাস" (রাজা জগতের উপভোগবিহীন স্বামী। রাজত্ব উপভোগ করা, মানে রাজসন্ন্যাস।) এই মহৎ বাণী শুনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'হে রাজ-তপস্বি বীর...
ধ্বজা করি উড়াইব
বৈরাগীর উত্তর বসন
দরিদ্রের বল"

রামগণেশও তাই বলেছেন। রাজসন্ন্যাস মানেই রাজতপস্যা। গৈরিক পতাকাই বৈরাগীর উত্তর বসন—দরিদ্রের বল। দুই কবি প্রতিভার মিল দেখে মন বিস্মিত হয়।

রামগণেশ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ 'রাজসন্ন্যাস' ছত্রপতি শিবাজীর অসাধারণ নিষ্ঠাবান, প্রভুভক্ত একটি শ্বানকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইতিহাস বুক ফুলিয়ে বলছে একটি শ্বানের অপূর্ব ইমানদারীর কাহিনী। ছত্রপতি শিবাজীর একটি শ্বান ছিল। সেই জীব তার প্রভুকে এত ভালবাসত যে তাঁকে ছেড়ে সে এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্বলন্ত চিতায় লেলিহান অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণোৎসর্গ করে। রায়গড়ে ছত্রপতি শিবাজী রাজার সমাধির পাশেই ঐ শ্বানের সমাধি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নরদেহের বৃথা গর্ব ছেড়ে, ঐ চতুষ্পদ জন্তুর পূজার জন্য, ঐ আশ্চর্য স্বামীভক্ত ইমানদার কুকুরের উদ্দেশে আমি আমার 'রাজসন্ন্যাস'রূপী গিরিপর্বতে প্রস্ফুটিত বনফুলের সাজি উৎসর্গ করলাম।" এমন আশ্চর্য, অপূর্ব উৎসর্গ পৃথিবীর সাহিত্যে আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করায় রামগণেশের বিশেষ ক্ষমতাশালী ভঙ্গী পাঠক দর্শককে অভিভূত করে। চরিত্রগুলি যেন পাঠক দর্শকদের সম্মুখে জীবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় ওরা যেন আমাদের সুপরিচিত। ওদের বুঝি আমরা সমাজে অন্যান্য পরিবেশে বারবার দেখতে পাই। বেড়াপ্তা বাজারের অন্যান্য চরিত্র; প্রেমসন্ন্যাসের লীলা-জয়ন্ত, মনভোলা গোকুল ও তার স্ত্রী মথুরা, আধুনিকতায় মত্ত বসন্ত-বীণা; পুণ্যপ্রভাবের তেজস্বিনী পতিব্রতা বসুন্ধরা ও কালিন্দী, কৌতুকময় নূপুর, কঙ্কন, সুদাম, কিঙ্কিনী, দামিনী; একচপ্যালার সুধাকর, সিন্ধু ও গীতা; ভাববন্ধনের মালতী, লতিকা ও মমতাময় মনভোলা পিতা ধুন্ডিরাজ; রাজসন্ন্যাসের মনঃশক্তিশালী বীরশ্রেষ্ঠ সম্ভাজী ও নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ সেবক সাবাজী এঁদের আমরা কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। ওঁরা আমাদের মনে চিরঅঙ্কিত। যেমন শেক্সপিয়রের চরিত্রগুলি।

রামগণেশের নাটকের খলনায়করা ওঁর স্বতন্ত্র অভিনব সৃষ্টি। ওরা খলপুরুষ হলেও নাট্যকার এমন সুনিপুণ হাতে ওদের স্বভাব বিকশিত করেছেন, যে পাঠক দর্শকের মন অভিভূত হয়। প্রেমসন্ন্যাসের কমলাকর, ভাববন্ধনের ঘনশ্যাম এবং পুণ্যপ্রভাবের বৃন্দাবন যদিচ খল, তবু মনে হয় 'ওরাও মানুষ'।

এই নাটকগুলির পর আরও আঠারটি নাটক লেখার সঙ্কল্প ছিল রাম গণেশের। ঐ সকল নাটকের প্লট তাঁর মনে তৈরি ছিল, একথা আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি। কিন্তু কি জানি কেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁকে সে অবসর ও সুযোগ দিলেন না। তাঁর খেলা আমরা কেমন করে জানি!

কবি হিসাবে রাম গণেশ আধুনিক মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কবি 'কেশবসুত'কে তাঁর আদর্শ মেনেছিলেন ও যথাশক্তি তাঁকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। রাম গণেশের কবি ছদ্মনাম 'গোবিন্দাগ্রজ'। গোবিন্দাগ্রজের 'বাগ্বৈজয়ন্তী' নামে একটি মাত্র কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তবু ঐ একটি কাব্যসংগ্রহে কবির প্রতিভা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গভীর ভাবাপন্ন, দার্শনিক তত্ত্বময়, আধ্যাত্মিক, সত্য ঘটনাবলম্বী, বর্ণনাত্মক, শিশুসম্বন্ধীয়, কৌতুকরসপূর্ণ, উপহাসসংকুল ইত্যাদি বহুবিধ কবিতায় 'বাগ্বৈজয়ন্তী' সুসমৃদ্ধ। গোবিন্দাগ্রজের 'বাগ্বৈজয়ন্তী' একটি অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠ কাব্যের সঙ্কলন। যদি বলি তাঁর কোনো কোনো কবিতা পড়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা মনে পড়ে, তাহলে অত্যুক্তি হয় না। না জানি গোবিন্দাগ্রজ আয়ুষ্মান হলে হয়ত তিনি মহারাষ্ট্রের রবীন্দ্রনাথ হতেন এবং বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্র আরো দৃঢ়তর 'ভাববন্ধনে' সুবদ্ধ হয়ে উঠত। বাগ্বৈজয়ন্তীর 'মহারাষ্ট্র গীত', 'মুরলি' 'রাজহংস মাঝা নিজলা' (ঘুমিয়েছে মোর রাজহংস), 'শ্মশানগীত', 'ঘুবড়' (পেঁচা), 'ফুটকী তপেলী' (ফুটো ঘটি), 'কৃষ্ণাকাঠী কুন্ডল' (কৃষ্ণা নদী তীরে কুন্ডলগ্রাম), 'চিন্তাতুর জন্তু' (চিন্তামগ্ন কীটক), 'বিহীনীচা কলকলাট' (বেয়াননীদের হট্টগোল) ইত্যাদি কবিতা পাঠকের মন অভিভূত করে।

তাঁর কৌতুকরসের লেখার ছদ্মনাম 'বালকরাম'। রামগণেশের ব্যঙ্গ-রস-রচনার সঙ্কলন 'রিকামপণ্‌চী কামগিরী' (ফুরসৎএর সময়কার কাজ), কিংবা 'সম্পূর্ণ বালকরাম'। বালকরাম পড়ে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য সাহিত্যিক গোল্ডস্মিথ, ডিকেন্স, জেরম কে জেরম এবং মার্ক টোয়েনের রচনা রামগণেশকে প্রভাবিত করেছিল। রামগণেশের রসঘন লেখা পাঠককে বিমুগ্ধ করে। রামগণেশের চমৎকার রসপূর্ণ 'বালকরাম' বাংলাদেশের সুকুমার রায়, মণিলাল ও মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশেষত শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু মহাশয়ের সুললিত সাবলীল ব্যঙ্গ সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মারাঠী সাহিত্যে বালকরাম হচ্ছেন রসিকরাজ।

রামগণেশের স্বল্পায়ু তাঁকে সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। তবু ঐ অল্পকালে তিনি যা লিখেছেন তাতে মারাঠী সাহিত্যের [illegible] ঐতিহ্য রক্ষা করে তাঁর সমকালীন [illegible] লেখকদের যশঃকীর্তি ছাপিয়ে দেশবাসীর মনপ্রাণ জুড়ে অমর হয়েছেন। না জানি তিনি কি তাঁর মৃত্যুর ডাক শুনেছিলেন? মৃত্যুর আগমন জানতে পেরেছিলেন কি? বোধহয় তাই। সেই জন্য তিনি নিজের 'মৃত্যুলেখা' লিখেছিলেন—

যাবজ্জীবহি কায় মী ন কড়ে
আপ্তাপ্রতি নীটসে
মিত্রাতেঁহি কড়ে ন গূঢ়—
ন কড়ে মাঝে মলাহি তসে
অজ্ঞাতা! মরণোত্তর প্রকট তে
হোঈল তুঁতে কসে?
কোঠে আনি কধীতরী জগতি মী
হোউন গেলো অসে।।১।।

অর্থ ঃ—নারে বুঝিবারে আত্মস্বকীয়
কে বা আমি সংসারে
নাহি বুঝে মোর বন্ধু—
আমি কেমনে বুঝিব ওরে!
ওহে অজ্ঞাত! বুঝিবে কি তুমি
মম মৃত্যুর পরে?
কোথা যেন আমি কোন একদিন
এসেছিনু এই ধরে!

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ছবি

রুশদেশে সংস্কৃতিচর্চা ও অন্যান্য

চিন্মোহন সেহানবীশ
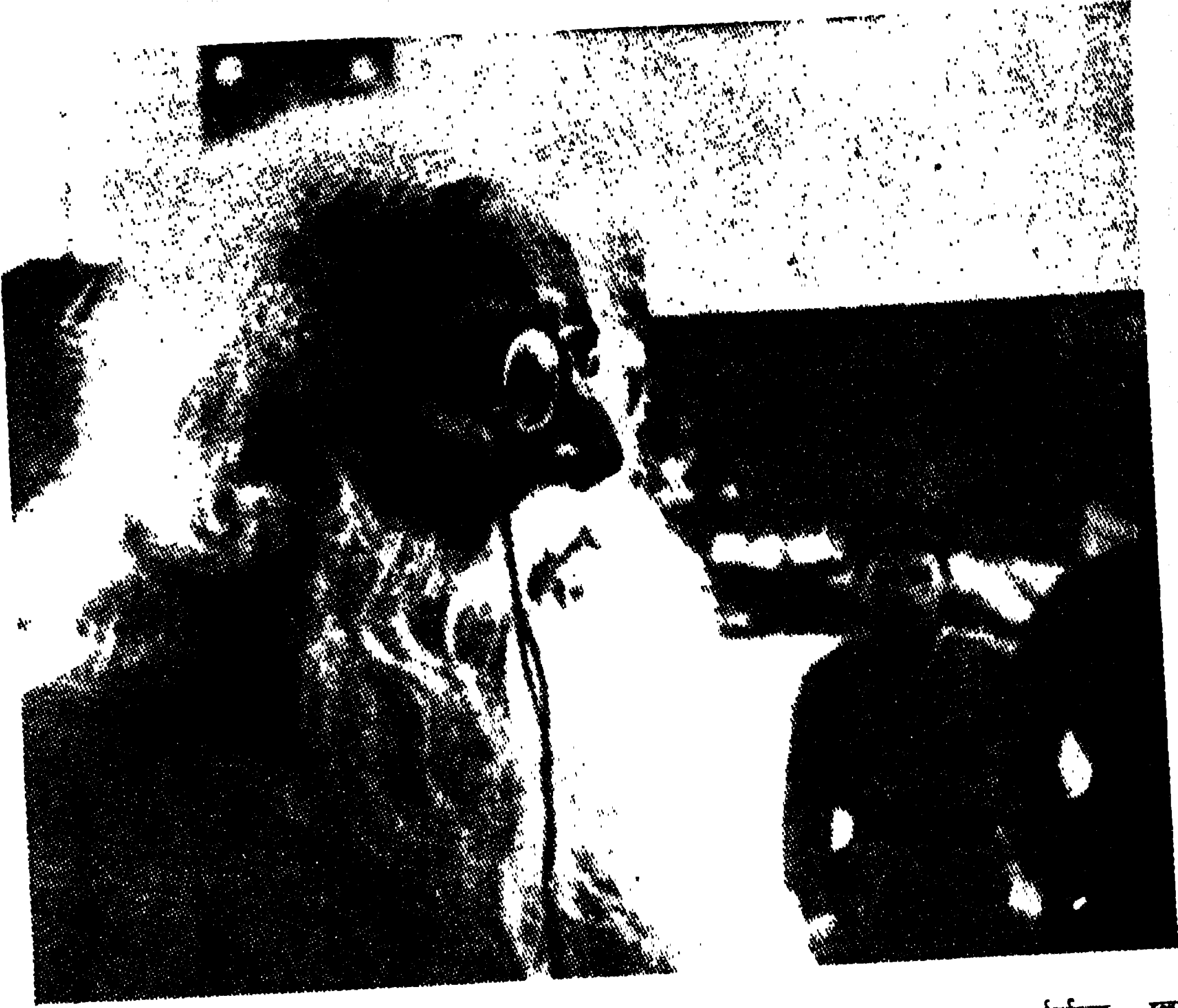
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সোভিয়েত পন্ডিতদের মূল প্রশ্ন তখনকার সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট। সে সমাজকে শুধু ফিউডাল বলেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেন নি, সেই ফিউডালতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি, তার উদ্ভব কিভাবে হল, ইউরোপীয় ফিউডালতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য কি, তার মধ্যে বিকাশ-প্রক্রিয়া কাজ করে কতটা ও কিভাবে, তার মধ্যে বিভিন্ন স্তর এবং উন্নততর সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল কি-না ইত্যাদি গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন আই. এস. রেইজনার ও এ এস আসিপভের মতো পন্ডিত। আসিপভের মতে ফিউডালতন্ত্র চালু হওয়ার পরেও দাস-প্রথা একেবারে লুপ্ত হয়নি, তবে ক্রমশ তার স্থান অধিকার করতে করতে ফিউডাল ব্যবস্থা সাত শতকে পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক সোভিয়েত গবেষকেরা মনে করেন যে পাঁচ থেকে সাত শতক হচ্ছে ফিউডালতন্ত্রের গঠনের কাল আর তার প্রকৃত সুপ্রতিষ্ঠা ঘটে ৭-৮ শতকে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীমতী কে এ এন্টোনোভা ও ই এন মেদভেদেভ।

মধ্যযুগীয় ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন জমির রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত স্বত্বের প্রশ্নে। এই প্রশ্ন নিয়ে সর্বাধিক মাথা ঘামিয়েছেন সম্ভবত অধ্যাপক রেইজ্নার। বর্তমানে তাঁর ও শ্রীযুক্ত কোমারভ ও শ্রীমতী সেমিয়েনোভার মতো গবেষকদের মত হচ্ছে মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় স্বত্ব ক্রমশ ক্ষয় পেতে এবং তার স্থান গ্রহণ করতে থাকে ব্যক্তিগত স্বত্ব। ঐ স্বত্বের নানারূপ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন কে আস্রাফিয়ান।

মধ্যযুগের বিভিন্ন লোক-আন্দোলন, তার উদ্ভব ও চরিত্র সম্পর্কে কাজ করছেন রেইজ্নার, আসিপভ, এন্টোনোভা, আস্রাফিয়ান প্রমুখ বহু পন্ডিত। এর মধ্যে 'সতেরো ও আঠারো শতকে ভারতের লোক আন্দোলন' নামে রেইজ্নারের বইখানিতে আছে (তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) ঐ ধরনের আন্দোলনের, বিশেষ করে শিখ, জাঠ ও মারাঠাদের মধ্যে সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র ও ভূমিকার বিশ্লেষণ।

আধুনিক পর্বে পৌঁছে সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিকেরা যে মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে মাথা ঘামান সেগুলি হল : ঔপনিবেশিক দাসত্বের অব্যবহিত প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর, দেশের সমাজ-জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উৎস, তার সামাজিক চরিত্র ও গতিপথ। এর মধ্যে প্রথম প্রশ্ন নিয়ে সোভিয়েট পন্ডিতদের মধ্যে প্রচন্ড বিতর্ক চলে বহুদিন ধরে। এখন মোটের উপর তাঁদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ঔপনিবেশিক যুগের আগে বহু শতক জুড়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা একেবারে অচল, অনড় ছিল—এই ধারণা ঠিক নয় এবং ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে দরকারী কিছু সর্ত পূরণও হয়েছিল শেষ দিকে। তবে ফিউডালতন্ত্রের দম তখনো ফুরোয়নি

পুরোপুরি—তাই নতুন সম্পর্কের উদ্ভবের পথ জুড়ে সেদিন দাঁড়াতে পেরেছিল ঐ ব্যবস্থা। ভি আই পাভলভ আরো এগিয়ে গিয়ে তাঁর নিবন্ধে লিখলেন যে ভারতে ধনতন্ত্রের যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধ্বংস হয়ে যায় ঔপনিবেশিকদের হাতে আর তারপর কারখানা উৎপাদন ব্যবস্থা ফের এখানে ঐ শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে চালু হয় ঔপনিবেশিকদের চেষ্টায় ও স্বার্থে।

দেশের অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রভাব যে ক্ষতিকর সে সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকেরা নিঃসংশয়—তবে এ'ও তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমানকালে ভারতীয় সমাজে অগ্রগতির ধারা দেশের ভিতরে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কাদির উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধির উপরে নির্ভরশীল যদিও সে-সম্পর্ক ঔপনিবেশিক অবস্থার দরুণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বিকৃত চরিত্রের।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত পন্ডিতেরা প্রথমেই নজর দেন সিপাহী-বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উপরে। বিশেষ করে অসিপন্ত বিদ্রোহীদের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশক ও বিশ শতকের গোড়ার দশক সম্পর্কেও সোভিয়েত পন্ডিতদের বেশ কিছু গবেষণামূলক রচনা তিলকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। এ'দের মধ্যে ছিলেন গোল্ডাবার্গ, কতভস্কি, পাভলভ, কোমারভ, লেভকভস্কি, গর্ডন, চিচেরভ ও রেইজনার। এ প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে মহারাষ্ট্রে গত শতকের সত্তরের পর্বের জাতীয় ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম, বাংলা দেশের স্বদেশী, ১৯০৫-'০৮ সনের সারা দেশ জোড়া জাগরণের বিচার আর এ সবের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ। এ বইখানির ইংরেজী সংস্করণ দিল্লীর পিপলস পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে সহজলভ্য হয়েছে এদেশের পাঠকদের কাছে।

সমসাময়িক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সোভিয়েত পন্ডিতদের নজর গেছে যে সব সমস্যার দিকে সেগুলি হল : রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পৃষ্ঠপট, হালের ভারতীয় সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির ভূমিকা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ, ঔপনিবেশিকদের নীতি ও ভারতীয় জনসাধারণের তরফে সে-নীতির প্রতিরোধ। স্বাধীনতা লাভের পর আরো সব নতুন ধরনের সমস্যা, যেমন স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণের সমস্যা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা, ভারতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সমস্যা ইত্যাদি। এ-সব সমস্যা বিচারের সময়ে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটেছে মাঝে মাঝে—তবে অতি দ্রুত তার সংশোধনও হয়েছে ও আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়েছে নতুন সব তথ্য।

শুধু সমগ্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই নয়, সোভিয়েত পন্ডিতদের দৃষ্টি গেছে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির বিশদ বিশ্লেষণের দিকেও। যেমন ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তার অবস্থা, রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগঠন ও মতাদর্শ বিষয়ে চর্চা করেছেন (অনেকে এখনো করছেন) সেইগেল, গেলার, বালাবুশেভিক, গর্ডন, ইগোরোভা, কুৎসোবিন, পোকাটেভা প্রমুখ পন্ডিতেরা। ভারতীয় কৃষকদের সম্পর্কে তেমনি গোড়ার দিকে কাজ করেছিলেন রেইজনার, সেইগেল, উলিয়ানোভস্কি প্রভৃতি সোভিয়েত গবেষক। পরে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র প্রসারের সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন কোতোভস্কি, রাস্টিয়ান্নিকভ, ম্যাকসিমভ প্রভৃতি। ওরুভিচ নজর দিলেন। কৃষি উৎপাদনের যন্ত্র-বিদ্যা ও অর্থনীতি সংক্রান্ত দিকটির প্রতি। সেমিয়োনোভা, মেল্নিকভের মতো গবেষকদের চর্চা কৃষক আন্দোলন ও স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষি সম্পর্ক বিষয়ে।

শুধু শ্রমিক কৃষকই নয়, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও পড়েছে, সোভিয়েত পন্ডিতদের এই চর্চার আওতায়। তার উদ্ভবের ইতিবৃত্ত, ক্রমবিকাশের পর্যায়, তার ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠি, ভারতীয় সমাজের অন্যান্য সামাজিক স্তর ও শ্রেণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা, মতাদর্শ ও ঝোঁক, তার প্রধান নেতৃবর্গ—মুক্তি আন্দোলনে তার বিশিষ্ট ভূমিকা সব দিকেই চলেছে বিচার। এখানে কাজ করছেন অসংখ্য গবেষক—গোড়ার যুগে মাদিয়ার, মাজুত, রেইজনার, সেই গেল, উলিয়ানোভস্কি, তার পরে দিয়াকভ, বালাবুশেভিচ, মেলমান; আর একেবারে হালে দেভিয়াৎকিনা, কোমারভ, চিচেরভ। এ-বিষয়ে বই লিখেছেন পাভলভ, রেইজনার ও শিরোকভ। দিয়াকভ বিশেষ করেই চর্চা করছেন জাতিসত্তা ও ভাষাগত সমস্যা সম্পর্কে। ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তেমনি গবেষণা করছেন নাসেঙ্কো, নিহামিন, শাস্তিৎকো—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করছেন গোল্ডবার্গ, লুস্তারনিক, এন্টোনোভা প্রভৃতি।

ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত অংশের ভূমিকা, বিদেশী সাহায্য ও বিদেশী মূলধন, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদন—এ-সব সমস্যাও সোভিয়েত পন্ডিতেরা পরীক্ষা করছেন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপকতর সমস্যার পৃষ্ঠপটে। এ ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা হলেন লেভকোভস্কি, পাভলভ, আলিকজান্দ্রভ, মেলমান, বাতালভ, গ্রদুকো, কন্দ্রাতিয়েভ, ম্যাম্মিকিন, রেইজনার, শিরোকোভ প্রভৃতি।

ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির দিকেও নজর গেছে সোভিয়েত পন্ডিতদের। এন পি এনিকেয়েভ একটি বই লিখেছেন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ঐতিহ্য প্রসঙ্গে আর শেষ করেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনের একটি সংকলন সম্পাদনার কাজ। আর এ এম পিয়াতিগোরস্কির বইয়ের বিষয় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের মালমশলা। আর তিলকের স্মৃতিতে নিবেদিত রচনা সংকলনে প্রকাশিত গোল্ডবার্গ, কোমারভ প্রভৃতির প্রবন্ধেও রয়েছে আধুনিক ভারতের সমাজচিন্তা বিষয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প[illegible] তেমনি অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশি[illegible]য়েছে বিশেষ করে কবির জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছরে। রামমোহন, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি চিন্তানায়কদের প্রসঙ্গেও জোর চর্চা চলেছে গবেষক মহলে। তাঁদের মধ্যে এ ডি লিৎম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের বিষয়ে বই লিখেছেন এস পি গর্ডন-পোলোনস্কায়া। গান্ধীবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করেছেন দিয়াকভ, উলিয়ানোভস্কি, রেইজনার ও লিৎম্যান। এখন চেষ্টা চলেছে বহু সোভিয়েত গবেষকে মিলে স্বাধীন ভারতের আত্মিক জীবন গড়ে তোলার সমস্যা বিষয়ে একটি গোটা সংকলন প্রকাশের। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান ভারত ও সমসাময়িক ভারতের দু' খন্ড ইতিহাস প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগীয় ভারতের অন্য দুই খন্ড ইতিহাসও প্রকাশিত হবে অনতিবিলম্বে। সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাসটির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেছেন দিল্লীর পিপলস পাবলিশিং হাউস।
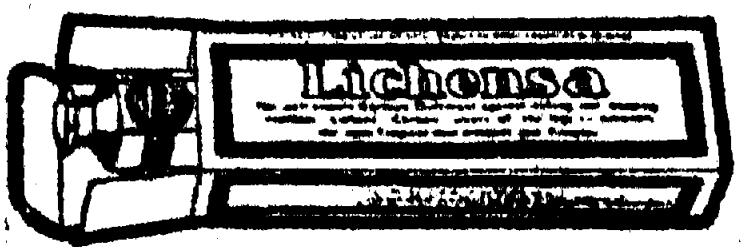
১৯২৬ খৃঃ লেনিনগ্রাডে 'চিত্রা' অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি।

Экспериментальный театр при Институте Живого Слова

ФЕВРАЛЬ 1922 г.

В Воскресенье 19-го общедоступно

РАБИНДРАНАТ

ТАГОР

В Воскресенье 26-го для учительства и студенчества

1) Лирические стихотворения из сборника „Садовник". || 2) Жертвопесни (Гитанджали).

3) **ЧИТРА**

এসব তথ্য আমাকে যোগালেন কালিয়ানভ কিছুটা মুখে মুখে, অনেকটাই ফিফ্‌টি ইয়ার্স অফ সোভিয়েত ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ, ১৯১৭—১৯৬৭ নামের সুবিশাল পত্রিকা সংকলন মারফৎ। সংকলনটি ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট থেকে আমায় উপহার দেওয়া হল—তাতে স্বাক্ষর করলেন কালিয়ানভ রুশ ও দেবনাগরী হরফে। দেবনাগরীতে তিনি তাঁর নাম লিখলেন 'কল্যাণ মিত্র'। আসার সময়ে কালিয়ানভ বললেন 'আপনি এখানে সত বছর অন্তর আসছেন, এ-অভ্যাসটা ভালো নয়। আসছে বার আরো তাড়াতাড়ি আসুন।' সশ্রদ্ধ নমস্কার ও অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম ভারততাত্ত্বিকদের কাছ থেকে।

পরদিন সকালে দেখা শ্রীমতী ইভা লুস্তারনিকের সঙ্গে। ইনি লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা। এঁর চর্চার বিষয় উনিশ ও বিশ শতকে ভারত-রুশ সম্পর্ক প্রসঙ্গে। ঐ বিষয়ে রুশ-ভাষায় লেখা তাঁর বইখানি তিনি আমায় উপহার দিলেন এক কপি। তিনি আমায় বললেন, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথা যিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো ও গবেষণা করেছিলেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৮১ সন পর্যন্ত ও দেশে ফিরে বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন তুর্গেনিভ প্রমুখ রুশ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে। শ্রীমতী লুস্তারনিকের কাছে জানতে পারলাম যে, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিনায়িভকে তাঁর গানের বই উপহার দিয়েছিলেন। আর সেগুলি পেয়ে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সমালোচক স্তাসভ মিনয়েভকে লিখেছিলেন যে, সঙ্গীতজগৎ এর জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে সৌরীন্দ্রমোহনের কাছে। মৃত্যুর ঠিক আগের বছর ১৯১৩ সনে তিনি আবার চিঠি ও বাদ্যযন্ত্র পাঠান সেণ্ট পিটার্সবার্গে। এইসব অমূল্য উপহার লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয় এখনো সংরক্ষণ করছেন পরম যত্নে।

এর আগে মস্কো ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটের কর্মী ডঃ কোমারভের কাছে শুনেছিলাম যে, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে নাকি সংরক্ষিত আছে আমাদের রেভারেণ্ড লঙ-স্বাক্ষরিত অভয়চরণ দাসের বিখ্যাত বই 'ইণ্ডিয়ান রায়ত'। 'নীল-দর্পণে'র ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ এবং তার জন্য তাঁর বিচার ও শাস্তির মধ্যে এ-দেশের মানুষের প্রতি, বিশেষ করে কৃষক-দের প্রতি এই মহাপ্রাণ ইংরেজের যে দরদ একদা প্রকাশ পেয়েছিল মনে হয় সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থা-বিষয়ক ঐ মহামূল্যবান বই উপহার দানের মধ্যেও তা আর একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রেভারেণ্ড লং জন্মেছিলেন রাশিয়ায়, আর এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে, এই ইংরেজ পাদ্রী সেদিন যেন মিলনসেতুর কাজ করে-ছিলেন আমাদের দুই দেশের মধ্যে।

আবার মস্কো ফিরে এলাম ২ ডিসেম্বর সকালে। লেনিনগ্রাড যাবার আগে দেখা করতে চেয়েছিলাম ফিওদর পেত্রভের সঙ্গে। ফিরে এসে শুনলাম ব্যবস্থা হয়েছে —দেখা করতে হবে ৪ ডিসেম্বর দুপুর বারোটায়।

পেত্রভের কথা এর আগে অনেক শুনেছি, কবির সঙ্গে তাঁর ছবি দেখেছি 'রাশিয়ার চিঠি'তে, লেখাও পড়েছি কিছু কিছু। কিন্তু একেবারে সামনাসামনি না দেখলে কিছুতেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয় মানুষটির আশ্চর্য প্রাণশক্তি। কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় গেছি ঘড়ি ধরে, পাছে বুড়ো মানুষের অসুবিধে করি। ঘরে ঢুকে দেখি মুগ্ধ টেবিলের উপরে ঝুঁকে কি একটা লেখা কাটাকাটি করছেন। শুনলাম, সম্পাদনা করছেন সোভিয়েত বিশ্বকোষ আর বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি' নামে বিশ্বকোষতুল্য আর এক গ্রন্থ রচনায়। অথচ বয়স তাঁর ৯৪। শরীর বেশ মজবুত, চোখে দেখেন, কানে শোনেন, মাথা পরিষ্কার। শুনেছিলাম রাসেলের কথা, তারো আগে 'জি বি এস'-এর, আর এই চোখে দেখলাম পেত্রভকে। না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত—এত বয়সে এত কাজ করা আদৌ সম্ভব।

অধ্যাপক পেত্রভ রাশিয়ার একজন সাবেক কালের বিজ্ঞানী। তিনি লেনিন, ক্রুপস্কায়া, গর্কি ও লুনাচারস্কির ব্যক্তিগত বন্ধু এবং বর্তমানে দুনিয়ার প্রবীণতম বলশেভিক। কবে তিনি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন জানতে চাইলে বললেন, ১৮৯৬ সনে। শুনে মাথায় হাত দিয়ে বললাম, সে কি? আমি তো জানি পার্টি তৈরীই হয়েছে

১৮৯৮ সনে মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসে। পেত্রভ হেসে জবাব দিলেন, কথাটা ঠিকই, তবে আমরা যারা বড়ো, বিশেষ করে লেনিন, অ মরা আমাদের পার্টি-সভ্যপদের মেয়াদ গুনি সেন্ট পিটার্সবার্গের 'লীগ অফ স্ট্রাগেল ফর দি এমানসিপেশান অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস'-এর সময় থেকে। মনে পড়ে গেল লেনিন ঐ সংস্থা গড়ে তোলেন ১৮৯৫ সনে আর যেহেতু তার মারফৎ তিনি শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন মার্কসবাদের তত্ত্বের সঙ্গে (এতাবৎ প্রবাসী রুশ মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের চর্চা করতেন জেনিভায় প্লেখানভের 'এমান-সিপেশান অফ দি লেবার গ্রুপ' মারফৎ) তাই ঐ লীগকে বলা হয় পার্টির অঙ্কুর। সেই অঙ্কুরিত পার্টিতে লেনিন ও ক্রুপস্কায়া এসেছিলেন ১৮৯৫ সনে আর পেত্রভ ঠিক তার পরের বছর। তবে লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯০০ সনে। তাঁদের তখন আলাপ হয় 'ইসক্রা' পত্রিকা সম্পর্কে।

বয়সের প্রসঙ্গে হঠাৎ বলে ফেললাম ভরোশিলভের কথা। ঠিক দু'দিন আগে মারা গিয়েছিলেন ভরোশিলভ। কথাটা তুলেই মনে মনে আপশোষ হল, কাজটা ঠিক হল না। পেত্রভ কিন্তু অবিচলিত। চট করে উঠে ড্রয়ার থেকে বার করলেন এক ছবি—দুই বৃদ্ধ হাসছেন প্রাণ খুলে। ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, ভরোশিলভ আমার চাইতে ছোট ছিল ছ' বছরের। হঠাৎ কেন জানি মরে গেল! বুঝলাম জরা স্পর্শ করতে পারেনি এই বৃদ্ধের মনকে, আর এ-ও অনুভব করলাম যে, তাঁর তারুণ্য সত্যই সংক্রামক।

পেত্রভের সঙ্গে আসল আলাপ হল রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। আমি জানতে চাইলাম, এ-কথা কি ঠিক যে, লুনাচারস্কি জেনিভায় কবির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রাশিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ১৯২৬ সনে। পেত্রভ বললেন, একদম ঠিক। আমি জানি, কারণ আমি তখন কাজ করতাম লুনা-চারস্কির সঙ্গে আর চিঠিপত্র সবই চালা-চালি হয়েছিল আমারই মারফৎ। ১৯৩০ সনে কবির রাশিয়ায় তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বললেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন যে, রাশিয়া আসবার ঠিক আগে জার্মানীতে খুব চেষ্টা হয়েছিল তাঁকে বোঝানোর যে, তাঁর পক্ষে রাশিয়া যাওয়া উচিত হবে না তিনটি কারণে। প্রথমত, শীতে মারা পড়বে, দ্বিতীয়ত, না খেয়ে মারা পড়বে ও তৃতীয়ত, বুদ্ধিমান লোকের অভাবে কথা বলতে না পেয়ে মারা পড়বে। পেত্রভ বললেন, আমি কবির কাছে জানতে চাইলাম তিনি কি প্রাণ বাঁচানোর মতো কথা বলার সঙ্গী একজনও পেয়েছেন রাশিয়ায়?

কবির হাসিতেই পাওয়া গিয়েছিল সে-প্রশ্নের জবাব। তবে পেত্রভের দুঃখ তাঁদের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও কবির একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল কি করে জানি।

আর একটা মজার ঘটনা বললেন পেত্রভ। কবি গেছেন কমসোমলদের আসরে। ছোট ছেলেমেয়েরা খুব হাসছে দেখে কবি জানতে চাইলেন—এরা হাসছে কেন? আমার দাড়ি দেখে কি? জানানো হল, ওরা আপনাকে দেখে আনন্দিত। এত আশ্চর্য সুন্দর মানুষ ওরা আর কখনো দেখেনি। কবি বললেন, ওদের বলুন ঐ দাড়িটা দেখে ওরা যেন না ঘাবড়ায়। ওটা আসল নয়, নকল। বাইরে বেরোবার সময়ে ওটা পরি। যাতে লোকে আমাকে মানে। আসলে আমি ওদেরই বয়সী।

হঠাৎ মনে হল সেদিনকার সেই কম-সোমলদের বয়স আজ নিশ্চয়ই পঞ্চাশের কোঠায়। অবশ্য যাঁরা বেঁচে আছেন। অনেকেই হয়ত প্রাণ দিয়েছেন নাৎসী আক্রমণ রুখতে।

আমার কৌতূহল দেখে পেত্রভ বললেন, লেনিন রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা মনে করতেন, কবির কিছু কিছু বই তিনি পড়েছিলেন ও সংগ্রহও করেছিলেন লাইব্রেরীর জন্য। আর ক্রুপ-স্কায়া শিক্ষা-সচিব হিসেবে বিশেষ করেই আগ্রহান্বিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক লেখাগুলি সম্পর্কে। তাঁর শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ সপ্রশংস উল্লেখ ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্পর্কিত মত ও পরীক্ষার। পেত্রভ জানালেন লেনিন এই বই এক কপি পাঠান কাপ্রি দ্বীপে ম্যাকসিম গোর্কির কাছে তাঁর মতামতের জন্য এবং গোর্কি বইটির উচ্চ প্রশংসা করে তার জবাব দেন। পেত্রভের বিশ্বাস রবীন্দ্র-নাথ ঐ বইটির কথা জানতেন। ক্রুপস্কায়া ও লেনিন উভয়েই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে শ্রম ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। গোর্কি রবীন্দ্রনাথকে মনে করতেন যুগপৎ শিল্পী ও শিক্ষাবিদ। আর লুনাচারস্কি ছিলেন পেত্রভের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তিনি কবির সঙ্গে দেখা করেন একাধিকবার—তিনি তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের একজন শিক্ষা কমিশার।

পেত্রভ দেখলাম রবীন্দ্রনাথের ছবিরও পরম ভক্ত। বারবার বললেন ঐ ছবিতে ধরা পড়ে কবির আশ্চর্য কল্পনা ও প্রবল মানবিকতাবোধ। মস্কোয় সেবার রবীন্দ্র-নাথের ছবির যে প্রদর্শনী হয় তাতে শিল্প রসজ্ঞ ও ত্রেতিয়াকভ গ্যালারীর পরিচালক ক্রিস্তি উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর ছবির ব্যাপারে।

ক্রিস্তির কথা জানতে চাইলে পেত্রভ বললেন, ক্রিস্তি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে এখন একজন চিত্র-পরিচালক। তিনি 'প্যারিসে লেনিন' নামে একটি ফিল্ম করেছেন অন্যান্যদের সহযোগিতায়।

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে উঠে আসার সময়ে পেত্রভ আবার উচ্চারণ করলেন রবীন্দ্রনাথের নাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটা কথা বলা দরকার এখানে। শ্রীমতী বীকোভার সঙ্গে আমার পরিচয় ভারতে। তিনি একজন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও বর্তমানে সম্ভবত মস্কোর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত। আচার্য সুনীতিকুমারকে তিনি তাঁর একজন গুরু হিসাবে মনে করেন। বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের ভাষাতাত্ত্বিক কাজকর্ম সম্পর্কে। তাঁরই আগ্রহে আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে গোপালবাবুর পূর্ব-বঙ্গের উপভাষা সংক্রান্ত বহুদিনের মূল্যবান গবেষণার ফল।

শ্রীমতী বীকোভার সঙ্গে আমি মস্কোতে যোগাযোগ করলাম রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে। বিশেষ করে তাঁর সোভিয়েত সফরের খবর জানার জন্যে। তিনি আবার আমার যোগা-যোগ ঘটালেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ভ্লাদোভিনের সঙ্গে। কারণ, ১৯৬১ সনে রাশিয়ায় কবির জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি পালনের যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লেখা রবীন্দ্র-নাথের চিঠির ফোটোস্টাটিক প্রতিলিপি তাঁরা আমাদের জন্য সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে যেহেতু সেগুলি এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো রয়েছে, তাই হয়তো কিছুটা সময় লাগবে এ-ব্যাপারে। রবীন্দ্র-নাথের সোভিয়েত ভ্রমণকালের [illegible] বিরল ছবিও তাঁরা আমাকে উপহার দিলেন। ১৯২৬ সনে লেনিনগ্রাডে 'চিত্রা' অভিনয়ের যে বিজ্ঞপ্তিটি এখানে ছাপা হল, তার ফোটোস্টাটিক কপিটি কে আমায় দিলেন তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আর সবশেষে এঁরা উদ্যোগী হয়ে ঐ জন্মশত-বর্ষ পূর্তির সময়ে 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিটি পাঠালেন ও বেশ ভালো অথচ এদেশে আমরা তার খবর রাখি না। মনে হয়, এ-ফিল্মটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে এদেশের প্রত্যেক রবীন্দ্রানুরাগীরই একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সে যাই হোক শ্রীমতী বীকোভা ও অধ্যাপক ভ্লাদোভিন যে আমায় এই বিষয় ও অন্যান্য অনেক খবরের সন্ধান দিয়েছেন এবং দিনের পর দিন আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন ও তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্য তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এবার অনেক কিছু জানলাম, পেলাম বিদেশে গিয়ে। তারই কিছুটা পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম 'অমৃত' পাঠকদের কাছে।

(শেষ)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। তিন ।।

সবার অলক্ষ্যে কখন আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। খোজাদের কবরখানার কাছাকাছি আসতেই আচমকা দন্দাড় বৃষ্টি। সবাই হুড়মুড় করে উঁচু ফটকের ভিতর ঢুকে পড়েছিল মাথা বাঁচাতে।

স্বাতী অবশ্য হাসতে হাসতে চীনা মিয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চীনা বলল, আপনার শীত করছে নিশ্চয়। ভিজে আলখেল্লাটা বদলাতে পারেন, আমার ব্যাগে একটা আছে দিতে পারি।

স্বাতী মাথা নাড়ল। দরকার নেই।

ফটকের দু-পাশে দুটো অক্ষত ঘর। তার ওপাশটা মুসাফিরখানা ছিল একদা। সারবন্দী একতলা ঘরগুলো ভেঙে-চুরে একাকার। প্রাঙ্গণে সারবন্ধ কবর। ফুলের গাছ। তবে কেউ কবর বা ফুলের গাছ দেখছিল না এটা ঠিক। আকাশ দেখছিল বিস্মিত চোখে। অকাল বর্ষণের এ চমক পুলকিত করে নি কাকেও—বরং দমিয়ে ফেলেছিল কিছুটা।

স্বাতী এবার রীতিমত ল্যাংচাচ্ছে। পিছনে পড়ে গিয়ে বেশ ভিজতে হয়েছে তাকে। টাইট জামা-প্যান্ট আর পুলওভার ধরনের বিচিত্র কোটসমেত ওকে ভিজে বেড়ালের মত দেখাচ্ছিল। শুভ দৌড়ে ওকে এগিয়ে আনতে যাবে ভাবছিল, কিন্তু বৃষ্টির ধার অনুভব করে শেষ অব্দি নিরস্ত হয়েছে। সে ঠোঁট চুক চুক করে বলেছিল, আঃ, ভেরি—ভেরি স্যাড!

ইরা সবিস্ময়ে বলল, ম্ম! অত ভিজেছেন! আমি হলে কী যে করতাম!

শুভ বলল, আরে, আরে! কী হারে গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে দেখছ? উঃ, ভাবা যায় না।

ব্যাপারটা তাই। বৃষ্টির তীব্রতা ছিল। পথের ওপর বা ঘাসে ইতস্তত সবুজ ও হলুদ পাতার রাশি থরে বিথরে জমে উঠেছে ক্রমশ। পাঁচের রাস্তায় স্যাঁৎ স্যাঁৎ

করে দু-একটা ট্যুরিস্ট বোঝাই রিকশো চলে যাচ্ছে। শুভ মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছিল।... দ্যাখ, দ্যাখ, সেই মস্তানগুলো! দিব্যি ভিজতে ভিজতে চলেছে!

শুধু ভিজতে ভিজতে নয়, কোমর ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছে। এদিকে চোখ পড়ামাত্র দলটা থেমেছিল কয়েক মুহূর্ত। হয়ত এখানে ঢুকে পড়বার মতলব করছিল। কিন্তু কী ভেবে এল না—সোজা রাস্তা ধরে হুল্লোড় করে এগোল।

কল্পনা নীরেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অল্প জায়গা। গা ঘেঁষাঘেঁষি অপরিহার্য। কিন্তু নীরেন একটু চমকাল। কল্পনার ভিজে হাতটা তার হাতের ওপর রয়েছে। সে মুখ ফেরাল কল্পনার দিকে। কল্পনা চোখ তুলল। চোখাচোখি হতেই নীরেন অন্য দিকে তাকাল। মুহূর্তে তার মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। এই মেয়েটিকে বুঝে ওঠা যায় না। কাল কাটরা মসজিদের মিনারে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময় নীরেনের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে ওঠার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। কেমন নাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে—যেন দেহমন অস্তিত্ব শুদ্ধ একটা আলোড়ন সুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ। ছেষট্টিটা ধাপের পর ওপরতলা। নীরেন গুনে গুনে উঠছিল। তারপর—সম্ভবত বাইশের পর সব গোলমাল হয়ে যায়। আর সে মুহূর্তে হঠাৎ ইচ্ছে করছিল, দেয়ালে ঠেসে ধরে কল্পনাকে—চুমু খেয়ে ফেলে। অবশ্য সেটা হঠকারিতাই হত। কয়েক ধাপ নীচে স্বাতী আর বিভাস ছিল—সব দেখে ফেলত।

কিন্তু মনের ভিতর সেই কম্পনের রেশ সারাটি রাত এবং আজ কিছুক্ষণ অব্দি ছিল তার। মোতিঝিলের বটতলায় নির্জনে কল্পনা আর দিব্যেন্দুর ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করে নীরেন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। বড্ড বোকামি থেকে বেঁচে গেছে।

অথচ কল্পনার মধ্যে কী একটা আছে। আছে, তা এখানে আসবার পর টের পাচ্ছে নীরেন। কলকাতার ছকবন্দী জীবনে সেটা কল্পনার মধ্য থেকে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি সম্ভবত। কতদিন তো নিরিবিলি কল্পনার সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ ঘটেছে—এমন কি এক সন্ধ্যা লেকের ধারেও বসে থেকেছিল দুজনে, কল্পনাকে এত দূরের কিছু মনে হচ্ছিল, এত অস্পষ্ট আর জটিল—পা বাড়ানোর কথা ভাবতেই ক্লান্তি লাগছিল প্রচুর। এখানে কল্পনা এসে খুব সহজ আর সুন্দর হয়ে গেছে যেন। ওইসব অকারণ বন্য গাছপালার মত। কিছুটা আদিম যেন। চোখে কিসের চঞ্চলতা, চলাফেরায় আত্মপ্রচারের ভাবটা প্রবল, নিজের যা কিছু আছে—উজাড় করার মতলব যেন ঝিলিক দিচ্ছে সারাক্ষণ।

এসব নীরেনেরই নতুন ভাবনার প্রতিফলন নয়ত? মনে মনে নীরেন বলল, না—কদাচ নয়। খুব সহজে ছুঁতে পারার সুযোগ দিতে চাচ্ছিল কল্পনা, এটা ঠিকই। হয়ত ভাবতে-ভাবতে দেরী করে ফেলেছে নীরেন। দিব্যেন্দু ওৎ পেতে ছিল। সে ছুঁয়ে ফেলেছে কল্পনার বুড়ি। কিন্তু একটুখানি বিসদৃশ ঠেকে। সকালে দিব্যেন্দু হয়ত কল্পনারই ছবি তুলতে চেয়েছিল, কল্পনা দু-হাতে মুখ ঢাকল কেন? নীরেনের পাশে ছিল সে—তাই?...

ঘৃণা হল মনে। কল্পনার দেহের স্পর্শ ভীষণ ঠান্ডা লাগল তার। একটু সরে আকাশ দেখতে গেল নীরেন। দেখে বলল, যা ব্বাবা! কান্নাকাটি কখন থামবে?

দীপেন বোস চীনার পাশে। তার পিছনে ইরা। ইরা চীনার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপেন স্ত্রীকে বলল, কী ব্যাপার! তোমরা পরস্পর আলাপ করছ না যে! কী হল হঠাৎ?

চীনা হাসল।... ইরা কথা বলবে কী! যে হাঁটা হাঁটাচ্ছেন—বেচারী হাঁফিয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় ওকে আমরা 'পুতুল' বলে ডাকতাম, জানেন? কী ফ্যাটি না ছিল!

দীপেন কপট গাম্ভীর্যে বলল, ফ্যাট শুকোনর দায়িত্ব অবশ্য আমার নয়। কেউ যদি রোগা হবার জন্যে দু'বেলা ডাক্তার দেখায়, আমি কী করতে পারি বলুন?

ওষুধ খেয়ে ফ্যাট কমানো যায়? কল্পনা প্রশ্ন করল।

দিব্যেন্দু বলল, কেন? ফ্যাট কমাবে তুমি?

সবাই হেসে উঠল এ কথায়। হাসবার কারণ ছিল। কল্পনার শরীরে ফ্যাটের কোন রকম লক্ষণ নেই। ছিপছিপে হাল্কা গড়ন তার। কেবল মুখটাই যা ডিমালো আর ভরাট। প্রথম-প্রথম দিব্যেন্দু ওকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিস্তর উপদেশ দিয়েছে। একটু ছোটাছুটি খেলাধুলো অল্পস্বল্প ব্যায়াম আর ভোরে শয্যা ত্যাগ। কল্পনা এর একেবারে উল্টো। আর স্বাতী—স্বাতীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে একত্র মানুষ হয়েছে কল্পনা; কিন্তু স্বাতীর জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

এখন অবশ্য স্বাতী কোন মন্তব্য করল না। মেজাজও নেই। এইমাত্র সবার সঙ্গে হাসল বটে, কেউ যদি ওর হাসিটা লক্ষ্য করত, দেখত হাসিটা ঠিক হাসি নয়—ওষ্ঠাধরের একটা যান্ত্রিক আক্ষেপ মাত্র। এবং সে কথাই সে ভাবতে থাকল। এ কল্পনা সে-কল্পনা নয়। অন্তর দিয়ে কোনমতে গ্রহণ করতে পারবে না তাকে আগের মত। স্বাতী অবাক হয়েছে। এত দুঃসাহসী ভাবতে পারে নি কল্পনাকে। খেলার পুতুল হঠাৎ জীবন্ত হয়ে নিজের খুশিমত চলতে থাকলে যেমন লাগে, তেমনি লাগছে ওকে। এটা অসহ্য।... ঠিক আছে। ফিরতে দাও—তারপর...

চীনা কী বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। দেখল দীপেন বোস কল্পনার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা খুব খারাপ লাগল তার। একটু আগে আঁক ভদ্রলোককে অন্য কী রকম লেগেছিল—মানুষ হয়ত এই রকমই। মুহূর্তের সুযোগে তার কত কী জানা যায়। কল্পনার সঙ্গে সামান্য দুটো দিনের আলাপ। এরই মধ্যে মেয়েটাকে এত ভালো লেগে গেছে চীনার। খুব শান্ত আর বাধ্য মেয়ে। স্নেহ-ভালবাসা সম্প্রীতি দিয়ে ওকে এত সহজে বশ করা যায়! ভরাট লম্বাটে গালের ওপর ভাজ-পড়া দুটো টানা চোখে সামান্য বিষণ্ণতার ছিট আছে কল্পনার—যা ওর সৌন্দর্যের একমাত্র উৎস। শিল্পের দিক থেকে ভাবলে কল্পনা ঠিক সেই মেয়ে—'চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এবং 'মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' তবে 'পাখির নীড়ে'র মত পরম আশ্রয় বলে ওর চোখ দুটোকে মেনে নিয়ে কোন জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষেরই সুখী হবার কথা নয়। চীনার শিল্পবোধ যা বলে, কল্পনার দু' চোখে গভীর এবং পরম ঘুমের চিরধূসরতা আছে—যা মৃত্যুরই প্রতীক।...

চীনা একটা ছবির বিষয় পেয়ে গিয়েছিল কল্পনার মধ্যে। অদ্ভুত কম্পোজিশন! শুধুমাত্র একটা রঙের ব্যবহার। সেটা হচ্ছে ধূসর কিম্বা অতিধূসর। ছোট-ছোট ভাঙচুর রেখা—ঝড়ে ওড়া পাখির বাসার অবশেষে, ডিমের ভাঙা খোলসের মত কয়েকটা বৃত্তাংশ, শীতের নিষ্পত্র গাছের আভাস দেয় এমন কয়েকটা তির্যক রেখা—আর, আর...

চোয়াল শক্ত হয়ে এল চীনা মিত্রর। বুকের ভিতর ঢাক বাজতে লাগল হঠাৎ।

দিব্যেন্দু পরক্ষণে নীরেনের দিকে তাকিয়েছিল। নীরেন কল্পনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কেমন অপোগণ্ড সঙের মত লাগছে নীরেনকে। বেঁটে চ্যাপটা শরীর ওর—নাকটাও থ্যাবড়ানো, নাকের নীচে গাঙফড়িংয়ের মত গোঁফ, পুরু ভুরু, চৌকো চোয়াল। নবাবী আমলে জহ্লাদগুলোর চেহারা কি ওই রকম ছিল? ভূত একটা! জন্তু! ঘেঁটুবনের ভিতর কী করছিল ও? দিব্যেন্দুদের দেখছিল? আড়ি পেতেছিল? নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল বলে আবার জাহির করে বেড়ায়। বড় বড় কথা বলে!

কল্পনাকে দিব্যেন্দু যতটা বুঝেছে, আর কেউ নয়। বেচারা ছেলেবেলা থেকে আত্মীয় বাড়ি মানুষ হয়েছে, মা-বাবার কথা মনেও পড়ে না—যত স্নেহ-ভালবাসাই পাক, পর সব সময় পর। তার ওপর স্বাতীর মত

দেমাকি মেয়ের গায়জোর চালচলন। বেচারা কল্পনা! অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ একটা হীনমন্যতায় আক্রান্ত হত। কল্পনার তা হয় নি। সে সহজভাবে মেনে নিয়েছে নিজের জীবনকে। অথচ ভাবতে গেলে পৃথিবীতে কল্পনার মত করুণার পাত্রী আর কেউ নয়।

আর, এখানে এসে দিব্যেন্দুরও মনের জোর হঠাৎ বেড়ে গেল যেন। এইসব বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাট ইতিহাসের ধূসর সমাধির মাঝখানে এসে পৌঁছলে হয়ত এইটেই স্বাভাবিক। সবাই নিজের নিজের দিকে তাকাতে শেখে। অখণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে। দিব্যেন্দু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল। সে দেখেছিল, স্বাতী বড় বেশি আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তার ওপর—কল্পনার ওপর। সে জানতে পেরেছিল, স্বাতীর মত দেহমনে শক্ত মেয়েকে তার কোনদিনই ভালো লাগবার নয়। এবং কল্পনাই বেশি কাম্য, বেশি প্রিয় তার কাছে।

তবে শুভ এ-সব ব্যাপারের ঊর্ধ্বে। শুভ তার কবিতা নিয়েই ব্যস্ত। কবিতার বিষয় হিসেবেই তার সবকিছু মনোযোগ আকর্ষণ করে। কল্পনাকে সে মাঝে মাঝে 'ইতিহাসের কালের এক বিষণ্ণ নায়িকা' বলে বর্ণনা করলেও কোন বিশেষ মোহ আছে বলে জানে না দিব্যেন্দু। অন্তত প্রমাণ বলতে তেমন কিছু পায় নি আজ অব্দি। অবশ্য কাল সন্ধ্যার ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ লাগে। শুভ কল্পনার হাত ধরে হাঁটছিল সবার অজানতে—সেকি নিজেরও অজানতে? আর কল্পনা এমন মেয়ে, তার অস্তিত্ব যেন গাছের মত—গোড়ায় চোট লাগলে কাঁপবে মাত্র, কথা বলবে না।...

শুভ কবিতার সুরে আবৃত্তি করল :

মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠলে চাঁদ
ডোবার ধারে পাতব হরিণ ধরার ফাঁদ...

পরক্ষণে হেসে উঠল সে। বলল, ব্যাটা কবির বরপুত্র। দৃশ্যটা ভাবতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। মিস মিত্র, আপনার ছবির সাবজেক্ট কিন্তু। নোট করে নিন। মধ্যরাতে বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। মধ্যরাতে যে চাঁদ ওঠে, তা কৃষ্ণপক্ষের। সুতরাং গোটা নয়, টুকরো চাঁদ। একটা গভীর ডোবা। গভীর কারণ, এ এলাকায় যে কয়েকটা পুকুর বা ডোবা দেখেছি, সবগুলোই বেশ গভীর। এর কারণও জেনেছি। গঙ্গার পলিমাটিতে ভরাট এলাকা। বালির ভাগ বেশি। সুতরাং জল শুষে নেয়। সুতরাং...

নীরেন তেতো মুখে বলল, ছেড়ে দে!

শুভ নিরস্ত হল না।... জাস্ট এ মিনিট। শুনুন মিস মিত্র। এবার ডোবাটার দিকে তাকান। ওই রকম বিচ্ছিরি জ্যোৎস্নায় গাছপালার ভিতর ডোবাটা ভীষণ কালো গর্ত দেখাচ্ছে—আই মিন, মড়ার গর্ত যেমন। তার পাশে, কী বলব?... ইয়েস, মাকড়সার জালের মত একটা ফাঁদ। তারপর ব্যাটা বসে আছে ঘাপটি মেরে। চেহারাটা কেমন হবে বলুন তো? [illegible] টাইপ? সন্ন্যেসীর মত? বুড়ো বোধহয় নয়—রীতিমত জোয়ান...,

চীনা হাসতে হাসতে বলল, জওয়ান বলুন!

শুভ কান করল না। বলতে থাকল, একটা আস্ত মমি। খড়িপড়া চেহারা, একটু নীল, একটু হলুদ, একটু ধূসর—

এবার কল্পনা হেসে বলল, গিরগিটির মত?

তবু কান করল না শুভ।... এবং হরিণটাই এ ছবির মূল বিষয়। আত্মভোলা অবোধ হরিণ। হরিণীই ভালো। শিঙ-টিঙ নেই। চুপিচুপি আসছে কিছু না জেনে। তার চেহারায় মানুষের আদল আছে। ইয়েস, ...শুভর শরীরটা কেমন শক্ত দেখাল এবার।...

বিভাস স্বাতীর কানে কানে বলল, ছিটগ্রস্ত।

স্বাতী চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। তারপর একটু হেসে নামাল। শুভকে দেখতে থাকল। শুভ কথা হাতড়াচ্ছে। লম্বা লিকলিকে একটা হাতের আঙুল কুঁকড়ে শূন্য থেকে কিছু ধরার চেষ্টা করছে। নীরেন হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরে ফেলল। বলল, এই শুভ, থামবি?

শুভ নিরস্ত হয়ে কাঁচুমাচু হাসল। দীপেন বলল, কবির কল্পনা চমৎকার! বরং একটা কবিতা লিখে ফেলুন। একটু অন্য রকম। হরিণটাকে মানুষ করে দিন।

চীনা বলল, মানুষী বলুন।

স্বাতী বলল, বৃষ্টি কিন্তু কমেছে। একটা হয়ে এল। দুটোয় পৌঁছতে হবে।

নীরেন বলল, অতক্ষণ লাগবে না। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার।... বলে সে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির অবস্থা বুঝে নিল। টিপ টিপ করে পড়ছে। শীত বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে। সব আনন্দ মাঠে মারা গেল। এ মাটিতে প্যাচপেচে কাদা অবশ্য হবে না। তবে এখন সোজা হোটেলেই ফিরতে হবে। কাঠগোলার বাগান যাওয়ার প্রোগ্রামটা আপাতত বাতিল।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা আকাশ একেবারে ঝকঝকে নীল। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। শান্ত সরল লাজুক বালকের মত রোদ। ভিজে পথঘাট, ছেঁড়া পাতার স্তূপ। তারপর কিন্তু ভীষণ রকমের ঠান্ডা এসে গেল আততায়ীর মত। অন্ধকার নামলে যে-যার ঘরে অন্যমনস্ক বসে থেকেছে চুপচাপ। আনন্দ-আরাম সব দিয়ে হঠাৎ কেড়ে নিলে এ রকম বিষণ্ণতা স্বাভাবিক। ফের সেই সময় কিছুক্ষণের জন্যে ইলেকট্রিক ফেল। মেজাজ আরও খারাপ, মন আরও হতাশ হতে দেরী হয় নি। প্রস্তুত না থাকার দরুণ মোমবাতি ছিল না কারো কাছে। নীচের রিসেপসান চত্বরে তাড়াতাড়ি একটা হ্যাসাগ জ্বালা হয়েছিল। খানিক পরেই মোমবাতি এসে গেল। ম্যানেজার-সুরঞ্জনবাবু অপরাধী মুখে নিজেই দরজায়-দরজায় এসে সেগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এখন টিমটিমে আলো জ্বলছে স্বাতী-দের ঘরে। কিন্তু কিছুক্ষণ বেশ দেখে নেওয়া গেছে এ ঐতিহাসিক পোড়ো শহরের রূপ। স্বাতী বিছানায় শুয়ে আছে চুপচাপ। কল্পনা ততক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছে। দরজাটা বন্ধ ছিল না, সেটা পরে ম্যানেজারবাবু এলে বোঝা গেল। অন্ধকার দেখছিল কল্পনা। জানালার ধারে প্রচন্ড ঠান্ডা। তা সত্ত্বেও কল্পনা কিছুক্ষণ অন্ধকারের স্বাদ নিবিড়ভাবে গ্রহণ করছিল। উত্তরে জঙ্গুলে বাগানের ছোট-বড় গাছপালার ঘন বুনোট। তার মধ্যে অন্ধকারের যে চেহারা, তা তার মত ভীতু মেয়ের পক্ষে অসহনীয় হবার কথা। এ চেহারা তার অপরিচিত। কিন্তু কল্পনা তারিয়ে তারিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ করছিল যেন।

দিব্যেন্দুর নয়, শুভর কথা ভাবছিল সে। শুভ এ শহরের নাম দিয়েছে এ ঘোস্ট টাউন—ভূতের শহর। সারারাত এর ধ্বংসস্তূপ আর পোড়ো বাড়ির মধ্যে নাকি অতীত সময় প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। হাবসী খোজাদের চলাফেরা, তলোয়ারের ঝনাঝন, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, নর্তকীদের ঘুঙুর বাজে, নকীব হাঁকে—নবাব মনসুর-উল-মুল্ক মীরজা মোহাম্মদ সিরাজদ্দৌলা হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর! তখন হাসি পেয়েছে শুনে, এখন পাচ্ছিল না।... লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসে মোহাম্মদী বেগ, হাতে ধারালো খড়গ.... আসে মীরজাফর, ইয়ারলতিফ রায়দুর্লভ... জগৎ শেঠের থলে থেকে মোহর পড়ে যায় ঝনাঝন... কত কী ঘটে যায়... সব স্পষ্ট হতে থাকে।

বাগানের ভিতরে কোথায় এক ঝলক আলো জ্বলে উঠেই নিভল। কল্পনা সরে

এসেছিল জানালা থেকে। সেই মুহূর্তে স্বাতী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছে কে, কে!

দরজার ওদিকে সামান্য পায়ের শব্দ হল মৃদু। কল্পনা বলেছিল, কই কে?

স্বাতী আর কথা বলে নি। কল্পনা নিজের বিছানায় চলে এসেছিল। তখনই ম্যানেজারবাবু মোমবাতি নিয়ে এসে গেল। খুব অসুবিধে হল, বুঝতে পারছি। ভেরি সরি। আনএকসপেকটেড ব্যাপার। নিন, ভয় পান নি তো?

দুজনেই মাথা নেড়েছিল। সুরঞ্জন চলে যাবার সময় স্বাতী বলেছিল, দেখুন—আমার খাবারটা এখানেই পাঠিয়ে দেবেন।

ফের স্তব্ধতা ঘরে। শুধু ঘরে নয়, সবখানে। পৃথিবী যে এত স্তব্ধ আর অবিশ্ট হতে পারে জানা ছিল না। কল্পনা মুখ তুলল। স্বাতীর পায়ের ব্যথা নিয়ে কিছু বলা দরকার ভাবল। বলল না। স্বাতী আজ তার সঙ্গে কথা বলছে না। না বলুক। অত রাগ মানাতে পারছে না কারো! কল্পনা গ্রাহ্য করল না ব্যাপারটা।

দিব্যেন্দু এল একটু পরে। বসল না। স্বাতীর পায়ের অবস্থাটা জেনেই চলে গেল। তারপর এল চীনা। হাসতে হাসতে এসে কল্পনার বিছানায় বসল সে।... কী ভুতুড়ে কান্ড রে বাবা! উঃ, যা ভয় না পেয়েছিলাম! আলো দিয়ে যেতেই পালিয়ে বেঁচেছি। সবে তুলি হাতে নিয়েছিলাম...

কল্পনা বলল, অন্ধকারে ছবি আঁকতে পারেন চীনাদি?

চীনা জবাব দিল, নাঃ। তবে চেষ্টা করে দেখা উচিত। ঠিকই বলেছেন কিন্তু। দেখব নাকি?

দরজা খোলা। কবাটটা নড়তেই তিনজনে চমকে উঠেছে। দেখা গেল, ইরা বোস হন্তদন্ত ঢুকছে। মুখে আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট।... এই যে, আপনারা আছেন! কী সাংঘাতিক কান্ড ওদিকে। আমার...আমার এ কী হল দেখুন তো! হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে।

চীনা লাফিয়ে উঠেছে। কল্পনা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব—তারপর সে মুখ ফেরাল। ভীষণ হাসি পেয়েছে তার। স্বাতী বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে।

ইরার হাতে এক গোছা লম্বা চুল। চুলগুলো যে তারই মাথার, তা স্পষ্ট।

চীনা স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, চুল খুলেছিলেন কখন?

ইরা কাঁপানো গলায় জবাব দিল, কিছুক্ষণ আগে। আলো নিভে গেল হঠাৎ। তখনও আমার হাতে চিরুনী...

চীনা বলল, আশ্চর্য! তা চুল খোলার সাধ হল কেন হঠাৎ?

বৃষ্টিতে ভিজেছিল যে। ইরা বোস ফের ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

কল্পনার রাগ হয়েছে চীনার ওপর। বাঃ, বেচারার চুলগুলো ভূতে এসে কেটে ফেলল, আর ওকে অবান্তর প্রশ্ন করে জ্বালাতন করছে। সে বলল, দীপেনবাবু ঘরে ছিলেন না?

না। ইরা মাথা দোলাল।

স্বাতী বলল, অদ্ভুত ভদ্রলোক তো! স্ত্রীকে অন্ধকারে ফেলে কোথায় আড্ডা দিতে গেলেন!

ইরা বলল, ও অনেক আগে বেরিয়েছে। ফিরতে একটু রাত্রি হবে বলে গেছে।

চীনা বলল, কোথায় গেছেন, বলে যান নি?

ইরা জবাব দিল, বিজনেসের ব্যাপারে গেছে। কাল ফের জিয়াগঞ্জ, তারপর লালগোলা যাবে বলছিল। সর্বনাশ! আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না। ফিরে এলে বলব, এক্ষুণি রেখে এসো কলকাতায়।

স্বাতী বলল, ঠিক আছে। আপনি ততক্ষণ এখানে থাকুন। চীনাদি, প্লীজ, ম্যানেজারবাবুকে খবর দিন না।

চীনা বলল, কেন?

ব্যাপারটা ওঁকে জানানো দরকার। স্বাতী গম্ভীর মুখে বলল।... এ কি কান্ড চলেছে! ওর টুথব্রাশ হারাল। আমার এক পাটি জুতো গেল বিভাসবাবুর বাথটাবে। ওঁর চুল কাটল...

ইরা লাফিয়ে উঠল।... না, না! প্লীজ! এ সর্বনেশে ব্যাপারটা কাকেও বলবেন না। বড্ড লজ্জার কথা। ছেড়ে দিন। চুল গেছে যাক্‌, এ নিয়ে কেলেঙ্কারী করতে চাই নে। ভূতের শহরে এমন হবে জানতাম।

চীনা বলল, কিন্তু ভূতে আর যাই করুক, জলজ্যান্ত চুল কেটে রসিকতা করবে কেন? এ নিশ্চয় হোটেলের কোন বদমাইস লোকের কাজ।

কল্পনা বলল, আমাদের মধ্যে কেউ করছে না, তার ঠিক কী?

স্বাতী চড়া গলায় বলল, বোকার মত বলো না। আমাদের মধ্যে এমন ইতর কেউ আছে বলে আমি মনে করি নে।

কল্পনা দমল না।... ইতর নয়, স্রেফ রসিকতা হতে পারে।

চীনা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবার। মৃদু কণ্ঠে বলল, কে সে? ছেলে না মেয়ে?

কল্পনা বলল, মেয়েদের এত সাহস হবে না।

স্বাতী তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল ওর দিকে।... তবে কে?

কল্পনা মাথা দোলাল। ...সে আমি জানি নে। আমার মনে যা হল, বললাম।

কাটা চুলের গোছাটা ইরা জানালা সামান্য ফাঁক করে ফেলে দিল। তারপর মাথার চুলগুলো কোন রকমে জড়িয়ে খোঁপামত করে ফেলল। বসে থাকল মুখ নীচু করে। তখনও সে ফোঁপাচ্ছে।

ইলেকট্রির আলো জ্বলবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সারা শহরই অন্ধকার একেবারে। ঘরে চারটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। একটু পরে হোটেলের পরিচারিকা মানদা এল। ...খাবার দেওয়া হচ্ছে নীচে। ওনারা সব গেছেন। আপনাদের ডাকতে বললেন দিদিমণিরা।

স্বাতী বাদে সবাই বেরল। স্বাতী বলল, আপনারা যান, আমার ভয় করবে না।

প্রকান্ড ডাইনিং হলটা আলো অন্ধকারে রহস্যময় দেখাচ্ছে। অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে-টেবিলে। সবাই এসে পড়েছে ততক্ষণে। একটা টেবিল ঘিরে যথারীতি শুভ নীরেন দিব্যেন্দু আর বিভাস। অন্যটায় একা দেবতোষ। সুরঞ্জন স্বপাক খান। অন্য একটা টেবিলে চীনা, ইরা আর কল্পনা বসেছে।

সুরঞ্জন বলল, ওপরের শেষ ঘরটা আজ ভরতি হল। এক ভদ্রলোক এসেছেন। আলাপ করিয়ে দেব—এক্ষুনি এসে পড়বেন। বেশ রসিক মানুষ কিন্তু। আমাদের পরিচিত—প্রায়ই আসেন এখানে।

বলতে বলতে সেই ভদ্রলোক হাজির। করজোড়ে নমস্কার করলেন। সুরঞ্জন [illegible] আগেই উনি আত্মপরিচয় দিলেন। আমার নাম নীলাদ্রি সরকার। পেশা [illegible]। স্থায়ী বাসস্থান নেই বললেই চলে।

সুরঞ্জন বলল, অসম্পূর্ণ থাকছে কিন্তু। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, উনি হলেন কর্ণেল এন সরকার। রিটায়ার্ড ফ্রম মিলিটারী সারভিস—এ পারফেকট জেন্টলম্যান অ্যান্ড...

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, বিশৃঙ্খল সামনে চুল—সবই সাদা ভদ্রলোকের। পরনে প্যান্ট কোট টাই—হাতে একটা ছড়ি, মুখে পাইপ। প্রকান্ড শরীর—ভুঁড়িও রয়েছে। সবার দিকে বাও করে দেবতোষের সামনে বসে পড়লেন। বললেন, ইয়ংম্যানদের কাছ থেকে আজকাল দূরে থাকাই নিরাপদ। কী বলেন স্যর!... পরক্ষণে প্রচণ্ড হো-হো হাসি। দেবতোষও হেসে উঠেছেন। যাক, সঙ্গী পাওয়া গেছে মনোমত।

শুভ নীরেনের কানে কানে বলল, মেয়েদের টেবিলে আজ কী হয়েছে রে? সব ভিজে দেখাচ্ছে।

নীরেন একটা আড়ামোড়া দিয়ে মন্তব্য করল, বৃষ্টিপাতের ফলাফল।

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়। — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

পঞ্চাশ টাকা ছাড়ুন---

এসব চিঠি পেলে মন এমনিতেই খারাপ হয়ে যায়। তখন আর ইচ্ছা হয় না যে, চিঠির ম্যাটিরিয়াল নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কোন গল্প ফাঁদি। দরকারই বা কি—সোজাসুজি চিঠিটাই সকলের কাছে আজ পেশ করব। কারণ আমাদের কারুরই তো বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা, গণতন্ত্র বলে, নিহিত রয়েছে সকলের মাঝে, সমষ্টির হাতে। সেই সমষ্টিই আজ বিচার করুক, বলুক এই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের ট্যাক্সের টাকায় যে এক-একটি সরকারী, আধা-সরকারী দপ্তর চলে, সেখানকার দায়িত্বশীল অফিসারদের দায় কাদের কাছে? কাদের টাকায় জীবন নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন? মাস গেলে হাজার দেড় হাজার টাকা মাইনে, সরকারী টাকায় পোষা অ্যাম্বাসাডার বা জীপ, [illegible] এয়ারকুলারে সাজানো-গোছানো কিউবিকল দরজায় মোতায়েন উর্দি-পরা আর্দালী—এসব সুখ-সুবিধা কেন তাঁরা পাবেন? তাঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট বলে? কোন জনগণের সেবায় তাঁরা নিয়োজিত আত্মপোষণ ছাড়া? আর এঁদেরই নবাবীর আওতায় থেকে অধস্তন কর্মচারীরা কেউ কেউ যখন নিজেকেও কেষ্টবিষ্টু মনে করে অভাবী দুঃখী মানুষের নাকের ডগায় ছড়ি ঘোরাতে থাকেন, তখন ইচ্ছে হয় এইসব বৃটিশ যুগের বড় দারোগা ছোট দারোগার ঝাড়-মূলে.....। থাক কি ইচ্ছে হয় তা আর নাই বা বললাম। তার চেয়ে ঘটনাটাই খুলে বলি।

দিন কয়েক আগে এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম কলকাতারই এক ইউনিভার্সিটিতে। গিয়ে শুনলাম সেদিন তিনি আসেননি। দেখা হল না, তাই ফিরে আসছিলাম। ইউনিভার্সিটির মেন বিল্ডিংয়ের পূব ধারের কোণের বাড়ীটায় উনি বসেন। ফিরতি পথে বহুপরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাল্টে-যাওয়া চেহারাটা খুঁটিয়ে ভাবে দেখছিলাম। কত নতুন নতুন বাড়ী উঠছে। বিরাট খেলার মাঠের চারধারে নানা প্যাটার্ণের নানা আকারের ঢাউস ঢাউস বাড়ী। কোনটায় সিভিল, কোনটায় মেকানিক্যাল, কোনটায় ইলেকট্রিক্যাল, কোনটায় কেমিক্যাল, কোনটায় মেটালার্জির ক্লাশ হয়। এক-একটা বিল্ডিংয়ে এক-একটা ডিপার্টমেণ্ট। মাঠ আর বাড়ীগুলোর মাঝ দিয়ে চলাচলের পিচমোড়া রাস্তা। কেমিক্যাল বিল্ডিং ছাড়িয়ে বাঁ-হাতে খেলার মাঠ রেখে পুকুরের পাড় ঘেঁষে এগুচ্ছিলাম। চোখে পড়ল রাস্তার ধারেই মেটালার্জি বিল্ডিংয়ের তলায় ত্রিশ-চল্লিশটি বিশ-বাইশের উঠতি যৌবন উত্তেজনায় দাপাদাপি করছেন। এগিয়ে গিয়ে কান পাতলাম। শুনতে পেলাম—এঁরা কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউ পুরুলিয়া, কেউ বাঁকুড়া বা বর্ধমান, বাকীরা এই শহরের নানা প্রান্ত থেকে আজ সকালে এসেছিলেন একটা ইণ্টারভিউয়ের আশায়। সকাল ন'টা থেকে লাইন লাগিয়ে দুপুর দেড়টার সময় এরা জানতে পেরেছেন। এঁদের কোন আশা নেই। এমন নয় যে, এঁরা সবাই বোকা গো-মুখ্যু। সকলেই এঁরা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা-হোল্ডার। একটা দেড়শো টাকার ভারত সরকারের ট্রেনিংয়ের আশায় এঁরা কেউ এক বছর কেউ ছ' মাস কেউ তিন মাস ধরে ঘুরে মরছেন। অনেক ঘোরাঘুরির পর আজ ইণ্টারভিউ হবে জেনে এঁরা ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু চার-পাঁচ ঘণ্টা লাইন লাগানোর পর জানতে পেরেছেন সবই ফক্কিকারি। কপালে শুকনো আমের আঁটি ছাড়া কিছু নেই।

নেই যখন তখন এত চেঁচাচ্ছেন কেন? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেই তো ভাল। শুধু শুধু এখানে জটলা করে ভিড় বাড়িয়ে কি লাভ? কিছুটা বিরক্ত নিয়েই, সব ব্যাপারেই রাজনীতির অনুপ্রবেশে শঙ্কিত সন্দিগ্ধমনা ভিড়টার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যাওয়া হল না। সামনেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে আমার পুরোনো পাড়ার প্রতিবেশী বিনয়বাবুর ছেলে সুব্রত।

—কি ব্যাপার সুব্রত, তুই এখানে? প্রশ্ন একটা করতেই হয় পরিচিত কাউকে দেখলে, তাই করলাম। শুকনো চৈত্রের গরম হাওয়ায় একরাশ রুক্ষ চুল উড়ছে। থোকা থোকা ঘামের দানা কপালে ঘাড়ে গলায় ঝরে পড়ার অপেক্ষায় জমে আছে। লম্বা ছিপ ছিপে রোগা ছেলেটা উত্তেজনায় কাঁপছে রীতিমত। এখানে কেন রে? কি ব্যাপার? —জবাব না পেয়ে রিপিট করলাম প্রশ্নটা।

একটা ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাওয়ার আশায় এসেছিলাম দাদা, থম-ধরা উত্তেজনার জমাট বরফ অল্প অল্প গলাতে শুরু করল—সকাল থেকে লাইন লাগিয়ে এই দেড়টার সময় শুনলাম, আমার ইণ্টারভিউয়ের ডেট নাকি দশদিন আগেই পেরিয়ে গেছে। সব মিথ্যে কথা। জোচ্চুরী। চিঠিই পাঠায়নি, বলে কিনা চিঠি পাঠিয়েছে। বলুন তো এখন কি করি? বাড়ী ফিরলেই মা জিজ্ঞাসা করবেন, বাবা জিজ্ঞাসা করবেন, কেমন ইণ্টারভিউ দিলাম। কি বলব বলুন তো?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বিনয়দা, রেণুবৌদির কথা। আগে যে-পাড়ায় থাকতাম, বড় রাস্তার ধারে একটা বহু পুরোনো ছাতলা-ধরা ফ্ল্যাট বাড়ীর মুখোমুখি দুটি ফ্ল্যাটে আমরা ছিলাম প্রতিবেশী। মার্কেনটাইল ফার্মের শ'-তিনেক টাকার কেরানী বিনয়দার হতাশায় বুড়িয়ে-যাওয়া মুখটা বারবার মনে পড়তে লাগল। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সুব্রতই বড়। আমরা যখন পাড়া ছেড়ে আসি তখন শুনেছিলাম ও কোন একটা পলিটেকনিকে নাকি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। বছর-দুয়েক দেখা-সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ এইভাবে ইউনিভার্সিটির রাস্তায় সুব্রতকে দেখে যেমন খুশী হলাম, তেমনি ভয়ও হল বিনয়দার কথা ভেবে—ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেও ছেলেটা বেকার। রেণুবৌদি এখনো সেই সকাল সন্ধ্যা হাঁড়ি ঠেলে যাচ্ছেন। মণ্টু, ঝণ্টু, খোকন, ভোম্বলরা খেতে না পেয়ে

পেরে আরো কত শুকিয়ে গেছে কে জানে? ইস সুব্রতটারই বা কি চেহারা হয়েছে! যেন কতদিন খায়নি। খাড়া নাকটার পাশে উত্তেজিত চোখদুটো গর্ত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মায়া হল, তাই ফের শুধুলাম—ব্যাপারটা কি বল তো?

কান্না-ভেজা গলায় হঠাৎ আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে সুব্রত বলল—দাদা, আপনি তো কাগজে লেখেন। আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে একটু লিখুন না।

অনুরোধ শুনে একটু বিরক্ত বোধ করলাম। তাকিয়ে দেখি পেছনের ভিড়টা থেকে দু-একটা উৎসুক মুখ এদিকে ছিটকে এসেছে। ভয় হল আবার আমি না কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি। তাছাড়া আমি যা নিয়ে লিখি, বা যাদের বিষয়ে লিখি তার সংগে সুব্রতর ইন্টারভিউ পাওয়া না পাওয়ার সম্পর্কই বা কি, বা এই ভর-দুপুরে একমাথা রোদে দাঁড়িয়ে কোন লেখা টেখার কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে না। তাই পাশ কাটানোর জন্য বললাম—বেশ তো একদিন বাড়ীতে আয়। সব শুনব। লেখার ব্যাপার হলে পরে দেখা যাবে।

ঠিকানাটা জানত না। এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম। তারপর মনেও ছিল না কিছু। গতকাল রাতে বাড়ী ফিরে শুনি সুব্রত এসেছিল। একটা চিঠি রেখে গেছে। কাল আর পড়া হয়ে ওঠেনি। চিঠিটা টেবিলেই পড়েছিল। আজ সকালে খবরের কাগজটা বারকয়েক নেড়েচেড়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। আর তখুনি দেখি একটা কাগজ হাওয়ায় উড়ে গিয়ে টেবিলের তলায় পড়ল। তুলে নিয়ে খুলে দেখি সুব্রতর চিঠি—

পূজনীয় দাদা,

সন্ধ্যা থেকে বসে বসে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। শুনলাম ফিরতে আপনার আরো রাত হতে পারে। তাই দেখা না করেই আজ যাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটা এই চিঠিতেই খুলে লিখলাম।

ডাক্তারী পাশ করলেই যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, তার পরেও সব ছেলেকেই ছ' মাসের জন্য হাসপাতালে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয় (যাকে পি আর সি এ পিরিয়ড বলে), তেমনি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পর ইঞ্জিনীয়ারদের কলে-কারখানায় হাতে-কলমে এক-দেড় বছরের জন্য কাজ শেখা দরকার। তবে ডাক্তারীর এপ্রেনটিসসিপ কমপালসারী আর আমাদের বেলায় যে যা জোটাতে পারে।

ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের মত সদ্য পাশ-করা ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন ঠিকই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। এই ট্রেনিংয়ের নাম—গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্রেনিং। চলতি কথায় জি ও আই ট্রেনিং। বিভিন্ন কল-কারখানার সংগে সরকারের চুক্তিমত এক বছরের ট্রেনিংয়ের সুবিধা আমরা পাই। ট্রেনিং পিরিয়ডে ডিপ্লোমা পাশ করা ছেলেরা পায় দেড়শো টাকা আর ডিগ্রীরা আড়াইশো টাকার সরকারী বৃত্তি। বছর-কয়েক আগেও যখন ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরীর অভাব ছিল না, তখন (স্টাইপেন্ডের হার ছিল ডিপ্লোমার বেলায় পঁচাত্তর আর ডিগ্রী হলে দেড়শো টাকা) কেউ আসত না এই ট্রেনিং নিতে। এখন তো দেশের চেহারাটাই আমূলে পাল্টে গেছে। চাকরী নেই কোথাও। তাই ভবিষ্যৎ অন্ধকার জেনেও, ট্রেনিং পিরিয়ডের পরে কোথাও হয়তো চাকরী জুটবে না জেনেও আমাদের মত হাজার হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ার এই সাময়িক বেকার-ভাতাটুকু পাওয়ার আশায় লাইন লাগাচ্ছে। যেমন সেদিন আমাকে দেখেছেন ইউনিভার্সিটিতে ট্রেনিং দপ্তরের অফিসে।

ঐ অফিসটি এখন আমাদের একমাত্র তীর্থক্ষেত্র। খোঁজ নিয়ে দেখবেন গড়ে দৈনিক একশোরও বেশী ছেলে ঐ অফিসে যায় যদি কোথাও কোন ট্রেনিং জোটাতে পারে।

ডিমান্ডের তুলনায় সাপ্লাই অনেক কম। তাই পরীক্ষার রেজাল্ট অনুযায়ী ওরা কল করেন। সাধারণত সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস থাকলে একটা চান্স ও'রা দেন। আমি পেয়েছি সিক্সটি পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট। গত নভেম্বরে আমাদের রেজাল্ট আউট হওয়ার পর কলেজেই ট্রেনিংয়ের ফর্ম ফিল-আপ করে এসেছিলাম। ফর্মের সংগে এক টাকার পোস্টাল অর্ডার জমা দিতে হয়েছিল।

নভেম্বর গেল, ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারীও শেষ হয়ে গেল। ইন্টারভিউয়ের কোন চিঠি না পেয়ে ভেতরে ভেতরে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। তার মানে এই নয় যে, এক মাস আমি অন্য কোথাও কোন চেষ্টা করিনি। ডালহৌসী পাড়ায় হেন অফিস নেই যেখানে আমি ঢু মারিনি। বক্স নম্বরে অ্যাপ্লাই করেছি অন্ততঃ পনেরোটা জায়গায়। কিন্তু নো রিপ্লাই। বাইরে কোথাও সুযোগ না পেলেও মনে আশা ছিল, ট্রেনিং বোর্ডের ইন্টারভিউটা তো বাঁধা। আর রিকুইজিট মার্কস যখন আছে তখন হয়তো একটা চান্স জুটেও যেতে পারে।

মাস আড়াই অপেক্ষা করার পর আর ধৈর্য রাখতে পারলুম না। না, বাবা-মা কিছু বলেননি। বরং বললে ভাল্লো ছিল। হয়তো রুখে উঠে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু মা-বাবাকে আপনি তো চেনেন। রোজ সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে বাবা যখন শুকনো মুখে জিজ্ঞাসা করেন—খোকা কোন খবর পেলি, তখন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা আমি করতে পারি।

কতদিন আর এভাবে চলে। তাই ফেব্রুয়ারীর গোড়ায়, সম্ভবত তিন তারিখ, একবার খোঁজ নিলুম ঐ অফিসে।

মেটার্লজি বিল্ডিংয়ের তেতলায় সিঁড়ির মুখে খান-দুয়েক বড় বড় ঘর আর একটা ছোট ঘর নিয়ে বোর্ডের অফিস। একটা ঘরে ডিরেক্টার সাহেব একলাই বসেন, আর একটা ঘরে বসেন জনা-পাঁচেক ক্লার্ক, দু-তিনজন টাইপিস্ট আর একজন অফিসার। অন্যদিকে একফালি একটা কামরার বাইরে ঝোলানো সাইনবোর্ডে এনকোয়ারী কথাটা দেখে যদি কেউ কোন খোঁজ নিতে ঐ ঘরে ঢোকেন তাহলে তাঁকে আমার মতই ঠকতে হবে। কারণ আমি প্রথম প্রথম এনকোয়ারীতে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু মানুষজন না থাকলে চেয়ার-টেবিল তো আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তাই নিরুপায় হয়ে কেরানীবাবুরা আর ট্রেনিং অফিসার যে ঘরে বসেন সে ঘরেই ঢুকতে হয়েছে।

এনকোয়ারীতে কাউকে না দেখে, তিন তারিখ ঐ ঘরেই গেলাম জানতে কি হোল আমার ইন্টারভিউয়ের। সারি সারি খানকয়েক টেবিল দরজার মুখোমুখি পোস্টাপিসের কাউন্টারের মত সাজানো। বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কাকে জিজ্ঞাসা করব। দেখলাম পূর্বসূরীরা একই ভদ্রলোকের কাছে এসে খোঁজ নিচ্ছেন। আমিও তাই করলাম।

আমি টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক চোখ তুললেন—কি নাম? কোন পলিটেকনিক? নাম বললাম আমি। তারপর ফাইল-টাইল ঘেঁটে উনি বললেন—এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি যাবে।

আদৌ ট্রেনিংয়ের চান্স পাব কিনা তার ঠিক নেই, শুধু একটা ইন্টারভিউয়ের চিঠি পাবে তাতেই বাড়ীতে সবাই কি খুশী। খবরটা শুনে বাবা-মা দুজনে পঞ্চানন-তলায় গেলেন পুজো দিতে। সাড়ে আট-দশটার সময় ফিরে এসে একটু [illegible]-পাতা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে [illegible] হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন—[illegible] তোর ঠিক হবেই।

অথচ সাতদিন কেটে গেল তবু কোন চিঠি এল না। আবার গেলাম ঐ অফিসে। সেদিন এগারোই ফেব্রুয়ারী। এদিনও ঐ ভদ্রলোক, এবার জেনেছি উনি ডিলিং ক্লার্ক, বললেন পনেরো তারিখ অবদি অপেক্ষা করুন। করলাম। কিন্তু চিঠি আসে কৈ? গেলাম আবার আঠারো তারিখ। এবার শুনলাম ডিরেক্টার সাহেব না কি দিল্লী যাচ্ছেন। বাইশ তারিখের আগে ফিরবেন না। অতএব তেইশ তারিখ যেন একবার খোঁজ করি।

একটা কথা বলা হয়নি। যত সহজে এক-একটা দিনের বিবরণ এখানে লিখছি, অ্যাকচুয়াল ঘটনা কিন্তু অত সহজ নয়। দেখেছি ঐ অফিস আমাদের মনে রাখতে পারে না। যতবারই গেছি প্রতিবারই একই কোশ্চেন-সেট রিপিট করেছেন—কি নাম? কোন কলেজ? কত পারসেন্ট মার্কস? শুধু জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হননি, চমৎকার চমৎকার সুবচনীও সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন। ও অমুক পলিটেকনিক—ওটাতো একটা

ঝুলছে। আর আমরা প্রত্যাশিজন ক্যান্ডিডেট বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা করছি। দু-একজন কার্ড পেয়ে এসেছে, বাদবাকী সব আমার মত মুখের কথায় ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে। জানে না কোথায় কোন্ কোম্পানীতে কপাল বাঁধা।

সাড়ে ন'টা নাগাদ ট্রেনিং অফিসার এলেন। তাঁকে দেখেই আমরা ছুটে গেলাম —স্যার আজ আমাদের ইণ্টারভিউ। কখন হবে? বোধহয় আমাদের অত্তজনকে এক-সঙ্গে হামলে পড়তে দেখে ভদ্রলোক ভয় পেয়েছিলেন। চোখের ইসারায় দরোয়ানকে অফিসের দরজা খুলতে বলে থতমত হয়ে বললেন—আমি কিছু জানি না। যে বলেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। বলতে বলতে সুট করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কাকে জিজ্ঞাসা করব? যিনি বলেছেন তিনি তো এখনো আসেননি। এলেন দশটা বেজে দশে। পান চিবুতে চিবুতে, হাতে ছাতা, টিফিন বাক্স। সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ বাকী থাকতেই চেঁচিয়ে উঠলেন—লাইন লাগাননি কেন? ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন না দাঙ্গাবাজী করতে এসেছেন?

আপই বলুন, অরিজিন্যাল মার্কসীট নিয়ে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা মুর্শিদাবাদ থেকে যারা এসেছেন, বা আমার মত যাঁরা সাতসকালে খেয়ে না খেয়ে টালা বা টালিগঞ্জ, মানিকতলা বা মোমিন-পুর থেকে এসেছেন, তাঁরা কি কেউ দাঙ্গাবাজী করতে এসেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই ভদ্রলোকের অ্যাটিচ্যুড খুব খারাপ লেগেছিল। তবু কিছু বলিনি। বলিনি এই ভেবে যদি উনি সব গুবলেট করে দেন। দেখেছি তো অফিসে ওর কি দোর্দণ্ড প্রতাপ।

সেই প্রতাপের ঠেলাতেই তিনতলা টু একতলা সিঁড়ির দেয়াল ঘেঁষে লাইন দিয়ে দাঁড়ালুম আমরা। এগারোটা নাগাদ ডিরেক্টার সাহেব এলেন। উর্দি-পরা আর্দালী সেলাম ঠুকে কাঁচের সুইং-ডোর ঠেলে বড়কর্তার ভেতরে ঢোকার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। কাঁচের দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ওধারের ছোটাছুটি ব্যস্ততার একটা মূক ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভালো লাগল, তাহলে আজ ইণ্টারভিউ হচ্ছে।

একটু বাদে আরো খানকয়েক গাড়ী এল। এই দারুণ গরমেও মোটাসোটা গোল-গাল চেহারায় কুল স্যুট চাপানো। টাইয়ের নট একটুও আলগা নয়। ওপরে উঠতে উঠতে কেউ কেউ একবার আমাদের ওপরে চোখ বুলিয়ে গেলেন। বুঝলাম এ'রাই আমাদের ইণ্টারভিউ নেবেন।

সোয়া এগারোটায় প্রথম ডাক পড়ল। এক-একজন ভেতরে যায়, দু-তিন মিনিট বাদেই বেরিয়ে আসে। আমার যখন টার্ন এল, তখন বাজে সাড়ে বারোটা। এই সোয়া ঘণ্টায় অনেকেরই ইণ্টারভিউ হয়ে গেছে। যাঁদের হয়ে যাচ্ছিল আমরা তাঁদের ছেঁকে ধরছিলাম—কি কি জিজ্ঞাসা করল? কোন্ কোম্পানী? এটা সেটা নানা প্রশ্ন। একটা জিনিস বড় অবাক লাগছিল, অনেকেরই দেখলাম ইণ্টারভিউ হয়নি। তাঁদের নাকি আগেই কবে ডেট পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি রকম ধাঁধার মত লাগছিল। খারাপ লাগছিল ভেবে যে এরা সব কতদূর থেকে এসেছে সেকি শুধু-হাতে ফিরে যাওয়ার জন্য। তখনো কি ছাই জানি আমার ভাগ্যে কি নাচছে?

ভেতরে গেলাম। সেই পাশের বড় ঘরটায়। সেই ডিলিং ক্লার্ক। গম্ভীর মুখে ফাইল খুলে বসে আছেন। ঢুকতেই মুখ তুলে চাইলেন—কার্ড দেখি। বললাম—ইণ্টারভিউ লেটার তো পাইনি। আপনি আজ আসতে বলেছিলেন। এবার কোন কথা না বলে ভদ্রলোক আরো গম্ভীর হয়ে ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—কি নাম? কোন কলেজ? বললাম। মিনিট-খানেক সব চুপচাপ। উনি ফাইল দেখলেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বেশ বিরক্তির সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন—বাইশ তারিখ কি হয়েছিল? ওদিন আসেননি কেন? ওদিন আপনার ইণ্টারভিউ হয়ে গেছে।

আমি তো শুনে হতভম্ব। ভদ্রলোক বলেন কি? আঠারো তারিখে এলাম তখন বললেন ডিরেক্টর দিল্লী যাবেন. তেইশে আসুন। এর মাঝে কোন ইণ্টারভিউ হবে না। তেইশে এলাম। তখন বললেন আজ আসার কথা। মাথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু শুনতে পেলাম ভদ্রলোক বলছেন—আপনার নামে গত মাসের আঠারো তারিখে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। বাইশে আপনার ইণ্টারভিউ ছিল। আপনি আসেন নি। এখন আর কিছু করার নেই। আমার সময় নষ্ট করবেন না। আরো ছেলে বাকী আছে। যান দিকি এখন, পরে আসবেন।

পরে আসব! আমি আর মেজাজ রাখতে পারি নি সেদিন। চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। টেবিলে ঘুষি মেরে চীৎকার করে উঠলম—ইয়ার্কি পেয়েছেন। আঠারোই আমি এসেছি। তেইশ তারিখও এসেছি। কৈ তখন তো একবারও ইণ্টারভিউ বা ইণ্টারভিউ লেটারের কথা বলেন নি? বরং তেইশ তারিখ আপনিই বলেছেন আজকে আসার কথা। তখন আমি বলেছিলাম কার্ড দিলেন না. উল্টে আপনি ধমকে তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন। আজ আপনাকে ছাড়ব ভেবেছেন। ইণ্টারভিউ না দিয়ে আমি যাব না, যাব না, যাব না।

এক নাগাড়ে বোধহয় মিনিট খানেক ধরে টেবিল থাবড়েছি, চীৎকার করে গলা ফাটিয়েছি। আমার চেঁচামেচিতে পাশের ঘর থেকে ডিরেক্টার সাহেব আর অন্যান্য সাহেবরা সব ছুটে এলেন। ট্রেনিং অফিসার ও অন্যান্য ক্লার্ক টাইপিস্টরাও ছুটে এসেছেন। আর্দালী, পিওন, দরোয়ান কেউ বাদ নেই।

বড়সাহেব দেখি আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। অন্যান্য কর্তার যাঁদের প্রশ্নের জবাব দেব বলে এক সপ্তাহ ধরে নিজেকে তৈরী করেছি, সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পাই নি। তাঁরাই এসেছেন আমার কাছে স্বয়ং বড়কর্তা আমার প্রশ্নের [illegible] নিচ্ছেন কি চমৎকার বলুন তো।

—বলুন, কেন এতদিন ধরে আমা[illegible] ধাপ্পা দিয়েছেন?

—কেন কি হয়েছে বাবা? (আহা মোলায়েম গলার স্বর!)

—আমার ইণ্টারভিউয়ের চিঠি আ[illegible] কেন পেলাম না?

—সত্যিই তো কেন পেলে না। দাঁড়াও আমি নিজে দেখছি কি ব্যাপার। তুমি এ[illegible] আমার সঙ্গে বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে [illegible] খাস কামরায় ঢুকলেন। তখন আমার খাতির। তখুনি 'বজার' টিপে বেয়ারা ডেকে বলে দিলেন ফাইল সমেত কেরা[illegible] বাবু যেন এক্ষুনি এসে দেখা করে। [illegible] এলেন। ছুঁচলো গোঁফজোড়া ঝুলে গে[illegible] মাথা নীচু করে ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে। আমি, যে আমি কতদিন ঘণ্টার পর [illegible] একটা জবাবের আশায় ওর সামনে দাঁ[illegible] হাত কচলেছি আজ পায়ের ওপর পা [illegible] ডিরেক্টরের মুখোমুখি বসে আ[illegible] ডিরেক্টার সাহেব একবারও ওকে ব[illegible] বললেন না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাইলের রহস্য বুঝিয়ে দিলেন ডিরেকটার সাহেবকে। দেখা গেল সত্যিই নোট করা আছে যে গত আঠারোই আমার নামে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। আর যে কোম্পানীতে হওয়ার কথা ছিল সেটি কলকাতারই। কত বড় একটা সুযোগ হাতছাড় হয়ে গেল। তখন আমার কি আপশোষ। তার দশগুণ দেখলাম কেরানীবাবুর আর তাঁর বড় সাহেবের। পোস্টাল পিওনদের গাফিলতির জন্যই নাকি আমার এত বড় সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল। যাহোক আমি যাতে আর একটা চান্স পাই, তা ওরা নিশ্চয়ই দেখবেন। তারপর 'ইয়ংম্যান মাথা গরম কোর না,' 'জীবনে আরো কত সুযোগ আসবে' ইত্যাদি বলতে বলতে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কর্তামশাই যে কখন আমায় তাঁর ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তা টেরও পাইনি। সেদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সেদিন মাথা গরম ছিল। কি বলছিলাম, কি করছিলাম নিজেরই কোন হুঁশ ছিল না। আজ যখন এই চিঠি লিখছি তখন খুব হুঁশিয়ার হয়েই গোটা কয়েক কথা এবার লিখব। আপনি কি মনে করেন না যে নিজের দায় অপরের ঘাড়ে চাপানো একটা মস্ত অপরাধ? বিশেষ করে একই সরকারের বেতনভোগী এক দপ্তরের কর্মচারী কি করে অন্য দপ্তরের কর্মচারীদের নামে দোষারোপ করে? আর পোস্টাল পিওনরা যদি সত্যিই তাঁদের কাজে গাফিলতি করতেন তাহলে কি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এতদিনে উঠে যেত না? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কয়েক যুগ ধরে ইলেকট্রিকের বিল এই শহরের প্রতিটি বাড়ীতে যাঁরা পৌঁছে দেন তাঁরা কেন আমার ইণ্টারভিউয়ের চিঠিটি ফালতু কাগজ বলে রাস্তায় ফেলে দেবেন? আর এতই যদি অবিশ্বাস তাহলে কেন ইণ্টারভিউ লেটার এঁরা আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং বা রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠান না? এই চিঠি পাঠানোর খরচ তো বোর্ডকে বেয়ার করতে হয় না। এর জন্য তো ফর্মের সঙ্গে এক টাকার পোস্টাল অর্ডার সব ছেলের কাছ থেকেই আদায় করছে বোর্ড।

আসলে বাস্তুঘুঘু বাসা বেঁধেছে অফিসে। রেজেস্ট্রি বা আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিংয়ে চিঠি পাঠালে হয়তো তাঁর বা তাঁদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। জারিজুরি, কাজ কারবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। ব্যাপারটা এখন জলের মত ক্লিয়ার আমার কাছে। ক্লিয়ার হয়েছে ঐ ঘটনার দিন দুয়েক বাদে। ঐ অফিসের তলাতেই মূর্তিমান ঘটনার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হায়ছে। এটুকু স্পষ্ট বলব যে দালালটি অফিসের কেউ নয়, কিন্তু আমার সন্দেহ ভেতরে ভেতরে কোথাও নিশ্চয়ই যোগ আছে। নইলে কোন সাহসে বলে—মিছিমিছি ঘুরে মরছেন। পঞ্চাশটা টাকা ছাড়ুন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুখের কথাই তাঁর বিশ্বাস করতে হবে। আর করলে যে ঠকতে হয় না সে কথাও দু একজন সৌভাগ্যবান 'ট্রেনি'র মুখে শুনেছি। তাঁদেরও দিতে হয়েছে। ওঁদের একজনের আবার সিকসটি পার্সেণ্ট মার্কস পর্যন্ত ছিল না। তবু ইণ্টারভিউ পেয়েছেন, ট্রেনিংয়ের চান্সও মিলেছে।

কেমন করে? এ তো খুব সোজা। ধরুন ঐ যে বাইশ তারিখ আমার ইণ্টারভিউ ছিল ঐদিন আমার মতো হয়তো আরো কুড়ি পঁচিশজনকে ডাকা হয়েছিল। হয়তো নেওয়া হবে পনেরোজনকে। মেরিট লিস্ট অনুযায়ী কল করা হবে। যাঁরা সিকসটি পার্সেণ্ট মার্কস পেয়েছেন তাঁদের চান্স আছে, তবে সেই সঙ্গে কম নাম্বারের ছেলেদেরও ডাকা হয়। কারণ গভর্ণমেণ্ট তো আর কোন পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। পারলে সকলকেই সুযোগ দেবে। তবে পোস্ট কম, অ্যাপ্লিকেণ্ট বেশী, তাই মার্কসের এত কড়াকড়ি।

কুড়ি পঁচিশ জনের নামেই কার্ড রেডি হল। যাঁরা ষাট বা ষাটের বেশী নম্বর পেয়েছেন তাঁদের নামে ছাড়াও যাঁরা কম পেয়েছেন তাঁহাদেরও ডাক পাঠানো হল। কারণ যদি কেউ অনুপস্থিত হন তাহলে যাতে পরেরজন একটা চান্স পায়। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করবেন না।

এখন সুড়ঙ্গপথে যাঁরা আয়োজন করতে পেরেছে তাঁরা ঠিকই বাড়ী বসে কার্ড পেয়ে গেলেন, আর আমার মত হতভাগ্য কজন যাঁরা ঠেকে শিখেছেন তাঁদের কার্ড আর কিছুতেই এল না। একথা আমি বলব না যে যাঁরাই, ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন তাঁদের সবাই এইভাবেই পাচ্ছেন। তবে কেউ কেউ যে পাচ্ছেন একথা হলফ করে বলতে পারি। এবং সেই সঙ্গে একথাও বলব, বোর্ডের অফিসে কোথাও নিশ্চয়ই গলদ আছে, যে-জন্য আমার মত অনেকেই চিঠি পায় না, অথচ ইণ্টারভিউ হয়ে যায়। আর এদিকে কয়েকটা উটকো লোক সেই সুযোগে দুহাতে টাকা কামাচ্ছে। এই অন্যায়, এই অবিচার কি কোন দিনই বন্ধ হবে না?

আবেগের মাথায় যদি কিছু বেশী লিখে থাকি, ছোটভাই বলে ক্ষমা করবেন।

সুব্রত মজুমদার।

পুনশ্চ : যদি কোন প্রমাণের প্রয়োজন থাকে আমাকে একটা খবর পাঠালেই সব নিয়ে হাজির হব। আমার কয়েকটি ভুক্তভোগী বন্ধুও রাজী আছেন সাক্ষী দিতে।

—সন্দিহদ্দ।

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

ঘটকের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব কি? কেন তিনি অসুস্থ হলেন? তাঁর অসুস্থতা এই বিশেষ রূপ নিল কেন? এখন এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলতে পারে।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে পাওয়া তথ্য যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করলে মানুষের রোগের কারণ ও উপসর্গ ঠিকভাবে বোঝা যাবে না। চিকিৎসারও উপায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। ল্যাবরেটরীর শিক্ষা মানুষের রোগ ইতিহাস থেকে পাওয়া শিক্ষার সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে; তবেই বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ও দৃষ্টি-ভংগী গড়ে উঠবে।

পাভলভীয় পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে আমরা জেনেছি যে দুর্বল অসম টাইপের নিউরোসিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি; কিন্তু সবল সুষম টাইপও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের উপর চাপ বেশি পড়লে অথবা শারীরিক অসুস্থতার দরুণ সাময়িকভাবে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়লে সবল সুষম টাইপও নিউরোটিক হয়ে পড়তে পারে। আরো জেনেছি যে আর্টিষ্টিক টাইপের মানুষ, (এদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য) রোগাক্রান্ত হলে তাদের মধ্যে সাধারণত হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ দেখা যায়, আর দার্শনিক টাইপের (দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য) মধ্যে অবসেসিভ্ নিউরোসিস বা আচ্ছন্ন অবস্থা দেখা যায়। এই ধরনের রোগীর কথা উঠলে এই আচ্ছন্ন অবস্থা এবং বাধ্যকরী অবস্থার শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ আমরা ঘটকের হিষ্টিরিয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

নিউরোসিসের তিনটি মডেল সৃষ্টির খবরও আমরা জেনেছি। স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা নিস্তেজনা ও গতিময়তার অতি-পীড়ন থেকে নিউরোসিসের মডেল তিনটি সৃষ্টি করা হয়েছে।

এইবার ঘটকের ক্ষেত্রে পাভলভ-তত্ত্ব প্রয়োগের চেষ্টা করব।

আমরা জানি ঘটক দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী। আত্মকেন্দ্রিক ও সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন। নিরাপত্তার অভাবে ও অনিশ্চয়তা-বোধে পীড়িত; সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার বাস্তবানুগ বিশ্লেষণের চেষ্টা তিনি কোনোদিন করেননি। হীনমন্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক-হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। উচ্চাশা আছে, কিন্তু আশাকে ফলবতী করার জন্য কর্মপ্রচেষ্টা বা উদ্যম নেই। স্পর্শকাতরতার দরুণ নিজের সম্বন্ধে অন্যের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর লেখা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

আমরা তাঁকে দুর্বল, নিস্তেজনাপ্রবণ টাইপের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতা জোগায়। এই ক্ষমতা তাঁর মধ্যে সীমিত। কাজেই দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র দুর্বল। হিস্টিরিয়ার উপসর্গ এই ধরনের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।

এইবার প্রশ্ন উঠবে প্রথমবারে ঘটকের মধ্যে যে সব রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছিল, সেগুলো হিস্টিরিয়ার লক্ষণ না নিউর্যাস-থেনিয়ার লক্ষণ? দ্বিতীয়বারে হিস্টিরিয়ার তৃতীয় দশা, স্বপ্নচারিতা দেখা দিল কেন?

ঘটকের প্রথমবারের উপসর্গের মধ্যে প্রধান ছিল ভয়, মৃত্যুভয়। বিরোধদ্বন্দের সমাজে দুর্বল চিত্তের মনে মাঝে মাঝে মৃত্যু-ভয় দেখা দিয়ে থাকে। যুদ্ধের সময়ে প্রথম সারির সৈনিকদের অনেকের মধ্যে, এই ধরনের মৃত্যুভয়তাড়িত হবার ফলে, নানারকমের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 'ওয়ার-নিউরোসিস' আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে অন্ধত্ব, বধিরতা, প্যারালিসিস ইত্যাদি নানারকমের হিস্টিরিয়া উপসর্গের অভি-ব্যক্তির খবর আমরা জানি। পাভলভের মতে এগুলো সবই মত্যুভয় থেকে সৃষ্ট রোগ-লক্ষণ। ভয়ের দরুণ স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের ও নাড়ীর গতিবেগ বৃদ্ধি হয়, পেশীগুলোতে টান পড়ে। আরো অনেক শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে। সবল মস্তিষ্কের মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন-গুলো সাধারণত স্থায়ী হয় না। কিন্তু দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষের মধ্যে উপসর্গ-গুলোর তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো ভয় পায় রোগী। কী করে ভয়ের উপসর্গ বাড়ে, এ সম্পর্কে পাভলভের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে ভয়ের উপসর্গগুলো শর্তাধীন রিফ্লেকসের নিয়ম অনুযায়ী জীবনের নিরাপত্তাবোধের সঙ্গে সংযুক্ত, আনুষঙ্গিক হয়ে পড়ে। সবল-চিত্ত মানুষ সামাজিক যুক্তিবুদ্ধি আদর্শবাদ দেশাত্মবোধের চিন্তা ইত্যাদির সাহায্যে এ[ই] যুদ্ধকালীন ভয়কে জয় করতে পারে অন্যান্য চিন্তা ও [...]ক প্রক্ষোভসঞ্চার উদ্দীপনা ভয়ের প্র[...] মস্তিষ্কে ছাড়ি[য়ে] পড়তে বাধা দান করে[...]কের মত লোকে[র] পক্ষে এইভাবে বাধাদান [স]ম্ভব নয়। দুর্ব[ল] মস্তিষ্কে ভয়ের তরঙ্গ [ছ]ড়িয়ে পড়ার ফ[লে] একদিকে নিম্নমস্তিষ্কে[...] অবস্থিত রক্তচ[াপ] নিয়ন্ত্রণের ও হৃদযন্ত্রে[র] কেন্দ্রগুলি আ[রো] বেশি উত্তেজিত হয়। [...] উপসর্গ বে[ড়ে] ওঠে। অন্যদিকে উচ্চ[...]ষ্কে নওথ[...] আরোহ ('নেগেটিভ [...]কশনের') [...] দরুণ অন্যান্য অংশে[...] [যু]ক্তি চিন্তা [...] তাড়িত অংশকে প্রভা[বিত] করতে পারে [...] এইভাবে ভয় বাড়তে [থা]কে, অন্যান্য সা[...] আনুষঙ্গিক চিন্তা, প্র[ক্ষোভ] কমতে থা[কে] কিছুদিন পরে দেখা যায়, রোগী [...] অসুখের সংগে প্রায় প্রেমে পড়ে গে[ছে] ভয়ের জায়গা থেকে দূরে থাকবার [...] অসুখকে যেন আঁকড়ে ধরেছে। পরি[...] বসে দিনরাত্ত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থ[াকার] চেয়ে হাসপাতালে অন্ধ হয়ে শুয়ে [...] অনেক বেশী আরামদায়ক। পাভলভের [...]

The flight the will to be sic[k] a most characteristic feature [...] hysteria". এ ছাড়া এইভাবে অ[...] হয়ে থাকার ফলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পা[লিয়ে] আসার লজ্জা থেকেও সে মুক্ত [...] নিজের কাছে ও অন্যের কাছে [...] বজায় থাকছে। মৃত্যুভয় থেকে অসু[খ] অসুস্থতা থেকে আরো ভয়—এইভাবে ভিসিয়াস সার্কেল তৈরী হয়েছে।

অনেক সময় স্বাভিভাবন হি[...] এবং অন্যান্য নিউরোসিসকে দীর্ঘ[...] করে।

পাভলভের মতে,—

"Any slight feeling of in[...] sition or unusual difficul[ty ...] any organic function is a[ccom]panied in the hysteric b[y ...] emotion of fear of a s[...] illness, and this is enough not only to support but

tensify them to an extreme degree making of the subject an invalid." (1)

যুদ্ধকালীন নিউরোসিসে যে রকমটি ঘটে, সামাজিক দুর্যোগে, অস্বাভাবিক অবস্থায়, আত্মীয়বিয়োগে, আর্থিক ক্ষতিতে, নিরাপত্তার অভাবে;—ঘটকের মত দুর্বল মস্তিষ্কের ঠিক সেইরকমটি ঘটতে পারে। ঘটকের মত আত্মমুখীনরা কোনো ঘটনার বিষয়গত বিচারে অক্ষম; কাজেই ভয় পাওয়া তাদের পক্ষে খুব বেশি অস্বাভাবিক নয়।

এইসব উপসর্গ, এই হিস্টিরিক ভয় কিন্তু ছলনা নয়। জীবনযুদ্ধে দুর্বল মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারার দরুন রোগ উৎপন্ন হয়েছে। রোগের ভান করছে না হিস্টিরিয়ার রোগী। কাজে ফাঁকি দেবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে রোগ উপসর্গ সৃষ্টি করা হয় না। রোগ উপসর্গ সৃষ্টির ফলে রোগীর ইচ্ছা পূরণ হয় বটে, কিন্তু সে মিথ্যাচারী নয়। পুরনো আমলের দু' একজন চিকিৎসক হিস্টিরিয়াকে এখনও malingering মনে করে থাকেন, আমি জানি।

"It is not intentional stimulation of symptoms ....It is an example of fatalistic physiological relations". (2)

এই একটি লাইনের মধ্য দিয়ে পাভলভ হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়বারের রোগলক্ষণের বিশিষ্টতার কারণ এবার আমরা অল্প আয়াসেই বুঝতে পারব।

প্রথমবারের অসুস্থতার মূলে ছিল রেসে যাবার ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব। নিস্তেজনা-প্রতিক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত চাপের দরুন অসুস্থতা ঘটেছিল। এই সময় সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে তাঁকে সুস্থ করে তোলা হয়। রেসে যাবার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে পারিবারিক কর্তব্য, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি সদর্থক উদ্দীপকও সুস্থ হতে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয়বারে স্নায়ুতন্ত্রের উপর অতিরিক্ত পেষণের ফলে অসুস্থতা। প্রথমবারের চিকিৎসায় রেসে যাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবনের ফলে, এইবারে ঐ ইচ্ছা প্রথমটায় তাঁকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করতে পারেনি। কিন্তু ঘটনার চাপে যখন মস্তিষ্ক অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, নিরানন্দ ভাব ও নিরাপত্তার অভাব যখন অতিমাত্রায় অনুভূত হল, তখন আনন্দময় জীবন (রেসের মাঠে যাওয়া) হাতছানি দিতে লাগল। প্রথমবারের থেকে ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠল। ফলে বিষম অবস্থার State dissociation উদ্ভব এবং স্বপ্নচারিতার মাধ্যমে পলায়নী প্রবৃত্তির আংশিক চরিতার্থতা। আনন্দহীন বর্তমান, শংকা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে সাময়িক পরিত্রাণ। হিস্টিরিয়ার তৃতীয় দশার উপসর্গ দেখা দেবার কারণ মোটামুটি এই।

আরো একটু স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা বিবৃত করব। সম্মোহনের ও অভিভাবনের পাভলভীয় ব্যাখ্যা ৪০শ সংখ্যায় যা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল, এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন। শুধু পুনরুল্লেখ নয়, ঘুম-স্বপ্ন-সম্মোহনের সম্পর্ক নির্ধারণ এই সূত্রে করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি ঘুম নিস্তেজনা-তরঙ্গের অবাধ বিস্তার। গোটা মস্তিষ্কের উপর নিস্তেজনা-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে, উত্তেজনা বাধা দিচ্ছে না। নিস্তেজনা আংশিক অথবা অতি সংকীর্ণ ঘুমন্ত অবস্থা। ঘুম এই নিস্তেজনার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। শুধু Cerebral hemispheres নয়, midbrain ও ঘুমন্ত অবস্থায় নিস্তেজনাপ্রবাহে অভিভূত। দুভাবে ঘুমের অবস্থা সৃষ্ট হতে পারে। সারাদিনের ক্লান্তির দরুন অন্তর্জাত নিস্তেজনা-উদ্দীপক এবং বহিরাগত মৃদু উদ্দীপকের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি—ঘুম নিয়ে আসে। আবার সব রকম উদ্দীপক ক্রিয়ার অভাবেও ঘুম আসতে পারে। দিনরাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমরা জেগে থাকি, কাজ করি, চিন্তা করি। এই সময় স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা নিস্তেজনার ক্রমপরিবর্তনশীল সংঘাতের ফলে চলমান ভারসাম্য বজায় থাকে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ, বিয়োগ সব সময়েই ঘটছে। লক্ষ লক্ষ কোষের মধ্যে কতকগুলি উত্তেজিত হচ্ছে যখন, অন্য কতকগুলি তখন আধা উত্তেজিত; আবার আরো কতকগুলি পুরো নিস্তেজিত। প্রতিটি কোষকে যদি একটা ইলেকট্রিক বাল্ব-এর সঙ্গে তুলনা করা যেত, তবে বলা চলত যে কতকগুলো বাল্ব জ্বলছে, কতকগুলো নিভে আসছে, কতকগুলো নিভে আছে। দিনরাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় প্রায় সবগুলো কোষ নিস্তেজিত, বাল্বগুলো নিভে আছে। এই সময় চলমান ভারসাম্য ব্যাহত; সব কোষই প্রায় নিস্তেজনায় অভিভূত।

স্বাভাবিক ঘুম ধীরে ধীরে আসে। প্রথমে মস্তিষ্কের উচ্চতম অংশ নিস্তেজিত হতে থাকে। এই অংশে, পাভলভের মতে, বাক্‌তন্ত্রের অধিষ্ঠান অথবা বলা চলে, এই অংশ বাক্‌তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র প্রথমে নিস্তেজিত হয়। ফলে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ ও চলমান ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।

শর্তহীন রিফ্লেক্স-তন্ত্র ও শর্তাধীন রিফ্লেক্সতন্ত্রের পুরনো অংশ (সংবেদন বা প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র) অসংগঠিত হয়ে পড়ে; শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায় তাদের ক্রিয়াকলাপে। বাক্‌তন্ত্র বা মস্তিষ্কের উচ্চতম অংশের কর্তৃত্ব না থাকার ফলে এই রকম ঘটে। জাগ্রত অবস্থা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় যাবার সময় এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়, এই বিশৃংখল ক্রিয়াকলাপের আধিক্য থাকে। এই সময় আমরা সাধারণত স্বপ্ন দেখি। পাভলভের ভাষায় ঘুম মস্তিষ্কের তিনটি তন্ত্রের (শর্তহীন রিফ্লেক্সতন্ত্র, শর্তাধীন সংবেদনতন্ত্র ও বাক্‌তন্ত্র; যাদের বলা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র) বিযুক্ত অবস্থার ফলে স্বপ্নের উদ্ভব। স্বপ্নের মধ্যে উজ্জ্বল দৃশ্যের সমারোহ এবং স্বপ্নের যুক্তিহীন বিশৃংখল চরিত্র বাক্‌তন্ত্রের নিস্তেজনার পরিচায়ক; পাভলভের মতে এই তন্ত্র অন্য দুটি তন্ত্রের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। স্বপ্নে উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপার ঘটে; শুধু তাই নয়, বহু পুরনো স্মৃতি জেগে ওঠে, মস্তিষ্কের দুই তন্ত্রের মধ্যে অনেক নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত সংযোগ ঘটে। আমেরিকায় ফ্রয়েডোত্তর গবেষকরা স্বপ্ন নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন; অনেক নতুন নতুন তথ্যের সমাবেশ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে পাভলভিয়ানদের অনেক তত্ত্বগত বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তাঁরা মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লেখ-যন্ত্র (ই. ই. জি.) এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে স্বপ্নকালীন মস্তিষ্কের অবস্থার উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। অমৃতের পাঠকদের কাছে এইসব সমীক্ষকদের গবেষণার দু'-একটা ফলাফল পেশ করছি।

আমরা সবাই আটঘণ্টা ঘুমের মধ্যে অন্তত চার পাঁচবার স্বপ্ন দেখি। এই সময় মস্তিষ্কতরঙ্গের বেগ বাড়ে। স্বপ্ন দেখা-কালীন বিদ্যুৎ-লেখ চিত্রের (ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ) সামান্য বর্ণনা এই প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। অমৃতের দুটি সংখ্যায় এক সাইকিক সোসাইটির পক্ষ থেকে মনের কথার আলোচনার সূত্রে ই. ই. জি.র উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই পাঠক এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে। অন্য একটি পত্রিকা থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি।

"তুমি যদি ক্লিটম্যানদের (স্বপ্ন-গবেষক) সমীক্ষাধীন হয়ে মাথায় অনেক ইলেকট্রোড আর তার লাগিয়ে ও'দের ল্যাবরেটরীর একটি বিছানায় নিদ্রামগ্ন হও, তবে প্রথমটায় চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাস্তবের যোগসূত্র ছিন্ন হতে থাকবে। বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠবে আবছা সব মূর্তি, ফুটে উঠবে নানারকমের আলোর রশ্মি। মনে হবে তুমি যেন মহাশূন্যে নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে ভাসমান। একে বলা হয় প্রারম্ভিক ঘুম আর জাগরণের অন্তর্বর্তী অবস্থা। এই সময় জাগিয়ে দিলে স্বপ্ন দেখেছিলে মনে হবে, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত কিছুই মনে করতে পারবে না। এই সময়কার বিদ্যুৎলেখ-চিত্রের বর্ণনা শুনবে? যখনই চোখ বন্ধ করলে, নিয়ম-মাফিক এ্যালফা ছন্দ অঙ্কিত হতে থাকল গ্রাফ কাগজে, সেকেন্ডে দশ ঢেউ। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই এ্যালফা ছন্দ ভেঙে যেতে থাকবে, ঢেউগুলো চ্যাপটা হয়ে যাবে। এর পর দ্বিতীয় পর্ব। ঘুম গভীর হয়ে আসছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘুমে এলিয়ে পড়লে তুমি। ই, ই, জির লেখা-

গুলো বদলে যাচ্ছে। টেকো থেকে জড়ানো সুতো ছাড়িয়ে নিলে যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেই রকম দেখতে হচ্ছে; ই, ই, জি, পরিভাষায় যার নাম Sleep-spindles ঢেউগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তার বিস্তার কমছে, বাড়ছে। ক্রমশ ঘুমের গভীরে তুমি তলিয়ে যাচ্ছ। তৃতীয় পর্ব। পাতালপুরীর রহস্যতিমিরে আবৃত হয়ে আসছে তোমার সংবিৎ। এদিকে বিদ্যুৎলেখ-চিত্রে দেখা দিয়েছে শ্লথগতির বড় বড় ঢেউ। ছবিটা যেন পাহাড় ও উপত্যকার। এখন সেকেন্ডে দুটো কি বড় জোর তিনটে ঢেউ দেখা যাচ্ছে গ্রাফ কাগজে—ডেলটা ওয়েভ। তিরিশ মিনিটের মত স্থায়ী এই পর্ব। তারপর আবার দ্বিতীয় পর্ব হয়ে প্রথমে প্রত্যাবর্তন।" অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে সব সময়েই একই রকমের ঢেউ দেখা যাবে না। স্বপ্ন দেখার অবস্থা ঘুম-জাগরণের অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা। এই সময়কার বিদ্যুৎলেখ-চিত্র দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না যে এটা ঘুমন্ত অবস্থা। তেমনি সম্মোহিত অবস্থা এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থা। গভীর স্বাভাবিক ঘুমের অবস্থা থেকে মাত্রাগত পার্থক্যের দরুন ই. ই. জি, Kuee Jerk ইত্যাদি গভীর নিদ্রাসূচক শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন সম্মোহিত অবস্থায় দেখা যাবে না। 'সাইকিক সোসাইটি'র সভামহোদয়কে বর্তমানে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখলাম।

ঘুমের আর এক বৈশিষ্ট্যের কথা পাভলভ উল্লেখ করেছেন। সম্মোহনকালীন অভিভাবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যখন ঘুমের অবাধ নিস্তেজনা-প্রবাহ সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে, তখনও কয়েকটি জায়গা জেগে থাকে, সক্রিয় থাকে। এই জায়গাগুলোকে বলা হয়, 'points on duty অথবা "points on guard" পাভলভের ভাষায় "nocturmal sentinel" রাতের অতন্দ্র প্রহরী। এই প্রহরীর কাজ প্রতিরক্ষামূলক অথবা কর্তব্যসূচক। বনের প্রাণী গভীর ঘুমের মধ্যে অচেনা শব্দ বা মুখের মৃদু উদ্দীপনায় জেগে ওঠে; লাইটহাউসের পাহারাদারের ঘুম কুয়াশার-সাইরেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যায়; শিশুর সামান্যতম হাত-পা নাড়া বা মৃদু কান্নার শব্দে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু তার থেকে অনেক জোরালো শব্দের মধ্যেও তিনি অকাতরে নিদ্রা যেতে থাকেন। কতকগুলো বিশেষ নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে এই রাতের প্রহরী কণ্ডিশনড।

> "Thus the nocturnal sentinel is a critical point which remains in rapport with certain determinate stimuli; but not with other". (৩)

পাভলভের মতে সম্মোহন এক ধরনের ঘুম বা নিস্তেজনা। নিস্তেজনা একটি বিশেষ জায়গা থেকে মস্তিষ্কের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই বিশেষ জায়গাটি হল মস্তিষ্কের সেই 'reception area' যেখানে সম্মোহক মারফৎ 'ক্লনিক' একঘেয়ে উদ্দীপক এসে নিস্তেজনার সাড়া জাগায়। নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এই Reesption area পাহারাদার হয়ে জেগে থাকছে। সম্মোহকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সম্মোহিতের। এই অংশের মাধ্যমে সম্মোহক - সম্মোহিতের মধ্যে rapport ঘটেছে।

> "Rapport, in this sense, signifies the special faculty of a hypnotised person for perceiving in a selective way exclusively the words of the hypnotist without maintaining any contact with the rest of the external world"

এখন গোটা মস্তিষ্কের উত্তেজনা মন্দীভূত, কেননা সম্মোহিত আংশিক ঘুমে আচ্ছন্ন। সম্মোহকের অভিভাবন এখন একমাত্র উদ্দীপক। অন্য অংশ থেকে বিপরীত বা বিরুদ্ধ কোনো ইচ্ছা এই উদ্দীপককে বাধা দিচ্ছে না। কাজেই মৃদু উদ্দীপকই এখন বিশেষ শক্তির বাহক। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের প্যারাডক্সিক্যাল অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

পাভলভের মতানুসারে সম্মোহন-অভিভাবন স্বপ্নেরই মত একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাপার;

> "not a normal mental phenomenon but a peculiarity of higher nervous activity in a dissociated state." (৫)

বিকফ তাঁর 'টেক্সট বুক অফ ফিজিওলজি' পুস্তকে লিখেছেন যে, ঘুম ও সম্মোহনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সম্মোহনে নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া সমস্ত মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে না। কিছু, কিছু অংশ সম্মোহিত অবস্থায় সক্রিয় থাকে বলেই সম্মোহক-সম্মোহিতের সম্পর্ক রক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকে বলেই অভিভাবনের ফল পাওয়া যায়।

> "The difference between hypnosis and natural sleep is only quantitative"

স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও মস্তিষ্কের কিয়দংশ সক্রিয় থাকে। ই-ই-জি সম্পর্কে লিখেছেন,—

> "The action currents of the cerebral cortex sharply change during sleep. The rhythm of the electric waves slows down both during normal and hypnotic sleep." (৬)

ঘুম এবং সম্মোহন দুই-ই শর্তাধীন নিস্তেজনার অবস্থা।

ঘুমের সাজেশসন না দিয়েও সম্মোহিত করা যায়। যেভাবেই সম্মোহিত করা হোক না কেন মস্তিষ্ক নিস্তেজিত হয়। যে-কোনো Chronic rhythmic monotonous stimulus -এর প্রয়োগে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা ঘটে। এসব পরীক্ষিত সত্য। ভয় দেখিয়ে সম্মোহিত করা যায়। একটা জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে একজন সম্মোহিত হয়ে পড়তে পারে। একটি আলো ক্রমান্বয়ে জ্বালিয়ে নিভিয়ে সম্মোহন আনার ব্যবস্থা আছে। সব ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন একই রকম ঘটে। Reception slea থেকে নিস্তেজনা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। সব ক্ষেত্রেই সম্মোহকের নির্দেশ বা ইঙ্গিত দরকার হয়।

পাভলভীয় তত্ত্ব ৪০।৫০ বছরের পুরনো হলেও আধুনিক। কেননা, ঘুম ও সম্মোহনের শারীরবৃত্তিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা অন্য কোনো তত্ত্ব এপর্যন্ত দিতে পারেনি। উন্নততর তত্ত্ব নিশ্চয়ই একদিন আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু পাভলভীয় মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান তার দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে না। 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা দুটির মধ্যে কোথাও সম্মোহনের নতুন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা দেখলাম না। সম্মোহিত অবস্থার বিবরণকে ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব কিছুই বলা চলে না। সম্মোহন একটা 'উন্নত অভিভাবিত অবস্থা, ...গভীরতম একাগ্রতাপূর্ণ অবস্থা', 'সম্মোহিত ব্যক্তির শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়', 'মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায়'—এই ধরনের উক্তি যা ঘটে তারই বিবরণ। ব্যাখ্যাও নয়, নতুন থিওরি নয়।

তাঁদের অসঙ্গতিপূর্ণ অসমর্থিত উক্তির যথাযথ উত্তর আগামী সপ্তাহে দিতে পারব, আশা করছি।

এবার ঘটকের কথায় ফিরে আসা যাক। আশা করি, সম্মোহন ও অভিভাবনের আলোচনার পর ঘটকের স্বপ্নচারিতা পাঠকের কাছে আর হেঁয়ালি বা রহস্যময় থাকবে না। দ্বিতীয়বার, যখন রেসের মাঠে যাবার ইচ্ছা মনে আসল, তখন ঘটক ভয়ার্ত হয়ে প্রতি রাতে স্বাভিভাবন দিতে আরম্ভ করেন। ভয়ার্ত অবস্থায় এই স্বাভিভাবন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এ-কথা তাঁর কাছেই শুনেছি। স্ত্রী ও সন্তানের নামে শপথ, এই স্বাভিভাবনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। ফলে বিষঙ্গ অবস্থা দেখা দিল অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে dissociations সম্পূর্ণ হয় স্বপ্নচারী হয়ে রেসে যেতে শুরু করলো।

ঘটক ও হিস্টিরিয়া প্রসঙ্গ এইখানে শেষ। এবার আমরা অবশেসন নিউরোসিস আলোচনায় রত হব।

উৎস:—

(1) Pavlov; Conditioned Reflex and Psychiatry pp 111. (2) Ibid pp 112. (3) Harry K. Wells: Pavlop and Freud II PP (4) Ibid pp 110. (5) Ibid pp (6) Bykov: Text Book of Physiology pp 622.

বাংলা উদ্ধৃতিটির উৎস—মানব ১৯৬৯ জুলাই।

—মনো

উত্তরমেঘ

।। তিন ।।

বেশ বেলা করে ফিরে আসে চন্দ্রচূড়। জরীপের কাজে অনেক দূর অবধি যেতে হয়েছিল আজ। কাড়রাম সঙ্গে ছিল। আর দুজন কুলি। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রচূড় একা আপিস ঘরে রুক্মিণীকুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ঘামে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে কেমন হাসি পেল। কিন্তু হাসি চেপে গিয়ে তাকে বরং খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেন রুক্মিণীকুমার। কদিনেই কেমন তামাটে হয়ে গেছে চন্দ্রচূড়। একটু রোগা হয়েছে কি? হবেই তো প্রথম-প্রথম তাঁরও কষ্ট হয়েছে। তিনিও রোদে পুড়ে, জলে ভিজে আজ এত দিন পরে এইখানে এসে পৌঁছেছেন। চন্দ্রচূড় তুমিও পৌঁছুবে। ভেবো না, তোমার জন্যেও এখানকার মাটিতেই সিংহাসন পাতা রয়েছে। এখন কেবল মাটি খুঁড়ে বার করতে হবে। তোমাকেই করতে হবে। একা করতে সব। ক্লান্ত হলে চলবে না। অবসাদে ভেঙে পড়লে সমূহ বিপদ। লোক জানাজানি কি ভালো? মানুষতো ওৎ পেতেই আছে। নাক উঁচিয়ে রেখেছে। এখানকার বাতাসেই গন্ধ আছে। গন্ধ টের পায়। মাটি দেখলে চেনা যায়। আমাকেও তোমার মতই চিনতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে। তোমাকেও চিনে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। দিনে-দিনে শিক্ষা সমাপ্ত করতে হবে। তোমার হার আমারই হার। এখন আর সহ্য হবে না ওসব। কারণ যৌবনেই ধৈর্য থাকে, উৎসাহ থাকে উদাম থাকে। ধীরে-ধীরে আমি যেন সেই ধৈর্য, উৎসাহ, উদামের পথ থেকে সরে যাচ্ছি। ইচ্ছে করেই যে যাচ্ছি তা নয়। এটা হয়তো বয়সেরই ধর্ম। আগে থেকেই টের পেয়েছি। তাই তোমাকে নিয়ে আসা। কিন্তু তোমাকে আমি ঠকাবো না চন্দ্রচূড়। আর যাকে ঠকিয়েই বড় হই না কেন, তোমাকে ঠকাবার লোভ আর নেই। লোভ থাকলেও এখন আমি প্রায় নখ-দন্তহীন বৃদ্ধ শার্দুল। ইচ্ছে কে পার পায় আমার হাতে? রুক্মিণীকুমার পারেনি, কাড়রাম পারেনি, মোহিনী পারে না, বৈজু.... কিন্তু বৈজুর কাছেই জীবনের শেষ অবধি আমার হার আমার পরাজয় লেখা আছে। তোমাকে তাই নিয়ে আসা। আমি এখন বিশ্বাস করি, তোমার শক্তি আছে, সাহস আছে, আছে উদাম উৎসাহ। যা ছিল আমার প্রাক-তিরিশের একমাত্র সম্পদ। আমি তাই জানি, তুমি বাঁচাবে, তুমিই বাঁচাতে পারো আমাকে। তার সঙ্গে তুমি নিজেও বাঁচবে চন্দ্রচূড়।

'কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো?'

'কন্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকেন রুক্মিণীকুমার। হাত তুলে ঘড়ি দেখেন। এটা তাঁর স্বভাব। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলার বাতিকটা যে এখনো মরেনি। বরং মাঝে-মাঝে বয়সের কথা ভুলে দুরন্ত, দুর্বার হয়ে ওঠেন। তখন বিস্ময়কর ঠেকে তাঁকে, তাঁর কর্মক্ষমতার কথা ভাবলে অভিভূত হতে হয়। যেন তার দেহ থেকে এই অপরিমাণ শক্তির শেষ নেই। উদাম অথবা উৎসাহের লয় নেই, ক্ষয় নেই। জীবনে বেঁচে থাকতেই একদিন যারা নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়, বুড়িয়ে যায় তিনি তাদের দলে নন। বরং মুখোমুখি এই ভাবে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকতে-থাকতে চোখে চোখ রেখে তাকালে তাঁকেই সব-চেয়ে জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ঠেকে।

'ফুরকুয়ারের বাংলো, তাই না?'

চন্দ্রচূড় চুপ করে ছিল। তাকে নীরব, আনমনা দেখে তিনি নিজেই কথা বলেন ফের। আসলে তিনি জানেন, অনুমান করে নিতে পারেন কোথায়, কতদূরে কাড়রাম নিয়ে যেতে পারে তাকে। জরীপের কাজটা তো অছিলা। মানুষকে চিনে নিতে কি এখনো কষ্ট হবে তাঁর?

'অনেক কথা শুনলাম।'

চন্দ্রচূড় থামে। মুখোমুখি চেয়ারে বসে হাঁফ ছাড়ে। ঘাড়ে-গলায় রুমাল বুলিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে কথা বলে। তাকে ক্লান্ত মনে হয়, বেশ মলিন। দেখে সুখ বোধ করেন রুক্মিণীকুমার। না, অশ্বিনী ঠকায়নি তাঁকে। সহসা নিজের যৌবন মনে পড়ে। বহুদূরে দীর্ঘ পথের প্রান্তে ফেলে-আসা জীর্ণ পোশাকের মত পুরানো জীবন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, দুঃখময় এক-একটা দিন আর দুঃসহ ঠেকে না, ঠিক আগের মতই বিচলিত করে না তাঁকে; কিন্তু তাদের স্মৃতি এখনো তোলপাড় করে হৃদয়। কেন যে সেইসব দিন আর রাত, রাত আর দিনের কথাই স্মরণে এলে তিনি

উদাস, উন্মনা হয়ে যান; তাদের জন্যে এক অস্পষ্ট মায়াবোধ পীড়িত করে তাঁকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এইভাবে থাকা চলে না। নিছক স্মৃতির জাবর কাটা অশোভন, অরুচিকর ঠেকে তাঁর কাছে। যেন দেহ-মনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়ে তাঁকে অসময়ে পঙ্গু করে দেবে এইসব তুচ্ছ ভাবাবেগ। তিনি তাই এড়িয়ে চলেন। মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন, ভয় পান সেই অতীতকে যে তাঁকে সুযোগ পেলে মুখ ভেংচে বিদ্রূপ করতে ছুটে আসে। পারা-ঘষা আয়নার বুকে আচমকা ফুটে-ওঠা আপন মুখ-ছবিকেই দূরে রেখে তিনি আরো অনেক দূর অবধি এগিয়ে যেতে চান। এখনো এই বুকে কত শত-সহস্র আশাই যে বাসা বেঁধে আছে! তিনি কী ছিলেন সেটাই সব নয়। তিনি কী হয়েছেন, তিনি কী হতে চাইছেন সেইটেই আসল। মানুষ বোঝে না, কেবল ভুল করে। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেনি বলেই আড়ালে নিন্দে ছড়ায়, এত বড় জয়ের মুখে কালি ঢেলে সমাজে-সংসারে সকলের চোখে খাটো করে দেখাতে চায় তাঁকে। তাই বলে তিনি কি ছোট হয়ে গেছেন, তুচ্ছ হয়ে আছেন, অপাঙ্‌ক্তেয়? হাসি পায়, দুঃখ হয় মানুষের জন্যে ভেতরে-ভেতরে মায়া বোধ করেন। ইচ্ছে হয় পৃথিবীর সেরা মানুষের মতই এই অসমীচীন স্বার্থময় দুর্বলতাকেই ক্ষমা করার উচ্চাশা নিয়ে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন।

'কড়িরাম পুরানো মানুষ। এখানকার উত্থান-পতনের ইতিহাস ওর জানা। খুব অল্প বয়সেই দেশ-বাড়ি ছেড়ে চলে এসে-ছিল। বৈজুপ্রসাদের দোকানেই কাজ শুরু করে। তারপর কেমন করে ফারকুয়ারের নজরে পড়ে গেল।'

থামলেন রুক্মিণীকুমার। যেন মনে করতে চাইলেন সব কথা। আগে-পিছে সেজে-গুজে মিছিল করে আসে না তো সবাই বরং একসঙ্গে হৈ-হৈ করে এসে হাজির হয়। যে-কারণ চোখ বুজে চুপ-চাপ সময় আর ঘটনা মেলাতে চেয়ে ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মন। তাছাড়া শুধু কি মিলিয়ে নেয়া? কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে হয়, মুছে ফেলতে হয় কত দিন-ক্ষণ-মানুষের মুখ! নইলে যে খেলো হয়ে যাবেন। চন্দ্রচূড় ধরে নেবে, তিনিও শঠ, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক! সে যে দুঃসহ, মৃত্যুর সামিল। তার চেয়ে সংসারে অন্তত একজন মানুষ থাক যার কাছে ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে আজীবন এবং মৃত্যুর পরেও নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকা যাবে।

যেন গল্পের গন্ধ লাগে নাকে। দেহ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাবতীয় বোধ কেমন করে, কোথায় যে মিলিয়ে যায়! বাড়ি, ঘর, আরামের কথা ভুলে দিব্যি চুপ-চাপ বসে থাকে চন্দ্রচূড়। বেলা গড়িয়ে যায়! বাইরে দুপুরবেলা আগুনের সমুদ্র মনে হয়। মাঠ-বন-প্রস্তর জুড়ে থৈ-থৈ করে রোদ। কোথায় আকাশ-দিগন্ত কাঁপিয়ে অনর্গল ডেকে চলেছে চিল। মন কেমন করে। যেন করে, কী হারিয়ে গেছে তার। প্রিয় মুখ মনে পড়ে। বাকী জীবনের ইতিহাস যাকে ছাড়াই লেখা হবে। অথচ কী আশ্চর্য! তার নাম জানে না চন্দ্রচূড়। অলস, অকর্মণ্য এইসব মুহূর্ত বড় নিষ্ঠুর, বড় করুণ। অথচ নেশার মত, স্বপ্নের মত মনে হয়। সারা দেহে কী দারুণ অবসাদ। ধীরে-ধীরে স্থান-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে সে যেন কোন দূরস্মৃতি দিন-মাস-মুহূর্তের জগতে হারিয়ে যায়।

'কিন্তু কড়িরাম সেই কড়িরামই থেকে গেল। আর বৈজু, সেদিনের বৈজুপ্রসাদ আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার থামলেন রুক্মিণীকুমার। কথা বলতে বলতে গম্ভীর, আনমনা হলেন। মনের মধ্যে সেই অতি দূরে অতীতের দিনগুলিই ফিরে পেতে চাওয়ার ব্যাকুলতা অবশ্য নেই আর। অস্থির, উদাসীন সেজে ভেতরে-ভেতরে দাপাদাপি মাতামাতি করার বয়সও গতপ্রায়। তবু ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত যে থাকে না। পেছন ফিরে তাকাতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এই দীর্ঘ, অতিক্রান্ত পথের পাশেই তো ছিল অন্ধকার, অতলান্ত গহ্বর; শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, পদে পদে পতনের সমস্ত আয়োজন। তবু তিনি বেঁচে আছেন, এখনো এগিয়ে চলেছেন, এই কি যথেষ্ট নয়! বৈজুর কী দোষ? তিনি নিজেই কি তেমনি আছেন? অথচ থাকা উচিত ছিল তাঁর। অন্তত লোকে তাই চায়। তিনি কার আশা পূর্ণ করেছেন? সব কথা খুলে বলা ভার। কিন্তু কড়িরাম তো জানে। একদিন তার কাছেই শুনতে পাবে চন্দ্রচূড়। তখন যেন তিনি আর বেঁচে না থাকেন। কারণ, কেবল নিজের কাছেই না, অন্যের স্মৃতি থেকেও তিনি সেই অতীতকে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলেন, এই দ্যাখো আমি! আমার কোনো অতীত নেই, ছিল না কোনোদিন। কেবল বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কারবার। এদের মধ্যেই বেঁচে আছি আমি। বেঁচে থাকবো চিরদিন। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তেই তো জন্ম হচ্ছে আমাদের। জন্ম আর মৃত্যু। প্রতিটি নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাসের ব্যবধানে আসা আর যাওয়া। যেন এ-ঘর থেকে ও-ঘর, আবার ও-ঘর থেকে এ-ঘর। তাহলে, 'আমি ছিলাম' এই কথা শুনিয়ে অযথা মানুষের ঘৃণা কিংবা করুণা কুড়িয়ে লাভ? বরং 'আমি আছি, আমি থাকবো' এই কথা সরবে অথবা নীরবে ঘোষণা করা ভালো।

'আসল কথা কী জানেন, বিজনেসে ক্ষেত্রে হৃদয়ের কারবার অচল। দুটোকে এ সঙ্গে চালাতে চাইলেই তা চলে কারণ এসব কাজে লোকসানটাই স্বাভাবিক। বিজনেসের প্রকৃতিই আছাড় খেতে খেতে উঠে দাঁড়ানো। একবার দাঁড়িয়ে গেলে কে রোখে! নিশ্চিত সফল হবে জেনেই হৃদ কারবার শুরু। তাই একবার বিকল তার আর গতি নেই। তখন নিজে অথবা অন্যকে মেরে সমাধানের পথ মানুষ। ফারকুয়ার সায়েবও আত্মহ পথই বেছে নিয়েছিলেন।'

ঘটনা যখন গল্প হয়ে ওঠে তখন বিশ্বাস্য করার দায়িত্ব এসে পড়ে ওপরেই। একই সঙ্গে মদ আর মাতাল হয় তাকেই গল্প যে শোনায়। শ্রোতা নিরুপায়, পক্ষপাতহীন ব্যক্তির ভূমিকা বসে থাকা ছাড়া গতি নেই তার। লাগলে উৎসাহ জুগিয়ে যেতে পারে; না লাগলে হাই তুলে মুখের সামনে দিতে দিতে উঠে চলে যাবে। বক্তা কি তাকে জোর করে ধরে রাখে তখ

রুক্মিণীকুমার তাই যথাসম্ভব মিশিয়ে বলতে চেষ্টা করেন। সবাই তো কড়িরাম নয় যে সতি মিথ্যে না বলার পণ করে বসে আ মুখের সত্য যে জ[illegible]নের সত্য অবধি হার মানায়[illegible] তারতম্য ভ্রূকুটি করে। রু[illegible]মারকে তাই হয়, তারপর? [illegible] কত ক এমনি করে জম[illegible] আছে। স কি অকপটে বল[illegible]য়? নির্বিচারে করা চলে সব? [illegible] কিছু গোপন, নিষ্ঠুর তাই তো লজ্জাকর। কঠোর আবরণে এতদিন তাকেই রেখে মনে মনে দিব্যি সুখী ছিলেন রুক্মিণীকুমার। কিন্তু মানুষ! বিবেক তাঁরও আছে। পোষমানা ঘুমন্ত বিবেক। য নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসে আজ আর বিশেষ মুহূর্তের চাপে খোলার মত সেই শব্দহীন কাঠ ভেঙে খান খান হয়ে পড়ে ত মাংসে সহজ, শীতল আবেগে পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই অন্তত একজনের কাছে হৃদ প্রকাশের তাগিদটাই হয়ে ওঠে জরুরি। নিজেকে মেলে ধরা মোচনের একমাত্র উপায় মনে তাঁর যে দুঃখ আছে, থাকতে সেকথা চন্দ্রচূড়ের জ্ঞান অ অতীত। কারণ তিনি তো ব নিতান্ত স্মৃতিবাহী পঙ্গু বি ম তাঁর শুধু অতীতই নয়, ব আছে স্বপ্নে-সম্ভাবনায় উজ্জ্ব পেছন পানে ফিরে তাকালে বেমানান ঠেকে। কী হবে তা লাভ? আজ তাঁকে হিসেব হবে না? মান-সম্ভ্রম-প্রতিপ ভাবতে হবে না?

কলকাতায় বসন্ত

শুভঙ্কর পাঠক

শীত পেরোলেই বসন্ত।

বাজে কথা বলছি না মশাই, গুজব ড়াচ্ছি না, প্রমাণ আছে ছাত্রপাঠ্য ইতে। যে-কোনো 'আদর্শ' রচনা' খুলে দখুন। নীচু ক্লাসের বই হলেই ভালো য়। পরিষ্কার লেখা আছে ঃ ফাল্গুন-চৈত্র ুই মাস বসন্তকাল।

বড়দের তা মনে থাকে না। বাচ্চাদেরও ুখস্থ করতে হয়।

একটা ঘটনা বলি। কলকাতার জনৈক কুল-মাষ্টার মশাইয়ের মনে লেগেছিল াল্গুনের দোলা। ক্যালেন্ডারের প্যাতা ল্টেই তিনি বুঝেছিলেন মাস পেরিয়ে াছে। পরের দিন স্কুলে গিয়েই ক্লাস াইভের ছাত্রদের লিখতে দিলেন একটা চনা। বিষয় ঃ বসন্তকাল। সকলকেই বিধান করে দিলেন, মন থেকে লিখতে বে। অর্থাৎ চিন্তা মৌলিক হওয়া চাই।

ছাত্ররা লিখলো যে-যার মতো। কিন্তু লমাল দেখা দিলো মৌলিকতা বিষয়ে। উ লিখেছে বসন্তকালে বৃষ্টি হয়, শীত ত করে। কেউ লিখেছে দারুণ গরম, ষণ তেষ্টা পায়, বিকেল হলে মানুষ ড় করে আউটরামঘাটে কিংবা লেকের র। যাদের মুখস্থ ছিল, তারা চলনসই। র, যাদের মুখস্থ ছিল না, তারা লেন্ডারের নির্দেশকে পর্যন্ত অমান্য রেছে। একজন লিখেছে ঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বসন্তকাল। কেননা, ঐ সময়ে র পোষা কোকিলটাকে ও ডাকতে নেছে।

মাষ্টার মশাই রচনা পড়ে দারুণ ক্ষুব্ধ, ত ও ক্রুদ্ধ। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে লেন ঃ তোমাদের চাষা হওয়া উচিত। স্ হবে না। পরের দিন মুখস্থ করে া।

আমি ঐ দৃশ্যে নিজেকে বিপন্ন ঃ কি-ই বা লিখতে পারতাম নতুন । নিয়ম অনুসারে বসন্তের মেয়াদ একষট্টি দিন। পয়লা ফাল্গুন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত। আবহাওয়া ঃ না- না-শীত। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন ঃ বলুন তো শীতোষ্ণ মানে কি?

তা হলে রীতিমতো হিমসিম খাবো। উত্তর দিতে পারবো না চট করে। এ যে আদ্যিকালের সেই জামাই-ঠকানো প্রশ্ন! ডিকশনারী ঘাটতে হবে। দেখতে হবে, চলন্তিকায় কি লেখা আছে? কি লিখেছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন?

আমি কলকাতার বাসিন্দা। কোনোদিন 'নাতিশীতোষ্ণ'র মানে খুঁজিনি। এখানে সবই চরম—কী উত্তাপে-উত্তেজনায়, কী চিৎকারে ও নীরবতায়। মানে, কলকাতার আবহাওয়া চিরটাকাল চরম ভাবাপন্ন।

এখানে বসন্ত আসে চড়ুই পাখির মতো। কয়েকদিন থাকে স্বল্পমেয়াদী ভাড়াটের উদাসীনতায়। আবার চলেও যায়, ফুরুৎ করে, বিনা নোটিশে। পার্কে গাছ-গাছালির সংখ্যা কম। বড় বড় বাড়ীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে পার্কগুলো। মনে হয়, বসন্ত স্থায়ী হয় না বাসস্থানের জন্যই। কলকাতায় বৃক্ষের গো-ডাউন আছে আলিপুরে। হাওড়ায় আছে, গাছেদের চিড়িয়াখানা, যার অন্য নাম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

সেদিন রাত বারোটায় পাশের বাড়ীর কার্নিস থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিলো ঃ কুহু কুহু। কতোদিন দেখেছি ঐ ভাঙা কার্নিসটাকে। কোনোদিন এত বিস্ময়কর মনে হয় নি। আমি বারান্দা থেকে কোকিলটাকে দেখতে পাইনি। কিন্তু প্রবল জ্যোৎস্নায় তার গভীর একটানা চিৎকার ছাদের মাথা ছুঁয়ে, দক্ষিণের বাড়ী আর পশ্চিমের বস্তীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। আমরা নানা তলের বাসিন্দারা ভাই একযোগে শুনলাম। হুহু-করা দীর্ঘ-শ্বাসের মতোই তার একটানা ঃ কুহু কুহু।

আসলে এটা কলকাতার ছবি নয়, আকস্মিক ঘটনা। জ্যোৎস্না এবং কোকিল কলকাতায় দেখা যায় না। দেখে নিতে হয়। এ ব্যাপারে একচেটিয়া পুঁজির মালিক কবিরা। বাংলা কবিতায় 'ফাল্গুনে' শব্দের বাড়াবাড়ি। 'জ্যোৎস্না' 'কোকিল'-জাতীয় শব্দগুলো অদূর অতীতের সিম্বল্ হয়ে যাচ্ছে অবশ্য। একা রবীন্দ্রনাথ এমন কান্ড করে রেখেছেন যে সকলে মিলে ঐসব শব্দ বয়কট করার

আটকাবে না। জ্যোৎস্না খেলা করবে ছাদের ওপর। কোকিল ডেকে উঠবে কার্নিসের ফাঁকে।

বেশীদিন আগের কথা নয়।

এই ফাল্গুনেই একটি ফাংশন ছিল মহাজাতিসদনে। সপরিবারে যাওয়ার ইচ্ছা। বাদ সাধলো ছোট ছেলেটা। বললো ঃ বৃষ্টি হয়েছে। কেমন ঠান্ডা লাগছে। সোয়েটারটা গায়ে দেবো?

আমার স্ত্রী ধমকে উঠলেন ঃ বলিস্ কিরে? ফাল্গুনে কেউ সোয়েটার গায়ে দেয়?

বেচারা দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

আমি আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিলাম। স্ত্রী পড়লেন নাইলনের শাড়ী। বাচ্চাটা গায়ে দিয়েছিল টেরিলিনের একটা হাওয়াই শার্ট।

ফিরে এলাম রাত এগারোটায়। শীতের চোটে কাঁপতে কাঁপতে।

গলির মোড়ে এসে দেখি, পাড়ার ছেলেরা বসন্তোৎসব করছে। নির্জন, ফাঁকা রাস্তায় মাইকের গমগম শব্দ। লোকজন এসেছিল, চলে গেছে। গলির আলো-ছায়াময় পথে পথে রবীন্দ্র-সংগীতের করুণ বিলাপ কাঁপছে যৌবনের অধীর যন্ত্রণায় ঃ ওরে ভাই ফাগুন এসেছে বনে বনে।

কিন্তু ফাল্গুন কোথায়? বসন্তোৎসব হয়েছিল সেদিন ফাঁকা রাস্তায়। অনেক-অনেক রাত পর্যন্ত।

জনৈক জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন ঃ আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে, যজুর্বেদের কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হয়েছিল। সুতরাং এখন আমরা যাকে বসন্তকাল বলি, সেটা তখন ছিল বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে।

আমি হিসেবটা না জেনেও কল-কাতাকে চির বসন্তের কাল বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম। কেননা, যৌবন এখানে টগবগ করে ফুটছে। কোথায় নয়? লেকে, ময়দানে, ভিক্টোরিয়ার ধারে, আউটরামঘাটে, চিড়িয়াখানায়, ইডেন গার্ডেনে—সর্বত্র।

বারোয়ারী আড্ডায়, চৌরঙ্গীর পথে পথে পর্যন্ত। সিনেমা হলগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন, চির যৌবনের মহড়া হচ্ছে প'য়ষট্টি পয়সার লাইনে।

সেই জ্যোতিষী ভদ্রলোক আমাকে আরেকটা তথ্য দিয়ে বলেছিলেন : আজ থেকে সাড়ে ছ হাজার বছর আগে বসন্ত এসেছিল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে। পাঁচ হাজার বছর আগে ধ্রুব, সূর্য ও রোহিনী নক্ষত্র একত্রে এসেছিল মহাবিষুবে। সেটা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন। কাজেই বসন্ত এসেছিল ফাল্গুনে নয়। জ্যৈষ্ঠে।

ভদ্রলোককে আমি আশ্বস্ত করে বললাম : আমিও তাই বিশ্বাস করি। বসন্ত এখন ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন ঋতুতে। বারো মাস তাকে ভাগ করে নিয়েছে।

মনে হয়, তিনি খুশি হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বললেন : কলকাতার উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বলছেন তো? শনির দশা আছে কলকাতার যৌবনে। কোন্ তারিখে কোলকাতার পত্তন হয়েছিল জানি না। কুম্ভ লগ্ন বলেই মনে হয়। শনির আনন্দময় স্থান। অনেক ঝড়-ঝাপটা আসবে, বিপর্যয় আসবে, কিন্তু আনন্দ যাবে না। সুখেও থাকবে না কোনোদিন।

ঠিক কথাই বলেছেন ভদ্রলোক। আমার অনুমানের সঙ্গে জ্যোতিষীর গণনা মিলে যাচ্ছে। এই নিবন্ধের পাঠক-পাঠিকারা এরপরে যদি কলকাতার একটা ঠিকুজী তৈরী করতে উদ্যোগী হন, তা হলে আমি জনমত সংগ্রহের কাজে সাহায্য করবো—একথা হলফ করে বলতে পারি।

কিন্তু আমার বিষয় কলকাতা নয়, কলকাতার বসন্ত। তার যৌবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার সময় এখনো আসেনি। যতদিন কলকাতা পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র থাকবে, যতদিন পশ্চিম, বাংলার রাজধানী থাকবে—ততদিন অনেক আবর্জনা বুকে করেও তার যৌবন থাকবে। আসবে নতুন নতুন ঢেউ—সাহিত্যে, কাব্যে, মিছিলে, ময়দানে, পোশাকের বৈচিত্র্যে আর চলনে-বলনে। যদি বড়বাজারে যান, ক্যানিং স্ট্রীট কিংবা ব্রাবোর্ণ রোডে—তা হলে দেখতে পাবেন বস্তাভরা যৌবনের উল্লাস। সদ্য গো-ডাউন থেকে বেরিয়ে এসেছে নানা রঙের আবীর—জবা লাল, খয়েরী-লাল, বেগুনী লাল। যেটা চাই আপনার, কিলো হিসেবেই নিয়ে আসতে পারবেন হোলির আগে। উৎসব না হলে তাসা-নাচই বা হবে কি করে - পুজো না হলে বিজয়া সম্মিলনী?

আমি দেখছিলাম, কলকাতার তাপ-মাত্রার তারতম্য ঘটছে কয়েক বছর ধরে। হয়তো সারা পৃথিবীতেই চলছে অনেকটা এরকম। যাই যাই করেও শীত যায় না। হঠাৎ একদিন দেখি, শীত গেল তো ভীষণ গরম। ফুলস্পীডে পাখা চালিয়েও গরম ঠেকানো মুশকিল।

গতবার একটা বসন্তোৎসবের ফাংশনে নেমন্তন্নের কার্ড পেয়েছিলাম। মূলত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। কিন্তু দিনটা ছিল এমন ভ্যাপসা আর এমন গরম যে পুরোদমে পাখা চালিয়েও অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে। ঘামের গন্ধে সারা ঘর একাকার। আমাদের হাতে ছিল রজনীগন্ধার গুচ্ছ কেউ চুলে গুঁজে এসেছিলেন লাল গোলাপ। বোধহয়, এয়ার কণ্ডিশনড হলে অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করলে বসন্তের 'নাতি-শীতোষ্ণ' ভাবটা বজায় রাখা যেতো।

অর্থাৎ দারুণ বৈপরীত্যের মধ্যে আমরা ঋতুরঙ্গের আসর জমাই। কি আর করা যাবে, প্রকৃতির মত বদল হলে তো আমরা নাচার। বসন্তে বসন্তোৎসব করবো না তো কি গ্রীষ্মে কিংবা বর্ষায় করবো?

মহুয়া গাছ কোলকাতায় দেখিনি। দেখেছি কলকাতার বাইরে। শিমুল গাছও বোধহয় খাস কলকাতায় নেই। না হলে, ওর ন্যাড়া ডালে ঝুলতে দেখতাম লাল ফুল। শাদা তুলোয় ভরে যেতো সারা কলকাতা।

সেদিন বাড়ী ফেরার মুখে পাড়ার ছেলেরা জানতে চাইলো: পক্সের টীকা নিয়েছেন স্যার?

বিস্ময়ে বললাম : কেন? এখনো নিইনি, নেবো।

ওদের মুখে এই উদ্বেগ আমাকে বিচলিত করেছিল। খবর পেলাম: পাশের বাড়ীতে এক ভদ্রলোকের পক্স হয়েছে

বললাম : ঠিক আছে। খবর দি দিও তো টীকাওয়ালাকে। আমি কাল নেবো।

ভ্যাকসিনেশন দিতে এলেন তি শোত্তরী এক ভদ্র-মহিলা। গায়ের দারুণ ফর্সা। ঠোঁটে লিপস্টিকের গোলা আভাস। চমৎকার স্বাস্থ্য। আমার দি তাকিয়ে, প্রায় ধমকের সুরে বললে এতদিন টীকা নেননি কেন? আপন যদি ভুল করেন, তা হলে অন্যেরা করবে? কলকাতায় এবার খুব ক হচ্ছে।

আমি বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দি তিনি খানিকটা শাদা তুলো . স্পি ভিজিয়ে নিয়ে হাতে ঘষে দিলেন। একটা অস্পষ্ট স্মৃতির আমেজ করছিলাম। অনেক—অনেক দূরের স্ব মতো। অনেকদিন টীকা দিয়েও মহিলার হাতটা নরম। এখনো শক্ত হ

ভ্যানিটি ব্যাগে কম্পোজি বললেন: আপনার নাম কি? বয়স

উদাসীন গৃহস্থের মতো ব নাম ঠিকানা বয়স।

তারপরই আমার বিস্ময়ের বললেন: আপনি কবিতা লেখেন? যেন পড়েছি? আপনিই বোধহয়, না?

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলা

তিনিই বললেন : আমিও কবিতা লিখেছি এক কালে। বসন্তের টীকা দিয়ে বেড়াই। কার্জন পার্কের সেই পলাশ দেখেছেন নিশ্চয়ই। কি রকম লাল যেতো এই সময়ে। ময়দানেও কয়েকটা গাছ আছে। কিন্তু মানুষের নজরে না সেসব।

আমি তেমনি নীরব। ভাষাহীন।

শুনেছি, শিব ঠাকুরের তারকেশ্বর যেতে নাকি পথের ধারে পলাশ গাছ দেখা যায়। বাসিন্দাদের খবরটা জেনে রাখা

হয়তো

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

রবিবার বিকেলে পরিতোষদের বাড়িতে ...ওয়া যাবে কিনা ভয় ছিল। কিন্তু গেটে ...তেই অসীমরা দেখতে পেলো পরিতোষ ...র বৌ বাগানে কাজ করতে ব্যস্ত। ...লাইরে আকাদামির মালীরা কাজে ফাঁকি ...না- দিব্যি সবুজ গালচের মত লন, ...র ধারে রংচঙে ফুলের কেয়ারী। বেশ ...য় গৃহকর্তার সস্ত্রীক উদ্যমটা ...টে শখের। অলস রবিবারের সময় ...বার উপায়। ছেলেমেয়ে দুটি মাটি ...টে খেলা করছে। একজন পরেছে ...কের কাপড়ের হাফ-প্যান্ট আর ডোরা-... গেঞ্জী। অন্যজন হলদে ফ্রক। চমৎকার ...টি সুখী পরিবারের ছবি, ভারত ...রের পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপনের ... অসীম একটু অবাক হয়ে দীপালীর ... চোখাচোখি করলো। ওরা এই এক ...ধরে যা যা শুনেছে তার সঙ্গে যেন ...ও মেলে না।

...দের দেখে পরিতোষরা হৈ হৈ করে ... এলো মাটি মাখা হাতে। 'কী আশ্চর্য ... কোত্থেকে! কোন খবর টবর নেই ...রে হঠাৎ।" পরিতোষ কোলাহল করে ...না জানালো। অসীম বললো ...এখানে আছিস বলেই আমি চেষ্টা ...করে ট্রান্সফার নিয়ে পুনায় এলাম— ...এসে শুনি যে ইথিওপিয়া না ...ল্যান্ড কোথায় জানি উধাও হয়েছিস। ভাবলাম এ যাত্রা আর দেখাই হোলো ...আমাদের তো আবার দু বছরের বেশি ... রাখে না।" পরিতোষ বিনয়ের হাসি বললো—হ্যাঁ আমি এই গত মাসেই ...ম। ইথিওপিয়ার সঙ্গে আমাদের ...মির একটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম চলছে। ...ট যখন এক বছরের জন্য ডেপুটেশনে ...কথা বললেন 'না' করতে পারলাম ...র্কি কিনা তোদের মত কথায় কথায় যাওয়া তো আর আমাদের চাকরীতে ... দেশের বাইরে যাবার একটা চান্স যখন—'

...তা বলতে কি অসীমের চাকরীতেও বিদেশ যাবার কোন কথাই ওঠে না। আধা জার্মান ফার্মে যেজোরকম ...ও। কোনকালে একবার কোম্পানী ...ড় মাসের জন্য জার্মানী পাঠিয়ে-... পরিতোষ বোধহয় সেই কথাই মনে

রেখেছে। কিন্তু এখন এ-সব নিয়ে তর্ক কে করে। ততক্ষণে পরিতোষের বৌ দীপালীর কোল থেকে বাবুয়াকে নিয়ে নিয়েছে। "ইশ্, কি মিষ্টি হয়েছে। এটার কথা তো জানতামই না। কি নাম রেখেছো? বড়

হয়েছে? এখনো তার পুলিশ হবার শখ আছে নাকি?" পরিতোষের বৌ-এর অভ্যর্থনাও আনন্দে উচ্ছল।

অসীম দেখলো দীপালী এখনো ঠিক বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পরি-

প্রত্যাশা ছিল সেটা জিজ্ঞেস করলে স্পষ্ট করে বলা শক্ত, কিন্তু ঠিক এ রকম ভাবোন। মুখে হাসি, শাড়ি-টাড়ি অগোছালো, এলো চুলে একটা গিণ্ট দিয়ে খোঁপা করা। ছুটির দিনের দিবানিদ্রার পর এখনো চুল বাঁধা কাপড় ছাড়া হয়নি। মুখটা ঘামে চকচক করছে। পাঁচ বছর আগে অসীম আর দীপালী শিখাকে বিয়ের কনে যা দেখেছিল তার চেয়ে বেশি বদলায় নি—বরং একটু রোগা হয়ে আরো ভালো দেখাচ্ছে। অসীম আশা করে নি বিখ্যাত শিখা মজুমদারকে এ রকম একটা ঘরোয়া পরিবেশে অপ্রসাধিত অবস্থায় দেখবে। পুনা এসে পর্যন্ত কম শোনে নি তো পরিতোষের বৌ-এর গল্প। মিলিটারী আকাদমি পুনা শহর থেকে দশ মাইল দূরে হলেও গুজব পৌঁছবার পক্ষে যথেষ্টই কাছাকাছি। তাছাড়া বাঙালী সমাজটা এখানে এমন কিছু বড় নয়। শহর, শহরতলী যেখানে যত বাঙালী আছেন সবাই সকলের নাড়ি নক্ষত্র জানাটা কর্তব্য বলে মনে করেন।

"কতদিন হোলো এসেছিস পুনায়?" পরিতোষ ওদের নিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকতে ঢুকতে আবার জিজ্ঞেস করলো। "এই তো, এবার পুজোয় এক বছর পুরো হবে।" "সে কী! এক বছর এসেছিস একটা খবর পর্যন্ত দিস নি? আমি না হয় ইথিওপিয়া গিয়েছিলাম, শিখা তো ছিল।" অসীম আবার দীপালীর দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাতে গিয়ে সামলে নিলো। "আর বলিস না, নানান ঝামেলায় ছিলাম প্রথম দিকে। ছ' মাসে তিনটে বাড়ি বদলেছি জানিস? তাছাড়া গাড়িটা কারখানায় পড়েছিল অনেকদিন। নিজের ট্রান্সপোর্ট ছাড়া তোদের আকাদমিতে আসা একটা ইমপসিবল ব্যাপার। তারপর অনিমেষের সঙ্গে দেখা হোলো—হ্যাঁ হ্যাঁ অনিমেষ সান্ন্যাল—জানিস তো ও আছে টেলকোতে—ও বললো তুই ফিরছিস অগস্টে। ভাবলাম এতদিন যখন যাওয়া হয় নি—তুই ফিরলে একেবারেই যাওয়া যাবে।" সত্য আর অর্ধ সত্য মিলিয়ে কৈফিয়ত দিতে দিতে অসীম পরিতোষদের সোফাতে আরাম করে বসলো। অনিমেষ সান্ন্যাল আর কি কি বলেছিল পরিতোষের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে—সবটা পরিতোষের না শুনলেও চলবে।

পরিতোষ যে সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত—ঘরের চারিদিকে তার প্রমাণ ছড়ানো। সামনেই একটা বড় রেডিওগ্রাম। প্রকাণ্ড ঘরের অন্য কোণে খাবার ব্যবস্থা। সেখানে দেখা যাচ্ছে বিলিতি রেফ্রিজারেটর, কোণে একটা বেলিং কোম্পানীর কুকিং রেঞ্জ। সাইড বোর্ডের ওপর টোস্টার, মিক্সার, কোনো যন্ত্রপাতিই যে দিশী নয় তা এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। ড্রইং রুমে কুকিং রেঞ্জ রাখা সম্বন্ধে দীপালী বাড়ি গিয়ে কি মন্তব্য করবে সেটা ভেবে অসীম এখন থেকেই একটু মুচকি হাসলো। সাত আট বছর বিয়ে হবার পর এখন ওরা পরস্পরের চিন্তাধারা আগের থেকেই খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। যেমন অসীম এখন ঘরের এ কোণ থেকেই বুঝতে পারছে যদিও দীপালী আপাতত শিখার সঙ্গে গল্প করছে, আসলে ওর নজর দেওয়ালের ছবিটার দিকে। দীপালীর আবার আর্ট-টার্ট সম্বন্ধে ভীষণ জোরালো মতামত। নিজেদের বাড়িতে ও কখনোই ওই রকম একটা চাঁদ-নৌকো-মার্কা ল্যান্ডস্কেপ টাঙাতে দেবে না। অসীম স্পষ্ট দেখতে পেলো আজ রাতে শোবার আগে মশারির টাঙাতে টাঙাতে দীপালী বলছে 'যত বড় রেডিওগ্রামই কেনো না কেন আসল টেস্ট ধরা পড়ে দেওয়ালের ছবিতে।' অবশ্য রেডিওগ্রামের ব্যাপারটায় অসীমেরও একটু খটকা লাগছিল। পরিতোষকে তো অনেকদিন থেকে দেখছে। ক্লাস থ্রি থেকে কলেজের শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছে—গান বাজনা সম্বন্ধে কখনও বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখে নি ওর। তবে হয়তো শিখার শখ। কিম্বা বিদেশ গেলে রেডিওগ্রাম আনতেই হয়—এটা নিয়ম। বিদেশ মানে ব্যাংককই হোক বা ঘানা, ভারতবর্ষের বাইরে যাবার প্রধান উদ্দেশ্যই তো নানান রকম জিনিস-টিনিষ কেনা একথা আজকাল কে না জানে।

"সত্যি, তোমরা যদি একবার জানাতে তাহলে আমিই গিয়ে দেখা করতাম। পরিতোষ ছিল না—একা একা এত খারাপ লাগতো আমার" শিখা বললো। "টুনুবুবুকে কলকাতা নিয়ে চলে গেলেন বাবা-মা। আমি নেহাত কনভেন্টের চাকরীটা নিয়ে নিয়েছিলাম তাই যেতে পারলাম না। কিন্তু খালি বাড়িতে যে কি বিশ্রী লাগতো না—"তার পরের কথাগুলো অসীম শুনতে পেলো না কারণ ততক্ষণে পরিতোষ ওর পাশে বসে ইথিওপিয়ার জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছে। পরিতোষ না থাকলেও শিখা যে একলা ছিল না একথা অসীমরা অনেকবার অনেকের কাছ থেকে শুনেছে। এক বা একাধিক স্তাবক শিখার সঙ্গদান করতো এত রকমভাবে শুনেছে একথা যে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া শিখাকে একলা রেখে তার বাবা-মাই বা হঠাৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন কেন? এতে লোকের সন্দেহ হবারই কথা। অথচ এখন খোলা চুলে, একটুখানি ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপ পরা এই সুশ্রী বৌটিকে দেখার পর শোনা কথাগুলো বিশ্বাস করতেও যে ইচ্ছে করে না। মুস্কিল যে সবটা তো শোনাও নয়—দু'দিন তো অসীম নিজেও শিখাকে দেখেছে। দু'দিন দু ভাবে। একদিন দেখেছিলো রেস্টোরেন্টে—দূরের টেবিলে একটি সুদর্শন যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে—আর অন্যদিন—যেদিনের কথা অসীম দীপালীকেও বলে নি—মোটর সাইকেলের পেছনে এক সন্ধ্যায় লয়েড ব্রিজের ওপর প্রায় পাঁচ মিনিট অসীম শিখার পিছনে পিছনে গাড়ি চালিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ওভারটেক করতে পারতো—কিন্তু করে নি। অসীম সারা দিনের প্রায় সব ঘটনাই বাড়ি এসে দীপালীকে বলে। কিন্তু কেন জানি না সেদিনের কথাটা আর বলা হয়ে ওঠে নি। শিখা মোটর সাইকেলে কার কণ্ঠলগ্না হয়ে বসেছিল সে কথা অসীম জানে না—কিন্তু হেড-লাইটের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছিল শিখার কোমরটা কত সরু। এখন অগোছালো-ভাবে বসা বন্ধুর স্ত্রীর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে অসীম সে কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করল। বন্ধুর দিকে মনোযোগ দিতে শুনতে পেলো পরিতোষ বলছে "আর মজা কি জানিস—ইথিওপিয়ার প্রথম ইতিহাস লিখেছেন একজন ইংরেজ। ওদের পুরানো লোকগাথা এক সঙ্গে জড়ো করে ছেপেছেন এক ক্যানাডিয়ান দম্পতি। ওদের নিজেদের অতীত সম্বন্ধে কোন উৎসাহ নেই। ও কি তুই সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলি নাকি? শেষ পর্যন্ত তুই ত! দাউ টু ব্রুটাস্! শিখা লক্ষ্য করলে আবার আমায় লেকচার শুরু করবে।"

"ইস্ আমার লেকচার শুনে তো তুমি উল্টে গেলে"—শিখা ভ্রূভঙ্গী করে মন্তব্য করলো। অসীম পরিতোষের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললো "ইথিওপিয়ার কেন, ভারতের কি তাই অবস্থা ছিল না? সাহেবরা এসে তো আমাদের অতীতকে—" এই প... বলার পরই এক কান্ড হোলো, ব... টলতে টলতে গিয়ে একটা ছোট্ট টেবি... ধারটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। টেবল ক্লথটা টান দেবার ফলে চমৎকার একটা ক... অ্যাশ-ট্রে—সেটাও দেখলে বোঝা... বিদেশী—মাটিতে ফেলে টুকরো টুকরো ভেঙে ফেলেছে। অসীম বড়ই অপ্রস্তুত করলো। দীপালীর দিকে তাকিয়ে দে... তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দুঃখ... লজ্জা প্রকাশ করলেও জিনিসটা ফিরিয়ে... যাবে না এই ভেবে অসীম বিরত হ... কিন্তু পরিতোষ বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না... ইথিওপিয়ার লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ... বই তাক থেকে নামিয়ে আনতে... অসীমকে দেখাবার জন্য। আর ... বাবুয়াকে কোলে তুলে বললো "বাঃ ... টুনুর মত মনে হচ্ছে যেন, হা... লক্ষ্মী। এই না হলে ছেলে।" ... কেউই ভাঙা জিনিসটার ... দুঃখিত মনে হোলো না। অসীম দেখ... শিখা বাবুয়াকে কোলে নিয়ে কথা ব... মধ্যে একটা প্রাণবন্ত ভাব রয়েছে। সাধার... পরিচিত লোকেদের ছেলেমেয়েদের যে ... ভদ্রতাসম্মতভাবে আদর করা হয় একবা... সে রকম নয়—ভারী স্বাভাবিক। দেখ... হয় ছোট ছেলেমেয়েদের ও সত্যিই উপ... করে।

দীপালী বাবুয়াকে শাসন ক... চেষ্টা করলো। কিন্তু শিখা আলগা... কথাটা উড়িয়ে দিয়ে উঠলো চা করে আ... অসীম পিছন থেকে লক্ষ্য করলো ... চলার ভঙ্গীটা বেশ। নিজের অজা... আবার চোখে ভেসে উঠলো হেড লা... আলোয় দেখা একটি মেয়ের ছবি। ... যখন নতুন বৌ হয়ে আসে তখন... ময়লা রং নিয়ে জামশেদপুরের লো... মন্তব্য করেছিল অসীমের মনে আছে... বছর খানেক আগেই অসীমের বিয়ে... অসীমের বৌ দীপালীর রং বিজ্ঞ... ভাষায় প্রকৃত গৌরবর্ণ। কাজেই এ... অসীমের একটা গোপন আত্মপ্রসাদ ... কিন্তু এখন শিখার দিকে তাকিয়ে অ...

লো ফরসা নাই হোলো, দুধের মধ্যে গুড় মেশানো রং শিখার। আর জ করলে কেমন দেখায় সেটা তো ই গে লর্ডে দেখা গেছে। কে বলবে উপর চুড়ো করে ফোলানো চুল, পাতার উপর নানারকম কারুকাজ, মডেলের মত সেদিনের সেই মেয়েটিই কোন রূপে শিখাকে বেশি ভালো ক জানে। এসব ভাবতে শুরু করে একটু অস্বস্তি বোধ করলো। মোটর সাইকেলে যে ছেলেটির কাঁধ থা বসেছিল সেই কি সেদিন ছিল না অন্য কেউ? অসীম আর সেদিন তাদের বিবাহ-বার্ষিকী রতে গে লর্ডে এসেছিল। দূরে দেখেছিল শিখারা দুজনে মাথা এনে নিজেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে গল্প করে গেল। কোনোদিকে না, কাউকে দেখলো না। অসীম পালী ওদের লক্ষ্য করছিল— মধ্যে খুব বেশি কথা বলার ছিল ম আর দীপালী অবশ্য সেই সব র মত নয় যারা সংসার খরচ ছাড়া ন আলোচনার বিষয় পায় না। মিত লাইব্রেরী থেকে রাজনীতি দি বই আনিয়ে পড়ে, তাই নিয়ে করে। তবুও কখনো কখনো য়ে যেন কথা ফুরিয়ে যায়। দামী রেস্টোরেন্টে যেখানে না খুব মৃদু—নেপথ্যে বিজ্ঞিত সুন্দরী মহিলা ও সুবেশ যুবকরা জোড়ায় বসে থাকেন, সেখানে ীম একটু নার্ভাস বোধ করে। এখন বোধ হয় দীপালির সঙ্গে ষ ধরনের কথা বলা দরকার, যা এখানেই নীচু গলায় বলা যায়। ন কথা মনে পড়ে না বলে অন্য থাও বলা হয় না। খাওয়া ছাড়া ই করার থাকে না তখন। এবং লের লোকেদের দিকে তাকিয়ে পালী মধ্যে মধ্যে অন্য লোকেদের রো করে। কিন্তু সেদিন শিখারা জেদের মধ্যে নিজেরাই পরিপূর্ণ ল। একবারও কথা ফুরোয় নি— তাকাবার দরকার হয়নি।

চায়ের ট্রে নিয়ে ফিরে আসা এই র দিকে তাকিয়ে অসীমের মনে ধ্যেও একটা আশ্চর্য পরিপূর্ণতা আত্মসচেতনতার অভাব? লোকে ধ কি বলছে শিখা কি কিছুই কিংবা জানলেও কি কিছু এসে এমনভাবে আরাম করে বসে চা কোথাও কোন গোলমাল নেই, ওর ভীষণ ভালো লাগছে। একে বলে মনে হয়? কথাটা অসীম উচ্চারণ করে কৌতুক বোধ নি হোলো এ কথাটা কখনো ও লতে শোনে নি—শুধু বইএ ইএই চলে—কথাটার সত্যি কোন মানে নেই। পরিতোষের ওপর করুণা না হয়ে অসীমের সামান্য হিংসেই মনে হোলো।

অথচ আশ্চর্য—এখানে বদলী হয়ে পর্যন্ত অসীম আর দীপালী পরিতোষকে নিয়ে কতবার দুঃখ করেছে। শিখার কাণ্ড-কারখানায় যখন পুনার বাঙালী সমাজ ছি ছি করছে তখন অসীম প্রায়ই ভেবেছে ওর বাল্যবন্ধু পরিতোষের কথা। দুজনেই এক সঙ্গে বড় হয়েছে, জামশেদপুরের আর পাঁচটা ছেলের মত ইস্কুল কলেজ গেছে, ক্রিকেট খেলেছে, মেয়েদের স্কুলের বাসের পাশে পাশে সাইকেল চালিয়েছে—পরে সম্বন্ধকরা সালঙ্কারা মেয়ে বিয়ে করেছে, খাট ড্রেসিং টেবিল যৌতুক পেয়েছে। তারপর পরিতোষ চলে গেল ডিফেন্স আকাদমিতে ইকনমিকস পড়াতে আর অসীম দু তিনটে চাকরী বদলে শেষ পর্যন্ত এই ইলেকট্রিক কোম্পানীর কজে পাকা হোল। পাঁচ বছর দেখা সাক্ষাত নেই, চিঠিপত্র কদাচিত। কিন্তু অসীম তো জানে যতই মিলিটারী জীবনের চাকচিক্য ওপরে পড়ুক না কেন আসলে পরিতোষ কিরকম সাদামাটা ছেলে। ওর বৌ ওর অনুপস্থিতির সুযোগে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন আর কাশ্মীরি মেজরদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। তাই নিয়ে পুনার বহুলোকের মুখরোচক জল্পনা-কল্পনার সীমা নেই। কিন্তু অসীম জানে যে পরিতোষের মা জামশেদপুরে এখনো মাথায় কাপড় দিয়ে কয়লার উনুনে রান্না করেন। পরিতোষের বৌদিরা অনেক কষ্টে শ্বশুরের মত করিয়ে মাসে একবার রিকশা চড়ে সিনেমা দেখতে যায়। অসীমের খুবই দুঃখ হোতো পরিতোষের বৌএর সম্বন্ধে কেচ্ছা শুনে। ও আর দীপালি অনেকবার রাতে খেয়েদেয়ে অন্ধকার বারান্দায় বসে এই নিয়ে আলোচনা করেছে। পরিতোষ আর শিখার বিয়েতে চিড় খেয়েছে সেটা ধরেই নিয়েছিল, সেইজন্য আফশোষও করেছে কত। বিয়ে যদি ভেঙেই যায় তাহলে ছেলেমেয়ে দুটোর কি হবে—শিখা ওর সামান্য আই-এ পাশ বিদ্যে নিয়ে কিই বা কাজ পেতে পারে—এতদূরও চিন্তা করা হয়ে গিয়েছিল। এসব আলোচনা করার সময় অসীমের নিজেকে বড়ই পরিতৃপ্ত মনে হোতো। পরিতোষ তার মত সুখী হতে পারে নি ভেবে সহানুভূতি হোত তার উপর।

কিন্তু এখন সোফার ওপর পা তুলে বসা পরিতোষকে স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখে কিরকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। চায়ের সঙ্গে মালপোয়া আর চিঁড়েভাজা দেখে পর্যন্ত পরিতোষ শিখার পিছনে লেগেছে। নানারকম বিরূপ মন্তব্য করছে শিখার গৃহিণীপনা সম্বন্ধে। "সেই মালপো! কদ্দিন চালাবে এগুলো বলো তো? অবশ্য অসীম আমাদের বাড়ির লোক, কাউকে বলবে না যে বাসি মিষ্টি চালাচ্ছো।" "দেখছো তো?" শিখা অনুযোগের গলায় অসীমের দিকে তাকায়। অসীম লক্ষ্য করলো শিখা তাকে তুমি বলছে। আগেও কি বলতো? কে জানে—নতুন বিয়ের কনে তখন নিজে থেকে কতটুকুই বা কথা বলেছে। মনে পড়ে না তুমি বলতো কি আপনি। "মোটে কালকে বানিয়েছি মালপোগুলো। বলো, শেষ না হলে কি ফেলে দেবো নাকি?" পরিতোষ তবুও রেহাই দেবে না। বললো "পাঁচ বছর পরে এলো অসীম। সেই অগতির গতি চিঁড়েভাজা? এর চেয়ে ভালো কিছু নেই তোমার স্টকে?"

শিখাকে বিব্রত হতে দেখে অসীম তাড়াতাড়ি বলে উঠলো "চিঁড়েভাজা আমার ফেভারিট জলখাবার। খুব ভালো লাগছে—অনেকদিন হয়নি আমাদের বাড়িতে।" বলেই নজর পড়লো দীপালীর দিকে। ওর মুখটা কি একটু গম্ভীর? অসীমের মনে হোলো কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হোলো না। এর মানে এও হতে পারে যে অসীমের প্রিয় জিনিসটা তার বৌ বানিয়ে দেয় না। কি জানি দীপালী আবার কিছু মনে করলো কি না।

কিন্তু কোনটাই যে হিসেবের সঙ্গে মিলছে না। বৌ সিগারেট খাওয়া নিয়ে অভিযোগ করছে—স্বামী বৌএর রান্না নিয়ে ঠাট্টা করছে—এ সবই তো সাধারণ সুখী পরিবারের লক্ষণ। সবটাই কি অভিনয় নাকি? বাবুয়াকে কোলে তুলে আদর করা,

দীপালীর সঙ্গে বসে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, অসুখবিসুখ সম্বন্ধে নানারকম ঘরোয়া আলোচনা—এসবগুলোই কি একটা বিশেষ পার্টের অভিনয়ের অঙ্গ? এখন আজ বিকেলে বোধহয় শিখার ভূমিকা হোলো কল্যাণী গৃহবধূর। সেদিন রাত্রে গে লর্ডে বা লয়েড ব্রীজের ওপর মোটর সাইকেলের পেছনে যে মোহিনীকে দেখেছিল সেটা একটা অন্য পার্ট।

কিন্তু পরিতোষ? পরিতোষের সঙ্গে একলা হলে শিখা কোন পার্ট অভিনয় করে? পরিতোষটা কি এতই গাধা যে কিছু বোঝে না? রেকর্ডপ্লেয়ার আর ইথিওপিয়ার ফোকলোর নিয়ে হতভাগা মশগুল হয়ে আছে—আসল জায়গায় গলদ বোঝার খেয়াল নেই।

উঠি উঠি করেও অনেকক্ষণ আড্ডা হোলো। গাড়ির সামনে এসে দীপালী পরিতোষকে বললো, "আপনারা কবে আসছেন বলুন আমাদের বাড়ি? শহরে আসেন নিশ্চয় প্রায়ই?"

"আমরা?" পরিতোষ জবাব দিল 'এমনিতে শহরে যাই কালেভদ্রে। কখনো সিনেমা টিনেমা দেখতে হয়তো। কিন্তু আপনাদের ওখানে শিগ্গির যাবো, এবং প্রায়ই যাবো। নেমন্তন্নের অপেক্ষায় থাকবো না।"

'এই পরিতোষ' শিখা বলে উঠলো। 'সিনেমার কথা বললে তাই মনে পড়লো—আমাকে রোমিও জুলিয়েট দেখাও নি এখনো। তোমরা দেখেছো? চলো না এক সঙ্গে যাই।'

শুধু যে স্বামীর বন্ধুকে তুমি বলছে তা নয়। শিখা স্বামীকেও নাম ধরে ডাকছে সেটা অসীম লক্ষ্য করলো। জামসেদপুরের বাড়িতে গিয়ে আশাকরি বলে না। এখানে শুনতে মন্দ লাগছে না—বেশ যেন বন্ধু বন্ধু মনে হয়। 'কালই চলো না' শিখা বলতে থাকে। "পরশু তো ইদের ছুটি আছে সকালে তাড়া নেই। কাল চলো। বাচ্চাদের ঘুম টুম পাড়িয়ে, বেশ মজা করে সেকেন্ড শো'তে"—শিখা দীপালীর মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করতে চেষ্টা করলো। "দূর, কাল হবে না।" পরিতোষ সিগারেটের শেষ অংশটুকু মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে ঘসতে ঘসতে বললো 'কালকের টিকিটই পাবে না।' 'কেন?' শিখা নাছোড়বান্দা। 'রাজেশকে বললে ঠিক সকালবেলা মোটর সাইকেলে গিয়ে টিকিট কিনে আনবে।" অসীম অবাক হোলো। সোমবার দিন সকালে দশ-দশ কুড়ি মাইল মোটর সাইকেলে করে চলে যাবে শুধু টিকিট কিনে আনতে এত অনুগত লোকটি কে? একটু সন্দেহ হোল—কিন্তু জিজ্ঞেস করা তো যায় না। "রাজেশ বম্বে গিয়েছিল না? ফিরেছে?"

পরিতোষ জানতে চাইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ কালই ফিরেছে। সকালে এসেছিল তো। তুমি তখন বাথরুমে। আমার ঘরে ওর কতকগুলো বই ছিল, নিয়ে গেল।" অসীম দেখলো দীপালীর কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে। ওরা পরস্পরের মুখ দেখে ভাবনা বুঝতে পারে এ নিয়ে দুজনেরই গর্ব। অসীম বুঝলো দীপালী আর সংযম রাখতে পারবে না। সত্যিই ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে দীপালী ফট করে জিজ্ঞেস করে বসলো "রাজেশ কে?" শিখা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে জবাব দিল 'একটা ছেলে আছে রাজেশ কোহলী বলে, ইনফ্যান্ট্রী অফিসার—পরিতোষের দারুণ ভক্ত। আমাদের এত রকম কাজ করে দেয় না! সত্যি ভীষণ ভালো ছেলেটা। পরিতোষ যখন ইথিওপিয়া গিয়েছিল, কি না করেছে—যখন যা দরকার একবার রাজেশকে বললেই হোলো।'

'আমার ভক্ত না আরো কিছু।' পরিতোষ কৌতুক ছলে চোখ টিপলো। "ছেলেটা আর্মি অফিসার হলে কি হবে পড়াশুনোর ঝোঁক আছে। আমার কাছে আসে ইকনমিক জার্নাল টার্নাল ঘাঁটতে। তবে আসল নজরটা বোধহয় শিখার দিকে।"

'আহা হা', শিখা পরিতোষের গায়ে এক ধাক্কা দিল। 'কি রকম কথা দেখ, শুনলে গা জ্বলে যায়।" শিখার ভঙ্গীটা এবং কথাগুলো খুবই ক্লাসিক। বহু মেয়েই অনেক পরিস্থিতিতে এই ভাষা ও ভঙ্গী ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের আলোয় বাগানে পাশাপাশি দাঁড়ানো শিখা আর পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অসীমের হঠাৎ মনে হোলো ওরা দুজনে বেশ আছে। সামনে পরিপূর্ণতার ছবি দেখে অকারণেই যেন নিজের মনটা ভার হয়ে গেল।

• • •

ফটক থেকে গাড়ি বেরোবার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো দীপালী। 'বাবাঃ কত ন্যাকামিই জানে।' কিছু না বলে অসীম গাম্ভীর্য চেষ্টা করলো। আর একটু এগিয়ে যাবার পর দীপালী বললো 'ওপর থেকে কিছু বোঝবার জো নেই, তাই না? ভেতরের ব্যাপার না জানলে লোকে চট করে টেরই পাবে না এত গলদ।' দীপালীর কথায় ঈষৎ আশা ভঙ্গের সুর। অসীম বললো 'বাবুয়াকে পেছনের সীটে শুইয়ে দেবে? গাড়ি থামাই? ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।' 'না, থাক।' দীপালী এই সরস আলোচনাটা মুলতুবী রাখতে রাজি নয়।

ডিফেন্স আকাদমি থেকে পুনা যাবার পথটা বড় সুন্দর। যেমন পাহাড়ের দৃশ্য, তেমনি রাস্তার সারফেসটাও চমৎকার। অসীম গাড়ির স্পীড বাড়ালো। অন্ধকার হয়ে আসছে, শিগ্গির হেড-লাইট জ্বালতে হবে।

'একটু ঢলানি ভাব কিন্তু শিখার প্রথম থেকেই ছিল। বিয়ের কনে যখন দেখেছিলাম তখনও। তবে জামশেদপুরে তো আর ইচ্ছে মত লীলা-খেলার সুযোগ ছিল না—তাই কেউ অতটা লক্ষ্য করে নি।' দীপালীর দু-একটা কথা অসীমের কানে বাজলো। অসীমের মনে পড়লো ওর এক দূর সম্পর্কের জেঠিমা ছিলেন অশিক্ষিত এবং ঝগড়াটি। ঘোঁট পাকাতে, সংসারে অশান্তি করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। অসীমের মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন তিনি। 'ঢলানি' 'লীলা-খেলা' এ-সব কথাগুলো তিনি খুব ব্যবহার করতেন। দীপালীর মত সুশিক্ষিত মেয়ের মুখে এ রকম শব্দ শুনে অসীমের অস্বস্তি লাগলো।

"সেই পাঞ্জাবী ছেলেটার কথা কিভাবে অনায়াসে বলছে পরিতোষের সামনে দেখলে? মিসেস সান্যাল বলেছিলেন সে নাকি ওদের বাড়িতেই থাকতো এতদিন, পরিতোষ আসাতে ব্যাচেলার্স মেসে উঠে গেছে। আর পরিতোষই বা কি? কিছু যেন গায়েই মাখছে না।" দীপালী বলে চললো।

শেষ পর্যন্ত কথা বলতেই হোলো অসীমকে। "তুমি কি আশা করেছিলে যে ওরা আমাদের সামনে ঝগড়া করবে? করলো না বলে দুঃখিত হয়েছো?"

অসীমের কাছ থেকে এটা অপ্রত্যাশিত। দীপালী আহত হয়ে চুপ করলো। [illegible] দুজনের মধ্যে এত সম্পূর্ণ মিল [illegible] দের সমস্ত চিন্তা ভাবনা [illegible] শান্তি হয় না। আজ এই রকম একটা আলোচনায় অসীমের অনীহা দেখে দীপালী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো 'কী জানি বাবা বুঝি না।"

হেড-লাইটের আলোয় দেখা গেল একটা খরগোশ দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে। দূরে পাহাড়ে পার্বতী মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে, আর নীচে পুনা শহরের আলো। আর পাঁচ মাইল পরে বাড়ি। নিশ্বাস ফেলে অসীম ঘড়ি দেখলো। মাত্র সাতটা এখন। সারা সন্ধে পড়ে রয়েছে সামনে। তারপর খেয়ে উঠে অন্ধকার বারান্দায় দীপালীর সঙ্গে বসা। আজ ওরা কাকে নিয়ে আলোচনা করবে? অসীমের পরিতৃপ্ত সুখে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ খচ করছে। গলদটা কোথায় বুঝতে পারলো না, শুধু মনে পড়লো মোটর সাইকেলের পিছনে বসা একটি মেয়ের এলায়িত বসার ভঙ্গী।

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

(আঠারো)

ঃখের দিনগুলো কাটতে চায় না
সুখের দিনগুলো কেমন যেন ঝড়ের
উড়ে যায়। বন্দনা-বিকাশকে নিয়ে
র দিনগুলিও অমনি উড়ে গেল।
দেখতে বিকাশের ছুটি ফুরিয়ে
।

টি দিন কত কি করল! কত কি
! রবিবার সকালেই বিকাশ চলে
শনিবার সন্ধ্যায় তরুণ ওদের নিয়ে
টিংএ বেরুল।

তামরা তো লণ্ডনে হাসু পাপীর
পরে হৈ হৈ কর। এদের হাতে তৈরী
জোড় নিয়ে পরে দেখ কি চমৎকার।'
কাশ বললো, আমার তিন-চার জোড়া
জুতো আছে। আবার জুতোর কি
।

রুণ সেকথা কানেও তুললো না।
ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা গলির
এক এজেন্সী হাউসে হাজির হলো।
উ আর ইউ মিঃ নোয়েল?'
ইন থ্যাংক ইউ স্যার।'
ই হচ্ছে আমার বোন আর ব্রাদার-
ওদের জিনিসটা রেডি আছে তো?'
কাশ-বন্দনা একটু মুখ চাওয়া-চাইয়ি

য়েল সাহেব বললেন, আপনার
রেডি রাখব না?

মিনিটের মধ্যে ভিতর থেকে ঘুরে
টেবিলের পর ব্রাউনের টুরিস্ট মডেল
টি-ভি সেট খুলে দেখালেন।
না বললো, একি দাদা! টি-ভি সেট
কেন?

শ করে থাক।'

ার বিকাশ বলে, 'একি করছেন

র একি করছেন? মাস কয়েক আগে
দেখেই ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।
ওদের আসার খবর পাবার পরই
ক দাম-টাম মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

তরুণের সঙ্গে তর্ক করার সাহস ওদের কারুরই নেই। তবুও বার বার আপত্তি করেছিল।

শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে তরুণ বলেছিল, 'জীবনে কাউকেই তো কিছু দেবার সৌভাগ্য হলো না। লোকেরা বাবা-মা ভাই-বোন, স্ত্রীপুত্রকে কত কি দেয়! তোমরা না হয় আমাকে সেই সৌভাগ্যটুকু উপভোগের প্রথম সুযোগ দাও।'

বন্দনা-বিকাশের মুখ দিয়ে আর একটি কথা বেরোয়নি।

কিছুক্ষণ পরে তরুণ আবার বললো, 'দাদার কাছে ছোট ভাইবোনেরা কত কি আবদার করে। কই তোমরা তো আমার কাছে কিছু আবদার করলে না?'

এই দুনিয়ায় স্নেহ, ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য চাই। কিন্তু সেই স্নেহ-ভালবাসা অপরকে না দিতে পারার মত দুর্ভাগ্য নেই। মানুষকে ভালবেসেই মনুষ্যের সার্থকতা, পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি। তরুণের জীবনে সেই পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি এলো না। একথা বন্দনা-বিকাশ জানত কিন্তু সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকল। খানিকক্ষণ পরে বন্দনা বললো, 'এই একমাস আমি এমন জ্বালাতন করব যে তোমার আর দুঃখ থাকবে না, দাদা।'

বিষন্ন তরুণের মুখে শুকনো হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'শুধু এই একমাসই তো জ্বালাতন করবে, তারপর তো নয়।'

পরের দিন বিকাশকে 'সী-অফ' করতে গিয়ে তরুণের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। 'বন্দনা, তুমিও চলে গেলে পারতে। ও বেচারীর একলা একলা থাকতে ভীষণ কষ্ট হবে।'

'তোমাকে একলা ফেলে গেলে তোমার বুঝি কষ্ট হবে না?'

বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'না, না দাদা, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। তাছাড়া বন্দনাও তো কতদিন ধরে একঘেয়ে জীবন কাটাচ্ছিল।'

বিকাশ চলে গেল। বন্দনাকে নিয়ে তরুণ ফিরে গেল হাম্সা কোয়ার্টারের এ্যাপার্টমেন্টে।

একটা এ্যালুমিনিয়াম ডেক চেয়ার নিয়ে তরুণ দক্ষিণের বারান্দায় বসল। বন্দনা চলে গেল ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরে দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে বন্দনা এলো বারান্দায়।

হাসতে হাসতে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি কফি?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর একটা বসবার কিছু আনি।'

'তুমি ধর। আমি আনছি।'

'না, না, আমিই আনছি।'

তরুণ চট করে ভিতর থেকে একটা ইজিপসিয়ান মোড়া আনল।

কফির কাপে চুমুক দিয়েই বন্দনা বললো, 'একটা মাস বেশ মজায় কাটান যাবে, তাই না দাদা?'

'হ্যাঁ, তা বেশ কাটবে', খুশীভরা হাসি হাসি মুখে তরুণ জবাব দেয়।

'জান দাদা আমার ভাগ্যটা যে এমন করে পাল্টে যাবে, তা কোনদিন ভাবিনি।'

আত্মস্মৃতির সবগুলি অধ্যায় মনে মনে পর্যালোচন করে বন্দনা যেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

'এর মধ্যে আবার ভাগ্য পাল্টাল কোথায়?'

ভ্রূ দুটো তুলে চোখ ঘুরিয়ে বন্দনা বলে, ভাগ্য না হলে তোমার মত দাদা পাই? হাম্সা কোয়ার্টারে থাকতে......

তরুণ আর হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতেই বললো 'একটা আস্ত পাগলী না হলে কেউ একথা বলে?'

হঠাৎ ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

তরুণ উঠতে গেলেই বন্দনা বললো, 'তুমি বসো, আমি দেখছি।'

বন্দনা দরজা খুলেই আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'আপ আ গিয়া! আইয়ে আইয়ে।'

তাড়াতাড়ি তরুণ উঠে গিয়ে দেখল ট্যান্ডন সাহেব এসেছেন।

ট্যান্ডন সাহেব মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'আই ওয়ানটেড টু চেক আপ দুই ভাই-বোনে কেমন মজা করছ?'

বন্দনা মজা করে বলে, 'এই তো সবে এক কাপ কফি নিয়ে শুরু করেছি। কদিন অপেক্ষা করুন, তারপর দেখবেন।'

ট্যান্ডন সাহেব বন্দনার কাঁধে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'এই বুড়ো দাদাকেও একটু শেয়ার-টেয়ার দিও।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। এবার বলে, 'আগে তো বসুন, তারপর ভাগাভাগি করা যাবে।'

তরুণ আর ট্যান্ডন সাহেব লিভিং রুমের কোণার কৌচে বসলেন। পাকা গিন্নীর মত বন্দনা জানতে চাইল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? টি অর কফি?'

'শুধু টি অর কফি? আর কিছু খাওয়াবে না?'

'আপনার মত সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটের তো অধৈর্য হওয়া চলে না। ইউ সুড ওয়েট এ্যান্ড সী।'

বন্দনার শাসন করার কায়দা দেখে দুজনেই হাসলেন।

ট্যান্ডন সাহেব কপালে হাত দিয়ে বল্লেন, 'খোদা হাফিজ! এ তো দারুণ মেয়ে!' এবার তরুণের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'সী সুড হ্যাভ বিন ইন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস।'

'ইউ গো অন পন্ডারিং, আমি যাচ্ছি।'

কার্ডিগানের হাত গোটাতে গোটাতে বন্দনা পা বাড়াল প্যান্ট্রির দিকে। ট্যান্ডন সাহেব প্রায় চীৎকার করে বল্লেন, তরুণ, আউটস্ট্যান্ডিং ডিপ্লোম্যাটদের মত সী ক্যান ইগনোর টু!'

তরুণ কিছুই জবাব দেয় না কিন্তু যেন মনে মনে বন্দনার জন্য গর্ব অনুভব করে।

ট্যান্ডন সাহেব এবার বলেন, 'ভারী চমৎকার মেয়ে! দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছা করে।'

'সত্যি, বন্দনা খুব ভাল মেয়ে।'

'তুমি খুব লাকী।'

'এ্যাজ ফার এ্যাজ বন্দনা ইজ কনসার্নড্, আমি নিশ্চয়ই লাকী।'

ট্যান্ডন সাহেব হঠাৎ একটু হাসলেন, 'এ্যান্ড সী ইজ ভেরী প্রাউড অফ ইউ।'

'তাই নাকি?' হাসতে হাসতে তরুণ পাল্টা প্রশ্ন করে।

কিছুক্ষণ পরে বন্দনা ট্রলি-ট্রে নিয়ে হাজির হলো। প্লেট ভর্তি পাকোড়া আর কফি ছাড়াও আরো কি কি যেন।

ট্যান্ডন সাহেব ঠাট্টা করে বল্লেন, 'এত বেলায় পাকোড়া-কফি? ভেবেছিলাম লাঞ্চ খাওয়াবে।'

'আজকে আমাদের একটু স্পেশ্যাল খাওয়া-দাওয়া আছে। সো ইউ মাস্ট এক্সকিউজ।'

বন্দনার কথা শুনে তিনজনেই হাসল।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এর আগে মহাশূন্যতার মধ্যে তরুণ ভেসে বেড়াত। আজকাল? সব শূন্যতা যেন পূর্ণ করেছে বন্দনা। একটি মুহূর্তের জন্যও তরুণ নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করতে পারে না।

তরুণের মুখটা তুলে ধরে বল্লো, 'তুমি চুপটি করে কি ভাবছ দাদা? আমি রান্না করছি, চলো না, তুমি ওখানে গিয়ে বসবে।'

তরুণ আর চুপটি করে একলা বসতে পারে না। বন্দনা রান্না করে আর ও পাশে ইজিপসিয়ান মোড়াটা নিয়ে বসে বসে গল্প করে।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রান্না ঘরে গিয়ে মাসিমার সঙ্গে গল্প করতে?'

'খুব ছোটবেলায় মা'র পাশে পাশেই কাটাতাম কিন্তু বড় হবার পর আর সে সুযোগ পেতাম না।'

'কেন?'

ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরুণ হাসল। পুরানো দিনের কথা মনে হতেই কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

উদাস ফ্যাকাশে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে তরুণ বল্লো, 'পরের দিকে ইন্দ্রাণী না হলে মা'র এক মুহূর্তও চলত না। ইন্দ্রাণীকে কাছে পেলেই মার ফিস ফিস সুরু হয়ে যেতো।'

'মাসিমা ওকে ভীষণ ভালবাসতেন।' আপন মনেই বন্দনা বল্লো।

কথা বলতে বলতেই মাছ ভাজা হয়ে গেল। একটা মাছ ভাজা প্লেটে তুলে তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লো, 'এই নাও দাদা।'

'সে কি? এখন মাছ খাব কেন?'

'আমি দিচ্ছি, খেয়ে নাও না।'

আরো এগিয়ে চলে। তরুণ ফিল-হারমনিক অর্কেস্ট্রার দুটো টিকিট কিনে এনেছে। বন্দনাকে বলেছে একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরে যেতে। ভিতরের ঘরে সাজগোছ করছে সে। তরুণ সিগারেট খেতে খেতে পায়চারী করছে।

'দাদা, একটু এদিকে আসবে?'

'কি হলো?'

'একটু এসো।'

ও ঘরে গিয়ে বন্দনাকে দেখেই তরুণ বল্লো, 'বাপরে বাপ! বার্লিনার্সরা ভাববে ইন্ডিয়ান কুইন এসেছে।'

'আমি কুইন না হতে পারি বাট সিস্টার অফ এ্যান ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট।'

ঠোঁটটা উল্টে তরুণ বলে, 'এই গহনা-টহনা কাপড়-চোপড় দেখে কি বিশ্বাস করবে?'

বন্দনাকে দেখতে ভালই। চোখ-মুখ বেশ সার্প। নাকটা যেন একটু চাপা। তবে তা নজরে পড়ে না। চেহারার গড়নটাও বেশ ভাল। লন্ডনের একদল ইন্ডিয়ান ছোকরা যে বন্দনার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য টি বোর্ডে দোকানে আড্ডা জমাত, সেজন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। আজ আবার একটা কালো বেনারসী পরেছে। আই-ল্যাশ দিয়ে চোখ দুটোকে আরো সুন্দর করেছে। পেন্ট করেনি বটে তবে একটু বিউটি ট্রিটমেন্ট করায় সুন্দর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

'দাদা, এই দুলটা পরিয়ে দাও তো।' দুল দুটো এগিয়ে দিয়ে বল্লো, 'এমন বিশ্রী ডিজাইন যে পরাই একটা ঝামেলা।'

'এই মাটি করেছে। আমি কি পারব?'

পারব না বললে কি বন্দনা ছাড়ে?

বন্দনাকে কাছে পেয়ে নতুন করে বাঁচবার আশা পায় তরুণ। আনন্দ পায়, উৎসাহ পায়। জীবনযাত্রার ধরনটাও পাল্টে গেল। কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়েই দিন কাটে না। প্রতিদিন কত কি রান্না করে বন্দনা।

'এত কি খাওয়া যায়?'

'তুমি বড্ড বেশী তর্ক কর, দাদা। অন্ততঃ খাওয়া-দাওয়ার ভারটা আমাকে ছেড়ে দাও।'

তরুণ আর তর্ক করে না। হার স্বীকার করেও যেন জিতে যায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে গল্প করত কত রাত পর্যন্ত। ভূত-ভবিষ্যত নিয়ে কত কথা হতো।

'চল, এবার তুমি শুতে চল।'

তরুণ বুঝত এ অনুরোধ নয়, অর্ডার। 'এই তো যাচ্ছি।'

'আর এই তো যাচ্ছি নয়, এবার ওঠ।'

তরুণ উঠে পড়ে। বন্দনা আগেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছে। তরুণ শুতে না শুতেই বন্দনা ব্ল্যাংকেট ঠিক [illegible] দেয়।

'আমি কি বাচ্চা? কম্বল-[illegible] গায় দিতে পারি না?'

'এত আদরে মানুষ [illegible] এসব শেখার সুযোগ পেলে [illegible]

বন্দনা ভোরবেলায় উঠে পড়ে। একবার উঁকি দিয়ে তরুণকে দেখে নেয়। হয়ত কম্বলটা একটু টেনে দেয়। মুহূর্তের জন্য একটু যা ভাল করে দেখে নেয়।

দুঃখে-কষ্টে মানুষ হয়েছে বন্দনা। ঝড়-বৃষ্টি বড় বেশী সহ্য করতে হয়েছে। তরুণের স্নেহচ্ছায়ায় এসেই [illegible] একটু পরিষ্কার আকাশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই [illegible] মুখ-খানা দেখে যেন সে অনুপ্রেরণা পায়, আনন্দ পায়। দাদার পর আধিপত্য করে আত্মতৃপ্তিও পায় মনে মনে।

সুখের দিনগুলো আবার ঝড়ে [illegible] উড়ে যায়। বন্দনার বার্লিন বাসের [illegible] প্রায় শেষ হয়ে আসে।

'সব অভ্যেসগুলো তো নষ্ট [illegible] গেছে। এবার যে কিভাবে একলা [illegible] থাকব আর স্যান্ডউইচ খাব, তাই ভাবছি [illegible]

সেইদিন দুপুরেই বন্দনা [illegible] লিখল, 'দাদাকে ছেড়ে যেতে মনটা [illegible] খারাপ লাগছে। তুমি যদি রাগ [illegible] তাহলে আরো সপ্তাহ দুই থাকতে [illegible]।

বিকাশের উত্তর আসতে দেরী হলো না। 'তুমি নিশ্চয়ই আরো কিছুদিন থাকবে। দাদাকে দেখলে কি আমি রাগ করতে পারি? ভুলে যেও না ওর চাইতে আমাদের আপন আর কেউ নেই।'

পরের দিন সকালে অফিস বেরুবার সময় তরুণ বল্লো, 'আজ তোমার টিকিট কাটতে দেব।'

'না, না, দাদা। আমার টিকিট কাটতে হবে না। তোমাকে আর একটু জ্বালাতন করি।'

সে কি? বিকাশ আর কতদিন হাত পুড়িয়ে খাবে?

'ওই আমাকে থাকতে বলেছে।'

একটু শুকনো হাসি হাসল তরুণ। 'আমার সঙ্গে তোমরা এত জড়িয়ে পড়ো না। তাহলে আমার পাপে তোমাদেরও দুঃখ পেতে হবে।'

'সেসব তোমার ভাবতে হবে না।'

(ক্রমশঃ)

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাছাকাছি যেতেই দেখলাম নালার বুকে চাঁদের আধো-অন্ধকার। অনেকগুলো বড় বড় পাথরে একটা টিলার মত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের পত্রবিরল গাছেদের মাথা দিয়ে ধবধবে চাঁদের আলো এসে দাবার ছকের মত ছক পেতেছে কালো পাথরে। নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেও সেখানে কোন জানোয়ার দেখতে পেলাম না। একটা টিটি পাখি রাস্তার উপরে ঘুরে ঘুরে টিটিরটি-টিটিরটি করে বেড়াতে লাগল। সাধারণত জঙ্গলে কোনো জানোয়ার বা মানুষকে চলাফেরা করতে দেখলে পাখিগুলো তার উপর দিয়ে দিয়ে অমনি করে উড়ে বেড়ায়। মুখ ঘুরিয়ে আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। রাস্তার দিকে পুরো মুখ ঘুরিয়েছি এমন সময় সেই কালো পাথরের টিলার কাছ থেকে একটি মেয়েলি গলার চাপা হাসি শুনতে পেলাম। বেশ ভয় পেয়ে ও অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়েই ও দিকে বন্দুক তুলেছি এমন সময় যশোয়ন্তের গলা শুনলাম, মৎ মারো ইয়ার। মাদীন্ হ্যায়।"

আমার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়াতে লাগল। আমি ইদানীং জঙ্গলে পাহাড়ে যেখানেই সন্দেহজনক কিছু দেখি অমনি জগদীশ পাণ্ডের কথা মাথায় খেলে যায়। আর একটু হলে ইয়ার গুলী করে ফেলতাম। এমন রসিকতা কেউ করে?

পাথরের টিলার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখি যশোয়ন্ত এবং একটি মেয়ে টিলার উপরের মসৃণ পাথরের বুকে ভর করে শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

যশোয়ন্তকে দেখে সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে ওকে আমি চিনি না। ঠিক এ অবস্থায় আগে ওকে কোনোদিন দেখিনি। দেখব বলে ভাবিওনি অথচ ওর পরিপ্রেক্ষিতে ওর পাগলামির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম দৃশ্য যে কোনোদিন দেখব বলে তৈরী হয়ে থাকা আমার উচিত ছিল।

আমি কি করব, বা বলব, ভেবে না পেয়ে বললাম যাচ্ছি। আমি চললাম।

যশোয়ন্ত একটা আদিম মানুষের মত বড় পাথরের স্তূপ বেয়ে চাঁদের রাতের আলোঅন্ধকারে আমার কাছে তরতরিয়ে নেমে এসে আমার হাত ধরল। বলল, ভাগতে কিউ হো ইয়ার? আও বৈঠো। তুমসে কুছভি ছিপানা নেহী।

তারপর উপরের দিকে চেয়ে ডাকল, উত্তারকে আ লালতি।

লালতি সলজ্জে বলল, নেহী।

নেহী।

ত কিঁউ?

এই সেহি।

যশোয়ন্ত হো হো করে হাসতে লাগল। আলোছায়ার বুটিকাটা বনে একজন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মত সমাজ সভ্যতার মুখে লাথি মেরে হাসতে লাগল। মনে হল, যশোয়ন্ত আজ নেশাটা বেশ বেশী মাত্রায় করেছে। যশোয়ন্তের হাসি থামতে না থামতে লালতির পায়ে লেগে উপর থেকে একটা খালি বীয়ারের বোতল টুংটাং শব্দ করে পাথর গড়িয়ে এসে নীচের বালিতে ধপ্ করে পড়ল।

লোকে যেমন পোষা কুকুরকে ডাকে তেমনি কোরে লালতিকে বলল, আঃ আঃ লালতি আ—মেরে দোস্ত তুমকো জেরা নজদিক্সে দেখে গা—আ।

লালতি আবার বলল, এ বাবু, তুম অ্যায়সা করোগে ত হাম ভাগেগী।

যশোয়ন্ত আবার পাগলের মত হাসতে লাগল।

আমি যশোয়ন্তকে কোনোদিনও এমন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখিনি। যশোয়ন্ত আমার হাত ধরে এক ঝটকা টানে আমাকে নিয়ে একটা পাথরে বসল। তারপর বলল, বুঝলে লালসাহেব, নরম ময়দার মত, মহুল ফুলের মত মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেক নাড়লাম চাড়লাম—শিঙ্গাল হরিণের মত হরিণীর দলের সঙ্গে ছায়ায় রোদ্দুরে অনেক খেললাম। কিন্তু সুমিতাবৌদির মত কাউকে দেখলাম না। মনের ভালবাসার গাঁ বদল আমার হোল না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

মনে পড়ল ঘোষদা আমার কাছে শালের নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন। হাসিও পেল। আবার সুমিতাবৌদির কথা ভেবে কথাটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা করছিল না।

যশোয়ন্ত আমার মুখে ওর হাত চাপা দিয়ে বল, কাউকে বোলো না দোস্ত্। এ কথা কাউকে বলার নয়। কেন যে তোমাকে বলে ফেললাম জানি না। তবে তোমাকে বলিনি এমন কিছুই আমার নেই। তাই বলে ফেললাম। তুমি আর কিছু শুধিও না। আমার খালি ভাবতে কষ্ট হয়। সে, আমার ছেলে—ডাকাইত যশোয়ন্তের ছেলের বাপ বলে পরিচিত হবে ঐ লোকটা—ঐ ইডিয়েট্, ভীতু, চাকরী-সর্বস্ব লোকটা। এটা ভাবলেই আমার কষ্ট হয়।

হঠাৎ লালতি উপর থেকে বলে উঠল যে ওকে অন্ধকারে সাপের কামড় খাওয়ানোর জন্যে ঐখানে একা শুইয়ে রেখে যশোয়ন্ত কোন্ আনজান্ ভাষায় গেহুঁ বাজরার গল্প করছে।

আমি বললাম, আমি চলি, যশোয়ন্ত, আমি চলি।

যশোয়ন্ত হাসল। তারপর অনিচ্ছার হাসি হেসে বলল, আচ্ছা।

আমি অন্ধকারের ঝুপড়ি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় যশোয়ন্ত পেছন থেকে আমাকে ডেকে বলল, লালসাহেব হিবিসকাস্ ফ্লাওয়ার একস্প্লোরারের মত একা একা দেখাই ভাল—যেদিন দেখবে। সব জিনিস অন্যের হাত ধরে দেখতে নেই।

বলেই আবার জঙ্গল কাঁপিয়ে হাসতে লাগল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(২১)

হুটার আর কুজরুমের কাছের এক ওঁরাও ছেলেরা নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। সোমবারে সারহুল উৎসবের। মার্চের শেষে শালবনে ওরা সারহুল উৎসব করে।

মারিয়ানা অনেকদিন আগে একটি সারহুলের গান শুনিয়েছিল—হালফিলের মেয়েরা প্রজাপতির মত নরম। হাত ছুঁইয়ে দেখ—কী নরম—ইস্ প্রজাপতির মত নরম।"

বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব। এমনিতে হয়ত নেমতন্ন করত না। আমিই ওদের বলে রেখেছিলাম, সারহুল উৎসবের সময় আমাকে যেন একবার বলে, দেখতে যাব।

এই উৎসব মার্চের শেষেই যে হবে এমন কোনো কথা নেই—শাল গাছে যখন থোকা থোকা ফুল ধরে—হাওয়ায় হাওয়ায় যখন সেই গন্ধ ভেসে আসে—ঋতুরাণী বসন্ত যখন বনে জঙ্গলে অসীম মহিমায় অধিষ্ঠিতা হন—তখন ওরা এই উৎসব করে।

যখন আমি প্রথম রুমান্ডিতে আসি তখন প্রখর গ্রীষ্ম। বসন্ত অপগত। তাই তখন বনে জঙ্গলের বাসন্তী ভুবনমোহিনী রূপ দেখতে পাইনি। এ রূপ এখন দেখছি। এ রূপ বর্ণনা করি আমার এমন সাধ্য নেই। প্রকৃতির মত সুগন্ধি, সুবেশা, সুতনুকা আর দেখলাম না। এই ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি বদলানো। এখন শীতের সবুজ গাড়োয়াল ছেড়ে বসন্তের ফিকে হলুদ বেগমবাহার পরেছেন। শ্যাম্পু করা শুকনো পাতার চুলে চূড়া বেঁধেছেন আর আতর কি আতর। সর্বক্ষণ গন্ধে হাওয়া ম' ম' করে।

দেখতে দেখতে সোমবার এসে গেল। গেলাম। হুটারে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে। রোদটা এখনও মিষ্টি মিষ্টি লাগলেও ভরদুপুরে একটু গরমই লাগে।

এপ্রিলের প্রথম থেকে বেশ গরম পড়ে যাবে। তবে হাওয়াটা এখনো গরম হয়নি—বনের পাতায় পাতায় পাহাড়ী নদী-নালায়

সেখান থেকে ট্রেন ধরব। কোম্পানীর ড্রাই-ভার আমাকে লাতেহার অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে। ইচ্ছে করলে রাঁচী অবধিও যেতে পারতাম। কিন্তু মর্যাদায় বাধল।

ভোর বেলা জুম্মান এক কাপ কফি করে দিল। কফি খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

পথের পাশে একটা বুনো মোরগ খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছিল। আমাদের দেখেই কঁক-কঁক করে উড়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। সকালের রোদে গাঢ় সোনালি পাখা ঝিকমিক করে উঠল। রুমান্ডির প্রতিটি দিন ও রাত্রির মুহূর্তই আমার চোখে এক সোনালি স্বপ্নের আলোকঝারির মত ছিল। যে স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে।

সেই সরু রাস্তা দিয়ে লাতেহারে চলেছি। যে পথ দিয়ে ওঁরাও ছেলেটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম সে পথ দিয়ে।

রুমান্ডি থেকে আসার আগে টাবড় এবং সুহাগী ও যবটোলিয়া বস্তির আরো অনেক নাম জানা ও অজানা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

বেচারি ওরা। ওদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। সকলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পর্যন্ত পারিনি—একবেলা। সকলকে পেট ভরে ভাত খাওয়ানোও হয় ওঠেনি। আমার অসামর্থ্যের ত্রুটি ব্যবহার দিয়ে মেটাতে চেয়েছিলাম জানি না কতটুকু পেরেছি।

লাতেহারের পাণ্ডেজীর দোকানে বসে চা ও শেওই ভাজা খাচ্ছি। বাসের অপেক্ষায় আরো অনেকে বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ একটি ঘোড়ার হ্রেষা রব কানে এলো।

যশোয়ন্ত ভয়ংকরাকে পাণ্ডেজীর দোকানের পাশের মহুয়া গাছে বেঁধে আমার কাছে এল, বলল, জানিনা কেন। ভাল লাগল না। আমার মন আজকাল আর আগের মত শক্ত নেই ইয়ার। আজকাল দুঃখ হলে দুঃখ লাগে, ভয় পাবার কারণ থাকলে ভয় পাই। তুমি সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছ ভাবতে ভাল লাগে না।

আমি কোনো কথা বললাম না।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। বললাম, চিঠি লিখলে উত্তর দেবে ত?

যশোয়ন্ত হাসল। বলল, আমি ত চিঠি লিখতে জানি না লালসাহেব, আমি শুধু কথা বলতে পারি। তাও জঙ্গলের জানোয়ারদের সঙ্গেই বেশী কথা আমার। আমার উত্তর আশা কোরো না। উত্তর পাবে না। তবে, তুমি চিঠি লিখ।

একটু থেমে বলল, সুহাগীতে যখন মাছ ধরা পড়বে তোমার কথা মনে পড়বে। সুমিতার সঙ্গে যখনি দেখা হবে গরমের দিনে আবার যখন মহুয়া আর করৌঞ্জার গন্ধ ভাসবে হাওয়ায়, জীরহুল আর ফুল-দাওয়াই ফুটবে, তোমার কথা মনে হবে। আবার যদি কোনো দিন বাগেচম্পার ঢালে বাইসন শিকারে যাই তখনো তোমাকে মনে পড়বে। তোমাকে মনে মনে অনেক চিঠি লিখব। চিঠিগুলো শুকনো শালপাতার মত জঙ্গলে নদীনালায় কালো পাথরে হাওয়ায় হাওয়ায় গড়িয়ে বেড়াবে। সে চিঠি ত ডাকে যাবে না।

আমি বললাম, জগদীশ পান্ডের জন্যে আমার রুমান্ডি ছেড়ে যেতে মন খুঁৎ খুঁৎ করছে। খুব সাবধানে থেকো যশোয়ন্ত। খুব সাবধানে থেকো।

যশোয়ন্ত উত্তর না দিয়ে বুশ শার্টের নীচে গুঁজে রাখা পিস্তলে একবার হাত ছোঁয়াল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, মরবে একজন ঠিকই। হয় ল্যাংড়া জগদীশ, নয় এই যশোয়ন্ত। তবে কে যে মরবে তা আবরং পাহাড়ের দেওতাই জানেন।

পকেট থেকে একটা চুট্টা বের করে যশোয়ন্ত এক গাল হাসল। যেন আমাকে ভোলাবার জন্যে। আবৃত্তি করে, হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'মরনেকে বাদ মেরি ঘরসে কেয়া নিকাল শমান? চাঁদ হসীনোঁকী খৎ, চাঁদ তসবীরেঁ বুতাঁ'।

ওর হাঁটুর উপরে রাখা চওড়া কব্জির উপর আমার হাত রাখলাম।

ডাল্টনগঞ্জ থেকে বাস এসে গেল; উঠে বসলাম।

টোরীতে এসে মোড় নিল বাস। বাঁয়ে ভাবরা মোড় হয়ে সীমারীয়া হয়ে যশোয়ন্ত-এর চটীলাওয়ার রাস্তা ওর বুড়ো বাবা মা কি করছেন জানি না।

আমঝারীয়ার বাঙলোটি পথ থেকে দেখা গেল শেষ বিকেলে। দুদিকে সারা পথ কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। পাহাড় আর পাহাড়। নিরলো বস্তির দিকে পথ বেরিয়ে গেছে এপথ থেকে। যশোয়ন্তের সঙ্গে শিকারে এসেছিলাম একবার।

বেশ গরম গরম লাগছে। আরো একমাস পর যখন গরম আরো জোর পড়বে, তখন সন্ধ্যার পর পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা জ্বলবে। কালো পাহাড়ের পটভূমিতে প্রকৃতির নিজের হতে জ্বালানো দেয়ালী দুলবে—হাওয়াটা ফিসফিসিয়ে কোনো গান্ধারী আলাপ বয়ে বেড়াবে। খরগোস আর কোটরা হরিণগুলো পথের উপর আগুনের ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে। মনে মনে সব দেখতে পাচ্ছি—সব দেখতে পাচ্ছি—পোড়া গাছের গন্ধ পাচ্ছি নাকে।

যেন হঠাৎই কুরুতে পৌঁছেই জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। এবার রাঁচীর রাস্তা সোজা।

দুপাশে চষা জমি—মাঝে মাঝে দুটি একটি গাছ। সমানেই মান্দার। পথের পাশে হাট বসেছে। ওঁরাও ছেলে-মেয়েরা ভীড় করেছে। বাসটা দাঁড়াল। ধানিয়াসের কাটা ওঁরাওদের হাতে বোনা দোহর, পেতলের গয়না, মাটির বাসনপত্র আরো কত কি।

একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে একটি ওঁরাও মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে—চুলে ফুল গুঁজেছে—একটি ছেলে মোষের পিঠে চড়ে হাটে এসেছে কি যেন বলছে ছেলেটি মেয়েটিকে মেয়েটি দুলে দুলে হাসছে—ছেলেটি দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে আছে। মোষটা একবার মাথা ঝাঁকাল কান দুটো পট পট করে নড়ে উঠল—গলার কাঠের ঘন্টাটা ডুংডুংইয়ে বাজল। ছেলেটি কি সেই কবিতাটি বলছে? মেয়েটিকে? —কানে কানে?

হাল ফিলের মেয়েরা
প্রজাপতির মত নরম—
ইস্ হাত ছুঁইয়ে দেখো—
প্রজাপতির মত নরম।

একটু পরে বাসটা ছেড়ে দিল। পেছনে একবার শেষবারের মত চাইলাম। সে কালো পথটা শ্রাবণের বিষণ্ণ মেঘের মত মনে জঙ্গলে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে রুমান্ডিতে—হারানো রুমান্ডিতে—আমার আদিগন্ত আনন্দের আলোকঝারিতে।

(শেষ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন আমার ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাকসি নিয়ে গেলাম মন্মথ রায়ের বাড়ীতে প্যারেলে, একা একা মুখ বুজে হোটেলে থাকতে কি ভাল লাগে? ভাবলুম মন্মথর কাছে গিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাক। কিন্তু হরি হরি! গিয়ে দেখি মন্মথ বাড়ীতে নেই। এত খুঁজে খুঁজে এসে কিনা দেখি বাড়ী নেই! ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। শুনলুম—জ্যোতিপ্রকাশের বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে তার শিশুপুত্র অসুস্থ—তাই সে কলকাতা যাচ্ছে আর মন্মথ তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছে। বিফল মনোরথ হয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

রাজনর্তকীর হিন্দি ও বাংলা দু' সংস্করণেই আমি রাজগুরুর ভূমিকাটি করি। হিন্দি সংস্করণের পার্ট বাংলায় লিখে আমাকে দেওয়া হল—আর এই হিন্দি সংলাপ শেখাবার ভার পড়ল মিঃ বোসের অন্যতম সহকারী ডবলু জেড় আহমেদের ওপর। স্টুডিও থেকে গাড়ী আসত আমাকে তুলে নিয়ে যেত—তারপর ওখানে হিন্দি ডায়লগ রিহার্সাল দিয়ে আবার গাড়ী আমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যেত। কোন-কোন দিন সঙ্গে থাকত মন্মথ। তখনকার দিনের খ্যাতনাম্নী কণ্ঠশিল্পী সুপ্রভা সরকার গিয়েছিল বম্বেতে 'রাজনর্তকীর' প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে। মাঝে মাঝে আমার গাড়ীতেই ফিরত।

আহমেদ ছেলেটিকে আমার বেশ ভালোই লাগতো। বম্বের দিনগুলো মনে এলেই মনে পড়ে আহমেদের কথা।

চুপ করে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। কাজের মধ্যে যেটুকু অবসর, সেটুকু ভরিয়ে নিতে চাই এখানে-ওখানে বেড়িয়ে।

একদিন গেলাম চৌপাট্টিতে 'কোকোনাট ডে' উৎসব দেখতে। ধীবরদের এই উৎসবটির নাম কেন যে 'কোকোনাট ডে' হয়েছে বলতে পারবো না। এই দিনটিতে ধীবররা সমুদ্র-জলে নারিকেল ভাসায়—প্রার্থনা করে সমুদ্রদেবতার কাছ থেকে যেন কোন অমঙ্গল না আসে। সমুদ্র যে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সমুদ্রে মৎস্য শিকারই এদের জীবিকা। যারা সমুদ্রে আছে, তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ যেন স্বচ্ছন্দ হয় এ জন্যেও তারা প্রার্থনা করে।

'কোকোনাট ডে' এখানকার আকর্ষণীয় লোক উৎসব। সত্যি বলতে কি, উৎসবটি সেদিন আমার ভালোই লেগেছিল।

বোম্বাইতে আছি, কিন্তু কলকাতার খবর না জানতে পারলে মনটা অস্বস্তিতে ভরে থাকে।

খবর পেলাম, নিউ থিয়েটার্সের ডাক্তার ছবিটি ৩১ আগস্ট কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-চিত্ত জয় করেছে ছবিটি। শুনে আনন্দ পেলাম। ছবিটিতে আমার ভূমিকা ছিল।

শুধু কি ছবির খবর কলকাতার অন্যান্য খবরের জন্যেও উন্মুখ হয়ে থাকি।

যাই হোক, এই সময়ের কথা বলতে, একটি ঘটনা-প্রসঙ্গ না বলে পারছি না। বাংলা দেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব সদলে বোম্বাই এসেছেন জিন্নাসাহেবের কনফারেন্সে যোগ দিতে। কিন্তু হক সাহেব খুব মুস্কিলে পড়লেন। হোটেলে তাঁর জায়গা মিললো না। শেষটা মন্মথ রায় সমস্যার সুরাহা করলেন। মন্মথবাবুর অনুরোধেই আমি আমার বসবার ঘরটি ছেড়ে দিলাম হক সাহেবের জন্যে। মনে আছে, দিন তিনেক তাঁরা ছিলেন। বলা-বাহুল্য হক-সাহেবের সঙ্গে আমার আগে থেকেই সামান্য পরিচয় ছিল, এবারে সে পরিচয় পরস্পরকে আরো কাছে টানলো।

হক সাহেব যেদিন বিদায় নেবেন বোম্বে থেকে সেদিন মন্মথবাবু ও আমি দুজনই তাঁকে বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছিলাম। হক সাহেবকে নিয়ে হোটেল ছাড়ার মুহূর্তে সেদিন আরো দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এঁরা হলেন কলকাতার বিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাবের করুণা ভট্টাচার্য ও প্রেমলাল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে বেশি কথা বলা হয়ে ওঠেনি।

হক সাহেবকে ট্রেনে তুলতে এক ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। আগে থেকে রিজার্ভেশন করা ছিল না। এদিকে ট্রেনের কোন কামরায় জায়গা নেই। শেষ পর্যন্ত কি হবে—হক সাহেব তো বললেন, জানালা দিয়ে গলে যাবো। যদিও তা আর করতে হলো না। তাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় জায়গা মিললো।

বোম্বাই শহরের বিলাসবহুল হোটেলের কক্ষে বেশ নিশ্চিন্তেই আছি। নিত্য-নতুন মানুষের আসা-যাওয়া লেগেই আছে। কতো নতুন মুখ, কতো পুরেনো পরিচিতের মুখ।

বাকুলিয়া হাউসের বিনোদ মুখুজ্যে আমার পরিচিত। তাঁকে আচমকা আমার হোটেলের কক্ষে ঢুকতে দেখে অবাক হলাম।

শুনলাম, বিনোদবাবু জানতেন আমি এখানে আছি। তাই এসেছেন দেখা করতে। কথাপ্রসঙ্গে শুনলাম, কোন হোটেলে ওঠেননি উনি। উঠেছেন স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। ওখানেই একটা দিন কাটিয়ে চলে যাবেন শোলাপুরে।

বিনোদবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। বেড়াবার পথে এলাম স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। খানিক কথা, গল্পগুজব হলো। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম আমার সেই নির্দিষ্ট হোটেলের চার দেয়ালের ঘরটিতে।

হোটেলের চার-দেয়ালের ঘরটির সঙ্গে আমার কতটুকু সম্পর্ক। দিনে রাত্রে যেটুকু সময় ঘুমোই—নয়তো আমার অবসর কাটে সমুদ্র-কিনারে। হোটেলের সামনেই সমুদ্রের বিস্তৃত পটভূমি।

কতো সময় রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তখনই উঠে এসেছি হোটেলের বারান্দায়। দাঁড়িয়ে দেখেছি রাতের সমুদ্র। শুনেছি তরঙ্গের কলকণ্ঠ।

দু-এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন আসে—আমি কি স্বপ্নবিলাসী? পরমুহূর্তেই আত্ম-জিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ করি। ভাবি, আমি শিল্পী। শিল্পীর জীবন তো স্বপ্ন-দিয়ে গড়া। আমার স্বপ্ন শিল্পের স্বপ্ন।

কদিন আগে 'কোকোনাট ডে'র উৎসব দেখেছি। এবারে দেখলাম গণেশ চতুর্থীর পুজো-অনুষ্ঠান। শহরের সর্বত্র আড়ম্বর সহকারে গণেশ পুজো হয়। এই উপলক্ষে রীতিমতো উৎসবের ধুম পড়ে যায় শহরে। বোম্বাই শহরে ব্যবসায়ী মহলের প্রভাব যথেষ্ট, এবং স্বভাবত তারা গণেশ পুজোয় উৎসাহী।

পরিচালক মধু বসুর অন্যতম সহকারী হেমন্ত গুপ্ত দাদারে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। একদিন নিমন্ত্রণ পেলাম তার কাছ থেকে।

হেমন্তর ফ্ল্যাটে যাবার পথে মন্মথবাবু আর জ্যোতিকে তুলে নিলাম। তারাও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। এই নিমন্ত্রণ কোন কিছু উপলক্ষে নয়—এমনিতে সবাই মিলে একটু খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করা।

এখানেই শুনলাম, হেমন্ত গুপ্তের সঙ্গে মধুবাবুর সাম্প্রতিক মনোমালিন্যের ব্যাপারটা। যার জন্য হেমন্ত ছেড়ে দিয়েছে মধুবাবুর সহকারীর কাজ।

কদিন পর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে আবার আমার ছবির কাজ আরম্ভ হলো। প্রথম দিনে আমার শ্যুটিং দেখবার জন্যে রাজ-নর্তকীর অধিকাংশ শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। এখানেই আলাপ হলো বিখ্যাত অভিনেতা নায়াম পল্লীর সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠতা হলো। এই নায়াম পল্লীই রাজনর্তকীর হিন্দী সংস্করণে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এর মধ্যে মাথায় চিন্তা এলো, বোম্বেতে যখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে, তখন আর এই হোটেলে কেন। একটা ফ্ল্যাট নিলেই ভালো হয়।

যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। 'ইব্রাহিম ম্যানরে' একটি ফ্ল্যাট নিলাম। ভাড়া করা ফ্ল্যাট, তবু নিজের। মনের মতো ফার্নিচার নিয়ে এলাম। তা-ও ভাড়া করে, ভাবলাম, যে কদিন থাকি, নিজের মতোই থাকি। কলকাতা থেকে আমার খাস চাকর বংশীও এসেছে—যা কিছু সবই সেই করে। আমার সুখ-সুবিধে সে বোঝে। কখন কি দরকার সে জানে। এখন থেকে আমার ভাবনা বংশীর হাতেই ছেড়ে দিলাম।

ফ্ল্যাটে থাকলেও বংশী আমার খাবার নিয়ে আসতো বাইরের রেস্তোরাঁ থেকে। তৃপ্তি না হলেও, এছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু ডিনারের পাট চুকিয়ে আসতাম মিঃ বোসের ওখানে। মিস্টার এবং মিসেস বোস কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। শুধু পরিচালক হিসাবে নন, মানুষ হিসাবেও মধু বোস একজন বিরল ব্যক্তি।

কাজের মাঝেও অবসর আছে। অবসর পেলেই এখানে ওখানে যাওয়ার প্রোগ্রাম। একদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম ভার্সোভা সমুদ্র-সৈকতে পিকনিক করতে। মিস্টার এবং মিসেস বোস ছাড়া সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিমিরবরণ, বুল-বুল দেশাই, সুনীত সেন, তিমিরবরণের ভাই শিশিরশোভন, টুকলু এবং আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব।

ভার্সোভা সমুদ্র-সৈকত জায়গাটি বড়ো মনোরম। বিলাসী মনের খোরাক ছড়িয়ে আছে সৈকত-এলাকায়। দেখলাম, আমাদের মতো আরো নরনারী এসেছে নানা দলে বিভক্ত হয়ে। কতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-দের দেখলাম, যারা সাগর-বেলায় খেলায় মেতেছে।

সারাটা দিন আমরাও সাগরবেলায় স্বচ্ছন্দ আনন্দ উপভোগ করলাম। দিন গেল। সূর্য ডুবলো, সাগর পারে। সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যা হতে সমুদ্র-সৈকতের চেহা-রাটাই যেন বদলে গেল।

জ্যোৎস্না ধোয়া সন্ধ্যায় ভার্সোভার সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন সত্যি আমি নিসর্গ শোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এখানে ওই যে ছোট ছোট কুটিরগুলো আছে, ওরই একটিকে আশ্রয় করে দিন কাটাই।

কিন্তু তার অবসর কই। অবসর থাকলেও বাস্তবে তা কোন দিনই সম্ভব নয়। তবু মন মাঝে মাঝে অসম্ভবের পিছু ছুটতে চায়।

বাংলা দেশে কালবৈশাখী দেখেছি, বর্ষা দেখেছি। তার রূপ আলাদা।

কিন্তু বোম্বাই-এর সাগরতীরে সেদিন যে বর্ষার রূপ দেখেছিলাম তা কোন দিনই ভুলবো না। মনে আছে, সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে ফিরতি পথে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সমুদ্র আর আকাশ যেন এক সঙ্গে মিশে গেল। তারপর শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামলো। সারা দিন ধরে চললো ধারা বর্ষণ। সমুদ্রের জল স্ফীত হলো। মেরিন ড্রাইভের বাঁধ ছাপিয়ে জল এলো শহরে। রাজপথ প্লাবিত হলো। সারাদিন আমার ঘরে বন্দী রইলাম। কিন্তু খোলা জানালার ধারে বসে উপভোগ করলাম এই বর্ষার রূপ।

কী জানি কেন, প্রকৃতির এই উদ্দামতার মধ্যে আমি এক বিচিত্র স্বাদ উপলব্ধি করি। যে কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।

আমি যে হোটেল ছেড়ে ফ্ল্যাটে এসেছি, সে খবর আমার স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। লিখেও ছিলাম, তুমি চলে এসো।

সুধীরাও যেন এই রকম একটা চিঠির প্রত্যাশায় কলকাতায় ছিল। খবর পেয়ে আমার ছোট শ্যালক অনন্তলাল মিত্র ডাক নাম ভাঁদু, তাকে নিয়ে চলো এলো বোম্বে। পাচক তারিণীকেও সঙ্গে এনেছে।

সুধীর কাছে থাকলে আমি অন্য মানুষ। কোথাও কোন অপূর্ণতা থাকে না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, আমার কথাটা আমি যতো না ভাবি, তার চেয়ে সে-ই বেশি ভাবে। সুতরাং সুধীরা আসার পর আমি একেবারে নিশ্চিত।

কলকাতার বাইরে আছি, তাই বলে কলকাতার খবর রাখি না এমন নয়। নাট্য-ভারতীতে নতুন নাটক জলধর চাটুজ্যের পি ডব্লিউ ডি-র উদ্বোধন হয়েছে, সে খবরও রাখি। দুর্গাদাস, রাণীবালা, রতীন, সন্তোষ, জহর, নির্মলেন্দু—এরা এই নাটকের শিল্পী তাও আমার অজানা নয়।

হীরেন বসুর ছবি 'অমর গীতি' ২রা অকটোবর কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে, সে তারিখটিও ডায়েরীতে লিখে রেখেছি।

আগেই বলেছি, কাজ না থাকলে ঘরে বসে থাকতে পারি না। অবসর পেলেই কোথাও না কোথাও যাই।

এবারে অবসর মিলতেই ঠিক করলাম এলিফ্যানটা গুহা দেখতে যাবো। গেলামও। একা নই, আমার সঙ্গে আছে সুধীরা, ভাঁদু, তারিণী আর বংশী।

প্রথমে ট্যাকসী চেপে অ্যাপোলো বন্দর। তারপর স্টীমার লঞ্চে সমুদ্রপথে সাত মাইল এসে এ্যালিফ্যানটা গুহা

গুহার মুখে উঠতে প্রায় ৫০০ ফুট সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। কষ্ট হলেও, এ কষ্ট গায়ে লাগে না।

এ্যালিফ্যানটা গুহার কথা অনেক শুনেছি। আজ দেখলাম। প্রথম দর্শনেই বিস্ময়। মনে হলো—ভারতের প্রাচীন শিল্প-তীর্থে এসে পৌঁছেচি।

গুহার ভিতরে প্রস্তর খোদিত শিব ও পার্বতীর মূর্তি। মহাকাল শিব, ত্রিলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক পুরুষ, আর পর্বত-দুহিতা পার্বতী। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি—দৃষ্টির নেশা মেটে তো মন ভরে না।

গুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকি অবিচল, দৃষ্টি আমার হর-পার্বতীর মূর্তির দিকে। কিন্তু মন উধাও হয়ে গেছে, ইতিহাসের কোন অলিখিত অধ্যায়ে। যেদিন ভারতের সাধক শিল্পীরা প্রাণের সমস্ত সত্তা নিংড়ে রূপ দিয়েছিলেন শিব ও পার্বতীকে।

কিন্তু আরো দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখবার সময় কই। ফিরে যেতে হবে আবার।

এখানেই পরিচয় হলো এ্যালিফ্যানটা গুহার কিউরেটরের সঙ্গে। ভদ্রলোক বাঙালী, নাম মিস্টার সেন—আমাদের সঙ্গে থেকে তিনি যা কিছু দর্শনীয় সবই দেখিয়েছিলেন।

এলিফ্যানটা গুহা থেকে অ্যাপোলো বন্দরে ফিরছি যখন, তখন বেলা চারটে। ফ্ল্যাটে না ফিরে চলে এলাম ফিরোজ শা মেহতা রোডে, গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিসে। তখন এখানে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের একটা প্রদর্শনী ছিল।

প্রদর্শনীটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নানা রকমের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের সাজানো-গোছানো স্টলে, মনের মতো নানা জিনিস। কিছু কিছু কেনাকাটাও হলো।

যেখানে যাইন কেন, কিছু না কিনে ফিরি না। সুধীরা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই।

যাই হোক, প্রদর্শনী থেকে ফ্ল্যাটে ফিরেছি যখন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিরে এসেই নাট্যভারতীর বিধু মল্লিকের চিঠি পেলাম। নাট্যভারতীর সাম্প্রতিক নাটক পি ডাবলু ডি সম্পর্কে লিখেছে নাটক তেমন সুবিধের হয়নি। এছাড়া আর জানিয়েছে, জহর গাঙ্গুলী নাট্যভারতী ছেড়ে নাট্যনিকেতনে যোগ দিয়েছে। তা কলকাতার নাট্যজগতের আরো খবর ছিল তার চিঠিতে। কিন্তু তার চিঠির আসল কথাটা—আমি যেন কলকাতায় ফিরে এবারে নাট্যভারতীতে যোগ দিই।

কথাটা মনের মধ্যে রাখলাম এই পর্যন্ত।

পুজো এলেই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়। দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাঙালীর যে নাড়ির টান। কিন্তু আমার পুজো এবারে প্রবাসেই কাটবে। তবু সুধীরা আর ভাঁদু এসেছে—নয়তো পুজোর দিনগুলো আরো নিঃসঙ্গ মনে হতো।

'রাজনর্তকীর জন্যে আমরা খুব কম লোক আসিনি কলকাতা থেকে। কথা উঠলো, পুজোর মধ্যে আমরা সবাই মিলিত হয়ে একটা কিছু করবো। নাটক আর বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রথমে সাজাহান নাটকের কথা হলো। আমি আপত্তি করলাম। বল-লাম, আমি না হয় শাজাহান করলাম—কিন্তু আর আর চরিত্র? শেষটা 'রাতকানা' প্রহসনটির কথা বললাম। অগত্যা তাই ঠিক হলো।

অনুষ্ঠান হলো। প্রবাসী বাঙালীদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতেও হয়েছিল।

দাদরে বাঙালীদের উদ্যোগে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হয়। সুধীরা আর ভাদু এক দিন পূজো দেখতে গিয়েও ছিল।

পূজোর কটা দিন কাটলো। বিজয়া-দশমীর দিনে ভাদু কলকাতা রওনা হলো।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজো যেমন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, এ-দেশে তেমনি দশেরা উৎসব। বিজয়াদশমীর দিনটিতে এই দশেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দশেরা উপলক্ষে এখানে কোন প্রতিমা পূজো হয় না। এই দিনটিতে কোন উন্মুক্ত স্থানে বাঁশের বাখারি এবং কাগজ ইত্যাদি দিয়ে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, রাম, সীতা, লক্ষণ ও রাবণের প্রতীক তৈরি হয়। এই প্রতীক রাবণের বুকে তীর মারবেন রাম—তারপর জ্বলে ওঠে বহ্ন্যুৎসব। রাবন সমূলে নাশ হবে। এমনি করেই উদযাপিত হয় দশেরা উৎসব।

শুনলাম বোম্বাই-এর থানা বলে একটা জায়গায় দশেরা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। এবং বিরাট আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদেরও ইচ্ছে ছিল যাবার। বেরিয়েও ছিলাম। কিন্তু থানা স্টেশনে নেমে ওভারব্রীজ পেরিয়ে শহরে যাওয়া আর হলো না।

ওঁদের কাজ এখনো বাকি আছে। রাজ-নর্তকীর জন্যে এখনো বোম্বে থাকতে হবে। কিন্তু মন্মথ রায়ের কাজ শেষ। এবারে ওঁর ফেরার পালা।

মন্মথবাবু কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে আমি কতকগুলি 'কিউরিও' পাঠিয়ে দিলাম।

বাকি কাজও প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর একদিন রাজ-নর্তকীর শুটিং করলে আমার কাজ শেষ। এই কাজের মধ্যে মাঝে কিছু দিনের ছুটি পাওয়া গেল।

ছুটি পেলে বসে থাকতে রাজী নই। কোথাও না কোথাও যাওয়ার নেশা চেপে বসে।

এবারে কোথায় যাবো? ঠিক হলো নাসিক। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। ২৮ অক্টোবর রাতে ভি টি স্টেশন থেকে নাসিকগামী ট্রেন ধরলাম।

নাসিকে পৌঁছেচি বেলা সাড়ে ন'টায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলো। গ্রেপ্তার করা বলতে ভারতের অন্যান্য তীর্থে যেমন, এখানেও তেমন পান্ডারা যাত্রীদের জন্যে বসে আছে।

হোটেলে ওঠা আর হলো না। শেষ পর্যন্ত নাছোড়বান্দা পান্ডার বাড়িতেই উঠলাম।

নাসিকে দ্রষ্টব্য স্থান বলতে পঞ্চবটি বন। রাম রাজ্য ত্যাগ করে সহধর্মিণী সীতা আর অনুজ লক্ষণকে নিয়ে এই বনে বাস করেছিলেন। এই পঞ্চবটিতেই রয়েছে প্রাচীন অক্ষয়-বট। এতো ঝুরি নেমেছে যে, বৃক্ষের মূল কান্ডটি খুঁজে পাওয়া দায়। কিংবদন্তী এই যে, এই বটবৃক্ষতলে রামচন্দ্র ও সীতা বিশ্রম্ভালাপ করতেন।

পঞ্চবটি বনে আরো কিছু দর্শনীয় স্থান দেখা হলো। সীতা যেখানে রাবনকে ভিক্ষা দেন, এবং লক্ষণ যেখানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন, সেই স্থান দেখলাম।

রাম, সীতা ও লক্ষণের নামে তিনটি কুন্ড আছে। যেখানে মৃতের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বিধি।

গোদাবরীর তুলনা নেই। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল—গভীর না হলেও স্রোতের টান খুব বেশি। সতর্ক হয়ে স্নান করতে হয়। আমি এবং সুধীরা—স্নান করেছি গোদাবরীর পূণ্য-সলিলে। স্নানে অপূর্ব প্রশান্তি। তারপর পিতৃ-তর্পণের পালা। তর্পণ শেষ করেছি অনেক বেলায়। এরপর পান্ডাঠাকুরের বাড়িতে আহারাদি সারলাম। রান্না করেছিল সুধীরা।

নাসিকে আরো কিছু দর্শনীয় মন্দির ইত্যাদি আছে। সে-সব দেখলাম। তারপর দিনান্তে এসে পৌঁছলাম স্টেশনে।

পাঞ্জাব মেল আসবে, তারই জন্যে ওয়েটিংরুমে প্রতীক্ষা।

এইখানে ঘটলো এক মহা ঝামেলা। দেখলাম, একজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশনে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান সাধারণ মানুষদের ওপর প্রচন্ড আস্ফালন করছে। যার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না।

শুনলাম, লোকটি নাকি শুয়োরের ব্যবসা করে। লোকটির এই অহেতুক অভব্য আচরণ আমাকে বিস্মিত করলো। তার এই আচরণের প্রতিবাদ না করে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত চুপ করলো লোকটি।

ট্রেনের অপেক্ষায় আছি। একটানা ওয়েটিং-রুমে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। প্ল্যাটফর্মে খানিক পায়চারি করলাম।

ট্রেন এলো। পাঞ্জাব মেল। নির্দিষ্ট কামরায় আসন গ্রহণ করলাম।

রাত তখন আড়াইটে। মানমদ স্টেশনে নামতে হলো গাড়ী বদলের উদ্দেশ্যে। এখান থেকেই ঔরঙ্গাবাদের মিটার গেজ লাইন আরম্ভ হয়েছে। যে রেলপথ নিজাম স্টেটের।

ট্রেন বদল করেছি। এবারে আর বসে থাকা নয়, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়া।

ভোর হতে সুধীরার ডাকে আমার ঘুম ভাঙলো।

—ওঠো, ঔরঙ্গাবাদ এসে গেছে।

উঠে বসলাম। বন্ধ কামরার দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম, এক দাক্ষিণ দেশীয় ভদ্রলোককে। মুখোমুখি হতে তিনি বিনয় প্রকাশ করে বললেন, আমি নিজাম স্টেট রেলওয়ে হোটেল থেকে আসছি। যদি আপনাদের সেবায় আমরা লাগতে পারি।

হোটেলে যখন উঠতেই হবে, তখন আপত্তি কিসের। ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলেই চললাম।

অভিনয়ে—অহীন্দ্র চৌধুরী

হোটেলের গাড়ী অপেক্ষা করছিল স্টেশনের বাইরে।

হোটেলে পৌঁছে প্রথম কাজ হলো, অজন্তা, ইলোরা দেখার বন্দোবস্ত করা। সেই মতো হোটেল ম্যানেজারকে বললাম।

ম্যানেজার বললেন, ঠিক আছে, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আপনারা ব্রেক-ফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিন।

কথামতো কাজ। ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা হলাম অজন্তার পথে। হোটেল থেকে একজন গাইডও আমাদের সঙ্গে এসেছে, এছাড়া ড্রাই ফুডের ব্যবস্থা। সুতরাং পথে অসুবিধার কোন কারণ নেই।

অজন্তা দেখার বাসনা আমার অনেক দিনের। এলামও। ঔরঙ্গাবাদ থেকে কিছু কম-বেশি ষাট মাইল দূরে অজন্তা গুহা।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী দেখলাম। দু'চোখে দেখার আগ্রহ।

কিন্তু কি দেখবো! উঃ! এমনই অন্ধকার ভালো করে দেখা যায় না। শেষটা পাঁচ টাকায় আলো ভাড়া করে ছবিগুলি দেখলাম। কিছু কিছু শিল্পকর্ম কালের ভারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও সেইসব অনুপম শিল্প-কর্ম দেখে অভিভূত হতে হয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। এইসব চিত্রকলার পরিচয় আছে নানা পুস্তিকায়। তা থেকে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

মিঃ প্রসাদজি অ্যালবামটা আরো দেখতে বললেন।
কয়েকটা পাতা উল্টে যান. লছমীর স্বামী রতনলালের ছবি পাবেন।

ডায়েরীর পাতা উল্টে রতনলালের একলার ও লছমীর সঙ্গে তার বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি পাওয়া গেল।

লছমীর জন্যে অনেক খুঁজে পেতে এ পাত্র ঠিক করেছিলাম। আমাদের সমাজে পয়সা আছে কিন্তু সত্যিকার বিদ্যে দুর্লভ। বিদেশে ডিগ্রী পাওয়া

রতনলালের মধ্যে একাধারে দুইই পেয়ে লছমীর সঙ্গে তার বিয়েই শুধু দিই। আমার ফ্যাক্টরী আর কারবারের ম্যানেজারও তাকে করেছিলাম।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

কিন্তু সেই চরম ভুলের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তই হচ্ছে। প্রথমে লছমীর সঙ্গে বিচ্ছেদ—

না. আর তোমার কাছে যেতে দেবে না। তোমার জন্যে বড় ভয় করে। চাচাজি ও সব পারে

তার পর গুপ্তঘাতকের ভয়ে শোবার সময়ও পিস্তল সঙ্গে রাখা.....

আজ হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গিয়ে ভোরবেলা .....

অঙ্গনা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১৯১০ সালে ডেনমার্কে সমাজতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই এই দিনটিকে চিহ্নিত করা হয় 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে। এরও আবার একটু নেপথ্য ইতিহাস আছে। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের শ্রমিক মহিলারা নারী-ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। আবার এই ৮ মার্চেই শ্রমজীবী নারী-সমাজের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সম্মিলিত দাবী ঘোষণা করা হয়। তারপরই আসে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-এর ঘোষণা। সেদিন থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীসমাজের মধ্যে এই দিনটি অধিকারের প্রতীক হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে লেনিন ঘোষণা করেন, শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম। শুধু মামুলি আনুষ্ঠানিক সমান অধিকার নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্য পায়। এবার উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী-দিবসের হীরক জয়ন্তী উৎসব। সারা বিশ্ব জুড়ে। নতুন শপথে উদ্দীপ্ত হয়।

সাধারণ অপরাধীদের হাতে হাতকড়া থাকে। প্রয়োজনে পায়ে বেড়িও। আমাদের মেয়েদের হাল ছিল এমনি। হাতকড়া আর বেড়ি অবশ্য অদৃশ্য ছিল। শুধু আমাদেরই বা বলি কেন, বিশ্বের অনেক দেশেই মেয়েরা অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সেসব বন্ধন ক্রমেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। হালকা হাওয়া বা অবলা নয়, পুরোপুরি বন্ধনমুক্তি। এমনিভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছে দেশবিদেশের নারীসমাজ। সবাই আজ সমান অধিকারের দাবিতে এগিয়ে আসতে চাইছেন।

কিন্তু একদিন পথ ছিল দুর্গম। সেদিন এগিয়ে আসা মানেই কাঁটার আঁচড়। শুধু কর্মক্ষেত্রেই না, সমাজপতিদের রোষানলে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে কোনকিছুই বাদ যেতো না। তবে কোন পথেই অগ্রগতির এই বিরাট আকাঙ্ক্ষা রোধ করা সম্ভব হয়নি। বাধা হয়েই পথ ছাড়তে হয়েছে। আমরা লড়াই করে বিজয়ী হয়েছি। দুঃখের স্মৃতিচারণ আজ তাই বড়ো মধুর।

আমাদের দেশের নারীসমাজ সমাজপতিদের কঠোর অনুশাসনে একদিন ছিল অসূর্যম্পশ্যা। সেই অনুশাসন আমরা ছেড়েছি। পথ আমাদের হাতছানি দিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছি। তারপর দেশ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতন লালিত বোরখা-সংস্কার। তিনি পৃথিবীর

সংবিধানে আমাদের সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

স্বাধীনতা আমাদের নতুন জীবন। আমাদের পূর্বসূরীরা বুকের রক্ত ঢেলে যে-পথ তৈরি করে গেছেন, সেই পথ আমরা বহুদূর প্রসারিত করেছি। শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন, অভিযান। বহুমুখী পথে আমরা পা বাড়িয়েছি। আর সর্বত্রই আমাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য এখন প্রায় রূপকথার সামিল। একদিন বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মেয়ে পড়ুয়া খুঁজে বেড়াতেন। বিদ্যোৎসাহী পরিবারের আনুকূল্যে হয়তো মেয়ে পড়ুয়া পেতেন। স্ত্রী-শিক্ষার যে-পথ সেদিন ছিল জনবিরল, আজ তা গমগম করছে। ভিড় বেড়েছে এমনই নয়। সাফল্যের খতিয়ানও গৌরবোজ্জ্বল।

এই তো সেদিনের কথা। সারা দেশ জুড়ে হৈ-চৈ। নয়াদিল্লীর কৃষি-গবেষণা সংস্থার তরুণ গবেষক এক অভাবিত সাফল্য লাভ করেছেন। বীজের পরাগ থেকে তিনি কৃত্রিম উপায়ে ধান উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করেছেন। আমাদের মতো খাদ্যাভাব-পীড়িত দেশের পক্ষে এ এক অতি বড়ো আশার কথা। আর আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এ তো অভূতপূর্ব। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও তাই তোলপাড়। আরো সাফল্যের পথে তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক।

স্বাধীনতা লাভের কুড়ি বছরের মধ্যে ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। রাষ্ট্র-পরিচালনায় এতখানি সাফল্য আজ পর্যন্ত খুব কম দেশের মহিলার ভাগ্যেই জুটেছে। এক্ষেত্রে ইজরায়েলের শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার অন্যতম। অবশ্য তারও আগে আছেন সিংহলের শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক। আর একটি চমক সৃষ্টি হতে পারতো আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে। প্রচণ্ড রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে শ্রীমতী ফতিমা জিন্না রাষ্ট্রপ্রধানের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি পরাজিত হলেও তাঁর প্রেরণা পরবর্তীদের অনুপ্রাণিত করবে নিশ্চয়।

চারদিক থেকে আজ আমাদের কাছে এক নতুন জীবনের হাতছানি। প্রতিমুহূর্তে যেন বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। ভিৎ নড়ে ওঠে। মুক্তির সার্বিক পথ প্রশস্ত হয়।

এমনি বিপ্লব একদিন সংঘটিত হয়েছিল তুরস্কে। আর সে-বিপ্লবের নায়ক ছিলেন কামাল পাশা। একটি ফরমানে সেদিন বাতিল হয়ে গিয়েছিল আজন্ম

বুকে চোখ-কান খুলে সোজা হয়ে চলার অধিকার দিলেন দেশের মেয়েদের। হৈ-চৈ হয়েছিল রক্ষণশীল মহল থেকে। কিন্তু কামাল কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। সংকল্পে তিনি অটল।

তার অনেকদিন পরে মিশর দেশে গৃহীত হলো আর এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'তিন তালাক' প্রথা বাতিল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আইনত বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে পুনর্বার বিবাহও দণ্ডনীয়। রক্ষণশীলদের স্বার্থে প্রচণ্ড ঘা। অনেক বাদ-প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। কিন্তু গামাল তো কামালেরই অনুসারী। মেয়েদের নিয়ে পুরুষেরা ছিনিমিনি খেলবে এ তিনি বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাই প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর নড়চড় নেই।

পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য খর্বের যুগ এখন। রুশকন্যা তেরেস্কোভা যখন মহাশূন্যে পাড়ি জমায় তখন আমাদের মেয়েরা পাহাড়ে চড়ে, অজানার ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে প্রান্তরে। প্যারাট্রুপার হয়ে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্যারাট্রুপার শ্রীমতী দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন একাধিক 'জীবন-ভয় তুচ্ছ করা' মহিলা। তাঁরা সফল হচ্ছেন। খতিয়ানে নতুন কৃতিত্ব যুক্ত হচ্ছে।

এমনিভাবে ভয় দূর হয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। পর্বতের চূড়া আমাদের হাতছানি দিয়েছে। সাহসে ভর করে আমরা তুষার রাজ্যে তাঁবু গেড়েছি। এক গিরিবর্ত্মে প্রাণ হারান শ্রীমতী অনিমা। পর্বত এভাবে তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে তার সুউচ্চ শৃঙ্গে আমাদের পদভার আরো সুনিশ্চিত করেছে। একের পর এক শৃঙ্গ আমরা জয় করেছি। সর্বশেষ সংযোজন হনুমান টিব্বা। লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে—সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট।

পিনাকী-ডিউক ঢেউয়ের ঝুঁটি জাপটে ধরে দাঁড়টানা নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দিলেন। আমাদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়লো পদব্রজে। প্রথম অভিজ্ঞতা দীঘা। এবার দিল্লী। সব অভিযান পরিচালিত হলো কলকাতা থেকে। অজানা আনন্দে উদ্বেল আমরা। ইতিহাস পূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। সেখানে অপেক্ষা করে আছে আরো মহত্তর সংযোজন।

—প্রমীলা

বেতার শ্রুতি

আকাশবাণীর, শুধু আকাশবাণীর কেন সমস্ত বেতার প্রতিষ্ঠানেরই প্রচার-সময়ের বড়ো অংশটা নিয়ে নেয় গান-বাজনা। বাকি অংশের একটা ভগ্নাংশ পায় 'শাদা কথা', ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্পোকন্ ওয়ার্ড'। এই স্পোকন্ ওয়ার্ডই কিন্তু রেডিওর নিজস্ব জিনিস। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বেতার সম্প্রচারকে যদি তার নিজের অধিকারে একটা শিল্পরীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তাহলে ওই স্পোকন্ ওয়ার্ডেরই সাহায্যে হতে হবে।

প্রাচীনকালে মুখের কথাই মানুষের চিন্তার বহিঃপ্রকাশের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম ছিল। এই মুখের কথার মধ্য দিয়েই সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে, মাতা-পিতার কাছ থেকে পুত্র-কন্যার কাছে প্রবাহিত হত। পরে যখন লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল তখন থেকে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতেরা তাঁদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা আর ব্যাখ্যা লেখার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে লাগলেন। এবং সাধারণভাবে যোগাযোগের মাধ্যম হল লেখা।

প্রায় ৫০০ বছর আগে ছাপাখানার আবিষ্কার যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ রূপান্তর নিয়ে এসেছিল এবং জ্ঞান ও শিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল। এ লয়েড জেমস তাঁর 'দি ব্রডকাস্ট ওয়ার্ড' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন :

> The Printing press sealed the doom of the Middle Ages, and settled the fate of those early broadcasters — troubadours, minstrels, trouveres, minnesingers, bards and professional story-tellers who traded in the spoken word. The rising tide of printer's ink overwhelmed them.

বর্তমান যুগে চিন্তার আদান-প্রদানের একটা বড়ো মাধ্যম রেডিও। এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতার উপর রেডিও-অনুষ্ঠানকে যদি সত্যিকারের প্রভাব বিস্তার করতে হয় তাহলে মুখের কথা ও লেখা কথা অর্থাৎ স্পোকন্ ওয়ার্ড ও রিট্‌ন্ ওয়ার্ডের মধ্যে যে সত্য পার্থক্য তা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। এবং তা না বুঝলে সমস্ত বেতার-সম্প্রচারই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে— কতকগুলো কথা আর শব্দই শুধু প্রচার করা হবে।

যাই হোক, বেতার সম্প্রচারের ব্যাপারে ডঃ নারায়ণ মেনন জোর দিয়ে বলেছিলেন : 'আমাদের এমন একটা ভাষা সৃষ্টি করতে হবে যে ভাষা যতখানি সম্ভব কথ্য ভাষার কাছাকাছি হবে।...এই ভাষার সক্রিয় উপাদান হবে শব্দের ঝঙ্কার, আকৃতি নয়। কণ্ঠস্বর প্রত্যয় জন্মাতে পারে, অগ্রাহ্য করতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, ইতস্তত করতে পারে, অনুমোদন করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে, দৃঢ়তা দেখাতে পারে। কণ্ঠস্বর ভাষণে ছন্দ ও প্রাণ আনতে পারে এবং অনেক কৌশল, যেমন অনুপ্রাস ও ধ্বন্যাত্মক শব্দকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারে।'

ধরে নেওয়া যাক কোনো ব্যক্তি রেডিওয় লেখার সমস্ত দক্ষতাই অর্জন করেছেন, কিন্তু এমন কি কোনো গ্যারাণ্টি আছে যে, তাঁর সেই লেখা যখন তিনি রেডিওয় পড়বেন তখন তা শ্রোতাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করবে? অর্থাৎ, ইংরেজীতে বললে, তাঁর ভাষণটি 'সাকসেসফুল' হবে?... দুর্ভাগ্যবশত, না।

উচ্চৈঃস্বরে পড়া, লেখা কথা অথবা নাটকের সংলাপ অভিনয় করা অনেকগুলি সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং শিল্পীকে সেগুলির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। লেখা কথা মুখে প্রকাশ করার সময় উচ্চারণ, শৈলী, মুদ্রা-দোষ, স্বরভঙ্গি ও শিক্ষা—প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্যক্তিত্বই ফুটিয়ে তুলতে হয়। এবং এই গুণ আপনা থেকে আসে না, অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে হয়। যে ব্যক্তি তা অর্জন করেছেন, কেবল তিনিই লেখা কথায় সঠিক শব্দ সংযোজন করতে পারেন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৩ মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী সুমিত্রা সেন। সুন্দর লাগল।

৪ মার্চ সকাল সওয়া ৮টায় আধুনিক গান গাইলেন শ্রীমতী অমিতা মুখোপাধ্যায়। বেশ লাগল।

এইদিন বেলা সাড়ে ১২টায় গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষের আগের রেকর্ডটিতে গানের চেয়ে ঘড়-ঘড় শব্দই হল বেশি। এই অনুষ্ঠানে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের রেকর্ড বাজানো হচ্ছিল।

৫ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় [illegible] সংবাদ বিচিত্রা, ৬টি বিষয় নিয়ে : এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের উদ্যোগে সাইকেলে [illegible]-পরিক্রমা-কারীদের সঙ্গে আকাশবাণী প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার, এক্সপ্লোরার্স [illegible] আরও [illegible] তিনজন সদস্য সাইকেলে শিলং সফর করে ফিরে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে আকাশবাণীর প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার, সাইকেলে আরও কয়েকজনের ভারত ভ্রমণের সংবাদ, শুশুনিয়া পর্বতারোহণকারীদের সঙ্গে আকাশবাণীর প্রতিনিধির কথাবার্তা, হুগলী জেলার কুইনান স্কুলের রজত-জয়ন্তী উৎসব, এবং মিনি সাহিত্য। এই সংবাদ বিচিত্রাটির অর্ধেকেরও বেশি সাইকেল আরোহীদের দিয়ে দেওয়ায় অন্যদের স্থান-সংকুলান করতে যে বেশ কষ্ট হয়েছিল সেটা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু এই সাম্যের যুগে এই রকম অসম বণ্টন কি ভালো?...অনুষ্ঠানটি এমনিতে কিন্তু মন্দ হয় নি। রেকর্ডিং ভালো, সম্পাদনাও।

৬ মার্চ রাত ৮টায় নাটক : 'অনুরাগের রাঙা'। কাহিনী : শ্রীজগদীশপ্রসাদ দাস; বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা : শ্রীমতী বিনতা রায়।

কাহিনীতে নতুনত্ব কিছু নেই। নবগোপাল ভালোবেসেছে কমললতাকে। কমললতাও ভালোবেসেছে নবগোপালকে। তারা নির্জনে নিভৃতে দেখা-সাক্ষাৎ করে, গান গায়, হৃদয়ের গোপন কথাগুলো বলে। তাদের যে বিয়ে হবে এতে কারও মনে সন্দেহ নেই। কিশোরীরও না। কিশোরীও বাল্যকালে নবগোপালকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সে ভালোবাসা পরিণতি পায় নি। তার জীবন অভিশপ্ত। সে এখনও নবগোপালকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে কিন্তু কমললতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হবার সাধ নেই তার। সে-ও জানে কমললতার সঙ্গেই নবগোপালের বিয়ে হবে।

কিন্তু দেনার দায়ে নবগোপাল [illegible] হবার উপক্রম। পাওনাদারেরা বাড়ি বয়ে [illegible]

মাকে পর্যন্ত অপমান করতে আসে। এই অপমান থেকে সে মুক্তি চায়। ভিটেমাটি ছেড়ে মাকে অনাথ রেখে সে এল কলকাতায়। মজার ব্যাপার, কলকাতায় এসেই নিরুপম নামে রেডিওর এক কর্মকর্তার সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। তার বাড়িতেই সে থাকতে লাগল। এবং তারই উদ্যোগে সে সঙ্গে-সঙ্গে রেডিওয় প্রোগ্রাম পেয়ে গেল।

নিরুপমের স্ত্রীর নাম সুস্মিতা। সুস্মিতার বোন বন্দনা। নবগোপাল বন্দনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। গ্রামে তার মাকে ভুলল, ভুলল তার কমললতাকে। এবং একদিন ভুল ভাঙতেই সে এই শহরের চোখ-ধাঁধানো রূপের মায়া ত্যাগ করে আবার গ্রামে চলে গেল।

এই রকম সব কাহিনী নিয়ে বছর কুড়ি আগে খুব ছবি হত। এখন বড়ো হয় না। সেই দিক দিয়ে 'অনুরাগে রাঙা' কিছুটা ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছিল। গ্রামের ছেলে শহরে এসেই রেডিওতে মুরুব্বি পেয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রোগ্রাম করতে লাগল, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে ভাবতে পারেন, এটা খাঁটি বাস্তব—মুরুব্বি জোগাড় করতে পারলে রেডিওয় প্রোগ্রাম পেতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

নাটকটা এমনিতে ছিমছাম। অভিনয়ও ভালো। কিন্তু তবু যেন সব মিলিয়ে রসের অভাব থেকে গেছে। ভালো দানা বাঁধতেও পারে নি নাটকটা। নবগোপালের কলকাতায় আসার পরের ঘটনা ঠিক খাপ খায় নি।

নবগোপালের ভূমিকায় শ্রীনির্মাল্য সেনগুপ্ত ভালোই অভিনয় করেছেন। নিরুপমের ভূমিকায় শ্রীকিরণময় লাহিড়ী কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। কিশোরীর ভূমিকায় শ্রীমতী শিখা মল্লিক ভালো। বন্দনার ভূমিকায় শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সবচেয়ে ভালো কমললতার ভূমিকায় শ্রীমতী হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তের সুস্মিতাও চলে গেছে। বংশীদাসের ভূমিকায় শ্রীরবীন মজুমদার ও রামহরির ভূমিকায় শ্রীগণেশচন্দ্র শর্মার অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

এইদিন রাত সওয় ১০টার ইংরেজী নিউজ রীলটি এমনিতেই মন্দ হয় নি। কিন্তু খালি বক্তৃতা আর বক্তৃতা। তাই বিশেষ আকর্ষণ করে নি।

৮ মার্চ সকাল সওয়া ৭টায় শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তের রাগপ্রধান ও ভজন প্রশংসনীয়।

রাত সওয়া ১০টার সংবাদ-বিচিত্রা ছিল লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে যুব উৎসব, প্রণবানন্দজী জয়ন্তী ও অন্ধকল্যাণ সপ্তাহ বিষয়ে। লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে যুব উৎসব হয়েছিল কলকাতার ইডেন্ গার্ডেনের রণজি স্টেডিয়ামে। এবং তাতে ভাষণ দিয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, তদানীন্তন স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, তদানীন্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমুলক্‌রাজ আনন্দ। উদ্বোধনী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।...অনুষ্ঠানটির মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া গেছে এই সংবাদ-বিচিত্রায়।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রণবানন্দজী জয়ন্তী উৎসবের আরম্ভ হয়েছিল সমবেত কণ্ঠে গান দিয়ে। তারপর প্রণবানন্দজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন স্বামী বিজয়ানন্দ। প্রণবানন্দজীর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে এবং তা মর্মগ্রাহী হয়েছিল

তৃতীয় অনুষ্ঠান "অন্ধকল্যাণ সপ্তাহ" উপলক্ষ্যে অন্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীমধুসূদন মজুমদার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে কাহিনী শোনাচ্ছিলেন তা গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করছিল, কিন্তু এই সংবাদ-বিচিত্রায় তা পুরোপুরি ধরে রাখা হয় নি। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার আগেই একজন ছাত্রীর বক্তৃতা শুরু করে দেওয়া হয়েছিল।

১২ মার্চ সকাল সওয়া ৭টায় শ্যামা-সঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী বীথিকা ঘোষাল। ভালো লাগল। কিন্তু পৌনে ৮টায় শ্রীমতী মঞ্জরী লালের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে বিশেষ খুশি হওয়া গেল না। ৮টায় লোকগীতির অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গানখানি অনেকটা আধুনিক গান বলে মনে হল, দ্বিতীয় গানটিতে অবশ্য কিছুটা লোকগীতির ভাব ছিল।

—শ্রবণক

স্মৃতি

দুর্লভ চক্রবর্তী

স্মৃতি এক-এক সময় এমন ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়।

শুনে হয়তো অনেকে অবজ্ঞার হাসি হাসবেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমার জীবনে প্রথম বিস্ময় এবং প্রধান আনন্দের স্মৃতি সিনেমাকে নিয়ে নয়। সিনেমা যে এ যুগের সব থেকে বড় এবং মোক্ষম শিল্পমাধ্যম তা আমি জানি। সিনেমার জনপ্রিয়তা যে কতো বেশি তাও তো হল্-এর সামনে লম্বা লাইন থেকেই দেখতে পাচ্ছি রোজ। তবু আমি আমার পুরনো ধারণাকে বদলাতে পারি না। সিনেমা আমাকে তেমন করে নাড়াও দিতে পারে না যেমন নাড়া দিয়েছিল—। কিন্তু না, সেকথা পরে বলছি।

কেউ যেন মনে করবেন না, সিনেমা আমি কখনোই দেখি না। একেবারেই তা নয়। বরং অন্য অনেকের চেয়ে বেশিই দেখি। এবং দেখে আনন্দও পাই। সিনেমার কল্যাণে পৃথিবীর অনেক বড় বড় চিরায়ত সাহিত্যের মর্মকথা জানা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আমার চোখে নতুন আলোকে ধরা দিয়েছে, যা হয়তো সিনেমার সাহায্য ছাড়া সম্ভবই হত না। তাছাড়া সিনেমা একই সঙ্গে স্থান ও কালের বাধাকে জয় করতে পারে, মানুষের ভেতরের ও বাইরের দ্বন্দ্বকে একবৃন্তে ধারণ করতে পারে। আবার তথ্য-মূলক সিনেমা ভৌগলিক বর্ণনা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের আবিষ্কার পর্যন্ত সবই তুলে ধরতে পারে আমাদের চোখের সামনে। কাজেই সিনেমার এই সর্বব্যাপী প্রাধান্যকে অস্বীকার করি কী করে?

অন্যপক্ষে আমি মঞ্চপ্রেমিকও নই যে সিনেমা আমার কাছে দুয়োরাণীর মতো মনে হবে। সেরকম লোক যে কেউ কেউ আছেন তা আমার অজানা নয়। মঞ্চের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। সিনেমা যতো অঘটন-ঘটন-পটীয়সী হোক না কেন, ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত ছায়াবাজী তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মঞ্চের কারবার জ্যান্ত মানুষ নিয়ে। কাজেই ছায়ার চেয়ে কায়ার টান যে বেশি হবে, অন্তত কারো কারো ক্ষেত্রে তো বটেই, তা অননুমেয় নয়। উপরন্তু নিজে ঐ রকম কায়া নিয়ে স্টেজের ওপর ঘুরেফিরে বাজিমাৎ করার সাধও অনেকের কম নয়। মহাকবি শেকসপীয়ার জীবনটাকে বলেছেন রঙ্গমঞ্চ—প্রবেশ ও প্রস্থানের মাঝে খানিকটা সময় আমরা সেই মঞ্চের ওপর অভিনয় করি বই আর কিছু নয়। কিন্তু সেই রকম প্রতীকী অভিনয়েই সকলের মন ওঠে না, সাক্ষাৎকারের মঞ্চে নামারও সাধ হয় অনেকের। আর এ সাধ যে কতো প্রবল তা বোঝা যায়, কলকাতা এবং বড় বড় শহরেই শুধু নয়, বাংলার প্রত্যন্ত পল্লীতেও ড্রামাটিক ক্লাবের অস্তিত্ব থেকে। তাদের না আছে ভালো স্টেজ, না আছে সিন-সিনারি বা পোশাক-আসাক, তবু মুখে চড়া করে জিঙ্ক-অকসাইড মেখে হ্যাজাকের আলোয় থিয়েটার করার প্রেরণায় তাদের কোনো বাধা ঘটে না। এবং তা ঘটে না বলেই—থিয়েটারের টান এত প্রবল বলেই—একদল লোক আছেন যাঁরা সিনেমা দেখে খুব একটা আরাম বোধ করেন না।

আমি কিন্তু সে দলেও নই।

থিয়েটার ভালো লাগে বলে সিনেমা দেখতে আমার ভালো লাগবে না এমন অবুঝ আমি নই। ফজলি আম এবং ল্যাংড়া আম দুয়েরই দু ধরনের বিশিষ্ট আস্বাদ আছে এবং দুটোই আমি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মসাৎ করতে পারি। সিনেমা-থিয়েটারের বেলাতেও আমি একই পদ্ধতি প্রয়োগ করি। দুটি নাটার পই আমি দেখতে পারি, এবং দেখে আমার ভালোও লাগে। কিন্তু—।

হ্যাঁ, কিন্তু একটা আছে বই কি! বরং 'কিন্তু' নিয়েই তো শুরু হয়েছে এ লেখাটা। সেই কথাটিই তাহলে বলে ফেলা যাক এবার।

সিনেমা-থিয়েটার আমার ভালো লাগে, কিন্তু সে ভালো লাগার মধ্যে কোনো যাদু নেই, শিহরণ নেই—তার মধ্যে কোনো বিস্ময়ের স্মৃতি নেই। সে জগৎ খুলে দিয়েছিল আমার মনে—ম্যাজিক লণ্ঠন!

সেই আমার প্রথম আনন্দ, প্রথম বিস্ময়। বয়স বোধকরি তখন আমার ন-দশ বছর। ছিলাম পাড়াগাঁর মানুষ। হঠাৎ এক হিমালয় ভ্রমণের ম্যাজিক লণ্ঠন যেন আমার সামনে অজানা রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমি যেন পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা-বাঁকা পথে, দেওদার শ্রেণীর পাশ দিয়ে, ঝরনা ডিঙিয়ে, কুয়াশার রাজ্য পার হয়ে, তুষারের ঝড় আর হিমবাহের বাধাকে অতিক্রম করে এক নতুন জগতের সন্ধানে চলেছি—সে যাত্রার যেন শেষ নেই। বলাই বাহুল্য, ম্যাজিক লণ্ঠনের পর্দার পটে ছবিগুলো ছিল স্থির এবং অস্পষ্ট, আর বর্ণনাকারীর ভাষাও ছিল অপটু এবং মেঠো বক্তার মতো। কিন্তু সে তো শুধু উপলক্ষ! আমার মন যে ততোক্ষণে জেগে উঠেছে—সব তুচ্ছতা, সব অক্ষমতাকে ভরাট করে নিজের কল্পনা দিয়েই তখন রচনা করে চলেছে তখন সেই কল্পলোক, যেখানে মহাকবি বাল্মীকির মতোই নিজের ক্ষমতার এই প্রথম আবিষ্কারে সে মুগ্ধ!

তারপর কতোদিন কেটে গেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছি, চতুর হয়েছি, হুঁশিয়ার হয়েছি। জীবনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কতো অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং জটিল আনন্দ-বেদনার মাধ্যমে উপলব্ধির কর্ষণে শিক্ষার সুসজ্জিত করেছি এই মনকে। কিন্তু সেই প্রথম জাগরণ, সেই প্রথম বিস্ময়ের স্মৃতি ম্যাজিক লণ্ঠনকে আমি ভুলতে পারি নি।

সত্যি, স্মৃতি মাঝে মাঝে আমাদের এমন করে ভোবায়!

জলসা

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এবং সুজাত খাঁ

ধ্যানেশ খাঁ
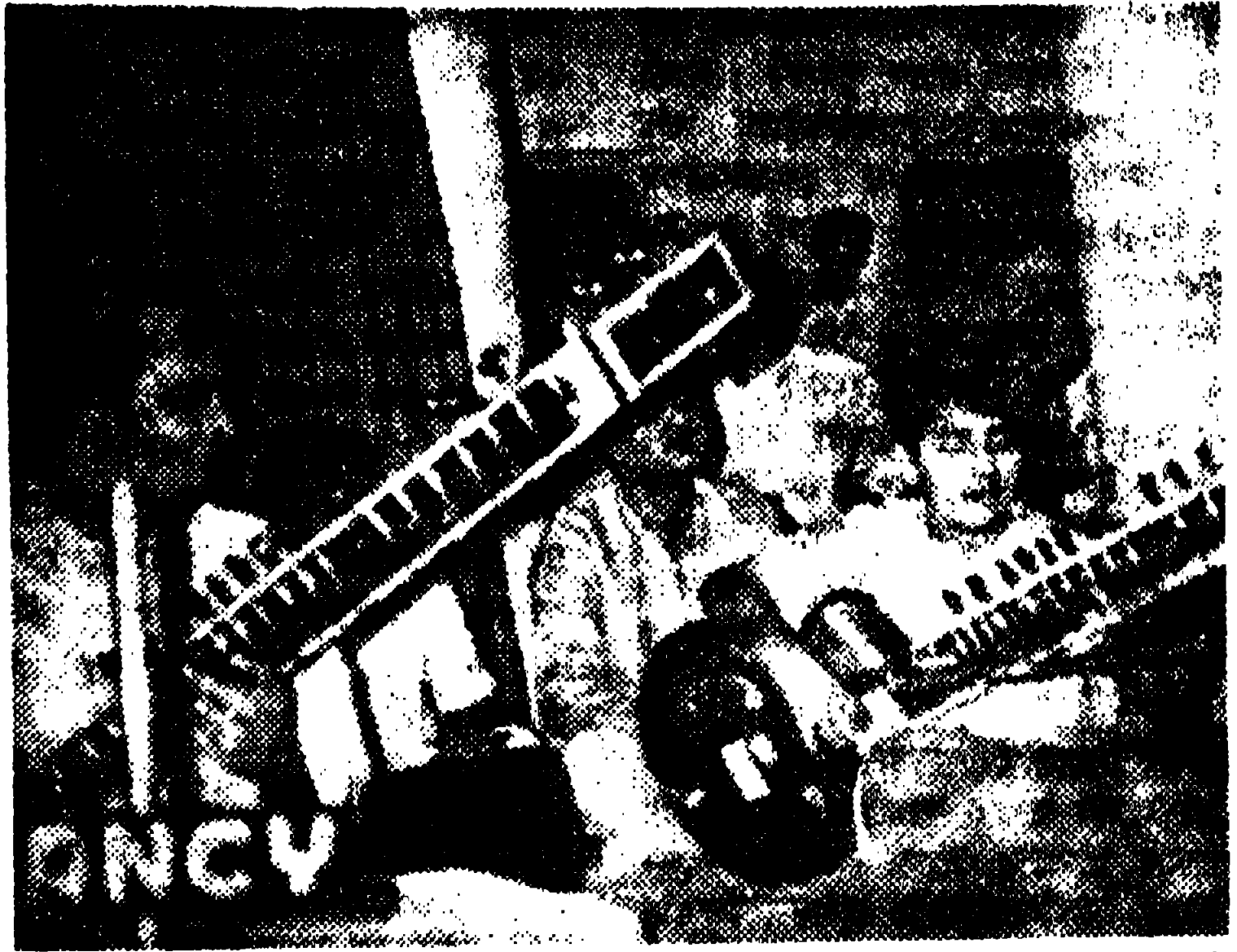
ত্রিসপ্তকের শ্যামা : নবজাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ত্রিসপ্তক' পরিবেশিত **যন্ত্র** ও কণ্ঠসংগীতের বিচিত্রানুষ্ঠান ও **শ্যামা** নৃত্যনাট্য মহাজাতি সদনে এক **মনোজ্ঞ প্রভাতী** আসরের সৃষ্টি করেছিল। গীটারে **সংগীত**-সংঘের ছাত্রছাত্রীদের ঐকাতানবাদন ও রবীন্দ্রসংগীতের সুর সুশ্রাব্য। **প্রধান** অনুষ্ঠান কবিগুরুর শ্যামা। বহুবার বহু শিল্পীসম্প্রদায় মঞ্চস্থ শ্যামায় নৃত্যরচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় তেমন কিছুই ছিল না। তবে শিল্পীরা আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে নৃত্যগুলি আয়ত্ত করেছেন। এবং ভাববস্তু প্রকাশপ্রয়াসেও কোন ত্রুটি ছিল না। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন উত্তীয়রূপী তুলসী রায়।

সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে শ্যামার গান প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। বজ্রসেনের গানগুলিও যত্নে পরিবেশিত হয়েছে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। উত্তীয় ও কোটালের গান যথোপযুক্তভাবেই গেয়েছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ঋষিণ মিত্র। ছাত্রী হলেও গাওয়ার আন্তরিকতায় হৃদয়স্পর্শ করেছে রমা দত্তর গাওয়া দুখানি গান 'নীরবে থাকিস সখি' ও 'জীবনের পরমলগন'।

সংগীতচক্রের বিজয়িনী : যৌবনের সৌন্দর্যতরঙ্গ চিত্তে শুধু দোলাই জাগায় না তার স্থির লাবণ্য মদনের লীলাচাতুরীকে পরানত করবার ক্ষমতাও রাখে। এই ভাববস্তু অবলম্বিত রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার এক নৃত্যনাট্যরূপ রবীন্দ্রসদনে কল রসিকদের উপহার দিয়েছিলেন 'সংগীতচক্র'-র শিল্পীরা। নরেশকুমারের পরিচালনায় নৃত্যাংশে ছিলেন প্রধানতঃ জয়শ্রী লাহিড়ী, অলকানন্দা চাকলাদার, নরেশকুমার, গোবিন্দম কুট্টি। সংগীতে সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, বনানী ঘোষ— এককথায় চিত্তআকর্ষণকারী রবীন্দ্রসংগীতের নৃত্য ও সংগীত-শিল্পী সমন্বয়ে কোনো কার্পণ্য ছিল না। তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই হয় যে সংগীতের তুলনায় নৃত্য অনেক ম্লান। নৃত্যে গোবিন্দম কুট্টি ও অলকানন্দা চকলাদার ছাড়া কেউই উল্লেখযোগ্য রমনীয়তা সৃষ্টি করতে পারেন নি। যদিচ জয়শ্রী লাহিড়ীর নৃত্যশৈলীতে নিন্দনীয় কিছু ছিল না। সংগীতে সুচিত্রা মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একক সংগীত আশানুরূপ হয়নি। তবে দ্বৈতসংগীত 'দোলনচাঁপা' ও 'আমার পরাণ যাহা চায়' উপভোগ্য হয়েছে। আশ্চর্য ভাল গেয়েছেন কিন্তু তরুণতর শিল্পী ধীরেন বসু ও বনানী ঘোষ। এককভাবে গাওয়া ধীরেন বসুর 'সখী সে গেল কোথায়', 'ভুল কোরোনা ভালবাসায়' ও 'যেয়ো না যেয়ো না ফিরে' তিনটি গান 'এইবার একাগ্রতায় কিনা জানি না ভাল বলতেই হয়। বনানী ঘোষের 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'—সু-গীত।

ধীরেন বসুর সুষ্ঠু সংগীত পরিচালনাও প্রশংসার্হ। কবিগুরুর অফুরন্ত সংগীতভাণ্ডারে ভাবোপযোগী গানের প্রাচুর্যের কারণই প্রয়োজনীয় সংগীতচয়নের একটি প্রধান বাধা। কিন্তু সু-সংযত নির্বাচনে যথার্থ মননশীলতার পরিচয় রেখেছেন সুনীলবরণ। বাংলা ও ইংরাজী সংলাপে আপনাদের চিত্তগ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন প্রদীপ ঘোষ ও রঞ্জন মিত্র। বিষয়বর্ণনে আপন আবেদন-সঞ্চারে কাজী সব্যসাচী সার্থক হয়ে উঠেছেন।

যদুভট্ট সংগীত সমাজ : যদুভট্ট সংগীত সমাজের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের মঙ্গলাচরণ দিয়ে।

সংগীতানুষ্ঠানে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের 'দরবারী কানাড়া' রাগে ধ্রুপদ ও ধামার, বিজয় ভট্টাচার্যের 'বেহাগ' রাগের আলাপে শিক্ষা ও গায়নশৈলীর গুণে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ রচিত হয়।

সুরবাহারে 'কৌশিকধ্বনী' রাগ বাজিয়ে শোনান সঙ্গীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই রাগ শ্রীরায়চৌধুরী শিক্ষা করেন রবাবী ঘরের বিশিষ্ট শিষ্য স্বর্গতঃ কেরামতউল্লা খাঁর কাছে। কিন্তু কোকব খাঁ ও কেরামতউল্লা খাঁর শিষ্য হরেন শীল ও কালী পালের তিরোধানের পর স্বরোদী ওমর খাঁ ও বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ব্যতীত অন্য কোনো শিল্পীর কাছে ঠিক এই ছাঁদের বাজনা আর শুনতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই ধারনের বাজনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সুযোগ্য তবলা-সঙ্গত করেন সুবিখ্যাত রাইচাঁদ বড়ালের ভাগিনের শ্রীবিদ্যাসাগর মল্লিক।

ধ্রুপদি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরায়-চৌধুরী বলেন ভারত স্বাধীনতালাভের পর বাংলাদেশে ধ্রুপদের লুপ্ত গৌরব পুন-রুদ্ধারার্থে রবীন্দ্রভারতীর ধ্রুপদ শিক্ষক রাজস্থানের 'তানসেন পাণ্ডেজীর বিপুল পরিশ্রমই ধ্রুপদের বর্তমান মর্যাদালাভ সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য বলেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমাদের অধ্যাত্ম বিকাশেরও সহায়ক।

ঈশিতা প্রযোজিত 'চণ্ডালিকা'। সম্প্রতি শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে নবগঠিত সংস্থা ঈশিতা প্রযোজিত 'চণ্ডালিকা' প্রথম প্রয়াস হয়েও উল্লেখযোগ্য মানের নিদর্শন রাখতে পেরেছে। নৃত্যাংশে প্রকৃতির ভূমিকায় কল্পনা ঘোষাল, আনন্দ ও রাজঅনুচরের ভূমিকায় যথাক্রমে বুলবুল বসু ও মহুয়া গুহ উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে-ছেন।

সঙ্গীতাংশে প্রকৃতির গানগুলি স-দরদে পরিবেশন করেছেন রুপা চক্রবর্তী। ব্যবস্থা-পনা মঞ্চ সুষ্ঠুতর হওয়া প্রয়োজন।

তরুণ সরোদী ধ্যানেশ খাঁ। সম্প্রতি গয়া সঙ্গীত সম্মেলনের এক আসরে আলি আকবর খাঁর পুত্র ধ্যানেশ খাঁর সরোদ গুণীজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করে। ইনি ইমন কল্যাণ রাগে আলাপ ও কির-বাণীতে গৎ বাজিয়ে শোনান। আলাপের সকল অঙ্গ সুবিশ্লেষিত, হাতের বাজ গম্ভীর ও পরিশীলিত। তানের অঙ্গ খুবই সুন্দর, মীড়ের অঙ্গ আর একটু পরি-মার্জিত হলে আশানুরূপ মানে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না। নৈহাটীর একটি গানের আসরেও সকলের অনুরোধে ইনি 'কির-বাণী'-ই বাজিয়ে প্রশংসিত হন।

পিতা-পুত্রের দ্বৈত আসর। বিডন স্ট্রীটের সুবিখ্যাত ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর গৃহের সঙ্গীতোৎসবে স-পুত্র ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ দুই ঘন্টাব্যাপী সেতার বাদনের আসর এক উপভোগ্য ও সরস অনুষ্ঠান। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ প্রথমে ইমন রাগে আলাপ ও গৎ বাজিয়ে শোনান। খাঁ সাহে-বের বাদনশৈলীর সকল বিশিষ্ট সমারোহে এই দীর্ঘ অনুষ্ঠান এক বর্ণসমুজ্জ্বল আনন্দে সারা আসর মাতিয়ে তুলেছিল। পরিশেষে বিলায়েৎ খাঁ শিশুপুত্র সুজাত খাঁর সঙ্গে পিলু বাজিয়ে সঙ্গীতোৎসবের মধুর সমাপ্তি ঘটান। 'পিলু' রাগ পুরো-পুরি স্বর্গত এনায়েৎ খাঁ সাহেবের ঢঙে বাজানো এবং গতের বন্দেজ, তোড়া, তানের বিস্তারে সুজাত খাঁ আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পিতার সঙ্গতকারীরূপে যেটুকু বাজিয়েছেন তা পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুরেলা। মেজাজটিও পিতার অনুরূপ। এ'র ভবিষ্যৎ পরিণতি দেখবার আশায় রইলাম।

সারা অনুষ্ঠানে সুযোগ্য তবলাসঙ্গত করেছেন উদীয়মান তরুণ তবলায় সন্দীপ দেব। ইতিপূর্বে কয়েকটি সঙ্গীত সম্মেলনে এ'র তবলাবাদন শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু বিলায়েৎ খাঁর মত বিরাট শিল্পীর সঙ্গে তবলাসঙ্গত এই প্রথম এবং এ কাজ তিনি উল্লেখযোগ্য দক্ষতায় সম্পন্ন করে বিলায়েৎ খাঁ এবং সভায় উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞ যামিনী গাঙ্গুলী, ভি জি যোগ এবং বুদ্ধ-দেব দাসগুপ্ত প্রমুখ গুণীজনের অভিনন্দন লাভ করেন।

নজরুলগীতির আসর। সম্প্রতি রাম-কৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের কর্তৃপক্ষ গোলপার্কস্থ বিবেকানন্দ হলে নজরুল গীতির একটি একক গানের আসরের আয়োজন করেন শিল্পী ধীরেন বসু। এক ঘন্টাকালীন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত-পরিচিতি ও ভাষাসহ নজরুলের বিভিন্ন পর্যায়ের যথা কাব্যগীতি, গজল, স্বদেশী গান, বিদেশী সুরের গান, ভাটিয়ালী, বর্ষাসঙ্গীত, নাটকের গান, ঠুংরী চালের গান, শ্যামাসঙ্গীত, বিবেকানন্দ-বন্দনা-গান আবেগ ও আন্তরিকতায় শ্রোতাদের পরি-তৃপ্ত করেছে। ওপরি-পাওনা ছিল কাজী সব্যসাচীর উদাত্তকণ্ঠের আবৃত্তি।

'সপ্তসুর'-এর বার্ষিক সম্মেলন। শ্রীমতী ঝরণা দত্তরায় আয়োজিত 'সপ্তসুর'-এর বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এক পরিচ্ছন্ন সুন্দর গানের আসরে আমরা অনেক দিন বাদে আবার শ্রীমতী দীপালি নাগের কণ্ঠ-সঙ্গীত শুনলাম। শ্রীমতী নাগ এখন দিল্লীবাসিনী। শুধুমাত্র সংস্থা সভ্যদের বিশেষ অনুরোধে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইনি গাইলেন 'নটবেহাগ' 'নন্দ' ও ঠুংরী। পূর্বের তুলনায় কণ্ঠদীপ্তি হয়ত ম্লান কিন্তু আসর জমিয়ে গাইবার সেই সাবেকী চাল বিশেষ একযুগের বৈঠকী সঙ্গীত সভাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে-যুগে মূল্যের বিনিময়ে সম্মেলনে প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল না। প্রবেশপত্র-বিহীন সঙ্গীত-মেলার রসজ্ঞমাত্রেরই প্রবেশাধিকার থাকত, আর থাকত শোনার আনন্দ শিল্পীচিত্তে ছড়িয়ে দেওয়া। শ্রীমতী নাগের সুর লাগানোর মেজাজ ছোট ছোট বিস্তারের সরসতা ও তানের সবলীল গতি আসরে উপস্থিত বহু গুণী ও শিল্পীর অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে।

যন্ত্রসঙ্গীতে কল্যাণী রায়ের বাজনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইনি বাজান 'বসন্ত' রাগ। শ্রীমতী রায়ের বাজনা আগেও বহুবার শুনেছি। কিন্তু সেদিনের বাজনা অন্য দিনের চেয়ে স্বতন্ত্র কুশলতায় পরি-বেশিত—শুধুমাত্র রাগমাধুর্যই বোধ হয় তার কারণ নয়। অনান্য দিন তিনি গুরুর শিক্ষারই এক নিষ্ঠাপূর্ণ নমুনার মধ্যেই আপনাকে সীমিত রাখেন। কিন্তু সেদিন যেন অ.আবিষ্কৃত মুহূর্তে গতানুগতিকতার আড়ালে এত দিনের শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার যোগফল এক আত্মবিশ্বাসসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব উঁকি দিয়েছিল বলেই সেদিনের বাজনা হয়ে উঠেছিল এক মনোরম অভি-জ্ঞতা। সেদিন ছন্দের ঝোঁকে এমন ধরনের ছুটতান বাজিয়েছেন, যা আগে শুনি নি —এমন অনেক ঝটকা যা আবেগ ছাড়া আসে না আর প্রতিটি কাজের শেষে আনন্দদীপ্ত মেজাজে সোমে ফেরা। মহা-পুরুষ মিশ্রর তবলাসঙ্গতও অবশ্য সাফল্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। শ্রীদীননাথ কৌকনী ও কুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত খেয়াল গান দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

শিশু সঙ্গীত সম্মেলন। ৭ এবং [illegible] আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ও [illegible]শ্রী প্রেক্ষাগৃহে চিলড্রেন মিউজিক কংগ্রেসের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। কলকাতা ছাড়াও কাশ্মীর, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু শিশুশিল্পী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এ'দের মধ্যে অনেকেই যন্ত্রসঙ্গীত, ভরতনাট্যম, কথক নৃত্য বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, প্রাচ্যনৃত্য, তবলালহরায় অংশগ্রহণ ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কাশ্মীরের বেলা সাপ্রু ভারত-নাট্যমে, তিমির রায়চৌধুরী তবলালহরায়, উড়িষ্যার ছবিরাণী মাইতি ওড়িশী নৃত্যে, পলি দে সরোদে, মাদ্রাজের মীরা ও চন্দ্রা ভারতনাট্যমে, পাপিয়া দাসগুপ্ত ভজনে, মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় কত্থকনৃত্যে, তাপস কর্মকার সেতারে স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় কীর্তনে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্রোৎসব

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক-এর উদ্যোগে গেল ১৩ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত সাতদিন ধরে স্থানীয় ম্যাজেস্টিক সিনেমায় জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীর যে চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, তা' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শহর-কলকাতায় দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তাবোধের গুরুতর অভাবের দরুণ দর্শক সমাগমের দিক দিয়ে—বিশেষ করে রাত্রির প্রদর্শনীগুলিতে—বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সি পি আই (এম)-এর আহ্বানে হরতাল হওয়ায় ১৭ তারিখের প্রদর্শনীটি তো বাতিলই করে দিতে হয়। অবশ্য চলচ্চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে আমরা বিজ্ঞাপিত সাতখানি কাহিনী চিত্রই দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলুম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতে নূতন ভাবনা, নূতন আঙ্গিক ও বিচিত্র চিত্রগ্রহণকৌশল দ্বারা সমুজ্জ্বল জার্মান চলচ্চিত্রগুলি যে বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত ছিল, দুঃখের বিষয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ও খণ্ডিত জার্মানীর চলচ্চিত্র সে গৌরবকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলেছে। ফাউস্ট, ক্যাবিনেট অব ডাঃ ক্যালিগারি, টেস্টামেন্ট অব ডাঃ মাবুজে, মেট্রোপলিস, প্যান্থার অব প্যারিস, ব্লু এঞ্জেল প্রভৃতি ছবির স্মৃতি আমাদের মনে চিরজাগরূক হয়ে আছে। 'উফা' প্রোডাকসন্স-এর নামে আমরা একদা উল্লসিত হয়ে উঠতুম।

কম্যুনিজম্ প্রভাবিত পূর্ব জার্মানীতে চলচ্চিত্র শিল্প 'ডাস্ এ ফিল্ম আগ' (সংক্ষিপ্ত নাম ডেফা—ডি-ই-এফ-এ) নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীন উফা ও সরকারী ডেফার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কোথায় 'উফা' সংস্থার চলচ্চিত্রকারদের স্বচ্ছন্দচারী কল্পনাপ্রসূত শিল্পসৃষ্টি, আর কোথায় 'ডেফা'র চলচ্চিত্রকর্মীদের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিল্পপ্রয়াস! জাতির মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক চেতনা-সৃষ্টি, জনগণকে মনুষ্যত্বের উপযোগী পথে চালিত হতে শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শন—এই বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই 'ডেফা'র চলচ্চিত্র কর্মীরা তাঁদের শিল্প-প্রয়াস করে চলেছেন গেল ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্মদিন থেকেই। সমাজ-চেতনার জটিল পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যাতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করে 'ডেফা' নির্মিত কাহিনী-চিত্রগুলি ক্রমে জার্মানীর সমাজচেতনাসম্পন্ন জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে। ওখানকার জনসাধারণ আজ ঐ ছবিগুলির মধ্যে তাদের জীবন ও জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছে।

কম্যুনিস্ট দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য ও শিল্প তার প্রচারধর্মী লক্ষ্যের

অগ্রদূত পরিচালিত মঞ্জরী অপেরার সেটে জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং উত্তমকুমার।
ফটো : অমৃত

জন্যে আনন্দবিধানের দিক দিয়ে বেশ কিছুটা রসহীন ও শুষ্ক হবে, এই ধারণা নিয়েই আমরা জি-ডি-আর-এর ছবিগুলি দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু বর্তমানে খোদ সোভিয়েত রাশিয়াতেও যেমন সাহিত্য ও শিল্পকে প্রচারধর্মিতার শৃংখলমুক্ত করে উন্মুক্ত নভোচারী হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, দেখে আনন্দিত হলুম যে, ঠিক তেমনই ভাবে পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্রকেও প্রচারধর্মিতার শুষ্ক কঠোরতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জীবনরসে জারিত হয়ে বৈচিত্র্যময়রূপে দর্শক মনোরঞ্জনের পথে অগ্রসর হবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

(১) সাতখানি ছবির মধ্যে উদ্বোধন দিবসের ছবি **'টাইম টু লিভ'ই** শ্রেষ্ঠতম, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। হোর্স্ট সীম্যান পরিচালিত এই ছবিখানি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে অন্যতম প্রতিযোগী ছিল। ছবিটিতে জনৈক পরার্থপর, কর্তব্যনিষ্ঠ প্রৌঢ় ব্যক্তির জীবনালেখ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে জ্বলন্ত প্রশ্ন দর্শকসম্মুখে উপস্থাপিত হয়, সেটি হচ্ছে : মানুষের কাজ করা যখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার দ্বারা আরব্ধ কাজটি যখন এমন স্তরে এসে পৌঁছোয়নি, যে-সময়ে এর সমাপ্তিভার অন্যের ওপর অনায়াসে ন্যস্ত করা যায়, তখন সে কি শারীরিক অসুস্থতাকে আমল দিতে পারে? বা চিকিৎসকের পরামর্শ শুনে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে? শিল্পপতি লোরেঞ্জ লোজার তাই তাঁর আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে বিশ্রাম গ্রহণের কথা ভাবতেই পারেননি; তিনি স্থির করেছিলেন, বাঁচবার দিন যখন স্পষ্টই সীমিত, তখন কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকা উচিত। এই কাহিনী-চিত্রটি যে কোথাও মাত্র শিক্ষামূলক না হয়ে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, এর জন্যে হোর্স্ট সীম্যান-এর পরিচালনানৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়।

(২) গুন্থার রুকার পরিচালিত **"দি বেস্ট ইয়ার্স"** ছবিখানি আদর্শের দিক দিয়ে একখানি অনবদ্য চিত্র। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা কতখানি ব্যাপক এবং একাগ্র হওয়া প্রয়োজন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই ছবিখানি। একজন যুদ্ধ-ফেরত যুবককে মাত্র তার ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন লোক তাকে কি করে শিক্ষকতার গুরুভার বহনে অনুপ্রাণিত করল এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সহায্যে তাকে ঐ ভার বহনে উপযোগী করে তুলল, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে সুন্দর সংলাপ ও বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'দি বেস্ট ইয়ার্স' ছবিখানি দেখে আমরা বুঝতে পারি, একটি জাতি আদর্শ সম্বন্ধে কতখানি একাগ্রতা থাকলে বড়ো হতে পারে। ছবিখানিকে আমাদের এই আদর্শচ্যুত বর্তমান ভারতের প্রতিটি শহরে ও গ্রামে দেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) হোর্স্ট সীম্যান পরিচালিত দ্বিতীয় ছবি **"শট্‌স্ আণ্ডার দি গ্যালোজ্"**-এর কাহিনীটি মধ্যযুগীয় হলেও ছবিটির মধ্যে যে মানবিকতার আদর্শ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তারই জন্যে এটি দর্শক-অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না। দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত ডেভিড যখন তার হৃদয়হীন পিতৃব্যের কাছে সাহায্যার্থী হয়ে আসে, তখন লোভী পিতৃব্য তাকে দূরে সরিয়ে দেবার কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এক-জন পলাতক বিদ্রোহীর সাহায্যে ডেভিড তার পিতৃব্যের হীন প্রয়াসকে ব্যর্থ করে এবং তাকে পরাস্ত করে সম্পত্তির মালিক হয়। তার এই কাজে তাকে আর একজন যে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে, সে হচ্ছে তার পিতৃব্যগৃহের পরিচারিকা ক্যাট্রিয়োনা। দ্রুত-গতিসম্পন্ন ছবিটি উচ্চাঙ্গের সাদাকালো ফোটোগ্রাফী দ্বারা সমৃদ্ধ।

(৪) স্লাটান ডুডো পরিচালিত **'লাভ্‌স্ কনফিউশন'** ছবিটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে যথার্থ প্রণয় প্রায় শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে। এতে আছে দু'জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা, যারা বয়োধর্মে বেশ কিছুটা ভিন্ন পথে চালিত হবার পরে শেষপর্যন্ত নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে এবং ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে অভীষ্টভাবে মিলিত হয়। সুন্দর প্রেমের কাহিনীটি, সোনিয়ার ভূমিকায় আনা কাপ্লেন বার্গার অসামান্য অভিনয় করেছেন।

(৫) বিখ্যাত পরিচালক কনরাড উলফ্-এর **'আই ওয়াজ নাইন্টিন'** ছবিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষতম অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। একটি জার্মান ছেলে তার ন' বছর বয়সে বাপ-মার সঙ্গে মস্কোতে বাস করতে গিয়েছিল। দশ বছর বাদে উনিশ বছর বয়সে সে রুশ সৈন্যদলে লেফটেন্যান্ট হয়ে ঐ জার্মান দেশে এসেছে জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে। প্রতি পদে তার মনে প্রশ্ন; জার্মানরা রাশিয়ানদের সম্বন্ধে কি ভাবে? রাশিয়ানরা জার্মানদের সম্পর্কে? মনে মনে সে এই সিদ্ধান্তে এল, যুদ্ধকে সে ঘৃণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধঘোষণাকারীদেরও। এই ছবিখানিই এই উৎসবে প্রদর্শিত একমাত্র প্রচারধর্মী ছবি।

(৬) রেণার সিমন পরিচালিত **'হাউ টু ম্যারি এ কিং'** ছবিটি একটি আনন্দে ভরা হাল্কা হাসির ছবি। একটি কৃষককন্যা কি করে তার উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা একজন খামখেয়ালী যুবক রাজাকে বুদ্ধিযুদ্ধে পরাস্ত করে তাকে বিবাহ করল, তার চিত্তহারী কাহিনী বিবৃত হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে।

(৭) ডঃ গোটফ্রিড কোল্ডিট্‌জ পরিচালিত **"ট্রেস অব দি ফ্যালকন"** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের একটি [illegible] কাহিনীকে চিত্রিত করেছে। নর্দার্ন প্যাসিফিক রেল রোড পত্তনে এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্বেতকায়দের বিরোধ ও যুদ্ধ বর্ণাঢ্যভাবে চিত্রায়িত হয়েছে ছবিটিতে। বিস্তারিত পটভূমিকা সত্ত্বেও ছবিটি যথেষ্ট দ্রুতগতিসম্পন্ন নয় বলে কিছুটা ক্লান্তিকর।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

পরিচালক অমল দত্ত তার দলবল নিয়ে সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং ও [illegible] মনোজ্ঞ দৃশ্যে তার নবতম প্রয়াস 'আবির রাঙানো'র চিত্রগ্রহণ করতে বেরিয়ে পড়েছেন। এই আউটডোরে ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হবে আগামী ৮ মার্চ। ছবির মুখ্য চরিত্রে আছেন নতুন শিল্পী সুচন্দ্রা, অনিল ও সলিল ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সত্যদেব চ্যাটার্জি। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা ও প্রচারে আছে

যথাক্রমে সুবোধ ব্যানার্জি, রমেশ যোশী, শ্যাম পোদ্দার ও সুশান্ত চক্রবর্তী।

ইউনিটের প্রথম ছবি 'শীলা' চন্দের ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় যে কোন মুহূর্তে শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। নরেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি তুলেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি। সুর দিয়েছেন রাজেন সরকার। গীত রচনা করেছেন অরবিন্দ মুখার্জি ও পুলক ব্যানার্জি। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জি, সবিতাব্রত দত্ত ও পূর্ণদাস বাউল। চরিত্রলিপিতে আছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, প্রসাদ মুখার্জি, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ, শোভা সেন, শেখর চ্যাটার্জি, গীতা দে, সবিতাব্রত দত্ত, প্রেমাংশু বসু, মিতা চ্যাটার্জি ও মাঃ ... । সন্তান ছাড়া নারীর জীবনের মূল্য ... কিছুই নয়—কাহিনীর এই মূল বিষয়-বস্তুটিকে এক অপূর্ব আবেগ আর মূর্ছনায় ... হয়েছে ছবিটিতে।

গত শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে বাংলার আদিকবি রামায়ণ রচয়িতা 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-এর পুণ্যজন্মদিন ছিল। ঐদিনই পরিচালক অশোক চ্যাটার্জি ফুলিয়া গ্রামে মহাকবির পুণ্য জন্মস্থানে আয়োজিত ... অনুষ্ঠানের দৃশ্যগ্রহণ করে ছবিটির চিত্রগ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রামায়ণ ... নিবেদিত ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচ্যাটার্জি স্বয়ং। ... ছবিটির একটি উল্লেখযোগ্য ... হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। শ্রী ... বিজন ঘোষ দস্তিদারের সুরে নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, হেমন্ত ..., শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জি, আরতি মুখার্জি, চন্দ্রাণী মুখার্জি, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী ব্রহ্ম, অধীর ..., অমর পাল ও শিবানী পাল। ... সঙ্গীত রচনা করেছেন কালীপদ ... অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ছবিটির প্রধান ... । নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ...কুমার। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন ... চক্রবর্তী, সুমন মুখার্জি, পদ্মা দেবী, ... প্রধান, রবীন ব্যানার্জি, পশুপতি ..., তরুণকুমার, চিত্রাণী মুখার্জি, মাঃ ... সেন, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, কল্যাণী মণ্ডল, ...বেন ব্যানার্জি, নটকেশরী ভোলা ... ও মঞ্জুলা মুখার্জি প্রভৃতি শতাধিক ... । নৃত্যাংশে আছেন গোপীকৃষ্ণ ও ... সুমিত্রা মিত্র।

সলিল দত্ত পরিচালিত বেবী জন প্রোডাকসন্সের 'কলঙ্কিত নায়ক' ছবিটির চিত্রগ্রহণ কিছুদিন হলো শেষ হয়ে বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীদত্ত স্বয়ং। রবীন চ্যাটার্জি ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি, নির্মলা মিশ্র ও বাসবী নন্দী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখার্জি। উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি। নৃত্যাংশে রয়েছেন বোম্বের মধুমতী।

দুটি মন-এর সেটে পরিচালক পীযূষ বসু, পল্টু সেন এবং উত্তমকুমার।
ফটো : অমৃত
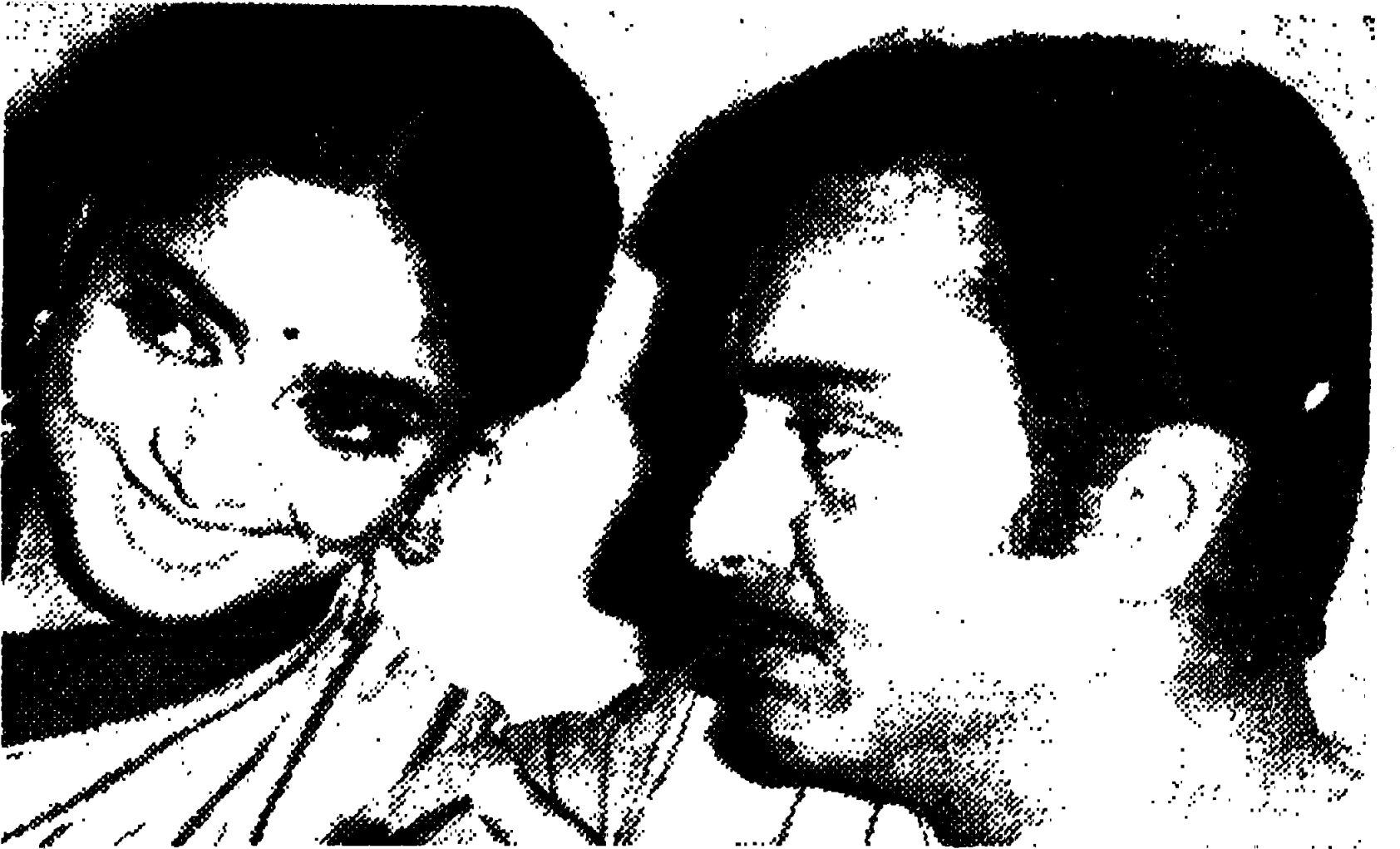
অজয় কর পরিচালিত মাল্যদান-এর সেটে নন্দিনী মালিয়া এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

চিত্রতীর্থ নিবেদিত 'ঠিকানা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন কানু রায়। নীতা সেন ছবিটির সুরকার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত ও তরুণ দত্ত। চরিত্র চিত্রণে আছেন কালী ব্যানার্জি, অঞ্জনা ভৌমিক, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা, হরিধন মুখার্জি, জিতেন ব্যানার্জি, মন্মথ মুখার্জি, নিভাননী দেবী, আরতি দাস, ধীরেন চ্যাটার্জি, প্রীতি মজুমদার ও মাঃ ইন্দ্রনাথ।

মঞ্চাভিনয়

রামপুরহাট নাট্যচক্রের শিল্পিগণ সম্প্রতি স্থানীয় রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি অভিনয় করেন। এদের দলগত অভিনয় সুন্দর। প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত। বিশেষভাবে স্মৃতিবিন্দু দাস, মলয় চট্টোপাধ্যায় ও

মেঘকালো / সুচিত্রা সেন ও মলিনা দেবী

গোপা চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অসীম সিংহ, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, শিশির চট্টোরাজ, কার্তিক ঘোষাল, ছবি কর, শৈলেন ভট্টাচার্য, পার্বতী সাহা ও রবীন্দ্র সেন প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন কার্তিক ঘোষাল ও মলয় চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি কুলটি সম্মিলনীর নিজস্ব মঞ্চে একটি মনোজ্ঞ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বর্ধমান জেলা থেকে সমাগত ষোলটি ভিন্ন স্বাদের নাটক অভিনীত হয় এই প্রতিযোগিতায়। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার স্বীকৃতি পেল রূপনারায়ণপুর রিক্রিয়েশন সেন্টারের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে'। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের মর্যাদা পেলেন : কৃষ্ণেন্দু ফারক (আমরা কবরে যাব না)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হলেন বিজয়কুমার গুহ (বাগদীপাড়া দিয়ে)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে নির্বাচিতা হলেন বেবী সরকার (বাগদীপাড়া দিয়ে)। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সুধী প্রধান, উমানাথ ভট্টাচার্য, বসন্ত ভট্টাচার্য, সাংবাদিক অসীম ঘোষ ও শামল দত্ত।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী। তেরো বছরে তেরোটি নতুন নাটক তারা মঞ্চস্থ করেছেন। এবার মঞ্চস্থ করলেন 'গল্প বলুন' গত ২৪ ফেব্রুয়ারী স্টার থিয়েটারে। এটি হাসির নাটক। বিষয়বস্তু, সংলাপ, নাটকীয় গতি ও পরিণতি, চরিত্রচিত্রণ ও সমাজ সচেতনতা, সকল দিক দিয়েই নাটকটি ভিন্ন স্বাদের এবং রসোত্তীর্ণ। দলগত অভিনয় সৌকর্য অনস্বীকার্য। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুমারেশ ও প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রমথবাবু। অন্যান্য চরিত্রে বিমান গুপ্ত, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখী সরখেল, কেয়া চক্রবর্তী, তুষারিকা চক্রবর্তী ও সুনন্দা মিত্র (মালবিকা) ভাল অভিনয় করেছেন।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা ১০ম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন (স্টার) থিয়েটার মঞ্চে। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডঃ রমা চৌধুরী ও সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এবার এরা অভিনয় করলেন শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'গোলাপ কাঁটা'। দলগত অভিনয়ে নাটকটির প্রতিটি ... অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে ... আকর্ষণীয়।

প্রমোদের ভূমিকায় প্রদীপ পাল ... অন্যান্য ভূমিকায় তপন মিত্র, ... ব্যানার্জি, বদ্রিনারায়ণ চ্যাটার্জি, ... মুখার্জি, বিমলেন্দু রায়, অশীষ ... অরুণ দত্ত, হীরেন সোম, ... নিরাপদ পাঠক, প্রতিমা পাল, ... তৃপ্তি দাস, এবং হিমানী গাঙ্গুলীর ... নয় প্রশংসনীয়। নাটকটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন শ্রী...পকেন্দু নিয়োগী।

গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী ... মহকুমা আফিসের কর্মচারীদের ... নির্মিত রঙ্গমঞ্চে ... 'কালিন্দী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ ... দুটি নাটকই সুঅভিনীত হয় এবং ... সাফল্যের ... স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন ... গুপ্ত মহাশয়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। ... ভূমিকায় দীনেশ সিংহ, বিমল চক্রবর্তী ও হরিপ্রসাদ মুখার্জির অভিনয় সার্থক ও সুন্দর। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুধীর দাস, চিন্তাহরণ মজুমদার, নাবাচা হালদার, কার্তিক মারিক, অজিত ভট্টাচার্য, রাধেশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অর্জুনের ভূমিকায় শিবশংকর ঘোষের অভিনয় সুন্দর। শিশুচরিত্রে সাগরিকা সাহার অভিনয় সাবলীল। স্ত্রী-চরিত্রে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না নিয়োগী, মীনা বোস, অলকা গাঙ্গুলীর অভিনয় চরিত্রানুগ।

দ্বিতীয় নাটক 'কালিন্দী' অপেক্ষাকৃত সুপ্রযোজিত। বিমল চক্রবর্তী ও অজিত রক্ষিতের অভিনয় সপ্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে দীনেশ সিংহ, সুধীর দাস, ইন্দু গোস্বামী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, চিত্তেশ্বর মজুমদার, উমানন্দ সাহা, অরবিন্দ নন্দী, অজিত ভট্টাচার্য, দেবেন লালা, অসিত লাহিড়ী, বিফল রজক প্রভৃতির অভিনয় সার্থক। স্ত্রী-চরিত্রে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়-এর অভিনয় চরিত্রানুগ। এছাড়া, মীনা বোস, অলকা গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না নিয়োগী ও গীতা চক্রবর্তীর অভিনয় সাধারণ। নাটক দুটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কালিন্দী : গত ১৩ মার্চ ঐকতান গোষ্ঠীর সদস্যারা এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অভিনয় করলেন তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' শিশির নাট্যমঞ্চে (রামরাজাতলা)। নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত হয় এবং পরিচালক বিভু ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব ... নাটকের ছোট চরিত্রগুলির সফল ... চরিত্রায়ণে, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ...নাথ আদক, সুদর্শন অধিকারী, ... বসু, প্রণব ভট্টাচার্য, অজিত চৌধুরী, অমল ভট্টাচার্য ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়। প্রধান চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক স্বয়ং 'স্নেহে...-

… ভূমিকায় এবং ইন্দ্র রায়ের ভূমিকায় … বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য … উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন … ভট্টাচার্য, শক্তি ভট্টাচার্য, অশোক … বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি চট্টো- … পাল।

ছটি একাঙ্ক : বিলাসপুরে প্রবাসী …দের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিক্রিয়েশন … গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে ক্লাবের … গত ১ মার্চ স্থানীয় রেলওয়ে … দুটি নাটক মঞ্চস্থ করালেন। … বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা … ' এবং অপরটি শ্রীপৃথ্বীশ …র 'লবণাক্ত'। নাটক দুটির নির্দেশনায় … জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। প্রথম … রজনী চাটুজ্যের ভূমিকায় … করলেন শ্রীলাহিড়ী স্বয়ং। দলগত …র গুণে দ্বিতীয় নাটক 'লবণাক্ত' … উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে … লাহিড়ী, গোবিন্দলাল সাহা, … চক্রবর্তী, ফাল্গুনী মুখার্জি এবং … শ্রাবণী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টাইপ চরিত্রের অভিনয়ে … ভৌমিক এবং শ্রীশচীন সমাদ্দার … কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ ছাড়া … রায়, নৃপেন চক্রবর্তী, শ্রীমতী … মুখার্জি এবং কুমারী রমা রায়ের অভিনয় সুন্দর।

গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সঙ্ঘ পরি-চালিত ৩য় বার্ষিক নাটক প্রতিযোগিতা …পুরের রবীন্দ্র-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। …ফল নিম্নরূপ। শ্রেষ্ঠ দল : প্রথম— … (শিল্পীতীর্থ), দ্বিতীয়—স্মৃতি … (রূপচক্র), তৃতীয়—স্বপন যদি মধুর … (নান্দনিক)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : প্রথম—রণজিৎ দত্ত (শিল্পীতীর্থ) দ্বিতীয়— …কৃষ্ণ ভদ্র (রূপচক্র)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : প্রথম—রণজিৎ দত্ত (শিল্পীতীর্থ), দ্বিতীয় … ভট্টাচার্য (নান্দনিক)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : প্রথম—মমতা চ্যাটার্জি (রূপ-চক্র), দ্বিতীয়—মঞ্জুলা ভট্টাচার্য (শিল্পী-তীর্থ)। শ্রেষ্ঠ টাইপ চরিত্র : অজিত মুখার্জি (শিল্পীতীর্থ)।

বিবিধ সংবাদ

গত ১৪ মার্চের সন্ধ্যায় চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)-র পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বাণী বিতান'এর বসন্তকালীন অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশনের সূচনায় সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করে দু মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্য যুগ ও গিরিশচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার, প্রণতি সরকার। দিলীপ পাল, অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়, প্রীতি রায়, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, অখিল নিয়োগী, ফাদার ফালোঁ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ উমা রায় ও নির্মলেন্দু বসু এবং সে যুগের উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত অংশা-ভিনয়ে ও সঙ্গীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়, কার্তিক সান্যাল, দেবাহূতি মৈত্র, প্রভাতকুমার দে, সিতাংশু চক্রবর্তী, সন্ধ্যা দে, কালিপদ দাস, শিবানী বসু, গণেশচন্দ্র দাস, চিত্রিতা মণ্ডল, স্বপনকুমার বসু ও ডাঃ সৌরেন্দ্র-নাথ দে প্রমুখ সাহিত্যিক, সাহিত্য সমা-লোচক ও শিল্পিবৃন্দ। শম্ভুনাথ অধিকারী, গৌরী জানা, রণজিত চক্রবর্তী প্রভৃতি সদস্যরা তত্ত্বাবধায়ক বিভূতি মুখোপাধ্যায় (সন্টুবাবু)-কে অনুষ্ঠান-ব্যবস্থাপনায় সহ-যোগিতা করেন। সভায় বহু গুণী ও বিদগ্ধ-জনের সমাবেশ হয়।

রাজকুমারী চিত্রে তনুজা, উত্তমকুমার এবং দীপ্তি রায়

'নাম নেই' নাটকের সফল প্রয়োজনার পর অভ্যুদয় যে নাটকটি নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেটি হল কিরণ মৈত্রের সাম্প্রতিক রচনা "অন্যছায়া"। পরিচালনাও তাঁর। সম্প্রতি এই নাটকের পর পর দুটি অভিনয় পরিবেশিত হল মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে ও বারাসত সত্যভারতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বর্তমান যুগের মানসের বিভ্রান্তি, ক্রোধ, হতাশার পটভূমিকায় রচিত নাটকটি দর্শক মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। 'টিম ওয়ার্ক'-এ অভ্যুদয় তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে এবং প্রায় সকল অভিনেতাই স্ব-স্ব চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন, তপন রক্ষিত, শান্ত সান্যাল, গোরাচাঁদ লাহিড়ী, অসীম মুখোপাধ্যায় হিরণ মৈত্র, মানব গুহ, বিশ্বনাথ পাল, দিলীপ দে, সুধীর ভট্টাচার্য, সুশীল দাশাল ও আরও অনেকে। আলোক সম্পাতে ছিলেন শ্রীঅমিয় সেন।

জনপ্রিয় 'হরবোলা' বেতার শিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় 'বীরভূম' 'সারেঙ্গাবাদ নন্দন আসরে' অংশ গ্রহণের পর সম্প্রতি 'স্টার রঙ্গমঞ্চে' 'সেয়লেশ ইন্সটিটিউটের' বার্ষিক অনুষ্ঠানে এককভাবে ইংরাজী ফিচারের মাধ্যমে মুখ দিয়ে নানান রকমের ডাক শুনিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন।

দাবার আসর

বিশ্ব জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশীপ

গত বছর ১০ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব জুনিয়ার দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা হয়েছিল স্টকহোলমে। প্রতিযোগী সকলেরই বয়স ছিল ১৮ কিম্বা তার কম। ৩৭টি দেশ থেকে মোট ৩৮ জন প্রতিযোগী এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী শ্রীকারপভের একটি খেলা আমরা পূর্বের কোন এক সংখ্যায় দিয়েছি। এবারে এই প্রতিযোগিতা থেকে আরো কয়েকটি খেলা দিলাম।

প্রতিযোগীদের মোট ৬টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক গ্রুপের খেলোয়াড়গণ নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য একটি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি গ্রুপ থেকে ২ জন করে খেলোয়াড় ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকারী হন।

ফাইনালে মোট ১১ রাউন্ড খেলা হয়। এতে বিজয়ী হন সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রীআনাতোলি কারপভ। যুগ্মভাবে ২য় এবং ৩য় স্থান দখল করেন হাঙেগরীর শ্রীআদোরজান এবং রুমানিয়ার শ্রীউর্বজিকা। চতুর্থ স্থান দখল করেন পোর্টোরিকোর শ্রীকাপলান। অর্জিত পয়েন্টের সংখ্যা—কারপভ ১০; আদোরজান এবং উর্বজিকা প্রত্যেকে ৭; কপলান সাড়ে ৬।

সাদা-কাপলান, কালো-ক্রাস্‌ক্‌। কিংস ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স। (১) ঘ-রাগ ৩ ঃ ঘ-রাগ ৩ (২) ব-গ ৪ ঃ ব-রাঘ ৩ (৩) ঘ-গ ৩ ঃ গ-ঘ ২ (৪) ব-ম ৪ ঃ ব-ম ৩ (৫) ব-রা ৪ ঃ ০-০ (৬) গ-রা ২ ঃ ঘ-গ ৩ (৭) ব-ম ৫ ঃ ঘ-ঘ ১ (৮) ০-০ ঃ মঘ-ম ২ (৯) গ-রা ৩ ঃ ব-রা ৪ (১০) ঘ-ম ২ ঃ ঘ-রা ১ (১১) ব-মঘ ৪ ঃ ব-রাগ ৪ (১২) ব-গ ৩ ঃ ব-গ ৫ (১৩) গ-গ ২ ঃ ব-রাঘ ৪ (১৪) ব-গ ৫ ঃ ঘ (ম ২)-গ ৩ (১৫) ঘ-ঘ ৫ ঃ ব-মন ৩ (১৬) ঘ-গ ৩ ঃ গ-ম ২ (১৭) ব-ঘ ৫ ঃ নব×ব (১৮) ম-ঘ ৩! ঃ রা-ন ১ (১৯) গ×ব ঃ ব×ব (২০) গ×ব ঃ ঘ-ম ৩ (২১) গ×গ ঃ ম×গ (২২) ঘ-গ ৪ ঃ ঘ (গ ৩)-রা ১ (২৩) মন-ঘ ১ ঃ ন-গ ২ (২৪) গ×ঘ! ঃ ঘ×গ (২৫) মন-গ ১ ঃ ঘ×ঘ (২৬) ম×ঘ ঃ ব-ঘ ৩ (২৭) ঘ-ঘ ৫ ঃ গ-গ ১ (২৮) ম×ব ঃ ম×ম [(২৮)...গ-গ ৪+ (২৯) ন×গ!] (২৯) ঘ×ম ঃ ন-ন ২ (৩০) ঘ-রা ৬ ঃ গ-গ ৪+ (৩১) ন×গ কালোর হার স্বীকার।

সাদা—কারপভ, কালো—ভ্যুগ্‌ট ৩ ঃ পির্ক ডিফেন্স। (১) ব-রা ৪ ঃ ব-রাঘ ৩ (২) ব-ম ৪ ঃ গ-ঘ ২ (৩) ঘ-রাগ ৩ ঃ ব-ম ৩ (৪) ব-গ ৩ ঃ ঘ-রাগ ৩ (৫) গ-ম ৩ ঃ ০-০ (৬) ০-০ ঃ মঘ-ম ২ (৭) মঘ-ম ২ ঃ ব-রা ৪ (৮) ন-রা ১ ঃ ব-গ ৩ (৯) ব-মন ৪ ঃ ম-গ ২ (১০) গ-গ ১ ঃ ব-ম ৪!? (১১) ব×রাব ঃ মঘ×ব (১২) ঘ×ঘ ঃ ম×ঘ (১৩) ব×ব ঃ ম×মব (১৪) গ-গ ৪ ঃ ম-মন ৪ (১৫) ঘ-ঘ ৩ ঃ ম-গ ২ (১৬) ম-গ ৩ ঃ গ-ম ৫ (১৭) ম-গ ৪! ঃ ম-গ ১ (১৮) ব-ম ৩ ঃ গ-ম ২ (১৯) গ-রা ৩ ঃ গ-রা ৩ (২০) গ×গ ঃ ম×গ (২১) ঘ-গ ৫ ঃ ম-গ ১ (২২) গ-ম ৪ ঃ ঘ-ম ৪ (২৩) ম-ম ২ ঃ ন-ম ১ (২৪) গ×গ ঃ রা×ব (২৫) ব-মগ ৪! ঃ ঘ-গ ৩ (২৬) ম-গ ৩ ঃ ম-গ ৪ (২৭) ন-রা ৫ ঃ ম-গ ৫ (২৮) ন-রা ৭ ঃ রা-ঘ ১ (২৯) ঘ×ব ঃ ন-ম ৭ (৩০) ন-রাগ ১ ঃ ন-ঘ ১ (৩১) ব-রাঘ ৩ ঃ ম-ম ৫ (৩২) ম×ম ঃ ন×ম (৩৩) ব-ঘ ৩ ঃ রা-গ ১ (৩৪) ন (১)-রা ১ ঃ ন-রা ৫ (৩৫) ন (১)×ন ঃ ঘ×ন (৩৬) ন-গ ৭ ঃ ব-মগ ৪

আনাতোলি কারপভ ঃ বিশ্ব জুনিয়র দাবা চ্যাম্পিয়ন

(৩৮) ব-ন ৫ ঃ ঘ-ম ৭ (৩৯) ঘ×ব ঃ ঘ×ব ? এবং কালোর হার স্বীকার।

সাদা—আকার, কালো—কাপলান। রাই লোপেজ। (১) ব-র ৪ ঃ ঘ-মগ ৩ (২) ঘ-রাগ ৩ ঃ ব-রা ৪ (৩) গ-ঘ ৫ ঃ ব-মন ৩ (৪) গ-ন ৪ ঃ ঘ-গ ৩ (৫) ০-০ ঃ ঘ×ব (৬) ব-ম ৪ ঃ ব-মঘ ৪ (৭) গ-ঘ ৩ ঃ ব-ম ৪ (৮) ব×ব ঃ গ-রা ৩ (৯) ম-রা ২ ঃ গ-গ ৪ (১০) গ-রা ৩ ঃ ম-র ২! (১১) ব-গ ৩ ঃ ০-০ (১২) মঘ-ম ২ ঃ ঘ×ঘ (১৩) ম×ঘ ঃ গ×গ (১৪) ম×গ ঃ ঘ-ন ৪ (১৫) গ-গ ২ ঃ ঘ-গ ৫ (১৬) ম-ম ৩ ঃ ব-ঘ ৩ (১৭) ব-মঘ ৩ ঃ ঘ-ন ৬ (১৮) গ-ম ১ ঃ ব-মগ ৪ (১৯) ম-ম ২! ঃ ব-মন ৪ (২০) ম-ন ৬ ঃ ব-গ ৩ (২১) ব×ব ঃ ন×ব (২২) ন-রা ১ ঃ ম-গ ১ (২৩) ম-ম ২ ঃ ন-রা ১ (২৪) গ-রা ২ ঃ ব-ঘ ৫ (২৫) মন-গ ১ ঃ ন-ঘ ১ (২৬) ম-ঘ ২! ঃ রা-ঘ (২৭) ঘ-রা ৫ ঃ ম-ম ৩ (২৮) গ-ম ৪! ঃ ঘ-ম ৫ (২৯) ব×মব ঃ ম×ব (৩০) ম×ম ঃ ব×ম (৩১) ন-গ ৭+ ঃ রা-ন ১ (৩২) ন-গ ৬ ঃ ন-ম ১ (৩৩) ঘ-ম ৫ ঃ গ×ঘ (৩৪) ন×ন+ ঃ গ×ন (৩৫) ন×ন ঃ ব-ম ৬ (৩৬) ন-ম ৬ ঃ গ-ঘ ৪ (৩৭) গ-ম ৭ কালোর হার স্বীকার।

সাদা—টরে ঃ কালো—ক্রাস্‌ক। কিংস ইণ্ডিয়ান এ্যাটাক। (১) ব-রা ৪ ঃ ব-র ৩ (৪) রাঘ-গ ৩ ঃ গ-র ২ (৫) ব-রাঘ ৩ ঃ ব×ব (৬) ব×ব ঃ ব-মঘ ৩ (৭) গ-ঘ ২ ঃ গ-ঘ ২ (৮) ম-রা ২ ঃ ব-গ ৪ (৯) ০-০ ঃ ঘ-গ ৩ (১০) ব-রা ৫ ঃ ঘ-ম ২ (১১) ব-গ ৩ ঃ ম-গ ২ (১২) ন-রা ১ ঃ ০-০ (১৩) ঘ-গ ১ ঃ ব-মন ৩ (১৪) ব-রান ৪ ঃ ব-মব ৫ (১৫) ঘ (গ ১)—ন ২ ঃ ব-গ ৫ (১৬) ঘ-ঘ ৪ ঃ ঘ-গ ৪ (১৭) ঘ-ঘ ৫ ঃ গ×ঘ (১৮) গ×গ ঃ ঘ-ম ৬ (১৯) ঘ-গ ৬+ (২০) গ×ঘ ঃ রান-ম ১ (২১) ম-ন ৫ ঃ রা-গ ১ (২২) ন-রা ৪ ঃ ম-ঘ ৩ (২৩) ন-রাগ ১ ঃ ঘ-রা ২ (২৪) ন-ঘ ৪ ঃ গ×গ (২৫) ন-ঘ ৭ ঃ ঘ-ঘ ৩ (২৬) ন-ঘ ৮+ কালোর হার স্বীকার।

* * *

১৯৭০ সালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ষষ্ঠ দাবা প্রতিযোগিতায় ৬ রাউন্ডের সুইস প্রথায় মোট ৪০ জন প্রতিযোগী নাম দিলেও শেষ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হন মোট ২৯ জন খেলোয়াড়। এবারের খেলায় বিজয়ী হলেন বাংলার একনম্বর ১নং খেলোয়াড় শ্রীঅনন্দকুমার ঘোষ এবং এই নিয়ে তিনি পর পর তিনবার বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশীপ পাবার গৌরব অর্জন করলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুজনেই যথাক্রমে ২ বার ও ১ বার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় যাদবপুরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। খেলার মান অন্যান্যবারের তুলনায় বেশ ভালই ছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত শ্রীঅভিনাথ সরকার ও শ্রীদিলীপ সেনের মত কয়েকজন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির জন্যে খেলা চালিয়ে যেতে পারেন নি।

শ্রীআনন্দ ঘোষ প্রতিটি খেলায় জিতে মোট ৬ পয়েন্ট অর্জন করেন। ২য় স্থানের জন্যে সমীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং স্বপন দের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দুজনেরই অর্জিত পয়েন্ট হয় ৫ এবং এস, বি পয়েন্ট হয় ১৪½। তখন শোকোলভ পয়েন্টের ভিত্তিতে সমীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২য় এবং স্বপন দে ৩য় স্থান লাভ করেন। ৪র্থ হয়েছেন শ্রীজয়দেব ভট্টাচার্য (৪ : এস, বি, ১২½) এবং ৫ম হয়েছেন শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জি (৪; এস, বি ১০½)।

—গজানন্দ বোড়ে

খেলার কথা

আমার দেখা নির্মল চ্যাটার্জি

নির্মল চ্যাটার্জি ও পঙ্কজ রায়ের মধ্যে পংকজ রায়ই ফুটবল এবং ক্রিকেটে বেশি প্রতিভাবান ছিলেন; কথা প্রসঙ্গে আজকের খেলোয়াড়েরা সবাই এই মতই ব্যক্ত করলেন। কথার মাঝেই বলেছিলামঃ 'ক্রিকেটে নির্মল চ্যাটার্জি স্বতন্ত্র মেজাজের ছিলেন। আর ফুটবলেও তাঁর ড্রিব্লিং চেয়ে দেখবার মত ছিল। কি ক্রিকেট, কি ফুটবল তিনি কেতাবী ধরণে খেলতেন না। এই জন্যেই ক্রিকেটে তাকে 'বাংলার মুস্তাক' বলা হত। ফুটবলে তাঁর পায়ের কারসাজি দেখে অনেকে স্ট্যানলী ম্যাথুজের কথা পাড়তেন আর টেনিসে ছোট বয়স থেকেই তাঁর হাত পাকা ছিল।' যাঁদের উদ্দেশ্য করে কথাটা বললাম তাঁরা বিশেষ গা করলেন না। কিন্তু একজন হবু খেলোয়াড় আমার কথার জবাব দিলেন, 'খেলার রেকর্ড দেখলেই বোঝা যাবে কে কত বড় খেলোয়াড়। যুক্তি তর্কের থোড়াই কেয়ার করি।' উপস্থিত অন্য সব খেলোয়াড়েরা তাঁর কথায় সায় দিলেন। তখন নিজের মনের কথাটা তাঁদের খুলে বললামঃ 'রণজি ট্রফিতে হোলকারের বিরুদ্ধে নির্মলের ৯৯ রাণ অবশ্যই অনেকের মনে থাকবারই কথা। সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, সর্বাতে ও হীরালাল গাইকোয়াড়ের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে খেলেছিলেন কোন স্কোর বইয়ে তা কি লেখা আছে? ফিগার সব সময় খেলার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারে কি? আমি কেন, কার্তিক বসুর মত সমঝদার ক্রিকেটারও প্রায়ই বলেন, নির্মল চ্যাটার্জির মত প্লেয়ার কমই দেখা যায়। সব সময় রেকর্ড বই দেখে খেলোয়াড় বিচার করা ভুল তো বটেই, অন্যায়ও। বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক নেভিল কার্ডাস বারবার এই কথাই বলেছেন। পঙ্কজ রায় বড় খেলোয়াড় সন্দেহ নেই; কিন্তু দু' মাঠে দু'জন যদি একই সঙ্গে খেলতে নামেন তাহলে ভীড় বেশি হবে সেই মাঠেই যেখানে নির্মল চ্যাটার্জির হাতে ব্যাট।'

বলার মত কথা যে, আজও নির্মল কলকাতার মাঠের খেলোয়াড়। পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে তাঁর বয়স; তবু মাঠ আজও তিনি ছাড়তে পারেন নি। এখনও তিনি খেলেন কেন এ প্রশ্ন কেউ যদি তাঁকে করেন তাহলে কিন্তু এর জবাব কেউ পাবেন না। তবে আমি জানি নির্মল মাঠে নামেন বিশেষ কোন কারণে। খেলার নেশা এবং শরীর শক্ত রাখা—এ জন্যেও অনেক প্রবীণ খেলোয়াড়েরা মাঠে নামেন বটে, তবে নির্মলের কথা স্বতন্ত্র। কথাটা খুলেই বলি।

গত ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের চড়া রোদে ইডেন মাঠে দ্বিতীয় ডিভিশনের এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তির খেলায় নির্মল মাঠে নামলেন খিদিরপুর দলের হয়ে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে। যখন তিনি মাঠে নামছেন তখন দলের খুব দুরবস্থা। সমবেত কিছু কিছু দর্শক নির্মলকে মাঠে

কমল ভট্টাচার্য

নামতে দেখেই বলে উঠলেন—'বুড়ো আর কেন?' নির্মল হঠাৎ থমকে গেলেন। মুখে তাঁর তখনও জ্বলন্ত সিগারেট। বয়স হয়েছে, রেগে উঠে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বভাব মতই গ্লাবস ছাড়া খালি হাতে ব্যাটটি কাঁধে ফেলে এগিয়ে গেলেন। দর্শকরা তা দেখে আরও টিপ্পনি কাটলেন। কিন্তু ততক্ষণে নির্মল ক্রিজে পৌঁছে গেছেন। ছয় উইকেটে ষাট রানের মাথায় গিয়ে নির্মল নিমেষে বাষট্টি রান করে দলকে হারের হাত থেকে বাঁচালেন। ফিরলেন ব্যাটটি বগলে চেপে। সেই মুষ্টিমেয় জনতার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন। দর্শকরা আর কি বলবেন! নির্মল চ্যাটার্জি আজও যে তাঁর সেরা খেলা দেখিয়ে গেলেন সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? বলা

খিদিরপুর ফার্স্ট ডিভিসনে খেলবার যোগ্যতা পেল।

এমনি করেই নির্মল চ্যাটার্জি ঠিক আগের বছর তাঁর পুরোনো দল দক্ষিণ কলকাতাকে ফার্স্ট ডিভিসনে তুলেছিলেন। সে বছর তাঁর গোটা দুই সেঞ্চুরীও ছিল। উইকেট পেয়েছিলেন অনেক। বন্ধুর অনুরোধে নির্মল খিদিরপুর দলে খেলতে এসেছিলেন। এ বছর তিনি ভবানীপুর দলে এসেছিলেন খেলতে ঐ একই কারণে। কিন্তু অফিসের কাজের চাপে তিনি এবার বিশেষ ম্যাচ খেলতে পারেননি। এমন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কখনও ক্রিকেট খেলেছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে নির্মলের সঙ্গে আমি বহুদিন খেলেছি বলেই আজ আমি বলতে পারছি যে তাঁর অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না। প্রয়োজনে তিনি এমন অনেক খেলা খেলেছেন যা আমাদের কল্পনা করতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখনকার দিনে এরিয়ান্স ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলাটি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। বলতে দ্বিধা নেই, নির্মলকে সহজে কাবু করতে পারিনি। আমার বোলিং নিখুঁত রাখবার চেষ্টা করতাম। সহজে কেউ মেরে উড়িয়ে দেবে এমন স্পর্ধাকে আমি সহজে দাবিয়ে রাখতে পারতাম—সে ক্ষমতা আমার ছিল। কিন্তু মাঠে নেমেই এগিয়ে পিছিয়ে এমন খেলা ধরলেন যা দেখে আমার গায়ে জ্বালা ধরেছিল। সেই নির্মল আমাদের বিরুদ্ধে রান করলেন ১৯৮। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল ক্যালকাটার বিরুদ্ধে। বেলা ১১-১৫ মিনিটে মাঠে নেমে লাঞ্চের কিছুক্ষণ পরেই ২১২ রান করেন। সে খেলায় নির্মল কম করে দশটি ওভার বাউন্ডারী মেরেছিলেন। বালিগঞ্জের বিরুদ্ধে নির্মলের ১৯৪ রান সহজে ভোলবার নয়। ১৯৩৮ সাল থেকেই বাংলা দলের হয়ে রণজি ট্রফিতে খেলেন। প্রথম খেলায় বিহারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে

নির্মল বাংলা দলে তাঁর জায়গা পাকা করে নেন। এই বছরই সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে আবার একটি সেঞ্চুরী করেন। ফাইনালে বাংলা সাউদার্ণ পাঞ্জাবকে হারিয়ে রণজি ট্রফি পায়। নির্মল খেলেননি বি-এ পরীক্ষার জন্য। একটানা চোদ্দ বছর বাংলার হয়ে খেলে প্রমাণ করেন ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিও একজন। কিন্তু এত সত্বেও নির্মল চ্যাটার্জির ভারতীয় দলে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় জায়গা হয়নি কেন?

নির্মল ভারতের একজন অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান এ বিষয়ে সেদিন সবাই একমত ছিলেন। তবে নির্মল নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারেননি। বুঝে সুজে কাজ করা তাঁর যেন ধাতে সইত না। মেজাজ খুব চড়া। ছোট মুখে বড় কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। সেদিন সেই কথাই তিনি বলেছিলেন।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম। ট্রায়াল খেলা হচ্ছে ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড সফরের জন্যে। বাংলা থেকে খেলতে গেছেন নির্মল চ্যাটার্জি আর পুঁটু চৌধুরী। নির্মল ব্যাটসম্যান আর পুঁটু বোলার। এই দুজনের সম্বন্ধে হাই অফিসিয়ালদের মতামত খুব সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু তাঁদের এই তুচ্ছজ্ঞানই সেদিন বাংলার ক্রিকেটরসিকদের মনে জ্বালা ধরিয়েছিল। কিন্তু বাংলার কথা কে শোনে? আর যাঁরা নির্মল সম্বন্ধে জানতেন তাঁরাও কেউ সেদিন মুখ খোলেননি।

ঘটনাটা খুলেই বলি। সেই ট্রায়াল খেলায় দুদলের অধিনায়ক ছিলেন সি কে নাইডু ও বিজয় মার্চেন্ট। এই সি কের দলেই বাংলার দুই গুণধর নির্মল ও পুঁটুর জায়গা হয়েছিল। সি কের দল প্রথমে ফিল্ডিং করে। যথারীতি হাত বদল করে পুঁটু চৌধুরীর হাতে বল আসে। পুঁটু হাত ঘোরালেই যে ব্যাটসম্যানরা বিপদে পড়বেন একথা কি কেউ জানতেন? কেউ না জানুক সি কে নাইডু জানতেন। আর জানতেন বলেই তিনি পুঁটুকে খুব দরাজ হাতে কাজে লাগাননি। কিন্তু পর পর তিনটি সহজ ক্যাচ ফেলে পুঁটুর মুখ পোড়ালেন সেদিন তাঁর দলের ফিল্ডাররাই। যে তিনজন ব্যাটসম্যান ক্যাচ দিয়েও টিকে রইলেন তাঁরা হলেন রুসি মোদী, বিজয় হাজারে ও গুল মহম্মদ। পুঁটুর অফ কাটার বলে সেদিন সেরা সেরা খেলোয়াড়েরা চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন। কিন্তু এ হেন অবস্থায় অধিনায়ক সি কে নাইডু হঠাৎ পুঁটুকে বদল করে দিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ব্যাটসম্যানরা। মার্চেন্টের দলের খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক খেলা দেখে দর্শকরা স্বস্তি পেলেন। কোথাকার পুঁটু চৌধুরী, কেইবা জানে তাঁর কথা! এক্ষেত্রে পুঁটু আর কি করেন। সি কের দিকে ঘুরে ফিরে বেড়ান বোলিংয়ের আশায়। কিন্তু সে আশা আর তাঁর মিটল না। নির্মল চ্যাটার্জি ফিল্ডিং করতে করতে সব ব্যাপারটা ভাল করেই দেখলেন। একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। অবসরে খোদ কর্তা সি কের কাছেই কথাটা পাড়লেন তিনি। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বললেন, 'পুঁটুকে আর একবার সুযোগ দিন না। দেখছেন না ওর বলে কেউ খেলতে পারছে না।' সি কে প্রথমটা তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জবাব দিলেন মুচকি হেসে—'হাঁ বাবুজি, ফিন উসকো লেয়াযগী। ঘাবড়ানেকা বাত কেয়া হায়।' নির্মল সি কের ফিকির বুঝলেন। দিন ফুরিয়ে এল আর কখন পুঁটুকে বোলিং করাবেন। ধৈর্য হারিয়ে বসলেন নির্মল। রসিয়ে রসিয়ে বললেন—'আমার মাথায় পাকা চুল গজায়নি বটে তবে বুদ্ধি কিছু আছে বৈকি! আপনার মতলব আমি ধরতে পেরেছি।' ব্যাস, সি-কের চোখ ঝলসে উঠল। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বাংলার ছেলের এত সাহস! দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন, কিছু বললেন না তখন। এর পরিণাম যে ভাল হবে না সেটা নির্মলের বুঝতে বাকি রইল না। তবে পরোয়া কি! তাই বলে অন্যায় সইতে হবে?

মুস্তাকের এগিয়ে পিছিয়ে খেলা—সে ত দর্শকরা দেখেছেন। কিন্তু বাংলার মুস্তাককে ত কেউ তাঁরা দেখেননি। সে যে আসল মুস্তাকের বাড়া। ব্যাট ধরলেই সেঞ্চুরী। কিন্তু ব্যাটিং অর্ডার দেখে নির্মলের চোখ ছানাবড়া। একেবারে ন' নম্বর। হ্যাঁ, শোধ নিলেন বটে সি কে নাইডু। খোস মেজাজেই খেললেন নির্মল। করলেন বত্রিশ রান—নট আউট। কিন্তু সে খেলার মূল্য কে দেবে?—কর্তৃপক্ষরা, তাঁরা ত কলম উঁচিয়ে আছেন নামের পাশে ঢ্যারা কাটবেন বলে। এইত গেল ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড সফরের কথা।

নির্মল নিজের ভুলের জন্যে একবারও হাত কামড়ে আফশোষ করেননি। বরং জ্বালা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে চালিয়েছিলেন। এরপরে নির্মলের আর একবার টেস্ট ট্রায়ালে ডাক পড়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্যে নির্মল [illegible] বেঁধে লেগে পড়লেন।

দু দুটো ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হল। প্রথমটি বোম্বাইতে—নির্মল দু ইনিংসেই ভাল খেললেন। দিল্লীতে করলেন [illegible]। কিন্তু দুর্ভাগ্য নির্মলের। দলে পড়লেন না। অস্ট্রেলিয়া সফরে মার্চেন্ট, মোদী ও মুস্তাক গেলেন না। আর দেশভাগ হওয়ার ফলে হাফিজ কারদারও যেতে চাননি। [illegible] খেলোয়াড় হিসেবে কত অজানা খেলোয়াড় দলে স্থান পেলেন তবু নির্মলের ডাক আসেনি। নির্মল সেবারও হাসতে হাসতে বলছিলেন—সি কে নাইডু আমার পুরোনো খোঁচা দেওয়া কথাটা নিশ্চয় ভোলেননি। তার ওপর সোনায় সোহাগা সি কে সিলেকশন কমিটির [illegible]।

নির্মলও সি কে কে ছেড়ে কথা বলেননি। অন্যায় যে তিনি কোনদিনই সহ্য করতে পারতেন না। হোলকারে বাংলাদল রণজি ট্রফিতে খেলতে গেল। সেবার নির্মল ক্যাপ্টেন। 'নিউট্রাল আম্পায়ার'—দুপক্ষই মেনে নিলেন। তবে সি কে নাইডুকে নির্মল ভয় পেতেন। কেননা কূটবুদ্ধিতে সি কের সংগে পেরে উঠবে কেন। হোলকার দল [illegible]৪ রানে আউট হলে বাংলার নির্মল একাই লড়বেন এই সংকল্প নিয়ে মাটি আঁকড়ে খেলে চললেন। তার আগে একবার অবশ্য নির্মলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল শিবাজী রায়কে ড্রপ ক্যাচে আউট দেওয়া নিয়ে। কিন্তু পা বাড়িয়ে খেললে যে এল বি ডবলিউ আউট হয়, বিশেষ করে সর্বাতের মত অফ ব্রেক বলে, সেটা নির্মলের জানা ছিল না। আউট দিতেই রাগ নির্মলের চরমে উঠল। ম্যাচে হার হলো। কাজেই নির্মল তখন একেবারে দিশেহারা।

ডিনার পার্টিতে বাংলার অধিনায়ক নির্মল চ্যাটার্জি মুখ খুললেন। গুছিয়ে, রসিয়ে তিনি বললেন—'এমন ক্রিকেট জীবনে দেখিনি। ক্রিকেটের অপমৃত্যু আর কাকে বলে।' যেখানে ন্যায়ের বিচার নেই সেখানে ক্রিকেট খেলা কেন!

আজ বিশ বাইশ বছর বাদে নির্মলের মুখে সব কথা শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাঁর কথায় কারও কি অনুকম্পা জাগবে না? অদ্ভুত কাহিনী শুনলাম! এ কথা খেলার স্কোর বইয়ে লেখা থাকবে না কেন?

খেলাধুলা

দর্শক

অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়ী হয়ে উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। সেমি-ফাইনালে তাঁকে খুবই বেগ দিয়েছিলেন জাপানের ইপ্পি কোজিমা। শেষ পর্যন্ত হার্টোনো কোনক্রমে ১৭-১৬ ও ১৫-১৬ পয়েন্টে জয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন জাপানের কুমারী ইতসুকো তাকেনাকা। এবারেও জাপান মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিল। গত বছরের মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান কুমারী হিরোমী জুকি এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন নি, হাঁটুতে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস ঃ রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-৭ ও ১৫-১ পয়েন্টে এস প্রিকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ ইতসুকো তাকেনাকা (জাপান) ১১-৩ ও ১১-৪ পয়েন্টে শ্রীমতী হেদার নেলসনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭০ সালের সদ্য সমাপ্ত বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪-০ খেলায় রাবার জয় রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যে অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে বে-সরকারীভাবে স্বীকৃত বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-১ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল তাদের যে এত কম সময়ের মধ্যে এরকম দুর্দশার হাল হবে তা কেউ কল্পনাও করেন নি। আসন্ন ইংলান্ড সফরের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এই রাবার জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকা স্বভাবতই আজ ক্রিকেট মহলের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা তার প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮৮৯ সালের ১২ মার্চ, পোর্ট এলিজাবেথ মাঠে। এর আগে টেস্ট খেলা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রচলন শুধু এই সাতটি দেশের মধ্যে—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সম্পর্ক আছে মাত্র এই তিনটি দেশের—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাক বড্ড বেশী উঁচু—দক্ষিণ আফ্রিকা অশ্বেতকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে ঘৃণা বোধ করে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আজও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের কোন ক্রিকেট খেলা সম্ভব হয়নি।

রুডি হার্টোনো

উপর্যুপরি ৩বার অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান। ফটো ঃ বলদেব দত্ত

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের জন্ম ১৮৯০ সালের ৮ এপ্রিল। এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮৮৯-৯০ সালে। টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের এম সি সি, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে নিয়ে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স নামে যে সংস্থাটি ১৯০৯ সালে গঠিত হয় বর্তমানে তার নামকরণ হয়েছে 'ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স।' বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য হল এই ৬টি দেশ—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। ১৯৬১ সালে 'কমনওয়েলথ' গোষ্ঠী থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বেরিয়ে আসার ফলে তারা 'ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে' সদস্য থাকার যোগ্যতা নষ্ট করেছে। সুতরাং ১৯৬১ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যেসব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে তা সবই বে-সরকারী। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন টেস্ট ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সের অনুমোদন নেই।

১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ১৪২টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে যেসব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তার পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল ঃ

সর্বাধিক রান এক ইনিংসে

৫৩৮ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), লিডস, ১৯৫১

সর্বনিম্ন রান এক ইনিংসে

(পুরা ইনিংসের খেলায়)

৩০ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), পোর্ট এলিজাবেথ, ১৮৯৫-৯৬

৩০ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), বার্মিংহাম, ১৯২৪

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান এক ইনিংসে

২৫৫ নটআউট—ডি জে ম্যাকগ্লু, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৫২-৫৩

ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান এক সিরিজে

৭৩২ রান—জি এ ফকনার, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯১০-১১ (খেলা ৫, ইনিংস ১০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৪, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৭৩-২০)

সর্বাধিক উইকেট এক ইনিংসে

৯টি (১১৩ রানে)—এইচ জে টেফিল্ড, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৬-৫৭

সর্বাধিক উইকেট একটি খেলায়

১৩টি (১৯২ রানে)—এইচ জে টেফিল্ড, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৬-৫৭

সর্বাধিক উইকেট এক সিরিজে

৩৭টি (৬৩৬ রানে)—এইচ জে টেফিল্ড, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫৬-৫৭

হ্যাটট্রিক

জি গ্রিফিন, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লর্ডস, ১৯৬০

সর্বাধিক রান

৩,৪৭১ রান—বি মিচেল (খেলা ৪২, ইনিংস ৮০, নটআউট ৯বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১৮৯, সেঞ্চুরী ৮ এবং গড় ৪৮-৮৮)

সর্বাধিক উইকেট

১৭০টি—এইচ জে টেফিল্ড (খেলা ৩৭, বল ১৩৫৬৫, মেডেন ৬০২, রান ৪৪০৫ এবং গড় ২৫-৯১)

সর্বাধিক ডিসমিসাল

১০১টি (ক্যাচ ৮৭ ও স্টাম্পিং ১৪)—জে এইচ বি ওয়েট (৩৬টি টেস্ট খেলা)

সর্বাধিক বার টেস্ট খেলা

৪৫টি—এ ডি নোর্স (সিনিয়র)

শ্রেষ্ঠ 'অল-রাউন্ডার' এক সিরিজে

৫৪৫ রান (৬০-৫৫) এবং ২৯টি উইকেট (২১-২৮)—জি এ ফকনার, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯০৯-১০

দঃ আফ্রিকার পক্ষে প্রথম

টেস্ট খেলায় জয় ঃ ১ উইকেটে (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), জোহানেসবার্গ, ১৯০৫-০৬

টেস্টের রাবার জয় ঃ ৪-১ খেলায় (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), ১৯০৫-০৬

টেস্ট সেঞ্চুরী ঃ ১০৬ রান—জে এইচ সিনক্লেয়ার (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), কেপ-টাউন, ১৮৯৯

এক ইনিংসে ৫০০ রান ঃ ৫০৬ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ, ১৯১০-১১

ডাবল সেঞ্চুরী ঃ ২০৪ রান—জি এ ফকনার (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ ১৯১০-১১

সিরিজের পাঁচটি খেলায় হার

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৩১-৩২ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই দক্ষিণ আফ্রিকা পরাজয় বরণ করে।

টেস্ট ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১৮৮৯-১৯৬০)

ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ-জিল্যান্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে জয়, হার ও ড্র

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হার	ড্র
ইংল্যান্ড	৯৪	১৭	৪৫	৩২
অস্ট্রেলিয়া	৩৯	৩	২৭	৯
নিউজিল্যান্ড	৯	৭	০	২
মোট:	১৪২	২৭	৭২	৪৩

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

বিপক্ষে	সিরিজ	জয়	হার	ড্র
ইংল্যান্ড	২২	৪	১৬	২
অস্ট্রেলিয়া	৯	০	৮	১
নিউজিল্যান্ড	৩	৩	০	০
মোট	৩৪	৭	২৪	৩

রঞ্জি ট্রফি

সেমি-ফাইনাল

বাংলা: ৭৪ **রান** (গোপাল বসু ৩২ রান। সেলিম দুরাণী **২২** রানে ৩, কৈলাস ঘাটানি **২৪** রানে ৩ এবং সি যোশী ৫ রানে ২ উইকেট)

ও ১৩৫ **রান** (অম্বর রায় ৪৯ রান। ঘাটানি ৬১ রানে ৪ এবং দুরাণী ৪১ রানে ৩ উইকেট)

রাজস্থান: ২৪৩ রান (লক্ষ্মণ সিং ৮৮ এবং সেলিম দুরাণী ৬১ রান। সুব্রত গুহ ৭৮ রানে ৫ উইকেট)

জয়পুরে আয়োজিত ১৯৬৯-৭০ সালের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এক-দিকের সেমি-ফাইনালে রাজস্থান শোচনীয়-ভাবে এক ইনিংস ও ৩৪ রানে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। চার-দিনের বরাদ্দ খেলা শেষ পর্যন্ত দুদিনেই শেষ। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সেমি-ফাইনাল খেলা দুদিনে শেষ হয়েছে এরকম নজির এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, রাজস্থান এই নিয়ে ৮-বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠলো এবং তারা ইতিপূর্বে ট্রফি জয়ী হয়নি।

রাজস্থান টসে জয়ী হয়ে বাংলাকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায়। প্রথমদিনেই বাংলার প্রথম ইনিংস ৭৪ রানের মাথায় শেষ হলে রাজস্থান প্রথম ইনিংসের ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৭০ রান সংগ্রহ করে ৯৬ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট।

দ্বিতীয় দিনে রাজস্থানের ১ম ইনিংস ২৪৩ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ১৬৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। দ্বিতীয় ইনিংসেও তারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৩৫ রানের মাথায় বাংলার ২য় ইনিংস শেষ হয়। দলের অধিনায়ক অম্বর রায় যা ৪৯ রান করেন। রাজস্থানের প্রথম ইনিংসের খেলায় বাংলার ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে চা-পানের সময় বাংলার **২য়** ইনিংসের রান ছিল ৭৪ (৪ উইকেটে)।

বিষেণ সিং বেদী

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই **প্রথম** ইনিংসের রানের ভিত্তিতে মহীশূরকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে বোম্বাই উপর্যুপরি **১২** বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠল। ইতিপূর্বে তারা উপর্যুপরি ১১ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়ে যেকোনো দেশের পক্ষে জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সর্বাধিকবার উপর্যুপরি জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মহীশূর : ৩০৯ রান (কিরমানি ৭৫ এবং জগন্নাথ ৬৮ রান। হাতিয়া, ইসমাইল, সোলকার এবং রেগে প্রত্যেকে **২**টি করে উইকেট পান)।

ও ৩৪৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ জি আর বিশ্বনাথ ৯৫ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল নট আউট ১০৫ রান। হাতিয়া ৮৮ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই : ৫২০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সারদেশাই ১৫৪, সোলকার ১০৫, ওয়াদেকার ৯১ এবং অশোক মানকাদ ৬০ রান। রাজাম্পা ১০৩ রানে ৩, বিজয়কুমার ৮৪ রানে **২** এবং চন্দ্র-শেখর ১৮১ রানে ২ উইকেট)।

ও ৫৭ রাণ (কোন উইকেট না পড়ে)

অর্জুন পুরস্কার

১৯৬৯ সালের জন্য সরকারী 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেছেন ১০ জন খেলোয়াড়। এঁদের মধ্যে আছেন এই দু'জন বাঙ্গালী—দীপু ঘোষ এবং বৈদ্যনাথ নাথ। অল-ইণ্ডিয়া কাউন্সিল [illegible] স্পোর্টসের সুপারিশে প্রতি বছর ভার[illegible] সরকার দেশের কৃতী খেলোয়াড়দের [illegible] অর্জুন পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

অ্যাথলেটিক্স: হারনেক সিং, ব্যা[illegible] মিন্টন: দীপু ঘোষ, বাস্কেটবল: হরি [illegible] ক্রিকেট: বিষেণ সিং বেদী, কুস্ত[illegible] (ভারতীয়): চাঁদগি রাম, ফুটবল: ইন্দ্র [illegible] স্যুটিং: রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী (কোটা[illegible] সাঁতার: বৈদ্যনাথ নাথ, স্কোয়াস র‍্যাকেট অনিল নায়ার, টেবল টেনিস : মীর কাশিম

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ক্লাব ফুটবল

মার্চ মাসের শেষদিকে তেহেরানে প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এশিয়া মহা[illegible] দেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান দলগুলো এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষের গত জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতায় সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলার আই এফ এ দল ভারতবর্ষের পক্ষে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। আই এফ এ দলের প্রথম খেলা পড়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান দলের সঙ্গে।

নিম্নলিখিত ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে আই এফ এ দল গঠিত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অশোক চ্যাটার্জি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ইস্ট-বেঙ্গল দলেরই শান্ত মিত্রের নেতৃত্বে আই এফ এ দল শেষবার (১৯৬৯ সালে) সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন ইস্টবেঙ্গল দলের ৮ জন, মোহন-বাগান দলের ৭ জন, মহমেডান স্পোর্টিং দলের ২ জন এবং খিদিরপুর দলের ১ জন।

গোলরক্ষক : বলাই দে (মোহনবাগান) এবং কানাই সরকার (ইস্টবেঙ্গল

ব্যাক: সুধীর কর্মকার ([illegible]বেঙ্গল), সি প্রসাদ (মোহনবাগান), শান্ত মিত্র (ইস্টবেঙ্গল), ভবানী রায় (মোহনবাগান), কল্যাণ সাহা (মোহনবাগান), অশোক ব্যানার্জি (খিদিরপুর) এবং সুনীল ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল)।

হাফ-ব্যাক: প্রিয় মজুমদার (মোহন-বাগান), কাজল মুখার্জি (ইস্টবেঙ্গল) এবং কালন গুহ (ইস্টবেঙ্গল)।

ফরোয়ার্ড : অশোক চ্যাটার্জি (ইস্ট-বেঙ্গল) — অধিনায়ক, বিমান লাহিড়ী (মহমেডান স্পোর্টিং), হবিব (ইস্টবেঙ্গল), এস ভৌমিক (মোহনবাগান), এস ঘোষ দস্তিদার (মোহনবাগান) এবং সরদার খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 3rd April, 1970. শুক্রবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৭৬ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রসাদ বেরা

চিঠিপত্র

ক্রন্দসী কলকাতা

গত ৬ মার্চ ১৯৭০ অমৃতের ৪৩শ সংখ্যায় 'ক্রন্দসী কলকাতা' প্রসঙ্গে শ্রীলোকেশরঞ্জন গুহের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে, একটি সরল সত্যকে অস্বীকার করতে গুহ-মশাই বিপুল পরিশ্রম করেছেন।

চলন্তিকার ভূমিকায় আছে 'বাংলা ভাষায় একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে,—যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে...।'

কাজ চলে বলেই হয়তো শ্রবণক তাঁর ২৭ ফেব্রুয়ারীর অমৃতের চিঠিতে বলেছিলেন, 'হাতের কাছে থাকে।' যথেষ্ট যে নয়—সেকথা তো চলন্তিকাকার বসুমহাশয় নিজেই বলেছেন—'ছোট অভিধান'। কিন্তু শ্রীগুহের 'পণ্ডিত না হলেও মূর্খ নন' বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা কি বলতে পারেন, চলন্তিকা ভুলতথ্যসমাকীর্ণ?

কাজী আবদুল ওদুদ এবং অনিলচন্দ্র ঘোষের 'ব্যবহারিক শব্দকোষে' যেমন 'ক্রন্দসীর' রোরুদ্যমানা অর্থের পর কবিপ্র নেই, তেমনি ঋষি দাসের অভিধান 'আধুনিকী' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা ভাষার অভিধান, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ' এবং সুবল মিত্রের অভিধানে রোরুদ্যমানা অর্থটাই নেই। এই সব অভিধানে 'ক্রন্দসী'র অর্থ আছে—'আকাশ ও পৃথিবী', 'দিগাঙ্গনা' ও 'চিৎকারকারী সেনান্বয়'। শ্রীগুহের মতানুসারে 'ক্রন্দসী' শব্দটি যদি স্বাভাবিকভাবেই ভাষায় স্থান পেয়ে থাকবে তাহলে ইং ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'আধুনিকী'তে এবং সাম্প্রতিককালের অন্যান্য অভিধানেও স্পষ্ট উল্লেখ থাকতো—ক্রন্দসীর আর এক অর্থ 'রোরুদ্যমানা'। 'ক্রন্দসী'র অর্থ যে 'রোরুদ্যমানা' নয় দিনের আলোর মত তা পরিষ্কার, এবং অবারিত এই সত্যটিকে অগ্রাহ্য করার জন্য শ্রীগুহ এত শ্রম স্বীকার করেছেন কেন তা বুঝতে পারা যায় না।

প্রায় সমস্ত অভিধানকারই একটি মাত্র কবিপ্রয়োগ উল্লেখ করেছেন : 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে'—নজরুল। কাজী নজরুলের মত উদ্দাম অস্থিরচিত্তের স্বভাবশিল্পীর পক্ষে 'ক্রন্দসী' শব্দের ব্যাকরণানুগ ব্যবহার সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। কিন্তু পৃথিবী বিখ্যাত ধুরন্ধর লেখক-কবিরা অনেক সময় শব্দের ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগ করেন নি। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক বলজ্যাকের লেখা প্রেসে এলে কম্পোজিটর প্রমাদ গুণতেন। কমা নেই, ফুলস্টপ নেই, সিনট্যাকস ঠিক নেই, গ্রামারের বালাই নেই। বলজ্যাকের পাবলিশার বড় বড় গ্রামারিয়ান ঠিক করে রাখতেন, শুধু তাঁর লেখা নির্ভুলভাবে ছাপানোর জন্য।

পরিশেষে বলি, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অরিজিন এ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাংগুইজ' বইটি একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাত্র আটটি বছর ভাষার ইতিহাসে একটি পলকমাত্র। আট বছরে কোন শব্দ (যা একবার মাত্র বিদ্রোহী কবি ব্যবহার করেছেন) স্বাভাবিকভাবে ভাষায় স্থান পেতে পারে না। তার আগে সেই শব্দের বহুল ব্যবহার দরকার, দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন।

'ক্রন্দসী' শব্দটি সম্বন্ধে প্রয়োগের দাবী করেছেন শ্রীগুহ, কিন্তু নজরুল ছাড়া আর কয়জন লেখক বা কবি 'ক্রন্দসী'কে 'রোরুদ্যমানা' অর্থে ব্যবহার করেছেন? সাধারণ বাংলা গদ্যে কেন প্রয়োগ পাওয়া যায় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তো স্পষ্টই বলেছেন—'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই। কিন্তু 'রোদসী' পাইয়াছি। রোদসী অনুকরণে অনুপ্রাস অনুরোধে 'রোদসী'র স্থলে 'ক্রন্দসী'।

নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দান অনস্বীকার্য। তবুও তিনি বারংবার ব্যবহার করা সত্ত্বেও সেই শব্দকে ভাষায় প্রচলন করা যায় নি—যেমন অনুকম্পাকারীর পরিবর্তে 'অনুকম্পায়ী', রাত্রিকে 'রৌদ্রময়ী' বলেছেন তিনি। কিন্তু আজকের এই কবিতা আন্দোলন, নতুন রীতির গল্প, মিনি পত্রিকা, নানা প্রগতিশীল সাহিত্যচিন্তায় কন্টাকীর্ণ বাংলার কোন কবি কি লেখক তো 'অনুকম্পায়ী' লিখছেন না! লিখছেন না 'রৌদ্রময়ী' রাত্রি!

সত্যি কথা, পণ্ডিতদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আ ম রা 'অর্ধাঙ্গিণী', 'আবশ্যকীয়', 'সকাতরে', 'সক্ষম', 'চাকচিক্য' লিখি এবং অনেকেই হয়তো জানেন না, উপরোক্ত শব্দগুলো ভুল। 'ক্রন্দসী' শব্দটির ব্যবহার কি 'অর্ধাঙ্গিনী', 'সকাতরে' ইত্যাদি শব্দের মত বহুল প্রচলিত?

শ্রীগুহকে অনুরোধ করবো, শিশু-সাহিত্যসম্রাট সুকুমার রায় তাঁর 'হ-য-ব-র-ল'তে 'ক্রন্দসী' নিয়ে যা লিখেছেন তা স্মরণ করতে—'কারে কয় ক্রন্দসী' কারে কয় অরণি...'।

অধিরথ
কলকাতা—২৭

(২)

৬ মার্চ তারিখের অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে লোকেশরঞ্জনবাবুর বক্তব্য পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য আছে। 'কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ কটাক্ষের অর্থ—কটাক্ষ : (পুং) অপাঙ্গদর্শনম্ (আড়চোখে দেখা)। অপাঙ্গদর্শন যে তীব্র সমালোচনা বা সম্যকরূপ দর্শন নয়—একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। 'ক্রন্দসী'র প্রয়োগের ব্যাপারেও তাই বলতে চাই যে, শব্দমাত্রেরই একটা মৌল অর্থ থাকে। 'কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের শব্দকল্পদ্রুমে 'ক্রদ' 'ক্রুন্দ' রোদঃ, রুদ্ প্রভৃতির মূলগত ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে কিন্তু 'ক্রন্দসী' বা 'রোদসীর' কোন উল্লেখ নেই—'রোদিতি'র উল্লেখ আছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে ক্রন্দসীর কোন ব্যাখ্যা নেই—'ক্রন্দসী'র অর্থ আকাশ (ফার্মানেন্ট); আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ আছে। অন্যান্য অভিধানেও তাই। (কোথাও কোথাও কবি প্রয়োগের উল্লেখ আছে—অতি-আধুনিক অভিধানে তাও নেই।) কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে 'ক্রন্দসী' আকাশ অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে; পরে অন্য কবির হাতে তার অর্থান্তর ঘটেছে।

এখন দেখা যায় বহু অপপ্রয়োগ শব্দ প্রয়োগবাদের চাপে পড়ে চলে যাচ্ছে। উদাহরণেরও অভাব নেই। আঙ্গিক—শুদ্ধ অর্থ অঙ্গসম্বন্ধীয় অথচ কৌশল বা টেকনিক হিসেবেই চলছে। তদ্রূপ দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণ পথ ইত্যাদি। 'ক্রন্দসী'র মূলে এই এক রহস্য জড়িত। তবে 'ক্রন্দসী'র অর্থ রোরুদ্যমানা এখনও ঠিকভাবে মেনে নেওয়ার সময় আসে নি। ভাবীকাল হয়ত অন্যান্য অপপ্রয়োগ শব্দগুলির মতো একেও মেনে নেবে।

সুধাময় আচার্য
কলকাতা—৩২

সাহিত্যে চুরি

এ সপ্তাহের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকমল লাহিড়ীর লেখা একটি চিঠিতে জানতে পারলাম যে, বেশ কিছুদিন আগে লেখা আমার 'মহড়া' নামক একটি উপন্যাস পুস্তকাকারে কে বা কারা বাজারে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সংসার' এবং লেখকের নাম : বিমল মিত্র।

প্রকাশক ভদ্রলোকের বোধহয় আমার উপর কোনো রাগ আছে, নইলে উপন্যাসটি বেমালুম মেরে দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে আমার নামটা পর্যন্ত গায়েব করতেন না।

চিঠিপত্র

শুনেছি, স্পেনে বুলফাইটিং দেখতে গিয়ে একবার হেমিংওয়ের পকেট মারা যায়। তিনি পরদিনই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, যিনি দয়া করে পকেট মেরেছেন তিনি যেন ততোধিক দয়া করে পার্সের টাকা-পয়সাগুলি গ্রহণ করেন, কারণ তাঁর হাতের নিপুণ্য সে পুরস্কারের দাবী রাখে। তবে তিনি দয়া করে তাঁর পার্সটি ফেরৎ দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে হেমিংওয়ে অত্যন্ত বাধিত থাকবেন তাঁর কাছে।

এই রকম পকেটমার প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে লেখকদের বলার সময় এসেছে, যে আমাদের লেখা বই ইচ্ছেমত ছাপিয়ে যান তবে দয়া করে সঙ্গে লেখকের নামটাও ছাপাবেন। আমার লেখা অগ্রজ বিমল মিত্রর চেয়ে সম্ভবত অনেক খারাপ, এবং সে কারণে আমার লেখার উপর তাঁর নামের ছাপ পড়লে তাঁর পক্ষেই বেশী বিচলিত হবার কথা।

যাই হোক, শ্রীলাহিড়ী যদি এক কপি [illegible] আমাকে দয়া করে পাঠান অথবা কোথায় এই বই নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেতে পারে তার ঠিকানা দেন, তাহলে আমার সতীর্থদের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু [illegible] ঝামেলা শুরু করা যায়। এই সব প্রকাশকের মুখোশ একবার খুলতে পারলে আইনগত (এবং প্রয়োজনবোধে অ-আইনীও) শিক্ষা দেওয়ার আশু বন্দোবস্ত করা যাবে।

শ্রীকমল লাহিড়ীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন।

বুদ্ধদেব গুহ
কলকাতা।

(২)

৬ই চৈত্রের অমৃতের সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে সাহিত্যে ডবল নকল পড়লাম। সাহিত্যে নকল কি লেখকের নামে, কি বিষয় নিয়ে এটা দেখছি অনেক দিন ধরে চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটা ঘটনার অবতারণা করছি। এবারের দুটি শারদীয় পত্রিকা আমার হাতে এসেছিল। এই দুটি পত্রিকায় একই গল্প ভিন্ন নামে ছাপা হয়েছে। গল্পটির লেখক সমরেশ বসু। একটিতে নাম 'ঘুম ভাঙানীয়া' আর একটিতে 'অন্তঃস্রোতা'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু একটি পত্রিকা মারফত বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন তিনি কোন কোন শারদীয়াতে লিখেছিলেন। তার মধ্যে আমার দেখা পত্রিকা দুটির নাম ছিল না। তাহলে প্রশ্ন জাগে এ সমরেশ বসু কে?

বাংলা সাহিত্যে এই হরেক রকমের চুরি, পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আইন থাকা দরকার এবং অপরাধীদের কঠোর সাজা দেওয়ার প্রয়োজন।

শংকর মিত্র,
পুরুলিয়া।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অনেক পেছনে ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থনে কিছু কথা যে হারিয়ে যাবে, বড়ো ঘটনা ছোটো হবে এবং ছোটো ঘটনা ব্যক্তিগত কারণে বড়ো হয়ে দাঁড়াবে, এতো অতি সাধারণ কথা। অতীতের কবর খুঁড়ে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী যে নিজের শিল্পী সত্তাকে এবং সেই সঙ্গে যে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সে শিল্প সত্তাকে গড়ে তুলেছিলেন,—সেই বিগত একটা যুগের কথাও 'আত্মচরিতে' তুলে ধরার প্রয়াস করছেন। যেখানে স্মরণ শক্তির দুর্বলতার দরুণ কিংবা অন্য কারণে কোনো বিশেষ ঘটনাকে ক্ষুদ্র বা উহ্য করার প্রয়াস থাকে তর্কের ঝড় সেখানেই ওঠে। নটসূর্যের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি. তাই বোধ হয় তাঁর আত্মচরিতে তথ্যের ফাঁকগুলো সতর্ক পাঠকদের নজর এড়াচ্ছে না।

অমৃতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নটসূর্যের আত্মচরিতটি যে সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। উনি যে কারুর মুখ চেয়ে লিখছেন বা লিখবেন—এমন কথা ভাবা ও যেমন অপরাধ, আশা করাও তেমনি অন্যায়। স্বাতন্ত্র্যবোধ না থাকলে যে-কোনো রচনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়। সুতরাং যা লিখছেন, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং সেটাকে চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়তো ভালো। তবে একথা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক বা অসঙ্গত হবে না যে, সত্যসন্ধানী সূক্ষ্ম হিসেবীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত-সত্যের অনেক গলদ ধরা পড়লে প্রতিষ্ঠিত-সত্যের মূল্য তো কমে না বরং সে-সত্যের ভিত্তিটা সুদৃঢ় হয় বলেই আমার বিশ্বাস।

শিল্প-সাহিত্যে যাঁরা দোষ-ত্রুটি নিরূপণ করেন, তাঁরা আমার মতে—

"fertile in suggestion, ruthless in [illegible] and vigilant' in the detection of error (acknowledgement page—A Dictionary of Modern English usage by Fowler)

দোষ-ত্রুটিগুলো কোনো বৃহৎ কাজের প্রস্তুতি সময়ে নির্দেশ করাই ভালো, তাতে ভবিষ্যতে পদক্ষেপ বেশি সতর্ক এবং বলিষ্ঠ হতে সাহায্য করে বলে আমার ধারণা।

কল্যাণ সিংহ,
পাটনা—৬।

কলকাতায় বসন্ত প্রসঙ্গে

আমরা কলকাতার বাসিন্দা। কোন এক সময়ে গাঁয়ে বাস ছিল। বসন্তকাল সঠিক বুঝবার বয়স তখন নয়। তবে শীতের পরই প্রকৃতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন অবশ্য নজর এড়াতো না। বিশেষ, আম-জাম গাছে মুকুলের সমারোহে মন ভরে যেত। ভাবতাম, সুদিন আসতে আর দেরী নেই। সেই আশায় বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। গাছে-গাছে নতুন পাতা। তখনো সবুজ নয়, ঈষৎ লালচে। ছিঁড়ে নিয়ে নাকের কাছে ধরতাম। প্রায়-শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলো আবার কেমন তেজীয়ান হয়ে উঠতো, অবাক হয়ে দেখতাম। হাঁটিতে-হাঁটিতে এসে দাঁড়াতাম সেই বিরাট বটগাছের নীচে। অসংখ্য কোকিল পালা করে ডাকছে। এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে যাচ্ছে। বটের ফলে গাছতলা ভরে গেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর বাড়ি ফিরে মাকে বলতাম, সব গাছে নতুন পাতা, আমের মুকুল, কোকিলের ডাক। মা বলতেন, এটা বসন্তকাল। ওরকম মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়িয়োনা। ঠান্ডা-গরমে জ্বর হলেই বসন্ত হবে।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেতো, চারদিকে এত সমারোহ তবে বসন্ত হবে কেন? প্রশ্নটা মনেই রাখতাম। কাউকে বলার সুযোগ পাই নি।

তারপর বয়স বেড়েছে। বসন্তকাল এবং বসন্তের সম্পর্ক বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু যখন বুঝলাম তখন বসন্তকাল শুধু হাজিরার খাতায়ই রয়েছে আর কোনভাবে তা উপলব্ধি করতে পারি না। তবে বসন্তের প্রকোপ উপলব্ধি করতে পারি। প্রতি বছরই টের পাই, কলকাতা শহরে বসন্ত খুব হচ্ছে। তাই বসন্তকালে এখন বসন্তের টিকা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অন্য চিন্তার ফুরসৎ পাই না। কলকাতার অবশিষ্ট গাছ-গাছালিতে নতুন পাতা নিশ্চয়ই ধরে, ফুলের সমারোহও আছে। যা নেই তা হলো বসন্ত ঋতুর যথার্থ পরিবেশ। এর যাওয়া-আসার ঠিক-ঠিকানা আমাদের অজানা।

অমৃতের ৪৬ সংখ্যায় 'কলকাতায় বসন্ত' প্রসঙ্গে শ্রীশুভঙ্কর পাঠকও এর বেশি আমাদের উপহার দিতে পারেন নি। তবু তাঁকে ধন্যবাদ, তিনি কার্নিসের কোকিলের কুহু-কুহু অনেক দূরে প্রসারিত করে ক্ষণিকের জন্যও বসন্তের আমেজ আমাদের মনে ধরাতে পেরেছেন।

বসন্ত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা—২৬

শা[illegible]চোখে

অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রণ্টের কিছু কিছু শরিক ফ্রণ্ট রাজত্বকালে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে আসছিলেন। এই অভিযোগের মূল কারণ ছিল, যখনই শরিকী সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশ নির্লজ্জের মত মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শুধু পক্ষাবলম্বন করে নি, এমন কি কোথাও কোথাও মার্কসবাদীদের আক্রমণের হাতিয়ার রূপেও কাজ করেছে। এই অভিযোগগুলি কতটুকু সত্য তা অনেকেরই জানবার কথা নয়। কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট ও নকসালবাদীদের লড়াই গড়ের মাঠে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা সকলেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, পুলিশ সেদিন মার্কসবাদীদের ভেনগার্ড হিসাবে মনুমেন্টের পাদদেশে নকশাল নেতা কানু সান্ন্যালের প্রথম সভা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আর পুলিশের সাঁজোয়া বাহিনীর পিছন থেকে বীরবিক্রমে নকসালবাদীদের উপর মার্কবাদী স্বেচ্ছাসেবকরা আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করেছিলেন। কার দোষে সেদিন লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু পুলিশকে সামনে রেখে ব্যূহ রচনা করে নকশালবাদীদের উপর যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে ঘটনা। নকশাল নেতা কানু সান্ন্যালকে দেখবার জন্য যে আগ্রহী জনতা সেদিন জমায়েৎ হয়েছিল তাঁরা বুঝেছিলেন কংগ্রেসী পুলিশ কি যাদুদণ্ড স্পর্শে রাতারাতি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পুলিশে রূপান্তরিত হয়েছিল!

সেদিন নকশালবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যুক্তফ্রণ্টের অন্য কোন শরিক দলকে পুলিশী বর্বরতা বা পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় নি। বরঞ্চ নেপথ্যে হেসেছিলেন। কারণ নকশালবাদীরা ফ্রণ্টের বিপ্লবী দলগুলির কাছে অপাঙক্তেয়। কেননা তাঁদের ধারণা নকশালীরা এক 'শিশুসুলভ চপলতায়' মেতে উঠে বিপ্লবী কর্মকান্ডকে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক থেকে মতান্তর থাকলেও যদি পুলিশী নিপীড়নকে লজ্জিকাল বলে গণ্য করা হয় তবে সেই যুক্তি সকলের উপরই যে প্রযোজ্য হতে পারে সেকথা সেদিন সকল বামপন্থী দলই ভুলে গিয়েছিলেন। মুখে সকলে রাজনৈতিক দিক থেকে নকশালবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার কথা বললেও আসলে পুলিশী নির্যাতনের মাধ্যমেও তাঁদের শায়েস্তা করার প্রয়াস যে হয়েছে বিভিন্ন স্থানে ইস্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলস-এর নিয়োগের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকরাও তাঁদের কর্মীদের উপর পুলিশী হামলা যখন হয়েছে তখন প্রতিবাদ করেছেন প্রত্যেকেই পৃথকভাবে কিন্তু কেউ এক-জোটে সেই প্রতিবাদ করবার সাহস পান নি বা করেন নি। কেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা করতে পারেন নি তার কারণ একটু গভীরে। কেউ কেউ অন্য শরিক দলের সেই প্রতিবাদ বিজ্ঞানসম্মত হয় নি বলে এড়িয়ে গেছেন আবার কেউ বা ফ্রন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে বলে প্রগতিবাদী সেজে থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ যতক্ষণ স্বীয় দলের উপর আঘাত আসে নি ততক্ষণ ফ্রণ্টের প্রতি দরদ ছিল অসীম এবং মার্কসবাদী পুলিশ মন্ত্রীর কর্মদক্ষতার উপর আস্থা ছিল অচল। আর এই অনেকের সুযোগ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে স্বয়ং শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে এক-একটি গল্প বলেছেন। আবার সেই গল্পের ভিত্তি ছিল পুলিশ রিপোর্ট। অন্যরা 'সাধু সাধু' বলে সেই সমস্ত কথাকে হজম করেছেন এবং যে-সব দল অভিযোগ করছিলেন তার সত্যাসত্য মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বা প্রগতিশীলতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে অংশীদারটা আসলে প্রগ্রেসিভ কিনা তা নিরূপণের চেষ্টায় রতী হয়ে থাকতেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়। আসানসোলের কোলিয়ারী অঞ্চলে প্রথম যখন শরিকী লড়াই সুরু হয় তখন এস এস পি থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য কোন শরিক সে সমস্ত ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন [illegible] এমন কি যখন কার্ফু ভেঙ্গে পু[illegible] সহায়তায় গরীব মজুরদের উপর [illegible] করা হত, প্রাণে মারা হত এবং [illegible]দের পর্ণকুটিরে আগুন লাগিয়ে দি[illegible] তাঁদের সত্যিকারের 'সর্বহারা' করে তোলা হত তখনও অন্য কোন শরিক প্রতিবাদে অঙ্গুলি হেলন করেন নি। কিন্তু যে মুহূর্তে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের উপর সেই অঞ্চলে আক্রমণ শুরু হল তখন সি পি আই এসে যোগ দিলেন। পরে যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের উপর আক্রমণ হল তখন তাঁরাও প্রগতির মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়লেন। সকল গুণী পাঠকেরই মনে আছে সে সময় জ্যোতিবাবু পুলিশ রিপোর্ট আন্দোলিত করে বলতেন—এই ত পুলিশ রিপোর্ট, সেরকম কিছু ঘটনার ত এখানে কোন উল্লেখ নেই।

ঐ সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবু বলতে চাই শ্রীজ্যোতি বসু ও তাঁর দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কি করে তাঁদেরই আস্থাভাজন পুলিশ বাহিনীর উপর চটে গেলেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশী অত্যাচারের একটি তালিকা পেশ করে বলেছেন কি নৃশংসভাবে তাঁর দলের কর্মী ও নেতাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে বর্তমানে প্রতিনিয়তই মহাকরণে প্রতিবেদন আসছে এই সমস্ত অভিযোগকে নস্যাৎ করে। যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এই এক বৎসরকাল পুলিশী রিপোর্টের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন এবং একদিন যাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিলেন তাঁদের অভিযোগকে এক নিমিষে নস্যাৎ করতে দ্বিধা করেন নি এবং প্রকাশ্য সেই অভিযোগকারী দলগুলিকে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী বলে আখ্যাত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি— এখন যদি সপ্তাহকালের মধ্যেই সেই পুলিশ 'অসৎ' হয়ে গেছে বলে তাঁরা বিবৃতি প্রচার করেন জনতা তা বিশ্বাস

করতে পারবে কি? মার্কসবাদীরা বলতেন শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে বলেই অন্য অংশীদাররা আতঙ্কিত বোধ করছিলেন। কাজেই শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে পুলিশ মার্কসবাদীদের সাহায্য করে এতদিন নিশ্চয়ই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণী সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরীরা রাতারাতি এখন পালটে গেলেন কি করে প্রমোদবাবু তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে সে সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেন নি।

যা হোক প্রমোদবাবুর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাতরোক্তি থেকে একটি বড় লাভ হল এই যে অন্যান্য অংশীদাররা দীর্ঘদিন ধরে যে অভিযোগ করে আসছিলেন রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদবাবুরা তার স্বীকৃতি দিলেন। এবং এই একটি প্রশ্নে সকল বামপন্থীরা আবার এক হয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি শাসনের এটাই প্রত্যক্ষ সুফল। সকল দলগুলির মধ্যে আবার বন্ধু-বন্ধু ভাবের উদয় হওয়ার অন্তত একটি যোগসূত্র পাওয়া গেল। এই পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য অচিরেই একটি ফ্রন্টের মাধ্যমে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য আলোচনা যে সুরু হবে সে সম্পর্কে সমদর্শী একেবারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বৎসরাধিক কাল ফ্রন্ট গদীতে আসীন ছিল আর পুলিশের কর্ণধার ছিলেন স্বয়ং শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়। সমদর্শী বার-বার বলেছে পুলিশ একটি ভিন্ন জাতি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে তাঁদের অমানুষ করে তুলবার জন্য যে আচরণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার অবিলম্বে সংশোধন বা পরিবর্তন করে পুলিশকে গণ-দরদী করে তোলার প্রয়োজন আছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যক্রম দেখে মনে হয় তিনি এ বিষয়ে নজর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। তবু যখনই বিপাকে পড়েছেন তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন। কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত ধুরন্ধর পুলিশ অফিসাররা শ্রীবসুর দ্বারা প্রতিনিয়ত তিরস্কৃত হয়েছেন তাঁরাই আবার ফ্রন্ট আমলে মার্কসবাদের বুলি আউড়ে প্রগতিশীল সেজে সেই পুরানো ঢঙে ঘটনার বিকৃত রিপোর্ট করে শ্রীবসুর আস্থাভাজন হয়েছিলেন। আর শ্রীবসু ও তাঁর দল ফ্রন্টের কার্যসূচী অনুযায়ী পুলিশকে 'নিরপেক্ষ' করে রেখেছেন বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। একজন বাঘা কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী পুলিশমন্ত্রী দলীয় বা ফ্রন্টের স্বার্থে পুলিশকে শুধু 'নিরপেক্ষ' রাখার মধ্যেই তাঁর কর্তব্য যথাযথ সম্পাদিত হয়েছে যদি মনে করেন অন্তত সে যুক্তির সঙ্গে সমদর্শী সহমত হতে নারাজ। তাঁর উচিত ছিল পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের দিকেও সঙ্গে সঙ্গে নজর দেওয়া। শ্রীবসু তা করেন নি বা করবার চেষ্টাও করেন নি। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন তাঁদের রাজত্বকালের মধ্যেই ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবাংলার ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিপ্লব হয়ে যাবে এবং তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে প্রশাসনের সর্বস্তরে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে যাবে। এবং পুলিশও সেই আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে একেবারে 'লাল ফৌজে' বা 'মুক্তি সেনায়' রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে কৌশল করে ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করা যায় না। শ্রীবসু সেইখানেই ভুল করেছেন এবং তারই জন্য কোন বুনিয়াদী পরিবর্তনের প্রতি তিনি নজর দেন নি। নতুবা পুলিশ বাহিনীর সশব্দ সেল্যুট বা সালাম তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে অপ্রীতিভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন নি। সেই কারণেই বোধহয় বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও পুলিশমন্ত্রী হিসাবে তিনি চুনোপুঁটির ভাতে হাত দিয়েছেন কিন্তু রাঘব বোয়ালদের দিকে হাত বাড়াতেও সাহস করেন নি। গদীচ্যুতির কিছুদিন আগে পুলিশ বদলীর ব্যাপার নিয়ে তিনি ও মুখ্যমন্ত্রী যে দৈবরথে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা এমন কিছু মৌলিক কর্ম নয়। নিজস্ব জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার একটা কৌশল ছাড়া এই ঘোষিত যুদ্ধের অন্য কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দলীয় কাজই করে গেছেন, পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের নেতৃত্ব দেওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি তিনি গড়তে পারেন নি।

সহৃদয় পাঠকরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন হরতালের দিন বর্ধমানে সাঁই পরিবারের লোকজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদীরা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলে চারিদিকে চীৎকার উঠবার পর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত দলীয় স্বার্থের উপরে উঠে বলেছেন, শুধু সাঁই ভ্রাতৃবর্গ কেন হরতালের দিন আরও যে ৩৪ জন প্রাণ হারিয়েছে সেই সম্পর্কেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত হউক। প্রমোদবাবুকে ধন্যবাদ। অন্তত এতদিন পরে হলেও আরও অন্য হতভাগ্য কুলি-মজুরদের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গোপীবল্লভপুর ও দেবরায় নকশালরা যখন বেছে বেছে জোতদার খুন করছিলেন তখন সেখানে তাঁরই পার্টির নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্টার্ণ রাইফেলের সৈনিকদের নিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠে নি। কারণ নকশালরা ওখানে তাঁদের প্রভাব বাড়িয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত অঞ্চলে নিশ্চয়ই আসানসোল কিম্বা দক্ষিণ ২৪ পরগণার মত 'গণহত্যা' অনুষ্ঠিত হয়নি। আর প্রমোদবাবু হরতালের দিন যে অভাগারা প্রাণ প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। কিন্তু ফ্রন্টের এক বৎসর রাজত্বকালে গোটা রাজ্যব্যাপী যে-সব দরিদ্র কৃষক, মজুর মধ্যবিত্ত প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের সকলের জন্য অনুসন্ধান কমিটি বসবার কথা বলতে তাঁর দ্বিধা হল কেন? আজকে ফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় বর্ধমানের এই ঘটনা যদি ঘটত তবে কি প্রমোদবাবু সকলের কথা উল্লেখ করে দুঃখিত হতেন? এখনও যেমন 'গুণ্ডা মরেছে' বলে ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করবার চেষ্টা করছেন তখন রাষ্ট্রশক্তির জোরে প্রমাণ করতেন 'গুণ্ডাই মরেছে' এবং মহাকরণ থেকে সত্যসম্বলিত প্রেসনোট জারী করে সমস্ত ঘটনার যবনিকা পাত করতেন। অন্যথা হত কি? কাজেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের মতে তখন যদি বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার আসানসোলের ঘটনা সম্পর্কে শ্রীজ্যোতি বসুকে সত্য রিপোর্ট দিয়ে থাকেন তবে এখন সেই প্রগতিশীল অফিসাররা বর্ধমান শহরের ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন বলে কি করে ধরে নেওয়া যায়? মার্কসবাদীদের বর্তমান বক্তব্যকে যদি ঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় অর্থাৎ চাপে পড়ে সেই মহিমান্বিত অফিসারবৃন্দ একপেশে রিপোর্ট পেশ করছেন তবে আগে সেই রাজপুরুষেরা মোহমুক্ত ছিলেন এ বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় কি? কাজেই সহজেই অনুমান করা যায় সোনারপুর, বারুইপুর, মথুরাপুর, কুলপি, ডায়মণ্ডহারবার বা জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে যা ঘটেছিল তা সত্য। এবং ফ্রন্টের অংশীদাররা যে সমস্ত অভিযোগ করেছিলেন তা সত্য। শুধু মার্কসবাদীদেরই পুলিশ সম্পর্কে দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। অন্য অংশীদারদের নয়।

অবশ্য রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ন্যায্যভাবেই একটি কথা উঠেছে। সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট আমলে মজুর কিষাণ মধ্যবিত্ত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল তা যেন কেড়ে না নেওয়া হয়। অর্থাৎ কিষাণরা যে জমি দখল করেছিল বা মজুর মধ্যবিত্ত যে বেতন বৃদ্ধি করে নিতে সমর্থ হয়েছিল তা থেকে যেন তাঁদের বঞ্চিত করা না হয়। বক্তব্যটা খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং সকলের সমর্থনের যোগ্য। এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কম্যুনিস্ট, আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি ও ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থনও করেছেন এবং অন্যথা কিছু হলে গণ-আন্দোলনের হুসিয়ারীও দিয়েছেন। কিন্তু সকল দলই মেহনতী মানুষের আর একটি লাভের কথা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে গেছেন। সেটা হচ্ছে পুলিশকে হাতিয়ার করে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সুযোগ। মার্কসবাদীরা যদি এই লাভটাকেও ধাওয়ান সাহেবকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারেন তবেই ভাল হয়। অন্য শরিকদলও আশা করি এই দাবীকেও সামনে রেখে আন্দোলনে অনতিবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এই দাবীটা যদি মানিয়ে নিতে পারেন তবে অন্তত প্রমোদবাবুদের পুলিশের প্রতি একটি 'ইউনিফরম এটিটিউড' বজায় থাকবে। নতুবা নয়।

দেশে বিদেশে

কেরলে শ্রীঅচ্যুত মেননের সরকার তাঁদের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আর এস পির একটি প্রস্তাবের ফলে নতুন সংকটের সামনে এসেছে। জম্মু ও কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ সাদিক ও কংগ্রেস প্রধান মীর কাশিমের বিরোধ মিটে গেছে এবং তার ফলে সাদিক সরকারও আপাত টিকে গেল। অন্যদিকে, অকালী নেতা সন্ত ফতে সিংয়ের বিরাগভাজন হয়েও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন হারিয়ে পাঞ্জাবের গুরনাম সিং তাঁর সরকার ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় খবর হচ্ছে, নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছেন।

এ ছাড়া, এক সপ্তাহের অন্যান্য বড় খবরের মধ্যে আছে, ভূমিকম্পে দক্ষিণ গুজরাটের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। ভারতের প্রবীণতম পার্লামেন্টারিয়ানদের একজন, শ্রীজয়পাল সিং, মারা গেছেন।

গুজরাট বিধান সভায় শক্তি পরীক্ষায় জিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরান সহজ হবে না।

কিন্তু এই শক্তি পরীক্ষার আগে ঐ রাজ্যে দল ভাঙা ভাঙির যে ধরনের খেলার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সেটা রীতিমত কুৎসিত। এই নিয়ে বিধানসভার সদস্যদের হোস্টেলে হাতাহাতি হয়ে গেছে বলেও খবর বেরিয়েছে।

গুজরাটের একজন স্বতন্ত্র পার্টিভুক্ত সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, পুরানো কংগ্রেসের একজন সদস্যের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘুষ দিতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলে পুরানো কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী সেখানে আসেন এবং আবার তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষ দিতে চান। তাঁরা নাকি একটি রুমালের মধ্যে এ টাকাটা রেখেও যায়। স্বতন্ত্র পার্টির ঐ সদস্য আরও বলেছেন যে, তিনি তাঁর ছেলেকে ঐ টাকাটা বাড়ীর বাইরে ফেলে দিতে বলেন। পুরানো কংগ্রেসের কর্মীরা নাকি বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করছিলেন এবং টাকাটা বাইরে ফেলে দেওয়া মাত্র তাঁরা ঐ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যান।

বিধানসভায় স্বতন্ত্র দলের নেতা মহারাজা জয়দীপ সিংও (শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে দেওগড়-বারিয়ার প্রাক্তন শাসক জয়দীপ সিং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন) অভিযোগ করেছেন যে, পুরানো কংগ্রেস হোলি উৎসবের সময় তাঁর দলের সদস্যদের ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারীরা ও পঞ্চায়েত কর্মচারীরাও এই দল ভাঙাবার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে, পুরানো কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যও তাঁদের দলের সভায় বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন কিভাবে ঘুষ দিয়ে তাঁদের দলত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে। গুজরাট বিধানসভায় পুরানো কংগ্রেসের দল ঠিক রাখার জন্য একটি অভিনব কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। প্রতি রাত্রে এক একজন মন্ত্রীর বাড়ীতে দলের সদস্যদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকছে এবং দলের সকল সদস্য যাতে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

বিধানসভায় একজন 'পুরানো কংগ্রেস' সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, 'নয়া কংগ্রেস'-এর কয়েকজন কর্মী তাঁকে ঘুষ দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়ী চড়াও হয়েছেন।

এই ধরনের কয়েকটি অভিযোগ বিধান সভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠান হয়েছে।

এদিকে, গুজরাটের 'নয়া কংগ্রেসের' আহ্বায়ক বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই তাঁর গদী সামলাবার রাজনীতি নিয়ে ও প্রতি রাত্রের ভোজসভায় যোগ দিতে গিয়ে এত ব্যস্ত যে, তিনি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ব্রোচ ও অন্যান্য শহরে যাওয়ার সময়ই করে উঠতে পারেন নি।

বরোদা থেকে বুলসর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ব্রোচ শহরের। প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে ষোলজন শিশুসহ মোট তেইশজন মারা গেছেন। অনেক ঘরদুয়ার নষ্ট হয়েছে।

এই ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠিয়েছেন।

চতুর্থ পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে চূড়ান্ত আকারে অনুমোদন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনাকালে **২৪৮৮২** কোটি টাকা লগ্নী করা হবে। এই অঙ্কটা খসড়া পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে ৪৮৪ কোটি টাকা বেশী। সরকারী লগ্নীর পরিমাণ খসড়া পরিকল্পনায় যা ধরা হয়েছিল চূড়ান্ত পরিকল্পনায় তা থেকে ১৫০৪ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট **১৫৯০২** কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী লগ্নীর পরিমাণ ১০২০ **কোটি টাকা কমিয়ে** ৮৯৮০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

যদিও বলা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে 'মতৈক্যের' ভিত্তিতে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছে তা হলেও তামিলনাড়ুর প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী শ্রীমাতিয়ালগন পরিষদে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই পরিকল্পনা মানছেন না। পরিষদে তামিলনাড়ুর প্রধান দাবী ছিল, সেলম শহরে একটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে হবে।

অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরাও অবশ্য বিনা প্রতিবাদে এই পরিকল্পনা মেনে নেন নি। প্রধান বিরোধ দেখা দিয়েছিল রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য দেওয়ার একটি নতুন ও অভিনব ব্যবস্থা সম্পর্কে। ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই যে, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের ভাগ বাটোয়ারায় বিভিন্ন রাজ্য যে টাকা পাবে তাছাড়াও একটা বিশেষ তহবিল থেকে কিছু টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। আগেকার কোন পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই ব্যবস্থা ছিল না।

এই বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধান দুটি আপত্তি জানান হয়। প্রথমত, এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, অনুগত রাজ্যগুলিকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকাটা ব্যবহার করবেন। প্রধানমন্ত্রী (ও পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ ডি আর গাডগিল যখন [illegible] করে বোঝালেন যে, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনাবহির্ভূত খরচ মেটাতে সাহায্য করার জন্য ঋণ হিসাবে টাকাটা দেওয়া হবে, তখন কোন কোন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যেসব রাজ্য তাদের টাকার সদ্ব্যয় করেছে তাদের এভাবে শাস্তি দিয়ে যারা অর্থের সদ্ব্যয় করতে পারে নি তাদের পুরস্কৃত করার মানে হয় না। এই ধরনের যুক্তি তোলায় জাতীয় পরিষদে বিতর্কটা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি 'অসচ্ছল' রাজ্যের বিতর্কে পরিণত হল। যদিও এই বিতর্কের কোন নিষ্পত্তি হয় নি তাহলেও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশন যেভাবে শেষ হল তাতে মোটামুটি বোঝা গেল যে, কেন্দ্রীয় সাহায্যের এই 'বিশেষ ব্যবস্থা' অপরিবর্তিত থাকবে বলেই মুখ্যমন্ত্রীরা ধরে নিয়েছেন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় এই 'বিশেষ ব্যবস্থা' বাবদ ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭৫ কোটি টাকা।

এই বিষয়ে রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, অর্থ কমিশনের সুপারিশ যেসব দুর্বলতর রাজ্যকে অসুবিধায় ফেলেছে তাদের সাহায্য করার একমাত্র উপায় হল এই বিশেষ ব্যবস্থা। তিনি এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে, এই বিশেষ তহবিলের টাকা বন্টনে রাজ্যগুলির মধ্যে কোন বৈষম্য করা হবে না।

পাঞ্জাবে নতুন সরকার

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যে পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রী পাঁচটি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিহারের সর্দার হরিহর সিং প্রথম বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন উত্তর প্রদেশের শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যখন ইস্তফা দিলেন তখন তালিকায় তৃতীয় নামটি যুক্ত হল। চতুর্থ বারে ও সর্বশেষে এই "প্রাক্তন"-দের তালিকায় যোগ দিলেন পাঞ্জাবের শ্রীগুরনাম সিং। টিমটিম করে টিঁকে থাকলেন শুধু হরিয়ানার শ্রীবংশীলাল। সেখানেও যদি রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমত বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে না দিতেন তাহলে কি হত বলা কঠিন।

সর্দার হরিহর সিং ও শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের বিদায় কংগ্রেস ভাগের ফল, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বিদায় অকংগ্রেসী দলগুলির যুক্তফ্রন্টে ভাঙনের ফল আর শ্রীগুরনাম সিংকে সরে যেতে হল অকালী দলে ভাঙনের ফলে।

শ্রীগুরনাম সিং অকালী দলের নেতা সন্ত ফতে সিংকে চটিয়েছেন। রাজ্যসভায় নির্বাচনের জন্য সন্ত দলের যে প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং ও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সমর্থন না করে অন্য একজন পাল্টা প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভায় ৫৬ জন অকালী সদস্যের মধ্যে ৩৫ জন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ও অকালীরা তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে তাঁর এই "বিশ্বাসঘাতকতা" ও "অগণতান্ত্রিক কাজের" জন্য তাঁকে শাস্তি দিলেন।

সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে, অকালী দলের নবনির্বাচিত নেতা শ্রীপ্রকাশ সিং বাদল জনসংঘের সহযোগিতায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। শপথ গ্রহণের পর তিনি বলেছেন, তিনি রাজ্যে শুধু পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করবেন এবং শিখ ঐক্য হবে তার ভিত্তি।

অচ্যুত মেননের জয়

আস্থাসূচক প্রস্তাবের উপর দুই দিন ব্যাপী বিতর্কের শেষে দোলের দিন সন্ধ্যায় যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল, কেরালের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকার আট ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। নয়া কংগ্রেস দল সরকারের পক্ষে ভোট দেয় আর পুরানো কংগ্রেস দল নিরপেক্ষ থাকে। প্রথমটি প্রত্যাশিত ছিল, দ্বিতীয়টি অপ্রত্যাশিত; কেন না, আগে জানা গিয়েছিল, সি পি আই-এর প্রভাবিত সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য পুরানো কংগ্রেস দল সি পি এমকে সাহায্য করবে।

সি পি এম মাঠে ময়দানে লড়াই চালিয়ে অচ্যুত মেননের সরকারের পতন ঘটাতে পারে নি, বিধানসভার ভোটেও তারা ব্যর্থ হল। কিন্তু অন্যদিকে, বিধানসভার ভোটের ফলাফল তাদের হাতে প্রচারের একটি ভাল অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, অচ্যুত মেননের সরকার টিঁকে রয়েছে কংগ্রেসের এক তরফের প্রত্যক্ষ সমর্থন আর এক তরফের পরোক্ষ সহায়তার জোরে।

এই প্রচারে ইতিমধ্যে সি পি এম কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে বলে মনে হচ্ছে। আর এস পি দাবী করেছে যে, বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের পর অচ্যুত মেননের সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বেলায় আর এস পি বলেছিল, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল কোন সরকার তাদের সমর্থন

এশিয়ার মানচিত্র

২৭.৩.৭০

লাভ করবেন না। অথচ, কেরলে এই দল অচ্যুত মেননের সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। এই দুই রাজ্যে অনুসৃত দুটি নীতির অসংগতি কোন কোন সি পি এম মহল থেকে দেখান হয়েছিল। তারপরই আর এস-পি ঐ দাবী করেছে।

পাকিস্থানের জন্য মার্কিণ ট্যাঙ্ক

"পাকিস্থানের জনকয়েক সেনানায়ক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব ফার্ম ট্যাঙ্ক তৈরী করে তাদের স্বার্থ ছাড়া আর কোন স্বার্থই এতে সিদ্ধ হবে না।"—একথা বলেছেন ভারতবর্ষস্থিত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ।

পিছনের দরজা দিয়ে আবার আমেরিকা পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, এরকম একটা খবর জানার পর বোল্‌জ ঐ মন্তব্য করেছেন।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাগজে-কলমে পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া বন্ধ করে রেখেছে। এখন একটা কৌশল করে সেই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে, ন্যাটো চুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দোসর তুরস্কের কাছে যেসব আমেরিকান ট্যাঙ্ক আছে তা থেকে শতখানেক পাকিস্থানকে দেওয়া হবে আর তার বদলে আমেরিকা তুরস্ককে আরও আধুনিক ধরনের ট্যাঙ্ক দেবে। ন্যাটো চুক্তির সর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিবেচনাধীন।

সংবাদটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পার্লামেন্টেও এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে ও আমেরিকা এই কাজ করলে ভারত তাকে মিত্র দেশ বলে গণ্য করতে পারবে না, একথা আমেরিকাকে জানিয়ে দেওয়া হোক বলেও দাবী তোলা হয়েছে।

পরলোকে জয়পাল সিং

৬৭ বছর বয়সে আদিবাসী নেতা ও ঝাড়খণ্ড দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীজয়পাল সিংয়ের মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতি থেকে একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষকে সরিয়ে নিয়ে গেল। গণ পরিষদ ও অস্থায়ী পার্লামেন্ট থেকে আরম্ভ করে পর পর চারটি লোকসভাতেই তিনি সদস্য ছিলেন।

দুই জার্মাণী

পূর্ব জার্মানীর এরফুর্ট শহরে গত ১৯ মার্চ দুই জার্মানীর সরকারের প্রধানদের বৈঠক হয়ে গেল তার বলতে গেলে একমাত্র বাস্তব ফল হচ্ছে, দুই সরকারের প্রতিনিধিরা আগামী ২১ মে তারিখে আবার বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হয়েছেন। ঐ দ্বিতীয় বৈঠক বসবে জার্মানীর কাসেল শহরে।

এছাড়া বাকী যেটুকু হয়েছে, তা হচ্ছে উভয় পক্ষের সুপরিচিত মতামতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ভিলি স্টফের কথা হচ্ছে, দুই জার্মানীর মধ্যে ঠিকমত আলোচনা আরম্ভ করার আগে পশ্চিম জার্মানীর দিক থেকে পূর্ব জার্মানীর জন্য পরিপূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি চাই। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ভিলি ব্রাণ্টের কথা হচ্ছে, তাঁর সরকার জার্মানীর মাটিতে দুইটি পৃথক সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে, আপাততঃ এর বেশী কিছু তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, যদিও ভবিষ্যতে পূর্ব জার্মানীর এক কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশ যদি মত দেন, তাহলে বন সরকার পূর্ব বার্লিনের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিও দিতে পারে। হের ব্রাণ্টের মতে, কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি আপাততঃ শিকায় তুলে দুই জার্মানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু হের স্টফ তাতে রাজী নয়।

দুই জার্মানীর মধ্যে এই প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। এরফুর্টের রেলস্টেশন থেকে নিকটবর্তী যে হোস্টেলে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তার দুয়ারগোড়া পর্যন্ত লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হোটেলের দরজায় ভিলি ব্রাণ্টকে অভিবাদন জানাবার জন্য পূর্ব জার্মানীর 'পিপ্‌লস্ আর্মি'-র সৈনিকদের মোতায়েন রাখাও হয়েছিল।

২৮-৩-৭০

সম্পাদকীয়

নৃশংসতার রাজনীতি

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের প্রাক্কালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বাংলা দেশে যে-হরতাল হয় তার রক্তক্ষরা স্মৃতি সহজে ভোলবার নয়। গণ-প্রতিবাদের সঙ্গে বাংলা দেশ অপরিচিত নয়। কিন্তু এবারের হরতাল ছিল ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবের নামান্তর। নানা স্থানে হরতাল-বিরোধীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ত্রিশজনের প্রাণান্ত হয়। বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। হরতাল যদি স্বতস্ফূর্ত হত তাহলে এই ধরনের খুন-জখমের কোনো প্রয়োজন হত না। গায়ের জোরে বিরোধীদের হরতালে বাধা করতে গিয়েই মার্কসবাদীরা বাংলা দেশে এভাবে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল। এই নৃশংসতার রাজনীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে আজ সজাগ হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে হবে।

হরতালের দিন সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে বর্ধমান শহরে। উন্মত্ত, উত্তেজিত জনতার আক্রমণে সেই দিন একটি বাড়ির তিনজন যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। নিহত তিনজন ছিলেন কংগ্রেসের কর্মী আর আক্রমণকারীরা ছিল মার্কসবাদী দল পরিচালিত শোভাযাত্রার অংশ। সারা দেশ এই মর্মান্তিক ঘটনায় মর্মাহত, স্তম্ভিত ও শোকস্তব্ধ। রাজনৈতিক বিরোধিতা যে এমন নৃশংস হতে পারে তা গণতান্ত্রিক শান্তিপ্রিয় মানুষেরা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশে গত এক বছরে রাজনীতি চরম নৃশংস আকার নিয়েছে। শরিকে শরিকে সংঘর্ষে কত লোকের যে প্রাণ গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই রক্তরঞ্জিত রাজনীতির পরিণতি কি সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে আজ চিন্তা করতে হবে। কতকগুলো শ্লোগান দিয়ে শ্রেণীসংঘাতের নামে সমাজের নিরীহ মানুষকে আজ সশস্ত্র রাজনীতিতে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে হত্যা করছে। শ্রমিক হত্যা করছে শ্রমিককে, কৃষকের হাতে প্রাণ দিচ্ছে কৃষক। এ কী ধরনের শ্রেণীসংঘাত তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। নিজেদের মন্ত্রিত্ব রাখবার জন্য দরিদ্র মানুষকে উত্তেজনাকর রাজনৈতিক শ্লোগানে প্রভাবিত করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সমাজ বিরোধীদের খপ্পরে, তারাই রাজনীতির নামে চালাচ্ছে জঘন্যতম কার্যকলাপ। যার নৃশংসতম সাক্ষী বর্ধমানে সাঁই ভ্রাতৃদ্বয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জিতেন রায়ের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড। পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার ফলে এইভাবে তিনজন যুবক প্রাণ দিল। এর জন্য সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠেছে। এ দাবি অত্যন্ত ন্যায্য। অপরাধীদের খুঁজে বার করে তাদের শাস্তিবিধান না করলে এই নৃশংস রাজনীতির অবসান হবে না। শুধু বর্ধমান নয়, হরতালের দিনে আরও যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার সবগুলোরই তদন্ত প্রয়োজন। এই নারকীয় রাজনীতি দেশের মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সমস্ত হত্যাকাণ্ডের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পক্ষে এই রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত হবে না।

এই রক্তাক্ত রাজনীতি আসানসোলের খনি এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিক সংঘর্ষের পরিণতিতে সেখানে বহু শ্রমিক রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। সম্প্রতি সেখানে কবর খুঁড়ে চারজন শ্রমিকের পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধারেরর পর সর্বত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তা এখন সরকারকে খুঁজে বার করতে হবে। পশ্চিম বাংলার মানুষ এই নৃশংসতার অবসান চায়। মানুষের রক্তে হোলি খেলে এখানে কোনো দলকে সর্বনাশা রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।

ভারতবর্ষে এখন এক অস্থির রাজনীতি চলছে। সমস্ত দলগুলো দ্বিধাবিভক্ত। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে দলগুলোর মধ্যে চলছে ক্ষমতা দখলের এক অশুভ প্রতিযোগিতা। রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রিসভাগুলোর মধ্যে দেখা দিয়েছে সংকট। জনসাধারণের মনে আজ চরম বিভ্রান্তি। এর সুযোগ নিয়ে চলছে গুণ্ডাবাজির রাজনীতি। তাতে মদত যোগাচ্ছে দায়িত্বহীন রাজনৈতিক দল বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও তাণ্ডব সৃষ্টিতেই যাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বাংলার মানুষ চায় স্বস্তি। নির্বাচন শুধু একটা অনুষ্ঠান নয়, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার প্রয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চাই বর্তমান নৃশংস রাজনীতির অবসান।

চৈতন্যের উত্তরণে ॥

বিষ্ণু দে

ভেবেছ কি লেখায় আঁকার গাওয়ার গড়ার,
কাঠ ছেঁটে কষ্টি কিংবা বেলে কেটে খোদাই করার
গঠনের দিব্য ঝোঁকে যারা অবচেতনের তলে
নিয়মিত, চব্বিশ না হোক বেশ কয়েক ঘন্টাই
ঘোরে থাকে, সারাদিন নিশিপাওয়া নিষ্পলক চোখে,
যেন বা তাদের চোখ মুখ হাত এমন কি মনটাই
সম্পূর্ণ আয়ত্তে নেই প্রতিষ্ঠিত সাফল্য কৌশলে।
কারণ তাদের কেউবা অনেকদিন কেউ কম,
আয়ুর মাঠটা ব্যেপে দৌড়ের ঘোড়ার ক্ষ্যাপা রোখে
ছুটেছে সে কোন লক্ষ্যে লক্ষ্যভেদে, কার মুনফায়?
দৌড়ে যে মট্‌কে পড়ে সেটা কার লোভে অন্তিম দফায়?

শুধু শিল্পী কবি নয়, সর্ব সৎ সংগঠনকর্মে এইতো নিয়ম।
ফলে, আশ্চর্য কি! যদি দেখ তার জীবনযাত্রায়
বিনিদ্র রাত্রিতে কিংবা স্পষ্টাস্পষ্টি দিনের আলোয়
বাজারে দুর্নাম রটে বেচারাম, নানান্ মাত্রায়
কারো কারো মন্দ ঘোর নিন্দনীয়, শাদায় কালোয়
খারাপে ভালোয় ভয়াবহ, দূরে পরিহার্য কখনো—
অন্তত সমাজে তাই সভ্যতার ব্যবসায়ী ইতিহাসে অদ্যাবধি।
নব্য ভব্য কেউ আর ভাবে না যে কোনো দৈবশক্তি
ভর করে এদের করে প্রতিবাদী দিব্যোন্মাদ। দেবদ্বিজে ভক্তি
সেজন্যই অধুনা কিঞ্চিৎ কম, শিল্পীর জীবনও
ধনিক বণিক বিশেষ ভাগ্যবান কয়েকটি ছাড়া প্রায়ই পল্বল,
যদিচ পৃথিবী সুন্দরী এবং মানুষ মহান জলধি
নিরবধি কাল। যার ফলে ধৈর্যচ্যুতি স্বাভাবিক
আত্মীয় বা বন্ধুদের, অথবা শত্রুর। তবু শোনো বলি হে প্রেয়সী!
মনে রেখো এ বক্তৃতা তোমরাই তো ভাগ্যের নাবিক
যা নাবিকা চিরনাবালিকা! অথচ সর্বত্র লবণাক্ত জল!
দুস্থ এই হতভাগ্য অবশ্যই বহু দোষে দোষী,
যা ক্ষমার্হ, স্নায়বিক চৈতন্যের অখন্ডতা-হেতু
রচয়িতৃদের বহু ক্ষেত্রে বোধ্য, যা তুমি জঠরে জানো, যতই না ঠিক্!
সমাজপতিরা বলে, যত ধূর্ত ভন্ড।
আমাদের জন্মলগ্নে তুঙ্গী মীনকেতু
অথবা বাগ্দেবী! সমাজে আজন্মা ভঙ্গ শিল্পী অবচেতন ও চেতনের সেতু,
চৈতন্যের উত্তরণে ঈশ্বর পাটনী তারা, বীর, বৈজ্ঞানিক॥

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

মুশকিল হয়েছে এই—সমাজকে এত কাছে থেকে দেখা যায় না। খুব কাছে থেকে বুঝি কিছুই দেখা যায় না। আমরা যখন বই পড়ি তখন সেটা থেকে—দৃষ্টির শক্তি অনুযায়ী—একটা স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, তার থেকে কাছে নিয়ে এলে আর পড়া যায় না, হরফগুলো একাকার ঝাপসা হয়ে যায়। চোখও টনটন করতে থাকে।

যে পৃথিবীর মধ্যেই আমরা বাস করি তার কতটুকু আমরা দেখতে পাই? যে সমাজে থাকি—সে সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। সে সমাজের কতটুকু আমাদের চোখে পড়ে? যেটা দেখছি বলে মনে করি সেইটেই কি ঠিক দেখছি? অন্ধের হাতী দেখা হচ্ছে না তো? হাতীর পায়ে যার হাত পড়ল সে দেখল জন্তুটা থামের মতো, শুঁড়ে যার হাত পড়ল সে জোর গলায় বলতে লাগল হাতী একগাছা মোটা কাছির মতো।

দেখতে গেলে, দ্রষ্টব্য বস্তুর সামগ্রিক চেহারা নিতে গেলে একটু দূরে থেকে দেখতে হয়। আমার বিশ্বাস—আজকের সমাজ নিয়ে আজই লিখতে গেলে—লেখাও খারাপ হয়, আজকের সমাজও দেখানো যায় না। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তখনই যেসব গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তার কখানা আজ টিকে আছে বলুন? কটাই বা সার্থক লেখা হয়েছিল? সেসব লেখায় হয় অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি হয়েছিল, নয় অনেক কম বলা হয়েছিল।

কলকাতাবাসী লেখকদের অভিজ্ঞতা বলতে গে 'মা একটু ফ্যান দাও', 'মা পাতের এঁটো-কাঁটা দাও'—এই সকরুণ প্রার্থনা, কিছু কঙ্কালসার ভিক্ষুক, চারিদিকে চালের দোকানে 'কিউ' আর পথে-ঘাটে কিছু মৃতদেহ। এর মধ্যে কে গোপনে এক মুঠো চালের জন্যে ইজ্জৎ বিক্রী করছে, কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের কন্যা গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করছেন—এর অনেকটাই আমাদের শোনা কথা বা অনুমান। একমাত্র যিনি এই সমস্ত কলুষিত এবং দুঃস্মৃতিবহ ব্যাপারটাকে নিজস্ব মাধুর্য দিয়ে জারিয়ে নিতে পেরেছেন—সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাই হয়ত সে যুগের অসংখ্য বেদনাবিদ্ধ বা বেদনাউদ্বুদ্ধ রচনার মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করবে:

বরং আজ যদি সেদিনের দ্রষ্টারা ঐ মন্বন্তর নিয়ে কিছু লেখেন, সেটাই হবে আসল লেখা। যা অতিরিক্ত, যা অনাবশ্যক—মহাকালের সূর্পে এতদিনে তা বাদ পড়ে গেছে, যা আছে সেইটিই আসল বস্তু।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

রচনার নূতন পটভূমি-রচনার জন্য আজকাল অনেকে দুচার দিনের জন্যে পাহাড়ে-জঙ্গলে-দ্বীপে ছোটেন, জেলে-শাঁখারি-ছুতোর-কামার পাড়ায় হানা দেন, নয়ত পাহাড়ী বা আদিবাসীদের দ্বারস্থ হন। তারপর সেখানে আট দশ বা পনেরো-বিশ দিন থেকে কি ঘোরাঘুরি করে এসেই মোটা মোটা উপন্যাস লেখেন। কিন্তু সত্যিই লেখকরা যা দেখেছেন, বিশেষ যা দেখা উচিত ছিল, ঐসব বইতে তার প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পড়ে না, ঐ ধরনের রচনাও তাই বেশির ভাগ সার্থক হয়ে ওঠে না।

এই অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত সমাজ নিয়ে লেখার যে আগ্রহ—তার মূলে অবশ্য আছেন তারাশঙ্কর। তারাশঙ্করের প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। কিন্তু তারাশঙ্কর দুদিনের দেখা দেখেন নি। আজন্ম যে দেশ, যে সমাজ, যে মানুষ দেখেছেন—সেই দেশ-সমাজ-মানুষ নিয়ে লিখেছেন বলেই এত বাহবা পেয়েছেন, স্বল্পদিনের ভাসাভাসা-দেখা অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে গেলে এতখানি স্বীকৃতি পেতেন না। তাও তিনি সেখানে বসে লেখেন নি, সেখান থেকে চলে এসে কলকাতায় বসে ছোটবেলায় দেখা গ্রামের কথা বলেছেন। অল্প দেখা বা জনশ্রুত, সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেও কিছু কিছু লিখেছেন বৈকি। কিন্তু সে লেখাগুলি অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে স্থান

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

পাবে না। ওঁর মতো শক্তিমান লেখকের দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাও হয়ত অনেকের প্রথম শ্রেণীর রচনার থেকে ভাল—তবু তা ওঁর রচনার মধ্যে দ্বিতীয় পংক্তিতেই থেকে যাবে। তারাশঙ্করের যেটা vantage point অপর লেখকের স্বল্পসঞ্চয়ের ফলে সেটাই disadvantage point হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক একই কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এত উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছে। বিভূতিভূষণকে 'এসকেপিস্ট' বা 'পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন' লেখক বলাটা এককালে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তথাকথিত 'প্রোগ্রেসিভ' লেখকদের কাছে. কিন্তু তাঁর লেখাই যথার্থ সমাজ-সচেতন। তিনি যে সমাজ বাল্যকাল থেকে দেখেছেন, যা তাঁর রক্তমাংসে মিশে গেছে, যে মানুষ তাঁর বহু পরিচিত—কেবলমাত্র তাদের নিয়েই লিখেছেন। অবশ্য তিনিও কিছু কিছু রচনা vantage point থেকে লিখেছেন। যেমন আরণ্যক। কিন্তু যখন তিনি অরণ্যে ছিলেন তখন লেখেন নি (তাও তিনি দুচার দিন কি দুচার মাস মাত্র ছিলেন না)। বহু পরে লিখেছেন। অরণ্যে বসে বাল্যের স্মৃতি মন্থন করে লিখেছেন 'পথের পাঁচালী' আর অনেক পরে কলকাতায় বসে বহুদিন আগেকার দেখা অরণ্য

[illegible] লিখেছেন 'আরণ্যক'। বর্তমান থেকে দূরে না থাকলে এসব বই লেখা যায় না। দূর অতীতে না গেলে বর্তমানকে আমরা তার পরিপূর্ণ চেহারায় দেখতে পাই না।

সমাজ-সচেতন লেখা মানেই কি বর্তমান-কালের সমাজের আলোকচিত্র? আমার তো তা মনে হয় না। আলোকচিত্র কখনও উচ্চ-স্তরের শিল্প পর্যায়ে স্থান পেতে পারে না। শিল্পীমানসের কবিচিত্তের জারকরসে জারিত না নিলে কোন চিত্রই রসোত্তীর্ণ হয় না।......

একটু বোধ 'মেন লাইন' ছেড়ে যাচ্ছি। [illegible] ছিল সাহিত্যিকের চোখে [illegible] সমাজ।

আগেই প্রশ্ন তুলেছি—বর্তমান সমাজের [illegible] একজনের চোখে পড়ে? সারা পৃথিবীতে ছুটোছুটি করার অবস্থা নয়, [illegible] এদেশই যা এদিকে ওদিকে [illegible]—তাতেই বা কতটুকু দেখেছি? সমাজকে যা দেখেছি, যা দেখছি তা কি সব লেখা যায়? যা দেখছি তাই কি ঠিক দেখছি? সদ্যদোয়া দুধের ওপরে অনেক-খানি ফেনা থাকে, সে ফেনা দিয়ে কি দুধের বিচার হয়, না দুধের বর্ণনা হয়? এভাবে যা লিখব—সে লেখার দাম কি?

সাহিত্যিক যা লিখবেন তা অবশ্যই বর্তমানের একটা নিখুঁত বর্ণনা নয়—সেটা সর্বাগ্রে সাহিত্য হওয়া চাই, নইলে লিখবেন কেন, আর পাঠকরাই বা পড়বেন কেন? সাহিত্য করতে গেলেই তাতে কিছু রঙ থাকবে। সুতরাং সম্পাদক মশাই যতই আমাদের দিয়ে ফটো তোলাবার চেষ্টায় থাকুন—অথবা সোজা বাংলায় কিছু [illegible] করাবার মতলবে থাকুন—আমরা [illegible] কেউই obliged করছি না, ভয় নেই।

অনেকেই মধ্যে মধ্যে বলে থাকেন, মশাই দেশে অমুক অমুক হচ্ছে,—এইসব নিয়ে লিখুন, কি করছেন?' 'খুব জোর [illegible], আপনাদের লেখায় যদি কিছু হয়!' ইত্যাদি। কেউ বা সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন 'কলম তরবারির থেকে শক্তিশালী'।

লেখা যায় না। দেশে নিত্য যা ঘটছে তা নিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় [illegible] লেখা যায়—কিন্তু যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক তিনি ঠিক এসব নিয়ে লিখতে পারেন না। লিখলেও তা সাহিত্য হবে না—[illegible] যাই হোক। আজকে এই ধরনের যা লেখা হচ্ছে যাকে অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন রচনা বলে চালানো হয়ে থাকে তা কি সত্যিই সমাজের ছবি? আমাদের সমাজের? না, বই পড়ে দেখা অন্য দেশের সমাজচিত্রকে ভেজাল দিয়ে—বনস্পতিতে ঘিয়ের এসেন্স দিয়ে শুদ্ধ ঘি বলে চালানোর মতো—আমাদের দেশের সমাজ বলে চালানো হচ্ছে। এ শ্রেণীর মেকী সমাজচিত্র আঁকার সুবিধা [illegible] অকারণে অপ্রয়োজনে কতকগুলো [illegible] বা সম্ভোগচিত্র ঢুকিয়ে পাঠকদের [illegible] প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে কিছু সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। তাও জনপ্রিয়তা মাত্র—যশ নয়।

চলচ্চিত্রেও তাই। সাম্প্রতিক কালের এক ফিল্ম ফেস্টিভালে একটি বিদেশী ছবি দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। তাতে না আছে কোন কাহিনী, না আছে পরিচালকের কোন কৃতিত্ব আর না আছে কোন চিন্তার ছাপ। এলোমেলোভাবে স্ত্রী-পুরুষের নগ্ন-মূর্তি এবং নিখুঁত যৌনসম্ভোগের কয়েকটি চিত্রকে জোড়া দিয়ে একটা পুরো দৈর্ঘ্যের 'ফিচার ফিল্ম' দাঁড় করানো হয়েছে। এই জিনিস সমাজের ছবি—আমি অন্তত মানতে রাজী নই। দশটা গুণ্ডা মিলে অনেক সময় অনেক কারখানার কর্মেচ্ছু শ্রমিকদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়—সেই অনিচ্ছাকৃত অনুপ-স্থিতিকে সমগ্রভাবে কর্মীদের মনোভাব বলবেন কি? আমাদের দেশের এক প্রধান পরিচালক বর্তমান কালের যুবসমাজের একাংশ নিয়ে একটি ছবি তুলেছিলেন, কিন্তু তা কি সেই সমাজের সঠিক চিত্র হয়েছে? তা হয়নি বলেই, অভিজ্ঞ পরি-চালক মশাই দর্শকোপযোগী সেন্টিমেন্টালটি বা ভাবালুতা যথেষ্ট মিশিয়েছেন বলেই, ছবিখানি দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে।

সেদিন এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে একটি বড় জেলা লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বহুদর্শী, অভিজ্ঞ ও মিতবাক। আমরা আলোচনা করছিলাম, কেন বাংলাদেশে বইয়ের বাজার এমন পড়ে গেল। রাজনৈতিক ডামাডোল, কলকারখানা বন্ধ, ব্যবসায় মন্দা, জাতীয় আয়ের হ্রাস, প্ল্যানিংএর টাকা আসছে না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি তার ফলে ক্রেতাদের হাতে অর্থাভাব, ইস্কুল-কলেজে শিক্ষার নিদারুণ অবনতি—সে কারণে ছেলেমেয়েদের একান্ত পাঠবিমুখতা, খেলাধুলোয় বেশী ঝোঁক—ইত্যাদি, অনেকে অনেক কারণ দেখা-চ্ছিলেন। ধৈর্য ধরে সব শুনে লাইব্রেরিয়ান বললেন, 'দেখুন মাপ করবেন, এসব কোন কারণই আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু এছাড়াও একটা কারণ আছে।...লেখাও ভাল হচ্ছে না। সাধারণ পাঠক বেশির ভাগই গল্প উপন্যাসের খদ্দের, সেগুলোর মান অত্যন্ত পড়ে গেছে। কী সব গল্প—কোন দেশের, কোন মানুষের—তাই বোঝা যায় না, পড়বে কি?' অল্পমিতিকিন্তরেণ।

ঐ দেখুন, আবারও 'সাইড ট্র্যাক'এ বলে গেলাম। ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। আসল প্রসংগটা নিয়ে কিছু লেখা হল না।

ওটা এ যাত্রায় বরং থাক সম্পাদক মশাই। আমার কোন বন্ধুই তো দেখছি সরাসরি ও-প্রশ্নের বিশেষ উত্তর দিচ্ছেন না, আমিই বা দিতে যাই কেন?

দুপুর রোদ্দুর

অদিতি দে

তুলসী একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠল। এমন কিছু কাজ না, ট্রাংক খুলে আদ্দির পাঞ্জাবি আর শান্তিপুরী ধুতিখানা নামিয়ে নেওয়া শুধু। কিন্তু বিশ্বসংসারের যাবতীয় দরকারী অদরকারী বস্তুতে বোঝাই ট্রাংকের ভেতর থেকে একে একে প্রতিটি জিনিস বের করে মেঝেয় পাতা পুরনো খবরের কাগজের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে অবশেষে যখন ট্রাংকের তলার একেবারে কাছাকাছি এসে ধুতি পাঞ্জাবির সন্ধান মিলল ততক্ষণে তুলসীর বেজায় হাঁফ ধরে গেছে। আজকাল অবশ্য তুলসী একটুতেই হাঁপিয়ে যায়। কাজকর্ম কেন, একনাগাড়ে কিছুক্ষণ কথা বললেও তুলসীর ঘন-ঘন শ্বাস পড়তে থাকে। তা এমনটি তো হবেই। বয়েস তো হচ্ছে। নিজের কাছে আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করে কি লাভ! গত শ্রাবণে সাতচল্লিশ পার হয়ে তুলসী আটচল্লিশ বছরে পা দিয়েছে। এখন কি আর গা-গতরে আগের মতো জুত আছে! যেমনি শরীরটা দিনদিন কমজোরী হচ্ছে, মনটাও আস্তে আস্তে সাহস শক্তি হারিয়ে জবুথবু হয়ে যাচ্ছে।

নিচু হয়ে এতক্ষণ ট্রাংকের ওপর ঝুঁকে থাকায় তুলসীর সারা দেহ যেমন ঘামে ভেসে যাচ্ছিল তেমনি পিঠের দিকের কোমরটাও ব্যথায় টন-টন করছিল। মুখটা সামান্য বিকৃত করে তুলসী সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কপাল থেকে নাক বেয়ে ঘাম গড়িয়ে ঠোঁটে লাগতে মুখের মধ্যে একটা নোনা স্বাদ টের পেল। দড়িতে ঝোলানো তেলচিটে পুরনো গামছাটা টেনে নিয়ে তুলসী চোখ মুখ ঘাড় গলার ঘাম মুছল। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে জবজব করছে, গা থেকে সেটা খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখল। দু কানের পাশে রগ দুটো এখনো দাপাদাপি করছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখনও। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে টিনের কৌটো থেকে তুলসী অভ্যেসবশে বিড়ি বের করল। একটু পরিশ্রান্ত হলেই একটা বিড়ি ধরানো ইদানীং তুলসীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু একটু চা হলে মন্দ হোত না, এই ভাবনাটা তুলসীর মগজে আসায় এই মুহূর্তে সে আর বিড়িটা ধরাল না।

খোলা দরজা দিয়ে তুলসী ওপারে চায়ের দোকানটার দিকে তাকাল। বাজারের ভেতরে দোকান, তাছাড়া একেবারে বাস রাস্তার ওপর, তাই বেলা হলেও হলধরের চায়ের দোকানে ভিড় লেগে আছে। এক-হাতে খদ্দের সামলাতে পারে না বলে আজকাল হলধর আবার একটা ছোকরাকে দোকানে রেখেছে। ছোকরার নামটি যেমন কেষ্ট, তার গায়ের রংটিও তেমনি আল-কাতরার মত কালো। শরীর ঘামতেলে এমন মাখামাখি যে মনে হবে সর্বদাই কালো রং চুঁইয়ে পড়ছে দেহ বেয়ে।—কেষ্ট, অ কেষ্ট, তুলসী উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল।

রাস্তা কাঁপিয়ে দ্রুতবেগে একখানা বাস বেরিয়ে গেল। সেই আওয়াজে তুলসীর চিৎকার হলধর কিংবা কেষ্ট কেউই শুনতে পেল না।

ব্যাটাচ্ছেলে কালা না কি! তুলসী মনে মনে খানিক গজগজ করে আবার চেঁচাতে লাগল, কেষ্ট, এই কেষ্ট—

এবারে হলধর তাক থেকে ডানহাত তুলে একটা আঙুলে দেখিয়ে তুলসী চেঁচিয়ে বলল, একটা চা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে তুলসী অন্য-হাতে ধুতি পাঞ্জাবি পরীক্ষা করছিল। কি ধুতি কি পাঞ্জাবি কোনটাই ঠিক অক্ষত অবস্থায় নেই। একটানা দু' বছরের মতো সময় ট্রাঙ্কে একগাদা জিনিসপত্তরের মধ্যে ভাঁজ-করা অবস্থায় থাকতে থাকতে ধুতি পাঞ্জাবি দুটোরই রং যেন কেমন জ্বলে গেছে বলে মনে হয়। তাছাড়া প্রতিটি ভাঁজে এক ধরনের দাগও ধরে গেছে। তুলসীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিয়ের নেমন্তন্ন বলে কথা। তার না হয় এখন আর মান-সম্মান বলে কিছু নেই। ময়লা লুঙ্গি আর জামা গায়ে দিয়েই তো সে আজকাল দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিষ্ণুপদর নতুন-কুটুম্বরা কি ভাববে? বরযাত্রী মানেই হোল বরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিংবা বন্ধু। তা সেই বরযাত্রীর একজন হয়ে তুলসী যদি এই হাড়-হাভাতের পোষাক পরে কনে-বাড়ীতে গিয়ে ওঠে তাহলে কি বিষ্ণুপদর কোনো মান-সম্মান থাকবে?

এইসব ঝুট-ঝামেলায় যেতে তুলসীর আদৌ ইচ্ছে ছিল না। পই-পই করে বিষ্ণুপদকে তুলসী বারণ করেছিল, দ্যাখো বিষ্ণু, আমাকে ওসব বরযাত্রী-ফরযাত্রীর মধ্যে টেনো না। আমি বুড়ো মানুষ, ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে হৈ হৈ করে বরযাত্রী যাওয়া আমার সাজে না।

থামো হে, এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল বিষ্ণুপদ, আমি বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যেতে পারছি আর উনি বরযাত্রী যেতে পারবেন না! বললেই হোল আর কি!

বিষ্ণুপদর ছোটভাই মহেন্দ্র বলেছে, তাছাড়া তোমাকে তো আর ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলতে হচ্ছে না। রিজার্ভ বাসে দিব্বি লাটসাহেবের মত আরাম করে বসে বসে যেতে পারছ। তারপর পয়সাওলা বাড়ির মেয়ের বিয়ে, ভালোমন্দ খাওয়াটাও তো হবে।

হুম। তুলসী আর কোনো কথা বলে নি।

ওসব হুম-ফুম জানি না। বিষ্ণুপদ বলেছে, না যদি যাও তো তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়ব বিষ্ণুপদ কি চীজ।

বিষ্ণুপদর এই এক দোষ। গোঁ একবার ধরলে উপায় নেই।

তুলসী বুঝতে পারছে বরযাত্রী না গেলে বিষ্ণুপদ তুলসীর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। তুলসীর যাবতীয় সুখ-দুঃখের কথা এখন ওই বিষ্ণুপদর সঙ্গে। নির্বান্ধব অসহায় তুলসীর জীবনে এখন সহায় বলো সম্বল বলো সব ওই বিষ্ণুপদ। টাকাটা সিকিটা দরকার পড়লেও বিষ্ণুপদ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর যে রোদটুকু এসে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বেলা বাড়তে থাকায় তা ক্রমশ গুটিয়ে ছোট হতে থাকল। গালে হাত বুলিয়ে তুলসী অনুভব করল, দাড়ি বেশ বড়ো হয়েছে। তাকের ওপর থেকে সে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নামিয়ে আনল। দরজার চৌকাঠে ছোট আয়না বসিয়ে সে মুখে অনেকক্ষণ ধরে এক চিলতে সাবান ঘষল। দাড়ি ভীষণ কড়া হয়ে গেছে এখন। সাবান ঘষে-ঘষে বেশ খানিকটা নরম করার পরও সহজে কাটতে চায় না। সাবান মাখা শেষ করে তুলসী গালের ওপর রেজর টানতে শুরু করল। জুলপির নীচে সামান্য কিছুটা অংশের দাড়ি কাটবার পর, রেজরের মুখে বাঁ গালটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত বেরিয়ে এল কিন্তু দাড়ি আর একটুও কাটল না। রক্ত দেখে তুলসীর হুঁস হলো, বুঝতে পারল গালের ওপর বৃথা রেজর টেনে কোনো লাভ নেই। আসলে ব্লেডটা সম্পূর্ণ ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন উপায়! নতুন ব্লেডও কিনে রাখা নেই। দোকানে গিয়ে ব্লেড কিনে এনে আবার দাড়ি কামাবার মতো উৎসাহ তুলসী আর সঞ্চয় করতে পারল না। গামছা দিয়ে গালের ওপরের চামড়া কেটে বেরিয়ে আসা রক্ত, সাবানের ফেনা সাফ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে তুলসী বাজারের পথে নামল।

খান দশেক দোকান ছাড়িয়ে সরু গলিটাকে বাঁ দিকে রেখে অল্প এগোতেই সাইনবোর্ডটা তুলসীর নজরে এল। 'বিউটি হেয়ার ড্রেসিং সেলুন'। এখানে অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা উত্তমরূপে চুল দাড়ি কাটা হয়। শ্যাম্পুরও ব্যবস্থা আছে। প্রো—শ্রীবিজয়কুমার শীল। প্রোপ্রাইটার বিজয় খদ্দেরের চুল কাটায় ব্যস্ত ছিল। খদ্দেরের চুলে যেমন ক্যাচ-কাচ করে বিজয়ের কাঁচি চলেছে, মুখেরও তেমনি কামাই নেই।

—বোঝলেন স্যার, অধম্মের পথে যদি যাইতাম তাইলে এই বিজয় শীলও দুই-চাইরখান বাড়ী কইরা দেখাইয়া দিতে পারত।

কথা বললে পাছে আরো উস্কানি দেওয়া হয় সেই ভয়ে শ্রোতা যথারীতি বিজয়ের হাতে মাথা ছেড়ে দিয়ে হুঁ হাঁ করে চলেছে।

চিরুনির মাথায় কাঁচিটা বার-কয়েক ঠুকে ফের খদ্দেরের মাথায় চালাতে চালাতে
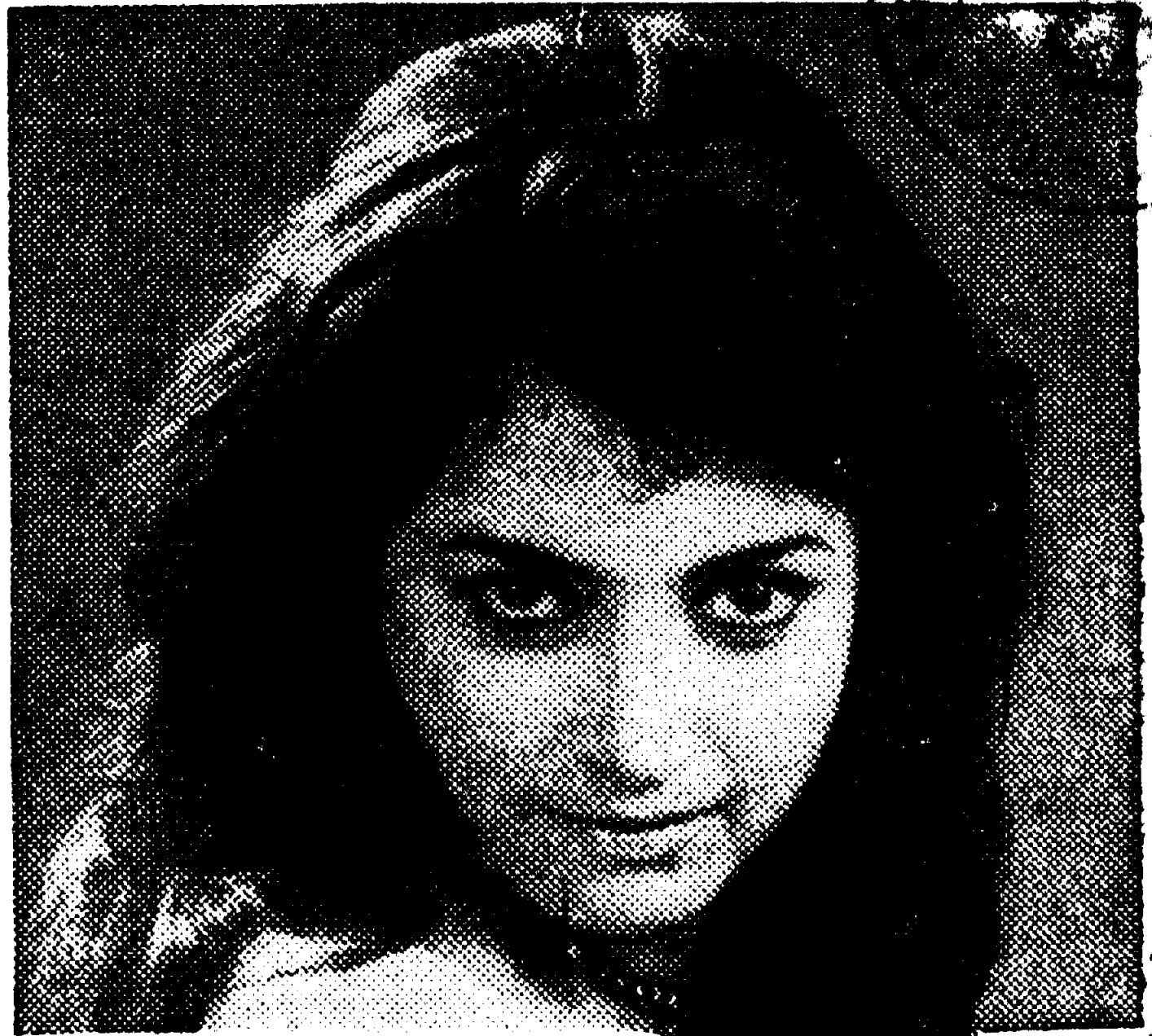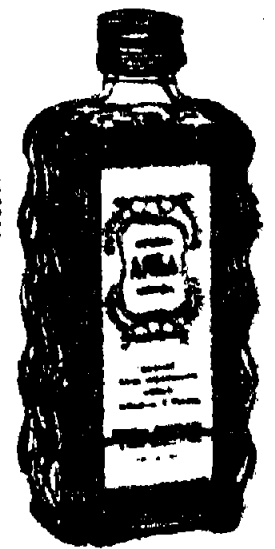
বিজয় শীল বকে যায় : আপনাগো চুল দাড়ি ফেলাইয়া আইজ আর বিজয় শীলের অন্ন জোগাড় করতে হইতো না।

কাঠের স্প্রিং ডোর ঠেলে তুলসী ভেতরে ঢুকে বলল, জ্ঞান দেওয়া ছেড়ে একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও বিজয়। এর পর আবার চান-খাওয়া আছে।

বক্তৃতা স্রোতে বাধা পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে বিজয় কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তুলসীর অংশত কামানো গালের দিকে চোখ পড়ায় হো-হো করে হেসে উঠল, একি দাদা, করছ কি? গালের এক পাল্লা চামড়া দেহি একেবারে উড়াইয়া ফেলাইছ! না, না, লজ্জা পাইও না। তুমি তো তুমি, কত বাবুর আমাগো ভাত মারতে গিয়া এই দশা লইয়া দোকানে আইস্যা হাজির হয়!

চুল কাটার খদ্দের বিদায় হলে বিজয় তুলসীকে ধরল। তুলসীর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর সাবান মাখানো ব্রাস ঘষতে-ঘষতে খুব অন্তরঙ্গ সুরে বিজয় বলতে থাকল, তুমি কিন্তু বেশ আছ দাদা! পরিবার নাই, ঘর-সংসার নাই। একদিন খাওয়া না জোটলে কেউ কওনের নাই, কান্দনের নাই। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট চুকাইয়া একলা-একলা দিব্বি আছো। বেশ ভগবানের নাম লওনের সময় পাও। আর আমাগো, মরবারও ফুরসৎ নাই। একদিকে অন্নচিন্তা, অন্যদিকে বাজার করো, র‍্যাশন ধরো, ডাক্তারের বাড়ী দৌড়াও, হাজার ঝামেলা। তোমারে দ্যাখলে হিংসা হয়। কোনো কাজ নাই, বইস্যা শুধু ভগবানের নাম করো।

তুলসী মনে-মনে খেপে উঠল। তা অত হিংসা কিসের বাপু! হ না, স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে নির্বংশ হয়ে একা-একা আমার মতো মনের আনন্দে ভগবানের নাম কর না। কে তোকে আটকে রেখেছে রে ব্যাটা! পরিবার হারিয়ে, সংসার-ধর্মের পাট চুকিয়ে একবার দ্যাখ না কত ধানে কত চাল!

দাড়ি কামানো হলে তুলসী নিজেই স্নোর কৌটো থেকে বেশ কিছুটা স্নো নিয়ে দু গালে ঘষল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, দামটা রইল, পরে নিও।

বিজয় সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আগের একটা চুল-দাড়ির পয়সাও আছে কিন্তু দাদা।

সব মনে থাকে, তুলসী ভাবল। এত বক্তিমে ঝাড়লে কি হবে, পয়সার ব্যাপারে বিজয়ের ভুল হবার উপায় নেই। সেই কবে চুল-দাড়ি কেটে পয়সা দেয় নি, ঠিক মনে রেখেছে শীলের পো।

বেলা হয়েছে। তুলসী আকাশের দিকে চেয়ে দেখল, সূর্য পশ্চিম দিকে সরে গেছে। রাস্তায়ও তেমন লোকজন নেই। দু ধারে রাস্তার ওপর যে সব সব্জি-ওয়ালারা দোকান পাতিয়ে বসে তাদের অনেকেই চলে গেছে, বাকি দু-একজনও দোকান গোটাচ্ছে। শুধু ডাবওয়ালা হারাধনের এখুনি যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গরমের দুপুরে, ডাব বিক্রির এইটেই উপযুক্ত সময়।

এখন বাজারে সবচেয়ে বড়ো মুদি-মনোহারী দোকান বাদলের। এ যাবৎ ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ মোদকের। বছর দুই হোল আকারে সাজ-সজ্জায় হাঁকে-ডাকে তাকে পেছনে ফেলে বাদল ফেঁপে-ফুলে উঠেছে। রাস্তার দিকে মুখ করে বাদল টাকা-পয়সা গুনছিল। পাশে রাখা ট্রানজিস্টর রেডিও সেটে চলতি হিন্দী গান নিম্নগ্রামে বাজছে। বাঁ হাতে দামী ঘড়ি, গলায় একছড়া সরু সোনার চেন। একটু ঝুঁকে থাকায় বাদলের গলার সরু হারটা অল্প-অল্প দুলছে।

বাদলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুলসী ডান হাতের তেলোটা প্রসারিত করে বাস্ত সুরে বলল, ওরে বাদল, এট্টু নারকেল তেল দে বাবা!

মুখ তুলে তুলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাদল যেন অবাক হয়ে গেল, বলল, জঞ্জাল-ফঞ্জাল সাফ করে একি কান্ড গো দাদা। গাল দুখানা যে একেবারে ভি আই পি রোড করে ফেলেছ, ব্যাপারখানা কি?

পলায় করে টিন থেকে অল্প একটু নারকেল তেল তুলে তুলসীর প্রসারিত হাতের ওপর ঢেলে দিয়ে চোখ টিপে বাদল ফের বলল, কেমন যেন রসের গন্ধ পাচ্ছি। কেষ্ট ঠাকুর সেজে কোন বৃন্দাবনে লীলা খেলতে যাচ্ছ দাদা!

হাতটা তেমনি প্রসারিত রেখে তুলসী বলল, দে, দে, আর এট্টু দে। অত কিপ্টেমি করিস নি। তোর সব তাতেই কেবল ফচকেমি। বিষ্টুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি, একটু সাফ-সুফ হতে হবে না।

দোকানের পেছনে ছোট পানাপুকুরে ডুব দিয়ে স্নান সেরে আসতে বেলা আরো গড়িয়ে গেল। শুধু স্নান হলেও কথা ছিল। ময়লা গেঞ্জিটাতেও সাবান দিতে হয়েছে। গায়েও অনেক দিন ধরে ময়লা জমছে। এই ফাঁকে কাপড়কাচা সাবানটাই গায়ে ঘষেছে তুলসী। কাপড়কাচা সাবান গায়ে দেওয়ার জন্যেই, না কি পানাপুকুরের জলটা গায়ে বেশিক্ষণ লাগাবার দরুন এখন যেন তুলসীর গা-টা কেমন চুলকাচ্ছে। কিন্তু পেটের মধ্যে ক্ষিধের জন্য মুচড়ে ওঠায় তুলসী গা চুলকানোর কথা ভুলে গেল। আজ আর সাত-তাড়াতাড়িতে তুলসী তেমন কিছু রান্না করতে পারে নি। ভাতের সঙ্গে শুধু আলু আর ডালসেদ্ধ। ক্ষিধের মুখে তেল-কাঁচা-লঙ্কা মেখে তাই গোগ্রাসে গিলে তুলসী তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। এবেলা কোনমতে পেটটা বোজানো নিয়ে কথা। ওবেলা বিয়ে-বাড়ীতে ভালোমন্দ তো পড়ছেই।

খাওয়া সেরে বিড়ি ধরিয়ে মাদুরটার ওপর একটু গড়াতে না গড়াতেই প্রায় বিকেল হয়ে এল। একটু বেলাবেলিই বেরোবার কথা। বিয়ে বসিরহাটে। এখান থেকে যেতেও কম সময় লাগবে না। কাজেই তুলসীকে উঠতে হল। সাজসজ্জা এমন কিছু নয়, তবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মাথার চুল আঁচড়ে ঘর বন্ধ করে তুলসী যখন বিষ্ণুপদর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল তখন বরসমেত বরযাত্রীরা প্রায় বেরোবার উদ্যোগ করছে। তুলসীকে দেখে মহেন্দ্র দরাজগলায় তারিফ

সুরু করল, সত্যি তোমাকে আর চেনাই যাচ্ছে না তুলসীদা। কেন যে তুমি রোজ ময়লা জামাকাপড় পরে ভূত সেজে থাকো বুঝি না! এসো, তোমায় একটু পাউডার দিয়ে দিই।

টেবিলের ওপর থেকে পাউডারের [illegible] কৌটো এনে মহেন্দ্র তুলসী[illegible] ঘাড়ে [illegible] মধ্যে পাউডার ছড়িয়ে দিল। পরে কিছুটা পাউডার হাতে ঢেলে মুখে মাখাতে [illegible] তুলসী মহেন্দ্রর হাত চেপে ধরে [illegible] দোহাই মহেন্দ্র, এই বুড়ো বয়সে পাউডার মাখিয়ে আমাকে আর বাঁদর [illegible] জোস [illegible]

পাট-ভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি [illegible] হাসো মুখর একদল ছেলে[illegible] সঙ্গে বাসে করে যেতে যেতে তুলসী [illegible] হীন অলস মন্থর একঘেয়ে জীবনে [illegible] ভিন্নতর স্বাদ অনুভব করছিল। [illegible] মুহূর্ত দিয়ে গড়া একাকীত্বে বন্দী [illegible] অস্তিত্ব যেন বাসের জানালার বাইরে [illegible] অপসৃয়মান সবুজ গাছপালা, পাখ-পাখালি, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধনদশা মুক্ত করছিল। চলমান বাসের জানালা দিয়ে তুলসী মুগ্ধ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

বসিরহাটে পৌঁছতে প্রায় ঘন্টাদেড়েক লাগল। এর মধ্যে চা খাওয়ার জন্য একবার মাত্র বাস দাঁড় করানো হয়েছিল বেড়াচাঁপায়। তাও মিনিট দশেকের জন্য। বিয়ে-বাড়ীতে পৌঁছবার পর শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, বর দেখবার জন্যে মেয়েদের হুড়োহুড়ি [illegible] কিছুই তুলসীর অত্যন্ত পরিচিত [illegible] তবু তুলসীর সব কিছুই কেমন নতুন [illegible] ছিল, আটচল্লিশ বছর বয়সেও তুলসী [illegible] বাড়ীতে নানা রঙের শাড়ী-ব্লাউজ [illegible] প্রজাপতির মতো ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়া[illegible] মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে [illegible] রোমাঞ্চ বোধ করছিল। ছেলে-ছোকরাদের [illegible] হাসি-ঠাট্টার সুযোগ দেওয়ার জন্য [illegible] একটু এদিক ওদিক তাকাবার চেষ্টা [illegible] ছিল। কিন্তু বিষ্টুপদ যেন তার ওপরেই [illegible] রেখেছে। ঘরের ভেতরে বরাসন [illegible] থেকে উঠে দরজার দিকে [illegible] অবস্থায়ই সামান্য উঁচু হয়ে [illegible] হাত ধরে টেনে একেবারে পাশে [illegible] তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে [illegible] ফিস করে বলল, দেখো বাপু, যা [illegible] এসেছ, তাতে আমার বদলে তোমাকেই না বর বলে ধরে নিয়ে যায়। আমার [illegible] তোমাকেই বেশি বর বর লাগছে আজ।

নিশ্চয়ই ঠাট্টা। তবু প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে উপনীত তুলসীর মনে এই সামান্য ঠাট্টাই অসামান্য তোলপাড় সৃষ্টি করল। তবে কি নারীসমাজে তুলসী এখনো একেবারে অপাংক্তেয়, বাতিল হয়ে যায় নি। [illegible] বয়েস হলেও, এখনো কি ভাগ্যকে [illegible] ফিরলে তুলসী তাকে ভালবাসার জন্য, [illegible] যত্ন করবার জন্য কোন মেয়েছেলেকে [illegible] ঘর বাঁধবার আশা রাখতে পারে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে [illegible] দেখবার একটা দুরন্ত কৌতূহলে তুলসী অধীর হয়ে উঠল। বেড়াচাঁপায় পান-সিগারেটের দোকানগুলোয় বেশ বড় আয়না

ছিল। তখন মনে পড়লে সহজেই তুলসী তার আজকের চেহারাটা দেখে নিতে পারত। কি করা যায়। তুলসী ভাবতে লাগল। অবশ্য বাসটা যখন বড় রাস্তা ছেড়ে এই বিয়ে-বাড়ীর গলিতে ঢুকছিল তখন মোড়ের মাথায় রেস্টুরেন্টের সঙ্গে লাগোয়া পান-সিগারেটের একখানা দোকান যেন দেখেছিল। তুলসীর এখন বেশ মনে পড়ছে। আর পান-সিগারেটের দোকানে ছোট হোক বড় হোক একখানা আয়না কি আর না থাকবে!

পর বিয়ের আসরে যেতে তুলসীর সুযোগ মিলল। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো অনেকেই বিয়ে দেখবার জন্য ভিড় করেছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একদল খেতে বসে গেছে। তুলসী এক ফাঁকে বিয়ের আসর থেকে সরে পড়ল। গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় মোড়ের ওপর এসে দাঁড়াতে সেই পান-সিগারেটের দোকানটা তুলসীর নজরে এল। কড়া বৈদ্যুতিক আলো দোকানের সামনের পথটা বহুদূরে পর্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে।

তুলসী দোকানদারকে বলল, জর্দাপান দেখি একটা।

তারপর সরাসরি আয়নার দিকে তাকাল। দোকানের আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে তুলসী অবাক হয়ে গেল। ধুতি-পাঞ্জাবিতে তুলসীকে এখন আর খুব একটা বয়স্ক দেখাচ্ছে না। তার মানে এই নয় যে তাকে একেবারে কাঁচ জোয়ানটি মনে হচ্ছে। তবে তার যে বয়েস আটচল্লিশ হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। বরং এখনো চল্লিশ পেরোয় নি তুলসী এমন দাবী করলে কেউ আপত্তি তুলতে পারবে না। বয়সের জন্য তুলসীর চোখে যে ঘোলাটে ভাবটা সচরাচর দেখা যায়, এখন সেটাও আর তেমন স্পষ্ট নয়। বরং নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানোর ফলে গাল দুটোর উজ্জ্বল ভাবটা চোখের দৃষ্টিটাকেও বেশ স্বচ্ছ করে দিয়েছে। একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারলে চেহারায় আরো কিছুটা জৌলুষও নিশ্চয় আসবে। যেটুকু বা বয়স্ক দেখাচ্ছে তাও কপালের সামনে মাথার মাঝখানের পাকা চুলগুলোর জন্য। চুলে কলপ লাগালে বয়েস আরো যে দু-চার বছর কম না দেখাবে তা নয়। তুলসী ভেতরে ভেতরে খুশী হয়ে উঠল। নিজেকে তার নতুন করে ভালো লাগছিল। বড়ো অযত্ন হচ্ছে শরীরের। জীবনটা হেলাফেলায় নষ্ট করবার জিনিস নয়। চেহারার যত্ন নিতে হবে এবার থেকে।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল তুলসীর। খাওয়া দাওয়া সেরে বাসে ফিরতে রাত দেড়টা বেজে গিয়েছিল। ঘরে এসে ঢকঢক করে জল খেয়ে তারপর বিছানা পেড়ে মশারি খাটিয়ে শুতে রাত আরো কত হয়েছিল কে জানে। তুলসী আড়মোড়া ভেঙে মশারির বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে আলো ফুটেছে কিন্তু তুলসীর ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। ঘরে তো জানালা নেই যে আলো আসবে। দু'পাশে দোকানঘর, পেছনেও ভাড়া খাটাবার জন্য ঘর তুলেছে বাড়ীওয়ালা। কাজেই জানালা কাটবে কোথায়। টালির দোচালা তাই রক্ষে। বেড়া আর চালের ফাঁক দিয়ে তবু কিছু আলো হাওয়া ঘরে আসে। না হলে দমবন্ধ হয়ে তুলসী কবে মরে যেত।

সামনের দরজা খুলতে বাজারের হৈ-চৈ যেন হুড়মুড় করে তুলসীর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। এখন রাজ্যের ভিড় বাজারে। এই অবস্থায় কেষ্টকে হাঁকডাক করে লাভ নেই। গ্লাস হাতে করে তুলসী নিজেই রাস্তা পার হয়ে দোকান থেকে চা আনল। তারপর মশারি গুটিয়ে রেখে বিছানায় বসে চায়ে চুমুক দিতে সুরু করল। রোদের তেজ দেখে তুলসী বুঝল, বেশ বেলা হয়েছে। তা হোক। আজ এবেলা তুলসী আর রান্নার ঝামেলা করছে না। জব্বর খাওয়া হয়েছে কাল রাতে। পেটটা যেন ফেঁপে রয়েছে। পুরোপুরি হজম হয় নি এখনো। নেহাত যদি বেলায় ক্ষিধে পায় তো খানিকটা চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে নেবে। চা খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে তুলসী ফের বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। চিৎ হয়ে শুতে প্রথমেই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তিটা তার নজরে এল। গণেশ তো দিব্বি সোজা হয়েই বসে আছে। কিন্তু লোকে বলে তুলসীর দোকান গণেশ উল্টেছে। অর্থাৎ তুলসীর দোকান ফেল পড়েছে। কিন্তু সেটা বোঝাতে মানুষ কেমন অদ্ভুত ভাষা বানিয়েছে দ্যাখো।

দোকানের খালি তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তুলসীর বুকের মধ্যে পুরনো ব্যথাটা খচ করে উঠল। এই তাকগুলো একদিন মালপত্তরে বোঝাই ছিল। কোণের জড়ো করে রাখা যে দাঁড়িপাল্লা বাটখারায় এখন মরচে ধরে যাচ্ছে তা শক্ত হাতে ধরে এইখানে বসে তুলসী কতো মাল মেপে-মেপে খদ্দেরদের কাছে বিক্রি করেছে। তখন তুলসীর এতটুকু ফুরসত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে যে একটা নিষ্কর্মা মানুষ হয়ে দাঁড়াবে তুলসী ভাবতেও পারে নি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করতে পেলে তুলসী বর্তে গেছে। সোজা তো নয়, মুদিখানা বলে কথা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পাঁচটা খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, দশ রকমের জিনিস হাতড়ে ওজন করা, মালের দর হিসেব করা, হিসেবমতো পয়সা গুনে নেওয়া, এ কি কম ঝামেলা না কি! তারপর মাল বেচলেই তো শুধু হবে না। আবার খরিদও করা চাই। বেশি পুঁজি থাকলে অবশ্য খরিদটা রয়েসয়ে করা চলে। কিন্তু তুলসীদের মতো কম পুঁজির দোকানদারদের সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার মাল খরিদের জন্য ছুটতে হয়। এক হাতে এতসব হ্যাঙ্গামা সামলানো কি চাট্টিখানি কথা। তুলসী কিছু কম খাটিয়ে ছিল না। তার শক্তি সামর্থ্যে অন্য পাঁচটা দোকানদার তাকে হিংসে করত। অনেকদিন পর্যন্ত তুলসী একা হাতেই সবকিছু করেছে। কিন্তু দোকানের কেনাবেচা বাড়তে শেষ পর্যন্ত তুলসীর একজন বাড়তি হাতের দরকার পড়ল। যাকে তাকে আবার দোকানের কাজে রাখা যায় না, একটু বিশ্বাসী লোক চাই। না হলে, মেরে দোকান ফাঁক করে দেবে। সে তাই ভাল লোকের সন্ধান করছিল। কিন্তু এদিকে অতিরিক্ত খাটুনিতে তুলসীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল দেখে বউ নয়নতারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, অত সাতপাঁচ ভেবে আর দরকার নেই। চেহারা তো আধখানা করে ফেলেছ। আমাদের ওই সুবলকেই আসতে খবর দাও। বাড়িতে বুড়ো বাপের ওপর সে বসে খাচ্ছে। এখানে এসে দোকানে বসলে ওরও তবু একটা হিল্লে হবে। সুবল অর্থাৎ নয়নতারার ভাই, তুলসীর সম্বন্ধী। শেষ পর্যন্ত তাকেই এনে তুলসী দোকানের কাজে লাগিয়েছিল। তা কাজকর্মে নেহাত মন্দ ছিল না ছোকরা। খাটতেও পারত। দোকানের পেছন দিককার একখানা ঘর তুলসী ভাড়া নিয়েছিল। রাতে দোকানে শুত সুবল। দিন বেশ কাটছিল। শত্রুরদের মুখে ছাই দিয়ে তুলসীর দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। হাতে দুটো পয়সা হলে তুলসী একমাত্র সন্তান রাধারও বিয়ে দিয়েছিল। মানানসই ঘর-বর দেখে। আরও দু'চার বছর পরে রাধার বিয়ে দিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হোত না। কিন্তু নয়নতারা যেন জেদ ধরেছিল। রাধার বিয়ের ব্যাপারে তুলসী এড়িয়ে যেতে চাইলে নয়নতারা বলত, এখন নয়, এখন নয় যে করছ, পরে কার কি হবে কেউ বলতে পারে না। আমার সখসাধ বলতে ঐ একটি। মেয়ের বিয়ে দেখে যাব। আমার পোড়াকপালে বোধহয় তা নেই। বলতে গিয়ে নয়নতারার চোখ ছলছল করত।

তারপর রাধার বিয়ের মাসতিনেক পর থেকে সত্যিই নয়নতারার শরীর ভাঙতে সুরু করল। খাওয়ায় অরুচি, রাতে ঘুম নেই। একটু আধটু জ্বরও হতে লাগল। বুকের ছবি, থুতু, রক্ত পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া গেল না। কলকাতায় বড়ো ডাক্তারও দেখান হয়েছিল, তেমন সুবিধে হয় নি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার বললেন, গ্রামের দিকে খোলামেলা জায়গায় রাখতে পারলে হয়তো কিছু উপকার হতে পারে। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে শ্বশুরবাড়ীতে নয়নতারাকে রেখে এল তুলসী। নয়নতারার শরীর তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বিছানা থেকে ওঠবার শক্তিটুকুও সে আস্তে-আস্তে হারিয়ে ফেলছিল। তেল ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপের সলতে উসকে দেওয়ার মতো, ক্যাপসুল ইনজেকশানগুলো যেন নয়নতারার জীবনটাকে জোর করে ধরে রাখছিল। সপ্তাহান্তে তুলসী একবার করে নয়নতারাকে দেখতে যেত। আর প্রতিবারই তাকে দেখে তুলসীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসত। তার মনে হোত, আর বেশি দিন বোধহয় নয়নতারাকে দেখতে আসতে হবে না। মাস দুয়েক এইভাবে চলবার পর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ দিনে খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত তুলসীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, অবনীকান্ত, তুলসীর শ্বশুর।—নয়নের অবস্থাটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। তোমাকে তো এখুনি আমার সঙ্গে একবার যেতে হয় বাবাজী।

অবনীকান্তর গলাটা কেমন ভিজে-ভিজে।

তুলসীর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। হয়তো নয়নতারা আর বেঁচে নেই। হয়তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে, বাকি কাজটা সারবার জন্য অবনীকান্ত তাঁকে কোন মতে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

—আছে কি নেই তাই বলুন! তুলসী ফুঁপিয়ে উঠল।

—না, না, বালাই ষাট! নয়ন বেঁচেই আছে। তেমন কিছু নয়। তবে একা একা ঠিক ভরসা পাচ্ছি না, তাই তোমাকে নিতে এসেছি। গিয়ে কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি।

চোখের জলে তুলসীর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। সুবলকে দোকানের একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, তোর দিদির অবস্থা তো শুনলি। তেমন দরকার পড়লে আমার হয়তো ফিরতে দু-চার দিন দেরী হতে পারে। পরশু মাসপয়লা। বাকি খদ্দেরদের কাছ থেকে খাতা মিলিয়ে টাকা-পয়সা মিলিয়ে নিবি। টাকা পেয়ে দোকানে মাল তুলবি। খবরদার, মালের অভাবে খদ্দের যেন হাতছাড়া না হয়। আর দিনকাল খারাপ। হুটহাট দোকান ফেলে কোথাও যাসনে যেন।

শেষ পর্যন্ত নয়নতারা বাঁচে নি। আশা-নিরাশার দোলায় তুলসীকে সপ্তাহখানেক ধরে দুলিয়ে নয়নতারা চিরকালের মতো চোখ বুজেছে। পরদিন সকালে শোকার্ত উদভ্রান্ত তুলসী ভূতগ্রস্তের মতো এসে দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে। সুবল তখন দোকানে বসে সিগারেট ফুঁকছিল। তুলসীকে দেখে সুবল সিগারেটটা ফেলে দিল।

দোকানের দিকে তাকিয়ে তুলসী নয়নতারার শোক ভুলে গেল। তার মাথার মধ্যে মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠল। দোকানে বিশেষ কোন মালপত্তর নেই, অল্প-স্বল্প যা আছে তাতে বেচাকেনা চলে না।

তুলসী হুংকার দিয়ে উঠল, দোকানে মাল তুলিস নি কেন?

তুলব-টা কি দিয়ে? সুবলের গলায় ঝাঁঝ ফুটল।

—তুলব কি দিয়ে মানে? খদ্দেররা টাকা-পয়সা দেয় নি বলতে চাস্?

—আমি চেয়েছিলাম। সব্বাই বলেছে, তুলসী না এলে দেব না।

—কেন, আমার অবর্তমানে তোকে খদ্দেররা কোনদিন টাকা দেয় নি?

—সে যখন দিয়েছে, দিয়েছে।

তুলসী আর সহ্য করতে পারল না। নয়নতারার মৃত্যু তাকে ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। তার উপর সুবলের এই বেইমানি তুলসীকে রাগে, আক্রোশে ক্ষিপ্ত করে তুলল। এক লাফে দোকানের মধ্যে ঢুকে সে সুবলের জামাটা বুকের কাছে মুচড়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, পাজী, বেইমান কাঁহাকা! শিগগির বল, টাকা কোথায় রেখেছিস? না হলে আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। তোকে আমি খুন করব।

চিৎকার শুনে আশে-পাশের দোকান থেকে ইতিমধ্যে কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছে। কাপড়ের দোকানের বসন্ত এগিয়ে এসে তুলসীকে সুবলের কাছ থেকে ছাড়িয়ে দিতে-দিতে বলল, ছি, ছি, এসব মারামারি ধরাধরি কি ভালো। লোকে কি ভাবছে বলতো তুলসীদা!

—দেখুন না বসন্তদা, সুবল এতক্ষণে মুখ খুলল, এসেই কি কাণ্ড শুরু করেছে দেখুন। আমাকে বলছে, চোর! বলছে, আমাকে খুন করবে।

—আলবৎ চোর বলব। তুলসী গলা আরো উঁচুতে তুলে চিৎকার করতে লাগল, এখনো ভালোয়-ভালোয় টাকা বের কর, না হলে তোকে আমি খুন করব।

—দেখুন, দেখুন বসন্তদা, কি রকম ছোটলোকের মতো চ্যাঁচাচ্ছে দেখুন। আপনারা এর একটা বিহিত করুন। নির্দোষীর ওপর এই অত্যাচার — বলতে-বলতে সুবল কেঁদে ফেলল।

বসন্ত এবং তার দলবল সুবলকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, সুবলকে আপনার দোকানে না রাখতে চান, ছাড়িয়ে দিন। আপনার কিছু বলবার থাকে আপনি বাজার কমিটিকে বলুন। তারা বিচার করবে। কিন্তু আপনি সেসব না করে সুবলের গায়ে হাত তুলবেন, আমরা থাকতে তা হতে দেব না।

তুলসী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তলায়-তলায় সবুল যে বাজারের অনেকের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছে, সে জানত না। বেশ ভালরকম দহরম-মহরম না থাকলে কি আর চুরি ঢাকবার জন্য বসন্তর দলবল অমন করে সুবলকে তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যায়। বাজার কমিটির কাছে গিয়েই বা কি লাভ হোত তুলসীর, সুবল তো ঐ দিনই এখান থেকে সরে পড়েছিল।

—বাবু!

একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ এসে লাগল তুলসীর নাকে। গলার আওয়াজ বুঝতে পারল আলি বক্স ডাকছে। তুলসী ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাতে দেখতে পেল, মাছের ঝুড়ি হাতে আলি বক্স এসে দাঁড়িয়েছে।

—বাবু, ঝুড়িটা রাখব।

—ঐ কোণের দিকটায় রাখো। মাছ সব বিক্রি হয় নি না কি?

ঘরে ঢুকে ঝুড়ির মাছে বরফ চাপাতে-চাপাতে বেজার মুখে আলি বক্স বলল, না বাবু, আজ বাজার একদম খারাপ। আধ মন মাল এনেছিলাম, তার দশ কিলোই রয়ে গেল। ওবেলা কি আর অত মাছ কাটবে?

—যাও, বিড়ি খাও দিকিন একটা, তুলসী টিনের কৌটোটা এগিয়ে ধরল আলি বক্সর দিকে, অত মন খারাপ করতে হবে না, বিকেলে না কাটলে কাল সকাল তো রয়েছে রে বাপু!

টিনের কৌটোটা নিল না আলি বক্স, গামছায় হাত মুছে ট্যাঁকে ঝোলানো ছোট কাপড়ের থলির মধ্য থেকে টাকা বের করে তুলসীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, না বাবু, এখন আর বিড়ি খাব না। কালকের টাকাটা রাখুন। তিন টাকা। সোলেমান আর যতীনের দু' টাকা আর আমারটা।

আলি বক্স বিদায় হল। ওর জন্য তুলসীর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আলি বক্সর ওপর তুলসীর সামান্য দুর্বলতা আছে। লোকটা ভালো, তাছাড়া দোকান ফেল পড়বার পর তুলসী যখন পৃথিবী অন্ধকার দেখছিল তখন এই আলি বক্সই তাকে দু মুঠো খেয়ে বাঁচবার পথ বাতলে দিয়েছে। রুজি-রোজগার বন্ধ, হাতে সামান্য দু-চারটে টাকা যা ছিল তাও ফুরিয়ে এসেছে. ভয়, দুশ্চিন্তায় তুলসী তখন আধমরা। উপোস করে শুকিয়ে মরার আতঙ্কে প্রায় উন্মাদ হবার যোগাড়। এমন সময় আলি বক্স প্রস্তাবটা এনেছিল। নীচু গলায় বলেছিল, বাবু, যদি কিছু [illegible] লেন তো একটা কথা বলি।

—যা বলবার বলে ফেল [illegible] বিরক্ত গলায় তুলসী বলেছে।

ভয়ে-ভয়ে আলি বক্স ব[illegible] আপনার দোকানের সামনে আমাদের এ[illegible] বসতে দেন বাবু!

—বসে কি হবে?

—মাছ বেচব বাবু। হকুমতো আপনি যা চাইবেন আমরা দেব।

এইভাবে আলি বক্সর দৌলতে তুলসীর একটা হিল্লে হয়ে যায়। আলি বক্স, সোলেমান আর যতীন এই তিনজন এখন রোজ দোকানের সামনে বসে মাছ বেচে। কোন-কোনদিন সকালে সব মাছ বিক্রি হয় না। বিকেলের জন্য বরফ চাপা দিয়ে তুলসীর ঘরেই ওরা মাছের ঝুড়িগুলো রাখে। আঁশটে গন্ধের জন্য তুলসীর প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হোত, আস্তে-আস্তে যদিও সয়ে আসছে তবু এখনো মাঝে-মাঝে গা গুলোয়। তা গুলোক, তবু তো দিন কবকার তিনটে টাকা আসছে। ঝুঁকি নেই, পরিশ্রম নেই। এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে মাথা [illegible] তলে খাটলেও তুলসী তিনটে টাকা উপায় করতে পারত না। একটা পেট এতেই একরকম চলে যাচ্ছে। এর চেয়ে বেশি চাইলে তাকে দিচ্ছেই বা কে। পুঁজি-পাটা থাকলে তুলসী কি করত কে জানে তবে এখন বেশি রোজগার করবার মতো উৎসাহ উদ্যম কিছুই তার নেই। পয়সা-পয়সা করে হন্যে হয়ে ঘুরবেই বা কার জন্যে। শুয়ে-বসে নিরুদ্বিগ্নতায় দিন মন্দ কাটছে না তুলসীর। রাতে ঘুমোনো আর দিনে খাওয়া-দাওয়া স্নান-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বিষ্টুপদর ওষুধের দোকানে গিয়ে তুলসী বসে। তুলসীর সময়টা কেটে যায়, বিষ্টুপদরও সুবিধে। ওষুধের দোকানে খদ্দের সব সময় লেগে থাকে না। তবু দোকান খুলে রাখতে হয়। কখন কাকে কি রোগ ব্যারাম ধরবে তা কেউ বলতে পারে না। কাজেই যে কোনো সময় খদ্দের আসতে পারে। অতএব যতক্ষণ পারে বিষ্টুপদ দোকান খোলা রাখে। তুলসীর মতো একজন নিষ্কর্মা মানুষ পেয়ে বিষ্টুপদর বরং ভালোই হয়েছে। খদ্দের না থাকলে ভূতের মতো একা-একা বসে থাকতে হয় না। তুলসীর সঙ্গে যা হোক কথাবার্তা বলে সময় কাটানো যায়। এখন কটা দিন অবশ্য বিষ্টুপদর আর টিকি পাওয়া যাবে

না। সদ্য বিয়ে হয়েছে, কাজেই এখনো দিন দশ-বারো বিয়ের ছোট-খাটো আচার অনুষ্ঠান, নতুন কুটুম্বদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে জোড় বেঁধে যাওয়া, ভালো-মন্দ খাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ ফুর্তিতে কাটবে। একদিন তুলসীর একটু মুস্কিল হবে। তা কি আর করা যাবে। তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য মানুষ কি বিয়ে-থা করবে না নাকি! তুলসী যেন মনে-মনে বিষ্ণুপদর জন্য কয়েক দিনের ছুটি মঞ্জুর করল।

দশ-বারোটা দিন যেন তুলসীর বুকের ওপর ভারী হয়ে চেপে রইল। হলধরের দোকানে বেঞ্চের ওপর ঠায় বসে-বসে তার দিন যেন আর কাটতে চাইছিল না। রাতে বিছানায় শুয়ে তুলসী টের পেতে লাগল মেয়েমানুষের ব্যাপারে সে আর আগের মতো নিস্পৃহ নেই। চোখ বুজলে নানান রূপের মেয়েদের চেহারা ভেসে ওঠে। ঠিক স্পষ্ট কোনো মেয়েছেলের মূর্তি সে দেখতে পায় না, তবে যাদের দেখতে পায় তারা সবাই যুবতী। একটা উষ্ণ নারীদেহের নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য তুলসী কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এইজন্যই, তুলসী আজকাল রাস্তায় কোনো মেয়েকে দেখতে পেলে সহজে তার চোখ ফেরাতে পারে না। তন্বী যুবতী হলে তো কথাই নেই, এমন কি উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীও বাদ যায় না। যেন বিয়ের উপলক্ষে বিষ্ণুপদ একটু দূরে সরে যাওয়ায় মেয়ের দল এখন তুলসীর মনের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। যেন এত-কাল তারা আশে-পাশে ঘুরঘুর করেছে, বিষ্ণুপদ সরে গিয়ে দাঁড়ানোয় এবার তারা মিছিল করে সেই শূন্যস্থান জবরদখল করতে আসছে। তাই পানাপুকুরে চান করবার সময়ও তুলসী আজকাল আড়চোখে মেয়ে-বউদের চান-করা দেখে। বুকের কাপড় কখন সরে যায় কি পায়ের থেকে কাপড় হাঁটু অব্দি তুলে কখন সাবান ঘষে সেটা দেখবার জন্য তুলসী যেন ইদানীং চান করতে একটু বেশি সময় নিচ্ছে।

রাতে ভালো ঘুম হয় নি বলে তুলসী খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে একেবারে সন্ধ্যায় উঠল। তারপর দড়িতে ঝোলানো সার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে গলিয়ে দরজা বন্ধ করে অভ্যাস-মতো বিষ্ণুপদর ওষুধের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হুঁ, তুলসী যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দোকান বন্ধ, ইয়া তালা ঝুলছে দরজায়। অবস্থাটা বোঝ একবার। এই যে বলা নেই, কওয়া নেই, হুট-হাট যখন খুশি দোকান বন্ধ রাখছিস, এর পরিণাম ভেবে দেখেছিস। দোকান লাটে উঠলে তখন মজাটা বুঝবি। তুলসীর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। হলধরের দোকানে বেঞ্চিতে বসে এক কাপ চা খেল তারপর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ উদাস চোখে মানুষজনের চলাফেরা দেখতে লাগল। অন্ধকার ঘন হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে চারিদিকে। মাঝে-মাঝে দ্রুতবেগে চলমান বাসের হেড লাইটের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দোকানগুলোয় ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। সেই আলোয় রাস্তার কিছুটা আলোকিত কিন্তু বাকিটা অন্ধকারে থিক-থিক করছে।

পেছন থেকে কাঁধে কে হাত রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে তুলসী দেখল, বাদল।

—এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে গো দাদা!

—হবে আবার কি। কাঁহাতক আর ঘরে বসে থাকব, তাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। তবু পাঁচটা মানুষের মুখ দেখে সময় কাটছে।

—অ, তা বিষ্টুর ওখানে যাও নি?

—বিষ্টুর কথা আর বোল না, তুলসী বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত করল, আজ ফের দোকান বন্ধ দিয়েছে।

—কেন? গেল কোথায়?

—বুঝলি না, হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। দেখিস, শেষ পর্যন্ত ওই হাওয়াই ওকে খেতে হবে। ওর দোকান যদি না লাটে ওঠে তো আমার নামে তুই কুকুর পুষিস বাদল।

—তা তোমার অতো রাগবার কি হল তুলসীদা? বাদল হাসল, নতুন বিয়ে করেছে, একটু আমোদ-ফুর্তি করবে না? তুমি যে কি বল!

—আমোদ-ফুর্তি! তুলসী ব্যঙ্গ করে উঠল, দোকান বন্ধ করে হ্যাংলামোর নাম আমোদ-ফুর্তি। মারো ঝাঁটা অমন আমোদ-ফুর্তির মুখে।

—এ তোমার ভারী অন্যায় তুলসীদা। আসলে বিষ্টু বউ নিয়ে ফুর্তি করছে দেখে তোমার হিংসে হচ্ছে।

হিংসে! রাগে তুলসী কথা বলতে পারছিল না। তুলসী বেজায় রেগে গেছে দেখে বাদল বাঁ হাত দিয়ে তুলসীর পিঠ জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে ঠেলতে লাগল।

—রাগ কোরো না তুলসীদা। তোমার মন মেজাজ আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি। চল, আগে এক পাত্তর চড়িয়ে আসিগে কালিপদর ওখান থেকে। তারপর ওখান থেকে এক জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে। বাদল চোখ টিপল।

—ছাড়, ছাড়, ওসব মদ-ফদের মধ্যে আমি নেই।

—আরে জিনিসটা চেখে দেখই না এক-বার। এমন তো নয় যে তোমাকে আমি বিষ খেতে বলছি। বাদল তুলসীর হাত ধরে টানতে লাগল।

—ঐ পাপের চেয়ে বিষও ঢের ভাল।

—পাপ! বাদল দাঁত বের করে হাসল, তুমি আর মানুষ হলে না তুলসীদা! পাপ বলে কিছু আছে না কি। মদ তো মদ, আমি তো খারাপ পাড়ায় বাজে মেয়েমানুষ নিয়ে কাটাই। তো হয়েছেটা কি? বলো, পাপ হচ্ছে, মরবার পর নরক বাস হবে। সে পরকালে যা হবে, হবে। ইহজন্মে তো কেউ আমাকে ঠেকাতে পারছে না। তুমি তো পুণ্যি করে রসাতলে গেছ। তোমার বউ মরেছে, তোমার দোকান লাটে উঠেছে। আর আমি দ্যাখো, দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছি, ব্যবসায় উন্নতি করেছি, এমন কি দু-দুটো বিয়েও করেছি। সব কিছু ষোল আনা ভোগ করে যাব আমি। গয়লাপাড়ায় নতুন এক-খানা যা জিনিস এয়েছে না তুলসীদা, দেখলে তোমার মতো সন্নিসিরও চরিত্তির নষ্ট হয়ে যাবে। নামখানাও রেখেছে তেমনি, ময়না। আহা, সাধের ময়না রে! বাদল চুকচুক করতে থাকল।

—করগে যা, যা তোর খুশি। আমায় ছেড়ে দে।

জোর হ্যাঁচকা টানে বাদলের হাত ছাড়িয়ে তুলসী উল্টোদিকে হনহন করে চলতে লাগল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে কিছু দূর এগিয়ে পিছন ফিরে তুলসী দেখল, না বাদল আসছে না। তুলসী যেন বেঁচে গেল। কেননা তার মনে হচ্ছিল, ফের যদি বাদল এসে তাকে জোর করে কালিপদর দোকানে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তুলসী আর তেমন আগেকার মতো তার হাত ছাড়িয়ে চলে আসতে পারবে না। যেন বাদলের
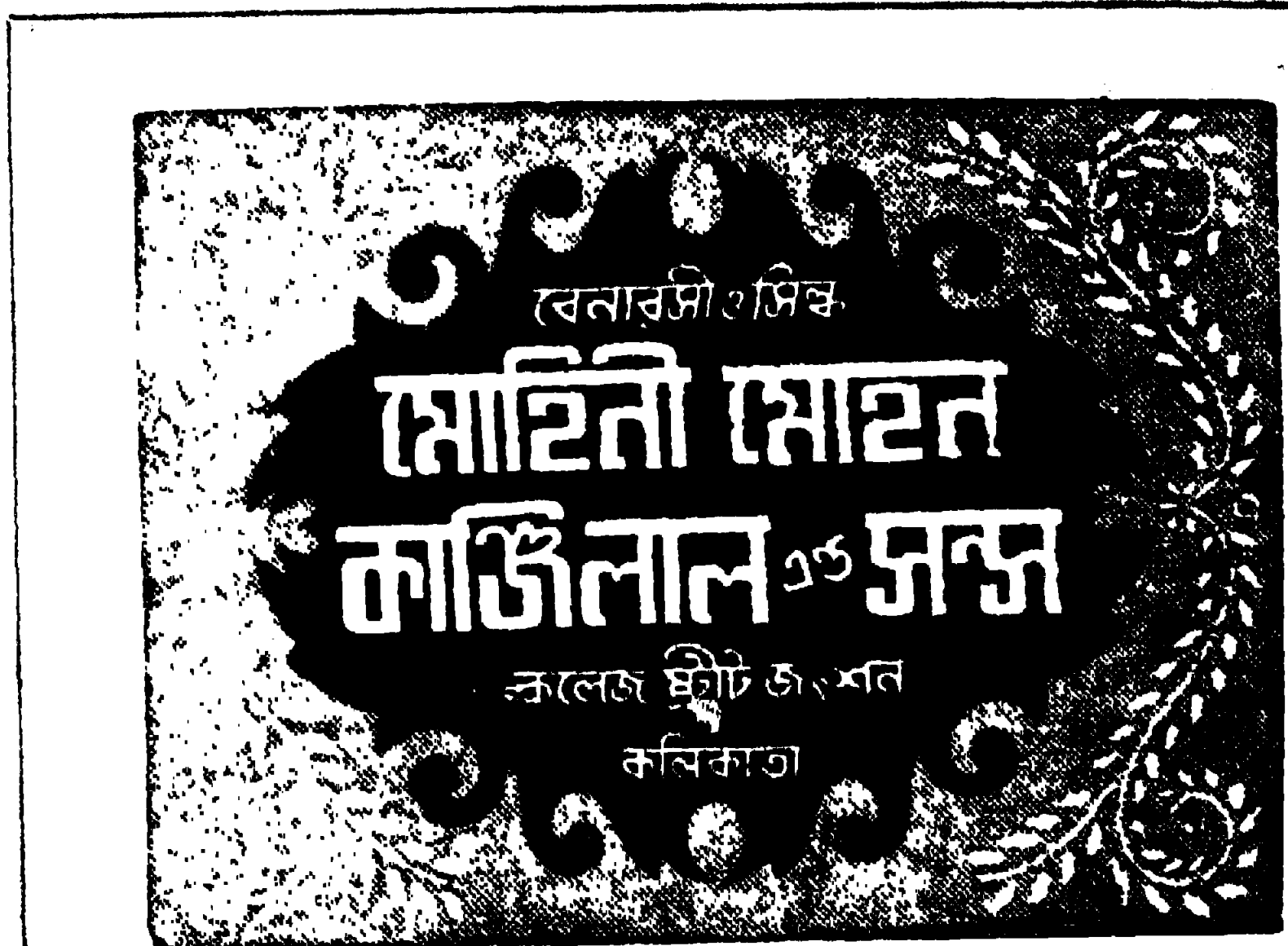
কথাগুলো তাকে ভিতরে-ভিতরে দুর্বল করে দিয়েছে। বাদলের কাছ থেকে সরে এলেও ওর কথাগুলো তুলসী মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। সারা জীবন মোটা-মুটি সৎ ভালোমানুষ থেকেও তুলসী রেহাই পেল না। কি পাপে তুলসী নয়ন-তারাকে হারাল, কি পাপে তার দোকান লাটে উঠল, আর কি এমন পুণ্যের জোরে সুবল তার দোকানের যথাসর্বস্ব চুরি করে সেই পুঁজি খাটিয়ে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে সব কিছু তুলসীর কাছে দুর্বোধ্য রহস্যময় হয়ে উঠল।

রাতে তুলসীর ঘুম আসছিল না। অথচ গোটা পৃথিবীটা গাঢ় ঘুমে মগ্ন। চারিদিক নিথর, নিঃশব্দ। নির্ঘুম চোখে তুলসী তার নিজের জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব-নিকাশ করছিল। রাত ক্রমশ বাড়ছিল। আর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে তুলসী তার অসহায় একাকীত্বের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল। ঘরের মধ্য থেকে তীব্র একটা আঁশটে গন্ধ ক্রমেই ভারী হয়ে তুলসীর নিঃশ্বাসকে বন্ধ করে আনছিল। 'বল হরি হরিবোল'। রাস্তা দিয়ে কারা একটা মড়া নিয়ে চলেছে। হরিধ্বনিটা ক্রমে দূরে থেকে কাছে এসে পড়ল। থেমে থেমে হরিধ্বনি দিচ্ছে শবযাত্রীরা। কাছাকাছি এসে লোক-গুলো চিৎকার করে উঠল, 'বল হরি হরি-বোল'। এবার যেন চিৎকারটা জোরে এসে তুলসীর কানে আছড়ে পড়ল। হরিধ্বনি দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরও তুলসী যেন তার কানের কাছে মৃদু মৃদু আওয়াজ পাচ্ছিল, 'বল হরি হরিবোল'। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকারটা কেমন একটা ভৌতিক রূপ ধরেছে হঠাৎ। তুলসী চোখ খুলেই আবার ভয়ে বন্ধ করল। তার যেন কেমন মনে হচ্ছিল, নয়নতারা তার মরা বাপ-মা, কাকা, জ্যাঠা, মাসিমা ঠাকুরমা আরো অনেকে একে একে সকলেই মরলোক থেকে এখন এই ঘরের মধ্যে এসে তুলসীর একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। সেই ছায়ামূর্তিগুলো এই ঘরে এখন কেমন নিঃশ্বাস ফেলছে। নিঃশ্বাসের মতো আওয়াজ করে তারা যেন তুলসীকে বলছে, আর কতকাল এমনি একা একা থাকবি। চলে আয়, আমরা সবাই এখানে আছি, আমাদের কাছে বেশ একসঙ্গে থাকবি।

ভয়ে তুলসীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তুলসী টের পেল, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝিন্-ঝিন্ করে ঘাম ছুটেছে। আতঙ্কে, কষ্টে তুলসীর কান্না পেয়ে গেল। কাঁদতে পারলে হয়তো বুকটা হাল্কা হোত। কিন্তু বয়েস বেশি হওয়ায় তুলসী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে পারল না। পরিবর্তে তার গলা দিয়ে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুল। নিদ্রামগ্ন পৃথিবীতে একা অন্ধকার ঘরের মধ্যে তুলসী টেনে টেনে গোঙাতে থাকল।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের কেমন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে তুলসী দীর্ঘ বিলম্বিত রাত্রিটা পার করল। পেছন দিকের কোন বাড়িতে কয়েকটা মোরগ ডেকে উঠলে তুলসী অন্ধকার ঘরের বাইরে ভোরের আলো, মানুষের মুখ দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। মশারি গুটিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে ভোরের স্নিগ্ধ নির্মল হাওয়ায় তুলসীর দেহমন জুড়িয়ে গেল। আঃ, বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল তুলসী। দু' একখানা মাল বোঝাই লরী প্রচণ্ড গতিতে পিচের রাস্তা ধরে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে গেল। লরীর সামনের হেডলাইটগুলো এখনো জ্বলছে, কিন্তু আলোয় তেমন জোর নেই। ভোরের আলো-আঁধারিতে ওপারে নজর করে তুলসী দেখল, হলধর ইতিমধ্যেই দোকান খুলে বসেছে। বাইরে উবু হয়ে বসে কেষ্ট প্রাণপণে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে। পেল্লায় এক কেটলী উনুনের মাথায় চাপানো। দোকানের সামনে রাস্তার ওপর একমুঠো মুড়ি কি খই বোধ হয় ছড়িয়ে দিয়েছে হলধর। অনেকগুলো কাক সারা রাস্তা জুড়ে সেইগুলো খুঁটে খুঁটে মুখে দিচ্ছে আর ইতস্তত উড়ে উড়ে বসছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজে তুলসীর চোখ ফের ঘুমে ঢুলে আসছিল। কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যে এখুনি আর তুলসীর ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাস্তা পার হয়ে সে হলধরের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে দু' একজন করে লোক রাস্তায় বের হতে সুরু করেছে। একে একে আশে-পাশের দোকানগুলো শব্দ করে দরজা খুলছে। একখানা প্রাইভেট বাসও কলকাতার দিকে ছুটে গেল।

—জল গরম হল? তুলসী হলধরকে জিজ্ঞেস করল।

—সে কি আর এখনো বাকি আছে!

—তাহলে চা দাও এক কাপ। বেশ গরম থাকে যেন।

তুলসী চায়ে চুমুক দিতে দিতে আরো দু'চারজন খদ্দের এসে জুটল হলধরের দোকানে। মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে এক এক করে সব্জিওয়ালারাও এসে হাজির হচ্ছে। পরের বাসে মাছওয়ালারাও হাজির হল বলে।

বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে খেতে গতরাত্রির কথা মনে পড়ায় তুলসী আবার বিষণ্ন হয়ে উঠল। নির্ঘুম আতঙ্কিত রাত্রির স্মৃতি তার মনের মধ্যে নতুন একটা ভয়ের জন্ম দিচ্ছিল। তুলসীর ভয় হতে লাগল ঐ দমচাপা অন্ধকার ঘরে কোন রাত্তিরেই সে আর ঘুমুতে পারবে না। নিঃশব্দ রাত্রিতে ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার রোজ ভারী হয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসবে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দকেই অশরীরী ছায়ামূর্তির গলার আওয়াজ বলে মনে হতে হতে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝিন্ ঝিন্ করে ঘাম ছুটতে থাকবে। আর সেই অসহায়, বিশ্রী অস্বস্তিকর মুহূর্ত দিয়ে তৈরী সারাটি রাত তুলসী ডাক ছেড়ে কাঁদতে না পেরে জন্তুর মতো গোঙাতে থাকবে। কোথাও গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে পারলে হয়তো এই ভয়টা তুলসীর মন থেকে সরে যেত। অন্য জায়গায় ভিন্ন মানুষজনের মধ্যে পাঁচটা দিন থাকতে পারলে চাই কি সে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠত। কিন্তু কারো বাড়ীতে একবেলা পাত পাড়বে, তুলসী সে কপাল করে আসেনি। আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, দোকান ফেল হওয়ার পর অমন যে নিজের জামাই অর্থাৎ রাধার স্বামী মনোহর, সেই কি ভালো চোখে তুলসীকে দেখেছে। অমন নিরীহ ভালো মানুষ মনোহর, তার সে কি ব্যবহার, সে কি কথাবার্তা। অথচ তুলসী এমন কিছু তার ঘাড়ে উঠে খেতে যায়নি। নেহাতই একা একা মনটা খারাপ লাগছিল বলে গত বছর পৌষ মাসে রাধার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সকালে গিয়েছিল, বিকেলেই চলে আসে। এমন কিছু সেখানে থাকতে যায়নি সে। আর শ্বশুর হয়ে সে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেই বা কেন। দোকান ফেল হয়েছে তো কি, সেজন্য তুলসীর কি নিজের কোন মান-সম্মান বোধ নেই না কি! তাকে দেখা মাত্রই মনোহরের মুখখানা আষাঢ়ে মেঘের মতো গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছিল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক লাগলেও তুলসী যথা-রীতি জিজ্ঞেস করেছিল, বাবাজীর খবর ভালো তো?

হাঁড়ির মতো মুখ করে মনোহর বলেছে, ভালোই। আপনার খবর কি? কাজকর্ম কিছু আরম্ভ করলেন?

—চাইলেই তো আর আরম্ভ করা যায় না বাবাজী। কাজ-কারবার করতে গেলে পুঁজি চাই। পুঁজি কোথায় পাব বল?

বিদ্রূপে মনোহরের গলা কঠিন হয়ে উঠল, পুঁজি-ফুঁজি ওসব কোন কাজের কথা নয়। আসলে আপনার কাজকর্ম করার ইচ্ছে নেই। ঘুরে ঘুরে যদি খাওয়া যায় তাহলে আর কে কাজ করতে চায়?

নীরবে মনোহরের এই খোঁচাটুকু এই হাড় পিত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া অপমান তুলসী হজম করেছিল। মেয়ের বাপ যখন, তখন অনেক কিছুই তাকে সহ্য করতে হবে। মনোহরকে দুটো কঠিন কর্কশ উক্তি কথা তুলসী অনায়াসেই শুনিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তাতে রাধাকে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হোত। মেয়ের সুখ-শান্তির কথা ভেবে তুলসী চুপ করে গিয়েছে। বাবার অপমানে মর্মাহত, অশ্রুভারাক্রান্ত রাধা আড়ালে ডেকে বলে এসেছে, তুই দুঃখ পাসনি মা, তোর তো কোন দোষ নেই। পরের ছেলে দু'কথা বললে আমি গায়ে মাখব কেন? আর ওই বা কেন আমার দুঃখ বুঝতে যাবে? তবে আমি কিন্তু আর তোর এখানে আসব না মা, মন খারাপ হলে তুই বরং জামাইকে বলে আমার ওখানে যাস।

ঐ শেষবার। তুলসী আর এ পর্যন্ত কোনদিন রাধার বাড়ী যায়নি। আট-দশ মাস আগে রাধা নিজেই একদিন এখানে এসে তার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

এতক্ষণে রাস্তা জুড়ে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। তুলসীর চোখের সামনে আস্তে আস্তে বাজার জমে উঠল। হলধরের দোকানেও আর বসবার যো নেই। মেলা খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। আর এক গ্লাস চা হাতে নিয়ে তুলসী রাস্তা পার হয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের ভেতরটা কেমন অগোছালো বিশৃংখল লাগল তুলসীর। বিছানার চাদরটা কুঁচকে বিশ্রীভাবে দলা পাকিয়ে গেছে। সারারাত বিছানায় ছটফট করলে যেমন হয় আর কি! এরি মধ্যে কোন ফাঁকে ঘরে বেড়াল ঢুকেছিল নিশ্চয়, রাতে খাওয়া এঁটো হাঁড়িটা কখন উল্টে দিয়ে গেছে।

দরজার সামনে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তুলসী বাজারের ভিড় দেখতে লাগল।

আজ আর রুই কাতলা কিছু আনেনি আলি বকস্, চুনো মাছ নিয়ে বসেছে। বাজোর খদ্দের আলি বকসকে ছেঁকে ধরেছে। কে কার আগে নেবে তাই নিয়ে খদ্দেরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটানা মাছ মাপতে মাপতে আলি বকস যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

রাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ায় তুলসীর এখন চোখ জ্বালা করছে। মাঝে মাঝে চোখে জল এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে তুলছে। বেলা বাড়ছে। সূর্য এখন হলধরের দোকানের চালের ওপর উঠে পড়েছে। সেদিকে তাকাতে চোখ জ্বালা করে ওঠায় তুলসী মাটিতে চোখ নামিয়ে আনল। পিচের রাস্তার ওপর নারায়ণ ঠাকুরের ব্যস্ত মূর্তিটা নজরে পড়ল। গায়ে জামা নেই, পায়ে হাওয়াই চটি। পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলী। নির্ঘাত পুজো-আচ্চা আছে কোথাও। এমনিতে ছোট একটা কারখানায় হাতের কাজ করে, বড়ো রকমের পুজো-আচ্চা কি বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ডাক পড়লে সেদিনটা কারখানা কামাই দেয়। শনি নারায়ণ বা অন্য যেসব পুজো সন্ধ্যের দিকে করা চলে সেদিন আর ডিউটি বাদ যায় না। পেশাদারী পুরুতগিরি করায় এখন আর তাকে এ তল্লাটে কেউ নারায়ণ চক্রবর্তী বলে না। সে এখানে নারান ঠাকুর বনে গেছে বহুকাল। রাস্তা ধরে জোর পায়ে দোকানের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল নারায়ণ, তুলসী চেঁচিয়ে ডাকল, অ ঠাকুর, শোন, শোন—

ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে নারায়ণ তুলসীকে দেখল। এক মুহূর্ত কি চিন্তা করল তারপর এগিয়ে এসে তুলসীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কেন ডাকছ বলো?

—বলছি, বলছি। ব্যস্ত কি, বসবে তো একটু।

—না, না, মোটে বসবার সময় নেই। এখন গিয়ে আরম্ভ করলেও বেলা তিনটে বেজে যাবে।

—বেশ বড় দাঁও মনে হচ্ছে!

নারায়ণ হেসে ফেলল, রায়সাহেবের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পুজো, ছোট আর কি করে বলি বলো? তা যখন দেরী করিয়ে দিলে, এখানেই তাহলে কাজটা সেরে যাই।

এদিক ওদিক দেখে নারায়ণ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তারপর একটা গোপনীয় গোপনীয় ভাব করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। নামাবলীর আড়াল থেকে ছোট একটা ঠোঙা বের করে আনল। ঠোঙার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা মুরগীর ডিম তুলে আনতেই তুলসী সেইদিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ডিমটা তুলে মেঝের ওপর ঠক্ করে ঠুকে সামান্য ভেঙে নারায়ণ মুখের ভেতর ঢেলে দিল।

ঢোক গিলে নারায়ণ বলল, অমন চোখ বড় বড় করে দেখছ কি? বেলা তিনটে পর্যন্ত আমি কি উপোস থাকব না কি?

আহত বিস্ময়ে তুলসী বলল, তা বলে তুমি মুরগীর ডিম খেয়ে পুজো করবে এ তুমি করছ কি নারান্! এতে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হবে না, গেরস্তর অকল্যাণ হবে না?

বিরক্তিতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নারায়ণ বলল, মেলা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ কোরো না বাপু। ঠাকুর মাথায় থাক। গেরস্তর অকল্যাণ হবে তো আমার কি! এই যে আমার বাপটা, নির্জলা উপোস করে সারাটা জীবন পুজো করল, তার হালটা কি হোল শেষ পর্যন্ত? হরদম উপোস করতে করতে টি-বি হোল। কোনো ঠাকুর, কোনো গেরস্ত এলো তখন তার চিকিচ্ছে করতে? আমি ওসবের মধ্যে নেই, উপোস করতে আমার বয়ে গেছে।

—হুঁ, তুলসী যেন নারায়ণের যুক্তিটা বুঝতে পারল, তা বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে বেরোলেই পার।

নারায়ণ হতাশায় ঘাড় নাড়ল, সেটি হবে না। গিন্নীও একেবারে তোমার মতো গোঁড়া। এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়ার হুকুম নেই। কি জ্বালা বলো দিকিনি। এই ডিমটা খাওয়ার জন্যে আমায় কতো আড়াল-আবডাল খুঁজতে হয়। পুজো করতে বেরোলে শুধু এইজন্য আমাকে মিছিমিছি মাঠপুকুর ঘুরে যেতে হয়। যাকগে, চট্ করে একটা চা বলে দাও দিকিনি।

দরজা খুলে দুটো আঙুল দেখিয়ে তুলসী হাঁক পেড়ে কেষ্টকে চা দিতে বলল।

—হ্যাঁ, এবার বলো, আমায় কি জন্যে ডাকছিলে?

অনেকদিন রাধার কোন খবর পাচ্ছি না। তোমার ছোট ভাইতো মাঝে মাঝে ওদিকপানে যায়। গেলে রাধার খবরও নিয়ে আসে। কিন্তু মাস দুই হোল হারান তো কই একবারও দেখা করল না আমার সঙ্গে।

আজকাল কে আর কার সঙ্গে কবার দেখা করতে পারে বলো! সব্বাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। গেল মাসে হারান গিয়েছিল বটে ওদিকে। রাধা ভালোই আছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর তুমিও হয়েছ তেমনি। কাজকর্ম তো কিছু নেই, চিন্তা নিয়ে থাকা তোমার একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন বাপু মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, ল্যাঠা চুকে গেছে, বাস্।

কেষ্ট চা নিয়ে এল। একটা গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে নারায়ণ বলল, পই পই করে তোমায় বলেছিলুম, এমন বাউণ্ডুলের মতো থেকে জীবনটা মাটি কোরো না। কতো ভালো ভালো পাত্রী ছিল আমার হাতে। তা এখন সময় হারিয়ে আর সে সব কথা ভেবে লাভ নেই। তবে—গলাটা হঠাৎ নিচু করে তুলসীর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে নারায়ণ বলল, বিয়ে-থা না হয় নাই করলে, ব্যবস্থা দেখে একটা বিধবা-টিধবাও তো কাছে রাখতে পারো। আজকাল বহুলোক ওরকম রাখছে। এসব কেসও আমার হাতে দু'চারটে আছে, বয়েস একটু বেশি এই যা। তা তুমিও তো আর কচি খোকাটি নও।

বাইরে রোদের তাপ বাড়ছিল। যে চিলতে রোদটুকু ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে তারও উত্তাপ এখন তীব্র মনে হচ্ছে। নারায়ণ উঠে পড়ল, না, আর নয়। ভীষণ বেলা হয়ে গেছে। পরে আবার কথা হবে।

নারায়ণ চলে যাওয়ার পরও তুলসী খানিক বসে রইল। তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। পুজারী ডিম খেয়ে পুজো করতে বেরিয়েছে। দুটো পয়সার লোভে গেরস্ত ঘরের অভাবী বিধবা মেয়ে-মানুষদের খারাপ রাস্তায় টেনে আনছে। কালে কালে হল কি! ধম্মো-কম্মো বলে আর কিছু রইল না। নিয়ম আচার সবই যেতে বসেছে। বাইরের বেশভূষা পাল্টে এখন মানুষ যেমন নতুন সব ঢঙের শাড়ী-ব্লাউজ, সার্ট প্যান্ট পরছে, ভেতরে ভেতরে পুরনো প্রথা সংস্কারগুলোও অকেজো বলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। না দিয়েই বা করবে কি। নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে যুঝতে গিয়ে বাঁচবার জন্যে মানুষকে এখন অনেক রকম রফা করতে হচ্ছে। অন্যের কথা কেন, চালের আক্রার সময় তুলসীর নিজের বিধবা মা কদিন আর আতপ চাল সেদ্ধ চালের বাছ-বিচার করতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত সেদ্ধ চাল, তাই সোনা সোনা করে খেয়েছে। বুকে হাত দিয়ে তুলসী নিজেও কি বলতে পারবে, জীবনটা পুরোপুরি ভোগ করবার জন্য তার মনে কখনো কোনো গোপন ইচ্ছা জাগেনি। লোভ কি তারই কম, কেবল সাহস নেই, সামর্থ্যও নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে সার্ট গায়ে দিয়ে তুলসী দোকানের দরজা বন্ধ করল। ঘুমের ওষুধ আনতে বিষ্ণুপদর দোকানে একবার যেতে হবে। ওষুধের দোকানে বসে বসে বিষ্ণুপদর কাছ থেকে মানুষের কতো রহস্যই না তুলসী জেনে গেছে। কতো রকমারি কায়দাই না মানুষ করে চলেছে। সারা মাস ফুর্তি করো। শুধু মাসে একুশটা বড়ি টানা খাইয়ে যাও তোমার পরিবারকে। ব্যস, নিশ্চিন্ত। কাচ্চা-বাচ্চা হবার যো-টি থাকবে না। কেমন বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে মানুষ ভগবানকে। তেমনি আবার ধার-দেনা, দুঃখ আঘাত ঈর্ষা হতাশার মোকাবিলা করতে গিয়ে, বাঁচবার জন্যে নিত্যনতুন প্যাঁচ কষতে কষতে মানুষের মাথা অষ্টপ্রহর ভীষণ গরম হয়ে থাকছে। ফলে সে আর স্বাভাবিকভাবে রাতে ঘুমোতে পারছে না। কিন্তু সেজন্য ঘাবড়াবার দরকার নেই। শোবার সময় ঘুমের বড়ি খাও। ঘুমের বাপ চলে আসবে সুড়সুড় করে। এও মানুষের আর একদফা প্যাঁচ আর কি।

সেদিন রাতে ঘুমের বড়ি খেয়ে তুলসী অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কত বেলায় উঠত কে জানে। কিন্তু দরজায় ধাক্কার ভীষণ শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তুলসীর চোখের পাতা তখনো ঘুমে ভারী, প্রথমটা সে

আওয়াজের কারণটা অনুভব করতে পারল না। ওদিকে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধাক্কায় দরজা ভেঙে পড়ে আর কি! বিছানা ছেড়ে চোখ কচলাতে কচলাতে তুলসী দরজা খুলল।

দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তুলসী কোথাও তাকে দেখেছে এমন মনে করতে পারল না। লোকটির চুল উস্কো-খুস্কো, চেহারায় কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টিতে তুলসী তার ওপর চোখ রাখতেই লোকটি বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। রাধা আমাকে পাঠিয়েছে। মনোহরের ভীষণ অসুখ। আপনাকে এখুনি যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বাজ-পড়া মানুষের মতো নিথর নিস্পন্দ হয়ে তুলসী দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটাও কথা সরল না।

অমন দাঁড়িয়ে থেকে একদম সময় নষ্ট করবেন না। দেরি হলে কি হবে বলা যায় না।

রাধাদের পাড়ায় তুলসীরা যখন পেীছল, তুলসীর তখন সর্বশরীর কাঁপছে। জামা কাপড় ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। একটা শীতল অসারতা যেন তুলসীর পা বেয়ে ক্রমশ উপর দিকে উঠে আসছিল। রাধার বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই একটা শোকার্ত কলরোল কানে আসতে তুলসী বুঝতে পারল, সব শেষ হয়ে গেছে। তুলসী হাঁ করে নিঃশ্বাস টানল। তার গতিটা আপনা থেকেই মন্থর হয়ে আসায় সে ভারী পা দুটো টেনে টেনে এগোতে থাকল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে মৃত মনোহরের বুকের ওপর রাধাকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখল। তুলসী এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। কিন্তু রাধাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। ওর এই শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। ও বরং কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে বুকটাকে শক্ত পাষাণ করে তুলুক।

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হল। খাওয়া-দাওয়ার কোনো পাট নেই, তুলসীরও খাওয়ার স্পৃহা বলতে কিছু ছিল না। তুলসী, রাধা আর রাধার আড়াই বছরের ছেলে সেই রাতটা একই ঘরে কাটাল। বিছানায় শুয়ে তুলসী কিছুতেই দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। সারা রাতে রাধার কান্নাও একবারের জন্যে থামেনি।

ভোর হলে অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় রাধা বলেছে, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

তুলসী কেমন অপ্রস্তুতের মতো চমকে উঠেছে, আমার সঙ্গে যাবি? উঠবি কোথায়? আমার তো ঘরও নেই।

দোকানঘরখানা তো আছে। ওখানেই পর্দা টাঙিয়ে নেব।

অমন করে থাকতে যাবি কেন? এখানেই তো তোকে থাকতে হবে মা।

না, না, তুমি জানো না বাবা, এখানে থাকলে আমি মরে যাব। এরা আমাকে একদিনও থাকতে দেবে না।

তারপর গলা নামিয়ে তুলসীর কানের কাছে ফিসফিস করে রাধা বলেছে, মাঝখান থেকে আমার শেষ সম্বল সোনাদানাটুকুও যাবে। তুমি আর অমত কোরো না বাবা।

নিস্তেজ গলায় তুলসী বলেছে, বুঝতে পারছি সবই। নিয়ে তো যাব। কিন্তু তিনটি প্রাণীর খরচা চালাব কোত্থেকে বলতে পারিস?

উপায় একটা হবেই। চলো যাই তো আগে তারপর দেখ না কি ব্যবস্থা করতে পারি।

দোকানের মাঝ বরাবর পুরনো শাড়ী ঝুলিয়ে রাধা আব্রু তৈরী করে নিল। পেছনের দিকটায় রান্না-বান্না, খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা হোল। স্যাকরার দোকানে সোনার গয়না বন্ধক রেখে রাধা নিজেই পুঁজির জোগাড় করে তুলসীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুমি ফের দোকান বসাও বাবা। এক বছরের মধ্যে আবার আমি গয়না ফেরত নিয়ে আসতে পারব।

তা একটা কিছু তো করতেই হবে। অশৌচের মাসটা কেটে গেলে পুজো দিয়ে তুলসী মালপত্তর সাজিয়ে আবার দোকান খুলে বসল। কিন্তু ওই বসাই সার হোল। খদ্দেরের দেখা নেই। তুলসী দোকানে বসে বসে হাই তোলে, ঝিমোয়। নেহাৎ উটকো খদ্দের যাও দু' একটা আসে তার বেশির ভাগেরই দৌড় পাঁচ পয়সার গুঁড়ো দুধ কি চা পর্যন্ত। বড় জোর পানের কুড়ি পয়সার তেল বা হলুদ লঙ্কা। তুলসীরও যেন আগের মতো কাজ করবার শক্তি নেই। খদ্দের এলে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। দিতে দেরী হওয়ায় খদ্দের বিরক্ত হয়। দোকানের হালচাল দেখে তুলসী ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছিল। ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার মুখ দিন দিন শুকিয়ে আসছিল, এক আধটা খদ্দের এসে কিছু চাইলে ভাবনায় ডুবে থাকা তুলসী খেই হারিয়ে জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ, পাঁচ নয়ার কালজিরে আর যেন কি—

দেখেশুনে রাধা একদিন হেসে বলল, খদ্দের দেখে অমন হাঁ করে থাকলে দোকান আর চলেছে! তোমার দ্বারা আর দোকানের কাজ হবে না। তোমায় ভাবনা রোগে ধরেছে। কাল থেকে আমি দোকানে বসব। এ কদিনে আমি সব দেখে নিয়েছি। দেখবে, কেমন দোকানদারি করি।

সত্যি সত্যিই পরদিন থেকে তুলসীকে সরিয়ে জোর জবরদস্তি রাধা নিজেই দোকানে বসতে লাগল। দশ-বারো দিন কাটতে না কাটতেই দোকান বেশ জমে উঠল। হলধরের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তুলসী তাই লক্ষ্য করছিল। দোকানে ছেলে-ছোকরাদের ভিড় মন্দ হচ্ছে না। বুড়োরাও কিছু কিছু আসছে। কয়েকটি ছোকরা তো জিনিস কেনবার ছুতোয় দিনের মধ্যে কয়েকবার করেই আসছে। হেসে হেসে রাধা খদ্দের বিদেয় করছে। বয়েসকালের মেয়ে, অমন মিষ্টি হেসে কথা বললে ছেলে-ছোকরাদের মাথা একটু ঘুরবেই। কিন্তু তা বলে ওই যে ফর্সা লম্বা ছোকরাটা আজকাল রোজ আসতে শুরু করে দিয়েছে, এসে যেন আর নড়তেই চায় না, একেবারে রাধার গা ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসি-মস্করা করে, সেই ছেলেটার সঙ্গে রাধার অমন ফষ্টিনষ্টি কি উচিত হচ্ছে? শত হলেও রাধা হিন্দুঘরের বিধবা মেয়ে, পরপুরুষের সঙ্গে এই ঢলাঢলিতে তার কি পাপ হচ্ছে না?

পাপ! তুলসী নিজেকে দাবড়িয়ে শাসন করল। পাপ আবার কি! আসল কথা হচ্ছে গিয়ে তোমার, টাকা। টাকা থাকলে ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পাপ-ফাপ ওসব হচ্ছে কথার কথা, অক্ষমের সান্ত্বনা। জীবনটা ভোগ করা নিয়ে কথা। আজ যদি ফের বাদল তুলসীকে কালীপদর মদের দোকানে নিয়ে যেতে চায় সে একটুও আপত্তি করবে না। এক পাত্তর চড়ানো তো নেহাৎ মামুলি, এমন কি গয়লাপাড়ায় সেই যে একটি মেয়ে নতুন এসেছে, ময়না না কি নাম, তার কাছে যেতেও তুলসীর এখন আর কিছুমাত্র বাধা নেই।

অভিনেতা ও সঙ্গীতরসিক জগদানন্দ রায়
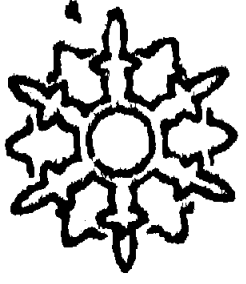
শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আরম্ভ-যুগের অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা পূজণীয় গুরুদেবের শিক্ষানীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বিদ্যালয়ের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় জগদানন্দবাবুর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস থেকে গুরুদেবের সহকর্মীরূপে তিনি গুরুদেবের পাশে ছিলেন ১৯৩২ সাল পর্যন্ত। প্রথম যুগে যে পাঁচজন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল শ্রদ্ধেয় জগদানন্দবাবু ছিলেন সে যুগের অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম। ছাত্রদের পড়াশোনা ও তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দায়িত্ব গুরুদেবের সঙ্গে তিনিও সমানভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। পূজণীয় গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের জগদানন্দবাবুর ছাত্রদের মধ্যে।

মূলতঃ জগদানন্দবাবু ছিলেন অংক ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার বহু গ্রন্থ বাংলাভাষায় রচনা করে তিনি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পরবর্তী জীবনে। যে কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশনে তিনি বিজ্ঞান শাখার সভাপতির পদপ্রাপ্ত হন। সে যুগের ইংরেজ সরকার বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গুণী লেখক হিসেবে তাঁকে 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ছাত্রদের পড়াশোনার উন্নতির প্রতি সর্বদাই ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সন্তানের মত স্নেহে ছাত্রদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করতেন। প্রথম পরিচয়ে বাইরে থেকে তাঁকে খুবই কঠোর বলে মনে হতো কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্নেহশীল ও সরল প্রকৃতিটিকে সকলেই ধরতে পারতো। অনাবশ্যক আবদার দিয়ে ছাত্রদের মাথায় তুলতে কেউ কখনো তাঁকে দেখেনি। ছাত্রদের নিয়ম নিষ্ঠার অবহেলাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগের সময় স্ব-স্নেহে তাদের কথা শুনতেন এবং তা দূর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

অসাধারণ কর্মী ছিলেন তিনি। সপ্তাহে বহুপর্ব ক্লাশ নিতে হতো তাঁকে। সন্ধ্যায় বিনোদন পর্বে নিয়মিত ছাত্রদের কাছে গল্প বলা, ছাত্রদের আকাশের তারা দেখিয়ে নক্ষত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে তাঁকে বহু সময় ব্যয় করতে হোত। সর্বাধ্যক্ষরূপে বহু বৎসর বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। আশ্রমের একটি সমিতি ব্যাংক তাঁর তত্ত্বাবধানে খুবই সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বভারতীর 'শান্তিনিকেতন' নামে পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করতে হয়েছে একটানা অনেক বছর। শেষ জীবনে বোলপুর শহরের ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতির পদেও কাজ করেছেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে তাঁকে বোলপুরের মুন্সেফ কোর্টে মাঝে মাঝে বিচারকের কাজও করতে হতো। এত রকমের বিচিত্র কাজের মধ্যে জড়িত থেকেও প্রতি বৎসর একটি একটি করে বিজ্ঞানের বই রচনা করতেন।

এ-হলো জগদানন্দবাবুর জ্ঞান ও কর্ম-জীবনের একটি বিশেষ রূপ যার সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর আর একটি যে-জীবন আমরা দেখেছি তা হলো তাঁর আনন্দ উপভোগের জীবন। যাকে বলবো তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি ও নাটকের অভিনেতার জীবন। সে দিকেও তাঁর দক্ষতা ও উৎসাহ ছিল প্রচুর।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে জগদানন্দবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে গুরুদেবের নাটকের সার্থক অভিনেতা হিসেবেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন :—

'১৯০২ সালের শীতকালে আশ্রমে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। রঘুপতির ভূমিকায় জগদানন্দবাবুর অপূর্ব অভিনয় দেখে বাবা বুঝেছিলেন এ ব্যক্তিটি লাখে এক। এর পর যখনই কোন অভিনয় হত, জগদানন্দবাবুকে ছাড়া হত না।'

'শারদোৎসব অভিনয়ে কৃপণ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা সত্যই অনন্য ও অনবদ্য। মনে হত ওই লক্ষেশ্বরের ভূমিকাটুকু যেন জগদানন্দবাবুর জন্যই বিশেষভাবে লিখিত।'

এর পর জগদানন্দবাবু ১৯১৪ সালের এপ্রিলে (বৈশাখ) শান্তিনিকেতনে প্রথমবার অভিনীত 'অচলায়তনে' মহাপঞ্চকের চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯১৫ সালের ইস্টারের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে যখন প্রথমবার ফাল্গুনী অভিনীত হয় তখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'দাদাঠাকুরে'র চরিত্র। ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের পুনরাভিনয়কালে লক্ষেশ্বরের ভূমিকা নেন। ১৯২২ সালেও তাঁকে ঐ একই চরিত্রে গুরুদেবের সঙ্গে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে দেখেছিলাম। ১৯২৮ সালের দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আম্রকুঞ্জের কারমাইকেল বেদীটির দক্ষিণে গুরুদেব শেষবার ফাল্গুনী নাটকের অভিনয় করান। গোটা কয়েক আম গাছ নিয়ে, তার সামনের কিছুটা খোলা জায়গার ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে অভিনয় হয়েছিল। এর অনেকখানি তফাতে, চারিদিক ঘিরে বসেছিলেন আশ্রমবাসীরা। গুরুদেব নিজে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন, জগদানন্দবাবু করেন 'দাদা'-র ভূমিকায়। এটিই বোধহয় জগদানন্দবাবুর শান্তিনিকেতনের জীবনে গুরুদেবের নাটকের শেষ অভিনয়। এরপরে আর কোন নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। পরের বছর, ১৯২৯ সালের দোল-পূর্ণিমার সময় গুরুদেব শান্তিনিকেতনে

জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

[illegible]

[illegible] Viceroy[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেন না। বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেবারের সন্ধ্যায় গুরুদেব রচিত কোন নাটক অভিনীত হয়নি। আয়োজন করা হয়েছিল অধ্যাপক ও কর্মীদের দ্বারা একটি বিরাট ফেন্সি ড্রেসের। এই দলে কিছু বয়স্ক ছাত্রও ছিল। অনুষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ কর। ফেন্সি ড্রেসের বিষয় ছিল সেযুগের মফঃস্বল শহরবাসী বিবাহের বরযাত্রী দল। বর, বরকর্তা, পাদরি, ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচি, মুন্সিজী, স্টেশন-মাস্টার, সন্ন্যাসী, পালোয়ান, শিখ, দারোয়ান, লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ, বুড়োমিঞা, চৌকিদার, ফিরিঙ্গী সাহেব ইত্যাদি প্রায় চল্লিশ রকমের সাজ হয়েছিল। শিল্পাচার্য নন্দলাল সেজে-ছিলেন জয়পুরী কারিকর, আমাকে বাঁশি হাতে একটি সাঁওতাল যুবকের সাজে সাজানো হয়। জগদানন্দবাবু সাজলেন পাত্রপক্ষের বরকর্তা। রথীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন কন্যাপক্ষের পিতা। উত্তরায়ণে বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। বর ও বরযাত্রী-দল প্রসেশন করে কলাভবনের নন্দন বাড়ী থেকে বের হয়ে শালবীথি, মাধবীকুঞ্জ ও মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে উত্তরায়ণে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে রথীন্দ্রনাথ কন্যাপক্ষের পিতার সাজে বরপক্ষকে যথারীতি আদর আপ্যায়নে অভ্যর্থনা করলেন। জগদানন্দবাবু বরকর্তা রূপে পর পর বর সমেত চল্লিশজন বরযাত্রীর নামধাম বলে পরিচয় দিলেন। বরকর্তা রূপে তাঁর চাল-চলন ও কথাবার্তায় মনে হয়েছিল সত্যি তিনি যেন কোন মফঃস্বল শহরের অবস্থাপন্ন একজন অধিবাসী।

জগদানন্দবাবুর অভিনয় গুরুদেব ও আশ্রমবাসী সকলে কেন পছন্দ করতেন এবং

রথীন্দ্রনাথও তাঁর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কেন করেছেন সে বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

গুরুদেবের নাটকের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেই জগদানন্দবাবুকে অভিনয় করতে হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নাটকের এই প্রত্যেকটি চরিত্রই ভিন্ন প্রকৃতির। এর সবকটিরই অভিনয়ে তিনি গুরুদেব ও আশ্রমবাসী দর্শকদের খুশী করতে পেরেছিলেন। অভিনয় কালে ওঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি নিজের চরিত্রকেই এক একবার এক এক রকমে প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ অভিনয় কালে তাঁর ওঠাবসা, চলা বলাতে আমরা দেখতে পেতাম প্রতিদিনকার পরিচিত জগদানন্দবাবুকে। তিনি যখন 'রঘুপতি'-র অভিনয় করেছেন তখন তাঁর মধ্যে রঘুপতির মত পুরোহিতের মনের দৃঢ়তার পরিচয়ে সকলে অবাক হতেন। লক্ষেশ্বরের অভিনয়ের সময় মনে হতো একই জগদানন্দবাবু লক্ষেশ্বরের মতোই যেন স্বার্থপর, ভীরু ও কৃপণ একটি ব্যক্তি। অভিনয় কালে তিনি গুরুদেবের অনুসরণ করতেন না বা কলকাতার কোন খ্যাতনামা অভিনেতার কোন ছাপ তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। অভিনয়কালে হাসি, দুঃখ, আনন্দ, রাগ, ভয়, স্নেহ ইত্যাদি ভাবপ্রকাশের সময় জগদানন্দবাবু নিজের স্বভাবেরই অনুকরণ করে যেতেন। সাজেপোষাকে তিনি রঘুপতি, লক্ষেশ্বর, মহাপঞ্চক, দাদা ও দাদাঠাকুর ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয় করলেও এর ভিতর থেকে জগদানন্দবাবুকেই আমরা দেখতে পেতাম নানাভাবে। এই কারণে তাঁর স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক রীতির অভিনয় প্রত্যেকেরই মন আকর্ষণ করত। ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র হলেও প্রতিবারই মনে হত গুরুদেব যেন জগদানন্দবাবুর কথা ভেবেই চরিত্রগুলির সৃষ্টি করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের দোল পূর্ণিমার দিনের উৎসব আমরা এযুগে যেভাবে হতে দেখি বিদ্যালয়ের যুগে বা তার পরবর্তী বিশ্বভারতীর যুগের প্রায় ১৯২৭।২৮ সাল পর্যন্ত তা ভিন্নভাবে হতো। বিশেষ করে সকালের আমবাগানের আনুষ্ঠানটির কথাই আমি এখানে বলতে চাই। সেকালে সকালের অনুষ্ঠানে এখনকার মত নাচ, পাঠ বা কবিতা আবৃত্তির রেওয়াজ ছিল না। শুকনো আবির, পিচকারীর দ্বারা জলে গোলা নানা রং-এর আবির, এবং কালির ছাপ গায়ে দেওয়ার রীতি ছিল ছাত্রদের মধ্যে। পলাশের ফুল জলে ভিজিয়ে সেই রঙিন জলও ব্যবহার করত। এই রকমের রং খেলার হুল্লোড়ের সময় আমবাগানে ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকেরা একসঙ্গে জড় হয়ে হারমোনিয়ম, এস্রাজ, তবলা ও বাঁয়ার সংগতের সঙ্গে গুরুদেবের যাবতীয় বসন্ত ঋতুর গান গাইতেন বহুক্ষণ ধরে। এই সংগীতের আসরের জন্যে কোন কার্যসূচী আগে থেকে রচিত হতো না। এই আসরে সুর-বেসুরে সকলেরই গাইবার অনুমতি ছিল। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন এই গানের আসরের দলপতি। সকালের এই আসরে জগদানন্দবাবু একটি বেহালা যন্ত্র নিয়ে বাজনায় যোগ দিতেন প্রতি বৎসর। তাঁকে কখনো গান গাইতে শুনিনি, কিন্তু বেহালাতে প্রত্যেকটি গান তিনি নিখুঁত সুরে আমাদের সঙ্গে বাজিয়ে যেতেন। পরে যখন সকালের আসরটি সুনির্দিষ্ট কার্যসূচীর দ্বারা বসন্ত-উৎসবে পরিণত হলো তখন জগদানন্দবাবুর বয়স প্রায় ষাট বছরের মত। তখন থেকে তাঁকে বেহালা যন্ত্রে আর আমরা আমাদের সঙ্গে পাইনি।

১৯২২ ও ১৯২৩ সালে পর পর দু-বৎসর শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত রচিত 'বীরভূমের পরাজয়' ও 'ঘোষযাত্রা' নামে দুটি যাত্রা যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীরা অভিনয় করেন তখন তার ছোকরার দলের গান, বিবেকের গান ও ফুলওয়ালীর গানে অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে জগদানন্দবাবু তাঁর বেহালাটি নিয়ে যোগ দিতেন। তিনি যাত্রাদলের বেহালাবাদকের সাজে আসরে বসে যাত্রার যাবতীয় গান বাজাতেন। অন্য সময় তাঁকে নিজের বাড়ীতে বেহালা বাজাতে শুনিনি। গানের মহড়াতেও তাঁকে কমই দেখতাম। অথচ এই সব সংগীতের আসরে তিনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে যেতেন।

জগদানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৩০।৩১ বৎসর বয়সে। এখানে তিনি বেহালা শেখেন নি, পূর্বেই বেহালা বাজাবার শিক্ষা নিয়েই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু তিনি কার কাছে শিখেছিলেন বা কিভাবে শিখেছিলেন তা আমার জানা নেই। লক্ষ্য করেছি নানা রাগ-রাগিণী ও তালে রচিত গুরুদেবের গান বা যাত্রার গানগুলিকে বেহালাতে তিনি অতি সহজেই যেভাবে বাজাতেন তা ভাল শিক্ষা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়।

নানা প্রকার বিজ্ঞানের বইয়ের লেখক শান্তিনিকেতনের অঙ্কের অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত পরিচালক হিসেবেই তাঁকে আমরা জানি কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ও সংগীতরসিক ছিলেন তাঁর এই গুণটির প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি পড়েনি।

জগদানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের জীবনের কথা যখন আমি চিন্তা করি তখন বারে বারেই মনে হয় যে বিবিধ জ্ঞান, আনন্দ ও কর্মের একত্র চর্চার দ্বারা গুরুদেব শান্তিনিকেতনে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের বিকাশের যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন এবং যাঁদের সেই আদর্শে উপযুক্ত অধ্যাপক রূপে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন শ্রদ্ধেয় জগদানন্দবাবু ছিলেন সেই দলের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নতুন দিনের কবি

এই স্তম্ভে আমরা মাঝে মাঝে বাংলা কবিতাগ্রন্থের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাংলা সাহিত্যে এই বিভাগে যে নিরন্তর নিরীক্ষা চলেছে তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের পরে রবীন্দ্রপ্রভাবিত কবিকুল ছন্দের নানাবিধ কারুকার্য ও পরিচিত রূপকল্প প্রয়োগ করেও কাব্যাদর্শের মৌলিক অবয়বকে খুব বেশ পাল্টিয়ে দিতে পারেন নি। লক্ষ্য করেছি কোন কোন সমালোচক সুবিধে পেলেই 'কল্লোল যুগ'কে হেয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সৎ-সাহিত্য ইতিহাসকার মাত্রেই স্বীকার করবেন বাংলা কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে এই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের কবিতাই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। তাঁদের সেদিনের রবীন্দ্র-বিদ্রোহের কদর্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত পথেরই বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন না। এই কল্লোলের কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নজরুল, অচিন্ত্যকুমার, অজিত দত্ত প্রভৃতি নতুন রীতির প্রবর্তক, তাঁদের কাব্যাদর্শ এবং কাব্যভাষা পূর্বসূরীদের বিপরীত। এই কল্লোলেই বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এক্সপেরিমেন্টাল' কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সমালোচনার আসনে বসে একটি জিনিস বেমালুম ভুলে যাই, যে যেপথে আজ এসে দাঁড়িয়েছি তার পূর্বে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, একদিনে অকস্মাৎ এই নতুন জগতে এসে চোখ মেলিনি। এই আলোচনা বাংলা কবিতার ইতিহাস নয়। নতুন নতুন কবি যখনই আত্মপ্রকাশ করেছেন তখনই তিনি নতুন ভাবনার আমদানি করেছেন, তাঁদের কবিতাচর্চা তাই নিছক প্রচলিত রীতির ফরমুলাবাঁধা ছকে দাগা বুলোনো নয়, তাঁরা সকলেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। পালাবদল হয়েছে বারবার আরও চার যুগে অন্ততঃ ষোলোজন প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব ঘটেছে—এটা সুলক্ষণ। তাই সেকালের অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দকে গ্রহণ করে আর বাদবাকী সকলকে বাতিল করাটাও যেমন পরিণত রসবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, তেমনই অতি সাম্প্রতিককালের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবিকুলের কাব্যাদর্শের স্বীকৃতিদানে ঔদাসিন্যও সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। লিরিক আদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম করে নতুন কাব্যাদর্শ আজ বিজয়ীর দীপ্ত ভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। বাস্তব জীবনের রূঢ় রুক্ষ দিকগুলি আজ কাব্যে স্থান পেয়েছে, অনেক নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সমসাময়িককালের বিচিত্র জীবনধারা ও তার সমস্যা সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। ছন্দের মুক্তি ঘটেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে নতুন ধারার গদ্যছন্দ। এ একরকম আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিঃশব্দে ঘটেছে। একালের গদ্যকবিতা তাই মাধুরীমণ্ডিত এবং গভীর অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তিনজন নতুন দিনের কবির কাব্যগ্রন্থ পড়তে বসে এই কথাগুলি মনে এল।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক লিখছেন পঞ্চাশের দশক থেকে। অবশ্য তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টিপাত' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে এক বছরের কবিতা নিয়ে। এটিই প্রথম গ্রন্থ কবির অন্তরে স্বপ্ন ছিল, আয়োজন ছিল ভৌগোলিক পরিধি নির্ণয়ের কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে কবি সহসা সচেতন—

"হৃদয়ে উদ্যান নেই/নদীময় প্রান্তরের ওপর হুহু-করা দক্ষিণের হাওয়া/বিলাপ করছে রাত্রিদিন।"

স্বপ্নভঙ্গের পর কবির অন্তরে গৈরিক স্পর্শ জাগে, উদাসীন সন্ন্যাসীর হৃদয় সজাগ হয়ে উঠে। পনেরই আগস্টের বাংলাদেশে এই স্বপ্নভঙ্গের পালা এসেছে, বোধনেই যেন ভাসানের বাজনা শুরু।

আরেক ক্রীতদাস হাতের বেড়ি পায়ের বাঁধন খুলেও মুক্তি পায় না, বুকের ভিতর শিকলের ঝনঝনানি শোনা যায়। আমাদের এই দাসত্বের অবসান নেই, মুক্তি নেই, হাতের বেড়ি পায়ের শিকল কাটলেই শেষ কথা নয়, মনের মুক্তি কোথায় এই প্রশ্ন কবিকে উদ্বেল করে তুলেছে।

আসামীর সন্ধানে আর্তনাদ করে উঠে, শেষে নিজের ছায়াকেই জড়িয়ে ধরতে হয়। অপরাধবোধ আজ প্রবল। কারণ আজ আমরা একটা ঝড়ের সময়ে উপনীত।

"কে আসামী? আসামী কই? ধরতে গিয়ে/নিজের ছায়া জড়িয়ে ধরি ঝড়ের সময়।"

মুখোশপরা মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না তাই সমস্ত অসম্ভবে তার অনায়াস অধিকার। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন—

"মুখোশ ছাড়াতে গিয়ে সকলেই চমকে ওঠে/দর্পণে দাঁড়িয়ে।"

আয়নায় নিজের মুখোশহীন মুখ দেখে এক অলৌকিক শুভ অন্ধকারে এ সবই শূন্য মনে হয়।

নিরাশাবাদী কবি, মনে সদাই শঙ্কা জাগে তাই—

নতুন জনপদে মানুষের পদশব্দ শুনলেই/চমকে দেখি ঃ /সামনে দেখি পিছনে আমি/ভূত-ভবিষ্যতে আমার রাজকীয় পদক্ষেপ/দিনরাত্রির সীমানা পেরিয়ে।

কবির চিত্তে অস্থিরতা আছে কিন্তু সেই অস্থিরতার অন্ধকারে নতুন অনুভূতির স্পন্দন আছে, প্রাণের পরিচয় আছে। তাই একদিন—

'আকাশ ভেদ করে বৃষ্টি পড়ে/যুঁই ফুলের মতো শাদা বৃষ্টি'

আর সেই বৃষ্টি জলপ্রপাতেও পড়ে, কারাগারের প্রাচীরেও পড়ে। শাদা বৃষ্টির পুণ্যস্নানে ধরণী শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে এইখানেই আশাবাদের প্রতিষ্ঠা।

আশিস সান্যাল 'তরুণতর কবিদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য কবি' একথা লেখা আছে তাঁর সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে' পিছনের মলাটে। আমরা একথা স্বীকার করি। তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁর মধ্যে বিচিত্র প্রাণপ্রবাহ লক্ষ্য করেছি। জীবনযন্ত্রণার বিশাল মরুভূমিতে কোথাও একটা স্বপ্নের উদ্যান আছে, সেই স্বপ্নলোকের উদ্যানকে ছুঁয়ে তিনি এক বিচিত্র অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করেছেন।

শব্দহীন অরণ্যে যেতে যেতে একদিন—

"তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম/সমস্ত আকাশ/সূর্যোদয়ের মতো নিরাময় প্রত্যাশায় জ্বলে উঠল।"

শব্দহীন অরণ্যের অন্ধকারে যে নাম উচ্চারিত সেই নামের পিছনে আছে স্নিগ্ধ প্রত্যাশা, আছে 'সূর্য থেকে প্রতিসূর্য পরিক্রমার নবীন বিস্ময়'। এই প্রত্যাশাটুকুই

হতাশার গভীরে একমাত্র নিষ্ক্রমণের পথ, তাই তার মাঝে আছে এক বিচিত্র বিস্ময়।

শব্দহীন অরণ্য, সন্ধ্যার বনভূমি এই নিরালা নির্জনেই শ্রুতিবিহীন পদচারণা। তাই মুখোমুখি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন ওঠে—

"কোথায় বলেছ বন্ধু ?/কি চাও আমার কাছে স্বাধীন বিশ্বাসে। বললাম ঃ ভালো-বাসা।/সহসা মেঘের শব্দ ছড়ালো আকাশে।" কিন্তু এ শব্দ মেঘে মেঘে ঘর্ষণের শব্দ নয়—"আবার বেদনা ঝরে পুনর্বার প্রবাহিত রক্তের তিমিরে।"

সন্ধ্যার বনভূমি, এখন পথ, কোনখানে স্থিতি নেই, যত দিন যায় প্রভৃতি কবিতা-গুলির মধ্যে অনুভূতির ঐক্যবোধ লক্ষ্য করার মতো। সংযত আবেগ তাঁর কাব্যের এক বিশেষ লক্ষণ। প্রকৃতিময়তা তাঁর কাব্যের আর এক গুণ। তাই সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, বনভূমিতে, অরণ্যে যে প্রশান্তি কবির চিত্তে সেই আশ্চর্য প্রশান্তি এমন কি 'এখন পথ' নামক কবিতার মধ্যেও জ্বালা নেই—

"সামনে নীল অথৈ জল, পেছনে সব স্মৃতি,/জন্মভূমি, বসতবাড়ি, কুয়োতলার মাটি;/অনেক কিছু বলার ছিলো, ভেবে-ছিলুম,/হয়নি বলা; তবু তোমার পথটি ধরেই হাঁটি।" অনেক কথা বলার থাকলেও বলা হয়নি, রাতের তারা কখন নিভেছে তা বোঝা যায়নি, তাই এখনো তোমায় ঘিরে দিগন্তহীন পথ ছড়ানো। কবিতাটির আশ্চর্য স্নিগ্ধতা পাঠকমনকে আকুল করে।

কিন্তু পরিক্রমণের শেষ নেই, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অন্ধকারের ভিতর বিরামহীন ছুটে চলার শেষ নেই। সূর্যো-দয়ের আগে সে বিচিত্র অনুভূতি তার মধ্যে আছে অস্থিরতার ছাপ। অন্ধকারে সূর্যো-দয়ের দিকে ছুটে চলা, হিংস্র জানোয়ার উপেক্ষা করে এই ছুটে চলার মাঝে বুকে বাজে শংখের পদধ্বনি, আর শিহরণ জাগায় শাল মহুয়ার কুঁড়িগুলি—রুক্ষতা এবং হিংস্র পরিবেশের ভিতরও আছে কুসুমের কোমল স্পর্শ। অন্ধকারের ভিতর আলো, হতাশায় আশা—

"এখুনি ঝড় উঠবে।/এক ঝাঁক রক্তবর্ণ অন্ধকার/ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।/প্রতিটি গাছের তৃষ্ণায় অন্ধকারের হাতছানি/অন্ধকার, শহরতলীর রাস্তায়/মাতৃগর্ভের মতো, বিরামহীন অন্ধকার।/যেন ঝড় উঠবার প্রাক্ মুহূর্তে, অবিস্মরণীয় স্তব্ধতার মধ্যে,/কল্লোলিনী কলকাতার বিক্ষুব্ধ অঞ্চল/তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে।' এই অন্ধকারে পরিক্রমা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের দিকে। কবির এই বিচিত্র অনুভবে আছে সেই আশা, যে আশা চিত্তকে আকুল করে সূর্যোদয়ের উন্মালনে। যে বিশ্বাস, যে সুগভীর প্রত্যাশা সূর্যোদয়ে। আশিস সান্যালের কবিতার এই যে আশ্বাস এই যে প্রত্যাশা প্রয়াস এ নিঃসন্দেহে শুভ-লক্ষণ। সবটাই অন্ধকার নয়, আলো আছেই, এবং অন্ধকার পার হলেই আলোর পারাবার। কবির আর এক অনুভবে এই উক্তি প্রতিধ্বনিত—

বাঁচার অনেক সুখ।/ভাবিলাম/এই বুঝি জীবনের সবচেয়ে স্বাদ। চারিদিকে অনুরত নিবিড় আহ্লাদের মধ্যে জীবনের স্বাদের সন্ধান পাওয়া এক বিচিত্র অনুভূতি।

আশিস সান্যাল শুধু বিচিত্র অনুভবের নয় বিচিত্র অনুষঙ্গে রূপকার।

গণেশ বসুর একাধিক কাব্যগ্রন্থের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে "অধিকার রক্তের, কবিতার" বিষয়ে ও বক্তব্যে বিচিত্র স্বাদের কবিতা। সুদীর্ঘ কবিতা, লেনিনকে নিবেদিত এই দীর্ঘ কবিতা অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন। এর মধ্যে আছে অনুভূতিপুঞ্জের নানাত্ব, বেদনাবোধ এবং অশান্ত প্রাণের হাহাকার। আছে ক্রোধ, বিক্ষোভ। লেনিনের আদর্শে জীবন প্রতিষ্ঠার শপথ এই অখণ্ড কবিতা আঙ্গিক ও প্রকরণে স্বতন্ত্র।

"আমার পায়ে পায়ে দুঃখের পাঁচিল/ক্রোধের বেদনা/ বিষাদ/ বিচ্ছেদের কুয়াশায় তাই আবৃত/ দু' চোখ বেয়ে নোনা ঢল/ অবহেলার ইতিহাস/ ইতিহাস ঘৃণার/ রক্তের/ বর্শার/।"

একদিন জীবন খসে গেল, যৌবন ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ে গেল। কৈশোরে যার চোখের সামনের মাটি ভায়ের রক্তে লাল হয়ে গেছে, শূন্যতা ছাড়া তার আর আশ্রয় কোথায়—

"ছিন্নমূল আমি সে কিশোর/দোরে দোরে ঘুরেছি লোকের/স্মৃতি তেতো ঘৃণা ও ধুলোর/কান্না জমা বিপুল বুকের।"

কোথায় ভালোবাসা, কোথায় ভালো-বাসার স্বপ্নপ্রতিম মানচিত্র?

ভারত এখন পরস্পরের বিপ্রতীপে বস্তি মিনার হাসছে, স্থিতিবাদের খোলস থেকে সাপের ছোবল বেরিয়ে পড়েছে। তার মাঝে করুণ জিজ্ঞাসা লেনিন। মিছিলেই আমাদের মুক্তি। সেই মিছিল অনন্তনাগের মত বিশ্বগ্রাসী—

"এ মিছিল চলছেই, চলবেই/মেকঙের গঙ্গার ভোলগার/সংগ্রামী এ মিছিল চলবেই/মার খাওয়া বিশ্বের জনতার /লেনিনের রক্তের জনতার।" অথচ এর ভিতর এ ভাঙা দেশের নেতারা সাপ খেলানোর সুরে কালহরণ করছেন। তবু তার মাঝে কেউ কেউ ক্ষেপে ওঠে, বাঁকা শিঙে ফুঁসে ওঠে—

"চম্পারণ/ মুশাহরি/ শ্রীকাকুলাম/পোড়া বাঙলাও।

এ পোড়া বাঙলার মাঝ-বুকে/সঙ্গীন উঁচিয়ে দুঃখ কাঁটার পাঁচিল এক নদী রক্ত বয়ে গেছে/একই নদী—বিষাদ উজান/কান্না/ কান্না আ-মরি ভাষার পদ্ম ফোটে/আ-মরি স্মৃতির দ্বার খোলে/অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই।"

এর মাঝে ক্রোধের মিছিল, বিবেক, বিপ্লব। মহামুক্তির দিন কই। কবির চিত্তে জেগেছে লেনিনের অসামান্য আদর্শ। লেনিন আজ বিপ্লবের প্রতীক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সামাজিক ক্যানসারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ লেনিনের ঐ মূর্তিতে যেন রূপায়িত। তাই আজ—

"প্রতিটি তরঙ্গ চূড়ায় বয়ে যায় লেনিন লেনিন/প্রতিটি বাঁকের মুখে নতুন মানুষ যেন/লেনিন লেনিন/অজস্র সূর্যের কণা, আমার দুচোখ ফেটে জল।"

স্বগত চিন্তার মধ্যে একমাত্র লেলিহান বহ্নিশিখার মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে আছেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

গণেশ বসুর কাব্যভাবনায় এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ সুর ধ্বনিত।

প্রতিটি গ্রন্থই বিস্তৃততর আলোচনার দাবী রাখে, সীমিত পরিবেশে সামান্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা গেল।

—অভয়ঙ্কর

বৃষ্টিপাত গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অনুভব প্রকাশনী। ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস। কলকাতা—২৯। দাম—দু টাকা।

স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে আশিস সান্যাল। বাক্ সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলকাতা—৯। তিন টাকা।

অধিকার রক্তের কবিতায় গণেশ বসু। পরিবেশক—মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিমিটেড। ৪।৩।বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

সাহিত্যের খবর

হাঙ্গেরী থেকে দুজন লেখক এসেছিলেন কলকাতায়—একজন কবি আর একজন সমালোচক। ভারতের নানা অঞ্চল পরিদর্শন করে এসেছিলেন কলকাতায় কয়েকদিনের জন্য। এখান থেকে যান মাদ্রাজে। গত ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় প্রথমে 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরে পরে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের অফিসে তাঁদের চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। 'পরিচয়'র দপ্তরে তরুণ সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দাশগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ নানান আলোচনায় অংশ নেন অতিথিদের সঙ্গে। আর সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের দপ্তরে সেদিন সমবেত হয়েছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকরা। প্রথমেই কবি সম্মেলনের সভাপতি অতিথিদ্বয়ের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করায়ে দেন এবং সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বাগত জানান।

এরপর ল্যাজলো কেরী হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাহিত্য পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবি গ্যাবরো গরাইও মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করছিলেন। তাঁদের আলোচনা শেষ হবার পর সভায় উপস্থিত কবি লেখকরা তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে কবি গ্যাবোর গরাই বলেন—'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ খুব কম। কারণ, বাংলার অনুবাদ তাঁদের চোখে বেশি পড়েনি। যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, প্রসূন বসু, আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, শিশির ভট্টাচার্য, অমল ভৌমিক, রামপ্রসাদ পাণ্ডে, হেম শর্মা প্রমুখ।

গ্যাবর গরাইয়ের বয়স এখন ৪১ বৎসর। হাঙ্গেরীর তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। এ পর্যন্ত তাঁর দশটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ল্যাজলো কেরীর বয়স ৫০। তিনি হাঙ্গেরীয়ান পি-ই-এনএরও সভাপতি। বুদাপেস্তের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় অধ্যাপনা করেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডি এইচ লরেন্সের উপর গবেষণা করে তিনি বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন। এছাড়াও শেকসপীয়রের সম্পূর্ণ নাটক তিনি সম্পাদনা করে হাঙ্গেরীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানান, ভারতবর্ষের আর কোথাও তাঁরা এরকম আতিথেয়তা লাভ করেননি।

'বুকস অ্যাবরড' পত্রিকার উদ্যোগে যে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্যপুরস্কার প্রদানের কথা অমৃত পত্রিকার এই বিভাগে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গত সপ্তাহে পুরস্কৃত কবির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার এই পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত ইতালিয়ান কবি উনগারেত্তি। উনগারেত্তির নাম এখন আর ইতালীর বাইরে অপরিচিত নয়। তিনি এবং মনতালের মাধ্যমেই আধুনিক ইতালীয় কাব্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। উনগারেত্তির মন্ত্র-শিষ্য কোয়াসিমোদো নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কিন্তু উনগারেত্তি চিরকালই অবহেলিত। তাঁর কবিতার অনুবাদ ইংরেজিতে মাত্র কয়েক বছর আগে হয়েছে। তাঁর বয়স এখন ৮০-র কোঠায়।

ফিলিপ রথ আমেরিকার একজন তরুণ ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি তাঁর 'পোর্টনয়স কমপ্ল্যাইন্ট' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি এর মধ্যেই বেশ একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে। একজন লাজুক, কামপীড়িত কিশোর কিভাবে ধীরে ধীরে একজন যুবক হয়ে উঠল, বইটিতে তাই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য বইটির কোথাও কোথাও তিনি এমন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যাকে অশ্লীল বলে মনে হয়।

সি রাধাকৃষ্ণান মালয়ালম ভাষার একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির নাম 'যুদ্ধম' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'বেশংগল'। প্রথম উপন্যাসে তিনি যুদ্ধের অনিষ্ট-কারিতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেইদিক থেকে বলা যায়, বইটিতে তেমন কোন মৌলিক প্রতিভার পরিচয় নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বইটি খুবই উল্লেখ্য। জীবন সম্পর্কে কয়েকটি দার্শনিক প্রত্যয় এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে।

কাশ্মিরী ভাষায় তিনজন প্রখ্যাত কবি হলেন নাদিম, রাহী এবং কামিল। সম্প্রতি তাঁদের উপর কাশ্মীরী ভাষায় একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন মহম্মদ ইউসুফ টাইং। তিনি শুধু এই তিনজন কবির কবিপ্রতিভা আলোচনার মধ্যেই নিজের মতামত সীমাবদ্ধ রাখেন নি—কবিতার বিভিন্ন আন্দোলনের উপরও তাঁর মন্তব্য উপস্থিত করেছেন। কাশ্মীরী সমালোচনা সাহিত্যে এ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

নতুন বই

সোনারূপা নয় (গল্প সংগ্রহ) — **জ্যোতির্ময়ী দেবী। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা। দাম : পনের টাকা।**

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা এক সময় বাংলা দেশের •প্রায় সবকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। জনপ্রিয়তাও তাঁর খুব কম ছিল না। দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকলেও, তাঁর রচিত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা সংখ্যায় বেশী নয়। আবার সব রচনা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় নি। মোট নয়-খানি বই বেরিয়েছে। চারখানি উপন্যাস—ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা এবং মনের অগোচরে; চারখানি গল্প সংকলন — রাজ-যোটক, আরাবল্লীর আড়ালে, আরাবল্লীর কাহিনী এবং ব্যান্ড মাস্টারের মা; তীর্থ-পরিক্রমা—সময় ও সংকৃতি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্বাচিত গল্পের সংকলন 'সোনারূপা নয়' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস থেকে গল্পে তিনি অধিকতর সার্থক। নরনারীর চিরন্তন জীবনজিজ্ঞাসা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। বলবার ধরন নিজস্ব। প্রসন্ন পরিহাস ও পরিচ্ছন্ন বাকরীতি গল্পগুলিতে সৃষ্টি করেছে এক ঘরোয়া পরিমণ্ডলের। গল্পে চিনেবাদ স্বাদ তোলবার নয়। জীবন সম্পর্কে অপরিসীম শ্রদ্ধা, মমতা ও প্রীতির জন্যই তাঁর রচনা এতখানি হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনায় রাজ-স্থানের পটভূমিকা এক বিশিষ্ট মহিমায় উজ্জ্বল। দীর্ঘকাল তিনি সেখানে জীবন কাটান। তাই তাঁর গল্পে রাজস্থানের রাজা-মহারাজার সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি এসেছে স্বচ্ছন্দে। 'সোনারূপা নয়'—এর মুখবন্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ' তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বাঙালীর পাশে রাজস্থানী মানুষদের এনে একাসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁদের [illegible] আত্মীয়তুল্য করে তুলেছেন। [illegible]

মৃত্তিকা, শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে রাজস্থানের রুক্ষ, কঠিন, বালুকাময় মৃত্তিকার গ্রন্থি-বন্ধন করেছেন। আমি মনে করি, কেউ যদি প্রথমে তাঁর এই রচনাগুলি পাঠ করে পরে রাজস্থান ঘুরে আসেন, তিনি রাজস্থানকে অপরিচিত দেশ বলে মনে করবেন না; মনে হবে কোন চেনা জায়গাতেই যেন বিচরণ করছি। জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই সুবৃহৎ গল্প সংগ্রহে মোট উনপঞ্চাশটি বিচিত্র স্বাদের গল্প স্থান পেয়েছে। বইটি বাঙালী পাঠককে খুশী করবে।

কালিতীর্থ কামারপুকুর (জীবনালেখ্য) **—বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—১৩। দাম—দশ টাকা মাত্র।**

ডকটর বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য তরুণ বয়সে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'কালিতীর্থ কামার-পুকুর' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা। লেখক জীবনী রচনার প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে কাহিনী আকারে এই যুগের পরম বিস্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনকথা প্রণয়ন করেছেন। লেখক ভক্তিমান এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধ ভক্তের আকুলতা বিশেষ-ভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তে অনুকরণীয় ভঙ্গীতে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' রচনা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অজস্র বই লেখা হয়েছে এবং বাঙালী পাঠকের মনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ঠাকুরের জীবন ছিল, তাঁর মুখবোধও ছিল আশ্চর্য সারল্যে পরিপূর্ণ। কোনোরকম দুরূহ তত্ত্বের কঠিন আবরণে ঠাকুরের বাণী আচ্ছাদিত নয়। সুলেখক বিবেকরঞ্জন অসামান্য লিপিকুশলতায় ঠাকুরের জীবনালেখ্য পরিবেশন করেছেন। অন্তরে ভক্তি থাকার ফলে এই গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্র মধুর ভাবরসে পূর্ণ। ঠাকুরের দিব্যজীবনকথা পাঠে আগ্রহ সকলের তাই "কালিতীর্থ কামারপুকুর" মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ-কালেই প্রশংসা অর্জন করেছে। এইকালের মহাতীর্থ কামারপুকুর আর সেই তীর্থপতি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। বাংলার একটি নগণ্য গ্রাম তাঁর মহান আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে, তাঁর বাণী আজ ভারতের বাইরে বিশ্বের মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করেছে। বিখ্যাত চিন্তা-নায়ক ও লেখক ক্রিস্টোফার ঈশারউড বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়াস এ ফেনো-মেনান—। এই আশ্চর্য অলোকসামান্য পুরুষের জীবনী ও বাণী ডঃ ভট্টাচার্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে যেভাবে লিখেছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'—অমল হোম মহাশয়ের সম্পাদনায় একদা সাময়িকপত্রের জগতে এক বিস্ময়কর ঐতিহ্য রচনা করেছিল। বর্তমান সম্পাদক রবীন্দ্রশতবর্ষে যে বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছিলেন তা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পূর্বগৌরবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত নেতাজী বিশেষ সংখ্যাটি আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও সম্পাদকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই সংখ্যায় লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যেন বোস, মণি সান্যাল, হেমন্তকুমার বসু, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্যামল দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিভাস দে, সন্তোষকুমার বসু, সত্যরঞ্জন বকসী, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ বা মঅ প্রভৃতি। যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে জানতেন এবং যাঁরা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণাকর্মে লিপ্ত সেইসব বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রচিত প্রবন্ধাবলী যে বিশেষ মূল্যবান একথা বলা বাহুল্য। এই সংখ্যায় প্রায় আটখানি আর্ট প্লেট দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা এত অল্প মূল্যে প্রকাশের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—(নেতাজী জন্মোৎসব বিশেষ সংখ্যা) : সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মূল্য—একটাকা মাত্র।

সরস্বতী পুজা উপলক্ষ্যে হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স পাটনা শাখার কর্মীরা ত্রিভাষিক পত্র 'বাসন্তিকা' প্রকাশ করেছেন। ইংরাজীতে নিবন্ধ রচনা করেছেন, স্বামী মহানন্দ, শচীন্দ্রনাথ সোম, ডি কে মিত্র, কমল চক্রবর্তী, দীপককুমার ঘোষ প্রভৃতি। হিন্দিতে লিখেছেন ভারতী টনডন ও পরমানন্দ প্রসাদ এবং বাংলায় কবিতা ও গল্প লিখেছেন অনিরুদ্ধ, শুভেন্দু পালিত, রবীন দত্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সুজাতা প্রিয়ংবদার অনুবাদ কবিতা, মহাবীর নন্দী মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, দিলীপকুমার মিত্র, গল্প লিখেছেন আশীষকুমার সিংহ, জীবনময় দত্ত, শিবনাথ রায়, শ্যামল ভট্টাচার্য, ও শুভেন্দুপ্রসাদ মৈত্র প্রভৃতি। কর্মী পরিষদের এই সাংস্কৃতিক আগ্রহ প্রশংসার দাবী রাখে। সম্পাদক : কমল চক্রবর্তী, পাটনা।

বিহারের একমাত্র প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা **'সপ্তদ্বীপা'র** চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। অল্প পরিসরে লিখিত 'সময়ের বিষম লেগুনে-শেখভ' নামক প্রবন্ধটি ও দেওয়ালের লিখন গল্পটি প্রশংসনীয়, এই দুটির লেখক যথাক্রমে সম্পাদকদ্বয়। পূর্ব বাংলার গল্প শওকত আলীর 'যখন কুলায় ফেরা'—পাকি-স্থানী খবর থেকে সংকলন করে দেওয়া হয়েছে। কবিতাগুলি সুনির্বাচিত। পত্রিকাটির পরিকল্পনা সুরুচিসংগত। সম্পাদক : রবীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত। এ।১২৪ কাঁকরবাগ কলোনী। পাটনা-১। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
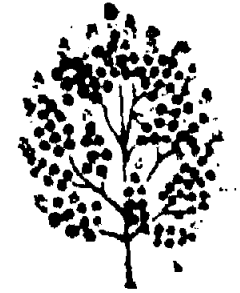
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক আজকের মঞ্চে আর বিশেষ অভিনীত হয় না। অথচ গিরিশচন্দ্রের আগে তাঁর মত ক্ষমতাশালী নাট্যকার আর কেউ ছিলেন না। তিনি প্রায় তেত্রিশখানি নাটক লিখে-ছিলেন। এর মধ্যে বাইশখানি অনুবাদ। মৌলিক থেকে অনুবাদেই তিনি সার্থক। অনুবাদ করেছিলেন ফরাসি, সংস্কৃত, ইংরেজি থেকে—অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। বাঙলা ভাষায় উনিশ শতকে একদিকে যেমন মৌলিক সৃষ্টির তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি শ্রেষ্ঠ বিদেশী সাহিত্যের নিদর্শনকে প্রচার করা হচ্ছিল। বিদেশী সাহিত্য নতুন পথ দেখায়। তাছাড়া এই শতকে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী যুগের ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে দেশাত্মবোধের জাগরণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের অন্যতম পুরোধা হওয়ায়, তাঁর ঐতিহাসিক নাটক-গুলি হয়েছে এই ভাবাদর্শের ফলশ্রুতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভায় সংগীতের সমন্বয় এক আশ্চর্য সার্থকতা অর্জন করে। তিনি নানাধরনের দেশী-বিদেশী যন্ত্র বাজাতে পারতেন। নিজেও নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করতেন। এই সঙ্গীতকে তিনি নাটকে প্রয়োগ করেছিলেন সার্থকভাবে।

ঐতিহাসিক, গীতিনাটক, প্রহসন এবং অনুবাদ নাটকের প্রতিভাশালী স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন নাট্যসংগ্রহ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বিশ্বভারতী জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের এই মৌলিক নাটকগুলির একটি সুবৃহৎ সংকলন প্রকাশ করেছেন। দাম

চোদ্দ টাকা। সম্পাদনা করেছেন শ্রীসুশীল রায়। পরিশিষ্টে প্রসংগকথায় সমস্ত নাটককেই বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠায় এই মূল্যবান কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীরায়ের।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার হওয়ার পেছনে একটি ছোট ইতিহাস আছে। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন ঃ "একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন সংবাদ প্রভাকর হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতালি দিয়া একটা 'অদ্ভুত নাট্য' খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা-উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ। এই নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা গোপাল উড়ের যাত্রা। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতিতে আছে—"তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত চর্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয়ে তাঁহার গুণদাদারও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া বাড়িতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল তাঁহাদেরই ও-বাড়িতে। সমিতির নাম হইল Committee Of Five কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন।" এই নাট্যশাখায় প্রথমে ও'রা মধুসূদনের নাটক ও প্রহসন এবং রাজনারায়ণ তর্করত্নের 'নাটকের' অভিনয় করেছিলেন। তারপর অভিনীত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন। প্রকাশের পর প্রতিকূল এবং অনুকূল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—"এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই।' তাছাড়া 'অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই সঙ্গে যদি কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা, ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত, তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। ......এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙলা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কণ্টকর।' কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার ওপর কটাক্ষ করে লেখা বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকখানির পুনর্মুদ্রণ করেননি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম ইতিহাসাশ্রয়ী মৌলিক নাটক 'পুরুবিক্রম'। হিন্দু মেলায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে এই নাটকে। নাট্যকারের ভাষায়, "হিন্দু মেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ বঙ্গদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাঁথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।' পুরুবিক্রম সাধারণ মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়। রসিকজনের প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পর প্রকাশিত 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' নাটকটি সবথেকে বেশী মঞ্চসফল হয়। 'এমন আর করব না' বা 'অলীকবাবু' প্রহসন ঠাকুরবাড়ীতে ও সাধারণ মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনায় আছে 'একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। অলীকবাবু জ্যোতিকাকা-মশায়ের লিখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন।... কী যে জমেছিল অভিনয় তা কি বলব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী'র হিন্দী ও মারাঠী অনুবাদ বেরিয়েছিল। এই নাটকটি নিয়ে সেকালে বেশ বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিশেষ করে প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতীকে সেলিমের অনুরাগী রূপে চিত্রিত করায় ভারতের কোন কোন অঞ্চল থেকে নাট্যকারকে অভিযুক্ত করা হয়। অশ্রুমতী নাটকাভিনয়ের সুন্দর একটি ছবি লিখে রেখে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'এলেন নাট্যজগতে জ্যোতিকাকামশায়। 'অশ্রুমতী' নাটক লিখেছেন, থিয়েটার হবে পাবলিক স্টেজে বাইরের লোক দিয়েই। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, চাকর কোলে করে নিয়ে বেড়ায়। ......অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েরা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না। কী করা যায়। বাবামশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার একরাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন। অ্যাকটাররা ছাড়া বাইরের লোক আর কেউ থাকবে না। ...বসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা...সিন উঠল। ......অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্ত হয়ে যাচ্ছে। মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত, স্টেজ-নাম ছিল গোলাপী। সে যা গাইত! বড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গলা ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি—এখনো চোখে ভাসছে।...

অশ্রুমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল।... অশ্রুমতীর অগ্নিপ্রবেশ, সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে—

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,......

হুহু করে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অশ্রুমতীর এই গানে সব মাত করে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। রবি-কাকাও কয়েকটা গানে তখন সুর দিয়ে-ছিলেন বোধহয়। বিলিতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে। কোত্থেকে যে সুর সব জোগাড় করেও ছিলেন। এইসব স্তব্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি! অশ্রুমতী নাটকে না ছিল কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার।

এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'স্বপ্নময়ী' গীতিনাট্য লেখেন। বাঙলা ভাষায় সম্ভবত এটিই প্রথম গীতিনাট্য রচনার প্রয়াস। 'স্বপ্নময়ী' ইতিহাসাশ্রয়ী ট্রাজেডি। কাহিনী রাজপুতানার নয়, এই বাঙলার পট-ভূমিকায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতা রোমান্টিকতায় ধুয়ে গেছে। গান বেশ কয়েকটি আছে। সংলাপ অধিকাংশ স্থলে লিরিক্যাল ভাব ফুটে উঠেছে। এর পর যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'হিতে বিপরীত' প্রহসন এবং 'পুনর্বসন্ত', 'বসন্তলীলা' এবং 'ধ্যানভঙ্গ' গীতিনাট্য রচনা করেন। কিন্তু 'স্বপ্নময়ী' রচনার পর নাটক লেখা প্রায় বন্ধ করে দিলেন। কারণ "ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্য-সাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।"

কিন্তু নিজের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে থেমে যাওয়া এবং নিজের প্রতিভার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। এই সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মসচেতনার জন্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

সোনালি বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে। হেমন্তের বিকেল। নদীর পার ধরে কিছু গ্রামের মানুষ হাট করে ফিরছে। দূরে দূরে সব গ্রাম মাঠ দেখা যাচ্ছে। তরমুজের লতা এখন আকাশমুখো। তামাক টানতে টানতে ঈশম সব দেখছিল। কিছু ফড়িং উড়ছে বাতাসে। সোনালি ধানের গন্ধ মাঠময়। অঘ্রানের এই শেষ দিনগুলিতে জল নামছে খাল বিল থেকে। জল নেমে নদীতে এসে পড়ছে। এই জল নামার শব্দ ওর কানে আসছে। সূর্য নেমে গেছে মাঠের ওপারে। বটের ছায়া বালির চর ঢেকে দিয়েছে। পাশে কিছু জলাজমি। ঠান্ডা পড়ছে। মাছেরা এখন আর শীতের জন্য তেমন জলে নড়ছে না। শুধু কিছু সোনা-পোকার শব্দ। ওরা ধানখেতে উড়ছিল। আর কিছু পাখির ছায়া জলে। দক্ষিণের মাঠ থেকে ওরা ক্রমে সব নেমে আসছে। এ-সময় একদল মানুষ গ্রামের সড়ক থেকে নেমে এদিকে আসছিল—ওরা যেন কি বলাবলি করছে। যেন এক মানুষ জন্ম নিচ্ছে, এই সংসারে এখন এক খবর, ঠাকুরবাড়ীর ধনকর্তার আঘুনের শেষ বেলাতে ছেলে হয়েছে।

ঈশম শেখ কথাটা শুনেই হুঁকোটা ছইয়ের বাতায় ঝুলিয়ে রাখল। কল্কে উপুড় করে দিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বের হল। উপরে আকাশ, নিচে এই তরমুজের জমি আর সামনে সোনালি বালির নদী। জল, স্ফটিক জলের মতো। ঈশম এই ছায়াঘন পৃথিবীতে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। বলল, সোভান আল্লা। শেষে আর সে দাঁড়াল না। নদীর পার অতিক্রম করে সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। ধনকর্তার ছেইলা হয়েছে—বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। সব খুদার মেহেরবাণী। সড়কের দু'ধারে ধান, শুধু ধান—কত দূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। ঈশম চোখ তুলে দেখল সব। এবং আল্লার করুণার কথা ভেবে বিকেলের এইসব বিচিত্র রং দেখতে দেখতে এবং পাশাপাশি এইসব গ্রাম—তার কত চেনা, কতকালের মেমান সব...নিচে খাল, মাছেরা জলে লাফাচ্ছে। সে সড়কের একধারে গামছা পাতল, নিচে ঘাস, গামছা ঘাসের শিশিরে ভিজে উঠছে। সে এইসব লক্ষ্য করল না। সে দু'হাঁটু ভেঙে বসল। খালের জল নিয়ে অজু করল। সে দাড়িতে হাত বুলাল ক'বার। মাটিতে পর পর কবার মাথা ঠেকিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। অঘ্রানের শেষ বেলায় ঈশম নামাজ পড়ছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে ওর ছায়াটা কত দূরে চলে গেছে। খালের জল কাঁপছিল বলে ওর ছায়াটা জলে কাঁপছে। কিছু হলদে মতো রঙের ফড়িং উড়ছে মাথার উপর। সূর্যের সোনালি রঙে ওর মুখ আশ্চর্য-রকমের গাল দেখাচ্ছিল। যেন কোন ফেরেস্তার অলৌকিক আলো এই মানুষের ভিতর। সে নামাজ শেষ করে হাঁটতে থাকল। এবং পথে যাকে দেখল তাকেই বলল, আঘুনের শেষ ফজরে ধনকর্তার ছেইলা হইছে। ওকে দেখে মনে হয় তরমুজ খেত থেকে অথবা সোনালি বালির নদীর চর থেকে এমন একটি খবর সকলকে দেবার জন্য সে উঠে এসেছে। সে সড়ক অতিক্রম করে সুপারির বাগানে ঢুকে গেল। বৈঠকখানাতে লোকের ভিড়। বাইরে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে প্রায় সকলকেই আদাব দিল এবং ভিতরে ঢুকে নিজের জায়গাটিতে বসে তামাক সাজতে থাকল।

সোনালি বালির নদীতে সূর্য ডুবছে। কচ্ছপেরা ধানগাছের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এইসব কচ্ছপেরা এখন একটু শক্ত-মত মাটি পেলেই পারে উঠে ডিম পাড়তে সুরু করবে। অনেকগুলো শেয়াল ডাকল টোডারবাগের মাঠে। একটা দুটো জোনাকি জ্বলল জলার ধারে। জোনাকিরা অন্ধকারে ডানা মেলে উড়তে থাকল। পাখিদের শেষ দলটা গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে গেল। নির্জন এবং নিরিবিলি এইসব গ্রাম মাঠ। অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। সে জানে ওরা কোথায় যায়। ওরা হাসান পীরের দরগাতে যায়। পীরের দরগায় ওরা রাত যাপন করে। শীতের পাহাড় নেমে এলে ওরা তখন দক্ষিণের বিলে চলে যাবে। ঈশম এবার উঠে পড়ল।

ঈশম ডাকল ঠাইনদি আমি আইছি।

দরজার বাইরে এসে ছোটকর্তা দাঁড়ালেন। —ঈশম আইলি?

—হ, আইলাম। ধনকর্তারে খবর দিতে পাঠাইছেন নি? না। পাঠাইলে আমারে পাঠান। খবর দিয়া আসি। একটা তফন আদাই কইরা আসি।

ছোটকর্তা বললেন, যা তবে। ধনদাদারে কবি, কাইলই যেন রওনা দেয়। কোন চিন্তার কারণ নাই। ধনবৌ ভাল আছে।

—তা আর কমুনা! কি যে কন! ঠাইনদি কই?

—মায় অসুজ ঘরে। তুই বরং বড় বৌঠাইনকে বল তরে ভাত দিতে।

ঈশম নিজেই কলাপাতা কাটল এবং নিজেই এক ঘটি জল নিয়ে অন্দরে খেতে বসে গেল। বলল, আমারে দ্যানগ বড়মামী।

বড়বৌ বলল, পাতাটা ধুয়ে নাও।

ঈশম পাতাটার উপর জল ছিটিয়ে নিল বলল, দ্যান।

বড়বৌ ঈশমকে খেতে দিল। ঈশম যখন খায় বড় নিবিষ্টমনে খায়। ভাত সে একটা ফেলে না। এমন খাওয়া দেখতে বড়বৌর বড়ো ভাল লাগে। ঈশমকে দেখতে দেখতে ওর বিবির কথা মনে হল। ঈশমের ভাঙা ঘর, পঙ্গু বিবি, নাড়ার বেড়া এবং জীর্ণ আবাসের কথা ভেবে বড় বৌ-এর কেমন মায়া হল। অন্যান্য অনেকদিনের মতো বলল, পেট ভরে খাও ঈশম। একটু ডাল দেব, মাছ? অনেক দূর যাবে, যেতে যেতে তোমার রাত পোহাবে।

ঈশম নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে, আর হাত-দশেক দূরের অসুস্থ ঘরটা দেখছে। সেখানে ধনমামী আছেন, ঠানদি আছেন, ঈশম ঘরের কোণায় কোণায় চেতপাতা ঝুলাতে দেখল। মটকিলা গাছের ডাল দেখল দরজাতে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। বাচ্চাটা দুবার ট্যাঁও ট্যাঁও করে কাঁদল, ভিজা কাঠের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, ধূপের গন্ধ মিলিয়ে এ-বাড়ীতে এক-জন নবজাতকের জন্ম...টিনকাঠের ঘর, কামরাঙা গাছের ছায়া...ধনমামী বড়মামী ...এবং এ-বাড়ীর বড়কর্তা পাগল, একথা মনে করতে পেরে ঈশম বলল, বড়মামী, বড়মামারে দ্যাখতাছিনা।

বড়বউ বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ঈশমকে শুধু দেখল। কোন কথা বলল না। বললেই যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ঈশম যেন এই মৌনতাটুকু থেকে ধরতে পেরেছে বড়মামা এখন বাড়ীতে নেই। অথবা কোথায় থাকে, কৈ যায় কেউ খোঁজ-খবর রাখে না। রাখবার সময় হয় না। অথবা দরকার হয় না। ঈশম ডাল দিয়ে সবকটা ভাত হাপুস করে মাকড়সার মতো গিলে ফেলল। বড়-মামী এখন কাছে নেই! বৈঠকখানায় লোক পাতলা হয়ে আসছে। বড়মামীর বড় ছেলে, ধনমামীর বড় ছেলে রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছে।

ঈশম বৈঠকখানা থেকে লাঠি নিল একটা, লণ্ঠন নিল হাতে। ঈশম মাথায় পাগড়ি বাঁধল গামছা দিয়ে। এই আঘুন মাসের ঠাণ্ডায় কাদাজল ভাঙতে হবে। খাল পার হতে হবে, বিল পার হতে হবে। গামছা মাথায় সে পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটবে। ধানের জমি কোথাও, কোথাও খালের পারে পারে, কোথাও পুলের উপর দিয়ে—কখনও চুপচাপ, কখনও গাজীর-গীত গাইতে গাইতে ঈশম দীর্ঘপথ হাঁটবে। ঈশম রান্নাঘর অতিক্রম করার সময় দেখল কুয়োতলার ধারে বড়মামী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করছেন। ঈশমকে দেখে বড়বৌ বলল, ঈশম দেখবে ত' তোমার বড়মামাকে, ট্যাবার বটতলায় পাও কিনা দেখবে। তুমি তো বটতলার পথেই যাবে।

ঈশম বাঁশঝাড় অতিক্রম করে মাঠের অন্ধকারে নেমে যাবার সময় বলল, আপনে বাড়ী যান। যাইতে যাইতে যদি পাই—পাঠাইয়া দিমু। এই বলে ঈশম ক্রমে অন্ধ-কার মাঠে মিশে যেতে থাকল। ঈশমকে আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু মাঠের ভিতর লণ্ঠনটা দুলছে।

ঈশমের ডান হাতে লাঠি, বাঁহাতে লণ্ঠন। অঘ্রান মাস। শিশির পড়ছে। এখনও ভালো করে ধানখেতের ভিতর আলো পড়ে নি। সরু পথ খেতের পাশে পাশে। পথ থেকে বর্ষার জল নেমে গেছে—পথের মাটি ভিজা ভিজা, কাদা মাটিতে পা বসে যাবার উপক্রম। অথচ পা বসে যাচ্ছে না—কেমন নরম তাল তাল মাটির উপর দিয়ে ঈশম হেঁটে যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার বলে ঈশম চারিদিকে শুধু লণ্ঠনের আলো এবং তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারল না। এ অঞ্চলে হেমন্তেই শীত পড়তে আরম্ভ করে। শীতের জন্য ঝোপজঙ্গলের কীট-পতঙ্গেরা কেমন চুপচাপ হয়ে আছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে এবার উঁচু জমিতে উঠে এল। পাশে করলার জমি। উপরে ট্যাবার পুকুর আর সেই নির্দিষ্ট বটগাছ। এখানে অনেক রাত পর্যন্ত বড়কর্তা বসে থাকেন। এখানে বড়কর্তাকে অনেকদিন গভীর রাতে খুঁজে পাওয়া গেছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে ঝোপেজঙ্গলে বড়কর্তাকে খুঁজল। ঝোপে-ঝোপে জোনাকি, বটের জট মাটি পর্যন্ত নেমেছে। পুরানো জট বলে জটসকল ভিন্ন ভিন্ন ঘরের মত ছায়া সৃষ্টি করছে। সে ডাক দিল বড়মামা আছেন, সে কোন উত্তর পেল না। তবু লণ্ঠন তুলে গাছটার চারধারে খুঁজতে থাকল—তারপর যখন বুঝল তিনি এখানে নেই, তিনি অন্য কোথাও পদযাত্রায় বের হয়েছেন তখন ঈশম ফের নিচু জমিতে নেমে হাঁটবার সময় দূরে দূরে সব গ্রাম, গ্রামের আলো, হাসিমের মনিহারী দোকানে হ্যাজাকের আলো দেখতে দেখতে নালার ধারে কেমন মানুষের গলা পেল।

সে বলল, কে জাগে?

অন্ধকার থেকে জবাব এল তুমি ক্যাডা?

—আমি ঈশম শেখ। সাকিম টোডার-বাগ। ঈশম যেন বলতে চাইল, আমি গয়না নৌকার মাঝি। বর্ষা এলেই দূরদেশে চলে যাই। অন্ধকার মানি না। বাবু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বাস। এখন তরমুজ খেত পাহারায় আছি। ঠাকুরবাড়ীর বান্দা আমি। বয়স বাড়ছে, গয়না নৌকা চালাতে আর পারি না।

—আমি আনধাইর রাইতে হাসিম ভূইঞা জাগি। সাকিম কলাগাইছা।

—অঃ হাকিম ভাই। তা কি করতাছ?

—মাছ ধরতাছি। দ্যাখছনা জল নামতাছে। আমি কই মাছের জাল পাইতা বইসা আছি। ঘুট-ঘুইট্টা আনধাইরে কই রওনা দিলা?

—যামু মুড়াপাড়া। ধনকর্তার পোলা হইছে। সেই খবর নিয়া যাইতাছি।

—ধনকর্তার কয় পোলা য্যান।

—এরে নিয়া দুই পোলা। তোমার কাছে কাঠি আছে, বিড়িটা আঙ্গাইতাম।

ঈশম বিড়ি ধরাল। ওর বড়কর্তার জন্য মনটা খচখচ করছে। বড়কর্তা রাতে বাড়ী না ফিরলে বড়মামী অন্ধকারে মানুষটার জন্য জেগে বসে থাকবে। সে বলল, বড়-মামারে দ্যাখছ?

—দুফরে দ্যাখছিলাম—নদীর চরে হাইটা যাইতাছে।

ঈশম কেমন দুঃখের গলায় বলল, ভাইরে তোমার আমার ছোট-খাটো দুঃখ। ঈশম ফের হাঁটতে থাকল। সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। ফাওসার খাল পার হবার জন্য সে হন-হন করে হেঁটে যাচ্ছে। হাট ভাঙবার আগে যেতে পারলে সে গুদারাঘাটে মাঝি পাবে। নতুবা এই শীতে সাঁতার কেটে খাল পার হতে হবে। ঠাণ্ডার কথা ভাবতেই ওর শরীর কেমন কুঁকড়ে গেল।

ইচ্ছা করলে ঈশম একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আরও আগে খালের পারে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু একটি অজ্ঞাত ভয়, বিশেষ করে বামন্দি-চকের বুড়ো শিমুলগাছটা এবং ওর দুটো বাজে পোড়া মরা ডাল, নিচে কবর, মানুষের আবহমানকাল ধরে কবর, হাজার হবে, বেশীও হতে পারে—ঈশম ভয়ে সেই পথে খালের পারে পৌঁছাতে পারছে না।

ঈশম হাতের লাঠিটা এবার আরও শক্ত করে ধরল। সে ভয় পেলেই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। আল্লা মেহেরবান। সে যেন আসমানে তার সেই মেহেরবানকে খুঁজতে থাকে। অজস্র তারা এখন বিন্দু-বিন্দু হয়ে জ্বলছে। নিচে সেই এক শুধু গাঢ় অন্ধকার। দূরে দূরে সব গ্রামের আলো, হ্যাজাকের আলো—রশিমটা গাছের ফাঁকে এবং ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে এখনও দেখা যাচ্ছে। পরাপরদীর পথ ধরে কিছু লোক যাচ্ছিল জল ভেঙে—ওদের হাতে কোন আলো নেই—জলে ওদের পায়ের শব্দ। কিছু কথাবার্তা ঈশমের কানে ভেসে আসতে থাকল।

সে ক্রমে খালের দিকে নেমে যাচ্ছিল। ওর হাঁটু পর্যন্ত ধানগাছের শিশিরে ভিজছে। ঈশম পরাপরদীর পথ থেকে ক্রমশ ডাইনে সরে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে সে কোন মানুষের সাড়া পাচ্ছে না। নীরবে যেন একটা মাঠ গাম্ভীর গরুর মতো অন্ধকারে শুয়ে আছে। পথ ধরে কোন হাটুরে ফিরছে না। ফসলের ভারে গাছগুলো পথের উপর এসে পড়েছে। সে লাঠি দিয়ে গাছগুলো দুদিকে সরিয়ে দিচ্ছে এবং পথ করে নেমে যাচ্ছে। খালের পারে গিয়ে দেখল গুদারা বন্ধ। মাঝি ও-পারে নৌকা রেখে চলে গেছে। নৌকাটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁপাশে সে কয়েক কদম হেঁটে গেল। অদূরে মনে হল আকাশের গায়ে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঈশম জানত, এ সময়ে জেলেনৌকা থাকবে। বর্ষার জল খালবিল ধরে নেমে যাচ্ছে। জল এ অঞ্চলে উঠে এসেছিল জোয়ারে—আঘুন মাসের টানে তা নেমে যাবে। জলের সঙ্গে মাছ, এবং কচ্ছপ। জেলেরা এসেছে খড়া জাল নিয়ে। খালের ভিতর জাল পেতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঈশম খালের পারে পারে সেই লণ্ঠনের আলো পর্যন্ত হেঁটে গেল। পারে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, আমি ঈশম। আমারে পার কৈরা দ্যাও। আমি যাইতাছি এক খবর নিয়া। ধনকর্তার পোলা হৈছে। তারপর সে চারি-দিকে তাকিয়ে ডাকল, বড়মামা আছেন, বড়মামা! বড়মামী আপনের লাইগা জাইগা বইসে আছে, বাড়ী যান। কোন উত্তর এল না। শুধু একটা সোঁকা ওপার থেকে ভেসে এল। বলল, ধনকর্তার পোলা হৈছে।

ঈশম বলল, হু।

—তবে কাইল যামু, একটা গরমা মাছ লইয়া যামু। মাছ দিয়া একটা পিরান চাইয়া নিমু। বলে সে পাটাতন তুলে অন্ধকারে একটা বড়মাছ টেনে বের করল। ঈশম

লণ্ঠনের আলোতে নীল রঙের তাজা মাছটা পাটাতনে লাফাতে দেখল। চোখ দুটো বড় অবলা। যেন এক পাগল মানুষ নিরন্তর এইসব মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুল-ফল পাখি দেখে বেড়াচ্ছে—এই চোখ দেখলে পাগল মানুষটার চোখ শুধু ভাসে। বড়-মামী বড় বড় চোখ নিয়ে প্রত্যাশায় বসে আছে। সে বলল, বড়মামারে দ্যাখছ?

মানুষটা বলল যে, বড়কর্তারে আইজ দেখি নাই।

ঈশম আর কোন কথা বলল না। এই সব মাঠে পাগল মানুষ দিন-রাত, ঘুরে বেড়ান। কোন অন্ধকারে, হোথায় তিনি কার উদ্দেশ্যে হে'টে যাচ্ছেন, ঈশম টের করতে পারছে না। তাকে খাল পার করে দিলে মাঠ ধরে হাঁটতে থাকল শুধু।

এখন সে পাটের জমি ভাঙছে। এখানে এখন কোন ফসল নেই। কলাই, খেশারী এসব থাকার কথা—কিন্তু কিছুই নেই। শুধু ফসলহীন মাঠ। শুধু খোঁচা খোঁচা দাড়ির মতো পাট গাছের গোড়া উঁকি মেরে আছে। যোগীপাড়াতে এত রাতেও তাঁত বোনা হচ্ছে। মাঠেই সে তাঁতের শব্দ পেল। সে গ্রামে উঠে যাবার মতলবে কোণাকোণি হাঁটছে। জেলেদের নৌকাগুলি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু খড়া জালের মাথায় বাঁশের ডগাতে লণ্ঠনের আলো প্রায় যেন এক ধ্রুবতারা—ওকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে—সে কতটা পথ হে'টে এল, এবং কোনদিকে উঠে যেতে হবে—অন্ধকারে সেই এক আলো ওকে বিলে নেমে যাবার পথ বাতলে দিচ্ছে। এ-মাঠের শেষেই সেই বুড়ো শিমুল গাছটা যেন ক্রমে অবয়ব পাচ্ছে। দিনের বেলাতে এ-জমি থেকে গাছটা স্পষ্টই দেখা যায়। সেই গাছটার পাশের গ্রামে একবার মড়ক লেগেছিল—ঈশম এখন কেমন ভয়ে-ভয়ে হাঁটছে। শিমুল গাছটার দূরত্ব ঈশমকে কিছুতেই ভয় থেকে রেহাই দিচ্ছে না। সে যত দূরে দিয়ে যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে গাছটা ওর দিকে হে'টে আসছে। ডান পাশে প্রায় আধ ক্রোশ পথ হে'টে গেলে সেই গাছ এবং নিচে তার কবরভূমি—কিন্তু যেহেতু টিলা জমি থেকে একবার সে গাছটাকে দেখতে পেয়েছিল, একদিন হাট ফেরত রাতে গাছটার মাথায় সে আলো জ্বলতে দেখে-ছিল...সেজন্য ঈশম...ঈশম দ্রুত পা চালিয়ে যোগীপাড়াতে উঠে এল। কেউ দেখে ফেললেই বলবে, এলাম সেই কবর ভেঙে—কারণ ঈশমের মতো সাহসী পুরুষ হয় না—এ-তল্লাটে এমন একজন সাহসী মানুষ, কিন্তু ঈশম কোনকালে তার পরানের ভয়ের কথা খুলে বলে না। সাহসী বলে সে রাতে-বিরাতে পরানের ভিতর ভয় লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে চলে যেতে থাকে। যোগী-পাড়াতে উঠতেই মানুষের শব্দে, চরকার শব্দে এবং নানা মাকুর শব্দে ভয়টা কেটে গেল। তারপর পরিচিত মানুষের গলা পেয়ে বলল, আমীর চাচায় গলা পাইতাছি।

—তুমি...? ?

—আমি ঈশম।

—এত রাইতে!

যাম্ মড়োপাড়া। ধনকর্তার পোলা হৈছে—খবর লৈয়া যাইতাছি। আপনের শরীর ক্যামন?

—ভাল নারে বা'জান। ভাল না। একটু থেমে বলল, বড়কর্তার মাথাটা আর ঠিক হৈল না।

—না চাচা।

—শোনলাম বুড়া কর্তা চক্ষে দেখতে পায় না।

—না। সারাদিন ঘরে এখন বৈসা থাকে। বড়মামী, বুড়া ঠাইরেন দেখাশুনা করে।

—পোলাটা পাগল হৈল, আর আমার কর্তার-অ চক্ষু গেল।

—হ চাচা।

—তা একটু বৈস। তামুক খাও।

—আর একদিন চাচা। আইজ যাইতে দ্যান। ঈশম কথা বলতে বলতে সৈয়দ মিস্ত্রর সোনার মাচান অতিক্রম করে রামপদ যোগীর আম বাগানে ঢুকে গেল। তারপর গ্রামের মসজিদ পার হয়ে মাঠে পড়তেই শিমুল গাছটার কথা মনে হল। সে জোরে জোরে মনের ভিতর সাহস আনার জন্য বলল, এলাহী ভরসা। গাছটা যেন ক্রমে শয়তান হয়ে যাচ্ছে। শয়তানের মতো পিছু নিয়েছে। মাঝে-মাঝে হাতের লাঠিটা লণ্ঠনটা ভয়ানক ভারী-ভারী মনে হচ্ছে। সে ভাবল—এমন ত হবার কথা নয়। সে ভাবল, অনেক রাতে, অনেক দূরে সে কত মানুষের সুসংবাদ, দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে... অথচ আজ...আজ, এখনও সে ফাওসার চক ভাঙতে পারে নি, অথচ শিমুল গাছটা বড় কাছে মনে হচ্ছে। পেছনে তাড়া করছে, কখনও সামনে। সে দুবার লাঠিটা মাথার উপর বন বন করে ঘোরাল। ওর পাইক খেলার কথা মনে হল—লাঠি খেলায় ওস্তাদ ঈশম এই মাঠে গাছটাকে প্রতিপক্ষ ভেবে মাঝে মাঝেই লাঠি ঘোরাতে থাকল। লণ্ঠনটা সে বাঁহাতে রেখে ডান হাতে লাঠি মাথার উপর ঘোরাচ্ছে এবং নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। যখন ধানগাছগুলো পা জড়িয়ে ধরছে, সে লাঠি দিয়ে ধানগাছ সরিয়ে ফের হাঁটছে। সে লাঠি দিয়ে মাঝে মাঝেই ধানগাছ সরাচ্ছিল—কিছুটা নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য, কিছুটা পথ পরিষ্কারের জন্য। মাঠে নেমেই শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে, ভয়ানক শক্ত সমর্থ শরীর ঈশমের। এই বুড়ো বয়সেও সে ঘাড়-গলা শক্ত রাখতে পেরেছে। অথচ এই রাত, অন্ধকার, বিশাল বিলের মাঠ এবং যে শিমুল গাছটা এতক্ষণে ওকে তাড়া করছে—এই সব মিলে সে কেমন সব গোলমাল করে ফেলছে। ঈশম লণ্ঠনের আলোতে যেন পথ দেখতে পাচ্ছে না। এই বিল ভেঙে উঠতে পারলেই ফের গ্রাম, ফের গ্রামের পথ, গোলাকান্দালের ভুতুড়ে পুল এবং পুরীপুজোর মাঠ। ফের গ্রামের পর গ্রাম, তারপর বুলতার দিঘি এবং নমশূদ্রপাড়া—পেড়াব, পোনাব, মাসাব গ্রামে।

অন্ধকার বলেই আকাশে এত বেশী তারা জ্বলজ্বল করছিল। বিলেন জমি নিচে নামতে-নামতে যেন পাতালে নেমে গেছে। আলপথগুলি এখনও ঠিক মতো পড়ে নি, অঘ্রান গেলে, পোষ এলে এবং ধানকাটা হলে পথগুলো স্পষ্ট হবে। এই বিলে পথ চিনে অন্য পারে উঠে যাওয়া এখন বড় কষ্টকর।

অনেকক্ষণ ধরে ঈশম একটি পরিচিত আলপথের সন্ধান করল। যারা মেলাতে যায়, অথবা বান্নিতে, তারা এই আলপথে বিলের অন্য পারে উঠে যায়। ধান জমির ফাঁকে-ফাঁকে কোথায় যেন পথটা লুকিয়ে আছে। সে সন্তর্পণে গাছ তুলে-তুলে দেখছে আর এগুচ্ছে। এই বুঝি সেই পথ, কিন্তু কিছু দূর গেলেই মনে হচ্ছে না সে ঠিক পথে আসে নি—পথটা ওকে নিয়ে এই বিলের ভিতর লুকোচুরি খেলছে। তারপর ভাবল, বিলেন জমির ধারে-ধারে হাঁটতে থাকলে সে নিশ্চয়ই পাশের গ্রামে গিয়ে উঠতে পারবে। মনে-মনে আবার উচ্চারণ করল, এলাহী ভরসা। তাকে এ-রাত, এ-বিল, এ-মাঠ অতিক্রম করতেই হবে। অন্ধকারে পথ যত অপরিচিত হোক, শয়তানের চোখ যত ভয়ংকর হোক—সে এ-মাঠ ঠেলে অন্য মাঠে গিয়ে পড়বেই। ধনকর্তাকে খবর দেবেই।

সে কখনও দৃঢ় হল অথবা কখনও সংশয়ে ভুলে সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে যেন ক্রমে এই বিলের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে তার, সে একই জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসছে। সে আদৌ এগুতে পারছে না। সে এবার বলল, খুদা ভরসা। সে যে ঘুরে-ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসছে পরখ করার জন্য হাতের লাঠিটা ধানগাছ সরিয়ে কাদা মাটিতে পুঁতে দিল। সে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি চিনে রাখার জন্য কিছু গাছ উপড়ে ফেলল। একটা ক্রুশের মতো করে গাছগুলোকে বিছিয়ে রাখল মাটিতে তারপর গোলমত চার পাশে একটা দাগ দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই বিল এবং পথ ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। সে একটু সময় বসল। বিশ্বচরাচর নিঝুম। মনে হয় ঠিক যেন এই বিল সেই পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময়। সে নিজের মনে হাসার চেষ্টা করল। অথচ গলা শুকনো। ওর সামান্য কাশি উঠে এল গলা থেকে। দ্রুত সেই শব্দ বিলের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। অপরিচিত শব্দ কোথাও। সে কান পেতে রাখল। এখন এই মাঠ আর তার কাছে পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময় নয়, নিঃসঙ্গ মাঠ অঘ্রানের শিশিরে ভিজে ওর পঙ্গু স্ত্রীর মতো ঘুমাচ্ছে অথবা রাতের কীট-পতঙ্গ সকল, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা সকল শীতের মরসুমের জন্য আর্তনাদ করছে। কবে শীত আসবে, কবে শীত আসবে, মাঠ ফাঁকা হবে, শস্যদানা মাঠে পড়ে থাকবে, আমরা উড়ে-উড়ে খাব, ঘুরব-ফিরব, নাচব-খেলব। সে যত এই সব শুনতে থাকল, যত এই সব চিন্তায় বিষণ্ণ হতে থাকল তত সেই ভয়াবহ শিমুল গাছটা মাথার আলো জ্বেলে ওর দিকে যেন এগিয়ে আসছে।

শিমুল গাছটার মাথায় আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। অথবা নিভে গিয়ে আলেয়া হয়ে যাচ্ছে, দূরে-দূরে, যেন বিলের এ-মাথা থেকে অন্য মাথায় আলেয়াটা ওকে নেচে-নেচে খেলা দেখাচ্ছে। সে বলল, ভালরে ভাল! এভাবে বসে থাকলে ভয়টা ওকে আরও পঙ্গু করে দেবে। সে দ্রুত উল্টো মুখে ছুটতে পারলেই কোন না কোন গ্রামে উঠে যেতে পারবে।

সুতরাং সে হাতের লণ্ঠন নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল। হাতের লণ্ঠনটা দুবার দপ-দপ করে জ্বলে উঠতেই সে দ্রুত ছুটে যেতে পারল না। সে দু হাঁটুতে আর শক্তি পাচ্ছে না। বার-বার কেবল পিছনের দিকে তাকাচ্ছে। সে এবার দেখল, স্পষ্ট দেখতে পেল শিমুল গাছটা যথার্থই এগিয়ে আসছে। সে দেখল গাছের মাথায় আলো আর ডালে ডালে মড়কের মৃতদেহ ঝুলছে। সে সেই গাছ দিয়ে নির্দিষ্ট করা জায়গাটায় ফিরে এসেছে। শিমুল গাছটা সহসা জীবন্ত হয়ে গেল। এতক্ষণে তবে সে একই স্থানে ঘুরছে। ভয়ে বিবর্ণ ঈশম দস্যুর মতো লাথি মারল জমিতে। উপড়ানো গাছগুলো অন্ধকারে বিলের প্রচণ্ড হাওয়াও উড়তে থাকল।

সে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলল, শয়তানের পো ভাবছটা কি শুনি! বিলের পানিতে আমারে ডুবাইয়া মারতে চাও! বলেই সে লাঠিটা সামনে তুলে উপরের দিকে ঘোরাল। যেমন সে মহরমের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সামনে পিছনে ঘুরে উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে লাঠি ঘোরাতো, লাঠি এগিয়ে দিত, পিছিয়ে আনত, সে উপরের দিকে উঠে যাবার সময় তেমন সব খেলা দেখাতে থাকল। এই বিলের জমি এবং শিমুল গাছটার উদ্দেশ্যে সে এখন মরিয়া। কিন্তু খেলা দেখালে হবে কি—কারা যেন ওকে পেছনে টানছে। চারপাশে হাঁটছে। মনে হচ্ছে সারা বিলে মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদল অবয়বহীন শয়তান ওর সঙ্গে হাঁটছে অথচ কথা বলছে না। অন্ধকারে সে কেবল উপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে সে চিৎকার করে উঠল, খুদা এইটা কি হৈল! ধনকর্তাগ আমারে কানাওলায় ধরছে! সে লণ্ঠন ফেলে লাঠি ফেলে বিলের আলে আলে ঘুরতে থাকল। ধানপাতা লেগে পা কেটে যাচ্ছে। সে বারবার একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসে হাজির হচ্ছে। আর এ সময়ই সে দেখল ভুতুড়ে আলোটা একেবারে

চোখের সামনে জ্বলছে নিভছে। সেই আলো হাজার চোখ হয়ে গেল, অন্ধকারের ভিতর চোখগুলো জ্বলছে। ঈশম আর নড়তে পারল না, ধীরে ধীরে আলের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।

আগে সুন্দর আলি লন্ঠন হাতে। পিছনে ধনকর্তা। তিন চারদিন আগে ধনবৌর চিঠি পেয়েছে। ধনবৌ লিখেছে—শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না, এ সময় তুমি যদি কাছে থাকতে। ধনবৌর চিঠি পেয়ে চন্দ্রনাথ আর দেরী করেনি। বড় কাছারি বাড়িতে সেজদা থাকেন, তার কাছে গিয়ে বলল, দাদা আমি একবার বাড়ি যামু ভাবছি। আপনের বৌমা চিঠি দিছে। অর শরীর ভাল না—একবার তরে ঘুইরা আসি। ভূপেন্দ্রনাথ সঙ্গে সুন্দর আলিকে দিয়েছেন। রাত হয়ে যাবে যেতে। সেরেস্তার কাজের চাপ পড়েছে—নতুবা তিনি নিজেও বাড়ি যেতেন। ছেলে হয়েছে এমন খবর জানা থাকলে এতটা বোধ হয় উদ্বিগ্ন হত না। সে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছে। সুন্দর আলিকে নিয়ে লন্ঠন হাতে নেমে এসেছে। শীতালক্ষ্যার পারে পারে কিছু দূর এসে বাজার বাঁয়ে ফেলে মাসাব পোশব পটায় হয়ে বুনোতার দিঘি ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। পেয়াদা সুন্দর আলি মাঝে মাঝে কাশছিল। সে সে-শব্দটাও করেনি। নির্ভয়ে নিঃশব্দে ওরা এ মাঠে এসে নেমেছে। মাঠ পার হলেই কাওসার খাল, তারপর দু'ক্রোশ পথ। বাড়ি পৌঁছাতে দেরী নেই। এমন সময়ে সুন্দর আলি চিৎকার করে উঠল, নায়েব মশাই, খুন। হাত থেকে লন্ঠনটা পড়ে যাবে যাবে ভাব হল সুন্দর আলির। সুন্দর আলি পেছনের দিকে ছুটে পালাতে চাইল।

ধনকর্তা হকচকিয়ে গেলেন, এখানে খুন ডাকাতি!

সুন্দর আলি বলল, মাঠের উপর দিয়া আসেন কর্তা। নিচ দিয়া আমি যামু না।

ধনকর্তা এবার জোরে ধমক দিল।—আয় দ্যাখি, কি খুন কে খুন দ্যাখি। ধনকর্তা লন্ঠন তুলে সন্তর্পণে মানুষটার মুখের উপর ধরল। মানুষটা বড় চেনা যেন। সে নাড়তে থাকল ওকে। দেখল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। সে ডাকল, ঈশম তর কি হৈল? ঈশম, অঃ ঈশম! ঈশমের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই—সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব।

ঈশমের পাশে বসে ধনকর্তা চোখ টেনে দেখল। না সবই ঠিকঠাক আছে। এবার মনে হল—বিলেন মাঠে এমন আঁধারে ঈশম পথ হারিয়েছে। সে বিল থেকে জল আনল। রুমালে ভিজিয়ে ভিজিয়ে জল দিল চোখে-মুখে। এবং একসময় জ্ঞান ফিরলে বলল, কিরে তর ডরে ধরছে। আমি তর ধনমামা।

ঈশম চোখ মেলে ধীরে ধীরে দেখল। প্রথম বিশ্বাস করতে পারল না। [illegible] কেমন অবিশ্বাসের গলায় ডাকল, ধনমামা! আপনে ধনমামা! ধনকর্তাকে দেখে সে কেঁদে ফেলল। মামাগ আমারে কানাওলায় ধরছে। সারাটা মাঠ, বিল, জমি ঘুরইয়া মারছে। শরীরটা আর শরীর নইগ মামা।

—আস্তে আস্তে হাঁট। বিলে তুই আইছিলি ক্যান?

এতক্ষণ পর ঈশমের সব মনে হল। কেন এসেছিল এই মাঠে, কোথায় যাবে, কি করবে, কি খবর দিতে হবে সব এক এক করে মনে পড়ল—ধনমামা আপনের পোলা হৈছে। আমিও আপনের কাছে যামু কৈরা বাইর হৈছি। পথে এই কাণ্ড— কানাওলা।

ধনকর্তা বিশাল বিলেন মাঠে আলো আঁধারে দাঁড়িয়ে কি জবাব দিতে হবে ভেবে পেল না। আকাশে তেমনি হাজার নক্ষত্র জ্বলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ধানের গন্ধ বয়ে আনছে। ঈশম সে সময় বলল, চলেন মামা, আস্তে আস্তে হাঁটি। যেতে যেতে খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমারে একটা বখশিশ দিতে হৈব।

ওরা হেঁটে হেঁটে একসময় ট্যাবার পুকুর পারে এল। অশ্বথ গাছ পার হতে গিয়ে ঈশম ডাকল, বড়মামা আছেন, বড় মামা! কোন উত্তর এল না। উত্তরের পারে ভীষণ ঝোপ-জঙ্গল। এত রাতে এই জঙ্গলে বসে থাকলে কিছুতেই ধরতে পারবে না। ভিতরে কেউ আছে কি নেই—দিনের বেলাতে টের পাওয়া যায় না। ঈশম অথবা চন্দ্রনাথ বৃথা আর ডাকাডাকি করল না। করলা খেত পার হয়ে ধানের জমিতে নেমে আসতেই টের পেল যেন খেতের ভিতর খচ-খচ শব্দ হচ্ছে। ধান খেতে সামান্য জল। পায়ের পাতা ডোবে কি ডোবে না। ঈশম লন্ঠন তুলতেই দেখল—বড়কর্তা। ধান খেতের ভিতর বড়কর্তা কেমন উবু হয়ে আছেন। ঈশম খেতের ভিতর ঢুকে বলল, উঠ্যান। বাড়ি যাইতে হৈব। বড়মামী আপনের লাইগা জাইগা আছে। কিন্তু বড়-কর্তার মুখে কোন রেখা ফুটে উঠল না। যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকলেন। কিছুতেই উঠছেন না। কিসের উপর চেপে বসে আছেন। পায়ের নিচে অন্ধকার এবং ধানে গাছ। খচ-খচ শব্দ। গাছগুলো নড়ছে। সে লন্ঠনটা নিচে নামাতেই দেখল একটা বড় কাছিম। একটা প্রকাণ্ড কাছিম চিৎ করে তিনি উপরে বসে আছেন। কাছিমটা পাগুলি বের করে মুখ বের করে কামড়াতে চাইছে। কিন্তু তাঁর পা নাগাল পাচ্ছে না। কেবল গাছগুলো নড়ছে। ঈশম কি বলতে যাচ্ছিল.. সঙ্গে সঙ্গে কাছিমের বুকে বসে বড়কর্তা হেঁকে উঠলেন, গ্যাৎ চোরেৎশালা।

ঈশম বলল বড়মামা এইটা আপনে কি করছেন? এতবড় একটা কাছিম ধৈরা বইসা আছেন। তারপর সে বলল, আপনে বাড়ি যান। ধনমামায় আইছে। ধনমামার পোলা হৈছে।

ধনকর্তা বললে, উইঠা আসেন বড়দা। কাছিমটা ঈশম লইয়া যাইবখন।

বড়কর্তা ভালো মানুষের মত ধন-কর্তাকে অনুসরণ করলেন। বড়কর্তা কখন ছুটতে থাকবেন, কখন হাতে তালি বাজাবেন—এই সব ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ধনকর্তা সন্তর্পণে পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলেন। বড়কর্তা অন্ধকারে ছুটতে চাইলে ধনকর্তা বলল, আমার হাতে লাঠি আছে বড়দা। ছুটবেন ত বাড়ি মারমু ঠ্যাঙে। ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু।

চন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে বড়-কর্তা ঘুরে দাঁড়ালেন। আমাকে তুমি ভৎর্সনা করছ চন্দ্রনাথ! এমন এক করুণ মুখ নিয়ে চন্দ্রনাথকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেমন কোন কথা বলেন না, এখনও তেমনি কোন কথা না বলে অপলক চেয়ে থাকলেন। এমন চোখ দেখলেই মনে হয় এই উত্তর চল্লিশের মানুষ বুঝি এবার আকাশের প্রান্তে হাত তুলে তালি বাজাবেন। চাঁদের কাকজ্যোৎস্না এখন আকাশের সর্বত্র। যথার্থই এবার বড়কর্তা দু হাত উপরে তুলে হাতে তালি বাজাতে থাকলেন, যেন আকাশের কোন প্রান্তে তার পোষা হাজার হাজার নীলকন্ঠ পাখি হারিয়ে গেছে। হাতের তালিতে তাদের ফেরানোর চেষ্টা। আর ধনকর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু নতুন করে লক্ষ্য করল—বড়দার বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, প্রশস্ত কপালের পাশে বড় আঁচিল, সবচেয়ে সেই সূর্যের মত আশ্চর্য রং শরীরের এবং সাড়ে ছয় ফুটের উপর শরীরের ঋজুতা। দেখলে মনে হবে মধ্যযুগীয় কোন নাইট রাতের অন্ধকারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রনাথ দেখল, বড় এবং গভীর চোখদুটো সারা-দিন উপবাসে কোটরাগত। দুঃখে চন্দ্রনাথ চোখের জল রোধ করতে পারল না। বলল, বড়দা আপনে আর কত কষ্ট পাইবেন, সবাইরে আর কত কষ্ট দিবেন!

বড়কর্তা ওরফে মণীন্দ্রনাথ শুধু বলল, কারণ তার প্রকাশে এই এক উচ্চারণ গ্যাৎ-চোরেৎশালা। ফের তিনি আকাশের প্রান্তে তালি বাজাতে থাকলেন। সেই তালির শব্দ এত বড় মাঠে কেমন এক বিস্ময়কর শব্দ সৃষ্টি করছে। এইসব শব্দ সকল গ্রাম মাঠ পার হয়ে সোনালি বালির নদীর চর পার হয়ে তরমুজ খেতের উপর এখন যেন ঝুলছে। মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা জীবনের হারানো সব নীলকন্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক—কিন্তু তারা নামছে না—বড় কষ্টদায়ক এই ভাবটুকু। তিনি এবার চন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ঘরের দিকে চলতে চলতে যেন বলতে চাইলেন, চন্দ্র তোমার ছেলে হয়েছে বড় আনন্দ। অথচ কথার অবয়বে শুধু এক প্রকাশ, গ্যাৎ-চোরেৎশালা। এবার তিনি নিজের এই অপ্রকাশের দুঃখে কেমন বঞ্চিত হলেন— এত নক্ষত্র আকাশে অথচ তাঁর পাগল চিন্তার সমভাগী কেউ হতে চাইছে না। সকলেই যেন তার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতে চাইছে। মণীন্দ্রনাথ আর কোন কথা না বলে সেজভাইকে শুধু অনুসরণ করে হাঁটতে থাকলেন।

[illegible]

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেল-গাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

"ইনজিনিয়ার কমিশনার"

একটা আট ফিট বাই ছ ফিট পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল ভাঙতে ম্যাক্সিমাম কত খরচ পড়বে বলুন তো? জানি প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলবেন। ভাববেন, সম্পাদক এসব আবার কি নয়া ফিচলেমি শুরু করল। সিঁড়ি-ভাঙার অংক তো সেই কোন সাত সকালে সারা হয়ে গেছে। নতুন করে দেয়াল-ভাঙার অংক কষার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি কোনটাই আপনার নেই। কি বললেন ?— ইচ্ছে নেই। ভেবে বলুন মশাই। আজ হয়তো নেই, তাই বলে যে কোনদিন ইচ্ছে হবে না, তাই বা কে বলতে পারে? আর সেদিন দেখবেন এই অভাজনের উপদেশটুকু বেশ কাজে লাগছে।

উপদেশ-টুপদেশ নয় মশাই, নিত্যি এই শহরে যা ঘটছে তারই একটা নমুনা পেশ করছি। তবে এটাই কোন স্ট্যাণ্ডার্ড নমুনা নয়। রমণী সাহা ব্যবসায়ী মানুষ তাই ঐ টুকরো দেয়ালটা ভাঙার ধাক্কা সামলে নিতে পেরেছিলেন। আর আপনি যদি সামান্য গেরস্থ ভাড়াটে হয়ে প্রয়োজনে বা লোভে পড়ে বা ভুলে কোনদিন ভাড়া বাড়ীর দেয়াল-টেয়ালের ম্যাপ পাল্টে ফেলেন তাহলে ইজেকটমেণ্ট স্যুটের ধাক্কা সামলানোর আদি-অন্ত সমস্ত খরচ-খরচা ছাড়াও হয়তো ইনজিনিয়ার কমিশনার সাহেবকে প্রণামী দিয়ে খুশী করতে গিয়ে না আবার ঘটি-বাটি সব বিকিয়ে যায়। প্রণামী বলুন বা আক্কেল সেলামী বলুন সবই অবিশ্যি আপনার মর্জি-নির্ভর। যদি মামলা মোকদ্দমাকে ভয় করেন তাহলে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আপনি কেন শুধু শুধু করপোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে দাখিল করা বাড়ীওয়ালার অরিজিন্যাল প্ল্যানটা খোঁদলাতে যাবেন। কিন্তু যায়ও তো মানুষ। যায় না কি?

সাহা মশাই তো তাই করতে গিয়ে প্রায় ফেঁসে গিয়েছিলেন। রমণী সাহার গ্যারেজের ব্যবসা। ফোরটি সিক্সের দাঙ্গার গুঁতোয় রমণী ঢাকার সব ব্যবসাপত্তর তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। যা সামান্য পুঁজিপাটা অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে এক ধুরন্ধর মোটর মেকানিকের পরামর্শে ফোরটি সেভেনের ফেব্রুয়ারী নাগাদ এই বিজনেস শুরু করেন।

তখনো কলকাতা কলকাতাতেই ছিল। ছোটখাট ব্যবসায়ীরা শহরের বুকের ওপরেই দোকানঘর জমি-জায়গা ভাড়া নেওয়ার সাহস করত। সেই সাহসেই কলকাতার বুকে শহরের পুরোনো বাসিন্দা মিত্তিরদের দু বিঘার একটা প্লট মাসিক সোয়া তিন শ টাকায় নিরানব্বই বছরের জন্য রমণী সাহা লিজ নেন। মিত্তিরদের বড় কর্তা তখনো বেঁচে। বাস্তুহারা রমণীর কাকুতি-মিনতিতে সহজেই গলে গিয়ে-ছিলেন।

জমিদার বড়কর্তা তেইশ বছর আগে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, তেইশ বছর পরেও যে তাঁর পুত্ররা সে উদারতা দেখাবেন এটা ভাবাই ভুল হয়েছিল রমণীর। তেইশ বছরে শহরের ঘরে ঘরে এডিসন সাহেবের ঝোলানো বাল্বের বদলে যেমন নিয়ন আলোর রোশনাই একটা ঝিকঝিকে ভাব এনে দিয়েছে তেমনি কলকাতার রাস্তাঘাটে মোটরের গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কিও বেড়েছে দশগুণ। সেই সুযোগে রমণী সাহার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার একেবারে উপচে উঠেছে। সার্ভিসিং, গ্যারেজিং, পুরোনো গাড়ী রি-মডেল করে চড়া দামে বেচে দেওয়ার ব্যবসায় সাহা মশাই ফেঁপে ফুলে ঢোল।

দু দুজন অটোমোবিল ইনজিনিয়ার, চারজন মেকানিক ছাড়াও ষোলজন কর্ম-চারীর মাইনে-পত্তর, জমির ভাড়া, ট্যাকস ইত্যাদি সব মিটিয়েও মাস গেলে কম করে বিশ বাইশ হাজার টাকা ঘরে আসে। আর একটুকরো বাড়তি জমি পাওয়া গেলে ইন-কামটা ডবল করে নেওয়া যায়। তাই, মিত্তিরদের ছোট তরফের মেজবাবুকে ধরে পড়ে রাজী করিয়ে তিন বছর আগে রমণী সাহা পাশের দু বিঘা প্লটটা মাসিক বারোশ টাকার কিস্তিতে চব্বিশ বছরের জন্য লিজ নেন। আর সেই থেকেই শুরু হোল নতুন ঝামেলা।

দুটি প্লটই পাশাপাশি। ভাবতেও অবাক লাগে এরকম বিজনেস সেন্টারে কি করে এতদিন এতখানি জায়গা খালি পড়ে-ছিল। পড়েছিল তার কারণ মিত্তিরদের দু তরফের কোন বাবুরই তো আর দিনের আলোর মুখ দেখতে হয়নি কোনদিন। যত-দিন জমিদারী অটুট ছিল, ততদিন প্রজা-পীড়নে বাবুয়ানি চলেছে পুরোমাত্রায়। জমিদারী যাওয়ার পরও কলকাতার বনেদী পাড়ার দোতলা তিনতলাগুলো বেচে, ভাড়া দিয়ে চলছিল। কিন্তু ইনজিনের ক্ষমতা যাই হোক না কেন ক্রমাগত যদি জল বার করে দেওয়া হয় তাহলে একদিন রবীন্দ্র সরোবরেও শুকনো ঝাঁঝি আর মরা শ্যাওলা ছাড়া যে কিছুই থাকবে না, এতো বলাই বাহুল্য।

বড় তরফের তিন শরিক। মরশুমে [illegible] দাদার ফুল স্যুইংয়ে ক্যাশের খৈ [illegible] যখন পোড়া বার্তাকুর দশা প্রাপ্ত হয়েছেন তখনি খবর এল ছোট তরফের মেজভাই অমলেন্দু তার প্লটটা ভাড়া দিয়ে সাহা মশায়ের কাছ থেকে মাস গেলে নিট বারোশ টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। টনক নড়ল। একই জমি বরং বড় তরফেরটা বড়রাস্তা লাগোয়া, তবু তার ভাড়া সোয়া তিনশ আর পেছনের গলির প্লটের জন্য বারোশ! এ ত ভারী অন্যায়। অতএব ডাক পড়ল রমণীর।

হাজার হলেও জমিদারনন্দন। তাই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি রমণী এবং যা অনুমান করেছিলেন গিয়ে শুনলেনও তাই। অনেক পয়সা তো করেছেন সাহা মশাই। এবার ভাড়া-টাড়া বাড়ান।

এ চাপ যে আসবে তা জানা ছিল। তাই সসংকোচে রমণী জানতে চাইলেন প্রার্থনা কত?

কত আর, অমলেন্দুকে যা দিচ্ছেন তাই দেবেন।

তা কি করে হয়? দিনকাল ভাল নয়। ব্যবসায় ভাটা চলছে। হঠাৎ করে নতুন খরচের ধাক্কা সামলাবে কি করে? মুখে কিছু না বলে সময় চাইলেন রমণী। অনেক ভাবনা চিন্তার পর অ্যাকাউনটেণ্ট ঘোষালকে দিয়ে খবর পাঠালেন—যা দিচ্ছি তার দুনো পর্যন্ত যেতে রাজী আছি। তার বেশী নয়।

কি যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা—পুরোনো জমিদারী রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। বড়তরফ ছুটল উকিলের কাছে পরামর্শ চাইতে। সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বাঁকা পথেই টেনে বার করতে হবে। অনেক পয়সা মিত্তিরদের কাছ থেকে খেয়েছেন দত্ত মশাই, দুঁদে উকিল। কাগজপত্র সব দেখে-শুনে অনেক নথিপত্র ঘেঁটে পরামর্শ দিলেন ইজেকটমেণ্ট স্যুট ঠুকে দাও। বাছাধন তখন আর পালানোর পথ পাবে না। শুড় শুড় করে এসে যা চাইবে তাই দিয়ে আপোষে মিটিয়ে নেবে।

মিত্তিরদের সমস্ত সম্পত্তির নাড়ি-নক্ষত্র উকিলের নখের ডগায়। ধর্মতলার এই সম্পত্তির জমির বন্দোবস্ত তো তারই হাত দিয়ে হয়েছে। ফলে অসুবিধা আর কি।

[illegible] কপি পেয়ে রমণী সাহা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ কি সর্বনেশে কথা! রমণী নাকি মিত্তিরদের বড় তরফের [illegible] নিশানা বাঁধা চিহ্নিত দেয়াল ভেঙ্গে নিয়েছে অন্যায়ভাবে। দেয়াল একটা ছিল ঠিকই। দুটো প্লটের মাঝ বরাবর বাউণ্ডারী ওয়াল। রমণীই বড়কর্তা বেঁচে থাকতে তাঁর পরামর্শ নিয়ে তুলেছিলেন। গাড়ীর ব্যবসা। সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। চোর-ছ্যাঁচড়ের অভাব নেই দেশে। একটা খোয়া গেলে ডেমারেজ দিতে জান কাহিল হয়ে যাবে। তাই সাবধান হওয়ার জন্য এই পাঁচিল।

৮ ফিট উঁচু এবং প্রায় শ দেড়েক ফিট লম্বা এই দেয়ালটা এক ইটের, সমস্ত খরচ-খরচা রমণীর। নতুন প্লটটা পুরোনো প্লটের লাগোয়া। মাঝে একটা ছোটখাট কাঠা পাঁচেকের পুকুরও আছে। গাড়িগুলো ঘোরাফেরা করা যাবে। কিন্তু নতুন প্লটের কোন এনট্রানস নেই। তাই পাঁচিলটার আট ফিট রাজমিস্ত্রী দিয়ে কাটিয়ে নিয়েছেন গাড়ি আসা-যাওয়ার জন্যে। ভাবতেও পারেন নি যে এই নিয়ে কোনদিন মামলা-মোকদ্দমা হবে। দত্ত মশাই ঝানু উকিল। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।

রাতারাতি রাজমিস্ত্রী ডেকে রমণী ভাঙ্গা পাঁচিলের গা ঘেঁষে বেরনো ইটের দাঁতগুলো ভালভাবে প্লাস্টার করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর উকিল পাল্টা আবেদন পেশ করলেন—এই পাঁচিল প্যাসেজ সমেত তেইশ বছর আগে মিত্তিরদের বড়-কর্তার কাছ থেকে লিজ নেওয়া হয়েছিল, ফলে কোথাও কোন আইনভঙ্গের কারণ ঘটে নি।

মামলা যখন পাঁচিল আর পাঁচিলের গায়ে প্যাসেজ নিয়ে তখন আগে ফয়সালা হওয়া দরকার পাঁচিলটা লিজ নেওয়ার সময় আদৌ ছিল কি? কাগজপত্রে দেখা গেল পাঁচিলের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্যাসেজের কোন কথা নেই। দত্ত মশাই হিয়ারিং-এর সময় বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন—ধর্মাবতার, পাঁচিল যে ছিল তার অকাট্য প্রমাণ দলিল। প্যাসেজ এরা অন্যায়ভাবে করেছে। রমণীর উকিলও সমান তেজে পাল্লা দিয়ে চললেন— মি লর্ড। পাঁচিল ছিল, প্যাসেজও ছিল। একথা ল্যাণ্ডলর্ড আজ অস্বীকার করছেন, এটা নিঃসন্দেহে ব্রীচ অব কনট্রাক্ট। বিচারকমশাই দু পার্টির বক্তব্য শোনার পর বললেন, আগে পাঁচিলটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার পাঁচিল যত পুরোনো প্যাসেজও তত পুরোনো কি না? কোর্ট থেকে এই পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হল একজন ইনজিনিয়ার কমিশনারকে।

'এই এক আজব চিড়িয়া বোঝলা নি ঘোষাল'—রমণী পায়ের ওপর পা তুলে বুড়ো আঙুলটা মটকাতে মটকাতে পুরোনো কর্মচারীর দিকে আড়চোখে তাকান। মৃদু ঘাড় নেড়ে সায় জানায় চারশো টাকা মাস মাইনের অ্যাকাউনটেণ্ট ঘোষাল। মালিকের ক্যাশের হিসাব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সাহা মশায়ের ব্যবসায়ের অন্ধি-সন্ধি, গোপন ফন্দি সবই তার জানা। রোজ সন্ধেবেলায় রমণী সাহা ঘণ্টাখানেকের জন্য গ্যারেজে আসেন। দিন-মানে সময় হয় না। অন্যত্র শো-রুম। সেখানেই বসেন সারাদিন। পুরোনো গাড়ি রংচং করে চড়া দামে বেচা-কেনা করেন। গ্যারেজ দেখাশোনার ভার ছোট দু ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে রমণীর নজর সব দিকে। নজর না রেখে উপায়ও নেই, কারণ আজ টাকা হয়েছে, ভাইরা যদি এখন পাখনা মেলে উড়তে চায় তাহলেই তো বিপদ। তাই সন্ধ্যেবেলায় নিজে এসে এক-বার ঢুঁ মেরে যান। পুরোনো কর্মচারী ঘোষাল বিশ্বস্ত লোক। কাগজপত্র দেখা-শোনার ফাঁকে ফাঁকে গল্প-গাছাও চলে।

'এনকোয়ারী করনের লাইগ্যা নির্ঘাৎ চৌর্ষট্টি টাকা কইর‍্যা গরমেন্ট থিক্যা পাইব তবু খাই ম্যাটে না'—গজ-গজ করেন রমণী।

কার কথা কন কর্তা?—ঘোষাল শুধায়।

'কার কথা আবার, ঐ কমিশনারের। একরাশ টাকা দুইয়া নিল। না দিয়াও উপায় নাই। আমি না দিলে ঐ পক্ষের টাকা খাইয়া একখান উল্টা রিপোর্ট দিলেই তো বেবাক ব্যবসা গুটাইতে হইত।' চাপা আক্রোশের ঝাল চিড়বিড় করে ওঠে রমণীর বাক্যস্রোতে। রাগের কারণটাও নেহাৎ সামান্য নয়।

জমি-বাড়ি সংক্রান্ত মামলায় কোর্ট থেকেই ইনজিনিয়ার কমিশনার অ্যাপয়েণ্ট করা হয়। কমিশনার হিসাবে কোর্টের খাতায় নাম ওঠাতে গেলে নিদেন-পক্ষে গ্র্যাজুয়েট ইনজিনিয়ার হওয়া চাই। নাম এনরোল করালেই মামলা জুটবে তার কোন মানে নেই। অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকলে হয়তো পাঁচ বছরেও একটি কেসও জুটবে না। কিন্তু ধনঞ্জয় সেয়ানা ছেলে। জানে কত ধানে কত চাল। শ্বশুর ওকালতি করেন। তাঁরই সুবাদে কনট্রাকটরী ফার্মের চাকরীটা যাওয়ার পর এই কাজটা জুটিয়েছে। রমণী সাহার কেসটাও এসেছিল ওরই হাতে।

চারদিন গ্যারেজে গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে দেখেছে পাঁচিলটা পুরোনো। প্যাসেজের দু-পাশে পাঁচিলের গায়ে যে প্লাস্টারিং আছে তার কিছুটা অংশ ভেঙ্গে ভেতরটা খুঁজতে গিয়ে দেখে দেয়ালের মাঝ বরাবর পিলার ধরে আট ফুট জায়গার

ফাউনডেশন সমেত পাঁচিল উপড়ে ফেলা হয়েছে। তবে পিলারের গায়ে দাঁতের মত হাঁ করা ইটগুলো দেখে অনুমান করা কষ্ট নয় যে এখানে একদিন দেয়াল ছিল। পায়ারও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাঁচিল যে পুরোনো, দলিলে তার উল্লেখ খুবই স্পষ্ট। এখন প্যাসেজ যে ছিল না, করা হয়েছে, এ কটি কথা লিখে দিলেই মিস্ত্রিররা খুব সম্ভবত মামলায় জিতে যাবে, একথা ধনঞ্জয় জানে। কিন্তু তাতে ওর আখেরে কি লাভ হবে?

রোজ চৌষট্টি টাকা হিসাবে চারদিনের জন্য দুশো ছাপান্ন টাকা, ডেস্ক ওয়ার্ক বাবদ আর ধরা যাক চল্লিশটা টাকা। সেই সঙ্গে হিয়ারিং এর সময় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলে প্রতিদিনের জন্য বত্রিশ টাকা। হিসাব করে ধনঞ্জয় দেখল খুব বেশী হলে শ চারেক টাকা বড়জোর পাবে। অথচ মা, বৌ, ছোট দুটি অবিবাহিত বোন আর টুকুন, বুকুন মেয়ে দুটি নিয়ে সাতজনের সংসারের জন্য মাস গেলে খরচ কম করেও ছশ টাকা। আবার কবে হাতে কেস আসবে কে জানি?

শাস্ত্রেই তো বলেছে অপ্রিয় সত্য কখনো বলবে না। যে সত্য নিজের পক্ষে অপ্রিয় তা লিখে কেন আয়ের পথ বন্ধ করবে ধনঞ্জয়। তাছাড়া শুধু সংসার খরচ তো নয়, অন্য বাবুরাও কিছু আশা করেন। খাঁটি রিপোর্ট দিলে তাঁদের খাই মেটানোর পয়সা আসবে কোথ্ থেকে। আজকাল কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে তবু এই নিয়েই কাটাতে হয় জীবন। ধনঞ্জয়ও কাটাচ্ছে। এন-কোয়ারীর সময়ই ধনঞ্জয় সাহা মশাইকে হিন্টস দিয়ে এসেছিল।

দত্ত উকিলও ঝান্ডু লোক। সেও লোক পাঠিয়েছে। তবে মিস্ত্রিদের এখন পড়তি অবস্থা। দেওয়া থোওয়ার ক্ষমতা বিশেষ নেই। তবু মিলিয়ে ঝুলিয়ে হাজার খানেক টাকা দেবে বলেছে। ধনঞ্জয় রমণী সাহার কানে শুধু ঐ কথাটুকুই তুলে দিয়েছিল। ব্যস তাতেই কেল্লা ফতে।

গলিতে ঢোকে না এতবড় একটা মার্কিণী গাড়ী চড়ে রমণী এসে হাজির ধনঞ্জয়ের বাসায়। সঙ্গে একটুকরী ফল, দুটো দশ কে-জি ওজনের পোনা আর কিছু মিষ্টি। সেই সঙ্গে রমণী সাহার মিষ্টি কথার প্যাঁচাল—'আপনিও পূর্ব-বঙ্গের আমরাও পূর্ববঙ্গের। এক দ্যাশের লোক। বিপদে নিজেরা নিজেদের না দ্যাখলে, দ্যাখবে কেডা?'

কথার প্যাঁচে আসল কথাটা সাহা মশাই চাপা দিতে চাইছেন; ধনঞ্জয় হুঁসিয়ার। মোলায়েম গলাটা মিহি করে বলল—নতুন প্লটেও দু বিঘা জমি আছে। গ্যারেজটা ওখানেই সিফট করে নিন না। কারণ আমি যা দেখেছি তাতে প্যাসেজ যে খুব পুরোনো তা তো মনে হয় না।

নিমেষে ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ চলকে উঠল রমণীর চোখে। মিনিটখানেক সব চুপচাপ। তারপর মুখ খুললেন রমণী। শুরু হয়ে গেল দরাদরি। বছরে কম করেও আড়াই লাখ টাকা যে গ্যারেজ থেকে আসে তার জন্য জান কবুল করতেও প্রস্তুত রমণী। তবে টাকাটা জানের চেয়েও দামী কি না। তাই যতটা টেনেটুনে পারা যায়। দেড় হাজার দর হাঁকিলেন সাহা মশাই শুধু ঐ কটি কথার জন্য—পাঁচিল ও প্যাসেজ দুটিই সমসাময়িক। মিষ্টি হেসে তার সমস্ত কমিটমেন্টের ফিরিস্তি বুঝিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে বলল—দশ হাজারের এক পয়সাও কম না।

'হ্যাসে (শেষে) পাঁচ হাজারে রফা হইল, বোঝলা ঘোষাল'—খড়কে কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে রমণী বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কথাগুলো বলেন। 'টাকা যায় যাউক। এবার দেখি কোন হালায় গ্যারাজ তোলে। দেখুম দত্ত উকিলের খ্যামতা কতখানি। তেল ত্যালানি বড় বাড়সে। আমাগো তুইল্যা দিব—দিউক। ভালোয় ভালোয় ডবল ভাড়া কবুল করলাম, তবু বাবুগো মন ওঠে না। ভাড়া চাইরগুণ বাড়াইতে কয়। কাঁচকলা দিমু। যা পারে করুক।' রমণী সাহা এবার হাসলেন।

তেইশ বছরে পঁচাত্তর টাকা থেকে ইনক্রিমেন্ট পেয়ে পেয়ে যে আজ চারশোয় পোঁছেছে, কর্তার কথায় সায় দেওয়া ছাড়া তার আর করার আছে কি? তবু কোথায় জানি খচ-খচ করে ঘোষালের। একদিন এই মিস্ত্রিদের পায়ে মাথা খুঁড়েই এই ব্যবসার পত্তন হয়েছিল আজ তাদেরই নাকের ডগায় ছড়ি ঘোরাচ্ছেন সাহা মশাই। ভয় হয় মনে, টাকার গরম থাকে না বেশীদিন। যেমন মিস্ত্রিদের আজ নেই। তেমনি কে বলতে পারে সাহা মশাইয়ের অনন্তকাল এ কপাল থাকবে কি না? পাঁচ হাজার টাকায় আট ফিট বাই ছ ফিট—পাঁচ ইঞ্চি প্যাসেজ কেমন পাকাপোক্তভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে গোড়া থেকেই ছিল। অবাক লাগে ঘোষালের। আরো অবাক লাগে এই ভেবে যে ইনজিনিয়ার সাহেবের বয়স বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ। খানদানী ভদ্র পরিবারের ছেলে। টাকার গুঁতোয় খানদান, ন্যায়-অন্যায় বেবাক ভুলে গিয়ে জলজ্যান্ত সত্যটাকে কেমন মিথ্যে করে ছেড়ে দিলেন। বিশ্বাস কাউকে করা যায় না। ঠকাতে পারলে কেউ ছাড়ে না।

ঘোষাল অবাক হলেও ব্যাপারটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। হরেক কিসিমের চিড়িয়ার ভরা এই শহর। কখন কোন তালে যে তারা আপনার আমার পকেট সাফ করে দেবে কে জানে। তাই আগ-ভাগে সাবধান হওয়ার জন্য দেয়াল ভাঙা দুটো-একটা অঙ্ক শিখে রাখলে ক্ষতি কি?

—সন্ধিৎসু

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ আর প্রাইভেট রোড ধরে বেশ কিছুটা হাঁটলে তারপর প্রধান ফটক। দারোয়ান আছে সেখানে। রাত বারোটায় গেট বন্ধ হয়ে গেলে বাইরের কারুর কেল্লা এলাকায় প্রবেশের কোন উপায় থাকে না। অবশ্য কারুর ইচ্ছে কোন কারণে প্রবল হলে ওই পশ্চিম সীমান্তে গঙ্গার দহ পেরিয়ে আসা সম্ভব। এ শীতে সে সাধ কারো থাকলেও সম্বরণ করা ভালো।

।। চার ।।
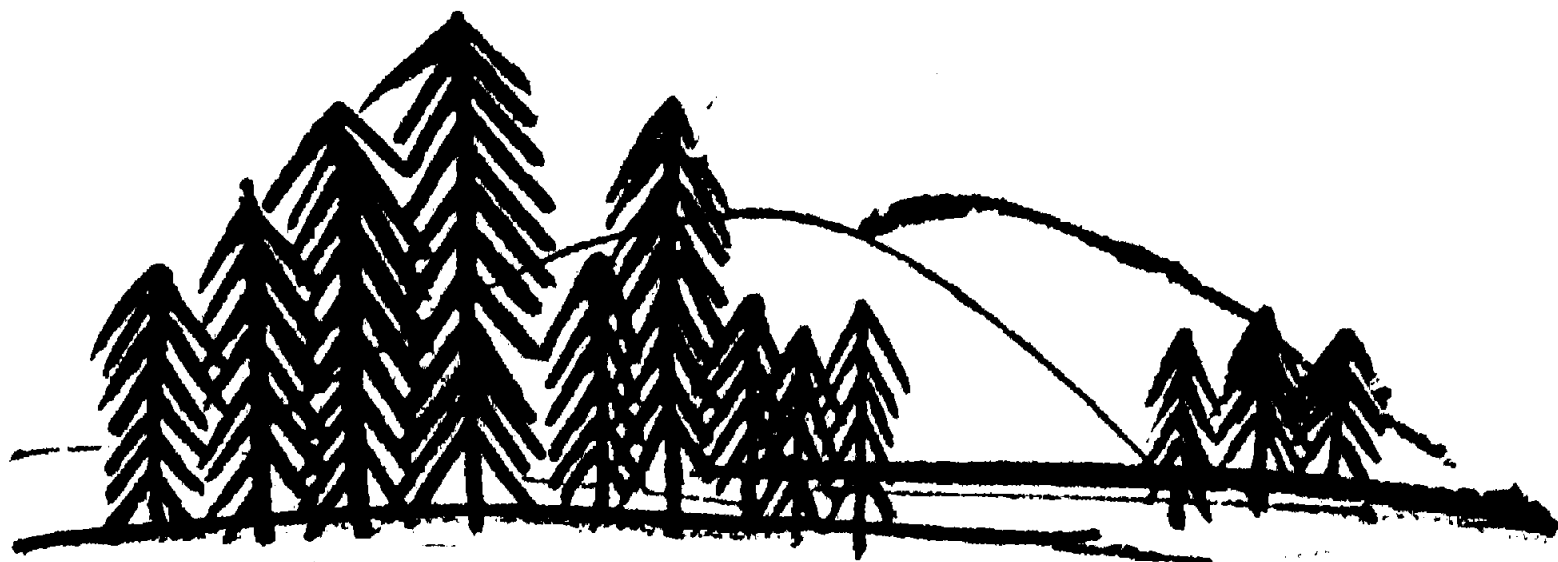
হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। শোবার সময় অ্যাসপিরিন জাতীয় একটা ট্যাবলেট খেয়েছিল স্বাতী। তাতেও কাজ হয়নি। ঘুম আসছিল না তার। নড়াচড়া করলে ব্যথাটা আরও টের পাচ্ছিল। ফলে সে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। চোখ দুটো বোজা। মাথার কাছের টেবিলে অর্ধভুক্ত খাবারের থালা। মানদা কখন চলে গেছে নিজের বাড়ি। ম্যানেজার লোকটি এমন ভদ্র, বলছিল—আমি নিজেই নিয়ে যাব'খন, ভাববেন না। স্বাতী এ'টো থালা তাকে ছুঁতে দেয়নি। চাকরবাকরগুলো সবাই সকাল সকাল বাড়ি পালিয়েছে আজ। ভীষণ ঠান্ডা, তার ওপর অন্ধকার। বাবুর্চি নীচের ঘরে খিল এ'টে শুয়ে পড়েছে। হোটেলটা জনবিরল কেল্লাবাড়ির সুবিস্তীর্ণ চৌহদ্দীতে। সেকারণে এমনিতেই সন্ধ্যার পর স্তব্ধ আর নিরিবিলি হয়ে পড়ে।

মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা আছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে আধুনিক কায়দায় জীবনযাত্রার প্রায় সবরকম উপকরণ প্যালেস হোটেলে রয়েছে। স্বাতী হঠাৎ চমকে উঠল। মাথার কাছে যেন খুটখুট কী শব্দ হচ্ছিল। অভ্যাসবশে সে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল টেবিল ল্যাম্পের। বাঃ! ইলেকট্রির চালু হয়েছে কখন! ঢাকনার নীচে থালা আর জলের গ্লাসের ওপর আলো পড়েছে। বিড়াল সম্ভবত। পরক্ষণে তার

মনে হল, বিড়াল আসবে কোন্ পথে? দরজা বন্ধ।

অবশ্য প্রকাণ্ড জানালাটা মাথার দিকে খোলা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সে। তাইতেই শীত লাগছে! কিন্তু এটা স্বাতীর অভ্যাস। জানালা বন্ধ করে সে ঘুমোতে পারে না।

সামান্য কাত হয়ে সে কয়েক মুহূর্ত জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল। বাইরে ঠাসা অন্ধকার। গাছপালা আছে উত্তরে। তাই আকাশ দেখা অসম্ভব। কিন্তু ও পথে বিড়াল আসতে পারে না। নীচে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। তবে কি কানের ভুল? সম্ভবত তাই। আসলে আজ সন্ধ্যার পর ইরা বোসের এক গাছা চুল কাটা গেছে—এ ঘটনাটা কিছু ভৌতিক তাৎপর্য পেয়ে গেছে তার অবচেতনায়। স্বাতী ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না। সে ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছে তখন থেকে। শেষে ধরে নিয়েছে, ইরা চালাকি করে এ ঘরে শুতে চায় আসলে। দীপেন বোস আজ ফিরছে না, সে জানে। বিদেশে এমন একটা পরিবেশে একা ঘরে ঘুমোবার সাহস তার নেই বলেই এই চালাকিটুকু করেছে ইরা। চুল যতটুকু কাটা গেছে, গুনলে বড়জোর পাঁচটা কি ছটা হবে—তার বেশি তো নয়ই। ও চুলের জন্যে ইরা বোসের মাথার সৌন্দর্য একটুও হানি হবে না। বোঝাই যায় না যে চুল কাটা গেছে। যত্তসব।

তবু মনটা কেমন ছমছম করে সেই থেকে। কল্পনার টুথব্রাশ, তার জুতো... শুধু কি নিতান্ত রসিকতা? সাহসের চেষ্টা সত্ত্বেও বুক টিপটিপ করে উঠল স্বাতীর। আচমকা হাত বাড়িয়ে নিজের ববছাঁট চুলগুলো ছুঁল সে। তারপর আশ্বস্ত হয়ে ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে পাতা কল্পনার খাটটার দিকে তাকাল। কম্বল মুড়ি দিয়ে ওরা ঘুমোচ্ছে। ইরা বোস আর কল্পনা। দুটো মাথা ডুবে আছে কম্বলের নীচে। কী ভয়!

কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল ফের। এখানে বেড়াতে আসার পর যা যা ঘটেছে, মনে ভেসে উঠল একের পর এক। দিব্যেন্দু আর কল্পনা তার মনের ভিতর খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিতে থাকল বারবার। দুটো পোকার মত ওরা তার মগজটা কুরে খাচ্ছিল অজানতে। ঘুণপোকার দাঁতের শব্দ এবার স্পষ্টতর হচ্ছে তার অস্তিত্বের গভীরে। অসহ্য! দাঁতে দাঁত চাপল সে।

বিভাসের ঘুম আসছিল না। স্বাতীর কথা ভাবছিল সে। এত বড় একটা ঘর একা নিয়েছে বিভাস। আজ যেন ঘরটা প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করে তাকে গিলে খেতে চাইছে। এক অভাবিত অগাধ শূন্যতা থমথম করছে তার চারপাশে। নিজের ভবঘুরে জীবনে আর এমনি করে কোনদিন কিছু আশা করে বসেনি সে। আজ যাদুকরী আশা তার ভ্রমণ বা পর্যটনের সব সুখে আগুন জেলেছে। একটুখানি সাহসের দরকার শুধু। সব কিছু হয়ত প্রস্তুত—স্বাতী নামক বিপুল আয়োজন সামনে, সে হাত বাড়িয়ে সাহসের কাঁচি চালিয়ে দ্বিধাসংকোচের ফিতেটা কাটলেই শুভ উদ্বোধন।

অন্ধকার মেঝেয় বন্ধ ঘরে পায়চারী শুরু করল সে। নিজের অলক্ষ্যে গুন গুন করে তার নতুন গানটা গাইতে থাকল। গানটা বানিয়েছে শুভ। ভারি সুন্দর কথা আসে ওর মাথায়। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলো উপহার দিয়েছিল সে।

...আমরা সবাই এসেছিলাম হারিয়ে যাবার খেলায়...

কিন্তু হারিয়ে যাবার খেলা কেন? এ তো পৌঁছে যাবার পাড়ি অন্ধকারের ভেলায় ভেসে। আস্তে আস্তে জানালা খুলে দিল সে। একটু ঝুঁকল। খুবই অকারণে সে অন্ধকার বাগানটা একবার দেখে নিতে গেল। তারপর চমকাল।

এইমাত্র নীচে দপ করে আলো জ্বলেই নিভে গেছে। দেশলাই জেলে কে সিগ্রেট ধরাল। মুখটা খুবই পরিচিত বিভাসের। এত রাত্রে ওখানে কী করছে ও? ঘড়ি দেখল বিভাস। বারোটা পাঁচ।

বিভাস একটু হাসল। খেয়ালী মানুষ! অন্ধকার বাগানে দাঁড়িয়ে হয়ত রাত্রির রূপ দেখছে। চমকে দিলে জোর তামাসা জমে যায়। বিভাস সাবধানে দরজা খুলল। থামওয়ালা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে—চীনা মিত্রর ঘরের পাশেই সরু একফালি ঘুরন্ত সিঁড়ি। দরজায় তালা নেই তো?

পা টিপে টিপে সে বেরুল। কপা যেতেই পিছন থেকে মেয়েলী বাজখাই ডাক—কে, কে যাচ্ছে? ...বাপস্। সূর্পনখা ব্যানার্জি যে! থামের আড়ালে লুকোল বিভাস।

অধ্যাপকগিন্নি বেরিয়েছেন এত রাত্রে! কী ব্যাপার কে জানে! কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পা বাড়াল বিভাস। চীনা মিত্রর ঘরে আলো জ্বলছে। কপাটের ফাঁকে আলোর ইসারা। তাহলে কি ইলেকট্রির চালু হয়েছে এতক্ষণে? ম্যানেজার হয়ত ঘুমোচ্ছে। তাই বারান্দায় বা সদর পথের সিঁড়িতে আলোগুলো জ্বালেনি প্রথামত। বিভাস ভাবল, ফিরে এসে ম্যানেজারকে ডেকে ওঠাবে। আলোগুলো জেলে দিতে বলবে।

চীনা মিত্রর ঘরের সামনে একটা জানালা আছে। খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রাখল সে। অবাক হল। পাগলের মত করছে কী মেয়েটা? বাকসোপত্র সব ওলটপালট করেছে—বিছানা ওলটানো—ঘরের সব কিছু তছনছ। চুলে হাত বোলাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। সম্ভবত এলোপাথাড়ি কী খুঁজেছিল—না পেয়ে স্তম্ভিত। কী হারিয়েছে চীনা মিত্র?

আর্টিস্টের কারবার! বিভাস মনে মনে হাসল। ইজেলে অসমাপ্ত ছবি—তার ওপর আলো পড়েছে টেবিল ল্যাম্পের। ছবিটা চেষ্টা করেও বোঝা গেল না। এলোমেলো সব রেখা আর চাপ চাপ রঙ। নাকি এই তছনছ ঘরটাকে মডেল করে কিছু আঁকতে চায় চীনা মিত্র? একটা ধ্বংসের ছবি?

পা টিপে টিপে বিভাস ছোট্ট দরজাটার সামনে গেল। এ পথে কেউ নামে না নীচে। নীচে বাগান। হয়ত কোন সময় নামবার দরকার হত। বাগানটা তখন সাজানো-গোছানো সুন্দর ছিল। এখন জঙ্গল হয়ে গেছে।

দরজায় তালা নেই। একটা হুড়কো ঠাসা আছে মাত্র। সেটা খুলে বেরিয়ে পড়ল সে। সিঁড়িটা লোহার। কোনরকমে একজন নামা চলে। বিকেলের বৃষ্টিতে বেশ পিছল হয়ে রয়েছে।

নীচে ঘাসের জঙ্গল গজিয়েছে। হুড়মুড় করে পেরিয়ে ফাঁকায় পৌঁছল সে। কিছু দেখা যায় না অন্ধকারে। থমকে দাঁড়াল সে। জ্বলন্ত সিগ্রেটটা কোথায় গেল? শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার—আর প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। হাড় অব্দি নড়ে যাচ্ছে। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হল তার। কী বদখেয়ালে এ ছেলেমানুষী করতে এল সে? কোনদিকে পা বাড়াতে সাহস হচ্ছে না। কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলবে।

বিভাস নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইল। না পারছে এগোতে, না পিছোতে। সেই সিঁড়িটাও অনুমান করতে পারছে না। সদর পথে পৌঁছতে গেলে কাঁটাতারের বেড়া পেরতে হবে। কিন্তু সেটাই বা কোনদিকে কে জানে! যাকে দেখে নেমে এসেছে, তাকে ডাকতেও সাহস হচ্ছে না। ওপরে বা নীচের ঘরে কেউ জেগে থাকলে কী ভেবে বসবে না জানি! রাগে ক্ষোভে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিচ্ছিল সে।

নীচের ত্রিকোণ বারান্দায় রিসেপসন টেবিল। রাতের দিকে টেবিল অর্থাৎ আপিসটা পাশের ঘরে ঢুকে যায়, দিনে

বেরিয়ে আসে। ও ঘরে সুরঞ্জন থাকে। তার পাশেরটায় দারোয়ান। অবশ্য বারান্দায় একটা খাটিয়ে আছে। ওটা দারোয়ানের লোকদেখানো কারবার। আজ যা শীত পড়েছে, তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বেচারা মানুষ তো বটে!

সুমসাম নির্জন নীচের তলা। জন-প্রাণীটি নেই। কী বিচিত্র ব্যবস্থা এদের! এ সময় যদি চোরডাকাত ঢুকে বোর্ডারদের সর্বস্বান্ত করে যায়, কারো মাথাব্যথা নেই। অধ্যাপক দেবতোষ ব্যানার্জি আগাগোড়া পশমী পোশাকে ঢেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট, পরনে ধুতি, পায়ে হাঁটু অব্দি মোজা আর পাম্পসু। রবারের সোল বলে কোন শব্দ হচ্ছিল না চলাফেরায়। সুদেষ্ণা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওঁকে না দেখতে পেলেই অবশ্য হইচই লাগবার কথা। লাগুক। অত আদিখ্যেতা আর সয় না দেবতোষের। সারাজীবন ধরে এই মহিলা তাঁকে জ্বালিয়ে আসছেন। জীবনে কত কী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—কোনটাই মেটেনি। এ সব কিছু ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সুদেষ্ণা। সবতাতেই তার নাকগলানো অভ্যাস। পুরাতনের বিচিত্র বিষয়ে থিসিস লেখবার চেষ্টা করছেন কতদিন থেকে। তার জন্য কত জায়গায় যাওয়া দরকার—কত কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা হাতেকলমে করা দরকার। সুদেষ্ণা তাকে স্বামীর কোন গূঢ় অভিসন্ধি ধরে নিয়ে আবোলতাবোল অভিযোগে মাথা খারাপ করে দেন। এত অবিশ্বাস আর সন্দেহ কেন সুদেষ্ণার? বয়স হয়েছে—তা সত্ত্বেও...ধুৎ!

মনের ভিতর চাপা ক্ষোভ নিয়ে মানুষ কতদিন ঠিক থাকতে পারে লক্ষ্যের পথে? দেবতোষ বারান্দা থেকে নীচের লনে নামলেন। নামবার সময় সুদেষ্ণার কথা ফের ভাবলেন। জাগে তো জাগুক, পারা যায় না আর।

সবখানে অন্ধকার। অন্ধকার দরকারও। কিছুক্ষণ অন্ধকার থাক আরো। ফিরে এসে সুরঞ্জনকে জাগিয়ে দেবেন। ইলেকট্রির চালু হয়েছে। হোটেলের যে আলোগুলো সারারাত জ্বলে, জ্বালিয়ে দিতে বলবেন। আপাতত অন্ধকার থাক সব।

ফটক পেরিয়ে সোজা হেঁটে গঙ্গার ধারে গেলেন দেবতোষ। বাঁধানো ঘাটের কাছে, মণ্ডপটার নীচে তাঁকে পৌঁছতে হবে। পকেটে টর্চ আছে। হাত পুরে টর্চটা বের করলেন। দাঁতে দাঁত চেপে, উত্তেজনায় অধীর দেবতোষ পা বাড়ালেন মণ্ডপটার দিকে।

ওখানে একটু ঘুরে মসজিদের পিছন দিয়ে গেলে অর কারো চোখে পড়বে না।...

স্বাতী দেখল, হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। ফের কারেণ্ট ফেল! কোন মানে হয় বালিশের নীচে থেকে অ্যাসপিরিনের বড়িটা নিল সে। উঁচু হয়ে জলের গ্লাস নিল। অন্ধকারেই খেয়ে নিল বড়িটা। যন্ত্রণা কেন এত! হাড়ে চোট লেগেছে সম্ভবত। কালই কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।...

সেই সময় বাইরে কে কাকে ডাকল যেন। কোথাও সামান্য শব্দ হল কিসের। ফের সব চুপচাপ।...

পাশ ফিরে শুল স্বাতী। কেন এখানে বেড়াতে এসেছিল! কী পেতে চেয়েছিল? ভাবতে ভাবতে ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল চোখের পাতা। হঠাৎ ফের অস্পষ্ট শব্দ। দরজার দিকে। স্বাতী অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে!

দিব্যেন্দুর হাসি শোনা গেল।... আমি। ঘুমোওনি দেখছি!

স্বাতী উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, দরজা খোলা ছিল নাকি?

তাইতো দেখছি। বলে দিব্যেন্দু তার বিছানায় এসে বসল।

খোলা ছিল? স্বাতী অবাক।... বঃ! কল্পনা যে দরজা বন্ধ করল তখন...কী আশ্চর্য! তোমার কাছে দেশলাই আছে?

না। এনে দিচ্ছি।

দিব্যেন্দু উঠতে যাচ্ছিল, স্বাতী তাকে নিবৃত্ত করে বলল, আনছ। কিন্তু এত রাতে কী ব্যাপার তোমার?

দিব্যেন্দু চাপা গলায় বলল, শুভ বিছানায় নেই।

তাকে খুঁজতে বেরিয়েছ? কিন্তু এ ঘরে সে আসবে কেন?

দিব্যেন্দু চুপ করে থাকল।

বলছ না যে? স্বাতী ধমকের সুরে বলল।... এ ঘরে তাকে খুঁজতে এসেছ? চালাকি কোরো না।

চালাকি? কী বলছ স্বাতী? বিশ্বাস করো, শুভ নেই।

বাইরে কোথাও বেরিয়েছে তাহলে। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছে।

নাঃ। বাইরে গিয়েছিলাম এইমাত্র। তার নাম ধরে ডাকলাম—সাড়া পেলাম না। তাছাড়া বাইরে কী প্রচণ্ড শীত, কল্পনা করতে পারবে না। এর মধ্যে শুভ বেরোবে কোন সাহসে? এত ভীতু আর গোবেচারা ও।

নীরেন কী করছে? বলেছ তাকে?

বলেছি। হয়ত কানে যায়নি—বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বিভাসবাবুর ঘরে যাও। সেখানে পেয়ে যাবে।

গিয়েছিলাম। বিভাসবাবুও ঘরে নেই।

সে কি!... স্বাতী চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বলল, দীপকবাবু ফিরেছেন জানো?

না। দরজায় তালা ঝুলছে। তাঁকে ডাকতে গিয়েই টের পেলাম। তারপর মনে পড়ল, ওঁর স্ত্রী তোমাদের ঘরেই রাত কাটাবেন বলেছিলেন......দিব্যেন্দু গলাটা খাটো করল, এখানেই আছেন নাকি?

আছেন কল্পনার পাশে।

দিব্যেন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, ভীষণ ঘুম তো! এতক্ষণ কথা বলছি, ঘুমের আবেশ কাটে না। বাপ্‌সে! এইসব মেয়েদের বাইরে আসা উচিত নয়। একটা বিপদ আপদ হলে......

স্বাতী ওকে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, ঘরে যাও তো। আপদ বিপদ কিছু হয়নি। কী যে জল্পনা করো সব।

দিব্যেন্দু যেন ঘাবড়ে গেল।... যা রে! দরজা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছ, জানিয়ে দিয়ে যাওয়া খুব অপরাধ হল দেখছি!

স্বাতী বলল, সেজন্যে তুমি আসোনি।

ফের আজেবাজে কথা!

যে জন্যে এসেছ, তা আজ অন্তত সম্ভব নয়—তা বুঝতেই পারছ।

স্বাতীর নির্বিকার কণ্ঠস্বর। দিব্যেন্দু ওর মুখে হাত দিতে চাইল।... আঃ ছি, কী হচ্ছে! ওর শুনতে পাবে যে। এত বিশ্রী কথা বলতে তোমার আটকায় না স্বাতী?

স্বাতী হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠল।...... যাও, বেরোও। দরজা আটকাবো। কী ভূতের দেশে আসা গেছে। যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালেই ফিরছি। জেনে রেখো।

দিবোন্দু বেরিয়ে গেল। বোঝা যায়, ভীষণ রেগেছে। রাগুক। দরজা আটকে স্বাতী কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ঘরের মধ্যিখানে। তারপর বিছানার কাছে সাবধানে এগিয়ে ডাকল, বউদি! এই ইরাদি!

ইরার সাড়া পাওয়া গেল। চাপা হাসির ঝংকার আছে কণ্ঠস্বরে।...জেগে আছি। সব শুনেছি। কান খোলা—আমায় দোষ দেবেন না কিন্তু।

স্বাতী বলল, কল্পনাকে ডাকুন তো।

ইরা জবাব দিল, ওর কথাই তো ভাবছি কতক্ষণ থেকে। জেগে থাকতে বলে কখন বেরিয়েছে। এখনও এল না।

বেরিয়েছে মানে? স্বাতী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।...কী বলে বেরিয়েছে?

কিছু বলে তো যায় নি। ইরা নির্বিকার জানাল।... এক্ষুনি আসছি বলে গেল তো গেলই। ভাবলাম, পাশের ঘরে দিবোন্দুবাবুদের কাছে আড্ডা দিতে গেল। তারপর দিবোন্দুবাবু এল দেখলাম। বোঝা গেল, ও ঘরে যায় নি। তাহলে...

স্বাতী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তাহলে কী ইরাদি?

ইরা হাসছিল খিক খিক করে।... অনুমান করে নিন। শুভবাবু নেই ঘরে, তাও শুনলেন! যান, শুয়ে পড়ুন। দরজা খোলা থাক। ঘরের স্ক্যাণ্ডাল নিজে থেকে ছড়িয়ে লাভ কী বলুন?

স্বাতী নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোচ্ছে দেখে ইরা চেঁচিয়ে উঠল, আরে, আরে! আপনিও বেরোচ্ছেন নাকি? কী বিপদ এখন আমি কী করি, বলুন তো? মা গো! এ ভুতুড়ে হোটেলে কী সব কাণ্ড চলেছে রাতদুপুরে। স্বাতী, এই স্বাতী!

উঠে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে দরজাটা ভিতর থেকে আটকে দিল ইরা। তারপর বিছানা লক্ষ্য করে দৌড়ে এল। কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল।......

নীরেন দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে ভয় পেয়ে জেগে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর একটু কাশল। গলা শুকিয়ে গেছে। সে মাথার পাশে হাতড়াতে থাকল। টর্চটা কোথায় গেল? খুঁজে না পেয়ে দেশলাই জ্বালাল সে। নীচে পড়ে গেছে নাকি? পর পর চারটে কাঠি জ্বেলেও পাত্তা পেল না টর্চটার। তখন সে তাক্তবিরক্ত হয়ে উঠে বসল। জানালাগুলো বন্ধ। ঘরে শীত কম। প্রচুর ওম জমে আছে। সে খাট থেকে নেমে ফের দেশলাই জেলে টেবিলের দিকে এগোল। ল্যাম্পের সুইচ টিপে দেখল, এখনও কারেণ্ট নেই। ঘড় ঘড় করে উঠল সে, টর্চটা কে নিল? দিবোন্দু, দিবোন্দু! শুভ! এই শুয়োর!

কোন সাড়া নেই। টেবিল থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট নিল সে। সিগ্রেট বের করে জ্বালাল। তারপর তারই মৃদু ছটায় জলের গ্লাসটা নিয়ে এল। বিছানায় পা দুলিয়ে বসে জল খেল ঢকঢক করে। গ্লাসটা নীচে রেখে দিল। সিগ্রেট টানতে থাকল চুপচাপ।

কী বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দুই শুয়োর! কোন সাড়াশব্দ নেই একেবারে। নিজের ঘুম যখন ভেঙেছে, ওদের ঘুমোতে দেওয়া ঠিক নয়। নীরেন প্রথমে গেল শুভর বিছানায়। চাঁটি মারতেই, শুভর মাথা নয়, খাটের কিনারায় লাগল। ব্যথা পেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে গাল দিল সে। ঠোঁটে সিগ্রেট রেখে সে ডাকাতি কায়দায় দুহাত বাড়িয়ে শুভর শরীরটা ধরতে চাইল। পরক্ষণে অবাক হয়ে জানল, তার দুহাতে শুভর কম্বল মাত্র। শুভ বিছানায় নেই।

দিবোন্দুর বিছানায় গেল সে। তারপর জানল, দিবোন্দুও বিছানায় নেই।

রাগে ক্ষোভে অস্বস্তিতে ছন্নছাড়া হচ্ছিল নীরেন। দিবোন্দু তাহলে কল্পনার সঙ্গে... বাঃ, চমৎকার অভিসার! কিন্তু শুভ? স্বাতীর সঙ্গে? খুবই সম্ভব। এখানে আসার পর কোনটাই আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না তার।

দরজা খোলা। বারান্দায় অন্ধকার আর শীত। নীরেন প্রথমে গেল বিভাসের ঘরে। দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। চাপা স্বরে ডাকল সে, বিভাসবাবু, বিভাসবাবু!

পিছনে সুদেষ্ণার গলা শোনা গেল, কে, কে ওখানে?

এই রে! সুর্পনখার পাল্লায় পড়ে এবার হাজার কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণান্ত হবে। একটু জোরে ধাক্কা দিল সে দরজায়। আশ্চর্য, দরজাটা খুলে গেল যে। পিছনে সুদেষ্ণা গজগজ করছে—কী সব কাণ্ড চলেছে রাতদুপুরে। কে কোথা আসছে-যাচ্ছে, কী সব হচ্ছে! যত সব ভূত জুটেছে কোত্থেকে!

বিভাসবাবুর বিছানাও খালি। নীরেন তাজ্জব। গেল কোথায় সব? বেরিয়ে এসে সে থামের আড়ালে দাঁড়াল। কখন কী অবস্থায় ফেরে দেখা যাক। সকৌতুকে অপেক্ষা করতে থাকল সে।

ডাকাডাকিতে সুরঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। সারারাত টেবিল ল্যাম্প জ্বলে। তবে কি ফের কারেণ্ট ফেল করেছে? বাইরে অধ্যাপকের গলা শোনা যাচ্ছে। রেডিয়ম দেওয়া ঘড়ির কাঁটা লক্ষ্য করল সে। রাত্রি সওয়া দুটো। এত রাত্রে কেন ডাকাডাকি?

সুরঞ্জন বেরল।

দেবতোষের হাতে টর্চ।... কী ব্যাপার মশাই? সব একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আমার স্ত্রীর আলো ছাড়া ঘুম হয় না। ওদিকে জানালা খুলে দেখি, দিব্যি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় আলো জ্বলছে—কেয়াবাড়ির সবখানে জ্বলছে। আলো শুধু এখানেই নেই!

সুরঞ্জন ডাকল, বাহাদুর! বাহাদুর!

বাহাদুরের সাড়া পাওয়া গেল। অনেক আগে সে নিঃশব্দে বেরিয়েছে। দেবতোষ টের পেয়ে বললেন, আস্ত ভূত রে বাবা! টেরও পাইনি।

বাহাদুর হাসল মাত্র। তার হাতেও টর্চ।

সুরঞ্জন বলল, মেন সুইচটা দ্যাখো তো! ফিউজ হল নাকি।

বাহাদুর এগিয়ে গেল। তারপরই কিন্তু আলো জ্বলে উঠেছে। সিঁড়িতে উঠে সুরঞ্জন বলল, কে যেন সুইচ অফ করে রেখেছিল তাহলে। আশ্চর্য তো! সরি, ভেরি সরি, প্রফেসর ব্যানার্জি—এমন তো কখনও ঘটেনি।

দেবতোষ মৃদু হাসলেন।... কে রসিকতা করেছিল আর কী! যাকগে। বাঁচা গেল। উঃ অন্ধকার যে এমন অসহ্য হয়, জানতাম না মশাই।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেল। দেবতোষ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরঞ্জন গেল দীপেন বোসের দরজায়। ভদ্রলোক ফেরেন নি তাহলে। কিন্তু ওঁর স্ত্রী কোথায় গেলেন? সম্ভবত ওই মহিলাদের ঘরে। ফিরে আসছিল সুরঞ্জন। হঠাৎ চমকে উঠল। বিভাসবাবুর ঘর থেকে এত রাত্রে স্বাতী বেরিয়ে আসছে কেন? থামের আড়ালে সরে এল সে। স্বাতী ল্যাংচাচ্ছে। এমন চেহারা কেন?

নিজেদের ঘরের দরজায় স্বাতী ধাক্কা দিচ্ছিল। বেড়ে মজা চালাচ্ছে তো সব। সুরঞ্জন নিঃশব্দে সরে এল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। কিন্তু এ হোটেলের একটা ইজ্জত আছে তো! সুরঞ্জন ভাবতে ভাবতে নেমে এল নীচে।

(ক্রমশঃ)

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

আবেশ (অবসেশন)

(নয়)

বিনোদ বাসে ট্রামে উঠে জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে মুখ করে থাকে। ঘন-ঘন ঘাড় ফিরিয়ে ওঠানামার পথের দিকে তাকায়। প্যাসেঞ্জে বা পাদানিতে ভিড় জমবার আগেই নেমে পড়ে। ট্যাক্সি কিম্বা রিকসা চেপে বাকি পথটা পাড়ি দেবার চেষ্টা করে। পারতপক্ষে সিনেমা থিয়েটার দেখতে যায় না। গেলেও 'এক্সিট' লেখা বাইরে যাবার দরোজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশিরভাগ দিন আধ ঘন্টার মধ্যেই হল থেকে বেরিয়ে আসে। তখন অবস্থা শোচনীয়; নাড়ীর গতিবেগ বেড়ে গেছে, ঘন-ঘন নিশ্বাস বাড়ছে। চোখমুখ লাল।

শ্যামবাবু তিরিশ বছর ধরে কোলকাতার বড় রাস্তা ধরেই শুধু চলাফেরা করেন। কখনও কোনো গলিতে ঢোকেন না, ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে; পিছু হটা ছাড়া উপায় থাকে না।

রতন পাল চিঠি পোস্ট করতে বেয়ারাকে পাঠিয়ে, তার পেছন ছুটে যান। ঠিকানা ঠিক লেখা হয়েছে কিনা, স্ট্যাম্প ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা, বারবার দেখতে হয়। মাঝে মাঝে খাম খুলে চিঠিটাও আদ্যোপান্ত পড়তে হয়। জলের কল বন্ধ করার আগে অনেকবার খুলে দেখেন জল ঠিকমত পড়ছে কিনা। অনেকবার রতন পাল রাস্তা থেকে বাড়ী ফিরে আসেন, ড্রয়ারটা ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা দেখতে।

রসময় একলা রাস্তায় বের হতে পারে না। অন্তত দুজন বন্ধু দুপাশে থেকে তাকে পাহারা না দিলে তার পক্ষে হাঁটাচলা করা অসম্ভব। ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে গেলে আরো মুস্কিল হয়। বন্ধু দুজন দুপাশে বসে তার দু' হাত চেপে রাখলে তবে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত। তার ভয়, তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে পাশের লোকের পকেটে হাত চালিয়ে দেবে আর ধরা পড়ে যাবে। পকেটমার হিসেবে অভিনন্দিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার নেই। কিছুদিন হোল স্ত্রী বা পুত্রের সঙ্গে একঘরে থাকতে সে ভয় পাচ্ছে। গলা টিপে ওদের দম বন্ধ করে দেবার অদম্য ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে।

শংকরের মন সব সময়ই এক চিন্তাতে আচ্ছন্ন। মোড়ের মাথায় বিড়ির দোকানে এবার ক'জন লোক দেখবে? রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিড়ি কেনার অছিলায় সে একবার দোকান ঘুরে আসবেই। যদি এক, তিন, পাঁচ—এইরকম বেজোড় সংখ্যার লোক দেখে, তবে তার ঘুম হবে না। জোড় সংখ্যার লোক দেখলে তার ঘুম হবে। রাস্তা পার হওয়া তার পক্ষে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। পা গুনে গুনে ওপারে গিয়ে যদি দেখে উনিশ কি একুশ পা হয়েছে, তাহলে তাকে আবার এপারে ফিরে আসতে হবে। আবার পার হতে হবে। যতক্ষণ না ওপারে পৌঁছুতে জোড় সংখ্যক বার পা ফেলতে হচ্ছে, ততক্ষণ সে এপার ওপার করতে থাকবে।

এই রকম মানুষ আপনাদের জানাশোনার মধ্যে অনেক আছেন। একলা রাস্তায় বেরুলে হার্টফেল করবে এই ভয়ে কেউ সংগী ছাড়া বেরুতেই পারেন না। সে সংগী পাঁচ বছরের শিশুকন্যা হলেও চলবে। এক ভদ্রলোক হার্টফেল করার ভয়ে সঙ্গে কোরামিন না নিয়ে পথে বেরুতেন না। পকেটে নাম ঠিকানা লেখা কার্ডও রাখতেন। রাস্তার লোক তাঁর মৃতদেহটি যেন বাড়ী পৌঁছে দেয়, এই রকম একটি অনুরোধপত্রও সঙ্গে থাকত। বার বার হাত ধোবার বাতিকগ্রস্ত দু-একটি মহিলার সংবাদ সকলেই রাখেন। আমি এক ভদ্রমহিলাকে জানি, যিনি সকালে সাতটায় বাথরুমে প্রবেশ করেন আর বেলা তিনটে নাগাদ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন। স্বামীর বেশ টাকাপয়সা আছে, তাই তাঁর জন্যে একটা আলাদা বাথরুমের বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। উঁচুতে উঠতে পারে না, উঠলেও সেখান থেকে নীচুর দিকে তাকাতে পারে না, এরকম লোকের সংখ্যাও কম নয়। এরা সবাই আবেশিক বা অবসেশনাল নিউরোসিসে ভুগছে। এদের মধ্যে কারুর আবেশ চিন্তাস্তরে আছে, কারুর বা কার্যস্তরে পৌঁছেছে। চিন্তাটি না করে সে পারে না, কাজটিও না করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা জিনিস দুবার তাকে ছুঁতেই হবে, একটা কথা দুবার তাকে বলতেই হবে; যদিও সে আপনাকে বলবে যে, এ সবের কোনো মানে হয় না। কাজটি এখন কম্পালসিভ। বাধ্যকারী, পীড়নকারী এই কাজটি নিরর্থক, এটা সে যুক্তি দিয়ে বোঝে। কিন্তু কাজটি না করলে দারুণ অতৃপ্তি, অস্বস্তি, অশান্তিতে ভুগতে হবে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আরো বৃদ্ধি পাবে। কাজটি করলে কি অশান্তি উদ্বেগ মিটে যাবে? না, তবে কিছুক্ষণের মত সে রেহাই পাবে। আবার আপদ আসবে। আবার কাজটি করতে হবে। কাজটি তার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে শাস্ত্রীয় আচার পালনের মত। 'রিচুয়াল' বা শাস্ত্রীয় আচার অনেকে পালন করে যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে। পালন করে লাভবান হচ্ছে কিনা জানে না, কিন্তু না পালন করার যন্ত্রণার সে ভুগতে চায় না। রোগীদের বেলায় বাধ্যকারিতা আরো বেশি প্রবল, আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ী। আমার পরিচিত একটি যুবক স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুখ উঁচু করে বিড়বিড় করতে বাধ্য হয়। এই বাধ্যকারী অভ্যাস তার অনেক দিনের। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রথম দিকে সে কিছু বলতে চায় না। পরে বলে, তার মনে বিশেষ একটা খারাপ চিন্তা আসলেই সে ঐ প্রক্রিয়ার চিন্তাটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে। এ রকম না করে সে পারে না। কেন? চিন্তাটাকে না তাড়ালেই কি নয়? না তাড়ালে, তার মনে হয়, তার ছোট বোনের মৃত্যু হবে। ছেলেটি বিজ্ঞানের ছাত্র; মার্কসবাদে দীক্ষিত। এমনিতে তুকতাক বিশ্বাস করে না। এই কাটান মন্ত্র আওড়ানোর কোনো মানে হয় না জেনেও দিনে অন্তত পঞ্চাশবার এই মন্ত্র তাকে আওড়াতে হয়। এগুলো ইতিবাচক বাধ্যকারিতা (পজিটিভ কমপালসান)।

প্রথমে যে দুটো কেসের কথা বললাম, তারাও কম্পালসানে ভুগছেন। একটা বিশেষ অবস্থা (সিচুয়েশন) এড়াতে চাইছেন। আমাদের বিনোদ আর শ্যামবাবু দুজনেই আশংকা-উৎকণ্ঠার দরুণ শারীরিক প্রতিক্রিয়াকে এড়াতে চান। বুক ধরপড়ানি, দম বন্ধ হয়ে আসার মত 'সিচুয়েশন' থেকে দূরে থাকাই তাদের উদ্দেশ্য। নেতিবাচক বাধ্যকারিতার দৃষ্টান্ত। রতন পাল, রসময়, শংকর ইতিবাচক বাধ্যকারিতার রোগী।

এদের সকলের মনেই আছে বিপদ এড়াবার প্রচেষ্টা। রোগ উৎপত্তির ইতিহাস যখন

শুনবেন, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন কি বিপদ থেকে এরা পরিত্রাণ পেতে চাইছে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের দিনেই নিজের অবস্থা স্পষ্টভাবে বলতে পারে ও বুঝতে পারে। কোনো কোনো রোগীর বেশ কয়েক দিনের জিজ্ঞাসাবাদ আলোচনার পর তার অস্বাভাবিক কার্য-কলাপের কারণ বোঝা যায়। মনস্তাত্ত্বিকরা নানাভাবে এই রোগ নিয়ে অনুসন্ধান বিশ্লেষণ করেছেন, চিকিৎসকরা 'অবসেশনের রোগী' নিয়ে অনেক হিমসিম খেয়েছেন ও খাচ্ছেন। অনেকের মতে এ রোগ সারানো যায় না অথবা দুরারোগ্য। অনেকে বলেন, দুরারোগ্য নয় বটে, তবে চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার। দু-চারজন আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সাইকোসিস্-এর সঙ্গে জড়িত অমূলক আতঙ্ক নিশ্চয়ই দুরারোগ্য, কিন্তু অবসেশনাল-নিউরোসিস দুরারোগ্য নয়। উপযুক্ত চিকিৎসার ফল পাওয়া যায়।

খোলা জায়গার ভয়, বন্ধ জায়গার ভয়, ময়লা লাগবার ভয়; নানারকমের ভয়ের বা 'ফোবিয়া'র আগে গালভরা গ্রীক শব্দ বসিয়ে (যেমন, এ্যাগারোফোবিয়া, ক্লস্ট্রোফোবিয়া, মাইসোফোবিয়া) উপসর্গগুলোকে বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভয়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যাবে সব ভয়ের উৎস প্রায় একই ধরনের। শুধু তাই নয়, এক ধরনের আতঙ্ক অন্য ধরনের আতঙ্কের সঙ্গে অনেক সময় মিশে যায়, তাদের রূপান্তরণও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। আবেশিক নিউরোসিসের রোগীর সংখ্যা প্রচুর এবং ধরন বিবিধ। কাজেই কয়েকটি 'টিপিক্যাল' কেসের ইতিহাস বিবৃত করব। সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রয়েড এবং পাভলভ কিভাবে আবেশের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাব। আতঙ্কের কেস দিয়েই সুরু করা যাক।

বিনোদ যখন প্রথমে চিকিৎসার জন্য আসে তখন তার বয়স প্রায় বত্রিশ। লম্বায় ৬ ফিট, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। বন্ধ জায়গার ভয় দেখা দিয়েছে বছরখানেক আগে। একটি সংস্থার উঁচুতলার কেরানী। এই চাকরী করছে বছর পাঁচেক। আগে অন্য দু-চার জায়গায় অস্থায়ী চাকরী করেছে। এই সংস্থার গোড়াপত্তন থেকে সে এর সঙ্গে জড়িত। বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী বলে অফিসে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। সংস্থার সেক্রেটারীর ডান হাত ছিল একসময়ে। তখন অবশ্য সংস্থাটি ছিল ছোট। সর্বসমেত ৩০। ৩৫ জন কর্মী এবং সেক্রেটারী, এই দিয়েই কাজ চলত। সংস্থা ক্রমশ বৃহদাকার ধারণ করছে। কর্মী সংখ্যা বেড়ে শ' তিনেকের মত হয়েছে। সেক্রেটারী আর কর্মীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারীর ব্যুরোক্রেটিক বেড়া ডিঙিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। আগে এমনটি ছিল না। কর্মীদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে সেক্রেটারীর সম্পর্ক ছিল বেশ সহজ, একটা ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে তাদের কাজকর্ম চলত। তখন ইউনিয়ন ছিল না, ওভার টাইমেরও রেওয়াজ ছিল না। বিনোদ এবং তার মত আরো দু-একজন অতি উৎসাহী কর্মী ছুটির পরও অনেকক্ষণ ধরে কাজ করত। অজিত দরকারী ফাইল বাড়ী নিয়ে এসে তিন দিনের কাজ এক রাত্তিরে সারত।

এই বাড়তি কাজের প্রেরণা জোগাতে সেক্রেটারীর স্মিত হাসি, উৎসাহজনক দৃষ্টি আর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুশল প্রশ্ন। এখন আর সেদিন নেই। একটা নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, একটা 'অফিসিয়ালিজম' সর্বত্র বিরাজ করছে। উপর-পড়া হয়ে সাহায্য করতে গেলে বাহবা মেলে না, সেক্রেটারীর মুখে তেমন হাসি আর ফোটে না। ফাইলগুলো ডেপুটি সেক্রেটারীর মাধ্যমে না এলে সেক্রেটারী তার দিকে দৃষ্টি দিতে চান না। অন্য সকলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে মোটামুটি একরকম মানিয়ে নিয়েছে, বিনোদ পারছে না। বিশেষ করে ডেপুটি সেক্রেটারীর সাহেবিয়ানা ও অতিমুরুব্বিপনা বিনোদের একেবারে বরদাস্ত হচ্ছে না। এই সংস্থায় তিনি যোগ দিয়েছেন দুই বছরের কিছু বেশি। পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-ছাত্রদের মধ্যেও পড়েন না। শাসকগোষ্ঠীর এক বড়কর্তার সুপারিশের জোরে প্রথমেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, (অন্য সেকশনের) এক বছরের মধ্যেই ডেপুটি সেক্রেটারী। কাজ জানেন না, কিন্তু হুকুম দিতে জানেন। বিনোদ সব থেকে অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্মী, তাকে দিয়ে ডেপুটী বেশির ভাগ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ করতে বিনোদ ভালবাসে, কাজ করতে তার আপত্তিও ছিল না। বাড়তি কাজের জন্যে ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অন্তত আন্তরিক ধন্যবাদও যদি জানাতেন, বিনোদ রাত আটটা পর্যন্ত সানন্দে খেটে যেতে পারত! কিন্তু আন্তরিক দূরের কথা, মৌখিক ধন্যবাদ জানাতেও ভদ্রলোক নাচার।

অন্য কর্মীরা ছুতানাতা করে ডেপুটীর দরুন বাড়তি খাটুনি কোনো রকমে এড়িয়ে যেত। ইউনিয়ন গড়ে ওঠায় তাদের উপরওয়ালার ভয়ও বিশেষ নেই। বিনোদ পারত না। তার কেবলই মনে হত এই সংস্থা তারাই ত' গড়ে তুলেছে। এটা কোনো ব্যবসাদারি প্রতিষ্ঠান নয়। জনসাধারণের এবং সরকারের কাছে সংস্থাটি এখনও তেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বিনোদের এক আধ ঘণ্টা বাড়তি খাটুনির ফলে যদি সংস্থার সুনাম বাড়ে, সেটাত' তারই সুনাম। অন্য কর্মীরা এই 'এক্স্টা লয়ালটি'র অন্য অর্থ করে। বড় কর্তাদের সুনজরে থেকে আখের গুছিয়ে নেবার কৌশল। বিনোদ আগের মতই 'ওভারটাইম' করে যায়, বিনিময়ে পায় সহকর্মীদের ঈর্ষা মিশানো ব্যঙ্গোক্তি এবং ডেপুটির তরফ থেকে ঘটে আরো চাপসৃষ্টি। ইউনিয়নের কাছে দরবার করতে যায় না বলে ইউনিয়নের কর্মকর্তারাও বিনোদকে সুনজরে দেখেন না। ইউনিয়ন বিনোদের কাছে যেন তাদের সংস্থার স্বার্থবিরোধী অন্য একটি প্রতিষ্ঠান।

প্রথম ভয়ের আবির্ভাবের দিন বিনোদের মনে আছে। সেদিন ছিল শনিবার। জুলাই মাস। আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। অফিসে আসবার আগে দুখানা সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিল। ভেবেছিল আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে সিনেমায় নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করবে। কিন্তু 'ম্যান প্রোপোজেস, বস্ ডিসপোজেস'। এসেই দেখে ডেপুটি স্লিপ পাঠিয়েছেন, আজ একটার পর বিনোদ যেন স্টোর ক্লার্কের রিটার্নটা মিলিয়ে একটা নোট লিখে ফেলে। ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী। মেজাজ বিগড়ে গেল বিনোদের। টিকিট দুটো নষ্ট। তাছাড়া ঐ স্টোর রুমটা ওর মোটেই ভাল লাগে না। ভ্যাপসা গন্ধ, অন্ধকার, জানালা-দরজা সব সময়ে বন্ধ থাকে। পারতপক্ষে ঐ ঘরটাতে সে ঢুকতে চায় না। রিটার্ন মেলাতে হলে স্টোর রুমে গিয়ে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হবে। সরাসরি ডেপুটিকে জানিয়ে দেবে আজ সে একটার পর এক মিনিটও থাকতে পারবে না। এমনি সময় পাশের টেবিল থেকে এক অল্পবয়সী ছোকরা বলে উঠল, আজ একটার পর সেক্রেটারীর কাছে ডেপুটেশনে যাব আমরা। আপনাকে সেক্রেটারী খুব খাতির করেন জানি। আপনাকে এই ডেপুটেশনের নেতা হতে হবে বিনোদদা।

মনের কথা—আলোচনার উত্তরে

৪৩ শ' ও ৪৪ শ' সংখ্যায় 'সম্মোহন'-এর প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনা দুটিতে বলা হয়েছে যে, সম্মোহন মস্তিষ্কের ঘুমন্ত বা নিস্তেজিত অবস্থা নয়। পাভলভের ধারণা পুরনো এবং অচল। প্রথম আলোচক (৪৩ শ) কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় আলোচক (৪৪ শ) শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ঘুমন্ত অবস্থার কতকগুলি শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের কথা তুলেছেন, যা সম্মোহিত অবস্থায় ঘটে না। দুজনেরই 'অথরটি' এক। বৃটিশ মেডিক্যাল হিপনটিস্ট সোসাইটি এবং সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেণ্টাল হিপনসিস। দ্বিতীয় আলোচক আবার চন্দননগরের এক সাইকিক রিসার্চ সেন্টারের কথাও বলেছেন।

এঁদের বক্তব্য মোটামুটি এই রকম : ১৯৫৩ সাল থেকে সব বিজ্ঞানীই নাকি এই সিদ্ধান্ত ও অভিমতে পৌঁছেছেন যে সম্মোহন মোটেই কোনো প্রকারের ঘুম নয়, ..."বরং উন্নত অভিভাবিত অবস্থা, গভীরতম একাগ্রতাপূর্ণ অবস্থা"। "এটা একটা উচ্চতর আত্মিক অবস্থা বা চিত্তসংযোগের অবস্থা, যে অবস্থায় হিপ্নোটিস্টের বাকপ্রয়োগ সাবজেক্টের মনে

গভীরভাবে ছাপ ফেলে ও সেই মত মনে কাজ করার শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।"

... হিপনটিজম ইজ এ থিওরি অফ কনসেনট্রেশন"...... "এই মতটাই বর্তমানে পরীক্ষিত সত্য, বিজ্ঞানীমহলে এই ধারণাটাই গৃহীত। বৈজ্ঞানিকভাবে এই মতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ-উ কোনো প্রতিবাদ করেন নি।"

সম্মানিত আলোচকদ্বয়কে জানাতে চাই যে, সম্মোহিত অবস্থায় যে আংশিক বিবরণ তাঁরা দিয়েছেন এই বিবরণ নিয়ে কোনো দিন কোনো বিশেষ মতভেদ ঘটেনি, কোনো বড় রকমের তর্কবিতর্কেরও সৃষ্টি হয়নি। এই 'ডেসক্রিপটিভ্ এ্যাকাউন্ট'এর সঙ্গে সর্বকালে সর্বদেশের বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী মহলই সুপরিচিত। সম্মোহনের কোনো ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব এর মধ্যে নেই। সম্মোহিত ব্যক্তির 'কনসেনট্রেশন' বাড়ে, অতএব, 'হিপনটিজম্ ইজ এ থিওরি অফ কনসেনট্রেশন',—এই ধরনের উক্তি অর্থহীন। যা ঘটছে তার বিবরণ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বিজ্ঞানীর ধর্ম নয়। কেন ঘটছে? কি কারণে ঘটছে? সেইটে আবিষ্কার করার চেষ্টা বিজ্ঞানী মাত্রেই করে থাকেন। আলোচকদ্বয় এ সম্পর্কে নীরব।

অভিনিবেশ বা কনসেনট্রেশন বৃদ্ধির শারীরবৃত্তিক কারণ অনুসন্ধান করলে জানতে পারতেন যে, ঐ সময় মস্তিষ্কের অধিকাংশ কোষ নিস্তেজিত বা ঘুমন্ত; কেবলমাত্র অভিনিবেশ-সংক্রান্ত অল্পসংখ্যক কোষ জাগ্রত, বেশি মাত্রায় জাগ্রত বা উদ্দীপ্ত। এই কারণে আশে পাশে যা কিছু ঘটে, অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কে তার কোনো সাড়া জাগে না। অবশ্য, সম্মোহিত ব্যক্তির শক্তি বহুগুণ বাড়ে,—এ দাবী সকলে মানেন না। এ দাবী যাঁরা করেন, তাঁদের পরীক্ষাধীন সবজেক্টের সংখ্যার স্বল্পতার 'কন্ট্রোলের' অভাবের দরুন তাঁদের দাবী খুবই দুর্বল।

যে দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচকদ্বয় তুলেছেন, তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষা-লব্ধ তত্ত্ব পেশ করে যদি বক্তব্য সমর্থিত করতেন, তবে আমাদের জ্ঞানও বাড়ত এবং সত্যিকারের আলোচনার সূত্রপাত হত। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঐ প্রতিষ্ঠান দুটি যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৫৩ থেকে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন। পত্রিকা দুটিতে অনেক তথ্য সংবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এমন কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন কি যা দিয়ে সম্মোহিতের কার্যকলাপ এবং সম্মোহিত-সম্মোহনে বিশেষ সম্পর্কের স্বরূপ বোঝা যায়? না। পাভলভ-উত্তর কোনো আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর থিওরি বা পাভলভের ব্যাখ্যার থেকে উন্নততর কোনো ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সেই জন্যই এই প্রতিষ্ঠান দুটি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কথা ৪০ শ সংখ্যায় উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তবে এ কথা বলছি না পাভলভ শেষ কথা বলে গেছেন বা উন্নততর তত্ত্ব কোনো দিন আবিষ্কৃত হবে না।

'মনের কথা' বলতে গিয়ে সম্মোহন সম্পর্কে 'এনসাইক্লোপেডিক' জ্ঞান জাহির করার ইচ্ছে ছিল না বলেই 'রোল প্লেইং' থিওরিরও উল্লেখ করিনি এবং 'হাইপার-সাজেশটিবিলিটি' তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করার যৌক্তিকতা অনুভব করিনি। এ সম্বন্ধে একজন আমেরিকান পন্ডিত লিখেছেন "দিস, হাউএভার ইজ মোর এ স্টেটমেন্ট অফ হোয়াট অকারস দ্যান এ্যান এক্সপ্ল্যানেশন অফ জাস্ট হাউ ইট অকারস্। (মারকিউস, এফ এল: হিপনসিস, ফ্যাক্ট এ্যান্ড ফিকশন, ১৯৬৩; পৃঃ ২১৪)

৪০ শ সংখ্যার আলোচক তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকান মেডিক্যাল কাউন্সিল (বোধহয় এ্যাসোসিয়েশন!)এর নাম টেনে এনেছেন। মারকিউসের বইটির এক জায়গায় লেখা আছে (ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্মোহন নিয়ে গবেষণাকারক প্রতিষ্ঠান দুটির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত) যে বি-এম-এর একটি কমিটি দু বছর ধরে অনেক তথ্যাদি পরীক্ষা করে হিপনটিজমকে চিকিৎসার একটি অনুমোদিত পদ্ধতি হিসেবে ছাড়পত্র দিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু হিপনসিসের তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। "সম্মোহনের অস্তিত্ব স্বীকৃত কিন্তু সম্মোহন কি, এ সম্বন্ধে কোনো মতৈক্য নেই" (ইবিড্ পৃঃ ১১) ১৯৬১ সালে আমেরিকান সিকায়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশন (এর প্রতিষ্ঠা হিপনটিস্ট সোসাইটির থেকে কম নয় নিশ্চয়ই!!) এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মোহিত অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্মোহকদের জ্ঞান এত কম যে, যে হিপনটিজ্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়েও এঁরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সম্মোহিত অবস্থায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো ঘটে তারই বিবরণ পেশ করে থাকেন। ঠিক যেমন আলোচকদ্বয় করেছেন। "ফিউ রিপোর্টস অফ কন্ট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্টস ইনটু দি নেচার অফ হিপনসিস হ্যাভ বিন পাবলিসড্।" (জারমন্ড এডুইন, দি সায়েন্স অফ ড্রিমস, ১৯৬০ পৃঃ ৪৮) আমেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের এক ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট তো সম্মোহন-চিকিৎসাকেই বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন! যদিও অন্যরা সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি, এবং ১৯৫৮ সালে সম্মোহন-চিকিৎসাকে অনুমোদিত করেছেন; তবুও এর তত্ত্ব বা থিওরি সম্বন্ধে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য কোনো অভিমত পোষণ করেন না। কিন্তু আমাদের আলোচকদ্বয়ের মতে ১৯৫৩ সাল থেকে নাকি ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপানে 'বৈজ্ঞানিকভাবে এই মতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো প্রতিবাদ করেন নি।' আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ও'রা অথরিটি মনে করেন, সেই দুটি প্রতিষ্ঠান যে-দেশে অবস্থিত, সেই দেশের বিজ্ঞানীমহল সে-রকম কিছু মনে করেন না। উপরন্তু ইংলণ্ড আমেরিকায় প্রচলিত হিপনসিসের ব্যাখ্যাকেও আমল দিচ্ছেন না। অন্তত ঐ সম্মোহন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দুটি কোনো নতুন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন বলে তাঁদের জানা নেই। আমার অজ্ঞতার বহর দেখে সমালোচকরা বিস্মিত ও দুঃখিত বোধ করেছেন। 'অমৃতের' পাঠক-পাঠিকাদের ভুল শেখানো হচ্ছে বলে নৈতিক মনঃপীড়া অনুভব করেছেন। তাদের অতি-উৎসাহজনিত মনগড়া উক্তির জন্য আমার কি মনোভাব প্রকাশ করা উচিত? বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রসঙ্গে মনগড়া উক্তি করা নীতিসম্মত নয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ অনেকেরই জানার সম্ভাবনা আছে, তাদের সম্বন্ধে কোনো কাল্পনিক উক্তি করা অযৌক্তিক ও অবিবেচনার কাজ। এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না।

গত দুই সপ্তাহের আলোচনায় পাভলভীয় তত্ত্ব অনুযায়ী 'সম্মোহন'-এর প্রকৃতি ও সম্মোহনপর্বের ব্যাখ্যা দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। গভীর ঘুমের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন (ই-ই-জি, নি-জার্ক সংক্রান্ত) সাধারণত সম্মোহিত অবস্থায় ঘটে না। সম্মোহনের শেষ পর্বে কোনো কোনো সময়ে ডেলটা ওয়েভ দেখা দিতে পারে। ঘুম-স্বপ্ন-সম্মোহন প্রসঙ্গে ই-ই-জি'র বৈশিষ্ট্য যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে

লিখেছি। এ নিয়ে আর নতুন কিছু বলবার প্রয়োজন আছে মনে করি না।

আলোচকদ্বয় মাঝে মাঝে আক্রমণ করার ঝোঁক অথবা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার অতি উৎসাহে আমার বক্তব্যের অংশ বিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমার প্রতি অবিচার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৪৪ শ সংখ্যার আলোচকের সম্মোহক-সম্মোহিতের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি লিখেছেন 'সম্মোহিতকে দিয়ে দুর্নীতিমূলক কাজ করানো ইচ্ছামতো সম্ভব নয়' ......'কারণ নীতি-বিরুদ্ধ বা বিবেকবিরুদ্ধ কোনো সাজেসান দিলে বিরোধ বাধে, পাত্রের মনে, আবেগের সংঘর্ষ হয়'......ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। আমি ৪০ শ সংখ্যায় লিখেছি,—মনে রাখা দরকার, সম্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে সব রকমের কাজ করানো যায় না। দুর্নীতির প্রবণতা যার নেই তাকে দিয়ে নৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব।' এ দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি? আমি এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হিসেবে লিখেছি—'কিছু কিছু সামাজিক বৃত্তি ও কোনো কোনো নীতিবোধ আমাদের মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মে পরিণত হয়ে যায়...... অভি-ভাবন-বাক্য এই ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভে অক্ষম।' আলোচকমহাশয় এই কথাগুলোর উল্লেখ করারও প্রয়োজন মনে করেন নি। আর একটি সম্ভাব্য কারণ, "অভিভাবন-নির্দেশে হয়ত সংবেশকের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকে"—পাঠকদের সামনে উদ্ধৃত করে ফতোয়া দিয়েছেন যে আমার ধারণা ভুল! অন্য সংবেশকের মনের ইচ্ছা পর্যন্ত কি আলোচকের নখ-দর্পণে ধরা পড়েছে? পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান খুব বেশি থাকলে বোধহয় এই রকম যুক্তি-হীন আক্রমণ চালানো যায়!

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এ বিষয়েও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অভাব আছে। সম্মোহকের নির্দেশে দু-একজন সাবজেক্ট সত্যিই 'হাতের পুতুল' হয়ে যায়। রাউল্যান্ড বলেছেন যে, কিছু সাবজেক্ট নিজের বা অপরের ক্ষতিকারক কাজ সংবেশিত অবস্থায় করে থাকে। দড়ির সাজেসন দেওয়াতে সম্মোহিত ব্যক্তি বিষাক্ত সাপ ধরবার জন্য হাত এগিয়ে দিয়ে থাকে, সম্মোহককে আঘাত করার অভিভাবন সাড়া দিয়ে থাকে। তবে এদের সংখ্যা নগণ্য। (এল ডবলিউ রাউল্যান্ড : এ্যাবনরম্যাল এ্যান্ড সোশাল সাইকলজি; ১৯৩৯, ৩৪ : ১১৪-১১৭)

সম্মোহন কন্ডিশনড রিফ্লেক্স। গত দুটি সংখ্যায় পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষার আলোচনা ও বিকফের মতামত পড়লে এ বিষয়ে আলোচকদ্বয়ের সন্দেহ থাকবে না। কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স দু রকমের। কতকগুলো আমরা চেষ্টা করে গড়ে তুলি। কতকগুলো পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

শিশু জন্মাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে থাকে এবং যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ক্রমশ মা বা ধাত্রীর চেষ্টায় নির্দিষ্ট সময়ে শর্তাধীন ঘুমে অভ্যস্ত হয়। এরপর দিনের এবং রাতের কতকগুলো স্বাভাবিক উদ্দীপকের সংগে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ঘুম কন্ডিশন্ড হয়ে যায়। সেই অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঘুম আসে। তখন আর রিফ্লেক্স গড়ে তুলতে হয় না। এসব ক্ষেত্রে কোনো-রকম ট্রেনিং দরকার হয় না। 'সম্মোহন নিয়ে যাঁরা কিছুমাত্র চর্চা করেছেন' (৪৪ শ সংখ্যার আলোচনা) তাঁরা যদি কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স নিয়েও কিছুমাত্র চর্চা করতেন', তবে পাভলভীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে পাভলভীয় তথ্যের প্রয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করতেন না। অতি সারল্য বা চাপল্যের অধীন হলে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা চলে না।

আমি অবশ্য এ দাবী করছি না যে, পাভলভের তত্ত্ব সকলেই মেনে নিয়েছেন। ইংলন্ড আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানী শেরিংটনের মত কন্ডিশন্ড রিফেলক্সের মধ্যে বস্তুবাদের গন্ধ পেয়ে থাকেন। তাই এই মহলে সম্মোহন, হিস্টিরিয়া ইত্যাদি নিয়ে অনেক মত প্রচলিত; কিন্তু কোনটাই শারীরবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নয়। হিপনটিস্ট সোসাইটিগুলির পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে তথ্য জমেছে প্রচুর, কিন্তু সেগুলো থেকে কোনো তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। ইংলন্ডের এক নাম-করা ফিজিওলজিস্ট (ইনি ই-ই-জি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন) দুঃখ করে বলেছেন যে, এ পর্যন্ত কেউই সম্মোহনের কোনো সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। সর্বসম্মত ত' দূরে কথা, অধিকাংশ সমর্থিত কোনো তত্ত্বও পাভলভ-বিরোধীদের নেই।

৪৩ শ সংখ্যার আলোচনায় এক জায়গায় 'ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ'-এর পাশে বন্ধনীতে 'ইউ এস এ' লেখা আছে। কোনো পাঠক এর থেকে এই মনে করেন না যেন, যে যন্ত্রটির আদি আবিষ্কারক কোনো আমেরিকান। তাঁরা যা জানতেন, সেই সংবাদই ঠিক। জার্মানীর হান্স বার্জার যন্ত্রটির আবিষ্কারক। লেখক কি মনে করেছেন, তিনিই জানেন।

আলোচকদ্বয়কে জানাতে চাই যে, আমি জ্ঞানী বা পণ্ডিত নই। তাই পাঠকদের যেসব তথ্য পরিবেশন করি, সেগুলোর স্বপক্ষে সমর্থন ও যুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করি।

নিজের অজ্ঞতা স্বীকারে দৈন্যবোধে পীড়িত হই না। তাই সাইকিক রিসার্চ সেন্টার, চন্দননগর এই নামটির বা তাঁদের রিসার্চ সম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকার [illegible] কুণ্ঠা বোধ করছি না। আলোচকদ্বয়কে প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম, ইতি—

—মনোবিদ্

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুহায় দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের মধ্যে তখন বিচিত্র এক অনুভূতি। ভাবছি, ভারতের প্রাচীন শিল্প-যুগের কথা। ভাবছি, সেই সব শিল্পীদের কথা, যাদের কল্পনার তুলি আর রঙে জীবন্ত হয়ে ফুটেছে এই শিল্পমহিমা।

ভারতের শিল্প-তীর্থ এই অজন্তা।

গুহার বাইরে এলাম। বাইরে একটি সুন্দর ঝর্ণাধারা। জল-প্রপাতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করলাম খোলা আকাশের নীচে। তারপর অজন্তার যা কিছু দর্শনীয় দেখা শেষ করে এলাম 'বিবি-কা-মকবারা' দেখতে। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজীবের বেগম রাবিয়াস দুরাণীর সমাধিমন্দির এই 'বিবি-কা-মকবারা' তাজমহলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

হোটেল থেকেই দেখা যায় 'বিবি-কা-মকবারা'—তবে সে দেখা দূরে থেকে দেখা। এবারে কাছে থেকে দেখলাম। অনেকটা তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত এই সমাধি-মন্দির। মার্বেল পাথরে তৈরি এই সমাধি-মন্দিরের অনেকাংশে শ্বেত পদ্মের কাজ করা। যার শিল্পচাতুর্য দেখবার মতো।

এরপর এলাম 'পবন চাক্কি' দেখতে। পবন চাককি বলতে হাওয়াই যাঁতা। একটা বিরাট কাঠের পাখা জলের বেগের মুখে পড়ে ঘুরতে থাকে, সেই সঙ্গে যাঁতাটাও। এখানেই এক সময়ে দুর্ভিক্ষের সময়ে ঔরঙ্গজীব প্রজাগণকে গম বিতরণ করেছিলেন। সে কথাও শুনলাম গাইডের কাছে।

সেদিনের মতো ভ্রমণের পাট এখানেই চুকলো। পরদিন, ভোরে বেরিয়ে পড়লাম ঔরঙ্গাবাদ ফোর্ট দেখতে। ব্রেকফাস্ট হোটেল থেকে সেরে এসেছি, দুপুরের খাবার নিয়েছি টিফিন কেরিয়ারে।

যাই হোক, ফোর্টের কাছে পৌঁছতেই দেখলাম, গেট বন্ধ। শুধু আমরা নই, আরো দর্শনার্থী বাইরে অপেক্ষা করছে। শুনলাম, কিছু ইংরেজ পর্যটক ভিতরে গেছে, তাদের বাইরে না আসা পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্যে দরজা খুলবে না। শুনে আমার ভারতীয় মন ক্ষুব্ধ হলো। ভাবলাম, এ অবস্থার অবসান কবে হবে। আরো ভাবলাম, এতো জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো এমন স্পষ্ট ব্যবধান চোখে পড়েনি। মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। ফোর্ট দেখার বাসনা ত্যাগ করলাম। চলে এলাম সোজা 'রাওজা'য়। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্র এই 'রাওজা'। সমাধিক্ষেত্রটি এতোই সাধারণ যে, সমাধি-প্রস্তরফলক পর্যন্ত নেই। চারদিকে ঘাস এবং ছোট ছোট আগাছা গজিয়ে উঠেছে। সাধারণ, তবু আমার চোখে সেদিন অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, এই 'রাওজা'।

এরপর এলাম আসাফজার সমাধিক্ষেত্রে। তারপর সেখান থেকে ইলোরায়। এই পথেই দেখলাম, অহল্যা বাঈ-এর গুহা, বৌদ্ধ গুহা এবং কৈলাস গুহা। কৈলাস গুহায় কেবল শিব এবং পার্বতীর নানা মূর্তি—নয়তো আর কিছু নেই।

ইলোরায় এসেছি। প্রবেশ পথেই একটি পাথরের হাতী দেখলাম, যার কারুকার্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনুরূপ আরো একটি হাতী ছিল, যেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোন কারণে।

মনের মধ্যে বিস্ময়। ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত কোথাও এলে মন আমার এমনই বিস্ময়ে ভরে যায়।

চাঁদ মিনা'র, হাতি-বস'হাওদা, দেখে ভিতরে যাবো বলে এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছু দূর সিঁড়িপথ উঠে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আর যেতে পারলাম না। বসে পড়লাম, ফটকের ধারে সিঁড়ির ওপরে।

হঠাৎ দেখি, একজন লোক কাছেই সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। কী হলো লোকটার?'

শুনলাম, মৌমাছির আক্রমণে মানুষটির এই অবস্থা।

সেই মুহূর্তেই দেখলাম, একঝাঁক মৌমাছি ছুটে আসছে। সুতরাং আর বসে থাকা নয়, উঠে পড়লাম।

এখান থেকে বেরিয়ে সোজা রেল-স্টেশন। এবারে চলেছি সেকেন্দ্রাবাদের দিকে।

পরদিন ভোরে সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছলাম। ট্রেন থেকে নামতেই নিজাম স্টেট কাস্টমসের লোকজন আমাদের ঘেরাও করলো চেকিং-এর জন্যে।

চেকিং হলো। তারপর স্টেশন থেকে সোজা চলে এলাম মন্টগোমারী হোটেলে।

কোথাও আসতে যেটুকু দেরি এলে আর স্থির থাকতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার উদ্দেশ্যে।

হোটেলে ব্রেক-ফাস্টের পাট চুকিয়ে ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে এলাম 'হুসেনী সাগর'। নামেই সাগর, আসলে একটা বড় দীঘি। তারপর সেখান থেকে বাগিচা, চিড়িয়াখানা, চারমিনার, টাউনহল, এবং মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের ভিতরে যাওয়া হলো না, কারণ ঈদের জন্যে সেদিন মিউজিয়াম বন্ধ।

ট্যাকসি ড্রাইভারই আমাদের গাইডের কাজ করছে। সে আমাদের নিয়ে এলো, মুসী নদী দেখাতে। নদীর ওপর সুন্দর সেতু। তারপর 'রিভার গার্ডেন', দেখবার মতো। নদীর কিনারায় এই সুন্দর উদ্যানটি শহরের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এখানেই টিলার ওপর ছোট্ট অথচ সুরম্য প্রাসাদটিই ফলকনামা প্যালেস নামে প্রসিদ্ধ।

এবারে ট্যাকসিচালক আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখালো। হাইকোর্ট, লর্ড বাজার, সিটি কলেজ, জুবিলী হিল। তারপর এলাম 'নিজাম প্রাসাদ' দেখতে। বাইরে থেকে দেখা, নয়তো ভিতরে দৃষ্টিপাত করার কোন উপায় নেই। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই প্রাসাদ, চারদিকে উঁচু প্রাচীর, ফটকেও পর্দার আড়াল। সুতরাং ভিতরের কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

একটা কথা বলা হয়নি, চারমিনারের পাশেই রয়েছে মক্কা মসজিদ। যেখানে নিজাম বাহাদুর যখন যান, তখন রাস্তার সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আরো কিছু দেখা বাকি ছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিজামশাহী প্যালেস, বেগম পেট, খৈরতাবাদ—তাও দেখা হলো। তারপর ট্যাকসি ছুটলো গোলকুণ্ডার দিকে।

প্রথমে দেখলাম কুতুবশাহী বাজার, মক্কা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আবুল হাসানের অসমাপ্ত কবর। তারপর দেখলাম, পাহাড়ের ওপর দুই নর্তকীর মর্মর-মূর্তি—যাদের নাম হলো প্রেমাবতী আর তারাবতী। জানি না, এই দুই নর্তকীর পিছনে কোন্ কাহিনী জড়িয়ে আছে। জানি না, কোন্ শিল্পীর স্বপ্ন-বিলাস এই দুজনকে সৃষ্টি করেছে।

বাইরে এলে আমার মধ্যে একটা যাযাবর মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হোটেলে ফিরে নৈশ ভোজ সমাধা করার পরেও বেড়ানোর নেশা। সেই রাতে আবার বেরোলাম। দূরে নয়, হোটেলের কাছাকাছি পায়ে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। সেকেন্দ্রবাদের স্মারক হিসেবে কিছু সচিত্র পোস্টকার্ড কিনলাম। তারপর টুকিটাকি আরো জিনিস।

হোটেলে ফিরেছি। রাতটুকু ভোর হবার অপেক্ষা। শেষরাতেই ঘুম থেকে উঠেছি, তৈরি হয়েছি 'বিদার' যাওয়ার জন্যে।

স্টেশনে এসে টিকিট কাটতে এমন মুস্কিলে পড়বো, এতো ভাবিনি। টিকিটের জন্যে কাউন্টারে টাকা দিতেই ভিতর আরে মিস্টার, এতো ব্রিটিশ মানি।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, আমিতো ব্রিটিশ সাবজেকট, থাকি ইন্ডিয়ায়—আমি তো এই টাকাই দেবো।

সে মাথা নেড়ে বললে, সরি স্যর, এটা নিজাম স্টেট। এখানে নিজামস্ কয়েন্স ছাড়া কিছু চলবে না।

তবুও টিকিটবাবুটি আমাকে নিরাশ করলেন। অগত্যা অপেক্ষামান ট্রেনের গার্ডসাহেবকে বললাম। মানুষটি ভালো। আমার অসুবিধের কথা বুঝলেন। যখন বললাম, এখন তো ট্রেনে উঠি, পরে কোন স্টেশনে ব্রিটিশ মানি বদলে নিয়ে টিকিট কেটে নেবো। গার্ডসাহেব তাতেই রাজি হলেন।

পথে ভিকারাবাদ স্টেশনে আমি ব্রিটিশ টাকা বদলে নিয়েছিলাম।

আজ সকাল থেকেই কেমন যেন বাধা। বিদার স্টেশনে নেমে যদিও একটা ট্যাক্সি দেখলাম, কিন্তু তা-ও পেলাম না। শুনলাম, আগে থেকে রিজার্ভ করে রেখেছে অন্য একজন।

শেষটা একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম।

প্রথমেই গেলাম ফোর্ট দেখতে। দেখলাম, বিরাট 'গম্বুজ দরওয়াজা'। গম্বুজের উপর একটি বিরাটকায় কামান বসানো। কামানটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া। যার অনেকখানি সোনা খোয়া গেছে।

তোরণদ্বার দিয়ে এলাম চিনি-মহলে। চিনি-মহলের মেঝেতে এখনো পারস্য দেশীয় টালিগুলো অতীতের ঐশ্বর্য-মুখর দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর এলাম রঙীন-মহলে। যেখানে আবুল হাসানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বন্দী কবি আবুল হাসান-মহলের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে উর্দুতে তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। উর্দু আমি জানি না, তবুও শুনলাম এই সব কবিতার মধ্যে দার্শনিক মননশীলতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

রঙ্গীন মহলের দেয়ালের চার ধারে ঝিনুকের কারু কাজ সত্যিই দেখবার মতো।

রঙীন-মহল থেকে এলাম 'শোলা-কা-মসজিদ' দেখতে।

কোথাও দুদণ্ড দাঁড়াবার অবসর নেই। এক জায়গা দেখা শেষ হতেই টাঙ্গায় চেপে আর এক জায়গায় ছুটে চলা। বিরতি নেই। ছুটে চলাতেই যেন আনন্দ। এরই জীবনের যাযাবর ছন্দকে আবিষ্কার করা। যে ছন্দে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

এবারে আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো মহম্মদ ঘউস মাদ্রাসাতে।

মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষই শুধু চোখের সামনে বর্তমান। যে ধ্বংসাবশেষ দেখে চমকে উঠতে হয়। প্রশ্ন জাগে, এমন করে কে ধ্বংস করেছিল এই বিরাট ভবন। শুনলাম, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এক কাহিনী। মাদ্রাসার যেদিন সাধারণ্যে উদ্বোধন হবে, স্বয়ং রাজা আসছেন সে গৃহ উদ্বোধন করতে, এমন সময় কোথাও কিছু নেই—না মেঘ, না ঝড়বৃষ্টি—এক বজ্রপাতের ফলে এই বিরাট গৃহটির আধখানা ধ্বংস হয়ে গেল—বাকী আধখানা আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই অভিশপ্ত শিল্পীর সাক্ষ্য বহন করে। দেখলে মনে হয় কে যেন ক্ষুর দিয়ে আধখানা অবিকৃত রেখে আধখানা নষ্ট করে দিয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে বিদার বাজারে গেলাম কিছু কেনা-কাটার জন্যে—কিন্তু ঈদের ছুটির জন্য বেশীর ভাগই বন্ধ, মাত্র ২।৩টি খোলা ছিল। তাতে বিশেষ এমন কিছুই ছিল না যা কেনা যায়। এরপর টাঙ্গাওলা নিয়ে গেল বারিদশাহী রাজারের কবর দেখাতে, তারও কিছু দূরে বাহমনি রাজাদের কবর।

এইসব দেখেশুনে স্টেশনে ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। ট্রেনে জায়গার অসুবিধে হয়নি। এলুম ভিকারাবাদে। ওখানে স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমেই চা-জলখাবার খাওয়া গেল। কিন্তু স্টেশনে এত ভিড় যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কোথাও একটু বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা স্টেশনের মধ্যে পায়চারি করে সময় কাটাতে লাগলুম।

একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। তিনি সপ্রতিভ ভাবে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন : আপনি কি মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম : হ্যাঁ।—আপনি কেমন করে জানলেন?

তিনি মৃদু হেসে বললেন : কাগজে আপনার অনেক ছবি দেখেছি।

তারপর মাদ্রাসাটা দেখলেন? বলে একটু থামলেন ভদ্রলোক—দেখে কি মনে হল? কিরকম অদ্ভূতভাবে বাড়ীটা ভেঙে পড়েছে না? মনে হচ্ছে না যে কেউ যেন ছুরি দিয়ে বাড়ীটাকে দু-আধখানা করে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, আমারও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছে।

—এর একটা করুণ ইতিহাস আছে।

আমি সাগ্রহে বললাম : বলেন কি? আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে বললে খুব খুশী হবো।

—না না, আপত্তি কেন থাকবে। তাহলে আসুন বসা যাক—এইখানেই বসা যাক। বলে খবরের কাগজখানিকে বেশ করে বিছিয়ে, নিজেও বসলেন এবং আমাদেরও বসতে অনুরোধ করলেন।

বসলাম! ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

পারস্য দেশ থেকে এক শিল্পী সে সময় এদেশে এসেছিলেন। খুব নামকরা শিল্পী। তদানীন্তন রাজা ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর প্রজাদের জন্যে একটি স্কুল (মাদ্রাসা) তৈরী করবেন। স্থপতিদের ডাকা হোল। সেই সময় এই শিল্পী এগিয়ে এসে বলল যে তাকে যদি এ গৃহ নির্মাণের ভার দেওয়া হয় তাহলে সে এমন বাড়ী করে দিতে পারে যা হবে কালজয়ী। অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগই একে ধ্বংস করতে পারবে না। যুগ-যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই গৃহ দাঁড়িয়ে থাক অক্ষত অবস্থায়।

এই কথা শুনে রাজাসাহেব বললেন : বল কি? বেশ, তাহলে তুমি বাড়ীর নক্সা তৈরী কর।

দিন যায় মাস যায়—প্ল্যান আর হয় না। রাজা শিল্পীকে তাগাদা দেন। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে ৮।১০ মাস কেটে গেল। রাজা অস্থির হয়ে উঠছেন। শেষে একদিন শিল্পী রাজসমীপে নক্সাটি দাখিল করল। নকসা দেখে রাজা খুব খুশী। রাজা সেই নক্সা অনুমোদন করলেন।

এখন কাজ আরম্ভ করলেই হয়। বেশ কিছুদিন সময় গেল। রাজা আবার জোর তাগিদ দেন। শিল্পী জানালেন যে একটা পুকুর কাটাতে হবে। তাতে তিনি যে মশলা দরকার তা তৈরী করবেন। রাজার হুকুমে পুকুর কাটা হোলো, সেখানে শিল্পীর নির্দেশমত সমস্ত মাল-মশলা এনে জড়ো হোলো। বেশ কিছুদিন ধরে সেই মশলা তৈরী হোলো। তারপর একদিন শিল্পী বললেন যে একটা খুব শক্তিশালী

হাতিকে সেই পুকুরে নামাতে হবে। হাতি যদি তার সেই তৈরী মশলার ওপর হেঁটে চলে আসতে পারে তাহলে মশলা ঠিকমত তৈরী হয়নি—আর যদি সে আটকে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে মশলা তৈরী হয়ে গেছে এবং এবার বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করা যেতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে যেটি সবচেয়ে তেজী হাতি তাকেই রাজার নির্দেশে নামানো হলো পুকুরে। রাজা সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য অমন তেজী হাতি, কিন্তু সেই মশলাভরা পুকুরে নেমে আর পা তুলতে পারে না—আটকে গেল। শিল্পী আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—তার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে—এই মশলায় যে বাড়ী হবে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে তাকে ধ্বংস করতে পারে।

রাজা বললেন ঃ সে তো না হয় হলাম, কিন্তু হাতিটাকে এখন বাঁচান।

শিল্পী বললেন, ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

—সে কী! ও যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হাতী!

শিল্পী হেসে বললেন, অনেক সময় অনেক বড় কিছুর জন্যে প্রিয় জিনিসের [illegible] ত্যাগ করতে হয়।

অগত্যা রাজা চুপ করে গেলেন।

যাক, কিছুদিন পরে এই বিরাট ভবন তৈরী হলো। ঠিক হলো উদ্বোধনের [illegible] রাজা আসবেন এই বিরাট ভবনের [illegible] করতে। উদ্যোগ-আয়োজনও [illegible] আড়ম্বর পূর্ণ।

কিন্তু এ কী হলো। হঠাৎ বিনামেঘে [illegible]। জল নেই, ঝড় নেই, আকাশের কোথাও এক টুকরো মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই—[illegible] বজ্রপাত হলো। জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে [illegible], বজ্রাঘাতে এই নবনির্মিত ভবনটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অর্ধাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আর বাকি অর্ধাংশ দাঁড়িয়ে রইলো। সেটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিল্পীর হুঁশ হলো। তিনি বুঝলেন ঈশ্বরের কাছে মানুষের কোন দম্ভই মূল্য পায় না। মুহূর্তের চিন্তা উন্মাদ করে দিল শিল্পীকে।

এইখানে গল্পে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন [illegible]।

ইতিমধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে পুণা যাবার গাড়ী এসে গেল। কিন্তু ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। সিট রিজার্ভ করা ছিল। কিন্তু [illegible] পেলাম না। অগত্যা স্ত্রীকে তুলে দিলাম 'জেনানা কামরায়' আর আমি কোন রকমে আর একটা কামরায় জায়গা করে নিলাম। বুঝলাম, ইদের ছুটির জন্যে এতো ভিড়।

গাড়ী ছাড়লো। কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে [illegible] স্টেশনে পৌঁছতে গার্ড সাহেব আমাদের জন্যে দুটি বার্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে অনেক যাত্রী নেমেও গেল। [illegible] আমি আগে থেকেই গার্ড-সাহেবকে জানিয়ে রেখেছিলাম।

রাতটুকু চলতি ট্রেনেই কাটলো। গভীর ঘুমের মধ্যে আর কোন খবরই রাখি নি। শুধু ভোর হতে দেখলাম, আমরা পুণা এসে পৌঁছেছি।

স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এক ট্যাক্সী চালককে বললাম, কাছাকাছি কোন হোটেলে নিয়ে যেতে। নিয়েও গেল তাই, ন্যাশনাল হোটেলে। স্টেশনের উল্টোদিকেই হোটেল। অথচ আশ্চর্য হলাম ট্যাক্সী চালকের ব্যবহারে। এই হোটেলে তুললো, অথচ মিথ্যে খানিক ঘুরিয়ে আনলো। বুঝলাম, ও আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিছু রোজগার করে নিল।

কিন্তু ট্যাক্সীওয়ালাকে কিছু বললাম না। সোজা হোটেলে এসে ঢুকলাম।

স্নান-টান সেরে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ। একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দেখতে গেলাম বন্দর বাঁধ, মূলা নদী, বন্দর উদ্যান, প্রিন্স অফ ওয়েলস সড়ক, রেস কোর্স, হর্টিকালচার বাগান, গোয়ালিয়র মহারাজার ছত্রী, (অর্থাৎ স্মৃতি-সৌধ) ক্যান্টনমেন্ট, দুটি স্টুডিও (সরস্বতী সিনেটোন ও অরুণ পিকচার স্টুডিও), পাহাড়ের ওপরে ভবানী মন্দির। এই মা ভবানী হলেন শিবাজীর আরাধ্যা দেবী।

এই ভবানী মূর্তি হল অষ্টভুজা—মন্দিরটি মধ্যস্থলে আর চারপাশে আরও চারটি মন্দির আছে — যেমন সূর্যনারায়ণ, গণপতি, অম্বিকা ও বিষ্ণু। গেলাম রেইসী মার্কেট, তার ওপরেই হল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম। এখানে দেখলাম ত্রিবাঙ্কুর জঙ্গল থেকে আনা একটি বিচিত্র ও বিরাট বল্কল। খাইওয়ালা গাছের ছাল। মার্কেটে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করলুম। তারপর যখন হোটেলে ফিরে এলাম তখন বেলা চারটে বেজে গেছে।

সমস্ত দিন ঘোরাঘুরিতে শরীরটা বেশ ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল, সেজন্য আর বেরুলাম না কোথাও।

পরদিন গেলুম শানওয়ারী বাদীতে। এটা মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদের প্রাসাদ। এখন শুধু দেওয়ালগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে, বাকী সব গেছে নষ্ট হয়ে। দেখলাম শিবাজী গার্ডেন ও মিলিটারী স্কুল, শিবাজীনগর নামে একটি নতুন কলোনী। চমৎকার উদ্যানসহ আবহাওয়া অফিস (সেদিন আবার সেটি ছিল বন্ধ), ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ, ফার্গুসন কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার—এই সব দেখে ফিরে এলাম হোটেলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হোটেলে চা না খেয়ে গেলাম স্টেশনে—সেখানকার রিফ্রেসমেণ্ট রুমের চা-টি বড় ভালো। ওখানেই চা-টা খেয়ে স্টেশনে বেড়াতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে আটটায় হোটেলে ফিরে নৈশভোজন সেরে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর ভোরবেলায়, মানে অন্ধকার থাকতে-থাকতেই আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। স্টেশনে এসে স্থির করলাম যে এত দূরে যখন এসেছি তখন কার্লা গুহাগুলিও দেখে যাওয়া যাক। কার্লা গুহা যেতে গেলে আবার লোনাভালা হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ওখানেই নামতে হবে।

লোনাভালায় নেমে দেখি কোন ট্যাক্সি নেই শুনলাম তখন নাকি ওখানে কোন ট্যাক্সি পাওয়াই যেত না। যাই হোক একটা ফিটন ভাড়া করলাম। এই ফিটনেই চললাম কারলা। পুণার দিকে আরও পাঁচ মাইল রাস্তা যেতে হবে। রাস্তায় পড়লো বিরাট রেলওয়ে কলোনী।

রাস্তাটা ভালোই — তবে প্রধান সড়ক থেকে সোয়া মাইলটাক পথ বড় বিশ্রী। গুহাগুলি বেশ উঁচুতে অবস্থিত, সমুদ্রগর্ভ থেকে ৪০০ ফুট উঁচু। উঠতে অবশ্য কোন কষ্ট হয় না—ক্রমাগত লোক চলাচলের ফলে পাহাড়ের গায়ে আপনিই সিঁড়ি হয়ে গেছে। তার ওপরে উঠে একটি ঝর্ণার জল জমে সুন্দর জলাশয় তৈরী হয়েছে। জলটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং সুস্বাদু। ঐখানটায় বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা। এই জায়গাটিতে এলে শরীর ও মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। ওখানে আমরা জলপান করলুম—সঙ্গের ওয়াটারবটলটি এই জলে পূর্ণ করে নিলাম।

ওখানে রয়েছে কয়েকটি বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার—এই চৈত্যগুলি সব কাঠের তৈরী। স্তূপের ওপরে যে ছত্র আছে সেটা কাঠের তৈরী। সামনের দিকের ঘোড়ার খুরের মত আকৃতিবিশিষ্ট জানালাগুলির সামনে যে বারান্দাটি আছে সেটাও কাষ্ঠ-নির্মিত। এই কাঠগুলি এত মজবুত যে, কত শতাব্দী অতিক্রম করে গেছে, আজও সেগুলি সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়।

এখানে যে সব মূর্তি ও শিল্পকীর্তি আছে সেগুলি সবই কাঠের তৈরী—ভরুত টাইপের। স্তম্ভগুলিও সব ঐ একই ধরনের।

এই চৈত্যের প্রবেশ মুখেই রয়েছে অম্বামাতার মন্দির, আর এক দিকে রয়েছে ধ্বজদণ্ড মন্দির। ওখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখে-শুনে ফিরে এলাম লোনাভালায়। স্টেশনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল—পাঁচটার সময় বম্বে যাবার ট্রেন এল। বম্বের ভিকটোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে ফিরে এলাম যখন তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

সোজাসুজি স্টেশন থেকে বাড়ী না ফিরে বাজারে গিয়ে কিছু তরীতরকারী কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম—কারণ জানি তো যে তারিণীকে যা টাকাকড়ি দিয়ে এসেছিলাম—তাতে সে আর বংশী নিজেরা খেয়েছে, আর বাকী কি আর কিছু রেখেছে।

বাড়ী ফিরে দেখি মহাবিপদ। সকাল থেকে মুড়িসুড়ি দিয়ে বংশী শুয়ে রয়েছে। তাকে এই অবস্থায় দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কিরে তোর কি হয়েছে—শুয়ে কেন?

(ক্রমশঃ)

উত্তরমেঘ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বদ্ধ ঘরে আবহাওয়া অসহ্য ঠেকে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় দরজা খুলে বাইরে যাবেন। প্রায় শিশুর মতই রোদ্দুরের কথা ভুলে খেলা মাঠে ছুটো-ছুটি করে ক্লান্ত হবেন। চড়াই-উৎরাই ভেঙে অবসন্ন দেহ নিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন, যে-ঘরে মোহিনী নেই, অনুগত ভৃত্য নেই, প্রাচুর্যের নাম-গন্ধটুকু অবধি না। আছে অভাব আর অবহেলা আর আশা আর প্রার্থনা আর তাঁর চিরদুঃখিনী মা। যার কথা ভাবলে বুকের ভেতরে অজান্তে মুচড়ে ওঠে এখনো, দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

তবু লোভ, লোভ! লোভ তাঁকে ছাড়ে না। মনের ভার উজাড় করে হাল্কা হতেও তাই পারেন না রুক্মিণীকুমার। সাময়িক-ভাবে ভাবান্তর ঘটে শুধু। তাই বলে তিনি কি পারেন এইসব ছেড়ে-ছুড়ে কোথাও চলে যেতে? কেউ পারে নাকি আবার? এত রক্ত আর শ্রমের বিনিময়ে গড়ে তোলা এই যে বৈভব কে পারে তুচ্ছ ভেবে একেই উড়িয়ে দিতে?

কথা বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান। আস্তে দরজা খুলে বাইরে যান। দাঁড় থেকে টুপি তুলে নেবার কথা মনেই পড়ে না। এমন কি যথারীতি ঘণ্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকার প্রয়োজনটুকু অবধি বোধ করেন না এখন। যেন ধীরে ধীরে যথোচিত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন তিনি। গভীর-ভাবে চিন্তা অথবা অনুভবের শক্তি লুপ্ত হচ্ছে ক্রমশ।

বাইরে আমলকির ছায়ায় বাঁধানো বেদীর ওপরে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল ইসাক। ওপাশে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গাড়িটা। আজ তাঁর ইচ্ছে হল না, ডেকে, জাগিয়ে বিরক্ত করেন ড্রাইভারকে। বরং তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিতে চেয়ে পা-পা করে তিনি গাড়ির কাছে এগিয়ে যান। ইসারায় চন্দ্রচূড়কে কাছে ডেকে বলেন, 'উঠে আসুন।'

কথাটা আদেশের মত শোনালেও তাঁকে ভয়ঙ্কর দুঃখী মনে হচ্ছিল। কেমন করুণ। যা দেখে মানুষের মায়া হয়, বুকের ভেতরে উথলে ওঠে ভালোবাসা।

গাড়ি ছুটছিল দ্রুত। মাঠের বুক-চেরা আঁকা-বাঁকা অসমতল পথ। আজ কেন কে জানে, নিজেকে বার-বার অচেনা ঠেকছে তাঁর। ইসাককে না জানিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ধীরে ধীরে চেতনায় ফিরে আসেন। তিনি যেন সেই পলাতক শিশু, গ্রীষ্মের দুপুরে যে মাঠে-বনে, নদীর কিনারে একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছে কতদিন। টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠলে একা-একা ধানক্ষেত-পাটক্ষেত পেরিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে চলে গেছেন কোথায়, কতদূরে তার

ঠিকঠিকানা ছিল না। আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মায়ের হাতে মার আর আদরের পালা সাঙ্গ হলে হাত-পা ধুয়ে চটের বস্তা পেতে ছালো ছেলে সেজে পড়তে বসা। যথারীতি রেড়ির তেলের মেজের সামনে ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়া। মা এসে কোলে তুলে নিয়েছে তখন। যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। আর এরই মধ্যে সব হারিয়ে কখন যে বড় হয়ে ওঠে মানুষ। তিনি নিজেও ভাবেন। ভেবে বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক হতে হয় তাঁকে। কখন যে নতুন করে জন্ম হল তার! অথচ এসব কিছুই কাম্য ছিল না তাঁর। এখন অনেক কিছু ফিরে পেতে চেয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন। কিন্তু তা কি হবে! এ জীবনে আর কোনো দিন সত্য হয়ে সম্ভব হয়ে দেখা দেবে সেই সব দিন যা অতীত, যা বিগত অথচ সুন্দর, সুখকর!

'যা দেখছেন সবই আমার। একদিন ফাবকুয়ারের বাংলোটাও বৈজুপ্রসাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবো।'

যেতে যেতে গম্ভীর গলায় কথা বলেন। এবার তাঁকে চেনা যায়। এই সেই পুরোনো, পরিচিত মানুষ, চন্দ্রচূড় যাকে গভীরভাবে চেনে। অন্তত কদিনের ঘনিষ্ঠ আলাপে আত্মস্থ করে নিতে পেরেছে তাঁকে।

'জোর করে?'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্রচূড়। কথায় বিস্ময় আর পুলকের আমেজ লাগে যেন।

'তাছাড়া কী? ভিক্ষে চাইবো?' তিনি যেন বিদ্রূপ করছেন। চন্দ্রচূড়ের কথা শুনে ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে উঠলেন, 'মাইট ইজ রাইট। কথাটা ভুলে গেলেন? ভেরি ব্যাড!'

কথা বলে না চন্দ্রচূড়। দুপাশে মাঠ দেখে অফুরন্ত পথ আর আকাশের সুদূর বিস্তার। একটানা ঝীপের গোঙানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শোনা যাচ্ছে না কিছুই। থেকে থেকে কানের কাছে বাঁশি বাজিয়ে উধাও হচ্ছে হাওয়া। পোড়া পেট্রোলের কটু গন্ধ নাকের ভেতরে জ্বালা করে। অদূরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ নিম। খনির এলাকা পেরিয়ে এবার তারা লোকালয়ে এসে গেছে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না চন্দ্রচূড়। ভেতরে ভেতরে অস্পষ্ট উত্তেজনা বোধ করে। সে যেন হেরে যাচ্ছে। লজ্জায় সংকোচে ক্রমশ ম্রিয়মাণ। এই স্বল্পভাষী মানুষটির সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়। অথচ অসংখ্য কথা আছে তার। সব কথা ঠিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারছে না। যে কারণ কষ্ট পাচ্ছে। বুকের গভীরে দারুণ যন্ত্রণা। কিসের আক্ষেপ তাকে কুরে খাচ্ছে এখন। একবার কিছু বলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চায়, কথা বলা তার পক্ষে আদৌ কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। এখনো নেই। কেবল বয়সকে সম্মান দিতে হবে ভেবেই সে এমন চুপ-চাপ বোকা সেজে ঘুরে বেড়ায়। অথচ বোকা, মূর্খ সে নয়। তবু কী এক দুর্বোধ্য কারণে রুক্মিণীকুমারের কথা শুনে জবাব দেবার বদলে সে কেবল বিস্মিত, বিমূঢ় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। দেহে-মনে সর্ব অবয়বে পরিপূর্ণ যৌবনের সকল চিহ্ন ও লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে যেন কাঁচ, কাঁচা কিশোরের মত চেতনা অথবা অবচেতনায় সারাক্ষণ নিজেকে অপাপবিদ্ধ, সরল এবং অনভিজ্ঞ প্রমাণ করতে চেয়ে বদ্ধপরিকর।

'তাই বলে বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা ভেবে বসবেন না যেন। এ তল্লাটে তেমন মানুষও আছে, লাখ-দুলাখ যার হাতের ময়লা। আমার মত রুক্মিণীকুমার যে-কোনো মুহূর্তে তাদের হাটে বিকিয়ে যেতে পারে।' বলে হাসলেন। দম নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ-চাপ এগিয়ে যাবার পর ধীরে, স্বরে আরো শান্ত, নিশ্চিন্ত ভঙ্গী ফুটিয়ে বললেন, 'তবে বুদ্ধি থাকলে টিকে থাকাও যায়। জগতে ওই বস্তুটির বড্ড টানাটানি। ওইটে না থাকলে কবে উড়ে যেতাম।'

আচমকা মোচড় খেয়ে গাড়িটা বাঁ পাশে গভীর খাদের গা ঘেঁষে যেতে যেতে টাল সামলে নিয়ে চলতে শুরু করে ফের। ভয়ংকর দাম্ভিক মনে হচ্ছিল রুক্মিণীকুমারকে। যেন মরণপণ সংগ্রামে এই অনভিজ্ঞ যুবকের হাত ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাকে সকল রকমে যাচাই করে নিচ্ছে। কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে যাবার আনন্দে তাঁর মুখ সহসা উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে কারণ চন্দ্রচূড়ের ভুল হয়ে যায়। সে ভাবে, বড় দ্রুত ক্ষয় হয়ে চলেছে সংসার। ক্ষমা, প্রেম, তিতিক্ষা, অধ্যবসায় ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণ ও সদিচ্ছা মানবচরিত্র থেকে বিকেলের আলোর মতই লুপ্ত হচ্ছে ক্রমশ। এবং রুক্মিণীকুমারই হয়তো পৃথিবীর শেষতম প্রতিভা যার অভাবে জীবনকে মনে হবে নিতান্ত এক মরুভূমি। তখন বেঁচে থাকা আর না থাকার কিছু নেই।

'ঠিক হাউইয়ের মত ফুরিয়ে যেতাম।'

অসমাপ্ত কথার জের টেনে থেমে গেলেন রুক্মিণীকুমার। যেন ঝরঝর শব্দে গাড়িটাই শেষবারের মত সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু না, গাড়ি এখন হু-হু করে ছুটে চলেছে। চিন্তিত মনে হচ্ছে রুক্মিণীকুমারকে। দাঁতে দাঁত ঘষছেন। চোয়াল শক্ত হচ্ছে ক্রমশ। স্টিয়ারিংয়ের ওপরে ন্যস্ত থাবা দুটো শক্ত, সবল, হিংস্র মনে হয়। নিষ্পলক চেয়েছিলেন তিনি। কাছে-দূরে মানুষ ছিল না। নির্জন, নিঃসঙ্গ পথরেখা। তবু অসংযত, বিরক্ত এবং বিশৃঙ্খল দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রতিজ্ঞায় কঠোর মনে হচ্ছে।

মনে মনে ভয় পাচ্ছিল চন্দ্রচূড়। গাড়ির গতি তাকে আতঙ্কের শিখরে পৌঁছে দিল। কিছু বলে বাধা দেবার সাধ্য নেই তাঁকে। ধ্যান ভেঙে গেলে তিনি জ্বলে উঠতে পারেন। হয়তো লহমার ভেতরে চরম মুহূর্তের দিকে ঠেলে দেবেন তাকে। এবং নিজেও এগিয়ে যাবেন নির্দ্বিধায়, হাসিমুখে। দারুণ অস্বস্তির ভেতরে কেটে চলেছে সময়। কথা বলার সমস্ত শক্তি হারিয়ে নির্বাক, নিশ্চল বসে থাকে চন্দ্রচূড়। ঘুমের ঘোরে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখার মত আপাতত তার হাত-পা শীতল, শিথিল হয়ে আসছিল। নিজেকে বাঁচাবার সমস্ত শক্তিই মনে হচ্ছিল লুপ্ত, অপহৃত। চেঁচিয়ে লোক জড় করতে চাইলেও শুনতে পাবে না কেউ।

রুক্মিণীকুমার আত্মস্থ হলেন। আবার উদাস, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। যেন আরো গোপন, গুহ্য কোনো সংবাদ শোনাতে চেয়ে তিনি এমন করে আচমকা চুপ হয়ে গেলেন। বহু ত্যাগ, আর লাঞ্ছনার শেষে আজ এইখানে, এত ওপরে উঠে আসার পর পেছন ফিরে তাকিয়ে চমকে যেতে হয়। তাছাড়া কাকেই বা বলা যায়, কী ছিলেন, কী হয়েছেন? আলাপ তো সবে শুরু। অন্তরঙ্গ হতে না জানি আরো কত যুগ কেটে যাবে। ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন জানা যাবে, বোঝা যাবে, গভীর-ভাবে চেনা-শোনা হয়ে যাবে সব। কত সহস্র দুঃখময় স্তর পেরিয়ে তবে আজ এতদিনে এইখানে, এত ওপরে উঠে আসা! ভাগ্যই কি শুধু দেয়? পৌরুষ? মানুষের সাফল্যের পেছনে পুরুষকারের হাত নেই? ধৈর্যের? তাছাড়া অধ্যবসায়ই বা যাবে কোথায়? বরং জীবনে ওইটেই সবচেয়ে জরুরি। সাফল্যের সোনার চাবি ওইখানেই লুকিয়ে আছে কোথাও।

অবাক, বিস্মিত দুই চোখ মেলে চেয়ে ছিল চন্দ্রচূড়। একটুও কি ক্লান্ত মনে হচ্ছে না তাঁকে? বয়স কি সত্যিই হয়েছে তাঁর? কতই বা হবে আর? পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন, ষাট? না, তাই কি হয়? না কি আরো বেশী? কেমন করে বলবে চন্দ্রচূড়? বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। দেখে বলার সাধ্য নেই। চাকরি করতে হলে এতদিনে বিদায় নেবার পালা এসে গেছে তাঁর। অথচ কর্ম-ক্ষমতা এখনো অটুট। পরিপাটি বেশ-বাস। আচরণে যৌবনের নিখুঁত ভঙ্গিমা। তাহলে সবই কি মোহিনীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে হাতে রাখার অর্থাৎ নিজেকে তার পাতে তুলে দেবার সুপটু ছলনা? কথাটা ভাবতেও রি-রি করে ওঠে মন। ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ ঘুলিয়ে ওঠে। সত্যিই কি এমনভাবে টিকে না থাকলে নয়? না জানি মোহিনীর কী হাল! বয়সের অথবা রুচির এই যে বৈষম্য যা তাকেও পীড়িত করে, মোহিনী অথবা রুক্মিণীকুমার হয়তো সেকথা কোনোদিন তলিয়ে ভাবার অবকাশ অবধি পায়নি। তাহলে কি বয়সের ফারাক অসামান্য ছিল না কোনোদিন? রুক্মিণীকুমারের দিকে চেয়ে বাস্তবিক ধাঁধা মনে হয়। কথা শুনে আরো চমকে যেতে হয়। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সাধ অবশ্য নেই। রুচিতে বাধে। তবু ভেতরে ভেতরে মোহিনী অথবা

ভিতরের দুটি দৃশ্য এবং কর্ণধার ডঃ আদিনাথ লাহিড়ী
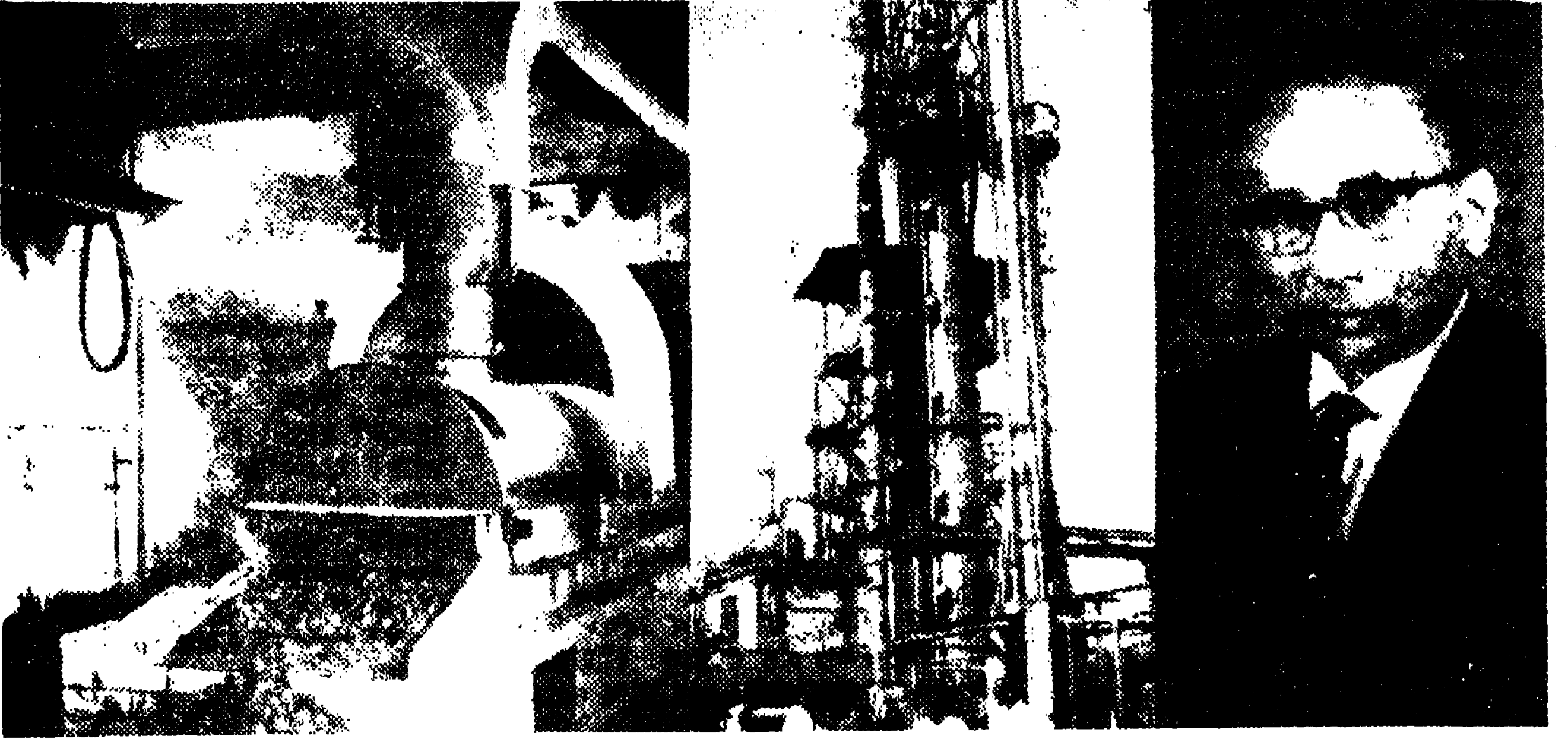
কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের স্তম্ভে এবং লোকপরম্পরায় একটি অনুযোগ প্রায়ই শোনা যায়ঃ স্বাধীনতা-উত্তরকালে (এবং তার কিছুকাল আগে) এদেশের যেসব জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি দেশের অর্থনীতি ও প্রগতিতে তেমন কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা করছে না। এই ধারণা আমাদের মনেও ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রায় ২৭২ কিলোমিটার দূরে ধানবাদের কাছে জিয়েলগোরায় কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের বিভিন্ন বিভাগ স্বচক্ষে দেখে এবং সেখানকার বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে উপলব্ধি করেছি আমাদের এই ধারণা কত ভ্রান্ত।

জ্বালানী গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা লাভের দুই বছর আগে ১৯৪৫ সালে। ধানবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস্ অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড জিওলজি-তে অস্থায়ী আস্তানায় অল্প সংখ্যক গবেষক ও বিজ্ঞানকর্মী নিয়ে এই গবেষণাগারের কাজের সূচনা হয় এবং এর প্রথম অধিকর্তা ছিলেন ডঃ জে ডবলু হোয়াইটেকার। তারপর ১৯৫০ সালের ২২ এপ্রিল জিয়েলগোরায় বর্তমান কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। গবেষণাগারের বর্তমান কর্ণধার হচ্ছেন ডঃ আদিনাথ লাহিড়ী এবং সাতটি কয়লা সমীক্ষা কেন্দ্র সমেত মোট কর্মীর সংখ্যা বর্তমানে ১৪০০ এবং তাঁদের মধ্যে ৭০০ জনের বেশি হচ্ছেন দক্ষ বিজ্ঞান-গবেষক ও কারুকুশলী।

এই জ্বালানী গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই ডঃ লাহিড়ী এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি প্রথমে এখানকার পরিকল্পনা দপ্তরের সহ-অধিকর্তারূপে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উপ-অধিকর্তা পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে কর্ণ-

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধাররূপে কাজ পরিচালনা করছেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে এই গবেষণাগার আজ দেশের শিল্পোন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডঃ লাহিড়ী একজন বিশিষ্ট জ্বালানী-বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃত। এখানকার মৌলিক ও ফলিত গবেষণা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী সদ্ব্যবহারের সমস্ত দিক নিয়ে পরিচালিত হয়। এখানে ভারতীয় কয়লার যে ভৌত ও রাসায়নিক সমীক্ষা হয়েছে তাতে কয়লা সম্পর্কে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। জ্বালানীর ক্ষেত্রে গবেষণার এত ব্যাপক ও বিবিধ সম্ভাবনা আছে যে কোনো গবেষণাগারেই তা সম্পূর্ণ করা দুরূহ। জিয়েলগোরার গবেষণাগারে যে সব কাজ হচ্ছে তা হল প্রধানতঃ (১) এদেশে কি ধরনের ও কি পরিমাণের জ্বালানী সম্পদ আছে তা কয়লা সমীক্ষা-কেন্দ্রের মাধ্যমে যথাযথভাবে নিরূপণ করা, যাতে এদেশের বিভিন্ন রকম জ্বালানীর যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে; (২) কঠিন জ্বালানী প্রস্তুতিকরণ ও সদ্ব্যবহার পদ্ধতির উন্নতি সাধন; (৩) উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় কয়লার অঙ্গারীভবন অর্থাৎ আলকাতরা, বেঞ্জল ইত্যাদি কয়লার উপজাত দ্রব্যগুলি উদ্ধার ও তার ব্যবহার; (৪) কঠিন জ্বালানীর গ্যাসীকরণ ও গ্যাসের বিশুদ্ধিকরণ; (৫) প্রকৃতিজাত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের পরীক্ষা ও সমীক্ষা; (৬) কয়লা থেকে তরল জ্বালানী সংশ্লেষণ; (৭) রাসায়নিক শিল্পের জন্য কয়লাজাত দ্রব্যের উন্নয়ন; (৮) কয়লা থেকে সার উৎপাদন; (৯) কয়লার সংযুক্তি, গঠন-বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা; (১০) জ্বালানীর উৎকর্ষ; (১১) জ্বালানী প্রস্তুতের বিশেষ সমস্যা, যেমন কয়লা

থেকে গন্ধক মুক্ত করা, লিগনাইট কয়লার সদ্ব্যবহার ইত্যাদি; (১২) জ্বালানী সংক্রান্ত সমস্যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য।

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে দেশের অর্থনীতি লাভবান হয়েছে এবং প্রগতি সাধিত হয়েছে, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ভারতীয় কয়লার গুণ-বিচার : ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক হাজারটি খনিতে কয়লাসম্পদ সঞ্চিত আছে। গুণ বা ধর্মের দিক থেকে এই সব কয়লা এক রকমের নয়। জ্বালানী গবেষণাগার তার সাতটি সমীক্ষা-কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় কয়লার ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক ও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করেছে। সাতটি সমীক্ষা-কেন্দ্র আছে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, রাঁচী, বিলাসপুর, নাগপুর, জোড়হাট এবং জম্মু ও কাশ্মীরে। গত ১৫ বছরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়লা নিয়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। অর্থের বিচারে শুধু এই বিশ্লেষণ কাজের দাম এক কোটি টাকার কম হবে না। তবে এই কাজের বেশির ভাগই রেল দপ্তর, কয়লা বোর্ড, বিদ্যুৎ বোর্ড, জাতীয় কয়লা উন্নয়ন পর্ষদ, লৌহ ও ইস্পাত প্রকল্প, ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, ভারতীয় খনি সংস্থা ইত্যাদির সুবিধার্থে বিনা অর্থেই করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের ফলে জ্বালানী উপযোগী প্রায় ১৩০০০ লক্ষ টন পরিমাণ নতুন কয়লা-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া, জ্বালানী হিসাবে মিশ্রণ উপযোগী প্রচুর পরিমাণ কয়লার উৎস সন্ধান করা হয়েছে এবং সেগুলি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখা হয়েছে। এই সমস্ত নতুন উৎসের অর্থমূল্য হবে ৩৫০০ কোটি টাকা।

জ্বালানী উপযোগী কয়লা প্রস্তুতিকরণ : কয়লা উৎসের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার বিশেষত ধাতুনিষ্কাশনের কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্যে ভারতে প্রাপ্ত কয়লাকে বিশেষভাবে উপযোগী করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ ভারতীয় কয়লাতে অবাঞ্ছিত খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, ভারতীয় কয়লাকে এভাবে উপযোগী করে তোলা এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের গবেষক ও বিজ্ঞান-কর্মীরা এই 'অসম্ভব'-কে সম্ভব করে তুলেছেন।

ভারতীয় কয়লায় সাধারণত ছাই-এর অংশ (কয়লা পোড়াবার পর যে অদাহ্য অংশ অবশিষ্ট থাকে) খুব বেশি। এই ছাই জ্বালানী হিসাবে কয়লার দক্ষতা দুভাবে কমিয়ে দেয়। প্রথমত কয়লার উত্তাপ মান কমিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয়ত চুল্লীতে জ্বলন্ত কয়লার তাপের কিছু অংশ শোষণ করে নেয়। এ কারণে জ্বালানী হিসাবে কয়লার উৎকর্ষ বাড়াতে হলে দাহ্য পদার্থ থেকে অদাহ্য পদার্থগুলিকে পৃথক করে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় কয়লাতে অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি এমন সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত থাকে যে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেগুলিকে সহজে পৃথক করা যায় না। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার 'ওলিওফ্লোটেশন' পদ্ধতি (কয়লার গুঁড়ো তেলে ভাসিয়ে) উদ্ভাবন করে এই সমস্যার একটি মূল্যবান সমাধান করেছে। যে সব যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে কয়লাকে এইভাবে বিশুদ্ধ বা ধৌত করা হয়, তাকে বলা হয় 'ওয়াশারী'। দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরা ইত্যাদি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং পাথরডিহি, ভোজুদিহি ইত্যাদি খনি অঞ্চলে এই ধরনের কয়লা ধৌতাগার স্থাপিত হয়েছে। জ্বালানী গবেষণাগারে উদ্ভাবিত 'ওলিওফ্লোটেশন' পদ্ধতি একটি ভারত-মার্কিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে বর্তমানে কথাবার্তা চলছে। জ্বালানী গবেষণাগারে সম্প্রতি বায়ুচালিত একটি শুষ্ক পৃথকীকরণ পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণাগারে এই পদ্ধতির যে প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে তাতে ঘন্টায় পাঁচ টন কয়লার পৃথকীকরণ করা যায়। ছয় মিলিমিটারের কম আকারের কয়লা চূর্ণ এই পদ্ধতিতে পৃথক করা সুবিধাজনক।

কয়লার অঙ্গারাস্তীকরণ : স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে নতুন ইস্পাত প্রকল্পগুলি স্থাপিত হয়েছে, তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছে কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার। ইস্পাত প্রস্তুতের জন্যে কয়লা একান্ত প্রয়োজন। ভারতে আনুমানিক মোট ১০০০০ কোটি টন কয়লা মজুদ আছে, কিন্তু তার বেশির ভাগই হচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের এবং ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ হচ্ছে তার শত ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত গলনের জন্যে প্রতি টন আকরের সঙ্গে দেড় টন বিশুদ্ধ কয়লার প্রয়োজন হয়। এ জন্যে শুধু বিশুদ্ধ কয়লা যদি ব্যবহার করা হয়, তা হলে ক্রমবর্ধমান ধাতু শিল্পের চাহিদা মেটাতে দেশের মজুদ পরিমাণ কিছুকালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে তাই গবেষণা চালানো হয় উৎকৃষ্ট মানের কয়লার সঙ্গে নিম্নমানের কয়লা মিশিয়ে কিভাবে দেশের কয়লা সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। পথনির্দেশক স্তরে (পাইলট) প্ল্যান্ট চালিয়ে জ্বালানী গবেষণাগার দীর্ঘকাল পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখিয়েছে, শতকরা ২০-৪০ ভাগ পর্যন্ত নিম্নমানের কয়লা মিশ্রণ হিসাবে ধাতুশিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জের কয়লা আগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু জ্বালানী গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে এই কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় বর্তমানে শতকরা ৭৫ ভাগ রানীগঞ্জ কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে শুধু কয়লার মাসুল ভাড়া বাবদ বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হয়েছে। অনুরূপভাবে রৌরকেলা ও ভিলাই ইস্পাত কারখানাতেও স্থানীয় কয়লা মিশ্রণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ধোঁয়াবিহীন গৃহস্থালী জ্বালানী :

গৃহস্থালী কাজের জন্যে ভারতে বছরে প্রায় ১০ কোটি টন জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ টন হচ্ছে কয়লা এবং বাকী জ্বালানী হচ্ছে ঘুঁটে, কাঠ ও খড়কুটো। আমরা শহরাঞ্চলে সাধারণত সফট কোক বা জ্বালানী উপযোগী কয়লা ব্যবহার করে থাকি। বায়ুরুদ্ধ আধারে খনিজ কয়লা পুড়িয়ে এই সফট কোক তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই গৃহস্থালী কয়লা পোড়ালেও বেশ ধোঁয়া বার হয়। শহরাঞ্চলে এই জ্বালানীর ধোঁয়া হচ্ছে একটা সমস্যা। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে তাই ধোঁয়াবিহীন কঠিন জ্বালানী উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালান হয়। এখানে নিম্নমানের কয়লা (যা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় না) দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। যে পদ্ধতিতে নিম্নমান কয়লা থেকে ধোঁয়াবিহীন কঠিন জ্বালানী উদ্ভাবিত হয়েছে তাকে বলা হয় নিম্ন তাপমাত্রায় অঙ্গারাস্তীকরণ বা 'লো টেম্পারাচার কার্বোনিজেশন'। এই পদ্ধতিতে নিম্নমানের কয়লা থেকে মূল্যবান উপজাত রাসায়নিক পদার্থও উদ্ধার করা যায়। জ্বালানী গবেষণাগারে ১৯৬১ সাল থেকে এরূপ একটি প্ল্যান্ট চালু হয়েছে। তাতে দৈনিক ২০ টন ধোঁয়াবিহীন জ্বালানী উৎপন্ন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতির লাইসেন্স নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি প্ল্যান্ট চালু করেছে। এই প্ল্যান্টে অবশ্য উপজাত পদার্থগুলি উদ্ধার করা হয় না। এই পদ্ধতিতে যে কয়লা থেকে উদ্বায়ী অংশ (যার দরুন্ত কয়লা পোড়ালে ধোঁয়া হয়) বার করে নেওয়া হবে, তা একটি চলমান ঝাঁঝরির তলা দিয়ে সীমিত পরিমাণ বায়ু চালিত করে উদ্বায়ী অংশগুলি বার করে নেওয়া হয় এবং বার করার জন্যে যে তাপের প্রয়োজন তা ঐ উদ্বায়ী অংশের প্রজ্বলনের উত্তাপ থেকে পাওয়া যায়। এই ধরনের একটি নির্দেশক প্ল্যান্ট কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে স্থাপিত হয়েছে এবং তার উৎপাদন-হার হচ্ছে দৈনিক ১০ টন ধোঁয়াবিহীন কয়লা।

সম্পূর্ণ অনুপযোগী কয়লা থেকে গৃহস্থালী, শিল্প ও ধাতু নিষ্কাশন কাজের উপযোগী ধোঁয়াবিহীন জ্বালানী উদ্ভাবন হচ্ছে কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের আর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। এই পদ্ধতিতে চূর্ণ কয়লা পুড়িয়ে অঙ্গার, আলকাতরা ও গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। তারপর আলকাতরা থেকে পাওয়া একটি রাসায়নিক পদার্থ (পিচ) মিশিয়ে অঙ্গারের ঢেলা পাকানো হয় এবং সেই ঢেলাকে নির্দিষ্ট আকারে

কোকে ও সে'কে সংশ্লেষিত জ্বালানী প্রস্তুত করা হয়। জ্বালানী গবেষণাগারে যে প্ল্যান্টটি আছে তাতে দৈনিক ১০।১২ টন জ্বালানী উৎপন্ন হতে পারে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কাশ্মীরের শ্রীনগরে লিগনাইট কয়লাচূর্ণের সঙ্গে কস্টিক সোডায় ভেজানো কর্কের গুঁড়ো মিশিয়ে ও সেঁকে জ্বালানীর টুকরো তৈরী করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের কারুকুশলী ও যন্ত্রবিদেরা এই পদ্ধতির নকসা তৈরী করেছিলেন এবং প্ল্যান্টটি বসাবার সময় তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

কয়লার গ্যাসীকরণ : অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কয়লা ধোআগার ও অন্যান্য নিকৃষ্ট ধরনের কয়লা থেকে পাওয়া উপজাত জ্বালানীর গ্যাসীকরণ। এই গ্যাসীকরণের গুরুত্ব আছে দুটি দিক থেকে। প্রথমত কয়লার এই গ্যাস গৃহস্থালী ও শিল্পের কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয়ত কয়লা থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও তেল সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গ্যাস হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ ও তেলের উৎপাদন-ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ নির্ভর করে কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরীকরণ ও তার বিশুদ্ধিকরণের ওপর। জ্বালানী গবেষণাগারে বিভিন্ন রকম নির্দেশক প্ল্যান্টে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যেমন চূর্ণ কয়লার গ্যাসীকরণ, বাষ্প ও অকসিজেনের সাহায্যে উচ্চ চাপে কয়লার গ্যাসীকরণ। শেষোক্ত প্ল্যান্টটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রদত্ত ৩৫ লক্ষ টাকার অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছে। এটি হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে উচ্চ চাপে গ্যাসীকরণের সর্বপ্রথম প্ল্যান্ট। এতে জ্বালানীর অনুপযোগী কয়লাকে উচ্চ ক্যালোরিমানের জ্বালানী গ্যাসে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করা যায়। সেই সঙ্গে সার ও অন্যান্য মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ এবং তেল প্রস্তুতের সংশ্লেষিত গ্যাসও এতে উৎপন্ন হয়।

কয়লা থেকে তেল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন : কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে এ সম্পর্কে মূল্যবান কাজ হয়েছে। কয়লা থেকে রাসায়নিক পদার্থ ও তেল উৎপাদনের বিভিন্নরকম পদ্ধতি আছে—যেমন উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় কয়লার অঙ্গারান্তরীকরণ থেকে উপজাত দ্রব্য হিসাবে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, ফিশার-টপস পদ্ধতিতে কয়লার গ্যাসীকরণ ও পরবর্তী সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তেল ও রাসায়নিক পদার্থসমূহ পাওয়া যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় অঙ্গারান্তরীকরণের প্রাথমিক উপজাত দ্রব্য থেকে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল, ক্রেসল, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন, আলকাতরা ইত্যাদি। জ্বালানী গবেষণাগারে ন্যাপথালিন থেকে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুতির একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কোল-টার তরল অর্থাৎ আলকাতরার অনুঘটক জারণ প্রক্রিয়ায় থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড উৎপাদনের নির্দেশক প্ল্যান্ট এখানে চালু হয়েছে। এই থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড হচ্ছে রঞ্জনদ্রব্য, প্লাস্টিকস ইত্যাদি প্রস্তুতের মূল্যবান মধ্যবর্তী উপাদান। অপরিশুদ্ধ টার অ্যাসিড থেকে জলে দ্রবণীয় এক রকম রেজিনও এখানে সংশ্লেষণ করা হয়েছে। কাঠের গুঁড়ো, কাগজের মন্ড, পাটতন্তু ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে শক্ত বোর্ড প্রস্তুতের এটি হচ্ছে মূল্যবান উপাদান। আলকাতরার ক্ষারীয় অংশ পিকোলিন থেকে আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড ইত্যাদি মূল্যবান ভেষজদ্রব্য প্রস্তুতের একটি পদ্ধতিও এখানে উদ্ভাবিত হয়েছে।

নিম্ন তাপমাত্রায় অঙ্গারান্তরীকরণের উপজাত দ্রব্যগুলিও বহু মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থের উৎস। এ বিষয়েও জ্বালানী গবেষণাগারে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। আলকাতরার অংশ থেকে উচ্চ মানের ডিজেল তেল উৎপাদনের যে পদ্ধতি এখানে উদ্ভাবিত হয়েছে তা পেটেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানী গবেষণাগারে দীর্ঘকাল নিরলস গবেষণার ফলে দেখা গেছে, উত্তর আসামের কয়লাকে সহজেই তেলে রূপান্তরিত করা যায়। আসামের নাহারকাটিয়ায় পেট্রোলিয়ামজাত কাঁচা মাল থেকে যে কেরোসিন পাওয়া যায় তা সাধারণত ব্যবহারোপযোগী নয়। এখানে অনুঘটক হাইড্রোজেনেশান পদ্ধতিতে এই কাঁচা মাল থেকে ব্যবহারোপযোগী উচ্চমানের কেরোসিন ও ডিজেল তেল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া বারজিয়াস পদ্ধতিতে কয়লা থেকে সরাসরি তেল উৎপাদন এবং ফিশার-টপস পদ্ধতিতে কয়লার গ্যাসীকরণের মাধ্যমে তেল উৎপাদন সম্পর্কেও এখানে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অনুঘটক এদেশীয় কাঁচা মাল থেকেই এখানে প্রস্তুত করা হয়েছে।

কয়লা থেকে সার : কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে কয়লা থেকে সার উৎপাদন। এখানে সার উৎপাদনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তা হচ্ছে প্রথমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় বাতাসের সাহায্যে কয়লাকে জারিত করে বিভিন্ন হিউমিক অ্যাসিড উৎপাদন এবং তারপর অ্যামোনিয়ার সাহায্যে সেই অ্যাসিডকে নাইট্রোজেনযুক্ত সারে পরিণত করা। বর্তমানে এখানে যে নির্দেশক প্ল্যান্ট চালু হয়েছে তাতে দৈনিক ২ টন সার উৎপন্ন হতে পারে। গত চার বছর ধরে এই কয়লাজাত সার পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ধান ও গমের ফলনে বেশ উৎসাহজনক সুফল পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে আরও বহু মূল্যবান কাজ হয়েছে যার গুরুত্বও কম নয়। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এখানকার বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রত্যক্ষ করে আমাদের এই আস্থাই জেগেছে, আমাদের দেশের জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এবং সরকার ও শিল্পপতিদের যথোপযুক্ত সহযোগিতা পেলে সেগুলি দেশের অর্থনীতি ও প্রগতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারে।

আত্মকথন

সান্ত্বনা মজুমদার

গেটের পাশে দুটো দেবদারু গাছ, সোজা সরল, উঁচু মাথায় আকাশ দেখছে। অন্ধকারে ও দুটো যদি এখন মিলিয়ে যায়, তাহলে কি হয়?

লনে বসে অঞ্জনা কি অঙ্ক কষছে? মিলিয়ে গেলেই কি সব ঠিক হয়ে যায়? কিন্তু হ, য, ব, র, ল, র ফ্যাক্টার সেই অঙ্ক মিলিয়ে ফেললেও যে পেনসিলটা হাতে রয়েই গেল, অর্থাৎ অঞ্জনার মুছে নিশ্চিহ্ন করাটাও অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

তাহলে এখন ও কি করবে? গাছ দুটো উপড়ে ফেলবে, না যেমন আছে তেমনি থাকতে দেবে?

খুকুমনি, অই একই কথা গো, যে বিন্দু ভালবাসায় মুক্তা, সে মুক্তাই পচা ঝিনুক। আর আমি ত একটা স্লাইডার, ঘৃণ্য জীব, কেঁচো, ওয়াক, থুঃ। আমার খালি ঘেন্না।

আর এই ঘেন্না দলা পাকিয়ে আমার মনে মুক্তা হয়, মুক্তার মালা হয়।

অঞ্জনার মনে কথাগুলো চমকে গেল। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের এই সবুজ লনেও কি সে লোকটা মুক্তোর জন্য হাত বাড়িয়ে হাসছে? অন্ধকারে অঞ্জনা নড়ে চড়ে বসল।

শোন! এই ট্যাক্সি ড্রাইভার ছাড়া কি উটীতে আর দ্বিতীয় ড্রাইভার নেই?

কেন? এ ট্যাক্সি তোমায় কি করেছে? চমৎকার নতুন গাড়ী, সুন্দর ড্রাইভার, খাসা জাজমেন্ট, দুর্দান্ত সাহসী, আর কি চাই? বড় খুঁত-খুঁতে তুমি অঞ্জনা! প্রদীপ স্ত্রীকে এর বেশি আর কি বলবে?

হ্যা, দুঃসাহসী! অপমানকর, অঞ্জনা কি রাগে ছাই হয়ে যাবে?

ওর সাহসটাও অপমানকর? বাব্বা তোমার আবিষ্কারের ক্ষুরে নমস্কার। কথায় কথায় অপমান! এত অপমানবোধ থাকলে ঘোমটা দিলেই হয়! কিন্তু অঞ্জনাকে এত সব বলার সাহস কি আছে?

ওর উপস্থিতি, গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব, পোশাক, কথা, নাকের পাটায় আর ঠোঁটের পাশের কুঞ্চন, সব কিছুই যে সবাই সমীহ করতে শিখেছে।

প্রদীপ কি করে ওকে দু' একটা উপদেশ দেবে?

যাক্ গে চুপ করে আছে, চুপ করে থাকাই ভাল।

গার্ডেন চেয়ারের হাতলে অঞ্জনা হাত পালটাল।

কি মাস ছিল?

ডিসেম্বর!

পাতা ঝরার সময় নয়, ভাই! উটীর রাস্তায়, পাহাড়ের মাথায়, গায়ে, ঢালুতে, খাদে, থরে থরে লাল পাতায় ছাওয়া, ছড়ান গাছ ছিল। দিনে আলোর মত নিষ্প্রয়োজন, তবুও। রাত্রিতে রং অন্ধকারে জমাট, ক্ষতের মত, ভারী, বুকে চাপ ধরে। অন্ধকারে সব লুকিয়ে রাখা যায়, অপরের কাছ থেকে নিজের কাছ থেকে, নিগূঢ় অন্ধকার।

কিন্তু এখন ট্রেনের কামরা থেকে অঞ্জনার সামনে পাহাড়ের গা কেটে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে ফুলকপি, বাধা কপি, সালগম গাজর, মুলো, টমেটো সাজান। চোখে ধাঁদ লাগে।

অঞ্জনা কিন্তু অন্য কিছু দেখছিল আকাশের গায় পেঁজা তুলোর সজ্জায় সাজান উটী।

রুপু এদিকে এসো। অঞ্জনা মেয়েকে জড়িয়ে বাইরে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল এই নীলগিরি পাহাড়। আমরা কতটা ওপরে উঠেছি জান? আট হাজার ফুট। এগুলো চা-গাছ। ঐ যে দূরে লাল পাতায় মোড়া গাছগুলো, ওগুলো পাহাড়ী বট। আর এই কালো সাদায় লোমে ঢাকা থ্যাবড়া মুখো বেঁটে গরুগুলো, এরা হল নীলগাই। অস্ট্রেলিয়া থেকে এদের আনা হয়েছে। উটীর ঠান্ডায় ওরা দেশের আবহাওয়ায় আছে। ভারি মিষ্টি দেখতে না?

— ওরা বুঝি সাহেব?

না রুপু, ওরা নীলগাই! মা'র মত মেমসাহেব। প্রদীপ রুপুর দোষ শুধরে তবু একটা কিছু যাহোক শেখাতে চাইল।

পুরো কম্পার্টমেন্টে চোখ বুলিয়ে অঞ্জনা প্রদীপের মুখে এনে চোখ রাখল। নাকের পাটা কি ফুলছে?

সরি অঞ্জনা। ঘাট হয়েছে।

অঞ্জনা ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল ভুল আর কি! ভাবনা শুধু রুপু না সবার মাঝে এমনি করে কথা বলতে শেখে। কে আর বুঝছে! এখানে কেউ বাঙালী নেই। প্রদীপ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল।

বাঃ। বাঙালী নেই বলে বাঙলায় যা ইচ্ছে বলা যায়, লুকোচুরিতে সবই চলে বুঝি?

তা জানি নে। তবে কিছুটা না লুকোলে চলে না। সবাই লুকোয়। তা বলে স্ত্রীর সঙ্গে একটু মস্করার ইচ্ছেটা নয়। হুঁ! একট্রেন লোকের মাঝে এমনি ঠাট্টা ইয়ার্কি করা না অপমান করা। কথাটা অঞ্জনা খুব আস্তে বলল যাতে পাশের লোক এমন কি রুপুও শুনতে না পায়।

কোথায় ইঙ্গিতে একটু ভালবাসলাম আপ্যায়িত হবে, না বলছে অপমান করেছে। ভালবাসলেও অপমান হয় প্রদীপ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কি আর করবে? সব কিছুই ত মেনে নিচ্ছে। মেনে নেবে, মেনে নিতে হবে। তাই হোক।

শোন! আমরা কখন পৌঁছুব?

এই দশটা সাড়ে দশটায়!

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রুপু লাফিয়ে উঠল মা দুয়োরানীর কুঁড়ে। পাহাড়ের গায় ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি অঞ্জনাও দেখছিল। তাহলে বসতি শুরু হচ্ছে।

ট্রেনের পাশে এখন কাছে, দূরে, ছোট ছোট বাড়ি। একটি মিলিটারী জিপ্ এক ধাপ নীচে রাস্তায় ছুটে চলেছে। এই তাহলে কুণুর। পরের স্টেশনই উটী। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো পাচন হাতে গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। ওরাই কি জিতবে? হতেও পারে। অনেক সময় ক্ষমতাও যে হার মানে।

রুপু জামাটা কি নোংরা করে ফেলেছে? অঞ্জনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

না ঠিক আছে! পুল ওভারটা টেনে ছোট ছোট চুল কাঁটা কপালে ছড়িয়ে দিয়ে অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল।

সাড়ী বদলে আর কি হবে? হাত দিয়ে চুলটা ঠিক করে ছোট আয়নার খুব কাছে মুখ নিয়ে গেল। মুখ মুছল, আর একটু চকচকে হলে ভাল হোত না? শীতে চামড়া কেমন শুকিয়ে যায়। চোখ জ্বলজ্বলে আছে ত? সবই দেখে নিল কেননা এবারে নাববে যে।

প্রদীপ কোথায়? ঐ যে দরজায় দাঁড়িয়ে। রুপুর হাত ধরে অঞ্জনা ঘুরে দাঁড়াল। কম্পার্টমেন্টের অপর প্রান্তে প্রদীপের কাছে পৌঁছুতে ওর বিশেষ সময় লাগে নি। সবাই ওকে রাস্তা করে দিয়েছে। হাটখোলা দরজায় চোখ রেখে অঞ্জনা এগিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে প্রদীপ বলল, পাহাড়ে গাড়ী খুব আস্তে চলে অঞ্জনা।

অঞ্জনা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল অসাবধান! আমি তা বলছি না। দেখছিলাম সোজা দাঁড়িয়ে এ গাড়ী থেকে কিছুই দেখা যায় না, নীচু হয়ে প্রাক-হাঁটু গেঁড়ে, আকাশ পাহাড় সব দেখতে হয়।

রুপু মা'র পাশেই ছিল, মায়ের হাঁটু জড়িয়ে বলল আমি সোজা হয়েই সব দেখতে পাচ্ছি।

ঠোঁট প্রসার করে অঞ্জনা মেয়ের গায়ে আলগোছে হাত রাখল।

এখানকার সবারই কি সুন্দর স্বাস্থ্য!

খরগোসের লোমে তৈরী ফেল্ট টুপী, গলায় মাফলার, হাল্কা ব্রাউন পেন্ট কোট, সার্টের দুটো বোতাম খোলা, ছ' ফুট দেহ, রোদ চকচকে চোখ, ঠোঁটের মাঝামাঝি কাটা একটা দাগ, থুতনি অবধি নেমে, থুতনিটাকে দু ভাগ করে মাঝে একটা বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে, পকেটে দু হাত, ভদ্রলোক এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

অঞ্জনাকে এক নজর দেখে প্রদীপের দিকে ফিরে বললেন, ওদিকে গাড়ী।

অনিশ্চয়ে থতমত খেয়ে প্রদীপ বলল কাকে চান? ভদ্রলোক ভুল করেছেন, অঞ্জনা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

লোকটি সেলাম করে বলল সাহাব আমার ট্যাক্সি।

ঘাড় প্রায় আকাশে তুলে প্রদীপ প্রশংসায় আপাদমস্তক দেখে নিল বাঃ চমৎকার ড্রাইভার ত?

রুপুর হাত ধরে অঞ্জনা তখন ঘুরে পেছনের পাহাড় দেখছে। লম্বা গাছগুলো পাইন কি?

খোঁজাখুঁজির হাঙ্গামায় না গিয়েই ট্যাক্সি হাজির। খুসী মনে প্রদীপ তাড়া দিয়ে বলল চল অঞ্জনা, রুপু চল।

অঞ্জনা ফিরে দাঁড়িয়েছে, রুপু বাবার হাত ধরে যাও। ওর পথ জুড়ে লোকটি এসে দাঁড়িয়ে বলল খুকুমনি আমা সাথ চল।

রুপুর হাত ছেড়ে দিয়ে অঞ্জনা দূরে সরে দাঁড়াল।

গাড়ীতে ঢুকে লাল সিটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে রুপু বলল ড্রাইভার আমার বাবার গাড়ীর চেয়েও তোমার গাড়ী খুব ভাল।

ওরে বাবা! ড্রাইভার জিভ কেটে কানের লতিতে চিমটি কাটল গ্যা। হয় খুকুমনি, তুলনায় পাপ লাগে, অই কি হয়? আপনার বাবার সব ভাল, গাড়ী ভাল, বাড়ি ভাল, আপনি ভাল, আর সব আরো ভাল। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করে দরজা খুলে বলল, মেমসাহাব মেহেরবানি [illegible]।

অঞ্জনা গম্ভীর, ঠোঁট চেপে ব্যাগের ভেতরটায় চোখ নাচিয়ে কি খুঁজছে প্রদীপকে বলল তুমি ওঠ।

উটীর উঁচু নীচু রাস্তা ভেঙে ট্যাক্সি এসে হোটেলে পৌঁছুল। সমতল প্লেটোর উপর অনেক জায়গা জুড়ে হোটেল। সাদা রঙ বাড়ি ছোট্ট ছাড়া ছাড়া কটেজ।

পেছনে সোজা পাহাড়ের দেওয়াল। দূরে গাছের ছায়ায় শীতের মৌন উটী।

সুন্দর!

অঞ্জনা কটেজে থাকবে। তাই ঠিক করা। ড্রাইভারই জিনিসপত্তর পৌঁছিয়ে [illegible] দিল।

গাড়ী থেকে প্রদীপ নেমে এল, [illegible]

[illegible]

ম্যানেজার খুলে ড্রাইভার এসে পাশে [illegible] ৫ওড়া [illegible] অপেক্ষা করছিল।

অঞ্জনা শুধু দু'দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মেমসাহাব [illegible] পাশের খুকুমণির [illegible] একোমেলো হাওয়া দিল। [illegible] বাইরে [illegible] বলল আজ কি [illegible] হাওয়া, [illegible] বড় [illegible] মেমসাহাব, এর নিশ্বাস নাই, কলকাতায় এর নিশানা মিলে না। ইখানে সব হুঁসিয়ার হতে হয়। খুকুমণিকে আজ [illegible] দিবেন না। ড্রাইভার এটা ওটায় হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল। এটাচিকেসের উপর অঞ্জনার হাত চেপে বসে গেছে।

ড্রাইভার তখন বাইরে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে উটীর গাছের মতই সোজা দাঁড়িয়ে, প্রদীপকে বলল কদ্দিন আছেন সাহাব? [illegible] চেয়ারটা রোদে টেনে আরাম করে [illegible] পা নাচাচ্ছিল। যাক —। বাঁচা গেল, এর কাছেই ত সব জেনে নেওয়া যাবে। [illegible] আয়েস করে সিগারেট ধরিয়ে বলল [illegible] তোমাদের উটী দেখা হয়ে যাবে, কি বল ড্রাইভার?

সাহাব! পুরো জনম দেখে ওকি দেখা হয়? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে মন যদি বলে হয়েছে, তবে না মুক্তি। নইলে একটা প্রশ্ন থাকেই কি বলেন সাহেব? পরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল তবে যা-যা দেখাবার সব আমি তিন দিনেই সেরে ফেলব। ঘাড় কি বলে সাহাব? ড্রাইভার সাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এগারটা পাঁচিশ।

খানা-পিনা করে আরাম করেন, তিন বাজে আমি আসব। লম্বা সেলাম করে ড্রাইভার বেরিয়ে গেল।

সিগারেট শেষ করে প্রদীপ কম্পাউন্ডে নেবে এল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। একটু দূরেই অফিস ঘর। এখন সিজন নয়। ভীড়ও নেই। পুরো হোটেলে আর কজনই বা হবে? সর্বত্র আলসেমির আমেজ। হোটেল বয়, মালি, সব বাগানে রোদে পিঠ রেখে বসে আছে। অফিস ঘরও চুপ। প্রদীপেরও কি এই ম্যাড়মেড়ে উটীতে আসার ইচ্ছে ছিল? কিন্তু কি করা? অঞ্জনার ত সবই ওরকম—অফ সিজনে উটী দেখবে।

এখন দেখ এই ট্যাক্সিওয়ালাকে! এ ছাড়া আর ত দ্রষ্টব্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

ম্যানেজার কেরালার লোক। অফিসেই ছিলেন। বাঙালী শুনে যেন আকৃষ্টই হয়েছেন। ঘাড়ে গর্দানে স্থূল ভদ্রলোক মোটা মোটা ঠোঁট দুটো আলগা করে অনর্গল বকে চলেছেন—পরশুর কাগজেই না দেখলাম কলকাতায় আবার গোলমাল, কলেজ স্ট্রীটে দুটো ট্রাম পুড়িয়েছে? এ এক চমৎকার দেশ মশাই। ভদ্রলোক খুসিতে টেবিলের উপর প্রায় গড়িয়ে এলেন। আমি দু'মাস বাঙলা মুলুকে ছিলাম চাল নেই, চিনি নেই লাগাও মার-পিট। পরীক্ষা এসেছে, ভাঙ্গ চেয়ার-টেবিল। ভদ্রলোক উরুতে থাপ্পড় মেরে পেট দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন। তবে একটা কথা দাদা বাঙালী আর মালাবারীদের একই মেজাজ, চেহারায় স্বভাবে খাওয়ায় আমরাও ভাত খাই মশাই কিন্তু চাল কই? দেশের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছেন কি?

ভদ্রলোক যেভাবে কথা বলছেন ভাববার অবকাশটা কোথায়? তবে মন্দ কি! ছুটির মেজাজে প্রদীপের ত ভালই লাগছে। তবে কিনা অঞ্জনা বসে রয়েছে।

এক ফাঁকে প্রদীপ উঠে দাঁড়াল, টাকা জমা, ধন্যবাদ, সব দায় সেরে মাঠে নেবে এল।

ভদ্রলোকও নাছোড়! কথা বলার লোক পেয়েছেন ছাড়বেন কেন? চেয়ার ঠেলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বিশ বছর আমার এ হোটেল মশায়, হোটেল নয় ত অজগরের বাঁধন। দুনিয়ার সবার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি দাদা। দুদিন থেকে ত আপনারা হাওয়া, আর আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখেছেন কি? আমি এখানে বসে আপনাদের ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে ঝাপসা দেখি। এ কি যন্ত্রণা বলুন ত? ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

কাচে ঢাকা বারান্দায় অঞ্জনা বসেছিল। প্রদীপ ও ম্যানেজার ঢুকতে, উঠে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকের অনর্গল কথায় কি হল? বড্ড বেশি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে না?

আলাপ করিয়ে দিতে সসম্ভ্রম ম্যানেজার কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে ফেললেন আপনার এখানে কষ্ট হবে।

অঞ্জনা দাঁড়িয়েছিল। বাইরে দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে কষ্ট হবে ভাবা নিবুদ্ধিতা নয় কি?

তা বটে! তা বটে! ভদ্রলোক হ্যা হ্যা করে একচোট হেসে তারপর যেন এই প্রথম এই বিশেষ জায়গাটি দেখছেন, তেমনি করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, এরপর আর কি করার আছে? বিনীতভাবে শুধু বলা আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা দেখছি। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রূপুর পাশে শুয়ে প্রদীপ বলল, অঞ্জনা তিনটেয় ডেকে দিও। ড্রাইভার আসবে।

অঞ্জনা তখন ড্রাইভারের রাখা সুটকেস, এটাচিকেসের জায়গা বদলাচ্ছে। কিন্তু রাখবেই বা কোথায়? ঐ একটিই জায়গা, যেখান থেকে চট করে সাড়ী টানার সুবিধে, এটাচিকেসের ডালা একটানে খুলে জিনিষ বের করার সুবিধে। তবু দুহাতে সুটকেস ধরে উপুড় হয়ে, খাটের নীচে সুটকেসটাকে ঠেলে ঠেলে ঢোকাল।

ঠিক তিনটেয় সামনের কাঁচে ছায়া পড়ল, ড্রাইভার এসেছে। অঞ্জনার ধাক্কায় প্রদীপ এলোমেলো উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, তুমি ত খুব পাংচুয়েল ড্রাইভার!

ড্রাইভার সেলাম করে বলল, গরিব আদমীকা হুঁসিয়ার সাহাব। আপন গুস্তাকির মাফ নাই, ধরম করম সব ঝুট মানে। তারপর একটু কথা রেখে বলল, আপনি দাঁত-মাজছে তৈয়ার হন সাহাব। আমি গাড়ীতে বসছি।

প্রদীপের চোখ তক্ষণে কপালে, বাব্বা এত দেখছি কথামৃতর জাহাজ।

রূপুকে তৈরী করে নিজে তৈরী হয়ে অঞ্জনা যখন বেরিয়ে এল, সাড়ে তিনটে, অজস্র রোদ, খোলা মাঠে হু-হু হাওয়া, কার্ডিগান ভাল করে টেনে গায়ে জড়িয়ে, দরজায় তালা দিয়ে অঞ্জনা গাড়ীতে উঠবে, ড্রাইভার ছুটে এসে দরজা খুলে দিল, রূপুকে কোলে করে নিজের পাশে বসিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, আজ উটীকে ভাসা ভাসা চিনে নিন সাহাব, এক চক্করে সব দেখাচ্ছি, কাল বটানিক্যাল গার্ডেন, গভরণরের বাড়ী, রাজার বাড়ী, আদিবাসীর ঘর, সব দিখাব। তিনদিন আছি। তোমার মর্জি মাফিক সব দেখিয়ে

দাও। বাড়ী গিয়ে যেন আফশোষ না থাকে। প্রদীপ ড্রাইভারের ওপর সব ছেড়ে দিল।

স্টিয়ারিং-এর সামনে থেকে আওয়াজ আসে, সাহাব আপনার মেহেরবাণি।

আওয়াজের গভীরতায় অঞ্জনা মুখ তুললো, আয়নার ভেতর দিয়ে দুটো চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

একি! বিরক্তিতে নাক ও ঠোঁট কুচুকে উঠল, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, মুখ বাড়িয়ে জানালা দিয়ে অঞ্জনা পাশের উটী দেখতে লাগল। সামনে আর তাকাল না।

গাড়ী নীচে নামছে। স্টেশন পাশে রেখে একটানা অনেকটা নীচে নেবে উটীর লেক। লেকের জলে লাল নীল হলদে অজস্র বোট নাচছে।

রুপু বায়না ধরল, মা আমি ঐ নীল বোটে চড়ব। অঞ্জনার জলে বড্ড ভয়, বললে, না রুপু বায়না করতে নেই, ঠাণ্ডায় বোটে চড়ে না।

প্রদীপ ফস করে বলে বসল, ছেলে-মানুষ চাইছে, চড়লই বা। সামনের দুটো চোখ অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অঞ্জনার পাথর মুখ বাইরে তাকিয়ে রইল, কিছুই বলল না। খুকুমণি মার বাকি মানতে হয়, অমান্যে পাপ লাগে, এমন পাপ করে না। গাড়ী চালাবে খুকু? এই ত ডাইনে চলো, বায়ে চলো, প্যাপ-প্যাপ ভাগ-ভাগ। দুজনে মিলে হেসে কুটি-কুটি হয়ে গাড়ী চালাচ্ছে।

যাক—। প্রদীপের বেফাঁস কথাটা ড্রাইভার সামলে নিয়েছে। গাড়ী চলছে। হঠাৎ ওদের দুজনের কথা হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচে হাত রেখে চুপ করে উঠে দাঁড়িয়ে রুপু রাস্তা দেখছে। সরু রাস্তার দুধারে আকাশ ছোঁয়া লম্বা লম্বা গাছ হু-হু করে পেরিয়ে যাচ্ছে, হাওয়ার শিসে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রদীপ বলল, তোমাদের এ গাছগুলো উটীকে বিষণ্ণ করে দিয়েছে, এ কি গাছ?'

ইকিউলিপটাস। এ গাছ নয় সাহাব, এ উটীর পাহারাদার, দেখিয়ে কেমন হুঁসিয়ার হয়ে দেখছে।

ওরে বাব্বা! কবিত্বর এযে দেখছি আরো এক কাঠি সরেস। প্রদীপ অঞ্জনার দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসল।

লেক পেরিয়ে গাড়ী ঘুরে ফিরে কাঁটাতারে ঘেরা খোলা মাঠের মাঝে এসে দাঁড়াল।

রুপু কোলে ড্রাইভার নেমে বলল, চলেন সাহাব ইকিউলিপটাসের তেল তৈয়ার দেখবেন।

রোদ থাকলেও ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গাড়ীর গরমে অঞ্জনা কার্ডিগান খুলে ফেলেছিল। গাড়ীতেই রেখে এসেছে। সাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে অঞ্জনা এগুতে লাগল।

পেছনে ড্রাইভারের আওয়াজ মেম-সাহাব?

একহাতে রুপু, অন্য হাতে কার্ডি-গানটা বুকে জড়িয়ে ড্রাইভার কাটা চিবুকে দাগ কেটে বলল, নিন মেমসাব।

একটু ইতস্তত, তারপর গরম কার্ডি-গানটা অঞ্জনা আঙুলে ছুঁয়ে রাখল।

ইকিউলিপটাসের পাতায় স্তূপাকার, ছোট একটি ঘরের সামনে ওরা সবাই এসে দাঁড়াল।

পাতা জ্বালান হচ্ছে। ঘর ভর্তি ধোঁয়া, ভেতরে মুখ বাড়িয়ে অঞ্জনা ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে দেখল, রুপুকে হাত ধরে দেহাতী লোকটির বলা কথা প্রদীপকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সেদ্ধ করা পাতা আধ শুকিয়ে কিভাবে তেল বার করা হয়।

রুপুর নাকে মুখে ধোঁয়া ঢুকছে।

অঞ্জনা দুপা এগুলো, রুপু চলে এসো, সর্দি হবে।

ওকে কোলে তুলে ড্রাইভার বলল, মেমসাহাব আপনি বাহির যান। ধুঁয়া লাগবে। খুকুমণি ঠিক আছে, ইকুলিপটাসের ধুয়ায় জুখাম হয় না, জুখাম ঠিক হয়। রুপুকে বুকে জড়িয়ে ফিরে প্রদীপকে আবার তেলের উপকরণ দেখাতে লাগল। অঞ্জনা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সব দেখে শুনে শিখে প্রদীপ বেরুচ্ছে, দরজার পাশে অঞ্জনাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ধোঁয়ায় দাঁড়িয়েছিলে, বাইরে দাঁড়ালে না কেন?

অঞ্জনা কথাটা উড়িয়ে দিলে, ঠিক আছে চল। ও গিয়ে ওপাশে বসল। এদিক থেকে গাড়ীর আয়নাটা দেখা যায় না।

ছোট শহর। পাহাড়ী সরু সরু রাস্তা, ওপর নীচ ঘুরে ফিরে অজস্র গাছের ভেতর, মৌমাছির ঘরের পাশ কেটে বাজারে পৌঁছুতে ওদের একঘন্টাও লাগেনি।

বাজার দেখে অঞ্জনা নড়ে চড়ে উঠল। প্রদীপকে কিছু বলবে সামনের চোখ দুটো বলে উঠল, মেমসাহাব ইখানে সাচ্চা মধু নিয়ে যান। এমন সাচ্চা চিজ আর মিলবে না। তারপর প্রদীপকে বলল, সাহাব আমাদের এ গরীব দেশের সব সাচ্চা, মাটি, আশমান, দিল, সব। আমরা ঝুটার কারবার জানি না।

পাহাড়ের সবই সাচ্চা ড্রাইভার প্রদীপও আবৃত্তি করল।

হোটেলে এসে যখন ওরা পৌঁছুল, রোদ তখনও গাছের মাথায় সোজা হয়ে লেগে আছে।

সামনের রাস্তা দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, সাহাব পয়দল এই রাস্তায় ঘুরে আসি। ইখান থেকে উটীর খুবসুরতী দেখে আপনার তবিয়ত খুস হোয়ে যাবে।

রুপু বক-বক করতে করতে ড্রাইভারের হাত ধরে চলল।

অঞ্জনা বড্ড বেশি চুপচাপ। প্রদীপ ওকে সব সময় বুঝে উঠতে পারে না, ঘাঁটাতেও সাহস নেই।

সুতরাং ড্রাইভারের সঙ্গেই ভাব জমাচ্ছে, তোমার নাম কি ড্রাইভার?

ড্রাইভার বিনীতভাবে বলল, সাহাব আমি উটীর ফকির মহম্মদ।

আঃ। প্রদীপ আড়চোখে অঞ্জনাকে দেখে নিশ্বাস ফেলে বলল, আমিও ফকির, বুঝলে মহম্মদ!

হ্যাঁ সাহাব! আপনি বড়া শৌখিন আদমী।

রাস্তাটার শেষ কবরখানায়। শেষ মাথায় রাস্তাটা পাক খেয়ে কবরখানা ঘিরে রয়েছে, নীচে লেকের জলে ... এক অংশ তারা হয়ে ফুটে আছে।

অঞ্জনা আঁৎকে উঠল এই পাথরের দেশে আবার কবরের পাথর দেখে ও রুপুকে কাছে চাইছিল। কিন্তু রুপু যে তখন নিশ্চিন্তে ড্রাইভারের হাত ধরে চলেছে।

প্রদীপও চমকে বলল, একি মহম্মদ!

মহম্মদ হাসে, আঁধার দেখছেন সাহাব? প্রশ্ন বটে খোদার এ বেহেস্তে এ আঁধার কেন? কিন্তুক সাহাব রাস্তা ... কবর পাক খায়, সুখ-দুখ ঘুরে, অমৃত, গরল ঘুরে, পাক খায়, আলো, আঁধার ঘুরে, পাক খায়, সবই এক সাহাব!

এবারে প্রদীপ মুগ্ধ, মহম্মদ কে তোমাকে এসব কথা শিখিয়েছে? মহম্মদ হাসে গরবী কুথায় শিখবে সাহাব! আপনারা শিখায়েছেন। আমি ড্রাইভার, ঘিণাজীব, আপনি তা মানলেন না, আমার সাথ কথা বলছেন, আমার মনে বাতি জ্বালালেন, কেউ বাতি জ্বালে সাহাব, কেউ আন্ধার ঢালে। মহম্মদ হাসে, সবই এক।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে রূপুকে মাঝে বসিয়ে অঞ্জনা ও প্রদীপ গাড়ীতে উঠল। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। গোঁ-গোঁ করে গাড়ী ছুটে চলল। তারা হয়ে ফুটে থাকা উটীর সব আলো একসময় নিভে গাড়ীটাকে অন্ধকার ঝিঁ-ঝিঁ ডাকের মাঝে ছুঁড়ে মারল। অঞ্জনা দরজার হাতল চেপে কাঁচে মুখ ডুবিয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে রইল আর ঐ ঝিঁ-ঝিঁ ডাক ঝিম ঝিম করে ওর বুকে মাথায় জড়িয়ে জড়িয়ে ওকে অন্ধকারে তলিয়ে দিতে লাগল। অঞ্জনা হাতল চেপে বসে রইল। সরু রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িগুলোর ওপারে আদিম পৃথিবী নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে। বিশ্বাস বন্ধ করে হাতল চেপে অঞ্জনা সামনে তাকাল। স্টিয়ারিং-এ থাবা দুটো চেপে মহম্মদ বসে আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জমাট অন্ধকার ওদের গ্রাস করছে। গাছের আড়ালে ঝটপট ঝুটোপুটির আওয়াজ তারপরই হুড়মুড় করে দুটো হরিণ রাস্তায় বেরিয়ে এল। আচমকা আলোয় এসে দুজন গা ঘেঁসে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথা নীচু, পিছু হটে, নিঃশব্দে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গাছের সঙ্গে মিশে এদিকে তাকিয়ে রইল। অন্ধকার ডালপালা মেলে স্থির। নিস্তব্ধ।

সাহাব এ পেয়ারের জঙ্গলে দিল আনচান করে।

কিন্তু তোমার হাতী বাঘ বাইসন কোথায়?

আঁধারে সব লুকিয়ে আছে সাহাব। সময় বুঝে বাহার আসবে।

তাই আসুক মহম্মদ। এ যে মিইয়ে যাচ্ছি।

আয়েগা সাহাব, সবুর কিজিয়ে। স্টিয়ারিং-এ থাবা চেপে আদিম জানোয়ার অন্ধকারে ছুটে চলল।

ঝুপ করে একটি খরগোস রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল, খুটখুট করে হরিণ বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটি নেকড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলল, প্রদীপ গলা বাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল নেকড়ে নাকি? ও হাঁপাচ্ছে, নেকড়েটা ছুটতে ছুটতে এক সময় পাশের জঙ্গলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে গেল। হাওয়ায় সর-সর করে অনেকগুলো পাতা একসঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। আর আলোর সামনে অনেক-ক্ষণ ধরে পাতাগুলো ওঠানামা করল। তারপর সব চুপ। অঞ্জনা হাতল চেপে ধরল, ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, আর ঐ ডাক শিস দিয়ে দিয়ে ওকে অনেক দূরে এক মহাশূন্যে নিয়ে বিন্দু বিন্দু করে অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। গাড়ীটা একসময় আস্তে, থেমে থেমে, দাঁড়িয়ে গেল। শিস দিচ্ছে। মাটি, আকাশ, জঙ্গল অন্ধকার হিস-হিস করে টেনে টেনে শিস দিচ্ছে। স্তব্ধ গাড়ীটায় স্টিয়ারিং-এ থাবা চেপে মহম্মদ চুপ। অঞ্জনা সামনে তাকিয়ে ঐ শিসের ডাক, যে ডাক ও অনেকদিন ওর বুকে শুনতে পেয়েছে তা টেনে নিচ্ছে।

প্রদীপ চুঁপি চুঁপি বলল, মহম্মদ?

সাহাব সবুর।

অন্ধকারের গুহা থেকে খুন করে জঙ্গলের আত্মা রাস্তায় এসে পড়ল। পেঁচিয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে, এক হয়ে সমস্ত রাস্তা জুড়ে পড়ে রইল। তারপর তেমনি জড়িয়ে জড়িয়েই রাস্তা পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মহম্মদ চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। একসময় গাড়ী আবার চলতে শুরু করল।

আ আমি বমি করব রূপু কেঁদে উঠল।

রাগে ভয়ে কিড়মিড় করে প্রদীপ খেঁকিয়ে উঠল, তখনই বলেছিলাম, সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। এখন সাপ খোপ থাক।

অঞ্জনা চাপা গলায় বলল, বাংলা বুঝতে না পারলেও অজস্র কথা সবাই বুঝতে পারে।

কথার নিকুচি করেছে। প্রদীপ ভেঙচিয়ে উঠল।

স্টিয়ারিং ছেড়ে মহম্মদ বেরিয়ে এল, সাহাব ঘাবড়াবেন না। আমি খুকুকে দেখছি।

রূপু হাত-পা ছিটিয়ে চীৎকার করতে লাগল, তুমি না, মা। দরজা খুলে প্রদীপ ফিসফিসিয়ে বলল, আলো নিভিয়ে দাও মহম্মদ, ওর গলা কাঁপছে।

অন্ধকারে বিরাট জানোয়ারের মত মহম্মদ দাঁড়িয়ে আছে। হাতল ছেড়ে গুহার ভেতর থেকে অঞ্জনা বেরিয়ে এল। বাইরে সমস্ত অরণ্য হিস-হিস করে টেনে টেনে শিস দিতে লাগল আর ঐ শিসের ডাক পাক খেয়ে খেয়ে ওপর নীচ ডাইনে-বাঁয়ে মহাশূন্যে বৃত্তাকারে বাড়তে বাড়তে গাছ জঙ্গল রূপু ওর স্মৃতি ভবিষ্যৎ সব নিশ্চিহ্ন করে ওকে দলে পিষে ছেড়ে দিল। ঐ শিসের ডাক বুকে টেনে দুহাত বাড়িয়ে অঞ্জনা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর সেই অন্ধকারের লোমশ দুটো হাত ওর বুক হাতড়ে ওর আত্মাকে দেখল, জিভের স্বাদ চাটল, সরিসৃপের মত ওকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দূরে টিঁহু টিঁহু করে একটা পাখি ডেকে উঠে, থেমে গেল।

রূপু ডুকরে উঠল, মা জল।

অঞ্জনা অন্ধকারের লোমশ গহ্বর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গাড়ীতে বসল।

টপ-টপ করে ওর গাল বেয়ে জল ঝরছে।

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের দশের পাশে বসে অঞ্জনা সামনে তাকাল। গেটের পাশের গাছ দুটো অন্ধকারে আকাশ দেখছে।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

শিউপ্রসাদজি তাঁর কাহিনী বলে চললেন···

চিড়িয়ামহল থেকেই যেন আওয়াজটা পেলাম

কেউ কি ওই দিক দিয়ে লুকিয়ে ঢুকেছে

দরোয়ানকে ডাকা এখন বৃথা। নিজেকেই যেতে হবে!

একটা চাপা শব্দ! কিসের?

মাপ করবেন শিউপ্রসাদজি! আপনি নিজে পিস্তল নিয়ে·· মানে-

সঙ্কোচ করবেন না। যে অন্ধ পিস্তল তার কি কাজে লাগবে ভাবছেন ত? কিন্তু যৌবনে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হলেই কানে শোনা জগতের জন্যে নিজেকে আমি তৈরি করেছি। আমার —

শব্দভেদী লক্ষ্যসন্ধান প্রায় অব্যর্থ। অ্যালবামেই তার ছবি পাবেন। পাতা উল্টে যান —

চিড়িয়ামহলে গিয়ে ঢুকতেই আবার সেই শব্দটা পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

কে যেন আমার দিকে ছুটে আসছে।

একটা ধাক্কার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলাম ধাক্কার শব্দ না আমার গুলি কোনটা আগে বলতে পারব না।

বুম

অঙ্গনা

সমান অধিকারের বিস্তৃতি

আজকের বিপ্লব, সমান-অধিকার। সূচনা কালের ঠিকুজী-কুলুজি অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিচার নিষ্প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় হাত সেদিন মুষ্টিবদ্ধ ছিল। সংকল্পে অটুট। প্রবল প্রতিপক্ষ। উদ্ধত তর্জনী। হুংকার, তর্জন-গর্জন। তূণীর নিঃশেষ। দিকে দিকে সংবাদ শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ পতনের। জয়োল্লাস। আমোদ প্রমোদে গা ভাসানো নয়। জোরো জাগরণ। অধিকার আদায়ে পাল্লা কষা। প্রতিজ্ঞামুখর লাখো কোটি হাত। পর্যুদস্ত প্রতিপক্ষ। হাতবল। একে একে মেনে নিল অধিকারের বিস্তৃত তালিকা।

অনেক অধিকারে সমৃদ্ধ অথচ মৌল অধিকারে বঞ্চিত ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর জার্মানীর নারীসমাজের ভোটাধিকার স্বীকৃতি আদায় করলো। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে নারীসমাজের সমান অধিকারে কোন প্রতিবন্ধক নেই আর আমাদেরও সংবিধান এই অধিকার মেনে নিয়েছে গোড়া থেকে। চলেছে আমাদের অধিকার আদায়ের বিজয় রথ। ঘর্ঘর শব্দে দিকবিদিক মুখরিত।

অধিকার আমরা আদায় করেছি। প্রতিষ্ঠিতও করেছি। তবু ফাঁক থেকে গেছে অনেক। আমরা পাহাড়ে চড়েছি, মহাকাশ অভিযান করেছি। কিন্তু দৈহিক অপটুত্বের সার্টিফিকেট এখনও কাঁধ থেকে পুরোপুরি নামিয়ে ফেলতে পারিনি। আর যাই হোক, এজন্য চিরাচরিত সংস্কার দায়ী অনেক পরিমাণে। আমরা নিজেরাই নিজেদের অনেক কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। অনুপযুক্ত মনে করি। নিজেদের এই অবিবেচনা প্রসূত বিবেচনার ফল হয় মারাত্মক। সুযোগ নেয় অনেকেই। তাই নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজে সুযোগ পেয়েও নির্লিপ্ত থাকতে হয় আমাদের। এসব জায়গায় আমরা আছি অথচ আমাদের অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হয়।

উদাহরণ অসংখ্য। এমনি একটি হলো পুলিশের চাকরি।

নারী পুলিশ প্রায়ই অ্যাকশন বিহীন। খুব বড় ধরনের কাজ তাঁদের প্রায়ই থাকে না। কোন ব্যাপারে মেয়েরা জড়িত থাকলেই একমাত্র ডাক পড়ে তাঁদের। এছাড়া এঁদের অন্য কাজ হলো অপরাধী ছেলেপুলের তত্ত্বাবধান এবং জিজ্ঞাসাবাদ। নারীরা স্বভাব দুর্বল। এই অজুহাতে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং অপারেশনে তাঁদের ডাক পড়ে না।

এবার এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেছে। পুলিশের কাজেও মেয়েরা সমান যোগ্যতা প্রদর্শনের দাবী জানিয়ে সমান অধিকারের আওয়াজ তুলেছে। এ কৃতিত্ব পশ্চিম জার্মানীর নারী পুলিশ বাহিনীর। দেশে দেশে এই আন্দোলনও যে অচিরে দানা বাঁধবে বলাই বাহুল্য।

স্বভাব দুর্বলতার বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীর নারী পুলিশ বাহিনী প্রতিবাদ জানিয়েছে। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ আর মহিলা সংক্রান্ত অ্যাকশনে নিজেদের পুলিশী দায়িত্ব শেষ করার ইচ্ছে তাঁদের নেই। তাঁরা সর্বস্তরের পুলিশী কাজে নিজেদের যুক্ত করতে চান। এ সম্পর্কে কেউ কেউ নারী পুলিশ বাহিনীকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁদের মতে, পুরুষ পুলিশদের মতো নারী পুলিশকে একই কাজে নিয়োজিত না করার কোন যুক্তি নেই।

আধুনিক চিন্তাধারায় ক্রাইম স্কোয়াড আর এলোমেলো কিছু নয়। বহুলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই স্কোয়াড উন্নত। তাই নারী পুলিশ এখন স্বচ্ছন্দে পুরুষ পুলিশের অনুগামী হতে পারে। একসময় অবশ্য এক্ষেত্রে সংখ্যাল্পতা অনেকখানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো এবং অনেক দেশেই এই সমস্যা এখনো বর্তমান। তবে পশ্চিম জার্মানীতে পরিস্থিতি ভিন্ন। এই অজুহাত এদেশে অচল। প্রতি বৎসরই প্রচুর নারী পুলিশ রিক্রুট করা হচ্ছে।

নারী পুলিশ রিক্রুট করা হলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। অনেক মহিলা পুলিশের কাজ করতে এসে গোড়া থেকেই সেই বাঁধাগতের কাজ ভীষণ অপছন্দ করেন। ইয়ং ড্রাংকস, বাচ্চাদের যারা মারধোর করে এধরনের গতানুগতিক কেস নিয়ে পড়ে থাকতে খুব অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের মনোগত অভিপ্রায়, ক্রাইম স্কোয়াডে যোগদান।

নারী পুলিশ বাহিনী যেসব কাজ-কর্ম করে, সত্যি কথা বলতে কি তা থেকে মনেই হয় না এঁরা পুলিশ বিভাগে কাজ করছেন। এর বদলে ধারণা করা সহজ যে, তাঁরা সমাজকল্যাণ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। আসলে পুলিশের কাজেই তাদের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া ক্রাইম স্কোয়াডে এমন কোন কাজ নেই যা একমাত্র পুরুষ প্রবরের জন্যই নির্দিষ্ট থাকতে পারে। একসময় এই নিয়ম চালু থাকলেও বরাবর তা চলতে পারে না! এখানেও কিঞ্চিৎ সত্যভাষণ প্রয়োজন। একজন 'হার্ড বয়েল্ড' আর রাফ নেক আসামীর পক্ষে সুন্দরীর কাছে ধরা দেওয়া যত সহজ, হার্ড-বিটেন পুরুষ প্রবরের পক্ষে নিঃসন্দেহে তত সহজে কাজ হাসিল হয় না।

এভাবে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর নারী পুলিশ ক্রাইম স্কোয়াডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে, এজন্য যে ট্রেনিং প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ভাগে ভাগে। প্রথম ট্রেনিং পেয়ে ক্রাইম স্কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাদের সংখ্যা নয়জন। এঁদের একজন তাঁর পূর্বের ডিউটি সম্পর্কে বললেন, অনুবাদক এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টান্টের কাজ আমায় ক্লান্ত করেছে।

দাগী অপরাধীরা পুলিশী অভিযান সম্পর্কে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এরকম একজন ধরা পড়ার পর বলেই বসলো, পুলিশের হাত থেকে ধূলো দিয়ে কেটে পড়া আমার পক্ষে এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু এরকম একটি সুন্দর মেয়ে যে এ দলে থাকতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। আর এখানেই ফেঁসে গেলাম।

পুলিশ বাহিনীতে অনেক নতুন ধরনের মেয়ের আগমন ঘটছে। একদল মেয়ে এখনো সেই চিরাচরিত কাজই পছন্দ করে। এর বাইরে যেতে তাঁরা রাজী নন। আর একদল কিন্তু নিজেদের অধিকারে করতে চান প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁরা চিরাচরিত কাজের বাইরে যেতে চান। এঁরা খুবই চালাক বুদ্ধিমান এবং সতর্ক। বিপদ এড়িয়ে কিভাবে কাজ হাসিল করতে হয় সে তাঁদের খুব ভাল জানা আছে।

ক্রাইম স্কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেয়েরা এমন সেজেগুজে বেরোয় যেন তারা বেড়াতে বেরিয়েছেন।

পুলিশের এই কাজ কি মেয়েদের পক্ষে খুবই কষ্টকর? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেন, ডাক্তারের সহকারী অথবা নার্স হিসেবে যে বিভৎসতার সঙ্গে তাদের পরিচিত হতে হয় এতো সে তুলনায় কিছু নয় বলা চলে। মেয়েরা আরো বেশি কার্যকরী হবে কারণ অনেকেই বুঝে উঠতে পারবে না যে, হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে ঐ মেয়েটি। তাছাড়া ট্রেনিং আছে খুবই ভাল। বিপদের মুখোমুখি এলেই সকলে একসঙ্গে কাজ শুরু করবে। এক্ষেত্রে মেয়েদের বেলায় যেমন পুরুষদের বেলায়ও ঠিক তেমনি।

অবস্থার মোকাবিলার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন। তবে পিস্তলটা কোথায় রাখা হবে এটা নিয়েই ঝামেলা। মেয়েদের কোমরে পিস্তল রাখা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছুনো যায়নি। তবে আপাতত কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অনেকেই পিস্তল নিয়ে যেতে চান হাত ব্যাগে পুরে।

অসংখ্য আবেদনপত্র আসছে। পুলিশে যোগদানের ব্যাপারে জার্মান তরুণীদের মধ্যে একটা উৎসাহের প্রাবল্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। কর্মখালির তুলনায় আবেদনপত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। এই ঝোঁক কতদিন বজায় থাকে সেটাও লক্ষণীয়।

—প্রমীলা

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য
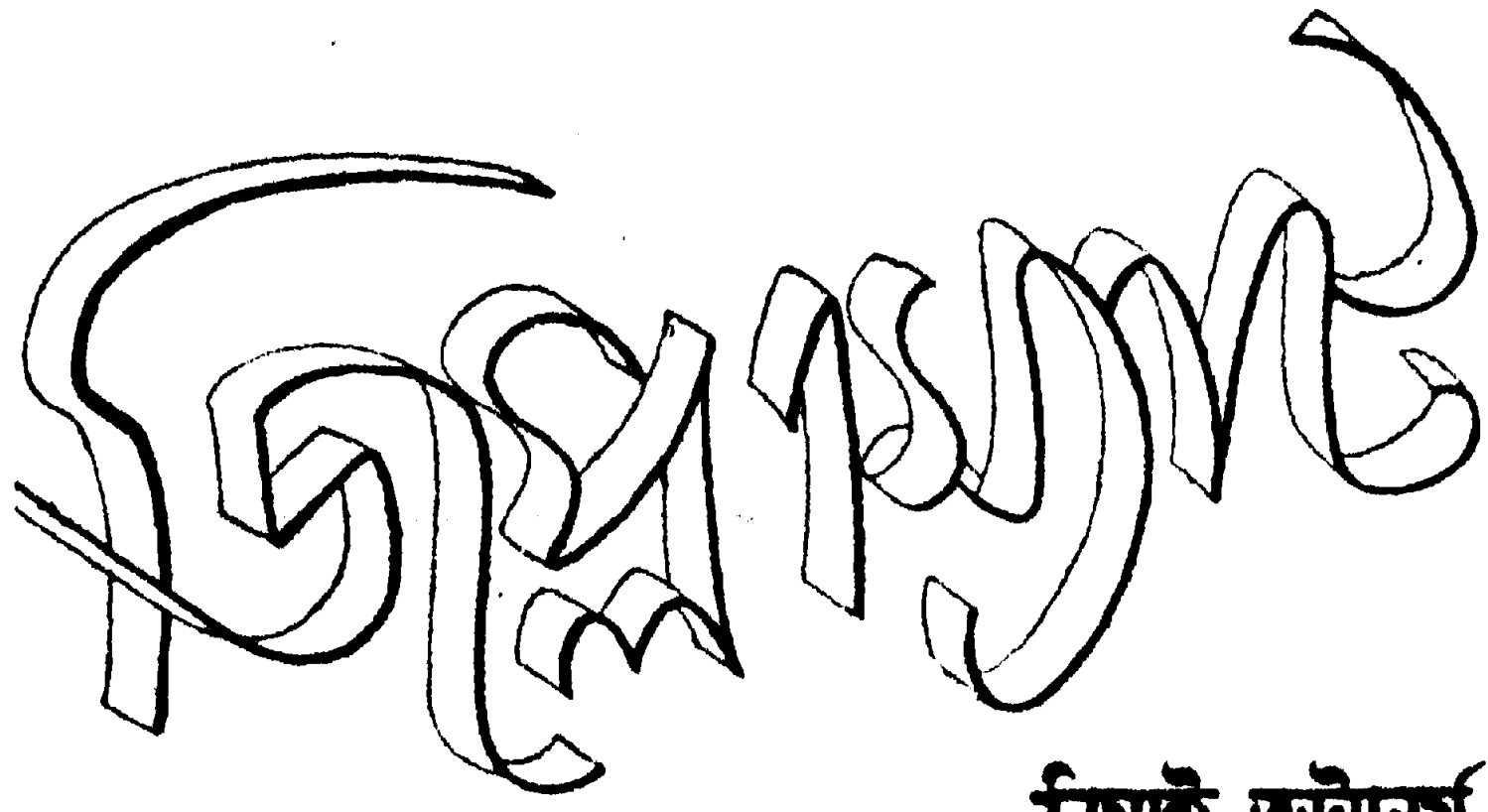
ঊনিশ

বন্দনা চলে গেল। নিয়ে গেল কিছু অনুভূতি, রেখে গেল কিছু স্মৃতি।

বিন্দুতে বিন্দুতে যেমন সিন্ধু হয়, তেমনি প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে জন্ম নিয়েছিল কিছু অনুভূতি। সে অনুভূতি এর আগে কোনদিন বুঝি নি। তার রেখে গেল যে টুকরো টুকরো স্মৃতি তা তরুণের জীবনের অনন্য সম্পদ। এত বড় দুনিয়াটায় এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এমন আপন আর কাউকে কাছে পায় নি। ভালবাসা পেয়েছে, সমবেদনা পেয়েছে বহুজনের কাছে। বন্দনা ইন্দ্রাণীর অভাব মেটাতে পারে নি, পারবে না, পারতে পারে না। তবুও সে যা দিয়ে গেল, তা তরুণ আর কোথাও আশা করতে পারে না।

বন্দনা ছাড়া আর কে এত আপন-জ্ঞানে বলতে পারে, দাদা, তুমি আমার শাড়ীর নীচের কুঁচিগুলো চেপে ধরো তো; আমি কাপড়টা ঠিক করে পরে নিই।

কোন কোনদিন পার্টিতে যাবার সময় নিজে হেয়ার-ডু করে দু' হাত দিয়ে খোঁপাটা চেপে ধরে ডাকত, দাদা, একটু এ ঘরে এসো।

'কেন কি হলো?'

তরুণ আসলেই বলত, ঐ সামনের কাঁটাগুলো দিয়ে দাও তো।

কাঁটাগুলো খোপায় গুঁজে দিতে দিতে তরুণ বলত, 'কি দরকার এত সব কায়দা-টায়দা করার?'

'জীবনে কোনদিন ঠিক আনন্দ করার অবকাশ পেলাম না তো, তাই তোমার এখানে এসেও লাইফটাকে এনজয় করব না?'

কে এমন স্পষ্টভাবে দাবী জানাতে পারে?

বন্দনা সত্যি অনন্যা!

বন্দনাকে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বড় বিশ্রী লাগছিল। চুপচাপ কোচটায় বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের কয়েকটা দিন আরো খারাপ লাগল। নিঃসঙ্গতার জ্বালাটা বড় বেশী অনুভব করল।

অফিসে যাতায়াত করে কিন্তু কাজকর্মে মন দিতে পারে না। ট্যান্ডন সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। জীবনটা যেন আরো বিবর্ণ হয়ে গেল। দিল্লী, লন্ডন, নিউইয়র্কে তবু সময় কেটে যায়, কিন্তু বার্লিনে যেন সময় কাটতে চায় না। একদিন কথায় কথায় ট্যান্ডণ সাহেবকে বলেই ফেলল, 'আর এখানে ভাল লাগছে না। ভাবছি এবার ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করি।'

'যেখানে ট্রান্সফার হবে, সেখানে গিয়ে ভাল লাগবে?'

তরুণ আর জবাব দিতে পারে নি।

মিঃ ট্যান্ডণই আবার বললেন, 'তুমি ট্রান্সফার চাইলে নিশ্চয়ই মিনিস্ট্রী আপত্তি করবে না, তবে তাতে তোমার কি লাভ? বরং ওয়েট ফর সাম টাইম।'

কাজকর্মের চাপ না থাকায় তরুণের আরো খারাপ লাগছিল। নিউইয়র্ক, লন্ডন, মস্কো, পিকিং-এ ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা থাকে, বার্লিনে তাও নেই। কি নিয়ে থাকবে তরুণ?

মাস খানেক পরে দু'-তিনজন জেনারেল অ্যাসিসট্যান্ট কাম স্টেনো টাইপিস্টের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তরুণ। পাঁচ-ছ'টি মেয়ে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল।

মিস হেরম্যানের ইন্টারভিউ নেবার সময় তরুণ জানতে চাইল, এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?

'কয়েক মাস আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি। ঠিক চাকরি কোথাও করি নি।'

'তবে কি করেছেন?'

'এল-বি'র পাড়ে নর্থ ল্যান্ড স্যানাটোরিয়ামে একজন পাকিস্থানী অফিসারের কাছে মাঝে মাঝে কাজ করেছি।'

তরুণ ন্যাকামী করে প্রশ্ন করল, 'ইজ হি এ বিজিনেস্ ম্যান?'

'না, না, বিজিনেস্ম্যান না। পারহ্যাপস হি ইজ অ্যান আর্মি অফিসার।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'উনি যে কেবল রাওলপিন্ডি আর পেশোয়ারের আর্মি অফিসারদেরই চিঠি লেখেন।'

তরুণ আর এগোয় নি। বুঝেছিল, অফিসারটি অসুস্থ নয়; কারণ চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হলে নিশ্চয়ই এত চিঠিপত্র লেখালেখি বা কাজকর্ম করতেন না। ওটা নিশ্চয়ই একটা কভার। গোপনে কাজ করার কায়দা মাত্র।

মিস হেরম্যানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টাইপ হবার আগেই বন-এর ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে মেসেজ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে দিল্লী; দিল্লী থেকে করাচী।

দিন দুয়েকের মধ্যেই বার্লিনে খবর এসে গেল।... কয়েকদিন আগে করাচীতে পাকিস্থান-কানাডার চুক্তি হলো যে দু' বছর অন্তর দু' দেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর ডেলিগেশন এক্সচেঞ্জ হবে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রীর যে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তিনি এবার এ স্বাক্ষর করেন নি। শোনা যাচ্ছে উনি অসুস্থ ও চিকিৎসার জন্য জেনেভা গেছেন।

পাকিস্থান অবজার্ভার, ডন, পাকিস্থান টাইমস ও আরো বহু পত্রিকায় নানা চুক্তি সই করার পর ঐ অ্যাডিশনাল সেক্রেটারীর ছবি ছাপা হতো। খবরের সঙ্গে এইসব ছবির কয়েকটা কপিও দিল্লী থেকে বার্লিনে পাঠান হলো।

একটু কায়দা করে মিস হেরম্যানকে ছবিগুলো দেখাতেই বলে উঠল, এই ভদ্রলোকের কাছেই সে কাজ করেছে।

ইতিমধ্যে রোমের একটি পত্রিকায় খবর বেরুল, ইতালী পুরনো ন্যাটো আর্মস বিক্রীর জন্য মিডল ইস্ট ও ফার ইস্টের কয়েকটি দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও পর্তুগালের কয়েকটি পত্রিকায় অনুরূপ খবর বেরুল।

ঠিক এই পটভূমিকায় পাকিস্থান ডিফেন্স মিনিস্ট্রীর অ্যাডিশনাল সেক্রেটারীর বার্লিনে উপস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের কষ্ট হলো না। দিল্লী আরো তৎপর হলো।

মেসেজ চলে গেল চারদিকে। ওয়াশিংটন, লন্ডন, বন, রোম, প্যারিস ও আরো কয়েকটি 'ন্যাটো' কান্ট্রিতে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ঐ সব দেশের ফরেন মিনিস্ট্রীর সঙ্গে। কোন কোন দেশ ন্যাকামী করে বলল, উই হ্যাভ নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট সেল অফ ন্যাটো আর্মস।

ওয়াশিংটন থেকে বলা হলো, ন্যাটো আর্মস নিয়মিত আধুনিকরণ করা হয়। ইট ইজ এ রেগুলার প্রসেস। বাট ঐ আর্মস অন্য দেশে বিক্রী করতে হলে আমাদের পারমিশন চাই। সুতরাং ডোণ্ট ওরি!

ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডরকে তারা একথাও বললেন, উই উইল থিংক টুয়াইস বিফোর উই অথোরাইজ এনি সাচ সেল টু পাকিস্থান।

সব শেষে করাচী। ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনার পাকিস্থান ফরেন সেক্রেটারীকে বললেন, আপনারা ন্যাটো আর্মস নিলে আমাদের দুই দেশের রিলেসান্স অ্যাফেক্ট করতে বাধ্য।

পাকিস্থান ফরেন সেক্রেটারী বললেন, আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিশন খুব খারাপ। কোরিয়ার যুদ্ধ থেমে যাবার পর আমাদের পাটের বাজারও খুব খারাপ। ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে আমরা প্রয়োজনীয় ফুড গ্রেণস্ ও ইন্ডাস্ট্রির জরুরী ইম্পোর্টস্ পর্যন্ত করতে পারছি না। সুতরাং ন্যাটো আর্মস কিনব আমরা? ইট উড বি এ বিবলিক্যাল ড্রিম ফর আস!

ফরেন সেক্রেটারী ইন্ডিয়ান হাই-কমিশনারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাসি ঠাট্টা করে বললেন, অনেক কষ্টে দু' দেশের রিলেসান্স একটু ইমপ্রুভ করেছে। এখন আর কিছু না হোক আমি আমার লক্ষ্মৌ'র পুরানো বাড়ীতে যেতে পারি, বুড়ী নানীর সঙ্গে দেখা করতে পারি, শালীর একটু ওয়ার্ম কম্পানী পেতে পারি। ডু ইউ থিংক আমরা এমন কাজ করব যাতে এই সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে যায়?

'আমরাও তো তা আশা করি না।'

ফরেন সেক্রেটারী শেষে বললেন, ভুলে যাবেন না উই আর সেয়ারিং সেম হিউম্যান মিজারিজ! ঐ যে ইন্দ্রাণীর কেসটা আপনারা রেফার করেছেন...

হ্যাঁ, হ্যাঁ......

'ভাবুন তো কি ট্রাজেডী!...

'হ্যাঁ, দারুণ ট্রাজেডী।'

'আই অ্যাম পার্সোন্যালী লুকিং ইন টু দ্য ম্যাটার এবং আশা করি দু' এক মাসের মধ্যেই মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যাবে।'

'উই উইল বী গ্রেটফুল...

'গ্রেটফুল হবার দরকার নেই। তবে দেখবেন যেন ওদের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে পারি।'

হাসতে হাসতে হাই-কমিশনার বললেন, আমি নিজে এসে আপনাকে নেমন্তন্ন করে যাব।

মাসখানেক তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কাটাবার পর দিল্লী থেকে পাকিস্থান ফরেন সেক্রেটারীর মন্তব্যের রিপোর্ট পেয়ে দীর্ঘদিনের ক্লান্তি এক মুহূর্তে বিদায় নিল। অনেক দিন পর আবার ইন্দ্রাণীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করল।

দিন তিন-চার পরেই মিঃ ট্যান্ডণ তরুণকে ডেকে পাঠালেন।

'বসো তরুণ।'

'কি ব্যাপার।'

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস অফ নিউজ ফর ইউ।'

চমকে উঠল তরুণ। তবে কি ইন্দ্রাণীর কোন খবর পাওয়া গেছে? তরুণ মুখে কিছু বলল না, উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ট্যান্ডণ সাহেবের মুখের দিকে।

'প্রথম কথা তুমি প্রমোশন পাচ্ছ...'

তরুণ শুধু একটু হাসল।

'দ্বিতীয় কথা, তোমার ট্রান্সফার হচ্ছে।'

'কোথায়?'

'বোধ হয় লন্ডনে।'

তরুণ হেসে ফেলল। 'লন্ডনে?'

'মনে হয় তাই।'

তারপর ধীরে ধীরে মিঃ ট্যান্ডণ জানালেন, ন্যাটো আর্মস সেল নিয়ে যা হয়ে গেল, তার জন্য মিনিস্ট্রী মনে করে তোমাকে আর বার্লিনে রাখা ঠিক নয়।

'সেটা আমিও ফিল করছিলাম।'

'অ্যাম্বাসেডর যা বললেন তাতে মনে হয় তোমাকে ফার্স্ট সেক্রেটারী, পলিটিক্যাল করে লন্ডনেই পাঠান হবে। তবে...'

'তবে কি?'

'হয়ত ইন-বিটুইন দু'-এক মাসের জন্য দিল্লীতে যেতে হতে পারে।'

শালগ্রাম শিলার আর শোওয়া-বসা? স্ত্রীর অমত, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সমস্যা যখন নেই, তখন লন্ডন আর দিল্লী! সবই সমান।

প্রমোশন? কৃতিত্বে উন্নতিতে আর পাঁচজন খুসী হয় বলেই আনন্দ। কিন্তু তরুণ কাকে খুসী করবে? হ্যাঁ, বন্দনা, বিকাশ নিশ্চয়ই খুসী হবে কিন্তু...

ঐ কিন্তুটা তরুণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; ওর থেকে মুক্তি নেই।

দু'-একদিন পরেই ঢাকা থেকে দেশাই-এর একটা চিঠি পেল, ঠিক বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। মনে হয় করাচী থেকে চাপ এসেছে।

ঐ চিঠিটা ঐখানেই শেষ। তবে সঙ্গে আরেকটা স্লিপ। তাতে লিখেছে, আজ অফিসে এসেই খবর পেলাম যে রায়টে ইন্দ্রাণীর বাবা-মা মারা যান। আগে বাড়ীতে যখন আগুন লেগেছিল তখন চাপা পড়ে ছোট ভাই মারা যায়। এর পর ইন্দ্রাণীকে স্থানীয় এক মুসলমান পরিবার আশ্রয় দেন।

দেশাই শেষে লিখেছে, ইস্ট পাকিস্থানের ডি-আই-জি (সি-আই-ডি) নিজে কেসটা ডিল করছেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই আরো খবর জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

চিঠিটা বার বার পড়ল। দশবার-বিশবার পড়ল। একটা চাপা উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ল তরুণ। চিঠিটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে গেল মিঃ ট্যান্ডণের ঘরে।

ট্যান্ডণ সাহেবও চিঠিটা বার কয়েক পড়লেন। হেসে বললেন, 'সত্যি সুখবর।'

একটু পরে বললেন, 'পাকিস্থান ওদের অনেস্ট ইনটেনশন প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

নিজের ঘরে ফিরে এসেই তরুণ দেশাইকে কেবল্ পাঠাল, থ্যাঙ্কস্ ইওর কাইন্ড কোটার্স স্টপ অ্যাসোসার্লি এক্সপেক্টিং ফারদার ডেভলপমেন্টস স্টপ লাভ তরুণ।

আশা-নিরাশার দোলায় তরুণ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। দেশটা দু' টুকরো হবার পর ইস্টবেঙ্গলে বহু হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমানদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে নানা কারণে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়। তাদের কেউ সুখী, কেউ অসুখী।

এমন অনেক মেয়ের কথা তরুণ জানে। শাঁখা-সিঁদুর পরেও অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান স্বামীর ঘর করছে, তাও সে জানে।

দিল্লীতে থাকতে এমন অনেক কেস সে নিজে ডিল করেছে। নাটক-নভেলকে হার মানাবে সে-সব কাহিনী। গুন্ডা-দস্যুদের হাত থেকে হিন্দু মেয়েদের বাঁচাবার জন্য সারা পূর্ব বাংলার বহু মুসলমান পরিবার তাদের ঠাঁই দিয়েছেন নিজেদের পরিবারে। অনেক প্রগতিশীল যুবক হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরকরণ না করিয়েই বিয়ে করেছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গিয়ে।

বাঙালীর জীবনের সেই কাল দুর্যোগের রাত্রিতে আরো কত কি হয়েছে! কেউ কেউটে সাপের মত ছোবল দিয়েছে, আবার কেউ পশুরাজ সিংহের মত ঔদার্য দেখিয়ে হাতের কাছের শিকার ছেড়ে দিয়েছে!

ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে এমনি কোন বিপর্যয় ঘটে নি তো?

ভাবতে পারে না তরুণ।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদ শ্রীনির্মলকুমার বসুর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নৃতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার ওপর একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোচনা করেন। এর আরেকটি আকর্ষণ ছিল কলকাতার বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী ইত্যাদি তাঁরা কলকাতার সঙ্গে তাঁদের শিল্পকলার সম্পর্ক নিয়ে বেশ খোলাখুলি একটা আলোচনার [illegible] ৩১ [illegible] নৃতত্ত্ববিদ শ্রীসুরজিৎ সিংহের [illegible] বিভিন্ন শিল্পীদের আরেকটি আলোচনাচক্র বসে। ঘরোয়া বৈঠকে কলকাতার [illegible] শিল্পীদের নানারকম সমস্যার একটা মনোজ্ঞ আলোচনা হয় যাতে [illegible] অপ্রতুলতা ছিল না। চিত্রশিল্পী ও [illegible] তরফ থেকে প্রভাস সেন ও মহিম রুদ্রের আলোচনায় শোনা গেল যে, [illegible] দেশী [illegible] শিল্পকলাকে ঠিক [illegible] সঙ্গে গ্রহণ করছেন না। আবার [illegible] শিল্পচেতনা [illegible] শ্রীমতী [illegible] শিল্প, বিজ্ঞানের মত [illegible] হতে না পারে। ছবির [illegible] কোন শিল্পী বেছে নেন [illegible] সমাজগত জীবনের [illegible] পারে তবে এমন কোন [illegible] নিয়ম বোধ হয় নেই যাতে এর [illegible] থেকে কোনটা মেকী এবং কোনটা খাঁটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। মহিম রুদ্র [illegible] বলেন যে, আন্তর্জাতিকতার প্রভাব শিল্পীদের ভেতর এসেছে দর্শকদের মধ্যে তা আসে নি।

নৃত্যশিল্পীর সমস্যা হিসেবে শ্রীমতী [illegible] সরকার বলেন যে দেশের দর্শক এক ধরনের ভারতীয় নৃত্য দেখতে অভ্যস্ত। বিদেশের দর্শক সর্বদাই একটা 'এক্‌সটিক' জিনিস আশা করে। তিনি মনে করেন ওই উভয় প্রকার চাপই ক্ষতিকর। ভারতীয় নৃত্যে শৃঙ্গার রসের পরিমাণ বড় বেশী কিন্তু তার থেকে মুক্তির উপায় চাই। কিন্তু দর্শকের প্রত্যাশা সেখানে সীমিত সেখানে সামাজিক চাপে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাচ্ছে না।

মৃণাল সেন স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন যে চলচ্চিত্রে যন্ত্রপাতি যা আছে [illegible] খাটিয়ে কাজ করতে পারলে তার থেকেই ভাল ছবি করা যায়।

সুরজিৎ সিংহ একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তোলেন। বিদেশে সমাজের এক বিষয়ের স্পেশালিস্ট অন্য বিষয়ের লোকদের সঙ্গে পরিচিত নন। এমনকি অনেক বিদেশী নৃতাত্ত্বিকরাও শিল্পী, সংগীতজ্ঞ বা নর্তকীর সঙ্গে পরিচিত নন। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতার জন্যই হয়তো বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার ইত্যাদিকে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন কিন্তু এই পরিচয়ের সুযোগ শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নেওয়া হয় না, কোন নাটক বা চলচ্চিত্র নির্মাণে বিদেশে যেমন বিভিন্ন শিল্পীরা একযোগে কাজ করতে পারেন এখানে সেরকম হয় না।

চিত্রশিল্পীদের আর্থিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে মহিম রুদ্র বলেন, জনসাধারণ আরো সচেতন ও আগ্রহী হলে দর্শনী দিয়ে প্রদর্শনী দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রামমোহন সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের সংগীত ও শিল্পবিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগের অধিকর্তা। গত বছর তুরস্ক সরকারের বৃত্তি পেয়ে ইস্তাম্বুলে রিসার্চ করতে গিয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিতে তাঁর 'মিস্টিক ওয়ার্ল্ড' প্রদর্শনীতে রহস্য-সন্ধানী মনের পরিচয় হয়ত অনেকে পেয়েছেন। ছবির ফিগারগুলি যাকে বলে সেরাফিক। কখনো কখনো তন্ত্রমন্ত্র ঘেঁষা রূপকল্পও পাওয়া যায়। প্রতীক কখনো ভারতীয় কখনো বা ভারত বহির্ভূত। উজ্জ্বল লাল, সবুজ, নীল, কৃষ্ণ ও ধূসরের সমাবেশ। মাঝে মাঝে ইংরিজি ও তুর্কী ভাষায় লেখা। একটু কাব্যিক লেখা "যেমন আমি স্বর্গে চললাম .... যন্ত্রণা আমার আনন্দ তোমার' ইত্যাদি। ডিজাইনের দিক থেকে ১, ২, ৮, ১৫ ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

শিউলি ঘোষ নব্যভারতীয় রীতি অনুযায়ী চিত্রবিদ্যা চর্চা করেছেন। এ ধরনের ছবির প্রদর্শনী আজকাল আর বেশী দেখা যায় না। গোড়ায় তিনি অজন্তার ছবি নকল করে হাত পাকিয়েছেন পরে কাগজ বা সিল্কে নব্যভারতীয় রীতির চর্চা করেছেন। পরে আবার তেলরঙে অ্যাকাডেমিক ধাঁচে প্রতিকৃতি অঙ্কন চর্চাও করেছেন। তাঁর ৪০ খানি ছবির মধ্যে সবরকম রীতিরই কিছু কিছু নমুনা দেখা গেল, বেশীর ভাগ ছবিই মাপে বেশ বড় এবং কয়েকটি প্রায় বৃহদাকার। তাঁর ওয়াশের কাজের মধ্যে 'রেওয়াজ', 'মায়াদেবীর স্বপ্ন', 'বুদ্ধের জন্ম', 'হোলী' প্রমুখ পরিচ্ছন্ন ছবি। তেলরঙে ভারতীয় পদ্ধতির দু-একটি কাজ ইন্টারেস্টিং। তাঁর তেলরঙের প্রতিকৃতির মধ্যে কয়েকটি শিশুর প্রতিকৃতিতে একটা মিষ্টি প্রিমিটিভিজমের ছাপ আছে। বড়দের প্রতিকৃতির মধ্যে একটু বেশী পালিশ করা ভাব এবং ফটোগ্রাফ ঘেঁষা কাজের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

নকুল দাস ২৩ থেকে ২৮ মার্চ অ্যাকাডেমিতে ২০খানি শাদা-কালোর স্কেচ প্রদর্শনী করেন। মোটা তুলিতে টানা ডেকরেটিভ ফিগার কোথাও কোথাও মা ও শিশুর মোটিফ। ক্যালিগ্রাফির ছাপটাই প্রকট। অনেকগুলিতে একটু ভৌতিক আমেজ যেন প্রস্ফুটিত।

কেমুল্ড গ্যালারিতে ৯ থেকে ১৮ মার্চ নির্মল দত্তের ১৬খানি আধুনিকতম ছবির সুদৃশ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ নিসর্গ দৃশ্যের ওপর তিনি কাজ করেছেন। ছবিগুলির মেজাজ রোমান্টিক এবং কিছুটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘেঁষা। সবুজ, লাল, হলুদ ও ধূসর বর্ণের প্রাধান্যই বেশী এবং ছবির মেজাজ একটু গম্ভীর তবে অনুভূতিময়। অনেক ছবিতেই কেমন একটা নিঃসঙ্গতার ছাপ আছে—শিল্পী যেন খুব নির্জনে নিজের অনুভূতির গভীরে ডুবে কাজ করেছেন। কোথাও বা তার ফলে কাজ কিছুটা ভারীও হয়ে গেছে। তাঁর 'ভন', 'ডাস্ক', 'ফেয়ার' ও জলরং-এর উজ্জ্বল ছবি 'আরবান মেজ' বেশ চোখে পড়ার মত।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের মুক্তাঙ্গনে ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়। দশজন শিল্পীর ২১খানি কাজ আধুনিক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ইয়োরোপে যতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার নানারকম প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। কয়েকখানি কাজ বাদ দিলে এটিকে একটি একক প্রদর্শনী বলেও চালানো যেত। বিশেষ করে কাঠের কাজগুলির প্রায় একরকমের টেকস্চার একটু একঘেয়েমি সৃষ্টি করেছে। বেশীর ভাগ কাজই অ্যাবস্ট্রাক্ট, তবে ফিগারেটিভ ঘেঁষা কাজ অনুপস্থিত নয়। দেবব্রত চক্রবর্তীর 'অ্যারাউন্ড দি মুন', দিলীপ সাহার 'ক্রাইং ফর্ম' এবং অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের নকটার্ন কাজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্রাফট কাউন্সিল অব ওয়েস্ট বেঙ্গল সংস্থা ১৬ থেকে ১৮ মার্চ কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে বাটিক, চামড়া, কাঠ, সেরামিক, নারকোলের মালা ও কয়েকটি ছবি ও ভাস্কর্য নিয়ে একটি প্রদর্শনী করেন। চমকপ্রদ কারুশিল্পের নিদর্শন কিছু চোখে পড়ল না। সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সৌখিন দ্রব্য বিক্রয়ের কাউন্টারের চেহারা নিয়েছিল।

২৪ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত অ্যাকাডেমি স্টুডিওর ২২ জন সদস্যের ৫১খানি স্কেচ, পেন্টিং ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হল। ফিগার স্কেচের নমুনা-গুলির মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের কয়েকটি স্কেচ উল্লেখযোগ্য। সুজয় মুখার্জির পোর্ট্রেট স্কেচ ও নুড, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাস্কর্য 'হেড স্টাডি' এবং সুনীলকান্তি সাহার সাঁওতাল রমণীর স্টাডিটি উল্লেখ-যোগ্য।

—চিত্ররসিক

বেতার শ্রুতি

উচ্চৈঃস্বরে পড়া, লেখা কথা বলা এবং নাটকের সংলাপ অভিনয় করা—এ বড়ো সহজ কাজ নয়। এ-কাজে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং শিল্পীকে সেই সমস্যা-বলীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তাঁর উচ্চারণ, স্টাইল, মুদ্রাদোষ, স্বরভঙ্গি এবং শিক্ষা (অথবা তার অভাব)—সমস্ত কিছুই, এক কথায় তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, ফুটে ওঠে এই রূপায়ণে। এবং দক্ষ শিল্পী ছাড়া আর কারও পক্ষে লিখিত শব্দে সঠিক ধ্বনি সংযোজন করা সম্ভব নয়। এবং এই দক্ষতা আপনা থেকে আসে না, অভ্যাসের দ্বারা, অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে হয়। অধিকাংশ ব্যক্তি তা করেন না বলেই তাঁদের আলোচনা, কথিকা, অভিনয় মনোগ্রাহী হয় না।

তাছাড়া বেতার-শিল্পীদের একটা অতিরিক্ত অসুবিধাও আছে ; তাঁরা কখনই শ্রোতাদের সামনাসামনি হতে পারেন না। মঞ্চের বক্তা, থিয়েটারের অভিনেতা দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। দর্শকরা তাঁদের মনের দিক দিয়ে চিনে নিতে পারেন, তাঁদের প্রতি অভিনিবিষ্ট হতে পারেন। কিন্তু বেতার-শিল্পীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা সিনেমা অথবা টেলিভিশন-শিল্পীদের মতোও নন। সিনেমা আর টেলিভিশনে দর্শকরা শিল্পীদের বাস্তব উপস্থিতি না পেলেও তাঁদের সামনাসামনি পান। তাঁদের প্রতিমূর্তিকে স্বমূর্তি বলে গ্রহণ করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। প্রতিমূর্তিতেই তাঁরা একাত্ম হয়ে যান।

বেতারে শিল্পীরা আর শ্রোতারা কখনই কাছাকাছি আসতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকে এবং সে ব্যবধান অদৃশ্য বলে অপরিমেয়। বাস্তব চিন্তায়, তাঁরা পরস্পরের কাছে অস্তিত্বহীন। তাই মঞ্চ আর থিয়েটার, সিনেমা আর টেলি-ভিশন থেকে বেতারের টেকনিক সম্পূর্ণ আলাদা। দেখার সঙ্গে শোনা আর না দেখে শোনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। প্রথমটির টেকনিক দ্বিতীয়টিতে সম্পূর্ণ বদলে যায়। বেতার-শিল্প সম্বন্ধে আসল কথা—এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—এই শিল্প সম্পূর্ণ কর্ণ বিষয়ক শিল্প, ইংরেজীতে যাকে বলে অর‍্যাল আর্ট।

শুধু শোনা বড়ো কঠিন কাজ। আমরা একই সঙ্গে দেখতে এবং শুনতে অভ্যস্ত। আমাদের অধিকাংশেরই কাছে শোনা একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার, এবং অনেক সময় আমরা কানকে পরিত্যাগ করে চোখকেই বেশি কাজে লাগাই। তার কারণ, কানের ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে যা প্রবেশ করে, অনেক সময়েই তা অপর্যাপ্ত থাকে অথবা মনের মধ্যে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে।

কল্পনা করুন, একটি অন্ধকার ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে। কথাগুলি এমন অর্থ পরিগ্রহ করবে যা উজ্জ্বল আলোয় কখনও করে না। আলোময় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে কথাগুলির অঙ্গবিন্যাস সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এবং কথাগুলির প্রতি আপনার সমস্ত অনুভূতি আর কল্পনা নিবদ্ধ করতে হবে, যা আলোর মধ্যে সচরাচর করতে হয় না। অন্ধকারে শ্রোতাদের মনে মনে একটা ছবি কল্পনা করে নিতে হয়, না নিলে কথাগুলি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

বেতারের অনুষ্ঠান এই রকম অন্ধকার ঘরের কথার মতো। কিছু দেখা যায় না, কেবল শুনতে হয়, কল্পনা করতে হয়, ছবি তৈরি করে নিতে হয়। তাই শ্রোতাদের উপর বেতারের দাবি বড়ো বেশি।

সুতরাং 'স্পোকন্ ওয়ার্ডের'' ক্ষেত্রে বেতারে অনেকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়। বেতারে আমরা শুধু কর্ণপাত করি, যা শুনি তা দ্রুতগামী—প্রতি মুহূর্তে তার পরি-বর্তন হচ্ছে এবং আমরা একবার মাত্র তা শুনি, শুধু একবার। তাই বেতারের অনু-ষ্ঠানকে যদি কোনো ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করতে হয় তবে একেবারে গোড়া থেকেই শ্রোতাদের শ্রবণ আকর্ষণ করতে হবে। যা বলা হবে তা যেন সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এবং আসল কথাগুলো যেন শ্রোতাদের মনে গেঁথে যায়, যাতে শোনার শেষে শ্রোতারা তা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। কোনো অনুষ্ঠানই এত দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতারা ক্লান্তি বোধ করতে পারেন এবং ক্লান্তির জন্য শোনা বন্ধ করে দেন। কী করে তা করা যাবে তা অনেকটা টেকনিকের বিষয় এবং বেতারের প্রযোজক-দের তা আয়ত্ত করতে হবে। বক্তাদের তাঁরা বেতারের উপযোগী স্ক্রিপ্ট রচনা করতে সাহায্য করবেন। কোনো স্ক্রিপ্ট রচনার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হলেই হয় না। স্ক্রিপ্ট যত সুন্দর করেই লেখা হোক না কেন, তা অনুষ্ঠানের কঙ্কাল মাত্র। স্ক্রিপ্টটা সুন্দর করে পড়ে সেই কঙ্কালের রক্তমাংস সঞ্চার করতে হয়। স্ক্রিপ্ট রচনা ও প্রচারের মাঝে প্রযোজনার সমস্ত টেকনিক নিহিত রয়েছে এবং তার সফলতা অথবা ব্যর্থতার অনেক-খানি নির্ভর করছে প্রযোজকের উপর। প্রযোজক শুধু বক্তা নিয়োগ করে এবং তাঁর স্ক্রিপ্ট থেকে বেতারের নীতি অনুসারে "অপ্রচার্য" বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন না।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের এখানে তা-ই হয়ে থাকে। প্রযোজকরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো বিষয় নির্বাচন করে "শিডিউল" তৈরি করেন, নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বক্তা নিয়োগ করেন, এবং সেই বক্তারা স্ক্রিপ্ট পাঠালে স্ক্রিপ্টের ভিতর 'অপ্রচার্য' কিছু আছে কিনা দেখেই তাঁরা ক্ষান্ত হন। বিষয় নির্বাচনে তাঁরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন না, বক্তা নির্বাচনে তাঁরা যোগ্যতা বিচার করেন না, নির্বাচিত বক্তার সঙ্গে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না, কেমন করে স্ক্রিপ্ট লিখলে তা বেতারের উপযোগী হবে তা তাঁদের বলেন না, কীভাবে পড়লে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণীয় হবে সে বিষয়েও তাঁদের পরামর্শ দেন না। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২১ মার্চ বেলা ২টো ২৬ মিনিটে আব-হাওয়ার খবরে জানানো হল, 'তাপমাত্রা পরিষ্কার থাকবে।'...অবাক কান্ড! তাপমাত্রা আজকাল পরিষ্কার থাকতে শুরু করেছে! আগে কিন্তু থাকত না। স্কুলে-কলেজে আর ল্যাবরেটরিতে তাপমাত্রা নিয়ে অনেক কারবার করতে হয়েছে, কিন্তু তাপমাত্রাকে কখনও ময়লা অথবা পরিষ্কার থাকতে দেখিনি।

এই আবহাওয়ার খবরেই বাঙালীর আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।... বাঙালীর আবহাওয়া! চমৎকার! তাহলে বাঙালীরও আবহাওয়া থাকছে আজকাল? আর কার কার থাকছে? বিহারীর? পঞ্জাবীর? মাদ্রাজীর?

২২ মার্চ সকাল সওয়া ৭টায় পদাবলী কীর্তন শোনালেন শ্রীমতী মাধবী ব্রহ্ম।... সুন্দর। যেমন মিষ্টি, তেমনি সুরেলা।

পরে সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে বসন্তোৎসব উপলক্ষে একটি সঙ্গীতরূপক শোনা গেল—'কুহু'। রচনা—শ্রীরমেন চৌধুরী: প্রযোজনা—শ্রীমতী বেলা দে: সঙ্গীত-পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়লাল চৌধুরী: এবং সম্পাদনা—শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

বেশ মনোরম। শিশুদের মনের মতো। কুহু কুহু ডাক দিয়ে বসন্তের আহ্বান, কথা দিয়ে তার সম্ভাষণ, গান দিয়ে তার বরণ! খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল গানগুলি।

—শ্রবণক

সময়েই তারুণ্যে ভরা ও দেখতে সুন্দর। তারা বেশীর ভাগই শিক্ষিত হলেও তারা প্রায়ই নিষ্কর্মা—তাদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই। তাদের সামনে কোনো বাধা উপস্থিত হলে তারা অনায়াসেই তাকে অতিক্রম করতে পারে—বাস্তব জীবনে কোনো বাধাকে দূর করতে যে-পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় বা যে-দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়, ছবির নায়ক-নায়িকাকে সে রকম কিছুই করতে হয় না। অথচ একথা ভুললে চলবেনা যে, অধিকাংশ ছবির দর্শকই অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির এবং সেই কারণেই ছবিতে যা ঘটে, তার সংগে নিজেদের সমীকরণ করে ফেলে, ঐ-ঘটনা তাদের জীবনেও ঘটা সম্ভব বলে কল্পনা করে বসে। ছবিতে যে-ধরনের জীবন চিত্রিত করা হয়, বাস্তবে তার কতখানি সম্ভব, সে-সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই বলেই তারা এই রকম একাত্ম-বোধ করে আনন্দ পায়। তারা নিজেরা গ্রামের দীন পরিবেশে বাস করে বলে যখন তারা দেখে যে, ছবির দ্যুতিময় তারকারা মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত হয়ে থাকে, বড় বড় প্রাসাদে বাস করে এবং কেমন যেন কল্পলোকের রাজপুত্রের মতো চলাফেরা করে, তখন তারা ভাবতে শুরু করে যতখানি সম্ভব ঐ ফিল্মী নায়কের মতো তারাও চলে ফিরে বেড়াতে চেষ্টা করবে।

আমাদের প্রযোজকেরা যখনই কোনো যৌন বা প্রেম সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু চিত্রিত করে, তখনই তারা শিল্পগত বা দার্শনিক মূল্যবোধকে দূরে সরিয়ে রেখে এমনই স্থূল অমার্জিত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, দেখা মাত্রই আমরা মনে করতে বাধ্য হই যে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, 'যেন-তেন-প্রকারেণ' অর্থ উপার্জন করা এবং তা' যত সহজে, অনায়াসে ও সময়ে সময়ে রুচি-বিগর্হিত উপায়েই হোক না কেন।

এই সব দেখে শুনেই খোসলার নেতৃত্বে গঠিত ফিল্মসেন্সারশিপ অনুসন্ধান সমিতি

ববিতা / কব, কিউ আউর কাঁহা

মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষতিকর তারকাপ্রথা ও চিত্র প্রযোজকদের অর্থলোলুপতা এমনই বস্তু যে, এদের মনে রেখে ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মনে কোনও আশাই জাগছে না।

মঞ্চাভিনয়

খাসদখল বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'ক্লাসিক' নাটকগুলিকে নব-পর্যায়ে নিয়মিত অভিনয় করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন 'কৌশিকী' নাট্যসংস্থা।

এদের প্রথম নিবেদন রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' মঞ্চস্থ হবে আগামী ৭ এপ্রিল 'মিনার্ভা' মঞ্চে। নাটকটি পরিচালনা করছেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করবেন দত্তা মুখার্জি, ইলা সেন, মণ্টু চক্রবর্তী, শংকর চক্রবর্তী, গৌতম মুখার্জী, অমল মন্ডল, স্বপন রায় চৌধুরী, অরবিন্দ সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

চতুর্মুখের জনৈকের মৃত্যু সুপরিচিত নাট্যসংস্থা চতুর্মুখ দিল্লীতে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর আমন্ত্রণে এবার আকাদেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' নাটকটির অভিনয় করে ফিরে এসে আবার হাওড়ার শীশমহলে "জনৈকের মৃত্যু" নাটকের নিয়মিত অভিনয় সুরু করেছেন ১৯ মার্চ থেকে। ১৩০তম অভিনয় উত্তীর্ণ হবে আগামী শুক্রবার ২৭ মার্চ।

দিল্লীতে 'চতুর্মুখ' সংস্থা 'ধর্মঘট' ছাড়াও দিল্লীর নাট্যামোদীদের বিশেষ অনুরোধে দুদিন তাঁদের "জনৈকের মৃত্যু" অভিনয় করেন দিল্লীর বিখ্যাত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ত্রিবেনী আর্ট থিয়েটারে। তিনটি অভিনয়েই তাঁরা নাট্যামোদীর প্রশংসা পেয়েছিলেন। দিল্লীর পত্র-পত্রিকা এবং রসিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন 'চতুর্মুখ' পেয়েছেন। "জনৈকের মৃত্যু"-র সংগেই 'চতুর্মুখ' শীশমহলে 'ধর্মঘট' নাটকটির কয়েকটি অভিনয় করবেন। 'ধর্মঘটের' সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও নৃত্য পরিকল্পনায় শ্রীঅতীন লাল। নাটকটির প্রয়োগপ্রধান শ্রীঅসীম চক্রবর্তী।

জান্তব দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী আগামী ৫ এপ্রিল রবিবার প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে তাদের মঞ্চসফল নাটক 'জান্তব' (হীরেন সান্যাল) পরিবেশন করছেন। অভিনয়ে অংশ নেবেন শিব ঘোষ, উমা গুহ, টাবলু ভট্টাচার্য, মুন্না দত্ত, রাম ভট্টাচার্য ও তপন চ্যাটার্জি সংগীত ও নাট্য-নির্দেশনায় অশোক বসাক।

আগামী শনিবার ৪ এপ্রিল "রূপাংকন" প্রযোজিত দুটি একাঙ্কিকা "সীমানা ছাড়িয়ে", "এইতো সামনে" মঞ্চস্থ হবে "বিশ্বরূপা"-য়, প্রয়োগ নির্দেশ তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রচনা ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায়।

'শ্রাবণী'র শিল্পীরা আগামী ১২ এপ্রিল 'মুক্তঅঙ্গনে' বারটোল্ট ব্রেখটের 'দি ককেসিয়ান চক সার্কল' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত "অধিকার" নাটক অভিনয় করবেন। নাটকের প্রেক্ষাপট আন্দামানের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এবং মূল নাটক ত্রিপুরার (১৫০০ শতাব্দী) পটভূমিকায় পরিকল্পিত, মূল নাটকের ধারা যথাসম্ভব অব্যাহত রেখে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে "অধিকার" রচিত।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা সাগরপাড়ি দিয়েছিল আন্দামানে নতুন করে ঘর বাঁধার আশায়। কিছুদিনের মধ্যেই তারা যখন বুঝতে পারল তাদের বাঁচার পথ অন্য কেউ সুগম করে দেবে না তখন তারা নিজেদের ভার নিল। শুরু হল সংগ্রাম, অবশেষে জয়, তাদের আনন্দোৎসব আরম্ভ হল। গায়েন এলেন গান শোনাতে, পালা বাঁধলেন এক বহু পুরোনো কাহিনী নিয়ে।

ত্রিপুরাধীশ মহারাজ প্রতাপমাণিক্য বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে মহারাণী তাঁর একমাত্র সন্তান কুমারকে ফেলে পালিয়ে গেলেন। পরিচারিকা সরলা সব রকম বিপদের ঝুঁকি ও কলংক মাথায় নিয়ে কুমারকে রক্ষা করল। কিন্তু রাজরোষ এড়াতে পারলো না।

বিদ্রোহীদের পরাজিত করে মুকুটমাণিক্য রাজা হলেন। দিকে দিকে সৈন্যদল দৌড়িয়ে পড়ল কুমারের খোঁজে। সরলাকে তারা ধরে নিয়ে এল বিচারালয়ে। বিচারক কিন্তু কুমারকে সরলার কোলেই ফিরিয়ে দিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সরলার বুকেই কুমার সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে।

নাটকটির নির্দেশনায় রয়েছেন শ্রীসমীর চক্রবর্তী। শ্রীঅমল ভট্টাচার্য সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিবিধ সংবাদ

'অভিনয়' পত্রিকা আয়োজিত আলোচনা সভা গত ২১ মার্চ সন্ধ্যায় ১৩১ হরিশ মুখার্জী রোডে 'অভিনয়' পত্রিকার দপ্তরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনা চক্রে নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য "বাংলা নাটকের সম্ভাব্য গতি প্রকৃতি-১৯৭০" শীর্ষক আলোচনায় আগামী দিনের নাটক কি হতে পারে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন ১৯৭০-এ বাংলা নাটকের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি বৈদেশিক নাটকের অনুবাদের দ্বারা অপরটি মৌলিক নাটকের। একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ [illegible] ভাবধারা সুনিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হয় না। জার্মান জাতির সঙ্গে তুলনা করে [illegible] ও দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিল্পীদের হার [illegible] রকমের [illegible]। এমন অবস্থায় ইলিউসান ব্রেক [illegible] জনসাধারণের কথা নাট্যকারকে অবশ্যই ভাবতে হবে। মৌলিক [illegible] সময় প্রতিনিধিদের [illegible] [illegible] এমন কোনো কথা নেই। [illegible] [illegible] জানতে হবে। [illegible] থেকে আগামী ৩০ বছরে নাটক, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে একটা [illegible] বিস্তৃত পরিবর্তন আসবে। [illegible] আমাদের [illegible] নবজাগৃতির [illegible] জনমানুষে যে চাপ সৃষ্টি [illegible] সাহিত্য ও নাটককে তারই [illegible] [illegible]। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে [illegible] দেশের কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে [illegible] রাশিয়ান কৃষক শ্রমিকের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কোনও যোগসূত্র নেই। [illegible] শিল্প-সাহিত্য-নাটক একটি প্রবাহ। [illegible] প্রবাহ ও শ্রম প্রবাহ আলাদা আলাদা। কৃষক আগামী দিনে থেকে [illegible] আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রতিষ্ঠা নির্ণীত হওয়ার বছর-[illegible] শিল্পীর ওপর একটা প্রচন্ড চাপ [illegible] করবে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা তখন [illegible] সত্যকে গ্রহণ করবেন, করে [illegible] প্রবাহে রূপ দেবেন। তরুণ নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে [illegible] নাটকের মধ্যে হঠাৎ একটা লালঝান্ডা [illegible] দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। [illegible] উপলব্ধি করতে হবে সমস্ত সমস্যাগুলির কেন্দ্রের জটিলতাকে। লাল [illegible] সম্মান দিতে হলে তাকে তার [illegible] মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এতে [illegible] চলবে না। আজকের রাজনৈতিক [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে যিনি নাটক লিখবেন তাঁর দায় দায়িত্ব অসীম। এই দায়-দায়িত্ব যিনি স্বীকার করেন তিনিই দেশের সুসন্তান। অর্থাৎ লেখককে আপন সত্তার কাছে, ব্যক্তি সত্তার কাছে এবং সমাজ চৈতন্যের কাছে চরিত্রবান হতে হবে। সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার করার আরেক নাম চরিত্রহীনতা। কোনও জীবন দর্শন অভিলাষী শিল্পী এর ওপর নির্ভর করতে পারে না। নাটক হোল সমাজের সঙ্গে শিল্পীর সাক্ষাৎ সম্পর্কের জমি। নাট্যকারকে সমাজের সঙ্গে সচেতনভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রগতিবাদের কথা উচ্চারণ মূঢ়তা মাত্র। সে এক ভয়ংকর মিথ্যার কুৎসিত প্রশ্রয়। এখানে নিরাসক্তি নয়, বরং একেবারে জীবন যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতেই নাটক সৃষ্টি করতে হবে। ১৯৭০-এর পর আগামী দিনের নাট্যকার ও শিল্পী সাহিত্যিকরাই নির্মাণ করবেন সমগ্র জাতির ভাবধারার চৈতন্যের ভূমি।

সেমিনারে কিছু বিতর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেন নাট্যকার সুধাংশু দাশগুপ্ত, রতনকুমার ঘোষ, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী সেমিনার এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। নাট্যামোদীদের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে।

সুর সাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলন আয়োজিত একাদশ বার্ষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এপ্রিল মাসের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীতে যাবতীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও গীটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদনপত্র গৃহীত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : রথীন চৌধুরী, সম্পাদক, ৮২।এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি—২৬।

লোকায়ণের নতুন প্রযোজনা লোকায়ণের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা লোকনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'কলকাতা-কলকাতা-কলকাতা' মঞ্চস্থ হচ্ছে আগামী ১০ এপ্রিল '৭০ মিনার্ভা থিয়েটারে সন্ধ্যা সাতটায়। নাট্য নির্দেশনায় আছেন অরুণ রায়। মঞ্চ নির্দেশনা —রাজেন তরফদার। নৃত্য—শক্তি নাগ। আলো —পিন্টু বসু। অংশ গ্রহণে লোকায়ণের শিল্পী গোষ্ঠী।

আমরা শুনে আনন্দিত যে, চারুচিত্র প্রযোজিত ও হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত "কমললতা" ছবিটি বাঙলা আঞ্চলিক চিত্ররূপে ফিল্মফেয়ার-এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে।

রূপসী/কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়

বরানগর ২৯, রতনবাবু রোডস্থিত 'সংগীত মঞ্জরী'র অবৈতনিক অধ্যক্ষ প্রতাপচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী এবং ৭ মার্চ এই প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'গীতায়ন' সংস্থার উদ্বোধন সংগীতের পর সুন্দর ভাষণ দেন, সভাপতি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীসুনীলকুমার মিত্র। কণ্ঠসংগীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা শ্রীরথীন ভট্টাচার্যের। অতিথিশিল্পী ছিলেন বিশ্বনাথ সুর এবং শৈলেন দে। এছাড়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর রাখেন, সর্বশ্রী গঙ্গাপ্রসাদ সেন, সংগীতপ্রভাকর, জনরঞ্জন ভট্টাচার্য, অসিত বিশ্বাস, অনিল দত্ত, সুজিত চক্রবর্তী, অসিতবরণ মিত্র, শ্যামলী মুখার্জি, কল্পনা চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি, শ্যামশ্রী মৌলিক, সুমিত্রা দে, ছায়া ভট্টাচার্য, ডলি পাল ও নিবেদিতা দত্ত। মানিক সাধুখাঁর তবলার লহরা উল্লেখযোগ্য। দেবব্রত শান্তরাম কিছু অশান্ত। নৃত্যে তাপসী ভট্টাচার্য। দেশী ও শুদ্ধকল্যাণ রাগে সুন্দর সেতার বাজান শ্রীমতী রেবা চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয় প্রবীণ-শিল্পী শ্রীহৃষিকেশ আচার্য ও ভুবনচন্দ্র পাকড়েকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

ইউ পি সংগীত নাটক আকাডেমীর সহযোগিতায় লখনউর লিটারেসী হাউস এবার অল ইণ্ডিয়া পাপেট ফেস্টিভ্যাল-এর তিন দিন ব্যাপী আয়োজন করেন। এই আসর চলে ৩ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লখনউ-এর সুসজ্জিত রবীন্দ্রালয়ে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক সংস্থা এই আসরে যোগদান করেন। বিষয়বস্তু ছিল—পুতুলনাচ ও আলোচনা-চক্র।

পশ্চিম বাংলা থেকে একমাত্র যে দল এই আসরে যোগ দিয়েছিল তা কলকাতার অতি পরিচিত ইউথ পাপেট থিয়েটার; ইণ্ডিয়া। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থা তাদের সুন্দর ও সুষ্ঠু পুতুলনাট্য পরিবেশন করে দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের আকর্ষণীয় পুতুলনাচ 'রড, গ্লাভস্ ও ম্যারিওনেটস্,' তিন বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখায় 'অল রাউণ্ড বেস্ট পারফরমেন্সে ট্রফি' পুরস্কার পেয়ে বাংলার সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে—এটা খুবই আনন্দের কথা।

১৯৬৫ স্যালে গঠিত এই সংস্থা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এক বিস্মৃতপ্রায় কলাকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছে, তার জন্যে এরা প্রশংসা পাবার যোগ্য। ইউথ পাপেট থিয়েটার এই পুরস্কার অর্জন করে এটা প্রমাণ করেছে যে, তাদের নিষ্ঠা ও সাধনার স্বীকৃতি হোক। আশা করি, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এরা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

সপ্তার্ষির অনুষ্ঠান পাথুরিয়াঘাটার মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিসভার্থে আয়োজিত একটি একক কণ্ঠসংগীতের আসরে শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তীর এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে। রঞ্জিত ঘরানায় ঝিঁঝিট রাগের আলাপ দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু। তারপর হোরী ধামারে "খেলত নন্দলালা"-য় উপযুক্ত সঙ্গতের অভাবে বিঘ্নিত রসের ক্ষতিপূরণ ঘটল দুর্গা রাগে। তিলবাড়া তালের বিলম্বিত অঙ্গে আগ্রা ঘরাণার বৈশিষ্ট্য আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। দীপচন্দিকা তালে ঠুমরী গেয়ে ইনি অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রথম বসন্ত/মাধবী চক্রবর্তী

প্রতিযোগিতা ।। রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর স্মৃতি রক্ষার্থে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে (**২য় বার্ষিকী**) "নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা" এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

গীটারের কৃতীশিল্পী শিবনাথ সাহা
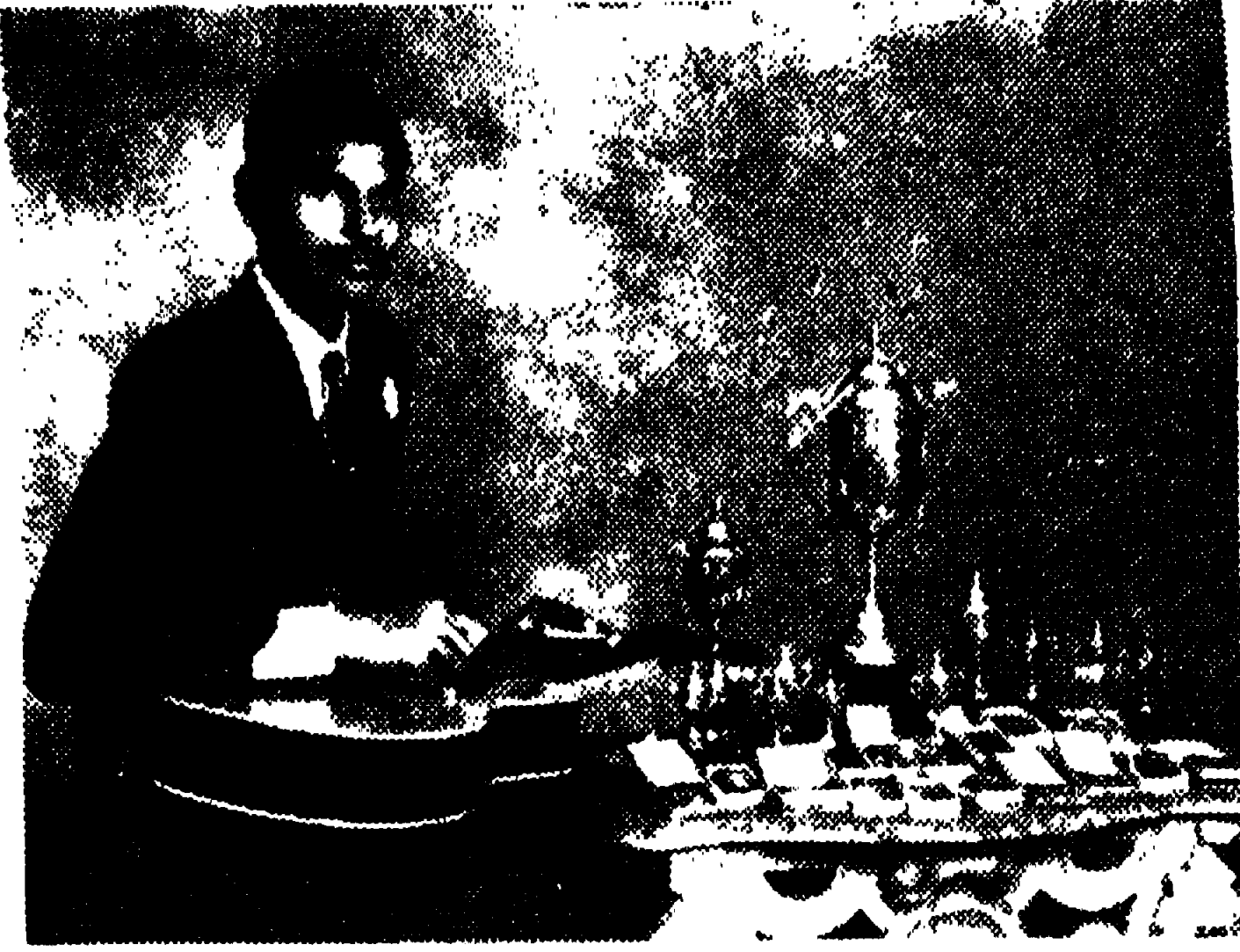
পুরস্কার যথাক্রমে ৫০০, ৩০০, ও ২০০ টাকা। কেবলমাত্র ১৪ থেকে ১৮ বৎসর বয়স্কা মেয়েদের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিযোগীতায় যোগদানের নির্ধারিত আবেদনপত্র প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার সন্ধ্যায় বৈতানিক কার্যালয়, ৪ এলগিন রোড, কলিকাতা হতে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল।

শ্রীমান শিবনাথ সাহার বয়স মাত্র ষোল বছর। এই অল্প বয়সেই শ্রীমান সাহা গীটার বাদনে প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম। ১৯৬৯—৭০ সালে শ্রীমান সাহা পশ্চিম ভারতে নিখিল সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় গীটার বাদনে অংশ গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ গীটার শিল্পীর সম্মান অর্জন করেন। গীটারে শাস্ত্রীয়, পাশ্চাত্য, লঘু ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে সমান ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে শ্রীমান সাহা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন।

স্টুডিও থেকে

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও : একজন সতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লাম সটান স্টুডিও-চত্বরে। দারোয়ান দেখতে পেয়ে আমাদের উপস্থিতিকে স্বাগত জানাল। ফটক পেরিয়ে দেখি, বাঁদিকের বেদীতে কজন স্টুডিও কর্মচারী যুক্তফ্রন্ট আর দেশের রাজনীতি নিয়ে মত্ত। সাউন্ড ভ্যানের দরজায় একবারে কুলুপ আঁটা।

আমি অবাক! আগের রাত্তিরেই মৃণালবাবুর (পরিচালক মৃণাল সেন) বাড়ীতে শেখর চ্যাটার্জি জানিয়েছিলেন 'কাল ইন্দ্রপুরীতে দীনেন গুপ্তর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কাজ আছে।'

তবে?

সাউণ্ডভ্যান বন্ধ কেন? ফ্লোরের দরজাও বন্ধ! কি ব্যাপার! হঠাৎ যেন ঘন্টার মধ্যে এমন কি অঘটন ঘটল বুঝতে পারছি না। অগত্যা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কি গো, কাজ ছিল না এখানে?

—হ্যাঁ ছিল। হোলো না। ক্যানসেল হয়ে গেছে।

: কেন?

পরিচালকের শরীর খারাপ।

বিরক্তির সুরে সতীর্থের উদ্দেশ্যে বললাম 'আপনাকে সঙ্গে এনেই এই বিপদ!'

—আমি কি করলাম ভায়া। স্যুটিং আছে শুনেছিলে ঠিকই, স্যুটিং হচ্ছে সে খবর তো পাওনি। ফিল্মি দুনিয়ায় 'হবে' আর 'হচ্ছে' রিয়া দুটোর মধ্যে ফারাক অনেক বুঝলে তো! বিজ্ঞের সুরে তিনি বললেন।

অতএব পিঠ ঘোরাতে হল উল্টোদিকে।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও : ছ নম্বর ফ্লোরে ঢুকে দেখি আটজন জন মেয়ে নাচের মহড়া দিচ্ছে। ডানদিকে সেট পড়েছে স্টেজের আর বাঁদিকে সেট পড়েছে স্টেজেরই ক্লোজ ফ্রেমে। মহড়া চলছে বাঁদিকে। সাইডস্ক্রীনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লিলি চক্রবর্তী। পায়ে বন্ধ চিলে পাজামা আর জরির কাজ করা চোলীর পোশাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে। আগে মহড়া কবার দিয়েছেন জানি না, কিন্তু লাইট ও ক্যামেরা পজিশন দেখার জন্য যে কবার তিনি নাচলেন তাতে মনে হলো পাকা নাচিয়ে বুঝি তিনি! সহযোগীদের সঙ্গে বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে নাচলেন লিলি চক্রবর্তী। ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত ক্রেন নিয়ে একেবারে মাথায় উঠে গিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দৃশ্যটার টেক করলেন।

ছবির নামটাই জানানো হয় নি। ছবির নাম হোল 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টান্ট'। পরিচালক হাসির ছবি বলেই বুঝি প্রধান চরিত্র দুটোর নাম পাল্টে জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু রায় করেছেন।

যে নাচের দৃশ্যটা গ্রহণ করা হোল, পর্দায় দেখবেন সেটি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিচালক পূর্ণেন্দুবাবু জানালেন 'আর অল্প কদিনের কাজ বাকি।'

সেট থেকে যখন বেরিয়ে আসছি তখন পরবর্তী টেকের জন্য আবার মহড়া শুরু হয়েছে। তালে তালে নেচে চলেছে আটটি মেয়ে আর মধ্যমণি হয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে এক-একটি মুদ্রা এঁকে চলেছেন লিলি চক্রবর্তী। বেরিয়ে দেখলাম সতীর্থমশায় চত্বরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এন-টি এক নম্বর : ছ নম্বর ফ্লোরে কাজ হচ্ছে 'মাল্যদান' ছবির। সেট পড়েছিল এক পাড়া-গাঁর হাসপাতালের। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাউনি। প্রধান ডাক্তারের টেবিলে টিম-টিম করে আলো জ্বলছে একটা। সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিকাশ রায় অজয় করের প্রধান সহকারী স্বদেশবাবুর কাছ থেকে ডায়ালগ শুনেছেন। পাশে দাঁড়িয়ে সৌমিত্রবাবু বিকাশ রায়ের অ্যাকশন লক্ষ্য করছেন। ক্যামেরা পজিশন ও লাইটিং রেডিই ছিল। ছোট্ট একটা দৃশ্যের টেক হলো।

মাত্র একটি করে সংলাপ দুজনের।

সৌমিত্রবাবু দরজা দিয়ে ঢুকে বিকাশ রায়ের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর সংলাপ—'আমি একটা রোগীকে নিয়ে মুস্কিলে পড়ে...' ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিকাশ রায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি। তুমি এক ফিমেল পেশেন্টকে বিশেষ যত্ন-সহকারে নার্স করেছো' দৃশ্যের ছেদ পড়লো ঐখানেই।

ক্যামেরা পজিশন চেঞ্জ হবে। ডানদিক থেকে তাই ক্যামেরা সরিয়ে নেওয়া হলো একেবারে বিকাশবাবুর সামনে। সুতরাং আলোকসম্পাতেরও হেরফের হচ্ছে। বেরিয়ে পড়েছি ততক্ষণে আমি। সৌমিত্রবাবু তখন গোলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খোসগল্পে ব্যস্ত। পেছনের রাস্তা দিয়ে আমি ততক্ষণে চণ্ডীঘোষ রোড ধরে ক্যালকাটা মুভিটোনের পথে।

ক্যালকাটা মুভিটোন : কাজ নেই। কদিন আগে তরুণ মজুমদার 'কুহেলী'র কাজ করেছেন এখানে। সেই সেটই বুঝি খোলা হচ্ছে দেখলাম। ছ নম্বর ফ্লোর একেবারে বন্ধ। সাউণ্ডভ্যানটা দুটো ফ্লোরের মাঝখানে জড়ভরতের মত চুপচাপ বসে। কাজের সময় ওরই বুক থেকে কত বিকট কিম্ভুত আওয়াজ বেরোয়। এখন শান্তশিষ্ট ইন্ডিয়ান গুড বয় একেবারে! আমারও ধীরপায়ে পিঠটান তাই মুখ ঘুরিয়ে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে

গুরুদাস ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালেই দিল্লীর 'ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার' একটি ভারত-ফ্রান্স সৌহার্দ্য সম্মেলনের আয়োজন করে এবং উভয় দেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্যে একদিকে গদার অন্যদিকে সত্যজিৎ রায়কে আমন্ত্রণ জানায়। শ্রীরায়ের উপস্থিতির অনিশ্চয়তা থাকায় ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয় ভারতের আরও কয়েকজন পরিচালকের নাম পাঠায় বিকল্প বক্তা হিসেবে। সেণ্টার সে-প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। দিল্লীতে উদ্যোক্তাদের সংগে দেখা করে এ-বিষয়ে যখন আলোচনা করি, তখন সংগঠন-মুখপাত্র আমায় জানালেন : 'সত্যজিৎ রায় ছাড়া ভারতে আর কোন পরিচালক নেই, আর কারও আন্তর্জাতিক ইমেজ নেই'। এ আমাদের 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ওদেশে বসেই।'

অর কারও ইমেজ নেই, একথা সত্য। আশ্বাস কিছুটা পরিচিত; মৃণাল সেনের পরিচয়-বৃত্ত সম্প্রতি বর্ধমান। কিন্তু আর কোন পরিচালক নেই ভারতে, এ-সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য নয়। ঋত্বিক ঘটককে আমরা ভুলতে পারি না। নতুন জেনারেশনের কাজও—যেমন বাসু ভট্টাচার্য বা পূর্ণেন্দু পত্রীর নতুন প্রচেষ্টা হিসেবে কম উল্লেখ-যোগ্য নয়। এঁদের ছবি বাহির-দুনিয়ায় যেতে পারেনি—প্রচারের অভাবে, প্রচেষ্টার অভাবে এবং আরও অনেক কিছুর অভাবে। ফলে, সত্যজিৎ রায়ের পরেও যে আরও কিছু দর্শনীয় ছবি ভারতে উঠছে, এ-তথ্য সাগরপারে প্রায়-অবিদিত।

কিন্তু (যদি বিদিতও হতো, তাহলেও) এঁরাই বা কতোজন সংখ্যাহীন ভারতীয় ছবির পরিচালকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তুলনায়! অন্য দেশে, চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটেছে আন্দোলনের মাধ্যমে, একাধিক পরিচালকের সমষ্টিগত অবদানে, অনেক ক্ষেত্রে 'গ্রুপিং' বা গোষ্ঠী মাধ্যমে। ভারতে এমন কোন আন্দোলন দেখা দেয়নি, এমন কোন গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়নি। যিনি যেটুকু করেছেন বা করছেন, নিতান্ত ব্যক্তি-গত প্রয়াসে। সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্ব এই-খানে—অনন্য একক চেষ্টায় তিনি আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্রে স্বগত আসনটি অর্জন করেছেন। আশ্বাস, সেন যেটুকু পেরেছেন, সেও নিজ নিজ আয়াসে। নতুন জেনারেশন-কেও এগোতে হচ্ছে একা-একা।

আর সবই তো বাজে ছবি—বংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সর্বত্র! ছকে বাঁধা, সস্তা আবেগে ভর্তি, বাস্তবিক নির্ভাবনায় জমাট, যৌনতা-প্রধান এবং নির্বোধ 'নাট্যচিত্র'। চিত্রগুলি নড়েচড়ে, যন্ত্রের কৌশলে; কিন্তু চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না।

ব্যবসা?—ব্যবসা তো হলিউডও করে। তারা অগভীর প্রমোদ-চিত্র তোলে, কিন্তু নির্বোধ ছবি নয়। সমস্ত কাজ চলে মেশিনের মতো, 'বিজিনেস-লাইক'। একটা ইনডাস্ট্রি চলাতে গেলে যে-পরিমাণ আয়োজন পরিকল্পনা-পদ্ধতি ইত্যাদির প্রয়োজন, তার সবই হলিউডে নিখুঁত। দূর দূর দেশ থেকে পাকা পাকা মাথাকে নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিভাগে। হলিউডের ছবি অকারণে দিগ্-বিজয় করেনি।

ভারতের প্রমোদ-চিত্র হলিউডের অনু-করণ, কিন্তু ব্যর্থ অনুকরণ। কুব্রিকের 'টু থাউজেন্ড স্পেস অডিসি' এবং বোম্বাই ছবি 'চাঁদ পর চড়াই'—তুলনা করলেই বোঝা যায় : অতুলনীয়। আর, বাংলাদেশের ছবি তো এখনও পঞ্চাশ বছর পেছনে পড়ে আছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক রীতি-নীতি নেই, স্থায়ী মূলধন এবং বিধিবদ্ধ বিধান নেই, কোন সুশৃঙ্খল সুবিহিত 'সিস্টেম' নেই, যার মাধ্যমে পরিচালক-শিল্পীরা নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করে যেতে পারেন। তার ওপর, নিজেদের মধ্যে দলা-দলি নিরন্তর। এবং এই সব ধাক্কা সামলে বা সামাল দিয়ে যেসব ছবি উঠছে, তাদের মধ্যে না আছে কোন প্রগতি চিন্তা, না কোন বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা, না কোন সমাজদৃষ্টি; এমনকি, কারিগরী প্রতিভারও কোন পরিচয় নেই।

তার মৌল কারণ : শিক্ষার, বিশেষত চলচ্চিত্র-শিক্ষার অভাব। শিল্প সৃষ্টির জন্যে প্রতিভাই যথেষ্ট নয়, তার অনুশীলনও প্রয়োজন। শিল্প-প্রতিভা যাদের নেই, তারা নির্ভর করে শোম্যানশিপের ওপর। কিন্তু শোম্যানশিপও শিক্ষনীয় বিষয়, যেমন শেখবার বিষয় 'পারসোনেল ম্যানেজমেণ্ট'। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রতিভা দুর্লভ। শো-ম্যানও সুলভ নয়। এখানে পরিচালনা-প্রযোজনার জন্যে কিছু শেখবার দরকার হয় না, একটা 'প্রপোজ' করতে পারলেই হলো। 'প্রপোজ' অর্থে লগ্নী টাকার যোগান। অর্থাৎ, শাঁসালো একজন মহাজন পাকড়াতে পারলেই আলুওলা-পটলওলাও চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী ডিরেকটার বা প্রডিউসার বা এমনকি রাতারাতি ফিল্ম স্টারও!

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে ভালো ছবি, বুদ্ধিজীবিত ছবি তৈরির অবকাশ কোথায়?

কয়েক বছর হল, ভারত সরকারের সৌজন্যে ফিল্ম ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে পুণায়। এখান থেকে পাশ করে যাঁরা বেরোচ্ছেন, সকলেই যে কাজ পাচ্ছেন, তা নয়। যাঁরা পাচ্ছেন, মোটামুটি ভালো ফলই দেখাচ্ছেন।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন অতি সামান্য। পুণায় যেতে পারে আর ক'জন? ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে এতদ্ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভাবনা হয়নি। সরকারের আশু কর্তব্য : এই তিন অঞ্চলে একটি করে ফিল্ম ইনস্টিটিউট খোলার ব্যবস্থা করা। এবং চলচ্চিত্র-বিষয়ে শিক্ষা-লাভকে অতিআবশ্যিক করে তোলা—অন্ততঃ কতকগুলি বিষয়ে এখান থেকে পড়াশোনা ও পাশ না করলে ছবি তোলার রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ।

ভালো ছবির মধ্যে যেমন শিক্ষিত পরিচালক - শিল্পী-কলাকুশলীর প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দর্শকের তথা জনমানসেরও উৎকর্ষবিধান। একাজের দায়িত্ব নিতে পারে ফিল্ম সোসাইটিগুলি, যাদের সংখ্যা আজকের ভারতে প্রায় শতাধিক। সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, কিন্তু ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের গুণগত বিকাশ বিশেষ ঘটছে বলে মনে হয় না। কারণ, ক্লাবে-ক্লাবে ছবিই দেখানো হয়, আলোচনা বা লেখাপড়া কোথাও ঘটে না। সরকারী অনুদান প্রায় শূন্যের পর্যায়ে। ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায়ই শিথিল।

মান-উন্নয়নের চেষ্টা, গবেষণা, চলচ্চিত্রের মাধ্যম ও উপকরণ নিয়ে বিবিধ নিরীক্ষা—এসব চেষ্টা কোথাও নেই। কাজ করতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়ে আছে অথচ গবেষণার কোন সুযোগ, কোন সংস্থা নেই এদেশে। একদিকে সরকারী-বেসরকারী 'রিসার্চ'-সেন্টার আছে, অদ্ভুত বিষয় নিয়ে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে; কিন্তু এই জীবন্ত শিল্পটি সেখানে অপাংক্তেয়। অথচ, এতজ্জাতীয় সিরিয়াস কাজ ছাড়া কোন শিল্পই স্বাস্থ্যলাভ করতে পারে না। এবং অসুস্থ শিল্প, বলা বাহুল্য, সামাজিক-দেরও দেহ-মনকে অসুস্থ করে তোলে। বিশেষত, সৃষ্টির চাবিকাঠি যখন অশিক্ষিত-অপটুদের স্থূল মুঠিতে।

সরকার কী পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন? এবং একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনা-মাধ্যমে স্থিতাবস্থা-পরিবর্তনে প্রস্তুত আছেন?

খেলার কথা

স্বর্গ হতে বিদায়

এমনটি আগে কখনো ঘটে নি। এ যেন পাহাড়ের চুড়ো থেকে অতলে গড়িয়ে পড়ার মতো। ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অ্যাসেজ রেখে দেওয়ার সাফল্যের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দলের স্বীকৃতি আদায় করেছিল যে অস্ট্রেলিয়া একদিন, পুরো একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই স্বীকৃতির শিরোপা মাথা থেকে খসে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। কি অসহায় অবস্থা! ভিকটর ট্রাম্পার, মণ্টি নোবল, ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং, ডন ব্র্যাডম্যান, রিচি বেনোদের ঐতিহ্য আজ যেন শুধু অতীতেরই ঐশ্বর্য। বর্তমানের পুঁজি যা তা দিয়ে সাবেকী গয়নাপত্তরের চকচকে জৌলুষটিকেও অবিকৃত রাখার উপায় নেই।

এক পর্যায়ের সব কটি টেস্টেই, তা হোক না বেসরকারী, হার এবং শোচনীয় হারই। ব্যবধান কখনো তিনশ রানের, কখনো বা ইনিংসের। ফলাফলেই প্রকাশ, দলে দলে আকাশ জমিন ফারাক। মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো সংগতি তো কোন ছার, মুখ তুলে চাইবার মতো সাহসটুকু নিঃশেষিত। টেস্ট ক্রিকেটের, আনুষ্ঠানিক বা বেসরকারী টেস্টের দীর্ঘ ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়াকে এমন নাকাল কোনোদিন হতে হয় নি। হাতী সত্যিই এবার কাদায় পড়েছে!

কিন্তু এমন অবস্থা যে ঘটতে পারে, তার পূর্বাভাষ কি আদৌ পাওয়া যায় নি? বোধহয় গিয়েছিল বিল লরির দলের ভারত পরিক্রমা কালে। পেস বোলার বিবর্জিত ভারতীয় দলের মোকাবিলায় এ দেশের শক্ত, শান বাঁধানো পিচে প্রসন্ন-বেদীর স্পিনের সামনে দাঁড়িয়ে দলবলসহ বিল লরি আতঙ্কে ও অনিশ্চয়তায় কেঁপেছেন। শুধু স্পিন, বিশেষভাবে প্রসন্নের অফ স্পিন সাধারণ ও সহজ পিচে যাঁদের অসহায় করে তুলেছিল, তাঁদের মানসিক বিন্যাস ও ক্রীড়াধারার পারিপাট্যে যে কতো খাদ মিশে থেকেছিল তা বোঝায় তখন অসুবিধে হয় নি। দিন কয়েক পর প্রোকটর ও পোলক যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে মাঠে পেস বোলিংয়ের উত্তাপ ছড়াতে লাগলেন, তখন ব্যাটিংয়ের সেই নিভেজাল খাদটুকুই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল।

প্রথমে ভারতের সঙ্গে সরকারী টেস্ট, পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বেসরকারী টেস্ট খেলার সূত্রে এই উপলব্ধিই সাচ্চা হয়ে উঠেছে যে বিল লরি ও সতীর্থদের পেস ও স্পিন বোলিং সামাল দেবার যোগ্যতা নেই। ডন ব্র্যাডম্যানের ফেলে রাখা উত্তরীয়টি ডগ ওয়াল্টার্সের গায়ে যতোই জড়াবার চেষ্টা করা হোক না কেন, মিথ্যে সাজ হাওয়ার টানে খসে পড়ছে। পড়বেই তো।

পেস বোলিংয়ের আঁচে গায়ে ফোসকা পড়ছে, অফ স্পিনের ঘা প্রতিনিয়তই মূর্ছা জাগাচ্ছে। তাহলে সম্বল বলতে এই অস্ট্রেলীয় দলের আছে কি? বোধহয় অবশিষ্ট শুধু বিল লরির সাফাই গাওয়ারই ক্ষীণ প্রচেষ্টা—আম্পায়ারিংয়ের জন্যে তাঁকে ও তাঁর দলকে ভুগতে হয়েছে, দক্ষিণ

অজয় বসু

আফ্রিকায় আম্পায়ারিংয়ের মান আশানুরূপ নয়। লরি এ কৈফিয়ৎ তুলতে কসুরও করেন নি। কেনই বা করবেন! নাচতে না জানলে উঠানের দোষ দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ! হেরে গিয়ে লরি তাই আম্পায়ারদের কাঠগড়ায় চড়াতে চাইছেন। খেলতে খেলতেও তিনি আম্পায়ারদের দুষেছেন। এডি বার্লোর সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দলপতি আলি বেচার মধ্যস্থতা করতে এগোলে তাঁকেও দু কথা শুনিয়ে তবেই ছেড়েছেন।

লরির মতো কটুভাষী, খিটখিটে মেজাজের খেলোয়াড় কোনোদিন কোনো দল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। ভারত সফরে প্রায় প্রতিদিনই তিনি এই মেজাজে শালীনতা, শোভনতার প্রশ্নকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। ব্যাটের ঘায়ে এক ফটোগ্রাফারকে ভূপাতিত করতেও তাঁর বাধে নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েও সেই মেজাজেই তিনি অবিচল। দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে কিথ মিলার লিখতে বাধ্য হয়েছেন, লরির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওঁর বদলে এখনই চ্যাপেলকে দল পরিচালনার ভার দেওয়া হোক।

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সদ্যোসমাপ্ত বেসরকারী টেস্ট খেলা সম্পর্কে ক্রিকেটে বিদগ্ধ কিথ মিলার যে সব মন্তব্য করেছেন তা শুনে বিল লরি ও তাঁর দলের নামী ও দামী খেলোয়াড়দের কান লাল হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। মিলার লিখেছেন যে পোলক ও প্রোকটর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়েসলি হল ও চার্লি গ্রিফিথের মতো জবরদস্ত ফাস্ট বোলার নন, তবু অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানেরা পোলক-প্রোকটরের বাম্পারকে সভয়ে সেলাম ঠুকে পিছু হটেছেন। মিলারের মতে, পোলক-প্রোকটর ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো বোলারেরই আন্তর্জাতিক জাত নেই। মিডিয়াম পেসার অফ স্পিনার এডি বার্লোকে তো ক্লাব ক্রিকেটের বাইরের আসরে বল করার জন্যে ডাকাই চলে না। তবু ওই বার্লোই বলে বলে লোক ঠকিয়ে ব্যাগ ভর্তি উইকেট কুড়িয়েছেন।

স্বদেশের খেলোয়াড়দের কীর্তিকলাপ দেখতে এবং সে সম্পর্কে কিছু লিখতেই কিথ মিলার অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ছুটেছিলেন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায়। পর পর তিনটি বেসরকারী টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার খেলার নমুনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি লিখে ফেলেন 'ভাবছি, আমাকে কাজে লাগাবার জন্যে লরির কাছে অনুরোধ রাখবো কিনা। প্রায় একযুগ হলো ক্রিকেট খেলি নি। সাজ-সরঞ্জামও সঙ্গে নেই। কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না। এই অপ্রস্তুত অবস্থাতেও আমি বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দলের অনেকের চেয়ে ভাল খেলতে পারবো।'

নিজের মুখে নিজের কথা বলে বড়াই করেন নি, কিথ মিলার অনেক দুঃখেই কথাগুলি বলে ফেলেছেন। এবং তাঁর এই প্রকাশ্য উচ্চারণেই বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দলের সামগ্রিক দৈন্য যেন যথার্থভাবেই ফুটে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ক্রিকেটের স্বর্গ থেকে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাসনও আজ নিশ্চিতপ্রায়।

আফশোষের কথা, যে দলটি এবার বিল লরি পরিচালিত অস্ট্রেলিয়াকে বেসরকারী টেস্টে এমন শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিল, সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কৃতিত্ব কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে না। ইংলণ্ডে প্রকাশিত 'ক্রিকেট পত্রিকা' উইজডেন, শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলাগুলির ওপর টেস্ট ম্যাচের খোলস চাপিয়ে দেবার যতোই নোংরা চক্রান্ত আঁটুক, ইতিহাস জানে যে, ওই খেলাগুলি আসলে আনুষ্ঠানিক টেস্ট ম্যাচ নয়, বেসরকারী

ম্যাচ। কারণ, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনে তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গিয়েছে। তাই ১৯৬১ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গ দেশগুলির সঙ্গে যেসব ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে, তার কোনোটিরই সরকারী সংজ্ঞা, মর্যাদা ও স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তা নেই জেনেও উইজডেন বা শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সেই সব খেলাগুলিকে টেস্ট ম্যাচ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ও'রা ইতিহাসকে বিকৃত করার সুপরিকল্পিত ফন্দী এঁটেছেন, সন্দেহ নেই।

আরও আশ্চর্য, এই সুচতুর ফন্দী-ফিকিরের কথা জানাজানি হয়ে পড়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্র সেই ফাঁদে ধরা পড়েছেন। চক্রান্তের ল্যাজটি উল্টে না দেখেই তাঁরাও ওই সব খেলাগুলির কপালে টেস্ট ম্যাচের তিলক পরাতে দ্বিধা করেননি। লজ্জার কথা এই যে, এই ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহকে, দু একটি বাদে অবশ্য, যেমন নীতিগত প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি, তেমনি তাঁরা আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধও হতে পারেননি।

কথায় বলে, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। কথাটা বুঝি একেবারে মিথ্যেও নয়। তাই আমরা প্রশ্ন তুলে বলিনি যে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাগুলিকে যদি উইজডেনে টেস্ট ম্যাচরূপে আখ্যাত হয়, তাহলে ত্রিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ভারত যে সমস্ত বেসরকারী টেস্ট ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে, সেগুলিই বা সরকারী স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাবে না কেন? সেই সব খেলাতেও অনেক ভারতীয় সেঞ্চুরী করেছেন অথবা বোলিং নৈপুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। অশ্বেতকায় ভারতীয়দের হাতে গড়া বলেই কি সেগুলিকে হিসেবের মধ্যে ধরার চেষ্টা নেই? অথচ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘিরে যে বেসরকারী টেস্ট তাতে কোনো শ্বেতাঙ্গ কিছু করলেই সেগুলিকে সাদরে আনুষ্ঠানিক কীর্তি বলে মেনে নেবার তোড়জোড় পড়ে যায়। এই একচোখো রীতি রীতিমতো নোংরা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, অন্যপক্ষদের নোংরা কারসাজি সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বা ক্রিকেট বোর্ড কোনো উচ্চবাচ্যই করেন না। ভারতীয় বোর্ড কি শুধু আত্মবিস্মৃত? না, সাহেবজাতীয় জুজুবুড়োর ভয়েই তটস্থ?

যাক্ সে কথা। ফিরে আসি অস্ট্রেলিয়ার শোচনীয় পরাজয় প্রসঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা পরস্পরের সঙ্গে খেলছে ১৯০২-৩ মরশুম থেকে। এই দীর্ঘ আটষট্টি বছরের কোনো এক ফাঁকেও দক্ষিণ আফ্রিকা এক পর্যায়ের সবক'টি খেলায় জিততে পারেনি। আনুষ্ঠানিক টেস্ট ম্যাচের আমলে স্কোয়ার্জ, ভলগার, ফকনার, হার্বি টেলর, ব্রুস মিচেল, দুই নোর্স, ক্যামেরণের মতো বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়েরা দলে থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় কোনো পর্যায়েই সব খেলা তো দূরে থাকুক, তিনটির মধ্যে দুটি বা পাঁচটির মধ্যে তিনটি খেলাতেও জিততে পারেনি। তবে দু দলে বেসরকারী খেলার সূত্রে একবার অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ মরশুমে পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তবে সেবারেও অস্ট্রেলিয়াকে এবারের মতো শূন্য হাতে ফিরতে হয়নি। তিনটিতে হারলেও ১৯৬৬-৬৭ সালে বব সিম্পসনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া একটি খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারায় এবং বাকী খেলা অমীমাংসিতও রাখতে পারে।

আর শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই নয়, অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতেও অস্ট্রেলিয়াকে এমন নাকাল কখনো হতে হয়নি যেমন হলো এবারে। ধরা যাক্ ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার খেলার কথা। ১৮৭৬-৭৭ থেকে ১৯৬৮-র দীর্ঘ ইতিহাসে একটি অধ্যায়ও নেই যেটি অস্ট্রেলিয়ার সার্বিক পরাজয়ের নজীরে লাঞ্ছিত। ১৯৩২-৩৩ সালে 'লৌহ-মানব' ডগলাস জার্ডিন লারউড ভোসকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে মাঠে বডি লাইনের আগুন ছুটিয়েছিলেন। অভাবনীয় আক্রমণের খুনে মেজাজের সামনে পড়ে সেদিন অস্ট্রেলিয়া চমকে উঠেছিল। সেদিন আত্মরক্ষার পথ খুঁজে না পেয়ে অনিশ্চয়তার গোলকধাঁধায় দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়ানো ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার অন্য উপায় ছিল না। তবু ক্রিকেটের সেই অন্ধকার লগ্নেও অস্ট্রেলিয়া জার্ডিনের দলকে নিদেনপক্ষে একটি টেস্ট হারাতে কসুর করেনি।

১৯১১-১২ সালে জ্যাক হবস্, উলফ্রেড রোডস, সিডনি বার্ণস, ফস্টারের দৌলতে ইংলন্ডের শক্তি যখন অপরিমিতপ্রায়, তখনও চারটিতে হারার আগেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টটিতে জিতেছে ১৪৬ রানে। ১৯২৮-২৯ মরশুমের চিত্রটিও অবিকল একই। ডন ব্র্যাডম্যানের আবির্ভাবের মুখে ইংলন্ডের সামর্থ্যের যেন মাপজোক করা যায় না। ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে রয়েছেন হবস্, সাটক্লিফ, হ্যামন্ড, হেনড্রেন; বোলার বলতে লারউড, টেট, গিয়ারি। বাঘা বাঘা এইসব খেলোয়াড়ের দক্ষতায় ভর করে ইংলন্ড সেবার চারটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তবুও অন্ততঃ একটিতে পাল্টা কামড় বসাতে অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে পড়েনি।

কিন্তু এবারের কাহিনী সব হিসেবেরই বাইরে। জয় তো দূরের কথা, একটি খেলা অমীমাংসিত রাখতেও বিল লরির দলের মুরোদে কুলালো না। এমন ফাঁকা হাত ও কপালে পরাজয়ের কালিমা মেখে অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো দলনায়ককে কোনোদিন মাঠ ছাড়তে হয়নি। ভাগ্য বটে বিল লরির! তাঁর আমলেই ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণযুগের অবসান ঘটলো।

ঘটনাটি বোধহয় আকস্মিক নয়, স্যার ব্র্যাডম্যানোত্তর কালে অবস্থাটা ধীরে ধীরে এই পরিণতির দিকে ঝুঁকেছিল। এবং অস্বাভাবিকও নয় নিশ্চয়ই, যেহেতু মাঝারি পর্যায়ের খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর করে কোনো দলই আন্তর্জাতিক আসরে দীর্ঘদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না। রাখতে পাবার আশাটাই তো বে-হিসাব ও নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। নয় কি?

গৃহীত হয়, যেহেতু প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদান বিপদজনক, সেই কারণে তাদের ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হল। ১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের প্রশ্ন পরবর্তী কমিটি বিচার-বিবেচনা করবেন। এখানে উল্লেখ্য, খেলাধুলোয় দক্ষিণ আফ্রিকার বহুনিন্দিত বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া খেলতে নামেনি; ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউরোপীয়ান জোনের উপর্যুপরি দুটি রাউণ্ডে ওয়াক-ওভার পেয়েছিল অর্থাৎ না খেলেই পরবর্তী রাউণ্ডে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার আজ কি হাঁড়ির হাল! বারবার অপদস্থ হয়েও কিন্তু তাদের এতটুকু জ্ঞান হল না। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে তারা সরকারী বর্ণবৈষম্য নীতি এখনও আঁকড়ে রয়েছে। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা এই বর্ণবৈষম্য নীতির কারণেই উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে) অলিম্পিক গেমসে যোগ দিতে পারেনি। ১৯৭০ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাদের যোগদানের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর উপলক্ষে এম সি সি দলে অশ্বেতকায় খেলোয়াড় বেসিল ডি'ওলিভেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বর্ণবৈষম্য নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এম সি সি দলে অশ্বেতকায় খেলোয়াড় নির্বাচন অনুমোদন করেনি এবং বেসিল ডি'ওলিভেরাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার যে-চাপ দেওয়া হয়েছিল, তাতে এম সি সি বেশ দ্বিধায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত জনমত এবং সংবাদপত্রের চাপে এম সি সি কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করতে বাধ্য হন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের ১৯৭০ সালের আগামী ইংল্যাণ্ড সফর নিয়ে যে যথেষ্ট হাঙ্গামা হবে তার পূর্বাভাষ দিন দিন জমে উঠছে। টাটকা খবর হল, আন্তর্জাতিক অপেশাদার সাইক্লিং সংস্থার কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা সদস্য হওয়ার জন্যে যে আবেদন করেছিল, তা মঞ্জুর হয়নি। আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা হালে পানি পাচ্ছে না দেখে সমবেদনায় মাত্র কয়েকটি দেশ হাঁপুস নয়নে তাকিয়ে আছে। নেপথ্যে কলকাঠি নাড়াচাড়া করেও বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু সুরাহা হচ্ছে না। কি আপশোষের কথা!

ভারতবর্ষ বনাম সিংহল

ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের ভলিবল টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ পুরুষ বিভাগে এবং সিংহল মহিলা বিভাগে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। পুরুষ বিভাগে ভারতবর্ষের জয় ৪—০ খেলায় এবং মহিলা বিভাগে সিংহলের জয় ৩—২ খেলায়। এখানে উল্লেখ্য, কলকাতায় আয়োজিত পুরুষ বিভাগের ১ম টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির দরুণ বাতিল হয়ে যায়।

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের খেলা

হংকংয়ে আয়োজিত জাপান বনাম হংকংয়ের পূর্বাঞ্চলের 'এ' গ্রুপের ডেভিস কাপ খেলায় জাপান ৫—০ খেলায় জয়ী হয়েছে। পরবর্তী রাউণ্ডে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অথবা ইন্দোনেশিয়া।

কোয়ালালামপুরে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে সিংহল পূর্বাঞ্চলের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে উঠেছে। সিংহলের সঙ্গে খেলবে ভারতবর্ষ।

পাটনায় পূর্বাঞ্চলের 'বি' গ্রুপের খেলায় ভারতবর্ষ ৩—১ খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। সিংহল রাজী হলে ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের ফাইনাল খেলা শুরু হবে দিল্লীতে আগামী ১১ই এপ্রিল।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় ভারতবর্ষ গত কয়েক বছর ধরে চ্যাম্পিয়ান হয়ে মূলে প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৬৬ সালে ভারতবর্ষ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১—৪ খেলায় পরাজিত হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে মাত্র এই দুটি দেশ এপর্যন্ত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলে রানার্স-আপ হয়েছে—১৯২১ সালে জাপান এবং ১৯৬৬ সালে ভারতবর্ষ।

১৯৭০ সালের ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার যোগদানে ভারতবর্ষের এতদিনের প্রাধান্য কি অক্ষুণ্ণ থাকবে? অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস কোন অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়াই পূর্বাঞ্চলের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হবে। পূর্বাঞ্চলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার যোগদান এই প্রথম।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

কলকাতার ময়দানে প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলা বেশ জমে উঠেছে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রথম হকি ম্যাচ খেলেছে গত ১৮ মার্চ। মোহনবাগান এ পর্যন্ত কোন পয়েণ্ট নষ্ট করেনি। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একটা পয়েণ্ট নষ্ট করেছে, আলেকজান্দার রেমণ্ড দলের সঙ্গে তারা গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করেছে। ১৯৭০ সালের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক করেছেন ইস্টবেঙ্গল দলের গোবিন্দ, পুলিশের বিপক্ষে। রেঞ্জার্সের বিপক্ষে মোহনবাগান দলের ইনাম এবং ইক্রাম যে হ্যাটট্রিক করেছেন তার বিশেষত্ব আছে—একটি খেলায় এক দলের পক্ষে দুটি হ্যাটট্রিক এবং তা করেছেন দুই সহোদর। মোহনবাগানের ইক্রামের কৃতিত্ব আরও উল্লেখযোগ্য, তিনি উপর্যুপরি দুটি খেলায় হ্যাটট্রিক করেছেন (বিপক্ষে রেঞ্জার্স এবং বেঙ্গল ইউনাইটেড)।

প্রধানত খেলার মাঠে নিরাপত্তার দাবীতে হকি আম্পায়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হকি আম্পায়াররা দুদিন যে ধর্মঘট করেছিলেন, তার ফলে হকি খেলা বেশ কিছুটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল। ধর্মঘটের অবসানে হকি লীগ খেলা নিয়মিত চলছে এবং হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিয়ে বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরলোকে জয়পাল সিং

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ এবং লোকসভার প্রবীণ সদস্য শ্রীজয়পাল সিং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

জয়পাল সিং

তাঁরই নেতৃত্বে ভারতবর্ষ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল ১৯২৮ সালে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি হকি খেলায় 'ব্লু' পেয়েছিলেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য এবং দিল্লীর ফুটবল ও হকি এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া আরও একাধিক ক্রীড়া-সংস্থার সম্মানজনক পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৮শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 10th April, 1970. শুক্রবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীতৃপ্তি নন্দী

চিঠিপত্র

মৌলিক নাটক প্রসঙ্গে

অমৃত-এর ৪৮ সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহ বিভাগের অন্তর্গত বিবিধ সংবাদ পর্যায়ে অভিনয় পত্রিকা আয়োজিত আলোচনা সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে দেখে খুব খুশি হলাম। এই আলোচনাচক্রে নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের সমস্ত আলোচনাটিই অত্যন্ত মূল্যবান। আলোচনার পরিশেষে তাঁর বক্তব্যটুকু আরো মূল্যবান। সেখানে তিনি বলেছেন, ১৯৭০-এর পর আগামী দিনের নাট্যকার ও শিল্পী-সাহিত্যিকরাই নির্মাণ করবেন সমগ্র জাতির ভাবধারার চৈতন্যের ভূমি। তিনি আলোচনায় আরো অনেক কিছু বলেছেন। বাংলা নাটকের দীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাতও তার মধ্যে আছে। সত্যি কথা, বাংলা নাটকে অনুবাদের বাড়াবাড়ি ঘটছে ভীষণভাবে। অবশ্য, আর্থার মিলারের মত নাট্যকার বাংলা-মঞ্চে এসেছেন এটা খুবই আনন্দের। এমনি আরো অনেকে আসুন, ক্ষতি নেই। তাতে বরং বাংলা নাটক সমৃদ্ধই হবে। কিন্তু যদি বিদেশী নাট্যকারের লাইন দীর্ঘই হয় এবং মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্র প্রায় অনাবাদী পড়ে থাকে, তাহলে সমৃদ্ধি ঘটবে কার? প্রশ্নটা এসে যায় স্বাভাবিকভাবেই। নাটক অনুবাদ হচ্ছে অজস্র। কিন্তু মৌলিক নাটক রচনা হয় কটি? এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলা প্রয়োজন মনে করি। একবার একটি অনুবাদ নাটকের অভিনয় দেখতে যাই। এক বিখ্যাত অভিনেতা প্রধান অতিথির ভাষণে বললেন, এবার আমরা অনুবাদ নাটক দেখছি। ভবিষ্যতে এই নাট্যকার মৌলিক নাটক দেখতে আমন্ত্রণ জানাবেন, আশা করবো। কিন্তু সে আশা একটুও সফল হয়নি: তিনি বরং দারুণ বুদ্ধিজীবীর মতো ভীষণভাবে বিদেশী নাটক অনুবাদ করে চলেছেন।

তবে কি ধরে নিতে হবে নবান্ন-এ যে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা কি লুপ্ত হয়ে গেল। যদি তাই না হবে তবে ১৯৭০ সালে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয় কেন? ইতিমধ্যে যে মৌলিক নাটক রচিত হয়নি এমন নয়। এবং আজো হচ্ছে। তবু যথার্থ স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলা নাটক গড়ে উঠছে না। তার হাঁটি হাঁটি পা পা অভ্যাসটা এখনো যায়নি। তাই বিজনবাবু আশা করেছেন আজকের সমস্যাসংকুলন জীবন অবলম্বন করে নাটক রচনার মাধ্যমেই পুনর্বার নবজাগৃতি ঘটবে। ইতিমধ্যে জীবন ভীষণ পোড় খাচ্ছে। দিকে দিকে হতাশা। জমাট ক্রোধ। এই যুগসত্যকে আজকের দিনে ধরে রাখার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। নাট্যকার নিজ যোগ্যতায় এ দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। কোথাও কোথাও যে এর প্রতিফলন না হচ্ছে এমন নয় কিন্তু তাতে সমস্যার কেন্দ্রিক জটিলতা ধরা পড়ছে না। ফলে এসবই সূচনাহীন হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, এরা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জীবন-যন্ত্রণা শূন্য। এর ফলে শুধুই অসারতা। সেই অসারতার প্রমাণ পেয়েছি আরও এক জায়গায়। জনৈক বিখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা এক জায়গায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বিদেশী শিল্পী-সাহিত্যিক গুণিজনেরা এলে লজ্জায় আমাদের মাথা নুয়ে আসে। আমাদের মঞ্চে আমাদের নাটক কোথায়? এখন প্রশ্ন হলো, এই নাট্যকার অভিনেতা বক্তৃতা দিয়েই নিজেদের দীনতা প্রকাশ করে দায়মুক্ত হয়েছেন। অন্য কোন চেষ্টা তিনি করেননি। অথচ তিনি ক্ষমতাবান। তবে এই ব্যর্থতা কেন?

আসলে, সবই চলছে একটা বিরাট ফাঁকির ওপর। আর সেই ফাঁকির ফানুসটা এমনভাবে সাজানো যে, তাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর কিছু ভাবতে পারি না।

শ্যামল ভাদুড়ী
কলিকাতা—১৬

পাঠক সজ্জন ও সম্পাদক সমীপেষু

গত ২৬শে মার্চের 'অমৃতের' (৪৬ সংখ্যা) প্রকাশিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঠক সজ্জন ও সম্পাদক—সমীপেষু' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের জানার কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাঠক-পাঠিকাদের এই কৌতূহল নিরশন তারাশংকরবাবুর আলোচ্য লেখাটি প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে আপনারা ধন্যবাদার্হ। কিছুদিন যাবত 'অমৃতে' নিয়মিত 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনা প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে আপনারা 'পাঠক-সজ্জন ও সম্পাদক সমীপেষু' শিরোনামায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা প্রকাশ করলে খুশী হব।

শ্রদ্ধেয় তারাশংকরবাবু তাঁর লেখক জীবনের ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে ছেলেবেলার লেখা তাঁর প্রথম কবিতা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত নিখুঁতভাবে আলোচনা করেছেন। এই লেখাটি পাঠ করলে তাঁর সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্ত হবে—সন্দেহ নেই। তারাশংকরবাবু তাঁর প্রথম জীবনের লেখার চেষ্টাকে স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান লেখক-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা শ্রেয় মনে করেন না। (সম্ভবতঃ এরকম রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল।) তারাশংকরবাবু তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন —'আমার সে কালকে স্মরণ করে মনে করতে পারি যে, তখন লেখক হবার বাসনা ছিল, কিন্তু বিনয় ছিল না।'। তাই বোধহয় তিনি লিখেছেন—'কি লিখেছি জানি না, তার মূল্য নির্ণয়েও 'আমার অধিকার নেই'। এটি তাঁর বিনয় ছাড়া আর কি? যাহোক, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েই—এই চিঠি শেষ করছি।

—অজিতকুমার দাস
হাওড়া-৬

বইকুণ্ঠের খাতায় ষাটের দশক

সপ্তাহ কয়েক আগে গ্রন্থদর্শী একটি আলোচনা লিখেছিলেন 'দশক ভাগের বিড়ম্বনা ও ষাটের দশক' শিরোনামে। দু-একটা উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখক অতর্কিত থেমে গেছেন বলে আমার মনে হয়। ষাটের দশক নিয়ে এখনো কোথাও কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চোখে পড়েনি। বোধহয়, তিনিই প্রথম লিখেছেন। এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

এই আলোচনার বিষয় ষাটের দশক হলেও গল্পকারদের প্রসঙ্গে কিছুই লেখা হয়নি। উল্লেখযোগ্য গল্প-কবিতার বইগুলোর আলোচনা করা উচিত ছিল। আমি এই দশকের কয়েকটি প্রবণতার কথা ভেবেছি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হলে খুশী হবো। আমার মনে হয়েছে।

(১) পঞ্চাশের মতো ষাটের সাহিত্য একমুখী নয়, বহুমুখী। কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী প্রাধান্যের কাল নয় এটা। একক ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখা যায়নি এই দশকে।

(২) এই দশকে ভাবগত পরিবর্তন যতটা হয়েছে, তার চেয়েও বেশী হয়েছে ফর্ম ও টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। চরিত্রের দিক থেকে কবি সাহিত্যিকরা কেউ শান্ত, কেউ রাগী কেউ বিষণ্ণ, কেউ সমাজমুখী। অনেকেই প্রথাবিরুদ্ধ এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী।

চিঠিপত্র

(৩) ষাটের প্রথম দু-তিন বছর ছিল মূলত পঞ্চাশের দখলে। হাংরি জেনারেশনের প্রভাব প্রতিপত্তির কাল এটা। তিরিশের চেয়েও প্রখর যৌনতার অসুখে রম্যতা সন্ধানের চেষ্টা চলেছিল কয়েক বছর। শেষ-ষাটে তাঁরা ম্রিয়মান। তবে বয়স্ক সাহিত্যিকরা তাঁদের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন জনপ্রিয়তার প্রলোভনে।

মধ্য-ষাটের কবি সাহিত্যিকরা কেউ কেউ নিম্নকণ্ঠ, রহস্যময় উচ্চারণের পক্ষপাতী, রাজনীতির ব্যাপারে ক্ষিপ্ত, শাস্ত্রবিরোধিতার অগ্রগামী। এ সময়ে চড়াসুরের কমিটেড লেখা লিখতে শুরু করেন সমাজবাদী কবিরা।

শেষ-ষাটের সাহিত্য সমাজ বাস্তবতায় আস্থাশীল, প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজ ও সমষ্টির প্রতিই তাঁদের যাবতীয় আগ্রহ।

(৪) পত্রিকা প্রকাশের দিক থেকে ষাটের দশককে বলা যায় 'হিড়িকের কাল।' গত কয়েক দশকে সম্ভবত আর কখনো এত পত্রিকা বেরোয়নি। অথচ প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো কাগজ বেরোয়নি ষাটের দশকে।

(৫) এ সময়ে সাহিত্যের তেমন কোনো বড় রকমের আন্দোলন না হলেও একটা জিনিস হয়েছে, সহজ কথায় তাকে বলা যায় জোয়ার ভাটার খেলা। বাংলার নিজস্ব মাটি থেকে উঠে-আসা আলোড়ন নয়, বিদেশী হাওয়ার প্রহারে আন্দোলিত হয়েছে কফি হাউসের পরিবেশ। ফরাসী অঁভা গার্দ মুভমেন্টের মতো একটা আন্দোলন গড়ে তোলা যায় কিনা তাই নিয়ে ভেবেছেন তরুণ কবিরা। বীট হিপ্পিদের আবেগময় যৌনতা পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। নির্বিষয় কাহিনী লেখার চেষ্টা করেছেন গল্পকাররা। এমনকি অ-কবিতা লেখার মহড়া দিয়েছেন দু'একজন।

কবিতার কথা ঠিক জানি না। এই দশকের প্রসঙ্গে মনে হয় (১) গল্পের ভাষা ক্রমশ কবিতার কাছাকাছি চলে আসছে (২) সমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে নিয়ে কাহিনী লেখা হচ্ছে কম (৩) মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনের জটিলতা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী (৪) গ্রামীন সংস্কার ও লোকায়ত প্রেমের কাহিনী নির্মাণে তরুণ লেখকরা নিরুৎসাহ (৫) মনোবিকলন ও মনোবিশ্লেষণের দিকে গল্পকারদের ঝোঁক (৬) প্রতীকের ব্যবহারে অনেক গল্প স্বপ্নমুখী (৭) প্রেমাক্রান্ত রোমান্টিক ভাবনার পরিবর্তে যৌনতার চিত্রণে তরুণেরা অধিকতর স্বতস্ফূর্ত (৮) বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের জটিলতায় আচ্ছন্ন রয়েছেন প্রায় সব গল্পকার (৯) অনেকে চরম ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে গা ঢেলে দিয়েছেন অবলীলাক্রমে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গল্পের নাম মনে পড়ছে। যেমন অজয় গুপ্তের 'একজন দ্বাররক্ষীর গল্প', মানব সান্যালের 'ঈশোপরিষদ' সমরেশ দাশগুপ্তের 'জন্মভূমি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন' 'ঘাটবাবু ও নস্তুপিসি', সুবিমল মিশ্রের 'হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের মরা বা সোনার গান্ধীমূর্তি', প্রভৃতি। এদের ছাড়াও সুভাষ সিংহ, তুষারাভ রায়চৌধুরী, আশিস ঘোষ, রমানাথ রায়, কবিতা সিংহ, অমল চন্দ, অজু মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু, অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, চন্ডী মন্ডল, তপোবিজয় ঘোষ, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, মিহির মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নকুল মৈত্র, রমেন্দ্র রায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক, তপন দাস, ভরত সিংহ শিশির লাহিড়ী, যীশু চৌধুরী প্রমুখের আলোচনা দরকার।

গল্প-কবিতা প্রভৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাঠকরা যেমন উপকৃত হন, সাহিত্যেরও তেমনি কিছু কাজ হয়। অমৃতের পাঠক-পাঠিকারাও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে আলোচনাটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেন।

—শুভংকর পাঠক
কলকাতা—৩

বহির্বঙ্গে বাঙলা চর্চার সংকট প্রসঙ্গে

অমৃতে ৯ মাঘ ১৩৭৬ সংখ্যায় কুসুমবিহারী চৌধুরী 'বহির্বঙ্গে বাঙলা চর্চার সংকট' সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। গত আট বছর ধরে এখানে 'বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত আছি। দেখেছি কী গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অবাঙালীরা বাংলা শিখতে আসেন—তাঁদের নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অথচ অন্য চিত্র দেখুন। স্থানীয় 'বেঙ্গলী এডুকেশন সোসাইটি হাইস্কুলে' এস এস-সি পর্যন্ত বাংলা লেখার সুযোগ আছে—তবুও বাঙালী অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের 'বাংলা স্কুলে' পাঠাতে চান না। এটি 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুল, উপরন্তু বাংলা বিষয়ে এস এস সি পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে—পরীক্ষাতে পাশের হার শতকরা ৯৫ থেকে ১০০। তা সত্ত্বেও সব বাঙালীরা এখানে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চান না। জানি না কেন এই অনীহা। অভিভাবকেরা যদি আগ্রহী হন, তাহলে 'বাংলা স্কুলে' ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারেন, বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতিতে তাদের পাঠাতে পারেন, কিংবা স্থানীয় অজস্র বাংলা বইয়ের লাইব্রেরীর সুযোগ নিতে পারেন। আমার আশংকা হয়, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দেখব একজন অবাঙালী বাংলায় গীতাঞ্জলি পড়ছেন, কিম্বা কাবুলিওয়ালা পড়ছেন, তা দেখে তাঁর বাঙালী বন্ধু ইংরেজিতে বলছেন, 'আমিও 'কাবুলিওয়ালা' সিনেমায় দেখেছি' অথবা গানটা শুনেছি।'

সুকৃতি রায়চৌধুরী
বোম্বে-১৪

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থের মধ্যে সর্বোত্তম বললেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। এই প্রবন্ধের একস্থলে কবি লিখেছেন—

'লক্ষ্মণ তো বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর ঊর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল......'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দ বৎসরের স্থানে বারো বৎসর কেন লিখলেন? বাল্মীকির রামায়ণ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও 'চতুর্দশ' বৎসরের কোনো বিকল্প সংখ্যা চোখে পড়ল না। বস্তুতঃ লক্ষ্মণও যে রামের সঙ্গে চৌদ্দ বছরই বনবাসে কাটিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে কি তবে মহাভারতে পাণ্ডবদের বারো বৎসর অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে এই চৌদ্দ বৎসর সংখ্যাটিকে ঘুলিয়ে ফেলা হয়েছে? আমার সামান্য জ্ঞানে ত এই সমস্যার কোনো সমাধানই খুঁজে পাচ্ছি নে। আমি প্রশ্নটির প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
বারাণসী-৫।

সাদা চোখে

হিংস্রতা একটি আদিম প্রবৃত্তি। মানুষ ও বন্য পশুর মধ্যে এই স্বভাব একদা সমভাবেই ছিল। সভ্যতার জাগরণে মানুষের মধ্যে এখন তা সুপ্ত। বন্য পরিবেশে পশুদের মধ্যে এখনও তা অব্যাহত। আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশুও হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকে। মানুষও আবার একই কারণে হিংস্র হয়ে ওঠে। কাজেই এই আদিম প্রবৃত্তি কখনও পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হতে পারে না। পুঁথি-পুরাণ সাক্ষ্য বহন করে দেবতাদের মধ্যেও এই স্বভাব পরিপূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল। যদি স্বর্গ থেকে থাকে এবং দেবতারা আজও সেখানে বিরাজ করছেন বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে দ্বিধাহীনচিত্তে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় হিংসা স্বর্গে আজও বর্তমান। হিংসা স্বার্থান্বিতার সহজাত সন্তান। আবার স্বার্থই মানুষকে বা পশুকে বা দেবতাকে গতিশীল করে তোলে। এই স্বার্থকেই আদর্শের আবরণ দিয়ে মানুষ তার হিংস্রতাকে ঔচিত্যের মহিমায় বিভূষিত করে। পশুর হিংস্রতা খাদ্যখাদকের সম্পর্কের রূপ নেয়। আবার ভয় ও নির্যাতন অনেক সময় হিংস্রতায় পর্যবসিত হয়। যতই বিচার বিশ্লেষণ করা হোক না কেন হিংস্রতার বিলুপ্তির জন্য কোন সঠিক পথের নিশানা পাওয়া যাবে না। কাজেই কি মানব বা কি পশুজীবন সর্বত্রই হিংস্রতা অপরিহার্য।

এই হিংস্রতা পরিহারের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে, মানুষ তার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করে এই হিংস্র পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কতই না আচরণবিধি প্রবর্তন করেছে। কিন্তু ব্যাপক আকারে সব সময় বর্তমান না থাকলেও হিংস্র বিস্ফোরণ ঘটছে, ঘটবে। কোন আইন-কানুন, কোন দন্ডবিধি এ প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। বিধাতা-পুরুষ আছে, কি না, অনুসন্ধানও করিনি কখনও। ভগবানের বিচারের ওপর যাঁরা আস্থাবান তাঁরাই দৈত্যকুলের ধ্বংস সাধনের জন্য বিধাতা-পুরুষের কাছে কৃতজ্ঞ। বেচারী দৈত্যকুল সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত পানের অধিকারী নয়। বিধাতার ভগ্নাংশ দেবকুলই একমাত্র তার স্বত্বাধিকারী। তাই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভগবান তাঁরই আত্মীয়-স্বজনের আর্জি শুনেছিলেন। তর্ক উঠতে পারে অমৃত পান করে দৈত্যরা অমর হলে দানবীয় রূপ প্রকট হয়ে উঠত। কিন্তু অমৃত পান করে দৈত্যরা ত দেবতাও হতে পারত। এই সম্ভাবনার কথা গুণীজনরা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে গেছেন।

ঠিক অনুরূপভাবেই সাঁই পরিবারের লোকজনকে হত্যা করার পর মার্কসবাদী [illegible] দেবতাদের অসুর নিধনের যুক্তির অবতারণা করেছেন। আর পাটনা স্টেশনে জ্যোতিবাবুর ওপর আক্রমণের প্রশ্নকে দৈত্যকুলের দেবতাদের ওপর আক্রমণের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু সাঁই পরিবারের ঘটনাকে কিছু কিছু নেতা নিন্দা করেছেন। আর পাটনার ঘটনাকে সকলেই নিন্দা করেছেন। কারণ মর্যাদার পার্থক্য। দেখা যাচ্ছে, নেতাদের উপর আক্রমণ হলে সব দলের নেতারা একই সুরে বক্তব্য রাখছেন। শুধু কর্মীদের বেলায় বক্তব্যের মধ্যে ফারাক থাকছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, হত্যা হত্যাই, যেভাবেই সংগঠিত হোক না কেন। নৃশংসতার তুলাদণ্ডে বিচার করে হত্যার মূল্যায়ন করার যে প্রবণতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সমদর্শী তাকে অদ্ভুত ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নয়। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। কোন এক যুবককে চোখের কাছে সাপে কামড়ায়। ফলে তার মৃত্যু ঘটে। পড়শিরা কান্নায় ভেঙে পড়ে আর বিলাপ করে নাকি বলতে থাকেন— আহা, আর একটু নীচে কামড়ালেই বাছার চোখটাই চলে যেত। বর্ধমানের সাঁই পরিবারের ভাগ্যাহত তরুণদের নিয়ে ঘটনাটা প্রায় এ-রকমই দাঁড়িয়ে গেছে। কেশোরাম রেয়নস, শ্রীপুর, সোনারপুর, কোচবিহার বা জলপাইগুড়িতে যা ঘটেছে সেই বীভৎসতা ইতিমধ্যে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বর্ধমানের হত্যাকান্ড সম্পর্কে রিপোর্ট তলব করার পর স্বয়ং গভর্ণর এক্‌জিকিউটিভ প্রধান হিসাবে বর্ধমান গেছেন। জ্যোতিবাবু কেশরাম রেয়নের ঘটনার উল্লেখ করার পর রাজ্যপাল ত্রিবেণীতেও গেছেন। রাজ্যপাল বলেছেন, জনতার চাপ ও ঘটনাটা সর্বভারতীয় রূপ নেওয়ার ফলে শাসক হিসাবে তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কিন্তু অন্য জায়গার খুন সম্পর্কেও বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে। রাজ্যপাল বলেছেন, সর্বত্রই যদি যেতে হয় তবে তাঁকে শুধু খুনের অকুস্থল পরিদর্শন করে সময় কাটাতে হবে। অন্য প্রশাসনিক ব্যাপারে জনসংযোগ করবার অবকাশ পাবেন না। তাই তিনি এই দুই যায়গায় পরিদর্শনের জন্য মনস্থির করেছেন।

সমদর্শীর ধারণা আলাদা। অনেকে হয়তঃ সহমত হবেন না। কিম্বা রাজ্যপালও চটে যেতে পারেন। কিন্তু সত্য কথা বলা উচিত মনে করে বলা হচ্ছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেখানে রিপোর্ট চেয়েছেন সেখানে রাজ্যপাল প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ না করে থাকতে পারেন কি? আর বাংলাদেশের বৃহত্তম দল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যেখানকার ঘটনায় ক্ষিপ্ত সেখানেও রাজ্যপালের না যাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, সমদর্শীর বক্তব্য সেখানে নয়। ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে বর্ধমানের ঘটনা বা পশ্চিমবাংলার অন্যত্র যা ঘটেছে তা রাজনৈতিক 'এ্যাকশানের' অংশবিশেষ। আর পাটনায় যা ঘটেছে আপাতদৃষ্টিতে তাও রাজনৈতিক 'এ্যাকশান' ছাড়া আর কি হতে পারে! দুয়ের মধ্যে শুধু পার্থক্য এইটুকু, একটি প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে গিয়ে করা হয়েছে। আর অন্যটি লুকিয়ে গিয়ে রণহুঙ্কার না দিয়ে গোপনে কাজ হাসিল করার চেষ্টা মাত্র।। তাই শেষোক্তটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এবং দেখা গেছে দুর্বলই সব সময় চক্রান্তে মেতে থাকে। কাজেই মার্কসবাদীরা বর্ধমানের ঘটনার দায়িত্ব উপেক্ষা না করে শক্তি ও আদর্শের প্রতি অকুতোভয়ে নিজেদের নিষ্ঠাবান বলেই চিহ্নিত করেছেন। আর বর্ধমানের সভার উপস্থিতি যদি কোন নিয়ামক বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হবে ঐ হত্যার প্রতি গণ-সমর্থন আছে। আর জ্যোতিবাবুর প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে যেভাবে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত হয়ে উঠেছে সেই অভিব্যক্তিকে যদি গ্রহণ করা হয় তবে বলতে হবে পাটনার ঘটনার প্রতি আদৌ জন-সমর্থন নেই। ঘটনার বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় মাস এ্যাকশনের ফলে যদি মৃত্যু ঘটে তবে তা তত নিন্দনীয় নয়। টেররিজম ঘৃণার্হ। অবশ্য যাঁরা হিংসায় আদৌ বিশ্বাস করেন না বলে দাবী করছেন তাঁদের কথা আলাদা।

মার্কসবাদীরা অবশ্য আর একটা বক্তব্যও রেখেছেন। তাঁদের নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার জনসভায় ঘোষণা করেছেন তাঁরা বর্ধমানের হত্যাকান্ডের জন্য আদৌ লজ্জিত নন। কারণ সাঁই ভ্রাতৃদ্বয় নাকি গুন্ডা ছিলেন। গুন্ডা কথাটা সমদর্শীর কাছে অত্যন্ত আপেক্ষিক। তবে চলতিভাবে গুন্ডা বলে তাঁদেরই আখ্যাত করা হয় যাঁরা নারীর শ্লীলতাহানি করেন, রাহাজানি করেন বা যখন তখন উপদ্রব সৃষ্টি করে লোকের প্রাণহানি পর্যন্ত করতে পারেন। সাঁই ভ্রাতৃদ্বয় কি ছিল তা জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি গুন্ডারা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন না। অবশ্য শাসকগোষ্ঠী যদি না তাঁদের আশ্রয় দেন। যদি সাঁই পরিবারের লোকজন গুন্ডা বলে বধ্য হয় সে অন্য কথা। কিন্তু সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোরগোল ওঠার পর ত্রিবেণীর কেশোরাম রেয়নসের কাহিনীর কথা তুলে পাল্টা ইস্যু সৃষ্টি করার তাৎপর্য বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ কেশোরামের গুন্ডারা যদি মার্কসবাদীদের হত্যা করে থাকেন তা হলে গুন্ডাকৃত ঘটনার উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয়। আর যদি তাঁরা মনে করেন অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা তাঁদের সমর্থককে খুন করেছেন তবে কেশোরাম রেয়নের ঘটনা রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের অংশবিশেষ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। কাজেই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ও

গুন্ডা নিধন সমপর্যায়ে উন্নীত হবার আশংকা রয়ে গেছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, কেরালার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ কয়ার যখন প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল তখন সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মার্কসবাদীরা ধিক্কার দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা টেররিজমকে সমর্থন করেন নি।

এ সব হত্যা বা হত্যার চেষ্টার ব্যাখ্যা না দিয়ে সোজাসুজি বলতে চাই খুন চলবে। সে খুন যে কোন প্রকারেই সংগঠিত হবে। কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। কোন দেশে পারে নি। পশ্চিম বাংলায় যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলশ্রুতিই হচ্ছে খুন। দেশে দেশে নিরন্তর চেষ্টা হয়েছে খুন যাতে কম হয়। একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোথাও খুন যাতে না হয় এমনিতর একটি প্রচেষ্টা জাতীয় স্তরে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয় নি। কি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ, কি দেশী পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই-এ—কোথাও যাতে প্রাণ হানি না যায় সেই প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধী এক নতুন প্রয়াস শুরু করেছিলেন। নিরস্ত্র জনতাকে কিভাবে শক্তিশালী শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে হবে সেই উদ্দেশ্যে অসহযোগিতার উদ্ভাবন করেছিলেন। পরের প্রাণ নেওয়া থেকে নিজের প্রাণ দিয়ে অন্যের শুভবুদ্ধি উদ্রেকের জন্য অনশনকে সংগ্রামের হাতিয়ার করেছিলেন। এই বিরাট প্রচেষ্টার ফল যে ফলেনি একথা বলা যায় না, কিন্তু এই উন্মত্ত পৃথিবী যেখানে হিংসার বিষবাষ্প ছেয়ে আছে সেখানে এই মহৎ চেষ্টার প্রভাব একেবারে যে পড়েনি তা নয়। অন্ততঃ আজ পৃথিবীতে বহু লোক আছেন যাঁরা অহিংসার কথা বলেন। কোন ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হিসাবে। গান্ধীজী সমস্ত নিপীড়িত মানুষকেই একত্রিত করেছেন, অভীষ্ট পথে যাত্রার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন, কিন্তু বিদ্বেষের ও ঘৃণার মানসিকতা সৃষ্টি করে তাকে সহিংস আক্রমণের পর্যায়ে নিয়ে যান নি।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর শুধু পারিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে একথা বহু রাজনৈতিক দলই বিশ্বাস করে না। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন পারিষদীয় গণতন্ত্র চলুক আর সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত জনতার আন্দোলনও চলুক। যাতে পারিষদের ওপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা যায় এবং আইনের মাধ্যমে প্রগতিশীল ব্যবস্থা কায়েম সম্ভব হয়। এই সংগঠিত জন-আন্দোলনকে তাঁরা আবার শ্রেণী-সংগ্রাম বলে মনে করেন। কিন্তু সেই সংগ্রামকে প্রাণ দেওয়া নেওয়ায় পর্যবসিত হতে দিতে চান না। তাঁদের বিশ্বাস জনতা সংগঠিত হয়ে গেলে আর রাষ্ট্রশক্তি হাতে থাকলে কয়েকজন পুঁজিপতির পুঁজি হস্তগত করবার জন্য প্রাণনাশের প্রয়োজন হবে না। কার্যত দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম-বাংলায় যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে জনতা ফ্রন্টের সঙ্গে থাকলেও খুনোখুনি না করে কোন কিছুই সম্ভবপর হয় নি। সে যে কারণেই হোক হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, একথা বলা যায়, বিপ্লবকর্ম সমাধা করতে হলে প্রচন্ড রক্তপাত ঘটবে।

অনেকেই বলতে পারেন, বিপ্লব বললেই রক্তপাত বুঝাবে কেন? যে সমস্ত দল পারিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বিপ্লবে বিশ্বাসী তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবেন রক্তপাত অপরিহার্য কিনা? এবং সত্যিই শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণী সংহত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণের পথে সহযোগী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর্বে রক্ত ঝরবেই। সেখানে তাকে প্রতিহত করার কোন প্রশ্নই নেই। কারণ, এ আদর্শের কথা। বিশ্বাসের কথা—কোন মনগড়া রোমাঞ্চকর অলীক স্বপ্নবিলাসের প্রচেষ্টা নয়।

কাজেই এই আদর্শকে পাথেয় করে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন বলে দাবী করছেন, তাঁদের সেই শেষের দিনের প্রস্তুতি হিসাবে মহড়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মেহনতী মানুষ খাদ্যমন্ত্র বলে হাতিয়ার নিয়ে ত ঝাঁপিয়ে পড়বে না। তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এবং সেই প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংসাত্মক লড়াই সংঘটিত হবেই। নতুবা সার্বিক প্রস্তুতি কখনও গড়ে উঠতে পারবে না। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ের প্রস্তুতিপর্বে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ ঘটবে না, অহেতুক মিত্রের প্রাণও চলে যাবে। সেই আখেরের দিনে কে সাথী হবে বা থাকবে তাও পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে এবং সেই পরীক্ষা এখন শুরু হয়েছে। এখানে কান্নাকাটির কোন স্থান নেই। এ আদর্শগত কথা। তত্ত্বের কথা—কৌশলের কথাও বটে।

তবু সমাজ ব্যবস্থা পালটে নিয়ে নয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলে খুন হবে না একথা তাত্ত্বিক ব্যক্তিরাও জোর করে বলতে পারেন না। তা হলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেকদিন আগেই খুন বন্ধ হয়ে যেত। সেখানে জনসাধারণ একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিমূলক স্তরে উন্নীত হয়েছেন। আর এই অনুন্নত দেশে মানুষ এখন অন্ধকারে পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই এখানে আরও বেশী খুন হওয়াটাই স্বাভাবিক। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে রাষ্ট্র ব্যবস্থাও পরিচালিত হয় নি, কিম্বা তাঁর সৃষ্ট সংগঠন কংগ্রেস

দিল্লী মাস্কেটীয়ার্স!

© কাফী খাঁ ৩.৪.৭০
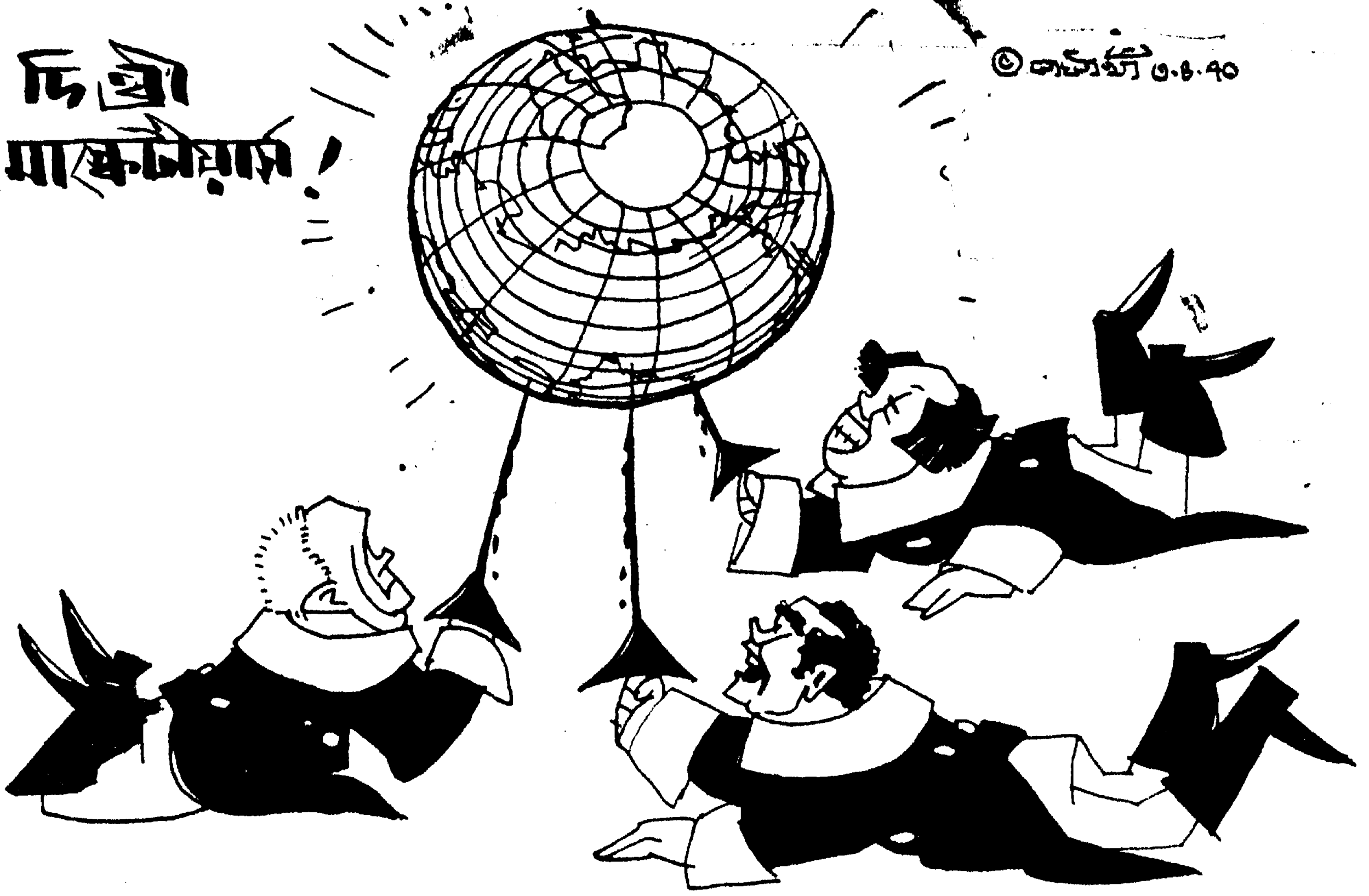
তাঁরই কায়দায় সংগ্রামকে অব্যাহত গতিতে চালিয়ে গিয়ে নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পৃথিবীকে নতুন চ্যালেঞ্জ দিতে পারেনি। যে নয়া একসপেরিমেন্ট মহাত্মাজী শুরু করেছিলেন হিংসাত্মক আন্দোলনের বিকল্প উপায় হিসাবে তার অনুশীলন করার মত নেতৃত্ব ভারতে এখন নেই। কাজেই সেই পুরোন সংঘর্ষ ও তত্ত্বগত লড়াই আবার নতুন করে এই দেশের মাটিতে শুরু হয়েছে। বর্ধমান বা পাটনা তারই ফলশ্রুতি, কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এ সমস্ত ঘটনার নিন্দা করা বা এ-রকম ঘটনাকে মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নেওয়া কোনটাই নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের পাশর্ব-পরিবর্তন মাত্র। তাই বলছিলাম হিংসা শাশ্বত। যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছে মানুষ। দুষ্টের দমন বা শিষ্টের রক্ষণ যে কোন কারণেই হোক প্রাণবলি দিতে হয়েছে। এই অপূর্ব সুন্দর জীবন ফুলের মতই অহর্নিশ ধুলোর ধরণীতে ঝরে পড়ছে। তা সে পুলিশ বুলেটের আঘাতে হোক বা গুপ্ত ঘাতকের শাণিত তরবারির চকিত চমকের মাধ্যমেই হোক। মানুষের শুধু প্রচেষ্টা হয়েছে কিভাবে হত্যাটা কম হয়, তারই পথ নির্ধারণ করা। ইন্দিরাজী স্বরং যদি প্রাণপণ চেষ্টা করে অতি দ্রুত সমাজ ব্যবস্থা পালটে দিয়ে নতুন গণমুখী অর্থনীতির মাধ্যমে নয়া সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ণও করেন তবুও হত্যা বা রাজনৈতিক হত্যা চলবে। তখন সেই হত্যা মাস অ্যাকশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে না। হবে টেররিজমের মাধ্যমে। আদর্শগত লড়াই-এ দুর্বল হয়ে গণ-সমর্থন হারালেই হঠকারীতার আশ্রয় নিতে হয়। অন্য পথ থাকে না।

কাজেই পশ্চিম বাংলার মানুষের আতঙ্কিত হয়ে কোন লাভ নেই। ঘটনার পরিবেশ দেখে মনে হয় আরও রক্তঝরা দিন সামনে আসছে। অনেক আত্মীয় পরিজনকে হারাতে হবে। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নাটকীয়ভাবে যে দ্রুত পট-পরিবর্তন হচ্ছে তাতে পরিস্কার বুঝা যায় সামনের দিনগুলি আরও বেদনাদায়ক হবে। যুক্তফ্রন্টকে জনসাধারণ যেদিন গদিতে আসীন করেছিলেন সেদিন হয়ত ভেবেছিলেন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে জীবনটা রাঙা হয়ে উঠবে। অতি দ্রুত যে মনের বাসনা পূর্ণ হয় না যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা তারই প্রমাণ। কারণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই আদর্শগত তত্ত্বকে প্রমাণ করাবার জন্য ফ্রন্টের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল। যে কোন অছিলায় এই নাটক মঞ্চস্থ হোক না কেন, আসল অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল জনসাধারণকে বোঝানো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিপ্লব হয় না। তাতে সমাজ ব্যবস্থায় চুনকাম হতে পারে মাত্র। এই উদ্দেশ্য অদ্যাবধি কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে বলতে পারি না। তবে এই বক্তব্যকে বোঝাবার জন্য যে পথ অনুসৃত হয়েছে, তার ফলে জনতার অধিকাংশ আতঙ্কিত বোধ করছেন মনে হয়। তবে একথাও ঠিক সংগঠিত সংখ্যালঘুই অসংগঠিত সংখ্যাগুরুর উপর যুগে যুগে প্রভুত্ব স্থাপন করে এসেছে। ইতিহাস আজ পর্যন্ত তার উলটো ছবি দেখাতে পারেনি।

আর একটা কথা বলাও প্রয়োজন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংবাদপত্র ঘৃণ্য অভিযান চালিয়েছে বলেই তাঁদের ওপর ও তাঁদের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ওপর ঘৃণ্য আক্রমণ হয়েছে। এই বক্তব্যটাকে সঠিক মেনে নিলেই আর একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সংবাদপত্র তা হলে মার্কসবাদী ছাড়া অন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন জনতার রোষবহ্নির কাছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই ঘৃণ্য প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। কোনটা সত্য সেটা সহৃদয় পাঠকদের বিবেচ্য।

—[illegible]

সম্পাদকীয়

মেয়র-রাজ্যপাল সংবাদ

কলকাতা পৌরসভার আর্থিক সঙ্কট এবার নিদারুণভাবে দেখা দিয়েছে। পৌরসভার অন্যান্য সংকটও আছে। বর্তমানে কলকাতা পৌরসভা যুক্তফ্রন্টের কর্তৃত্বাধীন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পতনের পর পৌর যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও বেসুরো গান সুরু হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো দল মনে করছেন যে, যে-চুক্তিবলে পৌরসভার মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও অন্যান্য পদ বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে বাঁটোয়ারা করা হয়েছিল তা তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল। সুতরাং এখন তা পুনর্বিবেচনা করা দরকার। পৌরসভায় প্রধান দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এখন অন্যান্য দল যদি পুরনো চুক্তি মানতে না চান তাহলে মার্কসবাদীদের সঙ্গে অন্য দলের বিরোধ বাঁধবে। সুতরাং পৌরসভার মেয়র নির্বাচনের সময় একটা সঙ্কট দেখা দেবার আশংকা খুবই বেশি।

এ-ছাড়াও কলকাতা পৌরসভার আর্থিক সঙ্কট মেয়রকে বিশেষ বিচলিত করে তুলেছে। তিনি এই বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজ্যপাল চান রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে পৌরসভা পরিচালনায় সকল দলের সদস্যরা ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করুন। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর রাজ্যপালকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ পেলে সকলে মিলে মিশে তাঁরা পৌরসভার কাজ পরিচালনা করবেন। রাজ্যপাল কলকাতার নাগরিকদের দুরবস্থা এই ক'মাস নিজের চোখে দেখেছেন। কলকাতায় বস্তির অবস্থা জানবার জন্য তিনি বস্তিতে রাত কাটাতে চেয়েছেন। সুতরাং রাজ্যপাল হিসেবে তিনি এই শহরের নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যা করণীয় তা করতে পিছু-পা হবেন না, এটা নিশ্চয়ই আশা করা চলে।

দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা ও অবহেলার ফলে কলকাতা পৌরসভার পরিচালনা ব্যবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যে কত অপদার্থ হতে পারে কলকাতা পৌরসভা তার একটি দৃষ্টান্ত। এদিকে শহরে জনসংখ্যা বেড়েছে, তার দায়দায়িত্ব বেড়েছে। তার জল সরবরাহ বাড়ানো দরকার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের সুব্যবস্থা চাই। রাস্তাঘাটের অবস্থাও শোচনীয়। এ সমস্ত নিয়ে পৌরসভার পরিচালকরা হিমসিম খাচ্ছেন। হাতে টাকা নেই। জনগণের দাবি ক্রমবর্ধমান। সুতরাং সরকারের কাছে তাকে হাত পাততেই হবে।

পৌরসভার এবারে ঘাটতি বাজেট। পরে আইন বাঁচাবার জন্য সেই ঘাটতিকে উদ্বৃত্ত করে দেখানো হয়েছে। মেয়র দেখিয়েছেন যে, আসল ঘাটতি পূরণের জন্য পৌরসভার সাড়ে আট কোটি টাকা দরকার। এ-ছাড়াও সি আই টি, ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রমুখের কাছে পৌরসভার দেনার পরিমাণ এক কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ঘাটতি এগারো কোটি টাকার ওপর। মেয়র মহোদয় রাজ্যপালের কাছে এই ঘাটতি টাকা চেয়েছেন পৌরসভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য। রাজ্যপাল সহানুভূতির সঙ্গে মেয়রের কথা শুনেছেন। রাজ্যসরকারের কোষাগারের যা অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য না পেলে তাঁর পক্ষেও পৌরসভার এই দাবি মেটানো সম্ভব নয়। তিনি মেয়রকে নিয়ে দিল্লীতে দরবার করতে যেতে চাইছেন। মেয়র রাজী। তবে তিনি চান এই প্রতিনিধি দলে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরাও যাতে যান। এই প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। কলকাতা শহরের সমস্যা আজ শুধু পৌরসমস্যাই নয়। এই সমস্যার সঙ্গে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে আছে। কলকাতার উন্নয়ন শুধু একটি অঞ্চলের উন্নয়নরূপে গণ্য না করে একে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত। কলকাতার সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জড়িত। এই শহরে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসেছে জীবিকার সন্ধানে। এই শহরের বন্দর ব্যবহার না করলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বৃহত্তর কলকাতা জাতীয় কর্মসংস্থান ও শিল্পোৎপাদন ক্ষমতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দিল্লিকে কলকাতার এই বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

জাতীয় অর্থনীতিতে কলকাতার দেয় অংশ নিশ্চিতই উল্লেখনীয়। তাই কলকাতার এই দুরবস্থায় যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌরসভার মেয়র আর্থিক সহায়তা দাবি করে থাকেন তবে তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। রাজ্যপাল শ্রীধাবন কলকাতার প্রতি সহানুভূতিশীল। এটি সমস্যাসংকুল রাজ্য জেনেই তিনি এখানে এসেছেন। এই রাজ্যে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এখন নেই। রাজ্যপালই হলেন প্রশাসনের প্রধান, রাষ্ট্রপতির প্রতিভূ এবং রাজ্যের জনগণের সুখদুঃখের জিম্মাদার। কলকাতার সমস্যা বাংলাদেশের সমস্যারই তীব্র কেন্দ্রীভূত রূপ। তার ক্রোধ, তার হতাশা, তার বিষাদ বিপর্যস্ত মনোভঙ্গি এই শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষেরই প্রতিবিম্ব। একে অবহেলা করলে হতাশা আরও বাড়বে। এবং হতাশা থেকে নানা সামাজিক রুগ্নতার উদ্ভব। তাই রাজ্যপালকে অনুরোধ তিনি এই শহরকে ভদ্রস্থ করার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। আর মেয়র মহোদয়কে নিবেদন, পৌরসভার দৈন্য আছে জানি, কিন্তু সততা, আন্তরিকতা ও শ্রমের দ্বারা যতটুকু করা যায় পৌরকর্মীদের তা করতে বলুন। শুধু ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেড়ালে মহৎ কিছু পাওয়া যাবে না।

দেশে বিদেশে

পাঞ্জাবে পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিংয়ের স্থান গ্রহণ করলেন সন্ত ফতে সিংয়ের অনুগামী অকালী দলের নেতা প্রকাশ সিং বাদল, ৪২ বছর বয়সে যিনি হলেন ঐ রাজ্যের কনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী।

এই সপ্তাহেই রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে নয়া কংগ্রেসের বিপর্যয় এবং বিশেষ করে সুব্রহ্মণ্যমের মত প্রথম সারির দলনেতার পরাজয় দলের ভিতর শৃংখলা রক্ষার প্রশ্নটিকে আরও বড় করে তুলে ধরল।

এবার হরিয়ানায় ও কাশ্মীরে যা হয়েছে সেই নজীর অনুসরণ করে গুজরাট বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত মুলতুবী করিয়ে দিয়ে হিতেন্দ্র দেশাই তাঁর মন্ত্রিসভার উপর আঘাত সামলাবার চেষ্টা করলেন।

পাঞ্জাবে প্রকাশ সিং বাদলের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তার পিছনে রয়েছে দুটি পার্টির কোয়ালিশন। ঐ দুটি পার্টির একটি হচ্ছে সন্ত ফতে সিংয়ের নেতৃত্বাধীন অকালী দল আর একটি জনসংঘ। এই কোয়ালিশন ইতিমধ্যে বিধানসভার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতে বাদলকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ জানাবার আগে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবে একটা কি-হয়-কি-হয় পরিস্থিতি ছিল। রাজ্যপালের আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উভয় পক্ষই দাবীদার ছিলেন। একপক্ষে অকালী দল ও জনসংঘের জোট ও তার পিছনে এস-এস-পির সমর্থন। অন্যদিকে নয়া কংগ্রেস, গুরনাম সিংয়ের অনুগামী অকালী সদস্যরা ও সি-পি-আই। দিল্লী থেকে পুরাতন কংগ্রেসের অশোক মেহতা, জনসংঘের অটলবিহারী বাজপেয়ী ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের মধু লিমায়ে ছুটে এসেছিলেন রাজ্যপাল যাতে শ্রীবাদলকেই মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেন সেজন্য রাজ্যপালের উপর চাপ সৃষ্টি করতে। অন্য তরফ থেকেও রাজ্যপালের উপর চাপ আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা একটু দেরী করে ফেলেছিলেন। নয়া কংগ্রেস দল গোড়ার দিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাদের একাংশ শ্রীবাদলের নেতৃত্বাধীন অকালী দলকে সমর্থনের কথা বিবেচনা করছিলেন আর এক অংশ শ্রীগুরনাম সিংয়ের নেতৃত্বাধীন অকালী দলকে বাজিয়ে দেখছিলেন। এই অবসরে জনসংঘ সময় নষ্ট না করে বাদলের দলের সংগে জোট বেঁধে রাজ্যপালের কাছে দাবী পেশ করল। যখনই ঐ তরফের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর দেখা গেল তখনই অকালী দলে ঐ তরফের দিকে ঢল নামল। বিধানসভার ৫৬ জন অকালী সদস্যের মধ্যে কম করে ৪৫ জন বাদলের প্রতি আনুগত্য জানালেন। সমস্ত অনুগত এম-এল-একে পাহারা দিয়ে রাখার জন্য বাদলের দলবল বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। সাধু সিং নামে একজন এম-এল-এর স্ত্রী রাজ্যপালের কাছে গিয়ে নালিশ করে এলেন যে, তাঁর স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এভাবে নয়া কংগ্রেস পাঞ্জাবে অকালী দলের ভিতরকার বিরোধের অবকাশে শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার একটি সুযোগ হারাল। এখন ঐ দলের কিছু সদস্য নয়া-দিল্লীতে গেছেন রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতের বিরুদ্ধে নালিশ এনে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরাবার দাবী জানাতে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, বাদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই না করেই রাজ্যপাল তাঁকে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

একই সপ্তাহে আরও দুজন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের বিরুদ্ধে এখানকার পুরাতন কংগ্রেসের অভিযোগ, তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন আর মার্কস-বাদী কম্যুনিস্টদের অভিযোগ হচ্ছে, তিনি বর্ধমানের প্রশ্নে তাঁদের দলের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে যোগ দিয়েছেন। বিহারের রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গুজরাটের রাজ্যপাল থাকাকালে তিনি এমন কতকগুলি কাজ করেছেন যেগুলি ঐ পদের উপযুক্ত নয়।

নূতন একটি অকালী দল গঠনের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের অকালীদের ভাঙনে পাকা ছাপ পড়ে গেল। দলছুট এই নূতন দলের নাম দেওয়া হয়েছে শিরোমণি অকালী দল। বিধানসভায় এই দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং আর বিধানসভার বাইরে দলের নেতা ভূপিন্দর সিং—যিনি সন্ত ফতে সিংয়ের মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রকাশ সিং বাদল আপাততঃ যে তিন-জনের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে তিনি ছাড়া রয়েছেন অকালী দলের বলবন্ত সিং ও জনসংঘের বলরাম দাস ট্যান্ডন।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে বাদল বলেছেন যে, রাজ্যে সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য হিন্দু-শিখ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করে যাবেন।

পাঞ্জাবে নয়া কংগ্রেস দল যদি সুযোগ হারিয়ে থাকে তাহলে রাজ্যসভার দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে তারা বলতে গেলে মুখ পুড়িয়েছে। দলের প্রথম অন্তর্বর্তী সভাপতি ও পয়লা সারির নেতা এই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরে গেছেন, শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া অন্যের উদ্বৃত্ত ভোট কুড়িয়ে কোনক্রমে জয়ী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিতও একইভাবে অন্যের উদ্বৃত্ত ভোটের করুণায় জয়লাভ করেছেন। উত্তর-প্রদেশে, অন্ধ্রে ও মহারাষ্ট্রে দলের মনোনীত প্রার্থী বিস্ময়করভাবে হেরে গেছেন। আর সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা হল, উড়িষ্যা বিধানসভায় কাগজে-কলমে পুরানো কংগ্রেসের একজন সদস্য না থাকা সত্বেও সেখানে ঐ দলেরই একজন রাজ্যসভার নির্বাচিত হয়েছেন আর নয়া কংগ্রেসের একজন ছাপমারা সদস্য ও একজন ছাপ-হীন সদস্য হেরে গেছেন।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দলের এই বিপর্যয়গুলি ঘটেছে দুটি কারণে। প্রথমত, রাজ্য বিধানসভাগুলিতে দলের সদস্যরা সকলে দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেন নি। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দলের সংগে ভোট ভাগাভাগি করা সম্পর্কে যেসব চুক্তি বা বোঝাপড়া হয়েছিল সেগুলি সর্বত্র ঠিকভাবে কার্যকর হয় নি।

বিপর্যয়ের এই উভয়বিধ কারণই নয়া কংগ্রেস দলের পক্ষে উদ্বেগের হেতু হয়ে উঠেছে।

দলের হুইপ না মেনে অন্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় দলীয় শৃংখলার যে প্রশ্ন এসছে সেবিষয়ে পরিস্থিতির বিচিত্র পরিহাস এই যে, বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার যে স্বাধীনতা চেয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর অনু-গামীরা মূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই স্বাধীনতার দাবীই এখন ঐ দলের বিরুদ্ধেও অস্ত্র হিসাবে উদ্যত হয়ে উঠেছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাওয়া গেছে উড়িষ্যায়। সেখানে নয়া কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থী শ্রীনারায়ণ পাত্রের পরাজয়ের কারণ বলতে গিয়ে বিজু পট্টনায়ক বলেছেন, প্রার্থী

মনোনয়নেই ভুল হয়েছিল। পট্টনায়ক নিজে এই মনোনয়নের উমেদার ছিলেন। উড়িষ্যার নয়া কংগ্রেস থেকে তাঁর নাম পাঠানও হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড তাঁর নামটি নাকচ করে দিলেন। পট্টনায়কের জায়গায় মনোনয়ন পেলেন নারায়ণ পাত্র। মনোনয়নপত্র দাখিল করার দিনে নারায়ণ পাত্র উড়িষ্যা বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের দুয়ারে দুয়ারে কান্নাকাটি করলেন একজন প্রস্তাবকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার জন্য। সম্ভবত পট্টনায়ক ও তাঁর অনুগামীদের আশীর্বাদ নিয়ে একজন পাল্টা প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর নাম সঙ্গাম্পা। দিল্লী থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উড়িষ্যা বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা সদাশিব ত্রিপাঠীর কাছে টেলিফোন করে অনুরোধ করলেন যাতে সঙ্গাম্পা এই নির্বাচন থেকে সরে যান এবং কংগ্রেস সদস্যারা সকলে এক জোট হয়ে দলের মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ত্রিপাঠীর সঙ্গে পুরানো কংগ্রেস দলের কোন গোপন বোঝাপড়া হয়ে থাকবে। (রাজ্যসভার নির্বাচনের পর ত্রিপাঠী পুরানো কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ায় এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া গেল)। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল যে পাত্র ও সঙ্গাম্পা দুজনেই হেরে গেছেন, মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেছেন পুরানো কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীবিজয় মোহান্তি। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় নয়া কংগ্রেস দলের প্রায় একাধিপত্য থাকা সত্ত্বেও দলের মনোনীত একজন প্রার্থীর পরাজয় ঠেকান যায় নি। পুরানো কংগ্রেসের হিসাবে, নয়া কংগ্রেস দলের ২৩টি ভোট তাদের পক্ষে পড়েছে। মহারাষ্ট্রে পুরানো কংগ্রেসের টিকেট নিয়ে রাজ্যসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন শিল্পপতি বাবুভাই চিনয়। অনুমান এই যে, চিনয়ের টাকার থলি এই ভোট ভাঙাবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

টাকার থলির ভূমিকা সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু থেকে সুব্রহ্মণ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে। তামিলনাড়ু বিধানসভার ২৩৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র আটজন নয়া কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। এই আটটি ভোট হাতে নিয়ে সি সুব্রহ্মণ্যম রাজ্যসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। জিতলে তিনি নির্ঘাত কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী হতেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কামরাজ সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছেন। পুরানো কংগ্রেসের ভোট ভাঙতে দেন নি, ডি-এম কের বাড়তি ভোটগুলি জোগাড় করার ব্যাপারেও সুব্রহ্মণ্যম সম্ভবত সফল হন নি। নয়া কংগ্রেসের সভাপতি জগজীবন রাম সুব্রহ্মণ্যমের পরাজয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'যাঁরা সুব্রহ্মণ্যমকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কথার খেলাপ করেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

তামিলনাড়ুর মত উত্তরপ্রদেশেও নয়া কংগ্রেস দলের সদস্যদের সঙ্গে অন্য সদস্যদের ভোট ভাগাভাগির চুক্তিতে কোন ফাঁক থেকে গেছে। সেখানে নয়া কংগ্রেস দল ভারতীয় ক্রান্তি দলের সঙ্গে এক জোটে আবদ্ধ। এই দুই দলের ভোট একত্র করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের একজন প্রার্থী পার হতে পারলেন না, অবিশ্বাস্য।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের যে শক্তিক্ষয় হয়েছে তার প্রতিফলন রাজ্যসভার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ঘটবে, এটা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু নয়া কংগ্রেসের পক্ষে আফশোষ এই যে, পুরানো কংগ্রেস যেখানে এই নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা একটি বাড়াতে সক্ষম হল সেখানে নয়া কংগ্রেস ১৮টি আসন হারাল। রাজ্যসভার ২৪০ জন সদস্যের মধ্যে নয়া কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা এখন মাত্র ৮৩টিতে এসে দাঁড়াল। অবশ্য রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু হলেও শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসের কিছু এসে যায় না, কেননা, সংবিধান বলছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দায়িত্ব শুধু লোকসভার কাছে, রাজ্যসভার কাছে নয়।

৩-৪-৭০

শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কেন আর নিচে পড়ে থাকা,
চলুন ওপরে যাই, অনেক ওপরে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।
এক দুই গুনে গুনে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
চলুন ওপরে যাই, অনেক ওপরে।
সেরা দান ভারতের বৈদিক ঋষির—
এক থেকে নয় আর শূন্য আবিষ্কার,
গাণিতিক অঙ্ক অন্তহীন!
সেই অঙ্ক গুনে গুনে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
চলুন ওপরে যাই, অনেক ওপরে।
সর্বাঙ্গে জড়ানো আজ বসন্তের
উৎসবের সুখ। একটি নক্ষত্র হতে
আমি কি পারি না? প্রত্যহের প্রতিধ্বনি
স্তূপীকৃত রাত্রি আর দিনের পাহাড়ে;
নতজানু মনের প্রার্থনা :
আমাদের স্থান হোক সপ্তর্ষি মণ্ডলে।
কেন আর নিচে পড়ে থাকা,
চলুন ওপরে যাই, অনেক ওপরে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

একটি জিজ্ঞাসা স্থির মূর্ত শবদেহ
রমণীয় গ্যালারির প্রান্তিক ছবিতে :
আর কতো দূরে আর কতোটা ওপরে
এইভাবে যাওয়া যাবে অঙ্ক গুনে গুনে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে?
তবু কেন নিচে পড়ে থাকা,
চলুন ওপরে যাই, অনেক ওপরে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

ছায়াতে তোমার মুখ ॥

ফিরোজ চৌধুরী

ছায়াতে তোমার মুখ
তোমার অর্ধেক দেহ
ছায়াতে তোমার দেহের
অসম্ভব উপুড় করা জ্যোৎস্না।

সেই ছায়া
সেই জ্যোৎস্না
আমি অজান্তে কখন
পান করে ফেললাম
আমার কন্ঠনালীতে সেই ছায়া
আমার কন্ঠনালীতে জ্যোৎস্নার সুতীব্র ঘ্রাণ...

তোমাদের মাঝে মাত্র কটা দিন
খেলতে এসেছি আমি
নুড়ি কুড়োবার ছলে
তাই আমার আলোর ভাবনা অন্ধকারের ভীতি
মুষ্টিমেয় মানুষের স্পর্শ ঘিরে
তাই সেদিন চাঁদের হাট-বসা রাত্রে
কার কান্নার শব্দ
সমুদ্রের স্বরের মত
দীর্ঘঃশ্বাসের মত
ছায়াতে—মুখেতে
অসম্ভব উপুড় করা জ্যোৎস্না
তোমার দেহের।

কীট পতঙ্গ ॥

গণেশ সেন

শব্দের জন্য—
প্রতিটি বৃক্ষের কাছে,
লতা-গুল্মের কাছে,
অনায়াসে ভিক্ষে করা চলে।

রঙের জন্য—
প্রতিটি পাখ-পাখালির কাছে,
মাছেদের কাছে,
যাচ্ঞা করা চলে।

আর ভালবাসার জন্য—
চাওয়া যায় অনেক কিছুই।
অনেক শব্দ।
অনেক রঙ।
অনেক মুখ।
বিশেষ করে আমার মা'য়ের মুখ।
যে আমাকে—
একটু একটু করে ভালবাসতে শিখিয়েছিল।
বৃক্ষ-লতা-গুল্মদের,
এবং কীট-পতঙ্গদের।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

তিরিশ বছর আগে আমাদের যৌবন-কালে দুটি লোককে আমরা এড়িয়ে চলতুম—এক বাড়ীতে ন'কাকা, দুই স্কুলে ভূগোলের মাস্টার বেণীমাধববাবু। অপরাধ তাঁদের নয়, অপরাধ আমাদেরই! তাঁরা কথায় কথায় আমাদের আচার-আচরণের ত্রুটি লক্ষ্য করে নানা মন্তব্য করতেন। আমাদের শোয়া-বসা-হাঁটা-চলা কোনটাই যেন তাঁদের মনঃপূত হতো না। ন'কাকা টিক্‌টিক্ করতেন, কখনো চড়-চাপড়, কখনো কান-মলা দিয়ে বলতেন, এই করবে, এই করবে না, এই করা উচিত নয়! আর বেণীমাধববাবু, তিনি তো সবসময় প্রস্তুত থাকতেন: ছাত্রদের নীতি-শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাবৎ মনীষীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে উপদেশ দিতেন। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে জনৈক ছাত্রের আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করে উপসংহারে বলতেন, আমরা যেভাবে চলছি তাতে সমাজকে গোল্লায় পাঠাতে আর বেশি দেরী নেই। আমরা তখনি নাকি এমনি উচ্ছৃংখল, বেয়াদপ হয়ে উঠেছিলুম সমাজের পক্ষে। অর্থাৎ আমাদের আচরণে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ন' কাকার আপত্তির কারণ ছিল, সাজ-পোশাকে আমরা বড় 'ফ্যাশানেবল' হয়ে উঠছি; বেণীমাধবের আপত্তি, ছাত্র হিসাবে আমরা বড় উচ্ছৃংখল, অবিনয়ী এবং দুর্বিনীত হয়ে উঠছি; পাঠে মনোযোগ, গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই।

অর্থাৎ সে-সময় আমাদের নিয়ে ভাববার এবং সমাজোপযোগী মনুষ্য করে তোলবার লোকের অভাব ছিল না। ঘরে-বাইরে আমাদের শিক্ষাদাতা অনেকে ছিলেন। আমাদের শাসনের সঙ্গে সমাজও শাসিত হ'তো বলতে গেলে। আর সমাজ বলতে তখন সর্বশক্তিমান, দেখা-যায়-না কিন্তু বোঝা যায় এমন একটি মর্যাদাসম্পন্ন নাম যার প্রভাব আমাদের ভয়-ভক্তিতে অনুভূত হ'তো। ল' এন্ড অর্ডারের জন্যে যেমন ব্রিটিশ শাসন তেমনি জাগতিক সব ব্যাপারে সমাজের শাসন। দুই-ই অবশ্য-মান্য ছিল।

তখন আমরা অত বুঝতুম না, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে এটুকু বুঝতুম যে, ন'কাকা বা বেণীমাধববাবু যা বলতেন আমাদের ভালর জন্যেই বলতেন। সে-ভালটা যে কি এবং কেমন, তা বোঝবার বুদ্ধি তখনো আমাদের হয়নি।

তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ন'কাকাও নেই, বেণীমাধবও নেই। সমাজ-শিক্ষা দেবার লোকও যেন আর নেই। সমাজ নামে একটা কিছু আজও টিঁকে থাকলেও তার জন্যে ভয়-ভক্তি তো দূরের কথা, সামান্য চক্ষু-লজ্জাও অবশিষ্ট নেই। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করবেন। কিন্তু আমার যা কাজ তাতে দিন-রাত এই সমাজটাকেই নেড়ে-চেড়ে দেখছি, তার ভাল-মন্দ যেমনটি বুঝছি বা মনে করছি তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে প্রকাশের চেষ্টা করছি। অনেক সময় আমার কাজ হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মত। কিন্তু কি প্রত্যক্ষ করছি, কি ভাবছি তার কোন নির্দেশ কি নিজ লেখায় দিতে পারছি? বোধ হয় না। কেননা আজ যা দেখছি কাল তা একেবারে না-দেখার বা অদেখার সামিল হয়ে যাচ্ছে।

প্রভাত দেবসরকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগা পর্যন্ত আমাদের সমাজটা মোটামুটি কতকগুলি ন্যায়-নীতি, ধ্যান-ধারণা বা আচার-আচরণ ইত্যাদির 'নরমস্' মেনে চলতো। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে বাঙালীকে যেমন করে চেনা যেত আজ আর তেমন বুঝি চেনা যায় না। নামে বা চেহারায় আমরা আজও বাঙালী বলে পরিচিত হ'লেও আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা আর হাবভাবে অনেক বদলে গেছি। ঠিক কবে থেকে যে বাঙালীর বাঙালীত্ব ঘুচে গেছে, পরিবর্তনটা পুরো হয়েছে, বলা শক্ত। তবে আমরা সকলেই বুঝতে পারছি বাঙালী সমাজ বলে এখন আর কিছু নেই, প্রকৃত বাঙালী সংস্কৃতি বলতে এককালে যা বোঝা যেত এখন আর বোঝবার উপায় নেই।

আচার-আচরণ, সংস্কার, অনুশাসন, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি নিয়ে যে সমাজ তার কাঠামোটা হয়তো এখনো পুরনো সেকেলে বাড়ীর ভগ্নাবশেষের মত টিঁকে আছে, কিন্তু তার আশে-পাশে রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির নানা ধরনের ইমারত খাড়া হয়েছে। সবাই এখন স্ব স্ব প্রধান, ব্যক্তিনিষ্ঠ! সুসংহত, পরিচ্ছন্ন বাঙালী জীবন এখন গবেষণার বস্তু। বাঙালীর পুজো-মণ্ডপে, বিয়ের আসরে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজে, নব-বর্ষ-উৎসব পয়লা জানুয়ারীতে, বড়দিন মানে যীশুর জন্মদিন, রাতভোর হল্লা, পানাহার! ব্যক্তি-জীবনের বার-ব্রত আর সমষ্টি জীবনের পালা-পার্বণ বিগত; ধুতি-পাঞ্জাবী তো অনেকদিন বিদায় নিয়েছে, মেয়েদের সাজ-পোশাকও অনেক হ্রস্ব হয়েছে। কেশ-বেশের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। আমাদের কৈশোরের চুল-ছাঁটার নির্দেশ গুরুজনরাই দিতেন, এখন সে-নির্দেশ আসে চিত্রতারকাদের অনুকরণে ছাঁটটা সামনে থেকে হবে, না পিছন থেকে হবে। মনে আছে ছোট-বড় করে চুল ছাঁটলে ন'কাকা বলতেন 'চুল-কর্ম', পরের দিন মাথা মুড়িয়ে ঘোল না ঢেলে দিলেও যথারীতি কদম ছাঁট করিয়ে দিতেন। আমরা চোখে জল নিয়ে মুখ-বুজে সহ্য করতুম। প্রতিবাদের কোন ভাষা আমাদের মুখ দিয়ে বেরত না। বিশেষ করে গুরুজনদের কথার ওপর কথা, সে তো কল্পনার বাইরে!

গুরুজন অর্থে তখন আমরা বাপের বয়সী কি বাপের তুল্য ব্যক্তিদের বুঝতুম। তাঁদের কাজের সমালোচনা আড়ালেও করতে সাহস করতুম না। একটা ভয় মনে সবসময় ছিল, বড়রা অসন্তুষ্ট হবেন, বড়রা রাগ করবেন, পাঁচ কানে আমাদের কথা উঠবে, এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু ভাবতে পারতুম না।

এখনকার ছেলেরা বড়দের কথা শোনেই না, বড়-ছোটর সীমা-রেখা বলে আর কিছু নেই। পাকা চুলে যদি কোন মতবাদের কলপ পড়ে তবেই বড়র মান-মর্যাদা কিছুটা রক্ষা হয়, নতুবা নয়। বলে বাপই হলেন 'ওল্ড ফুল', আর 'ওল্ডরা' তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। হ্যাঁ, তবে মানবো যদি দেখি কেবল কেশ নয় আর আর বিষয়ে এই 'ওল্ড' ব্যক্তিটি প্রতিষ্ঠিত (যথা অর্থ, পদ) এবং বিশিষ্ট। তবে সে-মানামানির দিনও গেল বলে, শ্রেণীসংগ্রামে অর্থ-পদের বিশিষ্টতা বিলোপ হবে, ব্যক্তি বা দলনেতা মর্যাদা পাবে।

আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে-সমাজ আজও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ডে বেঁচে আছে তা বিগত হতে আর দেরি নেই। খাওয়া-পরা, চলা-ফেরার পরিবর্তনটা যত দ্রুত ঘটছে, এ হয়তো তত দ্রুত হবে না, কিন্তু হবেই।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা লেখাপড়া শিখতো চাকরি পাবার জন্যে, দুধে-ভাতে

থাকবে বলে, বিয়ের বাজারে দরে বিকোবে বলে। আজও শিখছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেয়েরাও সমহারে লেখাপড়া করছে—উদ্দেশ্য ঐ চাকরি, নয় বিয়ে! তখন কলকাতা শহরে যত যুবক দশটা-পাঁচটা করতো এখন তার অনেক বেশি সংখ্যায় যুবতীরা আপিস করছে। সমস্যাটা কিন্তু একই আছে। আর সেই সঙ্গে যুবক সমাজটা খোলস-ছাড়া সাপের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এই তো দেখতে পাচ্ছি পাড়ায় পাড়ায় রাজনীতির দলাদলিতে যুবকরা ছোরা-ছুরি, বোমা-বন্দুক নিয়ে হানাহানি করছে; ছাত্ররা স্কুল-কলেজের পবিত্রতা নষ্ট করে দাবী আদায়ের নামে শিক্ষক-নিগ্রহ চালাচ্ছে, আপিস-আদালতের কর্মীরা কলম ছেড়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ঘুষি পাকিয়ে কর্ম-বিরতি ঘটাচ্ছে—প্রতিদিনই জীবনের অস্বাভাবিকতা (অর্থাৎ সমাজবিরোধিতা) স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে! একটা নিদারুণ অস্থিরতা সমাজকে যেন ভর করেছে। এর শেষ পরিণাম এখনো আমাদের দেখতে বাকি আছে, কিন্তু গত তিরিশ বছরে যা দেখেছি তার চেয়ে আরো অনেক বেশি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পারিবারিক জীবনকে সুসংযত এবং সুদৃঢ় করতে সমাজ, অর্থাৎ দলবদ্ধ হয়ে মানুষ আপন আচরণকে সর্বজনের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করে এমন একটা আদর্শকে অনুসরণ করেছে যার ফলে সবার পক্ষে বাঁচা-মরা, বিকাশলাভ করা সহজ হয়েছে। এখন কিন্তু সেই দলবদ্ধ হওয়ার মনোভাব সমাজ-কল্যাণের বা সামাজিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে প্রযুক্ত নয়। সে মনোভাব সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র-পরিচালন ক্ষমতা অধিকারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। এখন মানুষের গোষ্ঠিবদ্ধ হওয়া বা দলবদ্ধ হওয়া সমাজ-হীন, নাম-গোত্রহীন মানুষের উপর প্রাধান্য লাভের উপায়। সামাজিক পরিচয়ে আজ মানুষের পরিচয় নয়, সে পরিচয় রাজনীতিক মতবাদ বা বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য—Man is not a social animal, but a political animal—সংজ্ঞাই বদলে গেছে! কোন একটা রাজনীতিক দল বা মতকে আশ্রয় করলেই তবে বাঁচোয়া। সমাজের শ্রেণী ভাগ আজ রাজনীতির দল ভাগ। সমাজ বলতে এখন পার্টি।

আজকের সমাজের চেহারাটা তাই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে দলীয় রাজনীতিক মতবাদের ধ্বজা ধরে। আর যেভাবে তার প্রাধান্য ঘটছে, মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে তাতে সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখ, পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি, চিন্তার স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ সবই বিনষ্ট। পূর্বে আমাদের সমাজ-জীবনে নানা বিধিনিষেধ আর আচারের মরুবালি সত্ত্বেও মানুষে মানুষে একাত্মতা, সম সুখ-দুঃখ-ভাগিতার অভাব ছিল না। ধনী জমিদার কেউ অত্যাচারী হলেও গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিতেন না।

আজকে মতবাদের দল গড়ে যে সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই দলীয় আদর্শের পায়ে উৎসর্গ করা হচ্ছে। ফলে পরমত-অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা ও আক্রোশ, মানুষে মানুষে বিদ্বেষ বা হিংসা চরম আকারে প্রকট হচ্ছে। এখন বিনা রাজনীতিক মতবাদের শরিক হয়ে পাশাপাশি বাস করা সমূহ বিপদের কারণ।

লেখাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় একটা বোমা ফাটল, না না একটা নয়, পর পর কটা যেন। দরজা-জানালা বন্ধ করবার আগে সন্ধান করে দেখলুম আমার আত্মজরা ধারেকাছে আছে কিনা। বলা যায় না যে দিনকাল তাতে বোমার সঙ্গে ছেলেছোকরা-দের জড়িয়ে পড়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বোমার নামই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতো, ফাটা তো দূরের কথা। কোথাও যদি তার আবিষ্কার ঘটতো তাহলে পুলিশের জ্বালায় পাড়াশুদ্ধ সবাই অস্থির হয়ে উঠতো, সন্দেহক্রমে কত যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে জেল-হাজতে পুরে নিগ্রহের একশেষ করতো। এখন বোমা না পটকা, সাধারণ মানুষ না কুকুর-বেড়াল মরল কি বাঁচলো কারো কিছু যায় আসে না।

পাড়ায় বোমা-ফাটার কারণ অবশ্য জানা গেল। দুদল যুবকের মধ্যে সংঘর্ষ! পাড়ার ভবনাথবাবুর কোন মেয়ে নাকি রোজই বেপাড়ায় গিয়ে কিসব করে বেড়ায় তাই নিয়ে পাড়ার বয়স্ক দুর্গাচরণবাবু মন্তব্য করেছিলেন, সমাজের নৈতিক আদর্শের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তার জের হিসেবে যুবকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, শেষ বোমা-বাজি!

আমরা অনেকদিন দুর্গাচরণবাবুকে বলেছি সমাজের নৈতিক চরিত্র বা আদর্শ-জীবন, কি, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যেন মাথাটা একটু কম ঘামান। আর কম কেন একেবারে না-ঘামালেই বা কি, তাঁর ধারণার সমাজ কোনদিন ফিরে আসবে না। একই স্রোতে দু'বার স্নান সম্ভব নয়।

প্রতিধ্বনি

গোপাল সামন্ত

MITRA GHOSH

এইমাত্র ওরা এসেছে, তবু এর মধ্যেই ডাক পড়েছে অজয়ের। বড়দির ডাক অ—জ—য় বা—ড়ি—ই আ—আ—য়!

অজয় একটা বলের পেছনে মাঠের এক-দিক থেকে অন্য দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল।

আবার শোনা গেল শব্দটা। কী কাণ্ড কে জানে?

শিশির-ভেজা মাঠে নতুন বলের ক্রিকেট খেলা। সকালের বাতাসে এখনও ভর্তি-ভর্তি কুয়াশার নিঃশ্বাস। অজয়ের নিঃশ্বাসের সঙ্গেও ধোঁয়া উড়ছিল কুয়াশার মতো।

মাঠের তিন পাশ গাছপালায় ঘেরা। পশ্চিমে কয়েকটা জিউলি আর ফলসা গাছের পাশে একটা প্রকাণ্ড ডালপালা-ছড়ানো শিরীষ গাছ। তার কাছ থেকে পেয়ারা আর আমের বাগান দু-দিকে। ও-পাশে ইঞ্জিনীয়র-বাবুদের বাংলো বাড়িটার সীমানায় দীর্ঘ দেবদারুর সারি। অন্যদিকে মাঠের গা-ঘেঁষে রাস্তাটা অজয়দের বাড়ি পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। তারপর সোজা চলে গেছে স্টেশনের দিকে।

বড়দির ডাক সেই রাস্তাটার ওপর দিয়ে ভেসে, সামনের বাগানে গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেবদারু পাতার ঘন সবুজের ভিতরে গলে এসে কুয়াশায়-মাখা অস্পষ্ট হয়ে মাঠের চারপাশে জুড়ে ঘুরছিল — অ—জ—য় বা—ড়ি—ই আ—আ—য়!

অজয় বন্ধুদের বলে উঠল—তোরা খেলতে থাক, আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে আসছি। বড়দি ডাকছে

তাদের একজন বলল—কী যে বলিস্! এখানে কোথায় তোর বড়দি?

আর একজন—ও কি করে ঠিক জানতে পারে যে বড়দি ডাকছে।

আরও একজন—তোর বড়দি খালি তোকে ডাকছে আর ডাকছেই।

অজয় একছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে হাজির। বাগানের গেট পেরিয়ে বারান্দায় বড়দির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটু বকুনির মতো প্রশ্ন—এ মা! এর মধ্যে প্যান্টের এ দশা করেছিস?

বড়দির দেওয়া নতুন বলটা বারবার মাঠের শিশিরে ভিজে যাচ্ছিল সেটা মুছতে-মুছতে প্যান্টের সামনেটা বেশ কিছু ভিজে গেছে, তার ওপর শুকনো ঘাসের টুকরো

আর মাটি। ব্যাপারটা, বড়দিকে বলা যায় না। দৌড়ে আসার জন্য কথা বলতেও হাঁফাচ্ছিল অজয়। একটু দম নিয়ে হেসে বলল—পড়ে গেসলাম কিনা! বলো, কেন ডাকছিলে?

বড়দির হাতে একটা বোনার ব্যাগ। তার থেকে অজয়ের আধবোনা সোয়েটারটা বের করতে-করতে বলল—হাতের জায়গাটা এসে গেছে, এবারে ঘর ছাড়তে হবে, মাপটা দেখে নিই—দেখি, তুই একটু সোজা হয়ে দাঁড়া তো।

অজয় মাথা নিচু করে মাপ নেওয়া দেখতে লাগল। বুকের ওপর বোনাটা চেপে ধরে কোমরের কাছে টেনে-টেনে কী দেখছিল বড়দি, অজয়ের বুকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছিল—তখনও হাঁফাচ্ছিল অজয়। আর ঠিক তখনই সোয়েটার ছেড়ে ডান হাতে ওর চিবুকটা তুলে ধরে কপালে একটা চুমু খেল বড়দি।

অজয় তাড়াতাড়ি গেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল। শেষে লজ্জার সঙ্গে একটু হাসি মিশিয়ে বলল—যাও! ওরা যদি কেউ পিছনে-পিছনে এসে পড়ত? যদি দেখত?

তাহলে তোর খুব লজ্জা হতো, না? দেখছি এবারে বোর্ডিং থেকে ফিরে এসে তুই যেন খুব মস্তো এক মানুষ হয়ে গেছিস!

হয়েছিই তো! জানো, আমি এখন আট বচ্ছর?

বলেই অজয় আবার মাঠের দিকে একটা ছুট দিতে যাচ্ছিল, বড়দি পিছনে ডাকল—এই দাঁড়া! দুধটা গরম হয়ে গেছে, খেয়ে তবে যাবি।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দুধের গেলাশ নিয়ে এসে অজয়ের হাতে দিয়ে বলল—নতুন বল পেয়েছিস বলে কী ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই গিয়ে খেলতে হবে?

অজয় উত্তর দিল না। পরীক্ষার শেষে উইন্টার হলি-ডে'র ছুটি—পড়া এখন নেই। নতুন বলটাও তো বড়দিই দিয়েছে, খেলবে না তবে কী করবে সেটা দিয়ে?

তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে-দিয়ে গেলাশটা খালি করার চেষ্টা করতে লাগল। বড়দি আবার বলল—দুপুরে তো ফের খেলতে যাবি নিশ্চয়, কিন্তু বিকেলের আগেই খেলা শেষ করে চলে আসিস, আজ তোকে নিয়ে বাঁধের দিকে বেড়াতে যাব।

অজয় একটু মুস্কিলে পড়ল। দুপুরে ম্যাচ খেলার কথা বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে, সেটা যদি বিকেল পর্যন্ত চলে? বলল—আজ তো আমাদের ম্যাচ!

ভারি তো ম্যাচ তোদের! আর হলোই বা, ক্রিকেট কী কেউ বিকেলে খেলে নাকি?

বড়দিরই দেওয়া নতুন বলের আশ্চর্য গন্ধটা কাল বিকেল থেকে এখনও অজয়ের মনের মধ্যে লেগে। কথা না বলে তাড়াতাড়ি দুধটা শেষ করার চেষ্টা করতে লাগল।

খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল বিকেলের অনেক আগেই। তবে মাঠে আরও কিছুটা দেরি হলো অজয়ের, তারপর বাড়ি ফিরে আলমারির মাথায় বল-ব্যাট সব তুলে রেখে বাগানে এসে বড়দিকে ডাকল। বড়দি চন্দ্রমল্লিকার সারিতে ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিচ্ছিল তখন। মা কাছেই বারান্দার ওপর হাতে একটা বোনা নিয়ে বসে ছিলেন। অজয়ের কথা শুনতে পেয়ে বললেন—তোরা কী কোথাও যাবি নাকি?

বড়দি ঝাঁঝরিটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রেখে বলল—অজয় বাঁধ দেখতে যেতে চেয়েছে কিনা, আমার সঙ্গে যাবে বলেছে।

মার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, গলায় স্পষ্ট বিরক্তির স্বর, বড়দির দিকে তাকিয়ে বললেন—কাল তোকে ওই রাস্তাটায় যেতে বারণ করলাম না?

বড়দি আবার ঝাঁঝরিটা হাতে তুলে নিল। অজয় বলে ফেলতে যাচ্ছিল আসল কথাটা—একটা চিমটি খেয়ে বুঝল—ঠিক হবে না, নিষেধ আছে বড়দির। মা-র কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—আগের বারেও আমার দেখা হয় নি মা, তাই, বড়দিকে বললাম—

অজয় কিছু দিনের জন্যে বাড়ি এসেছে, ছুটি ফুরোলেই চলে যাবে, তাই তার কোন ইচ্ছেয় কেউ বারণ করে না এই-কটা দিন—তা অজয় জানে।

মা আর কিছু বললেন না। তবু মুখে সেই বিরক্তিটা নিয়েই ঘরের মধ্যে উঠে গেলেন।

অজয় বড়দির কাছে ফিরে গেল—চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বড়দি ওর দিকে তাকিয়েই বলল—এ কী রে! তুই কী এমনি নোংরা হয়ে বেড়াতে যাবি নাকি? যা, তাড়াতাড়ি পা ধুয়ে নতুন সু-জুতোটা নিয়ে আয়, আর কোটটাও আনিস, যা শীত! শুধু একটা সোয়েটারে ঠান্ডা লেগে যাবে।

তার একটু পরেই ওরা রাস্তায় বেরিয়ে এল। গেট থেকে বাঁ-দিকেই বাঁধের রাস্তাটা। বিকেল পড়ে আসছে তখন সেই লাল কাঁকরের পথের ওপর। দু-পাশে এখানে-ওখানে ছাড়াছাড়া বাড়ি, এক-একটা ফাঁকা জমিতে গাছপালার জঙ্গল। সীমানা-ঘেরা বেড়াগুলোর কোন-কোনটার গায়ে লতার ডগা ঝুলছে—অজয় হাত দিয়ে সেগুলো দোলাতে-দোলাতে বড়দির সঙ্গে ম্যাচ খেলার গল্প করছিল। বড়দিও মাঝে-মাঝে কিছু বলছিল, তখনই হঠাৎ অজয়ের মনে পড়ল একটু আগেকার কথাটা। বলে উঠল—জানো বড়দি, আমি তো মাকে প্রায় বলেই ফেলেছিলাম!

জানি, তুই একটা দারুণ বোকা!

বা রে; আমি কী করে জানব? তুমি আমাকে আগে বলবে তো?

এই অতো চেঁচাস্ না, লোকে শুনলে কী মনে করবে?

অজয় একটু অবাক হলো শুনে। এই ফাঁকা রাস্তা—লোক এখানে কোথায়? আর, কেউ শুনলেই বা কী? বড়দির মুখের দিকে বিস্ময় তুলে তাকাল। দেখল, বড়দি ডানদিকে একটা বাড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে অজয় দেখতে পেল—ওখানে ওই তারের বেড়া-ঘেরা বাগানের মধ্যে ফর্সামতো একজন কম-বয়েসী ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন—হাতে একটা খোলা বই। তিনি রাস্তার দিকে চেয়ে অজয়দেরই দেখছেন। অজয় থেমে দাঁড়িয়ে তাঁকে একটু দেখল, বইয়ের মলাটে ছবিটাও দেখার চেষ্টা করল, তারপর ফিরল বড়দির দিকে। বড়দি ওকে ফেলে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেছে, বেড়ার ধার-ঘেঁষে আস্তে-আস্তে হাঁটছে বড়দি, হাত বাড়িয়ে ভিতর থেকে একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিল, ডান দিকে আবার মুখ ফেরাল, একটু থেমে দাঁড়িয়ে রইল, আর তখনই পাতাটা হঠাৎ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে সোজা হাঁটতে লাগল।

অজয় আবার ওই ভদ্রলোকটির দিকে তাকাল। ও'দেরই কী ওই বাড়িটা? অজয় তো এটা খালি দেখেছে বরাবর। একবার ওরা বন্ধুরা মিলে এখানে এসে মালিকে বলে কাঁচামিঠে আম পেড়ে খেয়েছিল—সেবারই প্রথম ও কাঁচামিঠে আম খায়। আর, কী দারুণ একটা বাতাবী লেবুর গাছ আছে মালির ঘরের পিছনটায়।

আবার রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল যে, বড়দি ওকে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে বড়দিকে ধরে ফেলল অজয়—বড়দি তুমি কখনও কাঁচামিঠে আম খেয়েছো?

বড়দি কোন উত্তর দিল না।

জানো, ওই বাড়িটায় কী দারুণ বাতাবী লেবুর গাছ আছে?

জানি, তুই আরও দারুণ একটা পেটুক।

অজয় পেটুক? ও কার কাছে কী খেতে চেয়েছে এখন? বড়দির সঙ্গে আর কথা বলবে না অজয়! কিছুক্ষণ চুপচাপ বড়দির সঙ্গে চলতে লাগল। তারপর, আবার শুরু করল ক্রিকেট ম্যাচটার কথা। বলতে-বলতে এক সময় বড়দির মুখের দিকে তাকাল। বড়দি হেঁটে যাচ্ছে ওর সঙ্গেই—কিন্তু কোথায় চোখ বড়দির? সামনে ওই গাছটার দিকে? না, দূরে মাঠের দিকে? অজয় কথা বন্ধ করল। একটু সময় চুপ করে থেকে অভিমানের সুরে বলল—তুমি কিন্তু আমার কথা একটুও শুনছিলে না বড়দি?

বা রে! শুনছিলাম তো। তুই তো তোদের স্কুলের কথা বলছিলি?

স্কুলের কথা আবার কখন বললাম?

বড়দি একটু হেসে ওর গালে একটা টোকা দিল—ঠিকই বলেছিস, তোর তো খালি খালি স্কুলের গল্প!

বলে ওই রাস্তার মধ্যে মুখ নিচু করে অজয়ের কপালে একটা চুমু খেল বড়দি।

অজয় চমকে উঠল একটু। বড়দিটা যেন কী? কে কোথায় দেখবে, অজয় এত বড় ছেলে, তবু বড়দির আছে আদর খাচ্ছে! তাড়াতাড়ি চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল। কোন মানুষ নেই ওই ফাঁকা রাস্তাটায়। অল্প-অল্প অন্ধকার পথের মধ্যে, ও-বাড়িটা অনেক দূরে। তখনই বড়দিকে হঠাৎ

সর্দি-কাশিতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে— আর পাঁচরকম রোগে ধরে

স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড

সর্দি-কাশি হলে আপনার রোগনিরোধক শক্তি কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য সংক্রামণের ভয় থাকে। তাই নিয়মিতভাবে ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খাবেন। ওয়াটারবেরিজে নানা স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদান রয়েছে যাতে তরুণশক্তি ফিরিয়ে আনে, খিদে বাড়িয়ে তোলে, শরীরে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলে। 'ক্রিয়োজোট' আর 'গুয়াকল' থাকায় এতে সর্দি-কাশির উপশম হয়।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড - সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক

Waterbury's Compound
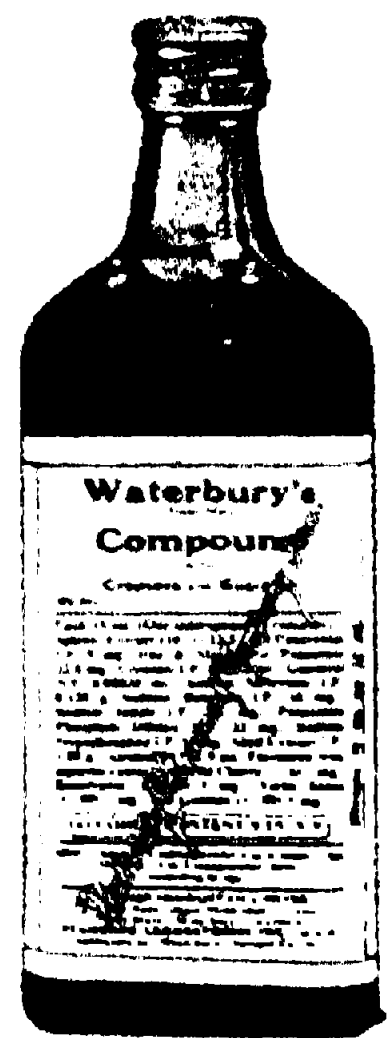
ওয়ার্নার-হিন্দুস্থান লিমিটেড

ভীষণ ভাল লাগল অজয়ের—দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড়দির শাড়িতে মুখ লুকলো। কী সুন্দর এক গন্ধ ওই শাড়ির মধ্যে! অজয়ের গালে নাকে কপালে ঘষে যাচ্ছে শাড়িটা—অল্প-অল্প শিরশির করছে সারা গা—কীভালোই না লাগছে বড়দিকে—বড়দির ওই গন্ধটা!

তার কয়েক দিন পরে খেলার মাঠ থেকে ফিরে অজয় ঘরের মধ্যে গিয়ে বড়দিকে ডাকল—জানো বড়দি! আজ আমাদের মাঠে, সেই ভদ্রলোক না—সেই যিনি সেদিন বাগানে বসে-বসে আমাদের দিকে দেখছিলেন—

অজয়ের কথা মাঝপথেই থেমে গেল বড়দির চোখের ইসারায়। বড়দি খোলা দরজা আর জানালার দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে এসে বলল—কোন ভদ্রলোক ?

ওঁর নাম তো সমীরদা। উনি যে বললেন, সমীরদা বললেই তুমি ঠিক বুঝতে পারবে ?

বড়দির মুখটা যেন কী-রকম বদলে গেল—ও বুঝেছি, বল।

আগে নাকি উনি আমাদের বাড়িতে রোজ আসতেন? তুমি তো তখন আরো অনেক ছোট ছিলে—বেশ, তা কী হলো বল।

সমীরদা আজ মাঠে এসে আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন অনেকক্ষণ; জানো—কী দারুণ বল করেন উনি? আমাকে বললেন যে আমার নাকি বল করার হাত খুব ভাল, আমি ওঁর কাছে ব্রেক বল করতে শিখে নিয়েছি, এমনি করে আঙুলে ঘুরিয়ে ধরতে হয়—জানো?

হাতের আঙুলগুলোয় একটা মোচড় দিয়ে অজয় বড়দির চোখের সামনে ধরল—তারপরে বলটা ছাড়ার সময়—

বড়দি ওর কথা থামিয়ে দিয়ে বলল—উনি আর কী বললেন, বল।

আরও বলেছেন—অজয় ডান পকেট থেকে মুঠো-ভর্তি লজেন্স-টফি বড়দির সামনে তুলে ধরল—বলেছেন যে এগুলো সবই আমার। তোমার কিন্তু একটাও নয়—উনি বলে দিয়েছেন।

এ কী রে! এ-সব তুই চাইলি ওঁর কাছে? তুই একটা দারুণ লোভী ছেলে তো।

অজয় তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করল—না, কক্ষনো না, তুমি জিগ্যেস কোরো সমীরদাকে।

তখনই অজয়ের আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাঁ-পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা খাম বের করে বড়দির দিকে বাড়িয়ে ধরল—আর এটা দিয়েছেন তোমাকে দিতে।

অজয়ের হাত থেকে খামটা তুলে নিয়েই বড়দি দরজার কাছে চলে গেল। ছিটকিনিটা বন্ধ করে বারান্দার দিকে জানালাটা ভেজিয়ে এসে অজয়ের সামনেই খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলল। অজয় দেখল—বড়দি ওর মধ্যে থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে আনছে।

অজয় তখন খুব বেছে বেছে কয়েকটা লজেন্স আর টফি বড়দির সামনে বাড়িয়ে ধরল—দ্যাখো, সব-রকমই তোমাকে দিলুম, আমাকে কিন্তু তার সেন্টু বলবে না কোনোদিন।

সেদিন রাত্তির বেলায় অজয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছিল—বড়দি বসে আছে পড়ার টেবিলে, টেবিল-লাইটার শেড দেয়ালের গায়ে ঠেকে একটু কাৎ হয়ে আছে, লাইটটা জ্বলছে। তার নিচে টেবিলের ওপর সমীরদার দেওয়া সেই কাগজগুলো বড়দির চোখের সামনে খোলা।

অজয় শুয়ে আছে মশারির মধ্যে বড়দি শুতে আসার অপেক্ষায়—বড়দি ওকে শোবার সময় আদর করে রোজ। অথচ, আজ কতোক্ষণ যে অজয় শুয়ে আছে—বড়দি শুতে আসছে না অজয়ের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না—বসে বসে সেই কটা কাগজই যে কতোক্ষণ ধরে দেখছে! —এখনও তো বড়দি ওই কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে!

অজয় মশারির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল—টেবিল-লাইটের আলোটা সামনের দেয়ালে ধনুকের মতো আধখানা গোল সাদা-কালোর দাগ ফেলে দূরের দিকে মিলিয়ে গেছে—সেখানে আধো-অন্ধকার। তার ওপাশটায় একটুও আলো নেই। অজয় ওই অন্ধকারের থেকে চোখ ঘুরিয়ে বড়দির দিকে তাকাল। বড়দির কাছে শুলে ওর ভয় করে না একটুও।

বড়দি মুখটা ওই আলোর সামনে—কিছুটা আলোয় কিছুটা ছায়ায়। আলোটা বড়দির কপালে নাকে ঠোঁটে আর গালের একপাশটায় চকচক করে জ্বলছে—মুখটা কী সুন্দর! ঠিক যেন মা সরস্বতীর মতো—অতোটা শাদা নয়—ওদের প্রতিমাটা গেল বছরে ভীষণ ভালো হয়েছিল—বড়দিও বসে আছে প্রতিমার মতো—চুপটি করে, চোখ একটাও পাতা পড়ছে না—বড়দি সরস্বতীর চেয়ে আরো অনেক সুন্দর।

বড়দির মুখ, সামনের টেবিল আর দেয়ালের কিছুটা ছাড়া বাকি সারাঘরটাই অন্ধকার। অজয়ের ভয় করছে একা-একা শুয়ে থাকতে—কী নিঃঝুম চারদিক। কোথাও কোন শব্দ নেই—শুধু টেবিল-ক্লকটাই যা একটানা শব্দ করছে টিক্‌টিক্‌! বড়দি কী জেগে আছে? না, বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে চেয়ারটায়?

হঠাৎ বড়দি একটু নড়ল, মুখের আলোটা এক হাসির মধ্যে আরো চকচক করে উঠল, অনেকক্ষণের একটা বন্ধ নিঃশ্বাস ফেলল যেন, তারপর টেবিল-ক্লকটার সেই একঘেয়ে শব্দের মধ্যে খস্‌ করে আরেকটা শব্দ হলো—অজয় দেখল, ওই কাগজগুলোরই একটা পাতা ওল্টাল বড়দি। আর, এ কী করছে? ওই কাগজগুলোকেই যে মুখের দিকে তুলে ধরছে—খুব কাছে! হঠাৎ ওদের ওপর শব্দ করে একটা চুমু খেল, অনেকক্ষণ চুমু খেয়ে গালের ওপর চেপে ধরল।

অজয়ের মন এক গভীর অভিমানে ভরে গেল—বড়দি না অজয়েরই? ওই কাগজগুলোকে না অজয়ই এনে দিয়েছে? এ জানলে ও কিছুতেই দিতো না—লজেন্স টফি সবগুলোই দিতো বরং।

আর, কটা বাজে এখন? বড়দির কী এখনও শোবার সময় হয়নি? বড়দি কী জানে অজয় তার জন্যই এখনো জেগে আছে? অজয়ের কী ঘুম পায় না নাকি? অজয় দেখল বড়দি কাগজগুলো বাঁদিকে সরিয়ে রাখছে। এবারে শুতে আসবে নিশ্চয়। কিন্তু বড়দি যে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপাশ থেকে একটা খাতা টেনে আনল। তার মধ্যে নিজেও কী লিখতে বসে গেল!

অজয় আর বড়দির দিকে তাকাবে না—কিচ্ছু ভালবাসে না বড়দি ওকে ঃ অজয়ের কোন দরকারও নেই। মুখ ঘুরিয়ে লেপটা মাথার ওপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকল।

শেষে অজয় যখন লেপের মধ্যে গরমে একটু একটু করে ঘামতে সুরু করেছে, বাতাস ক্রমেই খুব বিচ্ছিরী লাগছে, তখনই ওর চোখের সামনে লেপের রং-বদল হলো—অজয় বুঝতে পারল-টেবিল লাইটের আলোটা নিভল এবার। বড়দির পায়ের শব্দ ঘরের মধ্যে—শব্দটা এগিয়ে আসছে—শুতে আসছে এতক্ষণে। এখন মশারির টানার শব্দ খাটটা একটু নড়ল—বড়দি খাটের ওপর উঠছে। এবারে মশারির মধ্যে ঢুকল। অজয়ের পাশে বসে লেপটা মাথার থেকে নামিয়ে দিল—একটা ঠাণ্ডা বাতাস সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের নাক মুখ ভরে দিল। কোন শব্দ না করে অজয় সেই হাওয়াটাই বেশি বেশি নেবার চেষ্টা করছিল—বড়দি ওর চুলের মধ্যে আঙুল দিল আস্তে আস্তে চুল থেকে আঙুল সরিয়ে কপালের ওপর হাত বোলাতে লাগল—অজয়ের ভাল লাগছে বেশ। গাল টিপল বড়দি—বড়দিটা ভীষণ দুষ্টু! হঠাৎ অজয়ের সারা-গা সেদিনের মতো শিউরে উঠল—বড়দি ওর গালের ওপর চুমু খাচ্ছে এবার।

অজয় তখনও কষ্ট হয়ে শুয়ে রইল। বড়দির ওপর রাগ নেই আর, কিন্তু অজয় আজ অনেক দুঃখ পেয়েছে। কটা বাজে এখন ঘুম পেয়েছে খুব।

শেষে অজয় যে কখন ঘুমিয়েছে তা ওর জানা নেই।

পরের বছর উইন্টার হলি-ডের ছুটিতে অজয় আবার বাড়ি এল। ওর পুরনো বন্ধুরা সবাই ছিল পাড়ায়, ক্রিকেটের ব্যাট আর বড়দির দেওয়া বলটা ঠিক তেমনিই তোলা ছিল আলমারির মাথায়, শুধু একটু তফাৎ হয়েছে অজয়ের—স্কুলের খেলায় এবার ও ক্রিকেটের আসল ডিউজ বলে খেলেছে, টেনিস বলে ক্রিকেট খেলাটা এখন খুব ছেলেমানুষি মনে হয়।

আর, বদলে গেছে বড়দি—আগের মতো সারাদিন আর লাফালাফি করে না, হাসে না, অজয়কে নিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলে না, আদর করে না। কই, ও এসেছে আজ তো

ক'দিন হয়ে গেল, বড়দি ওকে একবারও আদর করেনি এখনো!

আরও একটু বদল—সমীরদাও ওখানে নেই। অজয় কালই একা-একা রাস্তাটা দিয়ে গিয়েছিল। সমীরদাকে খুঁজতে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল, মালির কাছে শুনেছে। মালি তখন একটা প্রকাণ্ড কুড়ুল দিয়ে খুব মোটা এক মরা-গাছের গুঁড়ি থেকে কাঠ চেলা করছিল—বড় বড় ফালি হচ্ছে এক-একটা ঘায়ে—কী ধার ওই কুড়ুলটায়! অজয় মালিকে বলল— দাও তো, আমি একটু কাটি।

মালি ওর হাতের দিকে কুড়ুলটা বাড়িয়ে দিয়ে শুধু একটু হাসল। কী ভেবেছে মালি—অজয় পারবে না? সমস্ত জোর লাগিয়ে সেটাকে ও ওপর দিকে টান দিল, কুড়ুলটা একটুখানি উঠেই গুঁড়ির ওপর পড়ল—এক চিলতে কাঠ ছিটকে গেল তার থেকে—মালির দিকে এবারে হাসল অজয়ই—দ্যাখো, পারলাম কী না!

সেই সমীরদার নামই রাত্তিরে হঠাৎ শুনল অজয়—ও-ঘরে বাবা-মা আর বড়দির কী-যেন কথাবার্তা। তার একটু আগেই অজয় একা খেতে বসেছিল, বড়দি বারান্দার কোণে চুপটি করে বসেছিল, অজয় গিয়ে ডাকল। কিন্তু বড়দি কিছুতেই এল না। তারপর বাবা বাড়ি ঢুকলেন—বাবার আজ বাড়ি আসতে বড্ড দেরি। অজয় খেতে খেতেই শুনল মা বড়দিকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলেন, আর তখন সঙ্গেই ও সমীরদার নাম শুনতে পেল। ওদের কথা অজয় কান পেতে শুনেছিল, কিন্তু তখনই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

টেমাটোর চাটনিটা ঠাকুর পাতে পাঁড়িয়ে দিয়েছে। রাগে তা সরিয়ে দিয়ে কিছু বলার জন্য কাউকে খুঁজল—এখানে কেউ নেই। বাটিটা উপুড় করে থালাময় চাটনিটা ছড়িয়ে দিয়ে অজয় হাত ধুয়ে ঘরের মধ্যে গেল। পড়ার চেয়ারটায় বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল বড়দির জন্য, শেষে বিছানায় উঠে বসল।

আর তখনই ও-ঘরে কী দারুণ গোলমাল! অজয় ভয় পেয়ে একটু চুপ করে থেকে শেষে খাট থেকে নেমে এল। বারান্দা পেরিয়ে ও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে ওরা কী-সব কথা বলছে। কিন্তু এত গোলমাল কেন?

ভেজানো দরজাটা ঠেলে অজয় ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখল—মা খাটের ধারে বসে বড়দির দিকে হাত তুলে কী যেন বলছিলেন, বড়দি খাটের মাথার দিকের মেঝেটায় দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে যেন খাটের কাঠটাই দেখছে, বাবা চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছেন—এ কী সব হয়েছে ওদের?

তখনই বড়দির হাতটা আস্তে আস্তে উঠে খাটের পাশটা ধরতে যাচ্ছিল। মা চিৎকার করে উঠলেন—এই খবর্দার! খাটে তুই হাত দিবি না, গঙ্গাজল দিয়ে ধুতে হবে এই রাত্তিরে।

অজয় দেখল—বড়দির হাতটা আবার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর, ওমা কী করেছে বড়দিকে—বড়দির দু-গাল বেয়ে চোখের জল। বড়দি কাঁদছে! কেন, কী হয়েছে? মা যেন এতক্ষণে অজয়কে দেখতে পেলেন, ওকেও বকে উঠলেন—এই, তুই আবার এখানে কেন? বড়োদের কথা কী শুনতে এসেছিস? যা, শুগে যা!

বাবও চোখ তুললেন অজয়ের দিকে—এ কী দৃষ্টি বাবার চোখে?

অজয় ভয়ে ভয়ে বাইরে চলে এল। মা ওর পিছনেই দরজাটা জোর শব্দে বন্ধ করে দিলেন।

অজয় ফিরে এসে বিছানায় শুলো। মশারিটা ফেলা নেই—বড়দিই রোজ মশারি টাঙায়—মশা কামড়াচ্ছে খুব, কানের কাছে ফিনফিন করে উড়ছে। অজয় তবু চুপ করে বড়দির জন্যে শুয়ে রইল। কিন্তু কখন আসবে বড়দি? নিজের চোখে ও দেখে এসেছে—বড়দি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। হঠাৎ অজয়ের ভীষণ দুঃখ লাগল বড়দির জন্য—ওদের কাছ থেকে চলে আসুক এ-ঘরে! সব কষ্ট ও ঠিক করে দেবে।

ও-ঘরে আবার জোরে শব্দ শুরু হলো। বাবা আর মার গলা একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এক-একবার একটু কমছে, আবার বাড়ছে। আরও একটা আওয়াজ—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—খুব আস্তে—গুমরে গুমরে কাঁদছে বড়দি!

কী দারুণ ওই শব্দটা। অজয়ের ঘরে এখনও বড়ো আলোটাই জ্বলছে, তবু বাইরে তাকালেই জানলার ভিতর দিয়ে ওপারের অন্ধকার দেখা যায়—কী কালো, কী ঘন—কতো অন্ধকার ওখানে? ওইসব অন্ধকারগুলো নিংড়ে নিংড়েই যেন কতো দূর থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দটা—বড়দিও যেন অনেক দূরে কোথাও এক

অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেছে—এবারে ওকে একবারও চুমু খেয়ে আদর করেনি বড়দি।

অজয় আবার বিছানা ছেড়ে ও-ঘরের বন্ধ দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পাল্লার ফাঁকে কান ঠেকিয়ে রইল। বাবা আর মা দুজনেই বড়দিকে বকছেন—শব্দ শোনা যায়, কথা বোঝা যায় না। আর তার মধ্যে অনেক ছাড়াছাড়া বড়দির কান্নাটা।

অজয় ফিরে এসে আবার লেপের মধ্যে শুল। কতোক্ষণ ওদের এমনি চলবে? ওরা কী কেউ শুতে যাবে না আজ? খাবে কখন? একটা জোরে চেয়ার টানার শব্দে চমকে উঠল অজয়। তারপরে একটা বড়ো আওয়াজ। বড়দির আর কোন শব্দ নেই।

আর অজয়? ভয়ে কুঁকড়ে ও কখন একা-একাই অন্ধকারের ভয় পেরিয়ে ঘুমিয়েছে।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই অজয় দেখল—ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছে, মশারিও ফেলা হয়নি। বড়দি শুতে আসেনি? বিছানা-বালিশে তো একটুও শোয়ার চিহ্ন নেই! তবে কী ও-ঘরেই এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে ও-ঘরে দেখতে গেল। বড়দি নেই—শুধু বাবা চেয়ারটা এখন জানালার দিকে ঘুরিয়ে বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে আছেন, ঘরের মেঝেময় সিগারেটের পোড়া-টুকরো ছাই আর দেশলাই-কাঠি। এখনো একটা সিগারেট হাতের মধ্যে পুড়ছে—কী ভীষণ লম্বা হয়েছে ছাইটা!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অজয় বারান্দার পাশে বসার ঘরটায় ঢুকল। এখানেও কেউ নেই—শুধু নীল আলোটা তখনও জ্বলছে। তাড়াতাড়ি অজয় বারান্দায় বেরিয়ে এল। মা চুপচাপ একা বসে বাগানের দিকে কেমন এক ফাঁকা চাউনিতে চেয়ে আছেন। অজয় কাছে গিয়ে বলল—মা, বড়দি কোথায়?

মা যেন হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠলেন, তারপরেই একটা অদ্ভুত গলায় অজয়কে ধমক দিলেন—কোথায় আবার! যমের বাড়িতে—

অজয় আস্তে আস্তে সরে এল। যমের বাড়িতে ভয়ানক কষ্ট—করাত দিয়ে দু-খানা করে কাটে, আগুনে পোড়ায়, গরম তেলে ভাজে। কাঁকড়া বিছের কামড়, আর ভীষণ ভীষণ চেহারার লোকগুলো ইয়া বড় বড় সাঁড়াশি দিয়ে মাংস ছিঁড়ে নেয়—অজয় একটা পাপ-পুণ্যের ছবিতে দেখেছে। ও-সব পাপের সাজা। বড়দি কী পাপ করেছে কিছু? ওরা কী বড়দিকেও অমনি করে—অজয়ের দারুণ ভয় করল হঠাৎ। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, মেঝের মধ্যে ঘোরাঘুরি করল, খাটের ধারে একটু বসে ছাদের ওপর দেখতে গেল। নিচে তাকিয়ে চারপাশে খুঁজল। বড়দি বাগানে নেই, সামনের রাস্তাটা—ওর দুপাশে কোথাও নেই। অজয়ের খুব খিদে পেয়েছিল, মা ডাকলেন না, বড়দিও দুধের গেলাস নিয়ে ডাকল না। বড়দি কোথায় গেল? মা বারান্দা থেকে সরে গেলেই খুঁজতে যাবে অজয়।

সে-সব আজ কতোকাল আগেকার কথা। অজয় তখন কোন ক্লাসে পড়ত তা ভেবে দেখলেই সময়ের হিসাব পাওয়া যাবে। কিন্তু একটা হিসাব অজয় কোনদিনই পায়নি—বড়দি কোথায় গেল? আর, কী পাপ করেছিল বড়দি?

অজয়ের এ-সব প্রশ্নের জবাব ওকে কেউ দেয়নি। ওর মনে অনেককাল তারা অনড় হয়ে ছিল। বড়দির জন্য ও কতো কেঁদেছে, দেখেছে মা কেঁদেছেন, বাবাও কেঁদেছেন—অজয় বুঝেছে—বড়দির জন্যই, তবু ওর কাছে তাঁরা স্বীকার করেননি কোনদিন। তাই, সেই প্রশ্নগুলোই কতোদিন ওর মনের মধ্যে সব নিয়মে সময় ঘিরে ছিড় করে দাঁড়াত।

কিন্তু আজ—এই এতকাল পরে আর কতোটুকুই বা মনে পড়ে বড়দিকে? খুব—খুব কম। শুধু, মাঝে মাঝেই—

একদিন কলকাতার একটা পার্কের মধ্যে ছোট ছেলেদের টেনিস বলে ক্রিকেট খেলা দেখে সেই বড়দির দেওয়া বলটার কথা মনে পড়েছিল। কিছুকাল আগে আর একদিন তাড়াতাড়ি চা খেতে কাপে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছিল সেই বারান্দার সামনে বাগানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলাসের দুধ ঠাণ্ডা করার কথা। আর কখনও কোন কাজহীন সময়ে দূরের কোন টেলিগ্রাফ তারের শব্দ কানে এলে ও হয়তো মুহূর্তেই ফিরে যায় সেই ছোট শহরের এক কুয়াশা-ঘেরা মাঠের সকালের দিকে—মাঝে মাঝে!

সেইসব শব্দ ভাবনা মিলিয়েও যায়। সামনে এগিয়ে আসে এক-একটা নতুন কলরবের দিন। তারাও পিছনে পড়ে যায়। আরও একটা দিন এগিয়ে আসে তখন। তাদের সবাইকে পিছনে ফেলে চলতে হয়। অজয় চলেছে।

আজও একটা দিনকে অজয় পিছনে ফেলে রেখেছিল। এ সেই ছোট্ট শহরটার দিন নয়, যে বিকেলের পরে নামমাত্র একটু ছোট্ট সন্ধ্যাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে রাত নেমে আসত কতো তাড়াতাড়ি—অজয়দের বাড়ির চারপাশ নিঃঝুম করে ওকে ভয় দেখাত ভীষণ। এ-কলকাতা শহরের একটা দিন।

বিকেলে অজয় যখন ক্লাসের বন্ধু সুতনুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কলেজ থেকে বেরিয়েছে, তখনই দিনটার প্রায় শেষ—রাস্তার লাইট-পোস্টগুলোয় আলো জ্বলে উঠেছে সবেমাত্র, ট্রাফিক-লাইটগুলোও ঝিম-ঝিম জ্বলতে শুরু করেছে, দোকানের সাইনবোর্ড আর সাইন-পোস্টগুলোয় তখনও জ্বলে নি—এমনি একটা সময়। বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা কলেজের উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টটায় ধীরে-সুস্থে চা খেয়ে নিল। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে একটা সিনেমা হলের ইভনিং-শোয়ে ঢুকল। সেখান থেকে কয়েক ঘণ্টা পরে যখন আবার রাস্তায় নেমে এল তখনও কলকাতার ইলেকট্রিক-আলো রাস্তা-ঘাটে ঠিক যেন একটা দিনের মেলাই চলছে—প্রায় তেমনি আলো, মানুষের বাস্ত চলা-ফেরা আর ভিড়।

বাইরে বেরিয়েই অজয় বলল—দারুণ খিদে লেগেছে রে। চল, কোথাও বসে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

সুতনু একটু হেসে বলল—আইডিয়া-গুলো সব বাজে লিমিটেড জিনিস! এতক্ষণ ধরে এই খাপ্পা সিনেমাটার কাণ্ডটা দেখার পর এখন বলতে পারছিস যে বাইরে কিছু খাব।

সুতনুর এমনি ফাঁকা বাহাদুরি অজয় অনেক শুনেছে, একটু হেসে উত্তর দিল—আচ্ছা, বলছি, বাইরেই খাব। দেখি, কী খাওয়া তো কেমন?

পারি না ভেবেছিস? পকেটে কত আছে তোর?

অজয় পকেটের মধ্যে হাত ঢোকাল—গোটা কুড়ি টাকার মতই তো ছিল!

যথেষ্ট! ওতেই খুব চলে যাবে। চল, আমার এক বন্ধুর বাড়ি, এখন তো দোকানপাট সব বন্ধ, কিন্তু ওখানে আন্ডার-হ্যান্ডে যে কোন সময় সবকিছু মাল পাওয়া যায়। এমন কি ইচ্ছে করলে তুই চা আনিয়েও খেতে পারিস।

অজয় একটু অবাক হয়ে বলল—তার মানে?

মানে কিছু একটা আছেই। মনে পড়ছে—এই সিনেটার কথা? —সেই যে যখন শুধু একটা তোয়ালে আড়াল করে কাপড় ছাড়ছিল? কী-একটা টেকনিক বলতো! খোলাখুলি না দেখিয়েও মেজাজটা কেমনটি বিগড়ে দেয়, না? তোর কী মনে হয়, ন্যাচিজম যে অ্যালাও করবে শিগ্গির,

তা এর চেয়ে অ্যাপীল কী একটুও বাড়াতে পারবে?

নিজের মুখটা খামোকা খারাপ করছিস্ কেন? যা বলতে চাইছিস, সোজা ভাষায় বল।

সারপ্রাইজটা একটু পরের জন্যে থাক; এখন চুপচাপ আমার সঙ্গে চল। তোর সঙ্গে আজ বন্ধুর চেনা করিয়ে দেব, বীয়ারও আনানো যাবে, আর ফালতু লাভে একটা রীয়্যাল লাইফও দেখতে পাবি—সব জীবনকেই একটু চিনে রাখা ভালো।

সুতনুর বাহাদুরি অজয়ের অনেক দেখা আছে। কী দেখাবে সুতনু? অজয় দেখবে। সুতনুর সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে কয়েকটা বাস-স্টপেজ পার হলো, একটা চার-রাস্তার মোড়, বড় এক ওষুধের দোকান। তার পরে একটা গলি। একথা-ওকথা বলতে-বলতে অজয় হঠাৎ বলল—এটা কোন গলি রে?

ওরা তখন সেই গলির মধ্যে হাঁটছিল। সুতনু একটা ভারিক্কি গলায় বলল—এখানেই বন্ধুর বাড়ি। বাঁক-টাঁকগুলো সব চিনে রাখছিস তো? পরে কখনও যদি একা আসিস—ভুল না হয়।

কথা বন্ধ করে সুতনু একটু থেমে দাঁড়াল—দাঁড়া, আগে এক প্যাকেট সিগ্যারেট কিনে নিই।

অজয় পকেট হাতড়ে নিজের প্যাকেট বের কতে-করতে বলছিল — আমারটা তো ভর্তিই আছে। এর থেকেই—

একটু বেশিই খরচ হবে আজ! সুতনু একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বাঁকের মাথায় সিগারেটের দোকানে চলে গেল। অজয় পথ-চলতি মানুষের রাস্তা ছেড়ে একটা দেয়ালের পাশ ঘেঁষে রাস্তার মানুষ-জন দেখতে লাগল। সুতনু ফিরে আসতেই বলল—দেখেছিস, এইটুকু সরু গলি, তবু কী দারুণ লোকের ভিড়?

সুতনু আবার একটু হাসল—তা আর হবে না? কী দারুণ একটা বাজার রয়েছে ভিতরে! আরো দেখে রাখ যে ভিড়টা সব ক্লাসের—রিচ অ্যান্ড পুয়োর, আর সব বয়স—ইয়াং অ্যান্ড ওল্ড।

সুতনু আজ সত্যি-সত্যিই এক অচেনা জগতের হেঁয়ালি-ভাষায় কথা বলছে। অজয় বুঝছে না কিছুই, সুতনু মুখে প্রশ্ন তুলে ধরে বলল—তার মানে?

উত্তরটাও প্রায় তখনই অজয় নিজে-নিজেই পেয়ে গেল। ওরা তখন গলিটার সামান্য একটু ভিতরে চলে গেছে—বাঁকটা পেরোনোর পরেই সেটা অনেক সরু হয়ে এসেছে, দু-পাশেই ঠাসাঠাসি পুরনো-পুরনো বাড়ি—অজয় হঠাৎ দেখল, ওর সামনেও এখানে অন্য একটা জগৎ। বাড়ি-গুলোর দরজায়-দরজায় জমকালো পোশাকের রং-বেরং মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে বুঝল অজয়—এরা তারাই—যাদের কথা ও অনেক শুনেছে। এদেরই কথায় না সুতনু বলছিল—কী দারুণ একটা বাজার! হ্যাঁ দারুণ একটা বাজারই—দেহের—নারী-মাংসের! কিন্তু এখানে ও কী কিনবে? কী কিনতে বলেছে সুতনুকে? রুখে দাঁড়াল অজয়। একটা কঠিন দৃষ্টি সুতনু চোখে তুলে ধল—সো দিস ইজ হোয়াট ইউ মেন্ট? বাট আই নেভার থট—কথা হারিয়ে ফেলল, শেষে খেই খুঁজতে-খুঁজতে বলল—হীয়ার! ইন এ ব্রথেল!

জানি তোর কাছে এ একটা সারপ্রাইজ। এখন রাগ করছিস্, আমি কিছু বলব না, কিন্তু দেখিস একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজই তোর জন্যে ওয়েট করছে—আর একটু এগোলেই—

অজয় তবু দাঁড়িয়েই রইল।

সুতনুর গলায় এবারে একটু অনুনয়ের সুরে—তোকে দেখাতে আনলাম, আর এত দূর এসেও ওকে একটু না দেখেই ফিরে যাবি? যখন এসেই পড়েছিস—

—এরকম একটা নোংরা জায়গায়! কে তোর বন্ধু এখানে?

বলতে-বলতেই অজয়ের চোখ পড়েছিল বাঁদিকের একটা সরু মত প্যাসেজে দাঁড়ান মেয়েগুলোর দিকে। সামনের মেয়েটার চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ নাচিয়ে একটা ইসারা করল। মুখভর্তি হাসিতেও এক নির্ভুল আহ্বান। হঠাৎ চমকে উঠল দেখে—বুকে একটা সরু কাঁচুলি ছাড়া আর কোন বসন নেই! শাড়িটাও কাঁধের একপাশে সরানো।

অজয়ের চোখের সামনেই—একটু নিচে—কতো কাছে! এত কাছে যৌবন! — এই প্রথম আজ অজয়ের চোখে—কী দুর্বার আকর্ষণ!

দেখতে দেখতেই এক ঘন লজ্জা ওর দু-চোখ ঘিরে আড়াল করল—চোখ নেমে এল মাটির দিকে তখনই আবার সেই আকর্ষণ—চোখ তুলল—কাঁচুলিটা! তার পাশেও—অজয়ের চোখ দুটো ওর একটুও বাধ্য নয়, পা দুটো যেন অজয়ের নয়—নিজেদের মর্জিমত তারা অল্প-অল্প কাঁপছে, হাঁটু দুলছে, বুকের মধ্যে এক অজানা ভয়ের দুরদুর—মেঘ ডাকছে কোন আদিম বনভূমিতে।

অজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সুতনু এতক্ষণ ওর মুখের অদল-বদল লক্ষ্য করছিল। সামনে ওই মেয়েটাকে দেখার মধ্যেই ডুব দিয়েছে অজয়—মুখে বসন্তর দাগ, কালো রং, চ্যাপটা নাক মেয়েটাকে। কী এত দেখছে অজয়? তুলে ধরা ওই ভাঙা যৌবন! উগ্র লাল শাড়ির রঙ। তার নিচে বেরিয়ে-থাকা সায়ার দিকেও চোখ পড়ল সুতনুর—তেল ময়লার ছোপধরা দাগ—কতোদিন কাচা হয় নি কে জানে! এই ক্যাড একটা মেয়েকেই মুগ্ধ চোখে দেখছে। অজয়ের হাতে একটা টান দিল সুতনু—আরে! এখানে কী দাঁড়াচ্ছিস? এ-গুলো সব ভীষণ চীপ আর ডার্টি টাইপ! চলে আয়, আমার বন্ধুকে

দেখবি, দেখিস ও কী পালিশড আর কতো ক্লীন।

দু চোখভরা অন্ধকারে ঘুরে দাঁড়াল অজয়। যেন ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখল—সুতনু কথা শেষ করার আগেই হাঁটতে শুরু করেছে—ওর দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে সুতনুর কোটের কোণা ধরল—সুতনু।

সুতনু পিছনে ফিরল—আরে! এ কী করছিস? ছাড়!

প্লীজ সুতনু! আমার মাথাটা কী রকম ঝিমঝিম করছে, আজ চল, অন্য আরেক দিন আসব।

কোটটা অজয়ের হাত থেকে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সুতনু—তুই তো আচ্ছা একটা কাওয়ার্ড!

অজয় কোন প্রতিবাদ করল না।

ওই একটা ডার্টি মেয়েকে দেখেই তুই ডুব দিতে যাচ্ছিলি, আর—আচ্ছা বলতো—কিসের এত ভয় তোর?

সুতনু একটু থেমে আবার বলতে লাগল—জানিস এখানে কিছুতেই কোন আটক নেই। এই যে তুই দেখতে-দেখতে হাঁটছিস, কাউকে পছন্দ হলে তবেই দাঁড়াবি, কি তার ঘরে ঢুকবি, না-হলে গলির ওমাথা দিয়ে সোজা বড়-রাস্তায় উঠে বাস ধরবি। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এত-গুলো মেয়ের সামনে এরকম সীন ক্রিয়েট করিস না প্লীজ!

অজয় যেন এতক্ষণে কিছু ভাষা খুঁজে পেল—কিন্তু যদি কোন চেনা লোক আমাদের এখানে দ্যাখে?

তো বয়েই গেল? যে আমাদের দেখবে, তাকে তো আমরাও দেখব? তাই, দেখায়-দেখায় সব কাটাকুটি! নইলে তুই কী ভাবছিস যে সে কার কাছে গিয়ে কোনদিন বলতে পারবে—অমুক-অমুককে অমুক জায়গায় দেখলুম। তাহলে লোকে তাকে তক্ষুনি বলবে না—বুঝলাম, তুমি একটি নিষ্পাপ আসল ঘুঘুপাখি! কিন্তু আগে জবাব দাও তো মানিক, যে কী করে তুমি ওদের ওখানে দেখলে?

সুতনু আবার হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। অজয় পিছনে-পিছনে নিরুপায়। একটু এগিয়েই সুতনু থামল—দাঁড়া, এসে গেছি। এটাই বেলার বাড়ি।

ডানদিকে একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুতনু। সামনে দাঁড়ান মেয়েগুলোকে বলল—বেলা আছে? ওকে একটু বাইরে ডাকো তো।

অজয় দেখল—সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েদের মধ্যে একটা গা ঠেলাঠেলি, একজন ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে, দরজার পিছন দিকের অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল — ও বেলাদি—ই, তোমার লোক এয়েছে গো—ও-ও!

সুতনু পিছিয়ে এল অজয়ের কাছে—এর পরে যদি কোনদিন একা আসিস, তো ওই পানের দোকানটা থেকে গুনে-গুনে বারোটা বাড়ি পার হবি, আর যদি তাও গুলিয়ে ফেলিস—

বলতে-বলতেই থেমে থেমে গেল সুতনু। দেখল—অজয় ওর কথা শুনছে না কিছুই—এক দৃষ্টিতে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, একটু মুচকি হেসে বলল—দেখছিস? তা ভালো দ্যাখ!

কারও নির্দেশ ছাড়াই অজয় অবাক হয়ে দেখছিল দরজার সামনে দাঁড়ানো মেয়ে-গুলোর দিকে—দেয়ালের গায়ে হেলান-দেওয়া ওই মেয়েটা কী দারুণ লম্বা আর রোগা! সবচেয়ে সামনের একজন—কী প্রকাণ্ড ওর শরীর! — কতো মাংস আর চর্বি ওই একটা দেহের মধ্যে। আর, তার ঠিক পাশেই যে ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটা—আরে! কতো ছোট একটা বাচ্চাই তো ও—পুতুলের মতো ছোট্ট সুন্দর মুখ—ও এখানে কেন? কারও বাড়ির ভিতরে বসে-বসে এখনও তো পুতুল খেলার কথা! কিন্তু, এখানে, এই পথের মধ্যে—মুখে শাদা রঙ লাগিয়ে, চোখে কাজল টেনে দাঁড়িয়ে আছে। পাখির মতোই যেন ছোট্ট একটুখানি বুকের পাঁজর। ওকে কে এখানে দাঁড় করিয়ে গেল? আরও, পিছন দিকের ঝোলা-মাংস ভাঙা-গাল চোখের নিচে কী গভীর দুটো খাঁজ—ওই মেয়েটা! মেয়ে নয়—অনেক বয়স্কা প্রায় বৃদ্ধা এক নারী। ওর দেহ থেকে যৌবন তো কবে চলে গেছে! তবু এখনও মুখে গালে রঙ মেখে কিসের আশায় দাঁড়িয়ে? ওই দেহটা দেখে কী আজও কেউ ভোলে? ভবে?

সুতনু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে অজয়ের মুখের দিকে দেখছিল। বেলার আসতে যেন একটু দেরিই হচ্ছে, তবু সুতনু এখন অজয়কে বেশ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে—অনেক উল্টে-পাল্টে ওকে দেখাও হলো আজ—একটু আগে তো মনে হয়েছিল, অজয় সত্যি-সত্যিই ফিরে যেতে চাইছে, একটু যেন সমীহও ওর ওপর হয়েছিল—কিন্তু এখন? মনে-মনে একটু হাসল সুতনু—খুব বড় এক মর‍্যালিস্ট অজয়—একটু একটু করে পথে আসছে এবার! অজয়ের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মনে হলো—সামনের মোটা মেয়েটাকেই দেখছে ও। কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল কী রে! চোখ দিয়ে তো গিলে-গিলেই খাচ্ছিস! তা ভালো করে সব দেখে নে, যতোক্ষণ বেলা না আসে। দেখিস কী দারুণ একটা ফীগার! আর আর আমার চয়েশটাও—

সুতনুর কথা শেষ হতে পারল না। ওদের পাশ দিয়ে ঠিক তখনই একজন বিশালবপু মাঝ-বয়েসী মানুষ কিছুটা টলমল-পায়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, সুতনুর কাছে গিয়েই সে একটু বেশি টলল হঠাৎ—ধাক্কা লাগল সুতনুর গায়ে। সুতনু প্রায় পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল।

মুহূর্তেই ফিরল সেই লোকটার দিকে—একটা গোলমাল এখনই বেধে যাবে নিশ্চয়! এত সহজে ও ছেড়ে দেবার ছেলে নয়। কিন্তু অবাক হলো অজয়—সুতনু লোকটার মুখের সামনে একটু দাঁড়িয়েই হাসতে-হাসতে অজয়ের কাছে ফিরে এল—দারুণ মাল টেনে এসেছে জানিস?

অজয় ওই বিশাল-পরিধির মানুষটাকে দেখছিল—ধুতির ওপর একটা গরম কোট—সেটা দু-ভাগ করে ফেঁড়েই যেন ওর বিরাট পেটটা সামনে এগিয়ে এসেছে, মেয়েগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ও ওপর-নিচে চোখ ঘুরিয়ে ওদের এক-একজনকে দেখছে—রূপ যৌবন সবই যাচাই করে পছন্দ করছে লোকটা। কিন্তু কোন দেহটা ও কিনতে চাইবে? ওই বিশালকায়া মেয়েটাকেই কী? আরে! লোকটা পড়ে যাচ্ছে নাকি?

লোকটা তখন মাথা নিচু করে একটু ঝুঁকে পড়েছিল। ঘাড় ঘোরাল একটু। সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের মেয়েটা শাড়ি সামলে সরে দাঁড়াল, আর, ওর শাড়ির পাশ ঘেঁষেই পচ্ করে দেয়ালে ওপর পানের পিক ফেলল লোকটা। অজয় দেখল রক্ত-লাল পিকটা অনেকখানি দেয়াল-জুড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। লোকটা তখন আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কী যেন হয়েছে ওর—গলা ঝেড়ে-ঝেড়ে জোর শব্দে থুতু ফেলতে লাগল মাটিতে—ঠিক যেন—অজয়ের মনে হলো—ওই মেয়েটাকে বা আর কাউকে দেখেই ঘেন্নায় ও-রকম করছে।

লোকটা আবার মুখ ঘোরাল মেয়েদের দিকে—দেখতে লাগল। ও খুঁজছে এখনও। আর ঠিক তখনই যেন সেই বাচ্চা মেয়েটার দিকে ওর প্রথমবার চোখ পড়ল—দৃষ্টি স্থির হলো এতক্ষণে, আর, কী-এক চাউনি ওর চোখে—মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সামনে গিয়ে একটা চোখের ইসারা করেই দরজার ভিতর দিকে অন্ধকারে চলে গেল।

আর, আরে! মেয়েটাও যে ওর পিছন-পিছন চলে যাচ্ছে! অন্য মেয়েদের দিকে একটু হাসতে-হাসতেই তো—গভীর এক বিস্ময়ের সামনে থমকে দাঁড়াল অজয়। এ কোন জায়গা?

—যেখানে কোন বয়স নেই, শরীর নেই, শুধু পকেটের টাকাই? লোকটার গরম কোট ফেটে বেরিয়ে-আসা বিশাল পেট, চিবুকের নিচে আর একটা দশগুন বড়ো চিবুক আর পানের রস-গড়ানো প্রকাণ্ড মুখটা ওর চোখের সামনে ভাসছিল—তার পাশে সেই ছোট্ট পুতুলের মতো মুখটা—সুতনুর গলা শুনতে পেল তখনই—কিছু বুঝছিস?

সুতনু কিসের কথা বলছে? অজয়ের কিছু ভাবার ইচ্ছে নেই এখন।

ওই যে লোকটা। বলতো, ও কী হতে পারে?

নিজেই উত্তর দিল সুতনু—আমি তো বলছি ও একজন ব্যবসায়ী। হেভি বাংলা টেনেছে জানিস। হাড়-কঞ্জুষের জাত—কিন্তু ওদের এক-একজনের যা ব্ল্যাক-মানি, তা শুনলে তোর মাথা একেবারে ঝিম মেরে যাবে। ডিসপোজ্যালের এক-একটা খ্রাকেই—

বলতে-বলতে থেমে গিয়ে অজয়ের পিঠে একটা ঠেলা দিল—দ্যাখ, ওই যে বেলা আসছে, স্টেডি!

অজয় দরজার দিকে তাকাল। ভিতর-দিকে দাঁড়ানো মেয়েগুলো দু পাশে সরে

যেন কারও বেরিয়ে আসার পথ ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের আড়াল থেকে এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের মাথা দেখা যায়। আরও এগিয়ে এসে সে দরজার সামনে দাঁড়াল।

মুহূর্তেই অজয় দেখল এক আশ্চর্য নারীকে। সারাদেহ ছাপিয়ে-ওঠা উদ্দাম যৌবন! হাল্কা শিফনের শাড়ি, আরও পাৎলা এক ব্লাউজ—তার নিচে যেন জলের পর্দার তলায়—স্পষ্ট দেখা যায়। আর, ওই দুটো দীঘল-গড়নের গোল নরম বাহু! কোমর থেকে কিছুটা অনাবৃত অংশ খাটো ব্লাউজটা পর্যন্ত—মাখনের মতো রঙ! মাখনের মতোই পিছল যেন—অজয় চোখ মেলে এসব দেখতে পারবে না!

চোখ তুলল তার মুখের দিকে—মুখে একটা আলো পড়েছে কোথা থেকে—কী নিখুঁত এক মুখের গড়ন—দীর্ঘ সোজা নাক, ভরাট দুটো গাল—তার ওপরে ছোট্ট একটু গোল এক সুন্দর কপাল—নিচে ওই ঠোঁট-দুটো—অন্য মেয়েদের মতো লাল রঙ মাখানো নয়—শুধু একটা লাল টিপই যা কপালে।

মেয়েটি সুতনুকে দেখে হাসতে-হাসতে বলছিল—আরে, তুমি! তা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

সুতনু অজয়কে দেখিয়ে বলল—আমার এই বন্ধুই ভিতরে যেতে লজ্জা পাচ্ছে কিনা! ওকে তোমায় দেখাতে নিয়ে এলাম আজ।

মেয়েটি এবারে অজয়ের দিকে তাকাল। হাসিমুখে ওকে একটা ছোট্ট নমস্কার করল। নিমেষেই অজয়ের মুহূর্তগুলো ওর মনের মধ্যে দ্রুত ছুটতে লাগল—নিখুঁত ওই নমস্কারের ভঙ্গিটা — পলিশড্ সত্যিই, আশ্চর্য হাসিটা ওর—কব্জিদুটো কী ভরাট গোল-আঙুলগুলো—চিবুকটা তো নমস্কার-এর আড়ালেই—

হাতের পিছন দিকে একটা চিমটি পড়ল। কানের কাছেও সুতনুর গলা—সী, শী হ্যাজ কোয়াইট লাইকড ইউ। চল, এখন ভেতরে যাই, ঘাবড়াস না—আমি আছি।

তখনই মনে পড়ল অজয়ের — মেয়েটির নমস্কার ও ফিরিয়ে দেয় নি এখনও, আর, এ কী করছে অজয় এই পথের মধ্যে? ওর দেহের দিকে—এভাবে? চোখ সরিয়ে নিতে গেল— ও তো এখনও স্থির চোখে অজয়কে দেখছে—কিন্তু কেন? চোখের পাতাদুটো যেন অল্প-অল্প কাঁপছে—ছায়া নড়ল যেন গালের ওপর—আলোয়-ছায়ার কী অপূর্ব এক মুখের আদল।

সেটাও হারিয়ে যাচ্ছিল অজয়ের সামনে। এগিয়ে আসছিল—অনেক দূরের—সে কতো-কাল আগেকার একটা মুখ—এমনি আলো-ছায়ায় দেখা। তার সামনে একটা টেবিল-লাইট দেয়ালের কোল ঘেঁষে জ্বলছে, আলোটা গোল হয়ে দূরের দেয়ালে মিলিয়ে গেছে—সেই সরস্বতীর চেয়ে আরও সুন্দর এক মুখ।

তবু, এ কতো তফাৎ! সে ছিল একটা হাল্কা-ছাঁচের মুখ। পাৎলা-গড়ন শরীর। এ শুধু একটা আদলই—চোখের ভুল অজয়ের।

পাশের থেকে একটি মেয়ের গলা শুনল অজয়—নতুন নাগরের তোমায় মনে ধরেছে বেলাদি!

সুতনুও পিঠে একটা ঠেলা দিল—চল, ভেতরে চল, তখন যতো ইচ্ছে দেখিস।

কী বলল সুতনু? আর ওই মেয়েটি? অজয়ের পা কাঁপতে লাগল আবার, বুকের মধ্যে দুরদুর—

ভেতরে যাবে? কোথায়? — ওই অন্ধকারে? — তারপর?

মেয়েটির মুখের দিকে আর একবার চোখ তুলল অজয়। ওর ঠোঁট দুটো অল্প-অল্প নড়ছে—যেন কিছু বলবে। কী বলবে? কী বলছে? কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন—এখান থেকে নয়—সে অনেক দূরের থেকে—

কে ডাকল না অজয়কে? সেই অনেক-কালের পুরনো একটা ডাক?

কয়েক-পা পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়াল অজয়। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লাগল কিছু।

গলির বাঁকে পান-বিড়ির দোকানে পেরেক-ঝোলানো রসিটায় ধোঁয়া উঠছে পাক খেতে-খেতে। দু-পাশের দরজায়-দরজায় মেয়েগুলোর আলতা-রাঙানো ঠোঁটের মধ্যে সিগারেট জ্বলছে কিছু-কিছু। গলি-ভর্তি মাংস-কেনা মানুষদের মুখে-মুখে অগুনতি সিগারেট-বিড়ি ছাই হচ্ছে অনর্গল। শীতের হাওয়ায় ভেসে থাকা ধুলোর পুঞ্জ বাতাস-ময়। রাস্তার পাশ-ঘেঁষা তেলেভাজার দোকানটায় নতুন কয়লা চাপিয়েছে দোকানী। দু-ধারের ঠাসাঠাসি বাড়িগুলোর ঘর-বারান্দায় উনুনে-উনুনেও ধোঁয়া উঠছে অনেক। ওই-সব ধোঁয়ার রাশি আকাশের দিকে উঠতে গিয়ে শীতে কুঁকড়ে, ভারি হাওয়ার চাপে আবার মাটির দিকে নেমেছে—ধুলো ধোঁয়া আর জানুয়ারীর আমেজী-কুয়াশায় কলকাতার ধোঁয়াশা।

অজয়ের চোখের সামনে শুধুই পথ-ভর্তি কুয়াশা। সেখানে এক শিশির-ভেজা সকালে ঘাসের মধ্যে পা ডুবিয়ে ও একটা মাঠের এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী একটা জিনিষে হোঁচট লাগল পায়ে। জোরে পা চালাল সেটার দিকে। খট্-খট্ শব্দ তুলে সেটা ছিটকে গেল কোথাও — অনেককাল আগেকার একটা টেনিশ বল ক্রিকেট-ব্যাটে মার খেয়ে ছুটেছে।

সেই সাত-সকালের ক্রিকেট খেলা বন্ধুদের সঙ্গে। খুব খুব কুয়াশা মাঠের মধ্যে—ভাল দেখা যায় না কিছু। কতো দূর থেকে একটা শব্দ আসছে সেখানে—ঘন দেবদারু পাতা সবুজের মধ্যে কাঁপতে-কাঁপতে, কুয়াশায় মাখা—মাঠের চারপাশ জুড়ে ভাসছে—অ—জ—অ—য়! বা—ড়ি—ই অ—আ—য়!

অজয়কে বাড়িতে যেতে ডাকছে বড়দি। অজয় ছুটতে-ছুটতে চলেছে।

অজয় কী বাড়িতেই যাবে? কিন্তু, কোথায় বাড়ি ওর? আর, বড়দি? বাড়ি যাওয়া কী অত সোজা নাকি কারও!

কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল শরীরে। কে জানে কী। একটা ঝাঁঝালো গলা শোনা গেল কাছাকাছি। পিছন থেকেও কার ছুটে আসার শব্দ। সে বলল—আরে, অরে! হাউ স্ট্রেঞ্জ!

সুতনুর গলা।

সুতনু! তুই আছিস তো?

আছি গুরু।

একটু পরেই সে আবার বলল—একটু পায়ের ধুলো দেবে গুরু?

অজয় আরও অনেক কুয়াশার মধ্যে দ্রুত একটা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবি শ্রীঅরবিন্দ

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পর শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরীতে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন সেইখানেই অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন ছিলেন, মাটির ধরণীতে দিব্যজীবন রচনার কর্মে, এই কর্মযোগী ব্রতী হয়েছিলেন। প্রতি বৎসর মাত্র চার বার তিনি লোকলোচনের সামনে হাজির হতেন। দর্শনাভিলাষী ভক্ত মানুষ শুধু তাঁকে দেখত, কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ধরনের নর-নারী আসতেন এই দর্শনটুকুর জন্য এবং মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের নীরব উপস্থিতির আকর্ষণ ছিল এমনই প্রবল, যিনি একবার সেই দিব্যতনু দেখতে পেতেন লুব্ধ হয়ে তিনি বার বার আসতেন। এই রহস্যময় মহাপুরুষের জীবনের অলৌকিক রহস্য আজো অনাবিষ্কৃত।

শ্রীঅরবিন্দের কবিতা প্রসঙ্গে সুন্দর আলোচনা করেছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ। তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'দি পোয়েট্রি অব শ্রীঅরবিন্দ'— মহাযোগীর জীবনের এক স্বল্পালোচিত দিক সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছে। বিশ্বজগৎ শ্রীঅরবিন্দকে বিপ্লবী, রহস্যময় যোগী বলেই জানে, কবি শ্রীঅরবিন্দকে সামান্য সংখ্যকই লোক জানে। ডঃ শিশির-কুমার ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন বিষয়ে সুদীর্ঘকাল সুগভীর অধ্যয়নে ব্রতী। শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে এযাবৎ অজস্র আলোচনা তিনি করেছেন এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবনী ও বাণী অনুধাবন করা সহজ হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে ডঃ শিশিরকুমার তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে শ্রীঅরবিন্দের কাব্য বিচার করেছেন এবং বলাবাহুল্য তাঁর এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কবিতাবলী ইংরাজীতেই রচিত এবং তার সামান্য অংশ বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

লেখক বলেছেন যে শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য রচনায় দুটি বস্তুর মিলন সংঘটিত হয়েছে তিনি একাধারে ঋষি ও ভাষাকার। কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু। কবি অরবিন্দ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে পরিণত বয়সের মধ্যে অজস্র কবিতা, বহুবিধ গীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা করেছেন। সনেট, মুক্তছন্দ, বর্ণনামূলক দীর্ঘ কবিতা, বেদ, উপনিষদ, বৈষ্ণব কবিতা। চিত্তরঞ্জন দাসের সাগর-সঙ্গীতের অনুবাদ ও কালিদাসের কবিতা এবং রামায়ণ ও মহাভারতের আংশিক অনুবাদও করেছেন। পাঁচখানি সম্পূর্ণ নাটক রচনা করেছেন (এর মধ্যে 'বসোরার উজিরেরা' নাটকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)। সাহিত্য সমালোচনা, রাজনৈতিক রচনা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র প্রভৃতি তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে 'দি ফাউন্ডেসন্স অব ইন্ডিয়ান কালচার' নামক বইটি জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের বিশেষ ধরনের উক্তির প্রতিবাদে লিখিত। এছাড়া দি লাইফ ডিভাইন, দি সিনথেসিস অব যোগ, এসেস অন গীতা, দি হিউম্যান সাইকেল, দি আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা শ্রীঅরবিন্দ। আর পরিশেষে প্রকাশিত হয়েছে 'সাবিত্রী'।

শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র জীবনে শুধু এই রচনাকর্মটুকুর জন্যই পৃথিবীখ্যাত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর জীবনের বহু বিচিত্র কর্মধারা এবং বিশেষ করে যোগসাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা-জনিত খ্যাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লেখক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের ভক্তবৃন্দ তাঁর অধ্যাত্মসাধনার আকর্ষণেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে পন্ডিচেরী ছুটেছেন, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার আকর্ষণে এসেছেন অল্প কয়েকজন। এর পিছনে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের ঔদাসীন্য এবং প্রচারবিমুখতাই ছিল দায়ী।

লেখক বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের রচনা-বলীর পরিচয় দিতে গেলে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারেই তা করা বিধেয়। যখন বিদেশে ছিলেন তখন প্রথম যৌবনের উন্মেষে লিখেছেন 'সঙস্ টু মারতিলা' আর 'সাবিত্রী'র অনেকখানি তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছেন অপরে লিখেছেন। যখন তখন বয়স তাঁর আশীর কাছাকাছি।

শ্রীঅরবিন্দ বিদেশে অবস্থানকালে পাশ্চাত্য ক্লাসিকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সঙস্ টু মারতিলা'র শেষাংশে তিনি বিদেশের প্রতি বিদায় জানিয়ে স্বদেশের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

> "For in Sicilian olive-groves no more
> Or seldom must my foot prints now be seen
> Nor tread Athenian lanes, nor yet explore
> Parnassus or thy voiceful shores, O Hippocrene.
> Me from her lotus heaven Saraswati
> Has called to regions of eternal snow
> And Ganges placing to the Southern Sea
> Ganges upon whose shores the flowers of Eden blow"

পাশ্চাত্য ক্লাসিক থেকে তিনি ভারতীয় ক্লাসিকের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এই ক্লাসিক-প্রীতির জন্যই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাস থেকে করেছেন অনুবাদ। দুটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছেন 'উর্বশী' ও 'লভ অ্যান্ড ডেথ' (এই কাব্য-গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ হয়েছে) লিখেছেন। এই দুই কাব্যগ্রন্থেরই বক্তব্য প্রেমের কাছে মৃত্যুর পরাজয়। অনেক বছর পরে রচিত 'সাবিত্রী'র বক্তব্যও এই : প্রেমের বিজয়-কাহিনী। 'লিটারারি জিনিয়াস—এ নোট' নামক পরিচ্ছেদে লেখক এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৯১৭ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিকভাবে "দি ফিউচার পোয়েট্রি" নামক প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। এই প্রবন্ধাবলী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। লেখক বলেছেন, শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ ধারা এই সমালোচনায় পরিস্ফুট [illegible]

কাটানোর উদ্দেশ্যে একটা উন্নত ধরনের খেলার বস্তু নয়, কিম্বা আঙ্গিকের কৌশল নয়—একথা বলেছিলেন এলিয়ট হার্ভাডে। শ্রীঅরবিন্দের মতে—কবিতায় সেই সম্ভাবনা বর্তমান, যার ফলে—

"the discovery of a closer approximation to what we might call the mantra in poetry".

শ্রীঅরবিন্দের কাছে কবিতা এক মন্ত্র। কবিতা প্রার্থনা-গীতি, আবাহনী, ইন্দ্রজাল এবং সর্বোপরি কবিতা হল দিব্যজ্ঞান বা 'দর্শন'।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বক্তব্য সপ্রমাণ করতে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে কবিতার ভূমিকা, বীরগাথা ও রোমান্টিক প্রেম, কয়েকটি উত্তরকালীন কবিতা ও সনেট এবং পরিশেষে 'সাবিত্রী' নামক এক পৃথক পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দের কাব্যভাবনার সামগ্রিক পরিচয়দানের চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর সেই প্রয়াস অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা হিসাবে এই গ্রন্থটির মূল্য অসীম। শ্রীঅরবিন্দ একদা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে 'আমাদের এখনও রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে হবে।' ডঃ ঘোষ বিরচিত এই গ্রন্থ পাঠে এই কথাটিই অন্যভাবে মনে জাগে—"শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।" আর সেই আবিষ্কারের কাজে ডঃ শিশিরকুমার ঘোষের এই গ্রন্থটি এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। —অভয়ংকর

THE POETRY OF SRI AUROBINDO—A short survey by Dr. SISIRKUMAR GHOSH. Published by Chatuskone (P) Ltd., Calcutta—14, Price Rs. 12-50.P.
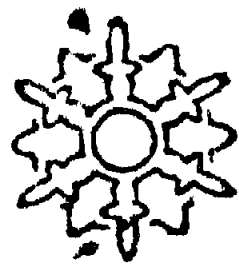
সাহিত্যের খবর

নোভিকোভা সম্মানিত

রুশ সমালোচক ভেরা নোভিকোভা এবছর রবীন্দ্র পুরস্কার পাবেন। কিছুকাল আগে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তাঁর জীবন ও সাহিত্য' রুশ ভাষায় লেখা বইখানি বেরোয়। এই বইটির জন্য তিনি পুরস্কৃত। কোন বিদেশী লেখক রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাননি।

'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তাঁর জীবন ও সাহিত্য'—এই সাম্প্রতিক আলোচনা গ্রন্থে অনেক নতুন কথা বলেছেন শ্রীমতী নোভিকোভা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দী' উপন্যাসের প্রচ্ছদপটের একটি আলোকচিত্রও আছে। প্রচ্ছদের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষর। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা দুশ এবং তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

শ্রীমতী নোভিকোভার নাম বাঙলা দেশে অপরিচিত নয়। বাংলা ভাষায় তাঁর অনুরাগ সুদীর্ঘকালের। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালে পালি এবং সংস্কৃত শেখেন। এসময় রাশিয়ায় একজন নির্বাসিত বাঙালী ছিলেন। তাঁর নাম প্রমথনাথ দত্ত। সাধারণে তিনি দাউদ আলি দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। ইনিই শ্রীমতী নোভিকোভাকে বাংলা ভাষায় আকৃষ্ট করেন। নোভিকোভা মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলা গীতিকাব্যের মাধুর্যে। ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে যান বাংলা ভাষায়।

কিন্তু নিজের দেশে ভাষা শিক্ষাই তাঁকে সম্পূর্ণতা দিল না। চলে এলেন কলকাতায়। পাঁচ বছরের একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখতে থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেশে ফিরে যান। যুদ্ধ শেষ হলে আবার এলেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম-এ হলেন। এসময় তিনি শান্তিনিকেতনেও কিছুকাল পড়াশুনা করেছিলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে লিখলেন থিসিস 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন'। এই বইটির জন্য লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ক্যান্ডিডেট অফ সায়েন্স উপাধিতে সম্মানিত করেন। প্রায় তিরিশ বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী নোভিকোভা গ্রাজুয়েট হন। পঁচিশ বছর এখানে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা করবার পর, এখন ডিপার্টমেন্ট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের প্রধান অধ্যাপিকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর শ্রীমতী নোভিকোভার পঞ্চাশের ওপর বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : উনিশ ও বিশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা, বাংলা কবিতার সংকলন, রুশ বাংলা অভিধান। রবীন্দ্র রচনাবলীর যে নির্বাচিত অনুবাদ তিনি করেছেন, তাও ওদেশে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রুশ ভাষায় লেখা 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইটিতে চর্যাপদ থেকে ক্ষণার বচন, সতের ও আঠার শতকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৩৩তম অধিবেশন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে তমলুক শহরে গত ২৭-৩০ মার্চ। এবারের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রভুতিনাথ চক্রবর্তী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী এবং আরো কয়েকজন সাহিত্যিক বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসেবে অন্নদাশঙ্কর রায় যে ভাষণ দেন তা একালের প্রতিটি সাহিত্যরসিককে ভাবিত করবে বলে মনে হয়। তিনি সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি যুগোপযোগী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"পাঠকের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রত্যেকের আলাদা চুক্তি। পাইকারী চুক্তি শ্রমিকদের বেলায় খাটে, প্রেমিকদের বেলায় নয়। শিল্প বা সাহিত্য একটা প্রেমের ব্যাপার। সাহিত্যকে ভালবেসেই যে সাহিত্যিকের প্রথম যাত্রারম্ভ হয় এবং সমস্ত জীবন ধরে যে চলে তার সাধনা—একথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'বলতে ভালবাসি, লিখতে ভালবাসি, গাইতে ভালবাসি, আঁকতে ভালবাসি, এমনি করেই আমাদের সাধনার হাতেখড়ি হয়। তারপর সারা জীবন চলতে থাকে সে সাধনা। সিদ্ধি জোটে অতি অল্পসংখ্যকের ভাগ্যে। লক্ষ্মী কৃপণ হলেন কিনা, সেটা অবান্তর, সরস্বতী কঠোর হলেন কিনা সেইটেই আসল।" পরিবেশ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিককে তার কাজ করে যেতেই হবে। শ্রীরায় লেখকদের এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরো বলেন যে—"এই ভেবে কাজ করে যেতে হবে যে, আমরা না করলে আর কেউ করবে না, করণীয় কর্ম অকৃত থেকে যাবে। সৃষ্টির ধারায় ছেদ পড়বে। নদীর মাঝখানে চড়া পড়বে। ভাবীকাল এর জন্য আমাদেরই দুষবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমরা চেষ্টা করলেও পারতুম না ঝড়ের রাতে দীপ শিখাটি অনির্বাণ রাখতে।" তাঁর ভাষণের উপসংহারে এসে শ্রীরায় বলেছেন 'চাষীকে দাও চাষ করতে, সাহিত্যিককে দাও সংস্কৃতির ফসল ফলাতে। লড়াই যারা করতে চাও, তারা লড়াই কর। কিন্তু লড়াইতে যারা নেই, তারা যে মজা করে বেহালা বাজাচ্ছে, তা ও নয়। তারা যা নিয়ে আছে তা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় রস আর রূপ। যা না হলে সভ্যতা হয় না, সংস্কৃতি হয় না।' সুতরাং সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্যই সাহিত্যিককে অবিরাম সাধনা করে যেতে হবে। অন্নদাশঙ্করবাবু একালের একজন অন্যতম সমাজসচেতন লেখক। সত্য কথা অপ্রিয় হলেও তিনি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। তাঁর এই সাহসিকতার প্রমাণ পেয়েছি অতীতে অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আলোচনায়। মাত্র কিছুদিন আগেও যুগান্তর পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতার উপর তিনি যে আলোচনা করেন, তাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বর্তমান ভাষণটিও তাঁর স্পষ্ট-

বাদিতা এবং সাহসিক মতবাদ প্রকাশের আর একটি নিদর্শন।

আকাদামি পুরস্কার। এ বছর যাঁরা সাহিত্য আকাদামির পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদেরকে গত ২৯ মার্চ দিল্লীর রবীন্দ্র-ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সেই পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাম্রশাসন সম্বলিত একটি আধার ও তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক এই পুরস্কারের সামগ্রী। এবার যে ষোলজন সাহিত্যিক এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দশজন পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বাংলার মণীন্দ্র রায়, ডঃ নীহার রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাখদুম মহীউদ্দীনের পুরস্কারটি তাঁর বিধবা স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হবে বলে স্থির হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্য আকাদামির স্থায়ী সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। মারাঠি ভাষায় এ বছরে সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ ইরাবতী কার্ভে তাঁর 'যুগান্ত' গ্রন্থটির জন্য। সম্প্রতি এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন পুণার ডেকান কলেজ। গ্রন্থটির কথাবস্তু গ্রহণ করা হয়েছে মহাভারত থেকে। মহাভারতের বিভিন্ন নারী চরিত্র—বিশেষ করে কুন্তী, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীর চরিত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের শেষ পর্বের নাম 'একটি যুগের শেষ'। এই অংশে তিনি মহাভারতের তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত এবং জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করেছেন। যাঁরা মারাঠি জানেন না, তাঁরা এখন ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ পাবেন।

আকাদমি পুরস্কৃত কবি মণীন্দ্র রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয় স্টুডেন্টস হলে ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। উদ্যোক্তা মণীষা গ্রন্থালয়, নবপত্র প্রকাশন, পরিচয় ও সীমান্ত পত্রিকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি গোলাম কুদ্দুস।

মণীষা গ্রন্থালয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ বলেন : "গত কয়েক দশকের প্রগতিশীল কাব্য-আন্দোলনের সংগে মণীন্দ্র রায় জড়িয়ে আছেন। বরাবর ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পাশাপাশি থেকেছেন। এজন্যে আমরা তাঁকে অভি-নন্দন জানাই।" কবি রাম বসু বলেন, মণীন্দ্র রায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সমালোচক। বাংলা সমালোচনার দুষ্ট পরিবেশে তিনিই তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছেন প্রথম যৌবনে। পরিচয় পত্রিকার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান শ্রীধনঞ্জয় দাস। তিনি বলেন : 'মণীন্দ্র রায়ের প্রথম কবিতা বেরোয় পরিচয় পত্রিকায়। তখন থেকে তিনি এই কাগজের সংগে জড়িত। এখনো নানাভাবে জড়িয়ে আছেন প্রগতিশীল আন্দোলনের শরিক হিসেবে।' সীমান্তের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কবি গণেশ বসু বলেন : 'মণীন্দ্র রায় সীমান্তের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা। স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্ক অন্তরের যোগা-যোগে।' কবি তরুণ সান্যাল বলেন : আকা-দমি পুরস্কার একজন কবির পক্ষে চূড়ান্ত মর্যাদার স্মারক নয়। মণীন্দ্র রায়কে সম্বর্ধনা জানানোর অর্থ প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য জানানোর নামান্তর।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ একটি রক্ত পতাকা উপহার দেন। তিনি প্রগতিশীল কাব্য-আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মণীন্দ্র রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সভায় ভাষণ দেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বসু, ধরণী গোস্বামী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মিত্র। মণীন্দ্র রায়ের কবিতা পাঠ করেন সিদ্ধেশ্বর সেন, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দীপক রায়চৌধুরী, সত্য গুহ ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কবিকে এক-গুচ্ছ রক্ত গোলাপ উপহার দেওয়া হয়। তাছাড়া তিনটি মিনি পত্রিকা 'তন্বী' 'এক্স' ও 'মিনি'র পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক উপহার দেন যথাক্রমে খাজিমউদ্দীন আহমদ, জগদীশ বসাক ও কুমারেশ চক্রবর্তী।

সম্বর্ধনার উত্তরে মণীন্দ্র রায় বলেন : 'আমি আপনাদের ভালোবাসায় অভিভূত। চিরকাল মানুষের জন্য লিখে এসেছি। লিখে যাব। আপনাদের ভালোবাসাই আমার কবিতার প্রেরণা।'

নতুন বই

দি রিয়্যাল লাইফ অফ সেবাস্তিয়ান নাইট ভ্লাদিমির নবোকভ বাংলা অনুবাদ—প্রজাপতি জীবন। অনুবাদ—দেবব্রত রেজ। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। দাম—ছ' টাকা।

বহু বিতর্কিত এবং আলোড়ন সৃষ্টি-কারী গ্রন্থ লোলিতার লেখক ভ্লাদিমির নবোকভের উপন্যাস দি রিয়্যাল লাইফ অফ সেবাস্তিয়ান নাইট উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য শুধু বিষয়বস্তুর গুরুত্বেই নয়, শিল্প-নির্মিতির এ এক অপূর্ব নিদর্শন।

খ্যাতিমান লেখক সেবাস্তিয়ান নাইটের মৃত্যু হল। সেবাস্তিয়ানের বৈমাত্রেয় ভাই শুরু করলেন তাঁর জীবনী রচনার কাজ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্ন-ভিন্ন সূত্রগুলি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক হারানো কাহিনী। সুচিত্রিত ডানা মেলে, কোমল দ্যুতি ছড়িয়ে যেন উড়ে বেড়াতে লাগল এক চঞ্চল প্রজাপতি। শেষ পর্যন্ত সেবাস্তিয়ানের রোমান্টিক জীবনী রচনার কাজ শেষ করলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। অথচ কি আশ্চর্য, রচনা শেষ হতে দেখা গেল নায়ক সেবাস্তিয়ান আর জীবনীকার বৈমাত্রেয় ভাই কখন যেন একাত্ম আর অভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

নবোকভ জাতিতে রাশিয়ান। বিপ্লবের ঝড়ে ছিন্নমূল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফরাসী, জার্মান, ইংরাজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য। দি রিয়্যাল লাইফ অফ সেবাস্তিয়ান নাইট তাঁর অন্যতম ইংরাজী রচনা। নবোকভ এক সময় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মের প্রজাপতি বিভাগের কিউরেটর ছিলেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মে বেরিয়ে পড়তেন প্রজাপতির সন্ধানে। তাঁর এই সন্ধান কেবল কর্মজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও তিনি প্রজাপতির সৌন্দর্য অন্বেষণ করেছেন। এই উপন্যাসটিও যেন এক চঞ্চল প্রজাপতির কাহিনী। ক্রমশই এক জটিল অন্বেষণের অরণ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কখন যেন চঞ্চল প্রজাপতির ডানায় নায়ক সেবাস্তিয়ানের মুখ আঁকা হয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে অনুবাদক দেবব্রত রেজের 'প্রজাপতির জীবন' নামকরণ সার্থক হয়েছে।

এই জটিল শিল্পকৃতির ভাষাও খুব সরল নয়। কিন্তু এই জটিলতার অন্তরালে এক করুণ রসাবেগ স্বচ্ছন্দধারায় প্রবহমান। এমন একটি গ্রন্থের অনুবাদ খুব সহজসাধ্য নয়। শ্রীদেবব্রত রেজের কৃতিত্ব—তাঁর অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

রুদ্ধ যাযাবর (উপন্যাস) **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। প্রকাশক-ভবন, কলিকাতা-১২। দাম—আট টাকা পঞ্চাশ পঃ।**

ঐতিহাসিক উপন্যাস অবশ্যই ইতি-হাসাশ্রয়ী হবে। কিন্তু তাতে কল্পনার অবকাশও কম নয়। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস এবং কল্পনার এমন সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে যে বিদগ্ধ পাঠক তা পাঠ করে একদিকে যেমন উপন্যাস পাঠের আনন্দ লাভ করে, অপর দিকে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অনেক অজ্ঞাত দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞানের জগতকে প্রসারিত করতে পারে।

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্যের রুদ্ধ যাযাবর একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস। উইলিয়াম কেরীর বিচিত্র জীবন-কাহিনী বিদগ্ধ পাঠকের কাছে মোটেই অজ্ঞাত নয়। এদেশের মানুষকে শিক্ষায় দীক্ষিত করার ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু কেরী কখনই এদেশের মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারেন নি। সদিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত বিদেশীই ছিলেন। আর তাঁর পুত্র

বইকুণ্ঠের খাতা

বাংলা বইয়ের প্রচার ও উপহারের বই

বাংলাদেশে বইপড়ার আন্দোলন হয়েছে দু'একবার।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এককালে বই উপহার দেবার আবেদন জানিয়েছিলেন শিক্ষিত মানুষের কাছে। এখনো লিটল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে ছাপা হয় 'আরো বই পড়ুন' 'তরুণ গল্পলেখকদের বই কিনুন' 'কবিতার বই পড়ুন' ইত্যাদি শিরোনামাঙ্কিত করুণ আবেদন। 'করুণ'—কেননা পাঠকের কাছে এইসব আবেদন বেশির ভাগ সময়েই অর্থহীন, অবিশ্বাস্য, আবেগহীন বলে মনে হয়।

বছর কয়েক আগে কবিতাকে পপুলার করার জন্য হয়ে গেছে 'কবিতা মেলা'। পরে 'কবিমেলা' নামে একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান তৈরীর পরিকল্পনা হয়েছিল বোটানিক্যালের গাছের ছায়ায়। হয়ে গেছে 'সাহিত্য মেলা' 'নাট্যমেলা' 'নাট্যোৎসব' ইত্যাদি। কেউবা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক কাগজ করে লেখা ও লেখক সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। কেউ কেউ ভেবেছেন সভা, সমিতি, পাঠাগার, সাহিত্যের আলোচনা, সমালোচনা করে পাঠক তৈরীর কথা। হয়ে গেছে কবিতার লং-প্লেয়িং রেকর্ড, বিভিন্ন কবির জন্মদিনে পোস্টকার্ড সংকলনের প্রকাশ।

কিন্তু কার্যত ব্যর্থ হয়েছে সবই। যথেষ্ট সুফল প্রসব করেনি কোনো প্রয়াস।

পর্যবেক্ষকের মতে, এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ উদ্যোক্তাদের অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও দল-উপদলের কোন্দল। যে-পরিমাণ উদারতা ও বাস্তবজ্ঞান থাকলে এ জাতীয় আন্দোলন সার্থক হতে পারে, সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন না কেউ-ই। সূচনাকালের মহৎ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার কারণ হয়ে উঠলে আগ্রহ থাকে না কারুর।

প্রথমত, লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে 'আরো বই পড়ুন' বিজ্ঞপ্তির সমর্থনে সাধারণত যে-সব গল্প-উপন্যাসের তালিকা পেশ করা হয়, তার মধ্যে সার্বজনীনতার নামগন্ধ থাকে না এতটুকু। ঘনিষ্ঠ মহলের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, নতুন লেখক-লেখিকাদের বই সাধারণত বড় প্রকাশকরা ছাপেন না বা ছাপতে চান না। গাঁটের কড়ি গুনে কেউ বই ছাপলেও উপযুক্ত পরিবেশনের ব্যবস্থা করে ওঠা যায় না অনেক সময়। ফলে, পাঠকের হাতে সে বই পৌঁছয় না কোনদিনই।

তৃতীয়ত, দোকানে দোকানে কিংবা ফুটপাথের স্টলে বই ধারে দিয়ে এলে তার দাম আদায় করতে রীতিমতো হিমসিম খান অনেকেই। বই বিক্রী হলেও টাকা দিতে চান না কিছুতেই। অবশ্য ব্যবসায়ীরা সেই টাকা আত্মসাৎ করেন সচেতনভাবে।

চতুর্থত, নির্ভীক, নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাবে পাঠকরা বারবার প্রতারিত হয়েছেন বই কিনে। এখন আর কেউ পত্র-পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসায় বিশ্বাস করেন না। ফলে, লেখক সম্পর্কে ধারণা তৈরী হতেও পাঠকের অনেক সময় লেগে যায়।

এইসব প্রাথমিক মৌলবিপত্তি ছাড়াও আছে বই কেনার কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা। আছে লেখকের সঙ্গে পাঠকের অপরিচয়ের ব্যবধান, চিন্তা-বিনিময়ের অসহযোগিতামূলক পার্থক্য। পরীক্ষামূলক গল্প-উপন্যাসকে সহজে স্বীকার করে নিতে চান না সাধারণ পাঠক।

সাময়িকপত্রে সম্পূর্ণ উপন্যাস—

গত কয়েক বছর ধরে সিনেমা ও যৌন-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি নিয়মিত প্রতিসংখ্যায় কোন না কোন লেখকের সম্পূর্ণ উপন্যাস ছেপে আসছেন। বড় ধরনের পত্রিকাগুলিতেও ঐ একই প্রবণতা সঞ্চারিত হয়েছে ইদানীং। রহস্য-রোমাঞ্চের পত্রিকাগুলিও সম্পূর্ণ উপন্যাস ছাপার পক্ষপাতী। ফলে, বই বেরোবার আগেই পড়ার সুযোগ পেয়ে যান অনেক পাঠক। কেউ কেউ বই না কিনে পত্রিকা বাঁধিয়ে রাখেন দ্বিতীয়বার পড়ার জন্যে।

সারা বছরে প্রকাশকরা যেসব উপন্যাস বের করেন, তার বেশীর ভাগই লেখা হয় পুজোর সময়। ছাপা হয় কোনো না কোনো শারদীয়া সংখ্যায়। অন্য পত্রিকার কথা বাদ দিলেও কেবল অমৃত, যুগান্তর, দেশ, আনন্দবাজার, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীতে উপন্যাস বেরোয় অন্তত এক ডজন। সিনেমা পত্রিকাগুলি সকলকে টেক্কা দিয়ে উপন্যাস ছাপেন পাইকারী হিসাবে।

অথচ লেখকদেরও উপায় থাকে না। এককালীন কিছু টাকা পাওয়ার প্রলোভনে তাঁরা লেখেন 'সম্পূর্ণ উপন্যাস'।

আমাদের পাড়ায় ছেলেদের একটি লাইব্রেরী আছে। স্কুলকলেজের ছেলেরা ওর সদস্য। স্বভাবতই দামী বই কেনার সামর্থ্য নেই। সস্তা দামের রহস্য, রোমাঞ্চ, ডিটেকটিভ গল্পের বই ছাড়া অন্য বই বড় একটা কিনতে দেখিনি ওদের। প্রতি বছর যাবতীয় শারদীয়া সংখ্যা কেনে নিজেদের সামর্থ্য ও প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে। পাড়ার কয়েকজন মহিলা আছেন ওদের সদস্য। ছেলেরা হিসেব করে দেখিয়েছে, পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ করে শারদীয়া সংখ্যা কিনতে পারলে ওরা যতগুলি উপন্যাস পড়ার সুযোগ পায়, বই আকারে কিনতে গেলে ওদের খরচ হতো তার সাত-আট গুণ।

বড় উপন্যাস—

অবশ্য এইটা সামগ্রিক চিত্র নয়। উল্লেখযোগ্য বই পেলে অনেকেই সংগ্রহ করে রাখতে চান ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক লাইব্রেরীর সম্পদ হিসেবে। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না অনেকের। সম্প্রতি প্রকাশিত খান-দুই মার্কা চাউস উপন্যাসগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যায় যেমন বিপুলায়তন, তেমনি দামের দিক থেকে মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়-সীমার বাইরে। মাস দুয়েক আগে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জনৈক ঔপন্যাসিকের একটি উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : 'আমি হলে বইটির দু'হাজার পৃষ্ঠার বিষয়কে দু'শ পৃষ্ঠার বেশী লিখতে পারতাম না।'

প্রকাশক বলেন : বই বড় হলে বিজ্ঞাপন দিতে সুবিধা হয়। কুড়ি পঁচিশ টাকার একটা বইয়ের জন্যে যতখানি স্পেস নিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, অল্প দামের বইয়ের ক্ষেত্রে ততখানি সম্ভব হয় না। তার ওপরে বেশী দামের পাঁচটা বই বিক্রী করে যে-টাকা রিটার্ণ আসে, অল্প দামের পঁচিশটা বইতেও তত টাকা রিটার্ণ আসে না।

ফলে, অনেক সময় লেখক সংযমবোধ হারিয়ে ফেলেন। অতি-কথনের মোহ তাকে বেসামাল করে। আমি এমন একজন ঔপন্যাসিককে জানি, যিনি প্রকাশকের অনুরোধে তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন

করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেবল কনেবর বুদ্ধির জন্যই।

পাঠকের অবস্থা জানি না। হয়তো ধৈর্যশীল পাঠক কয়েক সপ্তাহের অবিরাম অধ্যয়নে একেকটি উপন্যাসকে নিত্যসংগী করে তুলতে পারেন। কিন্তু অসুবিধা হয় ক্রেতার দিক থেকে। নিম্নবিত্ত পাঠক-পাঠিকারা কোনোদিনই এ জাতীয় বই কিনে পড়বার কথা ভাবতেও পারেন না। 'আরো বই পড়ুন' আবেদনের প্রথম প্রতিবাদ হলো এইসব বৃহদায়তন উপন্যাস।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ জাতীয় বইয়ের প্রধান ক্রেতা হলো পাবলিক লাইব্রেরীগুলো। স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীতেও কিছু কিছু বই বিক্রী হয়। সাধারণ ক্রেতা প্রায় নেই-ই। দশ-বারো টাকা দামের উপন্যাস হলে কেউ কেউ বিয়ে-বউভাতে উপহার দেয়ার জন্যে দু-এক কপি কিনে থাকেন।

প্রকাশকের অভিমত—

বইপাড়ার প্রকাশকেরা বলেন : গল্প-উপন্যাসের চাহিদা কমেছে দুটো কারণে : প্রথমত, পাক-ভারত যুদ্ধ, দ্বিতীয়ত লাইব্রেরীগুলোতে সরকারী সাহায্যের ঘাটতি। ওঁরা মনে করেন আন্দোলন করে বিশেষ পাঠকসংখ্যা বাড়ে নি। পাকিস্তানের সংগে বইয়ের ব্যবসা চলতে থাকলে বিদেশী মুদ্রাও আসতো। উপকৃত হতেন পশ্চিমবাংলার লেখক ও প্রকাশকেরা। তার উপরে সরকারী তহবিলের টানাটানিতে লাইব্রেরী প্রায় বন্ধ হয়েছে। বই কিনছে না সরকারী পাঠাগারগুলো। প্রকাশকেরা অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে দু একটা নতুন বই ছাপেন। সস্তা রোমান্টিক প্রেমের গল্প, রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস, [illegible] ছাপা হয় সাধারণ পাঠকের জন্যে। এইসব বই নাকি প্রকাশকদের টিকে থাকতে সাহায্য করছে।

উপহারের বই—

এ বছর আমি দুটো বিয়ে এবং বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। একটি বিয়েতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিলেন শ দুয়েক নর-নারী। উপহার দিয়েছেন শ দুই মানুষ। সাধারণত আমি বিয়েবাড়িতে গিয়েও স্বভাব-সংকোচের জন্যই হোক, কিম্বা অন্য কোনো দুর্বলতার জন্য হোক, কনের ঘরে ঢুকি না। সেদিন কৌতূহল হয়েছিল মনে পড়লো : জনৈক প্রকাশক দুঃখ করে বলেছিলেন, আজকাল বই উপহার দেবার রীতি ক্রম-অপসৃয়মান। বিয়ের মোসুমে আগের মতো গল্প-উপন্যাস বিক্রী হয় না।

দেখলাম, অভিযোগটা মিথ্যে নয়। ঐ বিয়েতে বই উপহার দিয়েছেন ছাব্বিশ জন। মনে হয়, বই উপহার দেবার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করেন অনেকে। তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ভ্যানিটি ব্যাগ, চামড়ার সুটকেস, ইলেকট্রিক হিটার, টি-সেট, টেবিললাম্প, শাড়ী, গয়না, প্রেস্টিজ কুকার ইত্যাদি। সিঁদুর কৌটো আর গয়নার বাক্স দেবার সাবেকী ঝোঁকটা এখন কমে যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা কয়েকজন মিলে যৌথ উপহার দেন সোফাসেট, সিলিং ফ্যান, সেলাই কল ডাইনিং টেবল ইত্যাদি। বর কিংবা কনের নিকট-আত্মীয়েরা কেউ বই উপহার দেন না। এখন বই উপহার দেন দূর-সম্পর্কিত নিমন্ত্রিতেরা কিংবা নিরুপায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এবং উটকো নিমন্ত্রিতের দল।

সম্ভবত বিয়েবাড়ীর তীব্র আলো, ফুলের গন্ধ, স্নো-পাউডারের সুবাস, অগুরুর তীব্র গন্ধের সংগে লুচি, পোলাও, মাংসের লোভনীয় গন্ধ, ছেলে-বুড়োর হাসিঠাট্টা, কোলাহল, মেয়েদের শাড়ীর খসখসানি, মৃদু ও তীব্র হাসির বিচিত্র সমাবেশ, রসিকতা প্রভৃতি এমন একটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে 'বই হাতে প্রবেশ' বুঝি অনাটকীয় ব্যাপার বলে ভ্রম হয়।

তবু আর্থিক অনটনের জন্য হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, অনেকে এমন সব বই উপহার দেন যা প্রচ্ছদ বৈচিত্র্যে বিয়েবাড়ীর উপযোগী হলেও পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। সব চাইতে বেশী উপহার পাওয়া যায় 'নারীর মূল্য' 'বিয়ের ফুল' 'ফুলশয্যার রাত' 'সংসার' 'পূর্ণিমা' জাতীয় জমকালো প্রচ্ছদশোভিত রঙ-বেরঙের নানারকম বই।

বাজারে এ জাতীয় বই-ই 'উপহারের বই' নামে পরিচিত। আজকাল ফুটপাতে, স্টেশনারী দোকানে, পাড়ার বুকস্টলে, ইকার্স কর্ণারে এ জাতীয় উপন্যাস বিক্রী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। কমিশনও ভালো। চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমিশনে বিক্রী করেন বিক্রেতারা। উপহারদাতারা উৎকট আকর্ষণে ও সস্তা দামের প্রলোভনে তা কেনেন। একবার ভেবেও দেখেন না, বিয়ে-বাড়ীর আলো নিভে গেলে, পরের দিন সূর্যোদয়ে সে বই পড়া যাবে কিনা। বই সম্পর্কে সামান্যতম মর্যাদা থাকলে কেউ এ ধরনের উপহার দিতে পারেন না।

রুচিশীল উপহারদাতা—

অবশ্য ভালো বই যে কেউ উপহার দেন না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেউ কেউ উপহার দেন রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' 'ঘরে-বাইরে' 'গীতাঞ্জলি' 'শেষের কবিতা' কিংবা নজরুলের 'সঞ্চিতা' 'অগ্নিবীণা' সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' 'সুকান্ত সমগ্র', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' গোর্কি'র 'মা' প্রভৃতি বই। কেউবা উপহার দেন আধুনিক কোনো 'গল্পসংকলন' 'কবিতা সংকলন' কিংবা সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' জাতীয় দুটো চারটে বই।

অবশ্য বর-কনের বিদ্যাবুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে কেউ কেউ গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তর-তম করেন। মোটামুটি উচ্চ-শিক্ষিত পাত্রপাত্রী হলে উপহারদাতারা ইংরেজী বইয়ের বাজারটাও ঘুরে দেখেন। সমরসেট মম, ও মোপাসাঁর দু-একটা চমকপ্রদ উপন্যাস কিংবা শেকসপীয়ারের কমপ্লিট ওয়ার্কস প্রায়ই দেখা যায় উপহারের তালিকায়।

তবু বাংলা বইয়ের বাজার ভালো নয়। গল্প-উপন্যাস-কাব্যগ্রন্থের চাহিদা তুলনামূলক ভাবে নিম্নগামী। দিনের পর দিন শিক্ষিতের হার বাড়ছে, কিন্তু বইয়ের চাহিদা তেমন বাড়ছে না। আমি নিজের বই উপহার দিতে দেখেছি খুব কম কবি-সাহিত্যিককে। অনেকে বন্ধু-বান্ধবের বই উপহার দিতে চান না বা দেন না। প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত নিজেদের বই বিয়ে কিংবা বউভাতে উপহার দিতে সংকোচ বোধ করেন। এই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারলে হয়তো বইয়ের চাহিদা কিছুটা বাড়তো। এখন সময় এসেছে একটি সংকল্প নেবার যে, আমরা বিয়ে, বৌভাত, কিংবা জন্মদিনে বই ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেবো না। কেবল গল্প-উপন্যাস নয়, কবিতা প্রবন্ধ-নিবন্ধের বইও উপহার দেবো। সব সময় জনপ্রিয় লেখকদের বই নয়, তরুণ কবিসাহিত্যিকদের বইও কিনবো তাহলে হয়তো সংকটের আংশিক সুরাহা হয়। যাঁরা আমাদের সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখছেন, সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করছেন, তাঁদের কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না। পাঠকের উপেক্ষায় যেন তাঁরা নিরুদ্যম না হয়ে পড়েন, সৃজনশীলতায় ভাঁটা না পড়ে। যারা আমাদের মনের স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখছেন, তাঁদের কথাটা পাঠককে অবশ্যই ভাবতে হবে।

—গ্রন্থদর্শী

ওদের কথায় বালকের মত হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর ওরা যেই চলে গেল—সন্তর্পণে ঢুকে ঝোপের ভিতর বসে গেল। চুপচাপ ঝোপের ভিতর বসে মটকিলার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে থাকল। কত দিন যেন দাঁত মাজেন নি, কতকাল সব ভুলে বসেছিলেন যেন--তিনি মুখের দুর্গন্ধ দূর করার নিমিত্ত দাঁত ঘসে-ঘসে সাদা করে তুলছেন। আবেদালি উঠে আসছিল গামে, সে দেখল ঝোপের ভিতর পাগল ঠাকুর। সে বলল, কর্তা বাড়ি যান। আসমানের অবস্থা ভাল-না।

মণীন্দ্রনাথ ঝোপের ভিতর থেকে আবেদালির কথা শুনেও হাসল। যেন ওরা আমাকে ধরতে পারছে না, আমি ঝোপের ভিতর লুকোচুরি খেলছি—কি যে বলি মানুষেরা, আমি যে স্বপ্ন দেখি—কে আছে আর নিশিদিন কাঁদে! সেই দুর্গের মতো বাড়িতে কে কাঁদে! তিনি ঝোপের ভিতর বসে কেউ কোথাও কাঁদছে কিনা শোনার চেষ্টা করলেন। তখন মুসলমান বিবিরা শালুক তুলে বাড়ি ফিরছিল। ওরা ঝোপের ভিতর খচ-খচ শব্দ শুনে উঁকি দিল। শিশুর মত পাগল ঠাকুর ঝোপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন অন্বেষণ করছেন। বিবিরা বলল, কর্তাগ বাড়ি যান। মা-ঠাইরেন চিন্তা করব—আসমান বড় টান-টান ধরছে।

আবেদালি বাড়ি উঠে ভাবল—কর্তারে ধৈরা নিয়া গ্যালে হয়। কিন্তু বড়ো ঠাকুরুণ শশীবালার কথা মনে করে কেমন
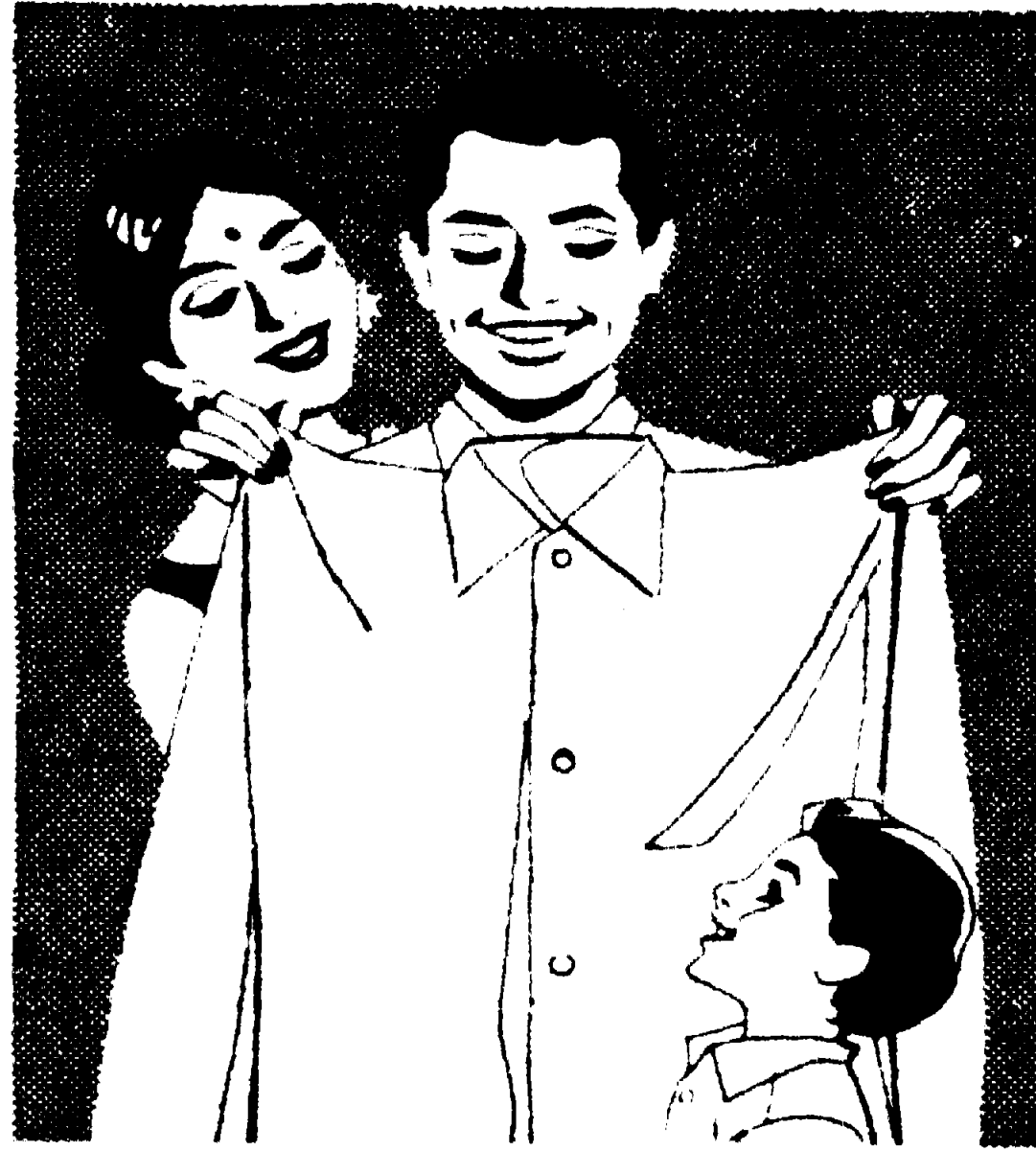
সংকোচিত হয়ে গেল। যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, যদি বলেন, তুই ক্যান অরে ধৈরা আনলি। আবার অরে সান করান লাগব। এই সব ভেবে উঠে সে আর দাঁড়াল না। সে চন্দদের নৌকায় কাজ করে। নদীতে নৌকা থাকে। ক'দিন পর বাড়ি ফিরেছে—ক্লান্ত এবং অবসন্ন। তবু কি এক কষ্টের কথা ভেবে আসমানের দিকে তাকিয়ে ওর ডর ধরে গেল। ঝড়-জল আসমান ফেটে নেমে মানুষটা ভিজে-ভিজে মরে যাবে। সে মাঠে নেমে গেল। এবং সোনালি বালির নদীর চরে ঈশমের ছই, সে ছইয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। ঈশমকে খবরটা দিয়ে ঘরে ফিরবে।

ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা দেখে মাঠ থেকে মানুষেরা গ্রামে উঠে গেল। গরু-বাছুর নিয়ে গৃহস্থেরা ফিরে এল বাড়ি। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে, শিলাবৃষ্টি হতে পারে আকাশটা ক্রমে কালো হয়ে গেল। দুটো-একটা শাদা বক ইতস্তত উড়ে-উড়ে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছিল। খুব থমথমে ভাব। গাছপালা একটা নড়ছে না। মুসলমান গ্রামে মোরগেরা ডাকতে থাকল। যত আকাশ কালো হচ্ছে, যত এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মণীন্দ্রনাথ তত উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। কি উল্লাস, কি উল্লাস! তিনি যেন ঘুরে-ফিরে নাচছিলেন। তিনি যেন আকাশ দেখে, পাগলপারা আকাশ দেখে যেমন খুশী হলে তালি বাজান, ভুবনময় তালি বাজে—তিনি নেচে-নেচে তালি বাজাতে থাকলেন। টুপটাপ বৃষ্টি, গাছপাতা ভিজে যাচ্ছে। গরম মাথা শক্ত হয়ে যাচ্ছে—এই টুপটাপ বৃষ্টি, আকাশের ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব ওকে সামান্য সহজ করে তুলছিল। কিন্তু এক্ষুনি শচি আসতে পারে, চন্দ্রনাথ আসতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি দেখে তিনি কোথায় আছেন—তিনি যে এখানে আছেন কেউ তো জানে না। বড়বো তুমি জান না, আমি কোথায় আছি তুমি জান না—আমি এখানে আছি, এই ভেবে ওরা এসে আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের মত গাছটায় কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে ভাবতেই তিনি কাপড়ের আঁচলে গাছের ডালে নানা রকমের গিঁট দিতে থাকলেন। ঝড়ে ওঁকে ঠেলতে পারবে না, গ্রামের মানুষেরা ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি কাপড়টা গোটা খুলে গাছের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন।

টোডারবাগ থেকে নেমে আবেদালি সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। বাড়ির কাজ ফেলে, নামাজ ফেলে সে ঈশমের জন্য নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। ছইয়ের নিচে কোন লণ্ঠন জ্বলতে দেখল না। সে আলে দাঁড়িয়ে ডাকল, অঃ ঈশম চাচা আছেন নাকি? বৃষ্টি পড়ায় আবেদালির শরীর ভিজে উঠছে। ঠান্ডা হাওয়ার জন্য শীত করছে। সুতরাং সে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। সে নিজের গাঁয়ে ফিরে ঘরে ওঠার মুখে ডাকল, জব্বরের মা আমি আইছি। দরজা খোল। অথচ কোন সাড়া না পেয়ে সে কেমন ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে ডাকল, তরা মইরা আছস নাকি!

বৃষ্টির শব্দের জনাই হোক অথবা অন্য কোন কারণে—জব্বর দরজা খুলতে দেরী করছে। আবেদালি বারবার ঝাঁপের দরজায় ধক্কা মারতে থাকল। জব্বর দরজা খুললে সে কেমন পাগলের মত চিৎকার করে বলল, তর মায় কৈরে?

—মায় গ্যাছে সামুগ বাড়ি।

—ক্যান গ্যাল! আবেদালি তফন দিয়ে শরীর মুখ মুছল।

—সামুগ বাড়িতে জালসা আছে।

আবেদালি তিন-চারদিন পর বাড়ি ফিরছে। সুতরাং গ্রামের কোথায় কি হচ্ছে জানার কথা নয়। আবেদালি চন্দদের বড় নৌকা নিয়ে নারাণগঞ্জে সওদা করতে গিয়েছিল। নদির বাজারে চন্দদের মুদের দোকান। আবেদালি চন্দদের বড় নৌকার মাঝি। ঘরে বসে সে কেমন শান্তি পাচ্ছিল না। ওর মনটা কেবল খচখচ করছে। এখনও হয়ত বড়কর্তা ঝোপে বসে আছেন। বাড়ির মানুষেরা মানুষটার জন্য ভাবছে। হয়ত কেউ কেউ খুঁজতে বের হয়ে গেছে। সে এবার ছেলের দিকে তাকাল—বলল, জব্বর, একটা কাম করবি বাজান।

জব্বর কেমন ঝাঁঝের গলায় বলল, কারণ এখন কত কথা এই বয়স্ক মানুষটা তাকে বলতে পারে, যাও মাঠে খেড় তুইলা আন। পানিতে ভিজ্যা গেলে গরুতে খাইব না।—কি করতে কন!

প্রথম ভাবল বিবির কথা বলবে। সে এসেছে—কোথায় বিবি এসে তাকে এখন খানাপিনার তাগিদ মর্জি মোতাবেক কিছু কথাবার্তা—তা না জালসায় পরাণ খুইলা দিছে। সে বিরক্ত হয়ে বলল, তর মায়রে ডাক দিবি।

—আর কি অখন আইব?

—আইব না ক্যানরে! তিনদিন ধৈরা লাগি বাইছি—এই জানডার লাগি তর মায়া-মমতা নাইরে!

—আর বেশীদিন কষ্ট করতে হৈব না বাজান।

এমন কথায় আবেদালি কি যেন টের পেয়ে বলল, হ চুপ কর।

জব্বর চুপ করে ছেঁড়া মাদুরটার এক পাশে বসে থাকল। সহসা বলল, হুকা খাইবেন বাজান?

আবেদালি বুঝল জব্বরও এ-সময় একটু হুকা খেতে চায়। মনটাতে খোস-মেজাজ এনে দেবার জন্য বলল, সাজা।

জব্বর হুকা সাজল। বাপকে দিল। তারপর নিজেও দুটান দিয়ে বলল, আপনে নামাজ পড়েন, আমি ভাতটা বাড়তাছি।

—নামাজ পরমু না। আবেদালি এবার উঠল। বৃষ্টির জলে বদনা ভরল। এবং হাতে মুখে জল দিল। বাইরে জোর বর্ষণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে আকাশটা চিরে যাচ্ছে। যেন কে মাঝে মাঝে আসমানের গায় স্বর্ণ-লতা ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে—ফালা ফালা আকাশে গর্জন উঠছিল—আবেদালির ঘরটা যেন পড়ে যাবে। শনের চাল—পচে গেছে। টুই দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। পাটকাঠির বেড়া পচে গেছে। বাঁশের উপর ছেঁড়া পাটি এবং কাঁথা বালিশ, নিচে ছেঁড়া চাটাই। আবেদালি ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর খেতে বসল। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া দিচ্ছে, মাদার গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। আবেদালি ডাকল, অ—জব্বর! জব্বর! খুব ধীরে এবং সোহাগের গলায় ডাকল।

—কিছু কন আমারে!

—একটা কাম করতে নারস

—কি কাম?

—তুই একবার বাজান ঠাকুরবাড়িতে গিয়া কবি বড়কর্তা সোনালি বালির নদীর চরে অর্জুন গাছটার নিচে বইসা আছে। বাড়ির বড় কর্তা বড়কর্তারে—যা একবার গিয়া কর্তার বাড়িতে খবর দে।

আমি পারমু না বাজান। আমারে অন্য কামের কথা কন।

আবেদালি এবার খাবার ফেলে উঠে পড়ল। সে জব্বরের মুখের সামনে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—যেন সে জব্বরকে মেরেই ফেলবে—পাটা পিঠের কাছে নিয়ে কি ভেবে সরিয়ে আনল। বলল, হারামের পো হারামি তুমি আমার বাপজান। তোমার কথায় আমি চলমু।

জব্বর তেমনি মাথা নিচু করে বসে থাকল।—আমারে অন্য কামের কথা কন। সে যেন কি স্থির করে রেখেছে মনে-মনে। সুখে এবং স্বচ্ছন্দে দিন যায় না—বাপ তার কত দিন পর ঘরে ফিরে এসেছে। এসে কোথায় মিষ্টি কথা বলবে—তা না কেবল খ্যাক-খ্যাক করছে খাটাশের মত। সে ভিতরে-ভিতরে এতক্ষণ যা প্রকাশ করতে চাইছিল

না, বাপের মর্জি দেখে, বাপের এই নিষ্ঠুর চেহারা দেখে মরিয়া হয়ে উঠল—যেন বাপ ফের বললে সে মুখের উপর বলেই দেবে।

—কি যাবি না!

—না। আমারে অন্য কামের কথা কন।

—তা হৈলে আমার কথা থাকব না।

—না।

—ক্যাছন, কি হৈ-চৈ! আবেদালি এবার স্বর নামাল।

—আমি লীগে নাম লেখাইছি।

—ত হৈছে ডা কি! হৈছেডা কি ক। নাম লেখাইয়া বাপজানের কোরানশরীপ শুদ্ধ কৈ-রা দিছ!

—কি হৈব আবার। হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।

—জ্বালসাতে বুঝি এডা ই হৈতাছে। জব্বর এবার চুপ করে থাকল।

বাপ বেটা এবার দুজনেই চুপ। আবেদালি ফের খেতে বসে গেল। মাথা নিচু করে খেতে বসে গেল। ঝালে—কি ছেলের কথায় চোখ ছল-ছল করছে বোঝা যাচ্ছে না। সে চোখের এই দুঃখটুকু সামলা-বার জন্য জল খেতে থাকল। তারপর খুব ধীরে-ধীরে যেন অনেক দূর থেকে বলার মত বলল, বড় কর্তা পানিতে ভিজতাছে, তুই না গেলে আমি যামু। আবেদালি বদনার নল মুখে পুরে দিল এবং হাঁসের মত কোৎ করে জলটা যেন গিলে ফেলল। তারপর বাকি জলটা মুখে-রেখে অনেকক্ষণ কুলকুচা করল। দাঁতের ফাঁকে যা কিছু ভোজ্য দ্রব্য—সমান-সমান অংশে দাঁতের ফাঁকে লেগে আছে—সে জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে বাকি খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে-নিতে কেমন নিষ্ঠুর চোখে ফের জব্বরের দিকে তাকাল। বলল, তুমি আমার ভাত পাইবা না, কাইল থাইক্যা তোমার ভাত বন্ধ। আবেদালি মরিয়া হয়ে উঠল। পুত্রের এমন সম্মান-অসম্মানবোধ ওর ভাল লাগল না। তিন দিনের পরিশ্রমে এবং এ-সময়ে ঘরে বিবির অনুপস্থিতি ওকে পাগল করে দিল। একবার ইচ্ছা হল ঘরের কোণ থেকে সড়কিটা নিয়ে পেটে একটা খোঁচা মারে—কিন্তু কি ভেবে সে বলল, আল্লা দ্যাশে এডা কি শুরু হৈল!

আবেদালির কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে কিছু জল গড়িয়ে পড়ল। কুপির আলোতে আবেদালির মুখ ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ঢাকায় রায়ট লেগেছে—এ-সব কথা কেন জানি বার-বার মনে পড়ছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই জবাই হচ্ছে। সব কচুকাটা। মুসলমান জবাই হলেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে—কিন্তু বড় কর্তা ধন কর্তার এবং পাশের গ্রামের অন্যান্য অনেক হিন্দুর উদারতা, পুরুষানুক্রমের আত্মীয় সম্পর্ক সব দুঃখ, উত্তেজনা মুছে দেয়। দরজার ভিতর থেকেই হাত বাড়াল আবেদালি। একটা মাথলা মাথায় [illegible] অন্ধকার পথে নেমে গেল।

শচী হাঁটছিল। আগে ঈশম যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে, সংসারে যে নানা রকমের দুঃখ জেগে থাকে—এই যে বড় কর্তা বিকেল থেকে নিরুদ্দেশে চলে গেল—কৈ গেল—ঝড়ে জলে এখন কোথায় আছে—এসব বলছিল।—শত্রুর য্যান এমন না হয়! অশান্তি, অশান্তি! মারা গ্যালে—অ ভাবতাম, গ্যাছে। কতকাল এই দেখতে হৈব ঈশ্বর জানে।

শচী এই ঝড় বৃষ্টিতে এবং শীতের হাওয়ায় কাঁপতে থাকল। ঈশমও শীতে কাঁপছে। ঝড় জলের ভিতর ওরা দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছিল। ওরা অনেকগুলি জমি অতিক্রম করে মুসলমান পাড়ার ভিতর ঢুকতেই দেখল, ইসমতালির বড় ছেলে মনজুর বারান্দায় বসে আছে। সামনে কোরাণ শরিফ—উপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা লণ্ঠন। ঝড় জল কমে গেছে। সে যেমন সাঁজ হলে রোজ পড়তে বসে তেমনি পড়তে বসার সময় দেখেছে—ঝড় জলে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। সে গরুগুলি গোয়ালে তুলে, হাঁসগুলি খোঁয়ারে রেখে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে-ছিল। ঝড় জল আসতেই দরজা জানালা খুলে দিয়েছে। আকাশ তেমন গর্জন করছে না। সুতরাং সে পা দুটো ভাঁজ করে অনেকটা নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে বসার সময় দেখল লাউমাচানে আলো এসে পড়ছে। তারপর আলোটা বাড়ির দিকে উঠে এলে দেখল—ঠাকুরবাড়ির ছোট কর্তা—শচী ঠাকুর। সঙ্গে ঈশম। ওরা এত রাতে—এ-পাড়ার! সে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বলল, কর্তা এই ম্যাঘলা দিনে বাইর হৈছেন।

—বড়দারে দ্যাখছস এদিকে?

—না গ কর্তা। তাইনত আইজ ইদিকে আসে নাই।

মনজুর হ্যারিকেনটা হাতে নিল। বলল, আপনে বসেন। আমরা পাড়টা খুইজ্জা দ্যাখতাছি।

শচী বলল, তুই আবার এই বৃষ্টিতে যাবি কি করতে। সকলে কষ্ট কৈরা লাভ নাই। বলে হাঁটতে থাকল। মনজুর কোন কথা বলল না। শুধু সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে থাকল। এ-সময় গ্রামে কিছু কুকুর ডেকে উঠল। ফেলুর বাড়িটা বাঁশঝাড়ের নিচে অন্ধকারে ডুবে আছে। শচীর ইচ্ছা হল বলতে, ফেলু কি হাইরা গ্যাছে। ফেলুর বাড়িতে এত অন্ধকার। কুপি জ্বালাইয়া অর বিবিটাত নলীতে সুতা ভরে! আইজ সারাশব্দ পাই না ক্যান। কিন্তু বলতে পারল না। কুল গাছে ফুলের গন্ধ। বৃষ্টি এবং ঝড়ের জন্য কিছু ফুল মাটিতে পড়ে আছে। শচী এ-সব মাড়িয়ে সহসা দেখতে পেল বড় রকমের একটা আলো—লাইট

জ্বলছে সামুদের বাড়ি। বড় টিন কাঠের ঘর, চওড়া বারান্দা, মুলি বাঁশের বেড়া, এবং ঠিক দরজার মুখে বাঁশে আলোটা জ্বলছে। সামনে সামিয়ানা টাঙানো ছিল, খুলে ফেলা হয়েছে। ঝড় জল একেবারে থেমে গেলে ফের শামিয়ানা টাঙানো হবে। এখন লোকগুলো ঘরে, বারান্দায় এবং বৈঠকখানায় গিজ-গিজ করছে। অন্ধকার গ্রামে সহসা এই আলো শচীকে বিস্মিত করল।

মনজুর যেন টের পেয়ে গেছে। কর্তার মনে সংশয়। কর্তা কি যেন ভাবছেন। সে বলল, খুলেই বলল, জালসা কর্তা। শুনছি ইখানে সামসুদ্দিন লীগের একটা অফিস খুলব। ঢাকা থাইকা আইসা সামু আমাগ লীগের পান্ডা হইয়া গ্যাল।

শচী কোন উত্তর করল না। সামুর এই ব্যাপারটা শচীর ভাল লাগল না।

মনজুর বলল, সামুরে ডাকি কর্তা। আপনে আইছেন।

শচী বলল, না দরকার নাই। অখন ব্যস্ত আছে, ডাইকা ব্যতিব্যস্ত কইরা লাভ নাই।

তবু খবর দিল মনজুর। ছোট কর্তা তোমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তুমি বসে-বসে জালসা করছ, একবার যাও। কর্তারে কও বইতে, পান তামুক খাইতে।

খবর পেয়ে সামসুদ্দিন তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল। বলল, আদাব কর্তা।

—ক্যামন আছ সামু?

—ভাল নাই কর্তা। ধনকর্তার নাকি পোলা হৈছে?

—হ।

—তবে মিষ্টি খাওয়ান লাগব। যামু একদিন।

শচী এতক্ষণ যা বলবে না ভাবছিল, অন্য কথা বলবে ভাবছিল, কিন্তু মনের ভিতর কি রকম গোলমাল শুরু করে দিল। বলল, চ্যালা-ফ্যালা জোগাড় হৈতেছে! খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলল শচী।—হঠাৎ পান্ডা সাজলা! আগে না আজাদের খুব ভক্ত আছিলা।

সামসুদ্দিন খুব বিব্রতবোধ করল। সে অন্য কথায় চলে আসতে চাইল। বলল, কর্তা ইট্টু বইসা যান।

মনজুর বলল, বড় কর্তারে খুঁজতে বাইর হৈছে।

এবার সামসুদ্দিন চন্দ্রনাথের সঙ্গে চলতে থাকল। যেন একটা কি নৈতিক দায়িত্ব এই সব মানুষের ভিতর। সংসারে এ-যে এক মানুষ, এমন মানুষ হয় না—পাগল হয়ে যাচ্ছে। সব ফেলে—যা কিছু প্রিয়, যা কিছু সুখের—সব ফেলে মানুষটা কেবল নিরুদ্দেশে চলে যেতে চাইছে। সবাই সুতরাং চুপচাপ হাঁটছে। ঘরগুলো পরস্পর এত বেশী সংলগ্ন যে, শচীকে প্রায় সময়ই নুয়ে পথ পার হতে হচ্ছিল, একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেই চালা এসে মাথায় ঠেকছে। এই বাড়িঘরের যেন কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই—একটা বাড়ির সঙ্গে আর একটা বাড়ি লেগে আছে—কার কোন ঘর, কে কোন বাড়ির মালিক মাঝে-মাঝে শচীর পক্ষে নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ বাড়িটা আবেদালির। বাড়ির উঠোনে আর একটা ঘর উঠছে। শচী বলল, আবেদালির দিদি জোটন নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ঘরটা দেখলেই সে টের করতে পারে। টের করতে পারে কিছুদিন আগে জোটন বিবি ছিল, এখন বেওয়া হয়েছে। জোটনের সব সমেত তিনবার নিকাহ। শচী হিসাব করে দেখল—এবারটা নিয়ে চারবার হবে। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর জোটন প্রতিবার আবেদালির কাছে চলে আসে। আবেদালি তখন লতা এবং খড়ের সাহায্যে উত্তর দেয়ারী ছোট্ট খুপরী ঘরটা তুলে দেয়—এই পর্যন্ত আবেদালির সঙ্গে জোটনের সম্পর্ক। তারপর কিছুদিন ধরে জোটনের জীবন সংগ্রাম, ধান ভেনে দেওয়া, চিড়ে কুটে দেওয়া পাড়া-প্রতিবেশিদের এবং যখন বর্ষাকাল শেষ হয়, যখন হিন্দু গৃহস্থ ঘরে পূজা-পার্বন শেষ, তখন জোটন অনেক দুঃখী ইমানদারের সঙ্গে ভাতের হাড়িটা ধুয়ে-পাকলে জলে নেমে পড়ে। এবং সব পাট খেত চষে বেড়াতে থাকে শালুকের জন্য। শালুক শেষ হলে আবেদালির কাছে নালিশ—দ্যাশে কি পুরুষ মানুষ নাইরে আবেদালি! সেই জোটন উঠানের উপর আলো দেখে মুখ বার করল। দেখল, শচী কর্তা হাঁইটা যায় উঠানের উপর দিয়া। সে একবার ডাকবে ভাবল, কিন্তু এত বড় মানুষকে ডাকতে সাহস পেল না।

শচী নেমে যাচ্ছিল, তখন আবেদালির দরজা খুলে গেল। ওরা পা টিপে-টিপে হাঁটছিল। জব্বর দরজা খুলতেই শচী দাঁড়াল। সব মাতব্বরদের দেখে জব্বর কিঞ্চিত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্রথম কি বলবে ভেবে পেল না। পরে সামুকে দেখে যেন কিঞ্চিত সাহস পেল। বলল, বা'জী আপনেগ বাড়ী গ্যাছে কর্তা।

—ক্যানরে?

—বড় কর্তার খবর দিতে। বড় কর্তা গোড়স্থানে বইসা আছে।

ওরা আর দেরী করল না। তাড়াতাড়ি উঠোন থেকে নেমে সড়কের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। জব্বর সকলকে দেখে ঘরে আর বসে থাকতে পারল না। সেও ওদের পেছনে-পেছনে হাঁটতে থাকল। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঝড়ো হাওয়া আর বইছে না। গাছের মাথায়, ঝোপে-জঙ্গলে আবার তেমনি জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। রাতের ঘন অন্ধকারে এই পাঁচটি প্রাণী মাঠে নেমে সেই গোরস্থানের বট গাছটার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

ঈশম যেন সকলের আগে পৌঁছাতে চায়। সে বলল, কর্তা পা চালাইয়া হাঁটেন।

অঘ্রানের প্রথম শীত বলেই জোনাকির এই অল্প-অল্প আলো, প্রথম শীত বলেই কোড়া পাখি এত রাতেও ডাকছে না, ঘাস মাটি বৃষ্টিতে ভিজে সব জল শুষে নিয়েছে, শক্ত মাটি, সড়কের কোথাও পথ পিচ্ছিল নয়—বরং শান্ত স্নিগ্ধ এক ভাব—অনেক দিন পর বৃষ্টি হওয়ায় ধানের পক্ষে ভাল হবে—সুদিন আসবে, দুর্দিন থাকবে না। ঈশম বড়-বড় পা ফেলে হাঁটছে। কেউ কোন কথা বলছিল না, যেন শচী ওদের সব দুষ্ট বুদ্ধি ধরতে পেরেছে—যেন পুরুষানুক্রমিক আত্মীয়বোধটুকুতে দুঃখ এবং বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছে। সামসুদ্দিন মনে-মনে কেমন এক অপরাধবোধে পীড়িত—যার জন্য সে প্রায় চুপচাপ হাঁটছিল।

লণ্ঠন তুলে বট গাছটার নিচে খুঁজতেই দেখল, বড় কর্তা ফাঁসির মত ঝুলে আছেন। ফাঁসটা গলায় নয়, কোমরে। ধনুকের মত বেঁকে আছেন। অথবা সার্কাসের তাঁবুতে খেলোয়াড় যেমন খেলা দেখায় তেমনি তিনি পিকফের খেলা দেখাতে চাইছেন। ঝড় বৃষ্টি শরীরের উপর শাদা-শাদা চিহ্ন রেখে গেছে। শরীরের ভিতর কোথাও এক যন্ত্রণা, ভালবাসার যন্ত্রণা অথবা স্বপ্নের ভিতর এক মঞ্জিল আছে, মঞ্জিলে যাদুর পাখি আছে—সেই পাখি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন তিনি তার সন্ধানে আছেন। মনে হয় পাখি উড়ে গেছে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সওদাগরের দেশ পেরিয়ে কোথায় জলপরীদের দেশ আছে, পাখি এখন সেখানে দুঃখী রাজপুত্রের মাথায় বসে কাঁদছে। তখনই ভিতরে বড় কর্তার কি যেন কষ্ট হয়—নিজের হাত নিজে কামড়াতে থাকেন। ওরা দেখল মানুষটা হাত কামড়ে ফালা-ফালা করে দিয়েছে। এবং ডালের উপর ঝুলে আছেন।

ঈশম মটকিলার জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সে এ-গাছ—ও-গাছ করে বড় কর্তাকে জঙ্গলের ভিতর থেকে মুক্ত করল। ঠাণ্ডায় বড় কর্তার চোখ মুখ বসে গেছে। অথবা যেন তিনি নিশিদিন জলের নিচে ডুবে ছিলেন—জল থেকে কারা তাকে তুলে এনে এই ঝোপে জঙ্গলে ফেলে গেছে। হাত-পা শাদা ফ্যাকাসে। ঈশম জঙ্গল থেকে বের হয়ে কাপড়টা ভাল করে পরিয়ে দিল। বড় কর্তা নিজের কব্জি থেকে নিজেই মাংস তুলে নিয়েছেন। হাত-মুখ রক্তাক্ত। বড় কর্তার শরীর

মুখ এ-মুহূর্তে বীভৎস মনে হচ্ছে। চাপ-চাপ রক্তের দাগ। গাছের ডালে-ডালে পাখিদের আর্তনাদ—নির্জন মাঠ সকলকে সহসা বড় ক্লান্ত করছে যেন।

শচী লণ্ঠন তুলে মুখ এবং কব্জি দেখতেই বড় কর্তা হেসে দিল। শিশুর মত সরল হাসি। শচী তাকাতে পারছে না। তাড়াতাড়ি এখন বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। দূর্বা ঘাস তুলে সেই ক্ষতস্থানে রস ঢেলে দিল শচী। জ্বালা এবং যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে। তিনি কিছু বলছেন না। চিৎকার করছেন না। সকলের সঙ্গে এখন আউলের মত হেলে-দুলে হাঁটছেন শুধু।

সামসুদ্দিন হাঁটতে-হাঁটাতে বলল, কর্তারে লৈয়া কাশি, গয়া, মথুরা ঘুইয়া আইলেন—কেউ কিছু করতে পারল না। ভাল করতে পারল না।

মনজুর বলল, কইলকাতায় লৈয়া গেলেন, বড় ডাক্তার দেখাইলেন, কেউ কিছু করতে পারল না?

শচীর গলাতে অন্ধকারেও হতাশা ফুটে উঠতে থাকল। বলল, কেউ কিছু করতে পারল না। দশ-বার বছর ধৈরা কত দেশ-বিদেশ করলাম।

মনজুর বলল, হাসান পীরের দরগায়ে সিন্নি দিলাম—না, কিছু হৈল না।

শচী আর কথাই বলছে না। সকলেই এ দুঃখে যেন কাতর। যেন এই দুঃখ পাশা-পাশি সকল গ্রামকে বিপর্যস্ত করছে। বড় কর্তাকে নিয়ে একদা এই সব পাশা-পাশি গ্রামের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। কত দিন থেকে বড় কর্তার অবিস্মরণীয় মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে এ-অঞ্চলের মানুষেরা গৌরব বোধে আচ্ছন্ন। আমাদের অঞ্চলেও একজন আছেন, আমরা একজনকে সকলের সামনে রাজকীয় সম্মানে হাজির করতে পারি। সকলের প্রীতি এবং স্নেহ যেন এই ক্ষণজন্মা পুরুষকে এতদিন ভক্তি-আদরে মনের ভিতর সংগোপনে লালন করছে—সেই মানুষ দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছে।

মনজুর এ-সময় শচীকে প্রশ্ন করল, আইচ্ছা কর্তা বাজী আমারে কয়, বুড়া কর্তা নাকি জীবনে মিছা কথা কয় নাই!

শচী বলল, শুনছি লোকে তাই কয়।

—তবে এত বড় একটা শোক পাইল ক্যান?

শচী উত্তর করতে পারল না। আকাশে যে মেঘ ছিল বাতাসে কেটে যাচ্ছে। ওরা গোপাট ধরে পুকুর পাড়ে উঠে এল না, ওরা নরেন দাসের গয়া গাছটার নিচ দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করল। নরেন দাসের উঠোনে উঠে দেখল, কোন আলো জ্বলছে না। নরেন দাসের তাঁত ঘরেও কোন শব্দ নেই। এত তাড়াতাড়ি সকলে শুয়ে পড়েছে! সামসুদ্দিন ভাবল—নরেন দাসের বোনটা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে—সুতরাং দুঃখ এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে ছমছম করছে।

সে একদিন দূর থেকে মালতিকে দেখেছে। বিধবা হবার পর থেকে মালতি ব্লাউজ পরে না। মালতির কোন সন্তান নেই। যে সালে বিলের জলে কুমীর আটকা পড়ল সে সালেই মালতির বিয়ে হল। নরেন দাস বিয়েতে খরচ-পত্তর করেছিল। সুতরাং চার মাস হবে মালতি এই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। ফুটফুটে রাজপুত্রের মত বর। ছোটখাটো মানুষের চোখ দুটো ইচ্ছা করলে সামু এখনও মনে করতে পারে। নরেন দাস নরসিন্দি থেকে চারটা ডে-লাইট এনে ঘরে-বাইরে সকল স্থানে আলো জ্বেলে, আলোময় করে, নরেন দাস চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বলেছিল বরের হাত ধরে, মালতির মা নাই, বাপ নাই তুমি অর সব। নরেন দাস অনেক-ক্ষণ চৌকিতে পড়ে কেঁদেছিল। সকলে চলে গেলে, বাড়ি ফাঁকা ঠেকল। তবু নরেন দাস দু দিন তক্তপোষ থেকে উঠল না। ছোট বোনটা এ-বাড়ির যেন প্রজাপতির মত ছিল। শুধু সারা দিন উড়ত, উড়ত। গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে-পাড়ে কটকন গাছের ডালে-ডালে মেয়েটা যেন নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াত। সামু, রঞ্জিৎ ছিল বড় কাছের মানুষ তখন।—ওরা কতদিন চুকৈর আনতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। মালতি বিধবা হয়ে ফিরলে সে আর কথা বলতে পারে নি। কারণ ঢাকার রায়টে স্বামী তার কাটা গেছে।

বাড়িতে ঢুকে শচী ডাকল, মা জল দ্যাও।

কাকার গলা গলা পেয়ে লাল্টু বৈঠক-খানা থেকে বের হয়ে এল। চন্দ্রনাথ বের হয়ে এল। শশীবালা স্বামীর পায়ের কাছে বসেছিল এতক্ষণ, উঠোনে শচীর গলা পেয়েই নেমে এল। মহেন্দ্রনাথ ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আজকাল মনির একটা নূতন উপসর্গ হয়েছে। কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া। এতদিন সে বৈঠকখানায় শুধু বসে থাকত—অথবা পুকুর পাড়ে পায়চারি করতে-করতে গাছপালা পাখির সঙ্গে কি যেন বিড়-বিড় করে বকত। ছেলে ফিরেছে শুনেই কম্বলটা হাতড়ে মুখের উপর দিয়ে কেমন কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। মনের ভিতর যে উদ্বিগ্ন ভাবটা ছিল সেটা কেটে গেছে।

শশীবালা উঠোনে নেমে অনেক লোকজন দেখতে পেয়ে বলল, তরা!

আমি সামু ঠাইরেন।

—আমি মনজুর, ঠাইরেন।

বড় বৌ জানালা দিয়ে সব দেখছে। স্বামীর দীর্ঘ চেহারা এবং বলিষ্ঠ মুখ আর কি যেন তার ভিতরে এক আত্ম-প্রত্যয়ের ছবি—সে-ছবি মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলতে থাকলে—বড় বৌ হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—ঈশ্বর আমার এই মানুষকে তুমি দেখে রেখো, উঠোনে মানুষজন বলে সে নেমে আসতে পারল না।

শশীবালা সকলকে বসতে বলে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে গেল। সামান্য জল, তুলসী পাতা এবং চরণামৃত এনে শচী আর মণির শরীরে ছিটিয়ে দিল। জল আনাল এক বালতি। চন্দ্রনাথ ফালি কাপড় বের করে আনল। ক্ষত স্থানে গাঁদা পাতার রস দিয়ে হাতটা বেঁধে দিল।

সামসুদ্দিন বলল, ঠাইরেন আমরা যাই।

—যাও। রাইত অনেক হৈছে। সাবধানে যাইও। তারপর কি ভেবে শশীবালা উঠোনের মাঝখানে এসে বলল, সামু, চাইর পাঁচদিন ধৈরা তর মায়রে দ্যাখি না।

—মার কমরে ব্যাদনা হৈছে। উঠতে পারতাছে না। বাতের ব্যাদনা মনে হয়।

—খাড়। বলে তিনি ঘরে ঢুকে একটা পুরোনো শিশি বের করে আনলেন। বললেন, শিশিডা নিয়া যা সামু। কমরে ত্যাল মালিশ করতে কবি।

ওরা চলে গেল। ঈশম লণ্ঠন হাতে তরমুজ খেতে নেমে গেল। সোনালি বালির নদীর চরে তরমুজ খেতে ছইয়ের ভিতর সারা রাত সে বসে থাকবে। খরগোশ অথবা ইঁদুর কচি তরমুজের লতা কেটে দেয়। রাতে সে বসে টিনের ভিতর ডংকা বাজাবে। অনেক দূর থেকে কেউ প্রহরে জেগে গেলে সেই ডংকা শুনতে পায়, শুনতে পেলেই ধরতে পারে—ঈশম, ঠাকুর-বাড়ির বান্দা লোক, ঈশম এখন তরমুজ খেতে ডংকা বাজাচ্ছে। ডংকা বাজিয়ে ইঁদুর বাদুড় সব তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ছোট কর্তা শচীন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে এখন দৈনন্দিন বাজার হিসাব লিখছেন। বড়কর্তাকে হাতমুখ পরিষ্কার করে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি ডাল দিলে ডাল খেলেন, ভাত দিলে শুধু ভাত, মাছ অথবা মাংস খাওয়ার সময় হাড়-গুলি গিলে ফেললেন। কেমন বড় বড় চোখে তিনি রান্নাঘরটা দেখতে থাকলেন। তখন শশীবালা বলল, মণিরে আর কষ্ট দিও না। তরকারী ভাতের লগে মাইখা খাও।

মার এমন কথায় মণীন্দ্রনাথ কীটসের একটি প্রেমের কবিতা পূর্বাপর ঠিক রেখে গভীর এবং ঘন গলায় আবৃত্তি করে শোনালেন। মা অথবা চন্দ্রনাথ কেউ তার একবর্ণ বুঝল না। বলতে বলতে তিনি বড় বৌর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। যেন নিদারুণ কোন যন্ত্রণার কথা তিনি বার বার এইসব কবিতার ভিতর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন। যেন এই পৃথিবী নিরন্তর অসহিষ্ণুতায় ভুগছে। মণীন্দ্রনাথ এ-সময় নিজের কপালে এবং মাথায় হাত বুলাতে থাকলেন। মাগো তোমরা আমাকে আদর করো, এমন ভাব মণীন্দ্রনাথের চোখমুখে। তার অপলক দৃষ্টি যেন বলছে—আমার বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা!

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

এরা বাদ দেবেনা কাউকে

ঃ স্যার, বাবা এসেছেন।

ঃ কোথায়? নিয়ে এস তাঁকে।— সিনিয়র কমন রুমের ইজিচেয়ারে আধ শোওয়া অবস্থায় একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন বাদলবাবু। এবার উঠে বসলেন। পাশের টেবিলে বইটা রেখে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। কোঁচার খুঁটটা বুক থেকে গড়িয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তুলে নিয়ে পাঞ্জাবীর ঝুল পকেটে গুঁজে নিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। পাশ ফিরে দেখলেন হল ঘরটা গম গম করছে। সুদেব, শ্যামল, বিরিঞ্চিবাবু ও অম্বুজাক্ষ ভাদুড়ী দাবা নিয়ে মেতে উঠেছেন। বোধহয় একটা চাল ফেরৎ নিয়েছে শ্যামল, তাই বিরিঞ্চিবাবু গজ গজ করছেন। অম্বুজাক্ষবাবু প্রাণপণে ডিফেন্ড করছেন শ্যামলকে। পাশেই নীলাদ্রি দুটো চেয়ারকে জোড়া লাগিয়ে মুখের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়ে ভাতঘুমটুকু এনজয় করছে। অশ্বিনীবাবু, নীহার, আশীষ আর এস কে এম এক কোণে চারটে চেয়ার জড় করে মাঝে একটা টেবিল পেতে ক্রমাগত ডেকে চলেছে থ্রি ক্লাবস, থ্রি ডায়মন্ডস, ফোর হার্টস...সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক উল্লাস ও পার্টনার ধমকানির স্রোত বয়ে চলেছে। সামনের টানা টেবিলটার দু পাশে সাজানো সারি সারি চেয়ারে বসে কেউ-কেউ টিফিনের পরের পিরিয়ড নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি নোট ওল্টাতে-ওল্টাতে মিষ্টিওয়ালা শঙ্করের গরম সিঙাড়ায় কামড় বসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। নিয়মনিষ্ঠ সান্যালবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছেন, ঘন্টা পড়ার আওয়াজ হতে-না-হতেই নোট-টোট নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসে ছুটবেন। হাতঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বাদলবাবু—এখনো মিনিট পনেরো বাকী ঘন্টা বাজতে। পরের পিরিয়ডে ক্লাস নেই। সেই পৌনে চারটায় থার্ড ইয়ার, বি সেকশন। যাক সময় কিছুটা আছে। কিন্ত ছেলেটি এত দেরী করছে কেন? একতলার ভিজিটার্স রুম থেকে দোতলার সিনিয়র কমন রুম তো মিনিট খানেকের ব্যাপার। এক কাপ চা পেলে মন্দ হত না। গলাটা ঈষৎ চড়িয়ে ডাকলেন—শঙ্কর। তখুনি আবার কানে এল—স্যার।

যাক ছেলেটি এসেছে। পাশেই শতছিন্ন ময়লা ধুতির ওপর কলার ফাটা হাফসার্ট পরণে মানুষটির মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা বড় মুস্কিল—চল্লিশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে। কাঁচা-পাকা এক মাথা চুল যত্নের অভাবে জট পাকিয়ে গেছে জায়গায়-জায়গায়। চোয়ালের চামড়ার গায়ে বাড়তির মধ্যে দিন কয়েকের না-কামানো দাড়ির ঝাড়ন। বোধহয় চশমার প্রয়োজন, নইলে এই ভরদুপুরে আকাশ-ভরা আলোর সমারোহেও কেন কোটরাগত চোখ-দুটো প্রাণপণে আশ-পাশের জমি-জায়গা আঁকড়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভাল করে মানুষটিকে দেখলেন বাদলবাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ আপনিই...?

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক, কোঁচকানো হাসিতে বিব্রত মুখটা ভরে গেল—

ঃ হ্যাঁ স্যার। আমিই যোগেশের বাবা। নিরাপদ মাইতি। বঙ্গবালা প্রাইমারী স্কুলে পড়াই। এই তো আপনাদের কলেজের কাছেই আমার স্কুল, দশ মিনিটও লাগে না।

ঃ ও আচ্ছা। অধ্যাপনার হাল্কা গাম্ভীর্যের একটা প্রলেপ ফুটে উঠল বাদলবাবুর মুখে।

ঃ স্কলারসিপের ব্যাপারে কি একটা গন্ডগোলের কথা সেদিন যোগেশ বলছিল ক্লাসে। তা আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। কাগজ-টাগজ কিছু এনেছেন সঙ্গে?

ঃ কাগজ? — কেমন একটু অবাক হয়ে গেলেন মানুষটি। কৈ স্যার আপনারা তো কোন কাগজ দেন নি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ন্যাশনাল লোন স্কলারসিপের জন্য যোগেশ অ্যাপ্লাই করেছিল। যোগেশ সার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। দরখাস্ত করার ছ মাস বাদে শুনলাম ও নাকি বৃত্তি পাবে—মাস মাস একশ টাকা। তা কখন তো কোন কাগজ আনে নি। কলেজে নোটিশ বোর্ডে শুধু নাম টাঙিয়ে দিয়েছিল। তাও তো স্যার প্রায় এক বছর হতে চলল। আটষট্টি-উনসত্তর সালের জন্য বারো মাসে বারোশ টাকা প্রাপ্য। আজ পর্যন্ত পেয়েছি মোটে পাঁচশ টাকা। শুনছি বাকী সাতশো পেতে না কি দেরী হবে। কেন স্যার? আমি ডি পি আই অফিসে গিয়েছিলাম। ও'রা বললেন সব টাকাই নাকি কলেজ গত বছর মার্চের মধ্যে এ জি বেঙ্গল থেকে তুলে নিয়েছে...আমি একটু বসব স্যার?

এতক্ষণে বাদলবাবুর খেয়াল হোল যে, মানুষটিকে তিনি বসতেই বলেন নি। ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল; ব্যস্ত হয়ে পড়লেন —বসুন, বসুন। বলে নিজেই ছড়ানো চেয়ারগুলো থেকে একটা টেনে এনে বসতে বললেন। নিজেও বসলেন ইজি-চেয়ারে। চেয়ার টানতে গিয়েই চোখে পড়েছিল শঙ্কর পাশে দাঁড়িয়ে এক ঠোঙা মিষ্টি আর চা নিয়ে।

ঃ থাক শঙ্কর মিষ্টি আজ আর খাব না। তুমি বরং আর এক কাপ চা নিয়ে এস।...হ্যাঁ তারপর...।

ঃ তারপর স্যার দু-দুটো অ্যাপ্লিকেশন করেছি। কিন্তু কোন জবাব পাই নি. আপনাদের অফিসে শেষবার অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে এসে......

থর-থর করে কেঁপে উঠলেন মানুষটি। হাজার চেষ্টা করেও চোখের জল চাপতে পারলেন না। গড়িয়ে-গড়িয়ে নাকের পাশ বেয়ে সরু দুটি জলের ধারা নেমে আসতে লাগল। কাপড়ের খুঁট তুলে কাঁপা-কাঁপা হাতে জলটুকু মুছতে-মুছতে, বাদলবাবু শুনতে পেলেন, ভদ্রলোক বলছেন—আমায় সার কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে।

ধুক করে বুকের ভেতরে হৃদপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল: চেঁচিয়ে উঠলেন বাদলবাবু—কে?

বাবার আড়ালে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটি। ওখান থেকেই বলল—অনিলবাবু সার। উনিই আমায় দিয়ে বারোশ টাকার বলে রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। কখন এক পয়সাও দেন নি। পরে বাবা অ্যাপ্লিকেশন করতে একদিন আমায় ক্লাস থেকে ডেকে পাঠি

: আজ বিকেলের মধ্যেই ফাইলটা খ‌ুঁজে বার করুন। আমি ব্যানার্জিবাবুর সঙ্গে কথা বলছি। — ধমকে উঠলেন প্রিন্সিপ্যাল।

তিনদিন লাগল ফাইলটা খ‌ুঁজে বার করতে। ফাইলটা অফিসেই ছিল। শুধু নিরাপদ মাইতির অ্যাপ্লিকেশনে ডি পি আই অফিস থেকে পাঠানো একটা জরুরী চিঠির উল্লেখ ছিল, সেটিই পাওয়া গেল না। ব্যানার্জিবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বারবার বললেন—ডি পি আই অফিসের চিঠির যে জবাব পাঠিয়েছিলাম দেখছি সেটাও নেই।

: আপনার জবাব বা ডি পি আই অফিসের চিঠিটা যে শুধু নেই তা নয় মিঃ ব্যানার্জি, নিরাপদ মাইতির অ্যাপ্লিকেশনের অরিজিন্যালটাও পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার হেড ক্লার্কের দিকে তাকালেন মিঃ মজুমদার। আপনাকে ডি পি আই কি লিখেছিলেন মনে আছে মিঃ ব্যানার্জি?—চশমার আড়ালে প্রিন্সিপালের চোখ দুটি ক্রমাগত কি যেন খ‌ুঁজে ফিরছে।

: হ্যাঁ। লিখেছিলেন, টাকা আপনারা এক বছর আগে তুলে নিয়েছেন, পেমেন্ট দেন নি কেন এখনো?

: তার জবাবে আপনি কি লিখেছিলেন?

: জবাবটা আমি ঠিক লিখি নি। কারণ এসব অফিসিয়াল ব্যাপার তো আমার কিছু জানা নেই। অনিলবাবুকে বলেছিলাম গুছিয়ে একটা ড্রাফট করে দিতে। তা উনিই টাইপ করে নিয়ে এলেন। আমি চোখ বুজে সই করে দিলাম। যতদূর মনে পড়ে তাতে লেখা ছিল — গত ফাইনান্সিয়াল ইয়ারেই ঐ ছেলেটির প্রাপ্য স্কলারসিপের টাকা এ জি বেঙ্গল থেকে নেওয়া হয়েছে। টাকাটা এখনো ছেলেটিকে দেওয়া হয় নি কলেজেই পড়ে আছে। ছেলেটি অভাবগ্রস্ত বলে টাকার জন্য আমাকে খুব তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু যেহেতু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গত তিন মাস যাবৎ গুরুতর অসুখের জন্য ছুটিতে আছেন ও আমি তাঁর বদলিতে কাজ চালাচ্ছি, তাই আপনার পারমিশন চাইছি যাতে কিনা টাকাটা দিয়ে দিতে পারি। — কথাগুলো বলতে-বলতে বৃদ্ধ অধ্যাপক যে বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন, বুঝতে পারলেন বাদলবাবু।

প্রিন্সিপ্যালের সামনে মুখোমুখি বসে বাদলবাবু, ব্যানার্জিবাবু, পাশে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং হেডক্লার্ক। ন্যাশনাল স্কলারসিপ ফাইলটায় চোখ বুলোতে বুলোতে মিঃ মজুমদার যেন একটা প্রশ্নের ঢিল ছুঁড়লেন হেডক্লার্কের গায়ে—পুরো টাকা আসা সত্ত্বেও কি করে অপনি পার্ট পেমেন্ট করলেন অনিলবাবু? কোন জবাব এল না। আবার বললেন মিঃ মজুমদার—আপনার ক বছর হোল এ কলেজে?

: ন বছর স্যার। — গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল।

: দেবেনবাবু রিটায়ার করার পর তো প্রায় সাত মাস হয়ে গেল অ্যাকটিং হেডক্লার্ক হিসাবে কাজ করছেন এখনো নিয়ম-কানুন জানেন না? এই অ্যাপ্লিকেশনে গার্জেন যে সব চার্জ এনেছেন তার একটাও এখন জিজ্ঞাসা করছি না, শুধু জানতে চাইছি, ব্যানার্জিবাবুকে ড্রাফট করে দেওয়ার সময়ও কি একবার এই ফাইলটা পড়ে দেখেন নি? এই দেখুন আটষট্টির ১১ জুন তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী ন্যাশনাল অ্যান্ড ন্যাশানাল লোনস স্কলারসিপের টাকা দেওয়ার রিভাইজড প্রসিজিওর (নং ১২৮৪—এড়ুকেশন সিজি)

২এস—১৬।৬৬—

সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাউনটেণ্ট-জেনারেলকে কি লিখছেন। এই সার্কুলারের তিন নম্বর ক্লজের তিন নম্বর উপধারায় স্পষ্ট বলেছে যে প্রতি মাসে মাসে বৃত্তির টাকা দিয়ে দিতে হবে। চার নম্বর উপধারায় লিখছে যে প্রতি ছমাস অন্তর ডেপুটি ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (পি)-কে বৃত্তির টাকা জমা ও খরচের হিসাব পেশ করতে হবে। এই নির্দেশগুলো একটাও মেনেছেন? আর কোথায় আপনি শুনেছেন যে অ্যাকটিং প্রিন্সিপ্যাল বৃত্তির টাকা দিয়ে দিতে পারেন না? তাঁকে আবার নতুন করে পারমিশন নিতে হবে ডি-পি-আই-এর কাছ থেকে? ঠিক আছে আপনি যান— আমি দেখছি কি করতে পারি।

এখনো যোগেশ টাকা পায় নি। তবে শীগগিরই হয়তো পেয়ে যাবে, সে আশা বাদলবাবু রাখেন। কারণ প্রিন্সিপ্যাল যে ঠিক স্টেপ নেবেন, সে বিশ্বাস তার আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ফাইল টাইল ঘেঁটে, বারবার একটি প্রশ্নই তার মনে আসছে—গোটা পশ্চিমবঙ্গে আটটা ইউনিভার্সিটি ও একশো নব্বইটি কলেজ ও পলিটেকনিকের ছাত্ররা বছর বছর লাখ লাখ টাকার এই বৃত্তির সুযোগ পাচ্ছে। সুযোগ তো পাচ্ছে কিন্তু সব ছাত্রই কি টাকাটা পাচ্ছে না গোপন পথে কিছুটা অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে? ডি-পি-আই অফিস তো স্যাংশন দিয়ে খালাস তাঁরা কি খোঁজ নেন যে ছমাস অন্তর বৃত্তির টাকা জমা খরচের হিসাব নিয়মিত কলেজ থেকে পাঠানো হয় কিনা? যদি তারা নিতেন তাহলে তো যোগেশের বাবার এত হয়রানি হোত না। তাহলে অনিলবাবুর মত লোকেরাও এত সাহস পেত না। কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে। নিজেরাই যদি নিয়ম গড়ে, নিয়মমাফিক খোঁজখবর না রাখেন তাহলে কত নিরীহ যোগেশ তার প্রাপ্য বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়। যাহোক তবু যে ছেলেটা টাকা কটা পাবে এই আশ্বাসেই মনে মনে খুশী হোন বাদলবাবু। প্রিন্সিপ্যাল নিজেই যোগেশকে ডেকে সব জানিয়েছেন। তাঁর আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ইজিচেয়ারের গায়ে নিশ্চিন্তে গাটা মেলে দিলেন অধ্যাপক।

—সন্ধিৎসু

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

আতংকের আবেশ

(১০)

ডেপুটেশনের নেতা হতে হবে শুনে বিনোদের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সেক্রেটারী তাকে আগের মত স্নেহ করেন না বটে, কিন্তু তা বলে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধা বিনোদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কাছে দাবী জানাতে যাওয়া মানে চিরদিনের মত তাঁর স্নেহ ও আস্থা থেকে বঞ্চিত হওয়া। আবার ইউনিয়নের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করাতেও বিপদ আছে। স্টোর-ক্লার্কের সাথে পরে দেখা করতে সে [illegible] ছুটির পর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করবে না। বিনোদের যা কিছু জানবার আছে তা এখনই যেন জেনে নেয়। রিপোর্টের কাজেও কোনো সুবিধা হল না। তিনি গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলেন রিপোর্টটা আজই তাঁর হাতে আসা চাই। বিনোদ স্টোর রুমে ঢুকে কাজে লাগল। আবছা অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধে তার গা ঘিন-ঘিন করছিল। একটার মধ্যে ক্লার্ক তাকে মোটামুটি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে ডেপুটেশনে যোগ দিতে বেরিয়ে পড়ল। বিনোদকে আশ্বাস দিল,—সে (বিনোদ) যে স্টোররুমে বসে কাজ করছে এ খবর সে কাউকে জানাবে না। যাবার সময় আলো-বাতাসের সংকীর্ণ পথটুকুও বন্ধ করে চলে গেল। বিনোদ দরজাটা বন্ধ করে আলো জেলে রিপোর্টে মন বসাতে চাইল। কিন্তু পারল না। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, ঘাম আর রোধ করা যাচ্ছে না। এমনি সময়ে বাইরের সহকর্মীদের সমবেত কণ্ঠের স্লোগান চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনের মত তার কানে এসে বাজল। সারা শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর কাঁপুনী; মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের নর্তন; — সব মিলিয়ে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। চেতনা লোপ হয়ে যাচ্ছে মনে হল। নিজের হাতে নাড়ী টিপে দেখল উদ্দাম গতিতে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। রক্তচাপ বেড়েছে নিশ্চয়ই। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল। হৃৎপিণ্ড আরো জোরে বুকের খাঁচাটায় এসে আঘাত করছে, খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ভয়-অবর্ণনীয়, অসহ্য এক ভয়: — এই প্রথম অনুভব করল বিনোদ। আসন্ন মৃত্যুর ছায়া সেই অসহ্য অন্ধকারে ঘরটার চারদিকে: দেওয়ালে, সিলিং-এ, মেঝেতে, যেন নেচে বেড়াচ্ছে।

'কাগজপত্র কোনরকমে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে সেই অন্ধকার নরকপুরী থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দারোয়ানকে চাবির গোছা দিয়ে টলতে-টলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি মিলে গেল। ট্যাক্সিতে বসে দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি ছাড়ল। সহকর্মীদের স্লোগান আমাকে তাড়া করে আসছিল। জোরে বৃষ্টি নামল। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা চোখে-মুখে লাগাতে খানিকটা সুস্থ বোধ করলাম। কিন্তু ভয় কাটলো না। বাড়ীতে আসার পর ভয় যেন আরো বাড়ল। পারিবারিক চিকিৎসককে পাওয়া গেল না, পাড়ার অন্য একজন ডাক্তারকে ডাকা হল। তিনি এসেই রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন। মুখে বললেন বটে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখে আমি আশ্বাস পেলাম না। ঘুমের ওষুধের সাথে রক্তচাপ কমাবার ওষুধও দিলেন। [illegible] পড়েই আমি ধরতে পারলাম। [illegible] রক্তচাপের ওষুধ আমার জানা ছিল। ওষুধ খাবার পর বমির ভাব আরো বাড়ল। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করলাম। [illegible] পর্যন্ত ঠিক ছিল। এর পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। এই ঘটনার পর থেকেই মৃত্যুভয় আমাকে পেয়ে বসল। বাস-ট্রামে ওঠা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে লোক না নিয়ে অফিসে যেতে পারতাম না। এখন মাঝে-মাঝে ট্রামে করে অফিসে যাই বটে তবে সবসময়েই সঙ্গী থাকে। ছোট জায়গায়, অন্ধকার ঘরেও দম বন্ধ হয়ে আসে। আপনার এই ঘর আমার খুবই অস্বস্তি লাগছে। দরজাটা খুলে দিন।'

প্রথম ভয় পাবার ইতিহাস খুব কম রোগীই এমন সঠিকভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারে। বিনোদ অনেক রোগীর থেকে বেশি বুদ্ধিমান। সাধারণ জ্ঞানও বেশি। দু-চারজন ডাক্তার বন্ধু থাকার দরুন ব্লাড প্রেসার, ক্যানসার, ইত্যাদি মারণব্যাধি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিফহাল। ওষুধপত্রের নামও অল্প-বিস্তর জানা। ওষুধ খাবার আগে লিটারেচারটা খুঁটিয়ে পড়ে। এই রকম যাদের অভ্যাস তারা বুদ্ধিমান হলেও রোগী হিসেবে মোটেই ভাল নয়। কোনো চিকিৎসকের উপর এরা দীর্ঘদিন আস্থা রাখতে পারে না। ওষুধ খাবার ভয়ও এদের অনেকের মধ্যে দেখা যায়। আবার ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে নিজেদের ওষুধের ব্যবস্থা নিজেরাই করে এবং ওষুধের উপর ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আকর্ষণও অতিমাত্রায় থাকে। সে আলোচনা এখন থাক। এবার বিনোদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস শুনুন।

বিনোদরা চার ভাই। বিনোদ জ্যেষ্ঠ। বাবা ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আদর্শবাদী ও পিউরি-টান। বিনোদের বাবা বরিশালের বহু-জনমান্য নেতা অশ্বিনী দত্ত দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে ভয় করত, সম্মানও করত। বিনোদেরও বাবার প্রতি ভয়-ভক্তি যতটা ছিল ভালবাসা ততটা ছিল না। কেননা তাঁর কাছে বিনোদের কোনো পৃথক অস্তিত্ব ছিল না; তাঁর কাছে বিনোদ স্কুল বিদ্যালয়ের অন্য যে-কোনো ছাত্রের মতন। ভালবাসার থেকে নীতিশিক্ষা-দানের দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বেশি। বাবাকে রাগতে দেখেছে কিনা বিনোদের মনেই পড়ে না। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাবা চাকরী ছাড়েন। বিনোদ তখন শিশু। তারপর আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় আবার তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন। কয়েক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় খুবই অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কেটেছিল। বাবা জেল থেকে ফিরে এলেন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে। অভাব-অনটন এবার চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিতে একটানা দারিদ্র্যের অনিশ্চয়তার আর [illegible] স্মৃতি। গ্রামের লোকের কাছে বাবার সম্মান প্রতিপত্তি যত বাড়তে লাগল বিনোদের মায়ের কাছে তিনি তত সম্মান হারাতে লাগলেন। ছেলেদের এবং মায়ের [illegible] [illegible] অর্ধাহারে [illegible] দিন কাটাতে হত মা। যা মনে করতেন বাবা

একগুঁয়ে, বুদ্ধিহীন, অবিবেচক। বাবা মনে করতেন মা স্বার্থবুদ্ধিতাড়িত সামান্য জীব। যেসব রোজগারের পথ মা দেখাতেন, বাবার মত মানুষের পক্ষে সে পথে চলা সম্ভব ছিল না। বাবার অসুখ, মায়ের মেজাজ এবং বিনোদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। বাবার সাংসারিক বুদ্ধির উপর বিনোদের আস্থা ক্রমশ কমে গেল। যে কাজ করলে বাবা মনে ব্যথা পাবেন, সেই সব কাজ করার ইচ্ছা মনে-মনে পোষণ করতে লাগল বিনোদ। মিথ্যাচরণ, ধূমপান এবং আরো অনেক অভ্যাস আয়ত্ত করল। মায়ের পরামর্শে মিথ্যা কথা বলে, অর্থাৎ বাবার নাম করে তাঁর চেনাশোনা লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করতে লাগল। গ্রামান্তরে অবস্থাপন্ন লোকদের কাছে গিয়ে বাবার চিকিৎসার নাম করে অর্থ সংগ্রহ করে কোনমতে সংসার চালাতে লাগল। এইভাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে কোলকাতায় এল চাকরীর খোঁজে। আদর্শবাদ ও নীতিজ্ঞানের কথঞ্চিৎ মোহ তখনও তার মধ্যে ছিল। বাবার সংসারিক বুদ্ধির উপর আস্থা হারালেও তাঁর আদর্শবাদ ও নীতিজ্ঞানের জন্য তখনও বাবাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। মা বাবাকে অনেক কড়া কথা শুনিয়েছেন, বিনোদ কিন্তু কোনোদিন মায়ের পক্ষ নিয়ে বাবার মনে প্রকাশ্যে কোনো আঘাত দেবার চেষ্টা করে নি। বাবার বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ জমা হয়েছে, বিদ্রোহ করার ইচ্ছা জেগেছে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই থেকেছে, বাইরে প্রকাশ পায় নি। এর একটা কারণ (বিনোদের মতে) বোধ হয় পরিচিত মহলে বাবার সুনাম ও সততার খ্যাতি। এই খ্যাতি বিনোদের পক্ষে অনেক সময় অনেক দিক দিয়ে লাভজনক হয়েছে। কোলকাতায় এসে চাকরি পাওয়ার মূলে এবং তার ফলে আই-কম, বি-কম ইত্যাদি পাশ করে বর্তমান চাকরীতে বহাল হবার মূলে পিতৃদেবের সুনাম ও আত্মত্যাগের খ্যাতি। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সুদূর পল্লীপ্রান্তের সেই দরিদ্র পিউরিটান স্কুল-মাস্টারই বিনোদকে এই প্রতিযোগিতার শহরে অন্তত আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিতার প্রতি বিনোদের মনোভাবের বিশ্লেষণ বিনোদের কথাতেই বিবৃত করা যাক।

'কোলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বাবাকে শ্রদ্ধা করেন। বাবা দুই-একজন ছাত্র সরকারী-বেসরকারী অফিসের বড়কর্তা হয়েছেন। তাদের কাছে বাবা যদি নিজের অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখতেন, আমার বিশ্বাস, আমি যুদ্ধের বাজারে সাপ্লাই-টাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করে বেশ দু পয়সা রোজগার করতে পারতাম। অন্তত একটা ভদ্রগোছের চাকরী নিশ্চয়ই জুটে যেত। বাবার পরিচয়-পত্র ছাড়া ঐ সব বড়লোকদের দরবারে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোনোরকম সাহায্যের জন্য পরিচিত কোনো ব্যক্তিকে চিঠি লেখা বাবার নীতি-[illegible] কাজেই [illegible]৫৯ সালে কোল-কাতায় এসে প্রথমটায় আমি শহরের আবর্জনার মত বায়ুতাড়িত হয়ে পথে-পথে ঘুরতে লাগলাম। অবশ্য হাটখোলার যে গদিতে আশ্রয় পেলাম, সেই গদির মালিক বাবার পরিচয় জেনেই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁরই ছোট ছেলেকে পড়াতাম আর তাঁর কারবারের কাঁচা খাতা লেখার কাজ করতাম। কাজ তাঁরাই আমাকে শিখিয়ে নিলেন। বাবার নাম-ডাকের জোরেই চাকরী পেয়েছিলাম। সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের এক অধ্যাপক বাবার ছাত্র। তাঁর সাহায্যে সিটি কলেজে ভর্তি হলাম। ফ্রি-স্টুডেন্টশিপের বন্দোবস্ত তিনিই করে দিলেন। সবই বাবার দৌলতে। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু যখনই ভাবি বাবা নিজে তদ্বির-তদারক করলে, নিদেন-পক্ষে চিঠিপত্র দিলে এর চেয়ে অনেক উঁচু থেকে কেরিয়ার আরম্ভ করতে পারতাম, তখনই কৃতজ্ঞতাবোধের বদলে বিরক্তি-বিতৃষ্ণা বোধ করি। বাবা তাঁর কঠোর নীতি-জ্ঞান এবং আত্ম-অভিমান পরিত্যাগ করলে চার ছেলে নিয়ে মাকে এত কষ্ট পেতে হত না; আমার শৈশব-কৈশোর একটানা দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস হত না। বাবার প্রতি দুই বিপরীত মনোভাব পোষণ করি। কোনো সময় মনে হয় বাবার মতন মহাপ্রাণ খাঁটি মানুষ এই বাজারে দুর্লভ, পিতৃগর্বে কোন সময়ে গর্বিত বোধ করি; আবার অন্য সময় মনে হয় যে 'খাঁটিত্বের' বাজারদর নেই, সে 'খাঁটিত্বের' জন্য আবার গর্ব কিসের? নিজের নীতিবোধকে, মূল্যবোধকে তিনি আমাদের থেকে বেশি ভালবাসতেন। পিতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি পালন করেন নি। তাঁর উপর বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। কিন্তু এই বিরাগ-বিরূপতা কোনদিন প্রকাশ করার সাহস ছিল না। গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর নীতিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; কিন্তু প্রকাশ্যে কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তাঁকে মনের কথা জানাতে পারি নি। দশ বছর হল তিনি দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু এখনও মনে হয় তাঁকে আমি ভয় করি।'

মায়ের কথা বলতে গিয়ে বিনোদ বলল, 'তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ। রাগ একটু বেশী। আমিও তাঁর মতন ক্রোধ সম্বরণ করতে পারি না। স্ত্রী-পুত্রকে খুবই ভাল-বাসি। কিন্তু তারা আমাকে ভয় পায়, আমি যেমন বাবাকে ভয় পেতাম। আমার অনিশ্চিত মেজাজের জন্য বন্ধু-বান্ধবরাও আমাকে এড়িয়ে চলে। শরীরে শক্তি বেশী। ক্রোধে যখন ফেটে পড়ি, হাতের কাছে যে থাকে তার দুর্গতির শেষ থাকে না। মানুষ-জন হাতের মাথায় না থাকলে থালা-বাসন চেয়ার-টেবিলের উপর রাগ প্রকাশ করি।'

বিনোদ শৈশব থেকেই 'ডেয়ার-ডেভিল' প্রকৃতির। 'পদ্মায় সাঁতার কেটেছি, পাখির বাসা ভাঙতে তেঁতুল গাছের মগডালে উঠেছি, অন্ধকার পড়োবাড়ীতে চামচিকের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছি। আমাকেই সবাই ভয় করত, ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। এখন এসব কথা বললে কেউ বোধ হয় বিশ্বাসই করবে না......'

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বিনোদের রোগ-ইতিহাসের বিবরণ সম্পূর্ণ হবে।

প্রথমবার অসুস্থতার পরদিন ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান এসে যখন রক্তচাপ পরীক্ষা করেন, তখন রক্তচাপ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিনোদের সন্দেহ কাটল না। কয়েকদিন পর একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হল। অবশ্য ফিজিসিয়ানের চিঠি নিয়েই সে বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিল। তিনি রায় দিলেন হার্টের কোনো দোষ নেই, কিন্তু প্রেসার বেশী। ভয় বাড়ল, সন্দেহ দৃঢ় হল। পরদিন বাড়ীর ডাক্তারের যন্ত্রে চাপমাত্রা স্বাভাবিক। সাত দিন পরে বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার আগে বাড়ীর ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। ঐ একই, অর্থাৎ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে বিশেষজ্ঞের যন্ত্রে আবার চাপবৃদ্ধি ঘোষিত হল। এক মাস পরে আবার ঐ একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ ঘরের ডাক্তারের যন্ত্রে বিশেষজ্ঞের যন্ত্রে গরমিল। ঘরের ডাক্তার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুটো যন্ত্র, পরীক্ষা করে দেখা গেল, ঠিক আছে। তবে—? বিশেষজ্ঞ বুঝিয়ে দিলেন যে, বিনোদের রক্তচাপ ভয় এবং উৎকণ্ঠায় সাময়িকভাবে বাড়ছে। এ-থেকে কোনো বিপদের আশংকা নেই। তখনকার মত আশ্বস্ত হয়ে বিনোদ বাড়ী ফিরে এল বটে, কিন্তু ডাক্তারদের কথায় তার বিশ্বাস হল না। মৃত্যুভয় কমল না, বরং বেড়েই চলল। কোথাও কারুর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে শুনলে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। সংবাদপত্রের মৃত্যু-সংবাদ পড়া বন্ধ করেও স্বস্তি পেল না। ক্লস্ট্রোফোবিয়ার থেকে বেশী ক্লেশদায়ক হয়ে উঠল এই প্রেসার-ভীতি। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেই মাথার যন্ত্রণা, বমির ভাব, সারা শরীরে কাঁপুনি, বুক ধড়ফড়, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। ঘন-ঘন ডাক্তার বদল, ওষুধ বদলের পালা চলল। বাড়ীর সকলের সামনে, বিশেষ করে স্ত্রী সামনে থাকলে তার অস্থিরতা বাড়ত। মৃত্যুদূতের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসার ছবি সে কল্পনার নেত্রে দেখতে পেত। চোখে-মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠত।

এই কেসটির ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করার কারণ কেসটি একদিকে যেমন 'টিপিকাল', অন্যদিক থেকে তেমনি বিশেষত্বব্যঞ্জক। 'অবসেশন' এবং 'হিস্টিরিয়ার' দুই রকমের নিউরোসিসের উপসর্গ বিনোদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

তার রক্তচাপের ওঠা-নামা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার,—এটা সে বুঝতে পারছে। তবু প্রেসারের ভয় বা মৃত্যুভয় কমছে না। ভয় আর যুক্তিগ্রাহ্য নয়, আবেশ বা অবসেশন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে হার্ট, কিডনী, লিভার ইত্যাদি দেহযন্ত্র সব ঠিকমত কাজ করছে, রক্তচাপের বাড়াকমা থেকে মৃত্যু হতে পারে না। তবু ভয় পাচ্ছে। ভয়কে এড়াতে পারছে না। ভয় যেন মনের মধ্যে কেটে বসে গেছে। হাজারো রকমের ঘষামাজা সত্ত্বেও দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে না। দেহের মধ্যে, বিশেষ করে পাকাশয়ে সামান্যতম অস্বস্তির অনুভূতি ঘটলেই আনুষঙ্গিক অন্য উপসর্গগুলের আবির্ভাব ঘটছে ও মৃত্যু ভয় আবিষ্ট হচ্ছে।

আবার দেখা যাচ্ছে অপ্রীতিকর কোনো পরিস্থিতির মুখে যেন পরিস্থিতি এড়াবার জন্যই, বিনোদ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে অসুস্থতাকে জাহির করতে চাইছে। বাড়ীর লোকদের সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার দিক থেকে অসুস্থতা তার কাছে আসছে। এসব হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। এ-সবের ব্যাখ্যা-আলোচনা আমরা ঘটকের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে করেছি। এখন শুধু অবসেশন-চর্চাতেই মনোনিবেশ করব।

ঘটকের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তার ইতিহাসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তার মস্তিষ্কের উত্তেজনার প্রাবল্য এবং নিস্তেজনার অভাব আছে, বোঝা যাচ্ছে। আরো বোঝা যাচ্ছে, তার ইন্দ্রিয়ভিত্তিক তন্ত্র (প্রথম সাংকেতিক) বাক্-ভিত্তিক (দ্বিতীয় সাংকেতিক) তন্ত্রের থেকে অনেক বেশী জোরালো। পাভলভীয় ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা প্রসঙ্গে বিনোদের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব নির্ণয় আমাদের কাজে আসবে। কিন্তু তার এখনও দেরী আছে। আপাততঃ অবসেশন সম্পর্কে ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

এক বিবাহিত মহিলা ফ্রয়েডের কাছে এসে জানালেন যে, তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে সে, স্বামী আর তাঁর প্রতি অনুরক্ত নন। ধারণাটা পুরোপুরি ভ্রান্ত। তিনি জানেন। তা সত্ত্বেও হাজার চেষ্টা করেও মন থেকে এ বিকৃত ধারণা তিনি তাড়াতে পারছেন না। কেন এমন হচ্ছে? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

জানা গেল, কিছুদিন আগে মহিলাটি একজন তরুণ অফিসারকে দেখে তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তাঁর এই আকর্ষণ অবৈধ ও লজ্জাজনক মনে হয়েছে তাই নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইছেন না। কাজেই এই আসক্তিকে তিনি স্বামীর উপর ক্ষেপণ করেছেন। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় একে বলে প্রজেকশন। ফ্রয়েডের মতে ব্যাপারটা অনেকটা 'র‍্যাশনালিজেশন'-এর মত। [illegible] বা [illegible] একটা মানসিক পদ্ধতি, যার সাহায্যে আমরা অন্যায়-অনুমিত, পাপবোধ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের স্বপক্ষে যুক্তিজাল তৈরী করে আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পেতে চাই, সত্তাকে রক্ষা করতে চাই। বাধ্যকারী অযৌক্তিক ক্রিয়কলাপ, (কমপালসন) ফ্রয়েডের মতে, অন্তর্জাত আবেগ বা আবেগ-প্রতিরক্ষক প্রতীকধর্মী কার্য। ম্যাকবেথ অন্তরের অপরাধ-অনুভূতিকে হাত ধোয়ার মধ্য দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করছেন। আতঙ্ক-রোগ ফ্রয়েডীয় মতে অবদমিত অবৈধ ইচ্ছাকে গোপন করার প্রচেষ্টা। এই ইচ্ছা সম্বন্ধে রোগী পুরোপুরি অবহিত নয়। অবদমনের ফলেই কমপালসন। একজন বৃটিশ সিকায়াট্রিস্টের মতে হিস্টিরিয়ার উপসর্গের মত গভীর নিজ্ঞানে সৃষ্ট নয় অবসেশিভ কমপালসিভ উপসর্গ। অন্ততঃ গোড়ার দিকে সংজ্ঞান মনে এর উদ্ভব। (স্ট্যাফোর্ড ক্লার্ক, সিকায়াট্রি, ১৯৬৬; পৃঃ ৮৬)

—মনোবিদ্

দক্ষী পাড়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

—পাঁচ—

আজকের সকালটা বেশ পরিচ্ছন্ন বাইরে শীতের আকাশ ঝকমকে নীল। ওপারের দিকে সামান্য কুয়াশা ছিল। ভিজে মাটির ওপর শান্তশীতল গঙ্গার জলে আর গাছপালার নীচে সবুজ ও হলুদ ঝরা-পাতাগুলো ঘিরে হালকা চালে উড়ে বেড়াচ্ছিল কুয়াশার পরী। সূর্য ওঠার পরই সে উধাও। কিন্তু কী শীত, কী শীত।

মাথায় হনুমানটুপি, হাঁটু অব্দি মোজা আর গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে দেবতোষ এক-পাক ঘুরে এসেছেন গঙ্গার ধারে। সুদেষ্ণা তখনও ঘুমোচ্ছে। আজ এটা অবশ্য ব্যতিক্রম। ভোরবেলা থেকে ধর্মকর্মের হিড়িক লাগানো তার খাতির। আজ বোধ হচ্ছে, শরীরটা ভালো নয়। স্ত্রীকে ঘাটানোর সাহস না থাকায় দেবতোষ একা উঠেছিলেন এবং প্রাতর্ভ্রমণ সেরে এসেছেন। তারপর ডাইনিং হলে চা খাবার ছলে আড্ডা দিচ্ছেন কর্ণেলের সঙ্গে।

স্বাতীর সঙ্গে নিত্যকার মত গঙ্গার ধারে দেখা হয়নি দেবতোষের। ডাইনিং হলেও সে নেই। সম্ভবত বেচারা হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছে। ভাবছিলেন, ওর ঘরে গিয়ে দেখে আসবেন নাকি। কিন্তু কর্ণেল ভদ্র-লোককে দেখে কথাটা শেষঅব্দি ভুলে গেলেন।

এত সকালে নীচে চা খেতে আসার অভ্যাস ছিল কেবল স্বাতী আর দিব্যেন্দুর। বোস দম্পতি আসবার পর আড্ডার লোক-সংখ্যা বেড়েছিল গতকাল। শুভ নীরেন আর বিভাস আটটার ঘর ছেড়ে বেরোয়। ঘরেই তাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা। এবং কল্পনারও।

চীনা মিত্রের আবির্ভাব কদাচিৎ ঘটে এ আড্ডায়। শিল্পী মেয়ে, একটু খামখেয়ালী তো বটেই।

কর্ণেল তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বলছেন। শেষঅব্দি দেখা গেল বর্মা ফ্রন্ট থেকে বর্মী বাঁশ—মিদানে বাঁশের কোঁড় এবং খাদ্য-সমস্যা এসে পড়েছে। দেবতোষ কিন্তু আলোচনার মোড় ঘোরাতে চাচ্ছেন পুরাতত্ত্বের দিকে। একদিকে ভারত, ওপাশে চীন—দুটো প্রাচীন সভ্যতার দেশ। তার দুবাহুর মধ্যে যে ভূখণ্ড—এই বর্মা—সেখানে কিন্তু কোনদিনই সেরকম দারুণ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। এটা আশ্চর্য লাগে।...

কর্ণেল টোপ গিলছেন না। কেবল বললেন, তা কেন? বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু পুরনো নমুনা জাপানীরা হস্তগত করতে চেয়েছিল। ওদের আত্মসমর্পণের পর সিঙ্গাপুরে একদল জাপানী বন্দীর কাছে একটা অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। তার আগে কী ঘটেছিল শুনুন।...

দেবতোষের কানটা অবশ্য শুনছে, মনটা নয়। ডাইনিং হলের এককোণে জানালার ধারে বসে আছে শুভ আর কল্পনা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার।... না, ওরা এত সকালে উঠেছে বা নীচে নেমেছে, সে জন্যে নয়। কাল রাত্রে জঙ্গুলে বাগানের ভিতর হঠাৎ ভয় পেয়ে টর্চ জেলেছিলেন দেবতোষ। সঙ্গে সঙ্গে শুভ যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাল। এক মুহূর্তের আলো মাত্র। দ্বিতীয়বার আর জ্বালেন নি। শুভ কবিতা লেখে। কাজেই ভীরু স্বভাবের ছেলে সম্ভবত। কিন্তু অন্য কেউ হলে সরাসরি চার্জ করে বসত। দেবতোষও, বলা বাহুল্য, কেটে পড়েছিলেন। ধাঁধার মত লাগছে ব্যাপারটা। ওখানে শুভ কী করছিল অত রাত্রে?

ধাঁধাটার সমাধান মিলেছে এতক্ষণে। কল্পনাকে ওর সঙ্গে সচরাচর এমন অন্তরঙ্গভাবে দেখা যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে। তার মানে, কাল রাত্রে মেয়েটির সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এবং নির্ঘাৎ নিষিদ্ধ এ্যাপয়েন্টমেন্ট। উঃ! আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কী বেলেল্লা না হচ্ছে! সুদেষ্ণা ঠিকই বলে।

বিচিত্র ক্রোধে দেবতোষের শরীরটা তেতে উঠল ক্রমশ। শীতবোধ কমে গেল। বারবার আড়চোখে ওদের দিকে তাকাতে থাকলেন তিনি।

চতুর কর্ণেলের দৃষ্টি এড়ায়নি। হঠাৎ ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললেন, আর ইউ ডিসটার্বড প্রফেসর? কিন্তু আমরাও একদা যুবক ছিলাম—মাইণ্ড দ্যাট।

এই বলে বুড়োমানুষটি চাপা খিক খিক করে হাসতে থাকলেন। দেবতোষ অপ্রস্তুত! ...না, না। সে কিছু দোষের নয়! আমি এমনি তাকাচ্ছি।

ম্যানেজার সুরঞ্জন এসে গেল। ...গুড মর্ণিং জেণ্টলমেন।

সুরসিক কর্ণেল আঙুল তুলে অদূরে থামের আড়ালে শুভ আর কল্পনাকে দেখিয়ে বললেন, দেয়ার ইজ এ লেডি অফকোর্স!... ফের চাপা হাসি। ফরসা মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে।

সুরঞ্জন হাসিমুখে দুপা এগিয়ে শুভদের উদ্দেশ্যে বলল, গুডমর্ণিং লেডিজ [illegible] জেণ্টলমেন।

শুভ তাকাল মাত্র। কল্পনা সামান্য হাসল এবং মাথা দোলাল।

সুরঞ্জন কর্ণেলের টেবিলে এসে বলল, কাল রাত্রে সম্ভবত চোর ঢুকেছিল হোটেলে। মেইন সুইচ অফ করে কাজ সেরে গেছে।

দুজনেই চমকে উঠলেন। ...বলেন কী!

...হ্যাঁ স্যার। তবে অন্য কিছু নয়—মিস মিত্র, ওই যে আর্টিস্ট ভদ্রমহিলা, ওঁর একখানা ছবি চুরি গেছে।

...ছবি! দুজনে হেসে ফেলেছেন। ...হুঃ, যত্তোসব!

...ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ পেয়েছেন। সদ্য এঁকেছিলেন ছবিটা। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত কিন্তু। জাস্ট ফিনিসিং টাচ দেবার জন্যে ইজেলেই ছিল ছবিটা। রাত্রিবেলা একবার বাইরে বেরিয়েছিলেন উনি—ইলেকট্রিক কতক্ষণে চালু হবে জানতে এসেছিলেন আমার কাছে। ফিরে গিয়ে আলো অবশ্য পেলেন, পেলেন না ওঁর ছবিটা। দারুণ দামী ছবি নাকি! হাউএভার—আমি শিল্পটিল্প বুঝি না, কিন্তু এ কী বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটল দেখুন তো!

কর্ণেল বললেন, কেউ রসিকতা করেছে হয়ত। কাল রাত্রে যা দেখলাম, অনেকের সঙ্গে ওঁর বেশ হৃদ্যতা রয়েছে।

শুভ আর কল্পনার কানে এসেছিল ব্যাপারটা। ওরা পরস্পর তাকাতাকি করে নিঃশব্দে হাসল। তারপর শুভ নীচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে চাপা মন্তব্য করল, মরুকগে।

কল্পনা বলল, ছবিটা আমি দেখেছিলাম কিন্তু।

শুভ তাকাল ওর দিকে। খুব একটা কৌতূহল নেই—তবে কল্পনা ইচ্ছে করলে তাকে ছবির বিষয়টা বলতে পারে। শুনতে আপত্তি নেই।

ওরা অবশ্য চাপাস্বরে কথা বলছিল। কল্পনা বলল, কী ভুতুড়ে সব দৃশ্য আঁকে চাঁদিদি, বোঝাই যায় না। কতকগুলো এলোপাথাড়ি মোটা দাগ—গাছের গুঁড়ির মত। ছাইরংয়া সেই দাগগুলোর ওপর চাপ চাপ কালো—তার ওপর হলদে ধ্যাবড়া খানিকটা রঙ। একটা মাকড়সার জাল আর একটা বেটপ চাঁদ-টাঁদ আছে যেন। আর নীচে ঝালরের মত ফিকে সবুজ—নাঃ, কী একটা অদ্ভুত রঙের ছড়াছড়ি। তারপর একটা বড় খোঁদল—কালো রঙের সেটা। ঠিক মড়ার চোখের মত। গা শিরশির করে দেখতে।।

শুভকে এবার কৌতূহলী দেখা গেল। মুখটা সামনে এনে বলল, সব একেবারে চোকের সামনে রেখেছ দেখছি। মুখস্থের মত—একেবারে চোখস্থ!

কল্পনা হাসল। ...কতকটা। ছবিটার নীচের দিকে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। খুব স্পষ্ট নয় চেহারাটা—কিন্তু মেয়ে বলে চেনা যায়।

শুভ সিরিয়াস হয়ে বলল—কিসে চেনা যায়? দেহের কোন অংশ দেখে?

কল্পনা ভুরু কুঁচকে কপট ধমক দিল। ...ফের অসভ্যতা? আমি বলছি মেয়ে, ব্যস্, এই যথেষ্ট।

শুভ দমল না। ...না—মানে, মেয়ে হলে চুলফুল বুকটুক বা শাড়িটাড়ি...

কল্পনা টেবিলের নীচে দিয়ে ওর পা মাড়িয়ে দিল।

শুভ একটু সরল। বলল, এই, পায়ে ব্যথা আছে। লাগবে।

পায়ে ব্যথা! তোমারও? কল্পনার মুখ হাসিতে কাঁপছিল। ...স্বাতীদির মত কলার খোসা নাকি? না, ভিজে?

বেজার মুখে শুভ বলল, দেখ—চপলতা খুব ভালো নয়। কালঅব্দি আমি কী পরিমাণে চপল ছিলাম তুমি দেখেছ। কিন্তু আর নয়- প্রেসটিজ থাকে না। তা ছাড়া সবাই আমায় নিয়ে তামাসা করে, বেশ টের পেয়ে গেছি। যদি বরাবর সিরিয়াস থাকতুম, কেউ মজা করার সাহস পেত না।

কল্পনা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, কেউ তোমায় নিয়ে মজা করে নি।

মজা করা নয়তো কী? শুভ আরও গম্ভীর হল। ...মিছেমিছি কী আজব জিনিস

দেখাবে বলে রাতদুপুরে আমায় হয়রান করলে। একে ঠান্ডা, তার ওপর অন্ধকার—বাপস্ ওই ভুতুড়ে বাগানে গিয়ে আমার প্রাণ যাবার দাখিল। পুলিশেরও তাড়া খেতে হল—উঃ!

কল্পনা বিরক্ত হয়ে বলল, এক কথা বারবার শুনতে ভালো না। থামো।

কিন্তু ব্যথাটা তো থামছে না।...শুভ পায়ের দিকে হাত নামাল। বোলাতে থাকল।

বোকার মত দৌড়চ্ছিলে কেন? বেশ হয়েছে।

তা তো বলবেই। হঠাৎ গায়ের ওপর টর্চের আলো পড়লে তুমি কী করতে দেখতাম।

কল্পনা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বলল, আলোটা আমিও দেখেছিলাম।

এবং আমাকেও দৌড়তে দেখেছিলে নিশ্চয়!

হুঁ-উ!

দেখেছিলে? লাফিয়ে উঠল শুভ।... খুব হাসছিলে নিশ্চয়।

উঁহু। সে-সুযোগ পেলাম কই? পিছিয়ে আসবার সময় একজনের গায়ের ওপর পড়েছিলাম।

অ্যাঁ? এতক্ষণ তো তা বলনি! সে আবার কে? ওখানে কী করছিল? শুভ হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের ওপর।

কল্পনা কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলল, অন্ধকারে চিনতে পারিনি। ধাক্কা লাগতেই লোকটা দৌড়ে পালাল। তবে—আমার যেন মনে হল, লোকটা অন্য কেউ নয়—স্বয়ং......

সেই মুহূর্তে সুদেষ্ণার চিৎকার শোনা গেল দরজায়। শুধু চিৎকার নয়, কান্না—অর্থাৎ রীতিমত চুলছেঁড়া আর্তনাদ।... ওগো, এ কী সর্বনাশ হল গো! আমার—আমার গুরুদেব কোথায় গেলেন।

তৎক্ষণাৎ দেবতোষ দৌড়ে গেছেন। কর্ণেল উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাবুর্চি-বয়-ঝি-চাকর সবাই ভিড় করেছে। সুরঞ্জন ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুদেষ্ণা দরজার মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন। রীতিমত দক্ষ-যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে যেন।

সুদেষ্ণার ফোঁপানি ও খণ্ডোচ্চারিত বাক্যাংশগুলি থেকে সবাই ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল। তারপর কর্ণেলের মন্তব্য কানে এল: মাই গুডনেস! গুরুহরণ হয়ে গেছে।

শুভ কাছে এসে প্রশ্ন করল, কী বললেন স্যার?

কর্ণেল গোঁফের নীচে লুকানো হাসি রেখে জবাব দিলেন, গুরুপত্নী হরণের কথা জানেন তো? ও'র হয়েছে গুরুহরণ। তার মানে, গুরুদেবের ছবিটি মাথার কাছ থেকে চুরি গেছে। বাট, হাউ স্ট্রেঞ্জ! একই রাত্রে পর পর দুটো চুরি এবং দুটোই ছবি!

শুভ বিড় বিড় করল। ছবিচোর!

দেবতোষ ইতিমধ্যে বাহুবল প্রদর্শনে ব্রতী। স্ত্রীকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে সুদেষ্ণাবিলাপের করুণ রাগিণী ওপরতলায় গিয়ে ডুবল। সবাই মুখ-তাকাতাকি করছিল। এবার হাসল। সুরঞ্জন তাড়া দিয়ে বলল, যে যার কাজে যাও—ভীড় করো না এখানে।

কল্পনা দেবতোষদের অনুসরণ করেছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুভ বেরোল। ওপরে গিয়ে সে দেখল, প্রফেসর দম্পতি ঘরে ঢুকে গেছেন। দরজা বন্ধ। বারান্দায় বিভাস নীরেন আর দিব্যেন্দু দাঁড়িয়ে আছে।

শুভ গিয়ে দাঁড়াতেই সামনের ঘর থেকে দীপেন বোস বেরিয়ে এল। পরনে ড্রেসিং গাউন। শুভ বাও করে বলল, ফিরেছেন দেখছি! কখন ফিরলেন?

দীপেন মৃদু হাসল। চোখ দুটো ঘোর লাল। বলল, এ্যাট অ্যাবাউট ফাইভ থার্টি। ব্যাপার কী?

শুভ বলল, বড্ড মজার ব্যাপার দাদা। গতরাত্রে দু-দুখানা ছবি চুরি গেছে। একখানা চাঁদাদির, অন্যখানা মিসেস ব্যানার্জীর। গুরুদেবের ফোটো নাকি।

নীরেন আর দিব্যেন্দু—দুজনেরই গাম্ভীর্য অস্বাভাবিক। কেবল বিভাস মিটিমিটি হাসছিল। দীপেন বোস ঘরে ঢুকে গেলে সে এগিয়ে এল শুভর দিকে। বলল, খুব সকাল সকাল উঠেছেন দেখছি। আপনিই ছিলেন সবার চেয়ে লেটরাইজার। ব্যাপার কী বলুন তো? ভোরবেলা জানলা খুলতেই দেখি সুইমিং পুলের ওদিকে পায়চারী করছেন। কবিতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন না তো?

নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠল বিভাস।

শুভ একটু চমকে উঠেছিল। বলল, কতকটা।

বিভাস বলল, তাই বুঝি কাল...

শুভ চোখ টিপতেই বিভাস থামল। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ ওর হাতটা ধরে বলল, ও হো! আপনার সংগে একটা জরুরী কথা আছে। আমার ঘরে আসুন।

ওরা চলে গেলে দিব্যেন্দু নীরেনের দিকে তাকাল। কিছু কৌতূহল ছিল দৃষ্টিতে। নীরেন সেটা বুঝতে পেরে ঠোঁট কোঁচকাল মাত্র। অর্থাৎ, ছেড়ে দে!

দিব্যেন্দু বলল, কী হচ্ছে সব! কাল রাত্রে একেবারে ঘুমোতে পারিনি। কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে। তার ওপর চাঁদাদির ছবি চুরি গেছে। উনি একেবারে পাগল হবার দাখিল। ও'র ঘরে গিয়ে সব শুনে আমি অবাক। ফিরে এসে দেখি, তুইও নেই।

নীরেন হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল যেন। একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ। তোদের না দেখে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বেরিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। বিভাসবাবু ঘরে নেই। তারপর যা ঘটল তোকে সেটা বলা দরকার। তুই তো স্বাতীর গারজেন এখন।

দিব্যেন্দু বলল, কে কার গারজেন! মরুক গে। কী লক্ষ্য করেছিলি?

স্বাতী বিভাসবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অ্যাঁ।

সত্যি। আমি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিভাসবাবুর অপেক্ষা করছিলাম।

দিব্যেন্দু পরক্ষণে অবিশ্বাসী হাসি হেসে বলল, যাঃ! অন্ধকার ছিল তো তখন। কী করে চিনলি—বাইরের মেয়ে নয়, স্বাতী? বিভাসবাবুদের মত লোকের চরিত্রে বাইরের মেয়ে আসবার ব্যাপারটা খাপ খেয়ে যায়।

নীরেন মাথা নাড়ল। ...নাঃ। স্বাতীর পোষাক চিনতে ভুল হবার নয়। স্ল্যাকস পরে এ জংলী শহরে কেউ হোটেলে আসবার কথা নয়।

দিব্যেন্দু স্বাতীর ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, স্বাতী এখনও ওঠেনি। ফিরে দেখে এসেছি, বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঠুক। তারপর জিগেস করব ওকে।

নীরেন ওর হাতটা ধরে টানল। ...না।

না কেন?

আফটার অল স্বাতীর মত মেয়ে তোর প্রশ্নটা খুব অপমানজনক মনে করবে। কী দরকার মিছেমিছি ওর পারশোনাল ব্যাপারে নাক গলিয়ে। ...নীরেন সকৌতুকে হাসল।... তাছাড়া তুই তো এখন কল্পনার সংগে প্রেম করছিস!

দিব্যেন্দু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ...যাঃ, কী বলছিস যা তা। কল্পনা একটু খেয়ালী ধরনের মেয়ে। যখন যাকে ভালো লাগে, তার সংগে মেশে। আছাড় নীরেন, তুই ওকে কতটুকুই বা জানিস? আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কল্পনা ভীষণ—ভীষণ বোকা।

থাক্। ওকালতি করতে হবে না। নীরেন ঘরের দিকে পা বাড়াল।

দিব্যেন্দু স্বাতীদের ঘরে ঢুকল।

স্বাতীর ঘুম ভেঙেছে ততক্ষণে। তার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে কল্পনা। সুদেষ্ণার গুরুহরণের কাহিনী শোনাচ্ছে। স্বাতী শুনছে কিনা বোঝা কঠিন। সে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে।

দিব্যেন্দু বলল, চা দিয়ে যায় নি?

জবাব কল্পনা দিল। ...না। এতক্ষণ বেল টিপলাম, পাত্তা নেই কারো।

যাই, বলে দিব্যেন্দু বেরোতে যাচ্ছিল—স্বাতী ডাকল, শোন।

দিব্যেন্দু ঘুরে দাঁড়াল। স্বাতীর দিকে তাকাতে পারছে না—বা তাকানোর ইচ্ছে নেই যেন। বলল, বলো।

স্টেশনে ফোন করে জেনে নাও, সেকেন্ড ট্রেন কটায়?

ট্রেন? অবাক হল দিব্যেন্দু। ...ট্রেনের কী হবে?

আমি ফিরব।

ফিরবে মানে? দিব্যেন্দু কয়েকপা এগিয়ে এল।

ফিরব। দ্যাটস অল।

দিব্যেন্দুর মুখটা বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সে খাটে এসে বসে পড়ল। বলল, পায়ের ব্যথা বেড়েছে তো ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি। এ অবস্থায় যাবে কী করে? তাছাড়া—কোনও তো বিশেষ ঘোরা হল না। পিকনিকের প্রোগ্রাম আছে। তারপর...

স্বাতীর মুখটা কঠিন। সে সাবধানে ব্যথা পাওয়া পাটা একপাশে সরিয়ে বলল, বেশ তো। তুমি এনজয় করো। আমাকে ফিরতে দাও।

ইতিমধ্যে কল্পনার মুখের রং ছাই-ছাই। সে মুখ নামিয়ে নখ খুঁটছিল। এবার শান্ত-স্বরে বলল, তাই হোক দিব্যদা। খুব তো ঘোরা হল—আমারও আর ভালো লাগছে না। কী সব ভুতুড়ে কান্ড ঘটছে এখানে...

বাধা দিয়ে স্বাতী ঝংকৃতা হল। ...কেন ঘটছে, সে তুমি নিজেই ভালো জানো।

কল্পনা চমকাল। ...আমি জানি!

স্বাতী ফুঁসে উঠল। ...হ্যাঁ, ইউ আর ইন দি সেন্টার অফ দি রিং। তোমার এতটুকু শালীনতাবোধ নেই, আমি জানতাম না। কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে শুভর সঙ্গে? অস্বীকার করতে পারো এ কথা? কেন গিয়েছিলে?

কল্পনার পক্ষ থেকে যা স্বাভাবিক ছিল, তা হচ্ছে ভীরুতা এবং লজ্জা।

কিন্তু দু'জনকেই অবাক করে সে পাল্টা কঠিন কণ্ঠে বলল, সব কাজের কৈফিয়ৎ সবাইকে যদি না দিই! আমায় আগের মত কচি খুকিটি ভাবছ কেন?

স্বাতী গর্জাল। ..চুপ! অসভ্য মেয়ে কোথাকার!

দিব্যেন্দু অপ্রতিভভাবে এবং ঘাবড়ে গিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, এই, কী করছ তোমরা! ছিঃ! শুনলে কী বলবে ওরা!

স্বাতী তেড়ে এল।...তুমি থামো। তোমারও কিছু জানতে বাকি নেই। আশ্চর্য তোমার সাহস, কল্পনা আমার সঙ্গে এসেছে, ওর সব দায়িত্ব আমার, আর তুমি......

কল্পনা কথা কাড়ল।...খুব বাড়াবাড়ি করছ স্বাতীদি।

স্বাতীর কি হিস্টিরিয়া হয়ে গেল রাতারাতি? আর কিছু করতে না পেরে কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। হাঁফাচ্ছিল সে।...বাড়াবাড়ি! কাল মোতিঝিলের ওখানে কী করছিলে দু'জনে? অস্বীকার করতে পারো? কাওয়ার্ড, নানসেন্স, ফুলিশ!

দিব্যেন্দু সাহস সঞ্চয় করে বলল, কী করেছি আমরা?

স্বাতী নির্দ্বিধায় বলে দিল, ইউ কিস্‌ড ইচ আদার।

দিব্যেন্দু হো হো করে কেঠোহাসি হেসে উঠল। কল্পনা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। বলল, বেশ করেছি। আমার খুশি!...

বলে সে হনহন করে বেরিয়ে গেল পর্দা তুলে। দিব্যেন্দু গাঁতিক বুঝে বলল, স্বাতী, সিন ক্রিয়েট করো না—প্লীজ। কিস-টিস ছেড়ে দাও। কল্পনা বখে গেছে আসলে। বিশ্বাস করো, আই ডিড্ নট্ কিস হার, বাট ইট ইজ শী...অ্যান্ড... তারপর তো কাল রাত্রের ব্যাপার তোমায় বলেছি। তুমিও দেখেছ। কল্পনা ঘরে ছিল না। আজ সকালেও একই ব্যাপার—শুভর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল নীচে।

মানদা এতক্ষণে চায়ের ট্রে হাতে এল। দু'জনের মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে কিছু আঁচ করল সে। তারপর নিঃশব্দে টেবিলের ওপর ট্রেটা রেখে বেরিয়ে গেল।

চীনা মিত্র চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমোতে পারে নি। রাত্রে দিব্যেন্দু হঠাৎ এসে পড়েছিল তার ঘরে। সব শুনে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। তারপরও কতক্ষণ সে জেগে বসেছিল। ঠিক বসে থাকা নয়, মাঝে মাঝে পায়চারি করেছে ঠোঁট কামড়ে। বিছানায় এসে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেছে। ফের উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছে। দূরে নিজামত-কেল্লার ফটকে ঘন্টাঘড়ি তিনবার বাজলে সে শেষ অব্দি শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম আর হল না। এক সময় ভোর হলে সে বাইরে বেরিয়ে দক্ষিণের লনে অত শীতের মধ্যে পায়চারি করে এসেছে। একটু পরেই শুভর আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে। শুভকে কথাটা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিল সে। মাত্র দু'এক কথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিল। শুভ বুকে হাত বেঁধে একা ঘুরছিল। ঘরে এসে জানালা খুলতেই চীনা দ্যাখে, শুভ একা নেই আর—কল্পনা এসে জুটেছে।

তারপর ফের বিছানায় গড়াচ্ছিল। ঘুম এবার আসতই। কিন্তু মানদার আবির্ভাব হল বেডটি নিয়ে। চা দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। ফিরল খানিক পরে। তার মুখেই সুদেষ্ণা দেবীর গুরুদেবের ছবি চুরি যাওয়া খবর শুনল চীনা।

খুবই অবাক হয়েছিল সে। এবং সেই সঙ্গে কিছুটা হাল্কা হয়েছিল মনের ভার। চীনার ছবি যে চুরি করেছে, সেই যদি এই গুরুহরণও করে থাকে—তাহলে বেশ বোঝা যায়, শ্রীমান চোর ঠিক চোর নয়—নিতান্ত রসিকজন। সুতরাং ছবি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং কল্পনার টুথব্রাশ, স্বাতীর কেডস জুতো—সব একান্তভাবে তারই কীর্তি। কিন্তু এ তামাসায় অর্থ কী? বিশেষ একজনের পিছনে লাগলে এসবের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া সোজা। দুষ্টু ছেলে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে এরকম করে থাকে। এখানে কিন্তু 'ভিকটিমে'র সংখ্যা কয়েকজন।...

পরমুহূর্তে চমকে উঠল চীনা। যাদের জিনিস চুরি যাচ্ছে, তারা সবাই কিন্তু মেয়ে! কোন পুরুষের তো কিছু খোঁওয়া যাচ্ছে না।

আরো একটা কথা মনে পড়ল তার। স্বাতীর জুতো নাকি বিভাসবাবুর বাথটবে পাওয়া গেছে। এবং কল্পনার টুথব্রাশটা, বড় লজ্জার কথা, চীনারাই ব্যাগের ভিতর কাল বেরিয়ে পড়ল। মোতিঝিলের কাছে ভাঙা মসজিদের উঠোনে ছবি আঁকবার সময় সে ওটা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু পাছে ওরা কী ভেবে বসে, লজ্জায় কাকেও বলতে পারে নি কথাটা। ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। দীপেন ব্যেস এসে পড়ায় সে-সুযোগ হল না। হোটেলে ফেরার পর সে ঠিক করেছিল, ওটা জানালা গলিয়ে ফেলে দেবে। কিন্তু নতুন একটা থিম মাথায় শুঁয়াপোকার মত জ্বালা দিচ্ছিল। খোজা কবরখানার ফটকে বৃষ্টির সময় শুভ যে কবিতাটি বারবার আওড়াচ্ছিল বা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করছিল, সেই ছবিটা। 'মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠলে চাঁদ : ডোবার ধারে পাতব হরিণ ধরার ফাঁদ।।' বেশ চমৎকার থিম। অথচ সন্ধ্যা থেকে ইলেকট্রিক ফেল। অগত্যা ম্যানেজারের কাছে মোমবাতি চেয়ে এনে কাজ সুরু করেছিল সে। কতক্ষণ পরে কল্পনা এসেছে। নিঃশব্দে বসে থাকার পর সেও চলে গেছে। দ্বিগুণ উদ্যমে হাত চালায় চীনা। কিন্তু হঠাৎ মোমবাতির আলো নিভে যায়। মোমবাতিটা অনেক আগে শেষ হয়েছিল লক্ষ্য করেনি সে। তখন ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল খবর জানতে, কখন ইলেকট্রিক চালু হবে। চীনার দুর্ভাগ্য। ফিরে আসার পর যেই আলো জ্বলল, দেখল ছবিটা নেই!

তবে শুধু ওখানেই শেষ হয়নি ব্যাপারটা। ছবি চোর (!) তার ব্যাগটাও নিয়ে গেছে। ব্যাগটা শূন্য—খোওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। জিনিসপত্র নিয়মমত বের করে রেখেছিল। শুধু তার মধ্যে রয়ে গেছে কল্পনার সেই টুথব্রাশটা। তাই ব্যাগটার কথা বলেনি কাকেও।

চীনা মিত্র এতক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা ত্রিশ। সে কলিং বেল টিপতেই মানদা এল। চীনা তাকে আরেক কাপ চায়ের কথা বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। মানদা চোখ দুটো বড় করে ফিসফিসিয়ে বলল, কী সব্বনেশে কান্ড দিদিমণি! কে বোসগিন্নির চুল কেটে নিয়েছে কাল রাত্তিরে—শোনেন নি?

সেই মুহূর্তে চীনার একটা কথা মনে পড়ে গেছে। সে বিছানায় গড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

নালন্দা ও সুবর্ণ দ্বীপ

বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নালন্দার একসময় ছিল জগদ্বিখ্যাত খ্যাতি। বুদ্ধের সমকালে নালন্দা একটি অখ্যাত স্থান ছিল। রাজগৃহ থেকে বৈশালী যাবার পথের ধারে অবস্থিত এই গ্রামটিতে বুদ্ধদেব কোনদিন বাস করেছিলেন অথবা ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ সাহিত্যে এমন কোন উল্লেখ নেই যদিও রাজগৃহ ও বৈশালীর সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের সম্পর্ক ছিল গভীর। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্তের জন্ম নালন্দায়।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান্ ৩৯৯ থেকে ৪১৯ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে থেকে চীনে ফিরে গিয়ে ভারত ভ্রমণের যে বিবরণ লেখেন তাতে নালন্দার উল্লেখ নেই। এর প্রায় দুইশত বৎসর পরে (৬৩০-৬৪৫ খৃঃ) চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন্ সাঙ্ যখন ভারতে আসেন তখন নালন্দা মহাবিহার বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতির উচ্চ-শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিউ এন্ সাঙ্ তাঁর প্রায় ষোল বৎসরব্যাপী ভারত-ভ্রমণের মধ্যে তিনবার নালন্দায় বিদ্যার্থী হিসাবে আচার্য শীলভদ্রের নিকট প্রায় দুইবৎসর কাল মহাযান ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন। হিউ এন সাঙের বিবরণে লেখা আছে যে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য নালন্দায় একটি বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন, এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত বুদ্ধের তাম্রনির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ছিল ৮০ ফিট্। অনুমান করা যেতে পারে যে, ফা হিয়ানের ভারত-ভ্রমণের কিছুকাল পরে মগধের গুপ্ত সম্রাটদের বদান্যতায় নালন্দা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয় ও কালক্রমে এই বিহার শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিউ এন্ সাঙ্ যে বালাদিত্যের কথা লিখেছেন ইনি ছিলেন মগধের গুপ্ত-সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি মগধে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এঁর প্রপিতামহ। গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কুমার দেবী নামে এক লিচ্ছবী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুরাগী গুপ্তরাজ বংশের সঙ্গে লিচ্ছবি সম্পর্ক হেতু গুপ্ত বংশেও বুদ্ধানুরাগের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কারণ বৈশালীর লিচ্ছবিরা ছিল পরম বুদ্ধ-ভক্ত।

সম্ভবতঃ বালাদিত্য বা তাঁর পূর্ববর্তী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরবর্তী কোন গুপ্ত সম্রাটই নালন্দার বুদ্ধমন্দির ও মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা। ফা হিয়ানের সময় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মগধ তথা উত্তর ভারতের অধীশ্বর। নালন্দা মহাবিহারে শুধু ভারতের নানা প্রান্ত থেকেই শিক্ষার্থীরা আসতেন না, এঁরা আসতেন হিমালয় ডিঙিয়ে চীন ও তিব্বত, ও সমুদ্রপার হয়ে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি সুদূর দ্বীপাবলী থেকে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মপাল, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব বীরদের প্রভৃতি কীর্তিমান আচার্যদের খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ধরে দেশ বিদেশের ছাত্রদের আকৃষ্ট করত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালে দশ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা, আহার ও বাসস্থান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা দেওয়া হত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যদিও মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই ছিল এই মহাবিহারে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনটি বৃহৎ অট্টালিকা জুড়ে ছিল এর রত্নোদধি নামীয় গ্রন্থাগার। এর মধ্যে একটি ছিল নবতলযুক্ত। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার গোপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মগধ অধিকার করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করার পর এই রাজবংশের গৌরব রবি অস্তমিত হয়। বাংলা তথা মগধের ইতিহাসে পাল রাজবংশের বিদ্যানুরাগের বহু পরিচয় আছে। পাল রাজাদের সময়ে তাঁদের অধিকার ভুক্ত মগধের নালন্দা মহাবিহারের খ্যাতি যে গৌরবের চরম শিখরে সমাসীন হয়েছিল তার মূলে ছিল এই মহাবিহারের প্রতি পালরাজবংশের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা। পালবংশের পতনের পর ১১৯৭-১২০৩ খৃঃ মধ্যে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে নালন্দা বিহার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আক্রমণকারি মহাবিহারের শ্রমণদের হত্যা করে এর ধনসম্পত্তির লুন্ঠন করে এটি সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করেছিল। নালন্দা মহাবিহারের অমূল্য গ্রন্থাগারটিকেও অগ্নিসংযোগ করে বিনষ্ট করা হয়। পূর্ব ভারতের বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও জগদ্দল মহাবিহারও এমনিভাবেই বিনষ্ট হয়েছিল। কালক্রমে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে এই সব বিহারের স্মৃতি এমনকি অস্তিত্বের কথাও জনমানস থেকে মুছে গিয়েছিল।

১৯১৫ খৃঃ ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ডাঃ স্পুনারের নেতৃত্বে বরগাঁও গ্রামের সংলগ্ন এই স্থানে উৎখনন কার্য আরম্ভ হয়। বহুদিন ধরে কাজ চলেছিল। পরবর্তীকালে এই কাজে যোগদান করেন জে এ পেজ, জি সি চন্দ্র, হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতি। এঁদের উৎসাহ ও কর্ম নৈপুণ্যে এখানে বহুসংখ্যক মন্দির, চৈত্য, স্তূপ, বিহার, প্রস্তর ও কাংস্যমূর্তি, (ব্রঞ্জ), সীল মোহর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। উৎখননের ফলে জানা যায় যে, এই মহাবিহার মোট আটবার সংস্কৃত বা পুনর্নির্মিত হয়েছিল পঞ্চম কালে (চতুর্থবার পরিবর্ধিত) মূল মন্দিরের গায়ে চুনদ্বারা নির্মিত শ্রেণীবদ্ধভাবে বুদ্ধ মূর্তিগুলি স্থাপিত হয়েছিল। হিউ এন সাঙের বিবরণে লেখা আছে যে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই বিহার শিল্পকলায় ও ভাস্কর্যে পরমরমণীয়, বিহার সমূহের চূড়া অভ্রভেদী, নিকুঞ্জ ও উদ্যান শোভা নিরুপম। উৎখননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, হিউ এন্ সাঙ্ অত্যুক্তি করেননি, নালন্দার অতীত সমৃদ্ধি তার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। সুসংস্কৃত নালন্দা এখন পূর্ব-ভারতে একটি বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্র। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি স্থানীয় সংগ্রহশালায় (মিউজিয়ম) রাখা আছে। এটি বিশেষ আকর্ষণীয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনার জন্য এখানে নব-নালন্দা মহাবিহার নামে একটি অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নালন্দার প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তুগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দীর পাল যুগের কীর্তি বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

১৯২১ খৃঃ নালন্দায় উৎখননের শেষ পর্যায়ে একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী একটি বিচিত্র তাম্রশাসন উদ্ধার করেন। এই তাম্রশাসনটির ইতিহাসের দিক থেকে অতি বৈশিষ্ট্যের দাবী আছে। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত এই অনুশাসনের ভাষা সংস্কৃত। এর সম্মুখ ভাগে ৪২ পংক্তি (লাইন) ও বিপরীত পৃষ্ঠে ২৪ পংক্তি লিপি উৎকীর্ণ। এক এক পংক্তির মাপ ১ ফিট ৪ ইঞ্চি। তাম্রশাসনের মুদ্রায় (লাঞ্ছনে) আছে দুটি মৃগের মধ্যে একটি ধর্মচক্র, নীচে লেখা আছে 'শ্রীদেবপাল দেবস্য'। তাম্রশাসনটি একটি দানমূলক রাজকীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাল রাজগণের মগধস্থ জয়শ্রী স্কন্দাবার (রাজকীয় শিবির) মোদাগিরি (আধুনিক মুঙ্গের) থেকে। লিপির তাৎপর্য এইরূপ: ধর্মপাল দেবের পুত্র রমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজ দেবপালদেব সুবর্ণভূমির (বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের প্রাচীন নাম) অধীশ্বর বালপুত্রদেবের অনুরোধক্রমে পাঁচটি গ্রাম দান করছেন নালন্দা মহাবিহারে, উক্ত রাজার প্রতিষ্ঠিত বিহারের ভিক্ষুরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে থেকে ধর্মতত্ত্ব (বৌদ্ধশাস্ত্র) লেখার কাজ করতে পারেন। সুবর্ণদ্বীপের অধীশ্বর বিশুদ্ধগুণযুক্ত শ্রমণদের দ্বারা অধ্যুষিত নালন্দা বিহারের পরম অনুরাগী, শুদ্ধবোন পুত্র ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভের জনাই তাঁর এই গ্রাম-দান। দূতক (রাজদূত) বলবর্ধন সুবর্ণদ্বীপের অধীশ্বরের থেকে এই অনুরোধ তাঁর কাছে এনেছিল, (সুতরাং তা রক্ষা করা হল)। শাসনটিতে আরও লিখিত আছে যে সুবর্ণ দ্বীপ-পতি বালপুত্রের মাতার নাম তারা, তিনি চন্দ্রবংশীয় (ক্ষত্রিয়) ধর্মসেনের কন্যা, বালপুত্রের দেবের পিতাও ছিলেন একজন মহান্ নৃপতি। এই নির্দেশনামায় উদ্দিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করার ভার দেওয়া হয়েছে বিশ্বস্ত দূত পূর্বোক্ত বলবর্মণের উপর। শাসনটিতে প্রদত্ত পাঁচটি গ্রামের নামও দেওয়া হয়েছে। নন্দীবনক, মণিবাটক, নটিকা ও হস্তীগ্রাম এই চারিটি গ্রাম মগধের রাজগৃহ বিষয় অথবা জেলায়। পঞ্চম গ্রামটির নাম পালমক, এটির অবস্থিতি শৃংগভুক্তির (পাটলিপুত্র বিভাগ) গয়া বিষয়ে বা গয়া জেলায়। অনুশাসনের তারিখ মহারাজ দেবপালের রাজ্যলাভের ৩৯তম বর্ষের ২১শে কার্তিক (৮৫০ খৃষ্টাব্দ)। তাম্রশাসনটির মর্ম অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, সুবর্ণ দ্বীপের অধিপতি পাল রাজার দূত বলবর্মণের মারফৎ মহারাজ দেবপালকে এই পাঁচটি গ্রামের ক্রয়মূল্য সুবর্ণ মুদ্রা অথবা অন্যবস্তুর আকারে পাঠিয়ে ছিলেন কারণ ভিন্ন দেশ থেকে পূর্ব ভারতের গ্রামক্রয় ও নালন্দার [illegible] ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই জন্যই তিনি স্থিরস্থানীয় শামেশাধর অধীশ্বর মহারাজ দেবপালের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তাম্রশাসনে আর একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে ইতিপূর্বেই বালপুত্র দেব নালন্দা মহাবিহারে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমানে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের সঙ্গে শ্যাম (থাইল্যান্ড), কম্বোজ (ক্যাম্বোডিয়া), লাওস, আনাম (চম্পা), যবদ্বীপ (জাভা), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), বলিদ্বীপ প্রভৃতি সমুদ্র পারবর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা, জাতক, দশকুমার চরিত, কথাসরিৎ সাগর প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকের কাহিনীগুলির মধ্যে থেকে এই যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমুদ্রোপকূলবর্তী বাঙলাদেশের সঙ্গে এই সব অঞ্চলের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ছিল—বাঙলার তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জলপোতে এই সব দেশে যাতায়াত চলত। বাঙলার প্রাচীন রূপকথাগুলির মধ্যেও প্রাচীন বাঙালীর দ্বীপময় ভারত ভ্রমণও সমুদ্রযাত্রার স্মৃতির রেশটুকু খুঁজে পাওয়া যায়। খৃষ্টজন্মের বেশ কিছুকাল আগেই ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্ণিও এবং ইন্দো-চীনের মালয়, শ্যাম, লাওস, কম্বোজ, আনাম প্রভৃতি দেশ বা দ্বীপাবলীতে ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা গিয়ে পৌঁচেছিল। এর কিছুকাল পর বৌদ্ধধর্মও এই সব দেশে পৌঁছায়। ফলে এই অঞ্চলের বিশেষতঃ জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ ও আনামের অধিবাসিরা যেন ভারতীয় সভ্যতাকে একরূপ আত্মসাৎই করে নিয়েছিল। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের রাজাদের নাম (মূল বর্মণ, অশ্ব বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ, কৃত রাজস, কৃতনাগর, গজমদ, বিক্রমবর্ধন), সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, বুদ্ধ প্রতিমার মন্দির, পৃথিবীর এই প্রান্তে ভারতীয় সভ্যতার দিগ্বিজয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণই বহন করে।

ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপ (জাভা), সুবর্ণ দ্বীপ (সুমাত্রা), বলিদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপাবলীকে বর্তমানে দ্বীপময় ভারত আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই দ্বীপময় ভারত ১৯৫০ খৃঃ ১৫ আগষ্ট গণরাজ্য বলে ঘোষিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে এই সেদিন পর্যন্ত এই দেশ ডাচ্‌দের অধীন ছিল—এজন্য এদেশকে ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া বলা হত, ডাচ ভাষায় বলা হত 'নেদারল্যাণ্ডশে ইণ্ডি'। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা উদ্ধারের কৃতিত্ব ডঃ কার্ণ, ক্রোম, বোস্ক, ব্রান্ডেস, কুনষ্ট, লেভি প্রভৃতি ইউরোপীয় বিশেষতঃ ডাচ্ পণ্ডিতদের প্রাপ্য। পরবর্তী কালে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ [illegible], ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীদের জ্ঞান সাধনাও এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভারত সভ্যতার বিকাশক্ষেত্রগুলি চাক্ষুষ করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই সব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের সময় "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী" "বোরোবুদুর" "সাগরিকা" প্রভৃতি কবিতায় কবি ভারতসভ্যতা-পূত দ্বীপময় ভারতের প্রতি তাঁর মুগ্ধ হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন।

আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনটিতে সুবর্ণ দ্বীপের অধীশ্বর যে বালপুত্রদেবের নাম পাওয়া যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এই ইতিহাসের সূত্রে জানা যায় যে, সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্র রাজবংশে এঁর জন্ম হয়েছিল, এঁর পিতার নাম ছিল সমরাগ্রবীর। এই শৈলেন্দ্র বংশীয়দের পূর্বপুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে ভারতীয়। শৈলেন্দ্র বংশীয়দের অভ্যুদয় হয়েছিল সুমাত্রা দ্বীপে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রীবিজয় নামক স্থানে। এই জন্য এদের রাজ্যকে ইতিহাসে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য বলা হয়ে থাকে ও সুমাত্রা দ্বীপের পালেমবাঙ নামক স্থানটিতে প্রাচীন শ্রীবিজয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তী কালে সংলগ্ন জাভা, বলিদ্বীপ মালয় এমন কি শ্যামদেশ পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশীয়দের বা শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে এঁরা যবদ্বীপ বা জাভার অধিকার হারান। সাম্রাজ্যের

সঙ্কোচন সত্ত্বেও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আটশত বৎসর ধরে এই ভারতীয় বংশোদ্ভব রাজবংশ একাদিক্রমে রাজত্ব করে এসেছিল। এই বংশেরই একজন রাজা মধ্য-যবদ্বীপ বা জাভার বিখ্যাত বোরোবুদুর মন্দির নির্মাণ করান। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জগতের পরম বিস্ময় এই বোরো-বুদুর মন্দির বা মন্দির শ্রেণী নির্মিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। নালন্দার তাম্রশাসন ব্যতীত অন্য সূত্রেও জানা যায় যে, শৈলেন্দ্র বংশীয়েরা বাঙলার পাল রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এবং এই সূত্রে বাঙালীরা এদেশে যাতায়াত করতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কোন সময়ে মহাযান ধর্মাবলম্বী এই শৈলেন্দ্র রাজ-কুলের ধর্মগুরু পদে বৃত ছিলেন কুমার ঘোষ নামে এহকজন বাঙালী পণ্ডিত। এঁর আগে বা পরেও পাল রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে বঙ্গ মগধ থেকে যে সব ভারতীয় পণ্ডিত সুবর্ণ দ্বীপে যান তাঁদের মধ্যে আচার্য ধর্মপাল (৭ম শতাব্দী) বজ্রবোধি, অমোঘবজ্র (৮ম শতাব্দী) ও অতীশ দীপংকরের নাম করা যেতে পারে। আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের সময়ের ব্যবধান প্রায় চারশত বৎসর। অতীশ ছিলেন বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং অবস্থিতিও ছিল পাল শাসনাধীন মগধে। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় যে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন বা তার ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাম কিনে দিয়েছিলেন, এঁর মূলে ছিল তাঁর বৌদ্ধধর্মানুরাগ বিশেষতঃ মহাযানী পন্থায় কারণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য বিখ্যাত ছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয়দের সময় দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য থাকলেও, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম এখান থেকে লোপ পায় নি। এই ধর্ম এখানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সহাবস্থিত ছিল বলা যেতে পারে। শৈলেন্দ্র বংশীয়দের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী পরাক্রান্ত রাজবংশেরও অস্তিত্ব ছিল এবং এই সময়ে পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরও প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান যখন দ্বীপ-ময় ভারত ভ্রমণ করেন—তখন তিনি এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রাবল্য দেখেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের কাশ্মীর অঞ্চল থেকে রাজকুলজাত গুণবর্মণ নামে এক বৌদ্ধ পন্ডিত প্রথমে যবদ্বীপে যান ও এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। যবদ্বীপের রাজা ও রাজমাতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করায়, এঁর পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের খুব সুবিধা হয়েছিল। গুণ-বর্মণই দ্বীপময় ভারতে প্রথম বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁর চেষ্টার ফলেই শুধু যবদ্বীপে নয় সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থে চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে গুণবর্মণ চীন দেশে যান। ৪৩১ খৃঃ চীনের নান্‌কিন শহরে এঁর মৃত্যু হয়। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্র-দেব কর্তৃক নালন্দায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা ও তদুদ্দেশ্যে গ্রামদান প্রসঙ্গে ইতিহাসের আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোল-রাজাদের সম্মতি নিয়ে শৈলেন্দ্র বংশীয় আর এক নরপতি মাদ্রাজের নিকটে নেগাপটম্‌ নামে একটি স্থানে একটি বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের বিভিন্ন অংশের রাজবংশগুলির সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের রাজবংশগুলির মৈত্রী ও সহযোগিতার এটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

শৈলেন্দ্র বংশীয়দের পরাজিত করে পূর্ব যবদ্বীপের একটি হিন্দুরাজবংশ এই অঞ্চলের প্রভুত্ব লাভ করেছিল ১০ শতাব্দীতে। শৈলেন্দ্র বংশের প্রভুত্ব এই সময় পুনরায় সুমাত্রা দ্বীপেই সীমায়িত হয়। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ বাণিজ্যসূত্রে উত্তর সুমাত্রায় ইসলামের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ১৫২৬ খৃঃ মধ্যে সমগ্র দ্বীপময় ভারতে মুসলিম প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। ধর্মের পরি-বর্তন হলেও এই অঞ্চলে ভারত সংস্কৃতির প্রভাব কোন দিনই নিশ্চিহ্ন হয় নি। বলি দ্বীপে ইসলাম ধর্ম কোন দিনই তার আসন দৃঢ় করতে পারে নি। পূর্ব যবদ্বীপের সুবিখ্যাত মজপহিত বংশীয় শেষ হিন্দু-নৃপতি ইসলামধর্মের প্রভুত্ব মেনে না নিয়ে বলি দ্বীপে চলে আসেন এবং সগৌরবে রাজত্ব করতে থাকেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে ডাচ্‌ বণিকেরা সমগ্র দ্বীপময় ভারত অধিকার করে তাদের সাম্রাজ্যস্থাপন করে-ছিল। মুসলিম প্রভুত্বের অবসানে ভারত অধিকার করার পর ইংরেজকে সর্বাপেক্ষা বাধার সম্মুখীন হতে হয় মারাঠা ও শিখ শক্তির কাছে। দ্বীপময় ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে এসে ১৯০৮ খৃঃ পর্যন্ত ডাচ্‌ সরকার বলি দ্বীপের হিন্দু রাজবংশ ও হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকেও প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। ১৯০৮ খৃঃ বলিদ্বীপের ক্লুশনকুঙের রাজা দেব আগুঙ মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে ডাচ্‌দের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সম্মুখ সমরে নিহত হন। এই রাজা নিজেকে হিন্দুক্ষত্রিয় বলে মনে করতেন এবং পরাধী-নতা স্বীকার অপেক্ষা যুদ্ধে আত্মাহুতি দানই ক্ষাত্রধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। বলি-দ্বীপের রাজার পতনের পরই ১৯১১ খৃঃ নাগাদ দ্বীপময় ভারতে ডাচ সাম্রাজ্য দৃঢ়ী-ভূত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ ইন্দোনেশীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৫০ খৃঃ তার স্বাধীনতা প্রাপ্তি, সুকর্ণের অভ্যুত্থান ও অবনতি, ইন্দো-নেশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনীতির কথা সকলেই প্রায় জানেন।

উত্তরমেঘ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবু অগোচরে কিছুই থাকে না। চোখের আড়াল করে রাখা যায় না সব। গোপনতার সীমা আছে, আয়ু আছে। আড়াল একদিন সরে যাবেই। হয়তো কোনো ঝড় উঠবে না, হাওয়া বইবে না তখন। তবু আবরণ ঘুচে গিয়ে আপনি উন্মুক্ত হবে, প্রকাশ হয়ে পড়বে সব। সময়ের হাতে মলিন হবে, ছিন্ন-ভিন্ন হবে এত যত্নের অর সতর্কতার পাহারা। ফারকুমার চলে গেছে। তেমনি একদিন অতর্কিতে বিদায় নেবেন রুক্মিণীকুমার। এ যে নিয়তির বিধান। যেতে তাঁকে হবেই। অহরহ এত বাধা, এক ঢাকার এই যে ব্যস্ততা আর উদ্বেগ, তখন মিথ্যে হয়ে যাবে সব। যাবার তাড়ায় হয়তো মনেও পড়বে না, কোথায় কী আছে আর কোথায় কী নেই। কিন্তু সংসার সেদিন ঘৃণা ছাড়া আর কী উপহার দেবে তাঁকে? কথাটা স্মরণ হলে মোহিনী নিজেই সরমে মরে যায়। তখন তাকেই তো শোনাবে সবাই। আর মাথা হেঁট করে তাকে মেনে নিতে হবে সব। তাঁর পাপের অর্ধেক দায় আমার। এ পাপ আমার! লোকে জানবে, মুখে-মুখে ছড়িয়ে যাবে তার নাম। তিনি শঠ, প্রবঞ্চক। ফার-কুমারের সর্বনাশের মূলে রোজ ফ্রান্সিস নয়, রুক্মিণীকুমার। বৈজুপ্রসাদ তাঁরই হাতে গড়া পুতুল। মোহিনী জানে, বোঝে, চেনে সবাইকে। তবু বোবা হয়ে থাকতে হয়। তাই যে রীতি। চোখের পাতা বুজিয়ে চিরকাল অন্ধ সেজে থাকতে হবে। তাই যে নিয়ম। নইলে কেমন করে আকাশ ছোঁবে সে? বেঁচে থাকবে কী নিয়ে? মরার সাধ নেই। মোহিনী তাই তুচ্ছতম সুখের আভাস পেলেই প্রাণ খুলে হাসে। ব্যথা পেলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। সুযোগ পেলে স্বপ্ন দেখে ঠিক কিশোরীর মত। আবার হতাশায় খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ে। কাছে পেলে তর্ক জুড়ে দেয়। তার আশা, স্বপ্ন আর সুখের একমাত্র আশ্রয় রুক্মিণীকুমার। মোহিনী তা ভোলে নি, ভুলতে পারে নি বলেই কি এত ভয়, এত জ্বালা, এত বিষাদ? নইলে এত কাছে এসে তবু বিমুখ কেন? এত ঘনিষ্ঠ হবার পরেও দূরে থাকার প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা কিসের? চন্দ্রচূড় তো শিশু নয়। সে বোঝে সব। টের পায়। তবু অদ্ভুত সংযমে নিজেকে বেঁধে রাখার দুরন্ত প্রয়াস! কাপুরুষ, কাপুরুষ! সব এক। একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। ভাবে, এর নাম মমতা। সাধু, সচ্চরিত্র সাজার কি উদ্ভট পন্থা। অথচ মনে-মনে তোমরা যে সবাই চোর, লম্পট, ধূর্ত! নইলে তুমি কি পারো না, অন্ততঃ একবার আমার কাঁধ ছুঁয়ে দেখতে? হাতে হাত রাখলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে বল তো? মোহিনী মনে-মনে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কুৎসিত ভাষায় ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু কে চায় হৃদয় খুঁজে বেদনা জাগাতে? মোহিনীও তাই একা, অসহায়, বিষণ্ণ চোখে চুপ-চাপ বসে থাকে। তার বুকে মরুভূমির তৃষ্ণা। সারা দেহে অতৃপ্তির দাহ।

'কী ভাবছেন?'

'আপনাদের কথা!'

'ভেবে কী লাভ?'

'অবশ্য হিসেব কষে তা দেখি নি!'

'দেখুন। এখনো সময় আছে। নইলে যদি ঠকতে হয় শেষে।'

'ঠকতে তো আসি নি। বরং আমার কাছে সবটাই জিত্। যা পেয়েছি আর যা পাই নি। অভিজ্ঞতাটাই জীবনে পরম সঞ্চয় যা আলোর মত অধকারে পথ দেখাবে, সঠিক পথে এগিয়ে দেবে আমাদের।'

'আমাদের মানে? নিজের সঙ্গে আর কাকে জড়াচ্ছেন?'

'কেন আপনাকে। আপত্তি আছে তাতে?'

'আপনি কি পাগল হলেন চন্দ্রচূড়বাবু? কার সঙ্গে কথা বলছেন? আমি না আপনার মনিবের স্ত্রী?'

'পাগল আমি হই নি। ভুলও করিনি কোথাও। তবু যদি প্রগল্ভ হয়ে থাকি সে কেবল আপনারই প্রশ্রয়ে।'

কথাগুলি কেউ কাউকে বলে না। তবু মনে-মনে বলা হয়ে যায়। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে মোহিনী যেন হর্ষে-বিষাদে একাকার হতে চায়। তবু ভালো, মানুষের মন এখনো টিকে আছে। নিদ্রায়-জাগরণে সে তার সকল শূন্যতা পূর্ণ করে চলেছে আপন মহিমায়, অন্তরঙ্গ ঔদার্যে। তাছাড়া উপায়? এখনো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে। তাকে যে বিরামহীন দুঃখের বোঝা বয়ে হেঁটে যেতে হবে এই পথে একা, সঙ্গীহীন। মাঝে-মাঝে মোহিনী তাই আত্ম-বিস্মৃতের মত নিজেকে নিয়ে অসম্ভব খেলা খেলতে চায়। পাগল, পাগল! শুনতে পেলে লোকে বলবে, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তার। একেবারে বিগড়ে গেছে মোহিনী। কিন্তু কল্পনার ভেতরেও যে কি অনির্বচনীয় সুখ, কত শান্তি তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বোঝে!

কিন্তু এক একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে ধরে রাখা দায়। অবাধ্য ঘোড়ার মতই চলতে চলতে মনটা হঠাৎ মাঝ পথে বেয়াড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। হিতাহিত জ্ঞান আর থাকে না তখন। ভবিষ্যতের ভয়-ভাবনা ঘুচিয়ে দেহ-মন বিদ্রোহ করে বসে প্রায় অতর্কিতে। প্রতিপক্ষের প্রস্তুতির প্রয়োজনের কথাটাও ভাবে না। স্থান-কালের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে মোহিনী। দেখে রুক্মিণীকুমার বিস্ময় বোধ করেন প্রথমে। ঘরে কেউ নেই। মুখোমুখি তারা দুজন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন। তবু ধীর, মন্থর, শীতল মনে হয় তাঁকেই। নইলে কী দিয়ে, কেমন করে ঘায়েল করবেন মোহিনীকে? সহজে কি শান্ত করা যায়? অমন বেপরোয়া মূর্তির দিকে চেয়ে ঘাবড়ে যেতে হয়। তবু তো সংসারে অনেক ভালো-মন্দ দেখা আছে তাঁর। এখন হাসি মুখেই অনেক আঘাত সইতে পারেন।

'সব কথাই জানো তুমি?'

'সব।'

'তবু ঘৃণা করো না যে?'

'বড় উঁচে বসে আছো তুমি। ঘৃণা তোমাকে স্পর্শ করে না আজ। তাহলে থুথু ছিটিয়ে লাভ কি? তোমার গায়ে তা লাগে না। আমার পরিশ্রমই সার। তাই মরে আছি। চোখ মেলে স্থির হয়ে আছি।'

'যদি উচ্চাসন থেকে নেমে আসি? তাহলে তো ঘৃণা করবে? আমার মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দেবে না তখন?'

'আমি কেন ছিঁড়তে যাবো? নিজেকে হেয় করে কী হবে? বরং আজ তুমি যে ডালে বসে আছো সে ডাল বড় পলকা। ঝড় একদিন উঠবে। প্রকৃতির নিয়মে হের-ফের হবে না। সেদিন ডাল ভেঙে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে নিশ্চিত। বিবেক যদি লুকিয়ে থাকে কোথাও তাহলে আপনা থেকেই নিজেকে অশুচি ঠেকবে, ঘৃণিত মনে হবে তোমার। তখন রক্ষা করতে, সান্ত্বনা জানাতে ছুটে আসবে না কেউ। শত্রু-মিত্র কেউ-ই না।'

'তুমি, তুমি আসবে তো?'

'আমার মূল্য আর কতটুকু তোমার কাছে?'

'অন্তত স্ত্রী হিসেবেই স্বামীর কাছে যতটুকু থাকে।'

'তুমি তো ফারকুয়ার সায়েব নও, আমিও রোজি ফান্সিস্ নই। অমন করে অপমান নাই বা করলে। তুমি কি জানো না, তোমার কাছে কোনো প্রার্থনাই নেই আমার?'

'কোনো লোভ?'

'না।'

'কোনো আশা?'

'না।'

'কোনো দাবী?'

'কিছু না, কিছু না।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে তবু।'

তাঁর চোখের দিকে চেয়ে ধীরে-ধীরে নিস্তেজ, ঠান্ডা হয়ে গেল মোহিনী। ফণা গুটিয়ে চুপ-চাপ কোটরে ফিরে গেল। কথা বলার সাহস হয় না, রুচি হয় না আর। এইসব কারণে মুহূর্তে তাকে দেখে রুক্মিণীকুমার খুশি হন কিনা, বিজয়ীর মত ফিরে যেতে-যেতে তার জন্যে আদৌ মমতা বোধ করেন কিনা মোহিনী জানে না। বরং এই অপ্রেম আর অবিশ্বাসের ভেতরেই আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হবে জেনে সে এখন বিপন্ন, আতুর। বড় হীন, তুচ্ছ মনে হয় নিজেকে। কত অল্পে তুষ্ট হতে চেয়েছিল সে। এই মুখ, এই প্রাচুর্যের ভেতরে মর্মর মত স্থির, অনড়, অবিচল থেকে লাভ? অথচ আমরণ এই মধুর পাত্রে মাছির মত ডুবে থাকতে হবে। এই অতৃপ্তি আর অপূর্ণতার ভেতরেই সুখের আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সহাস্যে বলতে হবে, আমি আছি, বেশ আছি!

রাত্রে ফিরে এলেও কথা হয় না। যে যার আপন কাজে মগ্ন। যেন হয়নি কিছুই। তাছাড়া ঘরের ভেতরেও তো সেই কাজ। আর হাতে কাজ পেলে মনে থাকে না কিছুই। ভুলে যান, ভুলে থাকতেই চান। ব্যস্ত মানুষ। কাজের বাইরে তাঁর কাছে সব কিছুই তুচ্ছ, অবান্তর, অকারণ। হয়তো ভোর হলে মোহিনীও ভুলে যাবে। দিনের আলোয় ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে যাবে সব। দেহ থেকে, মন থেকে সমস্ত ক্লেদ আর কালিমা ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন, বিলীন হয়ে যাবে। দেখে চেনাও যাবে না। মুখ থেকে, চোখ থেকে ঘনভার বিষাদের আড়ালটুকু সরে গেলে আবার উজ্জ্বল, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে মোহিনী। হয়তো একা অনুতাপে দগ্ধ হবে তখন। রুক্মিণীকুমার তা বিশ্বাস করেন। তাঁর চেয়ে কে আর বেশী চেনে মোহিনীকে? চন্দ্রচূড় এসেছে আজ, কাল হয়তো চলে যাবে। কিন্তু তিনি তো আছেন। আর তাঁর হয়ে তাঁরই জন্যে চিরদিনের মত থাকবে মোহিনী। তাই না এমন করে দরজা খুলে রাখা! কারণ, প্রবেশ-প্রস্থানের মন্ত্র এক নয়। অথচ মোহিনী একটাই জানে। সে মন্ত্র প্রবেশের, প্রস্থানের নয়। মেয়েরা যে পায়ের তলায় খুঁজে বেড়ায় মাটি, শক্ত ভিত! বাইরে থেকে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে মরে গেলেও মোহিনী যাবে না কোথাও। যেতে পারবে না। কেবল হতাশ হয়ে, কপাল ঠুকে চোরের মত পালিয়ে যাবে চন্দ্রচূড়। সোনার খাঁচার মায়া যে কী গভীর! সে কথা কে আর বুঝিয়ে দেবে কাকে?

রুক্মিণীকুমার সামনে তাকালেন। বাঘের হাঁ-করা মুখের মত দরজাটা খোলা। কাছে-পিঠে মানুষের সাড়া নেই, শব্দ নেই। আদপেই মানুষ আছে কি-না বোঝা ভার। জলের মত স্বচ্ছ, নীলাভ আলোর ভেতরে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সবকিছুই নতুন করে মনে পড়ে। আয়নায় নিজের অস্পষ্ট মুখ কেমন অচেনা ঠেকে। দেখে চমকে ওঠেন। তাহলে বেলা কি পড়ে এল! আমি কি বুড়িয়ে যাচ্ছি নাকি, আমি? আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি? এবার নিঃশেষে মিলিয়ে যাবো তবে? দুঃখ হয়, অপরিমাণ আনন্দের মুহূর্তগুলি কোথা থেকে আসে আবার কেমন করে চলে যায়! বুকের ভেতরে ভার-ভার ঠেকে। অজান্তে জমে ওঠে অভিমান। এমন সময়ে কেউ যদি কাছে আসে তাহলে সব শোক, সমস্ত তাপ ভুলে আবার হাল্কা হওয়া যায়। কিন্তু আসে না কেউ। মোহিনী ছাড়া কে আর আছে তাঁর? অথচ সেই মোহিনী আজ কত দূরে! একবার উঠে যাবো? এই তো পাশের ঘর। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়, ধরা যায়! উঠে দাঁড়াবার সাধ হল একবার। পরক্ষণেই দাঁতে-দাঁত চেপে, হিংস্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেন রুক্মিণীকুমার। কাছাকাছি পেয়ালা-পিরিচ ভাঙার শব্দ হল কোথায়। চমক লেগে যেন পলকে চেতনায় ফিরে এলেন তিনি। ধীরে-সুস্থে নিঃশ্বাস নিতে চাইলেন। দুঃখে-কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে যে-সব দিন এখন তাদের কথা ভেবে মায়া হয়। ক্রমশঃ

মানুষগুলিকে অবধি! কোথায় যে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল সব!'

বিলাপের মত শোনায়। শোকে-সন্তাপে শীর্ণ মনে হয়। শোকার্ত জননীর মত সিক্ত, করুণ, কোমল মুখশ্রী। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। অন্তত চন্দ্রচূড় জানে না, কী কথা আর কেমন করে শুনিয়ে শান্ত করা যায়। অথচ বলতে হয়, কিছু বলা উচিত। এমনি বোকার মত অপলক চেয়ে থাকা অশোভন। কী দিয়ে বোঝাবে চন্দ্রচূড়, এই আশ্রয়, এই নিরাপত্তা আজ নির্মম, নিষ্প্রাণ কারাগারের মত অসহ্য? এই সঙ্গ, এই সুখ, এই সাহচর্য না পেলে সে হয়তো পালিয়ে যেতো। গোটা পরিবেশটাই কুৎসিত, কদর্য, কৃত্রিম ঠেকে এখন। এবার ঘরে ফেরার পালা। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাবার। চিঠি লিখতে হবে। যেমন করে হোক এই বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাবে। ভালো লাগে না, একদম ভালো লাগে না। আবার ভেসে পড়বে চন্দ্রচূড়। বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছে এখানে। আপনার বলতে সংসারে বুড়িমা ছাড়া কে ই বা আছে আর? মরে গেলে কেউ নেই। তখন সে একা। ঝাড়া হাত-পা। কী হবে টাকা দিয়ে? এত টাকা? বিয়ে করবে না চন্দ্রচূড়। করে লাভ? টাকা, প্রেম, বিয়ে তার মানে পরিপূর্ণ সংসার? অর্থাৎ সন্তান, ধোপার হিসেব, ডাক্তার, সত্যনারায়ণের সিন্নি, ছেলের পরীক্ষা, মেয়ের বিয়ে, মুদীর দেনা, অবশেষে বার্ধক্য, অবসর, সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন? ছি! গা ঘিন-ঘিন করে। স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে যদি সুখ না থাকে, স্বচ্ছলতার আড়ালে শান্তি তাহলে কী নিয়ে বাঁচে মানুষ, কেমন করে থাকে? মোহিনীর দিকে তাকালে বোঝা যায়, জীবন, ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, আরাম—সবকিছুই আপেক্ষিক। স্যাকারিনের মত মিষ্টি প্রেম! জীবনে বিতৃষ্ণা মরণেও গভীর অরুচি। তাহলে কী চায় প্রাণ, কী? ভেতরে-বাইরে একাকার এই যে অস্তিত্ব, টিকে থাকার এই যে দুঃসহ লড়াই যার ফলাফল অনিশ্চিত, সচেতনভাবে কে আর এরই মধ্যে ঝাঁপ দেয়? অথচ দেয়। দুধের মাছির মতই মানুষ এই সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি ও বিষাদ চেয়ে পাগল!

'জানেন, মাঝখানে কটা বছর আসামের জঙ্গলে ছিলুম। সেইসব পুরানো কথা ভাবতে বেশ লাগে এখন। মনে হয় তখন যেন সত্যি-সত্যি বেঁচেছিলুম।' ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে মোহিনী।

'জন্ম থেকে শহরেই কেটেছে এতদিন। নদী-পাহাড়-বনের গল্প শুনে তাই অবাক হই।' চন্দ্রচূড় বিষণ্ণ হতে চাইল। সুরে যথাসাধ্য আবেগ মিশিয়ে বললো, 'সমুদ্র দেখেছেন, সমুদ্র?'

মোহিনী ঠিক হালকা হাওয়ার হাতে কাঁপা মেলার পুতুলের মত মাথা নাড়ল।

দেখে মায়া হয়। নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। সে কি পারে না কিছুই? মোহিনীকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে? গেলে বেশ হত! রুক্মিণীকুমারকে টের পাইয়ে দেয়া যেতো, ঘটা করে না হোক, অন্তত চুপি-চুপি, স্বেচ্ছায় যেখানে খুশি চলে যাবার অধিকার মোহিনীরও আছে। মেয়ে হলেও সে যে মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্যেই আছে। পাহাড়ে-সমতলে-সমুদ্রে —বেড়াবার জায়গার তো অভাব নেই কোথাও। অভাব শুধু মানুষের। মনের মত মানুষ।

কিন্তু মোহিনী তো জানে, ইচ্ছে থাকলেই হয়ে ওঠে না সব। বাক্স সাজিয়ে বিছানা বেঁধে হুট্ বলতে যারা বেরিয়ে পড়ে তাদের জাত আলাদা, গোত্র ভিন্ন। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া রুক্মিণীকুমার। তিনি ব্যস্ত মানুষ। যে যায় সে চলে যাক। তাঁর আছে কাজ, শুধু কাজ। রক্ত আর স্বেদের বিনিময়ে গড়া এই যে সংসার, সাম্রাজ্য— এসব ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি? কথাটা মোহিনী বোঝে না। তবু বলেন, 'কে দেখবে এসব?' যেন অকপটে মোহিনীর কাছেই চাওয়া হচ্ছে পরামর্শ।

'কেন তুমিই।' রাগ না করে সহজভাবে জবাব দেয় মোহিনী।

'পাগল, ফিরে এলে দেখতে পাবে কিছুই আর আমার নেই।' তিনি হাসেন। যেন সুযোগ পেয়ে ভয়, দুঃখ, দুশ্চিন্তার কিছু খোরাক মোহিনীর হাতের কাছে এগিয়ে দেন!

শীতল, নিঃশব্দ চোখে চেয়ে থাকে মোহিনী। কঠিন কথা মুখে এলেও লাগাম টেনে ধরতে হয়। নইলে অনর্থ বাঁধে। বরং ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সঁপে দেয়া ভালো। ফারকুয়ার সায়েবের ছিল, আজ রুক্মিণীকুমারের হয়েছে। না থাকলে কোথায় পেত রাজ্যপাট? বড়জোর কাঁড়রামের হাল হোত। বাকী জীবন আর কারো গোলামি করে কাটাতে হত। তখন মোহিনীই বা যেতো কোথায়? এই সুখ, আপাত স্বচ্ছল, স্বচ্ছন্দ জীবন কি তখনো খুঁজে পেতো মোহিনী? অন্য কোথাও, আর কারো কাছে? ভাবতে পারে না, ভাবা যায় না।

'এইভাবে আরো কতকাল কাটাতে হবে জানিনে! আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।' চেঁচিয়ে বলার মত নয়। প্রায় আপন মনে বিড়-বিড় করে মোহিনী। তারপর আচমকা, জরুরি কথাটাই মনে পড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি মুখ চোখ উজ্জ্বল করে তোলে। এক ফোঁটা জড়তার আভাস না রেখে আরো ঘনিষ্ঠসুরে কথা বলে, 'একদিন গিরিডি থেকে বেড়িয়ে আসি চলুন।'

'আবার।' কথায় কপট আতঙ্ক ফুটিয়ে চেয়ে থাকে চন্দ্রচূড়।

মোহিনী কেমন হয়ে গেল। ফারকুয়ার সায়েবের বাংলোর ঘটনা মনে পড়ে। অন্ধকারে, অজান্তে, হাতে হাত রাখার দুঃসহ সেই স্মৃতি। ভোলা কি যায়? হোক না লজ্জার, ভয়ের কলঙ্কের। তবু তা-ই স্মরণীয়। যেন গোটা জীবনের পরম সঞ্চয়, পবিত্র গোপনতা। যা না পেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ইট-কাঠের সামিল হয়ে যায়। বরং এ-ই বেশ। লজ্জা, ভয় আর কলঙ্ক। যা নিয়ে বেঁচে আছে মোহিনী। বেঁচে থাকবে চিরকাল। যার ভেতরে সগর্বে, সহাস্যে টিকে আছে জগৎ।

চাইলে ক্ষতের চিহ্ন খুঁজে পাবে মাথায়। চন্দ্রচূড় ভোলে নি। ভুলতে পারে নি বলেই তো কথাটা মোহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাওয়ার অমন ছল।

মোহিনী তা টের পায়। পেয়ে ভেতরে-ভেতরে আরক্ত হয়ে ওঠে। কিছু বা উষ্ণ। ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ইসাক ছিল তাই। হয়তো কাছে-পিঠেই দাঁড়িয়েছিল কোথাও। যেন যাবতীয় ঘটনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেই রেখেছিল। ভাগ্য ভালো মোহিনীর। নইলে সাধ্য কি তার অজ্ঞান, অচেতন চন্দ্রচূড়কে নিয়ে একলা ঘরে ফিরে যাবার? নিজেকে বার-বার অপরাধী মনে হয়েছে সেদিন। আগা-গোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অসহ্য ইতরতার ছাঁচে ঢালা। মুখে রা ছিল না। কেবল ভাবতে গেলে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছে মোহিনীর। আর নিজেকে মনে হয়েছে ভয়ংকর অসহায়।

অথচ রুক্মিণীকুমার কত শান্ত, কত অবিচল। আবেগহীন গলায় তিনি কেবল বলেছিলেন, 'কিছু না। আঘাত সামান্য।'

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল কি কোথাও? সুরে অথবা ভঙ্গিমায়? হয়তো ছিল। তবু তখনকার মত হজম করে গেছে মোহিনী। কত কথাই তো এমনি করে হজম হয়ে গেছে! এ শিক্ষা মোহিনী তার মায়ের কাছে পেয়েছে। কয়-জন বড়, না সয়-জন বড়? যে সয়, সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে পারে যে সংসারে সে-ই বড়। সহ্য-শক্তির চেয়ে মেয়েদের বড় শক্তি আর নেই। কথাটা মোহিনী মানে। মনে-মনে বিশ্বাস করে। নইলে এত কাল এইভাবে নিঃশব্দে টিকে থাকা ছিল দায়। বাইরে থেকে মনে হবে, এরই নাম সুখ। মোহিনী সুখী! ভাবলে ঈর্ষা হয়। ধন-মান-প্রতিষ্ঠা—মানুষ যা চায়, যা চেয়ে আমরণ সংগ্রাম করে চলেছে না চাইতে মোহিনীর মুঠোর ভেতরে এসে গেছে সেইসব মহার্ঘ সম্পদ। কিন্তু একবার ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলে দেখা যাবে, দেখে বিস্মিত হবে সবাই, তার জীবন কত ফাঁকা ফাঁপা, শূন্য! সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। নইলে আজ আবার বাইরে যেতে চায়? প্রস্তাব শুনে চমকে ওঠার কথা। কিন্তু ঠাট্টা করে বসে চন্দ্রচূড়।

'তেমনি কিছু ঘটে যদি?'

'তাহলে আর যেন ফিরে না আসি।' মোহিনী হাসে না। বিষণ্ণ, উদাসকণ্ঠে কথা বলে।

'কে?' চমকে ওঠে চন্দ্রচূড়।

'আমরা দুজনেই।' মোহিনী যেন কাছে নেই। অন্য মনে কথা বলে। দূরাগত শব্দের মত কথাগুলি অস্পষ্ট, মলিন।

'রুক্মিণীবাবুকে জানিয়ে যাবো তো?' চন্দ্রচূড় এখন স্থির, নিশ্চিত হতে চায়।

'না জানালেই বা ক্ষতি কী?' মোহিনী এবার হেসে ফেলে। যেন সংশয় আর সন্দেহের হাত থেকে আচমকা তাকে মুক্তি দেয়। ঘনিয়ে তোলা রহস্যের জাল নিজের হাতেই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

মানসিক রোগের চিকিৎসা

আমাদের দেশেও মানসিক রোগগ্রস্তের সংখ্যা ক্রমেই যেন বাড়ছে। আচারে-ব্যবহারে সামান্য ধরনের অস্বভাবিকতা আছে, এমন মানুষকে সাধারণত আমরা মানসিক রোগগ্রস্ত বলে ধরি না। অস্বাভাবিকতা যখন এমনভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে, তার নিজের পক্ষে বা তার আশেপাশের অন্যদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হতে পারে, মাত্র তখনই তার চিকিৎসার কথা ভাবা হয়ে থাকে। মাত্র তখনই সে হয়ে ওঠে রোগী। তার আগে পর্যন্ত কিছুটা অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহার বিশিষ্ট এই মানুষটিকে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে সহ্য করে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। আসলে কিন্তু তখনো সে রোগী তবে তার মধ্যে রোগের লক্ষণ এতই কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এই রোগীকেও গোড়া থেকেই রোগী হিসেবে ধরা ভালো। গোড়াতেই চিকিৎসা হলে অল্প চিকিৎসাতেই রোগটি সেরে যায়। সব রোগের বেলাতেই একথাটি খাটে, মানসিক রোগের বেলাতে আরো বেশি।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় চিকিৎসার ব্যাপারে। শারীরিক রোগের বেলায় ওষুধ আছে, ইনজেকশন আছে, অপারেশন আছে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট এক-একটি রোগের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট এক-একটি পদ্ধতি মোটামুটি ছক-কাটা হয়ে আছে। কিন্তু রোগটি যদি মানসিক হয় তবে এখনো পর্যন্ত বলা শক্ত তা নিরাময়ের সঠিক পদ্ধতিটি কি। ঘুমের ওষুধ বা উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করে এমন কোনো ওষুধ? ইলেকট্রিক থেরাপি? নির্জন বসবাস? নাকি, ফ্রয়েডপন্থীদের রীতি অনুসরণ করে হাতড়ে হাতড়ে অবচেতন মন থেকে গূঢ় কারণটি অনুসন্ধান করা?

মানসিক রোগের কথা উঠলে ফ্রয়েডের নামটাই আগে এসে পড়ে। এ কারণে মানসিক রোগের চিকিৎসা নিয়ে সম্প্রতি যাঁরা গবেষণা করছেন, ফ্রয়েডীয় রীতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী সে-কথাটা আগে জেনে দরকার। সায়েন্স ডাইজেস্ট পত্রিকার জুন ১৯৬৯ সংখ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ার নর্থরিজ হাসপাতালের প্রধান মনোবিজ্ঞানী ডঃ আর্উইন সি কাসোফ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েই আমি ফ্রয়েড সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা উপস্থিত করছি।

এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছিলেন রাইট ভ্রাতাদ্বয়। কিন্তু একালের মহাকাশ-অভিযান সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে রাইট ভ্রাতাদ্বয় অচল। তেমনি অচল মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অতি সীমাবদ্ধ তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ও লেখার ক্ষমতা। এই পুঁজি নিয়েই তিনি একটি তত্ত্ব প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন। একালের মতো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে ল্যাবরেটরির পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। আরো অনেকের পরীক্ষাকার্যে তাঁর উপস্থাপিত তথ্যগুলো স্বীকৃতি লাভের জন্যে অপেক্ষাও করতে হয় নি। তবুও ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রয়েডীয় রীতি নিয়ে প্রচুর মাতামাতি চলছে এবং এমন একটা উন্মত্ততার সঙ্গে যে মনে হতে পারে—এ কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, একটা অন্ধ বিশ্বাস, একটা গোঁড়া ধর্মীয় মতান্ধতা মাত্র। এই উন্মত্ততা কেন? ফ্রয়েডীয় রীতিতে চিকিৎসা করে মানসিক রোগ কি সত্যি সত্যিই সেরেছে? সম্প্রতি বেশ কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করে প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। তাঁদের মতে, রোগ কিছুটা ভালোর দিকে গেছে প্রতি একশোতে [illegible] পঞ্চাশজন রোগীর বেলায়। কোনো রকম চিকিৎসা না করালেও শতকরা পঞ্চাশজনের রোগ ভালোর দিকে গিয়ে থাকে। সম্ভবত ফ্রয়েডীয় চিকিৎসায় ভালোর দিকে যাওয়া পঞ্চাশজন এই শেষের দলের।

ফ্রয়েডীয় রীতিতে চিকিৎসা যদি বাতিল করতে হয় তাহলে উপায়? এমন অন্য কোনো রীতি বা পদ্ধতি আছে কি যাতে মানসিক রোগ সারে? যাতে মানুষের আচরণ বদলানো যায়? বা, আচরণের যেসব বাড়াবাড়িকে আমরা বলি পাগলামি তা কমানো যায়?

আছে। মনোবিজ্ঞান নিয়ে যেসব ল্যাবরেটরিতে গবেষণা চলছে সেখানে নতুন নতুন পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, একালের প্রচলিত ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি থেকে যা পৃথক। একালে কি করা হত? কারও মধ্যে হয়তো কোনো বাতিক দেখা দিয়েছে, বা কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, বা ছিটগ্রস্ততা। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান চলত তার অবচেতন মনের ভিতর থেকে এই সমস্ত কিছুর গূঢ় কারণটি খুঁজে বার করার। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসক আশু লক্ষণগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামান না। কবে কোন শৈশবকালে কোন ঘটনার ছাপ রোগীর মনের ওপরে কিভাবে পড়েছিল সেটাই তাঁর কাছে তখন অনেক বেশি জরুরি খবর। আর অবচেতন মনের গভীর থেকে এই সমস্ত সূত্রগুলো খুঁজে বার করতে অনেক সময়ে পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। তারপরেও যে রোগ সারে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। লাভের মধ্যে রোগী শুধু কতকগুলো নতুন নতুন শব্দ শেখে, আর তাই জপতে জপতে মনে মনে আশা করতে পারে রোগের হাত থেকে সে রেহাই পাবে। যদি না পায় তো ধরে নেওয়া হয় যে এই রোগ সারবার নয়।

মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে অন্য যে পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেছে তার কিন্তু মনোযোগ আশু লক্ষণগুলোর দিকেই। রোগী যদি বাতিকগ্রস্ত হয়, বা কাণ্ডজ্ঞানহীন বা ছিটগ্রস্ত—তাহলে বুঝতে হবে রোগী এইভাবেই সাড়া দিচ্ছে বা এইভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠছে। তার অবচেতন মনে এই ক্রিয়ার বা সাড়ার কোনো গূঢ় কারণ আছে কিনা তা ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়া বা সাড়া হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের আচরণ যার কমা বা বাড়া নির্ভর করে পরিবেশের ওপরে। অর্থাৎ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ধরনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, অবচেতন মনের মধ্যে ডুব না দিয়েও।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

রোগীর অস্বাভাবিক আচরণের লক্ষণটি হচ্ছে এই যে সে সারাটি দিন একটা ঝাঁটা আঁকড়ে ধরে থাকে। সাবেকী কালের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে হয়তো এই ঝাঁটা আঁকড়ে থাকার পিছনে অবচেতন মনের অনেক গূঢ় কারণ আবিষ্কৃত হবে, হয়তো একটি যৌনিক প্রতীকও। একালের গবেষক কিন্তু নজর দিচ্ছেন পরিবেশের ওপরে। রোগীর প্রতি [illegible] মনোযোগ দেওয়া হয়, ঝাঁটা আঁকড়ে থাকার শাস্তি হিসেবে তাতে ছেদ পড়ুক। রোগীকে খাবার কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় ঝাঁটা আঁকড়ে থাকার শাস্তি হিসেবে তা বন্ধ থাক। [illegible] থাকলে, অর্থাৎ রোগী যখন নিজেই বুঝতে পারবে যে, ঝাঁটা আঁকড়ে থাকার জন্যে তাকে বেশ খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে তার ঝাঁটা আঁকড়ে ধরার শক্ত মুঠি খানিকটা আলগা হবেই। এমনি চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠো থেকে ঝাঁটা খসে পড়তেও পারে। তার মানে রোগীর আচরণ ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে আশু লক্ষণটির ওপরেই নজর দেওয়া হল লক্ষণটি যাতে কমে সে জন্যে আশু, কার্যকরী ক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হল লক্ষণটির গূঢ় অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে বার করবার কোনো রকম চেষ্টাই হল না।

চিকিৎসার এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে 'অপারেন্ট কন্ডিশনিং'। বাংলায় বলা যেতে পারে সক্রিয়তার মাধ্যমে অবস্থাধীনতা। কতকগুলো কাজ হচ্ছে, এর ফলে একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে—রোগী হয় অধীন। ষাট বছরেরও অধিককাল ধরে এই পদ্ধতিটি পশুদের ওপরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছিল। এখন মানুষের ওপরেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির মূল কথাটি হচ্ছে এই : পশু বা মানুষের ক্রিয়া বা প্রবণতা পরিবেশ অনুযায়ী।

গত কয়েক বছরে এই পদ্ধতি নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। প্রচুর বইও লেখা হয়েছে। গবেষকরা দাবী করছেন, এই পদ্ধতিতে বহু রোগীকে তাঁরা সারিয়েছেন—পুরোপুরি বা প্রায়-পুরোপুরি। কথা

আটকে যাওয়া, তোতলামি, পেটব্যথা, খেতে না চাওয়া, বাতিকগ্রস্ততা, যৌন-বিকার, বুড়ো আঙুল চোষা, অত্যধিক ভয় পাওয়া ও এমনি আরো কিছু কিছু রোগের লক্ষণ তাদের চিকিৎসায় দূর হয়েছে বা লক্ষণীয় রকমের চাপা পড়েছে।

চিকিৎসার এই পদ্ধতি এমনিতে চমকপ্রদ কিছু নয়, কিন্তু তার ফলাফল চমকপ্রদ। আসল কথাটা কি? একজন মানুষের মধ্যে কোনো লক্ষণ বা সাড়া প্রকাশ পাচ্ছে, এই লক্ষণ বা সাড়া প্রকাশ পেলে সে যদি অপরের কাছ থেকে বাহবা বা পুরস্কার পায় তাহলে এই লক্ষণ বা সাড়া আরো জোরদার হবে। যদি অপরের কাছ থেকে তাচ্ছিল্য বা তিরস্কার পায়, তাহলে এই লক্ষণ বা সাড়া কমবে। মায়েরা এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েই ছেলেমেয়ে মানুষ করে। ছেলেমেয়ে ভালো কাজ করলে মায়ের আদর পায়, খারাপ কাজ করলে তিরস্কার।

ডঃ কাসোলা তাঁর প্রবন্ধে দুজন রোগীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যারা তাঁর চিকিৎসায় ভালো বা প্রায়-ভালো হয়ে গিয়েছে।

প্রথম জনের বয়স বাহাত্তর, সে কিছু মনে রাখতে পারত না, একই কথা বারবার বলে চলত, তার কোনো দিক-জ্ঞান ছিল না, সর্বত্র তাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যেতে হত।

ডঃ কাসোলা প্রথমে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন রোগীর পরিবেশটি কি-রকম। তিনি দেখলেন, রোগী যখনই কোনো কথা ভুলে যায় বা ভুল দিকে চলতে শুরু করে, হাসপাতালের নার্সরা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে তাকে সাহায্য করে। রোগী যখন একই কথা বারবার বলে নার্সরা রোগীর প্রতি মমতাবশতই তার কথা মন দিয়ে শোনে। ডঃ কাসোলা বুঝতে পারলেন, হাসপাতালের নার্সরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই রোগের লক্ষণগুলোকেই আরো বাড়িয়ে তুলছে।

তিনি তৈরি করলেন একটি বিপরীত পরিবেশ। অর্থাৎ রোগী যদি বারবার একই কথা না বলে, তাহলেই তার প্রতি মমতা মনোযোগ ইত্যাদি। রোগীকে শুধু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কোনদিকে যেতে হবে, হাত ধরে নিয়ে যাওয়া নয়। রোগী যদি বারবার একই কথা বলতে থাকে, তাহলে স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করা, ইত্যাদি। চার ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, রোগী যেখানে একই কথা ঘণ্টায় বলছিল ২০০ বার, এখন বলছে মাত্র ৬ বার। অন্য প্রত্যেকটি লক্ষণের ব্যাপারে একই ধরনের উন্নতি। অর্থাৎ রোগীর আচরণ যতো বেশি স্বাভাবিক মানুষের মতো ততো তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা নাচানাচি। আর উলটোটি ঘটলেই মুখ ফিরিয়ে থাকা। এই পদ্ধতিতে কাজ হল। রোগী নিজেই স্বাভাবিক মানুষের মতো অনুভব করতে পারল, তার মনে এখন অনেক ফুর্তি, তার শরীর এখন অনেক ভালো।

দ্বিতীয় জনের রোগ অনেক বেশি জটিল। রোগীর বয়স যখন একুশ, তখন প্রেমে ব্যর্থ হবার দরুন বা অন্য কোনো কারণে সে বোবা ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যায়। তারপরে কিছুদিন ইলেকট্রিক থেরাপি ও নানা ধরনের ওষুধপত্তর চলার পরে সে হয়ে পড়ে একেবারে জবুস্থবুর মতো। এমনিভাবে ত্রিশ বছর কাটবার পরে (যখন তার বয়স একান্ন) ডঃ কাসোলার নতুন পদ্ধতির চিকিৎসায় আসে সে।

যে লোক ত্রিশ বছর ধরে কথা বলে না বা নড়েচড়ে না, তার কাছে পুরস্কারই বা কি আর তিরস্কারই বা কি! কিসে এই লোকটির আগ্রহ? টাকাপয়সা? বই? আমোদপ্রমোদ? পোশাক-আশাক? কোনোটাতেই নয়। ভালো খাবার? মানুষটি যতোক্ষণ বেঁচে আছে ভালো খাবারে তার আসক্তি থাকতেই হবে। দেখা গেল, আছেও। অতএব এই ত্রিশ বছরের—জবুস্থবু লোকটিকেও পুরস্কার-তিরস্কার বোঝাবার একটি উপায় পাওয়া গেল।

লোকটির বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক কোন স্তরে আছে তার মাপ নিতে হলে একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হয়। তা করা হল ছ' বছরের একটি ছেলে সাধারণত যে-সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, তাই দিয়ে।

'তোমার নাম কি?'

'তোমার বয়স কত?'

জবাবে লোকটি শুধু বলে 'আঁ'। তাও প্রত্যেক বারে নয়, একশো বার প্রশ্ন করলে মাত্র এগারো বার, বাকি উননব্বই বার একেবারেই নির্বিকার। আরো একটা আওয়াজ মাঝে মাঝে তার গলা থেকে বেরোয়। শুনে মনে হয় সে বলছে 'ক্যাকেম'।

নতুন পদ্ধতির চিকিৎক এই আওয়াজটির ওপরেই নির্ভর করলেন। শিশু কথা বলতে শুরু করার আগে কত অর্থহীন আওয়াজ করে: গু-গু, বু-বু, মু-মু, এমনি আরো কত কি। বাবা-মা শিশুকে কথা শেখাবার জন্যে এই আওয়াজগুলোর ওপরেই নির্ভর করে থাকেন। আরো বলবার জন্যে শিশুকে আদর করে খেলনা দেয়, তারপরে শিশু যখন সত্যি সত্যি বলে, মা, বাবা, তাকে তো একেবারে মাথায় তুলে নিয়ে নাচানাচি। এই রোগীর বেলাতেও তেমনি শুরু হল 'ক্যাকেম' থেকে। রোগী যখনই অর্থবহ কোনো শব্দ বলতে পারে বা বলার চেষ্টা করে তখনই পুরস্কার হিসেবে সে পায় ভালো ভালো খাবার।

ডঃ কাসোলার প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে এই লোকটির চিকিৎসা কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। এক চামচ খাবার নিয়ে চিকিৎসক এসে সামনে দাঁড়াতেন, তারপরে বলতেন, 'বলো—কুকুর'। রোগী যদি বলতে পারত খাবার দেওয়া হত তাকে, সঙ্গে অনেক আদর। আরো পরে কুকুরের ছবি সামনে রেখে একইভাবে শব্দটি বলানো হত। আরো পরে কুকুরের ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হত, 'এটা কি?' এমনি ১০৪ দিন চলার পরে রোগীর মুখে মোটামুটি কথা ফোটাতে পারা গেল। তাই বলে কি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিল? না, হয়নি। তবে প্রায়-সুস্থ। এখন সে অন্যদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, নিজের প্রয়োজনের কথা জানায়, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, বেঁচে থাকতে চায়।

এই গবেষণা থেকে সবচেয়ে জরুরি যে-কথাটি বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে মানুষের আচরণের ওপরে পুরস্কার ও তিরস্কারের প্রভাব। বিষয়টি জরুরি এ-কারণে যে, আমাদের জীবনের গতি সমাজের ভালো করার দিকে যাবে, না খারাপ করার দিকে, তা পুরস্কার বা তিরস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

ছেলেমেয়েরা কেন বিগড়ে যায়? এক্ষেত্রে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে বিগড়ে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের বাপ-মায়ের সম্পর্কটাই এমন যে ছেলেমেয়েরা কখনো মুখের কথাতেও বাপ-মায়ের কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পায় না, এমনকি সামান্য রকমের উৎসাহও নয়। এই বাপ-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন অনেকটা এই ভাষায়:

'সময়ের কাজ সময়ে করতে পারিস না!'

'আরেকটু গা লাগিয়ে কাজ কর না!'

'পড়তে বসতে হবে না!'

'কথায় বুঝি কান যায় না!'

সব কথাতেই শুধু 'না' আর 'না'। এই বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েরাই বিগড়ে যায়।

অন্য ধরনের বাপ-মা'ও আছেন। তাঁদের কথাবার্তার ধরন এই রকম:

'তুই যে আমার কাজে এত সাহায্য করিস এতে আমার খুব আনন্দ হয়!'

'লেখাপড়ায় তোর মন দেখে আমার ভালো লাগে!'

'তোর খুব বিচার-বিবেচনা হয়েছে রে!'

ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে না বলে যে-সব বাপ-মা আক্ষেপ করে থাকেন তাঁরা একবার ভেবে দেখুন ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁরা নিজেরা কি ধরনের আচরণ করে থাকেন। ছেলেমেয়েরা যদি অনবরত শুধু 'না' 'না' শুনতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কাছেও সে 'না' হয়ে যায়। এমনকি শেষপর্যন্ত সৎ মানুষ হিসেবেও 'না'।

গোড়ার কথাটা আরও একবার বলি। পরিবেশটি ভালো হওয়া চাই। পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা চাই, তিরস্কারেরও। অতি বিগড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েকেও ঠিকমতো পুরস্কার ও তিরস্কার দিয়ে শোধরানো যায়। মানসিক রোগগ্রস্তকেও সারিয়ে তোলা চলে। আবারো বলি, মানসিক রোগের শিকার যাতে না হতে হয়, সেজন্যে গোড়া থেকেই উপযুক্ত পরিবেশটি গড়ে তুলুন।

—অয়স্কান্ত

মুখর কুয়াশা

হেনা হালদার

হোয়েন দ্য গর্ল ইন য়োর আর্মস
ইস দ্য গর্ল ইন য়োর হার্ট,
দেন ইউভ গট এভরিথিং......

অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যেতে যেতে যেন বিদ্যুতের শক্ খেল জে সেফ সেবাস্টিয়ান। পা দুটো আপনা থেকেই অচল হয়ে গেল ওর। লভলক এভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল ও। সদর বাজার যাবার পথেই সেণ্ট অ্যালয়সিয়স চার্চে যাবার জন্যে। প্রতি রবিবার সকালে ও ওখানেই যায়। গানটা যেন অচমকা ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে সেবাস্টিয়ানকে। রাস্তার দুধার দিয়ে সারি সারি ল্যাবার্ণামের গাছ। মাথার ওপর সবুজ জাফরী থেকে ঝুলেছিল সোনালী আঙুরের মতন থোকা থোকা ফুল। এপ্রিলের ঝিরি-ঝিরি হাওয়া হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল মুখে-চোখে। ভ্রূ কুঁচকে চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল সেবাস্টিয়ান। রাস্তার ওপারের কিংস গার্ডেন পার্কের কোণায় একটা বেঞ্চিতে ওদের দেখতে পেল সে এবার। একটি বছর-ষোলোর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে আর তার সঙ্গে সামান্য বড় একটি ছেলে বসেছিল। ওরা গান গাইছিল। মেয়েটির তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলা। ছেলেটার একটু নাকি-নাকি। খুব সম্ভব ছেলেটি ওর বয়-ফ্রেন্ড। সেবাস্টিয়ান অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দেখল। মেয়েটার পরনে সবুজ জীনস্ আর-ক্রাল কার্ডিগান। কাঁচ অমিষ্ট রক্ত মুখটাকে চেস্টনাট ব্রাউন চুলের গোছায় ঘিরে রেখেছে। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ তাকে নতুন করে মিতুলকেই মনে পড়িয়ে দিলে। মিতুল, পারমিতা চক্রবর্তী। এক সময় সেবাস্টিয়ান আর মিতুল একসঙ্গে সেণ্ট অ্যালয়সিয়াস কলেজে পড়েছিল। সে কবে? কতদিন আগে? ঠিক করে মনে করতে পারছিল না সেবাস্টিয়ান। মিতুল কোথায় গেল, কী করছে এখন, এসব প্রশ্ন বন্ধ ঘরে গুবরে পোকার মত ঘুরপাক খেতে খেতে দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটছিল ওর মস্তিষ্কের মধ্যে।

জোসেফ সেবাস্টিয়ান নেটিভ ক্রীশ্চান [illegible] [illegible] মাত্রাকায় সুপুরুষ ছিল।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ওকে রোমিও বলে উল্লেখ করত। স্বাস্থ্য ভাল ছিল ওর। চমৎকার ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারত। আর ভরাট পুরুষালি গলায় যখন-তখন গান ধরত : 'হোয়েন দ্য গার্ল ইন য়োর আর্মস ইস দ্য গার্ল ইন য়োর হার্ট ইউ'ভ গট এভরিথিং'......।

মিতুল চক্রবর্তী ছিল বাঙালি। একসঙ্গে বি-এ পড়ছিল ওরা যদিও, তবু মিতুল বয়সে বছরখানেকের ছোটই ছিল। চাঁদের মতন ছোট্ট কপাল ঘিরে কুচোকুচো চুল, টিকোলো নাক, টোল ফেলা গাল আর ফুলো-ফুলো ঠোঁটে ওকে এত মিষ্টি লাগত যে চোখ ফেরাতে ভুলে যেত সেবাস্টিয়ান। ভালো ড্রামা করতে পারত মিতুল। ইণ্টার কলেজ ড্রামা কম্পিটিশনে পুরস্কার পেয়েছিল। 'শী স্টুপস টু কনকর'-এ ওর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল জোসেফ সেবাস্টিয়ান। পরে অবশ্য ওরা দুজনে একত্র অনেকগুলো ড্রামা করে রোমাণ্টিক-জুটি বলে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল কলেজে। মিতুলকে ভাল লাগতে আরম্ভ করেছিল ওর। একদিন বিকেল বেলা কি একটা নোট দেবার অছিলায় ও মিতুলদের বাড়ী গিয়েছিল। ওর বাবা সনাতন চক্রবর্তী ওকে বসতে পর্যন্ত বলেননি। নাম শুনে তীক্ষ্ন চোখে চশমার ভেতর থেকে ওর আপাদমস্তক জরিপ করতে করতে নাক কুঁচকে বলেছিলেন 'ক্রীশ্চন?'

সেবাস্টিয়ান স্বীকার করেছিল।

উনি বিরক্ত-ভরা গলায় বলেছিলেন, 'মিতুলের সময় নেই এখন। আজ আমার এখানে জগদ্ধাত্রী পুজো আছে। মিতুল যোগাড় নিয়ে ব্যস্ত আছে।' বলেই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল সেবাস্টিয়ান। তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। পরে কলেজে দেখা হলে সে মিতুলকে এ-বিষয়ে কিছু বলেনি। কিন্তু ওর কেমন মনে হয়েছিল যে, মিতুল সব জানে। মিতুলের জন্যে একটা জোয়ালো ভালবাসা ওর বুকের কানা পর্যন্ত আস্তে আস্তে উঠে আসতে শুরু করেছিল। এই ব্যাপারের পর জোর করে সেটাকে দমিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল সেবাস্টিয়ান। কিন্তু মিতুল-ই তা হতে দেয়নি।

কলেজের পর সেদিন যখন চুপিসাড়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে আসছিল সেবাস্টিয়ান, মিতুল ওকে ধরে ফেলেছিল। নিজের [illegible]

'চল জো, রীজ রোড ধরে সীতা পাহাড়ের ওপর চড়ব আজ। কতদিন ওদিকে যাওয়া হয় না।' অনেক ওজর আপত্তি তুলেছিল সেবাস্টিয়ান কিন্তু ফল হয়নি কিছু। শেষ-পর্যন্ত ওর সঙ্গেই যেতে হয়েছিল। সীতা পাহাড়ের ওপর একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে বসেছিল ঘাসের ওপর। একরাশ হলুদ রঙের ডেইজি ফুল ফুটেছিল এধারে-ওধারে। আকাশে নানান রঙের পোঁচ পড়ে বিমূর্ত ছবি তৈরী হচ্ছিল। সিলভার-ওকের মাথায় একরাশ চড়ুই পাখি ঝুটোপুটি করছিল। হঠাৎ-হঠাৎ দমকা হাওয়া মিতুলের আঁচল ধরে টান মারছিল। মিতুলের কাঁচ অলিভ রঙের মুখে বড় বড় পালক ছাওয়া টলটলে চোখদুটো হাসছিল। সেবাস্টিয়ান ইচ্ছে করেই অনেকটা তফাতে বসেছিল। মিতুল ওর টসটসে নরম আঙুলে ছোট ছোট কাঁকরের ঢেলা তুলে একটার পর একটা ওর দিকে ছুঁড়ছিল। আর চোখের কোণে হাসছিল। একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসছিল। ফিনফিনে কালো শিফনের মত চরাচরকে ঢেকে দিচ্ছিল। হঠাৎ-ই এক সময় মিতুল ওর খুব কাছে সরে এসেছিল। সেবাস্টিয়ানের ডান হাতটা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে অদ্ভুত কাতর দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেবাস্টিয়ানের বুকের মধ্যে কোথায় টান পড়ছিল। একটা যন্ত্রণা বোধ করেছিল সে। মিতুলের হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বলে উঠেছিল, 'মিতুল, দিস শুড নট গো অন এনি লঙ্গার। উই মাস্ট—'। ওকে

কিছু বলতে দেয়নি মিতুল। ওর ঠোঁটের ওপর নিজের রুমালশুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিল। একটা ফিকে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করেছিল সেবাস্টিয়ানের রক্তে। ঝিম-ধরানো নেশায় অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল ওরা। তারপর মিতুল ওর মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে নিজের লম্বা লম্বা ফর্সা আঙুল চালিয়ে এলোমেলো করে দিতে দিতে বলেছিল, সেই গানটা শোনাবেনা জো?—'হোয়েন দ্য গার্ল ইন য়োর আর্মস ইজ দ্য গার্ল ইন য়োর হার্ট, ইউ'ভ গট এভরিথিং'......। সেবাস্টিয়ান গেয়েছিল। মিতুল ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠেছিল :

'হোয়েন ইউ আর হোলডিং দা ড্রীম
ইউ'ড বীন ড্রীমিং ইউ'ভ হেল্ড
ইউ আর এ্যাজ রীচ এ্যাজ কীং'—।

গানের শেষে মিতুলের মাথা নেমে [illegible] ওর [illegible] সেবাস্টিয়ান ওর সমস্ত

দিনের কামনা, রাতের স্বপ্নকে দু হাত ভরে ছুঁয়েছিল। বাড়ী ফেরার পথে দুজনে জোর সাইকেল-রেস চালিয়েছিল। কখনো মিতুল এগিয়ে গিয়েছিল, কখনো সেবাস্টিয়ান। হঠাৎ-ই এপ্রিলের আকাশ কালো করে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছিল। হু-হু হাওয়ার বিপরীতে সাইকেল চালাতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল ওদের। বৃষ্টির ফোঁটা মিতুলের থোকা থোকা চেস্টনাট চুলে বড় বড় মুক্তোর টায়রা পরিয়ে দিচ্ছিল। সেবাস্টিয়ানের স্নায়ুতে স্নায়ুতে বৃষ্টির স্বাদ ঘন হয়ে কাঁপছিল। হাওয়ার ঝাপটা থেকে থেকে যেন বেহালার ছড়ে সোপ্রানোর আর্তনাদ তুলছিল। ঝড়বৃষ্টির তুমুল মাতামাতির মধ্যে গান গাইতে ভীষণ ভাল লাগছিল সেবাস্টিয়ানের।

'প্লীজ হেল্প মী অ্যায়াম ফলিং
ইন ল্যভ উইথ ইয়ু......
ক্লোজ দ্য ডোর টু টেমটেশান
ডোন্ট লেট মী ওয়াক থ্রু'......।

দুজনের হাসির হার্মনি বাতাসকে চিরে চিরে বাজছিল। ক্যাণ্টনমেণ্টের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সেবাস্টিয়ান হঠাৎ থেমে পড়েছিল। সাইকেল থেকে নেমে মিতুলকেও হাত ধরে নামিয়েছিল। দুজনে 'রীস্টো'র ঢুকে কফি আর হ্যামবার্গার খেয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিল সেবাস্টিয়ানের। এই আশ্চর্য সুন্দর দিনটাকে অন্য সব দিনের থেকে আলাদা মনে হয়েছিল। রুপোলি পাতে মোড়া চকলেটের মত দিনটাকে নিয়ে যেন লোফালুফি করা যায়।

তারপর সাত-আটদিন আর দেখা হয়নি মিতুলের সঙ্গে সেবাস্টিয়ানের। মিতুল কলেজে আসেনি, সেবাস্টিয়ানও ভরসা করে ওদের বাড়ী যেতে পারেনি। প্রায় এক সপ্তাহ বইয়ের দোকানে বই খুঁজতে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল মিতুলের। সেবাস্টিয়ান মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। মিতুল সোজা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরেছিল। বলেছিল, 'আমার সঙ্গে এস জো, কথা আছে।' মিতুলের হাতে হাত দিয়ে সমস্ত রাগ অভিমান গলে গিয়েছিল সেবাস্টিয়ানের। নিঃশব্দে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমেছিল। মিতুলের শুকনো মুখ কেমন রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। চোখদুটোতে বিষন্ন সজলতা। কাছাকাছি একটা পিপুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মিতুল ওর চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত করুণ গলায় ফিসফিস করে বলেছিল,

'সেভেন লোনলি ডেজ মেক ওয়ান
লোনলি উইক
সেভেন লোনলি নাইটস মেক
[illegible] লোনলি [illegible]

সেবাস্টিয়ান আর রাগ করে থাকতে পারেনি। মিতুলকে কাছে টেনে নিয়েছিল। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বুঝেছিল মিতুল কাঁদছে। মিতুলের মুখেই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনেছিল সেবাস্টিয়ান। সেদিন নাকি দেরী করে মিতুল বাড়ী ফেরায়, মিতুলের বাবা কলেজে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে দারোয়ান ও অন্য ছেলেদের কাছে শুনেছেন যে, মিতুল অনেকক্ষণ আগে সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে চলে গেছে। মিতুল বাড়ী ফিরে বাবাকে গেটের সামনে হন্তদন্ত হয়ে পায়চারি করতে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওর বাবা কোনো কথা না বলে ওর চুলের গোছা ধরে হিড় হিড় করে ওকে ঘরে টেনে এনে ঠাস ঠাস করে ওর গালে মুখে চড় মেরেছেন। খৃস্টান ছেলের সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বেড়ানোর জন্যে যাচ্ছে-তাই করে বকেছেন, শাসিয়েছেন। তারপর একটা ঘরে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়েছেন। মিতুল খুব কেঁদেছে, খায়নি। কিন্তু বাবার মন ভেজেনি। সেদিন থেকে বাবা ওর প্রতি কড়া নজর রেখেছেন। কলেজের ত' ছুটিই হয়ে যাচ্ছে, এরপর কোথায় কিভাবে ওদের দেখা হবে ভেবে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল মিতুলকে। সেবাস্টিয়ান চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মিতুলকে কোনই সান্ত্বনা দিতে পারছিল না। গলায় যেন একটা ডেলা আটকে আছে বোধ হচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। মিতুল ওকে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিল 'জো, ওণ্ট য়ু ফাইণ্ড আউট এ ওয়ে? ইউ নো আই কাণ্ট লীভ উইদাউট সীয়িং য়ু?'

কোন জবাব দিতে পারেনি সেবাস্টিয়ান। একুশ বছরের বেকার যুবক কোন্ সাহসে ঝুঁকি নেবে? মিতুল ওকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, 'আই লাভ ইউ জো, আই বীলং টু ইউ—ডোণ্ট য়ু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

—'গিভ মী সম টাইম মিতুল, গিভ মী সম টাইম'... তোমাকে একটা বছর ত' অপেক্ষা করতেই হবে।' বলেছিল সেবাস্টিয়ান। 'গ্র্যাজুয়েট না হলে কে চাকরী দেবে আমায়?' মিতুল আর কিছু বলেনি। চোখ মুছে ক্লান্ত পায়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

জুলাই মাসে কলেজ খুলতে আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি সেবাস্টিয়ানের। মিতুলের বাবা ওর ট্রান্সফার করিয়ে হোম সায়েন্স কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। একটা বছর খুব কষ্ট করে নিজেকে সংযত রেখেছিল ও। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে পাশ করতে পারেনি, এমনকি দ্বিতীয় বিভাগেও নয়। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে তৃতীয় বিভাগে নাম এসেছিল ওর। মিতুল দ্বিতীয় বিভাগে ভালভাবে পাশ করেছিল। সেবাস্টিয়ান কিন্তু অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও একটা চাকরী জোটাতে পারেনি।

মিতুল লুকিয়ে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, 'বাবাকে আর ত' ঠেকিয়ে রাখা যাবে না জো, উনি হন্যে হয়ে আমার জন্যে পাত্র খুঁজছেন। তুমি কি কিছুই করবে না। প্লীজ, প্লীজ ডু সামথিং।' কিন্তু সেবাস্টিয়ান কিছুতেই একটা চলনসই কাজও জোটাতে পারেনি। একটা সামান্য চাকরী, একটা ছোট্ট বাড়ি, একটা সুন্দর সংসারের স্বপ্নগুলো ক্রমশই ওর মুঠো থেকে খসে পড়তে শুরু করেছিল। কানে এসেছিল, মিতুলের বাবা গান-ক্যারেজ ফাক্টরীর কোনো চাকুরে ছেলের সঙ্গে মিতুলের বিয়ের ঠিক করেছেন। হৃদপিণ্ডটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষার দিনগুলো কেটেছে সেবাস্টিয়ানের। কোনো সুরাহা করতে পারেনি কোনোভাবেই। মিতুলের পাকাদেখার আগের দিন হঠাৎ-ই মাথার শিরা ছিঁড়ে গিয়ে বাথরুমে পড়ে মারা গেলেন মিতুলের বাবা। মা ও ছোট দুটি ভাইবোনকে নিয়ে সর্বনাশের খাদের মুখে যেন দাঁড়িয়েছিল মিতুল। প্রেম-বিয়ে-ঘরকন্নার স্বপ্ন সব যেন ঝড়ের মুখে কুটোর মতই উড়ে গিয়েছিল ওর। আর সেবাস্টিয়ান শুধু দিনের পর দিন সাক্ষীগোপালের মত দেখেই গিয়েছিল। কিছুই কাজে লাগেনি ওদের। এরপর মিতুলকেও চাকরীর আশায় দিনের পর দিন ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। ওর শুকনো মুখ অগোছালো বেশবাস অপ্রসাধিত রুক্ষ চুলের গোছায় ওকে খুব ক্লান্ত বিষণ্ণ আর করুণ দেখাত। সেবাস্টিয়ানের রক্তে নিষ্ফল যন্ত্রণার ঢেউ ভাঙত সারাক্ষণ। কিন্তু তার নিজের অবস্থাও ত' প্রায় একই রকম। কিছুদিন আগে তার বুড়িমা মারা গেছেন। সে একটা গলির মধ্যে ছোট একটা ঘরে একা একা থাকে আর চাকরী খুঁজে বেড়ায়। কোনোদিন দু' টুকরো রুটি জোটে, কোনোদিন বা শুধু চা খেয়েই কাটে। চাকরীর আশাও ক্রমশ করে করে নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তবু এভাবেও কোন একটা সান্ত্বনার সুখ পাচ্ছিল সেবাস্টিয়ান মনে মনে। মিতুল আর সে যেন দারিদ্র্যের চরম আঘাতে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে বলে মনে হত ওর। যেন ওরা এক পালকের পাখি। একই ডালে বাসা বাঁধার জন্যে হন্যে হয়ে খড়কুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মিতুল কিন্তু হঠাৎ-ই বেশ ভালো একটা চাকরী পেয়ে গেল। একটা নামকরা বিদেশী সিগারেট কোম্পানীর ম্যানেজারের সেক্রেটারি। মিতুলের সুঠাম যৌবনশ্রী আর চোস্ত ইংরেজী বুলি এবং চালচলনের স্মার্টনেসই বোধহয় এর সঙ্গত কারণ। ওর বস্ অনীশ চন্দ্রভারকর খুব অল্পদিনের মধ্যেই ওর কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।

এরপর ক্রমশই ওদের দেখা-সাক্ষাৎ বিরল হতে হতে প্রায় বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। সেবাস্টিয়ান তখনো প্রায় পাগলের মত চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ডুবন্ত মানুষের বাঁচবার শেষ অবলম্বনের মত যে-কোনো চাকরী। ওর এলোমেলো রুক্ষ চুল মুখভর্তি গোঁফদাড়িতে ওকে অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখাতে শুরু করেছিল। এই সময় সে নেপিয়ার টাউন থেকে ক্যানটনমেণ্টে যাবার রাস্তার ধারে কালভার্টের ওপর সারাদিন বসে থাকত মিতুলকে দেখবার জন্যে। সকাল ঠিক সাড়ে দশটায় মিতুলকে নিয়ে চন্দ্রভারকরের কালো গাড়ীটা নক্ষত্র বেগে ছুটে যেত অধেরদের রেডের দিকে। বিকেল পাঁচটায় আবার দেখা যেত ওদের গাড়ীতে পাশাপাশি, বাড়ী ফেরার মুখে। মিতুলের চেহারায় লালিত্য আর শ্রী আবার ফিরে আসছিল। গায়ে মাংস লাগছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাজ-পোশাক প্রসাধনে পারিপাট্য। মিতুলের ঘাড়ের ওপর দোলানো চুলের থোকাগুলো মাথার ওপর বিরাট উঁচু খোঁপায় বন্ধ হয়ে ওকে যেন অন্য রকম দেখাত। একটু বয়স্ক আর সম্ভ্রান্ত। আবার চোখের সানগ্লাস ঠোঁটের লিপস্টিক ও হাতকাটা জামায় কেমন একটু যেন উদ্ধত আর অহংকারী। মোটের ওপর এই নতুন মিতুলও ওকে টানছিল অমোঘ আকর্ষণে। মিতুল যেমন তাড়াতাড়ি ফ্যাশনের আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদে উঠে যাচ্ছিল, সেবাস্টিয়ান তেমনি দ্রুতগতিতে নেমে আসছিল পথের ভিখিরির পর্যায়ে। ব্যবধান দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছিল।

তারপর একদিন নর্মদা রোড দিয়ে যেতে যেতে ওর চোখে পড়েছিল মিতুল

আর চন্দ্রভারকর গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। মিতুলের আঙুলে ধরা জ্বলন্ত সিগ্যারেট। সর্বাঙ্গক্ষত বেশবাস নিয়ে নির্লজ্জ ভঙ্গীতে সে হাসিতে ভেঙে পড়েছে চন্দ্রভারকরের গায়ে। শরীরে যেন সাপের ছোবল খেয়েছিল সেবাস্টিয়ান। রাস্তার ধুলোতেই বসে পড়েছিল। অনেকক্ষণ উঠতে পারেনি। মনে হয়েছিল মিতুলকে উদ্ধার করার কোন রাস্তাই আর খোলা নেই ওর চোখের সামনে। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে বাড়ী ফিরেছিল। তিন-চারদিন কোথাও আর বেরয়নি। ময়লা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভারী গলায় গেয়েছে :

'হোয়েন দ্য গর্ল ইন য়োর আমস
ইজ দ্য গর্ল ইন য়োর হার্ট
দেন হাউভ গট এভরিথিং—'

ওর মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন সোনার ক্রশটা বিক্রী করে প্রচুর মদ খেয়ে সারারাত চেঁচিয়েছে 'নো নো দ্য গর্ল ইন য়োর হার্ট ইজ নেভার ইন য়োর আর্মস—নেভার নেভার—।' তেড়ে জ্বর এসেছে ওর। বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে চমৎকার সব আসবাব সাজানো ছোট্ট বাড়ী, ফুলের টব বসানো বারান্দা, কীচেন, প্যান্ট্রি। ওর আর মিতুলের সংসার। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মাতালের মত কান্ডজ্ঞানহীন দাপটে গেয়ে উঠেছে :

'হোম ইজ হোয়ের দ্য হার্ট ইজ
মাই হার্ট ইজ এনিহোয়ের ইউ আর।

প্রায় আসখানেক অসুস্থতা ভোগের পর বিছানা ছেড়ে উঠেছে সে। দারিদ্র্য তখন অজগরের মতন ওকে সম্পূর্ণ গিলতে আরম্ভ করেছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে আস্ত কাপড় নেই, রাস্তায় পাওনাদারের ভিড়। শুধু লুকিয়ে বেড়ানো। কেবল লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া। কোনও আশা নেই, নেই কিছুর প্রতীক্ষা। বর্তমান ভবিষ্যৎ সব জুড়ে অতল অন্ধকার। সকাল হলেই ময়লা ছেঁড়া শার্ট পাৎলুন পরে নির্দিষ্ট কালভার্টের ওপর বসে থাকা মিতুলের প্রত্যাশায়। গাড়ীটা দেখলেই গেয়ে ওঠে : 'হোয়েন দ্য গর্ল ইন য়োর আর্মস, ইজ দ্য গর্ল ইন য়োর হার্ট, ইউভ গট এভরিথিং—'। হাবেভাবে বেশ কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। তারপর একদিন হঠাৎই কথাটা কানে তুলে দিল কেউ। মিতুল চক্রবর্তী আর চন্দ্রভারকারের এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে। একমাসের মধ্যেই বিয়ে হবে। নর্মদা ক্লাবে এই উপলক্ষে চন্দ্রভারকার দিচ্ছে বিরাট পার্টি। যে আদিম অনুভূতিটা মনের সুড়ঙ্গের মধ্যে নির্বিষ সাপের মত মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ-ই যেন সেটা ফণা তুলে জেগে উঠল। একটার পর একটা পরিকল্পনার খোলস ছাড়তে ছাড়তে নতুন বিষ সংগ্রহ করে জোরালো হয়ে উঠল রক্তের মধ্যে।

তারপর সেই সর্বনেশে বিকেল। ক'দিন-ই সেবাস্টিয়ানকে কালভার্টের ওপর বসতে দেখা যায়নি। মিতুলের অফিসের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করেছে সে। কাউকে দেখলেই সরে পড়েছে। মিতুল আর চন্দ্রভারকর বিয়ের কেনাকাটা তোড়জোড় নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল। সেদিন বিকেলবেলা ওরা ক্যান্টনমেন্টের রাস্তার ধারে গাড়ী দাঁড় করিয়ে যখন একটা দোকানে যাচ্ছিল, সেই সময় পরপর দুটো গুলীর মতন অব্যর্থ লক্ষ্যে এ্যাসিড বাল্ব এসে মিতুলের মুখে আর গায়ে লেগেছিল। চিৎকার করে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়েছিল মিতুল। চন্দ্রভারকরের চেঁচামেচিতে চারিদিক থেকে লোক জড় হয়েছিল। পালাবার চেষ্টা করেনি সেবাস্টিয়ান। কে একজন তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। সংজ্ঞা হারিয়েছিল সেবাস্টিয়ান। তারপর তার আর কিছু মনে নেই। প্রায় দু'বছর একটানা স্বপ্নাচ্ছন্নতায় কেটে গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সে নাগপুরের মেণ্টাল হোম থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে এসেছে। এখানে এসেও কোনও ঘটনা তার মনে পড়েনি। মিতুলকেও সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। সেণ্ট অ্যালয়সিয়েস কনভেণ্টের ফাদার অ্যানড্রুজ ওকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নির্বিকার নির্মুক্ত মন নিয়ে এক'দিন চমৎকার কেটেছিল তার। যদি না অজ হঠাৎ ঐ গানটা কানে আসত সেবাস্টিয়ানের। ও জানে এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে কানের কাছে ফাটা রেকর্ডের মত একটানা ঐ গানটা বাজতেই থাকবে। যতক্ষণ না আবার তার স্মৃতিশক্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অস্পষ্ট অতীতের কুয়াশা ভেদ করে একটি মুখ ক্রমশই মুখর হয়ে উঠতে উঠতে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এক কুম্ভীপাকের অতলে।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

শরীর খারাপ বাবু।

আসলে কি যে তার হয়েছে কিছুতেই বলতে চায় না—শুধু বলে শরীর খারাপ।

আমি তখনই মধুবাবুর দলের প্রোডাকশন সরকারী যাদলকে ডেকে পাঠালুম। তাকে বললুম বংশীকে কোনো একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে তাকে ডাঃ সালধানার কাছে নিয়ে গেল। ডাঃ সালধানা তাকে পরীক্ষা করে বললেন: এর কোনো অসুখই হয়নি।

বুঝলুম ব্যাপারটা। কিছুদিন থেকেই সে বাড়ী ফিরে যাবার কথা বলেছিল—এইবারে সে ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে। যাই হোক আমি সংগে সংগে তার পরদিনই বি এন আর বম্বে মেলের টিকিট কেটে দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম।

এদিকে একগাদা চিঠি এসে পড়ে আছে কলকাতা থেকে, বেশির ভাগই সব থিয়েটার-মালিকদের এবং বন্ধু-বান্ধবদের। সকলেই তাঁদের থিয়েটারে যোগদানের জন্য আবেদন-নিবেদন করেছেন। গণদেবকে চিঠি লিখেছিলাম ওখানকার সব থিয়েটারের অবস্থা কি জানাবার জন্যে। আমি ভেবে দেখলাম ওখানকার যা অবস্থা বর্তমানে তাতে যার দিকেই তাকাব সেই সানন্দে আমাকে লুফে নেবে এবং আমি যা দাবী করব তাতেই রাজী হবে। শুধু একমাত্র প্রবোধ গুহ মশায় একেবারে চুপচাপ রইলেন—তিনি একটি কথাও আমাকে লেখেন নি। শুনলাম তিনি কোনো কোনো লোককে বলেছিলেন যে ও তো এখন নীলামে উঠছে—নীলামে ডাকার মত ক্ষমতা আমার নেই। তারচেয়ে ও ফিরে আসুক, দেখি কোথায় যোগদান করে, দর কোথায় ওঠে, তারপর 'নাইট' হিসেবে আমি ওকে 'বুক' করব।

এদিকে আমি ফিরে এসেই মধুবাবুকে গিয়ে বললাম—এবার যেটুকু কাজ বাকী আছে তা শেষ করে ফেলতে, কারণ অবিলম্বে কলকাতায় ফেরা আমার খুব দরকার। মধুবাবুও আমার অবস্থা বুঝে আমার সেটগুলি সংগে সংগে ফেললেন। আমি মোটামুটি একরকম জানতে পারলাম যে দিন দশেকের মধ্যেই আমি বোম্বাই-এর পাট ওঠাতে পারব।

বম্বেতে এই ৩।৪ মাসে প্রচুর ফার্নিচার এবং টুকিটাকি অনেক কিছু কিনেছিলাম। সেই সমস্ত জিনিস ঠিকমতো প্যাক করে পাঠানো তো এক মহা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। কিন্তু ওখানকার লোকেরা আমায় বললে যে প্যাকিং করার জন্যে এখানে আলাদা লোক পাওয়া যায়। তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে তারা সুন্দরভাবে প্যাক করে দিয়ে যাবে। সুতরাং আমি বম্বে থেকে রেলওয়ে পার্শেল করলুম শালিমার স্টেশনে—এখান থেকে আমার দারোয়ান বাসদেব এসে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

৯ নভেম্বর শরীরটা ভাল ছিল না— একটু পেটের গোলমাল হয়েছিল। এই অবস্থাতেই সকালে মিঃ বোসের ফ্ল্যাটে গেলুম—কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলুম না সেখানে। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম।

সেদিন শ্যুটিং ছিল, বাধ্য হয়েই স্টুডিও যেতে হল। অবশ্য ডাক্তারের কাছে গিয়ে কিছু ওষুধ খেয়ে খানিকটা আরাম পেলুম। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হল। এখন তো আমার তাড়া, সুতরাং স্টুডিওতে আমার অনুপস্থিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শ্যুটিং রোজই চলতে লাগল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

একদিন তখনকার দিনের হিন্দি চিত্র-জগতের নামকরা অভিনেতা মজহর খাঁ এলেন সেটে শ্যুটিং দেখতে। এই মজহর খাঁ মানুষটি ছিল ভারী সুন্দর। অনেকদিন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করেছেন। 'সোনার সংসার'-এ আমি যে ভূমিকাটি করেছিলাম—স্যর শঙ্করনাথের—সে ভূমিকাটি তিনি করেছিলেন হিন্দিতে। সম্প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজ শেষ করেছিলেন। আসলে তিনি এসেছিলেন শিল্পী নরামপায়ার কাছে কি একটা কাজে—এই ফাঁকে আমার সংগেও দেখা হয়ে গেল। এই দিলখোলা লোকটির সংগে আলাপে বেশ খানিকটা সময় কাটানো গেল।

এই দিনই নরামপায়া বললেন বোম্বাই-য়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা তারাপোরওয়ালা'র একটি বুক ক্লাব আছে। এই ক্লাবের মেম্বার হলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় সব বই পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, আমি বুক ক্লাবের সভ্য হয়েছিলাম এবং অনেকদিন পর্যন্ত সভ্য ছিলাম।

একটানা আট দিন শ্যুটিং করার পর বিশ্রাম পেলুম ১৭ তারিখে। সেদিন কোন কাজ নেই।

এ ক'দিন ধরে কলকাতার থিয়েটার কর্তৃপক্ষগুলির চিঠি এবং টেলিগ্রাম এসে জমা ছিল, সকালবেলায় সেইগুলির সব উত্তর দিলাম।

প্রভাত সিংহ রংমহলের তরফ থেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে আমাকে লিখেছিল—শেষপর্যন্ত তার অনুরোধেই রাজী হয়ে গেলাম। কোনোরকম চুক্তিপত্র নয়—শুধু একটা স্বীকৃতিপত্র—যে প্রতিদিন অভিনয় পিছু আমি 'এত' করে নেব। তাতেই তারা রাজী হয়েছিল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর আমার স্ত্রী বেরিয়ে পড়লাম ইলেকট্রিক ট্রেনে করে জুহু বীচের দিকে। এই সাগর-সৈকতটি বেড়াবার পক্ষে ভারী মনোরম। ওখান থেকে চলে গেলাম সান্টাক্রুজ বিমানবন্দরে। সেখান থেকে বেশ খানিকটা ঘুরে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরে এলাম।

১৯ তারিখে 'রাজনর্তকী'র শ্যুটিং শেষ হল। চিত্রনাট্য অনুযায়ী আমার যা কাজ ছিল কাগজে-কলমে তা শেষ হল। কিন্তু মধুবাবুর দায়িত্বের কথা ভেবে আমার একটু ভাবনাও হল। ভাবনা কেন হল—সে কারণটা একটু খুলেই বলি।

আমি তো কাজ শেষ হয়েছে বলে ওঁরা জানালেই আমি কলকাতা চলে আসব—কিন্তু যদি কোন কারণে আমাকে আর একদিনের জন্যও প্রয়োজন হয় তখন তো আর আমায় পাওয়া যাবে না। কারণ, আমি একবার কলকাতা চলে এসে কোন থিয়েটারে যোগদান করলে আর তো সেখান ছেড়ে যেতে পারব না। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, সম্পাদনার পর দেখা গেল কোন কোন শিল্পীর ২।১টা 'শট' (যাকে বলে এডিটিং-শট) হলে ভাল হয়, নয়ত যেন একটা ধাক্কা আসছে। তখন শিল্পীকে ডেকে নিয়ে এসে সেই শট নেওয়া হয়। এ তো আমরা এখানে হামেশাই দেখেছি।

আবার এমনও হয় যে, শেষ মুহূর্তে হয়তো চিত্রনাট্যের কিছু অদল-বদল হল, ফলে কিছুদিন শ্যুটিং-এর দরকার হয়ে পড়ল—তখন?

অর্থাৎ সব দিক বিচার-বিবেচনা করে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে ছাড়তে হচ্ছে—এ একটা সাংঘাতিক দায়িত্বের ব্যাপার। [illegible] দু-একটা রিটেক শটের ব্যাপার হলে [illegible] [illegible] একদিন দিয়ে [illegible]

আমি বললাম : ঠিক আছে, নিয়ে এস সে লোককে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এনে হাজির করলো একটি লোককে এবং তার গাড়ী সমেত। লোকটির নাম আমেদ আলি। এরা যাকে বাস বলছিল—আসলে সেটি 'স্টেশন ওয়াগন' আর কি! যাই হোক, আমেদ আলির সঙ্গে দরদস্তুর করে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌনে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম শ্রাবণ বেলেগোলার উদ্দেশ্যে।

হাসান থেকে তার দূরত্ব হল ৩১ মাইল—ওখানেই আছেন জৈনদের দেবাদিদেব গোমতেশ্বরের মূর্তি।

গাড়ী ছেড়ে দিল। ফাঁকা রাস্তা—সুন্দর পীচের রাস্তা। আমেদ আলির সঙ্গে একজন লোক ছিল। ফাঁকা রাস্তায় হু-হু করে গাড়ী ছুটে চলেছে—এত স্পীডে চলেছে যে স্পীড-মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি গাড়ীর গতি কোনো সময়ই ৫০ মাইলের কম নামছে না, কখনও কখনও ৬০ মাইলও উঠছে। আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। মনের অস্বস্তি মনে চেপে রেখে তাকে শুধু একবার বললাম : ড্রাইভার সাহেব, এত স্পীডে যাবার কি দরকার—একটু আস্তে গেলে হয় না।

আমেদ আলি হেসে বলল : কিছু ভয় পাবেন না বাবুজি—এই স্পীডে তো আমরা হামেশাই যাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু তাড়াতাড়ি না গেলে অন্ধকার হয়ে যাবে—মন্দির দর্শন করবেন কি করে?

আমি আর কিছু বললাম না। তবে সমস্ত রাস্তাটাই আমি আর সুধীরা দুজনেই ভয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকলাম।

বেলেগোলা পৌঁছাতে তখন ৭ মাইল বাকি আমেদ আলি আমাদের দেখিয়ে বললে : ঐ দেখুন বাবুজী গোমতেশ্বরের মূর্তি। ওখান থেকেই পাহাড়ের চূড়ার ওপর গোমতেশ্বর মূর্তি দেখা গেল। বিরাট মূর্তি—৬০ ফুট উঁচু।

আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ওখান থেকে পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি আছে। ৫০০ সিঁড়ি—আমি দেখলাম যে এত সিঁড়ি ভেঙে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেখলাম ওখানে চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়—চেয়ারের দুদিকে বাঁশ বাঁধা—দুজন লোক দুদিকে কাঁধে নিয়ে ওঠে। আমি দুখানা চেয়ার ভাড়া করলাম। সুধীরা প্রথমে আপত্তি করেছিল এই বলে যে মানুষের কাঁধে চড়ে তীর্থে দেবদর্শন করলে কোনো ফল হয় না। সে পায়ে হেঁটেই উঠবে।

আমি তখন তাকে বোঝালুম যে ওটা মনের ভুল। নইলে যারা কেদার বদরী ও অন্য কোন দুর্গম তীর্থস্থানে যায় তারা ডাণ্ডিতে করে যেত না। আর তাছাড়া ৫০০ সিঁড়ি ভাঙ্গার পর শরীরের কি অবস্থাটা হবে সেটা ভেবে দেখ।

অনেক করে বোঝাতে সুধীরা রাজী হল। আমরা চেয়ারে করেই পর্বতশীর্ষে গোমতেশ্বরের মূর্তির পাদদেশে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন গোধূলির ম্লান আলোয় জায়গাটা অদ্ভুত স্বপ্নময় দেখাচ্ছিল। আমি তখনই ওখানে হাত মুখ ধুয়ে পূজো দিলাম।

তারপর অন্ধকার হয়ে আসাতে পুরোহিত ফ্লাড লাইট জেবলে সব দেখালে। ফ্লাড লাইটের আলোয় মূর্তির খুব কাছে গিয়ে দেখলাম—সব থেকে অবাক লাগল পাথর খোদাই করা—অসম্ভব মসৃণ। মনে হয় যেন একটি মাছি বসলেও পিছলে যাবে। আমি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এত চকচকে পালিশ করা কি করে হোল?

উত্তরে পুরোহিত ভাঙা হিন্দি ও ইংরাজীতে মিশিয়ে যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে : বছরে একটা বিশেষ দিনে এঁকে দুধে স্নান করানো হয় ২৪ ঘণ্টা ধরে। সেদিন ভক্তরা এসে সমস্ত দিন ধরে এবং রাত ধরে ঘড়া ঘড়া দুধ ঢালে দেবতার গায়ে। সেদিনটি ছাড়াও মাঝে মাঝে যাদের মানত থাকে তারা এসে মূর্তিকে খাঁটি দুধে স্নান করায়, তাই এঁর গা এত মসৃণ ও চকচকে।

গোমতেশ্বর দর্শন শেষ হতেই সুরু হয়ে গেল টিপ টিপ বৃষ্টি। আমরা আর দেরী না করে চেয়ারে গিয়ে বসলাম নামবার জন্য। বৃষ্টি থামল না—সিঁড়িগুলি বেশ পিচ্ছিল হয়ে পড়ল। বাহকগুলি খুব অভ্যস্ত এবং দক্ষ, তারা বেশ সন্তর্পণে অথচ দ্রুত নেমে এল আমাদের নিয়ে। কিন্তু আমরা যখন নীচে এসে পৌঁছলাম তখন ভিজে একেবারে কাক-ভেজা হয়ে গেছি।

অতিরিক্ত জামা-কাপড় সঙ্গে ছিল না—অতএব ঐ ভিজা কাপড়েই বাহকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে 'বাসে' উঠে বসলাম।

আসবার সময় আমেদ আলি সাহেব গাড়ীর গতি আর পঞ্চাশ মাইলে না তুলে আস্তে আস্তেই চালাতে লাগল। কিন্তু চালাতে চালাতে নানারকম ডাকাতি এবং ডাকাতের গল্প ফেঁদে বসল। একে নির্জন রাস্তা, তারওপর অন্ধকার—এ অবস্থায় যদি আপনি শোনেন কিভাবে এসব জায়গায় ডাকাতি হয়, কাউকে প্রাণে মেরে দেয়, কাউকে হয়ত মারধর করে লুটপাট করে নিয়ে হাত-পা বেঁধে পথের ধারেই ফেলে দিয়ে চলে গেল—তাহলে আপনি যতই সাহসী পুরুষ হোন, আপনার গাটা ছমছম করবেই। সুধীরা তো আমার খুব গা ঘেঁসে এসে বসল। আমারও যথেষ্ট ভয় করছিল এবং মুখে সাহস দেখিয়ে বললাম : ভয় কিসের? আমি আছি তো!

বললাম তো 'আমি আছি তো'—কিন্তু সত্যিই যদি কিছু হোত, তাহলে আমি আর কিই বা করতে পারতাম সেই বিদেশ-বিভূঁই জায়গায়। একবার মনে হল যে এরা ডাকাত নয়তো। কিংবা হতেও পারে কিছুই বলা যায় না। অন্ত্র তখন করবারও তো কিছু ছিল না। সম্পূর্ণ এদের মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মেরে-কেটে ফেললেও কেউ জানতেও পারবে না—সাহায্য করা তো দূরের কথা।

কিছুক্ষণ পরে তারা এসে থামল একটা জায়গায়। সেটাও এমন কিছু শহর নয়—লোক-চলাচল খুব কম। বেশ নির্জন চারিধার। বললে : আমার এখানে এক আত্মীয় থাকে—আমরা কয়েক মিনিটের জন্য গিয়ে দেখা করে আসব।

আমি কি আর বলি। এমন ভাব দেখালাম যেন মোটেই ভয় পাইনি। শুষ্ক মুখে বললাম : যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ যাব আর আসব।

তারা চলে গেল।

সেই অন্ধকার নির্জন পথপ্রান্তে আমি আর সুধীরা বসে যেন মহাকালের পদধ্বনি শুনতে লাগলাম। সময় আর কাটে না—এক একটা মিনিট যেন এক-একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। মনের নার্ভাস ভাবটাকে কাটাবার জন্য আমি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম।

সুধীরা বলতে লাগল : এরকম তাড়া-হুড়ো করে না বেরিয়ে কাল সকালে এলেই হোত। এদের মনে যে কি আছে কে জানে বাবা। এখন ভালোয় ভালোয় বাংলোয় ফিরতে পারলে বাঁচি।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম : তুমি না হয় একটু বস, আমি একটু ঘুরেফিরে দেখি ওরা কোথায় গেল।

—না না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি এইখানেই বস। আমি একা থাকতে পারব না।

অগত্যা চুপচাপ বসে রইলুম।

প্রায় আধঘন্টা পরে মূর্তিমান দুজন খুব হেসে গল্প করতে এসে হাজির হল এসেই বলল : বাবুজী, মাপ করবেন। একটু দেরী হয়ে গেল। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ী কিনা—অনেক দিন আসিনি, তাই একটু মুলাকাৎ করে এলাম। ছাড়তে চায় না—বলে বসো—চা খেয়ে যাও। তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

মনের বিরক্তি প্রাণপণে চেপে রেখে বললাম : আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বাংলোতে ফিরে চলো দেখি—রাত অনেক হয়েছে।

কিছু 'ফিকর' করবেন না—এখুনি পৌঁছে যাব। বলে গাড়ী ছেড়ে দিল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, শেষপর্যন্ত কোনোরকম অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

হাসান পৌঁছলাম যখন তখন রাত ৯-৩০ বেজে গেছে। আমেদ আলিকে জিজ্ঞাসা করলাম : খাবার-দাবার কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি।

(ক্রমশ:)

ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

— কুড়ি —

প্রতি মানুষের জীবনেই কিছু কিছু চরম মুহূর্ত আসে, যখন প্রতিটি মুহূর্তের অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, গুরুত্ব আছে। সর্বস্তরের সব মানুষের জীবনেই এমন মুহূর্ত আসে।

তরুণের জীবনে আজ আবার তেমনি চরম মুহূর্ত হাজির।

এমন মুহূর্ত এর আগেও এসেছে। পরীক্ষার হলে কোশ্চেন পেপার পাবার আগে, রেজাল্ট বেরুবার দিন, ফরেন সার্ভিসের ইন্টারভিউ দেবার সময় হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন শুনতে পেয়েছে। কেন? তখনকার সেই শেষ দিনগুলোতে? কিন্তু আজ যেন সুপ্রীম কোর্টের ফাঁসির দণ্ডের রায় বেরুবার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর যেন আর কোন পথ নেই।

দেশাই-এর চিঠি পাবার পর দিনই দিল্লী থেকে একটা মেসেজ পেল তরুণ। দেশাই যে খবর দিয়েছিল, সেই খবরই ফরেন মিনিস্ট্রি দপ্তর দিল্লীতে পাঠিয়েছে এবং তরুণ তারই কপি পেল।

সময় যেন কাটে না, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন আরো জোরে শুনতে পায়। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। চব্বিশ ঘণ্টা কত কি ভাবে। কত আজেবাজে চিন্তা আসে মনে। বহু মেয়েকে প্রথমে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়ে পরে পাচার করা হয়েছে লাহোরের আনারকলি বাজারের পিছনের সরু গলিতে। সেখানে তাদের নাচ শেখান হয়েছে, গান শেখান হয়েছে, শেখান হয়েছে বেলুচিস্থানের প্রাণহীন মরুভূমির হৃদয়হীন মানুষগুলোকে প্রলুব্ধ করতে। ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে যদি...

মাথাটা ঘুরে উঠে তরুণের। সারা শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনগুলো হঠাৎ খুব জোর হয়েই থেমে গেল।

প্রিয়জন সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা দেখা দিলেই যত খারাপ চিন্তা মনে আসে।

মনে আসবে না? সেই সর্বনাশা দিনগুলোতে কি হয়নি? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলোও যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। পশুত্বগুলো যেন সেতারের তারের মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল বহুজনের মধ্যে। সুপ্ত পশু প্রবৃত্তিগুলোরই তখন রাজত্ব। মানুষগুলো ফিরে গিয়েছিল তার আদিমতম অন্ধকার দিনগুলিতে।

ইন্দ্রাণী কি এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? লাহোর, পেশোয়ার, রাওলপিণ্ডির কোন হারেমে তার স্থান হয়নি তো?

হয়ত হয়েছে, হয়ত হয়নি। বাঙালীর জীবনের সেই চরম অন্ধকার রাত্রেও কিছু কিছু মহাপ্রাণ জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে এগিয়ে এসেছিলেন অসহায়া শিশুকে আশ্রয় দিতে, বিপদগ্রস্তা যুবতীর সম্মান রক্ষা করতে, নিঃসম্বল নারীকে আশ্রয় দিতে। এগিয়ে এসেছিলেন বহু ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক। পূর্ব বাংলার এই সব মহান মহাপ্রাণ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে বহু হিন্দু মেয়ে সন্তানের মত স্নেহ পেয়েছে, আপন বোনের মত ভালবাসা পেয়েছে, মায়ের সম্মান পেয়েছে।

ইন্দ্রাণী কি এমনি কোন পরিবারে একটু আশ্রয় পায়নি?

ঢাকায় কত মুসলমান পরিবারের সঙ্গেই তো ওদের ভাব, ভালবাসা, প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঈদের দিন কত বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে মিষ্টি খেয়েছে। অসহায়া ইন্দ্রাণীকে দেখে কি তাঁদের কারুর মন কেঁদে ওঠেনি? কেউ কি ওকে কোলে তুলে নেয়নি? চোখের জল মুছিয়ে দেয়নি?

নিশ্চয়ই দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তরুণ যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। ঢাকা থেকে একটা চিঠি, করাচী থেকে হাবিবের একটা মেসেজ পাবার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ মনে পড়ল বন্দনার দু দুটো চিঠি এসে গেছে অথচ উত্তর দেওয়া হয়নি। ইন্দ্রাণীর চিন্তায় আর কাউকে ভাবার অবকাশ পায়নি। বন্দনাকেও না?

না।

এ্যাপার্টমেন্টে একলা একলা বসে ছিল কিন্তু মনে হল সবাই জেনে গেল বন্দনাকেও সে ভুলতে বসেছে।

ছিঃ, ছিঃ।

নিজেই নিজেকে ধিক্কার করল। আর নিছক না হোক, ওর প্রমোশনের খবর, লণ্ডনে বদলী হবার সংবাদটা অতি অবশ্যই বন্দনাকে জানান উচিত ছিল। দেশাই-এর চিঠিটার কথাই বা কেন লিখবে না?

আর দেরী করল না। বন্দনাকে সব লিখল, সব কিছু জানাল। সব শেষে লিখল, জানি না কি লিখলাম, কি জানালাম। মনের যা অবস্থা। দাদা হয়ে ছোট বোনকে এসব লেখা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না। সে বিচার করার মানসিক অবস্থা আমার নেই। তবে বোন, তোমাকে ছাড়া আর কাকে লিখব? তুমি তো শুধু আমার বোন নয়, তুমি আমার মা, তুমি আমার বন্ধুও বটে।

আর লিখল, মনে হচ্ছে তোমাদের ওখানে যাবার পরই বিধাতা আমাকে চরম খবরটা জানাবেন। হয়ত আমার জন্য তোমাদের অদৃষ্টেও কিছু দুর্ভোগ জমা আছে। যদি সত্যিই কোন সর্বনাশা খবর পাই, তাহলে দাদাকে আর খুঁজে পাবে না। তোমাদের দু ফোঁটা চোখের জল পড়লেই আমার আত্মার শান্তি হবে। এর চাইতে আর বেশী কিছু করলে আমি যে ঋণের বোঝা বইতে পারব না।

বন্দনার চিঠি আসতে দেরী হলো না। দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখল, দাদা, তোমার কোন অকল্যাণ হতে পারে না। আর কেউ না জানুক, আমি অন্ততঃ জানি তুমি কি ধাতু দিয়ে তৈরী, কি গুনাহ্ ভরা। আমার মত নিঃসম্বল অসহায় মেয়েকে যে চরম সর্বনাশের মুখ থেকে রক্ষা করেছে, তার অকল্যাণ করার সাহস ভগবানেরও নেই।

চিঠিটা শেষ করে আবার নীচে লিখেছিল তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? তুমি যেভাবেই হোক দিল্লী যাওয়া বন্ধ কর। আমার মনে হয় তোমার এখন আমার কাছেই থাকা উচিত। যত তাড়াতাড়ি পার এখানে চলে এসো।

ট্যাণ্ডন সাহেবও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। তরুণের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর দিল্লী যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন এ্যাম্বাসেডরের সঙ্গে টেলিফোনে অন্যান্য কথাবার্তা বলতে বলতে এই প্রসঙ্গটাও তুলেছিলেন, স্যার ও এখন এমন টেনসনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে যে দিল্লীতে না গেলেই ভাল হয়।

"আই ডু রিয়লাইজ দ্যাট।"

"আপনি একটু ভেবে দেখবেন..."

"নিশ্চয়ই।"

গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোম্যাটদের বদলী করলে দিল্লী এনে তাদের ব্রিফিং করা হয় নানা বিষয়ে। এর প্রয়োজন আছে, গুরুত্ব আছে। কিন্তু দূরবর্তীদের ব্রিফিং-এর জন্য সরকারী অর্থে দু'এক মাস ভারত ভ্রমণ ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনো করাই চলতি রেওয়াজ। কেউ আপত্তি করেন না—কারণ যিনি আপত্তি করবেন, তিনিও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চান না।

এ্যাম্বাসেডর নিশ্চয়ই দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কারণ ট্রান্সফার অর্ডারে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য

ধরা গেল, এ্যাজ সুন এ্যাজ হি কমপ্লিটস্ হিজ রাউন্ড অফ ব্রিফিং হিয়ার, হি সুড প্রসিড টু লন্ডন টু জয়েন হিজ নিউ পোস্ট। অর্থাৎ ব্রিফিং শেষ হলেই লন্ডন যেতে পার।

এর পর পরই এ্যাম্বাসেডর নিজেই একদিন তরুণকে টেলিফোন করলেন, দিল্লীতে তোমার কদিন লাগবে?

'তিন-চারদিন। খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ।'

'তুমি কি তারপর একটু ঘোরাঘুরি করবে?'

'না স্যার, তেমন কোন প্ল্যান নেই।'

'তাহলে তুমি আমার একটা উপকার করবে?'

'নিশ্চয়ই স্যার। একথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন?'

'আমার ছোট মেয়ে যমুনাকে চেন তো?'

'খুব চিনি, স্যার।'

যমুনা এ্যাম্বাসেডরের ছোট ভাইয়ের কাছে থেকে বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল। ওকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে ভর্তি করার চেষ্টা চলছিল, তাও তরুণ জানে।

এ্যাম্বাসেডর আবার বল্লেন, আমার ছোট ভাই গত মাসে হঠাৎ বদলী হয়ে মাদ্রাজ চলে গেছে। ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা বোম্বেতেই আছে। যমুনার এ্যাডমিশন ফাইনাল হয়ে গেছে কিন্তু ও চলে আসার আগে আমার বুড়ো শ্বশুর-শ্বাশুড়ী একটু ওকে দেখতে চান।

'স্যার, ওরা তো দিল্লীতেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। তাই বলছিলাম তুমি যদি যাবার সময় বোম্বে হয়ে যেতে......

'নিশ্চয়ই'

'আর ফেরার সময় যমুনাকে নিয়েই এখানে চলে এলে......

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, স্যার।'

সব কথাবার্তা হবার পর এ্যাম্বাসেডর যমুনাকে চিঠি লিখে জানালেন, আংকেল তরুণ মিত্রের সঙ্গে দিল্লী যাবে এবং ওরই সঙ্গে এখানে চলে আসবে।

এবার বন্দনাকে জানাল, দিল্লীতে যাব, তবে মাত্র সপ্তাহ খানেকের জন্য। তারপর এখানে কদিন থেকেই লন্ডন চলে যাব। কেনসিংটন গার্ডেনে আমাকে এ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হবে। বিকাশ যেন কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এ্যাপার্টমেন্টটা ঠিক রাখে।

অসহ্য অস্বস্তিভরা দিনগুলি যেন কাটছিল না তরুণের। এই ট্রান্সফার হওয়া নিয়ে তবু কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আবার সেই দুশ্চিন্তা মাথায় এলো। অফিসে, পার্টিতে সময়টা তবু কাটে কিন্তু এই হান্সা কোয়ার্টারের নির্জন এ্যাপার্টমেন্টে এলেই যত আজব চিন্তা মনের মধ্যে ভীড় করে। ঢাকার কথা মনে পড়ে।

মাথাটা আবার ঘুরে ওঠে, শরীরটা ঝিম ঝিম করে।

এরই মধ্যে হাবিবের চিঠি এলো, ফরেন সেক্রেটারী স্বয়ং কেসটা ডিল করছেন এবং আমার কাকা বলছিলেন যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব খবর পাওয়া যাবে।

ভাল কথা। কিন্তু তাতে মন ভরে? দুশ্চিন্তা যায়?

ঠিক পরের দিনই আবার দেশাই'-এর চিঠি এলো।...ডি, আই, জি'র রিপোর্টের কপি আজই আমরা পেলাম। দীর্ঘ রিপোর্ট। আজই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লী পাঠান হলো বলে কপি করা সম্ভব হলো না। তবে ঐ রিপোর্টের মেন সামারিতে বলা হয়েছে যে, লেট বীরেন্দ্রনাথ গুহের কন্যা কুমারী ইন্দ্রাণী গুহ মডার্ন হিস্ট্রিতে এম-এ পড়ার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাডমিশান নেয় কিন্তু সিক্সথ ইয়ারে ওঠার পরই ছেড়ে দেয়।...

'এম-এ ক্লাশে ভর্তি হবার জন্য ইন্দ্রাণীর আবেদন পত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ইউনিভার্সিটির এ্যাডমিশন রেজিস্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।'...

দেশাই-এর চিঠি পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তরুণ। কি খবর জানা গেল?

...'প্রথম কথা জানা গেল তাঁর বাবা জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা সে অবিবাহিতা ছিল।'

অবিবাহিতা? তরুণ যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়।

...'তৃতীয় কথা তাঁর অভিভাবকের নাম লেখা আছে আজিজুল ইসলাম, প্লিডার।'...

আজিজুল ইসলাম? পুরনো দিনের ঢাকার স্মৃতি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে তরুণ। চিঠি পড়া বন্ধ করে আপন মনে বার বার বলে, আজিজুল ইসলাম!...

'রিলেসানসিপ উইথ দি গার্ডিয়ানের ঘরে লেখা আছে, আংকেল।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা বেশ জোর করে কামড়ে ধরে তরুণ বলে, আংকেল? তবে কি ইন্দ্রাণী কোন আশ্রয় পেয়েছিল?

'বার লাইব্রেরীতে খোঁজ খবর করে জানা গেছে যে, মিঃ আজিজুল ইসলাম হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন। তবে সঠিক সময়টা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। মিস গুহ এক বছর এম-এ পড়ার পরই কেন আর পড়লেন না, তা জানা যায়নি। প্রথমে সন্দেহ হয় যে হয়ত বিয়ে'.....

তরুণ প্রায় আঁতকে উঠে, বিয়ে? তাহলে শেষ পর্যন্ত......

চিঠিটা হাতে করে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের অস্তিত্বটা যেন নিজেই বুঝতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

...'বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে ঠিক ঐ সময়েই মিস গুহের নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাশ-পোর্ট ইস্যু করা হয়। ঠিক কি কারণে ও কোন দেশে উনি যান, তা খোঁজ করা হচ্ছে। আজিজুল ইসলাম সাহেব মারা যাবার পর ওর একমাত্র ছেলে ঢাকার বাড়ী বিক্রী করে দেন ও কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্থান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। মিস গুহ এরই সঙ্গে বিদেশ যান কিনা, তার কোন রেকর্ড ঢাকা এয়ারপোর্ট বা ইমিগ্রেশান বা পুলিশের কাছে নেই। করাচীতে অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই সেসব খবর পাওয়া যাবে।'

চিঠির শেষে দেশাই লিখেছে, মনে হয় ঢাকাতে আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই। তবে যদি করণীয় থাকে, জানাতে দ্বিধা করবেন না। তাছাড়া ডি. আই, জি'র পুরো রিপোর্টটা পড়ে দেখবেন। ঢাকার বহু লোকের মন্তব্য ও রেফারেন্স আছে এবং আপনি হয়ত অনেককে চিনতে পারেন।

ডি. আই, জি'র রিপোর্টের মূল বক্তব্য পড়ে নতুন সন্দেহের মেঘ জমল তরুণের মনে। তবুও যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। কৃতজ্ঞতাবোধ করল দেশাই-এর প্রতি। কেবল্ করে ধন্যবাদ জানাল, কাইন্ডলি এ্যাকসেপ্ট সিনসিয়ারেস্ট থ্যাংকস্।

কিন্তু কে এই আজিজুল ইসলাম? প্লিডার? তরুণের বাবাও তো ওকালতি করতেন। কিছু কিছু উকিলের সঙ্গে তো ওরও পরিচয় ছিল কিন্তু আজিজুল ইসলাম?

না।

উয়ারীর ওদিকে হুবিবুর ইসলাম বলে একজন উকিল ছিলেন। আর কোন ইসলাম নামে উকিল ছিলেন কি?

অনেকক্ষণ ভাবল। হঠাৎ মনে পড়ল, ওবেদুর ইসলাম সাহেব তো ওর বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন।

কিন্তু আজিজুল ইসলাম নামে কোন উকিলকে কিছুতেই মনে পড়ল না। আশ-পাশে ঢাকার কোন লোকও নেই যে খোঁজ-খবর করা যাবে। বার্লিনে বাঙালী নেই বল্লেই চলে। লন্ডন, নিউইয়র্ক হলে ঢাকার কতজনকে পাওয়া যেত। এমন বিশ্রী জায়গা এই বার্লিন।

অন্য জায়গাতে পাকিস্থান মিশনে কত ঢাকার লোক পাওয়া যায়! এখানে তাও নেই।

আজিজুল ইসলামের চিন্তা করতে করতেই দিল্লী রওনা হবার সময় এসে গেল।

প্লেনে দিল্লী যাবার সময়ও ঐ কথাই ভাবছিল, আজিজুল ইসলাম! তেহেরান এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বসেও ভাবছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, আবাল্য বন্ধু মৈনুল ইসলামের কথা। ওর বাবার নাম ছিল তো আজিজুল ইসলাম!

কিন্তু?

কিন্তু তিনি তো মুনসেফ ছিলেন, উকিল ছিলেন না। ডি-আই-জি ভুল করে মুনসেফকে উকিল বলে লেখেননি তো?

মৈনুলদের পরিবারেই কি ইন্দ্রাণী স্থান পেয়েছিল? মৈনুলের মাকে তরুণও আম্মাজান বলে ডাকত। ভদ্রমহিলার বেশ চুল পেকে যায়। ভারী ভাল লাগত দেখতে। আম্মাজানকে কি জ্বালাতনই করেছে ওরা!

(আগামীবারে সমাপ্য)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

শিউপ্রসাদজি কি বলতে গিয়ে ভেঙে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় ধ্বসে গেল, মিঃ ভর্মা —

আমার গুলির সঙ্গে সঙ্গে 'চাচাজি' বলে একটা আকুল আর্তনাদ শুনলাম।

চাচাজি!

এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি সামনে ছুটে গেলাম —

লছমী! লছমী!

শিউপ্রসাদজির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল যন্ত্রণায় —

লছমীর আর কোন সাড়া... তারপর...

পরাশর হঠাৎ এক অবান্তর প্রশ্ন করল।

আচ্ছা, আপনার পিস্তলের শব্দে পাখিগুলোর নিশ্চয় মারা যাবার অবস্থা?

যত মাথাব্যথা পাখিদের জন্য! কি মনে করবেন শিউপ্রসাদজি?

মনে যাই করুন শিউপ্রসাদজি নিজেকে সামলে এবার শান্ত স্বরেই বলে গেলেন।

না। ভেবে তখন দেখে উঠিনি। পাখিরা ভয় পায়নি। আমার রিভলভারে সাইলেন্সর দেওয়া। ছুটে যেতে গিয়ে আমি তখন কিন্তু —

কিসে বাধা পেয়ে পড়ে গেছি। আমার মুখস্ত চলা ফেরা তখন আর মনে নেই —

লছমী! লছমী! কোথায় তুমি?

লছমীর সাড়া পেলাম না। কিন্তু কাতর একটা অস্ফুট গোঙানির সঙ্গে —

মেঝের ওপর পা ঘষড়ে চলার একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম আমার গুলিতে আহত হয়ে লছমী অভিমানে যন্ত্রণায় কোন রকমে পালিয়ে যাচ্ছে।

অঙ্গনা

নারী ও দীর্ঘজীবন

দীর্ঘ দিনের সংস্কারে এটা আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, নারী নির্দ্বিধায় পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। এর কোন বাদ নেই, প্রতিবাদ নেই। সামাজিক অনুশাসনের নিগড়ই অবশ্য এজন্য দায়ী। এরকম অবস্থা চলেছে দীর্ঘদিন। আর সেদিন থেকেই আমরা জেনে গেছি, নারী সবসময় পুরুষের তাঁবে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসও এদিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে অংকিত হয়েছে এক মসীলিপ্ত চিত্র, নারী পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন। তাই তাদের মেনে নিতে হচ্ছে পুরুষের আধিপত্য।

কিন্তু ঐতিহাসিকের প্রয়োজন ছিল বিচার-বিশ্লেষণের। একটু তলিয়ে দেখা উচিত নারী পুরুষ অপেক্ষা কোন দিক থেকে ন্যূন। শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষে না বুদ্ধিবৃত্তিতে। অতটা বিচারের অথবা ভাববার দায় সেদিন কেউ বইতে রাজী হননি। সংস্কারের গায়ে উঠলো ইতিহাসের নামাবলী।

আজ কিন্তু সেই ইতিহাসের সংস্কার প্রয়োজন। দৈহিক এবং মানসিক উৎকর্ষে নারী যে পুরুষের অনেক ঊর্ধ্বে তার সংশয়াতীত প্রমাণ রয়েছে সেদিনেরই সংস্কার-আশ্রিত ঘটনায়। পুরুষ যুগ যুগ ধরে নারীর উপর ঢালাও অত্যাচার চালিয়েছে, সামাজিক অনুশাসনে বন্ধ করেছে। কিন্তু এত অত্যাচারেও তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ঘটনার সূক্ষ্ম বিচারে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়, মানসিক দিক থেকেও অনেক শক্তিশালী। প্রকৃতি নারী-নির্মাণ পর্বেই এই শক্তিতে তাদের বলীয়ান করে। পুরুষের যুগান্তর-ব্যাপী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও নিজ ব্যক্তিত্বে নারী আজো অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রমাণ শুধু একটাই নয়। হাতের কাছে হাজার প্রমাণ উপস্থিত। সংসারে অভাব, সংকট, জ্বালা, যন্ত্রণা এমনি কত উপসর্গ নিত্য হাজির। নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মোকাবিলা করতে হয়। এখানে তাকে পরম ধৈর্য এবং চরম স্থৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। ভেঙে পড়লে চলবে না, দিশেহারা হলে উপায় নেই। কিন্তু একই পরিস্থিতির মোকাবিলায় পুরুষের পক্ষে অতটা ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া একান্ত অসম্ভব। জীবনের প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারী ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত আচরণ করে। এ থেকেই বোঝা যায়, দুঃখ-কষ্টর সঙ্গে যুঝবার জন্য নারী গোড়া থেকেই মানসিক শক্তিতে বলীয়ান থাকে। যদি এই মানসিক শক্তি না থাকতো তবে সংসার পাগলামির আখড়া হয়ে যেতো। এখানেও একটা ভাববার জিনিষ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। পাগলের সংখ্যাবিচারে দেখা যায় নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। মানসিক রোগীর সংখ্যাধিক্যে পুরুষ নারীকে ছাড়িয়ে যায়। এত কথার পর আর বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয় না যে, মানসিক দিক দিয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক সংহত।

এটা অবশ্য মানতে হয় নারীদেহ রোগের আকর। এ ব্যাপারে পুরুষ টেক্কা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই সত্যটিও মেনে নিতে হয় যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ। নারী বেশি রোগগ্রস্ত হয় সত্যি, তবে শরীরবিজ্ঞানের দৌলতে একথা জানা গেছে যে, রোগের সঙ্গে লড়বার শক্তিও তার বেশি। মারাত্মক ধরনের অসুখের সঙ্গেও নারী সহজেই বছরখানেক লাগাতর লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। ব্রিটেনের এক খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ্ দীর্ঘ গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মৃত্যুর যতগুলি সম্ভাবিত কারণ আছে, তন্মধ্যে শতকরা ৫৭ জনই পুরুষ। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই জনৈক বৈজ্ঞানিক মহাকাশ যাত্রার পক্ষে নারীকে অধিকতর উপযুক্ত মনে করেছেন। মহাকাশের প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং বায়ুমন্ডলে তার অসুবিধা পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম হবে মনে করেই এই সিদ্ধান্ত।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর শক্তিমত্তার রহস্য জানবার জন্য দীর্ঘদিন চিকিৎসা-বিজ্ঞান তোলপাড় করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসকরা এই রহস্য ভেদ করে উত্তর দিয়েছেন, নারীদেহে প্রাণরক্ষক এক্স-ক্রোমোসোম সংখ্যা জন্ম থেকেই পুরুষ অপেক্ষা বেশি। নারীর গুপ্ত সুরক্ষিত শক্তির এটাই হলো আসল রহস্য। এক্স-ক্রোমোসোমের বাহুল্যের জন্য দেখা যায়, মেয়েরা সাধারণত বংশানুক্রমিক কোন রোগে আক্রান্ত হয় না যা পুরুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কারণ, পুরুষের দেহে এই উপাদানের সংখ্যাল্পতা। এর ফলে পুরুষের শারীরিক শক্তিতে ঘাটতি হয়।

এরকমই আর এক উপাদানের নাম হলো হিমোগ্লোবিন। মানবদেহে রোগের বীজাণুর সঙ্গে এর লড়াই। রক্তেই তাই এর অবস্থান। শরীর-বিজ্ঞান অনুসারে, এই উপাদানও পুরুষ অপেক্ষা নারী দেহেই বেশি। এজন্য নারী রোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। পুরুষের পক্ষে এই লড়াই চালানো অনেক সময় সম্ভব হয় না।

নারীর হরমোনে প্রাপ্ত আর একটি উপাদান হলো এস্ট্রোজেন। এই উপাদান শান্তি-প্রধান গুণে সমন্বিত। এর প্রভাবে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক শান্ত, সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হয়। এর বিপরীতে পুরুষ-হরমোনে টেস্টোস্টেরোন নামক উপাদানের অবস্থান। এর প্রভাবে পুরুষ স্বভাব-উগ্র, ক্রোধপরায়ণ এবং অসহিষ্ণু। এই উপাদান খুবই উত্তেজক। তাই পুরুষের শান্তিও [illegible] ক্ষয় পায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে দেখা গেছে যে, পঁয়তাল্লিশ বছর পার হলেই নারী-পুরুষ সকলেরই হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর কারণ রক্তে চর্বির মাত্রাধিক্য। এস্ট্রোজেনের ব্যবহারে এক্ষেত্রে আশাতীত ফল পাওয়া গেছে।

রক্তে চর্বির অবস্থান নিয়ে এক দীর্ঘ গবেষণা চালান আমেরিকার ডঃ রুথাপিক। তিনি মুরগীর উপর এর প্রয়োগ করেন। একটা নির্দিষ্ট নিয়ম পর্যন্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ান মুরগীদের। তারপর ওদের কেটে ফেলা হয়। প্রথমে কাটা হয় পুরুষ মুরগী। লক্ষ্য করা গেল, অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে পুরুষের রক্ত নালীর যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তারপর কাটা হয় স্ত্রী মুরগী। এদের রক্তনালী এই দোষ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত।

ডঃ রুথাপিকের পরীক্ষায় এই সত্যই প্রমাণিত হয়, চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে নারী নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই সুরক্ষিত থাকে। নারীদেহে এস্ট্রোজেনের মাত্রাধিক্যই তাকে এই কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখে।

প্রজনন-গ্রন্থি নারীর স্বাভাবিক গুণ-ধর্ম। গর্ভধারণ এবং সন্তান ধারণ দুইই তার পক্ষে প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী। এ দুটিই হলো খুবই বিপদাত্মক। এর পরে আবার যদি বাচ্চা-জন্মের জন্য অন্য কোন উপায় গ্রহণ করতে হয় তবে প্রসূতির শক্তিহ্রাস স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু প্রকৃতিও এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। এস্ট্রোজন এ সময় প্রসূতিকে খুবই সাহায্য করে। এর সাহায্যে প্রসূতির সকল ক্ষয়-ক্ষতি অতি শীঘ্র পূর্ণ হয়ে যায়।

এস্ট্রোজন নারীপ্রধান - গুণসম্পন্ন। করোনারীতে এস্ট্রোজন দিলে আশাতীত ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু এর প্রয়োগের ফলে পুরুষের মধ্যে নারীপ্রধান-গুণের বিস্তার ঘটে। এস্ট্রোজনের প্রভাবে কোন কোন পুরুষকে নিয়মিত দাড়ি কামাতে হয় না। অন্যদিকে তাদের মাথায় চুল খুব তেজী হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কিছুটা ধীরস্থির এবং শান্ত হয়। তার উগ্র প্রকৃতি তখন অন্য রূপ নেয়।

এস্ট্রোজন নারী-শরীরের অতন্দ্র প্রহরী। সন্তান জন্মের মুহূর্তে এর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগ-নাশক ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। এস্ট্রোজনের অবস্থানের প্রসবের পরবর্তী স্তরে প্রসূতির রোগ আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

মেয়েদের লিভার সম্পর্কে ডঃ রবার্ট বলেছেন, হরমোনের রূপান্তরে মেয়েদের লিভারও প্রেরণা জোগায়। করোনারীতে আক্রান্ত কোন পুরুষকে যখন এস্ট্রোজন দেওয়া হয় তখন নারীর লিভারের গুণও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

সর্বদিক বিচার বিবেচনা করেই বলা চলে নারী পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক মানসিক শক্তিতে বলীয়ান। আত্মসচেতন নারীসত্তা আজ তাই ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে চায় নতুন পথে।

—প্রমীলা

স্মরণীয়া

মহাত্মা গান্ধী-জননী পুতলীবাঈকে এমনিতে সাধারণ স্ত্রীলোকেরই সমপর্যায়ভুক্ত মনে হবে। কিন্তু যে মহাপুরুষের তিনি জননী সেই মহামানবের পরম মানবিকতার উৎস ছিল জননী পুতলীবাঈয়ের সাধারণ জীবনযাত্রা। তাই পুতলীবাঈ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নারী। তখনকার সময় অনুযায়ী পুতলীবাঈয়ের লেখাপড়ার শিক্ষার গন্ডী সীমাবদ্ধ ছিল। তবু সেই যুগে ভারত তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুই মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো কালজয়ী গ্রন্থরাজির যা কিছু শিক্ষণীয় তা গ্রহণ করবার, অন্তরে ধারণ করবার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় পুতলীবাঈ পুত্র মোহনদাসকে রামায়ণ কাহিনী শোনাতেন। মায়ের শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অমৃত কাহিনী তাঁর শিশুচিত্তকে ভাবাকুল করে তুলতো। বাল্যের বিস্ময় নিয়ে চণ্ডাল গুহক ও রামচন্দ্রের কাহিনী শুনতেন। আর শুনতেন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। মা বুঝতেন পুত্রের অন্তরের কথা। অল্পশিক্ষিতা জননী রামায়ণ পাঠের মধ্যে দিয়ে পুত্রের অন্তরে বিশ্বকল্যাণের প্রেরণার বীজ বুনে দিয়েছিলেন। সন্তানের চরিত্র গঠনের পক্ষে সেই হলো প্রধান শক্তি। মায়ের নিকট পুত্র অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। মানুষের প্রতি ভালবাসায় মন তাঁর ভরে গেল। পুতলীবাঈ হরিশ্চন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য রক্ষার্থে বিশ্বামিত্রকে তাঁর সব কিছু দান করলেন।' মা সন্তানকে বোঝালেন এই সত্যের রাজ্যই 'রামরাজ্য'। তাই মহাত্মার উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। 'দুষ্টের নিগ্রহবিধায়ক রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' তাঁর আদর্শ রাজা। তাই শিশুকাল থেকে রামরাজ্যের স্বপ্নকে সফল করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

হিন্দু রমণী পূজাপার্বণ উপলক্ষে অনশন করে থাকেন। পুতলীবাঈয়ের এই অনশন করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। গান্ধিজী নিজেই তাঁর জননীর ধর্মনিষ্ঠা ও অনশনব্রত পালনের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন—"আমার সতীসাধ্বী জননীর ধর্মে একনিষ্ঠতার কথা আমার স্মৃতিপথে স্পষ্টাকারে মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি অতি ধর্মপরায়ণ রমণী ছিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া কখনো জলগ্রহণ করিবার কথা মনেও আনিতে পারিতেন না। 'হাবেলী' নামক বৈষ্ণব ধর্মমন্দিরে যাওয়া তাঁহার একটি নিত্যনিয়মিত অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয় তিনি কখনো চাতুর্মাস্য বাদ দেন নাই এবং সেই সময় তিনি কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতেন এবং অবিচলিতচিত্তে তাহার উদযাপন করিতেন। অসুখ হইয়াছে বলিয়া সে সম্বন্ধে একটু শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। আমার মনে পড়ে একবার চান্দ্রায়ণের সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্রতোদ্‌যাপনের কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নি। চাতুর্মাস্যের সময় প্রত্যহ একাহার তো তাঁহার অভ্যাসের মধ্যেই হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাও মনঃপূত না হওয়ায় তিনি একদিন অন্তর উপবাস করিতে লাগিলেন। এককালে দুই-তিনদিন উপবাস করিয়াও তিনি কষ্টবোধ করিতেন না। এক চাতুর্মাস্যে তিনি এমন নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যেদিন সূর্য না দেখিবেন সেদিন আর জলগ্রহণ করিবেন না। আমরা বর্ষার দিনে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সূর্যদেবের দেখা পাবা মাত্রই জননীকে সে কথা জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতাম। সকলেই জানেন বর্ষাকালের ঘনঘটার দিনে প্রায়ই সূর্যদেব দেখা দেন না, এবং এমন এক একদিনের কথা মনে পড়ে সেদিন আমরা হঠাৎ হয়তো সূর্য দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাকে খবর দিয়েছি আর তিনিও ছুটিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, পলাতক সূর্যদেব তাঁহাকে সেদিনকার মত অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছেন। মা কিন্তু হাসিমুখে বলিতেন, 'তাহাতে কি হইয়াছে? ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আজ আমি অন্নগ্রহণ করি' এবং এই কথা বলিয়া আবার নিজের সংসারের নিয়মিত কর্মাবর্তে প্রবৃত্ত হইতেন।"

ঈশ্বরের প্রতি ধ্রুব বিশ্বাস এবং অনশন করবার প্রবল শক্তি তিনি মায়ের নিকট থেকেই পেয়েছিলেন। মায়ের জীবনের এই অনশনব্রত মহাত্মার জীবনের অন্তর্শুদ্ধির প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ প্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। উপবাস ও উপাসনা গান্ধিজীর ধর্মবিশ্বাসের মূলে ভিত্তিস্বরূপ। তাই তিনি বলতেন—"আমার বিশ্বাস উপবাস ব্যতীত উপাসনা হয় না এবং উপাসনা ব্যতীত সত্যিকার উপবাসও হয় না—আন্তিক উপবাসই হলো আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় কথা এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই হলো সত্যিকারের উপাসনা।"

গান্ধিজীর লেখা থেকে জানা যায় তাঁর মাতার গভীর ধর্মজ্ঞান ও নীতিবোধ তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। গান্ধিজীর তরুণ মনে মাতৃদেবী যে বীজ বপন করেছিলেন তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে সত্য ও প্রেমের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর চরিত্রকে এতবড় করে তুলেছিল।

সেই যুগে গান্ধিজী বিলাতে পড়তে যেতে চাইলেন। প্রথম চিন্তা পুত্রের বিচ্ছেদ তাঁকে বিচলিত করলো। দ্বিতীয় চিন্তা, পুত্র যদি অমানুষ হয়ে ফেরে তবে সে কলঙ্ক হবে মায়ের জীবনের দারুণ লজ্জা। কিন্তু পুত্রের সাফল্যের পথে তিনি বাধা দেবেন না। সেখানে গিয়ে যদি সন্তান কৃতি হয়ে ফেরেন তবে তো তাঁর বাধা দেওয়া উচিত হবে না। পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করতে বললেন—'আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর সুরা-পান করবে না—মাংস আহার করবে না, কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না।' মায়ের বিধান অমোঘ। মহাত্মাজী বলেছেন—'এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তিনি বহুবার বিপদসাগর পার হয়েছেন। বিদেশে পদস্খলনের আশঙ্কা ছিল না কিন্তু মায়ের [illegible] এবং তাঁর আদেশের কথা তিনি চিরদিন মনে রেখেছেন।

—বেলা দে

প্রদর্শনী পরিক্রমা

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ১৯ থেকে ২৫ মার্চ বিয়র্ণ উয়েবার-এর একটি ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী হয়। শ্রীবার জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জের তরফে সংস্কৃত কলেজে ভূগোল অধ্যাপনা করছেন। বর্তমান ফটোগ্রাফগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। জার্মানীর দৃশ্য, জার্মানী থেকে স্থলপথে ভারতের রাস্তা এবং ভারত উপমহাদেশের ছবি। বলা বাহুল্য শ্রীবার পেশাদার ফটোগ্রাফার না হলেও উঁচু দরের ফটোগ্রাফার। জার্মানীর মধ্যযুগের কতকগুলি শহরের দৃশ্য ভ্রমণের প্রচার-পত্রিকার মত সুন্দর। ভারত আগমনের পথে মিশর, ইরাণ, তুর্কী, সিরিয়া, জর্ডন ও বামিয়ানের কয়েকটি দৃশ্য ইতিহাসের বইয়ের মত চমৎকার। হিমালয়, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের ছবির মধ্যে মন্দির ও ভাস্কর্যই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এগুলি ছবি হিসেবে খুবই উঁচুদরের, তবু কাঠমাণ্ডুর বৃদ্ধ গায়কের ছবিটিই মানবিক আবেদনের দিক থেকে সবচেয়ে চোখে লাগে।

৭ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে সাউথ অ্যান্ড চিল্ড্রেনস্ স্টুডিওর ৪ থেকে ১৭ বছরের শিল্পীদের ৫৬খানি জল রং, কালি-কলম প্যাস্টেল ইত্যাদির মাধ্যমে আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। ছেলেমেয়েরা জীবজন্তু উৎসব, শহরের নানা-রকম দৃশ্য, বর্ষা, রথযাত্রা এমনকি জ্বর পাওয়া নিয়ে পর্যন্ত ছবি এঁকেছে। সমগ্র প্রদর্শনীতে ছেলেমেয়েদের সচেতনতার ছাপটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তপেন্দ্র সিংহ, দীপেন্দ্র সিংহ, মধুমিতা দত্ত, অভিজিৎ রায়চৌধুরী, সুতপা কর, মৌসুমী গুহ, শ্যামল দে, অরুণকুমার কর প্রভৃতি অনেকের কাজই পরিচ্ছন্ন এবং ইন্টারেস্টিং।

বিজন ব্যানার্জি অল্পদিন হল ফ্রান্স ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পচর্চা করে দেশে ফিরে আসেন। আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ললিতকলা আকাদামির গ্রাফিকসের পুরস্কার লাভ করেন। তারপর গত ৬ থেকে ১০ মার্চ ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে তাঁর কতকগুলি গ্রাফিক্স ও ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ভঙ্গীতে শিল্পকে উপস্থাপিত করার দরুন আলোচ্য প্রদর্শনীতে ইংরিজি ও বাংলা আধুনিক কবিতার সহায়তাও নিতে হয়েছে—অনেক-গুলিই আবার শিল্পীর স্বরচিত। শ্রীব্যানার্জির ছবিগুলি একান্তভাবেই অ্যাবস্ট্রাক্ট। আমেরিকার ইন্ডিয়ান লেকের দৃশ্য জানলার সার্শির ফাঁকে তিনি দেখেছেন। তাই জানলার গ্রাফকাটা নকশার মধ্যে উঁচু-নীচু রেখায় পাহাড় বা তেলের ছোপে জল ইত্যাদির আভাস তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংখ্যাতত্ত্বের পুস্তকে সালতামামির নকশার সঙ্গে বিশেষ তফাৎ পাওয়া যায়নি।

মার্চের গোড়ায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে এবং পরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শিশুশিল্পী অনমিত্র চক্রবর্তীর গত বছরের জুলাই থেকে এ-বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে আঁকা ৫৬খানি ছবির প্রদর্শনী হয়। গত পাঁচ বছরেই সে বিস্ময়কর খ্যাতি অর্জন করেছে। এবারে তার বীরভূম, কাশ্মীর আর পুরীর দৃশ্যের ছবি দেখা গেল। বীরভূমের লাল মাটি আর শাল গাছের ছবিতে তার আঙ্গিকে সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। অনেকগুলি কাজে ডেকরেটিভ ছাপ একটু যেন আত্মসচেতন। রূপকথার রাজ্যের অনেকগুলি ছবিতে রঙের ফোঁটায় কতকটা অ্যাবস্ট্রাকশনের আমেজ এসে গিয়েছে। এবারে অনমিত্র ক্রাইস্ট এঁকেছে কয়েকটি। তার জন্যে পোপ তাকে আশীর্বাদ ও একটি পদক পাঠিয়েছেন।

নিয়মিত প্রদর্শনীর আয়োজন, নতুন শিল্পীকে পরিচিত করে দেওয়া এবং চিত্র-শিল্পী ও ভাস্করদের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের যাঁরা অনুশীলন করেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ৬এ, সাকলাত প্লেসে (ম্যাডান স্ট্রীটের কাছে) পাঁচতলায় শ্রীসুভাষ সিংহরায় গ্যালারি ইউনিক-এর উদ্বোধন করলেন সুনীল দাসের ২২খানি নবতম শিল্পকর্ম নিয়ে। এই নতুন ছবিগুলিতে সুনীল দাস তাঁর পূর্ব ব্যবহৃত সাপ, তীর ও বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রতীক নিয়ে একটু নতুন ধরনের রঙের হার্মনি আনার চেষ্টা করেছেন। অনেক জায়গায় উজ্জ্বল সবুজ, সিঁদুরে, গোলাপী, বেগুনি ও কালো রঙের বিচিত্র ব্যবহার দেখা গেল। জমির উঁচু-নীচু টেক্সচার কোথাও কোথাও বেশ উঁচু রিলিফ ওয়ার্কে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কোথাও বা শাদা জমির ওপর শাদা আলপনা বা মেটে জমির পর শাদা আলপনা গ্রামবাংলার আমেজ নিয়ে এসেছে। তার ওপর পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গ্যালারি এবং আলোর বন্দোবস্ত ভাল থাকায় ছবিগুলি মানিয়েছেও ভাল। আশা করা যায় গ্যালারিটি অচিরেই শিল্পী-দের সমাগম স্থল হয়ে দাঁড়াবে। প্রদর্শনী ২৯ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত খোলা থাকছে।

কোম্পানী আমলের গোড়ায় ভারতবর্ষে যেসব ইয়োরোপীয় শিল্পী আসেন তাঁদের আঁকা ছবির রঙীন লিথোগ্রাফ, একুয়াটিন্ট ইত্যাদির একটি ছোট সংগ্রহ অ্যাকাডেমির ওপরতলার একটি ঘরে রাখা হয়েছে। এখানে ড্যানিয়েল, বোনারুক, মিস এমিলি ইডেন হান্টার, মোফাট, জোফানি, ডয়লি, অ্যাট-কিনসন প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা পুরোনো কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন অংশের ছবির প্রতিলিপি দেখা যাবে। জোফানির আঁকা কর্ণেল মরডাণ্টের তাঁবুতে মোরগের লড়াই (১৭৮৬) একটি প্রধান আকর্ষণ—এতগুলি মানুষের উত্তেজনা বিশেষ রসবোধের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েলের করা জৌনপুরের মসজিদ, রোটাসগড়ের ধ্বংসাবশেষ, চুণার দুর্গ, রাম-নগরের বাওলি, ট্যাঙ্ক স্কোয়ার ইত্যাদি ছবিগুলির ঐতিহাসিক ও চিত্রধর্মী আকর্ষণ যথেষ্ট। ডয়লির ছবিতে চৌরঙ্গীর দৃশ্য, ব্যারাকপুরের অধুনালুপ্ত চিড়িয়াখানা, পুরনো সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল প্রভৃতি জায়গার সঙ্গে এখনকার রূপ মিলিয়ে দেখতে সকলেরই ইচ্ছে করবে। হান্টা[illegible] শ্রীরঙ্গপাটন ও দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি ছবি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ফিরোজশার যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধের পর লুটতরাজ এবং ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলের দৃশ্যগুলি সাধারণ দর্শক এবং প্রিন্টমেকার এই উভয়েরই কৌতূহলের খোরাক যোগাবে। বারাণসীর শিল্পী হরি-লাল কিছুদিন আগে বাংলার দেবদেউলের ছবির একটি প্রদর্শনী করেন। এবারে তিনি ১ থেকে ৭ মার্চ আসামের দেবদেউলের ১৮টি পেন, পেন্সিল ও জলরঙের ছবি উপহার দেন। এই ছবিগুলি আঁকতে তিনি গৌহাটি, তেজপুর, শিবসাগর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন। কামাখ্যা, শুক্রেশ্বর, উমানন্দ, নবগ্রহ, হয়গ্রীব-মাধব, বিশ্বনাথ, [illegible] জনার্দন প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সুন্দর ছবি দেখা গেল। জলরঙের ব্যবহারটি পরিচ্ছন্ন এবং কয়েকটি পেন ও পেন্সিল স্কেচ সুন্দর।

—চিত্ররসিক

বেতার স্মৃতি

বিগত কয়েকবার কথিকা, ফীচার, নাটক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। মানে, 'স্পোকন ওয়ার্ড' নিয়ে। কথিকায় একটা মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যা থেকে কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়, অথবা সেই মানুষটির অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া যায়। ফীচারে শ্রোতাদের চক্ষুর অগোচরের জিনিস একটা কথাচিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ এমন সব কথা থরে থরে সাজানো হয় যাতে সেই জিনিসটার একটা স্পষ্ট ছবি শ্রোতাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর রেডিও নাটকে একটা সমগ্র দৃশ্য কেবল কণ্ঠস্বর আর শব্দের সাহায্যে শ্রোতৃসমক্ষে মূর্ত হয়ে ওঠে।

এ কেবল টেকনিকের ব্যাপার নয়, টেকনিক আর চিন্তার পিছনে যে 'জীবন্ত' জ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলতে পারি, 'লাইভ নলেজ'—তা-ই। তাই একজন আদর্শ প্রযোজকের মধ্যে অনেক জিনিস থাকা দরকার। একের মধ্যে বহু। কিন্তু তা থাকে না বলেই আকাশবাণীর স্পোকন ওয়ার্ডের আজ এই দশা।

আকাশবাণী স্পোকন ওয়ার্ডকে একটা শিল্পরীতি হিসাবে গড়ে তুলতে পারেননি। এর অনন্যতা সম্পর্কে লেখক আর কথকদের সচেতন করে তুলতেও না।

ভারতে শিল্পরীতি হিসাবে রেডিওর ক্ষমতা উপলব্ধ হতে আরম্ভ করে ১৯৩৫ সালে লায়োনেল ফিল্ডেন আকাশবাণীর কন্ট্রোলার হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার পর।

ফিল্ডেন এসেছিলেন বি-বি-সি অর্থাৎ বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে। বি-বি-সি থেকে তাঁকে ভারতে 'ধার' দেওয়া হয়েছিল। তিনি মূলত ছিলেন 'প্রোগ্রাম ম্যান', ঠিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নন। তাঁকে প্রায় একটা 'অতিমানবিক' কাজের ভার দিয়ে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। এবং প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় 'অতিমানবিক' কাজই করেছিলেন। ভারতের রেডিওর তাঁর নাম অবিস্মরণীয়, তাঁর দান অসামান্য। ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারতের বেতার সম্প্রচারের যে ইতিহাস তিনি লিখে গেছেন, তা এক প্রামাণিক দলিল হয়ে আছে, এবং গবেষকদের অশেষ কাজে লাগবে।

এই ইতিহাস থেকেই বোঝা যায়, ভারতে বেতার সম্প্রচারকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য, শ্রোতাদের বহুদিনের পুরনো শক্ত ধারণাকে আঘাত না করে বেতার সম্প্রচারকে জনপ্রিয় করার জন্য, এবং সর্বোপরি, 'বেতার-সাহিত্য' অর্থাৎ বেতারের উপযোগী স্ক্রিপ্ট রচনার জন্য কী প্রচণ্ড পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল।

ফিল্ডেনের হাত থেকে ১৯৪০ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এ এস বোখারি। তখন এই পদটির নামপরিবর্তন হয়েছে। তখন আর কন্ট্রোলার নয়, ডিরেক্টর জেনারেল—বাংলায় বলতে পারি, মহা অধিকর্তা।

বোখারি আকাশবাণীর প্রথম মহা অধিকর্তা। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আকাশবাণীর ঐ মহা অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত শিল্পী ছিলেন। তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় এখনও ছড়িয়ে আছে আকাশবাণীর অভ্যন্তরে। আকাশবাণীর পুরনো কর্মী আর শিল্পীরা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করেন। শিল্পীদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান দিতেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

লায়োনেল ফিল্ডেন তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন : "অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন যত মানুষ আমি দেখেছি তিনি তাঁদের মধ্যে একজন; একজন চমৎকার সংস্কৃতিবান, সদালাপী ব্যক্তি।"

নিজে সাহিত্যিক বলেই হয়তো সাহিত্যগুণান্বিত অনুষ্ঠানে বোখারির আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি নিজেও একজন সুসম্প্রচারক ছিলেন। বহু অনুষ্ঠান তিনি প্রযোজনা করেছেন। এবং সে প্রযোজনা অন্য অনেক বিশিষ্ট পদাধিকারীর প্রযোজনার মতো নয়।

বোখারিকে আমি দেখিনি—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমি পড়েছি, আকাশবাণীর পুরনো কর্মচারীদের কাছে শুনেছি। তিনি যেসব অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন তার সমগ্র দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করতেন। অফিসে বসে অধস্তন কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে এবং শেষে শেষ মহলা দেখে প্রযোজনার কৃতিত্ব গ্রহণ করতেন না। একজন সাধারণ প্রযোজকের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজই তিনি করতেন এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে খুবই সজাগ থাকতেন। পরবর্তীকালে একমাত্র ডঃ নারায়ণ মেনন ছাড়া আকাশবাণীর আর কোনো মহা অধিকর্তা অথবা উপ-মহা অধিকর্তা অনুষ্ঠান প্রযোজনা সম্পর্কে এমন গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন নি বললে বোধহয় অন্যায় বলা হয় না।

ঐ যে আগে টেকনিকের কথা বলেছি, বোখারি কখনও কোনো অনুষ্ঠান প্রযোজনায় রেডিও টেকনিকের প্রয়োজনের সঙ্গে আপোষ করেন নি।

বোখারির পরে আর কোনো মহা অধিকর্তাই এই মাধ্যমকে, তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে, তার নান্দনিক ও প্রয়োগিক সম্ভাবনাগুলিকে বোঝেন নি। এবং কেমন করে একে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে জনগণের হিতার্থে প্রয়োগ করা যায়, তা-ও না। এমন অনেক প্রশাসক এসেছেন যাঁরা ভেবেছেন, তাঁরা যা ভালো মনে করেন তা-ই প্রচারের উপযোগী।

এই প্রসঙ্গে আকাশবাণীর একজন মহা অধিকর্তার নাম করা যেতে পারে। তিনি জে সি মাথুর, ১৯৫৫ সালে আকাশবাণীর মহা অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হন এবং ছ বছরেরও বেশি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দী নাট্যকার হিসাবে তাঁর বিদ্বৎ

পরিচিতি ছিল। কিন্তু রেডিও টেকনিক বলে তিনি কিছু ভাবতে পারতেন না। রেডিওর লেখায় ও প্রয়োজনায় যে বিশেষ কিছু থাকতে পারে তা তাঁর ভাবনায় আসত না। তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর কার্যকালে। মাধ্যম হিসাবে রেডিও যে অনন্য তা তিনি বহুক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর আমলে আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে নাটক মঞ্চস্থ করতে এবং তা রেডিওয় প্রচার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিকল্পে, পেশাদার অথবা শৌখিন মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলি অভিনয়কালে রেকর্ড করে রেডিওয় প্রচার করতে বলা হয়েছিল। এবং করাও হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, কলকাতার বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকটি এইভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

আরও বিস্ময়কর, অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে এমনিভাবে নৃত্যানুষ্ঠান ও ছায়া-নাটকও প্রচারিত হয়েছিল। সেই নৃত্যানুষ্ঠানে আর ছায়া-নাটকে মঞ্চের আবহসঙ্গীত আর ধারা-বিবরণী শুনেই রেডিওর শ্রোতাদের দৃশ্যগুলি কল্পনা করে নিয়ে তৃপ্ত হতে হয়েছিল।

এখন অবশ্য এমন অদ্ভূত জিনিস আর রেডিওয় হয় না। কিন্তু এখনও আকাশবাণীতে রেডিও টেকনিক পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। এইদিকটা এখনও অবহেলিতই রয়ে গেছে। অথচ অনুষ্ঠানকে আকর্ষক করে তোলার জন্য এই টেকনিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৩ মার্চ বেলা ১টা ৫০ মিনিটে মহিলা মহলে সঙ্গীতালেখ্য "আবিরে কুমকুমে"। রচনা—শ্রীরথীন দাস; সুর সংযোজনা—শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য।

বসন্তোৎসব উপলক্ষে প্রচারিত এই সঙ্গীতালেখ্যটি নামেও যেমন মধুর, কাজেও তেমনি। এর সারা গায়ে যেন আবির-কুমকুম ছড়ানো ছিল। এ একটা মোহন রূপ ধারণ করেছিল।

২৪ মার্চ রাত ৭টায় পল্লী বেতার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান সম্পর্কে বললেন শ্রীমৃণালকান্তি করগুপ্ত। বললেন মানে ঝড়ের মতো বললেন। এত দ্রুত তাঁর বলা যে, আগে থেকে জানা না থাকলে অনুসরণ করা শক্ত, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর চাষীদের পক্ষে—যাঁদের জন্য এই অনুষ্ঠান। যাঁদের জন্য এই অনুষ্ঠান তাঁরাই যদি ভালোভাবে বুঝতে না পারলেন তাহলে কী লাভ এইরকম অনুষ্ঠান প্রচার করে? যেখানে ধীরে, সরল ভাষায়, গল্প বলার মতো করে একাধিকবার বলেও তাঁদের সকলকে বোঝানো সবসময় সম্ভব হয় না সেখানে এমন 'বাক্যঝঞ্ঝা' বইতে দেওয়া হয় কেন? বেতার কর্তৃপক্ষের এদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এটা 'লাইভ' প্রোগ্রাম ছিল না যে, এই 'বাক্যঝঞ্ঝা' পরিহার করা যেত না। রেকর্ডিংয়ের সময় অনায়াসেই বক্তাকে পল্লী বেতার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের মতো করে বলতে অনুরোধ করা যেতে পারত। একবারের পরিবর্তে একাধিকবার রেকর্ড করা যেতে পারত।

২৫ মার্চ বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্প-দাদুর আসরে 'গুড্‌ফ্রাইডে' সম্পর্কে বললেন শ্রীরবিদাস সাহারায়—গুড ফ্রাইডে কেন শোকের, কেন পবিত্র, কেন মনে রাখার মতো সে সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট করে, অনাড়ম্বরভাবে, কথা বলার মতো করে সব বর্ণনা করলেন তিনি।

২৬ মার্চ রাত ৮টায় 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আসর'। আসর পরিচালনা করলেন অধ্যাপক সমীরকুমার ঘোষ, আর এতে শ্রোতাদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র ও ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়।

কে একজন বলেছিলেন, "যে যা-ই বলুন, পপুলার সায়েন্স হয় না।"—হয় কি হয় না, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়ই এমন যে, সেগুলো বুঝতে হলে বিজ্ঞানের একটুখানি বনিয়াদ থাকা দরকার—এবং পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই তা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ উন্নতিশীল দেশ, তাই বিজ্ঞানের ছাত্ররা ছাড়া বিজ্ঞানচর্চা কেউ বড়ো একটা করেন না। তবে বিজ্ঞান বিষয়ে এখন অনেকেরই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা বিজ্ঞান কেন কোনো জ্ঞানেরই ধার ধারেন নি এতকাল তাঁদেরও মনে এখন বিজ্ঞান সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন জাগছে। তাঁরা মুখ খুলছেন, প্রশ্ন করছেন।

সুতরাং রেডিওতে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আসরে যাঁরা প্রশ্ন পাঠান তাঁদের সকলেরই বিজ্ঞানের কিছু না কিছু বনিয়াদ আছে, একথা ধরে না নেওয়াই ভালো। কিন্তু পরি-তাপের বিষয়, ২৬ মার্চের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আসরের বক্তারা সেটা ধরে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁদের আলোচনা শুনে মনে হয়েছে, তাঁরা যেন বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে আলোচনা করছেন। বিজ্ঞানের ছাত্ররা ছাড়া অন্যরাও যে তাঁদের প্রশ্নকর্তা হতে পারেন এটা যেন তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁদের অসুবিধার কথা বোঝা শক্ত নয়, সব কিছু আর একেবারে গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সে সময়ও পাওয়া যায় না রেডিওতে। কিন্তু তবু রেডিওর আলোচনায় ঐদিকেই একটু ঝোঁক থাকা দরকার, যত-খানি সম্ভব। যতখানি সম্ভব ব্যাখ্যা করে, সরল ভাষায়, 'পপুলার'ভাবে বলা উচিত।... কিন্তু এই ঝোঁকটা, এই ভাবটা এদিনকার আসরে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানের বেশ ভালো বনিয়াদ না থাকা শ্রোতারা এদিনকার আসরে আগ্রহী হতে পারেন নি।

২৭ মার্চ রাত সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে শ্রোতাদের আবার 'আপেলো' উপহার দেওয়া হয়েছে। সংবাদ পাঠিকা বারবার আপেলো-১৩ বলেছেন। এতদিন ধরে এতবার করে এত কাগজে এত লেখা সত্ত্বেও তাঁরা কিছুতেই আপেলো বলা ছাড়বেন না?

এইদিন রাত ৮টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক 'পাগলা ঘোড়া'। রচনা—শ্রীবাদল সরকার।

না, হিন্দী নাটকের বাংলা অনুবাদ অথবা কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবী বা তামিল নাটকের হিন্দী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ নয়; নাটকের নামে এক বান্ডিল কথা না—অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের নাটক বলতে সাধারণত যা বোঝায়।

কিন্তু তবু 'পাগলা ঘোড়াকে মন খুলে স্বাগত জানানো গেল না। নাটকটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য কী, স্পষ্ট বোঝা যায় নি। তবে নাটকটির সংলাপ রচনায় ও ঘটনা বিন্যাসে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে। নাট্যকার অনেক স্থানে বেশ পাকা হাতের ছাপ রেখেছেন। শেষদিকটাতে তিনি কৌতূহল সৃষ্টি করতে এবং মনটাকে সজোরে নাড়া দিতে পেরেছেন। নাটকটির অভিনয়ও স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত।

নাট্যকার এই নাটকে কী বলতে চেয়েছেন তা যদি সুস্পষ্ট হত তাহলে অকুণ্ঠ প্রশংসা করা যেতে পারত।

নাটকটির অভিনয়াংশে ছিলেন শ্রীগঙ্গা-পদ বসু, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় লাহিড়ী, শ্রীঅম্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অঞ্জলি বাগচী, শ্রীমতী মঞ্জু দে প্রভৃতি।

—শ্রবণক

প্রেক্ষাগৃহ

বি এফ জে-এর বিচারে ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ নায়িকা অপর্ণা সেন। ফটো : অমৃত

মস্তিষ্ক বিকৃতি—আসল ও নকল

কোনোও খুনীকে বিকৃতমস্তিষ্ক ব'লে আদালতের বিচারে তার প্রাপ্য শাস্তিকে লাঘব করবার প্রয়াসের ঘটনা পৃথিবীর কোথাও বিরল নয়। কিন্তু বার্ন অ্যান্ড মুভীজ-এর নবতম নিবেদন, ইস্টম্যান কলারে তোলা "পাগলা কাহীকা"-র কাহিনী ও চিত্রনাট্যরচয়িতা রঞ্জন বসু, পরিচালক শক্তি সামন্ত এবং প্রযোজক সুজিত চক্রবর্তীর জানা উচিত ছিল, দোষী আদালত-গৃহে পাগলের মতো আচরণ করলেই বিচারক তাকে উন্মাদ বলে মেনে নেন না, তাকে রীতিমত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করাবার পরেই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই বন্ধু শ্যামকে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার জন্যে নায়ক সুজিত হত্যার অপরাধ নিজের স্কন্ধে নেবার পরেও বিচারককে উন্মাদের অভিনয় করবার ফলেই যে উন্মাদাশ্রমে নীত হল, এই পরিস্থিতি রচনা যুক্তির দিক দিয়ে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য বাস্তবজীবনে অনেক ক্ষেত্রে এমনও শোনা যায় যে, বিশেষজ্ঞের ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে সুস্থ ব্যক্তিকে বিকৃতমস্তিষ্ক ব'লে চালানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা যদি ধরা পড়ে যায়, তখন? সুজিত যে সত্যই উন্মাদ নয়, এ-ও তা' ধরা পড়ে গিয়েছিল ডাঃ শালিনী বা শালুর কাছে। বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটলে সুজিতকে শুধু হত্যা-অপরাধে আবার যে চালান দেওয়া হ'ত, তাই নয়, মিথ্যা বিকৃতমস্তিষ্কের অভিনয় করার জন্যেও আলাদা শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হ'ত। কিন্তু আলোচ্য চিত্রকাহিনীতে তেমন কিছু না হ'য়ে আবার সুজিত ফিরে গেল সেই হোটেলে, যেখানে সে নর্তকী জেনীর পার্টনার হিসেবে কাজ করত এবং এখানে তার বন্ধু শ্যাম ও তার প্রণয়িনী জেনীকে পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার উৎসবের মধ্যে দেখে সে এবারে যথার্থই উন্মাদ হয়ে গেল। কাজেই সে আবার নীত হল পাগলের সেই উন্মাদাশ্রমে এবং এবারে ডাঃ শালিনীর আপ্রাণ চেষ্টায় সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল, তখন সে একাই উন্মাদাশ্রম ত্যাগ করল না, তার সঙ্গে তার জীবনসঙ্গিনীরূপে চলল ডাক্তার শালিনী বা শালু। কাহিনীটি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন তোলা যায় শ্যাম চরিত্রটির আকস্মিক পরিবর্তন ব্যাপারে। যে-শ্যাম ছিল সুজিতের একান্ত বন্ধু, যে-শ্যাম সুজিতের প্রণয়িনী জেনীর প্রতি অন্যায় এবং অসদাচরণ করার জন্যে হোটেল ম্যানেজারকে এমন আঘাত করল, যার ফলে সে মরণের কোলে ঢলে পড়ল, সেই শ্যাম কোনোরকম যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই কি ক'রে জেনীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং জেনীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে পাবার জন্যে সুজিতের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়ল, তা' বুঝে ওঠা যথেষ্টই শক্ত।

কাহিনী ও চিত্রনাট্যের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও ছবিটি যে আশ্চর্যরকম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, তার দু'টি কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা-প্রবাহ এবং অপরটি হচ্ছে, শাম্মী কাপুর, আশা পারেখ সহ প্রায় সকল শিল্পীর সমবেত অভিনয়নৈপুণ্য। উচ্চাঙ্গের অভিনয়কলা প্রদর্শনের পথে শাম্মী কাপুর যে দৃঢ়পদে অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি এখন যে আর 'জংলী' বা 'জানোয়ার'-এর শাম্মী কাপুর নন, এ-প্রমাণ তিনি রেখেছেন বর্তমান ছবিতে। ডাঃ শালিনী বা শালুর ভূমিকায় আশা পারেখ-এর সংবেদনশীল সুঅভিনয় দর্শকহৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রেম চোপড়া চলচ্চিত্রজগতে অপেক্ষাকৃত নবাগত। তিনি প্রেমিক-নায়ক অথবা ভীলেনরূপে বেশী সার্থক হবেন, তা' এখনও জোর ক'রে বলা যায় না। আলোচ্য

সাগিনা মাহাতোর সেটে সায়রা বানু এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

ছবিতে শ্যাম-এরু ভীলেন চরিত্রটি তিনি যত্নের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। হোটেল-নর্তকী জেনী বেশে হেলেন-এর নৃত্য-গীতসহ অভিনয় আকর্ষণীয়। উন্মাদাশ্রমের একটি নার্সের ছোট্ট চরিত্রে মাধবীর সুন্দর অভিনয় মনে রেখাপাত করে। এছাড়া মনোনমোহন কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ভরদ্বাজ, নিম্বাল-কর, মোহন চটি, সুন্দর, কানু রায়, মণি চট্টোপাধ্যায়, কুমুদ ত্রিপাঠী প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বেশ উচ্চ পর্যায়ের। বিশেষ করে ছবির সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় যথাক্রমে গোবিন্দ ডালওয়াদী ও শান্তি দাশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে ছ'খানি গান আছে; তার মধ্যে পাঁচখানি হসরৎ জয়পুরীর রচনা। শংকরজয়কিষেণ-কৃত সুর প্রতিটি গানকেই মাধুর্য দিয়েছে। "তুম মুঝে যু ভুলা ন পায়োগে"—এই লাইন দিয়ে আরম্ভ দু'খানি গানই—মোহম্মদ রফী ও লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া—বার বার শোনবার মতো।

শাম্মী কাপুর ও আশা পারেখের অভিনয়সমৃদ্ধ "পাগলা কাহীঁকা" বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে ব'লে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার—ভারত সরকারের স্টেশনারী অফিস স্টাফ্ রিক্রিয়েশন কাম ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সভ্যাগণ গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীললিত চৌধুরীর পরিচালনায় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কাহিনী অবলম্বনে শ্রীজয়দেব বসু নাট্যরূপায়িত 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' নাটকটি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। শিল্পীদের উচ্চাঙ্গের অভিনয় দর্শকচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুঁজো ব্যাঙার চরিত্রে পরিচালক শ্রীচৌধুরী, পরন্তপ রায়ের চরিত্রে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদয়-নারায়ণ ও বাণীবিজয় এই দুইটি চরিত্র সাধ্যমত প্রাণবন্ত করে তোলেন যথাক্রমে শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরাংশু মজুমদার। স্ত্রী ভূমিকায় ইন্দ্রাণী ও পুটুর চরিত্র সাবলীল অভিনয়ে মূর্ত করে তোলেন যথাক্রমে আরতি ঘোষ ও সবিতা পাত্র। বাইজীর চরিত্রে নমিতা গাঙ্গুলীর নৃত্যদৃশ্যটি আরও প্রাণবন্ত হওয়া উচিত ছিল। চাঁপারূপী কল্পনা রায় অতি অভিনয়ে দুষ্ট। দর্পনারায়ণ (বড়) ও বনমালার চরিত্র দুটিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে কমল মুখোপাধ্যায় ও রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি মোটামুটি সু-অভিনীত। আবহ-সঙ্গীত, আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সঙ্গীতাংশ দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রধান অতিথি অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী উল্লেখ করেন যে, তাঁর কাহিনীটি চল্লিশ বছর পূর্বে লিখিত হয় দুশো বছর পূর্বের সমাজব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এবং লেখক হিসাবে নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রায় প্রতি লেখকেরই কিছুটা অ[illegible] থাকলেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপ দর্শকদের আনন্দদানে সক্ষম হবে।

বিন্দুর ছেলে ও তিলোত্তমা—উত্তর-বংগের জলপাইগুড়ি জেলার চালসায় গত ২৮ ও ২৯ মার্চ, স্থানীয় মহিলা সমিতির সদস্যাবৃন্দ কর্তৃক এবং চালসা শালবনী সংঘের নাট্যবিভাগ কর্তৃক পরি-বেশিত হলো যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের অমর রচনার নাট্যরূপ "বিন্দুর ছেলে" এবং বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত পঃ বঃ সরকারের স্বল্প-সঞ্চয় ভিত্তিক নাটক "তিলোত্তমা" চালসা শালবনী সংঘের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে ভবেশ চৌধুরীর পরিচালনায়। অভি-নয়াংশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন বিন্দুর ছেলে নাটকে—পুষ্প মুখার্জি, মালা চৌধুরী, গীতা সেনগুপ্তা, মঞ্জু গুহ, রত্না মুখার্জি, রীণা গাঙ্গুলী, নীহার কর, অর্পণা বিশ্বাস, কৃষ্ণা দেব, মাঃ বাবুয়া প্রভৃতি এবং তিলোত্তমা নাটকে সর্বশ্রী ভবেশ চৌধুরী, প্রবীর চক্রবর্তী,

আশুতোষ ভৌমিক, পরিমল চক্রবর্তী, প্রমথ দেব, রত্না মুখার্জি, রেকা বিশ্বাস, চুলু চক্রবর্তী, দেবব্রত, সমীর, বিকাশ প্রভৃতি সদস্যবৃন্দ।

এবাড়ী ওবাড়ী এবং মহানায়ক শশাঙ্ক—সম্প্রতি বানারহাট স্থানীয় দেবপাড়া ক্লাবের সদস্যগণের উদ্যোগে যথাক্রমে 'এবাড়ী ওবাড়ী" ও "মহানায়ক শশাঙ্ক" নাটক দুটি প্রভূত সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅজিত মুস্তাফি। বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপদান করে নাটক দুটি সাফল্যমণ্ডিত করেন যথাক্রমে শ্রীমতী শ্যামলী বসু, (বান্দর) ডাঃ কালিপ্রসাদ দত্ত, হরিবন্ধু ভট্টাচার্য, দুর্গা বসু, বকুল দত্ত, কৃষ্ণা বসু, পূরবী ব্যানার্জি প্রভৃতি। স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

বিবিধ সংবাদ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল চারদিনব্যাপী **দ্বাদশ বার্ষিক বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০-এ অধিবেশনের কার্য শুরু হবে বিশ্বরূপা রঙ্গালয় প্রাঙ্গণে।

সাজ ও আওয়াজ তাঁদের সংস্থাগৃহ ১৬, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২তে আসছে ১৬ এপ্রিল মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় পরলোকগত মলয় মুখোপাধ্যায়, অরুণাভ মজুমদার, রতন গাঙ্গুলী ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্যাপন করবেন। ঐদিন সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটার মধ্যে যে কোনো সময়ে এসে পরলোকগত আত্মাগুলির শান্তি কামনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত উপহার দেবার দেবার জন্যে সকল বন্ধুস্থানীয় গায়ক-শিল্পীকে সংস্থার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সাঁত্রাগাছি মিউজিক আকাদেমি—গত ২২ মার্চ সন্ধ্যায় রামরাজাতলা বাণী-নিকেতন হলে সাঁত্রাগাছি মিউজিক আকাদেমির দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সুবোধকুমার ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী বেলা দে (আকাশবাণী)। অনুষ্ঠান শেষে আকাদেমির ছাত্রছাত্রীরা একক এবং সমবেত সঙ্গীত, সরোদ, সেতার, গীটার, নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' নৃত্যনাট্য। বিম্ববতীর ভূমিকায় মধুছন্দা ভট্টাচার্য এবং বিদূষকের ভূমিকায় মিলন মুখার্জি এবং সঙ্গতে তপন আদিত্য অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রবি ভট্টাচার্য মহাশয়।

সম্প্রতি টি আর বি (স্টিল টাউনশিপ, দুর্গাপুর) তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যে দিলীপ চক্রবর্তীর অর্কেস্ট্রা, শুভব্রত গুপ্তের গীতিআলেখ্য, শিশু-শিল্পী রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গান ও তৃপ্তি অধিকারীর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রশংসার দাবী রাখে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পীযূষ চক্রবর্তী।

চাকাপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গত ২৭ মার্চ সংস্থা-প্রাঙ্গণে বিশেষ আড়ম্বর ও উদ্দীপনার সাথে 'বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ দিবস' উদযাপন করেন। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুণধর মাজী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আমতা শাখা)-এর আন্তর্জাতিক চেতনাসমৃদ্ধ সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন করেন। বিশেষ ধরনের ধূপবাতি জ্বালিয়ে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য সুরু করেন। এই উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রে 'আন্তর্জাতিক নাট্যধারার বিবর্তন' 'নাটক, সমাজ ও মানুষ' 'গণনাট্য' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে নিমাই মান্না, ইন্দ্রজিৎ পাত্র, নির্মল পাত্র ও আরও অনেকে। নিমাই মান্নার আন্তর্জাতিক ভাবসমৃদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীকালী দেয়াসী ও বাবলু চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে সংস্থার সদস্যরা উর্দু নাট্যকার জনাব কুদ্রতুল্লা সাহাব রচিত উর্দু নাটক 'লালফিতা' (বাংলা ভাষান্তর) মঞ্চস্থ করেন। নাটকে সর্বশ্রী দিলীপ মান্না, ফেলু দোয়ারী, সমীর পাখীরা, শচীন মান্না, শ্রীকুমার খাঁড়া, রণজিৎ দোয়ারী নিজের নিজের অংশ কৃতিত্বের সংগে অভিনয় করেন। নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন খ্যাতিমান কবি ও সমালোচক নিমাই মান্না। 'ইন্টারন্যাশনাল' সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সাথে সভার কাজ শেষ হয়। এই উপলক্ষে নাট্য-সংক্রান্ত এক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কলম্বিয়া পিকচার্সের ম্যাকেন্নাস গোল্ডে ওমর শেরিফ এবং গ্রেগরী পেক

স্টুডিও থেকে

একদিকে বাংলা ছবি যেমন মুক্তি পাচ্ছে না অন্যদিকে তেমনি নতুন ছবি তৈরীর খবর আসছে প্রায়ই। নতুন রিলিজ চেনের কথা বাদ দিলেও বাংলা ছবির চেনে এখন আর বাংলা ছবি কই? সেন্সর-ভিত্তিক রিলিজের জন্য ফিল্ম কনসাল-টেটিভ্ কমিটির হাতে এখন মাত্র অল্প কখানা ছবি। তা দিয়ে হয়তো পুরোনো বাংলা চেনগুলো ভর্তি করা যেতে পারে। কিন্তু নতুন চেনে দেবার মত ছবি কোথায়?

কনসালটেটিভ্ কমিটির হাতে এখন যে ক'খানা ছবি আছে সেগুলো হলো শীলা (২৫-১১-৬৯), নল দময়ন্তী (২৬-৫-৬৯), সাগিনা মাহাতো (৫-৩-৭০), পদ্মগোলাপ (২-৩-৭০), নিশিপদ্ম (?) কলঙ্কিত নায়ক (৭-১-৭০), বিলম্বিত লয় (৭-১-৭০), মুক্তিস্নান ২০-১-৭০), এই করেছো ভালো (১০-৩-৭০), প্রথম কদম ফুল (৭-৩-৭০), নিশাচর (১২-৫-৬৯)। কমিটি পুরোনো পাঁচটি চেন ছাড়াও নতুন তিনটি চেন (এখন যে সব হলে বেশীর ভাগ সময়ই অ-বাঙলা ছবি চলে) তৈরী করার চেষ্টা করছেন। সেগুলো হোল বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা, প্রিয়া-গ্রেস-দর্পণা ও পূর্ণশ্রী-জেম-কালিকা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার অনেক ছবির প্রযোজক প্রদর্শক এই নতুন চেনগুলিতে ছবি রিলিজ করতে রাজী নন। কারণ বাংলা ছবি এইসব হলে নাকি ভালো চলবে না। অথচ সরকারী হিসাব মতে ঐ সকল হলের আশপাশে শতকরা সত্তর জন বাঙালীর বাস।

এ'দের প্রায় সবাইই বিরোধ দু-তিনটি চেনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন, অন্য চেনে ছবি রিলিজে অনেকেই নারাজ। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রদর্শক প্রযোজক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবার কথা বলতে পারেন, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের নতুন চেনে ছবি রিলিজ করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় কি?

নতুন ছবির কথা যা বলছিলাম তার প্রথমেই নাম করতে হয় তপন সিংহের 'এখনই'। রমাপদ চৌধুরীর গল্প নিয়ে চিত্রনাট্য রচনা প্রায় শেষ। কাস্টিং এখনও ঠিক হয়নি, হলে জানাব।

পূর্ণেন্দু পত্রী করছেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নতুন নায়িকা মন্দিরা ভট্টাচার্যকে নিয়ে। অরূপ গুহঠাকুরতা শুরু করছেন বনফুলের লেখা 'অধিক লাল'। নায়ক চরিত্রে বিশেষ পরিচিত কেউ থাকলেও নায়িকার ভূমিকায় নতুন মুখ খুঁজছেন। এদিকে আবার কালকূটের খ্যাতনামা উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'রও চিত্রস্বত্ব বিক্রী হয়ে গেছে। কিনেছেন প্রযোজক দেবনাথ রায়। চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। আসছে সপ্তাহে হয়তো আবার নতুন সংবাদ শোনা যাবে।

বি-এফ্-জে-এর বিচারে গত বছরের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন তপেন চট্টোপাধ্যায় ওরফে গুপী। অজিত গাঙ্গুলীর পর পর তিনখানা ছবিতেই তপেনবাবু কাজ করছেন। তার মধ্যে 'রূপসী'র কাজ শেষ। এ ছবিতে তিনি অবশ্য নায়ক নন। ও'র সঙ্গে এ ছবিতে আছেন সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, বিকাশ রায় ও অন্যান্যরা। অজিতবাবুর পরবর্তী ছবি 'অপরাজিতা' ও 'রজনী'তেও তিনি অংশ নিচ্ছেন। তবে 'অপরাজিতা'র কাজ শুরু হতে এখনও কিছু দেরী, 'রজনী'র কাজ এ মাসেই শুরু হচ্ছে। তপেনবাবু জানালেন অরুন্ধতী দেবীর নতুন ছবি 'পদীপিসির বর্মিবাক্স'তেও তিনি থাকছেন। দিন কয়েক আগে অরুন্ধতী দেবীর কাছ থেকে চিত্রনাট্য শুনে তপেনবাবু রাজী হয়েছেন। এ ছবিরও কাজ শুরু হচ্ছে এ মাসে। লীলা মজুমদারের লেখা এই হাসির গল্পটির সুন্দর চিত্রনাট্যও তৈরী করেছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী। পদীপিসির চরিত্রে আছেন শ্রীমতী ছায়া দেবী। আউটডোরের কাজ শুরু হোলো বলে। তপেনবাবু যে চরিত্রে করছেন, ও'র কথায় সেটি 'ইন্টারেস্টিং'।

উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেন্টারের শিল্পীদের অনুষ্ঠান

জলসা

পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনবদ্য অনুষ্ঠান

সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যার্থে আয়োজিত এক প্রভাতী আসরে ওস্তাদ আল্লারাখার তবলা-সহযোগে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতারবাদন এক অপরূপ ভাবলোক সৃষ্টি করেছিল। বিদেশ যাত্রার পূর্বে কলকাতায় এই তাঁর শেষ অনুষ্ঠান।

পণ্ডিতজী বিলাসখানি টোড়ি রাগে আলাপ এবং ঐ রাগেই গৎ বাজান রূপক তালে।

এরপর স্বল্প-শ্রুত রাগ 'নটভৈরব' ও গাঙ্গেশ্বরী বাজিয়ে ভৈরবী দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

ভারতীয় রাগের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-চেতনাকে মূর্ত করে তোলবার জন্য যে আঙ্গিক বৈভবের ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব তাঁর ছিলই এ-ছাড়াও ছিল এক গভীর প্রেরণার আলো যা গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা জমজমা ইত্যাদি অলংকারে রাগভাবকে উন্মুক্ত করেছে এমনভাবে যেখানে অলংকারগুলি পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে যে সমৃদ্ধ-পূর্ণতার সৃষ্টি করেছে তার তুলনা নেই।

বিলাসখানির আলাপ শুনতে শুনতে মনে হয়েছে কি অপূর্ব ও অনুপম তাঁর রাগবিস্তারের পদ্ধতি। অতি ধীরে, একটি, দুটি, তিনটি পরে চারটি এইরকম করে পরপর সুর নিয়ে অতিসূক্ষ্ম স্বরবিন্যাসের মালা গেঁথে রাগের অন্তরশায়ী বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যকে অনুভব গোচর করেন। ফলে রবিশঙ্করের আলাপের মধ্যে যে নিটোল তৃপ্তিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারা যায় না। সরগা-প দ ম গ র—পর অবরোহী অংশে মধ্যম গান্ধার রেখাবের পথ বেয়ে—খড়জে-র ধৈবতে পৌঁছনর সময় পর্দা হতে পর্দান্তরে যাবার কি সুন্দর ভঙ্গী। অতি কোমল ধৈবত গান্ধারের বিশুদ্ধ শ্রুতির ওপর কি অচঞ্চল স্থায়িত্ব।

তারপরেই বৃদ্ধ বেদনায় ভারাক্রান্ত শ্রোতাদের মনকে অকস্মাৎ রূপক তালের ছন্দবৈচিত্র্যে মুক্তির আনন্দে নাচিয়ে দেবার কি উল্লাস যার মধ্যে অনুরণিত হয়েছে শিল্পী ও শ্রোতা উভয় তরফেরই নিজেকে হারিয়ে ফেলার আনন্দ।

গাঙ্গেশ্বরীর ও তাঁর অফুরন্ত অবদানের অন্তর্ভুক্ত। রেখাব-বর্জিত ধৈবত-নিষাদ কোমল যুক্ত এই রাগ কৌষিকী-ভৈরব সমন্বয়কারী ভাবধর্মী হলেও সূক্ষ্ম-পার্থক্য ঐ রেখাবের বেলায়। দক্ষিণভারতে মন্দিরে দেবী দর্শনজাত প্রেরণাই এ-রাগের উৎস।

এ রাগ শুনে নতুন করে অনুভব করলাম যে, যে মুহূর্তে গুণী ভাবতন্ময় হয়ে তাঁর সংগীতকে ভোগের মত দেবতার চরণে নিবেদন করেন ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই ভোগও হয়ে ওঠে প্রসাদ যার মধ্যে ভগবৎ স্পর্শে বেজে ওঠে এক দিব্যস্পন্দন। এই গভীর মুহূর্ত জীবনে দুর্লভ বলেই স্মরণীয়। ভৈরবী ত এঁদের সিদ্ধ রাগ। এ সম্বন্ধে নতুন করে আর কি বলব? এইটুকুই শুধু বলা যায়, বিভিন্ন রাগ ও আবেগের সমন্বয়ে ভৈরবীর নানারভা দিকটি কখনও হৃদয়দ্রাবী মীড়, দুরূহতম লয়-কিরীও—সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে যেমন উন্মুক্ত করেছেন—তেমনই দেখিয়েছেন সাদা কটি পর্দা সমন্বয়ের মধ্যেই কেন্দ্রগত আকৃতিকে অনুভূতিগোচর করবে যাদুকরী শক্তি। আল্লারাখার তবলাসঙ্গতে মনে করিয়ে দিয়েছে সঙ্গতকারের পূর্ণ সহানুভূতির মাপ দিয়েই শিল্পীর হৃদয়ভাবের যথার্থ বিকাশ ঘটা সম্ভব।

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার নিবেদিত 'চিদাম্বরম'। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থের 'চিদাম্বরম' অবলম্বনে উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের শিক্ষার্থীদের নৃত্যনাট্য 'চিদাম্বরম' এক চিত্তগ্রাহী অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এই সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিলেন শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীধাবন। শ্রীঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের উদয়শঙ্করী ধারানুসারী নৃত্য-পদ্ধতির সৌন্দর্যচেতনার দিকটির সঙ্গে উপস্থিত রসিকদের পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সহজ, সুন্দর অনাড়ম্বর ভাষায়।

নৃত্যনাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। তাঁর শিক্ষাধীনে স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যে শিক্ষার্থীরা একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্যমানে পৌঁছতে পেরেছেন এবং রসগ্রাহী দর্শককে আনন্দ দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এ সত্য অনস্বীকার্য।

চিত্রকল্প-সৌন্দর্যে কখনও মণিপুরী, কখনও কথাকলির কখনও লোকনৃত্যের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু শিল্পীরা সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। এইখানেই শিক্ষা ও প্রয়োগ-কুশলতার বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বাঁধাধরা গণ্ডি-মুক্ত স্বাভাবিক নৃত্যে যেমন সামগ্রিক কুশলতা ব্যক্ত হয়েছে তেমনই কৃতিত্ববাহী শ্রীমতী মমতাশঙ্কর ও চম্পক জৈনের নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা ভারতনাট্যমের আলারিপু ও তিল্লানা। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়াও স্বাভাবিক প্রতিভার ছাপও ছিল যথেষ্ট।

সৌমেন দের পরিচালনায় সৌমেন বসু, বুলবুল বড়াল, গোপেশ্বর দত্ত, সৌরেন ঘোষ ভাবানুযায়ী আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন।

সজ্জা পরিকল্পনায় শ্রীমতী [illegible] তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

—[illegible]

খেলার কথা

খেলাধুলায় প্রতিভা অনুসন্ধান

খেলাধুলার উন্নতির জন্যে ভারত সরকার সম্প্রতি একটি নতুন কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। কর্মসূচীটি খুবই সমীচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। এতে ক্রীড়া-প্রতিভা অন্বেষণ ও সহায়তা দানের উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়েছে। ভারতের মত বিশাল দেশেও খেলার মান বিশ্ব পর্যায়ের অনেক নীচে পড়ে আছে। স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও তার যে বিশেষ উন্নতি হয়েছে তেমন কিছু সুলক্ষণ দেখা ত যায়ই নি, বরঞ্চ যেসকল বিভাগে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব এককালে সকলেই স্বীকার করে নিত, সেগুলিতেও আমরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়েছি এবং হকির প্রধান আসনটিও পাকিস্তানের কাছে বিকিয়ে দিয়েছি। বিভিন্ন খেলাধুলো, বিশেষ করে এ্যাথলেটিক্‌স, জলক্রীড়া, জিমনাস্টিক, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি প্রভৃতি বিষয়েও বিশ্বমান ভারতের সামর্থ্যের অনেক উঁচু জায়গায় চলে গেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, শারীরিক সামর্থ্যের দিকটা উপেক্ষিত হয়ে চলেছে। বৈরাগ্যের দেশ ভারতেই কিন্তু বহু প্রাচীন কালেই সোচ্চারে ঘোষণা করা হত "শরীর-মাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" জীবনসাধনার ত কথাই নেই, ধর্মসাধনা করতে গেলেও গোড়াতে একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যসমন্বিত দেহ চাই।

পৃথিবীর সমস্ত দেশই জাতীয় স্বাস্থ্য-সমুন্নতির দিকে চোখ রেখেই অন্যান্য কাজে হাত দেয়। এই স্বাস্থ্য-সমুন্নতির সহজ পথ হচ্ছে খেলাধুলো। খেলাধুলো তার স্বাভাবিক আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয় প্রতিটি তরুণের জীবন-তোরণে। তরুণ তাকে বরণ করে নেয় আনন্দের সঙ্গে। এই আনন্দের আকর্ষণ যুক্তি করে বিভিন্ন দেশ খেলাধুলার মান উন্নত করে চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রীড়া-প্রতিভার যাচাই হচ্ছে, দেশের সুনাম ও গৌরবের পথ খুলে যাচ্ছে। দেশের সরকার এই সমস্ত ব্যবস্থায় আর্থিক সাহায্য ও বিবিধ সুবিধার আয়োজন করে উৎসাহ যুগিয়ে দিচ্ছে। ফলে প্রতিটি দেশে খেলাধুলার মান উন্নত হয়েছে এবং এই উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে অবিরাম চর্চা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে। প্রতিটি দেশই তার তরুণ সমাজকে এই কাজে উৎসাহিত করে সুফল লাভ করেছে। ভারত এতকাল এ-বিষয়ে কোন সুসম্বদ্ধ নীতি বা কর্মসূচী গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিল। বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে ক্রমশ পিছু হাটতে আজ এমন এক জায়গায় এসে পড়েছে যে, খানিকটা না এগোতে পারলে আর মুখ থাকে না। তাই হয়ত ভারতে আজ এই শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছে।

কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, খেলাধুলায় প্রতিভা আছে এমন ছেলে-মেয়েদের খুঁজে বার করা এবং তাদের বৃত্তি দেওয়া। ১৯৭০-৭১ সাল থেকেই এটি চালু করা হচ্ছে। খুবই আনন্দের কথ, আর পাঁচটা পরিকল্পনার মত এটা চালু করতে গড়িমসি করা হচ্ছে না। ক্রীড়ামানের শোচনীয় অবনমন রোধ করতে হলে যে দ্রুততার সঙ্গে এগোনো দরকার, এটি চালু করার জন্যে সেই ক্ষিপ্রতা অবলম্বিত হচ্ছে। সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বার এটিকে সার্থক করে তুলতে পারলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। এই কর্মসূচীটির বিন্যাস হল দুটি স্তরে। প্রাথমিক কাজটা চলবে রাজ্য স্তরে এবং তারপর জাতীয় স্তরে এর পরিণতি ঘটবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়বার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া-প্রতিভা লক্ষ্য করা হবে।

শঙ্করবিজয় মিত্র

পর্যবেক্ষণের পর প্রতিভা পরিলক্ষিত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের এই বৃত্তি দিয়ে সহায়তা করা হবে—যাতে তারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় এবং খেলাধুলোয় উৎসাহ বোধ করে তারই জন্যে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। রাজ্য পর্যায়ে এই বৃত্তি দেওয়া হবে চারশোটি এবং পরিমাণ হবে বার্ষিক তিনশো টাকা। সতেরটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কুড়িটি করে বৃত্তি দিতে পারবে এবং এগারটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দিতে পারবে ছটি করে। প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যাগুলি অতি নগণ্য হলেও "অয়রাম্ভ শুভায় ভবতু" বলবো। অনেক দিনের অনেক দাবী, অনেক সমালোচনা ও অনেক আলোচনার পর কর্মসূচীটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে চলেছে। আরম্ভের জন্য অভিনন্দনই জানাবো।

চোদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ বৃত্তি পাবে। জাতীয় পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা দুশো। বিদ্যালয় ক্রীড়া-সংস্থাসমূহ, জাতীয় ক্রীড় ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে, সেগুলির ফাইনালে যেসব দল উঠতে পারবে সেসব ক্রীড়াঙ্গনে ক্রমশ পিছু হাটতে হাটতে আজ করতে পারবে। দৌড়, ঝাঁপ, সাঁতার, জিমনাস্টিক প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম দুটি স্থানের অধিকারীরাও ঐ বৃত্তি পেতে পারে। এই বৃত্তির পরিমাণ বছরে ছশো টাকা। খেলাধুলার মান বজায় রাখতে পারলে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে।

দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে ক্রীড়া-প্রতিভা বিকাশের এক পথ খুঁজে পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। এযাবৎ শহরাঞ্চলেই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভা দেখানর যা-কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে; তাও সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ধরাধরির সুযোগ থাকলে, বড় বড় ক্লাব বা ক্রীড়া সংস্থার হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবেই এ-ধরনের সুযোগ মিলে থাকে। এখন সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই সুযোগ পাবে এবং দূর গ্রামাঞ্চলের যে সকল প্রতিভা এতকাল অনাদৃত হয়ে আসছিল, তারাও তাদের ভাগ্যে কিছুটা আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কিছুটা বলছি এজন্য যে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই—না আছে খেলাধুলোর তদারকের কোন শিক্ষক, আর না আছে খেলাধুলোর মাঠ. অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দূরের কথা। খাস কলকাতার ক'টা স্কুলে খেলার মাঠ আছে তা হাতে গুনে বলা যায়। শতকরা আশিটি স্কুলেই খেলাধুলো, দেহচর্চা ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটা মায়া মরীচিকা। এর ফলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-চর্চায় বঞ্চিত ছাত্র সমাজ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গিয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতে অসামাজিকতার কিংবা দুষ্ট রাজনীতির শিকার হয়। শারীরিক সামর্থ্যের যে একটা দিক আছে এবং তাতে যোগ্যতা দেখাতে পারলে যে পেশা ও জীবিকার পথ সুগম হয় এ ধারণাটা ছাত্র সমাজের মধ্যে সহজ স্থান পেলে অনেকে এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং দেশের ক্রীড়মান যে সমুন্নত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি সমুন্নত দেশেই তাই বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি শারীর শিক্ষা একটা প্রধান রূপ নিয়েছে এবং সেইসব দেশের তরুণরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দেশকে গৌরবের আসনে বসাতে পেরেছে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এই ত্রুটি দূর না হলে বিশ্বসভায় তার সন্তানদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। সেখানে প্রবেশাধিকার পেতে

হলে যোগ্যতায় অধিকারী হতে হবে। কদমে অপরিপুষ্ট দেহ, অদিকায় অপটু কৌশল নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় অসাধারণ পটুত্বের অধিকারী আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পাল্লায় দাঁড়ান সম্ভব নয়। অবশ্য একাগ্র নিষ্ঠা ও সাধনা থাকলে অনেকখানি এগোনো সম্ভব। বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আফ্রিকান দেশগুলির সাফল্য তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের আন্তরিক সাহায্য ও সমর্থন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

রাজনীতির মাদকে সারা দেশের দেহে আজ যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাকে নাশ করতে হলেও সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারও জন্য দেশের তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে, খেলাধুলোর প্রতি তাদের অনুরাগ ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে গ্রামেই দেখতে হবে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাতে খেলার মাঠ ও শরীরচর্চার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা, প্রতিটি স্কুলে ক্রীড়া শিক্ষক রয়েছে কিনা।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচীর রদবদল, আর অনাবশ্যক পাঠ্যতালিকার সমাবেশ ঘটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভার না বাড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা যায় তার দিকে নজর দেওয়া আগে দরকার। সরকারকে এজন্যে একটা সুসংহত ক্রীড়া-নীতি করতে হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। দেশব্যাপী ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে সক্রিয় করে তোলার জন্যে এবং জাতীয় স্বার্থে সেগুলিতে নিযুক্ত করবার জন্য প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করবার জন্য আর এক ধাপ এগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কোমল কুঁড়িগুলিকে ফুটে উঠতে সাহায্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আনন্দের সঙ্গে ছোটদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা রাখলে অধিকতর সাফল্যের আশা করা যায়।

দাবার আসর

আন্ত-রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা

আগামী গ্রীষ্মে কলকাতায় দাবা খেলার একটি বড় আসর বসছে। ২৮ মে থেকে দিন দশেকের জন্যে সরগরম হয়ে উঠবে আমহার্স্ট স্ট্রীটে সেন্ট পলস্ স্কুলের হলঘর। এই তৃতীয় আন্ত-রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য থেকে ঝানু দাবা খেলোয়াড়রা আসবেন তাঁদের শক্তির মোকাবিলা করতে। অল ইণ্ডিয়া চেস ফেডারেশনের পক্ষে প্রতিযোগিতাটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল চেস এ্যাসোসিয়েশন।

প্রতিযোগিতাটির নাম 'ইণ্টার এ্যাসোসিয়েশন টীম চেস চ্যাম্পিয়নশীপ' হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে আন্ত-রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ—ফুটবলে যেমন সন্তোষ ট্রফি এবং ক্রিকেটে রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতা। অল ইণ্ডিয়া চেস ফেডারেশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় সংগঠনের দিকে যেরকম তৎপরতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, আন্ত-রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সেরকম সক্ষম হয়নি। ১৯৫৪ সালে প্রথম সর্বভারতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ (ব্যক্তিগত) শেষ হওয়ার পর ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে মোট আটবার এই ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ নিয়মমত হয়ে এসেছে। যে বছর ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ হয়, তার পরের বছর আন্ত-রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা; কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র দু'বার। প্রথম আন্ত-রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা হয় ১৯৬০ সালে মাদ্রাজে। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বোম্বাই (অধুনা মহারাষ্ট্র 'এ' দল নামে পরিচিত)। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয় ১৯৬৮ সালে পুণায়। এই দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় অন্ধ্র 'বি' দল, মোট ৩২ পয়েণ্টের মধ্যে ২২½ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। বাংলা দল কোনবারই খুব সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। পুণায় বাংলা দল মাত্র ১৪½ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল।

কলকাতায় দাবার বড় বড় সর্বভারতীয় আসর বসত দশের এবং বিশের দশকে। রাজামহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাবা খেলার এক বিরাট কেন্দ্র সে সময় গড়ে উঠেছিল এই মহানগরীতে। বৌবাজারে দেওয়ানজী হাউস চেস ক্লাব এবং ক্যালকাটা চেস সোসাইটির নাম তখন ভারতবিখ্যাত ছিল। কিষণলাল, ভি কে খাদিলকার, এন আর যোশী, এস ভি বোডাস প্রমুখ ধুরন্ধর খেলোয়াড়রা মথুরা, সাংলী, পুণা থেকে কলকাতায় আসতেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে। বাংলার হরিধন দত্ত, শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিধুভূষণ ঘোষ প্রমুখ নামী খেলোয়াড়রা এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন সমান তালে। তারপর ঐতিহাসিক নিয়মে যখন রাজারাজড়াদের ভাগ্যের চাকা অবনতির দিকে এগুতে শুরু করল, দাবার কদর এবং চর্চাও তখন কমে গেল। এর পর কলকাতায় উল্লেখযোগ্য দাবা প্রতিযোগিতা হয় ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে। তৎকালীন স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক শ্রীওয়ার্ডস্বার্থ কর্তৃক আয়োজিত 'ওয়ার্ডস্বার্থ' ট্রফি'র জন্য এই প্রতিযোগিতা মাত্র দুবার হয়েই শেষ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই প্রতিযোগিতায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাংলার সেই প্রাচীন দাবা-ঐতিহ্য আজ লুপ্তপ্রায়। সর্বভারতীয় দাবা প্রতিযোগিতার মানচিত্র থেকে কলকাতার স্থান আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন। অথচ স্বাভাবিক কারণেই কলকাতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে কলকাতায় তাঁরা খেলা দেখাবার সুযোগ পান না বলে। ১৯৩৬ সালের পর থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত কলকাতায় আর সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন দাবা প্রতিযোগিতা হয় নি। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কয়েকবার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। অধুনা আবার কলকাতায় দাবা চর্চা শুরু হয়েছে বলতে পারা যায়।

তবে একথা মানতে হবে, কলকাতায় সুষ্ঠুভাবে দাবা চর্চার জন্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দাবা সংস্থার কর্মকর্তারা অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে একটি করে দল আসবে। প্রতি দলে ৫ জন খেলোয়াড় এবং একজন ম্যানেজার থাকবেন।

কলকাতার দাবা মহলে ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া পড়েছে বর্তমানের ভারত চ্যাম্পিয়ন মাদ্রাজের ম্যানুয়েল এ্যারনের খেলা দেখতে পাওয়া যাবে বলে। তাছাড়া মাদ্রাজের নাসির আলির আকর্ষণ কম নয়। এ্যারন ইতিপূর্বে দুবার এবং নাসির আলি একবার ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ (১৯৭২) প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ হিসেবে গত নভেম্বরে যে পশ্চিম এশিয়া জোনাল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল, তাতে এঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রর মহম্মদ হাসানও আসছেন, যাঁর চিত্তাকর্ষক খেলা দেখার জন্যে এখানে সকলেই উদগ্রীব।

প্রতিযোগিতার আর্থিক দিকটা নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল চেস এ্যাসোসিয়েশন খুবই চিন্তিত। তা সত্ত্বেও আশা করি প্রতিযোগিতা ভালভাবেই শেষ হবে।

—[illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

রাজস্থান : ২১৭ রান (পার্থসারথি শর্মা ৬৭, অরবিন্দ আপ্তে ৪৭ এবং সেলিম দুরানী ৪১ রান। আবদুল ইসমাইল ৫৮ রানে ৪ এবং সোলকার ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৫৫ রান (সূর্যবীর সিং ৬৯, হনুমন্ত সিং নট-আউট ৬২ এবং অরবিন্দ আপ্তে ৫৬ রান। এম রেগে ৭৫ রানে ৪ এবং সোলকার ১৯ রানে ২ উইকেট)

বোম্বাই : ৫৩১ রান (সুনীল গাভাস্কার ১১৪, অশোক মানকাদ ১৭১, সোলকার ৮২ এবং অজিত পাই ৫৮ রান। দুরানী ১৪১ রানে ৪ এবং যোশী ১৩৯ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৯-৭০ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালের চতুর্থ দিনে বোম্বাই তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে পরাজিত করার সূত্রে উপর্যুপরি ১২ বার (১৯৫৯-৭০) রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে রাজস্থানের বিপক্ষে বোম্বাই এই নিয়ে ৭ বার খেলে সাতবারই জয়ী হল।

এখানে উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৩৬ বছরের ইতিহাসে (১৯৩৫-৭০) বোম্বাই ২২ বার ফাইনালে খেলে ২১ বার জয়ী হল। ফাইনালে বোম্বাইয়ের একমাত্র পরাজয় ১৯৪৭-৪৮ সালে হোলকারের কাছে ৯ উইকেটে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক বার ফাইনালে খেলার (২২ বার) এবং সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের (২১ বার) রেকর্ড বোম্বাইয়ের।

এপর্যন্ত এই ৯টি দল রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে : বোম্বাই ২১ বার, বরোদা ৪ বার, হোলকার ৪ বার, মহারাষ্ট্র ২ বার এবং একবার করে—নওনগর, হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম-ভারত, বাংলা (১৯৩৮-৩৯ সালে) এবং মাদ্রাজ।

বাংলার ভূমিকা

বাংলা এপর্যন্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৬ বার খেলে মাত্র একবার জয়ী হয়েছে। বাংলার জয় ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিপক্ষে ১৭৮ রানে এবং পরাজয় ১৯৩৭ সালে নওনগরের কাছে ২৫৬ রানে, ১৯৪৪ সালে পশ্চিমভারতের কাছে এক ইনিংস ও ২৩ রানে, ১৯৫৩ সালে হোলকারের কাছে প্রথম ইনিংসের রানে, ১৯৫৬ সালে বোম্বাইয়ের কাছে ৮ উইকেটে, ১৯৫৯ সালে বোম্বাইয়ের কাছে ৪২০ রানে এবং ১৯৬৯ সালে বোম্বাইয়ের কাছে প্রথম ইনিংসের রানে।

অজিত ওয়াদেকার
বিজয়ী বোম্বাই দলের অধিনায়ক

প্রথম দিনেই রাজস্থানের প্রথম ইনিংস ২১৭ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৬ রান সংগ্রহ করে। রাজস্থানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৬৭) করেছিলেন পার্থসারথি শর্মা এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে অরবিন্দ আপ্তের সহযোগিতায় তিনি দলের মূল্যবান ৯২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। রাজস্থানের ৭৬ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩৩ রান দাঁড়ায় (৫ উইকেটে)। ফলে তারা রাজস্থানের ১ম ইনিংসের ২১৭ রানের থেকে ১১৬ রানে এগিয়ে যায়। ১ম উইকেট জুটি সুনীল গাভাসকার এবং অশোক মানকাদ দলের ২৭৯ রান তুলে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম উইকেট জুটির খেলায় সর্বাধিক রান সংগ্রহের রেকর্ড করেন। পূর্বে রেকর্ড ছিল ২৭৩ রানের—নজর মহম্মদ এবং জগদীশ লাল (উত্তর ভারত), বিপক্ষে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ১৯৪১।

অশোক মানকাদ ১৭১ রান করে আউট হন। রঞ্জি ট্রফির খেলায় তাঁর এই তৃতীয় সেঞ্চুরী। অপরদিকে সুনীল গাভাসকার তাঁর রঞ্জি ট্রফির খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী (১১৪ রান) করলেন। মানকাদ ৩৩৫ মিনিট খেলে তাঁর ১৭১ রানে ২৩টা বাউন্ডারী করেন—উপর্যুপরি বাউন্ডারী ৭টা। বোম্বাইয়ের রান ছিল লাঞ্চের সময় ১৩৯। লাঞ্চের পরই মানকাদ এবং গাভাসকার মারমুখী হয়ে খেলেছিলেন। দলের ১৫০ রান ওঠে ১৪৫ মিনিটের খেলায় এবং ২০০ রান পূর্ণ হয় ১৯৫ মিনিটে। চা-পানের সময় দলের রান দাঁড়ায় ২৬১ রান (কোন উইকেট না পড়ে)। বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসের চারটি উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়—২য় উইকেট ৩০৯, ৩য় উইকেট ৩১০ এবং ৪র্থ ও ৫ম উইকেট ৩৩৩ রানের মাথায়।

তৃতীয় দিনে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস ৫৩১ রানের মাথায় শেষ হলে রাজস্থান ৩১৪ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২টো উইকেট খুইয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় রাজস্থানের ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে আরও ২৩০ রানের প্রয়োজন ছিল, এদিকে হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ৮টি উইকেট।

বোম্বাই তৃতীয় দিনের খেলায় তাদের বাকি ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। এই দিন রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের দু' ঘণ্টার খেলায় বোম্বাই ফিল্ডিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দে[illegible] কম করে সাতটা 'ক্যাচ' মাটিতে পড়ে গ[illegible] গড়ি খায়।

চতুর্থ দিনে চা-পানের পর মাত্র [illegible] মিনিট খেলা হয়েছিল। রাজস্থান দ[illegible] দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৫ রানের মাথায় [illegible] হলে বোম্বাই এক ইনিংস ও ৫৯ রানে [illegible] হয়।

রঞ্জি ট্রফির উল্লেখযোগ্য রেক[illegible]

সর্বাধিক মোট রান একটি খেলায়

(দুই দলের রান সমষ্টি)

২৩৭৬ রান (৩৮ উইকেটে) : [illegible] বনাম মহারাষ্ট্র, পুনা, ১৯৪[illegible]
(প্রথম শ্রেণীর খেলায় আজও বিশ্ব রেক[illegible]

সর্বাধিক রান এক ইনিংসে

৯১২ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ ম[illegible] উইকেটে) : হোলকার (বি[illegible] মহীশূরে), ইন্দোর, ১৯৪৫-৪৬
৮২৬ রান (৪ উইকেটে।টার্ফ উইকে[illegible] মহারাষ্ট্র (বিপক্ষে কাথিয়াড়), ১৯৪৮-৪৯

সর্বনিম্ন রান এক ইনিংসে

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

২২ রান (ম্যাটিং উইকেটে) : দক্ষিণ [illegible] (বিপক্ষে উত্তর ভারত), অমৃ[illegible] ১৯৩৪-৩৫
২৫ রান (টার্ফ উইকেট) : [illegible] (বিপক্ষে বোম্বাই), [illegible] ১৯৫১-৫২

সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান এক ইনিং[illegible]

৪৪৩ নটআউট : বি বি নিম্ব[illegible] (মহারাষ্ট্র), বিপক্ষে কাথিয়াড়, পুনা, ১৯৪৮-৪৯

সর্বাধিক মোট রান খেলোয়াড়-জীবনে

,,৩১২ রান (গড় ৬৮·৬০) : বিজয় হাজারে (মহারাষ্ট্র ও বরোদা)

সর্বাধিক সেঞ্চুরী এক মরসুমে

টি : রুসী মোদী (বোম্বাই), ১৯৪৪-৪৫

পার্টনারশিপ রেকর্ড

৪র্থ উইকেট জুটিতে ৫৭৭ রান : বিজয় হাজারে (২৫৪ রান) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯ রান), বরোদা বনাম হোলকার, বরোদা, ১৯৪৬-৪৭

(প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির আজও বিশ্ব রেকর্ড)।

য় উইকেট জুটিতে ৪৫৫ রান : বি বি নিম্বলকার (নটআউট ৪৪৩ রান) এবং কে ভি ভাণ্ডারকর (২০৫ রান), মহারাষ্ট্র বনাম কাথিয়াড, পুনা, ১৯৪৮-৪৯

প্রথম শ্রেণীর খেলায় আজও বিশ্ব রেকর্ড)

সর্বাধিক সেঞ্চুরী এক ইনিংসে

(এক দলের পক্ষে)

টি : হোলকার (বিপক্ষে মহীশূর) ইন্দোর, ১৯৪৫-৪৬

প্রথম শ্রেণীর খেলায় আজও বিশ্ব রেকর্ড)

সর্বাধিক সেঞ্চুরী একটি খেলায়

টি : বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, ১৯৪৮-৪৯

প্রথম শ্রেণীর খেলায় আজও বিশ্ব রেকর্ড)

সর্বাধিক উইকেট খেলোয়াড়-জীবনে

৯৫টি (গড় ১৯·৮৯) : সি এস নাইডু (১৯৩৪-১৯৬১)

১১টি (গড় ১৯·৮১) : বিজয় হাজারে (১৯৩৪-১৯৬১)

সর্বাধিক উইকেট এক ইনিংসে

০টি (২০ রানে) : পি এম চ্যাটার্জি (বাংলা), বিপক্ষে আসাম, জোড়হাট, ১৯৫৬-৫৭

ফাইনালে উল্লেখযোগ্য জয়

৩১ রানে বোম্বাইয়ের (বিপক্ষে হোলকার), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২

৬৮ রানে বোম্বাইয়ের (বিপক্ষে বরোদা), বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯

২০ রানে বোম্বাইয়ের (বিপক্ষে বাংলা), বোম্বাই, ১৯৫৮-৫৯

৭৪ রানে বোম্বাইয়ের (বিপক্ষে হোলকার), বোম্বাই, ১৯৪৪-৪৫

০ উইকেটে মহারাষ্ট্রের (বিপক্ষে যুক্ত-প্রদেশ), পুনা, ১৯৩৯-৪০

ক ইনিংস ও ৪০৯ রানে বরোদার (বিপক্ষে হোলকার), বরোদা, ১৯৪৬-৪৭

ক ইনিংস ও ২৮৭ রানে বোম্বাইয়ের (বিপক্ষে রাজস্থান), বোম্বাই, ১৯৬১-৬২

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বাইচ প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ কেম্ব্রিজ নাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম াৎসরিক বাইচ প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দল জয়ী হয়েছে। এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮২৯ সালে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে কয়েক বছর প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। লণ্ডনের বিখ্যাত টেমস নদীর বুকে এই প্রতিযোগিতার বাৎসরিক আসর বসে—নির্দিষ্ট পথ পরিক্রমা পুটনে ব্রিজ থেকে মর্টলেক—দূরত্ব ৪¼ মাইল (৩ মাইল ৩৭৪ গজ)। বর্তমানে প্রতিযোগিতার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : কেম্ব্রিজের জয় ৬৪ বার, অক্সফোর্ডের জয় ৫১ বার এবং ডেড্‌হিট ১ বার (১৮৭৭ সালে), অর্থাৎ অমীমাংসিত ফলাফল। অক্সফোর্ড শেষ জয়ী হয়েছে ১৯৬৭ সালে।

এবারের প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ৩½ লেংথে জয়ী হয় এবং তাদের সময় লাগে ২০ মিনিট ২২ সেকেন্ড।

অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাৎসরিক বাইচ প্রতিযোগিতা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের এক শুভ উৎসব এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে এক বিশেষ আকর্ষণ। পৃথিবীর কোন দেশে এরকম নির্ভেজাল অপেশাদার ক্রীড়ানুষ্ঠান নেই। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের কোন দলগত অথবা ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়া হয় না; এমনকি প্রশংসাপত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা নেই। যোগদানকারী দাঁড়ীদের কাছে প্রতিযোগিতার মহান ঐতিহ্য এবং শুচিতাই প্রধান আকর্ষণ।

বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়

ক্রিকেট খেলার একান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান গ্রন্থ হিসাবে 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জীর নাম পৃথিবীব্যাপী। এই বর্ষপঞ্জীকে বলা হয় 'ক্রিকেটার্স বাইবেল'। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে নানা বিষয়ের তথ্য ছাড়াও 'ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দি ইয়ার'—নামে একটি পৃথক অধ্যায় আছে। এখানে প্রতি বছর বাছাই-করা পাঁচজন খেলোয়াড়ের খেলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জীর ১০৭তম সংস্করণে 'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন : কেন ব্যারিংটন (ইংল্যাণ্ড), ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড), বেসিল বুচার (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), মুস্তাক জাহাঙ্গীর (পাকিস্তান) এবং মাইক প্রোক্‌টার (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)

কেন ব্যারিংটন (ইংল্যাণ্ড)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জীতে 'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' অধ্যায়ে এপর্যন্ত এই ৬ জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন : ১৮৯৭ সালে কে এস রঞ্জিৎ সিংজী, ১৯৩০ সালে কে এস দলীপ সিংজী, ১৯৩২ সালে পতৌদির নবাব ইফতিকার আলী, ১৯৩৩ সালে সি কে নাইডু, ১৯৩৭ সালে বিজয় মার্চেণ্ট, ১৯৪৭ সালে ভিনু মানকাদ এবং ১৯৬৮ সালে পতৌদির নবাব মনসুর আলী।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড) : জন্ম ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী ৬। ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়। প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫২ সালে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫২ সালের টেস্ট সিরিজে ২৯টি উইকেট নিয়েছিলেন (গড় ১৩·৩১)। ১৯৫৩ সালের 'উইসডেনে' বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' অধ্যায়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। টেস্টে ৩০৭টি উইকেট নিয়ে তিনি যে খেলোয়াড়-জীবনে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, তা আজও কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে সক্ষম হননি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৬৭, বল ১৫১৭৮, মেডেন ৫২১, রান ৬৬২৫, উইকেট ৩০৭ (বিশ্ব রেকর্ড) এবং গড়
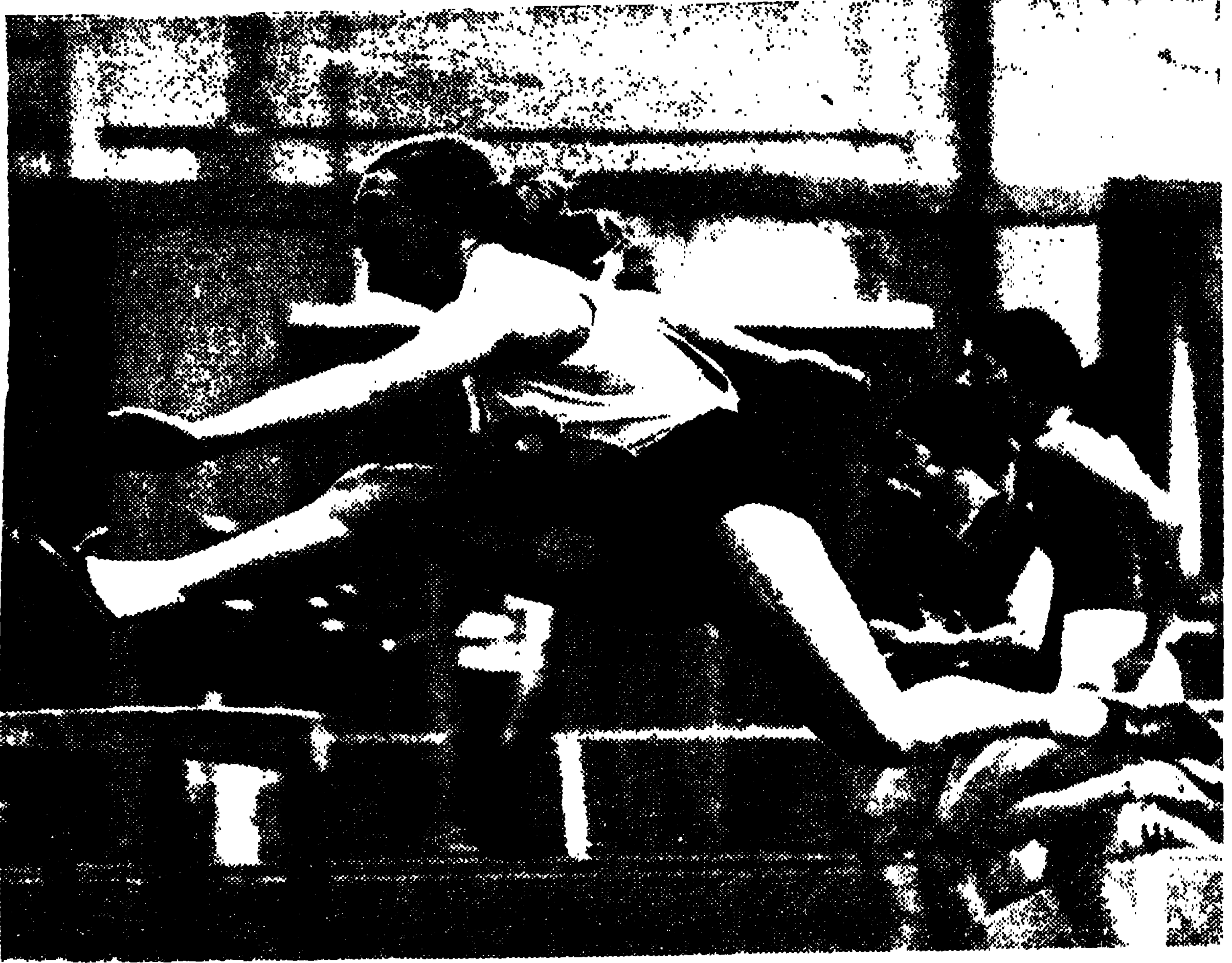
সম্প্রতি মহিলাদের 'ইনডোর এ্যাথলেটিক্স' অনুষ্ঠানে বৃটেনের মেরী পিটার্স ৬০ মিটার হার্ডলস ৩·৫ সেকেণ্ডে শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক গেমসে বৃটিশ অলিম্পিক মহিলা দলের নেত্রী ছিলেন।

২১·৫৪। এক ইনিংসে ৫টি উইকেট পেয়েছেন ১৭ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট পেয়েছেন ৩ বার।

কেন ব্যারিংটন (ইংল্যান্ড): জন্ম ১৯৩০ সালের নভেম্বর ২৪। সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান। প্রথম টেস্ট খেলা ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' অধ্যায়ে তিনি দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হলেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৭৪, ইনিংস ১১৮, নট-আউট ১৩ বার, মোট রান ৬০১৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৬ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ১৮।

বেসিল বুচার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ): জন্ম ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর ৩। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ভারতবর্ষের বিপক্ষে (বোম্বাইয়ের ১ম টেস্ট), ১৯৫৮-৫৯।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৪৪, ইনিংস ৭৮, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ৩১১০ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৯ নট-আউট (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ট্রেন্টব্রিজ, ১৯৬৬), সেঞ্চুরী ৭।

মাইক প্রোক্টার (দক্ষিণ আফ্রিকা): জন্ম ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর ১৫। গ্লস্টারসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের কৃতী চৌকস খেলোয়াড়। টেস্ট খেলায় হাতেখড়ি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ডারবান ১৯৬৬-৬৭।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৭, ইনিংস ১০, নট-আউট ১ বার, মোট রান ২২৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৪৮। বোলিং: ৬১৬ রানে ৪১ উইকেট।

মাজিদ জাহাঙ্গীর খাঁ (পাকিস্তান): জন্ম ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর ২৮। কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান গ্লামর্গান কাউন্টির একজন কৃতী ব্যাটসম্যান।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ১০, ইনিংস ১৪, নট-আউট ১ বার, মোট রান ২৭৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮০।

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং পশ্চিম জার্মানী—এই [illegible] দেশের খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন। [illegible] করে বিভাগের ফাইনালে খেলেছিলেন ডেনমার্ক ও ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি এবং এক করে বিভাগের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধি। মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে ইংল্যান্ড ছাড়া অপর কোন দেশের খেলোয়াড় ছিলেন না। শেষপর্যন্ত খেতাব পান পুরুষদের সিঙ্গলসে রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া), মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী তাকেনাকা (জাপান), পুরুষদের ডাবলসে টি বাচার এবং পেটারসেন (ডেনমার্ক), মহিলাদের ডাবলসে কুমারী এম বি বক্সাল ও শ্রীমতী পি হোয়েটনাল (ইংল্যান্ড) এবং মিক্সড ডাবলসে পি ওয়ালসো এবং কুমারী মে লগার্ড হ্যানসেন (ডেনমার্ক)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৫০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 24th April, 1970. শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৭৭ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

ডবল নকল ও সাহিত্যে চুরি

গত ২০শে মার্চ এবং ৩রা এপ্রিল তারিখের 'অমৃত' পত্রিকার দুটি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। চিঠিদুটি প্রকাশ করার জন্যে আমার তরফ থেকে আমি পত্রলেখকদ্বয় ও সম্পাদককে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।

আসলে গত দশ বছর ধরেই এই কাণ্ড চলছে। আমি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং আমার প্রকাশকদের দরজায় ধর্ণা দিয়েও এর কোনও বিহিত করতে পারিনি। বছরখানেক আগে একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আমার কাছে এসে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চান। তাঁদের কাগজে সে-রিপোর্ট ফলাও করে প্রকাশিতও হয়েছিল। পরে 'যুগান্তর' পত্রিকাতেও এ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছিল শুনেছিলাম। গত বছরে হিসেব করেছিলাম এ-যাবৎ প্রায় বাহান্নটি জাল বই বেরিয়েছিল আমার নামে। এতদিনে সে-সংখ্যা প্রায় ষাটে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক লোকসানের দিক থেকে দেখতে গেলে আমার লোকসান দাঁড়িয়েছে প্রায় আশি হাজার থেকে এক লক্ষ টাকার মতন।

পাকিস্তান সীমান্তবর্তী নদীয়া জেলার অজ গণ্ডগ্রামে গিয়ে দেখেছি এই জাল বই তার জাল বিস্তার করেছে। তিন বছর আগে আসাম সফরে গিয়ে দেখেছি এই জালিয়াতি। সুদূর দণ্ডকারণ্যের সুদূরতম বাস্তুহারাদের গ্রাম পাখানজোড়ে গিয়েও দোকানে জাল বই সাজানো থাকতে দেখেছি। দেখেছি আর বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের অজ্ঞতায় যেমন বিমূঢ় হয়েছি, পুস্তক-বিক্রেতাদের অসাধুতায় তেমনি স্তম্ভিত হয়েছি।

আমার বাড়ির নিচের তলায়ই একটি বই-এর দোকান আছে। সেখানে আসলের নামে নকল বিমল মিত্রের বই গণ্ডায় গণ্ডায় বিক্রি হয় এখনও। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনিও এই জাল বই বিক্রি করছেন মশাই? উত্তরে তিনি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। বললেন—আমায় মাফ করুন। দেখুন, আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে, আমাকে সংসার করতে হয়, জিনিস-পত্রের দাম আজকাল যা বাড়ছে, তাতে এ না করে আর পারি না—

নিজে ছেলের পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এর মোড়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ-বিপণিতে। দেখি, সেখানে একজন মহিলা ক্রেতা এসে বিমল মিত্রের নাম করে কোনও বই চাইলেন। দোকানীও আমার উপস্থিতিতেই অবলীলাক্রমে আমার নামের একটি জাল বই বার করে দিলেন। আমি স্তম্ভিত ধিক্কারে বই না কিনেই দোকান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

এই আমাদের বাঙলাদেশ, এই আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা, আর এই আমাদের বাঙলাদেশের প্রকাশকবর্গ।

এই ধরনের চুরি যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়কর। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে এ-ধরনের চুরি এই-ই প্রথম। শরৎচন্দ্রের বেলায় যা হয়েছিল তা অন্যরকম। কারণ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলে আর একজন লেখক সত্যিই ছিলেন। তিনি নিজের হাতেই বই লিখতেন। তাঁর লেখাও মোটামুটি ভালোই ছিল। তিনি 'গল্প-লহরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে সবাই সশরীরে দেখেছে। কিন্তু এই জাল 'বিমল মিত্র' বলে কোনও লেখকই নেই।

এর জন্যে কাকে দোষ দেব? দীর্ঘ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শরীরকে অগ্রাহ্য করে, নিন্দা কুৎসা এবং অবহেলা সবকিছু হাসিমুখে হজম করে যা-কিছু লিখেছি সমস্তই এক অসাধু ব্যবসায়ীর কুটিল চক্রান্তে নিঃশেষ হতে বসেছে। শারদীয়া সংখ্যার পত্রিকাগুলিতে আমার নামে প্রতি বছরই অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেখি, দেয়ালের পোস্টারেও সকলের মাথায় আমার নাম দেখি, আর কেবল ভাবি এই আমাদের বাঙলাদেশ, এই আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা, আর এই আমাদের বাঙলাদেশের প্রকাশকবর্গ। আর তার চেয়েও বড় কথা আমি এই বাঙলাদেশেই জন্মেছি। এই-ই আমার মাতৃভূমি, এই-ই আমার মাতৃভাষা!

ভেবে দেখেছি, এতে প্রকৃত লাভবান হচ্ছে কে? জাল-লেখক, না প্রকাশক? না, দু'জনের মধ্যে কেউ-ই প্রকৃত লাভবান হচ্ছে না। জাল লেখক হাবড়ায় এক জাল 'বিমল মিত্র'কে জোগাড় করেছে। লোকটি নিরক্ষর, একটা কয়লার দোকানের মালিক। সে নগদ দশটি টাকা পেলেই খুশী। দশটি টাকা পেয়ে সে একটি চুক্তিপত্রে সই করে দেয়। আর পাণ্ডুলিপি? পাণ্ডুলিপির জন্যে বেশি বেগ পেতে হয় না। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে কিম্বা পুরনো কাগজের দোকানে অচল বই বা মাসিক পত্র সস্তায় সের দরে কিনে নেয়। তাতে সামান্য অদল-বদল করে কোনও তথাকথিত প্রকাশক নামধারীর কাছে চল্লিশ বা তিরিশ টাকায় 'কাপরাইট' বিক্রি করে। একসঙ্গে দশ হাজার বারো হাজার ছাপা হয় সেই পাণ্ডুলিপি। তাতে কখনও নাম থাকে 'সধবার সিঁদুর', কখনও 'ফুলশয্যার রাত', কখনও বা 'মিলন-সঙ্গিনী'। আবার কখনও 'বাসর ঘর'। এক-বার নাম দিয়েছিল 'কড়ির চেয়ে দামী'। একই বই, কিন্তু বিভিন্ন মলাট এবং বিভিন্ন নাম! এবার সে আর কাউকে না পেয়ে তাড়াতাড়িতে বুদ্ধদেব গুহকে গ্রাস করেছে।

যাহোক, বই ছাপাবার পর 'প্রকাশক' সেইগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছে নিজের খরচে পাঠিয়ে দেয়। তখন পুস্তক-বিক্রেতারা শতকরা ষাট বা সত্তোর ভাগ কমিশনের লোভে আসল বিমল মিত্রের বই চেপে রেখে অজ্ঞ পাঠকদের কাছে এই জাল বিমল মিত্রের বই গছিয়ে দেয়। পাঠকরাও 'বিমল মিত্র'র নাম ছাপা দেখে তা নিঃসঙ্কোচে কেনে।

অর্থাৎ একটা আসল বিমল মিত্রের দু' টাকা দামের বই বেচতে পারলে যেখানে পুস্তক-বিক্রেতার কমিশন বাবদ লাভ হয় মাত্র ছ' আনা, সেখানে জাল বিমল মিত্রের একখানা বই বেচতে পারলে লাভ থাকে পুরো দেড় টাকা।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এ-ব্যবসায়ে পুস্তক-প্রকাশক বা জাল-লেখকের চেয়ে যাঁরা পাড়ায় পাড়ায় বই-এর দোকান করেছেন, তাঁদেরই মুনাফা বেশি। তাই তাঁরাই জাল বইকে আসল 'বিমল মিত্র'র বই বলে গছাতে এত আগ্রহী। তাঁরাই হচ্ছেন আসল পাপী! কারণ তাঁরা ভেতরের কারসাজিটুকু সমস্তই জানেন। তাঁদের শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা কে করবে যদি না পাঠক সচেতন হন?

এইভাবে কলকাতার ন্যাশনাল লাই-ব্রেরীতে এবং আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আমার বই-এর তালিকার মধ্যে জাল বিমল মিত্রও ঢুকে পড়েছে। আসলে-নকলে একাকার হয়ে গেছে। আরো

চিঠিপত্র

লাইব্রেরীতে কী অবস্থা হয়েছে আমি না।

পাঠক যাতে আসল-নকলের তফাৎ ... পারে, তার জন্যে আমার দিক ... আমার প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম ... আমার স্বাক্ষর ছাপানো থাকে। ... তা কে অত দেখছে? জাল সরষের ... জাল দুধ, জাল ওষুধেই যখন বাজার ... গেছে, তখন সাহিত্য নির্ভেজাল থাকবে ... আশা করবো কেমন করে? আমি ... টেলিফোনে বা পত্রযোগে ... তরফ থেকে এ-সম্বন্ধে অভিযোগ ... কিন্তু এর প্রতিকার কী?

...বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে—'ঘুঁটে ... গোবর হাসে'। আজকে আমি পুড়ছি ... লেখকদের হয়ত হাসবার পালা। ... একদিন গোবরকেও পুড়তে হবে ... এই কথা স্মরণ করে আমাদের ... সচেতন হওয়া উচিত। বিশেষ করে ... লেখকদের কোনও সংগঠন ... বুদ্ধদেব গুহ তাঁর সলিসিটারদের ... করার কথা লিখেছেন। তিনি ... তরুণ, তাঁর দ্বারা যা সম্ভব ... দ্বারা তা সব সময় সম্ভব নয়। ... নেমেছেন দেখে আমি একটু ... পেয়েছি। আমার একান্ত অনুরোধ ... আইনজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করুন। আমি ... তাঁর সহযোগিতা করবো। ... হলে আমি আদালতের কাঠগড়ায় ... দাঁড়াবো। তাঁর একখানা ... বই পরের নামে বেরিয়েছে, কিন্তু ... ষাটখানি পরের বই আমার ... বেরিয়েছে। আর তাছাড়াও লেখাই ... একমাত্র জীবিকা এবং অন্নসংস্থানের ... সূত্র। সুতরাং আমার ক্ষতিটাই ... চেয়ে বেশি। আর্থিক এবং ... দুদিক থেকেই। সারাজীবনে ... চল্লিশ-পঞ্চাশখানির বেশি বই লিখতে ... আর জাল লেখক মাত্র এই ক' ... ষাটখানি বই লিখে ফেললেন? এ ... হাত থেকে যদি শ্রীবুদ্ধদেব গুহ ... মুক্তি দিতে পারেন তো আমি তাঁর ... চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। একজন সাহিত্যিক ... আর একজন সাহিত্যিকের মর্মবেদনা ... নিশ্চয়ই বুঝবেন।

...খ্যাতির খেসারৎ দিতে হয় তা স্বীকার ... কিন্তু তা বলে এত? এমন চলতে ... যে একদিন ঢাকের দায়ে মনসা ... যাবে!

বিমল মিত্র
কলকাতা-২৭

কোয়েলের কাছে প্রসঙ্গে

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠিকা। অমৃতে প্রকাশিত বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি পড়লাম। অপূর্ব হয়েছে এই উপন্যাসটি। সত্যি এত সুন্দর যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আমিও যেন পালামৌ-এর রুমান্ডির আরণ্যক পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আর কেমন করে যে আমি এই রুমান্ডির প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলে গেছি, তা আমি নিজেই জানি না। অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতি সপ্তাহের জন্যে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন সমাপ্তিটা পড়ে নিজের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রুমান্ডির জীবন যে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে তা আমি ভাবতে পারি নি। যশোয়ন্তের জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে। লেখককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

অনুভা চক্রবর্তী
দত্তপুকুর
২৪-পরগণা

(২)

'অমৃতে' শ্রীবুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে' শেষ হয়ে গেল। বেশ দুঃখ লাগছে মনে সেজন্য। তাঁর কাহিনীর যে পঠভূমি সে পথে আমি কয়েকবার ঘুরেছি। রাঁচী-নেতারহাট, রাঁচী-লাতেহার-ডাল্টনগঞ্জ প্রভৃতি পথে যে মোহময় সৌন্দর্য দেখেছি, 'কোয়েলের কাছে' পড়তে পড়তে তা যেন আবার চোখের সামনে দেখতে পেতাম। লাতেহারে দীপালির রাতে আলোকসজ্জা, কুরুতে ওরাঁও বালকের কাছ থেকে কিনে টাটকা বুনো পেয়ারা এবং আতা খাওয়া সব নতুন করে মনে ভিড় করে বেদনামিশ্রিত আনন্দ জোগাত।

অবশ্য বুদ্ধদেববাবুর মতো অরণ্যের গভীরে যাওয়া আমার হয়নি। তাঁর মতো অরণ্যের মাঝে ডুবে জানোয়ার, পাখি, ফুলের প্রতিবেশী হয়ে থাকবার সৌভাগ্যও আমার হয়নি। আমি দেখেছি টুরিস্টদের সুরক্ষিত গাড়িতে বসে রাত্রির অরণ্যের মহান নিস্তব্ধতা, দেখেছি হাজারিবাগের অরণ্যে স্পটার মিঃ মুখার্জির স্পটলাইট চোখে লেগে তাজ্জব হরিণশিশুর চোখ কেমন জ্বলজ্বল করে ওঠে। এই পরের মতো নিরাপদ দূরত্বে থেকে অরণ্য জীবন দেখে যে সুখ পাই তা থেকেই বুদ্ধদেববাবুদের অরণ্যের মাঝে ডুবে আপনজনের ন্যায় অরণ্য দর্শনের সুখ অনুভব করতে পারি।

আর কী চরিত্র যশোয়ন্তের। কোমলে কঠোরে কী বলা মাধুর্যমন্ডিত রূপেই না তাঁর লেখক ফুটিয়েছেন। তেমনি অন্যসব চরিত্রও। বাস্তব থেকে উঠে এসেছে বলেই এরা এত জীবন্ত। জানি না এর মধ্যে কতটা বাস্তব। তবে পড়ে তো আমাদের একটি চরিত্রকেও বানানো বলে মনে হয় না।

এই সুন্দর জীবন ছেড়ে আসতে লেখকের যে দুঃখ তা আমরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভাগ করে নিয়েছি। সেই অরণ্য-জীবন যেমন তাঁকে দিয়েছে সুখ, তেমনি অরণ্য-বিচ্যুত তাঁকে তা দেবে এক ধরণের নরম দুঃখ। ইশক্-এর (প্রেমের) ধর্মই এই। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবুকে গালিবের একটি সুন্দর শের উপহার দিচ্ছি।

ইশক্সে তবীয়ৎনে জিস্তকা মজা পায়া,
দর্দকী দওয়া পায়ী দর্দে লা দওয়া পায়া।

প্রেমের ছোঁয়ায় এই জনমেই
পান করেছি জীবন-সুধা।
সকল ব্যাধির প্রলেপ সে মোর,
শান্তিবিহীন সে মোর ক্ষুধা।

শেষ কিস্তিতে যশোয়ন্তের মুখ দিয়ে বুদ্ধদেববাবু গালিবের একটি শের আলগা-ভাবে আবৃত্তি করিয়েছেন। আসল শেরটি এই :

চন্দ তস্ওয়ীরে বুতাঁ চন্দ হসীনোঁকে খতুৎ,
বাদ মরনেকে মেরে ঘরসে এহ্ সামাঁ নিকলা।

সুন্দরীদের চিত্র কিছু,
আর তাদেরি পত্র কিছু,
বাহির হল এসব কিছু
আমার ঘরে, মরার পিছু।

নেতারহাট পাহাড়ে উঠতে আবারো ছোট্ট কোয়েলকে পেরিয়ে যাব। লাতেহারে বাসস্ট্যান্ড মিস্টির দোকানে আবারো মিষ্টি খাব। লাতেহার হাসপাতালে ডাঃ রামের কাছে বসে আবারো হয়তো গল্প করবো। কিন্তু এবার এদের দেখবো অন্য চোখ দিয়ে। আর যখন ডাল্টনগঞ্জের পথে সন্ধ্যায় আলো-আঁধারীতে বাজারে ব্যবসায়ীর গদিতে বসে সুগঠিত দেহ অরণ্যের স্নেহ মাখানো লম্বা শ্যামলা লোকটির মুখ থেকে বাঘমারার গল্প শুনব তখন জিজ্ঞাসা করে নিতে ভুলব না তার নাম যশোয়ন্ত কিনা?

[illegible]
[illegible]

শাদা চোখে

ভারতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপতি সম্প্রতি কোলকাতায় সাংবাদিকদের বলেছেন যে, নিদেনপক্ষে একশ' কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নতুন-নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারলেই সমস্যাজর্জরিত মহানগরীতে মানুষ আশার আলো দেখতে পাবে। অর্থাৎ ভয়াবহ বেকারীর কিছুটা লাঘব হবে, আর রাজপথ দিয়ে অবলীলাক্রমে বাষ্পীয়যানসমূহ গড়গড়িয়ে চলবে। ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংসারযাত্রা নির্বাহের জটিলতা নাগরিক জীবনকে বিষময় করে প্রতিনিয়ত বিক্ষোভে রূপান্তরিত করছে তা নিরসন হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। ভয় আর ভাবনাহীন চিত্তে এই মহানগরীর মানুষ হয়ত সুখ-সাগরের দিকে পাড়ি জমাতে পারবে। আশা, কোলকাতার জীবন সুখময় হয়ে উঠলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও তার শুভ প্রতিফলন ঘটবে। মিছিল-নগরী কোলকাতার সঙ্গে অশান্ত পল্লীবাংলাও শান্তির পারাবার হয়ে উঠবে।

মূলধন বিনিয়োগ করে নতুন-নতুন শিল্প-সংস্থা বা অন্য কোন উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারলে বেকারী লাঘব হবে। ফলে লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি জোরদার হয়ে উঠবে। আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিরোধিতা থাকার কথা নয়। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে, বেশীর ভাগ বেকারের সাকারত্বপ্রাপ্তি ঘটলেই কি কোলকাতার সমস্যা জল হয়ে যাবে? রাস্তাঘাট, ড্রেন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা সুরাহা হয়ে গেলেই কি কোলকাতায় সভা-শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে? উত্তর হচ্ছে, মোটেই তা হবে না। চলমান পৃথিবীর অদম্য বাসনার সঙ্গে সমানতালে চলবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কোলকাতাবাসীকে মিছিল-মুখী করে রাখবেই। মিছিলই কোলকাতার প্রাণ। জীবন-জিজ্ঞাসার অশান্ত অভিব্যক্তি। কোলকাতা সেদিনই মরবে যেদিন মিছিল থাকবে না। বিক্ষোভ থাকবে না। আর থাকবে না উদ্দাম উত্তাল সমুদ্রের মত সরোষে গর্জে ওঠবার বাসনা। সেদিন কোলকাতার ইতিহাসে বিলম্বিত হোক!

প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্যোগ বেড়ে বেকারী কমলেও কেন অশান্তি থাকবে? নিত্যনৈমিত্তিক নাগরিক-জীবনের দুর্দশার লাঘব হলেও কেন অশান্তি থাকবে? কারণ, অতি গভীরে। যে কোনো কারণেই হোক, শুধু চাকরী করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলে বা অনেকটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এলেই মানুষ শান্ত হবে না। তাঁদের চাহিদা আরও অনেক ব্যাপক। যাঁরা বর্তমানে সুখে সময় অতিবাহিত করছেন, শুধু বিনা আয়াসে জীবনযাপন করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তবে রাস্তায় মিছিল করার ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না। কিন্তু লড়াই বাধে অন্যত্র —আদর্শের স্তরে।

বর্তমানে অনেকেই মনে করেন যদি মূলধন জোগাড় করে নয়া প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণ করা যায় তবে বর্তমানের জটিলতা হ্রাস পেয়ে যাবে। আর বামপন্থীদের প্রভাবমুক্ত হয়ে জনতা সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে ব্রতী হয়ে উঠবে। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই বললেই চলে যেখানে মানুষের শোষণই শুধুমাত্র চলছে। রাজা হন, ডিক্টেটার হন বা গণতন্ত্রীই হন, সকলেই নিজের-নিজের দেশের নাগরিকদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছু-না-কিছু যত্ন নিয়েই থাকেন। এই স্বাচ্ছন্দ্যদানের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো তফাৎ থাকে, মাত্রারও তফাৎ ঘটতে পারে। কিন্তু যেখানে নাগরিক-জীবন একেবারে স্বাচ্ছন্দ্যের তুঙ্গে গিয়ে প্রায় ঠেকেছে সেখানেও লড়াই হচ্ছে। অশান্ত জীবনের অগ্নিগর্ভ জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর সেখানেও মেলে।

কোন গুণী একথা মনে করবেন না আদর্শগত লড়াই চলছে বলে বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা সিকেয় তুলে রাখার জন্য ওকালতি করা হচ্ছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে না যে, আগে ঠিক হয়ে যাক কোন দল কোন্ 'বাদ' সম্বল করে এদেশ শাসন করবে। তারপর সমস্ত রকম বুনিয়াদী সমস্যায় হাত দেওয়া যাবে। এটা মোটেই সমদর্শীর বক্তব্য নয়। কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে বেকারীও দূর হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে আদর্শগত লড়াইয়ের উপরও যবনিকা পড়বে। সেই দিকেই আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্নের অবতারণা।

কিছু-কিছু কল্যাণমূলক কাজ করলেই যদি মানুষের মন ঘুরে যেত তবে তো আর কথাই ছিল না। যে আরামবাগ একদা ম্যালেরিয়ার ডিপো ছিল, আর যেখানে যেতে হলে এই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিন দিন সময় লাগত, সেই আরামবাগে এখন গড়গড়িয়ে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। ম্যালেরিয়াও নেই। কিন্তু সেখানকার মানুষের মন সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহ দিনগুলির কথা স্মরণ করে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় নেই। নয়া সড়ক-পথে নয়া আদর্শের হাওয়াও আরামবাগে গিয়ে পৌঁচেছে। এটা দোষের কথা বলছি না। গতিশীল মানুষের মনের পরিচয় এতে সুপরিস্ফুট। উদাহরণ হিসাবেই আরামবাগের কথা উল্লেখ করা হল, বাংলায় এরকম অনেক দৃষ্টান্তই আছে। দুর্গাপুর, কল্যাণী ইত্যাদি এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে।

তাই বলছিলাম, যাঁরা মনে
কিছু মূলধন বিনিয়োগ করে গ্রাসা
ব্যবস্থা করে দিলেই শান্তি আস
ভুল করছেন। শান্তি অত্যন্ত অ
ব্যাপার। অশান্তির তারতম্য ঘটতে
নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বলে কিছু আ
জানা নেই। হয়ত মৃত্যুর মধ্যে
নিরবচ্ছিন্ন শান্তি থাকতে পারে,
সেখানে জীবন নেই। সে যাক,
তারতম্য ঘটাতে হলে শুধু
বিনিয়োগ করলেই হবে না, সম্পূর্ণ
তার পদ্ধতিগত পরিবর্তন। ভারতে
আজ এই প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে
পশ্চিমবাংলার জনজীবনে জাগরণের
একটু বেশী বলেই অনেকে ভা
পড়েছেন। কিন্তু ভাবিত হলে
মূলকভাবে যদি স্বস্তি কেউ চ
তাঁকে ঐ পদ্ধতিগত প্রশ্নের ম
উপর অবিলম্বে জোর দিতে হবে
নৈতিক অবস্থার উপর জোর
করে মানুষের মনে যে স্বাধিকারে
প্রবল হয়ে উঠেছে তাকে ঠেক
যাবে না। কেউ যদি সেই আশ
করেন তবে তিনি ভুল করবেন।

তবু বেকারীর জ্বালায় যে লো
করে সে ব্যক্তি সাকার হলেই
স্পৃহা তার কমে যায়। কিন্তু
কারণ খুঁজে বার করে তাকে
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জু
যখনই কেউ ভবিষ্যৎ চিত্রের ক
তখনই তাঁদের মনে নতুন করে প্রশ
তখন আবার সাকার যুবক লড়
ওঠে, শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
তোলে।

কাজেই রাষ্ট্রপতি শ প্র
পর যাঁরা বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গকে
করবার কথা ভেবে নতুনভাবে অ
ইমপেটাস দিয়ে সুখী জীবন গড়
সাহায্য করতে প্রস্তুত তাঁদের
দেখতে অনুরোধ করি তাঁরা যে
এগোবেন। বুনিয়াদী পরিবর্তন
সামনে রেখে প্রকল্প রচনা না হলে
সকল সদিচ্ছাই ব্যর্থ হতে বা
শুধু বেসরকারী উদ্যোগের সাম
সরকারী প্রচেষ্টার সামনেও প
একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এসেছে।
গোটা ব্যবস্থাই একটি পু জিবাদ
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বলে প্রচা
জনগণের এক বিরাট অংশের
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়া
ভূমিকা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে

আগেই বলা হয়েছে, নিত্য
সমস্যার সমাধান হলে অশান্তির
ঘটে মাত্র। কিন্তু কথা হল
শাসনে সরকারী ও বেসরকারী
কল্যাণমূলক কাজ হলেও সেই
সম্পর্কে জনতাকে অবহিত কর

কাজ করবেন কে বা কাহারা? সাধারণত কেউ কেউ ভালো কাজের প্রশংসা করবার জন্য উদ্যোগী হলেও জনপ্রিয় সরকারের মাধ্যমে হয়নি বলে সব রাজনৈতিক দলই খোলাখুলিভাবে তার সপ্রশংস প্রচারে কুণ্ঠিত হয়। কেননা তাহলে গণতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা বিপন্ন হতে বাধ্য। আর যাঁরা বামপন্থী, তাঁদের ত দুদিকেই লাভ। যদি দেখেন জনতার মধ্যে একটা তুষ্টির ভাব এসেছে তবে তখনই বলবেন আন্দোলনের ফলেই এসব গণকল্যাণমূলক কাজ কিছুটা হচ্ছে। আর না হলে ত কথাই নেই। তখনই রাষ্ট্রপতির শাসনের কুকর্মের তালিকা লিপিবদ্ধ করে কাজে নেমে পড়বেন।

রাষ্ট্রপতি শাসনকালে হোক আর জনপ্রিয় সরকারের আমলেই হোক, প্রতিবারেই লক্ষ্য করা যায় কর্তৃপক্ষ অর্থ আদায়ের জন্য নয়াদিল্লী ছুটে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী দলের লোকেরা রাজ্য সরকারের গদীতে আসীন থাকলে তাঁরা যে অহর্নিশ কেন্দ্রের কাছে বেশী টাকা চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তখনই যখন স্বয়ং গভর্ণরও ছুটে যান আরও বেশি অর্থ বরাদ্দের দাবী নিয়ে। গভর্ণরের আনাগোনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতি কঠোর অবিচার করছেন। আর তখনই একশ্রেণীর লোকের কাছে শুনতে পাবেন এই রাজ্যপাল কাজের বাক্তি। ঠিক টাকা নিয়ে আসবেন। তারা তখন বুঝতে পারেন না যে অলক্ষ্যে তাঁরা নিজেদের কত ক্ষতি করছেন। অনেক কংগ্রেসীকেই একথা বলতে শুনেবেন।

রাজ্যপালের শাসন বলতে সোজাসুজিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় প্রত্যক্ষ শাসনই বোঝায়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে অর্থটা দাঁড়ায় এই, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার ইন্দিরা-সরকারের উপরই ন্যস্ত। কিন্তু শাসক কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই রাষ্ট্রপতি শাসনের ফলে কিছু সুফল দেখা দিলেও এর স্বপক্ষে প্রচার করার জন্য উদ্যোগী হবেন না। গভর্ণর যা করবেন সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই তা করবেন, এবং সংবিধানের আওতার মধ্যে যে কিছু করা যায় গভর্ণর তা প্রমাণ করলেও শাসক কংগ্রেস সেই সাফল্য থেকে তত্ত্বগত লড়ায়ের উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে না। কিম্বা সেই সাফল্যকে জনতার মধ্যে পেণীছে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েও একাগ্রতা এবং সদিচ্ছা থাকলে মঙ্গলকর্ম সম্পন্ন করা যায়—এ বোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে না। কারণ, শাসক কংগ্রেসকেই নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরোধিতা করতে হবে। কেননা, জনতার প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত না হলে সে কাজ কি পুরোপুরি সফল হতে পারে? নিশ্চয় নয়। যদি তা হয় তবে গণতন্ত্র হবে বিপন্ন আর জনতা হবে বিমুখ। রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে ওকালতি করবার জন্য এ বক্তব্য রাখা হয়নি। গণতন্ত্রের প্যাঁচে পড়ে গণতন্ত্রীরা কিভাবে বিপন্ন হন তারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হল শুধু।

পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হওয়ার পর আজ অবধি সরকারী নীতি কি হবে তা স্পষ্ট হয়নি। মুখ্য প্রশাসক শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এখনও এলোমেলো কথা বলছেন। আর তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ফ্রন্ট স্টাইলে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। শুধু ভরসা এই যে তাঁরা কেউ জনপ্রতিনিধি নন। এঁরা সকলেই বড় রাজপুরুষ মাত্র। কাজেই গণ-প্রতিনিধিদের মত বিমুক্ত পুরুষ নন। অনুশাসনের চৌহদ্দির মধ্যে আছেন। কিন্তু তবুও কে কি হবেন তার এক অঘোষিত যুদ্ধ লড়ে গেলেন। যাঁরা নিয়োজিত হয়েছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে নয়া জমানা আনবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। কেতাবে যা লেখা আছে ঠিক সেই মতই চলতে পারেন। কোনো পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়াও এঁদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তবু এঁদের লড়াইয়ের কথাও শুনতে হল। যা হোক কি নীতিতে সরকার চলবে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইতিমধ্যেই বামপন্থীরা সকলেই আওয়াজ তুলেছেন যে ফ্রন্ট আমলে যে সমস্ত জমি কৃষকরা দখল করেছিল তা পুলিশ ও জোতদার যোগ সাজসে পুনরায় দখল করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। অর্থাৎ সরকার একাজে মদৎ দিচ্ছেন।

ফ্রন্ট আমলে কৃষকের লাভ যা হয়েছে তা কেড়ে নেওয়ার কথা শুনলে সত্যিই দুঃখ হয়। যে সমস্ত সরকারী জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হলে সেটা ক্ষমার অযোগ্য। তদানীন্তন রাজস্ব মন্ত্রী বলেছিলেন, জমি উদ্ধারের আন্দোলনের সময় কিছু কিছু অন্যায় হয়েছিল। অর্থাৎ অনেকের কাছ থেকে সামান্য জমিও কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে সে সমস্ত জমি যদি মালিকদের ফেরৎ দেওয়া হয় তা সরকারের পক্ষে অন্যায় হবে না। ৭৫ বিঘা জমির যিনি মালিক ফ্রন্টের মতে তাঁরও জমি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারো ছিল না। অতএব, ফ্রন্টের যাঁরা শরিক ছিলেন তাঁদের উচিত তালিকা প্রস্তুত করে এই উদ্ধারকৃত জমির ব্যাপারে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলা। তবে, ফ্রন্টের রাজস্বমন্ত্রী যদি আইনটা করে এই সমস্ত উদ্ধার করা জমির উপর কৃষকদের স্বত্বাধিকার দিয়ে যেতেন তবে এ ঘটনা ঘটবার অবকাশ অনেক কম হত। জোতদাররাও আর সাহস করে পুনর্দখল করার ষড়যন্ত্র করতে পারত না।

শ্রমিকদের যা লাভ ঘটেছে তা বলতে বোঝায়, মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুলিশের নিরপেক্ষতা, আর ক্ষেত্র বিশেষে বেতন বৃদ্ধি। বর্ধিত বেতন সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে কাটা হয়েছে এমন নজীর নেই। তবে পুলিশের ভূমিকা কি হওয়া উচিত ধাওয়ান সাহেবই তা বলতে পারবেন। তিনিও যদি ফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মত পুলিশকে নিরপেক্ষ করে দেন তবে ভাল। কিন্তু সিদ্ধান্তটা অবিলম্বে ঘোষিত হওয়া উচিত। পুলিশের নিরপেক্ষতার ফলে একশ্রেণীর শ্রমিক তখন যেমন লাভবান হয়েছিল সেই রকম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে এবার আর একশ্রেণীর শ্রমিক লাভবান হবেন, এবং তাঁদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও শ্রীধাওয়ানের উচিত ফ্রন্টের শিক্ষানীতি চালু রাখা। তা হলে ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে শিক্ষাক্ষেত্র শুদ্ধিকরণ চলতে পারবে। আর ফ্রন্ট আমলে যে কায়দা করে কোনো কোনো শরিক এগিয়ে গেছেন, শাসক কংগ্রেস যদি সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে রাজনীতির খেলায় তাঁরা হেরে যাবেন নিঃসন্দেহে। হোয়াইট-ওয়াশ করে কিছু হবে না।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

সোভিয়েট ভাস্কর নিকোলাই টোমস্কি নির্মিত ৩-মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট লেনিনের এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ২২ এপ্রিল তারিখে কলকাতার লেনিন সরণিতে (ধর্মতলা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'নয়া' কংগ্রেস কোন পথে? অবিভক্ত কংগ্রেসের মধ্যে যেসব ব্যাধি প্রবেশ করেছিল, যেসব ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীরা পুরানো, সংগঠনপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই ব্যাধিগুলির সংক্রামণ কি নতুন পার্টির মধ্যেও ছড়াবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে?

সন্দেহ নেই যে, 'নয়া' কংগ্রেসের মধ্যে এই সব প্রশ্ন উঠছে। প্রাক্তন রাজন্যদের বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি বাতিলের প্রসঙ্গেই হোক, দলের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রসঙ্গেই হোক, সংশয় ও দ্বিধা এসে দলের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। এক সপ্তাহের খবরের মধ্যে আছে—শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যেখানে আই সি এস অফিসারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপের সিদ্ধান্ত করেছেন সেখানে 'নয়া' কংগ্রেসের কয়েকজন এম-পি প্রকাশ্যেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন, পাঞ্জাবে দলের ভিতর দুটি গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে 'নয়া' কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংযুক্তির প্রশ্নে স্পষ্টতই শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর সঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতভেদ হচ্ছে, রাজ্যসভার নির্বাচনে যাঁরা দলে নির্দেশ অমান্য করেছেন তাঁদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি ইত্যাদি। তালিকাটি, স্পষ্টতই, 'নয়া' কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ স্বস্তিকর নয়।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তিন মাস বাদে 'নয়া' কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই সব প্রসঙ্গ উঠেছিল। শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীচন্দ্রজিত যাদব প্রভৃতি 'তরুণ তুর্কী' ও শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ও শ্রীকে ডি মালব্যর মত প্রবীণ নেতারা ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, পুরানো দোষ ও বদঅভ্যাসগুলি 'নয়া' কংগ্রেসের ভিতরও ঢুকছে। রাজ্যসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় কয়েকজন প্রশ্ন তোলেন, এই নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে বিচারের মাপকাঠিটা কি? উত্তরপ্রদেশে কর্ণেল বি এইচ জইদিকে টিকেট না দিয়ে শহীদ ফার্কারকে টিকেট দেওয়া হল কেন? (ফার্কার হেরে গেছেন)। শ্রীজগদীশ দীক্ষিতের মত একজন প্রৌঢ়

ইউনিয়ন কর্মীকে ও শ্রীশান্তি কোঠারীর মত একজন পার্টি কর্মীকে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হল না কেন? দলের কোন কোন সদস্য রাজন্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপের বিরুদ্ধে যে 'প্রকাশ্য প্রচার' চালাচ্ছেন তার উল্লেখ করে শ্রীচন্দ্রশেখর ওয়ার্কিং কমিটির ঐসব সদস্যের শাস্তি দাবী করেন।

উড়িষ্যায় রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে শ্রীবিজু পট্টনায়ক যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য তাঁকে শাস্তি দেওয়ার দাবী জানান শ্রীমতী নন্দিনী সতপথী। তাঁর বিরোধিতা করেন উড়িষ্যা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান শ্রীনীলমণি রাউত রায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করেন নি। কমিটির বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজ্জীবন রাম প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান।

প্রকাশ, ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় দলের সভাপতি শ্রীজগজ্জীবন রাম এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুজনই স্বীকার করেন যে, দলের মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে এবং অবিলম্বে দলের মধ্যে কিছু চাঁছাছোলা করা প্রয়োজন। শ্রীরাম একই সঙ্গে মন্ত্রীর দায়িত্ব ও দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা তাঁদের চাকরির সর্তের মধ্যে যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন সেগুলি বাতিল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে পার্লামেন্টে একটি বেসরকারী বিল এনেছেন। এই বিলের দ্বারা তিনি সংবিধানের ৩১৪ অনুচ্ছেদ বাতিল করে দিতে চেয়েছেন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সিভিল সার্ভিস অফিসার হিসাবে তাঁরা যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন সেগুলি সংবিধানের ঐ অনুচ্ছেদের দ্বারা সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

লোকসভায় এই বেসরকারী বিলের আলোচনার সময় কয়েকজন সদস্য প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে 'নয়া' কংগ্রেস দলের দুজন সদস্যও ছিলেন। এই দুজন সদস্যের প্রধান যুক্তি হল, এই ধরনের কোন ব্যবস্থায় অফিসারদের মনোবল নষ্ট হবে। আর একজন নির্দলীয় সদস্য বলেন যে, সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট নিশ্চয়তার মর্যাদা রক্ষা করা হবে কিনা সেটাই হল মূল প্রশ্ন।

সংবাদ এই যে, ভারত সরকার নীতিগতভাবে শ্রীলিমায়ের এই বেসরকারী বিলের প্রস্তাব মেনে নেবেন। কিন্তু তাঁরা শ্রীলিমায়েকে বিলটি তুলে নিতে অনুরোধ জানাবেন। পরে, ভারত সরকার নিজেই এই উদ্দেশ্যে আর একটি সরকারী বিল নিয়ে আসবেন। অবশ্য, তাঁরা সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনবেন, না অন্য কোন আকারে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

আই সি এস অফিসারদের সুযোগ-সুবিধাগুলি লোপ করতে গিয়ে কংগ্রেসকে এক অর্থে নাড়ীর বন্ধন কাটতে হবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অ্যালেন অক্টেভিয়াস হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস অফিসার। পরবর্তী কালে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আইনের মধ্যেই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের খসড়া সংবিধানেও এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রাখা হয়। গণ-পরিষদ যখন খসড়া সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা বিবেচনা করছিলেন তখন পরিষদের তৎকালীন সদস্য (ও পরবর্তী কালে লোকসভার স্পীকার) অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ঐ ধারার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল আই সি এস অফিসারদের সমর্থন করে একটি বক্তৃতা দেন। এই হচ্ছে আজকের ভারতীয় সংবিধানের ৩১৪ অনুচ্ছেদের ইতিহাস।

যাঁরা আই সি এস অফিসারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি তুলে দিতে চাইছেন তাঁদের যুক্তি হল, বৃটিশ প্রভুদের সেবার মূল্য হিসাবে এঁরা যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন সেগুলি এখনও চালু রাখা অর্থহীন। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের স্থলে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস নামে যে নতুন সার্ভিসের প্রবর্তন করা হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত অফিসাররা বেতন, ভাতা, ছুটি পেনসন ইত্যাদির ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পান— এই বৈষম্য বজায় রাখা ঠিক নয়।

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধী তাঁদের প্রধান বক্তব্য হল, সংবিধানের গ্যারান্টি ভাঙ্গা মানে সংবিধানের অমর্যাদা করা। আর একটি যুক্তি এই যে এখন যে মাত্র ৮৩ জন সারা ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের সংখ্যা প্রতি বছরই কমছে এবং তাঁদের শেষ দলটি আগামী ১৯৭৯ সালে অবসর নিয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং এই কয় বছরের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের খাতির-যত্ন কিছু কম করার প্রশ্নটি হালে উঠেছে। কিন্তু আর একদল পোষ্যের

ব্যাপারটা দীর্ঘকাল ধরে ঝুলছে। তাঁরা হলেন প্রাক্তন রাজন্যবর্গ। আই সি এস-এর লোকদের তুলনায় এইসব রাজারাজড়ারা অনেক ক্ষমতাবান। বাঘের গায়েই আগে হাত পড়ে, না খরগোশের গায়ে সেটা এখন দেখার বিষয়।

রাজা-মহারাজারা যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেন তার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন। 'নয়া' কংগ্রেস দলের জন চল্লিশেক সদস্য তাঁদের সংগে সামিল হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছেন যে, তাঁরা প্রাক্তন রাজাদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার আগে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নিন।

দলের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় 'নয়া' কংগ্রেসের প্রায় ৫০ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন যে, রাজন্যভাতা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল এবং এখন বিষয়টি সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঐ প্রস্তাব বানচাল করে দেওয়া। ঐ ৫০ জন সদস্য আরও লিখেছেন যে, যাঁরা সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলছেন তাঁরা এই বিষয়ে আইন তৈরির কাজটায় দেরী করে দিতে চাইছেন এবং দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছেন।

রাজন্যভাতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আগে থেকে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চান বা না চান, বিষয়টি এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রীম কোর্টে যাবেই, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টে যান বা না যান, এই বিষয়ে আইন হয়ে গেলে রাজারা অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। যদি সুপ্রীম কোর্ট রাজন্যভাতা বিলোপের বিরুদ্ধে মত দেন তাহলে পার্লামেন্টের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের দ্বন্দ্বের আরও একটি কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে উভয়ের ভিতর সম্পর্কটা আদৌ ভাল নয়। ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিলটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় পার্লামেন্টের কিছু সদস্য ক্ষুব্ধ। তার উপর সম্প্রতি একটি মামলা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট লোকসভার পাঁচজন সদস্যের উপর আদালতে হাজির হওয়ার শমন জারী করে আর একটি বিরোধের কারণ ঘটিয়েছেন। ঐ পাঁচজন সদস্য পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁদের উপর ডাক এসেছিল। এম-পি'রা পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা দেন তার জন্য তাঁরা আদালতে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন, এই যুক্তিতে লোকসভার স্পীকার ঐ পাঁচজন সদস্যকে শমন অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একদল পার্লামেন্ট সদস্য সুপ্রীম কোর্টের দুজন বিচারপতিকে সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করছেন। এই দুজন বিচারপতির বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, যেসব ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে ঐ দুজন বিচারপতির শেয়ার ছিল, তৎসত্ত্বেও তাঁরা ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ আইনের বিরুদ্ধে শুনানীর সময় বিচারকের আসনে ছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে দিল্লীতে একটি বিতর্ক সভায় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে শ্রী এ এস আর চারি বলেছেন যে, দুজন বিচারপতির শেয়ার ছিল কিনা সেটা বড় কথা নয়, বিচারকদের শিক্ষাদীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীই এমন যে, তাঁরা শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলেন। এই মামলার বিচারে ব্যাংকের অংশীদার বিচারকের আসনে না থাকলেই যে মামলার ফলাফল অন্যরকম হত সেকথা মনে করার কারণ নেই। অপরপক্ষে, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-পি সুপ্রীম কোর্টের দুই বিচারপতিকে পার্লামেন্টে অভিযুক্ত করার চেষ্টার বিরোধিতা করে বলেন যে, ব্যাংকে যে এই দুজন বিচাপতির শেয়ার আছে সেকথা তাঁরা জানিয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও ভারত সরকারের অ্যাটর্নি-জেনারেল তাঁদের এই মামলার বিচার করার ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেন নি। অতএব, এখন সেই প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।

—১৭-৪-৭০

সম্পাদকীয়

। না, অগ্নিপরীক্ষা!

এবারে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিস্তর অভিযোগ জমা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এই পরীক্ষার নিয়ামক। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতি বৎসর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। কটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। কিন্তু পর্ষতের হাবভাব দেখে মনে হয়, পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মোটেই সযত্ন আজকাল চারদিকে ছাত্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। একতরফা ছাত্রদের তিরস্কার করে এ-অসন্তোষ দূর করা যাবে না। ত্রদের নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের ছাত্রদের সমস্যা, তাদের মানসিকতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া তো কর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই কর্তব্যের বিচ্যুতি ঘটছে প্রায়ই। এবং ছাত্র অসন্তোষের অন্যতম কারণ হল এই।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে এবারে প্রধান অভিযোগ হল অনেক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল পরীক্ষার সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে হুঁসিয়ারীও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তখন এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাক্য করে বং খবরটি ভুয়া এমন কথাই তখন প্রচার করা হয়েছিল। পরে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, একাধিক প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে কিছু পরীক্ষার্থী তার সদ্ব্যবহার করেছে। কে বা কারা এই প্রশ্ন-ফাঁসের জন্য দায়ী তার কোনো কিনারা হয় নি। সূত্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে পর্ষৎ কি তার ওপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেছে। যদি এর তদন্ত না হয় তাহলে র পরীক্ষার মূল্য কি? তা ছাড়া কলকাতা ও আশে-পাশের পরীক্ষার্থীরা এই প্রশ্ন-ফাঁসের সুযোগ নিতে পেরেছে নে হয়। দূর গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা কি পরীক্ষার ফলাফলের সময়ে এর দ্বারা নিজেদের প্রতারিত মনে করবে না? র শাস্তি না হলে এই প্রতারণার প্রতিক্রিয়া যে শুভ হবে না তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

এ ছাড়াও এবার প্রশ্নপত্র রচনায় পর্ষদের প্রশ্নকর্তারা চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন ভিযোগ এসেছে। ছাপার ভুল তো ছিল মারাত্মক যা পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার ই প্রশ্নের ইংরেজি ও বাংলা ভাষ্য দেবার নিয়ম চালু হয়েছে। এতেও প্রশ্নকর্তারা ন্যূনতম বিবেচনাবোধের পরিচয় । একই প্রশ্নের ইংরেজি ও বাংলা ভাষ্যে ভাষার গরমিল ছিল। তাহলে কোন্ প্রশ্নটি সঠিক বলে নির্ণীত হবে? বহু পরীক্ষার্থীদের অধ্যয়নের পরীক্ষা নেবার পরিবর্তে নিজেদের বিদ্যার বহর দেখাতে চেয়েছেন প্রশ্নপত্রে। উচ্চ-মাধ্যমিক র পাঠ্যসূচী এমনিতেই বেশ ভারী। অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের মগজে এত বিদ্যা একসঙ্গে ঢোকানোর চেষ্টা কতটা বে তা নিয়ে শিক্ষাবিদ মহলে যথেষ্ট দ্বিমত আছে। প্রশ্নকর্তারা সেদিকটি লক্ষ্য না রেখে দুরূহ এবং স-বহির্ভূত প্রশ্ন করে এবারে ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যি-সত্যিই এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন।

কিভাবে এধরনের অঘটন ঘটে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগের নেক দিনের। তাহলে অন্তত সিলেবাসটি প্রশ্নকর্তাদের জানা থাকবে। মডারেটররাই বা কি করেন? প্রশ্নের ভেতরকার নের ত্রুটি দেখবার দায়িত্ব তো তাঁদের। দায়িত্বশীল পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের কাছ থেকে কর্তব্যবিচ্যুতি আমরা রি না। বিশেষ করে লক্ষাধিক ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই খামখেয়ালী অমার্জনীয়।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভেতরে যে প্রশাসনিক গলদ ঢুকেছে এ বোধ হয় তারই বহিঃপ্রকাশ। এর পর যদি ছাত্ররা ক্ষুব্ধ বাঞ্ছিত কিছু করে বসে তাহলে তার দায়িত্ব কি শুধু পরীক্ষার্থীদেরই। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই মধ্যশিক্ষা গঠিত হয়েছিল এবং সরকারী কর্তৃত্ব যাতে এর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যই একে করা হয়েছিল একটি সিত প্রতিষ্ঠান। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নিজের দায়িত্বহীনতার ফলে নিজের কর্তৃত্ব ও গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে চলেছে, এটা খুবই কথা। এ সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা প্রয়োজন।

সমুদ্র ॥

সতীকান্ত গুহ

সমুদ্র কি মাথা কুটে মরে?
তোমার আমার মতো একটি কথার
একটি কথার জন্যে তার
এত ফুসে ফুসে ওঠা, এত হাহাকার।

যে কথা শুনতে চায়, আমরা শুনতে চাই
কেউ বলল না,
আজও বলল না
তোমাকে আমাকে ওরই মতো।
কত কোটি কথা ফেরে অর্থ নিয়ে কত!
যে কথা শুনতে চাই, সে কথার আজও
ঘুম ভাঙলো না।

আমাদের হাহাকার, তোমার আমার,
অন্য কোনোখানে;
সেখানেও ভাঙে ঢেউ ডাঙার উপর,
সে এক অদৃশ্য বেলাভূমি, খেলাঘর,
আর এক আকাশ কিন্তু একই আবিষ্কার
আর এক রকম কিন্তু একই তার মানে।

বছরে বছরে ফিরে আসি।
(সে এক নিশির ডাক, শুনেই উদাসী)
আমাদের আর এক সমুদ্রকে নিয়ে
এই সমুদ্রের খেলাঘরে
বালুকাবেলায় তারপরে
দিন কাটে দুটি সমুদ্রের হাহাকার
মিলিয়ে মিলিয়ে।

স্মৃতির মাঝে ॥

শঙ্কর

ব্যক্তিগত আর্দ্রতা সে,
যেন করুণ শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার--
স্মিতহাসির জলতরঙ্গ এখন স্মৃতি।
তবু স্মৃতির আঘাত থাকে নির্জনতায়।
ভারাক্রান্ত ছিলাম না তো দুঃখভারে।
দুঃখ আমার পাষাণ ছিল এমনভাবে?
কখ্খনো না, দুঃখ আমার আত্মগত।
বিয়োগ ব্যথার ভয় ছিল সেই কিশোর বেলায়
রিক্ত শাখার দৃশ্যে হতাম কাতর তখন।
এখন নিজের পায়ের মাটি চিনতে পারি,
সহজ কঠিন দ্বন্দ্ব-ছন্দে পোড়-খাওয়া প্রাণ।
মাঝে মাঝেই ভীষণ একলা,
আর কিছু না।

শীতার্ত এক আঘাত হানে দখিন পবন,
চতুর্দিকে যেন কিছুর স্পর্শ না পাই,
এমন কি এই তাকিয়ে থাকার স্বল্পতম তৃপ্তিটা
শেষ শিশিরের শব্দ শুনি রিক্ত শীতে,
ঝুপ্ করে যেই পাতার ছাওয়া পথেই পড়ে।

স্মৃতির মতন শক্তি আছে, এই টুকু যা।
কোথাও যেন অধিকারের মীড় থেকে যায়,
তমাল বনে কালো কোমল ছায়ার মতো।

কবে কখন হারিয়ে ছিলাম জানি না সে,
সঙ্গবিহীন জীবন কাটে স্মৃতির কাছে
চৈত্র বনে, বাদল মেঘের অন্ধকারে
রুদ্ধ প্রাণের গবাক্ষতে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আজকের সমাজে সকলের আগে ও সবচেয়ে বেশী করে যা চোখে পড়ে তা হল নরনারীর সমমাত্রিক যাত্রা। কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁরা একসঙ্গে পড়ছেন, অফিসে একত্রে কাজ করছেন, একত্রে সভাসমিতি, নাট্যাভিনয়, বনভোজন করছেন। রাজনীতি, শিল্পচর্চা, সংস্কৃতি সেবা, সর্বত্র নারী-পুরুষে পাশাপাশি মেশামেশি হয়ে রয়েছি আমরা। ট্রামে বাসে হাটে বাজারে থিয়েটারে সিনেমায় পুরান ব্যবধানের প্রাচীর কবেই নিঃশব্দে ধ্বসে পড়েছে। ট্রামে বাসে লেডীজ সিট আর রেলে জেনানা কামরা এখন অনেকটা সাবেকী কৌতুকের নিদর্শন হয়ে বেঁচে আছে। শুধু শহরে নয় মফস্বলেও একই দৃশ্য। মফস্বলে বরং আর একটু বেশী, স্কুলেও সেখানে সহাধ্যয়ন এসেছে, যা এখনো কলকাতায় চলেনি।

যখনকার কথা বলছি, তখন বাইরের কর্মক্ষেত্রে ত নয়ই, কলকাতার পথঘাটেও মহিলাদের দেখা মিলত না। অবাঙালী মজুর মেয়েরা কিংবা ফলমূল, ঘুঁটে বা পান বিক্রী করা মেয়েরা পথে বেরতেন, আর বেরতেন খুব সীমিত সংখ্যক গৃহস্থকন্যারা, যাঁরা ধাত্রীকর্ম বা শিক্ষকতা করতেন। সাধারণভাবে স্বচ্ছল ঘরের মেয়েরা এবং কিছু পরিমাণে গরীব ঘরের মেয়েরাও পড়াশোনা শুরু করেছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁরা খড়খড়ি লাগান ঘোড়ার গাড়ী চেপে যেতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, এক নেহাৎ বাচ্চা না হলে। আর বার তের বছর হলেই বেশীর ভাগের বিয়ে হয়ে যেত, তাই ব্রাহ্ম এবং ইঙ্গবঙ্গ ঘর ছাড়া কলেজ পর্যন্ত যেতেনই না কেউ।

এই অবরোধ মোচন ও নারীব্যক্তিত্বের জাগরণই হল আমার চোখে সমাজের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এবং এর পরিণাম হয়েছে দেশের পক্ষে দূরবিসর্পী। নরনারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশার অবকাশ হওয়ার অনিবার্যভাবেই এসেছে স্বেচ্ছা বিবাহ, যার ফলে জাতিভেদ ও পণের উপদ্রব বিদায় নিতে শুরু করেছে। গুরুজনস্থানীয়েরা সবাই হয়ত খুশি মনে মেনে নেন নি জিনিসটা। আবার অনেকে নিয়েছেনও এবং স্বয়মাগতা পুত্রবধূকে সাদরে ঘরেও নিয়েছেন বহু শ্বশুর-শাশুড়ী। শুধু তাই নয়, পুত্রবধূর চাকরি করাও অনুমোদন করছেন অনেকে। অবশ্য স্বেচ্ছা বিবাহের সঙ্গে এসেছে বিবাহবিচ্ছেদও এবং যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙনও দেখা দিয়েছে। কতকটা হয়েছে আর্থিক কারণে, কতকটা কালধর্মেও।

শহুরে সমাজেই এসবের ব্যাপ্তি বেশী সন্দেহ নেই, কিন্তু নানা পরিবর্তন এসেছে মফস্বলেও। আগে দেখেছি বামুনবাড়ীতে কায়স্থ বা বৈদ্য কিছু গেলে তাঁকেই এঁটো পরিষ্কার করতে হত। অবামুনরা বামুন বৈদ্যের সামনে জুতো পায়ে দিতেন না। তাঁদের কোন প্রবীণ ব্যক্তি, তিনি বাবা কাকার বন্ধু বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেও, পনের বছরের বামুন সন্তানকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন।

এই ধরনের ছুৎমার্গ, উঁচুনীচুর এই কৃত্রিম বিভেদ আজ আর বাংলাদেশে বিশেষ চোখে পড়ে না। বামুন শূদ্র এক পঙক্তিতে বসে আজ অম্লান বদনেই বিয়ে পৈতের নিমন্ত্রণ খান। অবামুনের হাতে খেতেও কারো আপত্তি হয় না। বিধবা বিয়ে অসবর্ণ বিয়েও মাঝে মাঝে হয় এবং তাতে সমাজের মাথা ও মুরুব্বিস্থানীয়েরাও স্বেচ্ছায় যোগ দেন কেউ কেউ। যাঁরা দেন না, তাঁরাও খুব একটা বিচলিত হন না এসব দেখে। আপন ছোটবেলার প্রেক্ষিতে রেখে দেখলে এই পরিবর্তনকে ত আমার রীতিমত বৈপ্লবিক বলেই মনে হয়। সেদিন এর যে কোনটার জন্যেই নৈষ্ঠিকরা দিতেন প্রায়শ্চিত্ত করার পাঁতি।

শুধু আচার আচরণ ও জীবনচর্যাতেই পরিবর্তন হয় নি, হয়েছে দেশের বাস্তব চেহারাতেও। কলকাতা থেকে আজ চমৎকার পাকা সড়ক হয়েছে শিলিগুড়ি কোচবিহার পশ্চিম দিনাজপুর পর্যন্ত, আবার মেদিনী-পুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া পর্যন্তও এবং সে পথে বাস চলছে। সর্বত্র জেলা ও মহকুমা শহরে বিজলী আলো এবং পাখা গেছে, গেছে টেলিফোন, বেতার। অধিকাংশ গ্রামেই হয়েছে উচ্চতর বিদ্যালয়, ডাকঘর, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং শহরগুলিতে সাধারণ কলেজ ত বটেই, বহু জায়গায় কারিগরী শিক্ষালয়, হাসপাতাল এবং রকমারি কলকারখানাও আত্মপ্রকাশ করেছে। নলকূপ, স্যানিটারী শৌচাগার, কোঠাবাড়ী, এ সবের বিস্তারও লক্ষণীয়।

এক হাঁটু কাদার মধ্যে যে গ্রামের পথে গোবরের গাড়ীর চাকা ডুবে যেত এক সময়, কিংবা বর্ষার সময় এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে তালের ডোঙায় উঠতে হত লাগ হতে নিয়ে, সেই গ্রামের ওপর দিয়ে এখন দিনরাত্রি জিপ ছুটছে। সেখানকার পথে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছেন জ্যোৎস্না রাত্রে গান গাইতে গাইতে। ছেলেদের পরনে পাৎলুন, গায়ে হাওয়াই শার্ট, মেয়েদের গায়ে কেতাদুরস্ত ব্লাউজ, পায়ে স্যান্ডাল। চাষী ছেলেরাও এখন হাফপ্যান্ট পরেন, চাষী বৌদেরও আর শুধু আঁচল গায়ে ঘুরতে দেখা যায় না। ওঁদের ঘরেও এখন লেখাপড়া আসছে, তার সঙ্গেই আসছে জামা জুতো, খবরের কাগজ এবং চা।

অর্থাৎ গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টানর সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বদলাচ্ছে এবং তার ফলে শহরের পিছু পিছু গ্রামবাংলাও মধ্যযুগ থেকে আস্তে আস্তে যুগের আলোয় জেগে উঠছে। মানুষের রুচি ত উন্নত হয়েছেই, উন্নততর মূল্য-বোধেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন অধিকাংশ নরনারী এবং অর্থনীতিবিদরা কি বলবেন জানি না, আমার ত ধারণা সাধারণ মানুষের ক্রয়সামর্থ্যও আগের চেয়ে বেড়েছে। জমিদারী প্রথা রহিত হয়েছে, এ সত্যিকার একটা বড় কাজ হয়েছে। এবার চাষের জমি যদি চাষীর এক্তিয়ারে আসে, তাহলে অন্ন-কষ্ট একদিন দূর হবেই দেশ থেকে। অবশ্য এই সঙ্গে চাই কলকারখানারও ব্যাপক প্রসার।

অর্থাৎ সমাজ গত চার দশকে পিছন থেকে সামনে, স্থিতি থেকে গতিতেই রূপ পরিবর্তন করেছে। বলা দরকার যে এখনো দৈন্য ও অনগ্রসরতা অনেক আছে, অনেক আছে গ্লানি এবং লজ্জার জিনিসও। কিন্তু সমগ্র মানুষ ভালর দিকেই এগোচ্ছেন। ব্যক্তিজীবনে গোষ্ঠীজীবনে মানুষ আজ যতটা আত্মাধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়েছেন, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে পরিমাণ সংহত হতে পারছেন, তা একদিন সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল। এই জাগরণ এসেছে সার্বিক শিক্ষার বিকিরণ থেকে, সক্রিয় রাজনীতিক আন্দোলন থেকে এবং সেই জীবনদর্শনের পরিব্যাপ্তি থেকে, যা মানুষকে বস্তুজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে শিখিয়েছে।

কর্তৃত্বের আসন থেকে অনুষ্ঠিত অনাচার স্বৈরাচারকে কিংবা কায়েমি স্বার্থের অশুচি সর্বগ্রাসকে আজকের মানুষ নির্বিবাদ বশ্যতায় মানার চেয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রামকেই বেশী মনুষ্যোচিত মনে করেন। আজকের মানুষ হয়ত আগের তুলনায় ঢের বেশী ঈশ্বর-বিমুখ এবং ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সংখ্যাও, হয়ত কম নয় আজ। কিন্তু আজকের মানুষ গরীবের মেহনৎ এবং গরীব নারীর ইজ্জত সম্বন্ধে অনেক বেশী সুবিচারসম্পন্ন। আসলে ধর্মাধর্মের চেয়ে হিতাহিতের নিরিখই হয়েছে আজ অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মের বড় নিয়ামক। সামগ্রিকভাবে সমাজ মনস্তত্ত্বের এই বিবর্তনকে শুভ জ্ঞানে স্বাগত জানাতেই হবে। দেশের ভৌমিক আয়তন ছোট হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ বৃহৎ সম্ভাবনীয়তার পথেই পা দিয়েছেন। কিন্তু সবই কি ভাল হয়েছে? মন্দ হয় নি কিছুই? তাও হয়েছে। যত মানুষ স্থিতিশীল জীবন ও জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তার তুলনায় কম হলেও, অন্তত এক-চতুর্থাংশ মানুষ পড়েছেন অজ্ঞ ঝটতি-পড়তির তালিকায়। যুদ্ধকালীন চোরাবাজার, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগজনিত বাস্তুচ্যুতি, নানা দুর্বিপাকের শিকার এঁরা। শ্রেয়মূল্য হারিয়ে অন্যায় ও অনৌচিত্যকে মূলধন করে বাঁচতে হচ্ছে এঁদের। এঁদের ছেলেরাই অবস্থাবিপর্যয়ে হয়েছেন তথাকথিত মস্তান, আর মেয়েরা পণ্য হয়েছেন পাপ ব্যবসায়ের। এঁদের অন্তঃপ্রবাহী অসন্তোষ ও বৈরিতা অলক্ষ্যে গড়ে তুলছে যে বিস্ফোরণের পটভূমি, সামলাতে না পারলে সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে চুরমার করে দেবে তা একদিন। কি সেই সামলানর রাস্তা? কি তা সাহিত্য-ব্রতীর বিচার্য নয়। তবে অর্থনৈতিক সমাশ্রিত নূতন সমাজের কথা ভাবা যেতে পারে হয়ত।
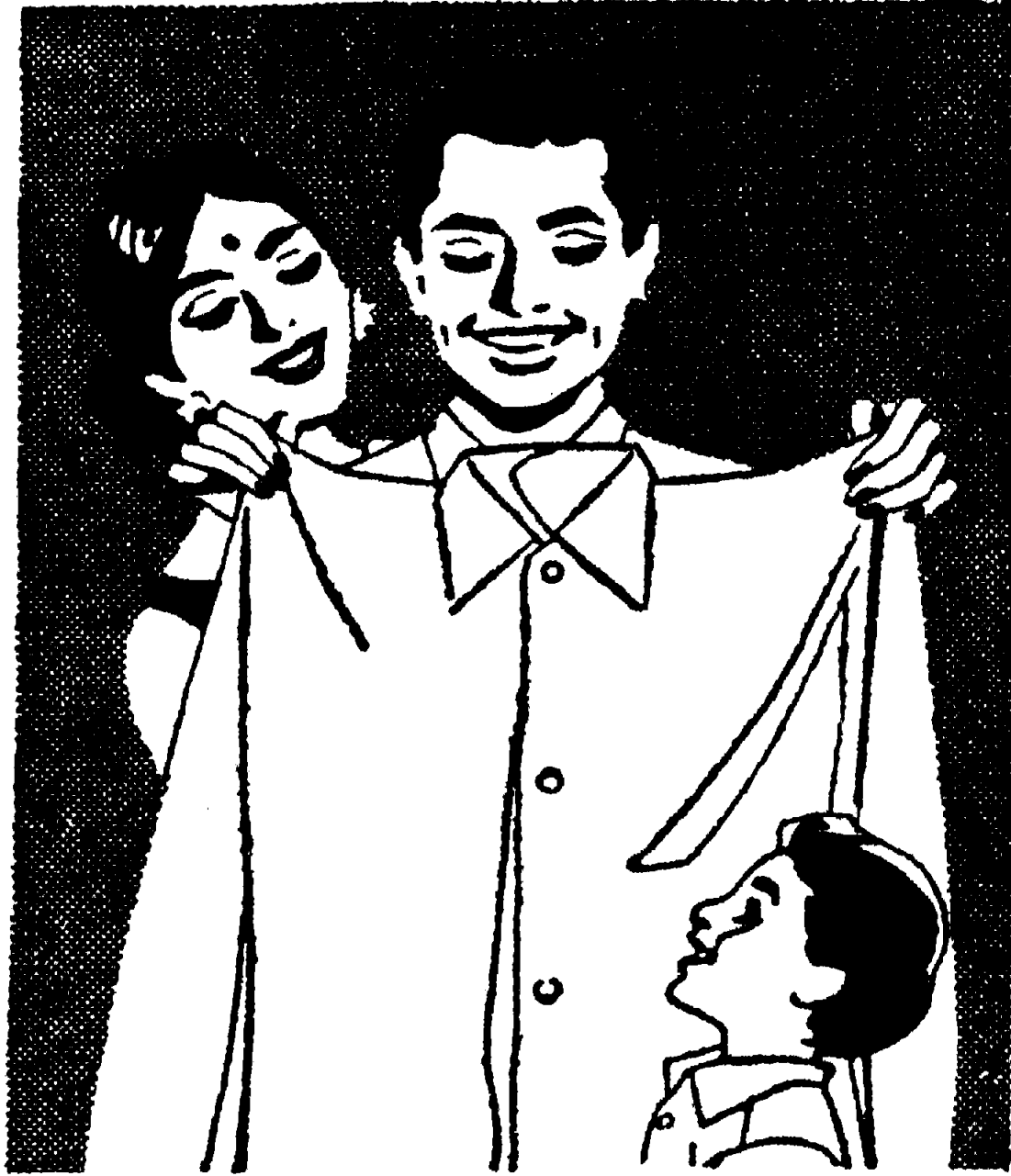
প্রতিবাদ

সমর বসু

আরও কিছুক্ষণ যদি বাঁচিয়ে রাখা যেত তাহলে হয়তো জানতে পারা যেত মনীষা আত্মহত্যা করল কেন!

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্তে আগে মনীষার জ্ঞান হয়েছিল। চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজেছিল,—তারপর মৃদুস্বরে বলেছিল, আমি জানতাম না, আমার ভাগ্যে এত সুখ ছিল।

আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল। —পারল না। ভেতর থেকে ওর জিভটা কে যেন টেনে ধরল। গভীর যন্ত্রণায় সমস্ত মুখটা নীল হতে হতে ক্রমশ পান্ডুর হয়ে গেল। ফ্যাকাশে চোখ দুটো জোলামেয়ের মত ঘোলাটে। বার কয়েক নিঃশ্বাস পড়ল, তারপর সব স্থির, নিস্পন্দ।

খুব বেশী সুখ পেলে কেউ কি কখনও আত্মহত্যা করে? আত্মহত্যার উদ্দেশ্য কি ডাক্তারবাবু?

—উদ্দেশ্য কিছু না!—ওটা হল একটা প্রতিবাদের উপায়। অনেকে অনেক রকম ভাবে প্রতিবাদ করে। কিন্তু যখন মানুষ ভাবে যে অন্য কোনও রকম ভাবে প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা তার নেই, তখনই সে আত্ম-হত্যা করে। আত্মহত্যার হেতুগুলোকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানেও একটি মাত্র কারণ নিহিত। নিজের অস্তিত্বটাকে সহ্য করতে না পারা!

—কিন্তু মনীষা যে বলল, আমি জানতাম না যে আমার ভাগ্যে এত সুখ ছিল! —সুখী অস্তিত্ব কারও কাছে অসহ্য ঠেকে নাকি!

—মনীষা মৃত্যুকে নিকটস্থ দেখে ভেবেছিল—ও কত সুখী। কেউ আর ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ওকে যে আর বেঁচে থাকতে হবে না—এই ভাবনাটাই ওর কাছে অত্যন্ত সুখকর ছিল। তাহলে বুঝতে পারছেন নিবারণবাবু যে, মনীষার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে ওর জীবিত অস্তিত্বটা ওর কাছে বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠেছিল। এবং সেটা কেন হয়েছিল জানতে পারলেই বোঝা যাবে এই অল্প বয়সে মনীষাকে কেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।—আপনি মনীষার মামা। অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন

ভাগ্নীটিকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা এবং তারপর ওকে সুপাত্রস্থ করা—এই ছিল আপনার কর্তব্য। প্রতিবেশী হিসেবে আমি যতটুকু জানি তাতে বলা যেতে পারে আপনি কর্তব্যচ্যুত হন নি। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে মনীষা কলেজে পড়ছিল। শুনেছি বি-এ পাশ করলেই ওর বিয়ের ব্যবস্থা আপনি করবেন স্থির করে রেখেছিলেন। আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নানারকম কাজকারবার করে থাকেন। আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভালই। সুতরাং অর্থনৈতিক দুরবস্থা কিংবা সাংসারিক উৎপীড়ন মনীষার মৃত্যুর কারণ নয়।—ডাক্তার সেন থামলেন। ঠান্ডা চোখে নিবারণবাবুর দিকে তাকালেন, দেখলেন, উনি পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধরালেন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। তারপর যেন অন্যমনস্কভাবে বললেন, —আপনি হয়তো জানেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমরা জানি, মনীষার মনে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। খুব স্বাভাবিক হাসি-খুশী ভরা ছিল ওর মন। হুটোপাটি করে কাজকর্ম করত। চান করতে করতে গান করত, —কখনও জোরে, কখনও গুন্-গুন্ করে। গান করতে করতে সেলাই করত। হাসি-গানে উচ্ছলতায় বাড়িটা মাথায় করে রাখত সব সময়। ওর মামীমা আসার পর ও যেন আরও মুখর হয়ে উঠল। বছর পাঁচেক আগে আমি বিয়ে করেছিলাম। মনীষা তখন ক্লাশ টেনে পড়ে, আর ওর মামী সবে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করে সংসারে এসে ঢুকেছে। বয়সের তফাৎটা ছিল না বেশী। তাই সম্পর্কটা ওরা ঠিকভাবে মেনটেন করতে পারত না। দুজনে থাকত যেন দুই সখী। ঠাট্টা-ইয়ার্কী, একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, গাল-গল্প—আর সেই সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি কাজ। সে সময় পড়াশোনা একদম বন্ধই হয়ে গেছল মনীষার। রেজাল্টও ভাল হল না। ইলেভেন-এ প্রমোশন পেল না। তাইতে ওর মনটা কিছু দিন খুব ভেঙে পড়েছিল। তারপর থেকেই ও বেশ সিরিয়াস হয়ে গেছল। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল। ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল কলেজে। ওকে নিয়ে আমরা কত স্বপ্ন দেখতাম। ও নিজেও বলত বিয়ে-থা না করে অধ্যাপনা করবে। আমরা কেউই ভাবতে পারিনি হঠাৎ ও এমন কাজ করে বসবে। অমন সুন্দর একটা তাজা ফুল—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা নীচু করে নিলেন নিবারণবাবু।

ডাঃ সেন বললেন,—পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পাবার পর এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা করব। এখন শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমার মনে হচ্ছে—মনীষার মামীমা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো এ ঘটনা ঘটতো না।

নিবারণবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন। বললেন, কেন বলুন তো।

—আপনার স্ত্রী ছিলেন মনীষার একমাত্র আত্মীয়া এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু—যাঁর কাছে সে অনায়াসে তার মনের গোপন কথা পর্যন্ত বলতে পারত। এমন অনেক মনোবেদনা আছে—যা কারও কাছে বলা যায় না, ভেতরে গুমরে গুমরে মরে। তাতে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, নয়তো আত্মহত্যা করে। তাই বলছিলাম—আপনার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতেন!

একটু থেমে ডাঃ সেন আবার বললেন, কতদিন হল উনি মারা গেছেন!

—তা প্রায় আড়াই বছর হল! কিন্তু সে তো আত্মহত্যা করে নি। হাসপাতালে প্রসব হতে গিয়েছিল। গায়ে রক্ত ছিল না। একটি মৃতশিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর ঘন্টা-পাঁচেক বেঁচেছিল।

ডাঃ সেন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন,—অনেক দিন আগে আমার কাছে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। একটা সার্টিফিকেটের জন্যে। আমি কিন্তু এ-বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট। যার চিকিৎসা করি না তাকে সার্টিফিকেট দিই না। ডবল ফী দিলেও না।—ভদ্রলোককে একথা জানাতে তিনি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যাবার সময় বললেন, চিকিৎসার সার্টিফিকেট নয়, ডেথ সার্টিফিকেট।

আমি বললাম, সে তো আরও মারাত্মক। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো! উঠছেন কেন, বসুন না!

—ভরসা দিলে বসতে পারি। নইলে সময় নষ্ট করে লাভ কি!—অন্যত্র চেষ্টা করতে হবে তো!

—কে মারা গেছে আপনার?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আমার পুত্রবধূ।

—কি হয়েছিল তাঁর।

—সার্টিফিকেট না দিলে বলে লাভ কি!

—আমি খানিকটা চুপ করে থেকে বললাম,—মৃতাকে না দেখলে—

—সে তো নিশ্চয়ই! সেই জন্যেই তো গাড়ী নিয়ে এসেছি। চলুন,—

তারপর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। দেখলাম একটি ফুটফুটে মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। যেন অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের পাতাগুলো বড় বড়। টানা-টানা ভ্রু। কালো কুঞ্চিত চুলের কুচি ছোট্ট কপালের ওপর খেলা করছে। মাথার ধারে জানালা খোলা। দক্ষিণের জানালা বোধ হয়। হু-হু করে বাতাস আসছে। ঘরটি বেশ বড়। সাজানো গোছানো। মেয়েটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, ঘরের আসবাবগুলোর মধ্যেও ঠিক তেমনি,—সবে বিয়ে হয়েছে—এমনই একটা আভাস যেন ছড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটির বয়স হবে বড়জোর আঠারো কি উনিশ। সমস্ত মুখমণ্ডলে নিষ্পাপ শিশুর সরল কমনীয়তা। এলোচুলে ঢাকা পড়ে গেছে বালিশ। সিঁথিতে ঝলমল করছে সিঁদুর। ধবধবে ফর্সা ছোট্ট পা দুখানি—আলতা দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে বসে আছে একটি যুবক—পঁচিশের কাছাকাছি হয়তো তার বয়স হবে। বোধ হয় মেয়েটির স্বামী। সদ্যবিবাহিত সুন্দরী বধূর আকস্মিক মৃত্যুতে ছেলেটি কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।...

—মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল—? নিবারণবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—না, মৃত্যুটা হয়েছিল অন্য কারণে। সেকথা পরে বলছি। মেয়েটির শ্বশুরমশাই অর্থাৎ সেই ভদ্রলোক জানতেন না যে মেয়েটি ...। ডাঃ সেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

—কি থামলেন কেন? নিবারণবাবুর অস্বাভাবিক কৌতূহল ডাঃ সেনকে বিচলিত করল।

ডাঃ সেন ইচ্ছা করেই থেমেছিলেন। —কথাটা বলা তাঁর পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। নিবারণবাবুর আগ্রহ আর কৌতূহল দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই অন্যমনস্ক হয়ে সেই কথাই ভাবছিলেন।

নিবারণবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কি হল! চুপ করে আছেন কেন?

এতক্ষণে একটু সহজ হলেন ডাঃ সেন। বললেন, পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক আমাকে চুপিচুপি বলেছিলেন, ঐ মেয়েটি ছিল তাঁর অবৈধ কন্যা। বিয়ের পরে সেটা আবিষ্কার করতে পেরে তিনি বেশ কিছুদিন অশান্তিতে কাটিয়েছিলেন। তারপর স্থির করলেন—

—কিন্তু তা কি করে হয়!—ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন নিবারণবাবু।

—হয়, হচ্ছে—এবং আরও হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি। ওটা ভদ্রলোকের বানানো কথা। —দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বলে ডাঃ সেন নিবারণবাবুর দিকে তাকালেন।

—আর কি বলেছিলেন ভদ্রলোক? —নিবারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—বলেছিলেন, অনেক ভেবে-চিন্তে আমি স্থির করলাম যে, ভবিষ্যতে কোনও দিন কোনও দুর্যোগে যদি এসব কথা জানা-জানি হয়ে যায় তাহলে সমস্ত সংসারটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। সংবাদটা শুনে আমার ছেলে হয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে। তাই বউটিকেই সরিয়ে দিলাম। পাপের ফসল পাপের সাহায্যেই ধ্বংস করলাম। কিছুদিন পরে ছেলের আবার একটি বিয়ে দেবো, তখন আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাস্তার পাশে একদল লোক জমায়েত হয়েছে। ফিসফিস কথা! চোখে-মুখে অনেক সংকেত। অন্য পথযাত্রীদেরও অর্থাৎ যাঁরা এ-পাড়ার বাসিন্দা নয়, তাঁদেরও আকৃষ্ট করছে। ভীড় ক্রমশ বাড়ছে।

সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিবারণবাবু বললেন, লোকগুলো মজা দেখতে এসেছে। মনীষাকে ওরা সবাই চেনে। কেন না, দুবেলা মনীষা এই পথ দিয়েই হাঁটত। হেঁটে হেঁটে যেত কলেজে—আবার হাঁটতে-হাঁটতেই ফিরে আসত সন্ধ্যেবেলায়। একই পথ দিয়ে রোজ দুবেলা একটি মেয়েকে হাঁটতে দেখলে মেয়েটি নিজের অজান্তেই সকলকার পরিচিত হয়ে যায়। —কোথায় বাড়ী, বাড়ীতে কে কে আছেন, সব সংবাদই ওরা সংগ্রহ করে নেয়। মনীষার মৃত্যু সংবাদটা যেমন করেই হোক ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ওরা সব ছুটে এসেছে। দেখছেন না, কারও কারও হাতে ফুল রয়েছে, ফুলের মালা। মনীষাকে উপহার দেবে। মৃতের প্রতি সম্মান জানাবে। কিন্তু মনীষাকে তো পুলিশে নিয়ে যাবে। ওদের হয়তো দেখতেই দেবে না। সুতরাং মিছি-মিছি ওরা ভীড় করছে—

—পুলিশের লোক এলেই ওরা সরে পড়বে, ও নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! পাড়ায় এ রকম একটা কান্ড হলে লোক জমবেই।

—তা যা বলেছেন,—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই,—একটু সহজ হবার চেষ্টা করলেন নিবারণবাবু, —তারপর। আপনার গল্পটার কি হল!

পুলিশ যতক্ষণ না আসে ডাঃ সেনকে অপেক্ষা করতেই হবে, কেন না তিনিই থানায় ফোন্ করেছিলেন। অগত্যা গল্পটি আবার সুরু করলেন তিনি।

আমি সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি কি করে আবিষ্কার করলেন যে, এ আপনারই মেয়ে?

ভদ্রলোক আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—সে খোঁজে আপনার দরকার কি! —আমি জেনেছি এবং স্থির নিশ্চয় হয়েছি, আপনি শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন।

—ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গী এত অসহ্য ঠেকল যে ,আমি বলতে বাধ্য হলাম, —জানেন আপনাকে পুলিশে দিতে পারি!

—পারা উচিত। কিন্তু পারেন না! পারলে সমাজের চেহারা অন্য রকম হত। —ধীর কণ্ঠে কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে এক-গোছা নোট বার করে আমার সামনে রাখলেন। রেখে বললেন, —নিন, সার্টিফিকেটটা লিখে ফেলুন। এরপর লোক জানাজানি হয়ে গেলে তখন আর সামলানো যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি শ্মশানে নিয়ে যেতে চাই।

আমার মাথায় তখন জ্বালা ধরেছে,—অপমানের জ্বালা। ভদ্রলোককে কঠিনগলায় জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি সত্যি কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলুন, নইলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না!

ক্লান্ত বৃদ্ধ গরুর মত লোকটা নিঃসাড় হয়ে আমার দিকে বোবাচোখে তাকিয়ে রইল। অর্থের অহংকারে উদ্ধত মানুষটাকে নিমেষে এইভাবে চুপসে যেতে দেখে আমি অনেক ভরসা পেলাম। আরও কঠোরভাবে আমার দাবী পেশ করলাম।

ভদ্রলোক অত্যন্ত ঠান্ডাগলায় বললেন, —আপনি কি করে জানলেন যে আমি মিথ্যা কথা বলছি!

—কারণটা নেহাত মনগড়া বলে আমার মনে হয়েছে। বিয়ের আগেই এ সম্বন্ধে আপনি সাবধান হতে পারতেন!

—বিয়েটা ওদের আগেই হয়ে গেছল, এবং আমাদের না জানিয়ে। আমরা পরে সেটা অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছিলাম—কেন না, না করলে ওরা দুজনেই হয়তো বিগড়ে যেত।

—আপনার ছেলে এসব জানে?

—না। সে শুধু জানে যে তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। করার আগে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছে—

—কই কাগজটা দেখি।

ভদ্রলোক একটি ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বার করে আমাকে দেখালেন। 'একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। এরপর আর বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। আমার মৃত্যুর জন্য আমার জন্ম দায়ী।'

—অদ্ভুত কথা!—নিবারণবাবু শুকনো-গলায় বললেন। —প্রত্যেকটি মৃত্যুর জন্যেই তো জন্মকে দায়ী করা যায়। না জন্মালে মৃত্যু হবে কি করে!—কথাটায় মস্ত বড় ফাঁকি রয়েছে।

—অথচ কথাটা সত্যি!—ডাঃ সেন মৃদু হেসে বললেন। অমন রূপ নিয়ে মেয়েদের না জন্মানোই ভাল। রূপসী মেয়ের আদর মেলে না, মেলে অপমান। ওদের দেহটাই ওদের সর্বনাশ করে। মানুষকে মুহূর্তে করে তোলে পশু, অথচ ঐ দেহটার জন্যে ও নিজে দায়ী নয়। পশুর শিকার হয়ে যখন বেঁচে থাকা আর চলে না, তখন জন্মকে দায়ী করে ওরা মৃত্যুকে বরণ করে। ওদের মৃত্যুটা হল অসুস্থ মানুষের প্রতি এক নীরব ধিক্কার, মৌন প্রতিবাদ।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা যেন পায়ের নরম পাতায় বিঁধল। নিবারণবাবু বিকৃত মুখে বললেন,—কিন্তু মনীষা তো কিছু লিখে যায় নি।

ডাক্তার সেন যেন সে-কথা শুনতে পান নি এই রকম ভাব দেখিয়ে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ এক সময় নিবারণবাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন,—আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তাই এত অল্পে অস্থির হয়ে পড়ছেন। মনীষা কিছু লিখে রেখে যায় নি—তাতে আপনার ভাবনার কি আছে। আত্মহত্যা করলেই কিছু লিখে রেখে যেতে হবে নাকি? স্থির মস্তিষ্কে সব দিক ভেবে-চিন্তে যারা নিজেদের সরিয়ে দেয়—তারাই পারে ঐসব চিঠি লিখে রেখে যেতে। তাছাড়া ও চিঠিটাও 'জাল' ছিল। ভদ্রলোক কিছু-তেই নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন না। ওকে ওঁর পুত্রবধূই বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

—তাই নাকি!—কি করে তা সম্ভব হল!

ডাঃ সেন বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কিছুক্ষণ বাদেই ওর ছেলে আমাদের ঘরে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—

যাবা, ও একবার চোখ মেলে চাইল—কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আপনি শীগ্গির আসুন।

আমার ডাক্তারী সত্তা আমাকে মুহূর্তে কর্তব্যপরায়ণ করে তুলল। মেয়েটিকে আমি শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তুললাম।

একটু থেমে ডাঃ সেন আবার বলতে লাগলেন, অ্যাটেমপ্‌ট টু মার্ডারও আইনের চোখে কম অপরাধ নয়, তাছাড়া গিলটি কনশন্‌স্‌ সব সময় ভারী দুর্বল। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত তার দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের জীবনে যে জঘন্যতম কাজ করেছিল, সে কথা স্বীকার করল। বলল, অফিসে একটা ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ আমি। অনেক লোক আমার শাসন মেনে চলে। আমি ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রীও সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু আমার শিক্ষা, আমার প্রশাসনিক দক্ষতা সবই অর্থহীন। ভেতরের পশুটার কাছে ও-সবের দম্ভ টিকল না। আমার কান ধরে সে তার কাজ করিয়ে নিয়েছিল,—তার ক্ষুধা মিটিয়েছিল। তারপর আমি আর কিছু জানি না। সে যা করতে বলেছে—মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট-এর মত তার আদেশ আমি পালন করেছি। আপনি মহৎ মানুষ এই বাজারে প্রায় হাজারখানেক টাকার লোভ আপনি সংবরণ করেছিলেন। আপনার আগমনই এই সংসারের সবকটি জীবনকেই রক্ষা করেছে। এরপর আমি কি করব, আপনিই বলুন!

সত্যিই সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম, মহত্ত্ব কাকে বলে জানি না, তবে আমার মনে হয়েছিল, ঘোর মৃত্যুর কুটিল আবর্ত থেকে কয়েকটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব কে যেন আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমি শুধু সে দায়িত্ব পালন করেছিলাম।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন। —তারপর ধীরগলায় বললেন, ট্রান্সফার নিয়ে ভদ্রলোক সস্ত্রীক চলে গেছেন নাগপুরে। ছেলে-বৌ এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সব এখানেই থাকে। এই ব্যবস্থাই চলবে যতদিন না ভদ্রলোক রিটায়ার করেন।

আমি একটু ভেতর থেকে আসছি—বলতে বলতে নিবারণবাবু বেরিয়ে গেলেন।

দুটি মাত্র ঘর। একটিতে বিপত্নীক নিবারণ একা। আর অন্যটিতে দিদিমা আর নাতনি—অর্থাৎ নিবারণবাবুর মা আর মনীষা। বাইরের যে ঘরটায় এতক্ষণ উনি বসে ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেটা বাড়িওয়ালার। তবে লোকজন এলে নিবারণবাবু সেটা ব্যবহার করেন। এখন বাড়িওয়ালা নেই। ঘরের চাবি নিবারণবাবুর কাছেই আছে। তিন দিন আগে অর্থাৎ গত সোমবারে এই ঘরেই বসে মিঃ কাপুরের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল।—এমন সময় চা নিয়ে এল মনীষা। নিবারণবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যে বললেন, একটা গান শুনিয়ে দাও মণি! পাঞ্জাবী হলে কি হয়, ইনি রবীন্দ্রসংগীত খুব ভালবাসেন।

মনীষা গান গেয়েছিল। পরপর তিন-চারখানা গান। তারপর কাপুর চলে গেল। মনীষাকে সেদিন খুব উচ্ছল, খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছিল। নিবারণবাবু আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

মায়ের ঘরে গিয়েই নিবারণবাবু চমকে উঠলেন। মায়ের জ্ঞান হয়েছে। উঠে বসেছেন। মনীষার মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু কাঁদছেন না।

—কেমন আছ মা!—নিবারণবাবু মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে! ইতর জানোয়ার কোথাকার!—মা চীৎকার করে উঠলেন।

নিবারণবাবু চমকে উঠলেন। মায়ের মুখের দিকে আর চাইতে পারলেন না। অথচ ঘর থেকে বেরিয়ে আসবারও সাহস নেই। একটু সরে এসে তক্তপোষের ওপর বসলেন। তাপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটাকে দেখতে লাগলেন।

—সেই বসে রইলি! ঘর থেকে বেরিয়ে যা—যা বলছি!—মা আবার চীৎকার করে উঠলেন।

নিবারণবাবু ধীরপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলেন। এ-কি মিঃ কাপুর! কখন এলে তুমি!

—এই মাত্র। সব শুনলাম। ভেরি স্যাড। এমন জানলে আপনার ঐ অফার আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম না। তবে কনট্রাক্‌ট আপনি পাবেন। আমার কাজ আছে—আমি চললাম।

মিঃ কাপুর চলে যাবার পর নিঃস্তব্ধ ঘরটা কিছুক্ষণ থমথম করতে লাগল।

হঠাৎ দূরে জীপগাড়ী আর মোটর-বাইকের শব্দ পেয়ে নিবারণবাবু চমকে উঠলেন। জানালা দিয়ে দেখলেন,—দূরে গলির মোড়ে পুলিশের গাড়ী এসে থেমেছে।

নিতান্ত অসহায়ের মত ডাঃ সেনের পাশে এসে বসলেন নিবারণবাবু। অস্থির-গলায় বললেন,—এখন আমি কি করব বলুন।

—কি আর করবেন। পুলিশ এলে পুলিশকে সাহায্য করবেন। ডেড বডি মর্গে নিয়ে যাক। তারপর যা হবার হবে।

—সত্যি বলছি। আমি ভাবতেই পারি নি মনীষা আমাকে এমন বিপদে ফেলবে।

—মনীষাকেই বা আপনি এমন বিপদে ফেলতে গিয়েছিলেন কেন। মনীষা যদি আপনার মেয়ে হত—পারতেন তাকে মিঃ কাপুরের কাছে পাঠাতে?—কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—কিন্তু কাপুরকে গান শুনিয়ে মনীষা খুব খুশী হয়েছিল। কাপুরের সম্বন্ধে কত কথা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে। তাই আমি ভেবেছিলাম—যদি তেমন কিছু হয়, ওরই সঙ্গে না হয় বিয়ে দেবো মনীষার। আমি ভেবেছিলাম—প্রথম দর্শনেই মনীষা ওকে ভালবেসে ফেলেছে।

—তাই ঠিক করেছিলেন,—ওর ভালবাসাও সফল হোক আর আপনিও মোটা টাকার কনট্রাক্‌ট পান—তাই না!—অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে কথাগুলো বলে ডাঃ সেন কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর ভরাগলায় আবার বললেন,—এইখানেও আমরা ভুল করে থাকি। ওদের সহজ সাবলীল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারকে 'প্রেম' বলে মনে করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দাবী পেশ করি। আপনি এবং মিঃ কাপুর সেই ভুলই করেছেন। আপনাদের সেই বুদ্ধিহীন নির্লজ্জতাকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু দিয়ে তিরস্কার করে গেল মনীষা। নিজেকে হত্যা করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়ে গেল!—এখন আর করবার কিছু নেই। ঐ পুলিশ অফিসার আসছেন। যান ওঁকে ঘরে নিয়ে আসুন।
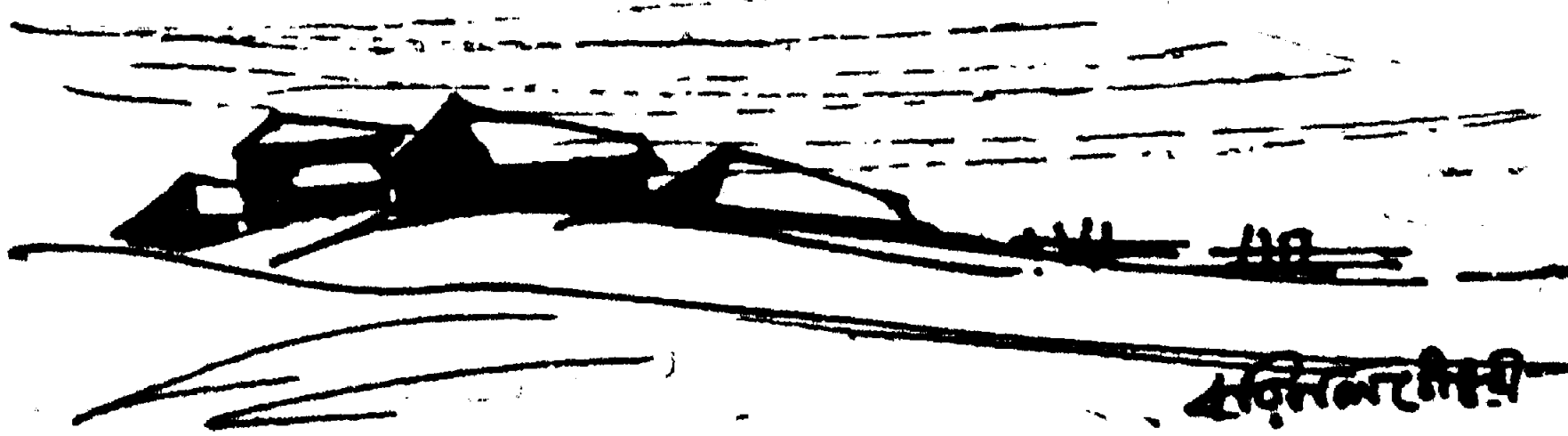
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বৈপ্লবিক বাইশ বছর

হিন্দু কলেজের হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও মাত্র বাইশ বছর মর্তধামে ছিলেন আর এই বাইশটি বছরের এক বিপ্লবী স্বপ্ন বিভোর মানুষ নব্য-বাংলার নব-জীবনের উদ্‌গাতা। তিনি বাঙালী নন, তবে বঙ্গসন্তান। বাংলার মাটিতেই এই ফিরিঙ্গি মহানায়কের জন্ম ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল ধর্মতলা মৌলালি অঞ্চলে। এই বাড়িটির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। হেনরী ডিরোজিওর পূর্ব-পুরুষ পোর্তুগীজ ও ভারতীয় সংমিশ্রণে জাত ফিরিঙ্গি সমাজের মানুষ। সেই পরিবারের অন্য সন্তানরা হেনরীর মতো সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি, কালের প্রবাহে তাঁদের নাম আজ মুছে গেছে, কিন্তু হেনরী ডিরোজিও কোনোকালে বিস্মৃতির পারাবারে হারিয়ে যাবেন না। স্কটল্যান্ডের ড্রামন্ড সাহেবের 'ধর্মতলা একাডেমিতে' হেনরী শিক্ষালাভ করেন, এই ড্রামন্ড ছিলেন সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন, ডি ডি স্বাক্ষরবিশিষ্ট তাঁর কবিতা সেইকালে খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়া সখের সাংবাদিকতাও তিনি করতেন। তিনি ছিলেন একজন সার্থক শিক্ষক। তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ করেই পোর্তুগীজ রক্ত দেহে নিয়েও তরুণ ডিরোজিও বাংলার নবীন যুবক সমাজে এক মহান আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত ডিরোজিও শিক্ষালাভ করে ১৮২৬-এ হিন্দু কলেজের শিক্ষক পদে ব্রতী হন। আর ১৮৩১-এ এই বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে ডিরোজিও প্রায় দু-বছর একটি মার্চেণ্ট অফিসে কেরানীগিরি করেন, এই কেরানীর কাজ হয়ত মনোমত হয়নি, তাই চাকরী ছেড়ে কিছুদিনের জন্য মাসীর বাড়ি ভাগলপুরে কাটিয়েছিলেন, কলকাতার বাইরে সমগ্র জীবনে এই সামান্য কালই ছিলেন। ভাগলপুরের গঙ্গা, মুঙ্গের ডালটনগঞ্জের পার্বত্য সৌন্দর্য তাঁর কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এই ভাগলপুর থেকে ফিরেই তিনি কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তার মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষার প্রথমতম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। জাস্টিস হাইড ইস্ট আর ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির সঙ্গে সেকালের সম্পন্ন বাঙালী সমাজও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছিলেন। ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষক ডিরোজিও-র বয়সের পার্থক্য ছিল সামান্যই। কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর এক আশ্চর্য প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁর ছাত্র রাধানাথ শিকদার লিখেছেন যে এই গুরুর কাছে শুধুমাত্র কেতাবী বিদ্যা অর্জন করেই ছাত্রদের কাজ শেষ হয়নি। সত্যনিষ্ঠ হতে, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও তিনি শিখিয়েছিলেন। ডিরোজিও যে সব ক্লাশে পড়াতেন তার আবহাওয়া ছিল বিচিত্র।

পড়াশোনার ও আলোচনার ব্যাপার ক্লাস-রুম থেকে ডিরোজিওর বৈঠকখানায় এবং পরে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে পর্যন্ত বিস্তৃত হল। 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামক এক বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠিত হল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এই একাডেমির অধিবেশন প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with orthodoxy'"

এই সভায় ডিরোজিও সভাপতি, উমাচরণ বসু সম্পাদক আর সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান ছাত্রবৃন্দ।

বেশীদিন কিন্তু এভাবে চলল না, ১৮৩১-এর ২৩ এপ্রিলের সভায় ডিরোজিও সাহেবের আচরণ আলোচনা করে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হল। কেউ বললেন তিনি সুযোগ্য, কেউ বললেন তিনি অযোগ্য। ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—মিথ্যা জনরবের বশে এবং নিন্দুকদের তুষ্ট করার জন্য আমাকে এভাবে সরানো কি সঙ্গত?

এই সূত্রে তিনি যে সব চিঠি লেখেন সেইগুলি বিশেষ মূল্যবান। তার মধ্যে তৎকালীন নাগরিক জীবনের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

'হেনরী ডিরোজিও: কবি ও প্রাবন্ধিক' এই পুস্তকের লেখক পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থারম্ভে লিখেছেন—

'হেনরী লুই ভিভিআন ডিরোজিওকে আমরা কেবল নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত, এক মহা প্রতিভাশালী প্রজন্মের অনুপ্রেরক অধ্যাপক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। ফলত, কবি হিসেবে তাঁর মূল্যায়নটুকু এখনো অপূর্ণ থাকায়, তাঁর আর একটি মহৎ সত্তা আমাদের কাছে আজো অপরিচিত।'

পল্লব সেনগুপ্ত অসাধারণ নিষ্ঠায় প্রচুর তথ্য সহযোগে ডিরোজিও-র কবিসত্তা এবং প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এই সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে। নব্য বাংলার এই মহানায়কের প্রতি সমকালীন সমাজ সুবিচার করেনি। তাঁর কাছে বাংলার যে ঋণ তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি মিলেছে একথা বলা চলে না। আজ তাঁর জীবনীর সঙ্গে কিছু পরিমাণে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর অন্যতর সত্তা অর্থাৎ কবি প্রতিভার 'পূর্ণতর মূল্যায়নে'র চেষ্টা করেছেন পল্লবকুমার। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ধর্মতলা একাডেমির প্রেক্ষাগৃহে 'ডাগলাস' নামক একটি ট্রাজেডি অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে চোদ্দ বছরের বালক অভিনেতা ডিরোজিও এক স্বরচিত প্রস্তাবনা পাঠ করেন কবিতায়।

সেদিন ইণ্ডিয়া গেজেট এই কবিতাটির প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

'a highly appropriate and neatly written prologue'.

হিন্দু কলেজে যোগদানের পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত হয় ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস' এবং এর পরের বছর 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা' নামক গাথা-কাব্য, সেই সঙ্গে আরো কিছু কবিতা।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'ওরিয়েণ্টাল হেরালড' নামক পত্রিকায় ডিরোজিওর কবিতা প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয় পরে ঐ বছর নভেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা গেজেটে' তা পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সুলিখিত আলোচনা পাঠে মনে হয় তরুণ কবি সেই-কালে বিদগ্ধ সমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করেছিল। তখন কবির বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এই কবিতা সঞ্চয়নের ভূমিকা লিখেছিলেন—

We can not but admit that production of such a poem as the 'Fakeer of Jungheera' is very extraordinary. It is as if a Briton of the time severus, had suddenly written a poem in good Latin.'

সমালোচক ভূমিকা-লেখকের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত। সমকালের মতামতের মূল্য নিঃসন্দেহে অনেক। আজ দীর্ঘকালের ব্যবধানে তরুণ-গবেষক পল্লব-কুমারের কণ্ঠে এই উক্তি সমর্থিত আর সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন—

'আসল কথা যে ধর্ম সংস্কারবিমুক্ত ডিরোজিওকে পরবর্তী সময়ে নাস্তিকরূপে চিত্রিত করার জন্য দায়ী সেই বিশ্বাসেরই প্রকাশ এটি। বাংলা-দেশের গীতিকা-সাহিত্যে যে ধর্মান্ধদৃষ্টি-পরিবর্জিত সমন্বয়বোধের আত্মপ্রকাশ দেখি, সেই মর্জিরই আধুনিক সংবেদন হল এই কাব্য, এমন বললে অন্যায় বলা হবে না।'

বলা বাহুল্য এই বিষয়ে আমরা লেখকের সঙ্গে একমত।

'দি ফকীর অব জঙ্গীরা'র : গল্পাংশ-টুকুও মনোহর। নলিনী সতীদাহের বলি, চিতায় উঠে সে সুর্যস্তব সুরু করেছে এমন সময় নলিনীর পূর্বপ্রণয়ী দস্যুসর্দার কর্তৃক উদ্ধার, জঙ্গীরার পর্বতকন্দরে সুখের দিন কিন্তু বেশী দিন চলল না, সুজার সহায়তায় নলিনীর ধর্মান্ধ পিতা আক্রমণ করলেন, তাদের হটিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে বলেছিল দস্যুসর্দার কিন্তু তা আর হল না, দেখা গেল তার নিষ্প্রাণ দেহটি জড়িয়ে পড়ে আছে আর এক জড়-দেহ, সে দেহ নলিনীর। সে এবার অনুমৃতা।

সেকালের সমালোচকবৃন্দ এই গাথাকে বায়রণের অন্ধ অনুকরণ বলেছেন। এই কাব্য পাঠের সময় তাঁদের টমাসমুরের 'লালা রুখ' এবং মিস লনডাসের 'রুবাদুর'কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক বলেছেন—'আনুপূর্বিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইঙ্গ বঙ্গ-সাহিত্যের এই প্রথম উল্লেখ-যোগ্য আলেখ্য কবিতাটি একটি অনু-সন্ধানের স্বর্ণখনি বিশেষ।'

বাংলা সাহিত্যে যখন ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের আবির্ভাব ঘটেনি তখন এই ফেরঙ্গ কবি 'স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির মন্ডলী' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ) জাতীয় সনেট রচনা করেছেন।

ডিরোজিওর এই বিখ্যাত গাথা কাব্যটি সবিস্তারে আলোচনা করে তাঁর য়ুরোপ পর্যায়ের কবিতাবলী আলোচনা করেছেন। এই বিভাগে 'গ্রীক' কবিতাগুলি উল্লেখ্য। লেখক বলেছেন যে 'মাতৃভূমির পরেই যে দেশকে ডিরোজিও সবচেয়ে বেশী ভালো-বাসতেন তা হল গ্রীস'—তার কারণও তিনি ঠিকই অনুমান করেছেন, প্রাচীন গ্রীস ছিল শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। ভারতীয় ঐতিহাসিক কাহিনী বিশেষতঃ রাজপুত বীরত্বের কথা তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করেনি একথা মনে করে লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মনে হয়, অতি অল্পকালের আয়ুই হয়ত তাঁর কাব্যপ্রতিভার যথোচিত বিকাশের পথে একমাত্র বাধা। লেখক বলে-ছেন—'ডিরোজিওর কাব্যের অন্যতম প্রধান স্বরগ্রাম মানুষের বন্ধনহীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ—' একথা সমর্থনযোগ্য।

লেখক বলেছেন আমরা শুধু ডিরোজিওর দেশপ্রেমটুকুই স্মরণে রেখেছি, কিন্তু বিশ্বপ্রেমের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রগতিশীলতা আছে—এদেশে তার অগ্নিহোত্রী ডিরোজিওই।'

ডিরোজিওর কবিপ্রতিভার বিশদ আলোচনান্তে লেখক তাঁর স্বল্পসংখ্যক প্রবন্ধ ও আলোচনার যে সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিচয় দান করেছেন। এতাবৎ ডিরোজিও সম্পর্কে স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই সব গ্রন্থে ডিরোজিওর দীক্ষাগুরুর ভূমিকাটিই মুখ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে, পল্লব সেনগুপ্ত অতি অল্প কথায় অজস্র তথ্য সমাবেশে ডিরোজিওর যে পরিচয় দান করেছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। —**অভয়ঙ্কর**

হেনরি ডিরোজিও : কবি ও প্রাবন্ধিক — পল্লব সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬ ।। মূল্য দেড় টাকা মাত্র ।।

সাহিত্যের খবর

সাহিত্য পুরস্কার।। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পক্ষ থেকে প্রতি বছরই সাহিত্যে বিশিষ্ট লেখকদের পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। এবারও সেই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এবার যাঁরা সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী পরিমল গোস্বামী, কাজী আবদুল ওদুদ, প্রবোধচন্দ্র সেন, গৌরকিশোর ঘোষ, সতীকান্ত গুহ ও তরুণ সান্যাল।

অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা থেকে যে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়, তা হল যথাক্রমে শিশিরকুমার পুরস্কার ও মতিলাল পুরস্কার। সাধারণত গবেষণাক্ষেত্রে যাঁদের পাণ্ডিত্য বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, শিশিরকুমার পুরস্কারটি তাঁদেরই দেওয়া হয়। এবার এই পুরস্কারটি পেলেন কাজী আবদুল ওদুদ। সমালোচক হিসেবে তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। 'মতিলাল পুরস্কার'টি পান তাঁরাই, যাঁরা গল্প-উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। এবার এই পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। গল্প রম্যরচনা এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে "আমি যাঁদের দেখেছি" নামে তিনি যে গ্রন্থটি লিখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সংযোজন।

আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কর্তৃপক্ষ যে পুরস্কার দেন, তা হল প্রফুল্ল-চন্দ্র সরকার' ও 'সুরেশচন্দ্র মজুমদার' পুরস্কার। এবার এই পুরস্কার দুটি পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত সমালোচক। তাঁর এই সম্মানে বাংলা সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন। গৌরকিশোর ঘোষ ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক এবং রম্যরচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'সাগিনা মাহাতো', 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ইত্যাদি।

শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির জন্য দেওয়া হয় 'সুধীরচন্দ্র সরকার'। আগে এই পুরস্কারটির নাম ছিল 'মৌচাক পুরস্কার'।

এবার থেকেই নতুন নাম করা হয়েছে। এবারের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমন্নীকান্ত পট্ট। শিশু ও কিশোরদের জন্য এ পর্যন্ত তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং কবিতা মিলিয়ে ১২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও ছোটদের জন্য কয়েকটি পত্রিকাও তিনি এর আগে সম্পাদনা করেছেন। 'চিত্রা' পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করতেন অবনীন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি "সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে"র সভাপতি।

কবিতার জন্য দেওয়া হয় 'উল্টোরথ' পুরস্কার। এবার পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীতরুণ সান্যাল। শ্রীসান্যালই বোধহয়, সর্ব-কনিষ্ঠ কবি, যাঁরা এ পর্যন্ত এ পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে। বাংলা প্রগতিশীল কাব্যান্দোলনে তরুণ সান্যাল একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থের নাম "মাটির বেহালা"। কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে "রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা"।

একজন বাঙালীর সম্মান।। "উর্দু এবং বাংলা"—এই নামে উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ লিখেছেন শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এই গ্রন্থের জন্য তাঁকে ১০০০ টাকার একটি পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। গত ৯ এপ্রিল দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি কে আর ভি রাও এই পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রীভট্টাচার্য উর্দু ভাষায় এর আগেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের অধীনে কাজ করেন। তাঁর এই সম্মানে প্রতিটি বাঙালীই গর্ববোধ করবেন বলে আশা করি।

বিষুব মিলন উৎসব ।। ওড়িশার সাহিত্য আন্দোলনে 'বিষুব মিলনে'র একটি অবদান আছে। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ওড়িশার সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটানো এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখকরা আসেন—আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। সাহিত্য কোন্ পথে যাবে, এই নিয়ে চলে তুমুল তর্কবিতর্ক। ওড়িশার বাইরে থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক প্রতি বছর এই সমাবেশে যোগ দিতে আসেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব।

এবারের ২১তম বিষুব মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য আকাদমির সহসভাপতি ডঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন—"ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এইসব সাহিত্য 'নোবেল পুরস্কারে'র মত বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হত।" অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উৎকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সদাশিব ত্রিপাঠী।

নতুন বই

স্টীম হাউস—জুল ভের্ন। অনুবাদ: [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ স্ক্রিপ্ট বুক সপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম: পাঁচ টাকা

আঠারশ আশি খৃঃ বেরিয়েছিল স্টীম হাউস। এই বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনী ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের রক্তঝরা পটভূমিকায় লেখা। জুল ভের্ন কখনও ফ্রান্সের বাইরে যাননি। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ, মহাসমুদ্র থেকে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর কাহিনী। বিস্ময়কর ঘটনা, সব কাহিনীতেই পরিবেশ কেমন বিশ্বস্তভাবে ফুটে ওঠে। কলকাতা থেকে এ আশ্চর্য যান্ত্র হাতীতে যাত্রা করেছিল কয়েকজন য়ুরোপীয় উত্তর ভারত ভ্রমণে। তাদের যাত্রাপথ নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। তরাই, ঔরঙ্গাবাদ, ভূপাল, বিন্ধ্যপর্বত প্রভৃতি অঞ্চলের খুঁটি-নাটি বিবরণ রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের গাছ-পালা, পশুপাখীর বৈচিত্র্য, জনসাধারণের বিচিত্র আচারব্যবহার জুল ভের্ন চিত্রিত করেছেন অসামান্য নৈপুণ্যে। এটা যেমন ভ্রমণকাহিনী, তেমনি শিকারকাহিনীও বটে। সেই সঙ্গে রয়েছে বিজ্ঞান। বইটা পড়বার পর জুল ভের্নের ভারতের সম্পর্কে জ্ঞান দেখে অবাক হতে হয়। জুল ভের্নের রচনার বৈশিষ্ট্য যে কল্পনাশক্তি, কাহিনীর চমৎকারিত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ এবং অতুলনীয় রচনাশৈলী অনুবাদেও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

●

বারান্দা (গল্প সংকলন)—অমল চন্দ।। অব্যয়, ৪২ গড়পাড় রোড, কলকাতা ৯।। দাম তিন টাকা।।

উচ্চারণসাম্যে আমরা 'গল্প'কে চলিত বাংলায় বলি 'গপ্প', মানে নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতরে থাকবে একটা ঘটনা কিংবা কাহিনীর বর্ণনা। অমল চন্দের 'বারান্দা' সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে। মনে হয়, এতদিনের গৃহীত সিদ্ধান্তের নিরিখে বুঝি গল্পের বিচার চলবে না, নতুন করে তার সংজ্ঞা-নির্ধারণ দরকার। তাঁর গল্পের ভাষা প্রায়শ কবিতার কাছাকাছি, কোনো অংশ কবিতাই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, 'বারান্দা' গল্পের শেষ পংক্তিটি: "বারান্দা, আমার বারান্দা, আমি একদিন বারান্দায় চলে যাবো।"

এই সংকলনে জায়গা পেয়েছে 'সাঁকো' 'রাস্তাটা' 'মুখোমুখি' 'ভূমিকা' 'জল' 'অন্ধকারে' 'বাস স্টপে' 'কালো পা' 'ঘরে' 'আসবাব' প্রভৃতি পনেরটি গল্প। একেকটি অনুভব কিংবা ধারণার সূত্রে প্রতিটি গল্প আবর্তিত, পুনরাবর্তিত। কোনো কোনো লেখায় কাহিনী কিংবা রহস্যের আভাস আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। আছে উপলব্ধির নিগূঢ় পরিচয়। নিজের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন। 'মুখোমুখি' গল্পে তিনি লিখেছেন: "আমি দরজায় পাল্লা টানতে লাগলাম। দরজা বন্ধ হতে লাগল। বারান্দা ছোট হতে লাগল। আমি এখন ঘুমোতে চাই। আমি এখন ঘুমোব।... কেননা এখন অনেক রাত। কেননা এখন ঘুমোবার সময়।"

লক্ষ্য করার বিষয় লেখকের শব্দচেতনা ও পরিবেশ-নির্মাণের কৃতিত্ব। বিভিন্ন লেখায় তাঁর একই মানসিকতার বিভিন্ন প্রকাশ। সাধারণ পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে প্রতিটি রচনা। অভ্যস্ততার সহজ পথ ধরে তিনি এগোননি। তাঁর একটি রোম্যান্টিক মন তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী। কবিতার মতো তাঁর গল্পকে বলা যায়, 'লিরিক গল্প'।

●

নত বিভাবরী (দীর্ঘ কবিতা)—আশিস সেনগুপ্ত।। শুকসরী প্রকাশক, ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৪।। দাম: দু' টাকা।।

আশিস সেনগুপ্ত 'নত বিভাবরী'তে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের একটি ফটোগ্রাফিক চিত্রপ্রদর্শনী খুলেছেন দীর্ঘ কবিতার অবয়বে। অবশ্য একটা অস্পষ্ট কাহিনীর আভাস আছে শেষ পর্যন্ত, যে-কাহিনী এই যুগতিক্ততার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। কেননা, প্রেমে-ভালবাসায়, সংগ্রামে ও ঘৃণায়, প্রতিটি মানুষই পাঠকের প্রতিবেশী।

শুরুতেই তিনি লিখেছেন: "মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে/মৃত্যুর সাথে পরিচিত হই/ মা কিংবা স্ত্রীর মতন।/কেননা তমলুকের পথে পথে/অসংখ্য স্মৃতির স্মৃতি/রক্তস্নান হতে/ঠাটাপোড়া রোদ্দুরে মায়ের বার্ধক্য/ তার সন্তান সাম্রাজ্যহারা ক্লান্ত কাঠ/ মুরগীর পেছনে ডাকে।" স্বভাবতই এই স্মৃতির আলোয় ভিড় করে যে-সব মানুষ, সে-সব ঘটনা কিংবা চরিত্র, তা দূর কিংবা অদূরকালের হলেও আজকের যুগযন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী অংশীদার। আশিস সেনগুপ্ত লিখেছেন: "নন্দীগ্রামের ছেলে তমলুক কলেজের সতীশ পড়ুয়া/রাজকুমারীর বিক্ষত বুকে উঁকি মেরে/নিতান্তই সাপ খেলা দেখাবার মতো/ওই বুকে ঠোঁট দুটি রেখে/সমস্ত দূষিত রক্ত পুঁজ ঘা/প্রাণপণে শুষে নিল।"

এভাবে কবি বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র পরিমণ্ডলকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, হৃদয়ের জটিলতা ও সামাজিক সংকটের ছবিও ফুটে উঠেছে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ছাপা বাঁধাই ভালো। সাম্প্রতিক কবিতাপাঠকের কাছে সমাদরে গৃহীত হবে।

বৈকুণ্ঠের খাতা

পূর্বস্মৃতির পুনরুদ্ধার

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি ধারাবাহিক বেরিয়েছিল অমৃতে। এমন একটা অঞ্চল ও সময়ের কথা লিখেছেন তিনি, যে অঞ্চলটা এখন রাজনৈতিক কারণে সীমান্তের ওপারে এবং সময়টা অনতি-অতীতের স্মৃতির বিষয়। পশ্চিমবাংলার মানুষ সেই অঞ্চলকে ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু সময়কে ভোলার সাধ্য নেই কারো। পূর্ববাংলার মানুষ, যাঁরা দেশ-ভাগের যন্ত্রণায় এখন ভারতবাসী, তাঁরা জাদুকরের আয়নার মতো নিজেদের মুখ দেখবেন উপন্যাসটির পাতায় পাতায়। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম অমৃতে বেরোবার সময়। পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন প্রফুল্ল রায়। পূর্বস্মৃতি পুনরুদ্ধারের কাহিনী বলছিলেন সকলকে। এখানেই তাঁর সার্থকতা। এজন্যেই তাঁর জনপ্রিয়তা। বিষয় এবং বিষয়ীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা বাংলা-সাহিত্যে এর আগেও লক্ষ্য করা গেছে কয়েকবার— তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ক্ষেত্রে। প্রফুল্ল রায় তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শিল্পদৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। কাছা-কাছি হয়েছেন মৌল প্রবণতায়। এজন্যেই আমি তাঁর জনপ্রিয়তাকে স্মরণীয় বিষয় বলে গণ্য করি, নেহাৎ-ই সাময়িক উত্তেজনা নয়।

আসাম থেকে জনৈকা পাঠিকা, নন্দিতা ভট্টাচার্য, উপন্যাসটি সম্পর্কে অমৃত সম্পাদককে লিখেছিলেন : "যদিও দাদু দিদিমা ঠাকুরমাদের কাছে পূর্ববঙ্গের অনেক গল্প শুনেছি এবং কল্পনায় তা রূপ দিতে চেষ্টা করি, তবুও মনের গভীরে পূর্ববাংলা না দেখার ব্যথা অনুভব করি। যখন শ্রীরায়ের গল্পটি পড়া আরম্ভ করলাম, 'রাজদিয়া' আমার কাছে বাস্তবায়িত হয়ে উঠল। গ্রামের রূপ আমার কাছে সহজ ও সুন্দরভাবে ধরা দিল।" কলকাতা থেকে সনৎ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "শ্রীরায় যেভাবে লারমোর এবং হেমনাথকে এঁকেছেন, তা শুধু জীবন্ত বললে ভুল হবে। এঁরা পূর্ববাংলার জন-জীবনের সার্থক প্রতিনিধি, হারিয়ে-যাওয়া একটা যুগের ভাষ্যকার।"

এ-রকম অজস্র চিঠি ছাপা হয়েছে অমৃতে। পাঠক-পাঠিকার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেকের ভাষায়। মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "গ্রামের এমন ছবি, এমন চরিত্র, এমন ভাষার দ্বারা পূর্ববাংলাকে এমন জীবন্ত, এমন বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে আমি অন্তত আর কোনো উপন্যাসে দেখতে পাইনি।" চব্বিশ-পরগণার পাঠক মোঃ মাহবুবর রহমান পুরোপুরি পশ্চিমবাংলার মানুষ। তাঁর মতে : "কেয়াপাতার নৌকো পড়তে পড়তে যে তৃপ্তিকর অনুভূতি—এর আগে এরকম অনুভূতি কখনো উপলব্ধি করিনি।"

আসল কথা, লেখকের অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, আন্তরিকতা, সৌন্দর্যবোধ, ইতিহাস-চেতনা ও দায়িত্ববোধ। এ সকল গুণের সার্থক সমাহার ঘটেছে উপন্যাসটিতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বইটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মতে, শহরের কথা নয়, তেমনভাবে বলতে পারলে গ্রামের কাহিনীও পাঠক শুনতে চায়। লেখকের প্রধান সম্পদ হবে আন্তরিকতা।

অতর্কিত লেখক

লেখক হবার কথা ছিল না প্রফুল্ল রায়ের। অন্তত এটাই তাঁর ধারণা। তিনি বলেন : "আমি সাহিত্যজগতের লোক নই। হঠাৎ গল্প লিখে ফেলেছি। সবাই বললেন, একেবারে আলাদা ব্যাপার। তারপর থেকে আমি সাহিত্যিক হয়ে গেলাম।"

প্রায় অনুরূপ কথা শুনেছিলাম সুবোধ ঘোষের মুখে। তিনিও বলেছিলেন : "সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধে আমি গল্প লিখেছিলাম। প্রথম গল্প 'ফসিল', দ্বিতীয় গল্প 'অযান্ত্রিক'।" অভিজ্ঞতার রকমফেরে একজন পূর্ববঙ্গের, অন্যজন বাঙালি হয়েও বিহারের। কাহিনীর স্বপ্নে নয়, জীবনের স্বপ্নে উভয়েই ছিলেন সজীব এবং উদাসীন। অন্য সকলের ক্ষেত্রে যা হয়, বাল্যকালে স্কুল-কলেজ ম্যাগাজিনে হাত মকসো করা, তারও চেষ্টা করেননি প্রফুল্ল রায়। সরাসরি সাহিত্যের আসরে ঢুকে পড়েন অতর্কিতে।

এসব আমার জানার কথা নয়। প্রফুল্লবাবু আমাকে বলেছিলেন আড্ডা দিতে দিতে। কখনো-বা বাগবাজার স্ট্রীট পেরিয়ে, গিরীশ এভিনিউ, সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে। কখনো-বা অন্যত্র—কফি হাউসে, কিংবা তাঁর নিজের বাড়ীতে বসে।

প্রফুল্লবাবু বলেন : "সদ্য পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি কলকাতায়। বন্ধুবান্ধবরা

জানতে চান পাকিস্থানের খবরাখবর। আমি বলি, আমার জীবনের কথা। যে-জীবন ফেলে এসেছি, তা তো ভোলবার নয়। ঘুরেছি গ্রামে গ্রামে, নদীনালায়। মিশেছি চাষী, জেলে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। কেউ সৎ, কেউ অসৎ। কিন্তু সকলের সঙ্গেই আমার হৃদয়ের সম্পর্ক। প্রত্যেককে দেখেছি কাছ থেকে, নিবিড়ভাবে। প্রত্যেকের মুখ আমি স্মরণ করতে পারি, তাদের চালচলন, কথা-বার্তা, ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ। পালিয়ে বেড়িয়েছি আন্দোলনে যোগ দিয়ে। বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে মুসলমান। আমি সেসব গল্প শুনিয়েছি বন্ধুবান্ধবদের। ওরা বলতো, এসব নিয়ে গল্প লিখলে হয়। গল্প লেখো। আমি বিস্মিত হয়ে বলতাম। কোনোদিন লিখিনি, আমার দ্বারা হবে কি?'

তারপর শোনালেন প্রথম লেখার ভৌতিক কাহিনী। বললেন : 'একদিন ঘুমিয়ে আছি দোতলার ঘরে। তখন অনেক রাত। হঠাৎ টের পেলাম বৃষ্টি নেমেছে। জানলা খোলা ছিল, পায়ের ওপরে পড়ছে বৃষ্টির ফোটা। জেগে উঠলাম, ধড়মড় করে। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, সামনের বাড়ীর বারান্দায় দুটো চোখ জ্বলছে। হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। জানলা বন্ধ করেও দেখি ভয় যায় না। চোখে ঘুম নেই। কি করি, কি ভাবে রাতটা কাটাই। অন্যমনস্ক হবার জন্য একটা উপায় বের করলাম। বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধটা মনে পড়লো। লিখতে শুরু করলাম। সেই রাতেই লেখা হলো দুটো গল্প—'মাঝি' আর 'চর'। প্রথম গল্পটি ছাপা হয়েছিল 'দেশ'-এ, দ্বিতীয়টি 'পরিচয়'-এ। তবে পরিচয়ের গল্পটি আমার দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্প নয়। 'মাঝি' রি-প্রিন্ট হয়েছিল উল্টোরথে, প্রথম সাড়া-জাগানো গল্প হিসেবে।'

তাঁর কথাকে জো বলে মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রফুল্ল রায়ের প্রবেশ আকস্মিক, কিন্তু বহু-প্রত্যাশিত। ভূতের ভয় তাঁর কোনো কালে ছিল বলে জানি না। সে রাতে তিনি যে জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখেছিলেন, তা ছিলো একটা কালো বেড়ালের। মাঝরাতের মেঘ তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে সাহায্য করলেও, সাহিত্যের জাগরণ ঘটাতে পারতো না। তার মূল রহস্যটা ছিল জীবনের অভিজ্ঞতায়। সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রণের আপেক্ষায় থাকতে হয়, সাহিত্যের উৎসবে তার প্রয়োজন হয় না। এখানে সকলেই নিমন্ত্রিত, সকলেই আকাঙ্ক্ষিত। প্রফুল্ল রায় নিজের আসন করে নিয়েছেন স্বাভাবিক শক্তিতে।

তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পূর্ব-পার্বতী' এককালে আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমহলে। এখনো বিক্রী কম নয়। চার পাঁচটা সংস্করণ হয়েছে অনেক বইয়ের। যেমন 'নোনা জল মিঠে মাটি', 'নাগমতী' 'সিন্ধুপারের পাখি' ইত্যাদি। অনেকেই পড়েছেন 'নিশিগন্ধ' 'বাঘ' মুক্তো রাজা আসে রাজা যায়'-এর মতো অসাধারণ গল্প।

প্রফুল্ল রায় তাতেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন : "আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্যিক হবার কথা ছিল না। আমি আমার কথা বলি, আমার দেখা মানুষের কথা বলি। বানানো গল্পে আমার বিশ্বাস নেই।" এখন তাঁর একটি উপন্যাস 'নোনা জল মিঠে মাটি'র নাট্যরূপ অভিনীত হচ্ছে মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। চলচ্চিত্রে দেখা যাবে 'এখানে পিঞ্জর'।

আঞ্চলিক সাহিত্য

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায় দুটো শব্দ ব্যবহার করেন হামেশাই। একটি শব্দ 'সয়েল', অপরটি 'লোকাল-কালার'। তিনি বলেন : 'বিদেশের দিকে মুখ তাকিয়ে-থাকা আমি পছন্দ করি না। বাংলাদেশে যদি সাহিত্যের কোন আন্দোলন হয়, তবে তার শেকড় থাকতে হবে এদেশেরই মাটিতে। বাইরের সাহিত্য যতই মনোরম হোক, এদেশের পক্ষে তা অনুপযুক্ত। ধার করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবে দেশের মাটি থেকেই। এখানকার মানুষ, প্রকৃতি, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসাকে আত্মসাৎ করে যিনি সকলের মুখে ভাষা ফোটাতে পারবেন, তিনি পাবেন মহৎ শিল্পীর মর্যাদা।'

জিজ্ঞেস করলাম : 'কেয়াপাতার নৌকো'কে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যায়?

—'নিশ্চয়ই'—বেশ জোরের সঙ্গে শব্দটি উচ্চারণ করলেন প্রফুল্লবাবু : 'এ উপন্যাসের পটভূমি পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চল। সারা পূর্ববাংলাকেও হয়তো ছোঁয়া যায়নি পুরোপুরি। চরিত্রগুলি সকলের চেনা নয়, আমার পরিচিত। প্রত্যেককেই আমি জানি। তাদের মুখের ভাষা, মনের কথা সবই আঞ্চলিকভাবে একান্ত সত্য। এমনকি জায়গার নামধাম, খালবিল, প্রকৃতি —সবই।'

আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি আপনার এ আকর্ষণের কারণ কি?

—কারণ, আমি নিজে। অন্যের কথা আমি জানি না। নিজের কথাই বলতে চেয়েছি বারবার। আমার পুরনো গ্রাম, তাছাড়া সেই নবীগঞ্জ, সুজনগঞ্জ, ইসলামপুর, প্রভৃতি গ্রাম এখনো রক্তের ভেতরে সজীব, সজাগ, আলোড়নের মতো। ওখানকার মানুষ এবং মাঠঘাট নদনদীতে আমি পেয়েছি আবেগ দিয়ে। তাছাড়া, আমি মনে করি সাহিত্যের উৎস জীবন, সেই জীবন তো এভাবেই অঞ্চলবিশেষের লোকাচারে, সুখেদুঃখে ও হৃদয়-সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। যে সাহিত্যে জীবন নেই, সে তো বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। খোলস নিয়ে পাঠক কি করবে?

আপনি যে 'লোকাল-কালার'-এর কথা বলেন, তা কি 'কেয়াপাতার নৌকো'য় পুরোপুরি পাওয়া যায়?

—আমার অনুভূতি ও স্মৃতির মধ্যে পূর্ববাংলার জল-হাওয়ার উপাস্থিত প্রত্যেক্ষণের। বিশেষ করে ওখানকার জলে-ডোবা বর্ষাকালের মাঠ, ধানক্ষেত, নদীর জোয়ার ভাটা, ক্ষেতভরা শাপলা আর পদ্মফুল, সমাজের নানাশ্রেণীর মানুষ। যতখানি পেরেছি সেই লোকাল-কালার বজায় রেখেছি। চরিত্রগুলির কোন কোনটায় নাম বদল হয়েছে। কোনো চরিত্রকে ভেঙে দুতিনটে চরিত্র বানিয়েছি—এই পর্যন্ত।

বাংলাদেশে আঞ্চলিক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আর কোন্ কোন্ সাহিত্যিকের লেখায় আছে? তাঁদের প্রভাব কি আপনার ওপরে লক্ষ্য করা যায়?

—তারাশঙ্করের সমস্ত লেখার মধ্যেই রয়েছে আঞ্চলিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং ধর্ম। সেজন্যেই তিনি এত বড়। বাংলা-দেশের একটা সময়ের, একটা অঞ্চলের পুরো ইতিহাস তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। অন্তরের গভীর স্থল থেকে উঠে এসেছে তাঁর চরিত্রগুলি। এমন সজীব, এমন কর্কশ, এমন প্রাণবান মাধুর্য সমকালীন আর কারো লেখায় নেই। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলকে অবিস্মরণীয় করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর প্রভাব আছে আমার প্রথমদিকের লেখায়। এখনো আছে। আমি তাঁর দৃষ্টিটাকে অনুসরণ করে চলি।

কেয়াপাতার নৌকো

'কেয়াপাতার নৌকো' প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদে লক্ষ্মীর সরার মতো একটা ছবি। বোধহয়, বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাণধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখেই আঁকা হয়েছে প্রচ্ছদচিত্রটি।

প্রফুল্লবাবু বলেন : আমার অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদই কমার্শিয়াল। প্রকাশকের রুচিমত আঁকা হয়েছে সবই। এ বইয়ের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল অন্য রকম। একদিন নানাজিনিষ ভাবতে ভাবতে নজরে পড়ে, পুরনোকালের একটি পটের প্রতি। সেই প্রাচীন পট থেকেই এ বইয়ের প্রচ্ছদের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করি।

প্রফুল্লবাবু কথায় কথায় বললেন : 'এ উপন্যাসটির প্রতি আমার দুর্বলতা সব-চাইতে বেশী। আর কোনো উপন্যাসে আমি
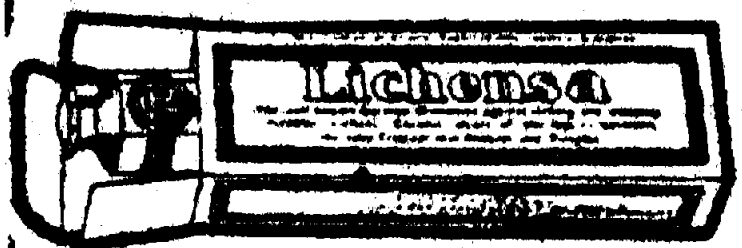
আমার নিজের কথা এতটা বলিনি। এতে আমার কিশোর বয়সের আশি ভাগ কথাই লিখেছি। বলতে পারেন স্মৃতিচারণামূলক উপন্যাস। কিছুটা পিছন ফিরে দেখা। দেশভাগের বেদনাকে আমি অন্য কোনো উপন্যাসে বলতে পারিনি। অন্যত্র বলেছি প্রসঙ্গক্রমে। এ উপন্যাসে আমি সেলফ-আইডেনটিফায়েড হয়ে পড়েছি। আর কোনো ঔপন্যাসিক এ সময়টাকে নিয়ে উপন্যাস লেখেননি। আমার মনে হয়, সেদিনের কথাগুলো ধরে রাখা দরকার। বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে সময়টা তো নেহাৎ উপেক্ষা করার মতো নয়। রক্ত দিয়ে আমরা দেশ-ভাগের দেনা শোধ করেছি।

অন্য কোনো উপন্যাসের সঙ্গে 'কেয়া-পাতার নৌকো'র কোনো মিল আছে কি?

—না। বিন্দুমাত্রও না। কাহিনীগত মিল তো নয়ই।

'পূর্বপার্বতী'র সঙ্গে পার্থক্য কোথায়?

—'পূর্বপার্বতী' আমার প্রথম উপন্যাস। তাতে চমকে দেওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল। ঝোঁক ছিল পাঠককে বিস্মিত করার। সেজন্যে নাগা হিলস-এ গিয়েছিলাম। 'পূর্ব-পার্বতী'তে আমি ওখানকার মানুষের কয়েকটি সামাজিক স্তরের কথা লিখেছি—প্রিমিটিভ থেকে মডার্ণ পর্যন্ত। যতটা সম্ভব আন্তরিক হয়েও ভেতরে ঢুকতে পারিনি। কেননা, আমি ছিলাম ভিন্ন সমাজের ভিন্ন পরিবেশের লোক। 'কেয়াপাতার নৌকো'র সঙ্গে আমার যোগ অন্তরের। এ উপন্যাসের নায়ক বিন্দু এবং আমি—এক ও অভিন্ন। 'পূর্বপার্বতী' আমার দেখা দূরে থেকে, কেয়াপাতার নৌকো'য় ভেতর থেকে।

এ উপন্যাসে কোনো প্রতীক বা চিত্রকল্প আছে কি?

প্রফুল্লবাবু বললেন : আমি সাধারণত কোনো ইমেজ বা ইমাজিনারী ব্যবহার করি না। কল্পনার চেয়ে বাস্তব নিয়েই যা কিছু লেখালেখি। তবে বর্ণনার সময় লোকাল কালার ফুটিয়ে তোলার জন্য অতিরিক্ত ছবির আমদানী করেছি।

শিল্পের প্রয়োজনে বক্তব্য কি কোথাও ব্যাহত হয়েছে?

—কেয়াপাতার নৌকো লিখেছি বক্তব্যের তাগিদে। শিল্প তো মুখ্য ব্যাপার নয়। যে-জীবনটা দ্রুত বিলীয়মান, তাকেই পেইন্ট করতে চেয়েছি আমি। কাজেই শিল্পের কারসাজি দেখিয়ে বক্তব্য না বলার কৌশল নেব কেন?

উপন্যাসটি তো দীর্ঘ। ছোটগল্পের উপাদান আছে কেমন এ কাহিনীর ভেতর?

টুকরো টুকরো গল্প আছে অনেক। হয়তো আলাদাভাবে লেখাও যেতো। কিন্তু পুরো বক্তব্যটা ধরে রাখা যেতো না। যে-কোনো বড় উপন্যাসেই আমার ধারণা, অনেক ছোটগল্পের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে।

আঞ্চলিক সাহিত্যের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত? কেয়াপাতার নৌকোয় কি আপনি সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেছেন?

—সংলাপ হওয়া উচিত চরিত্র অনুযায়ী। এ উপন্যাসে আমি বিক্রমপুরের মানুষের মুখের ভাষাকে হুবহু দেবার চেষ্টা করেছি। তবে অনেকটা সহজ ও সরল করে। তার কারণ, আমার উপন্যাসের যাঁরা পাঠক, তাঁরা বেশীর ভাগই পশ্চিম বাংলার মানুষ। ওখানকার ডায়ালেক্ট পুরোপুরি বজায় রাখলে পাঠকের পক্ষে বুঝে উঠতে অসুবিধা হতো। এখানকার পক্ষে অপ্রচলিত বহু শব্দের ব্যবহার আছে পূর্ববঙ্গের ভাষায়।

তা হলে কি পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে সংলাপের ভাষা বদলেছেন?

—শুধু পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে সংলাপ পাল্টাইনি। সেই অবিকৃত র ডায়ালগ দিলে দুর্বোধ্য হতো। আমি লিখেছি সকলের জন্য। যদিও আমার লেখা, আমারই নিজস্ব যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। তবু পাঠককে উপেক্ষা করতে পারি না। তা হলে তো লিখে বাক্সবন্দী করে রাখলেই পারতাম। চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক সংলাপ আমি বাদ দিই নি। সেরকম শব্দকে অক্ষুণ্ণ রেখে, ব্র্যাকেটে তার প্রচলিত ব্যবহার দিয়েছি।

কথায় কথায় বললেন : একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। তখন আমি খুব ছোট। সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছি চাকরের সঙ্গে। এ উপন্যাসে সেই চাকরটার নাম বদলে রেখেছি 'যুগল'। গিয়ে দেখি আশ্চর্য দৃশ্য। একটি লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করছে, "হিন্দু ভাইরা, মিয়া ভাইরা, অনেক-দিন পর আপনেগো সুজনগঞ্জে ঢেঁড়া দিতে আইলাম। আপনেরা শুইনা রাখেন, সগ্গলে জাইনা রাখেন, নাজিরপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন দত্তচৌধুরি মাউগা না—মাউগা না।"

ব্যাখ্যা করে প্রফুল্লবাবু বললেন : 'মাউগা' মানে স্ত্রৈণ। লোকটার নাম হরিবন্দর। একটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে দেশ ক্রমশ কিভাবে এগিয়ে আসছে তার ছবি আঁকতে চেয়েছি এই লোকটাকে দিয়ে। ১৯২০ সালে যে-লোকটা ঢেঁড়া পিটিয়ে জমিদারের পারিবারিক জীবনের কথা ঘোষণা করেছে। তাকেই ১৯৪২ সালে দেখি চীৎকার করে বলছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশের কথা। যুদ্ধে লোক নেওয়া হবে। আর ১৯৪৬ সালে সে-ই ঘোষণা করেছে : মুসলিম লীগের সভার কথা। ভাবুন, ঐ একই লোক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। তার কোনো পরিবর্তন নেই বাইরের দিক থেকে। অথচ দেশ, কাল, মানুষ, রাজনীতি, সমাজ—কোনো কিছুই স্থির থাকছে না। স্থির থাকে নি। কত বড় রকমের পরিবর্তন হয়ে গেল বাংলা-দেশটার। আমি এ উপন্যাসে সেই কালের ছবি এঁকেছি।

আমি এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। বর্ষাকালে দ্বীপময় পূর্ব বাংলার মানুষ ও তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিগত দিনগুলি। সব-চাইতে আশ্চর্য, প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমার মনে হচ্ছিল পরিব্রাজকের মতো। কেউ যেন স্থির নয়, কেউ যেন বসে নেই। না বৃদ্ধ হেমনাথ, না প্রৌঢ় অবনীমোহন। সকলেই ভাসমান, সকলেই চলমান। এমন কি লারমোর পর্যন্ত।

এ উপন্যাসের কিশোর নায়ক বিনুর প্রসঙ্গে প্রফুল্লবাবু লিখেছেন : "অনেক আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু। কিন্তু পাখি, যুগলের সেই বোন, সাঁকোর বাঁশে বসে কালো কালো ছেলেদের বঁড়শি বাওয়া, সুজনগঞ্জের হাট, ঢেঁড়া দেওয়া, লারমোরের রোগী দেখা, বুধাই পাল, হরিবন্দ, দামড়া মোষের মতন তার দুই ঢাকী, মিষ্টির দোকানে বসে ধবধবে মাঠা খাওয়া, বেবাজিয়াদের বহর—অসংখ্য মানুষ আর অগণিত ঘটনা তাকে ক্লান্তির কথা বুঝতে দেয়নি। এক উত্তেজনা থেকে আরেক উত্তেজনা, এক কৌতূহল থেকে আরেক কৌতূহল তাকে অবিরাম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। চোখ টান করে অপার বিস্ময়ে সে শুধু দেখে গেছে, কান পেতে শুনে গেছে।"

পাঠক হিসেবে আমারও অনুরূপ অবস্থা। বিস্মিত, মুগ্ধ ও অজস্র চরিত্রের ভিড়ে দিশেহারা। কেউ উপেক্ষার নয়, কেউ অবহেলার নয়। শান্ত চরিত্র আছে দু'একটি, যেমন স্নেহলতা। টাইপ চরিত্রও আছে কয়েকটা।

উপন্যাসটির সূত্রপাত ১৯৪০ সালের শরৎকালে। মানুষ ফিরে যাচ্ছে দেশের বাড়ীতে, সামনেই দুর্গোৎসব। আর, শেষ হয়েছে দেশভাগের পঞ্চাঙ্কে এসে। দীর্ঘ-কালের ভিটে ছাড়ার উদ্যোগ করছেন হিন্দুরা। এই অবিস্মরণীয় নাটকের পরিণতি নিঃসন্দেহে বিয়োগান্তক। তারা-শঙ্করের উপন্যাসে যেমন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তন্ত্রের আর্তি, সঙ্কটকালের ছবি, তেমনি 'কেয়াপাতার নৌকোয়' ক্রমবিস্মৃত অতীতের উপাখ্যান ও হাহাকার!

—গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

এ-ভাবে এ-দেশে বর্ষাকাল এসে গেল। বর্ষাকাল এলেই যত জমি জায়গা, খাল বিল নদী সব ডুবে যায়। শুধু গ্রামগুলো দ্বীপের মত ভাসতে থাকে। বর্ষাকাল এলেই গ্রাম থেকে বড় বড় নৌকা যায় উজানে। খাল বিল মাঠে বড় বড় মাছ উঠে আসে। ধানখেতে কোড়া পাখি ডিম পাড়ার জন্য বাসা বানায়। আত্মীয় কুটুম যা কিছু এ-অঞ্চলের এ-সময় বাড়ী বাড়ী আসতে থাকে। শাপলা শালুক ফুটে থাকে জলে। জলপিপি ফুলের উপর সন্তর্পণে এক পা তুলে শিকারের আশায় জলের দিকে চেয়ে থাকে।

বর্ষাকাল এলেই বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ ঘরে আর বসে থাকতে পারেন না। তিনি ধীরে ধীরে বৈঠকখানার বারান্দায় এসে বসেন। একটা হরিণের চামড়ার উপর বসে বিকেলবেলাটা কাটিয়ে দেন। বয়স তাঁর আশির উপর। চোখে আজকাল আর একেবারেই দেখতে পান না। তবু বাড়ীর উঠোন, শেফালি গাছ এবং বাগানে যে সব নানারকম গাছ আছে, গাছে নানারকম ফুল ফুটে থাকে তা একমাত্র অন্ধ মানুষ পর্যন্ত টের করতে পারেন কোথায় কোন ফুল গাছটা আছে, এবং কি সব ফুল ফুটে আছে। তিনি এখানে বসলেই ধনবৌ সোনাকে রেখে যায় পাশে। একটা মাদুরের উপর সোনা হাত পা নেড়ে খেলে। মহেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলেন। ওর কোমরে রুপোর টায়রা, হাতে সোনার বালা, এই ছেলে হেসে হেসে খেলে বৃদ্ধকে নানা বয়সের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি এই অতি পরিচিত বিকেলের গন্ধ নিতে নিতে সোনার সঙ্গে বিগত দিনের গল্প করেন—প্রায় যেন সমবয়সী মানুষ, একে অপরের অসহায় অবস্থা বোঝে। সোনা অ...আ...ত...ত করে আর বুড়ো মানুষটা তখন যেন দেখতে পান, পাটকাঠির আঁটি উঠোনের উপর দাঁড় করানো। উঠোন পার হলে দক্ষিণের ঘর। তার দরজা। ফড়িঙেরা নিশ্চয়ই এ-বাদলা দিনে উড়ছে। এটা শরৎকাল। শরৎকাল এলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠাবে মুড়াপাড়া থেকে। অষ্টমীর দিন সে, মহাপ্রসাদের আস্ত একটা কাটা পাঁঠার ছাল ছাড়ানো মাংস নিয়ে আসবে।

তখন বড়বৌ এদিকে এল। হাতে গরম দুধ। শ্বশুরের সামনে দুধের বাটি রেখে পায়ের কাছে বসল। সামনে পুকুর। আম জাম গাছের ছায়া। তারপর মাঠ। বর্ষাকাল বলে শুধু জল আর জল। যেখানে পাটের জমি—পাট কাটা হয়ে গেছে বলে সমুদ্রের মত অথব বড় বিলের মত, যেন সেই এক বিল—রূপকথার রাজকন্যা জলে ভেইসে যায়। বড়বৌ নদী মাঠ এবং জল দেখলে এইসব মনে করতে পারে। বড় বিলের কথা মনে হয়—বিয়ের দিন বড় নৌকা করে সে এ-অঞ্চলে এসেছিল। এত বড় বিলে পড়ে বড়বৌর বুকটা ধড়ফড় করে উঠলে, কারা যেন এ-বিলের কথা বলতে বলতে যায়—কিংবদন্তীর পাঁচালির মতো বলতে বলতে যায়—এক সোনার নৌকা রুপোর বৈঠা এ-বিলের তলায় ডুবে আছে, এক রাজকন্যা ডুবে আছে। রাজকন্যার নাম সোনাই বিবি। বড়বৌ এখন মেঘলা আকাশ দেখতে দেখতে সেই প্রথম দিন স্বামীর মুখে বিলের গল্প মনে করতে পেরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। স্বামীর মাথার ভিতর কি গন্ডগোলের পোকা তখনই ঢুকে গেছিল। নতুবা বাদলা দিনে হাটুরে মানুষের মত এমন গল্প বলবে কেন!

বড়বৌ সোনার মুখের আদলটা দেখল ভাল করে। দেখতে দেখতে মনে হল এই মুখ বাপের মত নয়, মার মত নয়। এ-মুখ বাড়ীর পাগল মানুষটার মত। বড়বৌ কলকাতায় বড় হয়েছে, কিছুকাল কনভেন্টে পড়েছে। পাগল ঠাকুরকে তার এখন আর পাগল বলে মনে হয় না। যেন সে তার কাছে এখন প্রায় মোজেসের মত অথবা কোন গ্রীক পুরাণের বীর নায়ক—যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড়বৌ বলল, সোনার মুখ আপনার বড়ছেলের মত হবে বাবা।

মহেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। তারপর কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন, মণির সাড়াশব্দ পাইতেছি না।

—পুকুর পাড়ে বসে আছে।

মহেন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই একটা কথা বলবেন বলে ভাবছিলেন। বড়বৌকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। যেন বড়বৌর বাপের বাড়ীর দিকের মানুষদের একটা ধারণা—হয়ত মনে মনে বড়বৌ নিজেও সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি ত জীবনে মিছা কথা কই নাই, প্রবঞ্চনা করি নাই। আমি এই বয়সে তোমারে একটা কথা কই—বিশ্বাস কর, না কর, কই। এমন ভাবে বললেন, বড়বৌমা! আমার ত সময় ফুরাইছে। তোমারে একটা কথা কমু ভাবছিলাম বৌমা।

বড়বৌ সামান্য হাসল। বলল, বলুন না।

—জান বৌমা মণি যখন ছুটি নিয়া বাড়ী আসত আমি গর্বে বুক ফুলাইয়া থাকতাম। এ-তল্লাটে এমন উপযুক্ত পোলা আর কার আছে কও। সুতরাং আমি তোমার বাবারে কথা দিলাম। মাইনসে কয় আমার পোলা পাগল হৈছে আমি নাকি বিয়ার আগেই জানতাম।

বড়বৌ কোন জবাব দিল না। সে বৃদ্ধের পাশে সোনাকে কোলে নিয়ে বসে থাকল।

—বোঝলা বৌমা মণি যে-বারে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় জলপানি পাইয়া প্রথম হৈল—সব্বাইরে কইলাম, নারায়ণ আমার মুখ রাখছে। অর বিয়ার দিনই যখন পাগল হৈল তখন কৈলাম নারায়ণ আমার তামাসা দেখছে। তিনি যেন এ-সময় কি খুঁজতে থাকলেন হাত বাড়িয়ে।

চক্ষু স্থির, ঘোলা ঘোলা চোখ। চুল এত সাদা, গালের দাড়ি এত সাদা যে মানুষটাকে সান্তাক্রুজের মত মনে হয়। চামড়া শিথিল। বড়বৌ বলল, আপনার লাঠিটা দেব?

—না বৌমা, তোমার হাতটা দ্যাও।

বড়বৌ হাতটা বাড়িয়ে দিলে বৃদ্ধ সেই হাত দুহাতে চেপে ধরে বললেন, বৌমা তুমি অন্তত বিশ্বাস কৈর মণি তোমার বিয়ার আগে পাগল হয় নাই। জাইনা শুইনা আমি পাগলের সঙ্গে তোমারে ঘর করতে আনি নাই। বলে বৃদ্ধ একেবারে চুপ মেরে গেলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখের রেখাতে এতটুকু ভাঁজ নেই। এক ভাবলেশহীন মুখ, মুখে কেন আর ইচ্ছার রেখা ফুটে নেই, শুধু উদাস আর উদাস। মৃত্যুর যাত্রী হবার জন্য যেন পৃথিবীর এক পান্থশালায় জলছত্র খুলে বসে আছেন, সারাজীবন ধরে সকলকে জল দিয়েছেন, অবশেষে সেই জলের তলানিটুকু দিয়ে হাতমুখ প্রক্ষালন করে দূরের তীর্থযাত্রী হবার জন্য উন্মুখ। বৃদ্ধ অনেকদূরে থেকে যেন কথা বলছেন, মণির মার কথা শুনলে বুঝি এমন হৈত না! দাখ বড়বৌ, আমি বাড়ীর কর্তা, মণি আমার বড় পোলা—সে কিনা ভাব কইরা ম্লেচ্ছ মাইয়া বিয়া করব—ঠিক না বৌমা। এইটা ঠিক কথা না।

বড়বৌ এ-সব কথা শুনলে আর স্থির থাকতে পারে না। চোখ ভার হয়ে আসে। সোনার টুকরো ছেলে ভালবেসে পাগল। কথা বললেই যেন এখন দরদর করে চোখের জল চলে আসবে। সে অন্য কথা বলল, চলুন বাবা আপনাকে ঘরে দিয়ে আসি।

—আমি আর একটু বসি বৌমা। বসলে মনটা ভাল থাকে। বারান্দায় বইসা থাকলে বর্ষার শাপলা শালুকের গন্ধ পাই। মনে হয় তখন ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি আছি। তোমার মায় কৈ?

—মা গেছেন পদ্মপুরাণ শুনতে। আপনার পদ্মপুরাণ শুনতে ইচ্ছা হয় না বাবা?

—পদ্মপুরাণত আমি নিজেই। মাগো—সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগরের পাঠ করছি, তুই বেহুলার। বৃদ্ধ এবার টেনে টেনে বললেন, যেন এই বয়সে কেবল বর দেওয়া যায়—এখন এমন এক বয়স তার, এমন এক মানুষ সে—সংসারে, এ-মানুষ প্রায় ঈশ্বরের সামিল যেন—তিনি টেনে টেনে যেন অনেক দূরে থেকে বলছেন—বৌমা তুমি আমার সতী সাবিত্রী। তুই আমার বেহুলা। শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হউক মা তর।

গভীর রাতে বড়বৌ ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা আলো ঘরে নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। জানালা খোলা। বর্ষার জলজ বাতাস ঘরে ঢুকে বড়বৌর বসন ভূষণ আলগা করে দিচ্ছে। বড়বৌ হাত দুটো বুকের উপর প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে রেখেছে। দেখলে মনে হবে, সে ঘুমের ভিতরও তার মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তখন মণীন্দ্রনাথ ঘরে পায়চারি করছিলেন। ওঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি দরজা খুলে ফেললেন সহসা। নদীর ও-পারে তিনি কাকে যেন ফেলে এসেছেন মনে হল।

আকাশে এখনও কিছু কিছু নক্ষত্র জেগে আছে। ঠাকুরঘরের পাশেই সেই শেফালি গাছ, ফুলেরা ঝরছে, ঝরে আছে এবং কিছু কিছু বোঁটায় সংলগ্ন। ওরা ভোরের জন্য অথবা রোদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। মণীন্দ্রনাথ দুই হাতে গাছের নিচ থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে বোঁটার হলুদ রঙ হাতে মুখে মাখলেন। রাত নিঃশেষ হয়ে আসছে। তিনি কি ভেবে এবার বাঁশ-ঝাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ঘাট—বর্ষার জল উঠোনে উঠে আসবে বুঝি, তিনি ছোট কোষা নৌকায় উঠে লগিতে ভর দিতেই নৌকাটা জলে নেমে গেল—কিছু গ্রাম মাঠ ঘুরে সেই নদীর পাড়ে চলে যাবেন—যেখানে তাঁর অন্য ভুবন নিঃসঙ্গ নির্জন নদীতীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

মাথার ভিতর এক অ-দৃষ্ট যন্ত্রণা মণীন্দ্রনাথকে সর্বদা নিদারুণ করে রাখে। মণীন্দ্রনাথ কেবল নির্জনতা চান।

কোষা নৌকা ক্রমশ গ্রাম মাঠ এবং ধানখেত অতিক্রম করে বিশাল বিলেন জলে অদৃশ্য হচ্ছে। এখন চারিদিকের গ্রাম-গুলো খুব ছোট মনে হচ্ছে। আকাশের সঙ্গে সব গ্রামগুলো যেন ছবির মত হয়ে ফুটে আছে। কোন শব্দ নেই—ভয়ানক নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তর। দূরে সোনালি বালির নদীর রেখা অল্পে অল্পে দৃশ্যমান হচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ পদ্মাসন করে বসে থাকলেন—সাধুপুরুষের মত ভাব চোখে মুখে। বিলেন জমিতে গভীর জল—এক লগির চেয়ে বেশী হবে। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে এই জলের ভিতর পলিনের মুখ যেন দেখতে পাচ্ছেন। পলিন কি করে যেন তার নদীর জলে হারিয়ে গেল। নদীর পাড়ে খেলা ছিল, কত খেলা। হায় তখন কেবল সেই দুর্গের কথা মনে হয়! বড় মাঠ, মাঠের পাশে দুর্গ, দুর্গে কেবল থেকে থেকে কার্নিস কবুতর উড়ত। মণীন্দ্রনাথ এবার গলা ছেড়ে পরমপুরুষের মত কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন—কবিতার অবয়বে সেই এক স্মরণচিহ্ন—কীটস নামে এক কবি ছিলেন—তিনি বেঁচে নেই। পলিন মণীন্দ্র-নাথের মুখে কবিতার আবৃত্তি শুনতে শুনতে এক সময় দুর্গের গম্বুজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেন।

কিছু হিজল গাছ অতিক্রম করলে নন্দীদের ঘাট। ঘাট পার হলে মুসলমান গাঁ। অনেকদিন পর যেন তিনি এই ঘাটে নৌকা বাঁধলেন। সর্বত্র পাট পচানো হয়েছে—পচা গন্ধ উঠছে, ইতস্তত কচুরিপানার ঝাঁক—নীল সাদা রঙের কচুরি ফুল এবং পাতিহাঁস ঘাটে নড়ছে। ঘাটে ঘাটে কুমড়োর মাচান, মাচানের নিচে কুমড়োলতা নেমে গেছে। তিনি সব কিছু দেখে শুনে সতর্ক পা ফেলে উপরে উঠে গেলেন। এক তকতকে উঠোনে উঠে যেতেই গোলার ফাঁক থেকে হামিদ বের হয়ে এল। বলল—সব বলাই নিরর্থক, তবু এত বড় মানুষটা,

মানুষটার আর বয়স কত, সেই যে যবে একবার হামিদ হাসান পীরের দরগাতে এই মানুষকে বসে থাকতে দেখেছিল—মানুষটা যেন চোখের উপর শৈশব পার করে যৌবনে পা দিয়েছে, যৌবন থেকে কিছুতেই নড়ছে না, শক্ত বাঁধুনি, শরীরের গঠন একেবারে আস্ত একটা দ্রুতগামী অশ্বের মত—সে বলল, আমাগ কথা এতদিনে মনে হৈল বড় ভাই।

মণীন্দ্রনাথ বড় বড় চোখে হামিদকে দেখলেন। একটু হাসলেন।

হামিদ বলল, একটু বইসা যান বড় ভাই।

মণীন্দ্রনাথ ওর উঠোনে উঠে গেলে হামিদ একটা জলচৌকি দিল বসতে। —বসেন বড় ভাই। সে সকলকে ডেকে বলল, কে কোন-খানে আছ, দ্যাখ আইসা বড়ভাই আইছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে হামিদের মা এল, হামিদের দুই বিবি এসে হাজির হল। বেটা বিবিরা সকলে। এবং গ্রামে যেন বার্তা রটি গেল—সকলে এসে ঘিরে দাঁড়াল মণীন্দ্র-নাথকে। সকলে আদাব দিল। মণীন্দ্রনাথ কোন কথা বলছেন না, যতক্ষণ না বলেন ততক্ষণই ভাল। এ-সময় হামিদ ভিড়টাকে সরে যেতে বলল। মণীন্দ্রনাথ সকলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। হামিদ তখন তার ছোট বিবিকে বলল, বড়ভাইয়ের নৌকায় একটা কুমড়া তুইলা দিও। যেন গাছের যা কিছু ভাল, নতুন যা কিছু এই মানুষকে না দিয়ে খেতে নেই।

গ্রামের উপর দিয়ে এক সময় হাঁটতে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। পিছনে গাঁয়ের ছোট বড় উলঙ্গ শিশুরা এবং বালক বালিকারা আখ খেতে খেতে মণীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করছে। তিনি ওদের কিছু বলছেন না। ছোট বড় গর্ত, বাঁশঝাড় এবং কর্দময় পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে তিনি হাজী সাহেবের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ হাজী সাহেব হুঁকোর নলে মুখ রেখে কোলাহল শুনে ধরতে পারলেন, পাগল ঠাকুর আজ এ-গাঁয়ে অনেকদিন পর উঠে এসেছে। হাজী সাহেব হুঁকো ফেলে ছুটে এলেন। বললেন, ঠাকুর বৈসা যাও। এদিকে আর আস না। হাজী সাহেব জানেন এইসব কথা পাগল ঠাকুরের সঙ্গে নিরর্থক। তবু এত বড় মানী ঘরের ছেলে—কোন কথা বলবেন না তিনি—পাগল ঠাকুর এই পথ ধরে চলে যাবে—কেমন যেন ঠেকছে।

মণীন্দ্রনাথ এখানে বসলেন না। কয়েক-বার চোখ তুলে হাজী সাহেবকে দেখলেন, তারপর সেই এক উচ্চারণ—গ্যাৎচোরেৎ-শালা।

হাজী সাহেব হাসলেন এবং চাকরকে ডেকে বলা হল, পাগল ঠাকুরের নৌকায় দুই ফানা সবরীকলা রাইখা আসবি। হাজী সাহেব মণীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে যেন বলতে চাইলেন—ঠাকুর কলাগুলি নিয়া যাও, পাকলে খাইয়। গাছের কলা—তোমারে না দিয়া খাইলে মনটা খুঁতখুঁত করব। তারপর হাজী সাহেব অল্লার কাছে যেন নালিশের ভঙ্গীতে বলতে থাকলেন, বড়া কর্তার কপালে এই আছিল খোদা!

বর্ষাকাল। ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছিল বলে পথ ভয়ানক কর্দমাক্ত। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—সুতরাং মণীন্দ্রনাথের কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। পথের দু পাশে আবর্জনা, মলমূত্রের দুর্গন্ধ। মণীন্দ্রনাথ এ-সবের কিছুই টের করতে পারছেন না। গ্রামের মুসলমান বিবিরা পাগল ঠাকুরকে দেখে পলকে ঘরে নিজেদের আড়াল করে দিচ্ছে। ওরা বড় নিঃস্ব। সুতরাং শরীরে পর্যাপ্ত আবরণ নেই। পুরুষেরা এখন প্রায় সকলেই মাঠে অথবা অন্যত্র পাট কাটতে গেছে। ওরা বিকেলে ফিরবে। মণীন্দ্রনাথ গ্রামটাকে চক্কর মেরে ফের ঘাটে এসে বসলেন নৌকায়। তারপর উদ্যোগী পুরুষের মত সংগৃহীত বস্তুসকলকে এক পাশে সাজিয়ে রেখে নৌকা বাইতে থাকলেন বর্ষার জলে। ঘাটে উলঙ্গ শিশুরা, বালকবালিকারা পাগল ঠাকুরকে দুঃখের সঙ্গে যেন বিদায় জানাল। আর এ-সময়ই তিনি মনে করতে পারলেন, বড়বৌ অপেক্ষা করতে থাকবে এবং বড়বৌর জন্য মনটা কেমন করে উঠছে। বড়বৌর সেই গভীর চোখ মণীন্দ্রনাথকে বাড়ীমুখো করে তুলল। অথচ বিলের ভিতর পড়েই মণীন্দ্র-নাথের বাড়ী ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বিলের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলেন। কতক্ষণ এ-ভাবে বসে থাকলেন, কতক্ষণ তিনি সকালের সূর্য দেখলেন, বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়ার উপর একদল কাকের উপদ্রব এবং ধানখেতে কোড়া পাখির ঢুব ঢুব শব্দ কতক্ষণ তাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল তিনি জানেন না। তিনি জলে নেমে গেলেন এবং স্বচ্ছ জলে সাঁতরাতে থাকলেন, শরীরের সর্বত্র গরম—এতবার ডুব দিয়েও তিনি তাঁর শরীরের ভিতরে যে কষ্ট, কষ্টটাকে দূর করতে পারছেন না। এই নির্জন বিলে এসে চুপচাপ বসে থেকে তিনি কতবার ভেবেছেন অপরিচিত সব শব্দ অথবা অশ্লীল উচ্চারণ থেকে বিরত হবেন। কিন্তু পারছেন না। সব কেমন ক্রমশ ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব কেমন স্মৃতির অতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য কি করা কর্তব্য—অনেক ভেবে ভেবেও নির্দিষ্ট পথ নির্ণয় করতে পারছেন না। তখন ভয়ংকর বিরক্তভাব ওকে আরও প্রকট করে তোলে। দু হাত উপরে তুলে চিৎকার করতে থাকেন—আমি রাজা হব।

বিকেলের দিকে ভূপেন্দ্রনাথ এলেন কর্মস্থল থেকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কদিন থেকেই বাপের জন্য মনটা কেমন উদ্বিগ্ন লাগছে। বুড়ো মানুষটার জন্য ভূপেন্দ্রনাথের বড় টান। এখনও যেন তিনি সকলকে আগলে আছেন। প্রথম বয়সে ভূপেন্দ্রনাথের কিছু আদর্শ ছিল। এখন আর তা নেই। স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন চোখে ভাসত। কিন্তু বড়দা পাগল হয়ে গেল—এত বড় সংসার শুধু জমি এবং জজমানিতে চলে না, ভূপেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেল। বুড়ো মানুষটার জন্য এত বড় সংসারের জন্য সে পায়ে হেঁটে নতুন ধনের ছড়া আনতে চলে গেল। সংসারে তার জীবন প্রায় এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন। বিবাহ করা হয়ে উঠল না। চন্দ্রনাথকে বিয়ে দিলেন। এখন শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দেশে চলে আসা এবং বুড়ো মানুষটার পাশে বসে, সংসারের গল্প, জোতজমির গল্প, কোন জমিতে

কেনে কসল দিলে ভাল হবে—এমন সব পরামর্শ। মনেই হয় না মানুষটার জীবনে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে নামতেই সকলে যেন বাড়ীর টের পেয়ে গেল—মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে, চাল চিনি, কলা কদমা এবং এখন বর্ষাকাল বলে বড় বড় আখ এসেছে। ধনবৌ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকে গেল। তিনি এখন এ-পথেই উঠে আসবেন।

তিনি প্রথমেই বাড়ীতে উঠে ছড়িটা বারান্দায় রেখে যে ঘরে বুড়ো মানুষটা চুপচাপ বসে থাকেন সেখানে উঠে গেলেন। বাবাকে, মাকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। বুড়ো মানুষটা কুশল প্রশ্ন করল। মনিবের কুশল নিল। শরীর কেমন, এ-সব জিজ্ঞাসাবাদের পর মনে হল উঠোনে কে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি বড়বৌ। বড়বৌকে প্রণাম করতে হয়। উঠোনে নেমে বাড়ীটার কি কি পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করতে গিয়ে মনে হল বাড়ীটার সেই শুকনো ভাবটা নেই। বাড়ীর চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলি বেড়ে উঠেছে। উত্তরের ঘর পার হলে কামরাঙা গাছের পাশে ছোট একটা মাচান। মাচানে কিছু শশার লতানে গাছ, হলদে ফুল। কচি শশা দুটো একটা ঝুলছে। পাশে ঝিঙের মাচান, করলার মাচান। চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওগুলো লাগিয়ে গেছে। সেই দুই নাবালককে খুঁজতে থাকলেন। ওরা এখন বাড়ীতে নেই—কোথায় গেল! গোটা বাড়ীটা এই দুই নাবালক—লাল্টু পল্টু চিৎকার চেঁচামেচি করে জাগিয়ে রাখে। ওদের জন্য তিনি হলদে রঙের পুরুষ্ট আখ এনেছেন। মোটা এবং সরস। নরম এই আখ ওদের খুব প্রিয়। তিনি নিজে ভেঙে দিতে পারলে কেমন যেন মনটা ভরে যায়। অরা গেল কৈ! এমন একটা প্রশ্ন মনে মনে।

সেই দুই বালক তখন ছুটছিল। পল্টুর মেজকাকা, লাল্টুর মেজজ্যাঠামশাই—ওরা গ্রামের উপর দিয়ে ছুটছে। ওরা খবর পেয়ে গেছে মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। নৌকা আসা মানে ওদের জন্য আখ এসেছে, কমলার দিনে কমলা, তিলা-কদমার দিনে তিলা কদমা। অথবা আম জাম জামরুলের দিনে নানারকমের ফল। ওরা এসে দেখল আলিমদ্দি মাথায় করে সব চাল ডাল তেল অথবা করলা ঝিঙে নামাচ্ছে। একটা বড় মাছ এনেছেন, সেটা গলুইর নিচে, লাল্টু পল্টু দুজনে মাছটাকে টেনে তুলে আনছে। প্রায় এখন যেন উৎসবের মত বাড়ী। কেবল বড়বৌ বিষণ্ণ চোখে চারিদিকে কাকে যেন সারাদিন থেকে খুঁজছেন। কে যেন তার চলে গেছে, আসার কথা, আসছে না। বড়বৌর বড় বড় চোখ দেখে ভূপেন্দ্রনাথ ধরতে পারল—বড়দা আবার নিরুদ্দেশে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরে কি এক কষ্ট ভেসে উঠল। বড়বৌর মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না।

বিকেলের দিকে বুড়ো মানুষটা ভূপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে নানারকম খবর নেবার জন্য বারান্দায় বসে থাকলেন। ভূপেন্দ্রনাথ পায়ের কাছে বসে সব বলছিল—এটা স্বভাব তাঁর। মুড়াপাড়া থেকে এলেই বাবাকে পৃথিবীর সব খবর দিতে হয়। বাবুরা অর্ধসাপ্তাহিক কাগজ পড়েন। বাবুদের পড়া হয়ে গেলে ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মুখস্থ করে ফেলেন। কেউ এলে তখন পত্রিকার খবর, যেন তার নখদর্পণে এই জগৎসংসার। বাড়ীতে এলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত দেশের অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। কাগজ থেকে কিছু খবরের কথা উল্লেখ করে বললেন, এবারে লীগ-পন্থীরা যে-ভাবে উইঠাপইড়া লাগছে তাতে আবার রায়ট লাগল বইলা।

বৃদ্ধ অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন, হাফিজদ্দির পোলা সামুরেত তুই চিনস। সে নাকি টোডারবাগে লীগের ডেরা করছে। গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইতাছে। দেশটা দিন দিন কি হৈয়া যাইতাছে বুঝি না!

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বাবা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্যাখলাম, গারো পাহাড় থেকে শহরে একজন সন্ন্যাসী আইছে। ভূত ভবিষ্যৎ সব কইতে পারে। ভাবছিলাম বড়দারে নিয়া যামু।

—যাও, যা ভাল বোঝ, কর।

—সঙ্গে ঈশম চলুক।

বড়বৌ ঘরের ভিতর বসে চাল, প্রায় দু বস্তা চাল, ঝেড়ে তুলে রাখছে। সবজি যা এসেছে সাজিয়ে রাখছে। পাগল মানুষটাকে নিয়ে যাবে ওরা। সামান্য আশার আলোক মনের ভিতর জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন তা নিভে গেল। মানুষটাকে নিরাময় করার জন্য কত চেষ্টা—দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর কেটে গেল। মানুষটা কিছুতেই ভাল হচ্ছে না।

—আজকাল ত মণি দুই তিনদিন বাড়ী আসে না। কৈ থাকে, খায় ঈশ্বরই জানে।

ভূপেন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছিলেন—এ-ভাবে না খেয়ে ঘুরছে, কোথায় থাকছে, কোথায় রাত কাটাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারছে না—বরং বেঁধে রাখা ভাল। কিন্তু বলতে পারল না। কারণ এই ঘরে এখন মা আছেন, বড়বৌ আছে—ওরা সকলে এমন কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না। তাহলে যেন বাবা যে দুদিন আরও বাঁচতেন তাও বাঁচবেন না। সুতরাং সে অন্য কথা বলল, সোনারে আনেন দেখি, দ্যাখতে কেমন হৈল দ্যাখি।

বড়বৌ সোনাকে কোলে দিলে কেমন তাজ্জব হয়ে গেল সে। একেবারে বড়দার মুখ পেয়েছে। কাঁধে করে বারবাড়ীতে চলে এল। সোনা যেমন অ-আ ত ত করে কথা বলে তেমনি কথা বলছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে সে এতটুকু কাঁদেনি। বরং মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস দাঁতে কামড়াচ্ছিল। সোনার দুটো ছোট ছোট ইঁদুরের মত দাঁত উঠেছে। —পোলা তোমার অসুখে হৈব দ্যাখতাছি। বলে দাঁতে দুটো চোকা দিল। যেন এই শিশুকে দাঁতে আঘাত করে ওর কঠিন অসুখ থেকে রক্ষা করছে ভূপেন্দ্রনাথ। সোনা ভয়ঙ্করভাবে কেঁদে উঠতেই পাশের বাড়ীর দীনবন্ধু পিছন থেকে ডাকল, মাইজা ভাই ঢাকায় নাকি আবার রায়ট লাগব শুনছি।

—তা লাগতে পারে।

—কেডা জিতব মনে হয়?

—কি কইরা কই? হার জিতের কি আছে ক?

—কি দুর্ধর্ষ দ্যাখেন, দুধের পোলা হালারহালা কথা নাই বার্তা নাই চাকু চালায়।

—তুই দ্যাখছস নাকি?

—তা দ্যাখমু না কন। মালতির বিয়ার সময় একবার ঢাকা শহরে গেছিলাম। ঘুইরা ফিরা দ্যাখলাম শহরটা। এলাহি কান্ড—না! —রমনার মাঠে গ্যালাম, সদর ঘাটের কামান দ্যাখলাম।

সন্ধ্যার পর ধনবৌ পশ্চিমের ঘরে হ্যারিকেন জেলে রেখে গেল। হাত-পা ধোওয়ার জল রেখে গেল। একটা জলচৌকি, ঘটি এবং গামছা রেখে দিল। সে হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে যাবে। আর বের হবে না। কারণ গ্রামে খবরটা রটে গেছে। মুড়াপড়া থেকে মাইজা কর্তা এসেছে। বিশ্বের খবর তার জানা আছে। গ্রামের পাল-বাড়ি থেকে মাঝি বাড়ি অথবা চন্দদের বাড়ি থেকে প্রৌঢ়গণ হাতে লাঠি এবং লণ্ঠন নিয়ে খড়ম পায়ে ঠাকুরবাড়ী এসে ডাকল, ভূপেন আছ? মাইজাকর্তা আছেন?

ভূপেন্দ্রনাথ তখন হয়তো তক্তপোষে বসে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিল অথবা ঈশমের কুশলবার্তা। তখন সে এক দুই করে খড়মের শব্দ শুনতে পেল। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা এখন এসে ভিড় করবে। আড্ডা দেবে, এবং পত্রিকার খবর নেবে। দেশের খবর, বিদেশের খবর, গান্ধীজী কি ভাবছেন, এমন সব খবরের জন্য ওরা উন্মুখ থাকে। তিনি তখন এই আড্ডার প্রাণ। সে তখন ঈশ্বরের চেয়েও বড়, তার কথা এদের কাছে ঈশ্বরের সামিল—এই বিশ্বাস লোকগুলির মনে। সে তখন বলবে, দেশের বড় দুরবস্থা হারান।

—ক্যান কাকা?

—কাইল সারা বাজার ঘুইরা বান্দুরা-হাটের একটা শাড়ি পাইলাম না।

—ক্যান এমন হৈল।

—কি জানি! মহালে তর আলাই লাই। এদিকে তোমার সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতেছেন গান্ধী। ইংরাজরাও ছাইড়া কথা কৈতাছেন না। লাঠি চালাই-

তেছে। গুলি করতাছে। এদিকে তোমার বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লীগের পক্ষ নিছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ লীগের পোয়াবার।

মাঝি বাড়ির শ্রীশচন্দ্র বলল, ঘোর কলি-কাল আইসা গেল মাইজাভাই।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, চারিদিকে তর একটা ষড়যন্ত্র। আনন্দময়ী কালীবাড়ীর পাশে বনজঙ্গলের ভিতর পুরান একটা বাড়ি আছে, একটা দিঘি আছে। কেউ খবর রাখে না। এখন তর চরের মৌলভিসাব কয় ওটা নাকি মসজিদ। মুসলমানরা কয় নামাজ পড়ব।

—তা হইলে গন্ডগোল একটা লাগব কন।

—বাবুরা কি ছাইড়া দিব। জায়গাটা অমর্তবাবুর। পাশে আনন্দময়ী কালীবাড়ী। আগুন জ্বলতে কতক্ষণ।

—অঃ আমার হোমদির পো' রে দেশে আর বিচার নাই। আমাগ জাতধর্ম নাই। পূজা-পার্বণ নাই। মাকালী নির্বংশ কইরা দিব। তখনই সে দেখল উঠোনে ঈশম বসে তামাক টানছে। মাইজা কর্তা এলে একটু দেরী করে সে তরমুজ খেতে নেমে যায়। ঈশমকে দেখে সে কেমন জিভে কামড় দিয়ে ফেলল। উঠোনে মানুষটা বসে আছে সে খেয়ালই করেনি। এবার কেমন গলা নামিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, আমার দোকান থাইকা এখন মাইজাভাই মুসলমান খরিদ্দাররা সওদা করতে চায় না। কত দিনের সব খরিদ্দার। কত বিশ্বাসের সব— অরা সরিন্দির দোকানে খায়।

এ-সময় সকলেই চুপ হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। শ্রীশচন্দ্র তার দুঃখের কথা বলে চুপ হয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রনাথ হুঁকা টানছে। জোর হাওয়ার জন্য আলোটা মৃদু-মন্দ কাঁপছিল। দূরে সোনালি বালির নদী থেকে গয়না নৌকার হাঁক আসছে। শচীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে শীতল ভোগ দিচ্ছে। ঘন্টার শব্দ, গয়না নৌকার হাঁক এবং ঈশমের দুঃখজনক চোখ সকলকেই কেমন পীড়িত করছে। বুড়ো মানুষটা ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। কোথায় এখন তাঁর পাগল ছেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথবা গাছের নিচে শুয়ে আছে কে জানে! বড়বৌ পুবের ঘরের জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কামরাঙা গাছ, গাছ পার হলে বেতের ঝোপ এবং ডুমুরের গাছটা পার হলে মাঠ। বড় চাঁদ উঠে আসছে গাছটার মাথায়। এখন সাদা জ্যোৎস্না সর্বত্র। গাছগুলো স্পষ্ট। ফাঁকা মাঠে ধানগাছে সামান্য কুয়াশার পাতলা আবরণ। সে পথের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কোন মানুষের ছায়া এই পথে উঠে আসে, যদি মানুষটা লগি বাইতে থাকে সামনের মাঠে অথবা নৌকার শব্দ পেলেই সে চমকে ওঠে —এই বুঝি এল, সাধু-সন্ন্যাসীর মত এক উদাসীন মানুষ বুঝি বাড়ী ফিরে এল। পাগল মানুষটার প্রতীক্ষাতে বড়বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মানুষটার জন্য কেন জানি কেবল কান্না পাচ্ছিল।

কিছুদূরে এসেই মণীন্দ্রনাথের বাড়ী ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বার বার একটি ধানক্ষেতের চারপাশে ঘুরতে থাকলেন এবং মাঝে মাঝে নৌকাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লগিটাকে মাথার উপর লাঠি-খেলার মত ঘোরাতে থাকলেন। এই যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, আকাশ রয়েছে এবং বিলের জলে কোড়া পাখি ডাকছে সব কিছুর ভিতর কোন এক অদৃশ্য সংগ্রাম তাঁর। পাটাতনে লাফ দিচ্ছিলেন, হাতে ধরে কি যেন আয়ত্তে এনেছেন, তারপর গলা টিপে হত্যা। যত তিনি লগিটা ঘোরাচ্ছিলেন তত বন-বন শব্দ হচ্ছে। দূরে যারা পাট কাটছিল তারা দেখল বিলের জলে নৌকা ভাসছে আর পাগলঠাকুর মাথার উপর লগি ঘোরাচ্ছে।—কি মানুষটা কি হৈয়া গ্যাল এমন সব চিন্তা।

তিনি অনেক দূরে চলে এসেছিলেন নৌকা বাইতে বাইতে। সুতরাং ঘরে ফিরতে বেশ দেরী হবে। বড়বৌ'র বড় এবং গভীর চোখ দুটো তাকে এখন কষ্ট দিচ্ছে। এই ভেবে যখন ধানখেত ভেঙে ঘরে ফেরার স্পৃহাতে লগি তুলছেন তখনই দেখতে পেলেন, সোনালি বালির নদীর বুকে একটা বড় পানসী নাও। তার কেন জানি মনে হল—এই নৌকায় পলিন আছে। পলিনকে নিয়ে এই নাও কোন এক অদৃশ্য-লোকে হারিয়ে যাচ্ছে। সে পাটাতনের নিচ থেকে এবার বৈঠা বের করে জলে বড় বড় ঢেউ তুলতেই নৌকাটি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে নদীতে পড়ল। স্রোতের মুখে সে ভেসে চলেছে। এখন কোন বেগ পেতে হচ্ছে না মণীন্দ্রনাথকে—তিনি পানসী নৌকাটার পিছনে হাল ধরে শুধু বসে আছেন।

পানসী নৌকার মানুষেরা দেখল পিছনে পিছনে একটা নৌকা আসছে। হালে বসে আছে উদোমগায়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘ এক সুপুরুষ। রোদে পুড়ে রঙটা একটু তামাটে হয়ে গেছে। হালে মানুষটা প্রায় যেন চোখ বুজে আছে। এই বর্ষা এবং তার স্রোত যেদিকে নিয়ে যায় যাবে—মানুষ-গুলো দেখে হাসাহাসি করছিল। ভিতরে জমিদার পুত্র এবং বাঈজী বিলাসী একঘরে এক বিছানায়। গান শেষে কিছু কিছু কৌতুককর কথাবার্তা। এবং সরোদের টুং-টাং শব্দ। বিলাসী তারে হাত রেখে পা দুটো ছড়িয়ে—হায় সজনিয়া এমন এক ভঙ্গী টেনে পড়ে আছে। চোখমুখ জড়িয়ে আসছিল, নেশায় ওরা পরস্পর তাকাতে পারছে না। মণীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘপথ ওদের কেবল অনুসরণ করলেন। তিনি সরোদের গম্ভীর আওয়াজের ভিতর কেবল যেন এক মেয়ের মুখ দেখতে পান—তিনি পলিনের অবয়ব এবং তার মুখ, তার প্রেম সম্পর্কিত সকল ঘটনা এই ধানখেতের ফাঁকে ফাঁকে, সোনালি বালির নদীর চরে, জলে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এক সময় আবার সবই কেমন গুলিয়ে গেল। কেন এত দীর্ঘ পথ পানসী নৌকার পিছনে ছুটে ছুটে আসছেন, কোন পথ ধরে ঘরে ফিরতে হবে সব যেন ভুলে গেলেন। তিনি এবার নদী থেকে চরে উঠে আসার জন্য নৌকার মুখ ফেরালেন, কাশবনের ভিতর ঢুকে আর পথ পেলেন না। সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে —এবার সূর্যাস্ত হবে—কিছু গগনভেরী পাখির আর্তনাদ আকাশের প্রান্তে শোনা যাচ্ছিল এবং দূরে হাটফেরৎ মানুষেরা ঘরে ফিরছে। তিনি নৌকার পাটাতনে এবার শুয়ে পড়লেন। শরীরের কোথাও কি যেন কষ্ট। তিনি তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। অথচ কি করলে এই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না। সুতরাং চুপচাপ শুয়ে থেকে গগনভেরী পাখির আর্তনাদ কোথায় কোন আকাশে হচ্ছে খুঁজতে থাকলেন। আকাশ একেবারে নিঃসঙ্গ। কোথাও একটা পাখি একটা ফড়িঙ পর্যন্ত উড়ছে না। তিনি ক্লান্তগলায় যেন বলতে চাইলেন, পলিন আমি তোমার কাছে যাব।

দূরে কোন গ্রাম—সেখান থেকে কাঁসর-ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে। কোন মুসলমান গ্রাম থেকে আজানের শব্দ। কিছু কিছু নক্ষত্র আকাশে ফুলের মত ফুটে উঠছে। এখন আকাশটাকে তত আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না। কতদূরে এইসব নক্ষত্রের জগত— ইচ্ছা করলে ওদের ধরা যায় না। এইসব নক্ষত্রের জগতে অথবা নীহারিকাপুঞ্জে নৌকায় পাল তুলে ঘুমিয়ে থাকলে কেমন হয়। তিনি কত বিচিত্র চিন্তা করতে করতে সব কিছুর খেই হারিয়ে সহসা কেমন উত্তেজনা বোধ করেন।

কিছু জোনাকি জ্বলছে ধানগাছের পাতার আড়ালে। জ্যোৎস্নায় এই ধরণী শান্ত এবং স্থির। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি এই মিষ্টি হাওয়ায় কেমন উবে গেল। ফের পলিনের মুখ মনে পড়ছে। মণীন্দ্রনাথ কাত হয়ে শুয়েছিলেন এবং বিড় বিড় করে বকছিলেন। দেখলে মনে হবে না—তিনি এখন সুদূর কলকাতার কোন ইউরোপীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ করছেন। মনে হবে বিড়-বিড় করে শুধু কি বকে যাচ্ছেন। জোরে জোরে উচ্চারণ করলে ইংরেজীর স্পষ্ট উচ্চারণে সব ধরা পড়ত, কিন্তু হাতের উপর মাথা রেখে অযথা এইসব কথা তাকে শুধু পাগল বলেই প্রতিপন্ন করছে। আমি পলিনকে ভালবাসি—এই উক্তি পরিবারের সকলের কাছে চিৎকার করে বলতে পারলে যেন খুশী হতেন। অথচ অঘটন ঘটে গেল। মণীন্দ্রনাথ যেন পিতৃসত্য পালনে বনবাসে গমন করলেন। পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করতে গিয়ে স্বিধা এবং দ্বন্দ্বে অবশেষে বলেই ফেললেন, গ্যাৎ চোরেৎ শ্লা।

মণীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন মাঠে অথবা নদীর জলে কোথাও কোন নৌকায় শব্দ উঠছে না তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলতে চাইলেন, পলিন, আমি পাগল হইনি। আমাকে সকলে অযথা পাগল বলছে। আমি তোমার কাছে গেলেই ভাল হয়ে যাব। এইসব কথা এখন মাঠে মাঠে জলে জলে বনে বনে ঘাসে ঘাসে সর্বত্র প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে—আমি পাগল হইনি। সকলে অযথা আমাকে পাগল বলছে।

রাত বাড়ছে। লালটু পলটু পড়ছে দক্ষিণের ঘরে। ঈশম আজ বুঝি তরমুজ খেতে যাবে না, গেলেও রাত করে যাবে। সে দক্ষিণের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ধনবৌ হেঁসেলে। শশীকলা দরজায় বসে কোলে সোনা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি তালপাতার পাখা নাড়ছেন। গরম পড়েছে বেশ। পশ্চিমের ঘরে যারা এতক্ষণ বসে রাজা-উজির মারছিল, রাত গভীর হলে এক এক করে সকলে চলে গেল। দীনবন্ধু কেবল যায় নি। সে মেজকর্তার পায়ের কাছে বসে হুঁকো টানছিল এবং জমিদারী সেরেস্তার গল্প শুনে কর্তার মন জয় করার তালে ছিল। দীনবন্ধু এতদিন যে জমিটা ভোগ করছে ভাগে, সে কর্তাকে খুশী করে জমিটার ভোগদখল চাইছে।

শশীবালা রান্না হলে সকলকে খেতে ডাকল। বড়বৌ কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে দিলেন। লালটু পলটুর জন্য ছোট পিঁড়ি। জল দিলেন। বড় দোচালা ঘর। মুলি বাঁশের বেড়া, সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে। শশীবালা এখন দরজার কাঠে হেলান দিয়ে ছেলেদের খাওয়া দেখবেন। বড়বৌ পরিবেশন করবে, ধনবৌ হেঁসেলে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে —মাঝে মাঝে কানের কাছে কথা ধনবৌ'র—ফিস ফিস করে কথা—এটা ওটা বড়বৌকে এগিয়ে দেবে।

খেতে বসেই ভূপেন্দ্রনাথের মনটা ভারি হয়ে উঠল। বড়দার আসন পড়ে নি। একটা দিক খালি। সেদিকে তাকিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বড়দা কখন বাইর হৈছে।

শচীন্দ্রনাথ পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছিল তখন, জলটা গণ্ডূষ করবে, ঠিক তখন মুখ তুলে তাকাল। তার এখন খেয়াল থাকে না—বড়দার আসন খালি, সে জলটা গণ্ডুষ করে বলল, পরশু ভোরে বৌদি উইঠা দেখে দরজা খোলা। ঘাটে গিয়া দেখি কোষাটা নাই। হাসিমের বাপ কইছে তাইন নাকি দুপরে বিলের দিকে নৌকা বাইতে বাইতে নাইমা গ্যাছে।

—কাইল একবার চল দেখি—অলি-মদ্দিরে লইয়া যাই।

—চলেন। তবে মনে হয় পাইবেন না। কৈ থাকে কৈ যায় কেউ জানে না।

বড়বৌ কোন কথা বলছিল না। বসে বসে সব শুনছিল। এবং চোখে জল এসে গেলে ঘোমটা সামান্য টেনে দিল। কোন নালিশ নেই এমন ভাব চোখেমুখে। কোন দিন সুপুরুষ লোকটি আদর করে কথা বলে নি। কোন প্রেম সম্পর্কিত সুখী ঘটনা ইদানীং আর ঘটছেই না। শুধু মাঝে মাঝে তাও কদাচিৎ কখনো বুকের কাছে টেনে এনে দস্যুর মত কি এক আদিম প্রেরণা যেন, চোখমুখ ঘোলা ঘোলা—মানুষ বলে চেনা যায় না। বুকের কাছে নিয়ে একেবারে বন্যজীবের মত করতে থাকে। বড়বৌ শরীর ছেড়ে দেয়—যা খুশী করুক—পাগল মানুষটাকে সে শিশুর মত, অথবা সন্তানের মত, অথবা তুমি যে এক আদিম মানুষ সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও—আমাকে দ্যাখো, খেলা কর। বন্যজীবের মত বুকের কাছে টেনে নেবার ঘটনাও সে আঙুলে গুনে বলতে পারে—কত দিন, কতবার—জ্যোৎস্না রাত ছিল, না অন্ধকার রাত ছিল সব বলে দিতে পারে।

দুদিনের উপর হয়ে গেছে। মানুষটাও ফিরছে না। বড়বৌ পাগলঠাকুরকে আপনার ধন বলে জানে। মণীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিটি বড় অপরিচিত। বিয়ের পিঁড়িতে সে যেন এই পাগল মানুষকেই দেখেছিল। অশান্ত পুরুষ, জীবন থেকে যেন তাঁর সোনার হরিণ হারিয়ে যাচ্ছে—মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন, অভিশাপ দেবার বাসনা যেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি এই লাবণ্যময়ীকে এবার গিলে খাবেন। এত লোকজন, এত আলো আর সমারোহ তবু বড়বৌ'র সেদিন ভয় করছিল। রাতে বড়দিদিকে ডেকে বলেছিল, দিদি আমার বড় ভয় করছে। মানুষটা যেন আমাকে গিলে ফেলবে। আমাকে তোমরা কি দেখে বিয়ে দিলে। এমন গ্রাম জায়গায় আমি থাকব কি করে! পরে বড়বৌ বুঝেছিল—মানুষটি নিরীহ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে। তত-দিনে সে এই সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসে ফেলেছে। সুতরাং দুঃখকে জীবনের নিত্য অনুগামী ভেবে আজকাল আর নিজের জন্য আদৌ ভাবে না—মানুষটার জন্য রাতে কেবল ঘুম আসে না, কেবল জেগে বসে থাকে মানুষটা কখন ফিরবে।

রাত ঘন হচ্ছিল। ঘাটে বড়বৌ বাসন মাজছে। সোনা কাঁদছিল বলে ধনবৌকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে এখন একা এই ঘাটে। শশীবালা খেয়েদেয়ে এইমাত্র বড় ঘরে ঢুকে গেছেন। নির্জন রাতে এমন কি বুড়ো মানুষটির কাসির শব্দও ভেসে আসছে না। বোধ হয় এখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নৌকাটা অলিমদ্দি ঘাটে রাখে নি। সামনের জলে নৌকা বেঁধে লগিতে, ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বৌর বাসন মাজা হয়ে গেছে, তবু উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘাটের একপাশে লণ্ঠনের আলোতে বড়বৌর মুখ বিষণ্ণ। জ্যোৎস্না রাত বলে দূরের মাঠ দিয়ে নৌকা গেলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ আর কুয়াশা ভাবটা নেই। বড়বৌ এই ঘাটে সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বসে আছে। তিনি হয়ত আসছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন। বড়বৌর চোখ মনে ভেসে উঠছে মানুষটা পাগলের মত ঘরে ছুটতে থাকেন।

রাত বাড়ছে। একা একা ঘাটে বসে থাকতে আর সাহস পেল না বড়বৌ। শুধু ঝোপ-জঙ্গলে কিছু অপরিচিত পাখ-পাখালি, কীট পতঙ্গ রাতের প্রহর ঘোষণায় মত্ত। আলকুশি লতার ঝোপে ঢুব-ঢুব আওয়াজ। গন্ধপাতাল ঝোপে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। রাত গভীর হলে, নিশীথের প্রাণীরা কত হাজার হবে, লক্ষ হবে এবং লক্ষ কোটি প্রাণের সাড়া এই ভুবনময়। গভীর রাতে জেগে থেকে টের পায় বড়বৌ যেন মানুষটা এখন নিশীথের জীব হয়ে জলে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে।

রান্নাঘরে বাসনকোসন রেখে পুবের ঘরে উঠে যাবার মুখেই মনে হল ঘাটে লগির শব্দ। বড় বৌর বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘাটে। মানুষটা নুয়ে নৌকা থেকে নামছে। নৌকাটাকে টেনে প্রায় জমিতে তুলে ফেলল। কোন দিকে দৃকপাত নেই। লম্বা উঁচু মানুষটা—কি যে লম্বা আর কি যে রহস্যময় চোখ—এই সুদৃশ্য জ্যোৎস্নায় যেন এক দেবদূত আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। বড়বৌ দেখল মানুষটার শরীরে কোন বসন নেই। একেবারে প্রায় উলঙ্গ এবং শিশুর মত বড়বৌকে জেগে থাকতে দেখে হাসছে। নৌকায় কচু-কুমড়া কলা। যার যা কিছু প্রথম গাছে, মানুষটাকে দিয়ে দিয়েছে। বড়বৌ প্রথম কোন কথা বলতে পারল না। যেন এক সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন তীর্থভ্রমণের পর নিজের ডেরাতে হাজির হয়েছে। অন্যদিন হলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কাপড় পেড়ে আনতেন। আজ কিছুই ইচ্ছা হল না। এই সাদা জ্যোৎস্নায় এমন এক শিশুর মতো যুবকটিকে নিয়ে কেবল খেলা করে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়োচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেল-গাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

কোটের ভেতরে

খুব কাছাকাছি, আপনার আমার বুক পকেট, ঝুল পকেট বা হিপ পকেটের পাঁচ নয়া, দশ নয়া, সিকি, আধুলি, টাকা, দু-টাকার প্রত্যাশায় সর্বদাই তারা লেপটে আছে। ভাল করে খেয়াল করলেই দেখবেন বিশ বাইশের জোয়ান শক্ত সমর্থ দেহগুলো আধা-মিলিটারী পোষাকে মোড়া। পায়ে ভারী বুট (অভাবে পোড়া-লাল কাপড়ের কেডস), ড্রেন পাইপ খাকী প্যান্টের ওপরে সামরিক কায়দায় হাত গোটানো ছাই রংয়ের ফুল সার্ট; কাঁধের দুধারে তকমা আঁটা। মাথায় পালক গোঁজা গোল-টুপি বা চাকতি বসানো বেরে। ফিট-ফাট ধোপ-দুরুস্ত ঝকঝকে তকতকে ছেলেগুলো ট্রামে-বাসে রাস্তায় সর্বদাই আপনার প্যাশে এসে ঝনাৎ করে এমনভাবে কৌটো টা নাচাবে যে, ইচ্ছা থাকলেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না যে, আজ আবার কাদের সাহায্য করার দিন (কারণ আর্মি বা নেভি বা রেডক্রস ডে তো বছরে একবার করেই হয়); বরং পকেটের অবস্থা যাই হোক না কেন একটা দস্তা বা নিকেলের টুকরো টুপ করে কৌটোয় ফেলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। ভাববেন, জানতে চেয়ে ঝুট ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ—এমনিতেই তো সবার মেজাজ চড়ে থাকে। কে জানে কারা কোন পার্টির? তকরার জুড়লে যদি গালমন্দ করে বসে বা কিছু না হোক ন্যাপলাখানা একবার বুকের কাছে ঝলসে দেয় তাহলেই তো চিত্তির ফাঁক। কেউ এসে তখন পাশে দাঁড়াবে না। সবাই মুখ ঘুরিয়ে নেবে বা উল্টো পথে দৌড় লাগাবে।

সাদাসিধে নিরীহ গোবেচারা মানুষ তারকবাবু। বত্রিশ বছর কলম পিষে শেষ বয়সে হেড অফিসের নম্বাবু হয়েছেন। নিজে জীবনে কখনো ফাঁকি দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। অপরেও কাজে ফাঁকি দিক, কি বড়র মুখের ওপর বেয়াদপী করুক, পছন্দ করেন না। তাই বিকালের অফিস ফেরতা ট্রামে সকালের বাসী কাগজখানায় চোখ বুলুতে বুলুতে হঠাৎ যখন প্রশ্নটা কানে এল একবার মুখ ঘুরিয়ে পাশের দিকে তাকালেন। কাগজটা পড়তেও অসুবিধা হচ্ছিল। রান্নাঘরের অপরিষ্কার ডুমটার মত দিনশেষের অস্বচ্ছ আলো বাইরে রাস্তা, দোকানপাট, মানুষজনের মুখ অস্পষ্ট করে তুলেছে। ভেতরের আলোয় কেমন একটা কালচে ভাব। চালসে চোখে অক্ষরগুলো সব মাছির মত লাগছে—হেডিংগুলো ছাড়া।

বসে বাড়ী ফেরার জন্য রোজই ফিরতি পথে অনেকটা হেঁটে এসে আপ ট্রামে বাড়তি মাশুল গোনেন তারকবাবু। বাঁধা বরাদ্দ জীবনের এটুকু বিলাসিতা রোজই তারিয়ে তারিয়ে চাখেন। সেই চাখুনিটুকু কেটে গেলে আজ গোটা কয়েক চোখা চোখা জবাবে—দেবেন তো দিন, নইলে বাকতাল্লা ছাড়ুন। তাকিয়ে দেখলেন পাশের বৃদ্ধ মানুষটিই বসে বসে বিদ্ধ হচ্ছেন। আর সবাই নিরাসক্তভাবে হয় বাইরের দৃশ্য দেখছেন বা রেডিমেড প্যান্ট, সার্ট, পেন্টস, কোলাপসিবল গেটের বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন। কাগজটা ভাঁজ করতে করতে কানখাড়া করলেন তারকবাবু। পাশের সমবয়সী মানুষটির গলা অনুনয়ে কেমন ভিজে উঠেছে—আমি তো ভাই আপনাকে কোন কটুকথা বলিনি। শুধু জানতে চেয়েছি আপনারা কারা?

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ জবাব এল—কেন দেখতে পাচ্ছেন না, কৌটোয়, টুপিতে, ঘাড়ে লেখা আছে আই. এম. ভি. পি। আমরা গরীব দুঃখীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য চাঁদা তুলি।

না বাবা সত্যিই ভাল দেখতে পাচ্ছি না। আমি বুড়ো মানুষ, তেরাট্টি চলছে। চশমা ছাড়া দেখতে পাই না।

এবার টুপি পরা মাথাটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—দেখতে যখন পান না, চশমা লাগালেই পারেন।

আরো শান্ত গলায় বৃদ্ধটি বললেন—লাগাতে তো পারি কিন্তু লাগাই কি করে? ঝুল পকেটে চশমা আছে। পকেটে তো হাত ঢোকাতে পারছি না। পাঁচজনের সীটে যে ভাই ছয়জন বসে আছি। আর তাছাড়া...

তাছাড়া যে আর কি কি যুক্তি আছে তা আর তারকবাবু শুনতে পেলেন না। তার আগেই আর একটি টুপি পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল—চ চ। যত্ত সব এইট কোয়ার্টি। দেবে না কিছু। টাইম নষ্ট করিস নি।

পাশের ছেলেটির স্বাস্থ্য একটু ভাল। হয়তো কিছুদিন কোন ব্যায়ামাগারে বারবেল ডাম্বেলিং করেছে। সেটা জানান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত সার্টের হাতা গোটানো, অনেকটা মেয়েদের স্লিভলেস ব্লাউজের মত। কোটো-ধরা হাতটা ঢাকা পড়ে গেছে মানুষ-দেয়ালে; রুক্ত-ধরা হাতের মাসল ডিউজ বলের মত ফুটে উঠেছে। বোধহয় ঐ ডিউজ বলটার জন্যই আর সবাই এই বৃদ্ধের অপমানেও চুপ করে আছে। কিন্তু তারকবাবু পারলেন না। মনে পড়ে গেল নিজের বড় ছেলে খোকার কথা। দুটি মেয়ে তিনটি ছেলের মধ্যে ওই বড়। ওর ওপরেই সব আশা ভরসা। একদিন বাড়ীতে মুখের ওপর কথা বলেছিল বলে দরজার খিলটা ওর পিঠের ওপর পিটিয়ে ভেঙ্গে-ছিলেন। অথচ ঐ খোকার বয়সী দুটি ছেলে কেমন এক ট্রাম লোকের সামনে বৃদ্ধ মানুষটির মুখের ওপর একদলা অপমানের থু থু ছিটিয়ে দিল। ভাবলেন, একবার রুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন—বলো তোমরা, আই. এন, ভি, পি, পুরো কথাটা কি? কি তোমাদের পরিচয়? কেন পয়সা দেব? কি হয় সেই পয়সায়? কোন দরিদ্র অনাথ আতুরকে তোমরা সাহায্য কর? কোন কাগজে তোমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বেরোয়? বল? বল?......

কিন্তু একটা কথাও মুখ থেকে বেরুলো না। নির্বাক লজ্জায় আড়ষ্টের মত পড়ে রইলেন। হু হু করে ট্রামের ভেতরে সন্ধ্যা

নেমে আসছে। দু-পাশের সাইনবোর্ডগুলো একটার পর একটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চওড়া পথটুকু ক্রমশ বাড়ি-ঘর, দোকান-বাজার, ফুটপাথ-জোড়া হকার-স্টলের মেলায় সরু হতে হতে ফিতের মত এলিয়ে যাচ্ছে। সামনেই একটা বড় মোড়। আর মিনিট-পাঁচেক বাদে, যদি কোন মিছিল-টিছিল বা গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় না থাকে তবে গলির মোড়ের স্টপে পৌঁছে যাবেন তারকবাবু। ঘড়িধরা নিয়ম-বাঁধা ব্যাপার। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে রবিবার আর বন্ধ্-টন্ধ্ ছাড়া যে মানুষটি রোজ একই রুটিনে চলেন, সকাল নটা পঁয়ত্রিশের ট্রামে অফিস আর সোয়া পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় ট্রামে বাড়ী, তিনিই আজ একটু অঘটন ঘটিয়ে বসলেন। পাঁচ মিনিট পরে নামার কথা কিন্তু পাঁচ মিনিট আগেই তারকবাবু নেমে পড়লেন ট্রাম থেকে।

ডানদিক বাঁদিক ভাল করে দেখে নিলেন। ছাতাটা শক্ত করে হাতে চেপে ধরে পকেটে টিফিন কৌটোর সাথে খবরের কাগজটা ঠাসতে ঠাসতে একদৌড়ে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল, ঠেলা, টেম্পো, রিকসায় ভরা রাস্তাটা পেরিয়ে এলেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় গেল ছোকরা দুটো? এই তো একমিনিট আগে একই ট্রাম থেকে ওরা নেমেছে তারকবাবুর সঙ্গে। নামার সময় চোখে চোখে রেখেছিলেন, রাস্তা পেরোতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছেন। প্রাণপণে সারা দেহের সবটুকু শক্তি অনেক দিনের পুরোনো সহায় চোখদুটোর পাতায় সঞ্চয় করে এ-পাশ ও-পাশ তাকালেন। ঐতো পাশের গলিটার মধ্যে ওরা ঢুকছে। তাড়াতাড়ি পা চালালেন তারকবাবু।

বড় রাস্তাটা এইখানে বটের ঝুরির মত একটা শিকড় নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেছে। ছোট গলি, বলতে গেলে কানা, খানকয়েক পুরোনো নোনা ধরা বাড়ীর পরেই বস্তির ভিড়ে হারিয়ে গেছে। পান-বিড়ি-সিগারেট, পুরোনো টায়ার, কালাই, মনিহারি দোকানের মাঝে চলটি ওঠা কাঠের কয়েকটা চেয়ার টেবিলে সাজানো চায়ের দোকানের কোণে ছেলেদুটোকে দেখতে পেয়ে থামলেন তারকবাবু। ঢুকবেন? কোনদিন তো এসব দোকানে ঢোকেন নি। চা, পান, বিড়ি, সিগারেটের নেশাই নেই. তাই কখনো প্রয়োজন হয়নি এসব দোকানে ঢোকার। আর একবার নিয়ম ভঙ্গ করলেন তারকবাবু।

ওদের পাশের টেবিলেই বসলেন। ছেলে দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। খেয়াল করেনি। আর করলেই বা কি—এই বুড়োটা যে ওদের ওপর নজর রাখছে বা রাখতে পারে, এ ভাবনা কি করে মাথায় আসবে? এক কাপ চা চেয়ে নিলেন। পকেট থেকে কাগজটা বার করে টেবিলে মেলে ধরলেন। দু-একজন খদ্দের আসছে যাচ্ছে। ছেলেদুটো এখনো কিছু নেয়নি। দেখে মনে হয় কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। মন ঘন

পেছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। এদের দু-একটা টুকরো কথা কানে এল—

আজ মাইরী কালুকে বলব তিন টাকায় আর পোষাচ্ছে না। বলাইবাবুকে বলে রেটটা একটু বাড়িয়ে দিক।

ধুর, কালু আবার বলাইবাবুকে বলবে? ও কি তোর আমার মত ফুরোনে খাটে। ব্যাটা কর্তার আপন সম্বন্ধি। যত হুজ্জুতি পোয়াব আমরা। পাব্লিক গালাগাল করবে। আর আমাদের উপায়ের টাকায় বাবু ফুর্টুনি করে বেড়াবেন। দেখেছিস গত মাসে বলাইবাবু একটা গাড়ী কিনেছেন। এ্যান্দিন মাইরী গাড়ীর দালালি করে গাড়ী চড়তে পেল না আর এখন দু হাত ভরে পয়সা লুটছে। সব দিয়ে থুয়েই রোজ কমসে কম ত্রিশ চল্লিশ টাকা ইনকাম। সুখের ব্যবসা। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই। পুলিশ ধরলে ধরবে আমাদের। বলাইবাবুর কি? পুছতে এলে স্রেফ বলে দেবে এদের চিনি না, জানি না।

কান পেতে শুনতে শুনতে একবার পাশ ফিরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন তারকবাবু, এই ছেলেটিরই স্বাস্থ্য ভালো। অন্য ছেলেটি পাতলা, নাক-মুখ-চোখ কাটা কাটা, রংটা ঈষৎ ফর্সা—খেতে-না-পাওয়া ফ্যাকাসে বললেই চলে। বোধহয় দলের নেতার বিষয়েই আলোচনা করছে ওরা। পাতলা ছেলেটি, বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—চিনি না, জানি না মানে? এই সব ইউনিফর্ম, কৌটো কে দিয়েছে?

প্রমাণ কি বল?—হতাশ সুরেই জবাব দিল স্বাস্থ্যবান ছেলেটি। কোথাও লেখা আছে এসব বলাইবাবু দিয়েছে? ধরা পড়লে আমরাই পড়ব, মারও খাব। কোন ব্যাটা তখন আর বাঁচাতে আসবে না দেখিস। এত অল্প টাকায় সত্যি মাইরী এসব ঝক্কি-ঝামেলা আর পোষায় না।

সঙ্গে সঙ্গে খেই ধরল পাতলা ছেলেটি—চ না, আমরা নিজেরাই বলাইবাবুকে গিয়ে ধরি।

ও বাবা!—যেন সাপের মুখে পা দিয়ে ফেলেছে, খলবলিয়ে উঠল স্বাস্থ্যবান ছেলেটি—কে জ্বালাতে যাবে বাবা? খপর পেলে কালু কিচাইন করে দেবে না। তাছাড়া বলাইবাবু মাইরী কি সব বিবেকানন্দ, নেতাজী, গানধীর কথা বলে, বুঝি না। দাঁড় করিয়ে রেখে একটা লম্বা লেকচার ঝাড়বে। মাথায় ঢোকে না কিছু। তার চেয়ে কালুকে বলে দেখি যদি কিছু হয়।

মিনিট খানেক সব চুপচাপ। স্বাস্থ্যবান ছেলেটি পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে টেবিলে কৌটো দুটোর পাশে রাখল। নিজে একটা ধরিয়ে সঙ্গীকেও দিল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর কটা বাজে? দোকানী সম্ভবত বিহারী। কলকাতার সব অবাঙ্গালী চা-ওয়ালা পানওয়ালার পেটেন্ট সম্বোধন। ঈষৎ ভাঙ্গা বাংলায় উত্তর এল—সাড়ে ছটা বাবু। টাইম জেনে ছেলে দুটি যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইল। ঠিক তখনি আর একটি ছেলে হিন্দি ফিল্মের গান বেসুরো হেঁড়ে গলায় গাইতে গাইতে ঢুকল দোকানে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সঙ্গে সঙ্গে এই ছেলেদুটো লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে—গুরু এসেছ। তোমার জন্য সেই তখন থেকে বসে আছি। একগাল খিস্তি ধোঁয়ার সাথে উগরে দিয়ে গুরুটি জিজ্ঞাসা করল—কখন এসেছিস তোরা? বোধহয় চেলাদের ওপর বিশ্বাস নেই, তাই দোকানীর দিকে তাকিয়ে একটু ভ্রু-দুটো নাচাল। খুব বিনীত উত্তর এল ঠাকুরের কাছ থেকে—পরেশবাবু আর ছোটকুবাবু আধঘন্টা এসেছেন।

নেপু আসেনি?—গুরু আবার জিজ্ঞাসা করল।

না কালুবাবু, নেপুবাবু এখনো আসেন নি। ছোট ছোট গ্লাসে চা ছাঁকতে ছাঁকতে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল ঠাকুর।

গুরু এগিয়ে এসে টেবিলে রাখা কৌটো দুটো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আওয়াজ তুলে পরীক্ষা করল। তারপর আবার একরাশ খিস্তি করে চড়া গলায় বলল—দোবেলা চা-টোস্ট গিলছ, তিন টাকা করে মাইনে নিচ্ছ আর কাজের বেলায় ঠন ঠন। সম্ভবত রোগা ছেলেটিই পরেশ। সেই এবার কাঁচুমাচু মুখে বলে উঠল—মাইরী বলছি কালু...। কথা কটা শেষ করার আগেই কালু থামিয়ে দিল দাবড়ি দিয়ে—চোপ। বাজে বাকতাল্লা করিস নি। সারাদিন কাজ করেছিস না ট্রামে বাসে লেডিজ সিটের সঙ্গে চপসে ছিলি? লা-ল-টু-কু-মা-র—চুলের লপচপানি কত! লেডিদের সঙ্গে পিনিক মেরে বেড়াস। বল্ কৌটোর সিকও ভরেনি কেন?

পরেশ ওরফে লালটুকুমার চুপ করে রইল। ভিউজবলের মত যার হাতের গুলি সেই ছোটকুর গালে একটা ঠোনা মেরে কালু বলল—ছেড়ে দে, এলাইন ছেড়ে দে। এ সব ভদ্র ব্যবসা তোদের নয়। যা আবার সিনেমার লাইনে গিয়ে বেলাক কর। মানুষের লাথি খেয়ে মরগে।

ছোটকু বোধহয় একটা কিছু বলতে চাইল। কানখাড়া করেও কিছু শুনতে পেলেন না তারকবাবু, ছেলেটা খুব মিইয়ে গেছে। শুনতে পেলেও যে এদের সব কটা কথা বুঝতে পারছেন তা নয়। অনেক শব্দই অপরিচিত। কানে এল কালুর দাবড়ানি—এক লাথে ফুটিয়ে দেব সব শালার জিন্দেগী।

বল সামাদিন ঘুরে ক'টাকা এনেছিস। দুটো কোটোর একটা বড় পার্টি হবে কি না সন্দ। বলাইবাবুকে কি বলব বল। পরেশ তুই আবার সেপুকে কাল বলেছিস রেট বাড়ানোর কথা?—পরেশের কোঁচকানো ভুরুদুটো কিছুতেই যেন আর সিধে হতে চায় না।

পরেশ কোন জবাব দিল না। দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটকু ছেলেটির সাহস বেশী—হ্যাঁ বলেছে তো। কি হয়েছে তাতে? তিন টাকায় আর পোষায় না।

না পোষায় তো আছিস কেন রে, ফোট।—কেমন একটা তালপটকা ফাটার মত কালুর ছুঁচলো মুখটা ফেটে পড়ল। রোয়াবি দেখাস না ছোটকু। বলতে বলতে চামড়ার সাথে লেগে থাকা প্যান্টের পেছনে হাতটা ঘসতে লাগল। বোধহয় ঐখানেই ছুরি-টুরি থাকে। এক গ্রাম লোককে যারা ভয় দেখিয়ে মুক করে রেখেছিল তারাই এখন ঐ রোগা প্যাকাটি, ব্রনয় ভরা নিষ্ঠুর মুখ ছেলেটির সামনে স্কুল পালানো পড়ুয়ার মত ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। বেশ মজা লাগল তারকবাবুর। কাগজ থেকে মুখটা তুলে দোকানীকে আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। নিয়ম-কানুন আজ যেন সব ভেঙে ফেলছেন। ভাল্‌ক, দেখাই যাক না খেলাটা আর কদ্দুর গড়ায়।

চা এল। খদ্দের বেড়েছে দোকানে। দু-হাতে চা করে যোগান দিতে দিতে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছে ঠাকুর। কয়েকজন বাইরে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে দাম চুকিয়ে চলে যাচ্ছে। ভেতরে তিন-চারজন রেসের বই খুলে রীতিমত গবেষণায় মগ্ন। কোণে ছেলে তিনটি গলা নামিয়ে কথা বলছে। সব শুনতে পাচ্ছেন না তারকবাবু। তবু কিছু কিছু কানে আসছে।

ছোটকু বলছে—সত্যি কালু এ বড় ঝামেলা হচ্ছে। রোজই পাব্লিক শুধোয় কোন পার্টি? কিসের সাহায্য? মেয়েগুলো পর্যন্ত স্যায়না হয়ে গেছে। লালটুকুমারকে আধলা ছোঁয়াতে চায় না তো আমাকে দেবে কি? সঙ্গে সঙ্গে কালু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল—রোজ রোজ এক রুটে কেন যাস? পই পই করে বলে দিই নি আজ যদি ভবানীপুরে তো কাল যাবি মেটেবুরুজ, পরশু শ্যাম-বাজার, তারপদিন ইসপ্যানেড। নইলে লোকে চিনে ফেলবে তো।

তাই তো করি গুরু, তবু লোকে ছাড়ে না—রোগা পটকা পরেশ বলে উঠল। কালুর জবাবও রেডি—না ছাড়ে তো বাবা লাইন ছেড়ে দাও। বস্তিতে ছেলের অভাব নেই। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? বলাই-বাবুকে বলে নতুন ছেলে দলে ভিড়িয়ে নেব। বলতে বলতে একটু থামল কালু। হাতে ধরা সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে। হুস হুস করে গোটা দুয়েক টান দিয়ে মেঝের ছুঁড়ে ফেলে বলল—তোদের লজ্জা করে না? যে লোকটা তোদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তার জন্য তোরা ভাবিস না। তোদের তিনজনের জন্য রোজ কত খরচ জানিস? এগারো টাকা। মজুরি তিন টাকা করে ন টাকা, দোবেলা চা টোস্ট আর তিন প্যাকেট...। এবার গুরুর কথার ওপরেই হামলে পড়ল ছোটকু—তোমারটা বুঝি হিসেবের বাইরে। মাস মাস দেড়শো টাকা আর রোজ দোবেলা দুটো মিল কোথা থেকে আসছে, ভেবেছ খোঁজ রাখি না?

চোপ। মুখ খোলাস না ছোটকু। চামড়ি খুলে লেব। খেতে পেতিস না, বলাইবাবুকে বলে চাকরী করে দিলাম আবার চিল্লাচ্ছিস। বেইমান। কালুর ছুঁচলো মুখটা চায়ের দোকানের নিস্তু আলোতেও তারকবাবু স্পষ্ট দেখলেন কেমন বীভৎস কর্কশ হয়ে উঠেছে। নাকের পাশে জেগে উঠেছে সরু সরু শিরা উপশিরা। রগের মোটা নলিটা দপ দপ করছে, যেন এখুনি ফেটে পড়বে।

গাল দিও না গুরু বলে দিচ্ছি—ঝাপটে উঠল ছোটকু। বেইমানী আমরা করি না। দিন ভোর খাটি, কোনদিন কিছু বলি ন। তোমার কি, তুমি তো আর বেরোও না।

বেরোও না—খেঁকিয়ে উঠল কালু। আমি না বেরোলে যে এতদিনে তোদের হাতে দড়ি পড়ত। তোরা সেজেগুজে গ্রাম-বাস চেপে বাকস বাজাস। আর আমি যে ইস্টিশনে ইস্টিশনে মানুষের তোয়াজ করে ফিরি সে খপর রাখিস? নইলে কখন গুঁতুনির চোটে সব সাবাড় হয়ে যেতিস।

যেতাম তো যেতাম। সাফ বলছি রেট বাড়াও, কাজ করব। নইলে আমিই পুলিশসে সব ফাঁস করে দেব—মরীয়া হয়ে উঠেছে ছোটকু। ওর চোখে মুখে এই বয়সে অত্যাচারের ছাপ পড়লেও এখনো কিছুটা নরম ভাব আছে। তারকবাবু আড়চোখে দেখছিলেন। কালু ছেলেদুটোর মুখের ওপর ছুরির ফলার মত চোখদুটো এক ঝলক ঘুরিয়ে নিল—ফাঁস করবি না? কালুকে চিনিস নি ছোটকু। বলতে বলতে টেবিলে রাখা কৌটো দুটো তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর গলাটা নামিয়ে এনে বলল—যা ফাঁস করগে যা। তোর নাম কোম্পানী থেকে কেটে দিলাম।

তুই নাম কাটার কে রে? শালা দালাল। মাল রেখে কথা বল।—রুখে দাঁড়াল ছোটকু, সেই সঙ্গে নির্বাক পরেশ। আস্তে আস্তে কৌটো দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখল কালু। একটা হাত পাছনের প্যান্টের পকেটে কি যেন খুঁজছে। ছোটকুর ছোট ছোট কুতকুতে চোখ দুটো কালুর হাতের দিকে। দেহের বাঁকে বাঁকে প্রত্যেকটি তিউজবল্ব ফুটে উঠেছে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনটি ছেলে। দোকানী ঠাকুর হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কয়েকজন খদ্দের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। যেন এটা একটা দাবা খেলা। পরের সব কটা চাল দর্শকদের মুখস্থ। খেলুড়েরা খেলছে, পাশে দাঁড়ানো দর্শকরা জানেন এর পর কি হবে। এদ্দুর পর্যন্ত খেলা দেখেই সখ মিটেছে তারকবাবুর। বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপছে। না জানি এখুনি কোন রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। এদের বখরার হিসেব নিকেশের বলি তো এরা হবে না, হবে তারই মত আশ-পাশের নিরীহ সাধারণ মানুষ। তাড়াতাড়ি দাম মিটিয়ে বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

দু পা হাঁটলেই মোড়। ভাবলেন একবার ট্রামে উঠবেন। না, এখনো যা ভিড়, তার চেয়ে হেঁটে ফেরাই ভাল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকগুলো ছবি মাথার মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। যেন কোন পুরোনো মন্দিরের দেয়ালে আঁকা ফ্রেসকো—পঞ্চতন্ত্র বা রামায়ণ, মহাভারত বা জাতকের কাহিনী। টুকরোগুলো জুড়লে একটা পুরনো গল্প দাঁড় করানো যায়। সেই গল্পের নায়ক কে খুঁজে বার করা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু করবে কে? কার এত বুকের পাটা। যার চেলা-চামুণ্ডা কালু, পরেশ, ছোটকু বা না-দেখা নেপু সেই বলাইবাবুর বাবুয়ানির পেশায় দাঁত ফোটায় হেন সাধ্য এ সমাজে অজ আর কার আছে? অশিক্ষিত বেকার ছেলে-ছোকরাদের সামান্য দু-মুঠো ভাত ভিক্ষের বিনিময়ে কিনে যিনি বা যাঁরা এই শহরে দাতব্য-ব্যবসায় ফলাও কারবার চালাচ্ছেন তাঁরা যে সব ভদ্রবেশী শয়তান। সেই শয়তানের মুখোস ছেঁড়ার মানুষ কোথায়?

বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তারকবাবু। একটা অজানা ভয় কুলকুল করে শিরদাঁড়া বেয়ে গোটা শরীরটা ঠাণ্ডায় অসাড় করে দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে আসছে—খোকা, তাঁর খোকাও তো দু-বছর বি-এ পাশ করে ঘরে বেকার বসে আছে। সারাটা দিন ও কি করে বেড়ায় তা তো জানেন না। ও যদি...। না আর ভাবতে পারেন না। নিঃঝুম হয়ে বাড়ীর লাগোয়া ল্যাম্প-পোস্টটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গজখানেক দূরেই দেখতে পাচ্ছেন সদর দরজা হাট করে খোলা। স্ত্রীর গলা শুনতে পেলেন—ও খোকা দ্যাখ না বাবা, তোর বাবা আজ কেন এত দেরী করছে? মানুষটা তো কোনদিন এত দেরী করে না। ও খোকা, খোকা......।

—অমিবেন্দু

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

আতংকের আবেশ
ইয়ুং, মর্টন প্রিন্স, ম্যাকডুগাল

(এগারো)

অবসেশন বা আবেশ নিয়ে নানারকমের তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। ইয়ুং, মর্টন প্রিন্স, ম্যাকডুগাল নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক আতংকগ্রস্ত রোগীর বিবরণ পেশ করেছেন।

ইয়ুং তাঁর নিজস্ব বাক্-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে এক মহিলার ঘুম না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন। মহিলাটি এসেছিলেন সম্মোহন চিকিৎসার জন্য। অন্যান্য চিকিৎসকরা কোনো কিছু ফল দেখাতে না পারায় তিনি ইয়ুংএর শরণাপন্ন হন। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ। ঘুমুতে গেলেই মনে হত, ঘুম হবে না। ঘুম যদিও বা হয়, সে ঘুম আর ভাঙবে না। ভয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেন এবং প্রায় সারারাত জেগেই কাটাতেন। মহিলাটি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও মনে করতেন তাঁর আবেশিক চিন্তা অন্য কেউ যদি শোনে, তবে সেও অবসেশনে আক্রান্ত হবে। অন্য একজন চিকিৎসক এবং একজন পাদ্রী, তাঁর রোগ-ইতিহাস শুনে, তাঁরই মত আবেশিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। চিন্তাটা বেশ অদ্ভুতধরণের। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী। এই মৃত্যুটি ঘটবার আগে অন্য একটি ছেলের মৃত্যুর জন্য বহু বছর ধরে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করে আসছেন। তাঁর এই ধারণা যুক্তিহীন মনে হলে এই ধারণা থেকে তাঁর মুক্তি ছিল না। ইয়ুং এই সময় ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব দ্বারা পুরোপুরি অনুপ্রাণিত। কাজেই বাক্-অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তিনি রোগিণীর অবচেতন স্তরের অভিলাষ ও কামেচ্ছা আবিষ্কার করলেন। মহিলাটিকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর আবেশিক চিন্তাগুলো অছিলা ও ওজুহাত মাত্র; সত্যকে ঢাকা দেবার উপায়। আসলে তিনি অবদমিত কামেচ্ছা দ্বারা পীড়িত।

প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে সমীক্ষা চলার পর দেখা গেল কামেচ্ছার অবদমন থেকে আতংকের উদ্ভব ঘটেছে। এমন কতকগুলো যৌন ব্যাপারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, যেগুলো তাঁর রুচি সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না। আতংকের চিন্তার পরিবর্তে সংজ্ঞান মনে যৌন চিন্তা ও প্রতীকের আবির্ভাবের ফলে ভদ্রমহিলা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, ভয়ের উপসর্গ অন্য কোনো চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত। ফ্রয়েডীয় "প্রোজেকশন" এর সমতুল্য না হলেও, "র‍্যাশানালিজেশন" বা যুক্তাভ্যাস এর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পৃক্ত। পাপবোধ-সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের স্বপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে আত্ম-গ্লানি থেকে রক্ষা পাবার একটা প্রচেষ্টা। অবশ্য আত্মগ্লানি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়; এক অন্যায়ের পরিবর্তে কাল্পনিক যে পাপবোধ ভদ্রমহিলাকে পীড়িত করছিল, তার গুরুত্ব কিছু কম নয়।

এবার মর্টন প্রিন্সের কথায় আসা যাক। মর্টন প্রিন্সের রোগিণীর আতংকের বিষয়-বস্তু ঘণ্টাঘর (বেল-টাওয়ার)। কোনো ঘণ্টা-ঘরের ধার দিয়ে আসতে গেলে আতংক-অভিভূত হয়ে পড়ত মেয়েটি। ভয়ের আনুষঙ্গিক শরীরিক উপসর্গ দেখা দিত। এমন কি 'ঘণ্টা-ঘর' কথাটিও শেষের দিকে ভয়ের উদ্রেক করত। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও ঘণ্টাধ্বনি বা ঘণ্টা-ঘরের এই ভীতির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এর পর সম্মোহিত অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় লেখার মাধ্যমে মেয়েটির আতংকের হদিশ মিলল। পঁচিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা তার মনে পড়ল। একটি ঘণ্টঘরের পাশে সে আকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। পাশের ঘরে মায়ের উপর অস্ত্রোপচার চলেছে। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টা-ঘরের ঘণ্টাটি বেজে চলেছে। উৎকণ্ঠা ভয় এবং আকুলতা চরমে উঠেছে। অস্ত্রোপচারের সময়ে মায়ের মৃত্যু ঘটল। পঁচিশ বছর ধরে ঘণ্টঘরের ভয় মেয়েটিকে তাড়িত করেছে; যদিও ভয়ের ঘটনাটি সে ভুলে গেছে। মর্টন প্রিন্সের মতে আতংকের আবেশের মূলে থাকে অবদমিত সক্রিয় গুচ্ছো (রিপ্রেসড্ অ্যান্ড এ্যাকটিভ্ কমপ্লেক্স); পুরোপুরি বিস্মৃতিগত অবস্থার সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য।

চিকিৎসাপুস্তকে আমরা যে-সব আতংকের কাহিনী পাঠ করি, তার অধিকাংশই এই একই প্যাটার্নের। শৈশবে কোনো একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে প্রথম ভয়ের সূত্রপাত। ঘটনাটির সঙ্গে অহং-বোধ বা আত্মসম্মান বিশেষভাবে জড়িত। এই ভয় শুধু মৃত্যুভয় নয়। মর্টন প্রিন্স, ম্যাকডুগাল প্রমুখ চিকিৎসক এই ভয়কে আরো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সেলফ্ রিগার্ড' এর 'সেন্টিমেন্ট' এর সঙ্গে জড়িত বলে ঘটনাটি মনে থাকে না; কিন্তু আনুষঙ্গিক ভয়ের অনুভূতি থেকেই যায়। আত্মসম্মানবোধকে অতি প্রাধান্য দিয়েও ঘটনাটি ভুলে যাওয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই সব রোগকাহিনী থেকে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। মর্টন প্রিন্সএর কেসটাই বিচার করা যাক। মায়ের মৃত্যু বেদনাদায়ক নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্ম-মর্যাদা বা অহংবোধ ক্ষুণ্ণ হবার মত ঘটনা এটা নয়। কাজেই বিস্মৃতির অন্য কোনো কারণ আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

ম্যাকডুগাল তাঁর "এ্যান আউটলাইন অফ্ এ্যাবনরমাল সাইকলজি" পুস্তকে ডাঃ ব্যাগবাই ও রিভার্সএর কয়েকটি কেসের উল্লেখ করেছেন। মনরোগের চিকিৎসকদের কাছে কাহিনীগুলো সুপরিচিত। পাঠকদের মধ্যে অনেকের কাছে কেসগুলি বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক মনে হতে পারে। দুটি কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করছি। বিনোদের রোগ উপসর্গের ব্যাখ্যা এর পর হয়ত অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে।

একজন চিকিৎসক সংকীর্ণ স্থানের ভয়ে অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন। প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু মাঝে-মাঝে একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন; কথা বলতে গিয়ে তোতলামি দেখা দিত। কিছুদিন একজন ফ্রয়েডিয়ান সমীক্ষককে দিয়ে চিকিৎসিত হবার ফলে বুঝলেন গোলমালটা যৌনসংক্রান্ত। কিন্তু তার ফলে উপসর্গ একটুও কমল না। এর পরে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হল। এই সময় পরিখার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সংকীর্ণ স্থানের ভয়টা একটা বড়দরের অসুস্থতার উপসর্গ। কিছুতেই ট্রেঞ্চে থাকতে পারতেন না। সারারাত তিনি পরিখা ছেড়ে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমশ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিল। তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাসপাতালে ফেরত পাঠানো হল। এখানে ডাঃ রিভার্সের নির্দেশে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে শৈশবের একটা স্মৃতি তাঁর মনে এল। বয়স তখন চার কি পাঁচ। তাঁদের বাড়ীর পাশে এক বৃদ্ধ পুরনো কাগজপত্রের ব্যবসা করত। দু-এক পয়সা দিয়ে বাচ্চাদের বশীভূত করে বৃদ্ধ পুরানো জিনিসপত্র সংগ্রহ করত। একদিন বাড়ী থেকে কোনো

একটা জিনিস নিয়ে বুদ্ধকে দেবার পর শংকিত মনে ফিরে আসবার সময় দেখল, সরু অন্ধকার গলির দরজাতে ছিটকিনি দেওয়া। ছিটকিনিতে তার হাত পৌঁছয় না। এমনি সময় গলির অন্য দিক থেকে একটা কুকুর গর্জন করে উঠল। ভয়ে প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম।......ঘটনাটা বিবৃত করতে গিয়ে বত্রিশ বছর বয়সেও তাঁর সারা দেহে ভয়ের উপসর্গ দেখা দিল। এই ঘটনাটি মনে আসার পর থেকে আতঙ্কের আবেশ অনেকটা দূর হল।

এখানেও ঘটনাটি বিস্মৃত নয়, অবদমিত। অন্যায় ও অপরাধবোধের সঙ্গে জড়িত বলেই স্মৃতির কোঠা থেকে বিলুপ্ত।

অন্য একটি ঘটনা। পঞ্চান্ন বছরের এক ভদ্রলোক বাল্যকাল থেকে এক অদ্ভুত আতঙ্ক রোগে ভুগছেন। তাঁর ভয় পেছন থেকে কেউ এসে তাঁকে আক্রমণ করবে। চলবার সময় মুহুর্মুহু পিছন ফিরে তাকাতে হয়। ঘরে বসবার সময় দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসেন। এই সময় কার্য-উপলক্ষে, বাল্যকালে যে শহরটিতে কাটিয়েছিলেন, সেই শহরে তাঁকে আসতে হয়। এক বৃদ্ধ মুদি গল্প প্রসঙ্গে তাঁকে জানায় যে, সে শৈশবে তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক মুঠো মটরশুঁটি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করত। একদিন মুদি একটা ড্রামের পেছনে আত্মগোপন করেছিল তাকে হাতে-নাতে ধরবার জন্য। যেই যে মটরশুঁটিতে হাত দিয়েছে, অমনি মুদি পেছন দিক থেকে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। ভয়ে সে চিৎকার করে ওঠে এবং জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়।

ভদ্রলোকের ঘটনাটি মনে এল। কিছুদিনের মধ্যে পেছন থেকে আক্রান্ত হবার ভয়ও দূর হয়ে গেল।

এই দুটি কাহিনীর মধ্যে লিবিডো-তত্ত্বের ছোঁয়াচ নেই। ইয়ুং-এর কেসের মত জটিলতাও নেই। পাভলভীয় শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কেসগুলো আবার আমরা অন্যদিক দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পাভলভ স্কুলের পরীক্ষামূলক অবসেশনের বিবরণ পেশ করার আগে, ভয় সম্পর্কে আরো দু-একটা কথা বলা দরকার।

মর্টন প্রিন্স ম্যাকডুগাল এবং অন্যান্য চিকিৎসক ভয়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় সব সময়েই ব্যক্তির রোগ-ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। অবদমিত ইচ্ছা অথবা বিস্মৃত কোনো ঘটনার অনুসন্ধানে সম্মোহনের সাহায্য নিয়েছেন। আজকের সমীক্ষকরাও ভুলে-যাওয়া ঘটনা কিম্বা অবদমিত কামেচ্ছার সন্ধানে অনেক সময় ব্যয় করে থাকেন। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বের সঙ্গে 'এক্জিসটেনশিয়াল' তত্ত্বের সংমিশ্রণে আধুনিক মনসমীক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু ভয়ের সামাজিক অস্তিত্ব নিয়ে, সমাজের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘর্ষ নিয়ে এঁরা আশানুরূপ উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এরিক ফ্রম, কারেন হর্ণি প্রমুখ নয়াফ্রয়েডিয়ানরা সামাজিক 'ট্রমা' সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন; যন্ত্রযুগের বিভীষিকা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ দেখে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু ভয়ের নিরসন সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে 'ইস্টার্ণ মিস্টিক' অথবা 'জেন-বুদ্ধিজম'-এর শরণাপন্ন হয়েছেন। বিশেষ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা যে ভয়ের জনক, সেই সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত তাঁরা স্পষ্টভাবে কোথাও দিয়েছেন বলে মনে হয় না। আমরা বর্তমানে এসব জটিল আলোচনার মধ্যে যাব না। শুধুমাত্র ভয়ের সামাজিক কারণগুলো অতি-সংক্ষেপে নির্ণয় করবার চেষ্টা করব।

নিউরোটিক ভয় রজ্জুকে সর্পভ্রম করার মত নয়। সাপ নয়, এটা রজ্জু, এটা বুঝতে পারলেই ভয় চলে যায়, কিন্তু নিউরোটিক ভয় অত সহজে যেতে চায় না। আর পাঁচজনে ভয় পাচ্ছে না, তবু বিনোদের মত নিউরোটিকরা ভয় পাচ্ছে। বিনোদের আশৈশব ইতিহাসের সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যে সমাজে বিনোদরা বড় হয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে, সেই সমাজের মধ্যেই রয়েছে ভয়ের আসল কারণ। ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রের বিশিষ্টতা বা তার ব্যক্তিগত ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা কোনো মতেই উচিত নয়; আবার এও মনে করা ঠিক নয় যে, ভয়ের কারণ শুধু মনের গভীরে, তার ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে, তার বিষয়ীমুখীন অভিব্যক্তির মধ্যে। ভয় সমাজে, ভয় আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে, ভয় ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণের ত্রুটির মধ্যে।

ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সমাজে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর স্বার্থপর ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য। আমার স্বার্থ ও অন্যের স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত ও নির্ধারিত। আমি এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে টিঁকে থাকতে চাই, বড় হতে চাই। সকলেই তাই চায়।

এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, বন্ধু-ভ্রাতা ইত্যাদি সব সম্পর্কের মধ্যেই প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা প্রকাশ পেতে বাধ্য। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা, বর্তমান সম্পর্কে নিরাপত্তা যেখানে নেই, সেখানে ব্যক্তি-মনে উদ্বেগ অশান্তি ও ভয় থাকা স্বাভাবিক। আমরা টুকরো, খণ্ডিত মানুষ হিসেবে নিজেকে মনে করি, কাজেই ভয় পাই। আমরা সম্মান-প্রতিপত্তি-অর্থ সন্ধানে সারা দিন ব্যস্ত, কাজেই হীনমন্যতায় ভুগছি। প্রতিযোগিতামূলক সমাজের যত উঁচুতেই উঠি না কেন, আমার থেকে শক্তিশালী প্রতিশক্তিশালী মানুষের দেখা পাবই, তাকে ভয় করব এবং হিংসা করব। তার উপর সমাজের যেখানে উঠেছি, সেখান থেকে পদস্খলনের ভয় ত আছেই। নিউরোটিকের সঙ্গে সুস্থ সাধারণ মানুষের পার্থক্য এই যে নিউরোটিক দলবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখে নি; ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে নি। সাধারণ সুস্থ মানুষ ধ্বংস ও প্রতিযোগিতামূলক প্রবৃত্তির সঙ্গেই শুধু পরিচিত নয়; সৃজনমূলক সহযোগিতাভিত্তিক প্রবৃত্তির সঙ্গেও পরিচিত। এই ধরনের 'গ্রুপ এ্যাক্টিভিটির' মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পায় সুস্থ মানুষ। আর নিউরোটিক সহজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বিনোদের মত নিউরোটিকরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। মানুষকে ভয় পায়; অনেক সময় অকারণে। সেই ভয়ই প্রতিফলিত হয় হৃৎযন্ত্রে, ফুসফুসে, এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারে।

সুস্থ মানুষও ভয় পায়; মাঝে-মাঝে অযৌক্তিক ভাবে। কিন্তু নিউরোটিকের ভয় তার চৈতন্যকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রাখে, ভয়ের পিছনে কোনো যুক্তি থাকে না, পরিবেশের বিশ্লেষণে অনেক সময়েই ভুল করে এবং ভয়কে অপাত্রে ন্যস্ত করে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

তা বলে নিউরোটিককে অসামাজিক বা সমাজবিদ্বেষী অপরাধী বলা ঠিক হবে না। ভয়, সন্দেহ নিউরোটিককে অসুখী করে, ভয়, সন্দেহ থেকে সে মুক্ত হতে চায়। মানুষকে ভালবাসতে চায়, মানুষকে বিশ্বাস করতে চায়। ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা তাকে সমাজবিদ্বেষী ক্রিয়াকলাপে কদাচ আকৃষ্ট করে। সমাজবিদ্বেষীমূলক অপরাধ এদের দ্বারা খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। আসলে এরা সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধের তাৎপর্য বুঝতে পারে না। নিজের অসাফল্যের জন্য হয় নিজেকে কিম্বা অপরকে দায়ী মনে করে। কাজেই সন্দেহ, অবিশ্বাস কাটিয়ে বিশ্বাস ভালবাসা এদের মনে সহজে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যার সময়ে দেখা যাবে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনার আধিক্যের জন্য এরা বিশেষ ধরনের অনুভূতির প্রাবল্যে কষ্ট পায়। বিনোদকে বা তার মত কোনো আতঙ্কের রোগীকে যদি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার জীবন-ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, মানুষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও ভাল ব্যবহার প্রায় সমমাত্রাতেই পেয়েছে। অথচ দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলো মনে করে রেখেছে: ভাল ব্যবহারের ঘটনাগুলো প্রায়শ ভুলে গেছে। কারণ, তার শৈশব থেকে সংগঠিত ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। আশৈশব প্রতিপালিত মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রক্ষোভ-সমন্বিত হয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চেতনার বিকারকে, আতঙ্কের আবেশকে দূর করা যাচ্ছে না। বহির্বাস্তবের বিশ্লেষণ তার প্রক্ষোভ-সমন্বিত আবেশকে প্রভাবিত করতে পারছে না। কারণ কি? মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অবস্থায় আবেশ যুক্তি বুদ্ধিকে দূরে ঠেকিয়ে রাখছে?

[illegible]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

—সাত—

ডাইনিং হলের প্রকাণ্ড সেকেলে ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা বাজল। তারপরই দূরে প্রধান ফটকখানার পেটাঘড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সুরঞ্জন হাসতে হাসতে মন্তব্য করল, বারো সেকেন্ডের তফাৎ! কোন ঘড়িটা যে ঠিক চলছে, সে আপনারা বুঝতেই পারবেন না স্যার। অবশ্য আপনাদের ঘড়িতে কী সময়, জানিনে।

কর্ণেল একপলক কব্জিতে চোখ ফেলে তারপর বললেন, ইওর ক্লক ইজ করেক্ট।

সবাই যে-যেখানে ছিল, নিজের-নিজের কব্জিতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। আজ ইলেকট্রিক ফেল করেনি। ঘরে-বাইরে সবগুলো রডলাইট আর বাল্ব জ্বালা হয়েছে। সুরঞ্জন গতরাত্রের ব্যাপার নিয়ে আজ বেশ সাবধানী। বারবার এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। বাহাদুর রিসেপশনের সামনে টহল দিচ্ছে। চাকর-বয়-বাবুর্চিও ম্যানেজারের তাগিদে সতর্ক। [illegible] আজ সকাল সকাল কেটেছে। তার দরকারও হবে না। স্বাতী দিব্যেন্দুর সাহায্যে নীচে নেমে এসেছে। ওরা দুজনে আজ আলাদা টেবিলে বসেছে। সেটা একেবারে কোণের দিকে।

আলাদা দীপেন বোস আর ইরা। একটা থামের পাশে মধ্যখানে তাদের টেবিল। কর্ণেল-দেবতোষের সঙ্গে চীনা। নীরেন-বিভাস দূরে একটা টেবিলে বসেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা একজোড়া করে লোক। হঠাৎ ঢুকে তাকালে মনে হয় মস্তো হলঘরটা যেন লোকে ঠাসা। উজ্জ্বল আলো। কিন্তু গুটিকয় মোটা থামের দরুন অনেকটা ঘাড় ঘোরালে তবেই এক টেবিলের লোক অন্য টেবিলের লোককে দেখতে পাবে।

দেবতোষ আড়ামোড়া ছেড়ে ফের ঘড়ি দেখে বললেন, এরা খেতে দিতে বড্ড দেরী করে।

কর্ণেল হাসলেন।...সে তো ভালই। খিদেটা বাড়তে দিন।

খিদে! দেবতোষের মুখটা কাঁচুমাচু দেখাল। ...আজ সারাটা দিন যা গেছে না। দুপুরে খাওয়ার অবসরই পেলাম না। গিয়েছিলাম, মাইল চারেক দূরে একটা ঢিবি দেখতে। বনজঙ্গলের মধ্যে জায়গাটা। কর্ণেল, আপনি তো এদিকে এসেছেন অনেকবার। গেছেন কখনও রামরামপুরে? সুযোগ পেলে প্রমাণ করতাম যে মহেঞ্জোদোরো-হরপ্পার জুটি একটা সভ্যতা এই বঙ্গদেশেও ছিল। এর পতনের কারণও এক। বর্বর বিদেশি আক্রমণ।

চীনা বলল, কোন দেশের? কারা তারা?

সোৎসাহে দেবতোষ বললেন, আবার কারা? আর্যরা।

কর্ণেল মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, বেদে ইন্দ্র কর্তৃক নগরধ্বংসের কথা অবশ্য আছে। তবে কি জানেন, নগর হল পুরোটাই কৃত্রিম—মানুষের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পবোধ মিলে তা সম্পূর্ণ তৈরী

জিনিস। নগর বাদে যা লোকালয়, তা কোন-রকমে ঝড়েবাদলে আত্মরক্ষার বা মাথা গোঁজবার আখড়ামাত্র। নেচারের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে। অতি সহজে তা মিলেছে মানুষের জন্যে। কিন্তু নগরের পিছনে অনেক স্বপ্নসাধ পরিকল্পনা অনেক শ্রম-যত্নের ব্যাপার আছে। এখন, মানুষের স্বভাব হল যা গড়বে, তা ভাঙবে। দেখুন না, সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে। লাস্ট গ্রেটওয়ারে আসামের অয়েল-ইন্ডাস্ট্রিটা......

কর্ণেলের যাত্রাপথ লক্ষ্য করে শশব্যস্তে দেবতোষ কথা কাড়লেন। ...বাই দি বাই, কর্ণেল, এ প্রবলেম ইজ সলভ্‌ড। ছবিটা পাওয়া গেছে।

চীনা লাফিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে! কই, কোথায়?

দেবতোষ গম্ভীর মুখে বললেন, আপনারটা নয়। সেই গুরুদেবের ছবিটা। আকার কাঁধে ব্যাগে ছিল আজ। রামরামপুরে নোটবই বের করতে গিয়ে দেখি, দিব্যি তার ভেতর রয়ে গেছে। আশ্চর্য!

কর্ণেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ব্যাগে?

হ্যাঁ। দেবতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ...ব্যাগটা ছিল ড্রেসিং টেবিলের হুকে। যাবার সময় কাঁধে নিয়েছিলাম। তখন ভেতরটা দেখি নি।

চীনাও ফোঁস করে বলল, আমার ছবিটা যদি এমনি করে পাওয়া যেত!

কর্ণেল বললেন, হয়তো পাওয়া যাবে। যাক গে, প্রফেসর, আপনার স্ত্রী তাহলে এখন আশা করি খুশি হয়েছেন?

খুশি কি? সন্ধ্যা থেকে ঘরের ভিতর পুজোআচ্চা হয়ে গেল একদফা। সুরঞ্জন পুরুত এনে দিয়েছিল। ঘণ্টার শব্দ শোনেন নি? বলে হাসতে লাগলেন দেবতোষ।......

দিব্যেন্দুর টেবিলে স্তব্ধতা। স্তব্ধতা সকালের সেই কথাকাটাকাটির পর থেকেই। ডাক্তার এসেছিল। স্বাতী এক্স-রে করে এসেছিল। বিকেলের মধ্যেই দিব্যেন্দু এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। তেমন কিছু নয়, সামান্য আঘাত। এক্সারসাইজে সেরে যাবে। গরম-ঠাণ্ডা কনট্রাস্ট বাথ ইত্যাদি।

তবু এত করেও স্বাতীর মন পাচ্ছে না বেচারা। এখন বারকয় স্তব্ধতা ভাঙতে চেয়েছিল দিব্যেন্দু, স্বাতী শুধু চোখে-চোখে তাকিয়েছে। হঠাৎ দিব্যেন্দু বলল, ওদের এত সাহস হবে? আমার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, তোমার দায়িত্বই বেশি ছিল আমার চেয়ে। একটা কিছু ঘটলে তোমার মা কী বলবেন?

স্বাতী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কী ঘটবে?

দিব্যেন্দু বলল, বিয়ে। সে না হয় ঘটল। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, শুভর মত বাউন্ডুলে ছোকরা—না আছে তেমন শিক্ষা-দীক্ষা, না সঙ্গতি। কল্পনা তোমার সঙ্গে যেভাবে মানুষ হয়েছে, তাতে ওর ভবিষ্যতটা কী হতে পারে অনুমান করছ?

স্বাতী একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা বিয়ে করবে ভাবছ কেন?

দিব্যেন্দু আকাশ থেকে পড়ল।...মাই গুডনেস! তুমি কী ভেবেছ তাহলে? সকালে বেরিয়েছে দুটিতে। এখনও ফিরল না। পুলিশের কাছেও যেতে নিষেধ করছ।

স্বাতী বলল, দুজনে একসঙ্গে তো বেরোয় নি শুনলাম।

এসব ব্যাপারে একসঙ্গে ওরা বেরোতে পারে না। এটা বোঝাই যায়।... দিব্যেন্দু বলল।... আগে-পরে বেরিয়েছে। নীরেন আর বিভাসের সঙ্গে শুভ বেরিয়েছিল। 'আঁধারমহল' না কোথায় মাটির তলায় কবরখানা আছে। তার ভিতর তিনজনে ঢুকেছিল। তারপর নীরেন আর বিভাস একে একে বেরিয়ে আসে। শুভর পাত্তা নেই। নীরেন বলল—দারোয়ান ওকে বলেছে—গঙ্গার পাড়ের দিকে সুড়ঙ্গ মত একটা ভাঙা দরজা আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা ভেবেছিল—সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে শুভ চলে গেছে।

স্বাতী বলল, চলে যাবে কেন? ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না?

দিব্যেন্দু বলল, অপেক্ষা করা উচিত ছিল। করে নি। তাতেই বোঝা যায়, ব্যাপারটা কী। নীরেনও সেইরকম আঁচ করেছিল। আজ ভোরে নাকি দুজনে সুইমিং পুলের ওখানে আপত্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল—নীরেন দেখেছে।

স্বাতী কড়াস্বরে বলল, স্টপ ইট।...

ইরার মুখটা বিষণ্ণ আর গম্ভীর। চোখের নীচেটা কালচে দেখাচ্ছে। চাপা-গলায় উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছিল সে।... তুমি এখন থেকে যাচ্ছ কিনা বলো।

দীপেন হাসি দিয়ে প্রতিহত করছিল আক্রমণ। বলল, অত ভীতু কেন তুমি? দ্যাখো তো, তোমাদের চীনাদি দিব্যি একা কাটাচ্ছেন, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইরা বলল, নিজের কাজে এসেছ জানলে আমি আসতামই না। কেন আনলে আমাকে? যতসব ভুতুড়ে জায়গা আর নোংরা লোকের কারবার।

দীপেন হঠাৎ চমকে উঠল যেন।... নোংরা লোক মানে?

ইরা চাপাগলায় বলল, কেন, শোন নি, চোখেও পড়ছে না কিছু?

না তো? দীপেন মাথা দোলাল।... কারো সঙ্গে আজ কথাই বলিনি বিশেষ।

ইরা টেবিলে ঝুঁকে বলল, কাল রাত্রের সব ব্যাপার তো বলেছি তোমাকে। আজ দুপুর থেকে সেই মেয়েটি আর কাঁচ-ছেলেটির পাত্তা নেই! আশ্চর্য, ওরা দিব্যি নির্বিকার!

দীপেন সকৌতুকে বলল, কবির সঙ্গে কাল কিন্তু বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছ!

ইরা নাক কুঁচকে বলল, চেহারা-কথা-বার্তা দেখে তো টের পাই নি, অমন লোফার!

ছেড়ে দাও। ...দীপেন বলল।... আমার আর একটা সকাল লাগবে। ইচ্ছে হলে দুপুরের গাড়িতেই চলে যাবো আমরা।...

নীরেনদের টেবিলে কথাবার্তা চলেছে। বিভাস চিন্তিতমুখে বলছিল, একটা ভুল হয়ে গেছে। 'আঁধারমহলে'র ভিতরটা খুঁজে দেখা উচিত ছিল আমাদের।

নীরেন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, চোখে তো কিছু দেখা যায় না। যা অন্ধকার।

বিভাস বলল, কাছেই বাজার। মোম-বাতি কিনে আনতাম।

নীরেন হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে একটা ভঙ্গী করল—মুখটা বিরক্ত।...ছেড়ে দিন। ও কচিশিশু নয়। একটা সামান্য জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না বুঝি? কল্পনার পাত্তা নেই দেখেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না আপনি?

তা ঠিক। বিভাস মাথা দোলাল।...কী আশ্চর্য কারবার দেখুন তাহলে। বেশ ফাঁক বুঝে শুভবাবু কেটে পড়লেন। কল্পনা ওদিকে হয়ত স্টেশনে কথামত অপেক্ষা করছেন। তারপর......ফিক-ফিক করে চুপি চুপি হাসতে লাগল বিভাস।...

রিসেপসানে সুরঞ্জন গম্ভীরমুখে হিসেবপত্র লিখছিল। শম্ভু এসে বলল, একটা কথা বলছিলাম স্যার। আজ আমার বাসায় না গেলেই নয়। বউর অসুখ—আপনার দিব্যি...

সুরঞ্জন ধমকাল।...ফের সেই ঘ্যান-ঘ্যান। খাবার দেওয়া হয়েছে সব?

হয়েছে আজ্ঞে।

তবে ভাগ্।

শম্ভু কাঁচুমাচু মুখে দু'পা এগোল। ......পাহারা দিয়ে কী হয় বলুন স্যার? আপনিও তো বুঝতে পারছেন—এসব হল ভেতরেরই ব্যাপার।

ধমকাতে গিয়ে সুরঞ্জন তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, হ্যাঁ রে শম্ভু, আজ কোনকিছু চোখে পড়েছে তোর?

সাহস পেয়ে শম্ভু ঘনিষ্ঠ হল। ফিস-ফিস করে বলল, পড়েছে। রোগাদাদাবাবু আর ড্যাবডেবে দিদিমণিটি সকাল থেকে নেই। ভোরবেলা দুজনের ব্যাপার-স্যাপার যা হয়েছিল, আপনাকে বলেছি। সকালে আর ওপারে আসিনি। বাবুর্চির কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, পিছনের সিঁড়ি বেয়ে দিদিমণি নামছে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাঁৎ করে বাগানের ভিতর

চলে গেল। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আর দেখা গেল না ওনাকে। বাবুর্চিকে দেখালাম ব্যাপারটা। ভাবলাম, এবার নামবেন রোগাবাবু। কিন্তু কতক্ষণ হয়ে গেল, ওনার পাত্তা নেই। পরে দেখি তিন ছোকরাবাবু বেরোচ্ছেন এখান দিয়ে—তাদের মধ্যে একজন তিনি।

সুরঞ্জন যেন মনশ্চক্ষে উপভোগ করছিল দৃশ্যটা। বলল, কিন্তু ওরা সবাই চেপে যাচ্ছে ঘটনাটা। লক্ষ্য করেছিস? কেউ বলছে না কিছু। আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম—ওই নীরেনবাবুকে। বলল, বাইরে কোথাও গেছে নাকি। এখন রাত নটা কুড়ি—এখনও ফিরল না দেখছি।

শম্ভু বলল, আপনারও স্যার একটা দায়িত্ব আছে কিন্তু।

সুরঞ্জন চমকাল।...যা বলেছিস। একটা ভালমন্দ হলে তখন যত ঝামেলা আমার ঘাড়ে পড়বে।

শম্ভু বলল, মন্দ আর কী হবে? ধরুন, যদি ওনারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন—সে একটা শুভকাজ।

সুরঞ্জন তেঁতোমুখে বলল, যা বুঝেছি মেয়ের বাবা বড়লোক। এদিকে পাত্রর অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে মাত্র। এখন, বাবা যদি কেসফেস ঠুকে দেয়, পুলিশ এখানে এসে জিগ্যেস-পত্তর করবে বৈকি।

শম্ভু সাহস দিয়ে বলল, আমাকে ডাকবেন। সাক্ষী যা দেবার দিয়ে দেব। তা স্যার, আমি আজ বাড়ি যাই?

যাবি?

হ্যাঁ স্যার। মাইরি বলছি, বউটার এখন-তখন অবস্থা।

হাসতে হাসতে সুরঞ্জন বলল, ভাগ ব্যাটা। কাল ভোর পাঁচটায় আসবি কিন্তু।

শম্ভু চলে গেল ডাইনিং হলের দিকে।...

ডাইনিং হলে ভোজনপর্ব সুরু হয়েছে। দেবতোষের টেবিলে ফের প্রসঙ্গক্রমে যুদ্ধ এবং পুরাতত্ত্বের পালাবদল ঘটছে। জানালাগুলো বন্ধ থাকার ভিতরে বেশ ওমের সঞ্চার হয়েছে। কর্ণেল মাফলারটা খুলে হাঁটুর কাছে রেখেছিলেন। সেটা গড়িয়ে নীচে পড়তেই তিনি টেবিলের তলায় ঝুঁকলেন। সেই অবসরে চীনা চোখ টিপল দেবতোষের দিকে। দেবতোষ সে-মুহূর্তে চোখ টেপার কারণ বুঝতে পারেন নি। পরমুহূর্তে অনুমান করলেন, সম্ভবত চীনা ওঁর টাক নিয়ে রসিকতা করল। দেবতোষ সায় দেবার ভঙ্গীতে হাসলেন।

কর্ণেল মাফলারটা গলায় জড়িয়ে বললেন, এত বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়েছে! ভাবা যায় না। গলাটা ব্যথা করছে।

চীনা হলের ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে বলল, এত ঠাণ্ডায় এখনও শুভবাবু বাইরে কী করছেন? এখনও ফিরলেন না দেখছি।

দেবতোষ বললেন, দ্যাট পোয়েন্ট!

চীনা মুখ নামিয়ে একটা মাংস ঠোঁটে রাখল। কামড় দিল না। ওই অবস্থাতেই বলল, কল্পনাও ফেরে নি!

কর্ণেল বললেন, তাই নাকি?

চীনার মুখটা এবার গম্ভীর।...একটা কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে। ওরা থমথমে মুখে বেড়াচ্ছে। জিগ্যেস করেছিলাম, স্পষ্ট জবাব পাই নি।

দেবতোষ চাপা হাসলেন।...আজকাল এই তো চলেছে সবখানে। ইয়ং ম্যানদের যুগ। যে যা খুশি করবে, নিয়ম-টিয়ম নাস্তি। কিন্তু আমাদের ইয়ং এজেতে সব অন্যরকম ছিল। আমাদের গার্জেনরা—বিশেষ করে মেয়েদের এমনি করে বাইরে পাঠানো কল্পনাও করতেন না। কী বলেন কর্ণেল?

কর্ণেল কী যেন ভাবছিলেন। বললেন, আজ সকালে যখন ওপরে তোমার ঘরে বসেছিলাম—একটি মেয়েকে নেমে যেতে দেখছিলাম পিছনের সিঁড়িতে। হাল্কা গড়ন—ডিমালো মুখ, টানাটানা চোখ,... ইয়েস—শাড়ির রঙ খয়েরী...ভাবলাম, তোমাদেরই কেউ।

চীনা বলল, হ্যাঁ। কল্পনা। কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছিল?

দেবতোষ পাংশুমুখে বললেন, ওদিকটা তো জঙ্গল। সাপখোপের রাজত্ব! সর্বনাশ কোন বিপদ ঘটেনি তো?

কর্ণেল বললেন, রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় না। গতরাত্রে একবার জানালা খুলেছিলাম। সেই সময় বেশ কিছুটা দূরে এক ঝলক আলো দেখলাম!......

দেবতোষ সোজা হয়ে বললেন, বাগানের ভিতরে?

হ্যাঁ। তারপর কারা যেন ধস্তাধস্তি করছিল। কিংবা দৌড়োদৌড়ি—ঠিক বুঝতে পারলাম না।...কর্ণেল বললেন।... সকালে ওখানটা ঘুরেছি—মানে তখন জাস্ট ছটা। ভীষণ কুয়াশা ছিল। মজার কথা, ভিতরে হেঁটে গিয়ে একটা গভীর ডোবামত দেখে এসেছিলাম—তারপর চীনা, তোমার হারানো ছবির সাবজেক্ট এবং মোতিঝিলের মসজিদের দেয়ালে শুভবাবু যে কবিতা দেখেছিলেন—তুমিই তো বলছিলে আজ সকালে, কী যেন...মধ্যরাতে ডোবার ধারে...

চীনা রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমি ভাবি নি, আমি ভাবি নি! বড় অদ্ভুত তো।

দেবতোষ উৎকর্ণ হয়ে বললেন, কী কবিতা?

চীনা আওড়াল।...মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠলে চাঁদ। ডোবার ধারে পাতা হরিণ ধরার ফাঁদ। ওই থেকেই ছবিটা মাথায় এসেছিল আমার।

কর্ণেল সস্নেহে তাকালেন চীনার দিকে।...একটা তারিখ লেখা ছিল বলেছিল। কালকের তারিখ।

হ্যাঁ। চীনা জবাব দিল।

এবং কাল রাত্রেই ওইসব ব্যাপার ঘটেছে!... দেবতোষ শিউরে উঠলেন।

কর্ণেল মাথা দোলাতে-দোলাতে থালায় ঝোল ঢেলে নিলেন। বললেন, দুপুরে ইচ্ছে হল ফের যাই একবার—ডোবাটা ভাল করে দেখে আসি, ব্যাপারটার মূলে সত্যি কোন রহস্য আছে কি না! কিন্তু হঠাৎ ফোন এল—পুলিশসুপার বর্মণ এসে গেছে লালবাগ। আমার বন্ধুর ছেলে। যেতে হল সেখানে। এস ডি ও'র বাসায় নেমন্তন্ন।

চনা বলল, তাই দুপুরে আপনাকে দেখতে পাই নি। ভাবলাম, কোথায় গেলেন! একটু গল্পগুজব করার ইচ্ছা ছিল। কাল রাত্রি থেকে মনমেজাজ ভালো নেই। বেরোই নি।

দেবতোষ বললেন, আমার সঙ্গে গেলে দারুণ সব সাবজেক্ট পেতেন।

চীনা একটু হেসে বলল, আমি আপনার মেয়ের মত। তুমি বলেই ডাকবেন।

দেবতোষ কী বলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ সুরঞ্জন এল হন্তদন্ত হয়ে।...নীরেনবাবু, দিব্যেন্দুবাবু। শুভবাবুর খোঁজ পাওয়া গেছে। এইমাত্র ফোন করছিল জাফরাগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে।

দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, কী, কী হয়েছে শুভর?

ঝোড়োকাকের মত চেহারা হয়ে গেছে সুরঞ্জনের। ভাঙা গলায় বলল, আঁধারমহলের ভিতর একটা লাস পাওয়া গেছে। যা বর্ণনা দিল, তাতে শুভবাবু ছাড়া কেউ নয়। পুলিশ অনুমান করে খোঁজ করছিল, হোটেলে কেউউ এ্যাবসেন্ট আছে কি না। মাই গড! এ এক আজগুবী ঘটনা!

খাওয়া ছেড়ে সবাই এঁটোহাতে সুরঞ্জনকে ঘিরে ধরেছে ততক্ষণে।। স্বাতী অস্ফুট চিৎকার করল, আর কল্পনা?

কর্ণেল আর দেবতোষ বাদে সবাই বেসিনের কাছে দৌড়ে গেল হাতমুখ ধুতে। দীপেন বোস আর ইরা থমথমে মুখে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দিব্যেন্দু স্বাতীর হাত ধরে বলল, তুমি চীনাদির সঙ্গে ওপরে চলে যাও। আমি আসছি। না-আসা অবধি দরজা খুলো না।

স্বাতী কচিমেয়ের মত কেঁদে উঠল এবার।...তাহলে কল্পনাও আর নেই! তাকে তোমরা খুঁজে বের করো।

(ক্রমশঃ)

জেমস লোভেল

ফ্রেড হেজ
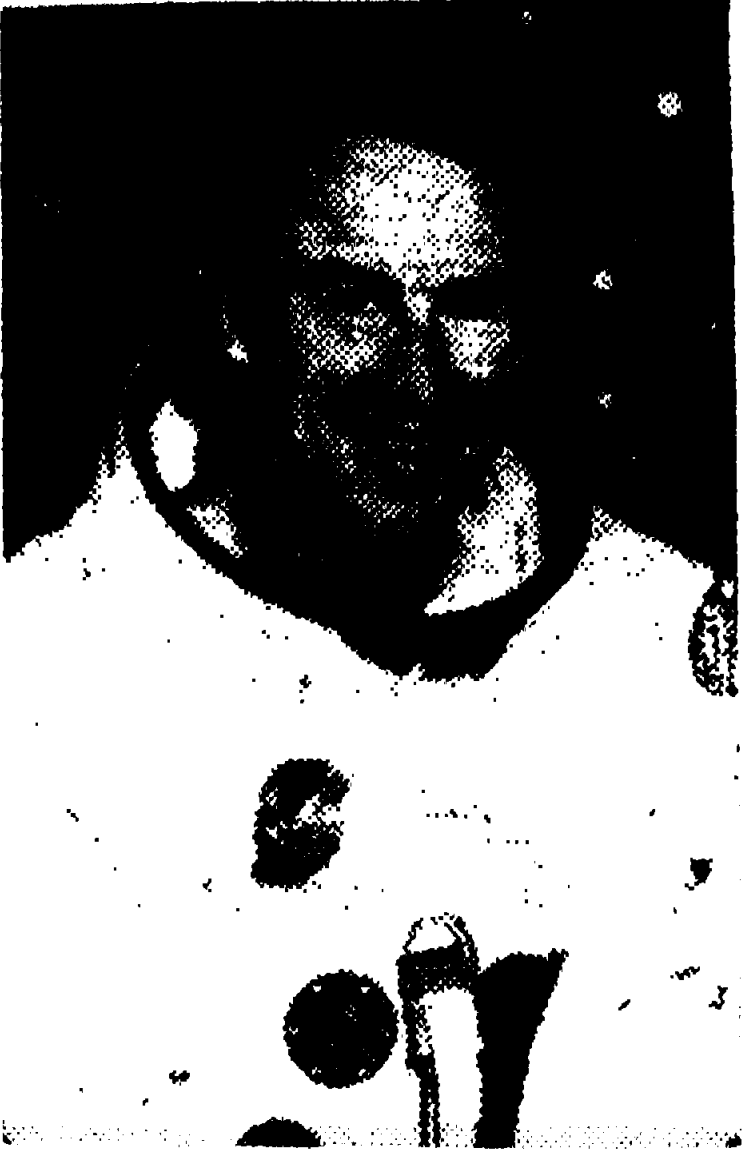
জন সুইগার্ট

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো-১৩

অ্যাপোলো-১৩ অভিযানে বিপর্যয় ঘটেছে। এই লেখা যেদিন প্রকাশিত হবে তার আগেই এই অভিযানের পরিণতি জানা হয়ে যাবে। মার্কিনী নভশ্চররা ইতিপূর্বে একাধিক অভিযানে অসাধারণ বীরত্ব সহ্যশক্তি ও ধীরমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছেন। এবারেও দিচ্ছেন। এবারকার অভিযানের নেতা জেমস লোভেল মহাকাশ অভিযানে একজন অতিশয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। অ্যাপোলো-৮ অভিযানে তিনি ছিলেন, তারও আগে জেমিনি-৭ অভিযানে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পৃথিবীর কক্ষপথে ছিলেন। মহাকাশ অভিযানের আটঘাট তাঁর জানা। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে অ্যাপোলো-১৩ অভিযানের নভশ্চরদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আনতে হলে ব্যক্তিগত ভূমিকা যতোখানি স্থান নিতে পারে তার অতিরিক্তই পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা তো আর শুধু ব্যক্তিগত ভূমিকার নয়। যান্ত্রিক গোলযোগে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যে ব্যক্তিগত ভূমিকা তার পরিণতি ঠেকাতে পারবে না। অ্যাপোলো-১৩ অভিযানের শেষ পরিণতি কী হবে তা এখন বলা সম্ভব নয়। শেষ পরিণতির জন্যে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আমরা শুধু আশা করব, ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই অভিযানে সমস্তটাই ক্ষতি হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু তিনটি অমূল্য প্রাণের ক্ষতি যেন না হয়।

অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযান হয়ে যাবার পরে অ্যাপোলো-১৩ তেমন চমক তুলতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে নভশ্চর বদলে কিছুটা সোরগোল উঠেছিল, কেননা এমনটি আগে কখনো ঘটে নি।

মূল বিষয়গুলিতে এগারো ও বারোর সংগে তেরো অভিন্ন। নভশ্চরেরাও মোটামুটি একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে আসবেন কথা ছিল। তবে এবার নভশ্চররা চাঁদের যে এলাকায় নামতেন তা আগের দুটি অভিযানের নামার এলাকার মতো মসৃণ নয়, উঁচুনিচু ও বন্ধুর। এবারের অভিযানে এই ছিল প্রথম নতুনত্ব। দ্বিতীয় নতুনত্ব, নভশ্চররা দশ ঘণ্টা চন্দ্রযানের বাইরে কাটাবেন। বারোর অভিযানে ছিলেন আট ঘণ্টা। এই বাইরে থাকাটা একবারে নয়, দু-বারে। প্রথম বারে তাঁরা হাঁটতেন বা বলা যেতে পারে ডিঙি মেরে মেরে চলতেন, এক মাইল, দ্বিতীয় বারে পৌনে দু মাইল। সম্ভবত ৫০০ থেকে ৬০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতেও উঠতে হত।

এই দুবার বাইরে থাকার সময়ে নভশ্চররা অবশ্যই নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা রকমের পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাতেন, পাথর সংগ্রহ করতেন ও চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র নিতেন—সবই মোটামুটি বারোর অভিযানের মতোই।

নভশ্চররা এবারে চাঁদের যে এলাকায় নামতেন তার নাম ফ্রা মরো। বিজ্ঞানীদের আশা ছিল এখান থেকে এমন পাথর সংগ্রহ করা যেত যা চাঁদের দেশের আদি পাথর, যা থেকে চাঁদের আদি ইতিহাসও জানা যেতে পারত। এগারোর সংগ্রহে পাথরের বয়স ছিল ৪৫০ থেকে ৪৭০ কোটি বছর পর্যন্ত। বারোর সংগ্রহে ৩৫০ কোটি বছর। এবারে হয়তো হতে পারত ৫০০ কোটি বছর। চাঁদ কেমন করে চাঁদ হয়েছে তার অনেকখানিই লেখা থাকত এই ৫০০ কোটি বয়সের রেখায়।

গত দুবারের মতো এবারেও নানা ধরনের যন্ত্রপাতি চাঁদের মাটিতে রেখে আসা হত, উত্তাপ-পরিমাপক কোনো কোনো যন্ত্র ড্রিলিং মেসিনের সাহায্যে দশ ফুট পর্যন্ত মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে।

গত দু-বারের মতো এবারেও নভশ্চররা চাঁদের মাটি থেকে উঠে আসার পরে চন্দ্রযানটিকে ঘুরিয়ে চাঁদের মাটিতে আছড়ে ফেলা হত। উদ্দেশ্য কম্পন সৃষ্টি করা। তবে এবারের আরো বড়োরকমের কম্পন সৃষ্টি করার কথা ছিল নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে নামার আগে। স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় পর্যায়টিকে এবারে আর সূর্যের কক্ষপথে যেতে দেওয়া হবে না কথা ছিল, চাঁদের মাটিতে আছড়ে ফেলার আয়োজন ছিল।

অ্যাপোলো-১৩ অভিযানের মোট খরচ ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার। নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন বা রেখে আসতেন তার দরুন ব্যয়ের পরিমাণ

ছিল ২৫ মিলিয়ন ডলার। বাকি সবটাই যাতায়াতের জন্যে। চাঁদ পর্যন্ত অবশ্য যেতেই হচ্ছে, চাঁদকে একটা চক্কর না দিয়ে ফেরাটা অসম্ভব বলে, সব যদি ভালোয় ভালোয় শেষ হয় তবুও দূরে থেকে তোলা চাঁদের মাটির কয়েকটি ছবি ছাড়া এই ৩৭৫ মিলিয়ন থেকে কিছুই উসুল করা গেল না।

বিশ্বের নানা দেশের বেশ কিছু বিজ্ঞানী গোড়া থেকেই অ্যাপোলো অভিযানকে সমর্থন করতে পারেন নি। যতোখানি প্রস্তুতি এবং বিশেষ করে উৎকর্ষ থাকলে পরে এ-ধরনের অভিযানে সাফল্যের নিশ্চয়তা থাকে, তাঁদের মতে তা এখনো অনায়ত্ত। স্যাটার্ন রকেট সম্পর্কে যতো কথাই বলা হোক না কেন, তার পে-লোড মোট ওজনের তুলনায় যৎসামান্য। অনেকে এমন রূঢ় মন্তব্যও করেছেন যে চাঁদের দেশে অভিযান চালাবার পক্ষে স্যাটার্ন রকেট অচল। রকেটের আরো উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স-মনুষ্য অভিযান স্থগিত রাখলেই ভালো হত। ততোদিন যান্ত্রিক অভিযান চলুক না কেন, অন্তত অ্যাপোলো-১২ অভিযানের দুজন নভশ্চর তাঁদের মাটিতে নেমে তথ্যসংগ্রহের দিক থেকে প্রয়োজনীয় যা-কিছু সম্পন্ন করেছেন তার সবটাই এবং আরো বেশি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্পন্ন করা যেত—আরো অনেক কম খরচে। অ্যাপোলো-১৩ অভিযানে বিপর্যয়ের পরে 'ন্যাসা' কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই বিষয়টিকে নতুন করে ভেবে দেখবেন।

প্রত্যাবর্তন

নভশ্চর-ত্রয় জেমস লোভেল, ফ্রেড হেজ ও জন সুইগার্ট ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ১১-৩৭ মিনিটের সময়ে নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মানুষের গত পাঁচ হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসে প্রত্যাবর্তনের অনেক স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ আছে — কখনো যুদ্ধজয়ের শেষে, কখনো দুর্গম অভিযানের শেষে। কিন্তু অ্যাপোলো—১৩ নভশ্চর-ত্রয়ের এই প্রত্যাবর্তন মানুষের ইতিহাসে স্মরণীয়তম—উভয় কারণেই। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সকাল ৯-২৪ মিনিটে অ্যাপোলো—১৩ ব্যোমযানে বিপর্যয় ঘটে। তারপরের ইতিহাস ৩ দিন ১৪ ঘণ্টা ৯ মিনিটের। ৮৬ ঘণ্টার সামান্য কিছু বেশি। মানুষের পুরো জীবনের তুলনায় হয়তো সামান্য। কিন্তু মার্কিন দেশের তিনজন নভশ্চরের এই ৮৬ ঘণ্টার দুর্ধর্ষ ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে — বীরত্বের দিক থেকে, মৃত্যুর সামনে অবিচলিত থাকার দিক থেকে, জল-হাওয়া-উত্তাপহীনতার অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যে ধীরমস্তিষ্কে কর্তব্য পালন করার দিক থেকে—দ্বিতীয় কোনো ঘটনা ইতিহাসে নেই। নভশ্চররা নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে নিজেরা বড়ো হয়েছেন, মানুষকেও আরো বড়ো করে তুলছেন। অ্যাপোলো—১৩ অভিযানের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু জেমস লোভেল ফ্রেড হেজ ও জন সুইগার্টের অতুলনীয় কৃতিত্ব তাতেও কিছুমাত্র ম্লান হয় না।

চাঁদ সম্পর্কে তথ্য

গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানীর একটি সম্মেলন হয়ে গিয়েছে টেক্সাস-এর হাউস্টন-এ। তাঁরা আলোচনা করেছিলেন অ্যাপোলো-১১ সংগৃহীত চাঁদের উপকরণ বিশ্লেষণের ফলাফল নিয়ে।

একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত যে চাঁদের ও পৃথিবীর বয়স সমান : ৪৬০ কোটি থেকে ৪৭০ কোটি বছর। পৃথিবীর জন্ম হবার পরে চাঁদের জন্ম, পৃথিবীরই খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদের সৃষ্টি—এমনি যেসব তত্ত্ব এতকাল চালু ছিল তা এই নিশ্চিত আবিষ্কারের পরে সম্পূর্ণভাবেই বাতিল হয়ে গেল।

অ্যাপোলো-১১ সংগৃহীত পাথরের টুকরো থেকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে পরিচিত ৬৮টি মৌলিক পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে নেই এমন তিনটি নতুন খনিজ পদার্থও পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ একই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই খনিজ পদার্থ তিনটি রূপায়িত। এ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন সহজেই বাষ্পীভূত হয় এমন সমস্ত পদার্থ চাঁদের জন্মের গোড়ার দিকেই চাঁদের মাটি ত্যাগ করেছে।

চাঁদের মাটির সঙ্গে পৃথিবীর মাটির মিল আছে কি? বিজ্ঞানীরা জবাব দিয়েছেন, হুবহু মিল নেই। উল্কাপিণ্ডের পদার্থের সঙ্গেও নয়। কেন নেই? এ-নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নানা বিজ্ঞানী নানা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। আশা করা গিয়েছিল অ্যাপোলো-১৩ সংগৃহীত ফ্রা মরোর পাথর হাতে পাওয়া গেলে বিষয়টির উপরে নতুন আলোকপাত করা যাবে। কিন্তু অ্যাপোলো-১৩ অভিযানের বিপর্যয়ের পরে আপাতত তার সম্ভাবনা নেই।

চাঁদের জন্ম কি ভাবে? এ প্রশ্নের জবাবেও বিজ্ঞানীরা একমত নন। নানা জনের নানা মত।

বিজ্ঞানীরা একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। একই স্থান থেকে সংগৃহীত পাথরের কোনটির বয়স ৩৭০ কোটি বছর, আবার কোনটির ৪৭০ কোটি। অথচ এই ৪৭০ কোটি বছর আগেই চাঁদের জন্ম। এ-ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীকেই নির্ভর করতে হয়েছে উল্কাপিণ্ডের পতনের ওপরে।

এ-থেকেই আলোচনা উঠেছে চাঁদের উপরিতল নিয়ে। সৌরমণ্ডলে চাঁদ এই একটি নয়, সবশুদ্ধ ৩২টি। কাজেই, চাঁদের উপরিতলটি কিভাবে তৈরি হয়েছে, এ-প্রশ্নের আলোচনা এমন একটি তত্ত্বে পৌঁছনো উচিত যাতে ৩২টি চাঁদকেই তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-আলোচনাও শেষ হয় নি।

বিজ্ঞানীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে প্রচুর তথ্য উপস্থিত করেছেন, বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। কল্পনার সাহায্যে একটি তত্ত্ব খাড়া করা আর তথ্যের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব গড়ে তোলা এক কথা নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য হাতে আসার পরেও হয়তো দেখা যায় ঠিক প্রয়োজনীয় তথ্যটি তবুও নাগালের বাইরে। তখন অপেক্ষা করতে হয়।

বিজ্ঞানীরা তাই অ্যাপোলো—১৩ অভিযানের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অ্যাপোলো—১৩ অভিযানে চাঁদের এমন এক এলাকা থেকে পাথর সংগৃহীত হবার কথা ছিল যা থেকে হয়তো এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি পাওয়া যেত।

আপাতত তাই এ-আলোচনা চলতেই থাকবে।

কমলালেবুর দিন

কমলালেবু আমাদের দেশের অধিকাংশের রোজকার খাদ্য-তালিকায় পড়ে না, এমন কি কমলালেবুর সময়েও নয়। তবে কমলালেবু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি আছে, এসব খবর আমরা সবাই রাখি। অনেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলে থাকেন, ওষুধ-ডাক্তারের খরচের চেয়ে রোজ অন্তত একটি করে কমলালেবুর খরচ আখেরের অনেকখানিই কম। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান, রোজ অন্তত একটি করে কমলালেবু খেয়ে যেতে পারলে অনেক অসুখ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মার্কিন দেশের এক দল বিজ্ঞানীর গবেষণায় কমলালেবুর এই রোগহর-ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বলছেন, কমলালেবুর মধ্যে নাকি ভিটামিন ছাড়াও আছে এমন সব অপরিহার্য তৈলপদার্থ যা জীবাণু-রোধী। এই তেল তাঁরা বার করেছেন কমলালেবু, পাতিলেবু ইত্যাদি কয়েকটি লেবু জাতীয় ফলের খোসা থেকে। তারপরে এই তেল তাঁরা মিশিয়ে রাখেন কয়েক জাতের জীবাণুর সঙ্গে দু-দিন পরে দেখা যায়, জীবাণুর বাড়-বৃদ্ধি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি ঠেকানো গিয়েছে, কোনো ক্ষেত্রেই ৯০ শতাংশের নিচে নয়।

দুধের সঙ্গে এই কমলালেবুর তেল মিশিয়ে দেখা গিয়েছে দুধ বেশ কয়েক সপ্তাহ মজুদ রাখা চলে, নষ্ট হয় না। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, শিগগিরই এমন দিন আসছে যখন কমলালেবুর তেল-মেশানো দুধ বাজারে বিক্রি হবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ক্রেতারা সেই 'ভেজাল' দুধই বেশি পছন্দ করবেন, কেননা খাঁটির চেয়ে ভেজালের এক্ষেত্রে ঠিক থাকার ক্ষমতা অনেক বেশি। শুধু দুধ নয়, চোখের কাজলে ও প্রসাধন সামগ্রীতেও কমলালেবুর তেলের গন্ধ পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। জেনে রাখা ভালো, চোখের কাজলে ও প্রসাধন সামগ্রীতে জীবাণুর আক্রমণ ঘটে থাকে খুব বেশি মাত্রায়।

—অয়স্কান্ত
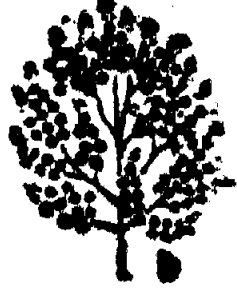
পাহাড়ে মেয়েরা

'বাঃ, দিব্যি আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছ? আর আমাদের ক্যাম্প ফায়ারের মহড়ার জন্যে তাড়া লাগিয়ে এলে।'

সুজাতার তাগিদে পাথরের কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। কিন্তু যাবো কোথায়? নিচ থেকে কাঠ এসেছে শুধু রান্না করার মতো। কাজেই বাইরে ফায়ার প্লেস হচ্ছে না। তাঁবুর মধ্যে আসর বসানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

ডাকা মাত্র একে একে মেয়েরা তাঁবুতে ঢুকতে লাগলো। গুটিশুটি মেরে, ঠেসেঠুসে ঢুকছে তো ঢুকছেই। ফেদার জ্যাকেট পরে, স্লিম ফিগারেরও ফুলো ফুলো চেহারা। তা সত্ত্বেও নজন ভেতরে—ছোট্ট তাঁবুটি ফেটে যাবার উপক্রম। তাও শেফালী বাদ। ওর তাঁবু থেকে শোনা যাচ্ছে, 'যেমন বোকা তোরা। নিজের তাঁবু ঠান্ডা করে পরেরটা গরম করছিস। রাতে শুতে এসে বুঝবি মজা।' বেজায় চটেছে। সারা সন্ধ্যে পারুদির মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুখী হয়ে কাটাতে হবে। সর্বজ্যেষ্ঠা পারুদি ক্যাম্প ফায়ারে নেই।

উত্তর কাশীতে পৌঁছানোর দুদিনের মধ্যেই আমাদের সমাবর্তন। আবার সেদিনই শুরু হচ্ছে নিয়মিত লেডিজ কোর্স। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চল্লিশটি মেয়ে আসবে। সেদিনের ক্যাম্প ফায়ারে তাই আমরা বাংলার নিজস্ব কিছু তুলে ধরতে চাই। ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্য-নাট্য হবে। শ্যামা। ঘাড় ধরে মহড়া শুরু হল। সুতপা আর সুদীপ্তা দরদী কণ্ঠে একের পর এক গান গেয়ে চলে। আমরা নীরবে শুনি।

হাসির ব্যাপারও আছে। সবচেয়ে জমাট হবে আশা করছি—পাসিং দি পার্শেল। অনেকটা র‍্যাগিং আর মিউজিক্যাল চেয়ারের সংমিশ্রণ। বাজনা থামার সময় যার কাছে পার্শেল থাকবে, সে ওর মধ্যে লেখা কাজ করতে বাধ্য। এই একটা সুযোগ—স্টাফ, তাদের স্ত্রী, মাননীয় অতিথি, নতুন শিক্ষার্থী, যাকে যেরকমভাবে ইচ্ছে বিব্রত করা যায়। ভেবেচিন্তে পার্শেলের গায়ে নির্দেশ লিখতে থাকি। নটি মেয়ের হাসির দমকে তাঁবু কাঁপতে থাকে।

খাবার ডাক পড়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বার হওয়া দুঃসাধ্য। জোঁকের মতো লেগে রয়েছি এ ওর গায়ে। এমন উষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে, বাইরের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিতেও ইচ্ছে করছে না।

কোনমতে বেরিয়ে আসতেই হল। বেশ রাত হয়েছে। এককোণে একটি পাথরের গুহার মধ্যে আমাদের রান্নাঘর। ইন্সট্রাক-টাররা খাওয়া শেষ করে শুতে চলে গেছে। আরাম করে উনোনের চারপাশে বসে ডাল-রুটি আর টিনের তরকারী চিবোই। নিভন্ত কাঠের মিটি মিটি আগুন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারই মাঝে মাঝে সাদার অস্পষ্ট আভাস। তুষারে ঢাকা তাঁবুগুলো আঁধারের গুরুভার ঠেলে ফুটে উঠতে সাহস পাচ্ছে না যেন।

নীলু কানের কাছে কলকল করে, 'বুঝলে, স্কীম করতে বসে একটু পাঁজি-পুঁথি সামনে রেখো। এমন তপোবনে নিয়ে এসেছ ঘোর অমাবস্যায়। এর পরের বারে যখন আসবো তখন চাঁদনী রাত হওয়া চাই।'

'থামোতো। আসছে বার তো আমরা চাঁদেই যাচ্ছি ক্লাইম্ব করতে। সেখানে যতো ইচ্ছে চাঁদনী রাত কোরো। চাইকি, পৃথিবী রাত করতে পারো।'

সুজয়া গুহ

অনুরাধার বকবকানিতে আমার হঠাৎ টনক নড়ে। সুদীপ্তাকে বলি, 'ওহে ন্যাতা। কালকের আরোহণ সূচীটা আওড়াওতো শুনি।'

'অ্যাঁ—তাই তো—ইন্সট্রাকটারের সঙ্গে আজ কোন কথাই হল না।' কাঁচুমাচু মুখে সুদীপ্তা রুটিগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে।

'ভাবছিস কেন? সাত সকালে উঠে কাঁপা গলায় গান ধরবি—হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা......' কল্পনা বাসন ধুতে ধুতে গান জুড়ে দেয়।

'কাল দিনের আলোয় বরং সুজাতা, সুজয়াদি শ্যামা-বজ্রসেনের নাচের মহড়া দিক। আজতো আর সেটা হল না। উনিশ তারিখের ফাংশনে পারফেক্ট করতে হবে তো।' শেফালী গম্ভীর মুখে ফোড়ন কাটে।

ভৈরী হতে যথারীতি সেই আটটা বাজলো। জামিত গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টোপগের মুখ ভার। কাল থেকে বাক্যালাপ বন্ধ। আজ দেখছি অবস্থা আয়ত্তের বাইরে।

টোপগে বেসিকের মেয়েদের আলাদা করে ডেকে নেয়, 'তোমরা আজ মেরু হিম-বাহের দিকে যাবে। পথে সতেরো হাজার ফুট উঁচু মোরেনের দেয়াল পেরোতে হবে। চলো, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো। এতো বেলা করে বেরোচ্ছ, কখন ফিরবে জানি না।' কথা শেষ করেই টোপগে রওনা হয়। পেছনে অপরাধীর মতো সার বেঁধে চলে—অনুরাধা, কল্পনা, শেফালি, সুতপা ও নিলু।

ওদের চলার পথে চেয়ে থাকি। সেই কলকাতা থেকে এতদিন ছিলাম একসঙ্গে। এই প্রথম আলাদা হলাম। সবাই সুস্থ শরীরে ফিরবে তো?

তুষার গাঁইতি উঁচিয়ে জামিত আমাদের দেখায়, 'শিবলিঙ্গ শিখরের উত্তরঢালে পাশাপাশি দুটো গিরিবর্ত্ম দেখতে পাচ্ছো? মাঝখানে বেবী শিবলিঙ্গ বা ব্ল্যাক পিক। তোমাদের যে কোন একটি গিরিবর্ত্মে উঠতে হবে। উচ্চতা হবে উনিশ হাজার ফুটের মতো।'

'আজ উঠবে পুরোপুরি নিজেদের হিম্মতে। কোন পথে কিভাবে উঠবে—ঠিক করবে তোমাদের লীডার। আমি আর মোহন দূর থেকে তোমাদের অনুসরণ করবো। বিপদে পড়লে বা পথে নিশানা না খুঁজে পেলে আওয়াজ দিও। আমরা মদত দেবো।'

'মিসেস্ গুহ, তুমি এগিয়ে যাও। তুমি আজ লীডার।' নাটকীয় ভঙ্গীতে ডায়ালগ শেষ করে।

'কোই বাত নেহী।' আপন মনেই বলি। টিলা থেকে তরতর করে নেমে আসি মাঠে। সূর্যের উজ্জ্বল আলো রাঙিয়ে তুলেছে আমাদের তাঁবু, ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। ভিজে ঘাস ভোরের আলোয় মাথা দুলিয়ে কী বলছে—সুপ্রভাত? না—যেমন ধিঙ্গিপনা, বুঝবেখন মজা?

সেই ছোট্ট নদীটি। স্তব্ধ, ধ্যান মৌন। ওর কাকচক্ষু জল এখন স্ফটিক কঠিন।

উষার আলোর পরশে এক বর্ণালী পরিবেশ। আলোর উষ্ণতায় আলোর খেলা ফুরিয়ে যায়, শিশু নদীর ধ্যান ভাঙে। বরফের আবরণ খসে পড়ে। ছল ছল শব্দে, শিশুর চাপল্যে আবার সে কল্লোল চলে।

আহা, বেচারী পাখি! আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে আবক্ষ তলিয়ে আছে নদীর জলে। শাদায়-কালোয় মেশানো পানকৌড়ির মতো অর্ধেক ডাঙায়, অর্ধেক জলে। মৃদু টোকা দিই। নিথর নিস্পন্দ। জলের আশায় এসে, হিমে অবশ হয়ে গিয়েছিল। তারপর মরণ এসেছে নিঃশব্দে এই তপোবনে। চল্ তোকে অমর করে রাখি। সন্তর্পণে তুলে রুকস্যাকে ভরি। এই শীতে দু-তিনদিন অবিকৃত থাকবে। নিচে নেমে স্টাফ্ করে নিম্-এর মিউজিয়ামে রেখে দেবো।

অজেয় শিবলিংগ। ওই আমাদের ধ্রুবতারা। ওকে লক্ষ্য করেই আমরা এগিয়ে চলি।

গগনস্পর্শী হর্মের মতো উদ্ধত প্রথম দিকে ঘাসে ছাওয়া চড়াই। বেজায় গরম। হাঁপিয়ে উঠছি। ধরাচূড়ো অসহ্য লাগছে। উইন্ডপ্রুফ খুলে ফেলি। ব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। বোঝা বাড়াবো কেন। একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখি। ফেরার পথে নিয়ে যাবো।

ঘাসের রাজ্য ছাড়িয়ে এসেছি পাথরের রাজ্যে। একি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড! দাঁতার মতো মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। অতিকায় পাথরের ব্যূহে আমরা ক্ষুদে বামনবীর। আমাদের অস্থির আস্ফালনে ওরা নির্বিকার। দুইঘণ্টা ধরে ক্রমাগত পাথরের পর পাথর ডিঙোচ্ছি।

যতো উঁচুতে উঠছি, বরফের পরিমাণ বাড়ছে। পুরু বরফ জমে আছে পাথরের মাথায় মাথায়, খাঁজে খাঁজে, ফাটলে ফাটলে। বোঝাই যায় না কোথায় গর্ত। মানুষ শিকারের জন্যে প্রকৃতির ফাঁদ। আমরা সচেতন, সতর্ক। তুষার-গাঁইতি ঠুকে ঠুকে প্রতিটি পা ফেলছি। মাঝে মাঝে তুষার-গাঁইতি তলিয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থ ফাঁদের শুচি-শুভ্র মুখোশ খুলে, অন্তহীন কৃষ্ণকায় স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে।

দুশ্চিন্তার বোঝা ভারী হয়ে উঠছে। এতগুলো মেয়ে চলেছে আমার নির্দেশে। যদি কেউ আহত হয়? বরফ সরিয়ে পাথরের ওপর পা রাখার জায়গা করছি। তা সত্ত্বেও বরফে ভিজে জুতো একেবারে জবজবে। পায়ের আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যথায় টনটন করছে। এটা আমাদের নির্বুদ্ধিতার খেসারত। যেমন পুরু চামড়ার ক্লাইম্বিং বুট না পরে হান্টার পরেছি। একমাত্র কমলা বুট পরেছে। শিবির থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না যে এখানে এতো বরফ। পায়ের যন্ত্রণায় একটা নতুন ভয় ঢুকেছে মনে—তুষারক্ষত হবে না তো?

পাথরের এলাকা এখনও শেষ হয়নি। তবে পাথর আকারে ছোট হয়ে এসেছে। মাড়িয়ে যাওয়া যায়। বরফও নেই, কারণ খুব খাড়া ঢাল। পাথরগুলো একেবারে ঝুরঝুরে। ক্ষণে ক্ষণেই ওরা ঝরণার মতো বেগবতী হতে চায়। কিছুক্ষণ প্রবাহের পর আবার আপন মনেই ব্রেক কষে। পাথরের প্রবাহের মধ্যে পড়ে, মাঝে মাঝে আমরাও চলি নিচের দিকে। হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে মনে পড়ে ছোটবেলার কথা, অংক কষার কথা—একটি তৈলাক্ত বাঁশে একটি বাঁদর যদি এতো মিনিটে এতো ফিট ওঠে, আর এতো ফিট নামে, তাহলে......

তাহলেও আমরা উঠছি। বেশ তাড়াতাড়িই উঠছি। আজ আমরা বিশ্রাম নেবার ছুতোয় বসে পড়ছি না যেখানে-সেখানে। একে তো পায়ের ভয় মাথায় উঠেছে। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে নির্ঘাৎ তুষার-ক্ষত। পা চালিয়ে গা গরম রাখাই এখন বাঁচার একমাত্র রাস্তা। তাছাড়া সব দায়িত্ব আজ আমাদের নিজেদের কাঁধে। কেউ দেখার নেই—ভুল শুধরে দেয়ারও কেউ নেই। ভারতীয় অভিযানে অভিনব—যে একটিও পুরুষ পথপ্রদর্শক নেই।

অতিকায় পাথর যদি মাতাল হয় তবে বড্ড ভয়ের কথা। একেবারে বেসামাল হলে আর কথাই নেই। নিমিষে কোথায় তলিয়ে যাব! খাড়া ঢালে পাথরের স্তূপ পর্বতাভিযানের সবচেয়ে বড় বাধা। প্রতিটি পাথর একটি মৃত্যুর পরোয়ানা। মনে পড়ে অনিমা সেনগুপ্তার কথা। সেই বলিষ্ঠ মহিলা কতো দুর্গম তুহিনরাজ্য পাড়ি দিয়ে মরণকে বরণ করলেন মাত্র দশ হাজার ফুটে—গড়িয়ে আসা পাথরের আঘাতে।

নতুন হাঁটিতে শেখা শিশুর মতো, প্রতিটি মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ার আতঙ্ক। চারিদিকে অতিকায় পাথরের নিদারুণ নৈরাজ্য। শেষপর্যন্ত বহু-প্রতীক্ষিত সেই বিপদটি এলো। একটি বিসদৃশ পাথর আমাকে ঠেলে দ্রুত নামতে লাগলো। সতর্ক ছিলাম। তাই ঘোড়সওয়ারের মতো আততায়ী পাথরটির ওপর চেপে বসে রইলাম কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর ঠাঁই খুঁজে চট করে নেমে গেলাম একপাশে। ওর নামার পথে পড়ে গেলে এতক্ষণে আমার আর চিহ্ন থাকতো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি—আন্দোলন সংক্রামিত হয় কিনা।

প্রকাণ্ড পাথরটি সরে যাওয়া বিরাট একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। ঐ পথে আর এগোই না। স্বপ্না দেখি অন্য পথে সিঁড়ি ভাঙা শুরু করেছে। ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। ও যে পাথরে পা দেয়, সেটাই দুলে উঠছে। শেষে হতাশ হয়ে বসে পড়ে স্বপ্না। আমিও বসি। প্রথম পদস্খলনের পর আমার একটু অস্বস্তি লাগছে। কমলা ও সুদীপ্তা নিঃশব্দে এসে বসে। সুজাতা কিছুটা নিচে বসে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

কি আশ্চর্য! একবারও মনে আসে না যে তোপের মুখে বসে আছি। আমাদের বসার আসনগুলো যদি নড়েচড়ে ওঠে। ওদের যদি একটু স্বিপ্রাহরিক ভ্রমণের ইচ্ছে জাগে। আমাদের বহুখ্যাত রসনা দিয়েও কি ওদের নিরস্ত করা যাবে? নশ্বর ধানী-লংকা শিলনোড়ায় বাটার মতো, মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাবো। আর ওপর থেকে যদি তুষারধস বা পাথরের পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়। তাহলে তো দলে দলে স্বর্গলাভ। আর যদি ছিটকে আসা ছোট্ট একটি পাথর, আদর জানাতে মাথায়, নাকে বা চোখে লাফিয়ে পড়ে......?

বহু নিচে বিশাল বোল্ডারগুলোকে নুড়ির মতো দেখাচ্ছে। আরও নিচে সবুজের অস্পষ্ট আভাস। আমরা ঐ তীক্ষ্ম চড়াই বেয়ে, আলগা পাথরের প্রস্রবণ পেরিয়ে, এতো ওপরে উঠে এসেছি—নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

হিমবাহের ওপারের শৃঙ্গগুলো প্রখর রোদে ভাস্বর। ভাগীরথীর তিনটি চূড়া বর্শাফলকের মতো ঝিকমিক করছে। অকস্মাৎ গগনভেদী দামামা—পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি, ভাগীরথী ১ রের নিস্তরংগ শিখর ভেঙে নেমে আসছে তুষারের বন্যা। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সোচ্ছ্বাসে শতধা হয়ে ঝড়ে পড়ছে পেঁজা তুলোর মতো। সূর্যকিরণ আপন মনে সেই হিম-পুঞ্জে রামধনুর আলপনা এঁকে চলেছে। আজ কি ওখানে বসন্তোৎসব? নানা রংয়ের ফাগ উড়িয়ে ভাগীরথীর তিন কন্যা আমাদের ডাকছে?

তুষার-কন্যা হারিয়ে গেছে, রামধনুও মিলিয়ে গেছে। ভাগীরথীর শুভ্র হিমশীর্ষে ফুটে উঠেছে এক গহ্বর। ভেতরে তার উজ্জ্বল নীলিমা-মাখা। নগ্ন নীলাভ হিম-শীলা।

ওদের চমক এখনও ভাঙেনি। যাক, ওরা বিশ্রাম করুক। আমি ততক্ষণে পথ খুঁজি। পথ মানে দেহ-ভার গ্রহণের মতো অটল অনড় পাথর। শেষে খুঁজে পেলাম সেই 'পরশ' পাথর। আনন্দে চিৎকার করি, 'এবারে তোমরা এস।'

জবাব নেই। নাম ধরে ডাকি। এবারে উত্তর আসে। স্বপ্না ও সুদীপ্তার পায়ের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই পা নিয়ে পতনোন্মুখ পাথরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করা যায় না। কি আশ্বাস দেবো? বলতে পারি না—চলে এসো, কোন বিপদ হবে না। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত অপঘাতের

আত্মরক্ষা করে নিয়ে আসছে। আঘাতের কথা বাদ দিলেও, তুষারক্ষত হলে কি করবো? তবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলি, 'আর বেশী দূরে নেই।' ওরা নিরুত্তর।

তবে কি এবারের মতো এখানেই শেষ? এখান থেকেই ফিরে যাবো সবাই? মন যে সায় দিচ্ছে না। শরীরে কোন ক্লান্তি নেই, প্রাণে কোন ভয় নেই, মনে এক অদম্য আশা—যাবো ঐ গিরিবর্ত্মে, উপল অবরোধ পেরিয়ে।

মন বলে একলা চলো। হঠাৎ শুনি, 'সুজয়াদি, আমি আসবো।' কমলা বলছে। নিশ্চয়ই আসবে। সঙ্গী পেলাম।

নিভৃত নিস্তব্ধ শিলাকীর্ণ পাহাড় ভেঙে আমরা দুজনে নীরবে উঠছি। খুব ভাল লাগছে। সেই শিশুকালে স্বপ্নে দেখা দিনগুলি যেন সত্যি হল। রাজপুত্র আর কোটালপুত্র ঘর ছেড়ে চলেছে কোন অচিন দেশে — চলেছে বনবাদাড় পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। সঙ্গে সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, হাতে শুধু খোলা তলোয়ার। দৈত্য দানো, রাক্ষস খোক্কস বিকট মুখে পথ জুড়ে দাঁড়ায়। ওরা কিন্তু ভয় পায় না—ওরা যে চলেছে রাজকন্যার কাছে।

কি সাংঘাতিক জায়গায় এলাম! ধসে পড়া জীর্ণ প্রাসাদের মতো একটা গোটা পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে আছে। রাশি রাশি ভারী ভারী চাকলা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। নড়া লাগলে নির্ঘাৎ ভূমিকম্প। থ্রিলের অনুভূতি ফিকে হয়ে আসছে। একনাগাড়ে ছ' ঘণ্টা ধরে শুধু পাথর আর পাথর।

কমলা আর আমি দুদিকে সরে গিয়ে, ধস বাঁচিয়ে পথ খুঁজি। কমলা ডাকে 'সুজয়াদি এদিকে এস, এইদিকে পথ। জামীত সিং-এর গলা পেলাম, এইদিকে।'

আর ধস বাঁচিয়ে নয়—ধসের ওপর দিয়েই বেড়ালের মতো লঘু পায়ে উঠতে থাকি। চারিদিকে পাথরের বড় বড় চলটা অ লগোছে ঝুলছে। কোন মতে মাথা বাঁচিয়ে চলি। সামনে একটা ফোকর। তার ভেতরে মাথা গলাতেই পৌঁছে গেলাম আলোর জগতে।

দাঁড়িয়ে আছি একটি অতি সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে। পূবে ও পশ্চিমে খাড়া ঢাল নেমে গেছে কোন অতলে। একটি বিরাট গিরিশিরার মধ্যে এইটুক অংশ চাপা—তাই গিরিবর্ত্ম। গিরিশিরাটি দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে কৃষ্ণচূড়ায় (ব্ল্যাকপিক)। জামীত হেসে বলে, 'আমি এই গিরিবর্ত্মের নাম বাংলায় মিসেস গুহ পাস্।' সহানুভূতির ছোঁয়ায় অবরুদ্ধ দুঃখকষ্ট উদ্বেল হয়ে ওঠে। বলি, 'আমার পা অসহ্য জ্বালা করছে। নির্ঘাৎ তুষার-ক্ষত হয়েছে।'

তবু আশ মেটে না। কয়েক ফুট উঠলেই শিখর আরোহণ। ঐ তো শুভ্র মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণকান্তি কৃষ্ণচূড়া। কতটুকুই বা দূর? নিশ্চয়ই পারবো। আর ব্যথা ঐ শিখরের জন্যে ব্যথা ও উপেক্ষা করতে পারি। জামীত আমল দেয় না, দেখছো না কি রকম পাথর পড়ছে? বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ছটফটানিও বাড়বে। ও সব বুদ্ধি ছাড়ো। এই ঢের হয়েছে।'

চারিপাশে শুভ্র শিখরের মেলা। এতো কাছে এতো চূড়া কখনও দেখিনি। উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ শিখরের পশ্চিমে মেরু, ভৃগু, আরও দক্ষিণে কীর্তিস্তম্ভ কেদারনাথ। রক্তবাহী ধমনীর মতো অসংখ্য গিরিশিরা, শাখা প্রশাখা মেলে দিগন্ত ছেয়ে আছে। আর আছে সবুজ সাদা কালো, স্লেটরঙা পাহাড়ের ঢেউ—ঢেউয়ের পর ঢেউ। মাঝখানে আমি। আমাকে ঘিরে প্রকৃতি তার শাশ্বত সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে। নয়ন ভরে দেখি। শুধু দেখি আর দেখি। আর ভাবি......

এই হিমালয়। আমরা কতো ঋণী এর কাছে। সুউচ্চ সীমান্ত প্রহরী, আমাদের দেয় বনজ সম্পদ, দেয় পলিমাটি, হিমবাহ গলিয়ে দেয় জল আবার মৌসুমী বায়ু প্রতিহত করে, বর্ষা আনে দেশে। হিমালয় নিঃসৃত জলধারা উত্তর ভারতকে করেছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। মানব সভ্যতার জন্মলগ্নে আর্য ঋষিরা দলে দলে ঘর বেঁধেছেন হিমালয়ের পললে গঠিত এই সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায়। তাঁদের উপাসনা, জ্ঞান ও কৃষ্টির আলোয় ভারত জগতসভায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছিল।

ঐ শিখরাশ্রিত হিমপুঞ্জ, দেবাদিদেব রুদ্রের মতো স্রষ্টা ও সংহারক। হিমযুগে হিমবাহগুলো হিমালয় ছেড়ে, উন্মত্ত হয়ে সমতলে নেমে এসেছে। সমাধিস্থ হয়েছে উষ্ণযুগের জীব ও উদ্ভিদ। আবার উষ্ণযুগের আবির্ভাবে, হিমবাহ বাহিত পলিমাটিতে নতুন জীব, নতুন উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে। হিমবাহপুষ্ট নদীর জলে তারা পুষ্টিলাভ করেছে।

হিম আর উষ্ণ যুগের আবর্তন হয় অতি ধীরগতিতে—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় পৃথিবীর আবহাওয়া। সৃষ্টির আদি থেকে কতবার হিমযুগের প্রচণ্ড শৈত্য ভারতকে গ্রাস করেছিল জানি না। ভারত যখন ছিল দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে, তখনকার শৈত্য সহজেই অনুমান করা যায়। বহু যুগ পরের কথা। তখন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড বিষুবরেখায়—তার উত্তর ও দক্ষিণে সাগর। এমন সময় হিমযুগ এল। উত্তরের টিথীস সাগর আর সেই সাগরে নেমে আসা নদীনালা ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। বিষুবরেখার উত্তাপ ভারতকে রক্ষা করতে পারলো না। হিমাচ্ছাদিত হল ভারতভূমি। তখন হিমালয় ছিল না। হিমানীর পৃষ্ঠপোষক ছিল উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী, উত্তর-পূর্বে আসাম পর্বতমালা আর দক্ষিণে পূর্বঘাট। বাংলা-বিহার জুড়ে ছিল ৭০।৮০ ফুট দীর্ঘ বৃক্ষের ঘন অরণ্য। তাও চাপা পড়ল হিমবাহের নিচে। সেই অরণি থেকে সৃষ্ট হয়েছে কয়লা—আমাদের আধুনিক সভ্যতার ধারক।

এল উষ্ণ যুগ। বরফ গললো, হিমভূমি সংকুচিত হল, হিমবাহ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে কোথাও বা মুছে গেল ধরাপৃষ্ঠ থেকে। মুক্ত জলধারা আর বাষ্পীয় বৃষ্টি-ধারা সাগরকে পুষ্ট করল। সেই টিথীস পশ্চিম থেকে ছুটে এল পূবে, প্লাবিত করল তার ছেড়ে আসা খাত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা থেকে নদীর সঙ্গে ভেসে আসা হিমখণ্ড লীন হল টিথীসের প্রশস্ত বক্ষে। আজও পাঞ্জাবের সল্ট রেঞ্জ অঞ্চলে দেখা যায় হিমখণ্ডের সঙ্গে ভেসে আসা পাথরের স্তূপ। ভাবলেও অবাক লাগে যে চিতোর-উদয়পুর, ধানবাদ-রাণীগঞ্জ ও তালচের-ভুবনেশ্বরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো বিশাল হিমপ্রবাহ।

হিমালয় সৃষ্টির পরেও পৃথিবীতে হিমযুগ এসেছিল। তবে ভারতের সমতল ভূমিকে গ্রাস করতে পারেনি। কারণ উত্তর থেকে নেমে আসা হিমভূমির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল হিমালয়। তা হলেও অনুকূল পরিবেশ পেয়ে হিমালয়ের হিমবাহগুলো ছ' হাজার ফুট পর্যন্ত নেমে এসেছিল। প্রচণ্ড শীতে ডায়নোসোরিয়া, শিবথেরিয়াম প্রভৃতি বিশালাকৃতি প্রাণী দলে দলে মারা গেল। কিছুকাল পরে হিমবাহ সংকুচিত হল—উষ্ণ আবহাওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্ম নিল। এইভাবে গত দশ লক্ষ বছরে, হিমালয়ের হিমবাহগুলো চারবার বড় হয়েছে—আবার সংকুচিত হয়েছে।

আমরা এখন হিমান্তর যুগের উষ্ণতায় বাস করছি। আগামী দিনে হিমবাহগুলো আবার নেমে এসে, হাজার বছর ধরে ভারতকে জরাগ্রস্ত করে রাখতে পারে। এমনকি লক্ষাধিক বছরের স্থায়িত্ব নিয়ে আরেকটি শীতল মহাকালের সূচনাও করতে পারে।

তবে আপাতত পৃথিবীর বেশীর ভাগ হিমবাহ দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। নগরের উত্তাপ, কারখানার ধোঁয়া ও আণবিক বিস্ফোরণ আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তুলছে। তাই অতীতের তুলনায় গত পঞ্চাশ বছরে, হিমবাহগুলো অনেক বেশী তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছে।

অথচ, একই আবহাওয়ায় ওয়াশিংটন অঞ্চলের দুয়েকটি এবং আলাস্কার ছ'টি বড় বড় হিমবাহ বনজঙ্গল ভেঙে নেমে আসছে সমতল ভূমিতে। গ্রীনল্যাণ্ড আর দক্ষিণ মেরুর হিমভূমি স্ফীত হয়ে উঠছে। দু'টি দেশের মধ্যভাগ বরফের প্রচণ্ড চাপে সমুদ্রসমতা থেকে নিচে নেমে গেছে।

হিমবাহের মেজাজের হদিশ পেতে আর আবহাওয়ার পরিবর্তনের সূত্র বার করার জন্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বহু হিমবাহে ও হিমভূমিতে গিয়ে গবেষণা করছেন। জানার চেষ্টা করছেন, আগামী দিনে আবহাওয়া আরও উত্তপ্ত হবে, হিমবাহ সংকুচিত হবে, সাগরে প্লাবন আসবে, না শৈত্য বাড়বে, হিমভূমি বিস্তারিত হবে, পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই হবে প্রথম হিমযুগ।

ভূত্বকের আবির্ভাবের প্রশ্ন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই সূত্রে গাঁথা আছে পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। উত্তর মেরু কি গ্রীনল্যাণ্ড ও আলাস্কার দিকে সরে আসছে? দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বেশ কয়েক ইঞ্চি নেমে গেছে। এটা কি ভূত্বকের ভারসাম্য হারানোর পূর্ব লক্ষণ? যে অস্থির আলোড়ন থেকে হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল, তারই কি পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে?

হয়তো তাই। ভূত্বক তার স্থিতাবস্থা হারিয়েছে। হিমবাহনিঃসৃত জলরাশি বিপুল পরিমাণে কাঁকর-বালি এনে জমা করছে সাগরের বুকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর আশী লক্ষ টন পলি জমা পড়ে সাগরে আর বঙ্গোপসাগরে জমা পড়ে প্রতিদিন উনিশ লক্ষ টন—দশ লক্ষ টন আসে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন থেকে আর ন লক্ষ টন আসে আসাম থেকে। দ্রুততালে পাহাড় ভাঙার জন্যে ভূত্বকের ভারসাম্য আর বজায় থাকছে না। কোন কোন অঞ্চলে আবার অত্যধিক বরফ জমার জন্যে ভূত্বকের ওপর চাপ পড়ছে।

মানুষের মতো বস্তুও তার নষ্ট ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। খানিকটা নড়ে চড়ে গা ঝাড়া দিয়ে, ভূত্বকের পুনর্বিন্যাস—এই চেষ্টারই ফল। অগ্ন্যুৎপাত তুষারঝঞ্ঝা আর মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেবে পৃথিবীর নতুন মানচিত্র, নতুন হিমালয়।

তখনও কি মেয়েরা পাহাড়ে বসে আমাদের কথা, অতীতের কথা ভাববে? কিন্তু আমাদের যদি কোন চিহ্ন না থাকে? পাঁচ হাজার বছরের যত্নে গড়ে তোলা মানব সভ্যতা যদি মুছে যায়—মহেঞ্জোদরো ও সুমের সভ্যতার মতো?

কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ বেঁচে থাকবে। বিবর্তনের ফলে হয়তো মানুষ হবে মাথা-সর্বস্ব, ক্ষীণ তনু। তারা উপনিবেশ স্থাপন করবে নতুন মহাদেশে, নতুন গ্রহে, নতুন উপগ্রহে।

"ওরে নামো নামো! দুটো বেজে গেছে।"

আকাশটা ঝাঁকিয়ে নামতে ইচ্ছে করছে না। আজকেই শেষ। কাল সকালে তপোবন থেকে পাড়ি দেবো কলকাতার পথে। মনে পড়লেই বিদায় ব্যথা গুমরে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। জানি না আবার কবে ফিরে আসবো, ধ্যানগম্ভীর এই তপোভূমিতে।

"না না। আর দেরী নয়। পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কাঁধের তো বড়ো ভয় নামার সময়।"

শেষ বারের মতো খুঁকে দেখি, গিরি-বর্তের পশ্চিম ঢালে—মেরু, ভৃগু আর শিবলিঙ্গের তুষারধারা বয়ে নিয়ে চলেছে মেরু বামক—উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে। বেসিকের মেয়েদের ঐখানে আসার কথা। এতো উঁচু থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

"কি হচ্ছে? একটুনি পড়তে টুপ করে চার হাজার ফুট নীচে। ঐ মেরু বামকেই তোমার শেষ শয্যা হতো। দু হাত চওড়া গিরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছ—খেয়ালই নেই, আশ্চর্য!"

কথা না বাড়িয়ে নামতে শুরু করি। ফিরে যেতে মন চায় না। মেরু বামকের শুভ্র তুষার স্তূপে হারিয়ে গেলে মন্দ হতো না। লক্ষ বছর পরে কোনো বিজ্ঞানী প্রকৃতির এই কোল্ড স্টোরেজ খুলে আবিষ্কার করতো আমার ফসিল। সাজিয়ে রাখা হতো কোন যাদুঘরে। ভীতি বিস্ময় আর অপ্রীতির দৃষ্টি নিয়ে দেখতো—যেমন আমরা আজ দেখি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের প্রাচীন ডায়নোসোরাস আর ছ' লক্ষ বছরের পুরনো ম্যাস্টোডনের কংকালের দিকে। কেউ হয়তো তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বলতো ভাগ্যিস আমি ঐ রাক্ষসীর যুগে জন্মাইনি।

উত্তমাঘেষে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য
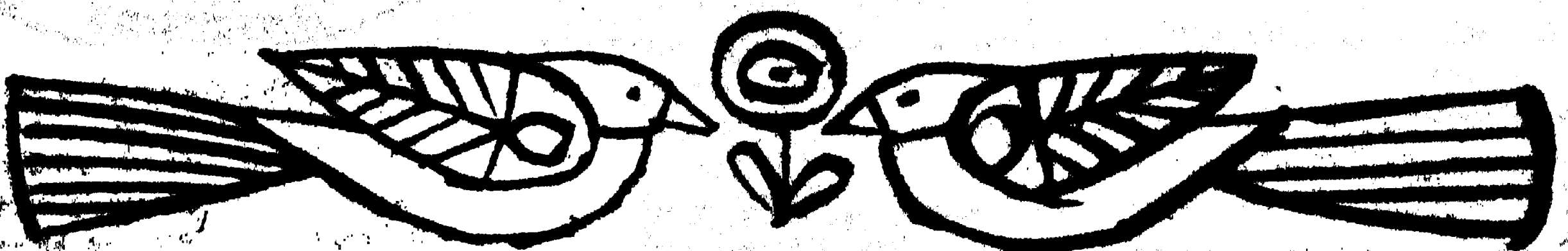
।। আট ।।

তখন গভীর রাত। দরজা'র ওপাশে কড়া নড়ে উঠল।

চোখে ঘুম ছিল না। চুপ-চাপ শুয়ে-ছিল চন্দ্রচূড়। অন্ধকারে অপলক চেয়েছিল। স্কাইলাইটের ফোকর গলিয়ে বর্শাফলার মত দীর্ঘ আলোর রেখাটাই অন্ধকার দেয়ালের গায়ে স্থির, অনড় হয়ে বিঁধে-ছিল। যে কারণ সারা ঘরে আলোর অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়ে। নিকষ, নিরন্ধ্র রাত্রির বুকে এক টুকরো উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু পরিপূর্ণ আকাশ, নক্ষত্র দেখা ভার। অথচ আছে সব। চন্দ্রচূড় জানে, কি দিন, কি রাত, কারো কাছেই কেউ মৃত কিংবা বিগত নয়। চিরদিনের মত হারিয়ে যাবার সাধ্য কারো নেই। কোথাও না কোথাও রয়ে গেছে সবাই। একদিন আচমকা দেখা মেলে। বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায় দেহ-মন অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন। এরই নাম ভালো-বাসা, প্রাণের আবেগে মেশা টান। দিশে হারিয়ে মানুষ শুধু নিজেকে খুঁজে পায় না কোথাও। জগৎ যে নিজেকে নিয়ে একলা বাঁচে না। নদ-নদী, গিরি-কান্তার-মরুভূমিই শুধু নয়। আছে মানুষ, আছে হিংস্র আর অহিংস অসংখ্য প্রাণ। বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ সব নিয়ে, সমস্ত মিলিয়েই জগৎ জগৎ হয়ে টিকে আছে।

কিন্তু এত থাকা সত্ত্বেও কে কার ব্যথা বোঝে? তার কাছে ধরা দেবে বলেই কি তৈরী হয়ে ছিল মোহিনী? তার আসার পথ চেয়ে বসেছিল এতকাল? চন্দ্রচূড় ভেবে পায় না। নিজেকেই চেনা ভার। সংসারে নিজেকে জানাই যে সব জানা। প্রেমে-বিরহে নিজেকেই তা নিরন্তর আবি-ষ্কার করে চলেছে মানুষ। নতুন করে পরিচয় হচ্ছে নিজের সঙ্গে। হয়তো এত ঘটনার পেছনে মোহিনীর হাত ছিল না কোথাও। শুধু চন্দ্রচূড়ের ভালো লাগা আর না লাগার হাতে সহজ-সরল বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে সুখী হতে চেয়েছে সে। অথচ বিপুল বৈভব, প্রতিপত্তি আর সম্মানের ভেতরে তার জন্যে আজ রাণীর আসন পাতা। আগলে রেখেছে নিজেকে জড়িয়ে রাখা ছাড়া সর্বকিছুই তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন দুর্গাকুমার

কিন্তু কী দিতে পারে চন্দ্রচূড়। নিজেকে ছাড়া আর কী দেবার আছে তার? কথাটা মোহিনীও জানে। তবু কেন এমন করে পাগল করে তাকে? ভাবতে ভাবতে ভয়ঙ্কর অসহায় বোধ করে চন্দ্রচূড়। তার কিছু করণীয় নেই, করবার শক্তি নেই কিছুই। তবু স্বপ্নে-কামনায় দেহ-মন অস্থির, উন্মাদ হতে চায়। তবে কি নিজেকেই পরিপূর্ণভাবে মোহিনীর কাছে মেলে ধরতে চেয়েছে সে? ভুল করে হলেও ভালোলাগার কথাটাই ভালোবাসা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে? মনে পড়ছে না। বরং তেমন কথা ভাবতে গেলেই লজ্জায়, সঙ্কোচে সমস্ত অন্তর আরক্ত হয়ে ওঠে। মনে পড়ছে, না জানিয়ে প্রায় চুপি-চুপি এসেছিলেন। আবার তেমনি চুপ-চাপ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সব কথা সাঙ্গ করার তাগিদ ছিল না যেন। অথচ অনেক কথা বলতেই আসা তাঁর। নিজেকে উজাড় করে কাঁদার অবকাশ জীবনে আর কতটুকুই বা মেলে? সেই দুর্লভ মুহূর্তই হয়তো আচমকা আজ তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল বিনা নোটিশে, প্রায় অজান্তে। আজ নিজের কাছেই অসহ্য, অপরাধী হয়ে উঠেছেন তিনি। কে তাঁকে বোঝাবে, অপরাধ কারো নয়? প্রবৃত্তির কাছে শেকলে বাঁধা পোষা কুকুরের মত আমরা সবাই। নিজের কাছে ক্ষমার অযোগ্য কেউ না।

আজ কেন যে নতুন করে অপরাধীর মনে হচ্ছে নিজেকে! আর কেন মনে পড়ছে

[illegible] কথা, মায়ের কথা। যেন মা মানেই [illegible], [illegible] মানেই আশ্রয়, আশ্রয় মানেই শান্তি। [illegible] [illegible] জুড়োবার ঠাঁই। একে-একে [illegible] [illegible] চোখের সামনে ভাসে, [illegible] [illegible] আবার কোথায়, কোন অঞ্চলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মেলে না। যেন [illegible] [illegible] দেখা কত, ঘুন্টি, [illegible] [illegible] জ্বালানো যান; ট্রামের [illegible] [illegible] সকালে প্রথম শিশির লাগা ঘাস, নতুন বইয়ের গন্ধের মত এক-একটা দুপুর—[illegible] হুড়ে-হুড়ে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত আচমকা একদিন এইখানে, এই চড়ায় এসে ঠেকে যাওয়া। ইচ্ছে হয় এখন, এই মুহূর্তে ফিরে যাবার। কিন্তু কোথায় যাবে সে? আর যদি কিছুই ফিরে না পায়? সেই পথ-ঘাট, ময়দান, ট্রামের জানলায় পরিচিত মুখ, দুপুরে বানের জলে স্ট্র্যান্ড রোডের হঠাৎ নদী হয়ে যাওয়া। ভাবতে গেলেই মাথাটা ঝিম-ঝিম করে। কেমন খাপছাড়া ঠেকে সব। নিজেকে দুর্বল মনে হয় থেকে-থেকে। যেন কতকাল শুয়ে আছে বিছানায়। শরীরে প্রচণ্ড তাপ নিয়ে একলা অন্ধকারে পড়ে আছে! সূর্যের মুখ অবধি দেখে না কতকাল! অথচ মুঠোর ভেতরে আছে সব। সুখ, সম্পদ, ভালোবাসা। যা নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়ে মানুষ মরিয়া। যা না পেলে জগৎ অন্ধকার ঠেকে। কিন্তু কী দেবে চন্দ্রচূড়? প্রেম? ভালোবাসা? মোহিনীর মন? কিন্তু কে দেবে? নিজেকে অমন করে অকপটে দেবার সাধ্য আছে কার? কে-ই বা দিতে পেরেছে? বরং কল্পনার ভেতরে বেঁচে থাকাই ভালো। স্বপ্নে বিচরণে যত সুখ, জাগরণে কে দেবে তেমন? কেউ না। জেগে উঠলেই মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়। খোয়ারিভাঙা মাতালের মত তখন তাকে চেনা দায়। সংশয়ে, সন্দেহে চন্দ্রচূড় তাই কণ্টকিত হয়ে থাকে। কারণ সে জানে একদিন নিজেকে গুটিয়ে নেবে মোহিনী। ঘর-মুখো মন একদিন তাকে [illegible] কথাই মনে পাড়িয়ে দেবে। তখন স্বামীই হবে একমাত্র সম্বল। সন্তান হবে একান্ত কামনা। তখন পৃথিবীটা বুড়িয়ে যাবে আরো। চোখের সামনে মস্ত নীল আকাশখানাই মনে হবে আবছা, ধূসর। আর আজকের এই প্রেম, এই ভালোবাসা, এই হাসা, এই কাঁদার স্মৃতিই অট্টহাস্যে ভরে তুলবে মন।

অবশ্য সমস্ত ঘটনাই যে তাকে বিরূপ, বিমুখ করে তুলেছে তা নয়। বরং মাঝে মাঝে মোহিনীর কাছে আসা, নিঃশব্দে চলে যাওয়া, অন্তরঙ্গের মত অর্থহীন কথা বলা তাকে তৃপ্ত করে; তৃষ্ণায়, দহনে এক-একটা মুহূর্ত উত্তাপে ভরে যায়। সে এক আশ্চর্য সুখ যার অর্থ নেই, যুক্তি নেই। তবু অনুভবে যার নিশ্চিত উপস্থিতি তার দেহে-মনে, রক্তের গভীরে কান্নার মত জড়িয়ে থাকে। তখন যুগ-যুগান্তের পসরায় নিয়ে তার চোখের সামনে প্রায় শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে এক-একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। দু'চোখ জুড়ে জেগে থাকে অনিদ্রার জ্বালা। এবং সাময়িকভাবে হলেও এইসব বিরল মুহূর্তে নিজেকে সফল, সার্থক মনে হয়। অথচ মধুকিরণীকুমারের প্রতি ঘৃণা কিংবা হিংসা পোষণ করার মত যথার্থ কারণ খুঁজে না পেলে অপরিসীম ক্লান্তিবোধ করে চন্দ্রচূড়। কখনো বিস্বাদ, বিরক্তিকর ঠেকে সব। কারণ এখনো বিবেক নামক সেই প্রবল শক্তি থেকে-থেকে তাকে [illegible], পবিত্র হবার [illegible] [illegible] [illegible] মত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে এলে মোহিনীকে দেখতে পায়। পলকে সারা দেহ অসাড়, অবশ হয়ে গেল যেন। স্থান-কালের বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সহজ হতে পারে না চন্দ্রচূড়। কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে সব। পথ আগলে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। সরে যাবার কথা মনে পড়ে না। বিস্মিত বিমূঢ় চোখে অপলক চেয়ে থাকে। তাহলে সত্যিই কি মোহিনী এল? মাটির ঢেলার মত সব সম্পদ, সমস্ত সম্মান তুচ্ছ করে পায়ে ঠেলে চলে এল আজ? এ যে স্বপ্নের অতীত ছিল এতকাল। কল্পনার অগোচর! অভিভূতের মত আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কী ভেবে অবাক হবার বিন্দুমাত্র ভান না দেখিয়ে নিজেকে আরো কঠিন, আরো কঠোর সংযত করে তোলে। সাহসের কথা মনে পড়লে তারিফ না করে পারে না। কিন্তু এ যে পাপ! এ যে অনাচার! অন্ধকারে নির্লজ্জের মত কী খুঁজে বেড়ায়। কামনা-বাসনায় আতুর, উদ্বেল মোহিনীকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সারা দেহে, সর্ব অঙ্গে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় তাকেই যে নারী পুরুষের যৌবনের, স্বপ্নের, সাধনার চিরন্তন ধন। আলতো করে উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে তার চিবুক ছুঁয়ে গেল। নাকে লাগল প্রসাধনের মৃদু সুবাস। কথা বলার শক্তি নেই। গলা বুজে আসে। কিন্তু কী বলে ফেরাবে মোহিনীকে? কোথায়, কেমন করে ফেরাবে? আজ, এই মুহূর্তে সে যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে কোথায় যাবে মোহিনী? হয়তো এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে, আরো গভীর হতাশায়, বঞ্চনা আর বিষাদের ভেতরে কাঙালের মত কেঁদে বেড়াবে চিরকাল। তাহলে করণীয় কিছুই কি নেই আর? দেবার মত সম্পদ? বড় দীন মনে হচ্ছে নিজেকে। কিছু যদি না পাই, না দিতে পারি যদি তাহলে এইখানে কেন আসা? এই সংসার, যৌবন, প্রেম, হৃদয় নিয়ে এত যুদ্ধ, এত রক্ত, এত অপচয় কেন তবে?

'দাঁড়িয়ে রইলে যে? পথ ছাড়ো!'

'কোথায় যাবে তুমি? অন্ধকার দেখতে পাচ্ছো না?'

'আমার আর ভয় নেই। ভয়-ভাবনার বেড়া ভেঙে চলে এসেছি আজ। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে চন্দ্র? বলতে গেলে কথাগুলি থরথরিয়ে কাঁপে। গলাটা ভাঙা-ভাঙা। মোহিনীর কি কষ্ট হচ্ছে খুব? এখুনি অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলবে, ভেঙে পড়বে নাকি? বিব্রত বোধ করে চন্দ্রচূড়। ভয়ে, অস্বস্তিতে থেকে থেকে শিউরে ওঠে হঠাৎ।'

'আহ্! অমন করে বলো না। ছিঃ! তোমার না স্বামী আছেন?' দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় শাসানির সুরে কথা বলে চন্দ্রচূড়। আর কথা বলতে গিয়ে সারা দেহে অসহ্য কাঁপুনি বোধ করে। চোয়াল [illegible] হচ্ছে ক্রমশ। চাপা গলায় কঠিন ভঙ্গি [illegible] বলে, সরে যাও?

শুনে মোহিনী কী [illegible]। শেষে এগিয়ে এল। বেপরোয়া, বিশৃঙ্খল হতে হতে ঘনিষ্ঠ হল আরো। ঝড়ো হাওয়া লাগা নদী যেমন, নদীর উত্তাল, অশান্ত ঢেউ—তটের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলকে মুছে ফেলতে চায়, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় সব—ঠিক তেমনি অথবা ততোধিক আবেগে, উচ্ছ্বাসে উন্মত্তের মত ভেঙে খান-খান হতে চেয়ে প্রাণপণে বুকের ভেতরে চন্দ্রচূড়কে জড়িয়ে ধরল মোহিনী। চন্দ্রচূড় প্রমাদ গণে। টের পায়, ধীরে, সন্তর্পণে তার দেহ-মন-চেনা থেকে আজন্মের আশ্রিত যাবতীয় শক্তি ও সংযম আপাতত লুপ্ত-প্রায়। অন্ধকার, অচেনা মাঠের মাঝখানে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন পথ খুঁজে খুঁজে অবশেষে ক্লান্ত, হতাশ এবং সন্ত্রস্ত, ঠিক তেমনি চতুর্দিকে নিঃশব্দ কোলাহল, পদ-শব্দ এবং বিসর্জনের বাজনা তার স্নায়ু, ধমনি, মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিণ্ডে স্পন্দমান। মোহিনীকে ঠেলে ফেলে দেবার সাধ্য আর নেই। কারণ, মনে-মনে এখন এই মহিলার জন্যে অক্ষম মমতা বোধ তাকে অস্থির আরম্ভ করে। যার পরিমাপ সাদা চোখে, সহজ বিশ্বাসে করা ভার।

'মোহিনী, আমি ক্লান্ত।'

'আর আমি? আমি যে সব লোভ, সমস্ত সম্পদ ছেড়ে চলে এলাম!'

'কেন এলে, মোহিনী? কার জন্যে?'

বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এল। মাথাটা বুকের ওপরে ঝুলে পড়ল মোহিনীর। যেন মোহভঙ্গের হতাশায় এখুনি নিচে লুটিয়ে পড়বে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। নইলে চন্দ্রচূড় এখনো অটল, আ[illegible] হয়ে থাকে? নিষ্প্রাণ পাথর তো নয়।

'আজ না হোক কাল আমি চলে যাবো, মোহিনী।'

'সেইটুকু আমার লাভ, চন্দ্র। যতদিন বেঁচে থাকবো মনে রাখবেন। জানবো, জীবনে অন্তত একটি মানুষের দেখা পেয়েছিলাম। তার কাছে নিজেকে একটুও গোপন করি নি। সে আমাকে ভালোবেসেছিল।'

'কিন্তু তোমার স্বামী, সংসার, এত সম্মান তুচ্ছ করে কোথায় যেতে চাও? কোন স্বর্গে?'

'তোমার কাছে। তুমি যে আমার বন্ধু, চন্দ্র।'

'লোভ দেখালে ভয় পাই যে।'

'একে তুমি লোভ বলছো? একবার আমার দিকে তাকাও, চন্দ্র। বিশ্বাস করো, আমার ভালোবাসায় ছলনা নেই। এই বুকে বড় ব্যথা, বড় তৃষ্ণা। আমি ঘর পেয়েছি, কিন্তু সেই ঘরে নিজের করে ধরে রাখবার মত মানুষ পাই নি। যাকে পেয়েছি সে দেবতা, নিষ্প্রাণ, পাষাণ। তাকে ভক্তি দিয়ে পুজো করা চলে। আপন ভেবে ভালোবাসা

যায় না।' বলতে-বলতে মোহিনী হাঁপিয়ে উঠেছিল। এবার সে খানিক পিছিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। বুক ঠেলে উঠে আসা কান্নাটাকেই ঢোক গিলে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে চায়। তারপর অতিকষ্টে ধীর, মন্থর গলায় বলে, 'তুমি কি এখনো দূরে সরিয়ে রাখবে, শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে আমাকে?'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো, না?'

'বাসি।'

'অন্ধকারে চোরের মত লুকিয়ে এলে তাই?'

'পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে আমি হেরে গেছি। তুমি আমাকে আমাকে বাঁচাও!'

আর্তনাদের মত শোনায়। মোহিনী বুঝি ভেঙে টুকরো-টুকরো হবে এখুনি। মাথা ঝিম-ঝিম করে চন্দ্রচূড়ের। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি, কার কাছে? তোমাকে নিয়ে কোথায়, কেমন করে যাবো? যাবার জায়গা নেই আমার, শক্তি নেই। এতকালের কামনা-বাসনা যা নিয়ে তিল-তিল করে গড়ে উঠেছিল আমার মন, আমি—সব যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে! এমনি করেই আমি হয়তো রক্তের ভেতরে কামনা-বাসনা নিয়ে অক্ষমতার পায়ের নিচে থেঁতলে যাবো, নিশ্চিহ্ন হবো একদিন! আমার আর কোনো চিহ্ন, কোনো স্মৃতিই পড়ে থাকবে না কোথাও। তখনো কি আমাকেই মনে রাখবে তুমি? আমার প্রেম, আমার ভয়, আমার অক্ষমতাকে স্মরণ করে কেঁদে উঠবে? ধিক্কার দেবে আমাকেই? ভাবতে-ভাবতে অস্থির, বিপন্ন বোধ করে চন্দ্রচূড়। যেমন করে হোক মোহিনীকে ফেরাতে হবে আজ। বুঝিয়ে দিতে হবে এমন করে পালিয়ে গিয়ে তারা সুখী হতে পারবে না কোনোদিন। কাছে-পিঠে কেউ নেই। গাছ-বাড়ি, মাঠ-পথ অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন, বিলীন। হাওয়া নেই। অসহ্য গুমোট। ভেতরে দাঁড়িয়ে সে ভাবে, এখুনি চৈতন্য লুপ্ত হবে তার। বাইরে দাঁড়িয়ে মোহিনী। বাইরে, কিন্তু দূরে নয়। অথচ কি দুস্তর ব্যবধান। একটুখানি ইঙ্গিতের অপেক্ষা কেবল। তাহলে সব ব্যবধান, সমস্ত দূরত্বের বাধা ঘুচিয়ে একাকার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পারে কি? প্রশ্নটা নিজেকেই করে চন্দ্রচূড়। সেই ভয়াবহ পরিণামের শেষ যে কোথায় কেউ তা না জানুক, সে জানে। হাজার বছরের শ্রম আর সাধনায় তিল-তিল করে গড়ে তোলা সভ্যতার সর্বশেষ পরিণতি তারা নয়। যে কারণ, মোহিনীকে ছেড়ে আরো দূরে, বহু দূরে চলে যাবার কথা ভাবে। অন্ধকারে চুপি-চুপি পালিয়ে গেলে কেউ জানবে না। কেবল মনে-মনে মাথা কুটবে মোহিনী। বলবে, ভীরু, বলবে কাপুরুষ। ভালোবাসার শখ আছে, সাহস নেই। দেখা না পেলে রুক্মিণীকুমার কি অবাক হবেন? আহত হবেন? সন্দেহে, সংশয়ে অস্থির, আকুল হবেন আরো? আর যদি না হন? হয়তো প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইবেন। কী জবাব দেবে মোহিনী? সব কথাই কি অকপটে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবে তখন? বলবে, তাঁরই ভয়ে পালিয়ে গেছে চন্দ্রচূড়? শুনে আঘাত পাবেন? দুঃখ পাবেন? না, হয়তো মুখে-চোখে ভাবান্তর-এর চিহ্নমাত্র না ফুটিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেন, তেমনি শব্দ না করেই বাইরে বেরিয়ে যাবেন। কারণ, সে জানে দুদিন পরেই অন্য কেউ হাজির হবে এসে। একেবারে নতুন মানুষ। চন্দ্রচূড় মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে সব। কান পাতলে শুনতে পাবে, সেই স্বর। ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজ কণ্ঠে তাকেও প্রশ্ন করবেন রুক্মিণীকুমার, 'কবে যাবেন?' কড়িরাম তাকেও শোনাবে ফারকুয়ারের ইতিহাস। রোজি ফ্রান্সিসের উপাখ্যান। সৌভাগ্যের শীর্ষারোহণে রুক্মিণীকুমারের বিচিত্র কাহিনী। আর মোহিনী? তাকেও কি এমনি করেই আঁকড়ে ধরতে চাইবে? বলবে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচিনে?'

ঘৃণায়, বিদ্বেষে জর্জর হতে চেয়ে পারে না। বরং আরো দুর্বল, আরো অসহায় বোধ করে চন্দ্রচূড়।

'পারবে, দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে এমনি করে আমার হাত ধরে বেরিয়ে যেতে?'

অন্ধকারে দেখা যায় না। সে যেন হিংস্র হয়ে ওঠে হঠাৎ। চাপা ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তীক্ষ্ণ, সন্ধানী চোখ মেলে চন্দ্রচূড় মোহিনীর সর্বাঙ্গে খুঁজে বেড়ায় বিশ্বাস, সততা আর আত্ম-সমর্পণের প্রতিটি নিখুঁত ভঙ্গী। তার ভালোবাসায় বিলাস আছে কিনা জানা নেই। কিন্তু বিকার? আচমকা মনে হল, এইভাবে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হলে সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। তবু দম বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রচূড়। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের ধ্বনি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। হাত-পা, সর্বাঙ্গ অসাড় ঠেকে। দেহ-মনে এক সর্বব্যাপী অথচ অননুভূত ভয় আর যন্ত্রণা তাকে মূর্তির মত স্থির, আবিষ্ট করে রাখে। রক্তের গভীরে ঘুমন্ত অথচ অনাবিল বাসনাগুলিই ধীরে-ধীরে কোলাহল শুরু করে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে অধীর, উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রচূড়।

'কী ভাবছো মোহিনী? জবাব দাও। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

আবেগে, উত্তেজনায় যতখানি তরল হয়েছিল, চন্দ্রচূড়ের কণ্ঠের উত্তাপে ততোধিক কঠিন হল মোহিনী। বললে, 'তাই কি হয়? আমার মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গেলে চন্দ্র? সকলের চোখের সামনে আমি আমার স্বামীর চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবো? তাহলে আর এমন করে সেজে-গুজে অন্ধকারে আসা কেন? তোমার কথা শুনে পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটাকেই বাতিল করে দিতে হয়।' মোহিনী শব্দ করে হাসে। ঠাট্টা করে কিনা বোঝা দায়। হাসিটা দুঃখের, না ব্যঙ্গের কে জানে।

চন্দ্রচূড় তবু আশ্বস্ত হয়ে শুনে। 'তাই দাও।'

জ্বালা-ধরা গলায় মোহিনী বলে, 'এই তো মুরোদ!'

'নিজেকে গোপন করে কী লাভ?'

'লাভালাভের বিচার এবার থাক। আমাকে ঘরের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে চল।'

'একলাই তো এসেছিলে?'

'তাই বলে এত রাত্রে অন্ধকারে একটা কাঁচাবয়েসী পাগল মেয়েকে — এভাবে ছেড়ে দেবে? কর্তব্য আছে না তোমার? নৈতিক দায়িত্ব? তাছাড়া আমি যে তোমার মনিবের স্ত্রী।'

'চল। সঙ্গে আলো নেবো?'

'লাঠি থাকলে তা-ও নিও।'

'মোহিনী!' সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে রুক্মিণীকুমার ডাকেন।

চমকে ওঠে চন্দ্রচূড়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তিনি হয়তো সব কথাই শুনেছেন। অথচ একবার কাছে আসার তাগিদবোধ করেন নি। তবে কি তিনিও জানেন, বিশ্বাস করেন, মোহিনীর যাবার সাধ্য নেই কোথাও? পালাবার মত সাহস?

মোহিনী অবিচল। দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলে, 'যাই।'

দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যায় মোহিনী। যেতে-যেতে একবার পেছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছা অথবা অবকাশ অবধি নেই আর। ক্লান্তিহীন, উদ্দাম, অফুরন্ত মনে হয় তাকে। এখন তার দেহ থেকে কান্নার, বিষাদের চিহ্নগুলি উধাও। দূর থেকে সব কিছুই রহস্যময় ঠেকে। দেখতে-দেখতে বুকের ভেতরে ফাঁকা, শূন্য হয়ে এল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না চন্দ্রচূড়। ভেতরে-ভেতরে দপ করে জ্বলে উঠল হঠাৎ। অথচ করণীয় কিছু নেই।

'তোমার ঘরের দরজা খোলা দেখেই নিচে নেমে এলাম। শুনলাম সব।' কথা-গুলি আস্তে, বেশ থেমে-থেমে কানে মধু ঢালার মত শুনিয়ে যান রুক্মিণীকুমার। বলেন, 'অন্ধকারে চোরের মত পালিয়ে যাবে মোহিনী? ঘরে যাও। এই ঘর, এই বাড়ি, সমস্ত সম্পদ আজ তোমার। অথচ কিছু দিয়েই তোমাকে ভোলাবার বাসনা আমার নেই। তুমি আমার হয়ে চিরদিন থাকো, এমন কথাও আর বলবো না।'

পা টিপে-টিপে নিজের ঘরে ফিরে আসে চন্দ্রচূড়। দরজায় খিল তুলে দিয়ে ভাবে, আমার সকাল হবে, নতুন করে [illegible]

হবে দিন। কিন্তু এই অন্ধকার লুপ্ত হবে কি? রৌদ্রে-নীলে আবার উদ্ভাসিত হবে আকাশ? আর আবাল্যের পরিচিত অপার নীলিমা? বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসাড় পড়ে রইল চন্দ্রচূড়। সে রাত্রে তার চোখে ঘুম আর আসে নি।

।। নয় ।।

। ড্রাইভারের পাশে চন্দ্রচূড়। পেছনের সীটে পাশাপাশি তারা দুজন। হয়তো জীবনে আজকেই প্রথম এত নিকট, এত ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে তারা। আজ অর কারো মুখেই কথা নেই। কোন দিনই বা থাকে? মোহিনী ভাবছিল, উশ-খুশ করছিল। কিন্তু কথা বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুই। যে কারণ কষ্ট হচ্ছিল খুব। মনে-মনে অস্বস্তির সীমা ছিল না। মোহিনী চন্দ্রচূড়ের মুখ দেখল। বোঝা গেল না, অন্তত আজ এই মুহূর্তে সে খুশি কিনা। নখে-দাঁতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে স্মৃতি ঠিক তার মতই চন্দ্রচূড়কেও আহত, রক্তাক্ত করে তুলেছে কি? বোঝা যায় না। চুপ-চাপ, নিঃশব্দ সবাই। কেবল আহত জন্তুর মত একটানা গাড়ির গোঙানি শোনা যায়। উঁচু-নিচু চড়াই-উৎরাই ভেঙে ধীর-মন্থর বেগে এগিয়ে চলেছে তারা।

সকলের আগে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেছে কড়িরাম। এতক্ষণে সে হয়তো স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ট্রেন সাতটায়। এখনো ঘন্টা-খানেক বাকি। তবু আগে-ভাগেই কিছুটা সময় হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তারা। টিকিট কেটে মালপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে অপেক্ষা করবে কড়িরাম। এত তাড়াতাড়ি তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন ভাবে নি চন্দ্রচূড়। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে কেমন অভিভূত হয়ে আছে। অথচ ইচ্ছে ছিল, সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সে নিজেই পালিয়ে যাবে একদিন। তা আর হল কই? পাকা-পাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল তার আগেই। কাউকে না জানিয়ে রুক্মিণীকুমার নিজেই রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন। এখন পথই এক-মাত্র আশ্রয়। আকাশ ছাড়া মাথার ওপরে আচ্ছাদন কিছু রইল না। যেন ভোগের জন্যে আহরণ নয়, সঞ্চয় নয়। ত্যাগের জন্যে সব। যখের মত সব ধন, সমস্ত সম্পদ আগলে বেড়াবার দায় শুধু তার। অথচ এ আমি চাই নি। রুক্মিণীকুমার সরে যাচ্ছেন স্বেচ্ছায়, না অভিমানে? তাহলে মোহিনীকে সঙ্গে নেয়া কেন? হয়তো জীবনে ফেরার সময় হবে না আর। কিন্তু মোহিনী? মোহিনী কি ভুলে যাবে সব? কোনোদিন তার কথা ভেবে কষ্ট পাবে না? ইচ্ছে হবে না এখানে আসার? মধ্যরাতে যদি কোনো-দিন চোখে আর ঘুম না আসে তখন, তখন কি মনে পড়বে না, পরিপূর্ণ সমর্পণের বাসনা নিয়েই একদিন এই চন্দ্রচূড়ের কাছে ছুটে আসতে হয়েছিল তাকে? তখন গোটা জীবনের বিনিময়ে একটি মুহূর্তের প্রার্থনাই ছিল কেবল।

সেই রাত্রে রুক্মিণীকুমার ডেকে নিয়ে গেলে মোহিনী আর আসে নি। যেকারণ, কাছে পেয়ে আজ, এখন, এই মুহূর্তে হাতে হাত রেখে একবার বলার সাধ হয়, মনে খেদ রেখো না মোহিনী। চিত্তে অকারণ ক্ষোভ নিয়ে অমন করে চুপ-চাপ চলে যেওনা, একটু হাসো, হেসে ওঠো একবার। জীবনে অন্তত বিদায়ের মুহূর্ত-টুকু স্মরণীয় হয়ে থাক। আমরা যে খুঁটোয় বাঁধা জীব। যা ভাবি তা করিনে। যা করি তা বিচার করে দেখিনে। তেমন যোগ্যতা আমার নেই। আমি অক্ষম। হয়তো ভীরু, হয়তো কাপুরুষ। তোমার কথাই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। এবার আমাকে ক্ষমা করো। কার অপরাধে আজ তোমাকে এত বড় দণ্ড মাথা পেতে নিতে হচ্ছে আমি তা জানি। কিন্তু সে মানুষটি কতখানি নিরুপায় সে খবর কি তোমার অজানা? আমি ঈশ্বর মানিনে। পরকালে বিশ্বাস নেই আমার। থাকলে বলতুম, এজন্মে যা হল না, পরজন্মে যেন তা হয়।

'কোথায় যাবেন?' সবিনয়ে জানতে চেয়েছিল কড়িরাম। তাছাড়া অমন করে কথা বলার সাহস আছে কার? তবু বিমর্ষ বিচলিত মনে হয়েছিল তাকে।

'স্থির করিনি কিছুই। আপাতত কলকাতার টিকিট নিও দুখানা। বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রুক্মিণীকুমার। এখন তাঁর কত কাজ! আসলে এসবই ছল। ব্যস্ততার নামে আনমনা হতে চাওয়া। 'আমার আর সময় নেই।' যেন তৈরী হতে, সবকিছু গোছগাছ করে নিতে এখনো বাকি।

'মোহিনীও যাচ্ছে তাহলে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল কড়িরাম।

'চলুক, যেতে যখন চায়!' কথা অসম্পূর্ণ রেখে উদাস, বিষণ্ণ চোখে একবার কড়িরামের মুখ দেখেন। তারপর জানলার শার্সির গায়ে চোখ রাখেন। ওপাশে বহুদূর দিগন্তবিস্তৃত মাঠপ্রান্তর আকাশ আবছা, ধোঁয়াটে অবিচ্ছিন্ন মনে হয়। তিনি আজ আশ্চর্য রকম শান্ত, স্নিগ্ধ, ম্রিয়মাণ। যেন আর কোনো কাজ নেই, ব্যস্ততা নেই। সেই উগ্র, উদ্ধত, মেজাজী মানুষটি কেমন করে না জানি জুড়িয়ে চিরকালের মত শীতল হয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ প্রায় একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর খানিকটা আত্ম-গতভাবে কথায় কৈফিয়তের সুর এনে ধীর-স্থির কণ্ঠে বলে যান, 'আমি কিন্তু জোর জবরদস্তি করছিনে। অধিকারের প্রশ্ন তুলে তাকে বিব্রত করিনি।'

চমকে ওঠে কড়িরাম। এমন করে কথা বলার স্বভাব তাঁর নয়। মানুষটা পাগল হয়ে গেল নাকি! নইলে এ কোন রুক্মিণী-কুমার আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত সহজ, স্বচ্ছন্দ, অকপট হতে চাইছে। চেনা যায় না, বোঝা যায় না! 'সে আপনার স্ত্রী।' কথাটা বুঝি স্মরণ করিয়ে দেবার তাগিদ বোধ করে কড়িরাম। তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় পুরানো, পরিচিত এক-একটা দিন।

'আমি তা ভুলিনি।' মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে রুক্মিণীকুমার ঘুরে দাঁড়ান। বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর। এখনো গম্ভীর চিন্তিত মনে হচ্ছে তাঁকে। যেন অনেক কিছু ভেবে নিয়ে শেষে বলেন, 'বড় ভুল হয়ে গেছে কড়িরাম, বড় ভুল হয়ে গেছে। গোটা জীবন মাটি হয়ে গেল মোহিনীর। কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল ভাবো তো? আমার মত রস-কষহীন তো নয়। অথচ নষ্ট হয়ে গেল সব। এজন্যে তুমি-আমি আমরা দুজনেই হয়তো সমান-ভাবে দায়ী।'

কড়িরাম বিস্মিত না হয়ে পারে না। বড় বিচিত্র এই মানুষ, মানুষের মন। গিরগিটির মত যা প্রতিনিয়ত রং পাল্টে নতুন হচ্ছে। প্রকৃতি, পরিবেশ আর ঘটনাই তাকে পলে-পলে নতুন করে জন্ম দিচ্ছে। আজ তাই এমন অভিনব মনে হচ্ছে তাঁকে। কেমন নাটকীয়ভাবে বদলে যাচ্ছে, নতুন করে, নতুন বেশে হাজির হচ্ছে সব। যেন মোহিনীকে ঘরে এনে আফশোসের অন্ত নেই। এতদিন কেমন করে, কোন গোপনে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন?

'মনটা পালাই-পালাই করছিল। এক-ঘেয়ে লাগছিল সব। এখন মোহিনীর দিকে তাকালে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। মেয়েরা তো জীবনে স্বামী চায়। স্বামীকে বন্ধু হিসেবেই পেতে চায়। গুরু কিংবা প্রভু হিসেবে নয়।' বলতে বলতে গলা ভারি হয়ে আসে। কেমন মলিন, উদাস মনে হয় তাকে। গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বেশ থেমে থেমে আবার বলেন, 'মোহিনী আমাকে ভয় পায়, ভক্তি করে জানি। কিন্তু ভালো-বাসতে পারে না। পারা উচিতও নয়। সেটা তার দোষ বলছিনে। বরং আমিই সহজ হতে পারিনি। সংসারে আর পাঁচটা মানুষের মত স্বামীস্ত্রীর স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ জীবন আমাকে এখনো কতখানি আকর্ষণ করে না। প্রেম-ভালোবাসা থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকাটাই মনে হয় সমীচীন। হৃদয় নিয়ে হাসা-কাঁদা বড্ড জোলো ঠেকে। আসল ব্যাপার কী জানো? অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ভয়ংকর নেশা। চিরটাকাল ওই নেশাতেই অন্ধ হয়ে আছি। ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কথা ভেবে সময় নষ্ট করার মত সময় যেন ছিল না। এখনো যে আছে তা হলফ করে বলতে পারছিনে। তবু পুরানো অভ্যাসটাই পাল্টিয়ে নিতে চাইছি। এখন তাই ছুটি চাইছি তোমাদের সকলের কাছে। একটু অবসর না নিলে যে চলে না। এবার আমার সত্যিকারের ঘরে ফেরার পালা। নেশার ঘোরে ছিলুম তাই বুঝিনি। নইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রমে আজ আমি বড় ক্লান্ত। এখন কে যে আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে জানিনে। জানিনে বলেই মোহিনীকে আঁকড়ে ধরে নতুন করে বেঁচে থাকতে চাই। এ আমার পলায়ন নয়। আমি যে জীবনকেই ভালোবাসি, কড়িরাম।'

(আগামীবারে সমাপ্য)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে আরও কয়েকটি পুরোন মন্দির রয়েছে অনাদৃত অবস্থায়. যেমন দেখলাম পঞ্চলিঙ্গের মন্দিরের ছাদের ওপর বড় বড় ঘাস গজিয়েছে এবং মনের আনন্দে গবাদি পশু সেই ঘাস খাচ্ছে। এসব মন্দিরের বিগ্রহও স্থানান্তরিত হয়েছে—সুতরাং পুজো-র্চনাও আর হয় না।

তারপর মহীশূরের পথে যেতে পড়ল চামুণ্ডি পাহাড়। এই মন্দিরে আছে মহিষমর্দিনীর মূর্তি। দেবীর মাথাটি আবার রজতনির্মিত। পাহাড় থেকে একটু নেমে গেলেই পথের মাঝে পড়বে বিরাট নন্দী বৃষকে। এখানে যে কেন কি উদ্দেশ্যে এই বৃষের আবির্ভাব ঘটলো তা বলা দুঃসাধ্য। এই পাহাড় থেকে সমগ্র মহীশূর শহরটিকে দেখা যায়—রাত্রি বেলায় দেখতে অপূর্ব লাগে। হাজার হাজার ইলেকট্রিক বাতির সমারোহে সারা শহরটিকে যেন একটি মায়ানগরী বলে মনে হয়।

পাহাড় থেকে নেমে এলাম শহরে। আসবার সময় 'ললিত ভবনে'র পাশ দিয়ে আসতে হোল। ললিত ভবন হল চমৎকার একটি বিরাট অট্টালিকা—বিশিষ্ট সম্মানীয় বন্ধুদের থাকবার জন্য মহারাজা বিশেষভাবে তৈরী করেছেন। এখানে ভাইসরয়, রাজা-মহারাজা বা ঐ শ্রেণীর বিশিষ্ট মাননীয় অতিথিদের ছাড়া অন্য কারুর থাকবার অধিকার নেই। এসব দেখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাৎ এলাম হোটেল মেট্রোপোলে। কৃষ্ণরাজ সাগর থেকে এখান পর্যন্ত মোটরে ঘোরা হয়েছে ১০২ মাইলের মত।

হোটেলে নিজের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন (২৫।১১।৪০) সকাল সাতটার সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলুম। এ কদিন ঝড়ের বেগে দিনরাত খালি ঘোরা হয়েছে—অনেকগুলো চিঠিপত্র লেখার ছিল, একটাও লিখতে পারিনি—এমন কি বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত না। আজ কয়েকখানা জরুরী চিঠি লেখা শেষ করে তারপর শহর পর্যটনে বেরুলাম।

প্রথমে গেলাম টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে। ওখানে নানারকম হাতের কাজের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন দেখা গেল। কিছু কেনা-কাটাও করলাম। মহারাজার প্রাসাদের পাশ দিয়ে এলাম। বিরাট গেট ধরে এদিক-ওদিক থেকে যেটুকু পারা যায় বাইরে থেকেই দেখলুম—ভেতরে যাওয়া গেল না। আর ভেতরে যেতে দেবেই বা কেন—মহারাজার পরিবারের লোকেরা তো রয়েছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখলাম, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসে গেলাম। দেখলাম ওখানে যে লাইব্রেরী আছে, সেখানে পুস্তক-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে ওখানে সব বই ছড়ানো রয়েছে—কিছু বই আবার মাটিতেই পড়ে রয়েছে। আমার দেখতে খুব খারাপ লাগলো। এছাড়া যোগেন্দ্র প্রাসাদে যে শিল্পসংগ্রহ রয়েছে তার মধ্যেও নতুনত্ব খুঁজে পেলাম না।

বাজার যাওয়াটা আমার চাই-ই। এখানেও বাজারে গেলাম। কিছু কেনাকাটা হলো না এমন নয়।

এর পর রোম্যান ক্যাথলিক গির্জায় এসেছি। গির্জার ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে মাতা মেরীর মূর্তি রয়েছে শায়িত অবস্থায়। রঙিন এই মূর্তিটি ইতালীর ভাস্করের নিদর্শন।

নামও ঠাণ্ডি সড়ক, বাস্তবেও তাই। মহারাজার অশ্বশালার সামনে দিয়ে এই ঠাণ্ডি সড়ক চলে গেছে। পথটি এতো মনোরম, আর এমন ছায়াশীতল যে সড়কের নামটি যাথার্থ প্রমাণ করে। বৃক্ষবিন্যাস এমন, সূর্যের আলো পৌঁছয় না বললেই হয়। পথ চলতে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে মনের মধ্যে।

সড়ক দিয়ে যেতে লক্ষ্য করলাম, এখনো পথের ধারে দশেরা উৎসবের বর্ণাঢ্য মিছিলের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। শুনলাম, এখানকার দশেরা উৎসবের মিছিল দেখবার মতো।

ঠাণ্ডি সড়ক পরিক্রমা শেষে ফিরে এসেছি হোটেলে। যেভাবে আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে বেলা তিনটে বাজলো।

তবু বিশ্রামের জন্যে সময় দিতে চাই না। পথে এসে আবার বিশ্রাম কী? বেরিয়ে পড়লাম চামুণ্ডী পাহাড় দেখতে। কিছুটা উঠলামও পাহাড়ের ওপর। তারপর পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম, নন্দীবৃষকে। একটি বিরাটকায় বৃষমূর্তি। ১৬ ফুট উঁচু আর ২৫ ফুট লম্বা। এবং একখণ্ড কষ্টিপাথর থেকে এটি তৈরি হয়েছে। পুণ্যার্থীরা বৃষকে পুজো করে। আমার স্ত্রী সুধীরাও সেই দলে। সেও পুজো দিলে।

চামুণ্ডী পাহাড় থেকে এসেছি শিব-সমুদ্রম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে। এই যে আসার পথটুকু, গাড়ীতে আসা অত্যন্ত কষ্টকর। অসমতল পথ। গাড়ী যেন লাফিয়ে চলে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিতরে যাওয়ার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে দেরি হলেও, পেলাম। টারবাইন রুমে গেলাম বিদ্যুৎচালিত পথে। শুধু একটি কাঠের পাটাতনের ওপর বেঞ্চিতে বসে পড়া, তারপর যথাস্থানে পৌঁছে নেমে যাওয়া, অনেকটা 'স্লিপের' মতো। তবে একসঙ্গে তিন-চার জন বসা যায়।

টারবাইন রুমে দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। এতো ভয়ংকর শব্দ, মনে হয় কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। ঘুরন্ত টারবাইনের ওপর প্রচণ্ডবেগে জলধারা টানেলের মুখ দিয়ে আছড়ে এসে পড়েছে—সেই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বিদ্যুৎ। পর পর তিনটি টারবাইন রয়েছে। যেগুলি পর্যায়ক্রমে কাজ করছে একটির পর একটি।

তারপর জলধারা যে টানেলের মুখ দিয়ে বাইরে যাচ্ছে, সে জায়গাটিও দেখলাম। দেখলাম নিয়ন্ত্রণ কথাটি। আমাদের মতো মানুষের চোখে সব কিছু বিস্ময়কর।

ইচ্ছে ছিল আজ কাবেরী জলপ্রপাত দেখতে যাবো। কিন্তু হলো না। এখানেই অনেক সময় গেল।

বাইরে এলাম। আকাশে তখন আসন্ন ঘনঘটার চিহ্ন। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, এবারে বাঙ্গালোরের পথে রওনা হওয়াই ভালো। রওনা হবার আগে স্থানীয় বাঙালীরা অনেক করে বললেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কিন্তু আকাশে যে রকম দুর্যোগের লক্ষণ দেখলাম, তাতে তাঁদের কথা রাখা হলো না। এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম বাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে।

আকাশের মেঘ তখন আরো জমাট বেঁধেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়ের সংকেতও শুনতে পাচ্ছি।

যে আশঙ্কা করছিলাম, তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। তারপর অহরহ বিদ্যুতের চমকানি।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পিছল পথ ধরে আমাদের গাড়ী মন্থরগতিতে এগোচ্ছিল। যে চিন্তা আমাদের মনে, সেই চিন্তা ড্রাইভারেরও। শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালোরের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো তো।

সত্যি বলতে কি, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যেতে আমরা রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ড্রাইভারও আর চলতে চাইলো না। গাড়ী দাঁড় করালো একটা বড়ো গাছের নীচে।

কিন্তু আমি বললাম, এ কি করছো ড্রাইভার সায়েব। গাছের নীচে কি থাকা ঠিক হবে। বড়ো গাছেই যে বাজ পড়ে। তাছাড়া গাছও ভাঙতে পারে।

ড্রাইভার জানালে, এখানে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টি না কমলে তার পক্ষে গাড়ী চালানো অসম্ভব।

গাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে রইলাম। চোখের সামনে ভয়ংকর দুর্যোগ। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি তারপর মেঘের ভয়ংকর গর্জন—মনে হয় যে কোন মুহূর্তে আমরা এই দুর্যোগের বলি হবো। তবুও মনের মধ্যে এই দুর্যোগকে উপভোগ করার স্পৃহা।

দুর্যোগ কমলো।

আমাদের গাড়ী আবার চলতে আরম্ভ করলো বৃষ্টিভেজা পথের ওপর দিয়ে, এখনো গাড়ীর গতি মন্থর।

পথে যেতে যেতে গ্রাম দেখলাম। প্রতিটি গ্রামেই বিজলী জ্বলছে। সবচেয়ে সুন্দর লাগলো গ্রামের প্রবেশপথের কাছে বাঁধানো চত্বরগুলিকে। চত্বরগুলির চারদিক আলোকিত করা শুনলাম, এখানেই গ্রামের মানুষ মিলিত হয়, গল্পগুজব করে আসর বসায়। এছাড়া রেডিও শোনার ব্যবস্থাও আছে। একটি সুন্দর ব্যবস্থা। ভাবলাম, এমনটি সারা ভারতের গ্রামেও তো হতে পারে! যার নাম হতে পারে, মুক্ত মজলিস কিংবা অনুরূপ কিছু।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সিনেমা হল। দক্ষিণ ভারতের ছবিগুলি প্রদর্শিত হয় এখানে। বুঝলাম, এখানে মানুষের জীবন থেকে আনন্দবোধ উহ্য হয়ে যায় নি।

আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি এই দেশে। মেয়েরা সিল্কের শাড়ী পরে ক্ষেত-খামারে কাজ করছে। জিজ্ঞাসা করেছি এ প্রসঙ্গে। উত্তরও পেয়েছি। এখানে সিল্কের সঙ্গে সুতী কাপড়ের বিশেষ তফাৎ নেই। তাছাড়া সুতীর চেয়ে সিল্ক অনেক বেশি টেঁকসই।

একটা কথা বলতে পারি, এদেশের সমাজজীবনে আমি একটা সার্বজনীন সৌন্দর্যবোধ প্রত্যক্ষ করেছি। সেটি আর কোথাও দেখিনি। মানুষ ছবি ভালবাসে, গান ভালবাসে, ফুল ভালবাসে—এটা নতুন কথা নয়। কিন্তু এদেশের মানুষের মতো এমন করে ভালবাসতে পেরেছে আর কোথায়। মেয়েদের তো দেখেছি, অন্য প্রসাধন থাক না থাক, খোঁপায় একটি ফুল ঠিকই আছে।

আরো দেখেছি চাষীদের জীবনে একটা সমন্বয় বোধ আছে। জমি নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ কম। কারণ, এখানে সব চাষীর জমিই সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা।

আর চাষের ব্যবস্থাও সুন্দর। জমির পাশ দিয়ে জল সরবরাহের খাল চলে গেছে। যেখান থেকে প্রত্যেক চাষীই জমিতে সেচ দিতে পারে। তারপর জল নিষ্কাশনের জন্যে পাকা নর্দমার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই রকম সুবন্দোবস্ত দেখে মনে হয়, এসব বন্দোবস্ত রাজ্যসরকারেরই সুবিবেচনার ফল। শাসক শ্রেণী প্রজাদের জন্য কিছু চিন্তা করেছিলেন এবং দেশের লোকেও কৃষি বিষয়ে স্বয়ংভর হবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব ছিল।

দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যখন ওয়েস্ট এন্ড হোটেলে পৌঁছালাম তখন ৯-৩০ বেজে গেছে। একে দুর্যোগের রাত—তার ওপর এত রাত্রি। রিসেপসন কাউন্টারে গিয়ে বললাম যে আমাদের ঘর রিজার্ভ করা আছে—সেই সঙ্গে এত দেরী হওয়ার কারণটাও বললাম। রিসেপসনের ভদ্রলোক আর কিছু না বলে বেয়ারাকে ডেকে আমাদের ঘরের চাবি দিয়ে দিলেন।

বেয়ারাটি আমাদের হোটেলের যে অংশটিতে নিয়ে এল—সেখানকার ঘরগুলি খুবই স্বল্পালোকিত। মনে হল যেন হোটেলের মধ্যে নিকৃষ্ট অংশ এদিকটা। মুখে কিছু বললাম না বটে কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। জিনিসপত্র নামিয়ে সামান্য মুখ হাত ধুয়ে চলে গেলাম ডিনার খেতে। কারণ সাহেবী হোটেল, তার ওপর বেশ রাত্রি হয়ে গেছে, এরপর গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না। যাইহোক এখনও যা ডিনার আমাদের দিল—দেখে মনে হল বাড়তি-পড়তি সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের জন্যে নিয়ে এসেছে। দেখেই তো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম একবার গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলুম, কি হবে করে। বললে হয়ত ওরা বলবে যে ওদের ডিনার-টাইম ৮টা, আর রাত্রি দশটার সময় কি খাবার থাকে! যাইহোক, যা দিল তাই কোনরকমে খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই ঘরখানিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। রাত্রে বিশেষ ভাল করে দেখবার অবকাশই পাইনি। ঘরটা সত্যই অত্যন্ত বাজে—বাথরুমটি তো জঘন্য। বাথরুমে একখানা আয়না পর্যন্ত নেই। কি আর করা যাবে—এই নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে কোনও ফল হবে না আর তাছাড়া এখান থেকে আজই আবার চলে যাব। সুতরাং ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাড়ে ন'টা নাগাত আবার বেরিয়ে পড়লাম। সকালের ব্রেকফাস্টটা অবশ্য বেশ ভাল ছিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এই এই হোটেলের শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ, এদেশীয়দের ভালো চোখে দেখেন না।

বেরিয়ে প্রথমে গেলাম স্টেশনে—সেখানে মাদ্রাজের টিকিট কেটে রেখে দিলাম, কারণ আজই তো বাঙ্গালোর ছেড়ে চলে যাব। তারপর বেরুলাম শহর পরিক্রমায়।

রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার ওপর রাস্তার দুধারে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় সমস্ত রাস্তাটাই বেশ ছায়া সুশীতল। তার ওপর জনসংখ্যাও খুব বেশী নয়—সুতরাং শহরটি বেশ ছিমছাম।

আমরা প্রথমে গেলাম সায়েন্স ইনস্টিট্যুট দেখতে। এখানকার প্রবেশপত্র যোগাড় করে ভিতরে ঢুকতেই হঠাৎ এই ইনস্টিট্যুটের অধ্যক্ষ ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখে হয়তো চিনতে পেরেছিলেন। একজন ছাত্রকে ডেকে বলে দিলেন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে এবং বুঝিয়ে দিতে। দেখলুম এখানে শিক্ষক এবং ছাত্র মিলিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালী রয়েছেন। আগে যাঁরা এই ইনস্টিট্যুট পরিচালনা করতেন তাঁদের কাছে বাঙালীরা ঠিক সুবিচার পেতো না—কিন্তু এখন দিনকাল বদলেছে। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়িয়ে যোগ্যতার ওপরেই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে তাই এখানকার অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

ডঃ ঘোষকে ধন্যবাদ দিয়ে ছাত্রটির সঙ্গে চলে গেলুম আমরা। ছাত্রটি আমাদের নিয়ে গেল সায়েন্স ইনস্টিট্যুটের লাইব্রেরীতে। বিরাট লাইব্রেরী—এত বড় লাইব্রেরী ভারত সরকারের ন্যাশনাল লাইব্রেরী ছাড়া [illegible] আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর [illegible] বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই এখানে সংগৃহীত এবং সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

ছাত্র বললে : ডঃ গুহর সঙ্গে আলাপ করবেন না স্যার!

আমি বললাম : ডঃ গুহকে তো আমি চিনি না, তিনিও বোধ হয় আমাকে চেনেন না—

ছাত্রটি বললে : ডঃ গুহ হলেন আমাদের প্রফেসর। ভারী ভাল লোক। আপনার নাম উনি নিশ্চয় শুনেছেন, আর তাছাড়া বাঙালী তো—

আমি বললাম : বেশ চলুন—আলাপ করতে আর আপত্তি কি আছে?

ছাত্রটি ডঃ গুহের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তখন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমাদের দেখেই একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, যেন দীর্ঘদিন পরে কোনো পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

ভারী সুন্দর দিলখোলা লোক ডঃ গুহ। এক মিনিটেই পরকে আপন করে নিতে পারেন। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন রাত্রে তাঁর বাংলোতে। কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হোল। আমি সবিনয়ে জানালাম—আমরা আজ রাত্রেই মাদ্রাজ যাচ্ছি। সুতরাং আপনার নিমন্ত্রণ রাখতে পারলাম না বলে বিশেষ দুঃখিত।

তিনি একটু ক্ষুন্ন হলেন যেন, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়লেন না—বললেন : বেশ, তাহলে বিকেলে আসুন একটু চা খেয়ে যাবেন। একবার গরীবের কুটীরে আপনাকে পদধূলি দিতেই হবে।

এখন আর না বলতে পারলুম না। বিকেলে চা খেতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তিনি আর দুজন ছাত্রকে ডেকে বলে দিলেন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে। ছাত্ররা আমাদের নিয়ে গেল বটে এবং সব ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং সেগুলি কি উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় তার বিবরণ দিতে লাগল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমরা বিশেষ কিছুই বুঝলাম না। শুধু বোকার মত ঘাড় নেড়ে চলে গেলাম।

ঐ ইন্স্টিট্যুটেই বিরাজ করছে এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার জামসেদজী টাটার বিরাট ব্রোঞ্জ মূর্তি।

তারপর আমরা এ ইনস্টিট্যুট থেকে বেরিয়ে গেলাম কুইনস পার্ক, শেখাদ্রি মেমোরিয়াল (লালবাগ), মিউজিয়াম, টাউন হল, বাজার—সব সেরে গেলাম একলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে। কি যেন একটা বিশেষ পর্ব
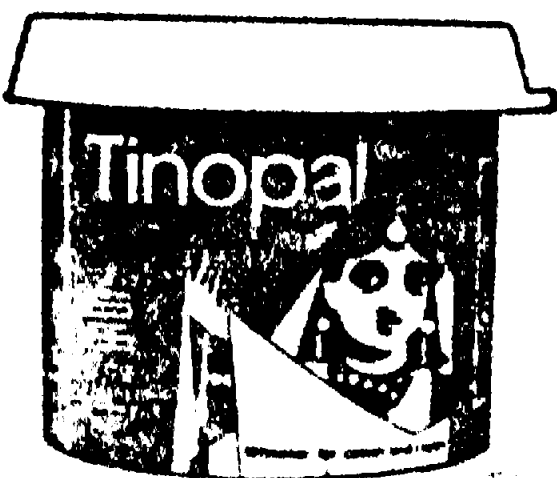
ছিল সেদিন—দেখলাম বেশ একটা জমকালো মেলা বসেছে।

এসব দেখতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরুলাম ৪-৩০ নাগাত। মহীশূর শিল্পের কিছু জিনিসপত্র কিনে, এলাম ডঃ গুহর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে।

আমার একটু যেতে দেরীই হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি ও'রা সকলেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ডঃ গুহ ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ছাড়া কয়েকজন বাঙালী ছাত্রও দেখি জমায়েৎ হয়ে রয়েছে।

একটা কৌতূহল অনেকক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল, আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম : আচ্ছা, আপনারা আমার নাম জানলেন কি করে? এদেশে তো আমার কোনো ফিল্মও আসে না—থিয়েটারের দলের সঙ্গেও কখনো আসি নি, এদেশের কাগজে আমার ছবি-টবিও বেরোয় না — সুতরাং আমার নাম তো আপনাদের জানার কথা নয়।

ডঃ গুহ তৎক্ষণাৎ বললেন : কেন আপনার অভিনয় দেখতে না পেলেও, নিয়মিত শুনি তো—মানে রেডিও মারফৎ।

—ও, বেতার নাটুকে দলের অভিনয়!

এইবার বুঝলাম ব্যাপারটা।

খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে প্রচুর জলযোগের পর ডঃ গুহদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম হোটেলে। ওখানকার বিল মিটিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় নৈশভোজন সমাধা করে ৮-৫৫ মিঃ'র ট্রেনে বাঙ্গালোর ত্যাগ করে মাদ্রাজ রওনা হলুম।

মাদ্রাজ পেৌঁছলাম সকাল ৬-১০ মিনিটে মাদ্রাজ স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখি অরোরার মাদ্রাজ অফিসের ম্যানেজার মিঃ জি রামশেষণ, ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ মশায়ের ক্যামেরা-শিষ্য জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে নিয়ে আমি অনেকবার 'আউটডোরে' ছবি তুলতে গেছি—আর কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের স্টারের বিজয় মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। স্টারের মালিক কুমার মিত্র মশায়ের বিরাট মাইকার ব্যবসা ছিল, কৃষ্ণবাবু ছিলেন সেই 'মাইকা' ব্যবসায়-এর দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি। তাঁরা আমাদের জিতেনের গাড়ী করে নিয়ে গেল অরোরা ফিল্মের অফিসে। এ'দের অবশ্য আমার আসার ব্যাপারটা আগে থেকেই জানান হয়েছিল। মানে অনাদিবাবু আমার সফরসূচী মাদ্রাজ এবং মাদুরা অফিসে আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, অরোরা অফিসে গিয়ে দেখি আমার নামে একগাদা চিঠিপত্র এসে পড়ে আছে। চিঠিগুলি সবই থিয়েটারওলাদের চিঠি—প্রত্যেক চিঠিতেই সেই এক অনুরোধ—কোথায় যোগ দিচ্ছি......ইত্যাদি।

তারপর আমরা চলে গেলাম শ্রীকৃষ্ণ ভবন হোটেলে। জিতেনই হোটেলটি ঠিক করেছিল। আমরা এ হোটেলে রইলাম কিন্তু প্রধান দুটি খাবার, মানে মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং নৈশভোজন, দুই-ই আসত জিতেনের বাড়ী থেকে। ভাত, ডাল তরকারী, মাছ, পুরো বাঙালী খানা। অনেক দিন পর আজ পুরোদস্তুর বাংলা দেশের বাঙালীর মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে ভারী তৃপ্তি পেলাম।

এখান থেকে গেলুম মিউজিয়াম—সেখান থেকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল। এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দেবীপ্রসাদ থাকত ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীর কাছে—সেই থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সে আমাকে দেখে তো জড়িয়ে ধরল—কিছুতেই ছাড়লে না—নিয়ে গেল তার স্টুডিওতে—সেখানে সে আমাদের একটি দীপলক্ষ্মী (ভারী সুন্দর কারুকার্য-করা একটি দীপ-দান) উপহার দিল। এই দীপলক্ষ্মীটি তাকে তার এক ভক্ত উপহার দিয়েছিল।

তারপর আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখাল টবের ওপর জন্মানো এক বটগাছ ও তেঁতুল গাছ। গাছটির বয়স ১২ বছর, কিন্তু তার উচ্চতা মাত্র দেড় ফুট। জাপানীরা যে অদ্ভুত এক প্রক্রিয়ার ফলে গাছের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে — এ গাছ দুটি সেই প্রক্রিয়ার নিদর্শন।

এই সব দেখা-শোনার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম বেলা ৫টা নাগাৎ। সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে গেলুম আমার অরোরা ফিল্মের অফিসে—ওখানে জিতেন (ব্যানার্জি) এসে আমাদের নিয়ে গেল তার নিউ টোন স্টুডিওতে। এখানে জিতেন এসেছিল একজন ক্যামেরাম্যান হয়ে কিন্তু তার কর্মকুশলতার গুণে সে এখন এই স্টুডিওর এক-তৃতীয়াংশের মালিক। চারিদিকে নাম-ডাক যথেষ্ট, অর্থাৎ সে এখন এখানে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে স্টুডিওটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল — অন্যান্য অংশীদারদের ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সকলেই টেকনিশান—একজন সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার আর একজন শিল্প-নির্দেশক।

ওখান থেকে গেলাম মেরিনা—দেখলাম সেখানকার জলজ প্রাণী ও পদার্থ সংরক্ষণাগারে Acquarium ২০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২০ সালে যখন এসেছিলাম তখনও যেমনটি দেখেছিলাম—এখনও প্রায় সেইরকম, শুধু কিছু কিছু নতুন সংগ্রহ স্থান পেয়েছে মাত্র।

ওখানে দেখা হোল হরিবাবুর সঙ্গে—হরিপদ চন্দ, মাদ্রাজের নাম-করা রূপসজ্জাকর make-up man। হরিপদ আগে কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর কাজ করত। ক্যামেরাম্যান শৈলেন বসু এবং জ্যোতিষচন্দ্র (শব্দযন্ত্রী) আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শৈলেন ক্যামেরাম্যানই রয়ে গেছে, কিন্তু জ্যোতিষ এখন চিত্র-পরিচালক। আমরা সবাই তারপর সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরে গেলাম এবং বেশ খানিকক্ষণ জমিয়ে বসে গল্প করা গেল। এখান থেকে কোথায় কোথায় যাব—সে সফরসূচী সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারপর তারা চলে গেল।

ইতিমধ্যে জিতেন একটি বিরাট টিফিন-কেরিয়ার করে প্রচুর মাছ-মাংস এবং নানা রকমের খাবার-দাবার নিয়ে এল। এসব যে এনেছিল আমাদের দুজনের জন্যে—কিন্তু পরিমাণ এত বেশী যে আমরা সবাই মিলে খেয়েও তা শেষ করতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পরে একে-একে সবাই শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

পরদিন (২৮-১১-৪০) ভোর ৫টার সময় কৃষ্ণবাবু এসে আমাদের ঘুম ভাঙালেন। কারণ সাড়ে ৬টার সময় আমাদের এগমোর স্টেশন ছেড়ে দক্ষিণাঞ্চল যাবার ট্রেন। এগমোর স্টেশন হল মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চল যাবার স্টেশন। জিতেনও এল স্টেশনে দেখা করতে। সত্যিই মাদ্রাজে জিতেন আমাদের যে রকম খাতির-যত্ন করেছিল তা আমার আজও মনে আছে।

ওখান থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল হল কাঞ্জিভরম। বেশী দূরে নয় ওখান থেকে। বেলা ৯-৩০টার সময় কাঞ্জিভরম পেৌঁছে গেলাম। এখানে আর কোনো হোটেলে না উঠে উঠলাম গিয়ে মিউনিসিপ্যাল রেস্টহাউসে। রেস্টহাউসটি ছোট হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার বেশ পছন্দ হোল। বাজারে গিয়ে কিছু তরিতরকারী ও চাল কিনে আনলাম, স্নানাদি সেরে সুধীরা ঐখানেই রান্না চড়িয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা দুটোর সময় বেরুলাম মন্দিরাদি দর্শন করতে। প্রথম বিষ্ণু-কাঞ্জি মন্দিরে। গর্ভগৃহের দরজা তখন বন্ধ, সাড়ে তিনটের আগে খুলবে না, সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল। ইতিমধ্যে দেখলাম মণ্ডপম। এইখানে আছে একশোটি স্তম্ভ, কিন্তু কতকগুলি স্তম্ভের গাত্রে যে সব চিত্র খোদিত রয়েছে সেগুলি উগ্র যৌন-বিষয়ক এবং অশ্লীল। প্রাইনের ধারে কিছুক্ষণ বসলাম। হঠাৎ সুন্দর টুং-টাং আওয়াজে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটি বিরাট স্বর্ণস্তম্ভের ওপর এক গুচ্ছে সোনার পাতা। অনেকটা বৃন্দাবনে সোনার তালগাছের মত, বাতাসে সেগুলি থর-থর করে কাঁপছে, আর ঐ টুং-টাং আওয়াজ হচ্ছে।

তারপর সাড়ে তিনটের সময় মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হোল। আমরা দোতলার ওপর উঠে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করলাম। বিগ্রহ হোল বিষ্ণু—অচলা মূর্তি এবং ভোগমূর্তি।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

কলকাতা আর্ট সোসাইটি ৫ থেকে ১৫ এপ্রিল সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের দুটি ঘরে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছবি ও ড্রয়িং-এর প্রতিলিপির একটি বড় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। প্রদর্শনীতে ৮০টি ইউনেস্কো রিপ্রোডাকশন (যা ইতিপূর্বে এঁরা এখানে দেখিয়েছিলেন) ছাড়া বিভিন্ন দূতাবাস থেকে সংগৃহীত ৩৬ খানি ড্রয়িং ২৩ খানি পেন্টিং-এর প্রতিলিপি এবং গোটা পঁয়তাল্লিশ লিওনার্দো সম্পর্কিত বই ও পত্রিকা রাখা হয়েছিল।

প্রতিলিপিগুলির সাজানো সম্পর্কে একটু মতভেদ থাকতে পারে। যেমন কতকগুলি ড্রয়িং ও পেন্টিং আছে যা লিওনার্দোর নামে চলে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেগুলি তাঁর কাজ বলে মনে করেন না। সেগুলি স্বতন্ত্র রাখা যেতে পারত। তাছাড়া তাঁর নোটবই-এর যন্ত্রপাতির ড্রয়িংগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ ক্রস বো এবং একসঙ্গে অনেকগুলি কামান ছোঁড়ার ব্যবস্থার ছবিটি সোজা করে টাঙ্গানো যেতে পারতো। আর পোল্যান্ডের সংগ্রহশালার "লেডি উইথ দি আরমাইন" ছবির পোস্টারপ্রতিলিপির বদলে আরেকটু ভাল কোন প্রতিলিপি রাখলে সুদৃশ্য হত নয়ত লিওনার্দোর কোন কোন ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয় তার হয়ত একটা বিশেষ বিভাগ খোলা যেতে পারত।

এইসব সামান্য বিচ্যুতি ছাড়া মোটামুটি প্রতিলিপি প্রদর্শনীটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। শিল্পীর সুপরিচিত সবগুলি ছবিরই রঙীন প্রতিলিপি এবং ড্রয়িং-এর সুন্দর প্রতিলিপি দেখা গেল। তাঁর বিখ্যাত ছবির চাইতে ড্রয়িংয়ের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় অনেক বেশী করে পাওয়া গেল। প্রতিলিপি হলেও নতুন করে তাঁর ড্রয়িং-এর সূক্ষ্মতা, দৃঢ়তা, গতিময়তা ও আবেদন অনুভব করা গেল। একদিকে রেখায় তিনি পুষ্পের কোমলতা ফুটিয়েছেন অন্যদিকে ফুটিয়েছেন মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলা, তাছাড়া তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির সৃষ্টির অন্তরালে যেসব ড্রয়িং রয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ চিত্রের তুলনা যে কোন শিল্পী বা শিল্পপ্রেমিকের কৌতূহলের বিষয় হবে। সে সব নিদর্শনেরও অভাব ছিল না। অসমাপ্ত "ব্যাটল অব আঙ্ঘিয়ারি"র স্কেচ ও ড্রয়িংগুলির মধ্যে তাঁর কল্পনাশক্তি এবং চিত্রে দুর্দমনীয় গতিবেগের আরোপের নমুনা পাওয়া গেল। আবার মিলানে ডিউকের প্রাসাদের গম্বুজের ফ্রেস্কোতে তাঁর সূক্ষ্ম কারিগরি এবং লতাপাতা দিয়ে নকশা তৈরীর বাহাদুরী দেখা গেল। বাস্তবিক সমস্ত প্রদর্শনী দেখলে কৌতূহল জাগে যে একটি মানুষের মধ্যে কতগুলি ব্যক্তিত্ব ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের স্বরূপই বা কি! আরেকটি জিনিসও চোখে পড়ে যে এই অতি আধুনিকতার যুগেও তাঁর ধ্রুপদী চালের ড্রয়িং-এর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি সমান ভাবেই তা দর্শকের চিত্তকে আকৃষ্ট করবার সামর্থ্য রেখেছে।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের প্রতি আরেকটি অনুরোধ এই যে কিছুদিন হল মাদ্রিদের লাইব্রেরীতে লিওনার্দোর নোটবইয়ের হারানো অংশের অনেকখানি পাওয়া গিয়েছে। সেই নোটবইয়ের কিছু প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারলে লিওনার্দোর শিল্পকর্মের আরো কিছু কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যাবে। এগুলি যদি তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন ত নতুন কিছু দেখাতে পারবেন।

*

বসন্ত পণ্ডিত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৬ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর জলরঙের নিসর্গ দৃশ্যের একটি প্রদর্শনী করলেন। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যচারী শিল্পীর এটি চতুর্থ একক প্রদর্শনী। ৪২খানি ছবি ও স্কেচের মধ্যে অরণ্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভিজে জমির ওপর জলরঙের ব্যবহারে যে টোনের সৃষ্টি হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে মধুর হলেও একটু একঘেয়ে কাজ। তবে বেশীর ভাগ ছবিতে একটা তুলির টানের স্বাচ্ছন্দ্য আছে সেটা অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ঢেকে দিয়েছে। রঙ তাঁর মোটামুটি নিম্নগ্রামের এবং ধূসর ঘেঁষা। মাঝে মাঝে ছবি প্রায় অ্যাবস্ট্রাকশন ঘেঁষে গিয়েছে, কতকটা যেন সচেতনভাবেই বাস্তবধর্মীতাকে এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টায়। ফলে ছবির ডেকরেটিভ দিকটার ওপরেই ঝোঁকটা বেশী পড়েছে। কখনো কখনো জাপানী ধরনের ওয়াশের দিকেও তিনি ঝুঁকেছেন যেমন "রিঅ্যাপিয়ারিং ডে" ছবির নীল পাহাড় ও গাছের চিত্রণে। তাঁর "দি রেড হর্স" ছবিতে ফান্জ মার্কের আমেজ পাওয়া গেল। "রিদম" ছবির উজ্জ্বল হলদে জমির ওপর বিচিত্র বর্ণের ছোপ দিয়ে নৃত্যপরা রমণীদের আভাসেও এক্সপ্রেশনিস্ট গোষ্ঠীর কাজের আমেজ দেখা যায়। অরণ্যের মধ্যে ছোট ছোট ঘুমন্ত কুটিরের কয়েকটি চিত্রে অরণ্যের নির্জনতা যেন অনেকখানি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে বনের পশু পাখি বা অরণ্যচারী মানুষের ছবিতে তাঁর দক্ষতা তেমন পরিস্ফুট হয়নি। তাঁর গতবারের প্রদর্শনী অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল। মনে হল এবারকার ছবির দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি আত্মসচেতন।

*

৬এ সাকলাত প্লেসের গ্যালারী ইউনিক এবারে ১২ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত উড়িষ্যার শিল্পী প্রফুল্ল মোহান্তির ২০ খানি ছবির প্রদর্শনী করলেন। কলকাতায় এঁর প্রদর্শনী ইতিপূর্বে হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।

শ্রীমোহান্তি বোম্বাইয়ের জে জে স্কুলে আর্কিটেকচার ডিগ্রিলাভের পর ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে টাউন প্ল্যানিং ডিপ্লোমা লাভ করেন। এছাড়া তিনি সেখানে যোগ ও ভারতীয় নৃত্যকলা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁর গ্রামের কারুশিল্পীদের কাজের একটি প্রদর্শনীও তিনি বিদেশে করেছেন।

শ্রীমোহান্তির ছবিগুলি মোটামুটি ওভাল গঠনের ওপর তৈরী এবং এই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজের মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন প্রতীক বা উজ্জ্বল বর্ণ ব্যবহার করে একটা বিচিত্র নয়নাভিরাম রূপ সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ওভাল গঠনের সীমিত রূপের মধ্যে রঙের বৈচিত্র্যে ছবির মধ্যে যে রসের বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছে তা এক নজরেই চোখে পড়ে। উজ্জ্বল হলুদ, বেগুনী, সবুজ, কমলা, বা নিম্নগ্রামের বিভিন্ন বর্ণের ধূসরতার মধ্যে দিয়েই এই বৈচিত্র্য এনেছেন। এরই মধ্যে ডিজাইনের ফাঁকে ফাঁকে হাল্কা নীলের ব্যবহার একটা স্পেস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। চোখের তৃপ্তির অনেকখানি উপকরণ এই সীমিত প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল।

*

১৫ই এপ্রিল বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, ও বুদ্ধিজীবি মিলে শিল্পী যামিনী রায়ের গৃহে তাঁর ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করলেন। শিল্পী বলেন অল্পমূল্যে সকলের ঘরে ঘরে যেন তাঁর ছবি থাকে। বাস্তবিক তাঁর ছবি যাতে সকলের ঘরে থাকতে পারে সেজন্য তিনি চিরকালই অল্প মূল্যে ছবি দিয়েছেন। মূল্যের বাধা তুলে সাধারণের কাছ থেকে তাঁর ছবিকে অল্পজনের ভোগ্য করে রাখেননি। তাঁর সমগ্র ছবির একটি তালিকা ও সহজলভ্য প্রতিলিপির একটা দাবী উঠেছে। আরো কিছু দরকার। দরকার তাঁর একটি প্রামাণ্য জীবনী এবং কতরকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে তাঁর শিল্প বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছচে তা বোঝবার জন্য তাঁর গোড়ার যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী। আশা করি তাঁর অনুরাগীদের আনুকূল্যে এ দুটি কাজ অবিলম্বেই সুসম্পন্ন হবে।

—চিত্ররসিক

চোখের ভাষা

সুভাষ সিংহ

চোখে না দেখলেও রেবা আমার উপস্থিতি টের পায়। একথা সে বলেছিল অনেকদিন আগে। আমার নাকি একটা বিশেষ গন্ধ আছে। সে আমাকে এতটা চেনে যে, তার চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারি না। তাই পা টিপে টিপে অফিস থেকে ফিরে পাশের ছোট্ট ঘরে ঢোকার পরেও স্বস্তি পেলাম না। জানি একটু পরে ডাক আসবে। রেবার।

অফিসের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে ঘরের চারিদিকে একবার তাকালাম। না, কোনরকম বিশৃংখলা টের পেলাম না। অফিসে যাওয়ার আগে সকালে যেমনটা দেখে গিয়েছিলাম, এখনও সব তেমনি আছে। ইন্দুর সমস্ত দিকে নজর।

রেবার সম্পর্কে যে একটু নিরিবিলি বসে ভাববো সে উপায় নেই। কেননা ইতিমধ্যে ইন্দু এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। ইন্দু না থাকলে এতদিনে রেবার মৃত্যু হোত। প্রৌঢ়া এই রমণীর ব্যবহার রেবার প্রতি মায়ের মত।

—দাদাবাবু, মা ডাকছেন। বলে ইন্দু আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না।

বাস্তবিক আজকাল রেবার কথা বেশিক্ষণ ভাবতে পারি না। চোখের সামনে তিল তিল করে শুকিয়ে যাচ্ছে রেবা। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অসাড়। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। এখনও চিকিৎসা চলছে। কিন্তু আমি আর ভরসা পাচ্ছি না।

রেবার ঘরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়ালাম। রেবার কাঁধের নীচে নরম বালিশ। আধ-শোয়াবস্থায় সে বিশাল দু' চোখে আমাকে দেখতে থাকে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত রঙীন চাদরে ঢাকা। ফর্সা মুখে বিষাদের ছায়া। দশ বছর ওই মুখে হাসি নেই। দশ বছর ঐ বিছানায় রেবা শুয়ে। দিনরাত শুয়ে থাকে। মাথার কাছে জানালা। সে আকাশ দেখে। মেঘের খেলা কিম্বা জ্যোৎস্নার ঢেউ, বৃষ্টিপাতের শব্দ অথবা সোনালি রোদ এইসব দেখে। কখনও পাখির ডাকে চমকে ওঠে। মেঘের গর্জনে ভীত-বিহ্বল মুখে চিৎকার করে ইন্দুকে ডাক দেয়। জানালা বন্ধ করতে বলে।

বেশিক্ষণ রেবার দিকে তাকিয়ে থাকা ইদানীং আমার পক্ষে রীতিমত অস্বস্তি-জনক। কেননা আমার শুধু মনে হয়, রেবা চোখের নীরব ভাষায় আমাকে প্রতি মুহূর্তে কী যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যদিও প্রকাশ্যে রেবার অনুযোগ খুব কম। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। চোখের ভাষা আমিও হালে রপ্ত করেছি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে রেবার সামনে একটা চেয়ারে বসলাম। ওর মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ। অফিস থেকে ফেরার পথে তীব্র ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠেছি। ঘরের সমস্ত

জানালা বন্ধ। রান্নাঘরে ইন্দু। রেবা তেমনি একদৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

—আজ কেমন আছ? রেবার গলার কাছে চাদর ভাল করে গুঁজে দিলাম। ইস্, কী নির্মম এই ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া! নাক চোখ মুখ বেশ ধারালো রেবার। দশ বছর আগের রেবাকে আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। প্রতিদিন যাকে দেখি, মাঝে মাঝে তাকে কেমন অচেনা রহস্যময় মনে হয়। আশ্চর্য!

একটু হাসল রেবা। তারপর দু'চোখ কুঁচকে তাকায়। অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর মত ওর চোখের দৃষ্টি।

—তুমি বৃথা চেষ্টা করছো! বলে রেবা দু'হাতে মুখ ঢাকল। ভেঙে পড়ল নিঃশব্দ কান্নায়।

—আ! রেবা, তুমি এমন করলে......! জান, ডক্টর মুখার্জি বলেছেন তোমার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল। কিছু-দিনের মধ্যে তুমি ভাল হয়ে উঠবে। সুস্থ সবল হয়ে আবার তুমি চলাফেরা করবে। আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাব। ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে হাঁটতে খুব মজা। ঝরণার জলে আমরা চান করবো। রেবা, তাকাও আমার দিকে।

মুখের ওপর থেকে দু'হাত সরিয়ে জলভরা চোখে তাকাল। ওর চোখমুখে কেমন যেন একটা সন্দেহ। এক পলক ওর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল। পরক্ষণেই বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর মুখ। চোখের তারা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আমার মুখে তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

রেবার চোখের জল সযত্নে মুছিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ইন্দু চায়ের কাপ টেবিলের ওপর রেখে চলে যায়। নীরবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে রেবার মুখের ছায়াছবি লক্ষ্য করি। সেই মুখে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ রেবার কাছে পাহাড়ের গল্প করলাম। ভোরবেলায় সূর্যোদয়, জল-প্রপাতের শব্দ, ঝরণার জলে স্নান ও বনমোরগের মাংস......ঘোড়ার পিঠে রেবা, গালে রক্তিমাভা, ঘোড়া ছুটছে কেশর ফুলিয়ে, সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিশোরী কণ্ঠে রেবা হাসছে খিলখিল করে...। গল্প করার সময় মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখলাম রেবার মুখের দিকে। গাঢ় বিষাদের ছায়া। দীর্ঘ দশ বছর ধরে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে রেবা স্তব্ধ। মাঝে মাঝে মনে হয়, দু' চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকলেও, এক-জোড়া মৃত চোখ। চোখের সামনে একটি শব। কোনদিন দু'চোখ বন্ধ হবে না। জেগে উঠবে না কোনদিন।

এক সময় রেবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। রেবা আজ অনেকদিন পর মুখ ফুটে জানাল—বৃথা চেষ্টা কোর না। হঠাৎ গা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে চুপচাপ শুয়ে থাকি। রেবা কী বুঝতে পেরেছে আর কোন আশা নেই? এখন শুধু অপেক্ষা। কবে ডাক আসবে। কী সাংঘাতিক এই অনুভূতি!

রাত্রের খাওয়া সেরে ঘুমোবার আগে টেবিল ল্যাম্প জেবলে ডায়েরির পাতা ওল্টাতে থাকি অন্যমনস্কভাবে। মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরতে পারে ডায়েরির মাধ্যমে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থমকে যাই।

"রেবার সঙ্গে আজ সকালে একচোট ঝগড়া হয়ে যায়। সে রীতিমত অপমানজনক কথা বলল আমাকে। বিশ্রী চিৎকার করল। রেবা এমন ইতর কথাবার্তা বলতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে। ওর সম্পর্কে আমার মনোভাব ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। ইন্দু যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল...... ছি ছি ছি! অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে না খেয়ে অফিসে গেলাম। এত নীচ মন রেবার। ওর জন্যে সব কিছু আমি ত্যাগ করেছি। ইদানীং জীবনযাপনে কোন আনন্দ নেই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ত্যাগ করেছি। সিনেমা থিয়েটারে যাই না। শুধু অফিস আর বাড়ি। এভাবেই তো কতগুলি বছর কেটে গেল। বিয়ের পর, আমাদের ভালবাসার বিয়ে, আজ মনে পড়লে হাসি পায়; দু' বছরের বেশি রেবার সঙ্গ পাইনি। এমন একটা জলজ্যান্ত তাজা মেয়ের অমন বিশ্রী অসুখ...দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে, গায়ের রক্ত মলিন, রুক্ষ মেজাজ, বেশিদিন অসুখে ভুগলে এমনি হয়।

আদর্শবান স্বামীর ভূমিকা একনিষ্ঠ-ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পালন করা যে কতখানি পীড়াদায়ক, একমাত্র ভুক্ত-ভোগীই সেকথা জানে। তবু প্রথম কয়েক বছর সফল অভিনেতার মত দায়িত্ব পালন করেছি। কোনদিকে তাকাইনি। সমস্ত রকম প্রলোভন এড়িয়ে গিয়েছি।"

মনে মনে হাসলাম একচোট। না, ডায়েরি লেখবার সময় কোন তারিখ দেইনি। প্রত্যেকদিন লিখিনি। কখনও কয়েকদিনের অনুভূতি বা ঘটনার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছি ছাড়াছাড়া ভাবে। এটা ইচ্ছাকৃত। লেখাও বিশৃঙ্খলভাবে। পারম্পর্যহীন। দ্রুত পাতা উল্টে আবার পড়তে থাকি।

"অফিস থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি। এখনই বাড়ি ফিরবো সেকথা মনে পড়লে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। ইংরেজী একটা ছবি চলছে। আনমনা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়াই। বহুদিন কোন ছবি দেখি না। রেবার কথা মনে পড়লে সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। বেচারী আমার অপেক্ষায় শুয়ে রয়েছে। আমি ফিরলে ওর রুগ্ন মুখে হাসি ফুটবে। কথা বলে না বেশি। শুধু তাকিয়ে থাকে। আমি গল্প করি। ওর মন যাতে ভাল থাকে সর্বদা সে চেষ্টা। দিনের পর দিন এইসব করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় একটু স্বার্থপর না হলে আমি বাঁচবো না। এই যে যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি পার করে দিচ্ছি হেলাফেলায়—পরে নিজের কাছে এর কৈফিয়ত দেব কি ভাবে? আদর্শ, কর্তব্য, দায়িত্ব ইত্যাদি গালভরা কথাগুলি এখন আর কোনরকম রেখাপাত করে না আমার মনে।

হঠাৎ কাঁধে কার স্পর্শে চমকে মুখ ফেরালাম। সুসজ্জিত সুদর্শন এক যুবক। সঙ্গে সুন্দরী এক যুবতী। যুবকটির মুখে মিটমিট হাসি। ভ্রু কুঁচকে ভাবতে থাকি, ঠিক মনে পড়ছে না অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; কোথায় কবে একে দেখেছি, খুব বেশিক্ষণ ভাববার অবসর পেলাম না। কেননা যুবকটি প্রবল হাস্যে ফেটে পড়ল।

—চিনতে পারলি না? চার বছর এক-সঙ্গে কলেজে পড়ার পর...সোমনাথ, তুই কী সত্যিই চিনতে পারছিস না—আমি পানু।

পানু! জলপ্রপাতের মত স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি টাল সামলাতে না পেরে হতভম্ব চোখমুখে পানুকে দেখলাম কিছুক্ষণ। তারপর অনেকদিন পর আমি স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করলাম। পানুকে জড়িয়ে ভাবাবেগে এক সঙ্গে অজস্র কথা আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হোল। এবং আমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

এর বেশ কিছুদিন পর কথাপ্রসঙ্গে মিতা আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনার চোখে জল দেখে আমারই কান্না পাচ্ছিল। আলাপ ছিল না তবু কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল আপনার প্রতি।"

একটা সিগারেট ধরালাম। চেয়ার ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে নিজেকে হালকা করে ফিরে এসে আবার ডায়েরির পাতা ওল্টাই। হাত-ঘড়ির দিকে তাকাই। প্রায় বারটা। চারিদিক নিস্তব্ধতা।

"পানু এক মাস ছুটিতে ছিল কোল-কাতায়। রোজ ওদের বাড়ি যেতাম। আঃ আমি যেন নতুনভাবে বেঁচে উঠলাম। পানুদের বাড়ির সবাই আমাকে আদর যত্ন করত। পানুর স্ত্রী সুন্দরী। ওদের দুটি বাচ্চা। দুটিই ছেলে। একজন দশ বছরের, অন্যজনের ছয় বছর। আমি গেলেই ছেলে দুটি ছুটে আসত। গল্প কর কাকু। তুমি খুব ভাল গল্প জান। পানুর স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলত, জানেন, ওরা দিনরাত আপনার কথা শুধু বলে। পানু মুচকি হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাত, আর তুমি? দ্যাখ সোমনাথ, যূথিকা আর ছেলে দুটি দিন দিন তোর যে-রকম ভক্ত হয়ে উঠছে...! যূথিকা কৌশ করে উঠত, ছিঃ!

লজ্জা করে না এসব বলতে। বলে সে রাগ করে উঠে যেত।

দিল্লীতে পানু সরকারী অফিসার। কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগে একদিন সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে এল। আমার খুব ইচ্ছা ছিল না ওরা আসুক। রেবার এই অসময়ের চেহারা কেউ দেখুক...প্রথমে ভেবে-ছিলাম ওদের কাছে গোপন করবো আমি বিবাহিত। সেটা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। মিতার সঙ্গে কথাবার্তা খুব বেশি হোত না। ও রোজ উপস্থিত থাকত আড্ডার আসরে। মাঝে মাঝে চা কিম্বা কফি বানিয়ে এনে দিত। সবার অলক্ষ্যে আমার দিকে চোরাচাহনি নিক্ষেপ করত। আমিও ওকে দেখতাম। ভাল লাগত। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে উঠতাম।"

খুট্ করে একটা শব্দ হোল। চমকে পিছন ফিরে তাকাই। কেউ নেই। ড্রয়ার থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বের করে তক্তপোষের নীচে আলো ফেললাম। ভেবেছিলাম বিড়াল কিম্বা ইঁদুর হবে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। একটু আগেও পাশের ফ্ল্যাটে অবনী-বাবুর প্রচণ্ড হাসি...ভদ্রলোক বোধহয় রোজ মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। নইলে এত হৈচৈ চিৎকার শুনবো কেন?

পাতার পর পাতায় কালো কালো অক্ষর। কবে থেকে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছি মনে নেই। হঠাৎ কবে প্রথম ডায়েরি লেখবার কথা মনে হয়েছিল—অবশ্য একটা যুক্তি মনে মনে খাড়া করেছি। যখন বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক জীবন শুরু হোল, চারপাশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিজের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলাম, হয়ত কোন এক সন্ধ্যায় অনির্দিষ্ট এক প্রেরণায় ডায়েরি লিখতে শুরু করি। আমি লেখক নই। আমার এই ডায়েরি যদি কোনদিন কোন কথাশিল্পীর হাতে পড়ে, তিনি এর মধ্যে একটি উপন্যাস লেখবার উপাদান নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

"পানু কলকাতায় নেই। দিল্লী চলে গেছে কয়েকদিন হোল। মিতার সঙ্গে আজকাল দেখা হয় না। রেবা বাড়ি ফিরলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথা বললে জবাব পাই না। নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। তবু ওর কাছে বসে গল্প করি। চা কিম্বা কফি খাই। ওর গলার কাছে চাদর ঠিকঠাক করার সময় হাতের আঙুল নিস্‌পিস্ করে ওঠে প্রতিদিন।

একদিন রেবা হঠাৎ প্রশ্ন করল, তোমার বন্ধু চলে গেছে?

—হুঁ। অবাক চোখে রেবাকে দেখতে থাকি। একটু আধটু কথা বলুক। হাসি ফুটুক মুখে। তাহলে স্বস্তি পাব। এমন বিষাদময় মনে হবে না প্রতিদিনের জীবন। মনের গুমোট ভাব কেটে যাবে।

উৎসাহিত হয়ে আমি রেবার কাছে পানুর গল্প করতে থাকি। কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখা, চীনেদের সঙ্গে মারপিট, মেয়েদের পিছনে লাগা—পানুর সবরকম গুণ ছিল। ওর কাছেই প্রথম সিগারেট খেতে শিখেছিলাম।

বাঃ! আমি মনে মনে একটু হাসলাম। রেবার দু'চোখ বন্ধ। ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে সন্তর্পণে চেয়ার থেকে উঠে কোনরকম শব্দ না করে দু'এক পা এগিয়েছি কি অমনি রেবার ডাকে থমকে দাঁড়াতে হোল।

—মিতা মেয়েটি বেশ না?

উঃ কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেবার! যেন মাছি হয়ে আমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে ঘন ঘন করে ঘুরছে। ঘুমোয়নি তবে রেবা। ঘুমের ভান করছিল কী?

—হুঁ।

রেবার সামনে আর দাঁড়ালাম না। ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ভেবেছি মিতার কথা।

অফিসে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মিতার কথা ভাবলাম। ছুটির পর বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখলাম। এখন বাস ট্রামে ওঠা যাবে না। ফলে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে থাকি। কে যেন বলেছিলেন কোলকাতা মিছিলের শহর। এখানে চোর পুলিশ পাশাপাশি হেঁটে বেড়ায়। বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে ডেটলের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই শহর কোলকাতায়।

ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে আমি পানুর নাম ধরে কয়েকবার অনুচ্চ স্বরে চিৎকার করলাম।

—আপনি! দাদা তো বেশ কিছুদিন হোল দিল্লী চলে গেছে।

সোফায় বসে দু' চোখ বন্ধ করলাম। ছি! মিতা কী মনে করল কে জানে। এখন কোনরকমে চলে যেতে পারলে...সুন্দর একটা গন্ধ, হাল্কা প্রসাধনে বেশ লাগছে দেখতে মিতাকে!

—একটু বসুন। কী খাবেন—চা না কফি?

—আমি যাচ্ছি। বলে উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্যে দু'এক পা অগ্রসর হতেই মিতা পথরোধ করে দাঁড়াল, কেন যাবেন? বসুন।

মিতা দ্রুত চলে যায়। আমি মনস্থির করতে না পেরে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। বাড়িতে এখন বোধহয় মিতার বাবা মা নেই। হঠাৎ চলে গেলে খারাপ দেখাবে। কেনই বা এলাম এখানে! এখন আসাটা কী দৃষ্টিকটু নয়? পানু থাকলে কেউ কিছু মনে করতো না।"

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম। রেবার ঘর থেকে ভেসে এল। ইন্দু কী যেন বলছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ওদের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। অনেকদিন পর রেবা এমন চিৎকার করে উঠল। ও নাকি স্বপ্নে নিজেকে খুন হতে দেখে। কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ধারালো চকচকে ছোরা হাতে কে যেন এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমবার চিৎকার শুনে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর রেবা স্বপ্নের কথা আমাকে জানিয়েছে। ডক্টর মুখার্জি সব শুনে বলেছেন, আপনার স্ত্রীর যা অসুখ তাতে এরকম স্বপ্ন দেখা অস্বাভাবিক কিছু নয়। চিন্তা করবেন না। সব সময় স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করুন।

একটু পরে রেবার ঘরে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। আবার ডায়েরির পাতা ওল্টাতে থাকি। আজ একদম ঘুম পাচ্ছে না। এদিকে রাত ক্রমশ বাড়ছে। ইদানীং ঘুম হয় না। ফলে স্লিপিং পিল খেতে হয়। একদিন একসঙ্গে অনেকগুলি খেয়ে নিলে...!

"মিতা মেয়েটিকে খুব ভাল লাগে। শান্ত অবনত মুখে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মিতা মৃদুস্বরে কথা বলে। আমি আড়চোখে ওকে দেখি। মিতার সমস্ত শরীরে আমার দু' চোখ ঘুরে বেড়ায়। বেশবাস ছিমছাম কিন্তু কোথাও এতটুকু উগ্রতা নেই। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশেষ করে ওর কালো গভীর দু' চোখের দিকে তাকালে। আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছি আমার সঙ্গ বা উপস্থিতি অনভিপ্রেত নয় মিতার কাছে। আর আমি? যখন নিজের কাছে ধরা পড়ে যাই, গোপন অভিলাষের কথা ভেবে, যুগপৎ শঙ্কিত ও আনন্দিত হয়ে উঠি। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বেশি হোত না। নীরবে পাশাপাশি ভীড়ের মধ্যে হাঁটা, ক্লান্ত বোধ করলে কখনও কফি বা চা; সাধারণত হোটেল বা রেস্তোঁরায় আমরা ঢুকতাম না, মিতা ঠিক পছন্দ করত না। আমি লক্ষ্য করেছি পথ চলতে চলতে ওর উদ্দেশ্যে অশোভন হাসি বা অশ্লীল ঠাট্টা কেউ কেউ ছুঁড়ে দিত। ভীড়ের মধ্যে কেউ কেউ ওর অঙ্গ স্পর্শ করত। সেইসব মুহূর্তে মিতার মুখে কোনরকম ভয় বা বিরক্তি লক্ষ্য করতাম না। বরং চাপা এক ধরনের বেদনায়, অথবা আরও সঠিকভাবে বলা যায়, আহত বিস্ময়ে ওর সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠত। ফলে ভীড় দেখলে থমকে দাঁড়াত। আর অদ্ভুতভাবে তাকাত আমার দিকে মিতা।

—আপনার আজকাল বাড়ি ফিরতে প্রায়ই দেরী হচ্ছে।

গঙ্গার ধারে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। আমি মিতার মুখের একপাশ দেখতে

পেলাম। আমাদের সামনে দুটি ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। কথা বলছে কল্‌কল্‌ করে। ওদের চলাফেরা দেখে মনে হয় ওরা সবকিছু ভুলে গেছে।

—এমন আর দেরী কোথায়। বলে আমি মিতার অবনত মুখ দেখতে থাকি। মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যায় না। বিশেষ করে মিতার মত চাপা স্বভাবের মেয়েদের...।

—রোজ রোজ এসব ভাল নয়।

সে কি আর আমি জানি না। সব জানি। সব বুঝি। মিতার সঙ্গে এত মেলামেশাও যে সঙ্গত নয়, বিশেষত আমার মত বিবাহিত একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের পক্ষে, যার স্ত্রী দীর্ঘ দশ বছর পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী...। হ্যাঁ, রীতিমত অন্যায় এসব। মিতা পরোক্ষে সাবধান করে দিচ্ছে।

—মিতা।

—বলুন। এবার সে দীর্ঘ চোখে তাকাল। মুখে হঠাৎ ঈষৎ হাসি। চোখা-চোখি হতে আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। বিশাল গঙ্গার বুকে অসংখ্য আলো। দূর থেকে হাওড়ার ব্রীজকে মনে হয় আলোর মালা।

—কিছু না। চল একটু বসা যাক।

—এবার বাড়ি ফিরবো। সোমনাথদা, আপনি কী আমার কথায় রাগ করলেন?

—না। তোমাকে সব বলেছি মিতা। আমি আর পারছি না। দিনদিন রেবার অবস্থা খারাপের দিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় কী জান?

মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না। ফলে ক্রোধ বা নিষ্ঠুরতায় মুখের চেহারা কতটা বদলে যায়, আনন্দের সংবাদ শুনে কতটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ, সে জানতে পারে না। তা জানা যায় অন্যের চোখে। তাই মিতার মুখের বিবর্ণতা আমার চোখ এড়াল না।

—চলুন আজ আপনার বাসায় যাই। সেই যে অনেকদিন আগে দাদার সঙ্গে গিয়ে-ছিলাম, তারপর তো কতবার দেখা হোল, কই যেতে তো বললেন না একদিনও।

স্পষ্ট না করতে পারলাম না। অথচ মিতাকে রেবার সামনে না আনলেই ভাল হোত। কারণ মিতাকে আমার সঙ্গে ফিরতে দেখে রেবা অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। আর মিতার দিকে আঙুল তুলে বলল, তুমি...তোমার হাতে ছোরা কেন! শুনেছো, ওকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বল।

তারপর রেবা দু' হাতে মাথার চুল টানতে থাকে। ওর সমস্ত মুখে বিস্ফারিত দেখায়। বিশাল দু' চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। ইন্দু ওকে জাপটে ধরে। আমি হতভম্ব মিতাকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসি।"

একটানা পড়তে পড়তে দু' চোখ টনটন করছে। চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করলাম কিছুক্ষণ। একবার থমকে দাঁড়ালাম। ধবধবে সাদা বিছানা। বালিশের নীচে স্লিপিং পিলের শিশি। শিশিটা হাতে তুলে গুনতে থাকি। এক দুই তিন চার পাঁচ...। একসঙ্গে চার পাঁচটা মুখে পুরলে...। ধেৎ। ছুড়ে দিলাম শিশিটা বিছানার ওপর। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা ছোরা বের করলাম। বার ইঞ্চি লম্বা। উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কণ্ঠনালীর কাছে ছোরার অগ্রভাগ সামান্য চেপে ধরলাম। তখন খুট করে একটা শব্দ হোল। চমকে দু'-পা পিছিয়ে গেলাম। তারপর একটা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে পা টিপে টিপে রেবার ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে ইন্দু ঘুমিয়ে। ঘরে হাল্কা সবুজ আলো। রেবার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মশারি তুলে... বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রেবা তাকাল আমার দিকে। আমি তাড়া খাওয়া কুকুরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে। ড্রয়ারে ছোরা রেখে চেয়ারে বসে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ডায়েরির পাতা ওল্টাই।

'আমি একটি বে-সরকারী অফিসে মাঝারি গোছের চাকরী করি। আমার বস্‌ একজন শিখ ভদ্রলোক। নাম কর্তার সিং। লম্বা-চওড়া সুপুরুষ। আমার কাজকর্মে তিনি বেশ সন্তুষ্ট। তিনি আমার চেয়ে বয়সে সামান্য বড়। অফিসে আমি অধিকাংশ সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করি। যতদূর মনে হয় ওরা আমাকে একজন নিরীহ অফিসার হিসেবে জানে। নিতান্ত গোবেচারা একজন ভদ্রলোক। ফলে ওদের মধ্যে অনেকেই কথাবার্তার সময়, বিশেষ করে যারা একটু বয়স্ক ও পুরনো কর্মচারী, অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করে। আমার স্ত্রীর সম্পর্কে একটু বেশি খোঁজখবর নিতে চায়। কখন মুরুব্বির সুরে কথা বলে। এতে আমি বিব্রত হয়ে উঠি। কিন্তু সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করি না। বরং হাসিমুখে থাকতে চেষ্টা করি।

একদিন কর্তার সিং তাঁর চেম্বারে ডেকে আমাকে বললেন, মুখার্জি, একটু কঠোর হতে শিখুন। শুনলাম কেরানীরা আপনার প্রাপ্য সম্মান দেয় না। নাম বলুন—চুপ করে থাকবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

—ভুল শুনেছেন স্যার। ওরা আমাকে যথেষ্ট রেসপেক্‌ট করে।

ধবধব গায়ের রঙ কর্তার সিংয়ের। খাড়া নাক। বড় বড় দুটো চোখ। প্রশস্ত ললাট। পরনে দামী পোশাক। কর্তার সিং-এর মুখে মৃদু হাসি। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করলেন।

—এত নরম হলে অফিস চালাবেন কিভাবে। থাকগে আপনার যখন কোন অভিযোগ নেই...। ওয়েল, মিসেস-এর অবস্থা এখন কেমন?

—দিন দিন খারাপ হচ্ছে স্যার। আমি আর কথা বাড়ালাম না। বাস্তবিক, রেবার সম্পর্কে বাইরের লোকের এত কৌতূহল ভাল লাগে না। বিশেষ করে এরা যখন আমাকে সমবেদনা জানায়, খুবই পীড়াদায়ক মনে হয়। যদিও এদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার কোন রকম সন্দেহ নেই।

কর্তার সিং হঠাৎ গলার স্বর নীচে নামিয়ে বলেন, একটা কথা বলবো মুখার্জি? কিছু মনে করবেন না যেন।

—বলুন।

—মেয়েটি কে? ভেরী নাইস গার্ল।

মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হলাম। মানুষটি ভাল। কিন্তু ঐ মেয়েদের সম্পর্কে দুর্বলতা...

—আই অ্যাম সরি...সত্যি আপনি যদি কিছু মনে করেন...।

—মনে করার কী আছে। যে মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখেছেন সে আমার বন্ধুর ছোট বোন।

—আই সী। কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবলেন কর্তার সিং। ইতিমধ্যে আমি মনে মনে চটে গেলাম। এইসব আজে-বাজে কথা বলার জন্যেই কী... অথচ টেবিলে কত কাজ পেন্ডিং... কিন্তু কী আর করা যাবে, শত হলেও বস্‌...বসের ইয়ারকি বা খাম-খেয়ালীপনাও মুখ বুজে মেনে নিতে হবে।

কর্তার সিং উঠে দাঁড়ালেন, আজ আমার বাড়ি চলুন মুখার্জি। বলে তিনি কলিং বেল টিপলেন। আমি অবাক হলাম। সবে পাঁচটা বেজেছে। সাড়ে ছটা সাতটার আগে কোনদিনও অফিস থেকে বেরুতে পারি না। তাছাড়া হঠাৎ ওঁর বাড়ি...।

—কই চলুন মুখার্জি। কী ভাবছেন?

—আপনি তো জানেন আমার স্ত্রী... অফিস থেকে আমাকে রোজ বাড়ি ফিরতে হয়।

—ইজ ইট? থাক তাহলে আজ। গুড নাইট।

অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় মিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কর্তার সিং অদ্ভুতভাবে হেসে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। তিনি কথা বিশ্বাস করেন নি। আমাকে আর মিতাকে একসঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন। আমরা নিজেদের নিয়ে আজকাল এত ব্যস্ত যে, কে আমাদের দিকে নোংরা হাসি ছুড়ে দিচ্ছে বা অশ্লীল মন্তব্য করছে—এসব ভ্রূক্ষেপ করি না। হ্যাঁ, গ্রাহ্যও করি না।

—তোমার কী হয়েছে মিতা?

—কেন? মিতা হেসে তাকাল। ওর দু' চোখে আজকাল অজস্র ইঙ্গিত। মুখের

মুচকি হাসি বড় লোভনীয়। আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছি আমার আর নিস্তার নেই। আমি বা মিতা, কেউ কারুর হাত থেকে মুক্তি পাব না।

গঙ্গার ধারে বেড়াতে আমাদের ভাল লাগে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা খুঁজতে থাকি। মিতা নীরবে হাঁটছে। আমি অনেক বার ওকে স্পর্শ করতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছি। বার বার মনে হয়েছে আমার দু' হাত নোংরা। এই নোংরা হাত দিয়ে কী একটি ফুলের মত নরম মেয়েকে ছোঁয়া যায়?

—জান। মিতা ঠোঁট ফুলিয়ে হাসল, আমি শিগগিরি চলে যাচ্ছি।

—যাঃ ঠাট্টা কর না।

—ঠাট্টা নয়। এখানেই বসা যাক। বলে মিতা গাছের নীচে আবছা অন্ধকারে বেঞ্চিতে বসল। আমি সামান্য দূরে বসলাম। আমাদের সামনে বিশাল গঙ্গা। তীব্র গর্জন করে জলরাশি সবেগে পাড়ে আঘাত করছে।

—কোথায় যাবে? এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ঠাট্টার ছলে বললাম, আমাকেও সঙ্গে নেবে তো?

—সোমনাথদা! মিতার কণ্ঠস্বরে প্রায় কান্না, আমি আর এভাবে থাকতে পারছি না। একটা মাস্টারী নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছি। সেই হবে আমাদের দুজনের পক্ষে ভাল।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। না, দুঃখ বা বিষাদ নয়। বরং আবছা অন্ধকারে সহসা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, একটিমাত্র রাস্তা আছে। সেই মুহূর্তে ভেবে নিলাম আমার কী করা দরকার।

—কবে যাবে? নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। মিতাকে যেতে দেব না। মিতা চলে গেলে আমিই বা বাঁচবো কিভাবে। কী আশায় বাঁচবো? কাকে নিয়ে বাঁচবো?

মিতার হাত স্পর্শ করলাম। ওর নরম আঙুল ছুঁয়ে মিনতির সুরে বলি, আরও কিছুদিন কী অপেক্ষা করতে পার না?

—কী লাভ? মিতা আমার কাছে সরে এল। আমি ওকে এক হাত দিয়ে কাছে টেনে নিতে গেলাম। সেই সময় হো হো শব্দে কারা যেন অট্টহাসি করে উঠল। আমরা চমকে দুজনে ছিটকে গেলাম বেঞ্চির দু' ধারে।"

রাস্তায় কোলাহলের মৃদু শব্দ। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠি। প্রায় সাড়ে চারটে। চেয়ার থেকে উঠে জানলা খুলে দিলাম। বাইরে এখনও আবছা অন্ধকার। টুপটাপ করে শিশির পড়ছে। কুয়াশায় কোন কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার মুখে আঘাত করল। আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে চেয়ারে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডায়েরির পাতা সরাই।

"সেদিন বাস থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে যাই। কঠিন রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে আমার চেতনা লোপ পায়। পরে জ্ঞান ফিরলে দেখি নিজের ঘরে তক্তপোষে শুয়ে আছি। মাথার কাছে গম্ভীর মুখে ডাক্তার মুখার্জী বসে। তিনি আমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে চলে যান।

ইন্দু ছুটি নিয়ে দেশে যেতে চায়। আমাকে কয়েকদিন সেকথা জানিয়েছে। আমি মনে মনে ঘাবড়ে গিয়েছি। ইন্দু চলে গেলে রেবাকে দেখবার কেউ থাকবে না। আমার নিজের শরীরও কিছুদিন যাবত ভাল যাচ্ছে না। যদিও স্বাস্থ্য আমার বেশ মজবুত। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও—আয়নায় নিজের দিকে তাকালে অথবা রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় মেয়েদের তাকানোর ভঙ্গি দেখেও, একথা অনায়াসে বলা যায়, এখনও আমি প্রেমিক হিসেবে যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর সুস্থ হয়ে অফিসে জয়েন করলাম। কর্তার সিং সমবেদনার সঙ্গে কথা বললেন। আরও ছুটির প্রয়োজন কিনা জানতে চাইলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজে মন দিলাম। আমি জানি আমার রোগ কোথায়। ডাক্তার মুখার্জী জানেন না। তিনি কয়েকটা টনিক খেতে বলেছেন। ভোরবেলায় মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো...স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্যে নানা রকম ওষুধ আর ফলের ফিরিস্তি... আসলে রাত্রে ঠিকমত ঘুম না হওয়ার ফলেই যত গণ্ডগোল।

মিতাকে দেখে রেবা যেরকম উন্মাদিনীর ন্যায় ব্যবহার করেছিল সেকথা ভুলি নি। ইদানীং রেবা আমার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, আমার ছায়া দেখলে পর্যন্ত রেগে ওঠে। এমন কি কাপ ডিস ছুঁড়ে মারে আমার দিকে। ফলে ওর কাছে পারতপক্ষে যাই না। আমার আর করবার কিছু নেই।

একদিন ছুটির দিনে দুপুরবেলায় বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। ইন্দু কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গিয়েছে। আমি শুয়ে নানারকম কথা ভাবছিলাম ঘুম পাচ্ছিল না। বই পড়তেও ভাল লাগছিল না। অন্যমনস্কভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘরের চারিদিকে দু' চোখ ঘুরছিল। মনে পড়ছিল মিতার কথা। মিতার সঙ্গে কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। দু'একদিন ওর বাড়িতে হঠাৎ হাজির হয়েছি। আমাকে দেখে মিতার বাবা-মা মুখ গম্ভীর করেছেন। তারপর দু' একটা শুকনো কথাবার্তা বলে উঠে গিয়েছেন। মিতা চুপচাপ সোফায় বসে থেকেছে। লক্ষ্য করেছি ওর মুখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। আহত চোখ মুখ। কোন কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে অন্যমনস্কভাবে ভেবেছি কী কথা বলা যায় মিতাকে। কীভাবে আলাপ শুরু করা যায়। আশ্চর্য! কথা বলার পরিবর্তে আমরা দুজনকে শুধু অপলক দৃষ্টিতে দেখেছি। তারপর মাথা নীচু করে চলে এসেছি আমি।

পাশের ঘরে রেবা শুয়ে। একা। ইন্দু বাইরে। দরজা জানলা বন্ধ। এখন দুপুর। ছুটির দিন। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। একটা সাদা হাঁস পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নীচে পড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড দিয়ে রক্ত ঝরছে। দরজা সামান্য ঠেলে ঘরের ভিতর এলাম। রেবা ঘুমচ্ছে। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। গোল টেবিলের ওপর একটা ফল কাটার ছুরি। বেশ ধারালো চকচকে। নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে যাই। টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা হাতে তুলে শক্ত হাতে চেপে ধরি। মাত্র এক হাতের ব্যবধান। বুকের বাঁ-দিকে ঠিক পাঁজরের নীচে... গলগল করে রক্ত, শক্ত হয়ে মুখ চেপে ধরা, খানিকটা ছটফটানি, তারপর সব শেষ। গোটা শরীরটা টুকরো টুকরো কেটে বস্তার মধ্যে পুরে অথবা ট্রাঙ্কে করে...। কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু রক্ত দেখলে যে আমার মাথা ঘুরে যায়। অন্যভাবেও মারা যায় কাজ। যেমন শ্বাসরোধ করে...... হাতে পরা থাকবে রবারের দস্তানা। অথবা ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে।

হঠাৎ একপ্রা আর্ত চিৎকার শুনে ধাতস্থ হয়ে উঠলাম। রেবার দু' চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে। আমি কখন যেন ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ওর গলার কাছে ছুরির অগ্রভাগ। থরথর করে কেঁপে ওঠে আমার সমস্ত শরীর।

—রেবা! রেবা!

টেবিলের ওপর ছুরি রেখে আমি রেবার পাশে বসলাম। রেবার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। সাদা ফ্যাকাসে। শুধু দু' চোখে আতঙ্ক। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট। এমন অবস্থায় হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে। আমি কী করবো ভেবে পেলাম না। বারবার রেবার নাম ধরে ডাকলাম। প্রায় কান্নার সুরে।

আমি বারবার ডাকলাম ওকে। রেবা কোন কথা বলল না। সেইরকম বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আর আমার কিছু রইল না। এভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে চাইনি। আমি দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফিরে এলাম ঘরে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে...।"

আজকাল আর আমি ডায়েরি লিখি না। সেদিন সারারাত ডায়েরি পড়ার পর মনে হল নিজেকে এভাবে আত্মপ্রকাশ করা ঠিক না। কিছুটা গোপন রাখতে হয়। রহস্যময় থাকা উচিত জীবনের কিছু কিছু বোধ বা অনুভূতি। সুতরাং ভোরবেলায় ইন্দুর অনুপস্থিতিতে উনুনের ভিতর ডায়েরি... মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

রেবার সামনে দাঁড়াতে পারি না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। নিয়মিত অফিস যাই। কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। এক মনে

কাজ করি। সবাই চলে গেলেও একা বসে থাকি। নিস্তব্ধতার ভিতর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে মাঝে মাঝে চমকে উঠি। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্ক-ভাবে একা হাঁটি। বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করি না। কোথাও যাবার জায়গা নেই। লক্ষ্য করি সুবেশ নরনারীর মিছিল। নিয়নের আলোয় ঝলসে ওঠে মানুষের মুখ। কেউ ডাকে না আমাকে। পিছন থেকে কাঁধ স্পর্শ করে না কেউ।

যত দিন যায় আমি বুঝতে পারি রেবা আর ভাল হয়ে উঠবে না। রেবাও সে কথা জানে বোধ হয়। আমি সম্প্রতি দরজায় একটা ফুটো করেছি। সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে রেবাকে দেখি। ভোরবেলায় অফিসে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে ফুটোর ভিতর চোখ রাখি। রেবার পায়ে রোদ নেচে বেড়ায়। দু' একটা পাখি জানলার সামনে বসে খেলা করে। কখনও বিছানার ওপর এসে বসে। রেবার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। সে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন কাউকে সে চেনে না। যেন প্রতিদিন তার নতুন করে জন্ম হচ্ছে। ইন্দু মাঝে মাঝে ঘরে ঢোকে। ফল কেটে দেয়। দুধের গ্লাস রেবার মুখের কাছে ধরে। ইন্দু আপনমনে কথা বলে যায়। রেবা তাকায় না ইন্দুর দিকে। ওর দৃষ্টি নীলাকাশের বিশাল শূন্যতায় হারিয়ে যায়।

অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে সকলের মত আবার দরজার ফুটোয় চোখ রাখি। ইন্দু চা দিয়ে যায়। আমাকে আজকাল সে ঘৃণার চোখে দেখে। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। অনেক আগেই ইন্দু চলে যেত। যায়নি আমার অনুরোধের জন্যে নয়। রেবার কথা ভেবে। রেবাকে ইন্দু আন্তরিকভাবে ভালবাসে। যতক্ষণ আলো জ্বলে ফুটোর ভিতর চোখ রেখে রেবাকে দেখি।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। স্লিপিং পিল ব্যবহার করলেও কাজ হয় না। কর্তার সিং আমাকে অনেকদিন ওর বাড়ি যেতে অনুরোধ করায় একদিন গিয়েছিলাম অফিস ছুটির পর। সেখানে বসের স্ত্রী ললিতার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মদের গ্লাস হাতে করে ললিতা, মহিলা অসাধারণ সুন্দরী, ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখছিল। ডাইনিং রুমের মায়াবী আলোয় ললিতাকে মর্ত্যের মানবী মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল এক মায়াবিনী আমার সামনে বসে। মুখো-মুখি। একটু দূরে কর্তার সিং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অচৈতন্য হয়ে হাত পা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন। ওদের পীড়াপীড়িতে আমিও খানিকটা হুইস্কি খেয়েছিলাম। এসব কোনদিন খাইনি। ফলে অল্প খেয়েই মাথা ঘুরছিল। ললিতা কী বলছিল খেয়াল করিনি। শুধু তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। প্রথম আলাপের পর রেবার খোঁজখবর নিয়েছে। তখন কর্তার সিং মিটমিট করে হাসছিলেন। বেয়ারা টেবিলের ওপর গ্লাস আর বোতল রেখে সেলাম জানিয়ে চলে যায়।

ললিতার ব্যবহার ছিল একটু অদ্ভুত। বিশেষ করে ওর তাকানোর ভঙ্গি। সাজ-পোশাকের স্বল্পতা আমার নজর এড়ায়নি। ললিতা গাড়ি দিতে চেয়েছিল। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। বেশ শীত করছিল। একটু হাওয়া গায়ে লাগা মাত্র শিরশির করে উঠছে সমস্ত শরীর। ললিতা যখন ফিক্ করে হেসে কী একটা কথা বলে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দেখেছিলাম রেবা খল্‌খল্ করে হাসছে। আমার সামনে রেবা দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে লিপস্টিক। উঁচু করে চুল বাঁধা। গায়ে খাটো ব্লাউজ। ধবধব করছে গায়ের রঙ। বিশাল কালো চোখে বিলোল কটাক্ষ। আমি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম। আঃ আমার রেবা এত সুন্দর!

...রেবা হাসছে খিলখিল করে। আমি রেবার দিকে তাকাচ্ছিলাম না। আমাদের চারপাশে পাহাড়। ঘন পাইন গাছের সারি। একটু দূরে অনেক উঁচু থেকে সবেগে নীচে পড়ছে ঝরণার জল। রেবা ঝরণার জলে স্নান করল। ওর নগ্ন শরীরে রোদ খেলা করে। আমার চোখে কালো চশমা। রেবা হাততালি দিয়ে একটা বুনো শেয়াল তাড়িয়ে দিল। আপনমনে গান করল অনেকক্ষণ। আমি ওকে শিকারীর দৃষ্টিতে দেখছিলাম। রেবা নিজেকে নিয়ে এমন মগ্ন ছিল যে, আমার উপস্থিতি টের পেল না। ওকে মনে হচ্ছিল প্রকৃতির সন্তান। আমি রেবাকে কয়েকবার ডাকলাম। ও আমার কথা শুনল না। একটু নীচু হয়ে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল। নিঃশব্দে ওর পাশে দাঁড়াই। অনেক নীচে সশব্দে পড়ছে ঝরণার জল। তাকালে মাথা ঘুরে যায়। রেবার পিছনে দাঁড়াই। একবার পিছন ফিরে তাকাই। একটা পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে মিত্রা। সে দু'চোখে আগুন ছড়াচ্ছিল। তার ইসারা আমি বুঝতে পারলাম। তারপর রেবার পিঠে হাত দেওয়ার আগেই রেবা ঘুরে দাঁড়াল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি রেবা খাটে শুয়ে। গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। তার বিস্ফারিত চোখের সামনে।...

ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। এখন দুপুর। দু'চোখ কচলে প্রতিদিনের দেখা অতিপরিচিত ঘরের এদিক ওদিক তাকালাম। এখনও কানে ভাসছে ঝরণার শব্দ। ঘন পাইনের অরণ্যে বাতাসের নিবিড় আলাপ। গলা শুকিয়ে কাঠ। চিৎকার করে ইন্দুকে ডাকলাম কয়েকবার। বড় জল পিপাসা। আজকাল শুধু স্বপ্ন দেখি। যেমন একটু আগে...স্বপ্নে প্রতিনিয়ত রেবাকে হত্যা করি!

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

শিউপ্রসাদজি বলে গেলেন ···
দুঃস্বপ্ন যে নয় তা জানতে দেরী হল না

মনের উদ্বেগে অস্থিরতায় তখন আমি কটা ঘুমের বড়ি খেয়ে··

কয়েক মিনিট একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি। হঠাৎ ফোনের শব্দে জেগে উঠলাম। ঘড়িতে তখন সকাল ছটার ঘণ্টা বাজছে।
ক্রীং ক্রীং
ক্রীং ক্রীং

ফোন করছিল স্বয়ং রতনলাল। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ···
কে রতনলাল? বাড়ি থেকে ফোন করছ? লক্ষ্মী' মানে লক্ষ্মী বাড়িতে আছে?

আপনি লক্ষ্মীর খোঁজ করছেন? করতে পারছেন?
হ্যাঁ, ভোরের একটু আগে সে এখানে এসেছিল!

রতনলালের গলা যেন ধারালো বাঁকা ছুরি! তবু ভোরের আগে লক্ষ্মী এসেছিল শুনে সে যেন ···
একটু চমকে গেল, কেমন! আচ্ছা, বলুন তারপর

ভোরের আগে এসেছিল বলছেন?
হ্যাঁ, ও সময়ে সে আসতে পারে কল্পনাও করিনি, আমি না জেনে··

না জেনে নয়! সব জেনে শুনে মতলব করে তাকে গুলি করেছেন!

'না না' বলে আর্তনাদ করে লক্ষ্মী কোথায় জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম···

গুলির খবর যখন জানো তখন লক্ষ্মী নিশ্চয় বাড়িতে ফিরেছে —

অঙ্গনা

সঞ্চয়ের অভ্যাস

আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অনেক বাড়ির ছেলেপুলেরাই হাতখরচ পেয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পকেট-খরচ পূর্বসর্ত আরোপিত। অর্থাৎ মা-বাবা আগে থেকেই বলে দেয় তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে যেন এই পয়সা খরচ করা না হয়। এতে ছেলেমেয়ে মা-বাবার হয়তো অনেকটা বাধ্য থাকবে কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটাই মার খাচ্ছে। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীর অভিমত, বাচ্চাদের হাতখরচ বাবদ যে পয়সাটা দেওয়া হলো তা তাদের মর্জিমাফিক খরচ করতে দেওয়াই বিধেয়। কারণ এখন থেকেই তাদের দায়িত্বজ্ঞানের সূচনা। সে যদি ভাবতে পারে, এ পয়সা একান্ত তার ভেবে তার ভবিষ্যত প্রতিক্রিয়া সুফল ফলাবে। অর্থাৎ পয়সার গুরুত্ব সে যথার্থ অনুভব করতে পারবে যার ফলে বেহিসাবের পথে সে পা বাড়াবে না। তবে, হ্যাঁ, বাচ্চা যদি কখনো কিভাবে পয়সা খরচ করতে হবে এ সম্পর্কে মা-বাবার কাছে কিছু জানতে চায় তবেই তাঁদের পক্ষে এসংক্রান্ত কিছু উপদেশ দেওয়া সমীচীন। এর পরও সে যদি অন্যভাবে পয়সা খরচ করে তবে তাকে বকাবকি করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে তাকে আপন অভিজ্ঞতা থেকেই শিখতে হবে। অর্থাৎ ঠেকবে এবং শিখবে। ভুলত্রুটিও জীবনের পক্ষে কম সহায়ক নয়। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনে সাফল্যের এরও প্রয়োজন রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ভুলত্রুটির সাবধানতার পথেই লুকিয়ে থাকে সাফল্যের চাবিকাঠি।

তাছাড়া এর আর একটা দিকও আছে। সে যদি বুঝতে পারে, তাকে যে পয়সা দেওয়া হয়েছে সে পয়সার উপর তার একারই অধিকার তবে তার আত্মবিশ্বাস, আত্ম-সন্তোষ এবং ভবিষ্যত দায়িত্বজ্ঞান ক্রমে স্ফুরিত হয়। এই সঙ্গে তার কথাবার্তার ঢঙও নতুন মোড় নেয়। বাচ্চাদের একটা সাধারণ প্রবৃত্তি থেকেই এ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ওরা যে কোন জিনিস জমানোর দিকে খুব নজর দেয়। মারবেল পাথর থেকে শুরু করে ছোট ছোট ইটের টুকরো পর্যন্ত ওদের ভান্ডারে সঞ্চিত থাকে। সুতরাং যে পয়সা হলো জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস তার মাহাত্ম্য অনু-ধাবন করতে ওদের কোন অসুবিধা হবারই কথা নয়। পয়সা সম্বন্ধে তার ধ্যানধারণা এবং আচার-আচরণ লক্ষ্য করে মা-বাবা এবং অভিভাবকরা সদুপদেশ দিতে পারেন। তারপর কতগুলি উপায় অনুসরণ করলেও বাচ্চাদের পয়সা জমানোর প্রবৃত্তি সহজেই জন্মায়।

খুব ছোটবেলা থেকেই পয়সা সম্বন্ধে বাচ্চাদের একটা মোহ থাকে। অবশ্যই শিশুভেদে তা স্বতন্ত্র। কোন কোন বাচ্চার মধ্যে পয়সা খরচের নানা পরিকল্পনা থাকে। ওর হাতে পয়সা পড়লেই খরচ হয়ে যাবে। এ অবস্থার মধ্যেই ওকে সঞ্চয়ে আগ্রহী করতে হবে। তাই হাতখরচের পয়সা থেকে ওকে এমন কিছু কিনতে উৎসাহী করা হবে যাতে ওর আগ্রহ অপরি-সীম। আবার এমন অনেক আছে, গোড়া থেকেই সঞ্চয় প্রবৃত্তির সঙ্গে তাদের সহবাস। ওরা বেশ গর্বের সঙ্গে পয়সা বাঁচায় এবং সঞ্চিত বিত্তের জন্য গর্ব অনুভব করে। এখন অভিভাবকের দায়িত্ব হলো, তিনি যথেষ্ট সতর্কতা এবং রুচির সঙ্গে ওদের চিন্তাভাবনার অনুসরণ করবেন। এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন উপদেশ দেবেন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সফল করার পথ দেখাবেন।

ছেলেপুলের মধ্যে সঞ্চয় অভ্যাস জাগিয়ে তোলার একটি সহজ উপায় হোল, ছোট কৌটোর মুখ ফুটো করে নিয়মিত পয়সা ফেলার অভ্যাস করানো। বাচ্চাকে আরো উৎসাহ দেবার জন্য ওর সামনে মা-বাবাকে কখনো কখনো কিছু পয়সা ওই কৌটোয় ফেলতে হবে। মা-বাবাকে দেখে ছেলেমেয়ে উৎসাহ পাবে। এই মজার সঞ্চয়ে ওরা আরো আগ্রহভরে অংশ নেবে। এই-ভাবেই গড়ে উঠবে ভবিষ্যত সঞ্চয় প্রবৃত্তি। মা-বাবা নিজের প্রয়োজনে বাচ্চার জ্ঞাত-সারেই ওখান থেকে ধার করতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাচ্চার সমক্ষে ওই টাকা যখন ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন কিছু অতিরিক্ত যেন কৌটোর মধ্যে পড়ে।

আমাদের দেশে নানা উৎসব। বিভিন্ন উপলক্ষে বাচ্চার হাতে কিছু কিছু পয়সা দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব বাড়ি এলে তারা আদর করে বাচ্চাদের হাতে কিছু দিয়ে যান। যদি এসব পয়সা ওই কৌটোর মধ্যে ফেলা হয় তবে জমানোর অংকটা নেহাত মন্দ হয় না। সময় সময় ওরা এখান থেকে খরচ করতেও পারে। আর সব সময় ছেলেপুলে চাওয়া মাত্রই পয়সা দেওয়ার সামর্থ্য মা-বাবার থাকে না। তখন এই কৌটো অনেকটা রক্ষকের ভূমিকা নেয়। এবং আকস্মিক খরচের মুহূর্ত ছাড়া তা মনে পড়ার উপায় নেই।

মা-বাবা বাচ্চাদের মাঝে-মাঝে নানা-ভাবে উৎসাহ দেন। কখনো একটা সুন্দর জামা কিনে দেন আবার কখনো লোভনীয় খাবার। কোন কোন পরিবারে সুন্দর-সুন্দর ছবিওয়ালা বইও উপহার দেওয়া হয় বাচ্চাকে। এই সঙ্গে আরেকটা অভ্যাসও রাখা দরকার। পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করলে, গুরু-জনের আদেশ-উপদেশ ঠিকমত মেনে চললে অথবা বেশ সন্তোষজনক কোন কাজের পর বাচ্চাকে উপহারের সঙ্গে কিছু অর্থ দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। আর এবার মা-বাবকে বলতে হবে, এই অর্থ তোমার জমিয়ে রাখা উচিত। বাজে জিনিস কিনে পয়সা খরচ করো না। এ পয়সা জমিয়ে রাখলে এমনি আরো পয়সা পাবে। বাচ্চা তখন উৎসাহের চোটে পয়সা জমাতে শুরু করবে।

বাচ্চাদের সহজ সঞ্চয় প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করার অনেক রাস্তা আজ খুলে গেছে। পশ্চিমের অনেক দেশেই ব্যাংকে বাচ্চাদের টাকা জমানোর ব্যবস্থা আছে। টাকা জমা দিয়ে ওরা পায় একটি সুন্দর পাশবুক, যাতে ওর ফটো ছাপানো থাকে। এই উৎসাহে বাচ্চা নিজে এসে টাকা জমা দেয়। এভাবে সঞ্চয় ভান্ডারের সঙ্গে ওর একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যার ফল হয় দূরপ্রসারী। আমাদের দেশেও বাচ্চাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ব্যাংকে টাকা জমানোর বন্দোবস্ত আছে। সে ব্যবস্থার আরো উন্নতি আমাদের কাম্য।

—প্রমীলা

বেতার শ্রুতি

সোভিয়েত রাশিয়ায় রেডিও পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান। যেহেতু সরকারী প্রতিষ্ঠান সেইহেতু একমাত্র প্রতিষ্ঠান। পুরোপুরি মনোপলি। এবং সরকারের ইচ্ছেমতোই সেখানকার রেডিওর সমস্ত কাজকর্ম হয়। সরকারের ইচ্ছের বাইরে কোন কিছু করার অধিকার রেডিওর কোনো কর্মচারীর বা কর্মচারিণীর নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র ভয়েস অব অ্যামেরিকা (ভয়েস অব অ্যামেরিকা অন্তর্দেশীয় শ্রোতাদের জন্য নয়, বহির্দেশীয় শ্রোতাদের জন্য) ছাড়া রেডিও পুরোপুরি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। যেহেতু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেইহেতু অনেক প্রতিষ্ঠান। কোনরকম মনোপলি নেই; একটি সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ নেই। বহু প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বৃদ্ধি লাভ করছে। যে প্রতিষ্ঠানের যেমন ইচ্ছে তেমন চলতে পারে, বাধা দেবার কেউ নেই। শ্রোতাদেরও আপত্তি করার কিছু থাকে না, কারণ রেডিও শোনার জন্য তাঁদের পয়সা দিতে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও সেট রাখার জন্য লাইসেন্স নিতে হয় না। ফি দিতে হয় না। একটা রেডিওর অনুষ্ঠান পছন্দ না হলে সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা রেডিও টিউন করা যেতে পারে, এবং সব রেডিওরই ভাষা এক বলে অসুবিধে কিছু হয় না।

আমাদের এখানে রেডিও রাশিয়ারই মতো পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান। একমাত্র প্রতিষ্ঠান। মনোপলি। পুরো মনোপলি। আর হিন্দী ছাড়া অন্যান্য ভাষার জন্য একাধিক কেন্দ্র নেই বলে টিউন করে রাখতে হয়। এবং একই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে হয়। অনুষ্ঠান পছন্দ না হলে রেডিও সেট বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এবং রেডিও শুনতে আমাদের এখানে পয়সা লাগে। পয়সা দিয়ে আমাদের এখানে রেডিওর লাইসেন্স নিতে হয়। সুতরাং পছন্দ-মতো অনুষ্ঠান না হলে, পছন্দমতো লোকের অনুষ্ঠান না হলে আমাদের এখানকার শ্রোতাদের আপত্তি করার অধিকার আছে। প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আছে। এবং রেডিওর কর্মচারী বা কর্মচারিণীদের নিজেদের ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকার নেই।

'কিন্তু' রেডিওর কর্মচারী বা কর্মচারিণীদের ইচ্ছেমতো, খেয়াল-খুশিমতো কাজ করার অনধিকারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানানো যায় না। নালিশ জানাতে হলে রেডিওরই কর্মচারী বা কর্মচারিণীদের কাছে চিঠি লিখে জানাতে হয়। এবং চিঠি তাঁরা গ্রাহ্য না-ও করতে পারেন, এমন কি প্রাপ্তি স্বীকারও না। তারও বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানানো যায় না। যায় খবরের কাগজে আর সাময়িক পত্রিকায়। এবং সে রকম নালিশ হামেশাই জানানো হয়। হামেশাই খবরের কাগজে আর সাময়িক-পত্রিকায় নালিশ ছাপানো হয়। তাতেও বিশেষ কাজ হয় না, কারণ খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকাকে মানতে তাঁরা বাধ্য নন। আর বাধ্য নন বলেই এখনও তাঁরা অবাধে নিজেদের ইচ্ছে-মতো, খেয়াল-খুশিমতো প্রোগ্রাম করছেন; নিজেদের পছন্দমতো, স্বার্থমতো লোকদের দিয়ে প্রোগ্রাম করাচ্ছেন।

'গ্রুপ অব (নিউজ) পেপার্স' বলে একটা কথা আছে। মানে, একই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকগুলি কাগজের প্রকাশ—তা সে সবই খবরের কাগজ হতে পারে, আবার খবরের কাগজের সঙ্গে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি অন্য পত্রিকাও হতে পারে। এই রকম 'গ্রুপ পেপার্স' কলকাতাতেও আছে। 'গ্রুপ অব পেপার্সে'র মধ্যে কেবল কাগজই থাকে, রেডিও থাকে না। কিন্তু কলকাতার একটি 'গ্রুপ অব পেপার্সে'র মধ্যে কলকাতা রেডিও-ও আছে—অন্তত সেই রকম মনে হয়, সেই রকম দেখা যায়। কারণ, কলকাতা রেডিওয় এই 'গ্রুপ অব পেপার্সে'র লোকেদের ছড়াছড়ি। নাটকে, কথিকায়, আলোচনায়, সমীক্ষায়, গল্প কবিতা ও অন্যান্য রচনা পাঠে, বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই 'গ্রুপ অব পেপার্সে'র লোকেদেরই যেন মনোপলি—খ্যাত-অখ্যাত সকল রকম লোকেদের। খবরে প্রকাশ, অনতিবিলম্বে এই 'গ্রুপ অব পেপার্সে'র দারোয়ান-বেয়ারাদেরও রেডিওর প্রোগ্রাম করার জন্য ডাকা হবে।

অথচ এই গ্রুপের বাইরেও অনেক যোগ্য লোক আছেন যাঁরা রেডিওয় অনাহূত, অবহেলিত, এই গ্রুপের বাইরে এমন অনেক গুণী কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক আছেন যাঁরা এখনও রেডিওর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি। এই গ্রুপের বাইরে এমন অনেক গুণী কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক আছেন যাঁরা বছরে একটা প্রোগ্রামও পান না। এই গ্রুপের বাইরে একজন সর্বভারতীয় খ্যাতিমান কবি বছরে নিয়ম করে মাত্র একটি প্রোগ্রাম পেয়ে থাকেন। একটির বেশি দুটি প্রোগ্রাম কখনও তাঁর জন্য বরাদ্দ হয় না। আর একজন কবি (কবি হিসাবে যাঁর পরিচিতি কম নয়) আজ তিন বছর প্রোগ্রাম পান না। চার বছর প্রোগ্রাম পান না এমন লেখকও শ্রবণকের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা রেডিওয় গিয়ে খোঁজ করলে তাঁদের নাকি বলা হয়, 'দেখছি।' — কিন্তু দেখা আর শেষ হয় না। চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিলে তার উত্তরও নাকি পাওয়া যায় না। এমনি করে মান-সম্মান খুইয়ে অনেকে রেডিওর প্রোগ্রাম পান না। অথচ তাঁদের কাউকেই স্পষ্ট করে বলা হয় না : মশাই, আপনি অপদার্থ, রেডিওয় প্রোগ্রাম করার যোগ্যতা আপনার নেই। অতএব আপনাকে আর প্রোগ্রাম দেওয়া হবে না।' বললে ল্যাঠা চুকে যেত, তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। ভাবতে পারতেন রেডিও পুরোপুরি ঐ 'গ্রুপ অব পেপার্সে'রই সম্পত্তি।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৩ এপ্রিল রাত সওয়া ১০টায় ইংরেজী নিউজ রীলে পথনিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনাগুলি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। পথদুর্ঘটনা এড়ানো যায় কিনা, কেমন করে একটু সতর্ক হয়ে পথ চললে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, আর অসতর্কতার ফলে দুর্ঘটনায় পড়ে কেমন করে অগণিত মানুষ মৃত্যু বরণ করছে, বিকলাঙ্গ হচ্ছে, শিশুদের অনর্থ করছে সে বিষয়ে ছোটো ছোটো অনেকগুলি আলোচনা। এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে কী করা হচ্ছে তার বিবরণ।...এই ধরনের অনুষ্ঠান যত বেশি করে, যত "কালার-ফুল" করে প্রচার করা যায় ততই ভালো।

এই নিউজ রীলের আর একটি বিষয় ছিল গান্ধীজী সম্পর্কে একটা আলোচনাচক্র। পৃথিবীর নানা দেশের প্রতিনিধি এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেছিলেন, গান্ধীজী সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান-ধারণা আর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানটি তেমন মনোগ্রাহী হতে পারে নি।

৫ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৮টায় নজরুল-গীতি শোনালেন শ্রীমতী ইরা সেনগুপ্ত। ...ভালো। প্রশংসনীয়।

পরে সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে "বিচার" নামে একটি গল্প পড়লেন শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার। গল্পটি এমনিতে মন্দ লাগল না। কিন্তু পড়াটা বড়ো দ্রুত, শিশুদের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন।

১টায়—না, রবিবার হলেও নাটক নয়, মাসের শেষ রবিবার না হলেও 'রূপ ও রঙ্গ"। নকশা আর বিরূপাক্ষ। নকশার নামে কড়চা "দিশেহারার কড়চা" ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের পঞ্চম পর্ব। রচনা শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইদিন পঞ্চম পর্ব হল, পরে ক্রমে ক্রমে আরও পঞ্চদশ পর্ব হবে কিনা বলা হয় নি। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে এই রকম বার-তের মিনিটের এক-একটা কড়চা প্রচার করে? কী বক্তব্য এর? সাহিত্যিক মূল্য কী? সামাজিক মূল্য? খবরের কাগজের রিপোর্টও তো এর চেয়ে বেশি সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য বহন করে।

রবিবারের দিনটা অনেকেরই ছুটির দিন। আর এই সময়টা বাড়িতে থাকার সময়। সুতরাং এই দিন এই সময় শ্রোতারা একটা করে পূর্ণাঙ্গ নাটক শুনতে চান—যার সাহিত্যিক মূল্য থাকবে, সামাজিক মূল্য থাকবে, নান্দনিক মূল্য থাকবে, এবং আরও অনেক কিছু থাকবে। তাঁদের আধখানা কি সিকিখানা কড়চা দিয়ে ছেলে-ভুলোলে চলবে কেন? তা-ও যদি অভিনয়ে আর প্রযোজনার জোর থাকত!

আজকাল টেনিসে গোল দিয়ে হার-জিত নির্ণয় হচ্ছে জানেন? ডেভিস কাপ টেনিসে তাই হয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে রেডিওর খবর শুনুন। ৫ এপ্রিল রাত ১০টা ৫ মিনিটে কলকাতা থেকে প্রচারিত খবরে বলা হয়েছে, "অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ টেনিসে পূর্বাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপাইন্সকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।"

৬ এপ্রিল রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আধুনিক গান শোনালেন শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়। বেশ ভালো লাগল।

৭ এপ্রিল সকাল সওয়া ৮টায় শ্রীমতী মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক গানও ভালো লাগল। বেশ স্বাভাবিক।

৮ এপ্রিল বেলা আড়াইটের "বিদ্যার্থীদের জন্য" অনুষ্ঠানে "প্রাণী পরিচয়" পর্যায়ে "উইপোকার জগৎ" সম্বন্ধে বললেন ডঃ জগন্নাথ মিত্র। বেশ স্পষ্ট করে, সরল ভাষায় উইপোকাদের, বিভিন্ন জাতের উইপোকাদের, বিভিন্ন স্থানের উইঢিবির পরিচয় দিলেন; তাদের আচার-আচরণের, খাদ্যের, কাজকর্মের, রাজারাণীর, রাজার রাজত্বের কথা বললেন; কীভাবে তারা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা-ও। বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছিল কথিকাটি। বলার ভঙ্গিটিও বেশ সরল, সহজ।

এর পরে এই আসরে "নতুন দেশের সন্ধানে" এই পর্যায়ে ফ্রান্সিস ড্রেক সম্পর্কে বললেন শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ। ভদ্রলোক বেশ সোৎসাহে, বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলে গেলেন। শুনতে ভালোই লাগল। মজাও। ...কিন্তু রেডিওয় এইভাবে বলা চলে কিনা, বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে, সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার। ছাত্রদের কাছে শুনতে ভালো লাগা, মজা লাগাটাই তো সব নয়, শুনে শেখাটাও দরকার। এইভাবে বললে শেখাটা ঠিকমতো হয় কি?

১২ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে মহাভারতের গল্পের মধ্যে ঘটোৎকচের গল্প বললেন শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়। বলাটা মন্দ লাগল না, কিন্তু ঘন ঘন "জেনে রাখো তোমরা" বলাটা মুদ্রাদোষের মতো শোনাল।

১৩ এপ্রিল সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে গীতবিতানের শিল্পীদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি চলনসই। খুব "ইমপ্রেস" করতে পারে নি।

১৪ এপ্রিল সকাল সওয়া ৭টায় ভজন ও রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে কীর্তন শোনালেন শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। রসে ও মাধুর্যে সুন্দর হয়েছিল দুটি অনুষ্ঠানই। মনটাও আপ্লুত হয়েছিল।

—শ্রবণক

বিদেশ যাত্রার পথে দমদম এয়ারপোর্টে পণ্ডিত রবিশঙ্কর

জলসা

দু-বছরের জন্য রবিশঙ্করের পুনরায় বিদেশ যাত্রা। ভারতে মাত্র ছ মাস অবস্থানের পর আবার দু বছরের জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিদেশ যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ থেকে বেনারস যাত্রাপথে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি দমদম এয়ারপোর্টে ছিলেন। সেইসময় অমৃতের প্রতিনিধিকে তিনি জানান তার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বারাণসীতে রামসহায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়।

ইতিপূর্বে বোম্বের সম্পূর্ণানন্দ প্রেক্ষাগৃহে ৭ই এপ্রিল তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শিল্পী ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগজেন্দ্রকার এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। কোচিন এবং মাদ্রাজেও ব্যাপকভাবে পণ্ডিতজীর সুবর্ণ উৎসব জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। শ্রীমতী এম এস শুভলক্ষ্মী, বৈজয়ন্তীমালা পবং আরো বহু শিল্পী মাল্যদানে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

উইমেন্‌স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম উৎসব। দক্ষিণ কলিকাতার সংস্কৃতি সংস্থা উইমেন্‌স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সাধারণ উৎসব পালিত হচ্ছে ২৬ এপ্রিল। এটি চ্যারিটি শো এবং এঁদের পরিবেশন তালিকায় থাকবে বিভিন্ন নৃত্য এবং পরিশেষে বর্তমান যুগের এক বিশিষ্ট জনপ্রিয় নাটক এবং ইন্দ্রজিৎ।

সুরতীর্থের বার্ষিক উৎসব—শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আগামী ২৭ এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে সুরতীর্থের বার্ষিক উৎসবে জটায়ু-বধ ও অন্যান্য নৃত্যনাট্যের এক বিস্তৃত অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোকে তরুণ শিল্পী শিবানী চট্টোপাধ্যায়। তরুণ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক পরলোকগমনে ২১ মার্চ সৌরভ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক শোকসভা আহূত হয়। গত ১৮ মার্চ এক মোটর দুর্ঘটনায় এই প্রতিভাসম্পন্না তরুণ শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবানীর সঙ্গীতগুরু চিন্ময় লাহিড়ী। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন পণ্ডিত ভি জি যোগ। এ ছাড়া বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, কল্যাণী রায়, বাণী ঠাকুর, বটুক নন্দী, অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক শিল্পী এইসভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী শিবানী ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তারাপদ চক্রবর্তী এবং চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। ইনি দিল্লীর সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে আড়াই শত টাকা বৃত্তি পেতেন। গত আঠার বছর ধরে তিনি বেতার শিল্পীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে একাধারে উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে সৌরভের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত। 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে'—সেদিন কবি মণীন্দ্র রায়ের আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্টুডেন্টস হলে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানটি শুনতে শুনতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে—প্রভাতী সুরের আকুতির এক কোমল কারুণ্য যেন ব্যাপ্ত হয়ে গেল অন্তরের অন্তলে। গানটি সত্যিই সময়োচিত। প্রতি মানুষের অন্তরেই বুঝি লুকোনো আছে পুষ্প-সমারোহের গন্ধ ও বর্ণবৈভব এবং গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পস্তবকের মতই তা ফুটে ওঠে কবির কাব্যে, শিল্পীর গানে, চিত্রকরের ছবিতে। এই ধূলি-মাটির জগতের সকল রূঢ়তা ও স্থূলতার বেদনা বাধা বিদীর্ণ করে স্রষ্টার অন্তরের এই ঊর্ধ্বমুখী ব্যাকুলতাই এই সীমিত জগতের অন্তরালে এক সৌন্দর্যলোকের বার্তা মানুষের চিত্তে পৌঁছে দেয় বলেই না ধূলি-ধূসর জগতের বিরসতা সহনশীল হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও অশোকবাবু গেয়েছিলেন 'আজি মন্দ্রিত পুণ্য অন্তরে', 'আমি কান পেতে রই', 'নয়ন মেলে দেখি', 'এবার বিদায় দাও খেলার সাথী'—কোনোটি ধ্রুপদ, কোনোটি কীর্তন, কোনোটি ভাটিয়ালীর ছোঁয়ায় আজকের দিনের মানুষের সমস্যাক্লিষ্ট অন্তরে যেন রং ও রসের স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিল। শিল্পীর শিক্ষা, অনুভূতি সবার ওপর নিবিষ্টচিত্তের গভীরতার প্রসাদগুণেই বুঝি প্রতিটি গান এমন করে মনকে ভিজিয়ে দিতে পেরেছে।

আড়ম্বরহীন কিন্তু আন্তরিকতায় দীপ্ত এই সম্বর্ধনা সভার পৌরোহিত্য করেন
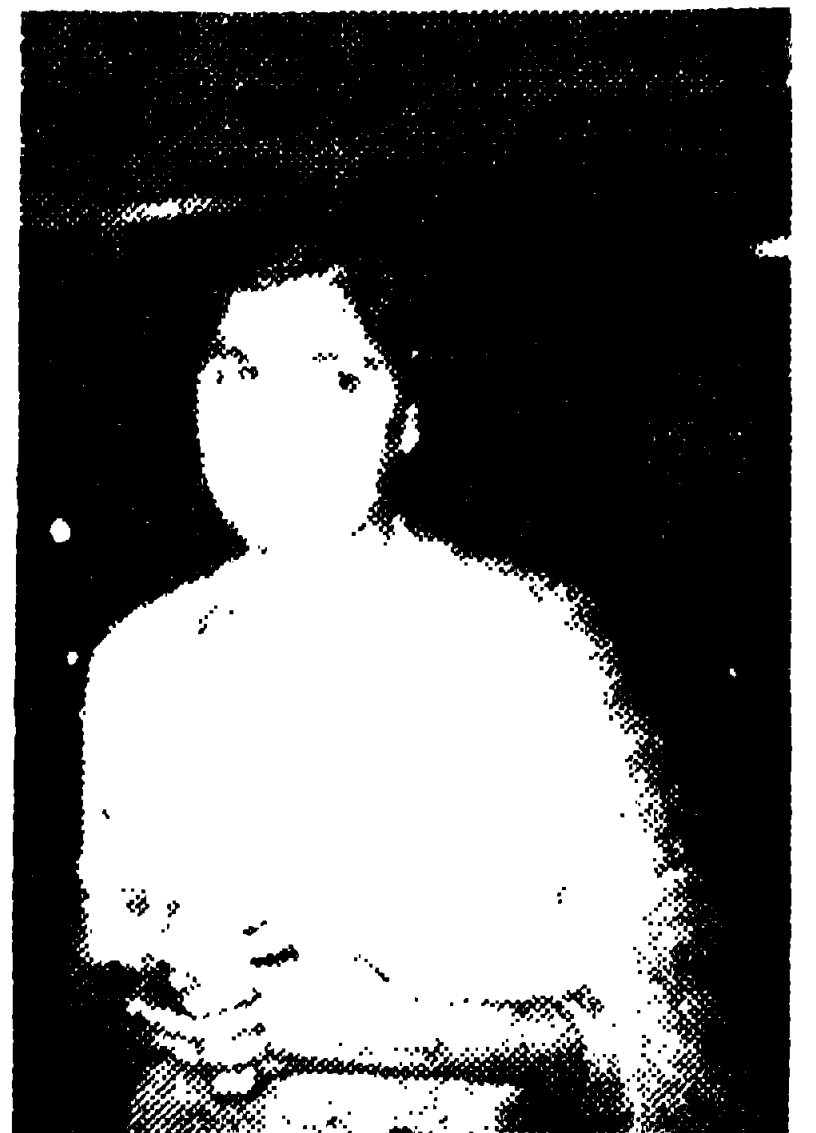
পপ-সঙ্গীত শিল্পী ঊষা আয়ার

প্রেমেন্দ্র মিত্র—প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমনোজ বসু।

রবিতীর্থের সমাবর্তন: গত ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে রবিতীর্থের সমাবর্তন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী কনক বিশ্বাস। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীনীহার-রঞ্জন সেন। ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন মঞ্জুভারতী চৌধুরী। রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন সুস্মিতা রায়চৌধুরী। ইনি 'বিদ্যাসাগর হিমাংশু স্মৃতি পদক' ও অন্যান্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র, সুস্মিতা রায়চৌধুরী ও রবিতীর্থের শিশু-শিল্পীবৃন্দ। রথীন চৌধুরী ও গৌর ...কের পরিচালনায় নজরুল গীতি ও ...গীতি পরিবেশন করেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ...তা গুপ্ত, রীতা সেনগুপ্ত, মমতা ...য় জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগতি রায়, ...কো গাঙ্গুলী, আরতি দত্ত, শিপ্রা ঘোষ ...রত্না রায়।

ঊষা আয়ার—উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের ...জ 'পপ সং' অথবা আধুনিক ইংরাজী ...পরিবেশন করে বর্তমান যুগের তরুণ ...কে আকৃষ্ট করেন প্রথম যে ভারতীয় ...—তাঁরই নাম ঊষা আয়ার। বোম্বেতে ... পারিবারিক বন্ধু 'মিনু' কর্তৃকের ...গে গ্রামোফোন কোম্পানীর ভি কে ...র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শ্রীদুবেরই ...লো হিজ মাস্টারস ভয়েস লেবেলে কয়েকটি গান ডিস্কবন্ধ হয়। প্রথম রেকর্ডের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যই ...ী আয়ার মাদ্রাজ তারপর বোম্বের ...রাবে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন এবং ...৬৯ থেকে কলকাতার 'ট্রিংকা' রেস্টুরেন্টে ...সন্ধ্যার এক আকর্ষণ। ঊষা আয়ারের ...নি এল পি ডিস্কেরিলিজ উপলক্ষে ...শোক পার্ক স্ট্রীটে গ্রামোফোন কোম্পানীর ...থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়ো-...ত হয়। এই সম্মেলনে শ্রীমতী আয়ারের ...গে সাক্ষাৎ এবং আলাপের আধ্যমে তাঁর ...চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার ...ত অবকাশ মিলেছিলো। ঊষা সুদর্শনা, ...উচ্ছল, প্রাণোচ্ছলা এবং সুহাসিনীও। ...কণ্ঠী ত বটেই। এক কথায় জনপ্রিয় ...র সকল উপাদানই এঁর মধ্যে প্রচুর পরি-...মাণে বিদ্যমান। শুনলাম এঁদের পরিবারের ...সেই সঙ্গীতপ্রবণ। প্রশ্ন করলাম ...পনি দক্ষিণ ভারতীয়। বিন্ধ্যপর্বত ...ই দত্ত রক্ষাকর্তার মত অচল থেকে ...দের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সকল রকম ...রের এবং বিদেশী প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে ...পন স্বাতন্ত্র্য অনাহত রেখেছে। মাফ ...কন পপ্-সঙ্গীতের মত বস্তুতে আপনার ... আত্মনিয়োগে একটু আশ্চর্য না হয়ে ...পারছি না।'

'পপ্ সঙ্গীত বলতে যদি 'পপুলার' ...বোঝাতে চান আমার কোনো আপত্তি ...ই। কিন্তু যদি বলেন পপ সং অর্থহীন

সংগীত পরিবেশন করছেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক অন্তঃসারশূন্য বস্তু আমি তা মানব না। আমি বিশ্বাস করি মানুষের আনন্দ তৃষ্ণার অনুভূতিতে বিশেষ করে তরুণ মনের মুখর উচ্ছাসে। আমি গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই উপ্‌চে ওঠা ওদের বাধাহীন আনন্দের জোয়ার অনুভব করি। আর এ আনন্দের ঢেউ আমারও চিত্ততটে লেগে গাইবার প্রেরণাকে আরো উদ্বেল করে তোলে। কারণ এটা পরস্পরসঞ্চারী।

শুধু ক্লাসিক্যাল কেন সব গানই আমি ভালবাসি কিন্তু 'আই ডোন্‌ট লাইফ টু বি বায়াস্‌ড'—আজকের সমস্যাক্লিষ্ট তরুণ মনের আনন্দে উথ্‌লে ওঠা দেখতে ভাল লাগে।' ঊষা বললেন নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসের সুরে।

ও'র গানের বিশেষ আঙ্গিক বা প্রকাশ-ভঙ্গী সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বললেন—আপন সঙ্গীতধর্ম সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা যদি মনের মধ্যে গড়ে ওঠে তবে যে কোনো শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীতে এমন একটা আন্ত-রিকতা ফুটে উঠতে বাধ্য যা মানুষকে আকৃষ্ট করবেই। তবে এ সম্বন্ধে শিল্পীকে আগে নিঃসংশয় হতে হয়। শিক্ষার প্রসঙ্গে বললেন—আপনাকে প্রকাশের তাগিদেই তাঁর গান-গাওয়া শুরু। একজন কেনো শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি।

এরপর ঊষার লং-প্লেয়িং ডিস্ক বাজিয়ে আমাদের শোনান হয়। বিভিন্ন রচয়িতার বিভিন্ন গানে দুর্বার এক উচ্ছ্বাসের প্রচন্ড প্রকাশ এবং তা মনোধর্মী নয় প্রাণধর্মী। ফেনিল উন্মত্ততাই হয়ত বা বেশী এবং গাইবার প্রাণবন্ততাই চিত্তা-কর্ষী। তবু কান পেতে শুনলে কয়েকটি গানে চটুলতার মধ্যেও আনন্দ, বিষণ্নতা ও স্বপ্নের একটা গুণগুণানি যেন শোনা যায়। গানগুলি হোল 'আই লেফ্‌ট মাই হার্ট অ্যাট সানফ্রান্সিসকো' 'ব্লু প্রেলিউড, ক্যালি-ফোর্নিয়া ড্রিমিং'। উপযুক্ত সঙ্গত করে-ছেন 'দি রোনি মেনেজেস কোয়াট্রেট' এবং 'স্যাভেজেস্‌'।

পরিশেষে ট্রিংকার ঊষার লাইফ পার-ফরমেন্স শুনলাম। এবং বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কলো-চ্ছ্বাসও প্রত্যক্ষ করলাম। বালকের মত কন্ঠের সতেজভাব, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং উল্লাসদৃপ্ত অনভেদী ও মুখভাবের সঙ্গাতে পরিবেশিত গানের ভাবব্যাপ্তি শ্রোতাদের মুহুর্মুহু উত্তেজনাপূর্ণ সমর্থনে হল ভরে তুলেছিলো। এর মধ্যে কোনো কোন গানে যেমন 'এ সং অফ্ লাভ ইজ এ স্যাড্ ওয়ান' গভীরের অস্ফুট অনুরণন হয়ত বা শোনা গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে আনন্দের চেয়ে আমোদের উপ-করণই বেশী, ব্যথার চেয়ে কৌতুকের। তবে বর্তমান জীবন ও কৃষ্টির এটিও একটি দিক—এবং সেইদিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এই গান ও অনুষ্ঠানের মূল্য এ কথা ভুললে চলবে না।

রম্যাণি বীক্ষ্য: গত ৫ এপ্রিল রবীন্দ্র-সদনে নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের শিল্পীরা 'রম্যাণি বীক্ষ্য' নৃত্য-গীতিবিচিত্রা পরিবেশন করেন। ওড়িষী, ভারতনাটাম, মণিপুরী, কথক ও রবীন্দ্রসংগীতের নৃত্যরূপ এই অনুষ্ঠানের সম্মেলক রূপ। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী-সরকার ও সহশিল্পীবৃন্দ নৃত্যাংশে উল্লেখ-যোগ্য। বিশেষ করে শ্রীমতী চাকীসরকার পরিবেশিত 'দশাবতার' ও 'নবরস' মনে রাখবার মত। সংগীতে অর্ঘ্য সেন, মঞ্জু গুপ্ত, অনুপ ঘোষাল, নমিতা ঘোষাল, ইন্দ্রকুমার পট্টনায়ক, শৈলেন দাস, অরবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। মঞ্চ-সজ্জা ও আলোকসম্পাতে কালীপদ সরকার প্রশংসার যোগ্য। এই অনুষ্ঠানে বিদেশী অতিথি নিকোলাস কারস্লাক গ্রন্থনা করেন।

বসন্ত উৎসব : সম্প্রতি পরিবেশ গোষ্ঠীর সদস্যারা নিউ আলিপুরে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন বিচিত্রা-নুষ্ঠানের মাধ্যমে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিল্পী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে প্রথম থেকেই আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। অনু-ষ্ঠানের সূচনা হয় ঝর্ণা রায়ের কন্ঠসঙ্গীত দিয়ে। এঁর গাওয়া আধুনিক গান বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের গানগুলি বিশেষ প্রাণ-বন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া একে-একে গান গেয়ে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায় ও বনশ্রী সেন-গুপ্ত। অনুষ্ঠানের সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল কৌতুকগানের পুরোধা মিন্টু দাশগুপ্তের রসময় গান। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়। কাজী সব্যসাচীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সুপরি-চিত চিত্রাঙ্গদার সুব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

—চিত্রাঙ্গদা

হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে

পূর্ব ইয়োরোপ অঞ্চলের হাঙ্গেরী রাজ্য আজ একটি কম্যুনিস্ট দেশ। সকল কম্যুনিস্ট দেশের মতো হাঙ্গেরীরও চলচ্চিত্রশিল্প তাই ১৯৪৮ সাল থেকে সরকার পরিচালিত। গেল দুটি দশকে যে-সকল ছবি হাঙ্গেরীতে নির্মিত হয়েছে, তাদের প্রায় প্রতিটির মধ্যে ঐ রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত দেখা যায়। হাঙ্গেরীর বর্তমান পটভূমিকায় বর্তমান কালের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস করেছেন প্রায় প্রতিটি পরিচালক। কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনীই হোক বা সামাজিক কাহিনীই হোক, হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রে আমেরিকা, ইতালী ফ্রান্স এবং অপরাপর পশ্চিমী দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিতে অনুসৃত রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

১৯৫০ দশকের প্রথম ভাগে হাঙ্গেরীতে বছরে মাত্র ছটি কি সাতটি চলচ্চিত্র নির্মিত হত। কিন্তু কয়েকজন উৎসাহী, সৃষ্টিধর্মী নবীন পরিচালকের যোগদানের ফলে ১৯৫৬ সালের পর থেকে বাৎসরিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা কুড়িতে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এঁদের পরিচালিত বহু ছবি আন্তর্জাতিক উৎসবে সম্মানিত হয়। কার্লভি ভেরি উৎসবে পুরস্কৃত হয় 'কারেন্ট'; লোকার্ণোতে গ্রাঁ প্রী লাভ করে 'দি এজ অব ডে ড্রিমিং'; মস্কো ও রোমে গ্রাঁ প্রী দ্বারা সম্মানিত হয় জোল্টান ফেব্রি পরিচালিত 'টোয়েন্টি আওয়ার্স।' মার দেল প্লাতাতে গ্রাঁ প্রী লাভ করে 'দি ল্যাণ্ড অব এঞ্জেলস' এবং কান-এ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় "স্কাইলাক"। লণ্ডন, বোস্টন, সান ফ্রান্সিসকো, আমস্টার্ডেম, ওবারহাউজেন, প্যারিস, ভেনিস প্রভৃতি উৎসবে হাঙ্গেরীয় কাহিনী ও তথ্যচিত্র বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করে।

হাঙ্গেরী সরকারের সাংস্কৃতির দপ্তর হাঙ্গেরীর সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গঠিত ফিল্ম আর্ট কাউন্সিল-এর পরা অনুসারে রাজ্যের চলচ্চিত্র প্র পরিবেশনা নিয়ন্ত্রিত করে ... চলচ্চিত্র আমদানী ও রপ্তানী সমেত চলচ্চিত্রজগতের আর্থিক দায়িত্ব বহন থাকেন হাঙ্গেরীয়ান ফিল্ম ট্রাস্ট। বি মাপের আটটি স্টুডিও ও তাদের স যন্ত্রপাতির কর্তৃত্বভার ন্যস্ত আছে 'মাফি সংস্থার উপর। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্ম জন্যে সরকার একটি পৃথক আ সংস্থান করে রেখেছেন।

সম্প্রতি কলকাতার লাইট হা অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উ উপলক্ষে দুই সদস্য বিশিষ্ট যে হাঙ্গে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল এই শহরে পদা করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, হাঙ্গেরীর কমা কুড়ি লক্ষ পরিবারের মধ্যে তিন-চতুর্থ অর্থাৎ প্রায় পনেরো লক্ষ পরিবারে একটি করে টেলিভিশন সেট আছে প্রতিটি পরিবারের প্রায় প্রত্যেকটি লো সন্ধ্যায় বাড়ীতে বসে টেলিভিশান প্রো

প্রেক্ষাগৃহ

দেখতে ভালোবাসে। তবু এখনও টি-ভি ফিল্মগুলি মাত্র সাদা-কালোতেই হয়ে থাকে; এগুলি খুব শিগগিরই যখন রঙীন হবে, তখন চলচ্চিত্রকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। কিন্তু টি-ভির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র অধুনা কি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করছে, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন, নবীন উৎসাহী পরিচালকদের জন্যেই এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। হাঙ্গেরীর সব ছবিই কি বাস্তবজীবনকে প্রতিফলিত করে, এই প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বলেন, আমাদের ছবিগুলি প্রায়ই বাস্তবাশ্রয়ী। ধরুন, 'হ্যালো, ভেরা'র নায়িকা ভেরা নিশ্চয়ই একটি বিশেষ টাইপের মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রশ্ন করে জানা গেল, হাঙ্গেরী একমাত্র ভারত ছাড়া আর সকল দেশের চলচ্চিত্রই আমদানী করে থাকে। প্রায় দশ বারো বছর আগে হাঙ্গেরীতে যখন ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তখন থেকে হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্ররসিকদের কাছে ভারতের রাজ কাপুর-এর নাম সর্বাধিক পরিচিত; তাঁর 'শ্রী ৪২০' ওখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

যে সাতখানে ছবি উৎসবে দেখাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে, এগুলি কি হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ভুক্ত, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, বিশেষভাবে ভারতীয় দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করবার জন্যে এই ছবিগুলিকে মনোনয়ন করা হয়েছে। আমরা এখানে ব্যবসায়িক সাফল্যমণ্ডিত ছবি দেখাতে চাইনি, আমরা চেয়েছি ছবিগুলির মাধ্যমে আমাদের দেশকে প্রতিফলিত করতে। গেল পঁচিশ বছরে হাঙ্গেরীর যে অগ্রগতি হয়েছে, তাকেই যতটা সম্ভব তুলে ধরবার জন্যে ছবিগুলিকে বাছাই করা হয়েছে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন, ছবিতে নগ্নতা তাঁদের দেশে নিষিদ্ধ নয়, তবে তা নিছক কাহিনী ও শিল্পের প্রয়োজনে। হাঙ্গেরী কো-প্রোডাকসান বা সহ-প্রযোজনার বিরোধী নয়; কিন্তু এমন কাহিনী অবলম্বন করে এই কো-প্রোডাকসান করা হয়, যাতে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন আমেরিকার পটভূমিকা থাকায় আমরা আমেরিকার সঙ্গে সহ-প্রযোজনা করেছি; ঠিক ঐ কারণেই আমরা এখন রুমানিয়ার সঙ্গে যুগ্ম-প্রযোজনায় অবতীর্ণ হয়েছি। প্রতিনিধিদলের দুজন সদস্যই—মিস ইলোনা কালাই ও মিঃ ফ্রিগিস সারাণি—ওদেশের সুখ্যাত শিল্পী; অবশ্য উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলিতে ওঁদের দেখতে পাওয়া যায়নি।

উৎসবের সাতটি ছবির মধ্যে নিঃসন্দেহে জনগণের অভিনন্দন সবচেয়ে বেশী লাভ করেছেঃ (১) 'দি স্টোরী অব মাই স্টুপিডিটি'। বেচারা কেটি অনেক আশা নিয়েই নাট্যাভিনয় শিক্ষা করতে গিয়েছিল 'স্কুল অব ড্রামাটিক আর্টস'-এ: বেচারা ভর্তি হবার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারল না; পরীক্ষায় অধিনায়ক ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা মেয়ে দি গ্রেট। কিন্তু কেটি নাছোড়বান্দা; তাকে অভিনয় শেখবার সুযোগ করে দিতেই হবে। ও সাহস সঞ্চয় করে বিখ্যাত অভিনেতার পথরোধ করে দাঁড়ালঃ স্যার, আমার প্রতি সদয় হোন। স্যার সত্যিই সদয় হোলেন, তিনি ঐ নাছোড়বান্দা নির্বোধ নারীকে বিবাহ করলেন।... কেটির দশ বছর হোলো বিবাহ হয়ে গেছে, ওদের বছর আটেকের মেয়ের নাম মারিকা। নাট্যকার ফোরবাথকে কেটির বোকা বোকা সুন্দর চেহারা মুগ্ধ করেছে। তিনি ওর জন্যে বিশেষ করে বই লিখলেন 'দি ক্লেভারেস্ট উওম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড"। আজ সন্ধ্যা সাতটায় নাটকের উদ্বোধন; কেটি নায়িকা। কেটির মনে ভীষণ ভয়—কি হবে! কি হবে! যদি ঘাবড়ে গিয়ে সব অন্ধকার দেখি? তা হলে? কেটি তার জবরদস্ত স্বামীকে জিজ্ঞেস করেঃ হ্যাঁগা, তা হলে? তা হলেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে ত'? স্বামী সহাস্যে বলেন : হ্যাঁ, তা' হলেও [illegible] আমার স্ত্রীই থাকবে—মিসেস মেয়ে! কে[illegible] বোকামি কেটিকে অনেক বিপদ থে[illegible] বাঁচিয়েছে; আজও সেই বোকামিই [illegible] প্রয়োজন। সঙ্গে একজন বিখ্যাত ফরা[illegible] অভিনেত্রীকে নিয়ে স্বামী বাড়ী ফিরলে[illegible] স্ত্রীকে জানালেন, তিনি নায়ক এবং ফরা[illegible] অভিনেত্রীটি নায়িকা হয়ে একটি নাট[illegible] অবতীর্ণ হচ্ছেন। বেচারা কেটি কিই [illegible] করতে পারে তার নিজের ঐ সঙ্ক[illegible] অবস্থায়! ফরাসী-না-জানা কেটি হাঙ্গে[illegible] ভাষা না-জানা অভিনেত্রীকে নানা [illegible] কসরৎ করে আমন্ত্রণ জানাল তার জীব[illegible] প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত থাকবার জ[illegible] অভিনেত্রী রাজিও হলেন। ঠিক সাত[illegible] পর্দা উঠল। কম্পিতবক্ষে কেটি অভি[illegible] শুরু করল, সে জানে না সে কি করে[illegible] অবতীর্ণ হবার আগে তার শুভানুধ্যায়[illegible] তার ঠোঁটের সামনে ধরেছিল সুরার পা[illegible] সেই সুরা অমৃতের কাজ করল। সে ক্র[illegible] সহজ হয়ে উঠতে লাগল। তার [illegible]

স/-এর নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।   ফটো : অমৃত

বাচন দর্শকদের কৌতূহলী করে
া, তারা আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল।
একদিনেই সাফল্যের জয়মাল্য অর্জন
। হবেই না বা কেন? কেটির জীবনের
আর নাটকের ঘটনা যে প্রায় এক।
তের মধ্যে বাস্তবজীবনে সে খ্যাতিমান
নেতার স্ত্রী; আর নাটকে সে প্রতি-
শালী চিকিৎসকের স্ত্রী এবং নিজেও
ৎসক হতে চায়। জবরদস্ত নাট্যকার
ফোরবাথ। তিনি কেটিকে সার্থকনামা
অভিনেত্রী করে ছাড়লেন।

কৌতুকরসের প্রাধান্য দিয়ে সুপরি-
কল্পিত চিত্রনাট্যটি রচিত হয়েছে এবং
আশ্চর্য অভিনয় করেছেন নায়িকা কেটির
ভূমিকায় ইভা রাটকে। মার্টন কেলেটির
পরিচালনায় ছবিটি একটি চমৎকার গতি-
সম্পন্ন সার্থকতা লাভ করেছে।

(২) **'দি সয়েল আন্ডার ইয়োর ফিট'** চাষী সম্প্রদায়ের ওপর দাম্ভিক জমিদারের অত্যাচারকে প্রাধান্য দিলেও ছবিটির মধ্যে মেহনতী মানুষের মুক্তির পথের নির্দেশ আছে। দেনা শোধ করতে না পারার জন্যে বৃদ্ধ জুহো তার একমাত্র কন্যা মারিকাকে জমিদারপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বিবাহরাত্রেই মারিকার প্রণয়ী মুখোশধারী নর্তকের ছদ্মবেশে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং দুজনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে আরম্ভ করে। জোস্কার আশা ছিল, জমিদারপুত্র মারিকাকে বিবাহবন্ধন থেকে অব্যাহতি দেবে। কিন্তু বিবাহের খরচ ও মারিকার বাবার দেনা শোধ না করলে মুক্তি মিলবে না, এই কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করল ফসল ফলাবার জন্যে। যেখানে জল নেই, সেখানে কুয়া খুঁড়ে ওরা জলের ব্যবস্থা করল। কিন্তু কুচক্রী জমিদার-সন্তান ওদের সকল চেষ্টা প্রতি পদে ব্যর্থ করে দিতে চায়। মেয়েটির পেটে সন্তান এসেছে; কিন্তু জমিদার-সন্তান ওকে বিবাহ থেকে মুক্তি না দিলে ওদের পুত্র পিতৃ-উপাধি ব্যবহার করতে পারে না—এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে আকাশের দেবতা নির্দয় হলেন; ফসল সমেত মাঠ শুকিয়ে উঠতে লাগল। অথচ অদূরে জমিদারের বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মাছের চাষ চলেছে। মরিয়া হয়ে জোস্কা অনুচরবর্গদের নিয়ে জলাশয়ের বাঁধ কেটে দিল। ওরা স্লুইস গেট বন্ধ করছিল; ও চড়াও হয়ে জোর করে স্লুইস গেট খুলে দিল। প্রতাপান্বিত জমিদারের নির্দেশে পুলিশ ওর হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে চালান দিল; কিন্তু উদ্বেল জনতা-চাষী সম্প্রদায় ওর জয়গানে মুখর হয়ে উঠল।

ফ্রিগিস বান পরিচালিত ছবিখানি অত্যান্ত বাস্তবধর্মী এবং উদ্দীপক।

(৩) **'দি আয়রণ ফ্লাওয়ার'** ছবিখানিতে বোধ করি বর্তমান হাঙ্গেরীর যুবসমাজের অব্যবস্থিতচিত্ততার একটি করুণ সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। কারখানার কর্মী সুন্দরী ভেরার সাধ সে একজন প্রথিতযশা নর্তকী হয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবে। কিন্তু তার কর্মস্থলের মালিক বলে দিয়েছে, ভেরা যদি তাকে তার মর্জি অনুযায়ী খুশী করতে না সম্মত হয়, তাহলে তার চাকরী খতম হয়ে যাবে। বাড়ীতেও ভেরা সুখী নয়। এই অবস্থায় ভেরার সঙ্গে ভাব হয় পিটারসনের। পিটার-সন জীবনের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে চলতে চায় না; সে কোনো রকম আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী নয়। তার কোনো রকম উপার্জন নেই, অথচ সে কারও সাহায্যও নেবে না। পিটারসন ইট-টিন-পাতা-কাঠ জড়ো করে একটি ছোট্ট কুঠুরী বানিয়েছে, তাই ওদের দুজনের কাছে স্বর্গ হয়ে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। ঐ ছোট্ট কুঠুরীর সে-শক্তি নেই, যা ভেরাকে চিরকালের জন্যে তার মধ্যে ধরে রেখে দেবে। কাজেই ভেরা চলে গেল; চলে গেল সেইখানে, যেখানে সে নিরুদ্বিগ্ন,

স্বচ্ছন্দ জীবন পাবে, ভালো ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পাবে। কিন্তু এতেও ভেরার শান্তি নেই; সে আবার ফিরে আসে তার দয়িতের কাছে সেই ছোট্ট কুঠুরীটিতে। পিটারসন হঠাৎ একটি কাজ পেয়েছে, কিন্তু সে তার ভেরাকে চায় না; প্রেমের ক্ষেত্রেও সে আপোষ-নিষ্পত্তি করতে নারাজ। কাজেই ভেরাকে ফিরে যেতে হল। পিটারসনের মনের গভীরে হয়ত চিন্তা উঠছে—আর একদিন, আর একরূপে ভেরাকে তার কাছে আসতেই হবে।

জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে আজ পূর্ণতার অভাব। ছবিতেও তাই যেন পূর্ণচ্ছেদ টানা হয় না, পূর্ণচ্ছেদ টানবার আগেই ছবি শেষ হয়ে যায়। জ্যানস হার্সকোর পরিচালনা বুদ্ধিদীপ্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ। ছবিটির মধ্যে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে।

(৪) 'হ্যালো ভেরা' ছবিটিও বর্তমান জীবনের একটি খণ্ডচিত্র। বাপ-মা-ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে সুন্দরী সপ্তদশী ভেরা তার যুবক-বন্ধু গুয়াকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনযোগে যেতে যেতে গুয়াকা একটি স্টেশনে নেমে পড়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে একটি তথ্যচিত্র তোলবার জন্যে। ভেরা তাদের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে পৌঁছয় রাত্রিবেলা। সেখানে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সে হাসপাতালে যায়। ঐ হাসপাতালে এক বর্ষীয়সী রোগিণীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা জন্মায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামে গিয়ে সে তাঁর মেয়ের বিবাহ-উৎসবে যোগ দেয়। ফেরার পথে আবার তার গুয়াকার সঙ্গে দেখা হয়; তার সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গতাও হয়। কিন্তু ভেরা শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে ফিরে আসে এবং দেখে তার বাপ-মা-ভাই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে। বাড়ীতে ফিরে ভেরা নিশ্চিন্ত হয়।

এই অস্থিরচিত্ততার ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন জ্যানস হার্সবো।

(৫) ও (৬) 'দি লাস্ট হাঙ্গেরীয়ান ন্যাব' ও 'জোল্টান কার্প্যাথি'; হাঙ্গেরীর সামন্ততান্ত্রিক যুগের একটি সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের দুই পুরুষের কাহিনী। এই রঙীন ছবি দুটিতে অভিজাত বংশীয়দের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পান আহার, উৎসব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি বাস্তবভাবে দেখানো হয়েছে। যুগোচিত বেশভূষা, দৃশ্যপট, আচার-ব্যবহার ছবি দুটির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করেছে। বন্যার জলে শহরের বাড়ী ভেঙে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি রীতিমত চমকপ্রদ। উৎসবে প্রাচানৃত্যের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু চিত্রনাট্যের মাধ্যমে কাহিনীটিকে বিস্তার করার মধ্যে ত্রুটি থাকায় দুটি ছবির কোনোটিই দর্শকদের আগ্রহকে ধরে রাখতে পারেনি; ছবিটির ঘটনাগুলি যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ দ্বিতীয় ছবিটিতে নায়ক জোল্টান কার্প্যাথির জন্ম-রহস্যকে অবলম্বন করে বেশ একটি কৌতূহলোদ্দীপক নাটক গড়ে তোলবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

(৭) 'দি হোপলেস ওয়ানস' ছবিটি কলকাতার আগে দেখানো হয়েছিল এবং দর্শকদের প্রশংসাও লাভ করেছিল। হত্যাপরাধে কাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া যায়, তাই নিরূপণের জন্যে আরক্ষী বাহিনী কয়েক শো লোককে মৃত্তিকানির্মিত দুর্গে সমবেত করে। একজন বৃদ্ধার স্বামী-পুত্রকে হত্যা করেছে, এই সন্দেহে একজন চাষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় যে, সে অন্তত পাঁচটি হত্যার জন্যে দায়ী। তার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে হত্যা করেছে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারলে তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হবে, এই আশ্বাস পেয়ে সে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু লোককেই চিহ্নিত করল। ফলে, সবাই তাকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করল। অপর যে-দুজন প্রচণ্ড অপরাধী বলে গণ্য হল, তাদের একজন পিতা অপরজন পুত্র; দুজনের একজন অপরের প্রাণরক্ষার জন্যে উৎসুক। এবং এর জন্যে ওরা ওদের নেতা স্যাণ্ডারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃত আসামীদের সকলকেই ব্যাপকভাবে ক্ষমা করা হল এবং সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া হল।

ছবিটি মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীর হাঙ্গেরীর একটি বাস্তব চিত্র। পরিচালক মিকলোস জ্যানসো সমগ্র ছবিটিকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে রূপায়িত করেছেন।

এই উৎসবে প্রদর্শিত কোনো ছবিটিকেই কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন রূপে গণ্য করতে পারছি না। যে সকল গুণে একখানি ছবি মহৎ শিল্প-সৃষ্টির আখ্যা লাভ করে, সেই অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা, ছবির মধ্যে বিচিত্র চিত্রকল্পের সৃষ্টি, কাহিনী বিস্তারে চিত্রনাট্যরচনায় অদৃষ্টপূর্ব অভিনবত্ব, এবং সর্বোপরি ছবির মাধ্যমে দর্শকের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি, যার ফলে ছবি দেখবার পরেও ছবি সম্পর্কে দর্শক তার মনোজগতে চিন্তা চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়,—তেমন কোনো ছবির সাক্ষাৎ পেলুম না এই হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রোৎসবে।

চিত্র সমালোচনা

বোম্বাইয়ের চালেই বাঙলা বোম্বাইকে পরাস্ত করতে পারে

বোম্বাইয়ের চালেই বাঙলা বোম্বাইকে পরাস্ত করতে পারে, এই রকম একটা মনোভাব নিয়েই আমরা সেদিন হিন্দ প্যালেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত হিন্দী ছবি "পারস"

ভগবান পরশুরাম জয়শ্রী গাদকর

দেখবার পরে। ভেবেছিলুম, ছবিটি সাদা কালো ফিল্মে তোলা না হয়ে যদি ইস্টম্যান কলারে তোলা হ'ত, বাংলায় বসে পরিচালক প্রহ্লাদ শর্মা যদি বোম্বাই বা মাদ্রাজের প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলি বা টেকনিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পেতেন, ছবিটির সঙ্গীতাংশ ও দৃশ্যসজ্জাগত চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্যে যদি প্রচুর অর্থব্যয় করা যেত, তাহ'লে? তাহ'লে কি প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত সেই 'প্যার' ছবিটি দেখবার পরে বোম্বাইয়ের তা-বড়ো তা-বড়ো প্রযোজক ভাবতে বসতেন না, প্রেমের ঘণ্টো-চচ্চড়ি তো আমরা অনেক দিন ধরে অনেক রকম করে রেঁধেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য রান্না তো আমরা কোনোদিনই রাঁধতে পারিনি। এ যে আমাদের একেবারে কাত করে দিয়েছে! হ্যাঁ, সত্যিই প্রহ্লাদ শর্মা নায়ক রতন ও সহ-নায়িকা কিরণকে জলপ্রপাতের পটভূমিতে যে-ভাবে নাচগান ও ভঙ্গীসহ প্রেমের দৃশ্যের অভিনয় করিয়েছেন, তা বোম্বের বহু প্রযোজকেরই ঈর্ষার সঞ্চার করবে। এবং তারপর ফুলওয়া! হাতীচড়া থেকে শুরু করে সর্পদংশনে আহত হওয়ার অভিনয়ের পরে সাপুড়ের বাঁশী-বাজানো ডাক্তার রতনের সঙ্গে নাচগান পর্যন্ত এবং পরে ডাক্তারের চলন্ত মোটরগাড়ীকে কলে-কৌশলে আটকানোর চেষ্টার সময়ে ফুলওলা যা করেছে, বর্তমান যুগের হিন্দী ছবির সুখ্যাত নায়িকারা তা' করতে পারবেন কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পরিচালক প্রহ্লাদ শর্মার সাহস ও ক্ষমতা, দুইই যে প্রচুর পরিমাণে আছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দর্শকদের মধ্যে যৌনউত্তেজনার সঞ্চার করতে হয় কি করে, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। এবং ছবির গানগুলি! দুখানি গানেই ভি বালসারা দর্শক-মনমজানো চটকদার সুর দিয়েছেন ও গানগুলি গাওয়াও হয়েছে ভালো, কিন্তু যে যন্ত্রসমাবেশ করলে গানগুলি শুনতে খুব জমকালো হয়ে ওঠে তার জন্যে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং সে অর্থের সংস্থান বাঙলাদেশে হওয়া কঠিন। তাই বেশ কিছুটা খামতি থেকে গেছে ওদিক দিয়ে। অভিনয়ে মাত করেছেন ফুলওয়ার ভূমিকায় সোমা সরকার। কিরণবেশিনী সঙ্গীতাও দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া শেখর চট্টোপাধ্যায় (বাদসা), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুর সিং), জহর রায়, পান্ডুর ন্যাটোয়ার, কবিতা (মালতী) প্রভৃতি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

বাংলাদেশে 'প্যার'-এর মতো ছবি তৈরী করে প্রহ্লাদ শর্মা আমাদের রীতিমত চমকে দিয়েছেন।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

'প্রয়াসী'র দুটি নাটক : প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'প্রয়াসী'র শিল্পীরা কিছু দিন আগে 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে দুটি উপভোগ্য নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নাটক দুটি হল তপন ঘোষালের 'ওরা কি হারালো' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথ'। নাটক দুটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় তরুণ নাট্যনির্দেশক চন্দন লাহিড়ী সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রযোজনার দিক থেকে প্রথম নাটক 'ওরা কি হারালো' অনেক দিকে নতুনতর চিন্তার আভাস এনেছে। শুরু থেকেই নাটকটির অভিনবত্বের সঙ্গে দর্শকদের পরিচিতি ঘটে। নাটকের অটুট পরিবেশ সৃষ্টিতে ও নাটকীয় গতিকে অব্যাহত রাখতে সুন্দরভাবে সাহায্য করেছে পর্দার বাইরে থেকে অধ্যাপকের গভীরতর অর্থবহ বক্তৃতা। কয়েকটি মুহূর্তে নির্দেশকের পরিচ্ছন্ন শিল্পচিন্তা আশ্চর্য দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় নাটক 'ছায়াপথ' নির্দেশকের নিপুণ দক্ষতা ও শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সংগীত ও আলোর অপূর্ব সেতুবন্ধনও এই নাট্যপ্রযোজনার একটি সম্পদ। বিভিন্ন চরিত্রের উপলব্ধিকে যেসব শিল্পী আন্তরিকভাবে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন তাঁরা হলেন সুরজিৎ দত্তগুপ্ত, সুশান্ত রায়, গণেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রণু ভট্টাচার্য, আলপনা দত্ত-গুপ্ত, চন্দন লাহিড়ী। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হারাধন ভট্টাচার্য, চন্দন বোস, প্রাপ্তিনাথ পাল, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পীযূষ বোস, বিশ্বজিৎ রক্ষিত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, নীলকৃষ্ণ সাহা, শান্তি শিকদার, গৌরীশংকর দত্ত, দিলীপ দাস, মাঃ গৌতম ও সুরশ্রী গুপ্তা।

কড়ি দিয়ে কিনলাম : আগামী ৩ মে সকাল ৯টায় অমৃতবাজার পত্রিকা এডিটোরিয়াল স্টাফ ড্রামা কমিটির শিল্পীরা 'বিশ্বরূপা'য় বিমল মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন রতন ঘোষ। দিলীপ মৌলিক নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব

নিয়েছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন সমীর মিত্র, নিশীথ বড়াল, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ঘোষ, সরোজ ভট্টাচার্য, কমল রায়চৌধুরী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, গৌরী মিত্র, অজিত ঘোষ, মন্তু গাঙ্গুলী, নমিতা গাঙ্গুলী, দীপিকা দাস ও দিলীপ মৌলিক। নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

টাইপিস্ট মিতা: সন্দীপন নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি রঙমহলে অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক 'টাইপিস্ট মিতা' মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটির বলিষ্ঠ আবেদন দর্শকদের আবিষ্ট করতে পেরেছিল। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে বহন করেন। নাটকটির কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে ছিলেন কাবুল চক্রবর্তী, তপন মিশ্র, সুকন্যা রায়, সুকুমার গুপ্ত, সুশান্ত ভট্টাচার্য, নিলীমা চক্রবর্তী, অশোক চ্যাটার্জি, মাঃ পিণ্টু। নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বিধায়ক ভট্টাচার্য।

অনর্থ: জি ই সি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'অনর্থ' নাটকটি পরিবেশন করেছেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানত চরিত্র-চিত্রণের নজীর রাখেন অনিল ভোস (ডাঃ প্রশান্ত মিত্র), দিলীপ রায় (দিনু), গৌর গোস্বামী (নেকু), পশুপতি চ্যাটার্জি (ভুলু রায়), গীতা দে, দীপিকা দাস। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বিজন মুখার্জি, প্রকাশ বোস, মৃগাঙ্ক ঘোষ, প্রভাস সেন, পটুল চক্রবর্তী, রীতা পাল ও শিল্পী সরকার।

দেবযানী: সম্প্রতি আর সি ক্লাবের শিল্পীরা নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'দেবযানী' নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করলেন রংমহলে। অমিতাভ চৌধুরীর দক্ষ নির্দেশনায় নাট্য প্রয়োজনাটি নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট চিহ্নিত হয়ে ওঠে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অমিতাভ চৌধুরী, ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'রঙমহলে' সুশীল মুখোপাধ্যায়ের রাজকুমার বসু, প্রকাশ চক্রবর্তী, উৎপল ব্যানার্জি, পবনকুমার, মহাদেব দত্ত, বিমল দাস, প্রদ্যোৎ বসু, সমীর ঘোষ, সাধন চক্রবর্তী, সুশান্ত ব্যানার্জি, সলিল দেবরায়, শিবানী চক্রবর্তী, ঊষা নন্দী, বিজলী সিনহা, ঊষা চক্রবর্তী।

'বড় পিসীমা': বাদল সরকারের রঙ্গ-রসে পরিপূর্ণ অনাবিল হাসির নাটক 'বড় পিসীমা' কিছু দিন আগে মহাজাতি সদনের মঞ্চে পরিবেশিত হল। অভিনয়ের আয়োজন করেন ইউনাইটেড স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। হাসির নাটক অভিনয়ে যে সংযম ও পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন শিল্পীদের চরিত্র-চিত্রণে তা প্রায় সব কটি মুহূর্তেই পরিস্ফুট হতে পেরেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন শচীন্দ্র দত্ত, কেশব চক্রবর্তী, তপন ঘোষ, তারাচাঁদ দত্ত, নৃপেন দত্ত, মলয়কান্তি রায়, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চৌধুরী, নন্দদুলাল কর, কাজী নজরুল আলাম, রুমা দাস, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রুবী মিত্র, গীতা প্রধান। নাট্যনির্দেশনা কমল চট্টোপাধ্যায় ও মুরারী ভড়।

সর্বভারতীয় অভিনয় প্রতিযোগিতা: আগামী ৮ মে দিল্লীতে শুরু হচ্ছে সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা। বারো দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ভাষার নানা নাটক অভিনীত হবে। অভিনয়ে যে সব সংস্থা অংশগ্রহণ করছেন তারা হল—পাটনার চতুরঙ্গ (ভোজপুরী নাটক), বাঙ্গালোরের মিত্র সঙ্ঘ (কানাড়া), নবযুগ কলাকেন্দ্র (হিন্দী), মিত্রাবিতান (অসমীয়া), অমৃতসর কলাকেন্দ্র (পাঞ্জাবী), রাওজী প্রোডাকশন (তেলেগু), দর্পণা (গুজরাটি), ট্রান্সপোর্ট সিটি থিয়েটার (মালয়ালম) ও কলকাতার অনামী, নান্দনিক, সাউথ ক্যালকাটা কালচারাল ক্লাব, অযান্ত্রিক গোষ্ঠী।

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের 'শিল্পী সংসদ' তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করেন ওখানকার রবীন্দ্র-ভারতী রঙ্গমঞ্চে। কোন প্রবেশমূল্য না থাকায় তিন দিনই প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সঙ্গীত, নৃত্যের সঙ্গে চারখানি নাটক—জগদীশ চক্রবর্তীর 'সাড়ে নটা', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চার প্রহর', বাদল সরকার-এর নতুন নাটক 'সারা রাত্তির' ও শরৎ চ্যাটার্জির 'বিজয়া' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে অশোক ব্যানার্জি, সুনীল ব্যানার্জি, পুষ্প গুপ্ত ও রবীন চ্যাটার্জি। 'চার প্রহরে' ইষিতা গুপ্তশর্মা, গোপীন ব্যানার্জি ও কণিকা বসু অভিনয়-দক্ষতায় দর্শকমন জয় করেন। 'সারা রাত্তি'র হায়দ্রাবাদের মঞ্চে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ধরনের নাটক হায়দ্রাবাদ মঞ্চে এই প্রথম। এই বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় পুষ্প গুপ্ত সবাইর প্রশংসা ও সাধুবাদ অর্জন করেন। এই নাটকের তিনটি চরিত্র স্ত্রী, পুরুষ ও বৃদ্ধের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে অঞ্জু দত্ত, পবিত্র দত্ত ও পুষ্প গুপ্ত। তিনজনেরই সপ্রাণ অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটে। বিশেষত অঞ্জু দত্তের অভিনয় এত উচ্চমানে পৌঁছয় যে, হায়দ্রাবাদের দর্শক অনেক দিন তা স্মরণে রাখবে। নাটকটির উচ্চমানের সফল্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে সুপরিকল্পিত মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহাওয়া সঙ্গীত।

'বিজয়া' নাটকের সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্বই পরিচালক রবীন চ্যাটার্জির। তাঁর পরিশ্রম ও প্রয়োগনৈপুণ্যে বিজয়া, নরেন, বিলাস ও রাসবিহারী চরিত্র সার্থক রূপ নেয়। এই চরিত্রগুলিতে সুঅভিনয় করেন যথাক্রমে ললিতা ব্যানার্জি, মানস মুন্সী, ধর্মজিৎ গুপ্তশর্মা ও সুনীল ব্যানার্জি। উৎসব সার্থক হওয়ার মূলে ছিল দিলীপ চক্রবর্তীর অনলস পরিশ্রম ও সাধু প্রচেষ্টা। উৎসব প্রারম্ভে শম্ভু মিত্রের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করে শোনান হয়।

মানু সেন পরিচালিত বিরাজ বৌ মহরতে কানন দেবী এবং মাধবী চক্রবর্তী।
ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

'ডেনজার ডায়াবলিক' দেখানো হবে আগামী ২৬ এপ্রিল, রবিবার, সকাল দশটায়, প্রাচী সিনেমায়। ছবিটি ইতালীয়, রঙীন এবং বিস্ময়কর। এক রোমান্টিক চোর-শিরোমণির রোমাঞ্চকর কাহিনী ফিল্মের উপজীব্য।

পয়লা বৈশাখ বাটা অ্যাকাউন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় বাটা সিনেমা হলে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চিত্রাঙ্গদা অনুষ্ঠিত হয়। অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীমতী সুতপা দত্ত, কুরূপার ভূমিকায় শুক্লা সেনগুপ্তা, সুরূপার ভূমিকায় রত্নাবলী ঘোষ, মদনের ভূমিকায় ঝর্ণা বাগচী ও অন্যান্য ভূমিকায় মানসী ঘোষ, বিভা হোপ, গীতালী বসু, বনানী চৌধুরী, বিভা পাস, কৃষ্ণা হালদার সুঅভিনয় করেন। সংগীত পরিচালনায় নির্মলেন্দু বিশ্বাস কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সহকারীরূপে মীরা চৌধুরী, কাজল বসু, স্বপ্না সেনগুপ্তা। বিশেষভাবে শ্রীমতী মীরা চৌধুরীর সংগীত দর্শকমণ্ডলীকে [illegible] । [illegible] গ্রহণ করেন

অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, সুখেন্দুবিকাশ দত্ত। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবিপুল ঘোষ।

কলকাতার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা ভারতীয় শিল্পী পরিষদ বোম্বাই দুর্গাবাড়ী সমিতি আয়োজিত বাংলা নববর্ষ উৎসবে অতীনলাল পরিকল্পিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত নৃত্যনাট্য 'শ্রীচৈতন্য' ও নবতম অবদান নৃত্যনাট্য 'যুগ নেতা' অভিনয় করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন। নৃত্যনাট্য দুটি রচনা করেছেন রাখাল ভট্টাচার্য। সঙ্গীত কানাই বন্দ্যোঃ। আলো অনিল সাহা। রূপায়ণে পরিষদের শিল্পীবৃন্দ।

মূকাভিনেতা শ্যামল চক্রবর্তী বয়সে তরুণ হলেও দক্ষতায় কম নয়। শ্রীচক্রবর্তী পরিবেশিত 'স্ট্রীট এ্যাকসিডেণ্ট' 'চণ্ডালের স্বপ্ন' 'প্রসাধনে আধুনিকা' 'মাদারল্যাণ্ড' 'জীবনমৃত্যু' প্রভৃতি ফিচারগুলি সম্প্রতি মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্রীচক্রবর্তী একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন।

ছয় রাত্রিব্যাপী যাত্রাভিনয়ের উদ্দেশ্যে তরুণ অপেরা দিল্লী গেছেন মিলন সমিতির আমন্ত্রণে। তারপর যাবেন চণ্ডীগড়, সিমলা পাহাড়, এলাহাবাদ।

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন 'মুক্তিস্নান' শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরায় আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। শক্তিপদ রাজগুরু রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন—রাজেন সরকার। গীত রচনায় আছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। চরিত্রলিপিতে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, জহর রায়, হরিধন, শ্যামল ঘোষাল, গীতা দে, [illegible] মলয় প্রভৃতি। পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছে [illegible] নর্মদা চিত্র।
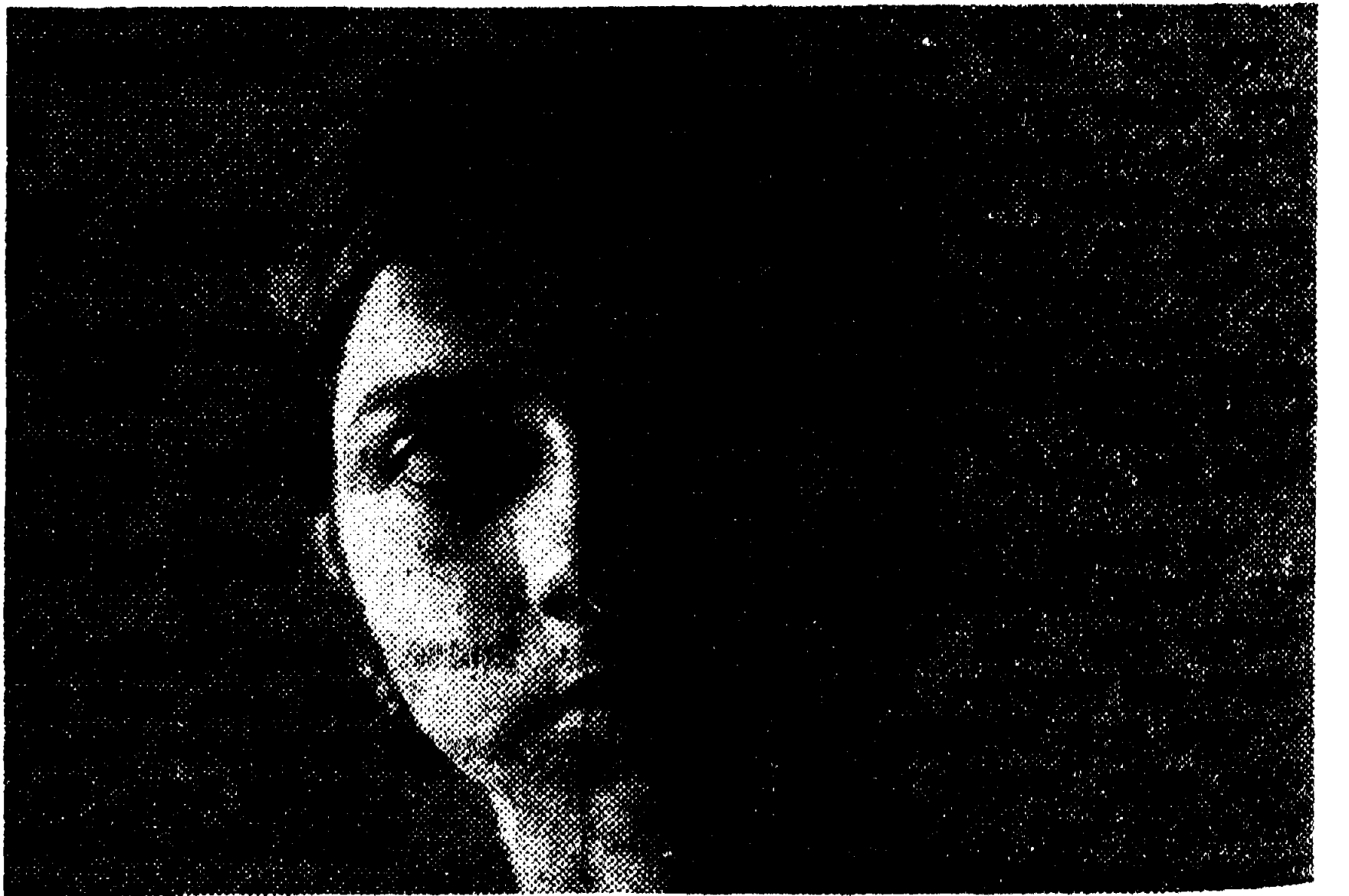
পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর-পত্র চিত্রে বিন্দুর ভূমিকায় নবাগতা মন্দিরা ভট্টাচার্য

প্রথম প্রতিশ্রুতি/কাজল গুপ্ত, সোনালী গুপ্ত এবং পরিচালক দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ আর সি প্রোডাকশন্সের দ্বিতীয় ছবি নৃত্যগীত-বহুল রূপসী চিত্রগ্রহণ কাজ অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শেষ হয়ে গেছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। অনিল বাগচীর সুরসৃষ্টি ছবিতে এক মাদকতা সৃষ্টি করবে। গীত রচনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা, আছেন যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও শিবসাধন ভট্টাচার্য। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, সুতপা চক্রবর্তী, যূথী বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, মণি শ্রীমানী, চুমকী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোঃ, নৃপতি চট্টোঃ, পঞ্চু ভট্টাচার্য, গুপী গাইন খ্যাত তপেন চট্টোপাধ্যায়, সামত ভঞ্জ প্রভৃতি। রূপসী-র বেশীর ভাগ অংশ স্টুডিও চত্বরের বাইরে বীরভূমের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তোলা হয়েছে। কাহিনী রচিত হয়েছে চাষ ও চাষীকে নিয়ে। এরই মধ্যে আছে—নাচ-গান-প্রেম প্রীতি।

গদার আর রাইফেল

এপর্যন্ত গদার যে ক'টি ছবি করেছেন, তার একটিতেও রাইফেলের অনুপস্থিতি চোখে পড়েনি বোধহয়। রাইফেল ছাড়া বুঝি তিনি অচল। 'ব্যুৎ দ্য সাফল্' থেকে 'লা কারাবিনিয়ার্স'-এর পথ বেশী দূরে নয়, 'পিয়ের দ্য ফ্যুল্' তো অনেক দূরে। যন্ত্রণায় ছটফটানো গদার (ব্যুৎ দা সাফল্) এখানে কিছু শান্ত। সংযত বুঝিবা কিছু মাত্রায় আত্মস্থও। ও'র চিন্তার জগৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিছুটা দার্শনিক, কিছুটা রাজনীতি আর বাকি অংশ ইনস্যানিটি নিয়ে গড়া। যার জন্য 'ব্যুৎ দ্য স্যাফলে'র নায়ক পিয়ের মরবার সময় বিকটভাবে হাসতে চেয়েছিল, কিন্তু দু চোখের কোণ দিয়ে দু ফোঁটা জল ছাড়া বেরোয়নি কিছুই (চ্য পলিনিক্)

সদ্য দেখা 'লা ক্যারাবিনিয়ার্স'ও পুরোনো সেই চিন্তার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারেনি। তবে সীমার মধ্যেই কিছুটা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যেন। দুজন লোককে রাজার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হল ভবিষ্যতে অনেক কিছু পাওয়ার লোভ দেখিয়ে। যুদ্ধশেষে রাজার কাছে পৌঁছে তারা দেখে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন। পুরস্কারস্বরূপ তাদের দুটি গুলি উপহার দেওয়া হলো শেষপর্যন্ত। ছবির শুরুতে যে শান্ত নিবিড় এক সবুজ গ্রামকে দেখানো হয়েছে, রাজার গাড়ী যখন প্রচণ্ড শব্দে আঁকাবাঁকা পথে সেখানে এল, শান্তি বিপর্যস্ত তখনই। সেই শুরু। মাঝে মাঝে প্রেমিকার লেটার বক্স থেকে চিঠি নেওয়া আর ইণ্টার কাট করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসার মাঝে গদার যেন রাইফেল থেকে যুদ্ধ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছেন মুহূর্তের জন্য কিছুটা আত্মস্থ হয়ে যেন যুদ্ধের ক্ষ্যাপামি নিয়ে ভাবতে বসেছেন। বিরোধী পক্ষের যে মেয়েটা লেনিনের বাণী আর মায়কোভস্কির কবিতা আবৃত্তি করতে করতে প্রাণ দিল, সে কিসের প্রতীক ? বুঝি স্থিরতার, শান্তির। শেষ দৃশ্যে যখন বিজয়ী সৈন্য দুজন রাজার কাছ থেকে পুরস্কার আনতে গিয়ে গৃহযুদ্ধের সামনে পড়ল, তখন সারা পর্দা জুড়ে শুধু বিভীষিকার রাজত্ব রাজার সমর্থক আততায়ীর হাতে অতর্কিতে খুন হয়েছে। সৈন্য দুজন তখন নিঃসহায় দর্শক, হতবাক। সেনাপতির কাছে পুরস্কার চাইতে গিয়ে উত্তর মিলেছে 'এসো দিচ্ছি'। ঘরের মধ্যে ঢুকেছে দুজনে।

তারপর শুধু দুটো গুলির শব্দ। দুম্-দুম্। সূচীপতন নিস্তব্ধতা। পর্দা কালো। আর কোনো মন্তব্য নয়! প্রাণ দিয়ে খাটার পুরস্কার! গদার নির্বিকার শান্ত। 'ব্যুৎ দা স্যাফলে'র মত নাটক আর তৈরী করেননি, 'পিয়ের দ্য ফ্যুলে'র মত অজাবাদও নেই এখানে। আছে শুধু নাটকহীন জীবন, জীবনের নাটকীয়তা, অবশ্যই গদারের স্টাইলে।

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি

শুনেছি ফ্রান্সে যখন সিনেমা ভেরিৎ স্টাইলের জোয়ার এসেছিল তখন রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুটি সব পরিচালকই ক্যামেরা বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাস্তাঘাটে, হাটেবাজারে। পাঁচশো—দুশো-লেন্স—ফিল্টার—টিল্টআপ ডাউন' ইত্যাদির বালাই ছিল না। প্রকৃতির আলোয়, বৃষ্টিতে ভিজে, রাতের অন্ধকারে ছবি তুলেছেন। এ রকম দু-চারটে ছবি দেখেওছি। চরিত্রের পেছনে ক্যামেরা কিভাবে ছুটে চলেছে, চরিত্রের প্রতিটি ভঙ্গীকে কি নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে সে সব ছবি। চলমান চরিত্রের সঙ্গে ক্যামেরাও চলতে শুরু করায় নতুন প্রাণ এসেছে যেন। সমালোচকরা যাকে 'ক্যামেরা স্টাইলো' বলেছেন আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় তার সঙ্গে ওদের দেশের ছবিতেই। 'ক্যামেরা স্টাইলো' ব্যাপারটা যে আসলে কি, কিভাবে তাকে কাজে লাগান হয় বা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশেষ কিছু হয়নি। যা হয়েছে তা ছোটো ছোটো ছবিতে, কাহিনী-চিত্রে নয়।

'ছিন্নমূল' ছবিতে পরিচালক নিমাই ঘোষ ক্যামেরাকে চার-দেয়ালের বাইরে এনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ক্যামেরাকে দিয়ে কথা বলাতে পারেন নি, যন্ত্রটাকে ফটোগ্রাফীর কাজেই ব্যবহার করেছিলেন। সত্যজিৎবাবুই প্রথম ক্যামেরা দিয়ে ছবি আঁকলেন, কথা কওয়ালেন। কিন্তু 'ক্যামেরা স্টাইলো' কি তাই? সত্যজিৎবাবু প্রায় সব ছবিতেই ক্যামেরাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। 'মহানগর'-এর স্যুটিং-এর সময়েও রিফ্লেক্টার, আলোকপাতের আরও কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

ক্যামেরাকে বগলদাবা করে বেরোন তাঁর হয়ে ওঠেনি। ফ্রেম কম্পোজিশন মেপে স্যুটিং করেছেন। কিন্তু চরিত্রকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে তার পেছনে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়লে পর্দায় যে ইম্প্রেশন আসে তা নিশ্চয়ই মাপা চলাফেরার থেকে স্বতন্ত্র। সত্যজিৎবাবুই এবার সে পথে নেমে এসেছেন। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির জন্য রেস্তরাঁয়, বাসে, দোকানে তিনি নায়ককে (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) ছেড়ে দিয়েছেন, লুকোন ক্যামেরা দিয়ে দিন-দুপুরে টাইগারের সামনে ছবি তুলেছেন। বিটলদের আড্ডায় গিয়ে গোপনে ক্যামেরা চালিয়েছেন। অর্থাৎ সত্যজিৎবাবু যথার্থ চরিত্রের পেছনে ছোটাছুটি করছেন। চরিত্র সত্যজিৎবাবুর কথা শুনেছে ঠিকই, কিন্তু অভিনেতাও এবার চুপচাপ গুড বয় সেজে পুতুল হননি। তুলি নিয়ে ক্যানভাসের চারদিকে রং ছিটিয়ে চলেছেন শিল্পী। কি অপরূপ সৃষ্টি হয় কে জানে?

কিছুদিন আগেও কলকাতা শহরে স্যুটিং করার ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুর প্রচন্ড অনীহা ছিল। নামীদামী স্টার নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরোনই মুস্কিল! স্যুটিং করা তো দূরের কথা। অনীহার কারণ অবশ্য তাই। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির কাজের সময়ও রাঁচির অনেক ভেতরে গ্রামস্য গ্রাম ছিপাদোহেরে কাজ করতে গিয়েও তাঁকে বহু অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র ক্ষেত্রে যে সে অসুবিধা তিনি একেবারে এড়াতে পেরেছেন তা নয়। যেখানে একটু বেশীক্ষণ দৃশ্য-গ্রহণের কাজ করতে হয়েছে সেখানেই ভীড় জমেছে। তবে পরিচিত অভিনেতা কেউ না থাকায় ক্যামেরায় বা বাসের মধ্য থেকে যখন শট্ নিয়েছেন তখন তো আলাদা কথা!

কিছুদিন আগে তিনি দীঘা গিয়েছিলেন, সেখানেও প্রায় নির্বিঘ্নেই কাজ হয়েছে। এখন ইন্দ্রপুরীতে একটানা কাজ করে চলেছেন। আউটডোরের মত ফ্রি স্যুটিং-এর নিয়ম ফ্লোরেও চলছে।

* * *

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির শিল্পীরা প্রায় সবাই নতুন। নায়ক ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের নাটক করার একটু আধটু অভ্যেস থাকলেও সিনেমায় মুখ দেখানো এই প্রথম। ভদ্রলোক ইকনমিকসে এম-এ। কাজ করেন মেটাল-বক্সে। নায়িকা জয়শ্রী রায় কি কাজ করেন জানি না, তবে দু বছর আগে অশোক রেড আয়োজিত সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সেরা সুন্দরীর পুরস্কার সম্মানিত হয়েছিলেন। অপর দুজন ভাস্কর চৌধুরী ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাশ করা অভিনেতা। ভাস্কর বন্দেতে একটা ছবিতে অল্প কাজ করেছিলেন, এ ছবিই তাঁর ব্রেক বলা যায়। তুলনায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা বেশী। তপনবাবুর 'আপনজন' 'সাগিনা মাহাতো', অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র'তে তিনি অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের ভাইপো। আরেকটি প্রধান চরিত্রে আছেন নতুন কৃষ্ণা রায়। ওঁর সম্পর্কে এখনও জানতে পারিনি বিশেষ। জানলে জানাব।

অস্কার ও ভাগ্যচক্র

সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার আর সিনেমার অস্কার। সম্মানের দিক থেকে গুরুত্ব দুটোরই হয়তো সমান নয়, কিন্তু অস্কারের গুরুত্ব মোটেই কম নয়! রাজনীতির কাদা নোবেল পুরস্কারের সারা গা জুড়ে নাকি আজ ছড়িয়েছে, কিন্তু অস্কারের বিরুদ্ধে এখনও তেমনভরো কোনো অভিযোগ কেউ শুনতে পারেন নি। তবে পর পর দু বছর চেক ছবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ায় কোনো কোনো মহল থেকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেলেও সরব কোনো গল্প এখনও শোনা যায় নি, যাচ্ছে না।

অস্কার পুরস্কারের তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ না ওঠার প্রধান কারণ এর সুনিপুণ নির্বাচন পদ্ধতি। পুরস্কার ঘোষণার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন না কার ভাগ্যে কি আছে? অস্কার ট্রফি যাবে কার হাতে! এই নির্বাচন নিয়ে প্রচন্ড এক রহস্যের জাল তৈরী আছে। আকাদেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের প্রায় তিন হাজার সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন বছরের সেরা শিল্পী ও কুশলীরা বহু আকাঙ্ক্ষিত অস্কার পাবার জন্য। ম্যানিপুলেশন, ফেবারিটিজম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো হলিউডে এত ভয়ঙ্কর যে বাধ্য হয়েই কমিটিকে এই নির্বাচন ঘিরে নিশ্ছিদ্র গোপনতার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

১৯২৭ সালে অস্কার পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। প্রথম দু বছর ফলাফল বহু আগেই বার করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ঠিক করা হয় যে, অনুষ্ঠানের আগের দিন ভোট গণনা করা হবে। কিন্তু এক বছর সেভাবে কাজ করতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়। পুরস্কার বিতরণের ঠিক আগের মুহূর্তে যখন কাউন্টিং শেষ হলো, দেখা গেল যে, দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রেডারিক মার্চ, ওয়ালেস বেরী! কিন্তু অস্কার ফলক ছিল একটা মহাবিপদ!

[অ]নেক কষ্টে অফিস থেকে আরেকটা ফলক [ছি]নিয়ে তবে মান বাঁচান। এর পরেও নানা-[র]কম বিচার করে ভোটিং পদ্ধতিটিকে অনেক [অদল-ব]দল করা হয়েছিল। শেষ অবধি [১৯]৪১ সাল থেকে ঠিক হয় গোপন [ব্যাল]ট-পেপার পদ্ধতিতেই ভোট নেওয়া [হবে]।

আজও তাই চলে আসছে। সারা [আমে]রিকা থেকে সদসরা লস এঞ্জেলসে এসে [শুধু] নমিনেশন পাওয়া ছবিগুলো দেখে [যান] আকাদেমির নিজস্ব মঞ্চে। তারপর [তাঁরা] গোপন ব্যালটে ভোট পাঠিয়ে দেন [আকা]দেমি অফিসে। ভোট গণনার জন্য এক [নিরপে]ক্ষ গণক সংস্থার ওপর ভার [দেওয়া] আছে। সেই সংস্থার প্রধান ও তিন-[জন] সহকারী মিলে তালাবন্ধ ঘরে ভোট [গণনার] কাজ শুরু করেন। প্রতিদিন কাজ [শেষ হলে স]ব ব্যালট পেপার সীলড় করে ভল্টের [মধ্যে রা]খা হয়। ভোট গণনা শেষ হওয়ার [পর ফ]লাফলের দুটি তালিকা করে একটি [গণক] সংস্থার প্রধানের কাছে এবং অনু-[ষ্ঠা]নের পূর্বক্ষণে সেটি বিশেষ সতর্কতার [সঙ্গে] নিয়ে আসা হয় প্রেক্ষাগৃহে। এবং [তিনিই] সর্বপ্রথম জানতে ও জানাতে পারেন [...]। অন্য কপিটি রাখা থাকে ভল্টে। [...] এত গোপনতার জাল ছিঁড়েও [...] যে কিছু ফোঁস হয়ে যায়নি [...] সেটা কদাচ। অস্কারের ইজ্জত [...] অমলীন। ফলাফল অনুষ্ঠান [...] পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত গোপন থাকে [...] মনোনয়ন যাঁরা পান তাঁদের [...] হাজির থাকতে হয় অনুষ্ঠানে, [...] নামটি যে ঘোষিত হবে তা স্বয়ং [...] জানেন না।

[...] বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ নায়ক-[না]য়িকার অস্কার দুটি পেয়েছেন জন ওয়েন [ও] ম্যাগি স্মিথ। দুজনেরই এই প্রথম [অস্কা]র পাওয়া। অস্কার দুবার পাওয়ার [সৌ]ভাগ্য খুবই কম জনেরই হয়েছে। ক্যাথ-[রিন] হেপবার্ন পেয়েছেন তিনবার, এঁর মত [...] আর কেউ অস্কারের ইতিহাসে [...] দুবার যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে [...] বেট্টি ডেভিস (১৯৩৫, ১৯৩৮), [এলি]জাবেথ টেলর (১৯৬০, ১৯৬৬), [ইনগ্রি]ড বার্গম্যান (১৯৪৪, ১৯৫৬), লুইজি [রেইনা]র (১৯৩৬-৩৭), ভিভিয়ান লী [(১৯]৩৯, ১৯৫১) ও অলিভিয়া দ্য হ্যাভি-[ল্যা]ণ্ড (১৯৪৬, ১৯৪৯)। অভিনেত্রীদের [তুলনা]য় দুবার অস্কার পাওয়া অভিনেতার [সংখ্যা] কম। মাত্র তিনজন। গেরী কুপার [(১৯৪]১, ১৯৫২), স্পেন্সার ট্রাসী (১৯৩৭-[৩৮]) আর ফ্রেডারিক মার্চ (১৯৩২, [১৯]৪৬)। এবারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে [মনো]নয়ন পেয়েছিলেন রিচার্ড বার্টন, পিটার [ও'ট]ুল, জন ওয়েন, ডাস্টিন হফম্যান। আর [অভি]নেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন ম্যাগি [স্মি]থ, জেন ফণ্ডা ও লিজা মিনেল্লী। [রি]চার্ড বার্টন এই নিয়ে পাঁচবার [মনো]নয়ন পেলেন, কিন্তু অস্কার জুটল না [এ]বারও। অথচ অর্ধাঙ্গিনী লিজ দু-দুবার অস্কার পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। একবার ১৯৬১তে 'বাটারফিল্ড—৮' ছবিতে আর দ্বিতীয়বার পেয়েছেন 'হুজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ্' ছবির জন্য ১৯৬৬ সালে।

সামনে রাখা অস্কারের রেকর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি একই ছবির নায়ক-নায়িকা মাত্র একবারই সেরা পুরস্কার দুটো পেয়েছেন। ১৯৩৪ সালে ঘটেছিল ব্যাপারটা 'ইট হ্যাপেনড ইন ওয়ান নাইট' ছবির দুই নায়ক-নায়িকা ক্লার্ক গেবল ও ক্লদেৎ কোলবার্ট পেয়েছিলেন পুরস্কার দুটো।

অস্কারের রেকর্ড একটু নাড়াচাড়া করলে এমনতরো অনেক মজার ঘটনার খবর পাওয়া যাবে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৪৪এ ব্যারী ফিৎজারেল্ড আর বিং ক্রসবি মনোনয়ন পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে 'গোয়িং মাই ওয়ে' ছবির জন্য, আবার ফিৎজরেল্ড ঐ ছবির জনাই পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতারও মনোনয়ন পেয়েছেন। শেষ অবধি অস্কার পেলেন দুজনেই। বিং ক্রসবি পেলেন সেরা অভিনেতা আর ফিৎজারেল্ড পেলেন সেরা পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কার। ১৯৫৫ খৃঃ একই ছবিতে অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনজন (চার্লস লটন, ক্লার্ক গেবল ও ফ্রানশট টোন), কিন্তু এঁদের কারো বরাতেই সেবার জোটেনি। বছর ছয় আগে (সম্ভবতঃ ১৯৬৪ খৃঃ) 'বেকেট' ছবি থেকে রিচার্ড বার্টন ও পিটার ও'টুল সেরা অভিনেতা হিসাবে মনোনয়ন পেয়েও শেষ অবধি অস্কারের চুল ছুঁতেও পারেননি। 'মাই ফেয়ার লেডি'র রেক্স হ্যারিসন পেয়ে গেলেন অস্কার। কি দুর্ভাগ্য! আজ অবধিও ওঁদের দুজনের কারোই অস্কার পাওয়া হয়ে উঠল না। শুধুমাত্র এমন ঘটনা যে অভিনেতাদের বেলাতেই ঘটেছে এমন নয়, অভিনেত্রীদেরও তেমন বিপাকে পড়তে হয়েছে। ১৯৬৩তে 'ভি-আই-পি' ছবির সহ নায়িকা মার্গারেট রাদারফোর্ড যখন শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন সেবার 'টম জোনস্' ছবির এডিথ ইভান্স, জয়েন্স রেডম্যান, ডায়না ক্লেন্ডো পেয়েছিলেন ঐ বিভাগে নমিনেশন। কিন্তু হা হতোস্মি! পুরস্কার পড়ল অন্য পাতে!

পুরস্কারের নমিনেশন পেয়েও পুরস্কার না পাওয়ার যদিচ কিছু সান্ত্বনা থাকে যে সে-ছবির কেউ পুরস্কৃত হননি, কিন্তু একই ছবি থেকে দুজন মনোনীত হয়ে যদি তাদের মধ্যে কোনো একজন পুরস্কার পান, তখন অপরজনের মধ্যে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স জাতীয় সচেতনতা আসা স্বাভাবিক। ১৯৩৯এ যখন অলিভিয়া দ্য হ্যাভিল্যান্ড ও হ্যাতি ম্যাকডোনিয়াল 'গন উইথ দ্য উইন্ডে'র জন্য মনোনয়ন পেলেন, আশঙ্কা ছিল শেষ অব্দি পুরস্কার বুঝি অলিভিয়া দ্য হ্যাভিল্যান্ডের ভাগ্যেই জুটবে। কিন্তু হল না। হ্যাতির ভাগ্যে জুটল জীবনের প্রথম অস্কার। হ্যাভিল্যান্ড নিরাশ হলেন। কিন্তু বেশী দিন নয়। পরে দু-দুবার (১৯৪৬ ও ১৯৪৯) শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার ('টু ইচ হিজ ওন' ও 'দি হায়ারেস') পেয়ে সুদে-আসলে সেবারের নিরাশাকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালেও একই ঘটনার প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। 'মিস্ মিনিভার' ছবিতে অভিনয়ের জন্য ডেম্ মে আর টেরেসা রাইট মনোনয়ন পেলেন, অভিনয়-দক্ষতায় দুজনেই সমান। এক আশা নিয়ে দুজনেই ভেবেছেন। সব আশা, সব স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে শেষ অব্দি অস্কার চলে গেল মিস রাইটের হাতে। মিস্ মে ভগ্নমনা হয়ে অনুষ্ঠানে চুপচাপ ছিলেন। আর মনোনয়নও পাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি মিস মের পক্ষে। অস্কার তো দূর অস্ত্।

এমনতরো আরও আরও অনেক গল্প-কাহিনী রহস্যের জাল ছড়িয়ে আছে অস্কার পুরস্কার ঘিরে। ১৯২৭-এর মে মাসে লুই মেয়ার জনা-তিরিশেক সতীর্থকে নিয়ে এই অস্কার পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। ম্যারী পিকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ পরবর্তীকালে আকাদেমির সভাপতিও হয়েছিলেন। হলিউডের চিত্র ব্যবসায়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জনাই এই পুরস্কারের প্রবর্তন। আজ পর্যন্ত সেই ধারা ও উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখে এসেছেন পরবর্তীরা। ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বা স্টার সিস্টেমের জঘন্য ব্যবসা যখন ব্যবসার মূল ভিত ধরে নাড়া দিতে শুরু করেছে, তখনও অস্কার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তর্কের ঊর্ধ্বে।

তবে একেবারে সংশয়হীন একথা বলা যাবে না। সারা আমেরিকা জুড়ে যুব-সমাজের যে তোলপাড় চলছে, তার ঢেউ থেকে অস্কার কি সত্যিই গা বাঁচাতে পারবে? বোধ হয় না। এবারে আলজিরিয়ার 'জেড' ছবির পুরস্কৃত হওয়া অন্ততঃ সে-কথাই বলতে চায়!

—নির্মল ধর

দাবার আসর

স্পাসকী - পেত্রোসিয়ান ম্যাচে দুজনেই কতগুলি ক্লাসিকাল ডিফেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন—যেমন, মন্ত্রীর বড়ের বিরুদ্ধে তারাশ্ ডিফেন্স। ইদানীং নানা ক্লাসিকাল ডিফেন্সের বেশ আবির্ভাব ঘটতে সুরু করেছে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে; অত্যধিক আলোচিত নানা আধুনিক ওপনিং সিস্টেম থেকে অনেকেই আজকাল অন্তত কিছুদিনের জন্যেও ছুটি নিতে চাইছেন। সমস্ত ক্লাসিকাল ডিফেন্সের আধুনিকীকরণের কাজও সুরু হয়েছে বহু দিন আগেই, যদিও গবেষণার এখনো ক্ষান্তি নেই। এই রকম একটি ক্লাসিকাল ওপনিং সিস্টেম—যা দাবার পরিভাষায় ভিয়েনা গেম নামে পরিচিত—এবং এর ওপর আধুনিক গবেষণালব্ধ ফল পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। বিশেষ করে যারা টুর্নামেন্ট খেলেন। তাদের পক্ষে এসব জেনে রাখা অত্যাবশ্যক।

ভিয়েনা গেমের একটি লাইনে (সাদার ৫নং চাল ব —ম৩ লাইনে) প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে বাস্তব ক্ষেত্রে সাদার জয়লাভের অনেক সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রথম চালগুলি হতে পারে এরকম : (১) ব — রা ৪ : ব — রা ৪ (২) ঘ — মগ ৩ : ঘ — রাগ ৩ (৩) ব — গ ৪ : ব — ম ৪ (৪) ব × রাব : ঘ × ব (৫) ব — ম ৩। এখন কালোর জবাব হতে পারে তিন রকম : (ক) ৫... ম — ন ৫ +, (খ) ৫......গ —মঘ ৫ (গ) ৫......ঘ×ঘ। প্রথম সম্ভাবনাটি আগে ধরা যাক।

(ক) ৫......ম — ন ৫ +

প্রখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টার পল কেরেস্ কালোর ৫ নং চাল হিসেবে এই চালটি তার ওপনিংয়ের ওপর বইতে দিয়েছেন। কিন্তু এই চালে কালো যে সমস্ত অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারে তা মনে হয় না।

(৬) ব — রাঘ ৩ : ঘ × ব (৭) ঘ — গ ৩ : ম — ন ৪ (৮) ঘ × ব।

[(৮) ন — রাঘ ১ চালটি ১৯৬৪ সালে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত একটি খেলার (ইয়েকবসন বনাম মুন্ডসটুক) পর বাতিল হয়ে যায়। এই খেলাটিতে (৮) ন — রাঘ ১ : ঘ × গ (৯) ন -- ঘ ৫ : ম — ন ৬ (১০) ঘ×ব : ঘ×ব! (১১) ঘ×ঘ : ম×ঘ (১২) ঘ × ব + : রা — ম ১ (১৩) ঘ × ন : ম — ন ৫ + (১৪) রা — গ ১ : গ — রান ৬ + এবং কালো জয়লাভ করেছিল।]

(৮) গ — রাঘ ৫

[পল কেরেসের মতে (৮)......ঘ × ন চালটায় খেলা সমান সমান দাঁড়ায় কয়েক চাল পরে : (৯) ঘ × ব + : রা — ম ১ (১০) ঘ × ন : গ — রা ২ (১১) গ — ঘ ২ : গ — ন ৫ + (১২) রা — গ ১ : ঘ — গ ৩ (১৩) গ × ঘ : গ — ন ৬ + (১৪) গ — ঘ ২ (মিলনার-ব্যারী বনাম পেনরোজ, ১৯৫০) এবং কালো বড়েটা ফিরে পায় (১৪)...গ×গ + (১৫) রা×গ : ঘ×ব। কিন্তু সাদা যদি ১৩ নং চাল হিসেবে ব — ম ৪! দেয় সেটা আরো ভালো এবং সাদার অন্ততঃ একটি বড়ে বেশী থাকে। কালো তার ঘোড়াটিকে (১৩)......ঘ — গ ৭ চাল দিয়ে বার করে আনতে পারে না কারণ (১৪) ম — রা ১, এবং (১৫) ঘ × গ চালের সম্ভাবনা থেকে যায়।]

(৯) গ — ঘ ২ : ঘ × ন

[(৯) ...গ × ঘ (১০) ম × গ : ম × রাব + (১১) রা — ম ১ : ঘ × ন (১২) গ — গ ৪ চালে সাদার জিৎ হবেই, যেমন, (১২)......ম × ব (১৩) ম — রা ৪ + : রা — ম ১ (১৪) গ × ব + : রা ম ২ (১৫) ম — গ ৫ + এবং (১৬) গ — রা ৫! ইত্যাদি]

(১০) ঘ × ব + : রা — ম ২

[(১০)......রা — ম ১ দিলে চাল আসত (১১) ঘ × ন : ঘ — গ ৩ (১২) ব — ম ৪, কারণ (১২)... গ × ঘ (১৩) ম × গ : ম × ম (১৪) গ × ম : ঘ × মব চালের পর সাদা (১৫) গ — ঘ ৫ + : গ — রা ২ (১৫...ব — গ ৩ (১৬) ০-০-০) (১৬) ন — ম ১ অথবা (১৫) গ — রা ৪ চাল দিয়ে জিতে যেত।]

(১১) ঘ × ন : ঘ — গ ৩

(১২) গ — রা ৩

[(১২) ব — ম ৪ চাল দিলে এখন সেটা কালোর পক্ষেই ভালো হয়ে যাবে কারণ (১২)......গ × ঘ (১৩) ম × গ : ম × ম (১৪) গ × ম : ঘ × মব (১৫) গ — রা ৪ : গ — গ ৪]

(১২)... ব — গ ৩

[(১২) ...গ — রা ২ (১৩) গ × ঘ : ন × ঘ (১৪) ম — রা ২ চালও সাদার পক্ষে ভাল।]

(১৩) ব — ম ৪ : ব × ব (১৪) ব — ম ৫! এবং সাদার জিৎ খেলা রয়েছে। এপর্যন্ত যে চালগুলি দেওয়া হোল, তা ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত মিলনার-ব্যারী বনাম সার্জেন্টের একটি খেলায় হয়েছিল।

(খ) ৫......গ — মঘ ৫

কালো ৫ নং চাল গ — মঘ ৫ দিয়ে একটি ঘুঁটি বিসর্জন দিয়ে খেলতে পারে। ফলে মিডল-গেমে কালো সাদাকে কিছুটা প্যাঁচে ফেলার সুযোগ পায়, কিন্তু অন্তখেলার (এন্ড-গেম) সুবিধে সাদারই থেকে যায়। স্বেচ্ছায় ঘুঁটি বিসর্জনের এই চালটি আজকালকার খেলায় আর বিশেষ দেখা যায় না।

(৬) ব × ঘ : ম—ন ৫ + (৭) রা—রা ২ : গ × ঘ

[সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ (৭)...ব×ব দিলে হবে না কারণ (৮) ব-রাঘ ৩! : ন ৪+(যদি (৮)...ম-ন ৫+(৯) রা-রা যদি (৮) গ-ঘ ৫+(৯) রা-গ ২ : গ ৪+(১০) রা-ঘ ২) (৯) র-গ ২ : ম× (১০) গ-রাগ ৪ : ম-মগ ৪+(১১) গ ৩ : ম-রাগ ৪+(১২) রা-ঘ ২ এবং সা তাড়াতাড়িই জিত হবে; ব্রন বনাম রথ ১৯৬৭।]

(৮) ব×গ : গ-ঘ ৫+(৯) ঘ-গ ব×ব (১০) ম-ম ৪ : গ-ন ৪ (১০...ব× (১১) ব×ব এবং গজটি মর যায়)। (রা-রা ৩।

[(১১) রা-ম ২ চালটায় জিৎ হবে : কালো (১১)...গ×ঘ চাল দেয়; (১২) ব : ঘ-গ ৩ (১৩) ম×রাব : ম-গ ৭+(রা-ম ১ : ০-০-০ + (১৫) গ-ম ৩ : ঘ (১৬) গ-রা ৩, হাইডেনফেল্ড ব আইজাকসন। জোহানসবার্গ ১৯৫৯; ক (১৬)...ঘ×গ চালের জবাবে সাদার রয়েছে (১৭) ম-গ ৫+এবং সাদার কিন্তু এক্ষেত্রে পল কেরেসের মতে কা ১১নং চাল গ×ঘ এর বদলে অনেক ভা চাল রয়েছে (১১)...ম-ঘ ৫ (১২) ব ৩ : ম-গ ৪। এবং (১২)...ম-গ নয়, কারণ (১৩) রা-রা ১ : ম-ঘ ৬+(ম-গ ২ : ম×ম+(১৫) রা×ম : ব×ঘ (ব × ব এবং সাদার জিত হবে।]

(১১)...গ×ঘ। (১২ গ-ঘ ৫+

[যদি (১২) ব×গ তাহলে কা (১২)...ম-রা ৮+(১৩) রা-গ ৪ : ৪+ইত্যাদি চাল দিয়ে ৬ করতে বাধ্য জন বনাম ল্যাকর্টি, এস্টোনিয়া বনাম ফিনল্যা ম্যাচ, ১৯৬৬]

(১২)...ব-গ ৩ (১৩) ব×গ

[এখন কালো হয় (১৩)...ব×গ না (১৩)...ম-ন ৩+ চাল দিতে পা ...ব×গ (১৪) ম×রাব : ম× ৩+(১৫) রা-গ ২ : ম-মগ ৩ (১৬) ম-ম সাদার পক্ষেই ভালো, স্টেইনীটস ব ব্লাকবার্ন, ১৮৭৬) (১৫) ব×ম এবং লেগটা সাদার পক্ষেই কিছুটা সুবিধাজন অথবা কালো (১৩)...ম-ন ৩+(১৪) রা× ম-ঘ ৩+(১৫) রা-রা ৩ : ব×গ চাল ছকের মাঝখানে বিপক্ষ রাজার বিরু কিছু খেলা পেতে পারে। (১৬) গ-ন ৩ ঘ-গ ৩ (১৭) ম-ম ৫ (শিগোরিন ক কারো, ভিয়েনা ১৮৯৮) চাল হলে কা বেশ ভালো সুযোগ পেতে পারে (১৭ ব-ঘ ৫! এবং পরে ...০-০ (কেরেসের চা চাল দিয়ে। কিন্তু সাদার পক্ষে আরও ভ চাল মনে হয় (১৭) ম-রা ৪ : ম-ন ((১৮) ব-রাগ ৪ এবং যদি এখন (১৮) ব-ঘ ৫ তাহলে (১৯) ব×ব : ০-০ (২ ব-ঘ ৫।

কালোর তৃতীয় সম্ভাবনা (৫)...ঘ চাল দিলে কিরকম খেলা হতে পারে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছে রাখি।

—গজানন্দ বোড়ে

১৯৭০ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দল

খেলাধুলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

মোহনবাগান ১৯৭০ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে উপর্যুপরি দুবার অপরাজিত অবস্থায় হকি লীগ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় মোহনবাগান এ নিয়ে মোট ১০-বার চ্যাম্পিয়ান হল—অপরাজিত অবস্থায় হয়েছে ৮-বার। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলার ইতিহাসে গত বছর মোহনবাগান এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে—বিপক্ষের কাছে কোন গোল না খেয়ে সমস্ত খেলায় জয়। এবছর তারা সে সুযোগ অল্পের জন্যে নষ্ট করেছে। ১৮টি খেলার মধ্যে তাদের জয় ১৬ এবং খেলা ড্র ২ (কাস্টমস ও ইস্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের বিপক্ষে)। এই আঠারটি খেলায় তারা ৫২টি গোল দিয়ে মাত্র একটি গোল খেয়েছে (ইস্টার্ণ রেলওয়ে এস সি দলের বিপক্ষে)।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী

১৯০৫-৬ বি ই কলেজ, ১৯০৭ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০৮ বি ই কলেজ, ১৯০৯-১০ কাস্টমস, ১৯১১ বি ই কলেজ, ১৯১২-১৩ কাস্টমস, ১৯১৪-১৭ রেঞ্জার্স, ১৯১৮ মিলিটারী মেডিক্যালস, ১৯১৯ গ্রীয়ার, ১৯২০ বি ই কলেজ, ১৯২১-২২ কাস্টমস, ১৯২৩ গ্রীয়ার, ১৯২৪-২৫ ক্যামেরনিয়ান্স, ১৯২৬-২৭ কাস্টমস, ১৯২৮-২৯ রেঞ্জার্স, ১৯৩০-৩৩ কাস্টমস, ১৯৩৪ রেঞ্জার্স, ১৯৩৫ মোহনবাগান, ১৯৩৬-৩৯ কাস্টমস, ১৯৪০ বি জি প্রেস, ১৯৪১ পুলিশ এ সি, ১৯৪২ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৩ রেঞ্জার্স, ১৯৪৪ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৫ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪৬ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৭ খেলা বন্ধ, ১৯৪৮-৪৯ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৫০ কাস্টমস, ১৯৫১-৫২ মোহনবাগান, ১৯৫৩-৫৪ ভবানীপুর, ১৯৫৫-৫৮ মোহনবাগান, ১৯৫৯ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৬০ ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬১ ইস্টবেঙ্গল এবং কাস্টমস (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬২ মোহনবাগান, ১৯৬৩-৬৪ ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬৫-৬৭ বি এন রেলওয়ে, ১৯৬৮ ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬৯-৭০ মোহনবাগান।

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান

১৮ বার—কাস্টমস (১৯৬১ সালে ইস্ট-বেঙ্গল দলের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী)

১০ বার—মোহনবাগান

৮ বার—রেঞ্জার্স

উপর্যুপরি ৪ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান

২ বার: কাস্টমস (১৯৩০-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৯)

১ বার: রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭)

১ বার: মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৮)

মোহনবাগানের লীগ জয়

বছর	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৩৫	১৪	৯	৫	০	২১	৯	২৩
১৯৫১	২০	১৬	৩	১	৪৭	১০	৩৫
১৯৫২	১৯	১৬	৩	০	৬৬	৪	৩৫
১৯৫৫	১৮	১৬	২	০	৫৪	৫	৩৪
১৯৫৬	১৮	১৭	১	০	৪৬	২	৩৫
১৯৫৭	১৮	১৭	১	০	৪৫	৩	৩৫
১৯৫৮	১৮	১৪	৪	০	৫২	৪	৩২
১৯৬২	১৮	১৭	০	১	৭২	৪	৩৪
১৯৬৯	১৯	১৯	০	০	৪৪	০	৩৮
১৯৭০	১৮	১৬	২	০	৫২	১	৩৪

এফ এ কাপ ফাইনাল

বিখ্যাত উইম্বলি স্টেডিয়ামে আয়োজিত লিডস ইউনাইটেড বনাম চেলসী দলের ১৯৭০ সালের এফ এ কাপ (ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ) ফাইনাল খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত থেকে গেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি এরকম ঘটনা ১৯১২ সালের পর এই প্রথম।

আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধে উভয় দল একটি করে গোল দেয়। লিডস ইউনাইটেড দল খেলায় দু'বার অগ্রগামী হয়েছিল। খেলার ২১ মিনিটের মাথায় লিডস যে প্রথম গোলটি দেয়, প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ৪ মিনিট আগে চেলসী তা শোধ করে। লিডসের ৮৩ মিনিটের দ্বিতীয় গোলটি চেলসী শোধ দেয় খেলার ৮৫ মিনিটের মাথায়। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় কোন গোল হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ প্রতিযোগিতা বিশ্বের প্রাচীনতম নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা, সূচনা ১৮৭১ সালে।

উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

সর্বাধিকবার এফ এ কাপ জয়

৭ বার—অস্টনভিলা (৯ বার ফাইনালে খেলে)

সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা

১০ বার—নিউ ক্যাসল

১০ বার—ওয়েস্ট ব্রোম, আলবিয়ন

(দ্রষ্টব্যঃ নিউ ক্যাসল ৬ বার এবং ওয়েস্ট ব্রোম, আলবিয়ন ৫ বার কাপ জয়ী হয়)

জোইয়া রুদনোভা

মস্কোর স্পোর্টস প্যালেসে আয়োজিত ৭ম ইউরোপীয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে রাশিয়ার ২৪ বছরের কুমারী জোইয়া রুদনোভা মহিলাদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া মহিলাদের দলগত বিভাগে স্বদেশকে খেতাব জয়ী হতে তিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। কুমারী রুদনোভা ইউরোপীয়ান স্টাইলে ব্যাট না ধরে 'পেন হোল্ডার গ্রিপে' খেলেন। এখানে উল্লেখ্য, গত ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের দলগত অনুষ্ঠানের কোর্বিলোন কাপ বিজয়ী রাশিয়ান দলে কুমারী রুদনোভা খেলেছিলেন এবং স্বেৎলানা গ্রিনবার্গের সহযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন। কুমারী রুদনোভা মস্কোর মরিস থোরেজ বিদেশী ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটের একজন মেধাবী ছাত্রী।
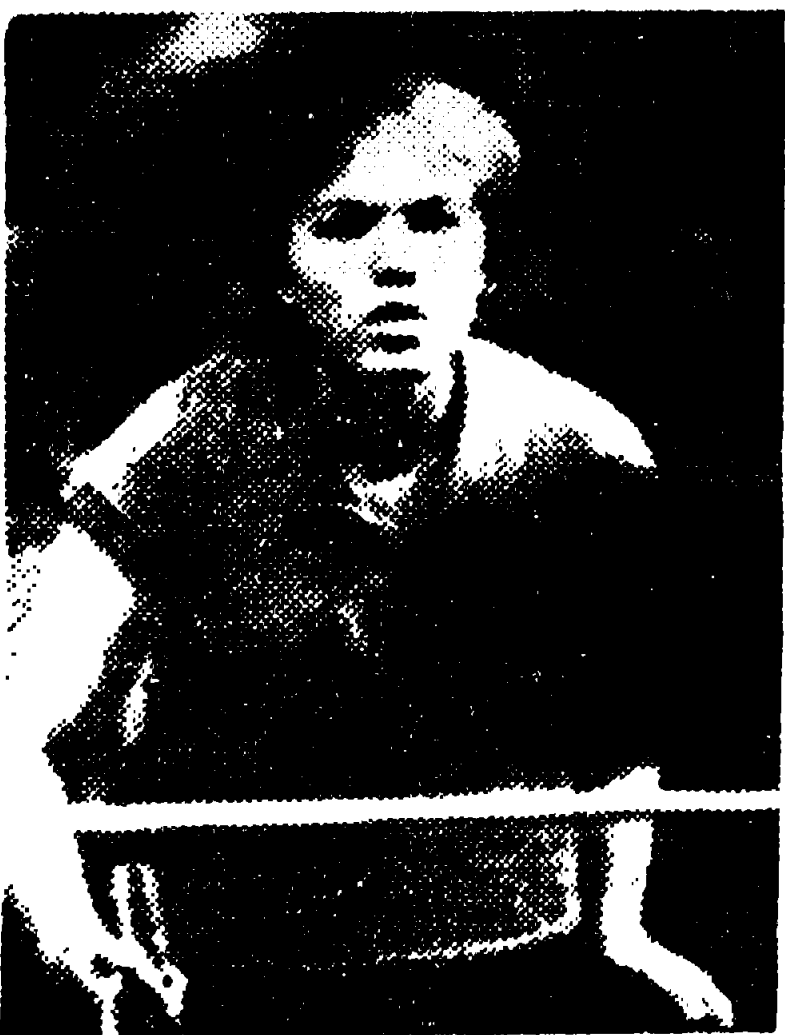
জোইয়া রুদনোভা

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানের নাগোয়াতে আয়োজিত ১০ম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে জাপান বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ব্যক্তিগত বিভাগে ছিল মোট ৭টি অনুষ্ঠান এবং জাপানের প্রতিনিধিরা প্রতিটির ফাইনালে খেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাপান ৫টি, দক্ষিণ কোরিয়া ১টি এবং ইন্দোনেশিয়া ১টি খেতাব জয়ী হয়। পাঁচটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে (পুরুষ ও মহিলাদের সিংগলস, পুরুষ ও মহিলাদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস) জাপানের খেলোয়াড় ছাড়া অপর কোন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন না।

জাপানের নোবুহিকো হাসেগাওয়া পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। কুমারী তোসিকো কোয়াদা দুটি খেতাব পান—মহিলাদের সিংগলস এবং মিকসড ডাবলস।

নোবুহিকো হাসেগাওয়া
এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায়
'ত্রিমুকুট' সম্মান বিজয়ী

ভারতবর্ষের খেলা

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পুরুষদের সিংগলস খেলায় ভারতবর্ষের মির কাশিম আলী (১নং খেলোয়াড়) ২য় রাউন্ডে, কে জয়ন্ত ৩য় রাউন্ডে এবং জি জগন্নাথ কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হন।

পরলোকে কোচবিহারের মহারাজা

কোচবিহারের মহারাজা স্যর শ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ৫৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলায় কোচবিহার রাজপরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়। স্বর্গীয় জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ হ্যারো এবং ট্রিনিটি হলে (কেম্ব্রিজ) উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। তিনি ক্রিকেট, টেনিস এবং পোলো খেলার সূত্রে বাংলা দেশের ক্রীড়ামহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি উপর্যুপরি তিনবার রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের অধিনায়ক ছিলেন।

কোচবিহারের মহারাজা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ বাংলা নববর্ষের নূতন বই ॥

প্রমথনাথ বিশীর

শাহীশিরোপা ৩॥

বিমল মিত্রের

কুমারীব্রত ৫্

আশাপূর্ণা দেবীর

নয় ছয় ৫॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সেই মরু প্রান্তে ১২্

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ঈশ্বরের আবাস ৬্

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন ভ্রমণকাহিনী

মণিমহেশ ৬॥

প্রফুল্ল রায়ের

বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭॥

নলিনীকান্ত সরকারের রম্যরচনা

শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫্

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

একই পথের দুই প্রান্তে ৪্

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই ১৪্

॥ নূতন তৃতীয় মুদ্রণ ॥

দহন ও দীপ্ত ৬্ উপকণ্ঠে ১০্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর

॥ নূতন মুদ্রণ — আঠারো টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কন্যাকুমারী ৬্ রাত্রি নিশীথে ৭্

অবধূতের
একাঘ্নী ৪॥০ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫্

প্রবোধকুমার সান্যালের
এক চামচ গঙ্গা ৪্ নগরে অনেক রাত ৪॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ইছামতী ৯্ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪্

তারাশঙ্করের
যোগভ্রষ্ট ৭্ রাধা ৮্ কালিন্দী ৭্

বঙ্কিমচন্দ্রের

সাহিত্যচিন্তা

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

আট টাকা

লীলা মজুমদারের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
আর কোনখানে ৫্ সুকুমার রায় ৪॥০

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
রাজস্থান কাহিনী ৮॥০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
ঈস্ট ব্যাকল্যান্ড রোড ৮্

মৈনাকের
বহ্নিবলয় ৯্

জরাসন্ধের
লোহকপাট (সম্পূর্ণ) ২০্ ছায়াতীর ৫্

চিত্রগুপ্তের
যদিদং হৃদয়ং মম (সত্য ঘটনা) ৪॥০

জ্যোতিকুমার চৌধুরীর ভ্রমণ
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪॥০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫॥০

সন্তোষকুমার ঘোষের

ত্রিনয়ন ৪্

সৈয়দ মুজতবা আলীর

রাজা উজীর ৮্

বিজন করের
সঙ্গিনী ৪্

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দ্বিধা ৭্

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৬৯১

রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

চিরমধুর রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড সংকলন। নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া এইচ-এম-ভির অনবদ্য অবদান।

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্ডেড্ প্লে রেকর্ড

ঋতু গুহ
প্রভু আমার, প্রিয় আমার
চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না
ওহে সুন্দর, মম গৃহে
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বিরহ মধুর হল আজি
প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে

কানন দেবী
তোমায় সাজাব যতনে
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
তিমির দুয়ার খোলো
এতদিন-যে বসেছিলেম
('অনির্বাণ' কথাচিত্রের গান)

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি
পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ
দিনশেষের রাঙা মুকুল
ছিন্নপাতার সাজাই তরণী

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
আমারে করো তোমার বীণা
কমিতে পারিলাম না যে

শ্যামল মিত্র
বহুযুগের ওপার হতে
তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার
তোমার আমার এই বিরহের
ওই কে গো হেসে চায়

সন্তোষ সেনগুপ্ত
আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে
যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে, যাক মিথ্যার জাল

সাগর সেন
আমি জন্মেতে পথ কেটেছি
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
একি সত্য সকলি সত্য

সুচিত্রা মিত্র
কেনো নয়ন আপনি ভেসে যায়
বারে বারে পেয়েছি যে তারে
কার মিলন চাও, বিরহী
নাই যদি বা এলে তুমি

সুমিত্রা সেন
দিনের বেলায় বাঁশি তোমার
কাছে থেকে দূর রচিল
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে

শম্ভু মিত্র (আবৃত্তি)
যেমন আছ তেমনি এসো
তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
আজিকার দিন না ফুরাতে
মনে পড়ে এককালে লিখিতাম

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

অর্ঘ্য সেন
খোলো খোলো দ্বার
হায় রে ওরে যায় না কি জানা

আরতি মুখোপাধ্যায়
পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ওগো সুন্দর) একদা কী জানি
কে উঠে ডাকি

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রঙ লাগালে বনে বনে
কমলবনের মধুপরাজি

পূরবী মুখোপাধ্যায়
আঘাত করে নিলে জিনে
ও আমার ধ্যানেরই ধন

প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে এই মাধুরী ছাপিয়ে

বনানী ঘোষ
দে পড়ে দে আমায় তোরা
তুমি কিছু দিয়ে যাও

বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়
তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও
চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে

বুলবুল সেন
দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আমি যায় যায় ফিরে যায়

মায়া সেন
মা সজনী, না, আমি জানি
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
দিবস রজনী আমি যেন কার
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে

সুনীল মল্লিক
ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও
হেসে গো নন্দরাণী

স্বপন গুপ্ত
কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
পথ এখনো শেষ হল না

স্বপ্না ঘোষাল
ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে
কাছে যবে ছিল

লং প্লেয়িং রেকর্ড

জেম্স কর এত্তার

পথহারা তুমি পথিক (অর্ঘ্য সেন); ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ (ঋতু গুহ); ঐ মালতী-লতা দোলে (সাগর সেন), মম যে কাঙালে পুঞ্জ হাতে (স্বপ্না ঘোষাল), আমায় থাকতে দে না (স্বপন গুপ্ত); আজি ঝর ঝর মুখর বাদর-দিনে (আরতি মুখোপাধ্যায়); গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়); কে দেবে, চাঁদ, তোমায় দোলা (সুমিত্রা ঘোষ); ওরে জাগায়ো না (শৈলেন দাস), শুধু যাওয়া আসা (পুরী সিংহ); ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে (সুনীল মল্লিক); তুমি আমায় ডেকেছিলে (পূরবী মুখোপাধ্যায়)।

গোল্ডেন গ্রেট্স্

পঙ্কজ মল্লিক

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়; আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়; তোমার বীণায় গান ছিল; ভয় করে তবু ভয় কেন তোর; আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ; ওগো দখিন বরূপিণী।
যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে; চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে; আমার প্রাণে গভীর গোপন; আজি ঝড়ের রাতে; অন্তরে জাগিছ, অন্তরযামী; দিন যদি হল অবসান।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি)
কলিকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-মাদ্রাজ-গৌহাটি-কানপুর

EMI

১ম বর্ষ | ৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৫১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 1st May, 1970. শুক্রবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

চিঠিপত্র

বইকুণ্ঠের খাতা

বৈকুণ্ঠের খাতায় বাংলা বইয়ের প্রচার ও উপহারের বই সম্বন্ধে গ্রন্থদর্শীর মন্তব্যটা (অমৃত ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ সংখ্যা—২৭শে চৈত্র ৭৬) ভালো লাগলো। এই বিষয়ে আমারও ব্যক্তিগত মতামত জানাতে চাই।

মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্যের সমৃদ্ধি সংস্কারমুক্ত উদার পথে আসা বাঞ্ছনীয়। পত্র-পত্রিকায় একটা আবেদন প্রায়ই চোখে পড়ে : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হোন। প্রসঙ্গটা খুবই ভালো লাগে। অন্তত প্রবাসী বাঙালীদের ভাষা-সংকট মুহূর্তে ভালো লাগা উচিত। কারণ, জাতীয় ভাষাটার পাকাপোক্ত একটা ঠাঁই স্কুল কলেজে এমনকি শিক্ষার মাধ্যমের মধ্যেও করে দেবার জন্যে সরকারের সহযোগিতায় হিন্দি-অনুরক্ত ভক্তবৃন্দরা মনপ্রাণ সঁপে উঠে পড়ে লেগেছেন। এমত অবস্থায় বাংলা দেশের বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে যে টনক নড়েছে—এটা নিঃসন্দেহে শুভ সংবাদ। তবে আরো ভালো লাগে, যখন দেখি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাধ্যাতীত মূল্যের ছাপ মারা বৃহদায়তন গল্প উপন্যাসগুলোর পরিচয় হিসাবে জনসাধারণের অবগতির জন্যে জানানো হয়—'বাংলা সাহিত্যের নতুন সংযোজন— সুবিপুল ক্ল্যাসিকস!' নামকরা লেখকদের মূল্যবান ক্ল্যাসিকসগুলোর প্রশংসাও আকাশছোঁয়া—কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকদের জন্যে লেখা বইগুলো থাকে পাঠকদের নাগালের বাইরে। প্রথমত দিন-এনে দিন খাওয়া মধ্যবিত্ত বাংলা সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠকেরা টাকার নিক্তিতে ওজন করা ক্ল্যাসিকস কিনতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করার সহজলভ্য মাধ্যম লাইব্রেরী (সব লাইব্রেরী নয়)। কিন্তু সেখানেও অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদের বইয়ের চাহিদার চাপের দরুণ সব বই সময় মতো পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে, নামী গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে যে উৎসাহ কৌতূহল আর আগ্রহ থাকে, বই সময়মতো না পেলে সে উৎসাহ আগ্রহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটতে বেশি সময় লাগে না। বই কিনে পড়ার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

এখানে এই পাটনাতে বাংলায় বিজ্ঞাপন দেখি না বললে অত্যুক্তি হবে না। যতটুকু বিজ্ঞাপন বাংলায় চোখে পড়ে তা অতি সামান্য, নগণ্য।— যস্মিন দেশে যদাচার বলেই সেটা মেনে নিয়েছি। অথচ বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার এখানে নেহাৎ মন্দ নয়। এখানে বহু বাঙালী বাসিন্দা আছেন বলেই ঘটছে সেটা। তবে হাটে-মাঠে-ঘাটে যখন সুলভ সংস্করণের দামী হিন্দি গল্প-উপন্যাসগুলো চোখে পড়ে, তখন একটা ইচ্ছা মনের কোণে উঁকি মারে বইগুলো যদি বাংলায় হতো! আমার সবিনয়ে একটি প্রশ্ন আছে, দামী বাংলা গল্প-উপন্যাসগুলো কি সুলভ সংস্করণে প্রকাশ করা সম্ভব নয়? আর প্রকাশ হলে কি লেখকদের devaluation হবার কোনো সম্ভাবনা কি?

কথায় কথায় আমরা জাতীয় ভাষার প্রসার ও প্রচারকে বলে থাকি, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীর দাপট! কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেদিক দিয়ে তো শক্তি আর সম্পদের অভাব নেই। তবে কেন বাংলা ভাষা দাপট দেখাতে পারে না?

কল্যাণ সিংহ
পাটনা—৬

(২)

গত ১০ই এপ্রিলের 'অমৃতের' ৪৮শ সংখ্যায় 'গ্রন্থদর্শী' বইকুণ্ঠের খাতায় 'বাংলা বইয়ের প্রচার ও উপহারের বই' শিরোনামায় যে আলোচনা করেছেন আমি সেজন্য একজন সাহিত্য অনুরাগী হিসাবে ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য মনে করলাম।

অত্যন্ত বাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক এবং আলোচনার ধারাও বয়ে গেছে বাস্তবের পথ ধরে।

'সাময়িক পত্রে উপন্যাস' শিরোনামায় যা বলেছেন তা ঠিক। তবে যাঁরা নূতন লেখক তাঁরা প্রথমত কোন প্রকাশকের কাছে পাত্তা পান না। অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকাও তাঁদের লেখা চটকরে ছাপেন না, অথবা ছাপানোর জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। বড় বড় পত্রিকাগুলিতে হয়তো অনেক লেখা জমে থাকে। সেই জন্য যতোদিন অপেক্ষা করতে হয় তার মতো ধৈর্য হয়তো নূতন লেখকের থাকে না। কাজেই যাঁরা লেখেন তাঁদের পরিচিত কেউ যদি কোনো কাগজে থাকেন, সে সিনেমাসংক্রান্তই হোক বা যৌনসংক্রান্তই হোক লেখা দিতে কোন দ্বিধা করেন না।

কাজেই বাংলা বইয়ের প্রচার বাড়াতে হলে, (১) নবীন লেখকদের সুযোগ দিতে হবে। (২) অল্প দামে বই বাজারে ছাড়তে হবে, (মধ্যবিত্তের আয়ত্বের মধ্যে), (৩) সঠিক সমালোচনা করতে হবে। (৪) নবীন লেখকদের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকাগুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা সততার সংগে পালন করতে হবে।

প্রবীণ ও নবীনদের যোগাযোগ করার আরও সুযোগ দিতে হবে।

প্রবীণ লেখকেরও নবীনদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে।

তাহলে বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয় নূতন প্রাণস্পন্দন দেখা দেবে।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য
সোদপুর, চব্বিশ পরগণা

ক্রন্দসী কলকাতা

গত ৩রা এপ্রিল ১৯৭০, অমৃতের ৪৭ সংখ্যায় আমার চিঠির উত্তরে দুটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্র লেখকদ্বয় শ্রীঅধিরথ ও শ্রীসুধাময় আচার্য প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নাই, আমার সামান্য বক্তব্য নিবেদন করে এ বিষয়ে আলোচনা ইতি করছি। অনুরোধ আমার পত্রটি প্রকাশ করে অমাকে অনুগৃহীত করবেন।

১। বিতর্কের সূত্রপাতের মূলে ছিল 'কলকাতা ক্রন্দসী' কোন্ অর্থে প্রবন্ধকের এই প্রশ্ন। 'ক্রন্দসীর' রোরুদ্যমানা অর্থ যে হয় তা অধিরথও স্বীকার করেছেন। কাজেই শব্দটির ভুল প্রয়োগ যে হয় ঐকথা আর তর্ক দ্বারা বোঝাতে হবে না। হতে পারে শব্দটি বহুল চলিত নয়, কিন্তু ভুলও নয়।

২। 'চলন্তিকা' ভুল তথাযুক্ত ঐ ইঙ্গিত আমি করিনি। তবুও শ্রীঅধিরথ যখন এ প্রসংগের অবতারণা করেছেন, দুএকটি কথা বলছি। চলন্তিকার ৩য় সংস্করণে 'নিধুবন' শব্দের অর্থ প্রসংগে 'কেলিকানন' অর্থ অশুদ্ধ ঐরূপ মন্তব্য আছে। সাহিত্য সংসদের বাঙ্গালা অভিধানে স্পষ্ট আছে রাধাকৃষ্ণের কেলিকানন। 'ঝরণা' শব্দের 'ঝরনা' বানান কতদূর সঙ্গত শ্রীঅধিরথকে বিচার করতে অনুরোধ করি।

৩। নিজের বক্তব্যের সুবিধার্থে শ্রীঅধিরথ নজরুলকে 'উদাম অস্থিরচিত্তের স্বভাবশিল্পী' বলে রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু বলতে অধিরথ সঙ্গত কারণেই সাহস করেননি। অবাক হচ্ছি নজরুলের ব্যাকরণ অসঙ্গতি শ্রীঅধিরথ হজম করলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও তো 'নটিনী' 'উষসী' (উষা অর্থে)' 'বেতসের বাঁশী' ইত্যাদি লিখেছেন।

চিঠিপত্র

৪। 'ছোট অভিধানে' অনেক কথা যেমন থাকে না, তেমনি আধুনিক ও হালফিলের শব্দ যাঁরা সঙ্কলন করেন, তাঁরা পুরাতন শব্দ সংযোজন করেন না। তাই ঋষিদাস 'কুন্দসী' শব্দ তাঁর অভিধানে সংকলন করেননি। ঋষিবাবু 'বাতাবরণ' শব্দটি গ্রহণ করেছেন. 'চলন্তিকা'র ৩য় সংস্করণে অথবা সাহিত্য সংসদের 'বাঙ্গালা অভিধানে' ঐ শব্দটি নাই। সাহিত্য সংসদ কিন্তু তাঁদের বাঙ্গালা অভিধানের ২য় মুদ্রণের সংযোজনে অধুনা প্রচলিত 'মোচা' শব্দটি দিয়েছেন।

Origin and Development of the Bengali Language সূত্র উল্লেখ করে শ্রীঅধিরথ বলেছেন 'আট বছর ভাষার ইতিহাসে একটি পলক-মাত্র'। হতে পারে পলক, কিন্তু ভাষার গতি বা সজীবতার যে অনবচ্ছিন্ন স্রোত তার মূল্য বা গুরুত্ব কম নয়। তাই আমি ব্যবহারিক শব্দ কোষের উল্লেখ করেছিলাম। শব্দের ভাষায় স্থান পেতে হলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদন দরকার ঐ কথার যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারলাম না।

৬। শ্রীসুধাময় আচার্য আমার বক্তব্যের খণ্ডনার্থে শব্দ কল্পদ্রুমের থেকে কটাক্ষের অর্থ উদ্ধার করেছেন। বিনীত বক্তব্য যে, 'কটাক্ষ' শব্দের বাংলা অর্থই আমার আলোচ্য ছিল, সংস্কৃত নয়। তাঁর অন্য বক্তব্যের জবাব আমার চিঠিতে দেওয়া হয়ে গেছে।

শ্রীলোকেশরঞ্জন গুহ, রাজপুর।

(২)

গত ৮৭শ সংখ্যা অমৃতে শ্রীঅধিরথ লিখিত 'কুন্দসী কলকাতা' শীর্ষক পত্রটি পড়লাম।

সারা পত্রে তিনি প্রচুর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, কিন্তু পত্রের শেষে এসে anticlimax এর একটি অপূর্ব উদাহরণ নজরে পড়ায় এ চিঠি না লিখে পারলাম না। তিনি লিখেছেন, 'শ্রীগুহকে অনুরোধ করবো শিশু-সাহিত্য সম্রাট সুকুমার রায় 'হ য ব র ল-তে কুন্দসী নিয়ে যা লিখেছেন তা স্মরণ করতে 'কারে কয় কুন্দসী, কারে কয় অরণি...'।

প্রথমতঃ এই অশ্রুতপূর্ব লাইনটি তাঁর কল্পনায় কিভাবে স্থান পেলো তা ভেবে সত্যিই আন্তরিক বিস্ময় অনুভব করছি। দ্বিতীয়তঃ যদি এই লাইনের সঙ্গে স্বর্গত সুকুমার রায় রচিত কোন অংশের সামান্যতমও মিল থাকে তবে সেটি 'হ য ব র ল'তে নেই, আছে 'আবোল-তাবোল'-এ। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীঅধিরথকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায় প্রণীত 'আবোলতাবোলের' ৫৭ পৃঃ-এ 'নোট বই' শীর্ষক কবিতাটি পড়তে, যার মধ্যে তিনি ঐ অংশটি নিম্নলিখিত আকারে পাবেন।

'...কার নাম দুন্দুভি, কাকে বলে অরণি...'

সুকুমার রায় আমার অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন লেখক হলেও এ আশা আমি নিশ্চয়ই করবো না যে তাঁর প্রতিটি রচনা সবসময় সকলের যথাযথভাবে স্মরণ থাকবে, কারণ এটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন এই নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, অথবা বই থেকে ইচ্ছামত উদ্ধৃতি দেন, তখন বিষয়টি আর ঠিক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে না। সে ক্ষেত্রে এতখানি তথ্যগত ত্রুটিকে বিনা মন্তব্যে মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন, এবং আমার মতে একান্ত অনুচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা নিবেদন না করে পারছি না। অপরকে বিশদভাবে সমালোচনা করবার পূর্ণ অধিকার যাঁরা রাখেন, তাঁদের কি কর্তব্য নয় নিজের সম্বন্ধে আর একটু সাবধান বা সচেতন হওয়া!

কোন বিষয়ে সঠিক জানা না থাকলে সেটি আলোচনার অন্তর্গত না করাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শ্রেয় মনে হয়।

আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হলে আন্তরিক কৃতজ্ঞ হবো।

মহামায়া গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা—১৪

রবীন্দ্রনাথের প্যারাডাইস লস্ট প্রসঙ্গে

শ্রীসুধাংশুশেখর রায়কে তাঁর চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি যে, আমার প্রবন্ধ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা তিনি হয়ত সম্যক অনুধাবন করতে পারেননি। যে কোনো শিক্ষাদর্শের মধ্যেই যে স্বপ্ন খানিকটা থাকবেই তা আর অস্বীকার কি করে করি। ঐখানেই তো সর্বত্র বাস্তব ও আদর্শের দূরত্ব। কিন্তু এই দূরত্ব কম বেশী হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এটাই সমালোচনার ভিত্তি। যেটা একেবারেই অসম্ভব আর যেটা সম্ভব হলেও হতে পারে দুটোর পার্থক্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। এই অভিজ্ঞতাজাত সত্যটিকে মনে রাখলে পত্রলেখকের প্রশ্নোত্তর সহজলভ্য হবে। 'বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিসরে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ কিভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে এর উত্তর আমার প্রবন্ধে বারবার হাজির হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়নি বলে যদি মনে হয় তবে তার কারণ এই যে, উত্তরটি নঞর্থক। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ যেভাবেই প্রবর্তন করা যাক না কেন তার আয়ু হবে ফুলদানির ফুলের মত। তার নিরাপত্তা তখনই সুনিশ্চিত হবে যখন ঐ বাইরের সমাজটা বদলাবে, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘুচবে। সুতরাং দুঃখ আমারও। এই সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যদি আদর্শ সফল করার পথ দেখতে পেতাম তবে তার দিক নির্দেশ করা কঠিন হত না। পথটা আছে একটা নতুন সমাজ তৈরী করার ভেতর।

দীপেন্দু চক্রবর্তী
কলিকাতা—২

নিকটেই আছে

আমি সাপ্তাহিক অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক. প্রায় এক দশক ধরে এই পত্রিকাখানি নানা পরিবর্তন এবং পরি-বর্ধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী এবং বাস্তব-ধর্মী যে ফিচার সরবরাহ করে আসছে তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

অধুনা 'নিকটেই আছে' নামক যে ধারা-বাহিক ফিচারটি সাধিৎসু জোগান দিয়ে যাচ্ছেন, একজন রসগ্রাহী পাঠক হিসেবে তা উপভোগ করছি। বিবেকহীন, বিচার-হীন, বিদ্রোহী, বেপরোয়া সমাজের যে অবক্ষয় তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—তার জন্য আমরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ।

কবিকঙ্কণ গুপ্ত,
প্রধান শিক্ষক
সান্তালডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পুরুলিয়া

(২)

আমি 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। ৯ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৪৫শ সংখ্যায় 'নিকটেই আছে' লেখাটির জন্য সত্যিই আনন্দিত। লেখক যেভাবে বর্তমান সমাজে যা ঘটছে তা নির্ভীকভাবে তুলে ধরার জন্য আমার অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি অমৃত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই বিভাগটি নিশ্চয়ই চালু রাখবেন। কারণ যে দেশের বর্তমান অবস্থায় এই বিভাগটি অনেক উপকার করতে সক্ষম হবে।

স্বপনকুমার মুখার্জি
আড়ংঘাটা, নদীয়া।

শাদা চোখে

মধ্যবর্তী নির্বাচন কবে কখন কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন সঠিক হদিস পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ বিধান-সভার অবলুপ্তি না হওয়ার ফলে সাধারণত এ ধারণাই জন্মে যে হয়ত সুযোগ এলে একটি নতুন সরকারের পত্তনও হতে পারে। এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে না দিয়েও একথা বলা যায় যে, সরকার গঠিত হোক বা না হোক সমস্ত রাজনীতিক দল কিন্তু ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনোনিবেশ করেছেন। বলতে কি আগামী নির্বাচনে কে কার সঙ্গে জোট বাঁধতে পারেন তার জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য দলগুলিই এই অনায়াস আলোচনার খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছে।

কেন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন—এ বিষয় নিয়ে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি গোটা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কাছে অবিরাম আর্জি পেশ করে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ পি এস পির প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়ে কেন সি পি এম-কে নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা যায় না সেই বক্তব্য রাখছেন। আবার এস এস পি নেতারাও শ্রীমুখার্জির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গময় ঘুরে বেড়িয়ে জনতাকে সি পি এম-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করছেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির নেতারাও বিশেষ করে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীজ্যোতি বসু বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য কোনো জায়গায় এঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন খণ্ডিত আর সি পি আই প্রতিনিধি ওয়ার্কার্স পার্টি ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রচার ধারা, ঘটনার বিশ্লেষণ তথ্যের সমাবেশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে কে কোন জোটে থাকবেন, অর্থাৎ নির্বাচনী জোটের চেহারা কি হবে। কি শ্রীমুখার্জি বা শ্রীজ্যোতি বসু সকলের সভায় প্রচুর জনসমাগমও হচ্ছে। সাংবাদিকদের মতে পার্থক্য শুধু এই যে শ্রীমুখার্জির সভার শ্রোতারা বেশীর ভাগই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিচ্ছেন। আর শ্রীবসুর সভায় দলীয় সংগঠনের মারফৎ মিছিল করে আসছেন। এই প্রতিবেদন যদি ঠিক হয় তবে বলতে হয়, শ্রীমুখার্জিকে তাঁর বক্তব্য খুবই পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে এই জনতার মন জয় করতে হলে। কিন্তু জ্যোতিবাবুর পক্ষে কাজটা বরঞ্চ অনেক সোজা—কেন না তাঁদের দলের সংগঠিত মানুষগুলি ইতিমধ্যে তাদের বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই আছেন। যা হোক, এই প্রচার অভিযানের ফলে পশ্চিম বাংলায় আবার একটি নির্বাচনী হাওয়া তৈরী হতে শুরু করেছে।

যুক্তফ্রন্টের চোদ্দটি দল ইতিমধ্যেই সতেরটিতে দাঁড়িয়েছে। এস এস পিতে ভাঙনটা সম্পূর্ণ হলেই দলের সংখ্যা ১৮তে গিয়ে পৌঁছবে। বর্তমানে ফ্রন্ট আর নেই। কাজেই নতুন করে ফ্রন্ট গড়ার কাজে নেতারা মনোনিবেশ করেছেন। এবং ফ্রন্ট গড়ার এ খেলায় সি পি এম ইতিমধ্যেই একটু বেকায়দায় পড়ে গেছে। সি পি এম-এর সঙ্গে অবশ্য চারটি দল, যথা আর সি পি আই ও বলশেভিকের ভগ্নাংশ আর মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ও ওয়ার্কার্স পার্টি। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত শ্রীসুকুমার রায় 'বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস' গড়ে সি পি এমকে মদৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে সংখ্যার দিক থেকে সি পি এম-এর সহযোগী দলও পাঁচ থেকে ছয়-এর কোটায় গিয়ে পৌঁছেছে। শক্তি থাকুক বা না থাকুক সহযোগী দলের সংখ্যা বাড়লে জনসাধারণকে বোঝাতে কোন কষ্টই হবে না যে তাঁরাও কম নন। ওদের সঙ্গেও ৬।৭টা বামপন্থী দল আছে।

অন্যদিকে কিন্তু আটটি পুরাতন যুক্তফ্রন্টের দল সত্যি সত্যিই জোট বেঁধে ফেলেছেন। এই আটটি দল হল—কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, এস ইউ সি বিক্ষুব্ধ পি এস পি, গুর্খা লীগ ও আর সি পি আই ও বলশেভিক পার্টির ভগ্নাংশ। যদিও ফ্রন্ট হিসাবে ঘোষণা এখনও হয়নি, তবু বিচার ধারা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তা থেকে মনে হয় একই সঙ্গে চলার জন্য তাঁরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। খবরে প্রকাশ, ফ্রন্ট হিসাবে সুনির্দিষ্ট ঘোষণার বিরোধিতা করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি। কেন করল তা বোঝা কঠিন কিন্তু আট পারটির যে দলিল প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ দায়িত্বই তাঁরা মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। দলবাজীর জন্য মিত্র শক্তির উপর আঘাত, প্রশাসনিক যন্ত্রকে বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ এবং সর্বোপরি দল বৃদ্ধির প্রয়াসে ফ্রন্টের স্বার্থকে বিপন্ন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে ফ্রন্টের পতন ঘটে। এই অভিমত ব্যক্ত করে দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে সি পি এম-এর এহেন কার্যকলাপের জন্য বাংলা কংগ্রেস ক্রুদ্ধ হয়। ফলে রাগবশতই

তাঁরা ফ্রন্ট ও ফ্রন্টের সরকার ছেড়ে চলে যান। দলিলের মধ্যে আরও বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল তা যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে আটটি দল লড়াই করবে। এবং এই জন্য, তাঁদের সি পি এম সম্পর্কে যে ধারণা আছে সেই ধারণার সঙ্গে সহমত হয়ে কেউ যদি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চান তবে তাঁকে স্বাগত জানাবেন। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সি পি এমকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যান্য দলগুলিকে একই প্লাটফরমে সমবেত করা। তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ফলে বাংলা কংগ্রেসের এই মোর্চায় ভিড়ে পরার পক্ষে মোটেই কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবু বাকী থাকছে আর এস পি ও লোক সেবক সংঘ। আর এস পির মতিগতি বোঝা দায়। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করেন, আর এস পি অন্তত বাংলা দেশে কখনও সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যাওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। তা হলে দলের আসন সংখ্যা একেবারেই কমে যাবে। আর লোকসেবক সংঘ কখনো ফ্রন্টে আসে নি। তাঁরা তাঁদের দল নিয়ে সকল দলের সমর্থন পাবার চেষ্টা করেন। অতীতেও তাই করেছেন। আর সি পি এম-এর সঙ্গে যাঁরা বর্তমানে জোটবন্দী হয়েছেন তাঁরা মার্কসবাদী কমুনিস্টদের সঙ্গেই থাকবেন। মার্কস-বাদীরা বাঁচলে তাঁরা বাঁচবেন। বাম কম্যু-নিস্টদের বাদ দিয়ে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব আছে কি না তাও উপলব্ধি করতে পারেন না।

ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৭ সালে যে দুটো ফ্রন্ট বামপন্থীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বর্তমানেও সেই একই পরিস্থিতি দেখা দিতে চলেছে। শুধু ব্যতিক্রম এই যে এস এস পি ও এস ইউ সি যাঁরা সেই প্রথম পদক্ষেপে মার্কসবাদীদের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা আজ অন্য শিবিরে চলে গেলেন। এবং এই দুই দলের নেতারা সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড তাত্ত্বিক আক্রমণ চালাচ্ছেন অন্যরা এখনও ততদূর পর্যন্ত এগোয়নি।

এই আটটি দল আবার ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২৮শে মে তারিখে এক সমাবেশের মাধ্যমে তাঁরা ময়দানে অব-তীর্ণ হবেন। এবং তারপর থেকেই গ্রাম-গ্রামান্তরে অন্টবামের প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে সি পি এম-এর ও রাজাপালের দুঃ-সাহসের মুখোশ খুলে ধরবেন। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় দলীয় ইউনিটদের প্রতি নির্দেশও চলে গিয়েছে কেন্দ্রভিত্তিক এই সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠনের জন্যে। এত প্রস্তুতিপর্ব শুধুই কি কয়েকটা সভা-সমিতি গড়ার জন্য? যদি আন্দোলন হয় তবে ত ঐক্য আরও মজ-বুত হতে বাধ্য।

অন্যদিকে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস দল ও ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে প্রতি জেলায় সংগঠনকে মজবুত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দুই কংগ্রেসই বর্ধমানের ঘটনাকে মূলধন করে ইতিমধ্যেই খানিকটা আসর জমিয়ে নিয়েছেন, সংগঠন কংগ্রেসের নেতা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ত সরাসরি জনতাকে তাঁর ভবিষ্যৎবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদর্শগত লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৪ শরিকের ফ্রন্ট কখনো একযোগে কাজ করতে পারে না বলে শ্রীসেন তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় জন-সাধারণকে সাবধান করে দিতেন। আর বলতেন 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। সেই বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে শ্রীসেন বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে বক্তৃতা করে আদি কংগ্রেসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে শাসক কং-গ্রেস দলের নেতারাও সর্বত্র কমিটি গঠন ও সভাসমিতি ইত্যাদি করে একটি পূর্ণাঙ্গ দলের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাঁদের একজন নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় দলের জন্য এমন কি জীবনদানী হতে চলেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বিগত নির্বাচনে কং-গ্রেস পশ্চিমবাংলায় বিপর্যস্ত হলেও ইন্দিরাজীর নতুন উদ্যম ও উদ্যোগকে সম্বল করে আবার দলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেকেই মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। তদুপরি ছাত্র সংস্থা গড়ে ওঠার ফলে কংগ্রেসকে আর একতরফা মার খাওয়ার আশঙ্কাও পোষণ করতে হবে না।

প্রত্যেক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও জোট বাঁধবার প্রচেষ্টা থেকেই মনে হয়, তাঁরা আর একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু রাজ-নীতি বড়ই জটিল। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিকে মোড় নিতে পারে। অনেকেই মনে করছিলেন যে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের পাঁচজন উপ-দেষ্টা যখন নিযুক্ত হয়েছেন, তখন অবি-লম্বে নির্বাচনের কথা উঠতেই পারে না। আর বিধানসভাও যখন ভেঙে দেওয়া হচ্ছে না তখন ত বোঝাই যাচ্ছে, নির্বাচন মোটেই আসন্ন নয়। অন্যদিকে চীফ সেক্রেটারি নিয়োগের ব্যাপারে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে শ্রীসুকুমার মল্লিককে পুরোপুরি ভাবে ঐ পদে বহাল করা হয়নি। কারণ যদি নতুন মন্ত্রিসভা আসে তবে শ্রীমৃগাঙ্ক মৌলি বসু মহাশয়কে ত আবার স্বস্থানে ফিরে যেতে হবে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার নতুন একটি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন একেবারে নস্যাৎ করে দেন নি। সেই অবস্থার জন্য সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার করা আছে।

অন্যদিকে প্রশ্ন হচ্ছে, মন্ত্রিসভা হলে কোন কোন দল এই নয়া মন্ত্রিসভার শরিক হবেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেরলের সাম্প্রতিক দুটি উপনির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সততা নিষ্ঠার সঙ্গে কোনো কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারলে জনতা সেই দলকে বা গোষ্ঠীকে তার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে না। তাই কেরালায় কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীঅচ্যুত মেনন জয়লাভ করেছেন। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী মার্কসবাদী-দের ঘাঁটিতে আক্রমণ করে তাঁদের পরাভূত করে বিজয়ীর বরমাল্য নিয়ে এসেছেন। একথা সত্য, নয়া কেরালা মন্ত্রিসভার প্রতি শাসক কংগ্রেসের সমর্থন আছে। কাজেই জনতা নয়া সরকারের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সহযাত্রী শাসক কংগ্রেসকে পর্যন্ত আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত করে নি। দুই উপনির্বাচনের ফলাফল যে এক সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সি পি এমকে বাদ দিয়ে যাঁরা সরকার গঠনে এতদিন নারাজ ছিলেন এক-কেরলের উপনির্বাচন নিশ্চয় তাঁদের অর্গলবদ্ধ মনের দরজা পুনরায় খুলে দিতে পারে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মার্কসবাদীদের শক্ত ঘাঁটি যেমন পশ্চিম বাংলা, তেমনি কেরালা ও। কাজেই পশ্চিম বাংলার মানুষ যদি নতুন প্রতিশ্রুতি কার্য-কর হতে দেখে, তবে তাঁরা কেরালাবাসীর মতই যে এগিয়ে আসবেন না, একথা কি করে বলা যায়?

কথায় আছে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। এমনিতর অবস্থার মধ্যে পশ্চিম বাংলার কিছু কিছু বামপন্থী দল পড়েছেন, যার ফলে তাঁরা ইচ্ছে থাকলেও এগুতে সাহস করছিলেন না। নেপথ্যে কথা বলুন দেখবেন কি রকম মানসিক দ্বন্দ্বে ঐ সমস্ত দলগুলি ভুগছেন। যা হোক, কেরলার উপনির্বাচনের ফলাফল নয়া চিন্তার পথ প্রশস্ত করে দেবে বলেই মনে হয়। বাংলা কংগ্রেস ও কংগ্রেস শাসক দলের মধ্যে যদি সত্যিই কোন কথাবার্তা হয়ে থাকে তবে তা নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের কৌশল নিয়েই হয়েছে। কারণ, রাষ্ট্রপতির শাসন বজায় থাকলে রাজনৈতিক দিক থেকে খুব সুবিধে হয় না। সরকারকে হাতিয়ার করে এগুতে পারলেই প্রভাব বাড়ে। শত্রু শিবিরও বিপর্যস্ত করে দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই তাই নূতন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চলছে, পশ্চিম বাংলায় ব্যতিক্রম ঘটবে বলে মনে হয় না।

—[illegible]

দেশে বিদেশে

পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ এখনও পার্লামেন্টের সদস্যদের অনেকখানি মনোযোগ অধিকার করে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে সম্প্রতি যে বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে সেটি হল এই রাজ্যে নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ। প্রতিদিনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে নকশালপন্থীদের হামলার খবর আসছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কাল গান্ধী সাহিত্য বিক্রেতার দোকানে, তার পরের দিন কোন কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে অথবা কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কামরায় এই চরমপন্থীরা যে হামলা চালাচ্ছেন তাতে লোকসভার সদস্যরা রীতিমত উদ্বিগ্ন। সবশেষে গত ২২ এপ্রিল লেনিনের জন্ম-শতবার্ষিকীর দিনে নকশালপন্থীরা বিরাট মিছিল করে তাঁদের শক্তি, শৃঙ্খলা ও চমৎকার পরিকল্পনার যে পরিচয় দিয়েছেন ও বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তাঁদের প্রসারের যে প্রমাণ রেখেছেন তাতে কলকাতায় ও নয়াদিল্লীতে অনেক চোখই কপালে ওঠার উপক্রম। একথা এখন অনেকেই বুঝছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এতদিন যে রকম বুঝিয়ে এসেছেন নকশালপন্থীদের শক্তি তার চেয়ে বেশী।

সমস্যাটার সামনে পড়ে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব ক্রমেই কঠোর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও সংসদে এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন পশ্চিমবঙ্গের নকশালপন্থীদের নিয়ে তাঁর খুব বেশী মাথাব্যথা নেই। নকশালপন্থীরা যে আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, এই স্বীকৃতিও শ্রীচাবনের বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যায় নি। তিনি বরং এটাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করার কথাই বলেছেন। আর যদি নকশালপন্থীদের দমন করার জন্য বিশেষ আইন করতে হয় তাহলে বিরোধী পক্ষ থেকেই সেই আইন করার প্রস্তাব আসুক, এই ছিল শ্রীচ্যবনের বক্তব্য।

কিন্তু পর পর ঘটনা ঘটে যেতে থাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুর বদলেছে। ১৭ এপ্রিল লোকসভায় বিবৃতি দিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে, নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে সাংঘাতিক করে তুলেছেন। এই বিবৃতিতে যদিও তিনি আবার বলেছেন যে, নকশালপন্থীদের চ্যালেঞ্জটি আসলে রাজনৈতিক, তা হলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথা যোগ করেছেন যে, যেখানে যেরকম প্রয়োজন সে রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। তিনি একথাও বলেছেন যে, তরুণ ছাত্ররা কেন নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন সেটা খুঁজে দেখার বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

সপ্তাহের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'নয়া' কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য আইন করার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর আলোচনা চলছে।

এদিকে মাদ্রাজে সাংবাদিকদের কাছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, সরকার শুধু নিজেদের চেষ্টায় নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারবেন না। হিংসাত্মক কাজ তখনই বন্ধ করা সম্ভব যখন জনসাধারণও তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করবেন।

"পুরনো" কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেও নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সেখানে মহীশূরের সদস্য ডাঃ নাগাপ্পা আলভা বলেছেন যে, নকশালপন্থীরা যেভাবে জীবন ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছেন সেটা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। "পুরনো" কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবশ্য "নয়া" কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই অভিযোগ এনে বলা হয়েছে যে, শাসক দল বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে মত্ত থাকার ফলেই চরমপন্থীরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

•

"নয়া" কংগ্রেস দল রাজ্যে রাজ্যে সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছে, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বলেছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের পতন ঘটান তাঁর দলের কাজ নয়। তাঁদের চেষ্টা হবে কি করে তাঁরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন না কেন, এই সপ্তাহে গুজরাটে যা ঘটল তাতে অন্য দল কর্তৃক পরিচালিত সরকারগুলিকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তাঁর দলের বিরুদ্ধে উঠবেই।

গুজরাটের ঘটনায় অবশ্য "নয়া" কংগ্রেস দল সামনাসামনি নেই। কিন্তু এটাও গোপন নেই যে, সেখানে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে স্বতন্ত্র পার্টি "পুরনো" কংগ্রেস দল থেকে সদস্য ভাঙিয়ে নেওয়ার যে চেষ্টা করছে তার পিছনে "নয়া" কংগ্রেস দলের প্রশ্রয় বা সমর্থন আছে এবং স্বতন্ত্র পার্টির এই চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে তাঁরা

"নয়া" কংগ্রেস দলের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার বিকল্প আর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবে।

গুজরাটের এই রাজনীতির সঙ্গে অবশ্য সর্বভারতীয় স্বতন্ত্র পার্টিরও কোন যোগ নেই। পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা "পুরনো" কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে চলতে চান এবং শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভাকে অপদস্থ করার ইচ্ছা তাঁদের নেই। অথচ, "নয়া" কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম যখন কিছুকাল আগে গুজরাটে এসে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান দিয়েছিলেন তখন গুজরাটের স্বতন্ত্র নেতা শ্রীসি সি দেশাই শ্রীরামকে তাঁর "বিচক্ষণতার" জন্য প্রশংসা করেছিলেন আর গুজরাট বিধানসভায় স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীজয়দীপ সিং খোলাখুলিভাবেই "পুরনো" কংগ্রেস থেকে বিধানসভা সদস্যদের দল ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। শ্রীদেশাইকে স্বতন্ত্র দল থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ এসেছে সেগুলির মধ্যে একটি হল এই যে, 'নয়া' কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি হিতেন্দ্র দেশাইয়ের সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীজয়দীপ সিং শ্রীদেশাইকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে [illegible] করেছেন। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে সর্বভারতীয় স্তরে স্বতন্ত্র পার্টির নীতি যাই থাক না কেন পার্টির গুজরাট শাখা, অন্তত তার একটা অংশ "পুরনো" কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাকে সরাবার জন্য সচেষ্ট এবং এই ব্যাপারে মদৎ দিতে "নয়া" কংগ্রেসের কসুর নেই।

শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার সর্বশেষ সংকট দেখা দিয়েছে তাঁর দল থেকে ছজন সদস্য বেরিয়ে যাওয়ার ফলে। মোট সাতজন সদস্য তাঁদের দলত্যাগের সংবাদ জানাবার জন্য স্পীকারের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। আগে থেকে এই খবর পেয়ে "পুরনো" কংগ্রেস পথের উপর পাশাপাশি তিনটি জীপ গাড়ী বসিয়ে রেখে তাঁদের আটকাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ সাতজন সদস্যের দলটি কোনক্রমে স্পীকারের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছান। পৌঁছবার পর একজন বেঁকে বসেন। তিনি বললেন যে, তাঁকে দিয়ে জোর করে দল ভাঙান হচ্ছে। স্পীকারের সামনেই সদস্যদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। একজনের জামা ছিঁড়ে যায়। যাই হোক, ছয়জন সদস্য জানান যে, তাঁরা দল ছেড়ে দিয়েছেন এবং স্পীকার যেন তাঁদের জন্য নির্দলীয় সারিতে বসবার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা স্পীকারকে অনুরোধ করেন যে, স্পীকারের বাড়ী থেকে ফিরবার সময় তাঁদের যেন পুলিশ পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্পীকার পুলিশ পাঠাবার অনুরোধ করেন। পুলিশ আসতে দেরী হওয়ায় স্পীকার নিজেই গাড়ী করে সদস্যদের শ্রীজয়দীপ সিং-এর বাংলোতে পৌঁছে দেন। দলত্যাগীরা সেখানেই

রয়েছেন। (শ্রীসিং একটি প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজা)।

এই ছয়জন দলত্যাগ করার পর ১৬৭ জন সদস্যবিশিষ্ট গুজরাট বিধানসভায় "পুরনো" কংগ্রেসের সমর্থকদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ৮৬ জন। অর্থাৎ আর মাত্র তিনজন দল ছাড়লেই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দল সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। অবশ্য "নয়া" কংগ্রেস দলের সাহায্য না পেলে স্বতন্ত্র পার্টির একার পক্ষে গুজরাটে কোন পাল্টা সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। সংবাদে প্রকাশ যে, গুজরাটের 'নয়া' কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকান্তিলাল খিরা ইতিমধ্যে দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনার বিষয়ে কথাবার্তা বলে এসেছেন।

গুজরাট বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অসমাপ্ত রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই-কোর্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। স্পীকার বলেছেন যে, তিনি এই মামলায় কোন রকম জবাবদিহি করবেন না এবং এ বিষয়ে আদালত থেকে কোন সমন দেওয়া হলে তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন।

স্পীকারের এই ঘোষণার ফলে গুজরাটে আইনসভার সঙ্গে আদালতের একটা সম্মুখ সংগ্রাম বাধার উপক্রম হয়েছে।

•

আর একটা ঠাণ্ডা লড়াই ইতিমধ্যে জমে উঠেছে সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে পার্লামেন্টের। পুরীর শঙ্করাচার্য সংক্রান্ত একটি মামলার আপীলের শুনানী হচ্ছিল সুপ্রীম কোর্টে। এই আপীলের মামলা সম্পর্কে লোকসভায় কয়েকজন সদস্যের কাছে নোটিশ গিয়েছিল। নোটিশ পাঠিয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের অফিস। লোকসভার ঐ সদস্যদের কয়েকটি বক্তৃতা সম্পর্কে ঐ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে লোকসভায় তীব্র উত্তেজনা প্রকাশ করা হল। সদস্যরা বললেন যে, তাঁরা সভায় যে-সব কথা বলেন সেগুলি কোন মামলার বিষয়বস্তু হতে পারে না। এটা লোকসভা সদস্যদের "বিশেষ অধিকার" এবং এই 'বিশেষ অধিকার' সংবিধানের দ্বারাই স্বীকৃত।

আইনমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেননও সদস্যদের অভিমত সমর্থন করলেন। স্পীকার শ্রীজি এস ধীলন সদস্যদের নির্দেশ দিলেন, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা যেন আদালতের সমন অগ্রাহ্য করেন।

বিষয়টি আলোচনার সময় কেউই এটা উল্লেখ করলেন না যে, সদস্যদের কাছে যেটা এসেছে সেটা আদালতের সমন নয়, নোটিশ মাত্র। এমন কি আইনমন্ত্রীও দুয়ের তফাৎ বুঝিয়ে দিলেন না। তিনি বরং একথা বললেন যে, সরকার পক্ষ থেকে লোকসভার সদস্যদের বিশেষ অধিকার কথাটা আদালতকে বুঝিয়ে বলা হবে।

ভুলটা দেখিয়ে দিলেন ঐ আপীলের মামলার দুই বিচারপতি—প্রধান বিচারপতি হেদায়েতুল্লা এবং বিচারপতি গ্রেভার। সমন জারী হয় বিচারপতির নামে। নোটিশ পাঠায় আদালতের দপ্তর। এক্ষেত্রে চলতি নিয়মমাফিক আপনা-আপনিই দপ্তর থেকে এই আপীলের নোটিশ সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং আইনমন্ত্রী লোকসভার সদস্যদের ভুল বুঝিয়েছেন বলে বিচারপতিদ্বয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল লোকসভার সদস্যদের বিশেষ অধিকারের বিষয়টি ত' উল্লেখ করলেনই না, উপরন্তু তিনি বললেন যে, তিনি লোকসভার সদস্যদের কাজ সমর্থন করার জন্য আদালতে উপস্থিত হন নি।

প্রসঙ্গটি যখন আবার লোকসভায় এল তখন সদস্যরা এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, আইনমন্ত্রী তাঁদের সঠিক তথ্য দেন নি। অ্যাটর্নি জেনারেলের উক্তিতেও তাঁরা আপত্তি জানালেন।

আইনমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন অ্যাটর্নি জেনারেল লোকসভার অভিমত আদালতকে বুঝিয়ে বলবেন।

স্পীকার অবশ্য তাঁর পূর্ব নির্দেশ বহাল রেখেছেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সদস্যদের তিনি আদালতের নোটিশ অগ্রাহ্য করতে বলেছেন। ২৫-৪-৭০

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির শাসনে আমলাতন্ত্র

পশ্চিমবঙ্গে যখন অতি দ্রুতগতিতে প্রশাসনের জঞ্জাল পরিষ্কার করা দরকার তখন রাজ্যপালের শাসনে অতিমূল্যবান সময় নষ্ট হল ওপরতলার আমলাদের নিজস্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধ মেটাতে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অচলাবস্থা তো আছেই, তার অর্থনীতি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এ খবর দিল্লীর অজানা নয়। তাছাড়া এখানে রয়েছে বিরাট বেকার-সংখ্যা, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, প্রাত্যহিক অভিযোগ এবং আরও কত কী। আশা করা গিয়েছিল যে রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে তাড়াতাড়ি এই জরুরী কাজগুলোতে হাত দেওয়া হবে। একটি সুস্থ, সুদক্ষ ও সৎ প্রশাসনের নজীর রাখতে কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন। কিন্তু কোথায় কী? রোম জ্বললেও নীরোর বেহালা বাজানোতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। রাজ্য রসাতলে যাক, আগে আমলাদের মানভঞ্জন হোক। তারপর দেখা যাবে কীভাবে এই আবর্জনার আস্তাবল সাফ করা যায়।

রাষ্ট্রপতির শাসন এই প্রথম কোনো রাজ্যে চালু হল না। আরও বহু রাজ্যে একাধিকবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যপাল নিজেই আমলাদের সহযোগিতায় সে-কাজ চালিয়েছেন। এখানে দেখা গেল রাজ্যপালের জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হল। উপদেষ্টাদের মধ্যে কে মুখ্য হবেন তা নিয়ে প্রকাশ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। এই মামলা শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। দিল্লিতে চলল দরবার। ক্ষুব্ধ আমলারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, এমনকি রাষ্ট্রপতিরও শরণাপন্ন হলেন। রাজ্যপাল রইলেন নীরব দর্শক। অথচ সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালই হলেন রাষ্ট্রপতির মুখ্য প্রতিনিধি। তিনিই রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যের ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে হল বিপরীত। দিল্লি থেকে ঘন ঘন উপদেশ আসতে লাগল। এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজ্যপাল এই আমলাতান্ত্রিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এত সব কান্ড-কারখানার পর মুখ্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হল দিল্লিরই পরামর্শে। তারপর দেখা দিল মুখ্যসচিব নিয়ে বিতর্ক। মুখ্যসচিবের উমেদার যিনি, তিনি দিল্লি থেকে তাঁর মনোনয়ন পাকা করে নিয়ে এলেন। স্বভাবতই রাজ্যপালের মত শেষপর্যন্ত টিঁকল না।

এক্ষেত্রে দিল্লির উচিত ছিল এত সব বিতর্কে না গিয়ে হয় রাজ্যপালের পরামর্শ অনুমোদন করা নয়তো এই রাজ্যপালকে সরিয়ে তাঁকে অযথা এক বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা করা। তা কিন্তু হল না। রাজ্যপালও রইলেন অথচ দিল্লির কথাই শেষ কথা রইল। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় কাজ কী সুষ্ঠুভাবে হবে? এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মহাকরণে যাঁদের যাতায়াত আছে তাঁরাই বলতে পারেন যে আমলাদের এই স্নায়ুযুদ্ধের চাপে পড়ে মহাকরণের কাজকর্ম শম্বুকগতি প্রাপ্ত হয়েছে। বড় আমলাদের মধ্যে যা চলছে তার প্রভাব তো নিচের দিকে পড়বেই। এমনিতেই সরকারী দফতরে কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। তখন যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে কলহকে এর জন্য দায়ী করে আমলারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এখন তো যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় নেই। আমলাতন্ত্রের আমলে এখন কাজ হচ্ছে না কার দোষে? দেশের এই অবস্থায় চাকুরীজীবী আমলাদের মর্যাদার লড়াই যুক্তফ্রণ্ট আমলের শরিকী লড়াইয়ের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝছেন না কিংবা বুঝলেও তা দূর করার জন্য চেষ্টা করছেন না।

প্রশাসনযন্ত্রে যে বিরাট গলদ বাসা বেঁধেছে তা পশ্চিমবঙ্গের ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী অফিসে দুর্নীতি ও আইনবিরুদ্ধ কাজকর্মের অভিযোগ বহুদিনের। এজন্য নিচুতলার কর্মচারীদের অসৎ ব্যবহারকেই এতদিন দায়ী করে পদস্থ আমলারা নিশ্চিন্ত থাকতেন। ভিজিলেন্স কমিশন বলেছেন যে, নিচুতলার কর্মচারীদের অসাধুতা বা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের চেয়ে ওপরতলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবই রাজ্যপ্রশাসনকে এতটা খারাপ জায়গায় এনে ফেলেছে। আইনের রক্তচক্ষু বা পুলিশের ভয় দেখিয়ে প্রশাসনকে সব সময় ঠিক রাখা যায় না। যাঁরা উচ্চপদে আসীন এবং যাঁদের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করেন, সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন, তাহলে নিচুতলার লোকেরা কর্তব্যে গাফিলতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেই। ভিজিলেন্স কমিশন বলেছেন, প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত ব্যক্তি সততা ও দক্ষতার কথা বলেন এবং অপরের ওপর দোষারোপ করেন তাঁরা সকলেই কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ দৃষ্টান্ত নন। তাঁরা যদি আন্তরিকভাবে কাজ করেন, যথার্থ তদারকির দায়িত্ব পালন করেন তাহলে প্রশাসনযন্ত্রটি এমন বিকল হত না।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় ভিজিলেন্স কমিশনের এই রিপোর্ট পদস্থ আমলাদের চোখ খুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন দেশের মানুষ রাষ্ট্রপতির শাসনে সুদক্ষ ও সৎ প্রশাসনই প্রত্যাশা করে। তা যদি আমলারা পূরণ করতে না পারেন তাহলে সঙ্গতভাবেই নির্বাচনের দাবি উঠবে। কারণ আমলাতোষণের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়নি। হয়েছে বৃহত্তর জনকল্যাণ ও দক্ষ প্রশাসনের নজীর স্থাপনের জন্য।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় প্রশ্নটা বোধহয় এইভাবে ওঠা উচিত। সমাজের চোখে সাহিত্যিক কে? কতটুকু? সমাজে সাহিত্যের স্থান কী?

একদিন সাহিত্যের ক্ষমতা সত্যি-সত্যি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। সাহিত্য নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারত। লেখকের আলাদা মর্যাদা ছিল। 'আনন্দমঠ', 'গোরা', 'পথের দাবী' পড়ে একদিন আমরা ভারতের বৃহৎধর্মে উদবুদ্ধ হতে পারতাম, দেশপ্রেমে দীক্ষা নিতাম। কিন্তু সাহিত্যের সে আসন আজ এদেশ-ওদেশ কোথাও পাত্তা নেই। আরেকজন রুশোর আরেক ন্যুভেল এলোয়িজ পরে আজকের ফ্রান্সের মানুষ ভোগের জীবন ত্যাগ করে নিঃস্বার্থ দরিদ্র-সেবায় ব্রতী হবেন না আর। আরেক টম-কাকার কাহিনী নতুন করে আমেরিকার বিবেকী মানুষকে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাতে পারবে না। আজকের পৃথিবীতে মানুষ আর যা থেকে হোক, সাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়ে সৎ ও মহান কাজে ব্রতী হতে যাবে না।

আসলে সমাজের চেহারা এই শতাব্দীতে বদলে যাবে, নিয়ত বদলাচ্ছে। সমাজ আর সে-রকম সরল নেই, নানা সমস্যায় জটিল হয়েছে তার অস্তিত্ব। এই সরলতার অভাব ভালো কি মন্দ, বর্তমান সমাজ চতুর, কুটিল, ও হৃদয়হীন কি না, সেসব কথা তর্কে বহুদূরে যেতে পারে, এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক। আসলে, সমাজ বদলে গেছে একথা যদি আমরা মেনে নিই তখন আমার জিজ্ঞাস্য, এ অবস্থায় সাহিত্যিকের কাছে সমাজের কথা জানতে চাইবার কোন স্বতন্ত্র, স্থায়ী মূল্য আছে কি? সাহিত্যিক এখন কোন সমাজের কথা বলবেন? গোটা সমাজের কথা? সমাজ কি আর গোটা আছে, না থাকতে পারে? আগে কয়েকটি মৌল নীতি, স্থায়ী মূল্যে সমস্ত সমাজের স্থির বিশ্বাস ছিল। যেমন ধরা যাক দেশপ্রেম। আজ, এই দেশ-প্রেমের কথাতেই সমাজ বহু অংশে ভাগ হয়ে যেতে পারে। দল-গোষ্ঠী রাজনৈতিক মতাদর্শে ছিন্নভিন্ন এই সমাজের কাছে এক 'দেশপ্রেম' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আজ। সাহিত্যিক তো এই ছিন্নভিন্ন সমাজেরই জীব। সমাজের এই নিদারুণ ছিন্নভিন্ন অবস্থা তো তাঁকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় অথচ লেখক আর যাই চান, টুকরো হয়ে যেতে চান না। কোন একটি জায়গায় যদি তিনি নিজের মধ্যে বিশ্বাস খুঁজে না পান তাহলে আত্মবিশ্বাসের অভাবে সংশয় তাঁকে কুরে খাবে। এই সংশয়

মহাশ্বেতা দেবী

নিয়ে তিনি যাই লিখতে যাবেন তাতেই তাঁর মনে হবে তিনি সকলের কাছে পৌঁছতে পারছেন না, আগেভাগে মাঝ-পথেই খারিজ হয়ে যাচ্ছেন। অথচ সাহিত্যিকের শেষ উদ্দেশ্য তো আর কিছুই নয়, আক্ষরিক উপায়ে সকলের কাছে পৌঁছনো।

সমাজ চিরকালই ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে এগোয়। তার কোন স্থিতাবস্থা নেই। আজ যা কিছু হচ্ছে তার সবই খারাপ একথা বলা যেমন অসম্ভব তেমনি যা হচ্ছে সবই ভালো হচ্ছে একথা বলতে না পারায় মধ্যে প্রগতির অভাব লক্ষ্য করাও অনুচিত। স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও যে দেশে জীবনধারণের উপ-যোগী সাধারণ একটা মান আয়ত্ত করা যায় না, সে দেশে অসহিষ্ণুতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই অসহিষ্ণু-তারও একটা চরিত্র থাকবার কথা। থাকে না এই জন্যে, যে অতি নিম্নস্তরের রাজ-নীতি আজ আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। সাহিত্য-শিল্প, মহত্তর বোধ, বাঁচার জন্য পবিত্র সংগ্রাম সবই সেই রাজনীতির পাঁকে চলে যাচ্ছে। ঠিক এই অবস্থা এ দেশে বিশ-বাইশ বছর আগে ছিল না। কি এদেশে, কি ওদেশে, রাজনীতির প্রভাব যখনি এইভাবে সর্ব-গ্রাসী হয়ে উঠেছে, সৃজনী শিল্প তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল্যবোধ কথাটা এখন হাস্যকর শোনায়। কিন্তু কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, মূল্যবোধ না থাকলে আরম্ভ যাই হোক না কেন, শেষ যে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন হয় না তা বার বার আমরা দেখতে পাচ্ছি। মূল্যবোধকে যখন জীপ-ফাস্‌নারের মতো সুবিধাজনকভাবে ওঠানো-নামানো হয়, তখনই সমাজে সংকটের সময় ঘনিয়ে ওঠে। তখন ভালোয়-মন্দয় তফাত থাকে না। গায়ের জোর ও জোরপ্রচারে যাকে ভালো বলা হয় তার ওপরেই আমাদের চোখ থাকে, আর সব কিছুই আমরা মন থেকে বাদ দিয়ে দিই। সৎ ও একক শিল্পপ্রচেষ্টা, কোন ভালো নিঃস্বার্থ কাজ, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত, কিছুই আমাদের চোখে আর পড়ে না। গুরু-শিষ্যের সেই গল্পটি আমরা মনে করতে পারি। মুড়ি ও সন্দেশ একই দামে বিকোচ্ছিল বলে গুরু সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচে যায়। শিষ্য গুরুর কথা শোনেনি। তার পরিণাম ভালো হয়নি।

সাহিত্যিকদের মুশকিল এইখানেই। রাজনৈতিক হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা কখনো বামে, কখনো দক্ষিণে, কখনো পূবে, কখনো পশ্চিমে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারেন না। তাঁদের পক্ষে সব কিছু দেখে-শুনে হাই তুলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়াও যেমন শক্ত, তেমনি অলৌকিক উপায়ে দশানন হয়ে কোলাহলে যোগ দেওয়াও কঠিন। রাজনীতি যা চায়, সময় যা দাবী করে, বিশেষ দল বা গোষ্ঠী যা চায়, সবসময়ে তাঁরা তা করে উঠতে পারেন না। তাৎক্ষণিকতায় যা মগজ লাভে তাঁদের বিশ্বাস কম হওয়ারই কথা। বৃহত্তর জীবন ও সমাজের কাজে লেগে থাকাই সাহিত্যিকদের ধর্ম।

কিন্তু এই ভূমিকায় বোধহয় সাহিত্যিকদের কেউ আজকাল দেখতে চান না। হয়তো সাহিত্যিকরা নিজেরাও চান না। নিজেকে একটি জানাশোনা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে ফেলতে পারলেই সহজে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বহু কিছুর মতো সাহিত্যিকরাও এখন দলে-দলে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, কামরায়-কামরায়, ভাগ হয়ে

যাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে আর পরিপূর্ণ সমাজের কথা শুনতে চাওয়া কেন? সমাজই বা সাহিত্যিকের কথা শুনবে কেন? কোথায় সেই সাহিত্যিক যাঁর কণ্ঠ সমাজকে বাধ্য করে তাঁর কথা শুনতে, যাঁর কথা শোনে না সমাজের সে উপায় কোথায়? সে আদর্শই বা কোথায়? সম্পূর্ণ মানুষের আদর্শ? কথায় আছে—যে ভালোবাসা পায় না, সে ভালোবাসতে পারে না।

ভালোবাসা নয়, ব্যক্তিত্বের আদর্শের কথা এখানে মনে পড়ছে। একসময়ে এদেশে বড় বড় মানুষ হতেন। তাঁরা অকৃপণে দান করে যেতেন নিজেদের। তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও তাই সৎ ও বিবেকী হতেন। আমরাও তো পেয়েছিলাম অনেক। কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে কি কিছু দিয়েছি অনুজদের? বিবেকহীন ক্ষমতার লড়াই, শুধু কোনমতে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া, এই যেন আমাদের একমাত্র কাজ। এমনি করেই আমরা সমাজকে পঙ্কিল করেছি, জটিল করেছি।

তাই মনে হয়, এই অবস্থায় কারো যেন কোন অখণ্ড, সম্পূর্ণ চেহারা আর নেই। এক এক সময়ে মনে হয় আমি আমি তো, না আর কেউ? আসলে আন্দোলন, সংগ্রাম, শিল্প, সাহিত্য সবই যদি গিয়ে একটি নিখিল ধারায় না মেশে তা হলে সব কিছুই অর্থহীন। এই পুরনো কথাটাই আমার কাছে আদত কথা, আজো সমান সত্য। আজ পৃথিবীময় সমাজে-সমাজে যে লড়াই, আমার মনে হয় তা নৈতিকতার জন্য লড়াইও বটে, এ লড়াই মূল্যবোধের লড়াইও নিশ্চয়। ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতির সংকটে পড়ে এই নৈতিকতার প্রত্যাশাই বারবার ভেঙে ভেঙে যায়।

সাহিত্যিক এখন আর আত্মার কারিগর নন। এই বিভক্ত ও বিচলিত সমাজে তিনি আর পাঁচজনের মতো সামান্য একজন কর্মী। সমাজের বিষয়ে মতামত জানিয়ে তিনি সংকটের মুখ ফেরান তাঁর সাধ্য কি? তা ছাড়া সমাজ বললে আমার শুধু বাংলাদেশের কথা মনে হয় না, গোটা ভারতবর্ষের কথাই মনে হয়। বাংলাদেশকে গোটা ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই আমি অভ্যস্ত। এই মুহূর্তের বাঙালীসমাজের সঙ্গে আমি বাদবাকী ভারতীয় সমাজের হয়তো বহিরঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাই না, সমস্ত অমিলের মধ্যেও একটি মিল খুঁজে পাই। আমার যদি মনে হয় একই সঙ্গে এই দুটোই সত্যি, এই প্রবল ভাঙচুর এবং কালের মুখে খুঁটো দেবার চেষ্টা; এই জীবনের সর্বস্তরে রাজনীতির ছায়া আর সৎ ও বিবেকী মানুষের শত যন্ত্রণার মধ্যেও নিজেকে বাঁচাবার হতাশ প্রয়াস; চেঁচিয়ে পারা যাবে না বলে অগত্যা নীরবতা শ্রেয় বলে বহুজনের চুপ করে যাওয়া; অন্যদিকে সমাজের অভ্যন্তরে, যাদের কাছে জীবনসংগ্রামের অর্থ একমুঠো ভাত অথবা চীনাঘাসের দানা অথবা বজরা সেদ্ধ এবং একটি ঘুমোবার জায়গা, তাদের মধ্যে প্রবল নৈতিকতা, সরলতা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি, এই সব কিছুই আজ একসঙ্গেই সত্যি।

আসলে, সময়ের এবং সমাজের এত উলটো-পালটা আমি আর কখনো দেখিনি। সমাজকে কখনো এমন অন্ধোর গতিতে ছুটতেও দেখিনি। তাই আজকের সমাজ সম্পর্কে সব কথা স্পষ্ট করে বলি আমার সে সঙ্গতি কোথায়? যার বিষয়ে বলব, আমার লেখা শেষ হতে না হতে সে হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। তাই এই কয়টি স্পষ্ট-অস্পষ্ট চিন্তায় ছবি ছাড়া আমার দেবার কিছু নেই।

কতদিন কেটে গেল ॥ তপন সিংহ

কতদিন কেটে গেল
কত সূর্য ডুবল আর উঠল,
কত জ্যোৎস্নার প্লাবন এল আর চুম্বন করল
নিঃসীম আঁধারের অধরে।

খুঁজি কাকে জানি না,
জানি না কি যে চাই,
সমুদ্রের কল্লোলে চাপা আমি—
বধির বায়ু অন্ধ আঁখি
রিনি রিনি শব্দতরঙ্গ।

স্তব আমার স্তব্ধতার
ধ্যানগম্ভীর নৈশব্দের পরপারে।
বিমূর্ত কল্পনার নানা রং নানা ছবি
এল, মিলাল
হাসল, হাসাল

তারপর ডুব দিল
গহন অরণ্যের আঁধারে।
তবু শুনতে চাই তাদের কথা
নিস্তব্ধতার ওপার থেকে।

সন্ত্রাস ॥ মানস রায়চৌধুরী

ভয়ের ভিতরে ডুবে যায়
তীর্থপ্রত্যাগত যাত্রীভরা নৌকো মাঝগাঙে নিশ্চিহ্ন গহিন
তেমনি আমাদের বুক ভালবাসা দিতে দিতে
আচমকা বিচ্ছেদের প্রাক-মুহূর্তে দেখি
রক্ত ও ফেনায় সিক্ত তিমির বিরাট মুখে
বিদায়ী-বালাড-এ হয় লীন।

প্রাত্যহিকতার এই নির্ভুল আলেখ্য আমি চিনি।

বাড়ি ফিরে শিশুটির স্বাগত-আতিথ্য আর ঘড়ির কাঁটায় প্রসারিত
মুহূর্তের মাখন ও মরিচ স্বাদ অথবা নির্দোষ
পানীয়ের স্নেহচ্ছটা কণ্ঠনলী পার হয়ে একান্ত ভিতরে
মৌমাছির গুঞ্জরণে মধ্যরাত করেছে আকুল।

অসম্ভব কিছু নয়।
সাধনাও আমাদের পাকদণ্ডী পার করে টেনে তোলে
প্রার্থিত বেদীতে
মজ্জশিখা ঘিরে শেষ পশমের আলিঙ্গন জনকজননী জীবনের
স্পন্দনে ঘোরাতে থাকে মেরু
'ওঁ মণিপদ্মে হুম' ভস্মিষ্ঠ লামার চোখে যেন প্রশ্ন সব
সমাধান হয়ে যায়, শুধু ভয় ঘিরে থাকে মরশ্বে আমার
ভয়ের ভিতরে ডুবে যায় নৌকো,
তীর্থের সুফল আর অভীষ্ট সমিধ।

দুটি কবিতা ॥ অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রতীক্ষা

কখন সময়ে হবে
তোমার দিগন্ত জুড়ে বৃষ্টি হবে
মেঘ হবে বৃষ্টি হবে বজ্রের উৎসব হবে!
মূলের আঁধার তুমি নক্ষত্রের মত ফুলে ভরে দিতে পার
তোমার চোখের মণি পারে।
তোমার চুলেতে বড় অন্ধকার
অন্ধকারে মুখ-মাথা আমূল আত্মাকে ঢেকে দাও।

জটিল জ্যোৎস্নায় নাচে বররুচি কিন্নর কন্যারা
একটি ছায়াই শুধু স্তব্ধতার
শূন্য হাত ভরে দিতে পারে।

আড়াল

অন্তরালে কার পদধ্বনি
হাওয়ার গভীর থেকে উঠে আসে
গাছের শরীর যেন নদীর মত ভরে যায়,
স্রোত...শব্দ...ধ্বনি...পদধ্বনি।
স্রোত...শব্দ...ধ্বনি...পদধ্বনি

বুকের ছবিকে আরো কাছে নিয়ে
ছবির গভীর বুক থেকে
আরেক রঙীন ছবি
অন্ধকার...স্রোত...শান্তি।

হাওয়ার গভীর থেকে
গাছের গভীর থেকে
ছবির গভীর থেকে...
একটি আঁধার ভেলা ভেসে যায়
শব্দ...পদশব্দ...অন্তরালে

পাহাড়ের আত্মা

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আসছিল। ওদের দুজোড়া চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি আকাশপথে উত্তোলিত হয়ে আবার ফিরে এসে মুখোমুখি হল। বৃষ্টি আসছে তা হলে। দুজনের চোখের ভাষায় যেন এই কথাটিই নিঃশব্দে ভেসে উঠল। আসছে। আসছে অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষিত জলধারা। নামবে এবার মুষলধারে। দূর অদূরের মাঠ পথ ঘাট ভাসবে। আকাশজোড়া সীসের মত ঘন কালো মেঘ ওদের মনের এ কথাকে নির্বিবাদে সমর্থন করল।

চুমকি আরেকবার আকাশের চারিদিকে চঞ্চল চোখজোড়া বুলিয়ে এনে বলল—'চ' পালাই।'

মেগা আকাশের দিকে তাকালো না। তাকালো চুমকির দিকে। এবং এক বিচিত্র হাসিতে ঠোঁট ভাসিয়ে বলল, 'কেন, ভয় করে নাকি?'

দুচোখের মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে মেগার হাসিটুকু সংগ্রহ করল চুমকি। অতঃপর বলল—'না, বাঘ ভালুকের মুখে ত পড়িনি।'

তা বটে। মেগা ওর অনেকদিনের চেনা মানুষ। অনেকদিন অনেক সুখ-দুঃখ নিয়ে চুমকি এসে দাঁড়িয়েছে ওর এই কাছের মানুষটির কাছে। আর মেগা ওকে যেমন সুখের দিনে তেমন দুঃখের দিনে নিজের পাশে জায়গা দিয়েছে।

মরশুমের সুখের দিনে খোপায় ঘোমটা আটকে রেখে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে চুমকি যখন হাঁটে তখন মেগা ওর কোমরের নাচন দেখে তৃপ্তি অনুভব করে। যেন ছোট্ট পাখির খাঁচাটি দুলছে। চুমকি যখন হাসে তখন বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মেগা। যেন শিশিরস্নাত ফুলের পাপড়ি খুলতে দেখছে। আর যখন ডাগর ডাগর চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকে তখন সেই রসস্বাদ আস্বাদন করে কৃতজ্ঞতার হাসিটুকু না হেসে পারে না।

সারাটা বৈশাখ বৃষ্টি হয়নি এবার। জমিজমার বিরাট বিরাট ফাটলের হাঁ ক্রমাগত দীর্ঘতর হয়েছে। রোদের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে না পেরে ঘাস পাতার সবুজ রঙ হলদে রংয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। একটু বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে মানুষের কাতর প্রার্থনা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় এসে কালো মেঘ যেন আকাশটাকে গিলে ফেলেছে একেবারে।

মেগা চুমকিকে সাবধান করে দিতে গিয়ে বলে—'জল এলে ভিজিস না যেন, জ্বর সর্দি হতে পারে।'

—'অমন কথা বলো না, গলা শুকিয়ে

বসে আছি মিস্ত্রি, এমন সুযোগ ছাড়ব না।'

—'যদি অসুখ হয় তাহলে কাজ এগুবে কী করে?'

চুমকি খিলখিল করে খানিক সময় ভাঙাচোরা হাসি হাসে। তারপর বলল—'ভয় পেয়ো না মিস্ত্রি, এ জল মাটির গতর এর অসুখ হয় না।

ভারী আশ্চর্য এই মেয়ে। ইঁটের পাঁজার দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে এই আশ্চর্য মেয়েটির কথা ভাবছিল মেগা। ওকে প্রায় রাস্তা থেকে ধরে এনেই কাজে লাগিয়েছিল মেগা। জনমজুরের কাজ। পেটে দুটি জলভাত ত পড়বে। একেবারে শুকিয়ে মরার চেয়ে খেটে খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। দুনিয়ালাল ত ওকে খেতে পড়তে দিচ্ছিলই না, বরং অত্যাচারের প্রমাণ হিসেবে পিঠের চামড়ায় কালো দাগের ছড়াছড়ি। একদিন দুনিয়ালালের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখোমুখি পড়েছিল চুমকির। মেগা খানিকসময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। চুমকির শুকনো পাণ্ডুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে মেগার মনে হয়েছিল চুমকি যেন অন্যায় অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর অবিচারের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। আর তাই ওর সর্বাঙ্গের ভরা জোয়ার যেন ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে তখন আত্মহত্যার পথ খুঁজেছিল।

সেই মুহূর্তে মনটা ব্যথায় ভরে উঠেছিল মেগার।

এমন কৌশলে যে, কেউ এমন একটা জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতে চায় সেইটেই তাজ্জবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর কাছে। বড় কুড়ে এই দুনিয়ালাল, কাজ করতে চায় না, বসে বসে পেট ভরে খেতে চায়। যত দুর্গতির কারণ ত সেইটেই। অথচ ভালো মিস্ত্রির চেয়ে কোন অংশে কম ভালো মিস্ত্রি নয় দুনিয়ালাল। পেটভর খেতে হলে দিনভর খাটতে হবে যে, সেইটুকু মনের জোর নেই দুনিয়ালালের, তাই মেয়েটাকে ঘরে এনে পারল না তাকে একটু শান্তি দিতে।

অবশেষে অসহ্য জ্বালা সইতে না পেরে একদিন সেই ঘরের চুমকি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর যাবেই বা কোথায়,—গিয়ে উঠেছিল সটান এই মেগার কাছেই। সেই তখন কম সময়ের মধ্যে অনেকখানি বুঝে নিতে কোন কষ্ট হয়নি মেগার। মেগা প্রথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রথমে দুনিয়ালালের উদ্দেশ্যে 'শালা জানোয়ার' বলে গালি পেড়ে শেষে চুমকিকে ডেকে বলেছিল,—'চ আমার সঙ্গে, গতর ভরে খাটবি পেট ভরে খাবি।'

সেই থেকে মেগার পাশের কাজের মানুষ চুমকি।

মাঝে মাঝে মেগা চুমকির দিকে তাকিয়ে দেখে, জোয়ারে গতর আবার ভেসেছে, রঙ খুলেছে গায়ের, হাসিতে আলো, বাক্যের স্পষ্টতায় সামর্থ্যের ইঙ্গিত। আর তাই এইসব দেখতে দেখতে গৌরব বোধ করে মেগা। কেননা, চুমকির শুকনো দেহে আবার ড্যালা ড্যালা মাংসের সমারোহ দেখা দিয়েছে।

আকাশজুড়ে থমথমে মেঘ। দিনের আলোকে অনেকখানি অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে কালো মেঘের এই বিরাট অবয়বটা। মনে হচ্ছে আকাশটাই বুঝি নেই। গলাধঃকরণ করার পরে এখন তাকে নিঃশেষ করার একটা নিঃশব্দ ষড়যন্ত্র চলছে। অথচ একটু বৃষ্টি তাবৎ মানুষের এখন অনেকখানি প্রত্যাশা।

মেগা বলে—'জল হলে ইট জল খাবে, ঘাসগুলির তেজ বাড়বে সবুজ হবে।'

—'আর মানুষেরও মনের জ্বালা জুড়োবে।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় চুমকি।

জলের অভাবেই ধীরে ধীরে কাজ চলছে। আশেপাশে নালা ইঁদারায় পর্যন্ত জল নেই। শুকিয়ে একেবারে কাঠ। টিউবওয়েল থেকে যেটুকু টানতে পারে সেটুকুতেই ভিজিয়ে মেখে নিয়ে চুমকি কড়াতে করে নিয়ে এগিয়ে দেয় আর মেগা গড়ার কাজে মন দেয়।

তেমন কোন কাজ আর এখন হচ্ছে না। আবার সুরু হবে। আরো মজুর মিস্ত্রি আসবে। বালি মাটির মশলা জড়ো হবে। বাবুরা এসে তদারকির কাজে দাঁড়াবে।

ওদের দলের মজুর মিস্ত্রিরা যখন আবার আসবে, যখন সবাই মিলে আবার কাজে হাত দেবে, যখন কাজে ও হাসিঠাট্টা তামাশায় দালানের চারিদিকটা আবার মুখরিত হয়ে উঠবে, তখন হবে আরেক জ্বালা। ওদের মেয়ে মজুরদের মধ্যে সাঁওতালী মেয়ে লুকার সঙ্গে চুমকির যেন এক মুহূর্তও বনে না। একদিন মেগাকে ডেকে চুমকি বলেছিল—'ও মেয়েটা ভালো নয়, একটু সাবধানে থাকিস।'

বলেছিল,—'কেন, কী হয়েছে?'

—'কেন বুঝতে পারিস না কিছু, ভারী দজ্জাল যে, আর...।' বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আরেকটা কী যেন আর বলতে পারল না, শুধু ডাগর ডাগর চোখে ভেসে উঠল একটা কৌতুকের ছবি।

মেগা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—'আর কী?'

চুমকি তখন আরো ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মেগার একেবারে নিঃশ্বাসের কাছে। বলেছিল—'কিছুই বুঝতে পারছিস না।'

মেগা একটু অন্যমনস্কভাবেই বলেছিল—'কৈ না, কিছু বুঝতে পারছি না ত।'

চুমকি যেন একটা আহাম্মকের সঙ্গে পড়েছে। তাই ওর চোখের তারায় ভেসে উঠেছিল একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। বলেছিল—'এই বয়সেই যে ও তিনটেকে পেটে ধরেছে, তবু কিছু বুঝতে পারছিস না?'

মেগা ওর কথায় এতক্ষণে আর না হেসে পারল না। হো হো করে খানিকক্ষণ হেসে পরে বলেছিল—'হলে ত এ্যাদ্দিনে ও রকম তিনটে তোরও হতে পারত।'

ততক্ষণে চুমকির দৃষ্টিটা কোমল হয়ে এসেছিল, আর গালে লাল ছোপ। বলেছিল—'মুখে ঝাঁটা।' বলেই পাখির খাঁচার মত কোমরটা দুলিয়ে সরে গিয়েছিল মেগার কাছ থেকে।

ওরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। এখনো থম মেরে আছে আকাশটা। একটা দারুণ আক্রোশে যেন গোঙাচ্ছে। দিশেহারা পাখিরা মাঝে মাঝে আর্ত চীৎকারে মুখর হয়ে উঠছে। হয়ত হঠাৎ ঝড় উঠবে। যাকে বলে কালবৈশাখী। উড়াবে ঝরাবে চারিদিক। গর্জাবে বর্ষাবে সমানভাবে।

—'যদি খুব জল হয়?' চুমকি একটা অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় মেগার দিকে।

—'হোক না, খুব জোরে খুব বৃষ্টি হোক না, এখন ত আর এটা উদাম বাড়ি নয়, ছাদ রয়েছে।'

—'আমার কেন যেন ভয় করছে।'

—'তবে পালিয়ে যা যেখানে খুশি।'

হয়ত গেলে ভালোই হত। কিন্তু মনের ভয়। কিসের যেন একটা ভয়। ভয় আতঙ্ক আছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না যে, তাই মুখ ফুটে বলতেও পারে না কিছু।

কাজ আছে নাকি, অথবা কবে থেকে

কাজ সুরু হবে, এমনি সব খোঁজ নিতে যখন-তখন আসে লুকা, আর তাকে দেখলেই কেমন যে গা-পিত্তি জ্বলে যায় ওর। তিন তিনটেকে পেটে ধরে এখনও শখ মেটেনি। রং-ঢঙের যেন আর শেষ নেই।

আর মরদগুলিও হয়েছে যেমন। মেয়েগুলিকে পেটে ভাত দিতে পারে না, কিন্তু মারার গোঁসাই। পেটের মধ্যে গাছিয়ে দেবার বেলায় ঠিক আছে, কিন্তু খাওয়া-পরা দেবার বেলায় নেই। আর মাগীরও বলিহারী যাই। নিজেরই যখন খেটেপুটে খেতে হবে তখন আর মরদের কাছে যাওয়া কেন। একটু বুঝে-সুজে চললে হয় না? আবার আসে এখানে ঢঙ করতে। ঝাঁটা মেরে বিদেয় করলে ও যেন বাঁচে।

বেশী করে বিস্তারিতভাবে কিছু ভাবতে মন চাইল না এখন। কেননা, এখন এই মন্দিরের পলেস্তারা হচ্ছে। বাবু এসেছিলেন কাল, বলে গেছেন অনেক কথা। মানুষের ভালো মন্দ সবই ঈশ্বরের হাতে। মানুষের ধর্মস্থানটা অন্তত পবিত্রভাবে হওয়া উচিত। আমরা পবিত্র থাকলেই ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করবেন।

সেটা মেগা স্বীকার করে। সেই সঙ্গে চুর্মকিও। তাই এ কাজটুকু ওরা আর কারো হাতে ছাড়তেও পারেনি। নিজেরাই পরামর্শ করে দায়িত্বটা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। আরেকজন মানুষের দরকার ছিল, সে সময় [illegible] মেগা। মেগাকে [illegible] সে দিক থেকে টেনে নেবার জন্য চুর্মকি বলেছিল না, আর কাউকে দরকার হবে না।'

মনে মনে খুশি হয়েছিল মেগা সেটা। থাক, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। নইলে ন্যাটিতে আবার উটকো মানুষ ঢুকে আসল কাজও নষ্ট হোত, উপরন্তু ধর্মস্থানের পবিত্রতাও নষ্ট হতে পারত। তবে ধর্মস্থানের পবিত্রতা বলে নয়, চুর্মকি আর লুকার ব্যবহারটা যেন মাঝে মাঝে কেমন হয়ে ওঠে। যা ও বোঝে না অথবা বুঝতে পারলেও ঠিক সহ্য করতে চায় না। তাই আর লুবাকে সঙ্গে নেয়নি। চুর্মকিকে নিতেই হয়। কারণ দুনিয়ালালের কাছে কথা দেওয়া আছে। রূপোপরি মেয়েটাকে সে নিজেই হাত ধরে এনে এ পথে নামিয়েছে।

মেগা বলে—ভগবানের জিনিস ভগবানই জুটিয়ে দেয়।'

—'তা যা বলেছিস, সত্যি ভগবান আছে, নাবে?'

—হ্যাঁ নইলে মন্দিরের কাজের সময়ই বা এতদিন বাদে জল আসবে কেন?

—এবার ইট জল খাবে, শক্ত হবে, বালি মাটি ধরে নেবে তাড়াতাড়ি।'

মাঝে মাঝে মেগা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে চুর্মকিকে। কী যেন চায় ও। কার কাছে চায়? কেন এই চাওয়া? কিছুই কি পায়নি মেয়েটা? দুনিয়ালাল কি ওকে কিছুই দিতে পারেনি। একেবারে নিঃস্ব করেই কি পথে বের করে দিয়েছে। জীবন যৌবন নিয়ে যে এই ধুলোমাটিতে নেমে এসেছে, সে কি শুধু পেটের জ্বালায়, না কি, আরো কিছু জ্বালা আছে মনে!

সেদিন বালির স্তূপের উপর অনেক সময় ধরে আকাশের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল চুর্মকি। হঠাৎ সেদিকে মেগার নজর পড়তেই তার মনটাও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, আশ্চর্য, এমন করে বসে কেন চুর্মকি! ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা করার জন্যই বলেছিল—'কিরে কাজে ফাঁকি দিচ্ছিস নাকি?'

চুর্মকি হেসে উঠেছিল ওর কথায়। যেন হাসিরই কথা। অথবা যে কথার কোন মানে হয় না, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করা যায়। এমন একটা ভাব।

—'বারে হাসছিস কেন?' মেগা আবার শুধিয়েছিল।

—'হাসব না, তোরা পুরুষগুলি যেন সবই ন্যাকা।'

ন্যাকা! মেগা চমকে উঠেছিল। হাতের যন্ত্র রেখে উঠে এসেছিল চুর্মকির কাছে। একেবারে সেই বালির স্তূপের উপর। অতঃপর চুমকির দিকে তাকাতে গিয়ে চুর্মকির চোখ বরাবর দৃষ্টিটা ধরে রাখতে পারেনি বেশিক্ষণ, যেন চোখের দৃষ্টিটা ওকে ছোবল মারতে চাইছিল। তাই সেই ছোবলের ভয়েই যেন খানিকটা দমে গিয়ে বলেছিল—'যা কাজে হাত দে, মন ভালো লাগবে।'

মন ভালো লাগবে! এ আবার কেমন কথা। মরদ যার ঘরে মদ গাঁজার ঘোরে পড়ে থাকে, যাকে নাকি মেয়েমানুষ হয়েও পেটের দায়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়, মাথার বোঝা আর বুকভরা পিপাসা যার সর্বক্ষণের সঙ্গী তার আবার ভালো লাগবে কি! সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে গিয়ে দেখে ঘর শূন্য। রাত্রে কোনদিন ফেরে দুনিয়ালাল, কোনদিন ফেরে না। মদের নেশায় বাড়ির পথ ভুল হয়ে যায়। যেদিন ফেরে, সেদিনও অনেক রাত হয়। ও তখন সারাদিনের খাটুনির পরে ঘুমে অচেতন থাকে। মাঝে মাঝে মনটা বিগড়ে যায় বটে। কিন্তু তবু ঝাঁপ খুলে ভিতরে টেনে আনতে হয় মাতাল মরদটাকে।

মেগার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল চুর্মকি। আর মেগা ওর এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে কেমন যেন এক রকমের ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সবই যে মেগার বুদ্ধির অগম্য অথবা জানে না কিছু তা ত নয়।

হঠাৎ গর্জে উঠল মেঘ। চুর্মকি আঁৎকে উঠেছিল। মেগার হাসি পেলো। কাউকে এরকম চমকে উঠতে দেখলে হাসি পায় মেগার। সেইভাবে হাসতে হাসতেই আরেকবার আকাশের দিকে তাকালো সে। মনে মনে বলল—জানি তুই আসছিস, আর হাঁকডাক করে জানান দিতে হবে না।'

যেন এতক্ষণ যে কালো মেঘটা আকাশ জুড়ে থমকে আছে সেটাকে কেউ কোন গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি ভেবেই বিরাটকায় মেঘটা গলাখাঁকারি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করল।

তারপরেই আবার। এবং অতঃপর একটা গোঙানির মত শব্দ উঠতে থাকল। সে শব্দটা মেগাকেও একটু ভয় পাইয়ে দিল। এমন দিনে মেঘের এমন কাণ্ডকারখানা করার ত কথা নয়। মেঘ আসে এখন ছুটে, হাঁকডাক থাকে অবশ্য, সেই-সঙ্গে উদ্দাম-পাগলা ঘটনা ঘটিয়ে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে ঝাঁকিয়ে, দূরে থেকে

যেমন আস্তে দূরের দিকে তেমনি পালিয়ে যায়।

তা যাই হোক। মুষলধারে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক যদি থাকে জলটা, তবে প্রাণটা বাঁচে, দালানের ইটগুলি বুকভরে জল খেয়ে নিতে পারে। জমিনের ফুটিফাটা দিয়ে জল গড়িয়ে গিয়ে পৃথিবীর বুকের পিপাসা মিটতে পারে। তাবৎ জীবজগতে তা হলে নেমে আসতে পারে একটা স্বস্তি।

চুমকি বলে—'যদি সত্যি খুব জোরে বৃষ্টি আসে।'

—'আসুক।'

—'যদি আর না থামে।'

—'না থামুক।'

—'আমার যে ভয় করছে।'

মেগা এবার ধমকের সুরে বলে উঠল—'না থামলে আর কী হবে, এখানে এই ভগবানের মন্দিরেই তুই আর আমি থেকে যাব?'

মেগার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা ছিল, কিন্তু কেমন যেন ভালো লাগল চুমকির। তুই আর আমি এখানে থেকে যাব। তা আবার এই ভগবানের মন্দিরে। এমন কথা দুনিয়া-লাল ওকে কোনদিন বলেনি। এমন একটা নিভৃতে, লোকজনের আড়ালে নিঃশব্দে সময় কাটানোর আবেদন কোনদিন করেনি দুনিয়ালাল, রাত-বিরেতে ফিরে যখন তখন অত্যাচার করেছে। কখনো খাবারের থাল ছুঁড়ে মেরেছে, কখনো বাঁশের কঞ্চি নিয়ে শপাং শপাং বসিয়েছে ওর পিঠে। অথচ খেতে দেবার সাধ্য ছিল না দুনিয়ালালের। কথায় বলে পেটে দিলে পিঠে সয়। পেটে দেয়নি, দিয়েছে পিঠে।

অবশেষে ঈশান কোণ থেকেই মেঘের আক্রোশটা প্রথম প্রকাশ পেলো। দেখা গেল, জমিন থেকে ধুলো উড়ে আকাশের দিকে উড়ছে। পাখিগুলি গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, একদিকে উড়তে গিয়ে আরেকদিকে উড়ে যাচ্ছে। যেন হঠাৎ গতিবেগ প্রতিহত হওয়ায় দিগ-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে।

পরক্ষণেই হু-হু করে ছুটে এলো এদিকে, মুহূর্তে মাতাল হল দিগ-দিগন্ত। মেঘের খাঁজে খাঁজে দেখা দিল ফাটল। আকাশজুড়ে রুপোর হাঁসুলী ভাসছে আর ডুবছে। ক্রোধ গর্জন ক্রমাগত বৃদ্ধির পথে।

মেগার তপ্ত নিশ্বাস চুমকির ঘাড়ের কাছের হাওয়াকে তপ্ত করছিল। একটা শীতল হাওয়া এখন পৃথিবীর উত্তাপকে কোমল করতে চেয়ে যেন দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। এই ঠান্ডায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাসের উত্তাপটুকু অনুভব করতে করতে চুমকি বলল—এখনো সময় আছে, পালাতে পারি কিন্তু।

মেগা হাসল খানিকটা। তারপর তাকিয়ে রইল চুমকির দিকে। আকাশজুড়ে ভগবানের খেলার পালা চলছে। সেই অন্য-মনস্কতায় কখন ওর খোঁপায় আটকানো কাপড়ের পাড়টা খসে পড়েছে তা ও টের পায়নি। কপালের কাছে ঘেঁষা চুলগুলি কপালের জমিতে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। দেখতে বেশ লাগছিল।

—জানিস, অনেক পাখি আছে যারা এই জলের ধারা থেকেই জল খায়।' মেগা কথা তোলে আবার।

—'তাদের বুকের ভিতরটা ঠান্ডা হয় তখন, না রে?'

—'যা বলেছিস।'

দূরে অদূরে গাছের মাথা নুইছে আর উঠছে। হাওয়া আরো ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাশি রাশি পাতা উড়ছে। মাঠে ঘাটের বলদ গরু সব বেপাত্তা। টিনের কানায় ঘা খাওয়া বাতাসের বুক ধাতব শব্দ অবস্থাকে আরো ভয়ানক করে তুলছে। বৃষ্টির ছাট সুরু হল।

বাইরের দিকেই দাঁড়িয়েছিল ওরা। তবু চুমকি হাত বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। ছাটের জল খানিকটা হাতে নিয়ে নিজের চোখে মুখে বুলিয়ে দিল। আঃ বলে একটা তৃপ্তির শব্দ করে মেগার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর তেমনি হাসতে হাসতেই বলল—'চ, তাহলে ঘরে ঢুকে পড়ি।'

মেগা কোন কথা না বলে মন্দির ঘরটাতেই ঢুকে পড়ল। পিছে পিছে চুমকিও। তারপর ভিতর থেকে দেখতে লাগল বৃষ্টির তাণ্ডব। ক্রমাগত বাড়ছে। অঝোরে ঝরছে। আক্রান্ত ছাওয়া জলের কণা ঠেটে নিয়ে মন্দিরের ভিতরেও ঢুকতে লাগল। আর ওরা পাশাপাশি বাইরে দাঁড়িয়ে এমন করে ঝড়-জলের তাণ্ডব দেখছিল যেন এমনটি আর দেখেনি কখনো।

প্রচণ্ড হাওয়া একবার অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে চুমকির কাঁধ থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে দিল। সেটা মেগার চোখে পড়তেই বলল—'এই তোর কাপড়, তোল শীগগীর।'

—'কেন, কেন তুলব আমি, আমি ফেলিছি ওটা?'

চমকে উঠল মেগা। চুমকির চোখে চোখ পড়তেই পিছিয়ে গেল এক পা। যেন বিষ ধর লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন ওই চোখের ভিতর দিয়ে ছোবল দেবার উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে চুমকির।

উন্মত্ত যৌবনের প্রবল বেগ যেন ওর বুকের কাছের জামাটাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিতে চাইছে। আরো এক পা পিছিয়ে গেল মেগা। এবারে সেই ভূ-লুণ্ঠিত বসনসহ এক [illegible] মত এক পা এগিয়ে মেগাকে অনুসরণ করতে চাইল চুমকি। বাইরে বৃষ্টি ও বাতাস নিজ নিজ তীব্রতা বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। মেগা যেন আর পিছিয়ে যেতে পারছে না। চীৎকার করে বলে উঠল [illegible] যে আমাকে বিশ্বাস করে [illegible] মত করে দেব একবার?'

—[illegible]

—চুমকি [illegible] ডাকল মেগা। চুমকি [illegible] সেই ডাক [illegible] একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেগার উপর। মেগা আর কোন [illegible] পথ পেল না। [illegible] উদ্দেশ্যে নিজেকে চুমকির হাতে ছেড়ে দিল।

তারপর আরো অনেক সময় ধরে যে বাইরে প্রকৃতির প্রবল তাণ্ডব চলেছে সে সংবাদ ওরা রাখে না। অনেক ঝড় বাদলের পরে জ্যৈষ্ঠের আকাশে আবার রোদ উঠল, নির্মেঘ নীল আকাশ ঝকঝক করছিল।

ওরা দুটিতে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন পৃথিবী শান্ত। শাড়িটা আবার গায়ে জড়িয়েছে চুমকি। পাড়টা খোঁপায় আটকানো। সেই সময় চুমকি হঠাৎ লক্ষ্য করল মেগার বুকের মাংসপেশী কেটে ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে। যেন কোন পশু দাঁত নখ দিয়ে ছিঁড়েছে মেগাকে। তারপর মেগার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—'ইট এখন অনেক জল খেয়েছে, এবারে পলেস্তারা খুব ভালো করে ধরবে।'

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের কলমে অনেক সময় ভারী অদ্ভুত ধরনের চিঠি-চাপাটি প্রকাশিত হয়। এই ধরনের চিঠি চালাচালির ফলে দুটি তরুণ-তরুণীর বিবাহ হয়ে গেল এই কিছুকাল আগে। আমাদের দেশে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্রের মান ইদানীং অনেক উন্নত হয়েছে। সম্পাদকীয় পাঠ করার পূর্বে অনেকে শুধু চিঠি-পত্র পড়ে থাকেন।

এই রকম একটি চিঠি একবার প্রকাশিত হল বিখ্যাত ইংরাজী-দৈনিক ডেলি টেলিগ্রাফ নামক পত্রিকায়। চিঠিটা ইংলিশ স্কুলের একটি ছোট্ট ছেলের লেখা। ছেলেটির পত্রটি দারুণ অভিযোগে পূর্ণ তবে সেই অভিযোগ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, ছেলেটি অনুযোগ করেছিল পাখিদের বিরুদ্ধে। তাদের নেহাৎ অভদ্রজনোচিত লোভী স্বভাবের জন্য।

ছেলেটি লিখেছিল, রোজ সকালে তার জলখাবারের রুটির ভালো ভালো টুকরো বাঁচিয়ে সে তাদের বাগানের পাখিদের জন্য ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু পাখিগুলি এতই বেয়াড়া যে, তারা এই ভালবাসার দান উপেক্ষা করে ডাস্টবিনে রাখা উচ্ছিষ্টের জন্য মাথাখুঁড়ে মরে, এ কি বিশ্রী আচরণ, পক্ষীসমাজের কাণ্ডজ্ঞানের নিতান্ত অভাব।

জিরি মুচা এই চিঠিখানি পড়ে ভাবতে থাকেন, নিজের বৃত্তির তুচ্ছতার কথা। হাজার হাজার পাঠকের কাছে যে অভিযোগটি সংবাদপত্র পৌঁছিয়ে দিল তার তুচ্ছতার কথায় তিনি চিন্তা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে স্তালিন-যুগে যে ধর-পাকড়ের হিড়িক সুরু হয়েছিল, সেই হিড়িকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে নির্বিচারে তাঁকে কয়েদ করা হয়। বেশ কিছু দিন নির্জন সেলে রাখা হল জিরি মুচাকে, তারপর কয়লার খনিতে কয়েদী অবস্থায় আটক রাখা হল। অতিশয় কঠোর শাস্তি, আর ততোধিক কঠোর কয়েদীর কায়িক শ্রম।

কারাবাসের প্রথম বছর জনৈক সহৃদয় সহযোগী তাঁকে কিছু নোটবই দান করেছিলেন। এই নোটবইতে জিরি বারো মাসের ডায়েরী লিখে রেখেছিলেন।

কয়েদীর কঠিন পরিশ্রমের মাঝে অবসর মিলত অতি সামান্যই, তারপর একেবারে নিরালা নিঃসঙ্গজীবন। এই নির্জন অবকাশের মুহূর্তটিতে তিনি পড়াশোনা ও কিছু কিছু লেখার মধ্যে ডুবে থাকতেন।

যে পৃথিবী একদা তাঁর পরিচিত ছিল, যে পৃথিবীর আলো, পাখি, গান সবই তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল একদিন, আজ তাদের সঙ্গে তিনি সম্পর্কহীন; তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কত জিনিসের ঘনিষ্ঠতা ছিল, আজ সেইসব বস্তু মানসচিত্র মাত্র।

জিরি মুচা তাই বলছেন—"আই লিভ অন সাবসটান্স"—আমি সার বস্তুটিকে নিয়ে বেঁচে আছি। ফুলের নির্যাসটুকুর সৌরভ থাকে ফুল না থাকলেও।

এই সাবসটান্স বা সারবস্তুটি কি? এই বস্তুটি হল বহির্জগতে বাস করার কালের স্মৃতি। কারা-প্রাচীরের অন্ধকারে বসে সেই স্মৃতির রোমন্থন করতে বাধা কি. কি চমৎকার সুন্দর ছিল সেদিনের পৃথিবী. বাল্য-শৈশবের সেই নিস্তরঙ্গ নিরাপদ দিনগুলি। কি আনন্দ, কি অপরিসীম শান্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জীবনের যে পরিপূর্ণ দিনগুলি কেটেছে, ঐশ্বর্যমণ্ডিত সেই সব সোনামাখানো দিন, কত বন্ধু কত সঙ্গী। এছাড়া বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে সংযোগ। বিদগ্ধ সমাজের প্রাণপ্রবাহে কল্লোলিত হয়েছে যে চিত্ত সেই চিত্ত আজ পঙ্গু, নিষ্প্রাণ।

জিরি মুচার এই যে স্মৃতিচারণ, এ এক হিসাবে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্বাসন। সেই কাল এবং সেই সব জগতের অন্ধকার অস্পষ্টতার মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করাই এখন তার ব্রত। মাঝে মাঝে সংশয় জাগে মনে, এই অস্তিত্বের ধারাবাহিকত্বে।

হতাশা আর বিভ্রান্তি অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। যে পরিপূর্ণ জীবন একদা উপভোগ করেছেন কোথায় সেই জীবন। কোথায় সেই উন্মুক্ত আকাশ, কোথায় সেই প্রাণভরা বায়ু।

মনে পড়ে, অতীতের কথা মনে পড়ে। কিন্তু যা মনে জাগে তা কি সত্য? একদিন কি এই জীবন পার হয়ে এসেছেন লেখক—

> "I remember it, but I feel that it has become different. Everything has changed. Even the telephone numbers are different It seems a little ridiculous to have once's mind filled with useless memories—numbers which no longer mean anything, addresses which no longer exist, and faces which have changed out of recognition.

মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ত হয় নি, কিন্তু তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে বসে যে পার্থক্য চোখে পড়ে তার ফলে মনটা বিভ্রান্ত হয়। সংশয়ের দোলায় দোলে মন। মূল্যবোধ ধ্বংস হলেও তার কিছুটা যেন অবশিষ্ট আছে। তখন আবার প্রয়োজন হয় উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করার। নিজের মনকে যাচাই করতে হয়, নিজস্ব দর্শনের পূর্ণ মূল্যায়ণ।

ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা গেল দুটি মানুষ গতবছরে লেখকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে—একজন হল মাংসওলা কসাই আরেকজন তাসখেলুড়ে।

এক ঘেয়েমির অবসাদ মনটাকে বিষিয়ে তোলে নিদারুণভাবে। তার প্রতিক্রিয়া বড়ই বিশ্রী—

> "Last night one of the old age pensioners who, attired in long black great-coats, guard our camp shot himself while on duty. No-

বেঁচে থাকার রকমফের

'body knows why he did it and nobody asks. Pavlicek, that incorrigible toothless thief, once caught Punta, an ugly puppy belonging to Prochozka, the fat irascible cook and painted it green all over. That incident then caused incomparably more excitement'.

শারীরিক অসম্পূর্ণতা অনেক সময় বেয়াড়া আচরণের জন্য দায়ী হয়ে ওঠে। একজন অতিশয় সরল এবং নিরীহ প্রকৃতির বন্দীর আঠারো মাসের কারাবাসের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় নববর্ষের আগের রাতের ভোজের টেবিলে বসে সে হৈ-চৈ বাধালো, শুধু সুপ আর এক টুকরো রুটি খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট নয়। প্রতিবাদস্বরূপ তার সেই টিনের পাত্রস্থ খাদ্যবস্তু রাঁধুনীর আচকানে ঢেলে ফেলে দিল।

এই অপরাধের জন্য লোকটির কঠোর শাস্তি হল। প্রথমে সংশোধনী ব্যারাকে রাখা হল, তারপর পিটুনী শাস্তি হিসাবে দু' বছরের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হল।

নির্জন কারাবাসে থাকার কালে লেখক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা এই জাতীয়। এইসব বিবরণ তিনি আতংকিত চিত্তে রচনা করেছেন এবং তাঁর রচনার গুণে সেই আতংককর চিত্র যথাযথ ফুটেছে। এর তুলনায় তাঁর বর্তমান কারাবাসে অনেক শান্তিময়।

আবার যে লিখতে পারছেন এই আনন্দে লেখক ভাবে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে উৎফুল্ল হয়েছেন, তার পরবর্তী বিবরণে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সমকালীন সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন বেশ বিস্তারিত ভঙ্গীতে। কোথাও বা অতীতের ঘটনার প্রতি অনুকম্পা ও শ্লেষ প্রকাশ করেছেন।

লেখকের মতে চারদিকে অন্ধকার, পথে কোনো আলো নেই, পথ বিজন, রজনী সঘন, কাননে কণ্টক তরুগহন, শুধু যেটুকু আলো—তোমার নিজস্ব তাই দিয়ে পথ চিনে চলতে হবে।

যখন তাঁকে জানানো হল, তোমাকে এবার মুক্তিদান করা হবে, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে নির্বাক রইলেন, মনে হল কোথাও হয়ত ভুল হয়েছে। তিনি বললেন—This must be a mistake.

আরেকজন বন্দীর দু'বছর কারাবাস শেষ হল। কোথাও তার যাওয়ার জায়গা নেই, আশ্রয় নেই কোথাও। লেখক তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি সর্বপ্রথম কি করবে? সে জবাব দেয়—

"I will look for my dog. When I find him I will take him for a walk."

এর নাম জীবন, বেঁচে থাকা আর আধা বাঁচা।

—অভয়ংকর

LIVING & PARTLY LIVING By JIRI MUCHA Translated from the original czech by Ewald Osers Publishers: HOGARTH PRESS Price 25 Shillings.

সাহিত্যের খবর

লেনিনের প্রতি কবিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ।। লেনিন এখন শুধু একটি নাম নয়। একটি প্রেরণা, একটি প্রতীক। এখন সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চলছে তাঁর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব। তাঁর চিন্তা, তাঁর আদর্শ অনুপ্রাণিত করেছে কত কবি সাহিত্যিককে। বাংলাদেশের কবিরাও বিশ্বের এই কাব্য-আন্দোলনের সমতালে পা রেখে এগিয়ে চলেছেন। গত সোমবার, ১০ এপ্রিল, এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা গেল 'ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতি' কর্তৃক আয়োজিত কার্জন পার্কের 'লেনিন শত-বার্ষিকী উৎসব' মঞ্চে উপস্থিত হয়ে। তখন সবে সূর্য অস্তমিত হয়েছে। কার্জন পার্কের চারদিকে জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতি। খোলা মঞ্চের উপর বসে আছেন বাংলার বিশিষ্ট প্রবীণ ও নবীন কবি সাহিত্যিকরা। সামনে কয়েক হাজার শ্রোতা বসে আছেন কবিকণ্ঠে লেনিনের উপর কবিতা শুনতে। কবি সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন বাংলার অন্যতম দিক্‌-পাল কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

উৎসব সমিতির সম্পাদক ধরণী গোস্বামী উপস্থিত শ্রোতা এবং কবিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন—'আমাদের দেশের মানবতার শ্রেষ্ঠ উপাসক রবীন্দ্র-নজরুলের উত্তরসূরী রূপে আপনারা তাই যখন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মহান লেনিনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, তখন মানবতার কণ্ঠস্বরই আপনাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাই, লেনিন জন্ম-শতবর্ষে যে সব কবি সাহিত্যিক কবিতা রচনা করেছেন, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।' ধনঞ্জয় দাস উৎসবের ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

লেনিনের জন্য এবং লেনিনকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করে শোনান যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেন-গুপ্ত, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, ধনঞ্জয় দাস, নচিকেতা ভরদ্বাজ কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অনন্ত দাস, শঙ্কর রায়, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, বিতোষ আচার্য, গোবিন্দ হালদার, শিশির সামন্ত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, প্রদীপ বসু, দিলীপ সেনগুপ্ত, তরুণ সেন, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্থ ।। ঘিয়ান্নিকস ঘউর্দালিস গ্রীক ভাষার একজন বিখ্যাত কবি ও গদ্যলেখক। এ ছাড়াও তিনি গ্রীক ভাষায় বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থটির নাম 'টেলিটোস'। স্পার্টান পর্বতমালায় 'টেলিটোস' একটি বিখ্যাত পর্বত। এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে। এই পর্বতটির পাদদেশে ছড়িয়ে আছে এক বিরাট সমভূমি অঞ্চল। গ্রীস দেশে এই অঞ্চলটির নাম 'মানি'। এই হলো কবির পিতৃভূমি। গ্রীকরা এই সমতল ভূমিটিকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কখনও দেখেছেন এর মধ্যে একটা বিরাট পৌরুষত্বকে, কখনও তার নির্জনতাকে আবার কখনও তার সৌন্দর্যকে। এই অঞ্চলকে নিয়ে যুগে যুগে গ্রীক ভাষায় রচিত হয়েছে কত কাহিনী। কবি এই গ্রন্থে যেন সব কিছুকে বর্ণনা করেছেন নতুন উপাচারে। দীর্ঘ বর্ণনামূলক কাব্য রচনা গ্রীক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিও সেই পরিমন্ডলের বাইরে চলে আসতে পারেননি। কিন্তু বাচনভঙ্গিতে, প্রতীক নির্মিতে তিনি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

একটি পত্রিকার পঁচিশ বছর ।। বাংলা কবিতা আন্দোলনে 'একক' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে শুদ্ধসত্ত্ব বসু অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করে আসছেন। বাংলা কবিতা পত্রিকার ইতিহাসে এত দীর্ঘদিন আর কোন পত্রিকাই প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে পত্রিকাটি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বলা যেতে পারে। সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু কাব্যরসিকের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন অবিচলিত নিষ্ঠার জন্য। গত এপ্রিল কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে এই পত্রিকার শততম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফণিভূষণ

চক্রবর্তী। সভায় ভাষণ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। শুদ্ধসত্ত্ব বসু কবিতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভাষণ দেন।

আলজিরিয়ার গদ্য ও কবিতা ।। গত বছর ১৩ এবং ২৫ মার্চ আলজিরিয়ায় ফ্রেঞ্চ কালচারল সোসাইটির উদ্যোগে দুটি সুন্দর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দুটি আলোচনা সভাতেই পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসী কবি জাঁ সেনেক। সেই আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা যা বলেছিলেন সম্প্রতি জাঁ সেনেক সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। এবং অর্ধেকের বেশিই হল সম্পাদকের কথা। দ্বিতীয় ভাগে আছে আলজিরিয়ার আটজন তরুণ কবির তেইশটি কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে আলজিরিয়ার সাহিত্যে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে, এরকম একটা আভাস আছে বলে সম্পাদক উল্লেখ করেছেন। কবিদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁরা হলেন ইয়ুসেফ সেবতি (জন্ম ১৯৪৭) ও রেচিও বে (জন্ম ১৯৪৬)। এঁরা সচেতনভাবে ফরাসী কাব্যধারার বাইরে এসে নিজস্ব ভাবধারায় কাব্য রচনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

পাণ্ডুলিপি নির্ভর সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা ।। তেজেশ অধিকারীর সম্পাদনায় ১৬২।১, শরৎশুনা মেইন রোড, কলকাতা-৬১ থেকে আগামী পঁচিশে বৈশাখ একটি পত্রিকা বেরোবে 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে। উদ্যোক্তারা দাবী করছেন : 'এটি হবে বিশ্বের প্রথম শুদ্ধ-পাণ্ডুলিপি নির্ভর সাইক্লোস্টাইল রীতির পত্রিকা।' এ থাকবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যে কবি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁ লিখতে শুরু করেছেন তাদের রচনা সম্পাদকের মতে 'এই সংকলন পৃথিবী বিভিন্ন দেশের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশাল স্থান পাবে।

ও' হারার জীবনাবসান ।। প্রখ্যা ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক মিঃ জন ও' হা গত ১২ এপ্রিল পরলোকগমন করেছে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬ বৎসর। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে 'টে নর্থ ফ্রেডারিক', 'বাটারফিল্ড—৮' ইত্যা উল্লেখযোগ্য।
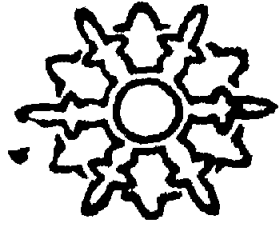
নতুন বই

সোজন বাদিয়ার ঘাট (কাব্যগ্রন্থ) — জসিমউদ্দীন।। বেঙ্গল পাবলিশার্স।। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২।। পাঁচ টাকা।

গত ভাদ্র মাসে জসিমউদ্দীন কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে যান। কিন্তু কলকাতার স্মৃতি ভুলতে পারেননি তিনি। এখানকার অভিজ্ঞতা করতে গিয়ে অখণ্ড বাংলার স্মৃতিচারণা করেছেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার ৪ আশ্বিন সংখ্যায়। তাতে তিনি বলেছেন : "কলকাতায় আমি বলেছি বাংলাভাষা বিশ্বসাহিত্যে গৌরবের আসন গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান আমরা একসঙ্গে বসবাস করছি। আমাদের সাহিত্যে তার কোনো নীড় তৈরী হয়নি। আমরা একসঙ্গে কারাভোগ করছি, ঝড়ের দিনে একসঙ্গে নৌকা বেয়ে কিনারায় এসেছি, কিন্তু সাহিত্যে তার কোনো খবর নেই।"

তাঁর লেখা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' পড়তে পড়তে সেই কথা মনে পড়ে। অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজ যেন দূর-অতীতের মতো এখন স্মৃতি-নির্বাসিত। বাস্তবে আর যাই হোক, অন্তরে যে-স্বপ্ন তিনি দেখেন তাকে কোনো ভৌগোলিক মানচিত্রের কাঠামোতে ঠাই দেওয়া যায় না। হয়তো বাংলার সেই আবহমানের চেতনা তাঁকে অন্তরে এখনো বিষাদময় আচ্ছন্নতায় ঢেকে দেয়, জীবনের উপরিতলের ব্যবধানকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। অনেকদিন আগেই তিনি স্মরণ করেছেন গাজীর গানের দুটো পংক্তি : 'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এমন একটা সময়ে লেখা যখন বাংলাদেশ অবিভক্ত, গ্রামীণ সমাজ অবিপর্যস্ত। এই আখ্যানধর্মী কাব্যেও তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথাই বলেছেন সহজ মানবিকতার হৃদয়স্পর্শে।

'শিমুলতলি গাঁয়ে
গাছের পাতা বাতাসে করে
মাটির শীতল ছায়ে।

নমু মুসলমানের আবাস, গলায় গলা ধরি,
খোড়োঘরের চালগুলি সব হাসছে মরিমরি।
নমুপাড়ায় পূজাপরব, শঙ্খকাঁসর বাজে
বউ-ঝিরা সব জয় জোকারে উৎসবেতে সাজে।
মুসলমানের পাড়ায় বসে ঈদের মহোৎসব,
মেজবানী দেয় ছেলেবুড়োয় করিয়ে কলরব।

মোরগ ডাকে, মুরগী ডাকে,
পেঁয়াজ রসুন, বাটি
তরকারিতে দেয় যে ফোড়ং:
বাতাস হলে ভাটি:
নমুপাড়ায় গন্ধ তাহার
যায় যে মাঝে মাঝে,
এতে তাদের হয় না ব্যাঘাত
কোনরকম কাজে।
চড়ক পূজায় গাজন গাহি
নাচে নমুর দল,
চৈতি ঢাকের বাদ্য শুনি,
গাঁও করে টলমল।
কীর্তনেতে এলিয়ে বাহু
জাগায় কলরোল,
মসজিদে তার বাজনা গেলে
হয় না কোন গোল।
বরং সাথে মাঝে মাঝে
ইহাও দেখা যায়
হিন্দুর পূজায় মুসলমান
বয়েৎ গাহেন গায়
... ...
ছোঁয়াছুঁয়ির এতই যে বাড়,
পীরের পড়া জল
নমুর পোলার পীড়ায় দিনে
হয়নি তা বিফল

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না শুধু কবিমানসিকতার বৈশিষ্ট্যসন্ধানে তার পুনঃস্মরণ দরকার। বিষ উপযোগী ভাষার ব্যবহারে তাঁ দক্ষতা এখনো পাঠকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। 'নকসী কাঁথার মাঠ' লিখে তিনি এককালে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' সেই সজীব মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বইটি পুনর্মুদ্রণ করে প্রকাশক গভীর দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে গৌড় (ইতিহাস)—শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। এশিয়ান পাবলিকেশনস। পি ১২, সি আই টি রোড। স্কিম-৫২ কলকাতা-১৪। দাম পনেরো টাকা।

বাংলাদেশ বর্তমান ভৌগোলিক রূপ পায় এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে। প্রাচীনকালে যেমন বাংলা দেশ বলে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি ছিল না বাঙালী জাতি। পুরাযুগে বিস্তৃত অঞ্চল পরিচিত ছিল রাঢ় নামে। তারপর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বঙ্গ ও বরেন্দ্রের দুটি অংশ গ্রাস করে গৌড়ের আবির্ভাব। ষোড়শ শতকে জন্ম সুবাবাংলার। প্রাচীন গৌড়ের মানচিত্র আর আজকের পশ্চিমবঙ্গে মিল রয়েছে অনেক।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস লিখছেন তিন খণ্ডে। প্রথম খণ্ড গৌড় কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে আগেই। বর্তমান মধ্যযুগের কাহিনী আরম্ভ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ সময় থেকে। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত গৌড়ের মধ্যযুগের কাহিনী বিস্তৃত। এই সময় গৌড়ের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। বার বার বিদেশীরা এসে হানা দেয়। রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণ বিদেশী শত্রুদের সাদরে ডেকে আনত। বলবন আধিপত্য ইলিয়াসশাহী বংশ, হাবসীযুগ, হোসেনশাহী বংশ, শেরশাহ, মোগল, মার্নোস, আলীবর্দী খাঁ, সিরাজদৌলা, মীরকাশিম, অবশেষে ইংরেজ—এই মাত্র গৌড়ের ইতিহাস নয়। রাজা দনুজমর্দনের আবির্ভাব, চৈতন্যের আবির্ভাব এবং বাংলা সাহিত্যের নবজন্ম কুচবিহারের হিন্দু রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত ভূস্বামী বিদ্রোহ, ব্যাপক গণবিদ্রোহ, মেদিনীপুর বিদ্রোহ—এসব গৌড়ের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণযোগ্য।

বইখানিতে এমন বহু তথ্য আছে যা আগে কোথাও বেরোয় নি। গ্রন্থকার বহু সূত্র থেকে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। গোটা বইটাই লেখা গল্প বলার ঢঙে। সরকারী তথ্য থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তেমনি পুরাণ বা লোকশ্রুতিকেও তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ সেকালের রাজা মহারাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজত্ব বাড়াবার প্রয়াসকেই দেখিয়েছেন। অথবা কোন ক্ষুদ্র ভূস্বামীর ক্ষমতালাভের সাময়িক বিক্রমকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বাংলা দেশের জনজীবনের নানা মুখী প্রবণতা, জীবনযাত্রার মান নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা তিনি করেন নি। আজকের ইতিহাস চিন্তায় এটি অন্যতম অনুষঙ্গ—একথা ভুললে ইতিহাসের প্রতিই অবিচার করা হবে।

সেদিনকে (শিশু সংকলন)—শ্রীমান উজ্জ্বল।। নীরাজনা প্রকাশনী, ৩৫।সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা ২৯।। দাম পঞ্চাশ পয়সা।।

শ্রীমান উজ্জ্বলের পুরো নাম 'উজ্জ্বলকৃষ্ণ গোস্বামী'। বাড়ির নাম হারকুলিস। বয়স সাত বছর। কিন্তু ছড়া গল্প লেখা শুরু করেছে পাঁচ বছর বয়স থেকে। বড়দের মাপকাঠিতে হয়তো তেমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু উজ্জ্বলের বয়স বিবেচনা করলে বিস্ময়কর মনে হয় প্রতিটি লেখা। বিশেষ করে দশ বারো লাইনের গল্পগুলিতে রীতিমতো অবাক করে দেবার মতো ভাবনা আছে। আমরা তার আসন্ন ভবিষ্যতকে স্বাগত জানাই।

শ্রীকৃষ্ণ—স্বামী প্রেমানন্দ সরস্বতী। মধ্য বাঙলা সারস্বত আশ্রম। পোঃ পূর্বস্থলী। বর্ধমান। মূল্য চার টাকা।

অনন্তগুণে বিভূষিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর অনিন্দ্যজীবনের অলোকসামান্য কাহিনী স্বামী প্রেমানন্দ ভক্তহৃদয়ের আত্যন্তিক মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাবের কারণ থেকে উদ্ধবের ব্রজে আগমন কাহিনী প্রতিটি ভক্ত-হৃদয়কে আবিষ্ট করবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রয়েল সাইজের ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা 'বাংলা কবিতার' বিশেষ সংকলনটিতে প্রথমেই স্মৃতিচারণমূলক একটি নিবন্ধ লিখেছেন সমর সেন, 'দি স্টিল সেন্টার' নামে। অনেকদিন পরে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে সমর সেনকেও যেন মনে পড়ে। ক্ষিতীশ রায় লিখেছেন, বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা। এই নিবন্ধে ক্ষিতীশ রায় বিষ্ণু দে সম্পর্কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটো চিঠির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। অশোক সেনের লেখা প্রবন্ধটির নাম "বিষ্ণু দে : পোয়েট অব হিউম্যান ফুলফিলমেণ্ট"। মনে হয় যেন অশোক সেনের লেখাটি ক্ষিতীশ রায়ের পরিপূরক। তবে ক্ষিতীশবাবুর চেয়ে অনেক বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করেছেন অশোকবাবু।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রোত্তরকালের আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে এমনিতেই আলোচনা হয়েছে যথাসম্ভব কম। বোধহয় জীবনানন্দ দাশ ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বই বেরোয়নি কারো ওপরে। 'বাংলা কবিতা'র বিশেষ সংখ্যাটি এজন্যেই আরো বেশী আকর্ষণীয় এবং সময়োপযোগী মনে হয়।

সংকলনটির শেষের দিকে ছাপা হয়েছে বিষ্ণু দে-র একটি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত লেখা 'হোয়াই আই রাইট' নামে। এই লেখাটি আসলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠির ইংরেজী অনুবাদ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের' সংকলনে। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, অমলেন্দু বসু এবং সমীর দাশগুপ্ত।

সংকলনটির অন্যতম সম্পদ বিষ্ণু দে-র অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ। বোধহয় এর আগে একসঙ্গে ইংরেজীতে তাঁর এতগুলো কবিতা কখনো অনূদিত হয়নি। বঙালী পাঠক মূল ভাষায় কবিতাগুলি পড়বার সুযোগ পেলেও অবাঙালী পাঠকের কাছে এগুলি একান্তভাবেই নতুন। ফলে, একই সঙ্গে তা দুটি উদ্দেশ্য সাধন করবে। অবাঙালী এবং অভারতীয় পাঠকদের কাছে তাঁর পরিচিতিকে সহজ করে তুলবে।

সংকলনটির সম্পাদক সমীর দাশগুপ্ত, শান্তি লাহিড়ী, স্টিফেন এন হে, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম : তিন টাকা। ঠিকানা : ১৮, পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা ২০।

ছোটদের জন্যে ছোট আকারের পত্রিকা 'ঝুমঝুমি' হাতে নিয়ে যে কোন পাঠকই চমকে উঠবেন। দু রঙে ছাপা এই পত্রিকায় কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, নাটক, ধাঁধা এবং নানান বিচিত্র বিষয়ের লেখা আছে। একে আকারে ছোট, তারপর পৃষ্ঠাসংখ্যাও বেশী নয়—কিন্তু সম্পাদক অসামান্য নৈপুণ্যে এতগুলি বিষয়কে একত্র করেছেন। পত্রিকাটি ছোটদের ভাল লাগবে। আধুনিক বিজ্ঞানের খবর, বাংলা বা ভারতের নানান পশু-পাখীর পরিচয় এবং জনসাধারণের আচারআচরণের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে পারলে, পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা বাড়বে। 'ঝুমঝুমি'র সম্পাদক গীতা দাশ ও সরল দে। এশিয়া পাবলিশিং হাউস কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২ থেকে বেরিয়েছে। দাম পঁচিশ পয়সা।

বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল ইদানীং বেড়েছে। পত্রপত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে অন্তত তাই মনে হয়। বিজ্ঞান সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'গবেষণা' পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যাটি সম্প্রতি বেরিয়েছে। এ সংখ্যায় চণ্ডীচরণ দেব লিখেছেন, সাধারণ ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য ক্ষার ও অম্লঘটিত অসমীয়াম রঞ্জক পদার্থ সম্পর্কে একটি আলোচনা। পাখি নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক নিবন্ধ লিখেছেন পুলক লাহিড়ী। শুভাশিস সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'ফ্রেক্কার শিল্প কুঞ্চনে আভ্যন্তরীণ বিকৃতি' প্রসঙ্গে। পত্রিকাটির সম্পাদক : আশিস সিংহ। কার্যালয় : ২৭ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো, কলকাতা—৯। দাম : এক টাকা।

সিনেমা সংক্রান্ত 'পৃথিবীর প্রথম মিনি পত্রিকা' 'মিনিয়েচার' বেরিয়েছে মার্চ মাসে। দাম প্রতি সংখ্যা ২০ পয়সা। লেখকদের মধ্যে আছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সরোজ সেনগুপ্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, বিমল চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জি ও পত্রনবিশ। সম্পাদক স্বপনকুমার ঘোষ ও শৈবাল পত্রনবিশ। ঠিকানা : ১৬৯ রায়বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা—৩৪।

কালি ও কলমের এ সংখ্যায় 'সমাজজীবনে কবিতার ভূমিকা' সম্পর্কে লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা চট্টোপধ্যায়, বজ্রেশ্বর রায় এবং আরো অনেকে। সম্পাদক : বিমল মিত্র। ঠিকানা : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

ছোটগল্পের সমস্যা

"সব সেরা লিখিয়ে হলেন তাঁরাই, যাঁরা বাস্তববাদী, যাঁরা জীবনকে যেমনটি দেখেন তেমনই আঁকেন। তবে যেহেতু এঁদের লেখার প্রতিটি ছত্র বক্ষে বহতা রসধারার মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবোধে অভিষিক্ত, পাঠক সেই হেতু তা থেকে শুধু যে জীবনের হুবহু স্বাদটুকু লাভ করেন তাই নয়, জীবনের পক্ষে যা হওয়া উচিৎ তাও অনুভব করেন এবং করে মুগ্ধ হন।"— চেখভের এই বক্তব্যটিকে স্মরণ করেছেন নিকোলাই আত্তারোফ সোভিয়েত ছোটগল্প বিষয়ে এক আলোচনা সভায়। সাহিত্য বিষয়ক সমস্যা পত্রিকাটির সাম্প্রতিক এই আলোচনাসভায় যোগদানকারী লেখকরা এ-বিষয়ে একমত হন যে অন্য যে কোন শিল্প মাধ্যমের মতো ছোটগল্পও জীবনের অনুসারী এবং জীবনেরই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

নিকোলাই আত্তারোফ বলেন, লেখকের [illegible] উদ্দেশ্য চেতনা নিবন্ধের বক্তব্য [illegible] সেকালে পুনর্গঠনের কাজে [illegible] জনগণের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াই কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল লেখকদের। নির্দেশিত হত নতুন জীবন-গঠনের কর্মে লিপ্ত সংগ্রামী মানুষের কথা সাহিত্যের উপজীব্য হওয়া উচিত। গল্পে চরিত্র-নির্বাচন ও [illegible] পরিস্থিতির পথনির্দেশেই একমাত্র ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারটি নিহিত ছিল। তবে একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিরিশের লেখকরা লিখতেন সমকাল সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে লিখতেন নিজেদের কথা আকস্মিকভাবে। কোন [illegible] ব্যাপার ছিল না এ ব্যাপারে। পারিপার্শ্বিক জগতে বাইবেল-কথিত ঘটনা সদৃশ বিরাট সব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। জন্ম নিচ্ছিল নতুন ধরনের মানুষ। তখন এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক।

এরপর তিনি আলোচনা করেছেন যুদ্ধপরবর্তী যুগের লেখকদের সম্পর্কে। যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে পৃথিবী থেকে যখন আপাত-শৃংখলার ভাবটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন তরুণ লেখকরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত করে, তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রধানত জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। ফলে, অন্তত কিছুকালের জন্যেও আত্মমুখকাব্যিক গদ্যের প্রচলন ঘটে। তবে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির মতো এখনও শ্রেষ্ঠ বর্ণনাত্মক রচনাই শেষ পর্যন্ত মহাকালের গলার মালায় স্থান পায়।

ইউরি ত্রিফোনভ 'প্রোসাস-এর যুগে প্রত্যাবর্তন' আলোচনায় কারুকৃতির সমস্যা, বিশেষ করে এ যুগের গদ্যের নির্দিষ্ট লক্ষণ ও শব্দের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কোন বিশেষ শিল্প শরীরের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ কঠিন কাজ। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে একমাত্র দৈর্ঘ্য ছাড়া কেন আর কোন মৌল পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। আসল বিবেচ্য বিষয় হল, অন্তর্নিহিত গতি। এই গতির পূর্ণতা থাকলে কুড়ি খণ্ডের এপিক উপন্যাস ও পাঁচ পাতার ছোটগল্পও তুল্যমূল্য। এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্রিফোনভ গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেন। অনেক শতাব্দীর অস্তিত্বের ফলে গদ্য-সাহিত্যের নিজস্ব আইনকানুন, আদর্শ ও রচনারীতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার এও স্মরণীয় যে গদ্য বা ইংরেজিতে যাকে 'প্রোজ' বলা হয়, সেই পরিভাষাটি ল্যাটিন ভাষার বিশেষণ শব্দ 'প্রোসাস' থেকে উদ্ভূত। আর এই 'প্রোসাস' শব্দটির অর্থ : মুক্ত, অকপট ও অনম্য।

ত্রিফোনফ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গল্পে প্লটের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে প্লটের চরম আত্মমুখ-ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে আসল ব্যাপার হল, এক মুহূর্তের জন্যেও লেখককে গল্পে প্রতিফলিত জীবনের সার সত্যকে ভুললে চলবে না। আর তাহলে ঐ সত্যই প্লটের উন্মোচনে সহায়ক হবে।

প্লট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করার পর শেষকালে ত্রিফোনফ বলেন, "প্লট-বিষয়ে আমি এযাবৎ যে-মত এখানে ব্যক্ত করলুম তা সবই যে সাহিত্য পৃথিবী আবিষ্কারের অভিযাত্রী, সেই সাহিত্য সম্পর্কিত। কিন্তু এছাড়া আরও একপ্রকার সাহিত্য আছে যা জগৎ সৃষ্টি করে, যা বাস্তব পৃথিবীকে রূপকথার জগতে পরিণত করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্লট হয়ে ওঠে প্রচণ্ড, সময়ে সময়ে অলৌকিক, শক্তিসম্ভব। গোগোল আর এডগার অ্যালান পো-র ছোটগল্প আর দস্তোইয়েভস্কির উপন্যাস এমন সব প্লানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যাতে প্রতিভাবান যাদুর ছোঁওয়া লেগেছে।"

লেখক ইউরি কুরানোফের "প্লট ছাড়া, ছোটগল্প নামে বস্তু নেই" আলোচনায় ছোটগল্পের শিল্পশরীরের গুরুত্ব ও তার বর্তমান সাফল্যের দিকনির্ণয় এবং সাম্প্রতিক ছোটগল্পে প্লট-সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ ছিল। আধুনিক সোভিয়েত ছোটগল্পে শিল্পগত গুণের লক্ষণীয় ক্রমোন্নতির উপর জোর দেন কুরানোফ। তিনি দেখান, গল্পে ঘটনাবর্ণনকে যোগ্যতার সঙ্গে গেঁথে তোলা, ঠিক ঠিক সুরটি বাজানো, যথাযথ শব্দ-প্রয়োগ, ইত্যাদি এ-যুগের ওস্তাদ ছোটগল্পলিখিয়েদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ছোটগল্পের আবেদন তাদের মানবধর্ম এবং পারিপার্শ্ব ও জগৎ সম্পর্কে ও তার পরিবর্তনের রঙ-বদল বিষয়ে গুরুতর অভিনিবেশ নিহিত। বহু বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে বিচিত্র জটিল পারস্পরিক যোগসূত্রের উদ্ঘাটনের কাজে লিপ্ত সোভিয়েত সাহিত্য। আর এই কাজটি সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্ভবত সম্পাদন করছে ছোটগল্প। এর কারণ, ছোটগল্পের শিল্পশরীর যেমন চনমনে তেমনই সংবেদনশীল এবং এটি সহজে প্রয়োগসাধ্য ও দ্রুত সুফল দানে সমর্থ।

প্লটের কথা বলতে গিয়ে কুরানোফ জানান যে, প্লট ছাড়া ছোটগল্প 'বস্তুর অস্তিত্ব আদপে সম্ভবই নয়। প্লট ছাড়া ছোটগল্পের এই ধারণার উৎস হয়তো এইখানে যে আধুনিক ছোটগল্প এমন প্লট অবলম্বন করতে চায়, যা তার বাহ্য অবয়বমাত্র হবে না, হবে অন্তরিন্দ্রিয়-সজাগ। অর্থাৎ, এই প্লট এমন বস্তু যা গল্পের চরিত্রের আন্তর জগৎ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে

এবং ঘটনাবিশেষের অন্তঃসার ও বাহ্য অবয়বের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ হবে ও তাদের পরস্পর-প্রভাবের পথ সুগম করবে। আর এরই ফলে সাম্প্রতিক যুগে গদ্য ও কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে চমৎকার একটি বোঝাপড়ার ভাব গড়ে উঠছে, যার পরিণতিতে আবেগে, প্রাণস্পন্দনে, রূপকের গভীরতায় গদ্য হয়ে উঠছে আরও সজীব, আরও তরতাজা। আধুনিক ছোটগল্পে তাৎপর্যের ফল্গুপ্রবাহ তাই আজ আরও অর্থবহ। তাই সে আজ ছোটগল্পের নিত্যসংগী।

এদুয়ার্দ শিম "আবেগের পারা চড়াই আসল কথা"তে বলেন, সত্যিকার ছোটগল্প হল প্রধানত 'জীবন সম্পর্কে যথাযথ নৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশের অন্যতম বাহন'। এটাই তাঁর কাছে ছোটগল্পের সত্যিকার মূল্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। অনেক লেখকই আজকাল গল্প লিখতে গিয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন, অনেকে রীতিমতো ঝলমলে স্টাইলে লিখে থাকেন, কিন্তু কখনও কখনও এই দক্ষতা, এই মসৃণ লাবণ্যই পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পে প্রায়শই যেমন চমৎকার স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় শিল্পের যথাযথ আবহাওয়া আর খুঁটিনাটি বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা। তবু সব সত্ত্বেও ফিরে ফিরে আপনার কেমন যেন মনে হবে, সমস্ত ব্যাপারটার উৎস লেখকের 'মস্তিষ্ক', তাঁর 'হৃদয়' নয়। অথচ লেখকের আবেগের উত্তাপ বা 'পারা চড়া'টাই তো এক্ষেত্রে আসল কথা। সত্যি কথা বলতে কি, খাঁটি প্রেরণা, স্বাধীনতা আর স্বাভাবিকতা-বর্জিত অগভীর ছলাকলা, ফ্যাশনদুরস্ত শব্দশিকার আর নীরস ত্রুটিহীনতায় ভরা 'পারা-নামা' ঈষদুষ্ণ গল্প পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে যাবার যোগাড় হয়েছে।

লেখক **আঁদ্রেই বিতোফ** সোভিয়েত ছোটগল্পের সাম্প্রতিক কৃতসংকল্প দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলে তার যে অভাবনীয় ব্যাপ্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে সেকথা জানান। ছোটগল্পই এখন সবচেয়ে নিখুঁত এবং সুসমঞ্জসভাবে গড়ে-ওঠা শিল্পমাধ্যম। তবু এই শিল্প-রীতিটি ইতিমধ্যেই 'খাবি খাওয়ার অবস্থা'য় পৌঁছেছে। বক্তা মনে করেন, গদ্যশিল্পের আরও বিকাশ ঘটতে বাধ্য। উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখকের অবশ্যই ছোটগল্প লেখার পাঠ নেওয়া কর্তব্য। তবে তাঁকে আরও বেশি দূর অগ্রসর হতে হবে। বিতোফ বলেন, এখন এমন সব কৌতূহলোদ্দীপক ছোট-গল্প লেখা হচ্ছে, যেগুলিকে একাধিক শিল্পমাধ্যমের সীমান্তবর্তী বলা চলে। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই ধরনের 'নতুন রীতি'র বেশকিছু ছোটগল্প দেখা যাচ্ছে, যাতে বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমের 'চৌহদ্দি অস্পষ্ট' হয়ে এসেছে এবং 'জীবনের সীমাহীন বিস্তার' পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ধরনের রচনাগুলিকে ছোটগল্প না বলে দীর্ঘতর কোনো রচনার একাধিক অধ্যায় বলাটাই বোধহয় সংগত। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের যেন মনে হয়, ওইসব অধ্যায়ের সংলগ্ন (অনুপস্থিত) আরো অনেক অধ্যায় আছে। যেন অনুপস্থিত অধ্যায়গুলি অলক্ষ্যে উপস্থিত। এ ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক হেমিংওয়ের অর্থের অন্তঃপ্রবাহ নয়। পূর্বোক্ত গল্পে আছে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ, আছে দূরবিসার প্রান্তর আর জীবনের অনুভব।

পরিশেষে আঁদ্রেই বিতোফ মন্তব্য করেন, ছোটগল্প শেষ পর্যন্ত এমন একটা সাহিত্যরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-রীতিতে লেখক ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে সবচেয়ে অপারগ। তাই লেখক যখন লেখার টেবিলে বসবেন তখন কোন্ সাহিত্যরীতি তিনি আশ্রয় করবেন তা আগে থেকে ভাবা তাঁর একেবারেই উচিত হবে না। তা যদি ভাবেন তাহলে তিনি সরাসরি সেই রীতির খপ্পরে পড়ে যাবেন। বরং সেই লেখকের ভাবা উচিত তিনি কোন্ বিষয়ে লিখবেন এবং কেনই বা লিখবেন।

মায়া গানিনা তাঁর 'অতিভৌতিক শিল্পীপনা না ফলিয়ে' আলোচনা-নিবন্ধের শুরুতেই এদুয়ার্দ শিমের বিরুদ্ধে মত দেন। শিম বলেছিলেন, গল্পটি যদি সৎ ভাবে লেখা হল, কিভাবে তা লেখা হয়েছে তাতে কিছু যায়-আসে না। আর গানিনা বলেন, ছোট-গল্পের শিল্পরীতি কোন খাতে বইছে, তার লক্ষ্য কী, সমস্যার সংঘাত আর কোন দিকে তা মোড় নিচ্ছে এসব বিষয়ে অনুধাবন এবং পারস্পরিক মত-বিনিময় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লেখিকা অতঃপর 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' এবং 'স্বীকারোক্তিমূলক' রচনা-পদ্ধতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন, দীর্ঘায়িত শিল্পরীতির ক্ষেত্রে 'প্রামাণ্য তথ্য'-মূলক এবং সংক্ষিপ্ত রচনার ক্ষেত্রে 'স্বীকারোক্তি'-জাতীয় পদ্ধতিতেই সম্ভবত ওই দুই শিল্পরীতির ভবিষ্যৎ নিহিত। 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' রচনা বলতে গানিনা বোঝাতে চান সেই ধরনের লেখাকে যা যতদূর সম্ভব বাস্তব তথ্যের অনুসারী, যা প্রকৃত ঘটনা ও চরিত্রকেই শিল্পরূপ প্রদান করে, যে রচনায় স্পষ্ট চোখে পড়ার মতো তৈরি করা কোনো প্লট নেই, অথচ আছে লেখকের চিন্তায় সততার প্রাচুর্য এবং ইত্যাদি।

মায়া গানিনা তাঁর আলোচনা শেষও করেন বিতর্ক দিয়ে। এবং এবার বিতোফের সঙ্গে। বিতোফের কোন-কোন মতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, ছোটগল্পের শিল্প-রীতি কয়েক শতাব্দী ধরে টিঁকে আছে এবং এখনও বহুকাল তা থাকবে, শিল্প-মাধ্যমটি প্রয়োগের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কঠিনসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও। আরও বলেন, লেখার টেবিলে বসে লেখক বা লেখিকা কোন্ শিল্পরীতি অবলম্বন করে লিখবেন তা তাঁকে আগে থেকে সঠিকভাবে জানতে হবে বৈকি।

'সামাজিক **ভিত্তিভূমির উপর'** নামে তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধে **বোরিস আনাশেন-কোফ** আরও বিতর্কের ঘূর্ণি তোলেন। বলেন, 'ভৌগোলিক **জ্ঞান** বেশ কিছু পরিমাণে' পূর্বতন যুগের লেখকদের মতি-গতি 'নিয়ন্ত্রিত করেছে'। **আজ** কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়-দেশের ভূগোল পৃথিবীর ভূগোলকে স্থানচ্যুত করেছে। এদিনের ছোটগল্পে বাহ্য ঘটনাবলী গল্পে-বর্ণিত চরিত্রকে আর পুরোপুরি অভিভূত করতে সক্ষম নয়, বরং তা নৈতিক কর্তব্যের সমস্যার দিকে, অর্থাৎ তার নিজের দিকেই চরিত্রটির মনোযোগ তীক্ষ্ণতর করে তোলে। তাই মনে হয় একালের ছোটগল্পে বুঝি প্লট নেই। একারণেই ছোটগল্পের 'বিশেষ' রীতি — অর্থাৎ ওই বুদ্ধিপ্রধান ও 'স্বীকারোক্তিমূলক' চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তাই প্রচলিত অর্থে যাকে প্লট বলা হয় তা-ই হয়ে পড়ছে গৌণ, প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে নৈতিক ও সামাজিক যোগসূত্র, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গল্পে-বর্ণিত চরিত্রের অন্তরের গতি। অর্থাৎ, প্লটের মৃত্যু হয়েছে, প্লট দীর্ঘজীবী হোক!

'গদ্য রচনার পাঠশালা' আলোচনা-নিবন্ধে **ভার্সিল আক্সিওনোফ** গল্পে কারুকৃতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিছক ঘটনাবর্ণন থেকে পাঠক যা পান সত্যিকার খাঁটি গদ্য রচনা তাঁকে তার থেকে আরও বেশী কিছু দেয়, খাঁটি গদ্য পাঠকের চোখে বাস্তব তথ্যের অন্তরের জীবনের ছবিটি তুলে ধরে। আক্সিওনোফ লেখকদের মধ্যে রচনারীতির আঙ্গিক ও কারুকৃতি নিয়ে 'কামারশালাগত' বা কারখানা-গত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।

বিতোফের সঙ্গে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন **আলেকসান্দর** লেবেদেনকো। তিনি বলেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি একটি শাশ্বত ব্যাপার। ... কাশিচেভ ও নাজারেভের মার্গারেট ক্লাসিক নভেলা বা উপন্যাসধর্মী রচনাকে একদিন বুনিনের 'স্বীকারোক্তিমূলক' ও ভোলতায়ারের দার্শনিক গদ্য উৎসাদন করেছিল। আবার, তারপর, হঠাৎ একদিন দেখা দিয়েছিলেন মেরিমে ক্রিইস্ত, ইত্যাদি। ছোটগল্পের রচনারীতি যেহেতু চিরকালের মত টিঁকে যাবে, অতএব আমরা নিশ্চিন্তে তার কারুকৃতি এবং বিশেষ করে প্লটের সমস্যার দিকে নজর দিতে পারি। বক্তা ছোট-গল্পে প্লটের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসই করেন না। প্লটের অভাব পাঠকের চোখে ধাঁধা-লাগানো সাহিত্যগত কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সত্যিকার, খাঁটি ছোটগল্পে সব সময়েই এমন একটি বিশেষ মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যাবে, যা কোন বিশেষ ঘটনা বা ছোট কাহিনীকে ওই গল্পের মূল প্লট থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে। আর ওই বিশেষ মুহূর্তটিতেই গল্পের অন্তঃসার একটি গভীর সামান্যকৃত বক্তব্যের রূপ নিয়ে ঝলমল করে ওঠে।

—বিব্রত ঘটক

সুখের মেলা

যাঁরা আমাদের কাছের মানুষ অথচ চির অচেনা, গ্রাম-বাংলার সেই অগণিত সাধারণ মানুষের আঁতের খবর জানাচ্ছেন তাদেরই আত্মার আত্মীয় বাংলার তরুণতম নতুন লেখক আবদুল জব্বার এই 'সুখের মেলায়'।

মোমিন কুঁজোর সংসার

'লাঙলের একটা 'মুড়ো' খুঁজে খুঁজে শালা হয়রান। এগার বিঘের ভেড়িতে চাল্লিশটা বাবলা গাছ আছে, একটারও ডাল বা গোড়া মুড়ো হবার মতন পেলুম না। শেষকালে কাল 'ঝুজ্‌কো' (ভোর) বেলা মাঠে গরু বাঁধতে যেয়ে হঠাৎ দেখি পাঁচু দর্জিদের একটা বাবলা গাছের গোড়া ঠিক এইরকম—মোমিন চাচার পিঠের মতন একেবারে—ধনুকবাঁকা—ঠিক লাঙল-মুড়ো হবে'...

পেটের ওপরে একটা হাত-দেড়েক কঞ্চি-বাড়ি রেখে তার মাথায় 'ছাকনি' জালের বুনতে-থাকা চুড়োটা বেঁধে 'কেঁড়ে' ধরে 'নাঙ্গি' দিয়ে টকাটক জাল বুনতে থাকে মোমিন কুঁজো। পিঠটা তার প্রথম বন্ধনীর মতন বাঁকা। তাতে হাত বুলিয়ে লাঙল-মুড়ো বলাতে রেগে যায়। কোনো কোনো মাদী বকুরির মুখে যেমন এক ছটাক করে দাড়ি থাকে আর জাবর কাটার সময় তালে তালে তা দোল খায়, তেমনি খেজুর আঁটি চিবিয়ে খাবার সময় দোল খায় মোমিনের দাড়িসমেত মুখটা। দোল খাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কপালের চামড়ার ভাঁজগুলো একবার মেঘের কোলে চকিত বিদ্যুৎচমকের মতন চারিয়ে গেল। টারা চোখের তারা দুটো যেন পট করে উল্টে গিয়ে পাক খেল একবার। দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। বললে, 'সমুন্দির পো, আমার পিঠটা 'লাঙল-মুড়ো' করতে চাস? কেন লম্বা 'ঈশটার দরকার নেই? তোর শাউড়ি বিধবা, বে-আবাদী দেড় কাঠা জাগা তার পড়ে আছে, ঘাস আগাছা জন্মাচ্ছে, মুড়ো তো পেলি, এট্টু ঈশটা নিয়ে যা!'

ধীরেন মাল ভয়ানক অপ্রস্তুত। চা-দোকানের সবাই মোমিনের কথায় খুশী। তার ছেলে এরপানেরও পিঠটা একটু বাঁকা। দোকানের টাটে বসে সে কাঁচি চালিয়ে কাচকাচ শব্দে দ্রুতহাতে বিড়ির পাতা কাটছিল। নটবর বোষ্টম এলো গায়ে পৈতে শোভিত হয়ে কুলো কোলে নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছিল দুলে। দুলে।

মোমিনের ছেলে চা-দোকানী। চটকলে বছর-ষোল কাজ করার পর তাঁতের মাকু দিয়ে জুতোর-ঠোকর-মারা-ম্যানেজার সাহেবের কপাল ফাটিয়ে দিয়ে অফিসের ভেতর হরদম লাথি কীল চড় প্যাদানী খেয়ে পশবই হাতে নিয়ে চাকরির মাথায় বাজ ফেলে চলে আসে। অনেক কষ্টে তবে 'ফন্ডে'র (প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের) টাকাটা তুলতে পারে সেই মূল টাকা থেকে থোকা একশো টাক ঘুষ দিয়ে লাইনবাবুকে। মাগ ছেলে খাবি খাচ্ছিল এক মাস কাজ ছুটে যেতে। মোমিন কুঁজো শ্যামগঞ্জের চটকলে 'পাজচাপা'য় কাজ করত। বদলি কাজ। সরদারকে চেকারা দিতে হত। ধেনো খাওয়াতে হত। গাঁজার পয়সা দিতে হত। দশটা টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলে তার 'ইসতিরি' মানে মেয়েমানুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে নারকোলপাতা পোড়ানো ছাইয়ের সঙ্গে মতিহার তামাক-পাতার গুঁড়ো মেশানো গুল মুখে দিয়ে একটা ধামা কাঁখে নিয়ে ফরফর করে চলে যেত হাটের দিকে। মোটা গাবদানা চাল, আধ-পচা আলু, পিঁয়াজ, রসুন আর সের-দুই 'ঘ্যাঙা' ট্যাংরা কিনে নিয়ে ফিরে এলে এরপানের বউ কাদুবিবি পেটে ময়লা-ভরা

বেছে কুটে ফেলে,' ভাল করে বাটা হলুদ মাখিয়ে রগড়ে ধুয়ে এনে ঝাল চচ্চাড় করত। দুপুরে এক ঝাঁপা তাড়ি নিয়ে বসত বাপ-বেটায়। ঝাল কটকটে মাছ অথবা গরুর সস্তা হড়মাসার মাংস কিংবা 'উজাড়' রান্না মাটির মালসা থেকে চেখে চেখে খেত—ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে তাদের ঘাম ঝরত। এরপান চটকলের ফান্ডের টাকা পেলে বারো শো। সেই দিয়ে দোকান করেছে। এখন নাকি তার সাত শো টাকা 'বিলেত' বাকি। দোকানে খদ্দের কমে গেছে। কাঠুরের দল, খড়ের গাড়িঅলা গাড়োয়ান খদ্দেররা—যারা দূরে দূরে থানা এলাকা থেকে আসত—প্রথম প্রথম নগদ খেত—তারপর ধার—শহর থেকে ফেরার পথে তারা অন্যদিক দিয়ে পালাত—চটকলের হাটুরে খদ্দের—গাঁয়ের কিছু মদ-মাতালে লোকরা—বাকি ফেলে ফেলে এরপানের দোকান ডকে তুলে দিল।

মোমিন কুঁজোরও হাঁপানীর ব্যামো ধরল। কাজ গেল। তবু সে ধানবন থেকে 'পাতি'-ঘাস কেটে এনে এনে সেসব শুকিয়ে ঝেড়ে নিয়ে 'ঝাংলা' বুনত দড়ি বাঁধা মাটির 'গুলো' তোলা-পাড়া করে। তার বাচাল মেয়েমানুষটা খুব ছোঁচা পরপুরুষপ্রিয় ছিল বটে কিন্তু (সোয়ামী কোনোদিন চিৎ হয়ে শুতে না পারলেও) ঘর ছেড়ে 'বিন্দাবনে' পালায় নি। শিকার করে যেখানে যা পেয়েছে "ডেঙো' পিঁপড়ের মতন নিজের গর্তে অর্থাৎ ঘরেই এনেছে। জলা-জাঙাল ঘুরে লোকের খেজুর গাছের পাতা কেটে এনে দিয়েছে লাগতে ঝান্তে বেঁধে টেনে টেনে। বউটাও তার মজবুত। গাছে উঠে কাঠ-কুটো ভাঙতে পারে। বেরন্দ পেট নিয়ে একবার হেলানো গাছে উঠে সেজনে ডাঁটা পাড়তে গিয়ে মড়ক, ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে বাচ্চা বিইয়ে ফেললো! আর সে বাচ্ছাটাও বেঁচে আছে এখনো! শাউড়ী বউয়ে সমান। যখন ঝগড়া লাগে যেন মোরগের লড়াই চলে। কাপড় খুলে পড়ে যায় দুজনেরই। গঞ্জো ভাঙে মুখ থেকে সারা বেলা।

মোমিন এসে জাল বাড়ি দিয়ে ঘা কতক ধরিয়ে দেয় তার ইসতিরি ফুলী বিবিকে। বিবি তখন বুড়োকে 'পাথর-কোলা' করে তুলে নিয়ে গিয়ে পানা পুকুরে দেয় ফেলে। আঁচড়া-কামড়া করে পরনের লুঙ্গি ঘাটে ফেলে রেখে মোমিন কুঁজো বাকুলে ছুটে এলে বউমা মা-কালীর মতন এত-খানি জিব বার করে লজ্জা কেটে ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। ঝগড়া থেমে যায়।

বুড়ী খিল খিল করে হাসতে থাকে। বুড়ো মারতে থাকলেও সে গ্রাহ্য না করে জোর করে গামছা পরিয়ে দেয়। বলে, 'ওলাউঠো মিনসে ভোম্বল দাস হয়েছে!'... পাড়ার ছেলেরা হেসে কূল পায় না।

সেই মোমিন কুঁজো একদিন মারা গেল। হাঁপানীর অসুখে সে কাহিল হয়ে পড়েছিল। কোনো চিকিৎসা করতে পারে নি। হরদম তামুক খেত, বলে নাকি ঐ হাঁপানী ব্যামো ধরেছিল পাড়ার 'হোমো-প্যাথি' ডাক্তার বলেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন দম ছুটে গেল। এমন কপাল তার যে ভারতের মতন এমন একটা পুরোনো সভ্য দেশে প্রায় ছাপ্পানো বছর বেঁচে থেকেও জীবনে নাকি কক্ষনো একটা ডালিম কিম্বা বেদানা কি জিনিস খেয়ে দেখে যেতে পারে নি!

মোমিন লোক খারাপ ছিল না। একটু তাড়ি একটু তামাক পেলেই খুশী হত। শুধু সে রাগত তার পিঠের কুঁজটা সম্বন্ধে কেউ যদি কিছু তামাসা করত। আর 'মোমিন মল্লিক' না 'মোমিন সেখ' শুধোলে। সে বলত, 'মোমিন স্যাক।'

'স্যাকের ইয়েতে ম্যাক!'
মল্লিকের ইয়েতে তালগাছ!'
'মিলল কই?'

'মিলুক আর নাই মিলুক—ইয়ে তো ফাটল!'

এইভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি'র মাথায় কখনো হয়তো বা ধীরেন মালের কোলের ওপরে পা তুলে দিত মোমিন কুঁজো। ধীরেন তাকে কোলে করে তুলে এনে দোকানের খোলার চালের ওপরে তুলে ছেড়ে দিত। মোমিন বসে বসে দাড়ি নেড়ে নেড়ে খেজুর আঁটি চিবত। আর হাসত। বলত, 'নাবিয়ে দে বাবা, কুঁজো মানুষ লাফ দিয়ে পড়লে, তালগোল 'পেককে' যাব!

এরপানও খাটো লোক। বাপকে উদ্ধার করতে গেলে এককড়া মই চাই। অগত্যা! মিনি-মাগনা এক কাপ চা খাওয়াতেই হয় মালকে। তখন সে যাবার সময় বলত, 'আয় বেটা হনুমান, নেবে আয় আমার কাঁধের ওপর।'

মোমিন তখন ঘেমে নেয়ে গেছে রোদ্দুরে। রাগে মুখটা থমথম করছে। তবু কিছু বলত না। বললে ধীরেন আবার কোথায় তাকে পাখির মতন ঠ্যাং ধরে ঝোলাবে!

দিনে একপোয়া খেজুর আঁটি চিবিয়ে খাওয়া, ভাল ঝ্যাংলা, জাল, বুনতে পারা মোমিন কুঁজো মারা যাবার পর এরপানের দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যেই। খানিকটা পান বরোজ করেছিল এরপান তাও জ্বলে গেল মেয়েরা বাসি গায়ে নোংরা কাপড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে ঢোকাঢুকি করে চুরি করে নাকি পান ভাঙবার 'অত্যোচারে'।

এরপান বলে, 'মাসের অসুখ হলে মেয়েরা যদি পান বরোজের ধারেকাছে যায় পান গাছ সব জ্বলে যাবে। ওদের গায়ে তখন একরকম ক্ষার গন্ধ থাকে। গাছ সইতে পারে না। পানদোক্তাখাকী আমার বউটা বরোজটাকে দিলে।'

এরপান এরপর অন্য দোকানে বিড়ি বাঁধতে যেত। দেড় টাকা হাজার। সারা-দিনেও সে হাজার বিড়ি বাঁধতে পারত না। সংসার অচল হয়ে গেল। পাঁচটা ছেলেমেয়ে। যুক্তফ্রন্টের প্রথম রাজত্বকাল এল। চালের দাম তিন টাকার উপরে উঠে গেল, প্রতি কে-জি। বেসম খেয়ে খেয়ে দুটো ছেলে মরে গেল রক্ত আমাশা ধরে। ফুলী বুড়ী কয়লা কুড়োতে গেল। এরপানের যৌবন-ফোটা মেয়েটাও গেল দাদির সঙ্গে মোড়া কাঁখে নিয়ে চটকল অঞ্চলে।

এরপানের বউ কাদু বিবি পাড়ার একটু অবস্থাপন্ন চাষী-বাসির বাড়ি যেত বাটনা পিষে আর জল তুলে দিতে। কারো বা ধান ভানত ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কারো শশা খেতে জল দিত ডোঙার মুখে পা চেপে জলভরা ডোঙা বাঁশের কাঁপকলে ঠেলে তুলে তুলে।

ঘরের উলুর ছাওয়া ছাউনী পচে গেল। বর্ষাকালে সারারাত তারা কুঁকড়ে বসে জলে ভিজত। বিদ্যুৎ চমকালে, বাজ পড়তে থাকলে, 'আল্লা আল্লা' বলে ডাকত। ভিজে ছাগলটাও ব্যা-ব্যা করত।

হঠাৎ তিনচার দিন পেটে দানাপানি না পড়াতে একদিন ভিটেমাটিটুকু মাত্র দুশো টাকায় বন্ধক দিয়ে ফেললে এরপান। এক বছরের কড়ারী বন্ধক। আগামী বৈশাখ পর্যন্ত। কিন্তু মুখ্যু এরপান জানত না যে সাফ কোবালা বন্ধকের নামে বিক্রি দলিল করেছে পাড়ার অনেক জমি আর টাকার মালিক সাবাজার মণ্ডল। ভিটে বন্ধকের আগেই আম, কাঁঠাল, [illegible] সবেদা বড় বড় গাছগুলো পেটের দায়ে 'আধা-কড়ি' দরে বিক্রি করে ফেলেছিল এরপান।

যখন এরপানের বাড়ির পশ্চিম পাশে বিরাট মাঠ জুড়ে আমন ধান পেকেছে চাষীদের তেমন দিনেও না খেতে পেয়ে পেয়ে সাতদিন পরে মারা গেল সে। মাঠের ধান সে ছিঁড়ে আনতে পারত, রগড়ে মেড়ে চাল বার করে খেতে পারত, তা করে নি সে। একজন নেতা এলেন খবর পেয়ে কদিন পরে। দশটা টাকা দিয়ে গেলেন কাদু বিবির হাতে। বললেন, 'না খেতে পেয়ে মরে গেছে এই রিপোর্ট দেবে সরকারী তদন্ত এলে।' খবরটা খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। তদন্ত হল। রিপোর্ট গেল, 'অনাহারে মরে নি। হার্ট ফেল করেছিল।'

সত্যিই, মরবার সময় সব মানুষই নাকি হার্টফেল করে। দেশের সবার উঁচু নেতা থেকে এরপান আলি পর্যন্ত এখানে গণ-তান্ত্রিক সমান অধিকার।

ফুলী বড়ী ডাগর হয়ে ওঠা নাতনিকে নিয়ে একদা মেটিয়াবুরুজে চলে গেল। সেখানে নাকি কোন হিন্দুস্থানী মুসলমান কসাইয়ের সঙ্গে নাতনির সাদি দিয়েছে। সেখানে ফুলীও থাকে। মাঝে মাঝে ছাপা শাড়ী পরে কালো বোরখা ঢাকা দিয়ে দাদি নাতনিতে আসে। এসে ভিটেয় বসে অনেকক্ষণ কাঁদে। তারা এলে কাদু বিবি ঝোলে-ঝালে রান্না করে তাদের আনা মাছ গোস্ত চাল ডাল নিয়ে। দু-একদিন থেকেই তারা চলে যায়। এরপানের মেয়ে নাকি অসামান্যা সুন্দরী হয়ে উঠেছে মোড়লের চোখে। সাবাহার মোড়ল ছিপ ফেলতে, বাগান দেখতে এসে সারাদিন কাটিয়ে যায়। এরপানের মেয়ে লায়লা ঘাটে এলে বলে, 'কিলো বুন, ভাতার-বাড়ি থেকে যে আর আসতেই চাস নি লো?'

লায়লা হাসে। বলে, 'এসে কি করব? ভিটেমাটি তো তোমার হাতে বন্ধক।'

'তুই থাক, ফিরিয়ে দোব।'

'দুশো টাকা দোব, ফেরত দাও।'
'সে সময় সময় কেটে গেছে।'
'কেন বোশেখ মাস পর্যন্ত তো?'

কাছে আসে সাবাহার। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ। মিহিন গেঞ্জি ও ধুতি পরে লোকটা। হাতের বাজুতে মিনে করা তাবিজ-মহল আঁকা সোনার পাতা বাঁধা। পুকুরের ওপার থেকে ঘাটে এসে জলে নেমে পড়ে লায়লা। ঘাট চেপে বসে সাবাহার। লায়লার বুকে জল ছিটে দেয়। তার পুরুষত্ব যেন প্রকট হয়ে ওঠে ভিজে কাপড়ে। লায়লা বলে, 'কি হচ্ছে দাদা, ছি-ছি, সরো, আমি উঠে যাই।'

'লায়লা বিবিজান, মেটেবুরুজে গিয়ে খুব সতী সাবিত্রী হইছিস না?'

উঠে পালাতে গেল হঠাৎ লায়লার হাত ধরে সাবাহার মোড়ল।

লায়লা আঁৎকে ওঠে।

'ছি! তোমার ই কি কাণ্ড। কি চাও—ওমা!'...

কিন্তু মা বা দাদি কেউ তখন বাড়িতে ছিল না। তারা কলোনের মাল তুলতে গিয়েছিল। লায়লা তা জানত! বোধহয় মোড়লও।

তাই মোড়ল তাকে ছাড়লে না। পাড়ার একান্তে নির্জন মাঠের ধারে বাড়ি। মোড়লের হাতে কামড়ে দিলে লায়লা। কেঁদে গেল। তবুও নিজেকে বাঁচাতে পারলে না। ক্ষুধার্ত সিংহ যেন হরিণীকে ধরে দলতে পিষতে লাগল।

শেষে ছেড়ে দিতে লায়লা ছুটে গেল মায়ের ঘরের মধ্যে একটা বঁটি কিংবা কাটারি খুঁজতে। তাও পেলে না। তখন গাল দিতে শুরু করলে, 'হারামির বাচ্ছা, তোর মা বুন নেই...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মজা দেখাব, ভাগো হারামির বাচ্ছারা, আজ রাতেই ঘর পুড়িয়ে ভেঙে দোব।'

'তোর নামে বিচার ডাকব রে খানকির বেটা।'

সাবাহার বললে, 'কোনো শালা আসবে না। আমাকে সবাই চেনে। আমার টাকা আছে। দিন-দুপুরে কত শালার মুণ্ডু 'উইড়ে' দিই মুই। ভাল চাস তো চুপ কর, বাপের ভিটে বাঁচাতে চাস তো থেকে যা। আর...'

'আর তোর সঙ্গে থাকি।'

'হাঁ।'
স্তম্ভিত লায়েলা। আর বাক্য সরল না। লোকটা ছিপ হাতে নিয়ে মাঠের পথ দিয়ে তার তেতলা পাকা বাড়িটার দিকে চলে গেল।

লায়লার গা ঘিন ঘিন করছিল। পুকুর থেকে স্নান করে এল। মা আর দাদি আসতেই বললে, এক্ষুনি আমি চলে যাব মা! দাদি চল এক্ষুনি!

'কেন এক্ষুনি যাবি কেন? কাল যাবি বললি তো?' কাদু বিবি অবাক হয়।

লায়লা বললো, 'ঘরে তোর একটা বঁটিও নেই? সব পাচার দিতে হয়?'

'কি হল কি?'

খুব অশ্লীল একটা কথা উচ্চারণ করলে লায়লা। কাপড়-চোপড় পরে নিলে। দাদিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। আগুনের মতন যেন তার মুখখানা জ্বলছে তখন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে আর ভরসা পেলে না কাদু বিবি।

লায়লা এসব ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করে না। মা শুনেও একথা ফাঁস হতে পারে। তাহলে আর তার স্বামী নেবে না।

তবু কাদু বিবি আন্দাজে বুঝতে পারে।

পরদিন মোড়ল সাবাহার তার প্যাকুলে এসে বলে, 'এরপানের বউ, এবার তো তোমাকে রাস্তা দেখতে হয়। বন্ধকী 'ডিড' কেটে গেছে।'
'কোথা যাব বাবা?'
'তা আমি কি জানি।'

'মেয়েটা দুশো টাকা ফেরত দিতে চায়, নিয়ে জায়গাটা ফেরত দাও বাবা, বন্ধক ছিল তো, এখনো বোশেখ মাস আসে নে।'
'বিক্রি দলিল ছিল দেড় হাজার টাকার।'

'দেড় বিঘে জায়গা দুশো টাকার মিথ্যে দলিলে তুমি দেড় হাজার টাকায় বিক্রি লিখে নিলে? এই কি তোমার ইমান হল বাবা?'

'আমি তো আর ইমানদার মওলানা মৌলবী নয় কাদু বিবি। কাল থেকে সরে পড়ো। যোয়ানী মেয়ের কাছে যাও—'ভাঁড় সেধে খাওয়াবে'সে।'
মোড়ল চলে গেল।

কাদু বিবি কাঁদছিল পাড়ার এক বাড়িতে বসে লঙ্কা হলুদ গুঁড়ো করে দেবার সময়। হামান দিস্তে ঠুকে ঠুকে সে লোহায় লোহায় লাগা কর্কশ শব্দ তুলছিল আর কথা বলছিল।

কাদু বিবি মোটা সোটা খাটো মেয়ে। রঙ মেটে নাক ভোঁতা। চোখ দুটো গোল। ছোট কোলের ছেকোটা একটা স্তন বগলের ভেতর দিয়ে পিঠের দিকে বার করে এনে পিঠে চড়ে চুষছিল।

কাদু বিবি বললে, চলে যাব মা, ভিখ মাগব। কিই-বা আছে! ছাতারের শূন্য ভিটে আগলে আর কি হবে। শুধু একটা বকরির ছানা আছে। দুটো ছানা হল ধাড়িটার। একটা শেয়ালে নিলে। ধাড়িটাও ধান খেতে যেতে সাবাহার মোড়লের ছেলেটা ধরে চুবিয়ে দিলে। হাঁ গা মা, ছাগলকে চুবোলে কি বাঁচে? কানে পানি ঢুকে গেল! কদিন বাদে মাথা ঘুরে ঘুরে মরে গেল। কচি বাচ্চাটা 'আসল' (ফেন)-পানি খেয়ে আর কদিন বাঁচবে? তাই মুই নিজের বিছনায় নিয়ে শুই। মোর এই ছাওয়ালটা একটা মাই খায় আর বকরির ছানাটা একটা মাই খায়!'

পাড়ার বউরা তাজ্জব। বলে কি এরপানের বউ!

কাদু বলে, 'আমি মা, বাচ্চাটা না খেয়ে মরবে, দেখতে পারি কি? বিছানায় মুতে দেয়, কি গন্ধ মা! তবু কি করব!' একটু হাসে কাদু।

আবার বলে, 'তা চুপ করে দুধ টানবি তো, না, থেকে থেকে এমনি করে খালি ঢু মারে, ঢু মারে!'

ছাগল বাচ্চা তার মায়ের পেটের তলায় মাথা গলিয়ে দুধ না পেলে যেমন করে ঢু মারে পিছনের পায়ে ভর রেখে তার অবিকল নকল করে দেখায় কাদু বিবি। মেয়ে বউরা তার কথা শুনে আর ভঙ্গী দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সেই কাদুর ঘর পুড়ে গেল একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা। কাদু বাড়িতে ছিল না। সন্ধ্যায় ফিরে সে খুব কাঁদলে। তারপর তারা মোমিন কুঁজোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না। হয়তো তারা পথে পথে ভিক্ষে করছে। হয়তো লায়লার কাছে যেতে তার হিন্দুস্থানী জামাই লাউড়ির নিকের ব্যবস্থা করতে চাইলে লজ্জার মাথা খেয়ে পালিয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু কাদু বিবি! পালাবে আর কোথায়? এই সংসার নেকড়ের কাছে তুমি তো মাত্র একটা ছাগলধাড়ি!...

মোমিন কুঁজো বলত, 'শালা, গরিব-লোকের জীবনটাই হল আমার ধনুকবাঁকা পিঠের মতন। হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, কক্ষনো আর চিৎ হতে পারে না।'

—আবদুল জব্বার

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

তখন বিকালবেলা। বর্ষার জল মাঠে থৈ থৈ করছে। জোটন গোপাট ধরে জল ভাঙতে থাকল। সে সাঁতার কেটে পাশের গ্রামে উঠে যাবে। সে জলজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে কেবল সাঁতার কাটছে। সে সাঁতার কেটে ঠাকুর-বাড়ীর সুপরির বাগানে উঠে দেখল একটাও সুপুরি পড়ে নেই। ঘাটে একটা তেমাল্লা নৌকা বাঁধা। ছই-এর নিচে দুই মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। জলে সে সারাক্ষণ সাঁতার কেটেছে। শাড়ি ভিজে গেছে। জবা ফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে শাড়িটাকে খুলে চিপে ফেলল। তারপর ফের প্যাঁচ দিয়ে পরতেই মনে হল—কোথাও যেন কারা চিঁড়া কুটছে। তালের বড়া ভাজছে। সে নাক টেনে গন্ধ নিল। চিঁড়া কোটার শব্দ ভেসে আসছিল। মামাদের এখন ভাদ্র মাস। ভিটা জমিতে আউশ ধান. আউশ ধানের চিঁড়া—সে ভাবল চিঁড়া কুটে দিলে ওর নসিবটা খুলে যাবে।

সে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। দেখল, মাইজা কর্তা পশ্চিমের ঘরে তক্তপোষে বসে একটা মোটা পুঁথি পড়ছেন। জোটন মাইজা কর্তাকে দেখেই দরজার সামনে দাঁড়াল। কে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ তুলতেই দেখল আবেদালির দিদি জোটন। জোটনের শরীরটা একটু বুঢ়া দেখাচ্ছে। চুল জোটনের নেই বললেই হয় এবং শনের মত। মুখে কোন কমনীয়তা নেই। ওর শরীরের গঠনটা কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। গালে মেচেতা সুতরাং মুখটি কুৎসিত দেখাচ্ছিল। ভুপেন্দ্রনাথ বলল, কিরে জুটি তুই!

—হ কর্তা আমি। আবার ফিরা আইছি।

—আবার তরে তালাক দিল।

—হ। কিন্তু নির্বৈংশায় না দিল পোলা, না দিল এক ফালি ত্যানা।

—পোলা না দিছে, ভাল করছে। পোলা আইনা খাওয়াইবি কি!

জোটন সেটা ভাল করে বোঝে বলে অন্য কথা আর বলল না। মাইজা কর্তা আবার বড় পুঁথিতে মন দিয়েছেন। চশমার ভিতর কর্তার সহৃদয় মুখ দেখে বলতে ইচ্ছা হল, মাইজা কর্তা আমারে পুরান-দুরান যায় হয় একটা ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু বলতে পারল না। যেন বললে এমন শোনাত—সেই ফকিরসাব এসেছিল, ঘরের যা-কিছু সঞ্চয় ছিল, মোট ভাত একটু শুকনো মাছের বাটা দিয়ে মানুষটা সবক'টা ভাত খেয়ে সেই যে চলে গেল আর এল না। যেন জোটন এই দরজায় দাঁড়িয়ে মনে করতে পারে—ফকিরসাব হুঁকো খাচ্ছিলেন, সব পোটলা-পুটলি যত্ন করে বাঁধা। যেন তিনি উঠবেন, শুধু হুঁকো খাওয়াটা বাকি। জোটন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারেনি, সে বলেছিল—ফকিরসাব, আমারে লৈয়া যাইবেন না। ফকিরসাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বলেছিলেন—আইজ না। অন্য দিন হৈব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরমু ঠিক নাই। সেই যে বলে চলে গেল আর এল না মানুষটা। আর আসবে কিনা ঠিক নাই। তাকে একটা মানুষ ঠিক করে দেবার জন্য সে যেন এখন বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।

আমারে একটা পুরান-দুরান যা হয় ঠিক কইরা দ্যান—বলতে সাহস পেল না। তিনবার তালাক এই শরীরকে যেন দুর্গন্ধময় করে রেখেছে। মাইজা কর্তা বললেন, কিছু কবি!

—কি কমু গ কর্তা। আমার চলে কি কইরা!

—আবার তর পাগলামি আরম্ভ হৈছে। এইটা ঠিক না। মাইজা কর্তা বুঝতে পারছিলেন, সেই মানুষ ঠিক করে দেবার কথাটা সে বলতে এসেছে। জোটন কর্তার মুখে এমন কথা শুনে আর দাঁড়াল না। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে ভিতর বাড়ীতে ঢুকে গেল।

ধনমামী বড়মামী দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পালের বৌ চিঁড়া কুটে দিচ্ছে। মালতি সঙ্গে আছে। জোটন বলল, দ্যান আমি চিঁড়া কুটি।

জোটন অতি অল্প সময়ে চিঁড়া কুটে খোলায় ছাড়িয়ে দেখাল। সে যে ভাল চিঁড়া কুটতে পারে, চিঁড়াগুলো ওর বেশ বড় বড় হয়—খোলায় ছাড়িয়ে সব যেন সকলকে দেখাতে চাইল। জোটন ওর চিঁড়াগুলি অন্য একটা বেতের ঢাকিতে রাখল। শশী-বালা এই চিঁড়া দেখলে খুশী হবে। যাবার সময় এক খোলা চিঁড়া ওর আঁচলে ঢেলে দেবে।

ধনবৌ বলল, তর নাকি আবার বিয়া বসনের শখ হৈছে।

—অঃ আল্লা, এডা এতদিনে জানলেন! কিন্তু পাইতাছি কৈ।

—তর ক্ষমতা আছে জুটি!

—কি যে কন আপনেরা। সরমের কথা আর কৈয়েন না। এডা গতরের কথা। আপনের-অ আছে, আমার-অ আছে। আপনে সুখ পন কথা কন না, কর্তা আসে যায়। আমার মানুষ নাই, মানুষ আসে না যায় না। সুখ পাইনা, কথা কই। এইসব বলে জোটন চিঁড়া কুটতে থাকল ফের, ওর মুখে একরকমের শব্দ; শব্দটা কোড়াপাখির ডাকের মত। ভাদ্র মাস বলেই এত গরম এবং তালের পিঠা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি—তার গন্ধ গ্রামময়। মাঠময়। হারান চন্দের বৌ

ধান খোলাতে ভাজছে, শুকনো কাঠ গ‍ুঁজে দিচ্ছেন শশীবালা। সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। জোটন একটু জল চাইল। বড় বৌ জল আনতে গেছে কুয়াতে। আর এ-সময় জাম গাছে একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ডাকল। দু' ধারে বস্তা পাতার সময় সে চোখ তুলে দেখল—গাছে পাখিটা ডাকছে। সে বলল, ধনমামী গাছে ইষ্টিকুটুম পাখি। মেমান আসব।

রান্নাঘরে পবন কর্তার বৌ, তার ছেলে-পেলে, সবাই বেড়াতে এসেছে। শশীবালা এই বর্ষাকালটা সব নায়রীদের জন্য যেন প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। ধনবৌ তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বড়বৌকে সারাদিন হেঁসেলে পড়ে থাকতে হয়। মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিল আর কি—আর কুটুম না। কিন্তু ঘরে পবন কর্তার বৌ। সে বলতে পারল না, পাখিটারে উড়াইয়া দে জুটি। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। দিন-রাইত নাই, আইতাছে যাইতাছে। অথচ বুড়ো ঠাকুরুন শশীবালার বড় শখ কুটুমের। কোন্ কুটুম কোন্ জিনিস খেতে পছন্দ করেন—শশীবালার সব মুখস্ত।

এ-সময় মেঘনা পদ্মাতে ইলিশের ঝাঁক উঠে আসবে। জোটন জানত, এ-সময় ঠাকুরুন কুটুমের জন্য ভাল-মন্দ খাবার অথবা নাইয়র নাইয়রীরা ঘুরে বেড়াবে ঘরময়, উঠোনময়, উঠোনময় শিশুদের কোলাহল, ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা—এইসব দৃশ্য, আর জোটন তখন দেখল হারান পাল নৌকা থেকে এক গণ্ডা ইলিশ নামাচ্ছে। বড় বড় ইলিশ—রূপোর মত উজ্জ্বল রঙ অবেলার রোদে চিকচিক করছিল। জোটন ইলিশমাছগুলো দেখে চোখ নামাতে পারছে না।

ওর ইলিশমাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা—খুব করুণ অথবা রহস্যময় মনে হয়—যেন কতদিন এইসব মাছের স্বাদ ভুলে গেছে জোটন। শশীবালা এসব লক্ষ্য করে বললেন, রাইতে খাইয়া যাইস জুটি। জুটির চোখদুটো কেমন সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, ঠাইনদি, মাছগুলির প্যাটে ডিম হৈব মনে হয়।

—তরে ডিম ভাজা দিতে কমু।

সে আর কি বলবে ভেবে পেল না। একমনে আবার চিঁড়া কুটতে থাকল। সেই কোড়াপাখির ডাকটা ওর ভিতর থেকে এখনও উঠছে। ওর পরনের শতচ্ছিন্ন শাড়িটা এতক্ষণে শুকিয়ে উঠছে। বড়বৌ জোটনকে এক খোলা চিঁড়া দিল খেতে. সে খেল না। আঁচলে পোটলা বেঁধে নিল। পল্টু এনে কাঁটা কাঁচা সুপারি দিল। আঁচলে তা বেঁধে নিল। রাত হয়ে যাচ্ছিল অনেক। সে কলাপাতা ধুয়ে বসে থাকল—রান্না হলেই সে খেতে পাবে।

জোটন খেতে বসে, বেশ করে খেল। চেটেপুটে খেল। বড় যত্নের সঙ্গে ভাতক'টি খেল। বেগুনের সঙ্গে ইলিশমাছের স্বাদ এবং আউশ ধানের মোটা ভাত জোটনকে এই পরিবারের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অভিভূত করছে। বুড়ো ঠাকুরুন, বড়বৌ, ধনবৌর সকলের উদারতা যেন এই পরিবারের পাগল ঠাকুরের মত। এই ভোজনের সঙ্গে রাতের জ্যোৎস্না এবং এক পাগল মানুষের অস্তিত্ব, বুড়ো কর্তার সাত্ত্বিক ধারণা, ভূপেন্দ্রনাথের সততা সব মিলে জোটনকে নিঃসঙ্গ সুখ দিচ্ছে। আর কতকালের মেমান যেন এইসব পরিবার। সে বড়বৌকে উদ্দেশ্য করে বলল, মামীগ অনেকদিন পরে দুইডা প্যাট ভইরা ভাত খাইলাম। এই খাওয়নের কথা ভুলতে পারি না।

বড়বৌ ওর দুঃখের কথা শুনে বলল, তুই যে বললি কোন্ দরগার এক ফকির-সাব তোকে নিকা করতে চায়!

—কী যে কন মামী! খোয়াবত কত দ্যাখলাম গ মামী। কিন্তু রসুলের মর্জি না হৈলে আপনে আমি কি করমু!

—কেন আবেদালি যে বলে গেল ফকির-সাব এসেছিল।

—আইছিল। প্যাট ভইরা ভাত গেল-ছিল। গিল্যা আমারে কয় কি, আপনে

থাকেন, আমি কোরবান শেখের সিম্নাতে যাম্‌। ফিরনের সময় আপনারে লইয়া ফিরমু। এই যইল্দা নির্বৈংশায় অ ইজ-অ গ্যাছে, কাইল-অ গ্যাছে মামী।

—যখন বলে গেছে তখন ঠিকই আসবে।

জোটন আর কোন কথা বলল না। সে কলাপাতায় সব এ'টোকাটা তুলে জাম-গাছের অন্ধকার অতিক্রম করে বড়ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল। গন্ধপাদালের ঝোপ ছাড়িয়ে সে তার এ'টোকাটা নিক্ষেপ করল। জ্যোৎস্না রাত বলে এই ঝোপ-জংগল, দূরের মাঠ, সবুজ ধানখেতের অস্পষ্ট ছবি তার ভাল লাগে। সে হিসাব করে বুঝল প্রায় দু'সাল হবে গতর আল্লার মাশুলে তুলছে না। বিশেষ করে এই রাত এবং ঝোপজংগলের ইতস্ততঃ অন্ধকারের ছবি, অথবা আকণ্ঠ ভোজনে এক তীক্ষ্ণ ইচ্ছা জোটনকে কেমন কাতর করছে। ফকির-সাবকে এ-সময় বড় বেশি মনে পড়ছিল।

সে বড় মামীর কাছ থেকে একটা পান চেয়ে নিল। কাঁচা সুপারি একটা আস্ত চিবোতে চিবোতে বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। এক মন্ত্রবৎ ইচ্ছাশক্তি এই বাগানের ভিতর ওকে কিছুক্ষণ রেখে দিল—যদি একটা পাকা সুপারি গাছ থেকে টুপ্—এই শব্দ ঘাসের ভিতর, সে কান খাড়া করে রাখল—কোথায় টুপ্ এই শব্দ জেগে উঠবে—কখন বাদুড়েরা উড়ে আসবে। কিন্তু একটা বাদুড় উড়ে এল না। টুপ শব্দ হল না। শুধু কাঁচা সুপারির রসে মাথাটা কেমন ভারী ভারী, নেশার মত মনে হল। সে এখন জলে নেমে যাবে। সাঁতার কেটে গ্রামে উঠে যেতে হবে। জ্যোৎস্না রাত। জলে সাদা জ্যোৎস্না এবং জোটন জলে নেমে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে সে কাপড় হাঁটুর উপর তুলে ফেলল। যত জলে নেমে যেতে লাগল, তত সে কাপড় ক্রমে উপরে তুলে তুলে এক সময় কোমরের কাছে নিয়ে এল। না, জল কেবল বাড়ছে। সে কাপড় খুলে মাথার উপর তুলে একটা গোসাপের মত জলে ভেসে পড়ল। এক কাপড় জোটনের। ভিজা কাপড়ে রাত্রিবাস বড় কষ্টের।

ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জোটন দেখল নরেন দাসের বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছে। পুবের ঘরে কোন তাঁতের শব্দ হচ্ছে না। অমূল্য ওদের তাঁত চালায়। অমূল্য বাড়ি গেলে তাঁত বন্ধ থাকে। তাছাড়া সুতো পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। তার জন্যও নরেন দাস রাতে তাঁত বন্ধ করে রাখতে পারে। এখন আর জোটন নলী ভরতে পারছে না। জোটন অনেক কষ্টে একটা চরকা কিনে যখন বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছিল, যখন ভাবল হিন্দু বাড়ির বৌদের মত ছোট একটা কাঁসার থালা কিনে বড়লোক হবে এবং যখন সুতার মোড়া দু' পয়সা থেকে চার পয়সা হয়ে গেল এবং একজন ফকিরকে পোষার ক্ষমতা হচ্ছে তখন কিনা—বাজারে সুতো পাওয়া যাচ্ছে না।

জোটন জল কাটছিল। দু'হাতে ব্যাঙের মত জলের উপর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। হাত-পা জলের ভিতর ফুটকরি তুলছে। এই গরমে জলের ঠাণ্ডাটুকু, আকাশের স্বাচ্ছন্দ্য-টুকু এবং পুব দিকের বড় চান্দের হাসি জোটনের ভিতর কতদিন পর মাশুলে তুলতে বলছে। আকণ্ঠ খেয়ে শরীরে এখন কত রকমের শখ জাগছে। দূরের মাঠে একটা আলোর ফুলকি। সামনে সব পাটের জমি। পাট কাটা হয়ে গেছে—জল স্বচ্ছ। হাওয়ায় জল থৈ থৈ করছে চারিদিকে। স্বচ্ছ জলে জোটন শরীরের উত্তাপ ঢালছিল—যেন কতকাল গাজীর গীদের বায়নদারের মত সূর্যের উত্তাপ না পেয়ে অবসন্ন। সে এ-সময় একমুখ জল নিয়ে আকাশমুখো ছুঁড়ে দিল। বলল, আল্লা, তর দুনিয়ায় আমার কি কামড়া থাকল কদিন!

আকাশে আলো রয়েছে। জলে শাপলা-শালুক রয়েছে আর মাঠ শেষে আম-জামের ছায়া প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে—এই দেখতে ভাল। শাপলা ফুলের মত সে জল থেকে মুখটা তুলে দুটো মান্দার গাছ অতিক্রম করতেই দেখল, গোপাটের বটগাছটার নিচে একটা হ্যারিকেন এবং নৌকার ছায়া। একটা মানুষেরও যেন। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর হারিয়ে যাবার জন্য ঘাসের বনে শরীর ঢেকে দিল। কিন্তু পালাবার সময় জলে শব্দ। বুঝি একটা মাছ পালাচ্ছে। অথবা বড়শীতে, বোয়ালের বড়শীতে বড় বোয়াল মাছ আটকে গেছে, মানুষটা নৌকা নিয়ে মাছের খোঁজে এসে দেখল কে এক মানুষের মত ঝোপে-জঙ্গলে জলের ভিতর ভেসে যাচ্ছে। জোটন তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে ঘাসের বনে শরীর লুকাতে চাইল—কিন্তু পারল না। ওর মুখের কাছে লণ্ঠন তুলে মনজুর বলছে তখন, জোটন তুই!

জোটন শরমে চোখ বুজে ফেলল। চোখ বুজেই বলল, হ আমি।

—কৈ গ্যাছিলি?

—গ্যাছিলাম ঠাকুরবাড়ি। পথ ছাড় যাই।

মনজুর জলের ভিতর ওর অবস্থা বুঝে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে মুখ ফেরাল না। অথচ বলল, আমি ভাবলাম বুঝি বড় একটা মাছ বড়শীতে ধরা পড়ছে।

—আর কিছু ভাবস নাই।

—আর কি ভাবমু। বলে সে নৌকটার উপর বসল।

—ক্যান অন্য কিছু ভাবন যায় না। তুই ইদিকে ক্যান! বলে জোটন চোখ খুলল। কথাবার্তায় যেন সব সংকোচ কেটে গেছে। দেখল মনজুর খালি গায়ে। পরনে অত্যন্ত মিহি গামছা। তাও জলে ভিজে খানিকটা উপরে উঠে গেছে। মনজুর কিছুতেই জোটনের দিকে তাকাচ্ছে না। জোটনের ভারি হাসি পেল। তর ত মালা পয়সা। একটা বড় গামছা কিনতে পারস না।

মনজুর বলল, তুই যা দিনি।

—যামু না ত, কি করবি। জোটনের ভিতরের ইচ্ছাটা বড় চাড়া দিচ্ছে।

—কি আবার করমু! সে তার এই উপস্থিতির জন্য অজুহাত দেখাল। বলল, হাইজাদি গ্যাছিলাম। অষুধ আনতে। ফিরতে রাইত হৈয়া গ্যাল। গোপাটে আইছি বড়শীতে মাছ লাগছে কিনা দ্যাখতে। আইয়া দ্যাখি তর এই কাণ্ড। জ্যোসনা রাইতে জায়গাটারে আমধাই'র কইরা আছস। তর লগে দ্যাখা হৈব জানলে তফন পইরা আইতাম।

মনজুর জোটনের সমবয়সী। কিছু-কিছু শিশু বয়সের ঘটনা উভয়ে এ-সময় স্মরণ করতে পারল। একদা শৈশবে এইসব পাটখেতের আলে-আলে ওরা ঘুরে বেড়িয়েছে। জোটন সেইসব স্মৃতির কথা স্মরণ করতে চাইল অথচ সংকোচবোধে উভয়ে কিছু পরস্পর বলতে পারছে না। দু সালের অধিক এই শরীর জনলে-জনলে খাঁ-খাঁ করছে। জোটন কাতর গলায় বলল, পথ দে। যাই।

—তরে ধইরা রাখছি আমি।

জোটন এই জল দেখে, রাতের জ্যোৎস্না দেখে এবং আকণ্ঠ ভোজনে কি যে তৃপ্ত শরীরে—জোটন কিছুতেই নৌকা অতিক্রম করে সাঁতার কাটতে পারল না। শরীর ওর ক্রমে কেমন জলের উপর ভেসে উঠছিল। জলের উপর ব্যাঙের মত যেন
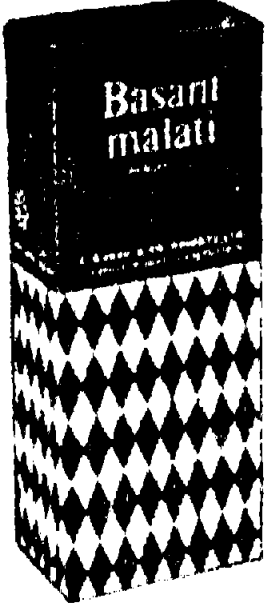
একটা সোনালি ব্যাঙ জোনাকি খাবার জন্য জলে ভেসে হাঁ করে আছে। মনজুর কোন কথা বলছে না দেখে সেই বলল, আসমানের চান্দের লাখান তর মুখখান। কিন্তু দেইখা ত অখনে মনে হয় আমাবস্যার আনধাইর রাইত। য্যান শুকাইয়া গ্যাছে।

—শুকাইয়া গ্যাছে। তরে কইছে।

মনজুর ওর রুগ্ন বিবির মুখটা স্মরণে এনে কিঞ্চিত বিব্রত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন বিবির রুগ্ন শরীর ওর গরম কলজের ভিতর জল ছিটাতে পারে নি। শুধু মনজুর জ্বলছে, জ্বলছে। একটা, সাদির যে সখ ছিল না—তা নয়, তবু মনজুর বিবিকে যথার্থই ভালবাসে। মনজুর অনেক কষ্টে যেন বলল, পারবি আনধাইর রাইত আলো করতে! এবং মনজুর মুখ ফেরাতেই আবার শরীরটাকে জলের ভিতর জোটন ডুবিয়ে দিল। সামনে-পিছনে জলজ ঘাস। বেশ আব্রু সৃষ্টি করেছে। জোটন এই জলজ ঘাসের ভিতর মনজুরকে নিয়ে ডুব দিতে চাইল। আর মনজুর সহ্য করতে না পেরে দু হাতে যেন একটা মরা মাছ নৌকায় তুলে আনছে—টানতে-টানতে নৌকার পাটাতনে তুলে ফেলল।

কিছুক্ষণ পর পাটখেতের ফাঁক দিয়ে কেমন একটা কান্নার শব্দ গ্রাম থেকে ভেসে আসতে থাকল। জোটন শুনতে পাচ্ছে, মনজুর শুনতে পাচ্ছে। নৌকার উপর কিছু পোকা উড়ছিল। ধানের জমিতে চাঁদের আলো বড় মায়াময়। সুখ অথবা আনন্দ এই পাটাতনে এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। সব দুঃখ ভেসে যাচ্ছিল জলে, সব উত্তাপ চাঁদের আলোর মত গলে-গলে পড়ছে। ইচ্ছার সংসারে মনজুর পুতুল সেজে বিবির মরা মুখ দেখতে দেখতে বলল, ক্যাডা ক্যান্দেল।

—মনে হয় তগ বাড়ি থাইক্যা আইত্যাছে।

—তবে বিবিডা বুঝি গ্যাল।

জোটন দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত মনজরের মুখ। সব উত্তাপ এখানে ঢেলে দিয়ে মনজুর হাউ-হাউ করে কাঁদছে আর নৌকোটা বাইছে।

কুকুরটাকে ফেলে দিয়ে গেছে কারা। জলের ভিতর ফেলে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কুকুরটা আপ্রাণ বাঁচার জন্য জলে সাঁতার কাটছে। কোনরকমে নাকটা জাগিয়ে রেখেছে জলে। তারপর মনে হল টানমত জায়গা। কুকুরটা সামান্য উঠে দাঁড়াল। না, দূরে কোন গ্রাম দেখা যাচ্ছে না। হতাশায় চোখ-মুখ উদ্‌বিগ্ন। শেষ বর্ষা এখন। জল, ধানখেত থেকে পাটখেত থেকে নেমে যাচ্ছে।

পাগল ঠাকুর তখন নৌকোটাকে আলে-আলে টেনে নিচ্ছিলেন। সারা পাটাতনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন। ধানগাছ হেলে পড়েছে। শ্রাবণ-ভাদ্রের সেই স্বচ্ছ ভাবটুকু আর নেই। জল ঘোলা। জলে পচা গন্ধ উঠছে। দুধারে কাদা জল, শামুক পচা দুর্গন্ধময় জলজ ঘাস। নৌকোটাকে সরকার-দের জমিতে ঢুকিয়ে দিতেই মনে হল একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে উদ্বিগ্ন চেহারা। কুকুরটা পাগল ঠাকুরকে দেখে বলল, ঘেউ।

পাগল ঠাকুর দাঁড়ালেন। তারপর পুরোনো কায়দায় হাত কচলে বললেন, গ্যাৎ চোরেৎ শালা।

কুকুরটা ফের বলল, ঘেউ!

পাগল ঠাকুর বললেন, গ্যাৎ চোরেত শালা।

জল কম বলেই আলের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে কুকুরটা। একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়ার মত জায়গা করে দিয়েছে। কুকুরের এই ভদ্রতাবোধটুকু পাগল ঠাকুরের খুব ভাল লাগল। তিনি আর তাকে মন্দ কথা বললেন না। তিনি পাশ কাটিয়ে নৌকো টেনে নেবার সময়ই কি মনে হতে পেছনে তাকালেন— কুকুরটা অবোধ বালকের মত তাকিয়ে আছে। তিনি এবার আদর করার ভঙ্গীতে মুখে এক ধরনের শব্দ করতেই, জলের ভিতর ছপ-ছপ শব্দ তুলে কুকুরটা পাশে এসে দাঁড়াল। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কুকুরটার মুখে চুমু খেলেন এবং নৌকোয় তুলে বললেন, গ্যাৎ চোরেত শালা।

কুকুরটা পাটাতনের এক পাশে দাঁড়াল। গা ঝাড়ল। তারপর লম্বা হয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জিভটা বের করে রাখল কিছু-ক্ষণের জন্য। পাগল ঠাকুর এবং সোনাকে দেখতে দেখতে হাঁপাচ্ছে। কুকুরটা লেজ নাড়ছে অনবরত। মণীন্দ্রনাথ তখন লগি মারছেন।

মণীন্দ্রনাথ শালুকের ফল তুলে খেলেন। ফল ভেঙে সোনাকে খেতে দিলেন। সোনা শক্ত জিনিস এখনও খেতে পারে না। সে খেতে গিয়ে বিষম খেল। ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠছে। সে কাঁদছে এখন। তিনি ওকে কোলে নিয়ে একটু আদর করলেন।

দুটো জমি পার হলে হাসান পীরের দরগা। শ্রাবণ মাসে তিনি এখানে ঘুরে গেছেন। তখন পীরের মেলা ছিল, সিন্নি ছিল। গ্রাম মাঠ বেয়ে মানুষেরা এসেছিল এবং মোমবাতি জেলে সওদা করে ঘরে ফিরেছিল। এখন কোন মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। শুধু ভাঙা মসজিদ এবং পীর-সাহেবের কবরের পাঁচিলে কয়েকটা কাক অনবরত উড়ছে, সোনার কিছুতেই কান্না থামছে না। তিনি এক হাতে সোনাকে বুকে নিয়ে অন্য হাতে লগি বাইতে থকলেন। হাসান পীরের নির্জন দরগাতে নৌকো ভিড়িয়ে এক সময় ভিতরে উঠে এলেন।

কাকগুলি পাঁচিলের উপর চিৎকার করছে। পীরসাহেবের কবরের পাশে পলাশ গাছটা এখনও তেমনি আছে। পাগল মানুষটাকে দেখে কাকগুলি পলাশ গাছটার উপর এসে বসল। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দূরের মাইনর স্কুলটা দেখা যাচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ হেঁটে-হেঁটে একদা এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে আসতেন।

ভিটেমাটির মত এই জমিটা উঁচু। কয়েকটা আমগাছ, কিছু পাখপাখালি, বেত ঝোপ, কাঁকড়া, সাপ এবং মোত্রাঘাসের জঙ্গল নিয়ে পীরসাহেব কবরের নিচে ঘুমোচ্ছেন। বর্ষাকালের জল পর্যন্ত পীরসাহেবকে ছুঁতে পারে না। তখন অদূরের নদী-নালার কচ্ছপেরা পর্যন্ত নরম মাটির খোঁজে পীর-সাহেবের কাছে চলে আসত। ডিম পাড়ার জন্য আশ্রয় চায়, ডিমে তা দেবার জন্য আশ্রয় চায়। অঘ্রান মাস, বেলা পড়তে দেরী নেই। সোনা তখনও কাঁদছিল। কুকুরটা ওদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। কবরখানায় দুটো-একটা পাতা ঝরে পড়ল। হেমন্তের শীত-শীত ভাবটা সকল ঘাস পাখি এবং পীরসাহেবের পাঁচিলের গায়ে জড়িয়ে আছে। পাঁচিলের নিচে কত রকমের গর্ত। কবরের বেদী থেকে ভাঙা কাঁচ উঠে এসেছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনাকে কোলে নিয়ে এই পাঁচিলের চারদিকে ঘুরতে থাকলেন। কাক-গুলো নির্জন নিঃসঙ্গ দরগায় সহসা মানুষ দেখে কেমন ক্ষেপে গেল। ওরা মণীন্দ্রনাথের মাথার উপর ঘুরে-ঘুরে উড়তে থাকল। কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীরসাহেবের দরগাতে এসেছেন, কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীর-সাহেবকে গলায় দড়ি দিয়ে মারার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন।

সোনা এখন আর কাঁদছে না। পাগল ঠাকুর সোনাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন। কুকুরটা এতক্ষণ পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। মণীন্দ্রনাথ সোনাকে রেখে একটু হেঁটে গেলেন সামনে। কুকুরটা সোনার পাশে বসে থাকল। এতটুকু নড়ল না। ঘাসের উপর শুয়ে সোনা হাত-পা ছড়িয়ে এখন খেলছে। মণীন্দ্রনাথ যেন কোথায় যাচ্ছেন। তিনি পাঁচিলের দরজা টপকে ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং বললেন, গ্যাৎ চোরেত শালা। যেন বলতে চাইলেন

পীরসাহেব তোমার দরগাতে মেলা বসেছে, তুমি হিন্দু-মুসলমান সকল মানুষের পীর, তুমি গলায় দড়ি দিলে কেন, বলে বেদীটার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং একটা শুকনো ডাল এ-সময় পাঁচিলের অন্য পাশে ভেঙে পড়ায় তিনি দেখলেন, ছাতিম গাছের মগডালে কিছু শকুন বাসা বেঁধেছে।

পাগল মানুষ বললেন, গ্যাৎ চোরেত শালা। বলার ইচ্ছা যেন পীরসাহেব ভিতরে আছেন? তিনি বেদীটার পাশে বসলেন এবং কান পাতলেন মাটিতে — পীরসাহেবের মুখটা মনে করতে পারছেন, বুড়ো অথর্ব তখন পীরসাহেব। মণীন্দ্রনাথ দূরের বিদ্যালয় থেকে পাঠ নিয়ে ফেরার পথে এই দরগায় এসে পীরসাহেবের দাড়ি-গোঁফ-বিহীন মুখটা দেখতেন। এবং সেই পীরসাহেব একদিন কেন যে রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে ছাতিম গাছটায় ঝুলে থাকলেন! হায়, ঈশ্বর জানেন এমন মানুষ হয় না এবং বাঁচতে ছিল পীরসাহেবের আহারের প্রয়োজন হত না। পীরসাহেবের হুঁকো-কলকে কোমরে বাঁধা থাকত। তিনি এই দরগার চারপাশে ঘুরতেন শুধু এবং রাত্রের অন্ধকারে যখন দূরে-দূরে শুধু ইতস্তত গয়না নৌকার আলো, দূরে-দূরে সব গ্রাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তিনি শাক-পাতা অথবা পুরানো ছাতিম গাছের ডাল বেয়ে উঠে শকুনের ডিম অন্বেষণ করতেন, কচ্ছপেরা এই দরগাতে অথবা খালের ধারে হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথমে ডিম পেড়ে রেখে যেত—তাও অন্বেষণ করে ঘরে তুলে রাখতেন।

এখন আর সে সব শাক-পাতার গাছ এই দরগাতে নেই। হেজে মজে গেছে। বর্ষাকাল গেছে বলেই দরগার চার ধারে নানা রকমের আগাছার জঙ্গল—কিছু ঘাসের ঝোপ। নরম ঘাসে সোনা ঘুমোচ্ছে—এই সময় সোনার কথা মনে হওয়ায় তিনি পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন একবার, দেখলেন সোনা ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কুকুরটাও পাহারায় আছে তখন তিনি চলে এলেন। পাঁচিলটার ভিতরের দিকে প্রচুর জায়গা। বড় বড় গর্ত, কবর থেকে যেন একনা খুলে কারা মানুষ তুলে নিয়ে গেছে। বড় বড় শান পড়ে আছে। শান দিয়ে ঢেকে দিলেই একটা মানুষ গায়েব। কেউ জানবে না শানের নিচে একটা মানুষ আটকা পড়েছে। প্রচুর জায়গা দেখে, ঘর করে এখন কেমন এই দরগায় বসবাসের ইচ্ছা মণীন্দ্রনাথের। মেলার সময় যেখানে মোমবাতি জেলে দেওয়া হয়, পীরসাহেবের নামে সিন্নি চড়ানো হয় সেই জায়গাটুকু শুধু পরিষ্কার। সেই জায়গাটুকুতে দুর্বো-ঘাস এবং সেই জায়গাটুকুতেই একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, ভাঙা হাঁড়ি কলসী ছিল, কিছু দ্রব্যগুণ ছিল পীরসাহেবের—যার দৌলতে হাসান চোর ফকির হল এবং এক সময় পীর বনে গেল। মালা তাবিজ, নানা রকমের হাড় সংগ্রহের বাতিক ছিল হাসানের। গোর দেবার সময় সবই ওর কবরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লম্বা বেদির উপর শকুনেরা শুধু হাগছেই। কাক এবং অন্য পাখ-পাখালি—যেমন শালিখের কথাই ধরা যাক বড় বেশি ভিড় করছে এই দরগাতে। আর এই হাসান পীরই বলেছিল, তর যা চক্ষু মণি, চক্ষুতে কয় তুই পাগল হইনা যাবি।

—কি যে কন পীরসাহেব।

—আমি ঠিক কথাই কই ঠাকুর। তর সব লিখাপড়া মিছা। পীর-পয়গম্বর হৈতে হৈলে তর মত চক্ষু লাগে, তর মত শরীর মুখ লাগে। তর মত চক্ষু না থাকলে পাগল হওয়ন যায় না, পাগল করণ যায় না।

আর ফোর্ট-উইলিয়ামের রেমপার্টে বসে পলিন বলত, তোমার চোখ বড় গভীর, বড় বিষণ্ণ মণি। ইউর আইজ আর গ্লুমি। অথবা বোটানিকেলের পুরোনো ছায়ায় পলিন ববকাটা চুলে বিলি কেটে মিহি ইংরাজীতে উচ্চারণ করত, এস আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে কীটসের কবিতা আবৃত্তি করি। 'দেয়রস নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইন্ড বাট ওনলি, ওনলি দি। তখন দূরের নারকেল গাছ অথবা গঙ্গাবক্ষে জাহাজের বাঁশি এবং সমুদ্র থেকে আগত সব পাখিদের পাখার শব্দ উভয়কে অন্যমনস্ক করত। ওরা তখন পরস্পর নিবিষ্টভাবে পরস্পরকে দেখত। কবিতা উচ্চারণের পর পাখির পালকের মত উভয়ে হাল্কা এক বিষণ্ণতায় ডুবে থেকে কথা বলত না।

পলিন বলত, চলো এইসব জাহাজে উঠে আমরা অন্য কোন সমুদ্রে চলে যাই।

মণীন্দ্রনাথ এই দরগায় বসে সেইসব স্মৃতিতে এখন উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। তার ইচ্ছার ঘরে পলিন...১৯২৫-২৬ সাল, পলিন তখন তরুণী, প্রথম মহাযুদ্ধে পলিনের দাদার মৃত্যু এবং সেই পরিবারে কোন রাতের আঁধারে মোমবাতির সামনে [illegible] হাঁটু গেড়ে পলিনের বসে থাকা—কি সব স্মৃতি যেন বারবার মাথার ভিতর ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। মণীন্দ্রনাথ কিছু মনে করতে পারে না। তার এখন কেবল ভালমানুষের মত কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল এই দরগার মালিক হাসান পীরকে বলতে, আবার সেখানে ফিরে যেতে পারি না পীর-সাহেব। অথচ কথা বলার সময় সেই এক উচ্চারণ। আর এ-সময় পাখিরা উড়তে থাকল। হেমন্তের রোদ নেমে গেছে। বর্ষার জল এখন জলাজমিতে হাঁটুজলে এসে থেমেছে। ছোট ছোট চাঁদা মাছ, বৈচা মাছ ধানের গুঁড়িতে লেজ নেড়ে নেড়ে শ্যাওলা খাচ্ছে। শীতের এই আমেজ সকল প্রাণী জীবনে অশুভ এক বার্তা বয়ে আনছে। তবু অনেক মোত্রাঘাস পেরিয়ে, অনেক বন-জঙ্গল পেরিয়ে অনেক নদীনালা অতিক্রম করে শুধু সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ, তার সবুজ মাঠ এবং গম্বুজের মাথায় ঝাঁকঝাঁক কবুতর উড়ছে—মণীন্দ্রনাথ দরগার বেদীতে বসে এখন কেবল দুর্গের মাথায় সূর্য দেখছেন। যেন পলিন সেই সূর্যের

আলো এই অবেলায় শীতের মাঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সোনা বসে নেই, অথবা হামাগুড়ি দিয়ে সোনা এগিয়েও যাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুকুরটা বসে রয়েছে। নড়ছে না। ওরও যেন কেমন ঘুম পাচ্ছে। সে চোখ বুজে ছিল। মণীন্দ্রনাথ আরও দেখলেন, হেমন্তের রোদ খুব সরু হয়ে পাঁচিলের গায়ে লেগে আছে। সোনারঙ্গলের মত এই রেখা চিকচিক করছে। মণীন্দ্রনাথ পলাশের ডাল ফাঁক করে আকাশের ভিতর মাথা গুঁজে দিলেন এবং সেই আলোর জল যেখান থেকে ঝরে পড়ছে, তাকে দু' হাতে ধরতে চাইলেন। বড় উঁচু মনে হচ্ছে সেই আধারকে। সুতরাং লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকালেন। তারপর দু'হাত উপরে তুলে সেই আলোর ঘর সূর্যকে ধরার জন্য ছুটতে থাকলেন। অথচ যত এগোচ্ছেন, সূর্য তত ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ঘাস-জঙ্গল পার হলেই দরগার জমি শেষ। তিনি ক্রমশ মাঠে নেমে যেতে থাকলেন, মাঠে হাঁটু জল, জল ভেঙে এগুতে থাকলেন—যেন ঐ যে সূর্য পালিয়ে যাচ্ছে রথে, তিনি সেই রথে এখন উঠে যাবেন এবং অশ্বের বল্গা ধারণ করবেন। তারপর সূর্যকে নিয়ে সেই নিরুদ্দেশে, যেখানে পলিন এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আর তা যদি না হয় এই সূর্যকে এনে অশ্বত্থের ডালে ঝুলিয়ে দেবেন। এই ধরিত্রির সব লাঞ্ছনা দূর করতে, অন্ধকার সরিয়ে দিতে সূর্যকে ধরে আনবেন। অর্থাৎ তিনি যেন ধরিত্রিকে সব কলুষ-কালিমা থেকে রক্ষা করার জন্য অথবা এখানে এক প্রিয় নিদর্শন রাখার জন্য পাগলের মত ধানখেত, শীত, জল এবং খাল-বিল সাঁতরে যখন ট্যাবগার পুকুরপাড়ে উঠলেন তখন দেখলেন সূর্য পলাতকের মত গাছগাছালির অন্য প্রান্তে নেমে গেছে। তিনি সূর্যকে ওপারে বিলের জলে অদৃশ্য হতে দেখে খুব ভেঙে পড়লেন। পরাজিত সৈনিকের মত একটা গাছে হেলান দিয়ে যেন বন্দুকের নল হাতে রেখেছেন এমন ভাবের এক ভঙ্গি টেনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চারপাশে রাতের সব কীটপতঙ্গের আওয়াজ আর তার সঙ্গে অতিদূর থেকে আগত এক শিশুকান্না। তার মাথার ভিতর ফের যন্ত্রণা হতে থাকল। পিছনে যেন কি ফেলে এসেছেন, একেবারেই মনে করতে পারছেন না। এত-দূর থেকে কান্না সেই শিশুর, মনে হয় মাঠময় হাজার শিশু উচ্চরোলে কাঁদছে। তাঁর কিছুই মনে পড়ছে না। কর্দমাক্ত পথে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন। পথটা তার খুবই চেনা। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে, অথচ দূর থেকে আগত শিশু-কান্নার জন্য ব্যথিত হচ্ছিলেন। বিকেলে সোনা যে একা বসে বসে বারান্দায় খেল-ছিল, পাগল-জ্যাঠামশাইর সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কথা বলছিল এবং তিনি যে তাকে আদর করে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হয়েছেন, সকলের অলক্ষ্যে নৌকা নিয়ে—সোনা দ্যাখ—কত জমিন মাঠ, এই মাঠ এবং জমির ভিতর তুমি বড় হবে, এই তোমার জন্মভূমি, মায়ের চেয়ে বড়, ঈশ্বরের চেয়ে সত্য এই ঘাস ফুল মাটি—অথচ এখন কিছুতেই সেসব তিনি মনে করতে পারছেন না—কখন ঘর থেকে বের হয়েছেন, কে, কে তার সঙ্গে ছিল!

কুকুর, সোনা এবং কোষা নৌকাটা দরগার মাটিতে পড়ে থাকল। দরগার মাটিতে হাসান পীরের স্পর্শ ওদের জন্য থাকুক। ছাতিমের ডালে শকুনের আর্তনাদ—এইসব নির্জন নিঃসঙ্গ গ্রামকে ভয় দেখাচ্ছে। আর মণীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরেই দেখলেন—সব মানুষ ছোটাছুটি করছে। মানুষেরা এসে সব জড় হয়েছে। সোনা কি করে উধাও হয়ে গেছে সংসার থেকে। ধনবৌ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, পাগল মানুষ বাড়ি একা ফিরেছেন, কোষা নৌকা আনেননি। ধনবৌ, বড়বৌ সকলেই কাঁদছিল। অন্ধ মানুষ মহেন্দ্রনাথ উঠোনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মণীন্দ্র-নাথ বুঝলেন—বাড়ি থেকে সোনা হারিয়ে গেছে। ওরা সকলে মিলে সোনাকে অন্বেষণ করছে। এবার মণীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সব স্মরণ করতে পারলেন, ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে জলে নেমে গেলেন। হাঁ জল ভেঙে যত এগুতে থাকলেন, ত কুকুরের আর্তনাদ স্পষ্ট হতে থাকল। ত তিনি বলতে চাইলেন যেন—হাসান পী তুই আছিস, তোর দরগা আছে, আমা সোনা তোর কাছে গচ্ছিত আছে। তি অন্ধকার পথে ছুটে চললেন। তিনি জল কাদা ভেঙে ছুটলেন। তিনি ঘেমে যাচ্ছেন কাদা-জলে মুখ-শরীর ভরে যাচ্ছে। তি শুধু এখন কুকুরের ডাক অনুসরণ কে হেঁটে যাচ্ছেন। হাতে কোন লণ্ঠন নেই-কোন পরিচিত শব্দ পাচ্ছেন না। থে থেকে দূরে শেয়ালেরা আর্তনাদ করছে একটা কুকুর কি করে পারবে এত শেয়ালে সঙ্গে। সোনা, সোনারে! কেমন ডাল মানুষের মত মুহূর্তে আবেগভরে ডে ফেললেন। আমি তোকে জঙ্গলে ফে এসেছি। আর কিছু বলতে পারলেন না আলো ছিল না তবু নক্ষত্রের আলো তিনি পথ চিনে নিতে পারছেন। অবশে তিনি আরও কাছে গিয়ে বললেন, গা চোরেত শালা। তিনি জোরে জোরে এক উচ্চারণে ডাকলেন অথচ কুকুরটা কা আসছে না। পাঁচিলের কোন এক গহ থেকে কুকুরটা যেন ডাকছে। তিনি ভিত ঢুকে দেখলেন, সোনা হামাগুড়ি দিচ্ছে অ কাঁদছে। কুকুরটা পাশে পাশে থাকছে অনবরত কান্নায় ভেঙে আসছে গলা। শু গলাতে এখন একটা হিক্কার শব্দ। পাগ মানুষ মণীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সোনাকে বুকে তুলে নিলেন এবং আদর করতে থাকলেন। সোনার হাত মুখ স্পর্শ করে অক্ষত সোনার শরীরের জন্য এ অপার আনন্দ—ধনবৌর মুখ, বাথিত সংসার আর কুকুরটাকে কাছে টেনে এক নতুন সংসার—বারবার তিনি কৃতজ্ঞতায় কুকুরটাকে চুমু খেয়ে কেমন পাগলের মত ছুটে গিয়ে কোষা নৌকাটাতে উঠতেই শুনলেন, এক দল ধূর্ত শেয়াল পাঁচিলের অন্য পাশে হুক্কাহুয়া করছে। তিনি আকাশ এবং দরগার ভাঙা কাচের স্বচ্ছ ভাবকে মথিত করে হেসে উঠলেন। কুকুরকে বললেন, আকাশ দেখো, সোনাকে বললেন, নক্ষত্র দ্যাখো—ঘাস ফড়িং ফুল পাখি দ্যাখো, জন্মভূমি দ্যাখো। তারপর নিজে দেখলেন আকাশের গায়ে লেখা রয়েছে—সোনার মুখ, পলিনের চোখ। কুকুরটা পাটাতনে দাঁড়িয়ে নীরবে লেজ নাড়ছে।

(ক্রমশঃ)

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়! — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

ওরা বোঝে না যে

মনে পড়ে ছেলেবেলায় পাড়ার মাঠে সে যুগের এক বিখ্যাত গায়কের একটি গান শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম। গানের সব কটা লাইন মনে নেই। গুঁড়োগাড়া যা মনের কোণে আজো জমে আছে তারই দু-একটা তখনো খুঁটে এনে গুন-গুন করে ভাজি, বিশেষ করে শেষ-চৈত্রের ঘাম-ঝরা সন্ধ্যায় বা পচা-ভাদ্রের ভেসে যাওয়া কলকাতার পথঘাট যখন রিকশায় চেপে পাড়ি জমাই—ঠুন ঠুন ঠুন... ঘন্টি বাজে...ঝড়-বাদলের রাতে ওরা বোঝে না যে।

সেদিন কেন কেঁদেছিলাম? হয়তো বয়স কম ছিল। মন তখনো মরে যায় নি। তখনো রাস্তায় ভিখারী পয়সা চাইলে, না বলতে বাধত। কিন্তু এখন কলেজ স্ট্রীট থেকে ধর্মতলা বা ভবানীপুর থেকে কালিঘাট যদি কখনো রিকসায় চেপে যাতায়াত করতে হয়, খুব সতর্কভাবে আগেই দর দাম করে নিই। বারো আনা লাগে গা বাবু—ক্লান্ত শীর্ণ শির ওঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে কোন মায়া হয় না। ধমক লাগাই—ভাগ ব্যাটা। বলিস কি রে? বারো আনা! তাহলে আর রিকসায় উঠব কেন, ট্যাকসি নিলেই হয়। শেষ পর্যন্ত রিকসায় উঠি, ভাড়া দিই আট আনা। চলে যাওয়ার সময় করুণ পরিশ্রমে কাতর ঘামে ভেজা মুখটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে—এ বাবু, আউর দশ পয়সা দিজিয়ে। এক কাপ চায়ে...। ততক্ষণে আমি নাগালের বাইরে।

কিন্তু যাকে ছেড়ে এলাম ঐ রাস্তায়, পথের ধুলোয়, পরণে যার নোংরা একটুকরো নেংটি, গায়ে নামী প্রসাধন কোম্পানীর ছাপওয়ালা গেঞ্জি (অভাবে জন্মসূত্রে পাওয়া একমাত্র চর্ম-আবরণী), আর একটা ছেঁড়াখোঁড়া গামছা, সেই রিকসাওয়ালা আমার কাছে একটা আধা-রোমান্টিক গানের কলি হয়ে বেঁচে থাকে মাত্র—অন্য কোন অস্তিত্বই আর নেই। তবু ওরা বাঁচে। হাজার গালাগালি, চোখ রাঙানি, ধমকানি খেয়েও বেঁচে থাকে আমাদের এই শিক্ষিত ভদ্দরলোক সমাজের আনাচে-কানাচে। যেমন বেঁচে আছে রামাশীষ।

বর্ষায় মাঠ-ঘাট সব ভেসে যায় বাবু, গঙ্গায় বাঢ় আসে। সেই বাঢ়ে মজঃফরপুর জেলার চুকসিকন্দর গ্রামও যায় ভেসে। সাত মাস মাঠে জল থাকে, আষাঢ় থেকে পৌষ। খেতি কারবার সব তখন বন্ধ। আড়াই বিঘা জমিন। মাঘ সে জেঠ, পাঁচ মাস কাম করে ধান, মকাই, চানা, গেঁহু, মিরচা, তামাকুল (খৈনী) যা হয় তাতে বাবা মা, বৌ, দু দুটো ছেলে মেয়ে আর হামার, এই ছজনের সনসার চলে না। চলে না বলেই জাতে দুগ্ধ ব্যবসায়ী, পেশায় চাষী রামাশীষ আর তার বাপ পরমেশ্বর রায় গাঁয়ের মহাজনের জমি ভাগে চাষ করে। তাতেও হয় না কিছু। তাই গোঁফের রেখা ফুটতে না ফুটতেই দেশ-গাঁও ছেড়ে রামাশীষ গিয়েছিল তেজপুর, আসামে। রেলের কুলি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছ মাসে তিন-চারশো যা কামাই হোত, নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়িতে পাঠানোর মত হাতে তার থাকত না কিছুই। ভারী ভারী আড়াই মণ তিন মণি সব বোরা ট্রাক থেকে গো-ডাউনে আর গো-ডাউন থেকে লরীতে উঠিয়ে নামিয়ে হাঁপিয়ে যেত। তবু সবদিন খোরাকী জুটত না। খেতে না পেয়ে বুকের হাড় পাঁজরা বেরিয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরতে বাপ বলল—আর গিয়ে কাজ নেই। টাকা যখন পাঠাতে পারিস না আর নিজের খোরাকীও জোটে না তখন আর মিছিমিছি দেশগাঁও ছেড়ে অতদূরে পড়ে থাকার কি দরকার?

রামাশীষ তিন বছর তেজপুরে কাটিয়ে সেই যে ফিরে এল, আর গেল না। পরমেশ্বর শত দারিদ্র্যের মধ্যেও এক কাড়ি টাকা বেয়াইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ভিন গাঁ থেকে জাত কুল মেনে বউ নিয়ে এল ঘরে। মাঠে ফসল নেই কিন্তু ঘর ভরে উঠল মানুষ-ফসলে। দু বছরে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হোল রামাশীষের।

সনসার বড় হয়েছে অথচ আর নে এক পয়সাও। চিন্তায় ভাবনায় পাগল হ ওঠে রামাশীষ। চোখের সামনে দিয়ে কে যায় বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের দিনগুলি পাগল ঝোড়ো হাওয়ার মত। সব জমি জলে তলায়। কিন্তু ডাঙা-জমিনে যে মান গুলো ছাউনীর তলায় মাথা গুঁজে দি কাটায়, তাদের পেটের ক্ষিদে তো আ বানের জলে মেটে না। অথচ চোখে সামনে দেখে কলকাতা থেকে দেশোয়াল ভাইরা মাস মাস কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ম অর্ডারে ভেজ দেয়। ওরা কলকাতায় কা করে। ওদের সনসারে তাই অভাব কম। স দেখে শুনে পাঁচ বছর আগে এক শীতে সকালে, একটা পাঁচহাতি ধুতি, গেঞ্জি একখানা তুষের কম্বল আর লাল গামছ সম্বল করে, জরুর হাতের রুপো বালা জোড়া গাঁয়ের মহাজনের কা বাঁধা রেখে গোটা কয়েক টাকা নি রেলে চেপে রওনা দিল রাম শীষ—সোনা, রুপো বা তেলের খনি সন্ধানে নয়, ভারী আজব শহর কলকাতার যেখানে হাওয়ায় টাকা ভাসে।

কাশীপুর, টালিগঞ্জ, ভবানীপু কালীঘাট সর্বত্র দেশোয়ালী ভাইদের বস্তি রামাশীষ উঠেছিল লিক মারকিটের পাশে বস্তিতে। অফিসে ফ্যাকটরীতে যারা কা করে তাদের পেছনে পেছনে এটুলী পোকা মত লেগে রইল দু মাস। জুটল না কিছু, ধার হয়ে গেল বিস্তর। বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে চাকরী মিলবে। তারা সেখানে অপেক্ষা করছে— কবে ছেলে, কবে স্বামী, কবে বাবা টাকা পাঠাবে? দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের পরবে হেসে উঠবে সনসার।

কোথাও কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রামাশীষ গেল খিদিরপুরে বুধন সর্দারের গদিতে, যদি একটা রিকসা টানার কাজ জোটে আশায়। বহুত বড়া আদমী বুধন সর্দার। কলকাত্তার রাস্তায় রাস্তায় তার সাত আটশো রিকসা রোজ খাটে। এই বড়া শহরে ঐ এক আদমী আছে যার কাছে
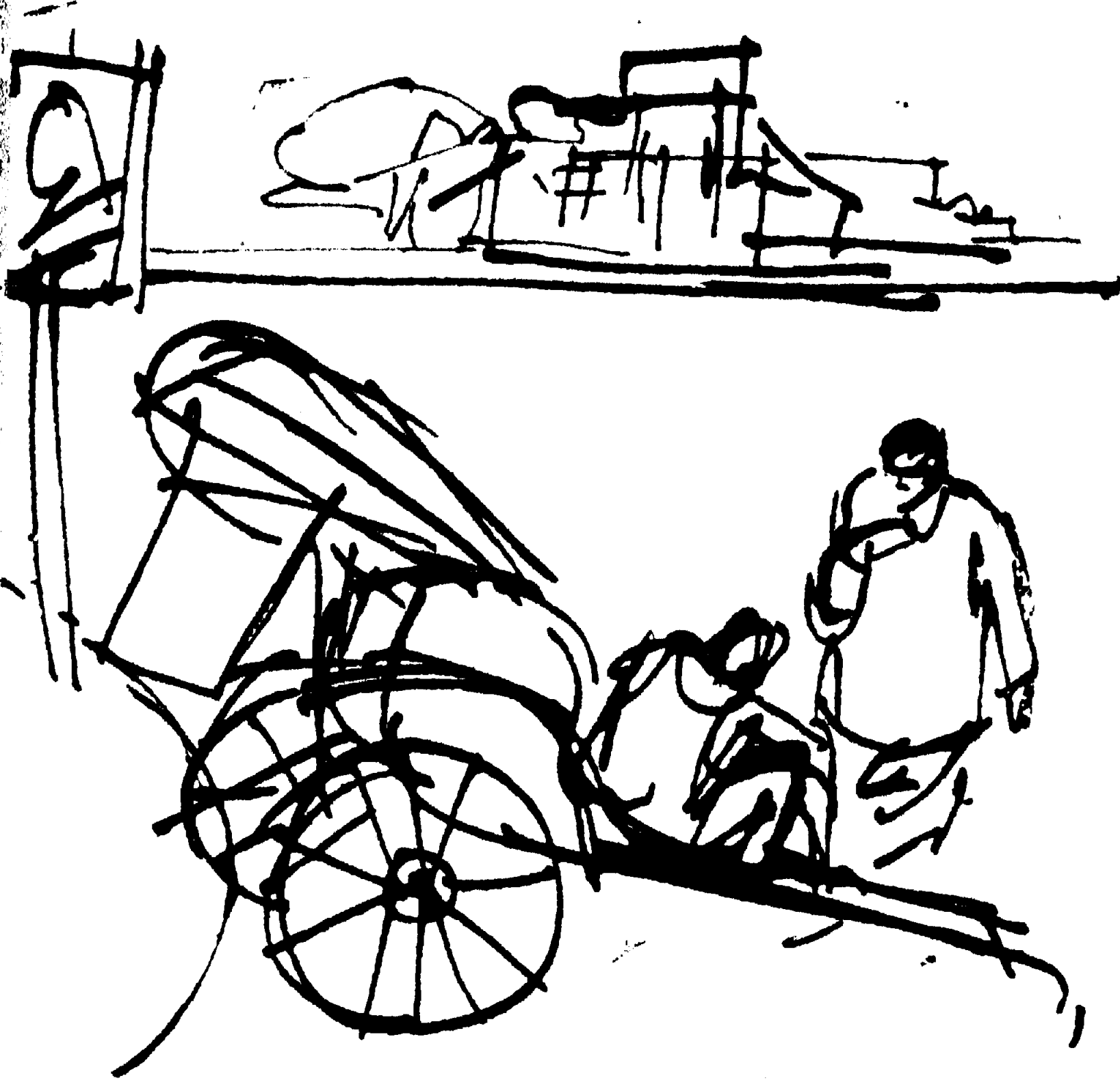
শ কাজ জুটবেই। মুনিমজী এক নজরে শ বছরের ছোকরার শিনা, গর্দান, -পাও সব দেখে নিয়ে বললেন—ঠিক য়, রিকসা মিলেগা। লেকিন...

লেকিন ফোটো-লাইসিন লাগবে। থায় মিলবে? কেন বেলতলায়, মোটর হকলের সদর দপ্তরে। দু-তিনদিন রাঘুরির পর পাঁচশটি টাকার বিনিময়ে ই অমূল্য বস্তুটি যোগাড় হোল। কাতা পুলিশের হ্যাকনি-ক্যারেজ জস্ট্রারের সই করা দলিলটি হাতে নিয়ে মাশীষ আবার গেল বুধন সর্দারের রায়। ফোটো লাইসিন দেখিয়ে একটা কসা পেল।

রিকসা মিলল। লেকিন লম্বরী নেহি—বউ, পেরাইভেট রিকসা। কলকাত্তায় তনা রিকসা ঘুমতা হায়, এর মধ্যে করা চল্লিশ ভাগের নম্বর আছে কি না দহ। অধিকাংশই প্রাইভেট। রিকসা ালানোর লাইসেন্স জোটানো সহজ কিন্তু ড়ির লাইসেন্স যোগাড় করা রীতিমত ঠন ব্যাপার। একটা টানা রিকসার দাম য় তিনশো টাকা। এক একটা চাকার দামই ড়ে তিরিশ, প্যঁত্রিশ টাকা। হাড়-বাখারির মও প্রায় তাই। তিনশো টাকা দামের কসার লাইসেন্স পেতে গেলে প্রায় দুশো টাকা খরচ করতে হবে। ফলে একটা নম্বরী রিকসার দাম পড়ে প্রায় পাঁচশো টাকা।

লম্বরী হলে ঝামেলা কম। দু'টাকা রোজ হিসেবে হপ্তা পিছু চৌদ্দ রুপেয়া মুনিমজীকে (বুধন সর্দার) দিলেই চলবে। আউর যিতনা আয়, উ সব রিকসাওয়ালার। পেরাইভেট হোনেসে হপ্তা রেট কম। দু টাকা রোজের বদলে পান্সিকি অর্থাৎ সপ্তাহ শেষে আট টাকা বারো আনা দিলেই চলবে। মগর ঝামেলা বহুৎ।

নম্বরী গাড়ী শহরের সর্বত্র যেতে পারে। যদি কোথাও পুলিশ ধরে—ইয়ে রিকসা কাঁহাকা হ্যায়? কিস কো গাড়ী? তাহলে বললেই হবে যে—হাম টালিগঞ্জমে (বা শ্যামবাজার বা শেয়ালদা) চালাতে হ্যায়। বুধন সর্দার কা গাড়ী। ব্যস, উ ছোড় দেতা হ্যায়। মুনিমজী প্রতি মাসে নম্বরী গাড়ী পিছু তিশ টাকা জলপানের জন্য মহা-প্রভুদের শ্রীচরণে প্রণামী দেন। সেই প্রণামীর সিকিটা আধুলিটা রক্তের মত ধমনী বেয়ে সারা শহরের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নম্বরী রিকসাওয়ালাদের অবাধগতি। তাই আয়ও বেশী। কিন্তু প্রাইভেটদের বড় মুস্কিল। এক থানার গাড়ী অন্য থানায় গেলেই পুলিশ ধরবে। বে-আইনী কাযকারবারের জন্য আইনের রক্ষকরা তখন দফায় দফায় প্রণামী আদায় করবে। ঐ সেলামীর ভয়েই রামাশীষ তার এলাকার বাইরে যেতে ভরসা পায় না। মুনিমজী প্রাইভেট গাড়ী পিছু লোকাল প্রভুদের পনেরো টাকা করে মাসকাবারী দেন। বাইরে গেলে যদি ধরা পড়ে, যদি ফাইন হয়, সে টাকা মুনিমজী দেবেন না। দিতে হবে রামাশীষকে। তাই ওর আয় বড় কম।

কত আয় রামাশীষের? রিকসা কা ভি রেট হ্যায়। রেট বড় কড়া। স্পষ্ট করে আইনে লেখা আছে—ভইসা গাড়ীকা পিছে পিছে চলো ঔর মাইলমে আট আনা লেও। বলুন বাবু এই রেটে কি করে বাঁচব? আমি পেরাইভেট আছি। হপ্তাপিছু আট রুপেয়া বারো আনা মুনিমজীকে জমা দিতে হোয়। অর্থাৎ মাস গেলে তেত্রিশ টাকা। আড়াই রুপেয়ার কম খোরাকীতে এই শহরে বাঁচনা বহুৎ মুস্কিল। উসি লিয়ে সত্তর রুপেয়া খোরাকী পড়ে রামাশীষের। ঘর ভাড়া দু টাকা। আট দশ জন রিকসাওয়ালা মেসে কুড়ি বাইশ টাকায় বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া নেয়। সেই অন্ধ বন্ধ খুপরীতে কোনরকমে খানা পাকানোর কাজ চলে, শোওয়া বসা অসম্ভব। রামাশীষ গোটা শীত আর গরম কাটায় সিনেমা হলের গাড়িবারান্দায় শুয়ে বা নিজের রিকসার পাদানিতে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে। বর্ষার ছ' মাস বড় কষ্ট। বাবুদের বড় বড় মকানের সিঁড়ির একধারে রিকসার গদি পেতে ফেলে আসা গঙ্গাপারের গাঁয়ের ঘরে ঝম ঝম করে মল বাজিয়ে যে মানুষটা চলে ফিরে বেড়ায় তার স্বপ্ন দেখে রাত কাটায়। রাত কাটানোরই বা আছে কি? সকাল সাতটা থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত যে ঘণ্টি বাজিয়ে সওয়ারীদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেয়, তার নিজের কোন বাড়ী নেই।

শহরে না থাকলেও দেশে তো আছে। সেখানে তো টাকা ভেজতে হবে। তাই জান-প্রাণের মায়া না করে পাগলের মত পরিশ্রম করে রামাশীষ। বেশী খাটুনী হয় বর্ষায়। হাঁটু ছাড়িয়ে কোমরে উঠে আসে জলের জোয়ার। ঠাণ্ডায় হাত পা কালিয়ে যায়। তবু রামাশীষ চায় এই শহরে সারা বছর বরষা নামুক। যে বর্ষা তাকে ঘর ছাড়া করেছে সেই বর্ষাই তাকে আবার দুমুঠো অন্নের সুযোগ দিয়েছে এনে। ঐ বর্ষার কটা মাস—শাওন, ভাদর আউর আশিন—তবু দুটো পয়সার মুখ দেখে। নীল টুপিপরা কম অত্যাচার করে। কারণ তখন রাস্তায় কুকুরই থাকে না তো তারা থাকবে কি। সব খরচ খরচা বাদ দিয়েও মাস মাস তিশ চাল্লিশ রুপেয়া ঘরে পাঠায় রামাশীষ।

যে রামাশীষ এত কষ্ট করে দু পয়সা কামায়, সমস্ত খরচ মিটিয়েও ত্রিশ চল্লিশ টাকা ঘরে পাঠায় সে কেন নিজে রিকসা করে না? তাহলে তো তাকে আর মুনিমজীকে 'হপ্তা' দিতে হোত না। যা আর সবই হোত

তার নিজস্ব। ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায়, মগর হোগা ক্যায়সা? এটা ঠিক যে দশ মাস ঘরে টাকা না পাঠালে সে একটা গাড়ী কিনতে পারে—হতে পারে গাড়ীর মালিক। কিন্তু তা করতে গেলে যে দেশের সব জমি জায়গা বেহাত হয়ে যাবে। বাবা, মা, বৌ, ছেলেমেয়ে খেতে না পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় যখন জমি-জায়গা, বসত-ভিটে বেচে দেবে তখন? তখন তারা থাকবে কোথায়? খাবে কি?

তবু হয়তো ধারকর্জ করে গাড়ী একটা রামাশীষ করতে পারে। হ্যাঁ একটা লম্বরী গাড়ী। কিন্তু বাঁচাতে পারবে না যে গাড়ীটাকে। কেন? ইয়ে তো সিধা হিসাব। ঘর-ভাড়া, খোরাকী আউর চা-টা ধরে মাস গেলে ওর নিজের খরচ বড় জোর শও রুপেয়া। কিন্তু নীলটুপিকে যে মাস গেলে তিশ রুপেয়া 'মাসকাবারী' দিতে হবে। সে টাকা কোথায় পাবে রামাশীষ? বর্ষার তিনটি মাসে টেনে টুনে আয় হয় আড়াই শো তিনশো। অন্য সময় বড় জোর দেড়শো টাকা। এই টাকা থেকেই মহাজনের ধার শুধতে হবে, সুদ গুনতে হবে। একটা বছর নিজে খেয়ে না খেয়ে, বাড়ীতে টাকা পাঠালে হয়তো ধার শোধ হবে। কিন্তু বরাদ্দ মাসকাবারী ত্রিশ টাকা দেবে কোথ্থেকে?

মুনিমজী বড়িয়া আদমী। হাজার হাজার টাকা তার আছে। সে পারে দিতে। কিন্তু রামাশীষ দেবে কি করে? যদি জ্বরে-বিমারীতে এক মাস পড়েও থাকে তাহলেও ছাড়ান নেই। না দিলেই রিকসা টেনে নিয়ে যাবে থানায়। কেস ঠুকে দেবে। হুজ্জোতি করবে। সে অনেক ঝামেলা।

পাসিনজার লোগ তো জানেন না যে কালীঘাট ছেড়ে পেরাইভেট রামাশীষ যদি কখনো ভবানীপুরের নীলটুপির খপ্পরে পড়ে তাহলে রিকসা বাঁচানোর জন্য তখুনি ট্যাঁকে যা থাকবে তাই দিয়েই তাকে উদ্ধার পেতে হয়। দিতে না পারলে গাড়ী জমা হয়ে যাবে। কোর্টে ফাইন দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে মুনিমজী তার হপ্তা ছাড়বেন না। বলবেন কেন রামাশীষ এলাকার বাইরে গিয়েছিল? কি করে তাকে রামাশীষ বোঝাবে যে এলাকার বাইরে না গেলে পোড়া পেট যে ভুখে মরে যায়। কেউ জানে না যে কতদিন সারাদিনের খাটুনীর শেষ পয়সাটা প্রণামী দিয়ে শূন্য হাতে ঘণ্টি বাজিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে রামাশীষ। পরের দিন কি খাবে তা পর্যন্ত তার জানা নেই।

তার থেকে এই ঢের ভালো আছে রামাশীষ। সে গাড়ীর মালিক হতে চায় না। সারাজীবন অপরের রিকসা টেনে বেড়াবে। এই করেই একদিন ঝড়ে জলে বর্ষায় শীতে গরমে ভিজে, ঠান্ডায় জমে, ঘামে নেয়ে উঠে বুকে দরদ নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। কাশবে খক খক করে। রক্ত উঠবে দলা দলা। তারপর একদিন সব শেষ হয়ে যাবে। পরমেশ্বরের ছেলে রামাশীষের জায়গায় বুধন সর্দারের রিকসা হপ্তার বিনিময়ে টানবে চুকসিকন্দর গাঁয়ের রামাশীষ রাহের বেটা বালমুকুন্দ। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলতে থাকবে। আর মোড়ে মোড়ে কানুনের মালিকরা হাত বাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে, কড়া ধমকে রামাশীষ বালমুকুন্দদের সারাদিনের পরিশ্রমের শেষ কুড়ানিটুকুও নিংড়ে নেবে। আর সেই বৌটি, যে বড় আশায় হাতের বালা জোড়া খুলে দিয়েছিল, সমস্ত স্বপ্নের অবসানে হতাশ ঘোলাটে দুটো চোখ মেলে এই জগৎ এই সনসারের দিকে তাকিয়ে যদি দুম করে প্রশ্ন করে বসে—কোন অপরাধে কার পাপে আমরা মানুষের জন্ম পেয়েও বাঁচার অধিকার পেলাম না? কেন আমার স্বামী অকালে মরে গেল? কেন আমার ছেলেও সেই একই পথে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল? কেন?

এর কি জবাব দেব আমরা? আপনি, আমি, আমরা সবাই শহরে গঞ্জে, নগরে বন্দরে রামাশীষ বালমুকুন্দদের ঘাড়ে চেপে আধা রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে কখনো-সখনো হয়তো গুন-গুন করে সুর ভাঁজব—শীতের রাতে ঝড় বাদলেও। আর সবার সামনে, সকলের নিকটে দাঁড়িয়ে সেই রক্তচোষা বাদুড়ের দল আইন-কানুন বজায় রাখার নামে রামাশীষ আর বালমুকুন্দদের সবটুকু লহু শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে মৃত্যুর আস্তাকুড়ে। কোন সঞ্জীবনীই আর তাদের ফিরিয়ে আনতে পারবে না সেই সুন্দর পাখি ডাকা, নির্জন নদীতীরের গাঁ চুকসিকন্দরে।
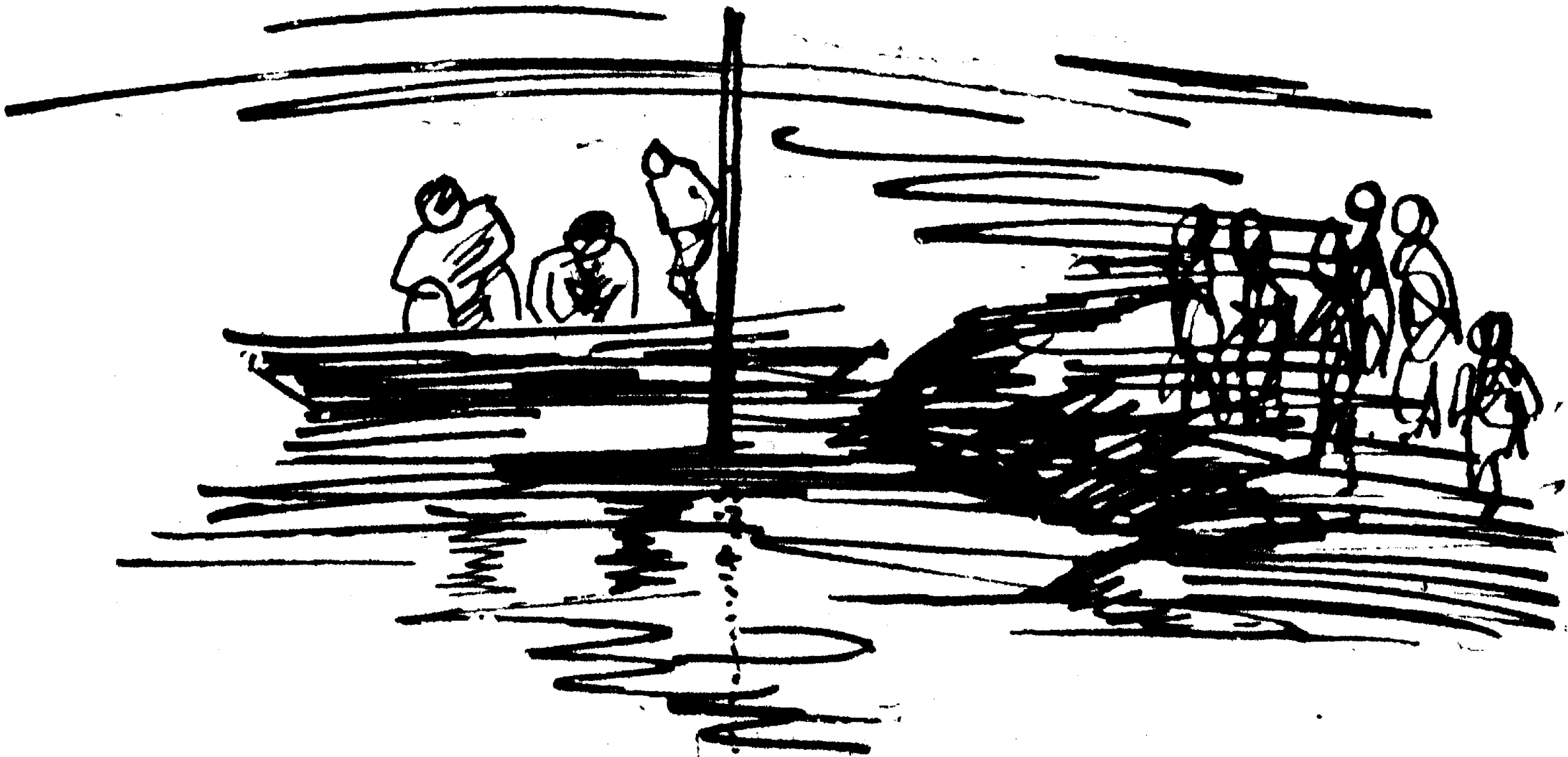
—সন্ধিৎসু

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

আবেশের পাভলভীয় ব্যাখ্যা

(বারো)

আতংকের আবেশ বা অন্য যে কোনো আবেশের বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ করতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা কার্যকলাপ বুঝি যুক্তিতর্কের প্রভাবমুক্ত। বুঝতে পারছি অসুখ নেই, তবু ভয় থেকে মুক্ত হতে পারছি না কেন? জানি ল্যাম্পপোস্টটা ছুঁয়ে যাওয়া অর্থহীন তবু না ছুঁয়ে পারি না কেন? তা হলে, আমার ভাবনাচিন্তা ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক অন্তরের কোনো অদৃশ্য শক্তি যার ওপর আমার কোনো এক্তিয়ার নেই। অনেক রোগী এই ধরনের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর না পেয়ে আরো বেশি আতংকিত হয়ে ওঠেন, অথবা দৈবশক্তি ও রহস্যময়তার ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে রোগ-মুক্তি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন। বস্তুবাদীদের প্রতিফলনতত্ত্ব অনুযায়ী সব রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিক্রিয়া থেকে ঘটছে, সব রকমের বিষয়ীমুখীন ধ্যানধারণা বাইরের জগতের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। আবেশগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কি মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে না? রজ্জুকে সর্প মনে করার মধ্যে অনেক সময় ভ্রান্তির অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু মনে করা সত্ত্বেও যদি রজ্জু দেখে সর্পভীতি জাগে তাহলে এই আবেশিক ভ্রান্তিকে আমরা কি-ভাবে ব্যাখ্যা করব? বহির্বাস্তব সঠিকভাবে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হচ্ছে না, শুধু এই বললেই ব্যাপারটা সঠিকভাবে বোধগম্য হবে না। কেন হচ্ছে না? ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা, বহির্বাস্তবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার অক্ষমতা আবেশিক ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। আবার প্রক্ষোভজনিত কারণেও ভ্রান্তি ঘটতে পারে। একটা বিশেষ বাস্তব অবস্থায় আতংকের সঞ্চার হয়েছিল, পরিবেশের সেই অবস্থায় বাস্তবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। পরিবেশের সেই বিশেষ অবস্থা প্রক্ষোভ সঞ্চার করে পরবর্তীকালে বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারে। পুনরায় বিনাকারণে অথবা সামান্য কারণে আতংকের আবির্ভাব ঘটতে পারে। বস্তুবাদীরা এইভাবে প্রতিফলনতত্ত্বকে প্রয়োগ করে আবেশের ব্যাখ্যা করতে পারেন। রহস্যবাদ বা অজ্ঞেয় দৈবশক্তির বা নির্জ্ঞানতত্ত্বের আশ্রয় না নিয়েও আতংকের আবেশ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বসম্মত ধারণায় আসা সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে, প্রতিফলনতত্ত্বের সমর্থকরা কখনও মনে করেন না যে, প্রতিফলন একটি নিষ্ক্রিয় ঘটনা। আরশিতে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবি আর মস্তিষ্কে প্রতিফলিত বহির্বাস্তব—এক ধরনের ব্যাপার নয়। মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বহু শর্তসাপেক্ষ। যে ব্যক্তি ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তার পক্ষে গভীর রাতে শ্মশানে বসে পক্ষীশাবকের কান্না শুনে মূর্চ্ছা যাওয়া স্বাভাবিক। পক্ষীশাবকের কান্নাকে প্রেতশিশুর কান্না বলে মনে না হলেও পরিবেশের অন্যান্য শর্ত থেকেই ভূতপ্রেতে অবিশ্বাসীর মনেও ভীতির সঞ্চার ঘটতে পারে। সেই ভীতির তরংগ মস্তিষ্কের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে মূর্চ্ছা না ঘটালেও, ভয়ে দেহমন সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যেতে পারে। আরো মনে রাখা দরকার মস্তিষ্ক কোষ দেহের ভিতরকার অন্যান্য যন্ত্রপাতির অবস্থা দ্বারা সাময়িকভাবে অনেকখানি প্রভাবিত হতে পারে। বাইরের ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ এই অবস্থায় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মোট কথা, প্রতিফলন ঠিক আলোকচিত্র নয়, ব্যক্তি-মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থার দ্বারা প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হতে বাধ্য। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, 'কগনিশন' বা বাস্তবের জ্ঞান কোন সময়েই কি পুরোপুরি বাস্তবানুগ, অবজেকটিভ নয়? আমরা কি আপেক্ষিক বা আংশিক জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়েই চিরকাল চলব? 'এ্যাবসলিউট কগনিশন' লাভের উপায় কি? এই সব প্রশ্নের আলোচনার আগে আবেশ বা অবসেশনের পাভলভীয় ব্যাখ্যা জানা দরকার।

ল্যাবরেটরীতে প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাভলভ নিউরোসিসের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। কয়েকটি পরীক্ষাধীন নিউরোসিসের বিবরণ আমরা পাঠকদের কাছে আগেই পেশ করেছি। এবার যে পরীক্ষাটির কথা বলতে যাচ্ছি, আবেশ বা অবসেশনকে বুঝতে সেটি আমাদের অনেকখানি সাহায্য করবে। এটিরও সূত্রপাত করেন পেত্রভা। সিঁড়ির একেবারে উঁচুতলায় পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে খাবার দেওয়া হচ্ছিল, একবার এই অবস্থায় উঁচু থেকে কুকুরটি মেঝের ওপর পড়ে গেল। এরপর কয়েকবার এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ফলে কুকুরটির মধ্যে নিউরোসিসের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সঙ্গে সঙ্গে উঁচু জায়গার ভয়ও দেখা দিল। খেতে অনিচ্ছা, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অক্ষমতা, সব সময়ে ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে চলা,—ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পেল। 'অবসেশনাল নিউরোসিসের' একটি মডেল তৈরী হল। উঁচু জায়গার ভয়, এই উপসর্গগুলোর মধ্যে প্রধানতম উপসর্গ হিসেবে দেখা দিল।

অন্যান্য পরীক্ষাগুলো থেকে পেত্রভার এই পরীক্ষাটির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়? অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে গোটা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিকার বা ত্রুটী ঘটেছে, এখানে বিশেষভাবে একটি বা কয়েকটি কোষসমষ্টিতে অসুস্থতা প্রকাশ পেয়েছে। পাভলভের ভাষায়—'অ্যান এনটায়ার্লি আইসোলেটেড এরিয়া অফ দি কর্টেক্স' অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের চলমান ভারসাম্যের অভাব থেকে এই অসুস্থতা সৃষ্ট হয়েছে। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণের সময় কুকুরটিকে এক বিশেষ ধরনের 'ডায়নামিক স্টেরিওটাইপ' বজায় রাখতে হয়েছিল। কয়েকবার পড়ে যাবার ফলে চলমান ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। নিজেকে বিশেষ অবস্থায় মানিয়ে নেবার অক্ষমতা থেকে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিন্দুর নিস্তেজনা-ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, বিন্দুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছে। উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার ভয়ের দরুন উত্তেজনা সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে নি বটে, কিন্তু ঐ বিশেষ বিন্দুগুলিতে যেন অবস্থান ধর্মঘট করে বসে আছে। কন্ডিশনড রিফলেক্সটি যেন এক জায়গায় জমে গেছে, ফ্রোজন হয়ে পড়েছে। কন্ডিশন বদলে গেছে, তবুও রিফলেক্সটির যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটছে; কেননা উত্তেজিত বিন্দুটির উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আশেপাশের অন্যান্য অংশ সুস্থ রয়েছে, কাজেই যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করছে। কিন্তু অসুস্থ অংশগুলোর ক্রিয়াকলাপে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটছে, যুক্তিবুদ্ধি উত্তেজিত অংশের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, অবসেশনাল নিউরোসিসের রোগীর মানসিকতায় বিরোধী অবস্থার প্রকাশ পেয়েছে। নিজের দৈহিক সুস্থতা যার গর্বের বিষয় ছিল, সেই রোগের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। চিরদিন সততা ও সামাজিকতায় অভ্যস্থ ব্যক্তির মনে ভয় ঢুকেছে যে সে অসৎ, অসামাজিক কাজ করে বসতে পারে। সন্তানকে যে নিজের

থেকেও ভালবাসে, তার মনে ভয় সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। সাধারণ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হয় যে, রোগীর নির্জ্ঞানে ঐ ধরনের কোনো অবদমিত ইচ্ছা রয়েছে। অথবা অন্য কোনো অপরাধবোধ থেকে এই অপরাধমনতার সৃষ্টি হয়েছে। যে ভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া হোক না কেন, রোগী আরো বেশি আতংকিত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাভলভ নির্জ্ঞানবাদ বা রহস্যবাদের সাহায্য না নিয়ে এই স্ববিরোধী মানসিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অমৃত-এর পাঠকদের কাছে মস্তিষ্কের এই অতি-স্ববিরোধী অবস্থা (আলট্রা প্যারাডকসিক্যাল ফেজ্) অজানা নয়। পূর্বে কোন এক সংখ্যায় এর শারীরবৃত্তিক তাৎপর্য বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকের কাছে বৈপরত্যের ডায়ালেকটিক্স অতি-পরিচিত ঘটনা (ফেনোমেনন্)।

এইবার যে প্রশ্নটি উত্থাপন করব, সেটি নিয়ে পাভলভ-পন্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। কোন ধরনের মস্তিষ্ক আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়? একদল বলেন যে, আবেশিক বা অবসেশনাল নিউরোসিস দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য থেকে সৃষ্টি হয়। 'সাইকেসথেনিয়া' দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের অতিপ্রাধান্যজনিত রোগ। এই ধরনের মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাঠক পরিচিত বলে ধরে নিতে পারি। সাধারণভাবে একে হ্যামলেটের মানসিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। 'হবে কি হবে না?' এই নিয়েই এদের চিন্তা। অবশ্য কোনো শারীরিক রোগ বা মানসিক দুর্যোগ আগে থেকে মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দেবার ফলেই আবেশিক নিউরোসিসের আক্রমণ ঘটে। এই মতাবলম্বীরা এই রোগকে দুরারোগ্য বলে মনে করেন।

অন্য এক দলের মতে, আবেশিক নিউরোসিস শুধু বুদ্ধিজীবীদের রোগ নয়। যখন বুদ্ধিজীবীরা এই রোগে আক্রান্ত হন, তখন হয়ত এর আরোগ্য দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং অন্যান্য অনেক কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথম সাংকেতিক স্তরের আধিক্য যে মস্তিষ্কে, সে মস্তিষ্কেও আবেশিক নিউরোসিস দেখা দিয়ে থাকে। পেত্রভার পরীক্ষাধীন কুকুরটির উল্লেখ করে এ'রা বলেন যে, পশুর মধ্যে আতংকের আবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। পশুর দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের বালাই নেই। কাজেই অবসেশনকে এ'রা সাইকেসথেনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে চান না। অবসেশন এ'দের চিকিৎসায় আরোগ্য হয়েছে বলে এ'রা দাবী করেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, শিল্পী-মস্তিষ্কও (যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তর বা অনুভূতি-সংবেদনের আধিক্য) আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শিল্পী-মস্তিষ্ক সাধারণত অভিভাবনে সাড়া দিয়ে থাকে, কাজেই এই টাইপের রোগীদের আরোগ্যের সম্ভাবনা বেশি।

আবেশিক অবস্থা বা বাধ্যকরী (কম্পালসিভ) ক্রিয়াকলাপ সব সময়েই নিউরোসিসের উপসর্গ নাও হতে পারে। সিজোফ্রেনিয়া অনেক সময় আবেশিক উপসর্গ, বিশেষ করে হাইপোকন্ড্রিয়ার (রোগের ভয়) লক্ষণ নিয়ে দেখা দিতে পারে। অন্যান্য উন্মাদ রোগেও আবেশিক রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। আবার অন্যান্য নিউরোসিসের সঙ্গেও আবেশিক বা বাধ্যকরী উপসর্গের আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রথম দিকে নিউরোসিস বিশেষ ধরনের উপসর্গ নিয়ে দেখা দিলেও, কিছুদিন পরে নানা রকমের উপসর্গের সৃষ্টি হয়। একেবারে অবিমিশ্র নিরোসিস খুব কমই পাওয়া যায়।

পাভলভ-ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিউরোসিসের কারণ সম্পর্কে আর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, এইখানে তার অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিনোদ এবং অন্যান্যদের আবেশিক বাধ্যকরী উপসর্গ বোঝার সুবিধাও অনেকটা হবে।

নিউরোসিস উৎপাদনের পরীক্ষা থেকে নানারকমের দৈহিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে এবং দেখা দিয়ে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি, রক্তচাপ কমা বাড়া ইত্যাদি উপসর্গ সব রোগীর বেলাতেই লক্ষ্য করা যায়। ল্যাবরেটরীতে কুকুরের ওপর পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের লালা নিঃসরণ বিনাকারণে বাড়ছে, লোম পড়ে যাচ্ছে, এক্জিমা জাতীয় চর্মরোগ বা অন্য ধরনের ক্ষত দেখা দিয়েছে। এছাড়া যে-কোনো আন্তরযন্ত্রের বিশৃংখলা নিউরোসিসে দেখা দিতে পারে। হজমের গোলমাল, ডিসপেপসিয়া, অন্তক্ষত ইত্যাদি নানারকমের রোগলক্ষণ পরীক্ষাধীন কুকুরগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকান চিকিৎসকরা সাইকো-সোমাটিক (মানসিক বিশৃংখলা থেকে উৎপন্ন শারীরিক ব্যাধি) বলে যেসব উপসর্গের নামকরণ করেছেন, পাভলভিয়ানরা সেগুলোকে কর্টিকো-ভিসেরাল (মস্তিষ্ক প্রভাবিত আন্তর-যান্ত্রিক গোলযোগ) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পাভলভের প্রত্যয় অনুযায়ী গুরুমস্তিষ্ক শুধু যে বহির্বাস্তবের সঙ্গে প্রাণীর সামঞ্জস্য বিধান করায় তাই নয়, প্রাণীর দেহের ভিতরকার প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণও করায়। মস্তিষ্কের বিশৃংখলা কয়েকটি কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সাধারণভাবে সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই দেহমনকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। নিউরোসিস থেকে শারীরিক পরিবর্তন এবং অসুস্থতাও ঘটে থাকে। পাভলভের মৃত্যুর পর কলতুসীর গবেষণাগারে বিকফ ও তাঁর সহকর্মীরা এ নিয়ে অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে।

এইবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এ যাবত বাইরের জগতের উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের কথাই আমরা বলেছি। গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তরযন্ত্রের অর্থাৎ দেহের ভিতরকার বিশৃংখলা ও বিপর্যয় থেকেও নিউরোসিস সৃষ্ট হতে পারে। একটু আগে মানসিক কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথার উল্লেখ করেছি। আন্তরযন্ত্রের বিকলতা থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের সংগে 'কর্টিকো-ভিসেরাল' সিনড্রোমকে এক করে ফেললে আমরা ভুল করব। এখানে শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়, ফলে শারীরিক অসুস্থতা অনেক সময় আরো জটিল হয়ে ওঠে, ও দুরারোগ্যের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে দুটি একটি উদাহরণ দিয়ে বিনোদের আলোচনায় ফিরে যাব। প্রাণী মাত্রেরই গর্ভধারণকালে ও সদ্যোজাত শাবককে লালনপালনকালে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় নতুন কন্ডিশন্ড রিফ্লেকস্ তৈরী করা কঠিন হয়ে পড়ে; নিস্তেজনা উত্তেজনা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। এগুলো অবশ্য স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন; অসুস্থতার নিদর্শন নয়। হরমোনের প্রভাবে মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন ঘটে।

পাভলভের গবেষণাগারে পুং হরমোন, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড এবং পিট্যুটারী হরমোনের সংগে নিউরোসিসের সম্পর্ক নিয়ে অনেক রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। কুকুরকে খাসী করার পর তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়া নানাদিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনানিস্তেজনার শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা:—তিনদিকই বিশেষভাবে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়, দেখা গেছে। এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী নয়। ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে প্রাণীটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এর পর খুব সহজেই এই সব কুকুর নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই সব প্রাণীদের উপর নিউরোসিস আরোগ্যের নানাবিধ চিকিৎসাপ্রণালী প্রয়োগ করার ফলে, চিকিৎসা বিষয়ে অনেক নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে। অবসেশন নিউরোসিসে অনেক পাভলভীয় মনোচিকিৎসক নিয়ম করে পুং হরমোন ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য হরমোন-প্রভাবিত নিউরোসিস নিয়ে এখনও গবেষণা চলেছে। সুনির্দিষ্ট কোনো ফলাফল পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। উচ্চমস্তিষ্কের উপর নানারকমের বিষ ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে।

এর মধ্যে এ্যালকহলের প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। নিয়মিত এ্যালকহল সেবনের ফলে কুকুরের নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া প্রথমে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার আত্মসংযমের অভাব ঘটে। তারপর উত্তেজনাপ্রক্রিয়াও দুর্বল হতে থাকে। এর পর আসে সম্মোহনপর্ব; প্রথমে সমমাত্রিক, তারপর স্ববিরোধী ও অবশেষে অতি-স্ববিরোধী অবস্থা। এই পর্ব প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনাপর্ব, প্রাণীর আত্মরক্ষার শেষ উপায়। কিন্তু এ্যালকহলের প্রভাব চলতে থাকার দরুন এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ক্রমশ আবেশিক নিউরোসিস, আতংক ও ভ্রান্তিমূলক উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

—মনোবিদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। আট ।।

এমন শক্ত মেয়ে স্বাতী, এ অভাবিত বিপর্যয়ের আঘাত সামলানো তবু সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। তখন থেকে ফুলে ফুলে কেঁদেছে সে। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশের দুটো কোণ আঁকড়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বারবার বলেছে, ইমপসিবল! এ্যাবসার্ড! এ হতে পারে না। পরক্ষণে ধড়মড় করে উঠেছে হিস্টিরিয়া রুগীর মত। চিৎকার করেছে—কল্পনা, কল্পনা কোথায়? আলুথালু চুল, লাল চোখ, অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার চেহারাটা।

চীনা মিত্র তাকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। পাশে চেয়ার টেনে কর্ণেল উদ্বিগ্ন মুখে বসে রয়েছেন। খবর পেয়েই দিব্যেন্দু নীরেন আর বিভাস জাফরাগঞ্জের দিকে চলে গেছে। কর্তব্যপরায়ণ ম্যানেজার সুরঞ্জনও গেছে। বোস দম্পতি—এ বড় আশ্চর্য লাগে, যেন ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। অধ্যাপক একবার এসেছিলেন স্বাতীর ঘরে। আশ্বাস দিয়ে গেছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাববার কিছু নেই।... মজার কথা, দিব্যেন্দুর সঙ্গে তখন শুভর লাস দেখতে যাচ্ছিলেন না দেবতোষ?

কর্নেল বিরক্ত হতে গিয়ে লুকিয়ে হেসেছেন। ভদ্রলোক ছিট্‌গ্রস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে মানে? আর—ভাববার কিছু নেই? সাধ করে বেড়াতে এসে একটি তাজা জলজ্যান্ত যুবক খুন হয়ে গেছে—ভাববার কিছু নেই! মাথা খারাপ আর কাকে বলে।

কল্পনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে—এ খবরও দিব্যেন্দুরা পুলিশকে জানাবে। পুলিশ খোঁজাখুঁজি সুরু করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্নেলের মাথার মধ্যে সেই থেকে একটা ব্যাপার পোকার মত কুটকুট করছে। বাইরে শীতের প্রকোপ প্রচন্ড। তা না হলে নিজেই একা বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর কেমন যেন বিশ্বাস, কল্পনা...

গা শিউরে উঠল কর্নেলের। মাথা নাড়লেন কয়েক বার। তারপর বুকে ক্রস আঁকলেন। মনে মনে বললেন, না, না, তা যেন সত্যি না হয়।

চীনা কর্নেলের চিন্তিত মুখটা দেখে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। বুকে ক্রস আঁকা লক্ষ্য করে সে এতক্ষণে চমকাল। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাহলে খৃশ্চান! কিন্তু সে জন্যেও নয়, চীনা একটু চঞ্চল হল—তবে কি উনি কল্পনারও কোন বিপদের আশঙ্কা করেছেন? সকালে মানদা যখন বোসগিন্নির ভূতে চুল কাটার কথা বলছিল, ভীষণ হাসি পেয়েছিল চীনার। হাসি পেয়েছিল একটা কথা মনে পড়ার দরুণ। ইরা তার পাড়ার মেয়ে। অথচ ইরা প্রথমে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন আদতে চেনেই না ওকে। আর শুভদের কাছে জানা গেছে, ইরা নাকি ওদের বলেছিল—উনি বুঝি আর্টিস্ট। যেন ন্যাকা খুকি, কিস্যু জানে না। তখন চীনার রাগ হয়েছিল প্রচন্ড। কিন্তু মানদা সকালে ওই খবর দেবার সময় তার হাসি পেয়েছিল এই ভেবে যে ইরার মাথাটা আসলে টাকপড়া। সুতরাং মাথা-ভর্তি ওই সুন্দর চুলের ঝাঁপটি আগাগোড়া নকল। অথচ নিজের স্মরণ-শক্তির ওপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায় চীনা। গতরাত্রে ইলেকট্রির ফেল এবং ইরার চুল কাটার ঘটনা যখন ঘটে, সে স্বাতীদের ঘরে উপস্থিত ছিল। ঘটনাটার আকস্মিকতার দরুণ তখন সবাই যেমন, তেমনি চীনাও এত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল যে মনেই ছিল না ইরার চুলগুলো পরচুলো মাত্র! সকালের হাসির গূঢ় কারণ এইটাই। তবে যাই হোক, রাতে ওই কান্ডের সময় সে যে হেসে ফেলে নি অর্থাৎ বিস্মৃতি তাকে হাসির হাত থেকে রক্ষা করেছে। হাসলে নির্ঘাৎ ইরা অপমানিত বোধ করত এবং পাল্টা শোধ নিতে চাইত।

ঠোঁট একটু কুঞ্চিত হল চীনার। নিলেই বা কী? সবার জীবনেই কিছু না কিছু দুর্ঘটনার ব্যাপার থাকে। তারও আছে। আছে তো আছেই। তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। সে ব্যক্তিগত সব কিছুতে আজীবন নির্বিকার থাকতে পারে। এ ক্ষমতা তার আছে। মুর্শিদাবাদে এসেই চীনা প্রথমে চমক খেয়েছিল। প্যালেস হোটেলে আগে থেকে টাকা দিয়ে ঘর বুক না করা থাকলে তক্ষুণি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করত। কিন্তু অত পয়সা কোথায়? বাধ্য হয়ে চোখে নির্বিকারত্বের সহজাত দৃষ্টিটা ফুটিয়েছিল সে। তবু মাঝে মাঝে উন্মনা হতে হয়েছে তাকে। এত কাছে, এত সামনাসামনি অতীত জীবনের একটা কুশ্রী স্মৃতি সশরীরে আনাগোনা করবে এবং তাকে কেবলই অভিনয় করে যেতে হবে, এর কোন মানে হয় না।

অবশেষে জেদ এসেছিল মাথায়। যা করতে এসেছে, তাই নিয়েই ডুবে থাকবে। সে এ্যান্টি-লাইফ বা প্রতি-জীবনের ছবি আঁকতে এসেছে মুর্শিদাবাদ। যে প্রতি-জীবন প্রতি মুহূর্তে ছায়া ফেলে চলেছে জীবনের ওপর, তাকে সে প্রত্যক্ষ করবে এই ঐতিহাসিক পোড়ো রাজধানীর মাটিতে। লক্ষ্য করবে, কেমন করে জীবনের ওপর প্রতি-জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

ওই সব ধ্বংসস্তূপে, কবরখানায়, প্রাচীন মন্দির - মসজিদ - গীর্জায় যে অবিচল ঘনকালো ছায়ার সত্তা, তা সে তার তুলিতে ফোটাবে।

আর আশ্চর্য, সত্যি সত্যি কখন সে এক সময় সবকিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এ মৃতের নিস্পন্দ শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল—যা দেখতে এসেছে তাই স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। চারদিকে শুধু ছায়া পড়ে আর ছায়া পড়ে, কেবলই ছায়া পড়ে। নিসর্গের আনাচে-কানাচে সেই ছায়া পড়ার ধারাবাহিক দৃশ্য।...

হঠাৎ আরও চমকাল চীনা মিত্র। কী ভাবছে সে? তার ছবির সাবজেক্ট শুধু? গা শিউরে উঠল তার। দেখল, কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্বাতী উপুড় আর নিস্পন্দ। কর্নেল কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছেন যেন। সেই মুহূর্তেই চীনা উঠে দাঁড়াল। ...স্যার! আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে...

কর্নেল শুধু বললেন, ইয়েস?

চীনা স্পষ্টত কাঁপছিল। চোখ দুটো চঞ্চল। সে বলল, আমার সেই ছবিটা।...

ইয়েস?

ছবিটা ডোবার ধারে... ক্রমশ দুর্বোধ্য হতে থাকল চীনার কথাগুলো।... কৃষ্ণপক্ষ, মধ্যরাত, চাঁদ... বিড় বিড় করছিল সে। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ফের বলে উঠল, কর্নেল! এ আমি ভাবি নি, একটুও ভাবি নি! ডু ইউ বিলিভ মি, স্যার?

চীনা কেঁদে ফেলবে নাকি? তার চোখে জল দেখামাত্র কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। নিঃসঙ্কোচে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, টেক ইট ইজি। কী বলতে চাও, আমি বুঝেছি। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ এখনও কল্পনার কোন খবর আমরা পাই নি।

চীনা ধরা গলায় বলল, এক্ষুনি ওই জঙ্গলের ভিতর ডোবার কাছে খোঁজা দরকার কর্নেল! আমি জানি, ঠিক তাই ঘটেছে।

কর্নেল ওর দিকে একবার তাকিয়ে কলিং বেলটা টিপে দিলেন। ততক্ষণে স্বাতী উঠে বসেছে। সে অস্ফুট চিৎকার করে বলল, এ আমি জানতাম, আমি জানতাম! চীনাদি, কর্নেল! প্লীজ, প্লীজ আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।

স্বাতী ধুড়মুড় করে নেমে আসতেই চীনা তাকে ধরল। ...না, না! আপনার পায়ে ব্যথা—আপনি কোথায় যাবেন? আমরা দেখছি, আপনি শুয়ে থাকুন চুপচাপ।

দরজায় টোকা দিচ্ছিল কে। দরজা খুলে দিলেন কর্নেল। অধ্যাপককে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ...বেল দিচ্ছেন শুনে আমিই এলাম স্যার। নীচে দাঁড়িয়েছিলাম ওদের অপেক্ষায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লাস শুভর নয়। অন্য কারো।

কর্নেল বললেন, নীচে চাকরগুলো কেউ নেই নাকি?

কই? কাকেও দেখলাম না তো! দেবতোষ বললেন। ...রিসেপশনে বাহাদুর একা বসে রয়েছে। তার সঙ্গেই গল্প করছিলাম। যাক্ গে, কোন দরকার থাকলে আমাকেই বলুন না! বিপদের রাত্রে পরস্পর একটুখানি কোঅপারেশন করা ছাড়া উপায় তো নেই।

কর্নেল বললেন, বাইরে মিঃ বোসকে দেখলেন না?

না তো। ও'দের দরজা বন্ধ।

প্লীজ, যদি কিছু মনে না করেন, একবার ওঁকে ডাকুন না! ওঁর স্ত্রীকেও আসতে বলুন এ ঘরে। আপনার স্ত্রীকেও বলুন। কারণ, আমরা তিনজনে একবার বেরোব ভাবছি।

দেবতোষ আঁতকে উঠে বললেন, বেরোবেন? কোথায়?

ওই বাগানটা একবার খুঁজব।

বাগানে কী খুঁজবেন?

চীনা জবাব দিল, কল্পনাকেও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই... কথা কেড়ে দেবতোষ বললেন, কী মুশকিল! এই শীতের রাত দুপুরে ওই ভূতের বাগানে যাবে কোন দুঃখে? পাগল হয়েছেন? পুলিশে ঠিকই খুঁজে বের করবে, দেখবেন।

পিছনে বাজখাঁই আওয়াজ শোনা গেল।...কী কথার ছিরি! যত বয়স বাড়ছে, তত ন্যাকামি বাড়ছে।

সুদেষ্ণা পর্দা তুলে ঢুকে পড়ল ঘরে। চীনা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। সুদেষ্ণা বলল, আমি রইলাম। দেখি কোন খুনে গুণ্ডার কী সাধ্য, কী ক্ষতি করে! তোমরা যাও—খুঁজে দ্যাখো মেয়েটাকে।...এই মেয়ে! যাও তো বাছা সামনের ঘরে। ওই চুলকাটা বউটিকে ডেকে নিয়ে এসো। আর ওর বরকে বলো, ওনাদের সঙ্গে যাক।

কথাটা স্বাতীর উদ্দেশ্যে বলা। স্বাতী নিঃশব্দে হুকুম তামিল করতে পা বাড়াল। পরক্ষণে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সুদেষ্ণা চেঁচাল, আ মর! তুমি যাও না মেয়ে। ও ল্যাংচাচ্ছে দেখছ না? ফের আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভাঙবে নাকি? আবার প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছ কেন? আজকালকার মেয়েগুলো যেন কী?

চীনা অবাক এবং অপ্রস্তুত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে বেরিয়ে গেল। স্বাতী এসে বিছানায় বসল। দেবতোষ রাগে বিরক্তিতে কাঁপছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা নেই। এই গ্রাম্য স্বভাবের স্ত্রীরত্নটি নিয়ে চিরদিন কম দুর্ভোগ তো ভুগতে হচ্ছে না।

কর্নেল গোপনে দেবতোষের দিকে কটাক্ষ করলেন। অর্থাৎ, চলুন।

দুজনে বেরিয়ে গেলেন। সামনের ঘর থেকে দীপেন বোসকেও বেরতে দেখা গেল। হাতে টর্চ নিয়েছে। চীনা আর ইরা বেরলো তার পিছনে। ওরা দুজনে স্বাতীর ঘরে গিয়ে ঢুকল। দীপেন বোস লম্বা বারান্দার এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে বলল, অন্তত একজন পুরুষ মানুষ থাকা উচিত ছিল। আমরা সবাই যাচ্ছি!

দেবতোষ হাত নাড়লেন। ...আমার গিন্নিকে চেনেন না। ও সব ম্যানেজ করবে।

দেবতোষের মুখে যেন এতক্ষণে গর্বের ভঙ্গিমা। স্ত্রীর ক্ষমতা জাহির করে একটু আগের ব্যাপারটা ঢাকতে চাইছেন হয়ত। অবশ্য সিঁড়িতে নামবার সময় বলেও ফেললেন, ও একটু গোঁড়া ধরনের সেকেলে মেয়ে। বুঝতেই পারছেন কর্নেল, যাকে বলে...

কর্নেল ফুট কাটলেন।...যাকে বলে রায়বাঘিনী!

রাইট! দেবতোষ একটু হাসলেন।

দীপেন হঠাৎ বলল, সরি। দরজায় তালা দিয়ে আসি মি বে। জাস্ট এ মিনিট।

সে চলে গেল ওপরে। এ'রা দুজনে রিসেপসানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাহাদুর একা বিষণ্ণ মুখে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল। তারপর বলল, আভি থানাসে ফোন আয়া সাব। পুলিশ লোক বোলা, কই আদমীকো বাহার যানে না দো। আভি থানাসে পুলিশ আনা পড়ে গা।

কর্নেল বললেন, সো কি! আমরা যে একবার বেরোব বাহাদুর, জরুরী দরকার।

বাহাদুর কুতকুতে চোখে হাসল।... আপলোগ নেহী যানে শাকতা সাহাব। মেরা পর হুকুম হ্যায়।

তেড়েমেড়ে দেবতোষ বললেন, রাখো তোমার হুকুম! আমরা যাচ্ছি। তোমাদের পুলিশকে বলো, যা ইচ্ছে করবে। ইস্! মামাবাড়ির আব্দার। মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে গেছে, তার পাত্তা নেই এদিকে!

বাহাদুর নমল না। এক গাল হাসল সে। ...মাফ কিজিয়ে। হামলোককা পর এইসী হুকুম হ্যায়।

দু-পা তেড়ে গেলেন দেবতোষ।... তুমি কি পুলিশ, না পুলিশের কর্তা? চুপসে বৈঠো রহো। হামলোক যাতা হ্যায়। আসুন কর্নেল!

কর্নেল দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কী ভাবছিলেন। মুখ তুলে বললেন, বরং আমরা একটু দেরী করি প্রফেসর। মিছে-মিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই। পুলিশের লোকেরা আসুক। তারপর ওদেরই ব্যাপারটা খুলে বলা যাবে।

দেবতোষ বললেন, রাইট, রাইট। আর কী প্রচন্ড শীত পড়েছে দেখছেন? তার ওপর আমরা একেবারে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ। বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।

সিঁড়ির মাথায় দীপেনকে দেখা গেল। কর্নেল সেদিকে পা বাড়িয়ে বললেন, হল না মিঃ বোস। পুলিশ নাকি দারোয়ানকে কড়া হুকুম দিয়েছে, আমরা কেউ যেন বাইরে না যেতে পারি!

ও, আচ্ছা! বলে দীপেন বোস অদৃশ্য হল।

এঁরা দুজনে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন ওপরে। দীপেন বোসকে আর দেখতে পেলেন না। দেবতোষ ফিসফিস বললেন, আজকালকার এই ইয়ংম্যানগুলো বড্ড স্বার্থপর কিন্তু! দেখলেন মিঃ বোসের কান্ড? ও সঙ্গে থাকলে জোর ফাইট দেওয়া যেত বাহাদুরের সঙ্গে।

স্বাতীর ঘরে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। খুলল চীনা। দেবতোষ ভিতরে ঢুকে বললেন, পুলিশ আমাদের যেতে দিচ্ছে না বাইরে। সুদেষ্ণা, তাহলে তুমি ওঁদের কাছেই থাকো। আমি কর্নেলের সঙ্গে কোথাও গিয়ে বসি।

সুদেষ্ণা ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বরে বলল, এরই মধ্যে পুলিশ এসে পড়েছে? নাকি ভয়ে কাঁপুনি ধরে গেছে বুড়ো হাড়ে? ধিক্ তোমাকে!

দেবতোষ কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, না মিসেস ব্যানার্জী। উনি ঠিকই বলছেন। আসুন প্রফেসর, আমরা বরং মিঃ বোসের ঘরে যাই।

সুদেষ্ণা তেড়ে এল। ...কী কাণ্ড দেখ। ওরা স্বামী-স্ত্রী শীতের মধ্যে এখন আরাম করে শোবে—তা নয়, ওদের জ্বালাতন করতে যাবে।

ঘরের ভিতর চোখ বুলিয়ে দেখা গেল, ইঁরা নেই। কর্নেল দেবতোষ দুজনেই অবাক। মুখতাকাতাকি করছিলেন পরস্পর। চীনা বলল, আপনারা যাবার পরই মিঃ বোস এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন ! আমরা ওঁর আচরণে বড্ড অবাক হয়েছি। মিসেস ব্যানার্জীও হতভম্ব।

স্ট্রেঞ্জ! বলে কর্নেল পা বাড়ালেন। তাহলে ঘরে চাবি দেবার ছল করে গিয়ে বউকে ডেকে নিয়েছে দীপেন বোস। হ্যাঁ, তাই ওর নামতে দেরী হচ্ছিল তখন। ব্যাপারটা অদ্ভুত।...পরক্ষণে কর্নেলের মনে হল, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। সম্ভবত ঘরে দামী কিছু আছে। তাই শেষ অব্দি স্ত্রীকে ডাকতে বাধ্য হয়েছে।

পিছনে সুদেষ্ণার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ...তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ? এখানে থাকো।

দেবতোষ বললেন, কেন? তুমি তো রইলে।

তর্ক করো না। সুদেষ্ণা ধমকাল।... এবার বাপু আমার গা কাঁপছে। এইমাত্র একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। উঃ, মাগো!

কর্নেল পর্দা তুলতে গিয়ে থমকে উৎকর্ণ দাঁড়ালেন। দেবতোষ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন, কী, কী?

তোমরা তো ঘর থেকে বেরোলে। তারপর বোসবাবু এসে ওর বউকে ডেকে নিয়ে গেল। সুদেষ্ণা কাঁপানো গলায় জানাল। ...তারপর তোমরা গেলে নাকি দেখবার জন্যে জানালার ধারে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি,...হঠাৎ থেমে গেল সুদেষ্ণা।

কর্নেল দেখলেন চীনা মুখ টিপে হাসবার চেষ্টা করছে। অবশ্য বড় ম্লান হাসি।

দেবতোষ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, কী, কী দেখলে?

বিড়বিড় করে সম্ভবত গুরুমন্ত্র জপছে সুদেষ্ণা। ঊর্ধ্বনেত্র যুক্তকর।

চীনার দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন দেবতোষ। চীনা বলল, কই! বলেন নি তো কিছু। তবে জানালা থেকে ওঁকে তাড়াতাড়ি সরে আসতে দেখেছি। কিছু দেখে হয়ত ভয় পেয়েছেন!

কর্নেল মন্তব্য করলেন, অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর কত কী দেখা সম্ভব। যাক্ গে। প্রফেসর, আপনি এখানে বসুন। আমি বরং নীচে বাহাদুরের কাছে যাই। পুলিশের লোকেরা হয়ত এসে পড়ল।

ধ্যানস্তব্ধ সুদেষ্ণার পাশে চেয়ার টেনে বসলেন দেবতোষ। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন, ওগো শুনছ?

স্বাতী শুয়ে আছে। চীনা তার মাথার কাছে গিয়ে বসল। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। কর্নেল বেরোলেন। ক-পা এগোলেন বারান্দায়। সেই সময় স্বাতীর ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। লম্বা প্রশস্ত বারান্দার দু-প্রান্তে দুটো আলো জ্বলছে। আলো উজ্জ্বল। হয়ত সে কারণেই শূন্যতা আর স্তব্ধতা এত অস্বাভাবিক লাগছে। সিঁড়ির দিকে না এগিয়ে উল্টো দিকে অর্থাৎ চীনা মিত্রের ঘরের দিকে আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন কর্নেল। ডাইনে দীপেন বোসের ঘর, বাঁয়ে স্বাতীদের। তারপর বাঁ দিকে পড়ে বিভাসের ঘর, ডাইনে বড় বড় দুটো থাম—নীচে লন, তার ওদিকে ফুল-বাগিচা আর সুইমিং পুল। থামের সংলগ্ন সুদৃশ্য রেলিংয়ে ভর করে দক্ষিণের খোলা-মেলায় তাকালেন কর্নেল। প্রকাণ্ড দেউড়ির ওপর আলো জ্বলছে দূরে—বাকিটা প্রায় অন্ধকার। দক্ষিণের প্রাইভেট রোডটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পূর্ব-দক্ষিণ অংশে গাছপালার ভিতর নিজামত কেল্লার কয়েকটা আলোর ঝিকিমিকি নজরে পড়ছে। ঘড়ি দেখলেন কর্নেল। পুরো দশটা। নির্জন ঠাণ্ডা রাতের দৃশ্যে স্নায়ুগুলো শুধু ভয়ের স্বাদেই আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত ভয়ে বারবার গা শিউরে উঠতে থাকল তাঁর। না, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার সাহসী পুরুষ। ফ্রণ্টে গিয়ে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আছে। কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি পড়েছেন। কিন্তু সে-সাহস এ-সব ক্ষেত্রে বড় অকেজো মনে হচ্ছে। এ ভয় অলৌকিকের প্রতি ভয়। এবং এ ভয় মুর্শিদাবাদের মত ঐতিহাসিক পোড়ো রাজধানী কিম্বা ভূতের শহরে রাত না কাটালে টের পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কী, এর স্বাদ পেতেই বারবার তিনি এখানে ছুটে আসেন। কেন এমন অনুভূতি তাঁর স্নায়ুকে আক্রমণ করে এখানে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত বহু ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখেছেন। কিন্তু এখানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এখানের রাতগুলো একেকটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। মনে হয়, জীবন আর মৃত্যুর এমন আশ্চর্য সার্থ আর কোথাও চোখে পড়ে নি কোনদিন। এ একটা অপরূপ মিথুন—জীবন আর মৃত্যুর, মৃত্যু আর জীবনের। এ শহরের প্রতিটি মানুষের মুখে এক গভীর ধূসরতার ছাপ। প্রতিটি জন্তুর ওপর সেই স্তিমিত পাণ্ডুর রং। সবখানে শুধু ছায়া পড়ে আছে—গাছের ছায়ার মত ছায়া, সাপের খোলসের মত ছায়া, ওই গঙ্গার জলে প্রতিফলিত শহরের ঘর-বাড়ির মত ছায়া। এ এক ধারাবাহিক ছায়া পড়ার ইতিহাস।...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলেন কর্নেল। পরক্ষণে মাথায় এক মতলব খেলে গেল। দেবতোষের টর্চটা তাঁর হাতে রয়েছে। চীনা মিত্রর ঘরের পাশে, বিভাসের ঘরের পিছনেই একটা ঘুরন্ত সরু লোহার সিঁড়ি আছে। কর্নেল পা টিপে টিপে এগোলেন।

সিঁড়ির মুখে দরজাটা খুলতে গিয়ে অবাক হলেন। খিল খোলা রয়েছে! কে খুলল? হয়ত কেউ খুলেছিল দিনের দিকে—আর আটকায় নি। আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে কর্নেল নামতে থাকলেন। খুব সাবধানে ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে গেলেন এক সময়।

তারপর গাছপালার শীর্ষে ভাঙা চাঁদটা দেখতে পেলেন। মুহূর্তে অস্ফুট উচ্চারিত হল—স্ট্রেঞ্জ, এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ পোয়েম!

মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠলে চাঁদ

ডোবার ধারে পাতব হরিণ ধরার ফাঁদ

হ্যাঁ, চীনা মিত্রর ছবিটাও নাকি এ রকম ছিল। তাই চীনা তখন বিড় বিড় করছিল, ছবিটা ডোবার ধারে...মধ্যরাত,...কৃষ্ণপক্ষ... চাঁদ...

এবং কর্নেলও এমনটি অনুমান করছিলেন। ঠিক আছে, সকাল হোক্। তারপর মোতিঝিলের সেই মসজিদে যাওয়া যাবে। কবিতাটা পরীক্ষা করতে হবে। দেয়ালে এ অদ্ভুত কবিতা কে লিখেছিল? কর্নেল সাবধানে আগাছার ভিতর টর্চ জ্বাললেন। কাঁটা ঝোপ নেই, সেই এক রক্ষে। টর্চ বার বার জ্বালবার দরকার হবে না।

পোড়ো বাগানটা কর্নেলের মোটামুটি পরিচিত। কিছু দূর হাঁটবার পরই পেয়ে গেলেন ভাঙা গম্বুজ ঘরটা। তার নীচেই ডোবা। সিঁড়ি আছে। পিছন ঘুরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখলেন এক ফালি চাঁদের সামান্য জ্যোৎস্না পড়েছে। টর্চ জ্বালবার মুহূর্তে তাঁর মনে হল, এইমাত্র কে যেন সাঁৎ করে সরে গেল গাছের আড়ালে। যেন শুকনো পাতায় পায়ের শব্দও শোনা গেল। ফের নীরবতা। কর্নেল সয়কার পকেট থেকে এবার ক্ষুদে পিস্তলটা বের করে ডোবার পাড়ে উঠলেন। টর্চের আলো পড়তে থাকল চারপাশে। তারপরই একটা অদ্ভুত মূর্তির উদয় হল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া পাঞ্জাবি পাজামা। দাঁত মেলে বলল, এসেছেন স্যার?

(ক্রমশঃ)

নকল প্রেমিক ক্যাসানোভা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

স্প্যানিস সাহিত্যের ডি লা মানচার নকল নাইট ডন কুইক্সোট যেমন দুনিয়া জুড়ে ভুয়ো দিগ্বিজয়ের প্রতীক,—ভেনিসের এক অন্ত্যজ জিয়াকম ক্যাসানোভা তেমনিই হচ্ছেন নকল প্রণয় অভিযানের প্রতীক। পার্থক্য এই যে, প্রথমজন সাহিত্যরথী সার্ভেন্টিসের এক বিপুল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-কল্পনার সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়জন তাঁর সমকালীন কৃত্রিম, ক্ষয়িষ্ণু, ব্যভিচারী ও ব্যর্থ সমাজের বাস্তব প্রতিনিধি। ইউরোপের ওই অলীকবাবুর অসংখ্য জীবনীকারদের মধ্যে একজন সেই বিচিত্র, বিতর্কিত, বিভ্রান্ত ও স্ববিরোধী ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় একযোগে যতগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা থেকেই তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবেঃ দিলদরিয়া, ইতর, বর্বর, কোমল, প্রতিহিংসাপরায়ণ, গর্বিত, সৎ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দীপ্ত মেধা, মূর্খ-অব্যবস্থচিত্ত। উদার-নৈতিক, দার্শনিক, ভক্ত ক্যাথলিক, সন্দেহবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণৎকার, নিম্নশ্রেণীর বদমাইস, কবি, লেখক, নাট্যকার, নাট্য-পরিবেশক ও পরিচালক, প্রতিষ্ঠিত সমাজের সমালোচক ও বিদ্রোহচারী, জুয়াড়ী, লটারী সংগঠক, গুপ্তচর, সামরিক কর্মচারী, পুরোহিত, আইনজ্ঞ, খনি বিশেষজ্ঞ, মাচার্ন্ট ব্যাঙ্কার, গণিতজ্ঞ ঐন্দ্রজালিক, তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, দালাল, ছাত্র, ঠক, ভেলকীবাজ, গর্ভপাতকারী, রাঁধুনী, বেহালা বাজিয়ে, নর্তক, রেশম উৎপাদক, বেশ্যার দালাল, নারীত্রাতা, সমলিপ্সু, প্রণয়রঙ্গী, প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞ, বেয়াড়া রসিক, কয়েদী, ফেরারী, সন্ন্যাসিনীদের মঠচালক, দ্বন্দ্বযোদ্ধা, কূটনীতিজ্ঞ, বড় বড় নাম বলিয়ে, গুলবাজ, রাজা সম্রাট ও পোপেদের স্বনিয়োজিত আদব-কায়দা শিখিয়ে, গোপন ও প্রকাশ্য ব্যাধির জন্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগী, উত্তম পরোপকারী এবং সর্বোপরি জাত ভেনিসিয়ান। জীবনে তিনি জমকালো ঐশ্বর্য-সম্ভোগ থেকে আরম্ভ করে দারিদ্র্যের চরমে উন্নীত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং তারই মধ্যে ভলটায়ার, রুশো, ফ্রাঙ্কলিন, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ দি গ্রেট, ফেডারিক দি গ্রেট, রাজা তৃতীয় জর্জ, ম্যাদাম ডি পম্পেডু এবং দুজন পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করেছেন। এক লিসবন বাদে সারা ইউরোপ অন্তত তিনবার ঘুরেছেন। আর প্রায় সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে নির্বিচারে সব শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে প্রেম ও লীলারঙ্গ করেছেন, তাদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন।

জন্ম ও জীবনারম্ভ

১৭২৫ ২ এপ্রিল ভেনিসে এক নর্তকীর গর্ভে ক্যাসানোভার জন্ম। বাহ্যিক সামাজিক পরিচয়ে তাঁর পিতা জনৈক অভিনেতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম তাঁর মাতা ও উক্ত অভিনেতার নিয়োগকর্তা একটি রঙ্গালয়ের মালিকের ঔরসে। ক্যাসানোভার অতি-শৈশবে 'স্বামীর' মৃত্যুর পর তাঁর মা পেশা বা পেশাগুলির তাগিদে সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং শিশু ক্যাসানোভাকে পাদুয়ায় একটি আবাসিক শিক্ষায়তনে পাঠিয়ে দেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে জন্মের জন্যে তাঁকে যে সহস্র অবমাননার কারণ হতে হয় এবং যা তাঁকে সারা জীবন একাকী বহন করতে হয় তার প্রতিবাদে, শৈশবে ত্যক্ত হবার বেদনায়, মায়ের হৃদয়হীনতার ক্ষোভে যেন সমগ্র জগতের প্রতি অভিমান ও অভিযোগ করে তিনি স্বল্পকটি কথায় লিখে গেছেন, "অতএব তারা আমার দায় থেকে রেহাই পেল।"

বাল্যেই তিনি তাঁর মেধার অনন্য-সাধারণত্বের পরিচয় দিয়ে বারো বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি নিজে যদিও ডাক্তার হতে চাইতেন, তবু তাঁর মা ও জন্মদাতার ইচ্ছে ছিল তিনি ধর্মীয় আইনজ্ঞ হন। ১৭৪১ খৃঃ ভেনিসের প্রধান যাজক তাঁকে ক্যাথলিক যাজকতন্ত্রের চারটি ছোট পদবীর স্নাতক হবার অনুমতি দেন। সতের বছর বয়সে উপাধি পান ডক্টর অব ল। ঐ বছরেই তাঁর প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ সে ঘটনা।

ইতিমধ্যে পোল্যান্ড থেকে ক্যাসানোভার মা তাঁকে চারশ মাইল দক্ষিণে মার্টোরানোর

মানন বেলেৎ—ক্যাসানোভার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রেয়সী—জাতীয় চিত্রশালা। —লণ্ডন

ক্যাসানোভা—রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক চিত্রশালা —মসকো।

বিশপের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের জন্যে যেতে বাধ্য করেন। ক্যাসানোভা পায়ে হেঁটে, ভিক্ষে করে সেখানে হাজির হন। পথে তাঁর যৌনব্যাধি সংক্রামিত হলো, বারবনিতার সঙ্গে ও তাস খেলায় সর্বস্বান্ত হলেন। সেই যাত্রাতেই তিনি সেই মারাত্মক তথ্য আবিষ্কার করেন যে মানুষের উদারতার চেয়ে তার লোভের কাছে আবেদন জানাতে পারলেই মুনাফার সম্ভাবনা অনেক বেশি সহজ। বিশপের কাছে উপনীত হয়ে তিনি তাঁর জরাজীর্ণ প্রাসাদ এবং কালাব্রিয়ান প্রদেশের রুক্ষ কঠোর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সোজা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তার ওই ফিরে যাবার ঘটনাটিও তাৎপর্য-পূর্ণ। বিশপ তাঁকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। ক্যাসানোভা নিতান্ত প্রয়োজনে তা গ্রহণও করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সম্প্রতি এক জালিয়াতিতে জেতা একটি খুরের সেট, সেই টাকার পরিবর্তে বিশপকে নিতে বাধ্য করেন। বিশপ অবশ্যই টাকা ফেরৎ পাবার বা তার পরিবর্তে কিছু পাবার আশা করেন নি। কিন্তু জন্ম তাঁকে যে আত্মমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে সে সম্পর্কে ক্যাসানোভা অতিশয় সচেতন ও স্পর্শ-কাতর। পরবর্তী জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে তিনি তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন।

অতঃপর তিনি গেলেন নেপলসে। সেখান থেকে রোমে। নিত্য নতুন রমণী তখন তাঁর জীবনে আটপৌরে ঘটনার মত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও তিনি এক কার্ডিনালের একান্ত সচিবের কাজ পেলেন। কিন্তু শীঘই একটি বিপন্না মেয়েকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর ধার্মিক প্রভু তাঁকে বরখাস্ত করলেন। যদিও মেয়েটির বিপদের জন্যে ক্যাসানোভা নিজে দায়ী ছিলেন না।

ইতিমধ্যে ইতালীতে বহিরাক্রমণ ঘটলো। ক্যাসানোভার মনে হলো ধর্ম নয়, যুদ্ধই তাঁর উপযুক্ত পেশা। তাই আলখেল্লার পরিবর্তে তিনি সৈনিকের ধড়া-

পরিধান করলেন এবং নিজের জন্যে ও নীলের ওপর সোনালী কাজ করা সুন্দর পোষাক তৈরী করান। বাকি লা শুধু যোগদান করার মত একটি বাহিনী। জন্মদাতা গ্রিমাণির চেষ্টায় তাও ট গেল। তিনি ভেনেসিয়ান গণতন্ত্রের নীতে কমিশনড হলেন। সৈন্যবাহিনীর সার হিসেবে তিনি কনস্টান্টিনপল দর্শন করেন, করফুতে কিছুদিন থাকেন। নে একটি বয়সে বড় মহিলার সঙ্গে টি হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। বাধিটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে পদোন্নতি না য় তা থেকে ইস্তফা দিয়ে ভেনিসে র আসেন। সেখানে একটি থিয়েটারের কস্ট্রায় বেহালাবাদকের কাজ নেন। অত- জন্মসূত্রে হীনতর সামাজিক মর্যাদার রে ওঠবার তাঁর দুটি প্রচেষ্টা যাজক- ও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের প্রচেষ্টা হোল। তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে ন। সেখানে এসে তিনি তাঁর সমশ্রেণীর সাথীদের নিয়ে সম্ভবপর সব কুকর্ম ও রে মেতে ওঠেন। গণিকাবাজি, সিঁদ রাহাজানি কিছুই বাদ গেল না। ফলে ভেনিসের কুচক্রী অত্যাচারী শাসকদের রে পড়েন।

ক্যাসানোভা তাঁর ব্যাপক ভ্রমণকালে জীবনকালে চালু ক্যাবালিজম নামে এক র ঝাড়ন-তাড়ন মন্ত্রতন্ত্র শেখেন। হঠাৎ বিদ্যা কাজে লেগে গেল। সিনর দিন নামে ভেনিসের এক ধনী সিনেটরের পীড়া হয়। ক্যাসানোভা তাঁকে সুস্থ তুললেন এবং দাবী করলেন যে ক্যাবা- জমের সাহায্যেই তিনি তাঁকে রোগমুক্ত ছেন। ব্রাগাদিন স্বয়ং ঐ তুকতাকে সী ছিলেন। তিনি ও তাঁর আর দুজন মধ্যবয়সী লোক বৃহৎ প্রাসাদে বাস করতেন। তাঁদের জনেরই হাবভাব, চালচলন ও বিশ্বাস কটা এক রকম ছিল। ক্যাসানোভার ক সাহচর্যে কয়েকদিন কাটানোর পর দিন প্রস্তাব করেন যে, ক্যাসনোভা দত্তক পুত্র হিসেবে তাঁর প্রাসাদে বাস ন। এর চেয়ে মনোমত ও উপযুক্ত আর হতে পারে না। যারা তাকে জক, কিম্বা সৈনিকবৃত্তির মত একটি জনক পেশায় বহাল করতে চেয়েছেন ভুল করেছেন। যা তাঁর পক্ষে হওয়া সম্ভব, স্বভাবনির্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত চ্ছে ধনী নাগর হিসেবে স্ফূর্তি লুঠে লো। সুতরাং তিনি সিনর ব্রাগাদিনের বে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তার নে পস্তিবাসের পাঠ চিরতরে চুকলো। পরবর্তী ত্রিশ বছর ক্যাসনোভার নির্দিষ্ট ন পেশা ছিল না। তিনি সমগ্র সমাজ- র শাখায়-শাখায় মন্দ-মধুরে বিলাসের স পরগাছা স্বর্ণলতিকার মত দুলে- কাটিয়ে দেন। তখনকার সমাজে এমন কের অভাব ছিল না, যাদের তার মত কের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাঁদের মাত্রায় সদ্ব্যবহার করেন। যদি সেই প্রায়কাজ করার মত তিনি কিছু করে থাকেন তাহলে তা হচ্ছে সরকারী লটারী সংগঠন করা। তাতে ফ্রান্সে তিনি প্রভূত মুনাফা লোটেন এবং ইংল্যান্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া আরো কয়েকটি দেশে প্রচণ্ড মার খেয়ে যান। তিনি একটা ছোট সিল্কের কারখানা চালানোর চেষ্টা করেন। তাছাড়া বাদবাকি সময়টা জুয়া খেলে, নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়িয়ে, ফন্দিবাজি করে, গুল গল্প করে, ধাপ্পা দিয়ে সারাটা ইউরোপ একটি লোকের সার্কাস পার্টির মত চক্র দিয়ে বেড়ান।

ঐ সময় তিনি ফ্রিমেশন দলে যোগ দেন। ঐ অর্ধগুপ্ত সমিতি আঠার শতকে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সমিতির সদস্যরা পরস্পরকে নানা গোপন সঙ্কেতের সাহায্যে যোগাযোগ করত এবং পরস্পরকে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করত। ক্যাসানোভার পক্ষে ঐ সমিতির সদস্যপদ একেবারে রক্ষা- কবচের মত কাজ করে। এমন বহু বিপদ থেকে তিনি অবলীলাক্রমে উৎরে গেলেন, অন্য লোক হলে ফেঁসে যেতো।

ওদিকে তাঁর প্রণয়-জীবনে নারীর মিছিল অব্যাহতভাবে চলেছে। যদিও তাঁর মত রমণীমোহনের পক্ষে বাছাই ও প্রত্যাখ্যান ছিল প্রত্যাশিত। অভিনেত্রী, সন্ন্যাসিনী, নর্তকী, দাসী, পরবধু, বিধবা, চাষী- কন্যা ও কাউন্টেস সব একাকার হয়ে আছেন সেই মিছিলে। অবশ্য এরকম জীবনে শুধু কামদেব নয়, শনি এবং নারদও এসে ভর করেন। শেষ পর্যন্ত ভেনিসের শ্যেনচক্ষু শাসকগোষ্ঠী তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'সামলে চলো, নয়তো... কিন্তু সামলে চলা ক্যাসানোভার স্বভাব- বিরুদ্ধ। তাই ১৭৫৫ খৃঃ ২৬ জুলাই ক্যাসানোভা গ্রেপ্তার হয়ে রাষ্ট্রপ্রধান দোজের প্রাসাদের সংলগ্ন লিডস কারাগারে প্রেরিত হন। সে কারাগার কঠোর কঠিন, পলায়ন বিফল। যে আইনে তিনি বন্দী হলেন তা অনেকটা ভারতরক্ষা আইনের মত। তাতে কোন অভিযোগ নেই, বিচার নেই, আবেদন নেই, দণ্ডাদেশ নেই।

পনেরো মাস পরে ক্যাসানোভা কারাগার থেকে ফেরারী হলেন। কি করে হলেন তা এক রহস্য। হয়তো তা কোন গোপন লেন- দেনে। কিম্বা তাঁর নিজের লেখা, ফেরারী হওয়ার ইতিহাসের হতবাক কীর্তি- কাহিনী 'লিডস থেকে পলায়ন' অনুযায়ী অবিশ্বাস্য-প্রায় কৌশলে। কিন্তু কারাগার তাঁকে বিপুলভাবে পরিবর্তিত করে। আর সেই বাল্যখিল্যোচিত চাপল্য, বেহিসেবী, বেপরোয়া উদ্দামতা নেই। এখন তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রখরবুদ্ধি পূর্ণপেশাদার, দাগী অপরাধী, ভয়ঙ্কর।

তিনি প্যারিসে পাড়ি দিলেন। লটারীর ব্যবসায়ে বহু অর্থ লুঠলেন এবং মার্কুইস ডি উর্ফ নামে এক পঞ্চাশ বছরের মহাধনী মহিলার সঙ্গে প্রণয়লীলা শুরু করেন। মহিলাটি ছিলেন পাশ্চাত্য সমাজের সেই ধরনের বিপুলবিত্তশালিনী মহিলা যাঁদের টাকা কোন-না-কোন এক চালবাজ, শঠ, কিম্বা তুখড় ডাক্তার, ভেলকীবাজ, জোচ্চোর অথবা নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কোন বাবাজী দাঁও মারার জন্যে অপেক্ষা করে। সেই সময় তিনি তখনকার দিনের মহা ভাঁওতা সাপের তেল কিনে অর্থ অপচয় করছিলেন। তাঁর সাধ ছিল পুনরায় ছেলে হয়ে জন্মানো। ক্যাসানোভা বললেন তিনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পরবর্তী ছ'বছর ক্যাসানোভা সেই মহিলার সঙ্গে ছিলেন। মহিলার আত্মীয়- দের ক্রোধের পরিবেষ্টনে, কিন্তু সমঝদার ইয়ার-বক্সীদের বাহবার মধ্যে সেই ক'বছরে দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ফুঁকে দিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ ডি উর্ফের চৈতন্য হলো।

ওদিকে জীবনের সূর্য মধ্যাহ্নমুহূর্ত পেরিয়ে গেছে। অমিত অপচয়ে দেহে জরার চিহ্ন দেখা দিল। দেশে-দেশে কুখ্যাতিতে পুলিশ তৎপর। এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে বাক্স-প্যাটরা খুলবার আগেই স্থান ত্যাগের পরোয়ানা। ক্যাসানোভা জানতেন তার জন্যে যৌবন, উৎসুক, উন্মুখ, অনভিজ্ঞ ও আকাঙ্ক্ষিতরা নয়, এখন হিসেবী, কূট- বুদ্ধি, মিথ্যা পরিচয় দেওয়া 'কাউন্ট' পাকা চোর, ধড়িবাজ, দালাল, জুয়াচোর শঠ, বিগত-যৌবনা, নর্তকী, উপেক্ষিত বেশ্যা ও পুলিশের ওপরওয়ালা অপেক্ষা করবে, তাল খুঁজবে, ওঁৎ পেতে থাকবে ক্যাসানোভা স্বয়ং অনবদ্য ভাষায় সেই ঘনায়মান নৈরাশ্যের কথা লিখে গেছেন।

তবু সুযোগ এলো। তাঁর হাজার দুর্নাম সত্ত্বেও ইউরোপময় তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধমনের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফেডারিক দি গ্রেট তাঁকে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জুয়োর নেশায় সে সুযোগও হারান। নারী ছিল তাঁর আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ। কিন্তু জুয়াখেলা ছিল তাঁর

নেশা। একই রাত্রে তিনি তখনকার দিনের মূল্যে ২০,০০০ টাকা জিততেন এবং তার চেয়েও বেশী হারতেন।

তবু চিরচঞ্চল, চিরতৎপর, চিরদিনের সুযোগ-সন্ধানী মন মানে না। আশার আলেয়ায়, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাবার প্রত্যাশায় তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। লটারীর ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হলেন। সিফিলিস মারাত্মক হয়ে উঠলো। তারপর বেলজিয়াম, হল্যান্ড, বার্ণউইক, রাশিয়া, পোল্যান্ড। পোল্যান্ডে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু বেঁচে গেলেন। তারপর অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও স্পেন। আনদালুসিয়ায় সুইস জার্মান ঔপনিবেশিকদের দেখা-শোনা করবার জন্যে একটি চাকরীর ব্যর্থ দরখাস্ত করেন। আর তিনি অর্থ, যশ কিম্বা প্রতিপত্তি চান না। চান শুধু স্থিতি, বিশ্রাম, শান্তি। ভেনিসের দণ্ডদাতারা কারাগার থেকে ফেরার অপরাধ তখনো ভোলেন নি তাই সেখানে ফেরার উপায় নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু সাধ্য-সাধনা, উপরোধ, অনুরোধ, প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের কলকাঠি নাড়া এবং সর্বোপরি ভেনিসের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার পর আঠার বছর পরে তিনি পুনরায় ভেনিসে ফেরার অনুমতি পেলেন।

ভেনিস ছিল তাঁর কাছে দ্বিতীয়া মায়ের মত। তিনি দেশ-দেশান্তরে ডেরা বেঁধেছেন কিন্তু ভেনিসকে কখনো ভোলেন নি। ভেনিসের জন্যে তাঁর হৃদয় কখনো শান্ত হয় নি। অবশেষে একদিন জলপথ বেয়ে তিনি আড্রিয়াটিক সমুদ্রতীরে ক্লিৎ-অপতেজ-মারুৎ-ক্যোম এবং কাঁচ ও কংক্রিট গীর্জা ও গম্বুজের অবাক মিতালী সেই দ্বীপময় নগরীতে ফিরে এলেন। কিন্তু তার অনিকেত জীবনে এক মা তাঁকে জারজ জন্মের কলঙ্কে চিরদিনের এক আত্ম-অপমানিত জীবনের ভাগী করেছেন, দ্বিতীয় মা তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। তার মুরুব্বী ও রক্ষাকর্তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তিনিও স্থবির বৃদ্ধ। তারপরে টাকার বড়ই অভাব। ক্যাসানোভা ভেবেছিলেন জুয়াখেলে ভাগ্য পরিবর্তন করবেন। কিন্তু নগর কর্তৃপক্ষ জুয়াখেলা বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং ক্যাসানোভাকে কাজের চেষ্টা করতে হলো। তিনি ইলিয়ডের অনুবাদ করলেন। পুস্তিকা লিখলেন, নাটক প্রযোজনা এবং পুলিশের জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এ যেন ভাগ্যের ভাঙা ডিমে বৃথা তা দেওয়া। শেষ পর্যন্ত মনের ক্ষোভে একটি বই লিখলেন, সমাজ ও আভিজাত্য সম্পর্কে তাতে বিদ্রূপের কষাঘাত। কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে নগর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ন বছর পরে ঊনষাট বছর বয়সে আবার তিনি নগর ত্যাগ করে গেলেন। আবার ইউরোপ পরিক্রমা। কিন্তু কিসের আশায়, কেন? এখন তিনি ক্লান্ত, বৃদ্ধ, সমাজত্যক্ত তামাদী। আর বিপদজনক নন, বিগত দিনের মূর্তিমান ব্যঙ্গ। এই সময় আবার তাঁর ফ্রিমেশনবাদ ও ক্যাবালিজম তাঁকে একটা আশ্রয় দিয়েছিল। বোহেমিয়ার তরুণ কাউনট ওয়ালডস্‌টেইন ছিলেন উভয় ব্যাপারেই জড়িত। তিনি তাঁকে তার পাঠাগারের দায়িত্ব দিলেন। নিরুপায় ক্যাসানোভা সেই নির্বাসনকে মেনে নেন।

কিন্তু বহেমিয়ায় তিনি ভৃত্যদের সঙ্গে কলহ করলেন। যাজকদের সঙ্গে বিবাদ বাধালেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। একবার পালিয়ে গেলেন, ফের ফিরে এলেন। বই, পুস্তিকা, রচনা ও নাটক লিখলেন। কিন্তু কেউ তা পড়ল না। তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত করেন। গুলি-ভরা পিস্তল কপালে ছুঁইয়েও নামিয়ে রাখেন। কিন্তু কেন? মনে হয়, সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হলো যে, তার জীবনের কাজ আরো কিছু বাকি আছে। তিনি তার স্বভাবজাত অহমিকাবশে মনে করতেন যে, তিনি অনন্য। নিঃসন্দেহে তা বহুলাংশে সত্যও। কিন্তু কালের কাহিনীতে তার সাক্ষী রইলো কৈ? তিনি তো স্থপতি, ভাস্কর কিম্বা চিত্রশিল্পী নন যে নিজেকে আপনার সৃজনসম্পদে অবিস্মরণীয় করে যাবেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি স্থির করলেন তিনি তাঁর অবিশ্বাস্য, অবিকল জীবনের অসংবৃত কাহিনী লিখে যাবেন। 'আমার জীবনের কাহিনী' নামক গ্রন্থই সেই কাহিনী। প্রকাশাবধি সেই কাহিনী উপন্যাস, মিথ্যাভাষণ, যৌনকাহিনীও একজন প্রতিভাধারের মহাসৃষ্টি বলে ধিকৃত ও বন্দিত হয়ে এসেছে। — অবশেষে ১৭৯৮ খৃঃ ৪ জুন তাঁর এ ভবের লীলা সাঙ্গ হয়। শেষ জবানীতে তিনি বলেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং আমার মৃত্যুর সাক্ষী, আমি দার্শনিকের জীবনযাপন করে গেছি এবং খৃস্টানের মত মৃত্যুবরণ করছি।'

অপকীর্তিতে অমর

কিন্তু সে কোন মানুষ, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন? তদানীন্তন ইউরোপের সবচেয়ে সভ্য, শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি বলে পরিচিত ছিলেন রাজকুমার ডি লিগনে। তিনি ক্যাসানোভা সম্পর্কে লিখে গেছেন, 'তিনি যদি কুৎসিত না হতেন তবে তাঁকে সুপুরুষ বলা চলতো। তিনি দীর্ঘাঙ্গ এবং তাঁর কাঠামো হারকিউলিসের মত। কিন্তু তাতে আফ্রিকানদের ধাঁচ। চোখ দুটি অগ্নিদীপ্ত ও প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। তাঁর স্পর্শকাতরতা, ক্লান্তি ও কলহপ্রবণতা তাঁকে হিংস্র বলে মনে হতো। তাঁকে [illegible] করার চেয়ে ক্রুদ্ধ করা সহজ। তিনি নিজে হাসেন অল্প, কিন্তু অপরকে হাসান।' — তবু লেখক রাজতনয় উল্লেখ করেন নি যে, মুখে বসন্তের দাগ, গড়ুরের মত উঁচু নাক ও দৃঢ় চোয়াল, তার মুখও প্রকাশভঙ্গী প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

তার ঐ বিশিষ্ট স্মৃতিকার অন্যত্র লিখেছেন, 'কেবল সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কেই তিনি কিছু জানতেন না, যেগুলি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল তিনি বিশেষ পণ্ডিত। যেমন, নৃত্যকলা ও তার কানুন, ফরাসী ভাষা, সুরুচি ভব্যতা ও জাগতিক নিয়ম। তার লেখা প্রহসনগুলির মধ্যে শুধু প্রহসনের লেশমাত্র নেই, তার দার্শনিক বাগাড়ম্বরে দর্শন নেই,—বাকি সব তাতে ভরপুর। অন্যত্র তিনি নবীন, তীব্র, বিপ[illegible]

ও বিরাট। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, কিন্তু অযথা অনর্গল হোমার ও হোরেস থেকে উদ্ধৃতি করেন।...যদি সময়-সময় তিনি তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্বুদ্ধি নরনারীর কাছ থেকে অর্থ প্রতারণার কাজে লাগিয়ে থাকেন, তবে তা হচ্ছে তার বন্ধুদের উপকারার্থে। তার যৌবনের বন্য-বিশৃঙ্খলায় বেপরোয়া অভিযানে এবং বিতর্কমূলক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি সর্বদা কৌশল, সম্মান ও সাহস দেখিয়েছেন। তিনি দাম্ভিক কারণ তার গর্ব করার মত কিছুই নেই। তার বিরাট ও বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি, তার ভেনিসিয়ান প্রাণপ্রাচুর্য, তার ভ্রমণ, তার কৌশল, তার চিত্তবিক্ষোভ, বীরোচিত সহিষ্ণুতা, — যা কিছু নিয়ে একদা তিনি গর্ব করতেন তা সবই এখন হারিয়ে গেছে। তাই এখন তিনি এমন এক দুর্বল ব্যক্তিত্ব, যাকে জানার সার্থকতা আছে। যে অতি-স্বল্পসংখ্যক লোককে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন তাদের পক্ষে তার বন্ধুত্ব মূল্যবান।'

যে লেখক ওই কথাগুলি লিখে গেছেন তার লেখনীতে বিধৃত হবার জন্যে তখনকার ইউরোপের অনেক রাজা তাদের রাজত্বের অর্ধেক দান করে দিতে পারতেন। তাই শুধু লেখক রাজকুমার ডি লিগনের দ্বারা চরিত্রচিত্রিত হওয়ার মধ্যেও প্রমাণিত হয় যে, ক্যাসানোভা তার সমকালে অনন্য-সাধারণ বলে বিবেচিত।

১৭৭২ ভেনিসে মৃত্যুশয্যা থেকে লেফটেনান্ট কর্ণেল ব্যারণ লেভিস সাখেদ কে লিখেছিলেন, 'আমি তো তোমায় আদরের ডাকনামেই জানতাম। সুতরাং এত কেতাদুরস্ত চিঠি কেন?' সেই বয়োবৃদ্ধ সৈনিকের সঙ্গে ক্যাসানোভার অন্তত কুড়ি বছর দেখা হয় নি। কিন্তু তার জন্যে তার অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে তিনি ভুলে যান নি।

চরিত্রের আরো কটি দিক

ক্যাসানোভা শুধু তার জীবন-নাটকের এক অবাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতাই ছিলেন না, মানুষের সৃষ্ট মঞ্চনাটক অপেরা ও নৃত্যের খুব বড় সমঝদার ছিলেন। তার কুড়িখানিরও ওপর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে তিনখানি নাটক। লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস, রোম, সেণ্ট, পীটার্সবার্গ সর্বত্র তিনি শ্রেষ্ঠতম মঞ্চে শ্রেষ্ঠতম নাটকাভিনয় দেখেছেন। সমকালের খ্যাত-অখ্যাত, স্মরণীয়-বিস্মৃত বহু নট-নটী, নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। অভিনয়-জগতে বহু নারীর সঙ্গে তার প্রেম ও যৌনসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সমলিপ্সা শুধু ক্যাসানোভার নয় তার সমচরিত্রের বহুলোকের একটি বৈশিষ্ট্য। কোন-কোন লেখক পূর্বোল্লিখিত ব্রাগাদিন ও তার দুই বন্ধুর সঙ্গে ক্যাসানোভার সম্পর্ককে সমলিপ্সার সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। তার সমলিপ্সু প্রেমিকদের মধ্যে কয়েকজন ভৃত্য থেকে আরম্ভ করে অভিজাতরা পর্যন্ত ছিলেন। তাদের অনেকেই ক্যাসানোভাকে শুধু ভালোবাসতেন না, গভীরভাবে শ্রদ্ধাও করতেন।

ক্যাসানোভার জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যৌনতার মতই তার রসনাবিলাস ও ক্ষুধা ছিল বিচিত্রমুখী ও চিরঅতৃপ্ত। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যুৎকৃষ্ট রাঁধুনী। দেশ-দেশান্তরে তিনি যেমন বিপুল ভোজে উদরতৃপ্তি করেছেন, তেমনি নানা প্রক্রিয়ায়, নানা মশলা ও জারকে নানা ধরনের পশু-পাখি, দুর্লভ মাছ, ঝিনুক ও গুগলির বিবিধ রান্না শিখেছেন ও শিখিয়েছেন।

ইতিহাসে অবশ্য ক্যাসানোভার আর সব পরিচয়কে ছাড়িয়ে তার প্রেমিক পরিচয়, তার রমণীমোহন মূর্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তিনি নিজে লিখে গেছেন যে তিনি কয়েকশ নারীর শয্যাসঙ্গী হয়েছেন। তার জীবনীকারদের অনেকেই তা বিশ্বাস করেন, যদিও কেউ-কেউ মনে করেন যে তার বর্ণিত কয়েকটি অদ্ভুত প্রণয়াভিসার কাল্পনিক। কিন্তু কোন জাতীয় মেয়েরা তার ছলা-কলায়, প্রলোভনে প্রগলভতায়, ক্ষণমধুর সম্ভোগে কিম্বা ঝঞ্ঝাটের ঘূর্ণি-পাকে জড়িয়ে পড়ার জন্যে ধরা দিতেন?—জীবনীকারদের মতে তারা অধিকাংশই সাধারণ শস্তা ও সহজলভ্যা। কেউ বলেছেন, তাদের কোথাও না কোথাও একটা খুঁৎ থাকতো। হয় তারা বঞ্চিতা, অসুখী কিম্বা কোন একটা কারণে অস্বাভাবিক। তাদের কয়েকজন সমলিপ্সু, কয়েকজন পুরুষ বেশ করতে ভালোবাসতো। একজনের একটা চোখ ছিল কাঁচের। কেউ অজাচারিণী, অর্থাৎ নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে যৌনসংসর্গকারিণী, কেউ স্খলিতা। অনেকেই অশিক্ষিতা, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞা এবং অপরিণীত বয়স ও বুদ্ধি। ক্যাসানোভা সেই সব রমণীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাদের সাহায্য করেছেন, তাদের ঝুঁকি পুইয়েছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা গোপন রেখেছেন। মেয়েদের মন জয়ের মোল মন্ত্রটি তাঁর খুব ভালো করে জানা ছিল এবং তিনি তার অব্যর্থ প্রয়োগ করে গেছেন: যখনই তিনি যে মেয়ের সঙ্গে থাকতেন তাকেই একথা ভাববার আত্মপ্রসাদ দিতেন যে, তিনি তার জীবনের রাজ-রাজেশ্বরী। তার সেই চপল চাটুকথায় দাসী-বাঁদী, চাষীকন্যা, গণিকা, সন্ন্যাসিনী, বহু অভিনেত্রী ও অভিজাতারা তৃপ্ত হয়েছেন।

স্বয়ংসম্ভোগ করা ছাড়াও ক্যাসানোভা নারীর দালালও ছিলেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত দালালী হচ্ছে ফরাসী সম্রাট পঞ্চ-দশ লুইকে লুসি ও'মার্ফি নামে এক কামময়ী নারীকে জোগাড় করা। আঠার শতকের ফরাসী শিল্পী ফ্রাঁসোয়া বুশেরের তুলিতে সেই নারীর একটি নগ্ন মূর্তি অমর হয়ে আছে।

বিপ্রলব্ধের প্রতিঘাত

কীর্তি কিম্বা অপকীর্তিতে মানুষ মাত্রেরই বিশ্রুত হবার পেছনে একটা ইতিহাস,—পরিণতির কারণ পারম্পর্য থাকে। ক্যাসানোভাও তার ব্যতিক্রম নন। বয়ে বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই আশ্চর্য-প্রতিভা-সম্পন্ন, কল্পনাবিলাসী, প্রবল প্রাণশক্তি-সম্পন্ন ক্যাসানোভা উপলব্ধি করেছিলেন তার জারজ জন্মের জন্যে তিনি জনক-জননী-উপেক্ষিত, সমাজ-উপহাসিত এবং সুযোগ-বঞ্চিত। সাধারণ মানুষ, সীমিত সামর্থের মানুষ সেই অবস্থাকে হয়তো সহজে মেনে নিতে পারে। কিন্তু আশৈশব যারা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষায় অশান্ত ও উদ্বেলিত তারা তা পারে না। ক্যাসানোভাও পারেন নি।

তার সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। এক, সেই বিরূপ ও নিষ্করুণ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। তাকে ভাঙা। আবার খানিকটা যুক্তিসঙ্গত ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে পুনরায় গড়ে তোলা। ক্যাসানোভা যৌবনে তার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু বেশী দূর এগোন নি। দ্বিতীয় পথ ছিল সংসারের সঙ্ঘাত, সঙ্ঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বেষ-বিদ্বেষের তীব্রতা থেকে দূরে চলে যাওয়া। অন্তত তিনবার তিনি সেকথা ভেবে মঠবাসী হবার উদ্যোগ করে ছিলেন। কিন্তু তার ভেতরে প্রাণপ্রাচুর্যের প্রাবল্যে তা হওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি তৃতীয় পথ, ঢিলের বদলে পাটকেল পাল্টা দেবার পথ বেছে নিলেন। সমাজ তাকে যে কাঠায় মাপলো তিনি তাকে সেই কাঠায় না দিয়ে অনেক ছোট কাঠায় শোধ দেন। কারণ সমাজের সাধারণের থেকে তার বুদ্ধি, চাতুর্য, শক্তি ও শঠতা অনেক বেশী। তার লক্ষ্য হল সমাজের দুর্বলতা, লোভ, ক্ষুদ্রতা, দম্ভ ও ভণ্ডামীর সুযোগ নেওয়া। শরৎ শেষের প্রকৃতির মত সেই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তখন পূর্ণতার অবস্থা। কিন্তু তার চারিদিকে ঋতু-বদলের ইশারা ঘনীভূত হচ্ছিল। তার পাতার ঝলোর ঝরে পড়ার দিন এগিয়ে আসছিল। ক্যাসানোভা সেই অভিশপ্ত সমাজের প্রতিভূ, প্রতিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে প্রত্যাঘাতকারী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জবাব দেবার কিছু নেই। বাকরুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকে কড়িরাম। অদ্ভুত ঠেকে না, নতুন মনে হয় না কিছুই। জীবনে দেখা তো আর কম হল না। কখন কী পেলে আর কী না পেলে যে মানুষ বিবাগী হয় তা সঠিক জানা না থাক, তবু ফারকুয়ার সায়েবকে তো দেখেছে কড়িরাম। একদিন এমনি করেই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে কোথায় যে চলে গেল। সেও তো গিয়েছিল রোজির জন্যে। ভালোবাসা যখন, দেহে-মনে রক্তের ভেতরে বাসা বাঁধে, মনের• মানুষের জন্যে মন যখন ব্যাকুল হয় তখন বুঝি এমনি করেই সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সম্মান তুচ্ছ ভেবে দূরে ঠেলে দিয়ে পথের মানুষ ফেরে ঘরে আর ঘরের মানুষ ছুটে যায় পথে। তখন ঘর আর বাইরের চিরন্তন সীমাটাই যায় কেমন করে ঘুচে। ভালোবাসার ধন কি তবু মেলে। সে যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়, স্বর্গের চেয়ে পবিত্র আশ্রয়। সারা দিনমান রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে তিনিও এখন ক্লান্ত, শিথিল পায়ে অবিচ্ছন্ন ছায়া খুঁজে পেতে চেয়ে সহসা তৎপর। বেলা যে যায়। এইবার ঘরের পথ খুঁজে নেবার পালা। আরেকটু পরেই তো অন্ধকারে লুপ্ত হবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দশদিক। কড়িরামের চোখ ছল-ছল করে। সে কোথায় যাবে? কার কাছে? সারাটা জীবন কেবল নিজের সঙ্গে লুকো-চুরি খেলে বেড়িয়েছে। এইবার? সে যেন ধরা পড়ে গেছে। বিশ্ব-সংসার জেনে গেছে তার কীর্তি। যে কারণ মুখ তুলে সামনে তাকাতে ভয়। মাথা হেঁট হয়ে আসে। কথা বলতে আজ শুধু ভেতর থেকে বাধা পাচ্ছে। দ্বিধা যেন আদুরে ছেলের মত গলা জড়িয়ে ধরতে চায়। তাকে এড়িয়ে চলা চায়।

মোহিনীর সঙ্গে দেখা হয়।

কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর হয় না। গোলমাল যে আসলে কোথায় তা টের পেয়ে মনে-মনে বরং আরাম বোধ কর কড়িরাম। অনুভব করে সুখী হয়, রুক্মিণীকুমারের হাল ধরার ক্ষমতা কি অসীম! চন্দ্রচূড়ের ওপরে রাগ নেই তাঁর। মোহিনীর বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। বিন্দুমাত্র অভি-মানবশত যে এত কাণ্ড ঘটাবার প্রয়াস তা নয়। বরং নিজের প্রতি তিনি আজ দ্বিধা-হীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর। নইলে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে কেমন করে নিষ্কৃতি পায় মোহিনী? নির্বিকার চিত্তে হাজার কথা শুনিয়ে দিতে চায় তাকে? সে বিস্মিত হবে কিনা ভাবে। মনের মধ্যে সেই অসহ্য দাপা-দাপি আর নেই। বরং চারদিকে তাকিয়ে যে কেমন শান্ত, স্তিমিত হয়ে আসে। দেহ-মন ঘুলিয়ে ওঠা তিক্ততা আর বিস্বাদের বদলে তার মন এখন, অন্তত মোহিনীর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে প্রায় ষোলআনা সংহত, সংযত হয়ে আসে। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে বাইরে ছুটোছুটি আর নয়। এবার নিজের কাছে ফিরে এসে ঠাণ্ডা মাথায় আগাগোড়া সব কথা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে আবি-ষ্কার করে কড়িরাম, মাথা তার রুক্মিণী-কুমারের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসছে। ভালোবাসার মধ্যে না থাক, মোহিনীকে তিনি তলিয়ে বুঝতে চাইছেন আজ। যে কারণ চন্দ্রচূড়ের চলাফেরা, কথা বলার খুঁটিনাটি নিয়ে অকারণ নিজেকে ব্যস্ত,

বিব্রত করে তোলার ইচ্ছেটুকু অবধি নেই। এমন কি তাঁরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মত মোহিনী আর চন্দ্রচূড় চুড়ের আচরণ তাঁকে স্পর্শ করে না আদৌ। বরং সবকিছুই যথাযথ, স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আজ। এতদূর এগিয়ে আসার পথ তো তাঁরই হাতে গড়া। সব ঘটনাই ঘটে আছে। মানুষ তার ভেতরে জেনে অথবা না জেনে প্রবেশ করে মাত্র। এবং তাই, জেনে-শুনে ক্ষমা কিংবা না-জানার ফাঁকিটুকুই অবজ্ঞা দিয়ে এড়িয়ে চলার বদলে ঘটনার গভীরে যাবার প্রলোভন থেকে মুক্তি পেতে তিনি নারাজ। কষ্ট হোক, শারীরিক-মানসিক অজস্র যাতনা আছে জেনেও তিনি যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর চিরাচরিত ভূমিকা ছেড়ে বন্ধুত্বের অনুরাগী।

কড়িরাম ভেবে পায় না, এতকালের শান্ত, গম্ভীর মানুষটার ভেতরেই না-জানি কিছু দুঃসহ আলোড়ন শুরু হয়েছে আজ। সেই অস্থিরতার আসল চেহারাটা স্বচক্ষে দেখতে পেলে কথা ছিল না আর। তাই মোহিনীর সঙ্গে কথা বলে, তর্ক করে গোটা অবস্থাটারই একটা আঁচ পেতে চাওয়া।

অথচ আগের মত খাতির দেখাবার বদলে মোহিনী আজ রীতিমত দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। শত হোক কড়িরাম তো চন্দ্রচূড়ের মতই তার ধনী স্বামীর বেতন-ভুক কর্মচারী। তাকে তোয়াজ দেখিয়ে নিজেকে ছোট করার মানে হয়? মোহিনী আজ বড় বেশী গম্ভীর, আত্মস্থ, নিরভি-মান।

রাতারাতি সে কি বুড়িয়ে গেল তবে? মন-প্রাণ দিয়ে বুঝতে পেরেছে, ভালো হোক, মন্দ হোক ইহজীবনে রুক্মিনীকুমারই একমাত্র গতি তার? পায়ে পা মিলিয়ে না চলে উপায় নেই? এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার ক্ষমতা তাহলে সে-ও রাখে? দুদিন আগে হলে এইসব দেখে-শুনে তৃপ্তি পেতো। এখন কেন যে অস্বস্তি বোধ করে কড়িরাম! দুর্ভাবনায় মাথার ভেতরে ভার-ভার ঠেকে তার। দুশ্চিন্তায় প্রবীণ বৃক্ষের মত নুয়ে পড়ে।

'মনটা ভালো নেই ওঁর।'

'এতকাল এখানে ছিল। তাই যাবার আগে মন খারাপ করে দেখছে কেমন লাগে।'

'ছেড়ে থাকা সম্ভব হবে তো এসব?'

'কেন হবে না। সময় পাল্টে গেছে তাই। নইলে তো বানপ্রস্থেই যেতে হত এখন।' ঠাট্টা করে কিনা বোঝা ভার। দম নেবার জন্যে খানিক থামে মোহিনী। নাকের ডগা টকটকে সিঁদুরের মত লাল। চোখের পাতা ভারি-ভারি। ভাবনায়-চিন্তায় রাত্রে ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক। ঝড় তো একা রুক্মিনী-কুমারের ওপর দিয়েই বয়ে যায়নি। তরল গলায় বেশ খানিকটা আক্ষেপ আর আফশোস মিশিয়ে মোহিনী বলে, 'মনটা টকে গেছে। ছানা কেটে গেলে দুধের যা অবস্থা হয় আর কি! ও আর ঠিক হবে না।'

কেউ ডেকে না বলুক, চন্দ্রচূড় টের পায় কী হচ্ছে আর কী হতে চলেছে। ধরা গলায় বলে, 'এ আমি চাইনি। উনি আমাকে এমন করে শাস্তি দেবেন ভাবিনি।'

কড়িরাম আজ আর তেমন করে কথা বলে না। বরং বাতাসের বুকে গন্ধ শুঁকে বেড়ায়। না জানি মোহিনীকে নিয়ে ঘরে-বাইরে সর্বত্র কানাকানি চলেছে কত কথার! একে-একে তারা সবাই চলে যাবে। নতুন যারা আসবে তাদের জন্যে তৈরী করে রাখতে হবে নতুন দিনের নতুন উপাখ্যান। ফারকুয়ারের পরে রুক্মিনী-কুমার। রোজি ফ্রান্সিসের পরে মোহিনী। চন্দ্রচূড় এই ঘটনাপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো চরিত্র নয়। বরং তার ভূমিকাটাই আজ মুখ্য। আগামীকালের ইতিহাসে সে-ই তো নায়ক। নিপুণ সূত্র-ধরের মত ঘটনার মালা গেঁথে যাবে শুধু কড়িরাম। তাছাড়া আর কী-ই বা করণীয় আছে তার?

'ভয় পাচ্ছেন?' প্রচ্ছন্ন, রহস্যময় দৃষ্টি তুলে বলে, 'একদিন সবাই পায়। কিন্তু এ যে সোনার শেকল। বাঁধন তাই লাগে না। দেখবেন, একদিন এই শেকলই মনে হবে মণিহার। ফারকুয়ার বলুন আর রুক্মিনী-কুমারই বলুন, সকলেরই এক হাল। আপনার বেলা উল্টো কিছু ঘটবে, তাই কি হয়? দিনে-দিনে সব সয়ে যাবে, সব।'

সান্ত্বনার সুরে কথা বলে কড়িরাম। তবু পরিহাস মনে হয়। নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করে চন্দ্রচূড়।

টিলার গা বেয়ে নিচে নামতে-নামতে ফারকুয়ারের সেই বাংলোটা চোখে পড়ে। ভাঙা পাঁচিলঘেরা দরজা-জানলাহীন অন্ধকার বাড়িটাই আজ তাঁর বুকের মত শূন্য, খা-খা করে। যেতে-যেতে অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে। ব্রোমাইড জলে-ধোওয়া ছবি যেমন, তাঁর অতীত ঠিক তেমনি অস্পষ্ট, ধূসর এবং বিবর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের দুঃসহ সেই দিন আর সেদিনের সেই দুরন্ত কিশোর আজ কোথায়। বহু-দূর দিগন্ত থেকে ছুটে-আসা অন্ধ, উন্মত্ত জলকল্লোল কানে বাজে। আবদ্ধ সেই স্রোতের মুখের পাথর আর নুড়িগুলিই সরিয়ে দিয়েছে কে! নতুন করে আর নয়। যেন পুরাতন সেই জলধারা, বন্ধনহীন, উধাও, উদ্ভ্রান্ত তরঙ্গরাশি লক্ষ লক্ষ হাত তুলে ছল-ছল, কল-কল শব্দে তাঁকে তলিয়ে দিয়ে ফের তুলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কোথায়, কতদূরে তা কেউ জানে না। কিন্তু কার কাছে যাবো আমি? কে আছে আপন? কে আর নিবিড় করে বুকের কাছে টেনে নেবে আমায়? নিশ্চিন্ত ঠাঁই দিয়ে বলবে, ভয় নেই, আমি আছি। চিরদিন তোমার হয়ে আমিই থাকবো মনে রেখো!

বাঁয়ে সারি-সারি নিম আর শিরিষ। এসবই এখন বৈজুপ্রসাদের দখলে। লোকটা লাল হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। একদিন হয়তো গোটা এলাকার মালিক হয়ে বসবে। আগে হিংসে হত ভেবে। আজ মায়া হচ্ছে কেন যে! অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। চেনা যায় না, স্পষ্ট করে বোঝা যায় না কিছুই। এতোয়ারির মাঠ পলকে উধাও হল যেন। পথের দুপাশে বিচ্ছিন্ন হেঁতাল। সহসা আঁতকে উঠে দূরে-দূরে ছিটকে সরে যাচ্ছে। এসবই আমার। একদিন আমার ছিল এসব। এখানে আমি ছিলাম। অন্ধকারে এসেছিলাম, আজ আবার নিঃশব্দে অন্ধকারেই ফিরে চলেছি কোথায় তা জানিনে। আবার যদি ইচ্ছে হয়, যদি ফিরে আসি কোনোদিন, আমাকে চিনবে তো? দেখামাত্র চিনে নেবে তো সবাই? আমিই কি চিনে নিতে পারবো সব? ভাবতে-ভাবতে তাঁর মনে হল, এই অন্ধকারের শেষ নেই, সীমা নেই, তল নেই। এই অতল, অসীম অন্ধকারে নিজেকে নতুন করে নিঃসঙ্গ মনে হল তাঁর। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য যেমন অশান্ত নট-বালকের মত কোনো এক মহাসূর্যের দিকে নিয়ত ধাবমান, তিনিও তেমনি এক দিগন্ত থেকে অন্য এক দিগন্তের সীমাহীনতায় ছুটে যেতে চেয়ে অস্থির, উদভ্রান্ত, পাগল। এবং এই তাঁর নিয়তি যার হাত থেকে মুক্তি নেই। যে-মুক্তির ভেতরে শান্তি নেই। তাই অতৃপ্ত, অশান্ত এই চলা।

'শীত করছে?'

'না।' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল মোহিনী। মাথা নাড়ল। নিজের অজ্ঞাতে ঘনিষ্ঠ হল আরো।

কাঁধ থেকে ভাঁজ করা র‍্যাপারখানাই স্নেহময় পিতার মত পরম মমতাভরে মোহিনীর গায়ে জড়িয়ে দিলেন রুক্মিনী-কুমার। কদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। দুপাশে খোলা মাঠ। থেকে থেকে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাওয়া। হাওয়ায় ঘাস-মাটি অরণ্যের স্নিগ্ধ সুবাস। দূরে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা ছোট ছোট গ্রাম। কুটিরে, আঙিনায় আলোর অস্পষ্ট রেখা। মাদলের দ্রিমি-দ্রিমি শব্দ শোনা যায়। একবার ওই গাঁ থেকেই অচেতন ফারকুয়ার সায়েবকে কাঁধে করে বয়ে এনেছিলেন। এখনো ওই গাঁ থেকে মেয়ে-পুরুষেরা দল বেঁধে খাদে কাজ করতে আসে। সন্ধ্যায় ফিরে যায়। কিছুই হল না জীবনে। যদি ওদের মতই হেসে-খেলে নিশ্চিন্তে ফুরিয়ে দেয়া যেতো সব! অথবা ফারকুয়ারের মত বাধা-বন্ধহীন হতাম যদি! না, ভাবা যায় না। সংসারে নিজের মত ছাড়া আর কারো মতই হওয়া যায় না। নইলে ফারকুয়ার গিয়েছিল, আজ আমিও চলেছি। এই দুই যাওয়া তবু এক নয়। চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। ওরা জানে না কিছুই। সকালবেলা যখন একে-একে আসবে সবাই [illegible] অবাক হবে, তিনি নেই। কথাটা ভেবে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। এখন তিনি অনেক দূরের মানুষ। [illegible] আছেন। তিনি [illegible] কারো নন, আলাপ নেই কারো সঙ্গে। দিনে-দিনে

কোথা দিয়ে আর কেমন করে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব জানা নেই। যাবার সময় বার-বার মনে হচ্ছে, ওরাই তাঁর আপন ছিল। ওরাই ছিল নিকটতম জন। তাহলে পরিচয়ের সীমা ছেড়ে কোথায় চলেছেন আজ? সে যে নতুন জগৎ। এখন অপরিচয়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই যত ভয়। বয়স তো আর কম হল না। সবাই যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে? সবাই যদি দূরে সরে যায়, কেমন আড়ষ্ট বোধ করেন। কথাগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরে দুরু-দুরু কাঁপুনি শুরু হয়। তাহলে কি এমনি করেই মরে যাচ্ছি আমি? চিরদিনের মত নিঃশেষ হতে চলেছি?

'চন্দ্রচূড়।'

'বলুন।'

'তুমি আমার ঠিকানা চেয়েছিলে, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল চন্দ্রচূড়। অন্ধকার আরো ঘন মনে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। এত কাছে থেকেও মোহিনীকে চেনা যাচ্ছে না। চোখে চোখ পড়লে অবাক হত চন্দ্রচূড়। মরা মাছের মত স্থির, শীতল চাউনি তার। যেন কান আছে তাই শুনে যাচ্ছে সব কথা। বোঝার সাধ্য নেই। অথচ সাধ হয় অন্তত একবার মোহিনীকে দেখার। হয়তো এই দেখাই জীবনে শেষ দেখা তার। একটু পরেই তো কে কোথায় চলে যাবে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত দূরে অদেখার আড়ালে তারা একা আর অসহায় পড়ে থাকবে দুজন। মনে-মনে আজ তাই আফশোষের অন্ত নেই। নিজেকেই অসহ্য ঠেকে এখন। বড় ক্লান্ত লাগে। অথচ কত কথাই যে বলতে চেয়েছিল চন্দ্রচূড়। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম। ঠিক তুমি যেমন আমাকে চাও। কিন্তু তোমার মত সাহস অথবা শক্তি আমার ছিল না। আর ছিল না বলেই এত দুঃখ এত গ্লানি সইতে হচ্ছে আমাকে। কথাগুলি নিজেকে শোনায়। শোনাতে ভালো লাগে। অকপটে বলতে ইচ্ছে করে আমি হেরে গেছি মোহিনী। মন আর বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এতদিন। অহরহ আমার বুকের ভেতরে সস্নেহে লালিত ইচ্ছা বাসনা ও স্বপ্নের মৃত্যু ঘটিয়ে এখন বিক্ষত বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত। রক্তপাত আর সইতে পারিনে। অথচ সাহসভরে চেঁচিয়ে বলতে পারিনে, থেকে যাও চিরদিনের মত থেকে যাও। এখন থেকে তুমি আমার শুধু আমার। আহা! 'ভালোবাসি' এই কথা কি চেঁচিয়ে বলা যায়? বলতে পারে কেউ? মোহিনী তুমি পারো? আমি পারিনে যে!

'একটাই তো মানুষ। হাজারটা ঠিকানা রেখে কী লাভ চন্দ্র? তাছাড়া ঠিকানা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ সংসারে অন্তত তুচ্ছতম কাজটির জন্যেও ডাক পড়ে তার। আজ আর আমার কোনো কাজ নেই। আজ আর আমার কোনো কথা নেই। আজ আর আমার কোনো পিছুটান নেই। যে ছিল এবার থেকে সে তো সঙ্গে রইল আমার। এখন আমি ছুটির দেশে চলেছি। সে-দেশ যে আরো বিশাল। সেখানে অকাজের কাজেই মত্ত সবাই। কেউ কারো কথা ভাবে না। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাচ্ছ না। তাহলে ঠিকানা কেমন করে দিই? কোথায় পাবে ঠিকানা? যেন তাঁর গলায় ভবিষ্যৎ কথা বলছে। একটুও উত্তেজিত মনে হচ্ছে না। গলা কাঁপছে না আদৌ। বরং আরো শান্ত, আরো স্থিতধী মনে হচ্ছে তাঁকে। এই মানুষটাই এতদিন লুকিয়েছিল কোথায়?

চন্দ্রচূড় আরেকবার মোহিনীর দিকে তাকাল। অন্ধকারে অসাড় হয়ে বসে আছে। কেবল গাড়ির গতির সঙ্গে দেহটা অল্প দুলছে। সামনে হেডলাইটের আলোয় পথের দু'পাশে ছুটন্ত গাছ-পালা, কাঁটাঝোপ, মাটির ঢিবি চোখের ওপর নেচে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। এইবার পুলের ওপরে উঠে এল তারা। নিচে অন্ধকার নদী। মোহিনী কি টের পাচ্ছে না কিছুই? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি। গাড়ির চাকা ইঞ্জিনের মিলিত শব্দটাই কেমন অদ্ভুত ঠেকছে আজ। সে যেন কবে, কোন্ যুগে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে! পরিচিত যারা একে-একে আজ তারা ফিরে যাচ্ছে সবাই। কেবল তার জন্যে অনন্ত নির্বাসন। একবার জানলার ফাঁকে মাথা গলিয়ে নিচে গভীর অন্ধকারে চোখ রাখল। কিছুই দেখতে পেল না। না জল না নদী। একদিন মোহিনীকে নিয়ে এখানে এসেছিল। তখন জল ছিল অল্প। এখন শুধু বালি আর বালি। পিকনিকের অছিলায় আর কোনোদিন এখানে আসবে না চন্দ্রচূড়। চুপি-চুপি মোহনীর হাতখানা মুঠোর ভেতরে টেনে নিল। বাধা দিলে না মোহিনী। বরং নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আরেকটু সরে এল। চন্দ্রচূড় ড্রাইভারকে দেখল। ড্রাইভারের পাশে রুক্মিনীকুমারকে। না, পেছন ফিরে তাকাবার গরজ নেই তাঁর। তবু গুলিয়ে যাচ্ছে সব। কথা বলার শক্তি আর নেই। থাকলেই কি শুনতে পাবে মোহিনী? কোনো কথাই যে কানে যাচ্ছে না তার। তবে সে-ও কি পালিয়ে যেতে চায়? ঠিকানা থেকে ঠিকানাহীনতায় চলে যেতে? তাহলে আমি আর কী নিয়ে থাকি? এই দূর নিঃসঙ্গ প্রবাসে আমার হয়ে কে আর রইল তবে? মোহিনী যদি সরবে ঘোষণা করে এখন শুধু একবার, না আমি যাবো না আর! এই ঘর শূন্য করে কোথাও যাবো না! চন্দ্রচূড়কে একা ফেলে, বন্ধনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে বৃহত্তের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোভ নেই, বাসনা নেই আমার। বরং সকল স্বপ্ন থেকে স্বপ্নহীনতায় চলে যেতে চাই। জীবনকে নিয়ে জীবনের মত বেঁচে থাকতে। কিন্তু তেমন কথা কি বলবে, বলতে পারবে কোনোদিন? সময় আছে আর? মোহিনী, তুমি কি সত্যিই ভুলে যাবে?

'বরং একটাই ঠিকানা থাক। সে-ঠিকানা তোমার। বন্ধনের ঠিকানা থাকে, মুক্তির তো কোনো ঠিকানা নেই। আজ আমি মুক্ত, চন্দ্র।'

আনন্দে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে তিনি এবার চোখ বুজলেন। চুপ করে রইলেন। সব কথা, সমস্ত ভার লাঘব হলে মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত, নির্ভার হতে পারে তেমনিভাবেই বসে রইলেন রুক্মিনীকুমার। তাঁর চোখের পাতায় স্নেহ-শীতল হাত রাখল অন্ধকার যা সারা দেহে ক্লান্তি আর ঘুমের আমেজ এনে দেয়। এখন যেদিকে খুশি গাড়ি ছুটে যেতে পারে। বাধা দেবেন না, আপত্তি জানাবেন না।

বিকেলেই কথা হচ্ছিল কাল।

'এবার নতুন মানুষ এলে কার কথা শোনাবে কড়িরাম?'

শুনে ভেতরে-ভেতরে কেন্নোর মত গুটিয়ে যাচ্ছিল কড়িরাম। কেমন কুণ্ঠা বোধ করছিল। প্রশ্নটাই আচমকা আর খাপছাড়া ঠেকছিল তার। বার-বার কেশে গলা সাফ করেও কিছুই বলতে না পারার অস্বস্তি আরো দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। এদিকে রুক্মিনীকুমার তখনো তার দিকে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছেন দেখে অমতা-আমতা করে বলেছিল, 'বলার ইচ্ছে ঠিক হয় না সব সময়। তবে কি জানেন, ফারকুয়ারের ওই বাংলোটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মনটা উদাস হয়ে যায়। বুকের ভেতরে অসহ্য কষ্ট হতে থাকে। সবই যে আমার চোখে দেখা। এত চেনা, এত আপন ছিল সব! সেসব কেমন করে ভুলি?'

তখন মূর্তির মত নিষ্প্রাণ, অবিচল মনে হচ্ছিল তাঁকে। কিছুবা করুণ। এখন আর বেশী দূরে বিচরণের সাধ্য নেই। অভিলাষ অথবা রুচি। বরং যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে শোনা যায়। সিন্ধুকাফির সুদীর্ঘ আলাপের মত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা যায়, কী ছিলাম আর কী হয়েছি। এখন বাসনাহীন, রিক্ত এই ঘাটের কিনারে পড়ে আছি শেষ খেয়ার আশায়।

'তবু নতুন মানুষ এলে এই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কি মনে পড়বে না তোমার? বুকের ভেতরে টন-টনিয়ে উঠবে না কখনো? কারো মুখ, কোনো কথাই কি তোমাকে তেমন করে সাড়া দেবে না কড়িরাম? আমি কি তোমার কেউ নই?'

'তা হয়তো দেবে। আমি তো পাষাণ নই।' কড়িরাম ঢোক গেলে। তাকে অসহায়, আর্ত মনে হল। যেন অন্ধের মত আদিগন্তব্যাপ্ত আলোর সংসারে পরিচিত শব্দ-গন্ধ-বর্ণের স্পর্শ পেতে চেয়ে নিঃশব্দ, কাতর এবং উদগ্রীব। ভেজা গলায় বলে, 'কিন্তু এবার আমারও গল্প বলা শেষ। আর আমি কাউকেই কিছু বলবো না ভেবে রেখেছি। পুরানো দিনের এইসব কথা বলতে ভয়ানক কষ্ট হয় আমার। এই কষ্ট বাইরের মানুষ বোঝে না। একবার শুরু হলে শেষ করবার দাবী তোলে সবাই।'

'কিন্তু শেষ কথা কেউ জানে? তুমি জানো, কোথায় সমাপ্তি কার? কিসে কার

অবসান?' বলে হাসেন। একটা ম্লান, বিষণ্ণ আভা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সান্ত্বনার মত মিষ্টি, সুরেলা গলায় বলে যান, 'জীবনে শেষ কথা তাই নেই। বলতে পারো, গাছের শেষ বীজে, না বীজের শেষ গাছে? পরিণতি, কাকে বলবে তুমি? কোথায় টানবে উপসংহার? আসলে গল্পের কোনো শুরু নেই। শুরু হয় আমাদের মর্জি-মাফিক। ইতিহাসেরও তাই শেষ নেই। আদি নেই, অন্ত নেই। তাহলে কোথায়, কেমন করে একটি সরলরেখা টেনে দিয়ে তুমি বলবে, ইতিসমাপ্ত?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন। এখন চুপ করে কড়িরামের দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসেন। ঘরে-বাইরে আর কোথাও, কোনো রকম শব্দ নেই। যেন মূক, স্তব্ধ হয়ে উত্তরের অপেক্ষায় কাল গুনছে সবাই।

মাথা হেঁট করে অনেকক্ষণ বসে থাকে কড়িরাম। হয়তো যুক্তির কাছে হার মেনে নিতে হচ্ছে তাকে। অবশেষে শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে কথা বলে, 'তাই তো মনস্থ করেছি, এবার থেকে বোবা হয়ে যাবো। একেবারে ইঁট-কাঠ-পাথরের মত মৌন।'

'না, তা হয় না কড়িরাম!' বাধা দিয়ে দ্রুত কাছে আসেন রুক্মিনীকুমার। বলেন, 'তোমাকে ছেড়ে গিয়ে নিদারুণ কষ্ট পাবো আমি। দীর্ঘদিনের একমাত্র বন্ধু ছিলে তুমিই। এখনো তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার সান্ত্বনা। অনেক দূরে গিয়েও যদি মন আর না মানে, এখানকার কথা ভেবেই যদি উতলা হয়ে উঠি কোনোদিন, তাহলে তোমার কাছেই ফিরে আসবো আবার। সেদিন কিন্তু যথার্থ বন্ধু হয়েই ফিরে আসতে চাই, প্রভু হিসেবে নয়। তখন তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরালম্বের অবলম্বন। জানি, তুমি থাকলে সব থাকবে আমার। সারা জীবনের শ্রম আর সাধনা দিয়ে যা পেয়েছি, গড়ে তুলেছি যতটুকু, তোমার হাতে তা নিশ্চিহ্ন হবে না, বিনষ্ট হবে না, লুপ্ত হবে না কখনো। চন্দ্রচূড় ছেলেমানুষ, কিন্তু সৎ। তার মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখি নি আমি। তাকেও তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি, সে তোমাকে প্রতারণা করবে না কোনো দিন। অসম্মান করবে না।'

'বয়েস হয়েছে ঢের।। এবার যে আমিও ছুটি চাই?' বেশ টেনে-টেনে ভেজা গলায়, ক্লান্ত সুরে কথা বলে কড়িরাম। তার কথা শুনে থমকে যেতে হয়। এ যেন সেই পরিচিত মানুষটি নয়। অন্য কেউ।

'চাও নাকি?' অবিশ্বাস্যভাবে তিনি যেন অট্টহাস্যে ফেটে চৌচির হবেন এবার। চোখে-মুখে কৌতুকের তরল আভাস ফুটিয়ে চেয়ে থাকেন খানিক। শেষে দম নিয়ে কথা শুরু করেন ফের। 'তুমি গেলে ফারকুয়ার সায়েবকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? রুক্মিনীকুমারের নাম যে ভুলে যাবে সবাই! এতোয়ারির মাঠের ইতিহাস সকলের অগোচরে থেকে যাবে। লোকগাথার মত সে কোন্ চারণ যুগ থেকে যুগান্তের মানুষকে শুনিয়ে বেড়াবে এই সব লোভ-হিংসা, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের কীর্তি-কাহিনী? মরে গিয়ে বেঁচে থাকার গৌরব তো নেই। কেবল তোমার মুখে মরজগতে আরো কিছুদিন টিঁকে থাকার লোভ। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না? আমাকে ভুলে যেতে চাও কড়িরাম?'

কথা শেষ হলে তিনি হাসতে চেষ্টা করেন। কড়িরাম তাঁর বুকের দ্রুত ওঠা-নামা দেখে। তিনি হাঁপাচ্ছেন। তাঁকে এখন মাতৃহীন শিশুর মতই সরল, অবহেলিত ও অবসন্ন দেখায়। ক্লান্ত, করুণ মুখে আবেগের, উচ্ছ্বাসের অস্পষ্ট রক্তিমাভা। ধীর, নিঃশব্দে শ্বাস টেনে নিতে-নিতে তিনি প্রকৃতিস্থ হতে চান। আয়েসের নির্লিপ্ত ভাবটুকুই তাঁকে এই মুহূর্তে নয়নলোভন করে তোলে। বয়সের হিসেব যেন ভুলে যায়, মনেই থাকে না কড়িরামের।

'তুমি জানো, আমি চলে যাবো? আমি কেন চলে যেতে চাই?'

'জানি।' ঘাড় কাত করে কড়িরাম। বলে, 'কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে এ কেমন চলে যাওয়া? এ যে পলায়ন!'

সে কথার জবাব নেই। তিনি যেন শুনতে পান নি কিছুই। বরং একদৃষ্টে বাড়ি-ঘর আসবাবের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে গম্ভীর, উদাস হলেন আরো। অনেকক্ষণ পরে আচমকা প্রায় আপন মনে কৈফিয়তের সুরে বলেন, 'মোহিনীকে কিন্তু নিয়ে যাবার সাধ নেই। ও স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গ নিতে চাইছে।'

'শুনেছি।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ। কথা বলা আর না বলার ইচ্ছা অথবা আগ্রহ আর যেন ব্যাকুল, বিচলিত করে না তাদের। কারণ পেছন ফিরে তাকাতে চেয়ে প্রায় একই সঙ্গে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। একদিন একই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে আজ কোথায় এসে পৌঁছুল দুজন! এখন তারা না জানি কত দূরের মানুষ! তাদের মাঝখানে ব্যবধান কি দুস্তর। আর কেউ না জানুক, কড়িরাম তো বোঝে সব! দুই মেরুর ব্যবধান নিয়ে আজ তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

রুক্মিনীকুমার কী ভাবেন। বিস্ময়-বিমূঢ় দুই চোখ মেলে কড়িরামকেই দেখেন। শেষ কথাকটিই মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া করেন। নিঃশব্দে সময় কাটে এমনি করেই। তারও পরে ধীর, মন্থর গলায় প্রায় ঘুমের ঘোরে বলার মত করে বলে যান, 'মনের অগোচরে পাপ নেই কড়িরাম। মোহিনীকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ঘটে নি আজো। তবু তাকেই আমার ভয়। সারাক্ষণ নিজেকে নিয়েই চলেছে এক অসহ্য টানাপোড়েন। এইখানে থাকলে আমি হয়তো আর আগের মত হতে পারবো না। একে-একে আমার হাতেই আমার যা কিছু সম্পদ লুপ্ত হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এসবই আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তাই পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইছি। বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি আমার এমন সাধের সাম্রাজ্য। আমি অক্ষম, তাই চন্দ্রচূড় আর মোহিনীর সহজ মেলামেশার অর্থ করতে চেয়েছিলাম নিজের মনের মত, তাদের ভেতরে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম হীন, জঘন্য ষড়যন্ত্র। অথচ কী আশ্চর্য দ্যাখো, মনে-মনে যা ভাবি মুখ ফুটে সেকথাই ওদের বলবো তেমন সাধ্য কিম্বা সাহস যেন নেই। এমনি করে চললে আমি আর কতদিন বাঁচবো বল তো?'

যথার্থ শিশুর মত আবেগে-উচ্ছ্বাসে ফেটে চৌচির হলেন রুক্মিনীকুমার।

॥ দশ ॥

এখনো মিনিট পনেরো বাকি।

গাড়ির ভেতরে মোহিনী একা। বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চন্দ্রচূড়। একবার ইচ্ছে হল যাবে, শেষবারের মত কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলবে, সব ভুল আমার। তুমি নেমে এসো, মোহিনী। এমন করে তোমার সর্বনাশ আমি চাই নি। এতকাল নিজেকে বুঝি নি তাই। নইলে কাউকে না বলে অন্ধকারে এমনি চুপি-চুপি চলে যাবার অধিকার কোথায় পেলে তুমি? যাওয়া তোমার হবে না। এসো, উঠে এসো, লক্ষ্মীটি একদিন যে সম্পদ অযাচিতভাবে এসে ফিরে গিয়েছিল, আজ এই মুহূর্তে যদি তা-ই ভিখিরির মত হাত পেতে নিতে চাই? আঁজলা ভরে পান করে নিতে চাই সবটুকু তৃষ্ণার জল? তুমি কি মুখ ফিরিয়ে থাকবে? অমাকেও ফিরিয়ে দেবে আজ?

আস্তে আস্তে ভিড় জমছে। প্রথম ঘন্টা বেজে গেছে কখন। এখন দ্বিতীয়বার ঘন্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল, সময় আর নেই। যেন সবকিছু জেনে-শুনেই ঘন্টা হাতে কুৎসিত, কদাকার লোকটা নিষ্ঠুরের মত প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেল। তেমন ক্ষমতা পেলে আজ ওকে মেরে ফেলতে পারে চন্দ্রচূড়। কিন্তু সে যে কত অসহায়, কত দুর্বল, কত অক্ষম! ঘরে-বাইরে এতদিনে তাকে চিনে নিয়েছে সবাই। গলায় বঁড়শি-গাঁথা মাছের মত সে আর কতদূর ছুটে বেড়াবে? ছিপ হাতে একজন দাঁড়িয়ে আছে কোথাও। চন্দ্রচূড় তাকে চেনে না, হয়তো দেখে নি কোনো দিন। তবু অপেক্ষা করতে হয় তাকে দেখার। সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলেও এখন শুধু ডাঙায় ওঠা বাকি।

অদূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কড়িরাম। শান্ত, বিষণ্ণ, একা। চতুর্দিকে এত মানুষ, কোলাহল। তবু তাকে যেন স্পর্শ করে না কিছুই। অথচ কড়িরামের জন্যে এখন আর দুঃখ হয় না, মায়া হয় না, চন্দ্রচূড়ের। অন্য সময় হলে কাছে যেতো, পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনার কথা শোনাতে চাইতো চন্দ্রচূড়।

রুক্মিনীকুমার কোথায়? তিনি যেন নিজেকে নিয়ে সকলের চোখের আড়াল হতে চেয়ে ব্যস্ত। লোকারণ্যে নিজেকে মিলিয়ে-মিশিয়ে কোথায় যে একা-একা ঘুরে বেড়ান! চন্দ্রচূড়ের দুই চোখ এখন তাঁকেই খুঁজে বেড়ায়। বিষণ্ন, অবনত, উদ্‌ভ্রান্ত সেই মানুষটিকেই কাছে পাবার দুরন্ত সাধ। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে একবার ইচ্ছে হল, যাবে। সব ছেড়ে সে-ও চলে যাবে। এবং ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে যায় চন্দ্রচূড়। কিন্তু গাড়ির পাদানিতে পা রেখে থমকে যেতে হয়। সাহস দেখে অবাক মানে নিজেই। এমন লোভী তো ছিল না চন্দ্রচূড়! তাহলে, কি লোভ নয়? ভালোবাসা? ভালোবাসা মানুষকে নির্লোভ করে বুঝি? চন্দ্রচূড় ভেবে কূল পায় না, মোহিনীর প্রতি এ তার কিসের টান। দেহের, না মনের? দেহ ছাড়া মন নেই। মন ছাড়া দেহ বাঁচে কী নিয়ে? এসব কথা বুঝিয়ে বলা যাবে না কাউকে। বুঝতে চাইবে না কেউ। কিন্তু মোহিনী তুমি, তুমি তো জানো সব। বুঝতে পারো, আমি কী চাই আর কী চাইনে? আমার লোভ আর লালসা, ইচ্ছা আর বাসনা, ক্রোধ আর ক্ষমা, ঘৃণা আর প্রেম। আসল কথা আজ আমি তোমার ভেতরে-বাইরে ছড়িয়ে রয়েছি। আর কেউ না জানুক তুমি তা জানো। চন্দ্রচূড় সরে এল। ভাবল, গিয়ে কী লাভ? যদি কোনো কথাই আর না বলে মোহিনী? যদি চিনতে না চায়?

'ভালোবাসার রীতি'ই যে এমনি, চন্দ্রচূড়বাবু। প্রেমই প্রেমিকের মনে আঘাত হানে। ভালোবাসাই একদিন তাকে নিঃস্ব করে পথের কাঙাল বানিয়ে ছেড়ে দেয়।'

কথাটা তার নিজের প্রসঙ্গেই উঠেছিল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে চন্দ্রচূড় প্রশ্ন করেছিল, 'এত লোকের এত ঘটনা জানেন। আপনার কি কোনো কথা নেই, কড়িরামবাবু? যা একান্তভাবে আপনার নিজস্ব?' উৎসাহে, ব্যাকুলতায় আরো অধীর মনে হয়েছিল তাকে।

'আছে বই কি!' ম্লান হাসি হেসে সাময়িকভাবে অন্তরঙ্গ হতে চাইল কড়িরাম। বললে, 'শুনবেন? কিন্তু নিজে কেঁদে পরকে হাসিয়ে কী লাভ?'

'হাসবো না। আপনি বলুন।'

'রাজা নহুসের উপাখ্যান জানেন?' বন্ধুর মত অমায়িকভাবে চন্দ্রচূড়ের কাঁধেই হাত রাখল কড়িরাম। বললে, 'একবার স্বর্গের সিংহাসন লাভ করেছিলেন নহুস। তারপর যা হয়। ক্ষমতা হাতে পেলে মাথা বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? ইন্দ্রের আসনে বসে নহুসও তাই ইন্দ্রাণীকে কামনা করলেন। এই চাওয়া, এই কামনাই হল কাল। নহুসকে আবার মর্তে নেমে আসতে হল। কিন্তু এবার আর রাজা নয়। এমন কি সামান্য মানুষ হয়েও না। দেবতা আর ঋষির অভিশাপে পৃথিবীতে সাপ হয়ে কাল কাটাতে লাগলেন।'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কড়িরামকে ভয়ঙ্কর দুঃখী মনে হল।

'আমি সেই নহুস। সাপ হয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতরে আছি। কবে আর কেমন করে মুক্ত হ'ব জানিনে।' বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল খানিক। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চন্দ্রচূড়কেই দেখল। কী ভেবে শেষে মুখে-চোখে প্রায় বেপরোয়া ভঙ্গি ফুটিয়ে বললে, 'সাপ হয়ে নহুস একাই মর্তে নেমে এসেছিল। আমি কিন্তু ইন্দ্রাণীকে নিয়েই এসেছি, চন্দ্রচূড়বাবু। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার মেয়ে মোহিনীকে-ও।'

'মোহিনী? মোহিনীর মা?'

কানের কাছেই বজ্রপতন হল যেন। বিহ্বল, বিস্মিত চন্দ্রচূড়। বাক্‌শক্তিরহিত।

'হ্যাঁ।' স্থির, অবিচলিত কণ্ঠ কড়িরামের। ক্লান্ত, মন্থর সুরে বলে যায়, 'মোহিনীর মা এখন হাসপাতালে গলায় ক্যান্সার নিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। সে যেদিন যাবে, আমিও মুক্ত হ'ব সেদিন।'

মোহিনীর কাছে দাঁড়িয়ে চন্দ্রচূড়। এখন আর মুখে কথা নেই তার। অথচ একটু পরেই শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে। জীবনে ছুটির ঘণ্টা যেন। বুকের ভেতরে ভার-ভার ঠেকে। হৃদয়ের বদলে তারই রক্ত-মাংসে গড়া হৃদ্‌পিণ্ড নামক প্রিয় বস্তুটি বার দুয়েক সশব্দে লাফিয়ে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায়। হাত-পা সর্বাঙ্গ শীতল মনে হয়। শুধু নিঃশ্বাস উষ্ণ ছিল তখনো। যে কারণ নিজেকে পুরোপুরি মৃত ঘোষণা করার আগে ভাবতে হয়। আমি কি বেঁচে আছি? মরিনি এখনো? কিন্তু পরক্ষণেই প্রাণান্তকর উচ্ছ্বাসে আর হাহাকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে-কেঁপে মুখর হতে চায়, কিন্তু কী নিয়ে আর বাঁচবো এখন? কাকে নিয়ে?

'চন্দ্র, তাহলে যাই?'

'মোহিনী, আর বুঝি ফেরা যায় না?'

'না।'

'যদি যেতে না দিই? আজ যদি সব ভুলে গিয়ে তোমার পথ আগলে দাঁড়াই?'

'ছি চন্দ্র, ছিঃ! তুমি না পুরুষ মানুষ?'

'একদিন না চাইতে এসেছিলে। আজ এসে ভিখিরির মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছি বলেই ফিরিয়ে দেবে?'

'রাতের অন্ধকারে যা একদিন ঘটনা হতে চেয়েছিল, দিনের আলোয় তাকে আর অযথা টেনে নিয়ে এসে লজ্জা দিও না, চন্দ্র। এবার যেতে দাও। বন্ধুর মত পথ ছেড়ে দাঁড়াও।'

ঠিক তখন, কোথায় অদৃশ্য এক হাত শেষবারের মত ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে, সময় নেই! সময় আর নেই! এবার তাদের বাঁধন ছেঁড়ার পালা।

মাথা হেঁট করে ধীরে-ধীরে চন্দ্রচূড় নিচে নেমে এল।

কিন্তু আরেকজন? তিনি কোথায়? রুক্মিনীকুমার? প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তিনি তখনো নিশ্চল ছবি দেখেন। আর যেন তাড়া নেই, যাবার তাগিদ নেই কোথাও। অথচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ি তখন আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলেছে। আর কান পেতে গভীর মুখ, তারও চেয়ে গভীরতর দুঃখকে বুকে চেপে অন্তরালে শেকল ছেঁড়ার শব্দ শোনে মোহিনী। তার কান্না পায়। তবু চিৎকার করে বলতে পারে না, চন্দ্র ফিরে এসো! ফিরে এসো চন্দ্র! তুমি অমন করে অন্ধকার বিষাদে লুকিয়ে কেন থাকো! আমি যে বাঁচিনে! এই বুকে বড় ব্যথা। তুমি আমার! আমার আজন্মের দুঃখ, মরণের পরে অনন্ত সুখ। গাড়ির একটানা ধাতব শব্দের সঙ্গে মিলে-মিশে কথাগুলি কে থেতলে যাচ্ছে, চূর্ণ হচ্ছে কিন্তু একে[illegible] হারিয়ে যাচ্ছে না কোথাও।

আর চন্দ্র! সে তখন সিন্দবাদের সেই নাবিক। তার চোখের সামনে পাখির প্রকাণ্ড সেই ডিম। শ্বেতপাথরের বিশাল গম্বুজ। যার ভেতরে প্রবেশের পথ খুঁজে-খুঁজে, খুঁজে-খুঁজে, খুঁজে-খুঁজে সে এখন ক্লান্ত, পরাস্ত ও ম্রিয়মান।

—শেষ—

অহীন্দ্র চৌধুরী

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর গেলাম বড় কাঞ্জীভরমে অর্থাৎ শিব কাঞ্চীতে। এখানে দেখলাম শিব-পার্বতী মূর্তি—একাম্রেশ্বর এবং কামাক্ষী-রূপে। এই এলাকার মধ্যেই কামাক্ষী দেবীর একটি আলাদা মূর্তিও আছে। এই স্থানটি কিন্তু বিষ্ণু কাঞ্চীর থেকে অনেক বড়। এসব মন্দিরাদি দর্শন এবং পূজাদি দিয়ে ফিরে এলাম রেস্ট হাউসে। ফিরে দেখি এক শিল্পী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নাম এম ভাবকেশবাচারী। সে আমাকে একটি নটরাজের মূর্তি তৈরী করে দেবে বলল। আমি বললাম যে, আমি তো আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তাতে সে বলল যে যাবার আগে স্টেশনে গিয়ে ডিজাইনটি আমাকে দেখাবে, অনুমোদনের জন্য। আমি মনে মনে ভাবলুম এত তাড়াতাড়ি কি সে স্কেচ করে আনতে পারবে। তবু মুখে বললুম : আচ্ছা তুমি নিয়ে এস স্টেশনে। দেখব তারপর কথা হবে।

সে কিন্তু ঠিক ডিজাইনটি নিয়ে এল স্টেশনে। ডিজাইন ভালোই হয়েছিল আমার পছন্দও হোল। তার সঙ্গে দর ঠিক হোল—দেড়শো টাকা। মূর্তিটি হবে ব্রোঞ্জের ওপরে। আমি তাকে তৈরী করবার অর্ডারও দিলাম—কিন্তু সে কিছু অগ্রিমের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি তাকে জানালুম যে, তাকে আমি এখন তো কিছু দিতে পারছি না। মাদ্রাজ ফিরে গিয়ে তাকে 'এ্যাডভান্স' কিছু পাঠাতে পারি। সে আর কিছু বলল না। বোধহয় কথাটা তার মনঃপূত হল না।

যাই হোক, ওখানে ট্রেনে আমরা চিংলিপটে গিয়ে সেখানকার রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে নৈশভোজ শেষ করে ১১-১০ মিনিটে ত্রিচি এক্সপ্রেসে ত্রিচিন-পল্লী অভিমুখে রওনা হলুম। কামরাটি ভালই পেয়েছিলুম এবং বেশ আরামেই ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ ভেল্লিপুরম স্টেশনে স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের জানলা ধাক্কা-ধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করতেই তিনি টিকিট দেখতে চাইলেন। আমি টিকিট দেখাতেই মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বভাবসিদ্ধ মাদ্রাজী রীতিতে বলল : 'Very sorry to trouble you Sir, thank you Sir.' বলতে বলতে চলে গেল।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতেই বোঝা গেল। এসব জায়গায় সেই সময় প্রথম শ্রেণীতে বিশেষ লোকই হত না। ও হয়ত ভেবেছিল আমাদের টিকিট নেই, যদি থাকে তো তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। 'ফালতু লোক' মনে করেই মাঝ রাত্রির আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কিন্তু যখন টিকিট দেখল—তখন সে নিজেই লজ্জিত হয়ে চলে গেল।

২৯ তারিখ ভোরবেলায় আমরা ত্রিচিনাপল্লী পৌঁছলাম।

ট্রেনে যেতে-যেতেই পথে পড়ল শৈল-মন্দির। পাহাড়ের উপরে মন্দির তৈরী হয় নি, পাহাড়েরই পাথর কুঁদে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে—আমরা অবশ্য দূর থেকেই দেখলাম, কাছে গিয়ে দেখবার আর সুবিধে হয় নি।

ওখানে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমেই আস্তানা গাড়লাম। দোতলার ওপরে সুন্দর ঘর, বেশ প্রশস্ত। পাশে রেলওয়ে রেস্তরাঁ—ওখানে সায়েবী খানা পাওয়া যায় বেশ ভালই—নীচেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সমস্ত দিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। ভাড়া খুব সস্তা—সমস্ত দিনের জন্য ৪ৎ টাকা—অবশ্য পেট্রোল ছাড়া।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে নিয়ে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়লুম তাঞ্জোরের অভিমুখে। ত্রিচিনোপল্লী থেকে তাঞ্জোরের দূরত্ব হল ৩৪ মাইল। ওখানে দেখলাম বৃহদেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরটির ভৌগলিক অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর, র‍্যামপার্ট, জলপূর্ণ গভীর পরিখা করা রয়েছে চারিদিকে। ঠিক যেন একটা দুর্গের মধ্যে এসে পড়েছি। হয়ত আগের দিনে বিধর্মী দ্বারা আক্রমণের হাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্যই এই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

এখান থেকে গেলাম সুব্রহ্মণ্য মন্দির। সেখান থেকে বাজার। পথে দেখি কয়েক স্থানে বিরাট বিরাট আশ্রয়ের নীচে রথ রক্ষিত আছে—অর্জুনের রথ, শ্রীকৃষ্ণের রথ এবং অন্যান্য দেবতার রথ। রথের সময় এ জায়গায় খুব ধুমধাম হয় এবং সে সময় ঝাড়পোঁছ হয়ে সুসংস্কৃত হয়ে শোভাযাত্রায় বার হয়। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, সুতরাং রথের যাওয়া-আসায় কোনো অসুবিধা হয় না। তাঞ্জোরের বাজার থেকে রুপো ও পেতলের ওপর খোদাই করা কিছু জিনিস-পত্র কিনে যখন আবার ত্রিচিনোপল্লী ফিরে এলাম তখন আড়াইটা বেজে গেছে। মোটর করে ৩৪ মাইল যাওয়া এবং ৩৪ মাইল আসায় বেশ পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ভ্রমণসূচী এমনই ছক বাঁধা যে বিশ্রাম করা আর ভাগ্যে ঘটল না। বেরিয়ে পড়লাম শ্রীরঙ্গমের দিকে। আরোরার মিঃ রামশেষণ ও সুন্দরেশন রঙ্গরাজ টকীজের মালিক মিঃ সদগোপের নামে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন আমার পরিচয় দিয়ে। আমার তীর্থ দর্শনে তিনি যেন সাহায্য করেন। রঙ্গরাজ টকীজ থেকে মিঃ সদগোপের সঙ্গে আলাপ করলাম এবং তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিলাম। তিনি এবং তাঁর এক সহকারী আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীরঙ্গনাথম মন্দির। ঐ মন্দিরেরই একজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঙ্গনাথম মন্দিরের প্রতিটি অংশ খুব খুঁটিয়ে সঙ্গে ভাল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

মন্দিরটি বিরাট অনেকগুলি গোপুরম আছে। এখানকার দেবতা হলেন নারায়ণ। অনন্ত শয্যায় শায়িত। ঠিক এই রকমই মূর্তি শ্রীরঙ্গপত্তমে আছে।

মন্দিরের নিজস্ব খামার আছে। যেখানে প্রয়োজনীয় সব কিছুই তৈরী হয়। ঠাকুরের ভোগের জন্য রয়েছে বিরাট পাকশালা। মন্দিরের কর্মী এবং অতিথি কেউ-ই ভোগ প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন না। এছাড়া দুধেরও অভাব নেই। গোশালা দেখেই তা বুঝলাম। শ্রীরঙ্গপত্তমের পাশ দিয়ে যেমন কাবেরী বয়ে গেছে, এখানেও সেই কাবেরী। মীনাক্ষী মন্দিরের মতো জমকালো না হলেও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয়।

শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দির দর্শন করে আমরা এলুম ত্রিচিনাপল্লীতে। এখানে দেখলাম শৈল মন্দির। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে মন্দিরটি। বাইরের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি পথে ওপরে উঠে এলাম। বৈদ্যুতিক বাতি থাকায় চলতে অসুবিধে

হয় না, তবে সুড়ঙ্গ পথে উঠতে দম বন্ধ হবার জোগাড়।

এই সুড়ঙ্গ পথে উঠতে প্রথমে পড়ে বিনায়ক মূর্তি, অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশ যেন এই মন্দিরের দ্বার রক্ষী।

মন্দিরের সামনেই উন্মুক্ত বারান্দা। চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম।

এখানেই শেষ নয় সুড়ঙ্গ পথের। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুড়ঙ্গ পথ ধরে এলাম পাহাড়ের ওপরে। যেখানে শিব-পার্বতী বিরাজ করছেন। দেখলাম শিব-পার্বতীর মূর্তি। লক্ষ্য করলাম চারদিকের প্রশান্ত পরিবেশ। ভারি মনোরম লাগলো। শুনলাম জায়গাটির আর এক নাম, দক্ষিণ কৈলাশ।

সবচেয়ে ভালো লাগলো, যখন মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সুন্দরী কাবেরীকে। বিপুল উচ্ছ্বাসে কাবেরী ছুটে চলেছে।

আবার ফিরে এসেছি স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, মিঃ সদগোপ। এক সময় কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ত্রিচিতে এলেন, কিন্তু এখানকার একটা প্রসিদ্ধ জিনিস দেখলেন না।

প্রসিদ্ধ জিনিস বলতে হীরে। এখানকার হীরে নাকি খুব বিখ্যাত। কিন্তু আমি মিঃ সদগোপকে বললাম, না বাপু, হীরে কিনতে আমি চাই না। একে হীরে চিনি না, তারপর ও কেনার সামর্থ্যও আমার নেই।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় ত্রিচিনোপল্লী ছেড়ে মাদুরা রওনা হলুম।

বেশী দূরের পথ নয়—বেলা ১১টার সময় এসে পৌঁছলুম মাদুরা। স্টেশনে নেমে দেখি মিঃ সুন্দরশান আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্টেশনে। একটি গাড়ীও ঠিক করে রেখেছেন। আমরা যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছি কয়েকজন হকার ছুটে এল আমাদের কাছে তাদের পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে। নতুন লোক দেখলেই তারা বুঝতে পারে, তার ওপর বাঙালী বলেও বুঝতে পেরেছে। তারা জানে যে তাদের এইসব টুকি-টাকী জিনিস নতুন লোকেরাই কেনে। স্থানীয় লোকের কাছে এদের তেমন কদর নেই।

যাই হোক তাদের কাছে যে সব জিনিস দেখলুম তা এমন কিছু ভাল নয়—সব সস্তা, খেলো জিনিস।

আমি তখন তাদের বললুম : এমন কিছু জিনিস দেখাতে পারো, যা চট করে মনে ধরে যায় এবং যা সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

তাদের মধ্যে একজন বলল ভাঙা ইংরাজী এবং আকারে ইঙ্গিতে : আপনি দু' একটা জিনিসের নাম করুন, দেখি যোগাড় করে দিতে পারি কি-না।

আমি তখন তাকে বললাম একটি নটরাজের মূর্তির কথা। সে দুই এক মিনিট কি যেন ভাবলো—তারপর বললো—'আচ্ছা স্যার, আমি এনে দেব আপনি যা চাচ্ছেন।

আমি বললাম : ঠিক আছে, তুমি ডাক বাংলোতে নিয়ে এস। আমি ওইখানেই থাকব।

লোকটি 'নমস্কারম' বলে চলে গেল।

আমরা ডাক বাংলোয় চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে লাঞ্চের বিষয় বলে দিলাম ডাক-বাংলোর তত্ত্বাবধায়ককে। ডাক-বাংলোর ছাদ থেকেই মীনাক্ষী মন্দিরের বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রথম দর্শনেই মন্দিরের বিরাটত্ব সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হল। এত বিরাট যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে—

—মিঃ নমস্কারম্।

পিছন ফিরে দেখি সেই হকার—যাকে আমি নটরাজ মূর্তির কথা বলেছিলাম। আর তার সঙ্গে একটি লোক। সে সত্যিই একটি চমৎকার ব্রোঞ্জের তৈরী নটরাজ মূর্তি নিয়ে এসে হাজির। দূরে থেকে মূর্তিটি দেখেই মনে ধরে গেল। কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম যে মূর্তিটি যেমন সুনির্মিত তেমনি ভারী। সবই নিখুঁত, শুধু একটি জিনিস নেই সেটি অগ্নি-গোলকের বৃত্তটি যা নটরাজের মূর্তির চারি পাশে থাকে।

তার সঙ্গে দর কষাকষি করে ২৫০্ টাকা থেকে ১৫০্ টাকায় রফা হল। সুন্দরেশান বলল যে এ মূর্তির পক্ষে ১৫০্ টাকা অন্যায্য নয়। আমি তখন তাকে বললাম : আমি তোমাকে এখন ১০০্ টাকা দিয়ে যাচ্ছি—তুমি মূর্তিটি মিঃ সুন্দরেশানের কাছে জমা রাখ। তারপর মাদ্রাজ থেকে আমি বাকী ৫০্ টাকা পাঠিয়ে দেব। তাতেই সে রাজী হল।

আমি টাকা দিয়ে দিলুম—সুন্দরেশান মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে তার অফিসে রেখে দিল।

আমরা এদিকে লাঞ্চ খেয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলুম। সুন্দরেশান এল সাড়ে তিনটার সময়। আসবার সময় তার এক বন্ধুর গাড়ী নিয়ে এল। তারপর তার সঙ্গে আমরা গেলুম টেম্পাকুলাম সরোবরে। সরোবরের মাঝখানে একটি জলটুঙ্গী গোছের জায়গা নৌকা করে যেতে হয়। স্থানটি অনেকটা দ্বীপের মত। স্থানীয় লোকদের উৎসব উপলক্ষ্যে এই স্থানটি ব্যবহৃত হয়। ওপরে উঠবার সিঁড়িগুলি বেশ সন্তর্পণে উঠতে হয়।

টেম্পাকুলামের পর আমরা গেলুম তিরুমল নায়েকের প্রাসাদে। এই প্রাসাদটি এখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কর্তৃপক্ষ দখল করেছেন। ট্যুরিস্ট বা পর্যটক সম্প্রদায় প্রাসাদটি ঘুরে দেখতে পারে। সঙ্গে গাইড অবশ্য এর কাহিনী চুপি-চুপি বলতে থাকে—এই তিরুমল নায়েক এক সময় নায়েক বংশের রাজা ছিলেন—তিনি মাদুরায় এক সময় রাজত্ব করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এই প্রাসাদটি এখনও খুব যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়েছে।

সন্ধ্যার সময় আমরা গেলুম মীনাক্ষী মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এল প্রবল বেগে বৃষ্টি। আমরা তখন মন্দিরের চত্বরের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। চারিদিক ঢাকা, সুতরাং ভিজতে হোল না। ড্রেন পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হল যেন কোনো জল-প্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

ওখানে নটরাজ, মীনাক্ষী, সুন্দরেশ্বর শিব, পার্বতী প্রভৃতি আরও বহু মূর্তি রয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল শিব ও পার্বতীর নৃত্য প্রতিযোগিতার মূর্তি। এই শিব পার্বতীর নৃত্য সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। সেটি হল একদিন শিব আর পার্বতীর নৃত্যের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কে ভাল নাচতে পারে। শিব যখন কিছুতেই পার্বতীর সাথে পেরে উঠছেন না তখন শিব করলেন কি নাচের মধ্যে হাত দিয়ে নিজের কর্ণ ভূষণ [illegible] দিয়ে পা দিয়ে সেটি আবার [illegible] পারলেন। পার্বতী তখন সলজ্জে জানালেন যে এই উদ্ভট ভঙ্গী তাঁর দ্বারা সম্ভব নয় তিনি পরাজয় স্বীকার করছেন।

এর মণ্ডপের মধ্যে হাজারটি স্তম্ভ আছে। এখানে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—[illegible] শঙ্খ [illegible] এগিয়ে [illegible] দর্শন করলাম [illegible] পূজা [illegible] আর কী [illegible]। তারপর ফিরে এসেছি নির্দিষ্ট ডাক-বাংলোয়। সুন্দরেশান ও তাঁর বন্ধুটি কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন, তারপর তাঁরা চলে গেলেন নমস্কার জানিয়ে। আমিও তাঁদের অকৃত্রিম ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি নি।

আগে থেকে ঠিক ছিল সকালেই আমরা মাদুরা ত্যাগ করবো। সেই মতো বলেও রেখেছিলাম কুলিদের। তারা ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম ভাঙালো।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েছি। ছটা বাজতে আমরা পৌঁছেছি স্টেশনে। সুন্দরেশান এসেছেন আমাদের বিদায় জানাতে। সত্যি মানুষটি কদিনে আমাদের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছে।

ছটা আটত্রিশ মিনিটে আমাদের ট্রেন স্টেশন থেকে ছাড়লো। কিন্তু কয়েক মাইল এসে আচমকা ধু-ধু করা মাঠের মাঝখানে ট্রেন থেমে গেল। শুনলাম, লাইন খারাপ হয়েছে, মেরামতের কাজ চলছে। ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ধূ-ধূ করা মাঠ। অবারিত, রুক্ষ। শুধু মাঝে মাঝে বাবলা গাছ রয়েছে। গাছগুলোও যেন কেমন। শ্রী নেই ছাঁদ নেই।

এখানে হাওয়ার গতি কোন সময় পূবে থেকে পশ্চিমে, কখনো পশ্চিম থেকে পূবে। ঝাঁকড় বাবলা গাছের ডালপালাও হাওয়ার গতির সঙ্গে কেমন যেন পাকিয়ে গেছে। কী করবো, বসে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছি। দেখছি বাতাসে বাবলা গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো দুলছে।

নেমে এসেছি ট্রেনের কামরা থেকে। কাছে-পিঠে ইতস্তত ঘুরে ঘুরে দেখছি। বাবলা গাছ থেকে প্রচুর আঠা বার করে নেওয়া হয়। যা আমাদের অনেক কাজে লাগে। এ-ছাড়া এক সময় অর্থাৎ যুদ্ধের সময় দেখেছি, যে কাঁটার ভয়ে পা বাড়াতে পারছি না, এই কাঁটা কুলীন হয়ে স্থান পেয়েছে অফিসে আদালতে—সর্বত্র পিনের তখন একান্ত অভাব। এই বাবলা কাঁটায় তখন কতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র গ্রথিত হয়েছে, তার ঠিক নেই।

পুরো দুটি ঘণ্টা আমাদের সেই মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করতে হলো। তারপর ট্রেন ছাড়লো।

চলতি পথে তেমন কিছু নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। তবু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি, যদি নতুন কিছু দেখতে পাই।

দুপুরের পর মণ্ডপম্ স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়ালো। এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করলাম।

মণ্ডপম থেকে পামবান্। পামবানে স্টেশন প্ল্যাটফরমে অজস্র অপেক্ষমান যাত্রী। শুনলাম এরাও সব রামেশ্বরমের যাত্রী।

রামেশ্বরে এলাম।

ইতিপূর্বে আমার মা ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেছিলেন—রামেশ্বরমও এসেছিলেন। এখানে তাঁকে যে পাণ্ডা সাহায্য করেছিল সেই পাণ্ডার ঠিকানায় আমি বম্বে থেকেই একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। স্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখার পর দেখি সেই পাণ্ডা মশায় ঠিক এসে হাজির। আমাকে তো সে চেনে না—কিন্তু বাঙালী পোশাক দেখে সে আমাকে ঠিক খুঁজে বার করল। মজার ব্যাপার হোল সেদিনের তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে বহু বাঙালী ছিল, আর ছিল গুজরাতী।

এই ভিড় দেখে আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। পাণ্ডা বললে যে কোনো ভয় নেই—ধর্মশালায় আমাদের জন্যে সে আগেই জায়গা বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছে। পাণ্ডামশাই আমাদের নিয়ে গেল ধর্মশালায়—কিন্তু জায়গাটি আমাদের মোটেই পছন্দ হলো না; জায়গাটি কি রকম যেন ঘিঞ্জি এবং অত্যন্ত পুরনো তার ওপর স্নান ও শৌচাগারে নিজস্ব স্বাধীনতা নেই—বারোয়ারী ব্যাপার। পাণ্ডামশায় তখন আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরের রেস্ট হাউসে।

এটাও অপরিষ্কার এবং জরাজীর্ণ। অবহেলা এবং অমনোযোগের ফলে রেস্ট হাউসটি এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে—অথচ এইখানে আগে বহু নামজাদ লোক থেকে গেছেন একদিন দুদিন করে। ভিজিটর্স বুকে আমি বিচারপতি স্যার মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখলাম। লোকজন এখন বেশী আসে না—সে জন্য ঘরগুলি সব বন্ধই থাকে। ঘর খুলতেই কয়েকটা চামচিকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। এই দেখে আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে হলো না। জিনিসপত্র সব দালানেই নামিয়ে রাখলাম। জায়গাটা আর কিছু না হোক ধর্মশালার থেকে তো ভাল।

রেস্ট হাউসের তদারককারীকে ডেকে পাণ্ডাঠাকুর বলে দিল এই দালানটিই বেশ ভাল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতে। অনেক দিন পরে সে একজন ভাল মক্কেল পেয়েছে। আর জিনিসপত্রগুলির ওপর যেন ভাল রকম নজর রাখে।

পাণ্ডাঠাকুরই আমাদের গাইড হলো—প্রথমে আমরা গেলুম রাম লক্ষ্মণ ও সীতা কুণ্ড দর্শনে। ওখান থেকে গেলাম তিন মাইল দূরে রামঝরকা—গো-যান ছাড়া কোনো যানবাহনাদি পাওয়া গেল না। এখানে একটি ঘরে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে—তারই পূজো হয়।

একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল এখানে—এই ঘরের বাইরে সমুদ্রের সে কি বিরাট গর্জন, কান পাতা যায় না কিন্তু এই ঘরের ভিতর সব শান্ত—কোনো আওয়াজ নেই। এটা দেবতার মহিমা, কি শিল্পীর নৈপুণ্য এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তীর্থস্থানে দেবতার মহিমাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে এই ঘরের ছাদের ওপর গেলাম—সেখান থেকে সমস্ত রামেশ্বর শহরটিকে সুন্দর দেখা যায়—দূরে ধনুষ্কোটিও দেখা যায়। রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোটি যেভাবে সমুদ্রে বেঁকে গেছে তা দেখতে অনেকটা ধনুকের মত। ওপারে ধনুষ্কোটির জাহাজঘাটায় দেখলাম একটি সিংহল যাবার ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই সেতুবন্ধ হয়েছিল—শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনাবাহিনী এই সেতু দিয়ে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কা আক্রমণ করেছিল। মণ্ডপম থেকে পামবান ব্রিজ ধনুষ্কোটি পর্যন্ত প্রসারিত যে সেতুটি আছে সেইটিই রামায়ণে বর্ণিত বানর সেনাদের দ্বারা তৈরী কিনা—সে গবেষণায় প্রবৃত্ত না হওয়াই ভালো।

ওখানে বেশ মোটামুটি একটা গরজী বাজার আছে। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে মিলে কিছু বাজার করে রেস্ট হাউসে ফিরে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানটি বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক আলো নেই বলে কয়েকটি বড় বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। রেস্ট হাউসের তদারককারী একটা তোলা উনুন এনে দিল—সুধীরা তাইতে রাত্রের রান্না চাপিয়ে দিল। আমি আর কি করি—কাছে একটা তক্তাপোষ ছিল—সেইটাতে বসে ডায়েরী লিখতে সুরু করলাম। এ ক'দিন বিরামবিহীন ঘোরাঘুরিতে কয়েক দিনের ডায়েরী লেখা হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুর বা ছড়িদার যাই বলুন, একজন চৌকিদারকে সঙ্গে করে এসে হাজির। সে তাকে বিশেষ করে বলে দিল যে আমি কলকাতা থেকে এসেছি—খুব নামী লোক রাত্রে যেন এখানে পাহারা থাকে সব সময়।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় নিয়ে গেল আমাদের রামেশ্বর মন্দিরে—সেখানে গিয়ে আরতি দেখলাম। রামেশ্বর মন্দিরের বাইরের বহুদূর প্রসারিত দালানে যে কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভগুলি আছে এতদিন তা শুধু ছবিতেই দেখেছি, এখন সেগুলি চোখের সামনে দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। এ যে কি বিরাট এবং অপূর্ব তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এখানে প্রতিদিন একটি করে পরিক্রমা উৎসব হয়, ব্যাপারটি হোল প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পরে কারুকার্য খচিত জমকালো একটি ডুলীতে করে শোভাযাত্রা করে প্রচুর শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্য সহকারে শিব আসেন পার্বতীর গৃহে, আবার সকাল বেলায় সেই রকম বাদ্য সহকারে সেই ডুলীতে করে শিব তাঁর নিজের ভবনে ফিরে যান। এই শোভাযাত্রা মন্দির সংলগ্ন দালানের চারিপাশ পরিক্রমা করে। প্রতিদিনই এই ব্যাপার হয়—এই সময় বহু লোক জমায়েৎ হয়। তা হলেই মনে করুন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যগুলিতে জনসমাগম কি বিরাট হয়।

মন্দিরের কাছে নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর শাঁখ বিক্রি হয়। ভারী সুন্দর দেখতে সেগুলি। আমি ঘুরতে ঘুরতে যত রকম শাঁখ সেখানে ছিল সবগুলিই কিনে ফেললাম—প্রায় ৬৬ রকমের শাঁখ ঝিনুক ও শামুক ছিল।

তারপর চলে এলাম রেস্ট হাউসে—এসে খেয়ে দেয়ে তক্তাপোষে বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পাণ্ডাঠাকুরই এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে চলে এলাম স্টেশনে। পাণ্ডার ছড়িদার আমাদের সঙ্গে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত এলো। পামবান সেতুর ওপর দিয়ে আসতে হোল। অতি দীর্ঘ সেতু—এক দিকে পাহাড় সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে চলে গেছে বরাবর। ধনুষ্কোটি

স্টেশনের পূর্ব দিক থেকে রামেশ্বরমের সুউচ্চ গোপুরমগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। বন্দরে সিংহল যাবার জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটি ছেড়ে গেল দেখলাম।

এখান থেকে তিন মাইল দূরে হল আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থল। বেশীর ভাগ যাত্রী সেখানে হেঁটেই চলেছে দল বেঁধে, ছড়িদার কিন্তু আমাদের জন্যে একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করে ফেলল। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। ওখানে গিয়ে দেখি একটি ছোট্ট মন্দির—অনেকটা আমাদের কলকাতায় রাস্তায় যেমন ছোট ছোট মন্দির দেখা যায় সেই রকম।

যাই হোক আমরা গাড়ী থেকে তো নামলুম। সঙ্গমে স্নান করবার জন্যে সুধীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছড়িদার পুজোর যোগাড় যন্তর করে ফেলল—তবে আমি স্নান করলাম না। সঙ্গমস্থলে গিয়ে জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটিয়ে নিলাম। সুধীরাকেও এখানে স্নান করতে নিষেধ করলাম। বালির ওপর দিয়ে বেশ কিছু দূরে গিয়ে হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম। ছড়িদার মন্ত্র উচ্চারণ করে দুই সাগরের (আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর) জল নিয়ে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। এই দুটি সাগরের দুটি বিভিন্ন প্রকৃতি—বঙ্গোপসাগরের দিকটা হল উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল আর আরব সাগরের দিকটা শান্ত।

এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ সেরে স্টেশনে ফিরে এলাম যখন তখন ১১-৪৫ মিনিটে ইন্ডো সিলোন এক্সপ্রেস জাহাজটি বন্দর ছেড়ে গেল। আমাদের ট্রেনটিও স্টেশনে অপেক্ষা করছিল—গাড়ীতে উঠে মন্ডপম্ পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম।

এইখানেই ছড়িদারের কাজ শেষ। তার খাতায় আমাদের নাম ঠিকানা সব লিখে দিলাম। বিদায় পর্বটি কিন্তু খুব মধুর হলো না। ছড়িদার আমার কাছে এই দুদিন ঘোরাঘুরির জন্যে একশ টাকা চেয়ে বসলো। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে এতো দিতে হয় নি।

ফিরতি পথে আবার আমরা নামলাম ত্রিচিনাপল্লীতে। আবার আশ্রয় নিলাম সেই রিটায়ারিং রুমে।

কথা ছিল আমাদের গাইড হিসেবে মিঃ যজ্ঞস্বামী আসবেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তিনি আসতে পারেন নি। একজন লোককে পাঠিয়েছেন।

এখান থেকে কুম্ভকোনামে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করবো, সে ব্যবস্থাও মিঃ যজ্ঞস্বামী করে রেখেছেন একথাও শুনলাম ভালোই হলো।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে কুম্ভকোনাম। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে বেলা একটায় পৌঁছলো।

এখানে এসে যে মানুষটিকে পেলাম, আমার চোখে সে একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। যজ্ঞস্বামীর সহকারীর ভাই, বয়স তার এমন কিছু নয় উনিশ-কুড়ির মতো। তাকে দেখেই অবাক হলাম। খালি গা, খালি পা, মাদ্রজীদের মতো কাপড় পরা, মাথায় একটি বিরাট শিখা, আর গায়ে একটি শাদা উত্তরীয়। আরো মানুষের ভিড় থেকে সে আমাকে ঠিকই চিনে নিয়েছে। কারণ, এখানে আমি একমাত্র ধুতি পাঞ্জাবী পরা বাঙালী।

একটা কথা বলা দরকার। এখানে আমার পরিচয় চিত্র-পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীরূপে, যদিও আমি বাংলাদেশের অভিনেতা একথাটাও জানে না এমন নয়। আমি বেশ কয়েকটি তেলেগু ছবি পরিচালনা করেছি, যেগুলি এদেশে ভালোই চলেছে।

যাইহোক, এই বিচিত্র যুবকটি আমাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো। তার নামটিও জানলাম। গোপাল।

স্টেশনের বাইরে এসে আমিই একটি গরুর গাড়ী ঠিক করলাম। কিন্তু গোপাল গাড়োয়ানটিকে কী যেন বললে তার ভাষায়। গাড়োয়ান চলে গেল তার কথা শুনে। আমি ভাবলাম গোপাল বোধহয় কোন পান্ডার লোক। চটেই উঠলম তার ব্যবহারে। বললাম, এ-সব কী হচ্ছে! তুমি বাপু এখান থেকে সরে পড়ো।

গোপাল আমাকে বোঝাতে চাইলো ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে, যে সে আমারই জন্যে স্টেশনে এসেছে।

—বলো কি?

এবারে সে জানালে, মিঃ যজ্ঞস্বামীর সহকারীর কাছ থেকে আগেই সে আমার খবর পেয়েছে। খবর পেয়েই আসছে।

নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেলাম।

এবারে গোপালের সঙ্গে তার ঠিক করা গরুর গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

আমাদের বাংলা দেশের মতোই এ-দেশের গরুর গাড়ী। গোপাল বসলো গাড়োয়ানের পাশে। আমি আর সুধীরা ভিতরে।

প্রথমেই আমরা এলাম একটা প্রেসে। আমরা এসেছি শুনে প্রেসের মালিক হন্ত-দন্ত হয়ে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে। গাড়ী থেকে নামতে বললেন। গোপাল দুজন কুলিকে ডেকে আমাদের মাল-পত্তর নামিয়ে নিলে। তারপর আমাদেরকে নিয়ে দোতলার একটি ঘরে চললো।

ঘরটা দেখে আমি আর সুধীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এ ঘরে বসা চলে, থাকা চলে না।

প্রেসের মালিকের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তিনি এক রাত্রির জন্যে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন, আরো শুনলাম, প্রেসের পাশেই একটি সিনেমা হল রয়েছে, তারও মালিক তিনি।

সবই শুনলাম এবং বুঝলাম। কিন্তু ঘরে থাকা কি সম্ভব। বললামও তাকে।—এখানে দু' দন্ড বসা যায়, কিন্তু থাকা কি সম্ভব?

আমার কথায় তিনি মনঃক্ষুন্ন হলেন, বললেন, সবই বুঝলাম স্যার, কিন্তু কি করবো বলুন। এখানে ভালো হোটেল নেই, তাছাড়া ধর্মশালাগুলিতেও জায়গার অভাব। যাই হোক, আপনারা একটু বিশ্রাম করুন, আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি, কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। গোপাল অবশ্য আমাদের কাছেই রইল।

কোথাও এসে কিছুতেই বসে থাকতে পারি না। এখানেও বসে থাকতে পারলাম না। একটা গরুর গাড়ী ঠিক করে বেড়াতে বেরোলাম।

যেখানেই যাই, সন্ধের মধ্যেই ফিরতে হবে। কারণ আলোর নিতান্ত অভাব। বিজলী আলোর ব্যবস্থা যা আছে, তা না থাকার সামিল।

কুম্ভকোনাম হলো তামিল সংস্কৃতির পীঠভূমি। বাংলাদেশের নবদ্বীপ, ভট্ট-পল্লী যেমন সংস্কৃতচর্চার স্থান, এ-ও তেমনি।

জ্ঞানী, গুণী, পন্ডিতদের বাসস্থান এই কুম্ভকোনামে। তাছাড়া জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চার জন্যে সারা ভারতে এদেশের খ্যাতি। এখনো কুম্ভকোনামে তেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি।

গরুর গাড়ীতে আমরা চলেছি। এদিক ওদিক যা দেখার দেখছি। এরই মধ্যে এক সময় বৃষ্টি নামলো। সেই বৃষ্টির মধ্যে আমরা বাজারে এলাম, কিছু কেনাকাটার জন্যে।

এতো সময় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এবারে বৃষ্টি নামলো মুষল ধারায়।

আকাশের অবস্থা দেখে মনে হলো, এ বৃষ্টি সহজে থামবে না।

বাজার থেকে কিছু কেনা-কাটা করেছি। তারপর ফিরে এলাম নির্দিষ্ট ছাপাখানায়।

কিন্তু মালিকের দেখা পেলাম না। শুনলাম, সিনেমা হলে গেছেন।

সিনেমা হলে দেখা হলো ভদ্রলোকের সঙ্গে। শুনলাম, আমাদের জন্যে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। যা হোক একটা আশ্রয় তো মিললো।

সিনেমায় তখন সন্ত জ্ঞানেশ্বর ছবিটি চলছিল। খানিক বসে ছবিটি দেখলাম। একটি মহান জীবনের ছবি বলেই দেখলাম, নয়তো সাধারণত ছবি আমি দেখি না।

(ক্রমশঃ)

অন্তরালে জ্যোৎস্না

কল্যান সেন

NITAI GHOSH

এখন বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায়; ক্রমশ হলুদ হয়ে আসা রোদ গাছের পাতায়, মাঠ ছাড়িয়ে দূরের বাংলোটার ছাদের লাল টালির ওপর কেমন ছড়িয়ে আছে। বাগানের দুটো গুলমোহরের গাছ এই শেষ বিকেলের আলোয় কেমন অলৌকিক ছবির মত মনে হল শ্যামলের। ঠিক ও রকম গাছ, হয়ত নরম ধুলোর একটা আঁকাবাঁকা পথ, তারপর একটা মন্দির, এরকম কিছু সে গত রাতে স্বপ্ন দেখেছিল। গত রাতে? না অনেক বছর আগে যেদিন তার দিদি মারা গিয়েছিল?... ঠিক মনে পড়ে না তার; মাথার ভেতর খুব হালকা একটা বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে গুল-মোহর গাছ, রোদের শুয়ে-থাকা, সব কেমন মিশে যায়।

আর একটু পরেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। এই বারান্দা তার বসে থাকার ইজি-চেয়ার, বাগানের গেট ছাড়িয়ে বিরাট ফাঁকা মাঠ, স্টেশানের দিকের পথ, ক্রমশ সব অন্ধকারে ডুবে যাবে। নিচু আকাশ থেকে দিনের উজ্জ্বলতা চলে গেলে শ্যামল অকারণ অস্থিরতা টের পাবে, অন্ধকারের গন্ধ তার রোমকূপে, সন্ধ্যার বাতাসে, ওই গুলমোহরের ডালপালায় দেখতে-দেখতে ঘুমের মত কিছু, হয়তো ছড়িয়ে দেবে; ঠিক নদীর ছল-ছল শব্দের মত শ্যামল শুনতে পাবে পৃথিবীতে মানুষের ক্লান্তির একটা ভাব...সব তার বুকে সেই অন্ধকারে উঠে আসতে চাইবে। উঠে আসে। এসব ভাল লাগে না, অথচ এরকম কথা তার মাথার ভেতর পিঁপড়ের সারের মত ঘুরে বেড়ায়। শ্যামল নিজেকে বড় দুঃখী আর হতাশ মনে করে তখন। ঠোঁট শুকিয়ে যায় তার; তাহলে, কিছুই আমার করার নেই। আসন্ন বিকেল-সন্ধ্যা তারপর মন্থর দীর্ঘ রাত শ্যামলের বুকের ভেতর ভয়ের মত জমা হতে থাকে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাই-তোলা বন্ধ করে সে। সমস্ত শরীরে একটা ঢিলেমি; এখন হঠাৎ তার ঘুমোবার কথা মনে হল। মনে হল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লে...মানে তার ভেতরে বিষাদের মত কিছু এমন স্পর্শ করতে চেষ্টা করছে সে। নাকি বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে 'শাওয়ার' খুলে সেই কাঁপা তিরতির করা জলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকবে সে?...অথবা মলিন রোদ, মাঠ, বাতাসের স্পর্শ, অচেনা পাখি, লালপাহাড় তার ওপর হনুমানজীর মন্দিরের [illegible]

আরতির শব্দ, সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে হেঁটে যাবে একা? অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না তার পা ধরে যায়। আমি কোনদিন একটা বাসি পাতার মত কোথাও হয়তো উড়ে যাবো!...হয়তো নক্ষত্রের অলোয় আমার শীত করবে তখন; হয়তো সকালের টাটকা রোদে আজস্র পাখির শব্দে, সে আর কিছুই শুনতে পাবে না, দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না!

মাথার ভেতর এসব সিনেমার ছবির মত ওঠা-নামা করে; শ্যামল এড়াতে পারে না, কী রকম যে হয়ে যায় তখন!

শ্যামল তাকাল—একটা সাইকেল রিক্সা স্টেশানের দিকে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় ফিরছে কেউ। নরম রোদে লাল ধুলোর বাঁকে, রিকসাটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ চোখে লেগে থাকে শ্যামলের। কারা গেল?...সেই বুড়ো ভদ্রলোক আর তার বিধবা মেয়ে? নাকি সেই মেডিকেল-রিপ্রেজেনটেটিভ ভদ্রলোক?...শ্যামলেরও হঠাৎ ইচ্ছে হয় একটা রিকসা ডেকে সেও উঠে পড়ে; কিন্তু কোথায় যাবে সে?...কলকাতায়?...কলকাতার শব্দ, মানুষ, আলো, অপরিচ্ছন্নতা, সব যেন এখন স্মৃতি মনে হয়; অথচ উপায় নেই; আর তিন-চারটে দিন; তারপর সেই বিশাল কলকাতার মুখের ভেতর এক সময় আবার সে টুপ করে ঢুকে পড়বে।... আবার বাস-ট্রাম, মিছিল, ফুটপাথের হকারদের চিৎকার, নিয়ন আলো, খবরের কাগজের উত্তেজনা, সিনেমার গান, ছিনতাইয়ের গল্প, পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ; তার পরিচিত মানুষজন, অফিস... লিফট, সহকর্মীদের গোল মুখ-চোখ; চোদ্দ, ষোল আঠারোতলা বাড়ি, সব আবার দেখতে-দেখতে তার রক্তের সঙ্গে মিশে যাবে।...নিঃশ্বাস ফেলল শ্যামল। বড় অদ্ভুত। তখন কলকাতায় বসে এই বাংলো, তিন-চার মাইল দূরের একটা ছোট ফলস গুলমোহরের ছায়া, দূরে লাল টালির মাথায় রোদ, মন্দিরের সন্ধ্যাবেলায় ধূপের গন্ধ, কিছু মনে থাকবে না আর। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মনে হবে রোমান্টিক স্বপ্ন! আশ্চর্য! কিছুই মিথ্যে নয় তাহলে? আমরা শুধু একটা অভ্যাস নিয়ে খেলি। অদ্ভুত এই দিন-রাতের খেলা!...

কয়েকজন লোক মাঠের ভেতর নেমে গেল। শ্যামল তাকিয়ে থাকে আজ কী এদিকে কোথাও হাট বসেছিল? কয়েকটি কালিষ্ঠ মেয়ে মাথায় টুকরি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে...মাঠের আড়ালে গরুর গলায় ঘণ্টার খুব মিহি একটা শব্দ ওঠে; শুনতে-শুনতে শ্যামল টের পায় এই মাঠ, নির্জনতা, আসন্ন অন্ধকার, নিচু আকাশে তারাদের ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া, তার ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেবে।...ফিরে যেতে হবে...তিন অথবা চারদিন! চোখের ওপর সমস্ত দৃশ্যটা তাকে অদ্ভুতভাবে টানছে এখন। শ্যামলের মনে পড়ে যায়—কোনো এক লেখকের গল্পে পড়েছিল সে; একজন বাইরে এসে ক্রমশ গাছ হয়ে যেতে চাইছিল, রাত্রির নগ্নতায় আকাশের নীচে সে শুয়েছিল; কিন্তু পর দিন লোকে দেখেছে তার শক্ত হাতে, পায়ে, কালো হয়ে আসা ঠোঁটে, পিঁপড়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে; লোকটা কী তাহলে আত্মহত্যা করেছিল?...কয়েকটা কথা এখনো তার পরিষ্কার মনে পড়ে: ওপরে ঝকঝকে আকাশ, নীচে স্বাভাবিক সকাল; রোদ নেশা ধরিয়ে দেয়; আর আশ্চর্য! লোকটার মুখের ওপর উড়ে এসেছিল এক ঝাঁক হলুদ প্রজাপতি; অথচ কেউ খেয়াল করে নি ওর ঠোঁট ফাঁক কেন? একটা হাত উঁচু হয়ে আকাশটা নামিয়ে আনতে চেয়েছিল না কি? পুলিশও বোঝেনি ব্যর্থতা নয়, দুঃখ, নয় হিরন্ময়ের তখন মৃত্যুটা ভাল লেগেছিল!...

শ্যামল বুঝতে পারল না সে কী এ রকম কিছু টের পায়?...কখনো মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে চকচকে আকাশ দেখলে তার কী মৃত্যুর মত কিছু মনে হয়?...তবে হঠাৎ কেন যে ওই হিরন্ময়ের গল্পটা তার মনে পড়ল?...কেন?...

বারান্দা থেকে রোদ নেমে গেছে। তবে এখনো বিকেলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আছে; এই রকম দিন চলে যাওয়ার মুহূর্তে তার নিজের হাত, পা, আঙুল, সব কেমন ছবির মত মনে হয়; ওই নতুন লাল টালির বাড়িটায় কাল ফেরবার সময় সে শুনতে পেয়েছিল রেকর্ড বাজছে।...একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। আলাপ করে যাবো?...ভাল লাগে নি শেষ পর্যন্ত। এখন তার ইচ্ছে হল ওই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে; শব্দ করে কথা বলে। পুরনো কাগজ চেয়ে পড়ে।

আকাশে চোখ পড়ল শ্যামলের। মেঘ নেই। অথচ কী রকম শান্ত একটা ভাব আকাশে ছড়িয়ে আছে; 'আকাশ জুড়োয়ে আছে আকাশে-আকাশে'...এরকম কিছু মনে পড়ে তার...। কার্তিকের ছোট বিকেলকে হঠাৎ তার বড় অভিমানী মনে হয়; যেন চলে যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে নিচ্ছে কেউ তাকিয়ে আছে কী না।—

এখন তার 'আকাশ-প্রদীপে'র কথা মনে পড়ে...অনেক উঁচুতে ওই আলো দেখলে বোঝা যায় মানুষ দেবতাকে কখনো-কখনো ঠিক নিজের মত করে পেতে চায়; 'আকাশ-প্রদীপে'র আলোয় পথ চিনে নেবেন দেবতারা।...কার্তিকের মলিন আকাশ দেখলে এসব মনে পড়ে; মনে পড়ে যায়।

কয়েকটা বিন্দু বিন্দু কালো ফুটকি উঁচুতে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মানে পাখিরা ফিরে যাবে আর একটু পরে। শ্যামল ভাল করে দ্যাখে...চিনতে পারে না, বোধ হয় চিল বোধ হয়...। তার ইচ্ছে হয়, অন্তত একবার সে উঠে যায় শূন্যে, যেখান থেকে সে দেখবে তার পুরনো অভ্যস্ত জীবনটা। দেখে মজা পাবে। দুঃখ পাবে কি? কে জানে, শ্যামল ঠিক বুঝতে পারে না। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার বুকের ভেতর সে শুনতে পায় ডানায় রোদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল...।

তার স্নায়ু কী রকম অবশ হয়ে যায়। আমি কী আজ বাইরে যাবো না? এই বারান্দার রহস্যময় অন্ধকারে নিজের সঙ্গে এই খেলায় একটা দিন নষ্ট করবো?... শ্যামল নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল। মানে হয় না, কোনো মানে হয় না, এভাবে সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে! অথচ আমি আর কী-ই বা করতে পারি?...মাথা ঝিম-ঝিম করে তার, আঙুল দিয়ে চোখ চেপে ধরে। আর তখন তার মনে পড়ে অতসী এত দেরী করছে কেন? ও কি আজ বাইরে যাবে না?...অতসী কি চাইছে শ্যামল একা বেরিয়ে যাক আজকে? নিজের ভেতর শাসনের ফেনার মত বিন্দু ভাসতে থাকে এখন; তুমি কি আমাকে এখন এড়িয়ে যেতে চাও অতসী?...কালকেও তো যাও নি...অথচ দুপুরে তুমিই বলেছিলে এই টাটকা আলো, বাতাসে হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে আমার! আজকে না তোমার লালপাহাড়ে যাওয়ার কথা ছিল? আশ্চর্য! কাল তুমি অসুখের নকল অভিনয় করেছিলে অতসী; আমি ফিরে এসে জানলা দিয়ে দেখলাম, তুমি একটা ম্যাগাজিন পড়ছ; তোমার চোখে-মুখে অসুখ ছিল না; তুমি কি আমার পায়ের শব্দ টের পেয়েছিলে?

এখন শ্যামলের চোখে পড়ল খাটের ওপর শরীর এলিয়ে অতসী আলসেমির সুখ করছে...সামান্য হাওয়ায় ওর চুলের টুকরো উড়ছে.....ওর নিটোল স্বাভাবিক শরীর এখন একবার স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছে করে তার। অতসী কি তাহলে রাগ করবে? কেন? অতসী, তুমি কি আমাকে সহ্য করতে পারো না? অথচ সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় ইচ্ছে হয়.....ভেঙে ফেলি তোমার রাগ, অভিমান অহংকারের অথবা দুঃখের সব রহস্য!...ভিজিয়ে দেই তোমার ঠোঁট!......

আর একটা সাইকেল রিকসা প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে গেল। আর তখনই তার মনে পড়ল আজ সমস্ত দুপুর অতসী চিঠি লিখেছে। এই তিন দিনে গোটা তিন-চার চিঠি লিখেছে অতসী; অথচ সে কাউকে লেখে নি; চিঠি লেখার কথা মনেই হয় নি তার। কাকে তুমি চিঠি লিখছ অতসী?...কোনো বন্ধুকে? মাকে?...আমি তো ইচ্ছে করলেই তোমার সব গোপন কথা জেনে নিতে পারি। সেই স্বাভাবিক অধিকার আমি পেয়েছি... অথচ তুমি নিজে চিঠি পোস্ট করলে। শ্যামলের হাসি পেল। কিছুটা অনুমান করা কষ্ট নয়; মেয়েরা বিয়ের পর প্রথম-

প্রথম একটু ভাললাগার হয়ে পড়ে। আর সেই তীব্র সুখ চিঠিতে ধরা থাকে। মেয়েরা কিছুই হারাতে চায় না; জমিয়ে রাখতে ভালবাসে।...

এই তিন দিনের কথা তুমি কাকে লিখছ, কী লিখছ অতসী?...এখানকার দিন, রাত, আকাশ, অন্ধকার, লালপাহাড়, কার্তিকের বিকেলে উড়ে আসা প্রজাপতি, বাইরের ওই গুলমোহরের বৃত্তাকার ছায়া, বালিসে সিঁদুরের দাগ, রক্ত-মাংসের ছোবল, তারপর সুখের লজ্জায় নিভিয়ে-দেওয়া আলোয় হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে করা...। অতসী, এই সব...অবিকল একই নিয়মে মানুষ বেঁচে থাকাটা শিখে রাখে। না হলে, তুমি এই নির্জনতায় আসতে চাইবে কেন? আমি আসতে চাইবো কেন?...কিন্তু তুমি কি এসব শুক্লাকে মনে করে লিখছ? তার ছোট জানলার বাইরে, কলকাতার একঘেয়ে আকাশ আর ঘরে নির্জীব ফ্যাকাসে অন্ধকারে যে ভয় আর ক্লান্তি ছড়িয়ে আছে ওর খাটের ওপর, টেবিলে, দেয়ালে, তুমি কি তার কথা ভুলে গেছ?...শুক্লা কী এখন বৃষ্টির কথা ভাবছে? নাকি প্রত্যেক রাতে সে জেগে থাকে একটা ট্রেন চলে যাওয়ার তীব্র শব্দের প্রতীক্ষায়?... দোষ তোমার নয় অতসী; আমারও নয়! তবে চেয়ে বাইরে এস তুমি, অন্ধকারে বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নাও এভাবে একটা বিকেল নষ্ট করো না অতসী।...

কাল অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি শ্যামলের। মাথার ভেতর যেন বিরামহীন একটা ঝিঁ-ঝিঁ ডেকে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পেয়েছিল জানলার বাইরে ঝকঝক করছে আকাশ, তাকিয়ে থাকলে বুকের ভেতর কি রকম ফাঁকা হয়ে যায়; লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে যে আগুনের গ্রহ-উপগ্রহ জ্বলছে, জানলার ফ্রেমে তাই দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল কি জানি, শুক্লাও কি ঠিক অবিকল ওই তারাদের মত? কত হাজার হাজার মাইল দূরে; ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। বাতাস নিয়ে আসছিল খুব চাপা মিষ্টি একটা গন্ধ; এখনো কী শিউলি ফোটে এখানে?......দরজা খুলে বাগানে, তারপর বাগান ছাড়িয়ে সোজা রাস্তায় চলে এসেছিল শ্যামল। চোখের পাতায় টের পাচ্ছিল অন্ধকার, হিমেল বাতাসে শরীর একটু কেঁপে উঠছিল তখন...পাতার ভেতর মিহি কুয়াশা...দূরে লাল টালির বাংলো নির্জনতায় মনে হয় অলৌকিক স্বপ্নের ছবির মত; শ্যামল তখন সব গুলিয়ে ফেলছে, সত্যিই কী আমি মধ্য রাতে পথ হাঁটছিলাম একা-একা? নাকি স্বপ্ন দেখছিলাম?...অতসী কী করছিল? ঘুমিয়েছিল?...টের পায় নি শ্যামল অন্ধকারে নেমে গেল। দুঃখ হয়; নিজের জন্য, তার চেয়েও বেশি অতসীর জন্য। আমরা দুজনই দুজনকে প্রতারণা করছি; কেন অতসী?...

না, অতসী হয়তো আরও অনেকক্ষণ [illegible]য়ে থাকবে। থাকুক। হয়তো ওর মনটা ছেড়ে দিচ্ছে এখানকার বিশুদ্ধ বাতাসে; কি দেখতে চাইছে, কি বুঝতে চাইছে ও? তুমিও কী ভেতরের কোনো অস্থির আবেগে কেঁপে উঠছো এখন? সমস্ত বিকেল, সন্ধ্যা তারপর রাত তুমি চোখের জল গোপন করবে? আমার মনে আছে; ভুলি নি। পরশু রাতে আমার গেঞ্জি ভিজিয়ে দিয়েছিলে তুমি; ভয় পাওয়া একটা পাখির মত দুলছিল তোমার নরম বুক; তোমার নিঃশ্বাস টের পাচ্ছিলাম আমার হাতে; এ কী হল শ্যামল?...মাঝখানে একটা আড়াল পড়ে গেল কেন?...আমি যে, আমি যে... তুমি অবুঝের মত আমাকে প্রশ্ন করছিলে। অতসী, মানুষের মন নিয়ে অন্ধকার, নির্জনতা, চিরদিনই খেলা করে। আমরা শুক্লার কাছ থেকে পালাতে পারি। নিজেদের কাছ থেকে কি করে পালাব অতসী?... না, আমি তোমার পিঠে হাত রাখব না। নকল সান্ত্বনায় গলা ভারি করে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না—এতে কোনো লাভ নেই; চল, আর তো তিন অথবা চারদিন: এ রকম একটা বিকেল নষ্ট করো না তুমি। অতসী, আমি নির্বোধ নই। তার চেয়ে আমার সিগারেট ফুরিয়েছে; একবার স্টেশানের দিকে যেতে হবে আমাকে। সিগারেট কিনতে। না হয় ঘুরে আসব একা; না হয় ওই লাল টালির বাংলোর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে শুনে আসব রেকর্ড। তুমি ইচ্ছে করলে এখানে বারান্দার এই ইজিচেয়ারে বসতে পারো, ইচ্ছে করলে ভেজিয়ে রাখতে পারো দরজা। এখনও তো তুমি মুখ ধোওনি, স্যুটকেসে তোমার নতুন শাড়িগুলো সব পড়ে রইল; আমার ক্যামেরাটা ঝুলছে খাটের কোণায়। আমি তোমার একটাও ছবি তুলিনি; মনেই হয়নি আমার। অথচ ট্রেনে উঠে ক্যামেরাটা দেখিয়ে আমি তোমায় চোখ টিপেছিলাম। তুমি রাগের ভান করে বলেছিলে—এই, একদম অসভ্যতা করবে না কিন্তু!...আমি মুখ নামিয়ে তোমার গালের নীচে একটা টোকা দিয়ে বলেছিলাম, মেয়েরা আসলে অসভ্যতা ভালবাসে।...তুমি হেসেছিলে অবিকল শুক্লার মত। না, ভুল আমারই। তোমার মুখে, ঠোঁটের কারুকার্যে, তোমার তাকিয়ে থাকায় কী এক বিষাদ যেন লেগে থাকে। তোমার মধ্যে আমি বোধ হয় শুক্লাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলাম। জানি এটা লজ্জার অথবা হৃদয়হীনতার কথা। তবু মিথ্যে নয়, অতসী আমি কালও একবার তোমাকে হঠাৎ শুক্লা বলে ডেকে উঠেছিলাম। তুমি কী ভয় পেয়েছিলে তখন? নাকি দুঃখ? তুমি কী পুরনো অ্যালবামটা সঙ্গে এনেছ?...লুকিয়ে দেখছ শুক্লার উজ্জ্বল চোখ, মুখ...হাসছে শুক্লা... পৃথিবীর প্রথম নারীর মত: তুমি দ্যাখোনি সেই ফটোটা? লালপাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সে রংমশালের মত জ্বলছে।

আমার একটা অনুরোধ, ওই অ্যালবামটা তুমি ফেলে দিয়ে যেও এখানকার কোনো জঙ্গলে।

ওই পুরনো ছবিগুলো বারবার মনে করিয়ে দেবে, একদিন...ছিল একদিন; ওই ছবিটা দেখছ এখন? যেখানে শুক্লা স্নানের ছোট জামা পড়ে, ওই যে ফেনার মত হাসছে ওর একটা ইতিহাস আছে। চেঁচিয়ে উঠে আমায় বলেছিল—ভিতু, ভিতু কোথাকার। একটা খরগোস না কী যেন ছুটে পালাল, আর তুমি তাতেই...এই সাহস নিয়ে তুমি আমায় নিয়ে জঙ্গলে এসেছ?...অতসী, আমি দেখছিলাম সেই হাসি, লালপাহাড়, আকাশ নির্জনতার সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল। চোখ বুজলে আমি বোধ হয় এখনো......

দূরে থেকে শ্যামল দেখল একটু জোরেই অতসী হেঁটে আসছে। ওর হাঁটার ধরণ দেখে বোঝা যায় ও বোধ হয় একটু হাঁপিয়ে গেছে। শ্যামল বসে রইল। চুপচাপ। এখন আর রোদ নেই। বাতাসের শব্দও আলাদা করে চেনা যায়; ফিকে অন্ধকার; এখনো মলিন আকাশ চোখে পড়ে, শ্যামল তাকিয়ে রইল...কী যেন মনে পড়ে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন; ছোট কপালের টিপের মত তারা ফুটছে একটা-দুটো করে। কিছু ঘটবে মনে হয়, কিছু হয়তো...। শ্যামল সিগারেট ছুঁড়ে দিল ঝোপের অন্ধকারে। এখন অতসীকে আর দেখা যাচ্ছে না; বোধ হয় কোনো গাছের আড়ালে পড়ে গেছে। দৃশ্যটা খুব নতুন মনে হল তার: একটু আগে দেখল অতসী জোরে পা চালিয়ে আসছে, এখন নেই। বাঃ, বেশ মজার খেলা তো! অতসী আছে; অতসী নেই। আচ্ছা, আমি কী উঠে যাব? ..ভাবলে ও একটু নার্ভাস হয়ে পড়বে!... শ্যামল এক ধরনের সুখ আর উত্তেজনা টের পাচ্ছিল কথাটায়। বিকেলে অতসী একবার আড়ালে চলে গিয়েছিল, এখন গাছের আড়ালে।...এই তো খুব ভাল। একটু স্বাভাবিক ছেলেমানুষী, একটু অনিয়ম... তুমি খোঁপায় ফুল পরেছ আজকে? অথচ এখানে এসে শুক্লা তো...

শ্যামল সিগারেট প্যাকেটের অয়েল পেপারটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। এসব অভ্যাস তার ছেলেবেলায় ছিল। একবার একটা দু'টাকার নোট হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল। আশ্চর্য! তাহলে কিছুই বদলায় না।

রোদ নেই। ছায়ার ভেতর এক ধরনের বিষাদ অনুভব করা যায়। মাঠের ভেতর থেকে একটা শীতল গন্ধ উঠে আসছে এখন। আজ কী জ্যোৎস্না উঠবে?......কী জানি......এসব কথা অতসীর মনে থাকে, ওকে জিজ্ঞেস করবো। জ্যোৎস্নার টুকরো ছায়া গাছের পাতার ভেতর, শ্যামল কী রকম বেদনা অনুভব করল। মাঠে জ্যোৎস্না... পাতায় জ্যোৎস্নার নীলগন্ধ...মাথার ভেতর খুব মিহি, রহস্যময় একটা ঢেউ খেলে যায়...কলকাতা মুহূর্তে ছুটে যায় চোখের ওপর। হয়তো হ্যারিসন রোডে এখন বোমা ফাটাচ্ছে কেউ, হয়তো এইমাত্র ভবানীপুরে একটা বাস ব্রেক-ডাউন হল।...তবু মনে পড়ে না, মনে থাকে না......ভাল লাগে না ভাবতে। কারণ আরও তিন অথবা চারদিন। এই মাঠ, স্টেশানের রাস্তা, লাল টালির বাংলোর রেকর্ড, কয়েক মাইল দূরের সেই ফলস্......অতসী, আজ যদি জ্যোৎস্না থাকে তুমি রাত জাগতে চাইবে? শুক্লা বলত : জ্যোৎস্নায় ওই ফলসটার জল দেখলে মনে হয় জীবন কী আশ্চর্য...কী রহস্যময় এই বেঁচে থাকা! তুমি কী বলবে অতসী?...আমি জানি, কী বলবে, কী বলতে পারো। হিম তোমার সহ্য হয় না, হয়তো ঘরে নীল আলোটা জ্বালিয়ে তুমি প্রতিটি মুহূর্তে একটা ভয়কে তাড়াতে চাইতে...কেন অতসী? ভয়ের কাঁটা পেন্ডুলামের মত অবিরাম কোথাও দুলতে থাকবে, ভয় না ব্যর্থতা অতসী?

তুমি হাঁপিয়ে গেছ, এখানে বসো অতসী। একটু বিশ্রাম নাও। হাওয়ায় হাত-পা মেলে দাও।

—বেশ হাওয়া দিয়েছে না?

—হ্যাঁ খুব সুন্দর, একটু শরীর সির-সির করে।

—এখন কলকাতায় থাকলে তুমি কী করতে?

—কী জানি,

—তুমি সিগারেট খাওয়া বাড়িয়ে দিচ্ছ কিন্তু।

—তুমি একটা চাদর আনলে পারতে, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

এই!

—কী?

—চুপ করে আছ যে!

—কোথায়, এই তো কথা বলছি......

—তুমি একা থাকতে চাইছিলে?

—তুমিও তো...

—আর কটা দিন থেকে যাবে?

—ভাল লাগছে তোমার?

—তোমার ভাল লাগছে না?

শ্যামল তাকাল—না, এটা কলকাতা নয়। সারা মাঠে এখন ঘন হিম মাখানো অন্ধকার। অতসীর মুখ অন্ধকার, শরীর অন্ধকার, চুল অন্ধকার। এই অন্ধকারে অতসী কী কিছু গোপন করতে চাইছে এখন? আমি তো পারি, যদি ইচ্ছে করি...অতসী আপত্তি করবে না, কারণ অতসীর ভেতরও সেই একই রক্তের যন্ত্রণা...তবু...তুমি গাছের অন্ধকারে কি জোনাকি খুঁজছ অতসী?

একটা জীপ হর্ণ দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। হেড লাইটের আলোয় শ্যামল একবার পরিষ্কার দেখতে পেল অতসীকে। বড় অন্যরকম মনে হয়। তাহলে অতসীও কী ভাবছে এখন অনেক দূরে একটা ঘর। বোধ হয় অন্ধকার, আর শুক্লা শুয়ে আছে অথবা বসে আছে। কিছু ভাবছে সে? ভাবতে পারে? কিছু মনে করার চেষ্টা করছে? মনে করতে পারে?

স্টেশানের পথে দু'একজন লোক চলাচল এখনো টের পাওয়া যায়। যদিও এখন আর ট্রেন নেই, খুব হালকা একটা গান-বাজনার শব্দ, হয়তো দূরের দেহাতি কোনো বস্তিতে সন্ধ্যার আসর জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে বেশ জোরে শোনা যায়। একটা সাইকেলের ট্রানজিসটার : আজ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এক ভাষণে বলেন, ক্রমশ শব্দটা দূরে সরে গেল। শ্যামল এক ধরনের অবসাদ টের পেল। যেন কলকাতা, পেছনের কলকাতা খুব গোপনে এইমাত্র তার রক্তে মিশে গেল।

এখন তারারা স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়েছে, অতসী মুখ মুছলো একবার। কোথায় কুকুর আচমকা ডেকে উঠল। হালকা গন্ধ টের পাওয়া যায়, সত্যি তাহলে এখনো শিউলি ফুটছে এখানে?

—দ্যাখো ওই নীল আলোটা,

—দেখছি, ওটা নীল নয়, পাওয়ার-হাউসের মাথায় জ্বলছে, কুয়াশা মিশে দূরে থেকে ও রকম মনে হয়। তোমার চোখে পড়ে না ওয়াচ-টাওয়ারের বিশাল আলোটা রাতে কী রকম তারার মত জ্বল্‌জ্বল্ করে।

অতসী আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন বড় অপরিচিত, বড় একা মনে হয় অতসীকে, অন্ধকার ওর চোখে, কপালে আঙুলে লেগে আছে। শ্যামল ভাবল, আমি কী একবার ওর পিঠে এখন হাত রাখবো? অথবা বলবো—কথা বল, যা তোমার ইচ্ছে ...কিন্তু বাতাস ওকে ছুঁয়ে গেলে শ্যামল বুঝতে পারে এখন অতসী একা থাকার কথা ভাবছে, এই নির্জনতার মুখোমুখি বসে কিছু খুঁজতে চাইছে সে। অতসী কী আকাশ দেখছে? অথচ সে চাইছিল অতসী একটু চঞ্চল হয়ে উঠুক, যা হোক একটা কিছু করুক, তার জামার বোতাম খুলে দিক, অন্তত শব্দ হোক ওর হাতের চুড়ির ......কিছু নয়, শুধু অন্ধকার, কুয়াশা পাওয়ার হাউসের আলো, যেন শ্যামলকে ফিরে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আর একটা সিগারেট ধরাল সে।

তুমি কী স্টেশানের দিকে যাবে? শ্যামল বলতে চাইল। এই তো সময় অতসী, এখন বাতাস ভারি হয়ে উঠছে, দেহাতি বস্তি থেকে মাদলের হালকা শব্দ, কুয়াশা মিশে 'পাওয়ার-হাউসে'র আলোটা নীল স্বপ্নের মত আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে কলকাতা এখন হারিয়ে গেছে। কোনো মানে হয় না, একটা ছোট জানলা, বন্ধ ঘরের একটা অসুস্থ মুখকে জাগিয়ে রাখবার......ফুলের মিষ্টি গন্ধ ঢেউ হয়ে খেলে যাচ্ছে না তোমার রক্তে, শিরা উপশিরায়?

সেই ঢেউয়ের কথা তোমার মনে পড়ে অতসী? আমি বুঝতে পারি, ওই অন্ধকারে এখন তুমি কী খুঁজতে চাইছ, কিন্তু কেন অতসী?......কত সহজ, কত নিখুঁত একটা প্ল্যান খেলে গিয়েছিল আমার মাথায়। একজন নিপুণ খুনীকে কেউ ধরতে পারবে না, আসলে ওটা খুন কী না, এটাই তো বোঝার উপায় ছিল না। মানুষের স্বাভাবিক বিচার তাকে দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিত, হয়তো সান্ত্বনা দিত আমাকে, আর তুমি অতসী?......

মনে আছে সমুদ্র সেদিন কী রকম 'রাফ' ছিল? আমি বহুবার পুরী গিয়েছিলাম কিন্তু ওই ভয়ংকর, পাগল হয়ে যাও সমুদ্র আগে আমিও কখনো দেখিনি। সমু কী সেদিন মাতাল হয়ে গিয়েছিল?...আমি জানতাম, এই সুযোগ, শুধু অপেক্ষা করতে হবে, আগে স্নানার্থীদের ভিড়টা কমে যাক আমার রক্তের ভেতর একটা দুর্দান্ত লোভ ছুটে গিয়েছিল তখন, শুক্লা কী কিছু বুঝতে পারবে?......না, মানুষের ইতর কখনো স্পর্শ করেনি তাকে।

কিছু না বুঝেই জলে নে গিয়েছিল শুক্লা, আমিই ওর শরী জড়িয়ে নেমে গিয়েছিলাম, রোদ সে ঢেউয়ের মাথা চিকচিক করছে, ছু আসছে বালিয়াড়িতে সাদা ফেনা......মাথা ওপর নীল অনন্ত সমুদ্র......অনন্ত আকা ......তার ভেতর শুক্লার নরম জলে ধো শরীর......উজ্জ্বল হাসি! বয়স কী ক যাচ্ছিল শুক্লার? না, আমি ভয় পাই কোনো স্পন্দন আমার প্রতিজ্ঞা দুর্বল ক দেয়নি, আঙুল কাঁপেনি আমার। কপা লেপটে থাকা চুল, চোখ ভিজে......শু বলেছিল : অনেক হয়েছে, এবার চল ও যাক, আমি হাসছিলাম, আমার যে অ ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না শুক্লা!... আমাকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে শুক্লা শরী এলিয়ে দিয়েছিল, খুব বাহাদুর! এর মাথা ধরে যাবে, চোখ লাল হয়ে... চল তো! আর সেই ছিল চরম মুহূর্ত আমি ক্রমশ টেনে নামিয়ে দিচ্ছিলাম ও কিছু টের পায়নি...কিছু বুঝতেই পা শুক্লা। তারপর সমুদ্রের একটা প্রাণীর মত আমি সরে এসেছিলাম দাঁড়িয়ে হাত ছুঁড়ে হাসছিলাম তাকিয়ে। শুক্লা হাত তুলেছিল, আম কাছে ছুটে আসতে চেষ্টা করছিল কি তলিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ সমুদ্র টেনে নিচ্ছ তার নিশ্চল শিকার! আমি চেঁচিয়ে ব লাম দাঁড়াও : ক্যামেরাটা বার করি, তো ও রকম একটা ছবি......তখনো আক আলো, মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা, কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছি শুক্লা, সমুদ্র খেলছিল তাকে নিয়ে আমি কী নিয়ে খেলছিলাম তার সঙ্গে? তারপর কী হয়েছিল অতসী?

না, শুক্লা বেঁচে গিয়েছিল! নুলিয়া কখন ছুটে গিয়েছিল, আমি উ জন্যে খেয়াল করিনি। তারপর হোটে বিকেল। ডাক্তার, শুক্লার মাথায় আমার হা রাখা।

—টেক ইট ইজি শুক্লা! তোমার জ ফাঁড়া কেটে গেল, আশ্চর্য! আমার গা এতটুকু কাঁপেনি তখন। শুধু খুব গলায় একবার কথা বলেছিল সে : তু এই চেয়েছিলে।......

আর তুমি অতসী? তুমি তখন কী করছিলে? সমুদ্রের বিশাল আলোড়ন সব তোমার বুকে উঠে এসেছিল? তুমি তাকাতে পারোনি আমার দিকে......বালির ওপর পায়ের গভীর ছাপ রেখে তুমি উঠে গিয়েছিলে। শুধু আমাকে নয়, আমার নিঃশ্বাসও হয়তো তখন তোমাকে পুড়িয়ে দিত। ঘৃণার চেয়েও বেশি কিছু তখন তোমাকে প্রায় পাগল করে দিচ্ছিল। তুমি কী কাঁদছিলে তখন?

পরদিন সকালেই শুক্লা বলল : আমি আজই ফিরে যাব, আর তোমাকেও বলল, তুইও আমার সংগে যাবি মিলু। শুক্লা তোমাকে ধরো ওই নামেই ডাকত। অসুবিধে ছিল না, সংগে গাড়ি ছিল আমাদের।

হাওয়ায় এখন ঘুমের মত কিছু ছড়িয়ে যাচ্ছে : দ্যাখো, আকাশ কাঁপছে তারার আলোয়, আর মাদলের শব্দ নেই, তোমার নিঃশ্বাসেরও শব্দ নেই, এই নির্জনতা কী ঢেকে দিচ্ছে তোমার অস্তিত্ব? নাকি, তুমিও ধরতে চাইছ কিছু? ওই অন্ধকারে কী দেখার আছে অতসী? অনেক রাত হল এবার উঠবে না তুমি?

মনে আছে, 'রবীন্দ্র-সদন' থেকে বেরিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে তুমি কী বলেছিলে? ...তুমি চেষ্টা করছিলে বাইরে চলে যাওয়ার। তুমি ভয় পেয়েছিলে। ঘৃণা করেছিলে আমায়। আর তুমি তোমার দিদির মুখের দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকাতেই পারতে না। তুমি বলেছিলে : লক্ষ্য করছ না? দিদি কী রকম চুপ হয়ে যাচ্ছে? ওর নার্ভ বোধ হয়......আমি তোমায় আঙুল ছুঁয়ে বলেছিলাম আর নয়, এবার আমাকেও দেখতে হবে। তুমি তখন কেঁপে উঠেছিলে? কেন?

আগস্টের সেই ভয়ানক বৃষ্টির দিনে কেন আমি শুক্লাকে বলেছিলাম : চল, তাপসের ওখানে ঘুরে আসি, অনেকদিন ফোন করছে ও......

—আজকে? এই বৃষ্টির মধ্যে সেই মধ্যমগ্রামে?...তাছাড়া গাড়ি বিগড়ে আছে সারভিসিং-এ পাঠাতে হবে, ওই গাড়িতে বৃষ্টির মধ্যে......

—তুমি কী দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু...

—শুক্লা রাজি হয়েছিল। শুধু দমদম ছাড়িয়ে গেলে আমায় বলেছিলে তুমি ঘামছ, হাত কাঁপছে তোমার, দাও স্টিয়ারিং আমাকে দাও...এভাবে দুজন মরলে...বৃষ্টির শব্দের ভেতর শুক্লার হাসি আমার বুকে হিম করে দিয়েছিল। আমি হেসেছিলাম। সত্যি, বোকামিই হয়ে গেছে, এই বিশ্রী ওয়েদার! আর রাস্তাঘাট যা হয়ে আছে... ফেরা যাক, কালকেই সারভিসিং-এ পাঠাতে হবে গাড়িটা, আমি বুঝিনি ঠিক যে কনডিশান এতটা......।

তুমি নিরুপায় শ্যামল, সরু চোখে শুক্লা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল তখন।

পরদিন দুপুরে একটা ফোন এসেছিল তোমার অফিসে। এখুনি চলে আসুন পি জিতে, আপনার স্ত্রী...রিসিভারটা পড়ে গিয়েছিল আমার হাত থেকে, সমস্ত দেয়াল কেঁপে উঠেছিল চোখের সামনে, তোমার কলেজেও কি ফোন গিয়েছিল অতসী?......

ট্যাক্সিতে বসে আমার ভয় হয়েছিল... শুক্লা কী তাহলে 'সুইসাইড' করতে গিয়েছিল?...

কিন্তু মৃত্যুর সামনে হয়তো ও একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ওর কাকা হাত ধরে রেখেছিল ওকে, এমনিই হয়। জীবনের জন্য এ রকম আশ্চর্য মমতা লুকিয়ে থাকে আমাদের সকলের বুকের মধ্যে!

মৃত্যু সামান্য একটু রসিকতা করে ফিরিয়ে দিয়েছিল শুক্লাকে। মাথায় আঘাত পেয়েছিল সে। চিরদিনের মত অতীত আর ভবিষ্যৎ হারিয়ে গেল শুক্লার জীবন থেকে ......রইল শুধু অর্থহীন, ভাষাহীন, অন্ধকার বর্তমান। আমাদের মধ্য থেকে কে ওকে পাঠিয়ে দিল বিস্মৃতির নির্বাসনে। আমাকেও চিনতে পারে নি শুক্লা।

আর নার্সিং হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার সমস্ত আবেগ, দুঃখ মমতা ভেঙে পড়েছিল : এ তুমি কী করলে? কেন করলে? তুমি এত ছোট হয়ে গেলে শ্যামল?......

চিরদিন পুরুষ যা বলে আমিও তাই বলতে চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে। আসলে প্রেমের উল্টো পিঠে কী, তা আমি জানি না। বোধহয়......বোধহয় জ্বালা, প্রতিহিংসার মত কিছু। তোমার প্রতিটি মুহূর্ত আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল, তোমার ঠোঁটের কারুকার্য, তোমার তাকিয়ে থাকার চাপা বিষাদ, চুলের গন্ধের ভেতর ঘুমের মত কিছু। শয়তান আমার ভেতরে খেলা করছিল তখন।

না, চেষ্টা করা হয়েছে সব রকম। দুবছর আমরা যেন একটা ব্রত পালন করছিলাম। কিন্তু জীবন তো সিনেমার গল্প নয় অতসী।......ক্রমশ বোঝা গেল। সবাই বুঝলো। ডঃ মজুমদার বললেন : আই অ্যাম রিয়েলি সরি মিঃ সেন, যা করার ছিল অন্তত এদেশে, সবই তো করে দেখা গেল, ইটস্ এ লস্ট কেস মিঃ সেন। আপনার স্ত্রীর......

উঃ কী অসহ্য মুক্তি! আমি শুনতে পেলাম সেই সমুদ্রের গর্জন। দীর্ঘদিন বাদে দেখলাম মানুষের মুখ, সমস্তের রঙ...জলের মত ঘুরে ঘুরে বুকের ভেতর খেলা করছিল তোমার নাম! এইবার, অতসী এইবার!

ডিভোর্স পেতে অসুবিধে হয়নি আমার। এ সব ক্ষেত্রে হবার কথাও নয়। তাছাড়া ডঃ মজুমদারের সার্টিফিকেট ছিল কোর্টের বুঝতে দেরী হয়নি এটা সাজানো নয়।

বেশ হিম পড়ছে অতসী, তুমি কী এখনো বসে থাকবে? দ্যাখো, স্টেশনের রাস্তাটা নির্জন হয়ে এসেছে, লাল টালির বাংলোয় হয়তো আলো নিভে গেছে এতক্ষণে।......হয়তো অসংখ্য জোনাকিরা উড়ছে অন্ধকারে......তারপর কুয়াশায় হেমন্তের মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে সমস্ত রাত। তারচেয়ে চল, ভেজা ঘাসের মধ্যে শব্দ না তুলে আমরা ফিরে যাই। স্টেশনে একটা ইঞ্জিন বোধহয় শান্টিং করছে......তোমার চারপাশে বিষণ্ণতা, স্মৃতি, তুমি কী কাঁদছিলে অতসী?

এখন অনেক রাত। চোখে পড়ে তারারা ম্লান হয়ে আসছে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে। রূপকথার মত এক রহস্য লেগে আছে গাছের মাথায়। অন্ধকার স্পর্শ করা যায়... দূরে কুয়াশায় পাওয়ার-হাউসের নীল আলো। কোথায় কী পাখি ডেকে যাচ্ছে?

কুয়াশায় শব্দহীন রাতকে মৃত মনে হয়। শ্যামল দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের নীচে ভিজে ঘাসের স্পর্শে শরীর কেঁপে ওঠে। সমস্ত দৃশ্যের ভেতর কী এক অব্যক্ত বিষাদ, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ভেজা পাতা। তাকাল একবার, অতসীর ঘরে, জানলায় ক্রমে ফিকে নীল আলো। ঘুম......স্বপ্ন। আরও কী সব মনে পড়ে তাকিয়ে থাকলে। শ্যামল তাকিয়েই রইল। শিশিরের ম্লান শব্দের মতই সময় ঝরে যাচ্ছে। ঝরে যাচ্ছে অবিরাম।

অতসী তুমি বাইরে আসবে না? এই বাগানে নেমে এলে দেখতে পেতে পৃথিবীর মত নিরপেক্ষ আর কিছু নেই। সৌরজগৎ চলছে অংকের নিখুঁত নিয়মে, বোঝা যায় না, চেনা যায় না, তবু ওই অনন্ত আকাশে জ্বলছে মার্স জুপিটার আর ভেনাস!...... নেমে এস, বাগানের এই নির্জনতায়, কত দূরের কর্কশ কলকাতা এখন কী আলপিনের মত তোমায় বিঁধছে?...কেন?...কেন অতসী? সেই ঘর, বাতাসহীন অন্ধকার ... বৃষ্টির শব্দের মত শুক্লা কী কিছু ভাবতে চাইছে, নাকি ট্রেন চলে যাওয়ার তীক্ষ্ন শব্দের প্রতীক্ষায় কেটে যাচ্ছে তার মুহূর্ত? ...কিছু নয়, এসব কিছুই নয় অতসী...... এ তোমার ভয়, তোমার ব্যর্থতা......সুখ দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভালবাসা, সবকিছু ছাড়িয়ে নিজের এক বিশুদ্ধ জগতে চলে গেছে শুক্লা! সেখানে হার নেই, জিৎ নেই ......রক্তের গোপন ষড়যন্ত্র নেই। মৃত্যু নয়, তবু মৃত্যুর চেয়েও অজ্ঞাত এক জগতে সে একা। একেবারে দূরের ওই তারার মত নিঃসঙ্গ।......

তাই কোনো লাভ নেই। কেন জলের মত তুমি বারবার কেঁপে উঠছ। আমরা পেয়েছি, আমরা যা চাই।......

দ্যাখো, লালপাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে উঠে এল তামা রঙের চাঁদ, গুলমোহরের ছায়া মনে হয় অলৌকিক স্বপ্নের মত। বাতাস মরে আসছে ক্রমশ।...এই তো সময় অতসী...তিন অথবা চারদিন......এখন একবার এখানে এসে দাঁড়াও, পাতায় জ্যোৎস্নার রঙ...... এখন একবার ছুঁতে দাও তোমার আঙুল, খুঁজে নিতে দাও আমাকে, ভয় পাওয়া পাখির মত তোমার নরম বুক।......বোধ হয় শিউলির গন্ধ আসছে দূর থেকে। অতসী অন্তত একবার।......

শ্যামল দেখল : অতসীর ঘরের আলো নিভে গেল। ম্লান নির্জনতায় ভেজা করবীর স্পর্শ টের পেতেই শ্যামল বুঝল : এখন অতসীকে ডাকলে, অতসী আসবে না।

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

শিউপ্রসাদজি অনেক রাত পর্যন্ত যে ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনালেন খল নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। সব শোনবার পর ···

রতনলালের কাছে খুনের কবুলতি তাহলে আপনি লিখে দিয়েছেন।

কিন্তু খুনত সত্যি আপনি করেননি! বোমার ভুলে এটা নিছক দুর্ঘটনা।

তবু খুনের শাস্তিই আমি চাই। লক্ষ্মী আমারই হাতে মারা গেছে জানবার পর আইনের ফাঁকে বাঁচতে আর চাই না।

তাহলে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? আপনার কোনো কাজেই যখন লাগছি না···

না, একটা বিশেষ সাহায্য আপনার কাছে চাই!

শিউপ্রসাদজি সহজ মানুষের মতই উঠে গিয়ে ঘরের কোনের একটি সিন্দুক খুললেন ···

ফিরে এসে টেবিলের ওপর সেই কাগজের প্যাকেটটা রেখে বললেন ···

এই কাগজগুলো আপনার জিম্মায় আমি রাখতে চাই, মিঃ ভর্মা!

কাগজগুলো কিসের?

এতো শিল মোহর করা দেখছি—

হ্যাঁ, এ শিল মোহর আপনিই প্রথম ভাঙবেন। পাছে খোওয়া যায় বলে সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছি আজ পর্যন্ত।

এগুলো এত দামী? নোটের তাড়া নাকি?

না। রতনলালের আসল শয়তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র! এ অস্ত্র আপনিই ব্যবহার করতে পারবেন।

অঙ্গনা

শীতল সন্ধ্যা

সেদিন [illegible] ঘরে [illegible] আসর [illegible]। [illegible]। এক্ষেত্রে আকস্মিকতায় [illegible] সবাই। এবং [illegible] [illegible]। যাঁরা [illegible] [illegible] কথা [illegible]। [illegible] [illegible]কে তাঁরা যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা যেমন ক্রেতাদের মন রেখেছেন তেমনি নিজেদের মান বাঁচিয়েছেন। বাদবাকি সবাইকে রাস্তার পাঁচ গলা আর গায়ের ঘাম ঝরা ঠাঠা রোদ্দুরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এর কোন বিকল্প নেই। কাজকম্মো করতে হবে তো!

এমনি কাজকম্মেই বেরোতে হয়েছিল। পড়ন্ত রোদ। আরো অসহ্য। রাস্তা ফুঁড়ে গরম উঠছে। গরমকে প্রাণপণে অস্বীকার করে এগুচ্ছিলাম, একটু পরেই মরুদ্যানে পৌঁছে যাব, এই চিন্তায়। ক্ষণিক বিশ্রামের কথাই তখন মনে ছিল। এর বেশি আর কিছু চাইওনি। অথচ অপেক্ষা করেছিল, বিরাট পরিতৃপ্তি, অনেকখানি শীতলতা। বিস্ময় ক্রমই বেড়েছে। অবশেষে আমার বিস্ময় আর থৈ পায়নি। এখনো সেদিনের স্মৃতিতে মাখামাখি।

একে গ্রীষ্মকাল তায় পুষ্পসজ্জার আসর। প্রথম চোটেই কেমন কেমন ঠেকেছিল। বসন্তকাল ফুরিয়ে গেছে। ফুলের মরশুম শেষ। এখন পুষ্পসজ্জার আসর কেমন হবে? মনের আনাচে-কানাচে এই প্রশ্নটা ঘুরে বেড়িয়েছে। সমাধান খোঁজার জন্যই সেদিন নির্দিষ্ট ঠিকানা বরাবর বেরিয়ে পড়েছিলাম। আর এ-ও জেনেছিলাম, উদ্যোক্তা যখন ইকেবানা (ইকেনোবো) ফ্লোরাল আর্ট স্কুল অফ ইণ্ডিয়া এবং প্রিন্সিপাল শ্রীমতী নোবুকো সফট তখন পুষ্পসজ্জার নিশ্চয়ই জমজমাট হবে। শ্রীমতী সফট শুধু উদ্যোক্তা, এখানে তাঁর তেমন ভূমিকা অবশ্য থাকবে না পুষ্পসজ্জার জন্মভূমি জাপান থেকে আসছেন ইকেনোবো ইনস্টিট্যুটের সিনিয়র প্রফেসর মিঃ টি মিয়ামতো এবং মিস এইচ মিয়ামতো। এঁরা সকলের সামনে জাপানী পুষ্পসজ্জা প্রদর্শন করবেন। তাই ফুলের বাহার এখানে খুব বড় কথা নয়। বাহার হলো বিন্যাসের। তার আকর্ষণই এখানে মুখ্য। সেই আকর্ষণেই হল-ভর্তি লোক। যার একজন আমি।

বসে আছি। সকলের সঙ্গে আমিও আগ্রহে অধীর। কতক্ষণে ওঁরা আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমতী সফটের সঙ্গে মঞ্চে এলেন ওঁরা দুজন। ওঁরা আসন গ্রহণ করলেন।

জাপ-দুহিতা এবং ভারতীয় ঘরণী শ্রীমতী সফটকে শাড়িতে সুন্দর মানিয়েছিল। তিনি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, ইকেবানা পুষ্পসজ্জায় ইকেনোবো হচ্ছে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। আর সেই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের দুজন সিনিয়র প্রফেসর আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এঁরা আমাদের সামনেই পুষ্পসজ্জার কারুকার্য প্রদর্শন করবেন। উপসংহারে তিনি বললেন, জাপানের ইকেনোবো প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা হিসাবে আমি এদেশে পুষ্পসজ্জা শেখানোয় নিযুক্ত আছি। আমি শিগগিরই জাপানে যাচ্ছি এবং পুষ্পসজ্জায় আমার কৃতী শিক্ষার্থীরা যাতে স্কলারশিপ নিয়ে খোদ জাপানে গিয়ে পুষ্পসজ্জায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য জাপ সরকারকে অনুরোধ করবো।

শ্রীমতী সফটের প্রতি কথায় যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল। ইকেবানা পুষ্পসজ্জার বহুল প্রসারের জন্য তিনি, যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর এমন দু-একজন কৃতী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কলকাতার পুষ্প রসিকদের পরিচয় হয়েছে যাঁরা নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছেন। শেখানোর এই আন্তরিকতা থেকে মনে হয় তিনি কৃতী শিক্ষার্থীর জন্য জাপ সরকারের কাছ থেকে স্কলারশিপ আদায়ে সফল হবেন।

এসব কথা মনে উঠছিল ঠিকই কিন্তু লক্ষ্য ছিল কখন মিঃ মিয়ামতো এবং মিস মিয়ামতো ফুলের কাজ শুরু করেন। এবার উঠলেন মিঃ মিয়ামতো। হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত মুখশ্রী। সকলকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। তারপরই বললেন , আজ ভীষণ গরম। তবে পুষ্পসজ্জা আমি আপনাদের নিশ্চয়ই দেখাবো। আর সেজনাই তো আমার এবং আপনাদের একসঙ্গে মিলিত হওয়া। বিবৃত করলেন জাপানী পুষ্প-সজ্জার ঐতিহ্যানুসারী ইতিহাস। অবশ্যই দু-একটি কথায়। তবে আসল কথাটা বলতে একটুও ভুল হয়নি, ভগবান তথা-গতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রদত্ত ফুল থেকেই ইকেবানার উদ্ভব। সেই ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হতো না। আর ভগবানকে এভাবে কেউ শ্রদ্ধা জানায় নাও। সেই ফুল হতো ঊর্ধ্বমুখী। অসীম অনন্তে মুখ তুলে ভগবান তথাগতের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছুতো ভক্তহৃদয়ের সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাই জাপানী পুষ্পসজ্জার ইতিহাস অনেক পুরানো। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমার হাতে সময় মাত্র দু ঘন্টা। শুধু সমুদ্র মন্থনজাত অমৃতটুকুই আপনাদের উপহার দেওয়া সম্ভব হবে। আশা করি, আপনারা তা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করবেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখের জাপানী বক্তৃতায় হল তখন মন্ত্রমুগ্ধ।

মিঃ মিয়ামতো কাজে হাত লাগালেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মিস মিয়ামতো।

প্রথমেই তিনি দেখালেন সোফা স্টাইলের কাজ। সাধারণতঃ এই পুষ্পসজ্জা এক দুই এবং তিনের সমাহারে সুন্দর করা যায়। সিন, তাই, সোয়ে তিনদিক থেকে এই পুষ্পসজ্জার সৌন্দর্য যোগান দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনে সোফা স্টাইলের কাজ হয়। পুরনো এবং নতুন ঢঙ। কখনো কখনো আবার দুইয়ের মিশ্রণ। অনেক রকম ফের তিনি দেখালেন। সব কিনা বলতে পারবো না। পুষ্পসজ্জা দেখাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে জাপানীতে তা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অনুবাদের দায়িত্বে আছেন স্বয়ং শ্রীমতী নফট।

দর্শকদের সঘন করতালি প্রতিটি পুষ্পসজ্জার শেষে ও'দের অভিনন্দিত করছিল। ও'রা হাসিমুখে দর্শকদের প্রত্যাভিবাদন জানান। তাপ-নিয়ন্ত্রিত হলেই পুষ্পসজ্জার আসর। কিন্তু সেদিনের গরমের হাত থেকে তবু রেহাই নেই। মিঃ মরিবানা, রিক্কা, নাগেরিয়ে প্রাইমেটোরিয়াল মিয়ামতোর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আর যোগান দিতে দিতে মিস মিয়ামতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হচ্ছে। এর মধ্যেও মুখের হাসি অক্ষুন্ন রেখেই ও'রা পুষ্পসজ্জা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন।

মুগ্ধ হবার মতো। প্রতিটি কাজ মুহূর্তে সম্পন্ন। হাতের কাছে সব উপস্থিত। উনি ব্যাকরণ মাফিক সাজিয়ে গেলেন। মনে হয় খুবই সহজ। সহজও যে সাধনা সাপেক্ষ একথা বেশ বুঝতে পারা যায়। একটি পাতা হাতে নিলেন মিঃ মিয়ামতো। হাতের চাপে সেই পাতাকে তিনি সোজা করছেন আবার বেঁকিয়ে দিচ্ছেন। পাতা সব সময়ই একরকম। একদম দোমড়াচ্ছে না। কোথাও এতটুকু ভাঁজ পর্যন্ত নয়। দর্শক অবাক। অথচ এর মধ্যে কোথাও যন্ত্রমন্ত্র নেই। নেহাতই সুপরিমিত হাতের ব্যবহার। আর এজন্যেই সাধনা। শুধু পাতাই নয়। যখন যা প্রয়োজন ডাল, লতা, ফুল তিনি হাতের সাহায্যে সোজা করে নিচ্ছেন অথবা বেঁকিয়ে নিচ্ছেন।

একটু বিশ্রাম নিলেন ও'রা। ইণ্টারভাল। আবার আসরে এলেন। এবার কাজ শুরু হলো অনেকখানি গতি নিয়ে। তিনি একের পর এক দেখিয়ে চললেন পুষ্পসজ্জা। ওদের বিভিন্ন ঢঙ। সোফা দিয়ে শুরু করায় কিরকম একটু ধাঁধায় পড়েছিলাম। রিক্কা তো আদি জননী। তবে সোফা প্রথমে কেন? সে সন্দেহের অবসান হলো। মিঃ মিয়ামতো জানালেন রিক্কার সহজ স্বচ্ছ রূপই হলো সোফা।

অনেক পুষ্পসজ্জা। ছোটখাটো একটি প্রদর্শনী। শুধু প্রদর্শন নয়। তিনটি টেবিল ভরে উঠেছে। দর্শকদেরও কৌতূহলের অন্ত নেই। কেউ দেখছেন শুনছেন। আবার কেউ কেউ মিঃ মিয়ামতোর বক্তৃতার নোটও নিচ্ছেন। সুযোগ ছাড়া হারাতে রাজি নয়। ফুলদানীতে শুধু রজনীগন্ধার গুচ্ছ স্থান পাবে না। পরিবর্তে সোফা বা রিক্কার একটি অতি আধুনিক স্টাইল সেখানে শোভা পাবে। আবার কেউ কেউ হয়তো উৎসাহের চোটে পুরোপুরি শিক্ষার্থী হয়ে আসবেন শ্রীমতী নফটের কাছে।

দেখতে দেখতে দু ঘন্টা হয়ে গেছে। দর্শকরা বুঁদ। হুঁশ নেই। মিঃ মিয়ামতো হুঁশিয়ার। প্রদর্শন শেষ। ঘড়ি তুলে তিনি সবার কাছে বিদায় চাইলেন। মুগ্ধ দর্শক দেখলে ঘড়ি ৬টার ঘর ৮টার ঘর ছুঁয়েছে। খেলাও শেষ। পারস্পরিক অভিবাদন এবং অভিনন্দনে সবাই বিদায় নিচ্ছেন।

এতক্ষণ মনে ছিল না। বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডা আমেজটা কোথায় মিলিয়ে গেল। ভ্যাপসানো গরমে শরীর জ্বালা করতে লাগলো।

—প্রমীলা

বেতার স্মৃতি

গানের অডিশন বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আছে। অডিশন বোর্ড গঠিত হবার আগে যাঁরা গানের শিল্পী নির্বাচন করতেন তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, কিন্তু অডিশন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশি এবং নানাবিধ।

আগে প্রোগ্র্যাম অ্যাসিস্ট্যান্টরাই শিল্পী নির্বাচন করতেন। তাঁদের অনেকেই সংগীত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ দ্বারা এই ধারণাই সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের খেয়ালখুশি মতো শিল্পী নির্বাচন করেন। এই খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠাতে অডিশন বোর্ডের সৃষ্টি।

ডঃ কেশকরের আমলেই প্রথম অডিশন বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে ডঃ বি ভি কেশকর তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রি-রূপে কার্যভার গ্রহণ করার পরই প্রথম সচেতনভাবে বেতারে সংগীতের ক্ষেত্রে একটা নীতি গ্রহণ করা হয়। এবং সেই নীতির অন্যতম সৃষ্টি অডিশন বোর্ড।

বেতারের সচেতন সংগীত নীতির প্রথম বড়ো পদক্ষেপ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের জন্য বেতারের বাইরের লোকদের নিয়ে দুটি অডিশন বোর্ড গঠন। বাইরের লোকদের দিয়ে শিল্পীদের গ্রেডিং ও ফী ঠিক করার এবং তাঁদের গুণবিচারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রথমেই অডিশন বোর্ড নিয়ে গোলমাল দেখা দেয় এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে, বিশেষ করে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মতো বড়ো বড়ো কেন্দ্রে।

অডিশন বোর্ডকে জুরি নামেও আখ্যাত করা হয়েছে। এই জুরি বেতারের প্রত্যেকটি শিল্পীকে তাঁদের সামনে হাজির হবার জন্য চাপ দেন, এবং তাঁদের গান শোনার পর সংগীতের তত্ত্ব নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানার কথা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যের কথা সারাদেশে পরিজ্ঞাত এবং স্বীকৃত। এবং এই পার্থক্য যে ভারতীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে সে-কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই জুরি পদ্ধতিতে শিল্পীদের মধ্যে এই ধারণারই সৃষ্টি হল যে, একদল লোক অন্যসব ঘরানার উপর একটা ঘরানারই মত চাপাবার চেষ্টা করছেন। এই নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বহু কেন্দ্রে 'শিল্পী সমিতি' গড়ে উঠল। ছোটো ছোটো কেন্দ্রের শিল্পীরা বাধ্য হয়ে জুরির সামনে হাজির হতে লাগলেন, নইলে বেতারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হত। কিন্তু কলকাতা আর বোম্বাই কেন্দ্রের শিল্পীরা বেঁকে বসলেন। তাঁরা অডিশন দিতে অস্বীকার করলেন।

তারপর ১৯৫৩-৫৪ সালে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কলকাতা কেন্দ্রের বহুসংখ্যক শিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে জুরির সামনে হাজির হওয়া থেকে 'অব্যাহতি' দেওয়া হল। স্টেশন ডিরেক্টরের সুপারিশক্রমে তাঁদের এমনভাবে নতুন গ্রেডে স্থাপন করা হল যাতে তাঁদের বর্তমান ফীতে হাত না পড়ে।

জুরি পদ্ধতির বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো সমস্ত সমালোচনা স্বীকৃত হল এবং সংশোধিত বিধানে সেগুলির বিহিতও করা হল। অডিশন বোর্ডের 'মিউজিক জুরি' নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হল 'মিউজিক অডিশন বোর্ড'। সুপরিচিত শিল্পীদের এই বোর্ডের সামনে হাজির হওয়া থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও হল। অডিশন বোর্ডের এখন কাজ দাঁড়াল শুধু শিল্পীদের গান বিচার করা, শিল্পীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনো সংস্থান আর রইল না। শিল্পীদের রোল নম্বর দেবার ব্যবস্থা করায় অডিশন বোর্ডের সঙ্গে তাঁদের আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ রইল না, এমনকি চাক্ষুষ দেখা পর্যন্ত না।

ডঃ কেশকরের আমলের একটা মস্ত দোষ—কেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রে অবস্থিত মাত্র দুটি (একটি উত্তর ভারতীয় ও অপরটি দক্ষিণ ভারতীয়) অডিশন বোর্ডের পক্ষে সারা দেশের প্রচুরসংখ্যক শিল্পীর গুণাগুণ বিচার করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফলে বহু শিল্পীকে তাঁদের অডিশনের ফলাফল জানার জন্য দু বছর, তিন বছরও অপেক্ষা করতে হল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য শেষে একটা উপায় উদ্ভাবিত হল। সংশোধিত ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি বেতার কেন্দ্র মিউজিক প্রোডিউসার আর বাইরের সংগীতজ্ঞদের নিয়ে একটা করে স্থানীয় অডিশন কমিটি গঠিত হল। এই স্থানীয় অডিশন কমিটি লাইট মিউজিকের শিল্পীদের চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল মিউজিকের বেলায় (লাইট ক্লাসিক্যাল মিউজিকেরও) স্থানীয় অডিশন কমিটি কোনো প্রার্থীকে বেতারের উপযোগী মনে না করলে তাঁকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু উপযুক্ত মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না কেন্দ্রীয় মিউজিক অডিশন বোর্ডের বিচারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করতে পারেন মাত্র।

এই শেষোক্তদের সংগীত স্থানীয় বেতার কেন্দ্র টেপ রেকর্ড করে দিল্লীতে মিউজিক অডিশন বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়। এবং তাঁরা সেই টেপ রেকর্ড শুনে চূড়ান্তভাবে স্থির করেন সেই প্রার্থী বেতারে সংগীত পরিবেশনের উপযুক্ত কিনা। তাঁরা স্থানীয়

অডিশন কমিটির সুপারিশ-করা কোনো প্রার্থীকে গ্রহণ করতে পারেন, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন।

এই শেষোক্তদের বিচারে দুর্নীতি আছে বলে বিশেষ শোনা যায় না, দুর্নীতির অভিযোগ প্রবল প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ যাঁরা লাইট মিউজিকের, মানে আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, শ্যামা-সংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, লোকগীতি প্রভৃতির শিল্পী তাঁদের অডিশনের ক্ষেত্রে।

স্থানীয় অডিশন কমিটিতে বাইরের যেসব বিচারক আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু ছাত্রছাত্রী আছেন, এবং এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁদের একটা 'কর্তব্য' আছে। এই 'কর্তব্য' পালন করতে গিয়েই অনেক সময় তাঁদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়। এই অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। মাস্টারমশাইদের ছাত্রছাত্রী না থাকলে চলে না, এবং অডিশনে পাস না করালে ছাত্রছাত্রী আসে না। তাই মাস্টারমশাইরা অডিশনে বসে নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের পাস করানোর প্রতিযোগিতায় নামেন। যাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রী নন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অনেককেই তাই বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। আর যাঁরা ছাত্রছাত্রী, যোগ্যতা না থাকলেও কিংবা কম থাকলেও অনায়াসে তাঁরা অডিশনের বৈতরণী পার হয়ে যেতে পারেন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৫ই এপ্রিল বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদে বলা হল, অ্যাপোলো-১৩র 'নভশ্চররা শুক্রবার দিন প্রশান্ত মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন'।.........দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগের জানা দরকার, নভশ্চররা কখনও মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন না, মহাকাশ-যানের ভিতরে অবরুদ্ধ থেকে ধীরে ধীরে মহাসাগরের বুকে নেমে আসেন। প্রত্যেক-বারই তাই এসেছেন। এবার বিপদ মাথায় নিয়েও তাঁরা মহাকাশযানের দরজা খুলে মহাকাশ থেকে কিংবা নিম্নাকাশ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নি, পূর্ববর্তী সমস্ত বারের মতো মহাকাশযানে করেই পৃথিবীর কাছাকাছি এসে প্যারাশুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমেছেন, তার-পর মহাকাশযানের দরজা খুলে বাইরে এসেছেন। কখনও কোনো স্তরেই ঝাঁপ দেবার প্রশ্ন ওঠে নি, সে প্রয়োজন দেখা দেয়নি। দিলেও কিছু লাভ হত বলে মনে হয় না। সুতরাং মনগড়া একটা কথা বলে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করার কোনো অর্থ হয় না।

তাছাড়া অ্যাপোলো-১৩র যাত্রীদের নভশ্চর বলাও বোধ হয় ঠিক হয়নি। কারণ, তা বিভ্রান্তিকর। নভশ্চর শব্দের অর্থ আকাশচারী। পাখি, বিদ্যাধর, মেঘ ইত্যাদিকে নভশ্চর বলা হয়, কারণ তারা আকাশে বিচরণ করে। মানুষ আকাশে বিচরণ করে না, তাই মানুষ আকাশচারী হতে পারে না। মানুষ আকাশে অথবা মহাকাশে যাত্রী হয়। সে যাত্রী—শুধুই যাত্রী। যে মানুষ মহাকাশে যায় (এবং ফিরেও আসে) তাকে মহাকাশযাত্রী বলাই সঙ্গত। নভঃ শব্দের প্রতি যদি বিশেষ আকর্ষণ থাকে তাহলে নভোযাত্রী। নভশ্চর নয় কোনো মতে।

এই খবরেই কার্বন ডাইঅকসাইড বলতে কয়েকবার কার্বন অকসাইড বলা হয়েছে। কার্বন অকসাইড বললে কার্বন মনোকসাই-ডও বোঝাতে পারে, এবং কার্বন ডাই-অকসাইড ও কার্বন মনোকসাইড এক জিনিস নয় বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

১৭ এপ্রিল রাত সওয়া ১০টায় ইংরেজী নিউজ রীল। এই অনুষ্ঠানে সব-চেয়ে বেশি ঐতিহাসিক মূল্য বহন করেছে যে অংশটুকু তা হচ্ছে "জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে" ডঃ হীরালাল চোপরার ভাষণ। ডঃ চোপরা ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ-দর্শী। তিনি নিজের চোখে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে সেদিনের বৃটিশের বর্বরোচিত আচরণ দেখেছিলেন, এবং "জালিয়ান-ওয়ালাবাগ দিবসের" সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন।

এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মনোরম অংশ হাঙ্গেরীয় সংস্কৃতি ও ভারত-হাঙ্গেরী সম্পর্ক বিষয়ে জনৈক হাঙ্গেরীয় মহিলার ধীর, নম্র কণ্ঠে মধুর, স্বচ্ছন্দ স্বরে ইংরেজী ভাষণ। তাঁর ভাষণটি সাগ্রহে শোনার মতো।

এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ গড়িয়ায় যক্ষ্মারোগীদের জন্য অতি-রিক্ত ১০০টি শয্যার উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। শ্রীশূর তাঁর ভাষণে বলেন, কলকাতায় যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু যেভাবে এগুনো হচ্ছে তাতে কত বছরে এই লক্ষ্যে পৌঁছুনো সম্ভবপর হবে?

এই অনুষ্ঠানে রেল সপ্তাহ অংশে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের ঐ কথাটি শুনতে বেশ ভালো লেগেছে : রেল এমন একটা জায়গা যেখানে সমাজের সর্ব নিম্ন থেকে সর্ব উচ্চ সমস্ত শ্রেণীর লোক আছেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পাদিত, সুগ্রন্থিত।

১৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টায় শিশু মহলে রূপক "সোনার মুকুট"। রচনা শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতু-পর্যায় নিয়ে লেখা এই রূপকটি যতখানি প্রয়ো-জনীয় ছিল ততখানি আকর্ষণীয় না। এক-এক ঋতুর এক-এক প্রতীক দাঁড় করিয়ে সেভাবে ছ'টি ঋতুর সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ভালো। প্রতীক-গুলি চেনাজানা, কিন্তু তাদের কথোপ-কথনে রসের অভাব। প্রথমার চেয়ে গানেরই আকর্ষণ ছিল বেশি। শব্দ সংযোজনা প্রশংসনীয়।

২০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে প্রচারিত "বিপদের কথা কী বলব" শীর্ষক নকশাটির উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা গেল না। অত্যন্ত মামুলি ধরনের একরাশ কথার মধ্যে একজন জোর করে আয়ত্ত করা মুদ্রা-দোষের মতো ঘন ঘন বলে গেলেন 'বিপদের কথা কী বলব।' তাঁর কী যে বিপদ, ঠিক করে জানা গেল না। লেখক এর মধ্য দিয়ে কী বলতে চেয়েছেন, বোঝা শক্ত। কিছু রঙ্গরস সৃষ্টিই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি। রঙ্গরসের বিন্দুমাত্রও দানা বাঁধে নি।

২১ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটোদের আসরে অতুলপ্রসাদের গান শোনাল গীতালি সেন। বেশ লাগল। এই শিশুশিল্পী সম্পর্কে আশা পোষণ করা যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের "বনবাস" পড়ে শোনাল নূপুর সরকার। বেশ স্বচ্ছন্দ নির্ভীক। ভালো লাগল।

এইদিন রাত ৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি-মন্ত্রীর নাম শোনা গেল বিদ্যাচরণ শুক্লা, আর পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব অ্যাডভোকেট-জেনারেলের নাম এস কে আচারিয়া। সংবাদ পাঠক বাঙালী তো?

—শ্রবণক

জলসা

চিত্তস্পর্শী জার্মান ব্যালে। "মানুষের হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র প্রকাশই আমাদের নৃত্যের বিষয়বস্তু। আমার মতে নৃত্য হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেই ছন্দময় ভাষার আধারে যার মধ্যে মানুষের আশা-নিরাশা-আনন্দ-বেদনার দোলা আছে—আবার দৈনন্দিন জীবনের সকল স্বপ্ন-অতিক্রমী ব্যঞ্জনা-দীপ্তির চকিত আভাসও ঝলকে ওঠে।" কলামন্দিরে জার্মান ব্যালে মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বে ম্যাকসমূলার ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে 'অমৃতের' প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে জার্মান ব্যালে দর্শন সম্বন্ধে এই তথ্য জ্ঞাপন করেন—তাদের অধিকর্তা মিঃ গার্ট রিন হোম।

পরদিন সকালে ম্যাকসমূলার ভবন নিবেদিত ব্যালেতে এই শিল্পভাবনারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ পেশ করে এরা শিল্প-রসিকদের অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছেন।

'দি টেম্পটেসন অফ ইসাবেলা'তে দেখা গেল মানুষের চঞ্চল বাসনার উদ্দাম রূপ। তারপরই শান্ত সংহত সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বমুখী আবেদনের এক চিত্তস্পর্শী প্রকাশ জর্জ ব্যালানচাইনের কোরিওগ্রাফি অনুসারী প্রথম ও দ্বিতীয় গতিছন্দ।

বার্ক কনসার্টোর এক মাইনরের সঙ্গীতসঙ্গ ব্রিত্তন ম্যাকডোনাল্ডের নৃত্য-রচনার প্রশ্নটা আঙ্গিকে এ সম্প্রদায়ের শিল্পীতারকারা একক এবং মিলিত উভয় সুষমার সমন্বয়ে এক তুলনাবিহীন সামগ্র্য সার্থকতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে 'হ্যামলেট' নৃত্যাভিনয়ে সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের অপরূপ সম্মেলন প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে রেখেছে।

'হ্যামলেট' নাট্য যেন বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের এক বিচিত্র রূপ। রাজার অন্তহীন লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার—দ্বন্দ্ব রাণীর দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি ও বাৎসল্যের সংঘাতে।

ওফেলিয়ার কুমারী হৃদয়ের রঙিন প্রণয় স্বপ্ন হ্যামলেটের কঠোর কর্তব্য-সাধনের দৃঢ়সংকল্পের আঘাতে বিচলিত। আর অন্তহীন দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ্যামলেট পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কামনায় তীব্রভাবে বাঁচার থাকার দরুণ রাজ্যসুখ-সম্ভোগে বীতস্পৃহ এমন কি প্রাণতুল্য ওফেলিয়ার প্রণয়েও সাময়িকভাবে উদাসীন। পরিণামে বন্ধু ও প্রণয়িনীহীন ভয়াবহ একাকীত্ব ও মৃত্যুবরণ।

জীবনের এই ঘাতপ্রতিঘাত, আলোড়ন আত্মধ্বংসী বিদ্রোহ যেন ছবির মত ফুটে উঠেছে কুশলী শিল্পী ও সুযোগ্য পরিচালকের যুগ্ম কুশলতায়। স্থূলে নৃশংসতা লঘুচিত্তের ফেনিলতা, নারীর কোমলপেলব সৌকুমার্য ও পুঞ্জীভূত বিষাদকে নাট্য ও নৃত্যসম্পদে অভিনব করে তুলেছেন রুডলফ হোজ, সিলভিয়া ক্যাসেল হেম, ডিডি কারলী এবং ক্যালানস বৌলজ।

টেপধৃত আবহসংগীত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখেছে। করপুস ডি ব্যালে এবং উৎসব দৃশ্যের ভাববস্তুর ওপর যথাযোগ্য আলোকপাত করেছে ম্যাজেন্টা ও নীলাভ এবং নানারঙা আলোর বর্ণবিভব।

সংগীত পরিবেশ করছেন সুপ্রকাশ চাকী

শিশু-সংগীত প্রতিভা সম্মেলন। "প্রতি বছর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে এবং নৃত্যে শিশু-প্রতিভা নির্বাচন, তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পুরস্কৃত করে ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ—ভারতীয় সঙ্গীতের যে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তা যে কোন সঙ্গীত-রসিকেরই শ্রদ্ধার বস্তু। তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হোক। আজকের যারা প্রতিশ্রুতি উপযুক্ত নিষ্ঠা, সাধনা ও শিক্ষা দ্বারা শিল্পী পরিণতিতে পৌঁছে তারা ভারতের সঙ্গীতজগতের সম্পদ হয়ে উঠুন আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা"—গত সপ্তাহে মহাজাতি সদনে আলাউদ্দিন সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজিত সর্বভারতীয় শিশু-প্রতিভা সম্মেলনে উদ্বোধনকালে কানন দেবী বলেন।

সেদিন মহাজাতি সদনের মঞ্চ যেন শিশুদের এক নির্মল আনন্দমেলা হয়ে উঠেছিল। সংস্থার পক্ষ থেকে উৎসব উদ্বোধিকা কানন দেবী, সভাপতি মনোজ সরকার এবং অধ্যক্ষ আলি আহমেদ খাঁকে মালাদানের পরও ৭৬টি শিশুরে প্রত্যেকে এক-একটি মালা পরিয়ে কানন দেবীকে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সারা প্রেক্ষাগৃহে এক আনন্দ কল্লোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। পুষ্পমাল্যভারে প্রায় অর্ধেক মুখ আবৃতা কানন দেবীকে খুব অভিভূত দেখাচ্ছিল এবং ভাষণেও তিনি তা প্রকাশ করেন।

শ্রীমনোজ সরকার তাঁর বিস্তৃত ভাষণে ভারতীয় সংগীতের বহুধা বিস্তৃত দার্শনিক দিকের ওপর আলোকপাত করেন।

ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ তাঁর স্বভাবোচিত বিনয়নম্র ভাষণে আবেগভরা ভাষণে 'সংগীত-লক্ষ্মী-স্বরূপিনী' কানন দেবীকে এবং মনোজ সরকারকে তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদানান্তে উদ্বোধন সভা সমাপ্ত করেন।

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ আয়োজিত সর্বভারতীয় শিশু-প্রতিভা সংগীত সম্মেলনে ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ, সভাপতি মনোজ সরকার এবং কানন দেবী

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ৭৬ জন শিশু-শিল্পী কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্য প্রদর্শন করেন। এ'দের মধ্যে অনেকেই সত্যিকারের প্রতিভাসম্পন্ন এবং আপন সাধনায় অচল-প্রতিষ্ঠ থাকলে সত্যিকারের শিল্পী হয়ে ওঠা এ'দের পক্ষে অসম্ভব নয়।

একটি উপভোগ্য আনন্দানুষ্ঠান। দক্ষিণ কলকাতার গোখলে স্পোর্টিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব অনেক আকর্ষণীয় শিল্পী সমন্বয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। আধুনিক গানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সুধাংশু রায়, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, সমরেশ রায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, সুপ্রকাশ চাকী ও বনশ্রী সেনগুপ্তা।

উদীয়মান শিল্পী সুপ্রকাশ চাকীর চারটি গান শ্রোতাদের প্রচুর অভিনন্দন লাভ করে। সতেজ সুন্দর কণ্ঠ, পরিবেশনা পদ্ধতিও প্রশংসনীয়। হাস্যকৌতুক ও আবৃত্তিতে ছিলেন যথাক্রমে বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, পিন্টু দত্ত (হরবোলা) প্রদীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী সবিতাব্রত দত্ত, তরুণকুমার ও নিমু ভৌমিক।

গত ২ বৈশাখ কাঁচরাপাড়ার রেল ইনস্টিটিউট মঞ্চে রেলওয়ে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নমস্কার নৃত্য ও শিকারী নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী চন্দনা দে, রবীন্দ্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শিবানী মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী মৌলিক ও স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার কর্তৃক 'গণনায়ক' অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীকে পি জয়রাথ।

দক্ষিণী: আগামী ১০ মে, রবিবার, সন্ধ্যায় 'ত্যাগরাজ-হলে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও দক্ষিণীর দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে দক্ষিণীর শতাধিক শিল্পী সমাবেশে।

শুভ বৈশাখের আগমনে, একটি মনোজ্ঞ নৃত্য-গীত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সুর-সুন্দরের পরিচালক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্র-ভারতীর অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সুর-সুন্দরের অগ্রগতির বিশেষ প্রশংসা করেন। সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শবরী সেন, ইলা দেববর্মন, শুক্লা দত্ত, সোনালী সেন, শিখা চৌধুরী, রত্না দেবরায়, শিবরাম জানা ও অজিত উনিকৃষ্ণান। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বৈতানিক: আগামী ২৫ বৈশাখ মহর্ষি ভবনে বৈতানিকের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে আলোচনা সহযোগে 'রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হবে। এই অনুষ্ঠানটি ১৯৪৮ সালে শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে জনমানসে রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতিকে সহজ সরল করে প্রচার ও প্রসারকল্পে বৈতানিকই প্রথম এই ধরনের প্রচেষ্টা সুরু করে। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রয়ী, যুক্তিগ্রাহ্য এবং চিত্তাকর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। তারপর বিভিন্ন সময়ে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স, তানসেন সংগীত সম্মেলন, অল ইণ্ডিয়া লিটারারী কনফারেন্স, নিখিল ভারত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ছাড়াও ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে গোরক্ষপুর, পাটনা, রাঁচি, হাজারী-বাগ, বোখারো, জামসেদপুর, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর খড়গপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা-স্থানে এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে মহর্ষি ভবনে শেষবার এই অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন আগামী ৩ মে রবিবার সন্ধ্যায় বৈতানিক কার্যালয় ৪, এলগিন রোড, কলকাতা-২০-তে যোগাযোগ করতে হবে।

আজকের বাংলার শ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়কদের মধ্যে রথীন ঘোষ অন্যতম। সম্প্রতি গান্ধীদর্শনের পশ্চিমবঙ্গ প্যান্ডিনিয়নে এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করেন। এই উৎসবে বাংলার কৃষ্টি ও কলা প্রদর্শনের জন্য একপক্ষকাল সময় নির্দিষ্ট ছিল। বাংলার কীর্তন দক্ষিণ ভারতের হরিকথার সঙ্গে সমগোত্রীয়।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধারায় অনুপ্রাণিত কীর্তন গানের মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন।

তাঁর গানের বিষয়বস্তু কৃষ্ণপ্রেম ও জীবন কথা।

শ্রীঘোষের কাছে শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র। কারণ তারা কৃষ্ণের প্রতি তাদের একনিষ্ঠ প্রেমের কোন প্রতিদান চায় না। এ প্রেম নিষ্কাম, স্বার্থশূন্য, প্রত্যেক ভক্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন না কোন বর প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তা মঞ্জুরও করে-ছিলেন এবং তার চেয়েও যারা বড় ভক্ত তারা পুনর্জন্ম থেকে আত্মার মুক্তি কামনা করেন। কিন্তু গোপীরা কোন প্রার্থনাই করেননি এবং পুনর্জন্ম থেকেও মুক্তি চান নি। তারা পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য কামনা করেন এবং তাকে প্রেম নিবেদন করতে চান।

কীর্তনের একটা বিস্ময়কর এবং মুগ্ধকর গুণ এই যে যখন কীর্তন গায়ক গদ্যে কথা বলেন তখনও তিনি তাল, লয় ও ছন্দের মাধ্যমেই তা করেন এবং খোল বাদক সমভাবে তাকে অনুসরণ করে চলে, কোন সময়েই তার গলা থেমে থাকে না এমন কি যখন গায়কের কীর্তন সাময়িক থেমে থাকে তখনও না।

কীর্তন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হলেও এই কীর্তনকার অতি সহজেই তার স্বভাব-সুলভ লীলায়িত ভঙ্গীতে তা মাধুর্য-মণ্ডিত করে ফুটিয়ে তোলেন।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ
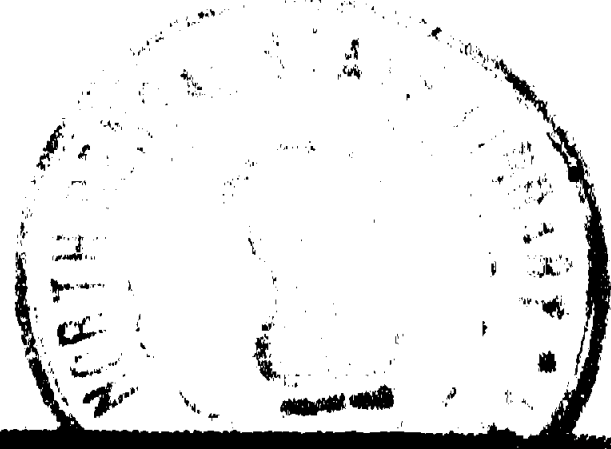
পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ছবি নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা

কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তার পিছনে থাকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তার নিজের গুণ এবং বাকী পঁচিশ ভাগ প্রচার। অবশ্য আমাদের মতকে নাকচ করে দিয়ে যাঁরা বলবেন 'দাদা, কিছুই কিছু নয়, সবটাই কপালগুণে', তাঁরা নমস্য ব্যক্তি এবং তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা চলে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য। কিন্তু কোনো রকম গুণ না থেকেও মাত্র প্রচারের জোরে কিছু, সে ব্যক্তিই হোক, আর বস্তুই হোক,—জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এমন ঘটনা একান্তই বিরল। চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও সমান কথাই বলা যায়। কাহিনী অভিনয়, সঙ্গীত, কলাকৌশল—কিছুই ভালো নয়, তবুও কোনো চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এমন আশ্চর্য ঘটনা কোনো দেশেই ঘটেনি। বহুনিন্দিত হিন্দী ছবিগুলি সম্পর্কেও সমান কথাই খাটে। সঙ্গম, লাভ ইন টোকিও, ফুল ঔর পাথর প্রভৃতি ছবির কাহিনী যতই অবাস্তব হোক না কেন, এদের সঙ্গীতাংশ, কলাকৌশল, দৃশ্য-বৈচিত্র্য প্রভৃতি নিশ্চয়ই দর্শকচিত্তকে মোহিত করবার ক্ষমতা রাখে। এবং সেই কারণেই এদের জনপ্রিয়তা।

একদা যখন উনিশ শো তিরিশ দশকে নিউ থিয়েটার্স-এর তৈরী 'চণ্ডীদাস', 'দেবদাস', 'পুরাণ ভকত', 'জিন্দগী', দুশমন, ক্রোড়পতি, প্রেসিডেন্ট, বিদ্যাপতি, বড়দিদি প্রভৃতি ছবি আসমুদ্র হিমাচলকে আলোড়িত করেছিল, তখন চলচ্চিত্র নির্মাণে বাংলাদেশ তথা কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থ টালিগঞ্জের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসংবাদী। কিন্তু একদিকে নিউ থিয়েটার্সের পতন, অপর দিকে বোম্বে টকীজের অভ্যুত্থান নিখিল ভারতীয় চিত্ররসিকদের দৃষ্টিকে বাংলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বোম্বেতে আবদ্ধ করল। এবং মাত্র বোম্বাইয়ের প্রতিই আবদ্ধ থাকত, যদি না অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মাদ্রাজের জেমিনী স্টুডিও কৃত 'চন্দ্রলেখা' দর্শকসমক্ষে সদর্পে উপস্থিত হয়ে বোম্বাইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করত। একথা

অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়

ফটো : অমৃত

ব্রজের কানাই যাত্রাভিনয়ে তরুণকুমার এবং গণেশ মুখার্জি

অনস্বীকার্য যে, দৃশ্যপটের জাঁকজমকে বোম্বাই মাদ্রাজের সংগে পাল্লা দিয়ে পারে না। সেই কারণেই বোম্বাইয়ের চিত্র-প্রযোজকেরা ইংলণ্ড, ইতালী সুইজারল্যান্ড বা জাপানে ছোটেন, ছবির মধ্যে দৃশ্য-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার জন্যে। কিন্তু কলা-কৌশলের দিক দিয়ে বোম্বাই বা মাদ্রাজ যতই উন্নত হোক না কেন, মনোগ্রাহী চরিত্র বা যুক্তিসম্মত ঘটনা সৃষ্টি দ্বারা একটি উপভোগ্য কাহিনীকে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে এদের দৈন্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এবং এ ব্যাপারে আজও তুরুপের তাস বাংলা দেশেরই হাতে আছে, এটা জানা আছে বলেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বহু প্রযোজক এই বাংলাদেশে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠান বাংলা কাহিনীর চিত্রসত্ব কেনবার জন্যে।

শুধু কাহিনী সৃষ্টিতেই নয়, সুকুমার শিল্পচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর সহজাত প্রতিভা আজও তুংগে অবস্থিত। তাই বাঙলা দেশ শুধু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকের জন্মভূমি নয়, এই বাঙলার মাটি জন্ম দিয়েছে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়ের মতো অংকন-শিল্পীকে, উদয়শংকরের মতো নৃত্য-জাদুকরকে, গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমারের মতো নাট্যপ্রতিভাকে, সত্যজিৎ রায়ের মতো চিত্রপরিচালককে। তাই কলাকৌশলের শত দৈন্য সত্ত্বেও বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চলচ্চিত্র বলতে বাঙলার ছবিই আদৃত হয়। প্রায় যে-কোনও বাঙলা ছবি মাত্র কাহিনী-গুণে যে-কোনও হিন্দী ছবি থেকে শ্রেয়। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ষোলো বছরের মধ্যে বাঙলা ছবি রাষ্ট্রপতির সুবর্ণপদক লাভ করেছে ন'বার এবং সেখানে হিন্দী ছবি পেয়েছে মোট পাঁচবার, আবার এই পাঁচবারের মধ্যে অন্তত দু'বার বাঙালীই হিন্দী ছবিকে স্বর্ণপদক পাইয়েছে (১৯৬০ 'অনুরাধা'র পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৬ 'তিসরী-কসম'-এর পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য)।

কিন্তু এই বাঙালী তার আপন রাজ্যে হিন্দী ছবি তৈরী করা বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে, পশ্চিম-বংগের তৈরী হিন্দী ছবির সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুক্তির আশা একেবারে নেই বললেই হয়। আরও বলা হয়, পশ্চিমবংগে হিন্দী ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী কোথায়? যদি বলা হয়, একদিন কানন, উমা, যমুনা, মলিনা, পাহাড়ী, বড়ুয়া প্রভৃতি হিন্দী ছবির রাজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন কেমন করে, অমনি জবাব আসবে, তখন প্রতিযোগিতা ছিল না বললেই হয়, তাই অশুদ্ধ উচ্চারণ ও ত্রুটিপূর্ণ বাচনভংগী সত্ত্বেও ও'রা মাত্র অভিনয়গুণে আসর আদায় করেছিলেন, কিন্তু আজ আর তা' হয় না।

মিথ্যা কথা! ডাহা মিথ্যা কথা! বাঙালী সব ভাষায় কথা কইতে পারে এবং বিশুদ্ধ ভাবেই। হিন্দী ছবির রাজ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অশোককুমার বাঙালী এবং ও'রই পাশে ও সংগে আছেন কিশোরকুমার, প্রদীপকুমার, বিশ্বজিৎ, জয় মুখোপাধ্যায়, অভি ভট্টাচার্য, অসিত সেন, মণি চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতি সার্থকনামা শিল্পী।

না। পশ্চিমবংগে বসে বাঙালীর হিন্দী ছবি করবার প্রতিবন্ধক অন্যত্র। ছবি তৈরী করতে বসে আজকে তার কলা-কৌশলের দিকটাকে আদপেই উপেক্ষা করা যায় না। শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান কলা-কৌশলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাঙলা দেশে আজ যে হিন্দী ছবি তৈরী করা যায় না, তার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, চিত্র-প্রযোজনায় লগ্নী করবার মতো মূলধনের এখানে একান্ত অভাব এবং ছবির কলাকৌশলের দিকটিকে চূড়ান্তভাবে নিখুঁত করবার জন্যে যে-ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের একান্ত আবশ্যক, তা' পশ্চিম-বংগে নেই। যেখানেই কলাকৌশলের সামান্যও কারচুপি প্রয়োজন, সেখানেই পশ্চিমবংগকে বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত একটিও ফিল্ম স্টুডিও টালিগঞ্জপাড়া বা কলকাতার আশেপাশে অন্য কোথাও নেই। 'মমতা' ও 'রাহগীর', এই দুখানি রঙীন হিন্দী ছবি কলকাতায় তুলতে গিয়ে এদের প্রযোজককে যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তার কথা চিন্তা করা যায় না।

তাই আজ প্রয়োজন, পশ্চিমবংগ রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পকে স্বগৌরবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে পশ্চিমবংগ সর-কারের নিজে থেকেই একটি আদর্শ ফিল্ম-স্টুডিও স্থাপন করা, যার সংগে থাকবে একটি সর্বাধুনিক রসায়নাগার, একটি সম্পাদনাবিভাগ এবং একটি সংগীতানু-লেখনের জন্যে মডেল স্কোরিং থিয়েটার। রঙীন ছবি তৈরী হবে, অ্যানিমেশান, কার্টুন ও পাপেট ছবি তৈরী হবে, কলা-কৌশলের নানা কসরৎ দেখানো সম্ভব হবে —এমন সব ব্যবস্থা রাখবার মতো করে বাঙলার সংস্কৃতির অধুনাতম শ্রেষ্ঠবাহন, এই চলচ্চিত্রশিল্পটিকে শ্রীবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার জন্যে পশ্চিমবংগ সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে কালবিলম্ব না করে। বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচতেই হবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দী ছবি ও সংগে সংগে বাঙলা ছবি করে।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময়

কলকাতার বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাব বা সোসাইটি বৈদেশিক দূতাবাসগুলির সহযোগিতায় মাঝে মাঝেই ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রোৎসব প্রদর্শন করে থাকেন। এই উৎসবে প্রবেশাধিকার থাকে মাত্র তাদেরই, যারা উদ্যোগী সংস্থার সদস্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো একটি ফিল্ম সোসাইটি যদি, ধরুন, একটি ফরাসী চলচ্চিত্রোৎসব ব্যবস্থা করেন, তাহলে অপর সংস্থাগুলিও একের পর এক ঐ একই উৎসব অনুষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সংস্থাগুলি প্রায়ই ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার সহায়তা পেয়ে থাকেন। সকলেই জানেন, ফিল্ম সোসাইটিগুলি আয়োজিত চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠানে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে না বলে বহু চলচ্চিত্রোৎসাহী দর্শকের ক্ষোভের অন্ত নেই।

তাঁদের এই ক্ষোভ কতকটা প্রশমিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত বৈদেশিক চলচ্চিত্রোৎসবগুলির মাধ্যমে। ভারত সরকার বছর দুয়েক ধরে এই উৎসবগুলির অনুষ্ঠান করছেন ভারত এবং পূর্ব ইয়োরোপস্থ কতকগুলি দেশের সঙ্গে সম্পাদিত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে (কালচারাল একসচেঞ্জ প্রোগ্রাম)। সম্প্রতি আমরা দেখলাম হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব এবং কিছু আগে দেখেছি চেকোশ্লোভেকীয় উৎসব। সপ্তাহকালব্যাপী এই উৎসবগুলি দেখতে দেখতে আমাদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জেগেছে, সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির ফলেই যখন কোনোও বিশেষ দেশের চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তখন সেই বিশেষ দেশে অত্যান্ত স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের ব্যবস্থা হয় না কেন? ভারতীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রককে এ সম্পর্কে চিঠি লিখেও কোনো জবাব আদায় করতে পারিনি। হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে ওদেশ থেকে আগত দুই সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম, অন্তত বছর দশেক আগে ওঁদের দেশে কিছু ভারতীয় ছবি দেখানো হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে রাজকাপুর অভিনীত 'শ্রী-৪২০' ছবিটিও ছিল। তাঁরা আরও বলেছিলেন, ওঁদের দেশে রাজকাপুর অত্যান্ত জনপ্রিয়। 'কিন্তু তারপরে আর যায়নি কেন?', এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা অত্যান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন, 'প্রশ্নটি আপনাদের সরকারকে করুন।'

১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত চেকোশ্লোভেকীয় চলচ্চিত্র উৎসবের বিনিময়ে চেকোশ্লোভেকিয়াতে কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি কেন, এ প্রশ্ন শুধু আমাদের মনকেই আলোড়িত করছে না, প্রাগে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কর্তাদেরও যথেষ্ট বিচলিত করেছে। চেক ফিল্মজগতের কর্মকর্তারা এ সম্পর্কে আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। অথচ চেকোশ্লোভেকিয়ার বৈদেশিক চলচ্চিত্র আমদানীকারকেরা আমাদের সরকারী কর্তাদের বেশ ভালোভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওখানকার জনসাধারণ ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখতে খুবই আগ্রহশীল।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে চেকোশ্লোভেকিয়া অন্তত ২০ খানি ভারতীয় ছবি কিনেছে এবং ওখানকার দর্শকরা তাঁদের মধ্যে 'আওয়ারা', 'ঝান্সী কী রাণী' প্রভৃতি ছবি বারংবার দেখেছে। এই সময়ের মধ্যেই (১৯৩৭) রাজকাপুর প্রযোজিত ও শম্ভু মিত্র পরিচালিত 'জাগতে রহো' ছবিখানি কার্লোভী ভেরীর চলচ্চিত্রোৎসবে 'গ্রাঁ প্রী লাভ করে। ১৯৫৮ সালে 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবির নায়িকা শ্রীমতী নার্গিস সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিবেচিত হন। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয়, চেকোশ্লোভেকিয়ার

আদমি আউর ইনসান/সায়রা বানু

কোনো ছবি আমাদের ভারতে ব্যবসায়গত-ভাবে প্রদর্শিত হবার সুযোগ লাভ করেনি। এবং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা। ইংরাজী সাব-টাইটেল যোগ করলে বহু চেক ছবিই যে ইংরাজী ছবির দর্শকদের মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে, এ জ্ঞান তাঁদের নেই।

চেকোশ্লোভেকিয়া তথা অন্যান্য দেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যে ভারত সরকারের দায়িত্ব কতখানি (কিছুটা নিশ্চয়ই আছে), তা জানা না থাকলেও আমাদের চলচ্চিত্রজগতের প্রতিপত্তিশালী কর্মকর্তারা যে বহুলাংশে দায়ী, এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। তাঁরা তাঁদের ফিল্মের একটি কপিও বিদেশে পাঠাতে নারাজ। জিজ্ঞেস করলে শুনবেন, 'কি হবে, পাঠিয়ে? দুটো পয়সা আসবে কি? শুধু শুধু একটা প্রিন্ট আটকে রাখা।' বহির্ভারতীয় ব্যবসায়কে সম্প্রসারিত করার জন্যে যে বিজ্ঞাপনস্বরূপ চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা সম্ভবত তাঁরা স্বীকার করেন না। এখানে ভারত সরকারেরও কিছুটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। বিদেশে ভারতের চেহারাকে তুলে ধরতে চলচ্চিত্র যে আজ শ্রেষ্ঠ বাহন, এ-তথ্যকে যদি তাঁরা স্বীকৃতি দেন, তাহলে বিদেশভূমিতে চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজনকে সম্ভব করে তোলবার জন্যে তাঁদের সর্বতোমুখী প্রয়াস করতে হবে। এক, ভারতে প্রস্তুত বছরের বিভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে সংগ্রহ করতে হবে। দুই, বিদেশের প্রতিটি ভাষায় ছবিগুলির কাহিনীর সারাংশ তৈরী করাতে হবে। তিন, কাহিনী বোঝাবার জন্যে দৃশ্যগুলিতে ব্যবহৃত অপরিহার্য সংলাপগুলির ভাষান্তর করাতে হবে এবং সেগুলিকে সাব-টাইটেল হিসাবে লেখাতে হবে। চার, কোনো বিশেষ দেশের জন্যে ছবি মনোনয়ন করবার ক্ষেত্রে সেই দেশের দর্শকসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবৃত্তি, সাধারণ মান প্রভৃতি সম্পর্কে সর্বদাই ওয়াকিবহাল হতে হবে। পাঁচ, চলচ্চিত্রোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে যথেষ্ট আগে থাকতে উপযুক্ত প্রচারকার্য চালাতে হবে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করতে হবে। এবং এই সব কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করবার জন্যে ভারত সরকারকে বিদেশের বাজারে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে একটি স্থায়ী বিভাগ খুলতে হবে। এ বিষয়ে ফিল্ম এক্সপোর্ট কর্পোরেশনেরও হয়ত দৃষ্টিকে সজাগ করা প্রয়োজন। —নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

আমি কি বলব : গত ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় শিবাজী সংঘের শিল্পীরা নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীলের 'আমি কি বলব' নাটকটি মহাজাতি সদনে অভিনয় করেন। আত্মভোলা আদর্শবাদী ডাক্তারের জীবনের এক নাটকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাটকের কাহিনী। চরিত্রানুগ অভিনয় করেন দিলীপ বসাক, দীপ্তিকুমার শীল ও বিশ্বনাথ রায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন—মিহিরলাল চন্দ্র, প্রদীপকুমার শীল, অশোক চন্দ্র, মদনমোহন মজুমদার ও ডাঃ বিমলকুমার চন্দ্র। আবহ-সুর শুভময় গুপ্তের। নির্দেশনা নাট্যকারের।

কাঞ্চনরঙ্গ ও লৌহকপাট : গত ১৭ ও ২১ এপ্রিল ডি ভি সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ অভিনয় করলেন যথাক্রমে কাঞ্চনরঙ্গ ও লৌহকপাট। প্রথমদিনে অভিনীত হয় কাঞ্চনরঙ্গ। নাটকটি সুন্দর হয়ে উঠেছে সাবলীল দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ছায়া বিশ্বাস ও পুষ্প দাস। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন কৃষ্ণা বসু, বন্দনা মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে মঞ্চস্থ হয় জরাসন্ধের লৌহকপাট। দলগত ও একক অভিনয় শিল্পিবৃন্দের বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। সমীর গুহ, কে এল রায়চৌধুরী, দেবনাথ চক্রবর্তী এঁদের অভিনয়-চাতুর্য অনস্বীকার্য। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সুশীল দাস রাসবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দাস। স্ত্রী চরিত্রে সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। নাটক দুটি পরিচালনা করেন শ্রীজ্যোতির্ময় দাস

পিযূষ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত সোনাবৌদি চিত্রে ননী গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন দাস, সাধন সেনগুপ্ত এবং সংঘমিত্রা সেন।
ফটো : অমৃত

ও প্রভাত বকসী। মঞ্চসজ্জা ও আলোর কাজ ভাল।

নান্দনিক সম্প্রদায় আগামী ২ ও ৩ মে রাঁচীতে 'শুধু ছায়া' ও 'রজনীগন্ধা', ১২ মে দিল্লীতে 'স্বপন যদি মধুর এমন' এবং ১৩ মে বিশ্বরূপায় 'রজনীগন্ধা' নাটক মঞ্চস্থ করবে। পরিচালনা ও রবি[illegible] ও প্রধান ভূমিকায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পার্থ ভট্টাচার্য, প্রণব ব্যানার্জী, শিপ্রা সাহা ও সন্ধ্যা সনজু।

বিবিধ সংবাদ

আগামী ৬ মে মহাজাতি সদনে সাড়ে ছটায় তরুণ অপেরার **লিনিন** অভিনীত হবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগে বহু তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে এবং লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক অনাড়ম্বর সভায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে নিহত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের স্মৃতি তর্পণ করা হয়। সভায় দেশাত্মবোধক সংগীত, আবৃত্তি এবং রূপদক্ষ রচিত একাঙ্ক নাটক 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' পাঠ করা হয়। এরপর কলকাতার অন্যতম সুখ্যাত নাট্য-সংস্থা 'শিল্পী মহল' কর্তৃক পার্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত মিনি নাটক 'দুটি মাত্র চরিত্র' অভিনীত হয়। এদিন আগামী বছরের নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়। সভান্তে উপস্থিত সকলে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে খিদিরপুর মিতালী সংঘের রজত-জয়ন্তী পূর্তি উৎসব সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালকে সম্বর্ধনা কালে রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী (বিশিষ্ট অতিথি) উপস্থিত ছিলেন। নাট্যকার মন্মথ রায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভাপতিত্ব করেন ডঃ বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে মঞ্চস্থ হয় বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস' ও সি এল টির 'সঙ অফ ইন্ডিয়া'। এছাড়া সংগীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় অংশ নেন।

সম্প্রতি মূকাভিনেতা তপন দত্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একক অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শুধু বাংলা নয় বাংলার বাহিরে উড়িষ্যা, বিহার, আসাম প্রভৃতি জায়গায় নির্বাক অভিনয় পরিবেশন করে চিন্তার স্বাক্ষর বহন করেন। শ্রীদত্তের ফিচারের মধ্যে যেগুলি বিশেষ রেখাপাত করেন যেমন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, চোর, টেস্ট ক্রিকেট, লেনিন এবং হতাশার জীবন প্রভৃতি। শ্রীদত্ত মূকাভিনয় ছাড়া হাস্য-কৌতুকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশংসার দাবী রাখেন। মূকাভিনেতা তপন দত্তকে আগামী কয়েকটি ছায়াছবিতে কৌতুক চরিত্রে দেখা যাবে।

ত্রিশটি বিদ্যালয়ের পাঁচ হাজার শিশু তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা মা-বাবা, বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, নাট্যকার, ক্রীড়াবিদ ও শিশুদরদী ব্যক্তিবর্গের এক বৃহৎ সমাবেশে শিশুনিধি শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'ফাল্গুনী' সম্প্রদায়ের শিল্পীবৃন্দ কন্ঠে বিশ্বশান্তি গানের

সুনীল বসু মল্লিক পরিচালিত জয়জয়ন্তী চিত্রে উত্তমকুমার এবং অনুভা ঘোষ
ফটো : অমৃত

মাধ্যমে শিশু উৎসব-এর পুরস্কার বিতরণী সভার উদ্বোধন করেন গত ১২ এপ্রিল রবিবার নাকতলা হাইস্কুল মাঠে। এই উৎসব আরম্ভ হয় ১০ এপ্রিল এবং সমাপ্তি ঘটে ১২ এপ্রিল। ঐদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তরুণ নাট্যকার-পরিচালক ও শ্রমিকনেতা নীলয় চৌধুরী. তিনি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেনিন কবিতা আবৃত্তিও করেন। শিশু উৎসব পরিষদের সভাপতি ও উপদেষ্টাগণ তাদের ভাষণে বলেন যে, শিশু শিক্ষায় শিশু উৎসব-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত যেসব অনুশীলন হয়েছে তার ব্যাপক প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। ঘটনাটি আঞ্চলিক হলেও এর ফলাফল জাতীয় শিক্ষার অঙ্গ।
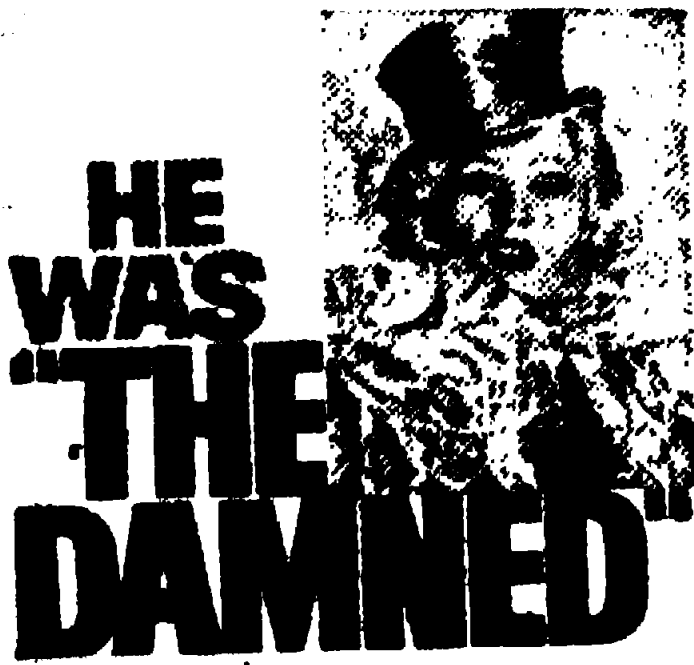
খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী পুরস্কার বিতরণ প্রসঙ্গে উপস্থিত সকল শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এই শিশু উৎসব-এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক খ্যাত-নামা অভিনেতা শ্রীবিশ্বজিৎ পরিষদ সদস্যদের সাথে এলাকার শিশুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শিশুদের জন্য 'রঙ্গমঞ্চ' স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সর্বশেষে সুখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীতিমির বরণ শিশুদের জন্য সরোদ বাজিয়ে শোনান এবং তাকে সহযোগিতা করে দশ বছরের আকাশবাণীর শিশুমহলের শিল্পী কুমারী পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত পয়লা বৈশাখ অতিঝিল কলেজ ময়দানে দমদম আঞ্চলিক ব্রতচারী নায়ক মণ্ডলীর পরিচালনায় নববর্ষ উৎসব প্রতি-পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রধান শ্রীসুনীল মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে দমদমে ব্রতচারী আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভা-পতির ভাষণে দমদম আঞ্চলিকের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আঞ্চলিক নায়কমণ্ডলীর কার্যধারা বিশ্লেষণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নায়ক প্রধান শ্রীশশির মিত্র। অনুষ্ঠানে সমবেত কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, লোকনৃত্য ও সংগীত, ব্রতচারীভঙ্গি প্রদর্শনী, রায়বেঁশে, কাঠি, লাঠি খেলা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

গিরিশ স্মারক আলোচনা সভা। গিরিশ নাট্য সংসদ-এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ৩রা মে রবিবার রাত ৭টায় ১নং লক্ষ্মী দত্ত লেনস্থ লক্ষ্মীনিবাসে গিরিশ স্মারক আলোচনা সভার সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ সভায় পৌরোহিত্য করবেন এবং প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ও সাংবাদিক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া গিরিশ সঙ্গীত, আবৃত্তি সভায় পরিবেশিত হবে। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব। রবীন্দ্র-সদন আগামী ৯ মে থেকে ১৯ '৭০ পর্যন্ত ১১ দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে-ছেন। ৯ মে সকালে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী ও বিশিষ্ট গুণী-জনের কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবে-দনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হবে। সদনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা রঙ্গসভা, রবীন্দ্রভারতী, বৈতানিক, মাস থিয়েটার্স, সুর মন্দির, সঙ্গীতচক্র, রবীন্দ্র কলাকেন্দ্র, মল্লার, সৃজন, গীতমালিকা, সুরসঞ্চয়ন ও উদ-

যাদবপুর টালিগঞ্জ কেন্দ্রীয় শিশু উৎসব সমাপ্তি দিবসে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী কানন দেবী।
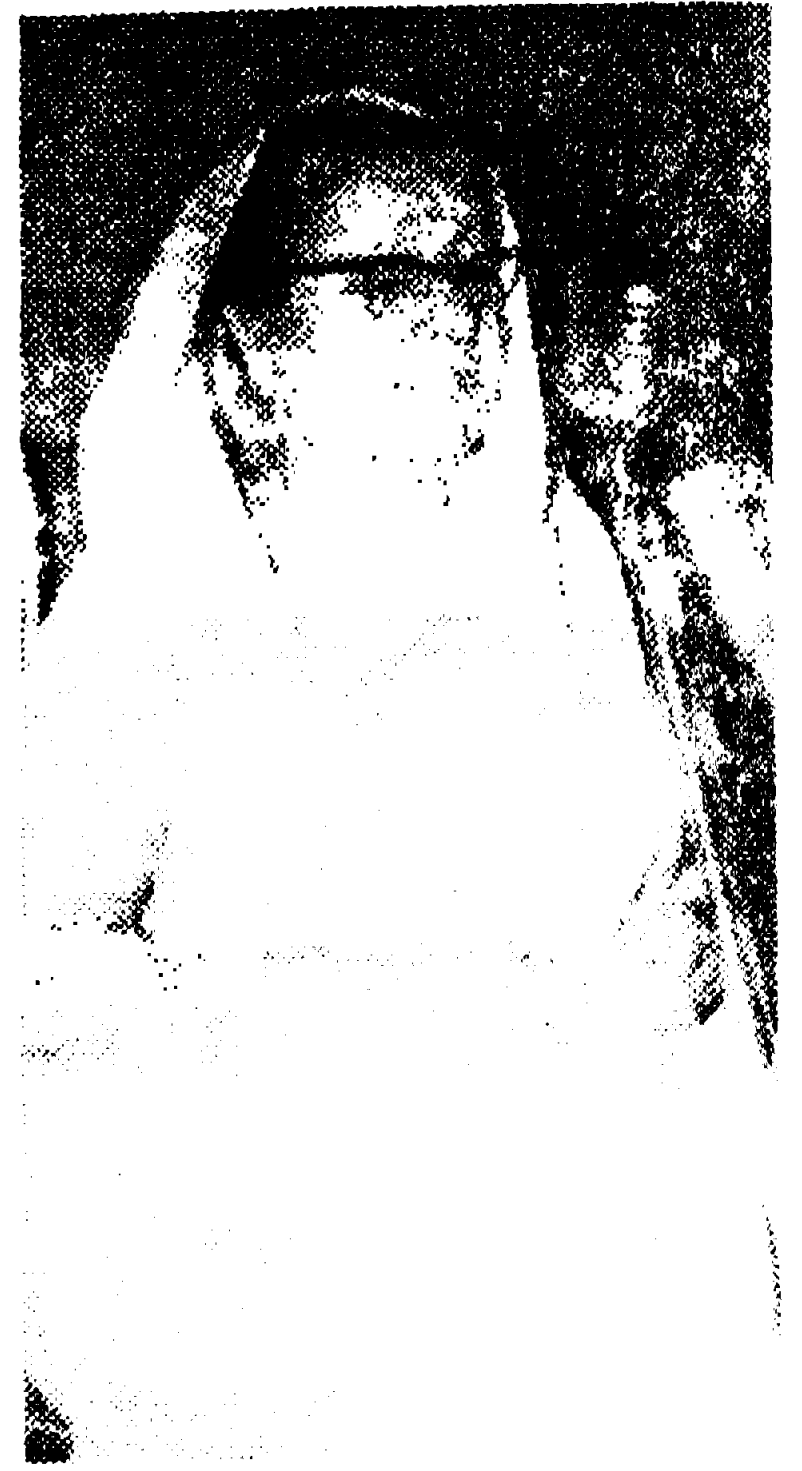
শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ প্রমুখের অংশ গ্রহণে এই উৎসব সংগঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে একদিন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সমন্বয়ে একটি রবীন্দ্রসংগীত আসরের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে 'সোনাই দীঘি' মঞ্চস্থ করলেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। সোনাই দীঘির যাত্রাভিনয় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। যাত্রা-নাটককে মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য যথেষ্ট সাহসি-কতার প্রয়োজন। স্বীকার করতে দ্বিধা

নেই, সেই সাহসের পরীক্ষায় 'গিলাণ্ডাস' আরবুথনট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

যাত্রা-সফল এই নাটকের চরিত্র-চিত্রণই হলো মূল কথা। তবে, মঞ্চে দলগত অভিনয় সবিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে এঁদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত অভিনয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন ভাটুকের চরিত্রে শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান তাঁর যথার্থ প্রাপ্য। আরেকটি সুন্দর চরিত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (নিশাচর)। কিন্তু ভাবনা কাজীর অভিনয় ততটা আকর্ষণীয় হয়নি, অপর্যাপ্ত সুযোগ সত্ত্বেও। পরিচালনার কাজ প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (হাওড়া শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা রংমহল মঞ্চে 'জরাসন্ধের লৌহ-কপাট' মঞ্চস্থ করলেন। নাটকের অভিনয়ে ও দলগত নৈপুণ্যে এই ক্লাবের সভ্যেরা উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে সুঅভিনয় করেন বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জি (মলয়), কানাইলাল দত্ত (কাসেম ফকির), অমর চক্রবর্তী (বদর মুন্সী), ভোলানাথ গাঙ্গুলী (দলরাজ) ও অজিত ভট্টাচার্য (অজিত)। অন্যান্য চরিত্রে চরিত্রানুগ অভিনয় করেন : সুনীল চ্যাটার্জি, অমল ব্যানার্জি, সমরেন্দ্রনাথ বোস, অনিল দে, সূর্যদেব ভট্টাচার্য, তারক চ্যাটার্জি, জয়দেব গাঙ্গুলী, স্বদেশরঞ্জন দাস, রথীন চক্রবর্তী, অরুণ নন্দী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার দে, সর্বাণী দে, বিপাশা গোস্বামী ও নূপুর গোস্বামী। নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের।

গত ১৮ই এপ্রিল '৭০ শনিবার বেহালা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ছেঁড়া তমসুক' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শ্রীশীতল দাসগুপ্তের অভিনয় বিশেষ উল্লেখ্য। পরে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, বলরাম দাস, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রণব ব্যানার্জী, অরুণ বসু, শ্রীমতী পলি চট্টোপাধ্যায়, পলি দে যন্ত্র-সংগীতে শ্রীরমেন রায় সম্প্রদায় ও বিদ্যুত বসু সম্প্রদায়। কৌতুকাভিনয়ে শ্রীমন্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা) অনবদ্য।

শ্লোভাক চলচ্চিত্রের রজত-জয়ন্তী বর্ষ

শ্লোভাক ছবিতে সমস্যা জর্জরিত নতুন আঙ্গিকের সুস্পষ্ট বক্তব্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতার ঠিক পরেই। জন কাদারের 'লাইফ গ্রোস অন রুইনস'—এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতেই সূচিত 'বিগত অতীত' বা বর্তমান ইতিহাসের নতুন মূল্যায়ণ অথবা আগামী ভবিষ্যৎকে তুলে ধরার সুপ্রচেষ্টা।

উৎসাহিত হয়ে নবীন চলচ্চিত্রকারেরা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির কথা ভাবলেন। কিছুদিন বাদেই চিত্রজগতে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিচার ছবির অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ পাকাপাকি হল। এর মধ্যে প্রবীণ পরিচালকদের দানও অনুল্লেখ্য নয়। প্রবীণ মার্টিন ফ্রিকের 'ভের্ণিং' ছবিখানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশের মানুষদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতির সংলাপ। তবুও সেই সময় উল্লেখযোগ্য ছবি পাভেল বিলিকের 'দি উলভস লায়ারস'। শ্লোভাক জাতীয় চেতনার ঐ ঐতিহাসিক উত্থানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা ছিল উপজীব্য। শ্লোভাকদেশের গ্রাম—শান্ত, সুন্দর এক অপরূপ নির্জন ভালোলাগার ছবি—সুখ দুঃখের ককটেলে শ্যাম্পেন জাতীয় অনুভব। এ অনুভব গ্রামের প্রতিটি মানুষের। তাদের লোক-গাথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলে আরও সুস্পষ্ট ধারণায় আসা যায়। কারণ লোকগাথাগুলো গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ভাষায় এবং কাব্যমহিমায় ছন্দময়। ওরা বলেন এই লোকগাথাই তাদের জাতীয় একতা সুসংবদ্ধ করেছে। সুতরাং লোকগাথা নিয়ে তারা ছবি করলেন এবং পরিচালক ওয়াসারম্যান প্রমাণ করলেন কতখানি এর প্রয়োজনীয়তা। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এ ছবির নাম 'দি ডেভিলস ওয়াল'। লোকগাথা বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক সমস্ত ছবিগুলোতেই রয়েছে দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার উচ্ছ্বাস এবং ভবিষ্যৎ আঁকড়ে বেঁচে থাকার সুচিন্তিত ঘোষণা।

এই বেঁচে থাকার অনুভূতি নিয়ে শ্লোভাক চলচ্চিত্র শিল্প তথাকথিত সৃজনশীলতায় পৌঁছে গেল, মাত্র পঁচিশ বছরের যাদের চলচ্চিত্র ইতিহাস। মাত্র আট বছরের উজ্জ্বল সৃষ্টির ইতিহাস যাদের সম্বল, তারা গত বছরই অভাবিত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে এসেছে সৃজনশীলতার পাশপোর্ট নিয়ে একাধিক শিল্প নিপুণ ছবি তৈরি করে। প্রাক মোরেতেই শ্লোভাক চলচ্চিত্রশিল্প প্রতিভা সন্তানের জনক হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কোনো ছবি তখন এতটা সাফল্যলাভে মুখর হতে পারে নি। তুলনামূলক বিচারে শ্লোভাক চলচ্চিত্রের এখনই পরিপূর্ণ যৌবন। অভিজ্ঞতায়, সূক্ষ্ম চলচ্চিত্র চিন্তায় ওঁরা এখন অনেক দেশকেই টেক্কা দিতে পারেন।

সেই তথাকথিত প্রবাহ থেকে সর্বপ্রথম মুক্ত হলেন অর্থাৎ পুরোনো কনভেনশন ভাঙলেন তিনি হলেন পাভেল বিলিক। যাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি 'উলভস লায়ারস' হল জাতীয়তাবাদী বলিষ্ঠ বক্তব্য সুদূরপ্রসারী মানসিকতার উন্মোচন। এই শ্লোভাক চলচ্চিত্রের সূচনাতেই বলুন আর এখনই বলুন পাভেল বিলিককে কোনো অজুহাতেই ভুলতে পারা অসম্ভব।

অনেকেই ভুল করেন। ভুলটা স্বাভাবিক। কারণ কথাটা যখন উচ্চারিত হয় তখন একসঙ্গেই—চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র। চেক এবং শ্লোভাক দুটো ভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত একীভূত রূপ—চেকোশ্লোভাক সাধারণতন্ত্র। ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী পৃথক সত্তা অনুমোদিত। মোটামুটি জনসংখ্যার হিসেব : চেক—৯৮৭৬০০০ এবং শ্লোভাক—৪৫৮৫০০০। চলচ্চিত্রশিল্পকে নতুন করে ভাগ করা হয় নি। বহুদিন থেকেই তারা পৃথকভাবে কাজ করছেন। সে বয়সের হিসেব বলাই বাহুল্য পঁচিশ বছর শ্লোভাক দেশের এবং চেক দেশের চলচ্চিত্র শিল্প সত্তোর বছরের।

শ্লোভাক চলচ্চিত্র শিল্প প্রথম ধাপে বক্তব্য ও ভাবধারার দিক দিয়ে খুববেশী সাফল্য লাভ করে নি। তাই সম্ভবতঃ চিত্রামোদীদের সুনজর বহির্ভূত ছিল ব্যাপারটা, এতদিন। পরিচালক পাভেল বিলিক-এর নেতৃত্বে সুসংঘটিত হয়েছিল এক প্রযোজক গোষ্ঠী—তাঁরা নতুন আঙ্গিক এবং ভাবনার কথা সেলুলয়েডে তুলে ধরলেন। দূর হল গতানুগতিকতার ক্লান্তি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিশ্বের চলচ্চিত্ররসিকেরা বুঝলেন শ্লোভাক চলচ্চিত্র অপাংক্তেয় নয়।

প্রথম ধাপের ছবিগুলোর বিষয় ছিল : ব্যঙ্গ, হাল্কা হাসি এবং গোয়েন্দা গল্প। এমনকি বিক্ষিপ্ততাও ছিল—ছিল না অস্থিরতা, উন্মাসিকতা। ব্যক্তি মানসের মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর শ্লোভাক জাতীয়—আদর্শবাদকেও তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছিল। বক্তব্যের বিচ্ছিন্নতায়, প্রকাশভঙ্গির অনন্যতায় সমৃদ্ধ থাকলেও শিল্পগত উৎকর্ষতায় কোনোরকম ছাপ ছিল না।

এখন সেই নবাগত প্রযোজকগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসছি যাঁরা পুরোনো 'প্রটেনশন, কনভেনশন' যুগপৎ ভেঙেছেন এবং নিত্য নতুন নিরীক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছেন ভাবী চলচ্চিত্রকারদের জন্য। প্রথম দুটো ছবি শিল্পগুণে অন্বিত এবং নতুন প্রতিভাধরদের বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচায়ক। পাভেল বিলিকের 'ফর্টি ফোর'—১৯৫৭ সালে এবং 'ক্যাপটেন দাবাক'—১৯৫৯ সালে তোলা। উক্ত ছবি দুটোই যৌবনোত্তর শ্লোভাক চলচ্চিত্রকে নতুন যুগের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

বিশৃঙ্খলা, উন্নাসিকতা, অস্থিরতা প্রভৃতি একে একে এসে জুটলো। একটা নতুন মানসিকতা প্রত্যক্ষ করা গেল শ্লোভাক ছবিতে। এইসব বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির মধ্যেও শ্লোভাক চলচ্চিত্র শিল্প তার সফল অনিবার্যতায় ক্রমশঃ এগুতে থাকে প্রাগ আকাদমি অফ মিউজিক অ্যান্ড ড্রামাটিক আর্টস-এর চলচ্চিত্র বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর তৃতীয় প্রযোজকগোষ্ঠীর

'দি ডায়মন্ড্' ছবির একটি দৃশ্যে ইনগ্রিড থুলিন্ ও হেলমুট বার্জার।

আগমনে স্তানিশলাভ বারাবাস, স্টেফান উহার, মার্টিন হলগ প্রভৃতি পরিচালক-গোষ্ঠীর গতানুগতিকতার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা, শ্লোভাক চলচ্চিত্রকে দিল অনেক নতুন এবং আধুনিকতর দৃষ্টি-ভঙ্গী। চলচ্চিত্রের নব্য বাস্তবিকতার প্রবাহে চিন্তা ও প্রয়োগপন্থায় বিস্ময়কর উপহার দিয়েছেন এঁরা। এঁদের কল্পনা, সাহস এবং চিন্তা—সংযুক্তভাবে শিল্প সংস্কারে তুমুল আন্দোলন সুরু করে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ, গতানুগতিক তারকা সম্মেলন এবং দৃশ্য সংস্থাপন ও অন্টাড়ম্বরের জাঁকজমক বর্জন করেছেন। বাইরে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যক্ষ জীবনের সুখ দুঃখ ও অভিজ্ঞতাকে অনুভবের গন্ডীতে ধরে রেখেছেন যুক্তি চিন্তার মন্থর গাম্ভীর্যে, নিপুণ স্থিরতায়।

স্তানিশলাভ বারাবাস-এর 'সং অফ দি গ্রে ডোভ' ১৯৬১ সালের ছবি, স্টেফান উহার এর 'সান ইন দি নেট' ১৯৬২ সালের ছবি। 'দি অরগান' উহারের ১৯৬৪ সালের ছবি, 'দি মিরাকুলাস মেইডেন' ১৯৬৬ সালের ছবি এবং 'থ্রি ডটারস' সর্বাধুনিক ছবি, ১৯৬৮'র, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখ্য 'দি অরগান' লোকার্নোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্যপদকে ভূষিত হয়েছিল।

ঘরে বাইরে চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ সাফল্যের বন্যা বইয়ে দিলেন সবচেয়ে নতুন ও যুবক চিত্র-নির্মাতা গোষ্ঠী। ফিল্ম জগতে যাদের আয়ু সবেমাত্র দুই কি তিন বৎসর। চিত্রজগতে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং বিশেষ শিল্পকলার সূচনা প্রসঙ্গে প্রাগ আকাদমি অফ. মিউজিক অ্যান্ড ড্রামাটিক আর্টসের স্নাতক জুরাজ জাকুবিস্কোর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছাত্রাবস্থায় তোলা প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'ওয়েটিং ফর গোদা' ইতিমধ্যেই পশ্চিম জার্মানী আয়োজিত বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় গ্রাঁ প্রী লাভ করেছে। জাকুবিস্কোর প্রথম ফিচার ছবি 'ক্রুসিয়াল ইয়ারস'। তিরিশের জেনারেশনের সমস্যার ওপর একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তোলা এই ছবি শ্লোভাককে চলচ্চিত্র জগতে সর্ব-প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতির সম্মান এনে দেয়। এ ছবি সাতষট্টিতে পশ্চিম জার্মানীর ম্যান হাইমে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রচন্ড বাস্তবানুগ ও বিস্ময়কর ছবি হিসেবে সর্বোচ্চ পুরস্কার 'জোশেফ ভন স্টারনবার্গ' পুরস্কার পায়। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক চিত্র সমালোচকদের পুরস্কার 'ফিপ্রেসি' পুরস্কার এবং জুরীদের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল।

জাকুবিস্কো'র 'ডেসারটারস' ১৯৬৮ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মান-পত্র লাভ করে। এ ছবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত।

শ্লোভাক চিত্র-পরিচালকরা টেলি-ভিশনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুনামের অধিকারী হয়েছেন। তার প্রমাণ স্তানিশলাভ বারাবাস ১৯৬৮ সালে মন্টিকার্লোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টি ভি ফিল্ম ফেস্টিভালে গ্রাঁ প্রীতে সম্মানিত হয়েছিলেন। ছবির নাম 'টেমড'—ডস্টোয়ভস্কির উপন্যাস অব-লম্বনে সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন পরিচালক বারাবাস। শিল্পনিপুণ অনন্য এই ছবিটির কলাকৌশলের কাজ রীতিমত প্রশংসনীয় এবং স্বীকৃতিধন্য। তা সত্ত্বেও বারাবাস ছবির 'কনটেণ্ট' থেকে সরে আসেন নি। উপন্যাসের মূলভাব একটুও ক্ষুন্ন না করে সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এই ছবির মাধ্যমে বারাবাস দেখালেন টেলিভিশন ছবিতে উচ্চ প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যেতে পারে। সেই উৎসবের জুরীরা ছবির ক্যামেরার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন—এ ছবি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ এবং বিশ্ববন্দিত হওয়ার ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ ক্যামেরার কাজের অবদান কোনোদিনই ভোলার নয়।

মন্টিকার্লোতেই পরবর্তী চিত্র উৎসবে নবীন পরিচালক মার্টিন হুলগ টি ভি ছবিতে স্বপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ছবির নাম 'ব্যালড অফ দি সেভেন হ্যাঙড'। ছবি-খানি প্রতিযোগী ছবি হিসেবে কোনোমতে এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল। ২৫টি বিভিন্ন দেশের ৪৫টি ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে শ্লোভাক টেলিভিশন চিত্র জগতকে এনে দিল গৌরবের স্বর্ণসিংহাসন। এ ছবির কাহিনীকার একজন অখ্যাত নাম রাশিয়ান লেখক—লিওনিড আন্দ্রে ইয়েভ। চিত্রনাট্যকার বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ টিবর ভিলন্তা। মন্টিকার্লোর জুরীরা এ ছবির নির্দেশনা, অভিনয়, সম্পাদনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আরও বলেছেন : যার লেখক একজন আধুনিক গদ্য সাহিত্যের অগ্রদূত, তার পক্ষে কি করে সম্ভব হল এমন বাস্তবানুগ শ্লোভাক জীবনযাত্রার সমস্যাগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা। সত্যি তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।

এভাবেই মাত্র কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত—শ্লোভাক চলচ্চিত্র জনমানসে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। অত্যন্ত সহজ সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও গভীরতা থাকতে পারে—শ্লোভাক চলচ্চিত্রকারেরা বারবার তা প্রমাণ করেছেন। এখন বিদেশের চিত্র-প্রযোজকদের শ্লোভাক চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর সুপ্রতিষ্ঠার প্রমাণ করে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ : ফরাসী নব সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রোব গ্রিয়ের—বর্তমানে পরিচালক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। একদা বিখ্যাত ছবি রেনের 'লাস্ট ইয়ার ইন মারিয়েনবাদ' ছবির কাহিনীকার ছিলেন। সেই রোব গ্রিয়ের ব্রাতিশ্লাভার কোলিবা ফিল্ম স্টুডিওতে কলাকুশলীদের আন্তরিক সহ-যোগিতায় প্রথম যুগ্মভাবে ছবি তুলছেন। তাঁর ছবির নাম 'দি ম্যান হু লাইস'। এ ছবির নায়ক ফরাসী অভিনেতা জাঁ লুই ত্রিনটিগনান।

এ ছাড়াও ১৯৬৯ সালে বর্তমান যুব সমস্যার ওপর ভিত্তি করে জনৈক বিখ্যাত পরিচালকের ছবি 'ইডেন অ্যান্ড দেন'এর সুটিং হয়েছে। শ্লোভাক চিত্র-পরিচালক এলো দেভেলটক ও প্যারিসের ফ্রেঞ্চ কমো ফিল্ম এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রযোজনা করছেন। ছবির নাম 'পার্টি ইন দি বোটানিক্যাল গার্ডেনস'। জুরাজ জাকুবিস্কো এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুগ্মভাবে যে ছবিটি তুলছেন—গম্ভীর মনস্তাত্ত্বিক ছবিটির নাম 'বার্ডস, অরফান্স অ্যান্ড ফুলস'।

গত কয়েক বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে সৃজনশীল এই শিল্পটি অচিরেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলবে!

অথচ যে সৃজনশীলতা প্রথমে ছিল, যে বিশ্লেষণ প্রথমে ছিল—এখন তা নেই—সেই সহজ ভাবটা ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে অর্থাৎ শ্লোভাক চলচ্চিত্রকারদের মানসিক অসংযোগের তীব্র সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। এই চলচ্চিত্র ভাবনা বিশ্বের দিকে দিকে প্রভাবিত। তাই শ্লোভাক চলচ্চিত্রেও ছোঁয়া লেগেছে বিশেষ করে যখন তারা ফরাসীদের সংস্পর্শে বেশী—ফরাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছেন।

—স্বপনকুমার ঘোষ

খেলার কথা

পেলে মাঠে ফিরলেন

অজয় বসু

ফুটবল সম্রাট তাঁর নিজের রাজত্বে ফিরে আসছেন। কারণ, পেলে জুলে রিমে কাপে আবার খেলতে চলেছেন। খবরটা পাকা এবং দুনিয়ার ফুটবল অনুরাগীদের কাছে শুভও বটে।

জুলে রিমে কাপের আসর হলো বিশ্ব ফুটবলের প্রতিযোগিতাভূমি। ফুটবলের সবচেয়ে বড় আয়োজনে একালের সেরা খেলোয়াড়ের উপস্থিত না থাকার নজীরটি কেমন যেন বেমানান—যেন শিবহীন যজ্ঞের মতো। শিবকে বাদ দিয়েই যজ্ঞ বসতো যদি না পেলে তাঁর আগের সিদ্ধান্ত বদলে ফুটবল অনুরাগীদের শুভ সংবাদটি শোনাতেন।

খেলে এবং বিধিসম্মত পথে পেলের দক্ষতার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে হাত-পা, লাথি-ঘুষি-বুট ছুঁড়ে একদল মতলব-বাজ খেলোয়াড় ১৯৬৬ সালে প্রতিনিয়তই পেলেকে অকেজো করে তোলার ফিকিরে ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের রকম-সকম দেখে বিশ্ব ফুটবলের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তাই পেলে স্থির করেছিলেন যে ফুটবলের নাম নিয়ে যে আসরে খোলাখুলি মারধোরই প্রশ্রয় পায় তার সঙ্গে তিনি আর সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু গত ১৯শে নভেম্বর রিও ডি জেনেরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে পেলে তাঁর পেশাদার খেলোয়াড় জীবনের সহস্রতম গোলটি করার পর পৌনে এক লাখ দর্শক যেভাবে তাকে অভিনন্দন জানায় তাতে অভিভূত হয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে পেলে বলে ফেলেন 'এরপর যদি বিশ্ব ফুটবলে আমার দেশ ব্রেজিলের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা আমি না করি তাহলে নিজের কাছেও আমি কোনো কৈফিয়ৎ রাখতে পারবো না।' দেশবাসী তাঁকে মাথায় তুলে নেচেছে, সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, ব্রেজিল সরকার তাঁর হাজার গোলের স্মারক হিসেবে ডাকটিকিট ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। এরই বিনিময়ে পেলে বিশ্ব ফুটবল ব্রেজিলের পক্ষে খেলে তাঁর দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ফিরিয়ে দিতে চান।

পেলে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে খেলছেন মাত্র তেরো বছর। এই ফাঁকে তিনি একাই গোল করেছেন হাজারটি। নজীরটি বিস্ময়কর। বৃটিশ ফুটবলে একজন খেলোয়াড়ের গোলের রেকর্ড হলো ৪৩৪। পেলে এই রেকর্ডকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আর কেউ কোনোদিন পেলের হাজার গোলের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

হাজার গোলের নজীর কেন, খেলোয়াড় হিসেবেও পেলে এক বিস্ময়। ব্রেজিলের মিনাস গেরিয়াস প্রদেশের ছোট্ট শহর বাউরুতে এক নির্ধন পরিবারে জন্মেও পেলে শুধু ফুটবলে দক্ষতা ভাঙিয়েই কোটিপতি হতে পেরেছেন। শুধু ফুটবল খেলেই তিনি বছরে কতো টাকা যে রোজগার করেন তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও সবিনয়ে বলা যায় যে উপার্জিত অর্থের পরিমাণ বছরে এক লক্ষ ডলারের কম তো নয়ই।

তাছাড়া অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্যে পেলে মাঠের বাইরে যে ব্যবসায় হাত দিয়েছেন সেই ব্যবসাতেই সোনা ফলেছে। অনেকগুলি ট্যাক্সি, অনেকগুলি আকাশ-ছোঁয়া বসতবাড়ী এবং অফিস ভবনের, একটি সেরামিক কারখানা ও বাড়ী নির্মাণ-কারক প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। তাছাড়া প্রচার কাজে তাঁর নাম ধার দিয়ে রয়ালটি বাবদ পেলে প্রতি বছর মোটা টাকা রোজগার করেন। কিন্তু কোনো সিগারেট বা মদ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে তিনি নিজের নাম ধার দেন না। নিজেও ওসব দ্রব্য স্পর্শ করেন না এবং বলে থাকেন যে মদ্য ও ধূমপান, দুই ভাল খেলার পক্ষে মস্তো বাধা। পেলেকে ব্রেজিল থেকে সরিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে ইতালী ও মেক-সিকোর ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এক সময় দশ লক্ষ ডলারের টোপ ফেলাও হয়েছিল। কিন্তু পেলে সে টোপ না গিলে তাঁর পুরানো ক্লাব সাও পালোর স্যানটোস এফ সি-তেই থেকে যান। নিজের ক্লাব-প্রীতি কতো নিখাদ হলে এবং নিজের পকেটের সম্পত্তি কতো অপরিমিত হলে একজন পেশাদার ফুটবলার দশ লক্ষ ডলারের লোভ এড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন, তা ভাববার বিষয়।

বাউরুতে খালিপায়ে ফুটবল খেলে বছর ষোল কাটিয়ে দেওয়ার পর পেলে সাওপালোতে এসে হাজির হন যেদিন সেই-দিনেই ফুটবলে বিদগ্ধ যাঁরা তাঁরা এক পলকে দেখেই পেলেকে কিশোর প্রতিভা বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের ঠিকেয় যে ভুল হয়নি তার প্রমাণ রাখতেই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পেলে জাতীয় দলে তাঁর জায়গা করে নেন। তখন তাঁর নিজের বয়স সতেরো।

সতেরো বছরেই পেলে বিশ্ব ফুটবলে খেলতে আসেন সুইডেনে। আসেন, দেখেন এবং জয় করেন। বলতে পারি, সেই থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে পেলের যুগ প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে এবং আজও সেই যুগের গতি রুদ্ধ হয়নি। তবে ফুটবল বয়সের খেলা। পেলেও উনত্রিশ ছুঁয়েছেন। ফুট-বলে প্রতিভাও অবিনশ্বর নয়। বয়স বাড়ছে বলেই পেলের খেলার ধার ও ভার যদি অতঃপর কমতে থাকে তাহলেই বা অবাক হবার কি আছে!

পেলের কি এখন পড়ন্ত বেলা? হলপ করে কেউ বলেন নি। তবে ব্রেজিলের বিতর্কিত ম্যানেজার জো সালদানহা বলতে সুরু করেছিলেন যে তাঁর আমলে, মানে সালদানহা যখন ব্রেজিল দলের ম্যানেজার তখন পেলে কিন্তু আগের মতো খেলতে পারেন নি বা তেমনভাবে খেলতে চান নি। সালদানহা তাই পেলেকে ব্রেজিল দল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু পেলে থেকেও দল থেকে বাদ! এমন অভাবনীয় পরিস্থিতি মেনে নিতে সালদানহা ছাড়া ব্রেজিলের আর কেউই অভ্যস্ত নয়। তাই তাদের চাপে বিশ্ব ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের খেলা মেকসিকোতে আরম্ভ হওয়ার হপ্তা কয়েক আগেই জো সালদানহাকে ব্রেজিল দলের ম্যানেজার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেলেকে অপছন্দ করায় সালদানহাকে দণ্ড ভোগ করতে হলো বটে, কিন্তু পেলে সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক মূল্যায়নে সত্য কিছু আছে কিনা তাই বা কে জানে!

পেলের খেলা পড়েছে একথা বলার সাহস ওই সালদানহা ছাড়া আর কারুর হয়নি। তবে তাঁর মাঠের ভূমিকার যে হেরফের ঘটছে সে কথা শুনিয়েছেন অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই। এবং তাঁদের মতে এই পরি-বর্তন স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

পেলে আগে খেলতেন দলের আক্রমণের নেতা হিসেবে। তখন গোল করার বিশেষ দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই চাপানো হতো যেহেতু গোল করায় পেলে ছিলেন যেমন ওস্তাদ তেমনি ক্ষুরধার আক্রমণে নেতৃত্ব দেবার কৌশলও ছিল তাঁর অধিগত। কিন্তু ঠেঙিয়ে আহত করে পেলেকে অকেজো করার চক্রান্ত গড়ে ওঠার পর ইদানীং

পেলে দলের মুখ্য স্কোরার বা দলের আক্রমণের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র হিসেবে খেলছেন না। আগে তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতো বিপক্ষ দলের গোল বা পেনাল্টি সীমানার সান্নিধ্যে। ফলে ওপক্ষের খেলোয়াড়দের তাঁর ওপর নজর রাখাও সহজ হোতো।

কিন্তু ওই নজর এড়ানোর জন্যেই পেলে এখন তাঁর আগের জায়গা ছেড়ে মাঝমাঠে নেমে এসে দলের আক্রমণ গড়ার পরিকল্পনা ছকছেন। অর্থাৎ রণনীতি নির্ধারণে তাঁর কাজ এখন সেনাধ্যক্ষ বা জেনারেলের মতো। আগে নিজে খেলতেন ও গোল করতেন, এখন অন্যদের খেলাতে ও গোল করতে তিনি সাহায্য করছেন। মানে তাঁদের খেলাচ্ছেন। মাঝমাঠে এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে পেলে হয়তো বিপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অশোভন আপ্যায়ন এড়াতে পারবেন। কিন্তু আগের মতো যখন তখন গোল না করার ফলে প্রচারের সার্চ লাইটের মুখটি হয়তো তাঁর দিক থেকে অন্যত্র সরেও যেতে পারে। কারণ, সব না হলেও ফুটবলে গোল অনেকখানি। যে খেলোয়াড় গোল করেন, দর্শকদের নজর কাড়েন তিনিই।

তবে আগের মতো গণ্ডা গণ্ডা গোল না করতে পারলেও পেলেকে ঘিরে ফুটবল অনুরাগীদের মাতামাতিতে কামাই পড়বে না। কারণ ফুটবলে নির্ভেজাল দক্ষতার, সৃজনধর্মী নিপুণতার পরিচয় রেখেই পেলে যেন জীবিতকালেই কিংবদন্তীর নায়ক বনে গেছেন। তাই ফুটবল মাঠে তাঁর উপস্থিতিই অনুরাগী মহলে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বাঁধনছেঁড়া আবেগের বন্যা বইয়ে দেবেই।

পেলে কতো বড় খেলোয়াড়, চোখে না দেখে তা অনুমান করা কঠিন। তবে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত থেকে তাঁর ক্রীড়াকীর্তির মূল্যায়ন করা একেবারে অসম্ভব নয়। বিশিষ্ট সমালোচকদের মধ্যে ইংলণ্ডের ডেইলি টেলিগ্রাফের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক ডেভিড মিলারই বোধ হয় পেলে সম্বন্ধে সবচেয়ে দামী কথা বলেছেন। ইংলণ্ডের মাঠে যুগে যুগে অনেক জাত ফুটবলারের আবির্ভাব ঘটেছে। সে দেশে খেলতে এসেছেন বিদেশের অনেক গুণী খেলোয়াড়ও। অনেককেই স্বচক্ষে দেখেছেন ডেভিড মিলার। বিভিন্ন খেলোয়াড়ের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন বিচার বিশ্লেষণ কালে। তারপর রায় দিয়েছেন, না, পেলের তুলনা নেই। স্টাইল ও প্রকরণ, সক্রিয় চিন্তা ও সৃজনশীলতার কল্যাণে পেলে তাঁর ব্যক্তিগত ক্রীড়াকলার মানকে যেখানে তুলে ধরেছেন সেখানে পৌঁছানো অন্যের অসাধ্য। সত্যিই ও কাজ আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

একজন খেলোয়াড় সম্বন্ধে এই উপলব্ধি ও অভিমতই হলো এক সমালোচকের শেষ কথা। শেষ কথা বলে দিয়েই ডেভিড মিলার অন্য সমীক্ষকদের টেক্কাও দিয়েছেন।

ফুটবল মাঠের বাইরে পেলের আরও পরিচয় আছে, অন্ততঃ ব্রেজিলের অধিবাসীদের কাছে। সেখানে তিনি শখের কবি, সঙ্গীত রচয়িতা, চিত্রশিল্পী ও টেলিভিশনে অভিনেতা। আর স্ত্রী ও এক কন্যার জনক হিসেবে নিজের সংসারের প্রতি রীতিমতো সুনিষ্ঠ। সব মিলিয়ে ব্রেজিলের অধিবাসীদের কাছে পেলে চরিত্র এক আদর্শ। তবে কজন যে তাঁকে আন্তরিকভাবে সঙ্গে অনুসরণ করতে পেরেছে তা কে জানে!

খেলাধুলা

দর্শক

ইংলিস ক্রিকেট মরসুম

১৯৭০ সালের ইংলিস ক্রিকেট খেলার মরসুমে সবে আরম্ভ হয়েছে। জিলেট কাপ নক আউট ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের খেলা সুরু হয়েছে গত ২৫ এপ্রিল। কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার তারিখ আগামী ২ মে।

ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা। বলতে কি, ক্রিকেট খেলা তাদের জাতীয় জীবনের ধ্যান-ধারণা। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর কারণ—ক্রিকেট খেলায় জৌলুষ এবং সজীবতার একান্ত অভাব, মানুষের সদাব্যস্ত কর্মজীবন এবং ক্রিকেট বাদে চিত্তবিনোদনের বিবিধ জনপ্রিয় উপকরণ। খেলার মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখার মত ধৈর্য এবং পর্যাপ্ত সময় আজ কয়জনের আছে? বর্তমান কর্ম এবং সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিকেট খেলা অনেকেরই বিবেচনায় কর্মনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলায় আকর্ষণ কতটুকু? ব্যাট হাতে ঠুকঠাক আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে দলকে পরাজয় থেকে রক্ষা করা। বেশীরভাগ সমর্থকই উন্মুক্ত খেলার থেকে দলের মান-সম্ভ্রমকে বেশী প্রাধান্য দেন। তাঁদের কাছে খেলার ফলাফল ড্র হওয়া তবুও মন্দের ভাল কিন্তু দলের পরাজয় কখনই তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। এই চাপের ফলেই ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আক্রমণাত্মক নীতি ত্যাগ করে আত্মরক্ষার ভূমিকা নিয়েছেন। ক্রিকেট খেলার বর্তমান দৈন্য দশার জন্য খেলোয়াড়রাও কম দায়ী নন।

ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় দিন দিন দর্শক সংখ্যা হ্রাসের বহর দেখে কর্মকর্তারা আজ খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। গত বছর কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপে যোগদানকারী ১৭টি দলের মধ্যে মাত্র এই দুটি দল—ইয়র্কশায়ার এবং এসেক্স ক্রিকেট খেলা থেকে যা লাভ করেছিল। যে-সব খেলার বরাদ্দ সময় তিন দিন, লোকের তা দেখার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অপর দিকে খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি একদিনেই হবে এমন খেলাতেই লোকের ভিড় হচ্ছে। গত বছরের হিসাবে দেখা যায় ল্যাঙ্কশায়ার এসেক্স এবং ওয়ারউইকসায়ার ৭।৮টি রবিবারের খেলা থেকে (যার বরাদ্দ সময় মাত্র একদিন) যে অর্থ লাভ করেছে তা সারা বছরের ৩০।৪০টি কাউন্টি খেলায় (যার বরাদ্দ সময় তিনদিন) তুলতে পারে নি।

গত বছর গ্লামর্গ্যান অপরাজিত অবস্থায় কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। এ বছর তারা পাকিস্তানের খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড় মজিদ জাহাঙ্গীরকে দলে পাবে না। কারণ তিনি বর্তমানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাতেই আটকে থাকবেন।

কাউন্টি ক্রিকেটে বিদেশী খেলোয়াড়

ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলের পক্ষে বেশ কয়েকজন নামকরা বিদেশী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবেন। পাকিস্তানের এই পাঁচজন খেলোয়াড় আছেন—সারে কাউন্টি দলে ইউনিস আমেদ এবং ইন্তিখাব আলাম, ওয়ারউইকশায়ারে খালিদ ইবাদুল্লা, কেন্ট কাউন্টি দলে আসিফ ইকবাল এবং নদাম্পটনশায়ার কাউন্টি দলে মুস্তাক মহম্মদ।

ভারতবর্ষের টেস্ট খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনীয়ার যোগ দিয়েছেন ল্যাঙ্কাশায়ার দলে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে সব খ্যাতনামা খেলোয়াড় খেলবেন তাদের নাম—গ্যারী সোবার্স (অধিনায়ক নটিংহামশায়ার), রোহন কানহাই (ওয়ারউইকশায়ার), ল্যান্স গিবস (ওয়ারউইকশায়ার), ভ্যানবার্ণ হোল্ডার (ওরসেস্টারশায়ার), জন শেফার্ড (কেন্ট) এবং ক্লাইভ লয়েড (ল্যাঙ্কাশায়ার)।

অস্ট্রেলিয়ার দুই বিশ্ব বিশ্রুত টেস্ট বোলার এ্যালান কনোলী এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী খেলবেন যথাক্রমে মিডলসেক্স এবং লিস্টারশায়ার কাউন্টি দলের পক্ষে।

আগামী জুন মাস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফরের ফলে হ্যাম্পশায়ার দলের বেরী রিচার্ডস, এসেক্স দলের লী আরভিন এবং গ্লস্টারশায়ার দলের মাইক প্রোক্টার কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা দলে খেলবেন।

ইউরোপীয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় লণ্ডনের ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী মেরীলিন নফিল্ডে ৪০০ মিটার দৌড় ৫৩ সেকেণ্ডে শেষ করে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বেটন কাপ

১৯৭০ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা গত ২২ এপ্রিল সুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলের সংখ্যা ৩৬টি—এর মধ্যে বাংলার বাইরের দল ১২টি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের যোগদানের আবেদনপত্র প্রথমে বাতিল হয়ে যায়। পরে তা মঞ্জুর করা হয়। বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান এই প্রথম। এ বছরের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি বি এন আর দলের। কাস্টমস দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কারণ তাদের কোন একজন খেলোয়াড় জনৈক কর্তাব্যক্তির অনুমতি নিয়ে অপর দলের পক্ষে খেলছেন। এই ঘটনা নিয়ে কাস্টমস দল হয়ত প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত থাকতে পারে।

গত বছর বেটন কাপের ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে মোহনবাগান এবং জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালস দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতার ময়দানে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার উদ্বোধন হবে আগামী ৮ মে। ১৯৭০ সালের প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি দল অংশ গ্রহণ করবে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা এই দুটি পর্যায়ে হবে—প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা এবং ফিরতি খেলা। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় প্রতিটি দল প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে ম্যাচ খেলে মোট ১৯টি ম্যাচ খেলবে এবং চূড়ান্ত তালিকার প্রথম পাঁচটি দলই ফিরতি খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে। চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং ফিরতি খেলার অর্জিত পয়েন্ট যোগ করা হবে।

গত বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের প্রথম লীগের খেলা পড়েছে নবাগত ভারতী সংঘের বিপক্ষে, ২১ মে।

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের খেলা

পূর্বাঞ্চলের 'এ' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ৫-০ খেলায় জাপানকে এবং পূর্বাঞ্চলের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় সিংহলকে পরাজিত করার সূত্রে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে।

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার এই ফাইনাল খেলাটি হবে আগামী ২ মে, বাঙ্গালোরে। প্রখ্যাত নীল ফ্রেজারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান টেনিস দলটি ভারতবর্ষে এসে গেছে। দলে আছেন মোট চারজন খেলোয়াড়—রে রাফেলস, জন আলেকজাণ্ডার, ডিক ক্রিলি এবং এ্যালান স্টোন।

এখানে উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়া মোট ২২-বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়ে সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। অপর দিকে ভারতবর্ষ মাত্র একবার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে (১৯৬৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪-১ খেলায় পরাজয়)।

ইউরোপীয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের ইউরোপীয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি খেতাবের মধ্যে বৃটেন ২টি, সুইডেন ২টি

ইংলিশ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস খেতাব বিজয়িনী ইংল্যাণ্ডের মেরী রাইট (ডান দিকে) এবং কারেজা ম্যাথ্যুজ। তাঁরা ফাইনালে রুমানিয়ার মেরিয়া আলেকজান্দ্রু এবং কারমেন ক্রিসানকে ১৪-২১, ২১-১২, ২২-২০, ১৪-২১ ও ২১-১৯ পয়েন্টে পরাজিত করেন।
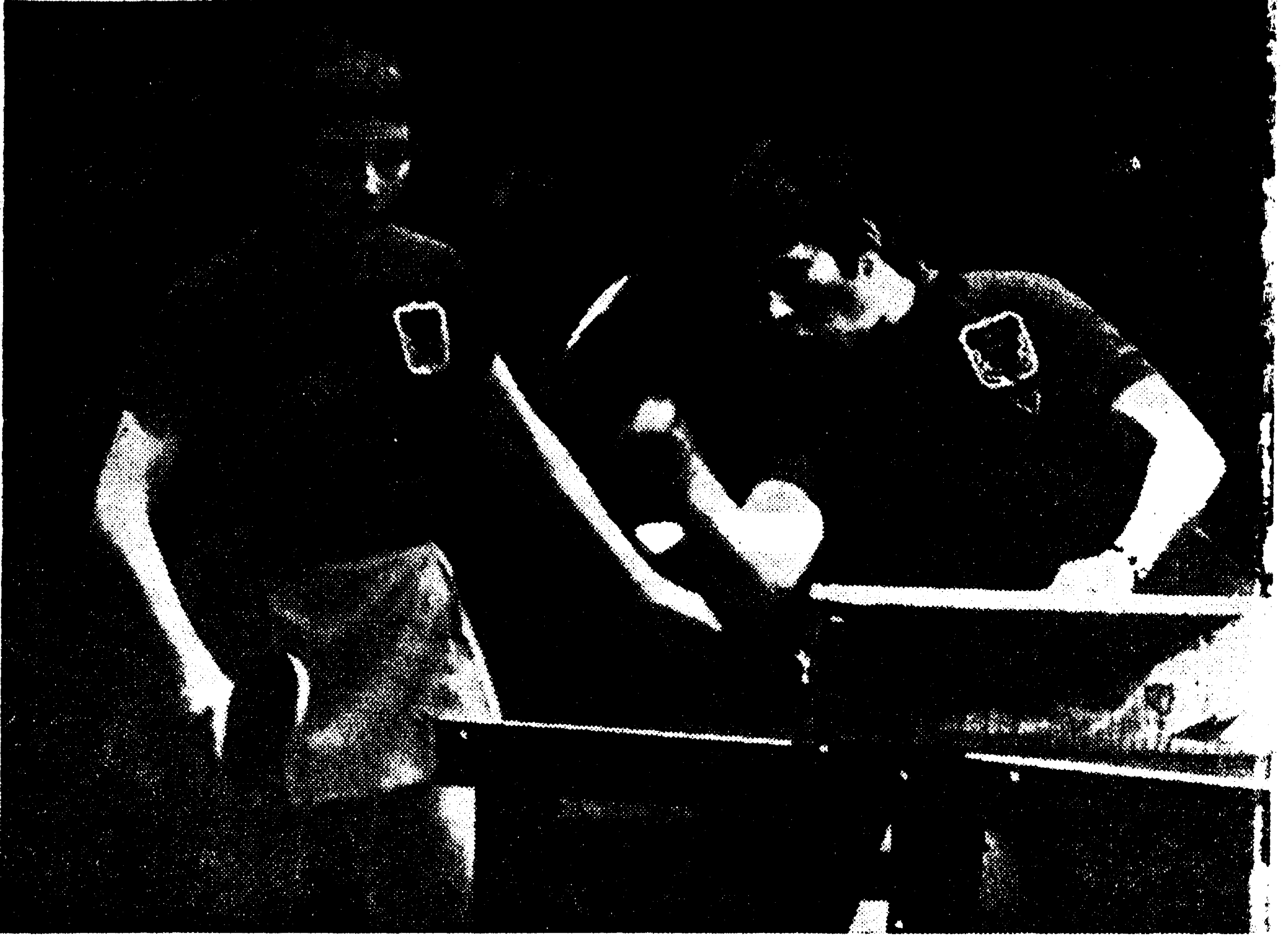
এবং ডেনমার্ক ১টি খেতাব জয়ী হয়েছে। বৃটেনের শ্রীমতী পি হোয়েটনাল মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। খেতাব জয়ী হয়েছেনঃ পুরুষদের সিঙ্গলসে—এস জনসন (সুইডেন), মহিলাদের সিঙ্গলসে—ইভা টুয়েডবার্গ (সুইডেন), পুরুষদের ডাবলসে—হ্যানসেন এবং ওয়ালসো (ডেনমার্ক), মহিলাদের ডাবলসে—এম বকসাল এবং পি হোয়েটনাল (বৃটেন), এবং মিক্সড ডাবলসে—এডি এবং পি হোয়েটনাল (বৃটেন)।

আলোচনা

শ্রীহীরেন চক্রবর্তী (বোম্বাই) প্রশ্ন করেছেন, অমৃতের গত ৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'টেস্ট ক্রিকেটে উইকেটকিপিং' নিবন্ধের সঙ্গে যে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ডন ট্যালন এবং লিভিংস্টোনের নাম না-থাকার কারণ কি?

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যাঁরা এ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে উইকেটকিপিং করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই পরিসংখ্যান একটি তালিকায় দিতে হলে যথেষ্ট স্থান দরকার। তাই সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে যাঁদের মোট ডিসমিসাল সংখ্যা ১০০ বা তার বেশী অথবা যাঁদের মোট রান সংখ্যা ২০০০ বা তার বেশী—এই দুই যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে অমৃতে প্রকাশিত তালিকাটি তৈরী হয়েছে। একই তালিকায় পৃথকভাবে উইকেটকিপারদের ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিংয়ের দক্ষতা দেখানো হয়েছে। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে তালিকার বৈশিষ্ট্য ধরতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ডন ট্যালন কোনমতেই স্থান পেতে পারেন না যেহেতু তাঁর মোট ডিসমিস্যাল সংখ্যা ৫৮ এবং মোট রান সংখ্যা ৩৯৪।

লিভিংস্টোনের কেস আরও খারাপ, কারণ তিনি কোন সরকারী টেস্ট ম্যাচই খেলেননি।

অমৃতের গত ৪৬ সংখ্যার চিঠি বিভাগে (পৃষ্ঠা ৫৬৫) শ্রীঅভিজিত কারের একটি চিঠি এবং সেই চিঠি সম্প লেখকের উত্তর ছাপা হয়েছে।

ডেনিস লিণ্ডসে কোন টেস্ট খেলায় ক্যাচ ধরেছিলেন তা উল্লেখ করতে না পা কারণে পত্রলেখক দুঃখ প্রকাশ করেছে তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, অস্ট্রেলি বিপক্ষে জোহানেসবার্গের প্রথম বেসরব টেস্ট খেলায় (১৯৬৬ সালের ডিসে ২৩—২৮) ডেনিস লিণ্ডসে ৮টি ক্যাচ ছিলেন। তাছাড়া লিণ্ডসে সম্পর্কে অ উল্লেখযোগ্য খবর আছে—যেমন অস্ট্রেলিয় বিপক্ষে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর মোট ডিসমিস্যাল ছিল ২৪টি (সব-গুলিই ক্যাচ)। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক সিরিজে সর্বাধিক ডিসমিস -এর বিশ্বরেকর্ড ২৪টি এবং সর্বা ক ক্যাচের বিশ্বরেকর্ড ২২টি।

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।